পৌরাণিকা

বিশ্বকোষ হিন্দুধর্ম

Encyclopedia Hinduism

প্রথম খণ্ড অ—ন

বিশ্বকোষ হিন্দুধর্ম

Encyclopedia, Hinduism

প্রথম খন্ড অ—ন

অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
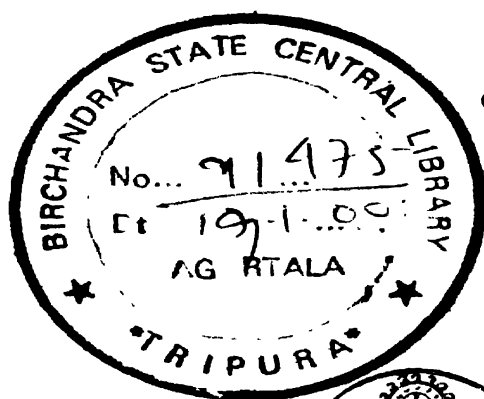
ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা—১২

ভ্রম সংশোধন

অকসস্	পাতা ২		স্বস্থানে যাবে
বরাব	পাতা ৭	পংক্তি ১১	হবে বিরাব
অগ্নীধ্র	পাতা ২০		হবে আগ্নীধ্র
অথর্বার কাছে ইনি	পাতা ২৬	পংক্তি ২২	হবে অথর্বার কাছে অঙ্গির
অমা	পাতা ৮০		জুড়ুন দ্রঃ-তুষ্টি
শাপ	পাতা ৮৩	পংক্তি ১২	হবে পাপ
উৎকোচ	পাতা ২১১		জুড়ুন দ্রঃ-ঘুস
জলমূর্তি	পাতা ২৪৬	পংক্তি ২৯	হবে জলমূর্তির স্ত্রী
মহাব্রজে	পাতা ২৫৩	পংক্তি ১৭	হবে মহাহ্রদে
মতান্তরে	পাতা ৫২০	পংক্তি ২১	হবে পক্ষান্তরে
জম্বুমালিকা	পাতা ৫৭৬	পংক্তি ৯	হবে জম্বুলমালিকা
৫১০-৫১৫	পাতা ৬১৪	পংক্তি ১৫	হবে ৫১৫-৫১০
জ্যোষ্ঠিল	পাতা ৬৪০	পংক্তি ৩৫	হবে জ্যোষ্ঠিল
দেবতা	পাতা ৭১৪	পংক্তি ৪	জুড়ুন দ্রঃ-যাস্ক
শৈবা	পাতা ৭৭৬	পংক্তি ২২	হবে শৈব
বিষ্ণুপুত্র কশেরু	পাতা ৭৮৭	পংক্তি ৩১	হবে বিষ্ণুপুত্র। কশেরু
তুর্ব, সু	পাতা ৭৯৮	পংক্তি ৩৩	হবে তুর্বসু
বৃত্ত	পাতা ৮০১	পংক্তি ১৫	হবে বৃত্র

ভূমিকা

দ্বিতীয় সংস্করণ

বেদ থেকে সন্তোষী মার পাঁচালি সবই সাহিত্য। এর মধ্যে ঋকবেদ, রামায়ণ ও মহাভারত ইত্যাদি সামান্য কয়েকটি বই মৌলিক। বাকিগুলি প্রায় সবটাই চর্বিত চর্বণ। ঋক্‌বেদে স্থানে স্থানে কবিতা আছে। ঋক্‌বেদ অশ্ববাহিত অর্থে সভ্যতার বিকাশের একটা ইতিহাস, সোমরসে পিচ্ছিল এবং ঘৃতাহুতি ও পুরোডাশের গন্ধে মনোরম। ঋক্‌বেদে তদানীন্তন কালের 'আধুনিক' কবিদের লেখা 'প্রহেলিকা' মত অংশও আছে। এগুলি বিভিন্ন ঋষির রচনা; যেভাবে যা দেখেছিলেন সেই ভাবে লিখেছিলেন; ফলে যে কোন পুরাণ থেকে এগুলি প্রাণবন্ত। আর রামায়ণ ও মহাভারত চন্দ্র ও সূর্য। পুরাণকাররা প্রায় কেউ সাহিত্যকার নন। মার্কণ্ডেয় ইত্যাদি দু একটি পুরাণ বাদে পুরাণকারদের স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা ছিল না। আরো একটা কথা রামায়ণের বা অন্যত্র বানরদের বা রাক্ষসদের অনেকে ভারতের আদিবাসী বলে ব্যাখ্যা করতে চান। এঁরা রূপকথা কি জিনিস জানেন না; এঁরা পদ্মবনে মত্ত বারণ। আমার এই কোষ গ্রন্থে রাক্ষসরা রাক্ষস, তবে কশ্যপ সন্তান এবং ব্রাহ্মণ। অর্থাৎ ধর্মীয় গ্রন্থগুলিকে সাহিত্য হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে এই অভিধান।

দেবতা (দ্রঃ) কজন কেউ জানে না। ভারতে ধর্মীয় কোন এক নায়কত্ব ছিল না। স্বাধীন চিন্তা করলে এখানে কোনদিন অপঘাতে মৃত্যু হত না। ফলে এখানে ধর্ম বহু দেবতা নিয়ে গণতন্ত্র; যদিও পুরোহিতদের হাতে পড়ে অনেক সময় গণিকা তন্ত্রে পরিণত হয়েছিল বা হয়েছে। ধর্ম এখানে কোন দিনই সামন্ত তন্ত্রের হাতিয়ারে পরিণত হয়নি ফলে ধর্ম নিয়ে কোন দিনই এখানে রক্তের হোলি খেলা হয়নি। ধর্মীয় সাহিত্য কোথাও বা অচ্ছোদ সরোবরে শতদল হয়ে ফুটেছিল আবার বহু স্থানে কচুরিপানাতে পরিণত হয়েছিল। এখানে ৩৩-কোটি দেবতা ছিল। সঙ্গে ছিল অকপট স্বীকতি রূপং রূপ-বিবর্জিতস্য ভগবতঃ যৎ ধ্যানেন কল্পিতং ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতঃ যৎ তীর্থযাত্রাদিনা, স্তুত্যা নির্বচনীয়তা দূরীকৃতা যন্ময়া ক্ষন্তব্যং জগদীশ তৎ দোষত্রয়ম মৎকৃতম্। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই বিশ্বকোষ রচিত হয়েছে।

অর্থাৎ এই বইয়ের প্রতিটি কাহিনীর মধ্যে তদানীন্তন যুগ মিশিয়ে আছে। বশিষ্ঠ নিজে ছিলেন বিরাট দুগ্ধপ্রতিষ্ঠানের সর্বস্বত্ব মালিক, গোয়ালা। কামধেনুর দেহ জাত সৈন্যরা ছিল দুগ্ধপ্রতিষ্ঠানের কর্মচারী কোল, ভিল, যবন, ইত্যাদি ইত্যাদি। বশিষ্ঠ কি ভাবে দুধ বিক্রি করতেন জানা নেই। ঘোষযাত্রায় কৌরবদের এবং বৃন্দাবনের দুগ্ধ-প্রতিষ্ঠানও পরিচিত। প্রোক্ষিপ্ত গোমাংস ব্যাপক ভক্ষিত হত। ফলে এমন অবস্থা দেখা দিয়েছিল যে গোহত্যা নিষিদ্ধ করতে হয়েছিল। আবার চিঞ্চা (দ্রঃ- বুদ্ধদেব) কাহিনীতে

মনে রাখতে হবে, মানুষ কতটা নীচ হতে পারে। অবশ্য এইটাই স্বাভাবিক। আমার দৃষ্টিকোণে এগুলি এই ভাবে ফুটে ওঠে।

আমাদের জীবন বাদ ছিল চরৈবেতি। ফলে বিরাট একটা পরজীবী সন্ন্যাসী সম্প্রদায় সারা ভারতে চরে বেড়াত এবং রাষ্ট্রীয় শক্তির কাছে অর্থমূল্যে নানা খবর এনে দিত। প্রকৃতি ছিল অকৃপণ; ফলে প্রকৃতির অযাচিত দানের ওপর সমাজের একটা বড় অংশ নির্ভর করত। অর্থাৎ এরা চরম অলস হয়ে পড়েছিল। ফলে পুঁজি গড়ে উঠতে পারছিল না এবং পুঁজির অভাবে শক্তিশালী রাষ্ট্রও দেখা দিচ্ছিল না। আর এই অলস জনতার একটা অংশ কবি, শাস্ত্রকার হবার খোয়াব দেখেছিল। অফুরন্ত সময়; হ্রীং, ক্লীং, ইড়িং, বিড়িং ফট্ ইত্যাদি (দ্রঃ- অসঙ্গ) কত অদ্ভুত মন্ত্র রচনা করে এঁরা স্বর্গে যাবার সিঁড়ি তৈরি করতেই জীবন কাটিয়ে দিয়েছিলেন। আবার কবিতাও লিখেছিলেন তস্য ভাষা ইদং সর্বং বিভাতি; এবং এই তস্য কে তাঁরাও জানতেন না; আজও কেউ জানে না।

এই সাহিত্য সম্ভার থেকে আমার এই কোষগ্রন্থ সংকলিত। উপাধি হীন ঈশ্বরকে উপাধি না দিলে সাহিত্য গড়ে ওঠে না; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব সেই সোপাধিক ঈশ্বর। ফলে কে বড় নিয়ে রসাল গল্প (পুরাণ কাহিনী), আখড়ার রেষারেষি, আবার হরিহর মিলন সবই ঘটেছিল। বিষ্ণু বা ইন্দ্র পরদারী হয়েছিল, ব্রহ্মা কন্যাগামী হয়েছিল; নীল সাহিত্য ফেঁপে উঠেছিল। এই ভাবে বিচার করতে হবে। ভারতীয় আর একটা প্রচেষ্টা ছিল লিবিডো ভিত্তিক ধর্ম গড়ে তোলা (দ্রঃ- নাথ বাদ ধর্ম বৈষ্ণব)। চেষ্টাটা ছিল অভিনব এবং প্রশংসনীয়। বহু রামী, ডোম্নী ও শবরী ফলে ঘর বাঁধবার সযোগ পেয়েছিল; পরকীয়া মতবাদ গড়ে ওঠার ফলে 'মহাসুখ'-এর সন্ধান মিলেছিল। কণ্ঠী বদলের ফলে সমাজে বহু মহাদেব খাণ্ডানি দশমহাবিদ্যার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছিল। ভৈরবী সেবার মধ্যে যে ভুক্তিমুক্তি সেটি সম্পূর্ণ পাভলভ-ফ্রয়েডীয়; অবসেসান ইনহিবিসানের মধ্য দিয়ে সাবলিমেসানের পথে এগিয়ে যাওয়া। ভুক্তিমুক্তি তত্ত্বের মধ্য দিয়ে সে দিনের অবাধ আদিম ব্যবসা একটা শৃঙ্খলিত রূপ পেয়েছিল। দু-তিন জন ভৈরবী (অনেক সময় এঁরাই মূল স্বত্বাধিকারী), কারণ-সুধা তৈরির জন্য কয়েকটি বড় গামলা, আর জনা বিশেক ভক্ত মুমুক্ষু শিষ্য পেলে গুরুর কুটির শিল্প জমজমাট হয়ে উঠত। সমাজে মস্তানি সমস্যাও প্রায় নির্মূল হয়ে এসেছিল। মস্তান জগাই মাধাই প্রেমে এই ভাবেই বলদে পরিণত হয়েছিল। সংস্কৃত সাহিত্য পড়বার সময় এই সব কথা খেয়াল রাখতে হবেই। সেই প্রাচীন ভারতকে জানা সহজ হবে।

আমি মূলত সাহিত্যিক; বেদপুরাণ থেকে চর্যাপদ, মঙ্গলকাব্য ও সন্তোষী মার পাঁচালি সবই আমার কাছে চরিত্র সৃষ্টির প্রয়াস। অগ্নিমীলের অগ্নি, পুরুষসূক্তের পুরুষ বা বৃন্দাবনের নিশ্চরিত্র আভীর গোয়ালা বা সন্তোষী মা সবই কল্পনার ফানুস; পণ্ডিতদের ভাষায় দেবতা মন্ত্রময়ী। এই সমস্ত চরিত্র কেউ এক নয়; অর্থাৎ মহাভারতে শান্তিপর্বের অহল্যা এবং রামায়ণে বালকাণ্ড ও উত্তর কাণ্ডের অহল্যা তিনটিই বিভিন্ন কাহিনীর বিভিন্ন চরিত্র। একথা স্বীকার না করলে ঐ সব লেখকদের প্রতি অবিচার করা হবে। এই পৌরাণিকা পড়ার সময় এই সব কথাগুলি খেয়াল রাখা চাই। মহাভারতে ৬২-ই বুকের ছাতি পার্থসারথি আর ভাগবতে ট্রিকোমোনাথ ভ্যাজাইনালিস আভীর গোয়ালা বা

হরিবংশে যাত্রা দলের ভাঁড় এ তিন জন তিনটি বিভিন্ন ব্যক্তি বা চরিত্র বলে মানতেই হবে। নাম এক হলেও কিছু এসে যায় না। বেদের আকাশ জোড়া ডানা সুপর্ণ আর পুরাণের বাদুড় এক নয়। বঙ্কিমের মহেশ ও সমরেশ বসুর মহেশ এক হতে পারে না। এই কারণে ২০৮ পুরাণে ২০৮ বিষ্ণু, ৬০০ তন্ত্রে বা আগমে ৬০০ শিব ও ৬০০ পার্বতী সকলেই বিভিন্ন সত্তা। ফলে এই বিষ্ণু বা মহাদেব বা পার্বতী সম্বন্ধে বহু বিরোধী উক্তি বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করতে চেষ্টা করেছি এই পৌরাণিকা গ্রন্থে। এই কারণেই চন্দ্রবংশ ইত্যাদি কোন বংশেরই বিবরণে কোথাও মিল নাই। যুধিষ্ঠিরও এই কারণেই এই সব গ্রন্থকারদের সমর্থন করে বলেছিলেন নাসৌ মুনিঃ যস্য মতং ন ভিন্নম্। বেদই হক আর মুণ্ডমালা তন্ত্র হক লেখক হিসাবে তাঁর নিজস্ব মন্তব্য থাকবেই। এই নিজস্ব অর্থে ব্যক্তিগত, আখড়াগত, ঐতিহাসিক পটভূমিগত, তথা রাজা, বা জমিদার বা ধনীসম্প্রদায়ের স্মিত হাস্য সম্মত। অর্থাৎ ধর্মীয় সাহিত্যের প্রতিটি লাইন পার্থিব এবং অস্বর্গীয়। এগুলিকে আমি একত্র সংকলন করেছি মাত্র।

মানুষের ইতিহাসে সব দেশে সব সময় সাহিত্য গড়ে উঠেছে ধর্মকে কেন্দ্র করে। ভারতীয় ধর্মীয় সাহিত্যে একটা বড় অংশ স্তব এবং এই সব স্তবের প্রায় ৭০-৮০ ভাগ তুমি বিষ্ণু, তুমি ব্রহ্মা, তুমি শিব বলে অতি নিম্ন স্তরের চাটুকারিতা। আজকের যুগেও নিরন্ন যুবকরা পাড়ার রাজনৈতিক দাদাকে তুমি মন্ত্রী, তুমি রাজ্যপাল, তুমি রাষ্ট্রপতি বলে স্তব করে। এ থেকে মেনে নেওয়া উচিত নয় বিষ্ণু ইত্যাদি সব দেবতা এক। এ কথা খেয়াল থাকলে সংস্কৃত স্তবগুলির সম্যক অর্থ বোঝা যাবে। বাক্‌সূক্ত (ঋক্ ১০।১২৫) দিলদরিয়া মেজাজের কবিতা, সোমরসের আধিক্যে হয়তো; কিন্তু মূলত কবিতা। এই কবিতার মধ্যে যারা দর্শন খুঁজবেন তাদের কাছে এই পৌরাণিকা নিষিদ্ধ

রামায়ণ ও মহাভারতে স্থানে স্থানে কিছু অপ্রোয়জনীয় অশ্লীলতা আছে। তন্ত্রে এই অশ্লীলতা সীমাহীন। জলন্ধর কাহিনী বা দারুবনে মহাদেবের নির্যাতন অনায়াসে অন্য ভাবে উপস্থাপিত করা যেত। আজকের যুগের নরিচালকদের মত সে যুগের সূতরা বংশানুক্রমে এবং জীবনভর আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্য চষে বেড়াত। ফলে এদের সংগৃহীত গাড়োয়ানি (সৌতি) কাহিনীগুলি আজকের আসমুদ্র হিমাচল ছুটে বেড়ান নরিচালকদের সংগৃহীত কাহিনীগুলির অনুরূপ এবং অহেতুক অশ্লীল। এ কথা স্মরণ রেখে এই সব গাড়োয়ানি কাহিনী গিলতে হবে। "এ ছাড়া কামঃ অদাৎ, কমায় অদাৎ, কামঃ দাতা, কামঃ প্রতিগ্রহীতা ইত্যাদি যে সব মন্ত্র রয়েছে সেগুলির অর্থ বিকৃতি স্বাভাবিক ভাবেই দেখা দিয়েছিল। এমন কি রামায়ণের মত বইতে ভরদ্বাজ মুনি ভরতের সৈন্যবাহিনীর জন্য বিবস্ত্রা কয়েক লক্ষ অপ্সরা সরবরাহ করে দিয়ে নিজে আত্মতৃপ্তি লাভ করেছিলেন। এই রামায়ণেই রাবণ সোমলোক জয় করতে গিয়ে দেখেছিল মোক্ষপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা রতিক্লান্তঃ চুম্বিতঃ সন্ বিবুধ্যতে, দিব্য বিমানে চড়ে স্বর্গে যাচ্ছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গির ফলে ধর্মীয় সাহিত্যগুলিতে অকারণ অশ্লীলতা এসেছে; নীল সাহিত্যের চাহিদা মিটিয়েছে। ভাগবত ও গীতগোবিন্দ তথা তন্ত্রগুলি অবাচ্য, অপাঠ্য। এগুলি সহজিয়া; এ আলোচনাও করেছি এই পৌরাণিকাতে। আবার শব্দ নিয়ে অহেতুক খেলা দেখাতে গিয়ে বহু ধন্ধ ঘটেছে।

আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্যন্ত জ্যোতির্লিঙ্গের সীমানা ব্রহ্মা বিষ্ণু কেউ খুঁজে পায়নি; এই মহতঃ মহীয়ান্ জ্যোতির্লিঙ্গের প্রতীক অণোঃ অণীয়ান্ শিবলিঙ্গ। কিন্তু তবু একটা ঠোঁটচাটা রসিকতা এর মধ্যে রয়ে গেছে। ফলে বরাহনন্দনদের (যজ্ঞবরাহ নয়) হাতে পড়ে একেবারে শুভিমন্দমে (দ্রঃ) পৌঁছতে হয়েছে। ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্ (শু-যজু ৩।৬০) বা ধ্যায়েৎ নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং স্তব সারমেয়স্য পুত্ররা এক দম জানত না। এই সব ঘটনা জানা থাকলে তবেই বেদপুরাণ কাহিনী এবং এই পৌরণিকা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হবে।

এই গ্রন্থে আমার মানসিকতার ছাপ প্রতি পাতায় আছে এবং এইটাই স্বাভাবিক। অধিকন্তু ১৯৭৮ খৃস্টাব্দে বইটি সম্পাদিত হয়েছে, খৃস্টপূর্ব নয়। আমার কাজ পাঠককে তোষণ করাও নয়। পৌরাণিকা পড়ার সময় এগুলি সর্বদা স্মর্তব্য। আবার বলছি পার্থ সারথিকে অদ্ভুত ভাল লাগে; জেগে জেগে স্বপ্ন দেখি সুভদ্রাকে হরণ করে ঐ শালার হাতে জীবনের বল্গা ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু বৃন্দাবনের লম্পট (ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে) ও তার পরকীয়া অসতীকে (উমাপতি ধর) কিছুতেই সহ্য করতে পারি না। অথচ বৈষ্ণব দর্শনে উজ্জ্বল রস পৃথিবীর সমস্ত আধ্যাত্মিক দর্শনের উজ্জ্বল মণি।

আবার বলছি হিন্দু ধর্ম প্রতিষ্ঠান হীন ধর্ম। বৌদ্ধদের অবশ্য প্রতিষ্ঠান ছিল কিন্তু সংঘভেদ হতে হতে চরম অবস্থা হয়ে উঠেছিল। ফলে যুক্তি, অযুক্তি, বাঞ্ছিত অবাঞ্ছিত অনেক কিছু হিন্দুধর্মীয় (বৌদ্ধ ও জৈন মিলে) সাহিত্যে ও মতবাদে রয়ে গেছে। এর ফলে পোরাণিকা অনুসন্ধিৎসু মনকে বাত্যাহত করবেই। পৌরাণিক এই সব কাহিনীর সঙ্গে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন স্থানে পূজিত বিগ্রহমূর্তি, বিভিন্ন স্তূপ এবং মন্দির গুহাতে প্রাপ্ত বিভিন্ন ছবিগুলি তথা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজার মুদ্রা ও সিলমোহর এবং তথা হরপ্পা, আফগান, সুমাত্রা, জাভা, শ্যাম, বর্মা, চীন ইত্যাদির সভ্যতা ও সংস্কৃতি মিলিয়ে দেখতে চেষ্টা করলে তবেই সেই প্রাচীন ভারত মূর্ত হয়ে উঠবে। সেই বনভুবনকে পৌরাণিকাতে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। ভারতে দেবতা (দ্রঃ) মন্ত্রময়ী; বৌদ্ধধর্মেও শূন্য থেকে এঁদের জন্ম; সুতরাং ৩৩৩ কোটি হলেই বা ক্ষতি কি। অথচ ব্রাহ্মণ্যধর্ম নিরুপাধিক ঈশ্বরকেও খাড়া করেছিল। এগুলো যুগপৎ খেয়াল থাকলে তবেই পৌরাণিকার রসাস্বাদন সম্ভব হবে।

হিন্দু অর্থে বৌদ্ধ জৈন কেউ বাদ নন। নাথপন্থী, কর্তাভজা, আউল, বাউল, তান্ত্রিক, সহজিয়া সকলেই হিন্দু। এই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্য দিয়ে যে মর্ত সজীব ঐতিহ্য বয়ে যাচ্ছে সেই ঐতিহ্যকে এই বইতে পাওয়া যাবে। আমাদের পিতৃপুরুষদের বিদ্যা, অবিদ্যা, ভণ্ডামি ও সাধুতার সমাহার এই ঐতিহ্য; একে নিশ্চয়ই সকলে আমরা মাথায় তুলে নেব।

আবার বলছি যা কিছু মন্তব্য এখানে করেছি সেগুলি আমার ব্যক্তিগত জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার মাটিতে সোনার ধান।

অমল বন্দ্যোপাধ্যায়।

পৌরাণিকা

অ—প্রণবের আদি অক্ষর।

অওঘড়—সন্ন্যাসী ব্রহ্মগিরি প্রতিষ্ঠিত দশনামী সম্প্রদায়। গোরক্ষনাথের দ্বারা প্রভাবিত। গুজরাট অঞ্চলে। মোহান্তের মৃত্যু হলে সন্ন্যাসীদের মধ্য থেকে এক জনকে বিশেষ ক্রিয়া অনুষ্ঠানের পর মোহান্ত করে নেওয়া হয়। সুখড়, রুখড়, ভুখড়, কুকড়, গুদড় ইত্যাদি সম্প্রদায়ের সঙ্গে আচার অনুষ্ঠানে অনেক মিল।

অংশ—একজন দেবতা ; কার্তিক জন্মালে ৫-জন পার্ষদ—পরিঘ, বট, ভীম, দহতি ও দহন—কার্তিকেয়কে দান করেছিলেন (মহা ৯।৪৪।৩১)।

অংশাবতার—দ্রঃ অবতার।

অংশু—একজন আদিত্য (দ্রঃ)।

অংশুবর্মা—নেপালে লিচ্ছবি-রাজ শিবদেবের মহাসামন্ত। শিবদেব নামে মাত্র রাজা ছিলেন। আভীরগণ নেপাল দখল করলে ইনি বাহুবলে তাদের হারিয়ে দেন। ফলে প্রতিপত্তি বেড়ে যায় এবং শেষ কালে নিজের নামেই রাজত্ব করেন। হিউএনৎসাঙ-এর মতে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও একটি সংস্কৃত ব্যাকরণ রচয়িতা। সম্বৎ ৬০৮-৬২৫ পর্যন্ত নেপালের সর্বময় কর্তা।

অংশুমতী—গন্ধর্বরাজ দ্রমিলের মেয়ে : ধর্মগুপ্তের স্ত্রী। (শিব, পু)

অংশুমান—(১) সূর্যবংশে। অসমঞ্জের ছেলে। ধার্মিক ও প্রিয়ংবদ। সগরের যজ্ঞের ঘোড়া রাখতেন। ইন্দ্র রাক্ষসী রূপে ঘোড়া চুরি করেন। অংশুমান সগরের কাছে এসে জানান। সগর ৬০ হাজার ছেলেদের পাঠান ঘোড়া খুঁজে আনতে এবং এরা ফিরছেনা দেখে সগর তখন একে পাঠান (রা ১।৪১।১) : পিতৃব্যদের কাটা পথে পাতালে নেমে যান, দিগ্‌গজদের দেখতে পান এবং প্রশ্ন করেন (রা ১।৪১।৮)। এরা এগিয়ে যেতে বলেন : ঘোড়া অংশুমান পাবে। ক্রমশঃ এগিয়ে গিয়ে পিতৃব্যদের ভস্মরাশি দেখে কেঁদে ফেলেন। ঘোড়াও দেখতে পান। পিতৃব্যদের জল দেবেন মনস্থ করেন কিন্তু জলাশয় পান না (রা ১।৪১।১৫) এবং পিতৃব্যদের মামা সুপর্ণকে দেখতে পান। সুপর্ণ জানান এরা কপিলের কোপে মারা গেছে ; জল দিতে নাই ; গঙ্গাজলে প্লুত ও পূত হয়ে এরা স্বর্গে যাবে, 'পার যদি গঙ্গাকে নিয়ে এস, (রা ১।৪১।২২) ; উপস্থিত ঘোড়া নিয়ে যাও'। সগরের পর প্রজারা এঁকে রাজা করেন ; ছেলে দিলীপকে (রা ১।৪২।২) রাজ্য দিয়ে হিমালয় শিখরে 'দ্বাত্রিংশৎ চ সহস্রাণি বর্ষাণি' তপস্যা করে যান।

মহাভারতেও (৩।১০৬।৬) এই ঘটনা। তবে দিগ্‌গজ ও সুপর্ণ নাই। ঘোড়া ও কপিলকে দেখতে পান। কপিলকে প্রণাম করেন ; কপিল বর দিতে চান। কপিলই বলে দিয়েছিলেন অংশুমানের পৌত্র স্বর্গ থেকে গঙ্গা আনবেন ইত্যাদি। অংশুমান গঙ্গা

আনার জন্য তপস্যা করেন নি। ছেলে দিলীপ। দ্রঃ-পঞ্চজন। (২) দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে একজন অংশুমান রাজা এসেছিলেন।

অংশু—ঋকৃবেদে এক অসুর। পুরুকুৎস মুনিকে খুব বেশি বিব্রত করত। এই অসুর ও এর সাতটি পুরীকে ইন্দ্র ধ্বংস করেন।

অকম্পন—রাবণের মামা ও এক জন সেনাপতি। সুকেশ-সুমালী-অকম্পন। পিতা সুমালী মা কেতুমতী। অকম্পনের বোন নিকষা, কুম্ভীনসী; ভাই ধূম্রাক্ষ ও প্রহস্ত। দণ্ডকারণ্যে রামের হাতে রাক্ষসেরা মারা গেলে রাবণকে খবর দেন রাম যুদ্ধে অপরাজেয়। তবু রাবণ শত্রু নিধনের জন্য যেতে চান (রা ৩।৩১।২১)। অকম্পন তখন পরামর্শ দেন সীতাকে হরণ করতে। তাহলে রাম শোকে আপনা থেকেই মারা পড়বে (৩।৩১।৩১)। লঙ্কার যুদ্ধে হনুমানের হাতে মৃত্যু।

অকম্পিত—বুদ্ধ বিশেষ।

অকলঙ্ক বা অকলঙ্কদেব—সমন্তভদ্রের সমসাময়িক এক জন জৈন নৈয়ায়িক। বহু স্থানে কুমারিলভট্ট এঁকে ভর্ৎসনা করেছেন। কিন্তু কুমারিলভট্টকে বিদ্যানন্দ পাত্রকেশরী ও প্রভাচন্দ্র সমর্থন করতে পারেন নি। পাণ্ডব পুরাণের প্রথমে শুভচন্দ্র এঁকে নৈয়ায়িক হিসাবে প্রশংসা করেছেন। রাষ্ট্রকূটের রাজা সাহসতুঙ্গদন্তিদুর্গের রাজত্বকালে (অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ) অকলঙ্কদেব জীবিত ছিলেন। তত্ত্বার্থরাজ-বাঁতিকা, অষ্টশতী ও তিনটি জৈনগ্রন্থ (ন্যায় বিনিশ্চয়, লঘীয়স্ত্রয়, স্বরূপ সম্বোধন) এঁর রচনা।

অকৃসস্—অন্য নাম আমুদরিয়া। রুসীয় তুর্কিস্থান ও মধ্য এশিয়ার প্রধান নদী। পামির মালভূমিতে উৎপন্ন ও আরল সাগরে এসে পড়েছে। অকৃসস্ ও হিন্দুকুশের মধ্যে প্রাচীন বহ্লীক বা ব্যাকট্রিয়া রাজ্য অবস্থিত ছিল। পরে অকৃসস্ উপত্যকায় ইউচিগণ বাস করতেন। বর্তমানে রুশ-আফগান সীমান্ত।

অকালকুষ্মাণ্ড—অকালে জাত কুষ্মাণ্ড। গান্ধারী নিজে গর্ভপাত করে কুষ্মাণ্ডাকার মাংসপিণ্ড প্রসব করেন। এই মাংসপিণ্ড থেকে শত পুত্র জন্মায় এবং পরে এদের জন্য বংশ নাশ হয়।

অকালপূজা (বা অকাল বোধন)—সূর্যের উত্তরায়ণ দেবতাদের দিন। দক্ষিণায়ণ রাত্রি। রাত্রিতে পূজা অবিধেয়। ফলে দেবতাদের রাত্রিকালে পূজা করতে হলে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রয়োজন। লঙ্কার যুদ্ধে রাম অকালে দুর্গা পূজা করেছিলেন। শারদীয়া পূজা রামের এই অকালপূজা। দ্রঃ-বাসন্তীপূজা।

অকালবোধন—কালিকা, বৃহৎ-ধর্ম ও দেবী পুরাণে রাবণ বধের জন্য ব্রহ্মা অকালে দেবীকে জাগান। দেবী তৎক্ষণাৎ আশ্বিনে শুক্লপক্ষে লঙ্কাতে আসেন।

অকূপার—হিমালয়ে ইন্দ্রদ্যুম্ন (দ্রঃ) হ্রদে এক কচ্ছপ; বিষ্ণুর অবতার বলে উল্লিখিত।

অকৃতব্রণ—এক জন ঋষি। পরশুরামের প্রিয় শিষ্য। নৈমিষারণ্যে মহাভারত প্রবক্তা সূত এর শিষ্য। শিবকে সন্তুষ্ট করে কিছু অস্ত্র লাভ করে পরশুরাম বনের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে এক গুহাতে একটি ব্রাহ্মণ বালককে বাঘের হাত থেকে রক্ষা

করেন। ব্যাঘ্রটি একটি গন্ধর্ব ; তাঁর বিদ্ধ হয়ে শাপমুক্ত পেয়ে পরশুরামকে প্রণাম করে চলে যায়। বালকটি পরশুরামের কৃপায় অকৃত-ব্রণ (অ-ক্ষত) ছিল ; পরশুরামের শিষ্য হয়ে যান। বনবাসকালীন তীর্থভ্রমণে মহেন্দ্র পর্বতে এসে যুধিষ্ঠির অকৃতব্রণের কাছে জানতে চান পরশুরাম কখন আসবেন। অকৃতব্রণ জানান, 'চতুর্দশী ও অষ্টমীতে পরশুরাম তপস্বীদের সঙ্গে দেখা করেন। আজ শেষ রাতে চতুর্দশী পড়বে।' যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয় নিধন কাহিনী শুনতে চাইলে অকৃতব্রণ পরশুরামের (দ্রঃ) জন্ম ইত্যাদি বর্ণনা করেন (মহা ৩।১১৫।-)। মহাভারতে বেশ কয়েক বার এ'র উল্লেখ আছে। অম্বা সকলের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে মাতামহ হোত্রবাহের পরামর্শে এই অকৃতব্রণের কাছে সব কথা জানান। অকৃতব্রণ এ'কে আশ্বাস দেন এবং পরশুরামকে সব কিছু জানান। ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধে পরশুরামের সারথি ছিলেন।

অক্রূর—বৃষ্ণি-যুধাজিৎ-শিনি-সত্যক-সাত্যকি-জয়-কুণি-অনমিত্র-বৃষ্ণি-শ্বফল্ক-অক্রূর। মা গান্দিনী। সম্পর্কে কৃষ্ণের কাকা। আহুকের কন্যা সুতনু স্ত্রী (ম. ২।১৩।৩২)। পুত্র দেবক ও উপদেবক। অন্য মতে উগ্রসেনের জামাতা। প্রসিদ্ধ কৃষ্ণভক্ত। যাদব সেনাবাহিনীর বিখ্যাত নায়ক। ভাই অসঙ্গ। এক সময় ইনি কংসের বাড়িতে থাকতেন। কৃষ্ণ ও বলরামকে হত্যা করার জন্য কংস ধনুর্যজ্ঞ করেন এবং এই যজ্ঞে কৃষ্ণ ও বলরামকে আনবার জন্য এ'কে বৃন্দাবনে পাঠান হয়। কৃষ্ণকে ইনি সব জানিয়ে দেন এবং কংসকে হত্যা করে যাদবদের রক্ষার জন্যও অনুরোধ করেন। এক সময় অক্রূর সত্যভামার পাণিপ্রার্থী ছিলেন। শতধন্বা এ'কে স্যমন্তক (দ্রঃ) মণি দিয়ে পালিয়ে যান। এই মণির গুণে অক্রূর ব্যয়সাধ্য যাগযজ্ঞও করতে পেরেছিলেন। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভাতে ছিলেন। সুভদ্রা হরণের সময় রৈবতক পাহাড়ে বনভোজনে গিয়েছিলেন। সুভদ্রার বিয়ের যৌতুক নিয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে পাণ্ডবদের কাছে এসেছিলেন। অভিমন্যুর বিয়ে উপলক্ষ্যে উপপ্লব্যে গিয়েছিলেন। পাণ্ডবদের সম্পর্কে ধৃতরাষ্ট্রের মনোভাব জানবার জন্য কৃষ্ণের কথায় ইনি হস্তিনাপুরে দূত হয়ে যান এবং কুন্তীর সঙ্গেও দেখা করে আসেন। অক্রূর ও আহুক সব সময়ই পরস্পরকে দোষ দিতেন যে, তাঁরা বিরোধীদলকে সমর্থন করছেন। প্রথম জীবনে মথুরাতে ও শেষ জীবনে দ্বারকায় কাটান। যদুবংশ ধ্বংসের সময় মৃত্যু হয়।

অক্রোধন—বা অক্রোধ। অযুতনায়ীর (দ্রঃ) ছেলে। কলিঙ্গ কন্যা করণ্ডু/করম্ভা স্ত্রী ; ছেলে হয় দেবাতিথি (মহা ১।৯০।২১)।

অক্ষ—(১) অক্ষয় দ্রঃ। (২) কাশ্মীরের রাজা দ্বিতীয় নররাজের ছেলে। গোপাদিত্যের পিতা। ৫৯৮ শকাব্দের আগে। এ'র তৈরি দেবপুরীর নাম অক্ষবাল।

অক্ষকুমার—রাবণের এক ছেলে। লঙ্কা দহনের আগে হনুমানের সঙ্গে যুদ্ধে মারা যায়। এরপর ইন্দ্রজিতের হাতে হনুমান বন্দী হয়। দ্রঃ- অক্ষয়।

অক্ষক্রীড়া—পাশাখেলা। দ্যূত বা জুয়া খেলাও এই নামে পরিচিত। দাবা খেলাও বোঝাত। কোজাগর পূর্ণিমা রাত্রিতে অক্ষক্রীড়া করে রাত জাগার ব্যবস্থা আছে। রঘুনন্দন তাঁর তীর্থতত্ত্বে এর ব্যাখ্যাও করেছেন। এই ক্রীড়া কিন্তু

শাস্ত্র-নিষিদ্ধ। মহাদেব এই খেলার সৃষ্টি করে পার্বতীর সঙ্গে খেলতেন (ব্রহ্ম-পুঃ)। মনুসংহিতার নবম অধ্যায়ে আছে, এই পাশাখেলা রাজ্য নাশ করে ; রাজা যেন এই খেলা বন্ধ করে দেন। নলরাজ ও যুধিষ্ঠির এই খেলাতে সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন। প্রাচীন কালে বহু প্রচলিত। বেদেও। আধুনিক খেলার পদ্ধতি অন্য ধরণের।

অক্ষপাদ—অক্ষপাদ-গোতম ন্যায় দর্শনের প্রবর্তক। খৃঃ ২-শতকে বা কিছু পরে। ৫ অধ্যায়যুক্ত ন্যায় সূত্রে ইনি প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের উদ্দেশ, লক্ষণ-নিরূপণ ও পরীক্ষা করেছেন। বাৎস্যায়নের ন্যায়ভাষ্য গোতমসূত্রের সর্বপ্রাচীন ব্যাখ্যা গ্রন্থ। এঁর প্রকৃত নাম গোতম। বেদব্যাস এঁর রচিত গ্রন্থের নিন্দা করলে ইনি ব্যাসের মুখ দেখবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেন। পরে ক্ষমা চাইলে ইনি প্রতিজ্ঞা না ভেঙে নিজের পায়ের ওপর নতুন চোখ তৈরি করে সেই চোখে ব্যাসের মুখ দর্শন করেন। অক্ষ (=চক্ষু) যাঁর পাদদেশে।

অক্ষপ্রপতন—আনর্ত দেশে একটি জায়গা। এখানে গোপতি ও তালকেতু ইত্যাদি দৈত্যকে কৃষ্ণ নিহত করেন।

অক্ষমালা—(১) রুদ্রাক্ষ মালা। জপের জন্য। শৈব ও শাক্তরা এই মালা হাতে বা গলায় ধারণ করেন। (২) অরুন্ধতীই শূদ্রকন্যা অক্ষমালা হয়ে জন্মান। বশিষ্ঠের সঙ্গে বিয়ে হয়। বশিষ্ঠের সংস্পর্শে এসে ইনি অসামান্য গুণবতী হয়ে উঠেছিলেন। আকাশে উত্তর দিকে বশিষ্ঠ সমীপে অরুন্ধতীকে বেষ্টন করে মালার মত অবস্থিত সপ্তর্ষিমণ্ডল।

অক্ষয়—মন্দোদরীর গর্ভে রাবণের এক ছেলে (রা ৫।৫৮।২৫)। দ্রঃ-অক্ষকুমার।

অক্ষয়তৃতীয়া—বৈশাখে শুক্লাতৃতীয়া। অতি পুণ্য দিন। রঘুনন্দন তিথিতত্ত্বে বলেছেন এই দিনে সত্য যুগের উৎপত্তি। জনার্দন এই দিনে সব সৃষ্টি করেছিলেন ও গঙ্গাকে দেবলোক থেকে মর্ত্যে আনা হয়েছিল। এই দিনে দান ইত্যাদি কাজে অক্ষয়পুণ্য। এই দিনে কৃষ্ণের চন্দন যাত্রা অর্থাৎ চন্দন পরান হয়। অনেকে এই দিন জলপূর্ণ কলসী দান করেন ও লক্ষ্মীনারায়ণের পূজা করেন। বহু ব্যবসায়ী এই দিনে নতুন খাতা করেন।

অক্ষয় পাত্র—বনবাসের সময় দ্রৌপদী এই পাত্রে রান্না করতেন। সূর্যের কাছে প্রার্থনা করে পেয়েছিলেন। দ্রৌপদীর খাবার আগে এতে অন্ন কোন দিন শেষ হত না ; অতিথি সৎকারে অত্যন্ত সহায়ক ছিল।

অক্ষয় বট—প্রলয়ের সময় বিষ্ণু বটপাতায় অবস্থান করেছিলেন। ফলে ধারণা বটগাছ অমর ও অর্চনীয়। প্রয়াগ, পুরী, গয়া, ভুবনেশ্বর, চন্দ্রনাথ ইত্যাদিতে এক একটি এই বট গাছ আছে। ধারণা এগুলি অমর ; এবং এদের জল দিলে ও পূজা করলে অক্ষয় পুণ্য হয়। প্রয়াগের গাছটি কেল্লার মধ্যে ; এর চার দিক ভরাট হয়ে ওঠার জন্য সমতল থেকে গাছটি নীচে অবস্থিত। আকবরের সময় হিন্দুরা এই গাছের তলা থেকে নীচে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করত। গঙ্গা তখন পাশেই ছিল। বৈতরণীর তীরেও অক্ষয়বটের উল্লেখ আছে। মহাভারতে (৩।৮২।৭২) গয়ার গাছটিকে

তিন ভুবনে বিখ্যাত বলা হয়েছে। পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে এখানে দান করলে অক্ষয় পুণ্য হয়। অপর নাম অক্ষয় করণ-বট (মহা ৩।৮৫।৮)। দ্রঃ গয়, গয়শির, তীর্থ।

অক্ষর—সাংখ্যের প্রকৃতি। শিব, বিষ্ণু, আকাশ, ধর্ম, মোক্ষ।

অক্ষরবৃত্ত—সংস্কৃত ছন্দ। গীতি কবিতার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ধ্বনি-গাম্ভীর্য, বাক্যের সম্প্রসারণ ক্ষমতা ও সুর বৈচিত্র্যের জন্যও সমাদৃত।

অক্ষহৃদয়—দ্রঃ নল।

অক্ষু—অশ্ম (রামা), অক্সিয়ন্ (গ্রীক)। সোগডোনিয়াতে অক্সাস্ (দ্রঃ) নদীর তীরে পাতালপুর।

অক্ষোভ্য—পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের অন্যতম। দ্রঃ- ধ্যানীবুদ্ধ। বিজ্ঞানস্কন্ধ-স্বভাব ও বজ্রকুলী বলা হয়। মামকী ইঁহার প্রজ্ঞা। সমস্ত বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থে এঁর বর্ণনা ও উল্লেখ আছে। বৌদ্ধ সংস্কৃতি যে দেশে রয়েছে সেখানে এঁর নানা আকারের মূর্তি ও ছবি পাওয়া যায়। বাহন দুটি হাতী ; চিহ্ন বজ্র। তিব্বত ও চীনে বিশেষ সমাদৃত। রঙ নীল। ভয়ঙ্কর দেবতা, এবং বিভীষিকাময় ক্রিয়া। যে কোন ধ্যানী বুদ্ধ থেকে এঁর বংশে দেবদেবীর সংখ্যা বেশি। অন্তর্গত পু-দেবতা ঃ—চন্দ্ররোষণ, হেরুক (এই বংশে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ; দ্রঃ) হেবজ্র, বুদ্ধকপাল, সম্বর, সপ্তাক্ষর, মহামায়, হয়গ্রীব, রক্তযমারি, কৃষ্ণযমারি, জম্ভল (এই বংশে এক মাত্র শান্ত দেবতা), উচ্ছুষ্ম জম্ভল, বিঘ্নান্তক, বজ্রহুঙ্কার, ভূতডামর, বজ্রজ্বালানলার্ক, ত্রৈলোক্যবিজয়, পরমাশ্ব, যোগাম্বর, কালচক্র। দেবীগুলি ঃ—মহাচীনতারা, জাঙ্গুলী, একজটা, বিদ্যুৎ - জ্বালাকরালী, পর্ণশবরী, প্রজ্ঞাপারমিতা (শান্তমূর্তি), বজ্রচর্চিকা, মহামন্ত্রানুসারিণী, মহাপ্রত্যঙ্গিরা, ধ্বজাগ্রকেয়ূরা, বসুধারা (শান্তমূর্তি), নৈরাত্মা, জ্ঞানডাকিনী, বজ্রবিদারিণী।

অক্ষৌহিণী—অক্ষ (গজাদি)+ঊহিনী (সংখ্যাকারিণী) ; অশ্বগজাদির সংখ্যাকারিণী। ২১৮৭০ রথ+২১৮৭০ হাতী+২১৮৭০×৩ ঘোড়া+২১৮৭০×৫ পদাতিক মিলে ২১৮৭০×১০ অংশ যুক্ত সেনাবাহিনী। আবার (মহা ১।২।১৫) ১ রথ+১ হাতী+৩ ঘোড়া+৫ পদাতি=১ পত্তি×৩=১ সেনামুখ ×৩=১ গুল্ম×৩=১গণ×৩ =বাহিনী×৩=১ পৃতনা×৩ =চমূ×৩=১ অনীকিনী×১০=অক্ষৌহিণী। পত্তির নায়ক পত্তিপতি এবং এই ভাবে সেনামুখ-নেতা, গুল্মনায়ক, গণনায়ক, বাহিনীপতি, পৃতনাপতি, চমূপতি ইত্যাদি। বহু জায়গায় অবশ্য অক্ষৌহিণী কেবল পরিমাণ বাচক ; যেমন ঃ—রাবণের বাদ্যভাণ্ড সাত অক্ষৌহিণী।

অক্সাস্—চক্ষুবর্দ্ধন। ইক্ষু (বিষ্ণু, পু), চক্ষু (দ্রঃ), সুচক্ষু, অশ্মন্বতী। আমুদরিয়া নদী। ভাগবৎ গঙ্গা, পাতাল গঙ্গা। ভাগবতে বঙ্ক্ষু। ওকোস বা ওকাস (গ্রীক), বক্ষু (মৎস্য-পু)। শাকদ্বীপে। ভাগবতের বঙ্ক্ষু নদী অবশ্য অক্সাস-এর একটি করদা শাখা ; সোগডোনিয়াতে। এই বঙ্ক্ষু>অক্সাস।

অখণ্ডা—দিলদার নগর। গাজিপুর থেকে ১২ মাইল দক্ষিণে।

অগতি—লক্ষ্মণ ঊর্মিলার ছেলে তক্ষ ও ছত্রকেতুর জন্মস্থান, প্রাচীন নাম কনখল। বন্য জাতি তাড়িয়ে দিয়ে লক্ষ্মণ এখানে নগরী স্থাপন করেন। অগতি তক্ষের রাজধানী হয়।

অগস্ত্য—অগ+স্তৈ (স্তম্ভিত করা); পর্বতকে যিনি স্তম্ভিত করেছেন। বংশঃ—ব্রহ্মা—মরীচি—কশ্যপ—সূর্য—অগস্ত্য। দ্বিতীয় জন্মে মিত্রাবরুণের (দ্রঃ) ছেলে। অন্য নাম অগস্তি, কুম্ভসম্ভব, ঘটোদ্ভব, মৈত্রাবারুণি, পীতাব্ধি, বাতাপিদ্বিট, আগ্নেয়, ঔর্বশীয়, অগ্নিমারুত। স্বনাম খ্যাত মন্ত্রকার ঋষি। বেদজ্ঞ; বহু বিজ্ঞান জানতেন, বহু অস্ত্র চালনায় দক্ষ ছিলেন। স্ত্রী লোপামুদ্রা। ছেলে দৃঢ়াস্য বা দৃঢ়স্যু বা ইধ্মবাহ। ভাই সুতীক্ষ্ণ ; অগস্ত্যের আশ্রমে আর এক ভাই (রা ৩।১১।৭৩)। শিষ্য অগ্নিবেশ। আদিত্য যজ্ঞে মিত্র ও বরুণ উর্বশীকে দেখে যজ্ঞকুণ্ডে বীর্যপাত করেন। এই কুম্ভ থেকে বশিষ্ঠ ও অগস্ত্যের জন্ম এই জন্য নাম কুম্ভযোনি বা মৈত্রাবারুণি। মতান্তরে পুলস্ত্য পত্নী হবির্ভূর ছেলে। প্রতিজ্ঞা ছিল বিয়ে করবেন না।

মহাভারতে (৩।৯৪।১১) পিতৃপুরুষদের এক জায়গায় অধোমুখে একটি গর্তের উপর ঝুলতে দেখেন। প্রশ্ন করলে নিজেদের পরিচয় দিয়ে এঁরা জানান বংশ থাকবে না বলে এই অবস্থা। অগস্ত্য এঁদের আশ্বাস দেন এবং উপযুক্ত স্ত্রী খুঁজে না পেয়ে প্রতি সত্ত্বার দেহ থেকে উত্তম উত্তম অঙ্গ সংগ্রহ করে একটি শিশু কন্যা তৈরি করে সন্তানার্থী বিদর্ভরাজকে পালন করতে দেন। অপরূপ সুন্দরী ; ব্রাহ্মণরা নাম রাখেন লোপামুদ্রা। রাজা এঁর জন্য এক শত দাসী নিযুক্ত করে দেন। ক্রমশঃ অপরূপ সুন্দরী যুবতী ; কিন্তু অগস্ত্যের ভয়ে কেউ বিয়ে করতে রাজি হয় না। রাজা চিন্তিত হয়ে পড়েন। এমন সময়ে অগস্ত্য আসেন। রাজার অগস্ত্যকে অপছন্দ ; ভীত রাণীকে এসে সব জানান। লোপামুদ্রা তখন নিজে রাজাকে জানান মহর্ষির ক্রোধ থেকে মুক্তি পেতে হলে বিয়ের ব্যবস্থা করা হোক। একটি মতে মহাসিন্ধু তীর্থে বিয়ে হয়।

মহাভারতে আছে বিয়ের পর গঙ্গাদ্বারে এসে অগস্ত্য কঠোর তপস্যা করতে থাকেন ; বল্কল ও অজিন পরিহিতা লোপামুদ্রা স্বামীর সেবা করতে থাকেন। বহু দিন পরে মুনি এক দিন দ্যোতিতা, স্নাতা লোপামুদ্রাকে সন্তানের জন্য আহ্বান করেন। লোপামুদ্রা এই সময় সপ্রণয় প্রার্থনা করেন ; পিতৃগৃহের শয্যা আভরণ ইত্যাদি পেতে চান এবং অগস্ত্য নিজেও যেন মালায় এবং ভূষণে সজ্জিত হন। তপস্যার বলে সবই সম্ভব হতে পারে। অগস্ত্য তপস্যার ফল এ ভাবে নষ্ট করতে চান না। কিন্তু লোপামুদ্রাও প্রার্থনায় অবিচল এবং জানান ঋতুকাল শেষ হবারও বেশি দেরি নেই। ফলে ভিক্ষার বার হতে বাধ্য হন। অন্য মতে সন্তানার্থী লোপামুদ্রা নিজেই স্বামীর কাছে গিয়েছিলেন এবং বল্কল ইত্যাদি অপবিত্র করতে চান নি ; সেই জন্য শয্যা ইত্যাদি চেয়েছিলেন।

অগস্ত্য প্রথমে শ্রুতর্বা রাজার কাছে আসেন এবং প্রজাদের ওপর কর না চাপিয়ে কিছু ভিক্ষা দিতে বলেন। রাজা আয়ব্যয়ের হিসাব দেখান, উদ্বৃত্ত কিছুই নাই। অগস্ত্য তখন কিছুই নিতে চান না। রাজাকে নিয়ে বধ্র্যশ্বের (ম ৩।৯৬।৭) কাছে যান এবং এখানেও ঐ অবস্থা হয়। এরপর এদের দুজনকে নিয়ে রাজা পৌরকুৎস ত্রস-দস্যুর কাছে আসেন। এখানেও সমান অবস্থা। রাজর্ষি তিনজন তখন বসুমান ইল্বলের কাছে যাবার সঙ্কল্প করেন। অন্য মতে অগস্ত্য এদের তিনজনকে নিয়ে নিজেই ইল্বলের কাছে এসেছিলেন।

দানবরাজ যথোচিত অভ্যর্থনা করে মেষরূপ ধারণকারী বাতাপির মাংস এ'দের জন্য প্রস্তুত করতে থাকেন। রাজর্ষি তিন জন ভীত (ম ৩।৯৭।৩৩) হয়ে পড়েন ; অগস্ত্য এদের আশ্বাস দেন এবং তারপর ধুর্যাসনে বসে সবটাই খেয়ে ফেলেন। ইল্বল এরপর ভাইকে ডাক দেন ; কিন্তু বাতাপি ইতিমধ্যে পরিপাচিত হয়ে গেছে ; অগস্ত্যর পেট চিরে আর বার হয়ে আসা সম্ভব হয় না। ইল্বল 'বিষণ্ণ' হয়ে পড়ে করযোড়ে জানতে চান কি চাই। অগস্ত্য তিন জন রাজার ঘটনা জানিয়ে অনুরোধ করেন কাউকে পীড়ন না করে তাঁদের সকলকে দান করতে। দানবরাজ বলে অগস্ত্য যদি ইল্বলের মনোগত ইচ্ছা প্রকাশ করে বলতে পারেন তবেই তিনি দেবেন। অগস্ত্য জানান রাজাদের প্রত্যেককে দশ হাজার গরু ও দশ হাজার সুবর্ণ এবং অগস্ত্যকে বিশহাজার সুবর্ণ ও একটি হিরন্ময় রথ ও দুটি মনোজব ঘোড়া দিতে অসুররাজের ইচ্ছা হয়েছে। নিরুপায় ইল্বল তখন দিতে বাধ্য হন। ঘোড়া দুটির নাম বিবাজ ও সুবাজ (ম ৩।৯৭।১৫) ; অন্য মতে বরাব ও সুরাব। রথ নিমেষের মধ্যে সকলকে এবং সমস্ত দান সামগ্রী নিয়ে অগস্ত্য-আশ্রমে আসে। রাজারা সকলে ফিরে যান, লোপামুদ্রা এবার সন্তুষ্ট হয়ে বলেন ঃ সকৃৎ উৎপাদয় অপত্যম্। কিন্তু অগস্ত্য জানতে চান সহস্র না সহস্রের সমান একশত বা দশ বা একটি পুত্র লোপামুদ্রা পছন্দ করবেন। লোপামুদ্রা সহস্র পুত্র তুল্য একটি পুত্র চান। গর্ভ হলে অগস্ত্য বনে চলে যান। সাত বছর গর্ভ ধারণ করে ছেলে হয় ইধ্মবাহ (দ্রঃ)।

দেবতাদের অনুরোধে সমুদ্র শোষণ করে অগস্ত্য কালেয়/কালকেয় (দ্রঃ) অসুরদের হত্যা করার সুযোগ করে দেন। অসুররা নিহত হলে (ম ৩।১০৪।১৬) দেবতারা অগস্ত্যকে সমুদ্র ভরে দিতে বলেন। অগস্ত্য জানান সব জল হজম হয়ে গেছে। দেবতারা তখন বিষ্ণুকে নিয়ে ব্রহ্মার কাছে যান। ব্রহ্মা বলেন ভগীরথ জন্মালে সমুদ্র আবার পূর্ণ হবে (ম ৩।১০৪।২)।

বিন্ধ্য একবার ঈর্ষায় মাথা তুলে দাঁড়ায় ; সূর্য যেমন মেরু পর্বতকে প্রদক্ষিণ করছেন তেমনি তাকেও প্রদক্ষিণ করতে হবে। সূর্য বিন্ধ্যের ইচ্ছা পূরণ করেন না এবং বিন্ধ্য তখন সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, (ম ৩।১০২।৮) সকলের পথ আটকে দেন। দেবতারা বিন্ধ্যকে বোঝাতে ব্যর্থ হয়ে অগস্ত্যকে এসে অনুরোধ করেন। অগস্ত্য তখন সস্ত্রীক বিন্ধ্যের কাছে এসে দক্ষিণে যাবার পথ চান এবং বলেন ফিরে না আসা পর্যন্ত বিন্ধ্য যেন নীচু হয়েই থাকে ; ফিরে এলে যত খুশি বাড়তে পারবে। অগস্ত্য যান এবং আর ফেরেন না, এবং বিন্ধ্যও মাথা নীচু করে থাকে ; সূর্য ইত্যাদিও পথ পেয়ে যান।

দেবী ভাগবতে নারদ বিন্ধ্যকে প্ররোচিত করেছিলেন এবং অগস্ত্য ছিলেন বিন্ধ্যের গুরু ; কাশী থেকে সস্ত্রীক আসেন এবং ১লা ভাদ্র বিন্ধ্য পার হন। মলয়াচলে আশ্রম বেঁধে বাস করতে থাকেন। এই অগকে স্তম্ভিত করার জন্য নাম অগস্ত্য।

গয়শির পাহাড়ে ব্রহ্মসর তীর্থে অগস্ত্য ধর্মরাজ বৈবস্বতের কাছে একবার গিয়েছিলেন (ম ৩।৯৩।১১)।

রাজা নহুষকে (দ্রঃ) শাপ দিয়েছিলেন। ইন্দ্রের অতিথি হয়ে একবার স্বর্গে যান। অগস্ত্যের সম্মানে ইন্দ্রের সভাতে উর্বশী এসেছিল। নাচতে নাচতে জয়ন্তের দিকে

চেয়ে উর্বশীর তালভঙ্গ হয়, নারদের বীণা 'মহতী'ও বেসুরো হয়ে পড়ে। ফলে অগস্ত্য শাপ দেন জয়ন্ত কোরক/বংশ হয়ে, উর্বশী মাধবী হয়ে এবং মহতী বীণা মানুষের বীণাতে পরিণত হবে।

অসুর শূরপদ্ম স্বর্গ থেকে ইন্দ্রদের তাড়িয়ে দিলে ইন্দ্র এসে শিয়ালিতে তপস্যা করতে থাকেন। বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়। কাবেরী নদী এই সময় অগস্ত্যের কমণ্ডলুতে ছিলেন। গণপতি ঘটনাটা জানতে পেরে কাকের বেশে এসে কমণ্ডলু উল্টে ফেলে দেন। অগস্ত্য কাকের পেছনে তেড়ে যান; কাক তখন বালকের রূপ ধরে পালাতে চেষ্টা করেও ধরা পড়ে যান। বালক তখন নিজের রূপ ধরে বর দেন অগস্ত্যের কমণ্ডলুতে/কাবেরী নদীতে কোন দিন জলাভাব হবে না। অগস্ত্য এক বার বারো বছর-ব্যাপী যজ্ঞ করেন। বহু ঋষি আসেন। কিন্তু যজ্ঞ আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্র বৃষ্টি বন্ধ করে দেন। তবু অগস্ত্য আগত সকলকে ভূরিভোজন করাতে থাকেন এবং বলেন প্রয়োজন হলে নিজেই ইন্দ্র হয়ে বৃষ্টি দিয়ে শস্য রক্ষা করবেন। ভয় পেয়ে ইন্দ্র তখন বিরোধিতা বন্ধ করেন।

ইন্দ্র একবার ভৃগু বশিষ্ঠ ইত্যাদি ঋষিদের নিয়ে তীর্থে যান এবং ব্রহ্মসরোবরে এসে অগস্ত্যের সমস্ত পদ্মফুল খেয়ে ফেলেন। অগস্ত্য জানতে পেরে ক্রুদ্ধ হয়ে কে খেয়েছে ধরতে চেষ্টা করেন এবং ইন্দ্রকে ঠিক ধরে ফেলেন। ইন্দ্র তখন সমস্ত ফুল মুখ থেকে বার করে দেন। দেবতারা এক বার অসুরদের হাতে পরাজিত হয়ে অগস্ত্যের শরণাপন্ন হলে অগস্ত্য তপোবলে অসুরদের পুড়িয়ে মারলে কিছু অসুর পাতালে ও পৃথিবীতে পালিয়ে যায়। স্বর্গ অসুর মুক্ত হয়। শিবপার্বতীর বিয়েতে হিমালয়ে সমস্ত দেবতারা এলে হিমালয়ে স্থানটি দেবে যায়, পৃথিবীও ভারে সেই দিকে হেলে যায়। শিব তখন অগস্ত্যকে দক্ষিণ দিকে পাঠান। অগস্ত্য প্রথমে কুট্টালামে বিষ্ণু মন্দিরে আসেন। এখানে পুরোহিতরা ছাইমাখা সন্ন্যাসীকে ভেতরে ঢুকতে বাধা দিলে অগস্ত্য বৈষ্ণব সেজে ভেতরে ঢুকে মন্দিরের বিগ্রহকে শিবলিঙ্গে পরিণত করে দেন। তারপর আরো দক্ষিণে পৃথিবীর শেষ প্রান্তে গিয়ে চেপে বসলে পৃথিবী আবার সোজা হয়ে ওঠে।

রাজা খেল-এর পুরোহিত ছিলেন (ঋক্)।

রাম বনে যাবার সময় লক্ষ্মণকে নির্দেশ দেন অগস্ত্য ও কৌশিককে আনিয়ে এঁদের রত্নরত্ন দান করতে। এরপর বনবাস কালে অগস্ত্যের ভাই সুতীক্ষ্ণের ও দণ্ডকারণ্যে অন্যান্য সমস্ত আশ্রমে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে দশ বছর কেটে যায়। সুতীক্ষ্ণ আশ্রম থেকে চার যোজন দক্ষিণে অগস্ত্যের আশ্রম এলাকা, রামচন্দ্রেরা এগিয়ে যান, পথে অগস্ত্যের আর এক ভাইয়ের আশ্রমে এক রাত কাটিয়ে বনের পাশ দিয়ে দক্ষিণ দিকে আর এক যোজন গিয়ে অগস্ত্যের আশ্রমে (দ্রঃ) পৌঁছান। রামকে ইনি সাদরে গ্রহণ করেন এবং বিশ্বকর্মা নির্মিত বৈষ্ণব ধনু, ব্রহ্মদত্তশর, দুটি অক্ষয় তূণ ও অসি দান করেন। এই ধনুতে বিষ্ণু এক সময় মহাসুরদের নিহত করেছিলেন। প্রক্ষিপ্ত অংশে আছে ইন্দ্র

ধনুর্বান দেন এবং বলে দেন কোন যুদ্ধে স্মরণ করলেই মাতলি দিব্য রথ নিয়ে সাহায্য করতে আসবে (রা ৩।১২।৩৩)।

পরদিন অগস্ত্য দণ্ডকারণ্যের (দ্রঃ) কাহিনী জানান ; এবং রাক্ষসদের হাত থেকে তপস্বী ব্রাহ্মণদের রক্ষা করতে বলেন এবং সেখান থেকে দু যোজন দূরে পঞ্চবটীতে গিয়ে বসবাস করার পরামর্শ দেন (রা ৩।১৩।১৩)।

লঙ্কাতে শেষ যুদ্ধে অগস্ত্য এসে রামকে আদিত্য হৃদয় মন্ত্র শিখিয়ে দিয়ে যান (রা ৬।১০৭।-) এবং অগস্ত্যের দেওয়া (রা ৬।১১১।৪) ব্রহ্মাস্ত্রে মাতলির পরামর্শে রাম রাবণকে নিহত করেন।

অযোধ্যাতে রাম রাজা হলে অগস্ত্য সমেত বহু মুনি দেখা করতে আসেন এবং রাক্ষসদের বংশ পরিচয় ইত্যাদি বহু কাহিনী (রা ৭।১।-) শোনান। শম্বূককে রাম নিহত করলে দেবতারা রামকে এসে অভিনন্দন জানান এবং বলেন অগস্ত্য (রা ৭।৭৬।১৭) জলশয্যায় ১২ বছর তপস্যা করে উঠেছেনঃ তাঁকে অভিনন্দন করতে যাচ্ছেন সকলে, রামও যেন একবার দেখা করে আসেন। রাম এলে বিশ্বকর্মা নির্মিত একটি আভরণ দেন ; রাম দান নিতে চান না ; অগস্ত্য তখন ক্ষুপের (দ্রঃ) কাহিনী বলেন এবং দণ্ডক বনে তপস্যা করতে গিয়ে রাজা শ্বেতকে দেখতে পেয়েছিলেন ; রাজা শ্বেতের (দ্রঃ) দেওয়া এই অলঙ্কার ইত্যাদি সব জানান। যোগবলে অগস্ত্য দেহত্যাগ করে নক্ষত্র লোক প্রাপ্ত হন।

অগস্ত্যের বিন্ধ্যদমন কাহিনী দাক্ষিণাত্যে আর্য উপনিবেশ স্থাপনের রূপক কাহিনী বলে অনেকের ধারণা। দ্রাবিড় জাতি অগস্ত্যকে তাঁদের প্রথম জ্ঞান-উপদেষ্টা বলে মনে করেন। তামিল ভাষার প্রবর্তক রূপেও অগস্ত্য প্রসিদ্ধ। ডঃ কলডোয়েলের মতে খৃঃ পূঃ ৬।৭ শতকে অগস্ত্যের আবির্ভাব। খৃস্টীয় ৬ শতকে এই নামে এক জন তামিল গ্রন্থকার ছিলেন। দ্রঃ-ইন্দ্রদ্যুম্ন, তাড়কা, সপ্তশাল, শূক, মণিমান, দুষ্পণ্য, কুবের, ক্রৌঞ্চ।

অগস্ত্য আশ্রম—বর্তমানে অগস্তিপুরী ; নাসিক থেকে ২৪ মাইল দ- পূর্বে। নাসিকের পূর্বে আকলাতে এবং বোম্বে প্রদেশে কোলহাপুরেও আশ্রম ছিল। যুক্ত প্রদেশে সরাই-অঘৎ ইটা থেকে ৪২ মাইল দ-পশ্চিমে ; এবং সাংকাশ্য থেকে ১-মাইল উ-পশ্চিমে। তিন্নেভেলিতে অগস্ত্যকূট আশ্রমে অগস্ত্য আজও আছেন প্রবাদ। গাড়োয়ালে রুদ্রপ্রয়াগের ১২ মাইল দূরে অগস্ত্য গ্রাম। বৈদূর্য (সাতপুরা) পর্বতে আর একটি। দ্রঃ- কারা ; তাম্রপর্ণী, বেদারণ্য, মলয়গিরি।

নাসিকের দ-পূর্বে আশ্রমটির কাছেই পঞ্চবটী, বনবাসের সময় পাণ্ডবরা এখানে এসেছিলেন। প্রয়াগের কাছে একটি আশ্রমের উল্লেখ আছে (মহা ৩।৮৫।১৪) ; এখানে কালঞ্জর পর্বতে হিরণ্যবিন্দু নামে অগস্ত্য আশ্রম বিখ্যাত। যুধিষ্ঠিররা গয়শির নামে একটি তীর্থে যান এবং এখান থেকে অগস্ত্য আশ্রমে এসে দুর্জয়াতে অবস্থান করেন।

অগস্ত্যতীর্থ—পাণ্ড্যেষু অগস্ত্য ও বরুণ তীর্থ (মহা ৩।৮৬।১০)। গোদাবরী থেকে

গিয়ে দ্রাবিড়েষু পুণ্য অগস্ত্যতীর্থে যাওয়া যায়; বনবাসের সময় যুধিষ্ঠিররা এখানে এসেছিলেন (মহা ৩।১১৮।৮)। ৫-টি নারী তীর্থের মধ্যে এখানে অগস্ত্য তীর্থ একটি। অর্জুন (দ্রঃ) এই ৫-টি তীর্থ থেকে বর্গাদের শাপ মুক্ত করেন।

অগস্ত্যনক্ষত্র—ক্যানোপাস। ভাদ্রের ১৭।১৮ তারিখে আকাশে দেখা যায়।

অগস্ত্যযাত্রা—অগস্ত্য যে দিন দক্ষিণাপথে গিয়েছিলেন। এই দিন যাত্রা নিষিদ্ধ। পরে প্রতি মাসে পয়লা তারিখে কোথাও যাওয়া নিষিদ্ধ হয়।

অগস্ত্য শাপ—মণিমান ও নহুষকে শাপ দিয়েছিলেন।

অগস্ত্য শিষ্য আশ্রম—দক্ষিণা পথে দেবসভা গিরিতে (মহা ৩।৮৬।১৪)।

অগস্ত্য সংহিতা—অগস্ত্য প্রণীত ধর্মশাস্ত্র।

অগস্ত্যসর—তণ্ডুলিকা আশ্রম থেকে অগস্ত্যসর তীর্থে যাওয়া যায়। এখানে পিতৃ-পুরুষদের পূজা করে তিন রাত্রি বাস করলে অগ্নিষ্টোম ফল লাভ হয় (মহা ৩।৮০।৬৩)।

অগস্ত্যোদয়—দ্রঃ অগস্ত্য নক্ষত্র। শরৎকালের আগমন সূচনা করে।

অগ্‌গলভ চৈত্য—সাংকাশ্য থেকে ৩৫০ মাইল উত্তরে সুগনতে। খলসির কাছে কোথাও। বুদ্ধদেব এখানে ১৬-শ বর্ষা কাটান। আলবক যক্ষ এখানে বাস করতেন (ফা-হিয়েন)।

অগ্নি—আগুন। তেজসের একটি রূপ। তড়িৎ-চুম্বক তরঙ্গ। আর্যদের প্রত্যক্ষ দেবতা। ঋক্‌বেদে সূক্তসংখ্যার ভিত্তিতে ইন্দ্রের পরই এঁর স্থান। প্রায় ২০০ সূক্তে এঁর স্তব করা আছে। এ ছাড়াও অন্য দেবতাদের সঙ্গে অন্যান্য সূক্তেও অগ্নির উল্লেখ আছে। ঋক্‌বেদে প্রথম ও শেষ সূক্তেও অগ্নির বন্দনা রয়েছে। অগ্নির প্রধান কাজ যজ্ঞস্থলে দেবতাদের ডেকে আনা ও দেবতাদের উদ্দেশ্যে হবির্বহন। তিনি মানুষ ও দেবতাদের দূত।

বেদে দেবতাদের মুখ, জিব, জঠর এবং দূতও বটে। অগ্নি সর্বদেব (বিশ্বদেবসম্ ঋক্ ১।১২।১)। অগ্নিই যজ্ঞের হোতা, পুরোহিত, এবং ঋত্বিক্; যথা অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবম্ ঋত্বিজম্, হোতারম্ রত্ন-ধাতমম্ (ঋক্ ১।১।১)। অগ্নি (শুক্ল যজুঃ ৫।৫।২।১) অন্নপতি। অগ্নি বলের পুত্র—সূনুঃ সহসঃ (ঋক্ ১।৫।৮)। সায়ন বলেছেন মথ্যমানঃ অগ্নিঃ জায়তে। আবার অন্নের পুত্র অগ্নি অর্থাৎ জঠরে খাদ্য থেকে অগ্নির জন্ম। এই অগ্নি সমস্ত বিশ্বভুবনে ব্যাপ্ত; সমুদ্রে, এবং জীবের দেহে ও জীবনেও এঁর অধিষ্ঠান। ঋক্‌বেদে অগ্নিই সহস্রশীর্ষ বিরাট পুরুষ। স্বর্গের অধিপতি। অগ্নি প্রাণ, অগ্নি মন, অগ্নি সকল দেবতার আত্মা। অগ্নিঃ বৈ সর্বদেবতা (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ২।৩)। ঋক্‌বেদে (২।১।৩-৭, ১১) অগ্নিকে ইন্দ্র, ব্রহ্মা, বরুণ, রুদ্র, সবিতা, মিত্র, অদিতি, ইলা, অর্যমা, ত্বষ্টা, বৃত্রহন্তা, সরস্বতী বলা হয়েছে; এটি অবশ্য অতিশয়োক্তি।

অথর্ব বেদে (১৩।৩।১৩) আছে স বরুণঃ সায়ম্ অগ্নিঃ ভবতি; স মিত্রঃ ভবতি প্রাতঃ উদ্যন্। স সবিতা ভূত্বা অন্তরীক্ষেণ যাতি, সঃ ইন্দ্রঃ ভূত্বা তপতি মধ্যতঃ দিবম্। ঋক্‌বেদে (১০।৮৮।৬) অগ্নি সূর্য—মূর্ধা ভবতি নক্তম্ অগ্নিঃ ততঃ সূর্যঃ জায়তে প্রাতঃ উদ্যন্। নিরুক্তে (৯।৮।৫) অগ্নিই সূর্য, অগ্নিই মাতরিশ্বা, অগ্নিই বায়ু। উপনিষদে

ও পুরাণে অগ্নি ব্রহ্মা। ঋকে (১০।৫।৭) অগ্নিকে ব্রহ্মা বলা হয়েছে ; দ্যাবা পৃথিবী এর জন্ম দাতা। মার্কণ্ডেয় পুরাণে [অ ৯৯।-] অঙ্গিরস শিষ্য ভূতি বলেছেন ত্বাম্ ঋতে হি জগৎ সর্বং সদ্যঃ নশ্যেৎ হুতাশন।

বেদে অগ্নির তিনটি রূপ—আহবনীয়, গার্হপত্য ও দক্ষিণাগ্নি ; বা সূর্য, বিদ্যুৎ ও অগ্নি। অগ্নি দেবতাদেরও আগে ; অগ্নিই ব্রহ্ম বা ব্রহ্মই অগ্নি। ঋক্ বেদে রাত্রির পুত্র অগ্নি এবং দিবার পুত্র সূর্য একটি কবিতা। ঋক্‌বেদে ও তৈত্তিরীয়তে অগ্নি পুষ্কর থেকে জাত। পুষ্কর অর্থে অন্তরীক্ষ, পৃথিবী, জল, পদ্ম ইত্যাদি ইত্যাদি। শতপথে হারিয়ে যাওয়া অগ্নিকে প্রজাপতি পদ্মপত্রে খুঁজে পান। তেজে অগ্নি অশ্বের সমান এই রকম একটি ধারণা গড়ে উঠেছিল। ঋকে (১।৬৫।১) অগ্নি দেবতাদের কাছ থেকে নিজেকে গোপন করার জন্য অশ্বরূপ ধারণ করে এক বছর অশ্বত্থ-গাছে বাস করেন। ঋকে (১।৭২।১) অগ্নির অশ্বরূপের কথা আছে। মহাভারতে ঔর্ব ঋষির ক্রোধাগ্নি সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হলে হয়শির রূপ গ্রহণ করে। ঋক্ (২।২৪।১৩) ব্যাখ্যায় সায়ন অগ্নিকে অশ্বনামা বলেছেন।

ঋক্‌বেদে অগ্নির জন্ম সম্বন্ধে আছে দ্যুলোক থেকে মাতরিশ্বা এঁকে আহরণ করেছেন। আবার আছে দুটি মেঘের মাঝখান থেকে ইন্দ্র এঁকে উৎপাদন করতেন। আবার আছে মেঘ থেকে উৎপন্ন হয়ে পৃথিবীতে নেমে এসে অদৃশ্য হয়ে যান ; মাতরিশ্বা অগ্নিকে আবার রূপ দেন এবং ভৃগুকে দান করেন। ঋক্‌বেদে অগ্নি বায়ুর পুত্র। কারণ অরণি ঘষবার সময় ব্যান বায়ু ঋষিদের সাহায্য করেন। সন্ধ্যাতে সূর্য অগ্নিকে তাঁর তেজ সমর্পণ করেন এবং সকালে আবার এই তেজ গ্রহণ করেন (ঋক্)। দেবতাদের একবার হাতে হব্য দ্রব্য লেগে গিয়েছিল। অগ্নি তখন জল থেকে একত, দ্বিত, ত্রিত (দ্রঃ) তিনটি ছেলের জন্ম দেন (ঋক্)। আবার আছে দ্যাবা ও পৃথিবী এঁর জননী। শাকপূণির মতে আকাশে সূর্য, অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎ ও পৃথিবীতে অগ্নি—অগ্নির এই তিন রূপ। অন্য মতে স্ত্রী ও পুরুষ রূপী অরণিদ্বয়ের সংঘর্ষণে এর জন্ম। ঋক্‌বেদে অগ্নির কয়েকটি বিশেষণ দেখা যায় ঃ—ঘৃতনির্ণিক, ঘৃতকেশ, দ্রুন্ন, ধূমকেতু, তমোহন, চিত্রভানু, শুক্রশোচিঃ, শুচিদন্, কৃষ্ণবর্ত্মানি, হিরণ্যরথ, বৈশ্বানর, তনূনপাৎ, নরাশংস। ঋক্‌মন্ত্রে অগ্নির সঙ্গে ত্রিত্ব সংখ্যার যোগ লক্ষণীয় ; যেমন ত্রিষধস্থ, ত্রিপস্ত্য। গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণ—অগ্নির এই তিনটি রূপ সুবিদিত। যজুর্বেদে হব্যবাহন, ক্রব্যবাহন, ও আমাদ তিনটি রূপ দেখা যায়। ঋক্‌বেদে দৈবোদাস, ত্রাসদস্যব, বধ্র্যশ্ব রূপেও অগ্নির বর্ণনা আছে। ঋক্‌বেদে অগ্নি রক্ষক, রক্ষোহন্ ; পুত্র, পশু ও হিরণ্য দাতা। অগ্নির বাহনের নাম রোহিৎ। ব্রাহ্মণ ও রাজন্যরা অগ্নিকে বিশেষ ভাবে পূজা করতেন।

অগ্নিকে বহু জায়গায় যুবা ও যবিষ্ঠ (তুলনায় গ্রীক-হেপাইটস) বলা হয়েছে। দুটি কাঠের ঘর্ষণে (মন্থনে) অগ্নি জন্মায় বলে নাম প্রমন্থ (তুলনায় গ্রীক-প্রমিথি-উস্)। অগ্নির আর এক নাম ভরণ্যু (তুলনায় ফোরোনিউস)। যজ্ঞাংশ দেবতাদের কাছে পৌঁছে দেন বলে ঋক্‌বেদে অগ্নি দেবদূত (তুলনায় গ্রীক হারমেস/দেবদূত)।

জাত মাত্রেই অগ্নি জনক জননীকে ভক্ষণ করেন। অগ্নি জলের গর্ভ বা ভ্রূণ। আকাশ ও পৃথিবীতে অগ্নির জন্ম ফলে অগ্নি দ্বিজ। গৃহে গৃহে অধিষ্ঠান বলে বহুজন্মা। ল্যাটিনে অগ্নির নাম ইগনিস, ফরাসিতে ইগ্নি, স্লাভ-অগনু, স্পেন, ও ইতালিতে-ইগনেস, বালটিক অগনে, ফা-আতশ।

অগ্নির দশটি মূর্তি ঃ—ধূমার্চি, উষ্মা, জ্বলিনী, জ্বালিনী, বিস্ফালিনী, সুশ্রী, সুরূপা, কপিলা, হব্যবহা, কব্যবহা। অগ্নির জিব বা শিখা সাতটি বা সাত রকমের ঃ— করালী, ধূমিনী, শ্বেতা, লোহিতা, নীললোহিতা, পদ্মরাগা ও সুবর্ণা। দার্শনিক মতে অগ্নির সপ্ত জিহ্বা হচ্ছে পঞ্চ ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও মন। অগ্নির চার শিঙ, তিন পা, দুই মাথা, সাত হাত। ইনি ত্রিলোক দর্শক। উপাসকরা এঁ'র দয়ায় দীর্ঘ জীবন, ধন ও সমৃদ্ধি লাভ করেন। ক্ষুধা, দৈন্য ও শত্রু থেকেও ইনি রক্ষা করেন। এঁ'র বর্ণনা কৃষ্ণবস্ত্রাবৃত, ধূম্রপতাকা, হাতে জ্বলন্ত বর্শা, বাহন ছাগ। অন্য মতে চার হাত, লোহিত বর্ণ, অশ্বচালিত রথে ভ্রমণ করেন ; সপ্তবসু এঁ'র রথের চাকা। ইনি স্থূলকায়, লম্বোদর, রক্তবর্ণ, কেশ ভ্রূ ও চক্ষু পিঙ্গল ; শক্তি ও অক্ষসূত্র ধাবী। অন্য মতে রঙ বালার্ক সমান।

অগ্নির নানা বর্ণনা আছে। কোথাও তিনটি কোথাও বা সপ্ত জিহ্বা। চার বা সহস্র চক্ষু ; এগুলি সবই রূপক ; বিশেষ অর্থ যুক্ত। মোটামুটি সমস্ত শাস্ত্র মিলে যে বর্ণনা তাতে নির্দিষ্ট কোন রূপ পাওয়া যায় না। মূলত অগ্নি চৈতন্য স্বরূপ ; অনন্ত এর উপমা। অবশ্য পুরাণে, মূর্তি শিল্প ইত্যাদিতে একটা মূর্তি খাড়া করবার চেষ্টা করা হয়েছে ; অগ্নির বামে স্বাহা থাকবে নির্দেশ রয়েছে। অগ্নির চারটি দংষ্ট্রা বলা হয়েছে ; এর অর্থ কেউ মনে করেন অপরাধীর চার প্রকার দণ্ড। অগ্নির রথে চারটি শুকপাখী ; চার বেদের প্রতীক যেন। বিশ্বকর্মা-শিল্পে অগ্নি মেষ-বাহন। হেমাদ্রি বর্ণিত অগ্নির বাম উরুতে অগ্নির স্ত্রী সাবিত্রী। সৌর, ও মৎস্য পুরাণে এবং মহানির্বাণ তন্ত্রে ছাগ বাহন। অগ্নির একাধিক মুখ অর্থে প্রতীক। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে অগ্নির উদ্দেশ্যে ছাগ বলির ব্যবস্থা আছে। দ্রঃ—দিকপাল।

ধর্মের ঔরসে বসুর গর্ভে অগ্নির জন্ম ; স্ত্রী স্বাহা, ছেলে পাবক, পবমান ও শুচি (দ্রঃ)। আর এক মতে স্বাহার তিন ছেলে দাক্ষিণ্যম্, গার্হপত্যম্, ও আহ্বনীয়ম্। দ্রঃ-অগ্নিত্রয়। ৬-ষ্ঠ মন্বন্তরে স্ত্রী বসুধারার গর্ভে দ্রবিণক ইত্যাদি ৪৫ ছেলে। সব মিলে সংখ্যায় ৪৯-জন অগ্নি। অন্য মতে ব্রহ্মার মুখ থেকে জন্ম। আর এক মতে ব্রহ্মার বীর্য ; সমুদ্রে পালিত। আর এক মতে অঙ্গিরার ছেলে (দ্রঃ-বৃহস্পতি) ; সাণ্ডিলার প্রপৌত্র। অষ্ট বসুদের মধ্যে এক জন। অগ্নিকে ভৃগু (দ্রঃ) সর্ব ভুক্ হবার শাপ দিলে অগ্নি বোঝাতে চেষ্টা করেন মিথ্যা সাক্ষ্য তিনি দিতে পারেন না ; সত্য কথা বলতে বাধ্য হয়েছেন। মুখে করে তিনি হবিঃ বহন করেন ; কি করে সর্বভুক্ হবেন ইত্যাদি ; এবং রাগে অগ্নিহোত্র ইত্যাদি সমস্ত যজ্ঞ থেকে অন্তর্হিত হয়ে যান। ঋষিরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন ; সমস্ত ক্রিয়া লোপ পায় ; দেবতাদের জানান। সকলে মিলে তারপর ব্রহ্মার কাছে যান (ম ১।৭।২১)। ব্রহ্মা অগ্নিকে সন্তুষ্ট করে বর দেন অগ্নি সব সময়েই পবিত্র ; এবং যা স্পর্শ করবে তাও পবিত্র হবে। কেবল মাত্র অগ্নির গুহ্য দেশের

শিখা ও ক্রব্যাদ শরীর সর্বভুক হবে এবং অগ্নির মুখে যে আহুতি দেওয়া হবে তাই দেবতারা ভাগরূপে গ্রহণ করবেন।

শ্বেতকি রাজার যজ্ঞে অতিরিক্ত হবি খেয়ে অগ্নির কঠিন অগ্নিমান্দ্য রোগ হয়। ব্রহ্মার উপদেশে তখন খাণ্ডব বনের সমস্ত প্রাণী ভক্ষণ করতে যান। এই বন ইন্দ্রের রক্ষিত বন ছিল, ফলে ইন্দ্র বাধা দেন। বনের শত সহস্র হাতী শুঁড়ে করে জল দিয়ে এবং বহুশীর্ষ সাপেরা মাথায় করে জল এনে আগুন নিভিয়ে দেয়। বার বার অকৃতকার্য হয়ে শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণ ও অর্জুনের সাহায্যে খাণ্ডবদহন (দ্রঃ) করে রোগমুক্ত হন। এই সময় অগ্নি বরুণদেবের কাছ থেকে কপিধ্বজ রথ, গাণ্ডীব ধনু ও দুটি অক্ষয় তূণ অর্জুনকে এবং সুদর্শন চক্র ও কৌমোদকী গদা কৃষ্ণকে এনে দেন। কার্তবীর্যার্জুনের (দ্রঃ) কাছেও একবার ভক্ষ্য চেয়েছিলেন।

কার্তিকের জন্মের জন্য শিব পার্বতী রমণ করছিলেন। বহু বছর কেটে যায়। দেবতারা ব্যস্ত হয়ে অগ্নিকে শিবের কাছে পাঠাতে চান। কিন্তু শিবের ভয়ে অগ্নি সমুদ্রে গিয়ে লুকিয়ে থাকেন। সমুদ্রে জল গরম হয়ে উঠতে থাকে; জলচর জীবেরা দেবতাদের সব জানিয়ে দেয় অগ্নি সমুদ্রে লুকিয়ে রয়েছে। ফলে অগ্নির শাপে এরা মূক হয়ে যায়। অগ্নি তারপর মন্দর পাহাড়ে পেঁচা সেজে পালিয়ে যান। হাতী ও শুক পাখীরা এবারও দেবতাদের জানিয়ে দেয় অগ্নি গাছের কোটরে লুকিয়ে আছেন। অগ্নির শাপে এদেরও জিব নষ্ট (উল্টো) হয়ে যায়। কিন্তু পরে অগ্নি শুক পাখির প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হয়ে বর দেন এর ডাক শিশুর কলভাষণ মত মিষ্ট ও মনোজ্ঞ হবে। দেবতারা অগ্নিকে ধরে ফেলেন। অগ্নি তখন বাধ্য হন শিবের কাছে যেতে। অগ্নির উত্তাপে শিব উত্তেজিত হয়ে নিজের বীর্য অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন। দ্রঃ- কার্তিকেয়। অগ্নি (মহা ১৩।৮৪।-) ভৃগুর শাপে অভিভূত; সেই সময়ে অসুরদের বিনাশের জন্য কার্তিকের জন্মের প্রয়োজনের কথা ব্রহ্মা বলেছিলেন এবং ব্রহ্মাই বলেছিলেন অগ্নিই একমাত্র সাহায্য করতে পারবেন। অগ্নি ভয়ে সমুদ্রে লুকান; প্রথমে ভেকরা বলে দেয় এবং অগ্নির কাছে অভিশপ্ত হয় এরা কোন কিছুর স্বাদ পাবে না। ভেকরা তখন দেবতাদের কাছে অভিযোগ করলে দেবতারা এদের বর দেন রাত্রির অন্ধকারেও এরা স্বচ্ছন্দচারী হবে। অগ্নি তারপর একটি বটগাছে আত্মগোপন করেন এবং একটি হাতী জানিয়ে দেয় ও অভিশপ্ত হয় হাতীর জিব ভিতর দিকে চলে যাবে। দেবতারা হাতীকে বর দেন তাদের খেতে কোন অসুবিধা হবে না; এবং সব কিছু খেতে পারবে। অগ্নি তারপর এক শমী গাছের কোটরে এসে আত্মগোপন করেন। গাছে একটি শুক পাখী ছিল বলে দেয়। দেবতারা এসে অগ্নিকে ধরে ফেলেন। শুক ও অভিশাপ পায় তার জিব ভেতর দিকে চলে যাবে এবং দেবতারা বর দেন সে ভাল গান করতে পারবে। শমী গাছ থেকে বার হয়ে আসার জন্য অগ্নির পুনর্জন্ম হল বলা হয়।

গৌতমের শাপে অভিশপ্ত ইন্দ্রকে (দ্রঃ) সুস্থ করেন।

অগ্নি একবার পুরূরবার ছেলে জাতবেদস্ হয়ে জন্মান। বৃত্র বধের পর লুকিয়ে থাকা ইন্দ্রকে বৃহস্পতির নির্দেশে খুঁজে বার করেন। অগ্নি অষ্টবসুর (অনল) একজন

এবং অগ্নি এক জন দিকপাল (দ্রঃ)। সৃষ্টির পর মৃত্যু ছিল না। পৃথিবী ভরে যায়। ব্রহ্মা তখন অগ্নিকে পাঠান ; জীবলোক পুড়ে শেষ হতে থাকে। শিব শেষে এই আগুন ফিরিয়ে নেবার জন্য অনুরোধ করলে জীবলোক রক্ষা পায়। মহাপ্রস্থানের সময় অর্জুন সমুদ্রের তীরে এসে উপস্থিত হলে অগ্নি বিরাট পর্বতের আকার ধারণ করে অর্জুনের পথ আটকে দাঁড়ান এবং খাণ্ডব দাহনের (দ্র:) সময় দেওয়া অক্ষয় তূণ ও গাণ্ডীব জলে বিসর্জন দিতে বলেন। দত্তাত্রেয়ের ছেলে নিমি মারা গেলে শ্রাদ্ধে ভূরি-ভোজনে দেবতাদের গর-হজম হলে ব্রহ্মা অগ্নির সঙ্গে পরামর্শ করেন। ঠিক হয় ভবিষ্যতে নিমন্ত্রণে অগ্নিকে নিমন্ত্রিতদের সঙ্গে নিয়ে গেলে আর এ অবস্থা হবে না। এই জন্য রান্নার পর প্রতিটি ভোজ্য বস্তুর একটু অংশ আগুনে দিতে হয়।

নলকে (দ্রঃ) বর দেন। দ্রঃ-অঙ্গিরা, অগ্নিবংশ।

বিভিন্ন কাজে যে অগ্নির পূজা করা হয় ঃ—লৌকিক (নবগৃহ প্রবেশাদি কাজ)-পাবক ; গর্ভাধানে-মারুত ; পুংসবনে-চন্দ্রনামা ; শুঙ্গাকর্মে (বিশেষ পুংসবন) শোভন ; সীমন্তে-মঙ্গল ; জাতকর্মে-প্রগলভ্ ; নামকরণে-পার্থিব ; প্রাশনে-শুচিঃ ; চূড়াকরণে-সত্য ; উপনয়নে-সমুদ্ভব ; গোদানে-সূর্যনামা ; সমাবর্তনে/কেশান্তে-অগ্নি ; সাগ্নিকর্তব্য-বিশেষে-বৈশ্বানর ; বিবাহে-যোজক ; বিবাহে চতুর্থী হোমে-শিখী ; প্রায়শ্চিত্তে-বিধু ; পাকযজ্ঞে (বৃষোৎসর্গ ইত্যাদিতে)-সাহস ; লক্ষহোমে-বহ্নি ; কোটিহোমে-হুতাশন ; পূর্ণাহুতিতে-মৃড় ; শান্তিকে-বরদ ; পৌষ্টিকে-বলদ ; অভিচারকর্মে-ক্রোধ ; বশ-অর্থে শমন ; বরদানে-অভিদূষক ; কোষ্ঠে-জঠর ; মৃতভক্ষণে-ক্রব্যাদ।

অগ্নির বিভিন্ন নাম—অনল, আপ্‌পিত্ত, অজহস্ত, আশ্রয়াশ, আশুশুক্ষণি, উষর্বুধঃ, কৃপীটযোনি, কৃষ্ণবর্ত্ম, কৃশানু, ঘৃতপিষ্ট, চিত্রভানু, ছাগরথ, জাতবেদস্, জ্বলন, জ্বালাময়, জ্বালাকেশ, তনূনপাৎ, তোমরধর, ত্রিজিহ্ব, দহন, দমন, ধনঞ্জয়, ধূমকেতু, নীলপৃষ্ঠ, পাবক, পিঙ্গলশ্মশ্রু, বহ্নি, বীতিহোত্র, বৈশ্বানর, বর্হিস্, বৃহদ্‌ভানু, বায়ুসখ, বিভাবসু, মধুজিহ্ব, রোহিতাশ্ব, শুষ্মা, শোচিষ্কেশ, শিখাবৎ, শুক্র, শুচি, সপ্তার্চিস্, সপ্তজিহ্ব, হিরণ্য-রেতস্, হিরণ্যদন্ত, হুতভুক, হুতাশন, হুতাশ হব্যবাহন, হিরণ্যকেশ ইত্যাদি। দ্রঃ—অগ্নিপরীক্ষা, অগ্নিরথ, ইন্দ্র, উতঙ্ক, উশীনর, কার্তিকেয়, কার্তবীর্যার্জুন, খাণ্ডবদাহন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, নল, রাজা নীল, নীল বানর, ভৃগু, মরুত্ত, মায়াসীতা, রম্ভ, শ্বেতকি, স্বাহা, হুতাশন।

অগ্নির পূজা হয়তো গুপ্ত রাজাদের সময় থেকে প্রচলিত হয়েছিল এবং ছাগ/মেষ বাহন, এবং দাড়ি আছে বহু প্রস্তর মূর্তি পাওয়া গেছে। শুঙ্গরাজ অগ্নিমিত্র ও ভানুমিত্রের তাম্রমুদ্রাতে বেদির ওপর অগ্নি দাঁড়িয়ে আছেন। বৌদ্ধরাও অগ্নিদেবকে গ্রহণ করে-ছিলেন ঃ—অগ্নিকোণের অধিপতি, ছাগবাহন এবং অমিতাভের দ্যোতক। ঋক্ বেদে (৮।৬৩।৫) স্বাহাপতি ; মহাভারতেও দক্ষকন্যা স্বাহা অগ্নির সঙ্গে ৬ বার মিলিত হন।

ইয়ুরোপে বা অন্যত্র অগ্নিপূজা হত ; আজও কোন কোন জাতি পূজা করে। কিন্তু অগ্নি ব্রহ্ম এ তত্ত্ব কোথাও নাই। ৩০০০ খৃ পূর্বে মহেন-জো-দারোতে যজ্ঞশালা ছিল এবং অগ্নিপূজা (দ্রঃ) হত। দ্রঃ- মুদ্রা।

অগ্নিকুমার—কার্তিকেয় (দ্রঃ)।

অগ্নিকুল—একটি রাজপুত কাহিনী অনুসারে বিশ্বামিত্র, গৌতম, অগস্ত্য প্রভৃতি ঋষিরা দ-রাজপুতানার আবু পাহাড়ে একটি যজ্ঞের আয়োজন করেন। দৈত্যরা এসে বিঘ্ন ঘটাতে থাকে। বশিষ্ঠ তখন মন্ত্রবলে যজ্ঞাগ্নি থেকে পরমার, চৌলুক্য, প্রতিহার ও চাহমান, এই চারজন বীরকে সৃষ্টি করেন। এরা দৈত্যদের নিহত করলে যজ্ঞ সুসম্পন্ন হয়। এই চার জন থেকে পরে পরমার, চৌলুক্য, প্রতিহার ও চাহমান বা চৌহান রাজবংশ সৃষ্টি হয়। অগ্নি থেকে উৎপত্তি বলে এ'রা অগ্নিকুল।

অগ্নিকেতু—রাবণের বন্ধু। লঙ্কার যুদ্ধে নিহত হন।

অগ্নিকোণ—পূর্ব ও দক্ষিণ কোণের মধ্যবর্তী কোণ। এখানে অগ্নির অবস্থান।

অগ্নিজিহ্ব—বিষ্ণু। বরাহ মূর্তি ধারণ কালে অগ্নিজিহ্ব হয়েছিলেন।

অগ্নিতীর্থ—কপালমোচন তীর্থ থেকে অগ্নিতীর্থে যেতে হয়। এখানে স্নান করলে অগ্নিলোক প্রাপ্তি হয় ; এবং বংশ উদ্ধার পায়। এখানেই বিশ্বামিত্র তীর্থ। এখান থেকে ব্রহ্মযোনি তীর্থে যেতে হয়। (ম ৩।৮১।১১৯)

অগ্নিত্রয়—তিন রকম আগুন ঃ—(১) গার্হপত্য—যজ্ঞাদির জন্য গৃহপতি যে আগুন গৃহে অনির্বাণ রাখেন। (২) আহবনীয়—গার্হপত্য আগুন থেকে গৃহীত মন্ত্রপূত অগ্নি ; হোমের জন্য। (৩) দাক্ষিণ্য বা দক্ষিণাগ্নি—দক্ষিণা দেওয়া হলে এই অগ্নি তৃপ্ত হয়ে দেবতাদের এই দক্ষিণা ভাগ দান করেন। এই তিনটি অগ্নিকে (দ্রঃ) স্বাহার পুত্রও বলা হয়। আবার আকাশে সূর্য, অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎ এবং পৃথিবীতে অগ্নি—এই তিনটি অগ্নিও বুঝায়। দ্রঃ-অগ্নিহোত্র।

অগ্নিদেবা—কৃত্তিকা নক্ষত্র।

অগ্নিধারা—কুমার ধারা থেকে অগ্নিধারা তীর্থে আসতে হয়। ত্রিভুবন বিখ্যাত অগ্নি-ধারা তীর্থ। এখানে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং স্বর্গ থেকে কোন দিন ফিরতে হয় না ; এখান থেকে তারপর পিতামহ সর তীর্থে যেতে হয়।

অগ্নিনক্ষত্র—কৃত্তিকা নক্ষত্র।

অগ্নিপরীক্ষা—জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে প্রবেশ করে বা লাঙলের তপ্ত লৌহ শলাকা চেটে এই পরীক্ষা দিতে হয়। সতী নারীর এতে কোন ক্ষতি হত না। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে হাতের ওপর কয়েকটি উত্তপ্ত লৌহ শলাকা নিয়ে কয়েকটি মণ্ডল অতিক্রম করার নির্দেশ আছে। নানা কারণে এই সব পরীক্ষা হত। রাবণ বধের পর সীতা সম্বন্ধে প্রজাদের সন্দেহ হীন করার জন্য লঙ্কাতে সীতাকে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছিল। অপমানে সীতা প্রাণত্যাগ করবেন ঠিক করেন। কিন্তু জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করলে অগ্নি নিজে সীতাকে বার করে এনে রামকে ফিরিয়ে দেন।

অগ্নিপুর—মাহিষ্মতী।

অগ্নিপ—ব্রাহ্মণ বেদনিধির ছেলে। পাঁচটি গন্ধর্ব কন্যা প্রমোদিনী, সুস্বরা, সুতারা, চন্দ্রিকা ও সুশীলা অগ্নিপকে বিয়ে করতে চান। ব্রাহ্মণ ক্রোধে শাপ দেন রাক্ষসীতে

পরিণত হবে। বেদনিধির করুণা হয় এবং লোমশ মুনির পরামর্শে প্রয়াগে এদের স্নান করতে বলেন ; ফলে এরা শাপমুক্ত হন। শেষ পর্যন্ত অগ্নিপ এদের বিয়ে করেন।

অগ্নিপূজা—অগ্নির পবিত্রতা প্রায় সব ধর্মেই স্বীকৃত। প্রাচীন কালে বহু দেশে অগ্নি পূজা প্রচলিত ছিল। ভারতীয়েরা ও জরথুস্ত্রবাদী পার্সিরাও এ'র উপাসক। ইন্দো-ইউরোপীয় আর্যেরা যেখানে গিয়েছিলেন সেইখানেই এই অগ্নিকেন্দ্রিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি নিয়ে গিয়েছিলেন। আর্যরা নিজেদের অগ্নির সন্ততি বলে বিশ্বাস করতেন এবং উষা, সূর্য, মিত্র, অগ্নি অথবা আতর্-এর পূজা করতেন। উত্তর ভারতে আর্যরা বসবাস করলে পশুযাগে ও অন্যান্য যজ্ঞে উৎসর্গীকৃত বস্তু অগ্নি দেবতাদের কাছে পৌঁছে দিতেন ; অর্থাৎ এক প্রধান দেবতা রূপে স্বীকৃত হয়েছিলেন। ইন্দো-ইউরোপীয়ানরা (=আর্য) ছিলেন মুখ্যত অগ্নি উপাসক। সর্ববিধ কল্যাণের জন্য এ'রা অগ্নির সাহায্যে দেবতাদের উদ্দেশ্যে নানা যজ্ঞ ও উপাসনা করতেন। পাঞ্জাবে আসার পর আর্যরা মৃতদেহ অগ্নিসাৎ করে পবিত্র করার প্রথা চালু করেন। ইরানীয় আর্যরা এ প্রথা গ্রহণ করেন নি।

প্রাচীন ইরানের আর্য সংস্কৃতিও অগ্নিকেন্দ্রিক। জরথুস্ত্র পরিপূর্ণ একেশ্বরবাদ প্রচার করে যজ্ঞের বদলে যশ্নের (পূজাবিধির) প্রচলন করেন। মূর্তিপূজা, গোমেধ হওম, ও সোমপান নিষিদ্ধ করেন। পশুবধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অগ্নিকে বাদ দিয়ে আদিম আর্যজাতির বেদী বা কুণ্ডগত অগ্নির মহিমা কীর্তন করেন। এই অগ্নি অহুরের (=অসুরের) সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তুলনায়—অসুরস্য জঠরাৎ অজায়ত। এই অগ্নি বিশ্বকে নব জন্ম দেন। দৈব জগতে এই অগ্নি অষ অথবা ঋতের প্রতীক। ফলে সব রকম ক্রিয়া কর্মে এই অগ্নি (পার্সি নাম আতর্) মূলাধার রূপে গৃহীত হলেন। পরিবারেতে অগ্নিকুণ্ডে এবং রাজপ্রাসাদে অপদানে (পার্সিশব্দ) অগ্নিরক্ষণের ব্যবস্থা হয়। পরিবারস্থ অগ্নির কাছে স্বাস্থ্য ও সন্তান ও পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনাদি করা হত। রাজ্যে জাতীয় বিজয়োৎসবে বা রাজ্যাভিষেকের সময় এই আতর্ (=অগ্নি) পূজা পেতেন ও পৌরাণিক বীরদের নাম অনুসারে বৃত্রহণ্, বৃত্রঘ্ন, বেরেথ্রঘ্ন, বহ্রাম ইত্যাদি নাম রাখা হত। অর্থাৎ আথর্বণ-গণ (আতর্/অগ্নির রক্ষক গণ) ঐরয় (আর্য) জাতিকে তাঁদের আইরান্ (=ইরান) রূপী উপনিবেশে এনেছিলেন। অগ্নির এই পূজা অগ্নি-কেন্দ্রিক সংস্কৃতির দান। ৬৫১ খৃ-অব্দে আরবের হাতে ইরান পরাজিত হলে আতর-এর পুরোহিতরা জরথুস্ত্র সম্প্রদায়ের আদর্শ বাঁচিয়ে রাখার জন্য ভারতে পালিয়ে আসেন। ৭৫০ খৃ-অব্দে আতর্ বহ্রামকে গুজরাটের উদ্‌বাড়োতে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই আগুন আজও প্রজ্বলিত আছে।

সৌরাষ্ট্রের মৈত্রিকগণ, পাঞ্জাবের অগ্নিহোত্রীরা, অগ্নিকে পার্সিদের মতই শ্রদ্ধা করেন। ভারতে শকযুগে এবং ইরানে প্রাচীন মুদ্রায় অগ্নিবেদীর ছবি দেখা যায় নওসারী অধিবাসী দস্তুর মেহেরজি রানা সম্রাট আকবরকে অগ্নিপূজার তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছিলেন।

অগ্নিপূর্ণ—সূর্যবংশে রাজা সুদর্শনের ছেলে। অগ্নিপূর্ণের ছেলে শীঘ্র ও মনু।

অগ্নিবংশ—বনবাস কালে পাণ্ডবদের মার্কণ্ডেয় অগ্নিবংশ কীর্তন করে শোনান। আশ্রমে তপস্যা করতে করতে অঙ্গিরা উজ্জ্বল হয়ে উঠে জগৎ উদ্ভাসিত করে তোলেন। অগ্নিও তপস্যা করছিলেন; অঙ্গিরার তেজে সংতপ্ত ও গ্লানি যুক্ত হয়ে পড়েন; ভাবেন তপস্যা করতে করতে তাঁর অগ্নিত্ব নষ্ট হয়ে গেছে হয়তো এবং এই জন্য ব্রহ্মা আর এক অগ্নি সৃষ্টি করেছেন। আবার অগ্নিত্ব কি ভাবে ফিরে পাবেন ভাবতে ভাবতে ভয়ে ভয়ে অঙ্গিরার সামনে আসেন। অঙ্গিরা বলেন অগ্নিকে সকলে জানে; অগ্নি নিজের অগ্নিত্ব গ্রহণ করুক; ব্রহ্মা প্রথমেই অগ্নিকে সৃষ্টি করেছিলেন ইত্যাদি। (মহা ৩।২০৭।-)

কিন্তু অগ্নি জানান তিনি নষ্টকীর্তি; সকলে অঙ্গিরাকেই পাবক বলে জানবে: অঙ্গিরাই প্রথম অগ্নি (সৃষ্টাগ্নি) হোক আর অগ্নি নিজে দ্বিতীয় (প্রাজাপত্য) অগ্নি হবেন। অঙ্গিরা তখন অগ্নিকে প্রজাস্বর্গ্য (ম ৩।২০৭) করতে বলেন এবং নিজের জন্য একটি ছেলে চান। অগ্নি তখন এঁর কথা মত কাজ করেন এবং অঙ্গিরার ছেলে হয় বৃহস্পতি। সমস্ত দেবতারা এসে কারণ জানতে চান; এবং অঙ্গিরার কথা মেনে নেন।

ব্রহ্মার তৃতীয় পুত্র অঙ্গিরা. স্ত্রী আপব সুতা (ম ৩।২০৮) শুভা; এঁদের সন্তান বৃহৎ-জ্যোতি. বৃহৎ-কীর্তি, বৃহৎ-ব্রহ্মা, বৃহৎ-মনা, বৃহৎ-মন্ত্র, বৃহৎ-ভাস ও বৃহস্পতি, মেয়ে প্রথমে ভানুমতী, দ্বিতীয়া রাগা, ক্রমশ সিনীবালী, অর্চিষ্মতী. হবিষ্মতী, মহিষ্মতী (দ্রঃ) ও কুহু/একানংশা।

বৃহস্পতির স্ত্রী চন্দ্রমসী (ম ৩।২০৯।৮); এর ছয় ছেলে শংযু, নিশ্চ্যবন, বিশ্বজিৎ, বিশ্বভুক্‌, বড়বামুখ, স্বিষ্টকৃৎ ও একটি মেয়ে মন্যতী বা স্বাহা। শংযুর স্ত্রী সত্যা; ধর্ম থেকে উৎপন্ন। সত্যার ছেলে ভরদ্বাজ অগ্নি ও তিনটি মেয়ে। শংযুর দ্বিতীয় পুত্র ঊর্জভরত বা ভরত তিনটি মেয়ে থেকে বড় (যাসাং স ভরতঃ পতিঃ; (ম ৩।২০৯।৭)। ঊর্জভরতের এক ছেলে ভরত এবং এক মেয়ে ভরতী। ভরণকারী প্রজাপতি ভরতের ছেলে পাবক: ইনি অতি মাত্রায় মহিত বলে অপর নাম মহান্‌ (ম ৩।২০৯।৮)।

শংযুর ছেলে ভরদ্বাজের স্ত্রী বীরা; ছেলে বীর। এঁর অপর নাম রথপ্রভু, রথধ্বান, ও কুম্ভরেতা। বীরের স্ত্রী সরযূ ও ছেলে সিদ্ধি।

নিশ্চ্যবনের ছেলে সত্য বা নিষ্কৃতি এবং নিষ্কৃতি অগ্নির ছেলে স্বন। বিশ্ব জগতের বুদ্ধি প্রভাবিত করেন যে অগ্নি তিনি বিশ্বজিৎ। দেহীদের অন্তরে থেকে ভুক্তদ্রব্য যিনি পাক করেন তিনি বিশ্বভুক্‌; পাক যজ্ঞে এঁর পূজা হয়; এঁর স্ত্রী গোমতী। সমুদ্রের জল যে অগ্নি সর্বদা পান করছেন তিনি বড়বামুখ; অপর নাম ঊর্দ্ধভাক্‌। স্বিষ্ট নামে হবিঃ যাকে দেওয়া হয় তিনি স্বিষ্টকৃৎ অগ্নি। ক্রোধপূর্ণ বৃহস্পতির কন্যা মন্যতী/মন্যন্তী/স্বাহা; এই স্বাহার রাজসী পুত্র পাবক কাম, তামসী পুত্র পাবক অমোঘ এবং সাত্ত্বিক পুত্র উক্‌থ। উক্‌থের ছেলে মহাবাক্‌/অপর নাম সকামাশ্ব/সমাশ্বাস।

বাশিষ্ঠ, কাশ্যপ, প্রাণপুত্র প্রাণ, অঙ্গিরার পুত্র চ্যবন ও সুবর্চক/ত্রিসুবর্চক এরা পাঁচজনে মহাব্যাহৃতি মন্ত্র ধ্যান করে পাঞ্চজন্য/তপ নামে অগ্নির জন্ম দেন। এই পাঞ্চজন্য পঞ্চ বংশের প্রবর্তক এবং তপস্যা করে মাথা থেকে বৃহৎ-রথন্তর, মুখ থেকে

তরসাহরো, নাভি থেকে শিবকে, বল থেকে ইন্দ্রকে, প্রাণ থেকে বায়ু ও অগ্নিকে এবং বায়ুস্বর থেকে উদাত্ত ও অনুদাত্ত দুই মন্ত্র, দেবতাত্মক মন ও পঞ্চজ্ঞান-ইন্দ্রিয় ও মহাভূত বর্গকে সৃষ্টি করলেন। এরপর বশিষ্ঠপুত্র বৃহৎ-রথের ছেলে প্রণিধিকে, কাশ্যপের ছেলে বৃহত্তরকে/মহত্তরকে, চ্যবনের ছেলে ভানুকে, সুবর্চকের ছেলে সৌরভকে/সৌভরকে ও প্রাণের ছেলে অনুদাত্তকে সৃষ্টি করেন। তপ এছাড়াও যজ্ঞ নষ্টকারী ১৫ জন দেবতা সুভীম, অতিভীম, ভীম, ভীমবল, অবল, সুমিত্র, মিত্রবান, মিত্রজ্ঞ, মিত্রবর্দ্ধন, মিত্রধর্মা, সুরপ্রবীর, বীর, সুরেশ, সুরবর্চা ও সুরহন্তা সৃষ্টি করলেন। তপের বৃহদুক্থ ও রথন্তর/মিত্রবিন্দ/মহাবিরাট নামে আরো দুটি পুত্র হয়। শংযুর ছেলে ভরতের অপর নাম পুষ্টিমতি। তপের আরো ৫ জন উর্জস্কর ছেলে পুরন্দর, উষ্মা, মনু, শম্ভু ও আবসথ্য-অগ্নি। অস্তগমনকালীন সূর্য প্রশান্ত-অগ্নি; ইনিও তপের পুত্র। তপের পুত্র মনু/ভানু/বৃহৎ-ভানুকে অঙ্গিরা সৃষ্টি করেন : এই ভানুর স্ত্রী সুপ্রজা ও সূর্যকন্যা বৃহৎ-ভাস এবং এঁদের ৬-টি ছেলে বলদ, মন্যুমান, বিষ্ণু/ধৃতি-অঙ্গিরা/ধৃতিমান, আগ্রয়ণ-অগ্নি, বিশ্বদেব/অগ্রহ, স্তুভ। ভানু নামে মনুর আর এক স্ত্রী নিশা : এই নিশার এক মেয়ে রোহিণী : ছেলে অগ্নি, সোম, বৈশ্বানর, বিশ্বপতি/স্বিষ্টকৃৎ, সন্নিহিত, কপিল, ও অগ্রণী।

অগ্নিতে কোন স্পর্শ দোষ ইত্যাদি দেখা দিলে এই অগ্নিকে শোধন করে নিতে হয়। শোধনের জন্য বিভিন্ন অগ্নি যথা শুচি, বীতি, দস্যুমান, সুরমান/অভিমত/সুরাভিমত, উত্তর-অগ্নি, পথিকৃৎ-অগ্নি ও অগ্নিমান-অগ্নি রয়েছে। বায়ু যোগে বিভিন্ন অগ্নি যদি পরস্পরে স্পৃষ্ট হয় তাহলে শুচি অগ্নিতে, দক্ষিণাগ্নি অন্য দুই অগ্নি দ্বারা স্পৃষ্ট হলে বীতি অগ্নিতে, নিবেশস্থ অগ্নি দাবাগ্নি দ্বারা স্পৃষ্ট হলে শুচি অগ্নিতে, অগ্নি-হোত্রাগ্নি ঋতুমতী নারীর দ্বারা স্পৃষ্ট হলে দস্যুমান অগ্নিতে, অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠানের সময় পশু সকল মারা গেছে ইত্যাদি শুনলে বা মৃত পশুব দ্বারা অগ্নি স্পৃষ্ট হলে সুরমান/অভিমত/সুরাভিমত অগ্নিতে, পীড়িত ব্রাহ্মণ তিন রাত অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান করতে না পারলে উত্তর অগ্নিতে, দর্শ ও পৌর্ণমাস যজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত হলে পথিকৃৎ অগ্নিতে এবং অগ্নিহোত্র অগ্নি সূতিকাগ্নি দ্বারা স্পৃষ্ট হলে অগ্নিমান-নামে অগ্নিতে আহুতি দিয়ে অষ্টকপাল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে হয়।

জলের মধ্যে অবস্থিত সহ নামক অগ্নির স্ত্রী মুদিতা ; ছেলে অদ্ভুত অগ্নি। অদ্ভুতের অপর নাম আত্মা/ভুবনভর্তা/গৃহপতি/ভূঃ-পতি/ভুবঃপতি/মহঃপতি। অদ্ভুতের ছেলে ভরত ; মৃত প্রাণীদের দাহ করে। ভরতের ছেলে ক্রতু/নিয়ত। এই ক্রতু/নিয়তকে দেখে সহ অগ্নি এর সংস্পর্শের ভয়ে সমুদ্রে লুকিয়ে পড়েন এবং তীব্র তপস্যারত অথর্বাঙ্গিরাকে দেবতাদের জন্য হব্য বহন করতে বলে অন্য দেশে চলে যান ; কিন্তু মাছেরা অগ্নির সন্ধান জানিয়ে দেয়। সহ তখন মাছেদের শাপ দেন সকলের ভক্ষ্য হবে এবং আবার অথর্বাঙ্গিরাকে অনুরোধ করেন। কিন্তু অথর্বাঙ্গিরা সম্মত হন না ; নিজের দেহ ত্যাগ করে মাটিতে গিয়ে প্রবেশ করেন ; তাঁর দেহ থেকে মাটিতে নানা ধাতু, পাথর, পাষাণ, অভ্র ইত্যাদি তৈরি হয়। এর পর ভৃগু আঙ্গিরাদি তপস্যার দ্বারা অথর্বাঙ্গিরাকে উত্থাপিত করেন কিন্তু এদের দেখে ভয়ে আবার সমুদ্রে প্রবেশ করেন এবং দেবতাদের প্রার্থনায় আবার

উঠে আসেন। নানা দেশ ভ্রমণ করতে করতে অগ্নি বেদোক্ত অগ্নিদেরও সৃষ্টি করেন। সিন্ধু, পঞ্চনদ, শোণ, দেবিকা, সরস্বতী, গঙ্গা ইত্যাদি নদীগুলিকে অগ্নিদের মাতৃগণ বলা হয়। অদ্ভুতের স্ত্রী প্রিয়া ; এবং বড় ছেলে বিড়ূরথ (মহা ৩।২১২।২৫)।

অগ্নিবর্ণ—(১) রাজা কুশের ছেলে। (২) সূর্য বংশে সুদর্শনের ছেলে ; রঘু বংশে শেষ রাজা। নারী ও সুরাসক্ত হয়ে যক্ষায় আক্রান্ত হন। মন্ত্রীরা পরামর্শ করে রাজাকে জ্বলন্ত চিতায় নিক্ষেপ করে তাঁর গর্ভবতী রাণীকে সিংহাসনে বসান।

অগ্নিবাহু—(১) প্রিয়ব্রতের ঔরসে কাম্যার গর্ভে জাত রাজপুত্র। (২) প্রথম মনুর একটি ছেলে।

অগ্নিবেশ—চরক সংহিতা প্রণয়ন করেন। আগে নাম ছিল অগ্নিবেশ সংহিতা। গ্রন্থটি লুপ্তপ্রায় হলে চরক আবার সংকলন বা সংস্কার করেন। দ্রঃ-অগ্নিবেশ্য।

অগ্নিবেশ্য—(১) অগ্নিবেশ। আত্রেয় শিষ্য। অন্য মতে অগস্ত্য বা বৃহস্পতি বা ভরদ্বাজ শিষ্য। মহাভারতে (১।১২১।৭) অগ্নি থেকে জন্ম বলে এই নাম। ভরদ্বাজ এঁকে আগ্নেয়াস্ত্র দিয়েছিলেন। ঐ অস্ত্র অগ্নিবেশ্য দ্রোণকে দিয়েছিলেন। দ্রোণ ও দ্রুপদের গুরু। (২) দ্বৈতবনে যুধিষ্ঠিরের সহচর একজন মুনি।

অগ্নিভূ—কার্তিকেয়।

অগ্নিভূতি—(১) বৌদ্ধ বিশেষ (২) জৈনদের শেষ আচার্য।

অগ্নিমাঠর—বাস্কল শিষ্য। বাস্কলের কাছে ঋক্‌বেদের একটি ভাগ শিখেছিলেন। ঋক্‌বেদ অধ্যাপক ঋষি।

অগ্নিমারুতি—অগ্নি (ক্ষুধা) যার মারুতির (হনুমানের) মত। বাতাপিকে ভক্ষণ করার জন্য অগস্ত্যের নাম।

অগ্নিমিত্র—শুঙ্গ বংশ পুষ্যমিত্রের ছেলে। ১০০ খৃ-পূ। পতঞ্জলির সমকালীন এক রাজা। এঁকে অবলম্বন করে কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রম্‌ রচনা মনে হয়।

অগ্নিমুখ—অসুর। মরীচি-কশ্যপ-শূরপদ্ম-অগ্নিমুখ। শূরপদ্মের স্ত্রী ময়ের মেয়ে। ছেলে হয় অগ্নিমুখ ভানুগোপ, বজ্রবাহু ও হিরণ্য।

অগ্নিরক্ষণ—অগ্নিকেন্দ্রিক সভ্যতায় ঘরে আগুন জেলে রাখার ধর্মীয় অনুশাসন। দ্রঃ-অগ্নিত্রয়। দিয়াশলাই না থাকা মূল কারণ।

অগ্নিলোক—মেরুপর্বতে কাল্পনিক একটি দেশ। অগ্নি এখানে অধিপতি।

অগ্নিশিরতীর্থ—উত্তর দিকে একটি তীর্থ, ধৌম্য বলেন সহদেব এখানে শম্যাক্ষেপ যজ্ঞ করেছিলেন ; কোটি সুবর্ণ দক্ষিণা দিয়েছিলেন। সার্বভৌম ভরত এখানে ৩৫ বার অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। এইখানে শরভঙ্গ ঋষির আশ্রম (ম ৩।৮৮।৪)।

অগ্নিশৌচ—চাদর বিশেষ। কর্কোটক নলকে (দ্রঃ) কামড়াবার পর এই চাদর দিয়ে যান।

অগ্নিষ্টুৎ—অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ।

অগ্নিষ্টোম—(১) বহু প্রজা সৃষ্টির জন্য প্রজাপতি কর্তৃক প্রবর্তিত ৫-দিন ব্যাপী

294.5
B-215
A(13)

বসন্তকালীন যজ্ঞ। (২) চাক্ষুষ মনু ও নডবলার (দ্রঃ) একটি সন্তান। অন্য নাম অগ্নিষ্টু (অগ্নি-পুরা)।

অগ্নিষ্বাত্ত—মরীচির ছেলে। পিতৃদেব (দ্রঃ)। দ্রঃ মদন।

অগ্নি সম্ভব—সূর্যবংশে রাজা উপগুপ্তের ছেলে।

অগ্নিসোম—(১) অগ্নিদেব ও সোমদেবের মিলনে জন্ম। ইনি যজ্ঞভাগ পান। (২) ভানু নামে অগ্নি ও তাঁর স্ত্রী নিশা; এ'দের ছেলে অগ্নি ও সোম। দ্রঃ-অগ্রণী।

অগ্নিহোত্র—সাগ্নিকের নিত্যকর্ম যজ্ঞ বিশেষ। গুরুগৃহ থেকে ফিরে বিয়ে করে প্রত্যেক গৃহপতি বাড়িতে একটি করে অগ্নিপাত্র স্থাপিত করতেন। এই স্থাপন করার নাম অগ্ন্যাধান। প্রতিষ্ঠাতা আহিতাগ্নি। চতুষ্কোণ বেদীর পশ্চিমে গার্হপত্য, পূর্বে আহবনীয়, দক্ষিণে দক্ষিণাগ্নি স্থাপন করা হয়। আহবনীয় অগ্নিতে দেবতাদেব, দক্ষিণাগ্নিতে মৃত পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে আহুতি দেবার নিয়ম। গার্হপত্য আগুনে আহুতি দেওয়া হয় না; প্রয়োজন মত এই আগুন থেকে আহবনীয়াগ্নি ও দক্ষিণাগ্নি স্থানে আগুন নিয়ে আসা হয়। আহবনীয় অগ্নিতে প্রতিদিন অনুষ্ঠিত যজ্ঞের নাম অগ্নিহোত্র। এই যজ্ঞে প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় যথাক্রমে সূর্য ও অগ্নিকে উদ্দেশ্য করে আহুতি দেবাব নিয়ম ছিল। সামান্য একটু দুধ, দই বা চাল দিয়েই আহুতি হয়। যিনি প্রতিদিন এই যজ্ঞ কবেন তিনি অগ্নিহোত্রী। গৃহস্থ স্বয়ং তবে অসমর্থ হলে ছেলে ভাই. ভাগিনেয, জামাতা বা অধ্বর্যু প্রতিনিধি হিসাবে এই যজ্ঞ করতেন। অগ্নিহোত্র যজ্ঞ মাস বা জীবনব্যাপী। জীবনব্যাপী যজ্ঞের আগুনে এদের দাহ করা হত। অগ্নিহোত্র অগ্নি শোধনের জন্য বিভিন্ন অগ্নি আছে। দ্রঃ-অগ্নিবংশ; মনু।

অগ্নীধ্র—(১) আগিরক্ষায় নিযুক্ত ঋত্বিক। (২) স্বায়ম্ভুব মনুর ছেলে জনৈক রাজা। (৩) জম্বুদ্বীপেব-বাজা প্রিয়ব্রতের সাত/দশ ছেলের মধ্যে বড়; স্ত্রী পূর্বচিত্তি। একটি মতে পরে জম্বুদ্বীপে রাজা হন। অপুত্রক রাজা মন্দর পর্বতে তপস্যা কবলে ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হয়ে বিপ্রচিত্তি (মতান্তরে) নামে অপ্সরাকে পাঠিয়ে দেন; ভাগবতে তপস্যা ভাঙবার জন্য পাঠান। গন্ধর্ব মতে বিয়ে হয, নয়টি ছেলে—নাভি, কিম্পুরুষ, হরি, ইলাবৃত/ইলাবর্ত, রম্য/রম্যক, হিরণ্ময়/হিরণ্বান্, কুরু, ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল। ছেলেরা বড় হলে রাজ্য ভাগ কবে দিযে অগ্নীধ্র দেহত্যাগ করেন। এই কুরু থেকে কুরুবংশ।

অগ্ন্যাধান—অগ্নি সংস্কার। দ্রঃ অগ্নিহোত্র।

অগ্রণী—ভানু (দ্রঃ) নামে অগ্নি ও নি[illegible]ম পুত্র। দ্রঃ-অগ্নিবংশ।

অগ্রদানী—শ্রাদ্ধে মৃতের উ[illegible]শে যাকে আ[illegible] তিলাদি দান করা হয়। যে লোভী ব্রাহ্মণ শূদ্রের আ[illegible] এই দান গ্রহণ করেন [illegible] কে পতিত ব্রাহ্মণ মনে করা হয়। অথচ এই দান গ্র[illegible] জন্য সমাজে এ'দের চাহিদাও আছে। বর্তমানে সাধারণ ব্রাহ্মণ পুরোহিতও এই দান গ্রহণ করেন।

অগ্রবন—আগ্রা। [illegible] একটি বন। বৃজ [illegible] প্রথম পর্যায়ে অবস্থিত ফলে এই নাম। কৃ[illegible]লার সঙ্গে [illegible] বহু দিন [illegible]কীর্ণ ছিল। বর্তমানের আগ্রা।

2[illegible]
8376
R.15[illegible]
STATE CENTRAL LIBRARY
91475
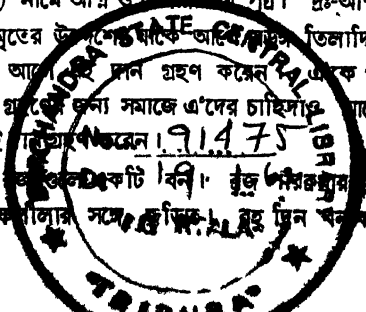
অগ্রহ—ভানু নামে অঙ্গির স্ত্রী সুপ্রজ্ঞা (সূর্যকন্যা) ; এ'দের ছয় ছেলে : একটির নাম অগ্রহ।

অগ্রমন্দির—প্রাচীন ভারতের জলযান। দূর প্রবাস যাত্রার উপযোগী। এই সব নৌকায় গলুইয়ের দিকে কুটুরি থাকত।

অগ্রায়ণী—অপর নাম অনুযায়ী ; ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে।

অঘ—অঘাসুর (দ্রঃ)।

অঘমর্ষণ—(১) এক জন ঋষি। (২) সর্বপাপ দমনকারী মন্ত্র। ঋক্‌বেদের একটি সূক্ত। জলে দাঁড়িয়ে পাঠ করলে পাপ বিনষ্ট হয়।

অঘাসুর—অঘ। বকাসুর ও পুতনার ছোট ভাই। কংসের এক জন সেনাপতি। পুতনা ও বকাসুর কৃষ্ণের হাতে নিহত হলে প্রতিশোধ নেবার জন্য অজগর হয়ে হাঁ করে পথের ধারে শুয়ে থাকে। বাড়ি ফেরার পথে কৃষ্ণ ও সঙ্গী গোপালেরা গুহা মনে করে এর মুখের মধ্যে ঢুকে পড়েন। অসুর সকলকে গিলতে চেষ্টা করে। কৃষ্ণ সকলের পেছনে ছিলেন এবং বিরাট দেহ ধারণ করে অসুরের পেট ফাটিয়ে হত্যা করেন।

অঘোর চতুর্দশী—ভাদ্র মাসে কৃষ্ণা চতুর্দশী। শিবলোক প্রাপ্তির জন্য শিবপূজা করা হয়।

অঘোরপন্থী—একটি শৈব সম্প্রদায়। এ'দের মতবাদ অঘোর/ভীষণ পন্থা। যিনি শিব, অর্থাৎ অনাসক্ত, আচার ব্যবহার ও লোকাচারের বাইরে। বিষ্ঠা ও চন্দনে সমজ্ঞান যাঁর তিনিই অঘোরনাথ। এ'র শিষ্যেরা অঘোরপন্থী। অঘোরপন্থীরা নিতান্ত অপরিষ্কার। আম-মাংস, গলিত শব মলমূত্র সব কিছুই ভোজন করেন। কখনো অঙ্গ বা মুখ মার্জনা করেন না। নর কপালে মদ্যপান করেন। পরিধান কৌপীন ও বহির্বাস বা কিছুই নয়। নর বলি দেন না। কিন্তু মৃত নর মাংস খান। এ ছাড়াও বহু ঘৃণিত কুৎসিত কাজ করেন। নির্বিকার ও নির্ঘৃণ হওয়াই উদ্দেশ্য। এ'রা যোগী : যথা নিয়মে সন্ন্যাস নিয়ে অঘোবমন্ত্র গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসীরাও এ'দের দৈবশক্তির অধিকারী মনে করেন। কাণে এক রকম দেখতে কুণ্ডল এবং গলায় অস্থিমালা, করোটিমালা, রুদ্রাক্ষ মালা ও ধুম্রা ইত্যাদি তীর্থ চিহ্ন ধারণ করেন। চুলদাড়ি কাটেন না। সমাজের সঙ্গে এ'দের কোন সম্পর্ক নাই। কারণ এ'দের প্রায় কিছুরই প্রয়োজন নাই। অনেক সময় নর মাংসের লোভে শব যাত্রীদের সঙ্গ নেন। এ'দের আদি স্থান বরোদা রাজ্য। এখানে অঘোরেশ্বর নামে একটি মঠ ছিল। এই মঠে এ'রা থাকতেন। আজকাল প্রায় নিঃশেষিত। অতি প্রাচীন সম্প্রদায়। মার্কোপোলো, প্লিনি, এরিস্টটল প্রভৃতি এ'দের উল্লেখ করেছেন। বুদ্ধদেব এ'দের অচেলক বলতেন।

অঘোরী—অঘোরপন্থী।

অঙ্কুশী—অঙ্কুশধারণকারী। ২৪ জন শাসন দেবীর মধ্যে একজন ; জৈন দেবী। অশোকা, মানবী, চণ্ডা ইত্যাদি।

অঙ্গ—প্রত্যঙ্গ। মুঙ্গের মিলে ভাগলপুরের চার পাশ। দ্রঃ-কামাশ্রম। মতান্তরে বীরভূম ও মুর্শিদাবাদও অঙ্গ রাজ্যের অংশ ছিল। আর এক মতে সাঁওতাল পরগণাও। খৃ-পৃ ৬ শতকে বিম্বিসার এটিকে মগধের সঙ্গে যুক্ত করেন। এখানে ঋষিকুণ্ড বা ঋষ্যশৃঙ্গ আশ্রম। দ্রঃ-কর্ণগড় বা কর্ণপুর, জহ্নু আশ্রম, চম্পা, মোদাগিরি, পাথর ঘাটা, মন্দর পর্বত, সুহ্ম। অথর্ব সংহিতাতে প্রথম অঙ্গ নাম পাওয়া যায়।

অঙ্গ নাম ঋক্ বেদে উল্লেখ নাই। অথর্ব বেদে এই দেশবাসীদের ব্রাত্য বলা হয়েছে। শোণ ও গঙ্গার অববাহিকাতে এদের বাস। পাণিনি বঙ্গ, কলিঙ্গ, ও পুণ্ড্রের সঙ্গে জুড়ে অঙ্গকে মধ্যদেশের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। বলির ছেলে অঙ্গ প্রতিষ্ঠিত দেশ। গঙ্গা ও সরযূর সঙ্গম থেকে পূর্বদিকে বিস্তৃত। রামায়ণ মতে মদন হর কোপানলে এইখানে দেহ ত্যাগ করেছিলেন বলে এই নাম। অযোধ্যাপতি দশরথের বন্ধু রোমপাদ/লোমপাদ এখানে রাজা ছিলেন। অন্য নাম লোমপাদ-পুরী বা চম্পা। মহাভারত মতে অঙ্গের রাজ্য বলে এই নাম। দুর্যোধন কর্ণকে গঙ্গাতীরে অবস্থিত এই রাজ্য দেন; অন্য নাম কর্ণপুরী, অঙ্গপুরী ও মালিনী। ভাগলপুরের চার পাশে এর অস্তিত্ব এখনও পাওয়া যায়। কৌশিকী নদীর দক্ষিণে ও গঙ্গার পূর্বে অবস্থিত দেশ; রাজধানী চম্পা। খৃ-পৃ ৫ ও ৬ শতকে ষোড়শ জনপদের অন্যতম। গৌতম বুদ্ধের গৃহত্যাগের সময় অঙ্গ মগধের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিম্বিসার অঙ্গ ও মগধের রাজা হন। অজাতশত্রু যুবরাজ অবস্থায় এখানকার শাসনকর্তা ছিলেন। গৌতমবুদ্ধের ও মহাবীরের জীবনের একাধিক ঘটনার সঙ্গে জড়িত এই অঙ্গ প্রাচীন ভারতে শিল্প সমৃদ্ধ নগরী ও বাণিজ্য কেন্দ্র। সংস্কৃত কবিদের মতে মগধ-রাজধানী গিরিব্রজের পূর্বে এবং মিথিলার পূ-দক্ষিণে বা পূ-উত্তর কোণে। য়ুআন-চুয়াঙ বলেছেন গঙ্গার প্রস্তরময় একটি দ্বীপ থেকে ২৪ মাইল দূরে। একটি মতে ভাগলপুর-মুঙ্গের এলাকাতে। বৈদ্যনাথ ধাম থেকে ভুবনেশ্বর পর্যন্ত। রাজধানী চম্পাবতী। কানিংহাম মতে ভাগলপুরের কাছে চম্পানগর ও চম্পাপুর দুটি গ্রাম এবং ভাগলপুর থেকে ২৪ মাইল পশ্চিমে শিলাকীর্ণ একটি জনপদ হচ্ছে য়ুআন-চুয়াঙ বর্ণিত দ্বীপ। ফা-হিয়েন চম্পা বা চান্‌পোতে এসেছিলেন।

অঙ্গ—(১) চন্দ্রবংশে রাজা সুতপসের ছেলে বলি। বলির স্ত্রী সুদেষ্ণার গর্ভে মহর্ষি দীর্ঘতমার ঔরসে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম ৫টি ছেলে হয় (মহা)। এ'দের নাম অনুসারে পাঁচটি রাজ্য। আরো দুটি ছেলে অদ্রূপ ও অনশাভূ। (২) অঙ্গ একবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। কিন্তু নিঃসন্তান রাজার যজ্ঞে দেবতারা কেউ আসেন না। অঙ্গ তখন পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন এবং যজ্ঞ থেকে এক দিব্য পুরুষ এক পাত্র চরু দিয়ে যান। রাজা ও রাণী সুনীথা দুজনেই খান: ছেলে হয় বেণ। বেণ অত্যন্ত নিষ্ঠুর হয়ে ওঠেন, ফলে রাজ্য ত্যাগ করে অঙ্গ চলে যান। (৩) চাক্ষুষ মনুর ছেলে কুরু এবং কুরুর ছেলে অঙ্গ। দ্রঃ—বেণ

অঙ্গ—জৈন আগম শাস্ত্রের অংশ। জৈনদের প্রধান ধর্মশাস্ত্র। এগারটি অঙ্গগ্রন্থ ও একটি দৃষ্টিবাদ মোট ১২টি গ্রন্থ জৈন ধর্মের মূল ভিত্তি। এ-ছাড়া ১২টি

উপাঙ্গ গ্রন্থও আছে। বর্তমানের প্রচলিত অঙ্গ শাস্ত্র মহাবীরের পঞ্চম গণধর সুধর্মস্বামী প্রচার করেছিলেন। মহাবীরের নির্বাণের ১৬০ বছর পরে প্রথম লিপিবদ্ধ হয়। দৃষ্টিবাদের অন্তর্গত ১৪টি পূর্বশাস্ত্রও অঙ্গগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। অঙ্গ গ্রন্থের মূল বক্তব্য প্রতি সৎ-পদার্থের মধ্যেই যুগপৎ, উৎপত্তি, বিনাশ ও স্থিতির কাজ চলেছে :—উপ্পণেই বা বিগমেই বা ধুবেই বা। জৈন দর্শনের এটি মূল কথা বা জৈন দর্শনের পরিণামবাদ। দ্বাদশাঙ্গ গ্রন্থে এই মূল তত্ত্বকে নানাভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

অঙ্গদ—(১) বালীর ঔরসে তারার ছেলে। বৃহস্পতির অংশে। কিষ্কিন্ধ্যাতে গুপ্তচর বিভাগের খবর রাখতেন এবং তারাকে (দ্রঃ) রামচন্দ্ররা এসেছেন জানিয়েছিলেন। বালীর মৃত্যুর পর সুগ্রীব রাজা হয়ে রামের নির্দেশে অঙ্গদকে তৎক্ষণাৎ যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করেন। সীতা অন্বেষণের কাজ আরম্ভ করার জন্য লক্ষ্মণ কিষ্কিন্ধ্যাতে এলে বানররা বাধা দেয়। ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণের কাছে তখন অঙ্গদ এলে লক্ষ্মণ একে সস্নেহে গ্রহণ করে সুগ্রীবকে খবর দিতে বলেন। সীতার অন্বেষণে হনুমান ইত্যাদিকে নিয়ে ত্রিভাগবলসংবৃত (রা ৪।৩৫। ৫৬) দক্ষিণ দিকে গিয়েছিলেন। বল বুদ্ধি সর্বদিক থেকে বালীর সমান (রা ৪।৫৪।-)। ঋক্ষবিল (দ্রঃ) থেকে বার হয়ে ভাবেন সুগ্রীবের দেওয়া এক মাস সময় শেষ হয়ে গেছে, ফিরে গেলে মৃত্যুদণ্ড হবে তার চেয়ে ঐখানে অনশন মৃত্যু ভাল। হনুমান সন্দেহ করে অঙ্গদ এই ভাবে দল থেকে আলাদা হয়ে যাবার মতলব করছে এবং শেষ পর্যন্ত কিষ্কিন্ধ্যা থেকে সুগ্রীবকে বিতাড়িত করবে। হনুমান নানা ভাবে বোঝাতে থাকে এবং তার উত্তরে অঙ্গদ জানায় বালী বেঁচে থাকতে সুগ্রীব তারাকে গ্রহণ করেছিল (রা ৪।৫৫।৩) ইত্যাদি ; সুগ্রীব অতি নীচ এবং অঙ্গদকে হত্যা করতে কৃতসঙ্কল্প ইত্যাদি ; এবং সোচ্চারে কাঁদতে থাকে। সীতার খবর নিয়ে বানররা কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরে এসে মধুবনে মধু খেতে চায়, অঙ্গদ নিজের দায়িত্বে সকলকে অনুমতি দিয়েছিলেন।

লঙ্কার যুদ্ধের প্রাক্‌কালে রাবণের কাছে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে গিয়ে রূঢ় ভাবে কথা বলতে থাকলে রাবণ একে বন্দী করতে চেষ্টা করেন। অঙ্গদ লাথি মেরে প্রাসাদ শিখর ভেঙে ফেলে দিয়ে ফিরে আসেন। লঙ্কার যুদ্ধে বহু রাক্ষস নিহত করেন এবং রামের (দ্রঃ) সঙ্গে অযোধ্যাতে ফিরে আসেন। সুগ্রীব একে রাজা করে দিয়ে রামের সঙ্গে স্বর্গে যান (রা ৭।১০৮।২৪)। দ্বাপরে ইনি ব্যাধ হয়ে জন্মান এবং যদুবংশ ধ্বংসের পর কৃষ্ণকে তীরবিদ্ধ করে হত্যা করে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। (২) লক্ষ্মণ ঊর্মিলার ছেলে অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু। (৩) দুর্যোধনের পক্ষে একজন যোদ্ধা। (৪) কৃষ্ণের ভাই গদ ও স্ত্রী বৃহতীর ছেলে।

অঙ্গদা—পিঙ্গলা নামে দক্ষিণ দিক হস্তিনী। দ-দিকহস্তীর স্ত্রী।

অঙ্গ বংশ—অঙ্গ-অঙ্গভূ-দ্রবিরথ-ধর্মরথ-লোমপাদ-চতুরঙ্গ-পৃথুলাক্ষ-ভদ্ররথ-বৃহন্মনস্-জয়দ্রথ-বিজয়-দৃঢ়ব্রত-সত্যধর্ম-অধিরথ-কর্ণ।

অঙ্গবাহু—বৃষ্ণি বংশে প্রসিদ্ধ এক রাজা। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে বলরামের সঙ্গে যোগদান করেন।

অঙ্গমলক—মলদ/করুষ। তাড়কা যে বনে থাকত সেই এলাকার পূর্বতন নাম। বৃত্র হত্যার পর ইন্দ্র এখানে থাকতেন ; দেবতারা দেখতে পেয়ে ইন্দ্রের মাথায় জল ঢালতে থাকেন। ইন্দ্রের (দ্রঃ) গা থেকে ধুলা, কাদা, মল/করুষ সব ধুয়ে মাটিতে পড়ে ; এই করুষ (মল) মাটিতে পড়ে মিশে যায়, ফলে দেশটির এক অংশের নাম মলদ আর এক অংশের নাম হয় করুষ। এর পর বহু দিন দেশটি জনহীন ছিল ; পরে তাড়কারা বসবাস করতে থাকে।

অঙ্গরাগ—নানা বস্তু দিয়ে তৈরি অঙ্গলেপ। সিন্ধু সভ্যতার যুগেও ব্যবহার ছিল। মহেন্-জো-দারো ও হরপ্পাতে অঞ্জন, অঞ্জনশলাকা, অধরাঞ্জনবর্তী, কপোলরক্ত-পিষ্টিকা, লোহার গোল মুকুর, ও হাতীর দাঁতের চিরুনি ইত্যাদি বহু কিছু জিনিস পাওয়া গেছে। বৈদিক সাহিত্য, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ ইত্যাদিতে অঙ্গরাগের প্রচুর উল্লেখ আছে। চৌষট্টি কলার মধ্যে দশন-বসন-অঙ্গরাগ একটি কলা ছিল। সংস্কৃত ও প্রাকৃত গ্রন্থে ভূরি ভূরি উল্লেখ রয়েছে। কামসূত্র, রতিরহস্য, অঙ্গ-রঙ্গ, নাগর-সর্বস্ব, পঞ্চ-সায়ক ইত্যাদি গ্রন্থে অঙ্গরাগের বহু পরিচয় আছে। আজকের পাউডার মত লোধ্রচূর্ণ, চন্দনচূর্ণ, কুঙ্কুমচূর্ণ, এবং রঙ হিসাবে অলক্তক ও মঞ্জিষ্ঠা ব্যবহাব হত। চোখে কাজল ও বিবিধ অঞ্জন এবং ঠোঁট ও গাল নরম রাখার জন্য মোম ব্যবহৃত হত।

কামসূত্রে নাগরক-বৃত্ত প্রকরণে আছে সকালে নিত্যকৃত্য সেরে নাগরক দন্ত ধাবন করে সামান্য অনুলেপাদি ধূপ ও মাল্য গ্রহণ করে মুখ মোম ও অলক্তক দিয়ে রঞ্জিত করে আদর্শে মুখ দেখবে এবং মুখবাস ও তাম্বূল গ্রহণ করে নিজ কাজে যোগ দেবে। রোজ স্নান করবে ; এক দিন অন্তর তেল মাখবে, দু দিন অন্তর ফেনক (সাবান) ব্যবহার করবে, তিন দিন অন্তর নখ কাটবে ও কামাবে। দেহে ঢাকা অংশে যেখানে ঘাম হবে রুমাল বা গামছা দিয়ে মুছে ফেলবে। ঈশ্বর-কৃত গন্ধযুক্তি ও শার্ঙ্গধর কৃত গন্ধদীপিকাতে এবং বৃহৎ-সংহিতার গন্ধযুক্তি প্রকরণে অঙ্গরাগেব আলোচনা রয়েছে। প্রাচীন কামশাস্ত্রকারগণ ও চিকিৎসকগণ দেহের দুর্গন্ধ নিবারণের জন্য বহু অঙ্গরাগের ব্যবস্থা দিয়েছিলেন। অঙ্গলেপন, সুগন্ধ তৈল ও কেশ পতন বন্ধের জন্য নানা লেপ ছিল। দাঁত মাজার জন্য নানা মাজন ও অবাঞ্ছিত লোমনাশক বহু অঙ্গরাগও ছিল।

অঙ্গলৌকিক-অঙ্গলৌকিক লোকদের দেশ। অগলসইয়ান (আলেকজেন্দ্রীয় ঐতিহাসিক) যেন। যেন শিবিদের প্রতিবাসী। হাইদাসপেস ও অসিক্লীর মধ্যবর্তী দেশ।

অঙ্গার—একজন রাজা। মান্ধাতার হাতে পরাজিত হন (মহা ১২।২৯।৮১)।

অঙ্গারক—একজন অসুর। উজ্জয়িনীর রাজা মহেন্দ্র বর্মার ছেলে মহাসেন উপযুক্ত একটি স্ত্রী ও একটি তরবারি পাবার জন্য বহু দিন তপস্যা করলে দেবী দেখা দিয়ে একটি অজেয় তরবারি উপহার দেন এবং বর দেন অঙ্গারক অসুরের মেয়ে অঙ্গার-বতীর সঙ্গে বিয়ে হবে ; এবং ভয়ঙ্কর কাজ করার জন্য মহাসেনের নাম চণ্ডমহাসেন

পরিবর্তিত হবে। এক দিন মৃগয়াতে একটি শূকরকে বাণবিদ্ধ করলেও আহত হয় না ; রাজার রথ উল্টে দিয়ে পালিয়ে যায়। শূকরের অনুসরণে রাজা একটি হ্রদের ধারে সুন্দরী একটি মেয়েকে সখীদের সঙ্গে দেখতে পান। রাজার কথা শুনে মেয়েটি কাঁদতে থাকে ; কারণ ঐ শূকর তার পিতা অঙ্গারক অসুর ; অস্ত্রে তার দেহ ভেদ হয় না। অসুর অবশ্য উপস্থিত শূকর দেহ ত্যাগ করে ঘুমাচ্ছে ; কিন্তু ঘুম থেকে উঠে রাজার নিশ্চয়ই ক্ষতি করবে ; এই ভয়ে মেয়েটি কাঁদছিল। তার সখীগুলি বিভিন্ন দেশের রাজকুমারী ; অসুর তাদের ধরে এনে মেয়ের পরিচারিকা করে রেখেছে। রাজা তখন পরামর্শ দেন অঙ্গারকের কাছে বসে থাকতে এবং অঙ্গারক ঘুম থেকে উঠলেই মেয়েটি যেন কাঁদতে থাকে ; অঙ্গারক মারা গেলে তার কি হবে এই ভেবে কাঁদছে যেন। অঙ্গারবতী এই পরামর্শ অনুসারে কাঁদতে থাকলে অসুর কারণ জানতে চান এবং মেয়েকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন এক মাত্র তার বাঁ দিকের নীচের হাতে আঘাত করলে তবেই তার মৃত্যু হবে। অর্থাৎ সে অমর : অঙ্গারবতীর কাঁদবার কোন কারণ নেই। রাজা লুকিয়ে সব শুনছিলেন ; তৎক্ষণাৎ বার হয়ে ঐ স্থানে আঘাত করে অসুরকে নিহত করে অঙ্গারবতীকে বিয়ে করেন। মহাসেনের দুই ছেলে হয় গোপালক ও পালক এবং ইন্দ্রের বরে এক মেয়ে বাসবদত্তা—উদয়নের স্ত্রী।

অঙ্গারকা—সিংহিকা।

অঙ্গারপর্ণ—এর পর্ণ বা বাহন জ্বলন্ত অঙ্গার মত। গন্ধর্ব। কশ্যপ মুনির ছেলে। স্ত্রী কুম্ভীনসী। ইনি কুবের সখা ও ইন্দ্রের সারথি। বিচিত্র রথের জন্য নাম চিত্ররথ। একচক্রা থেকে পাঞ্চালে দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে যাবার পথে সোমাশ্রবায়ণ তীর্থে গঙ্গাতে নারীদের নিয়ে রাত্রিতে অঙ্গারপর্ণ জলবিহারে মত্ত ছিলেন। পাণ্ডবরা এখানে এসে পড়লে অর্জুনের সঙ্গে প্রথমে বিতণ্ডা (ম ১।১৫৮।-)। অঙ্গারপর্ণ বলেন এই 'অঙ্গারপর্ণ বনে' তিনি থাকেন। গঙ্গা ও বাকা নদীতে / অনুগঙ্গাতে তিনি জলক্রীড়া করে থাকেন। রাত্রিতে নদী কূলে আসা কোন মানুষের উচিত নয়। অঙ্গারপর্ণ প্রথমে মায়া যুদ্ধ করেন। আগ্নেয়াস্ত্রে অর্জুন এঁর রথ পুড়িয়ে দিলে অজ্ঞান হয়ে যান এবং অর্জুনের হাতে বন্দী হন। রথ পুড়ে গিয়েছিল বলে নাম হয় দগ্ধরথ। কুম্ভীনসীর প্রার্থনায় যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে অর্জুন এঁকে মুক্তি দেন। চিত্ররথ নিজের নাম ত্যাগ করে দগ্ধরথ নাম গ্রহণ করেন। অর্জুনের সঙ্গে মিত্রতা হয় এবং অর্জুনকে চাক্ষুষী বিদ্যা ও পাণ্ডবদের প্রত্যেককে বাতাসের মত গতি এক শত গন্ধর্ব দেশীয় ঘোড়া দেন এবং অর্জুনের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র লাভ করেন। একটি মতে চারশত ঘোড়া যুধিষ্ঠিরকে উপহার দিয়েছিলেন। ঘোড়াগুলি এরা প্রয়োজন হলে চেয়ে নেবেন বলেছিলেন। চাক্ষুষী বিদ্যায় ত্রিলোকের সব কিছু ইচ্ছামাত্র দেখা যেত। অর্জুন জানতে চান পাণ্ডবরা ব্রহ্মবিদ হলেও অঙ্গারপর্ণের কাছে এ ভাবে বাধা পেলেন কেন। অঙ্গারপর্ণ জানান পাণ্ডবরা অগ্নি হীন ও পুরোহিত হীন ; সেই জন্য পাণ্ডবদের বংশকীর্তি সব জেনেও তিনি বাধা দিয়েছিলেন। অঙ্গারপর্ণ এই সময় তপতী ও সম্বরণ এবং বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের

কাহিনী বলেন। এ'রই (ম ১।১৭৪।২) পরামর্শে দেবলের ছোট ভাই, উৎকোচ-তীর্থে তপস্যাকারী ধৌম্যকে, পাণ্ডবরা পৌরোহিত্যে বরণ করেন। পৃথুরাজার সময়ে গন্ধর্বরা যখন পৃথিবীকে দোহন করেন চিত্ররথ তখন বৎস হয়ে ছিলেন। মহাদেব একবার চিত্ররথকে দিয়ে শঙ্খচূড়কে দুষ্ট কাজকর্ম থেকে বিরত হতে বলেছিলেন।

অঙ্গারিকা—দ্রঃ-রম্ভা।

অঙ্গিরস—অঙ্গিরাঃ। ব্রহ্মার মুখ থেকে জন্ম দশটি ছেলের মধ্যে একজন। রামায়ণে (৩।১৪।৮) ব্রহ্মা যে ১৬ জন প্রজাপতি সৃষ্টি করেছিলেন তাঁদের মধ্যে এক জন। নিরুক্তে প্রজাপতি নিজের বীর্য অগ্নিতে নিক্ষেপ করলে অগ্নির জ্বালা থেকে ভৃগু ও জ্বালাহীন অঙ্গার থেকে অঙ্গিরাঃ উৎপন্ন হন। অন্য মতে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মবীর্য থেকে অঙ্গিরার জন্ম (মৎস্য)। আবার অন্য মতে কঠোর তপস্যা করে ব্রহ্মা এ'কে সৃষ্টি করেন। স্ত্রী কর্দম ঋষির মেয়ে শ্রদ্ধা ; অন্য মতে অনেকগুলি স্ত্রী , উল্লেখযোগ্য শুভা, স্মৃতি, শ্রদ্ধা, দেবসেনা, বসুধা। ছেলে উতথ্য, বৃহস্পতি ও সংবর্ত (ম ১।৬০।৫)। অন্য মতে আরো ছেলে বৃহৎ-কীর্তি, বৃহৎ-জ্যোতি, বৃহৎ-মনা, বৃহৎ-মন্ত্র, বৃহৎ-ভাস, বয়স্য, (মহা ১৩।৮৫।৩৮) শান্তি, ঘোর, বিরূপ, সুধন্বা (দ্রঃ) ও কার্তিক ইত্যাদি। দ্রঃ-সব্য, অগ্নিবংশ। স্মৃতির মেয়ে সিনীবালী, রাকা, কুহূ ও অনুমতি। একটি মতে দক্ষের মেয়ে স্মৃতি ও খ্যাতি এ'র স্ত্রী (দ্রঃ-অসিক্নী)। আরো চার মেয়ে অর্চিষ্মতী, হবিষ্মতী, মহিষ্মতী ও মহামতী নামও পাওয়া যায়। সপ্তর্ষিদের মধ্যে এক জন এবং দশ প্রজাপতিদের মধ্যে প্রথম প্রজাপতি। দ্রঃ-ঋভু। কুৎস মুনিও অঙ্গিরসের বংশে জন্মান। এক জন মূল গোত্র প্রবর্তক। এ'র গোত্র কেবলাঙ্গিরস, গৌতমাঙ্গিরস ও ভরদ্বাজাঙ্গিরস তিনটি শাখাতে বিভক্ত। অঙ্গিরা ও তাঁর বংশীয়েরা ঋক্‌বেদের ঋষি হলেও অথর্ববেদ মন্ত্র সঙ্কলনে এ'রা সমধিক প্রসিদ্ধ। এই জন্য অথর্ব বেদের আর এক নাম আঙ্গিরস বেদ। মুণ্ডকে আছে অথর্বার কাছে ইনি ব্রহ্মবিদ্যা পেয়েছিলেন। অথর্ববেদের যাতু, অভিচার ইত্যাদি ঘোর কর্মের মন্ত্রগুলি আঙ্গিরস মন্ত্র নামে অভিহিত। অথর্ববেদের কল্পগ্রন্থের মধ্যে আভিচারিক কল্পের নাম আঙ্গিরস কল্প। মনু প্রভৃতি সংহিতাকার-দের অন্যতম। জ্যোতিষ গ্রন্থেরও প্রণেতা। মহাভারতে (১।৫৯।১০) ব্রহ্মার মানস পুত্র (দ্রঃ)।

একবার নিজের তেজে অঙ্গিরস উজ্জ্বল হয়ে উঠেন ; সমস্ত পৃথিবী আলোকিত হয়ে যায়। ফলে মানুষে অগ্নিকে ভুলে যায়। অগ্নি তখন বনে গিয়ে আত্মগোপন করেন। অঙ্গিরস জানতে পেরে অগ্নির কাছে গিয়ে অগ্নিকে সন্তুষ্ট করেন। সেই দিন থেকে অঙ্গিরস অগ্নির প্রথম পুত্র বলে প্রচারিত হন। অগ্নি আবার নিজের কাজ করতে থাকেন। দ্রঃ-অগ্নি। নহুষের পতন হলে ইন্দ্র আবার স্বর্গে ফিরে আসেন ; এই সময় অথর্ববেদ থেকে আবৃত্তি করেন ফলে ইন্দ্র বর দেন অঙ্গিরা অথর্বাঙ্গিরস নামে পরিচিত হবেন।

কুরুক্ষেত্রে দ্রোণ যখন তুমুল যুদ্ধ করছিলেন তখন অঙ্গিরস ও অন্যান্য মুনিরা এসে দ্রোণকে যুদ্ধ করতে নিষেধ করেন। দ্রোণ অবশ্য কথা রাখেননি। সূর্যকে এক বার রক্ষা করেছিলেন। পাণ্ডবদের বনবাস কালে গন্ধমাদন পর্বতে তপস্যা

করছিলেন। অগস্ত্যের পদ্মফুল চুরি গেলে অঙ্গিরস অগস্ত্যকে কে অপরাধী ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। এক বার সাগরের সব জল পান করেন কিন্তু এতেও তৃষ্ণা মেটে না; অঙ্গিরস তখন নিজে জলের একটি প্রস্রবণ সৃষ্টি করে সেই জলও পান করে প্রস্রবণ শুষ্ক করে ফেলেন। অগ্নি একবার অঙ্গিরসকে সম্মান না দেখালে অগ্নিকে শাপ দেন; সেই থেকে অগ্নি ধূম উদগীরণ করে থাকেন। বায়ু এক বার অঙ্গিরসের বিরক্তি ভাজন হয়ে পালিয়ে লুকিয়ে থাকেন। শৌনক মুনিকে অঙ্গিরস দর্শন ও শাস্ত্র ইত্যাদি শিক্ষা দেন। রাজা অবিক্ষিতের বহু যজ্ঞ করেছিলেন (মহা ১৪।৪।২২)। ধ্রুব যখন তপস্যা করছিলেন তখন ধ্রুবকে আশীর্বাদ করেন।

অগ্নিদেবদের মধ্যে এবং ঋষিদের মধ্যে অঙ্গিরস এক জন প্রধান দেবতা/ঋষি (ঋক্)। অঙ্গিরসের এক ছেলে হিরণ্যস্তূপ: ইনিও ঋষি (ঋক্)। অঙ্গিরস এক বার দেবতাদের কাছে ইন্দ্রের সমতুল্য পুত্র চান। কিন্তু ইন্দ্র তাঁর সমতুল্য কেউ হবে চাইতেন না। ফলে নিজেই ইন্দ্র অঙ্গিরসের ছেলে হয়ে জন্মান। এই ছেলে সব্য (ঋক্)। অঙ্গিরসের উপদেশে ইন্দ্র একবার সরমাকে (স্বর্গের কুকুরী) লুকান গরুর সন্ধানে পাঠান (ঋক্)। দ্রঃ-কার্তিকেয়, চিত্রকেতু, সুদর্শন। (২) চাক্ষুষ মনুর ছেলে উরু এবং উরুর ছেলে অঙ্গিরস। (৩) অথর্বমন্ত্রবিৎ ঋত্বিক।

অঙ্গিরসগণ ঋগ্বেদে বর্ণিত দেবতা ও মানুষদের মধ্যবর্তী সৃষ্টি। অগ্নির অনুচর। ভাগবত অনুসারে এঁরা অপুত্রক ক্ষত্রিয়রাজ রথীতরের স্ত্রীর সন্তান।

অঙ্গিরা—অথর্ব বেদের মন্ত্রসমূহ।

অঙ্গুত্তরনিকায়—সুত্ত-পিটকের চতুর্থ নিকায়। অন্য নাম একুত্তর নিকায়। রাজগৃহে প্রথম বৌদ্ধ-মহাসংগীতির সময় অনুরুদ্ধ এই নিকায়ের ভার নেন। এই সুত্তগুলি এগারটি নিপাতে (পরিচ্ছেদে) বিভক্ত. প্রতি নিপাত আবার কয়েকটি বগ্গে (বর্গে) বিভক্ত। দীঘ্ঘ ও মজ্ঝিম নিকায়ের বৃহদাকার সুত্তগুলিতে উপস্থাপিত হয়েছে বৌদ্ধধর্মের তত্ত্ব; এবং অঙ্গুত্তর নিকায়ে ছোট ছোট সুত্তগুলির সাহায্যে বৌদ্ধধর্ম অতি সুন্দর ভাবে আলোচিত হয়েছে। অভিধম্ম পিটকের অন্যতম গ্রন্থ পুগ্গল পঞ্ঞত্তি বস্তুতঃ এই অঙ্গুত্তর নিকায় থেকে উদ্ধৃতি সাহায্যে সংকলিত হয়েছে।

অজুল—বাৎস্যায়ন মুনি।

অঙ্গুলিমাল—প্রথম জীবনে একজন নৃশংস দস্যু; বুদ্ধদেবের সংস্পর্শে এসে পরিবর্তন হয়। পরে বুদ্ধের শরণ নিয়ে অর্হৎ হন। কোশলরাজের পুরোহিতের ছেলে নাম অহিংসক। তক্ষশিলায় গুরুর অত্যন্ত প্রিয় ছাত্র। ঈর্ষায় সতীর্থগণ গুরুর মন বিষাক্ত করে দেন। ফলে শিষ্যের ধ্বংস কামনায় দক্ষিণা হিসাবে শিষ্যের কাছে মানুষের ডান হাতের এক হাজার বুড়ো আঙুল দাবি করেন। অহিংসক তখন বনের মধ্যে পথিককে হত্যা করে আঙুল কেটে নিয়ে নিজের গলায় মালা করে ঝুলিয়ে রাখতেন। দস্যুকে দমন করার জন্য কোশলরাজ সৈন্য পাঠান। এ দিকে অঙ্গুলিমালের মা খবর পেয়ে ছেলেকে সাবধান করে দিতে আসেন। অঙ্গুলিমালের তখন আর একটি মাত্র আঙুল পেতে বাকি। নিজের মাকেই

তাই হত্যা করবেন ঠিক করেন। এই সময়ে বুদ্ধদেব এসে মাকে বাচান। পরে ভগবান. বুদ্ধ কোশলরাজ প্রসেনজিতের কাছেও অঙ্গুলিমালকে নিয়ে যান। অঙ্গুলিমালের পরিবর্তনে রাজাও মুগ্ধ হয়েছিলেন। শ্রাবস্তীতে ভিক্ষার সময় ক্রুদ্ধ জনতার হাতে অঙ্গুলিমাল মারা যান। বুদ্ধের আদেশে জনতার সকল অত্যাচার নীরবে সহ্য করে অঙ্গুলিমাল প্রাণ দেন।

অঙ্গুলিমুদ্রা—দেবপূজায় অঙ্গুলি দিয়ে করণীয় মুদ্রা। কয়েকটি মুদ্রার নাম ঃ— অঙ্কুশ, অভয়, আবাহনী, বর, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ইত্যাদি।' তন্ত্রশাস্ত্রে এদের বিশদ বিবরণ আছে।

অচল—দ্রঃ-সুবল। দক্ষ সারথি। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়তে অংশ নিয়েছিলেন। কুরুক্ষেত্রে অর্জুনের হাতে নিহত হন।

অচলত্রাতা—(১) বৌদ্ধ প্রধানের উপাধি। গণাধিপ বিশেষ। (২) শেষ জৈন আচার্যের এক জন শিষ্য।

অচিন্ত্যভেদাভেদ—চৈতন্যদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণব মত। অর্থাৎ গৌড়ীয়। বঙ্গীয় বৈষ্ণব মত। চৈতন্যদেবের দীক্ষাগুরু ঈশ্বরপুরী এবং ঈশ্বরপুরীর দীক্ষাগুরু মাধবেন্দ্রপুরী। এই মাধবেন্দ্রপুরী সম্প্রদায়ের মতে এবং পদ্মপুরাণ মতে শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র, সনক এই চারিটি বৈষ্ণব সম্প্রদায় ছাড়া আর কোন সম্প্রদায় থাকতে পারে না। বঙ্গীয় বৈষ্ণবরা কিন্তু এগুলি থেকে ভিন্ন আর একটি সম্প্রদায়। শঙ্করের কেবলাভেদ এবং অন্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আত্যন্তিক ভেদবাদ এঁরা স্বীকার করেন না। বঙ্গীয় বৈষ্ণবরা ভেদাভেদবাদী। এঁদের মতে সমুদয় জীব ও জগৎ ব্রহ্মেরই শক্তি ; এবং ব্রহ্মের সঙ্গে ব্রহ্মের শক্তির যুগপৎ ভেদ ও অভেদ সম্বন্ধ বিদ্যমান। পরস্পর বিরোধী ভেদ ও অভেদ যুগপৎ থাকতে পারে : যুক্তিতর্কের অগোচর হলেও শ্রুতার্থাপত্তি নামক প্রমাণের দ্বারা স্বীকৃত। ব্রহ্মার সঙ্গে জীব জগতের যুগপৎ ভেদ ও অভেদ সম্বন্ধকে এঁরা অচিন্ত্য-ভেদাভেদ নাম দিয়েছেন। এঁরা পঞ্চম বৈষ্ণব সম্প্রদায়। ভারতীয় দর্শনে এই চিন্তাধারা একটি অভিনব সমন্বয় চেষ্টা।

অচিরবতী—অচিরাবতী, অজিরাবাতী. নাগনদী। অযোধ্যা অঞ্চলে প্রবাহিত রাপ্তি নদীর প্রাচীন নাম। সরযূর করদা শাখা। আর একটি নাম সম্ভবত ঐরাবতী এবং ঐরাবতী থেকে রাপ্তি। শ্রাবস্তী এই নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। পঞ্চ মহানদীর অন্যতমা। পালি সাহিত্যে সুবিখ্যাত নদী।

অচ্ছোদ—অচ্ছাবৎ। স্বচ্ছ জল একটি হ্রদ। কাশ্মীর অন্তর্গত মার্তণ্ড থেকে ১০ কি-মি দূরে। বর্তমান নাম আচ্ছাবল। কাদম্বরীতে এর বর্ণনা আছে। এই সরোবরের তীরে সিদ্ধাশ্রম (দ্রঃ) অবস্থিত ছিল। অচ্ছাবতের কাছে অচ্ছোদ নদীর এক নাম বৃত্তব।

অচ্যুতাগ্রজ—(১) কৃষ্ণের বড় ; বলরাম। (২) ইন্দ্র ; অদিতির গর্ভে বামন রূপী বিষ্ণুর জন্মের আগে ইন্দ্রের জন্ম।

অজ—যার জন্ম নাই ; চির বিদ্যমান। ঈশ্বর, ব্রহ্মা, জীবাত্মা। সাংখ্যে সত্ত্ব, রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়া। আদ্যা শক্তি। দক্ষ যজ্ঞে ব্রহ্মা (=অজ) মেষ রূপ

ধরে পালিয়ে যান ; ফলে মেষকেও অজ বলা হয়। বিষ্ণু, শিব। বিষ্ণুর মন থেকে জাত চন্দ্র এবং বিষ্ণুর ঔরস জাত মদন ও অজ। ভাগবতে একাদশ রুদ্রের এক জন ; অন্য কোথাও উল্লেখ নাই।

অজ—দিলীপ-দীর্ঘবাহু-রঘু-অজ-দশরথ। ব্রাহ্ম মুহূর্তে জন্ম বলে নাম। বাল্মীকি মতে নাভাগের ছেলে। অধ্যাত্ম রামায়ণে ও কালিদাস ইত্যাদিতে রঘুর ছেলে। বিদর্ভরাজ কন্যা ইন্দুমতীর স্বয়ংবর সভাতে যাবার সময় পথে একটি হাতী আক্রমণ করে। অজ হাতীটিকে মারবার আদেশ দেন। হাতীটি গুরুতর আহত হলে তার দেহ থেকে অপরূপ সুন্দর গন্ধর্ব প্রিয়ম্বদ বার হয়ে আসেন। এক জন ঋষিকে উপহাস করার জন্য তাঁর অভিশাপে এই অবস্থা হয়েছিল। প্রিয়ম্বদ অজকে সম্মোহন নামে একটি বাণ উপহার দেন। এই বাণ দিয়ে স্বয়ংবরে আক্রমণকারী মিলিত রাজাদের সম্মোহিত করে ইন্দুমতীকে বিয়ে করেন। ইন্দুমতীর ছেলে দশরথ। ইন্দুমতী (দ্রঃ) মারা গেলে দশরথকে রাজ্য দিয়ে অজ প্রাণত্যাগ করেন। (২) জহ্নু-অজ-কুশিক-গাধি (দ্রঃ)। (৩) কশ্যপ ও সুরভির পুত্র অজ, একপাৎ, অহির্বুধ্ন্য, ত্বষ্টা, ও রুদ্র। (৪) তৃতীয় মনু উত্তমের ছেলে অজ, পরশু, দীপ্ত ইত্যাদি।

অজ একপাদ—ঋক্ বেদে এক দেবতা। নিঘণ্টুতে (৫।৬) দ্যুলোকস্থ দেবতাদের এক জন। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে পূর্ব দিগন্তে উদিত সূর্য। যাস্ক বলেছেন অজ একপাদ অর্থে অজন একপাদ=চলনশীল আদিত্য। এক পায়ে যিনি পাতি (রক্ষা/পান করা) অর্থও করেছেন। সূর্যের একপা প্রসিদ্ধ। অথর্ব বেদে ব্রহ্ম সূর্যেরও এক পা। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে অজ একপাদ অগ্নিও। মহাভারতে অজৈকপাদ ও অহির্বুধ্ন্য রুদ্রের নাম ; শান্তি পর্বে (২০১।১৮) এ'রা অষ্টবসুদের অন্তর্গত। দ্রঃ-অজপাদ।

অজক—কশ্যপ ও দনুর সন্তান—অজক, বৃষপর্বা ইত্যাদি। এক জন দানব।

অজকব—অজ (বিষ্ণু)+ক (ব্রহ্মা)-ব (স্থি)—অর্থাৎ যাতে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু আছেন। অজ+ক+ব (=বা সেবা করা)+অ—অর্থাৎ ব্রহ্মা ও বিষ্ণু যা থেকে ত্রিপুরাসুর নিধনের সময় তুষ্ট হয়েছিলেন। হরধনু। বেণ রাজার ছেলে পৃথু যখন জন্মান তখন এই ধনু, দিব্যবাণ ইত্যাদি স্বর্গ থেকে পৃথুর হাতে এসেছিল। দ্রঃ-অজগব।

অজকাশ্ব—অজমীঢ় ও কৌশিনীর ছেলে জহ্নু। জহ্নুর দুই ছেলে অজকাশ্ব ও বলকাশ্ব।

অজগ—অজ অর্থাৎ ব্রহ্মা যাঁর গান (গৈ=গান করা) করেন ; অর্থাৎ বিষ্ণু। অঃ শিবধনু।

অজগব—অজকব (দ্রঃ), আজগব। অজ ও গাভীর শিঙ দিয়ে গঠিত ধনু। অজ+গো(=বৃষ)+অ; অর্থাৎ প্রলয় কালে বিষ্ণু যাঁর বৃষ হয়েছিলেন, শিব। অজ+গব (গে =বাণ) অর্থাৎ ত্রিপুরাসুর নিধনের সময় বিষ্ণু যেখানে বাণরূপ ধারণ করেছিলেন হরধনু। মান্ধাতার ধনু এবং গাণ্ডীবও এই নামে উল্লিখিত।

অজন্তা—অজণ্টা, অজিণ্ঠা, অজুন্ত, অচিন্ত। ২০° ৩০′ উঃ এবং ৭৫° ৪৫′ পূঃ। পাহাড় কাটা গুহা। তরল লাভা কঠিন হয়ে প্রথমে ওপরে একটি শক্ত স্তর পড়ে। পরে

নীচের অংশ সরে গিয়ে যে গহ্বর সৃষ্টি হয় অজন্তা সেই ধরণের গুহা। একটি বৌদ্ধ কেন্দ্র। মহারাষ্ট্রে অন্যতম জেলা সদর ঔরঙ্গাবাদ থোক ১০১ কি. মি. এবং জলগাঁও স্টেসন থেকে প্রায় ৫৫ কি-মি দূরে ফর্দাপুর গ্রাম এবং এই গ্রাম থেকে ৬ কি-মি দূরে। গুহাগুলি থেকে অজন্তা গ্রাম ১১ কি-মি। নিয়মিত বাসের ব্যবস্থা আছে। হিউএন্-ৎসাঙ এর একটি সুন্দর বিবরণ দিয়ে গেছেন। এলোরা থেকে উ-পূর্বে ৫৫ মাইল মত। এখানে বিহারে যোগাচার্য শাখার প্রতিষ্ঠাতা আর্যসঙ্গ (অসঙ্গ ?) থাকতেন। এখানে গুহাগুলি অচল নামে এক ভিক্ষুক দ্বারা উৎখনিত (শিলালেখ)।

৭৬মি উঁচু একটি খাড়া পাহাড়ের গায়ে কেটে গুহাগুলি তৈরি। প্রায় ৫৪৯ মি জুড়ে অর্দ্ধবৃত্তাকারে গুহাগুলি সাজান। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে তৈরি। ফলে পূর্বপরিকল্পিত পরিকল্পনার অভাব। প্রতিটি গুহা থেকে নিজস্ব সিঁড়ি নীচে বহতা নদী ওয়া-ঘোরাতে নেমে গেছে। এখন অবশ্য মাত্র দুটি সিঁড়ি অবশিষ্ট। গুহাগুলির কতকগুলি খৃস্টপূর্বের ; প্রাচীনতমটি (১০ নং গুহা) খৃ-পূ দ্বিতীয় শতকের। দ্বিতীয় ভাগের গুহাগুলি চতুর্থ-পঞ্চম খৃস্টীয় শতকে। এগুলির অধিকাংশ বাকাটক্‌দের রাজত্ব-কালে তৈরি হয়েছিল। বাকাটক্ রাজা হরিষেণের মন্ত্রী বরাহদেবের আনুকূল্যে ১৬নং গুহা ও হরিষেণের অধীনে একজন সামন্ত রাজের সাহায্যে ১৭নং গুহা তৈরি হয়েছিল। গুহাগুলির মধ্যে কিছু গুহা দেবায়তন অর্থাৎ চৈত্যগৃহ ; বাকিগুলি শ্রমণদের সভাস্থল অর্থাৎ সংঘারাম। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ সমস্ত মিলে ত্রিশটি গুহা ; এদের মধ্যে কয়েকটি গুহা অসমাপ্ত। ২৫-টি সংঘারাম ও পাঁচটি (৯, ১০, ১৯, ২৬, ২৯) চৈত্যগৃহ। ৮, ৯, ১০, ১২, ১৩, ও ১৫নং গুহা প্রথম ভাগের অর্থাৎ খৃস্ট পূর্বের। চৈত্য গৃহ দুটির (৯, ১০) দরজাব ওপর চৈত্য গবাক্ষ নামে পরিচিত ঘোড়ার নালের আকার চৈত্য গবাক্ষ আছে। ভেতরে স্তম্ভ শ্রেণীর আসন কুলার মত আকৃতি। গুহার ছাদের নীচের পিঠ অর্দ্ধবৃত্ত ; অতীতে এই ছাদের গায়ে কড়িবরগা ছিল। এই দুটি দেবায়তনেই আরাধ্য বস্তু একটি পাথরের বেদী বা স্তূপ ; কারণ এ যুগে বুদ্ধমূর্তি পূজা প্রচলিত হয়নি। প্রথম ভাগের বাকিগুলি সংঘারাম অর্থাৎ সুপ্রশস্ত সভাগৃহ। এই সভার তিন দিকে ছোট ছোট আবাসিক কক্ষ।

চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর অর্থাৎ দ্বিতীয় ভাগের গুহাগুলির মধ্যে দুটি গুহা (৭, ১১) পরীক্ষামূলক। পরবর্তী গুহাগুলি এই পরীক্ষার ফলে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাতে গঠিত। এই ভাগের ১৯, ২৬, ও ২৯ এই তিনটি গুহা চৈত্যগৃহ ; এবং ২৯ নং গুহাটি অসমাপ্ত। বাকিগুলি সংঘারাম। সংঘারামগুলিতে প্রথমে অলিন্দ, অলিন্দের পরে থাম যুক্ত প্রশস্ত মণ্ডপ এবং মণ্ডপের তিন দিকে প্রকোষ্ঠ শ্রেণী। মণ্ডপের পেছনের সারির কেন্দ্রস্থ প্রকোষ্ঠে বুদ্ধমূর্তি উৎকীর্ণ। এগুলি এই আদর্শে গঠিত হলেও সংঘারামগুলির প্রত্যেকের কিছুটা বৈশিষ্ট্য আছে। ৬নং গুহাটি দোতলা। ১, ২, ১৬, ১৭ নং গুহা স্থাপত্যে ভাস্কর্যে ও চিত্রণে তুলনাহীন। দ্বিতীয় ভাগের চৈত্য গৃহগুলি প্রথম ভাগের গঠনরীতি অনুসারে গঠিত। কিন্তু গুহার গায়ে অলঙ্কার বহুল কারুকার্য এবং আরাধ্য স্তূপে (বেদীতে) বুদ্ধমূর্তি উৎকীর্ণ।

পাহাড় কাটা স্থাপত্যের বিবর্তন ধারায় গুহাগুলি অমূল্য। স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলা সবই অতুলনীয়। প্রথম ভাগের গুহার ছবিগুলিও খৃ-পূ প্রথম ও দ্বিতীয় শতকের। ছবিতে বেশভূষা, উষ্ণীষ, অলঙ্কার ইত্যাদি সাঁচী ও ভারহুতের উদগত মূর্তির মত। চিত্রগুলি নিপুণ হাতের পরিচয়। সমসাময়িক অন্য ভারতীয় ভাস্কর্য থেকে মূর্তিগুলিও উচ্চস্তরের। চিত্রগুলিও গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয় ভাগের গুহাগুলির ছবি চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে আঁকা। এই ছবিগুলি প্রায় তিন শতাব্দী ধরে আঁকা হয়। ফলে শিল্পমানের ইতর বিশেষ আছে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকের ছবিগুলি সৌন্দর্যে, ব্যঞ্জনায়, রঙের পরিকল্পনায়, রেখাবিন্যাসে, বৈচিত্র্যে ও গতিশীলতায় সমৃদ্ধ। নরনারীর ললিত সৌন্দর্য ও বিচিত্র আবেগ, নিখুঁত জীবন্ত রূপ ধরেছে। সপ্তম শতকে আঁকা বুদ্ধের ছবিগুলি কিন্তু নিষ্প্রভ ও ভাবব্যঞ্জনা রহিত। এগুলি নীচু মানের। চিত্রগুলি ধর্মীয়; বুদ্ধদেবের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা ও জাতকের কাহিনী ছবিগুলির উপজীব্য। এই সব ছবিতে সমসাময়িক রাজপ্রাসাদ, কুটির, নগর, গ্রাম, আশ্রম ইত্যাদির জীবন-যাত্রা এবং তখনকার সমাজের আচার ব্যবহার, সংস্কার, বিশ্বাস, পোষাক, পরিচ্ছদ, আসবাবপত্র এমন কি যুদ্ধ বিগ্রহের প্রাথমিক দলিল রয়ে গেছে। প্রাচীন যুগের মানুষের কল্পিত স্বর্গরাজ্য, দেবদেবী ও উপদেবতার পরিচয়ও এখানে রয়েছে। ছাদে নীচের পিঠে বর্ণাঢ্য অলংকরণ। গাছ-পালা ফুল-ফল পশু-পাখী মানুষ কিন্নর মিলিয়ে বিচিত্র নক্সা। ছবিগুলি স্বাভাবিক সজীব ও সুন্দর। এগুলি ফ্রেস্কো নয়। দেওয়ালে প্রথমে কাদামাটি তুঁষ ইত্যাদির প্রলেপ দিয়ে পটভূমি তৈরি করে নিয়ে তার ওপর চুন দিয়ে ছবির রেখাগুলি টেনে নিয়ে রঙ করা হয়েছে। রঙের জন্য আঠার ব্যবহার করা হয়েছে। লাল, হলুদ, সবুজ রঙ, গেরিমাটি, ভুষোকালি, চুন, ও নীল পাথর চূর্ণ দিয়ে এই সব রঙ তৈরি হয়েছিল।

অজপ—পিতৃগণ (দ্রঃ)।

অজপা—(১) যা জপিবার নয়। নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ারূপে আপনা থেকে যা জপ করা হয়। শ্বাস গ্রহণ কালে 'হং' মন্ত্র ও ত্যাগ কালে 'সঃ' এই মন্ত্র স্বতঃই উচ্চারিত হয়। 'হং' হচ্ছে পূরক; 'সঃ' রেচক। ৬০ শ্বাস=১ প্রাণ×৬০=১ নাড়িকা ×৬০=৬০×৬০×৬০=২১৬০০০ অজপার সংখ্যা। মানুষ দিবা রাত্রে এতবার এই 'হংসঃ' মন্ত্র জপ করে। বিজ্ঞানে পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির শ্বাস সংখ্যা ২৮৮০০ মত। (২) প্রাণবায়ু। (৩) তান্ত্রিকদের আরাধ্য দেবী।

অজপাদ—অজের পাদের মত পাদ। একাদশ রুদ্রের একজন। পূর্বভাদ্রপাদ নক্ষত্রের দেবতা। দ্রঃ-অজএকপাদ।

অজবীথী—জন্মরহিত বা অনাদি কালব্যাপী (নক্ষত্র) বীথী। আকাশে উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত ছায়াপথ।

অজমীঢ়—(১) অজম্ (বিষ্ণু)+ঈহ+ক্ত=বিষ্ণুকে যে ভালবাসে; যুধিষ্ঠির। (২) অজ+মিহ্ (সিঞ্চন করা)+ক্ত; বি; অজরাজ যেখানে যজ্ঞে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। (৩) দুষ্মন্ত—ভরত—বৃহৎক্ষেত্র—অজমীঢ়। (৪) সুহোত্রের (দ্রঃ) বড়

ছেলে। এঁর তিন স্ত্রী—ধূমিনী, নীলী ও কেশিনী। নীলীর ছেলে দুষ্যন্ত (শকুন্তলার স্বামী নয়) ও পরমেষ্ঠী ; ধূমিনীর ছেলে ঋক্ষ (দ্রঃ), কেশিনীর ছেলে জহ্নু, প্রজ/ব্রজন/জন, রূপিন্ (ম ১।৮৯।২৮) (৫) আবার আছে চন্দ্রবংশে রাজা বিকুণ্ঠ ও স্ত্রী সুদেবীর ছেলে ; স্ত্রী কৈকেয়ী, নাগা, গান্ধারী, বিমলা, ঋক্ষা (ভাণ্ডারকর ১।৯০।৩৯); ২৪০০ ছেলে ; বিভিন্ন রাজবংশ গড়ে ওঠে। এদের মধ্যে এক ছেলে সংবরণ (দ্রঃ)। বর্দ্ধমান সংস্করণে স্ত্রী কৈকেয়ী, গান্ধারী, বিশালা, ঋক্ষা। দ্রঃ-প্রবর।

অজয়—অজমতী। অম্যাস্টিস্ (মেগাস্থি), এরিয়ানে উল্লিখিত। গালব তন্ত্রে অজয় বাঙলাতে। কাটোয়াতে গঙ্গার সঙ্গে যুক্ত। জয়দেবের জন্মস্থান যেন।

অজা—সাংখ্যে মায়া। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণযুক্ত প্রকৃতি। অজামেকাং লোহিতকৃষ্ণশুক্লাম্—সাংখ্যে।

অজাতশত্রু—যার শত্রু জন্মায় নি। (১) যুধিষ্ঠির। (২) উপনিষদে উল্লিখিত বারাণসীর রাজা। মহর্ষি গার্গ্য বালাকি (দ্রঃ) এঁকে ব্রহ্মজ্ঞান দিতে আসেন। কিন্তু এঁর ব্রহ্মজ্ঞান দেখে বিস্মিত্ হয়ে যান। সমসাময়িক ক্ষত্রিয় রাজাদের মধ্যে যাঁরা ব্রহ্মবিৎ ছিলেন তাঁদের অন্যতম। (বৃহদা ২।১)

অজাতশত্রু—জরাসন্ধের অধস্তন ৩৬-শ পুরুষ। মগধ অধিপতি হর্যঙ্ক বংশীয় মগধরাজ বিম্বিসারের ছেলে। মা বিদেহ রাজকন্যা, বিমাতা উত্তর কোশলের রাজা প্রসেনজিতের বোন। অজাতশত্রুর অন্য নাম কূণিক। অজাতশত্রু পিতাকে হত্যা করলে বিমাতা শোকে প্রাণত্যাগ করেন ; এবং প্রসেনজিৎ এঁকে যুদ্ধে বন্দী করে কাশী দখল করেন। পরে নিজের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে যৌতুক হিসাবে কাশী ফিরিয়ে দেন। প্রথমে বুদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন পরে বুদ্ধদেবের কাছে পাপ স্বীকার করে অনুগামী হন। জৈনরা এঁকে জৈনধর্মাবলম্বী হিসাবে দাবি করেন। লিচ্ছবিদের কাছ থেকে অজাতশত্রু বৈশালী অধিকার করেন। জৈন সূত্র অনুসারে পূর্বভারতের ৩৬টি গণশাসিত রাজ্য সমবায়ও তাঁর কাছে হেরে গিয়েছিল। অবন্তীর রাজা চণ্ডপ্রদ্যোৎ চেষ্টা করেও এঁর অগ্রগতিকে বাধা দিতে পারেন নি। খৃ-পূ পঞ্চম শতকের শেষের দিকে রাজত্ব করতেন। মগধকে বৃহত্তর ও শক্তিশালী করে তুলে মগধরাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন।

অজামিল—ভাগবতে উল্লিখিত গণিকাসক্ত চোর। কান্যকুব্জের এক জন ব্রাহ্মণ। শাস্ত্রপাঠ, পূজা, অতিথি-সেবা ও বৃদ্ধদের সেবায় ব্যস্ত থাকতেন। কিন্তু এক দিন এক শূদ্রা বারাঙ্গনাকে ভোগাসক্ত দেখে তার প্রতি অনুরক্ত হন এবং নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করে তাকে বিয়ে করেন। অন্য মতে পিতার নির্দেশে বনে সমিধ আনতে গিয়ে শূদ্র কন্যাকে বিয়ে করেন। এই বারাঙ্গনার আটটি/দশটি ছেলে হয় এবং সব চেয়ে ছোট ছেলের নাম নারায়ণ। দ্যূত, চৌর্যবৃত্তি, প্রবঞ্চনা, প্রাণিপীড়ন ইত্যাদি করে সংসার চালাতেন। মৃত্যুর সময় যমদূতরা এলে অজামিল ভয়ে ছোট ছেলের নাম ধরে ডাকেন। ফলে বিষ্ণুদূতরাও এসে উপস্থিত হন এবং শেষ পর্যন্ত যমদূতরা ফিরে যেতে বাধ্য হন। অজামিল নিজে নারায়ণ নাম উচ্চারণ করেছিলেন এবং বিষ্ণুদূত ও

যমদূতের কথোপকথন ইত্যাদির মাধ্যমে হরিনাম শুনে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে এবং মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে তপস্যা করতে থাকেন। শেষ কালে বিষ্ণুলোকে গমন করেন।

অজামুখী—কশ্যপ সুরসার (দ্রঃ) মেয়ে। পুরুষ দেখলেই অজামুখী প্রলোভিত করে নিজের কাম চরিতার্থ করতেন। হিমালয়ে এক বার দুর্বাসাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়ে বিয়ে করেন। ছেলে হয় ইল্বল ও বাতাপি। অজামুখী এক বার কামের তাড়নায় কাশীতে আসেন। এখানে এক দিন ইন্দ্রাণীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে ধরে ফেলেন; ভাই শূরপদ্মর সঙ্গে বিয়ে দেবেন। কিন্তু ইন্দ্রাণীর চিৎকারে মহাদেব অজামুখীর হাত কেটে ইন্দ্রাণীকে মুক্ত করে কৈলাসে পাঠিয়ে দেন। অজামুখীর হাত কাটা গেলে শূরপদ্ম দেবতাদের বন্দী করেন। শেষ অবধি ব্রহ্মার বরে অজামুখীর আবার হাত হয়।

অজারবাইজন—ঐরণ্যম্ন বেজ (আবেস্তাতে), ঋক্‌বেদে আর্য (?), পুরাণে মদ্র বা উত্তর মদ্র। অরিয়ন (পারসিক), মেদিয়া। আর্যদের মূল আবাস স্থল যেন।

অজিত—(১) বিষ্ণু, শিব, বুদ্ধদেব। (২) দেবগণ বিশেষ। সৃষ্টিকার্য আরম্ভের আগে ব্রহ্মা জয় নামে বার জন দেবতা সৃষ্টি করেন। কিন্তু এঁরা সৃষ্টি কার্যে কোন সাহায্য না করে ধ্যানে নিযুক্ত হন। ব্রহ্মার সৃষ্টির কাজে বাধা পড়ে; ফলে ব্রহ্মা এঁদের শাপ দেন যে প্রতি মন্বন্তরে এঁরা জন্মগ্রহণ করবেন। সপ্ত মন্বন্তরে এঁরা ক্রমে অজিতগণ, তুষিতগণ, সত্যগণ, হরিগণ, বৈকুণ্ঠগণ, সাধ্যগণ ও আদিত্যগণ নামে পরিচিত। (৩) চাক্ষুষ মনুর অধিকার কালে ভগবান অজিত নামে অবতীর্ণ হন। পিতা বৈরাজ, মাতা সম্ভূতি। সমুদ্র-মন্থনে ইনি কূর্মরূপে মন্দর পর্বত পিঠে ধারণ করেছিলেন। (৪) ইক্ষ্বাকুর ছেলে। (৫) চতুর্দশ মন্বন্তরে একজন সপ্তর্ষি।

অজিত কেশকম্বলী—গৌতমবুদ্ধের সমসাময়িক ছয় জন অপধর্মীয়ের (হেরেটিক্) উল্লেখ বৌদ্ধ শাস্ত্রে পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে ইনি এক জন। অজিত কেশরচিত কম্বল পরতেন। বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থগুলিতে এঁর মতবাদ সব জায়গায় এক নয়। মতবাদগুলি অবশ্য বিরুদ্ধ ও হেয় মতবাদ এবং উচ্ছেদবাদ (নিহিলিজম্)। অজিতের মতবাদের দীর্ঘ পরিচয় দীঘ্‌ঘ নিকায় ও মজ্‌ঝিম নিকায় গ্রন্থে পাওয়া যায়। অজাতশত্রুর সঙ্গে তর্কে এঁকে আদর্শ কুতার্কিক (সোফিস্ট) বলে প্রতীয়মান হয়। এই মতে দান যজ্ঞ পাপপুণ্য সব মিথ্যা। বাপ মাও পূজ্য নয়। চরম জ্ঞানের অধিকারী বা ইহলোক পরলোক সম্বন্ধে অভিজ্ঞ কোন ব্রাহ্মণ বা শ্রমণ থাকতে পারে না। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এই চারটি ভূত দিয়ে গঠিত দেহ মৃত্যুর পর মাটি জল আগুন ও বাতাসে গিয়ে মিলে যায়। মূর্খ বা জ্ঞানী কোন তফাৎ নাই। মৃত্যুতেই সব শেষ। দ্রঃ-আজীবিক।

অজিতাবতী—হিরণ্যবতী (দ্রঃ)। ছোট গণ্ডক।

অজিন—প্রথমে ছাগচর্ম বোঝাত। পরে ঋক্ অথর্ব ও শতপথ ইত্যাদিতে হরিণচর্ম; এবং এর পরে বাঘের চামড়া বোঝাত। অর্থাৎ যে কোন পশুর চামড়া বা চামড়ার আসন।

অজিরবতী—অন্য নাম অচিরবতী (দ্রঃ)।

অজিহ্ব—বেঙ। দ্রঃ-অগ্নি। বিজ্ঞানে কিন্তু বেঙ স-জিহ্ব।

অজীগর্ত—অন্য নাম ঋচীক (দ্রঃ)।

অজৈকপাদ—অজের (মেষ রাশির) একপাদ (চতুর্থাংশ) বৎ যার পা। শিবমূর্তি। একাদশ রুদ্রের (দ্রঃ) এক জন। দ্রঃ- অজ একপাদ।

অজ্ঞাতবাস—বার বছর বনবাসের পর পাণ্ডবদের এক বছর অজ্ঞাতবাস করতে হবে পণ ছিল ; ধরা পড়লে আবার অনুরূপ বনবাস ইত্যাদি। অজ্ঞাতবাসের কয়েক দিন আগে (ম ৩।২৯৮।১৩) বক বা যক্ষরূপী ধর্ম যুধিষ্ঠিরকে বর দিয়েছিলেন যেখানে যে ভাবেই থাকুক কেউ চিনতে পারবে না। পাণ্ডবরা সমস্ত অনুচরদের দ্বারকাতে এবং অগ্নিহোত্র পুরোহিত ইত্যাদিকে দ্রুপদের কাছে পাঠিয়ে দেন। যুধিষ্ঠির মৎস্য রাজ্যে থাকবেন ঠিক করেন ও নিজেদের ছদ্মনাম ঠিক হয়। এরপর কালিন্দীর দক্ষিণ তীর ধরে এগিয়ে গিয়ে যকৃৎ-লোম ও শূরসেন দেশের মধ্য দিয়ে (মহা ৪।৫।৪) মৎস্য দেশে আসেন। এখানে বনান্তে দ্রৌপদী এক রাত্রি বিশ্রাম করতে চান ; যুধিষ্ঠির অসম্মত হন এবং অর্জুনকে বলেন দ্রৌপদীকে বহন করতে। রাজধানীর কাছে এসে শ্মশানের কাছে কূটে একটি শমী গাছে (ম ৪।৫।১২) অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রেখে গাছে একটি মৃত দেহ বেঁধে দেন। নিজেদের ৬ জনের মধ্যে ব্যবহারের জন্য জয়, জয়ন্ত, বিজয়, জয়ৎসেন ও জয়দ্বল নাম ঠিক করেন। এরপর রাজা বিরাটের কাছে ক্রমে ক্রমে এসে নিজেদের জন্য পূর্বকল্পিত কর্ম সংস্থান করে নেন। এখানে বাস করার সময় এঁরা যা অর্জন বা সংগ্রহ করতেন গোপনে সেগুলি নিজেরা ভাগ করে নিতেন। এই সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ৪-র্থ মাসে ব্রহ্মউৎসব (দ্রঃ)। মোটামুটি প্রথম দশ মাস দেখতে দেখতে কেটে যায় ; এরপর কীচকের (ম ৪।১৩।১) মৃত্যু হয়। উপকীচকদের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে দ্রৌপদী ফিরে এসে বলে ছিলেন আর তের দিন (ম ৪।২৩।২৭) এখানে আশ্রয় চান। অর্থাৎ কীচকের ঘটনাটা ১৩ দিন কম ২ মাস মত চলেছিল যেন।

অজ্ঞাতবাস শেষ হবার অব্যবহিত পরই ত্রিগর্তরাজ (দ্রঃ) সুশর্মা কৃষ্ণা সপ্তমীতে এবং পর দিন অষ্টমীতে কৌরব বাহিনী মৎস্য রাজ্য আক্রমণ করে।

ত্রিগর্তরাজ ঠিক যুদ্ধে আসেন নি ; গোধন হরণ করতে এসেছিলেন। যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল এবং সহদেবও যুদ্ধে এসেছিলেন। ভীম বন্দী বিরাটকে মুক্ত করে আনেন এবং ত্রিগর্তরাজ হেরে পালান। অবশ্য এদের চারজনার পরিচয় এই সময়ে বা পরেও কেউ টের পায়নি। কৌরব বাহিনীর সঙ্গে একা অর্জুন বিরাট রাজকুমার উত্তরের সাহায্যে যুদ্ধ করেন। কৌরব বাহিনীও মূলত গোধন হরণের জন্য এসেছিল। অর্জুনের পরিচয় জানাজানি হয়ে যায়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এদের পরাজিত করে এবং গোধন উদ্ধার করে বিকেলে (ম ৪।৬২।১০) ফিরে আসেন।

উত্তর যুদ্ধ করে জিতেছে এই খবরে বিরাট অভিভূত হয়ে পড়েন (দ্রঃ- যুধিষ্ঠির)। উত্তর রাজ সভাতে এসে কিন্তু সরাসরি বলে সে যুদ্ধ করেনি ; কিন্তু অর্জুনের কথা গোপন করে যায়। এর পর উত্তরের সঙ্গে পরামর্শ করে তৃতীয় দিবসে (মহা ৪।৬৫)

পাণ্ডবরা আত্মপ্রকাশ করেন। বিরাট এই বার সব জানতে পারেন এবং আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় উত্তরার (দ্রঃ) সঙ্গে অর্জুনের বিয়ে দিতে চান। পাণ্ডবরা পাশেই উপপ্লব্য গ্রামে গিয়ে বাস করতে থাকেন।

অজ্ঞাতবাস বর—বকরূপীধর্ম (দ্রঃ-অজ্ঞাতবাস) ও সূর্য (দ্রঃ) দুজনে বর দিয়েছিলেন।

অজ্ঞাবাদ—একটি দার্শনিক মতবাদ। এই মতবাদে বলা হয় আত্মা, ঈশ্বর, ইত্যাদি আছে কিনা জানা নাই। সুতরাং এগুলি সম্বন্ধে হাঁ-না কিছুই বলা সম্ভব নয়। নাস্তিক বা জড়বাদীদের সঙ্গে তফাৎ এই যে নাস্তিক বা জড়বাদীরা সরাসরি আত্মা ইত্যাদি অস্বীকার করেন। অজ্ঞাবাদীরা মধ্যপন্থা নিয়ে চুপচাপ থাকেন। অজ্ঞাবাদের মূলে প্রত্যক্ষপ্রমাণবাদ। প্রত্যক্ষপ্রমাণ দুটি শ্রেণী সৃষ্টি করেছে ঃ—একটি অজ্ঞাবাদ এবং আর একটি অবিশ্বাসবাদ। প্রাচীন বৌদ্ধ দর্শনের মধ্যে অনেকখানি অজ্ঞাবাদ রয়েছে। ভগবান বুদ্ধকে আত্মা ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তিনি নীরব থাকতেন। অবশ্য তিনি কতটা অজ্ঞাবাদী ছিলেন বলা শক্ত। অজ্ঞাবাদ এই শব্দটি মোটামুটি ১৮৬৯ সালে প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল। দ্রঃ—অজ্ঞেয়বাদ।

অজ্ঞেয়বাদ—এখানে ভগবান ইত্যাদির অস্তিত্ব মোটেই অস্বীকার করা হয় না। এই মতবাদে বলা হয় মানুষের ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা এবং ফলে মানুষের জ্ঞান সীমিত। অর্থাৎ কোন দিন জানা সম্ভব নয়। অজ্ঞাবাদে বলা হয় আজ পর্যন্ত জানা নাই পরে জানা যেতেও পারে।

অঞ্জলিক বাণ—ভীষ্মের শরশয্যার সময় এই বাণে অর্জুন ভীষ্মের বিকল্প উপাধানের ব্যবস্থা করেন।

অঞ্জন—(১) পশ্চিম দিকহস্তী (দ্রঃ)। (২) সুপ্রতীক দিকহস্তীর চারটি ছেলে অঞ্জন, ঐরাবত, বামন ও কুমুদ ; এরা চার জন অসুরদের হাতী ; ইন্দ্রের ঐরাবত নয়। (৩) পূজায় ব্যবহৃত অঞ্জন ঃ—সৌবীর, জাঙ্গল, তুত্থ, ময়ূর, শ্রীকর, দর্বিকা, নীলমেঘ। (৪) পাঞ্জাবে সুলেমান পর্বত শাখা।

অঞ্জনপর্বা—ঘটোৎকচের ছেলে। কুরুক্ষেত্রে ১৪-দিনের দিন অশ্বত্থামার হাতে নিহত হন।

অঞ্জনবতী—ঈশান কোণে সুপ্রতীক দিক-হস্তীর (দ্রঃ) স্ত্রী।

অঞ্জনা—(১) পশ্চিম দিক হস্তীর স্ত্রী। (২) বিশ্বামিত্রের শাপে অপ্সরা পুঞ্জিকাস্থলা (দ্রঃ)/মানগর্ভা, বানর শ্রেষ্ঠ কুঞ্জরের মেয়ে হয়ে জন্মান। . সুমেরু রাজা কেশরী (দ্রঃ) বানরের সঙ্গে বিয়ে হয়। মরুৎ বিনা দেহ সম্পর্কে এ'র গর্ভে শিবের বীর্য স্থাপন করেন। মরুৎকে অঞ্জনা তিরস্কার করলে মরুৎ আশ্বাস দেন একটি অতিবীর সন্তান হবে এবং এই সন্তান মারুতি/হনুমান (দ্রঃ) জন্মালে অঞ্জনা মুক্তি পাবেন। জন্মের পর হনুমান স্তন্যপানের জন্য কাঁদতে থাকলে অঞ্জনা ভর্ৎসনা করে বলেন বানরে পাকা ফল খায় ; এবং দিব্য রূপ ধরে স্বর্গে ফিরে যান।

অঞ্জলি—নাট্যশাস্ত্রে দুটি হাত জোড় করে অভিবাদন করা। দেবতাকে প্রণাম করতে

মাথার ওপর, গুরুজনকে মুখ মণ্ডলের ওপর, ব্রাহ্মণকে প্রণাম করতে বুকের ওপর অঞ্জলি ধারণ বিধেয়।

অট্টহাস—বীরভূমে সিউড়ি মহকুমার লাভপুর থানার পূর্বাংশে অবস্থিত ৫১ পীঠের একটি। এখানে সতীর জিব / অধরোষ্ঠ পড়েছিল। দেবী এখানে ফুল্লরা। মন্দিরে প্রায় দশ বার হাত চওড়া অঙ্গ সামঞ্জস্য হীন প্রকাণ্ড একটা শিলামূর্তি আছে। বিশ্বাস এটি অধরাকৃতি। মন্দিরের পাশে ভৈরব মন্দির আছে। আমোদপুর স্টেশন থেকে ৭ মাইল।

অট্ঠ কথা বা অথকথা—সংস্কৃতে অর্থকথা। বৌদ্ধপালি ত্রিপিটকের নিকায় বা তার অন্তর্গত সুত্তগুলির টীকা বা ব্যাখ্যা। এগুলি বেশির ভাগ বুদ্ধঘোষের রচনা। ধম্মপাল প্রভৃতিরও অট্ঠ কথা পাওয়া যায়। প্রাচীন সিংহলী ভাষায় রচিত অট্ঠ কথাও আছে। বুদ্ধঘোষের সমন্তপাসাদিকা, সুমঙ্গল বিলাসিনী, পপঞ্চসূদনী, মনোরথপূরণী, সারত্থপকাসিনী, পরমত্থজোতিকা নামে টীকা বা অট্ঠকথাগুলি সমধিক প্রসিদ্ধ।

অণহিল পাঠক—প্রাচীন নগরী। আহমেদাবাদের ১০৫ কি-মি উত্তরে সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। বর্তমান নাম পাটন। প্রবাদ আছে চাপ বা চাবোৎকট বা চোবড়া জাতির রাজা ধনরাজ ৭৪৫ খৃষ্টাব্দে এর প্রতিষ্ঠা করেন। ৯৪০ খৃষ্টাব্দে চৌলুক্যরাজ গুজরাট দখল করে এখানেই রাজধানী করেন।

অণিমা—যোগের অষ্টসিদ্ধির একটি। যথেচ্ছ অতি সূক্ষ্ম হওয়ার ক্ষমতা বা বিভূতি। দেবতারা বা এই বিভূতির অধিকারী যোগী অতিসূক্ষ্ম শরীর ধাবণ করে ঘুরে বেড়াতে পারেন।

অণিমাণ্ডব্য—অণীমাণ্ডব্য। প্রকৃত নাম মাণ্ডব্য। ধার্মিক ব্রাহ্মণ (মহা ১।১০১।১)। এক দিন আশ্রমের দরজায় মৌন হয়ে তপস্যা করছিলেন এমন সময় এক দল লোপ্ত্রহারী দস্যু এসে আশ্রমে লুকিয়ে পড়ে। ইতি মধ্যে রাজপুরুষেরা এসে মাণ্ডব্যকে প্রশ্ন করে দস্যুরা কোন পথে গেছে। মৌনী ব্রাহ্মণ চুপচাপ থাকেন। রাজপুরুষেরা তখন আশ্রমে ঢুকে দস্যুদের ও জিনিসপত্র সব পান (মহা ১।১০১।৯) এবং সকলকে ধরে নিয়ে যায়। রাজা সকলকে মৃত্যুদণ্ড দেন। অণিমাণ্ডব্য যোগরত অবস্থায় এ সব কিছুই জানতে পারেন না। শূলবিদ্ধ অবস্থায় কিন্তু মারাও যান না। অন্যান্য মুনিরা তাঁর তপস্যাতে বিচলিত হয়ে এসে উপস্থিত হন ; দুঃখিত হয়ে পড়েন এবং রাত্রিতে পাখী হয়ে জিজ্ঞাসা করেন মাণ্ডব্য কি দোষ করেছিল। একটি মতে মহাদেবও এসে আশীর্বাদ করে যান। মাণ্ডব্য কিছুই স্মরণ করতে পারেন না। এই সব খবর পেয়ে রাজা এসে ক্ষমা চান এবং শূল খুলে নিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সম্ভব হয় না, শূলের কিছুটা অংশ দেহের মধ্যে থেকে যায় বাকি অংশটা কেটে বাদ দেওয়া হয়। অণি অর্থাৎ শূলাগ্র দেহের মধ্যে থেকে যাবার জন্য এই নাম।

মাণ্ডব্য পরে এক দিন যমের কাছে এই শাস্তির কারণ জানতে চাইলে যমরাজ জানান বাল্য কালে অণিমাণ্ডব্য এক পতঙ্গের (মহাভারত) মতান্তরে ছোট ছোট পাখীর মলদ্বারে এই ভাবে তৃণ শলাকা/ঈষিকা প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিলেন। অণিমাণ্ডব্য তখন নিয়ম করেন অন্য মতে অণিমাণ্ডব্য জানান শাস্ত্রে আছে ১২ / ১৪ বছরের আগে

অজ্ঞান কৃত কাজের জন্য কার কোন পাপ হবে না। বালক বয়সের এই পাপের শাস্তি দেবার জন্য যমকে শূদ্র/বিদুর হয়ে জন্মাবার অভিশাপ দেন। দ্রঃ-বিদুর, দত্তাত্রেয়, উগ্রশ্রবা।

অণু—যযাতির ছেলে।

অণুহ—বিভ্রাজের ছেলে। অণুহের ছেলে ব্রহ্মদত্ত (দ্রঃ) ; ছেলেকে রাজা করে দিয়ে মারা যান।

অণ্ড—প্রলয়ের পর প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল অণ্ড।

অণ্ডকটাহ—ব্রহ্মাণ্ড রূপ কটাহ ; জীবের স্বকীয় কাজের ফল ভোগের স্থান। সংখ্যায় ১৪-টি ঃ—ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনর্লোক তপোলোক, সত্যলোক, পাতাল, রসাতল, মহাতল, তলাতল, সুতল, বিতল, অতল।

অতল—সাতটি পাতালের (দ্রঃ) প্রথম অংশ। এখানে ময়ের ছেলে বল (দ্রঃ) রাজত্ব করতেন।

অতিকায়—মধুকৈটভ (দ্রঃ) ত্রেতা যুগে খর ও অতিকায় হয়ে জন্মান। রামের সঙ্গে খরের যুদ্ধ হয় এবং লক্ষ্মণের হাতে অতিকায় মারা যান। অন্য মতে কুবেরকে জয় করে ফেরার পথে ময়ূর গিরিতে কয়েকটি ক্রীড়ারত গন্ধর্বকন্যাকে রাবণ দেখতে পান। এদের মধ্যে প্রধান ছিলেন চিত্রাঙ্গদ গন্ধর্বের স্ত্রী চিত্রাঙ্গী। চিত্রাঙ্গীকে রাবণ প্রলোভিত করে মিলিত হন। ফলে একটি উজ্জলবর্ণ শিশু অতিকায়ের জন্ম হয়। রাবণ শিশুকে নিয়ে ফিরতে থাকেন। পথে এক জায়গায় পুষ্পক রথ পাহাড়ে ধাক্কা খেলে শিশুটি নীচে পড়ে যায়। রাবণ শিশুটিকে খুঁজে বার করেন। শিশু একটুও আহত হয় নি ; এবং এত বিরাট আকার হয়ে ওঠে যে রাবণ নিজেই আর একে তুলতে পারেন না। শিশুটি তারপর নিজেই লাফিয়ে বিমানে উঠে আসে। লঙ্কায় ফিরে এসে রাবণ শিশুটিকে ধান্যমালিনীর হাতে দেন পালন করবার জন্য। গোকর্ণ তীর্থে অতিকায় তপস্যা করেন। ব্রহ্মা এলেও সমাধিমগ্ন অতিকায় জানতে পারেন না। পরে ব্রহ্মা দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং অতিকায়ের প্রার্থনা মত বর দেন ঃ—(১) ব্রহ্মাস্ত্রলাভ ; (২) দুর্ভেদ্য কবচ লাভ ; (৩) তৃষ্ণা ও অন্যান্য বাসনা থেকে মুক্তি। অতিকায়ের মাতুল চন্দ্র রাক্ষস ইন্দ্রের কাছে হেরে গিয়ে ইন্দ্রকে ধরে আনতে বলেন। ফলে অতিকায় ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করেন ; বিষ্ণু ইন্দ্রকে সাহায্য করলেও শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রকে হারতে হয়। রামায়ণে রাবণ ও ধান্যমালিনীর ছেলে (৬।৭১।৩০) ; অত্যন্ত ধার্মিক ; ব্রহ্মার কাছে সুরাসুরের হাতে অবধ্যত্ব ইত্যাদি বর (৬।৭১।৩২) ; বাণের দ্বারা ইন্দ্রের বজ্রকে বিষ্টম্ভিত করেছিলেন। লঙ্কার যুদ্ধে রথে করে আসেন এবং লক্ষ্মণের হাতে মৃত্যু।

অতিচক্ষু—ইন্দ্রজিতের হাতে রাম লক্ষ্মণ হতসংজ্ঞ হয়ে পড়েন এবং সুস্থ হয়ে উঠলে বিভীষণ রামকে জল দেন। এই জল শ্বেত পর্বত থেকে কুবের-দূত গুহ্যক এনেছে। এই জল চোখে দিলে সব কিছু দেখা যায়। রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীব ও বহু বানর এই জল চোখে দিয়ে অতিচক্ষু ক্ষমতা লাভ করেন (মহা ৩।২৭৩।১০)।

অতিচার—মঙ্গলাদি পঞ্চগ্রহের স্ব স্ব রাশি ভোগের কাল শেষ হবার আগে অন্য রাশিতে গমন।

অতিথি—তিথির কমাবাড়া অনুসারে এক দিনে দুই তিথি বা দু দিনে একই তিথি পড়া। দু দিনে একই তিথি হলে পর দিনের তিথি।

অতিথি—(১) কুশের ছেলে; মা কুমুদ্বতী; নাগরাজ ভগিনী। রামচন্দ্রের নাতি। (২) যার আসা যাওয়ার কোন নির্দিষ্ট তিথি নাই। যস্য ন জ্ঞায়তে নাম ন চ গোত্রং ন চ স্থিতিঃ॥ অকস্মাৎ গৃহমায়াতি সোঽতিথিঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ। বা এক রাত্রির অধিক যার স্থিতি নয়। মিতাক্ষরা মতে শ্রোত্রিয়, পথিক ও বেদ-পারগ তিন জনই অতিথি। বৌদ্ধ শাস্ত্রে যিনি বিদ্বান, সর্বত্র ভ্রমণকারী এবং যিনি প্রশ্নোত্তর রূপে উপদেশ দিয়ে জন সাধারণের হিত সাধন করেন।

অতিথিগ্ব--দিবোদাস। এক রাজা। ইন্দ্রের সাহায্যে অসুরদের সঙ্গে অনেকগুলি যুদ্ধ করেছিলেন। অসুরদের ভয়ে এক বার জলের নীচে লুকিয়ে ছিলেন।

অতিবল—ব্রহ্মা কালপুরুষকে (যম) পাঠান , ইনি অতিবল নামে সন্ন্যাসীর বেশে রামচন্দ্রের সঙ্গে গোপনে কথা বলতে আসেন।

অতিবলা—অযোধ্যা ত্যাগ করে সরয্ তীরে এসে বিশ্বামিত্র বলা ও অতিবলা দুটি মন্ত্র রাম লক্ষ্মণকে দেন। সমস্ত জ্ঞানের প্রসূতি এই মন্ত্র-দুটি পিতামহের কন্যা। সর্বলোকের রক্ষাকারী (রা ১।২২।১৩-১৯)। এই মন্ত্র বলে শ্রম, জ্বর, রূপবিপর্যয় হয় না। সুপ্ত বা প্রমত্ত অবস্থাতেও রাক্ষসরা কোন অনিষ্ট করতে পারবে না। পৃথিবীতে বাহুবলে অদ্বিতীয় ; সৌভাগ্যে, দাক্ষিণ্যে, জ্ঞানে, বুদ্ধিতে অপ্রতিদ্বন্দ্ব হবে। দ্রঃ—অমোঘা।

অতিবাহু—প্রধার ছেলে।

অতিভীম -অগ্নির একটি ছেলে। দ্রঃ-অগ্নিবংশ।

অতিরাত্র—নড্বলার (দ্রঃ) ছেলে।

অতীশদীপঙ্কর—১১শ শতক। যেন বিক্রমণীপুর (বিক্রমপুর)-এর রাজা কল্যাণশ্রীর ছেলে। ভারতে, সুবর্ণ দ্বীপে ও সিংহলে অধ্যয়ন শেষে বিক্রমশীলা মহাবিহারে ৫১-জন আচার্য ও ১০৮টি মন্দিরের অধ্যক্ষ হন। তিব্বত-রাজ জ্ঞানপ্রভের আমন্ত্রণে তিব্বতে যান (১০৪০ খৃ)। তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম স্থাপন করেন। ক-দম্ (পরে নাম গে লুক্) সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। বহু গ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেন। নিজস্ব রচনাও ছিল; বর্তমানে লুপ্ত , তিব্বতী অনুবাদ পাওয়া যায়। তিব্বতে বুদ্ধের অবতার বলে পূজিত ; লাসার নিকটে সমাধি স্থান একটি পবিত্র তীর্থ। ভারতবর্ষে থাকা কালীন সম্রাট নয়পালের এবং পশ্চিম দেশীয় কর্ণরাজের মধ্যে বিবাদের মধ্যস্থতা করে দিয়েছিলেন।

অত্রি—ঋক্ বেদে এক জন ঋষি ; ৫ম মণ্ডল এঁ'র দ্বারা রচিত। অথর্ব বেদে এঁ'র প্রাধান্য। যাস্ক ইত্যাদির মতে ইনি অগ্নি। মন্ত্রকার ও গোত্রপ্রবর্তক। এঁ'র স্মৃতি অত্রিসংহিতা। প্রাচীনতম ঋষিদের সমসাময়িক হলেও পৌরাণিক কাল পর্যন্ত এই বংশের প্রভাকর ছাড়া অন্য কাউকে পাওয়া যায় না। পুরুবংশে রাজা ভদ্রাশ্ব/রৌদ্রাশ্বের দশটি মেয়েকে প্রভাকর বিয়ে করেছিলেন। এই বিয়েতে দশটি ছেলে হয় এবং আত্রেয়দের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই বংশে প্রাচীনবর্হিস্ (অন্য মতে অগ্নির

ছেলে) মুনি জন্মান। আত্রেয়রা জাহাজ তৈরিতে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। এই জন্য ভার্গবদের সঙ্গে বিবাদের সময় কার্তবীর্যার্জুন দত্ত আত্রেয়কে তুষ্ট করে এ'দের সাহায্য নিয়েছিলেন।

ব্রহ্মার মানস পুত্র অত্রি ; চক্ষু থেকে জন্ম ; একজন সপ্তর্ষি। অত্রির বহু পুত্র : এ'রা মহর্ষি (মহা ১।৬০।৫)। এক জন প্রজাপতি। স্ত্রী অনসূয়া (দ্রঃ)। দ্রঃ—শলভা। পুত্র লাভের আশায় স্ত্রীর সঙ্গে পাহাড়ে গিয়ে তপস্যা করেন। তুষ্ট হয়ে ত্রিমূর্তি এসে বর দেন বিষ্ণু অংশে দত্তাত্রেয় (দ্রঃ- বলি), শিব অংশে দুর্বাসা, এবং ব্রহ্মা অংশে সোম/চন্দ্র জন্মাবেন। মনু সংহিতায় অত্রি মনুর সৃষ্ট দশজন প্রজাপতির এক জন ; এ'র ছেলেরা বর্হিষদ্, দৈত্যদানবাদির পিতৃপুরুষ। হরি বংশে ইনি স্বয়ম্ভুর সাত মানসপুত্রের একজন ও স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের এক জন। এ'র চোখের জলে চন্দ্রের উৎপত্তি।

এক বার দেবাসুরের যুদ্ধে বাণ বর্ষণে চন্দ্র সূর্য ঢাকা পড়ে গিয়ে অন্ধকার হয়ে গেলে দেবতারা অত্রিকে একটা প্রতিকার করতে বলেন। অত্রি তখন সূর্য ও চন্দ্রে পরিণত হয়ে দেবতাদের আলো দেন এবং সূর্যের তেজে অসুরদের পুড়িয়ে শেষ করে দেন। দত্তাত্রেয়ের ছেলে নিমি। নিমির ছেলে মারা গেলে অত্রি এসেছিলেন। কামদ বনে অত্রি একবার তপস্যা করছিলেন। এই সময় দেশে ভীষণ অনাবৃষ্টি হয়। স্ত্রী অনসূয়া বালি দিয়ে শিবলিঙ্গ গড়ে পূজা করছিলেন। অত্রি স্ত্রীকে জল চান। কিন্তু জল ছিল না। গঙ্গা তখন সেখানে এসে উপস্থিত হন এবং একটি কূপ তৈরি হয়ে কূপ থেকে জল উঠতে থাকে। অনসূয়া গঙ্গাকে এক মাস থেকে যেতে বলেন। গঙ্গা জানান অনসূয়া যদি তাঁর তপস্যার পুণ্য গঙ্গাকে দিয়ে দেন তবেই তিনি থাকবেন। জল পেয়ে অত্রি স্ত্রীর কাছে সব ঘটনা শোনেন এবং গঙ্গাদেবীকে দেখতে চান। অনসূয়ার অনুরোধে শেষ অবধি গঙ্গা পৃথিবীতে সর্বদা বর্তমান থাকতে সম্মত হন।

অত্রি ও অন্যান্য ঋষিরা দ্রোণের কাছে এসে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বন্ধ করবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। অসুররা এক বার অত্রিকে শতদ্বার যন্ত্রের মধ্যে ফেলে দিয়ে যন্ত্রণা দিয়ে/ পুড়িয়ে মারতে চেষ্টা করলে অত্রি অশ্বিনী কুমারদের স্তব করলে এ'রা এসে মুক্ত করে দেন। রাম অযোধ্যায় ফিরে এলে অত্রি দেখা করতে এসেছিলেন। দ্রঃ-চন্দ্র, বৃষাদর্ভি।

(২) জনৈক তপস্বী। বৈন্য (দ্রঃ), রাজার কাছে অর্থের আশায় যাব যাব করেও যান নি। বনে যাবার ব্যবস্থা করেন ; স্ত্রী (অনসূয়া) বৈন্যের কাছে গিয়ে কিছু অর্থ আনতে বলেন ; ছেলেদের ও ভৃত্যদের এই অর্থ ভাগ করে দিয়ে বনে যাবেন। অত্রি বলেন গৌতম বলেছেন রাজ সভাতে অত্রির বিরোধী বহু ব্রাহ্মণ আছে ; অত্রি সেখানে যা বলবেন এরা অন্য অর্থ করবে। এই জন্য যেতে চান না। তবু স্ত্রীর অনুরোধে যান।

অত্রি বৈন্য রাজার যজ্ঞশালাতে এসে রাজাকে স্তব করতে থাকেন। কিন্তু এই স্তব রাজার পছন্দ হয় না। দু জনে তর্ক হতে থাকে এবং তর্কের মীমাংসার জন্য দু জনে সনৎকুমারের কাছে এলে ইনি মীমাংসা করে দেন। রাজা তারপর অত্রিকে প্রচুর

দান করেন। এই সব হিরণ্য, দাসী, সহস্র পুত্রদের ভাগ করে দিয়ে বনে চলে যান (মহা ৩।১৮৩।)।

(৩) এক জন অসুর (কালকেয় ইত্যাদির) মন্ত্রী (মহা ১।৫৯।৩৬)।

(৪) শুক্রাচার্যের এক ছেলে অত্রি।

অথর্ব—অথর্বন্=অথ (মঙ্গল)+ঋণ (গমন করা)+বন যে মঙ্গলে গমন করেন। প্রাচীন পারসিক আথর্বন এবং ফারসী আতর্ (আতিশ্ অগ্নি)+বন্ (সেবা/স্তব করা)=আতুরবান্ –অগ্নিপূজক। চতুর্থ বেদ। ব্রহ্মার উত্তর মতান্তরে পূর্ব মুখ থেকে উৎপত্তি। সাম বেদের ছান্দোগ্য উপনিষদে একে চতুর্থ বেদ বলা হয়েছে। ঐতরেয়, শতপথ, বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য প্রভৃতি গ্রন্থে তিন বেদের উল্লেখ আছে ; মনুতেও বহু স্থানে তিন বেদের কথাই বলা হয়েছে। ইতিহাস ও পুরাণে অবশ্য চার বেদের কথাই আছে। এই বেদে বিংশতি কাণ্ড, নয়টি শাখা ও পাঁচটি কল্প। এর ব্রাহ্মণ গোপথ ব্রাহ্মণ। উপনিষৎ :—প্রশ্ন, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য। পাঁচটি কল্পসংহিতা :—নক্ষত্র কল্প ; নক্ষত্র পূজার বিধি। বেদকল্প ; ব্রহ্ম ও ঋত্বিক সম্পর্কীয়। সংহিতাকল্প ; মন্ত্রবিধি। আঙ্গিরসকল্প ; অভিচার ব্যবস্থা। শান্তিকল্প ; অশ্বহস্তী ইত্যাদি পশুপালন।

অথর্বা ঋষির নামে প্রসিদ্ধ বেদ। অন্য নাম আঙ্গিরস বা অথর্বাঙ্গিরস বা ভৃগ্বঙ্গিরস্ বেদ। অথর্বা, অঙ্গিরাঃ, ও ভৃগু তিন জনেই এই বেদ মন্ত্রের রচয়িতা বা সংকলয়িতা। একটি মতে বশিষ্ঠ পুত্র অথর্বন এর প্রণেতা। বিষ্ণু পুরাণ মতে জৈমিনি পুত্র সুমন্তু মহর্ষি তাঁর প্রিয় শিষ্য কবন্ধকে প্রথমে এই বেদ শিক্ষা দান করেন। কবন্ধ এই বেদকে দু ভাগ করে মহর্ষি দেবদর্শ ও পথ্যকে ভাগ করে দেন। দেবদর্শের শিষ্য মেধা, ব্রহ্মবলি, শৌতিকায়নি এবং পিপ্পলাদ। পথ্যের শিষ্য জাবালি, কুমুদাদি ও শৌনক। শৌনক আবার তাঁর অংশকে বভ্রু ও সৈন্ধবকে ভাগ করে দেন।

পদ্যের পরিমাণ বেশি থাকা অনুসারে ঋক্, গদ্যের পরিমাণ বেশি থাকা অনুসারে যজুঃ এবং গীতের পরিমাণ বেশি থাকা অনুসারে সামবেদ নাম হয়েছে। চতুর্থ বেদকে এই ভাবে নাম দেওয়া সম্ভব হয়নি। সব ধরণের মন্ত্রই এতে আছে ; ফলে সংকলয়িতাদের নাম অনুসারে নাম। অথর্ব বেদের বহু শাখার মধ্যে আটটি শাখা :-পৈপ্পলাদ, তৌদ, মৌদ, শৌনক, জাজল, জলদ, ব্রহ্মবেদ, দেবদর্শ ও চারণবৈদ্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। অথর্ব বেদের যে সমস্ত বিভিন্ন শাখা তৈরি হয়েছিল তাদের মধ্যে অল্পবিস্তর পাঠভেদ ও প্রয়োগভেদ ছিল। শাখাগুলি বৈদিক চরণপর্ষদের প্রধান ঋষিদের নামে অভিহিত ছিল। এই সমস্ত বহু শাখাই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। শৌনক শাখার মন্ত্রসংহিতা ভাষ্য সহ ছাপা হয়েছে। পৈপ্পলাদ সংহিতার মূল বইও পাওয়া গেছে। মূল বিষয়ে শৌনক ও পৈপ্পলাদ শাখার লক্ষ্য এক। শৌনক সংহিতায় বিশটি কাণ্ড : সাতশ ত্রিশটি সূক্ত, এবং প্রায় ছ হাজার মন্ত্র রয়েছে। অন্তিম কাণ্ডের অধিকাংশ মন্ত্র ঋক্ বেদেও পাওয়া যায়। অন্য কাণ্ডগুলির অনেক মন্ত্র ঋক্‌বেদ ও যজুর্বেদের সঙ্গে মিলে যায়। সমস্ত

মন্ত্রগুলির এক সপ্তমাংশ এই ভাবে মিলে যায়। ঋক্‌বেদের অনেক পরে অথর্ববেদ সংকলিত হয়েছিল।

অথর্ববেদের বেশির ভাগ মন্ত্রই স্বার্থকেন্দ্রিক গৃহ্যকর্মের জন্য। এই মন্ত্রগুলির মাধ্যমে মানুষের সহজাত আশা আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠেছে। অর্থ লাভ, রোগ-নাশ, রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি, পারিবারিক সম্প্রীতি, ভূত-নিবারণ ইত্যাদি কাজে যে সব মন্ত্র ব্যবহৃত হয় সেগুলিকে শান্তমন্ত্র বলা হয়। শত্রুনাশ, পররাজ্য উৎসাদন, বশীকরণ, ভূতাবেশন ইত্যাদি ঘোর কর্ম বা আভিচারিক কর্ম এবং এই সব কাজের মন্ত্রগুলি ঘোর মন্ত্র নামে পরিচিত। অথর্ববেদে আর এক শ্রেণীর মন্ত্র আছে 'কৃত্যাপ্রতিহরণ' মন্ত্র. এই মন্ত্রগুলি শত্রু কৃত অভিচারের প্রতিষেধমূলক।

আঙ্গিরস কল্পে দশ রকম আথর্বণিক কাজের উল্লেখ আছে, যথা ঃ-শান্তিক, পৌষ্টিক, বশীকরণ, স্তম্ভন, মোহন, দ্বেষণ, উচ্চাটন, মারণ, আকর্ষণ ও বিদ্রাবন। এই কাজগুলির সঙ্গে তন্ত্রের ষট্ কর্মের অদ্ভুত মিল আছে। অন্য বেদে এই ধরণের মন্ত্র অল্প। বিবাহ, গর্ভাধান, পিতৃমেধ প্রভৃতি নিত্যকর্মের মন্ত্রও অথর্ববেদে আছে।

অথর্ববেদের ভূমিসূক্তে (১২-১) সব প্রথম বসুন্ধরাকে জননী বলে অভিহিত করে বলা হয়েছে 'মাতা ভূমিঃ পুত্রো অহং পৃথিব্যাঃ'। আয়ুষ্য ও ভৈষজ্য মন্ত্রগুলিতে আয়ুর্বিজ্ঞানের প্রথম পদক্ষেপ। নানা ওষধির নাম ও বিভিন্ন শরীর সংস্থানের নাম এখানে রয়েছে। রাজকর্ম পর্যায়ে রাজার নির্বাচন, অভিষেক. গুণাবলী ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সম্বন্ধে বহু নির্দেশ রয়েছে। অথর্ব বেদে আধ্যাত্মিক মন্ত্রের সংখ্যাও অনেক। একটি পরম তত্ত্বই যে বিশ্ব সংসারের সব কিছুর মূল বহু মন্ত্রে বারবার এ কথা বলা হয়েছে। ব্রহ্মচারী. বেন. স্কম্ভ, অনড্বান, রোহিত, উচ্ছিষ্ট, কাল, প্রাণ পাঙ্ক্তি, সলিল ইত্যাদি বিষয়ে মন্ত্রগুলিও গুরুত্বপূর্ণ। সুপ্রসিদ্ধ ব্রাত্য কাণ্ডের (পঞ্চদশ কাণ্ড) ব্রাত্যগণকে নিগূঢ় অধ্যাত্ম রসের প্রতীক রূপে বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

অথর্ব বেদের আর এক নাম ব্রহ্মবেদ। গোপথ ব্রাহ্মণে আছে ব্রহ্মা নামে ঋত্বিক অথর্ব বিদ্যায় পারঙ্গম হবেন। ব্রহ্ম শব্দের এক অর্থ অভিচার অপর অর্থ বিশ্বের মূলতত্ত্ব। এই উভয় অর্থরূপ ব্রহ্মই এই বেদের প্রতিপাদ্য। অর্থাৎ সব দিক থেকেই অথর্ব বেদ ব্রহ্মবেদ। এই বেদে সত্যই আভ্যুদয়িক ও অভিচার মন্ত্রের সঙ্গে আধ্যাত্মিক মন্ত্রের একটা নিবিড় মিশ্রণ হয়ে গেছে। আঙ্গিরস কল্পের মতে এই বেদে সংসারীর ভোগ এবং সন্ন্যাসীর মুক্তি দুইই আছে ঃ—যত্রহি রাগিনাম্ ভুক্তিঃ যত্র হি মুক্তিঃ অরাগিনাম্।

অথর্ব—(১) অথর্ব বেদের ব্রাহ্মণ অংশ। (২) বশিষ্ঠ ঋষি। (৩) ব্রহ্মার বড় ছেলে ; মুখ থেকে জন্ম। ব্রহ্মা এঁকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দেন (মুণ্ডক)। অথর্ব বেদ রচয়িতা। কর্দম কন্যা শান্তি এঁর স্ত্রী। শান্তির আর এক নাম চিত্তি। কিছু মতে দুই স্ত্রী শান্তি ও চিত্তি। একটি মতে অথর্বা বশিষ্ঠ পুত্র। অথর্বার কাছ থেকে অঙ্গিরা এবং অঙ্গিরার কাছ থেকে ভরদ্বাজ বংশীয় সত্যবাহ এবং সত্যবাহ থেকে অঙ্গিরস্ এই ব্রহ্মবিদ্যা পান। কিছু মতে অথর্বাই অঙ্গিরা।

অথর্বা—অথর্বা শব্দটি প্রাচীন কাল থেকে ভারতে ও ইরানে একই অর্থে প্রচলিত। দুই দেশেই অগ্নিপূজা ও পুরোহিতের কাজের সঙ্গে অথর্বার সম্পর্ক। ঋক্‌বেদে আছে ইনি সর্ব প্রথম অগ্নিমন্থন করেন বা স্বর্গ থেকে অগ্নিকে পৃথিবীতে আনেন।

অথর্বা (=বায়ু) পুষ্কর (=জল) থেকে অগ্নি মন্থন করেছিলেন; অত্রির ছেলে দধ্যঙ্ ঋষি প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন (ঋক্ ৬।১৬।১৩-১৪)। অগ্নিকে অথর্বা যজ্ঞাদি কাজে নিযুক্ত করেন। অথর্ব বংশের পুরোহিতরা যজমানের পক্ষে প্রশস্ত বলে গণ্য হতেন। শান্তি, স্বস্ত্যয়ন ও মন্ত্রৌষধিতে এঁদের খ্যাতি ছিল। জরথুস্ত্র ধর্মের অগ্নি উপাসক পুরোহিতরাও অথর্বন, বর্তমানে অথোনা নামে পরিচিত।

অথর্বা ঋষি অঙ্গিরার সঙ্গে মিলে অথর্ব বেদ সঙ্কলন করেছিলেন। এই জন্য অথর্ব বেদের মন্ত্রগুলির দুটি ভাগ: আথর্বন ও আঙ্গিরস। আথর্বন মন্ত্র ভেষজ ইত্যাদি প্রয়োগের ক্ষেত্রে এবং আঙ্গিরস মন্ত্র অভিচার কাজে ব্যবহার হয়। মহাভারত মতে অথর্ববেদের পেশাদার পাঠকদের নাম অথর্বা। ভৃগু শাপে অগ্নি যখন সমুদ্রে লুকিয়ে ছিলেন তখন এই অথর্বা অগ্নিকে খুঁজে এনে সৃষ্টি রক্ষা করেন।

অদিতি—বড় বলে যাকে ছেদন করা যায় না; অর্থাৎ পৃথিবী—ইয়ং বৈ পৃথিবী অদিতি—শতপথ। বৈদিক অর্থে দেবমাতা, অদীনা, দাক্ষায়ণী, দৌ, আকাশ, জগৎ-জননী, ঐশীশক্তি। কিন্তু ঋক্‌বেদে (৫।৪৬।৩, ৬।৫।১৫) দেখা যায় পৃথিবী ও অদিতি যেন আলাদা। অদিতি অগ্নি বা সূর্যের মত বিশ্বব্যাপিনী (ঋক্ ১।৮৯।১০)। সায়ন ইত্যাদি মতে ইনি দ্যুলোক, অন্তরীক্ষ, জগতের মাতা, পিতা এবং পুত্রও। সকল দেবতাই অদিতি। অদিতি অর্থে গন্ধর্বগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, অসুরগণ ও রক্ষোগণ। অদিতি অখণ্ড ও দেবমাতা। কৃষ্ণ যজুর্বেদে অন্নের জননী, বেদীরূপা পৃথিবী। অদিতি অর্থে আকাশ ও পৃথিবী; সূর্য ও অগ্নিকে যথাক্রমে জন্ম দিয়েছেন। অদিতি অর্থে অনন্ত, অসীম অর্থাৎ অনন্ত শক্তি বা আকাশ। ৩।২৭।৯ ঋকে অগ্নি অদিতির পুত্র। আবার কয়েকটি স্থানে অগ্নিই অদিতি। ৪।১।২০ ঋকে অগ্নি যজ্ঞীয় দেবতাদের অদিতি। যাস্ক (১২।২৩।৭) অগ্নিঃ অপি অদিতিঃ। কোন কোন ঋকে (১০।৩৬।৬) মিত্র ও বরুণের এবং ৮।৪৭।৯ ঋকে অর্যমার জননী। অদিতির সন্তান আদিত্যরা। ১।১১৩।১৯ ঋকে অদিতি উষার প্রতিস্পর্দ্ধিনী। অদিতি ধেনু, এবং বৃষ্টিদায়িনী। সাধ্য দেবতাদের জন্য অন্নপাক করে দিয়ে (কৃ-যজু ৬।৫।৬) অদিতি প্রথমে ৪-পুত্র পরে আবার অন্নপাক করে মার্তণ্ডকে এবং অনুরূপ ভাবে তৃতীয় বারে বিবস্বানকে লাভ করেন। ঋকে (১০।৭২) অদিতি থেকে দক্ষ এবং দক্ষ থেকে অদিতি; অদিতির ৮ ছেলে, ৭ জনকে নিয়ে স্বর্গে যান এবং মার্তণ্ডকে জন্ম ও মৃত্যুর জন্য প্রসব করেন। রামায়ণে (৩।১৪।৪) ৩৩জন দেবতাদের জননী। (২) পুরাণে অদিতি দক্ষ প্রজাপতির মেয়ে, কশ্যপের স্ত্রী, দেবতাদের মা। এঁর ৩৩-টি ছেলে হয়—১২ জন আদিত্য, ১১ জন রুদ্র ও ৮ জন বসু; পরে বামন ইত্যাদি। ইন্দ্র এঁকে সমুদ্র লব্ধ কুণ্ডল দান করেন। পারিজাতের জন্য ইন্দ্র ও কৃষ্ণের বিবাদ ইনি মিটিয়ে দেন। এঁর বোন দিতি।

মহাভারতে (১।৫৯।১৪) ছেলে ধাতা মিত্র, অর্যমা, শক্র, বরুণ, অংশ, ভগ, বিবস্বান, পূষা, সবিতা, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু। বিষ্ণু কনিষ্ঠ কিন্তু গুণাধিক। মৈনাক কুক্ষিতে বিনশন তীর্থে পুত্রার্থে অন্ন প্রস্তুত করেন (মহা ৩।১৩।২৩, ৩।১৩৫।৩)। অদিতিকে রেবতী বলা হয়; এর গ্রহ রৈবত। এই রৈবত মহাগ্রহ হিসাবে শিশুদের বাধতে (মহা ৩।২১৯।২৮)।

অসুরদের শক্তি বাড়ছে দেখে নিজের ছেলেদের ডেকে অসুরদের ধ্বংস করতে বলেন। যুদ্ধে যাবার আগে ছেলেদের জন্য রান্না করলে বুধ এসে খেতে চান। কিন্তু নিজের ছেলেরা আগে খেয়ে নিক এই চেষ্টায় বুধকে একটু অপেক্ষা করতে বলেন। অন্য মতে খাবার শেষ হয়ে গেলে বুধ এসেছিলেন। বুধ এতে রেগে গিয়ে অভিশাপ দেন যে বিবস্বান অণ্ড হিসাবে তাঁর গর্ভে আসবেন এবং গর্ভ ধারণ করে অদিতি ভীষণ যন্ত্রণা পাবেন (মহা ১২।৩২৯।৪৪)। এই সন্তান মার্তণ্ড (দ্রঃ)। দ্রঃ- দিতি, মরুৎগণ, দেবকী। ষষ্ঠ মন্বন্তরে এই আদিত্যেরা তুষিত নামে পরিচিত। যজুর্বেদে অদিতি বিষ্ণু পত্নী।

অদিনজাই—সর্পৌষধি বিহার। বুনারে অদিনজই উপত্যকাতে। সোয়াৎ নদীর উত্তরে চকদার দুর্গের কাছে। হিউ-এন-ৎসাঙ উল্লিখিত।

অদৃশ্যন্তী—শক্তির স্ত্রী; পরাশরের (দ্রঃ) মা।

অদৃষ্টবাদ—পূর্ব পূর্ব জন্মে যে সব কাজ করা হয়েছে তার ফল ভোগ করা রূপ মতবাদ/দর্শন। ক্রমিক জন্ম অনুসারে এই ফল ভোগ করতে হবে। যেটুকু ফল ভোগ হয়ে যায় সেটুকুর হিসাব মিটে যায়। অর্থাৎ বর্তমান জন্মে যা ভোগ করা হচ্ছে সেটি পূর্ব-বর্তী এক বা বহু জন্মের বাকি পড়ে থাকা ধার মেটান। বর্তমানে যেটুকু ভোগ করতে হচ্ছে সেটুকু অদৃষ্ট বা দৈব। অন্য অর্থে ভাগ্য-দেবতা তাঁর বিচার অনুসারে কপালে যা লিখে দিয়ে যান সেই অনুসারে ফল ভোগ করা রূপ দর্শন। উন্নতির চেষ্টা না করে যা হবার হবে বলে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকার সমর্থনে যুক্তি।

অদৃষ্টভয়—পরীক্ষিৎ পুত্র জন্মেজয় ভাইদের সঙ্গে মিলে কুরুক্ষেত্রে দীর্ঘকাল যজ্ঞ করছিলেন। এই সময় দেবতাদের কুকুর সরমার পুত্র সেখানে এলে জন্মেজয়ের ভাই একে মেরে তাড়িয়ে দেন। সরমার ছেলে সেখানে গেলেও হবিঃর দিকে চেয়েও দেখেনি। অর্থাৎ বিনা কারণে পুত্র নিগৃহীত হয়েছে দেখে সরমা কুরুক্ষেত্রে এসে জন্মেজয়ের কাছে কেন মারা হয়েছে জানতে চান। কিন্তু সরমাকে কেউ উত্তর দেন না। সরমা তখন জন্মেজয়কে 'অদৃষ্টভয়' শাপ দেন। অথচ জন্মেজয় সরমার ছেলেকে মারেন নি। যজ্ঞের (সর্পযজ্ঞের) পর হস্তিনাপুরে ফিরে এসে এক দিন মৃগয়াতে গিয়ে শ্রুতশ্রবা (দ্রঃ) পুত্র সোমশ্রবাকে এই শাপ মুক্তির জন্য যজ্ঞ করতে বলেন ও নিয়ে আসেন এবং নিজে তক্ষশিলা জয় করতে বার হয়ে যান।

অদ্বয়—(১) দ্বয় শূন্য; অদ্বিতীয়। অদ্বয়ং ব্রহ্ম (বেদান্ত)। একমাত্র ঈশ্বর বা ব্রহ্ম এই মতবাদে স্বীকৃত। জীবাত্মা ও জগতের সঙ্গে ব্রহ্মের ঐক্য। সবই চিৎ-স্বরূপ, তার বেশি কিছু নাই। দ্রঃ-অদ্বৈতবাদ। (২) বুদ্ধ।

অদ্বয়বজ্র—খৃ: ১০-শতকে এক জন বাঙালী সিদ্ধাচার্য। অন্য নাম অবধূতী পা। উত্তর

বঙ্গে দেবী-কোট বিহারের সঙ্গে এঁর নাম জড়িত। রাজা মহীপাল, দীপংকর, নরো-পা ইত্যাদির সমসাময়িক। বজ্র-যানের বহু অমূল্য গ্রন্থের রচয়িতা। তিব্বতী ভাষাতেও কিছু বই অনুবাদ করেছিলেন। এর ২১টি রচনা অদ্বয়বজ্র নামে ছাপা হয়েছে।

অদ্বয়বাদ—ব্রহ্মবাদ। দ্রঃ-অদ্বয়, অদ্বৈতবাদ।

অদ্বয়বাদী—বুদ্ধ।

অদ্বৈত আচার্য—বা অদ্বৈত প্রভু। শ্রীহট্টে লাউড় গ্রামে, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। পরে শান্তিপুরে বসবাস। নবদ্বীপেও একটি বাড়ি ছিল। স্ত্রী শ্রী ও সীতা। সীতাদেবীর ৫/৬ ছেলে—অচ্যুত, কৃষ্ণদাস, গোপাল, বলরাম ও জগদীশ। চৈতন্যচরিতামৃতের কিছু পুঁথিতে এবং অদ্বৈত-বিলাস গ্রন্থে আর একটি ছেলে স্বরূপ। অচ্যুত ছেলেবেলা থেকেই চৈতন্যভক্ত।

অদ্বৈত প্রভু মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য। চৈতন্যের জন্মের আগেই ইনি ভক্তিতে ও পাণ্ডিত্যে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। গয়া থেকে নিমাই ভাবসম্পদা নিয়ে ফিরে এলে ভক্তেরা এঁকে স্বয়ং ভগবান বলে পূজা করতে থাকেন। প্রবীণ অদ্বৈতপ্রভু সর্বপ্রথম বৈদিক মন্ত্রে গৌরাঙ্গের চরণে তুলসী চন্দন দিয়ে প্রণাম করেন। পুরীতে রথযাত্রা উপলক্ষ্যে সমাগত জনতার মধ্যে শ্রীচৈতন্যের অবতারত্ব ঘোষণা করার উদ্দেশ্যে ভক্তদের দিয়ে স্বরচিত শ্রীচৈতন্য স্তব কীর্তন করান। ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্য শান্তিপুরে এলে বিদ্যাপতির পদ গান করে অদ্বৈতাচার্য্য তাঁকে অভ্যর্থনা করেন।

লোকাচারের অপেক্ষা ভক্তিকে অদ্বৈতাচার্য প্রাধান্য দিতেন। যবন হরিদাসকে তাই শ্রাদ্ধের অগ্রভাগ দিয়েছিলেন। আত্মমহিমা প্রচাব করতে চাইতেন না। এক দল ভক্ত শ্রীচৈতন্যের পরিবর্তে এঁকে অবতার বলে প্রচার করতে চেয়েছিলেন কিন্তু অদ্বৈতাচার্য এঁদের কোন উৎসাহ দেননি। নবদ্বীপে এঁর দারুময় মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে; ভক্তেরা শিবের অবতার জ্ঞানে পূজা করেন। শান্তিপুরের উড়িয়া গোস্বামী ব্যতীত প্রায় সকল গোস্বামীই অদ্বৈত প্রভুর সন্তান।

অদ্বৈতবাদ—জীবাত্মা ও ব্রহ্ম অভেদ এই মতবাদ। প্রাচীন ভারতের অন্যতম দার্শনিক মতবাদ। বৃহদারণ্যক ইত্যাদিতে এই মতবাদ রয়েছে। এই মতে একটি শাশ্বত মূলতত্ত্ব সমস্ত পাঞ্চভৌতিক জগৎ সৃষ্টি করে তাতে প্রবেশ করে তাকে সত্তার আভাস দিয়েছে। এই সমস্ত বস্তুতে অনুস্যূত তত্ত্বই ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মই বদ্ধ জীব রূপে জগৎ ভোগার্থে প্রকাশমান। অর্থাৎ একটি অখণ্ড আত্মচৈতন্যই ভোগের বিষয়ে ও অন্যান্য জীবরূপে কর্তা। অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মায়, জীব ও জগৎ এবং জগৎ ও পরমাত্মায় কোন ভেদ নাই। দ্বিত্ব কোথাও নাই; সবই অদ্বৈত। পরমার্থিক দৃষ্টিতে জীব ও জগতের উৎপত্তিও নাই ধ্বংসও নাই।

গৌড়পাদাচার্য এই মতকে উপজীব্য করে মাণ্ডূক্য উপনিষদের কারিকা রচনা করেন। এঁর প্রভাবে শঙ্করাচার্য অদ্বৈত তত্ত্বের কয়েকটি ভাষ্য লেখেন এবং সারা ভারতে এই মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর মতে ভ্রান্তিবশতঃ আত্মা বহুজীব ও

জগৎ বলে প্রতীয়মান। নিরুপাধিক শুদ্ধ আত্মা উপাধিবশতঃ কখনো ঈশ্বর, কখনো জীব, কখনো জড় বস্তু রূপে বিবর্তিত। জীবাত্মাকে এই জন্য নির্বিশেষে পরাসত্য ও শুদ্ধ-চৈতন্য স্বরূপ বলা হয়েছে। কর্ম, কর্মফল, কর্মের ভোগ ও সংসার বন্ধন সব মিথ্যা। অবিদ্যা থেকে এদের জন্ম। অবিদ্যা থেকে মুক্ত হওয়া মানে দ্বিত্বজ্ঞান দূর হওয়া। অবিদ্যা-বৃত জীব স্বরূপ জানে না বলে বার বার জন্মায়, কিন্তু অদ্বৈতজ্ঞান হলে তার আর পুনর্জন্ম হয় না। ঈশ্বর থেকে সামান্য তৃণ পর্যন্ত সব কিছুরই অস্তিত্ব ব্যবহারিক, পরমার্থিক নয়। এক মাত্র আত্মাই দ্বৈতহীন সত্য।

অদ্ভুত—(১) নবম-মন্বন্তরে মরীচি, গর্ভ ও সুধর্ম নামে তিন শ্রেণীর দেবতাদের অধিপতি। (২) (মহা ৩।২১২।-) সহ (দ্রঃ) নামে অগ্নির পুত্র। ইনি সর্বেশ্বর। জরায়ুজাদি প্রাণীর আত্মা; ভুবন ভর্তা, সর্বভূতের পতি; ভূপতি; মহৎ এর পতি। ইনি গৃহপতি অগ্নি রূপে যজ্ঞে নিত্য পূজিত এবং হুত হব্যকে বহন করেন। ইনি অপাং গর্ভঃ। এঁর ছেলে ভরত। অদ্ভুত অগ্নির স্ত্রী প্রিয়া (মহা ৩।২১২।১৫) এক ছেলে বিড়ূরথ।

অদ্ভুত রামায়ণ—বাল্মীকি রামায়ণের অর্বাচীন পরিশিষ্ট বা সংস্করণ। অন্য নাম অদ্ভুতোত্তর কাণ্ড। ভরদ্বাজ মুনির কাছে বাল্মীকির দ্বারা কথিত। অধ্যায় সংখ্যা ২৭, শ্লোক ১৩৫৯। এই বইতে সীতা রাবণের মেয়ে। সীতা এখানে মূল প্রকৃতি বা শক্তি। পুষ্কর দ্বীপে সহস্র স্কন্ধ রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে রাম মূর্ছিত হয়ে পড়লে প্রচণ্ড মূর্তি ধরে সীতা রাবণ বধ করেন। সীতার মহিমা, সহস্র নাম স্তোত্র, সাংখ্য-বেদান্ত সম্মত অধ্যাত্ম-জ্ঞান এবং অন্য বহু জিনিস এখানে আছে। কাশ্মীরে শাক্ত সমাজে এই বই বিশেষ সমাদৃত।

অদ্ভুতাচার্য—বাংলা অদ্ভুত রামায়ণের রচয়িতা। প্রকৃত নাম নিত্যানন্দ। ষোড়শ শতকের শেষ ভাগে পাবনা জেলায়। এক কালে উত্তর ও পূর্ব বঙ্গে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এই রামায়ণের বহু অংশ প্রচলিত রামায়ণে এসে হাজির হয়েছে মনে হয়।

অদ্রি—সূর্যবংশে এক রাজা।

অদ্রি—(১) সোমরস নিষ্কাশনার্থ পাথর। (২) যুবনাশ্বের পিতা।

অদ্রিকা—অপ্সরা এক জন। ব্রহ্মশাপে যমুনাতে মাছ হয়ে বাস করত। দ্রঃ-উপরিচর বসু।

অধঃশিরস—(১) হস্তিনাপুরে যাবার পথে এঁর সঙ্গে কৃষ্ণের দেখা হয়। (২) নরক বিশেষ।

অধরচাঁদ—যে চাঁদ সহজে ধরা যায় না। বাউলদের মতে আত্মরূপী আল্লাহ: অন্য নাম সহজ মানুষ, মনের মানুষ, অটল মানুষ, আলেক মানুষ, ভাবের মানুষ ইত্যাদি। এই মানুষ ব্যক্তির অন্তর-তম সত্তা। বাউলরা এঁকে ঈশ্বরও মনে করেন। এই অধরাকে ধরাই বাউলদের কাম্য।

অধর্ম—অগ্নিপুরাণে অধর্মের স্ত্রী হিংসা, সন্তান অনৃত ও নিকৃতি। এদের সন্তান ভয়,

নরক, মায়া ও বেদনা ইত্যাদি। মায়ার সন্তান মৃত্যু। বেদনা ও রৌরবের সন্তান দুঃখ ও শোক। মৃত্যুর সন্তান ব্যাধি, জরা, দুঃখ, তৃষ্ণা ও ক্রোধ। অন্যত্র অধর্মের স্ত্রী সম্পদ; সন্তান দর্প। মহাভারতে (১।৬০।৫২) প্রজারা পরস্পরকে পরিভক্ষণ করতে থাকে এই পরিভক্ষণাৎ অধর্মের জন্ম। অধর্মের স্ত্রী নির্ঋতি; তিনটি ছেলে ঃ—ভয়, মহাভয় ও মৃত্যু।

অধিদেব—অন্তর্যামী দেবতা। অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। সূর্যমণ্ডলবর্তী দেবতাদের অধিপতি।

অধিপতি—সমুদ্র/জলের অধিপতি বরুণঃ আদিত্যদের বিষ্ণু; বসুদের পাবক; মরুৎদের/দেবতাদের ইন্দ্র/বাসব; ঋষিদের বশিষ্ঠ; মানুষদের মনু; দৈত্যদের প্রহ্লাদ; পিতৃগণের যম; ভূত, পিশাচ, যক্ষ, রক্ষদের শিব; নদীদের সাগর; পাহাড়দের হিমালয়; গন্ধর্বদের চিত্ররথ; নাগদের বাসুকি; সাপদের তক্ষক; পাখীদের গরুড়; অর্থের কুবের, মৃগদের শার্দূল; ওষধি ও নক্ষত্রদের চন্দ্র; গ্রহদের সূর্য; রাজাদের বৈশ্রবণ; হাতীদের ঐরাবত; ঘোড়াদের উচ্চৈঃশ্রবা; গবাদি পশুর বৃষভ; এবং গাছেদের অধিপতি পিপ্পল। দ্রঃ-রাজা, পৃথু।

অধিবংশ্য—গণ্ডকী থেকে অধিবংশ্য নামে এক তপোবনে যাওয়া যায়। এখানে গেলে গুহ্যকেষু মোদতে (মহা ৩।৮২।৯৮)। এখান থেকে যেতে হয় কম্পনা নদীতে।

অধিবাস—চন্দন, তেল, হলুদ ইত্যাদি যোগে অঙ্গ সংস্কার। বিবাহ ইত্যাদি সংস্কার কাজে ও দুর্গাপূজা ইত্যাদি দেবপূজায় করণীয়। দেবপূজায় আগের দিন সন্ধ্যায় এবং বিবাহ ইত্যাদিতে ঐ দিন সকালে অনুষ্ঠিত হয়। বিবাহ ইত্যাদিতে মন্ত্রপূত চন্দন ইত্যাদি প্রথমে শালগ্রাম ও ভূমি স্পর্শ করিয়ে তারপর যার অধিবাস তার কপালে ও বিভিন্ন অঙ্গে মার্জনা (বাস্তবে স্পর্শ) করা হয়। বুক, মাথা, শিখা, দু চোখ, দুই কবচ, নাভি, হাতের ও পায়ের আঙ্গুল ক্রমান্বয়ে স্পর্শ করা হয়। অধিবাসের জিনিস ঃ—চন্দন তেল, হলুদ, মাটি, পাথর, ধান, দূর্বা, ফুল, ফল, দই, ঘি, আতপচাল, সিঁদুর, কাজল, গোরচনা (অভাবে হলুদ), সাদা সর্ষে, সোনা, রূপা, তামা, চাদর, দর্পণ, দীপ, গন্ধ, ক্ষেম, স্বস্তিক, শাঁখ, পূর্ণপাত্র, বরণডালা। বিয়েতে ছেলের অধিবাসের অবশিষ্ট চন্দন, তেল, হলুদ, কাজল, সিঁদুর মেয়ের অধিবাসের জন্য ব্যবহার হয়।

অধিভূত—পঞ্চভূতের ওপর যিনি। পরম পুরুষ।

অধিমাস—মলমাস।

অধিযজ্ঞ—যজ্ঞকে অধিকার করে যিনি স্থিত; কৃষ্ণ।

অধিরথ—কর্ণের পালক পিতা। বংশ—নহুষ-যযাতি-অনুদ্রুহ্যু-সদানর-কালনর-সৃঞ্জয়-তিতিক্ষা- কৃশংরথ- হোম- সুতপস্- বলি- অঙ্গ- দধিবাহন- দ্রবিরথ-ধর্মরথ-চিত্ররথ-সত্যরথ-রোমপাদ-চতুরঙ্গ-পৃথু-চম্প-হর্যঙ্গ-ভদ্ররথ-বৃহদ্রথ-বৃহন্মনস্- জয়দ্রথ- ধৃতব্রত- সত্যকর্মা- অধিরথ -কর্ণ। এঁরা ক্ষত্রিয়। অধিরথ সারথির কাজ করতেন। অন্য নাম সূত। স্ত্রী রাধা। সন্তান হীন। ধৃতরাষ্ট্রের সখা (মহা ৩।২৯৩।১)।

অধিরাজ্য—প্রাচীন ভারতে একটি রাজ্য। বর্তমানে রেওয়া।

অধিসীমকৃষ্ণ—অর্জুনের নিম্ন ৬ষ্ঠ পুরুষ।

অধোক্ষজ—অধঃ (স্থিত) অক্ষ (ইন্দ্রিয়-পা) জ ; এক কল্পে বিষ্ণু মহাদেবের পা থেকে জন্মান। বিষ্ণু।

অধোবায়ু—অপান বায়ু।

অধ্বর—বেদের শাখা বিশেষ।

অধ্বর—(১) যজ্ঞ। (২) অষ্ট বসুর দ্বিতীয় বসু।

অধ্বর্যু—যিনি অধ্বরের নেতা ; অর্থাৎ যজ্ঞ শেষ করেন (নিরুক্ত) : ঋত্বিক বিশেষ। যজুর্বেদ-বিৎ ; যজুর্বেদ বিধানে যজ্ঞ করতে সমর্থ। নারায়ণের মুখ থেকে এ'র উৎপত্তি। যজ্ঞ ভূমির পরিমাণ, বেদি নির্মাণ, যজ্ঞপাত্র নির্মাণ, জলকাষ্ঠ আনয়ন, অগ্নি প্রজ্বালন, পশু আনয়ন, ও বলিদান এ'দের কাজ। ঋত্বিক চার জনের মধ্যে যজমান যাঁকে আগে বরণ করেন এবং আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত যিনি কাজ করেন।

অধ্যবহার—জাতকে বর্ণিত আনন্দ, তিমিন্দ্র ও অধ্যবহার তিনটি মাছ। প্রত্যেকের দেহ পঞ্চ-শত যোজন প্রমাণ।

অধ্যাত্ম—আত্মাকে অধিকার করে যে অবস্থিত। আত্মা/পরমাত্মা/চিত্ত বিষয়ক। পর ব্রহ্ম।

অধ্যাত্ম তত্ত্ব—ব্রহ্ম বা ঈশ্বর জিজ্ঞাসা।

অধ্যাত্ম রামায়ণ—রাম চরিত্রের আধ্যাত্মিক বর্ণনা। ব্যাস রচিত মহাকাব্য। ১৪-১৫ শতাব্দীর রচনা মনে হয়। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের অন্তর্গত বলা হয়। হরপার্বতীর কথোপ-কথন আকারে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ। রামের কাহিনী প্রসঙ্গে রামভক্তির মাহাত্ম্য। কর্মকাণ্ড, ভক্তিযোগ, ধর্ম ও রাজনীতি ইত্যাদি নানা বিষয় বিশেষ ভাবে আলোচিত হয়েছে। পরমাত্মা ও রামের একাত্মা প্রতিপাদন করা হয়েছে। রামহৃদয় ও রামগীতা অংশ দুটি রাম ভক্তদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

অধ্যাস—সর্পতে রজ্জু জ্ঞান রূপ ভ্রান্তি।

অনংশা—নন্দ ও যশোদার মেয়ে। কৃষ্ণ এ'কে শ্রদ্ধা করতেন ও প্রয়োজন মত এ'র পরামর্শ নিতেন। দ্রঃ একানংশা

অনগ্নি—পিতৃগণ (দ্রঃ)।

অনগণ্ডি—দ্রঃ-কোঙ্কনপুর। অনগণ্ড পর্বত। দ্রঃ-স্ফটিকশিলা।

অনঘ—অলঘু। বশিষ্ঠের ছেলে ; ঊর্জার গর্ভে জন্ম। (অগ্নি-পুরা)।

অনঙ্গ—(১) মদন। (২) কর্দম প্রজাপতির ছেলে ; এক জন প্রজা বৎসল রাজা। (৩) একটি নদী।

অনঙ্গবজ্র—সিদ্ধাচার্য (দ্রঃ)।

অনধ্যায়—আনুষ্ঠানিক ভাবে অধ্যয়ন না করা বা ছুটি। নানা কারণে শাস্ত্রে এই বিরতির নির্দেশ ছিল। টোলে এখনও অনেকগুলি অনধ্যায় মানা হয়। অনধ্যায় অর্থে বেদপাঠ না করা কিন্তু শাস্ত্রপাঠও বন্ধ রাখা হয়। সাধারণত প্রতিপদ, অষ্টমী, চতুর্দশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যাতে অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। ত্রয়োদশী রাত্রিতেও ব্যাকরণ পাঠ নিষিদ্ধ। কোন কারণে মন চঞ্চল থাকলে বা ঝড়, বৃষ্টি, মেঘ ডাকা, বজ্রপাত, উল্কাপাত, ভূমিকম্প,

গ্রহণ, ধূলিবর্ষণ, অগ্নিকাণ্ড, আশেপাশে যুদ্ধাস্ত্রের শব্দ হলেও অধ্যয়ন নিষিদ্ধ ছিল। কান্না, গানবাজনা, শিয়াল, কুকুর. উট, গাধা ইত্যাদির বিকট ডাক কাণে এলে অনধ্যায় ব্যবস্থা ছিল। বহু লোক একত্র জমা হলে বা গুরুগৃহে বিশিষ্ট ব্যক্তি এলে, রাজার ছেলে হলে বা গ্রামে কেউ মারা গেলে মৃতের সংকার না হওয়া পর্যন্ত বা পাঠক অশুচি থাকলে কি কোন কাজে ব্যস্ত থাকলে ও শ্মশান সমীপে অনধ্যায়ের নির্দেশ ছিল। পাঠের সময় গুরু ও শিষ্যের মাঝখান দিয়ে কোন জন্তু চলে গেলেও অধ্যয়ন বন্ধ রাখা হত।

অনন্ত—শেষ নাগ, বাসুকি (দ্রঃ), গোনস। এক জন প্রজাপতি। নাগেদের মধ্যে প্রধান। বিষ্ণুর তামসিক রূপ। কদ্রু কশ্যপ সন্তান। স্ত্রী তুষ্টি। ভাইদের অসৎ ব্যবহারে তাদের ত্যাগ করে অন্য মতে জন্মেজয়ের সর্প যজ্ঞে মৃত্যু হবে কদ্রু (দ্রঃ) শাপ দিলে অনন্ত ইত্যাদি কিছু সাপ গন্ধমাদন, বদরিকাশ্রম ইত্যাদি স্থানে এসে তপস্যা করতে থাকেন। সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা বর দেন এবং পাতালে/রসাতলে গিয়ে পৃথিবীকে মাথায় ধারণ করে রাখতে বলেন ; যাতে পৃথিবী বিচলিত না হয় ; এই কাজে গরুড় অনন্তকে সাহায্য করবেন এবং গরুড় এ'র সখা। পশ্চিমে বরুণালয়েও অনন্তের একটি আবাস রয়েছে। এ'র সহস্র ফণা ; ফণাতে সহস্র মণি জ্বলছে। অসুরদের শক্তিহীন করে রেখেছেন। প্রলয়ের সময় এ'র মুখ থেকে রুদ্র বার হয়ে ত্রিভুবন ধ্বংস করেন। অনন্ত হাই তুললে পৃথিবী কেঁপে ওঠে, ভূমিকম্প হয়। অনন্তের কৃপায় গর্গ জ্যোতির্বিদ্যা, নিমিত্ত-বিদ্যা ইত্যাদি লাভ করেছিলেন। দেবতারাও এ'কে পূজা করেন। কালিকা পুরাণ মতে প্রলয় শেষে নারায়ণ অনন্তের মধ্যম ফণাতে শয়ন করেন। সঙ্গে লক্ষ্মী থাকেন। ছয়টি ফণা বিষ্ণুকে ছাতার মত আচ্ছাদন করে রাখে। দক্ষিণ ফণা বিষ্ণুর উপাধান, উত্তর পাদপীঠ। বিষ্ণু পুরাণে বলরাম (দ্রঃ) এ'র অবতার। মহাভারতে (১।১২।২৪) ইনি শেষ নাগ।

অনন্তনাগ—ইসলামাবাদ। ঝিলমের দ-তীরে। কাশ্মীরের প্রাচীন রাজধানী।

অনন্তজিৎ—১৪-শ জৈন মুনি।

অনন্ত নাথ—১৪-শ জৈন তীর্থঙ্কর। পিতা সিংহসেন, মা সুযশ। কোশলের রাজা। গর্ভকালে সুযশ স্বপ্নে একটি অনন্ত মুক্তার মালা দেখেছিলেন ; ফলে এই নাম। অনন্তনাথ অশ্বত্থ গাছের নীচে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। এ'র চিহ্ন সজারু ; নির্বাণ সুমেরু শিখরে।

অনন্তপদ্মনাভ—অনন্তপুর, অনন্তশয়নম্, পদ্মনাভপুর। ত্রিবেন্দ্রামে ; ত্রিবাঙ্কুরের রাজধানী। এখানে পদ্মনাভের বিখ্যাত মন্দিরে বিগ্রহ বিষ্ণু ; অনন্তের কোলে শায়িত।

অনন্তপুর—পঞ্চতীর্থ, ফাল্গুন। পঞ্চাপ্সরতীর্থ (দ্রঃ)। (২) অনন্তপদ্মনাভ (দ্রঃ)।

অনন্তবিজয়—যুধিষ্ঠিরের শঙ্খ।

অনন্তবীর্য—ভাবী কল্পে ২৩-শ জৈনাচার্য।

অনন্ত শীর্ষা—বাসুকি পত্নী।

অনন্তা—পুরুর ছেলে জন্মেজয়ের স্ত্রী।

অনবদ্যা—কশ্যপের স্ত্রী। অপ্সরা।

অনরক—(মহা ৩।৮১।১৪৬) স্বর্গদ্বার তীর্থ থেকে অনরক তীর্থে আসতে হয়। এখানে স্নান করলে দুর্গতি মুক্তি। এখানে নারায়ণ, অন্য দেবতারা ও ব্রহ্মা থাকেন। এখানে রুদ্রপত্নীর সান্নিধ্যে এলে দুর্গতি মুক্তি। উমাপতির সান্নিধ্যে সমস্ত পাপ ক্ষয় এবং নারায়ণের সান্নিধ্যে এলে বিষ্ণু লোক প্রাপ্তি হয়ে থাকে।

অনরণ্য—অনারণ্য। সূর্যবংশে সম্ভূতের/ত্রসদস্যুর ছেলে, অযোধ্যার রাজা। নিরামিষাশী। রাবণের দিগ্বিজয় কালে বাধা দিলে যুদ্ধ হয়। আহত ও রথভ্রষ্ট হয়ে মারা যান ; হার স্বীকার করেন না ; ভবিষ্যৎ বাণী করে যান ইক্ষ্বাকু বংশে দশরথ ও রাম জন্মাবেন এবং রাবণ ধ্বংস হবেন (রা ৭।১৯।-)।

অনল—ষষ্ঠ বসু (দ্রঃ)।

অনলা—(১) দক্ষের একটি মেয়ে ; এঁর সন্তান গাছ লতা পাতা ইত্যাদি; (রা ৩।১৪।৩০ পুণ্যফল বৃক্ষ)। অপর নাম বীরুধা ; এই জন্য বীরুৎ অর্থে গাছ। অনলা করঞ্জ গাছে বাস করেন। অনলার আশীর্বাদ পেতে হলে করঞ্জ গাছকে পূজা করতে হয়। (২) অন্য মতে দক্ষের মেয়ে ক্রোধবশা ; ক্রোধবশার বংশ—ক্রোধবশা—শ্বেতা—সুরভি—রোহিণী—অনলা। মহাভারতে (১।৬০।৬৬) অনলার সন্তান পিণ্ডফল দাতা সপ্তবৃক্ষ এবং আর এক কন্যা শুকী। (৩) মাল্যবানের ঔরসে সুন্দরীর মেয়ে ; বিশ্বাবসুর স্ত্রী, মেয়ে হয় কুম্ভীনসী। (৪) বিভীষণের মেয়ে।

অনশন ব্রত—উপবাস রূপ ব্রত। অনশন তিন রকম—স্বল্প, অর্ধ ও পূর্ণ অনশন। পূর্ণ অনশনে নিরম্বু উপবাস। অতি প্রাচীন ধর্মীয় ব্যবস্থা। সামাজিক-সংস্কার ও স্বাস্থ্যের জন্যও অনুমোদিত। প্রায়শ্চিত্ত ও কামনা পূরণের জন্য অনশন করে হত্যা দেওয়াও সুপ্রাচীন। শুদ্ধিকরণ, শোকানুষ্ঠান, সমবেদনা জ্ঞাপন, দীক্ষা, যাদু মন্ত্র ও বিশেষ শক্তি লাভের জন্য এবং সন্ন্যাসী জীবনে অনশন ব্যবস্থা আছে। অর্থ আদায়ের জন্যও অধমর্ণের বাড়িতে গিয়ে অনশন মনুতে রয়েছে। জৈনদের প্রায় প্রতি ধর্মকার্যের অঙ্গ। বৌদ্ধদের মধ্যেও অনশন স্বীকৃত।

অনশনে মৃত্যু বরণ ভারতীয় ধর্ম বিধানে রয়েছে। জৈনদের আমৃত্যু অনশন তিন রকম—ভক্তপ্রত্যাখান, ইঙ্গিনী ও পাদোপগমন। ভক্তপ্রত্যাখানে জলপান ও চলাফেরা নিষিদ্ধ নয়। ইঙ্গিনীতে নিরম্বু উপবাস তবে নির্দিষ্ট স্থানে চলা ফেরা অনুমোদিত। পাদোপগমনে নিশ্চল নিরম্বু উপবাস। মৃত্যু সঙ্কল্প করে ১, ২, ৩, ৭, ৯ দিন বা এক মাস অনশনের বিধান আছে। গরুড় পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ গরুড়কে বলেছেন অনশনে মারা গেলে বিষ্ণু তুল্য হয় এবং যত দিন অনশন করে জীবিত থাকে প্রতি দিনের জন্য স-দক্ষিণ যজ্ঞের ফল সঞ্চয় হয়। অগ্নি, মৎস্য পুরাণে, আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, অত্রি, বশিষ্ঠ, বিষ্ণু সংহিতা ইত্যাদিতে অনশন ব্রতের বিধান আছে।

অনস—অসঙ্গ। অক্রূরের ভাই। (ভাগ ১০।-)।

অনসূয়া—মহর্ষি অত্রির (দ্রঃ) স্ত্রী। দক্ষ ও প্রসূতির মেয়ে। অন্য মতে

কর্দম দেবহুতির দুই মেয়ে কলা ও অনুসূয়া। সম্পূর্ণ অসূয়াহীন। এক দিন এঁ'র সতীত্ব পরীক্ষা করার জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও মহেশ্বর ব্রাহ্মণ বেশে অতিথি হয়ে এসে দাবি করেন ছেলের মত তাঁদের যত্ন করতে হবে ; নইলে তাঁরা চলে যাবেন। ইনি তখন এঁ'দের গায়ে স্বামীর পাদোদক ছিটিয়ে দিয়ে তাঁদের শিশুতে পরিণত করে স্তন পান করতে দেন। অনুসূয়ার এই অপূর্ব মহিমায় এঁ'রা মুগ্ধ হয়ে বর দিতে চান এবং ইনি এই তিন জনকেই পুত্ররূপে বর চান। ফলে ব্রহ্মার অংশে সোম, বিষ্ণুর অংশে দত্তাত্রেয় ও মহেশ্বরের অংশে দুর্বাসা জন্মান। এক বার উগ্রশ্রবার (দ্রঃ) কারণে সূর্য না ওঠাতে দেবতারা অনসূয়ার কাছে প্রতিকারের জন্য আসেন। সূর্যের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবার জন্য উগ্রশ্রবার স্ত্রীকে অনসূয়া অনুরোধ করেন। ফলে সূর্য উঠলে উগ্রশ্রবা মারা যান কিন্তু অনসূয়া আবার বাঁচিয়ে দেন। দেবতারা সন্তুষ্ট হয়ে বর দিতে চাইলে একটি মতে অনসূয়া এই সময়ে ত্রিমূর্তিকে পুত্ররূপে বর চেয়েছিলেন। দ্রঃ- দত্তাত্রেয়। রাম চিত্রকূট ত্যাগ করে (রা ২।১১৭।) অত্রি আশ্রমে এলে অত্রি স্ত্রীর পরিচয় দিয়ে বলেন একবার দশ বছর বৃষ্টি হয়নি ; অনসূয়া ফলমূল সৃষ্টি এবং জাহ্নবীকে প্রবাহিতা করেন। আর একবার দশবর্ষ সহস্রাণি তপস্যা করে ঋষিদের বাধা বিপত্তি দূর করেন। আর একবার দেবকার্যের জন্য দশরাত্রং কৃতা রাত্রিঃ। অনসূয়া সীতাকে আদরে অভ্যর্থনা করেন ; এবং দিব্যমাল্য, বস্ত্র, আভরণ ও অঙ্গরাগ দেন ; এগুলি চির অম্লান এবং বহু উপদেশ দেন। এর পর অতি বৃদ্ধা বেপমানাঙ্গী মুনিপত্নী অপরিচিতা ও তুলনায় বালিকা সীতার কাছে সীতার স্বয়ংবর কাহিনী শুনতে চান—অপরূপ সুন্দর কবিতা ; এবং তারপর ঐ আভরণগুলি পরতে বলেন ; নতুন সাজে বালিকাকে দেখতে চান। দ্রঃ- অত্রি। (১) কণ্ব মুনির আশ্রমে শকুন্তলার প্রধান সখী।

অনহিল পত্তন—অনহিলপুর, বিরলপত্তন। গুজরাটের প্রধান সহর। বেরাভাল-পত্তন্।

অনাত্মবাদ—নৈরাত্মবাদ। একটি মতবাদ। আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করা। সাধারণ অর্থে ও ভারতীয় ন্যায় শাস্ত্রে আত্মা ও দেহ দুটি বিভিন্ন জিনিস মিলে জীব। বর্তমানে শরীর বিজ্ঞানে আত্মার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অহং, জ্ঞান, বিবেক ইত্যাদির বিজ্ঞান ভিত্তিক যে পরিচয় পাওয়া গেছে তাতেও আত্মার কল্পনা উৎসাদিত হয়েছে। চার্বাক মতে দেহই বা দেহের গুণ ; অতিরিক্ত কিছু নয় এবং আত্মার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। বৌদ্ধরা আত্মা বলে কোন দ্রব্য মানেন না ; দ্রব্য বলে কোন জিনিসই বৌদ্ধ দর্শনে নাই। নৈয়ায়িকরা আত্মাকে স্থায়ী ও অবিনশ্বর ইত্যাদি যে সব গুণ দিয়েছেন বৌদ্ধরা এ সব স্বীকার করেন না। বৌদ্ধমতে রূপ (দেহের মৌলিক উপাদান), বিজ্ঞান (অহং বোধ), বেদনা (সুখদুঃখ অনুভূতি), সংজ্ঞা (প্রত্যক্ষ) এবং সংস্কার (প্রবণতা) এই পাঁচটি স্কন্ধের (জিনিসের) সংঘাত (সমষ্টি) হচ্ছে একটি জীবের একটি বিশেষ ক্ষণের সত্তা। এই সত্তাকে আত্মা বলা যেতে পারে না। কারণ মিলিত সত্তা প্রতি মুহূর্তে বদলাচ্ছে এবং এক দিন এই সত্তা শেষ হয়ে যায়। বৌদ্ধদের এই মত ক্ষণিকবাদ।

অবশ্য বৌদ্ধমতের মধ্যে কিছুটা অসামঞ্জস্য আছে। বৌদ্ধরা জন্মান্তর, কর্মফল ইত্যাদি মানেন অথচ আত্মা না থাকলে কার জন্মান্তর হয়। আত্মা সম্বন্ধে বুদ্ধদেব নীরব ছিলেন।

অনাথপিণ্ডদ—নাম সুদত্ত। বাসস্থান শ্রাবস্তী। শ্রাবস্তীর জেতবন এ'র অর্থে নির্মিত। দানশীলতার জন্য নাম অনাথপিণ্ডদ, অনাথপিণ্ড বা অনাথপিণ্ডিক। এ'র তর্ক করার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। বুদ্ধত্ব লাভের প্রথম বছরেই রাজগৃহে বুদ্ধের সঙ্গে দেখা হয় এবং তাঁর বাণী শুনে স্রোতাপন্ন হন। কোশল রাজকুমারের উদ্যানভূমি আঠার কোটি মুদ্রায় কিনে নিয়ে সমান অর্থে এখানে একটি বিহার তৈরি করে দিয়ে আর একদফা আঠার কোটি মুদ্রা সমেত বিহারটি বুদ্ধ ও সংঘকে দান করেন। সব সমেত ১৮×৩ কোটি মুদ্রা খরচ হয়। বুদ্ধ ও সংঘের জন্য সব সময় অকুণ্ঠিত দান করতেন। দিনে দুবার তথাগতকে দেখতে যেতেন কিন্তু তথাগতকে পরিশ্রান্ত করে তোলার ভয়ে কোন প্রশ্ন করতেন না। পাঁচশ অতিথি ও এক শত ভিক্ষুককে তিনি রোজ খেতে দিতেন। এই অপরিমিত দানের জন্য শেষ বয়সে দরিদ্র হয়ে পড়েছিলেন। এ'র পুত্রবধূ সুজাতা ছিলেন শ্রেষ্ঠী ধনঞ্জয়ের মেয়ে ও বিশাখার ছোট বোন।

অনাধৃষ্টি—রৌদ্রাশ্বের ঔরসে অপ্সরা মিশ্রকেশীর গর্ভে জন্ম। অপর নাম ঋচেয়ু/ অম্বগভানু (দ্রঃ)। আরো কয়েক জন অনাধৃষ্টি রয়েছে।

অনার্য—ভারতে যাঁরা বেদ রচনা করেছিলেন অর্থাৎ বর্তমানের উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা নিজেদের আর্য বলে দাবি করেন; বাকি সকলকে অনার্য বলা হয়। এই অনার্যরা ভারতের নিজস্ব লোক; আদিবাসী। অনেকের মতে আর্যরা ভারতে এসে এ'দের দমন করে নিজেদের উপনিবেশ গড়েছিলেন।

সিন্ধু নদের উপত্যকায় এক বা একাধিক অনার্য জাতির বাস ছিল। এ'রা লোহা ছাড়া অন্যান্য ধাতুর ব্যবহার জানতেন এবং উচ্চতর সভ্যতার অধিকারী ছিলেন। দ্রাবিড় জাতির পূর্বপুরুষরাও অনার্য নামে অভিহিত; এ'দের সভ্যতা ও সংস্কৃতি খুব উন্নত ছিল। আর্যরা এ'দের সকলকে পরাজিত করেন। অনেকে দাস রূপে আর্য সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে শূদ্র নামে পরিচিত হন এবং বহু অনার্য জাতি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বনে পাহাড়ে আত্মগোপন করেন। এ'দের বংশধররা আজ বনে বাস করছেন। বৈদিক সাহিত্যে এ'দের অনার্য, নিষাদ, দস্যু ইত্যাদি বলা হয়েছে। অনার্যদের কালো কুৎসিত চেহারা, অবোধ্য ভাষা ও ধর্মহীনতার বহু উল্লেখ এবং এদের অমিত সাহস ও শক্তিমত্তার কথাও বেদ ইত্যাদিতে আছে।

বর্তমানের কোল, ভীল, সাঁওতাল, মুণ্ডা, শবর, পুলিন্দ, কিরাত, খাসিয়া, ভুটিয়া, নাগা ইত্যাদি বহু জাতি ভারতের সেই আদিবাসী; প্রকৃত ভারতীয় বা অনার্য। এদের ভাষা ভারতীয় ভাষা থেকে ভিন্ন; ইন্দো-ইউরোপীয়ান গোষ্ঠীর ভাষাও নয়। নৃতত্ত্ব অনুসারেও এ'রা আলাদা উপজাতি। তামিল, তেলেগু, কানাড়ি, মালয়ালম ইত্যাদি ভাষাও ইন্দো-ইউরোপীয়ান গোষ্ঠীর ভাষা নয়। বর্তমানে এই অনার্যদের

জীবন যাত্রায় ও ভাষায় আর্যদের সঙ্গে বহু আদান প্রদান ঘটেছে। অনার্য ভাষা অর্থে দক্ষিণ ও মধ্য ভারতীয় দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা, উত্তর ও মধ্য ভারতীয় অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষা এবং হিমালয়ের পাদদেশে ভোটচীনীয় গোষ্ঠীর ভাষা। ভাষা বিজ্ঞানের আর একটি মতে এক মাত্র অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষা অনার্য ভাষা : এবং এই গোষ্ঠীতেই সাঁওতাল মুণ্ডারি, খাসি ইত্যাদি পড়ে।

অনায়ুস্—বা দনায়ু। চার ছেলে বিক্ষর, বল, বীর ও বৃত (মহা ১।৫৯।৩২)।

অনাহত—ষটচক্রের একটি। হৃদয়স্থ আদিত্য সন্নিভ ১২-টি দল যুক্ত পদ্ম। এই পদ্মে অযুত সূর্য সমপ্রভ শুদ্ধ ব্রহ্ম অবস্থিত।

অনিকেত—(১) কুবের অনুচর এক জন যক্ষ। (২) অঙ্গ বংশে জন্ম এক রাজা (অগ্নি পুরা)।

অনিমিষ—গরুড়ের এক ছেলে।

অনিরুদ্ধ—শিনি - ভোজ - হৃদিক -শূরসেন - বাসুদেব - কৃষ্ণ - প্রদ্যুম্ন - অনিরুদ্ধ। অর্থাৎ কৃষ্ণের পৌত্র। মা রুক্মবতী ; অত্যন্ত সুন্দর দেখতে এই অনিরুদ্ধ। রথ ঋষ্য ধ্বজ। অর্জুনের কাছে ধনুর্বেদ শিক্ষা। বলির একশ ছেলের মধ্যে প্রধান বাণ, এই বাণের মেয়ে ঊষা (দ্রঃ) স্বপ্নে অনিরুদ্ধকে দেখে পতিত্বে বরণ করেন। দ্বারকা থেকে এঁকে আনবার জন্য সখী চিত্রলেখাকে পাঠান। নারদের পরামর্শ মত দ্বারকার অন্তঃপুরে প্রবেশ করে নারদ প্রদত্ত তামসী বিদ্যায় সকলকে মোহাচ্ছন্ন করে অনিরুদ্ধকে নিয়ে চলে আসেন। বাণের রাজধানী শোণিতপুরে গোপনে গন্ধর্ব মতে বিয়ে হয়। ঘটনা জানতে পেরে বাণ সসৈন্যে অন্তঃপুরে যান ; সৈন্যরা কিন্তু পরাজিত হয়। বাণ তখন নাগপাশে অনিরুদ্ধকে বন্দী করেন।

অনিরুদ্ধের অন্তর্ধানে দ্বারকাতে সকলেই চিন্তিত হয়ে পড়ল ; এমন সময় নারদ এই খবর কৃষ্ণ, প্রদ্যুম্ন ও বলরামকে জানালে এঁরা এসে বাণকে পরাজিত করেন। বাণ তখন এই বিয়ে স্বীকার করে নেন। কৃষ্ণ ইত্যাদি সকলে গরুড়ে চড়ে দ্বারকাতে ফিরে আসেন। হরিবংশে বাণ পরাজিত হলে চিত্রলেখা কৃষ্ণ ইত্যাদিকে অন্তঃপুরে নিয়ে আসেন ; গরুড়কে দেখে নাগেরা পালায়। কৃষ্ণ কুম্ভাণ্ডকে শোণিত পুরে রাজা করে দেন। ঊষা ও অনিরুদ্ধের আবার বিয়ে হয়; অগ্নিদেব নিজে এসে বিয়ে দেন। অনিরুদ্ধের দ্বিতীয় স্ত্রী রোচনা ; মহাবীর বজ্রের জননী। বৃষ্ণি বংশে আর এক জন অনিরুদ্ধ ছিলেন ; দুই অনিরুদ্ধই দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে যোগদান করেছিলেন। যদু বংশ ধ্বংসের সময় প্রথম অনিরুদ্ধ মারা যান। ইনি বাসুদেবের চতুর্ব্যূহের (দ্রঃ- ব্যূহ) এক জন। অনিরুদ্ধকে বিষ্ণু ও ব্রহ্মা রূপেও কল্পনা করা হয়। অনিরুদ্ধ যখন বিষ্ণুমূর্তি ধারণ করেছিলেন তখন নাভিপদ্ম থেকে ব্রহ্মা জন্মান। দ্রঃ-ঊষা।

অনিল—(১) অষ্ট বসুর এক জন ; পিতা ধর্ম, মাতা শ্বসা। অনিলের স্ত্রী শিবা ; দুই ছেলে মনোজব ও অবিজ্ঞাত গতি। (২) গরুড়ের ছেলে। (৩) ঊনপঞ্চাশ বায়ুর মধ্যে শেষ বায়ু। (৪) স্বাতি নক্ষত্র। (৫) তন্ত্রে বায়ু বীজ 'য'। (৬) বৃষাদর্ভি তাঁর ছেলে অনিলকে দক্ষিণা হিসাবে সপ্তর্ষিদের (দ্রঃ) দান করেছিলেন।

অনীকবিদারণ—জয়দ্রথের ভাই। সিন্ধু রাজ্যের রাজা। অর্জুনের হাতে মারা যান।

অনীকিনী—চতুরঙ্গ সেনার পরিমাণ। অক্ষৌহিণীর (দ্রঃ) দশম ভাগ। ২১৮৭ হাতী, ২১৮৭ রথ, ২১৮৭×৩ অশ্ব, ২১৮৭×৫ পদাতি, মোট ২১৮৭০টি।

অনীচিদর্শী—জনৈক বুদ্ধ।

অনু—অনুদ্রুহ্যু। শর্মিষ্ঠার গর্ভে যযাতির (দ্রঃ) ছেলে। যযাতির জরা নিতে রাজি না হবার জন্য অনু শাপান্বিত হন ও তাঁর সন্তান যৌবন লাভেই মারা যায়। অনু অগ্নি-হোত্রাদি ক্রিয়াহীন হন।

অনুগ্রহমূর্তি—শিবের দুটি অনুগ্রহমূর্তি—(১) রাবণানুগ্রহ মূর্তি ও (২) চণ্ডেশানুগ্রহ মূর্তি। দুটিই এক মাত্র দক্ষিণ ভারতে পাওয়া যায়। সাধারণত চোল এলাকাতে। তবে প্রথমটি কদাচিৎ উত্তর ভারতে। রাবণানুগ্রহ মূর্তিতে রাবণ (দ্রঃ) কৈলাস পাহাড় তুলতে চেষ্টা করছেন। এলোরা ও চোল এলাকার দুটি ছবিই অপূর্ব সুন্দর। চণ্ডে-শানুগ্রহ মূর্তিটি গঙ্গাই-কোণ্ডাকোলাপুরমে প্রাপ্ত। শিব-ভক্ত বিচারশর্মা ইষ্টদেবতার পূজা করছেন এমন সময় শিব নিজে বিচারশর্মার পিতা যজ্ঞদত্ত রূপে এসে বাধা দেন। ফলে বিচারশর্মা পিতাকে ভীষণ ভাবে প্রহার করলে শিব তখন আত্মপ্রকাশ করেন এবং বিচারশর্মার এই ভক্তির জন্য চণ্ডেশ নাম দেন এবং এক জন গণাধিপতি করে দেন। এই মূর্তিতে শিবের চার হাত, সঙ্গে পার্বতী, চণ্ডেশের মাথায় শিব নিজে মালা পরিয়ে দিচ্ছেন। শিবের উদ্‌গ্রীব ভালবাসা ও ভক্তের পরিপূর্ণ আত্ম-নিবেদন শিল্পীর হাতে অপূর্ব রূপ নিয়েছে। খৃ ১১ শতকের প্রথম চতুর্থাংশে।

অনুদাত্ত—বেদগানে নীচু সুর।

অনুপমা—কুমুদ নামে দিক হস্তীর স্ত্রী (অমর)। সুপ্রতীক দিক হস্তীর স্ত্রী (মেদিনী)। অগ্নি বা নৈঋত কোণের হস্তিনী।

অনুপম্যা—বাণাসুরের স্ত্রী। এক বার নারদের সঙ্গে ভীষণ মন দেওয়া নেওয়া ঘটে।

অনুবন্ধ—বেদান্ত দর্শনের মতে শাস্ত্র অধ্যয়ন কার্যে অধিকারী, বিষয় ইত্যাদি চারটি অপরিহার্য গুণ।

অনুবাক—শস্ত্র নামক বেদাংশ। গান শূন্য ঋক্ বিশেষ। বেদের একটি বিভাগ।

অনুবিন্দ—(১) ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। পাণ্ডবদের বনবাসের সময় চিত্রসেনের হাতে অন্যান্য কৌরবদের সঙ্গে ইনিও বন্দী হন। কুরুক্ষেত্রে ভীমের হাতে নিহত। (২) অবন্তির রাজা। কৃষ্ণের পিসী রাজাধিদেবীর ছেলে অনুবিন্দ, বিন্দ এবং মেয়ে মিত্রবিন্দা (কৃষ্ণের স্ত্রী)। অনুবিন্দ কৌরব পক্ষে ছিলেন।

অনুভব—আট প্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, উপমান, অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি, সম্ভব, ঐতিহ্য। এগুলির মধ্যে ক্রমান্বয়ে চার্বাক একটি, কণাদ ও বৌদ্ধ দুটি, সাংখ্যপাতঞ্জল তিনটি, নৈয়ায়িক চারটি, প্রভাকর পাঁচটি, বেদান্তী মীমাংসক ছয়টি, পৌরাণিকরা আটটি অনুভব স্বীকার করেন।

অনুভাগবত—কল্কিপুরাণ।

অনুমকুণ্ডপুর—তেলেঙ্গানার প্রাচীন রাজধানী ওয়ারাঙ্গল=কোরুনকোলা (টলেমি) =অক্কালিনগর=য়েক্কিলনগর=বেণাকটক।

অনুমতি—পূর্ণিমার অব্যবহিত আগের চন্দ্র। দ্রঃ-অঙ্গিরস।

অনুমতিকল্প—দ্রঃ-দশ বর্দ্ধনি।

অনুমিতি—অনুমান। ধূম থেকে পর্বত বহ্নিমান এই অনুভব (দ্রঃ)।

অনুমরণ—স্বামীর মৃত্যুতে মৃতদেহ না পেলে স্বামীর পাদুকাদি নিয়ে চিতায় ক্ষত্রিয়াদি বর্ণের দেহত্যাগ।

অনুযায়ী—অগ্রযায়ী। ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। কুরুক্ষেত্রে ভীমের হাতে নিহত।

অনুরাধা—১১-শ নক্ষত্র। ডেল্টা স্কোর্পি। অধিদেবতা মিত্র। সর্পাকৃতি ৭-টি তারা (কালি); বলিনিভ-৪-টি (দীপিকা টিকা)। বিশাখা নক্ষত্রের অন্তর্গত ১৭-শ তারা। যাত্রা সিদ্ধ হয়।

অনুরাধপুর—অনুরাধাপুর। সিংহলে ১৫-শত বছরের প্রাচীন রাজধানী। খৃ-পূ ৪-শতকে রাজা পাণ্ডুকাভয় এই নগরী পত্তন করে এখানে রাজধানী নিয়ে আসেন। পর পর কয়েকটি রাজা নগরের নানা উন্নতি করেন। খৃস্ট জন্মের সমসাময়িক কালে ঐশ্বর্যের চরম শিখরে উঠেছিল। ব্রাহ্মণ, জৈন, আজীবিক ও বিভিন্ন পরিব্রাজক সম্প্রদায়ের জন্য এখানে বাসস্থান, চিকিৎসালয় ও প্রসূতি সদন ছিল। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য অশোক মহিন্দ ও তাঁর বোন সংঘমিত্রাকে মূল বোধিদ্রুমের শাখা দিয়ে পাঠান। বুদ্ধগয়া থেকে আনীত এই বোধিদ্রুমের শাখা রাজা পিয়তিস্‌স এখানে মহাবিহারে বসিয়েছিলেন এবং সেই গাছ আজও জীবিত আছে বলে কথিত। ২৫০ খৃ-পূর্বে দেবানম্পিয় তিস্‌স থুপারাম ধাতুগর্ভ স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন। এই স্তূপে তথাগতের চিবুক বা দক্ষিণ হনু বা দক্ষিণ অক্ষক অস্থি রয়েছে এবং এই স্তূপের একটি কোণে তথাগতের শোবন / শ্বদন্ত খৃ ৪-শতকে স্থাপিত হয়। পুরী (দন্তপুর দ্রঃ) থেকে এটি আনীত। তাম্র মহাবিহার ও মহাবংশে বর্ণিত 'রুবন্-বেলি' বা রুয়নওয়েলি (খৃ ২-শতক) ধাতু গর্ভস্তূপ এই নগরে অবস্থিত ; রাজা দুটঠাগামনী এই স্তূপ নির্মাণ করিয়েছিলেন। নগরে ইষিভূমাঙ্গন স্থানটি মহিন্দরের চিতাভূমি ; এখানে ঘণ্টাকার বিহারে ত্রিপিটকের অট্‌ঠ কথা সিংহলী থেকে পালিতে বুদ্ধঘোষ অনুবাদ করেছিলেন। ১০ শতকে চোলরাজ সিংহল আক্রমণ করেন ; অনুরাধপুর বিধ্বস্ত হয়।

অনুরুদ্ধ— ভগবান বুদ্ধের কাকা অমিতোদনের ছেলে। অনুরুদ্ধের ভাই মহানামের অনুরোধে অনুপিয় আম্রবনে বুদ্ধের সান্নিধ্য লাভ করে প্রব্রজিত হন। অচিরে দিব্য-চক্ষু লাভ করেন। অনুরুদ্ধ সঙ্ঘের পরম অনুরাগী ও বুদ্ধের অতিপ্রিয় ছিলেন। অনু-রুদ্ধের সঙ্গে আনন্দ, ভগু, কিম্বিল, দেবদত্ত ও ক্ষৌরকার উপালি প্রব্রজিত হন। বুদ্ধের পরি-নির্বাণের সময় অনুরুদ্ধ কুশিনারাতে ছিলেন। অনুরুদ্ধের অপরিমিত ধৈর্যে ভিক্ষুরা নিরুদ্বিগ্ন থাকেন এবং তাঁরই উপদেশে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঠিক করেন। প্রথম ধর্ম সংগীতির সময় অঙ্গুত্তর নিকায়ের রক্ষা ও সংকলনের ভার এ'র ওপর ছিল। বজ্জি দেশে বেলুব গ্রামে ইনি দেহত্যাগ করেন।

অনুলোম—উত্তম পুরুষের ঔরসে অধম স্ত্রীর গর্ভে জাত সন্তান।

অনুশাল্য—এক জন দৈত্য। কৃষ্ণের শত্রু; কৃষ্ণ এঁকে ভয় করতেন। কৃষ্ণকে মারবার জন্য একবার সসৈন্যে হস্তিনাপুর আক্রমণ করেন। ভীম অর্জুন পরাজিত হন। কিন্তু বৃষকেতু একে হারিয়ে বন্দী করে কৃষ্ণের সামনে নিয়ে আসেন। কৃষ্ণের উপদেশে এঁর মত পরিবর্তন হয়; এবং তপস্যার জন্য বনে চলে যান।

অনুষ্টুপ—সংস্কৃত ছন্দ। ৮-অক্ষরে পদ্য ছন্দ। পঞ্চমং লঘু সর্বত্র, সপ্তমং দ্বিচতুর্থয়োঃ গুরু ষষ্ঠন্তু পাদানাম্ শেষেষ্বনিয়মো মতঃ। একবিংশতি স্তোম, অথর্ববেদ, আপ্তোর্যাম-যাগ ও বৈরাজ সামের সঙ্গে ব্রহ্মার উত্তর মুখ থেকে উৎপন্ন। সূর্যের (দ্রঃ) অশ্ব।

অনুহ্লাদ—হিরণ্যকশিপুর (দ্রঃ) তৃতীয় পুত্র। দ্রঃ—পুলোমা।

অনুচান—বেদের যিনি অনুবচন করেছেন। সাঙ্গ বেদ প্রবক্তা।

অনূচানা—এক জন অপ্সরা।

অনূদর—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে।

অনূপ—প্রাচীন ভারতে বিখ্যাত একটি দেশ। সম্ভবত নর্মদার কাছে। (মাহিষ্মতী দ্রঃ)।

অনৃত—অধর্ম ও হিংসার ছেলে।

অনেকান্তবাদ—জৈন দর্শনে একটি মতবাদ। অনেক অন্ত (ধর্ম) যুক্ত বস্তু। বস্তুর বহু অন্ত/ধর্ম আছে এই বাদ। উপনিষদে বস্তুর স্বরূপ নিত্য সত্তা। বৌদ্ধ মতে নিত্য সত্তা বলে কিছু নেই; সবই ক্ষণিক সত্তা। জৈনগণ সমন্বয় করে বলেছেন বস্তু নিত্য বটে আবার অনিত্যও বটে। নিত্য অংশে বস্তুর নাম দ্রব্য, অনিত্য অংশে নাম পর্যায়। এই দ্রব্য-পর্যায় স্বরূপই অনেকান্তবাদের মূল। বস্তুর এই স্বরূপকে বোঝাবার জন্য জৈনেরা সাতটি 'নয়'এর সৃষ্টি করেছেন। যেমন 'স্যাৎ অস্তি এব ঘটঃ' প্রথম নয়; ইত্যাদি। স্যাৎ শব্দের দ্বারা প্রতিটি নয় উল্লিখিত হয় বলে অনেকান্ত-বাদের অপর নাম স্যাদ্ বাদ (দ্রঃ)।

অনেনস্—দ্রঃ- (ইক্ষ্বাকুবংশ (মহা ৩।১৯৩।২)। (২) আয়ুর (দ্রঃ) ছেলে অনেনস্ এবং অনেনসের ছেলে শুদ্ধ। (৩) ককুৎস্থ-অনেনস্-পৃথু।

অনোতপ্ত—অনবতপ্ত হ্রদ—রাবণ-হ্রদ (?)। কল্পিত (?)।

অনোমা—অনমল। গোরক্ষপুর জেলাতে অউমি নদী। গৃহত্যাগ করে এই নদীর পূর্ব তীরে চন্দৌলিতে বুদ্ধদেব নদী পার হন। ছন্দক এখান থেকে ঘোড়া কণ্টককে নিয়ে ফিরে যান। একটি মতে ছন্দকের ফিরে যাওয়ার স্থান সূচিত করছে মহা-থান ডিহ মহাথানডির স্তূপটি; তমেশ্বর বা মনেয়া থেকে ৬ কি-মি উ-পূর্বে। নদীর পূর্বতীরে গোরক্ষপুরে শির-সরাও হচ্ছে মস্তকমুণ্ডন স্তূপ। (২) মতান্তরে অযোধ্যাতে বস্তি জেলাতে কুদাওয়া নদী=অনোমা।

অন্তঃকরণ—বুদ্ধি ও মন নামে দু ভাগে বিভক্ত। বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা; মন সংকল্পাত্মিকা বৃত্তি। চিত্ত, অহঙ্কার এদের অন্তর্ভুক্ত। চিত্ত অনুসন্ধানাত্মিকা বৃত্তি।

অন্তক—পৃথুরাজার প্রশ্রয়ে দেবতারা পৃথিবীকে ধেনুতে পরিণত করে দোহন করেন। বার জন যমকে পান; এঁদের মধ্যে এক জন অন্তক (মহা, দ্রোণপর্ব)।

অন্তরগিরি—রাজমহল পাহাড়। সাঁওতাল পরগণাতে। পতঞ্জলির কালকবন (দ্রঃ)।

অন্তরচক্র—তন্ত্রে মূলাধারাদি ষট্‌চক্র।

অন্তর্ধান—একটি অস্ত্র। ইন্দ্রের কাছে অস্ত্র শিক্ষা করতে যাবার অব্যবহিত আগে কুবেরের কাছ থেকে অর্জুন এই অস্ত্র লাভ করেন। অপর নাম প্রস্বাপন। শত্রু হনন করে; এবং শত্রুর ওজ, তেজ ও দ্যুতি হরণ করে (মহা ৩।৪২।৩৩)।

অন্তর্ধান—পৃথুর ছেলে। স্ত্রী শিখণ্ডী; ছেলে হবির্ধান।

অন্তর্ধামা—মনু বংশে। অংশ-অন্তর্ধামা-হবির্ধামা।

অন্তর্বেদি—অন্তর্বেদ। প্রয়াগ থেকে হরিদ্বার পর্যন্ত গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী দেশ; দোয়াব। অন্য নাম শশস্থলী। ব্রহ্মাবর্ত দেশ।

অন্তরাত্মা—জীবাত্মা; অন্তরস্থ-আত্মা। অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ অন্তরাত্মা (শ্বেতাশ্ব)।

অন্তরীক্ষ—(১) ভুবর্লোক। সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যগত স্থান। বা স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যগত। অপ্সরা, গন্ধর্ব, যক্ষদের বাসস্থান। স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে যযাতি এখানে ছিলেন। (২) কেতুমাল বর্ষ (৩) পারস্য, আপোগস্থান ইত্যাদি যবন দেশ। (৪) বৈবস্বত মন্বন্তরে যাঁরা বেদ বিভাগ করেন তাদের নাম ব্যাস (দ্রঃ)। সব সমেত আটাশ জন ব্যাসের মধ্যে ইনি ১৩-শ ব্যাস। (৫) মুরাসুরের ছেলে। (৬) অগ্নীধ্র ও পূর্বচিত্তির ছেলে নাভি। নাভি (দ্রঃ) ও মেরুদেবীর ১০০ ছেলে; বড় ছেলে ভরত; এই ভরত থেকে ভারতবর্ষ; এদের মধ্যে এক জন অন্তরীক্ষ।

অন্তিয়োক—সম্রাট অশোকের শিলালিপিতে আছে তিনি যবনরাজ অন্তিয়োক ও অন্য চারজন যবন রাজার রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন। এসিয়ার পশ্চিম অংশে সিরিয়ার রাজা এই অন্তিয়োক বা দ্বিতীয় অন্তিয়োক; খৃ-পূ ২৬১-২৪৬।

অন্ত্য—বৈশেষিক পরিভাষা। পরমাণুগত বিশেষ পদার্থ। ঘট ও পট বিভিন্ন কিন্তু এই প্রভেদ আকৃতিগত। কল্পনার দ্বারা এই সিদ্ধান্ত হয় যে পরমাণুই চরম ব্যাবর্তক। অর্থাৎ পরমাণু-নিষ্ঠ প্রভেদবিশেষ পদার্থই এদের প্রভেদের মূল কারণ। পরমাণু গত এই বিশেষ পদার্থই-অন্ত্য।

অন্ত্যজ—রজক, চর্মকার, নট, বরুড়, কৈবর্ত, মেদ, ভিল্ল এই সাত জাতি (অত্রি)। বর্দ্ধকী, নাপিত ইত্যাদি ১৭-জাতি (ব্যাস)। শূদ্রের ঔরসে উচ্চ বর্ণের স্ত্রীর গর্ভজাত প্রতিলোমজ সন্তান।

অন্ত্যাবসায়ী—(১) চণ্ডাল (নিষাদ)। (২) শ্বপচ (ব্যাধ)-চণ্ডাল। (৩) ক্ষত্তা (ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যার গর্ভে শূদ্রের সন্তান)। (৪) সূত (ব্রাহ্মণীর গর্ভে ক্ষত্রিয় সন্তান)। (৫) বৈদেহক (বৈশ্যার গর্ভে শূদ্র সন্তান)। (৬) মাগধ (ক্ষত্রিয়ার গর্ভে বৈশ্য সন্তান)। (৭) অয়োগব (বৈশ্যার গর্ভে শূদ্রের সন্তান)। এই সাত জাতি। (আঙ্গিরস-স্মৃতি)।

অন্ত্যেষ্টি—মৃতদেহের যথা নিয়মে সৎকার না হলে বা সৎকার সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য সংবাদ না পেলে বা বার বছর নিরুদ্দেশ থাকলে কুশ পুত্তলিকা বা পর্ণনর দাহের বিধান আছে। শর পত্র বা পলাশ পত্র মেষলোম সুতা দিয়ে গেঁথে মানুষের আকৃতি করতে হয়; নারকেল ফল দিয়ে মাথা এবং যবের পিটুলি ঐ পুতুলের গায়ে লেপে দিয়ে যথা নিয়মে

দাহ করতে হয়। সাধু সন্ন্যাসী বা দু'বছরের কম বয়স শিশুর শব মাটিতে সমাধি দেওয়া হয়। সর্পাঘাতে মৃত দেহকে জলে ভাসিয়ে দেবার বিধান রয়েছে। দ্রঃ—অগ্নিপূজা।

অন্ধ—১) কশ্যপ কদ্রুর সন্তান। (২) চেহারা জন্তুমত। তপস্যায় বর পায় সব কিছু ধ্বংস করতে পারবে। সৃষ্টি রক্ষার জন্য ব্রহ্মা একে অন্ধ করে দেন ; তবু এ ধ্বংস করতে থাকে ; ব্যাধ বলাকের হাতে নিহত হয় (মহা ৮।৪৯।৩৭)। (২) ধৌম্যের শিষ্য উপমন্যু ; গাছের পাতা খেয়ে অন্ধ হয়ে যান।

অন্ধক—(১) কশ্যপ ও দিতির ছেলে এক জন দৈত্য। দিতির সমস্ত ছেলে দেবতাদের হাতে মারা গেলে কশ্যপের কাছে দেবতাদের হাতে অবধ্য এক সন্তান দিতি চেয়েছিলেন। কশ্যপ সম্মত হয়ে দিতিকে আলিঙ্গন করেন এবং তাঁর আঙ্গুল থেকে অন্ধকের জন্ম। এর হাজার হাত ও দু হাজার চোখ ছিল। অন্ধ ছিল না ; কিন্তু অহঙ্কারে অন্ধ বলে এই নাম। এর অত্যাচারে ত্রিলোকের সমস্ত প্রাণী অস্থির হয়ে পড়লে দেবতারা নারদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। নারদ মন্দার-পারিজাত পুষ্পের মালা পরে অন্ধকের বাড়িতে দেখা করতে আসেন। ফুল দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়ে ফুলের জন্য অন্ধক মন্দর পাহাড়ে যান। এখানে উমা ও মহাদেব বিহার করছিলেন ; ক্রুদ্ধ হয়ে শূলের আঘাতে মহাদেব অন্ধককে নিহত করেন। বরাহ পুরাণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের দৃষ্টি একত্র হয়ে এক কন্যার জন্ম হয়। ইনি বিষ্ণু মায়া এবং এক জন অন্ধক অসুরকে নিহত করেন।

অন্ধক—শিবের ছেলে। শিব তপস্যা করছিলেন এমন সময় হিরণ্যাক্ষের মেয়ে খেলার ছলে শিবের চোখ টিপে ধরেন। সঙ্গে সঙ্গে সারা পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যায়। এবং এই অন্ধকারই অন্ধক রাক্ষসে রূপ নেয়। সন্তানের জন্য তপস্যারত হিরণ্যাক্ষকে মহাদেব এই ছেলেটি দিয়ে দেন এবং বলে দেন পৃথিবীর সকলের ঘৃণার পাত্র হলে বা ব্রহ্ম-হত্যা করলে বা পার্বতীর প্রতি লুব্ধ হলে মহাদেব একে ভস্মসাৎ করে ফেলবেন। অন্ধক বড় হয়ে শেষ পর্যন্ত পার্বতীর প্রতি মুগ্ধ হয়ে পড়েন। প্রহ্লাদ বোঝাতে চেষ্টা করেন পার্বতী প্রকৃতই তাঁর মা। কিন্তু অন্ধক মহাদেবের কাছে শম্বর অসুরকে পাঠান পার্বতীকে নিয়ে আসার জন্য। মহাদেব বলে দেন তাঁর সঙ্গে পাশা খেলায় জিততে পারলে তবেই তিনি অন্ধকের কথা শুনবেন। অন্ধক শুনে তেড়ে আসেন কিন্তু যুদ্ধে হেরে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে নেন এবং পার্বতীকে মা বলে স্বীকার করে নিয়ে মুক্তি পান ও ভৃঙ্গীতে (দ্রঃ) পরিণত হন। (বামন পুঃ)

অন্ধক—এক জন বৈশ্য মুনি, স্ত্রী শূদ্র কন্যা। দু'জনেই অন্ধ ; সরযূতীরে এক আশ্রমে বাস করতেন। এ'দের এক মাত্র ছেলে সিন্ধু/যজ্ঞদত্ত। এক দিন বর্ষাতে, ঊষা হয়ে এসেছে, সিন্ধু কলসীতে জল ভরছিলেন। সরযূতে হাতী জল পান করছে মত শব্দ শুনে অবিবাহিত, মৃগয়াগত রাজা দশরথ শব্দভেদী বাণে একে বিদ্ধ করেন। আহত বালকের চিৎকারে রাজা ছুটে আসেন ; মুমূর্ষু বালক নিজের পরিচয় দেয় ; অন্ধ পিতামাতাকে দেখতে চায়, রাজাকে কিছু ভৎর্সনা করে এবং বৃদ্ধ মুনিকে সব জানাতে ও শান্ত করতে বলে এবং বাণ মুক্ত করে দিতে অনুরোধ করে। বাণ মুক্ত করলে বালক মারা যাবে, ভয়ে রাজা চিন্তাকুল হয়ে পড়েন, বালক আশ্বাস দেয় সে ব্রাহ্মণ নয়। তীর খুলে নিলে

বালক মারা যায়; রাজা জলপূর্ণ ঘট নিয়ে আশ্রমে (রা ২।৬৪।৩) যান, ক্ষমা চান ইত্যাদি এবং এদের বালকের কাছে নিয়ে আসেন। এ'রা তর্পণ করলে সিন্ধু (বা ২।৬৪।৪৭) স্বর্গে যায় এবং এ'দেরও ক্ষিপ্র চলে আসতে বলে ; স্বর্গে ও এ'দের সেবা করবে। মুনি এরপর শাপ দেন দশরথও পুত্র শোকে মারা যাবেন এবং মুনি দম্পতীও চিতাতে প্রাণ বিসর্জন করেন। অন্য মতে রাজা মৃত বালককেও আশ্রমে নিয়ে গিয়েছিলেন।

অন্ধক—(১) যদু বংশে ক্ষত্রিয় রাজা সত্বান ও স্ত্রী কৌশল্যার ছেলে। কুকুর বংশ প্রতিষ্ঠাতা। এর বড় ছেলে কুকুর। পাণ্ডবরা বনবাসে এলে কৃষ্ণের সঙ্গে এরাও দেখা করতে এসেছিলেন (মহা ৩।১৩।২)। (২) উতথ্য মমতার ছেলে ; জনৈক মুনি/দীর্ঘতমা (দ্রঃ)।

অন্ধগজ ন্যায়—দ্রঃ-ন্যায়।

অন্ধগোলাঙ্গুলন্যায়—দ্রঃ-ন্যায়।

অন্ধতামিস্র—(১) পঞ্চ অবিদ্যার একটি। দেহ নাশে আমিও নষ্ট হলাম এই বুদ্ধি। (২) নরক বিশেষ। মনু মতে বকব্রতী, বিড়ালব্রতী ব্রাহ্মণরা, যাজ্ঞবল্ক্য মতে মহাপাতক ও উপপাতকরা এবং বাজসেন সংহিতা মতে আত্মঘাতীরা এই নরকে যায়। আর এক মতে স্ত্রী বা স্বামী স্বামী বা স্ত্রীকে বঞ্চিত করে অন্নগ্রহণ করলে এই নরকে আসে।

অন্ধদর্পণন্যায়—দ্রঃ-ন্যায়।

অন্ধপঙ্গু ন্যায়—দ্রঃ-ন্যায়।

অন্ধ পরম্পরা ন্যায়—দ্রঃ-ন্যায়।

অন্ধ্র—মহাভারতের যুগে বর্তমানের অন্ধ্র অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী ছিল। কথিত আছে সহদেব এই দেশের রাজাকে পাশা খেলায় পরাজিত করে জয় করেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে বিশ্বামিত্রের শাপে তাঁর কয়েকটি ছেলের অপত্যগণ অন্ধ্র প্রভৃতি জাতিতে পরিণত হন এবং আর্য দেশের প্রান্ত ভাগে বাস করতে থাকেন।

(১) গোদাবরী ও কৃষ্ণার মধ্যবর্তী দেশ ; কৃষ্ণ জেলা সমেত। রাজধানী ছিল ধনকটক বা বেণাকটক বা অমরাবতী; কৃষ্ণার মোহনাতে। আরো প্রাচীন রাজধানী বেঙ্গি (হিউ-এন-ৎসাঙ)। (২) তৌলিঙ্গ দেশ ; হায়দ্রাবাদের দক্ষিণে। অনর্ঘ রাঘবে সপ্ত গোদাবরী অন্ধ্র দেশ প্রবাহিত। অন্ধ্রে প্রধান দেবতা মহাদেব ভীমেশ্বর। বেঙ্গির পল্লবরাজদের উচ্ছেদ করেন কল্যাণপুরের চালুক্যরা ; তারপর ক্রমশ চোলরাজারা এবং তার পর ধরণীকোটের জৈন রাজারা। অন্ধ্র বংশের অপর নাম সাতবাহন/সাতকর্ণি ; প্রাচীন রাজধানী শ্রীকাকুলম্ ; কৃষ্ণা গর্ভে।

অন্নকূট—পাহাড়ের মত করে অন্ন সাজিয়ে উৎসব। দেওয়ালির পর কার্তিকী শুক্লা প্রতিপদে কাশীতে অন্নপূর্ণার ও অন্যান্য মন্দিরে এই উৎসব পালন করা হয়। বিশেষত বৈষ্ণব মন্দিরে। জয়দেব প্রভৃতি সাধকদের তিরোধান তিথিতে ও অন্য সময়েও হয়ে থাকে। স্মৃতিকৌস্তুভ, ধর্মসিন্ধু ইত্যাদি গ্রন্থ অনুসারে মূলত এটি গোবর্দ্ধন পূজা। গোময় বা অন্নের সাহায্যে গোবর্দ্ধন গিরির প্রতীক তৈরির বিধান আছে। গোবর্দ্ধন

পাহাড়ের কাছে আর একটি পাহাড়ের নাম ও অন্নকূট। পুরাণে এর পরিক্রমার বিধান আছে। বাঙলা স্মৃতি গ্রন্থে, এই উৎসবের উল্লেখ নাই।

অন্নপূর্ণা—শক্তির একটি রূপ। কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসারে এই পূজার নিয়ম দেওয়া আছে। দুহাত ; হাতে অন্ন পাত্র ও দর্বী। দেবী রক্তবর্ণা, সফরাক্ষী, স্তনভারনম্রা, বিচিত্র বসনা, অন্নপ্রদান নিরতা ও ভবদুঃখহন্ত্রী। তাঁর মাথায় বালচন্দ্র, একপাশে ভূমি, আর এক পাশে শ্রী। নৃত্যপরায়ণ শিবকে দেখে তিনি সন্তুষ্ট। চৈত্রের শুক্লা অষ্টমীতে তাঁর পূজা হয়। প্রাচীন কোন গ্রন্থে এই পূজা নাই। দক্ষিণা মূর্তি সংহিতাতে চার হাত ; পদ্ম, অভয়, অঙ্কুশ ও দান। কাশীতে এই মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। কাশীর অন্নপূর্ণা ও অন্নকূট (দ্রঃ) উৎসব প্রসিদ্ধ। বাংলাতে পূজিত হন। দ্রঃ—ভিক্ষাটন মূর্তি।

অন্বগভানু—রাজা পুরুর ছেলে প্রবীরের এক স্ত্রী শূরসেনী, ছেলে হয় মনস্যু। মনস্যু ও স্ত্রী অপ্সরা মিশ্রকেশীর ছেলে অন্বগভানু। অন্য মতে পুরুর আর এক স্ত্রীর ছেলে ইক্ষ্বাকু, রুদ্রাশ্ব, প্রবীর ; এবং এই রুদ্রাশ্ব ও মিশ্রকেশীর ছেলে অন্বগভানু=ঋচেয়ু =অনাধৃষ্টি।

অন্বয়—সাংখ্যে হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তি। ব্যাপ্য ও ব্যাপকের অবিনাভাব বা সতত সম্বন্ধ। কার্য কারণের অনুসন্ধান।

অপ্—ঋক্ বেদে এক জন দেবতা যেন।

অপদেবতা—ভূত, প্রেত, বিদ্যাধর, অপ্সরা, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নর, পিশাচ, গুহ্যক, সিদ্ধ ; এরা দেবযোনি কিন্তু ইন্দ্রাদি থেকে হীনবল।

অপবর্গ—জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যোগ। মোক্ষ (দ্রঃ)।

অপভ্রংশ—খৃ-পূ ২-শতকে পতঞ্জলি শব্দটি ব্যবহার করেন। সংস্কৃত থেকে জন্ম অথচ শিষ্ট ভাষায় অচল শব্দকে পতঞ্জলি অপভ্রংশ বলেছিলেন। বররুচি অপভ্রংশ সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নি। পুরুষোত্তম প্রভৃতি পরবর্তী পণ্ডিতরা অপভ্রংশ উল্লেখ করেছিলেন কিন্তু প্রাকৃতের নব্য বা সরলতর রূপ ইত্যাদি স্পষ্ট কিছুই বলেন নি।

বর্তমানে স্বীকার করা হয় যে প্রত্যেক প্রাকৃত থেকে এক/একাধিক অপভ্রংশ ভাষা তৈরি হয়েছিল এবং এই সব আঞ্চলিক অপভ্রংশ থেকে বাঙলা, হিন্দি, পাঞ্জাবি রাজস্থানি, সিন্ধি, গুজারাটি, মারাঠি ইত্যাদি প্রাদেশিক ভাষার জন্ম। অর্থাৎ পূর্ব ভারতে প্রচলিত প্রাকৃত থেকে পূর্বী অপভ্রংশ এবং পূর্বী অপভ্রংশ থেকে ভোজপুরী, মাগধী, মৈথিলি, বাঙলা, উড়িয়া, অসমীয়া উৎপন্ন হয়েছে। শৌরসেনী প্রাকৃত থেকে শৌরসেনী অপভ্রংশ এবং এই অপভ্রংশ থেকে পশ্চিমা হিন্দি প্রভৃতি ভাষার জন্ম। অর্থাৎ সংস্কৃত থেকে প্রাকৃত এবং প্রাকৃত থেকে অপভ্রংশ। অপভ্রংশের কাল অনুমান ৫০০-১০০০ খৃস্টাব্দ। অবশ্য খৃ ১৫-শতক পর্যন্ত অপভ্রংশ ভাষায় সাহিত্য রচিত হয়েছে। বহু জৈন পণ্ডিত ও বৌদ্ধ পণ্ডিত অপভ্রংশে অনেক বই লিখে গেছেন।

অপরবিদেহ—রঙপুর, দিনাজপুর। পূর্ব বিদেহ।

অপরাজিত—(১) এক জন রুদ্র। (২) কদ্রুর ছেলে একটি সাপ। (৩) ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে ; ভীমের হাতে নিহত। (৪) ঋষি বিশেষ।

অপরাজিতা—দুর্গা মূর্তি বিশেষ। আশ্বিনে শুক্লা দশমীতে পূজা হয়। (২) রত্নসম্ভব কুলে বৌদ্ধদেবী ; চার হাতে দণ্ড, অঙ্কুশ, ঘণ্টা ও পাশ। গণেশকে পদ-দলিত করছেন ঃ এক হাত চপেটাঘাতে উদ্যত। এক জন ব্রাহ্মণ্য দেবতা এঁর মাথায় ছত্র ধারণ করেছেন। পীতবর্ণ। এক মুখ এবং দু হাত—ধ্যানও রয়েছে ; এক হাতে চপেটাঘাতাভিনয় ও আর এক হাতে পাশ তর্জনী-লগ্ন। মুখ ভয়ঙ্কর ও হিংস্র। দুষ্টের দলনী এবং ব্রহ্মাদি দুষ্ট রৌদ্র দেবতারা ছত্র ধারণ করেছেন।

অপরাজিতা, সিতাতপত্রা—বৈরোচন (দ্রঃ) কুল। এক জন বৌদ্ধ দেবী। চোখে ক্রোধ কিন্তু মৃদু স্বভাব। তিন মুখ, তিন চোখ, ছয় হাত, শ্বেতবর্ণ। হাতে চক্র, অঙ্কুশ, ধনু, বজ্র, শর, পাশ ও তর্জনী। মাথাতে শ্বেত ছত্র। সমস্ত গ্রহদোষ নষ্ট করে দেন।

অপরানন্দা—অলকানন্দা। একটি তীর্থ। নন্দা (দ্রঃ)।

অপরান্ত—অপরান্তক একটি প্রাচীন জাতি/জনপদের নাম। পুরাণ, রঘুবংশ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও বৌদ্ধগ্রন্থ ইত্যাদিতে উল্লেখ আছে। ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে সম্ভবত আর একটি অপরান্ত দেশ ছিল। কোঙ্কন ও মালাবার মিলে। মতান্তরে কেবল কোঙ্কন। অন্য মতে ভারতের পশ্চিম উপকূল। রঘুতে মুরলার দক্ষিণে ; পশ্চিমঘাট (সহ্যপর্বত) ও সমুদ্র মধ্যবর্তী এলাকা ; মহী নদী থেকে গোয়া পর্যন্ত। মোটামুটি নর্মদা থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত দেশ। অরিয়েক (টলেমি)। পেরিপ্লাসে অরিয়েক কাম্বে উপসাগরের দক্ষিণ থেকে আভীরের উত্তর পর্যন্ত বিস্তৃত। অবশ্য পেরিপ্লাসের অরিয়েক=আরণ্যক। আর এক মতে কোঙ্কনের উত্তর অংশ ; রাজধানী সূর্পারক ; বাসেইনের কাছে। প্রচারক যোন-ধর্ম রক্ষিতকে অশোক এখানে ২৪৫ খৃ-পূ পাঠিয়েছিলেন।

অপরাবিদ্যা—দ্রঃ—বিদ্যা।

অপরার্ক—কোঙ্কনের (অপরান্ত) অধিপতি। ইনি শিলাহার রাজা প্রথম অপরাদিত্য খৃ ১২-শ শতাব্দী। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির টীকাকার। স্বাধীন চিন্তা মণ্ডিত টীকা। ভা-সর্বজ্ঞের ন্যায়সারের টীকাও লিখেছিলেন।

অপর্ণা—একটি গাছের পাতাও ভক্ষণ করতেন না অর্থাৎ (শিবকে বিয়ে করার জন্য) অনাহারে তপস্যা করার ফলে পার্বতীর এই নাম। দ্রঃ- একপর্ণা, একপাটলা।

অপাং নপাৎ—ঋক্ বেদে একটি দেবতা যেন। জলের পুত্র বা পৌত্র।

অপান—দেহ গত অধোগামী/গুহ্য বায়ু (দ্রঃ)। বিপরীত প্রাণ বায়ু।

অপান্তরতমস্—অন্য নাম সারস্বত। বিষ্ণু 'ভূ'-এই শব্দ উচ্চারণ করলে এঁর জন্ম। অন্তরে অপগত তমস্ ; ত্রিকালদর্শী। বিষ্ণুর আদেশে বেদকে ব্যাস/বিন্যাস করেন। দ্বাপরে ইনিই পরাশর পুত্র হয়ে আবার বেদ বিন্যাস করেন। (ব্রহ্ম সূত্র ভাষ্য)।

অপালা—অত্রির মেয়ে। ব্রহ্মবাদিনী। ঋক্ বেদে অষ্টম মণ্ডলে ৯১ সূক্তের ঋষি। চর্মরোগের জন্য দেহে রোম ছিল না ; ফলে স্বামী পরিত্যক্তা হন। ইন্দ্রের কাছে

প্রার্থনা করেন পিতার মাথা (টাক) ও তাঁর দেহ রোম যুক্ত হোক এবং অত্রির ঊষর শস্যক্ষেত্র উর্বর হোক। সোম চর্বণরতা অপালার দাঁতের শব্দকে ইন্দ্র অভিষব পাথরের শব্দ মনে করে এসে উপস্থিত হন এবং অপালার প্রার্থনা পূর্ণ করেন। সূর্যের মত উজ্জ্বল হয়েছিলেন অপালা।

অপূপ—পুরোডাশ। হবিঃ বিশেষ।

অপ্পয়্যদী ক্ষত—১৫২০-১৫৯২ খৃস্টাব্দ। দাক্ষিণাত্যে ভেলোরের নায়কগণের আশ্রিত প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। শতাধিক গ্রন্থ রচয়িতা। চিত্রমীমাংসা, লক্ষণাবলী, কুবলয়ানন্দ গ্রন্থ এবং যাদবাভ্যুদয় কাব্যের টীকা ইত্যাদি প্রসিদ্ধ।

অপ্পর্—তামিল শৈব সাধক। শৈব নায়নার সম্প্রদায়ের অন্যতম গুরু। খৃ ৬-শতকের শেষে দাক্ষিণাত্যে জৈন ধর্মের প্রভাব খর্ব করে শৈব-ধর্ম বিস্তারে বিশেষ সহায়তা করেছিলেন।

অপ্রতিরথ—সামবেদে প্রাস্থানিক মঙ্গলাচরণ মন্ত্র।

অপ্সরা—অপ্ (জল)-সৃ+অ/অস্ (র্তৃ) ; বিঃ =অপ্সরস্। অর্থাৎ যাঁরা জলে সরণ বিহার করেন। অপঃ থেকে জন্ম বলেও এই নাম। দেবযোনি বিশেষ। রামায়ণে সমুদ্র মন্থনে, অন্য মতে কশ্যপের ঔরসে প্রধার গর্ভে সমস্ত (অন্য মতে ১৬ জন) অপ্সরা, কাদম্বরীতে মানসদেব, অনল, জল প্রভৃতি থেকে ১৪-টি অপ্সরাকুলের জন্ম। অভিধান চিন্তামণি টীকাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু যম থেকে প্রভাবতী ইত্যাদি ৪৯ অপ্সরার জন্ম। মনুতে এরা সপ্তমনুর সৃষ্টি।

ভরত মুনির নাট্য শাস্ত্রে আছে ব্রহ্মা স্বর্গে অপ্সরাদের সৃষ্টি করেছিলেন ভরত মুনির প্রয়োজনায় অভিনয় করার জন্য। এখানে নাম আছে মঞ্জুকেশী, সুকেশী, মিশ্রকেশী, সুলোচনা, সৌদামিনী, দেবদত্তা, দেবসেনা, মনোরমা, সুদতী, সুন্দরী, বিদগ্ধা, সুমালা, সন্ততি, সুনন্দা ও সুমুখী। পুরাণে এরা দেব সভায় নর্তকী, রূপোপজীবিনী। পুরাণে আরো বহু নাম। কৃষ্ণ যজুর্বেদে অগ্নির রথে পূর্ব ভাগে পুঞ্জিকাস্থলা ও কৃতস্থলা, দক্ষিণে মেনকা ও সহজন্যা, পেছনে প্রম্লোচন্তী, উত্তরে বিশ্বাচী ও ঘৃতাচী এবং ঊর্ধ্বে উর্বশী ও পূর্বচিত্তি অবস্থিত। বেদে অপ্সরা আছে (ঋক্ ৯।৭৮।৩) ; আকাশ থেকে যজ্ঞ স্থলে এসে সোম প্রস্তুত করেছিল। যাস্ক বলেছেন এরা অপ্-সারিণী। আর এক জায়গায় বলেছেন অপ্স অর্থে রূপ ; অর্থাৎ রূপময়ী, সর্বব্যাপিনী ; ভোগাতীতা ও দর্শন যোগ্যা। কৃষ্ণ যজুর্বেদে সূর্যের আলোকে অপ্সরাবৃন্দ বলা হয়েছে—মরীচয়ঃ অপ্সরসঃ।

সমুদ্র মন্থনে ৬০-কোটি অপ্সরা উঠে আসেন। এঁদের অসংখ্য পরিচারিকা। দেবতা বা দানব কেউই এঁদের নিতে চান নি। ফলে এঁরা না দেবতা না দানব ; অর্থাৎ এরা সাধারণা (রা ১।৪৫।২৩)। কামদেব এঁদের অধিপতি। নৃত্যকলায় পারদর্শিনী, দেব সভায় নর্তকী ও গায়িকা। বহু স্থানে গন্ধর্বদের স্ত্রী রূপে পরিচিত। দেবতারা এঁদের দিয়ে মুনিঋষিদের তপস্যা নষ্ট করতেন। মায়াতে নানা রূপ ধারণ করতে পারতেন। মর্ত্যে এসে নানা ভাবে মানুষদের সাহায্যও করেছেন। পাশাতেও

এঁ'রা সুনিপুণ। এঁ'রা সুরসুন্দরী, স্বর্গবেশ্যা। সংস্কৃত সাহিত্যে অপ্সরা সৃষ্টির মাধ্যমে যৌনরস পরিবেশনের পথ সুগম করা হয়েছিল। কয়েকজন অপ্সরার নাম—

অদ্রিকা, অনবদ্যা, অনুম্লোচা, অনূচানা, অরুণা, অম্বিকা, অসিতা, অম্বুজাক্ষী, উর্বশী, উম্লোচা, ঋতুস্থলা, কর্ণিকা, কাম্যা, কাঞ্চনমালা, কেশিনী, ক্ষেমা, ঘৃতাচী, চন্দ্রপ্রভা, তিলোত্তমা, দান্তা, নাগদন্তা, পুণ্ডরীকা, পুঞ্জিকাস্থলা, পুষ্পগন্ধা, পূর্বচিত্তী, প্রজাগরা, প্রমাথিনী, প্রমদ্বরা, প্রম্লোচা, প্রশমী, প্রিয়বর্চস্, বাসনা, বিদ্যুৎপর্ণা, বিদ্যোতা, বিদ্যুতা, বিশ্বাচী (বিশ্বাচী), মধুরস্বরা, মনোরমা, মঞ্জুঘোষা, মরীচি, মহেশ্বরী, মিশ্রা, মিশ্রকেশী, মেনকা, রক্ষিতা, রম্ভা, রুচিরা, শরদ্বতী, শুচিকা, সহজন্যা, সুকেশী, সুকেশিনী, সুগন্ধা, সুবাহু, সুপ্রিয়া, সুমধ্যা, সুরসা, সুরজা, সুরথা, সোমকেশী, সোমা, হেমা, অলম্বুষা ইত্যাদি।

এদের নির্দিষ্ট কোন বিগ্রহমূর্তি নাই। কেবলমাত্র ভারহুত প্রাচীরে মারের পরাজয়ের পর আনন্দে মিশ্রকেশী, অলম্বুষা, সুভদ্রা ও পদ্মাবতীকে নাচতে দেখা যায়।

অবতার—মানুষ হয়ে দেবতার জন্ম। দু'রকম—পূর্ণ ও অংশ অবতার। কাজ দুষ্টের দমন এবং ধর্মসংস্থাপন। সৃষ্টিও রক্ষা করেন। কাজ শেষে ফিরে যান বা মারা যান। মোটামুটি জন্মান্তর বাদ। শতপথে ও তৈত্তিরীয় সংহিতাতে আছে ব্রহ্মা মৎস্য কূর্ম ও বরাহ অবতারে পৃথিবী সৃষ্টি বা রক্ষা করেছিলেন। পরে বৈষ্ণব পণ্ডিতরা সিদ্ধান্ত করেন এই তিনটি অবতারেই বিষ্ণু এসেছিলেন ; প্রজাপতিকে এ গুরুভার দিতে রাজি হননি। গীতাতে অবতারবাদ আছে ; ব্যূহবাদ তখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নি। গীতাতে অবতার সংখ্যা অনির্দিষ্ট ; প্রয়োজন হলেই যুগে যুগে 'সম্ভব-আমি' বলা হয়েছে। অবশ্য উ ও দ-ভারতের অবতার তালিকাতে একটু পার্থক্য রয়ে গেছেই।

পুরাণে বিষ্ণু দশবার দশটি পূর্ণ অবতার রূপে জন্ম নিয়েছেন ; এই সাধারণ দশটি অবতার ঃ— মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণবলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি।

মৎস্য পুরাণে ভৃগুর শাপে বিষ্ণু ৭ বার (কর্মবাদ) মানুষ হয়ে জন্মান। এই অভিশপ্ত সাতজন ঃ দত্তাত্রেয়, মান্ধাতা, পরশুরাম, রাম, ব্যাস, বুদ্ধ ও কল্কি। এই সাত জনের সঙ্গে নারায়ণ, নরসিংহ ও বামন মিলে দশ অবতার তালিকা পূর্ণ করা হয়েছে। পদ্ম পুরাণে আছে শুক্রাচার্যের (দ্রঃ) মা ঘোর নিদ্রা সৃষ্টি করে ইন্দ্রকে স্তম্ভিত করে ফেলেন। তখন ইন্দ্রের প্ররোচনায় বিষ্ণু শুক্রের মায়ের শিরচ্ছেদ করেন। ফলে শুক্র শাপ দেন নারী হত্যার জন্য মানুষেষু সাতবার জন্মাতে হবে। পদ্ম পুরাণে সৃষ্টি খণ্ডেও এই ঘটনা ; শুক্র তপস্যা করছিলেন, দানবরা এই সময় হেরে গিয়ে শুক্রের মায়ের কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন ইত্যাদি। এই পুরাণে সৃষ্টি খণ্ডের কাহিনীতে ভৃগু কন্যা লক্ষ্মী একটি পুরী নির্মাণ করে ভৃগুকে দিয়েছিলেন। লক্ষ্মী তারপর বিষ্ণুকে পাঠান এটি ফেরৎ নিতে কিন্তু ভৃগু দিতে চান না এবং বার বার বিরক্ত করার জন্য শাপ দেন ভূলোকে দশ-জন্মানি লপ্স্যসে। পদ্ম পুরাণে ভূমিখণ্ডে বিষ্ণু ভৃগুর কাছে প্রতিজ্ঞা করেন যজ্ঞ রক্ষা করবেন ; ফলে ইন্দ্রের কথায় দেবতারা যজ্ঞস্থান ত্যাগ করে দানবদের সঙ্গে যুদ্ধ

করতে যান। এই সুযোগে দানবরা যজ্ঞ নষ্ট করে, ফলে ভৃগু শাপ দেন দশ জন্মানি ভোগ করতে হবে। পদ্ম পুরাণে ভূমি খণ্ডে অদিতির গর্ভে বিষ্ণু মানুষ রূপে জন্মাতে স্বীকৃত হন। অদিতি মানুষী হয়ে জন্মাবেন। এখানে পরশুরাম, রাম, ও কৃষ্ণ তিনটি অবতার। পদ্মপুরাণে সৃষ্টি খণ্ডে ২০ অবতার ; এদের মধ্যে ১২ জন—নৃসিংহ, রাম, বরাহ, কূর্ম, সংগ্রাম, আড়ীবক, ত্রিপুরহন্তা, অন্ধকহন্তা, বৃত্রহন্তা, ধ্বজ, হলাহল, কোলাহল। বায়ুপুরাণে ১০ জন—প্রথম যজ্ঞপুরুষ; দ্বিতীয় নরসিংহ; তৃতীয় বামন, ত্রেতাতে সপ্তমাংশে; ৪-র্থ দত্তাত্রেয়, ত্রেতাতে দশমাংশে ; ত্রেতাতে ১৫-শ অংশে মান্ধাতার সময়ে আর একটি অবতার (নাম নাই); ৬ষ্ঠ পরশুরাম, ত্রেতাতে ঊনবিংশ অংশে ; রাম ত্রেতাতে ২৪-শ অংশে। দ্বাপরে অষ্টম অবতার ব্যাস এবং নবম কৃষ্ণ। কলিতে পরাশর তনয় কল্কি। এখানে বুদ্ধ তথাগত স্থান পান নি। দেবী পুরাণে ৬০ জন। সৌর পুরাণে অবতার দশ জন। ভৃগুর শাপ আছে ভূলোকে এবং শুক্রের শাপ আছে মানুষেষু অর্থাৎ মৎস্য ইত্যাদি বিষ্ণুর অবতার নয় যেন। মহাভারতে চার, ছয় ও দশ অবতারের কথা আছে ; শান্তি পর্বে ঃ—হংস কূর্ম, মৎস্য, বরাহ, বামন, পরশুরাম, সাত্বত, কৃষ্ণ ও কল্কি মোট ৯ জন। বুদ্ধ নাই। হরিবংশে বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম ও কৃষ্ণ মোট ৬ জন। বরাহ ও অগ্নি পুরাণে ১০ অবতার। ভাগবতে তিন জায়গায় (১।৩, ২।৭, ১১।৪) যথাক্রমে ২২, ২৩ ও ১৬ জন অবতার। ২২ জনের তালিকাতে রয়েছেন (১) পুরুষ, (২) বরাহ, (৩) নারদ (৪) নরনারায়ণ, (৫) কপিল, (৬) দত্তাত্রেয়, (৭) যজ্ঞ, (৮) ঋষভ, (৯) পৃথু, (১০) মৎস্য, (১১) কূর্ম, (১২) ধন্বন্তরি, (১৩) মোহিনী, (১৪) নরসিংহ, (১৫) বামন, (১৬) পরশুরাম, (১৭) ব্যাস, (১৮) রাম, (১৯) বলরাম, (২০) কৃষ্ণ, (২১) বুদ্ধ, (২২) কল্কি। বাকি দুটি তালিকা এই তালিকারই হেরফের। তবে ঋষভ (আদিনাথ তীর্থঙ্কর ?) ও বুদ্ধ তিনটি তালিকাতেই আছেন। এঁদের মধ্যে কৃষ্ণ পূর্ণ অবতার। ভাগবতে (১০।২।৪০) আর এক জায়গায় মৎস্য, অশ্ব, কচ্ছপ, নৃসিংহ, বরাহ, হংস, রাজন্য, বিপ্র ও বিবুধ। দ্রঃ বামন। মহাভাষ্যে বিষ্ণু বলিবন্ধন করেছেন উল্লেখ আছে। অঙ্গদের কামনা পূর্ণ করতে কৃষ্ণের (দ্রঃ) জন্ম বলা হয়েছে।

পঞ্চরাত্র সংহিতাতে, সাত্বত সংহিতাতে এবং পরবর্তী কালে অহির্বুধ্ন্য সংহিতাতে অবতার ৩৯ জন—পদ্মনাভ, ধ্রুব, অনন্ত, শক্ত্যাত্মা, মধুসূদন, বিদ্যাধিদেব, কপিল, বিশ্বরূপ, বিহঙ্গম, ক্রোধাত্মা, বড়বাবক্ত্র, ধর্ম, বাগীশ্বর, একার্ণবশায়ী, কমঠেশ্বর, বরাহ, নরসিংহ, পীযূষহরণ, শ্রীপতি, কান্তাত্মা রাহুজিৎ, কালনেমিঘ্ন, পারিজাতহর, লোকনাথ, শান্তাত্মা, দত্তাত্রেয়, ন্যগ্রোধশায়ী একশৃঙ্গতনু, বামন, ত্রিবিক্রম, নর, নারায়ণ, হরি, কৃষ্ণ, পরশুরাম, রাম, বেদবিদ, কল্কি, পাতালশয়ন। এখানে বাগীশ্বর ও লোকনাথ মহাযানের দেবতা ; কিন্তু শান্তাত্মা একটি মতে সনৎ কুমার বা নারদ। তবে শান্তাত্মা যদি বৃহৎ সংহিতার শান্তমনা হন তাহলে ইনি বুদ্ধ। অগ্নিপুরাণে শান্তাত্মা সরাসরি বুদ্ধ।

কিছু মতে এই ৩৯ অবতার তালিকা সব চেয়ে প্রাচীন ; এমন কি মহাভারত থেকেও। অথচ এই তালিকাতে বুদ্ধের নাম থাকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

বৈষ্ণব ধর্মে একটি বড় দিক অবতার বাদ। বৈদিক সাহিত্যে অবতার বাদের কিছু হদিস আছে কিন্তু ব্যূহের (দ্রঃ) কথা নাই। ব্যূহ বাদ সম্পূর্ণ আলাদা। বিষ্ণু বা বিষ্ণুর যে কোন ব্যূহমূর্তি বা যে কোন চেলাচামুণ্ড বা দেবতা অবতার হয়ে জন্মাতে পারেন। এমন কি বিশেষ কোন গুণ বা প্রতীকও অবতার হয়ে জন্মাতে পারেন।

সনক, সনন্দ, সনাতন, নারায়ণ, যজ্ঞ, পৃথু, মোহিনী, গরুড়, ঋষি, মনু, মনুপুত্র ও দেবতারাও বিষ্ণুর অংশাবতার বলা হয়। চৈতন্যচরিতামৃতে পুরুষ অবতার ইত্যাদি ১৬ প্রকার অবতারের উল্লেখ আছে। ব্রহ্মা ও ব্যাস বিষ্ণুর অবতার। বলরাম ও বুদ্ধ কিছু মতে অবতার বলে স্বীকৃত নন।

অহির্বুধ্ন্য, বিষ্বক্‌সেন ইত্যাদি সংহিতাতে অবতারকে দু ভাগ করা হয়েছে—মুখ্য ও গৌণ অবতার। এঁদের মতে ব্রহ্মা, শিব, বুদ্ধ, ব্যাস, অর্জুন, পরশুরাম, বসু (=অগ্নি) ও কুবের গৌণ অবতার। বলরামকে কখনো অবতার কখনো বা ব্যূহমূর্তি বলা হয়; এই দুটি মূর্তিতে পার্থক্য আছে। জন্মান্তর বাদের সমর্থনে এই অবতার বাদ।

বরাহ, নৃসিংহ, বামন ইত্যাদির আলাদা মন্দির যেন গুপ্ত যুগে ছিল। লাল বেলে পাথরের বিরাট আকার বরাহের মূর্তি আছে; পৃথিবীকে তুলে ধরেছেন। মৎস্য ও কূর্ম অবতার দু রকমের গড়া হতঃ- (১) প্রকৃত মৎস্য বা কূর্ম মত চেহারা; (২) অর্দ্ধেক মানুষ মত চেহারা। উদয় গিরিতে (ভিলসার কাছে) ৪-নং গুহাতে নৃ-বরাহের বিরাট মূর্তি উৎকীর্ণ রয়েছে; অত্যন্ত সুন্দর ছবি; দেবতার অমিত শান্তি ফুটে রয়েছে। সঙ্গে অন্যান্য বহু দেবতা দর্শক হিসাবে রয়েছেন। নৃ বরাহ দাঁতে করে পৃথিবীকে উদ্ধার করছেন। খৃ ৭-শতকের, মহাবলিপুরমে উৎকীর্ণ ছবিটিতে বরাহ দু হাতে করে পৃথিবীকে তুলে ধরেছেন, এটিতে বরাহ ও পৃথিবীর মিলনের দিব্য পরিবেশ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

নরসিংহ মূর্তিতে সব ক্ষেত্রেই সিংহ মুখ। ভারতে বহু জায়গায় উৎকীর্ণ মূর্তি / ছবি পাওয়া গেছে। কিছু কিছু ছবিতে হিরণ্যকশিপুর সঙ্গে যুদ্ধ হচ্ছে আবার কিছু কিছু ছবিতে দৈত্যরাজকে মেরে ফেলা হয়েছে। এলোরার ছবিটি অপূর্ব সুন্দর এবং সক্রিয়; মৎস্য পুরাণের বর্ণনাও অনুরূপ, দুজনে যুদ্ধ করছেন। নরসিংহ মূর্তি যাই হোক, ভাব ও ভঙ্গি বহু পুরাণ মতে সৌম্য ও শান্ত হওয়া উচিত, কারণ বিষ্ণু প্রেমের দেবতা। গুপ্ত যুগের একটি পোড়ামাটির সিলে ও একটি বাদামি উৎকীর্ণ চিত্রে এই রকম শান্ত মূর্তি পাওয়া যায়। হলেবিদ (মহীশূর) নরসিংহ ও শান্ত মূর্তি।

বামন অবতার বৈদিক ত্রিবিক্রম কাহিনী থেকে গড়ে উঠেছে। শতপথ ব্রাহ্মণে আছে বিশ্বের আধিপত্য নিয়ে দেবতা ও দানবদের মধ্যে যুদ্ধ হয়। শেষ পর্যন্ত সর্ত হয় বিষ্ণু শুয়ে থাকলে যতটুকু জায়গা লাগবে মাত্র ততটুকু জায়গা দেবতারা পাবেন। দেবতাদের মধ্যে বিষ্ণু সব চেয়ে বেঁটে ছিলেন। কিন্তু যখন শুলেন তখন সমস্ত বিশ্ব জুড়ে শুয়ে পড়েন। পুরাণ ইত্যাদিতে বলি ও শুক্রকে নিয়ে আর এক কাহিনী। বেদে তিন-বার পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে; এই কাহিনীগুলিতেও বামন ত্রি-পাদ ভূমি ভিক্ষা চান।

বামনের দু রকম মূর্তি পাওয়া যায়—(১) প্রকৃত খর্ব দেহ, ব্রাহ্মণ-বটু এবং (২) বিরাট মূর্তি ; তিনটি পদক্ষেপ করতে যাচ্ছেন। বৈখানস আগমে এই ভাবে পদক্ষেপ করতে চলেছেন বর্ণনা আছে। মহাবলিপুরমে উৎকীর্ণ ছবিতেও এই উদ্যত. ত্রিবিক্রম। বাদামি উৎকীর্ণ চিত্রও অনুরূপ , তবে সঙ্গে অন্যান্য দেবতা তত বেশি নয়। মহাবলিপুরম ও বাদামি ছবি দুটিতেই আট হাত। কেবল মাত্র বামন একা খুব কম দেখা যায় ; এগুলিতে সাধারণত চার হাত। খৃ ১১ শতকের একটি চার হাত একক বামন মূর্তি আশুতোষ সংগ্রহশালাতে রয়েছে ; সঙ্গে শ্রী ও পুষ্টি বর্তমান।

পরশুরাম অবতার বলে বর্ণিত হলেও ইনি বিষ্ণুর ছায়া-আবিষ্ট অবতার। রামের সঙ্গে দেখা হবার পর এর বিষ্ণু তেজ/অবতারত্ব রামের মধ্যে চলে যায়। পরশুরামকে দু-হাত দেখান হয়। কিছু গ্রন্থে চার হাত বলা হয়েছে। কিন্তু চার হাত মূর্তি ছবি অতি বিরল। অগ্নি পুরাণে চার হাতে ধনু. শর, তরবারি ও পরশু রয়েছে। রাণীহাটি (ঢাকাতে) প্রাপ্ত মূর্তিটিতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পরশু রয়েছে।

রামের সমস্ত উৎকীর্ণ মূর্তিতে দু-হাত। ইন্দোচীন ও ইন্দোনেসিয়াতেও বহু মন্দিরের দেওয়ালে রামায়ণ কাহিনী তুলে ধরা আছে।

বলরামের তিন ধরণের মূর্তি হয় ঃ (১) ক্রোধী দেবতা ; কৃষিকার্যের সঙ্গে বিশেষ একটা যোগ রয়েছে। (২) অনন্ত নাগের অবতার, বাসুদেব কৃষ্ণের এক জন পার্ষদ। (৩) বাসুদেব কৃষ্ণের বড় ভাই. বীর এবং ব্যূহমূর্তিও বটে।

কৃষ্ণ বলরাম কাহিনী বিশদ ভাবে হরিবংশ ও ভাগবতে দেওয়া আছে। অন্যান্য কিছু গ্রন্থেও আছে। মহাভারতে ও খৃস্টীয় যুগের প্রথম দিকেই এদের বাল্যের বহু কাহিনী জানা ছিল। সদ্য জাত কৃষ্ণকে নিয়ে বসুদেব যমুনা পার হচ্ছেন ২-৩ খৃ শতকের উৎকীর্ণ ছবি পাওয়া গেছে। মাড়োয়ারে মাণ্ডোবে (মাণ্ডব্যপুর) প্রাপ্ত কয়েকটি উৎকীর্ণ চিত্র যেমন গোবর্দ্ধন ধারণ, ননী চুরি. শকট উল্টে দেওয়া, ধেনুক হত্যা, কালীয় দমন পাওয়া গেছে : এগুলি খৃ-৪র্থ শতকের। দেওগড় উৎকীর্ণ চিত্রে. বাদামি ২ ও ৪ নং গুহা ইত্যাদিতে নন্দ যশোদার ছবি পাওয়া যায় ; এগুলি মধ্যযুগীয়।

মহাভাষ্যে বলরামের মন্দিরের উল্লেখ আছে। বৃহৎ সংহিতাতে বলেছে বলদেবের আয়ুধ থাকবে লাঙলের ফলা; চোখ গোল গোল, বড় বড়, ঘূর্ণীয়মান ও মদোৎকট, একটি কানে কুণ্ডল। দেহের রঙ শঙ্খ, বা পদ্ম বা চন্দ্র মত শ্বেত। পরবর্তী গ্রন্থগুলিতেও ২ বা ৪ হাত এবং মাথাতে সাপের ফণার ছাতা। এগুলি বলরামের অবতার মূর্তি। ব্যূহ মূর্তি হলে চার হাতে নির্দিষ্ট ক্রমে কেবল শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম থাকবে। মথুরাতে প্রাপ্ত একটি মূর্তি খৃ-পূ ২-শতকের যেন। মূর্তিটিতে মুষল ও লাঙলের ফলা আয়ুধ, মাথাতে সাপের ফণার ছাতা, ধুতি পরা এবং মাথাতে বিরাট একটি পাগড়ি। দাঁড়ান মূর্তি ; ডান পা সামান্য একটু হাঁটুতে বাঁকান। ব্রাহ্মণ্য সমস্ত দেবতাদের মধ্যে এটি প্রাচীনতম মূর্তি। খৃ ১-ম শতকের একটি মূর্তি (গোয়ালিয়র সংগ্রহ শালাতে) তালধ্বজ মূর্তি ; এবং সঙ্গে ধেনুকের মুণ্ডহীন রাসভ মূর্তিও রয়েছে।

ব্রাহ্মণ্যধর্মে বৌদ্ধ ধর্মের বিরুদ্ধে কটূক্তির সীমা নাই। কিন্তু তবু বুদ্ধকে অবতার

বলে স্বীকার করা হয়েছে, বলা হয়েছে বুদ্ধ মূর্তিমান মহামোহ : অসুরদের মিথ্যা ধর্ম দান করে নিধনের পথ সহজ করে দিয়েছিলেন। বৃহৎ-সংহিতাতে বলেছে বুদ্ধের মূর্তি হবে. শান্ত, হাতে ও পায়ের পল্লবে পদ্ম চিহ্ন থাকবে। পদ্মে বসে আছেন এবং দেখাবে যেন সমস্ত বিশ্বের জনক। কিছু পুরাণে বুদ্ধকে নগ্ন ক্ষপক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। দশ অবতার ফলকে কিন্তু এ'কে সব সময়ই দণ্ডায়মান এবং ডান হাতে অভয় মুদ্রা দেখান হয়েছে।

কল্কি বিষ্ণুযশার পুত্র ; ম্লেচ্ছদের নিধন করবেন এবং যাজ্ঞবল্ক্যর পৌরোহিত্যে আবার চতুর্বর্ণ ধর্ম স্থাপন করবেন। হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্র ও অগ্নিপুরাণ অনুসারে ২ বা ৪ হাত। বিষ্ণুধর্মোত্তরে ২ হাত ; উদ্যত খড়্গ, ক্রুদ্ধ, হয়ারূঢ় এবং মহাবল। কোন বিগ্রহ পাওয়া যায় নি।

বিষ্ণুর একটি বিশ্বরূপ মূর্তি পাওয়া গেছে ; খৃ. ১১ শতকের যেন। মূর্তিটি রাজসাহি সংগ্রহশালাতে রয়েছে। গুপ্তযুগের একটি উৎকীর্ণ মূর্তি পাওয়া গেছে ; বিষ্ণু এখানে আকাশে গরুড়ের পিঠে বসে ; গজেন্দ্রকে একটি গ্রাহর (চেহারা কিন্তু সাপের) কবল থেকে রক্ষা করছেন (ভাগবৎ পুরাণ)। অমরাবতীর একটি উৎকীর্ণ চিত্রে মান্ধাতাকে পাওয়া যায় ; প্রতীক অনুসারে এটি বিষ্ণু মূর্তি।

অবতীর্ণ/অর্ধকীল—দর্ভী নির্মিত তীর্থ : চারটি সমুদ্রকেও এখানে স্থাপন করেছিলেন। ক্রিয়ামন্ত্র বিহীন ব্যক্তিও এখানে স্নান করলে বিপ্র হয় (মহা, ৩।৮১।১৩৫)।

অবদান—পালিতে অপদান। অর্থ উল্লেখযোগ্য কাজ। অবদানগুলি সংস্কৃতে লিখিত। এগুলিতে তথাগতের অতীত জীবনের ধর্ম-সম্বন্ধীয় উল্লেখযোগ্য কাজগুলির বর্ণনা আছে। অবদানে তিনটি অংশ থাকে—(১) বর্তমান প্রসঙ্গ, (২) অতীত কাহিনী, (৩) একটি নীতি। এই অতীত কাহিনীর নায়ক বোধিসত্ত্ব হলে অবদানকে জাতকও বলা যেতে পারে। কোন কোন অবদানে জাতক কাহিনীর বদলে বুদ্ধের ভবিষ্যৎবাণী রয়েছে। প্রথম পর্বের অবদানগুলিতে হীনযানী ভাবধারা এবং পরবর্তীকালে সম্পূর্ণ মহাযানী ভাবধারার প্রাধান্য। জাতকের ন্যায় অবদানও বৌদ্ধ সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট সম্পদ।

অপদান কাহিনীগুলিতে তথাগতের এবং বিখ্যাত শ্রাবক শ্রাবিকাদের জীবনী। জন্মজন্মান্তরের সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল ভোগ রূপে এবং কল্পান্তে অবস্থিত একাধিক বুদ্ধগণের প্রসাদে কেমন করে এ জন্মে পরমার্থ লাভ হয়েছে তারই কাহিনী। কবিতায় আবেগময় অকপট বর্ণনা। জাতকে নায়ক স্বয়ং তথাগত বুদ্ধ ; কাহিনীতে তাঁর বিভিন্ন জন্মের কার্যাবলী। অপদানের কাহিনী ভূতপূর্ব বুদ্ধদের আন্তরিক সেবা ও তারই ফলে ভবিষ্যৎ জীবনে জীবন্মুক্তি লাভ।

অবধ—অযোধ্যা।

অবধী—পূর্বী হিন্দির অন্তর্গত একটি উপভাষা। ব্রজভাষার পরই এর স্থান।

অবধূত—বর্ণাশ্রম-ধর্মহীন, সংসারাসক্তি রহিত সন্ন্যাসী। যঃ বিলঙ্ঘ্য আশ্রমবর্ণান্ আত্মনি এব স্থিতঃ পুমান্। অতিবর্ণাশ্রমী যোগী অবধূতঃ স উচ্যতে। একই সঙ্গে

ত্যাগ ও ভোগের অনুসরণ করেন অথচ কোনটিতেই আসক্ত নন। সব রকম প্রকৃতি বিকারকে উপেক্ষা করেন (অবধুনোতি) বলে নাম অবধূত। অবধূত অনেক রকম: শৈবাবধূত, ব্রহ্মাবধূত, হংসাবধূত, কৌলাবধূত, গৃহস্থ, দিগম্বর। বন, অরণ্য, ভারতী, গিরি, পুরী এ'দের উপাধি। হংসাবধূত=পরমহংস বা পূর্ণভক্তাবধূত। পরিব্রাট= অপূর্ণভক্তাবধূত। গৃহস্থ=সবস্ত্র, সস্ত্রীক, ভাবুক, সাধক, শুচি, গুরুভক্তিরত, নিষ্কাম, শিবার্চনপরায়ণ; মদ্য গ্রহণ ও অগম্যা গমন নিষিদ্ধ। দিগম্বরাবধূত=সর্বভোগী, সর্বজাতির ধর্মকর্মে রত; মদ্যগ্রহণ ও অগম্যাগমন বিহিত। পরমহংস=অপরিগ্রহ, নিষেধবিধিরহিত, আত্মভাব সন্তুষ্ট, শোক-মোহ শূন্য, নিঃসঙ্গ, কর্মত্যাগী।

অবন্তি—উজ্জৈন। প্রাচীন ভারতে একটি পরাক্রান্ত দেশ। রাজধানী উজ্জয়িনী, শিপ্রা নদীর তীরে। অনেক সময় উজ্জয়িনীকে (দ্রঃ—উজ্জৈন) অবন্তি এবং শিপ্রাকে অবন্তি নদী বলা হয়। মালব জাতির নাম থেকে অবন্তির আর এক নাম মালব বা পশ্চিম মালব (দ্রঃ)। সাতটি মোক্ষদায়িনী পুরীর একটি। মহাভারতের সময়ে দক্ষিণে নর্মদা উপকূল থেকে পশ্চিমে মহী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এর উত্তরে অবস্থিত রাজ্যের রাজধানী, চর্মণ্বতী নদীর তীরে, দশপুর বা বর্তমানে ধোলপুর। দশপুর রন্তিদেবের রাজধানী। অনর্ঘ রাঘবে অবন্তি দেশের রাজধানী উজ্জয়িনী।

বৌদ্ধ কিংবদন্তী অনুসারে অবন্তি নামে এক রাজা এখানে রাজত্ব করতেন। পুরাণে রাজা অবন্তিকে যদুকুলের হৈহয় শাখার মাহিষ্মতী নগরাধিপ কার্তবীর্যার্জুনের বংশজ বলা হয়েছে। আর একটি কিংবদন্তী অনুসারে কার্তবীর্য বংশীয় তালজঙ্ঘ থেকে পাঁচটি বংশ উৎপন্ন হয়:—ভোজ, বীতিহোত্র, শার্যাত, অবন্তি ও তুণ্ডিকের।

মনে হয় এক সময় দক্ষিণ নর্মাদা উপত্যকা পর্যন্ত অবন্তিদের অধিকার ছড়িয়ে পড়েছিল। এই অবন্তি দেশের উত্তর ও দক্ষিণ অংশে উজ্জয়িনী ও মাহিষ্মতীকে কেন্দ্র করে দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল মনে হয়। রাজধানী অবন্তিকে মাহিষ্মতীও বলা হয়। দক্ষিণ অবন্তি অবন্তি-দক্ষিণাপথ নামে বা অশ্মকাবন্তি নামেও পরিচিত। অশ্মক রাজ্যের রাজধানী ছিল অন্ধ্রের নিজামাবাদ অন্তর্গত বোধন (প্রাচীন পোদন্য)। অর্থাৎ অবন্তি-দক্ষিণাপথ নর্মদার দক্ষিণে বহুদূর বিস্তৃত ছিল। আর মাহিষ্মতী ছিল অনূপ দেশের রাজধানী। মূল অবন্তি আজকের পশ্চিম মালব। হিউএন্-ৎসাঙ্ উজ্জয়িনী ও মালবদেশকে স্বতন্ত্র ভাবে উল্লেখ করেছেন; এই মালব গুজরাটের মহী নদীর নিকট অবস্থিত ছিল। কাদম্বরীতে উজ্জয়িনী অবন্তির প্রধান নগর এবং বিদিশা মালবের প্রধান নগর। বর্তমানের ভিলসার কাছে বেসনগর হচ্ছে প্রাচীন বিদিশা।

ভারতের ঐতিহ্যে অবন্তি বা পশ্চিম মালবের রাজধানী উজ্জয়িনী সুপ্রসিদ্ধ। এখানকার মহাকাল মন্দির সুপরিচিত। কিংবদন্তীর শকারি বিক্রমাদিত্যের রাজধানীও এই উজ্জয়িনী। অবন্তির ইতিহাসে পুরাণ বর্ণিত প্রদ্যোত বংশ এবং গুপ্তপূর্ব যুগের শকরাজ বংশ প্রসিদ্ধ, শক ও গুপ্তযুগে উজ্জয়িনী জ্যোতিষ চর্চার একটি শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।

অবন্তিকক্ষেত্র—অবনি। মহীশূরে কোলর জেলাতে একটি তীর্থ। ফেরার পথে রাম এখানে এক বার নেমেছিলেন।

অবান্তবংশ—নহুষ-যযাতি-যদু। যদুর এক ছেলে সহস্রজিৎ। সহস্রজিতের বংশে হৈহয় এবং হৈহয় বংশে কনক। কনকের ছেলে কার্তবীর্যার্জুন। (দ্রঃ) অবন্তি। (অগ্নি)।

অবভৃথ—মুখ্য কর্মসমাপ্তিতে করণীয় যজ্ঞ-শেষ কর্ম। যজ্ঞাঙ্গভূত করণীয় স্নান। সোম যাগের শেষে যজমান সপত্নীক পুরোডাশ্‌ আহুতি দিয়ে স্নান করেন। প্রধান যজ্ঞের অঙ্গীভূত যজ্ঞ; যজ্ঞ শেষে কোন বিষয়ে যেন ন্যূনতা না ঘটে এ জন্য সকল ত্রুটি পূরণার্থে অনুষ্ঠিত যজ্ঞ।

অবলোকিতেশ্বর—ধ্যানীবুদ্ধ অমিতাভ ও তাঁর প্রজ্ঞা পাওরা থেকে অবলোকিতেশ্বরের উদ্ভব। অবলোকিতেশ্বর এক জন মহাযানী বোধিসত্ত্ব।

মহাযানী কারণ্ড-ব্যূহ গ্রন্থে আছে বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর নির্বাণ পেয়ে শূন্যে বিলীন হবার মুহূর্তে বহু জীবের আর্তনাদ শুনতে পান। তাঁর অভাবে ভীত জীবদের এই অবস্থা বুঝতে পেরে বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর প্রতিজ্ঞা করলেন যে যত দিন জগতের সমস্ত প্রাণী দুঃখ থেকে মুক্তি অর্থাৎ বোধিজ্ঞান না পাবে ততদিন তিনি তাদের মুক্তির জন্য কাজ করে যাবেন, নির্বাণে প্রবেশ করবেন না। অবলোকিতেশ্বরের অপর নাম পদ্মপাণি। নেপাল ও ভারতবর্ষে বহু মূর্তি পাওয়া গেছে। বর্তমানে এটি ভদ্রকল্প। এই কল্পে মানুষীবুদ্ধ শাক্যমুনির পর থেকে ভবিষ্যৎ মৈত্রেয় বুদ্ধ আসা পর্যন্ত সময়টি অবলোকিতেশ্বরদের কাল। যে কোন ধর্মে যে কোন উপাস্য দেবতা হিসাবে বা পিতা মাতা হিসাবে জীবের কাছে এসে জ্ঞান দিতে চেষ্টা করবেন। প্রথমে মানুষ এবং তারপর জীব এই জ্ঞান লাভ করে নির্বাণ পাবে। অবলোকিতেশ্বরকে সঙ্ঘরত্ন বলা হয়। মোটামুটি ১৫টি মূর্তি / রূপ পাওয়া যায়; ১০৮টি রূপেরও উল্লেখ আছে; এঁদের নাম ও বর্ণও বিভিন্ন। এই ১৫ জনের মধ্যে ১৪ জনের মাথায় অমিতাভের (দ্রঃ) মুকুট এবং ১৫-শ অবলোকিতেশ্বরের মাথায় ৫টি ধ্যানী বুদ্ধ।

(১) অবলোকিতেশ্বর ষড়ক্ষরী—বর্ণ শ্বেত, মুদ্রা অঞ্জলি, সর্ব অলঙ্কার, চারহাত; প্রতীক পদ্ম ও জপমালা। সঙ্গী মণিধর ও ষড়ক্ষরী মহাবিদ্যা। ডান দিকে পদ্মে মণিধর বাম দিকে ষড়াক্ষরী মহাবিদ্যা। এই অবলোকিতেশ্বরের চারটি ব্যূহ মূর্তি প্রচলিত; দুটিতে মণিধর ও ষড়ক্ষরী মহাবিদ্যা সঙ্গে রয়েছে। একটিতে কেবল মহাবিদ্যা এবং আর একটিতে অবলোকিতেশ্বর একা।

(২) অবলোকিতেশ্বর সিংহনাদ—বর্ণ শ্বেত, মাথায় জটা, অলঙ্কার হীন, পরিধান ব্যাঘ্র চর্ম। প্রতীক পদ্মের ওপর খড়্গ বা সর্পবেষ্টিত ত্রিশূল, আসন মহারাজ লীলা। বাহন সিংহ। ইনি সর্বরোগহর।

(৩) অবলোকিতেশ্বর খসর্পণ—বর্ণ শ্বেত, দুহাত, মুদ্রা বরদ, প্রতীক পদ্ম, জটা-মুকুট, সর্বালঙ্কার, বয়স ষোল। আসন ললিত বা অর্ধপর্যঙ্ক। সঙ্গে তারা, সুধনকুমার, ভৃকুটি ও হয়গ্রীব। সব সময়ই এঁরা সঙ্গী। অমৃত বিতরণ করছেন।

(৪) অবলোকিতেশ্বর লোকনাথ—শ্বেত বর্ণ, মুদ্রা বরদ। দুহাত, প্রতীক পদ্ম।

চারটি মূর্তি পূজিত হয় ; তিনটি একক মূর্তি এবং একটিতে সঙ্গে ডান দিকে তারা ও বাম দিকে হয়গ্রীব। মাথাতে জটা এবং জটাতে বজ্র-ধর্ম-দেব। আসন ললিত, পর্যঙ্ক বা বজ্রপর্যঙ্ক। সর্বরোগহর।

(৫) অবলোকিতেশ্বর হলাহল—বর্ণ শ্বেত, ছয় হাত, ডান দিকের মুখ নীল, মাঝখানে সাদা, বাম দিকে লাল। সঙ্গী প্রজ্ঞা। সাধারণত অঙ্কে অবস্থিত শক্তি। হুঙ্কার বীজ। জটাতে অর্দ্ধচন্দ্র ও কপাল। পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম। বরদ মুদ্রা, জপমালা, ধনু, বাণ, পদ্ম এবং একটি হাত শক্তির স্তন-স্পর্শ। এই শক্তি এঁর নিজের সৃষ্টি। লালপদ্মের ওপর ললিত আসন।

(৬) অবলোকিতেশ্বর পদ্মনর্তেশ্বর—এক মাথা, ১৮-হাত ; আসন নৃত্যরত বা অর্দ্ধপর্যঙ্ক। প্রতীক প্রতিহাতে দুটি করে পদ্ম। মাথাতে জটামুকুট। বহু যোগিনী পরিবৃতা। দিব্য আভরণ। দুপাশে তারা, সুধন, ভৃকুটি ও হয়গ্রীব। আরো দু ধরণের মূর্তি দেখা যায়ঃ—(৬ক) রঙ লাল, দু হাত, ডান হাতে সূচী, মুদ্রা, সঙ্গে শক্তি। প্রতীক পদ্ম, বাহন পশু। সর্বরত্ন বিভূষিত। বামে পাণ্ডরবাসিনী দ্বারা আলিঙ্গিত এবং বাম হাতে শক্তিকে আলিঙ্গনে ধরে রেখেছে। যে পদ্মে বসে সেই পদ্মে আটটি দল ; প্রতি দলে একজন দেবী। (৬খ)—রঙ লাল, আট হাত, আসন নৃত্য-অর্ধপর্যঙ্ক। হ্রং-বীজ। জটামুকুট, তিন চোখ। সর্বাভরণ; নাগোপবীত, সূচী-মুদ্রা, পদ্ম, দণ্ড ও ত্রিশূল।

(৭) অবলোকিতেশ্বর হরিহরিহরি-বাহন—বর্ণ শ্বেত, জটামুকুট, শান্ত বেশ। হাতে তথাগত-সাক্ষী মুদ্রা, অক্ষমালা, উপদেশ মুদ্রা, দণ্ড, মৃগচর্ম, কমণ্ডলু ছয় হাত। বাহন সিংহ, গরুড় ও বিষ্ণু। সব চেয়ে নীচে সিংহ তার ওপর গরুড় তার ওপর বিষ্ণু। বিষ্ণুর কাঁধে এই অবলোকিতেশ্বর।

(৮) অবলোকিতেশ্বর ত্রৈলোক্য বংশকর—উড্ডীয়ান। বর্ণ লাল, মুখ এক, তিন চোখ, দু হাত। লাল পদ্মের ওপর। আসন বজ্র-পর্যঙ্ক। মাথাতে জটা, হাতে পাশ ও অঙ্কুশ ; দিব্য আভরণ ও বস্ত্র। উড্ডীয়ানে সব চেয়ে বেশি পূজিত হতেন বলে অপর নাম উড্ডীয়ান (দ্রঃ)।

(৯) অবলোকিতেশ্বর রক্তলোকেশ্বর—(৯/ক) চার হাত, লাল রঙ ; বামে তারা ডান দিকে ভৃকুটি। বেশভূষা লাল, হাতে পাশ, অঙ্কুশ, ধনু ও বাণ ; লাল ফুলে ভরা অশোক গাছের নীচে দণ্ডায়মান। (৯/খ) দুহাত, বর্ণ লাল, প্রতীক পদ্ম, মুদ্রা উন্মীলন-দল। জটামুকুট। হাতে রক্তপদ্ম ; অপর হাতে পদ্মের দল বিকাশয়ন্তম্। বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত।

(১০) অবলোকিতেশ্বর মায়াজালকর্ম—৫-মুখ, ত্রিনেত্র, ১২-হাত, বর্ণ নীল, আসন প্রত্যালীঢ়। ভয়ঙ্কর মূর্তি। ডান দিকে দুটি মুখ সাদা ও লাল বাম দিকে দুটি পীত ও হরিৎ। হাতে ডমরু, খট্টাঙ্গ, অঙ্কুশ, পাশ, বজ্র বাণ, তর্জনীমুদ্রা, কপাল, রক্তপদ্ম, রত্ন, চক্র, ধনু। মুখে করাল দংষ্ট্রা, গলাতে মুণ্ডমালা এবং অস্থিগঠিত ছয়টি অলঙ্কার। দিগম্বর।

(১১) অবলোকিতেশ্বর নীলকণ্ঠ—বর্ণ পীত, রক্তপদ্মের ওপর কৃষ্ণাজিন, আসন বজ্রপর্যঙ্ক, মুদ্রা সমাধি, প্রতীক কপাল। সঙ্গী দুপাশে গোক্ষুরা সাপ, মাথায় মণি। জটা-মুকুটে চন্দ্রকলা, হাতে সমাধিমুদ্রা। এনেয় চর্ম যজ্ঞোপবীত। ব্যাঘ্রচর্ম পরিধানে। অলঙ্কারহীন। গলা বিষ যোগে নীল।

(১২) অবলোকিতেশ্বর সুগতিসন্দর্শন—বর্ণ শ্বেত, হাত ছয়। বরদ, অভয়, অক্ষসূত্র, পদ্ম, কমণ্ডলু, দণ্ড, জটামুকুট। বস্ত্রালঙ্কারভূষিত, উপবীত।

(১৩) অবলোকিতেশ্বর প্রেতাসনতর্পিত—বর্ণ শ্বেত, হাত ছয়, জটামুকুট। প্রথম দু হাত বরদ মুদ্রা। দ্বিতীয় দুটি হাত রত্ন, পুস্তক, এবং বাকি দু হাতে অক্ষমালা এবং ত্রিদণ্ডী। যজ্ঞোপবীত, জটালঙ্কার ভূষিত।

(১৪) অবলোকিতেশ্বর সুখাবতী--বর্ণ শ্বেত, মুখ তিন, হাত ছয়, আসন ললিত, সঙ্গে শক্তি। দু হাতে তীর ছুঁড়ছেন, অক্ষমালা ; এক হাত তারার উরুতে। পদ্মের ওপর অবস্থিত। পাশে ঘিরে বজ্রতারা, বিশ্বতারা, পদ্মতারা ইত্যাদি। মাথার ওপর চৈত্য।

(১৫) অবলোকিতেশ্বর বজ্রধর্ম—বর্ণ সিতরক্ত, বাহন ময়ূর। প্রতীক পদ্ম। হাতে ১৬-দল পদ্ম অপর হাতে দলগুলিকে বিকশিত করছেন।

অবলোকিতেশ্বর কল্পনা খ্-পূ ৩ শতকে চালু হয়েছিল। প্রায় অশোকের সময় মহাবস্তু অবদানে উল্লেখ আছে। মানুষের সুখের জন্য ও মঙ্গলের জন্য সর্বদা উপদেশ দিচ্ছেন। এঁরা লোকেশ্বর নামেও উল্লিখিত ; যথা হয়গ্রীব লোকেশ্বর ইত্যাদি।

এঁদের ১০৮টি মূর্তির নাম ঃ—

(১) হয়গ্রীব, (২) মোজঘাঞ্জবল (?), (৩) হলাহল, (৪) হরিহরিহরি বাহন, (৫) মায়াজাল-কর্মা, (৬) ষড়ক্ষরী, (৭) আনন্দাদি, (৮) বশ্যাধিকার, (৯) পোতপাদ, (১০) কমণ্ডলু, (১১) বরদায়ক, (১২) জটামুকুট, (১৩) সুখাবতী, (১৪) প্রেতসন্তর্পণ, (১৫) মায়াজালকর্মক্রোধ, (১৬) সুগতিসন্দর্শন, (১৭) নীলকণ্ঠ, (১৮) লোকনাথ, (১৯) ত্রিলোকসন্দর্শন, (২০) সিংহনাথ, (২১) খসর্পণ, (২২) মণিপদ্ম, (২৩) বজ্রধর্ম, (২৪) পুপল, (২৫) উৎনৌতি (?), (২৬) বৃক্ষাচন, (২৭) ব্রহ্মদণ্ড, (২৮) অচাট (?), (২৯) মহাবজ্রসত্ত্ব, (৩০) বিশ্বহন, (৩০) শাক্যবুদ্ধ, (৩২) সান্ত্যাসি, (৩৩) যমদণ্ড, (৩৪) বজ্রউষ্ণীষ, (৩৫) বজ্রহুণ্টিক, (৩৬) জ্ঞানধাতু, (৩৭) কারণ্ডব্যূহ, (৩৮) সর্বনিবরণ-বিষ্কম্ভী, (৩৯) সর্বশোকতমনির্ঘাত, (৪০) প্রতিভানকূট, (৪১) অমৃতপ্রভা, (৪২) জ্বালিনীপ্রভা, (৪৩) চন্দ্রপ্রভা, (৪৪) অবলোকিত, (৪৫) বজ্রগর্ভ, (৪৬) সাগরমতি, (৪৭) রত্নপাণি, (৪৮) গগনগঞ্জ, (৪৯) আকাশগর্ভ, (৫০) ক্ষিতিগর্ভ, (৫১) অক্ষয়মতি, (৫২) সৃষ্টিকান্তা, (৫৩) সমন্তভদ্র, (৫৪) মহাসহস্রভুজ, (৫৫) মহারত্নকীর্তি, (৫৬) মহাশঙ্খনাথ, (৫৭) মহাসহস্রসূর্য, (৫৮) মহারত্নকুল, (৫৯) মহাপাতাল, (৬০) মহামঞ্জুদত্ত, (৬১) মহাচন্দ্রবিম্ব, (৬২) মহাসূর্যবিম্ব, (৬৩) মহাঅভয়ফলদ, (৬৪) মহাঅভয়কারী, (৬৫) মহা-

মঞ্জুভূত, (৬৬) মহাবিশ্বশুদ্ধ, (৬৭) মহাবজ্রধাতু, (৬৮) মহাবজ্রধৃক, (৬৯) মহা-বজ্রপাণি, (৭০) মহাবজ্রনাথ, (৭১) অমোঘপাশ, (৭২) দেবদেবতা, (৭৩) পিণ্ডপাত্র, (৭৪) সার্থবাহ, (৭৫) রত্নদল, (৭৬) বিষ্ণুপাণি, (৭৭) কমলচন্দ্র, (৭৮) বজ্রখণ্ড, (৭৯) অচলকেতু, (৮০) শিরিশরা(?), (৮১) ধর্মচক্র, (৮২) হরিবাহন, (৮৩) সরশিরি (?), (৮৪) হরিহর, (৮৫) সিংহনাদ, (৮৬) বিশ্ববজ্র (৮৭) অমিতাভ (৮৮) বজ্রসত্ত্বধাতু, (৮৯) বিশ্বভূত, (৯০) ধর্মধাতু, (৯১) বজ্রধাতু, (৯২) শাক্যবুদ্ধ, (৯৩) চিত্তধাতু, (৯৪) চিন্তামণি, (৯৫) শান্তমতি, (৯৬) মঞ্জুনাথ, (৯৭) বিষ্ণুচক্র, (৯৮) কৃতাঞ্জলি, (৯৯) বিষ্ণুকান্তা, (১০০) বজ্রসৃষ্ট, (১০১) শঙ্খনাথ, (১০২) বিদ্যাপতি, (১০৩) নিত্যনাথ, (১০৪) পদ্মপাণি, (১০৫) বজ্রপাণি, (১০৬) মহাস্থামপ্রাপ্ত, (১০৭) বজ্রনাথ, (১০৮) শ্রীমদার্যাবলোকিতেশ্বর।

অবস্তু—বেদান্তে ব্রহ্ম ব্যতীত সমস্ত কিছু।

অবস্থাচতুষ্টয়—দেহের চারটি অবস্থা। বাল্য, ১৫ পর্যন্ত ; কৌমার, ৩০ পর্যন্ত ; যৌবন, ৫০ পর্যন্ত ; তারপর বার্দ্ধক্য (বৈদ্যক)।

অবস্থাত্রয়—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি জীবের তিন অবস্থা (বেদান্ত)।

অবস্থাষটক—জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয়, নাশ, জীবের এই ছয় অবস্থা বা ভাব (যাস্ক)।

অবস্থান—সূর্যের পথ তিন অংশে বিভক্ত। উত্তর অবস্থান ঐরাবত ; মধ্যম অবস্থান জারদগব, দক্ষিণ অবস্থানের নাম বৈশ্বানর।

অবহট্‌ঠ—প্রাকৃত ও নবীন ভারতীয় আর্যগোষ্ঠী ভাষার মধ্যবর্তী অবস্থার সাহিত্যিক ভাষা। বৌদ্ধ তান্ত্রিক, শৈব বা নিরীশ্বর যোগীদের লেখা দোহার ভাষা। অবহট্‌ঠ=অপভ্রষ্ট। বৌদ্ধ যোগী সরহ ও কাহ্ন সংস্কৃতে তত্ত্বকথা, নবজাতক-বাঙলায় গান এবং অবহট্‌ঠে নীতি ও অধ্যাত্মজ্ঞানের কথা লিখেছিলেন। সাধক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ভাষা সীমাবদ্ধ ছিল না। সাধারণ সাহিত্যেও এই ভাষা (৭০০-১০০০ খৃস্টাব্দে) চালু ছিল। আনুমানিক ১৫০০ খৃস্টাব্দে রচিত প্রাকৃত পৈঙ্গলের অধিকাংশ সূত্রশ্লোক ও উদাহরণ কবিতা এই অবহট ভাষায় লেখা। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বিদ্যাপতির 'কীর্তি লতা' এই অবহট্‌ঠে রচিত।

অবাচীন—ছেলে অরিহা।, (গী-প্রে ১।৯৫।১৮)।

অবিক্ষিৎ—(১) রাজা করন্ধম ও রাণী সুবর্জার ছেলে। সাত জন স্ত্রী বরা, গৌরী, সুভদ্রা, লীলাবতী, বিভা, মঙ্গবতী ও কুমুদবতী। আর একটি স্ত্রী বৈশালিনী ; অন্য রাজাদের পরাজিত করে স্বয়ংবর থেকে একে নিয়ে আসেন। পরাজিত রাজারা আবার একত্র হয়ে অবিক্ষিৎকে বন্দী করেন। শেষ পর্যন্ত করন্ধম ছেলেকে মুক্ত করে আনেন। অবিক্ষিতের ছেলে মরুত্ত (মহা ১৪।৪)। (২) কুরু ও তাঁর স্ত্রী বাহিনীর একটি ছেলে। (গী-প্রে ১।১৪।৫১)।

অবিন্ধ্য—একজন বৃদ্ধ মন্ত্রী রাক্ষস। রাবণকে সীতা ফিরিয়ে দিতে উপদেশ দিয়ে-

ছিলেন (রা ৬।৩৪।২০)। ত্রিজটাকে পাঠিয়েছিলেন সীতাকে আশ্বাস দিতে এবং জানাতে নলকুবরের শাপের জন্য রাবণ সীতাকে স্পর্শ করতে পারবে না। ত্রিজটাকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছিলেন সে স্বপ্ন দেখেছে (মহা ৩।২৬৪।৫৪) রাম লক্ষ্মণ কুশলে আছেন। সুগ্রীবের সঙ্গে বন্ধুতা করেছেন। তৈলসিক্ত বিকচ রাবণ পাঁকে ডুবে যাচ্ছে এবং খরযুক্ত রথে চড়ে নাচছে। কুম্ভকর্ণাদি নগ্নদেহে পতিত-মূর্দ্ধজা এবং রক্তমাল্যানুলেপনাঃ দক্ষিণ দিক যাচ্ছে। বিভীষণ শুক্লমাল্য ধারণ করে অনুরূপ অলঙ্কৃত চারজন সচিবকে নিয়ে শ্বেত পর্বতে অবস্থিত। রাম অস্থিসঞ্চয়ের ওপর বসে মধুপায়স খাচ্ছেন ; লক্ষ্মণ চারদিকে চোখ রাখছেন এবং সীতা রুদন্তী রুধিরার্দ্রাঙ্গী ব্যাঘ্রেণ পরিরক্ষিতা উত্তর দিকে যাচ্ছেন।—দ্রঃ স্বপ্ন। হনুমান অশোক বনে সীতাকে নিজের পরিচয় দিলে সীতা হনুমানকে বিশ্বাস করেছিলেন। কারণ এই অবিন্ধ্যই হনুমানের কথা জানিয়ে গিয়েছিল (মহা ৩।২৬৬।৬৪)। ইন্দ্রজিৎ মারা গেলে রাবণ সীতাকে হত্যা করতে যায় ; অবিন্ধ্য রাবণকে নিরস্ত করেন। এই বৃদ্ধ সুপ্রাজ্ঞ অমাত্য যুদ্ধের পর সীতাকে রামের কাছে এনে অর্পণ করেন। রামায়ণে ইনি অবিন্ধ।

অবিশ্বাসবাদ—দ্রঃ-অজ্ঞাবাদ।

অব্দ—বৎসর। ভারতে অনেকগুলি অব্দ চালু হয়েছিল। যেমন পঞ্চাব্দ, দ্বাদশাব্দ, ষষ্ট্যব্দ, কল্যব্দ, অশোকাব্দ, শকাব্দ, বিক্রম-অব্দ, বুদ্ধাব্দ, জৈনাব্দ, গুপ্তাব্দ, গুপ্তবলভীসংবৎ, কলচুরি বা চেদি অব্দ। পঞ্চাব্দ হিসাব হত পাঁচ-বছর চক্রের ওপর নির্ভর করে ; অর্থাৎ ৫-বছর অন্তর সূর্য ও চন্দ্র আকাশে একই স্থানে এসে হাজির হয়। চন্দ্রসূর্যের এই জাতীয় দুটি ক্রমিক মিলনের অন্তর্গত দিনগুলিকে ৫-টি অব্দে বা বৎসরে ভাগ করে দেওয়া হত। এই মিলনের দিনটি ছিল প্রতি ৫-বর্ষ চক্রের প্রথম দিন। বেদাঙ্গ জ্যোতিষে (প্রায় ১৩৫০ খৃ পূ) এই ভাবে পঞ্জিকা গণনার পদ্ধতি দেওয়া আছে। আরো আগে থেকে অর্থাৎ বৈদিক সংহিতার যুগ থেকেই এই পদ্ধতি চালু ছিল মনে হয়। প্রতি ৫-বছর পরে আকাশে গ্রহনক্ষত্রাদির অবস্থান গণনায় কিছুটা ভুল দেখা দিত এবং সেটি সংশোধন করে নিতে হত। ৮০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত এই পদ্ধতি চালু ছিল। দ্বাদশাব্দ ঃ—সম্পূর্ণ রাশি চক্র ভ্রমণ করতে বৃহস্পতির বার বছর লাগে। অর্থাৎ এই দিনগুলিকে বারটি বছরে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। এটিও প্রাচীন পদ্ধতি ; কবে চালু হয়েছিল স্পষ্ট নয়। এই পদ্ধতিতেও প্রতি ১২-বছর অন্তর অন্যান্য গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান গণনায় যে ভুল দেখা যাচ্ছিল সেই ভুলকে ভ্রমের হারের সাহায্যে সংশোধন করে নেওয়া হত। ১২-অব্দের ভ্রমের পরিমাণ ৫-অব্দ পদ্ধতির ভ্রমের থেকে অনেক কম। এই দুটি প্রথাকে ত্যাগ করে খৃ ৫ শতকে ষষ্ট্যব্দ অর্থাৎ ৬০-বছর চালু করা হয়েছিল। কোন জ্যোতিষ্কের পরিক্রমার ওপর নির্ভর এই গণনা নয় ; ৫-অব্দ ও ১২-অব্দের এটি একটি সমন্বয়। এই গণনাতে প্রতি ৬০ বছর অন্তর আকাশে গ্রহনক্ষত্রের অবস্থানের পুনরাবৃত্তি হতে থাকে এবং ভুল প্রমাদও অনেক কমে যায়। এই ষষ্ট্যব্দ ভারতে এখনও চালু রয়েছে ; দক্ষিণ ভারতে এটি সমধিক প্রচলিত ; নাম বার্হস্পত্যাব্দ। ৬০ বছর এই চক্রের অন্তর্গত প্রতিটি বছরের বিভিন্ন নাম আছে। সপ্তর্ষি চার-অব্দ ঃ—

এটি মোটামুটি শতাব্দী গণনার একটি পদ্ধতি। এক একটি শতাব্দীকে ভচক্রস্থ এক একটি নক্ষত্রের নামে উল্লেখ করা হত। কল্পনা করা হয়েছিল সপ্তর্ষিমণ্ডল একশ বছর ধরে এক একটি নক্ষত্রে অবস্থান করেন। এটি নিছক কল্পনা ; পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক নয়। এই পদ্ধতিতে শতাব্দীর নামকরণ হত নক্ষত্রের নাম অনুসারে। অবশ্য এই একশ বছরকে পঞ্চাব্দ চক্রে ভাগ করে কুড়িযুগে এক শতাব্দী বলা হত ; এবং পঞ্চাব্দ হিসাব যেমন ভাবে হয়ে থাকে তেমনি হত। কাশ্মীর ও পার্শ্ববর্তী প্রদেশে এই গণনা চালু ছিল। বৃদ্ধগর্গ মতে মঘা শতাব্দী আরম্ভ হয়েছিল ৩১৭৭ খৃ-পূ। মঘা শতাব্দীর আরম্ভের তারিখ সম্বন্ধে অর্থাৎ শতাব্দী গণনায় অনেক মতানৈক্য রয়েছে। কল্যব্দ ৩১০২ খৃ-পূর্বাব্দ ১৭-১৮ ফেব্রুয়ারির মধ্য রাত্রি থেকে অর্থাৎ ১৮ ফেব্রুয়ারির সকাল থেকে এই কলি অব্দের হিসাব করা হয়। এই অব্দ সর্বভারতে প্রচলিত। ৪৯৯ খৃস্টাব্দে আর্যভট এই কলি-অব্দের হিসাব করেন ; তাঁর হিসাব অনুসারে ৩১০২ খৃ-পূর্বাব্দে কলিযুগের সুরু। হিসাবের সুবিধার জন্য এই কল্যব্দ সৃষ্টি করা হয়েছিল। আর্যভটের হাতে যে সমস্ত তথ্য ছিল তা থেকে গণনা করতে করতে দেখান ৩১০২ খ্রী-পূ ১৭-১৮ ফেব্রুয়ারিতে রাহু ছাড়া অন্য গ্রহগুলির মধ্যাবস্থান মেষ রাশির অতি সন্নিকটে ঘটেছিল। অবশ্য আর্যভটের এ হিসাব প্রমাদ যুক্ত। অধুনা প্রাপ্ত তথ্য থেকে হিসাব করে দেখা যায় গ্রহগুলি ঠিক একত্র ছিল না ; ৫০ ডিগ্রির মধ্যে ছড়ান ছিল। ৬৩৪-৬৩৫ খৃস্টাব্দের এক শিলালিপিতে কল্যব্দের প্রথম ব্যবহার দেখা গিয়েছিল। জ্যোতিষ্কগণের অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে এই সমস্ত অব্দ চালু করা হয়েছিল কিন্তু এ ছাড়াও অন্যান্য অব্দও চালু হয়েছিল।

সম্রাট অশোক এক অব্দ গণনা চালু করেন ; নাম বিক্রমাব্দ বা অশোকাব্দ কিন্তু কবে থেকে এই কাল চালু হয়েছিল কোথাও কোন হিসাব পাওয়া যায় না। ২৭৩-২৬৪ খৃ-পূর্বে মনে হয় অশোক অব্দের প্রথম দিন ; তাঁর অভিষেকের দিন থেকে সুরু। আর একটি বিক্রমাব্দ চালু করেছিলেন উজ্জয়িনীর এক রাজা বিক্রমাদিত্য। ৫৮ খৃ-পূর্বে এর আরম্ভ। কিন্তু ইতিহাসে ঐ সময়ে ঐখানে ঐ নামে কোন রাজা ছিলেন না। বাংলা ছাড়া উত্তর-ভারতে সর্বত্র এই অব্দ আজও চালু আছে। উত্তর ভারতে চৈত্র-শুক্লপ্রতিপদ থেকে, গুজরাটে কার্তিক শুক্ল প্রতিপদ থেকে এবং কচ্ছে আষাঢ় শুক্ল প্রতিপদ থেকে এই অব্দের আরম্ভ।

শকাব্দ আরম্ভ ৭৮ খৃস্টাব্দ থেকে। দক্ষিণ-ভারতে এর নাম শালিবাহনাব্দ বা শালিবাহন শক। মনে হয় সম্রাট কণিষ্ক এর প্রবর্তক। এই অব্দ সর্বভারতে চালু আছে। চান্দ্র গণনায় চৈত্র শুক্লপ্রতিপদ থেকে এবং সৌরগণনায় মেষাদি থেকে এই অব্দ গণনা করা হয়। মনে হয় শকরাজারা ব্যাকট্রিয়া জয় করার সময় থেকে অর্থাৎ ১২৩ খৃ-পূর্বাব্দে এই শকাব্দের সুরু কিন্তু প্রথম দিকের ২০০ বছরকে এক একটি শতক হিসাবে ধরা হয়েছিল এবং শতাব্দী শেষ হতে আবার নতুন করে প্রথম অব্দ দ্বিতীয় অব্দ হিসাব হয়েছিল। কণিষ্কের সময় থেকে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে শকাব্দের হিসাব চালু হয় এবং বরাহমিহিরের সময় থেকে সারা ভারতে চালু হয়েছে। বর্তমানে

ভারত সরকারও এই শকাব্দ স্বীকার করে নিয়েছেন। এজেস্ অব্দ শকাব্দের প্রাচীন আর এক নাম।

বুদ্ধাব্দ চালু হয়েছিল বুদ্ধের পরিনির্বাণের সময় থেকে। এর আরম্ভ ৫৪৫ খৃ পূর্বে। যদিও বুদ্ধের পরিনির্বাণ হয়েছিল (মনে হয়) ৪৮৩ খৃ-পূর্বাব্দে। সিংহলে খৃস্ট পূর্ব প্রথম শতাব্দী থেকেই এই হিসাব চালু হয়েছিল। ভারতে ত্রয়োদশ শতক থেকে প্রচলিত হয়। জৈনাব্দ গণনা হয় মহাবীরের নির্বাণ কাল থেকে, ৫২৮ খৃ-পূ। রাজা চন্দ্রগুপ্ত ৩১৯ খৃস্টাব্দে গুপ্তাব্দ চালু করেন। ৫৫০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত সৌরাষ্ট্র থেকে বাংলা পর্যন্ত সমস্ত উত্তর ভারতে চালু ছিল। গুপ্তবংশের পতনের পর কাঠিওয়াড়ের বলভী দেশের রাজাদের নামে গুপ্তাব্দের নাম হয়েছিল গুপ্তবলভী সংবৎ। ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত গুজরাট ও রাজপুতনায় এই অব্দ চালু ছিল। কলচুরি বা চেদি অব্দ ২৪৮-২৪৯ খৃস্টাব্দে আরম্ভ। মধ্যপ্রদেশে প্রচলিত। হর্ষবর্ধন সিংহাসনে বসেন ৬০৬ খৃস্টাব্দে ; এবং এই উপলক্ষ্যে হর্ষাব্দ চালু করেছিলেন। ভাটিকাব্দ সুরু হয়েছিল ৬২৪ খৃস্টাব্দে। গাঙ্গেয়াব্দ প্রচলিত ছিল উড়িষ্যায় ; সম্ভবত পঞ্চম শতাব্দীর শেষে ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝে সুরু। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজরা মল্লাব্দ ব্যবহার করতেন। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা আদিমল্লের রাজ্যকাল ৬৯৪ খৃ থেকে এর সুরু। লক্ষ্মণাব্দ মিথিলায় প্রচলিত। সম্ভবত বিজয় সেন যখন মিথিলা জয় করেন তখন পৌত্র লক্ষ্মণ সেনের জন্ম সংবাদ পেয়ে এই অব্দ চালু করেন। এর আরম্ভ ১১০৮-১১১৯ খৃস্টাব্দের মধ্যে।

অব্যপদেশ্য—ন্যায়ে নির্বিকল্প জ্ঞান। কোন বস্তু দেখে শিশু নাম করতে পারে না। ইন্দ্রিয় সামান্য ভাবে বস্তু গ্রহণ করে ; মন নাম দিয়ে উল্লেখযোগ্য করে নেয়।

অভঙ্গ—মারাঠী সন্ত কবিদের ভক্তি গীতির নাম। ১৩শ থেকে ১৮শ শতকে মহারাষ্ট্রে ধর্মীয় আন্দোলন এসেছিল ; সেই সময়কার ধর্মীয় গীতি। জনসাধারণের কাছে ভক্তি ও দর্শন পৌঁছে দিয়েছিল এই অভঙ্গ। ওবি নামে আরো পুরাতন একটি জনপ্রিয় ছন্দ থেকে এই অভঙ্গ ছন্দের জন্ম। বাঁধা ধরা ছন্দ রূপ নাই ; গীতিধর্মের প্রাচুর্যই বেশি। গুরু-গ্রন্থ সাহেবেও কিছু অভঙ্গ গীতি স্থান পেয়েছে। সন্ত তুকারামের প্রায় ৪৫০০ অভঙ্গ পাওয়া যায়। অভঙ্গ রচনায় এক দিন সমাজের সকল মানুষ কামার, কুমার, তেলি, মুসলমান, তাঁতি, কসাই সকলে যোগ দিয়েছিল। ভক্তির জগতে একটা বিরাট বন্যার প্লাবন এনে দিয়েছিল ; সঙ্গে দর্শনও ছিল।

অভয়দেবসূরি—একাদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ জৈন টীকাকার। প্রাকৃত ভাষায় এঁর বইয়ের নাম 'জয়তিহুয়ণ'। একবার অসুস্থ হয়ে পড়লে এই বইটির মহিমায় 'রোগমুক্ত হন এবং পার্শ্বনাথের একটি মূর্তি উদ্ধার করেন। এঁর বহু শিষ্য ছিল। স্থানাঙ্গ, ভগবতীব্যাখ্যা প্রজ্ঞপ্তি, জ্ঞাতৃধর্মকথা, উপাসকদশাসূত্র, অন্তকৃদ্-দশাসূত্র প্রশ্নব্যাকরণের টীকা, সম্মতিতর্ক-প্রকরণের টীকা, অষ্টকবৃত্তি ইত্যাদি গ্রন্থের লেখক। এঁর শিষ্য মালাধারী হেমচন্দ্র।

অভয়া—ভগবতীর একটি রূপ ; সিংহবাহিনী অষ্টভুজা। এই রূপে দানবদের ধ্বংস করে দেবতাদের অভয় দেন, ফলে এই নাম।

অভিচার—অথর্ববেদীয় মন্ত্রযন্ত্র সাধিত মারণাদি হিংসাত্মক ক্রিয়া। মারণ, মোহন, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন, বশীকরণ, এই ছয় রকম তান্ত্রিক প্রয়োগ। অপরের অনিষ্ট-সাধন বা অপরের দ্বারা অনিষ্টের প্রতিকার সাধনের জন্য তান্ত্রিক প্রয়োগ।

অভিজিৎ—(১) নক্ষত্র বিশেষ। ভেগা। তিনটি নক্ষত্র গঠিত; পানিফলের মত। উত্তরাষাঢ়ার শেষ পনের দণ্ড ও শ্রবণার প্রথম চার দণ্ড এই ১৯ দণ্ড এর কাল। এই নক্ষত্রে জন্মালে ললিত কান্তি, সজ্জনসম্মত, বিনীত, কীর্তিমান, সুবেশ, দেবদ্বিজভক্ত ও স্পষ্টবক্তা হয়। (২) দিনের অষ্টম মুহূর্ত অর্থাৎ মধ্যাহ্নের ২৪ মিনিট আগে থেকে ২৪ মিনিট পর পর্যন্ত মোট ৪৮ মিনিট কাল। (৩) দিনকে পনের ভাগ করলে তার অষ্টম ভাগ অভিজিৎ বা কুতপ কাল। (৪) যদুবংশীয় ভবের ছেলে।

অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্—কালিদাসের নাটক। দুষ্যন্ত (দ্রঃ) শকুন্তলার (দ্রঃ) কাহিনী উপজীব্য।

অভিধম্মকোশ—দার্শনিক বসুবন্ধু রচিত। ৬০০ কারিকায় অভিধর্মের সকল বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। সর্বাস্তিবাদী বৌদ্ধদের জন্য লিখিত। আট খণ্ডে রচিত। ধাতু, ইন্দ্রিয়, কর্ম, জ্ঞান ও ধ্যান সম্বন্ধে আলোচনা। শেষ অধ্যায়ে আত্মা সম্বন্ধে বৌদ্ধ মতবাদের বিশেষ রূপটি পরিস্ফুট। মূল সংস্কৃত পুঁথি নাই; এর টীকা স্ফুটার্থা-ভিধম্ম-কোশব্যাখ্যা। পরমার্থ; হিউএন্-ৎসাঙ কৃত চীনা অনুবাদ পাওয়া যায়। সমস্ত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ই পাঠ্য হিসাবে এই বই গ্রহণ করেছেন।

অভিধম্মপিটক—দ্রঃ-পিটক।

অভিধম্মাবতার -উরগপুর অধিবাসী বুদ্ধদত্ত কৃত অভিধর্ম গ্রন্থ। অভিধর্ম শিক্ষার ভূমিকা। বুদ্ধ ঘোষের বিসুদ্ধিমগ্‌গের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। বুদ্ধদত্তের আলোচনা সবটাই প্রাঞ্জল; শব্দ সম্পদে সমৃদ্ধ। পদ্যে লেখা; জায়গায় জায়গায় গদ্যে লেখকের স্বীয় ব্যাখ্যা। চোড়দেশে এই বই লেখা হয়েছিল। এর দুটি টীকা মহাবিহারবাসী বাচিস্‌সর মহাসামি কৃত এবং সারিপুত্ত শিষ্য সুমঙ্গল কৃত।

অভিনন্দন—চতুর্থ জৈন তীর্থঙ্কর।

অভিনবগুপ্ত—কাশ্মীরীয় আচার্য। ভারতের মধ্যযুগের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে বিরাট জ্যোতিষ্ক। ৯৫০-৯৬০ খৃস্টাব্দে জন্ম। কান্যকুব্জ অধিবাসী মহাপণ্ডিত অত্রিগুপ্ত ৭৪০ খৃস্টাব্দে কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্যের অনুরোধে কাশ্মীরে বিতস্তা তীরে প্রবরপুর নগরীতে রাজার দেওয়া জমিতে বাস করতে থাকেন। এ'র বংশে দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে বরাহগুপ্ত জন্মান। বরাহগুপ্তের ছেলে নরসিংহগুপ্ত (বা চখখ্লক)। সকলেই এ'রা নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। অভিনবগুপ্তের মা বিমলা বা বিমলকলা; শৈশবেই মা মারা যান; পিতা নরসিংহের কাছে শব্দশাস্ত্র ও ব্যাকরণ শেখেন। ভূতিরাজের কাছে ব্রহ্মবিদ্যা, লক্ষ্মণগুপ্তের কাছে ক্রম ও ত্রিক বা প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন, ভট্টেন্দুরাজের কাছে গীত, সাহিত্য, অলঙ্কার, ভট্টতোতের কাছে নাটশাস্ত্র প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন। তর্ক, বৈশেষিক, বৌদ্ধ, জৈন ও বৈষ্ণব দর্শনও তাঁর আয়ত্ত ছিল এবং শিক্ষা লাভের জন্য দেশান্তরেও পর্যটন করেছিলেন।

অভিনবগুপ্ত কঠোর জৈন সাধক ছিলেন এবং আজীবন ব্রহ্মচারী। কাশ্মীরের লোক তাঁকে সাক্ষাৎ ভৈরব অবতার মনে করতেন। পরিণত বয়সে বারশ শিষ্যের সঙ্গে কাশ্মীরের কাছে ভৈরুবগুহায় প্রবেশ করে স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করেন।

শৈব আগম শাস্ত্র, প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন, অলঙ্কার ও নাট্যশাস্ত্রের ওপর অগণিত বই লিখেছিলেন। বোধপঞ্চদশিকা, মালিনীবিজয়বার্তিক, পরাত্রিংশিকাবিবরণ, তন্ত্রালোক, তন্ত্রসার, ধ্বন্যালোকলোচন, অভিনবভারতী, ভগবদগীতার্থসংগ্রহ, পরমার্থসার, প্রত্যভিজ্ঞাবিমর্শিনী ইত্যাদি রচনা সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। ভারতীয় নাট্যের তত্ত্ব ও প্রয়োগ আলোচনায় অভিনবভারতীর গুরুত্ব অসামান্য। ধ্বনিপ্রস্থানের সর্বশ্রেষ্ঠ সমর্থক ও প্রবক্তা। রসতত্ত্বকে সুদৃঢ় একটি দার্শনিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কবিকর্মে শান্তরসের প্রাধান্য এবং শান্তরস থেকে সর্বপ্রকার রসের উদ্ভব বলে মনে করতেন।

অভিনয়—মূল চারটি অংশ ঃ—সাত্ত্বিক, বাচিক, আঙ্গিক ও আহার্য (বেশভূষা)। আর একটি অংশ অভিমানিক। (সাহিত্য দর্পণ)।

অভিনিবেশ—সাংখ্যে আশঙ্কা। যোগদর্শনে মৃত্যু ভয় জনিত অবিদ্যা।

অভিমন্যু—সুভদ্রার গর্ভে অর্জুনের ছেলে। নির্ভীক ও মন্যু/ক্রোধ যুক্ত অভীশ্চ মন্যুমান্ চৈব (মহা ১।২১৩।৫০)। অভিমন্যুর জন্মের বর্ণনার পর দ্রৌপদীর ছেলেদের জন্ম কাহিনী উল্লিখিত। অল্প বয়সেই পিতার কাছে অস্ত্র বিশারদ হন। মায়ের সঙ্গে যখন দ্বারকায় ছিলেন তখন কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্নের কাছেও অস্ত্র শিক্ষা করেন। পাণ্ডবরা বনবাসে এলে খবর পেয়ে কৃষ্ণ ইত্যাদি দেখা করতে আসেন , সঙ্গে সুভদ্রা ও অভিমন্যুও এসেছিলেন ও কৃষ্ণর সঙ্গে আবার ফিরে যান (মহা ৩।২৩।৪৪)। বিবাট দুহিতা উত্তরার সঙ্গে বিয়ে হয়। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের সময় এ'র বয়স ষোল মত। অসংখ্য কুরুসেনা হত্যা কবেন ও ভীষ্মের রথধ্বজ ছেদন করেন। যুদ্ধের ১৩-শ দিনে দ্রোণের অভেদ্য চক্রব্যূহ ভেদ করার জন্য যুধিষ্ঠির এ'কে আদেশ দেন। অর্জুন ও অভিমন্যু ছাড়া অন্য কেউ এই ব্যূহ ভেদ করতে জানতেন না। অর্জুন সংশপ্তকদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন। অভিমন্যু ব্যূহ ভেদ করতে জানলেও বার হয়ে আসবার উপায় জানতেন না। অভিমন্যুকে উদ্ধার করে আনবার কথা দিলেও সে কথা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। ব্যূহের ভেতর গিয়ে শল্যের ভাই, শল্যপুত্র রুক্মরথ, কর্ণের এক ভাই ও দুর্যোধনের ছেলে লক্ষ্মণ, মগধরাজ জয়ৎসেন, অশ্বকেতু, ভোজরাজ, শত্রুঞ্জয়, চন্দ্রকেতু, মেঘবেগ, সুবর্চস, সূর্যভাস্ ইত্যাদিকে নিহত করেন। বহু মহারথীকেও পরাজিত করেন। শেষ পর্যন্ত মহাদেবের বরে বলীয়ান জয়দ্রথ ব্যূহমুখে পাণ্ডবদের আটকে রাখেন এবং ভেতরে দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, বৃহদ্বল, কৃতবর্মা এই ছয় জন মিলে অভিমন্যুকে ঘিরে ফেলে যুগপৎ আক্রমণ করেন। বৃহদ্বল ও আরো অনেক রাজা মারা যান। শেষ অবধি দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, দুর্যোধন ও শকুনি যুগপৎ আক্রমণে এ'কে নিরস্ত্র করে ফেলেন এবং দুঃশাসনের এক ছেলে অন্য মতে দুঃশাসন মাথায় গদা মেরে এ'কে হত্যা করেন। কাশীদাসে আছে কর্ণ, দুঃশাসন, দ্রোণ, কৃপ, শকুনি, অশ্বত্থামা ও জয়দ্রথ আক্রমণ করেন। অভিমন্যুর

মৃত্যুকালে উত্তরা গর্ভবতী ছিলেন। উত্তরার ছেলে পরিক্ষিৎ (দ্রঃ)। পরবর্তী জন্মে অভিমন্যু রাধার স্বামী আয়ান হয়ে জন্মান। দ্রঃ-বর্চা/সুবর্চা।

অভিরথ—কর্দম বংশে এক জন মুনি।

অভিরামদাস—১৭-শতকে এক জন বৈষ্ণব কবি। ভাগবতের পদ্যানুবাদ করেন। গোবিন্দ-বিজয় রচয়িতা।

অভিষব—যজ্ঞ স্নান বা ব্রত স্নান।

অভিষেক—মানুষ বা দেবতাকে বিশেষ দশায় স্থাপন করা বা বিশেষ দশায় স্থাপিত হওয়ার জন্য মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। দেবতা প্রতিষ্ঠা বা বিশেষ পূজা উপলক্ষ্যে দেবতার অভিষেক করা হয়। দুর্গাপূজাতে দুর্গার অভিষেক বা মহাস্নানের ব্যবস্থা আছে। অভিষেকের সময় তীর্থ সলিল, তীর্থমৃত্তিকা ও নানা দ্রব্য ব্যবহার হয় এবং বিবিধ বাদ্য বাজান হয়। রাজার অভিষেকের সময়ও অনুরূপ নানা কিছু ব্যবহার হত; সোনা, রূপা, তামা ও মাটির কলসীতে নানা তীর্থ জল সুগন্ধ করে আনা হত এবং সুবর্ণখচিত শঙ্খে পুরোহিত, ও অমাত্য প্রভৃতি রাজা ও রাণীর মাথায় মন্ত্র সহকারে এই জল ছিটিয়ে দিতেন। এরপর মুকুট পরিয়ে ছত্র চামরাদি রাজ চিহ্ন যুক্ত করে যথা নিয়মে রাজাকে (কখনো বা রাজা ও রাণী দুজনকেই) সিংহাসনে বসান হত। শাক্ত সাধকদের তিনটি অভিষেক আছে—শাক্তাভিষেক, ইন্দ্রাভিষেক ও পূর্ণাভিষেক। সাধকদের অভিষেকের মূল কথা সাধনমার্গে সাধককে ক্রমশ উন্নীত করা। পূর্ণাভিষেক কৌল সাধকের অনুষ্ঠান এবং গুরুর অনুমতি সাপেক্ষ। পূর্ণাভিষেকের পর সাধকের নতুন নামকরণ হয় এবং নামের শেষে আনন্দনাথ যুক্ত হয়।

অভিষ্যৎ—বা অভিষান্। কুরুর (দ্রঃ) ছেলে। অভিষ্যৎ-এর আট ছেলে:- পরিক্ষিৎ, শবলাশ্ব, অভিরাজ/আদিরাজ, বিরাজ, শল্মল শাল্মলি, উচ্চৈঃশ্রবা, ভদ্রকার/ভঙ্গকার, ও জিতারি (মহা ১।৮৯।৪৫)।

অভিসারী—অভিসার (মহাভারতে)। অবিসরেস্ (গ্রীক); মতান্তরে প্রাচীন উরগ বা উরস। পেশোয়ার জেলার উ-পশ্চিমে একটি জেলা; অর্জুন জয় করেছিলেন। অন্য মতে বিতস্তা ও চন্দ্রভাগার মধ্যগত পার্বত্য এলাকা এবং রাজপুরী (দ্র—রাজৌরি কাশ্মীরে) এলাকা মিলে। হজর দেশ।

অভীম—একটি অগ্নি (দ্রঃ-অগ্নিবংশ)

অভ্যঙ্গ—কোমর বন্ধ। দ্রঃ-সূর্য।

অভ্রমু—পূর্ব দিকহস্তিনী। ঐরাবতের স্ত্রী।

অমথিতকল্প—(দ্রঃ) দশবর্ষ্যনি।

অমরকণ্টক—অমরকূট। বংশগুল্ম (দ্রঃ)। মধ্যপ্রদেশে মৈকল পাহাড়ের পূর্বচূড়া; পেণ্ড্রা রোড স্টেসন থেকে ৪৮ কি-মি মত দূরে। নাগপুরে গণ্ডোয়ানা পর্বতে (বিন্ধ্য পর্বতের অংশ) মিকুল/মেকল/মৈকুল। অমর কণ্টক পাহাড় মেকল বা সোম পর্বত, আম্রকূট, সুরথাদ্রি। বাসে যাওয়া যায়। নর্মদা, (= মেকল কন্যা) শোণ ও মহানদীর উৎপত্তি এখানে।

বিখ্যাত তীর্থ ; এখানে শ্রাদ্ধ করণীয়। মৎস্য পুরাণেও আছে। মহাদেব ত্রিপুর দগ্ধ করলে কিছু পোড়া অংশ এসে পড়েছিল। এখানে এলে অশ্বমেধের দশগুণ পুণ্য হয়। প্রাচীন কালে বহু মন্দির ছিল। উত্তর ভারতীয় বিশুদ্ধ নাগর রীতি থেকে মধ্যযুগের মধ্যভারতীয় স্থাপত্য রীতিতে বিবর্তন এখানে দেখা দিয়েছিল। অপেক্ষাকৃত অভগ্ন চারটি মন্দির (৯-১১ শতক) থেকে এই বিচার সম্ভব। কেশবনারায়ণ ও মচ্ছেন্দ্র নাথ মন্দির দুটি এবং করণ ডাহ্‌রিয়া (ডাহ্‌লের কলচুরি বংশীয় নৃপতি কর্ণ ১০৩৪/১০৪২-১০৭৩ খৃ, কর্তৃক নির্মিত) এই তিনটি মন্দির প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাছে মূল্যবান। এই মন্দিরগুলি এবং নর্মদা, শোণ ও মহানদীর উৎপত্তিস্থল কুণ্ডটি বর্তমানে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত যে কুণ্ডটিকে আজকাল নর্মদা ও শোণের উৎস এবং যে মন্দিরগুলি যাত্রীদের দেখান হয় সেগুলি আধুনিক ; কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই। অবশ্য দেববিগ্রহ অনেক সময় ঐতিহাসিক বিগ্রহ। মেঘদূতের রামগিরি ও আম্রকূটকে অনেকে অধুনাতন রামগড় ও অমরকণ্টক বলে মনে করেন।

অমরকোষ—দ্রঃ-অমরসিংহ।

অমরতরু—পারিজাত, মন্দার, কল্পবৃক্ষ, সন্তান, ও হরিচন্দন।

অমরদাস—তৃতীয় শিখগুরু (১৫০৯-১৫৭৪)। গুরু অঙ্গদের পর ইনি গুরু হন এবং বাইশ বছর ঐ পদে ছিলেন।

অমরনাথ—কাশ্মীরে হিন্দু তীর্থ। হিমালয়ে ভৈরবঘাটি শাখাতে একটি প্রাকৃতিক গুহাতে বিখ্যাত এক শিব মন্দির। কাশ্মীরের প্রাচীন রাজধানী : ইসলামাবাদ থেকে ৬০ মাইল মত। পহলগাম থেকে ৪৮ কি-মি দূরে। শ্রাবণ পূর্ণিমাতে তীর্থযাত্রী আসে। এখানে একটি নৈসর্গিক গুহায় স্বয়ম্ভু তুষার লিঙ্গ আছে। গুহার গা থেকে জল চুঁইয়ে বার হয়ে স্বচ্ছ বরফে (স্টালাগমাইট) পরিণত ; এইটি পূজ্য দেবতা। ডোলমাইট পাথর লিঙ্গের বেদী ; তিথি অনুযায়ী এই মূর্তির হ্রাসবৃদ্ধি হয়। ইনি অমরেশ্বর বা অমরনাথ।

৫১৮২ মি. উচ্চ তুষারাবৃত শিখরের পশ্চিম গাত্রে অতি মনোরম পরিবেশে গুহাটি অবস্থিত। স্থানীয় নাম কৈলাস। গুহার পশ্চিম দিকে সিন্ধু নদের ক্ষুদ্র উপনদীর নাম অমরগঙ্গা, সাদা মাটির ওপর দিয়ে প্রবাহিত। এই মাটি মাখলে পাপ নিঃশেষ হয়ে যায় বিশ্বাস। নদীর পাশ দিয়ে গুহাতে যাবার পথ। গুহার ব্যাস ১৫ মি, উচ্চতা ৮ মি ; প্রাকৃতিক খিলান যুক্ত গুহার দ্বার থেকে ৬-৮ মিটার ভেতরে গুহার শেষ প্রান্তে লিঙ্গমূর্তি অবস্থিত। মূর্তির উচ্চতা ৯১ সে.মি। যোনিপীঠের পরিধি ২-মি, উচ্চতা ৬১ সে-মি। যোনিপীঠের মধ্যস্থিত উঁচু হয়ে ওঠা সর্পাকৃতি তুষার পিণ্ড দ্বারা লিঙ্গমূর্তি বেষ্টিত। বিশ্বাস অমাবস্যা থেকে বাড়তে বাড়তে পূর্ণিমাতে এই মূর্তি পূর্ণ উচ্চতা লাভ করে এবং কৃষ্ণ পক্ষে ক্ষয় পেতে পেতে অমাবস্যায় নিঃশেষ হয়ে যায়। লিঙ্গমূর্তির দু দিকে দুটি তুষার স্তূপকে একটি পার্বতীর ও একটি গণেশের প্রতীক মনে করা হয়। প্রতি শ্রাবণ মাসে মার্তণ্ড থেকে তীর্থযাত্রী আসে। দর্শনের শেষ দিনে

মন্দিরের ওপর ১ বা ২ বা ৬টি পায়রা উড়ছে দেখা যায় ; এরা হরপার্বতী যেন। গুহার মধ্যে অদ্ভুত অদ্ভুত আকারের বরফ রয়েছে।

অমরসিংহ—বিখ্যাত অমরকোষ অভিধান প্রণেতা। উজ্জয়িনীতে বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম। ইনি জৈন না বুদ্ধ মতভেদ আছে।

অমর হ্রদ—একটি তীর্থ (মহা ৩।৮১।৮৯)।

অমরাবতী—ইন্দ্রের রাজধানী। বিশ্বকর্মা নির্মিত। সুমেরু (দ্রঃ মেরু) পর্বতের ওপর। এখানে নন্দন কানন, পারিজাত বৃক্ষ, সুরভি নামে গাভী ও অপ্সরা ইত্যাদি আছে। নন্দন বনে মন্দার, পারিজাত, সন্তান, কল্পবৃক্ষ ও হরিচন্দন নামে ৫টি প্রসিদ্ধ গাছ রয়েছে। অমরাবতীর মধ্য দিয়ে অলকানন্দা নদী প্রবাহিত। এখানে শোক, তাপ, জরা, মৃত্যু কিছুই নাই।

অমরাবতী—১৬°৩০′ অক্ষ এবং ৮০°২০′ দ্রা। অন্ধ্রে গুণ্টুর জেলায় ; গুণ্টুর থেকে ৩৪ কি-মি দূরে কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ তীরে। প্রাচীন নাম ধান্যকটক, বর্তমান ধরণী-কোট। ধনকটক, পূর্বশৈল সংঘারাম (হিউ-এন-ৎসাঙ), হীরক বালুকা, ডিপল-ডাইন। অমরাবতী স্তূপ বেজোয়াদা থেকে ১৮ মাইল পশ্চিমে এবং ধরণীকোটের দক্ষিণে কৃষ্ণ জেলাতে কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ তীরে। বৌদ্ধ অন্ধ্রেরা বা অন্ধ্রভৃত্য রাজারা (৩৭০-৩৮০ খৃ) এটি তৈরি করেন। অমরাবতী চৈত্য হচ্ছে পূর্বশৈল সংঘারাম (হিউ-এন-ৎসাঙ)। অমরাবতীর ৮০৫ মি পশ্চিমে এই ধরনীকোটে ধান্যকটক নগরীর ধ্বংসাবশেষ ও ঢিবিগুলি চার দিকে ছড়ান রয়েছে। দ্রঃ-ধনকটক।

৩-২ খৃ-পূর্ব থেকে খৃস্টীয় ১৪ শতক পর্যন্ত ধান্যকটক সমৃদ্ধ বৌদ্ধ কেন্দ্র ছিল। এখানে মুখ্য আরাধ্য স্তূপটি (নাম মহাচৈত্য) খৃ-পূ ৩-২ শতকে তৈরি হয়েছিল। এই মহাচৈত্য ছাড়া এখানে অসংখ্য স্তূপ, মন্দির, মণ্ডপ, বাসগৃহ ছিল। ৬-১১ শতকের পাথরের ও ব্রোঞ্জের বুদ্ধ, মৈত্রেয়, মঞ্জুশ্রী, লোকেশ্বর, বজ্রপাণি, হেরুক প্রভৃতির বহুমূর্তি পাওয়া গেছে। এগুলি তদানীন্তন শিল্প নৈপুণ্যের নিদর্শন বহন করছে। বৌদ্ধধর্ম কি ভাবে ক্রমে মহাযান ও বজ্রযানে রূপান্তরিত হয়েছিল তারও কিছু সাক্ষ্য এখানে পাওয়া যায়। ১১০০ খৃস্টাব্দের একটি স্থানীয় স্তম্ভ লেখে পল্লব বংশীয় রাজা সিংহবর্মা একটি বুদ্ধ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন উল্লেখ আছে। স্থানীয় অমরেশ্বর মন্দিরে একটি স্তম্ভে (১১৮২ খৃঃ) একটি লেখতে আছে ধান্যকটকের রাজা অমরেশ্বরের উপাসক হয়েও বুদ্ধের উদ্দেশ্যে তিনটি গ্রাম দান করেন ও দুটি অনির্বাণ দীপ উৎসর্গ করেন। সিংহলের কাণ্ডি জেলার গদল-দেনীয় শিলালেখ থেকে জানা যায় খৃস্টীয় চৌদ্দ শতকে বৌদ্ধ জগতে অমরাবতীর সম্মান অক্ষুণ্ণ ছিল। শিল্পে অমরাবতী সত্যই অমরাবতী। এর কিছু কাল পরে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব অপসৃত হয় এবং অমরেশ্বরের মহিমা ছড়াতে থাকে এবং অমরেশ্বরের নাম থেকে নাম হয় অমরাবতী।

অমরাবতী অন্ধ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ স্তূপ এবং সাঁচীর স্তূপের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর ছিল। কিন্তু উপস্থিত প্রায় কিছুই নাই। এই ধ্বংসের কারণের মধ্যে একটি হচ্ছে অবৈজ্ঞানিক হঠকারী খনন কার্য এবং দ্বিতীয় হচ্ছে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে

জমিদার ও স্থানীয় জনসাধারণ কর্তৃক ক্রমাগত চুরি। এই সময়ে অজস্র অমূল্য ভাস্করসমৃদ্ধ প্রস্তর ফলক এমন কি পুড়িয়ে চুন তৈরি করা হয়েছে। ১৮১৬ খৃস্টাব্দের পর থেকে এখানকার অবশিষ্ট প্রস্তরফলক মূর্তি ইত্যাদি যা কিছু পাওয়া গেছে ভারতের, প্যারিস ও ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। অমরাবতী এখন ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধীন। অমরাবতীতেও একটি সংগ্রহশালা স্থাপিত হয়েছে। (২) নগর হার (দ্রঃ)।

অমরু—অমরু শতক নামে সংস্কৃত শ্লোকগুলির রচয়িতা। কোন্ সময়ের লোক স্পষ্ট নয়। খৃস্টীয় নবম শতকে বামনের কাব্যালঙ্কারে অমরু শতকের তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে। আনন্দবর্দ্ধনও নবম শতকের মাঝখানে অমরুর নাম উল্লেখ করেছেন। অনেকের মতে ইনি ভর্তৃহরির পরবর্তী। অমরু শতকের বর্তমানে চারিটি সংস্করণ :—দক্ষিণ ভারতীয়, পশ্চিম ভারতীয়, বঙ্গ ও মিশ্র। এই চার সংস্করণ মিলিয়ে মোট শ্লোক সংখ্যা ১১৫ মত এবং এগুলির একান্নটি সব সংস্করণেই আছে। উনিশটি টীকা আছে। প্রাকৃতে সত্তসই নামক বইটির মত। জীবন ও প্রেমের বিভিন্ন অবস্থায় নারীর বর্ণনা এই সব শ্লোকে। ভাষা সরস ও সুখপাঠ্য। শ্লোকগুলি এক একটি শব্দময় চিত্র।

অমরেশ্বর—নর্মদার দক্ষিণ তীরে ওঙ্কারনাথের বিপরীত দিকে। খাণ্ডব থেকে ৩২ মাইল উ-পশ্চিমে। মর্তক স্টেসন থেকে ১১ মাইল পূর্ব দিকে। বৃহৎ শিবপুরাণে অমরেশ্বর ওঙ্কার ক্ষেত্রে (দ্রঃ) অবস্থিত। ১২ লিঙ্গের একটি।

অমলকগ্রাম—আমলক গ্রাম (নৃসিংহ পু) - সহ্য আমলক গ্রাম (পশ্চিমঘাট পর্বতে), আমলিতলা। তিন্নেভেলিতে তাম্রপর্ণী নদীর উত্তর তীরে। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে আছে।

অমা—চাঁদের ষোড়শ কলা। নিত্য ক্ষয় বৃদ্ধি রহিত প্রধান কলা। এই কলা অন্য কলাগুলির আধার শক্তিরূপা। অন্য কলাগুলিকে মালার মত গেঁথে রেখেছে। সহস্রারে অবস্থিত; অমৃতস্রাবিনী।

অমাত্য—ঋক্‌বেদে, পাণিনি ও বৌধায়নের পিতৃমেধসূত্রে অমাত্য অর্থে নিকটবর্তী মানুষ ; মন্ত্রী নয়। আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে অমাত্য শব্দ মন্ত্রীরূপে ব্যবহৃত। অর্থাৎ খৃস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে শব্দটি মন্ত্রী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অমাত্য ও মন্ত্রী অধুনা একার্থ বোধক। কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে উচ্চশ্রেণীর রাজকর্মচারীরা অমাত্য ; এবং অনেক সময় অমাত্যদের মধ্যে থেকে মন্ত্রী নির্বাচিত হত। মন্ত্রীর সংখ্যা ৩-৪ থেকে ১০-১২ হত। রাজা মন্ত্রীদের পরামর্শে কাজ করতেন।

মনুতে (৭।৫৪) আছে সাত আট জন অমাত্য নিয়ে মন্ত্রী পরিষৎ তৈরি হত। অর্থাৎ অমাত্যরাই মন্ত্রী। সাতবাহন ও পল্লবদের রাজ্যে অমাত্যরা ছিলেন নিম্ন শ্রেণীর কর্মচারী ও প্রান্তীয় শাসনকর্তা। রুদ্রদামনের জুনাগড় শিলালিপিতে আছে অমাত্য ধীসচিব নন ; কর্মসচিব মাত্র। গুপ্তযুগে বিভিন্ন শ্রেণীর অমাত্য ছিল। রাজপরিবারের লোক না হয়েও হরিষেণ ও পৃথ্বীসেন কুমারামাত্য ছিলেন এবং যথাক্রমে সান্ধিবিগ্রহিক ও মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

কৌটিল্য অনুসারে বিশেষ গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে অমাত্য ও মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করা হত। মহাভারতে আছে অমাত্য কুলশীলসম্পন্ন, ক্ষমাশীল, বলশালী, মান্য, বিদ্বান, নিরহঙ্কার এবং কার্য্যাকার্যবিবেককুশলী হবেন। ভরদ্বাজ, বিশালাক্ষ, পরাশর, পিশুন, কৌণপদন্ত, বাতব্যাধি, বহুদন্তীপুত্র ইত্যাদি শাস্ত্রকারদের মতে যাঁরা রাজার সহপাঠী, রাজার মত গুণযুক্ত, বিপদে রাজার জন্য প্রাণ দিতে পারেন, যাঁরা রাজ্যের আয় বাড়াতে পারেন এবং কুলানুক্রমে যাঁরা রাজভক্ত তাঁরাই অমাত্য হবার যোগ্য।

সোমদেব আত্মীয়দের অমাত্য পদে নিতে বারণ করেছিলেন। কৌটিল্য মতে দেশ, কাল ও কর্মের প্রকৃতি ও পুরুষার্থ বিবেচনা করে অমাত্য নেওয়া উচিত। সোমদেবসূরির মতে ব্রাহ্মণরা কৃপণ ; এবং ক্ষত্রিয়েরা অভিযুক্ত হলেই খড়্গ বার করেন। সুতরাং বৈশ্যরাই অমাত্য হবার উপযুক্ত। কৌটিল্যের আগে উপধা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তবেই অমাত্য নিয়োগ করা হত; এবং পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে খনি, হস্তিবন ও রাজকীয় কর্মশালায় কাজ দেওয়া হত। পরবর্তী যুগে কামন্দকীয় নীতিসার ইত্যাদিতে অমাত্যদের পরীক্ষার উল্লেখ আছে।

অমাত্যদের কাজ ছিল দেশে আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থা, অর্থব্যবস্থা, হিসাব-ব্যবস্থা, দেশের উন্নতি, সেনা সমস্যা, পররাষ্ট্র সম্পর্ক ইত্যাদি।

অমাবসু—পুরূরবা উর্বশীর এক ছেলে।

অমি বিহারে ছাপরা থেকে ১১ মাইল পূর্বে। পীঠস্থান। এখানে ভবানী মন্দির রয়েছে।

অমিতাভ—পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের মধ্যে প্রাচীনতম। সুখাবতী স্বর্গে শান্তচিত্তে ধ্যানমগ্ন হয়ে অবস্থান করেন। সৃষ্টির দায়িত্ব রয়েছে অমিতাভ থেকে উদ্ভূত বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের ওপর। অমিতাভের বাহন এক জোড়া ময়ূর এবং চিহ্ন পদ্ম। ইনি রক্তবর্ণ, সমাধি মুদ্রাধর, সংজ্ঞাস্কন্ধ-স্বভাব এবং পদ্মকুলী। এঁর প্রজ্ঞা পাণ্ডরা। সুখাবতীব্যূহ নামে মহাযানী গ্রন্থে এঁর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। অমিতাভ থেকে দুজন পুরুষ ঃ মহাবল ও সপ্তশতিক হয়গ্রীব এবং তিন জন নারী কুরুকুল্লা, ভৃকুটি ও মহাসিতবতীর উৎপত্তি। তিব্বত ও চীনে অমিতাভের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল। জাপানে অমিতাভের প্রভাব সব চেয়ে বেশি। অমিতাভের নামে একটি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ও আছে। চীন, তিব্বত ও ভারতে অমিতাভের বহু মূর্তি পাওয়া গেছে।

অমিতৌজা—ক্ষত্রিয় রাজা। রাক্ষস অংশে জন্ম। পাঞ্চাল আগত। পাণ্ডব পক্ষে ছিলেন। পূর্বজন্মে কেতুমান অসুর ছিলেন (মহা ১।৬১।১২)।

অমিত্রজিৎ—এঁর দেশে বহু শিব মন্দির ছিল। নারদ এঁকে জানান চম্পকাবতী নগরীর গন্ধর্ব কুমারী মাল্য গন্ধিনীকে রাক্ষস কঙ্কালকেতু হরণ করেছে। অমিত্রজিৎ রাক্ষসকে নিহত করে মাল্যগন্ধিনীকে বিয়ে করেন। (স্কন্দ-পু)

অমিন—অভিমন্যুখের। চক্রব্যূহ স্থান। কুরুক্ষেত্রের মধ্যে ছিল। এখানে অভিমন্যু নিহত হন।

অমূর্তরয়স্‌—রাজা গয়ের পিতা (মহা ৩।৯৩।১৭)। পুরুর কাছ থেকে তরবারি লাভ করেছিলেন এবং রাজা ভূমিশয়কে এই তরবারি দিয়েছিলেন (মহা ১২।১৬০।৭৩)।

অমৃত—(১) সুধা। এই পান করে দেবতারা অমর। সোমরসকে (দ্রঃ) অমৃত বলা হয়। জিনিসটি কি স্পষ্ট কোথাও বলা নাই। রাজা পৃথুর (দ্রঃ) পর দেবতারা পৃথিবীকে দোহন করলে অমৃত পান (হরি ৬।২২)। দুর্বাসার শাপে এই অমৃত সমুদ্রে চলে যায়। দ্রঃ-সমুদ্র মন্থন। ধন্বন্তরী কলসে করে এই অমৃত নিয়ে উঠে আসেন। (২) অর্থ। ঋত (মাঠ থেকে ও আঙ্গুলে করে কুড়িয়ে পাওয়া শস্য), অমৃত (ভিক্ষায় অযাচিত লব্ধ), মৃত (ভিক্ষায় লব্ধ), প্রমৃত (কৃষি লব্ধ), সত্যামৃত (ব্যবসায় লব্ধ)—এই পাঁচ প্রকার অর্থ।

অমৃতা—(১) প্লক্ষ দ্বীপে প্রবাহিত নদী। এই নদীর জল যে পান করে সে সব সময় সন্তুষ্ট থাকে। (২) আনন্দা, মধ্যা, ভূতনা ও পূতনা এই চারটি জলবাহিনী সূর্যরশ্মি। (৩) যতিদের মতে পরমেশ্বরের ধ্যান কালে অনুভূত অসাধ্য সাধনে সমর্থ সর্বাঙ্গে সঞ্চারী অনির্বচনীয় পদার্থ। ভক্তিমার্গীদের মতে ভক্তিতে সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলে যে আনন্দ মদিরাতে ভক্ত বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। যোগীদের মতে সহস্রার পদ্ম নিঃসৃত অপূর্ব আনন্দ রস; সমস্ত সন্তাপ নাশক, ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারক ও সর্বসুখ দাতা। (৪) চন্দ্রের প্রথম কলা।

অমৃতা—মগধরাজ কন্যা। অনশ্বের স্ত্রী। পরিক্ষিতের মা। ভাণ্ডারকরে (১।৯০।৮৩) অনশ্ব হচ্ছেন অরুঘাত।

অমোঘবর্ষ—দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট বংশের তিনজন রাজার উপাধি। রাষ্ট্রকূট রাজ তৃতীয় গোবিন্দের ছেলে প্রথম অমোঘবর্ষই সমধিক প্রসিদ্ধ (আনু ৮১৪-৮৭৮ খৃ)। ইনি বেঙ্গীর চালুক্য, মহীশূরের গঙ্গ, গুজরাটের রাষ্ট্রকূট শাখা এবং বাঙলার পাল রাজগণের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। প্রথম অমোঘবর্ষ শান্তিপ্রিয় ও ধর্ম ও সাহিত্য অনুরাগী ছিলেন। কবিরাজ-মার্গ' নামে কানাড়ি ভাষায় অলঙ্কারের একটি বই লিখেছিলেন। এঁর সভায় বহু সাহিত্যিক ছিল। শেষ জীবনে জৈনধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। হিন্দু ও জৈনধর্মের পৃষ্ঠপোষক। একবার প্রজাদের আসন্ন বিপদে দেবী মহালক্ষীর কাছে নিজের আঙ্গুল কেটে উৎসর্গ করেন কথিত আছে।

অমোঘসিদ্ধি—একজন ধ্যানী বুদ্ধ (দ্রঃ)। চিহ্ন অভয় মুদ্রা। এই বংশে এক জন মাত্র দেব বজ্রামৃত ; বাকি সকলে দেবী ঃ—খদিরবনীতারা, মহাশ্রী তারা, বশ্য তারা, ষড়ভুজা সিততারা, ধনদতারা, সিততারা, পর্ণশবরী, মহামায়ূরী, বজ্রশৃঙ্খলা, বজ্রগান্ধারী।

অমোঘা—(১) মহর্ষি শান্তনুর স্ত্রী। ব্রহ্মা ভ্রমণে এসে শান্তনুর আশ্রমে অমোঘার রূপে মুগ্ধ হয়ে শান্তনুর অনুপস্থিতির সুযোগে সঙ্গম প্রার্থনা করেন। কালিকা (৮২।১১) পুরাণে ব্রহ্মা অমোঘাকে ধর্ষণ করবার জন্যই এসেছিলেন। বর্ণনা অশ্লীল। অমোঘা ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিতে যাচ্ছিলেন কিন্তু ব্রহ্মা আশ্রমে বীর্যপাত করে পালিয়ে যান। শান্তনু ফিরে এসে সব শুনে স্ত্রীর ওপরই অসন্তুষ্ট হন। এ দিকে তেজ প্রভাবে অমোঘার গর্ভ সঞ্চার হয়। অন্য মতে আশ্রমে ফিরে এসে শান্তন হংসপদ চিহ্ন দেখে সন্দিগ্ধ হন।

এবং সব জেনে স্ত্রীকে বলেন লোকহিতের জন্য এই বীর্য তাঁকে পান করতে হবে। স্ত্রীর অনুরোধে শান্তনু নিজে এই বীর্য পান করেন, স্ত্রীকে প্রসাদ দেন, অন্যমতে রমণ করেন এবং অমোঘা গর্ভবতী হন। একটি মতে দৈবী গর্ভ ধারণ করতে না পেরে যুগন্ধর পাহাড়ে গর্ভ ত্যাগ করেন। স্থানটি লোহিত নামে প্রসিদ্ধ হয়। কালিকাপুরাণে অমোঘা হিরণ্যগর্ভ মুনির মেয়ে ; তৃণবিন্দু আশ্রমে জন্ম।

অন্যমতে কালক্রমে জলময় একটি পুত্র হয়। কালিকাতে জলরাশির জন্ম হয় এবং এই জলের মধ্যে শিশুমার বাহন, ব্রহ্মার সমান রক্ত-গৌর রঙ একটি শিশু ছিল। শান্তনু এই জলকে একটি কুণ্ডের মধ্যে রেখে দেন। জল ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে ব্রহ্মপুত্র নদে পরিণত হয় (কালিকা)। কালিকাতে অমোঘার সন্তান ব্রহ্মপুত্র রূপ জলরাশিকে শান্তনু উত্তরে কৈলাস, দক্ষিণে গন্ধমাদন, পশ্চিমে জারুধি ও পূর্বে সংবর্ত এই চারটি পাহাড়ের মাঝখানে স্থাপন করেন। এই জলরূপ পুত্র ক্রমশ বড় হতে থাকেন। পরশুরাম এখানে স্নান করে শাপমুক্ত হয়ে সকলের মঙ্গলের জন্য পরশু দিয়ে পথ কেটে নিকটে লোহিত সাগরে প্রবাহিত করে দেন। পরে আবার পূব দিকে পথ কেটে ব্রহ্মপুত্র নদকে পূর্বদিকে প্রবাহিত করেন। (২) তাড়কা বধের সময় বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে অমোঘা ও বিজয়া দুটি মন্ত্র দিয়েছিলেন। (দ্রঃ) অতিবল।

অম্বট্ঠ—আচার্য পোক খরসাদির শিষ্য। বুদ্ধ ঘোষের সঙ্গে জাতি ভেদ নিয়ে এ'র আলোচনা হয়েছিল। বুদ্ধদেবের জীবিত কালে ইনি তাঁর শিষ্য হয়েছিলেন কিনা কোন বইতে নাই। সূর অম্বট্ঠ নামে আর একটি নাম পিটকে আছে; ইনি এক জন বুদ্ধভক্ত। আরো কয়েক জন অম্বট্ঠ বংশীয়ের নাম পিটক ইত্যাদিতে রয়েছে।

অম্বপালী—আম্রপালী। বৈশালী রাজোদ্যানে এ'র জন্ম এবং উদ্যানপালকের কাছে পালিতা। আম্র উদ্যানের পালক দ্বারা পালিতা বলে এই নাম। অপরূপ সুন্দরী। বিভিন্ন দেশের রাজকুমাররা তাঁকে বিয়ে করতে চান। কিন্তু দেশের নিয়ম অনুসারে শেষ পর্যন্ত তাঁকে সকলের চিত্তবিনোদনের জন্য নর্তকী হতে হয়। বৈশালীর বাগানে বুদ্ধদেবের সঙ্গে দেখা হয় এবং ধর্ম ও উপদেশ লাভ করেন। বুদ্ধদেব এক বার লিচ্ছবি রাজের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে এ'র গৃহে অন্ন গ্রহণ করেছিলেন। ভিক্ষু সংঘকে ইনি একটি বিহার দান করেছিলেন এবং নিজের ছেলেকে তথাগতের বাণী প্রচার করতে দেখে অম্বপালী সংসার ত্যাগ করেন। শেষ পর্যন্ত অর্হত্ব লাভ করেছিলেন। পালি থেরী গাথায় এ'র করুণ কাহিনী ও অকপট আত্মনিবেদন লিখিত আছে।

অম্বর—রাজস্থানের জয়পুর জেলার একটি মহাকুমা ও মিউনিসিপ্যাল সহর। জয়পুরের প্রাচীন রাজধানী বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত। বর্তমান নাম আমের। জয়পুর রেল স্টেসন থেকে ১০-১১ কি-মি. উত্তরপূর্বে। একটি মতে মহাদেব অম্বিকেশ্বর নাম থেকে নাম। অন্য মতে অযোধ্যা অধিপতি অম্বরীষের (মান্ধাতার ছেলে) নাম থেকে। অম্বরপুরের অপর নাম অমরপুর। দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে কচ্ছবাহ রাজপুতরা এই রাজ্যের খানিকটা দখল করেন এবং সুসাবৎ মিনা-দের প্রধানের কাছ থেকে অম্বর কেড়ে নেন। আমের প্রাসাদ বা দুর্গে যশোরেশ্বরী কালী রয়েছে ; মানসিংহ যশোহর থেকে নিয়ে যান।

অম্বরনাথ—মহারাষ্ট্রে থানা জেলার মিউনিসিপ্যাল সহর। বোম্বাই থেকে ৬১ কি মি. দূরে অম্বরনাথ রেলস্টেসন। সহরের পূর্বপ্রান্তে পাথরের একটি মন্দির গাত্রে লেখ থেকে জানা যায় ১০৬০ খৃস্টাব্দে চিত্তবাজাদেবপুত্র মম্বানীরাজ এই শিব মন্দির তৈরি করেন। মম্বানীরাজ কল্যাণের চালুক্যদের কোঙ্কন মণ্ডলের মহামণ্ডলেশ্বর। অজন্তা এলুরুর শেষ যুগেব স্থাপত্য রীতি অনুসাবে নির্মিত। দাক্ষিণাত্য শিখররীতি ও চালুক্যরীতিও মিশে রয়েছে। দেওয়ালেব ছবিগুলি ম্লান হয়ে পড়েছে। আকারে বড় এবং অতি অলংকৃত এই মন্দিরটি পশ্চিম ভারতের চালুক্যরীতির মন্দিরগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। মাঘ মাসে শিবরাত্রির মেলাতে প্রচুর ভিড় হয়।

অম্বরীষ—(১) সূর্যবংশে নাভাগেব ছেলে (ভাগ ৯।৪।১৩)। বিষ্ণুভক্ত। দ্রঃ মান্ধাতা। বিষ্ণু অম্বরীষকে সুদর্শন চক্র দান করেছিলেন। কুরুক্ষেত্রে যমুনার কুলে তপস্যা ও যজ্ঞ করে পরা সিদ্ধি লাভ কবেন (মহা ৩।১২৯।২)। এক বার রাজা বর্ষব্যাপী একাদশী ব্রত উদ্‌যাপন করে তিন দিন উপবাসী থেকে দ্বাদশীতে পাবণে বসবেন এমন সময় দুর্বাসা আসেন।

দুর্বাসা তারপব কালিন্দীতে স্নান ও প্রাতঃকৃত্য করতে যান। কিন্তু ফিরছেন না দেখে, মতান্তবে দুর্বাসা ইচ্ছা কবে দেরি কবতে থাকলে এদিকে পারণের সময় পাব হয়ে যায় দেখে ব্রাহ্মণদেব খাইযে এবং অনুমতি নিযে বাজা খেতে বসে সবে মাত্র বিষ্ণু পাদোদক পান করেছেন, অন্য মতে বাজা খেতে বসেন নি অপেক্ষা করছিলেন এমন সময় দুর্বাসা ফিবে এসে অবশিষ্ট অন্ন পড়ে আছে দেখে বা বাজাকে ভোজন পাত্রের সামনে দেখে রাগে জটা ছিঁড়ে মাটিতে ফেলেন। এই জটা প্রকাণ্ড উগ্রদেবতাতে ভাগবতে (৯।৪।১০) কৃত্যাতে পরিণত হযে রাজাকে হত্যা কবতে গেলে সুদর্শন চক্র একে ভস্মীভূত করে বা গলা কেটে ফেলে দুর্বাসাকে বধ কবতে ছোটে। দুর্বাসা ক্রমান্বয়ে ইন্দ্র, ব্রহ্মা, শিব, কারো কাছে আশ্রয় না পেয়ে বিষ্ণুব কাছে আসেন, বিষ্ণু অম্ববীষের শরণাপন্ন হতে বলেন। অন্য মতে বিষ্ণু অম্বরীষেব কাছে ক্ষমা চাইতে বলেন। দুর্বাসা রাজার আশ্রয় নিয়ে নিষ্কৃতি পান। অম্ববীষ দুর্বাসাকে একাদশী মাহাত্ম্যও শোনান। পরে ছেলেদের রাজ্য দিয়ে রাজা বনে তপস্যা করতে চলে যান। একবাব অগস্ত্য ইত্যাদির সঙ্গে (মহা ১৩।৯৬।৫) তীর্থযাত্রা করেন। ব্রহ্মসবে এলে অগস্ত্যের পদ্মফুল ইন্দ্র চুবি করেন। এক জন পুণ্যশ্লোক বাজা (দ্রঃ)। দ্রঃ-শুনঃশেপ, ইন্দ্র। (২) শশবিন্দুর গর্ভে মান্ধাতাব ছেলে। (৩) প্রশুশ্রুকের ছেলে অম্ববীষ এবং অম্বরীষের ছেলে নহুষ (রা ২।১১০।৩১) দ্রঃ-বিবৃপ। (৪) পুলহ নামে ব্রহ্মর্ষির পুত্র। (৫) নবক বিশেষ।

অম্বলটি্ঠিকা—(১) রাজগৃহ ও নালন্দার মাঝামাঝি একটি উদ্যান। (২) মগধে খানুমৎ-এ একটি উদ্যান।

অম্বষ্ঠ—ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে জন্ম (স্মৃতি)। অনুলোমজ। ব্রাহ্মণেব একান্তর পুত্র ; অর্থাৎ দ্বিতীয় বর্ণ ক্ষত্রিয় বাদ দিয়ে বিবাহ। বৈশ্যদের চেয়ে অম্বষ্ঠ উচ্চবর্ণ। ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য দুজনেই দ্বিজ বলে এরাও দ্বিজ তুল্য ও দ্বিজধর্মী। এ'দের উপনয়ন হয় ; বৃত্তি চিকিৎসকতা। (২) অম্বষ্ঠ দেশের রাজা শ্রুতায়ু। কুরুক্ষেত্রে

অর্জুনের হাতে মারা যান। (৩) পাণ্ডবদের পক্ষে এক জন অম্বষ্ঠ ছিলেন, চেদি রাজের হাতে মারা যান। (৪) মনে হয় উত্তর সিন্ধু দেশ। অম্বতাই উপজাতির দেশ ($\alpha\mu\beta\alpha\sigma\tau$; টলেমি)। আলেকজাণ্ডারের সময় সিন্ধুর উত্তর অংশে এবং নিম্ন একেসিনেস্ এলাকাতে এরা বাস করত।

অম্বা—কাশীরাজ হিরণ্যবর্ণের বড় মেয়ে। মা কৌশল্যা। আরো দুই বোন মেজো অম্বিকা ও ছোট অম্বালিকা। বিচিত্রবীর্যের বিয়ের জন্য ভীষ্ম এঁদের স্বয়ংবর সভা থেকে কেড়ে নিয়ে আসেন। কিন্তু অম্বা জানান শাল্বকে তিনি পতিত্বে বরণ করেছেন। ফলে ভীষ্ম শাল্বরাজের কাছে পাঠিয়ে দেন (মহা ১৷৯৬৷৫১) কিন্তু অম্বাকে শাল্ব প্রত্যাখ্যান করেন। তখন ভীষ্মকে বিয়ে করতে চান কিন্তু ভীষ্ম রাজি হন না। অম্বা তখন ভীষ্মকে রাজি করার জন্য এবং রাজি না হলে শাস্তি দেবার জন্য নানা চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে মাতামহ হোত্রবাহনের পরামর্শে ভীষ্মের বাল্য গুরু পরশুরামের শরণাপন্ন হন। অকৃতব্রণ (দ্রঃ) ও এই মাতামহ সব কিছু জানালে পরশুরাম ভীষ্মকে অনুরোধ করেন এবং যুদ্ধও হয়। কিন্তু কোন লাভ হয় না। তখন ভীষ্মকে হত্যা করার মানসে অম্বা যমুনা তীরে কঠিন তপস্যায় রত হন এবং নানা তীর্থ ভ্রমণ করতে করতে গঙ্গার সম্মুখে এসে এক দিন উপস্থিত হলেন। গঙ্গাতে স্নান করার পর ভীষ্ম জননী গঙ্গাদেবী তাঁর তপস্যার কারণ জেনে বুঝিয়ে নিরস্ত করতে চেষ্টা করেন ; এবং শেষ পর্যন্ত বৎসা দেশে প্রবাহিত অম্বা নদীতে পরিণত হবার শাপ দেন। অম্বা এরপর মহাদেবের তপস্যা করে বর পান প্রথমে নারী হয়ে দ্রুপদের ঘরে জন্মাবেন ; পরে পুরুষে পরিণত হবেন এবং যোদ্ধা হিসাবে অম্বা ভীষ্মকে নিহত করবেন এবং পূর্ব জন্মের সমস্ত ঘটনা অম্বার তখন মনে থাকবে। বর পেয়ে অম্বা যমুনাতীরে চিতায় দেহত্যাগ করেন ও দ্রুপদের মেয়ে হয়ে জন্মান। ইনিই শিখণ্ডী।

অম্বালিকা—অম্বার (দ্রঃ) ছোট বোন। বিচিত্রবীর্যের স্ত্রী। সত্যবতীর নির্দেশে ব্যাস অম্বিকার (দ্রঃ) সন্তান উৎপাদন করেন। ধৃতরাষ্ট্র জন্মালে সত্যবতী ব্যাসকে অম্বালিকার সন্তান উৎপাদনে নির্দেশ দেন। ব্যাসকে দেখে অম্বালিকা ভয়ে পাণ্ডু বর্ণ হয়ে যান ; ফলে পাণ্ডুর জন্ম। দ্রঃ-সত্যবতী।

অম্বিকা—(১) অম্বার (দ্রঃ) পরে জন্ম। বিচিত্রবীর্যের স্ত্রী। বিয়ের সাত বছর পরে যক্ষারোগে নিঃসন্তান বিচিত্রবীর্য মারা গেলে শাশুড়ি সত্যবতী ভীষ্মকে নির্দেশ দেন অম্বিকার গর্ভে উৎপাদন করতে। ভীষ্ম প্রত্যাখ্যান করলে ব্যাসকে নির্দেশ দেন। অম্বিকা ব্যাসকে পছন্দ করেন নি ; বা ভয়ে চোখ বুজিয়ে ছিলেন ফলে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের জন্ম হয়। অম্বালিকার (দ্রঃ) সন্তান হবার পর সত্যবতী অম্বিকাকে আবার ব্যাসের কাছে পাঠান। কিন্তু অম্বিকা নিজে না গিয়ে পরিচারিকাকে নিজের মত সাজিয়ে ব্যাসের কাছে পাঠান ; এই পরিচারিকার ছেলে বিদুর। শেষ জীবনে অম্বিকা ও অম্বালিকা তপস্বিনীর মত কাটাতেন। দ্রঃ-সত্যবতী। (২) রুদ্র ভগিনী ; যজুর্বেদ ও শতপথ ব্রাহ্মণে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে রুদ্রের স্ত্রী। কাঠক সংহিতাতে শরৎ বৈ অম্বিকা (৩) উমা। (৪) জৈন দেবী

অম্বুবশ্য—একটি তীর্থ (মহা ৩।৮১।৪৬)

অম্বুবাচী—মৃগশিরার শেষার্দ্ধ, আর্দ্রার পাদ চতুষ্টয় ও পুনর্বসুর পাদত্রয় মিথুন রাশির অন্তর্গত। সূর্য মৃগশিরা ভোগ করে আর্দ্রার প্রথমপাদ ভোগার্থে গমন করলে পৃথিবী ঋতুমতী হন। আষাঢ়ে কৃষ্ণপক্ষের সূর্য যখন আর্দ্রার প্রথম পাদ ভোগ করেন সেই সময় অর্থাৎ তিন দিন কুড়ি দণ্ড মত সময় কাল। এই সময় কাম্য ও নৈমিত্তিক কর্ম স্বাধ্যায়, দেবপিতৃতর্পণ, হলবাহন ইত্যাদি নিষিদ্ধ। যতী, ব্রতী, বিধবা ও দ্বিজ এই সময় পাক করে ভক্ষণ করেন না। বিধবারা এই নিয়ম ব্যাপক ভাবে পালন করেন। চাষীরাও এই সময়ে কাজ বন্ধ রাখে। কোথাও কোথাও কিছু আনন্দ উৎসবের ব্যবস্থা করা হয়। উড়িষ্যায় এর নাম রজ ; জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তি থেকে ২রা আষাঢ় পর্যন্ত এবং বেশ বড় উৎসব হয়।

অম্বুবীচ—দ্রৌপদীর বিয়ের পর কৌরবদের মন্ত্রণা সভা বসে পাণ্ডবদের ফিরিয়ে আনা হবে কিনা ঠিক করতে। এই সভাতে কর্ণ (মহা ১।১৯৬।১৭) মগধের রাজা অম্বুবীচের কাহিনী শোনান। অম্বুবীচ কোন কাজ করতেন না ; কেবল বিশ্রাম নিতেন। সচিবরা সব কিছু করত। অমাত্য মহাকর্ণি সুযোগ পেয়ে রাজার ধন, রত্ন, স্ত্রী ইত্যাদি সব কিছু হস্তগত করে রাজ্য দখল করতে যায় কিন্তু সফল হয় না।

অম্ভোরুহ—বিশ্বামিত্রের এক ছেলে (মহা ১৩।৪)।

অয়ন—গতিপথ। সূর্যের উত্তর দিকে গতি উত্তরায়ণ (মাঘ থেকে আষাঢ়) এবং দক্ষিণ দিকে গতি দক্ষিণায়ন (শ্রাবণ থেকে পৌষ)। বিষুব বৃত্তের সঙ্গে (কম্পিত্ত) রবিমার্গ ২৩°২৭′ মিনিট পরিমিত কোণ উৎপন্ন করেছে। ২২-ডিসেম্বর পরম দ-দিক থেকে সূর্য উত্তরাভিমুখী হয় ; ২১ মার্চ বিষুববৃত্ত অতিক্রম করে ২১ জুন পরম উত্তর দিকে গিয়ে পৌঁছায়। ,২১ জুন থেকে দক্ষিণ মুখে যাত্রা সুরু হয় এবং ২৩ সেপ্টেম্বর পুনরায় বিষুববৃত্ত পার হয়ে পরম দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। ২২শে ডিসেম্বর পরম দক্ষিণ স্থান পেয়ে থাকে। ২২ ডিসেম্বর থেকে ২১শে জুন উত্তরায়ণ। ২১ জুন থেকে ২২ ডিসেম্বর দক্ষিণায়ন। উত্তরায়ণ দেবতাদের দিন , দক্ষিণায়ন রাত। ২২ ডিসেম্বর উত্তরায়ণ দিবস, ২১ জুন দক্ষিণায়ন দিবস ; এই দুটি অয়নান্ত বিন্দু। সম্পাৎ বা ক্রান্তিপাত বিন্দু অর্থাৎ রবিমার্গ ও খগোল বিষুব বৃত্তের পরস্পর ছেদ বিন্দু দুটির একটি বাসন্ত ক্রান্তিপাত বা মহাবিষুব, ২১ মার্চ। অপরটি শারদ ক্রান্তিপাত বা জলবিষুব ২৩ সেপ্টেম্বর।

এই ছেদ-বিন্দু বা ক্রান্তিপাত আকাশে নক্ষত্র মণ্ডলীর মধ্যে স্থির নয়, বছরে প্রায় ৫০ বিকলা (সেকেণ্ড) করে পেছন দিকে সরে যাচ্ছে। এই ক্রান্তি বিন্দু এই ভাবে ঘুরতে ঘুরতে ২৬০০০ বছরে একটি সম্পূর্ণ চক্র আবর্তন করে। ক্রান্তিপাত বিন্দুদ্বয়ের চলনকে ভাস্কর পণ্ডিত সম্পাৎ-চলন নাম দিয়েছিলেন। গণিত-জ্যোতিষের ও ফলিত-জ্যোতিষের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বৈদিক সাহিত্যে বহু জায়গায় এই অয়ন বিন্দু বা সম্পাৎ-বিন্দুর অবস্থান পাওয়া যায়। ফলে অয়ন চলনের হার জানা থাকার জন্য এই সব সাহিত্যের কাল কতকটা হিসাব করা সম্ভব।

অয়নান্ত বিন্দুদ্বয় এবং সম্পাৎ বিন্দুদ্বয় ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রে অতি প্রাচীন কাল থেকেই সুপরিচিত। বেদাঙ্গ জ্যোতিষের রচনাকালে ১৩৫০ খৃ-পূর্বে ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের আদিতে উত্তরায়ণ হত এবং অশ্লেষা নক্ষত্রের মাঝখানে দক্ষিণায়ন হত। এই জন্য সেই সময় ধনিষ্ঠা নক্ষত্রই চক্রের প্রথম নক্ষত্র ছিল। মহাভারত রচনাকালে নক্ষত্র চক্রের প্রথম হয় শ্রবণা। এক নক্ষত্র বা ১৩°২০′ অয়ন চলন হতে প্রায় ৯৬০ বছর লাগে। সুতরাং বেদাঙ্গ জ্যোতিষের ৯৬০ বছর মত পরে মহাভারতের রচনা। বরাহমিহির ৫৫০ খৃস্টাব্দে বলেছিলেন প্রাচীনকালে অশ্লেষার মাঝখানে দক্ষিণায়ন হত কিন্তু তাঁর সময়ে পুনর্বসুতে হচ্ছে। পরে বিষ্ণুচন্দ্র (৫৭৮ খৃ), শ্রীষেণ, মঞ্জালভট্ট (৯৩২ খৃ) ও ভাস্করাচার্য (১১৫০ খৃ) এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেছিলেন। ভাস্করাচার্যের নিরূপিত বার্ষিক গতিবেগে এক বিকলারও কম ভুল দেখা যায়।

বাসন্ত ক্রান্তিপাত বিন্দুকে আদি বিন্দু ধরে যে গণনা হয় তাকে সায়ন গণনা এবং আকাশের যে কোন তারকাকে স্থির আদিবিন্দু ধরে গণনাকে নিরয়ণ গণনা বলা হয়। দুটি সম্পাৎবিন্দু ও দুটি অয়নান্ত বিন্দু চারটি বিন্দুই আলাদা এবং চারটি বিন্দুই রবিমার্গের ওপর অবস্থিত। এই যে কোন বিন্দু থেকে বৎসর গণনা করলে বর্ষমান হয় ৩৬৫.২৪২২ দিন। কিন্তু নিরয়ণ বর্ষমান ৩৬৫.২৫৬৩৬ দিন। নিরয়ণ গণনা অয়নান্ত বিন্দুকে বাদ দিয়ে। সায়ন গণনায় ঋতু সমূহ স্থির, তারকাগুলি পরিবর্তনশীল। পাশ্চাত্য ফলিত জ্যোতিষ সায়ন ভিত্তিক। কিন্তু ভারতীয় জ্যোতিষ মূলত নিরয়ণ ভিত্তিক, এই জন্য ভারতীয় জ্যোতিষে ক্রান্তিপাত বিন্দু ভারতীয় জ্যোতিষের আদি বিন্দু থেকে ক্রমশ পেছিয়ে যাচ্ছে। এই অপসরণের পরিমাণ অয়নাংশ। অর্থাৎ ভারতীয় আদিবিন্দু ও ক্রান্তিপাত বিন্দুর মধ্যকার দূরত্বকে অয়নাংশ বলা হয়। আর্যভট (৪৯৯ খৃ), ব্রহ্মগুপ্ত (৬২৮ খৃ) মনে করেছিলেন তাঁরা সায়ন গণনাই স্থাপিত করে গেলেন। কিন্তু সায়ন নিরয়ণের পার্থক্য তাঁদের জানা ছিল না। এরপর ভারতীয় জ্যোতিষ অয়নাংশ উল্লেখ করে সায়ন ও নিরয়ণ গণনার মধ্যে একটা যোগসূত্র স্থাপনের ব্যবস্থা করে। যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টায় সূর্যসিদ্ধান্ত এরপর অয়নদোলন মতবাদ সৃষ্টি করে। অয়ন দোলন অর্থে ক্রান্তিপাত বিন্দু দুলছে অর্থাৎ পেছিয়ে যাচ্ছে আবার এগিয়ে আসছে এবং এই দোলনের সীমা ২৪° বা কোন মতে ২৭°। অয়নদোলন মতবাদ সূর্যসিদ্ধান্তে ছিল না, পরে যোজনা। অয়ন দোলন মতবাদ বিজ্ঞানভিত্তিক নয়।

আদি বিন্দুর স্থান ঠিক নির্ধারিত করতে গিয়ে অনেকে রেবতী নক্ষত্রকে ভচক্রের প্রথম বিন্দু কল্পনা করে পঞ্জিকা সংশোধন করেছিলেন। রৈবতপক্ষ অনুসারে অয়ন গতি ৫০ বিকলা, বর্তমানে অয়নাংশ ১৯°৩৩ এবং শূন্যায়নাংশ বর্ষ অর্থাৎ ক্রান্তিপাত বিন্দু ও আদি বিন্দুর মিলন বর্ষ ৫৬০ খৃ। রৈবত-পক্ষ হিসাব প্রতিষ্ঠা পায়নি। চৈত্রপক্ষ হিসাব বর্তমান ভারতে চালু রয়েছে। এই হিসাবে চিত্রা নক্ষত্রের ১৮০° অন্তরে ভচক্রের আদিবিন্দু কল্পনা করা হয়। এই গণনায় ১৯৬৪ খৃস্টাব্দে ১৪ এপ্রিল অয়নাংশ ২৭°২১′২৯″ এবং বার্ষিক অয়নগতি ৫০.৩ বিকলা (সেকেণ্ড)। শূন্য অয়নাংশ বর্ষ ২৮৫ খৃ।

অয়োগব—শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে জাত সন্তান।

অয়োবাহু—অয়োভুজ। ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। কুরুক্ষেত্রে ভীমের হাতে নিহত।

অয়োমুখী—সীতা অন্বেষণের সময় মতঙ্গ আশ্রমে আসবার পথে এই রাক্ষসীর সঙ্গে রাম লক্ষ্মণের দেখা হয়। লক্ষ্মণকে (রা ৩।৬৯।১৭) বিয়ে করতে চান। এ'র নাক, কাণ ও স্তন কেটে দিয়ে লক্ষ্মণ (দ্রঃ) এ'কে বিতাড়িত করেন।

অয়োর্নস্—গ্রীক। রনিগৎ পেশোয়ার জেলাতে ওহিন্দ থেকে ১৬ মাইল উত্তর-পশ্চিমে। নিশ্চিত এটি মহবন্ পর্বতে সাহা-কোট এবং পেশোয়ার থেকে ৭০ মাইল উত্তর-পূর্বে। পাণিনির বরণ>অয়োর্নস (?)। আজও সিন্ধুর পশ্চিম তীরে এটোক-এর বিপরীত দিকে বরণ (দ্রঃ) সহর রয়েছে।

অয়োর্নিস্—বরণপুর (রামা); ব্যাকট্রিয়াতে।

অযাতি—নহুষের (দ্রঃ) ছেলে; যযাতির ভাই।

অযুক নদী—পাঞ্জাবে রাভি নদীর পশ্চিমে আপগা (দ্রঃ-)নদী।

অযুতনায়ী—চন্দ্রবংশের রাজা মহাভৌমের ছেলে। মা সুযজ্ঞা, স্ত্রী ভাসা/কাসা; পৃথুশ্রবাকন্যা; এবং ছেলে অক্রোধ/অক্রোধন। অযুত সংখ্যক পুরুষ-মেধ যজ্ঞ করেছিলেন (মহা ১।৯০।২০) ফলে নাম অযুতনায়ী।

অযোধন—পাকপত্তন। রাভি থেকে ৫-মাইল পশ্চিমে। পাঞ্জাবে মণ্টগোমারি জেলাতে মামক ঘাট থেকে ৮-মাইল। ৪০ ফুট উচ্চ টিলার ওপর অবস্থিত বিখ্যাত সহর (আলেকজেন্দ্রীয়)। প্রাচীর ও দুর্গ ধ্বংসাবশেষে পরিণত।

অযোধ্যা—সরযূ নদীর তীরে কোশলের রাজধানী। সূর্যবংশীয় রাজাদের রাজধানী। মোক্ষদায়িকা সপ্তপুরীর একটি। সুদৃঢ় প্রাচীর, শত্রু-মিত্র উভয়েরই দুরধিগম্য। হস্তী, অশ্ব, সহস্রপতাকাধারী তুরগসৈন্য পূর্ণ সুদৃঢ় নগরী কেউ জয় করতে পারত না বলে নাম অযোধ্যা। অপর নাম· বিনীতা, সাকেতপত্তন, সাকেত (বৌদ্ধ), সৌতিকা, সগদ (টলেমি), বিশাখা/বিশাখ, অযুতো, অযুদো (হিউএন্), বাগদ, ভাগদ (তিব্বতী)। রামায়ণে কোসলের দক্ষিণ প্রান্তে ছিল স্যন্দিকা (সই) নদী, ·গোমতী ও গঙ্গার মধ্য অংশে। বৌদ্ধ যুগে সরযূ নদী দ্বারা বিভক্ত দুটি ভাগ, উত্তর কোসল ও কোসল। উ-কোসলের রাজধানী রাপ্তী তীরে শ্রাবস্তী; সরযূতীরে কোসলের রাজধানী অযোধ্যা। বুদ্ধের সময় কোসল রাজ্য হিমালয় থেকে গঙ্গা পর্যন্ত এবং রামগঙ্গা থেকে গণ্ডক পর্যন্ত বিস্তৃত; রাজা ছিলেন প্রসেনজিতের পিতা মহাকোসল।

উত্তর প্রদেশে ফৈজাবাদ জেলার ফৈজাবাদ-অযোধ্যা মিউনিসিপ্যাল সহরের অংশ। অযোধ্যা সহর ও এর পূর্বাঞ্চলের, উত্তর প্রদেশস্থিত, বিস্তৃত অংশ সাধারণত প্রাচীন অযোধ্যা এলাকা বলে পরিচিত। ২৬°৪৮′ উ-অক্ষাংশ ও ৮২ ১৪′ পূর্ব-দ্রাঘিমা। অযোধ্যা রেল স্টেসন থেকে প্রায় ২ কি-মি দক্ষিণে। লখ্নৌ-গোরখপুর জাতীয় জনপথের উপর অবস্থিত। এই পথ অযোধ্যাকে ফৈজাবাদের সঙ্গে যুক্ত করেছে। অযোধ্যার পাশ দিয়ে ঘর্ঘরা (সরযূ) নদী প্রবাহিত।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, অথর্ববেদ, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে এর উল্লেখ আছে।

এখানে রামসীতার বহু মন্দির আছে। প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে 'জনম-স্থানে' রাম জন্মেছিলেন; এবং বর্তমানে এখানে রামসীতার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। রামচন্দ্র যেখানে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন সেই স্থানটির নাম ত্রেতাক-ঠাকুর; এখানকার বর্তমান মন্দিরটির নাম কালে-রাম-কা-মন্দির। কুলুর রাজা তিন শতক আগে এটি তৈরি করে দিয়েছিলেন। অহল্যাবাঈ ১৭৮৪ খৃস্টাব্দে মন্দিরটির অনেক উন্নতি সাধন করেন। কালো পাথরের যে প্রাচীন মূর্তিগুলি ঔরঙ্গজেব নদীতে ফেলে দিয়েছিলেন সেগুলি তুলে এনে আবার মন্দিরে স্থাপন করা হয়।

চিরোদক বা চিরসাগরে দশরথ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেছিলেন। রত্নমণ্ডপে রামের সভাগৃহ ছিল। ফয়জাবাদে স্বর্গদ্বারে রামের অগ্নিকৃত্য করা হয়। লক্ষ্মণ কুণ্ডে লক্ষ্মণ সরযূতে দেহত্যাগ করেন। ফয়জাবাদে মঝউরাতে অন্ধঋষির পুত্রকে দশরথ হত্যা করেছিলেন।

দশরথের রাজধানীর বর্ণনা ঃ—মনুনা নির্মিতা ; ১২ যোজন×৩ যোজন। সুবিভক্ত মহাপথা ; মহারাজমার্গ দিয়ে শোভিত ও নিত্যজলসিক্তা (রা ১ ৫।৭)। অর্থাৎ পৌর ব্যবস্থার একটি বিশেষ প্রমাণ। মুক্তপুষ্পাবকীর্ণা। কবাটতোরণাবতী, দৃঢ়তোরণার্গলা (রা ১।৬।২৮), সর্বযন্ত্রায়ুধবতী, শতঘ্নীশতসংকুলা, দুর্গগম্ভীরপরিখা। সুবিভক্ত-অন্তর-আপণা উচ্চাট্টালধ্বজবতী, সালমেখলা, উদ্যান-আম্র-বনোপেতা, সর্বশিল্পীযুক্তা, সামন্ত-রাজ-নানা-দেশ-নিবাসী বণিক শোভিতা (রা ১।৫।১৪) অর্থাৎ বাণিজ্যের একটি কেন্দ্রস্থল। যান বাহন হিসাবে গরু, উট ও খর (১।৫।৩৩) প্রচুর ছিল ; যুদ্ধেও হয়তো কাজে লাগত। আর ছিল বাজি-বারণ-সংপূর্ণা। কাম্বোজ, বাহ্লীক ও বনায়ু (=আরব ?) দেশ জাত অশ্ববাহিনী (১।৬।২২) এবং বিভিন্ন জাতির হস্তী (১।৬।২৩) ছিল। হাতীগুলির মোটামুটি তিনটি ভাগ—ভদ্র- হিমালয় জাত, মন্দ্র=বিন্ধ্য জাত এবং মৃগ=সহ্য পর্বত জাত। এদের থেকে সঙ্কর হাতীও প্রচুর ছিল। অর্থাৎ পশু-পালন ও পশুব্যবসাও সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। এ ছাড়া শালিতণ্ডুল সংপূর্ণা ও ইক্ষুকাণ্ড-রস উদকা অযোধ্যা।

নগরবাসীদের চিত্তবিনোদের জন্য একটা অভিনব জিনিস ছিল বধূনাটক সংঘ (১।৫।১২) ; অর্থাৎ সম্পূর্ণ (?) মেয়েদের দল। আজকের দিনেও এটি দেখা যায় না। হয়তো কবির কল্পনা, কিন্তু কল্পনার ভিত্তি হিসাবেও কিছু একটা ছিল (রা ২ ৫১।২১)। গণিকাবর-শোভিতা, সর্বকল্যাণসম্পূর্ণা হৃষ্টপুষ্টজনপদা, আরাম-উদ্যানসম্পন্না, সমাজ-উৎসব-শালিনী অযোধ্যা ; সন্ধ্যাতে উদ্যানগুলি খেলার পর খালি হয়ে যায় : জনানাং রতি-সংযোগেষু অত্যন্ত গুণবন্তী নগরী ; মধুর-কল-বাণী-পূর্ণা, চন্দনাগুরুসংপৃক্তা, ধূপসং-মূর্চ্ছিতা, মাল্যাপণেষু পণ্যানি। (২।১১৪।২৩) বারুণীমদগন্ধা ও মাল্যগন্ধমূর্চ্ছিতা। (১।২২।১২) —অযোধ্যা থেকে দেড় যোজন দূরে সরয়ূ। ১।৭।১৫ শ্লোকে রয়েছে দশরথের শাসনে কেউ পরদাররত ছিল না ; অর্থাৎ পরদাররত সে যুগে ব্যাপক ছিল ; দশরথ নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন। (দ্রঃ-রাম)

অযোধ্যা রাজ্যকে কোশল রাজ্যও বলা হত। অযোধ্যা থেকে পরে সাকেতে

ও তারপরে শ্রাবস্তীতে কোশলের রাজধানী হয়। গুপ্ত সাম্রাজ্যে অযোধ্যা একটি প্রধান ও সমৃদ্ধ নগরী। হিউ-এন্-ৎসাঙ্-এর সময় অযোধ্যায় বৌদ্ধধর্ম অতি প্রবল ছিল। এই সময় এখানে ১০০টি বৌদ্ধ মঠে তিন হাজারেরও বেশি মহাযানী ও হীনযানী ভিক্ষু ছিলেন। হিউ-এন্-ৎসাঙ্ লিখে গেছেন এখানকার জনসাধারণ ধার্মিক ও ব্যবহার বিদ্যায় অনুরক্ত ছিল। অষ্টম থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে অযোধ্যা প্রথমে যশোবর্মার এবং পরে গুর্জর প্রতিহার সাম্রাজ্যের হাতে যায়। এরপর শ্রীবাস্তবদের এবং তারপর কান্যকুব্জের গাহড়বাল শক্তির হাতে যায়। ১১৯৩ খৃস্টাব্দে গাহড়বাল রাজ জয়চন্দ্র মুসলমানদের হাতে পরাজিত ও নিহত হন এবং অযোধ্যা মুসলমান শাসকের হাতে চলে যায়।

জৈন গ্রন্থাদি অনুসারে ২৪ তীর্থংকরের মধ্যে ২৩ জনই ইক্ষ্বাকু বংশীয় এবং এঁদের মধ্যে আদিনাথ (ঋষভদেব), অজিতনাথ, অভিনন্দনাথ, অনন্তনাথ ও সুমতিনাথ এখানে জন্মেছিলেন। জৈন মন্দিরগুলির মধ্যে শ্বেতাম্বর জৈনদের অজিতনাথ মন্দিরটি প্রসিদ্ধ।

এক মাত্র একাদশীর দিনে সাধারণের কাছে উন্মুক্ত নগেশ্বর নাথের মন্দিরটি কুশ তৈরি করেছিলেন বলে বিশ্বাস। হনুমান-গাড়িতে হনুমানের একটি মন্দির আছে। এই মন্দিরটি বৃহৎ ও দুর্গযুক্ত। এ ছাড়া সীতা কা রসোই (সীতার রান্নাঘর), বড়া আস্থান (নির্বাসনের পর অভিষেক স্থান), রত্ন সিংহাসন, রঙ মহল, আনন্দ ভবন, (কৌশল্যার তৈরি যেন), কৌশল্যা ভবন, ক্ষীরেশ্বরনাথ মন্দির, শিশ্-মহল মন্দির, কৃষ্ণ মন্দির, উমাদত্ এর মন্দির, তুলসী চৌরা (রামচরিত মানসের আরম্ভের স্থান), জানকী তীর্থ, চন্দ্রহরি, ধর্মহরি, স্বর্গদ্বার ঘাট, রামঘাট, সুগ্রীবকুণ্ড, মণিরাম কি ছাউনি উল্লেখযোগ্য। শ্রাবণ শুক্লপক্ষ থেকে শ্রাবণ ঝুলার মেলা আরম্ভ হয়। বিভিন্ন মন্দির থেকে মূর্তিগুলিকে শোভাযাত্রা করে মণিপর্বতে নিয়ে যাওয়া হয়। চৈত্রে রামনবমীর মেলা, কার্তিকে পূর্ণিমার মেলাও উল্লেখযোগ্য।

মণিপর্বত নামে ২০-মি উচ্চ টিলাটি বৌদ্ধস্তূপের ধ্বংসাবশেষ মনে হয়। মণিপর্বত অশোকের স্তূপ (হিউ এন-ৎসাঙ্)। রামকোটের দক্ষিণ পূর্বে ছোট টিলা দুটির একটির নাম সুগ্রীব পর্বত। সুগ্রীব পর্বত কালকারাম পূর্বারাম বিহার। কুবের পর্বত স্তূপে বুদ্ধের নখ ও কেশ রয়েছে, এটিকে গন্ধমাদন পর্বতের টুকরো বলা হয়, হনুমানের পিঠ থেকে ভেঙে পড়েছিল। খৃ-২ শতকে অন্য মতে ৫-শতকে বিক্রমাদিত্য (গুপ্তবংশ) অযোধ্যার পুরাতন স্থানগুলির সংস্কার করেছিলেন।

মণি পর্বতের কাছে সেঠ্ ও জব্-এর সমাধি এবং থানার কাছে নোয়া র সমাধি বলে কথিত সমাধি আছে। নোয়ার সমাধি ৮-মিটার দীর্ঘ।

অযোনিসম্ভব—যোনিপথে জন্ম সম্ভব হয় নি যার। যেমন সীতা, অগস্ত্য, বশিষ্ঠ, দ্রোণ, দ্রৌপদী, ধৃষ্টদ্যুম্ন ইত্যাদি।

অরণী—ধর্ম (দ্রঃ) হরিণ বেশে চুরি করেন (মহা ৩।২৯৮।২১)। যুধিষ্ঠির (দ্রঃ) ফিরিয়ে আনেন।

অরণ্য—নয়টি পবিত্র অরণ্য—সৈন্ধব, দণ্ডক, নৈমিষ, কুরুজাঙ্গল, উৎপলারণ্য, জম্বুমার্গ, পুষ্কর, অরণ্য ও হিমালয়। দ্রঃ-বন।

অরণ্য—জনৈক ইক্ষ্বাকু রাজা।

অরণ্যষষ্ঠী—জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ষষ্ঠী। জামাই ষষ্ঠী নামে অধিক পরিচিত। সন্তানের মঙ্গলের জন্য মেয়েরা এই দিন ব্যজন নিয়ে বনে গিয়ে বিন্ধ্যবাসিনী ষষ্ঠীর পূজা করবেন ও ফল মূল খাবেন বিধান আছে। অনেকে এই দিন ষষ্ঠী ব্রত অনুষ্ঠান করেন। সন্তানদের সমস্ত আবদার পূরণ করার জন্য ব্রতে নির্দেশ আছে। জননীরা এই আবদার পূরণের চেষ্টা করেন এবং সন্তানতুল্য জামাতাদেরও খাদ্য ও বস্ত্রাদি দিয়ে খুসি করেন। ষষ্ঠী দেবীকে যে নৈবেদ্য দেওয়া হয় তার সংস্কৃত নাম বায়ন ; এবং বায়ন থেকে বায়না বা বাটা শব্দ। এই নৈবেদ্যের অংশ বায়না বা বাটা নামে সন্তান ও জামাতাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার নিয়ম।

অরন্তুক—দেবীতীর্থ (মহা ৩।৮১।৫২)। শঙ্খিনী থেকে অরন্তুকে দ্বারপালে আসতে হয়। এখানে সরস্বতীতে যক্ষেন্দ্রতীর্থে স্নান করলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয়। এখান থেকে তারপর ব্রহ্মাবর্ত তীর্থে যেতে হয়। মহা ৩।৮১।১৭১ যক্ষং দ্বারপালম্ অরন্তুকম্ অভিবাদ্য কোটিবৃপম উপস্পৃশ্য বহু সুবর্ণক লাভ হয়। এইখানে গঙ্গা হ্রদ। তরন্তুক, অরন্তুক, রামহ্রদানি ও মচক্রুক এইগুলির মাঝখানে পিতামহের উত্তরবেদী—কুরুক্ষেত্র, সমন্তপঞ্চক।

অরন্ধন—ভাদ্র সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত হলে বৃদ্ধারন্ধন. ভাদ্রের যে কোন দিন হলে ইচ্ছারন্ধন। এই দিনে রান্না নিষিদ্ধ। বাসি অন্ন-ব্যঞ্জন মনসা দেবীকে উৎসর্গ করে গ্রহণীয়।

অরবালো—কাশ্মীরে উলুর,বোলুর হ্রদ। কাশ্মীর উপত্যকাতে সব চেয়ে বড় হ্রদ; প্রচুর পানিফল হয়। ভিক্ষু মঝ্‌ঝান্তিক-কে অশোক গান্ধার ও কাশ্মীরে পাঠান। ইনি অরবালো-রাজ নাগবংশীয় মহাপদ্মকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন। ফলে অপর নাম মহাপদ্ম সর।

অরবুট্ট—ওরোবর্টিস্ (আলেকজেন্দ্রীয়)। লণ্ডাই নদীর বামতীরে নওসেরার কাছে। পিউকেলাটিস্ বা পুষ্কলাবতীর পশ্চিমে।

অরা—শুক্রকন্যা। দ্রঃ-দণ্ডকারণ্য।

অরাচীন পুরুবংশে রাজা জয়ৎসেন ও স্ত্রী সুষবার (বৈদর্ভী) ছেলে। অরাচীনের স্ত্রী আর এক জন বিদর্ভ রাজকন্যা, নাম মর্যাদা, ছেলে মহাভৌম (মহা ১।৯০।১৮)।

অরালি—বিশ্বামিত্রের এক ছেলে (মহা ১৩।৪)।

অরিয়ান—মধ্য এসিয়াতে (স্ত্রাবো), আর্যদের একটি মূল আবাস স্থল। আবেস্তাতে ঐরণ্য বেজ (আর্যবীজ)। অজারবাইজন (দ্রঃ)। ভারতের উত্তরে ভীষণ ঠাণ্ডা দেশ। বেলুরতঘের ও মুস্তঘের পশ্চিমে। আম ও স্যহুন উৎসের কাছে। আর্যদের কিছু কিছু অংশ বিভিন্ন সময়ে ইউরোপে গিয়ে বসতি গড়ে তোলে। বাকি যারা ছিল পরে ইরান ও পাঞ্জাবে আসে। পাঞ্জাবে যারা আসেন তাদের মধ্যে কৃষি ও ধর্মীয়

ক্রিয়া কলাপ নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। বরুণকে সামান্য দেবতা এবং ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ এই নিয়ে জটিল বিরোধ দেখা দেয়। মধ্য এসিয়াতে থাকার সময় বরুণ ছিলেন সব-চেয়ে বড় দেবতা। পাঞ্জাবে এই ভাবে দুটি সম্প্রদায় গড়ে ওঠে এবং প্রাচীন বরুণপন্থীরা ইরানে গিয়ে বসবাস আরম্ভ করেন; এঁরা জরথুস্ত্র দল। পাঞ্জাবের নব্যপন্থীরা ক্রমশ সারা ভারতে ছড়িয়ে যান।

অরিষ্ট—(১) বৈবস্বত মনুর ছেলে; অন্য নাম নাভাগ। (২) অসুর। বলিরাজের ঔরস পুত্র। কংসের প্রিয় পাত্র। কংসের নির্দেশে বৃষভ রূপে উপস্থিত হন এবং উপদ্রব করতে থাকেন। কৃষ্ণ গোপিনীদের সঙ্গে খেলা করছিলেন; গোপিনীরা ভীত হয়ে পড়েন। অরিষ্ট কৃষ্ণকে তারপর আক্রমণ করতে এলে কৃষ্ণ এর শিঙ ধরে পিটিয়ে নিহত করেন।

অরিষ্টনেমি—অরিষ্টনেম। (১) এক জন রাজা। জীবনের অসারতা বুঝে সব ছেড়ে দিয়ে তপস্যা করতে থাকেন। ইন্দ্র স্বর্গে নিয়ে যেতে চান। রাজর্ষি স্বর্গেও যেতে চান না কারণ সেখানে পুণ্যবল শেষ হওয়া ইত্যাদি অনিত্যতা রয়েছে। ইন্দ্র তখন রাজাকে বশিষ্ঠ আশ্রমে পাঠান (যোগবাশিষ্ঠ)। (২) কশ্যপের ঔরসে বিনতার (দ্রঃ) সন্তান। (৩) পৌষ মাসে সূর্য (দ্রঃ) রথে যে যক্ষ অবস্থান করেন তাঁর নাম। যক্ষের কাজ রথে লাগাম ব্যবস্থা করা। (৪) সগর রাজার স্ত্রী সুমতির পিতা। সগরকে ইনি বহু উপদেশ দিয়েছিলেন। (৫) বৃষ্ণির প্রপৌত্র। (৬) ২২-শ জৈন তীর্থঙ্কর। (৭) এক জন প্রজাপতি; ইনি দক্ষের (দ্রঃ অসিক্নী) চারিটি মেয়েকে বিয়ে করেন (হরি বংশ)। একটা মতে অরিষ্টনেমির ১৬টি সন্তান। সকল কাজে স্বস্তি বচনে অরিষ্টনেমির নাম কীর্তন করা হয়। (৮) অজ্ঞাতবাসের সময় সহদেবের নাম। (৯) কশ্যপের এক নাম।

অরিষ্টনেমি—তার্ক্ষ্য। পাণ্ডবদের বনবাসের শেষ পর্যায়ে মার্কণ্ডেয় দ্বিজমুখ্যদের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন এক হৈহয় রাজকুমার পরপুরঞ্জয় বনে মৃগচর্ম পরিহিত এই ব্রাহ্মণ কুমারকে হরিণ মনে করে নিহত করেন (মহা ৩।১৮২।৪)। এরপর অনুতাপে বালকের পিতা অরিষ্টনেমি-তার্ক্ষ্য-এর আশ্রমে এসে সব জানান। বিপ্রর্ষি তখন আশ্বাস দিয়ে বলেন ব্রাহ্মণের সমস্ত ক্রিয়াগুলি তাঁরা পালন করেন, তাঁদের মৃত্যু ভয় নাই, এবং দেখান বালকটি তাঁর ছেলে; মারা যায়নি।

অরিষ্টপুর—অরিট্‌ঠপুর। শিবিদের রাজধানী। হয়তো পাঞ্জাবের উত্তরে অরিষ্টো-বোথ: (টলেমি)।

অরিষ্টা—দক্ষ কন্যা। কশ্যপের চতুর্থা স্ত্রী; সন্তান গন্ধর্বরা (দ্রঃ)।

অরুগ্বান্—বিডূরথের (দ্রঃ) ছেলে। স্ত্রী মাগধী নাম অমৃতা (দ্রঃ) ছেলে পরিক্ষিৎ/পরীক্ষিৎ (মহা ১।৯০।৪৩)।

অরুণ—গরুড়ের বড় ভাই। কশ্যপ কদ্রুকে বর দেন হাজার ছেলে হবে এবং বিনতাকে বর দেন অধিকতর বলবান ও গুণবান ছেলে হবে। বিনতার (দ্রঃ) গর্ভে কশ্যপের ঔরসে দুটি ডিম হয়। বহু দিন কেটে যায় ডিম ফোটে না অথচ সতীন কদ্রুর সন্তানরা

দিন দিন বড় হয়ে উঠছে দেখে বিনতা ঈর্ষায় একটি ডিম ফাটিয়ে ফেলেন। ফলে ডিম থেকে অপুষ্ট, ঊরুহীন একটি শিশু বার হয়ে আসে। ঊরুহীন বলে নাম অনূরু বা অরুণ। অপুষ্ট অরুণ মাকে শাপ দেন এই ব্যস্ততা ও সতীনপনার জন্য কদ্রুর কাছে তাঁকে ৫-শত বছর দাসী হয়ে থাকতে হবে ; এবং দ্বিতীয় ডিমটি এ ভাবে অসময়ে না ভাঙলে সেই ডিম থেকে যে সন্তান হবে সেই সন্তান এই দাসীত্ব থেকে বিনতাকে মুক্তি দেবেন। রামায়ণে আছে অরুণের স্ত্রী শ্যেনী ; ছেলে বড় সম্পাতি ও ছোট জটায়ু (মহা ১।৬০।৬৭)।

রাহু সুবিধা পেলেই সূর্যকে গ্রাস করেন। এই জন্য সূর্য রাগে সব কিছু পুড়িয়ে নষ্ট করে দিতে যান। দেবতারা ভয়ে ব্রহ্মার আশ্রয় নিলে ব্রহ্মা অরুণকে সূর্যের রথে সারথি করে পাঠান; সূর্যকে আড়াল করে থাকবে। সৃষ্টি তাহলে রক্ষা পাবে। সেই থেকে অরুণ সূর্যের সারথি।

উগ্রশ্রবার (দ্রঃ) স্ত্রীর শাপে সূর্য ওঠা বন্ধ থাকে ; ইন্দ্রসভাতে এই-সুযোগে অপ্সরাদের নাচ দেখতে যাবেন অরুণ মনস্থ করেন। কিন্তু এখানে পুরুষদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। অরুণ তখন স্ত্রী বেশে সভাতে যোগদান করেন। ইন্দ্র এঁকে দেখে মুগ্ধ হয়ে সম্ভোগ করেন এবং সেই রাতেই অরুণের একটি সন্তান হয়। ইন্দ্রের উপদেশে এই শিশুকে গৌতমের স্ত্রী অহল্যার কাছে অরুণ রেখে যান। এই শিশুই বালী। পর দিন সকালে সূর্যের কাছে যেতে অরুণের একটু দেরি হয়ে যায়। কেন দেরি হল সূর্য জানতে চান এবং অরুণকে আবার স্ত্রী বেশ ধারণ করতে বলেন। সূর্যের ঔরসে এবারও একটি সন্তান হয় এবং একেও অরুণ অহল্যার (দ্রঃ) কাছে দিয়ে আসেন। এই দ্বিতীয় শিশু সুগ্রীব। (২) কৃষ্ণের এক ছেলে। (৩) সূর্য বংশে ত্রিধন্বার ছেলে। ৪) চন্দ্র বংশে উরুক্ষ রাজার বড় ছেলে। (৫) নরকাসুরের ছেলে। (৬) একটি সাপ। (৭) শুক্লযজুঃ বেদে অরুণ উদয়কালীন রক্তবর্ণ সূর্য।

অরুণা—(১) কশ্যপের ঔরসে প্রধার প্রাবার মেয়ে অরুণা, রম্ভা তিলোত্তমা ইত্যাদি (মহা ১।৫৯।৪৮)। অরুণোদয় কালে জন্ম বলে নাম অরুণা। (২) প্রাচীন সরস্বতীর শাখা। কুরুক্ষেত্রে প্রবাহিত। অপর নাম মার্কণ্ড। পৃথু-উদক (পেহোয়া) থেকে ৩-মাইল উ-পূর্বে অরুণা-সঙ্গম নামক স্থানে সরস্বতীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। (৩) প্লক্ষদ্বীপের সাতটি নদীর মধ্যে সর্বপ্রধান নদী। অরুণোদয় কুণ্ড হতে নির্গত হয়েছে বলে এই নাম। (৪) সপ্ত কোশির একটি, বর্তমানেও এই নাম।

অরুণাচল—অরুণগিরি। মাদ্রাজে দক্ষিণে আরকট জেলাতে তিরুবন্নামালই। এখানে অরুণাচলেশ্বর ও অর্দ্ধনারীশ্বর মন্দির রয়েছে। মহাদেবের পাঞ্চভৌতিক মূর্তির অন্যতম তেজোমূর্তি এখানে প্রকাশিত। দ্রঃ- চিত্তমবলম্। (২) কৈলাস পর্বত শাখার পশ্চিমে একটি পর্বত।

অরুণোদয়—সূর্য ওঠার আগে চার দণ্ড। রাত্রির শেষ যামের শেষার্দ্ধ (ব্রহ্মবৈবর্ত)।

অরুণোদয় সপ্তমী—মাঘী শুক্লা সপ্তমী। এই তিথিতে অরুণোদয় কালে স্নান করে সূর্যকে অর্ঘ্য দিতে হয়।

অরুণোদা—(১) প্লক্ষদ্বীপে একটি নদী। (২) গাড়োয়াল ; এই দেশে অলকানন্দা নদী প্রবাহিত (স্কন্দ-পু)।

অরুন্ধতী—(১) বশিষ্ঠের স্ত্রী। অপর নাম ঊর্জা। প্রজাপতি কর্দমের ঔরসে দেবাহুতির গর্ভে জন্ম। অত্যন্ত বিদুষী এবং তপস্বিনী। পতিভক্তির আদর্শ। যে কোন নারীর তুলনায় পতিভক্তিতে শ্রেষ্ঠ ; সপ্তর্ষিরাও এ'কে শ্রদ্ধা করতেন। শাস্ত্রে আছে স্বামী-সেবা ধর্ম যাঁরা পালন করেন তাঁরা স্বর্গেও অরুন্ধতীর মত পূজিতা হন। অরুন্ধতী নক্ষত্রকে যখন কেউ দেখতে না পায় তখন তার আয়ু শেষ হয়ে এসেছে মনে করা হয়। কুশণ্ডিকার সময় মন্ত্রপাঠকালে নববধূকে অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখাবার নিয়ম আছে ; মন্ত্র—যথা শচী মহেন্দ্রস্য স্বাহা চৈব বিভাবসোঃ . বশিষ্ঠে চাপ্যরুন্ধতী, যথা নারায়ণে লক্ষ্মীঃ তথা ত্বং ভব ভর্তরি। নববধূ দ্রৌপদীকে কুন্তী এই মন্ত্রে আশীর্বাদ করেছিলেন। আকাশে বশিষ্ঠ নক্ষত্রকে যদি কোন সময়ে অরুন্ধতী নক্ষত্রের পেছনে দেখা যায় তাহলে সেই সময় দেশে তীব্র বিপদ দেখা দেয়।

আগের জন্মে নাম ছিল সন্ধ্যা। ব্রহ্মার কাম/অনুরাগ থেকে জন্ম। সন্ধ্যা ক্রমশ বয়স্কা ও রূপবতী হয়ে উঠতে থাকেন। ব্রহ্মাও উত্তেজিত হয়ে পড়তে থাকেন। শিব এই দেখে ব্রহ্মাকে উপহাস করেন : সন্ধ্যা লজ্জিত হয়ে পড়েন। তবুও ব্রহ্মা ও প্রজাপতিরা (এ'রা সন্ধ্যার ভাই) সন্ধ্যাকে ভোগ করেন। ফলে সন্ধ্যা অনুশোচনায় আত্মবিসর্জন করবেন ঠিক করেন। চন্দ্রভাগা পর্বতে গিয়ে তপস্যা করতে থাকেন। ব্রহ্মা জানতে পেরে দুঃখিত হয়ে পড়ে বশিষ্ঠকে পাঠান। ব্রাহ্মণবেশে এসে কি ভাবে তপস্যা করতে হয় বশিষ্ঠ শিখিয়ে দেন। কঠোর তপস্যা করতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত গরুড়ের পিঠে চড়ে বিষ্ণু দেখা দেন। সন্ধ্যা বর চান যে কোন জন্মেই স্বামী ছাড়া অন্য কোন পুরুষের কথা কোন দিন যেন না তাঁর মনে আসে ; এবং কোন পুরুষ যদি কোন দিন তাঁর দিকে কামার্ত হয়ে চেয়ে দেখেন তাহলে সে যেন তখনই নপুংসকে পরিণত হয়। এছাড়া কোন জীবেরই যৌবনের আগে যেন কোন দিন কাম ভাব না আসে। বিষ্ণু বর দেন এবং তাছাড়া বলেন প্রিয়ব্রতের ছেলে মেধাতিথি চন্দ্রভাগা নদীর কূলে জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ করছেন ; সকলের অলক্ষ্যে সেই আগুনে সন্ধ্যা গিয়ে যেন দেহত্যাগ করেন। তাহলে সেই আগুন থেকেই মেধাতিথির মেয়ে হয়ে জন্মাবেন এবং দেহত্যাগের সময় যার কথা স্মরণ করবেন তাকেই স্বামী হিসাবে পাবেন। বিষ্ণু তারপর আঙুলের ডগা দিয়ে সন্ধ্যাকে স্পর্শ করে ফিরে যান। সন্ধ্যা দেহ ত্যাগ করলে অগ্নি এই দেহ নিয়ে গিয়ে সূর্যমণ্ডলে স্থাপন করেন। সূর্য এই দেহ দু টুকরো করে নিজের রথে তুলে নেন ; ওপর অংশটি হয় প্রাতঃসন্ধ্যা এবং নীচের অংশটি হয় সায়ং-সন্ধ্যা।

এদিকে যজ্ঞের শেষে অগ্নিকুণ্ড থেকে অগ্নিশিখার মত একটি মেয়ে জন্মায়। মেধাতিথি একে কোলে তুলে নেন এবং নাম দেন অরুন্ধতী। রোধ অর্থে বাধা :

অর্থাৎ যাকে কেউ বাধা দিতে পারবে না। অন্য মতে কর্দম ও দেবাহূতির মেয়ে ; চন্দ্রভাগার উপকূলে বড় হতে থাকেন। পাঁচ বছর যখন বয়স তখন ব্রহ্মা এক দিন দেখতে পান এবং সূর্যের স্ত্রী সাবিত্রী ও বহুলাকে অরুন্ধতীর শিক্ষার ভার দেন। মানস সরোবরে সাবিত্রী, গায়ত্রী, বহুলা, সরস্বতী ও দ্রুপদার সঙ্গে অরুন্ধতী বাস করতে থাকেন। এর পর এক দিন বশিষ্ঠের সঙ্গে দেখা হয় এবং দুজনেই প্রণয়াবদ্ধ হয়ে পড়েন। দেবতাদের উপস্থিতিতে এঁদের বিয়ে হয়। কালিকা পুরাণেও এই কাহিনী। তবে এখানে ব্রহ্মা ও ব্রহ্মার মানস পুত্রেরা নির্দোষ। সন্ধ্যাকে ব্রহ্মা প্রথমে সৃষ্টি করেন ; কোন লালসা ইত্যাদি ছিল না। এর পর কামদেব জন্মান। কামদেব ব্রহ্মা ইত্যাদি সকলের উপর নিজের ক্ষমতা পরীক্ষা করতে চেষ্টা করেন। ফলে সকলে কামার্ত হয়ে পড়েন এবং ঘামতে থাকেন মাত্র। সপ্তর্ষিদের ঘাম থেকে পিতৃদেবদের (দ্রঃ) জন্ম ; সন্ধ্যা এখানে কারণ ফলে সন্ধ্যা এঁদের মা। ন রুণদ্ধি যতঃ ধর্মং (কালি ২২।১১৭) ফলে নাম অরুন্ধতী। বিষ্ণু সন্ধ্যাকে স্পর্শ করে পুরোডাশে পরিণত করে দিয়েছিলেন ; যাতে যজ্ঞে আহুতির উপযুক্ত হতে পারে।

অরুন্ধতীর বিয়েতে সমস্ত দেবতারা মিলে অবভৃত স্নান করান। ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিব নানা উপহার দেন ; অদিতি নিজের কুণ্ডল দান করেন। অবভৃত স্নানে এই জল মানস পর্বত থেকে হিমালয়ে সপ্তধারাতে নেমে আসে এবং সাতটি নদীতে পরিণত হয়। দ্রঃ শিপ্রা।

ইনি একবার স্বামীর চরিত্র সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে ওঠেন ; ফলে অরুন্ধতীর সৌন্দর্য হানি হয়। মহর্ষিরা একবার অরুন্ধতীকে আশ্রমে রেখে বনে ফলমূল আনতে যান। বার-বছর ধরে অনাবৃষ্টি হবার ফলে ভীষণ অভাব দেখা দিয়েছিল। সপ্তর্ষিরা হিমালয়ে গিয়ে সেখানে থেকে যান। অরুন্ধতী আশ্রমে কঠোর তপস্যা করতে থাকেন। শিব এই সময় এক দিন ব্রাহ্মণ বেশে এসে খেতে/ভিক্ষা চান। অরুন্ধতী বলেন বদর ফল ছাড়া খাবার মত কিছুই নাই। ব্রাহ্মণের অনুরোধে অরুন্ধতী এই ফল সিদ্ধ করতে থাকেন এবং ব্রাহ্মণ তাঁকে নানা গল্প শোনাতে থাকেন। এই ভাবে বার বৎসর কেটে যায় : সপ্তর্ষিরাও ফিরে আসেন। একটি মতে অরুন্ধতী সাধ্য মত খেতে দিলে বৃষ্টিপাত হয়। মহাদেব নিজের মূর্তি ধারণ করে সপ্তর্ষিদের বলেন অরুন্ধতী আশ্রমে থেকেও অধিক পুণ্য অর্জন করেছেন এবং অরুন্ধতীকে বর দিতে চান। অরুন্ধতী বর চান স্থানটি বদরপচন (মহা ৯।৪৭।৪৪) নামে পরিচিত হোক।

দক্ষ যজ্ঞে অন্যান্য অনেকের সঙ্গে বশিষ্ঠও মারা যান এবং অরুন্ধতী সহমৃতা হন এবং দুজনে দুটি নক্ষত্রে পরিণত হন। দ্রঃ-বশিষ্ঠ, অক্ষমালা, ঊর্জা।

(২) সপ্তর্ষি মণ্ডলে (উরসা মেজর) বশিষ্ঠের পাশে ছোট একটি তারা (Alcor)। (৩) দক্ষের দশটি মেয়েকে ধর্ম বিয়ে করেন তাঁদের মধ্যে অন্যতমা।

অরুন্ধতীবট—একটি তীর্থ (মহা ৩।৮২।৩৭)।

অরূপা—প্রধার একটি মেয়ে (মহা ১।৬৫।৪৫)।

অর্কক্ষেত্র—সূর্যক্ষেত্র, পদ্মক্ষেত্র, কোণারক, চন্দ্রভাগা, কোণাদিত্য, কৃষ্ণ প্যাগোডা। পুরী থেকে ১৯ মাইল উ-পশ্চিমে। সূর্য কোণাদিত্য বিগ্রহের মন্দির। গঙ্গাবংশে লাঙ্গুলিয় নরসিংহদেব মন্দিরটি নির্মাণ করান (খৃ ১২৩৭—১২৮২)।

অর্কপর্ণ—কশ্যপের ঔরসে মুনির ছেলে ; একটি গন্ধর্ব।

অর্কবিবাহ—চতুর্থাদি বিবাহার্থ তৃতীয় বারে কন্যারূপে কল্পিত অর্কবৃক্ষের সঙ্গে তৃতীয় বিবাহ।

অর্কব্রত—(১) সূর্য ব্রত। মাঘের শুক্লা সপ্তমী থেকে বৎসর পর্যন্ত প্রতি শুক্লা সপ্তমীতে সূর্য আরাধনা রূপ ব্রত। (২) অগ্রহায়ণাদি আটমাস অল্প তাপে অল্প অল্প রস গ্রহণের ন্যায় প্রজাদের কাছ থেকে বিনা পীড়নে রাজা কর্তৃক শাস্ত্রীয় কর গ্রহণ।

অর্ঘ্য—পূজাতে দেয় উপচার। আপঃ ক্ষীরং কুশাগ্রং চ দধি সর্পিঃ সতণ্ডুলম্। যবাঃ সিদ্ধার্থকাশ্চৈব অষ্টাঙ্গোঽর্ঘ্যঃ প্রকীর্তিতঃ।

অর্চিষ্মৎ—পিতৃদেবদের (দ্রঃ) একটি শাখা।

অর্চিষ্মতী—অঙ্গিরসের ৪র্থী কন্যা। এঁর আলোতে রাত্রিতেও দেখা যায়। দ্রঃ-অগ্নিবংশ।

অর্চিস্—বেণ (দ্রঃ) রাজার বাহু থেকে পৃথু ও অর্চিস জন্মান। পৃথু বনে গিয়ে তপস্যা করেন এবং আগুনে দেহ বিসর্জন দিয়ে অর্চিস-কে নিয়ে বৈকুণ্ঠ যান। (ভাগ ৪।-)

অর্জিকেয়- বিয়াস।

অর্জিসান--দ্রঃ-মহস্থ।

অর্জুন—প্রতীপ-শান্তনু-ব্যাস-পাণ্ডু-অর্জুন। দ্রঃ-রক্তক। কুন্তীর গর্ভে ইন্দ্রের ঔরসে জন্ম। পাণ্ডুর তৃতীয় ছেলে বলে পরিচিত। কর্ণ, যুধিষ্ঠির ও ভীমের থেকে ছোট। পূর্বজন্মে ইনি নর (দ্রঃ-নর-নারায়ণ) ঋষি ছিলেন। জন্ম হিমালয়ে, দিনের বেলা ; উত্তর ফাল্গুনী ও পূর্ব ফাল্গুনীর মধ্য সময়ে (মহা ৪।৩৯।১৪)। ভীমের জন্মের পর লোকশ্রেষ্ঠ পুত্র কামনায় মহর্ষিদের সঙ্গে পরামর্শ করে কুন্তীকে পাণ্ডু এক বৎসর ব্রত ধারণ করান এবং নিজেও ইন্দ্রের তপস্যা করেন। ইন্দ্র বর দিয়ে যান প্রার্থিত পুত্র দেবেন। পাণ্ডু তখন প্রার্থিত পুত্রের জন্য কুন্তীকে বলেন ; এরপর গর্ভ ধারণ করার অর্থ ভীম থেকে অর্জুন প্রায় ২ বৎসর মত ছোট। অর্জুন জন্মালে দৈববাণী হয় শিবের মত পরাক্রমশীল ও ইন্দ্রের মত অজেয় হবেন। শিবের কাছে পাশুপত অস্ত্র পাবেন, নিবাতকবচ নিধন করবেন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন। পুষ্পবৃষ্টি হয়েছিল, বহু অপ্সরা এসে নেচেছিলেন এবং দেবতারা, প্রজাপতিরা ও ঋষিরা দেখতে এসেছিলেন। পাণ্ডু নাম দিয়েছিলেন কৃষ্ণ। দ্বারকার কৃষ্ণ এঁর সখা, শ্যালক ও মামাতো ভাই। ধনুর্বিদ্যাতে অত্যন্ত দক্ষ। এঁর ধনু গাণ্ডীব, শঙ্খ দেবদত্ত, রথ কপিধ্বজ এবং অক্ষয় তূণ।

শৈশবে হস্তিনাপুরে কৌরবদের সঙ্গে কেটে যায়। অস্ত্রবিদ্যার সঙ্গে নাচ গানও শিখতে থাকেন। বসুদেবের এক পুরোহিত কশ্যপ অর্জুন ইত্যাদির উপনয়ন করান।

রাজর্ষি শুক প্রথমে ধনুর্বিদ্যা পরে কৃপাচার্য ও শেষকালে দ্রোণ অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা দেন। অশ্বত্থামাকে অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী করে তোলার জন্য সকলকে জল আনতে পাঠিয়ে দিয়ে দ্রোণ গোপনে এঁকে শিক্ষা দিতেন। অর্জুন জানতে পারেন ; এবং এর পর অশ্বত্থামার সঙ্গেই জল নিয়ে ফিরতেন। ফলে অর্জুনকে দ্রোণ সমান শিক্ষা দিতে বাধ্য হন। দ্রঃ দ্রোণ, অস্ত্রশিক্ষা, কর্ণ। দ্রোণ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন অর্জুনকে তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ শিষ্য করে তুলবেন। এই কারণেই দ্রোণাচার্য একলব্যের (দ্রঃ) কাছ থেকে গুরুদক্ষিণা হিসাবে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি চেয়ে নিয়েছিলেন। একবার শিষ্যদের নিয়ে গঙ্গাতে স্নান করতে নামলে একটি কুমীর দ্রোণকে (দ্রঃ) টেনে নিয়ে যেতে থাকে। এক মাত্র অর্জুন তীর নিক্ষেপ করে গুরুকে মুক্ত করেন। সন্তুষ্ট হয়ে দ্রোণ তখন ব্রহ্মশির অস্ত্রদান করেন। অস্ত্র শিক্ষা (দ্রঃ) শেষ হবার পর অস্ত্রবিদ্যা প্রদর্শনের যে ব্যবস্থা হয়েছিল সেখানে কর্ণ (দ্রঃ) অর্জুনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে এসেছিলেন। অস্ত্র শিক্ষা দেবার আগে উপযুক্ত গুরুদক্ষিণা দেবার প্রশ্ন উঠেছিল ; অর্জুন তখন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন গুরুর অভিলাষ পূর্ণ করবেন। অস্ত্রশিক্ষার শেষে দ্রোণের অভিলাষ মত দ্রুপদকে অর্জুন বন্দী করে আনেন। দ্রোণ (দ্রঃ) সন্তুষ্ট হয়ে অর্জুনকে নিজের সমতুল্য হবার বর দেন এবং প্রয়োজন হলে দ্রোণের সঙ্গেও যুদ্ধে যেন পরাঙ্মুখ না হন নির্দেশ দেন। গুরুদক্ষিণার পর অর্জুন যবন রাজা সৌবীর, ও রাজা সুমিত্র ইত্যাদিকে পরাজিত করে কৌরব রাজ্য সুদৃঢ় করতে থাকেন।

এরপর জতুগৃহ (দ্রঃ) কাহিনী। জতুগৃহ থেকে মধ্যরাত্রিতে গঙ্গার ধারে এসে উপস্থিত হন। এই সময়ে অর্জুন অঙ্গারপর্ণকে (দ্রঃ) পরাজিত করেন এবং তাঁর সঙ্গে বন্ধুতা স্থাপন করে চাক্ষুষী বিদ্যা (যে কোন জিনিস দেখতে পাবার বিদ্যা) পান। অঙ্গারপর্ণ একটি উপদেশ দিয়ে যান পাণ্ডবরা যেন এক জন পুরোহিত সংগ্রহ করে নিয়ে তাঁর উপদেশ মত চলাফেরা করেন। এই উপদেশ অনুসারে এঁরা মহর্ষি ধৌম্যকে পুরোহিত নির্বাচিত করেন। এর পর অর্জুন ভাইদের সঙ্গে স্বয়ংবর সভাতে যান, পথে বেদব্যাস আশীর্বাদ করেন। স্বয়ংবরে অর্জুন চক্রমধ্যে মৎস্য বিদ্ধ করে দ্রৌপদীকে লাভ করেন। সমবেত রাজারা বাধা দিলে পাণ্ডবরা এঁদের পরাজিত করে দ্রৌপদীকে (দ্রঃ) নিয়ে কুটিরে ফিরে আসেন। কুন্তীর (দ্রঃ) আদেশে পাঁচভাই একে বিয়ে করেন। ধৃতরাষ্ট্র এদের সকলকে ফিরিয়ে আনলে এঁরা খাণ্ডবপ্রস্থে বসবাস করতে থাকেন। এই সময়ে যুধিষ্ঠির যখন দ্রৌপদীর (দ্রঃ) সঙ্গে ছিলেন সেই সময়ে এক ব্রাহ্মণের অপহৃত গরু উদ্ধার করার জন্য অস্ত্রের প্রয়োজনে অর্জুনকে ঐ স্থানে যেতে বাধ্য হতে হয়। ফলে যুধিষ্ঠিরের অনিচ্ছা সত্ত্বেও অর্জুন বার বছরের জন্য তীর্থ যাত্রায় বার হয়ে যান। বনে এসে অর্জুন গঙ্গাদ্বারে (মহা ১।২০৬।-) বাস করতে থাকেন ; এক দিন গঙ্গাতে স্নান করেন ; এখানে উলূপীর (দ্রঃ) সঙ্গে দেখা হয় ও বিয়ে হয়। অর্জুন এখান থেকে (মহা ১।২০৭।-) তারপর হিমালয়ে যান। অগস্ত্যবট, বশিষ্ঠপর্বত, ভৃগুতুঙ্গ, হিরণ্যবিন্দু তীর্থ ঘুরে হিমালয় থেকে নেমে পূর্বদিকে যান এবং পূর্বদিকে সব দেখতে দেখতে মহেন্দ্র পর্বত হয়ে সমুদ্র তীর ধরে মণলূরে আসেন (মহা ১।২০৭।১৩, সমুদ্রতীরেণ শনৈঃ মণলূরম্

জগাম হ) এবং রাজা চিত্রাঙ্গদের মেয়ে চিত্রাঙ্গদার (দ্রঃ) সঙ্গে বিয়ে হয়। এরপর পঞ্চতীর্থে (দ্রঃ) আসেন এবং কুমীররূপী পাঁচটি অপ্সরাকে (দ্রঃ- বর্গা) শাপমুক্ত করে দিয়ে ফের মণলুরে ফিরে আসেন। এখানে পুত্র বভ্রুবাহনের জন্ম দিয়ে (মহা ১।২০৯।২৪) গোকর্ণ তীর্থে যান। এই বনবাসের সময় অর্জুন পরশুরামের কাছেও অস্ত্র শিক্ষা করেন। এক বার এই সময়ে সেতুবন্ধ রামেশ্বরে এসে সেতু দেখে মুগ্ধ হয়ে যান এবং এখানে এক ব্রাহ্মণের কাছে কথায় কথায় মন্তব্য করেন রামচন্দ্র শরযোগে নিজেই সেতু তৈরি করতে পারতেন ; বানরদের সাহায্য নেবার কোন প্রয়োজন ছিল না। হনুমান ব্রাহ্মণ বেশে কথা বলছিলেন : অর্জুনের কথাতে আপত্তি করেন। দু'জনে তখন তর্ক হয় এবং অর্জুন শরযোগে সেতু তৈরি করে হনুমানকে দেখিয়ে দেন। কিন্তু হনুমানের পায়ের চাপে সেই সেতু ভেঙ্গে পড়ে। তর্কে সর্ত ছিল হারলে অর্জুন প্রাণ বিসর্জন দেবেন আর ব্রাহ্মণ হারলে অর্জুনের দাস হয়ে থাকবে। অর্জুন আত্মহত্যা করতে গেলে বালক বেশে কৃষ্ণ এসে নিরস্ত করেন। অর্জুন আবার শরযোগে সেতু তৈরি করেন এবং হনুমান এবারে আর ভাঙতে পারেন না। কৃষ্ণ তখন পরিচয় করিয়ে দেন এবং স্থির হয় এখন থেকে অর্জুনের রথের চূড়ায় হনুমান অবস্থান করবেন।

তারপর তীর্থ পরিক্রমা করতে করতে অর্জুন গোকর্ণ ও তারপর প্রভাসে আসেন।

মহা ১।৫৫।৩২ শ্লোকে আছে বনবাসের এক বৎসর ১ মাস পরে দ্বারকাতে যান। কৃষ্ণ একা দেখা করতে আসেন; তীর্থ যাত্রার কারণ শুনতে চান। প্রভাস থেকে দু জনে রৈবতক পাহাড়ে আসেন। কৃষ্ণ আগেই লোক দিয়ে রৈবতক পাহাড় সাজিয়ে রেখেছিলেন ইত্যাদি (মহা ১।২১০।২০)। এখানে এক রাত্রি বাস করে দু জনে দ্বারকাতে আসেন ; নগরী উৎসব মুখর হয়ে ওঠে। কৃষ্ণের ভবনে অর্জুন বহু দিন বাস করতে থাকেন। এরপর রৈবতকে বৃষ্ণি অন্ধকদের এক উৎসবে উগ্রসেন, বলরাম, অক্রূর, হার্দিক্য, কৃতবর্মা ইত্যাদি সকলে আসেন এবং অর্জুন এখানে সুভদ্রাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে পড়েন। কৃষ্ণ বুঝতে পারেন ; সুভদ্রার পরিচয় দেন ; বসুদেবকে সব কথা জানাবেন বলেন এবং পরামর্শ দেন সুভদ্রাকে হরণ করতে। কৃষ্ণ ও অর্জুন সব ব্যবস্থা করে যুধিষ্ঠিরকে খবর পাঠান এবং যুধিষ্ঠিরও অনুমতি দেন। সশস্ত্র অর্জুন সৈন্য-সুগ্রীব রথে মৃগয়া ছলে রৈবতকে আসেন। সুভদ্রা রৈবতক গিরিকে ও দেবতাদের পূজা করে দ্বারকাতে ফিরছিলেন। অর্জুন প্রসহ্য আকাশগামী রথে তুলে নিয়ে স্বপুরে ফিরতে থাকেন সৈনিকরা দ্বারকাতে খবর দিলে ভোজ বৃষ্ণি-অন্ধকরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। বলরাম সকলকে শান্ত করে (মহা ১।২১১।২২) কৃষ্ণকে কি করণীয় জানতে চান। কৃষ্ণ অর্জুনকে সমর্থন করেন। ফলে অর্জুনকে ফিরিয়ে এনে বিয়ে দেওয়া হয়। দ্বারকাতে এক বৎসর এবং বনবাসের ১২-বৎসরের অবশিষ্ট অংশ পুষ্করে কাটিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে আসেন। যুধিষ্ঠিরকে নমস্কার করে অর্জুন দ্রৌপদীর সঙ্গে দেখা করতে এলে দ্রৌপদী কেঁদে ফেলেন এবং বলেন তত্রৈব গচ্ছ কৌন্তেয় যত্র সা সাত্বতাত্মজা (মহা ১।২১৩।১৫)—অপূর্ব কবিতা। অর্জুন তারপর সুভদ্রাকে গোপালিকা বধূ (মহা ১।২১৩।১৭) মত সাজিয়ে এনে উপস্থিত করেন ; অপূর্ব জীবন্ত বর্ণনা। দ্রৌপদী সুভদ্রাকে জড়িয়ে ধরে আশীর্বাদ করেন তোমার স্বামী নিঃসপত্ন হোক।

এর পর দ্বারকাতে এক মৃতপুত্র-ব্রাহ্মণকে সান্ত্বনা দেন পরবর্তী সন্তান হলে তিনি রক্ষা করবেন। পরবর্তী সন্তান জন্মের সময় শরজালে ব্রাহ্মণের গৃহ ঘিরে রাখেন, তবু শিশুটি মারা যায়। অর্জুন অপমানে আত্মহত্যা করতে যান ; কিন্তু কৃষ্ণ নিরস্ত করে অর্জুনকে নিয়ে বিষ্ণুলোকে যান। বিষ্ণু জানান কৃষ্ণ ও অর্জুনকে এক সঙ্গে দেখবার লোভে বালককে নিয়ে এসেছিলেন এবং দুটি বালককেই ফিরিয়ে দেন।

সুভদ্রার বিয়ের উপহার যারা এনেছিলেন সেই সমস্ত যাদবরা ফিরে যান ; এক-মাত্র কৃষ্ণ থেকে যান এবং খাণ্ডবদাহ (দ্রঃ) হয়। ময় (দ্রঃ) ইন্দ্রপ্রস্থ সভা তৈরি করে দিলে পাণ্ডবরা সুখে বাস করতে থাকেন। অর্জুন এই সময় রৌক্মিনেয়, সাম্ব, যুযুধান, সাত্যকি ও অন্য বহু রাজপুত্রকে অস্ত্র শিক্ষা দিয়ে সময় কাটাতেন (মহা ২।৪।২৯)। জরাসন্ধ (দ্রঃ) বধের প্রশ্নে যুধিষ্ঠির দ্বিধান্বিত হয়ে পড়লে অর্জুন আশ্বাস দেন এবং জরাসন্ধের মৃত্যুর পর অর্জুন এক দিন রাজসূয় যজ্ঞের কর সংগ্রহের জন্য উত্তর দিকে যাবেন প্রস্তাব করেন। যুধিষ্ঠির অনুমতি দেন। দ্রঃ-রাজসূয়।

এরপর ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবদের রাজসূয় যজ্ঞ হয়। তারপর পাশা খেলায় হেরে গিয়ে দ্রৌপদীকে নিয়ে পাঁচভাই ১২ বছর বনবাস ও এক বছর অজ্ঞাতবাসে চলে যান।

বনবাসে আসার পরই কৃষ্ণ দেখা করতে এসে কৌরবদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলে অর্জুন স্তব করে শান্ত করেন। স্তবটি (মহা ৩।১৩।-) কৃষ্ণের পরিচয় বহন করছে। বনবাসের ১৩ মাস কেটে গেলে যুধিষ্ঠিরের (দ্রঃ) কাছে প্রতিস্মৃতি (দ্রঃ) বিদ্যা গ্রহণ করে অর্জুন অস্ত্রলাভের জন্য যাত্রা করেন। দ্রৌপদী স্বস্তিবাক্যে বিদায় দেন ; সুন্দর এই স্বস্তি বচন। দিবারাত্র চলতে চলতে হিমালয়, এবং তারপর গন্ধমাদন পার হয়ে ইন্দ্রকীল পর্বতে আসেন। দৈববাণী এখানে (মহা ৩।৩৮।৩০) অর্জুনকে থেকে যেতে বলে। ইন্দ্র তপস্বী ব্রাহ্মণ বেশে দেখা দেন ; এবং শেষ পর্যন্ত নিজের পরিচয় দিয়ে নানা প্রলোভন দেখাতে চান। অর্জুন অটল থাকেন ; ইন্দ্র তখন মহাদেবের তপস্যা করতে বলেন, মহাদেবের সঙ্গে দেখা হলে মনস্কামনা পূর্ণ হবে ; ইন্দ্রও তারপর অস্ত্র দেবেন।

প্রথম মাসে তিন রাত পরে পরে, দ্বিতীয় মাসে ৬-রাত পরে পরে ফল খেয়ে এবং তৃতীয় মাসে পক্ষান্তে মাটিতে পড়ে থাকা পর্ণ এবং চতুর্থ মাসে এক মাস পরে খান। এরপর বায়ুভক্ষ্য হয়ে তপস্যা করতে থাকেন। মহা ৩।১৬৩।১৭ শ্লোকে আছে চারমাস শেষ হলে প্রথম দিনে কিরাত বেশে মহাদেব এসেছিলেন ইত্যাদি। মহর্ষিরা (মহা-৩।৩৯।২৩) মহাদেবকে গিয়ে জানান অর্জুনের তপস্যায় তাঁরা সন্তপ্ত ইত্যাদি। মহাদেব আশ্বাস দেন এবং নিজে কিরাত রূপ ধারণ করে এবং উমা ও ভূতরাও অনুরূপ বেশে আসেন। এই সময় দৈত্য মূর বরাহ বেশে অর্জুনকে আক্রমণ করতে আসে। অর্জুন শর নিক্ষেপ করতে যান ; কিন্তু মহাদেব বারণ করেন এ শিকার তাঁর। অর্জুন কাণ দেন না ; দুজনেই যুগপৎ তীর ছোঁড়েন এবং শিকার নিয়ে দুজনের মধ্যে বচসা ও যুদ্ধ আরম্ভ হয়। অর্জুনের অক্ষয় তূণ শেষ হয়ে যায় ; ধনুক কিরাত কেড়ে নেন। এরপর হাতাহাতিতে অর্জুন হেরে গিয়ে মাটিতে পড়ে যান (মহা ৩।৪০।৫১)।

মহাদেব তখন সন্তুষ্ট হয়ে দিব্য চক্ষু দেন ; বলেন অর্জুন নর (দ্রঃ) ; কৃষ্ণ ও অর্জুন জগৎ ধারণ করে আছেন এবং ইন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের সময় এই নরনারায়ণ দানবদের শাসন করেছিলেন (মহা ৩।৪১।৩) ইত্যাদি। মহাদেব তারপর গাণ্ডীব ফিরিয়ে দেন ; তূণ অক্ষয় হয়ে ওঠে আবার ; পাশুপত ও ব্রহ্মশির অস্ত্র দেন (মহা ৩।৪১।৮) এবং স্বর্গে যেতে বলেন। এই দিন এবং পর দিন সারা দিনই এইখানে কাটে ; অপরাহ্ণে লোক-পালরা আসেন (মহা ৩।১৬৮।৭)। যম বলেন কর্ণ অর্জুনের হাতে নিহত হবেন (মহা ১।৪২।২০)। যম, বরুণ ও কুবের অস্ত্র দেন ; এবং ইন্দ্র বলেন মাতলি আসছে ; অর্জুন স্বর্গে এলে তিনিও অস্ত্র দেবেন। এরপর মাতলি এলে অর্জুন গঙ্গাতে (মহা ৩।৪২।২০) স্নান করে মন্দর পর্বতের কাছে বিদায় নিয়ে রথে ওঠেন। মহা ৩।৩৮।১০ শ্লোকে আছে ইন্দ্রকীল পর্বত। ইন্দ্রের সামনে রথ থেকে নামলে ইন্দ্র কোলে তুলে নেন ; ঘৃতাচী ইত্যাদি মহাকটিতটশ্রোণি (মহা ৩।৪৪।-) এবং কম্পমানৈঃ পয়োধরৈঃ নাচতে থাকে। পাঁচ বছর অস্ত্র শিক্ষা করবেন প্রতিজ্ঞা ছিল ; ইন্দ্রের কাছে বজ্রও লাভ করেন। এরপর ইন্দ্রের নির্দেশে বিশ্বাবসু পুত্র (মহা ৩।১৬৪।৫৪) চিত্রসেনের কাছে নৃত্যগীত ও বাদিত্র ইত্যাদি শিক্ষা করতে থাকেন। এই সময়ে এক দিন ইন্দ্রের নির্দেশে উর্বশী আসেন অর্জুনকে তৃপ্ত করতে ; চিত্রসেন উর্বশীকে ইন্দ্রের নির্দেশ জানিয়েছিলেন। কিন্তু মাতৃস্থানে উর্বশীকে অর্জুন প্রত্যাখ্যাত করেন। উর্বশী তখন অর্জুনকে এক বৎসর নপুংসকে পরিণত হতে হবে শাপ দেন। এই সময়ে এক দিন লোমশ আসেন এবং অর্জুন ও ইন্দ্রকে একাসনে দেখে বিস্মিত হয়ে যান। ইন্দ্র লোমশকে সব জানান এবং যুধিষ্ঠিরকে (দ্রঃ) গিয়ে আশ্বাস দিতে বলেন।

যুধিষ্ঠিররা তীর্থযাত্রায় বার হয়ে গন্ধমাদনে (মহা ৩।১৫৫।৩৭) এসে অর্জুনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কুবেরের সৈন্যদের সঙ্গে ভীমের (দ্রঃ) যুদ্ধ হবার কয়েক-দিন পরে অর্জুন ফিরে আসেন। ইন্দ্রের কাছ থেকে পাওয়া দিব্য আভরণগুলি দ্রৌপদীকে (মহা ৩।১৬১।২৪) দিয়ে দেন। যুধিষ্ঠিরকে অর্জুন কি ভাবে অস্ত্রলাভ হয়েছিল বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন কাম্যক বন থেকে তিনি ভৃগুতুঙ্গে গিয়েছিলেন ; এখানে এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা হয় এবং তাঁর নির্দেশে শৈশির পাহাড়ে তপস্যা ইত্যাদি। ইন্দ্রের কাছে অস্ত্র শিক্ষার পর গুরুদক্ষিণা হিসাবে সমুদ্র কুক্ষিতে বাসকারী তিন কোটি নিবাতকবচদের ইন্দ্র নিহত করতে বলে কিরীট, অভেদ্যকবচ, এবং শম্বর-নমুচি-ইত্যাদিকে-জয়-করা ইন্দ্র-রথ দেন : অন্যান্য দেবতারাও আশীর্বাদ করেন এবং এই সময়ে দেবদত্ত (দ্রঃ) শঙ্খ দেন। সমুদ্র পার হয়ে অর্জুন (মহা ৩।১৬৬-১৬৮) নিবাত-কবচদের নিহত করেন এবং ফেরার পথে কালকেয় ও পৌলোমা দৈত্যদের হিরণ্যপুর দেখতে পান এবং মানুষের হাতে এরা বধ্য শুনে এদেরও ধ্বংস করেন। এরপর ইন্দ্র আনন্দিত হয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন অর্জুনের বলে যুধিষ্ঠির পৃথিবী পালন করবেন এবং নানা উপহার দিয়েছিলেন। অর্জুন যে দিন এই কাহিনী শোনান তারপর দিন সকালে প্রাপ্ত অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োগ দেখাতে গেলে সমস্ত পৃথিবী

কাঁপতে থাকে (মহা ৩।১৭২।৮)। ঋষিরা, দেবতারা, ব্রহ্মা, মহাদেব ও নারদ এসে অর্জুনকে অস্ত্র প্রয়োগ করতে নিষেধ করে যান।

এর পর ঘোষ যাত্রায় আগত দুর্যোধন চিত্রসেনের হাতে বন্দী হলে যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে অর্জুন এ'দের মুক্ত করে দেন। দ্রৌপদীকে জয়দ্রথের (দ্রঃ) হাত থেকে মুক্ত করে আনার পর বকরূপী ধর্মের জলাশয়ে জল আনতে গিয়ে নকুল ও সহদেবের পর ইনিও মারা পড়েন। দ্রঃ-যুধিষ্ঠির।

বার বৎসর বনবাসের পর এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের (দ্রঃ-) সময় এ'রা বিরাট রাজার আশ্রয়ে কাটিয়ে দেন। মৎস্য দেশে এসে পৌঁছবার শেষ দিকে ক্লান্ত দ্রৌপদীকে ইনি বহন করে এনেছিলেন। অস্ত্রশস্ত্র গোপন করে রাখার ব্যবস্থা মোটামুটি অর্জুনই করেন (দ্রঃ-নকুল)। বিরাট রাজের কাছে সরাসরি উত্তরার নাচের শিক্ষক (মহা-৪।১০।৮) হতে চান ; নিজের পরিচয় দেন দ্রৌপদীর পরিচারিকা ছিলেন ; নাম বৃহন্নলা ; এবং তিনি নপুংসক। অপর নাম ছিল বিজয়। কৌরব বাহিনী গোধন হরণ করেছে খবর আসে রাজকুমার উত্তরের কাছে (মহা ৪।৩৩।-)। ত্রিগর্তরাজ সুশর্মাকে বাধা দিতে সকলে আগেই চলে গেছে; একা উত্তর। স্ত্রীদের মধ্যে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে থাকে এক জন অন্তত সারথি পেলে কৌরবদের তিনি শাসন করতে পারতেন। দ্রৌপদী তখন বৃহন্নলাকে নিতে বলেন , বৃহন্নলা অর্জুনের সারথি ছিল ইত্যাদি এবং উত্তরাকে দিয়ে ডাকিয়ে আনতে বলেন। উত্তর ও অর্জুন যুদ্ধ যাত্রা করেন। এই সময় উত্তরা বলে দেয় সেনাপতি ভীষ্ম ইত্যাদির রুচিরাণি বাসাংসি তার জন্য যেন বৃহন্নলা নিয়ে আসে ; পাঞ্চালিকার্থে কাজে লাগবে।

কুরু সৈন্যবাহিনী দেখে উত্তর ভয়ে পালিয়ে আসতে থাকেন। শমী গাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র নামিয়ে অর্জুন তখন নিজের পরিচয় দিয়ে উত্তরকে সারথি হিসাবে নিয়ে যুদ্ধে আসেন। অর্জুন প্রথমেই গোধন মুক্ত করে দেন (মহা ৪।৩৮।১৩) এবং তারপর দুর্যোধনকে আক্রমণ করতে যান। তীব্র যুদ্ধে সকলেই পরাজিত হয়। শত্রুন্তপ ও কর্ণের ভাই সংগ্রামজিৎ নিহত হয় (মহা ৪।৪৯।-) এবং শেষ পর্যন্ত সংমোহন (৪।৬১।৮) বাণে সকলকে সংজ্ঞা হীন করে দিয়ে উত্তরকে দিয়ে কুরুসেনাপতিদের রুচির বস্ত্র ইত্যাদি সংগ্রহ করে ফিরে আসেন। গোপালদের পাঠিয়ে দেন আগে গিয়ে রাজধানীতে খবর দিতে ; নিজেরা দুজনে বিশ্রাম করে অপরাহ্নে (মহা ৪।৬২।১০) ফিরবেন।

অর্জুনের প্রতিজ্ঞা ছিল বিনা যুদ্ধে কেউ যদি যুধিষ্ঠিরের রক্তপাত করেন অর্জুন সবংশে তাকে নিহত করবেন। এই জন্য উত্তরের সঙ্গে অর্জুনকে সভায় আসতে যুধিষ্ঠির (দ্রঃ) নিষেধ করে পাঠান। রক্ত পরিষ্কার করা হলে অর্জুন আসেন। এরপর গোপনে উত্তরের সঙ্গে পরামর্শ করে অজ্ঞাতবাসের (দ্রঃ) পর তৃতীয় দিবসে পাণ্ডবরা আত্মপ্রকাশ করেন। কৃতজ্ঞতায় বিরাট রাজা অর্জুনের সঙ্গে উত্তরার বিয়ে দিতে চান। অর্জুন উত্তরাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করেন এবং উপপ্লব্যে অভিমন্যুর সঙ্গে (মহা ৪।৬৭।১৪) বিয়ে দেন।

কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের প্রাক্ কালে কৃষ্ণকে নিজেদের দলে নিয়ে আসার জন্য অর্জুন

দ্বারকাতে যান। দুর্যোধন আগেই দ্বারকাতে এসেছিলেন ; কপট নিদ্রায় নিদ্রিত কৃষ্ণের মাথার দিকে বসে ছিলেন। অর্জুন এসে কৃষ্ণের পায়ের কাছে বসে থাকেন। কৃষ্ণ চোখ মেলতে আগেই পায়ের দিকে চোখ পড়ে এবং অর্জুনকে দেখতে পান। এবং প্রথম দেখা অনুসারে অর্জুনের দলে যোগ দেন। দুর্যোধনকে কিছু দুর্ধর্ষ নারায়ণী (দ্রঃ) সৈন্য দিয়ে দেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জুন ছিলেন পাণ্ডব সেনাপতি ; কৃষ্ণ ছিলেন সারথি ও উপদেষ্টা। যুদ্ধের প্রারম্ভে স্বজন-নিধন যুদ্ধে অর্জুন অনিচ্ছুক হয়ে পড়েন। কৃষ্ণ তখন বুঝিয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করেন। এই বোঝান-অংশ গীতা এবং এখানে বিশ্বরূপ দেখে অর্জুন যে স্তব করছিলেন সে স্তবটি বিশ্বসাহিত্যে অতুলনীয়। দশম দিনে অর্জুন ও শিখণ্ডীর হাতে আহত হয়ে ভীষ্ম (দ্রঃ) মাটিতে পড়ে যান। তৃষ্ণার্ত ভীষ্মকে অর্জুন মেদিনীকে বাণবিদ্ধ করে ভোগবতীর জল পান করান। ভীষ্মের মাথা ঝুলে পড়ছিল ; ভীষ্মের ইচ্ছায় অর্জুন শরসন্ধান (দ্রঃ- আঞ্জলিক বাণ) করে মাথা তুলে ধরবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন। ১২-শ দিনে ভগদত্ত, ১৪-শ দিনে জয়দ্রথ, ১৫-শ দিনে দ্রোণাচার্য, ১৬-শ দিনে মগধরাজ দণ্ডধর ও ১৭-শ দিনে কর্ণকে অর্জুন নিহত করেন। যখন কুরুক্ষেত্রে অর্জুন কর্ণকে নিহত করতে পারছিলেন না/দ্বিধা করছিলেন সেই সময় যুধিষ্ঠির অর্জুনকে গাণ্ডীব ত্যাগ করতে বলেছিলেন। অপমানিত অর্জুন তখন যুধিষ্ঠিরকে তরবারি দিয়ে হত্যা করতে ছুটে যান। কৃষ্ণ নিবারিত করেন। এই সময়ে অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে দ্রৌপদীর তল্পকীট ইত্যাদি বলে গালি দেবার মধ্যে অর্জুনের মনের একটা দিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দ্রঃ-ইন্দ্র ; অশ্বত্থমা। যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির রাজা হন। অর্জুন অশ্বমেধের ঘোড়া নিয়ে দিগ্বিজয়ে বার হন। ত্রিগর্ত, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর ও সিন্ধুদেশ জয় করে মণিপুরে নিজের ছেলে বভ্রুবাহনের হাতে নিহত হন। উলূপী (দ্রঃ) তখন অর্জুনকে আবার বাঁচিয়ে তোলেন।

যদুবংশ ধ্বংস হলে এবং কৃষ্ণ মারা গেলে অর্জুন দ্বারকাতে গিয়ে সকলের শেষকৃত্য ইত্যাদি নিষ্পন্ন করে কৃষ্ণের পত্নী প্রভৃতিকে নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে আসছিলেন। পথে আভীর দস্যুরা বহু যাদব নারীকে হরণ করে। কৃষ্ণের মৃত্যুর জন্য হীনবল অর্জুন গাণ্ডীব তুলতেই পারেন না ; রাজধানীতে ফিরে আসেন। এরপর মহাপ্রস্থান। দ্রৌপদীকে নিয়ে পাঁচভাই বার হয়ে যান। পথে লৌহিত্য সাগরের তীরে অগ্নিদেবের কথায় অর্জুন গাণ্ডীব ও অক্ষয় তূণ সাগরে বিসর্জন করেন। পথে প্রথমে দ্রৌপদী তারপর সহদেব ও নকুলের পর অর্জুন দেহরক্ষা করেন। এক দিনে শত্রুসৈন্য বিনাশ করার প্রতিজ্ঞা করে তা রাখতে না পারার জন্য এবং অন্যান্য ধনুর্ধরদের অবজ্ঞা করার জন্য অর্জুন সশরীরে স্বর্গে যেতে পারেন নি।

অর্জুনের স্ত্রী দ্রৌপদী, উলূপী, চিত্রাঙ্গদা, সুভদ্রা ; ছেলে যথাক্রমে শ্রুতকীর্তি, ইরাবান, বভ্রুবাহন ও অভিমন্যু। দ্রঃ-ধৃতরাষ্ট্র ও কালকেয়।

অর্জুন—পুরাণাদিতে প্রাচীন হৈহয় বংশে রাজা কৃতবীর্যের ছেলে। অন্য নাম কার্তবীর্যার্জুন (দ্রঃ)। হিমালয় থেকে নর্মদা পর্যন্ত রাজ্যের রাজা।

অর্জুন—সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর তাঁর মন্ত্রী অর্জুন বা অরুণাশ্ব সিংহাসন অধিকার করেন। ওয়াং-হিউ-এনথ্সী নামে একজন চীন রাষ্ট্রদূত ভারতে হর্ষবর্দ্ধনের উদ্দেশ্যে আসেন। কিন্তু অর্জুন এঁর সমস্ত অর্থ লুট করেন এবং কয়েক জন অনুচরকে হত্যা করেন। দূত তিব্বতের রাজার শরণ নেন এবং তিব্বতী ও নেপালী সৈন্য সাহায্যে ভারত আক্রমণ করে অর্জুনকে হারিয়ে তাঁর রাজ্যের মস্ত বড় অংশ জয় করেন। এটি চীনা কাহিনী।

অর্জুনায়ন—একটি সম্প্রদায়। এঁরা অর্জুনের অন্য মতে কার্তবীর্যার্জুনের বংশধর। পাণিনির টীকায়, সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তি ও বরাহ-মিহিরের বৃহৎ সংহিতায় এদের উল্লেখ আছে। রাজপুতানার ভরতপুর ও আলওয়ারের অধিবাসী। ব্যাকট্রিয়ান গ্রীকদের পতনের পর এঁদের অভ্যুত্থান হয়। পরে শক ও কুষাণদের হাতে পরাজিত হন। গুপ্তযুগে এঁরা সুসংবদ্ধ গণতন্ত্রের অধীনে বাস করতেন।

অর্থবাদ—তিন রকম। গুণবাদ, অনুবাদ, ভূতার্থবাদ। আদিত্যযূপ গুণবাদ, বিরোধ হেতু। অগ্নি হিমের ঔষধ অনুবাদ, কারণ প্রমাণ সিদ্ধ। বজ্র হস্ত পুরন্দর ভূতার্থবাদ।

অর্থব্যবস্থা—রামায়ণের যুগে রাষ্ট্রে অর্থ ব্যবস্থার কিছু হিসাব পাওয়া যায়। রাম চিত্রকূটে ভরতকে প্রশ্ন করতে থাকেন। সৈনাদের বেতন ও ভক্ত (খাদ্য) ইত্যাদি সংপ্রাপ্ত কালে দেওয়া হচ্ছে কিনা জানতে চান; না দিলে চরম বিপদ হবে (রা ২।১০০।৩২)। আবার জানতে চান দেশে চৈত্য শত আছে কিনা, দেশ জনাকুল কিনা, দেবস্থান, প্রপা (জল পানের আধার) ও তটাক শোভিত কিনা? অর্থাৎ রাজকোষ কি ভাবে ব্যয়িত হত তার একটা মোটামুটি দিক স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এই সব দেবস্থান চৈত্য ইত্যাদি মাধ্যমে চরব্যবস্থাও সুদৃঢ় করে তোলা হত। প্রহৃষ্ট নরনারীকা ও সমাজ উৎসব সেবিতা দেশ কিনা জানতে চান; অর্থাৎ রাজকোষ এই বিষয়েও ব্যবহৃত হত। রাম আরও জানতে চান দেশ সুকৃষ্ট সীমা, পশুমান ও হিংসাবর্জিত কিনা। অর্থাৎ দেশের মোট উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য রাজপ্রাসাদ পশুপালনে ইত্যাদিতে উৎসাহ দিত। দেশ অদেব মাতৃক কিনা প্রশ্ন করেন; অর্থাৎ সেচের চিন্তা ও ব্যবস্থা তখন করা হত। মহাভারতেও অর্থব্যবস্থার অনেক খবর পাওয়া যায়। যুধিষ্ঠিরের কিছু রথী ছিল এরা মাসকালিক সহস্র পরমং ভৃতিম্ পেত, যুধ্যতঃ অযুধ্যতঃ বাপি (২।৫৪।২০)। অগস্ত্য অর্থের জন্য শ্রুতর্বা ইত্যাদি রাজার কাছে এলে এঁরা আয় ব্যয়ের হিসাব দেখান।

অর্থশাস্ত্র—প্রাচীন অর্থে রাজ্য শাস্ত্র বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান। কৌটিল্য অনুসারে যে বিদ্যার দ্বারা পৃথিবী বা ভূমি লাভ করা যায়। পঞ্চতন্ত্র অনুসারে এটি নীতিশাস্ত্র। অর্থ-শাস্ত্রের অপর নাম দণ্ডনীতি।

অতি প্রাচীন কাল থেকে এদেশে অর্থশাস্ত্রের আলোচনা হয়েছিল। কৌটিল্যের আগে মানব, বার্হস্পত্য, ঔশনস, পারাশর, আম্ভীয় পাঁচটি প্রাচীন বিশিষ্ট ধারা ছিল এবং কোটিল্য, ভারদ্বাজ, বিশালাক্ষ, পিশুন, কৌণপদন্ত, বাতব্যাধি, বাহুদন্তিপুত্র, পরাশর, কাত্যায়ন, চারায়ণ, ঘোটমুখ প্রভৃতি আচার্যরাও অর্থশাস্ত্রের আলোচন করেছিলেন।

জয়সওয়াল ও দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর মতে আনুমানিক ৬৫০ খৃ-পূর্বে এবং আলতেকার মতে ৫০০ খৃ-পূর্বে এবং উপেন্দ্রনাথ ঘোষালের মতে ৩০০ খৃ-পূর্বে ভারতে অর্থশাস্ত্রের আলোচনা আরম্ভ হয়।

মহাভারতে শান্তি পর্বে (৫৯ অধ্যায়) আছে ব্রহ্মা এক লক্ষ অধ্যায়ে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ বিষয়ে একটি বই লেখেন। বিশালাক্ষ এই বই ছোট করে দশ হাজার অধ্যায়ে নিয়ে আসেন। ইন্দ্র একে আরো ছোট করে বাহুদন্তক নামে পাঁচহাজার অধ্যায়ে পরিণত করেন। বৃহস্পতি তারপর তিন হাজার এবং উশনস তারপর এক হাজার অধ্যায়ে পরিণত করেন। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে আছে ব্রহ্মার গ্রন্থের অর্থসম্বন্ধীয় অংশ বৃহস্পতি এক হাজার অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করেন।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি, দণ্ডের স্বরূপ, রাজা ও প্রজার সম্বন্ধ, কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক ও স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা, আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি, দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইন ও যুদ্ধ সংক্রান্ত নীতি ইত্যাদি অর্থশাস্ত্রে আলোচিত হয়েছে। এ বিষয়ে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র শ্রেষ্ঠগ্রন্থ। গুপ্তযুগে কামন্দকীয় নীতিসার এবং খৃস্টীয় নবম-দশম শতকে বার্হস্পত্য সূত্র রচিত হয়। খৃস্টীয় একাদশ ও / বা দ্বাদশ শতকে রচিত শুক্রনীতিও একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। মহাভারত, রামায়ণ, অগ্নিপুরাণ, গরুড়পুরাণ, মৎস্যপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, কালিকাপুরাণ, মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য, বৃদ্ধ-হারীত, বৃহৎ-পরাশরস্মৃতি ইত্যাদিতে অর্থশাস্ত্রীয় প্রচুর তথ্য রয়েছে। ভোজযুক্তিকল্পতরু (১০২৫ খৃ), সোমদেবসুরি কৃত নীতিবাক্যামৃত (৯৫৯ খৃ), সোমেশ্বর কৃত মানসোল্লাস (১১২৭-১১৩৮ খৃ), লক্ষ্মীধর কৃত কৃত্যকল্পতরু (১১২৫ খৃ মত) ইত্যাদি গ্রন্থে অর্থনীতি সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। এর রচয়িতা চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী কৌটিল্য বা বিষ্ণুগুপ্ত। দণ্ডী, বাণ, পঞ্চতন্ত্র ও কামন্দক মতে কৌটিল্য, বিষ্ণুগুপ্ত ও চাণক্য একই ব্যক্তি। আধুনিক পণ্ডিতরা মনে করেন এটি কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রীর রচিত নয়। কারণ বাৎসায়নের কামসূত্রের সঙ্গে এমন মিল আছে যে মনে হয় দুটি গ্রন্থের রচনা কালের মধ্যে খুব বেশি ব্যবধান ছিল না। অর্থাৎ বাৎস্যায়নের কাল খৃস্টীয় তৃতীয় শতক মত অথচ চন্দ্রগুপ্ত খৃ-পূ চতুর্থ শতক। পতঞ্জলিতে চন্দ্রগুপ্ত ইত্যাদির উল্লেখ আছে কৌটিল্যের উল্লেখ নাই। অর্থশাস্ত্রে কোথাও চন্দ্রগুপ্ত বা তাঁর রাজধানী পাটলিপুত্রের উল্লেখ নাই। আধুনিক মতে কৌটিল্যের উপদেশাবলী অবলম্বনে খৃস্টীয় তৃতীয় শতকে এই গ্রন্থ সংকলিত হয়েছিল।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র পনেরটি ভাগে (অধিকরণ) বিভক্ত, প্রতি অধিকরণে আবার কয়েকটি প্রকরণ রয়েছে। বইতে মোট ১৮০ প্রকরণ/অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারবস্তু কয়েকটি শ্লোকে দেওয়া আছে। বইটি সূত্র ও ভাষ্য আকারে রচিত; মাঝে মাঝে শ্লোক আছে। শ্লোকের সংখ্যা ৬০০০। অধিকরণগুলিতে আলোচ্য বিষয় (১) রাজকুমারদের শিক্ষা; (২) বিভিন্ন বিভাগ, তাদের অধ্যক্ষ, নগর ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান সমূহের শাসন প্রণালী ও গণিকাবৃত্তি পরিচালনা; (৩)

দেওয়ানি আইন ; (৪) সমাজ কণ্টক শোধন ও ফৌজদারি আইন ; (৫) রাজ্যের শত্রু নিরসন, রাজকোষ বৃদ্ধি ও সরকারী কর্মচারীর বেতন ; (৬-৭) সপ্ত রাজ্যাঙ্গ ও ছয় নীতি, (৮) রাজার ব্যসন ও বন্যা অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদি দুর্বিপাক, (৯-১০) সামরিক অভিযান ; (১১) পৌরপ্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান, (১২-১৩) যুদ্ধজয়ের ও বিজিত দেশের প্রীতি অর্জনের উপায় ; (১৪) মায়ারূপ ধারণ, রোগবিস্তার প্রভৃতির উপযোগী দ্রব্যাদি প্রস্তুত প্রণালী ; (১৫) গ্রন্থটির পরিকল্পনা।

বইটিতে দুর্বোধ্য পারিভাষিক শব্দ ও অপাণিনীয় শব্দও আছে। না হলে বইটি সহজবোধ্য। এর দুটি টীকা (১) ভট্টস্বামীর প্রতিপদ্ পঞ্চিকা, (২) মাধবযজ্বার নয়চন্দ্রিকা।

অর্থসাধক—দশরথের (দ্রঃ) এক মন্ত্রী।

অর্দ্ধকুক্কুটন্যায়—দ্রঃ-ন্যায়।

অর্দ্ধগঙ্গা—যুবানাশ্বের শাপে অর্দ্ধরূপে কাবেরী নামে একটি মেয়ে হয়। এই মেয়ে কাবেরী নদী। এ'র আর এক নাম অর্দ্ধগঙ্গা। এতে স্নান করলে গঙ্গা স্নানের অর্দ্ধেক পুণ্য হয়।

অর্দ্ধচন্দ্রবাণ—এই বাণে অর্জুন ভগদত্তের হৃদয় বিদীর্ণ করেছিলেন। বহু ব্যবহৃত বাণ।

অর্দ্ধজরতী—দ্রঃ-ন্যায়।

অর্দ্ধনারীশ্বর—শিব ও পার্বতীর পাশাপাশি যুক্ত মূর্তি। এই কল্পনা প্রাচীন গুপ্তযুগে ছিল। কোন কোন পণ্ডিতের মতে কুষাণ যুগেও এই কল্পনা ও মূর্তি প্রচলিত ছিল (কুষাণ মুদ্রা খৃ ৪৯১)। গুপ্তোত্তর যুগে বহু বিগ্রহ পাওয়া গেছে। মূর্তি'র ডান দিক সায়ুধ অর্দ্ধমহাদেব, বামদিক অর্দ্ধপার্বতী। দক্ষিণ ভারতে কদাচিৎ এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। মূর্তিগুলি সাধারণত স্থানক। তাঞ্জোরে বৃহদীশ্বর মন্দিরে ও দরশুরামে অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্তি উৎকীর্ণ রয়েছে। তাঞ্জোরে শিবের তিন হাত, সামান্য ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে নন্দীর গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ান। পার্বতীর একটি হাতে নীলপদ্ম। দরশুরামে উৎকীর্ণ মূর্তি'তে তিন মাথা, আট হাত, শিব সম্পাদস্থানক ভঙ্গিতে দাঁড়ান ; নন্দী নাই। তিনটি মাথা অর্থে এলিফ্যান্টা গুহার ত্রিমূর্তি যেন। খৃস্টীয় সপ্তম শতকে নির্মিত ভুবনেশ্বরের কয়েকটি মন্দিরগাত্রে নৃত্যপর এই সংমিশ্রমূর্তি বিশেষ দর্শনীয়। ত্রিষষ্টি ভুবনের মধ্যে সপ্তপাতাল শ্রেষ্ঠ। অষ্টম উপ-পাতাল স্বর্ণময় ; এখানে অর্দ্ধনারীশ্বর বাস করেন।

বিষ্ণু-ধর্মোত্তরে শিবের পূব দিকের মুখ মহাদেব মুখ ; সৌম্য মুখ, দক্ষিণ মুখ-ভৈরব মুখ বা ঘোর মুখ, পশ্চিম মুখ নন্দিবক্ত্র। উৎকীর্ণ মূর্তি হলে এই মুখটি দেখান সম্ভব নয়। উত্তর মুখ উমা বক্ত্র। ৫-ম মুখ সদাশিব বা ঈশান মুখ : চারটি মাথার ওপর অবস্থিত। কিন্তু রূপ মণ্ডনে এই মুখ যোগিনাম্, অপি অগোচরম্। ফলে বিগ্রহ মূর্তিতে এই মুখটি দেখান হয় না। এই হিসাব অনুসারে তিনটি মাথা হবে এবং একটি মাথা হবে পার্বতীর। অর্থাৎ এলিফ্যান্টা গুহার ত্রিমূর্তি শিবেরই মূর্তি ; অর্দ্ধ নারীশ্বর (?) মূর্তিও বলা যেতে পারে ; বা অর্দ্ধনারীশ্বর কল্পনার জনক যেন এই ত্রিমূর্তি।

ঋষি ভৃঙ্গীর (দ্রঃ) একটি কাহিনীতে এই ঋষি ও অন্যান্য ঋষি ও দেবতারা কৈলাসে হরপার্বতীকে প্রদক্ষিণ করতে যান। শিবের একান্ত ভক্ত ভৃঙ্গী কেবল শিবকে প্রদক্ষিণ করতে থাকেন। ফলে পার্বতী ক্রুদ্ধ হয়ে ভৃঙ্গীকে কঙ্কালে পরিণত করেন ; দু পায়ে দাঁড়াতেও অক্ষম হয়ে পড়েন। শিব সদয় হয়ে তখন ভৃঙ্গীর আর একটি পা বর দেন এবং নিজে পার্বতীর সঙ্গে মিশে অর্দ্ধনারীশ্বর হয়ে অবস্থান করেন ; উদ্দেশ্য ভৃঙ্গী পার্বতীকে প্রদক্ষিণ করতে বাধ্য হবেন। ভৃঙ্গী তিন পায়ে কোন মতে দেহের টাল বজায় রেখে দাঁড়ান বটে কিন্তু বজ্রকীট হয়ে শিবপার্বতীর মাঝে গর্ত করে শিবকে প্রদক্ষিণ করতে থাকেন। এই ভাবে অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্তির উৎপত্তি (গোপীনাথ রাও)।

এটি অদ্বয় তত্ত্বের প্রতীক। বৌদ্ধ তন্ত্রেও অনুরূপ প্রতীক যবযুম। দ্রঃ-শিব, যুগলমূর্তি, লক্ষ্মী নারায়ণ।

অর্দ্ধব্রাহ্মণ —কেরল উৎপত্তিতে উল্লিখিত আছে পরশুরাম সমুদ্রের কাছে জায়গা নিয়ে সে সব ব্রাহ্মণদের সেই জায়গার অধিবাসীদের কাজে নিযুক্ত করেছিলেন।

অর্দ্ধমাগধী—একটি প্রাকৃত ভাষা। জৈনধর্মের প্রাচীন বইগুলি এই ভাষাতে। জৈন বৈয়াকরণরা একে আর্যপ্রাকৃত বলেছেন। সংস্কৃত নাটক ও কবিতায় এর ব্যবহার নাই। অশ্বঘোষের দুটি নাটকে কোন কোন পাত্রের মুখে অর্দ্ধমাগধী মত প্রাকৃত আছে। বুদ্ধদেবের কথ্য ভাষা অর্দ্ধমাগধীর প্রাচীনতর রূপ মনে হয়।

অর্দ্ধসীরী—বৈশ্য কন্যা জাত, ও ব্রাহ্মণ কর্তৃক সংস্কৃত ব্রাহ্মণ পুত্র (পরাশর)।

অর্দ্ধোদয় -যে তিথিতে সমৃদ্ধ পুণ্যের উদয়। পৌষ বা মাঘ মাসে রবিবারে ব্যতীপাত যোগ ও শ্রবণা নক্ষত্রযুক্ত অমাবস্যা রূপ তিথিনক্ষত্রাদি যোগ। কোটি সূর্য গ্রহণের সমান। এই সময় সমস্ত জল গঙ্গাজলের সমান হয়। সমস্ত শুদ্ধাত্মা ব্রাহ্মণ ব্রহ্মাতুল্য হন। এই যোগে দান বিশেষ পুণ্যজনক। দিনেতে এই যোগ প্রশস্ত। প্রায় ১৭ বৎসর অন্তর অন্তর হয়ে থাকে।

অর্বাবসু—পরাবসুর (দ্রঃ) ছোট ভাই (মহা ৩।১৩৮।১৫)

অর্বুদ—(১) রাজপুতানায় আরাবল্লী পর্বতের ৫০০০ ফু উচ্চ একটি শিখর। আরাবল্লী (দ্রঃ) পাহাড়ের বিচ্ছিন্ন শাখা আবু, রাজপুতানাতে। এখানে বশিষ্ঠের আশ্রম ছিল। বশিষ্ঠ এখানে যজ্ঞকুণ্ড থেকে পরমার নামে এক বীরকে সৃষ্টি করেন, কামধেনু হরণপ্রয়াসী বিশ্বামিত্রকে বাধা দেবার জন্য। এই থেকে রাজপুত পরমার বংশ (দ্রঃ-অগ্নিকুল)। এখানে অম্বাভবানীর বিখ্যাত মন্দির এবং আদিনাথ (১-ম) ও নেমিনাথ (২২-শ) তীর্থংকরের মন্দির রয়েছে। একটি প্রসিদ্ধ পাহাড়। বর্তমানে আবু। দ্রঃ-তীর্থ। (২) একটি সাপ, আবু পাহাড়ে থাকে। (৩) এক জন অসুর ; ইন্দ্র একে পদ দ্বারা আক্রমণ করেছিলেন।

অর্যমা—দ্বাদশ আদিত্যের এক জন। তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণে ও সায়ণ মতে প্রাতঃকালীন রক্তবর্ণ সূর্য। (২) পিতৃদেব বিশেষ। এঁরা শত্রু ভক্ষক (ঋক্ ৭।৬৬।৭)

অর্হৎ—ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সম্মানীয় বা সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি। প্রাক্ বৌদ্ধযুগে সাধারণত সকল সম্মানী ব্যক্তিই এই নামে অভিহিত হতেন। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মে অর্হৎ মানে

তৃষ্ণা মুক্ত এবং নির্বাণকে যিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন। অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ, মোহ ও কামনা, বাসনা মুক্ত। ইনি জীবনের যাবতীয় ব্রত সম্পন্ন করেছেন, জাগতিক ভাব থেকে মুক্ত, পরমার্থ প্রাপ্ত ও সম্যক জ্ঞানের দ্বারা বিমুক্ত। কাম ভব (জাত) অবিদ্যা প্রভৃতি সব রকম আস্রব (আসক্তি) থেকে মুক্ত হলে তবে ভিক্ষুরা অর্হৎ হতে পারতেন। ধ্যান ও প্রজ্ঞার দ্বারা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের মাধ্যমে নির্বাণলাভের যে মার্গ সেই মার্গের সব শেষ স্তর এই অর্হৎ-ত্ব। স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে যে কোন বয়সে অর্হৎ হওয়া যায়। বুদ্ধদেব ও অর্হতের মধ্যে তফাৎ এই বুদ্ধদেবরা কয়েকটি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ও সর্বজ্ঞও এবং এগুলি অর্হতের আয়ত্তের অতীত। সুতরাং গৌতমবুদ্ধ ছাড়াও অপর বুদ্ধ আছেন বা থাকতে পারেন এবং বহু বুদ্ধের উল্লেখ বৌদ্ধ সাহিত্যে আছে। ত্রিপিটকে সব জায়গায় অর্হৎ শব্দটি বুদ্ধের বিশেষণ।

অর্হন—জৈন দেব।

অলকা—(১) হিমালয়ে অলকানন্দা নদীর তীরে কুবেরের রাজধানী। গন্ধর্বদের বাসস্থান। (২) ৮-১০ বৎসর বয়স বালিকা।

অলকানন্দা—স্বর্গের নদী ; পৃথিবীতে এই নদী গঙ্গা, পাতালে ভোগবতী/বৈতরণী। বিষ্ণুপাদ থেকে বার হয়ে দেবলোক অতিক্রম করে চন্দ্রলোক থেকে ব্রহ্মলোকে আসে। ব্রহ্মলোকে চারটি ধারা সীতা, চক্ষু, অলকানন্দা ও ভদ্রাতে ভাগ হয়ে গেছে। সীতা মেরুপর্বতে নেমে এসে গন্ধমাদন হয়ে পূর্ব সাগরে গিয়ে পড়েছে। চক্ষু নেমে আসে মাল্যবান পর্বতে এবং কেতুমাল পার হয়ে পশ্চিম সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। অলকানন্দা পড়েছে হেমকূট পাহাড়ে এবং ভারতবর্ষ হয়ে দক্ষিণ সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। ভদ্রা শৃঙ্গবান পর্বতে নেমে এসে উত্তর সমুদ্রে গিয়ে মিলিত হয়েছে। অলকানন্দাতে স্নান করবার সঙ্কল্প করলেই অশ্বমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। রামায়ণে এর উল্লেখ নাই। (২) মহাগঙ্গা। গঙ্গোত্রীর কাছে গঙ্গার একটি করদা শাখা। বিষ্ণুগঙ্গা, (ধবলগঙ্গা, ধৌলি) ও সরস্বতী-গঙ্গার মিলিত ধারা। গাড়োয়ালে। সঙ্গমের ওপর অংশ বিষেন(=বিষ্ণু) গঙ্গা। বদ্রিনাথ থেকে ৪ মাইল উত্তরে বসুধারা জল-প্রপাত (মনাল গ্রামের কাছে) থেকে উৎপন্ন। বদরিকাশ্রম (দ্রঃ)। গাড়োয়ালের রাজধানী শ্রীনগর এই নদীর ধারে অবস্থিত। এর পর গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

অলক্ষ্মী—জ্যেষ্ঠা। দুর্ভাগ্যের দেবী। লক্ষ্মীর বড় বোন। রক্তমাল্য ও রক্ত-কমলে ভূষিত হয়ে সমুদ্র মন্থনে উঠে আসেন। দেবতা বা অসুর কেউই এঁকে বিয়ে করতে চান না। মহাতপা দুঃসহ একে বিয়ে করেন এবং পরে ত্যাগ করতে বাধ্য হন। অলক্ষ্মী কালো, দুহাত, হাতে ঝাঁটা, গায়ে লোহার গহনা, কাঁকরের চন্দন এবং বাহন গাধা। কলহ প্রিয়া, দারিদ্র্য তাঁর সহচর। বাঙলাতে বর্তমানে দীপান্বিতা অমাবস্যার প্রদোষে গোময় পুত্তলিকায় কালো ফুলে বাঁ হাতে এঁর পূজা করে কুলা বাজিয়ে প্রদোষে বা নিশীথে বিসর্জন দিতে হয়। অনাচার বহুল গৃহে এঁর স্থান। (পদ্ম-পুরা)

ঋক্ বেদে অশ্রী আছেন। বোধায়ন গৃহ্যসূত্রে এঁকে কপিল পত্নী, কুম্ভী, হস্তীমুখা,

বিঘ্নপার্ষদা, নিঋ'তি বলা হয়েছে। এ'র রথ সিংহযুক্ত এবং পেছনে বাঘ অনুসরণ করছে। লিঙ্গ পুরাণে সমুদ্র থেকে উঠে আসার পর দুঃসহ মুনির সঙ্গে বিয়ে হয়। বিষ্ণু বা শিবের স্তব বা পূজা বা ভাল কোন কাজ সহ্য করতে পারতেন না। মুনি তখন মার্কণ্ডেয়ের কাছে উপদেশ চান; মার্কণ্ডেয় উপদেশ দেন যেখানে অধর্ম ও পাপাচার অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেই সব স্থানে অলক্ষ্মীকে নিয়ে যেতে। এই সব স্থানের নাম হিসাবে বৌদ্ধ অবৈদিক স্থানগুলির নাম আছে। দুঃসহ কিন্তু স্ত্রীকে ছেড়ে কোন মতে পালিয়ে যান। জ্যেষ্ঠা তখন বিষ্ণুর কাছে জীবিকার ব্যবস্থার জন্য প্রার্থনা করেন। বিষ্ণু উপদেশ দেন জ্যেষ্ঠার নিজস্ব ভক্তদের কাছে এবং শিব ইত্যাদিকে যারা পূজা করে না তাদের কাছে যেতে। এ ছাড়াও নির্দেশ দেওয়া আছে বিষ্ণু ভক্তরা ও মহিলারা যেন জ্যেষ্ঠাকে অন্তত কিছু দান করেন।

অংশমংভেদাগমে ও বিষ্ণুধর্মোত্তর ইত্যাদিতে বলা হয়েছে অলক্ষ্মী দ্বিভুজা, লম্বা নাক, ঝুলেপড়া ঠোঁট, গলিত স্তন, ও লম্বোদরী। এক হাতে পদ্ম আছে। কাকধ্বজ-সমাযুক্তা, সঙ্গে পুত্রকন্যারা রয়েছে; একটি ছেলের মুখ বৃষ মত। সুপ্রভেদাগমে জ্যেষ্ঠা খরারূঢ়া, ও কলেঃ পত্নী। অলক্ষ্মীর কিছু মধ্যযুগীয় উৎকীর্ণ মূর্তিও পাওয়া গেছে। কাঞ্চীপুরমে কৈলাসনাথ মন্দিরে জ্যেষ্ঠার মূর্তি আছে। চোল রাজাদের ইনি গৃহদেবতা ছিলেন। ভারতে এক সময় এ'র পূজা প্রচলিত ছিল; বর্তমানে প্রায় কোথাওই হয় না। এই অলক্ষ্মীই যেন শীতলাতে (দ্রঃ) পরিণত হয়েছেন। বৌদ্ধ জাতক তেমকুনে অলক্ষ্মীর উল্লেখ আছে। দ্রঃ-নিঋ'তি, অশ্বত্থ, জ্যেষ্ঠা।

অলখনামী—বা আলেখিয়া। যিনি অলক্ষ্য তাঁর নাম যে সম্প্রদায় সকল কাজে নিয়ে থাকেন। অলখনামীরা পুরী সম্প্রদায়ের, অলখগিরিরা গিরি সম্প্রদায়ের এবং আলেখিয়ারা গোরক্ষপন্থী কাণকাটা যোগীদের মত। অবশ্য সকলেই এ'রা আলেখিয়া বা অলখ্‌কো-জাগানেওয়ালা নামে পরিচিত। এ'দের সম্প্রদায়গত পার্থক্য আছে। মিল এই যে এ'দের সকলের মত পরম দেবতা মানুষের বুদ্ধির অগোচর। বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের প্রভাব এ'দের ওপর প্রচুর। এ'দের পরিধান কম্বলের লম্বা আলখাল্লা এবং গোল বা মোচার মত উ'চু টুপি। কোন কোন সম্প্রদায় রূপা পেতল বা তামার চার পাঁচ হালি জিঞ্জিরের মত অলঙ্কার পায়ে পরেন। গৃহস্থের বাড়িতে এসে 'অলখ-কহো' বলে হাঁক দেন; ভিক্ষা চান না; যদি ভিক্ষা পান গ্রহণ করেন নতুবা অবিলম্বে সেখান থেকে চলে যান।

অলঙ্কার—মহেন্‌-জো-দড়ো বাসীদের কাছে অলঙ্কার অতি প্রিয় ছিল। হার, চুলের বন্ধনী, বলয় ও আংটি স্ত্রী পুরুষ সকলেই ব্যবহার করত। মেখলা, কাণের দুল, কাণবালা, ও পায়ের মল মেয়েরা ব্যবহার করত। ধনীদের গয়না সোনা, রূপা ও পেতল জাতীয় মিশ্রধাতু, গজদন্ত ও দামী পাথরে তৈরি হয়েছে। সাধারণ লোকে শাঁখ, হাড়, তামা, ব্রোঞ্জ ও পোড়ামাটির গহনা পরত। মেখলাতে নলের মত মালার লহর থাকত। গলার হার ছিল। হার ঢোলকের আকার, গোলাকার বা ঘড়ির চাকার মত হত; সোনা, রূপা, তামা, ব্রোঞ্জ, শাঁখ, হাড়, মসৃণ পাথর ও কাঁচ জাতীয় জিনিস

ও পোড়ামাটি দিয়ে এই হার তৈরি হয়েছে। বলয় তৈরি হত তামা, ব্রোঞ্জ, শাঁখ, পেতল মত মিশ্র ধাতু ও পোড়া মাটি দিয়ে। মনে হয় বলয় বাঁ হাতে বাহু থেকে কব্জি পর্যন্ত পরা হত। রূপা ও তামার আংটিও খুব সাধারণ ধরণের ছিল।

বৈদিক যুগে অশ্বমেধের ঘোড়ার মূল্যবান অলঙ্কার হিসাবে কাচের ব্যবহার ছিল। চাণক্যের সময়ও এই কাচমণি রাজরত্নাগারে স্থান পেত। অবশ্য এই কাচ আজকের ব্যবহৃত কাচ নয়। ঋক্-বেদে রুদ্রের স্বর্ণাভরণের উল্লেখ আছে। অসুররা মণিকাঞ্চনের নানা অলঙ্কার পরতেন। রামায়ণ মহাভারতে প্রচুর অলঙ্কারের উল্লেখ আছে। প্রাচীন ভাস্কর্যে ও প্রাচীর চিত্রে বহু গহনার উল্লেখ আছে।

অর্থশাস্ত্রে মুক্তাহার জাতীয় অলঙ্কারের বর্ণনা আছে। এই সময়ের জড়োয়ার কাজে দশভাগ সোনায় চার ভাগ রূপা বা তামা অথবা অর্দ্ধেক সোনা ও অর্দ্ধেক তামা থাকত। পিপারোয়াতে প্রাপ্ত অলঙ্কার থেকে বোঝা যায় অর্থশাস্ত্রের সময়ের অলঙ্কার শিল্প বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করেছিল। বেলন আকার, কারুকার্যখচিত ধাতু-খণ্ডের হার, মণিবন্ধের চওড়া ব্রেসলেট, পায়ের বড় বাঁকা মল, গোড়ালি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঘোরান গহনা, কাণে প্রকাণ্ড ঝোলান কুণ্ডল ইত্যাদি ব্যবহার হত। পাথর কাটা, পালিস করা ও পাথরে ফুটো করা সম্বন্ধে শিল্পীরা অত্যন্ত সুদক্ষ ও রুচি সম্পন্ন ছিল।

খৃস্টীয় প্রথম থেকে সপ্তম শতক পর্যন্ত অলঙ্কারের নানা বৈচিত্র্য দেখা যায়। গান্ধার ও ইরানের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে এই বৈচিত্র্য। অলঙ্কারের গড়ন মার্জিত হয়ে ওঠে, মাপ ও ওজন ক্রমশ কমতে থাকে। অজণ্টা চিত্রাবলী ও মথুরা, উড়িষ্যা ও মধ্য ভারতের ভাস্কর্যের গহনাগুলি থেকে অলঙ্কারের উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়। মুক্তা বা নানা আকারের ধাতু খণ্ড গেঁথে মালার বেশি প্রচলন ছিল এবং দেহের সর্বত্র ব্যবহার হত। ধাতুর বদলে ক্রমশ পাথর ইত্যাদির ব্যবহার বাড়ছিল। বৈদিক যুগেও মণি-মুক্তার ব্যবহার ছিল। পরে গ্রথিত অলঙ্কার হ্রাস পায়; বলয়, কবচ, কুণ্ডল ইত্যাদি এক খণ্ডে তৈরি অলঙ্কারের প্রচলন বাড়ে। তারের কাজ ও পাথরের কাজও বাড়তে থাকে। এই সময়েই রূপার কটকি-কাজ ও মিনার কাজের প্রচলন হয়। খৃস্টীয় পঞ্চম-সপ্তম শতকে অলঙ্কার অতুলনীয় হয়ে ওঠে। অজণ্টা চিত্রে নথ, ফুল, নোলক, নাকছাবি ইত্যাদি এবং পায়ের গয়না চুটকি, নূপুর ইত্যাদি নাই। কাণের ও হাতের গয়না আছে।

কোনার্ক সূর্যমন্দিরের মূর্তিগুলির অলঙ্কার থেকে সমসাময়িক অলঙ্কারের একটা ধারণা করা যায়। গাঁথা, পেটান, ফাঁপা অলঙ্কার মূর্তিগুলির গায়ে প্রচুর রয়েছে।

প্রাচীন অলঙ্কারের আদর্শ উত্তর ভারতে বিদেশী সংস্পর্শে দ্রুত পরিবর্তিত হয়েছিল, কিন্তু দক্ষিণ ভারতে খৃস্টীয় সপ্তদশ শতক পর্যন্ত প্রাচীন আদর্শই চিত্রে মূর্তিতে ও ধাতু শিল্পে প্রচলিত ছিল। মাদুরার বড় মন্দিরের কয়েকটি মূর্তি ও রামেশ্বরের মন্দিরের কয়েকটি স্ত্রীমূর্তির গায়ে নতুন কিছু অলঙ্কার দেখা যায়। ভারতীয় অলঙ্কারে

প্রাচীন কালে আসিরীয় ও গ্রীক প্রভাবের পরিমাণ হিসাব করা কঠিন। তবে অজন্টার সময় থেকে ভুবনেশ্বরের সময় পর্যন্ত বিশেষ একটি সম্পূর্ণ ভারতীয় ধারা স্পষ্ট চেনা যায়।

অলঙ্কারশাস্ত্র—যে শাস্ত্রে সাহিত্যের আলোচনা হয়। প্রথম যুগে কাব্যের উৎকর্ষ অপকর্ষ বিচারের জন্য এর উৎপত্তি। পরে অলঙ্কার অর্থে অনুপ্রাস, উপমা, গুণ, রীতি, বৃত্তি, লক্ষণ ইত্যাদি সব কিছু বোঝায়। অলংকার শাস্ত্রকে এই জন্য সংস্কৃতে কাব্যমীমাংসা, কাব্যলক্ষণ বা সাহিত্য মীমাংসাও বলা হয়। অর্থাৎ কেবল কাব্য নয় সাহিত্যের অলঙ্কারও এই শাস্ত্রে আলোচিত।

ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রের উৎপত্তি অতি প্রাচীন ও ক্রমবিকাশ দীর্ঘ কাল ব্যাপী। মহর্ষি যাস্ক নিরুক্ত গ্রন্থে উপমার স্বরূপ আলোচনা (নি ৩।১৩-১৮) করেছেন। বৈদিক সূক্তগুলিতে রূপক, অনুপ্রাস ও অতিশয়োক্তি ইত্যাদি অলঙ্কার অনেক আছে। এই জন্য অলঙ্কার শাস্ত্রকে সপ্তম বেদাঙ্গ নামে উল্লেখ করা হয়।

ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র প্রাচীনতম গ্রন্থ। আচার্য কানের মতে ৩০০ খৃস্টাব্দের আগেও এই গ্রন্থ বর্তমানের আকারেই ছিল। এই গ্রন্থে নাটক ইত্যাদির আলোচনার সঙ্গে রস ও ভাবের (ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে) বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। ভরত মুনির দীর্ঘ কাল পরে ভামহ ও দণ্ডীর আবির্ভাব; সম্ভবত সপ্তম খৃস্টীয় শতকের প্রথমার্দ্ধে। ভামহের কাব্যালঙ্কার বইটিতে ছয়টি পরিচ্ছেদে কাব্যশরীর, অলঙ্কার, কাব্যদোষ, ন্যায়নির্ণয় ও শব্দশুদ্ধি এই পাঁচটি জিনিস আলোচিত হয়েছে। দণ্ডী তাঁর কাব্যাদর্শে কাব্যলক্ষণ, বৈদর্ভী ও গৌড়ীরীতি, শ্লেষপ্রসাদাদি দশটি গুণ, উপমা, অনুপ্রাস প্রভৃতি বহু তত্ত্বের আলোচনা করেছেন। ভামহের মতে কাব্য অলঙ্কারহীন হতে পারে না। এবং স্বভাবোক্তি অলঙ্কার নয়, বক্রোক্তি না হলে অলঙ্কার হয় না। ভামহ অলঙ্কার ও গুণের মধ্যে কোন বিশেষ পার্থক্য আছে আলোচনা করেন নি। কিন্তু দণ্ডী বলেছেন শ্লেষ, প্রসাদ, সমতা, মাধুর্য, সুকুমারতা, অর্থব্যক্তি, উদারত্ব, ওজঃ, কান্তি ও সমাধি এই দশটি গুণই কাব্যের প্রাণ; অলঙ্কার কেবল শোভা বাড়ায়। ভরত মুনি রসকে কাব্যের প্রাণ বলেছিলেন কিন্তু ভামহ বা দণ্ডী রসকে ততটা উচ্চ সম্মান দেন নি। ভামহ ও দণ্ডীর পর উল্লেখযোগ্য আলঙ্কারিক হচ্ছেন উদ্ভট ও বামন।

উদ্ভটের একটি বই ভামহ-বিবরণ, লুপ্ত, বইটি ভামহ রচিত কাব্যালঙ্কারের একটি টীকা এবং এর একটি খণ্ড যেন সম্প্রতি পাওয়া গেছে। উদ্ভটের দ্বিতীয় বই কাব্যালঙ্কারসারসংগ্রহ। দ্বিতীয় বইটিতে মোট ৪১টি অলঙ্কারের লক্ষণ ও উদাহরণ আছে। এই বইতে অনেক জায়গায় উদ্ভট নিজের নতুন মতবাদ স্থাপনের চেষ্টা করেছেন। বামনের (৭৫০-৮০০খৃ) কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি বইটিতে একটি স্বতন্ত্র মতবাদ ইনি প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছেন। প্রাচীন পথ অনুসরণ করলেও তাঁর চিন্তায় অভিনবত্ব আছে। এঁর মতে কাব্যের আত্মা হচ্ছে রীতি। এরপর রুদ্রট (কাশ্মীরী) মনে হয় ৯০০ খৃস্টাব্দের কিছু আগে জন্মেছিলেন। ভরতের

নব রসের অতিরিক্ত প্রেয়ঃ নামে দশম একটি রসের ইনি আলোচনা করেছিলেন। অলঙ্কার সমূহকে তিনি বাস্তব, ঔপম্য, অতিশয় ও শ্লেষ এই চারটি শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেন। চার রীতি—বৈদর্ভী, পাঞ্চালী, লাটী ও গৌড়ী ; পাঁচ অনুপ্রাস—মধুরা, ললিতা, প্রৌঢ়া, পরুষা, ভদ্রা ; এবং চক্রবন্দ, মুরজবন্ধ, অর্দ্ধভ্রম, সর্বতোভদ্র ইত্যাদি চিত্রের আলোচনায় রুদ্রট নিজের সবল নতুন দৃষ্টিভঙ্গি স্থাপন করে গেছেন। মত, সাম্য ও পিহিত তিনটি অলঙ্কার যেন রুদ্রটের আবিষ্কার।

রুদ্রটের পর আনন্দবর্দ্ধন নতুন আর একটি মৌলিক ধারার প্রবর্তন করেন। এ'র বই ধ্বন্যালোক। অবশ্য গ্রন্থকার সম্বন্ধে মতান্তর আছে। আনন্দবর্দ্ধন ভরত মুনির রসকে কাব্যের প্রাণবস্তু বলে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইনি ব্যঞ্জনার আলোচনা করেন এবং বলেন রসের ধর্ম হল গুণ, অলঙ্কার হচ্ছে উৎকর্ষ এবং রীতি হচ্ছে প্রকাশ। রসের অপকর্ষ হচ্ছে দোষ। অলঙ্কারকে অভিনবগুপ্ত তিনটি ভাগে ভাগ করেন যথা বাহ্য, আভ্যন্তর ও বাহ্যাভ্যন্তর। গুণ, অলঙ্কার, রীতি, বৃত্তি, সংঘটনা, দোষ প্রভৃতি কাব্যের যাবতীয় উপাদানকে আলোচনা করে একটি সুসংহত কাব্যতত্ত্ব বা কাব্যনয় গড়ে তুলেছিলেন। আরো তিন জন আলঙ্কারিক ভট্টনারায়ণ, কুন্তক, ও মহিভট্ট, এবং এ'দের তিনজনের পর অভিনবগুপ্ত। ক্ষেমেন্দ্রের (৯৯০-১০৬৩ খৃ) বই ঔচিত্যবিচারচর্চা।

অলঙ্কার শাস্ত্রের ক্রম বিকাশের এই স্রোতকে চার ভাগে ভাগ করা হয় (১) প্রাচীন যুগ থেকে ভামহ পর্যন্ত প্রারম্ভ দশা ; (২) ভামহ থেকে আনন্দবর্দ্ধন দ্বিতীয় স্তর বা সৃষ্টিকারী স্তর ; (৩) আনন্দ বর্দ্ধন থেকে মম্মট পর্যন্ত স্তর এবং (৪) চতুর্থ বা শেষ স্তর মম্মট থেকে জগন্নাথ পর্যন্ত এটি পাণ্ডিতী স্তর। আজকের দিনে অনেকের ধারণা অলংকার-শাস্ত্র উপমা অলঙ্কার ইত্যাদির আলোচনা। কিন্তু তা নয়। অখণ্ড কাব্য সত্তাকে তাঁরা জানতেন এবং সে বিষয়ে সামগ্রিক আলোচনাও তাঁরা প্রচুর করেছেন। শব্দ, অর্থ, গুণ, রীতি, রস, অলঙ্কার, ধ্বনি, ব্যঞ্জনা সব কিছু মিলিয়ে কাব্য এ তত্ত্বটি তাঁরা বারবার উল্লেখ করেছেন।

ইউরোপীয় কাব্যতত্ত্বের চেয়ে ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব অতিপ্রাচীন এবং তুলনায় গভীর ও বৈচিত্র্যময়।

অলঘু—বশিষ্ঠ উর্জার এক ছেলে ; অলঘ (অগ্নি-পুরা)।

অলম্বল—জটাসুরের ছেলে। মানুষের মাংস খেত। যে হেতু ভীম জটাসুরকে নিহত করেছিলেন সেই হেতু অলম্বল কুরুক্ষেত্রে কৌরব পক্ষে ছিলেন। দুর্যোধনের নির্দেশে কুরুক্ষেত্রে ঘটোৎকচের সঙ্গে বহু ক্ষণ যুদ্ধ হয়। ঘটোৎকচ পরে মায়া যুদ্ধে এর মাথা কেটে নেন।

অলম্বুষ—(১) কুরুক্ষেত্রে সাত্যকির হাতে নিহত জনৈক রাজা। (২) রাক্ষস ঋষ্য-শৃঙ্গের ছেলে। অপর নাম শালকটঙ্ক। কৌরব পক্ষে ছিলেন এবং ঘটোৎকচের হাতে নিহত হন। (৩) আরো অনেকগুলি অলম্বুষ সংস্কৃত সাহিত্য রয়েছে।

অলম্বুষা—সরস্বতী তীরে তপস্যারত দধীচি মুনির তপস্যা নষ্ট করতে ইন্দ্র অপ্সরা

অলম্বুষাকে পাঠান। অলম্বুষাকে দেখে মুনির বীর্য পাত হয় এবং নদীতে পড়ে। ফলে সরস্বতী নদী গর্ভ ধারণ করেন; ছেলে হয় সারস্বত। সরস্বতী এই ছেলেকে দধীচির কাছে আনলে দধীচি শিশুকে আশীর্বাদ করে বলেন দেশে বার বছর অনাবৃষ্টি হবে, ব্রাহ্মণরা শাস্ত্র ভুলে যাবেন। সারস্বত তখন ব্রাহ্মণদের শাস্ত্র পাঠ শুনিয়ে শাস্ত্রজ্ঞান ফিরিয়ে আনবেন। সারস্বত তারপর সরস্বতীর সঙ্গে ফিরে যান। পরে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে ব্রাহ্মণরা নানা দেশে চলে যান। বার বছর পরে আবার শস্য হলে তাঁরা ফিরে আসেন কিন্তু বেদ, শাস্ত্র সব ভুলে গেছেন। সারস্বত এ'দের জ্ঞান ফিরিয়ে আনেন। (মহা ৯।৫২।-)

এক বার ইন্দ্র, বসু-বিধূম ও অলম্বুষা ব্রহ্মার কাছে আসেন। বাতাসে অলম্বুষার বস্ত্র অসংযত হয়ে পড়ে, বিধূম মুগ্ধ হয়ে যান। অলম্বুষাও বিধূমের চাঞ্চল্যে চঞ্চল হয়ে পড়েন। ব্রহ্মা ইন্দ্রকে ইঙ্গিত করেন এবং ইন্দ্র তখন এদের শাপ দেন। এই শাপে বিধূম চন্দ্রবংশে সহস্রানীক হয়ে এবং অলম্বুষা রাজা কৃতবর্মার ঔরসে স্ত্রী কলাবতীর মেয়ে মৃগাবতী নামে জন্মান। পৃথিবীতেও এ'রা পরস্পরকে ভালবাসতে থাকেন এবং এ'দের বিয়ে হবে ঠিক হয়। এরপর অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য ইন্দ্র সহস্রানীককে স্বর্গে নিয়ে যান। অসুরদের পরাজিত করে ফেরবার সময় ইন্দ্র সঙ্গে তিলোত্তমাকে দিয়ে দেন। রাজা রথে করে ফিরছিলেন এবং মৃগাবতীর কথা ভাব ছিলেন; পাশে তিলোত্তমার কথা শুনতে পান না। ফলে তিলোত্তমা শাপ দেন রাজাকে ১৪ বছর বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। শাপের কথা রাজা জানতে পারেন না। (কথা সরিৎ-সাগর)

রাজা কৌশাম্বীতে ফিরে এলে মৃগাবতীর সঙ্গে বিয়ে হয়। যথাকালে মৃগাবতীর গর্ভ হয়। মৃগাবতী এই সময় রাজাকে এক দিন জানান তাঁর বাসনা রক্তের পুষ্করিণীতে স্নান করবেন।· লাক্ষা ইত্যাদি যোগে রাজা কৃত্রিম রক্ত পুষ্করিণীর ব্যবস্থা করলে মৃগাবতী এই জলে স্নান করতে নামেন। এদিকে একটি শ্যেন পক্ষী মৃগাবতীকে এক টুকরো মাংস ভেবে ছোঁ মেরে নিয়ে চলে যায়। রাজা সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে যান; মাতলি এসে জ্ঞান ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করেন এবং শাপের কথা জানিয়ে যান। শ্যেন মৃগাবতীকে উদয়াচলে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায়। মৃগাবতী প্রাণ বিসর্জন দেবেন মনস্থ করেন কিন্তু শ্বাপদসঙ্কুল বনেও কেউ তাঁকে খেতে আসে না। শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত অবসন্ন মৃগাবতীকে এক মুনি বালক জমদগ্নি আশ্রমে নিয়ে আসেন। জমদগ্নি রাণীকে সান্ত্বনা দেন; একটি স্বনামধন্য ছেলে হবে জানান এবং স্বামীর সঙ্গে আবার মিলন হবে আশ্বাস দেন। মৃগাবতীর এরপর ছেলে হয় উদয়ন। জমদগ্নি সমস্ত জাতকর্ম করেন এবং শাস্ত্রবিদ্যা ও ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা দেন। ছেলের হাতে মৃগাবতী সহস্রানীকের নামাঙ্কিত বালা পরিয়ে দেন।

বালক উদয়ন বনে এক দিন এক সাপুড়েকে সাপ ধরতে দেখেন। সুন্দর সাপটিকে বালক ছেড়ে দিতে বললেও সাপুড়ে ছাড়তে চায় না, উদয়ন তখন হাতের বালা খুলে দিয়ে সাপকে মুক্ত করে দেন। সাপুড়ে বালা নিয়ে চলে গেলে সাপটি

উদয়নকে বলেন তিনি বাসুকির বড় ভাই বসুনেমি। উদয়নকে বাঁশি ইত্যাদি অনেক জিনিস উপহার দিয়ে যান। সাপুড়েকে দেওয়া বালার মাধ্যমে রাজার সঙ্গে এদের মিলন হয়।

(২) কশ্যপের ঔরসে প্রধার একটি মেয়ে, অপ্সরা। সূর্যবংশে রাজা তৃণবিন্দুকে মোহিত করে বিয়ে করেন। তিন ছেলে বিশালরাজ/বিশালদেব, শূন্যবন্ধু ও ধূমকেতু। বিশালদেব বৈশালী নগর স্থাপন করেন। মেয়ে ইড়াবিড়া/ইলবিলা; স্বামী বিশ্রবা এবং ছেলে কুবের (ভাগ ৯।২।৩১)। রামায়ণে (১।৪৭।১২) ইক্ষ্বাকু অলম্বুষার ছেলে বিশাল (দ্রঃ)।

অলম্বুষি—অলম্বুষের ছেলে।

অলর্ক—(১) সত্যযুগে এক জন অসুর। মূল নাম দংশ। ভৃগুর স্ত্রীকে চুরি করার জন্য ভৃগুর শাপে অষ্টপদ তীক্ষ্ণদন্ত ভয়ঙ্কর অলর্ক কীটে পরিণত হন। কর্ণকে (দ্রঃ) আক্রমণ করেন। পরশুরামের দৃষ্টিপাতে মুক্ত হয়ে পরশুরামকে প্রণাম করে ফিরে যান। অন্য মতে ইন্দ্র অলর্ক কীট হয়ে অর্জুনের স্বার্থরক্ষার জন্য কর্ণকে আক্রমণ করেছিলেন।

(২) কাশী ও করুষ দেশের রাজা। চন্দ্রবংশে প্রতর্দনের ঔরসে স্ত্রী মদালসার গর্ভে জন্ম। ছেলেকে মদালসা ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দেন। লোপামুদ্রার বরে দীর্ঘজীবী হয়ে ৬৬০০০ বছর রাজত্ব করেন। রাক্ষসদের হাত থেকে কাশীরাজ্য ইনি নিজের অধীনে এনে মানুষের বাসোপযোগী করে তোলেন। যমের এক জন সভাপতি হন। পঞ্চেন্দ্রিয় এবং মন ও বুদ্ধি জয় করবার জন্য এদের বাণবিদ্ধ করেও জয় করতে পারেন নি (মহাভারত)। শেষে যোগ সাধনায় এদের নিয়ন্ত্রণ করেন। এক বার এক অন্ধ ব্রাহ্মণ বালক তাঁর কাছে তাঁর চক্ষু দুটি চাইলে অলর্ক (রা ২।১২।৪৩) নিজের চোখ দুটি খুলে দান করেছিলেন। যোগ অভ্যাসের দ্বারা ইনি সমস্ত রিপু জয় করেন এবং যোগ বলে দেহত্যাগ করেন।

অলসন্দ—আলেকজেন্দ্রিয়া, হুপিয়ান (দ্রঃ)। যোন দেশের রাজধানী যেন। ...বংশে মিনান্দরের জন্মস্থান অলসন্দ।

অলায়ুধ—বক রাক্ষসের ভাই। কির্মীর ও হিড়িম্বকে ভীম বধ করেছিলেন ফলে কুরুক্ষেত্রে দুর্যোধন পক্ষে বহু সৈন্য নিয়ে যোগদান করেছিলেন এবং ভীষণ যুদ্ধে ঘটোৎকচের হাতে দ্রোণ পর্বে শেষ দিকে মারা যান (কা-প্রসন্ন ৭।১৭৭।-)। অন্য মতে বকের জ্ঞাতি ও হিড়িম্বের ভাই।

অলোপী—এলাহাবাদে। প্রজাপতিবেদী। এখানে অলোপী মন্দির একটি পীঠস্থান; সতীর পিঠ পড়েছিল। মন্দিরে কোন প্রতিমা নাই; কেবল একটি বেদী রয়েছে। বিখ্যাত তীর্থ।

অলোলুপ—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে।

অল্লা—পরম দেবতা। অথর্ব বেদে অথর্বণ সূক্তে অল্লার স্বরূপ বর্ণিত আছে: অল্লো জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠং পরমং, পূর্ণং ব্রাহ্মণমল্লাং, অল্লোবসুর মহমদরকং বরস্য অল্লো অল্লাং ইত্যাদি। ইল্লাকবর, ইল্লাকবর, ইল্লল্লেতি, ইল্লাল্লাঃ ইল্লা ইলল্লা অনাদিস্বরূপা অথর্বণী

শাখাং হ্রুং. হ্রীঁ....কম্ কম্ ফট্ ইত্যাদি। সম্রাট আকবরের নির্দেশে ১৫৮০ খৃস্টাব্দে অল্লোপনিষৎ রচনা হয়েছিল।

অশোক—(১) অশ্বপতির বড় ভাই; (২) দশরথের এক মন্ত্রী; অন্য নাম অকোপ। (৩) রাবণের প্রমোদ বন (৪) চৈত্র শুক্ল ষষ্ঠী (৫) ভীমের সারথি (৬) অশ্ব নামে অসুর পরিবারে এক রাজা।

অশোক—ধর্মশাস্ত্র ও আয়ুর্বেদের প্রসিদ্ধ বৃক্ষ। এই গাছের পাতা নবপত্রিকার অন্যতম উপকরণ। গৌরী এই গাছের নীচে তপস্যা করে পূর্ণ মনোরথ ও বিগতশোক হয়েছিলেন। পঞ্চবটী বেদির অগ্নিকোণে এই গাছ বসাতে হয়। বৃহৎ পঞ্চবটী বেদির চারধারে গোল করে পাঁচটি অশোক গাছ বসাতে হয়। বিষ্ণু, লক্ষ্মী ও দেবী পূজায় এই ফুল প্রশস্ত। কামদেবের পঞ্চবাণের মধ্যে একটি। এই ফুল থেকে স্ত্রীরোগে ব্যবহৃত ভেষজ তৈরি হয়। কবি প্রসিদ্ধি যুবতীদের পদাঘাতে এর ফুল ফোটে। বিজ্ঞানে নাম সারাকা ইণ্ডিকা (লিনি)।

অশোক—মগধের মৌর্যবংশের তৃতীয় সম্রাট। অন্য নাম প্রিয়দর্শী। চন্দ্রগুপ্ত এর পিতামহ; পিতা বিন্দুসার। তাঁর শিলালিপি ইত্যাদি থেকে অনুমান ২৭৩-২৩২ খৃ-পূ রাজত্ব করতেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজাগুলির চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আলেকজাণ্ডার, সিজর বা নেপোলিয়ন তাঁর তুলনায় প্রদীপ-সামান্য। বিন্দুসারের এক শত ছেলের মধ্যে অশোক অন্যতম। পিতার মৃত্যুর আগে তক্ষশীলায় ও উজ্জয়িনীতে রাজ-প্রতিনিধি ছিলেন। বিন্দুসারের মৃত্যুতে ছেলেদের মধ্যে রক্তাক্ত ভ্রাতৃবিরোধ দেখা দেয় এবং মন্ত্রী রাধাগুপ্তের সাহায্যে অশোক বড় ভাই অভিষিক্ত যুবরাজ সুমনকে (তক্ষশীলার শাসক) ও অন্যান্য ভাইদের পরাজিত ও নিহত করে মগধের রাজা হন। এর ফলে বিন্দুসারের মৃত্যুর চার বছর পরে অশোকের অভিষেক হয়। রাজত্বের ৯-ম বর্ষে বৌদ্ধ উপাসক, ১১-শ বর্ষে বুদ্ধের একনিষ্ঠ ভক্ত। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কোন বিশেষ প্রামাণিক হিসাব মেলে না। প্রধান মহিষী অসন্ধিমিত্রা এবং কারুবাকী,চারুবাকী, দেবী, পদ্মাবতী ও তিষ্যরক্ষিতা এই পাঁচজন। ছেলে মহেন্দ্র, তিবর, কুনাল, ও জলৌক। একটি শিলালিপিতে কারুবাকী ও তাঁর গর্ভজ পুত্র তিবরের উল্লেখ আছে। মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রার কথা কোন শিলালিপিতে নেই। অশোকের মৃত্যুর পর তাঁর দুই পৌত্র দশরথ ও সম্প্রতি রাজত্ব ভাগ করে নেন। চল্লিশ বছর মত রাজত্ব করে ২৩২ খৃ পূ অশোক দেহত্যাগ করেন। নানা জায়গা থেকে তাঁর প্রায় চল্লিশটি শিলা-লিপি পাওয়া গেছে; এঁদের একটি অনুশাসন লিপি থেকে মনে হয় অশোক যেন ভাইদের হিংসা বা হত্যা করেন নি।

উত্তরাধিকার সূত্রে অশোক যে রাজ্য পান তা উত্তর পশ্চিমে হিন্দুকুশ থেকে সম্ভবত বাঙলার কিছুটা ও হিমালয়ের পাদদেশ থেকে দক্ষিণে পেন্নার নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কলিঙ্গ তাঁর অধীন ছিল না। রাজা হওয়ার আট বছর পরে কলিঙ্গ জয় করেন। এই যুদ্ধে এক লক্ষ লোক নিহত ও দেড় লক্ষ লোক দেশচ্যুত এবং লক্ষ লক্ষ লোক যুদ্ধ জনিত দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে মারা যায়। যুদ্ধের এই পরিণাম দেখে

অশোক গভীর অনুশোচনায় সম্ভবত উপগুপ্ত নামে এক বৌদ্ধ ভিক্ষুর কাছে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। কলিঙ্গ জয়ের পর দীর্ঘ ত্রিশ বছর রাজত্ব কালে তিনি আর কোথাও কোন যুদ্ধ করেন নি; এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের যুদ্ধ পরিত্যাগ করে ধর্ম-বিজয়ের জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। দ্রঃ-অশ্ব।

বুদ্ধগয়া, বস্তি জেলার অন্তর্গত শিগ্‌লিভা গ্রামে অবস্থিত পূর্ববর্তী বুদ্ধ কনক মুনির আশ্রম ও গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনি গ্রাম পরিদর্শন করেন। লুম্বিনিতে তাঁর স্থাপিত স্তম্ভ আছে। সারা বৎসর প্রজাদের সঙ্গে মেলামেশা করে ও ধর্মপ্রচার করে বেড়াতে থাকেন। তাঁর এক মাত্র ব্রত হয়ে উঠেছিল ধর্মের বিস্তার ও প্রজাদের মানসিক উন্নতি। আফগানিস্তানের কান্দাহার ও জালালাবাদ, উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশের মনসেরা ও সাহাবাজগড়ি, দেরাদুনের কাসমী, ও কাথিয়াওয়াড়ে, গিরনারে, উড়িষ্যার তোষালি, এবং মহীশূরের মাস্কি ইত্যাদি স্থানে স্থানীয় বর্ণমালায় তাঁর শিলালিপি পাওয়া গেছে। কান্দাহার ও জালালাবাদে গ্রীক ও আরামাইক অক্ষর; মনসেরা ও সাহাবাজগড়িতে খরোষ্ঠী এবং অন্যান্য স্থানে ব্রাহ্মী লিপি দেখা যায়। শিলালেখের ভাষা অর্দ্ধ মাগধী; কতকটা পালি মত মনে হয়; এই ভাষা তখন ভারতে সর্বত্র প্রচলিত ছিল। এই সমস্ত অনুশাসনে ধর্মের কথা আছে; দর্শনের কথা নাই।

ভগবান বুদ্ধ গৃহস্থের জন্য যে ধর্ম নির্দেশ দিয়েছিলেন অশোক সেই নির্দেশই ধর্ম বলে প্রচার করেছিলেন। ধর্মপ্রচারের জন্য অশোক দাক্ষিণাত্যের স্বাধীন রাজ্য চোল, পাণ্ড্য, সত্যপুত্র, ও কেরলপুত্র রাজ্যে, সিংহলে, সম্ভবত ব্রহ্মদেশে এবং সিরিয়া, মিসর, কাইরিনি, মাসিডোনিয়া ও এপিরাস প্রভৃতি রাজ্যে প্রচারক পাঠিয়েছিলেন। ছেলে মহেন্দ্র ও মেয়ে সংঘমিত্রাকে সিংহল পাঠিয়েছিলেন। রাজকর্মচারীদের ওপর নির্দেশ ছিল কাজের সঙ্গেই ধর্ম প্রচার করবেন। জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম প্রচারের জন্য ধর্মমহামাত্র নামে নতুন এক শ্রেণীর রাজকর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন। বৌদ্ধধর্মের মধ্যে বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হলে পাটলিপুত্রে বৃদ্ধ-বৌদ্ধ আচার্যদের ডেকে একটি ঐক্যের চেষ্টা করেন। প্রাণী হত্যা নিবারণের জন্য বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। প্রজাদের নিজের সন্তানের মত পালন করতেন এবং নিন্দা ও বিবাদ না করে পরধর্ম উপলব্ধি করার জন্য সকলকে অনুরোধ করতেন। তাঁর তৈরি বরাবর গিরিগুহা অন্য সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের প্রতি শ্রদ্ধার সাক্ষ্য হয়ে রয়েছে। গাঙ্গেয় উপত্যকার সীমিত বৌদ্ধ ধর্মকে মিসর, পূর্ব ইউরোপ ও পশ্চিম এসিয়াতে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। পশু ও মানুষের জন্য চিকিৎসালয় স্থাপন জীবের প্রতি তাঁর করুণার স্বাক্ষর। পশ্চিম এশিয়া, মিসর, গ্রীক, দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপেও তিনি এই রকম চিকিৎসালয় স্থাপন করেছিলেন ও নানা ভেষজ পাঠাতেন।

তাঁর সময় স্থাপত্য ও অন্যান্য শিল্পেরও প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পাঁচশ বছর পরেও তাঁর প্রাসাদের সৌন্দর্য ফা-হিয়েন ইত্যাদিকে মুগ্ধ করেছিল। সারা দেশে প্রায় ৮৪০০০ বৌদ্ধ স্তূপ স্থাপিত করেছিলেন; এগুলি প্রায় সবই নষ্ট হয়ে গেছে।

সাঁচীর বৃহৎ স্তূপটিও অশোকের স্থাপিত ; পরে অবশ্য অনেক সংস্কার হয়েছে। সারনাথের স্তম্ভের শীর্ষদেশ ভারতীয় রাষ্ট্রপ্রতীক।

অশোকাষ্টমী—চৈত্র শুক্ল অষ্টমী। এই তিথিতে আটটি অশোক কলিকা খেলে লোকে শোকপ্রাপ্ত হয় না।

অশোকপূর্ণিমা—পূর্ণিমাতে কর্তব্য ব্রত বিশেষ।

অশোক-তীর্থ—দক্ষিণ দিকে একটি তীর্থ ; (মহা ৩।৮৬।:০)।

অশোকবন—(১) লঙ্কায় সীতা যেখানে বন্দী ছিলেন। বহু অশোক বৃক্ষযুক্ত। (২) রামের প্রমোদ বন ; অযোধ্যায় ফিরে এসে এখানে সীতার সঙ্গে রাম থাকতেন।

অশোকষষ্ঠী—চৈত্র শুক্ল ষষ্ঠী।

অশোকসুন্দরী—শিবপার্বতী একবার বিশ্রম্ভালাপ করছিলেন। পার্বতী কথায় কথায় শিবকে অনুরোধ করেন ব্রহ্মার সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ উদ্যান কি আছে দেখাতে। শিব তখন নন্দন বনে নিয়ে যান, কল্পবৃক্ষ দেখান এবং কল্পবৃক্ষের ক্ষমতার পরিচয় দেন। কৌতূহলে পার্বতী কল্পবৃক্ষের কাছে একটি মেয়ে চান এবং তৎক্ষণাৎ সুন্দরী একটি মেয়ে হয়। পার্বতী এঁর নাম দেন অশোক-সুন্দরী এবং একে পালন করেন এবং বর দেন নহুষের সঙ্গে বিয়ে হবে।

সখীদের সঙ্গে এক দিন মেয়েটি নন্দন বনে বেড়াচ্ছিল এমন সময় বিপ্রচিত্তির ছেলে হুণ্ড দৈত্য এঁকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যায় এবং বিয়ে করতে চায। নহুষেব সঙ্গে তাঁর বিয়ে হবে জানিয়ে অশোকসুন্দরী দৈত্যকে প্রত্যাখ্যান কবেন। অসুব বোঝাতে চেষ্টা কবে নহুষ এখনও জন্মায়নি। জন্মে যখন বিযের বয়স হবে তখন অশোক-সুন্দরী বুড়ি হয়ে যাবে ইত্যাদি। কিন্তু অশোকসুন্দরী এ সব কথায় কাণ দেন না। এরপর দৈত্য একটি সুন্দরী মেয়ে সেজে এসে জানায তার স্বামীকে হুণ্ড হত্যা করেছে, প্রতিশোধ নেবার জন্য মেয়েটি উপস্থিত তপস্যা করছে এবং গঙ্গাতীরে মেয়েটিব আশ্রমে অশোকসুন্দরীকে আসতে আহ্বান জানায়। বিশ্বাস করে অশোকসুন্দরী আশ্রমে এলে দৈত্য নিজের রূপ ধরে বলাৎকার করতে চেষ্টা করে। অশোকসুন্দরী তখন শাপ দেন নহুষের হাতে তার মৃত্যু হবে এবং কৈলাসে পালিয়ে যান। হুণ্ড তখন তাঁর মন্ত্রী কম্পনকে আয়ুর স্ত্রী ইন্দুমতীকে চুরি করে আনতে এবং চুরি কবা সম্ভব না হলে গর্ভের শিশুকে হত্যা করতে নির্দেশ দেয় (পদ্ম-পুরা)। দ্রঃ-নহুষ।

অশোকা—জৈন গৃহদেবতা।

অশৌচ—নিকট আত্মীয়ের জন্ম বা মৃত্যুতে বা অন্য কারণে ধর্মীয় সাময়িক অপবিত্রতা। এই সময় ধর্মকার্য নিষিদ্ধ। আত্মীয়তার দূরত্ব অনুসারে, বর্ণভেদ অনুসারে অশৌচ-কাল এক মাস, দশদিন তিন দিন বা এক দিন। আমিষ ভক্ষণ ও ক্ষৌরকার্যও নিষিদ্ধ। অশৌচগ্রস্তের ছোঁয়া অন্ন গ্রহণীয় নয়, এমন কি তার দেহও অনেক স্থানে অস্পৃশ্য মনে করা হয়। পিতা মাতা বা স্বামীর মৃত্যুতে ছেলের ও স্ত্রীর এক বৎসরকাল পর্যন্ত কালাশৌচ। শরীরে রক্তপাত হলে একদিন এবং রজো কালে অশৌচ ৩/১২ দিন।

অশ্ব—যে পথ ব্যাপ্ত করে বা অধ্বানম্ অশ্নুতে। ইহার উৎপত্তি স্থান সাতটি ঃ—অমৃত (জল?), বাষ্প, বহ্নি, বেদ, অণ্ড, গর্ভ ও সাম। (২) জ্যোতিষে ধনুঃ রাশি। (৩) পুরুষদের চারিটি শ্রেণীর মধ্যে চতুর্থ শ্রেণী। (৪) এক জন দৈত্য ; পরে কলিঙ্গরাজ অশোক হয়ে জন্মান। (৫) বশ মুনির ছেলে; এক জন ঋষি (ঋক্)। (৬) কশ্যপ ও তাম্রার সন্তান অশ্ব এবং উষ্ট্র। বৈদিক সমাজে অশ্ব গৃহপালিত পশু। ক্রমশ অশ্ব জাতীয় সম্পদ হয়েও ওঠে। অযোধ্যার বর্ণনায়ও অশ্বের উল্লেখ আছে। কিন্তু রামায়ণ গ্রন্থে অশ্ব কেবল রথ টানে। মহাভারতের সমাজে অশ্ব ব্যাপক ব্যবহৃত হয়েছে।

অশ্বকৃত—বিবাহের পণ হিসাবে ঋচীক সংগৃহীত অশ্বের প্রস্রাবে যে নদী হয়েছিল।

অশ্বক্রান্তা—দ্রঃ আগম, অশ্বতীর্থ।

অশ্বগ্রীব—(১) কশ্যপ ও দনুর ছেলে ; বিষ্ণুদ্বেষী হয়গ্রীব অসুর। (২) বৃষ্ণি বংশে চিত্রকের ছেলে।

অশ্বঘোষ—খৃস্টীয় দ্বিতীয় শতকের লোক। সম্রাট কণিষ্কের সমসাময়িক ও সাকেতে জন্ম। মা সুবর্ণাক্ষী। পার্শ্ব বা পার্শ্বের শিষ্য পুণ্যযশাঃ ছিলেন অশ্বঘোষের গুরু। কথিত আছে ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম; ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও শাস্ত্রে পারঙ্গম হয়ে শেষে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন ও তথাগতের বাণী প্রচারের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন। প্রথমে সর্বাস্তিবাদী ছিলেন। মৈত্রী, করুণা ও বুদ্ধভক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত তাঁর মতবাদ মহাযান শাখার প্রথম সূত্রপাত। এক জন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ ও গীতিকার রূপেও বর্ণনা আছে এবং গানের মাধ্যমে ধর্ম প্রচার করতেন। অশ্বঘোষের কাব্য, নাটক, দর্শন গ্রন্থ ভারতীয় চিন্তাধারার মুকুটমণি। তাঁর গ্রন্থ বুদ্ধচরিত, সৌন্দরানন্দ, শারিপুত্র প্রকরণ, বজ্রসূচী, সূত্রালংকার, গণ্ডীস্তোত্রগাথা, মহাযান-শ্রদ্ধোৎপাদ।

অশ্বচক্র—জনৈক অসুর; শাম্বের হাতে নিহত (মহা ৩।১২০।১৩)।

অশ্বতীর্থ—কান্যকুব্জের তীর্থ। গঙ্গা ও কালিন্দী সঙ্গম, কনৌজ জিলাতে। ঋচীক এখানে বরুণের কাছে হাজার অশ্ব পান। (২) গৌহাটির কাছে কামাখ্যাতে অশ্বক্রান্ত পর্বত।

অশ্বত্থ—যা অল্পকাল (শ্বশ্ব) স্থায়ী নহে। অশ্বের কাণের ন্যায় যার পাতা সর্বদা সচল। সংসার বৃক্ষ (কঠোপ)। ব্রাহ্মণ্য ধর্মে এর বিশেষ স্থান। বিষ্ণুর স্বরূপ। ঋক্ বেদে যম ও অন্যান্য দেবতারা একটি গাছে বাস করেন। অথর্ব বেদে এই গাছটিকে অশ্বত্থ বলা হয়েছে। অশ্বত্থ অগ্নির আবাস স্থান। এই অশ্বত্থের নীচে বুদ্ধ নির্বাণ লাভ করেছিলেন। রতিরত হর-পার্বতীর কাছে দ্বিজ বেশী অগ্নিকে পাঠিয়ে দেবতারা বাধার সৃষ্টি করেন। ফলে পার্বতীর শাপে বিষ্ণু অশ্বত্থ রূপে, শিব বট রূপে এবং ব্রহ্মা পলাশ রূপে জন্ম গ্রহণ করেন। এই গাছ দর্শন, স্পর্শন ও সেবার দ্বারা মানুষ পাপমুক্ত হয়। আর এক মতে দেবতারা দানবদের হাতে নিপীড়িত হয়ে গাছে গিয়ে আশ্রয় নেন এবং বিষ্ণু অশ্বত্থ গাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আর এক মতে বিষ্ণু এই গাছে অলক্ষ্মীর বাসস্থান নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। কেবল শনিবার অলক্ষ্মীর ছোট বোন লক্ষ্মী এখানে আসেন। এই শনিবার এই গাছ বিশেষ ভাবে পূজনীয়, অন্য দিন অস্পৃশ্য।

অশ্বত্থ গাছের গোড়া বাঁধিয়ে দেওয়া, জল দেওয়া, অশ্বত্থ গাছের নীচে ধর্মকার্য করা এবং অশ্বত্থ গাছকে প্রণাম করা অশেষ পুণ্য দায়ক। অশ্বত্থ গাছের ডাল নষ্ট করলে নিদারুণ পাপ হয়। দ্রঃ- তুলসী। অশ্বত্থ গাছ প্রতিষ্ঠা এবং বট অশ্বত্থের বিয়ে দেওয়া আড়ম্বর বহুল ধর্মানুষ্ঠান। বৃক্ষ প্রতিষ্ঠায় সকল প্রাণীর জন্য এই বৃক্ষ উৎসর্গ করা হয়। পঞ্চবটী স্থাপনে বেদীর পূর্ব দিকে অশ্বত্থ রোপন করতে হয়। বৃহৎ পঞ্চবটীতে চার দিকে অশ্বত্থ গাছ থাকে। পূজায় পঞ্চপল্লবের মধ্যে অশ্বত্থ পল্লবও রয়েছে।

(২) অশ্বিনী নক্ষত্র যুক্ত কাল।

অশ্বত্থামা—পিতার নির্দেশে দ্রোণ শারদ্বত মুনি কন্যা কৃপীকে বিয়ে করেন। কৃপীর ছেলে জন্মেই উচ্চৈঃশ্রবার মত চিৎকার করেছিলেন (মহা ১।১২১।১৪)। দৈববাণীও হয়েছিল, ফলে এই নাম। চিরজীবী ও মহাবীর। পিতার কাছে অস্ত্রশিক্ষা, কুরু-পাণ্ডব রাজপুত্রদের সঙ্গে এক সঙ্গে শিখতেন। অর্জুন (দ্রঃ)। দ্রোণের কাছ থেকে নারায়ণ প্রদত্ত নারায়ণ অস্ত্র ও ব্রহ্মশির অস্ত্র পেয়েছিলেন। দ্বিতীয় বার পাশা খেলাতে ধৃতরাষ্ট্রকে নিষেধ করেছিলেন (মহা ২।৬৬।২৮)। পাণ্ডবদের বনবাস কালে দ্বারকায় গিয়ে কৃষ্ণের কাছে ব্রহ্মশির অস্ত্রের বদলে সুদর্শন চক্র চান, উদ্দেশ্য অজেয় হওয়া। কিন্তু সুদর্শন হাতে করে তুলতে না পেরে অপমানিত হয়ে ফিরে আসেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে অংশ নিয়েছিলেন। কুরুক্ষেত্রে কৌরবদের পক্ষে ছিলেন, বহু যোদ্ধা নিহত করেছিলেন। অর্জ্জুনকে একবার হারিয়ে দেন এবং অর্জ্জুনের কাছেও একবার হেরে যান। ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণকে হত্যা করার পর পাণ্ডবদের নিহত করার জন্য অশ্বত্থামা নারায়ণ অস্ত্র ছেড়েছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণের উপদেশে পাণ্ডবরা সকলে রথ অস্ত্র সব কিছু ফেলে অস্ত্রকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন, নারায়ণী অস্ত্র ফিরে যায় (মহা ৭।১৭০।-)। একটি মতে দ্রোণের মৃত্যুর পর কৃপ ও সাত্বতকে সঙ্গে নিয়ে রাত্রি বেলা পাণ্ডব শিবির আক্রমণ করে প্রহরী মহাদেবকে সন্তুষ্ট করে দিব্য তরবারি লাভ করে শিবিরে প্রবেশ করে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করেন। ভাণ্ডারকরে দুর্যোধনের ঊরুভঙ্গের পর পাণ্ডবদের হত্যা করবেন প্রতিশ্রুতি দিয়ে কৌরবদের সেনাপতি হন এবং কৃপাচার্য ও কৃতবর্মাকে নিয়ে রাত্রে লুকিয়ে পাণ্ডব শিবিরে আসেন এবং প্রহরী মহাদেবকে সন্তুষ্ট করে খড়্গ লাভ করে (মহা ১০।৭।১৪) শিবিরে ঢুকে ধৃষ্টদ্যুম্ন, উত্তমৌজা, যুধামন্যু, শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীর ছেলেগুলিকে ও বহু সৈন্য ও হাতী ঘোড়া ইত্যাদি ধ্বংস করেন। কৃষ্ণ সাত্যকি ও পাণ্ডবরা অন্যত্র ছিলেন বলে রক্ষা পেয়ে যান। পুত্র শোকে দ্রৌপদী অন্নত্যাগ করেন এবং ভীমকে বলেন অশ্বত্থামার মাথার সহজাত মণি না পেলে আর অন্ন গ্রহণ করবেন না। ভীম বার হয়ে যান ; সঙ্গে যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনও যান। গঙ্গাতীরে ব্যাস ও অন্যান্য ঋষিদের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে অশ্বত্থামা লুকিয়ে বসে ছিলেন। যুদ্ধ হয়। পাণ্ডবদের নিহত করবার জন্য অশ্বত্থামা ব্রহ্ম শির অস্ত্র নিক্ষেপ করেন ; অর্জ্জুনও বাধ্য হয়ে ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রয়োগ করেন। দুই ব্রহ্মশির অস্ত্রে প্রলয় হয়ে যাবে দেখে নারদ ও ব্যাসদেব (মহা ১০।১৭।১২) দুই অস্ত্রের মাঝে দাঁড়িয়ে অন্য মতে দু পক্ষের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা দু জনকে অস্ত্র সংবরণ করতে বলেন। ব্রহ্মচারী অর্জুন তাঁর অস্ত্র সংবরণ করতে পারেন ; কিন্তু সব

সময়ে সৎ পথে না থাকার জন্য অশ্বত্থামা অস্ত্র ফেরাতে পারেন না, এবং এই অস্ত্র উত্তরার গর্ভস্থ শিশুকে হত্যা করে। অস্ত্র সংবরণ করতে না পারার জন্য সর্ত হয় অশ্বত্থামাকে তাঁর মাথার মণি কেটে দিতে হবে। অজাত শিশুকে হত্যা করার জন্য কৃষ্ণ শাপ দেন তিন হাজার বছর এঁকে নিঃসঙ্গ ভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হবে। যোগবলে উত্তরার গর্ভস্থ শিশুকে কৃষ্ণ পরে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। এই ভাবে পরাজিত হয়ে মাথা থেকে মণি কেটে দিয়ে অশ্বত্থামা বনে চলে যান। ভীম এই মণি দ্রৌপদীকে দেন এবং দ্রৌপদীর অনুরোধে এই মণি যুধিষ্ঠির মাথায় ধারণ করেন। পাঁচ ছেলের রক্তের মূল্যে এই মণি যুধিষ্ঠিরের মাথায় একটা যেন প্রচণ্ড ব্যঙ্গ হিসাবে দ্রৌপদী দেখতে চেয়েছিলেন। দ্রঃ- বেদব্যাস।

(২) কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষে মালবরাজ ইন্দ্রবর্মার হাতী (মহা ৭।১৬৪।১০১) ; ভীমের হাতে মারা যায়। দ্রোণকে নিরস্ত্র ও যুদ্ধবিরত করার জন্য কৃষ্ণের কথায় পাণ্ডবরা অশ্বত্থামা হত হয়েছে বলে চিৎকার করে প্রচার করতে থাকেন। কথাটা শুনে দ্রোণ বিচলিত হয়ে পড়েন এবং যুধিষ্ঠিরের মুখ থেকে কথাটা শুনতে চান। সত্যসন্ধ যুধিষ্ঠির (দ্রঃ) বাধ্য হয়ে ঘোষণা করেন 'অশ্বত্থামা হত' এবং অনুচ্চ কণ্ঠে বলেন 'ইতি গজঃ'। যুধিষ্ঠিরের কথায় বিশ্বাস করে দ্রোণ ব্যাকুল হয়ে পড়েন এবং এই সুযোগে তাঁকে হত্যা করা হয়।

অশ্বনদী—কুন্তিভোজের দেশে একটি নদী ; চর্মণ্বতীতে এসে মিশেছে। চর্মণ্বতী পরে যমুনাতে ও যমুনা গঙ্গাতে এসে পড়েছে। এই অশ্বনদীতে কুন্তী কর্ণকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। মঞ্জুষা গঙ্গাতে সূত বিষয়ে চম্পাতে এসে উপস্থিত হয়েছিল (মহা ৩।২৯২।৭)।

অশ্বপতি—(১) মদ্রদেশের পরম ধার্মিক রাজা। ১৮ বছর যজ্ঞ করতে থাকেন এবং সাবিত্রী মন্ত্রে আহুতি দিতে থাকেন। ১৮ বৎসর পূর্ণ হলে অগ্নিহোত্র থেকে সাবিত্রী দেখা দিয়ে বলেন রাজার অভিলাষের কথা তিনি ব্রহ্মাকে জানিয়েছিলেন এবং ব্রহ্মার বিধানে রাজার শীঘ্রই একটি মেয়ে হবে (মহা ৩।২৭৭।১৮) ; বাকি কিছু বলা উচিত হবে না। ফলে জ্যেষ্ঠা স্ত্রী মালবীর একটি মেয়ে হয়। রাজা ও ব্রাহ্মণরা মিলে নাম রাখেন সাবিত্রী (দ্রঃ) (২) কেকয়-রাজ ; কৈকেয়ীর পিতা।

অশ্বমুখ—কিন্নর। কিম্পুরুষ।

অশ্বমেধ—একটি রাজকীয় যজ্ঞ। শ্রুতিতে আছে প্রজাপতি অশ্বমেধ যজ্ঞ সৃষ্টি করেন এবং প্রাচী হোতাদের, দক্ষিণ ব্রাহ্মণদের, প্রতীচী অধ্বর্যুদের ও উদীচি উদ্গাতাদের দান করেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ঐন্দ্র-মহাভিষেক বর্ণনায় কয়েক জন দিগ্বিজয়ী অশ্বমেধ যজ্ঞকারী নরপতির নাম আছে। বসন্ত বা গ্রীষ্মে এই যজ্ঞ করা হত। প্রারম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত এক বছর মত সময় লাগত। প্রাচীন ভারতে পুত্র-কামনায় বা রাজচক্রবর্তী হবার জন্যও রাজারা করতেন। ৯৯-টি যজ্ঞ করার পর সুলক্ষণ একটি ঘোড়া ছেড়ে দেওয়া হত। মেঘের মত কালো, মুখ সোনার মত, দু-পাশে অর্দ্ধচন্দ্র চিহ্ন, লেজ বিদ্যুৎ মত ঝলকে ওঠে, পেট অংশ

কুঁদ ফুল মত সাদা, পা সবুজ মত, কাণ সিঁদুর মত লাল, জিব আগুনের শিখা মত, চোখ সূর্যের মত, বেগবান ও সর্বাঙ্গসুন্দর ঘোড়া বেছে নেওয়া হত। ঘোড়ার কপালে জয়পত্র বেঁধে দিয়ে রাজা বা রাজ প্রতিনিধি সসৈন্যে এগিয়ে যেতেন। ঘোড়ার সঙ্গে এক শত জীর্ণ অশ্বও ছেড়ে দেওয়া হত। ঘোড়া যেখানে খুসি যেত বা ঘোড়াটিকে অন্য দেশের ওপর দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হত। কেউ কোন রকম বাধা দিলে যুদ্ধ হত। অর্থাৎ ঘোড়ার মালিকের প্রভুত্ব এই ভাবে সকলকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নেওয়া। এই ভাবে ঘোড়ার অধিকারী রাজচক্রবর্তী উপাধি লাভ করতেন। রাজারা বশ্যতা স্বীকার করে প্রয়োজন মত প্রচুর কর দিতেন। এক বছর পরে ঘোড়া ফিরিয়ে এনে শাস্ত্র অনুসারে যজ্ঞ করে ঘোড়াটিকে বলি দেওয়া হত। ঘোড়া ফিরে এলে পরের দিন অশ্বের অভিষেচন ও রাণীদের দ্বারা অশ্বের বিলেপন প্রসাধন শেষ হলে একটি গাছ ও অন্যান্য বধ্য পশুর সঙ্গে যজ্ঞীয় যূপে বলি দেওয়া হত। রাত্রে রাণীরা ঘোড়ার মৃত দেহের পাশে শুয়ে থাকতেন বা পাহারা দিতেন। ঘোড়ার বুকের মেদ অগ্নিদগ্ধ করে যজ্ঞে দীক্ষিত রাজা দগ্ধ বসার ধূম গ্রহণ করতেন। ঘোড়ার দেহের অন্যান্য অংশও খণ্ড খণ্ড করে কেটে দেবতাদের উদ্দেশ্যে আহুতি দিয়ে হোম করা এবং যজমানের অবভৃথ স্নান ও ঋত্বিকদের দক্ষিণা দিয়ে যজ্ঞ শেষ হত। নিমন্ত্রিত সমস্ত রাজাদের ও দেশে অন্যান্য লোকদের নানা উপহার দেওয়া হত। বৈদিক গ্রন্থগুলিতে অশ্বমেধের উচ্ছ্বসিত মহিমা দেওয়া রয়েছে। সমস্ত পাপক্ষয় (মহাপাতকতাও) এবং স্বর্গ ও মোক্ষলাভ এর ফল। শত অশ্বমেধ করলে ইন্দ্রত্ব লাভ হয়। এই জন্য সগর ও দিলীপের শততম অশ্বমেধের ঘোড়া ইন্দ্র চুরি করেছিলেন। রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠির দুজনেই এই যজ্ঞ করেছিলেন। ইন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করে বৃত্র বধের পাপ থেকে মুক্তি পান, ইল (দ্রঃ) পুরুষ হয়েছিলেন; মরুত্তও এই যজ্ঞ করেছিলেন (রা ৭।৮৪।-)।

দশরথ পুত্র কামনায় অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন স্থির করেন। পরে সুমন্ত্রের পরামর্শে ঋষ্যশৃঙ্গকে নিয়ে আসেন। ঋষ্যশৃঙ্গ পূর্বকৃত্য 'বিশিষ্ট অশ্বমেধ' এবং অশ্বমেধের শেষে সঙ্গে সঙ্গে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন এই যজ্ঞে ৬ বিল্ব, ৬ খদির, ৬-পলাশ, ১ বহেড়া শ্লেষ্মাত্মক ও ২-দেবদারু মোট ২১ টি যূপ স্থাপন করা হয় (রা ১।১৪।২৩)। পশু, উরগ, পক্ষী হয় এবং জলচর কচ্ছপ বলিদানার্থে যূপে বাঁধা ছিল, তিন শত পশু বলি দেওয়া হয়েছিল। কৌশল্যা তিনটি কৃপাণ দিয়ে অশ্বকে শসাস (রা ১।১৪।৩৫); তারপর এক রাত অশ্বের সঙ্গে অবস্থান করেন। পুরোহিতরা তারপর ক্ষত্রিয়া মহিষীদের দ্বারা, শূদ্রা/পরিবৃত্তি ও বৈশ্যা/বাবাতা মহিষীদের দ্বারা অশ্বকে স্পর্শ করান। ব্রহ্মার মত দশরথও প্রাচী হোতাদের, দক্ষিণ ব্রাহ্মণদের, প্রতীচী অধ্বর্যুদের ও উদীচী উদগাতাদের দান করেন। পুরোহিতরা অবশ্য দক্ষিণা গ্রহণ করেও ফিরিয়ে দিয়ে বদলে ধনরত্ন চেয়ে নেন।

' লঙ্কা জয়ের পর মহাদেব বলে দিয়েছিলেন রাম শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন। সীতাকে বর্জন করার পর রাম অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। যুধিষ্ঠিরও করেছিলেন। দ্রঃ- মুদ্রা।

অশ্বমেধ ধর্মীয় যজ্ঞ হলেও এটি রাজনীতিক ক্রিয়া। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে এটিকে উৎসন্ন যজ্ঞ বলা হয়েছে। উৎসন্ন কেন বলা হয়েছিল স্পষ্ট নয় তবে এই যজ্ঞের ব্যয়-বাহুল্য রাজাদের উৎসন্ন যাবার মতই ছিল। বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে বা অন্য কারণে ক্রমশ এই যজ্ঞ অপ্রচলিত হয়ে যায়। কলিযুগে এটি নিষিদ্ধ। শারদীয়া দুর্গাপূজাকে কলির অশ্বমেধ বলা হয়। ঐতিহাসিক যুগে পুষ্যমিত্র শুঙ্গ দুবার এবং গুপ্ত সাম্রাজ্যের সমুদ্রগুপ্ত একবার এই যজ্ঞ করেছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের উপাধি হয়েছিল চিরোৎসন্নাশ্বমেধাহর্তা।

অশ্বরথা—আর্ষ্টিসেনের (দ্রঃ) আশ্রমের কাছে একটি নদী। ঋদ্ধিমান নাগকে নিয়ে উড়ে যাবার সময় গরুড়ের পাখার ঝাপটায় এই নদীতে পঞ্চবর্ণ পুষ্প এসে পড়েছিল (মহা ৩।১৫৭।১৯)। দ্রঃ-ভীম।

অশ্বসেন- নাগ। তক্ষকের ছেলে। খাণ্ডবদাহনের (দ্রঃ) সময় কোন মতে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করেন। (মহা ১।২১৮।১১) অগ্নি, অর্জুন ও কৃষ্ণ অন্য মতে কেবল অর্জুন অশ্বসেনকে অভিশাপ দিয়েছিলেন যে সে অপ্রতিষ্ঠ হয়ে থাকবে। কুরুক্ষেত্রে কর্ণের সঙ্গে অর্জুনের শেষ যুদ্ধের সময় প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছায় অজ্ঞাতে সর্পবাণ রূপে কর্ণের তূণে প্রবেশ করেন। কর্ণ এই বাণ নিক্ষেপ করলে কৃষ্ণ বুঝতে পারেন এবং পায়ের চাপে রথকে এক হাত মাটিতে বসিয়ে দিলে এই বাণ অর্জুনের স্বর্ণ কিরীট দগ্ধ করে যায়। অশ্বসেন বিফল হয়ে কর্ণের কাছে ফিরে এসে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে আবার বাণরূপে নিক্ষিপ্ত হতে চান। কর্ণ এক বাণ দুবার ছুঁড়তে ও অন্যের সাহায্যে জয়লাভ করতে রাজি হন না। ফলে অশ্বসেন সরাসরি অর্জুনকে আক্রমণ করতে যান এবং অর্জুনের হাতে নিহত হন (মহা ৮।৬৬'২৪)। (২) দ্রোণের সারথি।

অশ্বহৃদয়—নল (দ্রঃ) এই মন্ত্র বিদ্যা ঋতুপর্ণ রাজাকে দিয়েছিলেন। এই মন্ত্রে অশ্ব সম্বন্ধে সব দিক থেকে বিশেষ জ্ঞানী হয়ে ওঠা যায়। কোন্ অশ্ব কত সময়ে কত যোজন পথ অতিক্রম করছে তাও বলা সম্ভব। দময়ন্তীর পুনর্মিলনের পর রাজা ঋতুপর্ণ যখন ফিরে যাচ্ছিলেন নল (দ্রঃ) তখন প্রতিশ্রুতি অনুসারে অশ্বহৃদয় মন্ত্র ঋতুপর্ণকে শিখিয়ে দেন।

অশ্বিদ্বয়—অশ্বিনীকুমার। সূক্তসংখ্যার দিক থেকে হিসাব করলে ঋক্‌বেদে ইন্দ্র-অগ্নি ও সোম এদের পরেই স্থান। ৫০-এর অধিক সূক্ত প্রধানত এঁদের দুজনের জন্য। এঁরা দ্যুস্থানের (=স্বর্গের) দেবতাদের মধ্যে পরিগণিত।

ঋক্‌বেদে (১০।১৭।১-২) ত্বষ্টা কন্যা সরণ্যু। বিয়ের পর সরণ্যু অদৃশ্য হয়ে যান এবং তুল্যরূপ আর একটি স্ত্রী সূর্যকে দেওয়া হয়। অর্থাৎ বেদের সরণ্যু (দুটি যমজ সন্তান হয়েছিল) ও পুরাণে সংজ্ঞা বা সাবিত্রী অভিন্না। বৃহৎ-দেবতাতে সরণ্যু ছায়াকে রেখে পালান। কিন্তু সূর্য অশ্বরূপিণী স্ত্রীকে চিনতে পেরে অশ্বরূপে পেছু নেন। এবং স্বাভাবিক ভাবেই সূর্য মিলিত হতে যান কিন্তু তয়োঃ বেগেন বীর্য মাটিতে পড়ে যায়। গর্ভ কামনায় অশ্বা এই বীর্য ধারণ করে নাসত্য ও দস্র দুই পুত্রের জন্ম দেন।

কৃষ্ণযজুর্বেদে (৭।২।৭) এঁরা দেবতাদের অনুজ ও অন্ত্যজ/অবর; কিন্তু তবু এঁদের আগে প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে। যাস্ক বলেছেন কেউ এঁদের দ্যাবা পৃথিবী, কেউ

দিন রাত, কেউবা চন্দ্র সূর্য মনে করেন। যাস্কের মতে দ্যুস্থান দেবতাদের মধ্যে এ'রা মুখ্য : বিশ্বকে এ'রা ব্যাপ্ত (অশ্-ধাতু) করেন ; এক জন রসের দ্বারা আর এক জন জ্যোতির দ্বারা। যাস্কের মতে এ'রা ইন্দ্র ও সূর্য। ঔর্ণবাভ আচার্যের মতে এ'রা অশ্বযুক্ত বলে অশ্বী। বৃহৎ দেবতাতে এ'রা সূর্যের গণদেবতাদের মধ্যে মুখ্য এবং এক জন নাসত্য আর এক জন দস্র। মহাভারতেও (অনু ১৫০।১৭) এক জন নাসত্য আর এক জন দস্র। ঐতিহাসিক মতে দু জন পুণ্যবান রাজা (নিরু ১২।১।৪)।

বিভিন্ন মতে এ'রা (১) আকাশ ও পৃথিবী ; (২) দিন ও রাত ; (৩) সূর্য ও চন্দ্র ; (৪) বিবস্বান ও সরণ্যুর যমজ পুত্র ; (৫) আকাশের পুত্র (৬) সিন্ধুগর্ভজাত ; (৭) দক্ষসম্ভূত; (৮) সূর্যের সন্তান ও জামাতা।

এদের রঙ শুভ্র উজ্জ্বল। কল্যাণের অধিপতি (ঋক্ ১০।৯৩।৬) ; শরীর হিরণ্ময় ; এ'দের রথও সূর্যের মত উজ্জ্বল (ঋক্ ৮।৮।২), রথ হিরণ্ময়, বল্গা হিরণ্ময় ; রথে পক্ষযুক্ত সপ্তাশ্ব। কখনো রথের বাহক গর্দভ (ঋক্ ১।৩৪।৯)। এই রথে করে এ'রা ক্ষণকালের মধ্যে ত্রিলোক পরিভ্রমণ করেন। আবার আছে সুবর্ণময় রথে দিনে তিনবার ও রাতে তিনবার জগৎ-পরিক্রমণ করেন। এ'রা যুবা, পুরাতন, মধ্যবর্ণ, জ্যোতির অধীশ্বর, পদ্মমালা বিভূষিত, বলশালী, ভয়ানক কৌশলী, জ্ঞানী, অহঙ্কারের ধ্বংস-কারক। বহু যজ্ঞে এ'দের ডাকা হত।

এ'রা প্রত্যূষে উষার আগে জগতে আলোক নিয়ে প্রকাশ করে উষাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যান। এ'দের আবির্ভাব কাল অর্দ্ধরাত্রের পর এবং পূর্ণ প্রকাশের ব্যাঘাত পর্যন্ত (নিরু ১২।১)। অর্থাৎ প্রাতঃকালীন দেবতা। উষালগ্ন এ'দের আবির্ভাব কাল। কৃষ্ণবর্ণা গাভীগুলি (অন্ধকার) যখন লোহিতবর্ণ ঋভীদের (সূর্যোদয়ের রক্তিমা) সঙ্গে মিশে যায় তখন দ্যুলোকের এই পুত্রদ্বয়কে আহ্বান করা হয়। কৃষ্ণ যদ্ গোষু অরুণীষু সীদৎ দিবো নপতোশ্বিনা হুবে বাং (ঋক্ ১০।৬১।৪)। ১।৪৬।২ ঋকে এ'রা সিন্ধুমাতরা অর্থাৎ সিন্ধুর সন্তান। অশ্বিদ্বয়ের রথের উদয় হলে উষা আবির্ভূতা হন। প্রভাতে অশ্বগণ অশ্বিদ্বয়কে সোমপানের জন্য যজ্ঞ স্থানে নিয়ে আসে ; উষর্বুধঃ বহন্তু সোমপীতয়ে (ঋক্ ১।৯২।১৮)। কৃষ্ণ যজুর্বেদেও (৫।৫।৩।১)।

অস্য সোমস্য পীতয়ে প্রাতঃসবনে এ'দের ডাকা হয়। যজ্ঞের বেদি এ'দের বাসস্থান (ঋক্ ৫।৭৬।৪)। আবার আছে বাসাত্যঃ অন্য উচ্যতে, উষঃ পুত্রঃ অন্য ইতি (নিরু ১২।২।৪)। অর্থাৎ বাসাতি (রাত্রি) পুত্র, মতান্তরে উষা পুত্র। এ'রা ঋতাবৃধ বা যজ্ঞের বর্দ্ধয়িতা ; এর' বৃষ্টি দেন ; নদী সমূহ ও ঔষধিকে পুষ্টি দেন। এ'রা সোমপায়ী এবং ইন্দ্রের সঙ্গে মিলে নমুচির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন (ঋক্ ১০।১৩১।৪-৫)। এ'রা অতি সোমপায়ী মধুপাতমা নরা (৮।২২।১৭)।

এ'রা দেববৈদ্য হিসাবে শয়ু ঋষির বন্ধ্যা গাভীকে দুগ্ধবতী করেছিলেন। কূপে নিক্ষিপ্ত পাশবদ্ধ রেভ ও বন্দনকে জল থেকে উদ্ধার করেছিলেন। কূপে নিক্ষিপ্ত কণ্বকে ও অন্তককে উদ্ধার করেছিলেন। ভুজ্যু, কর্কন্ধু ও বয্যকে রক্ষা করেছিলেন। পৃশ্নি, পুরুকুৎস, কুৎস, শ্রুতর্য ও নর্যকে রক্ষা করেছিলেন। পঙ্গু পরাবৃজ ও শ্রোণকে চলতে

সমর্থ করেছিলেন। ঋজ্রাশ্বকে দৃষ্টি দান করেছিলেন। শ্যাবকে কুষ্ঠ রোগ মুক্ত, অন্ধ কণ্বকে চক্ষুদান ও নৃষদ্ পুত্রকে শ্রবণশক্তি দান করেছিলেন। ঋষি খেলের ছিন্ন-পদ পত্নী বিশ্‌পলাকে লৌহ জঙ্ঘা (ঋক্ ১।১১৬।১৫) তৈরি করে পরিয়ে দিয়েছিলেন। অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত অত্রির গাত্রদাহকে সুখকর করে তুলেছিলেন। কক্ষীবানকে বুদ্ধি এবং দধীচিকে অশ্বমুণ্ড দিয়েছিলেন। কৃষ্ণপুত্র বিশ্বকায় ঋষির বিষ্ণাপু নামে মৃত পুত্রকে জীবিত করে দেন। বিনষ্ট অবয়ব রেভ ঋষির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তৈরি করে দেন। বন্দন ঋষিকে দীর্ঘায়ু দেন। বধ্রিমতীকে স্বামী নপুংসক থাকা সত্ত্বেও হিরণ্যহস্ত নামে পুত্র দিয়েছিলেন এবং প্রসববেদনা থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। কক্ষীবান কন্যা ঘোষা; পিতৃগৃহে জরৎকুমারী ও কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ছিলেন; এঁদের প্রসাদে মুক্তি পান। মহাভারতে উপমন্যুকে দৃষ্টিশক্তি দান করেন। পুরুমিত্রযোষা কমদ্যুকে রথে করে যুবা বিমদের কাছে নিয়ে যান। চ্যবনকে (দ্রঃ) যুবক করে দিয়েছিলেন (দ্রঃ সুকন্যা); ফলে চ্যবন যজ্ঞ ভাগের ব্যবস্থা করে দেন।

অশ্বিনীকুমাররা বিশ্বক অসুর ও তাঁর বংশ নষ্ট করেছিলেন।

পরবর্তী যুগে এঁদের চিরযুবক ও অদ্ভুত চিকিৎসক বলা হয়েছে। একটি মানবিক, একটি ঐতিহাসিক ও একটি দেবতা মত উপাদান মিলে অশ্বিদ্বয়ের কল্পনা। মানবিক অর্থে অসাধারণ চিকিৎসা ক্ষমতা এবং দেবতা মত অর্থে আলোকের রোগ নিরাময় ক্ষমতা মিলে এই অশ্বিদ্বয়।

কৃষ্ণযজুর্বেদে এঁরা দেবতাদের অনুজাবর কিন্তু তবু যজ্ঞে এদের আগে গ্রহণ করতে হবে। মহাভারতে চ্যবন ঋষি ইন্দ্রকে দমন করে এঁদের যজ্ঞ ভাগ দেন। স্কন্ধ পুরাণেও ইন্দ্র পবনকে বোঝাতে চেয়েছিলেন এঁরা বৈদ্য, যজ্ঞভাগের অধিকারী নন; মহাভারতের অনুরূপ কাহিনী। মহাভারতে চ্যবন যজ্ঞাগ্নি থেকে মদাসুর সৃষ্টি করেছিলেন; স্কন্দ পুরাণে চ্যবনের আরাধিত শিবলিঙ্গ থেকে জ্বালা বার হয়ে সকলকে দগ্ধ করতে থাকে এবং ইন্দ্র তখন সোমপায়ী বলে স্বীকার করে নেন। মহাভারতে (শান্তি ২০৮।২৪) 'অশ্বিনৌ শূদ্রৌ তপসি উগ্রে অবস্থিতৌ' বলা হয়েছে। দ্রঃ-ত্বষ্টা।

সূর্যকন্যা সূর্য্যার সঙ্গে (ঋক্ ১০।৮৫।৮) এঁদের দু জনের বিয়ে হয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (১৬।৭) আছে সোমের সঙ্গে বিয়ে দেবার ইচ্ছা করেছিলেন সূর্য। দেবতারা তখন কৃষ্ণাজিং ধাবামঃ যঃ উৎ-জেষ্যাতি। অশ্বিনীকুমাররা জয় লাভ করেন। প্রজাপতি তখন নিজের কন্যা সোমকে প্রদান করেন।

ত্বষ্টা কন্যা সংজ্ঞা স্বামী সূর্যের তেজ সহ্য করতে না পেরে ছায়াকে সূর্যের কাছে রেখে পালিয়ে যান। যমের (দ্রঃ) কাছে ঘটনাটা জানতে পেরে সূর্য ত্বষ্টার কাছে আসেন। ত্বষ্টা ভ্রমি যন্ত্রে বসিয়ে সূর্যের তেজ কমিয়ে দেন। সংজ্ঞা এই সময় মরুপ্রদেশে বড়বা রূপে তপস্যা/বিচরণ করছিলেন। সংজ্ঞা কোথায় আছে ধ্যানে জানতে পেরে সূর্যও অশ্বরূপে এখানে আসেন। অশ্বিনীর অশ্বিন ও রেবন্ত দুটি যমজ ছেলে হয়। অশ্বিদ্বয়ের অংশে মৈন্দ ও দ্বিবিদ জন্মায় (দ্রঃ বানর পরিচয়)।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে (১০৬-১০৮) ত্বষ্টার বদলে বিশ্বকর্মা এবং মেরুপ্রদেশের বদলে

উত্তর কুরু দেখা যায়। খিল হরিবংশে নাসত্য ও দস্র দুজনার দুটি নাম। স্কন্দপুরাণে আবন্ত্যখণ্ডে অশ্বমুখ বিশিষ্ট নাসত্য ও দস্র জন্মান এবং বীর্যের শেষ অংশ থেকে খড়্গচর্মধারী অশ্বারূঢ়; বাণধনুর্ধর রেবন্ত জন্মান। বিষ্ণু পুরাণে বিশ্বকর্মার মেয়ে সংজ্ঞা এবং অশ্বিদ্বয়ের জন্মের পর বিশ্বকর্মা সূর্যের তেজ শাতন করেন। বিষ্ণু পুরাণে সংজ্ঞা তপসি স্থিতাম্—তপস্যা করছিলেন এবং এখানেও ঐ ভাবে রেবন্তেরও জন্ম হয়। স্কন্দপুরাণে সংজ্ঞা পালিয়ে এসে বিশ্বকর্মা গৃহে সহস্র বৎসর বাস করেন এবং বিশ্বকর্মা স্বামীগৃহে ফিরে যেতে বললে উত্তরকুরুতে বড়বা রূপে তপস্যা করতে থাকেন ; এবং বিশ্বকর্মা সূর্যের তেজ শাতন করার পর সূর্য এসেছিলেন। এখানেও সন্তান অশ্ববক্ত্র। স্কন্দপুরাণে রেবাখণ্ডে-ত্বষ্টার মেয়ে সাবিত্রী ; সূর্যের স্ত্রী ; বড়বা রূপে বিচরণ করছিলেন ; সূর্য অশ্বরূপে আসেন। সাবিত্রী সূর্যের ঘ্রাণ গ্রহণ করে গর্ভবতী হন। সন্তান হয় সুনুম্নাঙ্গৌ ভিষজৌ তৌ দিবৌকসাম্।

অশ্বিনীকুমারদের সন্তান গুহ্যকরা, সর্বৌষধী ও পশুরা (মহা ১।৬০।৩৯)।

দ্রৌপদীর বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন। খাণ্ডবদাহনে অর্জুনের পক্ষে ছিলেন। যুবনাশ্বের গর্ভ থেকে শল্য প্রয়োগে মান্ধাতাকে বার করে এনেছিলেন। ইন্দ্র এঁদের সোম পান করতে দিতেন না কিন্তু চ্যবনের (দ্রঃ) চেষ্টায় দিতে বাধ্য হন। আশ্বিন মাসে এঁদের নামে ঘি দান করলে সুন্দর দেহ হয়। দীর্ঘতমসের পুত্র দীর্ঘশ্রবস এঁদের কাছে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করে বৃষ্টি পেয়েছিলেন (ঋক্)। বনের মধ্যে হারিয়ে গিয়ে তৃষ্ণায় গোতম এঁদের দু জনকে স্মরণ করলে এঁরা কূপ কেটে জলের ব্যবস্থা করে দেন। দধীচির (দ্রঃ) কাছে মধুবিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন। এঁদের বাহন গাধা ; এই গাধা একবার নেকড়ে বাঘ সেজে বৃষাগীর ছেলে ঋজ্রাশ্বের কাছে যায়। ঋজ্রাশ্ব স্থানীয় জনগণের একশত ছাগল এনে একে খেতে দেন। এই কারণে বৃষাগীঃ ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দিয়ে ছেলেকে অন্ধ করে দেন। অশ্বিনী-কুমারদের কাছে প্রার্থনা করলে এঁরা আবার চোখ ফিরে পান।

সূর্যের দুটি ছেলে নাসত্য (দ্রঃ) ও দস্র ; অপর নাম অশ্বিনীদেব। বিশ্বকর্মার মেয়ে সংজ্ঞা স্বামীর তেজ সহ্য করতে না পেরে উত্তরকুরুবর্ষে ঘোটকী বেশে বেড়াতে/তপস্যা করতে থাকেন। সংজ্ঞা নাই ঘটনাটা জানতে পেরে ধ্যানে সংজ্ঞা কোথায় আছেন সূর্য নির্ধারণ করে ঘোটক বেশে যেখানে যান। অশ্বিনীর (=সংজ্ঞার) গর্ভে সূর্যের আশ্বিন ও রেবন্ত দুটি যমজ ছেলে হয়। এঁরাই স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমার। অন্য মতে অশ্বিনীকুমার ও রেবন্ত তিনটি ছেলে হয়।

পরম সুন্দর আশ্বিন ও রেবন্ত এক রকম দেখতে ; এক সঙ্গে থাকতেন এবং চিকিৎসা বিদ্যায় অদ্বিতীয় ছিলেন। এঁদের কয়েকটি বিশেষণঃ—যুবানা, বভ্রু, হিরণ্যপেশসা, মায়াবিনা, হিরণ্যবর্তনী, রুদ্রবর্তনী। ঋক্‌বেদে এঁদের রথ হিরণ্ময় ; এই রথের ঈষা ও অক্ষ হিরণ্ময়। এই রথ ত্রিচক্র, ত্রিবন্ধুর, এবং এর পবিসংখ্যাও তিন। এই রথের গতি অতি দ্রুত রঘুবর্তনি ; এবং সহস্র আভরণ ও সহস্র কেতুতে ভূষিত—সহস্রকেতু, সহস্রনির্ণিজ। রথের বাহন কখনো রাসভ, কখনো বিহঙ্গ কখনো

শ্যেন বা হংস সদৃশ ক্ষিপ্র অশ্ব। মাদ্রীর (দ্রঃ) গর্ভে এঁদের ঔরসে দুটি ছেলে হয় নকুল ও সহদেব। এঁদের প্রণীত গ্রন্থ 'চিকিৎসা সারতন্ত্র'। দ্রঃ- অশ্বিনীসুত।

অশ্বিনী—(১) সূর্যের স্ত্রী সংজ্ঞা। (২) স্বর্গে অপ্সরা। (৩) নক্ষত্র বিশেষ (হেড অব এরিজ; আরিয়েটিস্ বিটা বা গামা)। ঘোড়ার মাথার মত দেখতে বলে এই নাম। (৪) দক্ষ প্রজাপতির মেয়ে ও চন্দ্রের স্ত্রী। চন্দ্রের ২৭টি স্ত্রীর মধ্যে প্রথমা। চন্দ্র মণ্ডলের সাতাশটি নক্ষত্রের মধ্যে ঘোড়ার মুখ আকৃতি তিনটি তারা। নবপাদাত্মক মেষ রাশির প্রথম চতুষ্পাদ। যে মাসে পূর্ণিমাতে চন্দ্র এই নক্ষত্রে গমন করেন; এটি আশ্বিন মাস।

অশ্বিনীকুমার—অশ্বিদ্বয় (দ্রঃ)।

অশ্বিনীসুত—সুতপস্ মুনির স্ত্রী তীর্থে গেলে সূর্য এঁকে দেখে মুগ্ধ হয়ে জোর করে নিয়ে চলে যান এবং অশ্বিনীসুত নামে একটি ছেলে হয়। তীর্থ থেকে সন্তান নিয়ে ফিরে এলে মুনি সব জানতে পারেন এবং এঁদের তাড়িয়ে দেন। সূর্য এই ছেলেকে জ্যোতিষ ইত্যাদি শিক্ষা দিয়েছিলেন। সুতপস্ মুনি শাপ দিয়েছিলেন রুগ্ন হয়ে পড়বে কিন্তু পরে করুণা করে বলেন সূর্যপূজা করলে নীরোগ হবেন (ব্রহ্মবৈবর্ত)।

অশ্বিনোঃ তীর্থ—কোটি তীর্থ থেকে এখানে আসতে হয় (মহা ৩.৮১।১৪)। এখানে এলে মানুষ রূপবান হয়। এখান থেকে বরাহতীর্থে যাওয়া যায়।

অশ্মক—(১) সূর্যবংশের এক রাজা। কল্মাষপাদের (দ্রঃ) স্ত্রী মদয়ন্তীর ছেলে। ক্ষেত্রজ পুত্র। বশিষ্ঠের কাছে গর্ভধারণ করেন কিন্তু সন্তান হচ্ছে না দেখে দ্বাদশ বর্ষে অশ্ম দিয়ে নিজের কুক্ষি ভেদ করেন; এই ছেলের নাম রাখা হয় অশ্মক (মহা ১।১৬৮।২৫)। (২) জনৈক ঋষি।

অশ্মক—অস্মক, অশ্বক (মহাভারত) অলক, অস্সক। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে দাক্ষিণাত্যে একটি দেশ। কূর্মপুরাণে পাঞ্জাবের কোন অংশ। বৃহৎসংহিতায় উ-পশ্চিম ভারতে কোন দেশ। অউজোগ্নামিস্=সূমি (টলেমি); সরস্বতী নদী থেকে পূর্বদিকে একটু দূরে এবং সমুদ্র থেকে ২৫ মাইল মত; যেন প্রাচীন অশ্মক। অন্য মতে বৌদ্ধযুগের অস্সক=অশ্মক (বৌদ্ধযুগেও) অবন্তির অব্যবহিত উ-পশ্চিমে অবস্থিত। বুদ্ধের সময় গোদাবরী তীরে অস্সক দেশীয় লোকেরা বাস করত; এখানে প্রধান সহর ছিল পোতন। প্রতিষ্ঠান (দ্রঃ)। সুত্তনিপাত ও পারায়নবগ্‌গ অনুসারে গোদাবরী ও নর্মদা তীরে মাহিষ্মতীর মধ্যে কোন স্থানে অবস্থিত; রাজধানী প্রতিষ্ঠান। একে অলকা ও মূলকাও বলা হয়েছে। আবার বৌদ্ধগ্রন্থে অশ্মক ও মূলক পাশাপাশি দেশ বলা হয়েছে; মাঝখানে গোদাবরী নদী। পুরাণে অশ্মকের ছেলে মূলক। মহাভারতের প্রতিষ্ঠান; বৌদ্ধ পোতালি বা পোতন অশ্মকের রাজধানী। অশোকের সময় মহারাষ্ট্রের অংশ ছিল। খৃ. ৬-শতকে দশকুমার চরিতে দণ্ডী একে বিদর্ভের আশ্রিত বলেছেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের টীকাকার ভট্টস্বামী একে মহারাষ্ট্র বলেছেন। মহাভারতে অশ্বক নামেও অভিহিত। অশ্মকের এক রাজার নামও অশ্মক ছিল; ইনি পাণ্ডব পক্ষে ছিলেন।

অশ্মকী—শর্মিষ্ঠার ছেলে পুরু, স্ত্রী কৌশল্যা, ছেলে জন্মেজয়। জন্মেজয়ের স্ত্রী অনন্তা

বা মাধবী, ছেলে প্রাচীম্বা, অর্থাৎ সমস্ত প্রাচী জয় করেছিলেন। প্রাচীম্বার স্ত্রী অশ্মকী; ছেলে সঞ্জাতি।

অশ্মণ্বতী—অক্সাস্ (ঋক্)।

অশ্মযুগ—তিন ভাগ—আদি, মধ্য ও অন্ত্য। পাঞ্জাব, গুজরাট, রাজস্থান, মধ্যভারত ও দাক্ষিণাত্য ইত্যাদিতে আদি অশ্ম যুগের আয়ুধ পাওয়া গেছে। এগুলি অধিকাংশই অশ্মপিণ্ড থেকে এবং কিছু কিছু অশ্মশল্ক থেকে তৈরি। সোহান নদীর তীরে এক-মুখ আয়ুধের প্রাচুর্য দেখা যায়। কাংড়া জেলায় বাণগঙ্গা নদীর উপত্যকাতেও এই জাতীয় অস্ত্র পাওয়া গেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে এই জাতীয় আয়ুধের ধারা পূর্ব ও দ-পূ এশিয়া থেকে আগত। মাদ্রাজ অঞ্চলে দ্বিমুখ আয়ুধও পাওয়া গেছে; এগুলি অশ্মপিণ্ড থেকে তৈরি। এই জাতীয় আয়ুধের সঙ্গে ইউরোপ ও আফ্রিকার আবেভিলীয় অ্যাশিউলীয় আয়ুধের মিল আছে। হিমালয়ের পাদদেশ ব্যতীত সর্বত্রই দ্বিমুখ অস্ত্রের প্রাধান্য।

মধ্য অশ্মযুগে অস্ত্র ছোট। অধিকাংশই এগুলি কর্নেলিয়ান, জাসপার, এগেট ও চার্ট ইত্যাদি পাথর থেকে। এগুলির বহুবিধ আকৃতি। অন্ত্য অশ্মক যুগে অস্ত্রগুলি মধ্য যুগীয় অস্ত্র থেকে আকারে কেবল ছোট; আর সব দিক থেকে একই রকমের। বর্দ্ধমান জেলার বীরভানপুরে এই রকম অস্ত্র পাওয়া গেছে। গুজরাট ও অন্ধ্রপ্রদেশে অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের ক্ষুদ্রাশ্মীয় অস্ত্র পাওয়া গেছে। অশ্মযুগের পর নবাশ্মযুগ। দ্রঃ- অস্ত্র, আয়ুধ।

অশ্মোপাখ্যান—অশ্মগীতা। মহাপণ্ডিত অশ্মন জনককে মানুষের ভাগ্যোদয় ও ভাগ্যহানি ভিত্তিক যে তত্ত্বজ্ঞান দিয়েছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর ব্যাস যুধিষ্ঠিরকে এই তত্ত্বকথাই আবার শোনান।

অশ্লেষা—নবম নক্ষত্র। চক্রাকৃতি। ৬-টি নক্ষত্র গঠিত।

অষ্টউপায়—মুক্তির উপায়। যজ্ঞ, দান, বেদপাঠ, তপস্যা, দম, সত্য, ঋজুতা ও মৃদুতা।

অষ্টক—(১) যযাতির মেয়ে মাধবীর গর্ভে বিশ্বামিত্রের ছেলে। এক জন রাজর্ষি। স্বর্গ থেকে যযাতির পতনের সময় এক জায়গায় এই অষ্টক ও এঁর তিন ভাই (দ্রঃ- মাধবী) প্রতর্দন, বসুমান ও ঔশীনর-শিবির সঙ্গে দেখা হয়। যযাতির পরিচয় পেয়ে অষ্টক নিজের পুণ্য দিয়ে অন্তরীক্ষ বা দিব্যের যে কোন স্থান যযাতিকে দিতে চাইলেন। অন্য তিন ভাইও অনুরূপ স্থান দিতে চান। কিন্তু এঁদের পুণ্যে যযাতি একা স্বর্গে ফিরে যেতে রাজি হন না। শেষ পর্যন্ত এঁরা ৫-জনে এক সঙ্গে স্বর্গে যান।

একবার অষ্টক অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। যজ্ঞের পর প্রতর্দন ইত্যাদি তিন ভাইকে নিয়ে আকাশে বিচরণ করতে করতে নারদের সঙ্গে দেখা হয়। নারদের কাছে অষ্টক জানতে চান তাঁদের এই পাঁচজনের মধ্যে কে কত বেশি পাপী। নারদ জানান অষ্টক সব চেয়ে পাপী; পাঁচজনে স্বর্গে যেতে গেলে যদি কাউকে বাদ যেতে হয় তাহলে অষ্টক আগে বাদ যাবেন। কারণ অষ্টক এক বার ব্রাহ্মণদের গরুদান করে গর্ব করে সেই কথা বলেছিলেন: মনে গর্ব ছিল। তারপর বাদ যাবেন প্রতর্দন;

কারণ এক বার রথে করে যাবার সময় চার জন ব্রাহ্মণ এসে তাঁকে ঘোড়া চাইলে প্রতর্দন রথ থেকে ঘোড়া খুলে দিয়ে নিজেই রথ টানতে থাকেন ; কিন্তু দান করলেও গালিও দিয়েছিলেন। এর পর বাদ দিতে হলে বসুমনা বাদ যাবেন। কারণ বসুমনা নিজের রথ সম্বন্ধে অত্যন্ত গর্বিত। এর পরেও যদি কাউকে বাদ দিতে হয় অর্থাৎ এক জন মাত্র যদি স্বর্গে যাবার অধিকার পান তাহলে নারদ নিজেও বাদ যাবেন। কারণ শিবির তুলনায় নারদের পুণ্যও তুচ্ছ। হরিবংশে (১।২৭।৫৭) বিশ্বামিত্র ও দৃষদ্বতী সুত। অষ্টকের ছেলে লৌহি।

(২) দুষ্যন্ত (১)—ভরত (২)—অজমীঢ় (৫)—অষ্টক (৬)। (৩) পাণিনির আটটি সূত্র।

অষ্টকা—যে তিথিতে পিতৃগণ শ্রাদ্ধ ভক্ষণ করেন। গৌণচান্দ্র পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুনের কৃষ্ণাষ্টমী তিথি। অন্য মতে হেমন্ত ও শিশিরের চারটি কৃষ্ণাষ্টমী।

অষ্টকাত্রয়—পৌষ কৃষ্ণাষ্টমী পূপাষ্টকা মাঘ কৃষ্ণাষ্টমী মাংসাষ্টকা এবং ফাল্গুন কৃষ্ণাষ্টমী শাকাষ্টকা। এই তিথিতে যথাক্রমে অপূপ, মাংস ও শাক দিয়ে শ্রাদ্ধ বিধেয় (বায়ু-পু)।

অষ্টগন্ধ—চন্দন, গুগ্‌গুল, কুঙ্কুম, অগুরু, গোরচনা, জটামাংসী ইত্যাদি।

অষ্টগুণ—দয়া, ক্ষান্তি, অনসূয়া, শৌচ, অনায়াস, মঙ্গল, অকার্পণ্য ও অস্পৃহা।

অষ্টতারিণী—তারা, উগ্রা, মহোগ্রা, বজ্রা, কালী, শাশ্বতী, যামেশ্বরী, চামুণ্ডা—ভগবতীর এই আটমূর্তি।

অষ্টদল—অষ্ট পত্রক যন্ত্র। ষট্ চক্রের অন্তর্গত দ্বিতীয় চক্র। স্বাধিষ্ঠান পদ্ম। দ্রঃ-ষটচক্র।

অষ্টদিক্‌গজ—দ্রঃ-দিক গজ।

অষ্টদিকপাল—আট দিগের অধীশ্বর। পূর্বে ইন্দ্র, অগ্নিকোণে অগ্নি, দক্ষিণে যম, নৈঋর্তে নিঋর্তি, পশ্চিমে বরুণ, বায়ুকোণে মরুৎ, উত্তরে কুবের, ঈশানকোণে ঈশ। দ্রঃ-অমরাবতী।

অষ্টদ্রব্য—অশ্বত্থ, উদুম্বর, প্লক্ষ, ন্যগ্রোধ—এদের কাঠ এবং তিল, সিদ্ধার্থ, পায়স ও আজ্য। এই আটটি হোমের জিনিস।

অষ্টধর্ম—সত্য, শৌচ, অহিংসা, অনসূয়া, ক্ষমা, অনৃশংসতা, অকার্পণ্য ও সন্তোষ। দ্রঃ-অষ্টগুণ।

অষ্টধাতু—সোনা, রূপা, তামা, রাঙ (বঙ্গ), যশদ (ইস্পাত), সীসা, লোহা ও পারদ। প্রতিমা তৈরিতে পারদের বদলে পেতল গ্রহণীয়।

অষ্টনাগ—অনন্ত, বাসুকি, পদ্ম, মহাপদ্ম, তক্ষক, কুলীর (কুলিক), কর্কট ও শঙ্খ।

অষ্টনায়িকা—(১) পার্বতীর আট মূর্তি। উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, অতিচণ্ডা, চামুণ্ডা, চণ্ডা, চণ্ডবতী। অন্য মতে মঙ্গলা, বিজয়া, ভদ্রা, জয়ন্তী, অপরাজিতা, নন্দিনী, নারসিংহী ও কৌমারী। এঁদের অষ্ট যোগিনীও (দ্রঃ) বলা হয়।

(২) কাব্যে নাটকে স্বাধীন পতিকা, বাসক সজ্জিকা, বিরহোৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্তৃকা ও অভিসারিকা।

অষ্টনিধি—কুবেরের আট রত্ন ঃ—পদ্ম, মহাপদ্ম, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, নীল, নন্দ, ও শঙ্খ।

অষ্টপারিষদ—নন্দ, সুনন্দ, চণ্ড, প্রচণ্ড, কুমুদ, কুমুদেক্ষণ, বল ইত্যাদি বিষ্ণুর পারিষদ।

অষ্টবস্ত্র—সুদর্শন, শূল, ব্রহ্মার অক্ষমালা, বজ্র, বরুণের পাশ, যমদণ্ড, কার্তিকের শক্তি, দুর্গার খড়্গ। দুর্বাসার শাপে ঘোটকযোনি প্রাপ্ত উর্বশী এই অষ্টবজ্রের মিলনে মুক্ত হন।

অষ্টবর্ণ—জন্ম সময়ে সূর্য ইত্যাদি আটটি গ্রহের স্থিতি অনুসারে শুভাশুভ ফলসূচক চক্র।

অষ্টবসু—ধর্মের ঔরসে ও দক্ষকন্যা বসুর (দ্রঃ) গর্ভে জন্ম ধর, ধ্রুব, সোম, অনল, অনিল, সাবিত্র (মহাভারতে অহঃ), প্রত্যূষ, প্রভাস। বিষ্ণুপুরাণ মতে দ্রোণ, প্রাণ, ধ্রুব, অর্ক, অগ্নি, দোষ, বসু/বাস্তু ও বিভাবসু। এই নাম সব জায়গায় সমান নয়। ভব, বিষ্ণু, প্রভব, দ্যু, ধর্ম, আপ, অহঃ (দ্রঃ) ইত্যাদি নামও পাওয়া যায়। এঁদের পিতামাতা স্ত্রী ও সন্তানদের নাম সম্বন্ধেও মতভেদ রয়েছে। দ্রঃ বসু।

অষ্টবিনায়ক—গণপতির আটটি মন্দির। (১) ভীমা ও মুথমূলা সঙ্গমে রঞ্জনগাঁওতে ; (২) মারগাঁও ; (৩) থেউর ; (৪) লেনাদ্রি ; (৫) পুণাতে ওঝর ; (৬) পন্থসচিব রাজ্যে পালিত ; (৭) থান জেলাতে মধে ; (৮) আমেদনগর জেলাতে সিদ্ধটেক-এ। দ্রঃ-বিনায়ক তীর্থ।

অষ্টবিবাহ—ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, গন্ধর্ব, অসুর, রাক্ষস, পিশাচ।

অষ্টভার্যা—কৃষ্ণের স্ত্রী। রুক্মিণী, জাম্ববতী, সত্যভামা, মিত্রবিন্দা, সত্যা, ভদ্রা, লক্ষ্মণা, কালিন্দী।

অষ্টভৈরব—অসিতাঙ্গ, রুরু চণ্ড ক্রোধ, উন্মত্ত, কপালী, ভীষণ, সংহার।

অষ্টমঙ্গল—(১) বুক, ও লেজ, চারটি খুর, কেশ ও মুখ সাদা এই রকম ঘোড়া। (২) সিংহ হস্তী, বৃষ, কলস, ব্যজন, পতাকা, ভেরী, দীপ। অন্য মতে ব্রাহ্মণ, গো, অগ্নি, সূর্য, ঘৃত স্বর্ণ, জল ও রাজা। দর্পণ, দীপ, কলস, বস্ত্র, অক্ষত অঙ্গনা, ও স্বর্ণ ইত্যাদি আটটি বিভিন্ন বস্তুর (মতানুযায়ী) সমাহার।

অষ্টমাঙ্গল্য—অষ্ট মঙ্গল (দ্রঃ)।

অষ্টমাতৃকা— মাতৃকা (দ্রঃ)।

অষ্টমার্গ—সম্যক দৃষ্টি, স-সংকল্প, স বাক, স-কর্ম, স-আজীব, স-ব্যায়াম, স-স্মৃতি স-সমাধি। দ্রঃ-অষ্টাঙ্গিক মার্গ।

অষ্টমূর্তি—শিবের আট মূর্তি—সর্ব ক্ষিতিমূর্তি (ক্ষিতিলিঙ্গ শিবকাশীতে); ভব জলমূর্তি, অগ্নি তেজমূর্তি (জ্যোতির্লিঙ্গ তিরুবনমালাইতে); বায়ু মরুৎমূর্তি, ভীম আকাশ মূর্তি; পশুপতি যজমান মূর্তি, মহাদেব চন্দ্রমূর্তি ও ঈশান সূর্যমূর্তি।

অষ্টযোগিনী—দুর্গার আট সখী ঃ—শৈলপুত্রী, চণ্ডঘণ্টা, স্কন্দমাতা, কালরাত্রি, চণ্ডিকা, কুষ্মাণ্ডী, কাত্যায়নী ও মহাগৌরী। দ্রঃ-অষ্ট নায়িকা।

অষ্টরস—শৃঙ্গার, বীর করুণ, অদ্ভুত, হাস্য ভয়ানক, বীভৎস ও রৌদ্র।

অষ্টরিপু—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, অসূয়া ও দম্ভ।

অষ্টলোহ—সোনা, রূপা, রাঙ, তামা, সীসা, কান্তলোহ, মুণ্ডলোহ ও তীক্ষ্ণলোহ।

অষ্টসখী—রাধা—গদাধর পণ্ডিত, ললিতা—স্বরূপ গোস্বামী, বিশাখা—রায় রামানন্দ, সুচিত্রা—শিবানন্দ, চম্পকলতা—রামানন্দ, রঙ্গদেবী—গোবিন্দ ঘোষ, সুদেবী—বাসুঘোষ, তুঙ্গ—শ্রীমাধব ঘোষ।

অষ্টসাহস্রিক—দ্রঃ- প্রজ্ঞাপারমিতা।

অষ্টসিদ্ধি—অণিমা, গরিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব ও বশিত্ব।

অষ্টাঙ্গ—জানু, পদ, পাণি, বক্ষ, বুদ্ধি, শির, বাক্য ও দৃষ্টি—প্রণামের এই আটটি অঙ্গ। রথ, হস্তী, অশ্ব, যোধ, পত্তি, কর্মকার, চার ও দৈশিকমুখ্য (দেশের প্রধান ব্যক্তি)—সেনার এই অষ্ট অঙ্গ। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার (ইন্দ্রিয় সুখ থেকে মনকে টেনে নেওয়া) ধারণা, ধ্যান, সমাধি—যোগের এই অষ্ট অঙ্গ। জল, ক্ষীর, কুশাগ্র, দধি, ঘি, আতপচাল, যব, শ্বেত সর্ষপ—পূজার অষ্ট উপাচার। ব্যবহারশাস্ত্র, বিচারক, সভ্য, লেখক, জ্যোতির্বিৎ, স্বর্ণ, অগ্নি, জল—বিচারালয়ে অষ্ট অঙ্গ। শল্য, শালক্য, কায়চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমারভৃত্য, অগদতন্ত্র, রসায়নতন্ত্র, বাজীকরণ—আয়ুর্বেদের আটটি অঙ্গ। স্মরণ, কীর্তন, কেলি, প্রেক্ষণ, গুহ্যভাষ, সঙ্কল্প, অধ্যবসায়, ক্রিয়ানিষ্পত্তি—এগুলি অষ্টাঙ্গ রতি/মৈথুন।

অষ্টাঙ্গবিদ্যা—ষড়ঙ্গ চারবেদ, মীমাংসা, ন্যায়, ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ, আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গন্ধর্ববেদ ও অর্থশাস্ত্র।

অষ্টাঙ্গিকমার্গ—আট অঙ্গ সমন্বিত বুদ্ধদেব প্রদর্শিত মুক্তি মার্গ :—(১) সম্যক দৃষ্টি—চার আর্যসত্য ও দ্বাদশ নিদান যুক্ত প্রতীত্য-সমুৎপাদ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান। (২) সম্যক সঙ্কল্প—কাম, হিংসা, প্রতিহিংসা বিহীন, নিষ্কাম, মৈত্রী ও করুণার সঙ্কল্প। (৩) সম্যক বাক্য—মিথ্যা পিশুন ও কটুবাক্য ত্যাগ করে সত্য, প্রিয়, মিষ্ট ও অর্থপূর্ণ বাক্য। (৪) সম্যক কর্ম—প্রাণিহত্যা, চুরি, ব্যভিচার ও মাদক সেবন বাদ দিয়ে দয়া, বদান্যতা ও চরিত্র সৎ রাখার কর্ম। (৫) সম্যক জীবিকা—মিথ্যা জীবিকা বাদ দিয়ে সৎজীবিকার আশ্রয় নেওয়া। অস্ত্র, প্রাণী, মাংস, নেশা, ও বিষয়বাণিজ্য মিথ্যা জীবিকার অন্তর্গত। (৬) সম্যক উদ্যম—ইন্দ্রিয় সংযম, কুচিন্তা ত্যাগ, সুচিন্তা, উৎপন্ন সৎচেষ্টার স্থিতি ও বৃদ্ধির চেষ্টা। (৭) সম্যক স্মৃতি—কায়, বেদনা, চিত্ত ও মানসিক ভাব সমূহের প্রকৃত স্মৃতি। এদের মালিন্য ও ক্ষণভঙ্গুরতার প্রতি সতর্ক থাকা। (৮) সম্যক সমাধি—কাম ও অকুশল চিন্তা ত্যাগ করে চিত্তের একাগ্রশীলতা সাধন।

অষ্টাদশধান্য—যব, গোধূম, ধান, তিল, কঙ্গু, কুলত্থ, মাষ, মুদ্গ, মসূর, নিষ্পাব, শ্যামাক, সর্ষপ, গবেধুক, নীবার, আঢ়কী, সতীনক, চণক ও চীনক।

অষ্টাদশপুরাণ—ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব, বায়ু, ভাগবত, নারদীয়, মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত, লিঙ্গ, বরাহ, স্কন্দ, বামন, কূর্ম, মৎস্য, ব্রহ্মাণ্ড। দ্রঃ-পুরাণ।

অষ্টাবক্র—মহর্ষি ; সংহিতাকার। পিতা কহোড় বা খগোদর ; মাতা সুমতি অন্য নাম সুজাতা ; মাতামহ উদ্দালক। কহোড় উদ্দালককে সেবা করতে থাকেন ফলে

উদ্দালক সন্তুষ্ট হয়ে সদ্য সমস্ত বিদ্যা এবং নিজের কন্যা সুজাতাকে (মহা ৩।১২৩।৩) দান করেন। গর্ভস্থ বালক বেদপাঠ শুনতে শুনতে বেদজ্ঞ হয়ে ওঠে এবং এক দিন শিষ্যদের মধ্যে গর্ভস্থ শিশু পিতাকে বলে—সারা রাত্রি বেদ পাঠ করছেন ; সম্যক ন উপাবর্ততে (পড়া হচ্ছে না)। রেগে গিয়ে কহোড় শাপ দেন গর্ভেতেই যে শিশুর স্বভাব এত বক্র জন্মালে তার দেহ যেন আট জায়গায় বেঁকে যায়। ফলে শিশু বক্রাঙ্গ হয়ে জন্মান ও অষ্টাবক্র নাম হয়। এই সন্তান জন্মের আগে জনক রাজার সভাপণ্ডিত বাদবিৎ বন্দীর কাছে তর্কযুদ্ধে কহোড় পরাজিত হন। এই তর্ক যুদ্ধের সর্ত মত জলে কহোড়কে বন্দী ডুবিয়ে রাখেন। অন্য মতে কহোড় জলে প্রাণ বিসর্জন করেন। উদ্দালকের কথা মত সুজাতা ছেলেকে কহোড়ের কথা কিছুই বলেন নি। ফলে শিশু উদ্দালককেই বাবা বলে জানতেন। মহাভারতে বার বৎসর বয়সে অষ্টাবক্রের সমবয়সী মামা শ্বেতকেতু একদিন অষ্টাবক্রকে উদ্দালকের কোল থেকে নামিয়ে দেন এবং বলেন, অন্য মতে এরা দুজনে নদীতে স্নান করতে গেলে কথায় কথায় শ্বেতকেতু বলেন উদ্দালক অষ্টাবক্রের বাবা নন। অষ্টাবক্র বাড়ি ফিরে এসে কাঁদতে থাকে। ফলে সুজাতা ছেলেকে কহোড়ের কাহিনী জানাতে বাধ্য হন। অষ্টাবক্র তখন মাতুল শ্বেতকেতুর সঙ্গে জনক রাজসভাতে আসেন। পথে রাজার লোকেরা বাধা দেয়। রাজা এগিয়ে যাবার অনুমতি দেন (মহা ৩।১৩৩।২)। তার পর দ্বারপাল বাধা দেয় ; বন্দীর নিষেধ আছে জানায়। দ্বারপালকে কথায় পরাস্ত করে অষ্টাবক্র ভেতরে আসেন এবং জনককে জানতে চান বন্দী কোথায় ; বলেন সবিতা ইব নক্ষত্রাণি নাশয়ামি। জনক তখন কয়েকটি প্রশ্ন করেন এবং উত্তরে সন্তুষ্ট হয়ে বন্দীর কাছে যেতে দেন। উগ্রসেনের সমিতিতে (মহা ৩।১৩৪।১) এসে বন্দীকে তর্কে আহ্বান করেন। বন্দী অবজ্ঞায় ফিরিয়ে দিতে চাইলে অষ্টাবক্র গর্জন করে ওঠেন এবং তর্কের নামে কবির লড়াই আরম্ভ হয়। 'ত্রয়োদশ' শব্দ দিয়ে শ্লোকে রচনা করতে গিয়ে বন্দীর আটকে যায় ; অষ্টাবক্র পাদপূরণ করে দেন। সূতপুত্র (মহা ৩।১৩৪।২১) এই ভাবে পরাজিত হলে অষ্টাবক্র বলেন বন্দী যেমন এ পর্যন্ত ব্রাহ্মণদের জলে ডুবিয়ে দিয়ে এসেছে সেই ভাবে একেও জলে ডুবিয়ে দেওয়া হক। বরুণ যখন এর পিতা তখন বরুণের কাছেই ফিরে যাক। এ দিকে এ পর্যন্ত যত ব্রাহ্মণকে বন্দী জলে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন তাঁরা সকলে বরুণের যজ্ঞ থেকে ফিরে আসেন এবং জনকের অনুমতি নিয়ে বন্দী জলের মধ্যে প্রবেশ করেন। কহোড় আসেন এবং সন্তুষ্ট হয়ে ছেলেকে সমঙ্গা নদীতে স্নান করতে বলেন এবং স্নান করে অষ্টাবক্র সুন্দর সমঙ্গ দেহ ফিরে পান। বদান্য ঋষির মেয়ে সুপ্রভার রূপে মুগ্ধ হয়ে অষ্টাবক্র তাঁকে বিয়ে করতে চান। অষ্টাবক্রের ভালবাসা পরীক্ষা করবার জন্য বদান্য তখন এক বৃদ্ধ তপস্বিনীর সঙ্গে দেখা করে আসবার জন্য হিমালয়ে, কুবের ভবনাদি পার হয়ে হরপার্বতীকে প্রণাম করে আরো উত্তরে একটি বনে ঘুরে আসতে বলেন। অষ্টাবক্র বার হয়ে পড়েন এবং কুবের ভবনে এক বৎসর মত অতিথি থাকেন ; গন্ধর্ব কন্যাদের নৃত্যগীত উপভোগ করেন, তার পর শিব পার্বতীকে প্রণাম করে শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধার কাছে এলে বৃদ্ধা তাঁকে বিধিমত অভ্যর্থনা করেন এবং প্রতিরাত্রে নানাভাবে তাঁর

সংযম পরীক্ষা করতে থাকেন। অন্য মতে সাতটি পরমা সুন্দরী মেয়েকে দেখতে পান। এদের মধ্যে যে প্রধানা অর্থাৎ 'উত্তরা' থেকে যান বাকি মেয়েরা অষ্টাবক্রের নির্দেশে চলে যান; এবং এই উত্তরাই অষ্টাবক্রের সংযম পরীক্ষা করেন। (মহা ১৩।২০) শেষ পর্যন্ত অষ্টাবক্রের সংযমে মুগ্ধ হয়ে নিজের পরিচয় দেন। বৃদ্ধা ছিলেন উত্তর দিকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী; ঋষি বদান্যের অনুরোধে অষ্টাবক্রকে পরীক্ষা করছিলেন। এর পর অষ্টাবক্র ফিরে আসেন এবং সুপ্রভার সঙ্গে বিয়ে হয়। জনক রাজাকে মোক্ষ সম্বন্ধে অষ্টাবক্র যে সব উপদেশ দিয়েছিলেন তারই নাম অষ্টাবক্র সংহিতা। অষ্টাবক্রকে দেখে কয়েক জন দিব্যাঙ্গনা একবার উপহাস করেন। ফলে অষ্টাবক্রের শাপে এ'রা কৃষ্ণের স্ত্রী হয়ে জন্মান এবং কৃষ্ণের মৃত্যুর পর যখন এ'রা অর্জুনের সঙ্গে চলে আসছিলেন তখন দুর্বৃত্তের হাতে অপহৃতা হন। রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরে এলে রাজ্যাভিষেকে অষ্টাবক্র ছিলেন।

অষ্টাবক্র—অসিত মুনি শিবের তপস্যা করে দেবল নামে একটি সন্তান লাভ করেন। অপ্সরা রম্ভা দেবলকে দেখে মুগ্ধ হলেও প্রত্যাখ্যাত হন এবং শাপ দিয়ে দেবলকে অষ্টাবক্রে পরিণত করেন। এরপর ছ হাজার বছর তপস্যা করলে কৃষ্ণ ও রাধা দেখা দেন এবং কৃষ্ণ আঁলিঙ্গন করলে এ'র দেহের সমস্ত বক্রতা চলে যায় এবং বিমানে করে তিন জনে স্বর্গে চলে যান।

অষ্টাবক্রআশ্রম—রাহুগ্রাম। বর্তমান রৈলা; হরিদ্বার থেকে চার মাইল। কাছেই ছোট একটি নদী=অষ্টাবক্র নদী=সমঙ্গা। গাড়োয়ালে শ্রীনগরের কাছে পউরিতে আর একটি আশ্রম ছিল; এখানে অষ্টাবক্র পর্বতও রয়েছে।

অষ্টাবক্রগ্রাম—মথুরা জেলাতে রাবল। এখানে মাতামহ সুরভানুর প্রাসাদে রাধিকার জন্ম হয়। এখানে জীবনের প্রথম বর্ষ কাটে।

অসঙ্গ—কোন এক মুনি; তপস্যার ফলে নিজের নষ্ট পুরুষত্ব ফিরে পান; শুভন দেখে স্ত্রী শশ্বতী আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠেন। অনাবিল চিত্তের পূর্ণ প্রকাশ একমাত্র ঋকেই যেন সম্ভব:—শশ্বতী নারী অভিচক্ষ্যাহ সুভদ্রম্ অর্য ভোজনং বিভর্ষি (ঋক্ ৮।১।৩৪)।

অসঙ্গ—আচার্য অসঙ্গ। দ্বিতীয় ভাই বসুবন্ধু এবং আর এক ভাই বিরিঞ্চি-বৎস। পুরুষপুরে (পেশোয়ারে) এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম। অনুজ বসুবন্ধুকে ইনি মহাযানী মতবাদে অনুরাগী করেছিলেন। অসঙ্গ সে যুগের এক জন শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ দার্শনিক। মহাযানী সম্প্রদায়ের যোগাচার শাখা খৃ ৪-৫ শতকে (অপর মতে ৩০০ খৃষ্টাব্দমত) এ'র দ্বারা পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে। মৈত্রেয় বুদ্ধ এ'কে প্রবুদ্ধ করেন। তুষিত স্বর্গে নিয়ে গিয়ে অসংখ্য মন্ত্রের রহস্য শিক্ষা দেন। অন্য মতে এই মৈত্রেয় হচ্ছেন অভিসময়ালংকার প্রণেতা মৈত্রেয় নাথ। আচার্য অসঙ্গের দৃষ্টি ছিল সাধকের। পরমার্থিক তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর আলোচনা সাধকের আলোচনা। মন্ত্র সম্বন্ধে অসঙ্গ বলেছেন মন্ত্রের অর্থহীনতাই মন্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য (দ্রঃ-মন্ত্র)। এ'র রচনা সূত্রালঙ্কার, মহাযান সম্পরিগ্রহ শাস্ত্র, যোগাচার-ভূমিশাস্ত্র, মহাযানাভি-ধর্মসংগীতি শাস্ত্র, বজ্রচ্ছেদিকা প্রজ্ঞাপারমিতার টীকা।

অসচ্ছাস্ত্র—বৌদ্ধ আগমাদি শাস্ত্র। শ্রুতি ও স্মৃতি বিরোধী।

অসমঞ্জ—অযোধ্যার রাজা সগরের স্ত্রী কেশিনী ও সুমতি। পুত্র কামনায় রাজা এঁদের নিয়ে হিমালয়ে ভৃগু প্রস্রবণে ১০০ বছর তপস্যা করলে মহর্ষি ভৃগুর বরে কেশিনীর অসমঞ্জ এবং সুমতির ৬০ হাজার ছেলে হয় (রা ১।৩৮।৪)। মহাভারতে (৩।১০৬।১৪) শৈব্যার ছেলে। অসমঞ্জ বংশ রক্ষা করবে এবং বাকিগুলি ধ্বংস হবে বর ছিল। পরে অসমঞ্জ দুরাত্মা ও প্রজাপীড়ক হয়ে ওঠেন। ছোট ছোট ছেলেদের খুরেষু ক্রোশতঃ গৃহ্য সরযূতে ফেলে দিতেন, তারা ডুবে যেতে ; অসমঞ্জ মজা দেখতেন (রা ১।৩৮।২০)। প্রজারা এসে অভিযোগ করলে রাজা তৎক্ষণাৎ অসমঞ্জকে তাড়িয়ে দেন। অসমঞ্জের ছেলে অংশুমান প্রজারঞ্জক ছিলেন।

অসহায়—মনুসংহিতার প্রাচীন ভাষ্যকার। সম্ভবত খৃ ৫-৬ শতকে। কুমারিল ভট্টের আগে। এঁর পূর্ববর্তী কোন ভাষ্যকার অজানা।

অসি—কাশীর দক্ষিণে নদী। কাশীর দক্ষিণে গঙ্গাতে এবং উত্তর দিকে বরণা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। দ্রঃ-বারাণসী।

অসিক্নী—বীরণ প্রজাপতির মেয়ে অন্য নাম বৈরণী। দ্রঃ-পঞ্চজন। দক্ষের স্ত্রী। দক্ষ প্রথম দিকে মন থেকে সব সৃষ্টি করছিলেন। পরে স্থির করেন স্ত্রী পুরুষের মিলনের মাধ্যমে সৃষ্টি করবেন। অসিক্নীর গর্ভে দক্ষ তখন প্রথমে হর্যশ্ব নামে ৫ হাজার পুত্রের জন্ম দেন। দ্বিতীয় বার শবলাশ্ব নামে এক হাজার ছেলের জন্ম দেন এবং তৃতীয় বারে ৬০টি মেয়ে হয়। এঁদের মধ্যে ধর্ম ১০ জনকে (অরুন্ধতী, বসু, যমী, লম্বা, ভানু, মরুৎবতী, সংকল্পা, মুহূর্তা, সাধ্যা ও বিশ্বা। প্রসূতির কন্যা হিসাবে ধর্মের (দ্রঃ) স্ত্রীদের যে সব নাম পাওয়া যায় সেগুলি একটু অন্য রকমের) ; কশ্যপ ১৩ জন (অদিতি, দিতি, দনু, অরিষ্টা, খসা, সুরসা, সুরভি, বিনতা, তাম্রা, ক্রোধবশা, ইরা, কদ্রু ও মুনি) ; অরিষ্টনেমি ৪· জনকে ; বহুপুত্র ২ জনকে ; অঙ্গিরস ২ জনকে ; ও কৃশাশ্ব দুজনকে বিয়ে করেন। (২) ঋকবেদে একটি নদী। বর্তমান নাম চন্দ্রভাগা (চেনাব), পাঞ্জাবে।

অসিত—(১) হিমালয়বাসী এক জন ঋষি। বুদ্ধকে দেখতে এসেছিলেন। যিশুকে দেখতে যাবার মত। (২) সূর্য বংশে রাজা ভরতের ছেলে। পদ্ম পুরাণে এঁর নাম বাহু। দ্রঃ- সগর। (৩) জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞে একজন ঋত্বিক। ব্যাসের শিষ্য। শিবের বরে ছেলে হয় দেবল। জনক রাজাকে পুনর্জন্ম তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে শুনিয়েছিলেন। দ্রঃ-দেবল, অষ্টাবক্র। (৪) বিশ্বামিত্র নদীর কাছেই মৈনাক ও অসিত পর্বত। এখানে কক্ষসেন ও চ্যবনের আশ্রম। অল্পেই এখানে সিদ্ধিলাভ হয় (মহা ৩।৮৭।৯)।

অসিত দেবল—পাণ্ডবরা বনবাসে (দ্রঃ) যাবার পর কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলে দ্রৌপদী কৃষ্ণকে স্তব করেন এবং বলেন অসিতঃ দেবলঃ কৃষ্ণকে সর্বভূতের স্রষ্টা অব্রবীৎ (মহা ৩।১৩।৪৩) অর্থাৎ অসিত (দ্রঃ) বহু স্থলে বিশেষণ মাত্র।

অসিতলোমা—এক জন দানব। দনুর গর্ভে কশ্যপের ছেলে। মহিষাসুরের সঙ্গী। ব্রহ্মার বরে দুর্গাকে ও পরে বরুণকেও পরাজিত করেন। এর পর দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। দেবতারা তখন শিবের শরণাপন্ন হলে শিব সকলকে

নিয়ে বিষ্ণুর কাছে যান। বিষ্ণুর দেহ থেকে তখন অষ্টাদশ-ভুজা মহালক্ষ্মী আবির্ভূত হয়ে এঁকে নিধন করেন।

অসিতা—এক জন অপ্সরা।

অসিতাঙ্গ—এক জন ভৈরব।

অসিধারব্রত—অসিধারে স্থিতির ন্যায় দুষ্কর ব্রত। স্ত্রী ও পুরুষ ব্রহ্মচর্য নিয়ে দুজনের মধ্যে বিছানায় অসি রেখে শুয়ে থাকে। অর্থাৎ কঠিন সংযম পালনীয়। এই ব্রতে মনেও স্ত্রী-সঙ্গ চিন্তা না করে যুবতী স্ত্রীর সঙ্গে মুগ্ধ ভর্তৃবৎ যুবা আচরণ করণীয়।

অসিপত্র—(১) নরক বিশেষ। (২) ব্রত বিশেষ। অশ্বমেধে কর্তব্য।

অসিপত্রবন—নরক। এখানে গাছের পাতায় অসির মত তীক্ষ্ণ ধার। নিজের স্বাভাবিক কর্তব্য না করে অপরের কর্তব্য করলে, অকারণে বৃক্ষ ছেদন করলে ও শাস্ত্র লঙ্ঘন করলে এই নরকে গতি হয় (স্মৃতি, দেবী ভাগবত)। যমদূতেরা এখানে অসিপত্রের চাবুক মারে।

অসুর—বৈদিক ও পরবর্তী সাহিত্যে প্রচুর ব্যবহৃত শব্দ। অস্+উর+ক (নিরুক্ত)। অনেকের মতে প্রাচীন অস্সুর বা আসিরীয় অধিবাসীদের বোঝাত। ভারতে আর্যগোষ্ঠীর সঙ্গে মধ্য প্রাচ্যের অস্সুর সভ্যতার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল এবং এঁরাও বৈদিক যুগের সময় ভারতে অনুপ্রবেশ করতে চেষ্টা করেন। অন্য মতে অসুররা ভারতের অধিবাসী এঁদের সঙ্গে আর্যদের সঙ্ঘর্ষ হত। আবার আর এক মতে আসিরীয় অধিবাসীরা আগে ভারতে এসেছিলেন ; ভারতে আদিবাসী অর্থে আসিরীয় আগত এই সব লোক বুঝায়। গ্রীক দেশে এক কিংবদন্তী আছে অস্সুর দেশের সম্রাজ্ঞী সেমিরামিস্ ভারত জয় করবার জন্য আক্রমণ করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। অবশ্য এ মতগুলি একটিও প্রমাণ ভিত্তিক নয়। আর এক মতে প্রাচীন আর্যগোষ্ঠী সম্ভবত মধ্য এসিয়ার আমুদরিয়া ও শিরদরিয়ার উপত্যকায় বহুদিন বাস করেছিলেন। এঁদের বিশেষ একটি ধর্ম ও জীবন চর্চা গড়ে উঠেছিল; এবং প্রাচীন আর্য গোষ্ঠী থেকে এই ধর্ম ও জীবনচর্চা ভিন্ন। আদিম আর্যেরা অগ্নি ও প্রাকৃতিক শক্তির পূজা করতেন : কিন্তু এই নতুন গোষ্ঠী অনেক গুলি ভাবরূপ দেবতার পূজা আরম্ভ করেছিলেন। প্রাচীন প্রাকৃতিক শক্তিরূপী দেবতারা দেইবো (প্রাচীন ইন্দোইউরোপীয়) বা দইব (ইন্দো-ইরানীয়) বা দেব (সংস্কৃত) নামে পরিচিত হলেন এবং ভাবরূপী নতুন দেবতারা অসুর নামে পরিচিত হলেন। সম্ভবত আসিরীয় রাষ্ট্রের প্রধান উপাস্য দেবতার নামটি এই উদ্দেশ্যে গৃহীত হয়েছিল। মনে হয় ব্যাবিলনের কাস্সুবংশীয় রাজগণের মাধ্যমে অস্সুর প্রভাব আর্যধর্মের নবপর্যায়ের ওপর পড়েছিল। অসুর দলের প্রধান হলেন বরুণ আর দইব বা দেব দলের প্রধান হলেন ইন্দ্র এবং সঙ্গে সঙ্গে আর্যোগোষ্ঠী দুই সম্প্রদায়ে ভাগ হয়ে গেল। পণ্ডিতদের মতে মার্জিত রুচি চিন্তাশীল ব্যক্তিরা কৃষিও গোপালন করতেন ; এঁরা হলেন অসুর পন্থী। এবং অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর দুর্ধর্ষ যুদ্ধবাদীরা দেবপন্থী। পরে অসুর পন্থীরা ইরানে ও দেব পন্থীরা ভারতে প্রবেশ করেন। তবুও ইরানে অসুরপন্থীদের সঙ্গে কিছু দেবপন্থী ও ভারতে দেবপন্থীদের সঙ্গে

কিছু অসুরপন্থী রয়ে গেলেন। সংস্কৃতিতে এবং চিন্তাশীলতায় অসুর পন্থীরা অনেক ওপরে ছিলেন ফলে দেবপন্থীদের সঙ্গে এদের প্রথমে সংঘর্ষ হয়েছিল পরে দেবপন্থীদের ওপর ওরা প্রভাব বিস্তার করতে থাকেন। এই জন্য প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে কোথাও কোথাও অসুরদের ও অসুর ধর্মের নিন্দা আবার ইন্দ্র ইত্যাদি দেবতাদেরও প্রশংসা সূচক অসুর উপাধি দেখা যায়। অসুররা যে উন্নততর সভ্যাতার অধিকারী ছিলেন বৈদিক সাহিত্যে তা সুস্পষ্ট। পুরাণ এবং মহাকাব্যে অসুরদের সমান উন্নততের অবস্থা ফুটে রয়েছে। স্থাপত্য বিদ্যায় ময় দানব ইত্যাদি এবং ইন্দ্রজাল-শক্তি ইত্যাদি ক্ষমতায় এরা অদ্বিতীয় ছিলেন ; কিন্তু সংখ্যাগুরু দেবপন্থীদের ক্রমবর্দ্ধমান চাপে অসুরপন্থীরা ক্রমশ নিঃশেষ হয়ে যান। তবুও এ'দের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানের এবং বৈবাহিক সম্বন্ধের বহু দৃষ্টান্ত আছে।

অসুর শব্দটি অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর। চলতি অর্থ বর্তমানে দৈত্য, দানব, যজ্ঞবিরোধী ও দেবতা বিরোধী। এরা ভারতের আদিবাসী বা বিদেশী অনার্য কোনটাই নয় যেন। যাস্ক বলেছেন অ-সুরত অর্থাৎ ঠিক ভাবে/স্থানে রত নয়। বা অসু (=প্রাণ)-র=প্রাণবন্ত বা অসু (=প্রজ্ঞা)-র=প্রজাবন্ত। যাস্ক দেব শব্দের অর্থ বলেছেন যিনি কামনা বাসনা দান করেন। অর্থাৎ দেব ও অসুর একই সত্ত্বা হতে পারে। এ ছাড়া বেদে অসুর শব্দ প্রথম দিকে খুব সম্মানীয় বিশেষণ ছিল। কীর্তিমান বোঝাত। এই ভাবে মরুৎ, দ্যৌ, বরুণ, ত্বষ্টা, অগ্নি, বায়ু, পূষা, সবিতা পর্জন্য সকলেই অসুর বিশেষণ লাভ করেছিলেন। রাম নামে এক রাজাও (ঋক্ ১০।৯৩।১৪) অসুর বিশেষণ লাভ করেছিলেন। ঋক্‌বেদে ইন্দ্র, বরুণ, রুদ্র, মিত্র, মরুৎ, অগ্নি, সূর্য, সোম, ঊষা ইত্যাদি দেবতাকে অসুরও বলা হয়েছে ; কোন বিশেষণ নয়। রুদ্র দ্যুলোকের অসুর। মিত্রাবরুণও অসুর। সমবেত দেবগণ ও যজ্ঞকেও অসুর বলা হয়েছে। তুলনীয় আবেস্তাতে অহুর।

ঋক্‌বেদে দশম মণ্ডলেই অসুররা নিন্দিত হয়ে পড়েছিলেন। ঋক্‌বেদে সুর শব্দটি নাই; অর্থাৎ সুর শব্দের কল্পনাই সেখানে অনুপস্থিত। ইন্দ্র ঋজিশ্বার সঙ্গে বন্ধুতা করে মায়াবী অসুর পিপ্রুকে দমন করেন (১০।১৩৮।৩)। সূর্য (ঋক্ ১০।১৭০।২) অসুরহা; ইন্দ্র ও অগ্নি অসুরঘ্ন। ইন্দ্র ও বিষ্ণু বর্চি নামে অসুরের সৈন্য দল নষ্ট করেন (ঋক্ ১০।৯৯।৫)। বেদে ১৫০ বার ভাল অর্থে এবং ১৫ বার নিন্দা অর্থে অসুর শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ ক্রমশ তিক্ততা আসছিল।

পরে অসুর শব্দে দেবতাদের শত্রু বোঝায় এবং অমৃতের ভাগ অসুররা পায় না। ঋক্‌বেদের শেষে ও অথর্ব বেদে এরা দেবতা বিরোধী। পুরাণে ও মহাভারতে এরা কশ্যপ ও দিতি ও/বা দনুর সন্তান অর্থাৎ এরাও ব্রাহ্মণ এবং দেবতাদের সৎ-ভাই। ঐতরেয় ও শতপথ ব্রাহ্মণে আছে প্রজাপতির নিশ্বাস একবার প্রাণবন্ত হয়ে উঠে অসুরে পরিণত হয়। বিষ্ণু ও বায়ু পুরাণে প্রজাপতির জঘন থেকে জন্ম।

অসুররা দেবতাদের শত্রু ; পূজা ও যাগযজ্ঞ বিরোধী। তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণে (১৮।১।২) প্রজাপতির পুত্র দেব ও অসুর। যাস্ক বলেছেন প্রজাপতি সু থেকে সুরদের এবং অ-সু থেকে অসুরদের সৃষ্টি করেছিলেন। আবার সু অর্থে প্রজাপতির দেহের উত্তমাংশ

ও অসু অর্থে অধমাংশ। ব্যতিক্রম বৃত্রাসুর ; মহাভারতে ও ভাগবতে যজ্ঞ থেকে জন্ম; অর্থাৎ অগ্নি পুত্র। মধুকৈটভ বিষ্ণুর কাণ থেকে জন্মায়। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বলা হয়েছে অসুরেরা রাত্রি ও অন্ধকারের প্রতীক এবং তামসিকতায় পূর্ণ। দেবতাদের হাতে নিহত বহু অসুর মানুষ হয়ে জন্মে পৃথিবীতে নানা উপদ্রব করেছে।

বৃত্র, হিরণ্যকশিপু, মহিষাসুর, বলি, প্রহ্লাদ সকলই অসুর। মৎস্য পুরাণ মতে তিনজন অসুর (হিরণ্যকশিপু, বলি ও প্রহ্লাদ) রাজা/ইন্দ্র হয়েছিল। অসুররা সব সময়ই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব বা আদ্যাশক্তির বরে অজেয় হয়ে অত্যাচার করে বেড়াতেন ইত্যাদি এবং দেবতারা মিলিত হয়ে বা বিশেষ কোন দেবতা ছলে বলে এদের নিহত করতেন। মহাভারতে দেবতা ও অসুরেরা মিলিত ভাবে সমুদ্র মন্থন করলেও দেবতারা নির্লজ্জ ভাবে অসুরদের অমৃতের ভাগ থেকে বঞ্চিত করেছিলেন। রাক্ষসরাও অসুরদের সগোত্র। প্রহ্লাদ এবং বিভীষণ ইত্যাদি আবার পরম দেব ভক্ত।

ক্রমশ ভক্তদের মধ্যেই বিরোধ দেখা দিল। পারস্যে পার্সিরা হলেন অসুর পন্থী এবং ভারতে দেবপন্থীরা ছড়িয়ে গেলেন। এই ভক্তের দল ভারতে প্রবেশের পর দুভাগ হয়ে গিয়ে ছিলেন, না ভারতে আসার আগেই ভাগ হয়ে গিয়েছিলেন স্পষ্ট নয়। ভারতে অসুরদের কুকীর্তি ছড়াতে থাকে। পার্সিদের মধ্যে দেবতারা নিন্দিত হয়ে উঠলেন কিন্তু তবু বেরেথ্রঘন (বৃত্রঘ্ন) সেখানে বিশেষ সম্মান পেতে লাগলেন। ইরানে বোঘাস কোই (Boghas koi) লিপিতে (খৃ-পূ ১৪০০) ইন্দ্র, নাসত্য, মিত্র ও বরুণ অসুর রূপে উল্লিখিত। অর্থাৎ ইরানেও প্রথম পর্বে কোন কোন মতে দেব ও অসুর সমান সম্মানীয় ছিলেন। পরে ক্রমশ বরুণ, মিত্র, বায়ু, অগ্নি, সূর্য, সোম, বৃত্রহন্তা, অর্যমা প্রভৃতি ইরানে অসুর রূপে পূজিত হতে লাগলেন। জেন্দ-আবেস্তা ঋক্ বেদের অনেক পরে এবং অহুর-মজদা এই গ্রন্থে প্রধান দেবতা।

ঋক্‌বেদে দাস, দস্যু, দনু ইত্যাদি অনার্য এবং দেব বিরোধী জাতিও আছে। বৃত্র, বল, শম্বর, নমুচি, পিপ্রু দেব বিরোধীদের নেতাও বটে।

বিহারে ছোটনাগপুর অঞ্চলে নেতারহাট উপত্যকায় অসুর নামে ক্ষুদ্র একটি আদিবাসী গোষ্ঠী বাস করে। এদের তিনটি সম্প্রদায় (১) বীর অসুর, (২) বিরজিয়া, (৩) আগারিয়া। পুরুষানুক্রমে এ'রা লোহ বস্তু নির্মাতা। স্থানীয় পার্বত্য অঞ্চল থেকে খনিজ লোহ এনে নিজস্ব পদ্ধতিতে গালিয়ে নানা কিছু প্রয়োজনীয় দ্রব্য তৈরি করে। একটি মতে এরা অসুর বংশধর ; কিন্তু এরও কোন প্রমাণ নাই।

পুরাণে এ'রা কশ্যপ ও দিতির পুত্র। কয়েকটি প্রসিদ্ধ অসুর :—অনুহ্লাদ, অসিলোমা, অয়ঃশিরস্, অশ্ব, অশ্বশিরস্, অশ্বপতি, অশ্বগ্রীব, অশ্বগতি, অমূর্দ্ধন্, অজক, একপাদ, একচক্র, কপট, কেশী, কুপট, কুম্ভ, কেতুমান, গর্গ, চন্দ্র, চন্দ্রমস্, তুণ্ড, হুণ্ড দুর্জয়, নমুচি, নিকুম্ভ, প্রহ্লাদ, পুলোমা, পর, বিশ্রুত, বেগবান, বিরূপাক্ষ, বলি, বাণ, বিরোচন, বিপ্রচিত্তি, বাস্কল, বৃষপর্বা ; মহাকাল, মহাবল, মূর্দ্ধা, মায়াবান, শঙ্কু, শরভ, শলভ, শম্বর, শিবি, সূক্ষ্ম, সূর্য, স্বর্ভানু, সংহ্লাদ, হরাহর, অমৃতপ, একাক্ষ, গগনমূর্দ্ধা, গরিষ্ঠ, দানবনায়ু, দীর্ঘজিহ্ব, নরক, নিচন্দ্র, প্রলম্ব, বাতাপি।

অধুনাতন সাহিত্যে ও চলচিত্রে যেমন দুষ্ট চরিত্র সৃষ্টি করা হয় তেমনি পুরাণ ইত্যাদিতে বহু স্থানে অসুররাও অনুরূপ সৃষ্টি। কাহিনীকে জমকল করে তোলার অক্ষম প্রয়াস মাত্র। পরবর্তী কালে বৌদ্ধ ইত্যাদিদের যজ্ঞবিরোধী অসুর বা রাক্ষস হিসাবে উপস্থাপিত করা হয়েছিল কিনা কে বলবে।

অসুর বিবাহ—দ্রঃ-বিবাহ।

অসের—আসের। অসির গড়। মধ্যপ্রদেশে। বুরহানপুর থেকে ১১ মাইল উত্তরে। অশ্বত্থামা গির>অসের।

অস্তগিরি—শাকদ্বীপে অস্তকতঙ্গক ; (তঙ্গক=পর্বত)।

অস্তি—মগধরাজ জরাসন্ধের দুই মেয়ে অস্তি ও প্রাপ্তি। দু জনেই কংসের স্ত্রী। এ'দের প্ররোচনায় জরাসন্ধ যাদবদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন।

অস্ত্র—অস্ত্র সম্বন্ধে রামায়ণে বা মহাভারতে কেবল অসংখ্য নাম আছে। নির্দিষ্ট কি জিনিস প্রায় কোথাওই স্পষ্ট নয়। অযোধ্যাকে বলা হয়েছে সর্বযন্ত্রায়ুধবতী (রা ১।৫।১০), শতঘ্নী-শত-সংকুলা ও শব্দভেদী কুশলী ধানুকী পরিপূর্ণা নগরী। অর্থাৎ বাস্তব বর্ণনা যেন ; তবে শব্দভেদী শব্দটি রহস্যজনক। এরপর (রা ১।২১।১৫) আছে প্রজাপতি কৃশাশ্বের (দ্রঃ) ১০০টি সন্তান হয় ; এরা অস্ত্র ; দক্ষের এরা নাতি। অর্থাৎ অস্ত্রকেও সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যে আনা হল। এরপর তাড়কা নিহত হয় বাণ বর্ষণে ; কোন বিশেষ বাণে নয়। তাড়কা নিহত হলে ইন্দ্র ও দেবতাদের অনুরোধে বিশ্বামিত্র কৃশাশ্বের অস্ত্রগুলি রামকে দান করেন ; বিশ্বামিত্র নিজেও অস্ত্র তৈরি করতে পারতেন (অপূর্বাণাং চ জননে শক্তঃ—রা ১।২১।১৮)। অর্থাৎ রামকে বিশ্বামিত্র যে সব অস্ত্র দিয়েছিলেন সেগুলি সবই কৃশাশ্বের সন্তান কিনা উল্লেখ নাই। এগুলির নাম (রা ১।২৭)চণ্ডচক্র, ধর্মচক্র, কালচক্র, বিষ্ণুচক্র, ঐন্দ্রবজ্র, শৈবশূল, ব্রহ্মশির, ঐষীক, ব্রাহ্ম, মোদকী ও শিখরী দুটি গদা, ধর্মপাশ, কালপাশ, বরুণ পাশ, শুষ্ক ও আর্দ্র দুটি অশনি, পৈনাকি অস্ত্র, আগ্নেয় অস্ত্র, দুটি শক্তি অস্ত্র, কঙ্কাল, মুসল, কপাল ও কঙ্কণ/কিঙ্কিণী অস্ত্র, নন্দন নামে বিদ্যাধর অস্ত্র, অসি, মানব নামে গন্ধর্ব অস্ত্র, প্রস্বাপন, প্রশমন, সৌর, সাম্য অস্ত্র, বর্ষণ, শোষণ, সংতাপ ও বিলাপন অস্ত্র, সৌমনস্ অস্ত্র, সংবর্ত, মৌসল অস্ত্র, সত্য, মায়াধর ও তেজঃপ্রভ নামে সৌব অস্ত্র, শিশির নামে সৌম্য অস্ত্র, ত্বাষ্ট্র অস্ত্র, ভগের অস্ত্র, এবং মানব (শীতেষু) অস্ত্র। এগুলি সবই কল্পিত নাম, অস্ত্ররূপ মন্ত্র বা মন্ত্ররূপ অস্ত্র। এগুলির সংহার মন্ত্রও বিশ্বামিত্র দান করেন। কোন সংহার অস্ত্র কোন মূল অস্ত্রের জন্য ব্যবহার হবে উল্লেখ নাই।

এরপর মানবাস্ত্রে (শীতেষু, রা ১।৩০।১৮) মারীচকে উড়িয়ে সাগরে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেন এবং আগ্নেয় অস্ত্রে (১।৩০।২২) সুবাহুকে ও বায়ব্য অস্ত্রে (১।৩০।২৩) এদের অনুচর রাক্ষসদের নিহত করেন।

বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের যুদ্ধ হয় (রা ১।৫৬-)। বশিষ্ঠ এক মাত্র ব্রহ্মদণ্ড নিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন ; এটি কোন অস্ত্র নয়। কিন্তু বিশ্বামিত্র ব্যবহার করেছিলেন :—আগ্নেয়াস্ত্র,

বারুণ, রৌদ্র, ঐন্দ্র, পাশুপত, ঐষীক, মানব, মোহন, গান্ধর্ব স্বাপন, জৃম্ভন, মাদন, সংতাপন, বিলাপন, শোষণ, দারণ, বজ্র, বজ্রপাশ, কালপাশ, বরুণপাশ, পৈনাক, শুষ্ক ও আর্দ্র বজ্র, দণ্ডাস্ত্র, পৈশাচ, ক্রৌঞ্চাস্ত্র, ধর্মচক্র, কালচক্র, বিষ্ণুচক্র, বায়ব্য, মথন, হয়শির, শক্তিদ্বয়, কঙ্কাল, মুসল বিদ্যাধারাস্ত্র, কালাস্ত্র, ত্রিশূল, কাপাল, কঙ্কণ ও ব্রহ্মাস্ত্র।

এরপর রামায়ণে বিভিন্ন সময়ে ও লঙ্কার যুদ্ধে নানা অস্ত্র-ব্যবহার হয়েছিল। অস্ত্রগুলির মোটামুটি নাম অঙ্কুশ, অঞ্জলিক, অর্দ্ধচন্দ্র (বাণ), ইষীকা (বাণ). ঋষ্টি (খড়্গ), কর্ণী, কর্ণিশল্য, কাঞ্চনাঙ্গদ, কুঠার, কুন্ত (প্রাস), কুশমুদ্‌গর, ক্ষুর, ক্ষুরপ্র, খড়্গ, গদা, গন্ধর্ব, চক্র, তোমর (হস্তক্ষেপ্য স-শল্য দণ্ড), নাগপাশ, নারাচ (সমুদয় লৌহময় বাণ), নালীক (বাণ), নিখাত, নির্ঘাত, নিস্ত্রিংশ (খড়্গ), পট্টিশ, পট্টিশ (পরশু মত), পরিঘ (লৌহমুখ লগুড়, মুদ্‌গর বা শূল) পরশু, পরশ্বধ (পরশু), প্রাস (কোঁচ), বজ্র, বৎসদন্ত, বিকর্ণি, বিপাট, ভল্ল, ভিন্দিপাল (হস্তপ্রমাণ কাণ্ড, হস্তক্ষেপ্য লগুড়), ভুশুণ্ডি, মুদ্‌গর, মুষল (অয়ঃ অগ্রম্) যষ্টি, শক্তি, শতঘ্নী (অয়ঃকণ্টক সংছন্না), শিতাগ্রপট্টস, শিলীমুখ, (বাণ) শূল, সিংহদংষ্ট্র, হল। এই অস্ত্রগুলির প্রথম শ্রেণীতে একটি ভাগ হাতে করে ছুঁড়ে, মারা হত এবং আর একটি ভাগ যন্ত্র সাহায্যে (ধনু ইত্যাদি) ছোঁড়া হত। নিক্ষিপ্ত অস্ত্রগুলির একটি ভাগ ছিল শাণিত আর একটি ভাগ ছিল পাথর গদা ইত্যাদি মত ভারী বস্তু। অস্ত্রগুলির দ্বিতীয় শ্রেণী ছিল লাঠি, ডাণ্ডা, গদা ইত্যাদি ধরণের ; এগুলি দিয়ে পেটান হত ; আর তৃতীয় শ্রেণী ছিল খড়্গ, পরশু ইত্যাদি জাতীয়। দ্রঃ-আয়ুধ, অশ্মযুগ।

অস্ত্রশিক্ষা—(মহা ১৷১২৩৷-) পাণ্ডবরা কৃপাচার্যের পর দ্রোণের (দ্রঃ) কাছে অস্ত্র শিক্ষা করতে থাকেন। অশ্বত্থামা গোপনে সকল রাজকুমারের থেকে অধিক শস্ত্রবিৎ হয়ে ওঠেন। দ্রোণ (দ্রঃ) তারপর রাজকুমারদের লক্ষ্যভেদ করার ক্ষমতা এক দিন পরীক্ষা করেন। অর্জুন নিজের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করেন।

অস্ত্রশিক্ষা শেষ হলে ব্যাস বিদুর সোমদত্ত বাহ্লীক ইত্যাদি এক দিন রাজসভাতে ছিলেন। এদের শিক্ষা শেষ হয়েছে দ্রোণ জানান। এরা অস্ত্র শিক্ষা প্রদর্শন করতে চায়। ধৃতরাষ্ট্র সন্তুষ্ট হয়ে কি করতে হবে দ্রোণের কাছে জেনে নেন এবং বিদুরকে সব কিছু ব্যবস্থা করার দায়িত্ব দেন। গাছপালা হীন সমতল রঙ্গভূমি দ্রোণ তৈরি করান ; কাছেই প্রস্রবণ ছিল। রাজার জন্য ও রাণীদের জন্য প্রেক্ষা গৃহ তৈরি হয় বহু মঞ্চ করা হয়েছিল। নির্দিষ্ট দিনে সকলে আসেন। গান্ধারী, কুন্তী ইত্যাদি মঞ্চের উপর উঠে যান। পুর নারীরা ও আসে। বিরাট সমাজে পরিণত হয়। এরপর রঙ্গমধ্যে দ্রোণও অশ্বথাম প্রথমে আসেন। মঙ্গলকার্য ও পুণ্যাহ ঘোষণা ইত্যাদির পর রাজপুত্রেরা অনুজ্যেষ্ঠ ক্রমে সকলে এসে প্রবেশ করেন। এরা রথে, গজপৃষ্ঠে, অশ্বপৃষ্ঠে ইত্যাদি নানা কৌশল প্রদশন করেন। এরপর দুর্যোধন ও ভীমের গদা যুদ্ধ হয়। রঙ্গভূমি উত্তাল হয়ে ওঠে। দ্রোণ অশ্বত্থামাকে দিয়ে এদের থামতে বাধ্য করেন। এরপর বাজনা থামিয়ে দ্রোণ বলেন অশ্বথামা থেকেও যে প্রিয় সেই অর্জুন আসুক। অর্জুনকে দেখে জনতা আবার উত্তাল হয়ে ওঠে। অর্জুন নিজের কলা কৌশল দেখান। এর পর বাজনা থেমে এলে পায়ে হেঁটে সশস্ত্র কর্ণ

আসেন এবং তাচ্ছিল্য ভরে দ্রোণ ও কৃপকে নমস্কার করেন। আগে আছে কর্ণ দ্রোণের কাছেও অস্ত্র শিক্ষা করেছেন। কর্ণ তারপর অর্জুনের সমান অস্ত্র কৌশল দেখাতে চান। দ্রঃ-কর্ণ।

অস্পৃশ্যতা—কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের আগে রচিত অত্রি ধর্ম-সূত্রে রজক, চর্মকার কৈবর্ত, ভিল্ল প্রভৃতিরা অন্ত্যজ ছিল। এরা এবং প্রতিলোমজ চণ্ডালাদি শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত ছিল। কিন্তু সেখানে অস্পৃশ্যতার কোন উল্লেখ ছিল না। ঠিক কোন সময় শূদ্র বর্ণ ছাড়া অন্য জাতিও অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্য হয়েছিল জানা যায় না। মনে হয় কৌলিক বৃত্তির সঙ্গে বিচার করে এই অস্পৃশ্যতা গড়ে উঠে ছিল। সিংহল ও জাপানে অনুরূপ ভাবে অস্পৃশ্যতা রয়েছে : এবং এই অস্পৃশ্যতা ভারতীয় সভ্যতার সংস্পর্শজাতও হতে পারে। মনুতে বৌদ্ধ, পাশুপত, জৈন, লোকায়ত, কাপিল শাখার কাউকে ছুঁলে স্নানের বিধান আছে; অর্থাৎ এরাও অস্পৃশ্য। অত্রির মতে বৈদিক ক্রিয়াকরণে, বিবাহ সভাতে ও মেলায় এই নিয়ম লঙ্ঘন করা দূষণীয় নয়।

অস্তিসয়পর্বত—এরই একটি শাখা কটক জেলাতে চতুষ্পীঠ (দ্রঃ) পর্বত। উদয়গিরি ও (দ্রঃ) খণ্ডগিরি দুটি শাখা।

অস্যারিয়—শাল্মলী দ্বীপ। সালদিয়। এসিয়রিয়।

অহঃ—অষ্ট বসুর (দ্রঃ) এক জন; পিতা ধর্ম; মা রতি দেবী। এঁর ছেলে স্মৃত, জ্যোতি, শ্রম, শান্ত, মুনি (মহা ১।৬০।২২)।

অহঃ –একটি তীর্থ। কিংদন্ত থেকে এখানে আসা যায়। অহঃ তে স্নান করলে সূর্য-লোক প্রাপ্তি হয়। এখান থেকে মৃগধূমে যাওয়া যায়। (মহা ৩।৮১।৮৪)।

অহং—আমি সব এই বুদ্ধি। আমিত্ব জ্ঞান।

অহংযাতি—বা অহংপ্যাতি। সংযাতির (দ্রঃ) ছেলে। স্ত্রী কৃতবীর্য-কন্যা ভানুমতী। ছেলে সার্বভৌম (মহা ১।৯০।১৫)।

অহল্যা—(১) ব্রহ্মার মানস কন্যা; শতানন্দের মা। অন্য মত পুরুবংশে দুষ্মন্ত (১)—অজমীঢ় (৫)—মুদগল (১৩)—অহল্যা (১৪) (হরি ৩২।-)।

রামায়ণে আছে যস্মাৎ ন বিদ্যতে হল্যং; ফলে নাম অহল্যা। অদ্বিতীয় সুন্দরী ও সত্যপরায়ণা বলে ব্রহ্মা নাম দিয়েছিলেন অহল্যা (৭।৩০)। প্রজা সৃষ্টির সময় বহু প্রজা সৃষ্টি করে তখন এদের বিশিষ্ঠ প্রত্যঙ্গ নিয়ে অহল্যাকে (রা ৭।৩০।১৩) ব্রহ্মাই সৃষ্টি করেন এবং গৌতমের কাছে ন্যাসভূতা রেখে দিয়েছিলেন। ইন্দ্র কিন্তু অহল্যাকে নিজের স্ত্রী হবে মনে করেছিলেন। বহু বছর পরে গৌতম অহল্যাকে ফিরিয়ে দিলে ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হয়ে পত্নী হিসাবে হাতে তুলে দেন। ইন্দ্র এই জন্য (রা ৭।৩০) ক্রুদ্ধ হয়ে অহল্যাকে ধর্ষণ করেছিলেম। গৌতম এ জন্য ইন্দ্রকে শাপ দিয়েছিলেন যুদ্ধে ইন্দ্রও ধর্ষিত হবেন। এই কারণে ইন্দ্রজিৎ ইন্দ্রকে লঙ্কাতে বন্দী করে আনতে পেরেছিল। গৌতমের আরো শাপ ছিল ইন্দ্র যে ধর্ষণ প্রবর্তন করলেন জগতে এ আর কোন দিন বন্ধ হবে না এবং প্রতি ধর্ষণের অর্দ্ধেক পাপ ইন্দ্রকে গ্রহণ করতে হবে; এবং ইন্দ্রের স্থানও

স্থাবর হবে না। যে ইন্দ্র সেই ন ভবিষ্যতি (রা ৭।৩০)। এ ছাড়া গৌতম স্ত্রীকে শাপ দিয়েছিলেন মমাশ্রম সমীপতঃ বিনিধ্বংস ; এবং অহল্যার মত আরো বহু রূপসী জন্মাবে অর্থাৎ গর্ব করার মতও কিছু থাকবে না। অহল্যা স্বামীকে বোঝাতে চেষ্টা করেন— ত্বদ্‌-রূপেন দিবৌকসা ধর্ষিতা ; সে নির্দোষ। গৌতম তখন শান্ত হয়ে বলেন রাম এলে তাঁকে দেখে পূত হবেন ; এবং তখন দুজনে আবার এক সঙ্গে বাস করবেন। এই বলে গৌতম নিজের আশ্রমে ফিরে যান। অহল্যা তপস্যা করতে থাকেন। রামায়ণে (১।৪৮) আবার আছে মিথিলার কাছে উপবনে গৌতম আশ্রম। এক দিন সুযোগ বুঝে মুনি বেশ ধরে ইন্দ্র আসেন এবং সঙ্গম প্রার্থনা করেন। চিনতে পেরেও অহল্যা সম্মত হন। তারপর 'কৃতার্থাস্মি সুরশ্রেষ্ঠ' তুমি এবার শ্রীঘ্র পালাও (১।৪৮।২১) বলে সাবধান করে দেন। ভয়ে ভীত ইন্দ্র পালাতে গিয়েও ধরা পড়ে যান। মুনি স্নান করে সমিধকুশ নিয়ে (১।৪৮।২৫) ফিরছিলেন এবং শাপ দেন বিফলস্তং ভবিষ্যসি (১।৪৮।২৭)। ইন্দ্র (দ্রঃ) বৃষণ হীন হয়ে যান এবং গৌতম অহল্যাকে শাপ দেন বহু সহস্র বৎসর বায়ুভক্ষা, নিরাহারা, ভস্মশায়িনী, তপ্যন্তী ও অদৃশ্যা হয়ে এইখানে থাকতে হবে (রা ১।৪৮।৩০)। রাম এলে তাঁকে আতিথ্য দিলে পবিত্র হয়ে এবং কামমোহ-বিবর্জিত হয়ে নিজের দেহ ফিরে পেয়ে আবার স্বামীর সঙ্গে মিলিত হতে পারবেন। গৌতম তারপর হিমবৎ শিখরে তপস্যা করতে চলে যান (রা ১।৪৮।৩৩)। মিথিলার পথে রামলক্ষ্মণকে বিশ্বামিত্র এই কাহিনী শোনান এবং আশ্রমে নিয়ে আসেন। ভস্ম থেকে অহল্যা উঠে এসে অতিথি পরিচর্যা করেন। শাপে এত দিন দুর্নিরীক্ষ্যা হয়ে ছিলেন। রামলক্ষ্মণও অহল্যার পায়ের ধূলা নেন (রা ১।৪৯।১৯)। সঙ্গে সঙ্গে পুষ্পবৃষ্টি হয় ; দেবতারা অহল্যাকে প্রশংসা করতে থাকেন। গৌতমও আসেন এবং রামকে পূজা করে অহল্যাকে নিয়ে তপস্যা করতে চলে যান। শতানন্দ (দ্রঃ) পাশেই মিথিলাতে ছিলেন ; দেখা হয় নি।

কথা সরিৎ সাগরে আছে ইন্দ্র সরাসরি ধরা পড়ে যাচ্ছিলেন। 'মার্জাররূপ' ধারণ করে পালান। গৌতম স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলে অহল্যা বলেছিলেন 'মাজ্জার' ছিল চলে গেছে ; অর্থাৎ মৎ-জার বা মার্জার দুই অর্থ হয়। একটি মতে গৌতম শাপ দিয়েছিলেন পাথর হয়ে থাকতে হবে। রামচন্দ্রের পাদস্পর্শে মুক্তি পাবে। একটি মতে ইন্দ্রকে শাপ দিয়েছিলে দেহে সহস্র যোনি চিহ্ন ফুটে উঠবে। একটি মতে অহল্যার রূপে মুগ্ধ হয়ে ইন্দ্র (দ্রঃ) মোরগ সেজে মধ্য রাত্রিতে আশ্রমের কাছে ডেকে ওঠেন। ভোর হয়েছে মনে করে গৌতম স্নান করতে চলে যান এবং গৌতমের বেশে ইন্দ্র এসে অহল্যাকে ভোগ করেন। একটি মতে গৌতম ও শতানন্দ ফিরে এসেছিলেন এবং তিন জনে ঐ আশ্রমে বহু দিন বাস করেছিলেন। পদ্মপুরাণেও রামচন্দ্রেব পাদস্পর্শে মুক্তি লাভের কথা আছে। দ্রঃ- গৌতম। অরুণের (দ্রঃ) দুটি ছেলে অহল্যার কাছে পালিত হতে থাকে। কিন্তু গৌতম সহ্য করতে না পেরে শাপ দিয়ে এঁদের বানবে পরিণত করেন। এরও কিছু পরে ইন্দ্র ছেলে দুটিকে দেখতে এলে অহল্যা গৌতমের অভিশাপের কথা জানান। ইন্দ্র ছেলে দুটিকে খুঁজে বার করেন। বড় ছেলেটির লেজ বড়, নাম হয় বালী ; দ্বিতীয়টির গ্রীবা সুন্দর বলে নাম হয় সুগ্রীব।

কুমারিল ভট্টের মতে অহল্যা কাহিনী একটি রূপক। ইন্দ্র সূর্যের এবং অহল্যা রাত্রি বা অন্ধকারের প্রতীক। অহল্যাকে ধর্ষণ একটি রূপক ; অর্থ অন্ধকারকে জয় করা। অন্য মতে অহল্যা ঊষার প্রতীক। দিনে ইন্দ্ররূপী সূর্যের উদয়ে ঊষা অসূর্যম্পশ্যা হন। অহল্যা অর্থে কৃষির অনুপযুক্ত জমি। বেদে অহল্যা কাহিনী নাই। একটি অর্বাচীন শ্লোকে প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চকন্যাদের মধ্যে অহল্যা এক জন। দ্রঃ- উত্তঙ্ক, মাংস।

(২) রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের স্ত্রী একটি অপ্সরা। অহল্যার কাহিনী শুনে ইন্দ্র নামে এক অসুরের প্রতি আসক্তা হয়ে রাজা কর্তৃক বিতাড়িত হন।

অহল্যাআশ্রম—অহিয়ারি, অহল্যাস্থান, গৌতম আশ্রম (দ্রঃ)। জরইল পরগণাতে ত্রিহুতে ; জনকপুর থেকে ২৪ মাইল দ-পশ্চিমে। রামায়ণে জনকপুরের কাছে। এখানে ইন্দ্র অহল্যার কাহিনী ঘটেছিল।

অহল্যাহ্রদ—(মহা ৩।৮২।৯৩) মণিনাগ তীর্থ থেকে গৌতমের বনে যাওয়া যায়। এখানে অহল্যা হ্রদে স্নান করলে পরম গতি এবং উত্তমা শ্রী লাভ হয়। এখানে ত্রিভুবন বিখ্যাত উদপান তীর্থ রয়েছে। এই তীর্থে স্নান করলে বাজিমেধ ফল লাভ হয়।

অহার—বুলন্দসর থেকে ২১ মাইল উ-পূর্বে। গঙ্গার দক্ষিণ তীরে। এখানে পরিক্ষিত মারা যান এবং এখানে সর্পযজ্ঞ হয়েছিল প্রবাদ। সর্পযজ্ঞ হয়েছিল তক্ষশিলাতে (মহাভারত)।

অহি—এই দানবকে ইন্দ্র হত্যা করে সপ্ত নদীতে জল প্রেরণ করেছিলেন। দ্রঃ- ত্রিশিরা।

অহিংসা—দ্রঃ-অধর্ম।

অহিচ্ছত্র—প্রাচীন নাম অধিচ্ছত্র, আদিকোট, ছত্রবতী, প্রত্যগ্রহ, অহিচ্ছপুর, অধিছত্র, রামনগর (দ্রঃ)। রোহিলখণ্ডে বেরিলি থেকে ২০-মাইল পশ্চিমে। বর্তমানে অলমপুর কোট ও নসরৎগঞ্জের দুর্গ অহিচ্ছত্র নামে পরিচিত। মহাভারতে অহিক্ষেত্র, ছত্রবতী। জৈনগ্রন্থে উ-পাঞ্চাল=জঙ্গল ; রাজধানী অহিচ্ছত্র। প্রাচীন উত্তর পাঞ্চালের রাজধানী। অর্থাৎ রোহিলখণ্ড ও পার্শ্ববর্তী অংশের রাজধানী। বর্তমানে বেরিলি জেলার রাম নগর। খননকার্যের ফলে খৃ-পূ ৬ শতকের মৃৎ-পাত্র ইত্যাদি পাওয়া গেছে। বহু ঘর বাড়ি, ইঁটের তৈরি দুটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষও পাওয়া গেছে। প্রাক্ মৌর্যযুগ থেকে অহিচ্ছত্রের কোন কোন রাজার মুদ্রা পূর্বে বস্তি জেলা পর্যন্ত প্রচলিত থাকায় অনেকে এই রাজাদের পাঞ্চাল ও কোশল দুই দেশেরই রাজা মনে করেন। এই রাজাদের মিত্র উপাধি ; অর্থাৎ মিত্র-রাজ বলেও পরিচিত। অনেকে মনে করেন এ'রাই শুঙ্গ ও কাণ্ব রাজন্যবর্গ। বিভিন্ন মুদ্রা থেকে এ'দের নাম পাওয়া গেছে :- রুদ্রঘোষ, সূর্যমিত্র, ফাল্গুনীমিত্র, ভানুমিত্র, ভূমিমিত্র, ধ্রুবমিত্র, অগ্নিমিত্র, বিষ্ণুমিত্র, জয়মিত্র, ইন্দ্রমিত্র, বৃহৎস্বাতীমিত্র, বিশ্বপাল, রুদ্রগুপ্ত, জয়গুপ্ত, বজ্রপাল, বৈবর্ণীপুত্র ভাগবত, আষাঢ়সেন, দামগুপ্ত, বসুসেন, যজ্ঞপাল, প্রজাপতিমিত্র বরুণমিত্র। সম্ভবত এ'রা খৃ প্রথম তিন শতকে রাজত্ব করতেন। এক শ্রেণীর মুদ্রায় অচ্যুতের নাম পাওয়া যায়। এই সব মুদ্রায় যে শক প্রভাব রয়েছে তা থেকে মনে হয় এই অহিচ্ছত্র রাজ

অচ্যুতের সঙ্গে পশ্চিম ভারতের সম্পর্ক ছিল। সম্ভবত এই অচ্যুত সমুদ্রগুপ্তের হাতে পরাজিত হন। খৃ ৭-ম শতকে হিউ-এন-ৎসাঙ বৌদ্ধদের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র বলে অহিচ্ছত্রকে উল্লেখ করেছেন। গুরু দক্ষিণা হিসাবে অর্জুন দ্রুপদকে ধরে আনলে এই অহিচ্ছত্র দ্রোণকে দিয়ে দ্রুপদ (দ্রঃ-) মুক্তি পান।

অহিরথ—পুরু বংশে এক জন রাজা।

অহির্বুধ্ন্য—(১) ঋক্‌বেদে একটি গৌণ দেবতা। অন্তরীক্ষে অবস্থান। বৃত্রের একটি কল্যাণ রূপ অহি। বুধ্ন্য=গভীর জলের সর্প। যজু ও অথর্ববেদ একে ভয় ও শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছিল। মহীধরের মতে অগ্নি। (২) পুরাণ ও সাহিত্যে ইনি শিব/রুদ্র। স্কন্দ পুরাণে একাদশ রুদ্রের এক জন। (৩) বিশ্বকর্মা (দ্রঃ) ও স্ত্রী সুরভির একটি ছেলে। (৪) স্থাণুর (দ্রঃ) ছেলে এক জন রুদ্র। (৫) পাতালে একটি সাপ। অহিবুর্ধ্ন বা অহিব্রর্ধ্ন অশুদ্ধ কিন্তু বহু স্থানে চলে গেছে। দ্রঃ- অজ এক-পাদ।

অহির্বুধ্ন্য দেবতা—নক্ষত্র উত্তর ভাদ্রপাদ।

অহীনগু—সূর্যবংশে দেবানীকের ছেলে। সৎসঙ্গে কাল যাপন করে প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করেছিলেন।

অহীশুব—একজন অসুর ; ইন্দ্র একে বধ করেন (ঋক্ ৮।৩২।২৬)।

অহুর-মজ্‌দা—সংস্কৃত প্রতিরূপ অসুর+মেধস্। আর্য বা ইন্দোইরানীয় দেবতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বা প্রধান বা ঈশ্বর হলেন অহুর (=সংস্কৃত অসুর=অসু+র প্রাণবান্)। জরথুশত্র ইরানে একেশ্বর বাদ প্রচার করেন এবং অহুর মজদা একমাত্র সৃষ্টিকর্তা বলে গৃহীত হয়। এ'র নীচে বা এ'র প্রতিদ্বন্দ্ব অন্য কোন দেবতা আর রইল না। কিন্তু এ'র প্রতিস্পর্দ্ধী অসত্য ও অন্ধকারের প্রতীক অহ্‌রিমন্ নামে পাপপুরুষ স্বীকৃত হয়েছে। এবং ক্রমশ দএব-রা অর্থাৎ দেবতারা ঈশ্বর বিদ্বেষী অপদেবতায় পরিণত হয়েছে। ইরানীয় দইব=আবেস্তা দএব=সংস্কৃতে দেব। অহুর মজ্‌দা=আধুনিক ফারসিতে হোরমজদ্। অহ্‌রিমন (=আধুনিক ফারসি)=অংগ্রমৈন্যু। দও বা দীব্ (আধুনিক ফারসি)=রাক্ষস। জরথুশত্র=সংস্কৃত জরদুষ্ট্র।

অহোবল নৃসিংহ—একটি তীর্থ। মাদ্রাজে কর্ণাল জেলাতে কুদ্দপ থেকে পূব দিকে একটু দূরে। এখানে গরুড়াদ্রি পর্বতে এক গুহাতে নৃসিংহ মূর্তি রয়েছে। এই পাহাড়ের পাদদেশে, মধ্যদেশে ও শিখরে তিনটি পবিত্র মন্দির রয়েছে।

অহোরাত্র—মানুষের এক মাসে পিতৃগণের এক অহোরাত্র। কৃষ্ণপক্ষ দিন, শুক্লপক্ষ রাত্রি। মানুষের এক বছরে দেবতাদের এক অহোরাত্র ; উত্তরায়ণ দিন, দক্ষিণায়ন রাত। দ্রঃ- যুগ।

আইহোলি—প্রাচীন অয্যাভোলে বা আর্যপুর। উত্তর ১৬°৫০', পূর্ব ৭৫°৫৭'। মহীশূরে সিঙ্গাপুর জেলায় কাটগেরি স্টেসন থেকে ১৯ কিলোমিটার দূরে মালপ্রভা নদীর অপর পারে অবস্থিত প্রাচীন গ্রাম। চালুক্য বংশের রাজত্বকালে নির্মিত কয়েকটি মন্দির রয়েছে। মেগুটি মন্দিরে দ্বিতীয় পুলকেশীর (৬৩৪ খৃ) সময়ে ক্ষোদিত শিলালিপি বর্তমান। উত্তর ভারতের শিখর বা রেখ মন্দির এবং ধাপে ধাপে রচিত ছাদবিশিষ্ট দ্রাবিড় শৈলী এখানে একত্রে মিশেছে। ৩১৪-টি চতুরস্র আসনবিশিষ্ট রেখ মন্দির ছাড়া শিখর যুক্ত দুর্গা মন্দিরের আসন আয়ত, কিন্তু পেছনের অংশ অর্দ্ধবৃত্ত। পর্বতে ক্ষোদিত বৌদ্ধ বিহারে এই রকম আসন দেখা যায়। লাড়খানগুড়ি দ্রাবিড় শ্রেণীর প্রাচীনতম মন্দির শ্রেণীর অন্তর্গত। পিঢ়া বিশিষ্ট দেউলের প্রাচীন নিদর্শনও এখানে আছে। লকুলীশাদি বহু শিবমূর্তি, অনন্তশায়ী এবং বামনাদি বিষ্ণুমূর্তি এবং ব্রহ্মাদির মূর্তি মন্দিরে খোদিত আছে। মূর্তিগুলি সহজ, ও সুন্দর ও বলিষ্ঠ।

আউল বা আউলিয়া—এক শ্রেণীর মুসলমান উপাসক সম্প্রদায়। অপর নাম সহজ কর্তাভজা। আদিগুরু আউলিয়া ; ফলে সম্প্রদায়ের এই নাম। এ'দের গুরুপীঠের নাম গদি ; পশ্চিম বাঙ্গলাতে এ'দের কয়েকটি গদি আছে। এ'দের পরমার্থ প্রকৃতি-সাধনা। প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে ইচ্ছানুরূপ বহু বারাঙ্গনা ও গৃহাঙ্গনা এ'দের সাধন-সম্পাদনে নিযুক্ত। নিজের স্ত্রীকে (প্রকৃতি) অপরের অনুরক্ত দেখলেও এ'দের ঈর্ষা বা অসন্তোষ হয় না। এ'রা দাড়ি গোঁফ রাখেন না।

আউলচাঁদ—কর্তাভজা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে নদীয়াতে উলা গ্রামে বারুই জাতীয় পান ব্যবসায়ী মহাদেব দাস তার পানের বরোজের মধ্যে এ'কে কুড়িয়ে পান ও মানুষ করেন। পাগলাটে বা আকুল স্বভাবের জন্য বা সুফি সাধকদের উপাধি আউলিয়া থেকেও এই নাম হতে পারে। অবশ্য ইনি মুসলমান ফকিরের ন্যায় বেশ পরতেন। অনুমান কোন মুসলমান সহজ সাধকের শিষ্য ছিলেন। গুরুর নাম জানা নেই। ভক্তেরা চৈতন্যদেবের অবতার মনে করতেন। সুফিদের হক মতবাদ এবং চৈতন্যদেবের ভক্তিবাদের আত্মসমর্পণ বা আত্মবিলোপ এ'দের ধর্মের মূল কথা। বড় হয়ে উদাসীন হয়ে চলে যান এবং ২৪ পরগণা ও সুন্দর-বন অঞ্চলে নানা স্থানে বাস করেন। বেজরা গ্রামে বাস করার সময় ২৭ বছর বয়সে ধর্মগুরু রূপে প্রকট হয়েছিলেন এবং এইখানে তাঁর প্রধান ২২-জন শিষ্যকে লাভ করে-ছিলেন। মৃত্যু ১৭৬৯-১৭৭০ খৃঃ। মৃত্যুর পর দল ভাঙতে থাকে। এই ২২-জন শিষ্যের মধ্যে রামশরণ পাল কর্তাভজা (দ্রঃ) সম্পদায়ের প্রতিষ্ঠাতা।

আউলিয়া মনোহর দাস—বৈষ্ণব পদের প্রসিদ্ধ একজন সংগ্রহকর্তা। এ'র বিরাট গ্রন্থ পদ-সমুদ্র। আর একটি বই নির্যাসতত্ত্ব। আদিবাস বিষ্ণুপুরে ; বহু তীর্থ ঘুরে হুগলিতে বদনগঞ্জে বহুদিন বাস করে ছিলেন। এই অঞ্চলে বহু পরিবার এ'র শিষ্য। ১৬৩৮ সালে বৃন্দাবনের পথে জয়পুরে মারা যান ; সেখানে তাঁর সমাধি-

মন্দির আছে। বদনগঞ্জে প্রতি বছর মকর সংক্রান্তিতে এঁর মেলা হয়। নিত্যানন্দ শাখাভুক্ত জাহ্নবী দেবীর মন্ত্রশিষ্য। সখীভাবে কৃষ্ণের ভজনা করতেন ; মাথায় খোপা বেঁধে সাড়ি, কাঁচুলি,, নোলক, মল ইত্যাদি পরতেন। প্রবাদ সাধনবলে আড়াইশ বছরের অধিক জীবিত ছিলেন।

আকরাবন্তী—মালব। আকর=পূ-মালব। অবন্তী=প-মালব। বৃহৎসংহিতাতে আকারবেণাবন্তিকা।

আকালি—শিখ সম্প্রদায়ের একটি অংশ। খালসা দল সৃষ্টির সময়ই আসলে এঁদের উদ্ভব। গুরু নানকের প্রেম ও শান্তির বাণীর সঙ্গে যুদ্ধ প্রিয়, অসমসাহসিক এবং কখনো কখনো পরার্থে লুঠতরাজরত আকালিদের কোথাও মৌলিক সাদৃশ্য নাই। আকালিরা ঈশ্বরের জন্য আত্মসমর্পণকারী যোদ্ধা। কৃপাণকে কেন্দ্র করে এঁদের ভাব জগৎ ও কর্ম জগৎ। কোন পার্থিব প্রভুর প্রভুত্ব এঁরা স্বীকার করেন না। এঁরা পারিবারিক বন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ না হলেও মানুষের ও সমাজের প্রতি কর্তব্য এঁদের জীবনের একটা বিরাট অংশ। এক জন আকালি নিজ হাতে একটা রাস্তা তৈরি করতে করতে জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন ; গ্রামবাসী ভক্তিভরে তাঁকে আহার্য্য দিয়ে গেছেন এ রকম বহু দৃষ্টান্ত আছে।

আকাশ—পঞ্চভূতের একটি। এইটি আদি ভূত। আকাশ থেকে বায়ু>তেজ> অপ>ক্ষিতি উৎপন্ন হয়েছে। বেদান্তে আকাশ ৪-প্রকার :—মহাকাশ, ঘটাকাশ, জলাকাশ ও মেঘাকাশ (অভ্রস্থ)। বৈশেষিক নববিধ দ্রব্যের একটি।

আকাশগঙ্গা—মন্দাকিনী।

আকাশপ্রদীপ—বাঁশ ইত্যাদির মাথায় দেবতাদের উদ্দেশে আশ্বিন সংক্রান্তি থেকে কার্তিক মাসে প্রতি সন্ধ্যায় আকাশ বা বিষ্ণু মন্দিরে যে প্রদীপ দেওয়া হয়।

আকাশমুখী—বা উর্দ্ধমুখী শৈব সম্প্রদায়। কৃচ্ছ্র সাধনের জন্য আকাশের দিকে মুখ করে থাকেন। এই ভাবে থাকতে থাকতে শেষ পর্যন্ত ঘাড় নীচু করে মুখ নামান অসম্ভব হয়ে পড়ে। এঁরা ভিক্ষাজীবী, জটাধারী, দাড়ি, গোঁফ রাখেন এবং রঙিন বস্ত্র পরেন।

আকূতি—স্বায়ম্ভুব মনুর ঔরসে শতরূপার গর্ভে আকূতি ও প্রসূতি নামে দুই মেয়ে হয়। আকূতির স্বামী প্রজাপতি/মহর্ষি রুচি।

আখড়া—সংস্কৃত অক্ষবাট। মূলে অর্থ মল্ল-বা-ক্রীড়া ভূমি। ছোট ছোট ধর্ম সম্প্রদায়ের আশ্রম বা মঠ। যাত্রার আখড়া ইত্যাদি অর্থেও ব্যবহার আছে।

আগম—বেদাদি আপ্তবাক্যাত্মক শাস্ত্র। তন্ত্রশাস্ত্রের আর এক নাম। মহাদেবের মুখ থেকে 'আ'গত, পার্বতীর কাণে 'গ'ত ও বাসুদেবের 'ম'ত/সম্মত বলে নাম 'আগম' শাস্ত্র। পিঙ্গালামত তন্ত্রমতে যে শাস্ত্রে চতুর্দিকের বস্তু সমূহের (আজ্ঞা) সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ (গমাতে) করা যায়। আগম-শাস্ত্রে সাতটি বিষয় আলোচিত হয় :—সৃষ্টি, প্রলয়, দেবতার অর্চনা, সাধনা, পুরশ্চরণ, ষট্কর্ম ও চতুর্বিধ ধ্যানযোগ। সংখ্যার হিসাবে

বলা হয়েছে কলিযুগে বিষ্ণু ক্রান্তাতে (বিন্ধ্যের পূর্বে,) ৬৪টি ; অশ্বক্রান্তাতে বিন্ধ্যের উত্তরে) ৬৪টি এবং রথক্রান্তাতে (বিন্ধ্যের দক্ষিণ)-৬৪টি মোট ১৯২-টি আগমশাস্ত্র শিব প্রচার করেন। আগম ও নিগম মিলে তন্ত্র শাস্ত্র। আগম গ্রন্থগুলির সাহিত্যিক তথা দার্শনিক মূল্যে শূন্য , মুর্খ, গ্রাম্য অথচ শিক্ষাভিমানী স্বামী-স্ত্রীর বাকুম-বাকুমে পরিণত। অতি নিম্ন মানের প্রচার সাহিত্য। দ্রঃ- তন্ত্র, শৈব ও শাক্ত দর্শন।

আগমনী—দুর্গা। স্বামীর ঘর থেকে প্রতি বছর শরৎ-কালে হিমালয়ে পিতৃগৃহে যেন ফিরে আসেন। এই বিষয় নিয়ে বাঙ্গলায় বহু গান রচিত হয়েছে। বাঙ্গলা দেশের গানের একটি বিশিষ্ট শ্রেণী। দ্রঃ- দুর্গা পূজা।

আগ্নীধ্র—ধন দিয়ে বরণীয় ঋত্বিক। সাগ্নিক ব্রাহ্মণ।

আগ্নেয়—(১) কার্তিক (দ্রঃ)। (২) অঙ্গিরা-রা অগ্নিসম্ভূত বলে আগ্নেয় নামেও পরিচিত ছিলেন। (৩) দক্ষিণাপথে মাহিষ্মতী পুরী , বিশিষ্ট দেশ। দ্রঃ-নীল।

আগ্নেয়াস্ত্র—অগ্নির ছেলে অগ্নিবেশ্যকে ভরদ্বাজ এই অস্ত্র দেন। মহাভারতে (১।১৫৮।২৭) আছে প্রথমে বৃহস্পতি ভরদ্বাজকে দেন। অগ্নিবেশ্য আবার দ্রোণকে দেন। দ্রোণের কাছ থেকে অর্জুন পেয়েছিলেন। ঔর্ব ঋষিও সগর রাজাকে এই অস্ত্র দিয়েছিলেন। অগ্নি দেবতার অস্ত্র ; ব্রহ্মাস্ত্র, ব্রহ্মশির, পাশুপতাদি অস্ত্র। প্রাচীন ভারতে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহারের কোন প্রমাণ নেই কিন্তু। বারুদ ব্যবহার জানা ছিল না। তীর সাহায্যে জ্বলন্ত কিছু হয়তো ছুঁড়ে মারা হত।

আগ্রয়ণ—মনু/ভানুর ৪র্থ পুত্র। দ্রঃ- অগ্নিবংশ। ইন্দ্রের যজ্ঞে একে আগ্রয়ণ হবি দেওয়া হয়।

আঙ্করটোম—কম্বুজ দেশের রাজধানী। দ-পূর্ব এসিয়াতে প্রাচীন হিন্দু রাজাগুলির মধ্যে কম্বুজ (কম্বোজ, বর্তমানে কাম্বোডিয়া) একটি দেশ। ১২ শতকে বঙ্গোপসাগর থেকে দক্ষিণে চীন সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ইন্দোচীন উপদ্বীপ কম্বুজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কম্বুজ সম্রাট ৭ম জয়বর্মা ১১৮১ খৃস্টাব্দে রাজা হন এবং নিজের রাজধানী রূপে এই বিরাট নগরী আঙ্করটোম (সংস্কৃত নগর-ধাম) স্থাপন করেন। নগরের চারদিকে পাথরের প্রাচীর ছিল ১৩ কি-মিটার। প্রাচীর ঘিরে ১০১ মিটার চওড়া পরিখা ছিল। পরিখার দুপাড় পাথর বাঁধান। নগরীর সিংহদ্বার ৯ মিটার মত উঁচু ছিল। আঙ্করটোম নগরী সমচতুষ্কোণ। ৩০ মিটার চওড়া ৫০টি সোজা রাজপথ নগরীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত উত্তর দক্ষিণে ও পূর্বপশ্চিমে বিস্তৃত। নগরীতে বহু মন্দির ও প্রাসাদ ছিল এবং এগুলির মধ্যে বেয়ন নামে মন্দিরটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। নগরীর মাঝখানে ৭০০ মি × ১৫১ মি একটি মুক্ত অঙ্গন।

আঙ্করভাট—আঙ্করটোমের ১.৬ কি-মি দক্ষিণে কম্বুরাজ্যের একটি বিশাল মন্দির। খৃঃ- ১২ শতকের প্রথম দিকে রাজা দ্বিতীয় সূর্যবর্মা তৈরি করেছিলেন। মন্দিরটির চারদিকে ৪ কি-মি মত লম্বা পাথরের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ; প্রাচীরের বার দিক ১৯৮ মি চওড়া পরিখা দিয়ে ঘেরা। পরিখা পার হবার সেতুটি ১১ মি চওড়া। সেতুর পরই

৪৭৫-মি লম্বা এবং সমতল ভূমি থেকে ২-মিটার উঁচু একটি রাস্তা মন্দিরে গিয়ে পৌঁছেছে। মন্দিরের প্রথম তলা কক্ষ ও বারান্দা ২৪৪মি × ২০৬ মি। এই এক তলার সারা গায়ে প্রধানত মহাভারত কাহিনী এবং নানা দেব দেবীর মূর্তি ক্ষোদিত রয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলাতে যেতে হয়। এই তলাগুলি অবশ্য গ্যালারির মত; ঠিক একটির ওপর আর একটি নয়। তৃতীয় তলার মাঝখানে একটি অঙ্গন এবং এই অঙ্গনের মাঝখানে একটি বিষ্ণু মন্দির। মন্দিরের চূড়া কতকটা উড়িষ্যার মন্দির চূড়ার মত; এবং ৬৪ মি-উচ্চ। আঙ্করভাটের বিশালতা, নির্মাণ কৌশল ও কারুকার্য এই তিন মিলে এত বিরাট মন্দির পৃথিবীতে আর একটিও নাই।

আঙ্গিরস—অঙ্গিরস মুনির ছেলে। দেবগুরু বৃহস্পতি ইত্যাদি।

আঙ্গিরসকল্প—অথর্ব বেদের একটি সংহিতা।

আঙ্গিরসী—দ্রঃ রাজা কল্মাষপাদ।

আজিহ্বক—বিশ্বামিত্রের এক ছেলে। ব্রহ্মবাদী।

আচমন—ধর্মকর্মের জন্য মন্ত্রপাঠ করে বিধিমত জল গ্রহণ। পূজার আগে তিনবার জলপান করে, দুবার সংবৃত ওষ্ঠাধর মার্জনা করে, মাথাদি ছয় বা আট অঙ্গ স্পর্শরূপ প্রতীক শুদ্ধি-ক্রিয়া। মনু মতে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হৃদয়, মস্তক, মতান্তরে নাভি ও বাহু সমেত আট অঙ্গ স্পর্শ করতে হয়।

আচার—সদাচার হিন্দুধর্মের অঙ্গ। মনুসংহিতা মতে সরস্বতী ও দৃশদ্বতী এই দুই নদীর মধ্যবর্তী ব্রহ্মাবর্ত নামে দেশে পরম্পরাক্রমে প্রচলিত আচারই সদাচার। বিভিন্ন পুরাণে সদাচারের যে বিবরণ আছে সে অনুসারে শাস্ত্রোক্ত ধর্ম ও স্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক সমস্ত কর্তব্য কর্মই সদাচার। আচারহীন ব্যক্তি সর্বদা নিন্দনীয়। এ ছাড়া লোকাচার, দেশাচার ইত্যাদি আরো অনেক আচার ছিল।

তন্ত্র বেদ, বৈষ্ণব, শৈব বা দক্ষিণাচার যে কোন আচার পদ্ধতি অবলম্বন করে ৫-টি তত্ত্বের অনুকল্প দিয়ে দেবতার পূজা পশু-আচার বলে উল্লিখিত। কিন্তু তান্ত্রিক আচার অর্থাৎ বামাচার, সিদ্ধান্তাচার বা কৌলাচার অবলম্বনে পূজা ও মুখ্য ৫-তত্ত্বের দ্বারা পূজা বীরাচার। বামাচারে এই ৫-টি তত্ত্ব হচ্ছে পঞ্চমুদ্রা (মহা নির্বাণ তন্ত্র ১।৫৯)

আচারদীপ—রাজা, অশ্ব প্রভৃতির নীরাজনার্থ প্রদীপ।

আচার্য—শিষ্যকে উপনীত করে যে ব্রাহ্মণ তাকে সকল্প ও সরহস্য বেদ পাঠ করান।

আজগব—অজগব (দ্রঃ)

আজীবিক—বৌদ্ধ ও প্রাক-বৌদ্ধযুগের অবৌধ সন্ন্যাসী ও পরিব্রাজক সম্প্রদায়ের একটি অংশ। খৃ-পূ ৬ শতকে এঁদের উৎপত্তি মনে হয়। মহাভারত, বায়ুপুরাণ, ললিতবিস্তার প্রভৃতি গ্রন্থে এঁদের উল্লেখ আছে। মক্খালি গোসাল এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। এঁরা সকলেই নগ্ন। ভগবান বুদ্ধ এঁদের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। ক্রিয়া, বীর্য, কর্ম ইত্যাদি স্বীকার না করার জন্য বুদ্ধদেব এঁদের হেয় জ্ঞান করতেন। আজীবিক অর্থে যাঁরা অপরের দান গ্রহণ করে জীবন ধারণ করেন; অর্থাৎ ভিক্ষাজীবী। অন্য মতে আজীবিক অর্থে বিশেষ সম্প্রদায়ের বিশেষ একটি জীবন

যাত্রা। আর একটি মতে মক্‌খালি গোসালের আজীবন পালনীয় প্রতিজ্ঞাই হচ্ছে আজীবিকতা।

প্রাচীন আজীবিকরা অত্যন্ত কঠোর ব্রতধারী। সম্ভবত দলবদ্ধ হয়ে এঁরা লোকালয়ের বাইরে বাস করতেন। সম্পূর্ণ অদৃষ্টবাদী; বার্হস্পত্য মতবাদের সঙ্গেও এঁদের মতবাদের কতকটা সাদৃশ্য রয়েছে। এঁদের মতে নিয়তির নির্দেশে মানুষে সুখ বা দুঃখ ভোগ করে; জন্মান্তর মাধ্যমে শেষকালে মুক্তি। এঁদের সংঘজীবন, আলোচনা গৃহ ইত্যাদি নির্দিষ্ট স্থান ছিল। বহু গ্রন্থে এঁদের আচার-ব্যবহারের অতি ঘৃণ্য বিবরণ আছে। গাঙ্গেয় অঞ্চলে সমস্ত বড় বড় সহরে এবং দক্ষিণাত্যে দ্রাবিড় অঞ্চলেও এঁরা বর্তমান ছিলেন। দ্রাবিড় অঞ্চলে এঁদের প্রভাব সব চেয়ে বেশি ছিল মনে হয়। খৃ ১৪ শতকে তামিলনাদেও এঁরা বর্তমান ছিলেন।

অজন্টার একটি গুহাচিত্রে একটি নগ্ন সন্ন্যাসী আছে। বিখ্যাত আজীবিক উপকের সঙ্গে বুদ্ধের সাক্ষাতের দৃশ্য বোরোবুডুরের একটি ভাস্কর্যে রয়েছে। বোরোবু-ডুরের আজীবিক মূর্তিগুলি অবশ্য নগ্ন নয়। বরাবর গুহায় অশোক-শিলালেখ, নাগার্জুন গুহায় দশরথ-শিলালেখ প্রভৃতিতেও এঁদের উল্লেখ আছে।

আজ্ঞাচক্র—সাধনচক্র বিশেষ। ষট্‌চক্রের (দ্রঃ) অন্তর্গত ষষ্ঠচক্র।

আজ্যপ—ঘৃতপায়ী। এঁরা পুলস্ত্যের ছেলে। বৈশ্যদের পিতৃগণ (দ্রঃ)।

আঠারনালা—জগন্নাথ ক্ষেত্রের উত্তর দিকে ছোট একটি নদী মত। আঠার খিলান যুক্ত সেতুর জন্য নাম। প্রবাদ রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন এখানে নিজের ছেলেদের বলি দিয়েছিলেন।

আড়বার—একটি তামিল শব্দ। আড় অর্থে নিমগ্ন অর্থাৎ যিনি ভগবানে নিমগ্ন। এঁদের মধ্যে বৈরাগ্য, জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব সমন্বয়। এঁরা সকলেই ঐকান্তিক বৈষ্ণব। অর্চাবিগ্রহে ও তীর্থস্থানগুলিতে এঁদের পরম ভক্তি। কখনো এঁরা জ্ঞানদশায় পরমেশ্বরের ঐশ্বর্যের ধ্যানে, কখনো প্রেমদশায় ভগবানের মাধুর্য রসে বিভোর থাকেন। এই প্রেম দশায় দাস্য, সখ্য বাৎসল্য ও নায়িকা ভাবের অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে; তবে দাস্য ও নায়িকা ভাবকেই এঁরা প্রাধান্য দেন। নায়িকা দশায় কখনো স্বকীয় বা কখনো পরকীয় ভাব বিদ্যমান।

এঁদের ভজন ধারায় সংকীর্তন একটি প্রধান অঙ্গ। ভগবানের মঙ্গল গান আড়বার সঙ্গীতের একটা বিরাট অংশ। বাঙলার কীর্তন পদাবলীর ভাব, সুর ও তালের সঙ্গে আড়বার পদাবলীর ভাব, সুর ও তালের প্রচুর সাদৃশ্য রয়েছে। শ্রীরঙ্গমে প্রতি বছর পৌষ মাসে তিরু-অধ্যয়ন মহোৎসবে দ্রাবিড়বেদান্তের ৪০০০ শ্লোক অভিনয় সহকারে গীত হয়। দ্রঃ- শ্রীসম্প্রদায়। এঁদের বার জন আড়বার ঃ—পোয়্‌গৈ, পূদত্ত, পে, তিরুমড়িশৈ, নম্মাড়্‌বার, মধুরকবি, কুলশেখর, পেরিয়াড়্‌বার, অণ্ডাল, তোণ্ডারিপুড়ি, তিরুপ্পান, তিরুমঙ্গই। এঁদের দিব্য উক্তিগুলি দ্রাবিড়বেদান্ত নামে পরিচিত। আড়বার অণ্ডাল মহিলা ছিলেন; গোপীভাবময়ী সাধিকা। তিরুপ্পান ছিলেন সংকীর্তনের সজীব মূর্তি। নম্মাড়বার রচিত সহস্রশ্লোকাবলী বা সহস্রগীতি ভগবানের বিশেষত অর্চাবতারের বিভূতি ও মহিমাসূচক পদাবলী।

আড়ীবক—এক জন অবতার। দ্রঃ- বিষ্ণু, রাজসূয়।

আত্মা—ব্রাহ্মণ্য দর্শনে জীবের সমস্ত দুঃখের মূল আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞতা। অর্থাৎ নিজেকে বা আত্মাকে ঠিক মত জানতে পারার ওপর জীবের সমস্ত সুখদুঃখ নির্ভর করছে। এই আত্মা দেহ ও মনের অতীত। বৌদ্ধ মতে আত্মা বলে স্থায়ী নিত্য পদার্থ কিছু নাই। সাধারণে যাকে আত্মা বলে সেটি হচ্ছে আশু-বিনাশী মানস-ধর্ম-প্রবাহ। বৌদ্ধমতে নিত্য আত্মাকে স্বীকার করাই সর্বদুঃখের মূল। জৈন মতেও আত্মার স্বরূপ না জানাই জীবের দুঃখের মূল কারণ। অর্থাৎ উপরি উক্ত তিনটি চিন্তাধারাতেই আত্মাকে না জানাই জীবের দুঃখের মূল কারণ ; অবশ্য দুঃখ জয়ের জন্য আত্মার এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ পলায়নবাদিতা। ভারতীয় দার্শনিকদের বেশির ভাগেরই মত দেহ ও ইন্দ্রিয়ের অতীত এই আত্মা এবং এই আত্মা অপরিণামী। চার্বাক মতে আত্মা স্বীকৃত নয়। আবার বৌদ্ধরা বলেন জড়ভূত ছাড়াও জ্ঞান (=বিজ্ঞান) নামে এক জাতীয় পদার্থ রয়েছে এবং এই অতিরিক্ত জ্ঞানই আত্মা। কিছু ভারতীয় দার্শনিক মতে আত্মা একটি আধার =দ্রব্য ; জ্ঞান, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি মানস ব্যাপারগুলি এই আধারে বর্তমান। আবার কোন কোন মতে আত্মা হচ্ছে গুণ। কোন মতে ভিন্ন-ভিন্ন জীব অনুসারে আত্মা বিভিন্ন, আবার অন্য মতবাদে সব আত্মাই এক। সব আত্মাকে যাঁরা এক বলেন তাঁরা অন্তঃকরণ বলে আর একটি জিনিস কল্পনা করে নিয়েছেন এবং এঁদের মতে এই অন্তঃকরণ দেহ ও আত্মার মধ্যবর্তী সত্তা ; অন্তঃকরণ বহু কিন্তু আত্মা এক। আত্মা স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বপ্রকাশ, কূটস্থ চৈতন্য। আত্মার অভ্যন্তরে অবস্থিত পরব্রহ্ম জ্ঞাননেত্রে প্রকাশ পান। আত্মারূপ উজ্জ্বলকোষেই পরব্রহ্মের স্থান। এই আত্মাকে জানতে পারাই মুক্তি বা মোক্ষ। সাংখ্য মতে আত্মা চৈতন্য স্বরূপ এবং অনেক। যত জীব তত আত্মা। আত্মা বা পুরুষ অজ্ঞানবশতঃ প্রকৃতির জালে আবদ্ধ হয়। যোগ অভ্যাসে আত্মা মুক্তি পায়। মুক্ত আত্মার সুখ দুঃখ নাই। মুক্ত আত্মা বিশুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ। অদ্বৈত বেদান্ত মতে আত্মা এক, অব্যয়, চৈতন্যস্বরূপ, আনন্দময়, নিত্য বুদ্ধ ও শুদ্ধ। একটি মতে চেতন বায়ু থেকে আত্মার জন্ম। আত্মার চারটি দশা ঃ—জাগ্রত, স্বপ্নগত, সুষুপ্ত, ও তুরীয়। বিজ্ঞানে আত্মা অস্বীকৃত।

আত্মারাম—আত্মা যাঁর আরাম (=আনন্দ স্থান)। ব্রহ্মে যাঁর সুখানুভব। ব্রহ্ম, দেহ, মন, যত্ন, ধৃতি, বুদ্ধি, স্বভাব এই সাতটিতে যিনি আরাম (সুখ) অনুভব করেন।

আত্মোপনিষৎ—জীবাত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ নির্ণায়ক গ্রন্থ।

আত্যন্তিক ভেদাভেদ—দ্রঃ- অচিন্ত্য ভেদাভেদ।

আত্রেক—হিরণ্য নদী (মহাভা)। পুরাণে নাম হাটক। সাঁনিয়ম (গ্রীক)—শকদ্বীপে=সিদিয়া (তুর্কিস্থান)। কাস্পিয়ান সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। দৈত্য ও দানব দেশ। হিরকানিয়া ও সুপর্ণ দেশের মধ্যবর্তী সীমা।

আত্রেয়—অত্রি মুনির ছেলেরা। নাড়িজ্ঞান প্রকরণ গ্রন্থ প্রণেতা এক জন মুনি।

আত্রেয়ী—অত্রির মেয়ে। (১) বাল্মীকির শিষ্যা। বাল্মীকির কাছে বেদ বেদাঙ্গ পাঠ করেন। পরে বাল্মীকি লবকুশের শিক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়লে আত্রেয়ী বাল্মীকি আশ্রম ত্যাগ করে উপযুক্ত গুরুর খোঁজে অগস্ত্যের শিষ্যা হন। অগস্ত্য সযত্নে শিক্ষা দিয়ে-

ছিলেন। আত্রেয়ী পরে অদ্বিতীয়া বিদুষী রূপে খ্যাতি লাভ করেন। (২) অগ্নির ছেলে অঙ্গিরসের স্ত্রী। অঙ্গিরস সব সময়ই স্ত্রীকে কটু কথা বলতেন। আত্রেয়ী পিতাকে জানালে অত্রি উপদেশ দেন অগ্নির ছেলে বলে অঙ্গিরসের এই রকম স্বভাব ; জল দিয়ে শান্ত করতে হবে। আত্রেয়ী তখন নদীতে পরিণত হয়ে স্বামীকে শান্ত করেন। এটি আত্রেয়ী বা পরুষ্ণী নদী। (৩) অনসূয়ার অপর নাম। (৪) মনুর ছেলে উরু, উরুর স্ত্রী আত্রেয়ী ; সন্তান অঙ্গ, সুমনস্, খ্যাতি, ক্রতু, অঙ্গিরস ও গয় (অগ্নি পু ১৮।- ।)

আদমসুমার—কৌটিল্যের পরিকল্পিত রাষ্ট্র ব্যবস্থাতে আদমসুমারের স্থান ছিল। যাদের ওপর রাজস্ব আদায়ের ভার ছিল তাঁরা স্বীয় এলাকাতে সমস্ত বাড়ি, লোক সংখ্যা এবং তাঁদের জাতি পেশা ইত্যাদির হিসাব রাখতেন। রাজ্যের সর্বত্রই এই ব্যবস্থা চালু ছিল। অর্থাৎ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মন্ত্রী যদি চাণক্য হন তাহলে খৃষ্ট জন্মের আগেই ভারতে আদম সুমার প্রচলিত ছিল। মেগাস্থেনিসের বিবরণে আছে পাটলিপুত্রেও জন্মমৃত্যুর হিসাব রাখতে হত। এই হিসাব রাখার অর্থ আদম সুমারের প্রাথমিক পর্যায়।

আদর্শাবলী—আরাবল্লী পাহাড়।

আদি—অন্ধকাসুরের ছেলে। তপস্যায় বর পান শিবের ওপর পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ নিতে পারবেন। সর্প বেশে তারপর দ্বারীকে ধোঁকা দিয়ে ভেতরে এসে পার্বতীর রূপ ধরে শিবের দিকে এগিয়ে যান। মহাদেব বুঝতে পারেন ; আদি নিহত হন। দ্রঃ-আবি।

আদিগঙ্গা—ভাগীরথীর একটি প্রাচীন শাখা। এর তীরে কালীঘাট। ১৬৬০ খৃস্টাব্দের মানচিত্রে সাগর দ্বীপের উ-পূর্বে বর্তমান কাকদ্বীপ পর্যন্ত এই জলপথ আঁকা আছে। এর ১০০ বছর পরের মানচিত্রে এই নদীর সন্ধান নাই। জয়নগর থানার দক্ষিণ পর্যন্ত আজও এই লুপ্ত নদীপথের সাক্ষ্য রয়েছে। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে এই পথে বাণিজ্য তরী যাতায়াতের উল্লেখ আছে। শ্রীচৈতন্য নাকি নৌকায় এই পথে চক্রতীর্থ (মথুরাপুর থানাতে) হয়ে রূপনারায়ণ তটে তমলুকে যান এবং সেখান থেকে স্থলপথে পুরী যান। বর্তমানের আদি-গঙ্গা কর্ণেল টলির দ্বারা গড়িয়া পর্যন্ত আংশিক সংস্কৃত জলপথ। আদি গঙ্গার নীচে ভাগীরথীর মূল প্রবাহের গঙ্গা মাহাত্ম্য নাই।

আদিগ্রন্থ—শিখদের প্রসিদ্ধ পূজ্য ধর্মগ্রন্থ।

আদিত্য—সাধারণ অর্থে সূর্যের (দ্রঃ) একটি নাম। বৈদিক সাহিত্যে এরা অনেকগুলি দেবতা এবং অদিতির (দ্রঃ) সন্তান। এই অদিতি কিন্তু কশ্যপপত্নী নন। পৃথিবীর রস গ্রহণ করার জন্য বা চন্দ্র নক্ষত্রাদির দীপ্তি গ্রহণ করার জন্য বা স্বীয় দীপ্তিতে আবৃত বলে আদিত্য। ঋকে (২।২৭।১)— মিত্র, অর্যমা, ভগ, বরুণ, দক্ষ, অংশ ৬-জন আদিত্য। ঋক্‌বেদে অন্য জায়গায় (৯।১১৪।৩) এঁদের সংখ্যা ৭ কিন্তু নাম নাই। ঋকে (১০।৭২।৮-৯) ৮ জন আদিত্য জন্মান ; অদিতি ৭ জনকে (নাম দেওয়া নাই) নিয়ে দেবলোকে চলে যান এবং মার্তণ্ডকে ত্যাগ করে যান। ঋকে (৮।৩৫।১) ইন্দ্র, বরুণ ও বিষ্ণু আদিত্য নন কিন্তু ৮।৮৫।৪ ঋকে ইন্দ্র ও বরুণ আদিত্য হয়েছেন। অথর্ব বেদে (৮।৯।২১) এরা আট জন। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১।১।৯।১) এঁরা আটজন— মিত্র, বরুণ, অর্যমা, অংশ, ভগ, ধাতা, ইন্দ্র ও বিবস্বান। বৈদিক আদিত্যেরা সূর্যের

সঙ্গে সম্পর্কিত নন ; কিন্তু সকলেই দ্যুস্থান দেবতা। বেদের পরবর্তী যুগে আদিত্যেরা সকলেই সৌর দেবতা।

শতপথ ব্রাহ্মণে (৬।১।২।৮ ; এবং ১১।৬।৩।৮) এরা বারো জন, বারো মাসের দেবতা। কৃষ্ণ যজুর্বেদেও বার মাসের দেবতা যথাক্রমে তপন, ইন্দ্র, রবি, গভস্তি, যম, হিরণ্যরেতা, দিবাকর, চিত্র, বিষ্ণু, অরুণ, সূর্য, বেদজ্ঞ। মহাভারতে ও পুরাণে এদের সংখ্যা সব সময়ই বার এবং কশ্যপ অদিতির সন্তান। মহাভারতে আদিপর্বে আছে ধাতা, অর্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, ইন্দ্র, বিবস্বান, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা, পর্জন্য ও বিষ্ণু। বৃহৎ দেবতাতে কশ্যপ অদিতি সন্তান :—ভগ, অর্যমা, অংশ, মিত্র, বরুণ, ধাতা, বিধাতা, বিবস্বান, ত্বষ্টা, পূষা, ইন্দ্র ও বিষ্ণু। বিষ্ণু পুরাণে আট জন :—বিষ্ণু, শক্র, বিবস্বান, সবিতা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ। পদ্ম পুরাণে :—ইন্দ্র, বিষ্ণু, ভগ, ত্বষ্টা, বরুণ, অংশ, অর্যমা, রবি, পূষা, মিত্র, ধাতা ও পর্জন্য। বরাহ পুরাণে দ্বাদশ আদিত্যকে দ্বাদশ মাসের সূর্য এবং সংবৎসরের কর্তাকে হরি বলা হয়েছে।

কূর্ম পুরাণে বৈশাখে ধাতা, জ্যৈষ্ঠে ইন্দ্র, আষাঢ়ে রবি, শ্রাবণে বিবস্বান, ভাদ্রে ভগ, আশ্বিনে পর্জন্য, কার্তিকে ত্বষ্টা, অগ্রহায়ণে মিত্র, পৌষে বিষ্ণু, মাঘে বরুণ, ফাল্গুনে পূষা, চৈত্রে অংশ/অংশু।

মতান্তরে মেষ রাশিতে (বৈশাখে) বরুণ, বৃষ রাশিতে (জ্যৈষ্ঠে) সূর্য, মিথুনে সহস্রাংশু, কর্কটে ধাতা, সিংহে তপন, কন্যাতে সবিতা, তুলাতে গভস্তি, বৃশ্চিকে রবি, ধনুতে পর্জন্য, মকরে ত্বষ্টা, কুম্ভে চিত্র ও মীনে বিষ্ণু।

স্কন্দ পুরাণে কশ্যপপুত্র আদিত্যেরা (ইন্দ্র, ধাতা, ভগ, ত্বষ্টা, মিত্র, বরুণ, অর্যমা, বিবস্বান, সবিতা, পূষা, অংশুমান (অংশের পরিবর্তে) ও বিষ্ণু) নর্মদা নদীর তীরে সিদ্ধেশ্বর নামক স্থানে ভাস্করের/সূর্যের পদ লাভের জন্য উগ্র তপস্যা করে নিজেদের অংশ দিয়ে দিবাকরকে নির্মাণ করে স্থাপন করেন। স্কন্দ পুরাণে (১০১।৬০-৬১) বার মাসে যথাক্রমে আদিত্যদের নাম অর্যমা, বিবস্বান, অংশুমান, পর্জন্য, বরুণ, ইন্দ্র, ধাতা, মিত্র, পূষা, ভগ, ত্বষ্টা, বিষ্ণু। এই স্কন্দপুরাণেই (১০১।৫৯-৬০) আদিত্যদের নাম রয়েছে :—আদিত্য, সবিতা, সূর্য, মিহির, অর্ক, প্রতাপন, মার্তণ্ড, ভাস্কর, ভানু, চিত্রভানু, দিবাকর ও রবি।

তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ মতে বার মাসে বার জন আদিত্য, ৫ ঋতুতে ৫ জন আদিত্য, তিন লোকে তিন জন আদিত্য (সূর্য, বিদ্যুৎ, অগ্নি) এবং সূর্য মিলে মোট ২১ জন আদিত্য। ঋক্ ১।১৩৬।২ ভাষ্যে সায়ন বলেছেন সূর্য এক ; উপাধি ভেদে পৃথক স্তব করা হয়। সত্যব্রত সামশ্রমী মতে অরুণোদয়ের পর ভগ-উদয়কাল ; তারপর পূষা-উদয়কাল, সূর্যের তেজ তখনও অল্প ; তারপর অর্ক/অর্যমা (দ্রঃ) উদয়কাল ; এরপর মধ্যাহ্ন। অর্যমার অন্তে পূর্বাহ্ণ শেষ হয়ে যায়। মধ্যাহ্ন সূর্য বিষ্ণু আর এক মতে সূর্যকে বার্ষিক গতির অধিপতি হিসাবে বিষ্ণু নামে ; উত্তরায়ণ শেষ করে বর্ষা আনয়নকারী ইন্দ্ররূপে এবং দিন ও রাত্রিকে সমান কারক হিসাবে দক্ষ নামে অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ নাসৌ মুনিঃ যস্য মতং ন ভিন্নম্।

সর্বাধিক প্রচলিত বার জন আদিত্যের নাম ঃ—অর্যমা, মিত্র, বরুণ, ধাতা, ভগ, বিবস্বান, পূষা, ত্বষ্টা, বিষ্ণু, অংশ, সবিতা ও শক্র। পুরাণ অনুসারে এই নামের নানা হেরফের দেখা যায় ; তবে সংখ্যা, সব সময়ই বার। এই নামগুলি ঃ—পর্জন্য, ভাস্কর, যম, রবি, সূর্য, অংশুমান, ধনদ, জয়ন্ত, চণ্ড, সোম, উরুক্রম, বিধাতা, রুদ্র, বেদজ্ঞ, ভানু, গভস্তি, স্বর্ণরেতা, দিবাকর, ইন্দ্র, বরদ।

শিবপুরাণে আদিত্যদের জননী ভানু, দক্ষের মেয়ে। মহাভারত ও পুরাণাদি মতে চাক্ষুষ মন্বন্তরে যাঁরা তুষিত তাঁরাই বৈবস্বত মন্বন্তরে আদিত্য। হরিবংশে আছে ত্বষ্টা ভ্রমিযন্ত্রের সাহায্যে সূর্যের (দ্রঃ) তেজ কমাবার ব্যবস্থা করেন। সেই সময়ে সূর্যের অঙ্গভ্রষ্ট মুখরাগ থেকে দ্বাদশ আদিত্যের জন্ম হয়। পুরাণে আছে সংজ্ঞার (দ্রঃ) অনুরোধে বিশ্বকর্মা সূর্যের তেজ কমাবার জন্য সূর্যকে ভেঙ্গে বারটি আদিত্যে পরিণত করে সূর্যের তেজ কমিয়ে দেন।

আদিত্যদের মূর্তি তৈরি সম্বন্ধে ধর্মোত্তরকার বলেছেন দ্বাদশ আদিত্যের মূর্তি সূর্য মূর্তিরই অনুরূপ হবে। বিশ্বকর্মা শাস্ত্রের মতে বার জন আদিত্যের মধ্যে পূষা ও সম্ভবত বিষ্ণু দ্বিভুজ, বাকি সকলে চতুর্ভুজ। উড়িষ্যাতে কোণার্কে বিবস্বানের দুটি মূর্তি দেখা যায় এবং সমবেত আদিত্যদের মূর্তি যুক্ত দু-একটি শিলাপট্ট গুজরাটে পাওয়া গেছে। একটি মতে মূল ১২ জন আদিত্য এবং এ'দের ২২ জন ছেলে মিলে মোট ৩৩ জন দেবতা। এ'দের সন্তান সন্ততি মিলে পরে ৩৩ কোটি। এ'দের মধ্যে ইন্দ্র সব চেয়ে বড়, বামন সব চেয়ে ছোট। দেবযুগে (মহা ২।১১।১) এক জন আদিত্য এক বার মনুষ্যলোক দেখতে আসেন। ব্রহ্মার সভা আদিত্য দেখেছিলেন এবং নারদকে বর্ণনা করেন। নারদ তখন এই সভা দেখতে চান এবং আদিত্য সঙ্গে নিয়ে দেখিয়ে আনেন।

আদিত্য আশ্রম—একটি তীর্থক্ষেত্র (মহা ৩।৮১।১৬০)।

আদিত্যকেতু—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে, কুরুক্ষেত্রে ভীমের হাতে নিহত।

আদিত্যহৃদয়—রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে রাম ক্লান্ত হয়ে পড়লে অগস্ত্য রামকে এই মন্ত্র দিয়েছিলেন। রামচন্দ্র এই মন্ত্র পেয়ে রাবণকে জয় করেন।

আদিপুরাণ—প্রথম পুরাণ। ব্রহ্মপুরাণ। দ্রঃ-পুরাণ।

আদিবরাহ—বরাহ অবতার।

আদিবুদ্ধ—বজ্রযানের আবির্ভাবের সময় বৌদ্ধ ধর্মে আদিবুদ্ধ-বাদের অনুপ্রবেশ ঘটে। খৃ ৭-শতকের আগেই মনে হয় বজ্রযানীরা এক জন নিরঞ্জন, নিরাকার, নিরাধার আদি বুদ্ধের কল্পনা করে নেন। ইনিই এ'দের শ্রেষ্ঠ দেবতা ঈশ্বর। বজ্রযানীগ্রন্থ গুহ্যসমাজে এ'র বিবরণ আছে। কালচক্র যানে আদি বুদ্ধ একটি বিশেষ স্থান পেয়েছেন অর্থাৎ ক্রমশঃ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। পরবর্তী যুগে বৌদ্ধদের মতে ইনিই সকল কিছুর স্রষ্টা ও নিয়ন্তা। এই আদি বুদ্ধ থেকেই পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের উৎপত্তি। আদিবুদ্ধ ধ্যানে বৈরোচন (শ্বেত), অক্ষোভ্য (নীল), রত্নসম্ভব (পীত), অমিতাভ (লাল) ও অমোঘসিদ্ধি (সবুজ) এই ৫-জনকে সৃষ্টি করেন। এ'দের প্রজ্ঞা (শক্তি)

যথাক্রমে লোচনা, মামকী, বজ্রধাত্বীশ্বরী, পাণ্ডরা ও তারাদেবী। প্রতি ধ্যানী বুদ্ধ একটি করে পুত্রের সৃষ্টি করেন ; এঁরা বোধিসত্ত্ব। অমিতাভ বুদ্ধ ধ্যানে অবলোকিতেশ্বর (সিংহনাদ লোকেশ্বর=বজ্রপাণি) বোধিসত্ত্বকে সৃষ্টি করেন। এই বজ্রপাণিকে মহাদেব মত দেখতে এবং এঁকে সৃষ্টির দায়িত্বও দেওয়া হয়। ইনি তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের সৃষ্টি করেন।

আদিরাজ—(১) রাজা পৃথু। (২) বৈবস্বত মনু। (৩) পুরুবংশে অবিক্ষিতের ছেলে (কালীপ্রসন্ন)।

আদ্যশ্রাদ্ধ—মৃতাশৌচ শেষ হবার পরদিন যে শ্রাদ্ধ করা হয়। এই শ্রাদ্ধের একটি মস্ত বড় বৈশিষ্ট্য অন্নের সঙ্গে পোড়া মাছ, কোথাও বা রান্না মাংস এবং বিধবাদের স্থানে পোড়া কাঁচকলা দেওয়ার প্রথা আছে।

আদ্যাশক্তি—আদি শক্তি বা প্রকৃতি। দুর্গা, কালী, নারায়ণী, মহামায়া। দার্শনিক বিচারে মূল আদি শক্তি। দেবী ভাগবতে রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সাবিত্রী ও দুর্গা ৫-ভাগে বিভক্ত। দ্রঃ- দেবী, শক্তি।

আধারশক্তি—সর্ব আধার শক্তি রূপ মহামায়া। মূল প্রকৃতি। মূলাধারগত কুণ্ডলিনী শক্তি।

আনকদুন্দুভি—বসুদেবের একটি নাম। জন্মকালে স্বর্গে দুন্দুভি বেজেছিল বলে।

আনদ্ধ—বাদ্য যন্ত্র ; মুখ চর্মাচ্ছাদিত। শাস্ত্রোক্ত প্রাচীন যন্ত্রগুলি:—পটহ, মর্দল, হুড়ুক, করট, অঘট, রঞ্জা, ডমরু, ঢক্কা, টুক্করী, ত্রিবলী, দুন্দুভি, ভেরী, নিঃস্বান, তুম্বকী, কম্বুজ, পণব, কুণ্ডলি, শর্কর, টমকি, মণ্ড, মট্টু, ডিণ্ডিম, মৃদঙ্গ, উপাঙ্গ, ও দরী। যন্ত্র কোষ মতে এই সব বাদ্য পাঁচ শ্রেণীর:—(১) সভাতে বাদনীয়:—মৃদঙ্গ, তবলা, ঢোলক। (২) বহির্দ্বারে:—ঢাক, ঢোল, নাগারা নহবৎ। (৩) গ্রাম্য:—মাদল, জোড়খাই, ডুবডুবি, ডমরু, খঞ্জনী, খোর্দক, হুড়ক, ধুটক। (৪) সামরিক:—জগঝম্প দামামা, কাড়া, ঢক্কা, তাসা। ৫) মাঙ্গল্য:—টিকারা, কাড়া, নাগারা, ডম্ফ ও খোল।

আনন্দ—ব্রহ্ম। পরমব্রহ্ম।

আনন্দ—ভগবান বুদ্ধের এক জন প্রধান শিষ্য। গৌতমের জন্ম দিনেই তাঁর কাকারও এক ছেলে হয় ; এই ছেলে আনন্দ। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির দ্বিতীয় বছরে আনন্দ, ভদ্দীয়, অনুরুদ্ধ, ভগু ইত্যাদি মিলে সংঘে যোগদান করেন এবং বুদ্ধের দ্বারা প্রব্রজিত হন। পুন্নমন্তানিপুত্তের কাছে ধর্মের ব্যাখ্যা শুনে স্রোতাপন্ন হন। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর বিশ বছর বুদ্ধের কোন পরিচারক ছিল না। আনন্দকে এই ভার দেবার কথা উঠলে আনন্দ কয়েকটি সর্ত করেন। বুদ্ধদেব স্বীকৃত হন এবং আনন্দও ভার গ্রহণ করেন। সারা দিন পরিচর্যা করে রাত্রিতে বারংবার তিনি গন্ধকুটি পরিবেষ্টন করতেন। বুদ্ধের উপদেশাবলী অক্ষরে অক্ষরে স্মরণ রাখতে পারতেন বলে তাঁর নাম হয়েছিল ধর্ম-ভণ্ডাগারিক। বুদ্ধের সেবায় থেকে সকলকে তিনি বুদ্ধের উপদেশ লাভের সুযোগ

করে দিয়েছিলেন এবং বুদ্ধের বাণী সকলকে ব্যাখ্যা করে বোঝাতেন। আনন্দের চেষ্টাতেই ভিক্ষুণী সংঘ স্থাপিত হয়েছিল।

(২) অনমিত্রের ছেলে। ইনিই চাক্ষুষ মনু (৬-ষ্ঠ) রূপে জন্মান। শিশু কালে একটি বিড়াল একে রাজা বিক্রান্তের শিশুর শয্যায় রেখে আসেন। বিক্রান্ত নিজের ছেলে মনে করেই পালন করেন। উপনয়নের সময় বিক্রান্ত ছেলেকে বলেন মাকে (বিক্রান্তের স্ত্রী) প্রণাম করতে। আনন্দ রাজি হন না; বলেন বার বার মানুষ হয়ে জন্মেছেন; ফলে তাঁর বহু মা ইত্যাদি। এর পর আনন্দ বনে গিয়ে তপস্যা করেন। ব্রহ্মা বর দেন চাক্ষুষ মনু হয়ে জন্মাবেন (মার্কণ্ডেয় পু)।

আনন্দপুর –উত্তর গুজরাটে 'বড় নগর'। সিধপুর থেকে ৭০ মাইল দ-পূর্বে। বলভি থেকে ৫০ মাইল উ-পশ্চিমে আর একটি আনন্দপুর রয়েছে। প্রাচীন আনর্তপুর, একদা রাজধানী ছিল। হিউ-এন-ৎসাঙ এসেছিলেন। অপর নাম নগর। গুজরাটের নগর ব্রাহ্মণদের প্রাচীন দেশ। কুমারপাল এখানে চারদিকে প্রাচীর গেঁথে দিয়েছিলেন। গুজরাট রাজ দ্বিতীয় ধ্রুবসেনের রাজধানী। এখানে ভদ্রবাহুস্বামী কল্পসূত্র (৪১১ খৃ) রচনা করেন। অপর নাম বড়পুর, চমৎকারপুর, আনর্তপুর।

আনন্দবর্দ্ধন—কাশ্মীরে অবন্তিবর্মার রাজত্বকালে (৮৫৩।৫৪-৮৮৩।৮৪ খৃস্টাব্দ)। নোণ সুত বা নোণ-উপাধ্যায় আত্মজ বা জোনোপাধ্যায় বলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। ইনি কবি, দার্শনিক, ও সাহিত্য বিচারক। দেবীশতক, বিষমবাণ লীলা (প্রাকৃতে) ও অর্জুন-চরিত তাঁর কবিত্ব শক্তির পরিচায়ক। ধ্বন্যালোক তাঁর সাহিত্য বিচার গ্রন্থ। তত্ত্বালোক তাঁর দার্শনিক গ্রন্থ; এই বই অদ্বৈততত্ত্ব প্রতিপাদক। আচার্য ধর্মোত্তর রচিত প্রমাণ-বিনিশ্চয় টীকা বলে যে গ্রন্থ আছে তার ওপর আনন্দ বর্দ্ধনের ধর্মোত্তমা নামে একটি টীকা আছে। একটি মতে ধ্বন্যালোকের প্রকৃত লেখক সহৃদয়, এর কারিকাগুলি মনে হয় আনন্দবর্দ্ধনের।

আনন্দময় কোষ—বেদান্তে পরমাত্মার পঞ্চ কোষের অন্যতম কোষ। কারণ শরীর। জীবাত্মকোষ।

আনন্দরস—মাথাতে সুষুম্না নাড়ি স্থিত সহস্রদল পদ্ম বা সহস্রার থেকে নিঃসৃত অমৃত। ব্রহ্মানন্দ।

আনন্দলহরী—শঙ্কর রচিত পার্বতী স্তোত্র গ্রন্থ।

আনর্ত—(১) শর্যাতির ছেলে। কুশস্থলীতে (দ্বারকা) একটি দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। বরুণ এই দুর্গ জলে ডুবিয়ে দেশটি বনে পরিণত করে দেন। (২) দ্বারকা। গুজরাট ও মালবের অংশ। রাজধানী কুশস্থলী। আনন্দপুর দ্রঃ। শাল্ব দ্বারকা আক্রমণ করলে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য আনর্তদের ও নট নর্তকদের বহির্বাসিত করা হয় (মহা ৩।১৬।১৪)।

আন্বীক্ষিকী—আত্মতত্ত্ব শোনার পর মানস নেত্রে দেখা। তর্ক বিদ্যা; গৌতমের ন্যায় দর্শন।

আপ—এক জন বসু (দ্রঃ)। ছেলে বৈতণ্ড, শ্রম, শান্ত ও ধ্বনি। দ্রঃ- দ্যু।

আপগা—(১) পাঞ্জাবে রাবি নদীর পশ্চিমে অমুক নদী। (২) কুরুক্ষেত্রে একটি নদী। দ্রঃ- ওঘোবতী। আজও এই নাম। ঋক্‌বেদে এটি আপয়া ; সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর সঙ্গে বার বার উল্লিখিত। (৩) মহাভারতে (৩।৮১।৫৫) মানুষ তীর্থের পূব দিকে এক ক্রোশের মধ্যে বিখ্যাত একটি নদী। এখানে দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশ্যে শ্যামাক ভোজন দান করলে মহৎ ধর্ম ফল লাভ হয়। এখানে এক জনকে খাওয়ালে এক কোটি লোককে খাওয়ান হয়। এখানে স্নান করে দেবতা ও পিতৃপুরুষদের অর্চনা করে এক রাত্রি বাস করলে অগ্নিস্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয়। আপগাতে স্নান করে (মহা ৩।৮১।১৫৪) মহেশ্বরের পূজা করলে গাণপত্যম্ লাভ হয় এবং নিজের বংশ উদ্ধার পায়। এখান থেকে তারপর স্থাণুবট তীর্থে যাওয়া যায়।

আপদ্ধর্ম—নিজের ধর্ম দ্বারা জীবন ধারণে অক্ষম হলে বিপন্ন হয়ে অন্যধর্ম গ্রহণ। ব্রাহ্মণের ধর্ম-বৃত্তি যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ। ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি প্রজাপালনের জন্য অস্ত্রধারণ। বৈশ্যের বাণিজ্য, পশুপালন ও কৃষি। শূদ্রের বৃত্তি দ্বিজাতির সেবা। আপৎকালে উচ্চবর্ণ নিম্ন বর্ণের বৃত্তি গ্রহণ করতে পারে ; শাস্ত্রীয় অনুমোদন আছে। কিন্তু নিম্নবর্ণ কোন উচ্চবর্ণের বৃত্তি গ্রহণ করতে পারেন না। শাস্ত্রে অনেক স্থলে আপৎ কালে কি বৃত্তি গ্রহণীয় তাও উল্লেখ করা আছে। যেমন শূদ্র দ্বিজাতির সেবা ত্যাগ করতে বাধ্য হলে তন্তুবায়, সূত্রধর ইত্যাদির কাজ গ্রহণ করতে পারে এবং আপৎকালের শেষে আবার নিজের পুরাতন বৃত্তিতে ফিরে আসতে হবে। মনুতে (১০।৭৪-১৩০) আছে আপদ্ধর্ম পালনের দ্বারা মানুষ পরমগতি লাভ করে। আপদ্‌ধর্মের উদাহরণ হিসাবে দেখা যায় বিশ্বামিত্র ক্ষুধায় চণ্ডালের কাছে কুকুরের মাংস গ্রহণ করেছিলেন। ত্রিশঙ্কু (দ্রঃ) গরুর মাংস নিজে খেয়েছিলেন ও বিশ্বামিত্রের স্ত্রী ও সন্তানদের খাইয়েছিলেন। আপৎকালে কৃত কার্যের জন্য পরবর্তী কালে প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা চালু ছিল।

আপবসুতা—অঙ্গিরার স্ত্রী। দ্রঃ-অগ্নিবংশ (মহা ৩।২০৮।১), আত্রেয়ী।

আপস্তম্ব—আপস্তম্ভ। এক জন ধর্মসূত্রকার ঋষি। সংহিতার পরবর্তী যুগে। কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় শাখার অন্তর্গত আপস্তম্ব কল্পসূত্র এঁর প্রসিদ্ধ রচনা। গৌতম ও বৌধায়ন ধর্মসূত্রের পরে এবং হিরণ্যকেশী ও বশিষ্ঠ ধর্ম-সূত্রের আগে আপস্তম্ব ধর্মসূত্রের রচনা অর্থাৎ মোটামুটি ৫০০ খৃস্টাব্দের আগে। নর্মদার দক্ষিণ অঞ্চলে আপস্তম্ব মতাবলম্বীদের প্রাধান্য দেখা যায়, সুতরাং মনে হয় দাক্ষিণাত্যের লোক ছিলেন। বইটিতে ৩০-টি প্রশ্ন/অধ্যায়। ২৩-টি প্রশ্ন বৈদিক ক্রিয়াকর্ম বিষয়ক এবং নাম আপস্তম্ব শ্রৌত সূত্র। ২৪ ও ২৫ প্রশ্নে পরিভাষা, প্রবরখণ্ড, হৌত্রক মন্ত্র রয়েছে। ২৬ ও ২৭ প্রশ্নে গৃহ্য সংস্কার সমূহ ও অন্যান্য ধর্মীয় ক্রিয়ার আলোচনা।। এই অংশটির নাম আপস্তম্ব গৃহ্যসূত্র। ২৮ ও ২৯ প্রশ্নের নাম আপস্তম্ব ধর্মসূত্র। ৩০-শ প্রশ্নের নাম শুল্ব

সূত্র ; এই অংশে যজ্ঞবেদীর মাপ ইত্যাদির আলোচনা আছে। জ্যামিতি ও বাস্তুবিদ্যা বিষয়ে এটি একটি প্রাচীন গ্রন্থ।

কশ্যপের কাছে দিতি ইন্দ্রহন্তা একটি পুত্র চাইলে কশ্যপ আপস্তম্বকে দিয়ে যজ্ঞ করতে বলেন। আপস্তম্ব যজ্ঞ করে 'ইন্দ্রহন্তা অমিততেজা পুত্র হোক' বলে পূর্ণাহুতি দেন। একবার এক ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধের জন্য পুরোহিত না পেয়ে পিতৃদেবদের, বিশ্বদেবদের ও বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা করলে আপস্তম্ব সামনে আসেন। ব্রাহ্মণ এ'কে খেতে দেন এবং আপস্তম্ব আরো এবং আরো খেতে চান। ব্রাহ্মণ তখন ঋষিকে শাপ দিতে যান কিন্তু অভিশাপের জল ব্রাহ্মণের হাতে আটকে যায়। এই জন্য নাম আপস্তম্ব (ব্রহ্ম পু)। আপস্তম্ব একবার অগস্ত্যকে প্রশ্ন করেন ত্রিমূর্তির মধ্যে কে বড়। গৌতম বলেন মহাদেব। গৌতমী নদীর তীরে আপস্তম্ব তখন আরাধনা করে মহাদেবের দেখা পান। স্থানটি আপস্তম্ব তীর্থে পরিণত হয় ; এখানে স্নান করলে শিবের বরে দিব্য জ্ঞান লাভ হয়। দ্যুমৎসেনকে একবার আপস্তম্ব সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। স্ত্রী অক্ষসূত্র, ছেলে গার্কি।

আপাপন্থী—অযোধ্যা অঞ্চলে মুন্নাদাস নামে এক স্বর্ণকার প্রচারিত ধর্মপথ। নিজে ইনি কারো শিষ্য ছিলেন না। নিজেই এই ধর্মমত প্রচলন করেছিলেন। নির্গুণ ঈশ্বরের উপাসক। নির্গুণ ঈশ্বরের প্রতীক রাম মন্ত্র গ্রহণ করে এ'দের দীক্ষা হয়। রামায়ণের রাম নন। সাধক হয়ে উঠলে এ'রা সাধু বা ফকির হয়ে যান এবং গায়ত্রী-ক্রিয়ার অধিকারী হন। গৃহীদের এ অধিকার নাই। প্রক্রিয়া অত্যন্ত গুহ্য ও বীভৎস। বাউলদের মত এ'রা দেহকে ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ জ্ঞান করেন। গায়ত্রী-ক্রিয়া অর্থে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক শুক্রাদি সঞ্চালন ও গ্রহণরূপে কতকগুলি গুহ্য ক্রিয়া এ'রা পালন করেন। বাউলদের চারিচন্দ্র সাধনার মত এই সব কাজ। অযোধ্যা, নেপাল ও তরাই অঞ্চলে অনুন্নত লোকদের মধ্যে এই মতবাদ প্রচলিত। সৎনামী, ও পল্টুদাসপন্থীদের সঙ্গেও এ'দের বিশেষ মিল আছে। এই সম্প্রদায়ে ফকির ও উদাসীনগণ হলুদ জামা ও টুপি পরেন। নাম মাত্র মুখাগ্নি করে মাটি দিয়ে এ'দের সৎকার করা হয়। মৎস্য ও মাংস এ'রা গ্রহণ করেন না। কবীরের মতবাদের প্রভাব এ'দের ওপর অনেকটা রয়েছে।

আপোদ্ধৌম্য—আয়োদ্ধৌম্য (দ্রঃ)।

আপ্তনেত্রবন—অযোধ্যাতে বারইচ জেলাতে ইকয়ুনার কাছে ধ্বংসাবশেষ এলাকা। হিউ-এন-ৎসাঙ এসেছিলেন।

আফগানিস্তান—উপগস্থান, কাম্বজ (দ্রঃ), কাওফু, কম্বু—হিউ-এন-ৎসাঙ। লোহ (মহাভা), রোহ, রোহি, আবগান (বৃহৎ-সং), অপগ, ঔপগ। সাংস্কৃতিক ও রাজনীতিক ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এখানকার অনেক নদনদী ও প্রাচীন জাতির উল্লেখ ঋক্‌বেদে আছে। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর (৩২৩ খৃ পূ) পর সেলুকাসকে পরাজিত করে সন্ধিসর্ত অনুসারে আরিয়া (=হেরাত), আরকোসিয়া (=কান্দাহার), পরোপানিসদৈ (=কাবুল) হস্তগত করেন। মৌর্য সাম্রাজ্যের অধীন অংশগুলি পরে অশোকের মৃত্যুর পর ব্যাকট্রিয়ার গ্রীক রাজা অধিকার

করে নেন। খৃস্টীয় প্রথম শতকে পূর্বমধ্য এসিয়ার ইউ, চি জাতি আফগানিস্তানের পূর্ব ও উত্তরপূর্ব অঞ্চলে রাজত্ব স্থাপন করেন ; ইউ-চি-দের একটি শাখা কুষাণগণ ; এ'রা সমস্ত ইউ-চি-দের ওপর প্রভুত্ব স্থাপন করেন। কুষাণ সম্রাট কনিষ্ক পুরুষপুরে (=পেশোয়ার) রাজধানী স্থাপন করে আফগানিস্তান, বাল্খ্ ও ভারতের একটা মস্ত অংশ নিয়ে বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। কনিষ্কর রাজত্ব কালে আফগানিস্তানের উত্তরাংশে বৌদ্ধধর্ম ছড়িয়ে পড়ে ও বহু মঠ ও সংঘারাম প্রতিষ্ঠিত হয়। খৃস্টীয় তৃতীয় শতকে কুষাণরাজ্য দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে। হিউ-এন-ৎসাঙ উত্তর ও পূর্ব আফগানে বহু বৌদ্ধ মঠ ও সংঘারাম দেখেছিলেন। নবম শতকের পূর্বভাগে এই সব অঞ্চলে কয়েকটি হিন্দুরাজ্যও স্থাপিত হয়েছিল। কাবুলের শাহীবংশীয় হিন্দু রাজারা বহু দিন এখানে স্বাধীন রাজা ছিলেন এবং পাঞ্জাবের খানিকটা পর্যন্ত এ'দের রাজত্ব বিস্তৃত ছিল। শাহী বংশীয় শেষ রাজা জয়পাল মুসলমানদের হাতে পরাজিত হলে আফগানিস্থানে মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্রঃ- ঋভু।

আবগারি—মাদক দ্রব্যের ওপর শুল্ক। মৌর্যযুগে মদ্য উৎপাদন বিক্রয় ও পান করা কঠোর নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল। কোন শুল্কের ব্যবস্থা ছিল না। রামচন্দ্রের সময়ে বা কৃষ্ণের সময়ে মদ্যপান অবাধ ও অপরিমেয় ছিল।

আবন্ত—ব্রাত্য ব্রাহ্মণের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্ম সন্তান।

আবসথ্য—(১) গৃহাগ্নি। (২) পাঞ্চজন্য (দ্রঃ। তপের একটি ছেলে। দ্রঃ- অগ্নি বংশ। (মহা ৩।২১১।৫)।

আবি—অন্ধক দৈত্যের ছেলে। পিতৃহত্যার প্রতিশোধের চেষ্টায় উমার অনুপস্থিতিতে উমার বেশে শিবকে বধ করতে চেষ্টা করেন। শিবের হাতে মারা যান। দ্রঃ-আদি।

আবু—২৪°৪০′ উ, ৭২°৪৫′ পূ। রাজস্থানের সিরোহি জেলার একটি পাহাড়ি সহর। আরাবল্লী পর্বতমালা থেকে বনাস নদীর উপত্যকা দিয়ে বিচ্ছিন্ন। আবু পর্বত গড়ে ১২২০ মি উচ্চ। আমেদাবাদ থেকে ১৮৫ কি-মি উত্তরে। প্রাচীন নাম অর্বুদ (দ্রঃ) বা অর্বুদাচল। ঋক্‌বেদে (১০।৬৮।১২, ১।৫১।৬) উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে খৃ-পূ ৮-৬ শতকে নাগ উপজাতির বাসস্থান ছিল এবং নাগ সভ্যতার কেন্দ্র ছিল। মহাভারতে ও প্রাচীন পুরাণগুলিতে আবুকে অপরান্ত এবং পশ্চিম উপকূলের অংশ বলা হয়েছে। এখানকার লোক আনর্ত দেশের অধিবাসী বলে উল্লিখিত হয়েছে। বর্তমানের গুজরাটের প্রাচীন নাম আনর্ত। গুজরাটে যখন সোলাঙ্কিদের রাজত্ব আবু তখন চন্দ্রাবতীর পরমার সামন্তদের অধীন। আবু পাহাড়ে এক গুহায় অর্বুদা দেবীর মন্দির আছে। আবু রোড স্টেসনের দক্ষিণে ১১ কি-মি দূরে অম্বাদেবীর মন্দির। জৈন সম্প্রদায়ের এক প্রধান তীর্থ আবু। তীর্থঙ্কর ঋষভনাথ ও নেমিনাথের নাম এই তীর্থের সঙ্গে বিশেষ ভাবে জড়িত। বিমলশাহ নির্মিত বিমলবসহী। (১০৩০ খৃ) এবং বাস্তুপাল-তেজপাল নির্মিত লুণবসাহী (১২৩০ খৃ) মন্দির বিখ্যাত।

আবেস্তা—জরথুস্ত্রের ১৫০০ বছর পরে অথ্রবান্‌-রা (=পুরোহিত) তাঁদের ধর্মগ্রন্থাদি বোঝাতে আবেস্তা শব্দটি প্রয়োগ করেন। আবেস্তার ভাষা ঋক্‌বেদের ভাষার অনুরূপ ; এই ভাষায় অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে। প্রায় সমস্ত ধাতু ও প্রত্যয়ের মধ্যেও মিল আছে। আবেস্তা গ্রন্থাবলী প-এসিয়ার আর্যদের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অবদান। বিদ্‌-ধাতু থেকে আবেস্তার উৎপত্তি স্বীকার করলে আবেস্তা অর্থে জ্ঞান। উপস্তা শব্দের সঙ্গে সম্পর্ক স্বীকার করলে আবেস্তা অর্থে (জ্ঞানের) মূলাধার।

আব্রহ্মস্তম্ভ পর্যন্ত—পূর্ণ চৈতন্য থেকে অচেতন জড় বস্তু পর্যন্ত। নিখিল।

আভাস্বর—৬৪-জন গণদেবতা।

আভীর—প্রাচীন বহিরাগত একটি জাতি। সম্ভবত মধ্যপ্রাচ্য থেকে শকদের সঙ্গে আসে। পাঞ্জাব, রাজপুতনা ও পরে সিন্ধু উপত্যকাতে বসতি স্থাপন করে। এই জন্য সিন্ধু উপত্যকা অংশ আভীর রাজ্য বলে অভিহিত হয়। সরস্বতী নদীর মুখেও এরা বাস করতেন। আভীর—গুজরাটে দ-পূর্ব অংশ। নর্মদার মোহনার কাছে আবেরিয় (গ্রীক)। মতান্তরে সিন্ধুর পূর্বে, সিন্ধু এখানে দুভাগ হয়ে একটি বদ্বীপ করেছে। মহাভারতে আভীররা সমুদ্রতীরে এবং গুজরাটে সোমনাথের কাছে সরস্বতী তীরে বাস করত। অপর মতে ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে তাপ্তী থেকে দেবগড় পর্যন্ত ; গুজরাটের দক্ষিণ অংশ; এখানে সুরাট অবস্থিত। বাইবেলে এটি যেন ওফির। তারা তন্ত্রে কোঙ্কন থেকে দক্ষিণে তাপ্তীর পশ্চিম তীর পর্যন্ত। দ্রঃ- দ্রুমকুল্য। খৃ ১-শতকের এক জন বিদেশী গ্রন্থকার এবং ২-শতকে টলেমি এই আভীর রাজ্যকে আবিরিয়া বলেছেন। পুরাণেও এই কথাই আছে। পরে আভীররা আরো দক্ষিণে তাপ্তী নদীর মোহনা থেকে কোঙ্কন পর্যন্ত অপরান্ত দেশে ছড়িয়ে পড়ে। রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর ইত্যাদির মতে এরা খৃস্ট ধর্মাবলম্বী। এদের সমাজ ব্যবস্থা শিথিল ছিল ; এবং এই শিথিল সমাজ ব্যবস্থা কৃষ্ণকাহিনীতে এসে মিশেছে। ক্রমশ এরা হিন্দু হয়ে পড়তে থাকেন। হিন্দু শাস্ত্রে বহু স্থানে এ'দের ম্লেচ্ছ বা দস্যু বলা হয়েছে। পতঞ্জলি মহাভাষ্যে এ'রা শূদ্র। মহাভারতে অশ্বমেধ পর্বে এ'রা ক্ষত্রিয় ; কিন্তু পরশুরামের ভয়ে ক্ষত্রিয় ধর্ম পালন না করার জন্য শূদ্রপদ বাচ্য। প্রকৃত শূদ্রদের সঙ্গে এ'দের ভীষণ শত্রুতা ছিল। নকুল (পাণ্ডব) এ'দের পরাজিত করেন ; যুধিষ্ঠিরকে এরা বহু উপহার দিয়েছিলেন। কুরুক্ষেত্রে দ্রোণের গরুড়ব্যূহে আভীর সৈন্যরা অংশ নিয়েছিল। অর্জুন যখন দ্বারকা থেকে যাদব রমণীদের নিয়ে ফিরছিলেন তখন যাঁরা তাঁকে আক্রমণ করেছিল তাদের মধ্যে আভীররাও ছিল। মনুতে ব্রাহ্মণের ঔরসে অম্বষ্ঠা রমণীর গর্ভে সঙ্কর বর্ণ বলে স্বীকৃত। গোচারণ ও গোপালন প্রধান পেশা ; পরে কৃষি ইত্যাদি। বিভিন্ন শিলালিপি ও তাম্রশাসনে মাঠরি পুত্র ঈশ্বর সেন/দত্ত ইত্যাদি রাজার নাম পাওয়া যায়। সাতবাহনের পর দাক্ষিণাত্যের উ-পশ্চিমে আভীররা এক শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়ে তোলেন। সংগীতে আহির/আহিরী রাগিণী এ'দের অবদান। কৃষ্ণের গোষ্ঠলীলার বহু কাহিনীতে আভীরদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মার্কণ্ডেয় ঋষি একবার ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন কলিযুগে ভারতে বহু জায়গায় এরা রাজা হবেন। দ্রঃ- গায়ত্রী।

আভ্যুদয়িক—কোন অভ্যুদয় উপলক্ষ্যে শ্রাদ্ধ। শুভকাজের প্রথমে অনুষ্ঠিত। অন্য নাম বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ বা নান্দীমুখ। এই শ্রাদ্ধে পিতৃপুরুষদের মুখে নান্দী/প্রশস্তি উচ্চারিত হয়। এটি অন্নপাকহীন আমান্ন শ্রাদ্ধ। দক্ষিণমুখে বা উপবীত ডান কাঁধে নিয়ে বা মধ্যাহ্নে এ শ্রাদ্ধ করতে হয় না।

আমোদপ্রমোদ—প্রাচীন ভারতে বিভিন্ন ঋতুতে বাড়ির বাইরে গিয়ে সমবেত ভাবে আমোদ আহ্লাদ করবার রীতি ছিল। মল্লযুদ্ধ, মুষ্টিযুদ্ধ, বংশযুদ্ধ, রথের দৌড় ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হত। বাৎস্যায়নের সময় অপরাহ্নে গোষ্ঠীতে (=ক্লাবে) গিয়ে আমোদ আহ্লাদ করা হত। নাগরিকের নিত্য কর্মের মধ্যে দু রকম খেলা প্রচলিত ছিল ঃ—(১) গোষ্ঠী সমবায় ; (২) সমস্যা-ক্রীড়া। সমস্যা-ক্রীড়ার দু ভাগ ঃ—(ক) মাহিমান্য (=সর্বভারতীয়) ; (খ) দেশ্য (=আঞ্চলিক)। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে (৪।৪২) কয়েকটি সমস্যা ক্রীড়ার নাম ঃ—মাহিমান্য ক্রীড়া ঃ—যক্ষরাত্রি, কৌমুদীজাগর সুবসন্তক। দেশক্রীড়া ঃ—সহকারভঞ্জিকা, অভ্যূষখাদিকা, বিসখাদিকা, নবপত্রিকা, উদকক্ষ্বেড়িকা, পাঞ্চালানুযান, একশাল্মলী, যবচতুর্থী, আগোলচতুর্থী, মদনোৎসব, হোলাকা, অশোকত্তংসিকা, পুষ্পাবচায়িকা, চূতলতিকা, ইক্ষুভঞ্জিকা, কদম্বযুদ্ধ। নাচগান ও বাজনা সহযোগে এই সমস্ত ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হত।

কার্তিক পূর্ণিমা রাত্রে অন্য মতে কার্তিক অমাবস্যা বা শুক্লা প্রতিপদ রাত্রে যক্ষরাত্রি ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হত। সমস্ত রাত ধরে পাশাখেলা ও নাচগান হত। আশ্বিনের কোজাগর পূর্ণিমাতে কৌমুদীজাগর অন্য নাম মদনোৎসব বা দ্যূতপূর্ণিমা। প্রেমিক প্রেমিকা দোলাতে ঝুলত ও পাশা খেলে রাত কাটাত। পুরুষরা নিজেদের মধ্যে পাশা খেলত। সুবসন্তক উৎসব হত মাঘ মাসে শুক্লা পঞ্চমী বা বসন্ত-পঞ্চমী রাত্রে। নাচগান ও নানা খেলা দেখান হত। এই তিথিতে মদনোৎসবও হত। উত্তর ভারতে এই তিনটি উৎসব আজও প্রচলিত। নদী, পাহাড়, গাছ, প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে, ফসল ঘরে তোলার সময় উৎসব হত। পুষ্পিত শিমূল গাছকে ঘিরে নাচ গান হত। বসন্তে আমের মঞ্জরীতে এবং চৈত্রে শুক্লা অষ্টমীতে অশোক ফুলে সেজে উৎসব হত। কদমফুল ছুঁড়ে দল বেঁধে যুদ্ধ হত। দল বেঁধে বন ভোজনে যাওয়া; প্রথম বৃষ্টির পর বনভোজনে গিয়ে গাছে গাছে বিয়ে দেওয়া হত। কচি আম উঠলে, বা আকে মিষ্টতা এলে, ছোলা মটর ইত্যাদি শস্য পাকলে এক একটি উৎসবের ব্যবস্থা হত। গ্রীষ্মকালে বাঁশের পিচকারি করে পরস্পরকে জল দেওয়া একটি প্রমোদ ছিল। প্রাচীনকালে বৈশাখী শুক্লা চতুর্থীতে সুগন্ধি যবচূর্ণ পরস্পরের গায়ে দিয়ে উৎসব হত। শ্রাবণী শুক্লা চতুর্থীতে দোলাতে দুলত; বর্তমানে এটি ঝুলন। ফাল্গুনে পূর্ণিমাতে দোল উৎসবে কিংশুক ও অন্যান্য ফুলের সুগন্ধ জল ও যবচূর্ণ ও লাক্ষা নির্মিত কুঙ্কুম পরস্পরের গায়ে দিয়ে উৎসব হত। প্রাচীন লৌকিক উৎসব হোলাকা বা হোরি বর্তমানের দোল।

নাগর ও আঞ্চলিক উৎসব ছাড়াও বিভিন্ন স্থান থেকে আগত জনসাধারণের আমোদ প্রমোদের জন্য মেলা উৎসব ছিল। এই মেলার নাম ছিল সমাজ-উৎসব। এই

সমাজগুলির মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রচার কাজের সুবিধা ছিল বলে রাষ্ট্র এগুলিকে সাহায্য করত। রামায়ণে আছে উৎসব-সমাজ রাষ্ট্রের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে যাত্রা, উৎসব, সমাজ, এবং প্রবহণের ব্যবস্থা আছে। যাত্রা অর্থে দেবদেবীর রথযাত্রা ; সমাজ অর্থে সমবেত মেলা, উৎসব অর্থে ইন্দ্র মদন ইত্যাদির পূজা বা ঋতু উৎসব এবং প্রবহণ অর্থে উদ্যান ও বনভোজন। সাধারণত নগরের বাহিরে দূরে মাঠে বা পাহাড়ের ওপর সুন্দর পরিবেশে সমাজের ব্যবস্থা হত। সহজ মৃগয়ার ব্যবস্থাও থাকত। মল্লযুদ্ধ, লাঠিখেলা, দৌড়, রথচালনা, নাচ, গান, বাজনা এবং নানা দেবদেবীর রথযাত্রার বিচিত্র ব্যবস্থা হত। সমাজ অঙ্গনে ধর্মালোচনা, ও যজ্ঞাদিরও ব্যবস্থা ছিল। ভাটের রঙ্গকৌতুক, বীরগাথা আবৃত্তি, বৈতালিকের গান, পুতুল নাচ, নাটক, জাদুকরের খেলা, তিতির পাখী থেকে হাতী ঘোড়া, মোষ ও ষাঁড়ের লড়াইও বাদ যেত না। অস্ত্রের খেলা, সামরিক কুচকাওয়াজ ও নকল যুদ্ধেরও অনুষ্ঠান হত। সামরিক কুচকাওয়াজ ও নাচগান সহকারে স্বয়ংবর সভাও বসত। এই সব সময়ে মদ্যপান ও মাংসাদি ভক্ষণের ব্যবস্থাও ছিল। একাদিক্রমে চারদিন মদ্যপানেও রাষ্ট্রের আপত্তি ছিল না। পরবর্তীকালে অশোক এই সব আমোদ প্রমোদের বহু তামসিক অংশ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। অনেকের মতে মহাভারতে শৈব-মতবাদীদের সমাজের বর্ণনা আছে ; ফলে সেখানে মদ্যপান ও নাচগানের কথা আছে। লৌকিক সমাজ অনেক সময় বিরাট রঙ্গাঙ্গনে পরিণত হত। সমাগত দর্শকদের থাকবার জন্য শিবির ও মঞ্চ তৈরি করে দেওয়া হত এবং নানা রকম মাংসের-ব্যঞ্জন করে সকলকে ভোজ দেওয়া হত। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে দেখা যায় সরস্বতীর মন্দিরে পাক্ষিক বা মাসিক নাচগান ও বাজনার অধিবেশন হয়ে থাকত এবং এর নামও ছিল সমাজ।

পালি সাহিত্যে আছে আজীবকগণ নক্ষত্র বিচার করে শুভদিন ঠিক করে দিলে দিনটি ছুটি বলে ঘোষণা করা হত এবং নানা আমোদ প্রমোদে মানুষে মেতে উঠত : এর নাম ছিল নক্ষত্রক্রীড়া। অশোক শিলালিপিতে মঙ্গল নামে একটি উৎসবের উল্লেখ আছে। বিয়েতে এবং পরিবারে ছেলে হলে নানা রকম আমোদ আহ্লাদের আয়োজন করে মঙ্গল উৎসব পালন করা হত। মুসলমান রাজত্বের সময় থেকে আমোদ প্রমোদ ব্যবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে। কিছু কিছু ব্যবস্থা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। কিছু কিছু কীর্তন গান চালু হয় এবং মেলা বেচাকেনার হাটে পর্যবসিত হতে চলে।

আম্নায়—শ্রুতি, বেদ, নিগম শাস্ত্র, তন্ত্রশাস্ত্র।

আম্বালা—পাঞ্জাবের একটি বিভাগ, জেলা ও সদর। প্রাচীন সরস্বতী ও বর্তমান যমুনা নদীর মধ্যে। ভারতে আর্যদের অন্যতম আদি বাসস্থান। সপ্তম শতকে হিউ-এন-ৎসাঙের বিবরণে এটি একটি সুসভ্য রাজ্য বলে উল্লিখিত হয়েছে ; রাজধানী ছিল শ্রুঘ্ন। কারো কারো মতে জগাধ্রির কাছে বর্তমান শুঘ গ্রাম এই শ্রুঘ্ন আম্বালার ৭২ কি-মি, উত্তরে শতদ্রু নদীর তীরে রূপার, প্রাচীন নাম রূপনগর, একটি সুপ্রাচীন সহর। এখানে হরপ্পার সমকালীন সভ্যতার নিদর্শন আছে। রূপার থেকে ১৬ কি-মি

পূর্বে শিবালিক পাহাড়ে অবস্থিত বর্দারে প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ এখনও আছে। এখানে প্রায় ৭৫০ বছরের প্রাচীন দুর্গা ও অন্য দেবদেবী মূর্তি পাওয়া গেছে। নারায়ণ গড়ের হুসেইনি গ্রামে জামকেশর পুষ্করিণীর তীরে পাণ্ডবরা হিমালয়ের পথে বিশ্রাম করেছিলেন। এটি একটি পবিত্র তীর্থস্থান।

আয়তি—মেরুর দুই মেয়ে আয়তি ও নিয়তি। আয়তি ধাতার স্ত্রী ; নিয়তি বিধাতার স্ত্রী। এই ধাতা ও বিধাতা হলেন ভৃগু ও খ্যাতির সন্তান ; ধাতার ছেলে প্রাণ ; বিধাতার ছেলে মৃকণ্ডু।

আয়ান—বা রায়াণ ; প্রকৃত নাম অভিমন্যু (দ্রঃ) ; পিতা গোল, অন্যমতে গোপ-রাজ মাল্যকের ছেলে, মাতা জটিলা। গোল কৃষ্ণের মাতামহীর ভাই ; সুতরাং আয়ান কৃষ্ণের মাতুল। অয়নে জন্ম ইত্যাদি ফলে নাম আয়ান এবং ক্লীব। তিলক, দুর্মদ ও আয়ান তিন ভাই এবং যশোদা কুটিলা ও প্রভাকরী তিন বোন। বিদগ্ধ মাধবে জটিলা কৃষ্ণের মাতুঃ মাতুলানী। আয়ান গোলকে কৃষ্ণের অংশ স্বরূপ। রাধার স্বামী। ধর্মপ্রাণ কালী ভক্ত। আয়ান পুরুষত্বহীন ছিলেন। অন্য মতে এক জন ঋষি। এর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে নারায়ণ বর দিতে এলে ইনি বর চান যে নারায়ণের স্ত্রী যেন তাঁর স্ত্রী হয়। আয়ান বর পান ; এবং জানতে পারেন দ্বাপরে তিনি লক্ষ্মীকে পাবেন বটে তবে তাঁকে ক্লীব হয়ে জন্মাতে হবে। গীতগোবিন্দ ইত্যাদিতে কিন্তু এই ক্লীবত্বের কথা নেই। দ্বাপরে লক্ষ্মী রাধিকা হয়ে জন্মান এবং আয়ানের সঙ্গে বিয়ে হয়। শাক্ত আয়ান একদিন কালীপূজা করছিলেন এমন সময় কুটিলা এসে খবর দেন রাধিকা কৃষ্ণের সঙ্গে বনে বিহার করছেন। আয়ান ছুটে যান ; এদিকে কৃষ্ণ কালামূর্তি ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন এবং রাধিকা কালীর পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিতে থাকেন। ফলে আয়ান সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যান এবং বোনকে তিরস্কার করেন। এর পর আয়ানের মৃত্যু হয়। আয়ানকে ক্লীব বলে উপস্থাপিত করে বৈষ্ণবরা চরম ভুল করেছেন।

আয়ু—(১) আয়ুস্। পুরূরবা উর্বশীর ছেলে। আয়ুসের স্ত্রী স্বর্ভানবী- ইন্দুমতী=প্রভা (হরি ২৮।২)। ছেলে রজি, নহুষ, ক্ষত্রবৃদ্ধ (বৃদ্ধশর্মা), রম্ভ, অনেনস্, (মহা ১।৭০।২৩)। আয়ু ধার্মিক রাজা ছিলেন ; সন্তান হীন রাজা একবার দত্তাত্রেয় আশ্রমে আসেন। দত্তাত্রেয় সুরাপান করে কতকগুলি মেয়েদের নিয়ে উন্মত্ত অবস্থায় ছিলেন। রাজাকে দেখে মুনি ধ্যানে বসে যান এবং একশ বছর ধ্যান করতে থাকেন। রাজাও অপেক্ষা করতে থাকেন। রাজার ভক্তিতে শেষ পর্যন্ত মুনি রাজাকে বোঝাতে চান তাঁর কোন ব্রাহ্মণত্ব নাই ; মদ্য মাংস ও মেয়েছেলে নিয়ে তাঁর দিন কাটে ; রাজা বরং অন্য কোন মুনির কাছে যান। আয়ু এ সব কথায় কাণ দেন না ; সন্তান হোক আশীর্বাদ চান। মুনি তখন রাজাকে একটি নরকপালে করে মদ্য ও মাংস আনতে বলেন। রাজা তাই আনেন। দত্তাত্রেয় তখন সন্তুষ্ট হয়ে বর দেন রাজার একটি ছেলে হবে ; এই ছেলে ধার্মিক প্রজাপালক, বেদে ও শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং যুদ্ধে দেবাসুর ক্ষত্রিয় ইত্যাদি সকলের কাছে অজেয় হবে। মুনি রাজাকে একটি ফল দেন এবং রাজা ফলটি রাণী ইন্দু-মতীকে খেতে দেন। ছেলে হয় নহুষ (দ্রঃ)। (২) ভেকদের রাজা, এঁর মেয়ে

সুশোভনা ; পরিক্ষিতের (দ্রঃ) স্ত্রী। সমস্ত মণ্ডূক বংশ পরিক্ষিৎ ধ্বংস করতে থাকলে ইনি দেখা দেন ; রাজাকে শান্ত করে পালিয়ে যাওয়া সুশোভনাকে এনে দেন ; এবং বহু রাজাকে এই ভাবে বিপ্রলব্ধ করেছিল বলে মেয়েকে শাপ দিয়ে যান অপত্যানি অব্রহ্মণ্যানি (মহা ৩।১৯০।৪০) হবে। দ্রঃ- কাল।

আয়ুধ—যৌধেয় দ্রঃ। বিতস্তা ও সিন্ধুর মধ্যবর্তী দেশ।

আয়ুধ—প্রাচীন যুগে ব্যবহৃত অস্ত্র মহাভারত ইত্যাদির মতে চার রকম ঃ মুক্ত, অমুক্ত, মুক্তামুক্ত ও মন্ত্রমুক্ত। অগ্নি পুরাণ মতে পাঁচ রকম (১) যন্ত্রমুক্ত, পাণিমুক্ত, মুক্তসন্ধারিত, অমুক্ত ও বাহুযুদ্ধ। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে নানা অস্ত্রের প্রস্তুত প্রণালী ও প্রয়োগপদ্ধতি ইত্যাদির বহু বিবরণ আছে। ধনুক সাধারণত চার রকম ছিল ঃ- (১) কার্মুক (তালের তৈরি), (২) কোদণ্ড (বাঁশ), (৩) দ্রূণ (কাঠ), (৪) ধনু (শিঙ)। শরের মুখ ধাতু, হাড় বা কাঠ দিয়ে তৈরি হত এবং আকৃতি অনুসারে আরামুখ, ক্ষুরপ্র, গোপুচ্ছ, অর্দ্ধচন্দ্র, সূচীমুখ, ভল্ল, বৎসদন্ত, কর্ণিক, কাকতুণ্ড ইত্যাদি নাম ছিল। অর্থশাস্ত্র অনুসারে খড়্গ তিন রকম নিস্ত্রিংশ, অসিযষ্টি ও মণ্ডলাগ্র। শক্তি অস্ত্র নানা রকমের ছিল ; তোমর, প্রাস, কুন্ত, ভিন্দিপাল ইত্যাদিও শক্তি। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে মুষল, যষ্টি ও গদা এই তিন রকমের গদার উল্লেখ আছে। গদা লোহার মত। ধনুর্বেদে গদা তিন শ্রেণীর ঃ স্থূলাগ্র, চতুরগ্র, ও তালমূলাকৃতি। কুঠার কুলিশ, পরশু ও পরশ্বধ মোটামুটি একই , তবে পরশুর প্রান্ত কেবল অর্দ্ধচন্দ্রের মত। চক্র লোহ নির্মিত, তীক্ষ্ণধার ও ছুঁড়ে মারা হত। এক প্রকার শতঘ্নী নগর প্রাচীরের ওপর থাকত; শত্রু এলে তাদের প্রতি ছুঁড়ে দেওয়া হত। এগুলি কণ্টকাকীর্ণ মহাশিলা ও সচক্রা বলে বর্ণিত হয়েছে। আর এক প্রকার শতঘ্নী ছিল কাঁটাওলা মুগুরের মত। রামায়ণ ও মহাভারতে ও অর্থশাস্ত্রে যন্ত্র নামে নানা অস্ত্রের উল্লেখ আছে। অর্থশাস্ত্র মতে যন্ত্র দু রকম 'স্থির' ও 'চল'। এগুলি সাধারণত নগর দ্বারে থাকত। আকার বিরাট হত এবং চালাবার সময় ভীষণ শব্দ হত। এগুলির সাহায্যে শর ও পাথর শত্রুর ওপর ছুঁড়ে মারা হত। গ্রীক ও রোমানরাও অনুরূপ যন্ত্র ব্যবহার করেছে। এ ছাড়া অঙ্গত্রাণ হিসাবে বহু জাতের কবচ প্রচলিত ছিল। দ্রঃ- অস্ত্র, অশ্মযুগ।

আয়ুধ পুরুষ—দেবতাদের অস্ত্রকে বিগ্রহরূপে কল্পনা করা ও শিল্পে রূপ দেওয়া। শব্দটির লিঙ্গ অনুসারে এই মূর্তি কল্পনা ; অর্থাৎ গদা নারী, শঙ্খ পুরুষ, চক্র ও পদ্ম ক্লীব দেহী হিসাবে দেখাবার শাস্ত্রীয় নির্দেশ রয়েছে। অবশ্য গুপ্তযুগে শিল্পে সমস্ত আয়ুধকেই পুরুষ হিসাবে দেখান হয়েছে। বিষ্ণুর চক্র ও গদা গুপ্ত যুগেই মানুষ মূর্তি পেয়েছিল। শঙ্খ ও কদাচিৎ পদ্মকে বিগ্রহমূর্তি হিসাবে প্রথম ও শেষ মধ্যযুগে পূর্ব ও উত্তর ভারতে দেখা যায়। বজ্র, শক্তি, দণ্ড, খড়্গ, পাশ, অঙ্কুশ, ত্রিশূল ইত্যাদিকেও বিগ্রহ হিসাবে নানা গ্রন্থে দেখা যায় , কিন্তু শিল্পকর্মে পাওয়া যায় না। ইন্দো-সিদিয়ান যুগে প্রথম আয়ুধ পুরুষের সন্ধান মিলেছে ; মাউয়েস্-এর কিছু তাম্রমুদ্রাতে বজ্রকে মানুষের মূর্তিতে দেখা যায় এবং এর পেছনে দুটি শলাকা যুক্ত বজ্র রয়েছে। বজ্রযুক্ত

এই আয়ুধপুরুষের মাথায় হাত দিয়ে জিউস্‌-ইন্দ্র সিংহাসনে বসা। দেওগড়ে শেষ শয়ন-মূর্তিতে ধনু, চক্র, শঙ্খ গদা ও খড়্গ আয়ুধ-পুরুষ হিসাবে উপস্থিত; নির্দিষ্ট পরিচয় হিসাবে এদের মাথাতে ধনু, চক্র ইত্যাদি দেখান হয়েছে। আবার অনেক সময় অসুরদের (এরা আয়ুধ বহনকারী মাত্র) হাতেও আয়ুধ থাকে; কাঞ্জিভরমে কৈলাসনাথ স্বামিন্‌ মন্দিরে বিষ্ণুর মধ্যম ভোগাসন-মূর্তিতে এই রকম আয়ুধ দেখা যায়। দ্রঃ- সুদর্শন।

আয়ুর্বেদ—বা বৈদ্যক। ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আছে আয়ুর্বেদ চারটি বেদের সার এবং কশ্যপ মুনির মতে পঞ্চম বেদ। অন্য মতে অথর্ব-বেদের একটি উপাঙ্গ আয়ুর্বেদ। দেহ ও চিকিৎসা সম্বন্ধে নানা কিছু জিনিস বেদ-গুলির মধ্যে ছড়ান আছে। ঋকবেদে বায়ু, পিত্ত, কফ এবং অথর্ববেদে নর কঙ্কালের বিভিন্ন অংশের উল্লেখ আছে। বৈদ্যক অর্থে ক্লীবলিঙ্গে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ।

কাহিনী আছে এই বিশেষ বেদটি প্রজাপতি রচনা করে সূর্যকে দেন। সূর্য আর এক সংহিতা তৈরি করে ধন্বন্তরি, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ইত্যাদি ষোল জনকে পাঠ করান। এঁরা প্রত্যেকে আবার এক একখানি চিকিৎসা শাস্ত্র রচনা করেন। অন্য মতে ব্রহ্মা তাঁর ধ্যানলব্ধ জ্ঞান দক্ষ প্রজাপতিকে দেন এবং দক্ষ অশ্বিনীকুমারদের দেন। ইন্দ্র এঁদের এক জনের কাছ থেকে এই বিদ্যা আয়ত্ত করে ভরদ্বাজ ইত্যাদি ঋষিকে দেন। অন্য মতে দীর্ঘ জীবনের কামনায় ভরদ্বাজ ঋষি ইন্দ্রের কাছে আয়ুর্বেদ শিক্ষা করেন এবং কাশীরাজের ছেলেকে শিক্ষা দেন। মতান্তরে ভরদ্বাজ দেন আত্রেয়কে এবং আত্রেয় অগ্নিবেশ ও অন্য শিষ্যদের দেন। অগ্নিবেশের কাছ থেকে পান চরক। আবার ধন্বন্তরি (দিবোদাস) সুশ্রুত ও সহ অধ্যায়ীরা আয়ুর্বেদ আয়ত্ত করেন পরে নাগার্জুন এই শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়ে ওঠেন। প্রথম দিকে এই শিক্ষা মুখে মুখেই প্রচলিত ছিল। আত্রেয় শিষ্য অগ্নিবেশ প্রথমে সংহিতা রূপে লিপিবদ্ধ করেন। অগ্নি-বেশের দেখাদেখি আত্রেয়ের অন্য শিষ্যরাও যেমন ভেল, জতূকর্ণ, পরাশর, হারীত, ক্ষারপাণিও এক এক সংহিতা লেখেন। পরবর্তী কালে চরক অগ্নিবেশ সংহিতাকে বিশেষ ভাবে সংকলন করেন এবং নাম হয় চরক সংহিতা। এ ছাড়া খরনাদ, বিশ্বামিত্র, অত্রি, মাধব সংহিতা ইত্যাদি নানা গ্রন্থ প্রচলিত ছিল। শল্য চিকিৎসক সুশ্রুত প্রণীত গ্রন্থের নাম সুশ্রুত সংহিতা। আয়ুর্বেদের মধ্যে তান্ত্রিক চিকিৎসা পদ্ধতি নামে একটি শাখা আছে। অনেকের মতে এটি আর্যপূর্ব যুগের চিকিৎসা পদ্ধতি। বৈদিক পদ্ধতিতে দুটি ধারা আছে। তান্ত্রিক পদ্ধতিতেও দুটি ধারা রসসাধক ও বিষসাধক। রসসাধকরা পারদশোধন, মারণ প্রভৃতি দিয়ে জরা ও ব্যাধি নিয়ন্ত্রিত করতেন এবং বিষসাধকরা নানা বিষ দিয়ে রোগ ও রোগের যন্ত্রণা উপশম করাতেন। বিষসাধকদের গ্রন্থগুলি তন্ত্র নামে পরিচিত। রসার্ণব তন্ত্র, রসেন্দ্রসার সংগ্রহ, রসেন্দ্র চিন্তামণি, রসহৃদয় তন্ত্র, রসরত্ন, ঔপধেনব তন্ত্র, ঔরভ্র তন্ত্র, নিমিতন্ত্র, শৌনকতন্ত্র, বিদেহ তন্ত্র ইত্যাদি আরো বহু তন্ত্র রয়েছে।

অনেকের মতে কনিষ্কের সভাতে চরক রাজবৈদ্য ছিলেন। সুতরাং গ্যালেনের (আনু ১৩০-২০০ খৃ) সমসাময়িক হয়তো। কয়েক শতাব্দী পরে বিক্রমাদিত্যের ধন্বন্তরি ও অমর সিংহ। নবরত্ন ধন্বন্তরির একটি ভেষজ বিদ্যা রয়েছে এবং অমরসিংহের অমরকোষে

বহু ভেষজের বিকল্প নাম পাওয়া যায়। শুক্রাচার্যের মৃতসঞ্জীবনী এবং ইন্দ্রের দেহে মেষের মুষ্ক-সংযোগ ইত্যাদি অবশ্য নিছক কল্পনা। মুসলমান আক্রমণের পর ভারতের বাইরে আয়ুর্বেদ জ্ঞান ছড়িয়ে পড়ে। বাগদাদে খলিফা হারুন অল রসিদ (৭৬৩-৮০৯ খৃ) আয়ুর্বেদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং চরক সুশ্রুত ইত্যাদি আরবিতে অনুবাদ করান। তাঁর সভায় মঙ্খ নামে একজন ভারতীয় চিকিৎসক ছিলেন এবং আয়ুর্বেদের বিষক্রিয়া সম্বন্ধীয় অংশগুলির ফারসি অনুবাদ করেন। চরক সংহিতা অনুবাদ করেন আলি ইবন জৈন এবং অনূদিত সুশ্রুত সংহিতার নাম হয় 'কিলল সশুর অল হিন্দি'। বাগভট্টের অষ্টাঙ্গহৃদয় ও মাধবকরের নিদান ও আরবিতে ঐ সময়ে অনূদিত হয়। অষ্টম বা নবম শতাব্দীতে নাগার্জুন চোলাই করা, সত্ত্বপাতন, ঊর্দ্ধপাতন প্রভৃতি পদ্ধতির আবিষ্কার করেন। বহু বিদ্যার্থীকে চিকিৎসা ও ভেষজ বিদ্যা শেখাবার জন্য হারুন অল রসিদ ভারতে পাঠিয়ে ছিলেন এবং বহু ভারতীয় চিকিৎসককে নিয়ে গিয়ে বাগদাদে ও অন্যান্য হাসপাতালে নিযুক্ত করেছিলেন এবং বহু গ্রন্থ অনুবাদ করিয়েছিলেন। অর্থাৎ ইউনানি শাস্ত্রের উপর আয়ুর্বেদের প্রভাব অনস্বীকার্য।

ব্রহ্মসংহিতা মতে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদে নয়টি বিভাগ ঃ—কায়চিকিৎসা, শল্য চিকিৎসা, শালাক্যচিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমারভৃত্য, অগদচিকিৎসা, রসায়ন চিকিৎসা, বাজীকরণ চিকিৎসা, পশু চিকিৎসা। পশুচিকিৎসা বাদ দিয়ে বাকি আটটি শাখা মিলে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ। কায়চিকিৎসা ঃ—দেহের যে কোন স্থানের রোগের চিকিৎসা। দুভাগে বিভক্ত ঃ—শারীরিক ও মানসিক। বায়ু, পিত্ত, কফ এই তিনটি একক ভাবে বা মিলিত ভাবে কুপিত হয়ে যে রোগ ঘটায় তাকে স্বাভাবিক রোগ বলা হয়। বায়ু পিত্ত কফের সুষম অবস্থার নাম সমাগ্নি। এই তিনের স্বাভাবিক অবস্থার ব্যতিক্রম ঘটলে বিসমাগ্নি, তীক্ষ্ণাগ্নি বা মন্দাগ্নি অবস্থা দেখা দিতে পারে। বিষমাগ্নি থেকে বাতজরোগ, তীক্ষ্ণাগ্নি থেকে পিত্তজ রোগ ও মন্দাগ্নি থেকে কফজ রোগ দেখা দেয়। স্বাভাবিক রোগ ছাড়া আরো দুটি শ্রেণী রয়েছে ; একটি সংক্রামক রোগ ; যেমন হাম, বসন্ত, চর্মরোগ, অভিষ্যন্দ (একজিমা) প্রভৃতি। আর একটি আগন্তুক রোগ অর্থাৎ পুড়ে যাওয়া ইত্যাদি দুর্ঘটনা জনিত আসা রোগ। শরীর-গত বায়ুকে আয়ুর্বেদ পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছে ; প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান ও উদান। বায়ু-প্রকৃতির লোকের দেহে ক্ষিতি ও অপ্-এর প্রভাব কম থাকে। পুষ্টির অভাবে দেহের ত্বক ও কেশ শুকিয়ে যায় ; অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষীণ ও লঘু হয়ে পড়ে ; দেহ ও মনে দৃঢ়তা থাকে না ; স্নায়ুতন্ত্রের উত্তেজনা প্রবল হয়ে ওঠে, এবং একটুতেই এদের বাতজ ব্যাধি দেখা দেয়। শারীরিক ও মানসিক ক্ষুধা জনিত দুটি শক্তিশালী প্রবৃত্তির বিরোধই শুচিবায়ু, মূর্চ্ছা, উন্মত্ততা ইত্যাদি বায়ু রোগের কারণ। আয়ুর্বেদে ৮০ প্রকার বায়ু রোগের নিদান সহ বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে। চরকের মতে বস্তি, মলাশয়, কোমর, পদযুগল ও পায়ের হাড়গুলি ও প্রধানত পক্বাশয়ে বায়ুর অধিষ্ঠান। পিত্ত দেহের তাপ ও পরিপাক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে। পিত্ত-প্রকৃতির লোকেদের দেহের গঠন হয় মাঝারি। প্রচুর ক্ষুধা ও তৃষ্ণা থাকে। দেহ থেকে প্রচুর ঘাম, মল

ও প্রস্রাব নির্গত হয়। গায়ের চামড়া উজ্জ্বল ও মসৃণ থাকে কিন্তু সহজে কুঞ্চিত হয়ে পড়ে। গ্রীষ্মে সহজে কাবু হয়ে পড়ে। দুর্ধর্ষ সাহস থাকলেও কষ্ট সহ্য করতে পারে না। অতি তাড়াতাড়ি জরা ও বার্দ্ধক্য এসে দেখা দেয়। পিত্তের উষ্মাই অগ্নি বা অন্য মতে পিত্ত নিজেই অগ্নি। এই পিত্ত উষ্মা বিকৃত হলে তীক্ষ্ণাগ্নি দেখা দেয় এবং পরিণামে অজীর্ণ, গ্রহণী, জ্বর, চক্ষু রোগ ইত্যাদি হতে পারে। স্বেদ, রস, লসিকা, রক্ত ও প্রধানত আমাশয়ে পিত্তের স্থান। কফ দেহের স্নিগ্ধতা, জলীয় ভাগ ও পিচ্ছল গতি নিয়ন্ত্রণ করে। মাথা, গ্রীবা, অস্থিসন্ধি, মেদ এবং প্রধানত বুকে কফের স্থান। কফের প্রকোপে সর্দি, কাসি প্রভৃতি শ্বসন যন্ত্রের রোগ দেখা দেয়। কফ-প্রকৃতির লোকেদের দেহ সুগঠিত ও কান্তি লালিত্যপূর্ণ। কেশ ঘন ও কালো। আহার ও চলাফেরা মন্থর ও সংযত। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ঘর্মে বা গ্রীষ্মে এদের বিশেষ কষ্ট হয় না। প্রজনন ক্ষমতা এদের বেশি।

শল্যচিকিৎসা ঃ—সুশ্রুতে শল্য চিকিৎসার অদ্ভুত উৎকর্ষতা দেখা যায়। হিপোক্রেটিস্-এর (৪৬০ খৃ-পূ) বহু আগে ভারতে শল্য চিকিৎসা বিশেষ উন্নতি লাভ করেছিল। সুশ্রুত সংহিতায় শতাধিক অস্ত্র এবং চোদ্দ রকম পট্টবন্ধনীর বিবরণ আছে। হাড় ভাঙলে এবং সন্ধিতে হাড় সরে গেলে বিশেষ চিকিৎসার উল্লেখ আছে। ভাঙ্গা হাড় ঠিক জায়গায় বসিয়ে দিয়ে কাঠ বা বাঁশের ফলক দিয়ে বাঁধবার বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। অস্ত্রে কাটা নানা প্রকার ক্ষতের বিবরণ এই বইতে পাওয়া যায়। কনুয়ের সামনের দিক থেকে রক্ত মোক্ষণ, জোঁকের ব্যবহার, পেট ও জলমুষ্ক থেকে জল বার করে দেওয়ার ব্যবস্থা, উপযুক্ত চাপ দিয়ে বেঁধে রক্তমোক্ষণ বন্ধ করা ইত্যাদি শল্যচিকিৎসার অন্তর্গত। দুর্ঘটনায় আহত হাত, পা বা আরোগ্যের সম্ভাবনা হীন রুগ্ন হাতপা কেটে বাদ দিয়ে কাটা অংশে ফুটন্ত তেলের প্রলেপ দিয়ে বেঁধে দেওয়া হত। অর্বুদ ও বর্দ্ধিত লসিকাগ্রন্থি কেটে বাদ দিয়ে সেখানে সেঁকো বিষ দিয়ে আবার যাতে না হয় ব্যবস্থা ছিল। গাল থেকে মাংস কেটে নিয়ে কাণের সংস্কার করতেও চিকিৎসকরা পটু ছিলেন। নাভির একটু নীচে বাঁ দিকে চিরে নিয়ে পেটের ভেতরে অস্ত্রপ্রচার করা হত। অন্ত্রের কোনখানে টুকরো করে আবার সেলাই করে জুড়ে দেওয়া হত। দেহের যে কোন নলীয় বা থলীয় অংশে কিছু ঢুকলে তা বার করে দিতে পারতেন। প্রসবের সময় প্রয়োজন হলে অস্ত্রোপচার ও চোখের ছানি কাটাও হত। ভোজ প্রবন্ধে আছে মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচারের আগে রোগীকে ভেষজ যোগে সংজ্ঞাহীন করে নেওয়া হত।

শালাক্য চিকিৎসা ঃ—অক্ষকের ওপর যে কোন অংশের শল্য চিকিৎসা। অর্থাৎ চোখ, কাণ, নাক ও গলার ভেতর প্রভৃতি অংশে শল্যায়ন। বিভিন্ন তন্ত্রে এই রূপ চিকিৎসার বিশেষ বিবরণ আছে। ভূতবিদ্যা ঃ মানসিক রোগের চিকিৎসা। চরকে অষ্টম অধ্যায়ে, সুশ্রুতে ষষ্ঠ অধ্যায়ে এবং অষ্টাঙ্গ হৃদয়ে চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে বিশেষ ভাবে আলোচিত হয়েছে।

কৌমারভৃত্যা ঃ—সুশ্রুতে উত্তর তন্ত্রে বারটি পরিচ্ছেদে, কাশ্যপ-সংহিতা ও

বৃদ্ধজীবক তন্ত্রে শিশুরোগের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। সদ্যোজাত শ্বসনহীন শিশুকে কৃত্রিম শ্বসনের দ্বারা বাঁচিয়ে তোলার বিবরণও আয়ুর্বেদে আছে। অগদ সংহিতা ঃ—নানা বিষের ক্রিয়া জনিত রোগের উপযুক্ত চিকিৎসা শাখা। রোগের লক্ষণ, মৃত্যুর পরবর্তী পর্যবেক্ষণ বিবরণও অগদ সংহিতার অংশ। রসায়ন চিকিৎসা ঃ—বৈদিক যুগ থেকেই রসায়ন সাহায্যে চিকিৎসা চলে আসছে। পারদ, লৌহ প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট ভেষজ দু হাজার বছর আগেও ভারতে ব্যবহৃত হত। পতঞ্জলি লৌহশাস্ত্র সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। খৃস্টীয় ৮-৯ শতকে নাগার্জুন গন্ধক ও পারদ মিশ্রণে কজ্জলীর প্রবর্তন করেন। চোলাই ইত্যাদি এবং ভেষজের বড়ি তৈরি করে ব্যবহারও নাগার্জুন জানতেন। ভেষজ রূপে সেঁকো বিষের ব্যবহার নাগার্জুনের আগেও ভারতে জানা ছিল। ভেষজগুলি বিভিন্ন অনুপান যোগে ব্যবহৃত হয়। বাজীকরণ চিকিৎসা ঃ—বীর্যধারণ ক্ষমতা, প্রজনন শক্তি বৃদ্ধি প্রভৃতির জন্য আয়ুর্বেদের একটি শাখা। এ বিষয়ে বহু তন্ত্র রয়েছে।

এই আটটি বিষয় ছাড়াও পশু চিকিৎসার দিকও আয়ুর্বেদে অবহেলিত হয় নি। এই শাখার অনেক বই আছে। তার মধ্যে পালকাপ্য সংহিতাতে হাতীর, গোতম সংহিতাতে গরুর, এবং শালিহোত্র সংহিতাতে ঘোড়ার রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে। এ ছাড়াও বৃক্ষায়ুর্বেদে বৃক্ষাদির চিকিৎসা পদ্ধতির কথা আছে।

আয়ুষ্টোম—দীর্ঘায়ু কামনার যজ্ঞ।

আয়ুস্—দ্রঃ- আয়ুঃ।

আয়োগব—শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে জাত সন্তান। পেশা নাটক অভিনয় ও হস্তশিল্প।

আয়োদ্ধৌম্য—আপোদ্ধৌম্য, একজন মহর্ষি। এঁর তিন বিখ্যাত শিষ্য বেদ, দ্রঃ- উপমন্যু, দ্রঃ- আরুণি (মহা ১।৩।১৯)। গুরুভক্তি পরীক্ষার জন্য শিষ্যদের নানা ক্লেশ দিতেন এবং পরে বিবিধ বিদ্যায় পারঙ্গম করে গৃহাশ্রমে ফিরে যেতে দিতেন।

আরকট—মাদ্রাজের দুটি জেলা, উত্তর আরকট ও পূর্ব আরকট। সহর আরকট ১২°৫৬′উ ৭৯°২৪′পূ। অনেকের মতে তামিল আরুকাড়ু শব্দের অপভ্রংশ। আরুকাড়ু অর্থে ছয় অরণ্য এবং এখানে ছ জন ঋষি বাস করতেন। দক্ষিণ আরকটে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের বাস ছিল। পাথরের বহু অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি পাওয়া গেছে। ঐতিহাসিক যুগে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রভাব এসে পড়ে। খৃস্টীয় তৃতীয় শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত চোল রাজারা দক্ষিণ আরকটে রাজত্ব করতেন। নবম শতকের শেষ ভাগ পর্যন্ত উত্তর ও দক্ষিণ আরকট পল্লবদের অধীন ছিল। পল্লবদের সময় ভাস্কর্য চিত্রকলা ও স্থাপত্য শিল্পের চরম উন্নতি দেখা গিয়েছিল। নরসিংহ বর্মার সময় মহাবালিপুরম নামে জায়গাতে পাহাড় কেটে সাতটি রথ বা মন্দির তৈরি হয়েছিল। এগুলি পল্লব ভাস্কর্যের চরম উৎকর্ষতার নিদর্শন। শৈব পরমেশ্বর বর্মা অগণিত শিব মন্দির তৈরি করেন এবং মহাবালিপুরমের বিখ্যাত গণেশ মন্দিরটিও তাঁর।

আরট্ট—পাঞ্জাবে। সংস্কৃতে অরাষ্ট্র। এখানে ভাল ঘোড়া পাওয়া যেত।

আরণ্যক—উজ্জয়িন ও বিদর্ভের দক্ষিণে একটি দেশ। পেরিপ্লাসে অরিয়ক। অপর মতে অরিয়ক (আর্যক্ষেত্র) হচ্ছে ঔরঙ্গাবাদের অনেকটা+দক্ষিণ কোঙ্কন। রাজধানী ছিল টগর, বর্তমানে দৌলতাবাদ। কান্তারক।

আরণ্যক—বেদের ব্রাহ্মণ ভাগের তিন অংশ ; শুদ্ধব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। শুদ্ধ ব্রাহ্মণ মুখ্যত কর্মাশ্রয়ী বা কর্মকাণ্ড এবং উপনিষদ জ্ঞানাশ্রয়ী বা জ্ঞান-কাণ্ড। মাঝখানে আরণ্যক কর্ম ও জ্ঞানের সন্ধিসাধক সেতু। আরণ্যকে যজ্ঞের উপদেশ আছে কিন্তু এ যজ্ঞে হবন অপেক্ষা মননের প্রাধান্য অধিক।

অরণ অর্থে দূর দেশ বা বনদেশ। অরণে বা অরণ্যে সুগভীর তত্ত্বানুশীলন সম্ভব মনে হত। তাই অরণ্যে পাঠ্য গ্রন্থ আরণ্যক। বিদ্যার্থী ব্রহ্মচারী সমাবর্তনের আগে অরণ্যে বা 'অচ্ছদিদর্শ' (যেখানে বাড়ির ছাদ দেখা যায় না) প্রদেশে বসে গুরুর কাছে আরণ্যকের পাঠ গ্রহণ করতেন। গৃহস্থ বয়স কালে বানপ্রস্থে আসতেন এবং বৃদ্ধবয়সে অর্থাভাব হেতু আরণ্যক নির্দিষ্ট মানস যজ্ঞের মধ্যে নিজেকে মেলে ধরতেন। অর্থাৎ জীবনের দুটি প্রান্তে দুবার অরণ্যে এসে আরণ্যক পঠিত হত।

আরণ্যক রূপকবহুল রহস্যবিদ্যা। আরণ্যকে রূপক যজ্ঞের প্রাচুর্য সব চেয়ে : তৈত্তিরীয় আরণ্যকে চতুর্হোত্রযাগ একটি রূপক যজ্ঞ ; চেতনা যেখানে স্রুক, মন আজ্য, বাক বেদি। শাঙ্খায়ন আরণ্যকে আন্তর-অগ্নিহোত্রও সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক কর্ম।

গ্রন্থের বিন্যাস ব্যবস্থা ও বস্তু ভাবনার দিক থেকে তুলনা করলে উপনিষদের পূর্বে আরণ্যক। আরণ্যক ব্রাহ্মণের অংশ ; কিন্তু আজ পর্যন্ত যতগুলি ব্রাহ্মণ পাওয়া গেছে ততগুলি আরণ্যক কিন্তু পাওয়া যায় নি। ঋক বেদের দুটি ব্রাহ্মণ ঐতরেয় ও শাঙ্খায়ন এবং দুটিরই আরণ্যক আছে। কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেরও আরণ্যক আছে। ঐতরেয়, শাঙ্খায়ন ও তৈত্তিরীয় এ তিনটি প্রকৃতপক্ষে পরিপূর্ণ আরণ্যক। শুক্লযজুর্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণের শেষ অংশ বৃহদারণ্যক। এই বৃহদারণ্যক একাধারে আরণ্যক ও উপনিষদ। কৃষ্ণযজুর্বেদে মৈত্রায়ণীয় চরকশাখারও একটি বৃহদারণ্যক আছে। তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ প্রভৃতি সামবেদীয় ব্রাহ্মণগুলির কোন আরণ্যক আজও পাওয়া যায় নি। সামবেদের জৈমিনীশাখার উপনিষদ্‌ব্রাহ্মণখানি অনেক অংশে আরণ্যক ধর্ম যুক্ত। এটি হয়তো তলবকার জৈমিনীয় ব্রাহ্মণের আরণ্যক। অথর্ববেদের গোপথ ব্রাহ্মণেরও কোন আরণ্যক পাওয়া যায় নি।

আরতি—পূজার একটি অঙ্গ। আরাত্রিক, নীরাজন বা নির্মঞ্ছন। বিগ্রহের সামনে দীপমালা, বা পঞ্চপ্রদীপ, জলপূর্ণ শঙ্খ, ধৌত বস্ত্র, আম বা অশ্বত্থ ইত্যাদির পাতা বা ফুল এবং বেলপাতা দিয়ে আরতি এবং সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। ধূপধুনা ও কর্পূরের বাতিও ব্যবহার হয়। প্রথমে দেবতার পদতলে চারবার, তারপর ক্রমান্বয়ে নাভিদেশে দুবার, মুখমণ্ডলে তিনবার এবং সর্বাঙ্গে সাতবার এগুলি ঘুরিয়ে আনতে হয়। আরতির অনুষ্ঠান ও দর্শন বহুফলপ্রদ। অঙ্গহীন পূজা নীরাজনের দ্বারা পূর্ণতা পায়। সুদৃশ্য

দীপাবলী দিয়ে বিষ্ণুর নীরাজন অনুষ্ঠিত হলে তামসিকতা দূর হয় ফলে আর পুনর্জন্ম হয় না।

আরমেনিয়া—রমণীয়ক দ্বীপ (মহা)। দ্রঃ- আর্মানি।

আরা—বিহারে। আরাম নগর। সাহাবাদ জেলাতে। অন্য মতে আড়ারকালাম (> আরা) এখানে থাকতেন। পাটনা থেকে ৫০ কি-মি। ভগবান মহাবীর তাঁর যাত্রাপথে এখানে বিশ্রাম করেছিলেন। এখানে সহরে ৪৫-টি জৈন মন্দির আছে। জৈনরা এখানে প্রতি বৎসর এসে মিলিত হন। এখানে অরণ্যদেবী-স্থান সম্পর্কে জনশ্রুতি পাণ্ডবরা অজ্ঞাতবাসের সময় গভীর জঙ্গলে এইখানে মাতৃমূর্তি স্থাপিত করে পূজা করেছিলেন। কালক্রমে সেই অরণ্য আরাতে পরিণত হয়েছে। রাম নবমীর সময় এখানে তিন দিন ব্যাপী বিরাট মেলা হয়।

আরাকান—উচ্চ শৈলমালা একে ব্রহ্মদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত। খৃস্ট জন্মের আগে হিন্দুরা বাস করতেন। এখানে রামাবতীতে কাশীরাজের ছেলে প্রথম হিন্দুরাজ্য স্থাপন করেন। খৃস্টীয় অষ্টম শতকে বৈশালীতে নতুন রাজধানী হয়। এই শতাব্দীতে রাজা আনন্দচন্দ্রের সময়ের একটি সংস্কৃত শিলালিপিতে পূর্ববর্তী আরো ২০ জন রাজার ৩৫০ বছর ধরে রাজত্ব করার উল্লেখ আছে। আনন্দচন্দ্র বৌদ্ধ ছিলেন ; এবং তাম্রপট্টনরাজ নামে অভিহিত হতেন। অর্থাৎ আরাকানের প্রাচীন নাম তাম্রপট্টন। আরো কয়েকটি প্রাচীন লিপি ও মুদ্রা পাওয়া গেছে। বৈশালীর (দ্রঃ-) বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ এই রাজ্যের প্রাচীন সমৃদ্ধি ও গুপ্ত পরবর্তী যুগের ভারতীয় শিল্পকলার প্রভাবের পরিচয় দেয়।

আরাবল্লী—আদর্শাবলী। পারিযাত্র পর্বতের অন্তর্গত। উত্তর দিল্লিতে এই পর্বত শাখা এসে শেষ হয়েছে। দ্রঃ- অর্বুদ।

আরুণি—পাঞ্চালের ঋষি। ঋষি গৌতমের বংশে ঋষি উপবেশির নাতি এবং অরুণের ছেলে। আরুণি যাজ্ঞবল্ক্যের গুরু। আয়োদ্ধৌম্যের (দ্রঃ) শিষ্য। আরুণির ছেলে শ্বেতকেতু ও নাতি বিখ্যাত নচিকেতা। আরুণির দার্শনিক মতবাদ ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে রয়েছে। তৎ-ত্বমসির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইনি আত্মাদ্বৈতবাদ স্থাপন করেন। আরুণি একবার গুরুর ক্ষেতের ভাঙ্গা আল বাঁধবার আদেশ পেয়ে আল বাঁধতে চেষ্টা করেন কিন্তু বিফল হয়ে নিজে সেখানে শুয়ে পড়ে নিজের দেহ দিয়ে জল আটকে রাখেন। পাঞ্চাল্য আরুণি ফিরছে না দেখে আয়োদ্ধৌম্য অন্য শিষ্যদের নিয়ে আরুণির [illegible]জে এসে সমস্ত জানতে পেরে সন্তুষ্ট হয়ে আরুণিকে উঠে আসতে বলেন ও ক্ষেত্রের [illegible] থেকে উঠে এলেন (কেদারখণ্ডং অবদার্য—মহা ১।৩।২০) বলে গুরু নতুন নাম দিলেন উদ্দালক (দ্রঃ)। গুরু আশীর্বাদ করেন শ্রেয়ঃ অবাপ্স্যসি এবং সমস্ত বেদ প্রতিভাস্যন্তি। আরুণি তারপর স্বগৃহে ফিরে যান। (২) ধৃতরাষ্ট্র বংশে একটি গোক্ষুরা সাপ।

আরুষী—মনুর কন্যা। চ্যবনের স্ত্রী। ছেলে ঔর্ব (দ্রঃ) ; উরু থেকে জন্ম। এই ঔর্বের (দ্রঃ) ছেলে ঋচীক। ঋচীকের ছেলে জমদগ্নি।

আর্চীক পর্বত—পুষ্কর থেকে এখানে আসতে হয়। সব সময় এখানে জল ও গাছে ফল পাওয়া যায়। এখানে মনীষিরা ও মরুৎরা থাকেন। দেবতাদের বহু শত চৈত্য এখানে রয়েছে। এটি চন্দ্রের তীর্থ (মহা ৩।১২৫।১৩)। বনবাস কালে তীর্থ যাত্রায় বার হয়ে চ্যবন সরোবর থেকে আর্চীক পর্বতে আসার উল্লেখ আছে; নাম চন্দ্রমস্ তীর্থ; যেন যমুনার উৎপত্তি স্থান। এখানে বৈখানসরা এবং বালখিল্যরা তপস্যা করতেন; শান্তনু, শনক, নর ও নারায়ণ এখানে তপস্যা করে সনাতন স্থান লাভ করেন। কৃষ্ণ এখানে তপস্যা করেছিলেন। দেবতা ও পিতৃপুরুষদের এখানে নিত্য বাস।

আর্জব—সুবলের ছেলে। শকুনির ভাই। অর্জুনের ছেলে ইরাবানের হাতে মারা যান।

আর্দ্রা—আলফা ওরিওনিস্। দ্রঃ- কালপুরুষ। ৬-ষ্ঠ নক্ষত্র। পদ্মাকৃতি উজ্জ্বল একটি তারা।

আর্মানি—বা আর্মেনিয়া। এসিয়া মাইনর ও কাস্পিয়ান হ্রদের মধ্যবর্তী দেশ। এখানকার অধিবাসীরা ককেসীয় গোষ্ঠীর একটি শাখা। খৃস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে এখানে বহু হিন্দু স্থায়ীভাবে বাস করতেন এবং মন্দিরাদি করেছিলেন। মন্দিরগুলির মধ্যে দুটি মন্দিরে দেবমূর্তি যথাক্রমে ১২ হাত ও ১৪ হাত উচ্চ ছিল। ৩০৪ খৃস্টাব্দে ধর্মান্ধ পাদরি সেন্ট-গ্রেগরি হিন্দুদের বাধা সত্ত্বেও ঐ মন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংস করেছিলেন। দ্রঃ- আরমেনিয়া।

আর্য—এসিয়া ও ইউরোপের অধিবাসী একটি প্রাচীন জাতি। ঋক্‌বেদে 'আর্য', আবেস্তাতে ঐরয়, এবং প্রাচীন পারসিক গিরিলিপিতে অরিয় নামে উল্লিখিত। বৈদিক, সংস্কৃত, এসিয়ার আর্মানি, গ্রীক, ল্যাতিন, গথিক, প্রাচীন আইরিস, প্রাচীন ওয়েলস্, প্রাচীন স্লাব, তোখারি ইত্যাদি ভাষাগুলি একটি গোষ্ঠীগত ভাষা। অর্থাৎ এই ভাষাভাষীরাও একটি গোষ্ঠীর লোক। প্রথমে এই গোষ্ঠীর নাম দেওয়া হয়েছিল ইন্দোগেরম্যানিশ, পরে নাম দেওয়া হয় ইন্দো-ইউরোপীয়। অর্থাৎ আসাম থেকে সুদূর আইসল্যাণ্ড পর্যন্ত এই একটি গোষ্ঠীর লোক ও ভাষা। অবশ্য বর্তমানে আর্য অর্থে ভারতীয় ও ইরানের প্রাচীন বসতিকারদের বুঝায়। বর্তমানের এই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার জনক হিত্তি-ভারতীয় নামে আর একটি ভাষার প্রকল্প গড়ে তোলা হয়েছে।

বিভিন্ন মতবাদ সত্ত্বেও মোটামুটি বলা যায় রুস দেশে উরাল পর্বতের দক্ষিণে তৃণাচ্ছন্ন শুষ্ক সমতল ভূখণ্ডে আজ থেকে প্রায় ৫০০০ বছর আগে একটি জাতি, ভাষা ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। এরা নর্ডিক বা উদীচ্য জাতি; শ্বেতকায়, দীর্ঘদেহ, নীলচক্ষু, হিরণ্যকেশ, দীর্ঘ কপাল, সরল নাক। নানা কারণে এ'রা তারপর চার দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকেন। এখান থেকে আনুমানিক ২০০০ খৃস্টপূর্বাব্দে হিত্তি ভাষী একটি গোষ্ঠী এসিয়া মাইনরে কাপ্‌পাদোসিয়া-তে এবং ইন্দো-ইরানীয় একটি গোষ্ঠী মধ্য এসিয়াতে এসে বাস করতে থাকেন। ইন্দো-ইরানীয়েরা মধ্য এসিয়ার পামির অঞ্চলে বাস করতেন; অন্য মতে শিরদরিয়া ও আমুদরিয়া এই নদী দুটির চার পাশে

সমতল ভূখণ্ডে বাস করতেন। এখানে এ'রা-আধা-যাযাবর ও আধা প্রতিষ্ঠিত কৃষক। অবশ্য ঘোড়াকে এ'রা পোষ মানিয়ে কাজে লাগিয়েছিলেন কিন্তু তবু উন্নত ধরণের সভ্যতা গড়ে তুলতে পারেন নি। এখান থেকে পরে ১৫০০ খৃস্টাব্দের মধ্যে ইন্দো-ইরানীয়রা দুটি শাখায় ভাগ হয়ে এক দল উত্তর ভারতে আর এক দল ইরানে এসে নিজেদের আধিপত্য স্থাপন করেন। এ'দের বিভিন্ন গোত্র ছিল যেমন মদ বা মদ্র, পর্শু, পার্শ্ব বা পাস, পুলস্ত, শক, ভারত, কাশ্ব বা কাশ্যপ, বশ, তুর্ব ইত্যাদি। এই শাখাগুলির মধ্যে কয়েকটি শাখা ভারতে আসে।

১৫০০ খৃ- পূর্বের মধ্যে আর্য'রা ভারতে এসেছিলেন এ মত আজকে সুপ্রতিষ্ঠিত। এর পর ভারতে আর্য সভ্যতার বিকাশ। কোন কোন মতে ২৫০০০ খৃ-পূর্বে ভারতে আর্য সভ্যতা ও বৈদিক সংস্কৃতির উৎপত্তিকাল। বৈদিক সাহিত্যে প্রাপ্ত তিথি নক্ষত্রের হিসাবে তিলকের মতে ৬০০০ খৃ-পূর্ব এবং জার্মান পণ্ডিত হেরেমান য়াকোবির মতে ৪০০০ খৃ-পূর্বে ভারতে আর্য সভ্যতার পত্তন হয়েছিল ও বেদ রচিত হয়েছিল। আবার হ্যাজিং দেখাবার চেষ্টা করেছেন খৃস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকেও ভারতে বেদ রচনা সমাপ্ত হয়নি। অবশ্য এ সমস্ত সিদ্ধান্ত মূল্যহীন।

১৫০০ খৃ- পূর্বের আগে আর্যরা ভারতে এসেছিলেন। এই সময়ে সিন্ধু উপত্যকায় যে সভ্যতা ছিল অনেকের মতে সেটিও আর্য সভ্যতা। তবে বেশির ভাগ বিশেষজ্ঞের মতে সিন্ধু সভ্যতা আর্য সভ্যতা নয় এবং এর আয়ুষ্কাল ২৫০০ খৃ-পূ থেকে ১৫০০ খৃ-পূ। আর্যদের আক্রমণে এই সভ্যতা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়। সিন্ধুসভ্যতার মানুষরা নাগরিক জীবনে অভ্যস্থ ও নগর নির্মাণে দক্ষ ছিলেন। বৈদিক সভ্যতার আদি যুগে আর্যরা গ্রামকেন্দ্রিক গোষ্ঠী জীবন যাপন করতেন।

উ-প গিরিপথ দিয়ে এরা ভারতে এসেছিলেন। ফেলে আসা মধ্য প্রাচ্যের কোন হিসাব এরা দিয়ে যান নি। আফগানিস্তান ও উ-প সীমান্ত প্রদেশ ইত্যাদি অংশে বসতি করে সুদূর দ-ভারত ও পূর্ব ভারত সম্বন্ধেও নানা কথা বলেছেন; অথচ মধ্য প্রাচ্য সম্বন্ধে কোন কথা নাই কেন? জননী জন্ম-ভূমিশ্চ একথা কাদের? অর্থাৎ এ'রা কতটা বহিরাগত? পানিকরের মতে এরা যখন ভারতে আসেন তখন এদের প্রচুর গো-বল ছিল। ছাগল, কুকুর, গাধা ও ঘোড়া পালন করতেন। হাতীর খবর জানতেন না। বেদে ইন্দ্রের বাহন অশ্ব; ঐরাবত নয়।

ঋক বেদে কৃষির গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। ৬-৮ বা বারটি বলদ যোগেও চাষ করা হত। যব চাষও হত। হ্রদ ও পুষ্করিণী থেকে জল সেচ হত। সাধারণত বিনিময়ে বাণিজ্য হত। একটি জায়গায় মুদ্রা নিষ্ক-এর উল্লেখ রয়েছে। চর্ম শিল্পে, দারু শিল্পে ও ধাতু শিল্পে এরা দক্ষ ছিলেন। বয়ন শিল্প তখন একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। পশমের কম্বলও তৈরি হত। ঋক্ বেদে অয়স্ (=তাম্র?) শিল্পের প্রচুর প্রমাণ রয়েছে। আর্যরা সমুদ্র যাত্রা করতেন না। সিন্ধু নদীতে অবশ্য নৌকাবাহী বণিকের উল্লেখ রয়েছে। খাদ্য হিসাবে চাল ও ঘি সব চেয়ে বেশি

ব্যবহৃত। মাংসও বহুল প্রচলিত ছিল। ঋষিরা সাধারণত পশুচর্ম পরতেন। সমাজ ব্যবস্থায় কয়েকটি পরিবার মিলে গ্রাম; কয়েকটি গ্রাম মিলে বিষ্য এবং কয়েকটি বিষ্য মিলে জন।

শত্রুর সঙ্গে বার বার যুদ্ধ করতে হয়েছে ফলে রাজার প্রয়োজন হয়েছিল নেতা হিসাবে। এই রাজার কর্তব্য ছিল প্রজাপালন। বেদে পুণ্যশ্লোক রাজা হিসাবে দিবোদাস, সুদাস, অম্বরীষ, নহুষ, পুরূরবা ইত্যাদির উল্লেখ রয়েছে। প্রধান পুরোহিত রাজার রাজনীতিক উপদেষ্টা। রাজসভার উল্লেখ আছে কিন্তু এই সভার বিশেষ কোন ক্ষমতা ছিল না। যুদ্ধ বিগ্রহ সব সময়ই লেগে ছিল। চার দিকে আমাদের শত্রু ঘিরে রয়েছে, আমাদের সাহায্য কর—এই ছিল সে সময়ে স্লোগান। কুভাতট (কাবুল) থেকে যমুনা তীর পর্যন্ত সৈন্য যাত্রার বর্ণনা পাওয়া যায়। কুভাতটেই ঋক্ মন্ত্রগুলি প্রথম রচিত হয়েছিল। গঙ্গার তীরে যখন আর্যরা এসে পৌঁছান তখন ঋক্‌বেদের যুগ শেষ হয়ে যায়। পঞ্চনদ পার হওয়া আর্য ইতিহাসে একটি বিরাট পর্ব। বিশাল এবং গভীর সিন্ধুনদী দেখে তাঁরা হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। সিন্ধুকে নিয়ে সুন্দর একটি মন্ত্র রয়েছে; সিন্ধু পার হয়ে 'দস্যু' রাজাদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ঋক্‌বেদে বলা আছে এই সব দস্যুরা আর্যদের থেকে অনেক উন্নত ছিলেন। দস্যু রাজা শম্বর ১০০ নগরের রাজা ছিলেন। এদের দুর্গও শক্তিশালী ছিল। দুর্গগুলিকে অশ্মময়ী, আয়সী, ও শতভুজী বলা হয়েছে। আর্যদের প্রধান শত্রু ছিল পণিরা। নিরুক্ত থেকে বোঝা যায় এই পণিরা প্রধানত ব্যবসায়ী ছিলেন। ধুনি, চুমুরি, বিপ্রু, বর্চিস্, ও শম্বর—দস্যু রাজা হিসাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দস্যুদের যে বর্ণনা রয়েছে তা থেকে মনে হয় এরা দ্রাবিড় জাতি। ভাষা এদের ভিন্ন ছিল; এরা যজ্ঞ করতেন না এবং ইন্দ্রেরও পূজা করতেন না। এই অনার্যদের কাছ থেকেই আর্যরা ক্রমে শিব, দেবী ও লিঙ্গ পূজা গ্রহণ করেছিলেন।

আর্যদের একটি দল গঙ্গাযমুনা অঞ্চলে বসবাস গড়ে তোলেন; আর একটি দল রইলেন পঞ্চনদ এলাকাতে। পঞ্চনদ এলাকাতে যাঁরা রইলেন তাঁরা অধিকতর শক্তিশালী এবং এঁরা যাতে শতদ্রু পার হয়ে এগিয়ে আসতে না পারেন সেই জন্য দাশরাজ্ঞ (দশরাজার) নামে একটি যুদ্ধ হয়েছিল। পৃথিবীতে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ লড়াই। সুদাস রাজাকে যারা বাধা দিয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন আর্য। সুদাসের দলেও কিছু আর্য ছিলেন। সুদাসের দলই জয়ী হন এবং আর্যদের পরবর্তী বিজয় অভিযান এরপর বন্ধ হয়ে যায়। এর পর থেকে আর্যরা আদিবাসীদের সঙ্গে মিলে হিন্দু সভ্যতার ভিত্তি গড়ে তোলেন।

সামাজিক ব্যবস্থা হিসাবে পিতা তার সন্তানকে বিক্রয় করতে পারতেন। দ্রঃ- শুনঃ-শেপ। সন্তানকে সম্পত্তির অধিকার থেকেও বঞ্চিত করতে পারতেন। বিবাহে যৌতুক ছিলই। কন্যাকে বিয়ের পর স্বামীগৃহে চলে যেতে হত। বহু-বিবাহ প্রচলিত ছিল। এমন কি সপত্নীকে বিপন্ন করার মন্ত্রও রয়েছে, যাতে স্বামী বিশেষ একজন স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত থাকেন। ইন্দ্রাণী এই মন্ত্রের স্রষ্টা। বিবাহ একটি কর্তব্য বলে স্বীকৃত ছিল। বিধবা বিবাহও চালু ছিল।

সিন্ধুসভ্যতার মানুষরা লোহার ব্যবহার এবং সম্ভবতঃ বর্মের ব্যবহার জানতেন না। কিন্তু আর্যরা এই দুইটিই ব্যবহার করতেন। সিন্ধু সভ্যতার মানুষরা ঘোড়ার পরিচয় জানতেন। কিন্তু আর্যরা ব্যাপক ভাবে ঘোড়া ব্যবহার করতেন। সিন্ধু সভ্যতার প্রতীক উপাসনা, মূর্তিপূজা, লিঙ্গোপাসনা। সিন্ধু সভ্যতাতে সম্ভবতঃ শিব-পশুপতি ও মহাশক্তি-রূপা জগন্মাতার স্থানও ছিল কিন্তু বৈদিক ধর্মে মূর্তিপূজা, শিব ও শক্তি ও লিঙ্গপূজা ছিল না। আর্যদের মধ্যে বর্ণ বিভাগও ছিল না, পরে অবশ্য তিন বর্ণ এবং বহু পরে শূদ্র বর্ণের সৃষ্টি হয়। আর্যরা ভারতে এসে কৃষ্ণকায় (নিষাদ), শ্যামল বা কপিল (দ্রাবিড়) এবং পীত (কিরাত) অর্থাৎ অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও মঙ্গোল অনার্যদের সংস্পর্শে আসেন। এই আর্যেতর জাতিদের দাস, দস্যু, শূদ্র, নিষাদ, কিরাত, শবর, পুলিন্দ ও পরে অন্ধ্র, দ্রমিড় বা দ্রবিড়, কোল্ল, ভিল্ল ইত্যাদি নামে এঁরা অভিহিত করতে থাকেন। আর্যদের সামরিক অভিযান চলতে থাকে। ঋক্‌বেদে (৬।২৭।৫) আছে শৃঞ্জয় নামে আর্য-গোষ্ঠী ইন্দ্রের সাহায্যে হরিয়ূপীয়ার (=হরপ্পা) পূর্বে বরশিখ বংশীয় যজ্ঞপাত্র ধ্বংসকারী বৃচীবৎ-গণকে ধ্বংস করেন। ঋক্‌বেদে ও পরবর্তী সংহিতাগুলি, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক এবং উপনিষদে যে সব তথ্য আছে তা থেকে দেখা যাবে ভারতে আর্যসভ্যতা প্রসারের কাল ১৫০০-৫০০ খৃ-পূ। পরবর্তী কালের বৌদ্ধ, জৈন সাহিত্য ও রামায়ণ মহাভারত থেকেও কিছু তথ্য পাওয়া যায়। আর্যরা ভারতে এসে তাঁদের বহির্ভারতীয় বাসভূমির কথা ভুলে যান তবে মধ্যপ্রাচ্যের ইরান ও মধ্য এসিয়ার বালখ্ (প্রাচীন বাহ্লীক)-এর সঙ্গে কিছুটা সম্পর্ক ছিল। ঋক্‌বেদের যুগে আর্যরা পূর্ব আফগানি-স্তানে ও সমগ্র সিন্ধু উপত্যকায় অর্থাৎ সমগ্র পাঞ্জাবে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং গাঙ্গেয় উপত্যকায় উত্তর অংশেও উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। কাবুল নদী, এর শাখা প্রশাখা, ভারতের উত্তর পশ্চিমে বসবাসকারী পখ্‌থ (=পখ্‌থুনে) ও গান্ধারি জাতি ঋক্‌বেদে সুপরিচিত। সিন্ধু, সুষোমা, আর্জীকীয়া, বিতস্তা, অসিক্‌নী, পরুষ্ণী, বিপাশা, শুতুদ্রী প্রভৃতি নদী এবং পুরু ও শিব জাতির কথা ঋক্‌বেদে উল্লিখিত আছে। ঋক্‌বেদের যুগে পাঞ্জাব আর্য সভ্যতার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। উত্তরে কাশ্মীর উপত্যকার কিছুটাও এঁরা দখল করেছিলেন এবং মরুদ্‌বৃধা-রও (বর্তমানে মরুওয়ার্দোয়ান) উল্লেখ করে গেছেন। পূব দিকে এই সময়ে সর্‌হিন্দ ও থানেশ্বর ও তার চার পাশে এগিয়ে আসেন। গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, দৃশদ্বতী, অপায়া, (দ্রঃ আপগা), গোমতী, সরযূ প্রভৃতি নদী ও মধ্যদেশের অধিবাসী রুশম, উশীনর, দালভ্য, শৃঞ্জয়, মৎস্য, চেদি, ইক্ষ্বাকু ইত্যাদি বংশের সঙ্গেও এঁরা সংস্পর্শে আসেন। রাজপুতানার মরুভূমিকে এঁরা ধন্বন্ বলতেন। এই সময়ে সম্ভবত এঁরা বিন্ধ্য অতিক্রম করেন নি।

ঋক্‌বেদের যুগে আর্যরা যে সব স্থান অধিকার করেছিলেন যজুঃ অথর্ব ও ব্রাহ্মণগুলির যুগে সেই সব স্থানগুলির পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন এবং গাঙ্গেয় উপত্যকার অধিকাংশই দখল করেন। যমুনার প্রবাহ পথ ধরে ভরতগোষ্ঠী এবং সরস্বতী ও সদানীরার স্রোত ধরে বিদেশ বা বিদেহগণ পূর্ব দিকে এগিয়ে আসতে থাকেন। মধ্যভারতে মালব অঞ্চলে এই সময়ে সম্ভবত কুন্তি ও বীতহব্য ইত্যাদি বাস করতেন। আরো কিছু দিন পরে রচিত ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ-গুলিতে এগিয়ে

আসার ইতিহাস আরো স্পষ্ট। ভারতবর্ষ তখন পাঁচটি ভাগে বিভক্ত হয়েছে (১) ধ্রুবা মধ্যমা প্রতিষ্ঠা দিশ্ (মধ্য অঞ্চল), (২) প্রাচী দিশ্ (পূর্ব অঞ্চল), (৩) দক্ষিণ দিশ্ (দক্ষিণ অঞ্চল), (৪) প্রতীচী দিশ্ (পশ্চিম অঞ্চল), (৫) উদীচী দিশ্ (উত্তর অঞ্চল)। এদের মধ্যে মধ্য-অঞ্চলটি ছিল আর্য সভ্যতার পীঠস্থান এবং কুরু, পাঞ্চাল, বশ, উশীনর ইত্যাদি আর্যগোষ্ঠীর আবাস স্থান। পূর্ব অঞ্চলে কাশী, কোশল, বিদেহ ইত্যাদি আর্য জনপদগুলির সঙ্গে অনার্য অঙ্গ, মগধ, পুণ্ড্র প্রভৃতি দেশের সম্পর্ক ছিল। সত্বতগণ এই সময়ে আর্য সভ্যতাকে দক্ষিণ বিভাগে এবং বৈদর্ভগণ আর্য সভ্যতাকে বেরারে নিয়ে গেলেও দক্ষিণ ভারতে অন্ধ্র, শবর, পুলিন্দ ও মূতিব প্রভৃতি অনার্য জাতিরই প্রাধান্য বজায় ছিল।

এর পরবর্তী যুগে আর্য সভ্যতার বিকাশের পরিচয় বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে ও ব্রাহ্মণ্যসূত্রে আরো স্পষ্ট। ওপরে উল্লিখিত মধ্য অঞ্চল তখন মধ্যদেশ, মজ্ঝিম দেশ, শিষ্টদেশ বা আর্যাবর্ত নামে পরিচিত এবং আর্যসভ্যতার কেন্দ্র। এর সীমানা তখন উত্তরে হিমালয়, পূর্বে প্রয়াগ বা এলাহাবাদের কাছে কালকবন, দক্ষিণে পারিযাত্র পর্বত (=বিন্ধ্য পর্বতের পশ্চিম অংশ) ও পশ্চিমে সরস্বতী তীরে অদর্শন ও থুন। অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম তখনও অপবিত্র অনার্য দেশ। ভারতের পূর্ব সীমান্তে প্রাগ্জ্যোতিষপুর (আসাম) আর্যসভ্যতার পরিমণ্ডলের বাইরে বলে গণ্য হয়েছে। এই যুগে দক্ষিণে বিদর্ভ (=বেরার) অতিক্রম করে আর্যরা গোদাবরী উপত্যকা পর্যন্ত গিয়েছিলেন এবং ঐখানে পঞ্চবটী, জনস্থান, অশ্মক, মূলক প্রভৃতি উপনিবেশ ও দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম উপকূলে ভৃগুকচ্ছ ও শূর্পারক প্রভৃতি সমৃদ্ধ বন্দর নগরী তৈরি করেন। উড়িষ্যার কলিঙ্গ নদী (বর্তমানে বৈতরণী) থেকে গোদাবরী পর্যন্ত ভূভাগ এই সময়েও কিন্তু অনার্যদেশ বলেই পরিচিত ছিল। এই যুগে পশ্চিম অঞ্চলে অবন্তী, সুরাষ্ট্র, সিন্ধু, সৌবীর ইত্যাদির আর্য-অনার্য মিশ্র জনপদ গড়ে ওঠে। খৃস্টপূর্ব চতুর্থ শতকেও মেগাস্থিনিস ইঙ্গিত করেছেন যে দক্ষিণ ভারতে মাদুরা অঞ্চলের পাণ্ড্যরা উত্তর ভারতের মথুরা থেকে আগত। বার্তিককার কাত্যায়নের (খৃ-পূ চতুর্থ শতক) লেখা থেকেও মনে হয় আর্য বংশজ পাণ্ডুগোষ্ঠী থেকেই দক্ষিণ ভারতের পাণ্ড্যগণের উৎপত্তি। অর্থাৎ ১৫০০ খৃ-পূ থেকে ৫০০ খৃ-পূ সময়ে সারা ভারতে আর্য সভ্যতা ছড়িয়ে পড়ে।

এই আর্য উপনিবেশ সম্প্রসারণের মূলে সামরিক অভিযান, ধর্ম প্রচার ও বাণিজ্য বিস্তার তিনটিই বর্তমান ছিল। আর্যদের মধ্য থেকে বৈশ্যরা পূর্ব ও দক্ষিণে অনার্য দেশে যাতায়াত করতেন ও বসতি স্থাপন করতেন। ঋষিরা শিষ্যদের নিয়ে আশ্রম স্থাপন করতেন। রামচন্দ্র দক্ষিণে গোদাবরী উপত্যকায় পম্পাতীরে এই রকম বহু আশ্রম পরিদর্শন করেছিলেন। অগস্ত্যের বিন্ধ্য অতিক্রম কাহিনীও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য। বৌদ্ধ শাস্ত্র সুত্তনিপাতে আছে বাভরিন নামে একজন ত্রিবেদী ব্রাহ্মণ ষোল জন শিষ্য নিয়ে উত্তর ভারতের কোশল জনপদ থেকে দাক্ষিণাত্যে গোদাবরী তীরে অশ্মক দেশে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। সশস্ত্র সংঘর্ষ এ ছাড়া সব সময়ই লেগে ছিল।

কোন একটি বিশেষ দল দ্বারা বা বিশেষ সময়ে ভারতে এই অনুপ্রবেশ ঘটেনি। আর্যদের বিভিন্ন গোষ্ঠী ক্রমান্বয়ে এসেছে। এই সমস্ত গোষ্ঠীদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য প্রায়ই ছিল না। এক একটি গোষ্ঠীর এক একটি গোষ্ঠীপতি বা রাজা ছিল, একটি বিশেষ বৈদিক দেবতা তাঁদের দেবতা, এক জন বিশেষ পুরোহিত তাঁদের যাজক। এঁদের মধ্যে স্বাভাবিক কারণেই পারস্পরিক যুদ্ধ লেগে থাকত। মধ্য অঞ্চল যখন আর্য সভ্যতার কেন্দ্র বলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তখন বা তারপর আগত আর্যগোষ্ঠীদের এঁরা ঘৃণ্য ও অপবিত্র মনে করতেন। বৈদিক সভ্যতার এটি একটি দিক। বৈদিক আর্য-সভ্যতার আর একটি দিক অনার্যদের সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম করে দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে ছড়িয়ে পড়া। অনার্যদের সঙ্গে আর্য রাষ্ট্রগুলি মিলিত ভাবে যুদ্ধ করেনি। বিভিন্ন আর্য উপজাতি বিচ্ছিন্ন ভাবে এই যুদ্ধ করেছে।

আর্য বিজয়ের পর আর্য সংস্কৃতির প্রভাব কাবুল, সিন্ধু ও গাঙ্গেয় উপত্যকায় যত গভীর ভাবে ছড়িয়ে পড়ে ভারতের পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলে সে রকম ছড়ায় নি। এই জন্য মধ্য অঞ্চলের সীমান্তবর্তী দেশগুলির বিশেষত পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলের অনার্য ভাষা, সভ্যতা ও লোকযাত্রার সঙ্গে আর্যদের বহু আপোস করতে হয়েছে। এই জন্যই বহু জায়গায় অনার্যদের প্রতি ঘৃণা দেখা যায়। কীকট বা মগধকে (পাটনা ও গয়া জেলা) যাস্ক বলেছেন 'অনার্য নিবাস' এবং পরবর্তী পুরাণে বলা হয়েছে 'পাপভূমি'। শ্রৌতসূত্রগুলিতে মাগধী ব্রাহ্মণের মর্যাদা তত নয়। বৌধায়ন বলেছেন পূর্বে অঙ্গ, মগধ, বঙ্গ, ও কলিঙ্গ ; পশ্চিমে সিন্ধু, সৌবীর ও সুরাষ্ট্র ; এবং দক্ষিণে দাক্ষিণাত্যের মানুষরা বৈদিক আর্য সভ্যতার গণ্ডির বাইরে। এ রকম বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে এবং এ থেকে বোঝা যায় এই সব অঞ্চলে আর্য সভ্যতা ততটা ব্যাপকতা লাভ করেনি। আর্যেতর মানুষের সভ্যতা এই সব জায়গায় মাথা তুলে প্রতিষ্ঠিত ছিল। অর্থাৎ ভারতের সভ্যতা আর্য ও অনার্য মিশ্র সভ্যতা। এক সঙ্গে বাস করতে করতে অনুলোম প্রতিলোম বিবাহ থেকে রক্তের মিশ্রণও এগিয়ে চলেছিল। মহাভারতের যুগে এই মিশ্রজাতির নাম হয় হিন্দু জাতি। ফলে আর্য বলতে এই যুগ থেকে মানসিক উৎকর্ষতা যুক্ত সঙ্কর হিন্দু জাতিকে বোঝায়।

আর্যক—বিখ্যাত সাপ। জলের নীচে ভীমের (দ্রঃ) অচৈতন্য দেহ এলে সাপদের কামড়ে দেহের বিষ কেটে যায় ; জ্ঞান ফিরে আসে। ভীম ঘটনাবলী বুঝতে না পেরে কিছু সাপ মেরে ফেলেন। এই সময় আর্যক পালিয়ে গিয়ে বাসুকিকে ডেকে আনেন এবং ভীমকে রসায়ন পান করতে দিতে অনুরোধ করেন।

আর্বক—অরিয়ক (টলেমি)। দ্রঃ-অপরান্তক, আরণ্যক।

আর্যভট—বাসস্থান কুসুমপুর (পাটনা)। তাঁর মতে কলির ৩৬০০ বর্ষে তাঁর বয়স ছিল ২৩ অর্থাৎ তাঁর হিসাবে ৪৭৬ খৃস্টাব্দে জন্ম। আর্যভটের গ্রন্থ আর্যভটীয়। ভারতীয় বিজ্ঞান ভিত্তিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা। গ্রীকদের কাছে ইনি অন্দুবেরিয়স্ বা অর্দুবেরিয়স্ নামে পরিচিত ; আরবদের কাছে অর্জভর নামে খ্যাত। ইনিই প্রথম পৃথিবীর আহ্নিক গতির তত্ত্ব প্রকাশ করেন। এঁর প্রায় হাজার বছর পরে

কোপারনিকাস এই তথ্য পাশ্চাত্যে প্রকাশ করেন। বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত ও লল্ল প্রভৃতি আর্যভটের মতবাদ স্বীকার করেন নি।

ক, খ ইত্যাদি অক্ষর সাহায্যে এক দুই ইত্যাদি সংখ্যা প্রকাশ করার একটি পদ্ধতি ইনি প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছিলেন। আর্যভট মতে ১০০৮ মহাযুগে এক কল্প ; অন্যান্য মতে ১০০০ মহাযুগে এক কল্প। আর্যভটের মতে কলিযুগ ১০৮,০০০ বছর কিন্তু অন্য মতে ৪৩২,০০০ বছর। আর্যভটের আগে বেদাঙ্গ জ্যোতিষের স্থূল ও শুদ্ধ পদ্ধতিতে পঞ্জিকা গণনা হত। পরে অবশ্য গ্রহগতি কিছুটা পর্যবেক্ষণ করা হতে থাকে। ফলে একটি আংশিক শুদ্ধ হিসাব চলছিল। আর্যভট এগুলি পর্যালোচনা করে পরিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত শাস্ত্র রচনা করেন। আর্যভটই যুগ বিভাগ পদ্ধতি প্রবর্তন করেন এবং কলি যুগের প্রথম দিন নির্দিষ্ট করেন ৩১০২ খৃ-পূ ফেব্রুয়ারি ১৭।১৮ মধ্যরাত্রি। এই মত পরে সকলে স্বীকার করে নিয়েছেন। এক মহাযুগে (৪৩২,০০০ বছরে) রবি ও অন্য গ্রহাদি কতবার আবর্তন করে আর্যভট ঠিক করতে চেষ্টা করেন। আর্যভট দু রকম গণনা পদ্ধতি চালু করেন ঃ- একটি ঔদয়িক এবং আর একটি আর্ধরাত্রিক। পরবর্তী জ্যোতির্বিদরা আর্ধরাত্রিক পদ্ধতিই স্বীকার করেছেন। এঁর হিসাবে কলির প্রথম দিনে গ্রহগণ মেষাদিতে ছিল। অবশ্য আজকের নির্ভুল হিসাবে দেখা যায় রবিতে ৯ অংশ, চন্দ্রে ৫ অংশ, বুধে ৪২ অংশ ইত্যাদি এই প্রকার ভুল ছিল। আর্যভট শকাব্দ ব্যবহার করতেন না ; নিজের প্রবর্তিত কল্যব্দ ব্যবহার করতেন।

হিন্দু জ্যোতিষে আর্যভটের অবদান পরিবৃত্ত ও উৎকেন্দ্রীয় বৃত্তের সাহায্যে গ্রহগতির ব্যাখ্যা করা। আর্যভট ত্রিকোণমিতির সাইনকে জ্যার্ধ বলতেন এবং জ্যার্ধের একটি সারণীও তৈরি করেছিলেন। গণিতের বর্গমূল, ঘনমূল নির্ণয় পদ্ধতি বর্ণনা করেন। π এর মান সর্বপ্রথম ৩·১৪১৬ বলে তিনি স্থির করেন। জ্যামিতি ইত্যাদিতে এই ধ্রুবকটি প্রতিপদে ব্যবহৃত। সমান্তর শ্রেণীর যোগফল, প্রাকৃত সংখ্যার বর্গসমূহের ও ঘনসমূহের যোগ ফলও তিনি শুদ্ধভাবেই দিয়েছিলেন। আর্যভটের অপর নাম বৃদ্ধ আর্যভট ও সর্বসিদ্ধান্তগুরু। তাঁর টীকাকার শিষ্য হিসাবে লাটদেব, প্রথম ভাস্কর, ও লল্ল বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আর্যভট—দ্বিতীয়। ৯৫৩ খৃস্টাব্দ। এঁর গ্রন্থ আর্য সিদ্ধান্ত। দক্ষিণ ভারতে এখনও এঁর মতে পঞ্জিকা গণনা করা হয়।

আর্যভটীয়—প্রথম আর্যভট কৃত গ্রন্থ ; ১২১টি শ্লোকে রচিত। চারটি প্রধান অধ্যায় ; গীতিকা পাদ ১৩ শ্লোক ; গণিতপাদ-৩৩ শ্লোক ; কালক্রিয়া ২৫ শ্লোক ; গোলপাদ ৫০ শ্লোক। শেষ চারটি ভাগে মোট ১০৮ শ্লোক এবং এই অংশের অপর নাম আর্যাষ্টশত। গীতিকাপাদে এক মহাযুগে গ্রহাদির ভগণ ; গণিতপাদে পাটীগণিত ও অন্যান্য গণিতের বিষয় ; কালক্রিয়া পাদে কাল ও ক্ষেত্র বিভাগ, এবং গোলপাদে গ্রহ ও গোল বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ গণিতপাদে বিশুদ্ধ গণিত অন্যত্র জ্যোতির্বিদ্যা ও সংশ্লিষ্ট গণিত রয়েছে।

আর্যাবর্ত—আর্য জাতির বসতি স্থান। হিমালয় ও বিন্ধ্যের মধ্যবর্তী এলাকা। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত পথে ভারতে এসে আর্যরা বসতি স্থাপন করতে থাকেন। বৌধায়ন ধর্মসূত্রে (২।২।১৬) প্রথম এই শব্দটি পাওয়া যায়। খৃস্টপূর্ব প্রথম সহস্রকের মাঝামাঝি কালে এই ধর্মসূত্র লেখা হয়েছিল। এতে আর্যাবর্তের সীমা ছিল পশ্চিমে অদর্শন (বিনশন বা কুরুক্ষেত্র), পূর্বে কালক বন (উত্তর প্রদেশর মধ্যবর্তী অঞ্চল বিশেষ), উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে পারিযাত্র (অন্য মতে পশ্চিমে বিন্ধ্য ও আরাবল্লী)। খৃস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে পতঞ্জলিও এই সীমা স্বীকার করেছেন। খৃস্টীয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে মনুতে (২।২২-২৩) আর্যাবর্তের সীমা উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্য, পূর্বে ও পশ্চিমে সমুদ্র অর্থাৎ বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগর। অর্থাৎ প্রাচীন কালে যেটি আর্যাবর্ত (বিনশন ও প্রয়াগ মধ্যবর্তী অংশ) মনুতে সেটি মধ্যদেশ। মনুতে উত্তর ভারত আর্যাবর্ত ও দক্ষিণ ভারত দক্ষিণাপথ বা দাক্ষিণাত্য। রাজশেখর বলেছেন নর্মদা নদী আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যের সীমা। ভোজ প্রবন্ধে পরমার বংশীয় নরপতি ভোজকে দক্ষিণাপথ ও গৌড়ের অধীশ্বর বলা হয়েছে ; এখানে গৌড় অর্থে আর্যাবর্ত। অগ্নীধ্র'র ছেলে নাভি ; নাভির ছেলে ঋষভ। ঋষভ ও স্ত্রী জয়ন্তীর কুড়িটি ছেলে ; এদের মধ্যে একজন ভরত—এ'র রাজ্য ভারতবর্ষ ; একজন আর্য, রাজ্য আর্যাবর্ত ; এবং একজন দ্রমিড় এ'র রাজ্য দ্রাবিড়।

আর্ষবিবাহ—আট প্রকার বিবাহের একটি। এই বিয়েতে বরের কাছ থেকে যাগাদির জন্য এক বা দুই গোমিথুন নিয়ে কন্যা দান করা হত।

আর্যা—দ্রঃ-কার্তিকেয় শিশুমাতরঃ।

আর্ষ্টিসেন—বৃষপর্বার আশ্রম থেকে পাণ্ডবরা অর্জুনকে দেখতে পাবেন বলে এগিয়ে যেতে যেতে গন্ধমাদন বা শ্বেত পর্বতে আর্ষ্টিসেনের আশ্রমে আসেন। ভীম দ্বিতীয় বার ফুল আনতে যান এইখান থেকে। ভীমকে দেখতে না পেয়ে দ্রৌপদীকে এই আশ্রমে রেখে বাকি তিন ভাই ভীমের সন্ধানে যান। কুবের পাণ্ডবদের বলে দিয়েছিলেন এই আশ্রমে ফিরে গিয়ে অপেক্ষা করতে ; (মহা ৩।১৫৫, ১৮৯, ১৬১।-)।

আর্হত—বুদ্ধ বিশেষ। এ'র মতে আত্মা চিরস্থায়ী। প্রতি দেহে এক এক আত্মা নিরন্তর অবস্থিত। এই আত্মা সর্বজ্ঞ ও রাগদ্বেষাদি বর্জিত। আর্হতদের সাধনা সম্যগ্‌দর্শন, সম্যগ্‌জ্ঞান ও সম্যগ্‌চারিত্র। দ্রঃ- অর্হৎ, অষ্টাঙ্গিকমার্গ।

আলওয়ার—মৎস্য দেশ। জয়পুরের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এখানে আজও মচ্ছেরি নামে একটি সহর রয়েছে। দ্রঃ- জয়পুর। মহাভারতে আলোয়ার=সৌভপুর=শাল্বনগর =শাল্বপুর। দ্রঃ-শাল্ব।

আলপনা—মেঝেতে বা দেওয়ালে বা পিঁড়ি, ঘট ইত্যাদিতে পিটুলিগুলে এবং অনেক সময় রঙ মিশিয়ে আঁকা মাঙ্গলিক সংস্কার। অন্য নাম বৌছর ; বাংলার বাইরে নাম রঙ্গোলি। ভারতের প্রায় সব প্রদেশেই প্রচলিত তবে বাঙলা থেকে গুজরাট পর্যন্ত অংশে বেশি। শাস্ত্রের কোন নির্দেশ বা মন্ত্র নাই। সমুদ্র উপকূল থেকে

ভেতর দিকে এগোতে আরম্ভ করলেই ক্রমশ আলপনার বৈচিত্র্য কমতে থাকে। হিন্দুর সামাজিক উৎসবে একটি মণ্ডন শিল্প। মেয়েলি ব্রত আচারে একটি অপরিহার্য অঙ্গ। অনেকের মতে আলপনা প্রাক্ আর্য যুগের ঐতিহ্য; এবং অনেকের মতে বাঙলাতেই এর সব চেয়ে উৎকর্ষ। গুজরাট ও মাদ্রাজেও উন্নত ধরণের আলপনা দেখা যায়। তবে মনে হয় আলপনার পেছনে যেন একটি আভিচারিক অভিপ্রায় প্রচ্ছন্ন থাকে। আন্তরিক কামনাকে এইভাবে ব্যক্ত করা যাতে যেন সিদ্ধি লাভ হয়। সামান্য একটু তুলা বা কাপড় অঙ্কনের তুলি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত যে আঁকে তার সাধ্যমত ফুল, লতাপাতা, শাঁখ ও নানা নকসা, পাখী, মাছ, পায়ের ছাপ ইত্যাদি এ'কে থাকে। মেয়েরাই সাধারণত এ'কে থাকে।

আলবনিয়া—অলম্ব (মহাভা)। কাম্পিয়ান সাগরের পশ্চিমে। বর্তমানে সিরওয়ান।

আলবি—ঐরবা বা ঐরয়া। প্রাচীন একটি বৌদ্ধ নগরী। অ-লে (ফা-হিয়েন)। যুক্ত প্রদেশে ইটোয়া থেকে ২৭ মাইল উত্তর পূর্বে। বর্তমানের নওল যেন। নবদেবকুল (হিউ-এন-ৎসাঙ); কনৌজ থেকে ১৯ মাইল দ-পূর্বে। গঙ্গার তীরে। একটি মতে কোসল ও মগধের মধ্যবর্তী। এখানে অগ্গলব-চৈত্য ছিল। জৈনদের আলভি; এখান থেকে মহাবীর ধর্মপ্রচারে বার হন। কল্প সূত্রে আলভিক। বুদ্ধ এখানে ১৬-শ বর্ষা কাটান।

আলিমন্ত্র—মর্দান জেলা। ছোটি মর্দান। য়ুসুফজাই দেশ। পেশোয়ারের উ-পূর্বে। এখানে বৌদ্ধ ও গ্রীকো-ব্যাক্ট্রিয়ান বহু স্মৃতি চিহ্ন ছড়ান রয়েছে।

আলিগড়—জেলার বহুস্থানে বুদ্ধযুগের নিদর্শন পাওয়া যায়। খৃস্টপূর্ব দ্বিতীয় ও প্রথম শতকে এই অঞ্চল মথুরার ক্ষত্রপদের অধীন ছিল। পরে কুষাণ সাম্রাজ্যের মধ্যে আসে।

আলেকজান্দ্রিয়া—উচ্ছ। হুপিয়ান্। পাঞ্জাবে ৫-টি নদীর সঙ্গমে একটি নগরী। আলেকজান্দার প্রতিষ্ঠিত। অপর নাম অলসান্দ্রা। সিন্ধু নদীর একটি দ্বীপ। এখানে কলসী গ্রামে মিনান্দরের জন্ম। শাকল থেকে ২০০ যোজন। অপর মতে আলেকজান্দ্রিয়া ও কোকাসুম হচ্ছে বেঘরাম (গ্রীক); কাবুলের ২৫ মাইল উত্তরে; এখানে প্রচুর ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। মতান্তরে বামিয়ান্। ওপিয়ান্। অলসাদা (মহাবংশ)। হয়তো প্রাচীন ক্ষত্রিয় উপনিবেশ—ওপিয়ান। পরশুস্থাদের রাজধানী।

আশ্বলায়ন—(১) শৌনক শিষ্য; শ্রৌতসূত্র ও গৃহসূত্র প্রণেতা। আশ্বলায়ন বৈদিক শাখার প্রবর্তক। কাহিনী আছে শৌনক প্রথম ঋক্‌বেদের কল্পসূত্র তৈরি করেন, পরে শিষ্যের সূত্রের উৎকর্ষতা দেখে নিজের গ্রন্থ ফেলে দেন। ঐতরেয় আরণ্যকের চতুর্থ আরণ্যকও আশ্বলায়ন রচিত বলে প্রচলিত। শ্রৌতসূত্রে সোমযাগ অন্তর্গত একাহ, অহীন, ও সত্র এই তিন শ্রেণীর যজ্ঞের ও অন্যান্য যজ্ঞের বর্ণনা আছে। গৃহ্যসূত্রে গৃহস্থের করণীয় পাক যজ্ঞ ও সংস্কারগুলির বিবরণ আছে। (২) বিশ্বামিত্রের এক ছেলে।

আশ্বিন—অশ্বিনী নক্ষত্র যুক্ত পৌর্ণমাসী ঘটিত কাল ; সূর্য কন্যা রাশিতে অবস্থান করেন।

আশ্রম—আর্যরা বর্ণ অনুসারে জীবনের কয়েকটি পর্যায় ভাগ করেছিলেন। ব্রাহ্মণের চারটি, ক্ষত্রিয়ের তিনটি, বৈশ্যের দুটি এবং শূদ্রের একটি আশ্রম বিহিত করেন। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস ব্রাহ্মণের এই চারটি আশ্রম। ক্ষত্রিয়ের সন্ন্যাস আশ্রম নাই। বৈশ্যের দুটি আশ্রম গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ বা কোন মতে ক্ষত্রিয়দের মত তিনটি আশ্রমেরও এরা অধিকারী। শূদ্রের একমাত্র গার্হস্থ্য আশ্রম। অনেকের মতে কলিকালে বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস নিষিদ্ধ। জীবনের এই পর্যায় বা আশ্রম ভাগ আজকাল কোন বর্ণই আর মানে না। প্রাচীন নির্দেশ অনুসারে উপনয়নের পর গুরুগৃহে ব্রহ্মচারী হয়ে বাস করে ইন্দ্রিয় সংযম ; দুটি সন্ধ্যাতে সূর্য ও অগ্নির পূজা। গুরুর সেবা ও অধ্যয়ন করা ও ভিক্ষান্ন গ্রহণ করা ছিল ব্রহ্মচর্যাশ্রম। পাঠ শেষ হলে গুরুর আদেশ নিয়ে এবং গুরু দক্ষিণা দিয়ে গার্হস্থ্য আশ্রমে এসে অর্থ উপার্জন করে বিয়ে করে গৃহস্থের কর্তব্য পালন করা দ্বিতীয় আশ্রম জীবন। গার্হস্থ্য আশ্রমের কর্তব্য তর্পণ করে পিতৃগণের, যজ্ঞ করে দেবগণের, অন্ন দিয়ে অতিথিদের, বেদপাঠ করে মুনিদের, সন্তান উৎপাদন করে প্রজাপতির, বলিকর্ম ও আনুষ্ঠানিক ভোজ্যদ্রব্য দান করে মৃতদের ও প্রাণীদের এবং প্রেম দ্বারা সমস্ত জগতের অর্চনা ও সন্তোষ বিধান। গার্হস্থ্য আশ্রমই শ্রেষ্ঠ আশ্রম। কারণ ব্রহ্মচারী, ভিক্ষাজীবী, সন্ন্যাসী সকলেই এক মাত্র গৃহস্থের ওপর নির্ভর করেন। পৌত্র জন্মের পর সাধারণ নিয়মে পঞ্চাশের ওপর বয়স হলে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বা একা একাই বন গমন বিধেয়। এই সময়ে ক্ষৌরকার্য করা হয় না ; ফল, মূল, পাতা আহার ও ভূমি শয্যা বিধেয়। বসন ও উত্তরীয় হিসাবে চর্ম, কাশ ও কুশ ব্যবহৃত। দেবার্চনা, যজ্ঞ, হোম, অতিথি সেবা ও ভিক্ষা এই বানপ্রস্থের কর্তব্য। এটি তৃতীয় আশ্রম। এই ভাবে সত্তর মত বয়স হলে সন্ন্যাস গ্রহণীয়। সন্ন্যাসীর কোন করণীয় নাই ; সব দিক থেকে সে মুক্ত। কেবল মোক্ষের জন্য চিন্তা করবেন।

আষাঢ়—(১) সাতাশটি নক্ষত্রের মধ্যে বিংশ নক্ষত্র পূর্বাষাঢ়া (ডেল্টা সাজিটারি) ও একবিংশ নক্ষত্র (দ্রঃ) উত্তরাষাঢ়া (টাউ সাজিটারি)। (২) উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র যুক্ত পৌর্ণমাসী ঘটিত কাল। সূর্য মিথুন রাশিতে থাকেন। সংস্কৃত কবিতাতে একটি প্রসিদ্ধ মাস। (৩) সন্ন্যাসীর ব্যবহার্য লাঠি।

আষাঢ়া—উত্তর ও পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্র।

আসন—যোগ সাধনের উপবেশন কৌশল। অষ্টাঙ্গ যোগের তৃতীয় যোগ। যোগাসন পাঁচ রকম :-পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন, ভদ্রাসন, বজ্রাসন, বীরাসন। পূজাতে ব্যবহৃত আসনের একটা আন্তরিক প্রভাব থাকা স্বাভাবিক। এই কারণে তন্ত্রে নানাবিধ উৎকট আসন ব্যবস্থা উদ্দেশ্য অনুসারে ব্যবহৃত। বস্ত্র, কম্বল ও বেত্রাসন আছেই ; কাঠের আসন স্বীকৃত নয় কিন্তু শ্মশান কাঠ স্বীকৃতি পেয়েছে। মুণ্ডমালা তন্ত্রে বিভিন্ন পশুচর্মের উল্লেখ আছে, এমন কি শান্তিকর্মে গোচর্ম আসন প্রশস্ত বলা হয়েছে। শবাসন ও মুণ্ডাসনের ব্যবহার অর্থে,

একটা ঘোর পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা স্পষ্ট বোঝা যায়। অন্নদাকল্প তন্ত্রে অনুরূপ চেষ্টায় ছ মাসের মৃত শিশুর দেহ পিটিয়ে শুকিয়ে যে আসন তার নাম মৃদু আসন, ৫ বছরের শিশুর দেহ নির্মিত আসন কোমল আসন এবং ৫ থেকে কম বয়সের দেহের আসন চূড়া আসন ব্যবহারের নির্দেশ আছে। কিন্তু গর্ভচ্যুত-ত্বচং বাপি নারীণাং যোনিজং ত্বচম্ (মুণ্ডমালা ৩।১০) আসন হিসাবে সর্বসিদ্ধিপ্রদ কেন বা স্বীকৃত হল কেন স্পষ্ট নয়।

শ্মশানঘাটে শবের মত চিৎ হয়ে শুয়ে তন্ত্রে যোগানুষ্ঠান কর্তব্য। আবার সিদ্ধিলাভের জন্য চণ্ডালাদি শবের ওপর বসে যথাবিধি পূজা ইত্যাদি। ব্রাহ্মণের শব কেন স্বীকৃত নয় অস্পষ্ট। শবাসন ও মুণ্ডাসন স্যাডিস্টিক বা নেক্রোমানিয়াক অভিব্যক্তি ছাড়া কিছুই নয়। মুণ্ডাসনে ব্যবহৃত মুণ্ডের হিসাব ঃ-

	চণ্ডাল	নর	বানর	শৃগাল	কুকুর	সর্প
একমুণ্ড	১					
তিনমুণ্ড	১		১	১		
পঞ্চমুণ্ড	২		১	১		১
বা	১		১	১	১	১
শতমুণ্ড		১০০				

তন্ত্রে বর্ণভেদ এত বেশি স্বীকৃত যে শবাসনে বা মুণ্ড আসনে ব্রাহ্মণের শব বা মুণ্ড গৃহীত হয় না। দ্রঃ- বেদী।

আসব—বৌদ্ধ সাহিত্যে পাপ, রিপু।

আসাম—প্রাচীন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর। রামায়ণ ও মহাভারতে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। রামায়ণে অমূর্তরায় এই রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। মহাভারতের সময়ে শক্তিশালী বিখ্যাত রাজ্য। বিষ্ণু, ব্রহ্মাণ্ড ও হরিবংশে উল্লেখ আছে। বরাহরূপী বিষ্ণুর ঔরসে ধরিত্রীর গর্ভে জন্ম, মিথিলায় পালিত নরক প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা হয়ে কামাখ্যা দেবীর ভার গ্রহণ করেন এবং এখানকার নাম হয় কামরূপ (কা-পু)। খৃস্টীয় চতুর্থ শতকের শেষে হরিষেণের এলাবাহ প্রশস্তিতে সমুদ্রগুপ্তের করদমিত্র রাজ্য বলে কামরূপের সর্ব প্রথম ঐতিহাসিক উল্লেখ পাওয়া যায়। কালিদাসে কামরূপের বর্ণনা আছে। নরকের বংশ ৩৫০-৬৫০ খৃস্টাব্দে, এই বংশে পুষ্যবর্মা ৩৫০ খৃস্টাব্দে মত রাজা হন। পরে এই বংশের আরো বারো জন মত রাজা এখানে রাজত্ব করেন। এই বংশে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং শেষ রাজা ভাস্করবর্মা, হর্ষবর্দ্ধনের সমসাময়িক। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর ইনি পশ্চিম-বঙ্গের ওপরও কিছু দিন আধিপত্য করেছিলেন। এই ভাস্করবর্মার সময়েই হিউ-এন-সাঙ কামরূপে আসেন।

আসুরবিবাহ—দ্রঃ- বিবাহ।

আসুরি —দ্রঃ- পঞ্চ শিখ। কপিলের সাংখ্যদর্শনের আচার্য। আসুরির স্ত্রী কপিলা ; আসুরি এঁর কাছেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন।

আস্তিক—যাঁরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। অথবা বেদ, বা কর্মফল যাঁরা স্বীকার

করেন। সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা, বেদান্ত এই ষড় দর্শন আস্তিক দর্শন নামে পরিচিত। এই কারণে লোকায়ত, বৌদ্ধ, ও জৈন সম্প্রদায় নাস্তিক।

আস্তীক—জরৎকারু (দ্রঃ) মুনির ছেলে। বাসুকির বোন মনসার (=জরৎকারু) ছেলে। মুনি স্ত্রীকে ত্যাগ করে চলে যান এবং স্ত্রীর কাতর প্রার্থনায় যাবার সময় গর্ভবতী স্ত্রীকে বলেন 'অস্তি অয়ং সুভগে গর্ভঃ তব' (মহা ১।৪৪।২০)। এই অস্তি থেকে নাম আস্তীক। উপরন্তু বর দেন এই ছেলে বিদ্বান ও বিষ্ণুভক্ত হবে এবং বংশ রক্ষা করবে। স্বয়ং মহাদেব বাল্যকালে আস্তীককে বেদ বেদাঙ্গ শিক্ষা দেন। পরে বাসুকির কাছে পালিত হন। চ্যবন মুনিও কিছু শাস্ত্র পাঠ করিয়েছিলেন। মহাভারতে (১।৪৪।১৮) চ্যবনাত্মজাৎ বেদ পাঠ করেন। জন্মেজয় যজ্ঞে সর্পকুল ধ্বংস করতে থাকলে বাসুকি বোনকে ঘটনাটা জানান। অন্য মতে দেবতারা মনসাদেবীর শরণাপন্ন হন। মাতা জরৎকারু ছেলেকে সব জানালে আস্তীক গিয়ে বাসুকিকে আশ্বস্ত করেন। যজ্ঞস্থানে এলে (মহা ১।৪৯।২৮) দ্বারীরা আটকে দেয়। আস্তীক তখন রাজার একটি মস্ত বড় স্তব করেন। যজ্ঞে সদস্য ঋত্বিক ইত্যাদি শুনে সন্তুষ্ট হয়। এদের সন্তোষ দেখে জনমেজয় আস্তীককে বর দিতে চান; আস্তীক সর্পযজ্ঞ বন্ধ করার বর চেয়ে নেন। দ্রঃ- সর্পযজ্ঞ। আস্তীক তারপর ফিরে এসে বাসুকিকে সব জানালে সমস্ত সাপেরা একে ঘিরে ধরে বর চাইতে বলে। আস্তীক শেষ অবধি বর চান তাঁর এই কাহিনী সকালে বা সন্ধ্যায় যে বলবে তার যেন সর্প ভয় না থাকে (মহা ১।৫৩।২০)। দ্রঃ-সর্পযজ্ঞ।

আস্রপ—(১) একজন রাক্ষস। (২) মূলা নক্ষত্র।

আহবনীয়—গার্হপত্য অগ্নি থেকে অগ্নি নিয়ে হোমের জন্য সংস্কৃত অগ্নি।

আহার—বাহ্য জগৎ থেকে আহৃত, ইন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত এবং শরীরে পুষ্টির জন্য আত্মীকৃত বস্তু। ছান্দোগ্যে আছে আহারের শুদ্ধিতে সত্তার শুদ্ধি ও বুদ্ধির নির্মলতা।

আহিতাগ্নি—অগ্নিহোত্রী, সাগ্নিক।

আহুক—ভোজ রাজ বংশে ধার্মিক পরাক্রান্ত রাজা, স্ত্রী কাশ্যা। কৃষ্ণ যখন কংসকে নিহত করেন সেই সময় জরাসন্ধ কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধের উদ্যোগ করলে আহুক জরাসন্ধের পক্ষে যোগদান করেন। এরপর বলরামের সঙ্গে আহুকের যুদ্ধ হয় এবং আহুক পরাজিত হন। উগ্রসেনের পিতার একটি নাম। কৃষ্ণের পিতামহ। মহাভারতে (৩।২২।১২) কৃষ্ণের পিতার বন্ধু। শাল্ব যখন দ্বারকা আক্রমণ করেন তখন উপযুক্ত বেতন পরিধেয়, অস্ত্র ও প্রচুর অর্থব্যয়ে রাজা আহুক দ্বারকা সুরক্ষিত করে তোলেন। আহুকের একশত ছেলে। মেয়ে সুতনু; অক্রূরের স্ত্রী (মহা ২।১৩।৩২)। অক্রূর ও এই আহুকের মধ্যে প্রচণ্ড ঈর্ষা ছিল (মহা ১২।৮২।১০)।

আহুতি—(১) হবন যোগ্য ঘৃতাদি বস্তু। (২) দেবগণকে আহ্বান (ঐতরেয়)। (৩) দেবতাদের উদ্দেশ্যে কোন বস্তু দেওয়া।

আহৃতি—ভোজরাজ ভীষ্মকের ভাই (মহা ২।১৩।২১); বীর; যুদ্ধে পরশুরাম সমান।

ই

ইউ-চি—মধ্য এসিয়ার যাযাবর জাতি। খৃ-পূ ২ শতকের মাঝখানে এরা চীনের উত্তর পশ্চিমে বাস করত। পরে হুনদের হাতে হেরে গিয়ে পশ্চিম দিকে পালিয়ে যায়। এদের একটি শাখা সম্ভবত তিব্বতের দিকে চলে এসেছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ অপর শাখা শকদের সঙ্গে যুদ্ধ করে শিরদরিয়া নদীর অববাহিকাতে কিছু দিন বসবাস করে হুনদের দ্বারা আবার আক্রান্ত হয়ে আমুদরিয়ার অববাহিকাতে বসতি স্থাপন করতে বাধ্য হয়। সম্ভবত এই সময়ে যাযাবর বৃত্তি ত্যাগ করে এরা কৃষক হয়েছিল। পরে দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে এগোতে এগোতে এরা ৫-টি শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই ৫-টি শাখার মধ্যে সব চেয়ে শক্তিশালী শাখা কুষাণ। এই কুষাণ শাখাই কাবুল থেকে কাশী পর্যন্ত বিরাট রাজ্য গড়ে তুলেছিল এবং সম্পূর্ণ ভারতীয় হয়ে গিয়েছিল। দ্রঃ- আর্য।

ইউফ্রেটস্—বিবৃতি নদী (গরুড়-পু) ; নিবৃতি (অন্য পুরা)। শাল্মলী দ্বীপে, সালডিয়তে।

ইউসুফজোই—অলিমদ্র (ব্রহ্মাণ্ড)। প্রাচীন গান্ধার (দ্রঃ) ও উদ্যানের অংশ নিয়ে। উত্তরে চিত্রল ও যসিন ; পূর্বে সিন্ধু, পশ্চিমে সোয়াৎ, ও বজওয়ার এবং দক্ষিণে কাবুল নদী। ছোটি মর্দান=ইউসুফজোই দেশে ; সিন্ধু ও পঞ্জকোরার মধ্যবর্তী। এখানে রনিগৎ, সংঘাও এবং নুটু এলাকাতে কণিষ্ক যুগের বহু প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে (খৃ ১-ম শতক)। দ্রঃ-গান্ধার।

ইক্ষু—(১) অক্সাস্ নদী। (২) নর্মদার একটি শাখা (কূর্ম)।

ইক্ষুমতী—কালিন্দী নদী ; কুমায়ুন, রোহিলখণ্ড ও কনৌজ জেলা হয়ে এগিয়ে গেছে (রামা)।

ইক্ষুমতী—ইক্ষুল নদী। এর তীরে সাঙ্কাশ্য নগরী। কানিংহাম মতে ঈশানী নদী। কুরুক্ষেত্রের কাছে। তক্ষক ও অশ্বসেন সাপ এই নদীতে বাস করতেন। মিথিলার রাজার ভাই কুশধ্বজ এই নদীর উপত্যকাতে বাস করতেন।

ইক্ষ্বাকু—ঋক্‌বেদ, ছান্দোগ্য উপনিষদ প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থে এ'র প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। এরপর বৈবস্বত মনুর ছেলে ইক্ষ্বাকুর উল্লেখ দেখা যায়। বৈবস্বত মনু হাঁচলে (হরি ১১।১২) নাক থেকে এ'র জন্ম। অন্য মতে মনুর থুথু থেকে। অর্থাৎ কশ্যপ (১)—বিবস্বান (২)—বৈবস্বত মনু (৩)—ইক্ষ্বাকু (৪)। আর এক মতে অযোধ্যার রাজা পৃথুর ছেলে। এই বংশ ইক্ষ্বাকু বংশ নামে পরিচিত। এ'র তিন ছেলে বিকুক্ষি, নিমি, দণ্ড/দণ্ডক। রামায়ণে এ'র ছেলে কুক্ষি ও বিশাল (দ্রঃ)। মতান্তরে ১০০ ছেলে ; বড় বিকুক্ষি। এদের মধ্যে ২৫ পশ্চিম দিকে, তিন জন মধ্যদেশে, বাকি সকলে অন্য দেশ শাসন করতেন। হরি বংশে (১১।১৬) ৫০ জন পূর্ব ও উত্তর দিকে, ৪৮ জন দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে রাজত্ব করতেন ; দুজন মাত্র পিতার কাছে ছিলেন। নিমির বংশে জনক (দ্রঃ) এবং বিকুক্ষির বংশে মান্ধাতা, ত্রিশঙ্কু, হরিশ্চন্দ্র, সগর,

রামচন্দ্র ইত্যাদি। মান্ধাতা বংশে মুচুকুন্দ, ইত্যাদি। বিকুক্ষিকে (দ্রঃ) ইক্ষ্বাকু তাড়িয়ে দিয়েছিলেন পরে অবশ্য ইক্ষ্বাকু মারা গেলে ইনিই রাজা হন।

দক্ষিণ ভারতে সাতবাহন রাজ্যের পতনের পর অনেকগুলি ছোট ছোট রাজত্ব গড়ে ওঠে। এদের মধ্যে ধান্যকটকের ইক্ষ্বাকু বংশ অন্যতম। এ'দের মধ্যে প্রথম চান্তামূল, বীরপুরুষদত্ত, ইহুভূল এবং দ্বিতীয় চান্তামূল বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। প্রথম চান্তামূল অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। এই বংশে অনেক বৌদ্ধ ছিলেন। দ্রঃ-ইল।

ইক্ষ্বাকু বংশ—ব্রহ্মা-মরীচি-কশ্যপ-বিবস্বান-মনু-ইক্ষ্বাকু-কুক্ষি-বিকুক্ষি-বাণ-অরণ্য-পৃথু-ত্রিশঙ্কু-ধুন্দুমার-যুবনাশ্ব-মান্ধাতা-সুসন্ধি-ধ্রুবসন্ধি ও প্রসেনজিৎ। ধ্রুবসন্ধি-ভরত অসিত সগর-অসমঞ্জ-অংশুমান-দিলীপ-ভগীরথ-ককুস্থ-রঘু-কল্মাষপাদ-শঙ্খণ-সুদর্শন-অগ্নিবর্ণ-মরু-প্রশুশ্রুক-অম্বরীষ-নহুষ-যযাতি-নাভাগ-অজ-দশরথ-রাম।

রামের বিয়ের সময় বশিষ্ঠ এই বংশাবলী বলেছিলেন এবং চিত্রকূটেও রামকে বোঝাবার সময় এই বংশাবলীর উল্লেখ করেন। মনু ইক্ষ্বাকুকে মহী দান করেন (রা ২।১১০।৭)।

মহাভারতে (৩।১৯৩।-) রয়েছে ইক্ষ্বাকু > শশাদ > ককুৎস্থ > কাকুৎস্থ = অনেনস্ > পৃথু > বিশ্বগশ্ব > আর্দ্র > যুবনাশ্ব > শ্রাব/শ্রাবস্ত/শ্রাবস্তক > বৃহদশ্ব > কুবলাশ্ব > ২১ হাজার ছেলে। এই শ্রাবস্ত বা শ্রাবস্তক শ্রাবস্তী নগরী স্থাপিত করেন।

ইঙ্গিত—নাট্য অভিনয়ে আনন্দ প্রকাশক বঙ্কিম দৃষ্টি।

ইড়া—ইল। (১) প্রজা সৃষ্টির জন্য মনু এক পাক যজ্ঞ তৈরি করেন। যজ্ঞের জন্য ঘি মাখন ও আমিক্ষা জলে ফেলে দেন এবং এক বছর পরে একটি মেয়ে এই জল থেকে উঠে আসেন। মিত্রাবরুণ এ'র পরিচয় জানতে চাইলে ইনি মনুর মেয়ে বলে নিজের পরিচয় দেন। কিন্তু মিত্রাবরুণ বলেন 'তুমি আমাদের'। মেয়েটি কোন উত্তর না দিয়ে মনুর কাছে গিয়ে নিজের জন্মের কাহিনী বলে অনুরোধ করেন তাঁকে যেন যজ্ঞে অর্পণ করা হয়। মনু ইড়াকে দিয়ে কঠোর যজ্ঞ করেন (শতপথ)। অসুর ও দেবতারা একবার অগ্ন্যাধ্যান করেন। মনু ইড়াকে জানতে পাঠান ওঁরা কি ভাবে কাজ করছেন। ইড়া এসে জানান কেউই ওরা ঠিক মত কাজ করছেন না। মনুর যজ্ঞে ইড়া নিজে তিনটি অগ্নিকে ঠিক মত নিয়ে ঠিক স্থানে স্থাপন করেন। এক বার মনুর সামনেই দেবতারা ইড়াকে আহ্বান করেন, অসুরা গোপনে আহ্বান করেন। ইড়া দেবতাদের আহ্বান গ্রহণ করেন ফলে সমস্ত জীব দেবতাদের দলে গিয়ে যোগদান করেন। হরি বংশে বৈবস্বত মনুর প্রথম মেয়ে। পিতা একে মাম্ অনুগচ্ছস্ব বলেন; ইনি অসম্মত হন। মিত্রা বরুণের কাছে গিয়ে নিজের পরিচয় দেন এবং আশ্বাস পান মিত্রাবরুণের কন্যা রূপেও পরিচিত হবে এবং সুদ্যুম্ন নামে বৈবস্বত মনুর পুত্রে পরিণত হবে একদিন (হরি১০।১৪)। ইলা এরপর বৈবস্বত মনুর কাছে ফিরে আসছিল; পথে বুধ একে গ্রহণ করেন; পুরূরবার জন্ম হয় (হরি ১০।১৬)। এর পর ইলা সুদ্যুম্ন হয়ে যান। (২) পৃথিবী; (৩) ইক্ষ্বাকুর মেয়ে, বুধের স্ত্রী; (৪) বায়ুর মেয়ে, বুধের স্ত্রী, ছেলে উৎকল। (৫) দক্ষের মেয়ে, কশ্যপের স্ত্রী। (৬) মনুর স্ত্রী; খণ্ড প্রলয়ের পর

এঁর গর্ভে আবার মনুবংশ জন্মায়। (৭) শরীরে রক্তবাহিকা আধার; মেরুদণ্ডের বাম পাশে মহাধমনী। (৮) বেদে ইষ্টি যজ্ঞ, পশু যজ্ঞ ইত্যাদিতে প্রধান যাগের পর যজমান ও ঋত্বিকের ভক্ষ্য হবিঃশেষ। (৯) ধেনু।

ইণ্ডিয়া—জম্বুদ্বীপ, সুদর্শনদ্বীপ, ইন্টু (হিউ-এন-ৎসাঙ্)। সপ্তসিন্ধু (হপ্ত হিন্দু) >ইন্দু>ইন্দিয়া।

ইতিহাস—যাতে ধর্মার্থকামমোক্ষ উপদেশ সহ পূর্ব-বৃত্তান্ত বর্ণিত থাকে। পুরাণের পঞ্চ লক্ষণঃ—সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর, ও বংশানুচরিত। পুরাণে জনশ্রুতি ও কল্পনা আছে। ইতিহাসে তা নাই।

ইতু—কার্তিকের সংক্রান্তিতে ১২-টি ঘট বসিয়ে অগ্রহায়ণ মাসে প্রতি রবিবারে সকালে শস্য ও সম্পত্তির কামনায় সূর্য পূজা। ইন্দ্র=ইন (ব্রাহ্মী লেখ)=ইতু? ইতু পূজার মন্ত্রে মিত্রায় নমঃ মন্ত্র আছে।

ইদাবৎসর—ত্রিশ সূর্যোদয়ে যে মাস হয় সেই রকম বারো মাস যুক্ত বৎসর। বর্ষ পঞ্চকের ৩-য় বর্ষ; ৩৬০ দিনে সম্পূর্ণ।

ইধ্মজিহ্ব—মনুর ছেলে প্রিয়ব্রত। সুরূপার গর্ভে প্রিয়ব্রতের ছেলে ইধ্মজিহ্ব।

ইধ্মবাহ অগস্ত্যের (দ্রঃ) ছেলে। অপর নাম দৃঢ়স্যু। বেদাদি পাঠ করতে করতে উজ্জ্বল প্রভা একটি শিশু জন্মায় (মহা ৩।৯৭।২৪)। পিতার আশ্রমে ইধ্ম বহন করত বলে ইধ্মবাহ। পণ্ডিত ও তপস্বী।

ইন্দীবরাক্ষ—নলনাভ গন্ধর্বের ছেলে। ব্রহ্মমিত্র মুনির কাছে আয়ুর্বেদ শিখতে চান কিন্তু মুনি প্রত্যাখান করেন। গন্ধর্ব ঠিক করেন লুকিয়ে শিখবেন এবং ছয় মাসের মধ্যে অন্যান্য শিষ্যদের সমান শিখে ফেলেন। এক দিন লুকিয়ে থাকার স্থান থেকে ইন্দীবরাক্ষ হেসে ফেললে ব্রহ্মমিত্র ধরে ফেলেন এবং শাপ দেন সাত দিনের মধ্যে রাক্ষসে পরিণত হবে এবং নিজের সন্তানের হাতে তীরবিদ্ধ হলে মুক্তি পাবে। এক দিন নিজের মেয়ে মনোরমাকে খেতে গেলে জামাতা স্বরোচিষের হাতে তীরবিদ্ধ হয়ে মুক্তি পান (মহা ৬৩।৪০)।

ইন্দুমতী—তৃণবিন্দু ঋষির কঠিন তপস্যায় ভীত হয়ে তপস্যা নষ্ট করার জন্য হরিণী নামে এক অপ্সরাকে ইন্দ্র পাঠিয়েছিলেন। তপোভঙ্গ করতে গিয়ে মুনির শাপে ইন্দুমতী রূপে জন্মাতে হয়। হরিণীর অনুনয়ে তৃণবিন্দু বলেছিলেন পারিজাত দর্শনে শাপমুক্তি হবে। বিদর্ভরাজ ভোজের ঘরে জন্মান। স্বয়ংবরে রঘুর ছেলে অজকে বরণ করেন। ইন্দুমতীর ছেলে দশরথ। এক দিন বাগানে বেড়াবার সময় আকাশচারী নারদের বীণা চ্যুত পারিজাত মালা তাঁর দেহে এসে পড়ে। স্পর্শ মাত্রেই ইন্দুমতী মারা যান (রঘুবংশ)। (২) অন্য মতে রঘুর স্ত্রী। (৩) নহুষের মা।

ইন্দুরাজ—প্রাচীন আলঙ্কারিক। কাশ্মীরের লোক। জন্ম সম্ভবত ৯৬০-৯৯০ খৃস্টাব্দ। অন্য নাম ভট্টেন্দুরাজ বা প্রতিহারেন্দুরাজ। আচার্য ভট্টমুকুলের শিষ্য। অভিনব-গুপ্তের সাহিত্যগুরু; এঁর কাছে অভিনব গুপ্ত ধ্বনিশাস্ত্র পাঠ করেন। আচার্য কাণের মতে প্রতীহারেন্দুরাজ অন্য লোক।

ইন্দো-ইউরোপীয়—ইউরোপীয়, ইরানি, ভারতীয় ইত্যাদি ভাষা থেকে মনে হয় 'হিত্তিভারতীয়' নাম দেওয়া যেতে পারে। একটি ভাষা থেকে দুটি ভাষা (১) হিত্তি, (২) ভারত-ইউরোপীয় ভাষা গড়ে ওঠে। ভারত-ইউরোপীয় ভাষা সম্বন্ধে মোটামুটি তথ্য হচ্ছে সম্ভবত খৃ-পূ ৩-সহস্রকে পূ-দক্ষিণ ইউরোপে কৃষ্ণ সাগর ও কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে এই ভাষা চালু ছিল। এখান থেকে পশ্চিমে, উত্তরপশ্চিমে এসিয়া মাইনরে এবং পূর্ব দক্ষিণে ভারতবর্ষ পর্যন্ত এই ভাষা ও দল ছড়িয়ে পড়ে। আসাম থেকে সুদূর আইসল্যাণ্ড পর্যন্ত এই গোষ্ঠীর ভাষা নানা পরিবর্তনের ফলে আজ বাঙলা ইংরাজি, জার্মানি ইত্যাদি ইত্যাদি ভাষায় পরিণত হয়েছে। ১৪০০ খৃ-পূর্বের গ্রীক ভাষা ও সংস্কৃত ভাষার মধ্যে খুব নিকট সম্পর্ক দেখা যায়।

ইন্দো-সিদিয়ান রাজা—মাউয়েস্, আজেস্ ইত্যাদি।

ইন্দ্র—ঋক্‌বেদে আর্যদের প্রধান দেবতা। ঋক্‌বেদে ২৫০ সূক্তে এবং অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে আরো ৫০-সূক্তে অর্থাৎ ঋক্‌বেদে প্রায় একচতুর্থাংশ ইন্দ্রের স্তব। যাস্কের মতে ইনি অন্তরীক্ষের দেবতা। শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা। অবশ্য স্বয়ম্ভূ বলা হয় নি। ঋক্‌বেদে ৩।৪৮, ৪।১৮ সূক্তে ইন্দ্রের জন্মের বিবরণ রয়েছে যে মাতৃগর্ভেই তিনি মায়ের পার্শ্বদেশ ভেদ করে বার হয়ে আসার চেষ্টা করেছিলেন। জন্মেই আকাশকে উজ্জ্বল করেন (৩।৪৪।৪); জন্মাবধি যোদ্ধা (৩।৫১।৮, ৮।৪৫।৪) ও শত্রুদমনকারী (১০।১১৩।৪) ও অজেয়। তাঁর জন্ম সময়ে ভয়ে আকাশ, পাহাড় ও পৃথিবী কেঁপে উঠেছিল (৪।১৭।২), দেবতারা ভয় পেয়েছিলেন। দেবতারা রাক্ষস বধের জন্য ইন্দ্রকে সৃষ্টি করেন। তৈত্তিরীয় মতে পুরুষের মুখ থেকে ইন্দ্র, ও অগ্নির জন্ম (পুরুষ সূক্ত ১০।৯০।১৩)। দ্যাবাপৃথিবীর পুত্র ও জনক দুই-ই এই ইন্দ্র। এ'র পিতা দ্যৌ বা ত্বষ্টা। অগ্নি ও পূষা ইন্দ্রের ভাই। ঋক্ (১।৫১।২, ২।১২।২-৪)—পৃথিবীকে দৃঢ় করেছেন, পর্বতগণকে স্থির করেছেন, দ্যুলোককে স্তম্ভিত করেছেন, মেঘের মধ্যে অগ্নি উৎপাদন করেছেন, বৃষ্টি দেন, বিশ্বভুবন নির্মাণ করেছেন, সূর্য ও উষাকে সৃষ্টি করেছেন, সপ্তনদীকে প্রবাহিত করেছেন। দেবতাদের তিনি সম্রাট। ঋক্ ২।১৭৪।১—ইন্দ্রকে অসুর (দ্রঃ) বলা হয়েছে। অথর্ব বেদে (১৯।১।১) ত্রিলোকের রাজা; (ঐ ১।৬১।৯) স্বরাট; (ঐ ৩।৪।৬) ইন্দ্রেন্দ্র। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দেবতাদের মধ্যে সব দিকে শ্রেষ্ঠ। কিছু মতে ইন্দ্রই সূর্য। বেদে ইন্দ্র একজন আদিত্য মাত্র। পুরাণে শত ক্রতুর দ্বারা নির্বাচিত রাজা।

ঋক্‌বেদে এ'র বর্ণনা ঃ—ইন্দ্র হচ্ছেন সুশিপ্র=শোভন হনু বা শোভন নাসিকা। হরিকেশ, হরিশ্মশ্রু। তাঁর রঙ, রথ, ও ঘোড়া সবই হরিৎ বা পিঙ্গল। দুটি লম্বা হাত। হিরণ্যবাহু। স্বেচ্ছায় অনন্ত রূপ ধারণ করতে পারেন (ঋক্ ৩।৫৩।৮)। তাঁর রথ হিরণ্ময়, হাতে হিরণ্ময়ী কশা। রথে ঘোড়া দুটির নাম হরি। বায়ু সারথি। হিরণ্ময়ী রথে সব সময়ই আকাশে ঘুরে বেড়ান। হাতে ধনুর্বাণ, হিরণ্ময় অঙ্কুশ, ও ত্বষ্টা নির্মিত দ্যুতিমান বজ্র। এই বজ্র অন্তরীক্ষবর্তী সমুদ্রে জলরাশি দিয়ে আবৃত (ঋক্ ৮।১০০।৯)। এই বজ্রও হিরণ্ময়। তাঁর হাতের প্রকাণ্ড কাঁটা ও জাল দিয়ে

শত্রুদের জড়িয়ে ফেলছেন। হাজার হাজার নক্ষত্র খচিত আকাশই ইন্দ্র—এই অর্থে ইন্দ্র সহস্রাক্ষ।

ইন্দ্র নিজের পিতার পাদদ্বয় গ্রহণ করে পিতাকে বধ করেছিলেন (ঋক্ ৪।১৭।১২)। ইন্দ্রের পিতা দ্যোঃ। তৈত্তিরীয় সংহিতাতেও (৪।১।৩।৬) এই হত্যার উল্লেখ আছে। ইন্দ্রের জন্ম সম্বন্ধে (ঋক্ ৪।১৮।৪) আছে অদিতি সহস্রমাস ও বহু সংখ্যক শরৎ ইন্দ্রকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন। ইন্দ্রকে কেউ কেউ আকাশ মনে করেন। ঋকে (১০।৮৯।২, ২।৬।৩, ২০।৩০।১, এবং ৮।৯৩) ইন্দ্রকে সূর্য বলা হয়েছে। এ ছাড়া সূর্যকে বহু পুরাণে (স্কন্দ, পদ্ম, মার্কণ্ডেয়) ইন্দ্র বলা হয়েছে। ঋকে (১।৬।১) ইন্দ্রকে সূর্য, অগ্নি, বায়ু, নক্ষত্রও বলা হয়েছে; এটি ভাটের উপযুক্ত স্তব। ঋকবেদে প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্র, সূর্য ও অগ্নিকে নিয়ে একটা তালগোল পাকান অবস্থা। অগ্নি কায়িক শক্তি-বলের পুত্র; ইন্দ্রও সায়নের ভাষ্যে বলের (=যবসঃ) পুত্র। ইন্দ্র ও অগ্নি দু জনেই বৃত্রহন্তা। ঋকে (১।১০৮।৩) ইন্দ্র ও অগ্নিকে মিলিত হয়ে বৃত্রকে নিহত করার জন্য স্তব করা হয়েছে। অগ্নিকে ইন্দ্ররূপে তুলনাও আছে ঐতরেয় আরণ্যকে (১।১।২)। ঋকে (৬।৫৯।২) ইন্দ্র ও অগ্নি ভাই। ইন্দ্র তাঁর দেহ থেকে নিজের পিতা ও মাতাকে সৃষ্টি করেন যস্মাতরং পিতরং চ সাকম্ অজনয়থাঃ তন্বঃ স্বায়াঃ (ঋক্ ১০।৫৪।৩)।

ইন্দ্র শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করে সায়ণ অনেক কিছু বলেছেন; যজ্ঞানুষ্ঠাতাদের ভয়মুক্ত করেন, জীব চৈতন্য রূপে প্রাণীদেহে প্রবেশ করেন। কিন্তু এসব কাজের উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। বৃহৎ দেবতায় (২ ৩৬) বলা হয়েছে মরুৎগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে মেঘ বিদীর্ণ করেন ফলে নাম ইন্দ্র; ইত্যাদি। যাস্কের মতে ইন্দ্র, অগ্নি ও সূর্য একই দেবতার তিনটি প্রকাশ; তিন জনের স্থান এবং কাজও কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা।

সোম (দ্রঃ-) গাছের রস এঁর অতি প্রিয় পানীয়। যে কোন দেবতার তুলনায় সোমলোভী। জন্মেই মা অদিতির স্তনে সোম দর্শন করেন (৩।৪৮।৩)। ইন্দ্রের জন্মের সময় অদিতি বুঝতে পারেন এই সন্তান অমর। নিজের বিপদ আশঙ্কায় ইন্দ্রকে অদিতি অন্যত্র কোথাও চলে যেতে বলেন; ইন্দ্র সম্মত হন না; মায়ের পেছু পেছু ত্বষ্টার গৃহে যান। পিতা ত্বষ্টাকে পরাজিত করে তাঁর চমসস্থিত সোম পান করেন (৪।১৮।৩)। সোমরস পান করতে করতে পেট ফুলে উঠেছিল, দাড়িতে জটা বেঁধেছিল। সোমরস রাখা ঘটের নাম হয়েছিল এই জন্য ইন্দ্রোদর। ইন্দ্রের পেটে সোমরসের হ্রদ (৩।৩৬।৮)। এক চুমুকে ত্রিশ হ্রদ সোমরস পান করেন (৮।৬৬।৪)। যজ্ঞে তিনি ৩০-টি সোমপাত্র (ঋক্ ৮।৭৭।৪) নিঃশেষে শেষ করে ফেলেন। সোমপানের যজ্ঞে তাঁকে ডাকা হয় এবং তৃষ্ণার্ত ঋষ্য মৃগের মত ইন্দ্র ছুটে আসেন। সোমপানে দৃপ্ত হয়ে শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকেন। তিনি মহাযোদ্ধা বৃত্রহা। সোমরস পান করে বৃত্রবধ করেছিলেন (ঋক্ ১।৪।৭-৮)। সোম থেকেই ইন্দ্রের উৎপত্তি (৯।৯৬।৫)।

ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে সোমযাগ বিধেয়। তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণে (১৬।৪।১) আছে ইন্দ্র প্রজাপতির কাছে যান এবং বৃত্র বধ করবেন বলেন। তখন গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দ থেকে সার অংশ নির্মাণ (নির্মায় প্রাযচ্ছৎ) করে প্রজাপতি ইন্দ্রকে দান করেন। এই শক্তিতে

বৃত্র বধ হয়। বৃত্র বধের ফলে ইন্দ্রের তেজ হ্রাস পায়। দেবতারা তখন যজ্ঞ করেন কিন্তু তাতেও কিছু হয় না। দেবতারা তখন তীব্র সোম (দ্রঃ) প্রদান করেন অর্থাৎ সোমযাগ করে ইন্দ্রতেজ বৃদ্ধি পায়। মহাভারতে ত্রিশিরা ও বৃত্র বধের পর বিষ্ণুর নির্দেশে (ভাগ ৬।১৩।৩ ঋষিরা নিজেরা) অশ্বমেধ যজ্ঞ করে ইন্দ্র নিজের তেজ ফিরে পান।

মহাভারতে বনপর্বে ইন্দ্র ও অগ্নি সখা। মহাভারতে চেদিরাজের বা রুদ্রের স্তব অত্যুক্তির পরাকাষ্ঠা। দ্রঃ- অপালা।

দেবতাদের রাজা। বায়ু, বৃষ্টি, ঝড় ও বজ্রের দেবতা এই ইন্দ্র। বিদ্যুৎ ও বজ্রের সাহায্যে বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি ঘটান। অনাবৃষ্টি ও অন্ধকার রূপ অসুরকে বিনাশ করেন। সাধারণত তীরধনুক ও বর্শা নিয়ে যুদ্ধ করেন। তিনি বহু ভোজী ও চিরযুবা; ইন্দ্রের প্রধান কাজ বৃত্র বধ। বৃত্র বা ব্যাপক মেঘকে বজ্রাঘাতে বিদীর্ণ করে জলকে প্রমুক্ত করেন। ঋক্‌বেদে মেঘকে পর্বত, বা পুর বা দুর্গ রূপে কল্পনা করা হয়েছে। বৃত্র বধের উপাখ্যানগুলিকে নৈসর্গিক রূপক বলে অনেকে মনে করেন। ত্বষ্টা লোহা ও পাথর দিয়ে তীক্ষ্ণ বহুসূচীমুখ হিরণ্যবর্ণ বজ্র তৈরি করে দিয়েছিলেন। ইন্দ্র সুর ও অসুর (দ্রঃ)। এঁর রথ মনোরথও বটে। হরিৎবর্ণ শত সহস্র সূর্য-চক্ষু অশ্ব ইন্দ্রের রথ বহন করে (৪।৬৩।৩, ৬।৪৭।১৮)। মহাভারতে ইন্দ্রের ও সূর্যের অশ্বের নাম হরি। ঋকে (২।১২।১২) দুজনেই সপ্তাশ্ব। শতপথে (১।৬।৪।১৮) ইন্দ্র ও সূর্য অভিন্ন। এই রথ ও অশ্ব ঋভুগণের তৈরি। সোমপানে দৃপ্ত হয়ে বজ্র নিয়ে মরুৎগণের সাহায্যে অনাবৃষ্টির অসুর অহিবৃত্রকে আক্রমণ করলে আকাশ ও পৃথিবী কাঁপতে থাকে (১।৮০।১১)। জলরোধকারী বৃত্রকে বজ্রে শতখান করে দেন। বজ্রাঘাতে পাহাড় ফাটিয়ে বন্দী জলকে গোষ্ঠবদ্ধ গাভীর ন্যায় মুক্তি দেন। সরমার (দ্রঃ) সাহায্যে গোধন উদ্ধার করেন। তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণে ইন্দ্র সহস্র মরুৎদের জয় করেছিলেন বা মরুৎদের কাছে থেকে সহস্র গাভী উদ্ধার করেছিলেন। পাহাড় ও মেঘে যে দৈত্যরা বাস করেন তাদের পরাস্ত করে জলকে মুক্ত করে দেন।

দস্যুদের সঙ্গে যুদ্ধে আর্যেরা সব সময়ই ইন্দ্রের সাহায্য নিয়েছেন। ঋক্ বেদে ইন্দ্র শক্তিশালী এক বিরাট দেবতা। এমন কি বিষ্ণুকে ইন্দ্রের ছোট ভাই বলা হয়েছে। পুরাণে এই ইন্দ্র কামুক দেবরাজে পরিণত। অনেক সময় ইন্দ্র ও অগ্নি যমজ ভাই। অদিতির সেবাতে সন্তুষ্ট হয়ে কশ্যপ বর দিতে চাইলে অদিতি একটি আদর্শ পুত্র চান; এই ছেলে ইন্দ্র। ইন্দ্রের শত্রু রাক্ষস, অসুর, দৈত্য। অহি, অহীশুব, বৃত্র, উরণ, বিশ্বরূপ, অর্বুদ, ঔর্ণবাভ, কুযব, বল, নমুচি, জম্ভ, চুমুরি, ধুনি, পাক, পিপন/পিপ্রু, বট, শিম্ব্য, শুষ্ণ/তুষ্ণ, শম্বর ইত্যাদিকে নিহত করেছিলেন। ইলীবিষের সৈন্যদের ইনি বিদ্ধ করেছিলেন। অহিকে অপসৃত করলেই আকাশে সূর্য প্রকাশ পায়। ইন্দ্র উষাকে প্রকাশিত করলে অন্ধকার গোষ্ঠ থেকে মুক্ত গাভীগুলির ন্যায় সূর্য কিরণ ছড়িয়ে পড়ে; এ জন্য ইন্দ্র গোপতি। শত অশ্বমেধ করলে ইন্দ্রত্ব পাওয়া যায় বলে ইন্দ্রের নাম শতমখ, শতক্রতু, শতমন্যু। বৃত্র ইত্যাদিকে নিধন করার জন্য ইন্দ্রের নাম বৃত্রহা, নমুচিসূদন, জম্ভভেদী, বলভিদ্ পুরন্দর, পাকশাসন। অসুরপুরী বা দস্যুপুরী নষ্ট করার জন্য বা

বলির ছেলে পুরকে নিহত করার জন্য নাম পুরন্দর। মেঘ এর বাহন বলে নাম মেঘবাহন। বারি বর্ষণ করেন বলে বৃষা। প্রধান অস্ত্র বজ্র বলে নাম বজ্রী, গোত্রভিদ্; রথের ঘোড়ার রঙ হরিৎ বলে হরিদশ্ব। ইনি পূর্ব দিকের শাসক বা অধিপতি। স্বর্গরাজ্যের রাজা। বেদের সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা বলে নাম লেখর্ষভ। যেহেতু শত অশ্বমেধ করলে ইন্দ্রত্ব পাওয়া যায় সেই জন্য পৃথিবীতে কেউ শত অশ্বমেধ করতে গেলেই বাধা দিয়েছেন এবং অতি নীচতারও আশ্রয় নিয়েছেন। চিরশত্রু অসুরদের হাত থেকে স্বর্গ-বাঁচাবার জন্য ক্রমাগত যুদ্ধ করেছেন এবং তাঁদের কাছে বহুবার পরাস্ত হয়েছেন। নিজের ইন্দ্রত্ব লোপের আশঙ্কায় বহু তপস্বীর তপস্যাও কারণে অকারণে অতি নীচ ভাবে নষ্ট করেছেন।

স্বর্গ রাজ্যের যিনিই রাজা তিনিই ইন্দ্র উপাধি পান। ইন্দ্র আদিত্যগণের (দ্রঃ-) অন্যতম। সংবর্ত, পুষ্কর প্রভৃতি মেঘের অধীশ্বর। শস্য ও অন্নের প্রাচুর্যের কামনায় রাজা ও ঋষিরা ইন্দ্রের পূজা করতেন। বেদে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, বায়ু একই দেবতা। এক এক মনু পর্যন্ত এক এক জন ইন্দ্রের রাজত্ব কাল। প্রতি মন্বন্তরে (দ্রঃ) ইন্দ্র পৃথক। ১৪ শ মন্বন্তরে ইন্দ্রের ১৪টি নাম যজ্ঞ, সত্যজিৎ, রোচন ইত্যাদি।

পুরাণের ইন্দ্রও সমস্ত দেবতাদের রাজা। কিন্তু ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের নীচে। পুরাণেও পিতা কশ্যপ মা অদিতি (দ্রঃ)। মহাভারতে ও পুরাণে পুলোমা দৈত্যের মেয়ে ইন্দ্রাণী/শচীকে বিয়ে করেন এবং শ্বশুরকে হত্যা করেন। এই পুলোমা রামায়ণে (৭।১৮।১৯) জয়ন্তকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। বহু পুরাণে আছে ইন্দ্রাদি দেবতারা অপুত্রক। আবার আছে ইন্দ্রের ছেলে জয়ন্ত, ঋষভ, অন্য মতে মীঢ়, মীঢ়ুষ, বালী, অর্জুন এবং মেয়ে জয়ন্তী। ঋক্‌বেদে দশম মণ্ডলে ইন্দ্রের পুত্র বসুক্র ও পুত্রবধূর উল্লেখ আছে। বৃহৎ-দেবতাতেও পুত্রবধূর উল্লেখ রয়েছে। ইন্দ্রের নগরী অমরাবতী (দ্রঃ-মেরু), উদ্যান নন্দন কানন, প্রমোদপুরী বৈজয়ন্ত, ঘোড়া উচ্চৈঃশ্রবা, হাতী ঐরাবত, রথ বিমান, সারথি মাতলি (দ্রঃ); ধনু ইন্দ্রধনু, খড়্গ পরঞ্জ বা পারঙ্ক এবং অস্ত্র বজ্র। ঐরাবত ও উচ্চৈঃ-শ্রবা সমুদ্র মন্থনে প্রাপ্ত; যেন সমুদ্র জাত মেঘ। শতপথে ইন্দ্রের স্ত্রী ইন্দ্রাণী। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (১২।১১) প্রাসহা। ঋক্‌বেদে ইন্দ্র শচীপতি। দ্রঃ- শচী। অথর্ব ও কৃষ্ণ যজুর্বেদেও শচীপতি। বৃহৎ দেবতাতে (৬।৭৬) আছে পুং নামক দানবকে হত্যা করার চেষ্টায় এই পুং-এর জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে বিয়ে করতে চান।

ইন্দ্র ত্রিশিরসকে (দ্রঃ) বজ্রাঘাতে নিহত করেন। পুরাণে বজ্র এই সময়ই প্রথম নির্মিত হয়েছিল মনে হয়। ত্রিশিরসের মৃত্যুর পর বৃত্রের জন্ম। ত্রিশিরস্ হত্যার পাপ ব্রহ্ম হত্যার রূপ ধরে ইন্দ্রকে অনুসরণ করতে থাকে। ইন্দ্র একে গ্রহণ করেন এবং এক বছর পরে এই পাপকে কেটে চার টুকরো করে মাটি, জল, বৃক্ষ ও রমণীদের মধ্যে ভাগ করে দেন। এই চারিটি অংশ মাটিতে লবণ, জলে ফেনা ও বুদ্‌বুদ্, গাছের রস ও রমণী দেহে রজ-রূপে বর্তমান। বৃত্রাসুরকে নেতা করে কালকেয় ও অন্যান্য অসুররা ভীষণ উপদ্রব করতে থাকলে, ইন্দ্র যুদ্ধে হেরে যান ও অজ্ঞান হয়ে পড়েন। বশিষ্ঠ জ্ঞান ফিরিয়ে দেন। স্বর্গ থেকে ইন্দ্র বিতাড়িত হন। দেবতাদের নিয়ে ইন্দ্র তখন বিষ্ণুর

শরণাপন্ন হন এবং বিষ্ণুর নির্দেশে ইন্দ্র দধীচির কাছে এসে দধীচির (দ্রঃ) অস্থি সংগ্রহ করে নিয়ে এই অস্থিতে বজ্র নির্মাণ করিয়ে বজ্রাঘাতে বৃত্রকে (দ্রঃ) বধ করেন। বৃত্র হত্যা করে আবার ব্রহ্ম হত্যার পাপ হয়। একটি মতে দেবতা ও ঋষিরা তখন ইন্দ্রকে সরযূতে স্নান করিয়ে মলদ ও করূষ (দ্রঃ) দেশে এই পাপ ধুয়ে পাপ মুক্ত করে দেন। রামায়ণে (১।২৪।২০) কলস কলস জলে স্নান করিয়ে ইন্দ্রের গায়ের মল ও করূষ ধুয়ে দেন। এই দুটি দেশ মলদা ও করূষা। হৃষ্ট হয়ে ইন্দ্র বর দেন স্থান দুটি স্ফীত জনপদে পরিণত হবে। দ্রঃ- অঙ্গামলক। আর এক মতে পাপ মোচনের জন্য ইন্দ্র মানস সরোবরে পদ্ম ফুলের মধ্যে বাস করছিলেন। এই সময়ে স্বর্গে নহুষ (দ্রঃ) ইন্দ্র হন। নহুষের পতনের পর ইন্দ্র স্বর্গে ফিরে এলে অঙ্গিরস (দ্রঃ) অথর্ব বেদ থেকে মন্ত্র পাঠ করে ইন্দ্রকে অভ্যর্থনা করলে ইন্দ্র এঁকে অথর্বাঙ্গিরস বলে পরিচিত হবেন বর দেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৭।২) আছে বিশ্বরূপকে বধের জন্য দেবতারা ইন্দ্রকে যজ্ঞ থেকে বর্জন করেছিলেন। ত্রিশিরা ও বৃত্র বধের জন্য ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়েছিল। ফলে পদ্মের মধ্যে আত্মগোপন করেছিলেন। পদ্মপুরাণে ইন্দ্র ও পদ্মগন্ধার প্রেমকাহিনী আছে।

ইন্দ্র অশ্বিনীকুমারদের সোমপান করতে দিতেন না। কিন্তু চ্যবনের (দ্রঃ) চেষ্টায় বাধ্য হয়ে এঁদের সোমপানের অধিকার দেন। গরুড়ের (দ্রঃ) পিঠে নাগদের রক্ষা করেছিলেন এবং অমৃত আনতে এলে গরুড়কে বজ্রাহত করেছিলেন। ইন্দ্র একবার বলিকে (দ্রঃ) সুযোগ পেয়েও হত্যা না করে তাড়িয়ে দেন। যযাতিকে (দ্রঃ) ইন্দ্র স্বর্গচ্যুত করেন। জানপদী অপ্সরাকে পাঠিয়ে শরদ্বানের বিভ্রান্তি ঘটাবার চেষ্টা করেছিলেন (দ্রঃ- কৃপ)। কুরুরাজের সঙ্গে একটা মধ্যস্থতা করে কুরুক্ষেত্রের দ্রঃ) মাহাত্ম্য অনেকটা সীমিত করেন। খাণ্ডব দাহনের (দ্রঃ) সময় সশস্ত্র বাধা দেন এবং বন্ধু তক্ষকের (দ্রঃ) স্ত্রীপুত্রদের বাঁচাতে চেষ্টা করেছিলেন। সুরভিকে (দ্রঃ) শান্ত করার জন্য বৃষ্টি দেন। দময়ন্তীর (দ্রঃ) স্বয়ংবর সভাতে যোগ দিতে গিয়েছিলেন এবং কলি নলকে (দ্রঃ) শাপ দিতে উদ্যত হলে কলিকে নিরস্ত করেন। শিশু মান্ধাতাকে (দ্রঃ) রক্ষা করেছিলেন। উশীনর শিবিকে (দ্রঃ) পরীক্ষা করে গিয়েছিলেন এবং যবক্রীতকে প্রার্থিত বর দিয়েছিলেন। সত্যভামার (দ্রঃ) অনুরোধে কৃষ্ণ (দ্রঃ) পারিজাত (দ্রঃ) গাছ/শাখা ইন্দ্রলোক থেকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করলে ইন্দ্রাণীর তিরস্কারে ইন্দ্র সশস্ত্র বাধা দেন কিন্তু পরাজিত হন এবং মিত্রতা স্থাপিত হয়। নরকাসুরও (দ্রঃ) ইন্দ্র থেকে বড় হবার জন্য তপস্যা করেছিলেন। দেবাসুরের যুদ্ধের পর ঐরাবতে চড়ে ইন্দ্র শান্ত মনে পৃথিবী ভ্রমণে বার হয়ে সমুদ্রের পূর্বতীরে হাজার বছর বয়স বকমুনির (গী-প্রে ৩।১৯৩) আশ্রমে এসেছিলেন। কেশীকে (দ্রঃ) পরাজিত করে দেবসেনাকে (দ্রঃ) রক্ষা করেন এবং দেবসেনার বিয়ে দেন।

কর্ণের ধনু বিজয় ইন্দ্রের পরিকল্পনায় বিশ্বকর্মার দ্বারা নির্মিত হয় (মহা ৮।২২।৩৬)। ত্রিপুরের হাতে ইন্দ্র পরাজিত হয়েছিলেন এবং একটি মতে ইন্দ্র শিবকে দিয়ে ত্রিপুরকে নিধন করান। কুরুক্ষেত্রে কর্ণ ও অর্জুনকে কেন্দ্র করে কে জিতবে এই নিয়ে সূর্য ও ইন্দ্রের

মধ্যে মত বিরোধ দেখা দেয়। অসুররা সূর্যের দলে এবং দেবতারা ইন্দ্রের সঙ্গে যোগ দেন। শেষ অবধি সূর্য ইন্দ্রের কাছে হেরে যান। নমুচিকে (দ্রঃ) হত্যা করার জন্য মিত্রঘাতী ও বিশ্বাস ঘাতকতার পাপে জড়িয়ে পড়েন। ইন্দ্র একবার পাখীর বেশে বনে গিয়ে সেখানে মুনি ঋষিদের নানা উপদেশ দিয়েছিলেন। একবার এক বৈশ্য, কশ্যপ নামে অল্পবয়সী এক মুনিকে নিজের রথের ধাক্কায় ফেলে দেন। মুনি অপমানে আত্মহত্যা করবেন ঠিক করেন। ইন্দ্র এই সময়ে শৃগাল হয়ে মুনিকে আত্মহত্যা কত পাপ বুঝিয়ে নিরস্ত করেন। ইন্দ্রই কামদেবকে (দ্রঃ) পাঠিয়ে শিবকে প্রণয়াসক্ত করে পার্বতীর সঙ্গে বিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিলেন। ইন্দ্র একবার ব্রহ্মার কাছে গোদানে কি পুণ্য হয় জানতে চান। ব্রহ্মা বলেন গোদানে লোকে জরাহীন বা ব্যাধিহীন গোলোক প্রাপ্ত হয়। মহাভারতে অনুশাসন পর্বে ৫-ম অধ্যায়ে আছে কাশীতে এক ব্যাধ বিষাক্ত তীর দিয়ে পাখী শিকার করত। এই তীর দৈবাৎ একটি মস্ত বড় গাছে বিদ্ধ হয় এবং গাছটি শুকিয়ে ওঠে। এই গাছের কোটরে একটি পাখী জন্মাবধি বাস করছিল। পাখীটি কিন্তু কোটর ছাড়তে সম্মত হয় না। ইন্দ্র তখন এক ব্রাহ্মণ বেশে পাখীটিকে নতুন আশ্রয়ে যাবার উপদেশ দেন। পাখীটি ইন্দ্রকে চিনে ফেলে কিন্তু নতুন আশ্রয়ে যেতে রাজি হয় না। পাখীটির এই কৃতজ্ঞতায় ইন্দ্র পাখীটিকে স্বর্গে নিয়ে যান।

শম্বর অসুর একবার ইন্দ্রের কাছে ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন এবং জানান তাঁর নিজের সমস্ত ঐশ্বর্যের মূল ব্রাহ্মণদের প্রতি ভক্তি। এই সময় থেকে ইন্দ্রও ব্রাহ্মণদের পূজা করতে থাকেন। এক বনে দেবশর্মা নামে এক মুনি ও তাঁর রূপসী স্ত্রী রুচি বাস করতেন। রুচির প্রতি অনেকের এবং ইন্দ্রেরও লোভ ছিল। মুনি একবার অন্য জায়গায় যজ্ঞ করতে যাবার সময় শিষ্য বিপুলকে রুচির রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়ে এবং ইন্দ্র বহুরূপী হয়ে আসতে পারেন সাবধান করে দিয়ে যান। বিপুল তাঁর তপস্যার বলে রুচির দেহে প্রবেশ করে রুচিকে পাহারা দিতে থাকেন। এর কিছু পরে সুন্দর এক যুবকের বেশে ইন্দ্র আসেন ; রুচিকে নিজের পরিচয় দিয়ে এক রাত রুচির সঙ্গে কাটাতে চান। রুচিও মুগ্ধ হয়ে যান। কিন্তু বিপুলের (দ্রঃ) জন্য শেষ পর্যন্ত লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে যেতে হয় (মহা ১৩।৪১।-)। ইন্দ্র এক বার জনৈক মহামুনি গৌতমের হাতী চুরি করলে গৌতম ধৃতরাষ্ট্রের কাছে অভিযোগ করেন। রাজা ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করতে বলেন। স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে ইন্দ্র হাতী ফিরিয়ে দিয়ে হাতী ও গৌতম দু জনকেই স্বর্গে নিয়ে যান। ভাণ্ডারকরে (১৩।১০৫।-) আছে ধৃতরাষ্ট্র বেশে ইন্দ্র কেড়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন ; কিছুটা বাদানুবাদ হয়, তারপর দু জনকেই ইন্দ্র স্বর্গে নিয়ে যান। যুধিষ্ঠিরকে (দ্রঃ) স্বর্গদ্বারে প্রবেশে বাধা দিয়েছিলেন।

ইন্দ্র অদিতির ছেলে হয়ে জন্মালে দিতির ভীষণ হিংসা হয় এবং কশ্যপের কাছে ইন্দ্রের সমান একটি ছেলে চান। রামায়ণে (১।৪৫।৩২) আছে অমৃত নিয়ে যুদ্ধে সমস্ত দৈত্যারা মারা গেলে দিতি বর চান ইন্দ্রহন্তা পুত্র জন্মাক ; কশ্যপ ১০০০ বছর শুচি হয়ে থাকতে বলেন। অন্য মতে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু মারা গেলে ইন্দ্রবিজয়ী

...চান। কশ্যপ বলেন ১০,০০০ দিব্যবর্ষ শুচি হয়ে থাকতে হবে ইত্যাদি। দিতি সম্মত হন এবং তারপর গর্ভ হয়। অদিতি এদিকে অধৈর্য হয়ে পড়েন ; ইন্দ্রের সমান ছেলে কিছুতেই সহ্য করতে পারবেন না। ফলে ইন্দ্রকে এই গর্ভস্থ শিশু নষ্ট করে ফেলতে বলেন। অন্য মতে এই ভাবী সন্তান সম্বন্ধে কেবল সাবধান হতে বলেছিলেন। ইন্দ্র তখন বিমাতার সেবা করতে থাকেন এবং সুযোগ খুঁজতে থাকেন। এক দিন পা না ধুয়ে শুয়ে পড়ার জন্য সুযোগ বুঝে নিদ্রিত দিতির নাক দিয়ে পেটের মধ্যে ঢুকে পড়েন। রামায়ণে কশ্যপ অঙ্গস্পর্শ করে চলে গেলে দিতি কুশপ্লব (রা ১৷৪৬৷৯) নামক স্থানে তপস্যা করতে থাকেন। ইন্দ্র নানা ভাবে বিমাতাকে পরিচর্য্যা করতে থাকেন। ৯৯০ বছর কেটে গেলে দিতি একদিন সানন্দে জানান যে আর দশ বছর পরে ইন্দ্র নিধনকারী জন্মাবে। রামায়ণে দিতি বলেছিলেন তোমার জন্য সমাধাস্যে ; এর সঙ্গে তুমি সুখ ভোগ করবে (রা ১৷৪৬'১৫)। এই ছেলে ইন্দ্রের সহায় হবে এবং এর সাহায্যে ইন্দ্র ত্রৈলোক্য ভোগ করবে (রা ১৷৪৬৷১৫)। অথচ তিনি ইন্দ্র-জিৎ পুত্র চেয়েছিলেন ; এই দিনই দুপুর বেলা নিদ্রাক্রান্ত দিতি পাদুটি মাথার দিকে করে ঘুমিয়ে পড়েন। ইন্দ্র তখন দিতির শরীর বিবরে (১৷৪৬৷১৮) প্রবেশ করে বজ্র যোগে গর্ভ টুকরো করতে থাকেন। গর্ভস্থ শিশু কেঁদে উঠলে দিতির ঘুম ভেঙে যায়। রুদৎ গর্ভকে ইন্দ্র মা-রুদ মা-রুদ বলে টুকরো করতে থাকেন। দিতি ব্যস্ত হয়ে গর্ভ নষ্ট করতে (১৷৪৬৷২১) বারণ করেন। মায়ের বচন গৌরবাৎ ইন্দ্র বার হয়ে এসে বলেন অশুচি অবস্থার পাদতঃ কৃতমূর্দ্ধজা ঘুমিয়ে পড়ার সুযোগে 'ইন্দ্র হন্তাকে' 'সাত'-টুকরো করে রেখে এসেছেন। দিতি নিজের দোষ স্বীকার করেন এবং নিজের এই গর্ভ বিপর্যয়ে ইন্দ্রের প্রিয় কাজ করতে চান ; এবং বলেন এই তাঁর সন্তানের স্থানপালাঃ হোক, (রা ১৷৪৭ ৩) এবং মারুত নামে বিখ্যাত হোক। একজন ব্রহ্মলোকে, একজন ইন্দ্রলোকে ও তৃতীয়জন দিব্যবায়ু হয়ে এবং বাকি চার জন ইন্দ্রের নির্দেশে দিকে দিকে ঘুরে বেড়াবে। ইন্দ্রের কারণে এদের নাম হবে মারুত। দিতি বলেন বায়ুস্কন্ধা হয়ে চরন্তু। ইন্দ্র দিতির এই বাসনা মেনে নিয়ে বর দেন দেবভূতাঃ তবাত্মজাঃ এই ভাবে বিচরিষ্যন্তি। দিতি ও ইন্দ্র তারপর কৃতার্থো স্বর্গে জগ্মতুঃ (১৷৪৭৷২০)। এরা সাত জনে আবহ, প্রবহ, সংবহ, উদ্বহ, বিবহ, পরাবহ ও পরিবহ। এই কুশপ্লবের অপর নাম বিশালা।

ভাগবতে আছে হিরণ্যকশিপু হিরণ্যাক্ষ মারা গেলে ইত্যাদি কশ্যপ দিতিকে সংবৎসরম্ (ভাগবৎ ৬৷১৮৷৪৫) ব্রতচারণ করতে বলেছিলেন। কিন্তু ত্রুটি হলে ইন্দ্রের অনুগত/সখা হবে। ইন্দ্র সেবা করতে থাকেন। এক দিন সন্ধ্যায় উচ্ছিষ্ট অবস্থায় থাকেন ও পাদপ্রক্ষালন না করে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েন ; ইন্দ্র সুযোগ বুঝে যোগমায়ার সাহায্যে প্রবেশ করেন।

পদ্মপুরাণে (৭৷৩৫) কুরূপা দিতি কশ্যপের বরে রূপবতী হয়ে উঠলেন এবং এর পর ইন্দ্রহন্তা পুত্রের প্রার্থনা করেছিলেন। কশ্যপ আপস্তম্ব কথিত পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করে ইন্দ্রশত্রু 'ভবস্ব' বলে আহুতি দেন। দিতি গর্ভবতী হয়। শতবর্ষ শুদ্ধাচারে থাকার নির্দেশ দেন কশ্যপ। কিন্তু সময় পূর্ণ হতে তিন দিন বাকি ছিল এই সময়

ইন্দ্র সুযোগ পান ইত্যাদি। পা না ধুয়ে চুল খুলে বিপরীত দিকে মাথা করে শুয়েছিলেন। পদ্মপুরাণে ভূমিখণ্ডে আছে বল ও বৃত্র নিহত হলে বিলাপরত দিতিকে কশ্যপ ইন্দ্রহন্তা একটি পুত্র দিতে সম্মত হন। শত বৎসর তপস্যা করার সর্ত থাকে। মেরুপ্রদেশে দিতি তপস্যা করতে থাকেন এবং ইন্দ্র ২৫ বৎসর বয়স্ক এক ব্রাহ্মণ যুবক বেশে সেবা করতেন। ৯৯ বৎসরে গা, পা না ধুয়ে খোলা চুলে শুয়ে পড়েছিলেন ইত্যাদি।

একটি মতে ইন্দ্র প্রথম সাত টুকরো গর্ভকে আবার সাত টুকরো করেছিলেন। অর্থাৎ মোট ৪৯ মারুত। এরা ইন্দ্রের সহায় ও অনুচর বা সখাতে পরিণত হন। এই ৪৯ খণ্ড ভাগবতে বিষ্ণুর কৃপায় জীবিত থাকেন। ইন্দ্র এদের পার্ষদ করে নেবার প্রতিশ্রুতি দেন ; এবং দিতির প্রশ্নে ইন্দ্র সব স্বীকার করতে দিতি সন্তুষ্ট হয়ে এই সন্তানকে ইন্দ্রের সঙ্গে স্বর্গে পাঠিয়ে দেন। আর এক মতে ঘুম ভাঙতে দিতি সব বুঝতে পারেন ; ইন্দ্রকে শাপ দেন রাজ্য ভ্রষ্ট হতে হবে এবং অদিতিকে শাপ দেন কারারুদ্ধ হতে হবে এবং তাঁর ছেলেদেরও নিহত হতে হবে। ফলে অদিতি দেবকী (দ্রঃ) হয়ে জন্মান।

অম্বরীষের সুদেব নামে একজন মন্ত্রী যুদ্ধে মারা যান। কয়েক বছর পরে অম্বরীষও মারা যান এবং স্বর্গে এসে সুদেবকে দেখে ইন্দ্রকে প্রশ্ন করলে ইন্দ্র জানান অম্বরীষ অনেক যজ্ঞ করেছেন এবং সুদেবও বহু রণযজ্ঞ করেছেন। রণযজ্ঞও সমান স্বর্গফলপ্রদ (মহা ১২।৯৯)। ইন্দ্র শুনঃশেপকে (দ্রঃ) রক্ষা করেছিলেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের (দ্রঃ) কাছ থেকে মুখের অন্ন একবার চেয়ে নিয়েছিলেন। কঠোর তপস্যারত এক তপস্বীর কাছে যোদ্ধার বেশে ইন্দ্র একবার দেখা করে নিজের তরবারিটি দিয়ে যত্ন করে রাখতে বলেন। তপস্বী তরবারির যত্ন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন ; নিজের তপস্যার কথা ভুলে যান : ফলে নরকে পতিত হন (রা ৩।৯।১৬)। দেবতারা ইন্দ্রকে মেঘবান পর্বতে ইন্দ্রত্বে অভিষিক্ত করেন। হনুমান ইত্যাদিকে সুগ্রীব এই পর্বতেও সীতাকে খুঁজতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। মৈনাক (দ্রঃ) বাদে অন্য সমস্ত পাহাড়ের পক্ষচ্ছেদ করেন। ব্রহ্মার বরে অসুর শূরপদ্ম অজেয় হয়ে ত্রিভুবনে অত্যাচার করতে থাকেন এবং ইন্দ্রকে ধরে আনতে লোক পাঠান। ইন্দ্র জানতে পেরে ইন্দ্রাণীকে নিয়ে কোন্‌বনে একটি মন্দিরে লুকিয়ে থাকেন। কিছু দিন পরে ইন্দ্রাণীকে শিবের রক্ষণা-বেক্ষণে রেখে ইন্দ্র কৈলাসে যান। এই সময়ে অজামুখী (দ্রঃ) ইন্দ্রাণীকে ধরে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করেন (স্কন্দ পু)। ইন্দ্র একবার রাজা বৃষণশ্ব/বৃষণাশ্বের মেয়ে হয়ে জন্মান ; নাম হয় মেনা (ঋক্ ১।৫১।১৩)। রাজা ঋজিশ্বানকে অসুর নিধনে ইন্দ্র একবার সাহায্য করেছিলেন (ঋক্ ১।৫১।৫)। সূর্যের কাছে স্বশ্ব একটি ছেলে চান এবং সূর্য নিজেই স্বশ্বের ছেলে হয়ে জন্মান। এই ছেলের সঙ্গে মহামুনি এতশ যুদ্ধ করেন। মহামুনি প্রায় মারা পড়ছিলেন ; ইন্দ্র এসে তাঁকে উদ্ধার করেন (ঋক্ ১।৬১।১৫)।

ইন্দ্র একবার এক ঘোটকীকে পরিহাস ছলে একটি গরু প্রসব করার বর দেন (ঋক্)। চন্দ্রবংশে কৌশাম্বীরাজ শতানীকের বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে দেবলোকে নিয়ে গিয়ে অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বলেন। যুদ্ধে শতানীক মারা

গেলে ছেলে সহস্রানীক যুদ্ধে আসেন ও অসুর নিধন করেন। ইন্দ্র সন্তুষ্ট হয়ে সহস্রানীকের সঙ্গে মৃগাবতীর বিয়ের ব্যবস্থা করেন। সুদাসকে সাহায্য করার জন্য ইন্দ্র একবার একটি নদীকে শুষ্ক করে দেন যাতে সৈন্য বাহিনী নদী পার হতে পারে। হিরণ্য পুত্র শনি ইন্দ্রকে এক বার পরাজিত করে ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণী দু জনকে বন্দী করে পাতালে নিয়ে যান। বরুণ এই শনির আত্মীয় ; দেবতারা বরুণের শরণ নেন এবং বরুণের অনুরোধে শনি এ'দের মুক্তি দেন। ইন্দ্র তখন শিবের কাছে প্রতিশোধের জন্য প্রার্থনা করলে শিব বিষ্ণুর আরাধনা করতে বলেন। বিষ্ণু সন্তুষ্ট হয়ে বর দেন ; গঙ্গার জল থেকে শিব ও বিষ্ণু অংশে জন্ম নিয়ে এক জন যোদ্ধা শনিকে নিহত করেন (ব্রহ্মাণ্ড-পু)।

রামায়ণে আছে রাবণ একবার স্বর্গ অধিকার করে নেন এবং মেঘনাদ ইন্দ্রকে লঙ্কাতে বন্দী করে আনেন। ব্রহ্মা ইন্দ্রের মুক্তি চাইতে আসেন কিন্তু ইন্দ্রজিৎ বিনিময়ে অমরত্ব চান। শেষ অবধি ব্রহ্মা বর দেন অগ্নিপূজা করলে আগুন থেকে অশ্বসমেত যে রথ বার হয়ে আসবে সেই রথে চড়ে যুদ্ধ করলে মেঘনাদ অবধ্য হবেন। এই বর পেয়ে ইন্দ্রকে মুক্ত করে দেন। মুক্তি পেয়ে ইন্দ্র (দ্রঃ রাবণ) অত্যন্ত চিন্তাকুল হয়ে পড়েন। ব্রহ্মা তখন অহল্যার (দ্রঃ) কারণে গোতমের শাপের কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং বৈষ্ণব যজ্ঞ করতে বলেন, তাহলে স্বর্গে ফিরে যেতে পারবেন এবং সান্ত্বনা দেন জয়ন্ত মারা যায় নি ; পুলোমা তাকে সমুদ্রে নিয়ে গেছে। অহল্যার সতীত্ব নাশের জন্য গোতমের শাপে ইন্দ্রের সর্বাঙ্গে সহস্র যোনি ফুটে ওঠে। শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রের কাতরতায় গোতম এগুলিকে চোখে পরিণত করে দেন। এই জন্য নাম সহস্রাক্ষ বা নেত্রযোনি (মহাভারত)। পদ্মপুরাণে সহস্র ভগ চিহ্ন হয়। ইন্দ্র জল মধ্যে আত্মগোপন করে ইন্দ্রাক্ষী দেবীর স্তব করেন। দেবী তখন সহস্র চক্ষু, মেষাণ্ড ও মেষশিশু দান করেন। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে (৪৭।৩১-৩২) এক বৎসরের জন্য এই অবস্থা হয়েছিল এবং গায়ে যোনিগন্ধ থাকে। পরে সূর্যের আরাধনাতে এগুলি চক্ষুতে পরিণত হয়। রামায়ণে আছে ইন্দ্র দেবতা ও ঋষি ও চারণদের বলেন (রা ১।৪৯।২) দেব কার্যের জন্য গোতমের তপস্যাতে বিঘ্ন ঘটাতে গিয়ে এই অবস্থা হয়েছে। শাপ দেবার ফলে গোতমের তপঃ অপহৃতং ময়া। রামায়ণ সপ্তম কাণ্ডে আবার অহল্যা (দ্রঃ) ধর্ষণের অন্য কারণ দেওয়া হয়েছে। অগ্নি ও দেবতারা ইন্দ্রকে নিয়ে পিতৃদেবদের কাছে যান। এখানে একটি মেষ ছিল সকল বলেন এর বৃষণ ইন্দ্রের দেহে লাগিয়ে দেওয়া হোক। অফলঃ মেষঃ (মাংস) পরাতুষ্টিং প্রদাস্যতি (রা ১।৪৯।৮) এবং পিতৃদেবদের এই অফল-মেষ দিলে মানুষের অক্ষয় পুণ্য হবে। পিতৃদেবরা তখন ইন্দ্রের অভাব মিটিয়ে দেন। সেই থেকে পিতৃদেবরা অফলান মেষান্ ভুঞ্জতে এবং ফলৈঃ তেষাম্ আযোজয়ন্ (রা ১।৪৯।১১)। অন্য মতে অগ্নি/অশ্বিনীকুমার-দ্বয় অজাণ্ড/মেষাণ্ড জুড়ে দিয়েছিলেন (মহা ১২।১২৪।২৮)। তিলোত্তমার (দ্রঃ) জন্ম হলে তিলোত্তমা যখন দেবতাদের প্রদক্ষিণ করছিলেন তখন প্রদক্ষিণ রত তিলোত্তমাকে দেখবার জন্য ইন্দ্রের সহস্র চক্ষু হয়েছিল। মহাভারতে (শান্তি ৩২৯।১৪) গোতমের শাপে হরিৎবর্ণ শ্মশ্রু ও মুষ্কহীনতা আছে এবং কৌষিক মুনি মেষবৃষণ দান করেন। মহাভারতেই আবার

শান্তিপর্বে (২৫৮:-) চিরকারী (দ্রঃ) কাহিনী আছে। গৌতমের শাপ নাই। বৃত্রকে নিহত করে স্বর্গে ফিরে এসে ইন্দ্রের সোমরস পানের মাত্রা ও ইন্দ্রিয়াসক্তি ভীষণ বেড়ে যায়। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আছে ইন্দ্র যৌন আবেদনে আকৃষ্ট হয়ে অন্য সুন্দরীদের ফিরিয়ে দিয়ে ইন্দ্রাণীকে বিয়ে করেন। আবার অন্য জায়গায় আছে ইন্দ্রাণীর সতীত্ব নষ্ট করেন এবং ইন্দ্রাণীর বাবা পুলোমার শাপ থেকে রক্ষা পাবার জন্য ইন্দ্রাণীকে বিয়ে করেন এবং শ্বশুরকে হত্যা করেন। মহাভারতে আছে এ'র ঔরসে কুন্তীর গর্ভে অর্জুনের জন্ম। এই অর্জুনকে রক্ষা করার জন্য অন্যায় ভাবে কর্ণের কবচ কুণ্ডল সংগ্রহ করে আনেন। পরিবর্তে অবশ্য কর্ণকে একাঘ্নী বাণ দিয়ে এসেছিলেন। অর্জুন স্বর্গে এলে ইন্দ্র এ'কে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দেন এবং পাশুপত অস্ত্র যেন পান আশীর্বাদ করেন ও মহাদেবের তপস্যা করবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। অর্জুন যখন স্বর্গে ছিলেন তখন অর্জুনের মনোরঞ্জনের জন্য একদিন উর্বশীকে পাঠিয়েছিলেন।

একবার বেড়াতে বেড়াতে এক অপ্সরা/মেনকার কাছে দুর্বাসা সন্তানক ফুলের একটি মালা পান। মালাটি ইন্দ্রকে দিলে ইন্দ্র এটি ঐরাবতকে পরিয়ে দেন। ঐরাবত একটি মতে মৌমাছিতে আক্রান্ত হয়ে, ঐ মালা মাটিতে ফেলে দিলে দুর্বাসা শাপ দেন ; ইন্দ্র ও দেবতারা শ্রীভ্রষ্ট ও জরাগ্রস্ত হয়ে পড়েন ; দৈত্যদের হাতে হৃতরাজ্য হতে হয় এবং সামান্য গব্যঘৃতের জন্যও ইন্দ্রকে ভিক্ষা করতে হয়। অভিশপ্ত হয়ে ইন্দ্র দুর্বাসার কাছে ক্ষমা চাইলে দুর্বাসা বলে দিয়েছিলেন সমুদ্র মন্থন করে অমৃত পান করতে। অন্য মতে জরাগ্রস্ত হয়ে দেবতারা বিষ্ণুর কাছে যান এবং বিষ্ণুর পরামর্শে সমুদ্রমন্থন (দ্রঃ) করে অমৃত পান করে সুস্থ হয়ে ওঠেন ও দৈত্যদের বিতাড়িত করেন। পুরাণে কৃষ্ণের (দ্রঃ) সঙ্গে ইন্দ্রের বহু বিরোধের উল্লেখ আছে। ব্রজবাসীরা ইন্দ্রের উপাসক ছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণের চেষ্টায় তারা কৃষ্ণকে পূজা করতে আরম্ভ করলে ইন্দ্র অত্যাচার আরম্ভ করেন। কৃষ্ণ তখন গোবর্দ্ধন ধারণ করেন। ইন্দ্র এক জন দিকপাল। রামায়ণে গৌতম প্রসঙ্গে ইন্দ্রের উল্লেখ আছে। বিশ্বামিত্রের তপস্যা নষ্ট করার জন্য রম্ভাকে পাঠান (রা ১।৬৩।২৬) এবং পরে উপবাসী বিশ্বামিত্রের মুখের অন্ন ভিক্ষা করে চেয়ে নিয়ে যান। এই দুই কাজই বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণ হতে না দেবার চেষ্টা। শরভঙ্গ (দ্রঃ) আশ্রমে এসেছিলেন এবং রামকে দেখে অন্তর্হিত হয়ে যান। সুতীক্ষ্ণের সঙ্গে একবার দেখা করে গিয়েছিলেন। এ ছাড়া মরুৎদের (দ্রঃ) কাহিনীতেও ইন্দ্রের উল্লেখ আছে এবং যুদ্ধের শেষে রামকে (দ্রঃ) বর দিয়েছিলেন।

মহাভারতে কাহিনীর সঙ্গে ইন্দ্র অনেকটা জড়িয়ে আছেন। প্রথমত তিনি অর্জুনের পিতা। খাণ্ডব দাহনের (দ্রঃ) সময় ইন্দ্র অর্জুনকে সরাসরি বাধা দেন; পরাজিত হন এবং খাণ্ডবদহন শেষে কৃষ্ণকে বর দেন এবং অর্জুনকে পরামর্শ দিয়ে যান। বনবাসে এসে অর্জুন যখন অস্ত্রের জন্য ইন্দ্রকীল পাহাড়ে আসেন তখন অর্জুনের (দ্রঃ) সঙ্গে দেখা করেন এবং অর্জুন তারপর স্বর্গে ইন্দ্রের কাছে অস্ত্র শিক্ষা করতে যান। আধুনিক ক্যাবারে নাচ ও পরিবেশ ইন্দ্রের এই সভা (মহা ৩।৪৪।৩১) থেকেই নিখুঁত ভাবে গৃহীত।

এরপর স্বর্গে এক দিন লোমশ আসেন এবং ইন্দ্র এ‘কে পাঠান যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাস দিতে এবং যুধিষ্ঠির যেন তীর্থযাত্রায় যায় বলে দেন এবং লোমশকে নির্দেশ দেন যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে থাকতে ; পথে রাক্ষসাদি নানা ভয় রয়েছে।

অর্জুন স্বর্গ থেকে ফিরে এলে ইন্দ্র যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দেখা করে যান এবং কাম্যক বনে (মহা ৩।১৬২।-) ফিরে যেতে বলেন।

এরপর বনবাসের সময় নানা কাহিনী প্রসঙ্গে ইন্দ্রের উল্লেখ রয়েছে ঃ—নল-দময়ন্তী কাহিনী, দেবসেনা কাহিনী, কার্তিকেয় কাহিনী, বৃত্রবধ কাহিনী, নৃপ কাহিনী, গয় কাহিনী, চ্যবন, মান্ধাতা, উশীনর, যবক্রীত কাহিনী দ্রষ্টব্য।

তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণে ঋষি কুৎসের সহায়তায় দীর্ঘজিহ্বী রাক্ষসীকে দুজনে মিলে হত্যা করেছিলেন। এই রাক্ষসী যজ্ঞের চরু ও পুরোডাশ্ ইত্যাদি লেহন করত। তৈত্তিরীয় সংহিতাতে (৬।২।৪) ইন্দ্র শৃগালীর রূপ ধরে তিন পদক্ষেপে সমস্ত পৃথিবী অধিকার করেছিলেন।

দ্রঃ- অগস্ত্য, অরুণ, অহল্যা, উত্তঙ্ক, ককুৎস, কবন্ধ, কার্তিকেয়, কৃষ্ণ, গাধি, গোত্রভিৎ, গোবর্দ্ধন, গৌতম, চন্দ্র, তারক, ত্রিশঙ্কু, ত্রিশিরা, দণ্ড, দধীচি, দিতি, দুর্বাসা, পণি, পাণ্ডব, পৃথু, বলি, বিশ্বরূপ, বিকুণ্ঠা, বৃত্র, বৃহস্পতি, মতঙ্গ, মরুত্ত, ময়দানব, মহিষাসুর, মুচুকুন্দ, রন্তিদেব, রাম, শরভঙ্গ, স্রুচাবতী, সগর, সব্য, সরমা, হনুমান, মুদ্রা, দিক্‌পাল।

আর্যদের সঙ্গে দস্যুদের যুদ্ধে ইন্দ্র আর্যদের সাহায্য করেছিলেন। তাঁরই প্রভাবে কৃষ্ণত্বক দস্যু বা দাসবর্ণ বশীভূত হয়েছিল। বেদের এই দস্যু অর্থে প্রাচীন ভারতীয় আদিবাসী। পুলোমা দৈত্যের মেয়েকে বিয়ে করার অর্থ ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে আর্য ও অনার্য রক্তের মিশ্রণ। আবেস্তাতেও ‘বেরেথ্রঘন’ (=বৃত্রঘ্ন) শব্দটি আছে। অর্থাৎ সুপ্রাচীন ইন্দো-ইরানীয় যুগ থেকেই ইন্দ্র দেবতা।

ঋক্‌বেদে ইন্দ্রের যে প্রাধান্য সেটি পরে নষ্ট হতে থাকে। অথর্ববেদে ইন্দ্র শত্রু বিনাশক দেবতা মাত্র। কিন্তু মহাভারতে ও পুরাণে ইন্দ্র হীন-দেবতা ; কেউ কঠোর তপস্যা করলেই তার ক্ষতি করেন। অপ্সরা পাঠান তাঁর একটি বিশেষ নোংরামি। এই ইন্দ্রকে বৃত্র স্বর্গ থেকে তাড়িয়েছিলেন ; শচীকে ফেলে পালিয়ে এসেছিলেন। তারকাসুর, মহিষাসুর, শুম্ভ, নিশুম্ভও ইন্দ্রকে তাড়িয়েছিল। পদ্মপুরাণে অদিতি পুত্র বসুদত্ত বিষ্ণুর অনুগ্রহে দেবরাজ হয়েছিলেন। ত্রিশিরা ও বৃত্র বধের পর ইন্দ্র জলাশয়ে আত্মগোপন করে থাকেন ; নহুষ তখন ইন্দ্র হন। মেঘনাদও ইন্দ্রকে লঙ্কাতে বন্দী করে এনেছিল। ইন্দ্রপূজার বিরোধিতা যেন ঋক্‌বেদেই রয়েছে। এমন কি ঋক্ ৮।১০০।৩ সূক্তে ইন্দ্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে ঃ—ন ইন্দ্রঃ অস্তি ইতি নেমঃ আহ। ঋক্‌বেদে (১।১৭০।১) ইন্দ্র আক্ষেপ করেছেন ‘আজকে আমার হবি নাই’। এই খেদের মূল হয়তো ইন্দ্রের ক্রমশঃ অপ্রচলিত হয়ে পড়া। পারস্য ও ইরাণ ইন্দ্রকে নস্যাৎ করে দিয়েছিল। কিছু মতে ইন্দ্রবিরোধী পণিরা ছিল ফিনিসীয়। তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণে মরুৎ-আদি গণদেবতারা বিদ্রোহী হয়ে পাপ-রূপ শত্রুকে যজ্ঞে বিনষ্ট

করেন। যজ্ঞটির নাম বিঘনন। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (২।৭।১৮-১) এই বিরোধিতার কথা আছে। ভাগবতে গোবর্দ্ধন ধারণও এই বিরোধিতা। খাণ্ডবদাহন ইন্দ্রের প্রাধান্য লোপের একটা দিক যেন। মহাভারতে বিপুলও (দ্রঃ) শাপ দিয়েছিলেন।

শুঙ্গবংশী মিত্ররাজ ইন্দ্রিমিত্রের (১০০ খৃ-পূ-১০০ খৃস্টাব্দ) মুদ্রাতে ইন্দ্রের মূর্তি আছে। কোন কোন মুদ্রায় মন্দিরের মধ্যে এই ইন্দ্রমূর্তি। কালিকাপুরাণে (৮৭।২৩-২৫) ইন্দ্রমূর্তি গড়ে পূজা ও ইন্দ্রধ্বজ পূজার নির্দেশ রয়েছে। বর্তমানে অবশ্য ইন্দ্রের কোন প্রতিষ্ঠা নাই। কালিকা পুরাণে সূর্যের সিংহরাশিতে অবস্থান কালে ভাদ্র মাসে শ্রবণা সমন্বিত দ্বাদশীতে ইন্দ্রপূজা বিধেয়। বরাহ-মিহিরের বৃহৎ-সংহিতাতে ইন্দ্র তাঁর ধ্বজা উপরিচর বসুকে দিয়েছিলেন; রাজা ভাদ্রমাসে শুক্লা অষ্টমীতে এই ধ্বজা নগরে এনেছিলেন। বৃহৎ-সংহিতাতে (৪৩।৫-৬) অসুর পীড়িত দেবতারা ব্রহ্মার কাছে গেলে বিষ্ণু একটি কেতু দেন; এবং ইন্দ্র এই পতাকা নিয়ে শত্রু নিধন করেন। ভরত নাট্যশাস্ত্রে (১।৬১) আছে দেবতাদের অভিনয় দেখে ইন্দ্র প্রীত হয়ে নিজের ধ্বজা উপহার দেন। ফলে অভিনয় কালে অসুরদের উপদ্রব নিবারিত হয়; এই ধ্বজার নাম হয় জর্জর। পাল ও সেন যুগে শক্রোত্থান নামে ইন্দ্রধ্বজ (দ্রঃ) উত্তোলন ও পূজা প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধতন্ত্রে পূর্বদিকের অধিপতি ইনি; ইনি রত্নসম্ভবের দ্যোতক।

ইন্দ্রকীল—হিমালয়ে মন্দর পাহাড়। অন্য মতে মহেন্দ্র পর্বত। এখানে নানা মণিমুক্তা ছিল। অর্জুন এখানে তপস্যা করতে আসেন এবং কিরাতরূপী মহাদেবের সঙ্গে যুদ্ধ হয়।

ইন্দ্রজাল—যাদুবিদ্যা। অথর্ব বেদে (৮।৫) অন্তরীক্ষ বা আকাশ এই জাল; দিক সমূহকে এই জালের দণ্ড বলা হয়েছে। স্বর্গে ইন্দ্রের সভায় মায়াকারগণ নানা খেলা দেখিয়ে ইন্দ্রের মনোরঞ্জন করতেন তাই নাম ইন্দ্রজাল। অন্য মতে শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয় চোখের ওপর জাল বিস্তার করে বলে নাম ইন্দ্রজাল। অন্য মতে মালবরাজ ভোজ ও তাঁর মেয়ে ভানুমতী (=বিক্রমাদিত্যের স্ত্রী) এই বিদ্যায় সুদক্ষ ছিলেন বলে নাম ভোজবাজি/ভানুমতীর খেলা। ভারতীয় ইন্দ্রজালে বাটি ও বলের খেলা এ দেশে ও পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন খেলা। রাস্তায় বেদেরা একটি বাটি ও ছোট ছোট কয়েকটি গুটি নিয়ে হাতের খেলা দেখায়, 'এই আছে এই নাই'। 'জ্যোতিষী ও সন্ন্যাসীরা অঙ্কসংখ্যা, ফুলের নাম ইত্যাদি আগে লিখে রেখে বা নখদর্পণে দেবদেবী ইত্যাদির যে ছবি দেখান সেগুলি আসলে ইচ্ছাশক্তি বা বুদ্ধিবৃত্তির খেলা; বহু প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত। এ ছাড়া রাসায়নিক বিক্রিয়াগত খেলা ও যন্ত্রপাতি সাহায্যে ইন্দ্রজাল খেলা ভারতে অতি প্রাচীন। প্রাচীন সন্ন্যাসী ও পুরোহিতরা এই ভাবে নানা ইন্দ্রজালের সাহায্যে নিজেদের দৈবশক্তি সম্পন্ন বলে প্রতিপন্ন করতেন। অথর্ববেদ, তন্ত্রশাস্ত্র ও উত্তর রামচরিতে বিভিন্ন স্থানে ইন্দ্রজালের উল্লেখ আছে।

ইন্দ্রজিৎ—রাবণের অন্যতম ছেলে। মন্দোদরীর (দ্রঃ) গর্ভে জন্ম। আর এক মতে সমুদ্রমন্থনে সুলক্ষণা নামে এক সুন্দরী নারী উঠেছিলেন। ইনি পার্বতীর সখী হন। পার্বতী একদিন স্নান করে সুলক্ষণাকে ঘর থেকে পরিধেয় বস্ত্রাদি আনতে বলেন। এই

ঘরে শিব ছিলেন; মুগ্ধ হয়ে সুলক্ষণাকে সম্ভোগ করেন। সুলক্ষণা বিব্রত হয়ে পড়লে মহাদেব বলেন সুলক্ষণার বিয়ের পর এই ছেলে হবে। পার্বতীর কাছে পরে বস্ত্র নিয়ে এলে পার্বতী সব বুঝতে পারেন এবং শাপ দেন ইত্যাদি। পরবর্তী কাহিনী সুলক্ষণা মধুরার মত মন্দোদরীতে (দ্রঃ) পরিণত হলেন। এই জন্য ইন্দ্রজিতের অপর নাম কানীন। অতিকায় ও অক্ষয়কুমার ইন্দ্রজিতের দুই সহোদর। স্ত্রী প্রমীলা। জন্মেই মেঘের মত গর্জন করে উঠেছিল বলে নাম মেঘনাদ (রা ৭।১২।৩১)।

অপর মতে মেঘের আড়াল থেকে ঘোর নাদে যুদ্ধ করতেন বলে এই নাম। রাবণ একে নিয়ে দিগ্বিজয়ে বার হয়ে স্বর্গ আক্রমণ করলে মেঘনাদের হাতে ইন্দ্রের ছেলে জয়ন্ত অজ্ঞান হয়ে পড়েন। জয়ন্তের পিতামহ পুলোমা জয়ন্তকে নিয়ে সকলের অজ্ঞাতে পালিয়ে যান। ইন্দ্র শোকে মুহ্যমান হয়ে বজ্রাঘাত করেন , রাবণ অজ্ঞান হয়ে যান। মেঘনাদ শিবের বরে মায়া প্রভাবে অদৃশ্য থেকে যুদ্ধ করে ইন্দ্রকে হারিয়ে বন্দী করে ফেলেন। ইতি মধ্যে রাবণের জ্ঞান ফিরে আসে ; ইন্দ্রকে লঙ্কায় বন্দী করে নিযে আসেন। রামায়ণে (৭।৩০) আছে অহল্যাকে ধর্ষণ করার পাপে বন্দী হন। দেবতাদের অনুরোধে ব্রহ্মা ইন্দ্রকে প্রায় এক বছর পরে ছাড়িয়ে নিয়ে আসেন ; ইন্দ্রজিৎ নাম দেন ; ইন্দ্রকে মুক্তি দেবার পরিবর্তে বর দিতে চান। ইন্দ্রজিৎ অমর হবার বর চান এবং শেষ পর্যন্ত মেঘনাদ প্রস্তাব করেন যুদ্ধে যাবার সময় ইষ্ট দেবতা অগ্নিকে পূজা করবেন এবং অগ্নি থেকে যে ঘোড়া পাবেন সেই ঘোড়াতে চড়ে যুদ্ধে গেলে অজেয় হবেন ; এবং যদি এই পূজা অসমাপ্ত রেখে যুদ্ধে যান তাহলে যুদ্ধে মে স্যাৎ বিনাশনম্। অর্থাৎ নিজের বিক্রমে অমরত্ব চান। ব্রহ্মা মেনে নেন। অন্য মতে মহামায়ার পূজা করে ইন্দ্রজিৎ মায়াবল লাভ করেছিলেন। রামায়ণে আরো রয়েছে রাবণ যখন প্রথম দিকে নিজে একা ত্রৈলোক্য জয় করে বেড়াচ্ছিলেন সেই সময়ে নিকুম্ভিলা নামে লঙ্কার একটি উপবনে (রা ৭।২৫) উশনার পৌরোহিত্যে অগ্নিষ্টোম, অশ্বমেধ, বহুসুবর্ণক, রাজসূয়, গোমেধ, বৈষ্ণব ও মাহেশ্বর সাতটি যজ্ঞ করে মহাদেবের কাছে কামগ স্যন্দন, তামসী মায়া, অক্ষয় ইষুধি ও বহু অস্ত্র লাভ করেন। মহাদেবের কাছে এই সব মায়া বিদ্যা লাভ করে নাম হয় মায়াবী।

যজ্ঞ শেষ হবার পর রাবণ ফিরে আসেন। শুক্র যজ্ঞে পুরোহিত ছিলেন, পুত্রের কাছে সব খবর শুনে বৈষ্ণব যজ্ঞ করার জন্য রাবণ বিরক্ত হয়ে পড়েন। ফলে শুক্র শাপ দেন বিষ্ণুর হাতে নিহত হতে হবে। লঙ্কায় হনুমান সীতার খোঁজে এলে ইন্দ্রজিতের সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছিল এবং হনুমানকে ইন্দ্রজিৎ বেঁধে ফেলেছিলেন। লঙ্কায় রামচন্দ্র এলে ইন্দ্রজিৎ প্রথমে অঙ্গদের হাতে পরাজিত হন। ফলে আবার আক্রমণ করে রাম লক্ষ্মণকে নাগপাশে বদ্ধ করেন। কুম্ভকর্ণ, অতিকায়, ত্রিশিরা প্রভৃতি মারা গেলে ইন্দ্রজিৎ আবার আক্রমণ করেন ; রামলক্ষ্মণ পরাজিত হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েন।

এই সময় হনুমান ঔষধ এনে জ্ঞান ফিরিয়ে আনেন। অর্থাৎ রাম লক্ষ্মণকে দু বার পরাজিত করেন। চতুর্থ বার রামচন্দ্রদের ব্যাকুল ও বিভ্রান্ত করবার চেষ্টায় মায়া সীতাকে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু কৌশল ধরা পড়ে ব্যর্থ হয়ে যায়। শেষ কালে

অজেয় হয়ে যুদ্ধে যাবার জন্য নিকুম্ভিলাতে যজ্ঞ করছিলেন। এই সময়ে লক্ষ্মণ এসে (দ্রঃ-বিভীষণ) অর্থাৎ যজ্ঞ পূর্ণ হবার আগে নিরস্ত্র অবস্থাতে এঁকে হত্যা করেন। দ্রঃ-রাবণ।

ইন্দ্রদৈবত—পুত্র কামনায় যজ্ঞ। যুবনাশ্ব এই যজ্ঞ করলে মান্ধাতা ছেলে হয়।

ইন্দ্রদ্বীপ—পৃথিবীর নয় ভাগের একটি। ভাগগুলি ইন্দ্রদ্বীপ, কশেরুমান, তাম্রবর্ণ, গভস্তিমান নাগদ্বীপ, সৌম্য, গান্ধর্ব, বারুণ ইত্যাদি।

ইন্দ্রদ্যুম্ন—(১) সত্যযুগে অবন্তি বা উজ্জয়িনীর সূর্যবংশীয় রাজা। বিষ্ণুভক্ত। এক দিন বিষ্ণু পূজা করবেন স্থির করে উপযুক্ত স্থান খুঁজতে খুঁজতে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে এসে পূজা করে যজ্ঞ শেষ করে এক বিষ্ণু মন্দির তৈরি করান। কিন্তু কি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করবেন ভেবে পান না। বিষ্ণু তখন স্বপ্নে জানান তাঁর সনাতনী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে এবং জানান ভোরে সমুদ্রতীরে একটা কাঠ ভেসে যাচ্ছে দেখতে পাবেন ; সেই কাঠে যেন মূর্তি তৈরি হয়। পর দিন ভোরে কাঠ পেয়ে রাজা নিজেই মূর্তি তৈরি করতে চেষ্টা করেছিলেন। এমন সময় বিশ্বকর্মাকে সঙ্গে নিয়ে ছদ্মবেশে বিষ্ণু এসে কুশলী শিল্পী বলে বিশ্বকর্মার পরিচয় দিয়ে তাঁর হাতে বিগ্রহ নির্মাণের ভার দিতে বলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন এঁকে, কৃষ্ণ. বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি তৈরি করার ভার দেন। অন্য মতে উৎকলে নাগ পর্বতে নারদের সঙ্গে নীলমাধব দেখা করেন। অন্য মতে রাজা পুরীতে আসেন। বিগ্রহ বালির নীচে লুকান ছিল ; রাজা দেবতাকে দেখতে না পেয়ে নীল পর্বতে প্রায়োপবেশনে আত্মবিসর্জন করবেন ঠিক করেন। তখন দৈববাণী হয় রাজা জগন্নাথ দেবকে দেখতে পাবেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন তখন অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন এবং সুন্দর একটি মন্দির নির্মাণ করান। নারদের আনা নৃসিংহ মূর্তি এই মন্দিরে স্থাপিত হয়। পরে স্বপ্নে রাজা জগন্নাথের দর্শন পান এবং সমুদ্র তীরে অবস্থিত একটি সুগন্ধ বৃক্ষ থেকে বিগ্রহ তৈরি করিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন।

ইন্দ্রদ্যুম্ন—(২) রাজা তেজসের ছেলে। অন্য মতে নাভি-ঋষভ-ভরত-সুমতি-ইন্দ্রদ্যুম্ন। বিষ্ণুভক্ত। ভগবতে (৮।৪।৭) পাণ্ড্যঃ দ্রবিড়সত্তমঃ। বৃদ্ধ বয়সে ছেলেদের রাজত্ব দিয়ে মলয় পাহাড়ে তপস্যা করতেন। এক দিন অগস্ত্য আসেন ; ধ্যানরত রাজা জানতে পারেন না। কিন্তু অগস্ত্য অনাদর মনে করে হস্তীতে পরিণত হবার শাপ দেন। রাজা তখন ক্ষমা চাইলে অগস্ত্য বর দেন বিষ্ণু এসে তাঁর পিঠে হাত রাখলে তখন মুক্তি পাবেন। হস্তী হয়ে রাজা ত্রিকূট পাহাড়ে আসেন। এখানে একটি সরোবরের তীরে দেবল মুনি তপস্যা করছিলেন। এখানে এর আগে গন্ধর্ব হূহূ এক দিন অপ্সরাদের নিয়ে জল কেলি করতে এসে দেবলের শাপে কুমীর হয়ে এইখানে বাস করছিলেন। হস্তী ইন্দ্রদ্যুম্ন এই জলে নামলে কুমীর দ্বারা আক্রান্ত হন। হাজার বছর ধরে হাতী ও কুমীর টানাটানি করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত দুজনেরই মনে দিব্য ভাবের উদয় হয়, ইতিমধ্যে বিষ্ণু এসে সুদর্শন চক্রে কুমীরকে, অন্য মতে দুজনকেই হত্যা করেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন মুক্তি পেয়ে বৈকুণ্ঠে চলে যান। পুণ্য ক্ষীণ হয়ে এলে স্বর্গচ্যুত হয়ে রাজা মার্কণ্ডেয় মুনির সামনে এসে পতিত হন। মুনি রাজাকে চিনতে পারেন না। মার্কণ্ডেয় তখন আরো বৃদ্ধ প্রাবারকর্ণ/প্রাকারকর্ণ পেচকের কাছে যাবার কথা তোলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন ঘোড়া সেজে

মার্কণ্ডেয়কে পিঠে নিয়ে হিমালয়ে প্রাবারকর্ণের কাছে আসেন ; এও রাজাকে চিনতে পারে না (মহা ৩।১৯১।৪)। পেচক তখন আয়ো বৃদ্ধ নাড়িজঙ্ঘ বকের কাছে যেতে বলেন। রাজা তখন মার্কণ্ডেয়কে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে হ্রদে ঐ বকের কাছে নিয়ে আসেন। বকও চিনতে পারেন না এবং বলেন ঐ হ্রদে অকূপার নামে কচ্ছপের কাছে যেতে। অকূপার নাড়িজঙ্ঘের চেয়েও বৃদ্ধ ; রাজাকে চিনতে পারেন এবং কৃতজ্ঞতার সঙ্গে জানান রাজা এত গরুদান করেছিলেন যে তাদের পায়ে পায়ে এই হ্রদ তৈরি হয়েছিল ইত্যাদি। এই জন্য হ্রদের নাম ইন্দ্রদ্যুম্ন হ্রদ। কচ্ছপের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আকাশ থেকে দিব্য রথ নেমে আসে। মার্কণ্ডেয় ও পেচককে রাজা স্বস্থানে পৌঁছে দিয়ে স্বর্গে ফিরে যান। অর্থাৎ প্রমাণিত হয় রাজার পুণ্য এখনও কীর্তিত হচ্ছে ; এখনও রাজার পুণ্য শেষ হয় নি (মহা ৩।১৯১।২১)। অন্য মতে অকূপার চিনতে পারলে মার্কণ্ডেয় রাজাকে স্বর্গে পাঠিয়ে দেন। (৩) হিমালয়ে/গন্ধমাদন পর্বতে একটি সরোবর। (৪) পুরীতে ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রতিষ্ঠিত একটি হ্রদ। (৫) জনকের পিতা। (৬) ইক্ষ্বাকু বংশের এক রাজা। (৭) কৃষ্ণের হাতে নিহত জনৈক রাজা (মহা ৩।১৩।২৯)। (৮) দ্বৈত বনে এক মুনি ; যুধিষ্ঠিরকে শ্রদ্ধা দেখাতে এসেছিলেন (মহা ৩।২৭।২২)।

ইন্দ্রদ্যুম্নহ্রদ—দ্রঃ- ইন্দ্রদ্যুম্ন।

ইন্দ্রধনু—রামের বনবাসের সময় অগস্ত্য রামকে ইন্দ্র দত্ত বিশ্বকর্মা নির্মিত বৈষ্ণব (রা ৩।১২) ধনু উপহার দেন। এই ধনুতে রাবণ নিহত হন। রাবণের সঙ্গে যুদ্ধের সময় ইন্দ্র মাতলিকে দিয়েও আর একটি ধনুক পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

ইন্দ্রধ্বজ—নারায়ণ প্রদত্ত ও ইন্দ্রের দ্বারা পূজিত ধ্বজা। অসুরদের হাতে উৎপীড়িত হয়ে দেবতারা ব্রহ্মাকে ধরেন। ব্রহ্মা বলেন ক্ষীরোদ সাগরে নারায়ণের কাছে গিয়ে স্তব করলে দেবতারা একটি ধ্বজা পাবেন। এটিকে বাঁশে বেঁধে ইন্দ্র যদি পূজা করেন তাহলে এই ধ্বজা অসুর বিনাশে সাহায্য করবে। এই ভাবে অসুরেরা পরাজিত হন। নারায়ণ আরো বলেছিলেন যে রাজা এই ধ্বজা পূজা করবে তার রাজ্যে কোন বিপদ থাকবে না। কালিকা পুরাণে (৮৭।৪৬) আছে ভাদ্র মাসে সিংহ রাশিতে শুক্লা দ্বাদশীতে রাজারা ইন্দ্রের প্রীতির জন্য বিধি মত এই ধ্বজা পূজা করে পরে অনুষ্ঠান সহকারে বিসর্জন দেবেন। ইন্দ্রের সঙ্গে শচী, মাতলি, জয়ন্ত, বজ্র, ঐরাবত, সমস্ত দেবতা ও গণদেবতাদের ও পূজা করতে হবে। রাজা যেন নিজে এই ইন্দ্রধ্বজ বিসর্জন না দেখেন। (২) চেদি রাজ উপরিচর বসু ইন্দ্র (দ্রঃ) ধ্বজ পূজা করে ইন্দ্রের কৃপায় পরম সুখে প্রজা পালন করতেন (মহা ১।৬৩।১৭-১৮)। (৩) পতাকা। এই পতাকা উড়িয়ে দিলে বৃষ্টি হয়। এই পতাকা দণ্ড ভেঙে পড়ছে স্বপ্ন দেখলে দেশে দুর্দৈব আসে। দ্রঃ- ইন্দ্র।

ইন্দ্রপুর—(১) সুমাত্রা দ্বীপের দ-পশ্চিমে বেঙ্কুলেনের ১০০ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে নগরী। (২) ইন্দোর। যুক্তপ্রদেশে বুলন্দসর জেলাতে অনূপসহর সাবডিভিসানে ডিভই এর উ-পশ্চিমে। ৪৬৫ খৃস্টাব্দে চন্দ্রগুপ্তের শিলালেখে উল্লেখ আছে। হয়তো শঙ্কর বিজয় গ্রন্থের ইন্দ্রপ্রস্থপুর।

ইন্দ্রপূজা—দ্রঃ-উপরিচর বসু ; ইন্দ্র পৃ ১৮৭ ; বিপুল। হরিবংশ (৩।৫।১৭) জন্মেজয় ইন্দ্রপূজা হবে না বলে শাপ দেন। দ্রঃ- বসুষ্টমা।

ইন্দ্র প্রমতি—ঋক্ বেদের একজন আচার্য। পৈল ঋক্ বেদ দু ভাগ করে এক ভাগ শিষ্য ইন্দ্রপ্রমতিকে পড়ান। ইন্দ্রপ্রমতি তাঁর সংহিতার এক অংশ নিজের ছেলে মাণ্ডূকেয়কে পড়ান। ইন্দ্রপ্রমতি বাষ্কলের সতীর্থ (ভাগ ১২।৬)।

ইন্দ্র প্রমিতি—ঘৃতাচীর গর্ভে বশিষ্ঠের ছেলে। অন্য নাম কপিঞ্জল/ত্রিমূর্তি। পৃথু কন্যার গর্ভে ইন্দ্রপ্রমিতির ছেলে হয় ভদ্র।

ইন্দ্র প্রস্থ—ইন্দ্রপত্ত=ইন্দ্রপতন=ইন্দ্রস্থান। বর্তমান দিল্লির নিকটবর্তী নগরী। পুরাতন দিল্লি (দ্রঃ)। মহাভারতে বৃকস্থল ; খাণ্ডবপ্রস্থ। খাণ্ডব বনের একটি অংশ। যমুনা তীরে একটি নগর। বর্তমানের ফিরোজ শা কোটিলা ও হুমায়ুনের সমাধির মাঝখানে। বর্তমানের দিল্লির ২ মাইল দক্ষিণে। যমুনা বর্তমানে পূব দিকে ১ মাইল মত সরে গেছে। যমুনা তীরে নিগমবোধ ঘাট বা নিগমতীর্থ সাহজাহানের দিল্লির নিগমবোধ দ্বারের ও সেলিমগড়ের কাছে এবং কেল্লার অব্যবহিত বহির্দেশে। নিগমবোধ ঘাট ও নীলছত্রীর মন্দির যুধিষ্ঠির একটি যজ্ঞ করার সময় তৈরি করেছিলেন বলা হয়। এই দুটি স্থান পূর্বতন রাজধানীর অংশ ছিল। পুরাতন দুর্গের সাধারণ নাম ইন্দ্রপথ (ইন্দ্রপ্রস্থ) ; বা পুরাণ কিল্লা। এটিকে এখনও যুধিষ্ঠিরের দুর্গ বলা হয়। প্রাচীন হিন্দু দুর্গের ভিত্তির ওপর হুমায়ুন আবার দুর্গটি সারিয়ে তৈরি করে নেন; নাম দেন দিন-পান্না। ইন্দ্রপ্রস্থ যুধিষ্ঠিরের রাজধানী ; ৬৫৩ কল্যব্দতে বা যুধিষ্ঠির-অব্দে রাজা হন। আর্যভট (দ্রঃ) ও বরাহমিহির মতে কলির আরম্ভ ৩১০২ খৃ-পূ। দিল্লি এলাকা বহু শাসকের খেয়ালখুসি অনুসারে কমান বাড়ান ও রূপান্তরিত করা হয়েছে। ফিরোজ শা কোটিলাতে অশোকের স্তম্ভ রয়েছে। ইন্দ্রপথ বা যুধিষ্ঠিরের দুর্গের বাইরে লাল দরওয়াজা। দ্রঃ- পাণিপ্রস্থ।

বর্তমান দিল্লিতে ইন্দ্রপ্রস্থের কিছু ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। পাণ্ডবরা দ্রৌপদীকে বিয়ে করে হস্তিনাপুরে এলে ধৃতরাষ্ট্র এঁদের অর্দ্ধেক রাজত্ব দিয়ে খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করতে বলেন। পাণ্ডবরা এখানে এক বিরাট সুন্দর সহর ইন্দ্রপ্রস্থ গড়ে তোলেন; ময় দানব (দ্রঃ) এখানে অপূর্ব সভাগৃহ তৈরি করে দেন ; মৈনাক পর্বতে অবস্থিত বিন্দুসরোবর থেকে ধনরত্ন এনে ইন্দ্রপ্রস্থ সাজিয়ে দেন। ১৪ মাসে (মাসৈঃ পরিচতুর্দশৈঃ ২।৩।৩৪) এই প্রাসাদ নির্মাণ শেষ হয়। দশ কিষ্কু সহস্রাণি সমন্তাৎ আয়তা (মহা ২।৩।১৯)। সভাতে সূর্যের প্রভা যেন ম্লান হয়ে আসে। মণিপ্রাকারমালিনী ; বহু রত্নযুক্ত সভা। দাশার্হী, সুধর্মা বা ব্রহ্মার সভাও (মহা ২।৩।২৪) এর সমান নয়। কিঙ্কর নামে আট হাজার রাক্ষস এই সভাকে রক্ষন্তি চ বহন্তি চ। সভাতে পুষ্করিণী ছিল ; এখানে নানা মণি দিয়ে তৈরি পদ্ম ও পদ্মপাতা ছিল; নানা পাখী মাছ ও কূর্ম ছিল এবং বাতাসে যেন জলে ঢেউ উঠছে। এই পুষ্করিণী দেখেও ঠিক বুঝে ওঠা যায় না, লোকে পড়ে যায়। সভা ঘিরে নানা বিধ গাছ ও পাখী ইত্যাদি (মহা ২।৩।৩১)। দেবতাদের পূজা করে বহু ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে এবং বহু দান করে যুধিষ্ঠিররা সভাতে

প্রবেশ করেন। সাত রাত ধরে মল্ল, নট, ঝল্ল, সূত ও বৈতালিকেরা উৎসব করে। অর্জুনের বন্ধু তুম্বুরু, চিত্রসেন এবং অপ্সরা ও কিন্নর-রাও গান বাজনা করতে থাকে। বহু মুনি ঋষি এবং বহু রাজা এই সভাতে সভাসদ হন। নারদ বলে যান মনুষ্য লোকে ইন্দ্রপ্রস্থ সভা সর্বশ্রেষ্ঠ। যুধিষ্ঠির এখানে প্রথম রাজা। পাণ্ডবদের পর যাদব বংশে অনিরুদ্ধের ছেলে বজ্র ইন্দ্রপ্রস্থ শাসন করেন। অন্য মতে খাণ্ডব বনের মধ্যে দেবতাদের স্থাপিত একটি নগর। ইন্দ্র এখানে স্বর্ণযূপ দিয়ে বহু যজ্ঞ করেছিলেন এবং সেই সব যজ্ঞে নারায়ণের সমক্ষে ব্রাহ্মণদের বহু দান করেছিলেন। এই জন্য নাম ইন্দ্রপ্রস্থ। এখানে মৃত্যু হলে পুনর্জন্ম হয় না ; বিষ্ণুতুল্য হয়। জাতকে আছে ইন্দ্রপ্রস্থ সহর সাত যোজন। যমুনার বাম উপকূলে ইন্দ্রপ্রস্থ, দক্ষিণ উপকূলে দিল্লি। নিগমবোধ ঘাট প্রাচীন স্মৃতি বহন করছে।

ইন্দ্রবর্মা—মালব-রাজা। কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডব পক্ষে। এর হাতী অশ্বত্থামা। ভীম এই হাতীকে মারলে সমবেত চাপে যুধিষ্ঠিরকে (দ্রঃ) অশ্বত্থামা মারা গেছে বলতে হয়। দ্রঃ-দ্রোণ।

ইন্দ্রবল—পাণ্ডু বংশে উদয়ন পুত্র। কিন্তু শবর-রাজ বলে পরিচিত।

ইন্দ্রভূতি—খৃঃ ৭-৮ শতকে জন্ম। তিব্বতের প্রসিদ্ধ ধর্মগুরু পদ্মসম্ভবের পিতা। উড্ডীয়ানের রাজা। বজ্রযান ও তন্ত্রশাস্ত্রে এক জন সুপণ্ডিত। আচার্য অনঙ্গবজ্রের শিষ্য। প্রায় ২৩টি গ্রন্থের রচয়িতা। এগুলির মধ্যে কুরুকুল্লাসাধন ও জ্ঞানসিদ্ধির মূলগ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া গেছে।

ইন্দ্ররথ—যযাতিকে ইন্দ্র (হরিবংশ ৩০।৮) একটি রথ দেন। এই রথে যযাতি পৃথিবী জয় করেন। এই রথ চেদি রাজ বসু এবং ক্রমশ তারপর জরাসন্ধ পান। জরাসন্ধ নিহত হলে ভীম এই রথটি কৃষ্ণকে দেন (৩০।৩৫)। গার্গ্যের ছেলেকে ইন্দ্রোত (দ্রঃ) জন্মেজয় হত্যা করলে গার্গ্যের শাপে এই রথ নাশং জগাম।

ইন্দ্রশিলাগুহ—গিরিয়েক (<গৈরিক) পর্বত। রাজগির থেকে ৬ মাইল। এই পাহাড়ে বেশ কিছু পাথর গেরুয়া রঙ। বিপুলা পর্বতের শাখা ; রাজগিরি এলাকার সব চেয় পূব দিকের পাহাড়। পঞ্চানন>পঞ্চান নদী পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। নদীর ওপারে ; বৌদ্ধগ্রাম গিরিয়েক ; পাহাড়ে দুটি শৃঙ্গ। পূব দিকে ছোট শৃঙ্গে ইঁটের বুরুজ জরাসন্ধ-কা-বৈঠক ; অর্থাৎ বৌদ্ধদের হংসস্তূপ। ভারতে এক মাত্র এই বাড়িটি অশোকের আগে তৈরি ; এখনও দাঁড়িয়ে আছে। বাড়িটির সামনে একটি সংঘারামের ধ্বংসস্তূপ, একটি কূপ, দুটি পুষ্করিণী ও একটি বাগান রয়েছে। পশ্চিম দিকের শৃঙ্গটি হংসস্তূপের সঙ্গে পাকা রাস্তা দিয়ে যুক্ত ; এটি উচ্চতর শৃঙ্গ এবং এইটি গৈরিক শৃঙ্গ ; এখানেও একটি বিহার রয়েছে। ফা-হিয়েনের এটি 'বিচ্ছিন্ন' পর্বত। এই পাহাড়ে ইন্দ্র স্বর্গের গায়ক পঞ্চশিখকে বুদ্ধের সামনে বাঁশি বাজাবার জন্য এনেছিলেন।

ইন্দ্রসভা—অমরাবতীর দেবসভা। বিশ্বকর্মা নির্মিত। দিব্য আলোকে উদ্ভাসিত।

৪০০ ক্রোশ পরিধি ও দুই ক্রোশ উচ্চ। বা ১৫০ যোজন×১০০ যোজন×৫ যোজন (মহা ২।৭।২)। তেত্রিশ কোটি দেবতা ও ৪৮,০০০ ঋষির বসবার স্থান আছে।

ইন্দ্রসাবর্ণি—১৪-শ অর্থাৎ শ্বেতবরাহকল্পে শেষ মনু। এই মন্বন্তরে অবতার বৃহৎভানু; ইন্দ্র শুচি; দেবতা পাঁচ ভাগ ঃ—চাক্ষুষ, পবিত্র, কনিষ্ঠ, ভ্রাজিক, বাচাবৃদ্ধ। অগ্নিবাহু, শুচি, শুক্র, মাগধ, অগ্নীধ্র, যুক্ত ও জিত সপ্তর্ষি। উরু, গম্ভীরবুদ্ধি ইত্যাদি মনু পুত্র (বিষ্ণু ২৩।২)। দ্রঃ- ভৌম।

ইন্দ্রসেন—(১) নল ও দময়ন্তীর ছেলে। (২) যুধিষ্ঠিরের সারথি; বনে যাবার সময় প্রথম দিকে এই সারথি সঙ্গে ছিলেন। (৩) সূর্য বংশে পূর্ণের ছেলে; বীতিহোত্রের পিতা। (৪) পরিক্ষিতের ছেলে।

ইন্দ্রসেনা—(১) নল ও দময়ন্তীর মেয়ে। (২) মহর্ষি মুদ্গলের স্ত্রী; ইনি বীরাঙ্গনা। মহর্ষি মুদ্গল বৃষ বাহিত রথে ইন্দ্রসেনার সারথ্যে শত্রু জয় করে বহু গাভী সংগ্রহ করে আনেন। (৩) নালায়ণী ইন্দ্রসেনা মুদ্গলের স্ত্রী (মহা ৩।১১৩।২৪)।

ইন্দ্রাক্ষী—এক জন দেবী। দ্রঃ-ইন্দ্র।

ইন্দ্রাণী—ইন্দ্রের (দ্রঃ) স্ত্রী শচী; সন্তান জয়ন্ত ও জয়ন্তী। কশ্যপ+দনু>পুলোমা> শচী। ঋক্ বেদে আছে ইনি ভাগ্যবতী, এঁর স্বামী অমর। দেবী হিসাবে ইন্দ্রাণী সে রকম পূজিতা নন। শূরপদ্ম অসুর শচীকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন এবং ধরে আনবার জন্য অনুচরদের পাঠান। কোঙ্কন দেশে এক মন্দিরে গিয়ে ইন্দ্র আশ্রয় নেন। ইন্দ্রের অনুপস্থিতিতে শূরপদ্মের বোন অজামুখী (দ্রঃ) ইন্দ্রাণীকে দেখতে পেয়ে ধরে ফেলেন এবং বিয়ে করতে বলেন। শেষ পর্যন্ত ইন্দ্র স্ত্রীকে নিয়ে দেবলোকে ফিরে যান। এই ইন্দ্রাণীর অংশে দ্রৌপদীর জন্ম। কৃষ্ণের সঙ্গে সত্যভামা দেবলোকে এলে ইন্দ্রাণী তাঁকে অদিতির সঙ্গে দেখা করতে নিয়ে যান। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ইন্দ্রের স্ত্রী প্রাসহা। দ্রঃ- নহুষ, অগস্ত্য। (২) অষ্ট মাতৃকার এক জন। (৩) যোগিনী। (৪) দুর্গা।

ইন্দ্রানুজ—বামন। পুরাণে ইন্দ্রের জন্মের পর কশ্যপ-অদিতির দ্বিতীয় পুত্র বামন জন্মান।

ইন্দ্রিয়—বেদান্তে কর্ম ইন্দ্রিয় ঃ—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ। জ্ঞানেন্দ্রিয় ঃ—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক। অন্তরেন্দ্রিয় ঃ—বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত। চক্ষুর দেবতা সূর্য, কর্ণের দিক, নাসিকা অশ্বিনীদ্বয়, জিব প্রচেতা, ত্বক বায়ু, মন চন্দ্র, বুদ্ধি চতুর্মুখ, অহঙ্কার শঙ্কর, চিত্ত অচ্যুত, বাক্ বহ্নি, পাণি ইন্দ্র, পাদ বিষ্ণু, পায়ু মিত্র, উপস্থ প্রজাপতি।

ইন্দ্রোত—ইন্দ্রোদ=শৌনক। (মহা ১২।১৪৬।২) শুনকের ছেলে। পরিক্ষিতের ছেলে জন্মেজয় একবার এক ব্রাহ্মণ হত্যা করে ফেলেন এবং শৌনকের পরামর্শে তীর্থ যাত্রা ইত্যাদি করে ইন্দ্রোত মুক্তি পান। হরিবংশে (১।৩০।১৪) জন্মেজয়ের নাম ইন্দ্রোত জন্মেজয়; গার্গ্য মুনির এক বাচাল ছেলেকে হত্যা করেন (দ্রঃ-ইন্দ্ররথ)। রাজা পতিত হন; গায়ে লোহার গন্ধ ইত্যাদি। শৌনক অশ্বমেধ যজ্ঞ করে রাজাকে গন্ধ ও পাপ মুক্ত করেন।

ইরা—দক্ষের মেয়ে কশ্যপের স্ত্রী, সন্তান ঘাস, গুল্ম ও বৃক্ষলতা (হরি ১।৩।১১৮)।

ইরান—পারস্য। আর্য উপনিবেশ বলে এই নাম। পাঞ্জাব আগত আর্যদের বসতি। প্রাচীন পারসিক বা প্রাচীন বাহ্লীক (ব্যাকট্রিয়া) বা প্রাচীন মাদ (মেডিয়া) দেশ। উত্তর কুরু।

ইরাবতী—(১) পঞ্চনদের একটি। রাবি। গ্রীক হিদ্রাওতেস্। অন্য নাম পরুষ্ণী (দ্রঃ)। ধবলাধর পাহাড়ের উত্তর ঢাল ও পীর পাঞ্জালের দক্ষিণে ঢাল থেকে উদ্ভূত জলধারা মিলে সৃষ্টি। চম্বা উপত্যকা হয়ে চন্দ্রভাগার সঙ্গে মিলিত হয়ে সিন্ধু নদে এসে পড়েছে। এই নদীর তীরে হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ। (২) অযোধ্যাতে রাপ্তি<রেবতী। (৩) বর্মাতে একটি নদী ; নাম সুভদ্রা। (৪) ভব নামে রুদ্রের স্ত্রী। (৫) ক্রোধবশার নাতনি ; অর্থাৎ কদ্রুর মেয়ে।

ইরাবান—অর্জুন ও উলূপীর ছেলে। অর্জুন যখন তীর্থযাত্রায় গিয়েছিলেন তখন একদিন গঙ্গাস্নানের সময় ঐরাবত কুলে কৌরব্য নাগের মেয়ে উলূপী অর্জুনকে প্ররোচিত করে বিয়ে করেন। প্রথম স্বামী গরুড়ের হাতে মারা যান। বংশ রক্ষার জন্য ঐরাবত বিধবা কন্যাকে অর্জুনের হাতে দেন। ইরাবান নাগলোকে মায়ের কাছে পালিত হন। অর্জুনের প্রতি বিদ্বেষ বশত এঁর পিতৃব্য অশ্বসেন এঁকে ত্যাগ করেন। অর্জুন যখন স্বর্গে অস্ত্রশিক্ষা করছিলেন সেই সময় ইরাবান গিয়ে অর্জুনকে নিজের পরিচয় দেন (মহা ৬।৮৬।১১)। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুন ইরাবানকে যোগ দিতে বলেন। যুদ্ধের অষ্টম দিনে গজ, গবাক্ষ, বৃষক, চর্মবান, আর্জব ও শুক নামে (মহা ৬।৮৬।২৪) শকুনির ৬ ভাইকে ও বহু কৌরব সৈন্য ধ্বংস করে অলম্বুষের হাতে নিহত হন।

ইর্ন—কচ্ছের রান<ইর্ণ=লবণ জমি। পেরিপ্লাসে এইরিয়োন।

ইল—ভাগবতে বৈবস্বত মনু পুত্র কামনায় মিত্রাবরুণকে সন্তুষ্ট করার জন্য অগস্ত্যকে দিয়ে যজ্ঞ করান। কিন্তু মনুস্ত্রী মনাবী/শ্রদ্ধা একটি মেয়ে চান। অন্য মতে যজ্ঞে ত্রুটি ছিল। মনাবীর কথায় কন্যা লাভের সংকল্প করে আহুতি দেন ফলে ইলার জন্ম হয়। মনু কিন্তু ছেলে চেয়েছিলেন। বশিষ্ঠের কাছে মনু কন্যা লাভের কারণ জানতে চান এবং অনুনয় করলে ইলা পুত্ররূপে সুদ্যুম্ন নামে পরিচিত হন। অন্য মতে মিত্রাবরুণের বরে ইলা সুদ্যুম্ন হন। এই সুদ্যুম্ন একবার সঙ্গীদের নিয়ে মৃগয়াতে বার হয়ে কুমারবনে (দ্রঃ) প্রবেশ করলে সঙ্গে সঙ্গে সকলে নারীতে পরিণত হয়ে যান। পদ্ম পুরাণে আছে পুং নামক বনে এসে ইলা হন। অন্য মতে মৃগয়া কালে কার্তিকের জন্মস্থান ঘোর অরণ্যে প্রবেশ করেন। উমা-মহাদেবকে এখানে ক্রীড়ারত দেখতে পান। উমার মনোরঞ্জনের জন্য মহাদেব স্ত্রী রূপে খেলা করছিলেন এবং তাঁর ইচ্ছা মত অরণ্যের সমস্ত পুরুষ-জন্তু, পুরুষ-বৃক্ষ স্ত্রীত্বপ্রাপ্ত হয়েছিল। রাজা ও তাঁর অনুচরেরা নারীতে পরিণত হন। মৎস্য পুরাণ মতে মনুর বরপুত্র ; রাজা হয়ে দিগ্বিজয়ে সমগ্র পৃথিবী জয় করে দৈবাৎ কুমারবনে/শরবনে প্রবেশ করে তৎক্ষণাৎ নারী হয়ে যান। নাম হয় ইলা এবং পূর্বস্মৃতি ভুলে যান। বিমূঢ় হয়ে কয়েক দিন পরে রাজ্যে ফিরতে থাকেন, পথে বুধ এঁকে দেখে মুগ্ধ হয়ে বিয়ে করেন। অন্য মতে ইলা এক দিন বেড়াতে

বেড়াতে চন্দ্রের ছেলে তপস্যারত বুধের সঙ্গে মিলিত হন। রূপে মুগ্ধ হয়ে ইলার গর্ভে বুধ একটি সন্তানের জন্ম দেন ; এই ছেলে পুরূরবা। ভাগবতে এই ছেলে হবার পর ইলা বশিষ্ঠকে সব জানান এবং বশিষ্ঠ মহাদেবকে অনুরোধ করেন অন্য মতে যজ্ঞ করে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করে বর পান এক মাস নারী হয়ে অন্তঃপুরে থাকবেন এবং পরবর্তী মাসে পুরুষ হয়ে রাজ্য শাসন করবেন। এই ভাবে জীবন কাটবে। আর এক মতে ইল প্রথমে নারীতে পরিণত হন যখন তখন ইলের ভাইরা ইলকে উদ্বিগ্ন হয়ে খুঁজতে থাকেন এবং সব জানতে পেরে চ্যবন বশিষ্ঠ ইত্যাদি ঋষিকে দিয়ে এক অশ্বমেধ যজ্ঞ করে মহাদেবকে খুসি করে মাসান্তর নারী-পুরুষ জীবনের বর পান। এই সময় ইলের নাম সুদ্যুম্ন। রামায়ণে (৭।৮৭) বাহ্লীশ্বর। কর্দম প্রজাপতির ছেলে। ধার্মিক শক্তিশালী রাজা। চৈত্র মাসে মৃগয়া ; বনে ঘুরতে ঘুরতে মহাসেনের জন্মস্থানে। এখানে হরপার্বতী বিহার করছিলেন ; সমস্ত অনুচর ও পুরুষ গাছগুলিও স্ত্রী-রূপ ধারণ করেছিল, ইল সানুচর স্ত্রীত্ব। মহাদেবের শরণ ; ও প্রত্যাখ্যান ; তারপর পার্বতীর বরে একমাস স্ত্রী ও একমাস পুরুষ এবং যে কোন দশাতে অন্য দশার কথা মনে থাকবে না।

প্রথম মাসে স্ত্রী বেশে (রা ৭।৮৮) বনে ঘুরে বেড়ান ও সকলে একটি সরোবরে জলক্রীড়া ; তীরে বুধ তপস্যা করছিলেন ; কামবশ হয়ে পড়েন ; এদের পরিচয় চান ; এরা ঠিক বলতে পারে না। বুধ ধ্যানে জেনে নেন ; অনুচরীদের উপদেশ দেন কিম্পুরুষী ভূত্বা শৈলরোধসি বাস করুক ; কিম্পুরুষদের স্বামী হিসাবে লাভ করবে। এই ভাবে কিম্পুরুষ উৎপত্তি (রা ৭।৮৯।১)। সকলে চলে যায় ; ইলাকে বুধ নিজের পরিচয় দেয় ; এবং এক সঙ্গে বাস। এক মাস পরে পুরুষ ; কিছুই মনে থাকে না ; কেবল অনুচরদের কথা ও বনে আসা ইত্যাদি মনে পড়ে। বুধ বোঝান অশ্মবৃষ্টিতে অনুচররা মারা গেছে ; ইল আত্মহত্যা করতে চায় ; শশবিন্দু (দ্রঃ) রাজ্য করছে করুক। বুধ আশ্বাস দেন, এক বছর মত অপেক্ষা করতে বলেন। এক মাস স্ত্রী ও এক মাস পুরুষ হিসাবে কাটে, ন-মাসে পুরূরবা বুধস্য সমবর্ণাভ জন্মান। এক বৎসর কাটলে সংবর্ত, চ্যবন, অরিষ্টনেমি, প্রমোদন, মোদকর ও দুর্বাসাকে বুধ আনান ; কিছু একটা করতে বলেন। এই সময় কর্দম, পুলস্ত্য, ক্রতু, বষটকার ও ওঙ্কারও আসেন। কর্দম নির্দেশে অশ্বমেধ যজ্ঞে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করা। ঐখানেই যজ্ঞ। সন্তুষ্ট মহাদেব পুরুষ করে দেন। ইল প্রতিষ্ঠানে রাজধানী করেন ; শশবিন্দু বাহ্লিতে থেকে যান (রা ৭।৯০।২২)।

রাজা ইলের পুরুষ অবস্থার ছেলে শশবিন্দু, উৎকল, গয়, বিমল=হরিতাশ্ব। পুরূরবার বয়স হলে সুদ্যুম্ন এঁকে রাজ্য দিয়ে বনে চলে যান। ইলের দেশের নাম ইলাবৃত। ইলার ভাই ইক্ষ্বাকু।

ইলবিলা—দেববর্ণিনী। বিশ্রবার স্ত্রী। কুবেরের মা (ভাগ ৯।২)।

ইলা—দ্রঃ ইল, ইড়া।

ইলাবৃত—(১) এখানে ইলা (দ্রঃ-ইল) বুধের সঙ্গে বাস করতেন। কৈলাসের নিকট। (২) জম্বুদ্বীপে নয়টি দেশের মধ্যে একটি। এর উত্তরে নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গবান পর্বত ; দক্ষিণে নিষধ, হেমকূট ও হিমালয় পর্বত ; পশ্চিমে মাল্যবান ও পূর্বে

গন্ধমাদন। এই দেশে মেরু পর্বতকে সুমেরু বেষ্টন করে অবস্থিত। মেরু এখানকার নাভি দেশ। অন্য মতে চীন, তুর্কিস্তান ও গোবি মরুভূমি নিয়ে ইলাবৃত বর্ষ। আর এক মতে মধ্য এসিয়ার কোন স্থান, সম্ভবত পামির বা পূর্বতুর্কিস্তান। ইলাবৃতবর্ষের অপর নাম স্বর্গ। (৩) মৎস্য পুরাণে বৈবস্বত মনুর ছেলে রাজা ইলের (দ্রঃ) নাম অনুসারে নাম। (৪) ভাগবত (৫।২।১৯) মতে জম্বুদ্বীপের অধিপতি আগ্নীধ্রের নয় ছেলের এক জন। দ্রঃ- অগ্নীধ্র।

ইলিন—তংসুর ছেলে। স্ত্রী রথন্তরী। ছেলে দুষ্যন্ত, শূর, ভীম, বসু, প্রবসু (মহা ১।৮৯।১৪ এবং ১।৯০।২৯)। দ্রঃ- ঈলিল।

ইলিল—ঈলিন, ইলিন (দ্রঃ)।

ইলোরা—দৌলতবাদ থেকে সাত মাইল ও আওরঙ্গাবাদ নগরের থেকে ৯-ক্রোশ দূরে অবস্থিত। ইলিচপুরের রাজা ইলু কর্তৃক নির্মিত। দ্রঃ- এলোরা, ইল্বলপুর।

ইল্ববাহ—ইধ্মবাহ।

ইল্বল—সিংহিকার গর্ভে বিপ্রচিত্তির ছেলে। অসুর। ছোট ভাই বাতাপি। অন্য মতে রাক্ষসী অজামুখী দুর্বাসার কাছে আত্মনিবেদন করে এই দুটি ছেলে পান। এরা পিতার তপঃ ফলের ভাগ চাইলে দুর্বাসা ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দেন অগস্ত্যের হাতে মৃত্যু হবে। দ্রঃ- অজামুখী। মহাভারতে ইল্বল ও বাতাপি দুই ভাই প্রহ্লাদ গোত্র, দৈত্য; মণিপত্তন বা মণিমতী নগরীতে বাস করতেন। বাতাপি এক তপস্বী ব্রাহ্মণের কাছে ইন্দ্রের সমান পুত্রলাভের বর চেয়ে বিফল হয়ে ব্রাহ্মণ হত্যায় নিযুক্ত হন। ব্রাহ্মণ বেশ ধরে সংস্কৃত ভাষাতে (রা ৩।১১।৫৭) ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করে আনতেন। ইল্বলের ক্ষমতা ছিল বৈবস্বতক্ষয়ম্ যে গেছে তাকে ডাক দিলে সে জীবিত হয়ে উঠত। বাতাপিকে মেষ/ছাগল রূপ ধারণ করাতেন (মহা ৩।৯৪।৮)। ইল্বল এই মাংস নিমন্ত্রিতদের খাইয়ে ভাইকে ডাক দিতেন। সঙ্গে সঙ্গে বাতাপি ব্রাহ্মণদের পেট চিরে বার হয়ে আসতেন। এই ভাবে বহু ব্রাহ্মণ নিহত হলে এক দিন দেবতারা অগস্ত্যকে (দ্রঃ) নিয়ে (মহাভারতে অগস্ত্যের সঙ্গে মাত্র তিন রাজা ছিলেন; রামায়ণে দেবতা ও মহর্ষিদের প্রার্থনায় একা অগস্ত্য) এখানে অতিথি হন। যথা রীতি খেতে দিলে অগস্ত্য একাই সব মাংস খেয়ে ফেলেন। পরে ইল্বলের ডাকে বাতাপির কোন সাড়া মেলে না, এবং অগস্ত্য জানান বাতাপিকে তিনি হজম করে ফেলেছেন। ক্রুদ্ধ ইল্বল তখন অগস্ত্যকে আক্রমণ করতে চেষ্টা করলে মুনির কোপে ভস্মীভূত হন। মহাভারতে ইল্বল জীবিতই থাকেন। (২) প্রহ্লাদ বংশে এক জন অসুর। (৩) প্রহ্লাদের (দ্রঃ) ছেলে। (৪) মৃগশিরার ওপরে পঞ্চ তারা।

ইল্বলপুর—এলোরা, এলপুর, এলাপুর, মণিমতীপুর, বেলুর, ভেলুর, শিবালয় (দ্রঃ), বা দেবপর্বত (শিব-পুর)। শৈবল, রেবাপুর দেবীপর্বত, দুর্জয়া, বেরুলেন। নিজাম রাজ্যে দৌলতাবাদ থেকে ৭ মাইল; নন্দনগাঁও থেকে ৪৪ মাইল। ইল্বল>এলাপুর। ইল্বলের দেশ। একটি মতে বাতাপিপুরে ইল্বল নিহত হয়েছিল। এলোরাতে বিশ্বকর্মা চৈত্য ও সঙ্গে বিহারটি ৬০০-৭৫০ খৃস্টাব্দে নির্মিত।

এখানে সব চেয়ে সুন্দর কৈলাস গুহা মন্দির ; বাদামি-রাজ প্রথম কৃষ্ণ খোদিত করেন ; পত্তদকল-এ বিরূপাক্ষ মন্দিরের অনুকরণে ; ৮-শতকে ; নিজের জয় লাভের স্মৃতি হিসাবে। এখানে ঘুশ্রীনেশ শিবের মন্দির রয়েছে, ১২-শ লিঙ্গের একটি। একটি মতে এলাপুর হচ্ছে গুজরাটে ভেরাভাল। দ্রঃ- এলোরা, ইলোরা।

ইল্বলা—মৃগশিরা নক্ষত্রের মাথায় ৫-টি ছোট ছোট তারা। দ্রঃ-ইল্বল।

ইষু—সামবেদীয় যজ্ঞ।

ইষুপাদ—দনুর একটি ছেলে। পর জন্মে রাজা নগ্নজিৎ (গী-প্রে ১।৬৭।২০)।

ইষ্টি—চারজন ঋত্বিক সম্পাদ্য সাগ্নিক যজমান কর্তৃক অনুষ্ঠেয় যজ্ঞ। শ্রৌত অগ্নিতে সম্পাদ্য হবির্যজ্ঞ।

ইসমান—যমুনা, বা ত্রিযামা, বা ইক্ষুমতী।

ইসলামাবাদ—কাশ্মীরের প্রাচীন রাজধানী অনন্তনাগ ; ঝিলম নদীর তীরে।

ইসলিয়—কেশরীয়া/কেসরিয়া। চম্পারণ জেলাতে। পূর্ব জন্মে বুদ্ধদেব এখানে রাজ চক্রবর্তী হয়ে জন্মান। লিচ্ছবিদের কাছ থেকে চলে যাবার সময় একটি ভিক্ষাপাত্র বুদ্ধদেব এদের উপহার দিয়েছিলেন, এর স্মৃতি হিসাবে একটি স্তূপ রয়েছে। স্তূপটি রাজা বেণ কা ডেরা নামে পরিচিত। রাজা বেণও এক জন রাজ চক্রবর্তী ছিলেন।

ইসিদাসী—উজ্জয়িনীতে এক ধনী ও ধার্মিক বণিক-কন্যা। সাকেতে এক ধনী বণিক-পুত্রের স্ত্রী। স্বামী একে ত্যাগ করলে দ্বিতীয় বার বিয়ে করেন এবং আবার পরিত্যক্ত হয়ে তৃতীয় বার বিয়ে করেন। শেষ কালে থেরী জিনদত্তার সংস্পর্শে এসে সংঘে যোগদান করে অর্হত্ব লাভ করেন।

ইস্পাত—সম্ভবত ভারতেই প্রথম প্রস্তুত হয়েছিল। ২০০০ বছর আগেও ভারতে উজ্-ইস্পাতের ব্যবহার ছিল। বিশ্ববিখ্যাত দামস্কাসের তরবারি এই ইস্পাতে গঠিত। পরে এই শিল্প ভারতে অবলুপ্ত হয়।

ঈ-ৎসিঙ্—চীনে ৬৩৫ খৃষ্টাব্দে চি-লি প্রদেশ জন্ম। অল্প বয়সে সেখানে কৃতবিদ্য হয়ে ওঠেন। ১৫-বছর মত বয়সে ভারতে আসার বাসনা হয় এবং ৬৭১ সালে ক্যান্টন থেকে জলপথে দ-পূর্ব এসিয়ার ভারতীয় উপনিবেশ শ্রীবিজয়ে (সুমাত্রাদ্বীপে পালেম্বাং) উপস্থিত হন। শ্রীবিজয় ঐ সময়ে বৌদ্ধশাস্ত্র চর্চার বিখ্যাত কেন্দ্র ছিল। ৬৭৩ সালে জলপথে তাম্রলিপ্তে (তমলুক) আসেন। এখানে কিছু দিন থাকার পর ভারতে বৌদ্ধ কেন্দ্রগুলি পরিভ্রমণ করেন এবং বৌদ্ধশাস্ত্র ও আয়ুর্বেদ চর্চা করেন এবং প্রায় ৪০০ বৌদ্ধ পুঁথি সংগ্রহ করেন। এর পর আবার তাম্রলিপ্ত ও শ্রীবিজয় হয়ে ২৫ বৎসর পরে দেশে ফিরে গিয়ে বাকি জীবন সংগৃহীত বৌদ্ধ পুঁথিগুলিকে চীনা ভাষায়

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করে কাটান। ফা-হিয়েনের মত সংঘের নিয়ম যথাযথ ভাবে পালন করবার ওপর অধিকতর গুরুত্ব অর্পণ করতেন। এ জন্য বিনয় সাহিত্যের চর্চা করতেন এবং মূলসর্বাস্তিবাদ বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সমগ্র বিনয়পিটক তিনি চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন। সব সমেত ৫৬টি বৌদ্ধশাস্ত্র তিনি অনুবাদ করেন এবং সাতখানি মৌলিক গ্রন্থ লেখেন। এর মধ্যে একটি বই ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে; এটি ইংরাজিতে অনুবাদ হয়েছে এবং আর একটি বই চীনা ও কোরিয়া থেকে যে সব পরিব্রাজক ভারতে আসতেন তাঁদের জীবনী ও সাধনা সম্বন্ধে; এটি ফরাসিতে অনুবাদ হয়েছে।

ঈর্ষা—দক্ষের মেয়ে। কশ্যপের তের জন স্ত্রীর মধ্যে এক জন।

ঈশ—এক জন বিশ্বদেব।

ঈশান—ঋক্‌বেদে দেবতাদের একটি বিশেষণ; অর্থ ঐশ্বর্যশালী। উপনিষদে অর্থ প্রভু বা নিয়ন্তা। বেদসংহিতায় রুদ্র; রামায়ণ মহাভারতে শিব এবং পৌরাণিক শিবের একটি নাম। একাদশ রুদ্রের এক জন। পৌরাণিক যুগে শিবের অষ্টমূর্তিঃ-পঞ্চ ভূত, সূর্য, চন্দ্র, যজমান। এই অষ্টমূর্তির মধ্যে ঈশান হচ্ছেন সূর্য। তন্ত্রে শিবের পাঁচ-মূর্তিঃ—ঈশান, তৎপুরুষ, অঘোর, বামদেব, সদ্যোজাত। (২) আর্দ্রা নক্ষত্রের দেবতা। (৩) ঈশান কোণের দেবতা। (৪) বিষ্ণুর এক নাম। (৫) সাধ্যদেব বিশেষেরও নাম। দ্রঃ-দিকপাল।

ঈশান—দ্বিজাহ্নিক পদ্ধতি প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা। হলায়ুধের বড় ভাই। রাজা লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধ্যক্ষ ধনঞ্জয়ের ছেলে। ঈশানের আর এক ভাই পশুপতি; এঁরও কয়েকটি গ্রন্থ ছিল। একটি গ্রন্থও পাওয়া যায়নি।

ঈশানকোণ—পূর্ব ও উত্তর দিকের মধ্যবর্তী কোণ। দ্রঃ- দিক্‌পাল।

ঈশানী—সতীর অন্য নাম।

ঈশিতা—অণিমা ইত্যাদি অষ্ট ঐশ্বর্যের মধ্যে স্বামিত্বরূপ ঐশ্বর্য। এই ঐশ্বর্যের জন্য স্থাবর, জঙ্গম, সর্বভূত ঈশ্বরের আজ্ঞাধীন।

ঈশ্বর—(১) একাদশ রুদ্রের একজন। (২) ক্লেশ, জন্ম, কর্ম, বিপাক, আশয় দ্বারা অপরাভূত চৈতন্য (পাতঞ্জল)। ঐশ্বর্য যুক্ত সগুণ ব্রহ্মের উপাধি, অর্থাৎ ব্রহ্মের যে অংশ সৃষ্টি করছেন। ভারতে ধর্মের তিনটি ধারা, ঈশ্বর বিশ্বাসী, নিরীশ্বরবাদী ও নাস্তিক। বেদকে যাঁরা মানে না অর্থাৎ চার্বাক, ও বৌদ্ধ দর্শন নাস্তিক। সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক এবং পূর্ব ও উত্তর মীমাংসা এই ষড়-দর্শন আস্তিক। সাংখ্য আস্তিক হলেও নিরীশ্বরবাদী। সাংখ্যের মতে প্রমাণের অভাবে ঈশ্বর ধারণা অসিদ্ধ। সাংখ্যের ঈশ্বর-অসিদ্ধ যুক্তিগুলির মধ্যে একটি যুক্তি জীব নিত্য ও অবিনাশী। সুতরাং সৃষ্টিকর্তা অসিদ্ধ। অনেকের মতে সাংখ্য ঠিক ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করে না, সাংখ্য বলতে চায় প্রমাণের অভাব হেতু অসিদ্ধ, নতুবা ঈশ্বর সিদ্ধ। যোগে ঈশ্বরকে বলা হয়েছে সগুণ ও সক্রিয় ও সদাত্ত, দেহাদি রহিত পরম পুরুষ। জগতের নিমিত্ত। জীবকে কর্মানুসারে ফল দেন। যে জীব ঈশ্বরে

আত্মসমর্পণ ও কর্মফল অর্পণ করেন তিনি অন্তরে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে পারেন এবং কৈবল্য (দ্রঃ) পান। যোগীর অনুভূতি ঈশ্বর সত্তার অন্যতম প্রমাণ।

প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে চার্বাক ও বৌদ্ধ দার্শনিকরা ঈশ্বর সত্তা মানেন না। বৌদ্ধ মতেও শোক-দুঃখ এবং বিনাশপূর্ণ জগতের কারণ ঈশ্বর নন। কর্তা-ক্রিয়া উপমা দিয়ে জগতকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মানুষ ঈশ্বর রূপ কর্তা সৃষ্টি করেছে। ন্যায় দর্শনে ঈশ্বর অপ্রমেয় সগুণ ও সক্রিয় একটি আত্মা। তাঁর দেহ নাই; ইচ্ছাশক্তিই তাঁর সব। ন্যায়ের যুক্তিগুলি অবশ্য সবই প্রকল্প। বৈশেষিক কণাদ জগতের কারণ রূপে ঈশ্বরের উল্লেখ করেন নি। কিন্তু পরবর্তী বৈশেষিকরা নৈয়ায়িকদের প্রকল্পগুলি মেনে নিয়ে ঈশ্বর রূপ সৃষ্টি কর্তাকে স্বীকার করেছেন। মীমাংসকগণ জগতের কর্তা ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করেন না। নানা যুক্তি দিয়ে এঁরা পরমেশ্বরবাদ খণ্ডন করেন কিন্তু দেবতাদের স্বীকার করেন এবং পূজাহোমের আবশ্যকতাও মেনে নেন ; এঁরা বলেন বেদ নিত্য। বেদান্ত দর্শনে মায়া-বিশিষ্ট ব্রহ্ম অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্ম হচ্ছেন ঈশ্বর। ঈশ্বরের সত্তা ব্যবহারিক। ব্রহ্মজ্ঞান হলে ঈশ্বর-সত্তা থাকে না। দ্রঃ এশ্বেরবাদ।

ঈশ্বরপুরী—মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ; শ্রীচৈতন্যের দীক্ষাগুরু। জন্ম হালিসহর। একটি মতে এঁর বাবার নাম শ্যামসুন্দর আচার্য ; রাঢ়ী ব্রাহ্মণ। ঈশ্বর পুরী সন্ন্যাসী হয়েও সাধারণ বেশে থাকতেন। নবদ্বীপে অদ্বৈতের বাড়িতে এলে কেউ এঁকে চিনতে পারেন নি ; কিন্তু কৃষ্ণ বিষয়ক একটি গান শুনে এঁর দেহে সাত্ত্বিক বিকার ফুটে উঠেছিল। ফলে অদ্বৈত এঁকে চিনতে পারেন। এই সময়ে কয়েক মাস গোপীনাথ আচার্যের বাড়িতে ছিলেন। ১৫০৮ সালে গয়াতে নিমাই এঁর কাছে দীক্ষা নিয়ে চৈতন্য নামে পরিচিত হন। ঈশ্বরপুরী চৈতন্যকে এত ভালবাসতেন যে দেহত্যাগের সময় তাঁর নিজের সেবক গোবিন্দকে শ্রীচৈতন্যের সেবার জন্য পাঠিয়ে দেন। ঈশ্বর-পুরী রচিত তিনটি শ্লোক পাওয়া যায় ; একটিতে তিনি নিজের দৈন্য দেখিয়েছেন এবং অন্য দুটিতে মুক্তি ও ব্রহ্মজ্ঞান অপেক্ষা শ্যামসুন্দরের সেবা ও গোপীদের প্রেমরস আস্বাদনই জীবনের শ্রেয় বলে উল্লেখ করেছেন।

ঈশ্বরী—পার্বতী, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, শক্তি, বা যোগিনী বিশেষ।

উক্‌থ—(১) সামবেদ। (২) সাত্ত্বিকী মন্যতী/স্বাহার পুত্র। দ্রঃ-অগ্নিবংশ। স্বাহার পুত্র এই উক্‌থকে অপর তিনটি উক্‌থ (শরীর, প্রাণ ও পরমাত্মা) স্তব করেন। অর্থাৎ এই তিনটির সঙ্গে স্বাহাপুত্র একাত্মভাবে অবস্থান করেন। মহাবাচং (ব্রহ্মকথার) জন্ম দেন এবং ইনি সমাশ্বাস। দ্রঃ- বৃহৎ-উক্‌থ। (মহা ৩।২০৯।—)

উগ্‌গ—বৈশালীর এক গৃহপতি ও শ্রেষ্ঠদাতা। দীর্ঘদেহ, উন্নতমন ও অপরিমেয় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ছিলেন বলে নাম উগ্‌গ শেট্‌ঠি। বুদ্ধের প্রথম দর্শনেই তিনি স্রোতাপন্ন ও অচিরে অনুগামী হন।

উগ্র—(১) শিবের অষ্টমূর্তির একটি। (২) বরাহ কল্পে ১১-শ দ্বাপরে গঙ্গাদ্বারে মহাদেব উগ্র নামে অবতীর্ণ হন এবং লম্বোদর, লম্বাক্ষ, লম্বদেশ ও প্রলম্ব নামে চার ছেলে হয়। এঁরা সকলেই মাহেশ্বর যোগে পারদর্শী ছিলেন। (৩) দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ সেনাপতি হলে মাতৃকা জটাধরা স্কন্দকে সাহায্য করার জন্য উগ্র প্রভৃতি সহায়ককে পাঠিয়েছিলেন। (৪) মহিষাসুরের এক সেনাপতি। (৫) ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে ; ভীমের হাতে নিহত (মহা ৬।৬০।২৯)। (৬) শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণ কন্যার সন্তান বা ক্ষত্রিয়ের ঔরসে শূদ্রা স্ত্রীর সন্তান। (৭) এক জন যাদব রাজা ; পাণ্ডবরা এঁকে যুদ্ধে নিজেদের দলে ডেকেছিলেন (মহা ৫।৪'১২)। (৮) প্রজাপতি কবির পুত্র। (৯) কেরল। (১০) মহাস্থান।

উগ্রক্ষত্রিয়—ক্ষত্রিয় পিতা ও শূদ্রা মাতা থেকে উৎপন্ন জাতি। পূর্ববঙ্গে নিম্ন জাতি, পশ্চিম বঙ্গে নবশাখের অন্তর্গত।

উগ্রচণ্ডা—(১) আশ্বিন মাসে কৃষ্ণা নবমীতে কোটি যোগিনীর সঙ্গে প্রথমে আবির্ভূত হয়ে অষ্টাদশ ভুজা দেবী মহিষাসুরের প্রথম মূর্তি বিনাশ করেন। (২) দক্ষ যজ্ঞে সতী দেহ ত্যাগ করে উগ্রচণ্ডা রূপ নিয়ে কোটি যোগিনী সহ শিবের সঙ্গে যোগ দিয়ে যজ্ঞ নষ্ট করেন। কালিকা পুরাণে কাত্যায়নীই উগ্রচণ্ডার রূপ ধারণ করেন। আবার দুর্গার অষ্ট নায়িকার মধ্যেও এক জন। কালিকা পুরাণে প্রথম সৃষ্টিতে উগ্রচণ্ডা, দ্বিতীয় সৃষ্টিতে ভদ্রকালী এবং তৃতীয় সৃষ্টিতে দুর্গারূপে মহিষাসুরকে বধ করেন। ভিন্নাঞ্জন সদৃশা, সিংহবাহিনী (কালিকা ৬০।১২৪)। এঁর অষ্ট যোগিনী :—কৌশিকী, শিবদূতী উমা, হৈমবতী, ঈশ্বরী, শাকম্ভরী, দুর্গা ও মহোদরী (কালিকা ৬১।৪১)। উগ্রচণ্ডা ১৮, ভদ্রকালী ১৬, এবং দুর্গা ১০ হাত। দ্রঃ- চামুণ্ডা ; চণ্ডনায়িকা।

উগ্রতারা—ভগবতীর এক মূর্তি, অন্য নাম মাতঙ্গী। শুম্ভ নিশুম্ভের উৎপাতে দেবতারা হিমালয়ের পাদদেশে মতঙ্গ মুনির আশ্রমে এসে ভগবতীর আরাধনা করেন। দেবী তুষ্ট হয়ে মতঙ্গ মুনির স্ত্রীর রূপ ধারণ করে দেবতাদের দেখা দেন ; এবং এই স্ত্রীর দেহ থেকে এক দিব্য মূর্তি বার হয়ে আসে। মতঙ্গের স্ত্রীর দেহ থেকে নিষ্ক্রান্তা বলে নাম মাতঙ্গী। চার হাত, কৃষ্ণবর্ণ, চোখ রক্তবর্ণ, গলায় মুণ্ডমালা ও সাপ ; ডান দিকের হাতে খড়্গ ও কর্ত্রী বাঁ দিকের হাতে পদ্ম ও খর্পর। মাথায় গগন স্পর্শী জটা। পরিধানে বাঘছাল ও কালো কাপড়। বাঁ পা শবের বুকে ডান পা সিংহের পিঠে। এঁরও অষ্ট যোগিনী আছে।

উগ্রশ্রবা—(১) কুশিক বংশে এক কুষ্ঠরোগী ব্রাহ্মণ। স্ত্রী শীলাবতী (দ্রঃ) অত্যন্ত পতিব্রতা। এক দিন এক পতিতার জন্য ব্রাহ্মণ কামার্ত হয়ে উঠে স্ত্রীকে অনুরোধ করেন সেখানে পৌঁছে দিতে। স্ত্রী স্বামীকে কাঁধে নিয়ে পৌঁছে দিতে যাচ্ছিলেন। পথে অন্ধকারে শূলবিদ্ধ অণিমাণ্ডব্যের (দ্রঃ) গায়ে উগ্রশ্রবার পা ঠেকে যায়। অন্য মতে পা লাগেনি। উগ্রশ্রবার চরিত্র দেখে অণিমাণ্ডব্য শাপ দেন পর দিন সূর্যোদয়ের আগেই ব্রাহ্মণের মৃত্যু হবে। এই শুনে পতিব্রতা স্ত্রী বলেন তাহলে কাল থেকে আর সূর্যই উঠবে না। ফলে সূর্য না ওঠাতে পৃথিবী নষ্ট হয় দেখে দেবতারা ব্রহ্মার কাছে

যান এবং ব্রহ্মা সকলকে অনসূয়ার কাছে যেতে বলেন। শীলাবতী শাপ তুলে নেন, সূর্য ওঠে, উগ্রশ্রবা মারা যান, অনসূয়া (দ্রঃ) আবার ব্রাহ্মণকে বাঁচিয়ে দেন (ব্রহ্মাণ্ড-পু)। দ্রঃ- অরুণ।

(২) রোমহর্ষণ মুনির ছেলে। অপর নাম সূত/সৌতি (দ্রঃ)। নৈমিষারণ্যে পুরাণ পাঠ করে শোনান। নৈমিষারণ্যে কুলপতি শৌনকের ১২ বৎসর ব্যাপী যজ্ঞে আসেন। সকলে কাহিনীকথা শুনতে চান। উগ্রশ্রবা বলেন রাজা জনমেজয়ের (মহা ১।১।৮) সর্পযজ্ঞে ব্যাস প্রোক্ত এবং বৈশম্পায়ন বর্ণিত মহাভারত কাহিনী শুনে এসেছেন এবং বহু তীর্থ ও সমন্ত-পঞ্চক/কুরুক্ষেত্র ঘুরে এসেছেন। শৌনক অগ্নিসরণে ছিলেন; বার হয়ে এলে কথা আরম্ভ হয়। (মহা।৪।১)। (৩) ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। ভীমের হাতে নিহত।

উগ্রসেন- কংসের-পিতা। নহুষ-যযাতি-যদু(১)-হেহয়(৪)-কৃতবীর্য(৯)-কার্তবীর্যার্জুন(১০)-শিনি(১৪)-সত্যক(১৫)-সাত্যকি(১৬)-পৃশ্নি(২০)-চিত্ররথ(২১)-তুম্বুরু(২৬) দুন্দুভি(২৭)-আহুক(৩১)-উগ্রসেন(৩২)-কংস(৩৩)। (দেবী ভাগবত)।

শত্রুঘ্নের দুই ছেলে মথুরাতে রাজত্ব করতেন। এর পর যাদব রাজ শূরসেন মথুরার অধিপতি হন। এই শূরসেন বসুদেবের পিতা, কৃষ্ণের পিতামহ। বসুদেব রাজত্ব নেন না, ফলে আর এক জন যাদব রাজা উগ্রসেন মথুরাতে রাজা হন।

আহুকের স্ত্রী কাশ্যা; দুই ছেলে দেবক, উগ্রসেন। উগ্রসেনের স্ত্রী পদ্মাবতী; নয় ছেলে ও পাঁচ মেয়ে। (হরিবংশে ৩৭।৩০) ছেলেদের নাম ন্যগ্রোধ, সুনামা, কঙ্ক, শঙ্কু, সভূমিপ, রাষ্ট্রপাল, সুতনু, অনাধৃষ্টি, পুষ্টিমান। মেয়ে কংসা, কংসবতী, রাষ্ট্রপালী, সুতনু, ও কঙ্কা। এই ছেলেদের মধ্যে কংস (দ্রঃ) বড়। কংস অবশ্য উগ্রসেনের ক্ষেত্রজ পুত্র। রাজ্যলোভী কংসের হাতে নিগৃহীত হয়ে উগ্রসেন কারারুদ্ধ হন। পরে কৃষ্ণ বলরাম কংসকে নিহত করে উগ্রসেনকে মথুরার সিংহাসনে বসান। ইনি দীর্ঘজীবী ছিলেন এবং যদুবংশ ধ্বংস প্রত্যক্ষ করেন। কোন কোন মতে অহুকই উগ্রসেন। উগ্রসেনের অনুমতি নিয়েই কৃষ্ণ কংসকে নিহত করেন। উগ্রসেনের রাজত্বকালে জরাসন্ধ ও শাল্ব মথুরা আক্রমণ করেছিলেন। দ্বারকাতে আহুক/উগ্রসেন যখন রাজা তখন এক দিন বিশ্বামিত্র নারদ ও কণ্ব এলে যাদবরা সাম্বকে (দ্রঃ) মেয়ে ছেলে সাজিয়ে ঋষিদের ঠকাতে পরীক্ষা করতে চেষ্টা করেন। যদু বংশ ধ্বংসের আগে আহুক দেশে সুরাপান নিষিদ্ধ করেছিলেন (১৬।২।১৯)। মৃত্যুর পর আহুক/উগ্রসেন বিশ্বদেবদের দলে গিয়ে যোগ দেন (মহা ১৮ ৫।১৫)।

(২) পরিক্ষিতের চার ছেলের এক জন; জন্মেজয়ের ভাই। (৩) ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে, অপর নাম চিত্রসেন। (৪) কশ্যপের ঔরসে মুনির পুত্র। (৫) নন্দবংশের প্রতিষ্ঠাতা। (৬) মহাবোধি-বংশ গ্রন্থের উগ্রসেন ও পুরাণে মহাপদ্ম বা মহাপদ্মপতি অনেকের মতে অভিন্ন।

উগ্রা—যোগিনী বিশেষ।

উগ্রায়ুধ—(১) ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভাতে উপস্থিত ছিলেন

(মহা ১।১৭৭।২)। (২) অজমীঢ় (দ্রঃ- কুরুবংশ) বংশে। ইনি পাঞ্চাল রাজ পৃষতের পিতামহ নীপকে নিহত করেন (হরিবংশ ১২০।৪৫)। শন্তনু মারা যাবার পর অশৌচ কালে উগ্রায়ুধের দূত এসে মৎস্যাগন্ধাকে নিয়ে যেতে চায় ; বিয়ে করবে। অশৌচান্তে ভীষ্ম উগ্রায়ুধকে নিহত করেন। এরপর পৃষত কাম্পিল্য আক্রমণ করে অহিচ্ছত্র অধিকার করেন। দ্রোণ (দ্রঃ) এর পর দ্রুপদকে কাম্পিল্য দান করেন (হরি ১।২০।৭৫)।

উচ্চাটন—তান্ত্রিক ষট্ কর্মের একটি। স্বস্থান থেকে উচ্ছেদ করার ক্রিয়া। দেবতা দুর্গা। কৃষ্ণাচতুর্দশী বা কৃষ্ণাষ্টমীতে শনিবারে শত্রুর কেশ গ্রথিত অশ্বদন্তের মালা জপ করতে হয়।

উচ্চৈঃশ্রবা—সমুদ্র মন্থনে প্রাপ্ত সাদা ঘোড়া। সপ্ত মুখ, অমৃত পান করত। ঘোড়াদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্র পেয়েছিলেন। দ্রঃ- রমা।

উচ্ছনগর—(১) বুলন্দসর। দ্রঃ- বরণ। (২) আলেকজান্দ্রিয়া।

উচ্ছিষ্টচণ্ডালিনী—মানস সরোবর তীরে শিব সন্ধ্যা করছিলেন। পার্বতী সখীদের সঙ্গে নিয়ে কিরাতিনী বেশে উপস্থিত হয়ে তপস্যা করবেন বলেন। শিব চিনতে পারেন এবং চণ্ডালী বেশে আসার জন্য উচ্ছিষ্ট চণ্ডালিনী নাম দেন। ধ্যানে এই দেবী শবাসনা।

উজানী—কোগ্রাম, মঙ্গলকোট (মঙ্গলকোষ্ঠ) ও আরাল মিলে (বৃহৎ ধর্ম পু)। কাটোয়া সাবডিভিসানে। একটি পীঠস্থান। কোগ্রাম লোচন দাসের জন্মস্থান।

উজ্জপালক—উত্তঙ্ক মুনির আশ্রমের কাছে একটি মরুভূমি। মধুকৈটভ সন্তান ধুন্ধু (দ্রঃ) এখানে বাস করত।

উজ্জয়—বিশ্বামিত্রের এক ছেলে।

উজ্জয়িনী—(১) উজানী (দ্রঃ)। (২) উরইন ; মুঙ্গের জেলাতে ; কিউলের কাছে। বহু বৌদ্ধ প্রত্নকীর্তি ছড়ান আছে। উড্ডিয়ান উরইন, উজ্জেইন। (৩) কুশস্থলী, পদ্মাবতী, মহাকালবন। (৪) মধ্য প্রদেশে ইন্দোর বিভাগের জেলা ও সহর। ২৩°৯′ উ×৭৫°৪৩′ পূ। অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তিকা ও দ্বারাবতী এই সাতটি মোক্ষদায়িকা পুরী। প্রাচীন অবন্তি (দ্রঃ) বা মালবের রাজধানী। স্কন্দ পুরাণ মতে ত্রিপুরাসুরকে মহাদেব নিধন করলে জয়ের স্মৃতি হিসাবে প্রাচীন নাম অবন্তি বদলে উজ্জয়িনী নাম রাখা হয়। পশ্চিম মালবের (দ্রঃ) রাজধানী। (দ্রঃ) মাহিষ্মতী। কালিদাসের মেঘদূতে এর নাম বিশালা। সোমদেবের কথা-সরিৎ-সাগরে এই নাম পদ্মাবতী, ভোগবতী, বা হিরণ্যবতী। শিপ্রাতটে সুরম্য নগরী। বুদ্ধদেবের সমসাময়িক রাজা চণ্ডপ্রদ্যোতের রাজধানী। মৌর্য ও গুপ্তদের সময়ে রাজপ্রতিনিধিদের শাসন কেন্দ্র। রাজকুমার অশোক (খৃ-পূ ২৬৩) কিছু দিন এখানে রাজপ্রতিনিধি হয়েছিলেন। এখানে তাঁর ছেলে মহিন্দ জন্মায়। ব্যবসা বাণিজ্যের একটি কেন্দ্র ছিল। খৃ ১·ম শতকে এখান থেকে বারিগাজায় (=ব্রোচ নগর) এবং ভারতের অন্যান্য স্থানে পণ্যদ্রব্য রপ্তানি হত। তিনটি বিশিষ্ট বাণিজ্য পথের সঙ্গম এই উজ্জয়িনী। বিভিন্ন সাহিত্যে ও লেখগত প্রমাণে পাওয়া যায় জ্ঞান, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও সাহিত্যচর্চার একটি প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। এখানে জ্যোতির্বিদ্যার বিশেষ চর্চা ছিল এবং এখান থেকে দ্রাঘিমান্তর

হিসাব হত। এখানে গর্দাভিল বংশ রাজত্ব করত। গর্দাভিল রাজাকে উৎখাত করে শকেরা এখানে রাজা হন। কিন্তু গর্দাভিলের ছেলে বিক্রমাদিত্য শকদের তাড়িয়ে রাজ্য উদ্ধার করে সম্বৎ চালু করেন। এই বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধে বহু মতান্তর। বহু মতে ইনি হচ্ছেন সমুদ্রগুপ্ত ও দত্তাদেবীর ছেলে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। ৩৭৫ খৃস্টাব্দে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত অযোধ্যায় রাজা হন। কারণ চন্দ্রগুপ্তের পিতা পাটলিপুত্র থেকে এখানে রাজধানী সরিয়ে এনেছিলেন। শক রাজা রুদ্রসিংহকে (সত্য সিংহের ছেলে) ৩৯৫ খৃস্টাব্দে পরাজিত করে চন্দ্রগুপ্ত উজ্জয়িনীতে রাজধানী নিয়ে আসেন। এই সময় উজ্জয়িনী ছিল শক রাজ্যের (সুরাষ্ট্র, মালব, কচ্ছ, সিন্ধ, কোঙ্কন) রাজধানী। আর এক মতে যশোধর্মা ছিলেন গুপ্তদের সেনাপতি এবং কাবুর-এ হূণ মিহিরপালকে পরাজিত করে ৫৩৩ খৃস্টাব্দে বিক্রমাদিত্য নাম গ্রহণ করেন। বিক্রমাদিত্যের সভাতে নবরত্ন ছিল। খৃ ৭-ম শতকে শঙ্করাচার্যের সময় উজ্জয়িনীতে সুধনু রাজা ছিলেন। সুধনু বৌদ্ধদের উৎপীড়ন ও দেশ থেকে বিতাড়ন করেন।

খৃস্টীয় ৬-শতকে গুণমতীর শিষ্য পরমার্থ, উজ্জয়িনীর অধিবাসী, চীন পরিদর্শন করেন; এবং সেখানে ৭০টি বৌদ্ধগ্রন্থ চীন ভাষায় অনুবাদ করেন। গুপ্তবংশের পর কলচুরি বংশ এখানে রাজা হয়। ৫৯৫ খৃস্টাব্দে কলচুরিরাজ শংকরগণ এখানে রাজা ছিলেন। এরপর প্রতিহার বংশ এখানে রাজত্ব করেন। ৮-শতকের প্রথম ভাগে নাগ-ভট্ট প্রতিহার উজ্জয়িনী পর্যন্ত এগিয়ে আসা আরবদের পরাজিত করে প-ভারতকে আরবদের কবল মুক্ত করেন। ১৪০১ খৃস্টাব্দের পর মালবের শাসন কর্তা দিলার খাঁ মালবে স্বাধীন সুলতানি রাজ্য স্থাপিত করেছিলেন; ধারা ও মাণ্ডু মালবের রাজধানী হয় এবং উজ্জয়িনীর গৌরব শেষ হয়ে যায়।

উজ্জয়িনীতে শিপ্রা নদীর তীরে মহাকাল শিবের মন্দির, কালীয়দহ, বা প্রাচীন ব্রহ্মকুণ্ড ও কালভৈরব মন্দির এখানকার স্থাপত্যের নিদর্শন। মহাকাল মন্দির ১২-শিবলিঙ্গের একটি। জৈনরা দাবি করেন মন্দিরটি অবন্তিসুকুমারের ছেলের দ্বারা নির্মিত। প্রাচীর ঘেরা মস্ত বড় একটি চত্বরের মধ্যে মন্দির। প্রকৃত দেবমূর্তি মাটির নীচে ঘরে; সুড়ঙ্গ পথে যেতে হয়। নীচে এই গর্ভগৃহের ঠিক ওপরে মহাদেবের বিগ্রহ রয়েছে, পরেশ নাথ। ওপরে চত্বরের সামনে একটি বারান্দা রয়েছে। এর থামগুলি অতি প্রাচীন। মন্দিরটি অবশ্য প্রাচীন নয়। এই চত্বরে কোটিতীর্থ নামে একটি কুণ্ড রয়েছে। কোটিতীর্থ এখানে বিশেষ একটি স্নানের ঘাট। হিন্দু লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের একটি তীর্থ-স্থান। একান্ন পীঠের একটি। শিবরাত্রি, বৈশাখী পূর্ণিমা ও কার্তিকী পূর্ণিমাতে এখানে বড় মেলা হয়। ভারতবর্ষের চারটি স্থানে কুম্ভ মেলা হয়; উজ্জয়িনী তার মধ্যে একটি। এই মহাকালের জন্য উজ্জয়িনীর অপর নাম মহাকাল বন। এখানে সিদ্ধনাথ ও মঙ্গলেশ্বর মন্দির রয়েছে। সহরের উত্তর দিকে কালীয়দহ বা প্রাচীন ব্রহ্মকুণ্ড (স্কন্দ) এবং ভৈরগড়ে কালভৈরব মন্দির রয়েছে। দশাশ্বমেধ ঘাট থেকে একটু দূরে অঙ্কপাদ নামক স্থানে সান্দীপনি আশ্রম ছিল। এখানে দামোদর কুণ্ডে কৃষ্ণ বলরাম তাঁদের শ্লট ধুতেন। পুরাতন সহরের দু-মাইল উত্তরে শিপ্রা তীরে ভর্তৃহরি গুহা অবস্থিত।

দ্রঃ- চরণাদ্রি। এখানে হরসুদ্ধি দেবীর মন্দিরে বিক্রমাদিত্য প্রতিদিন নিজের মাথা কেটে দেবীকে উপহার দিতেন ; দেবী রাজাকে আবার বাঁচিয়ে দিতেন। এখানে গোগসোহিদ একটি বিচ্ছিন্ন পর্বত ; সহরের দ-পূর্ব অংশে। এখান থেকে বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনটি ধরণগড়ের রাজা ভোজ মাটি খুঁড়ে উদ্ধার করেছিলেন। সহরের দ-পূর্বে জয়পুর রাজ জয়সিংহের মান মন্দির রয়েছে। দ্রঃ- নালন্দা।

বৌদ্ধ ও জৈনদের পবিত্র তীর্থস্থান। বৌদ্ধ প্রচারক মহাকচ্চায়ন বা মহা-কাত্যায়ন এবং লুইপাদ এখানে জন্মেছিলেন। এখানে প্রাপ্ত একটি মুদ্রাতে 'ক্রস ও বল' চিহ্ন এবং উজেনিয়া শব্দটি খোদিত দেখা যায়। এই চিহ্নটির নাম উজ্জয়িনী চিহ্ন। খননের ফলে প্রতিরক্ষা প্রাচীর বেষ্টিত নগরের স্তরবিন্যাস পাওয়া গেছে। আনুমানিক ৬৫০ খৃঃ পূর্বে নগর পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীর নির্মিত হয়েছিল। ঐ সময়ে লৌহ ও কালো লাল মৃৎ-পাত্র এবং কিছু পরে উত্তর ভারতীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্রের ব্যবহার ছিল।

উজ্জানক—একটি তীর্থ। এখানে যবক্রী ও সস্ত্রীক বশিষ্ঠ শান্তিলাভ করেন (মহা ৩।১৩০।১৪)। ধুন্ধুর (দ্রঃ) বাসস্থান।

উঞ্ছবৃত্তি—(১) উপেক্ষিত শস্য খুঁটে জীবন ধারণ। ব্রাহ্মণদের সর্বোৎকৃষ্ট বৃত্তি। ঋত (=উঞ্ছবৃত্তি), অমৃত (দ্রঃ), ও মৃত এই তিনটি বৃত্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৃত্তি। (২) এক জন ব্রাহ্মণ। কর্মহেতু নাম উঞ্ছবৃত্তি বা কাপোতি। ভিক্ষা করে জীবন ধারণ করতেন। একদিন কিছু খুদ বা ছাতু (যবপ্রস্থম্ উপার্জয়ৎ) পান। প্রথমে অগ্নিকে এই খুদের অংশ অর্পণ করেন তারপর ছেলে, ছেলের বউ ও নিজের স্ত্রীকে ভাগ করে দিয়ে অবশিষ্ট অংশ নিয়ে নিজে খেতে বসেন। এমন সময় ধর্ম এক অতিথি ব্রাহ্মণ হয়ে উপস্থিত হন। অতিথিকে নিজের ভাগ দিয়ে দিলেও অতিথি সন্তুষ্ট হন না। ফলে ক্রমশ বাকি তিন জনেও তাদের ভাগ দিয়ে দেন। ধর্ম তখন সন্তুষ্ট হয়ে এদের সকলকে স্বর্গে নিয়ে যান। মাটিতে যেখানে সামান্য কয়েকটি খুদের কণা পড়েছিল সেখানে এক বেঁজি এসে গা ঘসলে যে যে অংশে এই খুদ লাগে সেই সেই অংশ সোনা হয়ে যায়—কাঞ্চনীকৃতঃ (মহা ১৪।৯৩।৮৯)। দ্রঃ- নকুল, স্বর্ণ।

উড়িপ—<উড়ুপ। দ-কানাড়া। কারওয়ার জেলাতে। স্থানটি পাপনাশিনী নদীর তীরে। এখানে মাধবাচার্যের প্রতিষ্ঠিত একটি মঠ আছে। এখানে কৃষ্ণের বিগ্রহ, উড়ুপকৃষ্ণ। তুলুভা তীরে ডুবে যাওয়া একটি নৌকা থেকে তুলে এনে মাধবাচার্য্য এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। উপকূল থেকে ৩ মাইল।

উড্ডীয়ান—একটি দেশ। বহু বৌদ্ধ বজ্রযান গ্রন্থে এর নাম আছে। তিব্বতী হিসাব অনুসারে এই দেশে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রথম প্রচার হয়েছিল এবং তারপর কামাখ্যা, পূর্ণগিরি ইত্যাদি পীঠস্থানে ও ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। এখানকার রাজা ইন্দ্রভূতির ছেলে প্রসিদ্ধ পদ্মসম্ভব। তারানাথের মতে উড্ডীয়ান দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল এবং ৫০০,০০০ নগর যুক্ত। অনেকের মতে আফগানে সোয়াট উপত্যকায় অন্য মতে

কাশগড়ে অবস্থিত ছিল। আর এক মতে উড়িষ্যা বা বাঙলার কোন অঞ্চলে একটি মতে ঢাকা জেলাতে বিক্রমপুর পরগণাতে বজ্রযোগিনী গ্রাম।

উতথ্য—এক জন ঋষি। পিতা অঙ্গিরা, মা শ্রদ্ধা। স্ত্রী মমতা (দ্রঃ) ও সোমের মেয়ে ভদ্রা। মমতার ছেলে দীর্ঘতমা (দ্রঃ)। উতথ্যের আর এক ছেলে গৌতম। ছোট ভাই দেবগুরু বৃহস্পতি। স্ত্রী ভদ্রার ওপর বরুণ দেবের লোভ ছিল এবং সুযোগ মত ভদ্রাকে সমুদ্রে ভাসিয়ে নিয়ে যান। নারদ, ঘটনাটা জানিয়ে দিলে উতথ্য নারদকে দিয়েই অনুরোধ করে পাঠান। কিন্তু কোন কাজ হয় না। উতথ্য তখন সমুদ্রের সমস্ত জল শোষণ করে ফেলেন (মহা ১৩।১১৯।২২)। বরুণ ভীত হয়ে ভদ্রাকে ফিরিয়ে দেন। মান্ধাতাকে উতথ্য রাজধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছিলেন।

উৎকল—(১) বৈবস্বত মনুর এক ছেলে। (২) প্রাচীন উড়িষ্যা। উড়িষ্যা, উড্র, শ্রীক্ষেত্র, ওড্র (দ্রঃ)। উৎ-কলিঙ্গ অর্থাৎ উত্তর কলিঙ্গ। কটকের বিপরীত দিকে নদীর পরপারে চৌদুয়ার ছিল মগধ রাজাদের প্রাচীন রাজধানী। কেশরী রাজাদের রাজধানী ছিল ভুবনেশ্বর ও যাজপুর। গঙ্গাবংশীদের রাজধানী ছিল কটক, চৌদুয়ার ও বরাবাটি। খৃ ৫-শতকে উড়িষ্যা বৌদ্ধধর্ম ত্যাগ করে কেশরী রাজাদের সময় শৈব হয় এবং গঙ্গাবংশীয়দের সময় খৃ ১২-শতকে বৈষ্ণব হয়। দ্রঃ- ওড্র। মহাভারতে উৎকল কলিঙ্গের অংশ; বৈতরণী তখন এর উত্তর সীমানা। কালিদাসের সময় একটি স্বাধীন রাজ্য। ব্রহ্মপুরাণে উৎকল ও কলিঙ্গ দুটি আলাদা রাজ্য। উড়িষ্যাতে চারটি বিখ্যাত তীর্থ :—চক্রক্ষেত্র = ভুবনেশ্বর, শঙ্খক্ষেত্র = পুরী, পদ্মক্ষেত্র = কোণারক, এবং গদাক্ষেত্র = যাজপুর। গয়াসুরকে নিহত করে বিষ্ণু গয়াতে তাঁর পদচিহ্ন এবং চক্র, শঙ্খ, পদ্ম ও গদা উল্লিখিত স্থানগুলিতে রেখে যান। শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত গোবর্দ্ধন মঠ এই উড়িষ্যাতে। দ্রঃ- শৃঙ্গগিরি। কলিঙ্গ মধ্যকলিঙ্গ ও উৎকলিঙ্গ এই তিনটি কলিঙ্গের মধ্যে উৎকলিঙ্গ থেকে অপভ্রংশ উৎকল (অশোক অনুশাসন ১০৭)। (৩) ধ্রুবের বড় ছেলে। (৪) পঞ্চ গৌড় ব্রাহ্মণের এক জন।

উৎকোচ—চিত্রকূটে রামচন্দ্র ভরতকে জানতে চান বর্তমানে চোর অর্থ দিয়ে মুক্তি লাভ (রা ২।১০০।৫৭) করছে কিনা। অর্থাৎ রাজাকে স্বয়ং এ বিষয়ে কড়া নজর রাখতে হত। শকুন্তলার হারিয়ে যাওয়া আংটি নিয়ে রাজদ্বারে এসেও জেলেকে ঘুস দিতে হয়েছিল। দ্রঃ- ব্রহ্মদণ্ড। উৎকোচ দেবার এগুলি প্রাচীন ইতিহাস।

উত্তঙ্ক—উতঙ্গ, উতঙ্ক। বিখ্যাত মুনি। আয়োদ্-ধৌম্যের বেদ (দ্রঃ) নামে শিষ্যের শিষ্য এই উত্তঙ্ক। অত্যন্ত গুরুভক্ত। যজন কাজের জন্য অন্যত্র যাবার সময় আশ্রমের ভার উত্তঙ্ককে দিয়ে যান (মহা ১।৩।৮)। এই সময়ে আশ্রম নারীরা একদিন উত্তঙ্ককে গুরুপত্নীর ঋতুরক্ষা করতে বলেন। অন্য মতে গুরুপত্নী নিজেই এসেছিলেন। উত্তঙ্ক বিমূঢ় হয়ে প্রত্যাখ্যান করেন। গুরু ফিরে এসে সব শুনে আশীর্বাদ করে গৃহে ফিরে গিয়ে গৃহী হতে আদেশ দেন। উত্তঙ্ক গুরু দক্ষিণা দিতে চান ; গুরু পরে হবে বলে নিরস্ত করেন ; কিন্তু পরে আবার পীড়াপীড়িতে স্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দেন। উত্তঙ্ককে বিব্রত করার জন্য রাজা পৌষ্যের/সৌদাসের/কল্মাষপাদের ক্ষত্রিয়া স্ত্রীর কুণ্ডল দুটি

গুরুপত্নী দক্ষিণা হিসাবে এনে দিতে বলেন। চার দিন পরে পুণ্যক ব্রতে (মহা ১।৩।১০০) ঐ কুণ্ডল ধারণ করে তিনি ব্রাহ্মণদের পরিবেশন করে খাওয়াতে চান।

উত্তঙ্ক বার হয়ে পড়েন। পথে প্রকাণ্ড বৃষভারূঢ় এক জন মহাকায় ব্যক্তি উত্তঙ্ককে সেই বৃষের পুরীষ ভক্ষণ করতে বলেন। উত্তঙ্ক দ্বিধা করেন; লোকটি কিন্তু আবার খেতে বলেন এবং জানান উত্তঙ্কের গুরুদেবও এই পুরীষ খেয়েছেন। উত্তঙ্ক তখন সেই পুরীষ ও মূত্র ভক্ষণ করে তাড়াতাড়ি আচমন সেরে পৌষ্যের কাছে আসেন। রাজা রাণীর কাছে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু রাণীকে খুঁজে না পেয়ে উত্তঙ্ক ফিরে এলে পৌষ্য বলেন উত্তঙ্ক সম্ভবত অশুচি আছেন। হয়তো ঠিক মত আচমন করেন নি। সেই জন্য পতিব্রতাকে দেখতে পান নি। উত্তঙ্কের খেয়াল হয় তাড়াতাড়ি আসবার সময় পথে দাঁড়িয়েই আচমন করেছিলেন। পূর্বাস্য হয়ে এবার বিধিমত আচমন করে অন্তঃপুরে রাণীকে দেখতে পেয়ে তাঁকে প্রার্থনা জানান। পাত্র অনতিক্রমণীয় মনে করে রাণী কুণ্ডল দুটি দিয়ে সাবধান করে দেন নাগরাজ তক্ষকও এই কুণ্ডল প্রার্থী। উত্তঙ্ক যেন সাবধান থাকে। রাজা পৌষ্য অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু অন্ন শীতল ছিল ও অন্নে কেশ ছিল বলে উত্তঙ্ক রাজাকে অন্ধ হবার শাপ দেন। বিনা কারণে এই ভাবে অভিশপ্ত হয়ে রাজা উত্তঙ্ককে নিঃসন্তান হবার শাপ দেন। পরে রাজা অন্ন পরীক্ষা করে বলেন নিশ্চই খোলা চুলে কোন নারী এই অন্ন এনেছিল; এই জন্য কেশ এসে পড়েছে এবং এ জন্য রাজা ক্ষমা চান। উত্তঙ্ক তখন বর দেন রাজা অচিরে আবার দৃষ্টি ফিরে পাবেন; এবং বলেন যেহেতু অন্নের দোষ ছিল সেই হেতু রাজার শাপ নিষ্ফল হবে। কিন্তু পৌষ্য বলেন তাঁর রাগ যায় নি; শাপ তিনি তুলে নিতে পারবেন না; ক্ষত্রিয়দের হৃদয় অত্যন্ত কঠিন।

কুণ্ডল নিয়ে ফেরার পথে এক নগ্ন শ্রমণ পেছু নেয় এবং মাটিতে এক জায়গায় কুণ্ডল দুটি রেখে স্নান করতে নামলে ঐ নগ্ন ক্ষপণক এই কুণ্ডল দুটি নিয়ে ছুট দেয়। উত্তঙ্ক ছুটে গিয়ে ধরে ফেললে ক্ষপণক সহসা এক তক্ষকের রূপ ধরে এক বিবৃত গর্তের মধ্যে চলে যায়; নিজের ভবনে এসে উপস্থিত হয়। উত্তঙ্ক তখন হাতের লাঠি দিয়ে গর্ত খুঁড়তে থাকেন। এদিকে ইন্দ্রের আদেশে বজ্র এসে এই লাঠির প্রান্তে অধিষ্ঠিত হয়। ফলে নাগলোক পর্যন্ত পথ কাটা হয়ে যায়। নাগলোকে গিয়ে উত্তঙ্ক নাগেদের ও তক্ষকদের স্তব করতে থাকেন কিন্তু তবুও তক্ষকের দেখা পান না। সেখানে দেখেন দুটি মহিলা সাদা ও কালো সুতো দিয়ে তাঁত বুনছে এবং ছয়টি বালক/ কুমার বারটি অর যুক্ত একটি চাকা ঘোরাচ্ছে। এ ছাড়া একটি সুদর্শন পুরুষ ও একটি ঘোড়া রয়েছে। উত্তঙ্ক এঁদেরও স্তব করলে পুরুষটি, ইনি ইন্দ্র, বর চাইতে বলেন। উত্তঙ্ক নাগেদের বশ করতে পারার বর চান। পুরুষটি তখন ঘোড়াটির গুহ্যদেশে উত্তঙ্ককে ফুঁ দিতে বলেন। ফুঁ দেবার সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বার পথে সধূম অগ্নিশিখা বার হয়ে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। নাগলোকে প্রায় নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। তক্ষক তখন কুণ্ডল ফেরৎ দেন। নির্দিষ্ট সময়ে অর্থাৎ ঐ দিনই গুরুপত্নীকে কুণ্ডল দেবার কথা। উত্তঙ্ক বিমূঢ় হয়ে পড়লে পুরুষটির উপদেশে ঐ ঘোড়াটিতে

চড়ে ক্ষণাৎ এব (মহা ১৷৩৷১৬১) ফিরে আসেন। গুরুপত্নী উত্তঙ্কের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন; কেশ প্রসাধন করছিলেন এবং শাপ দেবার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন এমন সময় কুণ্ডল পেয়ে যান। উত্তঙ্ককে আশীর্বাদ করেন। সমস্ত কাহিনী শুনে গুরু বলেন মহিলা দুজন ধাতা ও বিধাতা; সাদা ও কালো সুতা হচ্ছে দিন ও রাত; ছয় কুমার হচ্ছে ছয়টি ঋতু এবং চাকাটি বৎসর, বারটি অর বারটি মাস ; পুরুষ পর্জন্য এবং ঘোড়াটি অগ্নি। পথে বৃষারূঢ় পুরুষটিও ঐরাবতের পিঠে ইন্দ্র ; পুরীষ অমৃত। এই অমৃতের জন্যই উত্তঙ্কের নাগলোকে কোন ক্ষতি হয় নি। ইন্দ্র তাঁর সখা বলে উত্তঙ্ককে এই ভাবে সাহায্য করেছেন। উত্তঙ্ক তারপর স্বগৃহে ফিরে এসে হস্তিনাপুরে গিয়ে তক্ষকের ওপর প্রতিশোধ নেবার আশায় তক্ষশিলা জয় করে ফিরে আসার পর জন্মেজয়কে সর্পযজ্ঞ করতে পরামর্শ দেন এবং সর্প যজ্ঞ আরম্ভ করেন (মহা ১৷৩৷-)।

বৃদ্ধ বয়সে উত্তঙ্ক মন্দির পরিভ্রমণ করে বেড়াচ্ছিলেন। সৌভীর দেশে গুলিক নামে এক ব্যাধকে দেখেন এক বিষ্ণু মন্দিরের চূড়া থেকে স্বর্ণফলক চুরি করতে চেষ্টা করছে। গুলিক উত্তঙ্ককে হত্যা করবার চেষ্টা করে কিন্তু উত্তঙ্কের উপদেশে নিরস্ত হয় এবং ভয়ে তৎক্ষণাৎ মারা যায়। উত্তঙ্ক মৃত দেহে গঙ্গা জল ছিটিয়ে দিলে ব্যাধ বৈকুণ্ঠে চলে যায়। বিষ্ণুর উপদেশে উত্তঙ্ক বদরিকাশ্রমে তপস্যা করে বৈকুণ্ঠে যান (নারদীয়-পু)।

আবার মহাভারতে (১৪৷৫৫) অহল্যার স্বামী গৌতমের ভৃগুবংশীয় শিষ্য। গৌতম একে সব চেয় ভাল বাসতেন এবং এ'কে আশ্রম ত্যাগ করতে দেন নি। এক দিন বন থেকে সমিধ নিয়ে ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসে কেঁদে ফেলেন; গুরুকন্যা চোখের জল মুছিয়ে দেন। গুরু তখন উত্তঙ্ককে প্রশ্ন করলে শিষ্য বলেন অন্য শিষ্যেরা অধ্যয়ন শেষ বাড়ি ফিরে গেছে ; আর তার চুল পেকে গেল বাড়ি ফিরতে পারল না। এই জন্য তার মনোকষ্ট। গৌতম তখন বাড়ি যাবার অনুমতি দেন ; বর দিয়ে ১৬ বছর বয়স করে দেন এবং নিজের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেন। উত্তঙ্ক তখন গুরু দক্ষিণা দিতে চান। গৌতম বা অহল্যা কিছুই চান না। কিন্তু উত্তঙ্কের পীড়াপীড়িতে অহল্যা শেষকালে নর মাংসভোজী রাজা সৌদাসের স্ত্রীর কুণ্ডল গুরুদক্ষিণা হিসাবে চান। উত্তঙ্ক তখনই বার হয়ে পড়েন। গৌতম জানতে পেরে শিষ্যকে সৌদাসের হাত থেকে বাঁচবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। বনের মধ্যে রাজা সৌদাসের সঙ্গে দেখা হলে রাজা উত্তঙ্ককে খেতে আসেন। উত্তঙ্ক মিনতি করে সব কথা বলেন এবং সময় চান গুরুদক্ষিণা দিয়ে ফিরে এলে সৌদাস যেন তাকে খায়। রাজা তখন স্ত্রী মদয়ন্তীর কাছে উত্তঙ্ককে পাঠিয়ে দেন। মদয়ন্তী অভিজ্ঞান চান সত্যই সৌদাস পাঠিয়েছেন কিনা। কারণ দেবতা (দেবাশ্চ, যক্ষাশ্চ, মহোরাগাশ্চ) ইত্যাদি অনেকের এই কুণ্ডলের প্রতি লোভ আছে ; এমন কি মাটিতে রাখলে সাপে নিয়ে পালাবে। উত্তঙ্ক তখন ফিরে গিয়ে অভিজ্ঞান আনলে রাণী কুণ্ডল দিয়ে দেন। ফেরবার সময় পুঁটলিতে বাঁধা কুণ্ডল গাছে ঝুলিয়ে রেখে বেল গাছে উঠে বেল খেতে থাকেন। এই সময় কুণ্ডল দৈবাৎ

মাটিতে পড়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি সাপ এটি নিয়ে কাছেই একটি বল্মীক ঢিপিতে লুকিয়ে পড়ে।

গাছ থেকে নেমে উতঙ্ক ৩৫-দিন (গী-প্রে) ধরে ঢিপি খুঁড়তে থাকেন; ইন্দ্র তখন বজ্র দেন; পাতাল পর্যন্ত পথ করে উতঙ্ক নেমে যান। পাতালে একটি কালো ঘোড়া, কেবল লেজ সাদা; দেখতে পান। ঘোড়া উতঙ্ককে তার গুহ্য দেশে ফুৎকার দিতে বলে, নাগলোক অগ্নি শিখাতে ভরে যায়; সাপেরা কুণ্ডল ফিরিয়ে দেয়।

হস্তিনাপুর থেকে অশ্বমেধ যজ্ঞের আগে কৃষ্ণ ফিরছিলেন, পথে উতঙ্ক আশ্রমে আসেন। কুরুপাণ্ডবদের একটা মিটমাট না করে দেবার জন্য উতঙ্ক এই সময়ে (মহা ১৪।৫২।২১) কৃষ্ণকে শাপ দিতে যান। কৃষ্ণ তখন বিশ্বরূপ দেখিয়ে উতঙ্ককে বুঝিয়ে শান্ত করেন এবং বর দেন যে কোন জায়গায় এমন কি মরুভূমিতেও কৃষ্ণকে স্মরণ করলেই উতঙ্ক সেখানে জল পাবেন।

একবার মরুভূমিতে ঘুরতে ঘুরতে তৃষ্ণার্ত উতঙ্ক কৃষ্ণকে স্মরণ করলে কাদা মাখা, নগ্ন দেহ এক চণ্ডাল অনেকগুলি কুকুর নিয়ে এসে জল (তস্যাধঃ স্রোতসঃ/প্রস্রাব) দিতে চান এবং এই জল খেতে বার বার অনুরোধ করেন। উতঙ্ক রাজি না হলে চণ্ডাল অন্তর্হিত হয়ে যান এবং শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী কৃষ্ণ দেখা দিয়ে উতঙ্ককে তিরস্কার করে জানান তিনি স্বয়ং ইন্দ্রকে অমৃত দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। ইন্দ্র নিজের খুসি মত চণ্ডাল বেশ ধরে এসেছিলেন। কৃষ্ণ বর দেন উতঙ্ক অমৃত প্রত্যাখ্যান করেছেন; কিন্তু এর পর মরুভূমিতে উতঙ্ক-মেঘ দেখা দেবে এবং মিষ্টি জল মিলবে। সেই থেকে উতঙ্ক-মেঘ বৃষ্টি দিয়ে আসছে। এই উতঙ্কই রম্য মরুধন্বেষু আশ্রমে থাকতেন; বিষ্ণুর দুষ্কর তপস্যা করতেন। বিষ্ণু দেখা দেন; বর চাইতে বলেন। উতঙ্ক দেখা পেয়ে নিজেকে কৃতার্থ মনে করেন এবং পীড়াপীড়িতে বর চান বিষ্ণুর প্রতি নিত্য ভক্তি থাকে যেন। বিষ্ণু বর দেন এবং জানিয়ে যান বৃহদশ্ব বলে এক রাজা হবে এবং বৃহদশ্বের ছেলে কুবলাশ্ব উতঙ্কের শাসনাৎ ধুন্ধুমার হবে (মহা ৩।১৯২।৮)।

উতঙ্ক যথা সময়ে বৃহদশ্বকে এসে সব জানান; আশ্রমে উতঙ্ক বাস করতে পারছেন না এবং বিষ্ণু বর দিয়ে গেছেন ধুন্ধুকে বধ করতে গেলে সেই সময় বৈষ্ণব তেজ এসে রাজাকে শক্তিশালী করে তুলবে। দ্রঃ ধুন্ধুমার; কুবলাশ্ব।

উত্তম—(১) স্বায়ম্ভুব মনুর দ্বিতীয় ছেলে উত্তানপাদ। উত্তানপাদ (দ্রঃ) রাজার স্ত্রী সুরুচি, ছেলে উত্তম; অন্য রাণী সুনীতি, ছেলে ধ্রুব। সুনীতি ও ধ্রুবকে (দ্রঃ) রাজা অনাদর করতেন। এই জন্য ধ্রুব বনে গিয়ে কঠোর তপস্যা করে ব্রহ্মপদ লাভ করেন। একদিন মৃগয়া কালে বনের মধ্যে এক যক্ষের হাতে উত্তম নিহত হন। পুত্রের খোঁজে দাবদাহে সুরুচিও মারা যান; ধ্রুব (দ্রঃ) তখন রাজা (ভাগ ৪।১০।৪)। (২) স্বায়ম্ভুব মনুর ছেলে রাজা প্রিয়ব্রত (দ্রঃ)। প্রিয়ব্রতের স্ত্রী বর্হিষ্মতী; ছেলে তৃতীয় মনু উত্তম। উত্তম মনুর ছেলে অজ পরশুদীপ্ত ইত্যাদি। এঁর রাজত্বকালে ইন্দ্র সুশান্তি; পাঁচ দল দেবতা: সুধামন, সত্য, জপ, প্রতর্দন ও শিব/বশবর্তী। প্রতি দলে ১২ জন দেবতা। বশিষ্ঠের স্ত্রী ঊর্জার সাত ছেলে সপ্তর্ষিঃ- রজস্, গোত্র, ঊর্দ্ধবাহু, সবন, অনঘ, সুতপ, শুক্র।

হরিবংশে (১।৭।১৯) এদের নাম ইষ, ঊর্জ, তনুজ, মধু, মাধব শুচি, শুক্র, সহ, নভস্য, নভ। আগে এরা হিরণ্য গর্ভের পুত্র ছিলেন ; নাম ছিল ঊর্জ। ভাগবতে (৮।১।২৪) সপ্তর্ষি প্রমদ ইত্যাদি ; দেবতা সত্য, বেদশ্রুত ও ভদ্র ইত্যাদি ; ইন্দ্র সত্যজিৎ। উত্তমের ছেলে পবন, সৃঞ্জয় ও যজ্ঞহোত্র। উত্তমের ভাই তামস চতুর্থ মনু। (৩) ২১-তম দ্বাপরে ব্যাসের নাম।

উত্তমসাহস—বেদত্রয় বেত্তা, রাজা ও দেবতাকে গালি দিলে উত্তম-সাহস অর্থাৎ সর্বোচ্চ দণ্ডের (১৮০,০০০ পণ মুদ্রা) বিধান ছিল।

উত্তমৌজা—(১) মনুর ছেলে ; দশম মন্বন্তরাধিপ। (২) পাঞ্চাল রাজ দ্রুপদের একটি ছেলে ; কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষে রাত্রি বেলা অশ্বত্থামার হাতে নিহত হন (মহা ১০।৮।৩৩)।

উত্তর—ভূমিঞ্জয়। মৎস্যরাজ বিরাটের ছেলে। মা সুদেষ্ণা। বড় ভাই শঙ্খ ; বোন উত্তরা। দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে পিতার সঙ্গে ছিল। পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের শেষ মুহূর্তে বিরাট রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলে সুশর্মাকে গোধন হরণের জন্য দুর্যোধন পাঠান। মৎস্যরাজ সৈন্যবাহিনী নিয়ে সুশর্মাকে বাধা দিতে যান। পর দিন কৃষ্ণাষ্টমীতে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, দুর্যোধন উত্তরাঞ্চল আক্রমণ করেন। গরু চুরি করতে থাকেন। একা উত্তর রাজধানীতে ছিল ; অন্তঃপুরে আস্ফালন করছিল উপযুক্ত সারথি পেলে কৌরব বাহিনীকে পরাজিত করতে পারবে ইত্যাদি। দ্রৌপদী তখন বাধ্য করেন অর্জুনকে (দ্রঃ) সারথি করে যুদ্ধে যেতে। ভীষ্মদের বিরুদ্ধে অর্জুনকে সারথি নিয়ে উত্তর যুদ্ধে যান। কিন্তু শত্রু সৈন্যবাহিনী দেখে ভয়ে পালাতে চেষ্টা করেন। অর্জুন তখন আত্মপরিচয় দিয়ে উত্তরকে সারথি করে যুদ্ধ করে কৌরববাহিনীকে পরাস্ত করেন। যুদ্ধ জয়ের পর ফিরে এসে সে অকপটে জানায় যুদ্ধ সে নিজে করেনি এবং যুধিষ্ঠিরের (দ্রঃ) নাক থেকে রক্ত পড়ছে দেখে ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়ে, পিতা বিরাট-রাজকে কঙ্কের কাছে ক্ষমা চাইতে বলে এবং জানিয়েছিল প্রকৃত যে যুদ্ধ করেছিল তাকে কাল বা পরশু দেখতে পাবেন (মহা ৪।৪৪।৩২)। দ্রঃ- উত্তরা। কুরুক্ষেত্রে শল্যের হাতে নিহত হন (মহা ৬।৪৫।৪৩)।

উত্তরকুরু—হিমালয়ের উত্তরে প্রাচীন দেশ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৮।২৩) বলা হয়েছে দেবভূমি এবং মানুষের অজেয় ; অর্থাৎ বাস্তব একটি দেশ। পরবর্তী কালে অর্থাৎ রামায়ণ মহাভারত যুগে কাল্পনিক দেশে পরিণত হয়েছিল। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে দেশটি ভারতের বহু উত্তরে এবং এর উত্তর সীমায় সমুদ্র। জাতক অনুসারে হিমালয়ে অবস্থিত। অন্য মতে কাশগড়ের পূর্বস্থিত দেশ। আর এক মতে পামির মালভূমির বেলুর তঘ নামক পর্বতশ্রেণী যে ঢালু অঞ্চলে বড় বড় নদীগুলি উৎপন্ন হয়েছে সেই অঞ্চল। এই বেলুর তঘ পশ্চিম তিব্বতের উত্তর সীমা। একটি মতে উত্তরকুরু বংশীয়েরা কাশ্মীরে বসতি স্থাপন করেন এবং পরে কুরুক্ষেত্রে বসবাস করতে যান। দ্রঃ- ইরান।

গাড়োয়ালের উপর অংশ ও হূণ দেশ। অন্য মতে হিমালয়ের পারে। ওত্তরকোরা

(টলেমি)। আর এক মতে তিব্বত ও পূর্ব তাকিস্তান উত্তর কুরুর অংশ ছিল। এই উত্তরকুরু পশ্চিম তিব্বতের সীমানা ও তুষারাবৃত। উত্তরকুরুকে মুস্তঘ, কারাকোরাম, কিউনলুন, হিন্দুকুশ, শুড-লুণ্ড ও হরিবর্ষও বলা হয়েছে। এক জায়গায় কোরিয়াকে উত্তর-কুরুদ্বীপ বলা হয়েছে। দ্রঃ- উত্তর হরিবর্ষ।

জম্বুদ্বীপের একটি অংশ। অন্য নাম কুরুবর্ষ। সুমেরুর উত্তরে ও নীল পর্বতের দক্ষিণে এই উত্তরকুরু অবস্থিত ; আর্যদের আদি বাসভূমি। সিদ্ধগণ সেবিত। এখানে গাছে ফল ও সুগন্ধ ফুল এবং ক্ষীরী গাছে দুধ বস্ত্র ও আভরণ পাওয়া যায়। এখানে কল্পবৃক্ষও রয়েছে। মাটিতে সোনা ও মণিমুক্তা ছড়ান। স্বর্গ থেকে পতিত হলে মানুষ এখানে বাস করে। এখানে ভারুণ্ড পাখী রয়েছে, এরা মৃত দেহ পেলে গুহার মধ্যে সরিয়ে নিয়ে যায়। অন্য মতে মেরুর দক্ষিণে শৃঙ্গীপর্বতের অপর পাশে দেবগণের বাসস্থান। মন্দাকিনী নদী ও চৈত্ররথ বন এখানে রয়েছে। সপ্তর্ষিরা থাকেন। অর্জুন এখানে এসে প্রচুর ধনরত্ন সংগ্রহ করেছিলেন। ভাগবতে (৫।১৮।৩৪) এখানে ভগবান যজ্ঞপুরুষ বরাহরূপে অবস্থান করেন।

উত্তরকোশল—অযোধ্যার অন্তর্গত সরযূ নদীর উত্তরস্থ দেশ। এখানকার প্রাচীন রাজধানী শ্রাবস্তী, ইরাবতী নদীর তীরে। শ্রাবস্তীর দক্ষিণে বর্তমান বলরামপুর।

উত্তরগঙ্গা—সিন্ধু (দ্রঃ)।

উত্তরগা—রামগঙ্গা (দ্রঃ)।

উত্তরপাঞ্চাল—রাজা পৃষত মারা গেলে দ্রুপদ (মহা ১।১২১।১০) এখানে রাজা হন। পরে দেশটি দ্রোণের অধিকারে আসে।

উত্তর ফল্গুনী—বিটা লিয়োনিস্। অশ্বিনী আদির অন্তর্গত ১২শ নক্ষত্র। দুটি তারকা বিশিষ্ট ; এর দেবতা অর্যমা। দ্রঃ- ফল্গুনী।

উত্তরবিদেহ—নেপালে দক্ষিণ অংশ। এখানে গন্ধবতী সহর অবস্থিত।

উত্তর ভাদ্রপাদ—গামা পেগাসি। অশ্বিনী ইত্যাদি ২৭ নক্ষত্রের মধ্যে ২৬শ নক্ষত্র। ৮টি তারকা যুক্ত ; পর্যঙ্ক সদৃশ।

উত্তরমানস—(১) মানস তীর্থ। (২) কাশ্মীরে হরমুখ শিখরের পাদদেশে নন্দিক্ষেত্রের কাছে গঙ্গাহ্রদ। (৩) গয়াতে একটি তীর্থ।

উত্তরমীমাংসা—বেদান্ত। পঞ্চাঙ্গ ন্যায়ের বিচার। ভিন্ন ভিন্ন উপনিষদে ব্রহ্মনির্ণয় মূলক যে সব তত্ত্ব আছে তাদের সমন্বয় করা।

উত্তর রাঢ়—সুহ্মোত্তর। অজয়ের উত্তরে। মুর্শিদাবাদের কিছুটা মিলে।

উত্তরসাধক—তন্ত্রোক্ত শব সাধনায় সাধকদের পেছনে থেকে যে সাহায্য করে ও সাহস দেয়।

উত্তর হরিবর্ষ—রাজসূয় যজ্ঞের কর আদায় করতে অর্জুন এখানে এসেছিলেন (মহা ২।২৫।৭)। এই দেশে দ্বারপালরা জানায় স্থানটিতে মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ ; এখানে জয় করবার কিছু নাই। এখানকার অপর নাম উত্তরকুরু (মহা ২।২৫।১১)। মানুষ এখানে এলে কিছু দেখতেও পায় না। অর্জুন কর চান শুনে দিব্যবস্ত্র, আভরণ ও মোকাজিনাদি কর হিসাবে দান করেন।

উত্তরা—বিরাটের স্ত্রী সুদেষ্ণার মেয়ে। অজ্ঞাত বাস কালে অর্জুন বৃহন্নলা নামে ক্লীব (দ্রঃ) সেজে উত্তরাকে নাচ-গান শেখাতেন। অর্জুনকে সারথি করে উত্তর (দ্রঃ) যখন যুদ্ধে যান তখন, উত্তরা পুতুল খেলবে বলে, পরাজিত কুরুবীরদের গা থেকে দামী বস্ত্রাদি সংগ্রহ করে আনেন। পুতুল খেলবে বললেও উত্তরার বাকভঙ্গি থেকে—প্রণয়াৎ উচ্যমানা ত্বং পরিতক্ষামি জীবিতম্ (মহা ৪।৩৫।৭)—উত্তরার বয়স নির্ভর করা সম্ভব নয়। অর্জুনের পরিচয় পেয়ে বিরাট রাজা অর্জুনের সঙ্গে এর বিয়ে দিতে চান। কন্যা স্থানীয় শিষ্যাকে বিয়ে করতে অসম্মত হওয়াতে অভিমন্যুর সঙ্গে উত্তর বিয়ের প্রস্তাব করেন এবং বিয়ে হয়। অজ্ঞাত বাসের পর উপপ্লব্য নগরে উত্তরার বিয়ে হবার সময় এক জন ব্রাহ্মণ এসে বলেছিলেন উত্তরার সন্তান পরিক্ষীণ কুরুবংশে জন্মাবে (মহা ১০।১৬।৩) ফলে নাম হবে পরিক্ষিৎ (দ্রঃ)। এই বিয়েতে সকলে সুরা মৈরেয় পান করেন। অভিমন্যুর মৃত দেহ পেয়ে উত্তরা (মহা ১১।২০।২৬) বিলাপ করেছে ষণ্মাসাৎ সপ্তমে মাসি ত্বং বীর নিধনং গতঃ। কৃষ্ণ তখন গর্ভবতী উত্তরাকে সান্ত্বনা দেন। অশ্বত্থামা (দ্রঃ) উত্তরার এই গর্ভস্থ সন্তানকে নিহত করেছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র যখন বনে যান তখন উত্তরা সঙ্গে কিছুটা এগিয়ে দিয়ে এসেছিলেন। ভাগবতে (১।৮।১১-১৬) যুদ্ধের শেষে কৃষ্ণ ইত্যাদি ফিরে যাচ্ছিলেন, উত্তরা তখন ছুটতে ছুটতে আসেন ; অশ্বত্থামার ৫-টি জ্বলন্ত বাণ (ব্রহ্মশির) আসছে। কৃষ্ণ উত্তরার গর্ভে প্রবেশ করে অস্ত্র প্রতিহত করেন। (২) দ্রঃ- অগস্ত্য।

উত্তরাখণ্ড—উত্তরভারতে হিমালয় পর্বতমালার মধ্যে গাড়ওয়াল ইত্যাদি জায়গা।

উত্তরাপথ—কাশ্মীর ও কাবুল মিলে।

উত্তরায়ণ—মাঘ থেকে আষাঢ় ছয় মাস। দেবতাদের দিন ; অসুরদের রাত। সূর্য এই সময়ে বিষুব রেখার উত্তরে অবস্থিত।

উত্তরাষাঢ়া—টাউ সাজিটারি। চারটি তারা। কুলার মত। এদের দেবতা বিশ্ব। দ্রঃ- আষাঢ়।

উত্তরাসঙ্গ—সন্ন্যাসীদের পরিধেয় উত্তরীয়। মঠের ভেতরে ও বাইরে ব্যবহার্য। ত্রি-চীবরের একটি।

উত্তরাস্য—শাস্ত্রমতে দান গ্রহণ করার সময় উত্তর দিকে মুখ করে বসা।

উত্তানপাদ—স্বায়ম্ভুব মনু ও শতরূপার (দ্রঃ) ছেলে। স্ত্রী সুনীতি ও সুরুচি। সুনীতির ছেলে ধ্রুব, কীর্তিমান, আয়ুষ্কাল, ও বসু। প্রেয়সী সুরুচির ছেলে উত্তম (দ্রঃ)। সুরুচির অনুরক্ত রাজা সুনীতি ও ধ্রুবকে (দ্রঃ) বনে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেন। হরিবংশে (১২।৯) অভি উত্তানপাদকে প্রতিপালন করেন। স্ত্রী ধর্মের কন্যা সুনৃতা, ছেলে ধ্রুব, শিব, শান্ত, অয়স্পতি। ভাগবতে (৪।৮।৯) সুনীতির একটি মাত্র ছেলে ধ্রুব। নারদের কাছে বলেন ৫-বছরের ছেলে ও তার মাকে নির্বাসিত করেছেন এবং পরে অনুতাপে এই ধ্রুবকে সমস্ত রাজ্য দিয়ে বানপ্রস্থ গ্রহণ করেন। উত্তানপাদের বোন আকূতি (দ্রঃ)।

উত্থান একাদশী—যে তিথিতে বিষ্ণুর ঘুম ভাঙে। কার্তিক মাসে শুক্লা একাদশী।

উৎপত্তিক্রম—প্রত্যক্ষ রূপ ব্রহ্ম থেকে আত্মা>আকাশ>বায়ু>অগ্নি>জল>পৃথিবী ওষধি>অন্ন>পুরুষ ইত্যাদি ক্রমশ উৎপন্ন হয়েছে (তৈত্তিরীয়)।

উৎপবন—প্রাদেশ প্রমাণ দুটি কুশ দিয়ে নেড়ে দ্রব্যাদি শুদ্ধি করা।

উৎপলবংশ—৯-ম-শতকের মধ্যভাগে কর্কোট বংশের পতনের পর কাশ্মীরে অবন্তীবর্মা (৮৫৫-৮৩ খৃঃ) যে বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। মহাপদ্মহ্রদের বন্যা নিবারণ করে বহু জমি চাষের উপযোগী করে তোলেন। অবন্তীবর্মা বিদ্যোৎসাহী। ছেলে শংকর বর্মা রাজা হয়ে পাশে কয়েকটি রাজ্য জয় করেন কিন্তু পরে বিদ্রোহী প্রজাদের হাতে নিহত হন।

উৎপলাবতী—ত্রিস্রেভেলিতে ব্যপর,বৈপার নদী।

উৎপলারণ্য—উৎপলাবৎ কানন। বিঠুর। বাল্মীকি আশ্রম। কানপুর থেকে ১৪ মাইল উ-পশ্চিমে গঙ্গাতীরে। এখানে বাল্মীকি মন্দির রয়েছে। কানপুরে সতীঘাটে লক্ষ্মণ সীতাকে রেখে যান ; সীতা এইখানে বাল্মীকির কাছে এসে ওঠেন। বিঠুরে ব্রহ্মাবর্ত ঘাটের কাছে একটি মন্দিরে সবজেটে মত তীরের মস্ত বড় একটা ফলা দেখান হয়। এই বাণে লব রামচন্দ্রকে আহত করেছিলেন। আশ্রমের সামনে গঙ্গা থেকে এটি পাওয়া গেছে প্রবাদ। এখানে লবকুশের জন্ম। এটি প্রতিষ্ঠান পুর (দ্র) ; রাজা উত্তানপাদের রাজধানী। এখানে ব্রহ্মাবর্ত ঘাট নামে একটি তীর্থ রয়েছে। ব্রহ্মাবর্ত অর্থাৎ সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর মধ্যগত দেশের রাজা উত্তানপাদ ; ধ্রুবের পিতা। এখানে গঙ্গাতীরে ভাঙ্গা একটি দুর্গকে উত্তানপাদের দুর্গ বলা হয়।

উৎসদ—প্রতি মহানরকের চতুর্দ্বারে চারটি করে উৎসদ নামে ১৬টি নরক। অর্থাৎ বৌদ্ধ অষ্ট মহানরকের প্রত্যেকের ১৬টি করে উপনরক আছে।

উৎসব—মন্দিরে প্রাচীন কালে যে সমারোহ করা হত। মন্দিরে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করলে অবশ্য করণীয়। বিগ্রহ স্থাপন করার পর ১-রাত, বা ৩-দিন, ৭-দিন ধরে এই উৎসব করণীয়। উৎসবের সময় অঙ্কুরবীজ বপন, ও বাদ্য-নৃত্যগীত একান্ত প্রয়োজন।

উৎসবসঙ্কেত—হিমালয় বাসী জাতি। সপ্তগণে বিভক্ত। এদের বিবাহ প্রথা নাই। সঙ্কেত দিয়ে ডেকে নিয়ে গিয়ে নারীপুরুষ মিলিত হয়। দ্রঃ- পুষ্কর।

উদখণ্ড—উদকখণ্ড। ছিন্দ বা উণ্ড। সিন্ধুর দক্ষিণ তীরে ; পাঞ্জাবে পেশোয়ার জেলাতে। এটোক থেকে ১৫ মাইল দ-পূর্বে। গান্ধার রাজধানী।

উদণ্ডপুর—বিহার সহর ; পাটনা জেলাতে। দণ্ডপুর, ওদন্তপুরী বা উদ্দণ্ডপুর। এক সময়ে বাঙলার পালরাজাদের রাজধানী। এখানে একটি ধ্বংসাবশেষ গড়কে পাল-রাজাদের প্রাসাদ বলা হয়। পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল এখানে মস্তবড় একটি বৌদ্ধবিহার স্থাপন করেন ; পাটলিপুত্র এই সময়ে ধ্বংসে পরিণত হয়েছিল। গোপালের ছেলে ধর্মপাল বিক্রমশীলা বিহার স্থাপন করেন ; খৃ ৮ শতক। গঙ্গার দ-তীরে একটি পর্বতের ওপর এই বিহার। এই বিহার-সহরের উ-পশ্চিমে একটি বিচ্ছিন্ন পাহাড়ের চূড়াতেও একটি বিখ্যাত বিহার ছিল এবং এখানে অবলোকিতেশ্বরের চন্দন কাঠের বিগ্রহ ছিল ; হিউ-এন-ৎসাঙ দেখে গেছেন। দ্রঃ- নেপাল, উরুবিল্ব। বিহার থেকে

৭-মাইল দ-পূর্বে আর একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল : ধ্বংসাবশেষ আজও পড়ে আছে। ১৫৪১ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত বিহার সহর সমৃদ্ধ ছিল।

উদপান—গৌতমের তিন ছেলে একত, দ্বিত ও ত্রিত (দ্রঃ-অগ্নি)। ছেলেদের পিতৃ-ভক্তিতে গৌতম অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। একটি যজ্ঞ করে গৌতম স্বর্গে যান। এই যজ্ঞে রাজা ও পুরোহিত যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সকলেই ত্রিতকে সম্মান দিয়ে প্রণাম করলে দুই ভাইয়ের পছন্দ হয় না। তিন ভাই তারপর অনেকগুলি যজ্ঞ করে বহু গরু সংগ্রহ করে পূর্ব দিকে যাত্রা করেন; ত্রিত আগে আগে যাচ্ছিলেন; পেছনে একত ও দ্বিত পরামর্শ করে গরু নিয়ে অন্য দিকে চলে যান। ত্রিত একা এগিয়ে যেতে যেতে সরস্বতী তীরে একটি নেকড়ে বাঘ দেখে ভয়ে এক জলহীন কূপের মধ্যে পড়ে যান। কূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সোমরস যোগে বেদ পাঠ করে যজ্ঞ করেন। স্বর্গে বৃহস্পতি এবং দেবতারা বেদপাঠ শুনে ত্রিতকে বর দিতে আসেন। ত্রিত কূপ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য বর চান। সঙ্গে সঙ্গে সরস্বতীর জলে কূপ ভরে যায়, ত্রিত ওপরে উঠে আসেন। এরপর বাড়ি ফিরে এসে দুই ভাইকে শাপ দিয়ে বৃকতে এবং এঁদের সন্তানদের বাঁদর ইত্যাদিতে পরিণত করেন। স্থানটি সেই সময় থেকে উদপান তীর্থ নামে পরিচিত (মহা ৯।৩৫)।

উদয়গিরি—(১) যেখান থেকে সূর্য প্রতিদিন আকাশে ওঠে। (২) একটি তীর্থ স্থান। ২০°৩৮′ উ×৮৬°১৬′ পূ। ছোট পাহাড়। কটক জেলায়। কটক থেকে ৫১·৫ কি-মি। অর্দ্ধ চন্দ্রের মত পূব দিকে বাঁকান; উত্তল দিক পশ্চিমে। উচ্চতা ৭৭ মি। কাছেই বিরূপা নদী।

এখানে বুদ্ধ, জটামুকুট, লোকেশ্বর, জম্ভল প্রভৃতি বৌদ্ধমূর্তি ও একশিলা উদ্দেশিক-স্তূপ রয়েছে। আনুমানিক দশম-একাদশ শতকে রাণক ব্রজনাগ যে শৈলখাত সোপান যুক্ত বাপী তৈরি করে দিয়েছিলেন সেটি এখনও প্রায় অক্ষত আছে। এখানে একটি পূর্ণ অবয়ব চতুঃশালা সংঘারাম ছিল। এই সংঘারামের একটি প্রকোষ্ঠের পেছনের দেওয়ালের সংলগ্ন ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় আসীন বুদ্ধদেবের সুন্দর একটি প্রতিমা আছে। এই সংঘারামের প্রবেশিকা সংলগ্ন দেওয়ালের শোভাবর্দ্ধনকারী অনবদ্য গঙ্গামূর্তি (সপ্তম-অষ্টম শতক) বর্তমানে পাটনায় সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত রয়েছে। এই মূর্তিটির দোসর যমুনা মূর্তিটি এখানেই একটি অর্বাচীন মন্দিরে ব্রাহ্মণ্য দেবীরূপে পূজিত হন। ইষ্টক নির্মিত একটি আংশিক প্রকট স্তূপের দুদিকে দুটি বুদ্ধ বিগ্রহ উদয়গিরির ভাস্কর্যের নিদর্শন। চার দিকে আরো বহু মূর্তি ছড়ান আছে। লোকেশ্বরের একটি বৃহৎ বিগ্রহের পিঠে সুদীর্ঘ ধারণী উৎকীর্ণ রয়েছে। অর্থাৎ নবম-দশম শতকে এই প্রতিষ্ঠানটি বজ্রযান সম্প্রদায়ের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। পাহাড়ের পশ্চিম গায়ে একটি প্রাকৃতিক গুহার পাশে কয়েকটি বৌদ্ধ দেবদেবীর সুন্দর মূর্তি খোদিত দেখা যায়। এখান থেকে ৫ কি-মি দক্ষিণে ললিতগিরি। একটি মতে উদয়গিরি অথবা ললিতগিরি হচ্ছে হিউ-এন-ৎসাঙ বর্ণিত উ-তু (ওড্র) দেশের বিখ্যাত বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান পুষ্পগিরি।

উদয়গিরি-খণ্ডগিরি—২০°১৬´উ×৮৫°৫৭´পূ। বালি পাথরের দুটি পাহাড়। খণ্ডগিরি ৩৮-মি উচ্চ; পূ- উত্তরে উদয়গিরি ৩৪-মি উচ্চ। উড়িষ্যাতে ভুবনেশ্বর থেকে ৫ মাইল পূর্বে। অসিয় (দ্রঃ) পর্বতের (প্রাচীন চতুষ্পীঠ) শাখা। এখানে বহু প্রত্নকীর্তি ছড়ান রয়েছে। সরু একটি খাদ (গর্জ) পার হলে খণ্ডগিরি পর্বত অবস্থিত। সব চেয় প্রাচীনগুহা উদয়গিরিতে (৫০০ খৃ-পূ—৫০০ খৃস্টাব্দ)। এখানে হয়তো হিউ-এন-ৎসাঙ দৃষ্ট পুষ্পগিরি সংঘারাম ছিল। এখানে হস্তী গুম্ফাতে শিলালেখে রাজা খারবেলের বিজয়যাত্রা ও জৈন ধর্মের সমর্থনের বিবরণ রয়েছে। খারবেল (খৃ-পূ ১ম শতক) তাঁর স্ত্রী এবং তাঁদের বংশে কূদেপ ও বড়ূখ এখানে নানা গুহা তৈরি করে দিয়েছিলেন। গণেশ গুম্ফাতে (খৃ অষ্টম-নবম শতকে) ভৌম রাজবংশের শান্তিকরদেবের সময়কার একটি লেখ আছে। এখানে দর্শনীয় খাত-গুহা উদয়গিরিতে ১৮টি; খণ্ডগিরিতে ১৫টি। রাণীগুম্ফা খৃস্টপূর্ব প্রথম শতকের এবং সব চেয় বড় ও সব চেয় সাজান। এটি দ্বিতল গুহা। রাণীগুম্ফা, মঞ্চপুরী, স্বর্গপুরী, গণেশ গুম্ফা এগুলি উদগত চিত্রে সজ্জিত এবং সমসাময়িক মধ্য-দেশের শৈলী প্রতিফলিত হয়েছে। শিল্পমান খৃস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের ভারতের শিল্পকৃতি থেকে উচ্চস্তরের এবং খৃস্টপূর্ব প্রথম শতকের সাঁচীর সঙ্গে তুলনীয়। এখানে উৎখননের সময় ক্ষুদ্রাশ্ম ও নবাশ্ম হাতিয়ার পাওয়া গেছে।

উদয়ন—(১) পুরু (কুরু বা ভরত) বংশের রাজা। বুদ্ধদেবের জীবিতকালে ষোড়শ মহাজনপদের অন্যতম বৎসরাজ্যের রাজা; রাজধানী কৌশাম্বী (দ্রঃ)। অবন্তীরাজ চণ্ড প্রদ্যোতের মেয়ে (দ্রঃ) বাসবদত্তাকে হরণ করে এনে বিয়ে করেন। উদয়ন তাঁর আধিপত্য ভর্গরাজ্যেও বিস্তার করেছিলেন; দেশের প্রভূত উন্নতি করেছিলেন এবং প্রথমে বিরূপ থাকলেও পরে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। এক ছেলের নাম রেখেছিলেন বোধি। উদয়নের পর বৎসরাজ্য সম্বন্ধে কোন বিশেষ তথ্য মেলে না। স্বপ্নবাসবদত্তা, প্রিয়দর্শিকা ও রত্নাবলী তিনটি বিখ্যাত সংস্কৃত নাটকের নায়ক উদয়ন। দ্রঃ- কুরু. কৌশাম্বী, সহস্রানীক, অলম্বুষা।

উদয়পুর—(১) ত্রিপুরা (দ্রঃ)। (২) রামায়ণে পম্পাপ্সর হ্রদ; ছোট নাগপুর বিভাগে, উদয়পুর জেলাতে। দ্রঃ- অনন্তপুর।

উদয়প্রভসূরি—জৈন কবি, টীকাকার। ত্রয়োদশ শতাব্দী। ধবলক্কের (বর্তমান ধোল্কা) রাজা বীরবলের অমাত্য বস্তুপাল এঁর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এঁর জন্য দূরদূরান্ত থেকে পণ্ডিতদের আনিয়ে বস্তুপাল এঁর শাস্ত্রশিক্ষা পূর্ণ করতে চেষ্টা করেছিলেন। ধর্মাভ্যুদয় বা সংঘপতিচরিত্র (১২২১ খৃঃ মত) উদয়প্রভসূরি রচিত মহাকাব্য। নেমিনাথ চরিত নামে আর একটি গ্রন্থ আছে এবং এটি অবশ্য সংঘপতিচরিত্রেরই অংশ। সুকৃত-কীর্তি-কল্লোলিনী ও বস্তুপালস্তুতি নামে দুটি প্রশস্তি কাব্য ও আরম্ভসিদ্ধি নামে একটি জ্যোতিষগ্রন্থও তাঁর রচনা। 'উবএসমালা' গ্রন্থের টীকা কর্ণিকা ও উদয়প্রভসূরির তৈরি। স্যাদ্‌বাদমঞ্জরী রচয়িতা মল্লিষেণ উদয়প্রভসূরির শিষ্য।

উদান—(১) বেদান্তে কণ্ঠদেশের উৎক্রমণ বায়ু। কণ্ঠস্থিত বায়ু। প্রাণ, অপান আদি পঞ্চবায়ুর একটি। এই বায়ু জীবকে বাঁচিয়ে রাখে।

উদান—(২) সুত্তপিটকের অন্তর্গত খুদ্দকনিকায়ের তৃতীয় গ্রন্থ। বুদ্ধের উদাত্তবাণীর সংকলন ; আটটি বর্গে বিভক্ত এবং প্রতি বর্গে দশটি করে সুত্ত। সুত্তগুলিতে প্রথমে বুদ্ধের সময়ের এক একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে এবং শেষে বুদ্ধের একটি উক্তি জোড়া আছে। এই উক্তি বা উদান সাধারণত ত্রিষ্টুভ্ বা জগতী ছন্দে রচিত এবং এগুলিতে বৌদ্ধের জীবনাদর্শ, অর্হত্তের মানসিক শান্তি, নির্বাণ ইত্যাদির মহিমা বলা হয়েছে। সুত্তের গল্পগুলি থেকে উদানগুলি প্রাচীন ; এবং সম্ভবত বুদ্ধ বা তাঁর প্রাচীন শিষ্যদের বাণী।

উদাবৎসর—বর্ষপঞ্চকের মধ্যে একটি বৎসর।

উদাবসু—জনক বংশের এক জন রাজা।

উদাসী—গুরু নানক প্রবর্তিত শিখ ধর্মকে আশ্রয় করে যে সকল সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল তাদের মধ্যে প্রাচীনতম একটি সন্ন্যাসী সম্প্রদায়।

উদীচ্য—সরস্বতী নদীর উত্তর পশ্চিম স্থিত দেশ। অন্য নাম উদগ্-দেশ।

উদীচ্য ভোজ—জরাসন্ধের ভয়ে এরা প্রতীচী দিকে পালিয়ে গিয়েছিল (মহা. ২।১৩।২৪)।

উদ্গাতা—সামবেদ গায়ক। দ্রঃ- ঋত্বিক।

উদ্গীথ—(১) প্রণব। (২) সামবেদের দ্বিতীয় অধ্যায়।

উদ্দক-রামপুত্ত—সংসার ত্যাগের পর গৌতম যাঁদের কাছে শিক্ষার জন্য গিয়েছিলেন তাঁদের শেষতম হচ্ছেন উদ্দক রামপুত্ত। মহাবস্তু ইত্যাদি গ্রন্থে এঁর নাম উদ্রক। উদ্দক কোন নতুন মতবাদের প্রতিষ্ঠা করেন নি। উদ্দকের পিতা রাম ধ্যানমার্গে যে সমাধি লাভের তত্ত্ব উপলব্ধি করেছিলেন সেই না-সংজ্ঞা না-অসংজ্ঞা অবস্থা গৌতমকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। বৌদ্ধ শাস্ত্রে ধ্যানমার্গের অষ্টাঙ্গ সমাধির শেষ অঙ্গ বলে এটি পরিচিত। এই নতুন জ্ঞান গৌতমের কাছে সম্পূর্ণ মনে হয়নি ; তিনি তখন উদ্দকের কাছ থেকে চলে যান ; কিন্তু উদ্দককে তবু গভীর শ্রদ্ধা করতেন। বুদ্ধত্ব লাভের পর গৌতম বুদ্ধ চিন্তা করতে থাকেন যে তাঁর এই নতুন জ্ঞান (সঞ্ঞা বেদয়িত নিরোধ) উপলব্ধি করবার মত উপযুক্ত ব্যক্তি কে হতে পারে এবং এই জ্ঞান প্রচার করার জন্য কে তাঁকে সাহায্য করতে পারেন। এই সময়ে প্রথমে আলার-কালাম (দ্রঃ) ও পরে উদ্দকের কথা তাঁর মনে হয়। কিন্তু উদ্দক ইতিমধ্যে মারা গিয়েছিলেন।

সব রকম পাপের মূল উৎপাটন করে সব কিছু জয় করতে পেরেছি বলে উদ্দক যে দাবি করতেন বুদ্ধের মতে এ দাবি অযৌক্তিক। রাজা এলেয্য ও তাঁর দেহরক্ষী ইত্যাদি সকলেই উদ্দকের ভক্ত ছিলেন।

উদ্দালক—(১) অরুণ ঋষির ছেলে আরুণি (দ্রঃ) রাজর্ষি অশ্বপতির কাছে ব্রহ্মবিদ্যা পান। গুরু আয়োদ্-ধৌম্যের দেওয়া নাম উদ্দালক। বা উদ্দাল গাছের নীচে গর্ভস্থ হয়েছিলেন বলে নাম উদ্দালক। ইন্দ্রের সভায় বিশেষ সভাসদ। উদ্দালকের ছেলে

শ্বেতকেতু (দ্রঃ) ; মহাভারতে (১২।৩৫।২২) উদ্দালকঃ শ্বেতকেতুং জনয়ামাস শিষ্যতঃ। মেয়ে সুজাতা। প্রিয় শিষ্য কহোড়ের (দ্রঃ) সঙ্গে সুজাতার বিয়ে দিয়েছিলেন; ছেলে হয়েছিল অষ্টাবক্র। জন্মেজয় আরুণিকেও এক জন পুরোহিত নিযুক্ত করেছিলেন। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে উপশম প্রকরণে এ'র তপস্যা ও সিদ্ধি লাভের কথা বিশদ ভাবে বর্ণিত আছে। উদ্দালক ও শ্বেতকেতুর সামনে এক দিন এক ব্রাহ্মণ এসে শ্বেতকেতুর মার কাছে সঙ্গম কামনা জানিয়ে জোর করে তাঁর হাত ধরে নিয়ে যান (মহা ১।১১৩।১১)। শ্বেতকেতু এতে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলে উদ্দালক বোঝাতে চেষ্টা করেন এটা জীবনের ধর্ম; স্ত্রীরা গাভীদের মতই অরক্ষিত। কিন্তু শ্বেতকেতু শান্ত হন না এবং দাম্পত্য-জীবন সম্বন্ধে নিয়ম করেন স্ত্রী স্বামী ভিন্ন অন্য কোন পুরুষের সংসর্গ করবে না। পতিব্রতা ও ব্রহ্মচারিণী স্ত্রীকে ত্যাগ করে স্বামী অন্য স্ত্রীতে যেন আসক্ত না হয় এবং স্বামীর নির্দেশ মত স্ত্রী ক্ষেত্রজ সন্তানে যেন আপত্তি না করে। এই নিয়ম যাঁরা মানবেন না তাঁরা ভ্রূণ হত্যার পাপে পাপী হবেন। শ্বেতকেতু ব্রাহ্মণদের ঘৃণা করতেন বলে উদ্দালক এ'কে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন (মহা ১২।৫৭।১০)। সরস্বতী নদীকে একবার স্মরণ করা মাত্র নদী এ'র যজ্ঞ স্থলে এসে উপস্থিত হয়েছিল (মহা ৩।১৩২।২)।

উদ্দালক—(২) অপর নাম উদ্দালকি। আর এক জন মুনি। এক বার আশ্রমে ফিরে এসে মনে পড়ে ফল কমণ্ডলু ইত্যাদি সব কিছু নদীতে ফেলে রেখে এসেছেন। ছেলে নচিকেতাকে এগুলি আনতে পাঠান। কিন্তু ছেলে এসে দেখে জলে সব ভেসে গেছে। নচিকেতা এই কথা জানালে মুনি শাপ দেন, নচিকেতা (দ্রঃ) তৎক্ষণাৎ মারা যান।

উদ্ধব—অপর নাম দেবশ্রবা। কৃষ্ণের সখা ও সচিব ও পরম ভক্ত। এক জন যাদব। বৃহস্পতির পূর্ব শিষ্য (ভাগ ৩।১।২৩)। পূর্ব জন্মে এক জন বসু (ভাগ ৩।৪।১১); নারায়ণকে পাবার জন্য আরাধনা করেছিলেন। অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও বৃষ্ণিদের মন্ত্রী। উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিযোগ, কর্মত্যাগ ইত্যাদি বহু উপদেশ দিয়েছিলেন। কংসকে বধ করে উগ্রসেনকে রাজা করে দিয়ে কৃষ্ণ যখন মথুরাতে বাস করছিলেন তখন কৃষ্ণের নির্দেশে এই উদ্ধব গোকুলে এসে নন্দ, যশোদা ও গোপীদের কৃষ্ণের খবর দেন। সকলে ঘিরে ধরে কৃষ্ণের খবর শুনতে থাকেন (ভাগ ১০।৪৬)। উদ্ধব অনেক তত্ত্বজ্ঞানও দান করেছিলেন এই সময়। এ'দের দেওয়া উপহার উদ্ধব মথুরাতে কৃষ্ণকে এনে দিয়েছিলেন। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভাতে ছিলেন। রৈবত পাহাড়ে বন ভোজনেও গিয়েছিলেন। সুভদ্রার বিয়ের যৌতুক নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে এসেছিলেন। শাল্ব দ্বারকা অবরোধ করলে ইনি দ্বারকা রক্ষা করেন। এক বার এ'কে শ্রীকৃষ্ণ বদরিকাশ্রমে গিয়ে ফলমূল খেয়ে জীবন যাপন করতে এবং অলকানন্দাকে দেখে পাপমুক্ত হতে বলেছিলেন। যদুবংশ ধ্বংসের প্রাক্কালে কৃষ্ণ এ'কে কি ঘটবে জানান এবং (ভাগ ৩।৪।৩) বদরিকাতে যেতে নির্দেশ দেন। দ্বারকা ধ্বংস হবার আগে যাদবরা প্রভাসে চলে যান এবং উদ্ধব সকলের কাছে বিদায় নিয়ে নিরুদ্দেশে বার হয়ে পড়েন। একটি মতে ইনি বদরিকাশ্রমে দেহত্যাগ করেন। দ্রঃ- বিদুর।

উদ্বৎসর—চন্দ্রমাসান্বিত বৎসর।

উদ্বহ—দ্রঃ- বায়ু।

উদ্ভট—কাশ্মীর অধিবাসী। কহ্লনের মতে মহারাজ জয়াপীড়ের (৭৭৯-৮১৩ খৃ) সভাপতি। এঁর একটি মাত্র বই 'কাব্যালঙ্কার সার সংগ্রহ' বর্তমানে পাওয়া যায়। উদ্ভটের লেখা 'ভামহ বিবরণ' নামে বিস্তৃত একটি টীকা ছিল এবং এই বইটির সার সংগ্রহ মনে হয় এই কাব্যালঙ্কার সারসংগ্রহ। উদ্ভটের আর একটি বই 'কুমার সম্ভব'। নাট্য শাস্ত্রের ওপরও একটি টীকা লিখে ছিলেন জানা যায়। উদ্ভট ছিলেন ভামহের অনুগামী। তাঁর মতে কাব্যে অলঙ্কারই প্রধান। উদ্ভটের কবিত্ব প্রচুর ছিল। এঁর মতে অনুপ্রাস ত্রিবিধ ও রূপক চতুর্বিধ। কাব্য মীমাংসার ক্ষেত্রে উদ্ভট এক নতুন সম্প্রদায় গড়ে তুলে ছিলেন।

উদ্যান—কাফিরিস্তান, উদয়, উজ্জানক। মহাভারতে উল্লেখ আছে। পেশোয়ারের উত্তরে ; সোয়াৎ নদীর তীরে। অন্য মতে হিন্দুকুশের দক্ষিণে সমস্ত পার্বত্য এলাকা। অর্থাৎ চিত্রল থেকে সিন্ধু পর্যন্ত ; দরদ-ই-স্তান। দ্রঃ- দরদ। সোয়াতের কিছু অংশ ও ইউসুফজোই দেশ (=বর্তমানে সোয়াৎ উপত্যকা মিলে) ; অর্থাৎ গজনির চারপাশের দেশ। কাশ্মীরের উ-পশ্চিম পর্যন্ত। রাজধানী মঙ্গল ; মেঙ-হো-লি (চীন)। উদ্যান প্রাচীন গান্ধার বা গন্ধর্ব দেশ।

উন্মত্ত—লঙ্কায় রাম রাবণের যুদ্ধে এই রাক্ষস মারা যায়। দ্রঃ- মাল্যবান।

উন্মদা—গন্ধর্ব রাজা হংসের সেনাপতি দুর্মদ। পুরূরবার স্ত্রী উর্বশীর ওপর ভীষণ লোভ ছিল। বহু বার উর্বশীকে মনের কথা জানিয়েছিলেন কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন। পুরূরবা ও উর্বশী যখন ইন্দ্রের সভাতে ছিলেন তখন এক দিন এঁরা রাত্রিতে নন্দন বনে মিলিত হবেন ঠিক করেন। দুর্মদ জানতে পেরে অপ্সরী উন্মদাকে ডাকেন এবং দু জনে মিলে উর্বশী ও পুরূরবার বেশে নন্দন বনে আসেন। প্রকৃত উর্বশী ভুল করে দুর্মদের কাছে যান, পুরূরবারও ভুল হয়। উর্বশীকে সম্ভোগ করার পর দুর্মদ অট্টহাস্যে ফেটে পড়েন। উর্বশী তখন বুঝতে পারেন ; ইতিমধ্যে পুরূরবাও এসে হাজির হন। উর্বশী তখন দুর্মদকে শাপ দেন রাক্ষস হয়ে জন্মাতে হবে এবং উন্মদাকে শাপ দেন মানুষ হয়ে জন্মাতে হবে এবং জীবনে এক জনকে ভালবাসবে কিন্তু বিয়ে হবে অপরের সঙ্গে। পরে এদের প্রার্থনায় করুণা হয় এবং বলেন দুর্মদ উন্মদার ছেলে হয়ে জন্মাবে এবং স্বামি-পুত্রের মৃত্যুর পর অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে মুক্তি পাবে। দুর্মদ শত্রুর তরবারিতে মারা গিয়ে স্বর্গে ফিরে আসবেন। এই শাপের ফলে হিরণ্যপুরের রাজা অসুর দীর্ঘজঙ্ঘের ছেলে হয়ে দুর্মদ জন্মান ; নাম হয় পিঙ্গাক্ষ। উন্মদা বিদেহ রাজের মেয়ে হয়ে জন্মান , নাম হয় হারিণী।

অসুর পিঙ্গাক্ষ এক দিন হরিণীকে দেখে আকাশ পথে উড়িয়ে নিয়ে যান। হরিণী ভীষণ কাঁদতে থাকলে পিঙ্গাক্ষ এঁকে এক বনে ছেড়ে দেন। এই সময় বসুমনস্ নামে এক রাজা এখানে মৃগয়াতে এসেছিলেন ; পিঙ্গাক্ষকে তিনি হত্যা করেন এবং হরিণীর কাহিনী শুনে জীমূত ঘোড়ায় চড়িয়ে বিদেহে পাঠিয়ে দেন। বিদেহ-রাজ আনন্দিত হয়ে বসুমনসের সঙ্গে হরিণীর বিয়ে দিতে চান। কিন্তু নিমন্ত্রিতদের

মধ্যে থেকে রাজা ভদ্রশ্রেণ্য হরিণীকে জোর করে নিয়ে পালাতে চেষ্টা করেন, ফলে যুদ্ধ হয় এবং বসুমনস্ হেরে যান। কাশীরাজ দিবোদাস ভদ্রশ্রেণ্যকে পরাজিত করেন বটে কিন্তু মুক্তি দেন। ভদ্রশ্রেণ্য হরিণীকে নিয়ে যান এবং বিয়ে করেন এবং দুর্মদ অর্থাৎ পিঙ্গাক্ষ এবার হরিণীর ছেলে হয়ে জন্মায়। এই দুর্মদ বড় হয়ে নিজের খুল্লতাত কন্যা চিত্রাঙ্গীকে গায়ের জোরে বিয়ে করেন এবং একটি সন্তান হয়। এর পর কাশীরাজ দিবোদাসের সঙ্গে ভদ্রশ্রেণ্য ও এই দুর্মদের আবার যুদ্ধ হয় এবং দুজনেই হেরে যান। এর পর অযোধ্যারাজ বসুমনসের সঙ্গে যুদ্ধে ভদ্রশ্রেণ্য ও দুর্মদ দুজনেই মারা যান। হরিণী অগ্নিতে আত্মবিসর্জন দিয়ে মুক্ত হন (কথাসরিৎসাগর)।

উপক—এক জন বিখ্যাত আজীবিক (দ্রঃ)।

উপকীচক—মৎস্যরাজ বিরাটের শালা; কীচকের (দ্রঃ) এরা বাকি ১০৫ ভাই (মহা ৪।২২।২৫)। কালকেয় অসুরের অংশে জন্ম। কীচকের মৃত দেহ শ্মশানে নিয়ে যাবার সময় সামনে দ্রৌপদীকে পেয়ে বিরাটের অনুমতি নিয়ে (মহা ৪।২২।৮) তাঁকেও কীচকের সঙ্গে দাহ করবার জন্য এ'রা বেঁধে নিয়ে যেতে থাকেন। কিন্তু দ্রৌপদীর আর্তনাদে ভীম শ্মশানে গিয়ে একটি গাছ তুলে নিয়ে গাছের ঘায়ে সমস্ত ভাইগুলোকে নিহত করে দ্রৌপদীকে মুক্ত করেন (মহা ৪।২২।১৫)।

উপ:কোশা—উপবর্ষের মেয়ে। বররুচির স্ত্রী।

উপগান—সামবেদীয় ২৩-টি প্রপাঠক সম্বলিত গীতগ্রন্থ।

উপগাহ—বিশ্বামিত্রের এক ছেলে।

উপগুপ্ত—উত্তরভারত, মধ্য এসিয়া, চীন, জাপান ও তিব্বত প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধ সাহিত্যে ও কিংবদন্তীতে উপগুপ্ত একজন বিখ্যাত পুণ্যচরিত সুঘস্থবির। দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এসিয়াতে বৌদ্ধ শাস্ত্রে উপগুপ্তের নাম নেই। কিন্তু বর্মাতে লোকশ্রুতিতে উপগুপ্ত একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। মথুরায় (মতান্তরে বারাণসীতে একজন গুপ্ত নামধেয় গান্ধিকের (গন্ধদ্রব্য ব্যবসায়ীর) তৃতীয় ছেলে। বুদ্ধের নির্বাণ লাভের প্রায় ১০০ বছর পরে জন্ম। উপগুপ্তের বড় ভাই অশ্বগুপ্ত, মেজ ভাই ধনগুপ্ত। প্রথমে পিতার ব্যবসায়ে যোগদান করেন। পরে মথুরাতে উরুমুণ্ড পাহাড়ে অবস্থিত নটভটিক বিহারবাসী অর্হৎ শাণবাস এ'কে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দেন। উপগুপ্তের বয়স তখন সতের। দীক্ষা গ্রহণের তিন বৎসর পরে উপগুপ্ত অর্হৎ হন, এবং নাম হয় অলক্ষণক (বিশিষ্ট শরীর লক্ষণ বিরহিত) বুদ্ধ। লামা তারানাথের মতে উপগুপ্তের দীক্ষাগুরুর নাম অর্হৎ যশস্ বা যশেথ। শাণবাসের মৃত্যুর পর উপগুপ্ত সংঘের সর্বোচ্চ স্থবিরের পদ পান এবং নটভটিক সংঘে বাস করতে থাকেন। মথুরা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তাঁর স্মৃতিকাহিনী ছড়িয়ে রয়েছে। এই অঞ্চলে মার অর্থাৎ পাপপুরুষের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ হয় এবং মার প্রভাব মুক্ত হয়ে অসংখ্য নরনারী তাঁর কাছে দীক্ষা লাভ করেন। কিংবদন্তী আছে উপগুপ্ত সিন্ধু ও কাশ্মীর পরিদর্শনে গিয়েছিলেন।

হিউ-এন-ৎসাঙ্-এর মতে উপগুপ্ত সম্রাট অশোককে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন এবং উপগুপ্তের পরামর্শে এবং দেবগণের সাহায্যে সম্রাট অশোক ভারতবর্ষে চুরাশি

সহস্রস্তূপ নির্মাণ করে বুদ্ধের শরীর নিদান সংরক্ষিত করেন। অশোকাবদান অনুসারে উপগুপ্ত ছিলেন ধর্ম বিষয়ে অশোকের প্রধান মন্ত্রণাদাতা এবং সম্রাটকে সঙ্গে নিয়ে লুম্বিনী, কপিলবস্তু, বুদ্ধগয়া, ঋষিপতন, (সারনাথ) কুশীনগর, ও শ্রাবস্তী পরিভ্রমণ করেছিলেন। আজ পর্যন্ত অবশ্য অশোকের কোন শিলালিপিতে উপগুপ্তের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় নি। সিংহল ও দক্ষিণ পূর্ব এসিয়া অনুসারে অশোকের ধর্মবিষয়ে প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন মৌদ্গল্যীপুত্র তিষ্য। অনেকের মতে এই তিষ্য ও উপগুপ্ত একই ব্যক্তি।

তারানাথের মতে উপগুপ্ত মথুরাতে মারা যান। জাপানী মতে ভূমিকম্পে মারা যান। ব্রহ্মদেশীয় মত অনুসারে মহাকশ্যপ ইত্যাদির মত উপগুপ্তও অমর।

উপগ্রহ—গুরুর কাছে বিধিপূর্বক বেদ পাঠ গ্রহণ।

উপচার—পূজার উপকরণ। যজমানের সঙ্গতি অনুসারে পাঁচ, দশ, ষোল, আঠার, বা চৌষট্টি উপচারে পূজার ব্যবস্থা করা হয়। শঠতা না করে সাধ্যমত এই সমস্ত উপচার যথাসম্ভব ভাল সংগ্রহ করা কর্তব্য। পঞ্চ-উপচার অর্থে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য। দশ-উপচার অর্থে পঞ্চ উপচার এবং সঙ্গে পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, পানীয়, ও তাম্বুল। ষোড়শ-উপচার অর্থে দশ-উপচার এবং আরো ছয়টি উপচার যথা আসন, স্বাগত প্রশ্ন, মধুপর্ক, স্নানের জল, বস্ত্র ও আভরণ। অতিথিকে দেয়, ভাল বিছানা ও অনুলেপন বস্তুও উপচার হিসাবে গণ্য হয়।

উপচিত্র—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। ভীমের হাতে নিহত।

উপতন্ত্র– জৈমিনি, বশিষ্ঠ, কপিল, নারদ প্রভৃতি কৃত তন্ত্র।

উপতিস্স—(১) গোতম বুদ্ধের প্রধান শিষ্য ; অপর নাম সারিপুত্ত। জন্মস্থান নালক। এইজন্য নালকের অপর নাম উপতিস্সগাম এবং এঁর বাণীর নাম উপতিস্স সুত্ত। (২) কস্সপ রচিত 'অনাগতবংশ' নামক পালিগ্রন্থের ভাষ্যকার। (৩) খৃস্টীয় প্রথম শতকে অরহা উপতিস্স নামে একজন ভিক্ষু 'বিমুত্তিমগ্গ' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। (৪) দশম শতকে সিংহলে উপতিস্স নামে এক জন বৌদ্ধ মহাবোধিবংশ রচনা করেন। (৫) মহানিদ্দেস গ্রন্থের ভাষ্য সদ্ধম্মপজ্জোতিকা রচনাকার। (৬) মহাবংসের ভাষ্যকারের নাম উপতিস্স। (৭-৮) সিংহলে ৩২১-৪০৯ খৃ পর্যন্ত এবং ৫২২-৫২৪ খৃ পর্যন্ত দুজন উপতিস্স রাজত্ব করেছিলেন।

উপদানবী—দ্রঃ- জ্যামঘ।

উপদেব—(১) দেবকের ছেলে (ভাগবত ৯।২৪)। (২) আহুকের নাতি এবং দেবকের ছেলে (হরিবংশ ১৩৭।২৮)। অক্রূরের ছেলে উপদেব / উপদেবক।

উপদেবতা—দেবতাদের নীচে, অর্থাৎ মানুষ থেকে ওপরে; এঁদের ১০টি ভাগ বিদ্যাধর, অপ্সরা, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব, কিন্নর, পিশাচ, গুহ্য, সিদ্ধ, ভূত।

উপদেবা/উপদেবী - যদুবংশীয় দেবকের মেয়ে। বসুদেবের (দ্রঃ) স্ত্রী।

উপধাতু—মাক্ষিক, তুত্থক, অভ্র, নীলাঞ্জন, মনঃশিলা, হরিতাল, রসাঞ্জন। অন্য মতে স্বর্ণমাক্ষিক, তারমাক্ষিক, তুঁতে, কাঁসা, পিতল, সিন্দুর, শিলাজতু। দেহস্থ উপধাতুঃ—

স্তন্য (রসজ); রজঃ (রক্তজ); বসা (মাংসজ); স্বেদ (মেদজ); দন্ত (অস্থিজ); কেশ (মজ্জাজ); ওজ (শুক্রজ)।

উপনন্দ—(১) কৃষ্ণের পালক পিতা নন্দের ছোট ভাই। (২) বৌদ্ধ শাস্ত্রে এক জন নাগরাজ। (৩) মদিরা নামে বসুদেব পত্নীর গর্ভে জাত পুত্র (ভাগ ৯।২৪।৪৮)। (৪) কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের ছেলে। ইনি রাজপুরোহিতের ছোট ভাই কুহনের পরামর্শ ও সহায়তায় যুবরাজ নন্দকে নিহত করতে চেষ্টা করেন। (৫) ধৃতরাষ্ট্রের ছেলে; ভীমের হাতে মারা যান (মহা ৮।৩৫।১০)। (৬) একটি সর্প (মহা ৫।১০১।১২), ভোগবতীতে নারদ মাতলিকে দেখান।

উপনন্দ—(১) একজন বৌদ্ধ স্থবির। বিনয় পিটক এবং জাতকে ভোগ্য বস্তুর প্রতি এ'র আসক্তির বহু কাহিনী আছে। জনপ্রিয় ছিলেন বটে তবে নিজের গোষ্ঠীতে নানা ভাবে ধিক্কৃত ছিলেন। বুদ্ধ ঘোষ এ'কে লোল জাতিক বলেছেন। জাতকের একটি কাহিনীতে আছে পূর্ব জন্মে ইনি একটি মায়াবী শৃগাল ছিলেন। অন্যান্য শৃগালদের বঞ্চিত করতেন। (২) মগধরাজ অজাতশত্রুর সেনাপতি। মঝ্‌ঝিম নিকায়ের গোপক মোগ্‌গল্লান সুত্তে বর্ণিত আনন্দ ও বস্‌সকারের আলাপচারির সময়ে উপনন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উপনয়ন—বৈদিক দীক্ষা। যজ্ঞোপবীত ধারণ রূপ সংস্কার। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বালকদের যথাক্রমে ৭ বৎসর ৩ মাস থেকে ১৫ বছর ৩ মাস, ১০ বছর ৩ মাস থেকে ২২-৩, এবং ১১-৩, থেকে ২৩-৩ উপনয়নের মুখ্য কাল। এই সীমা পার হয়ে গেলে এবং উপনয়ন না হলে সাবিত্রী পতিত ব্রাত্য বলে অভিহিত হয়। এ জন্য কঠিন ব্রাত্যে প্রায়শ্চিত্ত করে উপনয়নের ব্যবস্থা করার নিয়ম। বর্তমানে প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে সামান্য অর্থ দান করা হয়। উপনয়ন সংস্কারের মধ্য দিয়ে বালক অধ্যয়নের জন্য গুরুর কাছে যেতেন। বর্তমানে পিতা বা পুরোহিত বা অনা কেউ গুরুর পদগ্রহণ করেন এবং বালককে কতকগুলি নির্দেশ দিয়ে দণ্ড ও উপবীত (দ্রঃ) ধারণ করান ও গায়ত্রী মন্ত্র শিক্ষা দেন। দণ্ডধারণ করে মা বা মাতৃস্থানীয় মহিলার কাছে এবং পিতার কাছে ভিক্ষা নিতে হয়। উপনয়নের পর বেদ পাঠের অনুষ্ঠান হয় এবং চার বেদের চারটি মন্ত্র শিক্ষা দেওয়া হয়। উপনয়নের আগে চূড়াকরণ ও কর্ণবেধ এবং উপনয়নের পরে সমাবর্তন সংস্কার অনুষ্ঠিত হয়। সমাবর্তন উপলক্ষ্যে আনুষ্ঠানিক স্নান, দণ্ডত্যাগপূর্বক বা দণ্ড ভেঙ্গে নতুন কাপড়, নতুন উপবীত, পাদুকা, কুণ্ডল, গন্ধমাল্য ইত্যাদি গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। বর্তমানে উপনয়নের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কাজ বহু জায়গায় এক দিনেই সেরে নেওয়া হয়; কচিৎ কোথাও তিনদিন বা বারো দিন ব্রহ্মচর্য পালন ও হবিষ্যান্ন গ্রহণের রীতি অনুসরণ করা হয়। উপনয়ন সংস্কারের গুরুত্ব ক্রমশ লুপ্ত হয়ে আসছে।

উপনিষদ্—বেদের প্রধান দুটি ভাগ মন্ত্র (= সংহিতা) ও ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ অংশ আবার তিন ভাগে বিভক্ত শুদ্ধ ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্। আসলে আরণ্যক অংশের অন্তর্গত অংশ উপনিষদ্। এই ভাবে উপনিষদ্ বেদের অন্ত বা বেদান্ত। অন্য

মতে বেদজ্ঞানের নিষ্কর্ষ হচ্ছে উপনিষদ্। বেদপাঠ শেষ হবার পর বেদান্ততত্ত্ব শ্রবণের অধিকার জন্মে। উপনিষদ্ শব্দের ব্যাখ্যা হিসাবে একটি মত গুরুর সমীপে (উপ-) বসিয়া (নি+√সদ্) যে বিদ্যা গ্রহণ করতে হয়। অন্য মতে ব্রহ্মবিদের নিকট উপস্থিত হয়ে নিশ্চয়ের (নি) সঙ্গে যে বিদ্যা অনুশীলন করলে অবিদ্যা বিনাশ (√সদ্) প্রাপ্ত হয়। উপনিষদের আর এক অর্থ রহস্য। অর্থাৎ অতি দুর্লভ এই ব্রহ্মজ্ঞান গুরু প্রিয় শিষ্য বা বড় ছেলেকে গোপনে দিতেন। প্রাচীন কালে উপনিষদ্ পাঠ ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্তব্য ছিল।

চারটি বেদেরই উপনিষদ্ আছে এবং উপনিষদে আছে কেবল জ্ঞানের উপদেশ। উপনিষদে যজ্ঞ গৌণ; ষষ্টব্যের স্বরূপ নির্ণয়ই মুখ্য চেষ্টা, অর্থাৎ জ্ঞানের প্রাধান্য। উপনিষদ্-গুলি সাধারণত ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকের অংশ; তবে উপনিষদে বেদের মন্ত্র (=সংহিতার সঙ্গে) যুক্ত হলে একে সংহিতোপনিষদ্ এবং অপরগুলিকে ব্রাহ্মণোপনিষদ্ বলা হয়। ঋক্‌বেদীয় উপনিষদ্ ঐতরেয় ও কৌষীতকি। সামবেদীয় উপনিষদ্ ছান্দোগ্য ও কেন। কৃষ্ণযজুর্বেদীয় উপনিষদ্ তৈত্তিরীয়, কঠ, ও শ্বেতাশ্বতর। শুক্ল যজুর্বেদীয় উপনিষদ বৃহদারণ্যক, ও ঈশা। অথর্ববেদীয় উপনিষদ্ প্রশ্ন, মুণ্ডক মাণ্ডূক্য। মাণ্ডূক্য ভিন্ন এই উপনিষদ্‌গুলির ওপর এবং মাণ্ডূক্যের কারিকার ওপর শঙ্করাচার্যের ভাষ্য আছে। ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক বড় বই; ঈশা মাত্র আঠারটি শ্লোকে সম্পূর্ণ।

ঐতরেয়, কৌষীতকি, তৈত্তিরীয়, বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য ও কেন এই ছয়টি গদ্যে রচিত। আবার প্রাচীনত্বে ও রচনা শৈলীতে এগুলি ব্রাহ্মণ সাহিত্যের অনুরূপ। এগুলি পাণিনির পূর্ব যুগের রচনা। কঠ, শ্বেতাশ্বতর, মহানারায়ণ (তৈত্তিরীয় আরণ্যকের চতুর্থ প্রপাঠক), ঈশা ও মুণ্ডক এই পাঁচটি কিছু পরের রচনা তবে বুদ্ধের আবির্ভাবের আগে। এগুলি প্রধানত পদ্যে রচনা। এই পাঁচটিতে বেদান্ত চিন্তার সঙ্গে সাংখ্য যোগের মতবাদও মিশে রয়েছে। প্রশ্ন, মাণ্ডূক্য ও মৈত্রায়ণীয় এই তিনটি বুদ্ধের পরে সংকলিত হয়েছে; এদের তৃতীয় শ্রেণীতে ধরা হয়। গদ্য ও পদ্য দুইই আছে এবং এই গদ্যের ভাষার সঙ্গে লৌকিক সংস্কৃতের বিশেষ মিল আছে। চতুর্থ শ্রেণীতে পরবর্তী কালের অসংখ্য উপনিষদ্ রয়েছে; বেদের সঙ্গে এগুলির সে রকম যোগ নেই। বিভিন্ন সম্প্রদায় নিজেদের মত প্রতিষ্ঠা করবার জন্য উপনিষদ্ নাম দিয়ে এগুলি চালু করেছিলেন। অনেকগুলি প্রধানত পুরাণ ও তন্ত্রের অনুগামী। শাক্ত বৈষ্ণব ইত্যাদি বহু সম্প্রদায়ের এমন কি মোগলযুগে অল্লোপনিষদ্ নামেও একটি উপনিষদ্ রচিত হয়েছিল। দ্রঃ- অল্লা।

প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলিতে গুরুশিষ্যের প্রশ্নোত্তর ছলে এবং স্থানে স্থানে সাঙ্কেতিক ভাষায় উপাখ্যান দিয়ে বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে মূল সংহিতা থেকেও মন্ত্র নেওয়া হয়েছে। এই সব আলোচনায় পাত্রপাত্রী হিসাবে ব্রাহ্মণ, গার্গী ইত্যাদি মহিলা, জনক ইত্যাদি ক্ষত্রিয় এবং রৈক ইত্যাদি শূদ্র যোগদান করেছেন। উপনিষদে আত্মা সম্বন্ধে নানা আলোচনা রয়েছে। আত্মাই ব্রহ্ম, আত্মবিদ্যা হচ্ছে ব্রহ্মবিদ্যা; এবং

পরাবিদ্যা, অপরাবিদ্যা ইত্যাদি বহু বিষয় আলোচিত হয়েছে। ভারতীয় দর্শনগুলির প্রায় সবগুলিই এই উপনিষদের মতবাদ, প্রভাব বা ছায়া বহন করছে। উপনিষদের তাৎপর্য বিচারের জন্য পরে বহু বই লেখা হয়েছিল। এগুলির মধ্যে ব্রহ্মসূত্র, ও শ্রীমৎভগবৎ গীতা প্রধান। এই দুই বই এবং উপনিষদ্ তিনটিকে একসঙ্গে প্রস্থানত্রয় বলা হয়। অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্র ন্যায়প্রস্থান, গীতা স্মৃতিপ্রস্থান এবং উপনিষদ্ শ্রুতিপ্রস্থান। এবং বিরোধের স্থলে শ্রুতিই গ্রাহ্য। পাশ্চাত্য চিন্তাজগতেও উপনিষদের প্রভাব প্রচুর। ১৬৫৬ খৃস্টাব্দে দারা শিকোহ-র প্রচেষ্টায় ৫০-টি উপনিষদের একটি পারসিক সংকলন প্রকাশিত হয়। ১৮০১/২ সালে এই গ্রন্থের লাতিন অনুবাদ করেন আঁকেতিল দ্যু পেরোঁ। পরে বহু ভাষায় বহু অনুবাদ হয়েছে। ভারতীয় চিন্তাধারায় রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত উপনিষদের প্রভাব অনেকখানি।

একটি মতে উপনিষদ সব সমেত ২৮০ খানি। যজুর্বেদের মুক্তিকোপনিষদ্ মতে ঋক্‌বেদের দশটি উপনিষদ্, শুক্লযজুর্বেদের ১৯, কৃষ্ণযজুর্বেদের ৩২, সামবেদের ১৬ এবং অথর্ববেদের ৩১টি—মোট ১০৮ খানি উপনিষদ। ১৯৪৮ সালে নির্ণয়সাগর প্রেস ঈশাদি-বিংশোত্তরশতোপনিষদঃ নামে ১২০টি বইয়ের একটি সংকলন বার করেছে। এগুলির নাম :—১-ঈশাবাস্য, ২-কেন, ৩-কঠ, ৪-প্রশ্ন, ৫-মুণ্ডক, ৬-মাণ্ডুক্য, ৭-তৈত্তিরীয়, ৮-ঐতরেয়, ৯-ছান্দোগ্য, ১০-বৃহদারণ্যক, ১১-শ্বেতাশ্বতর, ১২-কৌষীতকি-ব্রাহ্মণ, ১৩-মৈত্রেয়ী, ১৪-কৈবল্য, ১৫-জাবাল, ১৬-ব্রহ্মবিন্দু, ১৭-হংস, ১৮-আরুণিক, ১৯-গর্ভ, ২০-নারায়ণাথর্বশিরস, ২১-মহানারায়ণ, ২২-পরমহংস, ২৩-ব্রহ্ম, ২৪-অমৃতনাদ, ২৫-অথর্বশিরস্, ২৬-অথর্বশিখা, ২৭-মৈত্রায়ণী, ২৮-বৃহজ্জাবাল, ২৯-নৃসিংহপূর্বতাপনীয়, ৩০-নৃসিংহোত্তরতাপনীয়, ৩১-কালাগ্নিরুদ্র, ৩২-সুবাল, ৩৩-ক্ষুরিকা, ৩৪-মন্ত্রিকা, ৩৫-সর্বসার, ৩৬-নিরালম্ব, ৩৭-শুকরহস্য, ৩৮-বজ্রসূচিকা, ৩৯-তেজোবিন্দু, ৪০-নাদবিন্দু, ৪১-ধ্যানবিন্দু, ৪২-ব্রহ্মবিদ্যা, ৪৩-যোগতত্ত্ব, ৪৪-আত্মপ্রবোধ, ৪৫-নারদপরিব্রাজক, ৪৬-ত্রিশিখব্রাহ্মণ, ৪৭-সীতা, ৪৮-যোগচূড়ামণি, ৪৯-নির্বাণ, ৫০-মণ্ডলব্রাহ্মণ, ৫১-দক্ষিণা-মূর্তি, ৫২-শরভ, ৫৩-স্কন্দ, ৫৪-ত্রিপাদ্বিভূতিমহানারায়ণ, ৫৫-অদ্বয়তারক, ৫৬-রামরহস্য, ৫৭-শ্রীরামপূর্বতাপিনী, ৫৮-শ্রীরামোত্তরতাপিনী, ৫৯-বাসুদেব, ৬০-মুদ্গল, ৬১-শাণ্ডিল্য ৬২-পৈঙ্গল, ৬৩-ভিক্ষুক, ৬৪-মহা, ৬৫-শারীরক, ৬৬-যোগশিখা, ৬৭-তুরীয়াতীত, ৬৮-সন্ন্যাস, ৬৯-পরমহংসপরিব্রাজক, ৭০-অক্ষমালিকা, ৭১-অব্যক্ত, ৭২-একাক্ষর, ৭৩-অন্নপূর্ণা, ৭৪-সূর্য, ৭৫-অক্ষি, ৭৬-অধ্যাত্ম, ৭৭-কুণ্ডিক, ৭৮-সাবিত্রী, ৭৯-আত্মা, ৮০-পাশুপতব্রহ্ম, ৮১-পরব্রহ্ম, ৮২-অবধূত, ৮৩-ত্রিপুরাতাপিনী, ৮৪-দেবী, ৮৫-ত্রিপুরা, ৮৬-কঠরুদ্র, ৮৭-ভাবনা, ৮৮-রুদ্রহৃদয়, ৮৯-যোগকুণ্ডলী, ৯০-ভস্মজাবাল, ৯১-রুদ্রাক্ষজাবাল, ৯২-গণপতি, ৯৩-শ্রীজাবালদর্শন, ৯৪-তারসার, ৯৫-মহাবাক্য, ৯৬-পঞ্চব্রহ্ম ৯৭-প্রাণাগ্নিহোত্র, ৯৮-গোপালপূর্বতাপিনী, ৯৯-গোপালোত্তরতাপিনী, ১০০-কৃষ্ণ, ১০১-যাজ্ঞবল্ক্য, ১০২-বরাহ, ১০৩-শাট্যায়নীয়, ১০৪-হয়গ্রীব, ১০৫-দত্তাত্রেয়, ১০৬-গারুড়, ১০৭-কলিসন্তরণ, ১০৮-জাবালি, ১০৯-সৌভাগ্যলক্ষ্মী, ১১০-সরস্বতীরহস্য, ১১১-বহ্বৃচ, ১১২-গণেশপূর্বতাপিনী, ১১৩-গণেশোত্তরতাপিনী, ১১৪-গোপীচন্দন, ১১৫-

ষিণ্ড, ১১৬-মহা, ১১৭-আশ্রম, ১১৮-সন্ন্যাস, ১১৯-যোগশিখা, ১২০-মুক্তিক।

উপপাতক—মহাপাতক অপেক্ষা লঘু। পরদারগমন, আত্মবিক্রয়, মাতৃত্যাগ, পিতৃত্যাগ, সুতত্যাগ, কন্যাদূষণ, দারবিক্রয়, অপত্যবিক্রয়, বান্ধবত্যাগ, অভিচার, ঋণশোধ না দেওয়া, অনুপযুক্ত পুরোহিত দিয়ে যজ্ঞ করান, নাস্তিকতা, গোহত্যা, ইত্যাদি ৫৯-টি উপপাতক।

উপপুরাণ—পুরাণ সাহিত্যে দুটি ভাগ মহাপুরাণ ও উপপুরাণ। আঠারটি মহাপুরাণের অতিরিক্ত পুরাণগুলি উপপুরাণ। এগুলি মহাপুরাণের পরবর্তী ও পরিশিষ্ঠ। কতকগুলি উপপুরাণ কিন্তু মহাপুরাণের সমকক্ষ বা আরো মর্যাদাশালী। অনেক উপপুরাণ অর্বাচীন হলেও শাম্ব ও বিষ্ণুধর্মোত্তর বেশ প্রাচীন। উপপুরাণের বিষয়-বস্তু প্রায় মহাপুরাণেরই মত এবং সংখ্যাও আঠার। বিভিন্ন গ্রন্থে উপপুরাণের যে নাম দেখা যায় তাতে কিন্তু উপপুরাণের সংখ্যা আঠার থেকে অনেক বেশি। এ ছাড়াও মুদ্রিত এবং অমুদ্রিত আরো কিছু উপপুরাণ রয়েছে। এই সব উপপুরাণের মধ্যে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাসের বহু উপাদান এমন কি মহাপুরাণের থেকেও বেশি রয়েছে। কয়েকটি নাম ঃ—আদি, আদিত্য, উশনঃ, কপিল, কালিকা, নন্দী, নৃসিংহ নারদ, নন্দিকেশ্বর, দেব, দুর্বাসঃ, পদ্ম, পরাশর, বায়ু, বরুণ, বামন, ব্রহ্মাণ্ড, বশিষ্ঠ, ভাগবত, ভার্গব, ভাস্কর, মহেশ্বর, মরীচি, মানব, শাম্ব, শিবধর্ম, শিব, সনৎকুমার, সৌর, স্কান্দ।

উপপ্লব্য—মৎস্য রাজ্যের অন্তর্গত নগর বা গ্রাম। বিরাট নগরের উপকণ্ঠে। অজ্ঞাত-বাসের শেষে এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আগে পাণ্ডবরা এখানে ছিলেন। বিরাট রাজ সভার পাণ্ডবরা আত্ম-প্রকাশ করার কয়েক দিন পরেই এখানে অভিমন্যুর বিয়ে হয়।

উপবঙ্গ—গঙ্গার বদ্বীপের পূর্ব অংশের মধ্যভাগ (বৃহৎ-সং)। ভাগীরথীর পূব দিকে যশোহর সমেত।

উপবর্হণ—দ্রঃ- নারদ।

উপবসথ—বৈদিক যাগের আগের দিন।

উপবাস—সমস্ত পাপ থেকে উপাবৃত্ত হয়ে গুণের সঙ্গে বাস করাকে উপবাস বলা হয় (গোভিল ভাষ্য)। এই ব্যবস্থা থেকে ক্রমে অনশন এসেছে মনে হয়।

উপবীত—(১) যজ্ঞোপবীত। দ্বিজাতির গৃহীত সূত্র। বাম স্কন্ধে ধারণ করলে উপবীত, দক্ষিণ স্কন্ধে প্রাচীনাবীত, এবং মালার মত ধারণ করলে নিবীত। ব্রাহ্মণের কাপাস তুলার, ক্ষত্রিয়ের শণের এবং বৈশ্যের মেষলোমের উপবীত বিহিত। উপবীত রূপে ধৃত বস্ত্রও উপবীতের কাজ করে। শ্রৌত ও স্মার্ত কর্মে দুই গ্রন্থি উপবীত ধারণীয়; উত্তরীয় অভাবে আর এক গ্রন্থি ধারণের ব্যবস্থা আছে।

(২) সূর্যপথ। সূর্যকে বেষ্টন করে অবস্থিত। সূর্য যখন পুরাতন পথ শেষ করে নতুন পথে যান তখন তাঁর নতুন উপবীত হয়।

উপবেদ—বেদের নীচে বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ। সকল বেদেরই উপবেদ আছে। ঋক্-

বেদের উপবেদ আয়ুর্বেদ, যজুর্বেদের উপবেদ ধনুর্বেদ, সামবেদের উপবেদ গন্ধর্ববেদ বা সঙ্গীতবেদ এবং অথর্ববেদের উপবেদ স্থাপত্য বেদ। স্মৃতি শাস্ত্র থেকে এগুলি ভিন্ন।

উপমন্যু—(১) মহর্ষি আয়োদ্‌ধৌম্যের ভক্ত শিষ্য। দিনের বেলা গুরুর গরু চরাতেন। উপমন্যুকে হৃষ্টপুষ্ট দেখে জানতে চান উপমন্যু কি খান। শিষ্য ভিক্ষান্নে ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন শুনে শিষ্যকে বলেন গুরুকে নিবেদন না করে এ অন্ন গ্রহণ করা অনুচিত। এরপর থেকে ভিক্ষায় যা পেতেন উপমন্যু গুরুকে দিয়ে দিতেন। কিন্তু তবু তাঁর সুন্দর স্বাস্থ্য দেখে আবার জানতে চান উপমন্যু এখন কি খান। শিষ্য জানান দ্বিতীয় বার নিজের জন্য ভিক্ষা করে ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন। গুরুদেব শিষ্যকে দুবার ভিক্ষা করতে নিষেধ করেন কারণ এতে লোভ বেড়ে যায় এবং অপর ভিক্ষার্থী বঞ্চিত হয়। এর পরও উপমন্যুর স্বাস্থ্য অটুট দেখে গুরু আবার জানতে চান উপমন্যু এখন কি খান। উপস্থিত উপমন্যু আশ্রমগাভীর দুধ খাচ্ছেন শুনে বিনা অনুমতিতে এই দুধ খেতে নিষেধ করেন। কিন্তু এর পরেও তাঁকে পূর্ণ স্বাস্থ্যবান দেখে আবার জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন দুধ খেয়ে বাছুরদের মুখ থেকে যে ফেনা বার হয় উপমন্যু সেই ফেনা খান। গুরুদেব এই ফেনা খেতেও নিষেধ করেন; কারণ বাছুররা উপমন্যুর প্রতি দয়াপরবশ হয়ে প্রচুর ফেনা তৈরি করে নিজেদের পুষ্টির ক্ষতি করছে। নিরুপায় উপমন্যু এবার গরু চরাতে গিয়ে ক্ষুধায় কাতর হয়ে আকন্দপাতা খেয়ে অন্ধ হয়ে এক কূপের মধ্যে পড়ে যান। এদিকে ফিরতে না দেখে গুরুদেব শিষ্যদের নিয়ে খুঁজতে বার হয়ে ডাকতে থাকেন; কূপের কাছে এসে উপমন্যুর কাছে সব জানতে পেরে শিষ্যকে অশ্বিনীকুমারদের স্তব করার উপদেশ দেন।

অশ্বিনীকুমার দু জন এসে উপমন্যুকে পিষ্টক খেতে দিলে উপমন্যু গুরুকে নিবেদন না করে খেতে অসম্মত হওয়ায় এঁরা মুগ্ধ ও সন্তুষ্ট হয়ে বর দেন উপমন্যুর দাঁত হিরণ্ময় হবে, দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন এবং শ্রেয় লাভ করবেন; এবং আয়োদ্‌ধৌম্যের দাঁত কালো লৌহময় হবে। এই ভাবে এত দিন পরীক্ষা করার পর গুরু উপমন্যুকে শাস্ত্রে পারঙ্গম হবার আশীর্বাদ করেন এবং গৃহে ফিরে যেতে বলেন (মহা ১।৩।৭৩)

উপমন্যু—(২) সত্যযুগে ব্যাঘ্রপাদ মুনির দুই ছেলে উপমন্যু ও ধৌম্য (মহা ১৩ ১৪।৭৫)। কিছু মতে এই উপমন্যুই আয়োদ্‌ধৌম্যের শিষ্য। এক বার পিতার সঙ্গে অন্য এক মুনির আশ্রমে গিয়ে দুধ খেয়ে আসেন। ফিরে এসে নিজের মাকে দুধ ও ঘি দিয়ে পায়স তৈরি করতে বলেন। কিন্তু এই আশ্রমে দুধ ছিল না। ফলে জলে চালের/গমের গুঁড়ো গুলে ছেলেকে খেতে দেন। কিন্তু উপমন্যু খেতে চান না। উপমন্যুর মা তখন শিবের আরাধনা করতে বলেন, দারিদ্র্য মোচন হতে পারে। উপমন্যু তপস্যা করলে শিব ইন্দ্র বেশে এসে বর দিতে চান কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হন। তখন শিব নিজের বেশে দেখা দেন এবং বর দিয়ে উপমন্যুকে দেবতাতে পরিণত করেন।

(৩) সুতপস্‌ মুনির ছেলে। পৃথিবী পরিক্রমা করে গয়াতে এসে পিতৃদেবদের পূজা করলে পিতৃদেবরা জানান বিয়ে করে সন্তানের জন্ম দিতে হবে। এই জন্য কশ্যপের আশ্রমে আসেন গরুড়ের বোন সুমতিকে বিয়ে করবেন বলে। কিন্তু বৃদ্ধ

উপমন্যুকে কশ্যপ মেয়ে দিতে রাজি হন না। বৃদ্ধ তখন শাপ দেন কোন ব্রাহ্মণের সঙ্গে এই মেয়ের বিয়ে দিলে কশ্যপের মাথা ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। দ্রঃ- ঔর্ব, সগর, যাদবী।

উপযাজ—কশ্যপ গোত্রীয় ঋষি। এঁ'র বড় ভাই যাজ (দ্রঃ)।

উপরিচর বসু—চেদি বংশে এক রাজা; প্রকৃত নাম বসু। যযাতি (১)—পুরু (২)—দুষ্যন্ত (১৫)—ভরত (১৬)—হস্তী (২৩)—অজমীঢ় (২৪)—চ্যবন (৩০)—কৃতি (৩১)—বসু (৩২)। ধর্মনিত্য রাজা; ইন্দ্রের উপদেশে এই বসু চেদি রাজ্য গ্রহণ করেন। ইন্দ্রের উপদেশ অনুসারেই তপস্যা করেছিলেন। কিন্তু এঁ'র কঠোর তপস্যায় ভীত হয়ে ইন্দ্র নানা ভাবে ভুলিয়ে তপস্যা থেকে এঁ'কে নিরস্ত করেন এবং পরিবর্তে ফটিকময় বিমান, বৈজয়ন্তী মালা ও একটি লাঠি/বংশদণ্ড উপহার দিয়েছিলেন এবং প্রজাপালন রূপ ধর্ম পালন করতে বলেন ও বন্ধুত্বের প্রতিশ্রুতি দেন (চেদি রাজ্য জয় করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। ইন্দ্র এঁ'কে বন্ধু মনে করতেন। এই রথে করে আকাশে ভ্রমণ করতেন বলে নাম হয় উপরিচর বসু। এই মালা ধারণ করে থাকলে যুদ্ধে দেহে কোন আঘাত লাগবে না। এই মালা রাজার বিশেষ চিহ্নে পরিণত হবে। লাঠিটি বৈষ্ণবী যষ্টি, ইষ্টদায়িনী এবং প্রজাপরিপালিনী। এক বৎসর পরে যষ্টিটি মাটিতে পুঁতে দিয়ে ইন্দ্রপূজা করেন (মহা ১।৫৭।-)। এই প্রবর্তিত পূজা আজও হয়ে থাকে। পর দিন এই যষ্টি মাল্য অলঙ্কার ইত্যাদি দিয়ে সাজিয়ে এবং ইন্দ্র হংসরূপেণ (মহা ১।৫৭।২১) এলে পূজিত হন। ইন্দ্র সন্তুষ্ট হয়ে বর দেন যে এই ভাবে ইন্দ্রপূজা করবে তার রাষ্ট্র সমৃদ্ধ হবে, রাজা শ্রী ও বিজয় লাভ করবে। উপরিচর বসুর ৫-ছেলে (মহা ১।৫৭।২৯)—বৃহদ্রথ (মগধে রাজা), প্রত্যগ্রহ, কুশাম্ব (=মণিবাহন), মচ্ছিল্ল ও যদু। এরা নিজেদের নামে পাঁচটি রাজত্ব স্থাপন করেছিলেন। প্রত্যগ্রহের বদলে রাজন্য ও মচ্ছিলের বদলে মভেল্ল বা মবেল্ল নামও পাওয়া যায়। আকাশে ইন্দ্র প্রাসাদে বাস করতেন। গন্ধর্ব ও অপ্সরারা দেখা করতে আসত। এই জন্যও নাম উপরিচর বসু। অগ্রহায়ণ মাসে রাজপুরীতে এই লাঠি এনে উৎসব করে ইন্দ্রপূজা (দ্রঃ) করেন এবং পর দিন আকাশে ইন্দ্রধ্বজা (দ্রঃ) তোলেন)' এঁ'র রাজধানীর কাছে শুক্তিমতী/শক্তিমতী নামে একটি নদী ছিল। কোলাহল নামে একটি পাহাড় কামার্ত হয়ে এই নদীর পথ রোধ করলে উপরিচর বসু (মহা ১।৫৭।৩৩) পদাঘাত করে পাহাড় বিদীর্ণ করলে গর্ভবতী নদী পথ পায়। কোলাহলের ঔরসে শুক্তিমতীর গর্ভে এক ছেলে ও গিরিকা নামে এক মেয়ে হয়। কৃতজ্ঞতায় নদী এই ছেলে ও মেয়েকে রাজার হাতে তুলে দেন এবং রাজা এদের পালন করেন। ছেলেটিকে সেনাপতি এবং গিরিকাকে নিজের মহিষী করেন।

মহাভারতে (১।৫৭।৩৬) গিরিকা একদিন ঋতুস্নাতা করে সঙ্গম প্রার্থনা করেন। কিন্তু পিতৃলোকের আদেশে রাজা মৃগয়া করতে চলে যান। মৃগয়া কালে অপরাম্ শ্রিয়ম্ ইব স্ত্রীর কথা ভাবতে ভাবতে বসন্ত উজ্জ্বল বনে রাজার বীর্যপাত হয়। এই বীর্য যেন নিষ্ফল না হয় এই উদ্দেশ্যে পাতাতে বীর্য ধারণ করে কাছেই অবস্থিত

সূক্ষ্ম ধর্মতত্ত্বজ্ঞ এক শ্যেনকে দিয়ে রাজা এই বীর্য রাণীর কাছে পাঠিয়ে দেন। পথে আর এক শ্যেনের আক্রমণে মারামারি করতে গিয়ে এই বীর্য যমুনায় পড়ে যায়। ব্রহ্মশাপে মৎস্যরূপিণী অপ্সরা অদ্রিকা এই বীর্য 'তরসা' পান করে গর্ভবতী হয়ে দশমাস পরে জালে ধরা পড়ে। মাছের পেটে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে পেয়ে জেলে রাজার কাছে নিয়ে আসে। শাপ অনুসারে সন্তানের জন্ম দিয়ে অদ্রিকা শাপমুক্ত হয়ে যায়। রাজা ছেলেকে নেন এবং মেয়েটিকে জেলেকেই দিয়ে দেন। ছেলেটি মৎস্য নামে বিখ্যাত রাজা হন; মেয়েটির গায়ে মাছের গন্ধ থাকায় নাম হয় মৎস্য-গন্ধা; মৎস্যা; সত্যবতী; রূপসত্ত্বসমাযুক্তা; সর্বগুণে-প্রমুদিতা। মৎস্যরাজ ধার্মিক রাজা ছিলেন। অন্য মতে মৎস্যরূপিণী একটি অপ্সরার সঙ্গে মিলনে এঁর ছেলে হয় মৎস্য এবং মেয়ে হয় মৎস্যগন্ধা (ব্যাসের মা)।

ইন্দ্র ও মুনিদের মধ্যে একবার তর্ক হয় গোমেধ উচিত কি না? অন্য মতে দেবতা ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে তর্ক হয়, দেবতারা বলেন যজ্ঞে ছাগ মাংস দেওয়া শ্রেয়, ব্রাহ্মণরা বলেন শস্য দেওয়াই যথেষ্ট। উপরিচর বসু সেই সময় সামনে এলে তাঁকে বিচার করতে বলা হয়। উপরিচর বসু পশুহত্যার স্বপক্ষে যুক্তি দিয়ে (ছাগেনাজেন যষ্টব্যং) মহা ১২।৩২৪।১৩) দেবতাদের সমর্থন করেন। ফলে মুনিদের/ব্রাহ্মণদের অভিশাপে আকাশ থেকে পাতাল/মাটিতে গর্তে গতি হয়। দেবতারা তখন বর দেন পৃথিবীতে যত দিন উপরিচর থাকবেন তত দিন তাঁকে ক্ষুৎ পিপাসা পীড়িত হতে হবে না এবং বিষ্ণুর আশীর্বাদে আবার নিজের জায়গায় ফিরে আসতে পারবেন। উপরিচর বসু বিষ্ণুর স্তব করলে গরুড় গিয়ে উপরিচর বসুকে তুলে এনে নিজের স্থানে স্থাপন করেন (মৎস্য-পু)। উপরিচর বসু বিষ্ণুভক্ত, ইন্দ্রের বন্ধু ও যমের সভাসদ ছিলেন। অত্যন্ত পিতৃভক্ত রাজা। শেষকালে পিতৃলোক প্রাপ্ত হন। দ্রঃ- কলিঙ্গ, বসুধারা।

উপশ্রুতি—উত্তরায়ণের (সূর্যের উত্তর পথের) দেবী। নহুষের রাজত্বকালে ইন্দ্র যখন আত্মগোপন করেছিলেন তখন ইন্দ্রের সন্ধান এনে দিয়ে ইন্দ্রাণীকে সাহায্য করেছিলেন (মহা ৫।১৪।১)।

উপশ্লোক—কৃষ্ণের এক ছেলে; সৈরন্ধ্রীর গর্ভে জন্ম। কৃতবিদ্য, এবং সাংখ্য-যোগ অভ্যাস করেন (ভাগ ১০।-)।

উপসুন্দ—হিরণ্যকশিপু বংশে নিকুম্ভের ছেলে সুন্দ ও উপসুন্দ। দুই ভাই; বড় সুন্দ (মহা ১।২০৪।১৬); এক প্রাণ। ত্রৈলোক্য জয় করবার জন্য বিন্ধ্যপর্বতে দীর্ঘতপস্যা; নিজেদের মাংস দিয়ে আহুতি দিতে থাকে। এদের তপস্যার তাপে বিন্ধ্যপর্বত উত্তপ্ত হয়ে ধূম বার হতে থাকে। দেবতারা নানা প্রলোভন দেখিয়ে এবং মা, বোন, স্ত্রী ইত্যাদির রূপ ধরে এসে নানা ভাবে তপস্যা ভাঙতে চান। শেষ কালে ব্রহ্মা আসেন; এরা অমর হতে চান এবং শেষ অবধি রফা হয় অমর হবে তবে ভাইয়ের হাতেই পরস্পরে মারা যাবে। এর পর বহু দিন এরা সুখে কাটিয়ে ত্রৈলোক্য জয় করতে যযাসু হৃষ্টুঃ তদা (মহা ১।২০২।২)। ত্রিলোক জয় করে। এরপর সৈনিকদের নির্দেশ দেন রাজর্ষিরা ও ব্রাহ্মণরা যজ্ঞ করে দেবতাদের বল বৃদ্ধি করে, এদেরও বধ করতে

হবে। সমুদ্রের পূর্বতীরে তারপর সমবেত হয়ে এখান থেকে ছড়িয়ে পড়ে; যজ্ঞরত ব্রাহ্মণ দেখলেই হত্যা করতে থাকে। সারা পৃথিবীতে হাহাকার ছড়িয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত নিঃসপত্ন হয়ে কুরুক্ষেত্রে এসে বাস করতে থাকে।

এদিকে ঋষিরা ব্রহ্মার কাছে যান (মহা ১।২০৩।-); ব্রহ্মা বিশ্বকর্মাকে ডাকেন এবং 'প্রার্থনীয়া এক প্রমদা' সৃষ্টি করতে বলেন। কুজা/তিলোত্তমাকে (দ্রঃ) কেন্দ্র করে দু ভাই মারা যান। দৈত্যরা ভয়ে তখন পাতালে পালিয়ে যায়। দ্রঃ কুজা। (২) নরকাসুরের সেনাপতি, কৃষ্ণের হাতে মারা যান।

উপসেন বঙ্গন্তপুত্র—বৌদ্ধ মহাশ্রাবক। সারিপুত্তের ছোট ভাই। পিতা বঙ্গন্ত। তিন বেদ পাঠ করার পর বুদ্ধের কাছে ধর্মব্যাখ্যা শুনে উপসেন প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা লাভ করেন; অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, পরে ভিক্ষু হবার যোগ্যতা লাভ করেন। এরপর ধুতংগ অর্থাৎ তেরটি বিশেষ সদাচার অভ্যাস করেন এবং অপরকেও এগুলি অভ্যাস করতে প্রবুদ্ধ করেন। তাঁর প্রচারে বহু লোক সংঘে যোগ দিয়েছিলেন। সর্পাঘাতে মারা যান।

উপস্মৃতি—অপ্রধান স্মৃতি। উপস্মৃতিকার ঃ—কাত্যায়ন, কপিঞ্জল, কশ্যপ, কণাদ, জনক, জাবালি, জাতুকর্ণ, নাচিকেত, ব্যাস, বিশ্বামিত্র, বৌধায়ন, ব্যাঘ্র, লৌগাক্ষী, শতজুঁ, সনৎকুমার, স্কন্দ।

উপাংশু—দেবতার প্রতি মনোনিবেশ করে জিব ও ঠোঁট অল্পচালিত করে মন্ত্র উচ্চারণ করা। নিজে ছাড়া এ মন্ত্র অপরে শুনতে পায় না। এর নাম উপাংশু জপ।

উপাকরণ—সংস্কারপূর্বক বেদপাঠ বা পশুবধ।

উপাঙ্গ—মীমাংসা, বৈশেষিক, ন্যায়, যোগ, সাংখ্য, বেদান্ত ইত্যাদি।

উপাধি—ন্যায় দর্শনে গুণবাচক শব্দ।

উপাধ্যায়—যিনি বেদের একদেশ বা ব্যাকরণাদি উপাঙ্গ শিক্ষা দিয়ে জীবিকা চালান। বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদির উপাধ্যায় অংশ বল্লাল সেনের দেওয়া উপাধি।

উপার্দ্ধরঙ্গ—হাসাবার জন্য এক প্রকার নাচ। শরীরের অর্দ্ধাংশ নাচান হয় বাকি অর্দ্ধাংশ নিশ্চল থাকে (বৌ. সা)।

উপালি—বৌদ্ধ মহাশ্রাবক। বুদ্ধের বিশিষ্ট শিষ্য। কপিলবস্তুতে নাপিতের ঘরে জন্ম। শাক্যদের সেবা করতেন। অনুরুদ্ধ প্রমুখ শাক্যদের সঙ্গে বুদ্ধের কাছে যান এবং বুদ্ধদেব সন্তুষ্ট হয়ে উপসম্পদা অর্থাৎ দীক্ষা দেন। বুদ্ধদেবের কাছে সমস্ত বিনয় পিটক শিক্ষালাভ করেন এবং বিনয়ধরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হন। বুদ্ধদেবের কাছে উপালির প্রশ্নগুলি এবং বুদ্ধদেবের উত্তরগুলি 'পরিবার' গ্রন্থের 'উপালিপঞ্চক' অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে। এই অধ্যায়ের কিছু অংশ হয়তো পরে যুক্ত হয়েছে। বিনয়ের সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা করে তিনি বিনয় সংগ্রহের ভার নিয়েছিলেন। কথিত আছে বুদ্ধদেবের জীবিত কালেই ভিক্ষুরা উপালির কাছে বিনয়ের শিক্ষা গ্রহণকে পরম শ্লাঘার বিষয় মনে করতেন। থের-গাথায় উপালির আত্মউৎকর্ষের বিবরণ আছে।

উপাশ্রয়—ভিক্ষুণীদের থাকবার জায়গা।

উপাসনা—অনুভূতি সহ পূজা। আনন্দ স্বরূপ ঈশ্বরে নিজের আত্মাকে ডুবিয়ে দেওয়া। উপাসনা দু রকম। নির্গুণ উপাসনা অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, লঘু, গুরু, সংযোগ, বিয়োগ, অবিদ্যা, জন্ম, মরণ, দুঃখাদি গুণ রহিত পরমাত্মাকে উপাসনা করা। সগুণ উপাসনা—সর্বগুণের আধার পরমাত্মাকে উপাসনা করা।

উপেক্ষা—মৈত্রী, করুণা, মুদিতা—এই তিন অবস্থা অতিক্রম করে যে অবস্থায় মানুষ সুখে বা দুঃখে অবিচলিত হয়ে শান্তভাবে অবস্থান করে (বৌ. সা)।

উপেন্দ্র—ইন্দ্রের ছোট ভাই। বিষ্ণু, বামন (দ্রঃ)। বিষ্ণু অদিতির গর্ভে বামন হয়ে জন্মান; নাম উপেন্দ্র।

উপোসথ—(বৈদিক উপবসথ)। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের একটি অবশ্য কর্তব্য অনুষ্ঠান। কৃষ্ণপক্ষ বা শুক্লপক্ষের অষ্টম, চতুর্দশ বা পঞ্চদশ দিনে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা মিলিত হয়ে 'পাতি-মোকখ্' (বৌদ্ধ দণ্ড ও প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ) আবৃত্তি করতেন; এবং অনুষ্ঠানের আগের দিনগুলিতে কোন দোষ করলে সেই দোষ স্বীকার করে পাপমুক্ত হতেন। অর্থাৎ এটি যেন একটি শুদ্ধি অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান কেন্দ্র থেকে তিন যোজন পর্যন্ত (প্রায় ২৪ কি, মি,) একটি আবাসের পরিধি ধরা হত; অর্থাৎ এই বিস্তীর্ণ স্থানে একটি অনুষ্ঠানই হত। যে বিহারে থের বাস করতেন সেই বিহারেই উপোসথ-সভা বসত। কথিত আছে রাজা বিম্বিসারের পরামর্শে বুদ্ধদেব এই অনুষ্ঠান চালু করেছিলেন।

বৈদিক, জৈন ও প্রাক্ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যেও মোটামুটি এই জাতীয় অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল। তাঁরাও ঐ একই তিথিতে মিলিত হতেন এবং সন্ন্যাসী ও পরিব্রাজকরা ধর্ম আলোচনা করতেন। একই 'আবাসের' ভিক্ষুদের একটি অনুষ্ঠানে বাধ্যতামূলক ভাবে যোগ দিতে হত।

উপ্পলবণ্ণা—বৌদ্ধ মহাশ্রাবিকা। বুদ্ধের দুই প্রধান শিষ্যার একজন। শ্রাবস্তীর এক শ্রেষ্ঠী কন্যা। দেহের রং নীলপদ্মগর্ভের বর্ণের মত ছিল বলে নাম উপ্পলবণ্ণা। বহু রাজপুত্র বা শ্রেষ্ঠিপুত্র তাঁকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু তিনি সংসার ত্যাগ করে ভিক্ষুণী সংঘে যোগ দেন। এক দিন একটি দীপ জ্বেলে দীপের শিখা সম্বন্ধে ক্রমাগত চিন্তা করতে করতে অর্হত্ব লাভ করেন। ঋদ্ধি (অনৈসর্গিক শক্তি) সম্পন্না ভিক্ষুণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা ছিলেন। মারকে তিনি পরাজিত করেছিলেন। উপ্পলবণ্ণা কিন্তু তাঁর মাতুল-পুত্রের হাতে উৎপীড়িতা হলে বুদ্ধদেব সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষুণীদের বনে বাস নিষিদ্ধ করে দেন।

উভয়বেদান্ত—দ্রাবিড় বেদান্ত এবং সাধারণ বেদান্ত মিলে অভিহিত। রামানুজ এই নামটি চালু করেন।

উভয়ভারতী—মাহিষ্মতী নগরীর মীমাংসা দার্শনিক মণ্ডনমিশ্রের স্ত্রী। পিত্রালয় শোণ নদীর তীরে। বিভিন্ন কিংবদন্তীতে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। অদ্বৈতবাদ স্থাপনের জন্য শঙ্করাচার্য দিগ্বিজয়ে বার হয়ে কুমারিল ভট্টের নির্দেশে কুমারিল শিষ্য মণ্ডন মিশ্রের সঙ্গে দার্শনিক তর্ক সুরু করেন। এই সময় উভয়ভারতী

মধ্যস্থতার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। দীর্ঘকাল তর্কের পর মণ্ডনমিশ্র হেরে গেলে উভয়-ভারতী নিজে তর্কে অবতীর্ণ হন এবং কয়েক দিন আলোচনা করে তাঁকে পরাস্ত করতে না পেরে শেষ কালে কামশাস্ত্র বিষয়ে তর্ক করতে চান। শঙ্করাচার্য আজীবন ব্রহ্মচারী; কামশাস্ত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। ফলে এক বছর সময় চেয়ে নেন। তারপর উভয়ভারতীকে পরাজিত করেন। তর্কের সর্ত অনুযায়ী এঁরা দুজনেই তখন শঙ্করাচার্যের শিষ্য হন।

উমা—উমার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় কেনোপনিষদে। সামনে আবির্ভূত 'পূজ্য-কে' জানাবার জন্য কয়েক জন দেবতা একে একে এগিয়ে আসেন। শেষ কালে ইন্দ্র আসেন। ইন্দ্র আসাতে ইনি অন্তর্হিত হন এবং তাঁর পরিবর্তে আকাশে সুশোভনা সুবর্ণালঙ্কার ভূষিতা 'উমা হৈমবতী' দেখা দেন এবং ইন্দ্রকে জানান যে যিনি অন্তর্হিত হয়ে গেলেন তিনি ব্রহ্ম। এই উমাই ব্রহ্মবিদ্যা। ইন্দ্রের ভক্তি দেখে উমারূপে দেখা দিয়েছিলেন (কেন ১।১২)।

বৈবস্বত মনুর অধিকার কালে হিমালয় ও সুমেরু দুহিতা মেনকার মেয়ে হয়ে জন্মান। বৃহৎ ধর্ম পুরাণ মতে জ্যৈষ্ঠ শুক্লা চতুর্থীতে জন্ম। কালিকাপুরাণ মতে নাম হয় পার্বতী। পূর্ব জন্মে পার্বতী দক্ষের মেয়ে সতী এবং শিবের স্ত্রী ছিলেন। বিষ্ণুচক্রে সতীদেহ খণ্ডিত হলে মহাদেব তপস্যায় মগ্ন হন। নারদ এই সময়ে হিমালয়কে জানিয়ে যান পার্বতীর সঙ্গে শিবের বিয়ে হবে। এই জন্য হিমালয়ের একান্ত অনুরোধে মহাদেব পার্বতীকে তাঁর আরাধনা করতে অনুজ্ঞা দেন। এদিকে তারকাসুরের উৎপাতে ইন্দ্রাদি দেবতারা ব্রহ্মার শরণ নেন এবং জানতে পারেন মহাদেবের ছেলে কার্তিকের হাতে তারকাসুর মারা পড়বেন। দেবতারা তখন পার্বতীর সঙ্গে মহাদেবের বিয়ে দেবার জন্য মদনকে পাঠিয়ে মহাদেবের তপস্যা ভঙ্গ করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু মহাদেব বিরক্ত হয়ে অন্যত্র চলে যান। পার্বতী তখন শোকে ও লজ্জায় অভিভূত হয়ে মহাদেবকে পাবার জন্য কঠোর তপস্যা করতে থাকেন। এই কঠোর তপস্যা দেখে মেনকা উ (= না) অর্থাৎ ওরে না, বা এত তপস্যা কর না বলেছিলেন। ফলে পার্বতীর নাম হয় উমা। এই সময় আর এক নাম হয় অপর্ণা (দ্রঃ)। শেষ পর্যন্ত মহাদেব সন্তুষ্ট হয়ে বিয়েতে মত দেন এবং সপ্তর্ষিরা হিমালয়ের কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসেন এবং বিয়ে হয়। রামায়ণ (১।৩৫।১০) গঙ্গা বড়, উমা ছোট। দ্রঃ- কার্তিক।

এক দিন হিমালয়ে মহাদেবের সঙ্গে উমা বিহার করছিলেন এমন সময় কুবেরের দৃষ্টি এই দিকে পতিত হওয়ায় কুবের একপিঙ্গল (দ্রঃ) হয়ে পড়েন। উমার দেহ-সম্ভূতা কৌষিকী যোগনিদ্রা মহাদেবের নির্দেশে যশোদার মেয়ে হয়ে জন্মান। উমার দেহ থেকে এক মুদ্গর সৃষ্টি হয় এবং তাতে শুম্ভ নিশুম্ভ নিহত হয় (হরি ২।১০৬।৩৮)। পরে এই মুদ্গর শম্বরকে দেওয়া হয়েছিল। লিঙ্গপুরাণ, হরিবংশ, মৎস্যপুরাণ, বায়ুপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, বৃহদ্ধর্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, দেবীভাগবত, কালিকাপুরাণ, শিবপুরাণ, বামনপুরাণ ও মহাভারতে শান্তিপর্বে সতী ও উমা কাহিনী উল্লিখিত আছে। কাহিনী সর্বত্র প্রায়ই এক। কালিকাপুরাণের ঘটনা বিস্তৃততম। দ্রঃ- পার্বতী।

উমাচতুর্থী—উমার জন্ম তিথি। জ্যৈষ্ঠ শুক্লাচতুর্থী। দ্রঃ- পার্বতী।

উমাস্বামী/স্বাতি—১৩৫-২১৯ খৃঃ। বিখ্যাত জৈন নৈয়ায়িক। মায়ের নাম উমা-বাৎসী, পিতা স্বাতি। সেই জন্য অন্য নাম উমাস্বাতি। মূলতঃ ঘোষনন্দি ক্ষমাশ্রমণের শিষ্য। দিগম্বররা এঁকে কুন্দকুন্দাচার্যের শিষ্য বলেন। এঁর কয়েকটি উপাধি গৃধ্রপিচ্ছ, বাচকশ্রমণ, বাচকাচার্য। পাঁচশত মত গ্রন্থ লিখেছিলেন। একমাত্র তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র পাওয়া যায়; এটি পাটলিপুত্রে সংস্কৃত ভাষাতে রচনা। শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর দুই সম্প্রদায়ই এই গ্রন্থের বহু টীকা রচনা করেন।

উম্লোচা—এক জন অপ্সরা।

উরগ—কদ্রুর সন্তান। নাগেরা সুরসার সন্তান (রামা ৩।১৪।২৮)।

উরগপুর—উরয়িয়ুর, ত্রিচিনোপল্লি (দ্রঃ)। খৃঃ ৬-শতকে পাণ্ড্য রাজধানী। মল্লিনাথ একে নাগপুর বলেছেন। এই নাগপুর=নাগপত্তন; কান্যকুব্জ (কোলেরুন) নদীর তীরে। অর্গরু (পেরিপ্লাসে)। আর এক মতে উরয়িয়ুর=কোরি=ত্রিচিনোপল্লি—চোল রাজধানী। পবনদূতে উরগপুর=ভুজঙ্গনগর; তাম্রপর্ণী নদীর তীরে।

উরনজির—বিপাসা। হয়তো এরিয়ানের সরঞ্জেস।

উরশ্চক্র—পাপীর শাস্তির জন্য সুন্দর-হারের মত দেখতে পাথরের চাকা। পাপীর গলায় পরিয়ে দিলে ঘুরতে থাকে; এবং চাকার ধারে দেহ ক্ষত-বিক্ষত হতে থাকে। (বৌ. সা)।

উরসা—ঝিলম ও সিন্ধুর মধ্যে কাশ্মীরের পশ্চিমে হজর দেশ। অর্স (টলেমি, উ-ল-সি হিউ-এন-ৎসাঙ)। আর এক মতে কাশ্মীর থেকে তিন দিনের হাঁটা পথে গুরেজ বা গুরেইস উপত্যকা; দরদ দেশের রাজধানী। মৎস্য পুরাণে দরদ ও উরসা বিভিন্ন দেশ। আর এক মতে কাশ্মীরের উ-পূর্বে মোজাফরবাদের পশ্চিমে 'রাস' জেলা।

উরুবিল্ব—উরবিল্ব, মহাবোধি, পালি উরুবেলা। গয়ার ৬।৭ মাইল দক্ষিণে প্রাচীন মগধরাজ্যের নিরঞ্জনা (=ফল্গু) নদীর তীরবর্তী অঞ্চল। বৌদ্ধগয়া। এখানে সেনানিগামে ৩৬ বছর বয়সে ৫২২ খৃ-পূর্বে বুদ্ধদেব বোধিলাভ করেন। বিম্বিসার তখন ১৬ বৎসর রাজত্ব করছেন। এখানে বড় মন্দিরটির পশ্চিম দিকে বোধিবৃক্ষের নীচে বোধিলাভ করেন। মন্দিরটি খৃ-পূ ১ শতকে মতান্তরে খৃ ৬-শতকে নির্মিত। স্থানটিতে আগে অশোকের একটি বিহার ছিল। শঙ্কর ও মুদ্গরগামী (নালন্দার প্রতিষ্ঠাতা) এই মন্দির নির্মাণ করান। মুচিলিন্দ পুষ্করিণীর বর্তমানে নাম বুদ্ধকুণ্ড, মন্দিরটির দক্ষিণে। বোধিলাভের পর এই পুষ্করিণীর পশ্চিম তীরে বুদ্ধদেব সাত দিন বসে বসে চিন্তা করেছিলেন। বোধিলাভের পর বুদ্ধ যেখানে পায়চারি করেছিলেন সেই স্থানটির নাম চঙক্রমন/জগমোহন; স্থানটি মন্দিরের উত্তরে এবং রেলিং দিয়ে ঘেরা। মন্দিরের দক্ষিণে যে রেলিং রয়েছে এটি অশোকের সময়ে নির্মিত। বাগীশ্বরী (এটি আসলে বজ্রপাণির মূর্তি) মন্দিরের সামনের ঘরে যে গোল পাথরটি এটি বুদ্ধের বজ্রাসন; বোধিদ্রুমের নীচে এই পাথরটিতে বসে ধ্যান করতেন। এই বজ্রাসনটি বোধিবৃক্ষ ও মন্দিরটির মাঝখানে। কাছেই তারাদেবীর (এটি কিন্তু পদ্মপাণি-বিগ্রহ—ধ্যানীবুদ্ধ

অমিতাভের ছেলে) মন্দির রয়েছে। উদন্তপুর দ্রঃ। সিংহল রাজ মেঘবর্ণ বোধিদ্রুমের উত্তরে একটি বিহার খৃ ৪র্থ শতকের মাঝখানে তৈরি করে দিয়েছিলেন। দ্রঃ- গয়া। মজ্‌ঝিমনিকায়-এর অরিয়-পরিয়েসন সুত্তে উরুবিল্বের বর্ণনাঃ—'রমণীয় ভূমিভাগ, মনোহর বনখণ্ড, অদূরে স্বচ্ছসলিলা সতীর্থযুক্ত প্রবহমানা নদী ; এবং সব দিকে গোচর-গ্রাম। সাধনপ্রয়াসী কুলপুত্রের উপযুক্ত স্থান।' বুদ্ধত্ব অর্জনের আগে কৃচ্ছ্রসাধনের পথ বর্জন করলে তাঁর 'পঞ্চবগ্‌গীয়' ব্রহ্মচারীগণ উরুবিল্বতেই তাঁকে ত্যাগ করে চলে যান। সাধারণ অন্ন গ্রহণ করবেন ঠিক করলে সেনানিগাম অধিবাসিনী সেনানীকন্যা সুজাতা তাঁকে পায়সান্ন দেন। বুদ্ধত্ব লাভের পর গৌতম এখানে অজপাল বটবৃক্ষ, মুচলিন্দ বৃক্ষ, ও রাজায়তনে গাছের নীচে কিছুদিন বাস করেছিলেন। পরে এই স্থানগুলিতে অনিমিস চৈত্য, রতনচংকম চৈত্য ও রতনঘর চৈত্য স্থাপিত হয়। উরুবিল্ব থেকে বুদ্ধদেব ইসিপতনে (সারনাথ) যান এবং ৬১ জন অর্হৎকে ধর্ম প্রচারের জন্য বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করে আবার উরুবিল্ব ফেরার পথে কপ্‌পাসিক বনে গিয়ে ভদ্দবগ্‌গীয় নামে যুবকদের দীক্ষা দেন। এরপর উরুবিল্বে ফিরে এসে এখানে জটিল তপস্বী তিনভাই উরুবেল কস্‌সপ, নদী কস্‌সপ ও গয়া-কস্‌সপ ও তাঁদের হাজার শিষ্যকে নিজের বিভূতি প্রভাবে মুগ্ধ করে দীক্ষা দেন।

উরুবেলা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বালির চড়া। কাহিনী আছে বুদ্ধের আগে দশহাজার তপস্বী এখানে বাস করতেন এবং তাঁদের রীতি ছিল তাঁদের কারো মনে কোন অসৎ চিন্তা এলে এক ঝুড়ি বালি এনে নির্দিষ্ট একটি জায়গায় ফেলতে হবে। ফলে এই বালি চড়ার সৃষ্টি। মহাবস্তু অবদান মতে উরুবিল্বের সেনানিগামের নাম সেনাপতি গ্রাম এবং এই গ্রামের পাশেই প্রস্কন্দক, বলাকল্প, উজ্জঙ্গল, ও জঙ্গল নামে আরো চারটি গ্রাম ছিল। মোট এই পাঁচটি গ্রাম মিলে উরুবিল্ব।

উরুবেল কস্‌সপ— দ্রঃ- উরুবিল্ব। এক জন বৈদিক তপস্বী ; নিরঞ্জনা নদী তীরে বৈদিক ক্রিয়াকর্মে জীবন কাটাতেন। এঁর নিষেধ সত্ত্বেও বুদ্ধদেব এখানে এক রাত্রি বিষধর সর্প-পূর্ণ যজ্ঞগৃহে কাটান এবং দুটি সাপকে বশীভূত করেন। কস্‌সপ তখন তাঁর দৈনিক আহারের ব্যবস্থা করেন। বুদ্ধদেব তারপর আরো অনেক আশ্চর্য কাজ করায় কস্‌সপ সশিষ্য বুদ্ধের শরণ নেন এবং অর্হত্ব পান। রাজগৃহে যাবার পথে এই শিষ্যরা অপর অনেককে সংঘভুক্ত করেন।

উরুমুণ্ড পর্বত—মথুরাতে একটি কৃত্রিম পর্বত ; কঙ্কালি টিলা। এখানে উপগুপ্তের গুরু শাণবাস থাকতেন। পাটলিপুত্রে আসার আগে উপগুপ্তও এখানে থাকতেন। রুরুমুণ্ড পর্বত।

উর্জগুণ্ড—দরদ দেশের কাছে উর্জগুণ্ডদের দেশ। কাশ্মীরে কিষেণগঙ্গা উপত্যকার ওপর অংশ। রাজধানী ছিল যেন গুরেজ/গরেস। (২) যেন খিব (দ্রঃ)।

উর্জস্কর অগ্নি—পাঞ্চজন্য (দ্রঃ) তপের একটি ছেলে। সুবর্ণ সদৃশ প্রভা। হব্যবাহ।

উর্ণনাভ—নাট্যশাস্ত্রে আটাশ প্রকার হস্তাভিনয়ের অন্তর্গত পদ্মকোষ হস্তের

বজ্রাঙ্গুলি। হিরণ্যকশিপুর দেহ চিরে ফেলবার সময় নরসিংহের অঙ্গুলগুলি যে অবস্থায় ছিল।

ঊর্ব—(১) পাণ্ডব বংশীয় পুরঞ্জয়ের ছেলে। কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মার সমান তেজস্বী হয়েছিলেন। একবার নিজের উরুতে হুতাশন প্রবিষ্ট করিয়ে তপস্যা করছিলেন। এমন সময় হঠাৎ উরু ভেদ করে আগুন বার হয়। এই আগুনের নাম হয় ঊর্ব অনল। ব্রহ্মা এই আগুনকে সমুদ্রে স্থাপন করেন। অন্য মতে বংশ রক্ষার জন্য দেবতারা এঁকে বিয়ে করতে বলেন। কিন্তু ইনি বিয়ে না করেই আগুনে উরু-মন্থন করে ঔর্ব নামে এক পুত্রের জন্ম দেন। (২) ভৃগু বংশে জন্ম। চ্যবনের ছেলে; ঋচীকের পিতা। ত্রিলোক পুড়িয়ে ফেলার জন্য ভীষণ আগুন সৃষ্টি করেছিলেন। পরে সমুদ্রে এই আগুন সমর্পণ করেন।

ঊর্বরা—জনৈক অপ্সরা।

ঊর্বরীয়ান—ক্ষমার (দ্রঃ) ছেলে।

ঊর্বশী—স্বর্গের অতি সুন্দরী অপ্সরা। ঋক, অথর্ব, শুক্লযজু, শতপথ-ব্রাহ্মণ, বৃহৎ-দেবতা, বোধায়ন-শ্রৌত-সূত্র, মহাভারত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, শ্রীমৎভাগবৎ ও কথাসরিৎসাগরে এঁর কাহিনী বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়ান রয়েছে। এগুলির মধ্যে ঋক্‌বেদের সংবাদ সূক্তের কাহিনী প্রাচীনতম।

নারায়ণের (ঋষি) উরু ভেদ করে জন্ম তাই নাম উর্বশী। উরুকে (=মহাপুরুষকে) যে বশ করেন তিনি উর্বশী। অন্য মতে সমুদ্র মন্থনে অপ্সরাদের সঙ্গে উঠেছিলেন। আর এক মতে সাতজন মনু এঁকে সৃষ্টি করেছিলেন। অন্য মতে নরনারায়ণ (দ্রঃ) ঋষি এঁকে সৃষ্টি করেছিলেন। অনুচানা, অদ্রিকা, অলম্বুষা, অম্বিকা, অসিতা, ক্ষাম্যা, ক্ষেমা, তিলোত্তমা, পুণ্ডরীকা, প্রমাথিনী, বিদ্যুৎপর্ণা, মিশ্রা, মরীচি, রম্ভা, শুচিকা, শরদ্বতী, সোমকেশী, সুবাহু, সুপ্রিয়া, সুগন্ধা, সুরমা ইত্যাদির মধ্যে গায়িকা হিসাবে ২১-শ স্থান (শ্রী-প্রে ১।১১২।৬৫); সুন্দরী হিসাবে প্রথম স্থান।

শতপথে ও পুরাণে আছে পুরূরবা (দ্রঃ) ইন্দ্রের সভায় নাচ দেখতে এসেছিলেন। উর্বশীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকাতে উর্বশীর তালভঙ্গ হয়। ফলে ইন্দ্রের শাপে উর্বশীকে মর্ত্যে এসে বাস করতে হয় এবং পুরূরবার স্ত্রী হন। হরি বংশে ব্রহ্মার শাপে আর এক মতে মিত্রাবরুণের শাপে মানুষ হয়ে জন্মাতে হয়। পুরূরবার খ্যাতি শুনে রাজপ্রাসাদে এসে দেখা করেন এবং রাজাও মুগ্ধ হয়ে যান; বিয়ে করতে চান।

শতপথ ব্রাহ্মণে (১১।৫।১) দিবাভাগে মিলন হবে না; অকামা অবস্থাতেও নয় এবং নগ্ন দর্শন করবেন না উর্বশীর তিনটি সর্ত ছিল। বামন পুরাণে (২।১।৪) উর্বশী স্বেচ্ছায় রাজাকে বিয়ে করেন, এবং বহু দিন দেবাধ্যুষিত অরণ্য প্রদেশে দুজনে এক সঙ্গে বাস করার পর ব্রহ্মশাপে উর্বশী মানবদেহ প্রাপ্ত হন। এই সময়ে নিজের মুক্তির উদ্দেশ্যে নিয়ম করেন দিনে তিনবার মত রাজা তাঁকে আলিঙ্গন করতে পারবেন; অকামা অবস্থাতে মিলন হবে না, রাজাকে নগ্নদর্শন করবেন না; শয়নকক্ষে দুটি মেষ থাকবে, উর্বশী পুত্রবৎ তাদের পালন করবেন এবং রাজাকেও এদের যত্ন করতে হবে। উর্বশী একসন্ধ্যা কেবল

ঘৃত ভোজন করবেন—ঘৃতস্য স্তোকং সকৃৎ অহ্নে আশ্নাং (ঋক্)। এইভাবে এ'রা ৬৪ বছর, হরি বংশে ৫৯ বছর ; ঋক্ বেদে চার বছর (রাত্রীঃ শরদঃ চতস্রঃ) এ'রা স্বামী-স্ত্রী রূপে কাটাবার পর দেবলোকে এদিকে উর্বশীর অভাবে ভীষণ অসুবিধা দেখা দিলে উর্বশীকে ফিরিয়ে আনার জন্য ইন্দ্র গন্ধর্বদের নির্দেশ দেন। গন্ধর্বরাজও উর্বশীর অভাবে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন।

একদিন মধ্য রাত্রিতে গন্ধর্ব বিশ্বাবসু উর্বশীর মেষশিশু দুটি পর পর চুরি করলে এদের চিৎকারে উর্বশী বিচলিত হয়ে ঘুমন্ত রাজাকে কটূক্তি করেন এবং ভেড়া খুঁজে আনবার জন্য ডাকেন। রাজা ধড়মড়িয়ে উঠে উলঙ্গ অবস্থাতেই ধনুর্বাণ নিয়ে ছুটে যান এবং গন্ধর্বরা এই সময় বিদ্যুৎ চমকের ব্যবস্থা করে বা গন্ধর্ব মায়াতে প্রাসাদ আলোকিত করে তুললে উলঙ্গ রাজাকে দেখে উর্বশী শাপমুক্ত হয়ে যান। গন্ধর্বরা মেষদুটি ফেলে যান এবং রাজা এ দুটিকে ফিরিয়ে আনেন। ঋক্‌বেদে সংবাদসূক্ত অনুযায়ী উর্বশী ৪ বছর ছিলেন এবং গর্ভবতী হবার সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্হিত হয়ে যান।

এই বিচ্ছেদের কারণ পুরূরবার প্রতি অনেকগুলি শাপ ছিল। পরে এদের মিলন হয়েছিল কিনা বৈদিক সাহিত্যে নাই। ঋক্ বেদে রাজার কাতর অনুনয় ও উর্বশীর সান্ত্বনার বিখ্যাত শ্লোকটি ন বৈ স্ত্রৈণানি সখ্যানি সন্তি সালাবৃকাণাং হৃদয়ানি এতা (ঋক্ ১০।৯৫।১৫) রয়েছে। শোকে রাজা ভগ্নস্বাস্থ্য হয়ে পড়েন এবং দেশে দেশে উর্বশীকে খুঁজতে থাকেন। এক দিন শেষ পর্যন্ত একটি সরোবরে অন্যান্য অপ্সরাদের সঙ্গে তাঁকে খেলা করতে দেখেন। রাজা অনেক অনুনয় বিনয় করেন। আত্মহত্যার ভয় দেখান কিন্তু উর্বশী ফেরেন না। অন্য মতে রাজা কুরুক্ষেত্রের কাছে হংসী দেহধারী চারজন অপ্সরার সঙ্গে উর্বশীকে স্নান করতে দেখে তাঁকে ফেরাবার জন্য বার বার অনুরোধ করেন।

হরিবংশে (১।২৬।৩২) কুরুক্ষেত্রে প্লক্ষতীর্থে হৈমবতী পুষ্করিণীতে পঞ্চসখীসহ জলক্রীড়া করছেন দেখতে পান। রাজার প্রার্থনায় উর্বশী জানায় সে গর্ভবতী। এক বৎসর পরে সন্তান হলে রাজাকে দিয়ে যাবেন এবং প্রতি বৎসর এক রাত্রি রাজার সঙ্গে বাস করবেন বলে চলে যান। এক বৎসর পরে উর্বশী আসেন এবং এক রাত্রি বাস করেন। রাজা কিন্তু স্থায়ীভাবে কামনা করেন। উর্বশী পরামর্শ দেন গন্ধর্বরা রাজি আছেন, গন্ধর্বদের কাছ থেকে তাঁকে চেয়ে নিতে। গন্ধর্বরা রাজার প্রার্থনা পূরণ করেন। উর্বশী রাজাকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন গন্ধর্বদের সমান হবার বর চাইতে (হরি ১।২৬।৪০)। গন্ধর্বরা একটি অগ্নিপূর্ণ পাত্র দিয়ে যজ্ঞ করতে বলেন। রাজা ছেলেদের ও আগুন নিয়ে স্বপুরে ফেরার পথে এক জায়গায় আগুন রেখে দিয়ে আসেন এবং ফিরে এসে স্থানটিতে একটি অশ্বত্থ গাছ দেখতে পান এবং গন্ধর্বদের উপদেশ মত এই অশ্বত্থ গাছের অরণি মাধ্যমে অগ্নি জ্বেলে তিন ভাগ করে যজ্ঞ করে গন্ধর্বদের সমান হন। অর্থাৎ আগে অগ্নি এক ছিলেন পুরূরবা তিন ভাগ করেন।

কথাসরিৎসাগরে রাজা বদরিকাশ্রমে বিষ্ণুর তপস্যা করতে থাকেন। উর্বশীও রাজার জন্য কাতর হয়ে পড়েছিলেন। তপস্যাতে বিষ্ণু সন্তুষ্ট হন এবং গন্ধর্বরা উর্বশীকে

ফিরিয়ে দেন। ঠিক হয় বছরে একবার দুজনের মিলন হবে। সারারাত্রি এই দিকে রাজার কাছে থাকবেন। এরপর প্রতি বছরে এ'দের মিলন হয়েছিল এবং ৫-টি অন্য মতে ৭-টি ছেলে হয়েছিল। প্রথম ছেলে আয়ু। এরপর বিশ্বায়ু, শতায়ু, বলায়ু, (বনায়ু?) দৃঢ়ায়ু, শ্রুতায়ু ও অমাবসু ছেলে হয়েছিল। ভাগবতে (৯।১৫) শ্রুতায়ু, আয়ু, সত্যায়ু, রয়, বিজয়, জয়। ভাগবতে (৯।১৪) মিত্রাবরুণের শাপে মানবী উর্বশী পুরূরবার গুণ শুনে নিজে আসেন। উর্বশীর অভাবে ইন্দ্র গন্ধর্বদের পাঠান ইত্যাদি। কুরুক্ষেত্রে দেখা হলে উর্বশীর কথায় গন্ধর্বদের স্তব করলে অগ্নিপূর্ণ স্থালী পান। রাজা অগ্নিস্থালী নিয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াতে থাকেন এবং এক জায়গায় এটি ফেলে রেখে প্রাসাদে ফিরে আসেন। ক্রমশ ত্রেতা যুগ আরম্ভ হয়। রাজার মনে তিনটি বেদ স্ফুট হয়ে ওঠে। রাজা তারপর বনে ফিরে এসে দেখেন একটি শমী বৃক্ষের মধ্যে একটি অশ্বথ গাছ হয়েছে। এই গাছের ডালে (তেন দ্বে) দুটি অরণি তৈরি করে উর্বশীলোক কামনা করে অগ্নি প্রজ্বলিত করেন; এই অগ্নির নাম জাতবেদস্—এটি তারপর দক্ষিণাগ্নি ইত্যাদি তিনটি আগুনে বেদ অনুসারে ভাগ হয়ে যায়। যজ্ঞেশ বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করেন। এই অগ্নিরূপ পুত্র সাহায্যে পুরূরবা গন্ধর্ব লোক প্রাপ্ত হন।

শ্রীমৎভাগবৎ অনুসারে নরনারায়ণ (দ্রঃ) ঋষির উরু থেকে জন্ম। বৃহৎ দেবতায় আছে মিত্রাবরুণ আদিত্য যজ্ঞে নিমন্ত্রণে এসে উর্বশীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যান এবং দুজনেরই বীর্য স্খলিত হয়। দেবতা দুজন এতে ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দেন উর্বশী পৃথিবীতে নির্বাসিত হয়ে থাকবেন। পৃথিবীতে এসে উর্বশী পুরূরবার স্ত্রী হন। মিত্রাবরুণের স্খলিতবীর্য কুম্ভে পতিত হলে সেই বীর্যে অগস্ত্য ও বশিষ্ঠ জন্মান। পদ্মপুরাণে আছে বিষ্ণু একবার ধর্মপুত্র হয়ে গন্ধমাদনে তপস্যা করছিলেন। ইন্দ্র ভয়ে অপ্সরা, বসন্ত ও কামদেবকে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু এ'রা বিষ্ণুর ধ্যান ভাঙতে পারেন না। তখন কামদেব অন্য মতে ইন্দ্র অপ্সরাদের উরু থেকে অন্য মতে ইন্দ্র নিজের উরু থেকে উর্বশীর সৃষ্টি করে বিষ্ণুর তপস্যা ভঙ্গ করেন। এই জন্য সন্তুষ্ট হয়ে এবং উর্বশীর রূপে মুগ্ধ হয়েও বটে ইন্দ্র এ'কে গ্রহণ করলেন। পরে মিত্রাবরুণ উর্বশীকে চান কিন্তু উর্বশী এ'দের প্রত্যাখ্যান করেন। এর ফলে মিত্রাবরুণের অভিশাপে উর্বশী মনুষ্যভোগ্যা হয়ে পুরূরবার স্ত্রী হন।

স্কন্দপুরাণে আবন্ত্যখণ্ডে আছে বদরিকাশ্রমে নরনারায়ণের তপস্যা ভঙ্গ করার জন্য ইন্দ্র অপ্সরাদের পাঠান; এরা ব্যর্থকাম হয়; নর (৮।৩৩) তখন নিজের উরু থেকে এদের থেকেও সুন্দরী একটি নারীকে জন্ম দেন। বামনপুরাণে মদন ভস্মের পর এই ঘটনা ঘটে এবং তারপর এই নারী অর্থাৎ উর্বশীকে এ'রা ইন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে দেন। কালিকা-পুরাণে (৬৯।৩৪-৩৭) উর্বশী কামাখ্যা দেবীর সহচরী; ভস্মকূটের দক্ষিণে অবস্থান করেন এবং দেবীর যোনিমণ্ডলে অমৃতসেক করেন।

আয়ুর বংশে পুরু জন্মান ফলে উর্বশী পৌরব বংশের জননী। অর্জুন যখন দিব্যাস্ত্র লাভের জন্য ইন্দ্রলোকে যান তখন ইন্দ্রের আদেশে উর্বশী একদিন অর্জুনের মনোরঞ্জন করতে আসেন। কিন্তু পুরূরবার স্ত্রী বলে শ্রদ্ধার সঙ্গে অর্জুন উর্বশীকে

ফিরিয়ে দেন। উর্বশী বোঝাতে চেষ্টা করেন কিন্তু বিফল হয়ে শেষ পর্যন্ত অভিশাপ দেন এই প্রত্যাখ্যানের জন্য অর্জুনকে এক বৎসর নপুংসক হয়ে কাটাতে হবে। বিক্রম উর্বশী নাটকে কালিদাসের মতে কেশী দৈত্য উর্বশীকে হরণ করেন। পুরূরবা তাঁকে উদ্ধার করলে দুজনে প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়েন। স্বর্গে একদিন অভিনয় কালে ভুল করে উর্বশী পুরূরবার নাম উল্লেখ করাতে শাপগ্রস্তা হয়ে মর্ত্যে এসে রাজার স্ত্রী হন। পুত্র-মুখ দেখার পর শাপমোচন হয়। পরে নারদের বরে উর্বশী ও পুরূরবার মিলন চিরস্থায়ী হয়। অগস্ত্যের (দ্রঃ) শাপে উর্বশী মাধবী হয়ে জন্মান। দ্রঃ- উন্মদা, মিত্রাবরুণ, অষ্টবক্র।

পণ্ডিতদের মতে বেদের এই আদি কাহিনীতে সূর্য ও উষার মিলন কাহিনীর সন্ধান মেলে। বা মর ও অমরের ভালবাসার রূপক। অন্য মতে পুরূরবা সূর্য এবং উর্বশী প্রভাতের কুয়াসা। সূর্যের আলো ফুটলেই কুয়াসা মিলিয়ে যায়। অপ্সরারা কুয়াসার প্রতীক; তারা কুয়াসা বা মেঘরূপে সূর্য কর্তৃক আকৃষ্ট হয়।

(২) যে হেতু গঙ্গা শন্তনুর পিতার উরুতে বসেছিলেন সেই হেতু গঙ্গার এক নাম।

উর্বশী তীর্থ—ভগীরথ দান করছিলেন, জনতার ভীষণ ভিড়। গঙ্গা ভগীরথের কোলে গিয়ে বসেন ফলে কন্যাস্থানীয়া হন; নাম হয় উর্বশী, অন্য নাম হয় ভাগীরথী। স্থানটির নাম হয় উর্বশী তীর্থ (কা-প্র ৭।৬০)।

উলু—আরব্য উপন্যাসে বেশ কয়েক স্থানে উলু দেবার ঘটনা আছে; যথা ২০৯ রাত্রিতে ইত্যাদি। তং জায়মানং ঘোষাঃ উলূলবঃ উদতিষ্ঠন্ (ছান্দো্য ২৭৯); অথর্ব বেদে উলুলয়ঃ (উলুলি শব্দ) এই অর্থে ব্যবহৃত। শঙ্কর বলেছেন উরুরবঃ=বিস্তীর্ণ রব; আনন্দগিরি বলেছেন উৎসবধ্বনি।

উলুর হ্রদ—অরবালো দ্রঃ।

উলূক—(১) শকুনির ছেলে। দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে ছিলেন। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের আগে দুর্যোধনের দূত হয়ে পাণ্ডবদের কাছে এসেছিলেন; কটূক্তি করে যান। অর্জুন জানিয়ে দিয়েছিলেন যুদ্ধে গাণ্ডীবের সাহায্যে দুর্যোধনের এই সংবাদের উত্তর তিনি পাঠিয়ে দেবেন। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করেছিলেন। দ্রোণের মৃত্যুর পর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যান। যুদ্ধে ১৮ দিনের দিন সহদেবের ভল্লের আঘাতে মারা যান। (২) কূর্মপুরাণে একজন মহর্ষি। (৩) এক জন যক্ষ। (৪) বিশ্বামিত্রের এক ছেলে। শর শয্যায় শায়িত ভীষ্মের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।

উলূপী—ঐরাবত (দ্রঃ) বংশে কৌরব্য নাগের মেয়ে (মহা ১।২০৬।১৮)। স্বামী গরুড়ের হাতে মারা যান। অর্জুন (দ্রঃ) যখন বার বৎসর বনবাসী ছিলেন সেই সময়ে একদিন গঙ্গায় স্নান করতে নামলে কামাতুরা উলূপী ওঁকে পাতালে নাগলোকে টেনে নিয়ে যান। অর্জুন এখানে অগ্নিতে আহুতি দিয়ে নিত্যকর্ম শেষ করে উলূপীকে কারণ জানতে চান। নাগকন্যা জানান অর্জুনকে সে বিয়ে করতে চায়; না হলে আত্মহত্যা করবে। অর্জুন বাধ্য হন; সেই রাত্রি নাগভবনে বাস করে পর দিন উঠে আসেন

(মহা ১।২০৬।-)। উলূপী অর্জুনকে বর দেন জলে অর্জুন অজেয় হবেন এবং সমস্ত জলচর জীব অর্জুনের বশীভূত হবে। উলূপীর ছেলে ইরাবান। অশ্বমেধের ঘোড়া নিয়ে অর্জুন মণিপুরে এলে বভ্রুবাহন পিতাকে অভ্যর্থনা করতে আসেন। কিন্তু অর্জুন ছেলেকে ক্ষত্রিয়োচিত কাজ করতে বলায় এবং আর এক দিকে উলূপীর প্ররোচনায় বভ্রুবাহন যজ্ঞাশ্ব অবরোধ করেন এবং যুদ্ধ হয়। বভ্রু বাণবিদ্ধ হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় এবং (মহা ১৪।৭৮।৩৬) অর্জুন ছেলের হাতে নিহত হন। এই মৃত্যুর মূল কারণ শিখণ্ডীকে সামনে রেখে ভীষ্মকে বাণবিদ্ধ করা। এই ভাবে ভীষ্মকে পরাজিত করার জন্য গঙ্গা ও অন্যান্য বসুরা অর্জুনকে নরকে যাবার শাপ দিয়েছিলেন। শাপের কথা জানতে পেরে উলূপী তৎক্ষণাৎ নিজের পিতাকে গিয়ে জানান এবং উলূপীর পিতা বসুদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন। ঠিক হয়েছিল বভ্রুবাহনের (দ্রঃ) হাতে অর্জুনকে একবার মৃত্যুবরণ করতে হবে। নাগলোক থেকে স্মরণ করে সংজীবনী দিব্যমণি এনে উলূপী স্বামীকে জীবিত করে দেন। উলূপী যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞে যোগদান করে-ছিলেন এবং কুন্তী, দ্রৌপদী ও সুভদ্রার সঙ্গে আলাপ করে যান ও নানা উপহার দেন। গান্ধারীকেও সেবা পরিচর্যা করেছিলেন। মহাপ্রস্থানের সময় উলূপী গঙ্গাতে প্রবেশ করেন।

উল্মুক—(১) হরিবংশে বৃষ্ণি বংশীয় রাজা। বলরামের (দ্রঃ) ঔরসে রেবতীর গর্ভে জন্ম। (২) ভাগবতে মনুর স্ত্রী নড্বলার ছেলে। ধ্রুববংশীয় রাজা।

উশনস্—ভৃগু মুনির ছেলে। পিতৃদত্ত নাম কাব্য। পরবর্তী যুগে অসুরগুরু শুক্রাচার্য হয়েছিলেন।

উশিক, উশিজ—কলিঙ্গ রাজমহিষী সুদেষ্ণার ধাত্রী। পুত্র লাভের আশায় রাজা স্ত্রীকে ঋষি দীর্ঘতমার (দ্রঃ) কাছে যেতে বলেন। কিন্তু রাণী এ'কে পাঠিয়ে দেন। দীর্ঘতমা এ ঘটনা জেনেও উশিজকে পুত্রদান করেন। ঋক্‌বেদে (১।১৮।১) এই ছেলের নাম কক্ষীবান্। পালক পিতার দিক থেকে কক্ষীবান ক্ষত্রীয় কিন্তু দীর্ঘতমার দিক থেকে ব্রাহ্মণ (মহা ১।১৮।২৭)।

উশিক—ঋক্‌বেদে এক ঋষি।

উশীনর—(১) যদু বংশের এক রাজা। বসুদেব পত্নী রোহিণীর ছেলে। (২) চন্দ্রবংশীয় রাজা। দ্রঃ- নহুষ। মহামনার ছেলে ও শিবির পিতা। ৫-টি স্ত্রী নৃগা, নরী, কৃমী, দশা ও দৃষদ্বতী ; এদের ছেলে যথাক্রমে নৃগ, নর, কৃমি, সুব্রত ও শিবি। যযাতি(১)-অনুদ্রুহ্যু (২)-সৃঞ্জয়(৫)-উশীনর(৬)>(৭) শিবি ও বেন (দেবী ভাগবত)। হরিবংশেও যযাতির বংশধর মহামনার দুই ছেলে তিতিক্ষু ও উশীনর। উশীনরের স্ত্রী (হরি ১৩১।২৭) নৃগা (ছেলে হয় নৃগ, যৌধেয় রাজা), কৃমী (ছেলে কৃমি, কৃমিলাপুরীতে রাজা), নবা (ছেলে নব, নবরাষ্ট্রে রাজা), দর্বা (ছেলে সুব্রত, অম্বষ্ঠ রাজা), দৃষদ্বতী (ছেলে শিবি, শিবি রাজ্য)। শিবির ছেলে বৃষদর্ভ, সুবীর, মদ্রক, কৈকয়। বিতস্তা নদীর তীরে নানা যজ্ঞ করে ইন্দ্রের চেয়ে/সমান শ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠেন। মহাভারতে (৩।১৩০।১৮) তীর্থযাত্রা কালে লোমশ কুরুক্ষেত্র মত স্থানে এসে এ'র কাহিনী বলেন। এ'কে (অন্য মতে শিবিকে)

পরীক্ষা করার জন্য অগ্নি কপোত রূপে এসে রাজার কোলে আশ্রয় নেন। পেছনে শ্যেনরূপী ইন্দ্র এসে ভক্ষ্য কপোতকে ফিরে চান। কিন্তু রাজা শরণাগতকে ছাড়তে রাজি হন না। কপোতের পরিবর্তে গো-বৃষ আদির মাংস (গী-প্রে ১৩।৩২।১৮) দিতে অঙ্গীকার করেন। শ্যেন রাজার দেহ থেকে কপোতের সমান ওজন মাংস চান। রাজা রাজি হন কিন্তু বারবার মাংস কেটে নিয়েও কপোতের সমান হয় না। রাজা তখন নিজেই তুলাদণ্ডে উঠে বসেন। রাজার এই ত্যাগে অগ্নি ও ইন্দ্র নিজেদের পরিচয় দিয়ে আশীর্বাদ করে যান তাঁর এই দানের কাহিনী পৃথিবীতে অক্ষয় হয়ে থাকবে। পরমুহূর্তে শিবি স্বর্গে যান (১৩।৩২।৩৪)। এই উশীনরের মেয়েকে (নাম্না জিনবতী ; মহা ১।৯৩।২১) উপহার দেবার জন্য বসু-দ্যু, স্ত্রীর কথায়, নন্দিনী গরুকে চুরি করেছিলেন। (৩) যযাতির মেয়ে মাধবীর স্বামী। দ্রঃ- উশীনর দেশ।

উশীনর দেশ—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ মতে মধ্য দেশ কুরুপাঞ্চালের নিকট একটি জনপদ। গোপথব্রাহ্মণে আছে বশ (পরবর্তীকালে বৎস) ও উশীনর গোষ্ঠী একত্র বাস করতেন। সম্ভবত ঋক্‌বেদের কালেও এঁরা এই দেশেই বাস করতেন। অনেকের মতে পরবর্তী যুগে কাশী ও বিদেহ গোষ্ঠী এঁদেরই বংশধর। পুরাণে আছে চন্দ্রবংশীয় আনব গোষ্ঠীর উশীনর (দ্রঃ) নামে এক রাজা পাঞ্জাবে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর ৫-ছেলের মধ্যে পরে রাজ্য ভাগ করে দেন। ছেলেদের মধ্যে শিবি মূলতানের সিংহাসনে বসেন। এই শিবি অন্য ভাইদের থেকেও প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং শিবিগোষ্ঠী স্থাপন করেন। পশ্চিম পাকিস্তানের মণ্টগোমারি জেলা ও বর্তমান বিকানির জেলার উত্তরাংশ নিয়ে নৃগ একটি পৃথক রাজ্য তৈরি করেন। যৌধেয়গণ এই বংশের সন্তান। নব 'নবরাষ্ট্রের' এবং কৃমি কৃমিলা সহরের রাজাদের পূর্বপুরুষ। 'সুব্রত' সম্ভবত পূর্বপাঞ্জাবে অম্বষ্ঠগণের আদিপুরুষ।

উশীনরগিরি—হরিদ্বারে সেওয়ালিক শাখা। এই পাহাড় পার হয়ে গঙ্গা সমতলে নেমেছে।

উশেক—যযাতি বংশে কৃতির ছেলে (ভাগ)।

উষঙ্গু—যদুবংশে এক রাজা। বৃজিনীবানের ছেলে ; চিত্ররথের পিতা (গী-প্রে ১৩।১৪৭।২৯)। সর্বদা যজ্ঞ করতেন বলে প্রসিদ্ধ।

উষীরবীজ—উত্তর ভারতে একটি পর্বত।

উষ্ণিক—(১) বৈদিক ত্রিপাদ ছন্দ। (২) লৌকিক চতুষ্পাদ সপ্তাক্ষর ছন্দ। (৩) সূর্যের একটি অশ্ব।

উষ্ণীনাভ—একজন বিশ্বদেব (গী-প্রে ১৩।৯১।৩৪)।

উষ্ণীষবিজয়া—বৈরোচন (দ্রঃ) কুল ; চৈত্যগর্ভে অবস্থান। বৌদ্ধ জনপ্রিয় দেবী। শ্বেতবর্ণ, তিন মুখ, তিন চোখ, যুবতী, সর্বালঙ্কারভূষিতা। দক্ষিণ মুখ পীত, বাম নীল। হাতে বিশ্ববজ্র, পদ্মস্থবুদ্ধ, বাণ, বরদ মুদ্রা, ধনু, পাশ-তর্জনী, অভয় মুদ্রা। পূর্ণকলস। দ্রঃ- দেবতা উষ্ণীষ।

উষ্মা—পাঞ্চজন্য (দ্রঃ)। পুরন্দর নামে অগ্নির একটি ছেলে। জীবের উষ্মা থেকে লক্ষিত হয় (মহা ৩।২১১।৪)।

উষ্মাপা—পিতৃগণ। এঁরা যমালয়ে বাস করেন।

ঊ

ঊরু—মনুর ছেলে। স্ত্রী আগ্নেয়ী। সন্তান অঙ্গ, সুমনস, খ্যাতি, ক্রতু, অঙ্গিরস, গয়।

ঊর্জ—(১) স্বারোচিষ মনুর ছেলে। স্বারোচিষ মন্বন্তরে সপ্তর্ষি ঊর্জ, স্তম্ভ, প্রাণ, রাম. পৃষভ, নিরয়, পরীবান (বিষ্ণু পু)। মার্কণ্ডেয় পুরাণে পৃষভ=ঋষভ; নিরয়=নিশ্চর; পরীবান=অর্ববীরান্।। (২) হেহয় বংশে বিখ্যাত জরাসন্ধের পিতামহ (অগ্নি-পু)

ঊর্জযোনি—বিশ্বামিত্রের এক ছেলে।

ঊর্জস্বতী—স্বায়ম্ভুব মনুর ছেলে প্রিয়ব্রত ও বিশ্বকর্মার মেয়ে সুরূপার দশটি ছেলে; এবং একটি মেয়ে ঊর্জস্বতী। এঁর স্বামী শুক্র; মেয়ে দেবযানী (যযাতির স্ত্রী)। দ্রঃ-বসু।

ঊর্জা—বশিষ্ঠের স্ত্রী। ছেলে রজস্, গোত্র, ঊর্দ্ধবাহু, সবন, অনঘ, সুতপস্, শুক্র। তৃতীয় মন্বন্তরে এঁরা সপ্তর্ষি (বিষ্ণু-পু)। ভাগবতে (৪।১।৩৭) চিত্রকেতু, সুরোচি, বিরজা, মিত্র, উল্বণ, বসুভৃদ্যান ও দ্যুমান্।

ঊর্জাণী—সূর্যকন্যা (ঋক্‌বেদ)।

ঊর্ণনাভ—সুদর্শন। ধৃতরাষ্ট্রের ছেলে; ভীমের হাতে নিহত হন।

ঊর্ণা—(১) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে মরীচির স্ত্রী। এঁর ছয়টি শক্তিমান পুত্র। ছেলেরা ব্রহ্মাকে দেখে বিদ্রূপ করেন বাপ হয়ে মেয়ে সরস্বতীকে বিয়ে করেছেন। ব্রহ্মা তখন এদের দৈত্য হয়ে জন্মাতে শাপ দেন। কালনেমির ছেলে হয়ে জন্মান। পরবর্তী জন্মে হিরণ্যকশিপুর সন্তান হয়ে জন্মান এবং ধার্মিক ভাবে জীবন যাপন করতে থাকেন। ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হয়ে বর দিতে চান এবং এঁরা অজেয় হবার বর চান। হিরণ্যকশিপুকে না জানিয়ে এই ভাবে বর চাওয়া হিরণ্যকশিপু সহ্য করতে না পেরে শাপ দেন পাতালে গিয়ে ষড়র্ভক হয়ে ঘুমিয়ে দিন কাটাবে। ছেলেরা কাতর হয়ে পড়লে হিরণ্যকশিপু তখন বলেন বহুদিন ঘুমাবার পর দেবকীর সন্তান হয়ে জন্মাবে এবং কালনেমি কংস হয়ে জন্মাবে এবং কংস এদের আছাড় মেরে হত্যা করবে। ভাগবতে (১০।৮৫) এদের নাম স্মর, উদগীথ, পরিষঙ্গ, পতঙ্গ, ক্ষুদ্রভুক্ ও ঘৃণি। শেষ কালে বলির কাছে ছিল। রাম ও কৃষ্ণ সুতলে গিয়ে এদের নিয়ে এসে দেবকীকে দেখিয়েছিলেন। ঘটনাটা যেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরে। এর পর এরা স্বর্গে যায় (দ্রঃ- ষট-গর্ভ দৈত্য)। (২) রোমাবর্ত। চক্রবর্তী যোগীর ভ্রূদ্বয়ের মাঝখানে সূক্ষ্ম, শুভ্রায়ত রোমাবর্ত। মহাপুরুষের চিহ্ন।

ঊর্দ্ধগপুর—(১) রাজা হরিশ্চন্দ্রের নগর। (২) পুর নামে অসুরের নগর।

ঊর্দ্ধতিলক—ঊর্দ্ধপুণ্ড্রক, ঊর্দ্ধফোঁটা। সম্প্রদায় বিশেষের কপালে চিহ্ন।

ঊর্দ্ধবাক্—একটি অগ্নি। বৃহস্পতির ৫ম পুত্র এই অগ্নি।

ঊর্দ্ধবাহু—(১) শৈব সন্ন্যাসী। এক বা দুহাত উ'চু করে অবস্থান করে থাকেন। জটাধারী। নির্দিষ্ট কোন বাসস্থান নাই। (২) বশিষ্ঠ ও ঊর্জার সন্তান।

ঊর্দ্ধরেতা—(১) যার বীর্য ঊর্দ্ধ'গামী, স্খলিত হয় না। ব্রহ্মচারী। (২) দক্ষযজ্ঞে সতী মারা গেলে মহাদেব নিজের বীর্যকে ঊর্দ্ধ'গত করেন। (৩) সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার ইত্যাদি ৮৮,০০০ ঋষি; এ'দের সকলেরই এই বিশেষণ ব্যবহৃত হয়।

ঊর্দ্ধাম্নায়—ব্যাস দেবের কাছে নারদ এই শাস্ত্র প্রকাশিত করেন। গুরুভক্তি মৎস্যাদি অবতার বর্ণনা, গৌরাঙ্গ মাহাত্ম্য, কৃষ্ণ পূজাবিধি, নারায়ণ স্তব, গয়া মাহাত্ম্য ইত্যাদি ১২টি অধ্যায় যুক্ত শাস্ত্র।

ঊর্ব—দ্রঃ- ঊর্ব।

ঊর্বশর—ভরত বংশে রাজা মহাবীর্যের ছেলে।

ঊর্মিলা—মিথিলার রাজা জনকের ঔরস জাত মেয়ে। সীতার ছোট। লক্ষ্মণের সঙ্গে বিয়ে হয়। ঊর্মিলা বনে যান নি। রাম রাজা হবার পর ঊর্মিলার দুই ছেলে হয় অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু (রা ৭।১০২।২)। লক্ষ্মণ বর্জনের পর ঊর্মিলা আগুনে প্রাণ বিসর্জন করেন।

ঊষা—বৈদিক দেবতা। ঋক্ বেদে কুড়িটি সূক্তে এই দেবতার স্তুতি রয়েছে। ঋষিগণ ঊষাকে অপূর্ব সজ্জায় ভূষিতা তরুণী রমণীরূপে কল্পনা করেছেন। ঋক্ (১।৯২।৪) নর্তকীর ন্যায় রূপ প্রকাশ করেছেন এবং গাভী যেমন দোহনকালে নিজের উধঃ প্রকাশ করে ঊষাও সেই রকম নিজ বক্ষ প্রকাশ করেছেন। ঋক্ (১।১১৩।১৪) ঃ—সুপ্ত প্রাণীদের জাগিয়ে ঊষা অরুণাশ্ব রথে এগিয়ে আসছেন। ঋক্ (১।১১৫।২) ঃ—মানুষ যেমন নারীর পেছনে যান সূর্য সেই রকম দীপ্তিমতী ঊষার পেছনে আসছেন। ঋক্ (১।১২৩।১১) ঃ—মা দেহমার্জনা করে দিলে মেয়ের শরীর যেমন উজ্জ্বল হয়, ঊষা, তুমিও সেই রকম দর্শনীয় আপন শরীর প্রকাশ কর। ১।৯২।১০ মন্ত্রে বলা হয়েছে ব্যাধের স্ত্রী যেমন চলনশীল পক্ষীর পক্ষ ছেদ করে হিংসা করে সেই রকম বার বার আবির্ভূত হয়ে নিত্য এবং এক-রূপধারিণী ঊষা (দিনে দিনে) সমস্ত প্রাণীর জীবন হ্রাস করেন। ১।১২৩।২ মন্ত্রে কক্ষীবান বলছেন, 'ঊষা যুবতী; বার বার তাঁর আবির্ভাব হয়।' ঊষাকে দিবোদুহিত (ঋক্ ১।৭১।৫) এবং নক্তম্ (রাত্রি) ও ঊষাকে দুই বোন ও দিব্যযোষা বলা হয়েছে। সূর্যকে ঊষার প্রণয়ী বলা (ঋক্ ১।১১৫।২) হয়েছে এবং প্রণয়ীর মতই তিনি ঊষার অনুগমন করেন। আবার ঊষার পর সূর্য প্রকাশিত হয় বা ঊষাকে সূর্যের জননীও বলা হয়েছে (ঋক্ ১।১৩৩।১-২); আবার এক স্থানে সূর্যের ভগিনী বা ভগস্য স্বসা বরুণস্য জামি/ভগিনী (ঋক্ ১।১২৩।৫)। ঊষা অগ্নির কন্যা। আবার অন্য জায়গায় অগ্নিকে ঊষার প্রণয়ী বলা হয়েছে। আবার আছে সূর্য ঊষার স্বামী; এই ঊষা অগ্নির কন্যা; বৃহৎ পিতার (=সূর্যের) পত্নী ঊষাকে অগ্নি সৃষ্টি করেছেন। অগ্নি নিজের ভগিনী ঊষার জার (ঋক্ ১০।৩।৩)। অর্থাৎ প্রাকৃতিক ঘটনাগুলিকে নানা ভাবে কবিতার মধ্যে ঋষিরা ফুটিয়ে তুলেছিলেন; সত্যমিথ্যা এখানে অপাংক্তেয়। ঊষা অশ্বিদ্বয়ের সখী। ঊষার রথের বাহক অরুণবর্ণ অশ্ব, গো বা

বৃষভ। মঘোনী, ঋতাবরী, হিরণ্যবর্ণা, অমৃতা, দক্ষিণা প্রভৃতি বিশেষণ উষার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। ঋক ৬৫।৫৯।৬ থেকে এবং অন্য বর্ণনা থেকে মনে হয় বৈদিক উষা আমাদের পরিচিত স্বল্পস্থায়ী উষা নয় ; দীর্ঘকাল স্থায়ী।

প্রজাপতির মেয়ে ; আদিত্য দেবের বোন। এ'র কাপড় জ্যোতি। চির-যৌবনা এবং সমস্ত সৌন্দর্য্যের আধার। সোমের (=চন্দ্র) সঙ্গে বিয়ের ঠিক হয়। কিন্তু খবর পেয়ে অগ্নি, সূর্য, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এসে পাণিপ্রার্থনা করেন। প্রজাপতি তখন ঘোষণা করেন অনন্ত আকাশ পথে অনুধাবনে যিনি সফল হবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বরচিত যত বেশি বেদ সূক্ত আবৃত্তি করতে পারবেন তাঁর সঙ্গেই উষার বিয়ে হবে। অগ্নি, ইন্দ্র ও সূর্য বিফল হন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় ইন্দ্রের কাছ থেকে বেদসূক্ত লাভ করে শেষ পর্যন্ত সফল হন ও উষাকে লাভ করেন। কিন্তু সকলেই সূর্যের অনুচর বলে এবং সূর্যের প্রীতি কামনায় উষাকে কেউ গ্রহণ করেন না। শেষ পর্যন্ত সূর্যই গ্রহণ করেন। (২) রাত্রি শেষের নাম উষা, দিনের নাম ব্যুষ্টি। উষা ও ব্যুষ্টির মধ্যবর্তী সময় সন্ধ্যা। (৩) বিরোচন-বলি-বাণ-উষা। প্রহ্লাদের প্রপৌত্র শোণিতপুরের রাজা বাণাসুরের মেয়ে। পার্বতীর এক সখী। পার্বতীকে মহাদেবের সঙ্গে বিহার করতে দেখে নিজেও যাতে স্বামীর সঙ্গে ঐ রকম বিহার করতে পারেন কামনা করেন। পার্বতী জানতে পেরে বর দেন তিন দিনের মধ্যে স্বপ্নে উষা এক জন সুপুরুষ রাজকুমারের সঙ্গে বিহার করবেন এবং সে-ই উষার স্বামী হবে। পার্বতীর বর ছিল ১২-শ রাত্রিতে মিলন হবে। উষা এর পর স্বপ্ন দেখেন এবং সখী চিত্রলেখার সাহায্যে স্বপ্নে দেখা প্রণয়ী অনিরুদ্ধের (দ্রঃ) সাথে বিয়ে হয়। হরিবংশ (২।১১৮।-) শিব, পার্বতী, অপ্সরা, গন্ধর্ব ও শিবের অনুচর ইত্যাদি সকলে উমা ও মহেশ্বর সেজে বিহার করছিলেন। পার্বতী বর দিয়েছিলেন বৈশাখ মাসে দ্বাদশীতে দিনক্ষয়ে স্বপ্নে যার সঙ্গে 'সংযোগম্ এষ্যসি' সেই ভর্তা হবে। নির্দিষ্ট দিনে স্বপ্নে (২।১১৮।২) রময়ামাস এবং শোণিতাক্তা হয়ে ঘুম ভেঙে যায়। কুম্ভাণ্ড কন্যা চিত্রলেখা পার্বতীর বর স্মরণ করিয়ে দেয়। অপ্সরা কন্যা সখী চিত্রলেখা বিভিন্ন অভিজাতদের ছবি দেখান এবং এই চিত্রলেখাই যুগপৎ স্বপ্নদর্শনে অস্থির চিত্ত অনিরুদ্ধকে নিয়ে আসেন। দ্রঃ-বাণগড়, তিলোত্তমা। (৪) শাল্বের হাতে বিদর্ভরাজ সত্যরথ নিহত হলে মহিষীরা বনে চলে যান। একটি রাণী গর্ভবতী ছিলেন ; নদীতীরে উষা নামে তাঁর একটি মেয়ে হয়। প্রসূতি তারপর জলে নামলে কুমীরে এ'কে খেয়ে ফেলে। এক মুনি কন্যা উষাকে পালন করেন (শিব-পু)। (৫) পুরাণে ভব নামে শিবের জলমূর্তি।

ঋ

ঋক্—বেদের তিন রকম মন্ত্রের অন্যতম। পদ্যময় বেদমন্ত্র। এই মন্ত্রগুলির অক্ষর, চরণ ও অবসান নিয়মবদ্ধ থাকে। এই মন্ত্রে দেবতাদের স্তব করা হয়। ঋক্‌বেদও বুঝায়।

ঋক্‌বেদ—ভারতীয় আর্যদের প্রাচীনতম সাহিত্য। পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ। চারটি বেদের মধ্যেও প্রাচীনতম। ম্যাক্সমূলার মতে (১) ১২০০-১০০০ খৃ পূ পর্যন্ত

ছান্দস যুগ ; (২) ১০০০-৮০০খৃ-পূ পর্যন্ত মন্ত্র যুগ। এই দুটি যুগেই ঋকসংহিতার সমস্ত মন্ত্র রচিত ও সংকলিত হয়েছিল। (৩) ৮০০-৬০০ খৃ-পূ ব্রাহ্মণ যুগ এবং (৪) ৬০০-২০০ খৃ-পূ সূত্র যুগ। অন্য মতে ২৪০০-২০০০ খৃ পূর্বে রচিত। কাল সম্বন্ধে বহু বিতর্ক আছে। ঋক্‌বেদে উল্লিখিত নক্ষত্র ইত্যাদির অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে রচনা কাল নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিক দিক থেকেও ভারতে আর্যদের প্রবেশ কাল নির্ণয়ের চেষ্টা হয়েছে, এবং এদিক থেকে ১৪০০ খৃঃ পূর্বের আগে বেদ রচিত হয়েছিল বলে মনে হয় না। বর্তমানে যে সংকলন প্রচলিত তাতে ১০১৭ সূক্ত এবং ১১টি বালখিল্য সূক্ত মোট ১০২৮। সূক্তগুলি দশটি মণ্ডলে বিভক্ত, এই জন্য বইটির অপর দাশতয়ী। ১ মণ্ডলে ১৯১ সূক্ত, ২ মণ্ডলে ৪৩, ৩য় মণ্ডলে ৬২, ৪র্থ মণ্ডলে ৫৮, ৫ম মণ্ডলে ৮৭, ৬ষ্ঠ মণ্ডলে ৭৫, ৭ম মণ্ডলে ১০৪, ৮ম মণ্ডলে ৯২, ৯ম-মণ্ডলে ১১৪, ১০ম মণ্ডলে ১৯১ মোট ১০১৭। বর্তমানে প্রচলিত ঋক শাকল শাখার অন্তর্গত। বিভিন্ন সংস্করণের ৮ম মণ্ডলে অতিরিক্ত (৮।৪৯-৮।৫৯) সূক্ত বালখিল্য সূক্ত নামে পরিচিত। এই এগারটি সূক্ত সম্ভবত ঋকবেদের অপর শাখার অংশ। ঋকবেদের খিল বা পরিশিষ্ট রূপেও আরও কয়েকটি সূক্ত পাওয়া যায়। ঋক সংখ্যা ১০৬১৬ (শৌনক)। বেশির ভাগ সূক্তগুলি স্তব। প্রতি মণ্ডলে কয়েকটি করে অনুবাক আছে। আর এক বিভাগ অনুসারে বইটি আটটি অষ্টকে বিভক্ত, প্রতি অষ্টকে আটটি বর্গ এবং প্রতি বর্গে পাঁচটি মন্ত্র বা ঋক। মণ্ডল বিভাগটি প্রাচীন এবং যুক্তিযুক্ত বিভাগ। দশটি মণ্ডলের মধ্যে ২য়-থেকে ৭ম মণ্ডল যথাক্রমে গৃৎসমদ, বিশ্বামিত্র, বামদেব, অত্রি, ভরদ্বাজ ও বশিষ্ঠ এবং এঁদের বংশধরদের দ্বারা রচিত। অর্থাৎ এক একটি মণ্ডল এক একটি বংশের রচনা। ৮ম মণ্ডলের নাম প্রগাথা মণ্ডল, ৯ম মণ্ডলের নাম পবমান মণ্ডল। ১ম এবং ১০ম মণ্ডল পরবর্তী কালের রচনা বলে মনে হয়। ১ম মণ্ডল অনেকগুলি রচনাকারের দ্বারা রচিত। ৮ম মণ্ডল প্রধানত কণ্ব গোত্রীয় ঋষিদের দ্বারা রচিত। ৯ম মণ্ডলে প্রতি সূক্তের দেবতা 'পবমান সোম' অর্থাৎ যজ্ঞে সোমের উদ্দেশ্যে যে সব মন্ত্র পাঠ করা হত সেগুলির সংকলন, রচনাকার বৈশ্বামিত্র, কাণ্ব, কাশ্যপ, আঙ্গিরস ইত্যাদি। ১০ম মণ্ডলও বিভিন্ন রচনাকারের রচনা। অষ্টম মণ্ডলে এক একটি রচনাকারের সূক্তগুলি এক এক স্থানে একত্র করা আছে প্রতি রচনাকারের সূক্তগুলি আবার দেবতা অনুসারে ভাগ ভাগ করা রয়েছে।

পতঞ্জলি মহাভাষ্যে আছে বহ্‌বৃচ দের মধ্যে ঋকবেদের একুশটি শাখা ছিল। কিন্তু উপস্থিত শাকল শাখা ছাড়া অন্য শাখা পাওয়া যায় নি। তখন লিখিত পুঁথি সম্ভব ছিল না, যার ফলে প্রধানত নতুন শাখা গড়ে ওঠা সহজ হয়েছিল। অন্য কতকগুলি শাখার নাম ;-বাস্কল, আশ্বলায়ন, শাঙ্খায়ন, মাণ্ডুক, ঐতরেয়ী, কৌষিতকী, শৈশিরী, পৈঙ্গী।

মহর্ষি শৌনকের রচনা 'ঋক্‌প্রাতিশাখ্য' এবং শাকল্যের 'পদপাঠ' ইত্যাদি গ্রন্থের কারণে ঋক্‌বেদের এই শাকল্যশাখার লুপ্ত হয়ে যাওয়া সম্ভব হয় নি। এই সমস্ত গ্রন্থে ঋক্ সংহিতাকে নানা দিক থেকে এমন ভাবে আলোচিত হয়েছে যে শাকল

শাখার মূল গ্রন্থকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করেছে। অর্থের দিকে মহর্ষি যাস্কের নিরুক্ত বেদের অপ্রচলিত শব্দ ইত্যাদির অর্থ নির্দ্ধারণে অপরিসীম সাহায্য করে। এ ছাড়া আধুনিক তুলনামূলক ভাষা বিজ্ঞানের পদ্ধতিতে প্রাচীন ইরানীয়, গ্রীক, ল্যাটিন ও অন্যান্য ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে বহু এখনও-অজ্ঞাত বৈদিক শব্দের যথার্থ অর্থ নির্ণয় সম্ভব হচ্ছে। বৈদিক ভাষার আর একটি বিশেষত্ব শব্দের উচ্চারণ ভঙ্গি। উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত এই তিনটি উচ্চারণ ভঙ্গি বৈদিক শব্দের অর্থান্তর ঘটায়। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের আলোচনার মাধ্যমে উচ্চারণ ভঙ্গির আলোচনায়ও বহু জ্ঞাতব্য জিনিস অবগত হওয়া গেছে।

ভাষার দিক থেকে বৈদিক সংস্কৃতে সমাস কম কিন্তু সন্ধি, শব্দরূপ, ধাতুরূপ ও প্রত্যয় প্রভৃতির বৈচিত্র্য প্রচুর। ঋক্ মন্ত্রগুলি মূলত গায়ত্রী (২৪ অক্ষর), উষ্ণিহ্ (২৮ অক্ষর), অনুষ্টুভ (৩২ অক্ষর), বৃহতী (৩৬ অক্ষর), পঙ্‌ক্তি (৪০ অক্ষর), ত্রিষ্টুভ (৪৪ অক্ষর), জগতী (৪৮ অক্ষর,) এই সাতটি প্রধান ছন্দে রচিত। কবির কল্পনা হিসাবে ঋক্ মন্ত্রের বহু স্থান অপূর্ব সুন্দর। ঋক অর্থে পাদ-নিবদ্ধ মন্ত্র। হিরণ্য পশু ও পুত্র ইত্যাদি ঐহিক এবং স্বর্গাদি পারলৌকিক লাভের জন্য ঋষিরা এই সব মন্ত্রে দেবতাদের স্তব করতেন। কিছু ঋকে দেবতাদের প্রথম পুরুষে এবং কিছু ঋকে মধ্যম পুরুষে স্তব করা হয়েছে। এ ছাড়াও কিছু ঋকে রচনাকার ঋষি ও দেবতা যেন এক হয়ে গেছেন ; ঋক্‌গুলির ক্রিয়াপদ এখানে উত্তম পুরুষ। এই ভাবে ক্রিয়াপদ অনুসারে ঋকগুলিকে যাস্ক তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। ঋকগুলিকে আর এক ভাবে ভাগ করা হয়ঃ-কিছু ঋকে দেবতাদের স্তব ; কিছু ঋকে কথোপকথন ছলে বর্ণনা যেমন সংবাদ সূক্ত অংশ ; কিছু ঋকে আথর্বন মন্ত্রের মত শপথ, অভিশাপ ইত্যাদি ; কিছু সূক্তে লৌকিক বিষয়ের অবতারণা যেমন অক্ষসূক্তগুলি। কিছু সূক্তে গভীর দার্শনিক তত্ত্ব বর্তমান। ভাষার দিক থেকে প্রাচীন ইরানীয়দের আবেস্তার সঙ্গে বৈদিক সংস্কৃতের সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ যে অনেক ক্ষেত্রে আবেস্তার মন্ত্রগুলির ধ্বনি পরিবর্তন করে নিলে ঋক মন্ত্রে রূপান্তরিত হয়।

ঋগ্বেদের দেবতাদের মধ্যে প্রধান অগ্নি তারপর ইন্দ্র। এ ছাড়া আদিত্য মিত্র, বরুণ, বিষ্ণু, উষস্, অশ্বিদ্বয়, সূর্য, পর্জন্য, পৃথিবী, মরুৎ, রুদ্র, যম, সোম, সরস্বতী (=নদী ও দেবতা) ইত্যাদি অসংখ্য দেবতার স্তুতি রয়েছে। বহু মন্ত্রে দেবতাদের পুরুষ আকৃতি কল্পনা করা হয়েছে। নৈসর্গিক ঘটনা ও পদার্থসমূহকে নানা দেবতা ও উপাখ্যান রূপে কল্পিত হতে দেখা যায়। ঋক্‌বেদে দেবতার সংখ্যা সম্বন্ধে মতভেদ আছে। একটি মতে নাম অনুসারে প্রতি দেবতা বিভিন্ন ; নিরুক্ত মতে অগ্নি, ইন্দ্র (=বায়ু) এবং সূর্য্য এই তিনটি মাত্র দেবতা ; অন্যগুলি এঁদেরই নামান্তর বা প্রকার ভেদ। আবার আধ্যাত্মিক সম্প্রদায়ের মতে সব দেবতাই এক, কেবল বিভিন্ন রূপে প্রতিভাসমান। এই মূল দেবতা একটি মতে পরমব্রহ্ম ; আবার মহর্ষি কাত্যায়নের মতে সূর্য। বেদের এই সব দেবতাদের সঙ্গে ইন্দোইউরোপীয় গোষ্ঠীর বহু দেবদেবীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

ঋক্‌বেদে এই বহু দেবতা, এ'রা বিভিন্ন অথচ মিলিত। এ'দের মন, অভিপ্রায় কাজ সমভাবাপন্ন। দেবতাদের এই সমবেত ঐশী শক্তিই ঋক্‌বেদে পূজিত হয়। অর্থাৎ বেদে দেবতারা দুই অর্থে ব্যবহৃত। প্রথম অর্থে দেবতারা সিদ্ধ ও অসংখ্য ; এবং দ্বিতীয় অর্থে সিদ্ধ পুরুষদের মিলিত ঐশী শক্তিই হচ্ছে দেবতা। ৫-টি জ্ঞান ইন্দ্রিয়, ৫-টি কর্ম ইন্দ্রিয় ও মন এই এগারটি ইন্দ্রিয় পথে ১১-টি আকারে দেবশক্তি মানুষের কাছে প্রতীয়মান হয়। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় গোচর দেবতা ১১। ঋকবেদ অনুসারে স্বর্গে, অন্তরীক্ষে ও পৃথিবীতে তিনটি স্থানেই এই একাদশ দেবতা অবস্থিত, অর্থাৎ ১১×৩=৩৩ দেবতা বা বিশ্বদেব (দ্রঃ)। দ্রঃ- দেবতা।

বেদ থেকে সেই যুগের আর্যদের চিন্তাধারা ও জীবনযাত্রা সম্বন্ধে বহু কিছু জানা যায়। ভারতীয় আস্তিক দর্শন শাস্ত্রের ছয়টি প্রস্থান ঋক্‌বেদের কতকগুলি ঋক্‌কে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। বহু পৌরাণিক কাহিনীও ঋক্‌মন্ত্রের অন্তর্গত নাম বা সামান্য উদ্ধৃতিকে কেন্দ্র করে পরে পত্রপল্লবে সজ্জিত হয়েছে।

ঋক্‌সংহিতা—বেদের দুটি ভাগ। মন্ত্রভাগকে সংহিতা বলা হয়। দ্বিতীয় অংশ ব্রাহ্মণ ভাগ। 'অগ্নিমীলে' ইত্যাদি মন্ত্রসমুদয় সংহিতা অংশে আছে। সংহিতার অর্থ সন্ধিকার্য।

ঋক্ষ—পুরুবংশে অজমীঢ়ের ছেলে জন ও রূপিন্‌ থেকে বড় ; সংবরণের পিতা (মহা ১।৮৯।৩০)। (২) পুরু বংশে রাজা ঋচ ও সুদেবার ছেলে। ঋক্ষের স্ত্রী তক্ষক দুহিতা জ্বালা ; ছেলে মতিনার (মহা ১।৯০।২৩-২৪)। (৩) ঋক্ষবান (দ্রঃ) পাহাড়।

ঋক্ষদেব—শিখণ্ডীর ছেলে।

ঋক্ষপর্বত—বিন্ধ্যপর্বতে পূর্ব অংশ। বঙ্গোপসাগর থেকে নর্মদা ও শোণের উৎস পর্যন্ত। শোণের দক্ষিণ দিকের পাহাড়গুলিও (রামগড় ইত্যাদি)। শুক্তিমতী নদীও এখানে উৎপন্ন।

ঋক্ষবন্ত—শম্বর অসুরের নগর। দণ্ডকারণ্য স্থিত বৈজয়ন্ত নগর।

ঋক্ষবান—(১) পুরুবংশে অরিহের ছেলে। (২) চিত্রসেনের ছেলে। (৩) পাহাড় ; গণ্ডোয়ানা দেশে অবস্থিত। এই পাহাড় থেকে তাপ্তী ও নর্মদা প্রবাহিত। বর্তমান বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণপূর্ব অংশে।

ঋক্ষবিল—সীতা অন্বেষণে হনুমানদের দলটি বিন্ধ্যপর্বতে দ-পশ্চিম কোটিতে (রা ৪।৫০।৩) এসে উপস্থিত হয়। এখানে খুঁজতে খুঁজতে দানবদের দ্বারা অভিরক্ষিত ঋক্ষবিল গুহার সামনে শ্রান্ত ও পিপাসাক্রান্ত হয়ে বসে পড়ে। গুহা থেকে জলচর পাখী বার হয়ে আসছিল। বানররা তারপর ভয়ে ভয়ে পরস্পরের হাত ধরে অন্ধকার গুহাতে এক যোজন মত এগিয়ে গিয়ে সুন্দর একটি দেশে এসে উপস্থিত হয়। এখানে সোনা ও মণিমুক্তার ছড়াছড়ি এবং মণিরত্ন বিভূষিত অনেকগুলি মুখ্যগৃহ এবং চীরকৃষ্ণাজিনাম্বরা বৃদ্ধা তাপসী স্বয়ংপ্রভাকে (দ্রঃ) দেখতে পায়।

ঋক্ষরজা—কিষ্কিন্ধ্যার রাজা। সুমেরু পর্বতের মধ্যম শৃঙ্গে ব্রহ্মার শতযোজন ব্যাপী দিব্য সভা বসত। এখানে একদিন যোগাভ্যাসের সময়ে ব্রহ্মার চোখ থেকে একবিন্দু জল পড়ে। এই জল ব্রহ্মা হাতে করে গ্রহণ করে মাটিতে ফেলে দিলে এই জল থেকে ঋক্ষরজা বানরের জন্ম। ব্রহ্মার নির্দেশে অন্তিক-চর হয়ে বাস করত; সারা দিন বনে চরে বেড়াত এবং সন্ধ্যা বেলাতে মুখ্যানি ফলানি ও পুষ্পানি এনে ব্রহ্মাকে নিবেদন করত। এক দিন তৃষ্ণার্ত হয়ে সুমেরু পাহাড়ের উত্তর শিখরে এক সরোবরে গিয়ে জলে নিজের ছায়া দেখে অন্য কোন বানর মনে করে জলে নেমে আক্রমণ করতে যায়। কিন্তু এই জলে নামার জন্য সুন্দর একটি নারীতে রূপান্তরিত হন। এ দিকে ইন্দ্র ব্রহ্মাকে নমস্কার করে ফিরছিল ও সূর্যাও ফিরছিল; এঁকে দেখে দুজনেই কামার্ত হয়ে পড়েন। ইন্দ্র এঁর কেশে এবং সূর্য এঁর গ্রীবায় বীর্যপাত করেন। ফলে যথাক্রমে বালী ও সুগ্রীবের জন্ম হয়। ইন্দ্র নিজের কাঞ্চনীমালা বালীকে দিয়ে যান এবং সূর্য বর দিয়ে যান সুগ্রীবের সব কাজে হনুমান সহায় হবে। পর দিন সূর্য উঠলে বানররূপ ফিরে পেয়ে ঋক্ষরজা ছেলে দুটিকে নিয়ে ব্রহ্মার কাছে যান। ব্রহ্মা ঋক্ষরজাকে তখন দেবদূত সঙ্গে দিয়ে পাঠিয়ে কিষ্কিন্ধ্যার রাজা এবং সমস্ত বানরকুলের অধিপতি করে দেন (রা ৭।৩৭।প্র৬)। বালী ও সুগ্রীবকে ইনি পালন করেন। অন্য মতে কিষ্কিন্ধ্যার রাজা এবং নিঃসন্তান। ইন্দ্র অহল্যার (দ্রঃ) কাছ থেকে অরুণের (দ্রঃ) দুটি ছেলেকে এনে পালন করতে দেন, এঁরা বালী ও সুগ্রীব। দ্রঃ- অরুণ, অহল্যা, কিষ্কিন্ধ্যা।

ঋক্ষরাজ—ভল্লুক রাজ জাম্ববান (দ্রঃ)। জাম্ববতীর (দ্রঃ) পিতা।

ঋচ—দেবাতিথির (দ্রঃ) ছেলে। অঙ্গকন্যা সুদেবা স্ত্রী। ছেলে ঋক্ষ (মহা ১।৯০ ২৩)।

ঋচীক—অজীগর্ত। চ্যবন বংশে ভৃগু মুনির ছেলে। অন্য মতে ঔর্ব ঋষির ছেলে। ব্রহ্মা—ভৃগু—চ্যবন—উর্ব—ঋচীক। লোভী ব্রাহ্মণ। বিয়ের জন্য চন্দ্রবংশে গাধি রাজার কাছে গিয়ে সত্যবতীকে প্রার্থনা করেন। কুলধর্ম অনুসারে কন্যার শুল্ক হিসাবে গাধি একতঃ কালো কাণযুক্ত পাণ্ডুর বর্ণ এক হাজার ঘোড়া চান (মহা ৩।১১৫।১২)। ঋচীক তখন বনে গিয়ে তপস্যায় বরুণকে সন্তুষ্ট করলে গঙ্গার জল থেকে এই ঘোড়া বার হয়ে আসে। কাণ্যকুব্জে, অদূরে গঙ্গাতীরে ঘোড়াগুলি যেখানে জল থেকে উঠেছিল সেই স্থানটি অশ্বতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ। এই ঘোড়াগুলি দিয়ে কান্যকুব্জে সত্যবতীকে বিয়ে করেন। দেবতারা বরযাত্রী এসেছিলেন। ঋচীকের বিয়ের পর সস্ত্রীক ভৃগু পুত্র ও পুত্রবধূকে দেখতে আসেন এবং বর দিতে চান। সত্যবতী (দ্রঃ)। সমস্ত ক্ষত্রিয়দের উচ্ছেদ করার জন্য অলৌকিক উপায়ে ধনুর্বেদ অধ্যয়ন করেন। সত্যবতীর ছেলে জমদগ্নি (দ্রঃ)। জমদগ্নির ছেলে পরশুরাম ক্ষত্রিয়গুণ যুক্ত হয়েছিলেন। সত্যবতীর আরো তিন ছেলে শুনঃশেপ (দ্রঃ), শুনঃপুচ্ছ ও শুনঃলাঙ্গুল। মহাভারতে (১।৬০।৪৮) সত্যবতীর সব সমেত একশত ছেলে হয়েছিল। ঋচীকের শালা বিশ্বামিত্র (দ্রঃ)। বিষ্ণু নিজের ধনুকটি (দ্রঃ- ইন্দ্রধনু) ঋচীককে দিয়ে দেন; ঋচীক দেন ছেলে জমদগ্নিকে। জমদগ্নির কাছ থেকে পান পরশুরাম। এই ধনুই রাম পরশুরামের কাছ থেকে নিয়ে শরসন্ধান করে পরশুরামের স্বর্গের পথ রোধ করেন। পরশুরাম যখন সমন্ত-পঞ্চকে পিতৃকুলের তর্পণ করেন তখন ঋচীক

দেখা দিয়ে পরশুরামকে হিংসা থেকে নিবারিত করেন (মহা ৩।১১৭।১০)। ঋচীক বৈকুণ্ঠে গেলে তাঁর স্ত্রীও সশরীরে সঙ্গে যান। সত্যবতী পরে উত্তর ভারতের কৌশিকী নদীতে পরিণত হন। লোকস্য হিতকার্যার্থং হিমবন্তং উপাশ্রিতা। ভগিনী স্নেহে বিশ্বামিত্র এই নদী তীরে হিমালয়ে থাকতেন (রা ১।৩৪।১০)। কালিকা পুরাণে (৮২।৬৮) কান্যকুব্জে তপস্যা। হরিবংশে ঋচীককে ভাগাবার জন্য ১০১০ ঘোড়া শুল্ক চেয়েছিলেন। মহাভারতে (১৩।৪) চরু, অশ্বত্থগাছ ইত্যাদি (দ্রঃ- জমদগ্নি) ঋচীক বলেছিলেন। হরিবংশে ঋচীক প্রাচীন কালে রুদ্র ও বিষ্ণুর তপস্যা করেছিলেন; বৈষ্ণব চরু থেকে জমদগ্নি (১।২৭।৩৬) জন্মান। কালিকা পুরাণে ভৃগু দেখতে আসেন, নাক থেকে আরক্ত ও শ্বেত দুটি চরু বার করেন; শ্বেত চরু সত্যবতীর জন্য ইত্যাদি এবং নাতি ক্ষত্রিয় ধর্ম হবে ভৃগু বর দেন। মহাভারত (১৩।৪) ও ভাগবতে (৮।১৫) সত্যবতীর মা ভাল ছেলে হবে আশায় চরু ইত্যাদি বদল করে নেন। হরিবংশে ভুল করে মেয়ের চরু খান ইত্যাদি এবং হরিবংশে জমদগ্নি, মধ্যম শুনঃশেপ ও কনিষ্ঠ শুনঃপুচ্ছ তিন ছেলে।

ঋচীষ—(১) নরক বিশেষ। (২) এক জন আদিত্য।

ঋচেপু—অনদগভানু। ঋচেয়ু। অনাধৃষ্টি। পুরুবংশে রাজা রৌদ্রাশ্বের ছেলে। ঋচেপুর মা অপ্সরা মিশ্রকেশী; ছেলে মতিনার। ভাণ্ডারকরে ঋচেপু>অনাধৃষ্টি>মতিনার (১।৮৯।১০)। হরিবংশে (১।৩২।২) স্ত্রী তক্ষক কন্যা জ্বলনা। জ্বলনা>মতিনার>তংসু, প্রতিরথ, সুবাহী ও মেয়ে গৌরী (>মান্ধাতা)। প্রতিরথ>কণ্ব>মেধাতিথি (এদের থেকে কাণ্বায়ন ব্রাহ্মণ বংশ)। তংসুর স্ত্রী রাজকন্যা ব্রহ্মবাদিনী ঈলিনী>সুবোধ+ উপদানবী>দুষ্মন্ত, সুষ্মন্ত, প্রবীর, অনঘ।

ঋজিশ্বন্—ইন্দ্রের বন্ধু এক রাজা। ঋগবেদে কৃষ্ণ নামে দস্যু এ'র হাতে অংশুমতী নদীর তীরে নিহত হন। বঙ্গৃদ-এর শত নগর (ঋক্ ১।৫৩।৮) ভেদ করেছিলেন।

ঋজুপালিকা—বরাকর নদী। গিরিডির কাছে। হাজারিবাগ জেলাতে। পরেশ নাথ পাহাড়ের কাছে। ছোটনাগপুর বিভাগে। গিরিডি থেকে ৮-মাইল দূরে মহাবীরের পদ-চিহ্ন যুক্ত একটি মন্দিরের লিপিলেখে রয়েছে আগে পরেশনাথ পাহাড়ের কাছে জৃম্ভিকা গ্রামে এই মন্দিরটি ছিল। পুরাতন মন্দিরের জিনিসপত্রে বর্তমান মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে।

ঋজ্রাশ্ব—ঋক্‌বেদে এক মুনি। রাজর্ষি বৃষাগীঃ এ'র পিতা। অশ্বিনী দেবদের বাহন গাধা বৃকী রূপে ঋজ্রাশ্বের কাছে এলে জনসাধারণের ১০০ মেষ এনে একে খেতে দেন। বৃষাগীঃ এতে কুপিত হয়ে শাপ দিয়ে ছেলেকে অন্ধ করে দেন। অগ্নির স্তব করে দৃষ্টিশক্তি আবার ফিরে পেয়েছিলেন (ঋক্ ১।১১৬।১৬)।

ঋণ—হিন্দু ধর্ম অনুসারে তিন রকম। দেবঋণ যজ্ঞ করে পরিশোধ করতে হয়। ঋষি-ঋণ ব্রহ্মচর্য ও বেদপুরাণ পাঠ করে পরিশোধ্য। পিতৃঋণ সন্তান উৎপাদন করে পরিশোধ করতে হয়।

ঋত—(১) ঋ-ধাতু অর্থে গমন করা। সৃষ্টির মূলে এক অস্ফুট নিয়মধর্মী সত্য রয়েছে। এই সত্যের সক্রিয় রূপ হচ্ছে ঋত। ঋত একটি বৈদিক শব্দ। জগৎ অর্থে গতিশীল,

বিবর্তমান, অনাদি, অনন্ত সৃষ্টি। ঋত অর্থে গতিশীল, বিবর্তমান, অনাদি, অনন্ত পরিব্যাপ্ত 'সত্য'। নৈসর্গিক ঘটনা, নৈতিক প্রবণতা ও ধর্মীয় আচরণের মধ্যে যে নিয়মানুগত্য রয়েছে সেটি ঋতের সক্রিয় রূপ। ঋতের অন্য অর্থ উদক, যজ্ঞ, উঞ্ছশীল, ও যথার্থ মানস সংকল্প। (২) ঋত (=উঞ্ছবৃত্তি), মৃত, অমৃত (দ্রঃ) প্রমৃত ও সত্যামৃত ঃ- জীবিকার্থে বিভিন্ন প্রকারে লব্ধ অর্থ/বস্তু। (৩) সত্য। (৪) ভিক্ষালব্ধ বস্তু। (৫) একজন রুদ্র। (৬) একজন ধর্মপুত্র, শ্রদ্ধার ছেলে। (৭) মিথিলেশ্বর বিজয়ের ছেলে ; এ'র ছেলে শুনক।

ঋতধ্বজ—(১) একজন রুদ্র। (২) কুবলাশ্ব (দ্র) ; মদালসা (দ্রঃ)।

ঋতব্রত—সূর্যলোক প্রাপ্তি বিধায়ক ব্রত। ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে তিনরাত উপবাস করে পালনীয়।

ঋতম্ভরা—প্লক্ষদ্বীপ স্থিত একটি নদী।

ঋতু—বৈদিক মতে বসন্ত চৈত্র বৈশাখ। গ্রীষ্ম জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়। বর্ষা শ্রাবণ ও ভাদ্র। শরৎ আশ্বিন কার্তিক। হেমন্ত অগ্রহায়ণ পৌষ। শিশির মাঘ ফাল্গুন। দিনকেও ছয়টি ঋতুতে ভাগ করা হয়। সূর্যোদয়ের ১ম দশ দণ্ড বসন্ত, ২য় দশ দণ্ড গ্রীষ্ম, ৩য় দশ দণ্ড বর্ষা, ৪র্থ দশ দণ্ড শরৎ, ৫ম দশ দণ্ড হেমন্ত, ৬ষ্ঠ দশ দণ্ড শিশির। ভিন্ন ভিন্ন অভিচার কর্মের ভিন্ন ভিন্ন ঋতু। অন্য মতে অর্দ্ধরাত্রি শরৎ, প্রভাত হেমন্ত, পূর্বাহ্ণ বসন্ত, মধ্যাহ্ণ গ্রীষ্ম, অপরাহ্ণ বর্ষা, প্রদোষ শিশির। অন্য মতে ঊষাকাল হেমন্ত, প্রভাত শিশির, প্রহরার্দ্ধ বসন্ত, মধ্যাহ্ণ গ্রীষ্ম, ৪র্থ যাম বর্ষা, রবির অস্তগমন শরৎ। (২) এক ঋতু =৬০ অহোরাত্র।

ঋতুপর্ণ—সূর্যবংশীয় অযোধ্যারাজ অযুতাশ্বের ছেলে। মহাভারতে (৩।৬৮।২) ইনি ইক্ষ্বাকু বংশে ভঙ্গাসুরের ছেলে। অন্য মতে সগর (১)-অসমঞ্জ(২)-অংশুমান(৩) -ভগীরথ(৪)-ঋতুপর্ণ(৮)। অক্ষ ক্রীড়াতে ও গণনা বিদ্যায় সুপণ্ডিত। এ'র কাছে নল রাজা বাহুক (দ্রঃ) নামে সারথি রূপে আশ্রয় নিয়েছিলেন। নলকে (দ্রঃ) পাবার আশায় দময়ন্তী যখন মিথ্যা স্বয়ংবরের ঘোষণা করেন তখন ঋতুপর্ণ মাত্র এক দিন আগে সুদেব মাধ্যমে খবর পান। ঋতুপর্ণের অনুরোধে বাহুক এক দিনেই ঋতুপর্ণকে অযোধ্যা থেকে বিদর্ভে পৌঁছে দিয়েছিলেন। রথে ঋতুপর্ণের পুরাতন সারথি বার্ষ্ণেয়ও ছিল। পথে রাজাকে বাহুক অশ্বহৃদয়(দ্রঃ) নামে অশ্বচালনা বিদ্যা শিখিয়ে দেবেন ঠিক হয় এবং পরিবর্তে রাজার কাছে অক্ষহৃদয় নামে পাশা খেলা বিদ্যা ও গণনা বিদ্যা লাভ করেন। বিদর্ভে নল দময়ন্তীর মিলন হয়। ঋতুপর্ণের প্রদত্ত বিদ্যার ফলেই বাহুক কলির হাত থেকে মুক্ত হন ও পুষ্করকে হারিয়ে দিয়ে রাজ্য উদ্ধার করেন। ঋতুপর্ণ মিথ্যা স্বয়ংবর ব্যাপারটা জানতে পেরে ক্ষুণ্ণ হলেও নল দময়ন্তীর মিলনে সুখী হয়েছিলেন।

ঋতুসংহার—কালিদাস কৃত কাব্য। ঋতু সমূহের বর্ণনা।

ঋতুস্থলা—এক জন অপ্সরা।

ঋত্বিক—ঋতুতে অর্থাৎ বিশেষ সময়ে যাঁরা যজমানের হয়ে যজ্ঞ করতেন। যজমানের

অনুরোধে ঋত্বিকরা এসে যজমানের বাড়িতে ইষ্টিযজ্ঞ, পশুযজ্ঞ, সোমযজ্ঞ, ইত্যাদি সম্পাদন করতেন। বিদ্যা ও কর্ম অনুসারে ঋত্বিকদের চারটি শ্রেণী এবং ষোলটি পদ ছিল। (১) অধ্বর্যু এবং তাঁর অধীনে প্রতিপ্রস্থাতা, নেষ্টা, ও উন্নেতা। (২) হোতা এবং এঁর অধীনে প্রশাস্তা (=মৈত্রাবরুণ), অচ্ছাবাক্ ও গ্রাবস্তুৎ। (৩) উদগাতা এবং এঁর অধীনে প্রস্তোতা, প্রতিহর্তা, সুব্রহ্মণ্য। (৪) ব্রহ্মা এবং এঁর অধীনে ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, আগ্নীধ্র, পোতা। অধ্বর্যু ও তাঁর সহকারীরা যজুর্বেদী; এঁরা যজ্ঞের কাঠামো হাতে করে গড়ে তুলতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিম্নস্বরে মন্ত্র পাঠ করতেন। হোতা ও তাঁর সহকারীরা ঋক্‌বেদী। এঁরা যেখানে যেমন প্রয়োজন ঋক্ মন্ত্র পাঠ করতেন এবং দেবতাদের যজ্ঞে নিয়ে আসবার জন্য অগ্নিকে অনুরোধ করতেন। উদগাতা ও সহকারীরা সামবেদী। এঁরা যজ্ঞের এই কাঠামোতে সুর সংযোগ করতেন। সোম যজ্ঞে স্তোত্রগান এঁদের বিশেষ কর্তব্য ছিল। আর ব্রহ্মা ও তাঁর সহাকারীরা সমস্ত যজ্ঞকার্য পরিচালনা করতেন, অনুমতি দিতেন, ত্রুটি হলে শুধরে দিতেন এবং শুধরান সম্ভব না হলে প্রায়শ্চিত্ত করাতেন। যজ্ঞকে বলা হয় যজমানের পক্ষে কায়মনোবাক্যে শব্দব্রহ্মকে অনুভূতির চেষ্টা। এখানে অধ্বর্যু হলেন কায়, ব্রহ্মা হলেন মন, এবং হোতা ও উদগাতা হলেন বাক্য।

ঋদ্ধি—বরুণের স্ত্রী।

ঋদ্ধিমান—একটি সাপ। আর্ষ্টিসেনের (দ্রঃ) আশ্রমের কাছে মহাব্রজে থাকত। দ্রঃ- ভীম, বনবাস।

ঋভু—ঋভু/ঋভুক্ষিন্, বিভ্বন বাজ, এই তিন জন স্বল্প পরিচিত দেবতাদের সমষ্টিগত নাম। এঁরা সুধন্বার (দ্রঃ) ছেলে (ঋক্ ১।১১০।৪)। অর্থাৎ অঙ্গিরসের পৌত্র। ঋক্ বেদে এঁদের ঋভু বলা হয়েছে। ঋক্‌বেদে কিন্তু সংখ্যায় এঁরা বহু। ত্বষ্টার মত শিল্পী; শিল্পকুশলতার জন্য দেবত্ব লাভ। ঋভুদের মধ্যে দ্বিতীয় বিভ্ন্ বা বিভ্ব এবং কনিষ্ঠ বাজ। ঋতেন ভান্তি বা ভরন্তি ইতি ঋভু। এঁরা ইন্দ্রের সখা, সোমপায়ী এবং অন্ন ও ধন দান করেন। মহাভারতে (৩।২৪৭।১৯) এঁরা ব্রহ্মলোকে থাকেন এবং দেবনাম্ অপি দেবতা; কারুকর্মে দক্ষতার জন্য দেবত্ব লাভ করেন। ঋক্‌বেদে যজ্ঞীয় সোম গ্রহণের জন্য এঁদের আহ্বান আছে। ঋভুরা ত্বষ্টার একটি চমসকে (পানপাত্র) চারটি চমসে পরিণত করে দেন। এ ছাড়া অশ্বিদেবতাদের জন্য সুখবহ রথ, ইন্দ্রের জন্য স্বয়ং শিক্ষিত অশ্ব, বৃহস্পতির জন্য ক্ষীরক্ষরা ধেনু তৈরি করে দিয়েছিলেন। নিজেদের বৃদ্ধ মাতা-পিতাকে যৌবন দান করেছিলেন। অন্য মতে ইন্দ্রের রথ ও অশ্ব এঁরা শোভিত করে দিতেন। ইন্দ্র সন্তুষ্ট হয়ে এঁদের মাবাবাকে পুনর্যৌবন দান করেন (ঋক্ ১।১১০।৮)। এক ঋষির একটি গরু মারা গেলে বাছুরটি ভীষণ চিৎকার করতে থাকে। ঋষি এঁদের কাছে প্রার্থনা করলে এঁরা একটি গরু তৈরি করে তার গায়ে মরা গরুর চামড়া লাগিয়ে দিয়ে বাছুরটিকে শান্ত করেন। অন্য মতে এঁরা কয়েক জন দিব্যসত্ত্বা। তপস্যায় এঁরা দেবত্ব পান। এমন কি দেবতারাও এঁদের পূজা করতেন। ঋভুদের সঙ্গে গ্রীক দেবতা অরফিউসের কিছু মিল আছে। (২) এক শ্রেণীর দেবতা।

সতীর দেহত্যাগে প্রমথগণ দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করলে দক্ষের পুরোহিত ভৃগু মন্ত্র বলে অগ্নিকুণ্ড থেকে ঋভু নামে সৈন্যদের সৃষ্টি করেন। এঁরা প্রমথদের তাড়ান (ভাগ ৪।৪)। আবার ভাগবতে (৪।৮।১) ঋভু ব্রহ্মার পুত্র। বৈবস্বত মন্বন্তরে ঋভুরা দেবতা। একটি মতে এঁরা পণিদের/ফিনিসীয়দের দ্বারা পূজিত দেবতা। (৩) ব্রহ্মার (বি-পু) ছেলে। বিখ্যাত পণ্ডিত। তপোবলে জ্ঞানলাভ করেছিলেন। পুলস্ত্যপুত্র নিদাঘের গুরু। (৪) অপগস্থান (আফগানিস্থান) বাসী সুধন্বার ছেলেদের নাম। অঙ্গিরা বংশজ। বড় ছেলে বা ছেলেগুলি ঋভু নামে পরিচিত। এঁরা অগ্নির পূজা করতেন এবং অগ্নির জন্য ব্রহ্ম বা বেদমন্ত্র রচনা করেছিলেন।

ঋষভ—(১) হিমালয়ের উত্তরে কৈলাসের কাছে এক পর্বত। বিশ্বাস এখানে হিরণ্য-করণী, মৃতসঞ্জীবনী, সন্ধিনী ও সাবর্ণ্যকরণী ইত্যাদি পাদপ পাওয়া যায়। (২) পূর্ব সাগরস্থ ধবলবর্ণ পাহাড়। এখানে সুদর্শন সরোবর আছে। (৩) দক্ষিণ সাগরস্থ পর্বত। এখানে রোহিত নামে গন্ধর্বরা বাস করতেন। (৪) নাভি থেকে উঠে কণ্ঠ শীর্ষ পর্যন্ত যে বায়ু সেই বায়ুর দ্বারা উচ্চারিত সুর। (৫) রাজসাধ্য ও একাহ সাধ্য যজ্ঞ। দক্ষিণা সহস্র ঋষভ। (৬) চন্দ্রবংশে এক রাজা। উপরিচর বসুর নাতির ছেলে। দ্রোণের গরুড় ব্যূহের মধ্যে ইনি ছিলেন। (৭) এক জন অসুর। (৮) ঋষভদেব (দ্রঃ)।

ঋষভকূট—হেমকূট নামে পর্বত। দ্রঃ ঋষভদেব।

ঋষভদেব—প্রথম জৈন তীর্থংকর। অপর নাম আদিনাথ। গর্ভকালে এঁর মা ঋষভের স্বপ্ন দেখেন ফলে এই নাম। কাহিনী অনুসারে সুষমদুঃষম যুগে সর্বার্থসিদ্ধি নামে বিমান থেকে উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে ধনুরাশিতে চৈত্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা নাভির ঔরসে স্ত্রী মেরুদেবীর গর্ভে বিনীতা (বর্তমান অযোধ্যা) নগরে জন্মান। ইক্ষুরস পান করে চৈত্রাষ্টমীতে দীক্ষিত হন। গুরু শ্রেয়াংস। বট বৃক্ষের নীচে সিদ্ধি এবং কৈলাস শিখরে মহানির্বাণ লাভ করেন। এঁর চিহ্ন ঋষভ। এঁর সম্বন্ধে রচিত স্তোত্র ও গ্রন্থ আছে। (২) ভাগবত মতে (৫ স্কন্ধ) ভগবানের অষ্টম অবতার। অগ্নীধ্রের ছেলে নাভির ঔরসে মেরুদেবীর গর্ভে জন্ম। ইন্দ্র একবার নাভির রাজ্যে বৃষ্টি বন্ধ করেন ঋষভদেব যোগপ্রভাবে অজনাভবর্ষে বর্ষণ সম্ভব করেন। স্ত্রী ইন্দ্রের কন্যা জয়ন্তী (ভাগ ৫।৪।৯); ১০০ ছেলে; বড় ভরত। এই ভরত থেকে ভারতবর্ষ। এরপর নয় ছেলে কুশাবর্ত, ইলাবর্ত, ব্রহ্মাবর্ত, মলয়, কেতু, ভদ্রসেন, ইন্দ্রস্পৃক, বিদর্ভ ও কীকট; এরা ভরতের অনুগত। পরবর্তী নয় জন কবি হরি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রুমিল, চমস ও করভাজন; এরা নয়জন ধর্মপ্রদর্শক, মহাভাগবত। বাকি ৮১ জন ব্রাহ্মণ হয়ে যান। কুশাবর্ত ইত্যাদি ন-জনকে ভারতে নয়টি দ্বীপে রাজ্য দিয়ে নিজে সর্বত্যাগী দিগম্বর সন্ন্যাসী হয়ে যোগ-চর্চায় রত হন। পুলহের আশ্রমে তপস্যা করতেন। স্থানটির নাম হয় ঋষভকূট। এখানে কারো আসা তিনি পছন্দ করতেন না; এমন কি এখানে বাতাস পর্যন্ত নিঃশব্দে বয়ে যেত; একটুও শব্দ হত না। শিবের ভক্ত ছিলেন। এই সময়

সাধারণ লোকে বিদ্রূপ ও কৌতুক ছলে তাঁকে নানা নির্যাতন করত ; কিন্তু যোগীদের মতই নির্লিপ্ত হয়ে তিনি সব কিছু সহ্য করতেন। বহু স্থান পর্যটন করে দেহ ত্যাগের কামনায় কুটকাচলের উপবনে (ভাগ ৫।৬।৭) উপস্থিত হন। এখানে দাবানলে মারা যান।

ঋষভদ্বীপ—এই দ্বীপে ক্রৌঞ্চ নামে পর্বত বিদারণ করে কার্তিক ক্রৌঞ্চদারণ নাম পান।

ঋষভপর্বত—মাদুরাতে পলনি পর্বত। মলয় পর্বতের উত্তরাংশ। মহাভারতে এটি পাণ্ড্য রাজ্যে। স্থানীয় নাম বরাহ পর্বত। মহাভারতে (৩।১০৯।২, ৭) অপর নাম যেন হেমকূট ; ঋষভ নামে অত্যন্ত রাগী এক তপস্বী থাকতেন। অনেক শতবর্ষ আয়ু। শাপ দিয়েছিলেন এই পর্বতে যে কথা বলবে তাদের ওপর উপল বৃষ্টি হবে। বাতাসকে শব্দ করতে বারণ করে দিয়েছিলেন। কেউ কথা বললে মেঘ যেন তাকে নিবারিত করে। সামনে নন্দা নদীতে একবার দেবতারা এলে কিছু লোক দেবদর্শনে আসে। ইন্দ্রাদি দেবতারা দেখা দিতে চান না ; ফলে স্থানটিকে দুরারোহ দুর্গে পরিণত করে দেন। সেই থেকে এখানে কেউ থাকতে পারেনা। দেবতারা এখানে যজ্ঞ করেছিলেন। দ্রঃ- ঋষভদেব।

ঋষি—দ্রষ্টা ' ঋ অর্থে শব্দ করা। অর্থাৎ এঁরা শাস্ত্র পাঠ করতেন এবং কণ্ঠস্থ করে রক্ষা করতেন। তপস্যার ফলে বেদ মন্ত্র যাঁদের কাছে প্রতিভাত হত তাঁরাই প্রথম ঋষি নামে অভিহিত হন। অর্থাৎ বেদকে অপৌরুষেয় রাখবার প্রচেষ্টায় মন্ত্র রচনাকারদের বলা হয়েছে মন্ত্র তাঁদের কাছে প্রতিভাত হয়ে উঠত ; তাঁরা আসল রচনাকার নন। দ্রঃ- শ্যাবাশ্ব। বেদের অনুক্রমণিকাতে প্রতিটি বৈদিক মন্ত্রের রচনাকার ঋষির নাম আছে। এঁদের মধ্যে সাতটি ঋষি (সপ্তর্ষি) বিশেষ ভাবে সম্মানিত। শতপথে এদের নাম গৌতম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ ও অত্রি। আকাশে এঁরা সাতটি তারা রূপে বর্তমানে অবস্থিত মনে করা হয় ; 'উরসা মেজর' নামে নক্ষত্রপুঞ্জের অন্তর্গত। এঁদের ব্রহ্মার মানসপুত্রও বলা হয়। পুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থে বলা হযেছে পরমার্থ তত্ত্বে যাঁরা সম্যক দৃষ্টি রাখেন এবং সংসার অতিক্রম করেছেন বা যাঁদের কাছ থেকে বিদ্যা, সত্য, তপঃ ও শ্রুতি সম্যক রূপে নিরূপিত হয় তাঁরা হচ্ছেন ঋষি। পুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থে এই সাতজন ঋষির নামের অনেক অদল বদল দেখা যায় এবং এঁদের সম্বন্ধে বহু কাহিনী পাওয়া যায়। বিভিন্ন গ্রন্থে এই সাতজন ছাড়া আরো বহু ঋষির নাম দেখা যায়। মহাভারতে সপ্তর্ষির নাম মরীচি, অঙ্গিরা, পুলহ, ক্রতু, অত্রি, পুলস্ত্য, বশিষ্ঠ। বায়ুপুবাণে ভৃগুকেও এবং বিষ্ণুপুরাণে ভৃগু ও দক্ষকেও ঋষি বলা হয়েছে। আবার কিছু গ্রন্থে মনু, কণ্ব, বাল্মীকি, ব্যাস ও বিভাণ্ডককেও ঋষি বলা হয়েছে। ঋষিদের আবার শ্রেণী বিভাগ রয়েছেঃ—(১) শ্রুতর্ষি হচ্ছেন সুশ্রুত ; (২) কাণ্ডর্ষি হচ্ছেন জৈমিনি ; (৩) পরমর্ষি হচ্ছেন ভেল ; (৪) মহর্ষি ব্যাস ; (৫) রাজর্ষি বিশ্বামিত্র, জনক ; (৬) ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ ঃ (৭) দেবর্ষি নারদ, অত্রি, মরীচি, ভরদ্বাজ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, প্রচেতা, ভরত, তুম্বুরু ও কণাদ। আরো বিশ প্রকার ঋষির

উল্লেখ আছে ঃ—(১) বৈখানস, (২) বালখিল্য, (৩) মরীচিপ, (৪) সংপ্রক্ষাল, (৫) অশ্ম-কুট্ট, (৬) আকাশ নিলয়, (৭) অনবকাশিক, (৮) দন্তোলুখল, (৯) অপব্যা, (১০) পত্রাহার, (১১) উন্মজ্জক, (১২) গাত্রশয্যা, (১৩) বায়ুভুক, (১৪) জলাহার (১৫) আর্দ্র-পট্টবাস, (১৬) স্থণ্ডিলশায়ী, (১৭) উর্দ্ধবাহু, (১৮) তপোনিষ্ঠ, (১৯) পঞ্চতপান্বিত, (২০) সজপ। মহাভারতে আরো কয়েকপ্রকার ঋষির কথা আছে ঃ—ফলাহারী, মূলাহারী, ঘৃতপায়ী, সোমবায়ব্য ইত্যাদি। পরে ঋষি ও মুনি সমার্থক শব্দ হয়ে উঠেছে। নাহলে মুনি অর্থে কৃচ্ছ্রব্রত তপস্বী। ঋক্ বেদে ১০-ম মণ্ডলে কবষ একজন শূদ্র ঋষি। এই ১০-ম মণ্ডল ছাড়া অন্য কোথাও ঋক্‌বেদে জাতি বিচার নাই।

ঋষিকুল্যা—(১) ঋষিদের কল্পিত নদী (মহা ৬।১০।৩৪)। হিমবতী। (২) মহেন্দ্র পর্বত থেকে বার হয়ে গঞ্জামের কাছে সাগরে গিয়ে পড়েছে। (৩) বিহারে শুক্তিমৎ পাহাড়ে উৎপন্ন কিয়ুল নদী।

ঋষিগিরি—রাজগৃহ।

ঋষিপত্তন—সারনাথ।

ঋষিযজ্ঞ—বেদ ইত্যাদি অধ্যয়ন।

ঋষিলোক—এখানে ঋষিরা থাকেন। ধ্রুবলোকের নীচে, শনিলোকের ওপরে।

ঋষ্যমুক—(১) ঋশ্যমূক। ঋষ্য অর্থে মৃগ ; অর্থাৎ মৃগেরা (হরিণ) যেখানে নির্ভয়ে বিচরণ করে। দাক্ষিণাত্যের পাহাড়। পূর্বঘাট ও নীলগিরি পর্বতশ্রেণীর মাঝে। তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে অনগণ্ডি পর্বত থেকে ৮ মাইল। পম্পা নদীও এই পাহাড়ে উৎপন্ন এবং তুঙ্গভদ্রাতে এসে মিশেছে। পম্পার পশ্চিম তীরে এই পাহাড়ের কাছে মতঙ্গ বনে শবরী বাস করতেন। কাবেরী নদীও এখানে উৎপন্ন হয়েছে। (ঋষ্যমুকশ্চ পম্পায়াঃ পুরস্তাৎ পুষ্পিতদ্রুমঃ। সুদুঃখারোহণো নাম শিশুনাগাভিরক্ষিতঃ॥ রামা ৩।৭৩।৩২) কবন্ধকে যেখানে অগ্নিসাৎ করা হয়েছিল সেখান থেকে প্রতীচীং দিশম্ আশ্রিত্য পন্থা (রা ৩।৭৩।২)। এই বন পথ অতিক্রম করে নন্দন প্রতিম একটি বন ; এখানে উত্তরকুরু মত পাদপগুলি সর্বকামফলা এবং চৈত্ররথ মত এখানে সমস্ত ঋতু বর্তমান। এই বন ও পাহাড় পার হয়ে পম্পা (দ্রঃ) সরঃ। ব্রহ্মা নির্মিত পাহাড়। এই পাহাড়ের শিখরে শুয়ে স্বপ্ন দেখলে সেই স্বপ্ন-দৃষ্ট বিত্ত লাভ হয়। কোন পাপী এই পাহাড়ে উঠে ঘুমালে রাক্ষসরা তাকে প্রহার করে (রা ৩।৭৩।৩৫)। এই পাহাড়ে একটি বড় গুহা ; গুহাটিতে প্রবেশ করা খুব কঠিন ; গুহাটির স মনে মস্ত বড় একটি রম্য হ্রদ। এই গুহাতে সুগ্রীব থাকতেন। কাছেই মতঙ্গ মুনির আশ্রম ছিল ; মার্কণ্ডেয় মুনিও এখানে থাকতেন। অসুর দুন্দুভিকে বধ করে বালী তার দেহ ছুঁড়ে ফেলে দেন ; অসুরের মুখের রক্ত ছিটকে আশ্রমে এসে পড়েছিল। এ জন্য মতঙ্গ অভিশাপ দিয়েছিলেন বালী এই পাহাড়ে এলেই মারা পড়বেন। এই জন্য সুগ্রীব এখানে নির্ভয়ে বাস করতেন। কবন্ধকে (দ্রঃ) শাপমুক্ত করে রাম লক্ষ্মণ মতঙ্গ আশ্রমে এলে শবরী মুক্তি পায়। সুগ্রীবের সঙ্গে এখানে রামচন্দ্রের বন্ধুতা হয়। (২) বক (দ্রঃ) রাক্ষসের পিতা।

ঋষ্যশৃঙ্গ—বিভাণ্ডক / বিভণ্ডক মুনির ছেলে। দশরথের জামাই (দ্রঃ শান্তা)।

বিভাণ্ডক, মতান্তরে কশ্যপ, মুনি তপস্যায় শ্রান্ত হয়ে হ্রদে স্নান করছিলেন। এই সময় উর্বশীকে দেখে কামার্ত হয়ে বীর্য স্খলন হয়। এই বীর্য জলে পড়ে ; একটি তৃষ্ণার্ত হরিণী এই বীর্যযুক্ত জল পান করে গর্ভিণী হয়ে এই শিশুর জন্ম দেয়। ভগ নামে আদিত্যের শাপভ্রষ্টা কন্যা স্বর্ণমুখী এই হরিণী। হরিণীর সন্তান বলে শিঙ ছিল ; বিভাণ্ডক নাম রেখেছিলেন ঋষ্যশৃঙ্গ। কৌশিকী নদীর তীরে পিতার আশ্রমে পালিত হয়ে পরে ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করে তপস্যা ও বেদ অধ্যয়ন করে কাটাতেন। কোন দিন কোন স্ত্রীলোককে দেখেন নি। রামায়ণে (১।৯।৫) সনৎকুমার বলেছিলেন এই ঋষ্যশৃঙ্গ দ্বিবিধ ব্রহ্মচর্য পালন করবেন।

রাজা লোমপাদ (দ্রঃ) ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতদের ওপর একবার অসৎ ব্যবহার করাতে এঁরা রাজাকে ত্যাগ করে চলে যান। ইন্দ্রও বৃষ্টি বন্ধ করে দেন। মহা দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। রাজা তখন একজন মুনির পরামর্শে প্রায়শ্চিত্ত করে সকলকে খুসি করেন এবং ব্রাহ্মণ ইত্যাদির পরামর্শে ঋষ্যশৃঙ্গকে দিয়ে বৃষ্টি হবার জন্য যজ্ঞ করাবার ইচ্ছায় কতকগুলি পরমাসুন্দরী বারাঙ্গনাকে পাঠিয়ে দিয়ে বিভাণ্ডকের অনুপস্থিতিতে ঋষ্য-শৃঙ্গকে সহজেই কুৎসিত ভাবে ভুলিয়ে নিয়ে আসেন। প্রথম দিন এঁরা নিয়ে যেতে পারেন নি। বিভাণ্ডক আশ্রমে এসে ছেলেকে বিচলিত দেখে জিজ্ঞাসা করে ঘটনাটা কিছুটা জানতে পারেন এবং ছেলেকে বিশেষ ভাবে সাবধান করে দেন। এরা পরে সুবিধামত আবার এসে ঋষিপুত্রকে ভুলিয়ে নিযে আসেন। মহাভারতে (৩।১১০।-) কাশ্যপ বিভাণ্ডক মহাহ্রদে তপস্যা করছিলেন ; বীর্য স্খলন হয় ইত্যাদি। ঋষ্যশৃঙ্গ পিতা ছাড়া কাউকে দেখেনি। লোমপাদের আদেশে একজন জরৎ যোষা একটি নাব্যাশ্রম তৈরি করে নানা ভাবে সাজিয়ে নৌকাটি নিয়ে উপস্থিত হয়। নিজ (?) দুহিতাকে কি করতে হবে ইত্যাদি বুঝিয়ে পাঠায়। দুহিতা একা এসেছিল ; নানা কিছু দিয়েছিল। অগ্র্যাণি পানানি খেয়ে ভূঃ চলিতা ইব আসীৎ (মহা ৩।১১২।১৫)। নানা ভাবে প্রলোভিত করে দুহিতা চলে যায়। হরি পিঙ্গলাক্ষ বিভাণ্ডক এসে সব শুনে বোঝান এ রাক্ষস ; নিজেও রাক্ষস খুঁজতে যান এবং তিন দিন পরে বিফল হয়ে ফিরে আসেন। তারপর বিভাণ্ডক আবার ফল আনতে গেলে সেই বেশ-যোষা এসে ঋষ্যশৃঙ্গকে নিয়ে পালায়। ঋষ্যশৃঙ্গ এসে পৌছনর সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। রাজা এঁকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করেন ; নিজের কন্যা (রা ১।১১।১৯) শান্তার সঙ্গে বিয়ে দেন এবং বিভাণ্ডককে প্রচুর ধনরত্ন উপহার পাঠিয়ে দেন। অন্য মতে শান্তা (দ্রঃ) দশরথের মেয়ে। ঋষ্যশৃঙ্গ যজ্ঞ করলে বৃষ্টি হয়েছিল। মহাভারতে বিভাণ্ডক উপহার গ্রহণ করেন নি : ক্রুদ্ধ হয়ে ছুটে এসেছিলেন ; কিন্তু আতিথ্য ও সম্মানে শান্ত হন। ঋষ্যশৃঙ্গ পরে অঙ্গদেশেই বাস করতেন। মহাভারতে বিভাণ্ডক নির্দেশ দিয়ে যান শান্তার ছেলে হলে ঋষ্যশৃঙ্গ যেন আশ্রমে ফিরে যান। বশিষ্ঠ ও মন্ত্রী সুমন্ত্রের পরামর্শে অশ্বমেধ (ঋষ্যশৃঙ্গং পুরস্কৃত্য কর্ম চক্রুঃ দ্বিজর্ষভাঃ অশ্বমেধে যথান্যায়ং পরিক্রামন্তি শাস্ত্রতঃ ॥ রামা ১।১৪।৩) যজ্ঞে এবং অব্যবহিত পরে পুত্রেষ্টি যজ্ঞে রাজা দশরথ এই ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রধান পুরোহিত করে পূর্ণ

মনোরথ হয়েছিলেন। সপুত্র শান্তা-ভর্তা ঋষ্যশৃঙ্গ এই যজ্ঞে এসেছিলেন (রা ১।১১।৬)। ভাগবতে (৯।২৩) ঋষ্যশৃঙ্গ ইন্দ্র-যজ্ঞ করে লোমপাদেরও পুত্র উৎপাদন করেন।

ঋষ্যশৃঙ্গআশ্রম—বিভণ্ডক আশ্রম। ভাগলপুর থেকে ২৮ মাইল পশ্চিমে ঋষিকুণ্ডে এবং বারিয়ারপুর (পূ-রেল) থেকে ৪ মাইল দ-পশ্চিমে। মৈর বা মরুক পর্বত গঠিত একটি গোল মত উপত্যকাতে অবস্থিত, উপত্যকার উত্তর দিকে একটি মাত্র পথ। এখানে ৫-টি উষ্ণ প্রস্রবণ এবং দুটি ঠাণ্ডা জলের প্রস্রবণ রয়েছে। এই সাতটি প্রস্রবণের জল মিলে ঋষিকুণ্ড; বাড়তি জল এই কুণ্ড থেকে অভিনদী নামে উত্তর দিকে বার হয়ে গিয়ে ৫ মাইল দূরে গঙ্গাতে গিয়ে পড়েছে। আগে গঙ্গা এই উপত্যকার পাশ দিয়েই প্রবাহিত ছিল। কুণ্ডটির উত্তর তীরে ভাঙা পাথরের ছোট একটি ঢিপি মত রয়েছে; প্রবাদ এখানে বিভণ্ডক ও ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি তপস্যা করতেন। প্রতি তিন বৎসরে এখানে ঋষির নামে একটি মেলা হয়। আর একটি ঋষ্যশৃঙ্গ পর্বত রয়েছে কাজরা স্টেসন থেকে ৮ মাইল দক্ষিণে। দ্রঃ- রোহিনালা। নৌকা করে ঋষ্যশৃঙ্গকে ভুলিয়ে আনা হয়েছিল; অর্থাৎ ঋষিকুণ্ডই যেন প্রকৃত ঋষ্যশৃঙ্গ আশ্রম। মহাভারতে আছে এই আশ্রম কুসি বা কৌশিক নদীর কাছে এবং চম্পা থেকে তিন যোজন অর্থাৎ ২৪ মাইল। কিয়ুলের কাছে আর একটি আশ্রম ছিল প্রবাদ। দ্রঃ- সিংঘোল পর্বত। ঋষ্যশৃঙ্গগিরি= শৃঙ্গেরি (দ্রঃ)।

এ

একচক্র—দনুর (দ্রঃ) বিখ্যাত পুত্র।

একচক্রা—বর্তমানে আরা। জতুগৃহ দাহের এবং হিড়িম্বাকে বধ করার পর পাণ্ডবরা (দ্রঃ) কুন্তীকে নিয়ে এই নগরে কিছুদিন আশ্রয় নিয়েছিলেন। এখানে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে থাকার সময় ভীমের হাতে বকাসুর (দ্রঃ) নিহত হন। একচক্রা থেকে পাঞ্চালে যান (মহা ১।৯০।৮০)। এটওয়ার ৮ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত নগরী। গীতা-প্রেসে (১।১৫৫।১৮) শ্লোকে পাঠান্তর রয়েছে ইহ মাসং প্রতীক্ষধ্বং; মনে হয় এক মাস মত এখানে ছিলেন।

একচূর্ণী—তৈত্তিরীয় যজুঃ সংহিতার ভাষ্যকার মুনি।

একজটা—(১) অন্য নাম নীলতারা। বৌদ্ধ মহাযান দেবতাদের মধ্যে একজন শক্তিশালী দেবী। এঁর অনেকগুলি নীলমূর্তি। একটি মূর্তির নাম বিদ্যুৎজ্বালা; করালী মূর্তি, বারটি মুখ, চব্বিশটি হাত। তারা দেবীর এই মূর্তির উগ্রতার জন্য আর এক নাম উগ্রতারা। তিব্বতে ইনি লামো নামে পূজিতা। ভীষণতার ইনি প্রতিমূর্তি। নেপালে ইনি আর্য তারাদেবী। সাধনমালাতে এঁর অক্ষোভ্য কুল, সবসময় নীল রঙ; ভয়ঙ্কর দেখতে। মুখ একটি; হাত দুই, চার বা আট। ব্যাঘ্রচর্ম, পিঙ্গল-উর্দ্ধ কেশ, বেঁটে, লম্বোদরী, গলাতে মুণ্ডমালা, শবের ওপর প্রত্যালীঢ় ভঙ্গি। হাতে খড়্গ, ধনু, বজ্র, কর্তরি, বাণ, উৎপল, পরশু, কপাল। এঁর মন্ত্র একবার শুনলে মানুষ সব বিপদ থেকে মুক্ত হয়। বৌদ্ধ শাস্ত্র অনুসারে খৃ সপ্তম শতকের মাঝখানে সিদ্ধ নাগার্জুন

তিব্বত থেকে এ'র পূজা ভারতে প্রচলন করেন। (২) দেবতারা. শুম্ভনিশুম্ভের ভয়ে মাতঙ্গী মহাবিদ্যার স্তব করলে তাঁর দেহ থেকে কৃষ্ণবর্ণা, চতুর্ভুজা, মুণ্ডমালা বিভূষিতা, ডান হাতে খড়্গ ও পদ্ম বাঁ হাতে কর্ত্রী ও খর্পর মাথায় একজটা মূর্তির আবির্ভাব হয়েছিল। দ্রঃ- উগ্রতারা। (৩) লঙ্কাতে এক রাক্ষসী। রাবণের কাছে আত্মসমর্পণের জন্য মিষ্ট কথায় সীতাকে অনেক বুঝিয়েছিল।

একত—দ্রঃ- ত্রিত।

একদন্ত—গণেশ। যুদ্ধকালে পরশুরামের কুঠারাঘাতে একটি দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছিল বলে এই নাম (পদ্ম-পু)। অন্য মতে পাশা খেলার জন্য পাঞ্জির প্রয়োজনে রাবণ এ'র একটি দাঁত তুলে নেন। আর এক মতে রাবণ একবার কৈলাসে শিবের সঙ্গে দেখা করতে এলে গণেশ বাধা দেন ; রাবণ তখন একটি দাঁত ভেঙে দেন। আর এক মতে কার্তিকের সঙ্গে যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলতে গিয়ে দাঁতটি ভেঙে গিয়েছিল।

একপর্ণা—হিমালয় ও মেনকার তিন মেয়ে একপর্ণা, একপাটলা (দ্রঃ) ও অপর্ণা (দ্রঃ)। একটি মাত্র পাতা খেয়ে জীবনধারণ করে তপস্যা করতেন ফলে এই নাম। অসিত-দেবলের সঙ্গে বিয়ে হয়।

একপাটলা—একপর্ণার (দ্রঃ) বোন। একটি মাত্র পাটল (=পারুল) পুষ্প খেয়ে জীবন ধারণ করে তপস্যা করতেন ; তাই নাম। জৈগীষব্যের স্ত্রী।

একপাদ—(১) ১১-রুদ্রের একজন। (২) মহিষাসুরের মন্ত্রী।

একপিঙ্গল—একপিঙ্গ, কুবের। পরমেশ্বরের পাশে পার্বতীকে বসে থাকতে দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে কুবেরের একটি চোখ নষ্ট হয়ে পিঙ্গল বর্ণ হয়ে যায়। অন্য মতে পার্বতীর শাপে বামচক্ষু নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। পরে শিবের অনুগ্রহে পার্বতী চক্ষুর স্থানে একটি পিঙ্গলবর্ণ চিহ্ন করে দেন। যক্ষেরা এ'কে পূজা করতেন।

একবীর—হেহয় (দ্রঃ)।

একবাদ—বেদান্তে আব্রহ্মস্তম্ভ পর্যন্ত তাবৎ পদার্থের অভিন্নত্ব প্রতিপাদক মতবাদ।

একলব্য—নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর ছেলে। দ্রোণের কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিখতে এলে দ্রোণ এ'কে নীচ জাতি বলে প্রত্যাখ্যান করেন (মহা ১।১২১-)। একলব্য তখন দ্রোণের মূর্তি তৈরি করে গুরু হিসাবে মূর্তির সামনে তপস্যা করেন ও ধনুর্বিদ্যা চর্চা করতে থাকেন। অচলা ভক্তির ফলে ক্রমশ অর্জুনের চেয়েও অস্ত্রকুশলী হয়ে ওঠেন। একদিন কুরুপাণ্ডব বালকরা দ্রোণের অনুমতি নিয়ে বনে মৃগয়াতে এলে এ'দের কুকুর একলব্যকে দেখে চিৎকার করে উঠলে ইনি সাতটি তীর যোগে এর স্বর বন্ধ করে দেন ; অথচ একটুও ক্ষত হয় না। কুকুরটি ফিরে এলে এ'রা শর প্রয়োগ কৌশল দেখে অবাক হয়ে খুঁজতে খুঁজতে একলব্যের সন্ধান ও পরিচয় পান। দ্রোণ কথা দিয়েছিলেন অর্জুনকে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ ধনুর্বিদ শিষ্য করবেন। অর্জুন এ জন্য অনুযোগ করলে দ্রোণ প্রথমে বিশ্বাস করতে চান না। পরে অর্জুনের সঙ্গে বনে আসেন। গুরুকে দেখে একলব্য কৃতার্থ হয়ে যান। কিন্তু দ্রোণ অর্জুনকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি স্মরণ করে একলব্যকে শিষ্য বলে স্বীকার করে নেন এবং 'বেতন' (মহা ১।১২৩।৩৩) হিসাবে একলব্যের ডান

হাতের বুড়ো আঙ্গুলটি চান। একলব্য অকাতরে দিয়ে দেন। এর ফলে একলব্যের তীরসন্ধানের ক্ষমতা কিছুটা বিঘ্নিত হয় এবং অর্জুনের শ্রেষ্ঠতা বজায় থাকে। কৃষ্ণের হাতে একলব্য মারা যান (মহা ৭।১৫৬।২১)। অশ্বমেধের ঘোড়া ধরলে অর্জুনের হাতে একলব্যের ছেলে নিহত হন। হরিবংশে (১।৩৪) দেবশ্রবার (দ্রঃ-শূর) ছেলে শত্রুঘ্ন; নিষাদরাজের কাছে পালিত; পরে নাম একলব্য।

একশৃঙ্গ—একজন পিতৃদেব (দ্রঃ)।

একাক্ষ—জয়ন্ত (দ্রঃ) নামে একটি কাক। (পুত্রঃ কিল স শক্রস্য বায়সঃ পততাং বরঃ। রামা ৫।৩৮।২৮)। চিত্রকূটে বাস করার সময় সীতার স্তনে ঠোঁট দিয়ে আঘাত করে। রামচন্দ্র সীতার কোলে মাথা রেখে ঘুমচ্ছিলেন। ঘুম ভেঙে যায় এবং (মৎকৃতে কাকমাত্রে তু) ব্রহ্মাস্ত্রং (সমুদীরিতম্। রামা ৫।৩৮।৩৯) ছোঁড়েন। কাক ভয়ে নানা দেবতা ও ঋষির কাছে আশ্রয় নিতে চেষ্টা করেন। এ দিকে অস্ত্র ছুটে আসছে। দেবতারা তখন রামের কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইতে বলেন। জয়ন্ত বাধ্য হয়ে ফিরে আসে এবং একটি মতে সীতার অনুরোধে রাম একে হত্যা না করে ডান চোখটি নষ্ট করে ছেড়ে দেন।

একাঘ্নী—এক জনকে হত্যা করবে এই রকম মহাস্ত্র। কর্ণ নিজের কবচ ইন্দ্রকে দিয়ে এই অস্ত্র চেয়ে নেন এবং অর্জুনকে বধ করবার জন্য সযত্নে রেখে দেন। কিন্তু ঘটোৎকচের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধে এই অস্ত্র নিক্ষেপ করতে বাধ্য হন।

একাত্মবাদী—এক ব্রহ্মকে যাঁরা স্বীকার করেন। সবই ব্রহ্ম যাঁদের মত।

একাদশ ইন্দ্রিয়—বাক, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও মন।

একাদশতনু—মহাদেব। অজ, একপাদ, অহির্বুধ্ন্য, পিনাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু, হর, ঈশ্বর সব সমেত এই এগারটি মূর্তি মহাদেব ধারণ করেছিলেন। এঁরা একাদশ রুদ্র নামেও পরিচিত। অন্য মতে অজৈকপাদ, অহির্বুধ্ন্য, বিরূপাক্ষ, সুরেশ্বর, জয়ন্ত, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৈবস্বত, সাবিত্র, হর। দ্রঃ- রুদ্র।

একাদশরুদ্র—দ্রঃ- একাদশতনু।

একাদশী—দ্রঃ- মুর। যে সময় সূর্যের দৃষ্টি থেকে চন্দ্রের একাদশ-কলা বার হয়ে যায় সেই সময় শুক্লা একাদশী। যখন চন্দ্রের একাদশ কলা সূর্যের দৃষ্টি পথে প্রবেশ করে তখন চন্দ্রকলার জ্যোতি থাকে না; সেই সময় কৃষ্ণা একাদশী। বৈশাখে শুক্লা-একাদশীর নাম মোহনী, কৃষ্ণা একাদশীর নাম বরূথিনী। জ্যৈষ্ঠে যথাক্রমে নির্জলা, অপরা। আষাঢ়ে পদ্মা, যোগিনী। শ্রাবণে পুত্রদা, কামিকা। ভাদ্রে বামনা, অজা। আশ্বিনে পাপাঙ্কুশা, ইন্দিরা। কার্তিকে প্রবোধিনী, রমা। অগ্রহায়ণে মোক্ষা, উৎপলা। পৌষে পুত্রদা, সকলা। মাঘে জয়া, ষট্‌তিলা। ফাল্গুনে আমর্দকী, বিজয়া। চৈত্রে কামদা, পাপমোচনী। মলমাসে সুভদ্রা ও কমলা। একাদশী একটি পুণ্য তিথি। অপর নাম হরিবাসর। এই দিনে উপবাস বিধেয়। উচ্চবর্ণের বিধবাদের উপবাস অবশ্য কর্তব্য ছিল। বিশেষ নামকরা একাদশী: শয়ন একাদশী আষাঢ়ে

শুক্লা একাদশী। ভৈমী একাদশী মাঘে শুক্লা একাদশী। পুরাণে ভদ্রশীল, রুক্মাঙ্গদ ও চন্দ্রহাসের কাহিনীতে একাদশীর মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। দ্রঃ- অম্বরীষ।

একানংশা—(১) কিছু মতে ইনি সুভদ্রা (দ্রঃ)। বৃহৎ সংহিতাতে এ'র দুই বা চার বা আট হাত। আট হাত হলে হাতে আয়ুধও থাকে ; কৃষ্ণ ও বলরামের মধ্যস্থানে এই মূর্তি স্থাপনের নির্দেশ রয়েছে। একানংশা কার্যা দেবী বলদেবকৃষ্ণয়োঃ মধ্যে, কটি-সংস্থিত-বাম করা, সরোজম্ ইতরেণ চ উদ্বহতি। হরিবংশে আছে দেবকীর সন্তানদের হত্যা করা হবে মন্ত্রণা শুনে বিষ্ণু ষট্-গর্ভ দৈত্যদের প্রাণপুরুষগুলিকে নিয়ে নিদ্রা / যোগ-নিদ্রা/যোগমায়াকে দেন এবং ক্রমশ এদের দেবকীর গর্ভে স্থাপন করতে বলেন। আরো নির্দেশ দেন সপ্তম গর্ভে বিষ্ণু অংশে বলরাম এলে সপ্তম মাসে একে যেন রোহিণীর গর্ভে (২।২।৩১) স্থাপন করে দেন। এরপর কৃষ্ণ (দ্রঃ) যাবেন এবং নিদ্রা যেন যুগপৎ যশোদার গর্ভে যান। আট মাসে কৃষ্ণা নবমীতে অভিজিৎ মুহূর্তে দুজনে এক সঙ্গে জন্মাবেন। বিষ্ণু আরো বলে দেন কংসের হাত থেকে পিছলে আকাশে উঠে গিয়ে দেবীতে পরিণত হবেন ; রঙ হবে কালো (২।২।৪০), মুখ বলরামের মত গৌর। চার হাত ; হাতে শূল, খড়্গ, পদ্ম ও মধুপাত্র। সর্বরত্নাভরণা, কৌমারং ব্রতম্ আস্থায় স্বর্গে যাবেন। ইন্দ্র অভিষেক করে ভগিনী বলে স্বীকার করে নেবেন। কুশিক গোত্রের কারণে আর এক নাম হবে কৌশিকী (২।২।৪৮) বিন্ধ্য পর্বতে বাস করবেন, শুম্ভনিশুম্ভকে বধ করবেন। সুরামাংসবলি-প্রিয়া ও সর্ববরদা হয়ে অবস্থান করবেন। কিরাতীরূপী, শবরৈঃ, বর্বরৈঃ, পুলিন্দৈঃ পূজিতা (২।৩।৪)—বিন্ধ্যবাসিনী। দ্রঃ- দুর্গা, মাতৃকা, কালী, মুদ্রা, বিন্ধ্যাচল, কন্যাকুমারী।

যথা সময়ে কংসের হাত থেকে আকাশে উঠে গিয়ে বলে যান মৃত্যু সময়ে এসে কংসের রক্ত পান করবেন (২।৪।৪৪)। বসুদেবের নির্দেশে এই মেয়েকে বৃষ্ণিরা পালন করেন (২।১০১।১৩)। ইনি বিষ্ণুর অংশ ফলে অপর নাম একানংশা (২।৪।৪৭)। ভাগবতে (১০।৪) আকাশে উঠে গিয়ে আট হাত এবং আট হাতেই আয়ুধ। দ্রঃ-কালী।

পূর্ব ভারতে অনেকগুলি শিলা ও ব্রোঞ্জের উৎকীর্ণ মূর্তি পাওয়া গেছে। একানংশ সম্প্রদায় পূর্ব ভারতে একদিন বেশ ছড়িয়ে পড়েছিল।

বিশেষ (২) দুর্গার একটি রূপ। স্কন্দপুরাণে আছে নিশাকে ব্রহ্মা নির্দেশ দিলেন পার্বতীর রং কালো করে দিতে এবং এই পার্বতী যখন গৌরী হবেন তখন পার্বতীর কালো খোলস একানংশা হবেন। এই শাক্তদেবী সুরা ও মাংস প্রিয়া। মহাষ্টমীতে মহিষ ও মেষ বলির নির্দেশ আছে। (৩) অগ্নিবংশ (দ্রঃ) ।

একাবলী—রাজা হৈহয়ের (=একবীর) স্ত্রী ; এ'র নাতি কার্তবীর্যার্জুন।

একাম্রবন—ভুবনেশ্বর=গুপ্তকাশী। এখানে একটি আমগাছ ছিল। গন্ধবতী নদীর তীরে। কটক থেকে ২০ মাইল। ৪৭৩ খৃস্টাব্দে যবন বা বৌদ্ধদের বিতাড়িত করে রাজা যযাতিকেশরী ভুবনেশ্বর মন্দির নির্মাণ সুরু করেন। ১০০ বছর পরে রাজা ললাটেন্দুকেশরী কাজ শেষ করেন। প্রাচীন নাম কলিঙ্গনগরী। খৃ-পূ ৬ শতক থেকে যযাতিকেশরীর সময় পর্যন্ত উড়িষ্যার রাজধানী। বা হরক্ষেত্র। ভুবনেশ্বর (হরিহর

বিগ্রহ), মুক্তেশ্বর, গৌরী ও পরশুরাম মন্দির এখানে স্থাপত্যের জন্য মূল্যবান। আজও এগুলি অক্ষুণ্ণ আছে। দেবী-পাদ-হরা কুণ্ডের চারদিকে যোগিনীদের ১০৮টি ছোটছোট মন্দির রয়েছে। কীর্তি ও বাস নামে দুজন অসুরকে দেবী এখানে পদদলিত করে নিহত করেন। ভুবনেশ্বরে পবিত্রতম পুষ্করিণী হচ্ছে বিন্দু সরোবর। লালাটেন্দুকেশরীর স্ত্রী খনন করান। স্টেসন থেকে রামেশ্বর মন্দিরে যাবার পথের ধারে যযাতি কেশরীর প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আজও পড়ে আছে। দ্রঃ- কলিঙ্গনগর।

একাষ্টকা—প্রজাপতির কন্যা. ইন্দ্র ও সোমের জননী।

একেশ্বরবাদ—ব্রাহ্মণ্য দর্শনে একেশ্বর বাদ মুক্তকণ্ঠে স্বীকৃত হলেও বেদে পুরাণে ও তন্ত্রে অর্থাৎ যেগুলি সরাসরি দর্শন নয় যেখানে ভক্ত গ্রন্থকারদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে নানা বৈচিত্র্য আসতে বাধ্য। ঋক্ বেদে বহু দেবতা আছেন, আবার একজন ঈশ্বরও আছেন। ঋক্‌বেদ ইত্যাদি যেহেতু সংচয়ন গ্রন্থ সেই হেতু নানা দৃষ্টিভঙ্গি সেখানে ফুটে ওঠাই স্বাভাবিক।

পুরুষ সূক্তে বলা হয়েছে—
সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ
স ভূমিং বিশ্বতঃ বৃত্বা অত্যাতিষ্ঠৎ দশাঙ্গুলম্
পুরুষঃ এব ইদং সর্বং যদ্ভূতং যৎ চ ভব্যম্
উৎ অমৃতত্বস্য ঈশানঃ যৎ অন্নেন অতিরোহতি
এতাবান্ অস্য মহিমা অতঃ জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ
পাদ অস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদ্ অস্য অমৃতং দিবি। (ঋক্ ১০।৯০)

বা- সুপর্ণং বিপ্রাঃ কবয়ঃ বচোভিঃ একং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি (১০।১১৪।২৫)
বা- ইন্দ্রং মিত্রং বরুণং অগ্নিম্ আহুঃ অথ দিব্যঃ সুপর্ণঃ গরুত্মান্
একং সৎ-বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি অগ্নিং যমম্ মাতরিশ্বানম্ আহুঃ (১।১৬৪।৪৬)
বা- একং বা ইদং বি বভূব সর্বম্ (৮।৫৮।২)
বা- মহৎ দেবানাম্ অসুরত্বম্ একম্ (৩।৫৫।১)
বা- এতস্যৈব স বিসৃষ্টিঃ এষঃ—(শু-যজু)

এগুলি নিশ্চিত ভাবে একেশ্বর বাদ। কিন্তু অম্ভৃণ ঋষি কন্যা বাক্ দেবী-সূক্তে (১০।১২৫।১-২) বলছেন ঃ—

অহং রুদ্রেভিঃ বসুভিঃ চরামি অহম্ আদিত্যৈঃ উত বিশ্বদেবৈঃ
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্মি অহম্ ইন্দ্রাগ্নী অহম্ অশ্বিনোভা
অহং সোমম্ আহনসং বিভর্মি ত্বষ্টারম্ উত পূষণম্ ভগম্ (১০।১২৫।১-২)

এটি expansive mood বা illusion grandeur উক্তি। স্কিজোফ্রেনিয়াতে দেখা যায়। তবু কিন্তু বহু দেবতা এখানে স্বীকৃত। আবার বহু মতে এখানে এই অহং একমাত্র দেবী।

গীতাতে—পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং......
বা- মণ্ডুকে অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্যৌ দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্বিবৃতাশ্চ বেদাঃ ॥ (২।১।৪)

বায়ুঃ প্রাণঃ হৃদয়ম্ বিশ্বমস্য পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্বভূতান্তরাত্মা ॥

বা- সর্বতঃ পাণিপাদন্তং সর্বতঃ অক্ষিশিরোমুখম্

সর্বতঃ শ্রুতিমৎ লোকে সর্বম্ আবৃত্য তিষ্ঠতি। (শ্বেতাশ্বতর ৩।১৬)

এ তিনটিই পুরুষসূক্তের পুনরাবৃত্তি; কিন্তু ঠিক একেশ্বরবাদের এগুলি প্রমাণ নয়। কারণ চক্ষুষী চন্দ্রসূর্যৌ ইত্যাদি উক্তির মধ্যে চন্দ্রসূর্যকে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছেই। অথচ এগুলিকেও অনেকে একেশ্বরবাদের প্রমাণ বলে চালাতে চান।

বিশ্বরূপ দেখান একটি সস্তা ভানুমতীর খেলাতে পরিণত হয়েছিল। শিব, গণেশ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু সকলেই এই ভেল্কি দেখিয়ে ভক্তদের মন রেখেছেন। গণেশ গীতাতে গণেশ বলছেন তিনি মহাবিষ্ণু ইত্যাদি। সুরটা একেশ্বরবাদ। মহাভারতে মার্কণ্ডেয় কার্তিকেয়ের স্তব করে বলেছেন তুমি সকল দেবতার আরাধ্য; অর্থাৎ যুগপৎ সকলেই আছেন। চেদি রাজের প্রার্থনা (বৃ-সং ৪৩।৫৪-৫৫) যেন ভাটের অতি নীচ চাটুকারিতা। তুমি বিষ্ণু, তুমি ব্রহ্মা বলে আজকেও যে কোন নিরন্ন যুবক রাজনৈতিক দাদাদের স্তব করে; এতে বিশেষ কিছু প্রমাণিত হয় না।

তন্ত্রে খিচুড়ি আরো মনোরম। অর্থাৎ তন্ত্র সাহিত্যের মূল সুর একেশ্বরবাদ নয়। জটপাকানই সেখানে একমাত্র প্রকট সত্য। ভারতে চিন্তার স্বাধীনতা অবাধ; ফলে ধর্মীয় একনায়কত্ব ভারতে নাই। একেশ্বর বাদের মূল কিন্তু সবটাই দর্শন নয়; ধর্মীয় আখড়াই একেশ্বরবাদের প্রাণশক্তি জুগিয়েছিল। অবশ্য একেশ্বরবাদের দার্শনিক মূল্যও যে খুব বেশি তাও নয়। খৃষ্টীয় ধর্ম ইত্যাদির মত ব্রাহ্মণ্য ধর্মকেও একেশ্বরবাদী হতে হবে এ এক হাস্যকর অনুকরণপ্রিয়তা।

এডাম পিক—রোহণ, সুমনকূট, সামন্তকূট, দেবকূট, শুভকূট; সিংহলে। এই শিখরে যে পায়ের চিহ্ন রয়েছে সেটিকে হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমান সকলেই নিজেদের মতানুসারে পূজা/শ্রদ্ধা করেন। দ্বীপে একটি সুউচ্চ শিখর।

এতশ—(১) সূর্যের একটি ঘোড়া। (২) ঋক্‌বেদের (১৬১।১৫) একজন প্রসিদ্ধ ঋষি। রাজা স্বশ্বের ছেলের সঙ্গে যুদ্ধে বিপন্ন হয়ে পড়লে ইন্দ্র এতশকে রক্ষা করেন।

এন্টিমনি—এণ্টিমনি ও গন্ধক যোগ এণ্টিমনি সালফাইড। প্রাচীন ভারতে কাজলের অন্যতম উপাদান। চরক সংহিতায় এর ব্যবহার উল্লিখিত আছে। এই সালফাইডের সঙ্গে লোহার টুকরা মিশিয়ে উত্তপ্ত করে ভারতে মৌল এণ্টিমনি নিষ্কাশন হত। সোমদেবের রসেন্দ্রচূড়ামণিতে এই প্রণালীর বর্ণনা আছে। সোমদেব এণ্টিমনিকে ভাল জাতের সীসা বলেছিলেন।

এম্বোলিমা—(গ্রীক); অম্বদুর্গ। এটোক থেকে ৬০ মাইল ওপরে সিন্ধুর তীরে। বিপরীত দিকে দরবুন্দ। আলেকজান্দার জয় করেছিলেন।

এরণ্ডী—উরি বা ওর নদী। বরদা রাজ্যে নর্মদার একটি করদা শাখা; নর্মদা এরণ্ডী সঙ্গমে কর্ণালি; সঙ্গমটি একটি পবিত্র তীর্থ স্থান।

এলাপত্র—কদ্রুর গর্ভে কশ্যপের ঔরসে একটি সন্তান; উরগ; অত্যন্ত বুদ্ধিমান। কদ্রু (দ্রঃ) ছেলেদের শাপ দিলে অভিশপ্ত ছেলেরা যে সভা করেন সেই সভাতে এই এলাপত্র

জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। নাগরাজ এলাপত্র বুদ্ধকে প্রণাম করতে এসেছিলেন—ভারহুত। দ্রঃ- জরৎকারু, বাসুকি।

এলাপুর—বর্তমানে ভেরাওয়াল। এখানে সোমনাথ পত্তন ও সোমনাথের মন্দির আছে।

এলাহাবাদ—প্রয়াগ। ভরদ্বাজ আশ্রম। ভাস্কর ক্ষেত্র। এখানে ৭-ম শতকে অক্ষয় বটটি হিউ-এন-ৎসাঙ দেখেছিলেন।

এলিফ্যাণ্টা—আঞ্চলিক নাম ঘারাপুরী। ১৮°৫৭′ উ এবং ৭৩° পূ। বোম্বাই সহর থেকে ১০কি-মি দূরে ছোট দ্বীপ। এখানে একটি পাথরের হাতী ছিল বলে পর্তুগিজরা এই নাম দিয়েছিল। গুহামন্দিরের জন্য বিখ্যাত। ৬-টি গুহামন্দির আছে ; এর মধ্যে চারটি সম্পূর্ণ বা প্রায় সম্পূর্ণ। শিবপুরা গুহামন্দিরটি প্রায় ৮-ম শতকের এবং বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারতের গুহামন্দির থেকে এর আকৃতি, আসন বিন্যাস পৃথক। মন্দিরের উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ব দিক এমন ভাবে খোলা যে সভাতে সূর্যালোকের অভাব হয় না। এই মন্দিরের দেবতা প্রসিদ্ধ ত্রিমূর্তি (দ্রঃ)। মধ্যের মুখ মহাদেবের, দক্ষিণের মুখ অঘোর-এর এবং বাম দিকে উমার। আরো অনেকগুলি পাথরের সুন্দর মূর্তি আছে। শিবরাত্রি উপলক্ষে এখানে মেলা হয়।

এলোরা—একটি অনুচ্চ পাহাড়। পাশের গ্রামের নামে নাম। মহারাষ্ট্রের জেলা-সদর ঔরঙ্গাবাদের উত্তর উত্তর-পশ্চিমে প্রায় নয় ক্রোশ দূরে (২০° উ ও ৭৫° পূ)। রাষ্ট্রকূট নৃপতি দ্বিতীয় কর্কের তাম্রলিপিতে এই পাহাড় সংলগ্ন এলাকার নাম এলাপুর। অজন্তার (দ্রঃ) মতই প্রাকৃতিক কারণে উৎপন্ন। পাহাড়ে ৫০টির বেশি শৈলখাত গুহা আছে। পাদদেশের গুহাগুলি কালক্রম অনুসারে ১-৩৪ সংখ্যায় চিহ্নিত। দক্ষিণ দিক থেকে হিসাব করলে এই ৩৪-টির প্রথম ১২টি বৌদ্ধদের, পরবর্তী ১৭টি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের এবং উত্তর প্রান্তে বাকি পাঁচটি জৈনদের।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে এখানে মানুষের বাস ছিল। ২১ নম্বর গুহার সামনে পরিষ্কার করবার সময় খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকের মৃৎপাত্র, অন্যান্য প্রত্নবস্তু ও গুপ্ত রাজাদের মুদ্রা পাওয়া গেছে। বাদামির চালুক্যরা এই অঞ্চলে যখন রাজা ছিলেন (খৃ ৬-৭ শতক) সেই সময়ে কয়েকটি বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য গুহা কাটা হয়। চালুক্যদের পর রাষ্ট্রকূটদের সময়েও অন্তত দুটি বৌদ্ধগুহা (১১নং ও ১২নং) এবং ব্রাহ্মণ্য ও জৈন গুহাগুলির বেশ কয়েকটি কাটা হয়েছিল। তিন সম্প্রদায়ের সহাবস্থান এখানে লক্ষ্যণীয়। ১৫নং গুহা সম্ভবত দন্তিদুর্গের আমলে (৭৫৩-৭৫৭ খৃ) এবং ১৬ নং গুহা 'কৈলাস' ; রাজা প্রথম কৃষ্ণের (৭৫৮-৭৭৩ খৃ) সময় কাটা হয়। ১৩নং অসমাপ্ত গুহাটির নাম ছোট কৈলাস।

এলোরার বৌদ্ধগুহাগুলি বিশাল। জমকালো গুহা তৈরির চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু অজন্তার মত সৌন্দর্য বোধ ও পরিমিতি-বোধ নাই। অধিকাংশ গুহা চিত্রিত ছিল ; এখনও যৎসামান্য বিদ্যমান। ছবির মানও নিম্ন স্তরের। অজন্তার তুলনায় এখানে মূর্তিসংখ্যা অনেক বেশি। মহামায়ূরী প্রমুখ বজ্রযান গোষ্ঠীর দেব-দেবীর সংখ্যাও

বহু। বুদ্ধ মন্দিরের দরজায় মহাযানী বোধিসত্ত্বের বিরাট মূর্তির পাশে বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি রয়েছে। মূর্তিগুলি সে সময়ে প্রলেপিত ও চিত্রিত ছিল। ৫ম, ১০ম, ১১শ, ১২শ বৌদ্ধগুহাগুলি বিশেষ দর্শনীয়। পঞ্চম গুহাটিতে বিশাল আয়তনের মণ্ডপ ও পেছনে বুদ্ধায়তন। মণ্ডপের দু দিকে কয়েকটি আবাসিক কক্ষ এবং স্তম্ভযুক্ত একটি করে উপশালা। উপশালার পাশে আবার কয়েকটি ছোট কক্ষ। মণ্ডপটিতে দুটি সমান্তরাল নীচু শৈলখাত আসন বোধ হয় শিক্ষার্থীরা ব্যবহার করতেন। দশম চৈত্যগৃহের নাম বিশ্বকর্মা; এর পরিকল্পনা ও রূপকর্ম বহু বিষয়ে অনন্য। ১১ ও ১২নং গুহাগুলির পরিকল্পনাও অনন্য; এ দুটি প্রশস্ত প্রাঙ্গণযুক্ত তিনতলা সৌধ; প্রতি তলার সামনে স্তম্ভযুক্ত বারান্দা।

১২নং গুহার প্রায় ৩৭ মিটার উত্তরে ব্রাহ্মণ্য গুহাগুলি প্রথম দিকে বৌদ্ধশৈলী অনুকরণে তৈরি। পরে নিজস্ব রীতি উদ্ভাবিত হয় এবং চরম সার্থকতা লাভ করে। ১৪ নং গুহা রাবণ-কা-খাই, ১৫ নং দশাবতার, ১৬ নং কৈলাস, ২১ নং রামেশ্বর, ২৯ নং ধুমার-লেনা। রাবণ-কা-খাই গুহাটির সামনে ১৬টি স্তম্ভের একটি সমাবেশ শালা, পিছনে প্রদক্ষিণ পথ বেষ্টিত গর্ভগৃহ। সমাবেশ শালার উত্তর ও দক্ষিণ গাত্রে শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব দেবদেবীদের খোদাই করা সুন্দর উদ্‌গত মূর্তি রয়েছে। প্রদক্ষিণ পথের দক্ষিণ প্রাচীরের গায়ে বীরভদ্র ও গণেশসহ সপ্তমাতৃকার মূর্তি। দশাবতার গুহাটি দোতলা, প্রাঙ্গণের সামনে তোরণযুক্ত প্রাচীর, প্রাঙ্গণের মধ্যে একটি শৈলখাত স্বতন্ত্র মণ্ডপ; পাশে ছোট ছোট দেবায়তন ও একটি জলাধার। গুহার নীচের তলা চোদ্দটি স্তম্ভের একটি সমাবেশ শালা ও চারটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। দোতালার সমাবেশ শালাটি মস্তবড়; এর পেছনে উপপ্রকোষ্ঠ এবং তারও পেছনে গর্ভগৃহ। সমাবেশ শালার দেওয়ালের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে শৈব ও বৈষ্ণব দেবতাদের এবং বিষ্ণুর কয়েকটি অবতারের সুঠাম বলিষ্ঠ মূর্তি রয়েছে। রামেশ্বর গুহা একটি লম্বা বারান্দার ন্যায় মণ্ডপ; মণ্ডপের দু পাশে একটি করে দেবায়তন ও পেছনে প্রদক্ষিণ পথ পরিবেষ্টিত গর্ভগৃহ। এই গুহা প্রাঙ্গণের কেন্দ্রে শিবের বাহন নন্দীর জন্য একটি স্বতন্ত্র মণ্ডপ ও প্রাঙ্গণের পাশে একটি ছোট দেবালয় রয়েছে। রামেশ্বর গুহার স্তম্ভগুলি কারুকার্যের জন্য প্রসিদ্ধ। ধুমার-লেনা গুহা ক্রুশের আকার একটি বিরাট সমাবেশ শালা। এর তিনটি প্রবেশ দ্বার এবং প্রতিটির সামনে একটি অঙ্গন। সমাবেশ শালার পেছনে মন্দির। মন্দিরের চারটি প্রবেশ দ্বারের দু পাশে দীর্ঘকায় দ্বারপাল মূর্তি। কৈলাস গুহা ভারতের বৃহত্তম ও সব চেয়ে আড়ম্বরপূর্ণ শৈলখাত মন্দির। ঠিক গুহার মত নয়; পাথর ইঁট ইত্যাদির সাহায্যে মন্দিরের আদর্শে গঠিত। কৈলাসের স্থানীয় নাম রঙমহল। এলোরার এটি শ্রেষ্ঠ গুহা। মন্দিরের রঙিন ছবিগুলি বিখ্যাত। মন্দিরটি শৈলখাত প্রাঙ্গণের মধ্যে। একটি দোতলা প্রবেশিকা দিয়ে ভেতরে যেতে হয়। প্রাঙ্গণের পেছনে অলিন্দ। অলিন্দের পেছনে দেওয়াল উপস্তম্ভ দিয়ে বিভক্ত, প্রতি ভাগে দেবদেবীর খোদিত অনবদ্য মূর্তি। বিমান ও স্তম্ভযুক্ত মণ্ডপ সমেত মূল মন্দিরটি একটি সুউচ্চ মঞ্চের ওপর অবস্থিত। মঞ্চগাত্রের মাঝখান হাতী

ও সিংহ দিয়ে অলংকৃত, যেন এরাই মন্দিরটির ভার বহন করছে। মঞ্চে ওঠবার দুটি সিঁড়ি। ওপরে উঠলে প্রথম মণ্ডপে প্রাচীন চিত্রাবলীর অবশেষ অংশ রয়েছে; মণ্ডপ থেকে একটি উপ-প্রকোষ্ঠ দিয়ে গর্ভগৃহে যেতে হয়। মঞ্চের সামনে একটি নন্দী মণ্ডপ। মণ্ডপটির দু পাশে ১৫ মিটার উচু ধ্বজস্তম্ভ।

জৈন গুহাগুলির মধ্যে ইন্দ্রসভা, জগন্নাথ সভা ও ছোট কৈলাস। ছোট কৈলাস ১৬ নং গুহার একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। ইন্দ্রসভার প্রাঙ্গণের শৈলখাত মন্দিরটি কৈলাসের অনুরূপ; স্থাপত্যশৈলী মূলত দ্রাবিড়ীয়। অঙ্গনের পেছনের গুহাটি দোতলা। মোটা-মুটি দুটি তলেই একটি করে স্তম্ভযুক্ত-সমাবেশ শালা; ও তার পেছনে মহাবীরের বিগ্রহ যুক্ত গর্ভগৃহ। জগন্নাথ সভাও দোতলা; ওপর তলার সমাবেশ শালাটি ইন্দ্রসভার অনুরূপ। এলোরা গ্রামে রাণী অহল্যাবাঈ নির্মিত ঘৃষ্ণেশ্বর শিব মন্দিরটি রয়েছে। ঘৃষ্ণেশ্বর দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। দ্রঃ- ইলোরা, ইল্বলপুর।

এসেসিনস্—চেনাব, চন্দ্রভাগা, অসিক্নী (ঋক্)

ঐ

ঐক্ষ্বাকী—ভূমনন্যুর ছেলে সুহোত্রের স্ত্রী; ছেলে অজমীঢ়, সুমীঢ়, পুরুমীঢ়। (মহা ১।৮৯।২৬)।

ঐতরেয়—ইতর ঋষি বা ইতরার অপত্য নাম মহিদাস। ইতরা এক ঋষির অন্যতমা স্ত্রী। ঋষি স্ত্রীকে ও ছেলেকে ভালবাসতেন না। এক বার এক সভায় ছেলেকে স্বামীর অবজ্ঞাপাত্র দেখে ইতরা কুলদেবতা ভূমিকে স্মরণ করেন। ভূমি তখনই সেখানে এসে মহিদাসকে সিংহাসনে বসিয়ে পাণ্ডিত্য ও ব্রাহ্মণ-প্রতিভাসন-রূপ বর দেন। ভূমির বরে ব্রাহ্মণ-গ্রন্থ মহিদাসের আয়ত্ত হয়ে যায়। এই জন্য ব্রাহ্মণ গ্রন্থ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত।

ঋক্‌বেদের একটি শাখার নাম ঐতরেয়; ইতরার পুত্র মহিদাস রচিত। এই শাখাতে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ঐতরেয় আরণ্যক ও ঐতরেয় উপনিষৎ পাওয়া যায়। অর্থাৎ এটি ঋক্‌বেদের একখানি ব্রাহ্মণ; আট পঞ্চিকায় বিভক্ত; প্রতি পঞ্চিকায় ৫-অধ্যায় ও প্রতি অধ্যায়ে ন্যূনাধিক ৭-কাণ্ড; সব সমেত ২৮৫ কাণ্ড। প্রথম ১৬-টি অধ্যায়ে একাহব্যাপী অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ; পরবর্তী দুই অধ্যায়ে বৎসর ব্যাপী গবাময়ন সত্র; ১৯ থেকে ২৪ অধ্যায়ে দ্বাদশাহ যজ্ঞের বিবরণ। ২৫ থেকে ৩২ অধ্যায়ে অগ্নিহোত্র এবং শেষ আটটি অধ্যায়ে রাজ্যাভিষেক প্রণালী সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। শেষ দশ অধ্যায়ে উপাখ্যান ও ঐতিহাসিক ঘটনাও প্রচুর রয়েছে। নাভানেদিষ্ঠ, হরিশ্চন্দ্র ও শুনঃশেপের কাহিনী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐতরেয় আরণ্যকের ২-য় ও ৩-য় আরণ্যকের নাম বহ্বৃচ, ব্রাহ্মণোপনিষদ্ বা ঐতরেয় উপনিষদ্। অন্য মতে দ্বিতীয় আরণ্যকের শেষ চার অধ্যায়ের নাম ঐতরেয় উপনিষদ। (২) মাণ্ডূকি মুনির প্রথমা স্ত্রী ইতরার পুত্র। বালক বয়সে চুপচাপ থাকতেন এবং সব সময়ই বাসুদেবকে স্মরণ

করতেন। ফলে ছেলেকে জড়ধী মনে করে হতাশ হয়ে বিদ্বান বুদ্ধিমান পুত্রের আশায় পিঙ্গাকে বিয়ে করেন। পিঙ্গার চার ছেলেই পণ্ডিত। ইতরা এক বার নিজের ছেলেকে মুনির অবজ্ঞার কথা জানান। ঐতরেয় মাকে আত্মহত্যা করতে বারণ করেন এবং ধর্মোপদেশ দেন। কিছু দিন পরে বিষ্ণু দেখা দিয়ে মা ও ছেলেকে আশীর্বাদ করেন এবং ঐতরেয়কে হরিমেধ্য রাজার যজ্ঞভার নিতে বলেন। হরিমেধ্যার মেয়ের সঙ্গে ঐতরেয়-র বিয়ে হয় (স্কন্দ-পু)। এই ঐতরেয় মহিদাস-ঐতরেয় নন।

ঐতরেয় উপনিষদ—ঋক্‌বেদের দ্বিতীয় আরণ্যকের ৫ম-৬ষ্ঠ অধ্যায়। বিষয়বস্তু সৃষ্টিরহস্য, জন্মরহস্য ও আত্মার স্বরূপ। ইতরার পুত্র মহিদাস-ঋষি রচিত (ঐতরেয় দ্রঃ)। সব চেয়ে প্রাচীন উপনিষদ যেন। শঙ্কর, মধ্ব ও রঙ্গরামানুজ রচিত টীকা আছে।

ঐন্দ্র অস্ত্র—ইন্দ্রের একটি অস্ত্র। এ থেকে অসংখ্য বাণ বার হত।

ঐন্দ্রিলা—বৃত্রাসুরের স্ত্রী। গন্ধর্ব কন্যা।

ঐরাবত—কশ্যপের স্ত্রী ক্রোধবশা। ক্রোধবশার মেয়ে ভদ্রমতা ; ভদ্রমতার মেয়ে ইরাবতী ; ইরাবতীর ছেলে ঐরাবত। চতুর্দন্ত (মহা ৪।৪৩।৩৫)। ইরাবত অর্থাৎ জল থেকে জাত বলে নাম ঐরাবত। দুর্বাসা (দ্রঃ) ইন্দ্রকে লক্ষ্মীহীন হবার শাপ দিলে ঐরাবতের অনুশোচনা হয় সেই সব অনিষ্টের মূল। ফলে ক্ষীর সমুদ্রে গিয়ে ঐরাবত আশ্রয় নেয় এবং সমুদ্র মন্থনে উঠে আসে। অর্থাৎ সমুদ্রে জন্ম নয়। দ্রঃ- পৃথু। অসুর শূর-পদ্ম দেবলোক আক্রমণ করলে ভীষণ যুদ্ধ হয়। জয়ন্ত বাণবিদ্ধ হয়ে তৎক্ষণাৎ মারা (আহত) গেলে ঐরাবত তীব্র ভাবে শূরপদ্মকে (দ্রঃ) আক্রমণ করে। অসুর ঐরাবতের দাঁত ভেঙে পৃথিবীতে ছুঁড়ে ফেলে দেন। ঐরাবত অবশ হয়ে পড়ে থাকে ; পরে বনে গিয়ে শিবের তপস্যা করে দাঁত ফিরে পায় এবং দেবলোকে ফিরে যায়। সমুদ্র মন্থনে উঠলে ইন্দ্র আবার বাহন রূপে পান। ভগীরথ যখন গঙ্গা আনেন তখন এক জায়গায় গঙ্গার স্রোত আটকে গেলে ঐরাবত গঙ্গার পথ খুলে দিতে রাজি হয় কিন্তু সর্ত করে প্রতিদানে গঙ্গার সঙ্গে সে সহবাস করবে। কিন্তু গঙ্গার স্রোতে ঐরাবত ভেসে যায়। পরে অবশ্য দয়া করে গঙ্গা এর জীবন রক্ষা করেন। ঐরাবত হাতীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং এক জন দিকপাল (পূব দিকে)। এর চারটি দাঁত। ঐরাবত ও অন্য তিনটি দিক্‌-হস্তী পুষ্কর দ্বীপে বাস করে। দ্রঃ- দিগ্‌গজ, মার্তাল। (২) কশ্যপ কদ্রুর এক ছেলে। এই ঐরাবত বংশে উলূপীর পিতা কৌরব্য জন্মান।

ঐরাবতী—রাবি নদী। রাপ্তি ও ইরাবতীও এই নামে পরিচিত। অচিরাবতী>ঐরাবতী।

ঐল—রাজা এলের/ইলের ছেলে বা ইলার গর্ভে বুধের ঔরসজাত ছেলে পুরূরবা।

ঐলবিল—বিশ্রবা মুনির স্ত্রী ইলবিলার সন্তান।

ঐলাবৃতবর্ষ—অন্য নাম ইলাবৃতবর্ষ। ইলাবৃত রাজার দেশ। দ্রঃ- অগ্নীধ্র।

ঐশ্বর্য—অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামবসায়িতা এই আট শক্তি। অন্য মতে সমগ্র প্রভুত্ব, পরাক্রম, যশ, সম্পৎ, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ছয়টি।

ও

ওঘ—শোণিতপুর নিবাসী নরকাসুরের একজন অনুচর। কৃষ্ণ এ'কে নিহত করেন।

ওঘবতী—ওঘবানের মেয়ে। সুদর্শনের স্ত্রী। মাহিষ্মতীতে ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজকন্যা সুদর্শনার গর্ভে অগ্নির ঔরসে সুদর্শনের জন্ম। (মহা ১৩।২।-) সুদর্শন কুরুক্ষেত্রে বাস করতে থাকেন এবং গার্হস্থ্য আশ্রমেই মৃত্যুকে জয় করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। যে কোন মূল্যেও যেন অতিথি সৎকার করা হয় স্ত্রীকে নির্দেশ দেন। কারণ অতিথিই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। একদিন সুদর্শনের অনুপস্থিতিতে ধর্ম ব্রাহ্মণের বেশে অতিথি হয়ে আসেন এবং ওঘবতীকেই দাবি করেন। ওঘবতী অতিথিকে অন্য প্রলোভন দেখিয়ে নিরস্ত করতে চেষ্টা করে বিফল হয়ে বাধ্য হয়ে সহাস্যে ব্রাহ্মণকে নিয়ে অন্য ঘরে গিয়ে ঢোকেন। ইতি মধ্যে সুদর্শন ফিরে এসে স্ত্রীকে না দেখে ডাকতে থাকেন। ওঘবতী নিজেকে অতিথির উচ্ছিষ্ট মনে করে নিরুত্তর থাকেন কিন্তু অতিথি সুদর্শনকে ডেকে বলেন তিনি ওঘবতীকে ভোগ করেছেন। সুদর্শন যা উচিত মনে করবেন করতে পারেন। সুদর্শন একটুও বিচলিত হন না; বরং দেবতাদের নামে শপথ করে বলেন অতিথি সুখী হোক এটাই তাঁর একান্ত কাম্য। সুদর্শনের পেছনে এতক্ষণ মৃত্যু লোহার মুগুর নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন; ছিদ্র পেলেই আঘাত করবেন। এ দিকে ধর্ম ঘর থেকে বার হয়ে এসে নিজের পরিচয় দিয়ে জানান তিনি পরীক্ষা করতে এসে-ছিলেন; ছিদ্রান্বেষী মৃত্যুকে সুদর্শন জয় করতে পেরেছেন। ওঘবতী নিজের ক্ষমতায় নিজকে ও স্বামীকে চির দিন রক্ষা করতে পারবেন। ব্রহ্মবাদিনী ওঘবতী বাক্য-সিদ্ধা হবেন এবং নিজের তপস্যার প্রভাবে তাঁর শরীরের অর্দ্ধেকটা নদী ওঘবতীরূপে লোকপাবন করবেন এবং বাকি অর্দ্ধেক শরীরে সুদর্শনের অনুগমন করবেন। সুদর্শন সস্ত্রীক স্বশরীরে শাশ্বত লোক পাবেন। মৃত্যুকে জয় করে গার্হস্থ্যধর্ম মাধ্যমেই কাম-ক্রোধ জয় করতে পেরেছেন। দেবরাজ ইন্দ্র শ্বেতবর্ণ সহস্র অশ্বযুক্ত রথে দুজনকে পরে স্বর্গে তুলে নিয়েছিলেন। (২) সাতটি সরস্বতী নদীর একটি। এই নদীকে আহ্বান করে কুরুক্ষেত্রে আনা হয়েছিল এবং এই নদীর তীরে ভীষ্মের শরশয্যা হয়।

ওঘবতী—চিতঙ নদীর শাখা আপগা। থানেশ্বর থেকে ৩ মাইল। এর তীরে কুরু যজ্ঞ করেছিলেন। বামন পুরাণে পৃথূদক এই ওঘবতীর তীরে। মার্কণ্ড ও সরস্বতী নদীর সঙ্গমে পেহোয়া (=পৃথূদক, দ্রঃ) তীর্থ। অর্থাৎ মার্কণ্ডই যেন ওঘবতী; নিশ্চয়ই আপগা নয়।

ওঘবান—ওঘবানের মেয়ে ওঘবতী (দ্রঃ); ছেলে ওঘরথ। দ্রঃ- সুদর্শন।

ওঙ্কার—কাশীস্থ শিবলিঙ্গ ওঙ্কারনাথ।

ওঙ্কারনাথ—ওঙ্কার, ওঙ্কারক্ষেত্র, অমরেশ্বর, মান্ধাতা, মহালয়। নর্মাদাতে একটি দ্বীপে, মণ্ডলেশ্বরের কাছে। প্রাচীন মাহিষ্মতী, বর্তমানের মহেশ থেকে ৫ মাইল পূর্বে। খাণ্ডয়া থেকে ৩২ মাইল উ-পশ্চিমে এবং মোর্তক স্টেসন থেকে ৭ মাইল উ-পূর্বে; বারওয়াই থেকে ৬ মাইল পূর্বে। দ্বীপের পূর্বপ্রান্তে বিরখাল শিখরে কালভৈরব মূর্তি রয়েছে; এখানে যেন নরবলি হত। এটি যেন সব চেয়ে প্রাচীন শিবমন্দির। ওঙ্কার-

নাথ ১২ লিঙ্গের একটি। ওঙ্কারনাথের অপর নাম রুদ্রপদ ; এখানে রুদ্রের পদচিহ্ন রয়েছে।

ওজন—প্রাচীন ভারতে ওজনের সুনির্দিষ্ট এবং সূক্ষ্ম একক গড়ে উঠেছিল। ওজনের সুনির্দিষ্ট একক সভ্যতার উন্নত অবস্থার পরিচায়ক। ঋক্‌বেদে ও বৌদ্ধজাতকের গল্পে 'নিষ্ক' ও 'মান'-এর উল্লেখ আছে। শতপথ ব্রাহ্মণে, তৈত্তিরীয় সংহিতায়, কাত্যায়নের শ্রৌতসূত্রে, পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ও অষ্টাধ্যায়ীর বার্তিকে শতমান-এর উল্লেখ আছে। শতপথ ব্রাহ্মণ ও জাতকের বিভিন্ন গল্পে 'সুবর্ণ'-এর উল্লেখ রয়েছে। নিরুক্তে, বৃহদারণ্যক উপনিষদে ও অষ্টাধ্যায়ীতে 'পাদ' রয়েছে। তৈত্তিরীয় সংহিতা, মৈত্রায়ণী সংহিতা, কাঠক সংহিতা, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, অনুপদসূত্র ও মনুতে কৃষ্ণল ও রক্তিক-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। বৌদ্ধজাতক গল্পে ও মনুতে কার্ষাপণ বা কার্ষ উল্লিখিত হয়েছে। মনুতে আছে ঃ—৮ ত্রসরেণুতে (রোদে দৃশ্যমান ভাসমান ধূলিকণা) =১ লিখ্যা (পোস্তদানা)×৩=১ রাজসর্ষপ×৩=১ গৌরসর্ষপ×৬=১ যব×৩=১ কৃষ্ণল বা রক্তিক (=রতি, গুঞ্জাফল)। রৌপ্য ঃ—২ রতিতে=মাষক×১৬=১ ধরণ বা পুরাণ×১০=১ শতমান। স্বর্ণ ঃ—৫ রতিতে=১ মাষ×১৬=১ সুবর্ণ×৪=১ পল বা নিষ্ক×১০=১ ধরণ। তাম্র ঃ—৮ রতিতে=১ কার্ষাপণ। শস্যবীজের সাহায্যে হিসাবের পদ্ধতি যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য ছিল। তোলা, সের, মণ ইত্যাদি যাজ্ঞবল্ক্য ও মনুতে নাই।

ওড্র—উৎকল (দ্রঃ)। এখানকার বৌদ্ধ এলাকাগুলি খৃ ৫-৬ শতকে বৌদ্ধদের হাত থেকে চলে যায়। ভুবনেশ্বরে শৈবরা, পুরীতে বৈষ্ণবরা, যাজপুরে শাক্তরা, কোণারকে সৌররা এবং দর্পণে (প্রাচীন বিনায়ক ক্ষেত্র) গাণপত্যারা প্রতিষ্ঠা পায়। একটি মতে পুষ্পমিত্র শাকলে প্রতিটি বৌদ্ধমুণ্ডের জন্য ১০০ দিনার পুরস্কার দিতেন। ব্রহ্মপুরাণে ওড্র ছিল উত্তরে ব্রজমণ্ডল বা যাজপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ; এবং তিনটি অংশ/ক্ষেত্রে বিভক্ত ঃ—শ্রী/পুরুষোত্তম ক্ষেত্র ; অর্ক/সবিতৃক্ষেত্র ; এবং বিরজা ক্ষেত্র।

ওড়নষষ্ঠী—অগ্রহায়ণে শুক্লা ষষ্ঠী। এই দিন থেকে জগন্নাথ বিগ্রহ শীত বস্ত্র ব্যবহার করেন।

ওদন্তপুরী—উদন্তপুরী, উদ্দণ্ডপুর। বর্তমান বিহার শরিফের অনতিদূরে নালন্দার কাছে একটি বৌদ্ধ বিহার। রাজা গোপাল (৭৫০-৭৭৫ খৃ) বা দেবপাল(৮১০-৮৫০ খৃ) অন্যমতে ধর্মপাল (৭৭৫-৮১০ খৃ) এটির প্রতিষ্ঠাতা। ওদন্তপুরীর অধ্যক্ষের সম্মানিত উপাধি ছিল মহাসংঘিকাচার্য। এখানে আচার্য শীলরক্ষিতের কাছে চন্দ্রগর্ভ (দীপংকর শ্রীজ্ঞান) শিক্ষালাভ করেছিলেন এবং পরে এই বিহারের প্রধান আচার্যও হয়েছিলেন। গিরিশীর্ষে অবস্থিত বিহারটি বক্তিয়ার খিলজি দ্বাদশ শতকে ধ্বংস করেছিলেন। আচার্য শান্তরক্ষিতের পরামর্শে তাঁর শিষ্য তিব্বতের রাজা খ্রি-স্রং-লে-সোন ওদন্তপুরীর আদর্শে 'সম-য়ে' নামে তিব্বতের শ্রেষ্ঠ বিহারটি তৈরি করেছিলেন।

ওম্—প্রাচীন অর্থে তথাস্তু। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে প্রজাপতি সংকল্প করলেন, তখন তিনটি বর্ণ অ, উ, ম উৎপন্ন হয়। তিন বর্ণ একত্রে ওম্। মনুতে আছে

প্রজাপতি তিন বেদ থেকে অ, উ, ম দোহন করেছিলেন। মহানির্বাণ তন্ত্র মতে বিষ্ণু, শিব ও ব্রহ্মা এই তিন অংশে অবস্থিত। বিশ্বাস এটি একটি পবিত্র মন্ত্র। বেদে একটি বীজমন্ত্র। সমস্ত কাজের আরম্ভে ও শেষে এই মাঙ্গলিক বীজমন্ত্র উচ্চারণ করা বিধেয়; নতুবা মন্ত্রপাঠ ও ধর্মক্রিয়া নিষ্ফল হয়। ওম্-এর আর এক নাম প্রণব, তন্ত্রে নাম 'তার'। স্কন্দপুরাণে এর সহস্র নাম রয়েছে; এখানে বলা হয়েছে 'প্রণবঃ সর্ব-দেবতাঃ'। পাতঞ্জল যোগ সূত্রে প্রণবজপের বিধান আছে, প্রণব ঈশ্বর বাচক। ছান্দোগ্য উপনিষদের 'ওম্'-এর উপাসনার অনুকরণে তান্ত্রিক সাধন পদ্ধতিতে একাক্ষর বীজমন্ত্রের উপাসনার পদ্ধতি চালু হয়েছিল। ওম্ সম্বন্ধে বলা হয়েছে অকারঃ ভগবান্ ব্রহ্মা অপি উকারঃ স্যাৎ হরিঃ স্বয়ম্। মকারো ভগবান্ রুদ্রঃ অপি অর্দ্ধমাত্রা (ঁ) মহেশ্বরী। ভাগবতে রয়েছে ঃ—পরমেষ্ঠী আত্মসংযম করলে তাঁর হৃদয়াকাশ থেকে শব্দ উৎপন্ন হয়েছিল। হৃদয়াকাশে আত্মার নিকট থেকে এর উৎপত্তি। এই বীজ নিজের আশ্রয় ও সাক্ষাৎ ব্রহ্মবাচক। সর্বমন্ত্র ও উপনিষৎ স্বরূপ। বেদের সনাতন বীজ। এই থেকে অকারাদি তিন বর্ণ হয়েছিল। গুণ (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ), নাম (ঋক্, যজুঃ ও সাম), অর্থ (ভূঃ, ভুবঃ, ও স্বঃ), এবং বৃত্তি (জাগ্রৎ, সুষুপ্তি ও স্বপ্ন) এই সমস্ত তিনটি করে পদার্থ ধৃত হয়ে আছে এই ওম্-এ। ব্রহ্মা শেষ পর্যন্ত অক্ষর সমষ্টি এই ওম্ থেকেই সৃষ্টি করেছিলেন। তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য ও পাণিনি মতে প্রণব ত্রিমাত্রা; অর্থাৎ ও-কার প্লুত। মুখ বুজে ওঁ শব্দ উচ্চারণ করতে করতে সাধারণ মত মুখ খুললে 'অ' উচ্চারিত হয়। এর পর মুখ আরো বেশি খুললে 'আ' উচ্চারিত হয় এবং বিভিন্ন ভাবে মুখ খোলার ফলে অন্যান্য স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণগুলি উচ্চারিত হয়। ফলে ঋষিদের ধারণা হয়েছিল ওঁ-শব্দ থেকে সমস্ত অক্ষরের উৎপত্তি।

মণ্ডূকে বলা হয়েছে পরমাত্মাকে ওঁকার রূপে ধ্যান করতে হবে। তৈত্তিরীয়তে ওঁ সম্বন্ধে নানা আলোচনা। মাণ্ডূক্যে বিষয়বস্তু সবটাই ওঁ। প্রশ্ন উপনিষদে ওঁকারের উপাসনা রয়েছে। ছান্দোগ্যেও নানা আলোচনা।

ওঁ মূলত একটি প্রতীক মাত্র। বিভিন্ন শাস্ত্রকার তার মতবাদের প্রতীক হিসাবে এই ওঁ-কে খাড়া করেছেন। ওঁ-এর প্রতি এই মোহ সত্যই কৌতূহলোদ্দীপক।

তন্ত্রে প্রণবের ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে সপ্তাঙ্গং চতুষ্পাদং ত্রিস্থানং পঞ্চদৈবতম্ ওঁকারং যঃ ন জানাতি সঃ কথং ব্রাহ্মণঃ ভবেৎ। আবার বলা হয়েছে শব্দব্রহ্ম ও পরমব্রহ্মকে যে জানে সে ব্রাহ্মণ। এই সপ্তাঙ্গ অর্থে (১) অ, (২) উ, (৩) ম, (৪) ঁনাদ, (৫) ঁবিন্দু (৬) —কলা ও (৭) =কলাতীত। চতুষ্পাদ অর্থে স্থূল, সূক্ষ্ম, বীজ ও সাক্ষী। ত্রিস্থান অর্থে জাগ্রৎ অবস্থা, স্বপ্নাবস্থা ও সুষুপ্তি; এবং পঞ্চ দেবতা ঃ—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর ও মহেশ্বর।

উপহিত চৈতন্য=অপর প্রণব=শব্দব্রহ্ম=ব্রহ্মা+বিষ্ণু+মহেশ্বর। ব্রহ্ম যখন নিষ্ক্রিয় অনুপহিত তখন তিনি পরম ব্রহ্ম=পরপ্রণব=অনুপহিত চৈতন্য। আর পরমব্রহ্ম+শব্দব্রহ্ম=মহাপ্রণব=তন্ত্রের শিব। এই শিবের ৭টি মুখ ৭টি আম্নায়। (মহানি তন্ত্র-৩।৩২-টীকা ১।

বামাচারীরা বেদের আচার আচরণ অস্বীকার করেন কিন্তু বৈদিক ওঁ-এর রদবদল চাপে নিষ্পিষ্ট। দ্রঃ- ঔং, প্রণব।

বৌদ্ধশাস্ত্রে ওঁ মণিপদ্মে হুং বলে একটি প্রসিদ্ধ মন্ত্র রয়েছে। এখানে ওঁ অর্থে দেবকুলে, ম=অসুরকুলে, ণি=মানুষরূপে, পদ্‌=পশুরূপে, মে হতাশরূপে; হুং= নারকিরূপে=পুনর্জন্ম নিরোধ করে। এই মত অনুসারে পুনর্জন্মের ছয় অবস্থা সূচক ছয় প্রকার বর্ণ উক্ত ছয় অক্ষরে আরোপিত হয়ে থাকে। আর এক অর্থে ওঁ=দৈবিক সিতবর্ণ, ম=আসুরিক নীলবর্ণ, ণি=মানুষিক পীতবর্ণ; পদ্‌—জান্তব হরিৎ-বর্ণ; মে= নৈরাশিক রক্তবর্ণ এবং হুং=নারকীয় কৃষ্ণবর্ণ। অর্থাৎ বৌদ্ধ পণ্ডিতরাও 'ওম্'-এর মোহ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি।

ওয়ারঙ্গল—অনুমকুণ্ডপুব, অনুমকুণ্ডপত্তন, করুনকোল (টলেমি), বেণাকটক, অক্ষালি নগর। তেলেঙ্গানা ও অন্ধ্রের প্রাচীন রাজধানী।

ওয়ার্দ্ধা—বরদা; গোদাবরীর একটি শাখা।

ওরোবাটিস্—(গ্রীক)। নওসেরার কাছে লণ্ডাই নদীর বাম তীরে অবু'ট; পুষ্কলাবতীর পশ্চিমে। এই পথে হেফাইসটিয়োন ভারতের দিকে এগিয়েছিল।

ওষধি—মৃত সঞ্জীবনী, বিশল্যকরণী, অস্থি-সঞ্চারিণী ও সন্ধানকরণী। হিমালয়ের কাছে ঋষভ ও কৈলাস পর্বতে পাওয়া যেত।

ওষধি প্রস্থ—ব্রহ্মলোক থেকে গঙ্গা এখানে পতিত হয়। সতী শোকে মহাদেব এখানে তপস্যা করেছিলেন।

ওস্ওয়াল—জাতি বিশেষ। বিক্রম সংবতের চারশ বছর আগে ভীনমালের রাজপুত্র উপলদেব বাজস্থানে যোধপুব জেলায় ওসিয়াঁ (=উপকেশ) নগরী স্থাপন করেন। আচার্য শ্রীরত্নপ্রভসূরি এই ওসিয়াঁদের জৈনধর্মে দীক্ষা দেন এবং এই সময় থেকে এঁরা ওস্ওয়াল নামে পরিচিত।

ঔ

ঔং—দীর্ঘ প্রণব। শূদ্রদের সেতু (কা-পু ৫৬।৮০)।

ঔকথ্য—(১) সামবেদের অংশ বিশেষ, যজ্ঞ বিশেষে গীত হয়। (২) গর্গ (=উকথ) মুনির ছেলে।

ঔডুম্বর—(১) চতুর্দশ যমের এক জন। পিতৃপতি। (২) কচ্ছ দেশের প্রাচীন নাম। দ্রঃ-ঔদুম্বর।

ঔত্তরপথিক—উপাসক বিশেষ।

ঔদক—মণিপর্বতের মাথায় একটি উপত্যকা। মুর অসুর এখানকার রক্ষক। এখানে নরকাসুর ১০ হাজার কন্যা বন্দী করে রেখেছিলেন।

ঔজস—বারুণ তীর্থ; এখানে সুন্দকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করা হয়েছিল (মহা ৩।৮১।১৫৩)।

ঔদুম্বর—(১) উদুম্বর,অউদুম্বর (বৃহ-সং), উদুম্বরবতী (মহাভাষ্য), মরুকচ্ছ, অশ্বকচ্ছ, কচ্ছ, ওডোম্বর। ওচোম্বেরি (টলেমি)। এখানকার প্রাচীন রাজধানী কোটেশ্বর বা কচ্ছেশ্বর (মহ-সভা)। (২) নুরপুর জেলা (গুরুদাসপুর বলাই ভাল); প্রাচীন নাম দমেরি/দেমিবওরি—রাজধানী পাঠানকোট (প্রতিষ্ঠানপুর)। পাঞ্জাবে রাভি নদীর তীরে। (৩) কনৌজের পূর্বে আর একটি উদুম্বর ছিল।

ঔদুম্বর—মুনিদের একটি শ্রেণী। সকালে উঠে প্রথমে যে দিক দেখতে পান সেই দিক থেকে ফল ইত্যাদি সংগ্রহ করে খান (ভাগ ৩।১২।৪৩)।

ঔর্ণবাভ—ইন্দ্র এই অসুরকে বধ করেন (ঋক্ ৮।৩২।২৬)।

ঔর্ব—পিতা চ্যবন, মা আরুষী; জমদগ্নির পিতামহ। ছেলে ঋচীক। (দ্রঃ উর্ব) ভৃগুবংশ। এক ঋষি। হেহয়রা ক্ষত্রিয় ; ভৃগু বংশীয়েরা এ'দের কুলপুরোহিত। কুলপুরোহিতদের এ'রা প্রচুর ধন রত্ন দিতেন। ফলে ভৃগু বংশীয়েরা ক্রমশঃ সমৃদ্ধ হয়ে ওঠেন। ক্ষত্রিয় হেহয়রা এদিকে নানা কারণে দরিদ্র হয়ে পড়ছিলেন এবং ভৃগুদের সহ্য করতেও পারছিলেন না। অন্য মতে অর্থাভাবে এ'রা ভৃগুদের কাছে একবার অর্থপ্রার্থী হন বা ধার চান। কিন্তু এ'রা কিছু দিতে চান না। ফলে হেহয়রা এ'দের ওপর অত্যাচার করতে থাকেন। ভার্গবরা তখন সামান্য কিছু দিয়ে বাকি ধনরত্ন মাটির নীচে লুকিয়ে ফেলেন। ফলে ক্ষত্রিয় ও ভার্গবদের মধ্যে একটা তীব্র মনোমালিন্য দেখা দেয়। মহাভারতে (১।১৬৯) আছে কৃতবীর্যের (দ্রঃ) বংশধরেরা রেগে গিয়ে ব্রাহ্মণদের শর বর্ষণে শেষ করতে থাকেন; গর্ভস্থ শিশুদেরও বাদ দেন না। কেবল ভৃগুপত্নীরা তখন হিমালয়ে পালিয়ে যান। একজন মহিলা তাঁর গর্ভটিকে নিজের উরুতে ধারণ করে লুকিয়ে রাখেন। ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণীকে দেখতে পায় ও গর্ভস্থ শিশুকে নষ্ট করতে যায়। শিশু তখন উরু ভেদ করে জন্মে নিজের তেজে ক্ষত্রিয়দের চোখ নষ্ট করে দেয়। ক্ষত্রিয়েরা তখন ব্রাহ্মণীর শরণাপন্ন হন; আর ক্ষতি করবেন না এবং দৃষ্টি পেয়ে ফিরে যেতে চান। ব্রাহ্মণী জানান ভার্গবদের হত্যা করার জন্য ঐ শিশু কোপে এদের দৃষ্টি হরণ করে নিয়েছে। ব্রাহ্মণদের ওপর অত্যাচার চলা কালীন শত বর্ষ ঐ শিশু উরুতে অবস্থান করেছিল। গর্ভকালেই ষড়ঙ্গ-বেদ লাভ করেছে ; একে সন্তুষ্ট করে এর কাছে প্রার্থনা করলে দৃষ্টি ফিরে পাবে। উরু ভেদ করে জন্ম বলে নাম ঔর্ব। ক্ষত্রিয়দের প্রার্থনায় দৃষ্টি এরা ফিরে পায়। কিন্তু ঔর্ব তারপর সর্ব লোকের বিনাশের সঙ্কল্প করে (মহা ১।১৭০।১১) কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। পিতৃপুরুষরা এসে শান্ত করেন এবং বোঝান তাঁদের আয়ু শেষ হয়ে এসেছিল ; ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে শত্রুতা করবার জন্যই মাটির নীচে তাঁরা ধনরত্ন লুকিয়ে-ছিলেন ইত্যাদি। ঔর্ব জানান তাঁর ক্রোধ বিফল হবে তিনি চান না। গর্ভে থাকা কালীন আত্মীয় স্বজনদের তীব্র কান্না তিনি শুনেছেন ; গর্ভস্থ শিশুদেরও তারা নষ্ট করেছে। এই ক্রোধ সংবরণ করতে গেলে নিজেকেই এই ক্রোধে দগ্ধ হতে হবে। পিতৃপুরুষেরা বলেন সমস্ত জীবন জলে প্রতিষ্ঠিত, সর্ব জগৎ জলময় ; এই জলে ঔর্ব ক্রোধ বিসর্জন করুক। ঔর্ব সম্মত হন। এই ক্রোধ সমুদ্রে বড়বামুখ হয়ে বাস করে ; জল পান করে এবং অগ্নি বমন করে (মহা ১।১৭১।২২)। দ্রঃ- হিরণ্যকশিপু।

অপর মতে চ্যবনের স্ত্রী আরুষী নিজের উরুতে ১২ বৎসর গর্ভ গোপন রেখেছিলেন। শিশুর দীপ্তিতে ক্ষত্রিয়েরা অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পিতা ও পিতৃব্যগণের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন ঔর্ব ; এবং দেবতারাও ঔর্বকে শান্ত করতে এসেছিলেন।

আজও এই বড়বাগ্নি সমুদ্রের নীচে রয়েছে। মতান্তরে উর্ব ঋষি আগুন নিয়ে বুকে মন্থন করেন। ফলে এক জ্বালাময় অযোনিজ পুরুষ ঔর্ব জন্ম নেন।

এক উর্ব হরিবংশে উগ্র তপস্যা করছিলেন। ঋষিরা বংশ রক্ষা করতে বলেন। উর্ব (দ্রঃ) নিজের উরুতে অগ্নি স্থাপন করে দণ্ড দিয়ে মন্থন করেন। উরু থেকে তখন জগতের নিধনাকাঙ্ক্ষী ঔর্ব বহ্নি জন্মায়। ব্রহ্মা এসে সমুদ্রে বড়বা মুখে এই অগ্নির বাসস্থান ঠিক করে দেন। নিয়মিত বারিময় হবি পান করবে এবং যুগান্তে সকলকে পুড়িয়ে মারবে। ব্রহ্মা ও মুনিরা চলে গেলে হিরণ্যকশিপু এসে এই অগ্নিকে ঔর্বের কাছে চেয়ে নেন। অসুর বংশপরম্পরাকে যুদ্ধে রক্ষা করবে (হরি ১।৪৫।৭৫)। হিরণ্যকশিপু মারা গেল এই আগুন কিছুটা হীনবল হয়ে পড়ে।

ঔর্বের আশ্রমে এক দিন পরশুরাম এসেছিলেন এবং ভৃগু, ভৃগুর স্ত্রী খ্যাতি ও চ্যবন ঔর্বকে প্রণাম করে গিয়েছিলেন। দ্রঃ-যাদবী, সগর, সুমতি, কন্দলী।

(২) মালবে এক ব্রাহ্মণ ; স্ত্রী সুমেধা, কন্যা শমীক। ধৌম্যকের ছেলে মন্দারের (শৌনক ঋষির শিষ্য) সঙ্গে খুব ছোট বয়সে শমীকের বিয়ে হয়। শমীকের বয়স হলে মন্দার স্ত্রীকে নিয়ে ফিরছিলেন, পথে মহর্ষি ভুশুণ্ডিকে দেখে এ'রা হেসে ফেলেন। মহর্ষি তখন শাপ দিলে এরা দুটি গাছে পরিণত হন। খবর পেয়ে ঔর্ব শমীক-রূপ গাছে অগ্নিরূপে বাস করতে থাকেন এবং মন্দার-রূপ গাছের মূল দিয়ে শৌনক গণপতির মূর্তি পূজা করতে থাকেন। ঔর্ব ও শৌনকের ভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে গণপতি গাছ দুটিকে আবার মানুষ করে দেন (গণে-পু)।

ঔলূক্য—উলূক মুনির গোত্রাপত্য। বৈশেষিক দর্শনকার কণাদ (দ্রঃ)।

ঔশনস—কপালমোচন তীর্থ (দ্রঃ)।

ঔশীনর উশীনরের ছেলে। সাধারণ অর্থে শিবি।

ঔশীনরা/নরা - উশীনর দেশে এক শূদ্রক কন্যা। এ'র গর্ভে গৌতম মুনির কক্ষীবান ইত্যাদি সন্তান হয়।

ক

কংস—যদু(১)-হেহয়(৪)-কার্তবীর্যার্জুন(১০)-সাত্যকি(১৬)-চিত্ররথ(২১)-তুম্বুরু(২৬)-নাহুক(৩০)-আহুক(৩১)-উগ্রসেন(৩২)-কংস (৩৩)। দেবী ভাগবতে কালনেমি কংস হয়ে জন্মেছিলেন।

ভোজ বংশীয় রাজা। মথুরার (দ্রঃ) রাজা উগ্রসেনের ক্ষেত্রজ পুত্র। হরিবংশ অনুসারে ঋতু স্নাতা স্ত্রী পদ্মাবতী (দ্রঃ) সুযামুন পর্বতে সখীদের নিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। অন্য

মতে পিত্রালয়ে পুষ্পবান নামে এক পাহাড়ে বেড়াচ্ছিলেন। এমন সময় এক গন্ধর্ব/ সৌভপতি দ্রুমিল (দ্রঃ-গোভিল) কামার্ত হয়ে উগ্রসেনের বেশে এসে সহবাস করেন। কিন্তু ইতি মধ্যে সন্দেহ হওয়াতে "কস্যত্বং" (হরি ২।২৮। ঃ-কঃ ত্বম্) বলে পরিচয় চান এবং বৈশ্রবণের এক জন অনুচর বলে পরিচয় পেয়ে তিরস্কার করতে থাকেন। দ্রুমিল বোঝাতে চেষ্টা করেন পরপুরুষের ঔরসে দেবতার সমান বহুপুত্র পৃথিবীতে জন্মেছে ইত্যাদি। আরো বলেন 'কস্যত্বং' বলে প্রতিবাদ করার স্মৃতি হিসাবে কংস নামে শত্রুবিজয়ী এক ছেলে হবে। উগ্রসেনের স্ত্রী তখন শাপ দেন তাঁর স্বামীর বংশে জন্ম অন্য কারো হাতে এই অবাঞ্ছিত পুত্র নিহত হবে। পদ্মাবতী পিতামাতাকে ঘটনাটা জানান এবং গর্ভনাশের বহু চেষ্টা করেন। কিন্তু গর্ভের শিশু এক দিন পদ্মাবতীকে জানায় সে কালনেমি অসুর ; বিষ্ণু তাকে হত্যা করেছেন ফলে সে প্রতিশোধ নেবার জন্য জন্মাতে চায়। এর দশ বছর পরে কংস জন্মান। কংস পরে এই সব ঘটনা জানতে পারেন ফলে উগ্রসেনের প্রতি দুর্ব্যবহার করতে থাকেন। কংসের আর আট-ভাই ও দুই বোন দেবকী ও কংসবতী। জরাসন্ধের দুই মেয়ে, সহদেবের অনুজা, অস্তি ও প্রাপ্তি এ'র স্ত্রী। অন্য মতে কংস উগ্রসেনের পালিত পুত্রও নন। কংস দুর্দ্ধর্ষ ধনুর্বিদ ছিলেন এবং তাঁর বহু সৈন্য, রথ ও হস্তী ছিল। দ্রুমিলের বিবরণ নারদ কংসকে বলেছিলেন এবং ধনুর্যজ্ঞে কৃষ্ণকে আনবার জন্য অক্রূরকে যখন পাঠান তখন অক্রূরকেও কংস ঘটনাটি জানিয়েছিলেন।

শ্বশুর জরাসন্ধের (ভাগ ১০।১ জরাসন্ধের আশ্রিত) সাহায্যে উগ্রসেনকে সিংহাসন চ্যুত করে কংস রাজা হন। রাজা হয়ে যদু, বৃষ্ণি, ও অন্ধকদের ওপর কংস অত্যাচার করতে থাকেন। বোন দেবকীর বিয়ে দেন বসুদেবের সঙ্গে। বোনকে কংস একটি রথ উপহার দেন এবং বসুদেব ও দেবকীকে রথে তুলে নিজে রথ চালিয়ে যখন যাচ্ছিলেন সেই সময় দৈববাণী হয় এ'দের অষ্টম সন্তান কংসকে বধ করবে। কংস তৎক্ষণাৎ দেবকীকে হত্যা করতে যান। কিন্তু বসুদেব বাধা দেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন দেবকীর প্রতিটি সন্তানকে কংসের হাতে দিয়ে দেবেন (ভাগ ১০।১)। একটি মতে কংস তখনই বসুদেব ও দেবকীকে বন্দী করে ফেলেন। ভাগবতে (১০।১) দেবকী বসুদেব কারারুদ্ধ হন নি। তাঁদের প্রথম ছেলে হয় কীর্তিমান। একে হত্যা না করে কংস ফিরিয়ে দেন। কীর্তিমান বড় হতে থাকেন। এমন সময় নারদ এসে কংসকে জানান কালনেমি কংস হয়ে জন্মেছেন এবং দেবকীর অষ্টম সন্তান ইত্যাদি। কংস তখন কীর্তিমানকে আছাড় মেরে হত্যা করেন (ভাগবতে নাই) এবং বোন ভগিনীপতিকে কারারুদ্ধ করেন। প্রলম্ব, চাণূর, তৃণাবর্ত, মুষ্টিক, অরিষ্ট, কেশী, ধেনুক, অঘ, দ্বিবিদ এবং পূতনা ইত্যাদি রাক্ষসরাক্ষসীরা কংসের অনুচর ছিলেন এবং এ'দের দিয়ে কংস বৃষ্ণি, অন্ধক ও যাদবদের উৎপীড়ন করতে থাকেন। বহু যাদব দেশ ত্যাগ করেন। বিষ্ণুভক্ত উগ্রসেনও নানা ভাবে নিপীড়িত হতে থাকেন।

দেবকীর পর পর আরো পাঁচটি ছেলে হয় (দ্রঃ-ঊর্ণা) এবং কংস সবগুলিকেই আছড়ে মেরে ফেলেন। সপ্তম শিশু গর্ভে থাকা কালে বিষ্ণুর নির্দেশে বসুদেবের অপর

স্ত্রী রোহিণীর গর্ভে মহামায়া শিশুটিকে স্থানান্তরিত করে দেন। এই শিশু জন্মালে নাম হয় সঙ্কর্ষণ। এর পর অষ্টম গর্ভ হিসাবে বিষ্ণু আসেন ; এবং বিষ্ণুর নির্দেশে নন্দগোপের স্ত্রী যশোদার গর্ভে মহামায়া আসেন। এর পর ভাদ্রমাসে কৃষ্ণাষ্টমীর মধ্যরাত্রে দেবকীর অষ্টম পুত্র জন্মান ; ভাগবতে (৯।১।৫৬) এরা অনুবৎসরম্ জন্মেছিলেন। এবং যশোদার একটি মেয়ে হয়। প্রহরীরা ঘুমিয়ে পড়ে, কারাগার খুলে যায় (দ্রঃ-কৃষ্ণ) এবং শৃঙ্খল বন্ধনও খুলে পড়ে। বসুদেব সদ্যজাত শিশুকে নিয়ে সেই রাত্রিতে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে যমুনা হেঁটে পার হয়ে ঘুমন্ত যশোদার কাছে রেখে সকলের অজ্ঞাতে যশোদার মেয়েটিকে নিয়ে ফিরে আসেন। মহামায়ার/যোগমায়ার মায়াতে সব কাজ নির্বিঘ্নে নিষ্পন্ন হয়। কারাগারে প্রহরীদের এর পর ঘুম ভাঙলে কংস খবর পান ; মেয়েটিকে আছাড় মেরে হত্যা করতে যান। কিন্তু শিশুটি হাত থেকে ছিটকে বার হয়ে আকাশে উঠে গিয়ে বলে যান গোকুলে কংসের হত্যাকারী নিরাপদে আছেন। (দ্রঃ-একানংশা)।

এর পর কংস অনুশোচনায় দেবকী ও বসুদেবকে ছেড়ে দেন ; এবং চিন্তিত হয়ে পড়েন। দেবকীর কাছে ক্ষমাও চান (হরি ২।৪।৫০)। সভাসদরা মন্ত্রণা দেন গত দশ দিনে যত ছেলে জন্মেছে সকলকে হত্যা করতে (ভাগ ১০।৪)। এই পরামর্শ অনুসারে শিশুদের হত্যা করার জন্য কংস চারদিকে গুপ্তঘাতক পাঠাতে থাকেন। কিছু গুপ্তচর/ঘাতক ইত্যাদি কৃষ্ণের হাতে নিহত হলে কংস তখন মথুরার সমস্ত শিশুকে হত্যা করার চেষ্টা করেন। কংসের নির্দেশে পূতনা, শকট, তৃণাবর্ত, অরিষ্ট, বক, অঘ ও কেশী কৃষ্ণকে হত্যা করবার বার বার চেষ্টা করে। এরা সকলেই নিহত হয়। বৃষ-রূপধারী অরিষ্টকে নিধন করা নারদ প্রত্যক্ষ করেন এবং কংসকে আবার জানিয়ে যান যে কৃষ্ণ বলরাম আসলে বসুদেবেরই সন্তান ; এবং যে মেয়েটি কংসের হাত থেকে আকাশে পালিয়ে গিয়েছিল সেটি যশোদার সন্তান। কংস তখন দেবকী বসুদেবকে আবার কারারুদ্ধ করেন।

এর পর কংস ধনুর্যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে অক্রূরকে পাঠিয়ে রথে করে কৃষ্ণ ও বলরামকে মথুরাতে নিয়ে আসেন। অক্রূর কংসের অভিসন্ধির কথা বলে দিলেও এঁরা ভয় পান না। মথুরাতে যজ্ঞের আগে ক্রীড়াক্ষেত্রে মল্লযুদ্ধের ব্যবস্থা ছিল। হরিবংশে কৃষ্ণ (দ্রঃ) বলরাম কুব্জা ইত্যাদির কাছ থেকে সাজসজ্জা করে কংসের অস্ত্রাগারে এসে ধনু ভেঙ্গে পালিয়ে যান। খবর পেয়ে কংস চিন্তা করেন পুরুষাকারে কিছু হবে না। বিষণ্ণ হয়ে পড়েন। এরপর প্রেক্ষাগৃহে এসে নির্দেশ দিয়ে যান আগামীকাল (২।২৮।৯) মল্লযুদ্ধ হবে এবং চাণূর ইত্যাদির ব্যবস্থা প্রস্তুত থাকে যেন। মল্লদের উপদেশ দেওয়া ছিল এঁদের যেন হত্যা করা হয়। কুবলয়াপীড় নামে একটি হাতীও ঠিক করা ছিল প্রয়োজন মত দুই ভাইকে যেন পদদলিত করে। 'পরদিন কৃষ্ণ বলরাম এখানে এলে মাহুত হাতীটিকে ইঙ্গিত করে এবং হাতী এসে আক্রমণ করে। কৃষ্ণ হাতীটিকে মেরে একটি দাঁত বলরামকে দেন। তারপর হাতীর মাহুতকেও কৃষ্ণ বধ করেন। এর পর মল্ল যুদ্ধে কৃষ্ণের হাতে চাণূর এবং বলরামের হাতে মুষ্টিক মারা যায়

(ভাগ ১০।৪৪)। আরো তিন জন মল্লবীর কূট, শল এবং তোশলও এ'দের হাতে নিহত হন। বাকি যারা মল্লযোদ্ধা ছিল তারা ভয়ে বনে পালিয়ে যায়। কংস তখন গর্জন করে ওঠেন; এ'দের দুজনকে তাড়িয়ে দেবার জন্য এবং নন্দকে বন্দী করার এবং নন্দ, বসুদেব ও উগ্রসেনকে হত্যা করবার আদেশ দেন (ভাগ ১০।৪৪)। কৃষ্ণ ইতিমধ্যে এগিয়ে এসে কংসকে সিংহাসন থেকে টেনে নামিয়ে এনে হত্যা করেন এবং কংসের আট ভাই বাধা দিতে এলে বলরামের হাতে এ'রা মারা যান। উগ্রসেনকে কৃষ্ণ মথুরার রাজা করে দেন। দ্রঃ- কুশস্থলী।

হরিবংশে শূরসেন > উগ্রসেন > কংস (১৫৪।৬৪)। তারকাময় যুদ্ধে হিরণ্যকশিপুর ছেলে কালনেমি বিষ্ণুচক্রে নিহত হয়ে কংসরূপে (১৫৪।৬৪) জন্মান। হরিবংশে কংস ভোজ বংশ বিবর্দ্ধক এবং প্রজাপীড়ক। ভাগবতে (৯।২৪।২৪) কংসের আর আট ভাই সুনামা, ন্যগ্রোধ, কঙ্ক, শঙ্কু, সুহূ, রাষ্টপাল, সৃষ্টি (ধৃষ্টি) ও তুষ্টিমান ও পাঁচ বোন কংসা, কংসবতী, কঙ্কা, শূরভূ ও রাষ্ট্রপালিকা। হরিবংশে (২।১।১৮) নারদ দেবকীর সন্তান নষ্ট করতে এবং ৮ম সন্তান থেকে মৃত্যু হবে তাও বলে যান। কংস মন্ত্রণা করে স্থির করেন এদের প্রচ্ছন্ন ভাবে বন্দী রাখবেন ও সন্তানদের হত্যা করবেন (২।২।৫) দ্রঃ-উর্ণা। চাণূর ও মুষ্টিক (হরি ১৫৪।৭৬) পূর্বজন্মে বারাহ ও কিশোর দুই দানব ছিল এবং রিষ্ট অসুর (১৫৪।৭৩) কুবলয়াপীড় হয়ে জন্মায়। পূতনা, অরিষ্ট ইত্যাদি মারা গেলে কংস ভীত হয়ে পড়েন। কৃষ্ণ বলরাম বসুদেবের ছেলে জানতে পারেন। সভা ডেকে মন্ত্রণা করেন; সভাতে বসুদেবকে তীব্র কটূক্তি করেন এবং ধনুর্যজ্ঞের নামে অক্রূরকে পাঠান এদের নিয়ে আসতে (হরি ২।২২।৮৫)। হরিবংশে (২।১০১'৫২) আবার আছে কৃষ্ণ বলরামকে শাস্তি দিতে না পেরে বসুদেব ও উগ্রসেনকে চোরের মত বহুদিন বন্দী করে রেখেছিলেন।

কংসবতী—কংসের এক বোন। বসুদেবের ছোট ভাইয়ের স্ত্রী।

ককুৎস্থ—অযোধ্যায় সূর্যবংশীয় বিখ্যাত রাজা। ইক্ষ্বাকুর ছেলে বিকুক্ষি (হরি, বিষ্ণু, কূর্ম-পু) মতান্তরে শশাদ। এই বিকুক্ষি বা শশাদের ছেলে পুরঞ্জয়। শিবপুরাণে এই পুরঞ্জয়ের অন্য নাম ককুৎস্থ। রামায়ণে ভগীরথের ছেলে ককুৎস্থ এবং ককুৎস্থের ছেলে রঘু। ত্রেতাতে অসুরদের কাছে হেরে গিয়ে দেবতারা বিষ্ণুর কাছে যান। বিষ্ণু পুরঞ্জয়ের সাহায্য নিতে বলেন এবং আশ্বাস দেন পুরঞ্জয়ের শরীরে বিষ্ণু কিছুটা ভর করে অসুর বধে সাহায্য করবেন। পুরঞ্জয় দেবতাদের সাহায্য করতে রাজি হন। সর্ত হয় ইন্দ্রকে রাজার বাহন হতে হবে। লজ্জায় ও অপমানে ইন্দ্র অরাজি হলেও পরে (ভাগ ৯।৬) বিষ্ণুর কথায় রাজি হন। পুরঞ্জয় তখন বৃষরূপী ইন্দ্রের ককুদে চড়ে গিয়ে দৈত্য নিধন করেন। ককুদে বসে ছিলেন বলে নাম হয় ককুৎস্থ; দৈত্যপুরী জয় করার জন্য নাম হয়েছিল পুরঞ্জয়। ভাগবতে দৈত্যপুরীর পশ্চিম-দিক আক্রমণ করেন।

হরিবংশে (১।১১) ককুৎস্থ > অনেনা > পৃথু > বিষ্টরাশ্ব > আর্দ্র > যুবনাশ্ব > শ্রাব— শ্রাবস্তক > বৃহদশ্ব > কুবলাশ্ব (= ধুন্ধুমার) > ১০০ ছেলে; এদের মধ্যে দৃঢ়াশ্ব, চন্দ্রাশ্ব ও কাপিলাশ্ব জীবিত ছিলেন; দৃঢ়াশ্ব বড়। দৃঢ়াশ্ব > হর্যশ্ব > নিকুম্ভ > সংহতাশ্ব > অকৃশাশ্ব ও কৃশাশ্ব (হরি ১।১২।৩)। সংহতাশ্ব > প্রসেনজিৎ > যুবনাশ্ব > মান্ধাতা >

পুরুকুৎস ও মুচুকুন্দ (হরি ১।১২।৯)। পুরুকুৎস > ত্রসদস্যু > সম্ভূত > সুধন্বা > ত্রিধন্বা > এয়্যারুণ > সত্যব্রত। ভাগবতে (৯।৬) ককুৎস্থ > অনেনা > পৃথু > বিশ্বগান্ধি > চন্দ্র > যুবনাশ্ব > শ্রাবস্ত (শ্রাবস্তীপুরী নির্মাতা) > বৃহদশ্ব > কুবলয়াশ্ব (-ধুন্ধুমার) > ২১০০০ ছেলে : জীবিত ছিল দৃঢ়াশ্ব, কপিলাশ্ব ও ভদ্রাশ্ব। মেয়ে তারাবতী (দ্রঃ)। দ্রঃ-বেতাল।

কক্ষীবান—দীর্ঘতমার (দ্রঃ) ঔরসে বলিরাজের স্ত্রীর পরিচারিকা উশিকের (দ্রঃ) কক্ষীবান ইত্যাদি এগার জন সন্তান হয়। এই ঋষি কক্ষীবানের অনেকগুলি ছেলে। দীর্ঘকাল তপস্যা করে ব্রাহ্মণত্ব পান। এ'রা কৌষ্মাণ্ড ও গৌতম নামে প্রসিদ্ধ।

ঋক্‌বেদে এক জন প্রসিদ্ধ ঋষি। অঙ্গিরস বংশে জন্ম; পূর্বদিকে আশ্রমে বাস করতেন; ইন্দ্রের গুরু ছিলেন এবং বুদ্ধতেজে জগতে সব সৃষ্টি করেছিলেন। যবক্রীত, রৈভ্য, অর্বাবসু, পরাবসু, কক্ষীবান, অঙ্গিরস ও কণ্ব এ'রা সাতজন বর্হিষদ। এই বর্হিষদরাও ইন্দ্রের গুরু। একজন প্রসিদ্ধ যজ্বন। অশ্বিনী কুমাররা (ঋক্ ১।১১৬) এক বার এক শত কলস সুরা পান করতে দিয়েছিলেন, শক্তি পরীক্ষার জন্য। বিদ্যাশিক্ষা করে কক্ষীবান গুরুগৃহ থেকে ফেরার পথে এক জায়গায় পথে রাত্রি যাপন করেন। এক দিন সকালে রাজা ভাবয়ব্য-এর সুন্দর ছেলে স্বনয়কে দেখতে পান; খেলা করতে করতে পথ ভুলে এসে পড়েছিল। ছেলেটির সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দেবেন স্থির করেন। ছেলেটিকে রাজপ্রাসাদে এনে দিলে রাজা প্রচুর উপহার দেন।

কঙ্ক—(১) বনবাসের শেষে বিরাট গৃহে অজ্ঞাত বাসের সময় যুধিষ্ঠিরের নাম। কঙ্ক নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন যে তিনি যুধিষ্ঠিরের সখা ছিলেন এবং পাশা খেলায় নিপুণ। যুধিষ্ঠিররা অজ্ঞাতবাসে চলে যাবার ফলে তিনি এখন আশ্রয়প্রার্থী। কঙ্ক অর্থে ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়; অর্থাৎ যুধিষ্ঠির নিজের সত্য পরিচয় দিয়েছিলেন। (২) একটি জাতি; যুধিষ্ঠিরকে এরা উপহার দিয়েছিল (মহা ২।১৭।২৬)। (৩) সুরসার একটি সন্তান; পাখী।

কঙ্কালমূর্তি—দ্রঃ-শিব। বিগ্রহ ঘোর হলেও খুব বেশি ভয়ঙ্কর নয়। ত্রিশূলের ডগাতে বিষ্বক্‌সেনের (দ্রঃ) কঙ্কাল। ভিক্ষাটন মূর্তি (দ্রঃ) শান্ত; এই কঙ্কালমূর্তির কাহিনীর সঙ্গে জড়িত। উৎকীর্ণ চিত্র সাধারণত দ-ভারতে পাওয়া যায়।

কঙ্কালটিলা—মথুরাতে উরুমুণ্ড পর্বত; এটি একটি স্তূপ। এখানে উপগুপ্ত ও তাঁর গুরু বাস করতেন।

কঙ্কালী—বীরভূমে কোপাই নদী যেখানে উত্তরমুখী হয়েছে সেখানে একটি শ্মশান। একটি পীঠস্থান। দেবী কঙ্কালী। দ্রঃ-মথুরা।

কঙ্‌গ্রা—নগরকোট, ভীমনগর, ত্রিগর্ত, বা সুশর্মাপুর। রাভি ও বাণগঙ্গা নদীর তীরে। কুলূত দেশের প্রাচীন রাজধানী।

কচ—দেবগুরু বৃহস্পতির ছেলে। অত্যন্ত সুন্দর দেখতে। বৃহস্পতি সঞ্জীবনী বিদ্যা জানতেন না। শুক্রাচার্য জানতেন, ফলে মৃত অসুরদের বাঁচিয়ে তুলতেন। দেবতারা ফলে কচকে শুক্রাচার্যের কাছে এই বিদ্যা শেখার জন্য পাঠান। শুক্র থাকতেন অসুর বৃষপর্বার কাছে। নিজের পরিচয় দিয়ে কচ হাজার বছরের জন্য শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ব্রহ্মচারী

হয়ে গুরু ও গুরুকন্যার সেবায় নিযুক্ত হন। শুক্র সাদরে গ্রহণ করেন এবং বলেন বৃহস্পতিঃ অর্চিতঃ অস্তু (মহা ১।৭৬।১৯)। গান গেয়ে নেচে বাজনা বাজিয়ে ফুল এনে দিয়ে দেবযানীকে সন্তুষ্ট করতেন; দেবযানীও অনুগায়মানা ললনা রহঃ পর্যচরৎ তদা। ৫০০ বছর কেটে গেলে দৈত্যরা কচের উদ্দেশ্য জানতে পেরে এবং বৃহস্পতির প্রতি বিদ্বেষে গোচারণ কালে কচকে ধরে কুচি কুচি করে কেটে কুকুর (শালাবৃকেভ্যঃ) দিয়ে খাইয়ে দেন। দেবযানী পিতাকে বলেন তং বিনা ন জীবেয়ং কচং সত্যং ব্রবীমি তে। ফলে শুক্র সঞ্জীবনী মন্ত্রে কচকে জীবিত করে তোলেন; কচ কুকুরের দেহ থেকে বার হয়ে আসেন। দৈত্যরা এর পর সুযোগ মত কচের দেহ পিষে ফেলে সমুদ্রের জলে গুলে দেন, শুক্রাচার্য আবার বাঁচিয়ে তোলেন। তৃতীয় বারে দৈত্যরা কচকে পুড়িয়ে ছাই করে সুরার সঙ্গে মিশিয়ে শুক্রাচার্যকে পান করিয়ে দেন। দেবযানী পিতাকে বলে কচের মার্গং প্রতিপৎস্যে; কচ আমার প্রিয়। শুক্রাচার্য তখন কচকে প্রথমে জীবিত করেন এবং তার পর তাঁকে সঞ্জীবনী মন্ত্র শিক্ষা দেন এবং নির্দেশ দেন তাঁর দক্ষিণ কুক্ষি ভেদ করে বার হয়ে এসে কচ যেন গুরুকে বাঁচিয়ে দেন। এই ভাবে কচ আবার বেঁচে ওঠেন। শুক্রাচার্য এই সময়ে মোহগ্রস্ত ব্রাহ্মণের কাছে সুরা নিষিদ্ধ পানীয় বলে ঘোষণা করেন। পান করলে অপেত ধর্ম ও ব্রহ্মহা হবে এবং পরলোকে গর্হিত হবে। হাজার বছর পরে ফিরে যাবার সময় দেবযানী কচকে বিয়ে করতে চান (মহা ১।৭২।৫)। কচ শেষ বারে শুক্রের দেহ থেকে বার হয়ে এসেছিলেন অর্থাৎ কচ শুক্রের পুত্র স্থানীয় এবং দেবযানী গুরুকন্যা এই দুটি কারণে কচ বিয়ে করতে রাজি হন না। ফলে দেবযানী অভিশাপ দেন কচের সঞ্জীবনী বিদ্যা কোন দিন ফলবতী হবে না। কচ বলেন দেবযানীর শাপ ধর্মতঃ নয়, কামতঃ এবং শাপ দেন দেবযানীর বাসনাও কোন দিন পূর্ণ হবে না; কোন ব্রাহ্মণ ঋষিপুত্র তাঁকে বিয়ে করবেন না। কচ আরো বলে যান সঞ্জীবনী বিদ্যা তিনি অপরকে শিখিয়ে দেবেন; তাদের এ বিদ্যা নিষ্ফল হবে না।

কচ ফিরে এলে দেবতারা এই বিদ্যা পান এবং দেবতাদের পরামর্শে ইন্দ্র যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন; এবং এই সময় বনে দেবযানী (দ্রঃ) সখীদের নিয়ে স্নান করতে এলে ইন্দ্র বায়ু হয়ে এদের জামা কাপড় এক সঙ্গে মিশিয়ে দেন।

কচ্চায়ন—কাত্যায়ন। প্রাচীনতম পালি বৈয়াকরণ। পাণিনির বার্তিককার ও বুদ্ধের শিষ্য মহাকচ্চায়ন এঁরা অন্য লোক। মনে হয় বুদ্ধ ঘোষ, পাণিনি, কাতন্ত্র ও কাশিকা-বৃত্তির পরে। কাহিনী আছে বুদ্ধদেব এঁকে 'অত্থো অক্খর-সঞ্ঞাতো' বলে সাবধান করে দিয়েছিলেন।

কচ্ছ—(১) অশ্বকচ্ছ (রুদ্রদামন), (২) কচ্ছ=মরুকচ্ছ(বৃহৎ-সং), ঔদুম্বর। দ্রঃ-কৌশিকী কচ্ছ। (৩) কইরা (খেড়), গুজরাটে; বড় সহর; আমেদাবাদ ও কাম্বের মধ্যে; বেত্রবতী (বর্তমানে বত্রক) নদীর তীরে। (৪) হয়তো উছ; দ্রঃ-শূদ্রক। (৫) কাছাড়; আসামে।

কচ্ছপ—কুবেরের একটি নিধি।

কচ্ছপী—নারদের বীণা।

কটক—বারাণসী কটক। যযাতি নগর। বিনতাপুর। উড়িষ্যাতে; মহানদী ও কাটজুরি সঙ্গমে; নৃপ কেশরী স্থাপিত (৯৪১-৯৫২ খৃ)।

কটদ্বীপ—কণ্টক নগর—কণ্টকদ্বীপ>কটদ্বীপ>কাটাদিয়া>কাটোয়া। বর্দ্ধমানে; বাঙলাতে। বৈষ্ণবতীর্থ; ২৪ বছর বয়সে চৈতন্যদেব এখানে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। একটি মন্দিরে চৈতন্য দেবের কেশ রক্ষিত আছে। কাটোয়া থেকে ১৪ মাইল দক্ষিণে দাদুর-এ চৈতন্যদেবের হস্তাক্ষর রক্ষিত আছে। কাটোয়া থেকে ৪ মাইল উত্তরে ঝামৎ পুরে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বাস করতেন। কাটোয়া থেকে ১৬ মাইল পশ্চিমে নানুরে (বর্দ্ধমান জেলা) চণ্ডীদাস জন্মান।

কটাক্ষ—কটাস, কোটস। সিংহপুর। পিণ্ডিদাদন খাঁ থেকে ১৬ মাইল। পাঞ্জাবে সল্ট রেঞ্জ-এর উত্তরে। ঝিলম জেলাতে। হিউ-এন-ৎসাঙ মতে এর পশ্চিম প্রান্তে সিন্ধু। অর্জুন এটি জয় করেন। সতীর মৃত্যুতে শিবের চোখের জলে এখানে একটি পবিত্র প্রস্রবণ গড়ে ওঠে। কটাসের কাছে পোটোয়ার-এ প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। প্রবাদ এখানে নৃসিংহ অবতার হয়েছিলেন। দ্রঃ-মূলস্থানপুর।

কঠোপনিষদ্--দশটি প্রধান উপনিষদের একটি। কৃষ্ণ যজুর্বেদের কঠ বা কাঠক ব্রাহ্মণের অন্তর্গত। দুটি অধ্যায় এবং তিনটি করে বল্লী অর্থাৎ মোট ছয়টি বল্লী। আরম্ভে দুটি বাক্য ছাড়া সবটাই পদ্যে রচিত। প্রথম অধ্যায়ে পিতা বাজশ্রবস্ ও পুত্র নচিকেতা সংবাদ এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে যম ও নচিকেতা সংবাদ। পিতৃসত্য পালনের জন্য নচিকেতা যমালয়ে যান এবং যমের কাছে দুটি বর ও আত্মজ্ঞান লাভ করেন। আত্মতত্ত্ব, আত্মার একত্ব, পরমাত্মার সর্বব্যাপকতা, চিত্তশুদ্ধি ইত্যাদি এই উপনিষদের আলোচ্য বিষয়। এই উপনিষদের বিখ্যাত মন্ত্র উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।

কড়ি—ভারতে প্রাচীন মুদ্রা হিসাবে প্রচলিত। খৃ পঞ্চম-শতকেও চালু ছিল ফা-হিয়েন লিখে গেছেন। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে বাংলাতেও ব্যবহৃত হয়েছে।

কণাদ বৈশেষিক দর্শন প্রণেতা। বিবুদ্ধবাদীদের দেওয়া নাম কণা/কণভক্ষ, কণভুক, উলূক। ফলে অপর নাম ঔলূক্য দর্শন। আর এক নাম কাশ্যপ। খুব বেশি পরিমাণ পিপ্পলী খেতেন বলে অপর নাম পিপ্পলাদ। তণ্ডুল কণা খেয়ে জীবন ধারণ করতেন বলে কণাদ। কণাদের বৈশেষিক দর্শনে দশ অধ্যায়, প্রতি অধ্যায়ে দুটি আহ্নিক; কেবল মাত্র মীমাংসা ও সাংখ্য মতবাদ আলোচিত হয়েছে। মূল গ্রন্থ এবং এর প্রাচীন ও প্রামাণিক ব্যাখ্যাদি সাহিত্যও লুপ্ত। প্রশস্তপাদ রচিত পদার্থ-ধর্ম সংগ্রহ বৈশেষিক দর্শনের একটি প্রাপ্তব্য প্রচলিত গ্রন্থ। ইনি পরমাণু-বাদী। এঁর মতে জীবনের কঠোরতাই ঋষিদের আধ্যাত্মিক উন্নতির মূলসূত্র। বিশেষ নামে একটি অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার করার জন্যই এই দর্শন বৈশেষিক দর্শন। এই মতে দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই ছয়টি ভাব পদার্থের সঙ্গে অভাব পদার্থ মিলে সব কিছুর সৃষ্টি। অভাব পদার্থ:—প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব, অন্যোন্যাভাব ও অত্যন্তাভাব। ইনিই প্রথম বলেন পরমাণুই সৎস্বরূপ নিত্য পদার্থ এবং কারণহীন; এবং পরমাণুর সংযোগেই সমস্ত জড় পদার্থের উৎপত্তি। পরমাণুতে বিশেষ নামে একটি জিনিস আছে

এবং এই বিশেষ থেকেই পরমাণু ভিন্নরূপে প্রতীত হয়। কণাদ দেখান তেজ ও আলোক একই মূল জিনিসের অভিন্ন অবস্থা। কণাদ দর্শনে ঈশ্বরের উল্লেখ নাই ; এই জন্য নাস্তিক বলে অভিহিত। ইনিই বিশ্বে পরমাণুবাদের প্রথম প্রবক্তা। দ্রব্যাদি পদার্থজ্ঞান থেকে মুক্তিলাভ হয় বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মত। এঁর কাহিনী ও সময় কাল অজ্ঞাত ; মহাভারতে ও পুরাণে ইত্যাদিতে কণাদের মতের আভাস আছে।

কণারক—বা কোণার্ক। পুরী সহর থেকে ৩৪ কি-মি পূর্ব, উত্তরপূর্ব কোণে এবং সমুদ্র থেকে ৪ কি-মি দূরে ধ্বংসাবশেষ একটি সূর্য মন্দির। ১২৫০-৬০ খৃস্টাব্দে ওড়িশার রাজা লাঙ্গুলিয়া নরসিংহ দেব রচিত। ১৭ শতকের প্রারম্ভে ওড়িশার সুবাদার বাখর খাঁর অত্যাচারের ভয়ে কণারক বিগ্রহ 'মৈত্রাদিত্য বিরিঞ্চিদেবকে' পুরীতে পুরুষোত্তম দেউলে স্থানান্তরিত করা হয় কিন্তু পরে এই বিগ্রহের সন্ধান আর মেলে নি। ১৬২৭ খৃস্টাব্দে এর উচ্চতা ছিল ২২০ ফুটের কিছু বেশি। সামনে জগমোহনের উচ্চতা বর্তমানে ১২৯ ফু, ৬-ই। কণারকের এই মন্দির তৈরি হবার আগেও সম্ভবত এখানে আরো পুরাতন কোন মন্দির ছিল। বর্তমানে কাছাকাছি গ্রামে অষ্টশম্ভু ও অষ্টশক্তির মন্দির আছে। এগুলিকে নিয়ে কণারককে পদ্মক্ষেত্র বলে বিবেচনা করা হয়। মন্দির পূর্বাস্য : কিছু দূরে পরবর্তী কালে নিকৃষ্ট কারিগর দিয়ে রচিত নাট মন্দির বর্তমান। এই দুটির মধ্যে উন্মুক্ত স্থানে সূর্যের সারথি অরুণের মূর্তিযুক্ত স্তম্ভ ছিল। স্তম্ভটি এখন পুরী মন্দিরে আছে। প্রাঙ্গণে আরো কয়েকটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। মন্দিরের চারদিকে চারটি দরজা ছিল ; পূর্ব দরজাতে অতিকায় সিংহমূর্তি ; দক্ষিণে অশ্বদ্বয়, উত্তরে হস্তিযুগল এখনও বর্তমান।

সূর্যের রথের আকারে কল্পিত এই মন্দির। ভিত্তি বেদির গায়ে নয় ফুটের বেশি উঁচু বারো জোড়া চাকা যেন রথের চাকা। পূর্ব দিকে প্রধান সিঁড়ির দু পাশে সাতটি ঘোড়ার মূর্তি ছিল। সমস্ত মন্দিরটি কারুকার্য খচিত। বাস্তব ও কাল্পনিক জীবজন্তু, রাজা, রাজধানী, সৈনিক, নাগরিক, রাজাকে উপঢৌকন দিচ্ছে জিরাফ সহ বণিক, গুরুশিষ্য, রাজসভা, বণিকসভা, বিবাহসভা, শিকার কাহিনী, দেবমন্দির, শোভাযাত্রা, কামপাশে আবদ্ধ নরনারী, বৃক্ষছায়ায় গোযান, বা রন্ধনরত নারীমূর্তি মন্দিরের গায়ে খোদিত রয়েছে। মন্দিরের ওপর দিকে নৃত্যরত দেবতা ও নর্তকীদের সংখ্যা অধিক। সব কিছুর ওপরে পাথরের কলস ও দেবতার আয়ুধ ষোড়শদল পদ্ম ছিল। কণারকের তক্ষণ শিল্প ভারতের একটি বিশিষ্ট কীর্তি। সমগ্র মন্দিরটি এই খোদিত মূর্তিগুলি দিয়ে জীবন প্রবাহে যেন উচ্ছল হয়ে রয়েছে। খৃস্টীয় ১৭-শ শতকের গোড়াতে হয়তো পাশের নদী মজে যাওয়ায় মন্দিরটি পরিত্যক্ত হয়েছিল। তারপর কালের কবলে সমস্ত মন্দিরটি ক্রমশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতে থাকে। বিংশ শতকের প্রথম দিক থেকে মন্দিরটির সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছে।

কণিক—ধৃতরাষ্ট্রের এক জন কূটনীতিক ব্রাহ্মণ মন্ত্রী। পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে ধৃতরাষ্ট্রকে সর্বদাই উত্তেজিত করতেন। শত্রুকে যে কোন উপায়ে ধ্বংস করার নীতির সমর্থক। কণিকের নীতি ভীতুকে ভয় দেখিয়ে জয় করবে। সাহসীকে সম্মানিত করে ছলনা করে হত্যা করবে। লোভীকে উপহার দিয়ে বশ করবে। নিজের পিতা, গুরু বা

নিজের ছেলেও যদি শত্রু হয় তাকে হত্যা করতে দ্বিধা করবে না। কাউকে অপমান সূচক কোন কথা বলবে না এবং পৃথিবীতে সকলকে অবিশ্বাস করবে। এই নীতির সমর্থনে বলতেন এক শৃগাল এক সিংহের মাংস খাবার জন্য একটি বাঘ, একটি ইঁদুর ও একটি বেঁজির সঙ্গে বন্ধুতা করে। ইঁদুরকে দিয়ে সিংহের থাবা এমন ভাবে খাইয়ে ফেলে যে সিংহ খোঁড়া হয়ে পড়ে। এর পর বাঘকে দিয়ে সিংহকে হত্যা করায়। শৃগালের পরামর্শ মত তারপর সকলে স্নান করতে যায়, এসে মাংস খাবে এবং শৃগাল পাহারা দিতে থাকে। বাঘ স্নান করে প্রথম ফিরে আসে ; শৃগাল জানায় ইঁদুর অহঙ্কারে বলে বেড়াচ্ছে সে নিজে সিংহকে নিহত করেছে। অপরের হাতে নিহত শিকার শৃগাল নিজেই আর খেতে রাজি নয়। শুনে বাঘের অহমিকা আহত হয় এবং বাঘ না খেয়েই চলে যায়। এর পর ইঁদুর এলে শৃগাল জানায় বেঁজি বলেছে সিংহের মাংস বিষ; খেলেই মৃত্যু হবে। ইঁদুর না খেয়ে পালিয়ে যায়। এর পর বেঁজি এলে শৃগাল তাকে তেড়ে যায় এবং বেঁজি ভয়ে পালিয়ে যায়। শৃগাল নিজের খুসি মত তখন সিংহের মাংস খেতে থাকে।

কণ্ডু —কণ্বের ছেলে। এক জন প্রসিদ্ধ মহর্ষি। কণ্ডু ও মেধাতিথি দুই ভাই। গোমতী তীরে কঠোর তপস্যা করছিলেন। ইন্দ্র ভয়ে প্রম্লোচা অপ্সরাকে পাঠান। এঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে প্রায় শতবর্ষ এঁর সঙ্গে মন্দর পর্বতে বসবাস করেন। এরপর অপ্সরা বিদায় নিয়ে ফিরে যেতে চান কিন্তু মুনি রাজি হন না। বার বার এই ভাবে বিদায় চাওয়া ও রাজি না হওয়ার মধ্য দিয়ে কয়েক শত বছর কেটে যায়। মুনি ভোগের নতুন নতুন পথে ভেসে চলতে থাকেন। এর পর এক দিন সন্ধ্যা বন্দনার উদ্যোগ করলে ৯০০ বছর ৬ মাস ৩ দিন পরে ধর্মের কথা মনে পড়েছে বলে অপ্সরা পরিহাস করেন। প্রথমে মহর্ষি বিশ্বাস করতে চান না। বলেন মাত্র সেই দিন সকালে দু জনের দেখা হয়েছে। কিন্তু তারপর কণ্ডু মুনির জ্ঞান ফিরে আসে ; গর্ভবতী স্ত্রীকে তিরস্কার করেন ও ফিরে চলে যেতে বলেন এবং নিজে আবার তপস্যায় মগ্ন হন। প্রম্লোচা সব শোনেন। গা দিয়ে ঘাম ঝরতে থাকে এবং শেষ অবধি চলে যান। অপ্সরার গায়ের ঘাম ও গর্ভ নীচে বহু গাছের পাতায় ও নরম শাখায় ছড়িয়ে পড়ে। বাতাসে এগুলি তারপর এক জায়গায় জমা হয়ে চন্দ্রালোকে পরিপুষ্ট হয়ে মারিষা=বাক্ষী নামে একটি শিশু কন্যাতে পরিণত হয়। অন্য মতে একটি গাছে ইনি গর্ভ ত্যাগ করে গিয়েছিলেন, এই ফেলে দেওয়া গর্ভ থেকে মারিষা নামে একটি মেয়ে হয় (বিষ্ণু-পু)। এক বনে কণ্ডুর প্রিয় পুত্র ১৬ বছর বয়সে মারা যান। শোকে অভিশাপ দিয়ে বনটিকে মুনি মরুভূমিতে পরিণত করেন। সীতার অন্বেষণে হনুমান এই মরুভূমিতেও এসেছিলেন (রা ৪।৪৮।১৩)। রামের রাজ্যভার গ্রহণের সময় কণ্ডু অযোধ্যাতে গিয়েছিলেন।

কণ্ব - ঋক্‌বেদে এক ঋষি। পুরুবংশে অপ্রাতিরথের ছেলে। কণ্বের ছেলে কণ্ডু ও মেধাতিথি। কণ্ব গোত্রের আদি পুরুষ। শুক্লযজুর্বেদের কণ্বশাখা প্রণয়ন করেন। প্রাচীন ঋষিদের মধ্যে কণ্ব বংশ একটি প্রসিদ্ধ বংশ। কশ্যপ বংশে জন্ম কি না অস্পষ্ট, তবে কাশ্যপ নামেও পরিচিত। মালিনী নদীর তীরে শিষ্যদের নিয়ে আশ্রমে বাস করতেন। অন্য মতে প্রবেণী নদীর উত্তর পাড়ে অবস্থিত। আর এক মতে চম্বল

নদীর তীরে। রাজপুতানাতে কোটা থেকে চার মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। শকুন্তলার পালক পিতা। দুষ্মন্তের ছেলে, গোবিতত নামে যে যজ্ঞ করেন তাতে কণ্ব প্রধান পুরোহিত হন। মাতলি স্ত্রী সুধর্মার (মহা ৫।৯৫।১৯) সঙ্গে পরামর্শ করে মেয়ে গুণ-কেশীর পাত্র খুঁজতে বার হয়েছিলেন—এ ঘটনাটি কণ্ব দুর্যোধনকে বর্ণনা করেন। রাম রাজা হলে কণ্ব দেখা করতে এসেছিলেন। কণ্ব ও মেনকার একটি মেয়ে হয়, নাম ইন্দীবরপ্রভা। শকুন্তলার স্বামী দুষ্মন্তের কাকার ছেলে কণ্ব। ঋক্‌বেদে ১ম মণ্ডলের ৫০টি সূক্ত এবং ৮ম মণ্ডলটি কণ্ব পরিবারের দ্বারা লিখিত।

কণ্বআশ্রম—মালিনী (চুকা) তীরে। শতপথ ব্রাহ্মণে হরিদ্বার থেকে ৩০ মাইল পশ্চিমে নাদপীঠে বা রাজপুতানাতে কোটা থেকে ৪ মাইল দ-পূর্বে। পদ্ম পুরাণে নর্মদা তীরে ; দ্রঃ-ধর্মারণ্য।

কতি—বিশ্বামিত্রের ঔরসে শীলাবতীর গর্ভে জন্ম পুত্র। কতির বংশ কাত্যায়ন বংশ।

কতৃপুর—কর্তৃপুর, ত্রিপুরা, তিপেরা। আর এক মতে কুমায়ুন, আলমোড়া, গাড়োয়াল ও কাঙ্গড়া মিলে ; সমুদ্রগুপ্ত জয় করেছিলেন।

কথাসরিৎসাগর—সংস্কৃতে পদ্যে লেখা কাহিনী। ১০৬৩-৮১ খৃস্টাব্দে কাশ্মীরী কবি সোমদেব রচিত। ২১৩৮৮ শ্লোক। জলন্ধর রাজকন্যা কাশ্মীর রাজ অনন্তের মহিষী সূর্যমতির চিত্ত বিনোদনের জন্য পৈশাচী ভাষায় গুণাঢ্য (দ্রঃ) রচিত বৃহৎ-কথা গ্রন্থের সার-সংগ্রহ। বৃহৎ-কথার কাশ্মীরী সংস্করণ অবলম্বনে ক্ষেমেন্দ্র সংস্কৃত পদ্যে বৃহৎ-কথা-মঞ্জরী রচনা করেন। এর পর প্রায় ৩০ বছর পরে কথাসরিৎসাগর রচিত হয়। সোমদেব বৃহৎ-কথা মঞ্জরী অনুসরণ করেছিলেন কিনা মতভেদ আছে। তবে এই দুটি বইতেই প্রথম ৫-টি খণ্ডের মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে। কথাসরিৎসাগর ১৮টি পরিচ্ছেদ বা লম্বকে বিভক্ত ; লম্বকের অবান্তর বিভাগের নাম তরঙ্গ; সমগ্র গ্রন্থে ১২৪ তরঙ্গ। উদয়ন বাসবদত্তা, বেতালপঞ্চবিংশতি ও পঞ্চতন্ত্রের বহু কাহিনী এই গ্রন্থের অন্তর্গত।

কদফিস—বিম কদফিস। শৈব কুষাণ রাজ।

কদ্রু—দক্ষ প্রজাপতির মেয়ে ; কদ্রু ছোট, বিনতা (দ্রঃ) বড় ; এরা দুই বোন। দুজনেই কশ্যপের স্ত্রী। রামায়ণে (৩।১৪) ক্রোধবশার মেয়ে কদ্রু ; অর্থাৎ দক্ষের নাতনী ; এবং তাম্রার একটি মেয়ে শুকী>নতা>বিনতা। কশ্যপ বর দিতে চাইলে কদ্রু বলশালী এক হাজার নাগ এবং বিনতা এই নাগেদের চেয়ে সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ দুটি সন্তান চান। যথা কালে কদ্রুর হাজারটি এবং বিনতার দুটি ডিম হয়। তারপর পাঁচশ বছর স্বোপসেদেষু ভাণ্ডেষু রেখে দেবার পরে কদ্রুর ডিমগুলি থেকে বাচ্চা বার হয়ে আসে। বিনতা (দ্রঃ)। মহাভারতে এক দিন এর পর উচ্চৈঃশ্রবা (অন্য মতে ঐরাবতের লেজের) কি রং এই নিয়ে দুই বোনে তর্ক হয়। বিনতার মতে লেজ সাদা, কদ্রুর মতে কালো এবং সঙ্গে সঙ্গে পণ রাখেন। যার কথা মিথ্যা হবে তাকে অপরের দাসী হয়ে থাকতে হবে। দুজনে এরপর বাড়ি ফিরে আসেন ; পরদিন কি রঙ দেখতে যাবেন। কদ্রু তারপর গোপনে ছেলেদের ডেকে উচ্চৈঃশ্রবার লেজে লেগে থাকতে বলেন যাতে

লেজ কালো দেখায়। অনন্ত (দ্রঃ) ইত্যাদি বহু সাপ রাজি হন না; কদ্রু তাঁদের অভিশাপ দেন জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞে তাঁদের মৃত্যু হবে। ব্রহ্মা এই শাপ শোনেন; পৃথিবীতে বহু সাপ হয়ে গেছে; এদের তীব্র বিষ: এই সব চিন্তা করে ব্রহ্মা ও দেবতারা কদ্রুর শাপকে অনুমোদন করেন (মহা ১।১৮।৯, ১।৪৯।৮); এবং কাশ্যপকে বিষহণী বিদ্যা দান করেন। পরদিন হেরে গিয়ে বিনতা কদ্রুর দাসী হন। এই ভাবে বিনতার প্রথম ছেলে অরুণের অভিশাপও সফল হয়। এরপর বিনতার দ্বিতীয় ডিম থেকে গরুড়ের জন্ম হয়। কদ্রুর আদেশে গরুড়কে (দ্রঃ) সাপদের দেখাশোনা করতে বাধ্য হতে হয়। কদ্রুর ছেলে উরগ (দ্রঃ)। মহাভারতে (১।৬০।৬৬) কদ্রুর ছেলে পন্নগ; সুরসার ছেলে নাগ (দ্রঃ)। হরিবংশে (১।৩।১১১) সন্তান ১০০০ নাগ; অনেক মাথা।

কদ্রুর প্রধান ছেলেগুলি ঃ—সব চেয়ে বড় শেষ। তারপর বাসুকি, ঐরাবত, তক্ষক, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, কালিয়, মণিনাগ, আপূরণ, পিঞ্জরক, এলাপত্র, বামন, নীল, অনীল, কল্মাষ, শবল, আর্যক, আদিক/উগ্রক শলপোতক/কলশপোতক, সুমনোমুখ/সুমনা/সুরামুখ, দধিমুখ, বিমলপিণ্ডক, আপ্ত, কোটনক/কর্কোটক, শঙ্খ, বালশিখ/বালিশিখ, নিষ্ঠানক/নিষ্টানক, হেমগুহ, নহুষ, পিঙ্গল, বাহ্যকর্ণ, হস্তিপদ, মুদগরপিণ্ডক, কম্বল, অশ্বতর, কালীয়ক, বৃত্ত, সংবর্তক, শঙ্খমুখ/শঙ্খনখ, স্কণ্ডক/কুষ্মাণ্ডক, ক্ষেমক, পিণ্ডারক, করবীর, পুষ্পদ্রংষ্ট্র, বিল্বক, বিল্বপাণ্ডুর, মুষকাদ, শঙ্খশির, পূর্ণদ্রংষ্ট্র/পূর্ণভদ্র; হরিদ্রক, অপরাজিত, জ্যোতিক, শ্রীবহ, কৌরব্য, ধৃতরাষ্ট্র, পুষ্কর/শঙ্খপিণ্ড, শল্যক, বিরজা, সুবাহু, শালিপিণ্ড, হস্তিভদ্র/হস্তিপিণ্ড, পিঠরক, মুখর/সুমুখ, কোণবাসন/কৌণপাশন, কুরর, কুঞ্জর, প্রভাকর, কুমুদ, মুকুদাক্ষ, তিত্তির, হলিক, কর্দম, বহুমূলক, কর্কর, অকর্কর, কুণ্ডোদর, মহোদর (মহা ১।৩১।-)। প্রধান ছেলে শেষ, অনন্ত, বাসুকি, তক্ষক, কূর্ম, কুলিক (মহা ১।৫৯।৪০)।

কদ্রু একবার বিনতাকে বলেন সমুদ্রের মাঝে রমণীয়ক দ্বীপে নিয়ে যেতে। বিনতা কদ্রুকে পিঠে নেন এবং গরুড় নাগেদের পিঠে নেন। গরুড়ের কাছে ব্যাপারটা খুব খারাপ লাগে। আকাশে সূর্যমণ্ডলের কাছে উঠে যান, ফলে সূর্যের অসহ্য তাপে নাগশিশুরা ঝলসে যেতে থাকে। কদ্রু তখন ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করে বৃষ্টি নামিয়ে উরগদের রক্ষা করেন।

এরপর গরুড় মায়ের দাসীত্ব মুক্তির উপায় কি কদ্রুর কাছে জানতে চাইলে কদ্রু অমৃত এনে দিতে বলেন, তাহলে বিনতাকে তিনি মুক্তি দেবেন।

কনকধ্বজ—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। ভীমসেনের হাতে নিহত।

কনকাবতী—কঙ্কাবতী, কঙ্কোট, কনককোট। যমুনা ও পৈশুনি (পয়স্বিনী) সঙ্গমে; দক্ষিণ তীরে। কোসাম থেকে ১৬ মাইল পশ্চিমে; যমুনার দক্ষিণ কূলে।

কনকায়ুস—করকায়ুস। ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে যোগ দিয়েছিলেন।

কনখল—কুব্জামর্ক, মায়াপুরী। ছোট গ্রাম। হরিদ্বারের (দ্রঃ) ২ মাইল পূর্বে।

গঙ্গা ও নীলধারা সঙ্গমে ; এখানে দক্ষযজ্ঞ হয়েছিল। মহাভারতেও তীর্থস্থান। লিঙ্গপুরাণে কনখল গঙ্গাদ্বারে অবস্থিত। এখানে স্নান করলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হয়। বশিষ্ঠের নির্দেশে লক্ষ্মণের ছেলে তক্ষ এখানে বনবাসীদের পরাজিত করে অগাতি/তী নগরী স্থাপন করেন। দ্রঃ- হরিদ্বার।

কনবক—দ্রঃ- শূরসেন। ছেলে তন্ত্রিজ ও তন্ত্রিপাল (হরি ১৷৩৪৷৩৮)।

কনিষ্ক—কুষাণ বংশে শ্রেষ্ঠ রাজা। ইউ-চি (দ্রঃ) বংশ। ৭৮ খৃস্টাব্দে রাজা হন এবং এই সময়ে শকাব্দ চালু করেন। অন্য মতে খৃ ২-শতকে। বিহার থেকে কাশ্মীর এবং মধ্য এসিয়ার গোবি মরুভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত রাজ্য ; পুরুষপুর (=পেশোয়ার) ছিল রাজধানী। পার্থিয়ান ও চীনদের তিনি পরাজিত করেছিলেন। অশ্বঘোষ, চরক ও আরো কয়েক জন পণ্ডিত তাঁর সভাতে ছিলেন প্রবাদ আছে। কনিষ্ক বৌদ্ধধর্মের পৃষ্টপোষক ছিলেন এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মহাসংগীতি তিনিই ডাকিয়েছিলেন। গৌতম বুদ্ধের অস্থির ওপর একটি বিরাট ও সুন্দর স্মৃতিসৌধ রচনা করে দিয়েছিলেন। একটি আধারের মধ্যে পেশোয়ারের কাছে ভূগর্ভে অস্থিটি পাওয়া গিয়েছিল ; উপস্থিত এটি ব্রহ্মদেশে রক্ষিত আছে। নাগার্জুন, নাগার্জুন শিষ্য আর্যদেব, পার্শ্ব, চন্দ্রকীর্তি কনিষ্কের সমসাময়িক।

কনিষ্কপুর—কানিখপুর, কামপুর। শ্রীনগর থেকে ১০ মাইল দক্ষিণে। কাশ্মীর-রাজ কনিষ্ক স্থাপিত। ৭৮ খৃস্টাব্দে কনিষ্ক এখানে শেষ বৌদ্ধসংগীতি ডাকেন এবং এই সময় থেকে শকাব্দ গণনা আরম্ভ হয়।

কন্‌জ্যুর—দ্রঃ- তন্‌-জ্যুর।

কন্দর্প—মদন (দ্রঃ)।

কন্দলী—ঔর্ব ঋষির জানু থেকে জন্ম। অন্য মতে ব্রহ্মার পৌত্রী। অত্যন্ত কলহ-পরায়ণা। ঔর্ব এঁকে দুর্বাসার সঙ্গে বিয়ে দেন এবং অনুরোধ করেন কন্দলীর শত অপরাধ যেন দুর্বাসা ক্ষমা করেন। দুর্বাসা (দ্রঃ) তাই করেছিলেন এবং তারপর বিরক্ত হয়ে ভস্ম হবার জন্য শাপ দেন। পর জন্মে কলাগাছ হয়ে জন্মান এবং কাউকে আর বিয়ে করেন নি।

কন্যাকুব্জ—কুশ নামে এক ধার্মিক রাজা/মুনির ছেলে কুশনাভ (দ্রঃ)। কুশনাভের স্ত্রী ঘৃতাচীর ১০০ মেয়ে হয়েছিল। এক দিন উদ্যানে এই মেয়েরা নাচগান করছিলেন বায়ু তখন এদের রূপে মুগ্ধ হয়ে সকলকে বিয়ে করতে চান ; অমরী ও চিরযৌবনা (রা ১৷৩২৷২৭) করে দেবেন। মেয়েরা এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে কুশনাভের কাছে গিয়ে প্রস্তাব জানাতে বলেন এবং তিরস্কার করেন শাপ দিয়ে বায়ুকে স্থানচ্যুত করতে পারেন (রা ১৷৩২৷২০) ; কিন্তু তবু ক্ষমা করছেন। তখন বায়ু এদের সর্বাঙ্গ ভেঙ্গে দেন, ফলে এঁরা কুব্জ হয়ে যান। এই জন্য স্থানটির নাম হয় কন্যাকুব্জ। কুশনাভ মেয়েদের কাছে সব শুনে বায়ুকে ক্ষমা করার জন্য মেয়েদের প্রশংসা করেন। মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে চূলী পুত্র কাম্পিল্যরাজ ব্রহ্মদত্তের সঙ্গে বিয়ে দেন। বিয়ের সময় ব্রহ্মদত্ত এদের পাণিস্পর্শ করা মাত্র (রা ১৷৩৩৷২০) এরা সুস্থ হয়ে ওঠেন। অন্য মতে মেয়েরা অবজ্ঞা ও প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তারপর অনুনয় বিনয় করলে পবনদেবই বলে দিয়েছিলেন

কাম্পিল্যরাজ ব্রহ্মদত্ত অন্য মতে কাছেই তপস্যারত মুনি ব্রহ্মদত্তের সঙ্গে বিয়ে দিতে। এই কন্যাকুব্জে (মহা ৩।৮৫।১২) ইন্দ্র ও বিশ্বামিত্র এক সঙ্গে সোম/সুরা পান করেছিলেন।

কন্যাকুমারী—(১) এক মহিলা পদব্রজে কাশী থেকে এসে এখানে স্নান করে পাপমুক্ত হন ; ফলে নাম হয় কন্যাকুমারী। (২) ময়াসুরের মেয়ে পুণ্যকাশী কৈলাসে শিবের তপস্যা করেন। শিব দেখা দিলে শিবের দেহে লীন হয়ে যাবার বর চান। শিব বলেন বহু দিন অপেক্ষা করতে হবে, দ-সমুদ্রতীরে বসে তপস্যা করতে হবে, পুণ্য-কাশীর আশ্রম কন্যাক্ষেত্র বা তপস্থল নামে প্রসিদ্ধি পাবে এবং বাণাসুর ইত্যাদি দুষ্টদের দমন করতে হবে ; তারপর। এই নির্দেশে ইনি সমুদ্রের তীবে এসে কন্যা-কুমারী নাম গ্রহণ করে তপস্যা করতে থাকেন। বাণাসুর ত্রিভুবন জয় করে দুষ্ট শাসক হয়ে উঠে কন্যাকুমারীকে দেখে বিয়ে করতে চান। কিন্তু ইনি প্রত্যাখ্যান করলে দুর্মুখ ও দুর্দশন নামে দুই অনুচরকে নিয়ে যুদ্ধ কবতে এসে বাণাসুর (দ্রঃ) নিহত হন (স্কন্দ-পু)।

(২) কংসের হাত থেকে যে শিশু কন্যা আকাশে চলে যান সেই কন্যাই কন্যাকুমারী (পদ্ম-পু)। (৩) হেরোডটাস (খৃ-পূ ৩-য় শতক) তাঁর গ্রন্থে কন্যাকুমারীর উল্লেখ করেছেন। ৬০ খৃস্টাব্দে লিখিত পেরিপ্লাস গ্রন্থে এই তীর্থের মাহাত্ম্যের উল্লেখ আছে। ভক্ত স্ত্রী-পুরুষেরা এখানে স্নান করে বাকি জীবন ব্রহ্মচর্য নিয়ে কাটিয়ে দেন বলেছেন। দেবী মন্দিরের স্থানটি comara বলে উল্লিখিত। টলেমির, 'কোমারিয়া একুন' গ্রন্থে উল্লেখ আছে এখানে তিনি তীর্থ স্নান করেছিলেন এবং মন্দিরে পূজাও দিয়েছিলেন। ১২৪৩ খৃস্টাব্দে মার্কোপলো এই মন্দিরে পূজা দিয়েছিলেন।

কন্যাতীর্থ—(১) কুরুক্ষেত্র। (২) কাবেরী নদীর তীরে। (৩) কুমারী।

কপর্দী—একজন রুদ্র (দ্রঃ)।

কপালমোচনতীর্থ- (১) বারাণসী (২) মায়াপুরে। (৩) তাম্রলিপ্তে। (৪) গুজরাটে সবরমতী তীরে। (৫) সরস্বতী তীরে, অপর নাম অনুশাসন তীর্থ। (৬) একটি মতে সরস্বতীর পূর্ব তীবে সধোরা থেকে ১০ মাইল দ-পূর্বে। রামচন্দ্র জনস্থানে এক রাক্ষসের মাথা কেটে ছুঁড়ে ফেলেন। মহর্ষি মহোদরের জঙ্ঘায় এই মাথা আটকে যায়। স্থান থেকে পুঁজ বার হতে থাকে। মহোদর তবু তীর্থ যাত্রায় যান। সব তীর্থে অবগাহন করে শেষ পর্যন্ত এই ঔশনস তীর্থে এসে স্নান করলে ঐ মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে নাম কপালমোচন। শুক্র এখানে দানবদের সংগ্রাম বিষয়ক নীতি উদ্ভাবন করেন ফলে এই নাম ঔশনস।

কপালী—যিনি কপাল ধারণ করেন। (১) একবার ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মধ্যে ত্রিভুবনে কে বড় তর্ক হয়। এমন সময়ে সামনে একটি উজ্জ্বল আলো ফুটে ওঠে এবং দৈববাণী হয় এই আলো কোথা থেকে আসছে যে বলতে পারবে সেই ত্রিভুবনে প্রকৃত প্রধান। ব্রহ্মা তখন ওপর দিকে উঠতে থাকেন এবং বিষ্ণু নীচের দিকে যেতে থাকেন। বহু বহু দিন ধরে এগিয়ে যাবার পর ব্রহ্মা একটি কেতকী ফুল দেখতে পান, ফুলকে জিজ্ঞাসা করলে ফুলটি জানায় এই আলোর উৎস থেকে তিন ব্রহ্মপ্রলয়-কাল পার হয়ে সে

আসছে। ব্রহ্মা তখন ফুলটিকে নিয়ে বিষ্ণুর কাছে এসে বলেন এই আলোর উৎস তিনি দেখে এসেছেন। সঙ্গে সঙ্গে কেতকী ফুলটি শিবের মূর্তি ধরে অন্য মতে শিব আবির্ভূত হয়ে এই মিথ্যা বলার জন্য ব্রহ্মার একটি মাথা নখে ছিঁড়ে ফেলেন। ব্রহ্মা তখন শিবকে শাপ দিলেন নর-কপাল হাতে আটকে থাকবে এবং এই নিয়ে জীবন ভর ভিক্ষা করতে হবে। শিবও শাপ দেন কেউ ব্রহ্মাকে কোন দিন পূজা করবে না। পরে বিষ্ণুর ইচ্ছায় শিব বারাণসীতে এসে শাপমুক্ত হন ; হাত থেকে কপাল চ্যুত হয়।

দেবী ভাগে (৫।৩৩) সত্য যুগে শ্বেতদ্বীপে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য বিষ্ণু এবং সমস্ত বাসনা জয় করার জন্য ব্রহ্মা তপস্যা করছিলেন ; এবং এক বার এঁদের দেখা হয়ে যায় ইত্যাদি। এই সময়ে লিঙ্গ দেহ ধারণ করে শিব দেখা দেন এবং তাঁর আদি বা অন্ত যে জানতে পারবে সেই বড় ইত্যাদি। ব্রহ্মা তার পর বিষ্ণুকে এসে বলেছিলেন শিবের মাথা থেকে ঐ ফুল এনেছেন ; কেতকী ব্রহ্মাকে সমর্থন করেন। বিষ্ণু মহাদেবকে সাক্ষী মানেন। মিথ্যা ভাষণের জন্য মহাদেব কেতকীকে শাপ দেন কোন পূজায় কেতকী ফুল ব্যবহৃত হবে না এবং ব্রহ্মার একটি মাথা ছিঁড়ে নেন ইত্যাদি। (২) ভগবতী জগৎ পালন করেন বলে অথবা ব্রহ্মার কপাল ধারণ করেন বলে কপালী। (৩) একজন রুদ্র। দ্রঃ-কালভৈরব।

কপিঞ্জল—দ্রঃ-ইন্দ্রপ্রমিতি।

কপিধ্বজ—অর্জুনের রথ। বিশ্বকর্মা নির্মিত (৫।১৪০)। উরু ভঙ্গের পর পাণ্ডবরা কৌরব শিবিরে এলে অর্জুন ও কৃষ্ণ রথ থেকে নামেন। গাণ্ডীব ইত্যাদিও নামিয়ে দেন। ধ্বজা থেকে কপি অদৃশ্য হয়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে রথ দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। কৃষ্ণ বলেন বিবিধ ব্রহ্মাস্ত্রের আঘাতে রথ আগে থেকেই জর্জরিত ছিল (মহা ৯'৬১।১৩)। দ্রঃ- খাণ্ডবদহন।

কপিল—ঋষি। পুরাণে ও সাহিত্যে একাধিক কপিলের উল্লেখ আছে। গৌড়পাদ স্বামীর মতে কপিল ব্রহ্মার মানস পুত্র ; এবং দ্বাবিংশতি সূত্র সংবলিত 'তত্ত্ব মানস' নামে ছোট বইটি কপিল প্রণীত আদি সাংখ্য গ্রন্থ। বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে তত্ত্বমানস সূত্র ও সূত্রষড়ধ্যায়ী দুটিই কপিলের রচনা। ভাগবতে দেবহূতি কপিল সংবাদে এবং কপিল মতবাদে বেদান্ত দর্শনের প্রভাব সুস্পষ্ট। পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব যুক্ত সাংখ্য দর্শন রচনা করেন। সাংখ্য মতে প্রকৃতি ও পুরুষ অনাদি। আত্মা কিছুই সৃষ্টি করে না ; আত্মা কেবল দ্রষ্টা। কর্মফল অনুসারে আত্মা দেহান্তরে আশ্রয় নেয়। কর্মক্ষয় হলে আর দেহান্তরে যায় না। বস্তু মাত্রেই সৎ এবং সৎ থেকেই সতের উৎপত্তি। এই সব তত্ত্ব, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ ইত্যাদি কপিল নিজের মাকে শোনান। একাগ্রচিত্তে তপস্যা করার জন্য কপিল পাতালে আশ্রম করেছিলেন।

কপিল হচ্ছেন কর্দম (দ্র.) প্রজাপতির ঔরসে দেবহূতির ছেলে। আর এক মতে বৈবস্বত মনুর ছেলে কপিল। অপর নাম চক্রধনু। ভাগবত মতে বিষ্ণুর অবতার। কঠোর তপস্যা করেছিলেন। কর্দম প্রজাপতি মারা গেলে দেবহূতি (দ্রঃ) এসে কপিলের কাছে ভক্তিযোগ শিখতে চান। কপিল মাকে উপদেশ দেন। নরক যন্ত্রণার

বর্ণনাও দিয়েছিলেন (ভাগ ৩।৩০)। মহাভারতে (৩।৪৫।২৬) একে বিষ্ণু বলা হয়েছে। রামায়ণে (৭।২৩-৫)-ও ইনি বিষ্ণু। দেবী ভাগবতে (৯।১) স্ত্রীর নাম ধৃতি দেখা যায়। দ্রঃ-রাবণ।

রাক্ষসের বেশে ইন্দ্র সগর রাজার অশ্বমেধের ঘোড়া চুরি করে পাতালে ধ্যান মগ্ন কপিলের আশ্রমে বেঁধে রেখে আসেন। সগর রাজার ষাট হাজার ছেলে ঘোড়া খুঁজতে পাতালে এসে এঁকে ঘোড়া চোর মনে করে আক্রমণ করলে মুনির ক্রোধে সকলে ভস্ম হয়ে যান। এর পর অংশুমান এসে মুনিকে সন্তুষ্ট করে ঘোড়া নিয়ে যান। অংশুমান পিতৃব্যদের উদকাঞ্জলির জন্য অনুমতিও চেয়েছিলেন। কপিলমুনি তখন বলে দিয়েছিলেন অংশুমানের পৌত্র মহেশ্বরকে সন্তুষ্ট করে (মহা ৩।১০৬।২৭) স্বর্গ থেকে গঙ্গা এনে এদের মুক্তির ব্যবস্থা করবে। মাকে উপদেশ দেবার পর কপিল পুলহের আশ্রমের গিয়ে বাস করতে থাকেন। ভীষ্মকে শরশয্যায় দেখা করে যান। কপিল ও স্যূমরশ্মি মুনির মধ্যে একবার (মহা ১২।২৬০।৯) আলোচনা হয় গৃহস্থধর্ম না যোগ ধর্ম কোনটি বড়। কপিল শিবের ভক্ত ছিলেন। (২) একটি সর্প ঃ- ধর্ম, কাম, কাল, বসু, বাসুকি, অনন্ত ও কপিল—এই সাতটি সাপ পৃথিবীকে ধারণ করে রয়েছে। (৩) ভানু নামে অগ্নির চতুর্থ পুত্র। শুক্লকৃষ্ণগতিঃ হুতাশনম্ বিভর্তি (মহা ৩।২১১।২০)। নিজে অকল্মষ কিন্তু কল্মষণাং কর্তা ; ক্রোধাশ্রিত ; সাংখ্য যোগ প্রবর্তক। (৪) শালিহোত্রের পিতা ; একজন মুনি ; উপরিচর বসুর যজ্ঞ পরিচালনা করেন। (৫) বিশ্বামিত্রের এক ছেলে।

কপিলা—অমরকণ্টক পর্বতে নর্মদা নদীর উৎসের কাছে কিছুটা অংশের নাম। এখান থেকে ২ মাইল মত এগিয়ে গিয়ে ৭০ ফুট নীচে পড়ছে; এই জলপ্রপাতটি কপিল ধারা। নাসিক থেকে ২৪ মাইল দ-পশ্চিমে এই জলপ্রপাত। এখানে কপিলাশ্রম ছিল। কপিল সঙ্গম হচ্ছে নর্মদার দক্ষিণ তীরে অমরেশ্বর মন্দিরের কাছে। (২) মহীশূরে একটি নদী।

কপিলা—(১) দক্ষের মেয়ে,কশ্যপের স্ত্রী। একটি মতে এঁর মেয়ে অরুণা. রম্ভা, তিলোত্তমা ইত্যাদি ; ছেলে অতিবাহু, হাহা, হুহু, গন্ধর্ব ইত্যাদি। মহাভারতে (১।৫৯।৫০) এর সন্তান অমৃত, ব্রাহ্মণ, গবু, গন্ধর্ব ও অপ্সরা। (২) পঞ্চশিখের জননী।

কপিলাবস্তু—কপিল মুনির বাসস্থান। অন্য নাম কপিলপুর, কপিলবস্তু। সুপ্রচলিত প্রবাদ অনুসারে পোতলক অথবা সাকেতে রাজত্বকারী জনৈক ইক্ষ্বাকু রাজার নির্বাসিত ছেলেরা কপিলের আশ্রমের কাছে মনোরম পরিবেশে এই নগরী তৈরি করে এখানে বাস করতেন। এঁদের সঙ্গে এঁদের বোনেরাও ছিলেন। বোনেদের বিয়ে করে শোণিতগর্বী শাক্য বংশের স্থাপন করেন। এই বংশে বুদ্ধদেবের জন্ম। বুদ্ধদেবের সময় কপিলাবস্তু বিরাট সমৃদ্ধশালী নগরী ছিল কিনা মতভেদ আছে। খৃস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে শাক্যরা মনে হয় কোসলরাজ প্রসেনজিতের অনুগত বা আশ্রিত রাজা ছিল। প্রবাদ আছে প্রসেনজিতের স্ত্রী শাক্যদের ক্রীতদাসী ছিলেন ; এবং মাতুল বংশের কাছে উপযুক্ত সম্মান না পাওয়ার ক্ষোভে প্রসেনজিতের ছেলে বিরূঢক বুদ্ধদেবের জীবদ্দশাতেই কপিলাবস্তু ধ্বংস করেন এবং এখানকার অধিবাসীদের নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করে শাক্যদের

প্রায় শেষ করে দিয়েছিলেন। এর পর শাক্য বংশ আর কোন দিন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। ফা-হিয়েন কপিলাবস্তু পরিদর্শন করেন এবং সে সময় এখানে কেবল এক দল বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং দশটি উপাসক পরিবার ছিল। রাজা বা অন্য কোন প্রজা ছিল না। শুদ্ধোদনের জীর্ণ রাজপ্রাসাদ ও বুদ্ধদেবের স্মৃতিজড়িত কয়েকটি প্রাসাদ ও নগরী দেখেছিলেন। হিউ-এন্‌-ৎসাঙও এই জরাজীর্ণ প্রাসাদ ও নগরী দেখেছিলেন। এখানকার বৌদ্ধদের অবস্থা তখন চরম শোচনীয়।

কিন্তু কপিলাবস্তু জায়গাটি ঠিক কোথায় আজও নিশ্চিত হওয়া যায় নি। বেশির ভাগ মতে কপিলাবস্তু হিমালয়ের দক্ষিণ পাদদেশে এবং কোশল রাজ্যের অন্তর্গত, এবং এই কপিলাবস্তু একটি নদীর কাছে একটি হ্রদের তীরে অবস্থিত। নদীটির নাম একটি মতে ভাগীরথী আর একটি মতে রোহিণী। লুম্বিনীর অপর নাম রুম্মিনদেই (জেলা ভৈরহাওয়া, নেপালী তরাই), কপিলাবস্তু থেকে ১০ মাইল পূর্বে; ভগবানপুর থেকে ২ মাইল উত্তরে এবং পাদেরিয়া থেকে ১ মাইল উত্তরে। লুম্বিনীতে অশোকের শিলালিপিতে উল্লেখ আছে এটি বুদ্ধদেবের জন্মস্থান। এই লেখে লুম্বিনী নাম ও মায়াদেবীর মন্দিরের উল্লেখ আছে। রুম্মিনদেই-এর উত্তর-পশ্চিমে ২৪ কি-মি দূরে তিলৌরাকোট (জেলা তৌলি-হাওয়া, নেপালী তরাই) এবং রুম্মিনদেই-এর ১৪ কি-মি পশ্চিমে ভারত নেপাল সীমান্তে পিপ্‌রাওয়া (জেলা বস্তি, উত্তরপ্রদেশ) এই দুটি জায়গার একটি কপিলাবস্তু হতে পারে। তিলৌরাকোটে অবশ্য বৌদ্ধযুগের কোন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া যায় নি, মৌর্যযুগের প্রচুর নিদর্শন পাওয়া গেছে। ফা-হিয়েন অনুসারে পিপরাওয়াই কপিলবস্তু এবং এখানে প্রচুর বৌদ্ধ যুগীয় ধ্বংসাবশেষ ও পাশেই গানওয়ারি গ্রামে মৌর্যযুগের অপর্যাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। পিপ্‌রাওয়ার বৃহত্তম স্তূপটির কেন্দ্রস্থানে খননের ফলে পাঁচটি মঞ্জুষা পাওয়া গেছে এবং এদের একটির গায়ে বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ গচ্ছিত রাখার কথা উল্লিখিত রয়েছে। তবু পিপ্‌রাওয়াই-যে কপিলাবস্তু এ কথা এখনও নিশ্চিত নয়।

বস্তি জেলাতে উ-পশ্চিম অংশে এবং ফয়জাবাদ থেকে ২৫ মাইল উ-পূর্বে 'ভুইল'। ঘর্ঘরা ও গণ্ডক সংগম থেকে ফয়জাবাদের মধ্যগত এলাকা। অন্য মতে এটি নগরখাস, চণ্ডতালের পূর্বতীরে। অযোধ্যার উত্তর অংশে; ঘর্ঘরা থেকে অনেকটা। একটি মতে লুম্বিনী হচ্ছে মোক্ষ। মতান্তরে কপিলাবস্তু হচ্ছে নেপালী তরাইতে উত্তর গোরখপুরে নিগালিভা নামে নেপালী গ্রামের পাশে, উসকা স্টেসন থেকে ৩৮ মাইল উ-পশ্চিমে। আর এক মতে লুম্বিনী হচ্ছে পাদেরিয়া গ্রাম; ভগবানপুরের ২-মাইল উত্তরে। কপিলাবস্তু থেকে কোলি যাবার পথে লুম্বিনী গ্রামে শাল গাছের নীচে বুদ্ধদেব জন্মান। খৃ-পূ ৫৫৭ জন্ম; খৃ-পূ ৪৭৭ মৃত্যু; আর এক হিসাবে খৃ-পূ ৬২৩-৫৪৩। একটি মতে পাদেরিয়ার উ-পশ্চিমে কপিলাবস্তুর ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। আর এক মতে কপিলাবস্তু=তিলৌরা; তৌলিভার ২ মাইল উত্তরে এবং নিগলিভার ৩·৫ মাইল দ-পশ্চিমে। কপিলাবস্তু সহর অর্থে বর্তমানের চিত্রদেই, রামঘাট, সন্দয়া ও তিলৌরা মিলে। তিলৌরাতে দুর্গ ও রাজবাড়ি ছিল। বাণগঙ্গার পূর্ব উপকূলে অবস্থিত। একটি মতে বাণগঙ্গা=ভাগীরথী। দ্রঃ-তিলৌরা, পিপরাওয়া।

কপিলাশ্রম—(১) কপিলা (দ্রঃ)। গঙ্গার মুখে (বৃহৎধর্ম) সাগরসঙ্গমে (দ্রঃ)। এখানে একটি ছোট দ্বীপের দ-পূর্ব কোণে কপিল মুনির আশ্রম রয়েছে । (৩) সিদ্ধপুর। দ্রঃ-কাম্বিসন।

কপিসা—(১) কুষাণ ; ওপিয়ানের ১০ মাইল পশ্চিমে। হিন্দুকুশের ঢালু গায়ে। অর্থাৎ কাবুল নদীর উত্তরে। চীনেরা বলেছেন কিপিন। মতান্তরে কোহিস্তানের উ-সীমানাতে পঞ্জশির ও টাগো/তাগাও উপত্যকা মিলে প্রাচীন কপিসা জেলা। কপিসী (পাণিনি); টলেমি বলেছেন কাবুল (কাবুর) থেকে ২·৫ ডিগ্রি উত্তরে। আর এক মতে উত্তর আফগানে অর্থাৎ কাবুল নদীর উত্তরে। এক সময় গান্ধারের রাজধানী ছিল। (২) উড়িষ্যাতে সুবর্ণ রেখা (দ্রঃ) নদী। (৩) মেদিনীপুরে কাঁসাই নদী। একটি মতে এই কাঁসাই ও কংসাবতী দুটি আলাদা নদী ; মহাভারতে এটি কোসা যেন। কোশ।

কপোত—গরুড়ের একটি ছেলে। দ্রঃ-তারাবতী।

কবচী—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে, ভীমের হাতে নিহত।

কবন্ধ—বুকে একটি মাত্র চোখ, উদরে মুখ, যোজন আয়ত হাত। জটায়ুর শেষকৃত্য করে সীতার খোঁজে ক্রৌঞ্চারণ্যে মতঙ্গ আশ্রমের কাছে হাত বাড়িয়ে এক ক্রোশ দূর থেকেই রামলক্ষ্মণকে ধরে ফেলে এঁদের পরিচয় চায় (রা ৩।৬৯।৪৪)। এঁরা কবন্ধের হাত কাটতে যান ফলে কবন্ধ খেয়ে ফেলতে চেষ্টা করে। ইতিমধ্যে রাম ডান ও লক্ষ্মণ বাম হাত কেটে দেন। কবন্ধ আবার পরিচয় চায় এবং পরিচয় পেয়ে কৃতজ্ঞতায় নিজের পরিচয় দেয়, অগ্নিসংকার করতে অনুরোধ করে।

কবন্ধ দনুর পুত্র (রা ৩।৭১।৭), অত্যন্ত রূপবান ; কিন্তু ভীষণ রূপ ধারণ করে ঋষিদের ভয় দেখাত। এক দিন স্থূলশিরাকে ভয় দেখালে অভিশপ্ত হতে হয় এই রূপই ধরে থাকতে হবে। তখন অনুনয় করে এবং ঋষি বলেন রাম হাত দুটি (রা ৩।৭১।৬) কেটে বনের মধ্যে অগ্নিসংকার করলে মুক্তি পাবে। রাম অবশ্য একটি হাত কেটেছিলেন। এরপর উগ্র তপস্যা করে দীর্ঘায়ু পেয়ে দর্পে ইন্দ্রকে আক্রমণ করলে বজ্রাঘাতে সক্‌থিনী ও মাথা শরীরের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল। ইন্দ্রের কাছে তখন মৃত্যু চায় ; কিন্তু দীর্ঘায়ু কবন্ধকে মৃত্যু না দিয়ে কবন্ধের অনুরোধে বাঁচবার উপায় করে দেন। এই উপায় যোজন বাহু, কুক্ষিতে মুখ ও তীক্ষ্ণদংষ্ট্রা। সেই থেকে হাত বাড়িয়ে সিংহ ব্যাঘ্র ইত্যাদি ধরে খেত। ইন্দ্রও বলেছিলেন রাম হাত কাটলে (রা ৩।৭১।১৬) ইত্যাদি। সেই থেকে কবন্ধ রামের প্রতীক্ষা করে এসেছে। রাম নিজের কাহিনী জানালে কবন্ধ বলে অগ্নিসংকার করলে দিব্যজ্ঞান আসবে, তখন নিশ্চয়ই কিছু পরামর্শ দিতে পারবে (রা ৩।৭১।২০)। সূর্য অস্ত যাবার আগে সংকার করতে অনুরোধ করে এবং বলে রাবণকে যে জানে এ রকম এক ভাবী বন্ধুর নাম সে বলে দিতে পারবে ; এই ভাবী বন্ধু কোন এক কারণে এক সময় সর্বলোক পরিভ্রমণ করেছিল। এঁরা জীবন্ত কবন্ধকে অগ্নিসাৎ করলে দিব্যবেশভুষা কবন্ধ আকাশে উঠে গিয়ে পম্পাতীরে চার জন বানরের সঙ্গে অবস্থিত (রা ৩।৭২।১২) সুগ্রীবের সঙ্গে মিত্রতা করতে বলে। রামকে বলে

দশা ভাগেন হীনঃ স্বম্; কালঃ হি দুরতিক্রমঃ। আগুন জ্বেলে মিত্রতা করতে বলো এবং ঋষ্যমূকের (দ্রঃ) পথ ও শবরী (দ্রঃ), ও মতঙ্গ আশ্রমের কথা বলে দিয়ে স্বর্গে চলে যায়। মতান্তরে হংসযুক্ত রথে পুণ্যলোকে যায়।

মহাভারতে (৩।২৬৩।৩৮) নাম বিশ্বাবসু। এক জন গন্ধর্ব, কবন্ধ হয়েছিল। আর এক মতে গন্ধর্বরাজ শ্রীর ছেলে নাম দনু/বিশ্বাবসু।

বাস্তুর দেবতা বলে স্বীকৃত। অমরাবতী ও গান্ধার শিল্পে একে পাওয়া যায়। পেটেতে একটি মুখ; মূল মুখ ও পা অবিকল; রামায়ণের মত দশা নয়।

কবন্ধ—সরিককূল দেশ; রাজধানী তসকুরঘন; তগদুম্বুস পামিরে। কিয়ে/কেই-পান-টো (হিউ-এন-ৎসাঙ)। ভারতের উ-পশ্চিমে পাহাড়ি দেশ বলে বর্ণিত। অপর নাম কনুপথ।

কবরী—দ্রঃ-কেশবিন্যাস।

কবি—(১) বিবস্বানের নাতি। বৈবস্বত মনুর এক ছেলে। (২) বৃহস্পতির ৫-ম পুত্র; ইনি এক জন অগ্নি। সমুদ্রে বড়বাগ্নি রূপে অবস্থিত। অপর নাম উর্দ্ধভাক্। (ম ৩।২০৯।২০)। (৩) ব্রহ্মার যজ্ঞে কবি, ভৃগু ও অঙ্গিরস উৎপন্ন হয়। এই কবিকে ব্রহ্মা নিজের ছেলে বলে গ্রহণ করেন। কবির আট ছেলেঃ—কবি, কাব্য, বিষ্ণু, উশনা, ভৃগু, বিরজা, কাশী ও উগ্র (মহা ১৩।৮৫।৮১); এরা সকলে বরুণ নামে পরিচিত।

কবীর—সাধক কবি; কাশীতে জন্ম, আনুমানিক ১৪৪০-১৫১৮ খৃঃ। কাহিনী অনুসারে এক ব্রাহ্মণ বিধবার মাতৃপরিত্যক্ত শিশু; নিরু নামে এক মুসলমান জোলার ঘরে প্রতিপালিত। শৈশবেই ধর্মসাধনা ও সাধুসেবায় আগ্রহ দেখা দেয়। বালক বয়স থেকে লোককে নানা উপদেশ দিতেন এবং বালকের কোন গুরু ছিল না বলে নিগুরা ও গুরু-হীন বলে উপহাসের পাত্র হয়েছিলেন। পরে কবীর রামানন্দের শিষ্য হন এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেন। কবীরের জীবনে লোঈ নামে একটি মহিলা ছিলেন। এক মতে ইনি কবীরের শিষ্যা আর এক মতে স্ত্রী এবং লোঈ-এর গর্ভে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে হয়েছিল। কবীব লেখাপড়া জানতেন না। সুফি, যোগী ও বৈদান্তিকদের কাছ থেকে আহৃত জ্ঞান এবং নিজের উপলব্ধি ও স্বভাবকবিত্ব মিলে কবীরের সাধক-মূর্তি গড়ে উঠেছিল। তাঁর ভক্তি ও রামনাম কীর্তনে হিন্দুমুসলমান সকলেই তাঁর শিষ্য হতে থাকেন। কবীব হিন্দুমুসলমানের ধর্মীয় মিলন করতে চেয়েছিলেন। ফলে বহু লোকের অপ্রীতিভাজন হতে হয়েছিল। কিন্তু তবু হিন্দি জনসমাজের ওপর কবীরের প্রভাব তুলসীদাসের পরই। অদ্বৈতবাদ, ও ইসলামের একেশ্বরবাদ এবং সম্প্রদায়হীনতা মিলিয়ে ভক্তিপন্থ নামে ধর্মমত গড়ে তোলেন। কবীর রামানন্দস্বামীর বার জন শিষ্যের এক জন এবং বৈষ্ণবদের প্রতি আকর্ষণ বেশি ছিল। কিন্তু উপাসনা ও ক্রিয়াকলাপের দিক থেকে বৈষ্ণব বা কোন হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রভাব স্বীকার করতেন না। কবীরপন্থী গৃহস্থরা নিজেদের জাতীয় ও বর্ণোচিত আচার অনুষ্ঠান করেন; সন্ন্যাসীরা কবীরের ভজনা এবং ধর্মসংগীত গান করেন। এ'র প্রভাবে উত্তর

ভারতে সন্তকাব্য নামে একটি সাহিত্য শাখা গড়ে উঠেছিল এবং কবীরের সময় থেকে প্রায় উনবিংশ শতক পর্যন্ত এই সাহিত্য চালু ছিল। এই সাহিত্যে ভক্তিপন্থ্-এর মতবাদ বিবৃত হয়েছে। সন্ত কবিদের মধ্যে রৈদাস, নানক, ধরমদাস, দাদু, রজ্জব ইত্যাদি নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা সকলেই প্রায় নিরক্ষর ছিলেন। শিক্ষিত উচ্চশ্রেণীকে বাদ দিয়ে সাধারণ লোকের ওপর এঁদের প্রভাব অপরিসীম হয়ে উঠেছিল। পরে জাতিভেদ দেখা দিয়েছে। কবীরপন্থী হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোন সংস্রব নেই। মুসলমানদের প্রধান কেন্দ্র মগ্হর। হিন্দুদের দুটি দল; এক দলের প্রধান কেন্দ্র বারাণসী আর এক দলের ছত্তিশগড়। নিম্ন বর্ণ হিন্দুদের অস্পৃশ্য ধরা হয়। ব্রাহ্মণরা উপবীত নেন; ব্রাহ্মণ ভিন্ন কেউ জপমালা নিতে পারেন না। কবীর পন্থীদের সন্ন্যাসাশ্রমে যোগ দেবার জন্য উৎসাহিত করা হয়। দু বছর শিক্ষানবিশির পর মেয়েরাও সন্ন্যাস গ্রহণ করতে পারেন।

কবীরের নিজস্ব ধরণের একটা যোগ সাধনা ছিল যেন। ইড়া, পিঙ্গলা, গঙ্গা, যমুনা, ত্রিবেণী ইত্যাদি বহু শব্দ কবীর ব্যবহার করেছেন। দ্রঃ-নারী।

কবীরপন্থ—নাথপন্থ ও কবীরপন্থীদের মধ্যে যোগ সাধনার মিল রয়েছে। এঁরা সকলেই নারী জাতিকে চরম ঘৃণা করতেন। ফলে নাথপন্থ ও কবীরপন্থ যেন যুক্ত ছিল মনে হয়। কবীরের সঙ্গে গোরক্ষনাথের যেন দেখা ও ধর্ম আলোচনা ইত্যাদি হয়েছিল।

কমলযোনি—প্রলয়ের পর ত্রিজগৎ তমোময় ও জলময় ছিল; এবং দেবতা, ঋষি, স্থাবর জঙ্গম কিছুই ছিল না। একমাত্র বিষ্ণু নারায়ণ রূপে যোগনিদ্রায় অভিভূত হয়ে শেষ নাগের কোলে শুয়ে ছিলেন। এই সময়ে তাঁর হাজার মাথা, হাজার চোখ, হাজার পা ও হাজার বাহু ছিল। এর পর তাঁর নাভি থেকে শত শত যোজন বিস্তীর্ণ এক পদ্ম ফুটে ওঠে এবং এই পদ্মে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা (=কমলযোনি) উৎপন্ন হন।

কমলা—দ্রঃ-লক্ষ্মী। প্রহ্লাদের মা কয়াধুর অপর নাম।

কমলাকর ভট্ট—বিখ্যাত নির্ণয়-সিন্ধু (১৬১২ খৃ) গ্রন্থের রচয়িতা। এই গ্রন্থে বিভিন্ন ধর্মকৃত্যের ব্যবস্থা আছে। মীমাংসা দর্শন অলঙ্কার ইত্যাদির ওপরও এঁর গ্রন্থ আছে। সব সমেত গ্রন্থের সংখ্যা কুড়ির বেশি। এঁর প্রপিতামহ নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত রামেশ্বর ভট্ট দাক্ষিণাত্য থেকে কাশীতে এসে বাস করতে থাকেন। এঁর পিতামহ নারায়ণ ভট্ট সম্রাট আকবরের কাছে জগৎ-গুরু উপাধি লাভ করেছিলেন। এঁর পিতৃব্যপুত্র নীলকণ্ঠ ভট্ট ভগবন্ত-ভাস্কর নামে বিরাট গ্রন্থের রচয়িতা। এঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বিশ্বেশ্বর ভট্ট (=গাগাভট্ট) শূদ্র রূপে পরিচিত শিবাজির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপন্ন করে তাঁর রাজ্যাভিষেকে পৌরোহিত্য করেছিলেন।

কমলাক্ষ—তারকাসুরের একটি ছেলে।

কমলাঙ্ক—কুমিল্লা, কমলিঙ্গ, কোমলা। খৃ ৬-শতকে ত্রিপুরার রাজধানী। বায়ু পুরাণে কোমলা যেন। কিয়-মো-লো-ঙ্কিয়া (হিউ-এন-ৎসাঙ)।

কমলেকামিনী—বৃহৎ ধর্মপুরাণে আছে।

কম্বোজ—বা কম্বুজ। ভারতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত; গান্ধারের সঙ্গে এর

উল্লেখ দেখা যায়। গান্ধারের পাশেই ছিল মনে হয়। মহাভারতে আছে রাজপুরে গিয়ে কর্ণ কাম্বোজদের পরাজিত করেছিলেন। হিউ-এন-ৎসাঙ বলেছেন কাশ্মীরের দক্ষিণে রাজপুর রাজ্য ; এবং অসভ্য জাতির বাস। সম্ভবত ম্লেচ্ছ সংস্পর্শে সংস্কৃতির অবনতি ঘটেছিল। মনে হয় বর্তমানের রাজাওরি এই রাজপুর। মজ্‌ঝিমনিকায়েতে কম্বোজ দেশে আর্য সংস্কৃতির উল্লেখ আছে। যাস্কের সময় কম্বোজের ভাষা অনার্য ভাষা বলে পরিচিত ছিল। ভূরিদত্ত জাতকে এখানকার ধর্ম ও সংস্কৃতিকে অনার্যরূপ বলা হয়েছে। মহাভারতে চন্দ্রবর্মা ও সুদক্ষিণ কম্বোজের এই দুই রাজার উল্লেখ আছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে কম্বোজদের 'বার্তাশস্ত্রোপজীবী সংঘ' বলা হয়েছে ; এদের রাজা ছিল ; গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং অস্ত্রশস্ত্র (=যুদ্ধ ব্যবসায়) ও বার্তা (=কৃষি পশুপালন ও বাণিজ্য) এদের জীবিকা ছিল। এখানকার ঘোড়া প্রসিদ্ধ ছিল।

কম্বোজ—বা কম্বুজ, দক্ষিণপূর্ব এসিয়াতে ইন্দোচীনে। বর্তমানে নাম কাম্বোডিয়া। খৃস্টীয় প্রথম শতকে বা আরো কিছু আগে এখানে ভারতীয় উপনিবেশ (= ছোট ছোট রাজ্য) ভাষা, ধর্ম ও সামাজিক ব্যবস্থা ছড়িয়ে পড়েছিল। চীনা গ্রন্থে বিবরণ পাওয়া যায় কৌণ্ডিণ্য নামে এক ভারতীয় ব্রাহ্মণ এখানে এসে দক্ষিণ ভাগে এক রাজ্য স্থাপন করেন। এখানকার লোকেরা তখন অসভ্য ছিল ও উলঙ্গ থাকত। ক্রমে হিন্দু সভ্যতা ছড়িয়ে পড়েছিল। ষষ্ঠ শতকে উত্তর অঞ্চলের (অর্থাৎ কম্বোজের) রাজা এই অংশ জয় করে নেন এবং সবটাই কম্বোজ নামে অভিহিত হতে থাকে। কম্বোজে অনেক পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। যশোবর্মা, ইন্দ্রবর্মা, জয়বর্মা ইত্যাদি রাজারা অনেক দেশ জয় করেছিলেন। চীন ও ব্রহ্মসীমান্ত এবং পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত রাজ্য ছড়িয়ে পড়েছিল। চম্পা ও আনাম ও (=ভিয়েৎনাম) কিছু দিন এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। শৈবধর্মই এখানে প্রাধান্য পেয়েছিল। বৈষ্ণব তান্ত্রিক ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবও কম ছিল না। ব্যাপক সংস্কৃত অনুশীলন হত। ষষ্ঠ ও দ্বাদশ শতকের প্রায় দু'শ শিলালিপি পাওয়া গেছে ; এগুলি অধিকাংশই সংস্কৃত ভাষাতে। এখানে বহু মন্দির হয়েছিল। আঙ্কর-ভাট এখানের বিখ্যাত মন্দির। রাজধানী আঙ্কর-টোম। চোদ্দ শতকের পর আনাম ও থাই জাতির আক্রমণে দুর্বল হয়ে পড়ে। এখন স্বাধীন রাজ্য ; ধর্ম বৌদ্ধ।

কয়াধু—অন্য নাম কমলা। হিরণ্যকশিপুর স্ত্রী ; জম্ভাসুরের মেয়ে। কয়াধুর চার ছেলে হ্লাদ, অনুহ্লাদ, সংহ্লাদ, ও সবচেয়ে ছোট প্রহ্লাদ।

কররুল্ল—সিন্ধে করাচি। ক্রোকল (মেগাস্থি)।

করতোয়া—কুরতী, সদানীরা। রঙপুর, দিনাজপুর ও বগুড়া হয়ে প্রবাহিত। মহাভারতে বাংলা ও কামরূপ সীমানা। প্রাচীন পুণ্ড্র দেশে অবস্থিত। পার্বতীর সঙ্গে বিয়ের সময় শিবের হাত ঘামতে থাকে। সেই ঘামে এই নদী। (২) গন্ধমাদন পর্বতের কাছে একটি নদী।

করন্ধম—দ্রঃ-সুবর্জা, মরুত্ত।

করবীর—(১) একটি সাপ। (২) গোমন্ত পর্বতের পাদদেশে একটি দেশ ; এখানে রাজা ছিলেন শৃগাল-বাসুদেব। পরশুরামের নির্দেশে কৃষ্ণবলরাম একে নিহত করেন।

করবীরপুর—পদ্মাবতী (দ্রঃ), কোলহাপুর, করবীর (দ্রঃ); বোম্বে প্রদেশে। স্থানীয় নাম কারবীর বা কোলাপুর। কৃষ্ণ এখানে পরশুরামের সঙ্গে দেখা করেন এবং রাজা শৃগালবাসুদেবকে হত্যা করেন। কৃষ্ণার শাখা বেণ্বা নদীর তীরে মহালক্ষ্মীর মন্দির রয়েছে। ১১ খৃ-শতকে শিলহার রাজারা এখানে রাজত্ব করতেন। (২) অগস্ত্য আশ্রম যেন; অবশ্য নাসিকের তীরে আকোলা হচ্ছে অগস্ত্য আশ্রম (৩) দৃষদ্বতী তীরে ব্রহ্মাবর্তের রাজধানী।

করবীরাক্ষ—খর দূষণের সঙ্গী এক রাক্ষস; রামের হাতে নিহত।

করভাজন—ঋষভ দেবের নয় জন ছেলের মধ্যে একটি। একজন যোগী; বিদেহ রাজের যজ্ঞে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের দিব্য জ্ঞান দান করেন।

করভি—শকুনির একটি ছেলে।

করমণ্ডল—>কোরমণ্ডল>চোরমণ্ডল। চোল; দ্রাবিড়। কাবেরী ও কৃষ্ণার মধ্যে মলকূট। রাজধানী কাঞ্চিপুর।

করম্ভ—রম্ভের ভাই। মহিষাসুরের কাকা।

করম্ভা—করণ্ডু। কলিঙ্গ রাজার কন্যা। পুরুবংশে রাজা অক্রোধের স্ত্রী, দেবাতিথির মা।

করূষ—(১) একটি দেশ ও জাতি। পাণিনি ও মৎস্য পুরাণ মতে দ-ভারতে একটি জনপদ। ভাগবত ও কৌটিল্য মতে দ-পূ ভারতে। ভাগবতে (৯।২) করূষ মনুপুত্র। এদের সন্তান কারূষ ক্ষত্রিয় জাতি। উত্তরাপথের রক্ষক। কৌটিল্য অনুসারে এখানে ভাল হাতী মিলত। বৃত্রহত্যার পাপ ইন্দ্রের (দ্রঃ) গা থেকে এইখানে ধুয়ে ফেলে দেওয়া হয়; এই জন্য নাম। এখানে তাড়কা (দ্রঃ) থাকত। (২) কারূষ। দন্তবক্রের রাজ্য= অধিরাজ, রেওয়া, বহেল, বঘেলখণ্ড; সহদেব জয় করেছিলেন। মহাভারতে নাম মৎস্য ও ভোজ। পুরাণে বিন্ধ্য পর্বতমালার পিছনে। অন্য মতে কাশী ও বৎস দেশের দক্ষিণে; পশ্চিমে চেদি পূর্বে মগধ। কৈমুর পর্বত মোটামুটি করূষ দেশের অন্তর্গত। মোটামুটি রেওয়া রাজ্য। (৪) বিহারে সাহাবাদ জেলার দক্ষিণ অংশ; দীনেশচন্দ্র সরকার বলেছেন শোণ ও কর্মনাশা নদীর মাঝখানে। বেদগর্ভপুরী=বক্সার এই করূষ দেশে। (৫) পুণ্ড্র দেশের অপর নাম।

কর্কোটক—মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে কদ্রুর এক হাজার ছেলের মধ্যে প্রধান এক জন। এক বার নারদকে বঞ্চনা করলে নারদের শাপে বনের মধ্যে গতিশক্তিহীন হয়ে আগুনে পুড়তে থাকেন। কথা ছিল যদি কোন দিন নল রাজা এসে বাঁচান তবেই মুক্তি পাবেন। নল (দ্রঃ) রাজা এর আর্ত চিৎকারে কাছে এগিয়ে এলে নলকে আশ্বাস দেয় তার সখা হবে (মহা ৩।৬৬।৭) এবং কর্কোটক নিজেকে অঙ্গুষ্ঠ মত ছোট করে নেন যাতে সহজেই তুলে নিয়ে যাওয়া যায়।

কর্কোটক নগর—কর, করুর। এলাহাবাদ থেকে ৪১ মাইল উ-পশ্চিমে। একটি পীঠস্থান; সতীর হাত পড়েছিল। (২) হয়তো আরাকান; তাম্রলিপ্তের বিপরীত দিকে সমুদ্রপারে।

কর্ণ—পৈল(১)>সুতপা(২)>বলি(৩)>অঙ্গ(৪)>লোমপাদ(১০)>ভদ্ররথ(১৫)>

বৃহৎরথ (২০)>বিশ্বজিৎ(২১)>কর্ণ (২২)। দ্রঃ-অঙ্গ, অধিরথ। স্ত্রী পদ্মাবতী, ছেলে কৃষ্ণসেন, চিত্রসেন, বৃষকেতু ইত্যাদি। সত্যসেন, সুষেণ ইত্যাদি ছেলের নামও পাওয়া যায়। কুন্তীর (দ্রঃ) কানীন পুত্র। কর্ণ থেকে জন্ম বলে নাম কর্ণ। সহজাত কবচ ও কুণ্ডল (দ্রঃ-কুন্তী) ধারণ করে শ্রিয়াবৃতঃ হয়ে জন্ম। শিশুর জন্মের পর সূর্য কুন্তীকে আবার কন্যাত্ব দিয়ে আকাশে উঠে যান (মহা ১।১০৪।১২)। সন্তান হলে কলঙ্কের ভয়ে কাঠের বাক্স করে অশ্ব নদীতে ভাসিয়ে দেন। কুন্তীর পালিকা মাতা (ধাত্রী) ছাড়া ঘটনাটি কেউ জানতেন না। এই পাত্র ভাসতে ভাসতে অশ্বনদী থেকে যমুনা ও গঙ্গা হয়ে চম্পাপুরীতে আসে। বসু (=সুবর্ণ) নির্মিত কবচ ধারণ করে জন্ম বলে নাম বসুষেণ। মহাভারতে (১।১০৪।১৫) বসুনা সহজাত বলে নাম বসুষেণ। সূত অধিরথ তখন চম্পাপুরীর রাজা, স্ত্রী রাধা। গঙ্গায় ভেসে যাওয়া শিশুকে এনে নিঃসন্তান স্ত্রীকে দান করেন। মহাভারতে (৩।২৯৩।৩) আছে রাধা জলেতে মঞ্জুষা দেখতে পেয়েছিলেন প্রথমে। এরপর রাধার (দ্রঃ) আরো অনেকগুলি সন্তান হয়েছিল। কুন্তী চর মুখে সমস্ত খবর পান। শিশু-কাল থেকে ধার্মিক, সত্যবাদী, বীর ও অসাধারণ দানশীল। বেদাদিতে সুপণ্ডিত ও সূর্যের উপাসক ছিলেন। প্রতি দিন সূর্যের উপাসনা করতেন এবং এই সময়ে কোন ব্রাহ্মণ এসে কিছু ভিক্ষা চাইলে যা চাইত তাই দিতেন (মহা ১।১০৪।২১)। ইন্দ্র এই সুযোগ নিয়েছিলেন, দ্রঃ-পৃ ২৯৬। শিক্ষার সময় অধিরথ হস্তিনাপুরে পাঠিয়ে দেন ; কৃপ, দ্রোণের কাছে অস্ত্র শিক্ষা লাভ করেন ; এবং দুর্যোধনের সঙ্গে পরম মিত্রতা পাশে আবদ্ধ হন। অস্ত্র শিক্ষার সময়ই কর্ণ ও অর্জুনের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। কর্ণ এমন কি দ্রোণকে গোপনে ব্রহ্মাস্ত্র শিখিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন কিন্তু দ্রোণ সূত-পুত্র বলে রাজি হন নি। এর পর মহেন্দ্র গিরিতে পরশুরামের কাছে গিয়ে ভৃগুবংশীয় বলে আত্মপরিচয় দিয়ে ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা করতে চান। পরশুরাম বিশ্বাস করে ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা দেন। এক দিন আশ্রমের কাছে একটি ব্রাহ্মণের হোমধেনু চরছিল ; কর্ণ এটিকে অসাবধানে বাণবিদ্ধ করে হত্যা করেন। ফলে ব্রাহ্মণ শাপ দেন যার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য কর্ণ অস্ত্র শিক্ষা করছেন তার সঙ্গে যুদ্ধের সময় কর্ণের রথের চাকা মাটিতে বসে যাবে ; শ্বভ্রেতে পততাম্ চক্রম্ (মহা ৮।২৯।৩১) এবং ভীষণ ভয় পেয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়বে ; ইতিমধ্যে সেই প্রতিদ্বন্দ্বী কর্ণের শিরশ্ছেদ করবেন। কর্ণ ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করেন কিন্তু সফল হন না। এর পর এক দিন পরশুরাম কর্ণের কোলে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছিলেন ; সেই সময়ে অলর্ক (দ্রঃ) নামে একটি কীট (মহা ৮।১৯।৪, কীটরূপ ইন্দ্র) কর্ণের উরুতে কামড় দিয়ে রক্ত পান করতে থাকে ও ক্রমশ ভেতরে উঠতে থাকে। অসহ্য যন্ত্রণা হতে থাকে এবং রক্ত গড়াতে থাকে কিন্তু তবু কর্ণ নিশ্চল হয়ে বসে থাকেন পাছে পরশুরামের ঘুম ভেঙে যায়। এর পর ঘুম ভাঙলে কর্ণের ধৈর্য দেখে পরশুরামের সন্দেহ হয় শিষ্য তাঁর নিশ্চয়ই কোন ক্ষত্রিয়। কর্ণ তখন সব কথা স্বীকার করেন। ফলে পরশুরাম রেগে গিয়ে শাপ দেন কার্য কালে কর্ণ এই অস্ত্র প্রয়োগ ভুলে যাবেন। কর্ণ নিত্য অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চেষ্টা করতেন।

দ্রোণের কাছে কুরুপাণ্ডব বালকদের অস্ত্র শিক্ষা শেষ হলে পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়। কর্ণ নিজেও তাঁর পারদর্শিতা দেখাতে থাকেন। জনতা কৌতূহলে লাফিয়ে ওঠে। দুর্যোধন প্রীত ও অর্জুন লজ্জিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। এরপর দ্রোণের অনুমতি পেয়ে নিজের অস্ত্রকৌশল দেখান। দুর্যোধন জড়িয়ে ধরে বল্লেন কুরুরাজ্যম্ যথেষ্টম্ উপভুজ্যতাম্ (মহা ১।১২৬।১৪)। কর্ণ তারপর অর্জুনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করতে চান। দুর্যোধন বলেন কৌরবদের যারা দুর্হৃদ তাদের মাথায় পা তুলে দিক কর্ণ। অর্জুন তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন অনাহূত হয়ে নিহত হয়ে যে গতি হয় অর্জুনের হাতে নিহত হয়ে কর্ণের যেন সেই গতি হয় (মহা ১।১২৬।১৮)। দ্রোণের অনুমতি ক্রমে দুজনে প্রস্তুত। ইন্দ্র আকাশে মেঘ এনে আকাশে ছায়া করে দেন; সূর্য মেঘ নষ্ট করে দেন। ফলে অর্জুন মেঘছায়া উপগূঢ় ও কর্ণ রৌদ্রস্নাত দেখাতে থাকেন। ধৃতরাষ্ট্র কর্ণের দিকে; ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ অর্জুনের দিকে, এমন কি নারীরাও দুভাগ হয়ে দুজনকে সমর্থন করে। কুন্তী অজ্ঞান হয়ে যান ; বিদুর সান্ত্বনা দেন। উদ্যত কার্মুক দুই বীরের মধ্যে অর্জুনের পরিচয় দিয়ে কৃপ কর্ণের পরিচয় চান; না হলে অর্জুন যুদ্ধ করবেন না। অর্জুন যদি অরাজার সঙ্গে যুদ্ধ করতে না চান এই অবস্থায় দুর্যোধন তৎক্ষণাৎ কর্ণকে অঙ্গ রাজ্যে অভিষিক্ত করে দেন। কৃতজ্ঞতায় কর্ণ কি প্রতিদান দিতে হবে জানতে চাইলে দুর্যোধন তার বন্ধুতা চান। ইতিমধ্যে স্রস্ত উত্তরীয়, সবেপথু. যষ্টিপ্রাণ সূত সামনে এসে উপস্থিত হন। পিতার সম্মানে কর্ণ অস্ত্র ত্যাগ করেন। সূতপুত্র বলে সকলে জানতে পারে। ভীম কুৎসিত গালি দিতে থাকেন। কর্ণ আকাশে সূর্যের দিকে চেয়ে দেখেন। যুদ্ধ আর হয় না। কর্ণ অঙ্গেশ্বর জেনে কুন্তী আনন্দিত হয়; দুর্যোধনের অর্জুন ভয় কেটে যায় এবং যুধিষ্ঠিরের ধারণা কর্ণের তুল্য ধনুর্ধর আর নাই (মহা ১।১২৭।২৩)। দুর্যোধনের বদান্যতা কোন দিন কর্ণ ভোলেন নি যেন।

দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে লক্ষ্যভেদ করতে গেলে দ্রৌপদী সূতপুত্রকে বিয়ে করবেন না জানান। ফলে কর্ণ আর চেষ্টা করেন নি। অর্জুন লক্ষ্যভেদ করলে উপস্থিত রাজাদের সঙ্গে যে যুদ্ধ হয় তাতে কর্ণ অর্জুনের কাছে হেরে যান। পরে হস্তিনাপুরে পাশাখেলার সময় দ্রৌপদীর সেই প্রত্যাখানের জন্য অপমান করে কর্ণ প্রতিশোধ নেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়তে কর্ণ অংশ নিয়েছিলেন। পরশুরামের কাছে থাকার সময় কলিঙ্গরাজের মেয়ের স্বয়ংবর থেকে দুর্যোধন চিত্রাঙ্গদ কন্যাকে হরণ করলে বিরোধী রাজাদের কর্ণ (মহা ১২।৪) পরাজিত করেন এবং এই উপলক্ষ্যে রাজা জরাসন্ধের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে জরাসন্ধ হেরে গিয়ে (মহা ১২।৫) সন্তুষ্ট হয়ে মালনী নগরী দান করেন। অন্য মতে জরাসন্ধকে পরাজিত করেন ; এবং মালিনী জয় করে অঙ্গরাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করে নেন ; দুর্যোধন চম্পা দান করেন। সরাসরি যুদ্ধে ভীমের কাছে একবার পরাজিত হন।

ক্রমশ দুর্যোধনের একজন প্রধান পরামর্শদাতায় পরিণত হন এবং জতুগৃহের পরামর্শদাতাদের মধ্যেও ইনি এক জন। বনবাস কালে পাণ্ডবরা যখন দ্বৈতবনে ছিলেন তখন কর্ণ ও শকুনি পরামর্শ দিয়ে দুর্যোধনকে বনে পাঠান পাণ্ডবদের বিদ্রূপ/

বিব্রত করবার জন্য। কিন্তু এর ফলে গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনের হাতে সপরিবারে দুর্যোধন বন্দী হলে কর্ণ এঁদের উদ্ধার করতে পারেন নি। পরাজিত হয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। মুক্তি পেয়ে দুর্যোধনেরা (দ্রঃ) যখন ফিরছিল তখন কর্ণ এসে যোগ দেন। এরপর কর্ণ দিকবিজয়ে বার হন এবং বলে যান রাজসূয় উপলক্ষ্যে পাণ্ডবরা যে সব দেশ জয় করেছিলেন সেগুলিকে তিনি একাই জয় করতে পারবেন। এই সময়ে কর্ণ প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেন।

দুর্যোধন যখন বৈষ্ণব যজ্ঞ করছিলেন কর্ণ সেই সময় প্রতিজ্ঞা করেন অর্জুনকে বধ না করা পর্যন্ত পা ধোবেন না (মহাভারত ৩।২৪৩।১৫)। পরে কর্ণ আসুর ব্রত গ্রহণ করে প্রতিজ্ঞা করেন অর্জুনকে না মারা পর্যন্ত এই ব্রতপালন করবেন এবং এই ব্রত কালে যে কোন প্রাণী যা চাইবেন তাই দান করবেন। এই সময়ে কর্ণের দানশীলতা পরীক্ষার জন্য ব্রাহ্মণ বেশে কৃষ্ণ এসে কর্ণের ছেলে বৃষকেতুর মাংস খেতে চান। কর্ণ অম্লান বদনে ব্রাহ্মণকে খুসি করতে চেষ্টা করেন। কৃষ্ণ তখন সন্তুষ্ট হয়ে বৃষকেতুকে বাঁচিয়ে দেন। এই আসুর ব্রতের সময় অর্জুনের মঙ্গলের জন্য ইন্দ্র ব্রাহ্মণ বেশে এসে কর্ণের সহজাত কবচ ও কুণ্ডল চেয়ে নেন। অথচ কর্ণ জানতেন এই কবচ কুণ্ডল যত দিন ধারণ করে থাকবেন তত দিন তিনি অজেয় থাকবেন। কর্ণ কেবল অনুরোধ করেছিলেন দেহ থেকে দিতে গিয়ে তাঁর যেন কোন ক্ষত না হয়। সূর্য অবশ্য আগেই ইন্দ্র (দ্রঃ) সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়েছিলেন। কিন্তু কর্ণ নিজের প্রতিজ্ঞায় অটল রইলেন। অবশ্য সূর্যের পরমর্শে অর্জুন বধের জন্য ইন্দ্রের কাছে একাঘ্নী অস্ত্র চেয়ে নিয়েছিলেন। অস্ত্র পান কিন্তু সর্ত থাকে এই অস্ত্র এক জনকে মাত্র বধ করতে পারবে। কবচ ও কুণ্ডল কেটে দেবার জন্য বীভৎস দেখতে না হয় বর চান এবং এই ভাবে কেটে দেবার জন্য (মহা ৩।২৯৪।৩৮) কর্ণের নাম হয়েছিল বৈকর্তন। কুরুক্ষেত্রে এই একাঘ্নী/বৈজয়ন্তী অস্ত্র কর্ণ ঘটোৎকচের প্রতি ব্যবহার করতে বাধ্য হন। কর্ণের ধনুক ইন্দ্রের পরিচালনায় বিশ্বকর্মা নির্মাণ করে দেন; এই ধনুর নাম বিজয় (দ্রঃ)/কাণ্ডপৃষ্ঠ।

চরিত্র হিসাবে দেখা যায় পাণ্ডবদের পাওয়া যাচ্ছে না খবর এলে আবার চর পাঠাতে বলেন; ত্রিগর্তরাজ মৎস্যরাজ্য আক্রমণ করতে চাইলে তৎক্ষণাৎ মত দেন। ভীষ্ম ইত্যাদির সঙ্গে কর্ণ পরদিন মৎস্যরাজ্য আক্রমণ করে গোধন নিতে আসেন এবং অর্জুনের হাতে দুবার পরাজিত হন (মহা ৪।৪৯, ৪।৫৫)। বিরাটের গরু-চুরির যুদ্ধে কর্ণের গা থেকে উত্তর বস্ত্র সংগ্রহ করে এনেছিল। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের আগে কৃষ্ণ গোপনে দেখা করে কর্ণের জন্মের কাহিনী বলেন এবং পাণ্ডবদের সঙ্গে জ্যেষ্ঠপুত্র হিসাবে যোগ দিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু কুন্তীর প্রতি অভিমানে, অর্জুনের প্রতি হিংসায় এবং দুর্যোধনের প্রতি কৃতজ্ঞতায় কর্ণ রাজি হন নি। বরং কৃষ্ণকে অনুরোধ করেন যুধিষ্ঠির যেন এ সব কথা জানতে না পারেন; জানলে যুধিষ্ঠির রাজা হতে চাইবেন না; কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধও হয়তো সম্ভব হবে না। কর্ণ এই সময় পাণ্ডবদের কল্যাণ কামনা করেন। বলেন দুর্যোধনকে খুসি করার জন্য পাণ্ডবদের কুবাক্য বলেন। ভবিষ্যদ্বাণী

করার মত বলেন (মহা ৫।১৩৯।৪৬-৪৯) সব্যসাচীর হাতে তাঁর মৃত্যু হবে। দুঃশাসনের রক্তপান ও দুর্যোধনের মৃত্যু হবে বলে যান। এরপর কুন্তী দেখা করেন। ভাগীরথী তীরে অপরাহ্নে জপ করছিলেন এবং এই সময় সূর্য দৈববাণী করে কর্ণকে কুন্তীর কথা রাখতে বলেন। কিন্তু কুন্তীকেও ফিরিয়ে দেন; কেবল কথা দেন অর্জুন ছাড়া যুদ্ধে কোন ভাইয়ের ক্ষতি করবেন না। কর্ণ বা অর্জুন মিলে পঞ্চপাণ্ডব ঠিকই থাকবেন (মহা ৫।১৪৪।২২)। কর্ণ যত ধার্মিকই হন কৃষ্ণ, তারপর কুন্তী এবং শেষ পর্যন্ত শরশয্যায় ভীষ্মের কাছে এই একই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এই প্রতিশ্রুতি অর্থে দুর্যোধনের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা। কর্ণ গর্বিত, নীচ. পরশুরামের কাছে অভিশপ্ত এবং কবচকুণ্ডলহীন বলে ভীষ্ম এঁকে অর্দ্ধরথ বলে গণনা করেন। ফলে কর্ণ প্রতিজ্ঞা করেন ভীষ্মের জীবিত কালে তিনি যুদ্ধ করবেন না। ভীষ্ম যখন শরশয্যায় তখন কর্ণ দেখা করতে এলে কর্ণকে তিনি ভাইদের সঙ্গে যোগ দিতে বলেছিলেন। কুরুক্ষেত্রে অভিমন্যুর হাতে পরাজিত হন, ভীমকে এক দিন হতচৈতন্য করে দেন এবং অর্জুনের কাছে এক দিন আহত হয়ে কিছুটা পিছিয়ে এসেছিলেন। সহদেবকে পরাজিত (মহা ৭।১৪২।১৫) করেন কিন্তু কুন্তীর কথা স্মরণ করে ছেড়ে দেন। জয়দ্রথ বধের আগের যুদ্ধে ভীমের হাতে বারবার পরাজিত হন। এই যুদ্ধের সময় কৃপাচার্যকে একবার অপমানিত করেন। অশ্বত্থামা ফলে কর্ণকে হত্যা করতে যান; দুর্যোধন থামান (মহা ৭।১৩৪)। নিরুপায় হয়ে ইন্দ্রের কাছে পাওয়া অস্ত্রে ঘটোৎকচকে নিহত করেন। যুদ্ধে তের দিনের দিন অন্যায় যুদ্ধে আরো ছ-জনের সঙ্গে মিলে অভিমন্যুকে বধ করেন। ষোল দিনের দিন দ্রোণ মারা গেলে খবর শুনে কর্ণ যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যান। তারপর অশ্বত্থামার প্রস্তাবে কর্ণ সেনাপতি হন। অর্জুন বাদে চার ভাইকে পরাজিত, অপদস্থ করেন কিন্তু কারো কোন ক্ষতি করেন না। ১৭-শ দিনের যুদ্ধে শল্যকে সারথি হিসাবে চান। শল্য অপমানিত বোধ করলেও দুর্যোধনের অনুরোধে সম্মত হন। শল্য এই সময় প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেন (মহা ৮।২৫।৬) কর্ণকে যা খুসি বলবেন। ফলে যুদ্ধ চলা কালীন তীব্র 'গালি' দেওয়া আরম্ভ হয়। অর্থাৎ এই ভাবে কলহ করে কর্ণের মনোবল নষ্ট করে দিতে চেষ্টা করেন। অর্জুনের হাতে একটু আগে কর্ণপুত্র বৃষসেন নিহত হয় (৮।৬২।৬০)। কর্ণের সর্পবাণে (অশ্বসেন দ্রঃ) অর্জুনের কিরীট ভূলুণ্ঠিত হয়। অর্জুনের সঙ্গে এই যুদ্ধে পরশুরাম ও ব্রাহ্মণের শাপ সফল হয়। দেবতাদের মধ্যেও বাদানুবাদ হতে থাকে কে জিতবে। কর্ণ দানব পক্ষকে সমর্থন করছেন বলে ব্রহ্মা ও রুদ্র অর্জুনকে সমর্থন করেন। যুদ্ধে রথের চাকা মাটিতে বসে যায়। কর্ণ এই চাকা মাটি থেকে বার করবার চেষ্টা করেন এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন; অর্জুন এই সময়ে কর্ণকে নিহত করেন। চিত্রসেন, সত্যসেন ও সুষেণ তিন ছেলেই নকুলের হাতে যুদ্ধে মারা যান। মৃত্যুর পর কর্ণের তেজ সূর্যে বিলীন হয়ে যায়। (২) ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে; ভীমের হাতে নিহত হন। (৩) ঘণ্টাকর্ণের ছোট ভাই।

কর্ণকি—নর্মদা তীরে একটি নগর। কর্ণিকা (বৃহৎশিব-পু); হয়তো বর্তমানের কর্ণালি; নর্মদা ও উরি নদীর সঙ্গমে। দ্রঃ- এরণ্ডী; ভদ্রকর্ণ।

কর্ণকুব্জ—জুনাগড়, কাথিওয়াড়ে ; অন্তক্ষেত্রে অবস্থিত।

কর্ণগঙ্গা—গাড়োয়ালে পেন্দার নদী। অলকানন্দার করদা।

কর্ণপুর—বর্তমানে কর্ণগড়। ভাগলপুরের থেকে ৪ মাইল। করাতিনগর (টলেমি) দ্রঃ-চম্পাপুরী। ভদ্রকর্ণ।

কর্ণসুবর্ণ—প্রাচীন বাংলার একটি মহানগর। কাণসোনা, রাঙামাটি। মুর্শিদাবাদ জেলাতে ভাগীরথীর দক্ষিণ তীরে ; বহরমপুরের ৬ মাইল দক্ষিণে বাঙলাতে। আদিশূরের রাজধানী। তাঁর অনুরোধে কনৌজরাজ বীরসিংহ পাঁচজন ব্রাহ্মণ ভট্ট নারায়ণ, দক্ষ, শ্রীহর্ষ, ছান্দড় ও বেদগর্ভকে বৈদিক যজ্ঞ করতে বাঙলাতে পাঠান। পালরাজ ধর্মপালের সভাতে ভট্ট নারায়ণ (বেণীসংহার) ছিলেন। প্রাচীন প্রাসাদ, সিংহদ্বার, টাওয়ার এখনও চেনা যায়। বৌদ্ধ বিদ্বেষী শেষ গুপ্তরাজ (খৃঃ ৭-ম শতক) শশাঙ্কের রাজধানী। হিউ-এন্-ৎসাঙ-এর বর্ণনায় এখানকার জলবায়ু, ভৌগলিক তথ্য ও এখানকার অধিবাসীদের গুণাবলী ও জ্ঞান-পিপাসার পরিচয় পাওয়া যায়। এই খানে এবং এর উপকণ্ঠে হিউ-এন-ৎসাঙ বহু বৌদ্ধ বিহার, সংঘারাম, স্তূপ ও দেবমন্দির দেখেছিলেন। এগুলির মধ্যে লো-তো-উই-চি বা লো-তো-মো-চি অর্থাৎ রক্তমৃত্তিকা মহা-বিহারটি সুবিখ্যাত ছিল। এই বিহারটির কাছেই সম্রাট অশোক নির্মিত স্তূপের উল্লেখও হিউ-এন-ৎসাঙ করেছিলেন এবং হিউ-এন-ৎসাঙের বর্ণনা থেকে জানা যায় বুদ্ধদেব এখানে সাত দিন থেকে ধর্মপ্রচার করেছিলেন

হাওড়া থেকে ১৯২-কি-মি দূরে চিরুটি রেল স্টেসনের কাছে রাজবাড়ি ডাঙা নামে একটি ঢিপি মত জায়গা খুঁড়ে এখানে রক্তমৃত্তিকা বিহারটি নিঃসন্দেহে পাওয়া গেছে। এখানে উৎখননের ফলে আনুক্রমিক ছয়টি পর্যায়ের অতি মনোরম সৌধমালা ইত্যাদি উদ্ধার হয়েছে। প্রাচীনতম পর্যায়ের সৌধমালা প্রাচীর বেষ্টনী দিয়ে সুরক্ষিত ছিল কিন্তু গঙ্গার প্লাবনে বিধ্বস্ত হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের সৌধগুলি বন্যার পলিমাটির ওপর নির্মিত। এই পর্যায়ের একটি দেওয়ালের ভিতে একটি নরমুণ্ড পাওয়া গেছে। সৌধ নির্মাণের সঙ্গে জড়িত নরবলির এটি প্রত্নতাত্ত্বিক নির্ভুল নিদর্শন। তৃতীয় পর্যায়ে একটি বৌদ্ধ বিহারের অস্তিত্ব পাওয়া যায় ; এটি হিউ-এন-ৎসাঙের সমসাময়িক অর্থাৎ সপ্তম শতকের। চতুর্থ ও পঞ্চম পর্যায়ের বেষ্টনী প্রাচীর ও এর চারকোণে সুসজ্জিত ইষ্টক নির্মিত সমকোণিক চারটি বেদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ষষ্ঠ পর্যায়ের সৌধ নিদর্শনের মধ্যে একটি গোলাকার বৃহৎ স্তূপের ভিত্তি ও চুনের পলেস্তারা দেওয়া সমকোণিক একটি বেদি পাওয়া গেছে। এইখানে লোক বসতি মুসলমান আক্রমণ কাল পর্যন্ত অর্থাৎ তের-চোদ্দ শতক পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল মনে হয়। অর্থাৎ এই চিরুটির কাছেই গঙ্গার তীরে কর্ণসুবর্ণ অবস্থিত ছিল ; গঙ্গার গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। (২) ভাগীরথীর পশ্চিমে মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান ও হুগলী মিশ্রে দেশ। একটি কাহিনী ঃ-এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ রাবণের ভাই বিভীষণকে ভোজে নিমন্ত্রণ করেন ; বিভীষণ কৃতজ্ঞতায় এখানে সোনা বর্ষণ করেন ফলে মাটি লাল হয়ে যায়। এটি যেন রূপক ; সিংহলের সঙ্গে মণিমুক্তার ব্যবসাতে মাটি লাল হয়ে উঠেছিল (কিংবদন্তী)। অন্য মতে বর্দ্ধমানের কাছে কাঞ্চননগর।

কর্ণাট—কর্ণাটক। প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যে কুন্তল নামেও পরিচিত। অশোকের সময় কর্ণাটের বিভিন্ন অংশে সত্যপুত্র ও কেরলপুত্রেরা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতেন। এর পর শাতবাহন ও গঙ্গবংশের এক শাখা এর কতকটা অংশে আধিপত্য স্থাপন করেন। পরে কুন্তল নামে এখানে একটি স্বাধীন পরাক্রান্ত রাজ্য গড়ে ওঠে। রামনাদ ও শ্রীরঙ্গপত্তমের মধ্যে দেশ। কুন্তল (দ্রঃ)। বিজয়নগর রাজ্যকে কর্ণাট এবং মহীশূরকে কর্ণাটকও বলা হয়েছে।

কর্ণিকার—টেরোস্পার্মাম এসেরিফোলিয়াম্।

কর্ণাবতী—বুন্দেলখণ্ডে কানে বা কেন বা কিয়ানা বা শ্যোনী নদী। চন্দেল রাজ্যের মাঝখান দিয়ে দক্ষিণ থেকে উত্তরে বয়ে গেছে। পশ্চিম অংশে মহোবা ও খজুরাহো এবং পূর্ব অংশে কলিঞ্জর ও অজয়গড়। তমসা, পৈশুনি ইত্যাদির উৎস এলাকা থেকে উৎপন্ন। দ্রঃ-শুক্তিমতী। (২) গুজরাটে আমেদাবাদ ; অনহিলপত্তনের সোলাঙ্কি রাজা কর্ণদেব নির্মিত। অপর নাম শ্রীনগর। জৈনদের রাজনগর।

কর্দম—ব্রহ্মার ছেলে ; একজন প্রজাপতি। ব্রহ্মা সৃষ্টি করতে বললে সরস্বতী নদীর তীরে অন্য মতে বিন্দু সরোবরে দশ হাজার বছর হরির তপস্যা করেন এবং হরি দেখা দিলে উপযুক্ত স্ত্রী পাবার জন্য বর চান। বিষ্ণু বলে যান আগামী পরশু (ভাগ ৩।২১-) মনু আসবেন এবং কর্দমের নয় মেয়ে ও বিষ্ণুর অংশ যুক্ত এক ছেলে (কপিল দ্রঃ) হবে। পৃথিবী পরিক্রমা করে মনু আসেন ; জানান দেবহূতি (দ্রঃ) নারদের কথায় কর্দমকে বরণ করেছ ইত্যাদি। কর্দম সাধ্বী পতিব্রতা দেবহূতিকে বিয়ে করেন ; এবং সন্তুষ্ট হয়ে স্ত্রীকে একটি বিমান দান করেন এবং দুজনে মিলে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াতে থাকেন। কলা, অরুন্ধতী ইত্যাদি নয়টি মেয়ে হবার পর কর্দম যোগাভ্যাসের জন্য বনে যাবার সঙ্কল্প করেছিলেন। স্ত্রী তখন বিচলিত হয়ে পড়েন এবং কর্দম আশ্বাস দেন হরির মতই এক ছেলে হবে। এই ছেলে কপিলমুনি। কপিলের (দ্রঃ) জন্মের পর মরীচি ইত্যাদির সঙ্গে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে কর্দম সংসার ত্যাগ করেন এবং সমাধিতে ইচ্ছা মৃত্যু বরণ করেন। (২) পুলহের ঔরসে ক্ষমার গর্ভে জন্ম। প্রথমে অঙ্গিরার মেয়ে সিনীবালীকে বিয়ে করেন। পরে সিনীবালী চাঁদকে দেখে মুগ্ধ হয়ে স্বামীকে ত্যাগ করলে কর্দম অত্রির মেয়ে শ্রুতিকে বিয়ে করেন। শ্রুতির ছেলে শঙ্খপাদ ও মেয়ে কাম্যা। একটি মতে পুলহের ছেলে কর্দমের স্ত্রী দেবহূতি। কর্দম প্রজাপতির ঔরসে স্ত্রী প্রিয়ব্রতের গর্ভে ছেলে হয় সম্রাট, কুক্ষি ও বিরাট।

কর্দম আশ্রম—সিতপুর, সিধপুর, সিদ্ধপুর। গুজরাটে। কপিলেরও এখানে জন্ম। বিন্দু সরোবরের নীচে এই আশ্রম। বিষ্ণুর চোখের জলে সৃষ্ট এই সরোবর। বরোদা রাজ্যে কদি জেলাতে সরস্বতীর উত্তর তীরে নগরটি ; আহমেদাবাদ থেকে ৬৪ মাইল উত্তরে।

কর্ম—বৈশেষিক দর্শনে স্বীকৃত একটি পদার্থ (= ক্যাটিগরি)। সাধারণে পরিচিত ক্রিয়াই দর্শনের কর্ম। কণাদের মতে ক্রিয়া বা কর্ম একটি পৃথক এবং অন্য নিরপেক্ষ পদার্থ। একটি সক্রিয় বস্তুর স্থানিক গতি পরিবর্তন পরপর তিনটি ক্ষণের ওপর নির্ভরশীল তিনটি পৃথক ঘটনার সমন্বয়। অর্থাৎ ক্রিয়া এই তিনটি ঘটনার সমন্বয়। (১) প্রথম ক্ষণে

বস্তুটি কোন একটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে বিভক্ত বা পৃথককৃত হয় ; (২) দ্বিতীয় ক্ষণে পূর্ব সংযোগ নষ্ট হয় ; (৩) তৃতীয় ক্ষণে উত্তর সংযোগের উৎপত্তি অর্থাৎ অন্য স্থানিক অবস্থার সঙ্গে সংযোগের উৎপত্তি। এইভাবে তিনটি ক্ষণ গত তিনটি পৃথক ঘটনার সমন্বয়ে একটি ক্রিয়া। তিনটির যে কোন একটিকে বাদ দিলে ক্রিয়া সম্ভব নয় ; এবং এই তিনটি ঘটনার পর মুহূর্তে ক্রিয়ার অস্তিত্ব লোপ হয়। এই তিনটি ঘটনার সঙ্গে ক্রিয়াটির উৎপত্তিক্ষণ ও বিনাশক্ষণকে হিসাবের মধ্য নিলে একটি ক্রিয়া পাঁচটি ক্ষণব্যাপী পদার্থ।

কর্মনাশা—একটি নদী ; সাহাবাদ জেলার পশ্চিম সীমা। বিহার ও যুক্তপ্রদেশের মধ্যে সীমানা। সরোদক গ্রামে একটি ঝর্ণা থেকে জন্ম। ত্রিশঙ্কুর পাপের স্পর্শে জল অপবিত্র। (২) বৈদ্যনাথধামে ছোট একটি নদী।

কর্মবাদ—নিজের কর্ম অনুসারে সুফল ও কুফল ভোগ করা। এক জীবনে কৃতকর্মের সমস্ত ফল ভোগ করা সম্ভব না হতে পারে। সুতরাং স্থূলদেহ বিনাশের পর সূক্ষ্ম শরীর অভুক্ত কর্ম বহন করে এবং কর্মফল ভোগ উপযোগী নতুন দেহ গ্রহণ করে। বর্তমান জীবনে কৃতকর্মের নাম পুরুষাকার ; পূর্ববর্তী জীবনের সঞ্চিত অর্থাৎ অভুক্ত কর্মের নাম দৈব বা অদৃষ্ট। পূর্ব জন্মের এই কর্ম অজ্ঞেয় এবং অপ্রত্যক্ষ এবং অপর নাম ভাগ্য ; ভবিতব্য বা নিয়তি। সঞ্চিত কর্মগুলির মধ্যে যখন যে কর্মের ফল ফলতে থাকে তাকে প্রারব্ধ কর্ম বলা হয়।

দৈব (=অদৃষ্ট) বড় না পুরুষাকার বড় বহু মতভেদ আছে। দৈবের দুটি ভাগ স্বীকার করা হয় ; একটি সঞ্চিত ভাগ এবং অপর একটি প্রারব্ধ ভাগ। আরো স্বীকার করা হয় সঞ্চিতভাগকে অর্থাৎ পূর্বজন্মের কর্মের সঞ্চিত অংশকে পুরুষাকার খণ্ডন করতে পারে কিন্তু প্রারব্ধভাগকে পারে না। এই জন্য তত্ত্বজ্ঞানী সিদ্ধপুরুষরাও সাধারণ মানুষের মত রোগ শোক ভোগ করে থাকেন। আবার বলা হয়েছে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে নিষ্কাম কর্ম করতে পারলে তখন আর কর্মের ফল ভোগ করতে হয় না ; প্রারব্ধ কর্ম ছাড়া সমস্ত সঞ্চিত কর্ম, তখন নিঃশেষে বিনষ্ট হয়ে যায়। কর্ম, কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ সমস্ত ভারতীয় দর্শনেই সংসার সৃষ্টির ভিত্তিরূপে স্বীকৃত। এই কর্মবাদের সঙ্গে ঈশ্বরকেও জুড়ে দেওয়া হয়েছে। বাদরায়ণের মতে জীবের কর্ম অনুসারে ঈশ্বর তার সুখদুঃখের নিয়ন্তা। কর্মজীবনের একটি প্রতিপাদ্য মানুষের এ জীবনের কর্মই পরজীবনে দৈব বা অদৃষ্ট রূপে পরিগণিত। চার্বাক মতেও কর্মবাদ স্বীকৃত ; কিন্তু পূর্বজন্ম ও ঈশ্বর বাদ দিয়ে। দ্রঃ-অবতার।

জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ এবং মানুষ, পশুপাখী কীটপতঙ্গ সব কিছু মিলে একটা অখণ্ড ধারার, একটা সমগ্রতার কল্পনা করা সম্ভব হয়েছিল এই রঙীন কর্মবাদ ও প্রমাণহীন জন্মান্তরবাদের মধ্য দিয়ে। একটা সস্তা ও অতি সহজ সান্ত্বনা এনে দিয়েছিল ভারতীয় মনেতে।

কর্মমন্ত—কমট। কমৃপ্ত। কুমিল্লার কাছে ত্রিপুরা জেলাতে। সমতটের রাজধানী। খড়্গ রাজাদের সময় একটি সামন্ত রাজধানী।

কলচুরি—হৈহয় বংশ। মহাভারতে। চন্দ্রবংশে যযাতির-পৌত্র সহস্রার্জুনের পৌত্র হৈহয়ের বংশধর। বিভিন্ন শিলালিপিতে অহিহয়, চেদি, কলচ্চুরি, কটচুরি, কলৎসুরী কুলচুরি ইত্যাদি নাম। এই বংশের আদি বাসস্থান নর্মদা উপত্যকা। প্রাচীন রাজধানী মাহিষ্মতী (=বর্তমান মান্ধাতা)। অবন্তিও এক সময় এই রাজ্যভুক্ত ছিল। ৬-শতকে দক্ষিণে নাসিক, পশ্চিমে গুজরাত, পূর্বে বুন্দেলখণ্ড, বাঘেলখণ্ডের অঞ্চল সমেত গাঙ্গেয় উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ৬-শতকের শেষে এঁদের প্রতিপত্তি হ্রাস পায়। দ্রঃ-চেদি।

কলহা—ভিক্ষু নামে এক ব্রাহ্মণের স্ত্রী। সৌরাষ্ট্রে। ব্রাহ্মণ যা বলতেন স্ত্রী ঠিক তার বিপরীত করতেন। ফলে ব্রাহ্মণ স্ত্রীকে ঠিক বিপরীত কাজগুলি করতে বলতেন। একদিন শ্রাদ্ধের পিণ্ডগুলি গঙ্গাতে দিতে বললে কলহা এগুলি শৌচকূপে ফেলে দেন। ফলে পর জন্মে কলহা রাক্ষসী হয়ে জন্মান। কিন্তু ধর্মদত্ত (দ্রঃ) পাপমুক্ত করেন এবং নিজের পুণ্যের অর্দ্ধেক দান করেন। এই কারণে এঁরা দুজনে পরজন্মে দশরথ ও কৌশল্যা/কৈকেয়ী হয়ে জন্মান (পদ্ম-পু)।

কলহুয়া—কলুহা। মুকুল পর্বত (দ্রঃ)। ভুলক্রমে গয়ার ব্রহ্মযোনি পর্বতকে বলা হয়।

কলা—(১) কর্দমের স্ত্রী দেবহূতির মেয়ে। মহর্ষি মরীচির স্ত্রী। কলার ছেলে মহর্ষি কশ্যপ ও পূর্ণিমা (ভাগ ৪।১।১২)। পূর্ণিমার ছেলে বিরজ, বিশ্বগ ও মেয়ে দেবকুল্যা। (২) বিভীষণের মেয়ে। অপর নাম অনলা। রামায়ণে (৫।৩৭।১১ এক কলাকে দেখা যায় বিভীষণের স্ত্রীর নির্দেশে সীতাকে এসে আশ্বাস দিতেন বিভীষণ সীতার জন্য নানা চেষ্টা করছেন। (৩) একজন অপ্সরা। (৪) ৬৪ কলা।

কলাপ—পাণিনির পরবর্তী ব্যাকরণগুলির মধ্যে অন্যতম। খৃস্টীয় প্রথম মতান্তরে তৃতীয় শতকে দাক্ষিণাত্যে সর্ববর্মাচার্য রচিত। প্রাথমিক অবস্থায় অতিক্ষুদ্র আকার ছিল বলে অপর নাম কাতন্ত্র (ঈষৎ তন্ত্র)। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারানাথের মতে কলাপের সঙ্গে ঐন্দ্রশাখার সাদৃশ্য আছে। তামিল ব্যাকরণ তোল কাপ্পিয়ম-এর সঙ্গেও সাদৃশ্য রয়েছে। এক সময় সিংহল, কাশ্মীর, নেপাল ও তিব্বতে জনপ্রিয় ব্যাকরণ ছিল। বাংলাতে বিশেষ করে পূর্ববাংলাতেও বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। কলাপের দুর্গাসিংহকৃত টীকা 'বৃত্তি' ও সুষেণাচার্য কৃত পঞ্জী প্রসিদ্ধ। শ্রীপতি দত্ত কলাপের অসম্পূর্ণতা দূর করবার জন্য 'কাতন্ত্রপরিশিষ্ট' এবং চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার 'কাতন্ত্রছন্দঃপ্রক্রিয়া' রচনা করেন। কাতন্ত্রচ্ছন্দঃপ্রক্রিয়া বৈদিক অংশ সম্পর্কিত। একটি কাহিনী আছে দাক্ষিণাত্যে রাজা শাতবাহন বা শালিবাহন স্ত্রীর সঙ্গে এক দিন জলকেলি করছিলেন। স্ত্রী রাজাকে 'মোদকং দেহি দেব' বলে জল দিতে বারণ করলে রাজা মোদক (লাড্ডু) এনে দেন এবং রাণীর কাছে তিরস্কৃত হন। রাজা তখন সভাপণ্ডিত সর্ববর্মাচার্যকে অনুরোধ করেন ছ মাসের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষার উপযোগী ছোট করে একটি সম্পূর্ণ সংস্কৃত ব্যাকরণ লিখে দিতে হবে। সর্ববর্মাচার্য তখন শিবের আরাধনা করেন। শিবের আদেশে কুমার (=কার্তিকেয়) তাঁর বাহন ময়ূরের কলাপের সাহায্যে এই ব্যাকরণ লিখে দেন। এই জন্য নাম কলাপ বা কৌমার। (২) বিখ্যাত এক মুনি; রাজসূয় যজ্ঞের শেষে যুধিষ্ঠির এঁকে পূজা করেন।

কলাপগ্রাম—এখানে মরু (দ্রঃ- সূর্যবংশ) ও দেবাপি (দ্রঃ- চন্দ্রবংশ) তপস্যা করছেন যাতে কল্কির হাতে ম্লেচ্ছ নিধনের পর মরু অযোধ্যাতে ও দেবাপি হস্তিনাপুরে আবার জন্মাতে পারেন। মহাভারত, ভাগবত ও বৃহৎ সংহিতা মতে বদরিকাশ্রমের কাছে। বায়ু পুরাণেও এটি হিমালয়ে। এখানে উর্বশী কিছুদিন পুরূরবার সঙ্গে কাঠান। আর এক মতে গাড়োয়ালে বদ্রিনাথে অলকানন্দার শাখা সরস্বতীর উৎপত্তিস্থানে কলাপগ্রাম। সত্যভামা ইত্যাদি কৃষ্ণের কয়েক জন স্ত্রী, অর্জুনের সঙ্গে ইন্দ্রপ্রস্থে এসে এখান থেকে কলাপগ্রামে তপস্যা করতে চলে যান। হিমালয় অতিক্রম করে এই কলাপ গ্রাম (কা-প্রসন্ন)।

কলাবউ—অন্য নাম নবপত্রিকা। কলা, কচু, হলুদ, জয়ন্তী, বেল, ডালিম, অশোক, মানকচু ও ধান এই নয়টি গাছ একত্র মিলিয়ে এবং শ্বেত অপরাজিতার লতা ও হলুদ সুতা দিয়ে বেঁধে তৈরি করে কাপড় পরিয়ে মাথায় সিঁদুর দিয়ে দেওয়া হয়। দেখতে হয় অবগুণ্ঠনবতী বধূর মত। নয়টি গাছের অধিষ্ঠাত্রী দেবী যথাক্রমে ব্রাহ্মণী, কালী, দুর্গা, কার্তিকী, শিবা, রক্তদন্তিকা, শোকরহিতা, চামুণ্ডা ও লক্ষ্মী। কিন্তু সমবেত ভাবে নবপত্রিকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী দুর্গা। দুর্গা পূজার সময় সপ্তমীর দিন প্রথমে নবপত্রিকার স্থাপনা একটি বিশেষ অনুষ্ঠান। গণেশের পাশে বসিয়ে দেওয়া হয়; গণেশের স্ত্রী নয়।

কলাবতী—(১) রাধার মা। কান্যকুব্জের মেয়ে। যজ্ঞকুণ্ড থেকে জন্ম। বৃষভানু রাজার স্ত্রী। (২) কাশী রাজকন্যা। দুর্বাসাকে পূজা করে শিব-মন্ত্র পান। অত্যন্ত ধর্মশীলা। মথুরার রাজা দাশার্হকে অন্য মতে দশরথকে বিয়ে করেন। রাজা নিজে পাপী ছিলেন; স্ত্রীর তেজ সহ্য করতে পারছিলেন না। কলাবতী তখন রাজাকে গর্গ মুনির কাছে নিয়ে গেলে মুনি রাজাকে কালিন্দীর জলে ডুব দিতে বলেন। জন্ম-জন্মান্তরের পাপ তখন এঁর দেহ থেকে কাক হয়ে বার হয়ে উড়ে যায়। রাজা নিষ্পাপ হন (শিব-পু)। (৩) একজন অপ্সরা।

কলাবিদ্যা—চাঁদের কলা/অংশ মত, বিদ্যার এক একটি শাখা। বাৎস্যায়ন ইত্যাদি মতে কলার সংখ্যা ৬৪। ক্ষেমেন্দ্র কৃত কলাবিলাসের ১০-ম সর্গে ১০০ কলার উল্লেখ রয়েছে। শয্যা রচনা, গাছে চড়া, চুরিবিদ্যা, মারণ, উচাটন, সন্তরণ, প্রত্যুপকার, গীত, বিদ্যা ইত্যাদি সব কিছুই কলা।

কলি—কশ্যপ ও মুনির ছেলে ভীমসেন, উগ্রসেন, সুপর্ণ, বরুণ, ধৃতরাষ্ট্র, গোপতি, সূর্যবর্চস, সত্যবাক্, অর্কপর্ণ, প্রযুত, বিশ্রুত, চিত্ররথ, শালিশিরস্, পর্জন্য, নারদ ও কলি। পরিক্ষিৎ রাজা হয়ে রাজ্য জয় করতে বার হলে এক দেশে দেখেন এক শূদ্র রাজা একটি বৃষ ও গাভীকে বিব্রত করছেন। পরিক্ষিৎ রাজাকে লক্ষ্য করে বাণ সংযোগ করতে গেলে কলি এসে প্রণাম করেন। কলিকে পরিক্ষিৎ হত্যা করেন না কিন্তু তার রাজ্য পরিত্যাগ করতে বলেন। কিন্তু সমস্ত পৃথিবীই পরিক্ষিতের রাজ্য ফলে কলি রাজার কাছে থাকবার মত জায়গা চান। ঠিক হয় যেখানে পাশা খেলা, বেশ্যালয়, সুরাপান, হত্যা, স্বর্ণ ইত্যাদি থাকবে সেখানে বাস করবেন (ভাগ ১।১৭।-)।

কলি ও দ্বাপর দুজনে দময়ন্তীর স্বয়ংবরে এসেছিলেন; পথে ইন্দ্র ইত্যাদিকে ফিরে আসতে দেখেন এবং নলের বিয়ের খবর পান। নলের বিয়ে করা রূপ আস্পর্দ্ধাতে কলি ও দ্বাপর ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। দেবতারা চলে গেলে দ্বাপরকে বলেন নলকে (দ্রঃ) রাজ্যভ্রষ্ট ও স্ত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন করবেন। কলি নলকে ভর করবেন এবং দ্বাপরকে বলেন অক্ষতে ভর করতে (মহা ৩।৫৫।১৩)। দ্রঃ-নল, অলক্ষ্মী।

মার্কণ্ডেয় (দ্রঃ) যুধিষ্ঠিরকে চার যুগের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন আন্ধ্রাঃ শকাঃ পুলিনাশ্চ যবনাশ্চ নরাধিপা কাম্বোজা ঔর্ণিকাঃ শূদ্রাঃ তথাভীরা নরোত্তম (৩।১৮৬।৩০) এরা রাজা হবে। অর্থাৎ মহাভারতের যুগে এরা ছিল। মুখে ভগা স্ত্রিয়ঃ রাজন্ ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে (৩।১৮৬।৩৫)। দ্রঃ-তন্ত্র। অট্টশূলা জনপদা শিবশূলাশ্চতুষ্পথাঃ, কেশশূলাঃ স্ত্রিয়ঃ রাজন্ ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে। আরো বলেন এড‌ুকান্ (বৌদ্ধ স্তূপ) পূজয়িষ্যন্তি বর্জয়িষ্যন্তি দেবতা; এবং ন দেবগৃহ ভূষিতা (মহা ৩।১৮২।৭৪-৬৬)। যথা চন্দ্রশ্চ সূর্যশ্চ তথা তিষ্য বৃহস্পতী। এক রাশৌ সমেষ্যন্তি প্রপৎস্যতি তদা কৃতম্ (৩।১৮৮।৮৭)। কল্কির (দ্রঃ) কথাও বলেন। দুর্যোধনের উরুভঙ্গ হলে মহাভারতে (৯।৫৯।২১) রয়েছে প্রাপ্তং কলিযুগং বিদ্ধি কৃষ্ণ বলরামকে বলেছিলেন। হরিবংশে (১।৫৬।৬১) আছে কলিতে মহেশ্বর ও কুমার প্রধান হবেন। দ্রঃ-যুগ, কালকাল, কলিযুগ।

কলিকাল—চার যুগের মধ্যে শেষ যুগ। কলি এর অধিষ্ঠাতা। এই যুগের আয়ু ১২০০ দিব্য বছর; অর্থাৎ ১২০০ × ৩৬০ = ৪৩২,০০০ মানবিক বছর। প্রতি মন্বন্তরে ৭১টি মহাযুগ বা দিব্যযুগ (দ্রঃ-কাল)। প্রতি দিব্যযুগে একটি কলিযুগ থাকে। বর্তমানে ৭-ম মনু বৈবস্বতের অধিকার কাল। অতীতে কলিযুগে কল্কি অবতার জন্মেছিলেন কিনা পুরাণে কোন সঠিক উল্লেখ নাই। ৩১০২ কলি বর্ষে খৃ-শতাব্দী আরম্ভ হয়েছে ধরা হয়। দ্রঃ-আর্যভট। এই যুগের শেষে অষ্টম মন্বন্তর আরম্ভ হবে। কৃষ্ণ যে দিন স্বর্গারোহণ করেছিলেন সেই দিন কলিযুগের (দ্রঃ) জন্ম। হরিবংশে (১।৫৩।৫৪) পাণ্ডবরা মারা গেলে কলিযুগ আরম্ভ। দ্রঃ-কলি।

কলিঙ্গ—(১) দ্রঃ ঋতায়ু। বলিরাজের ক্ষেত্রজ পুত্র। সুদেষ্ণার গর্ভে দীর্ঘতমার ঔরসে জন্ম। এর রাজ্যের নাম কলিঙ্গ। (২) উত্তর সিরকরস। উড়িষ্যার দক্ষিণ থেকে দ্রাবিড়ের উত্তর পর্যন্ত ভূভাগ। উড়িষ্যা ও অন্ধ্রপ্রদেশের সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চল। প্রাচীন রাজধানী তোসলি। ভুবনেশ্বর থেকে ১০ কি-মি দূরে অবস্থিত ধৌলি এই তোসলি। দ-পশ্চিমে গোদাবরী এবং উ-পশ্চিমে ইন্দ্রাবতী নদীর শাখা গয়লিয়। আর এক মতে মহানদী ও গোদাবরীর মধ্যবর্তী। প্রধান নগর মণিপুর, রাজপুর, রাজমাহেন্দ্রি ইত্যাদি। মহাভারতের সময় উড়িষ্যার একটা বড় অংশ কলিঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল; উত্তর সীমা ছিল বৈতরণী নদী (বন-প)। রঘুবংশে উৎকল ও কলিঙ্গ দুটি দেশ। অশোকের মৃত্যুর পর খৃ-পূ ৩-শতকে মগধের হাত থেকে স্বাধীনতা পায়; এবং কণিষ্কের সময় পর্যন্ত স্বাধীন ছিল। খৃ-পূ ৪ শতকের প্রথম দিকে মগধের সম্রাট মহাপদ্ম নন্দ কলিঙ্গ অধিকার করেন। খৃ-পূ ৩-শতকের মাঝে সম্রাট অশোক কলিঙ্গ জয় করেন। মগধের

পতনের সুযোগে মহামেঘবাহন নামে রাজবংশের অভ্যুদয় হয়। এই বংশ প্রাচীন চেদি বংশের শাখা; এরা আর্য। এই মেঘবাহন বংশে ৩য় নরপতি খারবেল নিজেকে রাজর্ষি বসু অর্থাৎ পৌরাণিক চেদিরাজ উপরিচর বসুর বংশধর বলে দাবি করতেন। দ্রঃ-কলিঙ্গনগর।

কলিঙ্গনগর—ভুবনেশ্বর যেন। একাম্রবন (দ্রঃ)। খৃ-পূ ৭ শতক থেকে খৃ ১৫ শতক পর্যন্ত উড়িষ্যার রাজধানী। খৃ ৭-ম শতকে ললাটেন্দু কেশরী ভুবনেশ্বর নাম রাখেন। গঞ্জাম জেলাতে মুখলিঙ্গম্ তীর্থে এই নগর; পারলাকিমেদি থেকে ২০ মাইল। কলিঙ্গরাজ ইন্দ্রবর্মার পারলাকিমেদি লেখ থেকে জানা যায় এই কলিঙ্গনগর গঞ্জাম জেলাতে বংশধারা নদীর মুখে কলিঙ্গপত্তম্; মতান্তরে কংস নদীর (কাসাই নয়) তীরে। কলিঙ্গের রাজধানী বিভিন্ন সময়ে মণিপুর, গঞ্জাম, রাজমাহেন্দ্রি, রাজপুর, ভুবনেশ্বর, পিষ্টপুর, জয়ন্তপুর, সিংহপুর, মুখলিঙ্গ ইত্যাদি। কিন্তু সাধারণ নাম কলিঙ্গনগর। ভুবনেশ্বরে বহু বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য প্রত্নবস্তু রয়েছে। এখানে মধুকেশ্বর শিবমন্দির অতি প্রাচীন এবং সোমেশ্বর শিবমন্দির সব চেয়ে সুন্দর। এই দুটি মন্দিরেই বহু লেখ ও ভাস্কর্য রয়েছে। পাশে নগরকটকমে কিছু কৌতূহলোদ্দীপক ধ্বংসাবশেষ ও বুদ্ধের একটি মূর্তি রয়েছে।

কলিযুগ—কলিযুগে সকলে অসাধু। পাপ এ সময়ে ত্রিপাদ, পুণ্য একপাদ, দান যজ্ঞ নামেই প্রচলিত থাকবে; ব্রাহ্মণ শূদ্রের কাজ করবে শূদ্রেরা সমৃদ্ধ হয়ে উঠবেন। মানুষ অল্পায়ু এবং খর্বকায়। পশুভাব বৃদ্ধি পাবে। ধান বিক্রি হবে; ব্রাহ্মণে বেদও বিক্রি করবে। বেদ পাষণ্ড-দূষিত হবে। ব্রাহ্মণেরা ভিক্ষুক হবেন, মুনিরা ব্যবসায়ী হবেন। বিনা কারণে ব্রাহ্মণেরা চুল ও নখ রাখবেন। চতুরাশ্রম পালিত হবে না। নরহত্যা ব্যাপক হয়ে উঠবে। ব্যবসায়ীরা ঠকাবে ও মাপে কম দেবে। যৌবনের প্রারম্ভে চুল পেকে যাবে; বৃদ্ধেরা যুবকদের মত আচরণ করবে। মেয়েরা তাদের দেহাংশ বিক্রি, গৃহিণীরা ভৃত্যের সঙ্গে এবং এয়োতিরা অপরের সঙ্গে ইন্দ্রিয় সুখে লিপ্ত হবেন। বহু লোক ক্ষুধায় প্রাণ হারাবে। মিথ্যা, হিংসা ও শোকের প্রাধান্য হবে। মানুষ কামী ও কটুভাষী; জনগণ দস্যুপীড়িত, স্ত্রীগণ অল্পভাগ্যা। এই যুগের শেষে কল্কি জন্মাবেন। তারপর আবার সত্যযুগ আরম্ভ হবে। দ্রঃ-কলিকাল।

কল্কি—বিষ্ণুর দশ অবতারের শেষ অবতার। বর্তমান যুগের শেষে বিষ্ণু কল্কিরূপে জন্মগ্রহণ করে কলিকে বিনাশ করলে আবার সত্যযুগ আসবে। পৃথিবী ম্লেচ্ছপূর্ণ হলে সমস্ত মানুষ নাস্তিক ও একবর্ণ হয়ে উঠবে এবং পৃথিবী পাপে ভরে গেলে কল্কি আসবেন। কোন জাতি বিচার থাকবে না। কেবল মাত্র ১৫-টি সূত্রযুক্ত বাজসনেয় ধর্ম পালিত হবে। রাজা ধর্মহীন ও প্রজাভক্ষক হবেন। নরভোজী ম্লেচ্ছ তখন রাজা হবেন। সম্ভল গ্রামে বিষ্ণুযশা ব্রাহ্মণের পুত্র (দে-ভা ৯।৮।৫৪) চৈত্র শুক্লা দ্বাদশীতে কল্কি জন্মাবেন। মায়ের নাম সুমতি। মহাভারতে (৩।১৮৮।৮৯) বিষ্ণুযশাই কল্কি। হরিবংশে (১।৪১।১৬৪) বিষ্ণুযশাই কল্কি; যাজ্ঞবল্ক্যকে সঙ্গে নিয়ে আসবেন। যমুনার মধ্যবর্তী কূলে নিজের কাজ সম্পূর্ণ করবেন। ডানাওয়ালা সাদা

ঘোড়ায় চড়ে জ্বলন্ত ধূমকেতুর মত এক হাতে তলোয়ার আর এক হাতে চক্র নিয়ে এগিয়ে আসবেন। ম্লেচ্ছ ও বিধর্মীদের শেষ করে অশ্বমেধ যজ্ঞ করে দক্ষিণা স্বরূপ সমস্ত পৃথিবী ব্রাহ্মণদের দান করে বর্ণাশ্রমধর্ম/সত্যযুগ স্থাপন করবেন এবং দেহ ফেলে রেখে স্বর্গে ফিরে যাবেন। অগ্নিপুরাণে আছে এ'র পুরোহিত হবেন যাজ্ঞবল্ক্য।

কল্কি পুরাণে সব চেয়ে বিস্তৃত বিবরণ আছে এবং অতীতের কাহিনী হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে ; সম্ভবত বৌদ্ধযুগের অধঃপতনের সময় কল্কিপুরাণ লিখিত। এই পুরাণ মতে কল্কি বৌদ্ধ ধর্মের উৎসাদন করেছিলেন। মহাভারতে মার্কণ্ডেয় (দ্রঃ) বলেছেন বিষ্ণু-যশা ব্রাহ্মণই কল্কি (৩।১৮৮।৯০); মনে মনে চিন্তা করলেই আয়ুধানি ও যোধাঃ এসে উপস্থিত হবে। ধর্ম-বিজয়ী রাজচক্রবর্তী হবেন। অশ্বমেধ যজ্ঞে দ্বিজেভ্যঃ এই পৃথিবী দান করবেন এবং জরাবান হয়ে বনে যাবেন। অন্যান্য কয়েকটি পুরাণেও কল্কির জন্ম ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে। মৎস্য পুরাণ মতে মহাবীরের নির্বাণ প্রাপ্তির পর প্রতি হাজার বছরে কল্কি আবির্ভূত হয়ে জৈনধর্মের খণ্ডন করেন। দ্রঃ-অবতার।

কল্কি—তিন্নেভেলিতে তাম্রপর্ণী নদীর মুখে টিউটিকোরিন। কোলকই বা সোসিকউ-রই (টলেমি)। পাণ্ড্য রাজাদের পূর্বতন রাজধানী। কয়েল (মার্কোপোলো)।

কল্প—দ্রঃ-কাল। পুরাণ মতে ১৪টি মন্বন্তর মিলে ব্রহ্মার এক কল্প এবং দুই কল্পে ব্রহ্মার এক অহোরাত্র। দিনে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয় ও বিদ্যমান থাকে ; রাত্রিতে লয় পায়। (২) ধ্রুবের ছেলে।

কল্পতরু—কল্পান্ত পর্যন্ত স্থায়ী তরু। সমুদ্র মন্থনে উত্থিত এবং কল্পান্তে আবার সমুদ্রে ডুবে যাবে। এর কাছে যা কিছু চাওয়া যায় পাওয়া যায়। দেবলোকের একটি গাছ। আবার মন্দার, পারিজাত, সনাতন, কল্পবৃক্ষ ও হরিচন্দন গাছও এই নামে পরিচিত।

কল্পসূত্র—বেদাঙ্গ গ্রন্থ। বৈদিক যজ্ঞ, সামাজিক জীবন ও লোকাচার ক্রমেই এমন জটিল ও বহুবিস্তৃত হয়ে উঠতে থাকে যে এই সব ব্যবস্থাগুলি ব্রাহ্মণ ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে সূত্রাকারে সংক্ষিপ্ত করে কল্পসূত্র নামে গ্রন্থ রচনা করা হয়। বহু মতে এই কল্পসূত্র বেদেরই সমান ; বোধায়ন, আপস্তম্ভ, আশ্বলায়ন, ও কাত্যায়ন প্রভৃতি কল্পসূত্র অপৌরুষেয়। কতকগুলির নাম ঃ—ঋক্‌বেদে কল্পসূত্র আশ্বলায়ন, সাংখ্যায়ন ও শৌনক। সামবেদেঃ—মশক, লাট্যায়ন ও দ্রাহ্যায়ন। কৃষ্ণযজুর্বেদেঃ—আপস্তম্ভ, বৌদ্ধায়ন, সত্যাষাঢ়, হিরণ্যকেশী, মানব, ভরদ্বাজ, বাধূল, বৈখানস, লৌগাক্ষি, মৈত্র, কঠ, বারাহ। শুক্লযজুর্বেদেঃ—কাত্যায়ন ; এবং অথর্ব বেদে কৌশিক।

কল্মাষপাদ—প্রকৃত নাম সৌদাস/মিত্রসহ। ৩৫-তম ইক্ষ্বাকু রাজা। ভগীরথ (১)-ঋতুপর্ণ(৫)-সুদাস(৭)-কল্মাষপাদ/মিত্রসহ(৮)। সুদাসের ছেলে বলে নাম সৌদাস। রামায়ণে অপর নাম বীরসহ। অল্পবয়স থেকেই মৃগয়াপ্রিয়। শার্দূল রূপী দুটি রাক্ষস এক দিন বহু মৃগ ভক্ষণ করছে দেখে একটিকে বধ করেন ; দ্বিতীয় রাক্ষসটি প্রতিশোধ নেবে ভয় দেখিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। এরপর রাজা হয়ে বাল্মীকি আশ্রমের সমীপে অশ্বমেধ (দ্রঃ-শত্রুঘ্ন) করেছিলেন; যজ্ঞে বশিষ্ঠ পুরোহিত ছিলেন। যজ্ঞ শেষ হলে

প্রতিশোধ নেবার জন্য সেই রাক্ষস বশিষ্ঠের রূপ ধরে রাজার কাছে সমাংস অন্ন খাবেন বাসনা প্রকাশ করেন। রাজা ব্যবস্থা করেন। কিন্তু রাক্ষস পাচক বেশে নর মাংস এনে দেয়। রাণী মদয়ন্তী বশিষ্ঠকে এই অন্নমাংস দিলে ঋষি অভিশাপ দেন রাজা নরমাংসাশী রাক্ষস হবেন। অন্য মতে বশিষ্ঠরূপী এই রাক্ষস রাজাকে এই মাংস গোপনে আশ্রমে পাঠিয়ে দিতে বলেন এবং মাংস বা অন্য মতে নর মাংস পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বশিষ্ঠ মাংস দেখে অভিশাপ দেন। বিনা দোষে অভিশপ্ত হয়ে রাজাও জল নিয়ে শাপ দিতে যাচ্ছিলেন কিন্তু মদয়ন্তী রাজাকে নিবৃত্ত করেন। কিন্তু মন্ত্রপূত এই জল যেখানে পড়বে সে জায়গা নষ্ট হয়ে যাবে। তাই রাজা জলটি নিজের পায়ের ওপর ফেলেন এবং দুই পা পুড়ে কালো হয়ে যায়। সেই থেকে নাম কল্মাষপাদ। এরপর অনুনয় করলে নিজের ভুল বুঝতে পেরে বশিষ্ঠ বলেন ১২-বছর পরে সৌদাস মুক্তি পাবেন (রা ৭।৬৫)। এর পর সৌদাস রাক্ষস হয়ে বনে মানুষ খেয়ে দিন কাটাতেন।

মহাভারতে (১।১৬৬) আছে মৃগয়াতে ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত হয়ে সরু একটা চলার পথে শক্তির সঙ্গে দেখা হয়। রাজা পথ ছেড়ে দিতে বলেন, শক্তি রাজি হন না; রাজা রাক্ষসবৎ নিষ্ঠুর হয়ে কশাঘাত করতে থাকেন; ফলে অভিশপ্ত হন মানুষের মাংস খেয়ে বেড়াবে। যজ্ঞ করার জন্য বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের আগে থেকেই কলহ ছিল; বিশ্বামিত্র কল্মাষপাদ ও শক্তির সামনে এই সময় এসে পড়েন। সব বুঝতে পারেন এবং কিঙ্কর নামে এক রাক্ষসকে রাজার মধ্যে প্রবেশ করতে বলেন এবং নিজে সেখান থেকে সরে যান। রাজা রাক্ষসগ্রস্ত হয়ে অত্যন্ত পীড়ামান হয়ে পড়েন। এই সময়ে এক ব্রাহ্মণ সমাংস অন্ন প্রার্থনা করেন। মিত্রসহ মুহূর্ত অপেক্ষা করতে বলেন এবং প্রাসাদে ফিরে আসেন। অর্দ্ধরাত্রে মনে পড়ে; পাচককে ডেকে নির্দেশ দেন। পাচক রাত্রিতে মাংস পায় না; রাজা নরমাংস দিয়ে ভোজন করাতে বলেন। বধ্য স্থান থেকে পাচক মাংস আনে ইত্যাদি এবং ব্রাহ্মণ বুঝতে পেরে শাপ দেন নরমাংস লোলুপ হবে। এই ভাবে দুবার অভিশপ্ত হয়ে প্রথমে শক্তিকে পান ও খেয়ে ফেলেন; বিশ্বামিত্র কিঙ্কর রাক্ষসকে আবার নির্দেশ দিতে থাকেন; কল্মাষপাদ বশিষ্ঠের তান্ শতান্ অবরান পুত্রান্ খেয়ে ফেলেন (মহা ১।১৬৬।৩৮)।

অন্য মতে মৃগয়াতে গিয়ে রাজা বশিষ্ঠ-আশ্রমে এসেছিলেন; শক্তি বার হয়েছিল ইত্যাদি। একটি মতে শক্তি ১৬ বছর রাক্ষস হতে হবে শাপ দেন। রাজা তৎক্ষণাৎ একে খেয়ে ফেলেন। একটি মতে বিশ্বামিত্র নিজে অপর মতে বিশ্বামিত্রের নির্দেশে কিঙ্কর এরপর কল্মাষপাদকে ভর করেন ও অপর শতপুত্রকে রাজা খেয়ে ফেলেন। আর এক মতে একবার মৃগয়াতে গিয়ে এক রাক্ষসকে নিহত করলে রাক্ষসের ছোট ভাই প্রতিহিংসাতে পাচক হয়ে পাকশালাতে কাজ করছিল। একবার একটি শ্রাদ্ধের কাজে রাজা বশিষ্ঠকে নিমন্ত্রণ করেন। এই সুযোগে নরমাংস রান্না করে দিলে বশিষ্ঠ রাজাকে বার বছরের জন্য নরমাংস ভোজী রাক্ষস হবার শাপ দেন। উতঙ্ক (দ্রঃ) এই কল্মাষপাদের স্ত্রীর কুণ্ডল নিয়ে গিয়েছিলেন।

মহাভারত-গত ওপরের কাহিনী অঙ্গারপর্ণ অর্জুনকে শোনান এবং আরো বলেন মানুষাদ হয়ে কল্মাষপাদ স্ত্রীকে নিয়ে যখন বনে বনে ঘুরে বেড়াতেন তখন এক দিন (মৈথুনায়োপসংগতৌ, মহা ১।১৭৩।৮) এক ব্রাহ্মণ ও তার স্ত্রীকে দেখতে পান। রাজা ব্রাহ্মণকে ধরে ফেলেন। সূর্যবংশে ধার্মিক রাজা ইত্যাদি এবং ব্রাহ্মণী গর্ভধারণ করতে পারলেন না ব্রাহ্মণ বোঝাতে চেষ্টা করেন। রাজা ব্রাহ্মণকে খেয়ে ফেলেন। ব্রাহ্মণীর চোখের জল মাটিতে পড়ে আগুন হয়ে সেই দেশ পুড়িয়ে ফেলে এবং শাপ দেয় ঋতুকালে স্ত্রী সমীপে গেলেই মৃত্যু হবে এবং যে বশিষ্ঠের ছেলেদের রাজা নষ্ট করেছেন সেই বশিষ্ঠের কাছ থেকেই রাজাকে বংশকর পুত্র লাভ করতে হবে (মহা ১।১৭৩।১৯)। এই ব্রাহ্মণী আঙ্গিরসী ; সেইখানেই আগুনে দেহ ত্যাগ করেন। বশিষ্ঠ তপস্যায় সবই জানতে পারেন। এই শাপের কথা স্মরণ ছিল না, মদয়ন্তী স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন।

মহাভারতে (১।১৬৮।৫) আছে বারো বছর এই ভাবে কাটার পর এক দিন বশিষ্ঠ (দ্রঃ) পুত্রবধূকে নিয়ে আশ্রমে ফিরছিলেন; কল্মাষপাদ এদের খেতে আসেন। বশিষ্ঠ হুঙ্কার দিয়ে বাধা দেন এবং মন্ত্রপূত জল দিয়ে শাপ মুক্ত করেন ; ব্রাহ্মণদের যেন কোন দিন আর অবমাননা না করেন উপদেশ দেন এবং রাজ্যে ফিরে যেতে বলেন। রাজা তখন মদয়ন্তীর একটি ক্ষেত্রজ পুত্র চান এবং এই জন্য বশিষ্ঠকে নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে আসেন। এই সন্তান অশ্মক (দ্রঃ)। এই ব্রহ্ম হত্যার পাপ ভয়ঙ্কর মূর্তিতে অনুসরণ করতে থাকলে রাজা শেষ পর্যন্ত জনকের কাছে আসেন। এখানে গৌতমের সঙ্গে দেখা হয়। মুনি দিব্যজ্ঞান দিলে রাজা গোকর্ণে গিয়ে কিছু দিন তপস্যা করেন। এরপর বশিষ্ঠ শাপ মুক্ত করে দেন ; রাজা অযোধ্যাতে ফিরে যান। কল্মাষপাদ কিন্তু ব্রাহ্মণীর শাপ মনে রেখে স্ত্রী সহবাস করতেন না এবং পিতৃঋণ পরিশোধের জন্য বশিষ্ঠকে অনুরোধ করলে বশিষ্ঠের ঔরসে রাণীর গর্ভ হয়। কিন্তু সাত বছরেও কোন সন্তান না হওয়ায় বশিষ্ঠ এক দিন একটি পাথরের (=অশ্ম) টুকরো দিয়ে গর্ভে আঘাত করলে রাণীর একটি ছেলে হয়। এই ছেলে অশ্মক। দ্রঃ-পরাশর ; চিত্রগুপ্ত।

কল্যাণ—অঙ্গিরস ইত্যাদি কয়েক জন ঋষি ও কল্যাণ সকলে মিলে স্বর্গে যাবার জন্য এক যজ্ঞ করেন। কিন্তু কেউই এঁরা দেবযান জানতেন না। শেষ অবধি সকলে কল্যাণ মুনির ওপর সন্ধানের দায়িত্ব দেন। কল্যাণ বার হয়ে পড়েন এবং গন্ধর্ব ঊর্ণায়ুর সঙ্গে দেখা হয়। এই গন্ধর্ব এঁকে একটি সাম গান 'ঔর্ণায়ব' শিখিয়ে দেন যাতে দেবযানের সন্ধান পাওয়া যাবে। কল্যাণ ফিরে এসে সঙ্গীদের সব বলেন কিন্তু কার কাছ থেকে পেয়েছেন বলতে রাজি হন না। অঙ্গিরা ইত্যাদি সকলে এই সাম গান করে স্বর্গলাভ করেন কিন্তু কল্যাণ যেহেতু 'ঊর্ণায়ু'র কথা চেপে গিয়েছিলেন সেই হেতু স্বর্গ হতে বঞ্চিত হন এবং কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত হন।

কল্যাণ—কল্যাণপুর, কলিয়ানি। নিজাম রাজ্যে বিদর থেকে ৩৬ মাইল পশ্চিমে। কুন্তলদেশের রাজধানী। কল্যাণ রাজাদের কর্ণাটরাজও বলা হয়।

কল্যাণসুন্দর মূর্তি—শিবের (দ্রঃ) বিবাহের মধ্যযুগীয় ছবি। উত্তর ও দ-ভারত দু জায়গাতেই। এলিফ্যান্টা গুহাতে উৎকীর্ণ এই ছবিটি অপূর্ব। এলোরাতেও একটি রয়েছে

(খ্ ৮-ম শতকের মত), শিব পাণি গ্রহণ করছেন, ব্রহ্মা পুরোহিত, ব্রহ্মার পেছনে যেন ইন্দ্র দাঁড়িয়ে ; বিষ্ণু কন্যা দান করছেন। পার্বতীর পেছনে লক্ষ্মী। ছবির ওপর অংশে আকাশে দিকপালরা নিজেদের বাহনে বসা ঃ—বরুণ মকরে, ইন্দ্র ঐরাবতে, অগ্নি মেষে, যম মহিষে, বায়ু হরিণের পিঠে, ঈশান বৃষের পিঠে এবং নিঋতি মানুষের পিঠে। তাছাড়া বিদ্যাধর ও সিদ্ধরাও রয়েছে। শিল্পকর্ম সুন্দর।

কশিপু—কশ্যপ পুত্র। দুর্দ্ধর্ষ রাজা। দেবাসুরের যুদ্ধে নিহত হন।

কশেরু—প্রজাপতি ত্বষ্টার সুন্দরী মেয়ে। এর যখন ১৪ বছর বয়স তখন নরকাসুর গজরূপেণ একে চুরি করে নিয়ে যান (গী-প্রে ২।৩৮)। কৃষ্ণ নরকাসুরকে জয় করে কুমারী কশেরুকে বিয়ে করেন।

কশ্যপ—এক জন প্রজাপতি। শত পথ ব্রাহ্মণেই আছে প্রজাপতি কচ্ছপ আকার ধারণ করে প্রজা সৃষ্টি করেন। কশ্যপঃ বৈ কূর্ম (শতপথ ৭।৪।১।৫)। কশ্যপ=কচ্ছপ= অকূপার=আদিত্য (নিরুক্ত)। নিরুক্ত বলেছে খকে যে আবৃত করে সে খ-চ্ছ এবং খচ্ছ থেকে কচ্ছ। মহীধর মতে কশ্যপ সূর্যের অন্য মূর্তি ; যজুর্বেদে অদিতি বিষ্ণু পত্নী। ঋক্‌বেদেও এক জন ঋষি। শুক্লযজুর্বেদ ইত্যাদি বৈদিক সংহিতা মতে হিরণ্যবর্ণ ব্রহ্মা থেকে এঁর উৎপত্তি। লিঙ্গপুরাণে (ও মহা ভারতে ১।৫৯।১০) ইনি ব্রহ্মার মানস পুত্র। ভাগবতে মরীচি ও কলার সন্তান ; অর্থাৎ ব্রহ্মার নাতি। প্রজাপতির পৌত্র হলেও কশ্যপ নিজেও প্রজাপতি, সমস্ত গুণের আধার। বৃষাদর্ভির (দ্রঃ) যাতুধানীকে নিজের নামের ব্যাখ্যা করে কশ্যপ বলেছিলেন (মহা ১৩।৯৫।২৯) ক্‌লং ক্‌লং চ ক্‌পপঃ ক্‌পয়ঃ কশ্যপঃ দ্বিজঃ কাশ্যঃ কাশনিকাশত্বাৎ এতৎ মে নাম ধারয়। পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী কশ্যপের সন্তান। দক্ষের তেরটি মেয়ে এঁর স্ত্রী ঃ- অদিতি, অরিষ্টা, ইলা, ক্রোধবশা, কাষ্ঠা, তাম্রা, তিমি, দনু, দিতি, মুনি, সরমা, সুরসা, সুরভি। অন্য মতে এঁদের নাম অদিতি, কালা/কালকা, কপিলা, কদ্রু (দ্রঃ), ক্রোধা, দিতি, দনু, দনায়ুস্, প্রধা/ প্রবা/প্রাবা (মহা ১।৫৯।১২), বিশ্বা, বিনতা (দ্রঃ), মুনি, সিংহিকা এবং আরো আটজন সুরসা, খসা, সুরভি, তাম্র, ইরা, পুলোমা ও অরিষ্টা মোট একুশ জন। কাশা, অনলা (দ্রঃ) ও অলকা ইত্যাদি নামও পাওয়া যায়। অদিতির সন্তান দেবতারা, দিতির দৈত্য, কাষ্ঠার অশ্বাদি পশুরা, অরিষ্টার গন্ধর্বেরা, সুরসার রাক্ষসরা, অন্য মতে নাগেরা, ইলার বা অনলার বৃক্ষ উদ্ভিদাদি, মুনির অপ্সরা, অন্য মতে মানুষ, ক্রোধবশার পিশাচকুল তাম্রার পক্ষীরা, সুরভির গোমহিষাদি, সরমার শ্বাপদাদি এবং তিমির সন্তান জলজন্তু। বিভিন্ন পুরাণে বহু মতান্তর আছে। রামায়ণে (৩।১৪) দক্ষের আটটি মেয়েকে বিয়ে করেন এঁরা অদিতি, দিতি, দনু, কালিকা, তাম্রা, ক্রোধবশা, মনু, অনলা ; এবং কশ্যপ মৎসমান্ ত্রৈলোক্য ভর্তা সুমহান পুত্রদের জন্ম দিতে বলেন। ফলে অদিতি অষ্টবসু, দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র ও যুগল অশ্বিনীকুমারদের, দিতি দৈত্যদের, দনু অশ্বগ্রীবদের এবং কালকা বা কালিকা নরক ও কালকের জন্ম দেন। বাকি চার জন (তাম্রা, ক্রোধবশা, মনু, অনলা) কশ্যপের কথায় সম্মত না হয়ে ক্রৌঞ্চী, ভাসী, শ্যেনী, ধৃতরাষ্ট্রী, শুকী, মৃগী, মৃগমন্দা, হরি, ভদ্রমদা, মাতঙ্গী, শার্দূলী, শ্বেতা, সুরভি, সুরসা, কদ্রু, মনুষ্য

ও পবিত্র ফল সকলের জন্ম দেন। বৃহৎ দেবতাতে অদিতি, দিতি, দনু, কালা, দনায়ু, সিংহিকা, ক্রোধবশা, বরিষ্ঠা, বিনতা ও কদ্রু। চাক্ষুষ মন্বন্তরে সুতপস্ মুনি ও তাঁর স্ত্রী পৃশ্নি দীর্ঘকাল তপস্যা করলে বিষ্ণু দেখা দেন। এ'রা বর চান বিষ্ণু তাঁদের ছেলে হয়ে জন্মান। পরবর্তী বৈবস্বত মন্বন্তরে এই সুতপস্ ও পৃশ্নি কশ্যপ ও অদিতি হয়ে জন্মান এবং প্রতিশ্রুতি মত বিষ্ণু বামন হয়ে জন্মান। এই জন্মেও অদিতি এবং সুরসা ছাড়াও বহু স্ত্রী ছিল। আর এক মতে যজ্ঞ করবার উপযুক্ত গরু না পেয়ে কশ্যপ একবার বরুণের গরু চুরি করে যজ্ঞ করেন এবং ফিরিয়ে দেন না। ফলে বরুণ কশ্যপের আশ্রমে তেড়ে এলে স্ত্রী অদিতি ও সুরসা বরুণকে উপযুক্ত সম্মান দেন না। এই জন্য বরুণ শাপ দেন ; কশ্যপ বসুদেব, অদিতি দেবকী ও সুরসা রোহিণী (দ্রঃ) হয়ে জন্মান। হরিবংশে (১।৫৫।২১) যজ্ঞ শেষে কশ্যপ বরুণকে ফিরিয়ে দিলে বরুণ ব্রহ্মার কাছে অভিযোগ করেন। ব্রহ্মা কশ্যপকে অনুরূপ শাপ দেন, এবং বলেন মথুরার কাছে গোবর্দ্ধন নামক স্থানে গোপালক হিসাবে এবং কংসের করদ হয়ে বাস করতে হবে। ব্রহ্মা ও বরুণ দুজনে কশ্যপকে নন্দগোপ হয়ে জন্মাবার শাপ দেন।

কদ্রু যখন অবাধ্য সাপদের সর্পযজ্ঞে মৃত্যু হবে বলে শাপ দেন তখন এদের বিষ ও সংখ্যা ভীষণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই জন্য ব্রহ্মা এক কাশ্যপকে সর্পবিষ নিবারণের বিদ্যাশিক্ষা দেন (মহা ১।১৮।১১)। দ্রঃ- গজকচ্ছপ।

সমস্ত ক্ষত্রিয় নিধন করে অন্য মতে আঠার/একুশবার নিধন করে পরশুরাম এক যজ্ঞ করেন এবং যত রাজ্য জয় করেছিলেন/বা সমস্ত পৃথিবী কশ্যপকে দান করেন। কশ্যপ তখন পরশুরামকে দান প্রাপ্ত রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেন। সমুদ্রের তখন করুণা হয় এবং পরশুরামকে শূর্পারক দেশ দান করেন। অন্য মতে পরশুরাম (দ্রঃ) তখন সমুদ্রকে বাণ বিদ্ধ করে সমুদ্র থেকে একটি অংশ নিয়ে নিজের বসবাসের জন্য একটি দেশে পরিণত করেন। কশ্যপ এটিকে কেড়ে নিয়ে ব্রাহ্মণদের দিয়ে দিন। পরশুরাম তখন বনে চলে যান। এর পর শূর্পারক/কেরল এলাকা একবার পাতালে নেমে যেতে থাকলে কশ্যপ পৃথিবীকে ধারণ করেন এবং উত্তর দিক থেকে ক্ষত্রিয়দের এনে এখানে রাজা করেন। এই শূর্পারক দেশ কেরল (শান্তি অধ্যা ৪৯)। ব্রহ্মা একবার যজ্ঞ করে সমস্ত পৃথিবী কশ্যপকে দান করলে পৃথিবী পাতালে গিয়ে কাঁদতে থাকেন। কঠোর তপস্যা করে কশ্যপ পৃথিবীকে শান্ত করেন। সুধন্বা (দ্রঃ) ও বিরোচনের তর্ক একটি মতে কশ্যপ মিটিয়ে ছিলেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ চলাকালীন কশ্যপ এক বার দ্রোণের সঙ্গে দেখা করে যুদ্ধ থামিয়ে দিতে অনুরোধ করেন। যদুবংশ ধ্বংসের কারণও এই কশ্যপ (দ্রঃ- শাম্ব)। কশ্যপের আর এক নাম অরিষ্টনেমি (মহা ১২।২০৮)ও দেখা যায়। দ্রঃ- কাশ্যপ, পরশুরাম, তাম্রা, ক্রোধবশা, মনু, অনলা, পুলোমা।

কহলগাঁও— <কলহ গ্রাম ; দুর্বাসা মুনির চরিত্র অনুসারে। ভাগলপুর জেলাতে। কহলগাঁও থেকে ১ মাইল দূরে উত্তরে খল্লি পাহাড়ের মাথায় মুনির আশ্রম। পাথরঘাটা থেকে ২ মাইল দক্ষিণে।

কহোড়—কহোড়ক=খগোদর। এক মুনি। উদ্দালক ঋষির শিষ্য। অষ্টাবক্রের (দ্রঃ) পিতা। শিক্ষা সমাপ্ত হলে উদ্দালক নিজের মেয়ে সুজাতার (= সুমতি) সঙ্গে বিয়ে দেন। মহাভারতে আছে দশমাস গর্ভ অবস্থাতে সুজাতা কহোড়কে কিছু অর্থের জন্য বলেন ; কহোড় জনকের কাছে আসেন। এখানে বন্দী তর্কে পরাজিত করে কহোড়কে জলে ডুবিয়ে দেন।

কহ্লণ—কাশ্মীর ইতিহাস রাজতরঙ্গিনীর রচয়িতা। কহ্লণের পিতা চম্পক কাশ্মীর-রাজ হর্ষের (খৃ ১০৮৯-১১০১) মন্ত্রী ছিলেন। কহ্লণের পৃষ্ঠপোষক অলকদত্তের উৎসাহে আট তরঙ্গ রাজ তরঙ্গিনী রচনায় ১০৭০ শকাব্দে কহ্লণ প্রবৃত্ত হন এবং পরের বছর বইটি সম্পূর্ণ হয়। কিংবদন্তি ও নানা কাহিনী গ্রহণ করলেও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গি রক্ষা করতে কহ্লণ যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন।

কাওয়াদোল—গয়ার কাছে বিচ্ছিন্ন একটি পাহাড়। বরাবর পর্বত (খলতিক) শাখা ; এখানে নাগার্জুন গুহা রয়েছে। শীলভদ্র বিহারও (দ্রঃ) এখানে ছিল ; হিউ-এন-ৎসাঙ এসেছিলেন।

কাক—দ্রঃ-কলাবতী। কশ্যপ ও তাম্রার একটি সন্তান কাকী ; এই কাকী থেকে সমস্ত কাকের জন্ম। মরুত্ত যজ্ঞে ধর্ম কাকের রূপ ধরে পালিয়েছিলেন ফলে ধর্ম কৃতজ্ঞতায় বর দেন পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে তণ্ডুল বলি দিলে সেই বলি কাকেরা পাবে।

কাকগিরি—(১) কামাখ্যা। (২) মায়াপুরী। (৩) পাঞ্জাবে দেবিকা নদীর তীরে একটি তীর্থ।

কাকী—কার্তিকেয়ের সাত জন ধাত্রী মাতাঃ—কাকী, হলিমা, বৃহলী, পদ্মালা, আর্যা, রুদ্রা ও মিত্রা (দ্রঃ-কাক)। (মহা ১৷২১৭৷৮)

কাকৌথ—ককুত্থ, কুকুত্থ। ছোট নদী বর্হি (দ্রঃ) ; কাসিয়া/কসিয়া থেকে ৮ মাইল নীচে ছোট গণ্ডকে এসে পড়েছে। একটি মতে ঘাগি নদী ; গোরখপুর জেলাতে। মতান্তরে নেপালে বাগমতী নদী।

কাক্ষীবতী—রাজর্ষি কাক্ষীবানের মেয়ে ভদ্রা। পুরুবংশীয় (মহা ১৷১১১৷১৫) রাজা ব্যুষিতাশ্বের স্ত্রী। রাজা যক্ষ্মাতে মারা যান। কাক্ষীবতী স্বামীর দেহ জড়িয়ে ধরে কাঁদছিলেন। এমন সময় ব্যুষিতাশ্ব আকাশবাণী করে স্ত্রীকে ঘরে ফিরে গিয়ে ঋতু স্নান করে শুয়ে থাকতে বলেন ; সন্তানবতী করে দেবেন। যথাকালে মৃতস্বামীর ঔরসে সাতটি সন্তান হয়।

কাক্ষীবান—গৌতম (অহল্যার স্বামী নন) মহর্ষি যখন গিরিব্রজে বাস করছিলেম তখন উশীনর দেশের একটি শূদ্রা রমণীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন এবং ছেলে হয় কাক্ষীবান ; যুধিষ্ঠিরের সভায় ছিলেন। কাক্ষীবানের ছেলে চণ্ডকৌশিক, মেয়ে ভদ্রা ও ঘোষা। দ্রঃ-কাক্ষীবতী।

কাঞ্চী—কাঞ্চিপুরম্, কাঞ্জিবরম ক/কো-ঞ্জিভরম। ১২°৪৯'৪৫" উ, ৭৯°৪৫' পূ। মাদ্রাজ প্রদেশে প্রাচীন সহর। অতি প্রাচীন সমৃদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র। খৃ-পূ. ২-শতকে

মহাভাষ্যে এর উল্লেখ আছে। দ্রাবিড় বা চোল রাজধানী (মহা, পদ্ম)। পলর নদীর তীরে মাদ্রাজের ৪৩ মাইল দ-পশ্চিমে। এই অংশ চোল, দ্রাবিড় বা তোণ্ডমণ্ডল নামে পরিচিত ছিল। ৬-শতকে হিউ-এন-ৎসাঙ এখানে এসেছিলেন ; ধর্মে জ্ঞানে বিদ্যায় ও বিক্রমে ভারতের একটি শ্রেষ্ঠ স্থান বলে উল্লেখ করে গেছেন। ভারতে ৭টি মোক্ষদায়িকা নগরীর একটি। দুটি ভাগ ঃ-শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী। দাক্ষিণাত্যের স্মার্তদের মতে শিবকাঞ্চী বারাণসীর সমান। শিবকাঞ্চী থেকে ৬-কি-মি দূরে বিষ্ণুকাঞ্চী। নগরের পূর্ব দিকে বিষ্ণু কাঞ্চী (দেবতা বরদ-রাজ), পশ্চিম শিবকাঞ্চী (দেবতা একাম্র-নাথ ও দেবী কামাক্ষী) দ্রঃ-চিত্তমবলম্। শঙ্করাচার্য এই বিষ্ণু মন্দির নির্মাণ করান এবং শিব কাঞ্চীতে কামাখ্যা দেবীর মন্দিরের সীমানায় শঙ্করাচার্যের সমাধি রয়েছে। দ্রঃ-কেদারনাথ। এই নগরের মধ্যে বিখ্যাত তীর্থ শিবগঙ্গা। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। দ্রঃ-নালন্দা।

কাঠমন্ডু—প্রাচীন নাম মঞ্জুশ্রীপত্তন। নেপালের রাজধানী ; ৮৫°১২′ পূর্ব এবং ২৭°৪২′ উ। অর্দ্ধ চন্দ্রাকার, ৭০০ বর্গ কি-মি ব্যাপী মনোরম উপত্যকা; মধ্য হিমালয়ে ১৪০০ মিটার উচ্চে। উত্তর ও উ-পশ্চিমে নাগার্জুন ও শিবপুরী পর্বত এবং দক্ষিণে মহাভারত পর্বত। বর্তমানে রক্সৌল থেকে কাঠমনডু পাকা সড়ক তৈরি হয়েছে। উত্তর থেকে বিষ্ণুমতী নদী ও পূব দিক থেকে বাগমতী নদীর মিলন স্থানে অবস্থিত। কাহিনী আছে এখানে বৃষ্টির রাজা নাগরাজের বাসস্থান স্বরূপ একটি হ্রদ ছিল। কোতওয়াল পাহাড় বিদীর্ণ করে মঞ্জুশ্রীদেব জল বার করে দিয়ে এই স্থানটিকে জনপদে পরিণত করেন। বার হয়ে যাওয়া এই জল বাগমতী নদী। এই জল পরে দক্ষিণে চোভার গিরি প্রাচীরে আটকে গেলে মঞ্জুশ্রীদেব খড়্গ দিয়ে আবার পথ করে দেন এবং বাগমতী বুড়িগণ্ডকীতে গিয়ে মেশে। অপর কাহিনী অনুসারে নেওয়ার জাতি এই জনপদের স্থাপয়িতা। নেওয়ার ইতিহাস বুদ্ধের প্রায় সমসাময়িক। বুদ্ধ এখানে স্বয়ম্ভুনাথ ; পদ্মের কোরক থেকে তাঁর জন্ম। কাঠমন্ডুর পশ্চিমে স্বয়ম্ভুনাথের চৈত্য মন্দিরে (প্রবাদ ২০০০ বছরেরও পুরাতন) স্তূপের মাথায় এই পদ্ম কোরকের প্রতীক আছে। বুদ্ধ এখানে নিজে এসেছিলেন। লিচ্ছবি রাজবংশ বৈশালী থেকে এখানে আসে এবং ৭২৩ খৃস্টাব্দে এই বংশের রাজা গুণকমাধব কান্তিপুর সহর স্থাপন করেন। কথিত আছে যোড়শ শতকে নরসিংহ মল্লের সময় দৈব সহায়তায় একটি মাত্র শালবৃক্ষের টুকরো থেকে একটি মণ্ডপ বা ধর্মশালা তৈরি হয়েছিল। এই কাষ্ঠমণ্ডপটি এখনও দরবার স্কোয়ারের এক দিকে বিদ্যমান। কাষ্ঠমণ্ডপ থেকে নাম হয় কাঠমনডু। এখানকার প্রাচীন ও বর্তমান অধিবাসী মঙ্গোলীয় নেওয়ার জাতি। এখানকার মল্লরাজ বংশ দক্ষিণ ভারত থেকে আগত বলা হয় ; দক্ষিণ ভারতের প্রভাব এখানে বেশ স্পষ্ট। শংকরাচার্য এখানে বিখ্যাত পশুপতিনাথ মন্দির স্থাপন করেন। হিন্দু-রাজ্য হলেও মৌর্য যুগ থেকে এখানে বৌদ্ধধর্মের প্রচুর প্রভাব ছিল। এই প্রভাব কমে এলেও এখানে ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছে। তান্ত্রিক আচার-প্রধান মহাযানী বৌদ্ধধর্মের প্রভাব এখানকার হিন্দুধর্মে প্রচুর দেখা যায়।

এখানে পশুপতিনাথের মন্দির ১০০০ বছরের অধিক পুরাতন। কাঠমনডুর দক্ষিণে মচ্ছেন্দ্রনাথের মন্দির। কাঠমনডুর পশ্চিমে স্বয়ম্ভুনাথের চৈত্য মন্দির। কাঠমনডু থেকে বাগমতীর উৎসে যাবার পথে বোধনাথের মন্দির।

কাণানদী—রত্নাকর নদী। হুগলি জেলাতে; এর তীরে খানাকুল কৃষ্ণনগর। এখানে মহাদেব ঘণ্টেশ্বরের মন্দির রয়েছে।

কাণাড়—দ-কানাড়=তুলুঙ্গ (দ্রঃ); উ-কানাড় ক্রৌঞ্চপুর।

কাণ্ডর্ষি—বেদের একটি অংশের মীমাংসক ঋষি। যেমন কর্মকাণ্ডের মীমাংসক জৈমিনি; ব্রহ্মকাণ্ডের বেদব্যাস; ভক্তিকাণ্ডের শাণ্ডিল্য।

কাত্যায়ন—মহর্ষি কাত্যের ছেলে। এক জন মুনি। মহিষাসুর এ'র শিষ্য। রৌদ্রাশ্বের তপস্যা ভগ্ন করার জন্য কাত্যায়ন শিষ্যকে শাপ দিয়েছিলেন যে মেয়েদের হাতে নিহত হতে হবে। দ্রঃ-কাত্যায়নী, কতি।

কাত্যায়নী—(১) ভগবতী মূর্তি। কাত্যায়নের শাপের কারণে ব্রহ্মাদি দেবতাদের নিজ নিজ দেহ থেকে তেজ বার হয়ে এই তেজ মিলিত হয়ে এই দেবীর সৃষ্টি হয়। কাত্যায়ন এ'র প্রথম পূজা করেন বলে নাম কাত্যায়নী। দশভূজা সিংহবাহিনী। আশ্বিনে কৃষ্ণা চতুর্দশীতে বোধিতা হন; সপ্তমীতে দেবতেজে আকার গ্রহণ; অষ্টমীতে অলংকৃতা, নবমীতে মহিষাসুরকে বধ। বৃহৎধর্মপুরাণে ব্রহ্মা আশ্বিনে কৃষ্ণা নবমীতে বোধন করেছিলেন। দেবীর বরে কৃষ্ণা নবমীতে কুম্ভকর্ণ, ত্রয়োদশীতে লক্ষ্মণের হাতে অতিকায়, অমাবস্যা রাত্রিতে মেঘনাদ, প্রতিপদে যমরাক্ষ, দ্বিতীয়াতে দেবান্তক নিহত হন। সপ্তমীতে দেবী রামের অস্ত্রে প্রবেশ করেন, অষ্টমীতে রামরাবণের যুদ্ধ। অষ্টমী নবমী সন্ধিতে রাবণের মাথা সাময়িকভাবে ছিন্ন হয়; নবমীতে নিহত হয়।

চণ্ডী বা দুর্গার বাহন সিংহ। কদাচিৎ গোধা। কাত্যায়নী ১০-ভুজা; হরিবংশে ১৮ ভুজা। কাদম্বরী ও ভাগবত ইত্যাদিতে উল্লেখ আছে। একটি মতে কাত্যায়নের শাপের কারণে দেবীর উদ্ভব; দেবতাদের মিলিত তেজমূর্তি। কাত্যায়ন প্রথম পূজা করেছিলেন বলে নাম হয় কাত্যায়নী। হরিবংশে দেবীকে কিরাতী; চীনবসনা; চৌরসেনানমস্কৃতাম্ বলা হয়েছে; বনে ও উপবনে থাকেন; শবর, পুলিন্দ বর্বরৈঃ অভিপূজিতা। সারদা তিলকে পুলিন্দ কন্যা। নারদ পঞ্চরাত্রে কিরাতিনী বেশ। দ্রঃ- উচ্ছিষ্ট চণ্ডালিনী কুমারী, চণ্ডী।

কুষাণ সম্রাট হুবিষ্কের মুদ্রায় যেন ঈশ ও ননা মূর্তি রয়েছে। জিতেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে এ মূর্তি ভবেশ ও উমা-র। ভারহুতে লক্ষ্মী সরস্বতী আছেন দুর্গা নাই। গুপ্তযুগে (খৃ-৪-৫ শতকে) মহিষাসুর (দ্রঃ) মর্দিনীর মূর্তি প্রচলিত হয়েছিল। ভিলসার নিকট উদয়গিরিতে বরাহ গুহাতে খৃঃ ৫-শতকে নির্মিত ১২-হাত দুর্গামূর্তি রয়েছে; দেবী শূলের দ্বারা মহিষাকৃতি একটি অসুরকে বধ করছেন। দেবীর দুহাতে গোধা। মার্কণ্ডেয় পুরাণ খৃ: ৫-শতকে রচিত। খৃ, ১১-শতকে ভবদেব ভট্ট দুর্গাপূজা পদ্ধতি রচনা করেছিলেন। দুর্গা (দ্রঃ) পূজাটি কাত্যায়নীর পূজা। (২) যাজ্ঞবল্ক্যের এক স্ত্রী।

যাজ্ঞবল্ক্য যখন সংসার ত্যাগ করেন তখন এই কাত্যায়নী সংসারের যত কিছু ভাগ গ্রহণ করেন। অপর স্ত্রী মৈত্রেয়ী (দ্রঃ)।

কান্‌হেরি—প্রাচীন নাম কৃষ্ণগিরি। মহারাষ্ট্রের ঠানা জেলায়। ভারতের অন্য কোন পাহাড়ে এত শৈলখাত বৌদ্ধগুহা (শতাধিক) নাই। খৃস্টীয় ১ম শতক থেকে ১০-ম শতক পর্যন্ত স্থানটি জীবিত ছিল। কাছে সমুদ্র এবং শূর্পারক (সোপারা) কল্যাণ, চেমুল প্রভৃতি সমৃদ্ধশালী বন্দরের সঙ্গে যাতায়াতের সুবিধা থাকার জন্য এখানের শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব হয়েছিল। গুহাগুলির স্থাপত্য সে রকম নয়; সংখ্যাতেই অধিক। তবে গুপ্ত ঐতিহ্যের অনুকরণে খৃস্টীয় ৬ শতকের উৎকীর্ণ চিত্রগুলিতে কমনীয় শিল্প সুষমা আছে। সাধারণত গুহাগুলি ছোট। অধিকাংশ গুহার সামনে একটি অঙ্গন, অঙ্গনের দুপাশে শৈলখাত প্রাচীর, প্রাচীরে এক অংশে একটি জলাধারের ঠিক ওপরে একটি কুলুঙ্গি। অঙ্গনের পর উ'চু স্তম্ভযুক্ত একটি বারান্দা; বারান্দার পর একটি বাসকক্ষ অথবা স্তম্ভহীন হলঘর। কিছু হলঘরে গবাক্ষ আছে এবং প্রাচীনতর অধিকাংশ গবাক্ষগুলিতে জালি আছে। বৃহত্তর হলঘরগুলির এক দিকে কয়েকটি প্রকোষ্ঠ আছে। প্রাচীরের গায়ে বেষ্টনী গরাদ ক্ষোদিত। প্রায় সব গুহাতেই একটি করে জলাধার রয়েছে। দরবার গুহাটির স্বাতন্ত্র্য প্রচুর। এটিতে আটটি স্তম্ভযুক্ত অষ্টকোণী একটি বারান্দা; হলঘরের পেছন দিকের কেন্দ্রস্থলে মুখ্য দেবায়তন এবং দশটি প্রকোষ্ঠ। হলঘরে ৩ দরজা, ২ জানলা। এই হলের মেঝেতে এলোরার ৫-নং গুহার মত দুটি নীচু শৈলখাত বেঞ্চি আছে। মুখ্য দেবায়তনে প্রলম্বপাদ আসনে উপবিষ্ট ধর্মচক্র প্রবর্তন মুদ্রায় বুদ্ধদেবের মূর্তি রয়েছে। এই গুহাতে ৮৫৩ খৃস্টাব্দের রাষ্ট্রকূট নৃপতি অমোঘবর্ষ ও শীলহার বংশীয় রাজপুত্র কপর্দির 'লেখ' রয়েছে। শাতবাহন রাজা যজ্ঞশ্রী শাতকর্ণির (খৃ ২ শতক)-রাজত্ব কালে নির্মিত ৩য় গুহাটি চৈত্য গৃহ; কার্লার চৈত্য গৃহের মত দুটি স্তম্ভ যুক্ত এবং কার্লার চৈত্র গৃহের অতি অক্ষম অনুকরণ। এই দুটি স্তম্ভের মধ্যে একটিতে বুদ্ধদেবের মূর্তি রূপায়িত হয়েছে। বুদ্ধ প্রতিমার সঙ্গে বোধিসত্ত্ব ও কতকগুলি নাগমূর্তি রয়েছে এবং এগুলিতে অমরাবতী শৈলীর প্রভাব সুস্পষ্ট। কতকগুলি গুহার দেওয়ালে প্রধানত বুদ্ধদেবকে কেন্দ্র করে প্রচুর চিত্রাবলী রয়েছে। অধিকাংশ বুদ্ধমূর্তিগুলি সুঠাম ভঙ্গিমায় ও অলৌকিক আনন্দের অভিব্যক্তিতে ভাস্বর। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বুদ্ধদেবের দুপাশে এক জন করে বোধিসত্ত্বের মূর্তি। বুদ্ধহীন ছবির সংখ্যা অল্প। তিনটি গুহায় অষ্ট মহাভয়ের কবল থেকে ভক্তদের উদ্ধাররত বোধিসত্ত্বের মূর্তি এবং খৃস্টীয় ৬ শতকে ক্ষোদিত ৪১ নং গুহায় একাদশ মস্তকবিশিষ্ট চতুর্ভুজ অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি অনন্য। ৬৭ নং গুহায় দীপংকর জাতকের কাহিনী একটি চিত্রে উৎকীর্ণ রয়েছে। এলোরায় যে রকম বজ্রযানীয় দেবদেবীর প্রচুর পূর্ণায়ত মূর্তি রয়েছে এখানে কিন্তু সে রকম নেই। এই বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানটির একটি নিজস্ব শ্মশান ছিল এবং বিশিষ্ট ভিক্ষুদের ভস্মাবশেষের ওপর ছোট ছোট স্তূপ বিদ্যমান ছিল।

কান্তিপুরী—(১) কোটোয়াল। গোয়ালিয়র থেকে ২০ মাইল উত্তরে। (২) কাষ্ঠমণ্ডপ। (৩) বিষ্ণুপুরাণে এলাহাবাদের কাছে গঙ্গাতীরে।

কান্দাহার—নব গান্ধার। পেশোয়ারে কণিষ্কের স্তূপ থেকে বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্র এনে এখানে স্থাপন করা হয়েছিল এবং এখনও রক্ষিত আছে বলা হয়। হরকৃহইতি (জেন্দাভেস্তা); হরউবতিস্ (বেহিস্তুন শিলালেখ); অরকোসিয়া, সৌকুট।

কান্যকুব্‌জ—অপর নাম কন্যাকুব্জ (দ্রঃ), কুশস্থল, কুসুমপুর, গাধিনগর, মহোদয়, কনৌজ। বর্তমান নাম কনৌজ; ২৭°২'৩০" উ×৭৯°৫৮' পূ। উত্তর প্রদেশে ফররুখাবাদ জেলায়। বর্তমানে একটি ভগ্নাবশেষ সামান্য সহর ও বাণিজ্য কেন্দ্র। প্রাচীন কালে এর উত্তর-পূর্ব সীমানায় গঙ্গা ছিল। এখন প্রায় ৬-কি মি দূরে সরে গেছে। কালিন্দীর পশ্চিম তীরে; কালিন্দী গঙ্গা সঙ্গমের ৬-মাইল উপরে গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে নদীতট থেকে একটি পাহাড় খাড়া উঠে গেছে। পাহাড়ের পশ্চিমে প্রাচীন কান্যকুব্জ একটি দুর্ভেদ্য দুর্গের মত অবস্থিত ছিল। প্রাচীন সাহিত্য ও শিলালেখে কান্যকুব্জের নাম পাওয়া যায়। মহাভারতের যুগে পঞ্চালের রাজধানী ছিল কাম্পিল পরে রাজধানী হয় কান্যকুব্জ। রাজা কুশনাভ মহোদয় নামে একটি নগরী স্থাপন করেন; এই মহোদয়ের পরবর্তী নাম কন্যাকুব্জ (দ্রঃ) বা কান্যকুব্জ। খৃ পূ-২ শতকে মহাভাষ্যে এর উল্লেখ আছে। সম্ভবত এটি টলেমি বর্ণিত কানোগিজা। ফা-হিয়েন এর নাম অনুবাদ করে কা-নাও-য়ি বা কানোয়ি করেছিলেন। হিউ-এন ৎসাঙ রাজধানী ও রাজ্য দুটিকেই কনৌজ বলেছিলেন। বিভিন্ন যুগে কনৌজের রাজসভার অনুগ্রহ প্রাপ্ত কবি ও নাট্যকারদের মধ্যে বাণ, বাকপতিরাজ, রাজশেখর ও শ্রীহর্ষের নাম উল্লেখযোগ্য। হিউ-এন-ৎসাঙের বর্ণনায় ৮ কি. মি.×২ কি. মি. সহর। এই সহর এবং তার চার পাশের অঞ্চলের অধিবাসীদের ভাষা মার্জিত ও সুবোধ্য; এবং এখানকার বাচন ভঙ্গি ভারতের অন্যত্র আদর্শ ছিল। নবম শতকে রাজশেখরও এই কথা বলে গেছেন। এখানকার পুরবাসিনীদের সাজসজ্জাও সকলের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছিল। প্রবাদ আছে বাঙলাতে আদি শূর এখান থেকে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে এনেছিলেন এবং শ্রীহর্ষ এঁদের মধ্যে অন্যতম। গুপ্তোত্তর যুগে কান্যকুব্জ ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক ছিল। বৌদ্ধযুগে দ-পাঞ্চালের রাজধানী; এবং কর্পূর-মঞ্জরীতেও। গাধিরাজের রাজধানী; বিশ্বামিত্রের জন্মস্থান। হর্ষবর্দ্ধন বা দ্বিতীয় শিলাদিত্যের সময় হিউ-এন-ৎসাঙ এসেছিলেন। এই হর্ষ নবী মহম্মদের সমসাময়িক। ধাবক ও চন্দ্রাদিত্য ও হর্ষের (৬১০-৬৫০ খৃ) সভাসদ। কনৌজের যশোবর্মার সভাতে ভবভূতি ছিলেন। ললিতাদিত্য কনৌজ জয় করলে ভবভূতি ললিতাদিত্যের রাজধানী কাশ্মীরে চলে যান। হর্ষবর্ধনের আগে এখানে মৌখরি রাজারা রাজত্ব করতেন। থানেশ্বর থেকে হর্ষবর্ধন এখানে রাজধানী আনেন। নগরের দ-পশ্চিমে তিনটি বড় বৌদ্ধ বিহার; একটিতে বুদ্ধের একটি দাঁত ছিল। কান্যকুব্জে বামনের বিখ্যাত মন্দির ছিল। প্রাচীন হিন্দু প্রাসাদের রঙমহল ছিল তিনকোণা দুর্গের দ-পশ্চিম কোণে; আজও এটি অবশিষ্ট আছে। খৃস্টীয় ৫ শতকে ফা-হিয়েন এখানে বৌদ্ধদের

দুটি সংঘারাম দেখেছিলেন ; হর্ষের সময় এখানে সংঘারাম ছিল এক শত। প্রবাদ আছে এই অঞ্চলে গঙ্গার তীরে বুদ্ধদেব ধর্ম ও জীবনের ক্ষণিকতা প্রচার করেছিলেন। প্রাচীন প্রাসাদ ও মন্দির শিল্প শোভায় অতুলনীয় ছিল ; বর্তমানে এগুলি নাই। এখানে খৃস্টীয় ৪ ও ৫-শতকে গুপ্ত বংশ ; ৬-শতকে মৌখরি বংশ ও ৮-শতকের প্রথম দিকে যশোবর্মা রাজত্ব করেন। ৭-শতকে হর্ষবর্ধনের সময় কনৌজ সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। পাল বংশের সম্রাট ধর্মপালের এখানে অভিষেক হয়। ৯-শতকের প্রথমে প্রতিহার-রাজ কনৌজ দখল করেন ; এবং এঁদের রাজধানী হিসাবে কনৌজ গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহন করেছিল। ১০-শতকের প্রতিহারদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে কনৌজ সাম্রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে যায়। (২) কাবেরী নদীর যে অংশে পাণ্ড্য রাজধানী উরগপুর রয়েছে সেই অংশটিকে কান্যকুব্জ নদী বলা হত।

কাপালিক—শৈব্য বা শাক্ত সম্প্রদায়। এরা ছয়টি মুদ্রা, দুটি উপমুদ্রার তত্ত্বজ্ঞ ও ধারক। কণ্ঠিকা বা ঘণ্টিকা, রুচক, কুণ্ডল, শিখামণি এই চারটি অলংকার এবং ভস্ম ও যজ্ঞোপবীতে এই ছয়টি মুদ্রা, এবং কপাল ও খট্টাঙ্গ দুটি উপমুদ্রা। এই মুদ্রার দ্বারা দেহ মুদ্রিত করলে পুনর্জন্ম হয় না। যোনিরূপ আসনে অবস্থিত আত্মাকে ধ্যান করে এঁরা নির্বাণ লাভ করেন। এঁরা বামাচারী; অন্য নাম মনে হয়, সোমসিদ্ধান্তী। এঁদের শাস্ত্র ভৈরবাষ্টক, চন্দ্রজ্ঞান, হৃদ্‌ভেদতন্ত্র, কলাবাদ। বহুসময় এঁরা শ্মশানবাসী, নরপালে ভোজন বিলাসী, অগ্নিতে নরমাংস আহুতি দেন, ব্রাহ্মণ কপালে সুরাপান করেন এবং নরবলি দিয়ে মহাভৈরবের পূজা করেন।

কাপিস্থল—কপিস্থল। কবিতাল (অলবেরুনি)। কাপিস্থল (বৃহৎ-সংহি)=কাম্বি-স্থোলি কাম্বিস্থোলোই (এরিয়ান) ; বর্তমানে কৈথাল। পাঞ্জাবে কর্ণাল জেলাতে। যুধিষ্ঠির প্রতিষ্ঠিত। নগরের মাঝখানে মস্তবড় হ্রদ আছে।

কাবুল—কুভা (বেদে), ঊর্দ্ধস্থান ; ওর্টোস্পান (গ্রীক)। কাবুল উপত্যকার নীচের অংশ। কুনর (=খোয়াসপেস) ও সিন্ধু নদীর মধ্যগত বা কাবুল নদী এলাকা গন্ধর্ব দেশ বলে পরিচিত। দ্রঃ- গান্ধার, কুভা।

কাবুল নদী—কুভা (বেদে), কুহু (পুরাণে)। দ্রঃ- কুভা।

কাবেরী—নদী। দ্রঃ- ক্রৌঞ্চ। অর্দ্ধগঙ্গা (দ্রঃ), চেলগঙ্গা, সহ্যাদ্রিজা, চন্দ্রতীর্থ। (১) ভারতে একটি নদী। কুর্গে ব্রহ্মগিরি পর্বতে চন্দ্রতীর্থ প্রস্রবণ থেকে উৎপন্ন। শিবসমুদ্র নামক স্থানে কাবেরীর একটি জলপ্রপাত রয়েছে। দাক্ষিণাত্যে একবার ভীষণ গ্রীষ্মে সব জল শুকিয়ে গেলে অগস্ত্য (দ্রঃ) কাবেরী নদীকে মহাদেবের কাছ থেকে কমণ্ডলু করে নিয়ে আসেন। পথে ক্রৌঞ্চকে পাহাড়ে পরিণত করেন এবং তারপর একটি স্থানে (দ-ভারতে) বসে অগস্ত্য ধ্যান করছিলেন। ইন্দ্রের অনুরোধে গণেশ কাকের বেশে এসে অগস্ত্যের কমণ্ডলু উল্টে দিয়ে যান ; কাবেরী নদী মাটিতে গড়িয়ে যায় ; নদীর উৎপত্তি হয়। কাকের সঙ্গে অগস্ত্যের বচসা হয় এবং শেষ পর্যন্ত গণপতি নিজের মূর্তি ধরে অগস্ত্যকে আশীর্বাদ করেন। হরিবংশ (১।২৭।৯) যুবনাশ্বের শাপে গঙ্গা অর্দ্ধেন

দেহেন কাবেরীকে (দ্রঃ- জহ্নু) সৃষ্টি করেন। (২) নর্মদার শাখা ; উত্তর দিকে ; ওঙ্কারনাথের কাছে (পদ্ম ও মৎস্য)। নর্মদা ও কাবেরী সঙ্গম তীর্থ।

কাব্য—কাব্যের সংজ্ঞা হিসাবে ভামহ বলেছেন শব্দ ও অর্থের সাহিত্য (=সহযোগিতা) হচ্ছে কাব্য। দণ্ডীর মতে 'ইষ্টার্থব্যবচ্ছিন্ন' পদাবলীই কাব্য ; রুদ্রটের মতে কবিকর্মই কাব্য ; মম্মটের মতে অদোষ, গুণযুক্ত, সালংকার শব্দ ও অর্থই কাব্য এবং বিশ্বনাথের মতে রসাত্মক বাক্যই কাব্য। ভামহ আরো বলেছেন প্রতিভা থাকার একান্ত দরকার। মম্মট ইত্যাদির মতেও প্রতিভার একান্ত প্রয়োজন। সংস্কৃতে গদ্য ও পদ্য কাব্যের মূলত দুটি শ্রেণী। দণ্ডী তাঁর কাব্যাদর্শে কাব্যের তিনটি শ্রেণী স্বীকার করেছেন ; গদ্য, পদ্য, গদ্যপদ্যমিশ্র।

পদ্যবন্ধ কাব্যের ৫টি শ্রেণী ঃ—মুক্তক, কুলক, কোষ, সংঘাত, ও সর্গবন্ধ (=মহাকাব্য); গদ্যবন্ধ কাব্যের দুটি শ্রেণী আখ্যায়িকা ও কথা। গদ্য ও পদ্যের মিশ্রকাব্য চম্পূকাব্য। পরবর্তী কালে খণ্ডকাব্য ও বিরুদকাব্য ও নামে আরো দুটি শ্রেণী স্বীকৃত হয়েছিল। অর্থাৎ মোট দশটি শ্রেণী এবং এগুলি সবই শ্রব্য কাব্য। এই দশটি শ্রেণীর মধ্যে মহাকাব্যই অন্যান্য কাব্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত।

মহাকাব্যের বিষয়বস্তু হয় ইতিহাসকথা ; প্রথমে, থাকে আশীর্বচন, নমস্ক্রিয়া, বা বস্তু নির্দেশ। নগর, পাহাড়, সমুদ্র, চন্দ্রসূর্যের উদয় ও অস্ত, ঋতু, উদ্যানক্রীড়া, সলিলক্রীড়া, মধুপান, রতিউৎসব, বিপ্রলম্ভ, বিবাহ, কুমারজন্ম, গূঢ়মন্ত্রণা, দূতপ্রেরণ, যুদ্ধযাত্রা, যুদ্ধ এবং শেষকালে নায়কের অভ্যুদয় বর্ণিত হয়। বিবিধ অলংকার, রস ও ভাব থাকে। শ্লোকগুলি শ্রুতি সুখকর হয় ; অন্যূন আটটি সর্গ থাকে। কথাবস্তু মুখ, প্রতিমুখ ইত্যাদি পঞ্চসন্ধি সমন্বিত হয়। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুবর্গের উপদেশ থাকে ; এ ছাড়া মানব চরিত্র, সমাজ জীবন, রাজনীতি ইত্যাদির বিষয়ও থাকে। মহাকাব্য হিসাবে পরিচিত অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরানন্দ প্রাচীনতম। কালিদাসের রঘুবংশ ও কুমারসম্ভবও দুটি প্রসিদ্ধ মহাকাব্য। ভারবির (৬-৭ শতক) কিরাতার্জুনীয়, ভর্তৃহরি রচিত রাবণবধ, কুমারদাস রচিত জানকীহরণ, মাঘ রচিত শিশুপালবধ এই চারটিও মহাকাব্য নামে পরিচিত। ভারবি ও মাঘের পর রচিত মহাকাব্যের মধ্যে কৃত্রিমতা বাড়তে থাকে এবং কবিত্ব ক্রমশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে থাকে। রত্নাকর রচিত হরবিজয়, শিবস্বামী রচিত কপ্‌ফিণাভ্যুদয়, মঙ্খক রচিত শ্রীকণ্ঠচরিত, অভিনন্দ রচিত রামচরিত, ও শ্রীহর্ষ রচিত নৈষধচরিতও মহাকাব্য রূপে পরিচিত। এগুলি মনকে মোটেই ছুঁতে পারে না তবে নৈষধচরিত পাণ্ডিত্যে পরিপূর্ণ। পরবর্তী যুগে মহাকাব্য রচনা স্রেফ পাণ্ডিত্যের কসরতে পরিণত হয়েছিল। কবিরাজ রচিত রাঘবপাণ্ডবীয়, হরদত্তসূরি রচিত রাঘবনৈষধীয়, বিজয়নগরের সভাকবি রচিত রাঘব-পাণ্ডব-যাদবীয় এবং ভৌমক প্রণীত রাবণার্জুনীয় মহাকাব্য বলে পরিচিত। এগুলিতে প্রতিটি শ্লোকে দুই বা তিন অর্থ হয়ে থাকে।

ঐতিহাসিক কাব্য হিসাবে রাজতরঙ্গিণী, শঙ্কুক রচিত ভুবনাভ্যুদয়, ক্ষেমেন্দ্র রচিত নৃপাবলী, পদ্মগুপ্ত রচিত নবসাহসাঙ্কচরিত, বিহ্লণ রচিত বিক্রমাঙ্কদেব-চরিত,

সন্ধ্যাকরনন্দী রচিত রামচরিত, জোনরাজ রচিত পৃথ্বীরাজবিজয়, হেমেন্দ্রসূরি রচিত কুমারপালচরিত, পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ কৃত প্রাণাভরণ, আসফ-বিলাস, ও জগদাভরণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। রাজতরঙ্গিণী বাদে অন্য গ্রন্থগুলির ঐতিহাসিক তথ্য বহু-বহু ত্রুটিপূর্ণ।

খণ্ডকাব্য ঃ—এক শ্রেণীর সংস্কৃত কাব্য ; মোটামুটি ইংরাজি লিরিক জাতীয়। ঋতুসংহার একটি খণ্ডকাব্য।

দূতকাব্য ঃ—সংস্কৃত সাহিত্যে এটি একটি বিশেষ ধারা। এই ধারায় প্রথম বই কালিদাসের মেঘদূত। পরে মেঘদূতের অনুকরণে ধোয়ী রচিত পবনদূত, বিষ্ণুদাস রচিত মনোদূত, রূপগোস্বামী রচিত উদ্ধবসন্দেশ ও হংসদূত, কৃষ্ণসার্বভৌম রচিত পদাঙ্ক-দূত ইত্যাদি প্রায় একশত দূতকাব্য রয়েছে। দূতকাব্যে নিসর্গবর্ণনা, বহু জনপদের ভৌগলিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক তথ্য এবং ভক্তি ও দার্শনিকতা ছড়িয়ে রয়েছে।

শতককাব্য ঃ—একশত শ্লোকযুক্ত এক একটি কবিতা সংগ্রহ। প্রতি শতকে শ্লোকগুলি একই বিষয়ের ওপর রচিত। দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে এগুলি অপূর্ব। অমরু রচিত অমরুশতক ; ভর্তৃহরি রচিত বৈরাগ্যশতক, নীতিশতক, শৃঙ্গারশতক, শিহ্লণ রচিত শান্তিশতক, ভল্লটশতক, সোমনাথ রচিত অন্যোক্তিশতক, শম্ভু কবি রচিত অন্যোক্তিমুক্তালতা, নীলকণ্ঠ রচিত অন্যাপদেশশতক ও জনৈক অজ্ঞাত কবির মূর্খশতক ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

স্তোত্রকাব্য হিসাবে আর একটি ধারা গড়ে উঠেছিল। বিভিন্ন দেবদেবীর স্তব এই ধারার অন্তর্গত। এই স্তবগুলি বর্ণনা, ভক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে অপূর্ব। যেমন গঙ্গাস্তোত্র, মহিম্নঃস্তোত্র ইত্যাদি।

গদ্যকাব্যের সংখ্যা খুব বেশি নয়। বাণভট্টের কাদম্বরী ও হর্ষচরিত, এবং সুবন্ধুর বাসবদত্তা উল্লেখযোগ্য।

চম্পূকাব্য ঃ—গদ্য ও পদ্যের মিশ্রণ। পদ্যের মধ্যে স্থানে স্থানে কবিতার আশ্রয় নিয়ে রচনায় মাধুর্য ও বৈচিত্র্য বাড়ান হত। চম্পূকাব্যগুলির মধ্যে ভোজ রচিত রামায়ণ চম্পূ সব চেয়ে প্রসিদ্ধ। অনন্তভট্ট রচিত ভারতচম্পূ, নীলকণ্ঠ দীক্ষিত রচিত নীলকণ্ঠবিজয়চম্পূ, বেঙ্কটাধ্বরি রচিত বিশ্বগুণাদর্শচম্পূ, ত্রিবিক্রম রচিত নলচম্পূ, সোমদেব সূরি রচিত যশস্তিলকচম্পূ, জীবগোস্বামী রচিত গোপালচম্পূ, কবিকর্ণপূর রচিত আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ, শংকর কবি রচিত শংকর চেতো-বিলাস-চম্পূ উল্লেখযোগ্য।

কাব্যমাতা—শুক্রের মা ; পুলোমা।

কাব্যালঙ্কার সার সংগ্রহ—উদ্ভট রচিত। 'ভামহবিবরণ' নামে উদ্ভট রচিত অধুনালুপ্ত বিরাট গ্রন্থের সারসংগ্রহ মনে হয়। ৬-টি বর্গে বিভক্ত এবং এতে ৪১-টি বিভিন্ন অলংকার ও তাদের উদাহরণ দেখান আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভামহের লক্ষণগুলি অক্ষরশ বা ঈষৎ পরিবর্তন সহকারে এই গ্রন্থে গৃহীত হয়েছে। উদ্ভটের নিজের রচিত কুমারসম্ভব থেকে নানা উদাহরণ এই কাব্যালঙ্কার সারসংগ্রহে সন্নিবেশিত হয়েছে। এই বইয়ের ওপর প্রতীহারেন্দুরাজ কৃত দুটি টীকা 'লঘুবৃত্তি' ও 'বিবৃতি' পাওয়া যায়।

কাম—স্বাহার এক ছেলে। ইনিও অগ্নি, অদ্ভুত সুন্দর দেখতে। দ্রঃ- গায়ত্রী।

কামদেব—মদন (দ্রঃ)।

কামধেনু—গো জাতির প্রথম। এক জন দেবী যেন। যে কোন প্রার্থিত বস্তু দান করতে পারেন এবং প্রয়োজন হলেই দুধ পাওয়া যায়। নাম অনেক সময় সুরভি এবং নন্দিনী। আবার (রামা ৩।১৪) প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে দক্ষের নাতনি সুরভির গর্ভে রোহিণীর জন্ম ; এবং যেন কশ্যপের ঔরসেই রোহিণীর গর্ভে কামধেনুর জন্ম। আর এক মতে কশ্যপ ক্রোধবশার মেয়ে সুরভি। সুরভির দুটি মেয়ে রোহিণী ও গন্ধর্বী। রোহিণীর সন্তান পৃথিবীর সমস্ত গো জাতি। আর এক ব্যাখ্যা সুরভি যদিও কশ্যপের কন্যা কিন্তু অন্য পুরুষের অভাবে কশ্যপের ঔরসে সুরভির (দ্রঃ) সন্তান হয়। অর্থাৎ ক্রোধবশার মেয়ে হয়েও কশ্যপের স্ত্রী।

মৎস্য পুরাণ মতে বিষ্ণুর শরীর থেকে যে অষ্ট মাতৃকার সৃষ্টি হয়েছিল কামধেনু তাদের মধ্যে অন্যতমা। স্কন্দ পুরাণ মতে সমুদ্রমন্থনে কামধেনু উঠেছিল অর্থাৎ ক্রোধবশার কন্যা নয়। আর এক মতে সমুদ্র মন্থনে অমৃত উঠলে ব্রহ্মা যত পারেন অমৃত পান করেন এবং বমি হয়। ঐ বমি কামধেনু। এই কামধেনুটি রসাতলে থাকেন এবং এর পূব দিকে সুরভি, দক্ষিণে হংসিকা, পশ্চিমে সুভদ্রা, এবং উত্তরে ধেনু অর্থাৎ আরো চারটি কামধেনু রয়েছে। বিষ্ণু যখন অদিতির গর্ভে অবস্থিত সেই সময় সুরভি কৈলাসে ব্রহ্মার আরাধনা করেন এবং ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হয়ে সুরভিকে দেবী করে গোলকে থাকার নির্দেশ দেন। কৃষ্ণ ও রাধা একবার ইন্দ্রিয় ভোগে লিপ্ত ছিলেন। তারপর ক্লান্ত হয়ে দুধ খাবার ইচ্ছা হলে কৃষ্ণ তাঁর দেহের বাম দিক থেকে সুরভি ও বাছুর মনোরথকে সৃষ্টি করেন। সুদাম এই দুধ দুয়ে দেন। মাটির পাত্রে এই দুধ খেতে গিয়ে পাত্র পড়ে ভেঙে যায় এবং পড়ে যাওয়া দুধে ক্ষীর সমুদ্র তৈরি হয়। রাধা ও সখীরা এই সমুদ্রে জলকেলি করেন। এই সুরভির গা থেকে অসংখ্য সুরভির সৃষ্টি হয় এবং এগুলিকে শ্রীকৃষ্ণ গোপদের উপহার দেন। (দে- ভাগ ৯।৪৯)।

কৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণ করলে ইন্দ্র পরাজিত হন। কামধেনু তখন গোকুলে এসে নিজের দুধ দিয়ে কৃষ্ণকে স্নান করিয়ে যান। জমদগ্নি একবার গোকুলে যান এবং কামধেনুকে পূজা করে সন্তুষ্ট করলে কামধেনু তাঁর বোন সুশীলাকে জমদগ্নির হাতে দান করেন। জমদগ্নি আবার স্ত্রী রেণুকাকে এই গরু দান করেন। জমদগ্নির কামধেনু কপিলা ; বশিষ্ঠের শবলা বা নন্দিনী। আরো বহু স্থানে কামধেনুর উল্লেখ রয়েছে। কামধেনুর (পুরাণে সুরভির) সন্তান অজৈকপাৎ, অহির্বুধ্ন্য, ত্বষ্টা ও রুদ্র (হরি ১।৩।৪৯)। দ্রঃ- ত্রিশঙ্কু, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, বসু ও ইন্দ্র।

কামন্দক—নীতিসার গ্রন্থের রচয়িতা। মহাভারতে শান্তিপর্বে এক কামন্দকের উল্লেখ আছে ; নীতিসারের উল্লেখ নাই। গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী শিখরস্বামীই কামন্দক, অনেকে অনুমান করেন। আবার অন্য মতে গুপ্ত যুগের শেষভাগে এই নীতিসার রচিত হয়েছিল।

কামযান—মহাযান, শূন্যযান, গুহ্যসমাজ, সহজিয়া বৌদ্ধ, সহজিয়া বৈষ্ণব, আউল, বাউল, কর্তাভজা, কৃষ্ণকেন্দ্রিক বৈষ্ণবতা ইত্যাদি। এগুলি না জেনেও লিবিডো-কে কেন্দ্র করে গড়ে তোলা ধর্মীয় মতবাদ। সম্পূর্ণ ফ্রয়েডীয় দৃষ্টিভঙ্গি। এঁদের গায়ত্রী কাম-গায়ত্রী (দ্রঃ)। এই কারণেই ভাগবতে আত্মনি অবরুদ্ধ- সৌরত (ভাগ ১০।২৩) সম্ভোগ দেখা যায়। তন্ত্রে (দ্রঃ) আত্মনি অবারিত সৌরত সম্ভোগ। এই কামযানের মোটামুটি দুটি ধারা (১) বৈষ্ণবীয় উজ্জ্বলযান, শবরী, ডোম্বী, তথা রজকিনী রামীর পেছনে ছুটতে থাকা। আর একটি তান্ত্রিক বীভৎসযান ; ভৈরবীর পেছনে ধাওয়া করা। এই সমস্ত আচার্যরা ঋক্‌বেদের উর্বশীর উক্তিকে বা কবীরের উক্তিকে (দ্রঃ- নারী) অস্বীকার করে তথা ধনতান্ত্রিক সমাজকে নস্যাৎ করে পরকীয়া ও ভৈরবীর খোয়াব দেখেছিলেন। দ্রঃ- গোপী, তন্ত্র, রাধা, রাস।

কামরূপ—আসামে। উত্তরে ভুটান মিলে। দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র, লাখ্যা ও বঙ্গ। মণিপুর, জয়ন্তিয়া, কাছাড়, সিলেট ও ময়মন-সিংহের কিছুটা মিলে। রঙপুরও এর অন্তর্গত ছিল। কামরূপ-রাজ ভগদত্তের বাড়ি ছিল রঙপুরে। বর্তমানে কামরূপ গোয়ালপাড়া থেকে গৌহাটি পর্যন্ত। পুরাণে রাজধানী প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর=কামাখ্যা (দ্রঃ) বা গৌহাটি। রাজা নীলধ্বজ কোমটাপুর (বর্তমানে কামতাপুর) নামে কুচবিহারে আর একটি রাজধানী করেন। ব্রহ্মপুত্র নদীর উত্তরে অশ্বক্রান্তা পর্বত ; এখানে কৃষ্ণ ও নরকাসুরের যুদ্ধ হয়েছিল (বৃহদ্‌ধর্ম)। নরকের ছেলে ভগদত্ত ; দুর্যোধনের বন্ধু ছিলেন। অহম রাজারা পূর্বদিক থেকে খৃ ১৩ শতকে আসামে আসেন। অথচ নরকাসুরের বংশধরদের ভৌম (কালিকা পু) বলা হয়েছে এবং ভৌম>অহম যেন। দলপানি নদীর তীরে তাম্রেশ্বরী দেবীর মন্দির ; প্রাচীন কামরূপের উ-পূর্ব সীমানাতে। পিচ্ছিলা কামরূপে একটি নদী (যোগিনীতন্ত্র)। চর্যাপদে (১০-১২ খৃ শতকে) কামরূপের উল্লেখ আছে। অর্থাৎ এই সময়ে শক্তি সাধনার তথা গুহ্য সাধনার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। দ্রঃ- আসাম, কামাখ্যা।

কামশাস্ত্র—যৌন সম্ভোগ শাস্ত্র। ভারতে অতি প্রাচীন কাল থেকে আলোচিত। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৬।২।১২-১৩ ; ৬।৪।২-২৮) প্রথম কামশাস্ত্রের অনুশীলনের পরিচয় রয়েছে। বর্তমানে উপলভ্যমান বাৎস্যায়ন রচিত কামসূত্রই প্রাচীনতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। বাৎস্যায়ন মতেঃ- প্রজা রক্ষা করবার জন্য লক্ষ অধ্যায় ত্রিবর্গ-সাধন এক শাস্ত্র প্রজাপতি উপদেশ দিয়েছিলেন। এই উপদেশের একাংশ নিয়ে স্বায়ম্ভুব মনু ধর্মশাস্ত্র রচনা করেন ; আর এক অংশ নিয়ে বৃহস্পতি অর্থশাস্ত্র তৈরি করেন এবং এই রচনাগুলি এক দেশিক ছিল বলে এবং বাভ্রব্যের রচনা বিরাট ছিল বলে বাৎস্যায়ন গুছিয়ে কামসূত্র রচনা করেন। কামসূত্রের রচনা কাল মনে হয় খৃ ৪-শতকের মাঝামাঝি। এর অনেকগুলি টীকা হয়েছিল ; এগুলির মধ্যে জয়মঙ্গলাই প্রসিদ্ধ।

বাৎস্যায়নে উল্লিখিত নন্দীই সম্ভবত প্রাচীন কামশাস্ত্রকার নন্দিকেশ্বর। উদ্দালক পুত্র শ্বেতকেতু লিখিত সম্ভবত একটি কামশাস্ত্র ছিল। গোণিকাপুত্র রচিত

পারদারিক, দত্তকাচার্য রচিত দত্তকসূত্র বা বৈশিক অধিকরণ, চারায়ণ রচিত সাধারণ অধিকরণ; ঘোটকমুখ রচিত কন্যাসংপ্রযুক্তক; গোনর্দীয় রচিত ভার্যাধিকারিক; সুবর্ণনাভ রচিত সাম্প্রয়োগিক, এবং কুচুমার রচিত ঔপনিষদিকেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। এই চারায়ণ বা দীর্ঘচারায়ণ কোশলরাজ প্রসেনজিতের মন্ত্রী ছিলেন। কুচুমারের ঔপনিষদিকের একটি সংক্ষিপ্ত কাব্যসংস্করণের খণ্ডিত অংশ বর্তমানে পাওয়া যায়। কুচুমারকে ঋষি মনে করা হত এবং তাঁর গ্রন্থ কুচোপনিষদ নামে পরিচিত।

অর্বাচীন কালে অজস্র কামশাস্ত্র রচিত হয়েছিল। কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের মন্ত্রী দামোদর গুপ্ত নবম শতকের গোড়ায় কুট্টনীমত নামে একটি বই লেখেন। ১০ বা ১১ শতকে পদ্মশ্রী বা পদ্মশ্রীজ্ঞান নামে এক বৌদ্ধভিক্ষু নাগরসর্বস্ব রচনা করেন। ক্ষেমেন্দ্র লেখেন বাৎস্যায়নসূত্রসার ও সময়মাতৃকা। বার শতকে কোক্কক লেখেন রতি রহস্য। এই কোক্ককই কোকা পণ্ডিত। এর পরবর্তী গ্রন্থগুলি রতিরহস্য অনুকরণে রচিত। রতিরহস্যের অন্যূন চারটি টীকা হয়েছিল; এগুলির মধ্যে কাঞ্চীনাথের টীকাই বিখ্যাত। এর পর আরো বই লেখা হয়েছিল। ১৭ শতকে কামপ্রবোধ রচনা করেছিলেন বিকানীর রাজ অনূপ সিংহের সভাকবি ব্যাসজনার্দন।

কামা—পৃথুশ্রবার মেয়ে। অযুতন্যায়ীর স্ত্রী। ছেলে অক্রোধন।

কামাখ্যা—২৬° ১০′উ×৯১° ৪৫′ পূ। আসামে কামরূপ জেলার ঝালুকাবাড়ি থানার অন্তর্গত। ব্রহ্মপুত্র নদের বাম তীরে অবস্থিত। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ২৯৩ মিটার উচ্চে নীলাচল, নীল বা নীলকূট পর্বতে কামাখ্যা মন্দির; গৌহাটি থেকে ২-মাইল। চার দিকের প্রাকৃতিক-দৃশ্য সুন্দর। এখানকার দেবীর নামও কামাখ্যা। দশ মহাবিদ্যার অন্যতমা। দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করলে বিষ্ণু সতীর মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করে ফেলেন। সতীর যোনিদেশ এইখানে পড়েছিল। একান্নপীঠের একটি। রাজপুত্র নরক আদি-মন্দিরটি তৈরি করে দিয়েছিলেন। ১৫৬৫ সালে রাজা নরনারায়ণ মন্দিরটির সংস্কার করেন। এখানকার দেবী কামাখ্যার সঙ্গে কামেশ্বরের বিবাহ উৎসবের স্মরণার্থে পৌষমাসে পৌষবিয়া উৎসব, বসন্তে বাসন্তী উৎসব, আষাঢ়ে অম্বুবাচী ও শরতে দুর্গাপূজা উল্লেখযোগ্য। কামরূপ, কালিকা পুরাণে, করতোয়া নদীর পূব দিক থেকে যাবৎ দিক্করবাসিনী। এখানে শত শত নদী রয়েছে। মদন এখানে নিজের দেহ ফিরে পান ফলে নাম কামরূপ (কালি ৫১।১৭)। এখানে ৬টি আশ্রমে শিবপার্বতী বাস করেন। ঈশান কোণে আশ্রমটির নাম নাটক শৈল (কা ৫১।১৭)। নীলকূট পাহাড়ে শিবের সঙ্গে যথা কামার্থাগতা দেবী তথা নাম হয় কামাখ্যা (৬২।১১)। কুব্জিকা পৃষ্ঠে সতীর যোনিমণ্ডল পড়েছিল (৬২।৫৭), পাহাড় নীল বর্ণ হয়ে যায়, ভারে মাটিতে বসে যেতে থাকে। তখন ব্রহ্মা ইত্যাদি পাহাড়ের রূপ ধরে এই কুব্জিকা পাহাড়কে তুলে ধরতে চেষ্টা করেন। পাহাড়ের চূড়াগুলি কেবল বার হয়ে থাকে। পূব দিকের পাহাড়টি ব্রহ্মা; নাম ব্রহ্ম বা শ্বেত শৈল, শিবরূপী পর্বতটি নীল পর্বত; বরাহরূপী পর্বতটি চিত্র পর্বত, ঈশান কোণে কূর্মরূপী পর্বতটি মণিকর্ণ, বায়ু কোণে অনন্ত রূপী পর্বতটি মণি পর্বত, নৈর্ঋত কোণে মহামায়া রূপী পর্বতটি গন্ধমাদন (কা ৬২।৭১)।

গরুড়ের পিঠে বিষ্ণু একবার এখান দিয়ে উড়ে যাচ্ছিলেন ; দেবীকে প্রণাম করেননি। ফলে দেবী প্রথমে গরুড়কে স্তম্ভিত করে দেন। বিষ্ণু তখন কামাখ্যা পর্বতকে তুলে ফেলে দিতে চান। দেবী তখন এদের দু জনকে বেঁধে সমুদ্রে ডুবিয়ে রাখেন। ব্রহ্মা এদের সন্ধানে আসেন ; জল থেকে তুলতে চেষ্টা করেন, পারেন না। সমস্ত দেবতারা আসেন ; কিন্তু সকলেই বিষ্ণুর মত বন্দী হয়ে যান। শেষে বৃহস্পতি শিবের কাছে এসে সব জানতে চান ; শিব এঁকে সমুদ্রের তলাতে নিয়ে আসেন ; এদের সকলকে কামাখ্যা কবচ দিলে এরা সকলে নীলকূট পর্বতে এসে দেবীর স্তব করেন। দেবী তখন মদ্‌যোনি সলিলেষু এদের স্নান ও পান করিয়ে মুক্তি দেন (কা ৭২।-)

কামাখ্যাতে এলে মানুষ স্বর্গে চলে যেতে থাকে। কর্মহীন যম বিব্রত হয়ে ব্রহ্মার কাছে যান। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু তখন শিবের কাছে আসেন। শিব তখন উগ্রতারা ও গণদের নির্দেশ দেন কামাখ্যা থেকে সকলকে তাড়িয়ে দেবার (কা ৮১।১৬)। এরা সকলকে এবং বশিষ্ঠকেও তাড়ান। ফলে বশিষ্ঠ শাপ দেন দেবী বামাচারে পূজিত হবেন, গণেরা দুর্বৃত্ত ম্লেচ্ছ হবে এবং শিব ম্লেচ্ছপতি হবেন। কামরূপ মাহাত্ম্য তন্ত্র বিরল প্রচার হবে এবং যত দিন না বিষ্ণু এখানে আসবেন তত দিন এই ভাবে চলবে (কা ৮১।২৪)। দ্রঃ-কামরূপ, কামেশ্বরী।

কামাশ্রম—কারণ, কারোন, কার্কগির়ি। বালিয়া জেলাতে কোরণতেড়ির ৮ মাইল উত্তরে। প্রবাদ এইখানে মদন ভস্ম হয়েছিল। সরযূ গঙ্গা সঙ্গমে অবস্থিত ছিল। বর্তমানে এই সঙ্গম পূব দিকে সরে গেছে ; ছাপরার ৮ মাইল পূর্বে। এখানে কামেশ্বর নাথ বা কৌলেশ্বরনাথ শিবমন্দির রয়েছে। রঘুবংশে এটি মদন তপোবন। স্কন্দপুরাণে মদন ভস্ম হয়েছিল হিমালয়ে দেবদারু বনে (দ্রঃ)।

রামায়ণে (১।২৩।-) সরযূ গঙ্গা সঙ্গমে। বলাতিবলা লাভের পরদিন বিশ্বামিত্র রামলক্ষ্মণকে এখানে আনেন ও একরাত্রি কাটিয়ে পরদিন নৌকা করে গঙ্গা পার হন। এই আশ্রমে মহাদেব তপস্যা করতেন। কৃতোদ্বাহ মহাদেব একদিন মরুৎগণের সঙ্গে যাচ্ছিলেন মদন সেই সময় মহাদেবকে বিচলিত করে তোলেন। ফলে মহাদেব রৌদ্রেণ চক্ষুষা একে ভস্ম করেন। যেখানে মদন অঙ্গত্যাগ করেছিল সেই স্থানটি অঙ্গবিষয় নামে পরিচিত। অপর নাম পূর্বাশ্রম।

কামেশ্বরী—কামাখ্যা। কালিকা পুরাণে কয়েকটি মূর্তির উল্লেখ রয়েছে। রঙ লাল বা ঈষৎ পীত। চার হাত, শবের বুকে উপবিষ্ট। আর একটি মূর্তি দলিতাঞ্জন সদৃশ ; ছয় মুখ, বার হাত, হাতে পুস্তক ও আয়ুধ ইত্যাদি। সিংহের ওপর প্রেত, তার উপর পদ্ম এবং তার ওপর দেবী। পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম। যেখানে সতীর যোনিমণ্ডল পড়ে প্রস্তরীভূত হয়েছিল কালিকা পুরাণ মতে সেইখানে কামাখ্যা দেবী অবস্থান করেন।

কাম্পিল—দক্ষিণ পাঞ্চালের রাজধানী। প্রাচীন কাম্পিল্য। পুরাতন গঙ্গা নদীর ধারে, বদায়ূঁ ও ফর্‌রুখবাদের মাঝামাঝি কোন স্থানে ছিল। উত্তরপ্রদেশে ফর্‌রুখবাদ জেলার ফতেগড় সহরের ৪৫ কি-মি উ-পূর্বে অবস্থিত। দ্রুপদের রাজধানী ; এখানে দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভা হয়েছিল। বুড়গঙ্গার (গঙ্গার প্রাচীন খাত) তীরে একেবারে

পূর্বপ্রান্তে একটি ঢিপি এখনও দ্রুপদের রাজধানী হিসাবে পরিচিত। দ্রুপদের আগে এখানে নীপ বংশীয়েরা রাজত্ব করতেন। এই বংশের প্রথম রাজা নীপ পাণ্ডবদের ১২ বা ১৪ পুরুষ আগে। এই বংশে বিখ্যাত রাজা ব্রহ্মদত্ত পাণ্ডবদের উর্দ্ধতন ৫-পুরুষ রাজা প্রতীপের সমসাময়িক। ভীষ্মের সময় এই র'জবংশ ধ্বংস হয়। ভাসের স্বপ্ন-বাসবদত্তাতে কাম্পিল্যের উল্লেখ আছে। বরাহ মিহিরের জন্মস্থান।

কাম্প্তানাথগিরি—চিত্রকূট (দ্রঃ) গিরি। দণ্ডকারণ্যের পরে রামচন্দ্র এখানে কিছু সময় ছিলেন।

কাম্বিসন—(টলেমি) ; গঙ্গার সব চেয়ে পশ্চিম মুখ। কপিলাশ্রম>কাম্বিসন।

কাম্বেরিখোন—টলেমির কুম্ভীর খাতম্। গঙ্গার তৃতীয় মোহনা। খুলনা জেলাতে। বর্তমানে এটি বঙ্গর খাড়ি। দ্রঃ- কাম্বিসন।

কাম্বোজ--আফগানিস্তান (দ্রঃ)। অন্তত আফগানের উ-অংশ (মার্কো) ; মতান্তরে পূর্ব অংশ। অশ্বকান>আফগান ; অস্সকেনোই (মেগা ও এরিয়ান)। অশ্বের জন্য বিখ্যাত। রাজধানী আর এক দ্বারকা। বর্তমানে হিন্দুকুশে অবস্থিত সিয়াফোস জাতি এই কাম্বোজদের বংশধর। আর এক মতে গজনির পর্বতের নাম। অশোকের গিরনার ও ধৌলি লেখে কাম্বোজ=কাম্বোছ। ১২-শ খৃ শতকে এখানকার শেষ হিন্দু রাজা মুসলমানদের হাতে পরাজিত হন।

কাম্যকবন—(১) মহাভারতে সরস্বতী তীরে কুরুক্ষেত্র এলাকাতে একটি রমণীয় বন। থানেশ্বরের ৬ মাইল উ-পূর্বে কামোদ। এখানে একটি স্থানকে দ্রৌপদীর ভাণ্ডার বলে দেখান হয়। বনবাসের সময় দ্রৌপদী এখানে র'াধতেন।

বনবাসের (দ্রঃ) জন্য রাজধানী ত্যাগ করে দ্বিতীয় দিনে পাণ্ডবরা এখানে আসেন। এখানে আসার পরই বিদুর আসেন (মহা ৩।৫।২০)। এখানে প্রবেশ করতেই কির্মীর (দ্রঃ) আক্রমণ করে। এই কাম্যক বন থেকে অর্জুন অস্ত্রের জন্য ইন্দ্রের তপস্যা করতে যান। স্বর্গ থেকে অর্জুন ফিরে আসার (মহা ৩।১৬২) পর ইন্দ্র এসে যুধিষ্ঠিরদের সঙ্গে দেখা করে কাম্যকে ফিরে যেতে বলেন এবং যুধিষ্ঠির পৃথিবীর রাজা হবে বলে যান। সঞ্জয়, নারদ, মার্কণ্ডেয় ইত্যাদিও দেখা করতে এখানে এসেছিলেন। (২) মথুরাতে আর একটি।

কাম্যা—(১) কর্দমের ঔরসে স্ত্রী শ্রুতির গর্ভে ছেলে শঙ্খপাদ ও মেয়ে কাম্যা। স্বায়ম্ভুব মনুর ছেলে প্রিয়ব্রতের স্ত্রী। (২) একজন অপ্সরা।

কায়ব্যূহ—পতঞ্জলি বলেছেন নাভিচক্রে চিত্তসংযম করলে কায়ব্যূহ জ্ঞান হয়।

কারণ্ডব্যূহ—একটি বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থ। একজন অবলোকিতেশ্বর (দ্রঃ)ও।

কারস্কর—দ-ভারতে কারস্করদের দেশ। হয়তো দ-কানাড়াতে কারাকল ; মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে ; জৈন ও বৌদ্ধ তীর্থস্থান।

কারা—অগস্ত্য আশ্রম ; দক্ষিণ সমুদ্রে। হয়তো বর্তমানের কোলাই ; কায়েল (মার্কো)। তাম্রপর্ণী নদীর মুখে তিন্নেভেলিতে।

কারাকোরাম—কারাপথ, কারাবাঘ=কালাবাঘ=বাম্বান=করবৎ (টাভের্নি), কারু-

পথ (রামায়ণে)। মুস্তুঘ, কৃষ্ণগিরি। সিন্ধুর দক্ষিণ/পশ্চিম তীরে। বান্নু জেলাতে নিলি পর্বতের পাদদেশে। এখানে লক্ষ্মণের ছেলে অঙ্গদকে রাম রাজা করে দেন। কান্দাহার থেকে গজনির পথে, গজনি থেকে ৩৫ মাইল দ-পশ্চিমে একটি কারাবাগ রয়েছে ; চারপাশের এলাকা মিলে দেশটিও কারাবাগ। পদ্মপুরাণে অঙ্গদ মদ্রদেশে রাজ্য পান। এই মদ্র যেন রামায়ণের মল্ল। এটি হয়তো কৈলাবৎ (বৃহৎ সং)।

কারাবন—কায়াবরোহন, কার্বান, নকুলেশ্বর, লকুলীশ, পশুপত। গায়কোয়াড় রাজ্যে। বরোদার ১৫ মাইল দক্ষিণে এবং মিয়াগাম স্টেসন থেকে ৮ মাইল উ-পূর্বে। পাশুপত সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা নকুলীশ এখানে ২-৫ খৃ শতকে বর্তমান ছিলেন। এখানে সম্প্রদায়ের প্রধান মন্দির নকুলেশ্বর বা নকুলীশ মন্দির। এই মন্দিরের সান্নিধ্য হেতু নর্মদা ও নর্মদাগত নুড়ির (শিব লিঙ্গ) বিশেষ মাহাত্ম্য।

কারাষ্ট্র—দক্ষিণে বেদবতী এবং উত্তরে কোইনা বা কোয়না নদী। সাতারাও এই দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাজধানী কারাহাটক (দ্রঃ)।

কারাহাটক—করহাটক। কারাষ্ট্র (দ্রঃ) দেশের রাজধানী। কাড়ার। বোম্বে প্রদেশে সাতরা জেলাতে কৃষ্ণা ও কোইনা নদী সঙ্গমে এবং করবীরপুর (কোলহাপুর) থেকে ৪০ মাইল উত্তরে। সহদেব এই দেশ জয় করেছিলেন। শিলহার রাজদের রাজধানী ; বাসুকি বংশ ; সিন্ধ পরিবারের দেশ।

কারীষ—বিশ্বামিত্রের একটি ছেলে।

কারুষ—(১) কারুষ দেশের রাজা। ভদ্রা নামে এক যুবতী এঁকে বিয়ে করবার জন্য তপস্যা করেছিলেন, এমন সময় শিশুপাল এঁকে ধরে নিয়ে যান। (২) বৈবস্বত মনুর এক ছেলে। (৩) এক জন যক্ষ। তপস্যা করে একটি মন্বন্তরের অধিপতি হন। (৪) প্রাচীন ভারতে একটি দেশ। সম্ভবত বর্তমানের বুন্দেলখণ্ড। ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যা-পাপ ব্রাহ্মণরা এখানে ধুয়ে দিয়েছিলেন। ইন্দ্রের (দ্রঃ) করীষ (ময়লা) যেখানে পড়েছিল সেখানের নাম হয় করীষ ; পরে নাম কারুষ হয়ে দাঁড়ায়। মলদা ও কারূষ দুটি স্ফীত জনপদ গড়ে ওঠে। তাড়কা এই জনপদ দুটিকে উৎসন্ন করে নিবিড় বনে পরিণত করেছিল (রা ১।২০।১৪)। দ্রঃ- করূষ।

কার্তবীর্য—কৃতবীর্যের ছেলে। অন্য নাম অর্জুন বা কার্তবীর্যার্জুন। যযাতি (১)>যদু (২)>সহস্রজিৎ(৩)>একবীর(=হেহয়)(৫)>ভদ্রসেন(৮)>কৃতবীর্য(১০)>কার্তবীর্য(১১) নর্মদা তীরে হৈহয় রাজ্যের রাজধানী মাহিষ্মতী। কার্তবীর্য রাজা হয়ে গার্গ্য মুনির কাছে অমিতবলশালী হবার জন্য উপদেশ চান। গার্গ্য রাজাকে দত্তাত্রেয়র কাছে যেতে বলেন। অত্রিপুত্র দত্তাত্রেয় মুনির কাছে হাজার হাত পেয়ে অজেয় হয়ে ওঠেন। দশহাজার যজ্ঞ করেছিলেন। ইনি যখন ত্রিলোকের রাজা সেই সময় এক দিন অগ্নি এসে এঁর কাছে কিছু ভিক্ষা চান। রাজা কিছু পাহাড় ও বন দিয়ে দেন। অগ্নি এগুলি পোড়াতে থাকেন। এখানে আপব মুনির আশ্রম পুড়ে গেলে মুনি শাপ দেন রাজার সব হাত কাটা যাবে বা পরশুরাম কেটে ফেলবেন। হেহয়রা ক্ষত্রিয়; কুলপুরোহিত ভৃগু (দ্রঃ) বংশীয় ব্রাহ্মণদের সঙ্গে এবং ক্রমশ সমস্ত ব্রাহ্মণদের সঙ্গে

হেহয় তথা ক্ষত্রিয়দের তীব্র সংঘর্ষ দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত ঔর্ব (দ্রঃ) জন্মালে হেহয়রা কিছুটা শান্ত হয়। এর বহু কাল পরে হেহয় বংশে কার্তবীর্য ও ভৃগুবংশে জমদগ্নি জন্মান; এবং উত্তরাধিকারে আসা কলহ আবার দেখা দেয়। এ ছাড়াও আর একটি কারণ ছিল।

একদিন কার্তবীর্য মৃগয়া পথে ক্লান্ত হয়ে জমদগ্নি (দ্রঃ) আশ্রমে এসে কামধেনুর ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ ও আশ্চর্য হয়ে গরুটিকে নিয়ে যাবার চেষ্টায় মারামারি আরম্ভ করেন; এবং জমদগ্নিকে নিহত করেন। কামধেনু ব্রহ্মলোকে অন্তর্হিত হয়ে যায়। রাজা এর বাছুরটিকে নিয়ে আসতে পেরেছিলেন। প্রতিশোধ নেবার জন্য পরশুরাম শিষ্য অকৃতব্রণকে সঙ্গে নিয়ে মাহিষ্মতী আক্রমণ করে রাজার সব হাত কেটে দেন এবং শেষ পর্যন্ত শিরচ্ছেদ করেন। এই কার্তবীর্যার্জুনের জলক্রীড়া রেণুকার (দ্রঃ) মৃত্যুর কারণ হয়েছিল।

নারদ একবার কার্তবীর্যের সঙ্গে দেখা করলে রাজা সাদরে অভ্যর্থনা করে মোক্ষ-লাভ তথা জাগতিক সুখ ভোগের পথ জানতে চান। নারদ 'ভদ্রদীপ প্রতিষ্ঠা' নামে যজ্ঞ করতে বলেন। নর্মদা তীরে রাজা সস্ত্রীক যজ্ঞ করেন। অত্রির ছেলে দত্তাত্রেয় এই যজ্ঞে গুরু ছিলেন। যজ্ঞের শেষে কার্তবীর্যকে সন্তুষ্ট হয়ে বর চাইতে বললে রাজা অনেকগুলি বর ও এক হাজার হাত চান। এই হাজার হাত নিয়ে রাজা মহানন্দে রাজপ্রাসাদে ফিরে এলে দৈববাণী হয় ক্ষত্রিয় থেকে ব্রাহ্মণ অনেক বড়। ব্রাহ্মণের সাহায্যে ক্ষত্রিয়কে রাজ্য স্থাপন করতে হয়। রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে পড়েন, বুঝতে পারেন বায়ু এই কথা বলছেন এবং বায়ুর সঙ্গে তর্ক করতে থাকেন। বায়ু তখন আবার সাবধান করে দেন ব্রাহ্মণের শাপে কার্তবীর্যকে বিপদে পড়তে হবে। (ব্রহ্মাণ্ড-পু ৪৪)

রামায়ণে আছে (৭।৩৩) ইন্দ্রকে মুক্তি দেবার পর রাবণ মাহিষ্মতীতে আসেন; কার্তবীর্য তখন নর্মদাতে জলক্রীড়াতে গেছেন শুনে রাবণও নর্মদাতে এসে স্নান করেন, সচিবদেরও স্নান করে পুণ্য সঞ্চয় করতে বলেন। রাবণ তারপর বালুকা বেদিতে জাম্বুনদময় লিঙ্গ স্থাপন করে পূজা করে গান গাইতে ও নাচতে থাকেন। এখান থেকেই কিছু দূরে স্ত্রীদের নিয়ে কার্তবীর্য জলক্রীড়া করছিলেন; সহস্র হাতে রাজা নর্মদার জল আটকে দেন; ফলে জল উপচে ওঠে; ফুল ইত্যাদি ভেসে যায়। রাবণ শুকসারণকে ব্যাপারটা কি জানতে পাঠান; এরা আধযোজন মাত্র পশ্চিমে কি ঘটছে এসে জানায়। রাবণ বুঝতে পারেন এ-ই কার্তবীর্য এবং ছুটে যান। রাজার অমাত্যরা রাবণকে অপেক্ষা করতে বলে; আগামীকাল কার্তবীর্য যুদ্ধ করবেন; উপস্থিত অমাত্যরা তীব্র যুদ্ধ আরম্ভ করেন। কার্তবীর্যও এগিয়ে আসেন এবং রাবণকে বন্দী করে মাহিষ্মতীতে নিয়ে যান। পুলস্ত্য খবর পেয়ে এসে রাবণকে মুক্ত করেন। অগ্নিসাক্ষী করে দুজনের বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। রাবণ এখান থেকে বালীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে যান।

কার্তবীর্যার্জুন ত্রিভুবন জয় করেন। সূর্যবংশে ত্রয্যারুণ, হরিশ্চন্দ্র, রোহিতাশ্ব এবং চুঞ্চু এঁর কাছে পরাজিত হন। হাজার হাত পেয়ে দেবতা ও যক্ষদের হারিয়ে দেন। এমন কি বিষ্ণুকেও যুদ্ধে আহ্বান করেন। ইন্দ্রকে অপমানিত করেন। বিজয়গর্বে

উদাসিক্ত হয়ে রাজা সমুদ্রতীরে গিয়ে সমুদ্রকে যুদ্ধে আহ্বান করেন এবং জলজন্তুদের বাণবিদ্ধ করে হত্যা করতে থাকেন (মহা ১৪।২৯।৫)। তখন বরুণদেব দেখা দিয়ে নিজের হার স্বীকার করে নিয়ে রাজা প্রকৃত কি চান অর্থাৎ প্রকৃত এক জন যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চান জানতে পেরে পরশুরামের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বলেন।

কার্তবীর্যের একশত ছেলে। এ'দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন শূর, শূরসেন, ধৃষ্ট/ধৃষ্টোক্ত (হরি ১৷৩৩৷৪৯), কৃষ্ণ ও জয়ধ্বজ। ভাগবতে (৯৷২৩৷২৭) পরশুরামের হাতের থেকে ১০০ ছেলের মধ্যে জয়ধ্বজ, শূরসেন, বৃষভ, মধু, উর্জিত বেঁচে গিয়েছিল। কার্তবীর্যের পর জয়ধ্বজ রাজা হন। জয়ধ্বজের ছেলে তালজঙ্ঘ। হৈহয় বংশ পরে পাঁচটি শাখায় ভাগ হয়ে যায়ঃ—ভোজ, অবন্তি, বীতিহোত্র, স্বয়ংজাত ও শৌণ্ডিক শাখা। দ্রঃ- জয়ধ্বজ, যদু।

কার্তিক—দ্রঃ কালপুরুষ।

কার্তিকপুর—কার্তিকেয়পুর। কুমায়ুন জেলাতে বৈজনাথ বা বৈদ্যনাথ। আলমোড়া থেকে ৮০ মাইল।

কার্তিকেয়—রামায়ণের কাহিনী ঃ মহাদেবের বিয়ে হয়। কোন সেনাপতির প্রয়োজন ছিল ইত্যাদি বিশদ উল্লেখ নাই। তারপর সংক্রীড়মানস্য দিব্যবর্ষশতং গতম্ (রা ১৷৩৬৷৭); কিন্তু কোন সন্তান হয় না। পিতামহ পুরোগমা দেবতারা ভয় পান; এই দীর্ঘকালব্যাপী সঙ্গমে যে ছেলে হবে নিশ্চয়ই সে এই তুলনায় বীর হবে; পৃথিবী তাকে সহ্য করতে পারবে না। সকলে এসে মহাদেবকে জানান কঃ তৎ প্রতিসহিষ্যতে (রা ১৷৩৬৷৯); এবং অনুরোধ করেন তপস্যা করতে যেতে; দেব্যা সহ তপশ্চর। মহাদেব সম্মত হন; বলেন ত্রিদশাঃ ও পৃথিবী নির্বাণং অধিগচ্ছতু (রা ১৷৩৬৷১৫) এবং জানতে চান তার ক্ষুভিতং তেজঃ কঃ ধারয়িষ্যতি। দেবতারা বলেন পৃথিবী ধারণ করবে। শিব তখন মহীতলে তেজঃ মুমোচ এবং দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ হুতাশনকে বলেন ত্বং বায়ুসমন্বিতঃ প্রবিশ মহাতেজঃ (রা ১৷৩৬৷১৮)। উমা ও মহাদেবকে দেবতা ও ঋষিরা তখন পূজা করেন। কিন্তু পার্বতী হাতে জল নিয়ে দেবতাদের শাপ দেন (রা ১৷৩৬৷২২) পুত্রকাময়া অহং সংগতা নিবারিতা এই জন্য যুষ্মাকম্ অপ্রজাঃ সন্তু পত্ন্যঃ (রা ১৷৩৬৷২৩) এবং পৃথিবীকে শাপ দেন ন একরূপা ত্বং; অবলে বহুভার্যা ভবিষ্যসি (রা ১৷৩৬৷২৫)। এরপর শিবপার্বতী উত্তর দিকে চলে গিয়ে হিমালয় শৃঙ্গে তপস্যা করতে থাকেন। অগ্নি এই তেজ ধারণ করলে অগ্নিনা পুনর্ব্যাপ্তং সংজাতং শ্বেতপর্বতং এবং দিব্যং শরবণং (রা ১৷৩৬৷১৯)। এরপর দেবতা ও ঋষিরা অগ্নিকে সঙ্গে নিয়ে পিতামহের কাছে জানান সেই 'দত্তঃ' সেনাপতি আজও জন্মায়নি। ব্রহ্মা বলেন উমার শাপে তোমাদের পত্নীরা নিঃসন্তান। সুতরাং ইয়ং আকাশগঙ্গা; এ কারও স্ত্রী নয়; যস্যাঃ পুত্রং হুতাশনঃ জনয়িষ্যতি (১৷৩৭৷৭); গঙ্গা (দ্রঃ) এ সন্তানকে মেনে নেবেন। গঙ্গা (দ্রঃ) তারপর গর্ভ ত্যাগ করলে পর্বতসংনদ্ধ সেই বনটি সোনা হয়ে যায় (রা ১৷৩৭৷২২)। গর্ভের সঙ্গে মলক্লেদ অংশ ত্রপু ও সীসকমে পরিণত হয় (রা ১৷৩৭৷২১); ইন্দ্র

ও মরুৎরা কৃত্তিকাদের স্তন্য দিতে বলেন। এইজন্য দেবতারা নাম দেন কার্তিকেয় (রা ১।৩৭।২৫)। গর্ভ পরিস্রবাৎ স্কন্নং; ফলে নাম স্কন্দ (রা ১।৩৭।২৮); এবং ছয়টি মুখ হয়; স্তন্য পান করতে থাকেন। একাহ্না গৃহীত্বা ক্ষীরম্ সুকুমারবপুঃ হয়ে দৈত্য জয় করেন (রা ১।৩৭।৫০)।

মার্কণ্ডেয় বর্ণিত কাহিনী ঃ—মহাভারতে (৩।২১৩।-) আছে কি ভাবে বা কোথা থেকে দেবসেনাপতি পাওয়া যেতে পারে মানস সরোবরে গিয়ে ইন্দ্র ভাবছিলেন। এমন সময় দেবসেনার (দ্রঃ) কান্না শুনতে পান ও তাকে রক্ষা করেন। ইনি দেবদানবযক্ষ-কিন্নরোরগ-রাক্ষসদের সকলকে জয় করতে পারবে এই রকম স্বামী চান। ইন্দ্র চিন্তিত হয়ে পড়েন। আকাশের দিকে দেখেন সূর্যতে সোম এবং হব্য নিয়ে অগ্নি প্রবেশ করছেন। সূর্য চন্দ্র ও অগ্নির এই একতা সমালোক্য, এই রৌদ্র-সমবায়ং দৃষ্টবা ভাবতে থাকেন সোমের যে সন্তান হবে, অগ্নি যে গর্ভ উৎপাদন করবেন সেই সন্তানই এই মেয়ের স্বামী হবার উপযুক্ত। ইন্দ্র তখন দেবসেনাকে ব্রহ্মার কাছে নিয়ে গিয়ে সব জানান এবং ব্রহ্মা বলেন ইন্দ্রের চিন্তা মতই সব হবে; এবং যে পুরুষটি জন্মাবে সেই দেবতাদের সেনাপতি হবে। এরপর বশিষ্ঠ ইত্যাদি ঋষিদের যজ্ঞে ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতারা আসেন সোমের ভাগ নিতে। ঋষিরা আহুতি দিলে সূর্যমণ্ডল থেকে অগ্নি বার হয়ে এসে হব্য বহন করে দেবতাদের দান করেন। কিন্তু যজ্ঞ থেকে বার হয়ে যাবার সময় দেখেন ঋষিপত্নীরা নিজেদের আশ্রমে স্নান করছেন (আসনে বসে ঘুমচ্ছেন (মহা ৩।২১৩।৪২)। এরা অত্যন্ত সুন্দরী; বিচলিত হয়ে পড়েন; অন্যায় হচ্ছে চিন্তা করেন এবং শেষ অবধি ঠিক করেন গার্হপত্য অগ্নিতে প্রবেশ করে অভীক্ষ্ণঃ এদের দিকে চেয়ে থাকবেন; শিখা দিয়ে স্পর্শ করবেন ইত্যাদি। এই ভাবে সুচিরম্ থাকতে থাকতে এত কামসন্তপ্ত হয়ে পড়েন যে আত্মহত্যা করবার জন্য বনে চলে যান।

দক্ষ দুহিতা স্বাহা অগ্নিকে বহুদিন কামনা করেছিলেন; এবার সুযোগ পেয়ে অঙ্গিরার স্ত্রী শিবার রূপ ধরে আসেন; জানান ঋষিপত্নীরা সকলেই অগ্নিকে ভালবাসে এবং যাতরঃ (যায়েরা) অপেক্ষা করছে। অগ্নি স্বাহাকে গ্রহণ করেন এবং স্বাহা নিজের হাতে এই শুক্র গ্রহণ করে ভাবেন; এবং কেউ যেন জানতে না পারে এই উদ্দেশ্যে সুপর্ণী রূপ ধরে বন থেকে বার হয়ে শ্বেতপর্বত দেখতে পান। শরস্তম্ভ, সপ্তশীর্ষ-সর্প, রক্ষ, পিশাচ, রৌদ্রভূতগণ ও রাক্ষসরা এই পর্বতকে রক্ষা করছে; এখানে কাঞ্চনকুণ্ডে এই শুক্র ত্যাগ করেন। এই ভাবে স্বাহা ছ-বার (অরুন্ধতী বাদে) ছয় ঋষিপত্নীর রূপ ধরে এই কুণ্ডে শুক্র ফেলে দিয়ে যান। কুণ্ডে জমা হয়ে ওঠা স্কন্ন স্কন্দতা পায়; ছয় মাথা, একটি গ্রীবা, বার হাত একটি কুমারে পরিণত হয়। দ্বিতীয়াতে স্পষ্ট চেহারা, তৃতীয়াতে শিশুরূপে স্পষ্ট, এবং চতুর্থীতে গুহ হিসাবে বিরাজ করতে থাকেন (মহা ৩।২১৪।১৮)।

আকাশে সূর্যের মত উজ্জ্বল। সুরারি নিধনকারী ত্রিপুরান্তকের ধনু নিয়ে সিংহনাদ করতে থাকেন। মহানাগ চিত্র ও ঐরাবত সামনে এগিয়ে আসে; বালক

এদের দুহাতে তুলে নেন এবং এক হাতে তাম্রচূড়কে নিয়ে আবার চিৎকার করে ওঠেন। এই চিৎকারে বহু মানুষ এসে তাঁর শরণ নেয়; এঁদের স্কন্দের পারিষদ বলা হয় (মহা ৩।২১৪।১৯)। এরপর শ্বেতপর্বতে বাণ বর্ষণ করতে থাকেন এবং হিমালয় পুত্র ক্রৌঞ্চ শৈলকে তীরবিদ্ধ করে হংস ও গৃধ্রদের মেরুপর্বতে যাবার পথ করে দেন। ভয়ে অন্য সমস্ত পর্বত চিৎকার করে ওঠে। গুহ শক্তি অস্ত্র প্রহারে শ্বেতপর্বত শিখর ভেদ করেন; শ্বেত লাফিয়ে ওঠে। ভূমি ও পর্বত সকলে স্কন্দকে নমস্কার করে সুস্থির ও আশ্বস্ত হয়। পঞ্চমীতে সমস্ত লোক এসে স্কন্দকে ভজনা করে (মহা ৩।২১৪।৩৭)।

এই সমস্ত ভয়ঙ্কর উৎপাত ঘটতে দেখে ঋষিরা শান্তির ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ঐ চৈত্ররথ বনে যে সব লোক বাস করত তারা অগ্নিকে মুনিপত্নীদের সঙ্গে সঙ্গম করার জন্য দায়ী করেন; অনেকে সুপর্ণীকে দায়ী করতে থাকে। সুপর্ণী এই সব শুনে স্কন্দকে এসে বলে সে স্কন্দের মা (৩।২১৫।৪)।

এদিকে সপ্তর্ষিরা সব শুনে ছজনে নিজেদের স্ত্রীদের ত্যাগ করেন। স্বাহা এসে সপ্তর্ষিদের সব জানায়। এছাড়া বিশ্বামিত্র এদের যজ্ঞ করেছিলেন; অগ্নির পেছু পেছু গিয়েছিলেন; সব ঘটনা জানতেন। বিশ্বামিত্র প্রথমে স্কন্দের শরণ নেন; সমস্ত জাত-কর্মাদি করেছিলেন এবং কুক্কুট সাধন, শক্তিদেবী সাধন ও পারিষদগণের সাধন করেছিলেন। ফলে বিশ্বামিত্র স্কন্দের অত্যন্ত প্রিয় হন এবং মুনিদের সব জানান তবু মুনিরা বিশ্বাস করেন না (মহা ৩।২১৫।১২)।

দেবতারা এদিকে স্কন্দের সিংহনাদ শুনে ইন্দ্রকে বলেন একে নিহত করতে; না হলে এ ইন্দ্র হয়ে বসবে। ইন্দ্র লোকমাতাদের পাঠান একে হত্যা করবে বলে। এরা অপ্রতিবল স্কন্দকে দেখে বোঝেন কিছু করতে পারবেন না। এরা তখন স্কন্দের শরণ নিয়ে নিজেদের পরিচয় দেন 'আমরা জগৎ-ধারণ করে আছি (মহা ৩।২১৫।১৮)।' স্নেহে স্কন্দকে এরা পুত্ররূপে পেতে চান; স্কন্দ স্বীকার করে নেন। এর পর অগ্নি আসেন ছেলেকে দেখতে। অগ্নি ও লোকমাতারা স্কন্দকে ঘিরে রক্ষক হয়ে অবস্থান করতে থাকেন। ক্রোধসমুদ্ভবা লোকমাতা শূলহস্তে ধাত্রী হিসাবে পাহারা দিতে থাকেন এবং লোহিত উদধি কন্যা শোণিত-ভোজনা লোকমাতা স্কন্দকে আলিঙ্গন করে অবস্থান করতে থাকেন এবং অগ্নি বহুপ্রজ ছাগবক্ত্র নৈগমেয় হয়ে স্কন্দের সঙ্গে খেলা করতে থাকেন (মহা ৩।২১৫।২৩)।

এই সময়ে সসৈন্যে ইন্দ্র এসে আক্রমণ করেন। স্কন্দের মুখের আগুনে দেবসেনারা পুড়তে থাকে; কিছু সৈন্য স্কন্দের শরণ নেয়। ইন্দ্র তখন বজ্রাঘাত করেন। স্কন্দের দক্ষিণ পার্শ্ব আহত হয় এবং এখান থেকে এই আঘাতে কালানল সমদ্যুতি শক্তিধারী এক পুরুষ জন্মান। বজ্রাবিশন থেকে এঁর নাম হয় বিশাখ (মহা ৩।২১৬।১৩)। ইন্দ্র ভয় পেয়ে যান; সকলে স্কন্দের শরণ নেন।

এই বজ্র প্রহারের ফলে বহু কুমার জন্মায়; এরা গর্ভস্থ বা জাত শিশুদের হরণ করেন (মহা ৩।২১৭।১); বহু কন্যাও জন্মায়। এই কুমারেরা বিশাখকে পিতা বলে স্বীকার করে নেন; তিনি ছাগমুখ হয়ে সকলকে রক্ষা করতে থাকেন। ভদ্রশাখ

পুত্রকন্যাগণ কর্তৃক পরিবৃত হয়ে অবস্থান করতে থাকেন, এই জন্য স্কন্দকে কুমার-পিতা বলা হয়। এই জন্য পুত্রার্থী মানুষেরা অগ্নিকে রুদ্র হিসাবে ও স্বাহাকে উমা হিসাবে পূজা করেন (মহা ৩।২১৭।৫)।

তপ নামে হুতাশন যে সব কন্যাদের জন্ম দিয়েছিলেন তাঁরা এসে স্কন্দের অনুগ্রহে সর্ব লোকের উত্তম মাতরঃ হতে চান। স্কন্দ মেনে নেন এবং এ'দের শিবা ও অশিবা দু ভাগে ভাগ হয়ে যেতে বলেন। এ'রা তারপর চলে যান (মহা ৩।২১৭।৮)।

এরপর কাকী, হলিমা, রুদ্রা, বৃহলী, আর্যা, পলালা ও মিত্রা নামে সাত জন শিশু মাতা আসেন ; স্কন্দের প্রসাদে এদের শিশু নামে (৩।২১৭।১০) অতিদারুণ একটি ছেলে হয়। একে অষ্টমবীর অষ্টক বলা হয়। ছাগ বক্ত্রের সঙ্গে হিসাবে এ নবম বীর। স্কন্দের ছয়টি মাথার মধ্যে ছাগবক্ত্র মাথাটি প্রধান। যিনি দিব্যশক্তি সৃষ্টি করেছিলেন তিনি ভদ্রশাখ। শুক্ল পঞ্চমীতে এই সব ঘটে ; ষষ্ঠীতে ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল (মহা ৩।২১৭।১৪)

মহর্ষিরা তারপর স্কন্দকে বললেন ছয় রাত্রিতে সমস্ত লোককে বশীভূত করেছেন স্কন্দ। স্কন্দ সুতরাং ইন্দ্র হন, সকলকে পালন করবেন। ইন্দ্র নিজেও অনুরোধ করেন কিন্তু স্কন্দ সম্মত হন না ; বরং ইন্দ্রের কিংকর হয়ে থাকতে চান (মহা ৩।২১৮।১৪)। ইন্দ্র তখন দেবতাদের অর্থ সিদ্ধির জন্য সেনাপতি হতে বলেন ; স্কন্দ সম্মত হন এবং স্কন্দের অভিষেক হয়। মহাদেব ও পার্বতী এসে হিরণ্ময়ী মালা পরিয়ে দিয়ে যান।

স্কন্দকে রুদ্রপুত্র বলার কারণ হিসাবে বলা হয়েছে অগ্নিকে রুদ্র বলা হয় ফলে স্কন্দ রুদ্রপুত্র (মহা ৩।২১৮।২৭), রুদ্রের দ্বারা উৎসৃষ্ট শুক্র শ্বেতপর্বত হয়েছিল এবং কৃত্তিকারা অগ্নির ইন্দ্রিয় জয় করেছিলেন। অগ্নির, রুদ্রের, ছ-জন ঋষিপত্নীর ও স্বাহার তেজে স্কন্দের জন্ম (মহা ৩।২১৮।৩০)। অগ্নি দত্ত কুক্কুট স্কন্দের রথে কেতু হয় (মহা ৩।২১৮।৩২)। এরপর সমস্ত দেবসৈন্য এসে স্কন্দের অধিনায়কত্ব মেনে নেয়। ইন্দ্র তখন কেশী দৈত্যের হাত থেকে যাকে রক্ষা করেছিলেন সেই দেবসেনাকে স্মরণ করেন এবং স্কন্দের সঙ্গে এ'র বিয়ে দেন (মহা ৩।২১৮।৪৬)।

এরপর ছয়টি ঋষিপত্নী এসে তাঁদের অভিযোগ জানান, গুহকে পুত্র হিসেবে চান; গুহ তথাস্তু বলে মেনে নেন (মহা ৩।২১৯।৬)। এরপর ইন্দ্র বলেন রোহিণীর কনিষ্ঠা ভগিনী অভিজিৎ জ্যেষ্ঠতা পাবার জন্য তপস্যা করতে গেছেন ; সে স্থান খালি হয়ে পড়েছে ; কৃত্তিকারা আকাশে গিয়ে সেইস্থান পূর্ণ করুক ; এ'রা শকটাকার বহ্নি-দৈবত নক্ষত্র হিসাবে আকাশে অবস্থান করতে থাকেন।

ক্রমশ বিনতা ও লোকমাতারা এসে স্কন্দকে পুত্র হিসাবে চান। স্কন্দ স্বীকার যান ; এবং এই লোক-মাতাদের সাহায্য হিসাবে নিজের দেহ থেকে স্কন্দ ভীষণ এক পুরুষকে দেন ; লোকমাতারা এর সাহায্যে ১৬ বৎসরের কম বয়স মানব শিশুদের ভক্ষণ করবে। এই ভাবে নানা দুষ্ট গ্রহের উৎপত্তি হয়। স্কন্দের দেহ জাত ভীষণ পুরুষটি রৌদ্র গ্রহ বা স্কন্দ-অপস্মার (মহা ৩।২১৯।২০) ; বিনতা শকুনি গ্রহ ; পূতনা-রাক্ষসী পূতনা গ্রহ বা শীত পূতনা। অদিতির অপর নাম রেবতী ইনি রৈবত গ্রহ ; দিতি মুখমণ্ডিকাগ্রহ, স্কন্দসম্ভবা

কুমার ও কুমারীরা ও গর্ভভুক গ্রহ হন। স্বর্গের কুক্কুরী সরমা একটি গ্রহ হন। নাগমাতা কদ্রু, গন্ধর্বদের জননী, অপ্সরাদের জননী এ'রাও গ্রহে পরিণত হন; গর্ভ নষ্ট করতে থাকেন। এই সমস্ত স্কন্দগ্রহগুলি ষোল বছর বয়সের পর শুভপ্রদ হন।

এরপর স্বাহা এসে নিজের পরিচয় দেন এবং অগ্নির সঙ্গে বাস করতে চান। স্কন্দ বলেন এখন থেকে সকলে স্বাহা বলে অগ্নিতে আহুতি দেবে (মহা ৩।২২০।৬)। এই ভাবে স্বাহা অগ্নির সঙ্গে যুক্ত হন। এরপর ব্রহ্মা স্কন্দকে মহাদেবের কাছে যেতে বলেন এবং বলেন রুদ্রেণ অগ্নিং সমাবিশ্য স্বাহাম্ আবিশ্য চ উময়া জাতঃ ত্বম্ (মহা ৩।২২০।৯); এবং বলেন উমাযোন্যাং চ রুদ্রেণ সিক্তং শুক্রং পাহাড়ে এসে পড়ে এবং এ থেকে মিঞ্জিকা-মিঞ্জিক মিথুন জন্মায়। এই শুক্রের কিছু অংশ সমুদ্রে, কিছু অংশ সূর্যকিরণে, কিছু পৃথিবীতে ও কিছু অংশ বৃক্ষসমুদয়ে এসে পড়েছিল—অর্থাৎ ৫ ভাগে ভাগ হয়ে পড়ে। স্কন্দের পিশিতাশন পারিষদরা সেই রুদ্রশুক্র সম্ভূত। স্কন্দ তারপর পিতা মহাদেবকে পূজা করেন।

শেষ কালে সমস্ত দেবতারা ফিরে যান। রথে করে হরপার্বতী ভদ্রবটে চলে যান (মহা ৩।২২১।১)। স্কন্দও এগিয়ে যাচ্ছিলেন; কিন্তু মহাদেব উপদেশ দেন অতন্দ্রিত হয়ে সপ্তম মারুতস্কন্ধ রক্ষা করবার জন্য এবং স্কন্দকে ফিরে যেতে বলেন। স্কন্দ ফিরে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই দানবরা আক্রমণ করে; ইন্দ্রের নেতৃত্বে ঘোর যুদ্ধ হয়। দানবেন্দ্র মহিষ শেষ পর্যন্ত রুদ্রকে আক্রমণ করে। রুদ্র তখন স্কন্দকে স্মরণ করলে স্কন্দ এসে শক্তির আঘাতে মহিষের শির ছিন্ন করেন। স্কন্দ এই ভাবে এক দিনে সব জয় করেন। মহিষের ছিন্নমস্তক এমন ভাবে এসে পড়ে যে উত্তরকুরু দেশে যাবার ১৬ যোজন দ্বার আটকে বন্ধ হয়ে যায়; কেবল উত্তর কৌরবরা বাদে এ পথে আর কেউ যেতে পারে না।

বিভিন্ন পুরাণ ইত্যাদিতে মোটামুটি এই কাহিনী। একটি মতে অসুরদের কাছে পরাজিত ইন্দ্র মেরু পর্বতে বাস করছিলেন; দেবতা ও ঋষিরা তখন কার্তিকের শরণাপন্ন হন। ইন্দ্র জানতে পেরে রেগে গিয়ে আক্রমণ করেন; কার্তিকেয়র মুখে ক্ষত করে দেন। এই ক্ষত থেকে কার্তিকেয়র দুই ছেলে শাখ ও বিশাখ জন্মান। এই দুই ছেলের সাহায্যে আবার যুদ্ধ হয়; কিন্তু এই সময় শিব এসে জানান তারকাসুরের বধের জন্য কার্তিকেয়র জন্ম; ইন্দ্র যাতে রাজ্য ফিরে পাবেন। ইন্দ্র তখন কার্তিকেয়কে চিনতে পারেন, ক্ষমা চান এবং দেবসেনাপতি করে দেন (দ্রঃ- গণেশ)। এর পর যুদ্ধে প্রায় সমস্ত দানবই কার্তিকেয়র শরে নিহত হয়। মহাদানব মহিষের অন্য মতে তারকেরও মুণ্ডচ্ছেদ করেন। তারকের ছেলেরাও নিহত হয়। বাণাসুরও পরাজিত হন। হরিবংশে উষা হরণ প্রসঙ্গে বাণকে সাহায্য করতে আসেন ও কৃষ্ণের হাতে পরাজিত হন।

আর এক মতে অরুন্ধতীকে বাদ দিয়ে ছয়টি ঋষিপত্নী সকালে গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে অগ্নির সঙ্গে সহবাস করতেন এবং গর্ভবতী হন। পরে এরা সকলেই হিমালয়ে গর্ভ পরিত্যাগ করে আসেন। এই মিলিত গর্ভ/তেজ থেকে স্কন্দের জন্ম। আর এক

মতে বরুণের যজ্ঞে সকলে আসেন। শিবও আসেন। ঋষিদের সুন্দর পত্নী দেখে শিবের বীর্যপাত হয়, শিব এই বীর্য অগ্নিতে ফেলে দেন। অগ্নি এই বীর্য গঙ্গাকে ধারণ করতে দেন। গঙ্গা প্রথমে অস্বীকৃত হয়েও ধারণ করেন এবং ছেলে হলে শরবণে ফেলে দেন। হরিবংশে (১।১১৬।১৮) যেখানে কার্তিকেয় জন্মান সেই স্থান পরে বাণের রাজধানী শোণিতপুর হয়েছিল।

কালিকা পুরাণে দেবতাদের প্রার্থনায় হরপার্বতী পুত্রার্থে মিলিত হন ; মানবীয় ৩২ বছর কেটে যায় ; পৃথিবী কেঁপে ওঠে। ইন্দ্র ভয় পান তাঁর থেকেও শক্তিশালী সন্তান হবে ; ব্রহ্মার কাছে ছুটে যান। ব্রহ্মা সকলকে নিয়ে এসে শিবকে নিবৃত্ত করেন। এর ফলে পার্বতী অভিশাপ দেন দেবতাদের জন্য তাঁর পুত্র হল না ; দেবতারাও নিঃসন্তান হবেন। কিন্তু শিবের বীর্য কে ধারণ করবেন? অগ্নি রাজি হন। এই সময় দু-ফোঁটা বীর্য পাহাড়ে গিয়ে পড়ে এবং ভৃঙ্গী ও মহাকাল জন্মান। মহাদেব তারপর বলে দেন উমার বড় বোন আকাশগঙ্গা, এ'র গর্ভে তাঁর ঐ বীর্যে অগ্নি থেকেও শ্রেষ্ঠ অরিন্দম পুত্র জন্মাবে। ফলে অগ্নি এই বীর্য গঙ্গাতে ফেলে দেন ; গঙ্গা ধারণ করেন ও পূর্ণ কালে শাখ ও বিশাখ দুটি ছেলে হয় এবং দুটি ছেলে জুড়ে গিয়ে একটি পুত্রে পরিণত হয়। গঙ্গা একে শরবণে পরিত্যাগ করেন এবং এই সন্তানের জন্মের কথা নক্ষত্র বহুলাকে (=কৃত্তিকা ; ৪৬।৮৯) জানান। কৃত্তিকারা পালন করেন ফলে নাম কার্তিকেয়।

পদ্মপুরাণে তারকের জন্য সেনাপতির প্রয়োজন হয়। মহাদেব তখন বিপত্নীক। হিমালয়ের কন্যা হবে এবং এই কন্যার গর্ভে জন্ম-শিবের-ছেলে তারককে মারতে পারবে। ব্রহ্মা নিশাকে ডেকে নির্দেশ দিলেন হিমালয়ে সতী জন্মাবে তাকে কালো করে দিতে হবে। রঙের জন্য শিবের সঙ্গে কলহ বাধবে ; পার্বতী তপস্যা করতে যাবেন এবং এই তাপসীর ছেলে দেবসেনাপতি হবে। এই কারণে সতী কালো রঙ নিয়ে জন্মান, নারদ ভাবী স্বামীর কথা জানিয়ে যান। মদনের সাহায্যে ইন্দ্র শিবের তপস্যা ভাঙেন। মদন ভস্ম হন এবং সপ্তর্ষিদের উদ্যোগে হরপার্বতীর বিয়ে হয়। এরপর খেলার ছলে একদিন পার্বতী গাত্রমল থেকে গণেশকে সৃষ্টি করলেন। এরপর শিব একদিন কালো রঙ নিয়ে উপহাস করতে পার্বতী রাগে বীরককে শিবের অসৎ চরিত্রের সন্দেহে পাহারা রেখে তপস্যায় চলে যান এবং গৌরী হয়ে ফিরে আসেন। সতীর কালো চামড়া কৌশিকী দেবীতে পরিণত হয়ে বিন্ধ্যাচলে গিয়ে বাস করতে থাকেন। দ্রঃ- একানংশা।

এরপর শিবপার্বতী পুত্রার্থে মিলিত হন ; হাজার বছর কেটে গেল ইত্যাদি। অধৈর্য্য দেবতারা অগ্নিকে পাঠান মহাদেবকে বিরত করার জন্য। শুক রূপে আসেন ; মহাদেব বিরত হন বটে কিন্তু শুক-কে চিনতে পেরে শাপ দেন অর্দ্ধ স্খলিত বীর্য অগ্নি পান করবে। ফলে অগ্নির জঠর স্ফীত হয়ে উঠল ; দেবতারা এই জঠর ভেদ করে মহাদেবের বীর্য মাটিতে বার করে আনলেন। ফলে সেখানে একটা বিশাল সরোবর গড়ে উঠল। পার্বতী এই সরোবরের তীরে বসে শোভা দেখছিলেন এবং দেখলেন

ছয় জন কৃত্তিকা স্নান করে পদ্মপাতায় করে এই জল নিয়ে যাচ্ছেন। পার্বতী এই জল পান করতে চাইলেন। এরা জানায় এই জল পান করলে পার্বতীর পুত্র হবে এবং সেই ছেলে তাঁদেরও ছেলে এবং তাঁদের নামে কার্তিকেয় বলে পরিচিত হবে। পার্বতী সম্মত হন, পান করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দেবীর দক্ষিণ কুক্ষি ভেদ করে ষড়ানন এক শিশু জন্মায়; ইনি কুমার এবং তারপর বাম কুক্ষি ভেদ করে আর এক শিশু জন্মায় নাম হয় স্কন্দ। অগ্নির মুখ থেকে আর এক ষড়ানন জন্মায়; নাম বিশাখ। চৈত্রমাসে কৃষ্ণা পঞ্চমীতে এই দুই শিশু এক হয়ে গুহতে পরিণত হন; ষষ্ঠীতে অভিষেক হয়; ইন্দ্র তারপর দেবসেনার সঙ্গে বিয়ে দেন এবং বিষ্ণু অস্ত্রশস্ত্র দেন।

বামন পুরাণে কৃষ্ণা-সতী ব্রহ্মার বরে গৌরী হন এবং মহাদেব গৌরীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে পুত্রার্থে মিলিত হন। হাজার বছর কেটে যায়; দেবতারা ছুটে আসেন, অগ্নি হংসরূপে ঘরে ঢুকে সূক্ষ্মরূপে শিবের মাথায় উঠে জানান দরজায় দেবতারা অপেক্ষা করছেন। শিব তৎক্ষণাৎ বার হয়ে এলেন। শিবের স্খলিত বীর্য কাউকে গ্রহণ করতে হবেই; অগ্নি পান করলেন; পার্বতী দেবতাদের নিঃসন্তান হবার শাপ দেন এবং শৌচাগারে গিয়ে গাত্রমল দিয়ে গণেশকে তৈরি করলেন।

এদিকে শিবের বীর্য পান করে অগ্নির তেজ ক্ষীণ হয়ে এল। এই সময় নদীরূপা কুটিলা অগ্নির কাছ থেকে এই তেজ গ্রহণ করে ৫০০০ বছর ধারণ করে ব্রহ্মার নির্দেশে শরবণে গিয়ে মুখ থেকে এই তেজ বার করে দিলেন। দশ শত বৎসর পূর্ণ হলে এখানে এক বালক জন্মায়। ছয়জন কৃত্তিকা দেখতে পেয়ে কৃপাযুক্ত হয়ে এগিয়ে আসেন এবং কে আগে একে স্তন্য দেবেন কলহ করতে থাকেন। শিশু তখন ৬-মুখে স্তন্য পান করেন। এরপর কার ছেলে স্থির করার জন্য শিব, গৌরী, কুটিলা ও অগ্নি সেখানে আসেন। শিশুটি তখন কুমার হয়ে শিবের কাছে, বিশাখ হয়ে পার্বতীর কাছে, শাখ হয়ে কুটিলার কাছে এবং নৈগমেয় হয়ে অগ্নির কাছে উপস্থিত হন। শিব তখন বলেন কুটিলার পুত্র কুমার নামে, পার্বতীর স্কন্দ নামে, শিবের গুহ নামে, অগ্নির মহাসেন নামে এবং শরবণের পুত্র সারস্বত নামে পরিচিত হবেন। (বামন ৫৭।৪২)। এরপর সেনাপতি হন; শিব চারটি গণ দেন, দেবতারা নিজেদের গণ দেন এবং গরুড় ময়ূর দেন।

বরাহ পুরাণে আছে সেনাপতির প্রয়োজন এবং ব্রহ্মার পরামর্শে দেবতারা স্তব করেন। শিব নিজ দেহস্থিত শক্তি থেকে অহঙ্কাররূপে কার্তিককে জন্ম দিলেন। শিশু খেলনা ও অনুচর চাইলে কুক্কুট ও অনুচর হিসাবে শাখ ও বিশাখকে দিয়েছিলেন। শিব-পুরাণেও অন্যান্য পুরাণের মত কাহিনী। মহাদেব বিরত হলে স্খলিত বীর্য কপোতরূপী অগ্নি ঠোঁটে করে তুলে নিয়ে এবং নিজে ধারণ করতে না পেরে গঙ্গায় এবং গঙ্গা অসমর্থ হয়ে শরস্তম্ভে ফেলে দেন; শরবণে শিশু জন্মায়। এই সময় ছয়জন রাজকন্যা এসেছিলেন গঙ্গাস্নানে। এরা আমার ছেলে আমার ছেলে বলে এগিয়ে এলে কুমার ছয় মুখে এদের স্তন্য পান করেন। মৎস্যপুরাণে কার্তিক অগ্নির পুত্র এবং কার্তিকেয়র পিঠ থেকে শাখ, বিশাখ ও নৈগমেয় জন্মান।

জন্মের এই কাহিনীর আরো নানা হেরফের রয়েছে। একটি মতে ব্রহ্মার নির্দেশে দেবতারা পার্বতীর সঙ্গে (দ্রঃ- মদন) মহাদেবের বিয়ে দেন। বহু দিন কোন সন্তান হয় না। দেবতারা ব্যস্ত হয়ে পড়েন। হরপার্বতী একদিন বিহার করছিলেন অগ্নি (দ্রঃ) এই সময় দেবতাদের নির্দেশে কপোত রূপ ধরে সেইখানে এলে মহাদেব সম্ভোগে বিরত হন এবং বীর্যপাত হয়। আর এক মতে ব্রহ্মা অগ্নিকে পাঠান। অগ্নির তেজে উত্তপ্ত হয়ে মহাদেবের বীর্যপাত হয় এবং পৃথিবীতে এসে পড়ে। পৃথিবী এই বীর্য ধারণ করতে না পেরে অগ্নিতে ফেলে দেন। অগ্নি অসমর্থ হয়ে শরবণে ফেলে দেন। অন্য মতে অগ্নি গঙ্গাতে ফেলে দিয়েছিলেন এবং গঙ্গা অসমর্থ হয়ে হিমালয়ের পাশে শরবণে এই বীর্য ত্যাগ করেন। শরবণে এই বীর্য সুন্দর একটি বালকে পরিণত হয়। আর এক মতে শরবনে ফেলে দিলে দেবতারা তখন ছয় জন কৃত্তিকাকে এই বীর্য রক্ষা করতে পাঠান। এরা এই বীর্য পান করে গর্ভবতী হয়ে ছয়টি সন্তান প্রসব করেন ; এবং ছয়টি ছেলে জুড়ে গিয়ে একটি ছেলে কার্তিকেয়তে পরিণত হয়। গঙ্গা মহাদেবের বীর্য ফেলে দিয়ে ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে আশ্রয় নেন। পরে দেবী বসুন্ধরা এই ছেলেকে গ্রহণ করেন এবং শরবণে এই ছেলে বড় হতে থাকে। অন্য মতে কৃত্তিকারা এসে একটি শিশুকে দেখতে পান এবং স্তন্য দান করে পালন করেন। আর এক মতে পার্বতী কৃত্তিকাদের পাঠিয়েছিলেন এবং পরে কার্তিককে চেয়ে নেন। আর এক মতে হরপার্বতীর সম্ভোগে সারা পৃথিবী কাঁপতে থাকে; সৃষ্টি নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। দেবতাদের অনুরোধে মহাদেব বিরত হন। শিবের বীর্য পৃথিবীতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। দেবতাদের অনুরোধে এই তেজ-বীর্য অগ্নি গ্রহণ করে পুড়িয়ে ছাই করে দেন ; গাদা হয়ে ছাই যেখানে পড়ে থাকে সেখানে শরবণ গড়ে ওঠে।

অগ্নি শিবের তেজ গ্রহণ করে পুড়িয়ে ছাই করে দিলেও কিছু তেজ তাঁর মধ্যে ছিল; সহ্য করতে পারছিলেন না। দেবতাদের জানান, দেবতারা ব্রহ্মার কাছে পাঠান। পথে গঙ্গার সঙ্গে দেখা, গঙ্গাকে এই বীর্য ধারণ করতে দেন। ৫000 বছর অগ্নি এই তেজ/বীর্য ধারণ করেছিলেন ফলে তাঁর দেহের রঙ সোনার মত হয়ে যায় এবং নাম হয় হিরণ্যরেতঃ। ৫000 বছরেও গঙ্গার কোন সন্তান হয় না এবং গঙ্গাও এই তেজ সহ্য করতে পারছিলেন না। ফলে ব্রহ্মার কাছে যান এবং ব্রহ্মার নির্দেশে উদয় পর্বতে শরবণে (স্যাকারাম মুঞ্জা—রক্ষ) এই বীর্য মুখ থেকে বার করে দেন ; এবং ১000 বছর পরে এই বীর্য একটি শিশুতে পরিণত হয়। শিবের তেজে এই শরবণ ও এখানে পশুপাখী গাছপালা যা কিছু ছিল সোনা ও সোনার মত রঙ হয়ে যায়।

শিশু জন্মেই বজ্র নির্ঘোষে কাঁদতে থাকেন। ছজন কৃত্তিকা ইত্যাদি এবং ছয়টি মুখমণ্ডল হয়; নাম হয় কার্তিকেয় ও ষড়ানন। ব্রহ্মার কাছে খবর পেয়ে অগ্নি দেখতে আসেন, পথে গঙ্গার সঙ্গে দেখা। দুজনে তর্ক এ কার ছেলে। বিষ্ণু এসে তখন শিবের কাছে গিয়ে এই তর্কের সমাধান করতে বলেন। শিব পার্বতীকে নিয়ে শরবণে আসেন ; এবং বলেন দেখা যাক শিশু কার দিকে চেয়ে দেখে। শিবের

উদ্দেশ্য জানতে পেরে কুমার, বিশাখ, শাখ ও নৈগমেয় এই চারটি অংশে ভাগ হয়ে এরা শিব পার্বতী গঙ্গা ও অগ্নির দিকে যথাক্রমে চেয়ে থাকে; ইত্যাদি। মহাদেব এরপর দেবতাদের স্মরণ করেন; সকলে এলে শিশুকে কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী তীরে নিয়ে গিয়ে শিব ও বিষ্ণু একে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করেন। পার্বতী তারপর শিশুকে কোলে তুলে নেন। দেবতারা তাঁদের নানা অস্ত্র ইত্যাদি দেন এবং সহায় হিসাবে অনেকগুলি প্রমথ ইত্যাদি দান করেন। শিবের দেওয়া প্রমথ ঘণ্টাকর্ণ, লোহিতাক্ষ, নন্দিসেন ও কুমুদমালী (ব্রহ্মাণ্ড-পু)। গরুড় বাহন হিসাবে নিজের ছেলে ময়ূরকে দান করেন। এরপর তীব্র যুদ্ধ হয়। তারক, তারকের তিন ছেলে, মহিষাসুর, বলির ছেলে বাণ যুদ্ধে আসেন। যুদ্ধে তারক ও অন্যান্য বহু অসুর নিহত হন। বাকি সব পালিয়ে যান।

এরপর কার্তিকেয়র বয়স হতে থাকে; পার্বতীর সীমাহীন আদরে একেবারে নষ্ট হয়ে যান। কিছু দেব রমণীদেরও বলাৎকার করে বসেন। সকলে তখন পার্বতীর কাছে এসে অভিযোগ করেন। পার্বতী তৎক্ষণাৎ কার্তিককে ডেকে পাঠান এবং দেখান এই সকল দেবপত্নীদের মধ্যে পার্বতীরই অংশ রয়েছে। কার্তিক তখন অনুশোচনায় শপথ করেন এরপর সমস্ত নারীকে তিনি পার্বতী বলে শ্রদ্ধা করবেন।

খাণ্ডবদাহনের সময় কৃষ্ণ ও অর্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছিলেন (মহা ১।২২৬।৩৩)।

একটি মতে কার্তিকের পিঠ থেকে শাখ, বিশাখ, নৈগমেয় ইত্যাদি জন্মান। কার্তিকের ২, ৪, ৬ ও ১২ হাতও বর্ণিত আছে। কার্তিকের একটি বড় পরিচয় ভূতগ্রহ পতি। কার্তিকেয় গায়ত্রী :- তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাসেনায় ধীমহি তৎ নঃ ষণ্মুখঃ প্রচোদয়াৎ। বৈদিক যুগের শেষ দিকে ইন্দ্রের প্রভাব হ্রাস পেতে থাকলে তখন যেন স্কন্দের কল্পনা রূপ নিয়েছিল। বা হয়তো নতুন চরিত্র ও কাহিনী সৃষ্টির প্রয়াস থেকে স্কন্দের জন্ম। বরাহপুরাণে ৬-ষ্ঠীতে পিতামহ স্কন্দকে অভিষিক্ত করেন। মহাভারতে মঘবান (৩।২২৮।২৩) অভিষেক করেন। কার্তিকেয়র বাহন ময়ূর; তন্ত্রশাস্ত্রে গরুড় থেকে এই ময়ূরের জন্ম বলা হয়েছে।

কার্তিকেয় বৈদিক যুগের দেবতা নন। বর্তমানে এ'র পূজার প্রচলন সে রকম ব্যাপক নয়। সংহিতা ও আরণ্যক যুগের পরে এ'র পরিকল্পনা রূপ পায় এবং এক দিন এ'র পূজা ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। পতঞ্জলি স্কন্দ ও বিশাখকে লৌকিক দেবতা বলেছেন। মুদ্রাতে ও বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন নামে স্কন্দকে পাওয়া যায়। বিভিন্ন গ্রন্থের বিভিন্ন কাহিনী বিচার করলে দেখা যায় অনেকগুলি লৌকিক কাহিনী মিলে স্কন্দের জন্ম; পিতামাতার কোন স্থিরতা নাই। এ'র পারিষদরা বিভিন্ন জন্তুর মুখধারী গণ; ফলে ক্রমশঃ গণেশের মত গণেশ্বর হয়ে শিবের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। বহুস্থানে শিবকে জন্মদাতা বলা হয়েছে। দেবতা হিসাবে গণেশের বহু আগে দেখা দিয়েছিলেন কিন্তু তবুও কোন সম্প্রদায় গড়ে ওঠেনি। কার্তিকেয়র অনেক নাম; স্কন্দপুরাণে ১০৮ নাম রয়েছে। এগুলির মধ্যে সব চেয়ে প্রচলিত নামগুলি

হচ্ছে ঃ—কার্তিকেয়, স্কন্দ, কুমার, বিশাখ, মহাসেন, ব্রহ্মণ্য, সুব্রহ্মণ্য, নৈগমেয়, সনৎকুমার, গুহ, জয়ন্ত, ষড়ানন। ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখা যায় ঋষি সনৎকুমার ও স্কন্দ অভিন্ন। মহাভারত ইত্যাদিতে সনৎকুমার ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ মানসপুত্র, মহাজ্ঞানী পরমর্ষি। মহাভারতে শান্তিপর্বে অবশ্য স্কন্দকে সনৎকুমার বলা হয়েছে। শল্য পর্বে আছে ব্রহ্মা স্কন্দকে দেব সেনাপতি করে দেন। সেবসেনার সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন। বায়ু, কূর্ম ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ মতে ব্রহ্মার ধ্যান প্রসূত অষ্টনাম ও অষ্টতনুর মধ্যে শিবের পাশুপতী তনুর নাম অগ্নি ; অগ্নির স্ত্রী স্বাহা এবং ছেলে স্কন্দ।

বেদোত্তর সাহিত্যে কার্তিকেয়র জন্মের সঙ্গে স্বাহা, রুদ্র, শিব, অগ্নি, গঙ্গা (দ্রঃ) ও ছজন কৃত্তিকাকে জড়িয়ে নানা কাহিনী তৈরি হয়েছে। বামনপুরাণে গঙ্গার পরিবর্তে কুটিলাকে অগ্নির কাছ থেকে মহাদেবের বীর্য গ্রহণ করতে দেখা যায়। এতগুলি দেবতাকে মিলিয়ে কার্তিকেয়র এই বিচিত্র জন্মকাহিনী গড়ে তোলার কারণ কি স্পষ্ট নয়। প্রাচীন কালে কার্তিকেয়র পূজার সঙ্গে সূর্যপূজার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল মনে হয়। মহাভারত, পুরাণ ও শিল্পশাস্ত্রে কার্তিকেয়র সঙ্গে এবং হাতে মুরগি রাখার নির্দেশ আছে। কার্তিকেয়র মুরগিযুক্ত বহু প্রাচীন মূর্তিও পাওয়া গেছে। এই মুরগি সূর্যের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী (নিরুক্ত ১২-১৩) বা সম্পর্কিত। বামন ও স্কন্দ পুরাণে দেখা যায় অরুণ কার্তিকেয়কে মুরগি উপহার দিচ্ছেন। কানপুরে লালা ভগত গ্রামে কার্তিকেয় উপাসনার নিদর্শন রূপ কুক্কুট শীর্ষ যে ভগ্নাবশেষ স্তম্ভ (খৃঃ ২-শতক) আছে তার গায়ে সূর্যমূর্তি খোদিত রয়েছে। ভবিষ্য পুরাণে স্কন্দ সূর্যের অনুচর এবং সূর্যের বাঁ দিকে অবস্থিত। সূর্যের পার্শ্বদেবতা রাজ্ঞ ও কার্তিকেয় অভিন্ন বলা হয়েছে। মৎস্য পুরাণে নবগ্রহ পূজার সঙ্গে কার্তিকেয় জড়িত। অর্থাৎ সূর্য ও কার্তিকেয় পূজার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল।

কার্তিকেয় কল্পনায় ও পূজায় সামরিক দেবতা। তস্করদের পূজ্য রূপেও উল্লেখ আছে। তথাকথিত অহিন্দু বৌদ্ধ ও জৈন পুরাণেও কার্তিকেয় গৃহীত হয়েছেন। পালি সাহিত্যে স্কন্দ, কুমার ও ময়ূর-বাহন রূপে বা শিবের সঙ্গে কার্তিকেয় উপস্থিত রয়েছেন। বৌদ্ধধর্মের বজ্রযান শাখায়ও কার্তিকেয়র উল্লেখ রয়েছে। জৈন শাস্ত্রে (জয়ন্ত নামে) অনুত্তর দেবতা হিসাবে বর্তমান। জৈন ধর্মশাস্ত্রে কুমার ও ষণ্মুখ নামে যে দুজন যক্ষ রয়েছে তারা কার্তিকেয়র একটি সংস্করণ মাত্র। জৈন কাহিনীতে আছে হরিনেগমেসি বা নৈগমেষ ছিলেন ইন্দ্রের সেনাপতি এবং মহাবীরকে ইনি ব্রাহ্মণী দেবানন্দার গর্ভ থেকে ক্ষত্রিয় ত্রিশলার গর্ভে স্থানান্তরিত করে দিয়েছিলেন। এই নৈগমেষ নাম সাদৃশ্যে ও জীবিকাতে ব্রাহ্মণ্য দেবতা নৈগমেয় অর্থাৎ কার্তিকেয়। এছাড়াও জৈন ভাস্কর্যে নৈগমেয় ছাগমুখ এবং মহাভারতে ও পুরাণাদিতেও কার্তিকেয়র একটি ছাগ মুখ এবং তাঁর সপ্ত অনুচরী মাতৃগর্ভ থেকে ভ্রূণ অপহরণ করেন।

বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ভাবে পরস্পর বিরোধী উপাদানের সংমিশ্রণে কার্তিকেয়র এই রূপায়ণ। সনৎকুমার রূপে কার্তিকেয় বেদের উপদেষ্টা। মহাভারতে (১২।৩৪।১২) স্কন্দ হচ্ছেন সনৎকুমার। ছান্দোগ্য উপনিষদে সনৎকুমারকে স্কন্দ

বলা হয়েছে। এই সনৎকুমার ঐতিহ্যের কারণে দক্ষিণ ভারতে সুব্রহ্মণ্য মূর্তিতে পূজিত এবং এই সুব্রহ্মণ্য তাঁর পিতা মহাদেবকে প্রণব শিক্ষা দিয়েছিলেন। একদা দস্যু তস্করের উপাস্য দেবতা ছিলেন কার্তিকেয় ; মৃচ্ছকটিক নাটকে তস্করদের কার্তিকেয় পুত্র বলা হয়েছে ; চৌর্য শাস্ত্রের প্রবক্তাও সেখানে কার্তিকেয়। প্রাচীন ভারতীয় চৌর্য-শাস্ত্রের নাম ষণ্মুখকল্প। উন্মাদ রোগ, অপস্মার রোগ প্রভৃতির এবং ডাকিনী, শাকিনী ভ্রূণাপহারিণী অনুচরীদের দেবতাও কার্তিকেয়। এই সকল রৌদ্র-কর্মের মধ্যে দিয়ে দেখলে কার্তিকেয় ভয়াল বৈদিক দেবতা রুদ্রের একটি সংস্করণ। অর্থাৎ রুদ্রের অনেক-গুলি গুণ স্কন্দের ওপর চাপান হয়েছে। আদিত্যের সঙ্গে সম্পর্কও বহু জায়গায় দেখান হয়েছে। আবার কার্তিকেয় কর্তৃক বিভিন্ন শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠার কাহিনী ও কুশস্থলী নামে কার্তিকেয় তীর্থে ব্রহ্মার দ্বারা শিব প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে দেখা যায় শৈব প্রভাবও কার্তিকেয়র পূজার মধ্যে এসে পড়েছিল। কার্তিকেয় ও তাঁর অনুচর বিশেষকে পুরাণে কোন কোন জায়গায় আরোগ্যকারীও বলা হয়েছে। ব্রহ্মপুরাণে কার্তিকেয়কে মুনি পত্নীদের সঙ্গে ব্যাভিচারে রত দেখা যায় ; এটা যেন অগ্নির কাছ থেকে পাওয়া চরিত্র দোষ। দেবসেনাপতি রূপে তারকাসুর নিধন করলেও কার্তিকেয়কে আবার ইন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপেও পুরাণাদিতে দেখা যায়। এক মতে কার্তিকেয় চিরকুমার আর এক মতে এঁর স্ত্রী (দ্রঃ পৃ ৩৩৬) দেবসেনা। পদ্মপুরাণে কার্তিকেয়র বোন অশোক-সুন্দরী (দ্রঃ), শিবপার্বতীর মেয়ে। দ্রঃ- পুত্রবধূ।

প্রাচীন ভারতে সর্বত্র এঁর পূজা ব্যাপক ছিল। উত্তর ভারতে প্রাচীন দেবতা। অর্থ-শাস্ত্রে দুর্গমধ্যে জয়ন্ত বা কার্তিকেয়র পূজা-গৃহ নির্মাণের নির্দেশ আছে। অগ্নিপুরাণে বলা হয়েছে শহরের উত্তর দিকে যক্ষ, কুবের ও গুহের মন্দির স্থাপন করতে হবে। অর্থাৎ যক্ষ ইত্যাদির সঙ্গেও একটা সম্পর্ক রয়েছে। মহাভাষ্যে আছে শিব, স্কন্দ ও বিশাখ ইত্যাদির প্রতিমা পূজার জন্য তৈরি করে বিক্রি করে মৌর্যরাজারা অর্থ সংগ্রহ করতেন। যুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্ক অতি প্রাচীন, ফলে যৌধেয় ইত্যাদির কাছে অত্যন্ত পূজিত হতেন। দেশী ও বিদেশী শাসকগণের মুদ্রাতে উ-ভারতে স্কন্দকে প্রথম পাওয়া যায়। কুষাণরাজ হুবিষ্ক মুদ্রাতে স্কন্দ, কুমার, বিশাখ ও মহাসেন চার জনেই বর্তমান। হাতে বর্শা কোথাও বা তরবারি। অন্য ধরণের মুদ্রাও পাওয়া গেছে। পাঞ্জাবে যুদ্ধ ব্যবসায়ী যৌধেয় উপজাতি কার্তিকেয়র পরম ভক্ত ছিলেন এবং কার্তিকেয়র নামে মুদ্রা চালু করেছিলেন। যৌধেয় মুদ্রাতে (খৃ-২-শতক) ৬-মাথা, ২-হাত কার্তিক, বাম হাতে বর্শা এবং ব্রহ্মণ্যদেবস্য বা ব্রহ্মণ্যদেবস্য কুমারস্য বলে মুদ্রাতে উল্লেখ রয়েছে। কিছু যৌধেয় মুদ্রাতে কার্তিকেয়র এক মাথা। কতকগুলি মুদ্রাতে এক মাথা কার্তিক এবং এই মুদ্রাগুলির বিপরীত দিকে ১ বা ৬ মাথা একটি দেবী মূর্তি ; সম্ভবত ইনি দেবসেনা। মনে হয় যৌধেয়দের অনেকে নিজেদের রাজ্য কার্তিকেয়কে উৎসর্গ করে প্রতিনিধি রূপে রাজপাট চালাতেন। এঁদের রাজধানী রোহিতক কার্তিকেয় উপাসনার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। প্রথম কুমারগুপ্তের মুদ্রাতে ময়ূরের পিঠে বসা, এক মাথা, হাতে বর্শা। আর এক শ্রেণীর মুদ্রাতে নৃত্য রত মূর্তি ছিল। গুপ্ত যুগের লাল বেলে পাথরের উৎকীর্ণ মূর্তিতেও ময়ূর বাহন,

হাতে শক্তি। ১-ম কুমারগুপ্তের বিলসদ্ স্তম্ভ (৪১৫-৪১৬ খৃ) লেখে কার্তিকেয়র মন্দির প্রসঙ্গ এবং সম্রাট স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ বিহার স্তম্ভ লেখে স্কন্দকে মাতৃকাগণের অভিভাবক হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অযোধ্যাতে প্রাপ্ত দেবমিত্র ও বিজয়মিত্রের (খৃ ১ শতক) মুদ্রাতে কুক্কুটধ্বজা পাওয়া যায়। মুদ্রা অনুসারে অনুমান ঐ সময় এঁর পূজা চালু ছিল। ৮-১১ খৃ শতকে বহু উৎকীর্ণ চিত্রে পূর্ব ভারতে বহু স্থানে দ্বিভুজ দণ্ডায়মান মূর্তি; ময়ূর পাশে রয়েছে। উড়িষ্যা থেকে প্রাপ্ত একটি দণ্ডায়মান মূর্তি বর্তমানে লণ্ডনে রয়েছে। এলোরাতে উৎকীর্ণ ছবিতে চার হাত, এক হাতে কুক্কুট এবং দেবতার দক্ষিণে ছাগবক্ত্র (নৈগমেয়) এবং বামদিকে গর্দভমুণ্ড আর এক জন পারিষদ রয়েছে। 'দেবসেনা কল্যাণসুন্দর' (তিরুপ্পরঙ্কুন্ড্রম্—nkunram) মূর্তিটিতে দেবসেনার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে। মূর্তিটি শিবের কল্যাণ-সুন্দর মূর্তির (দ্রঃ) অনুকরণ; পার্বতীর বদলে দেবসেনা; ইন্দ্র কন্যাদান করছেন; পুরোহিত এখানেও ব্রহ্মা। কার্তিকের একটি দাক্ষিণাত্যীয় স্ত্রী আছেন নাম বল্লী বা মহাবল্লী। পাথরে খোদাই কিছু ছবিতে ও ব্রোঞ্জমূর্তিতে এই মহাবল্লী ও দেবসেনা দুজনকেই কুমারের সঙ্গে দেখা যায়। অন্ধ্রের ইক্ষ্বাকু বংশীয়, বাদামির চালুক্য বংশীয়, ও বনবাসীর কদম্ববংশীয় রাজারা নিজেদের কার্তিকেয় দ্বারা সুরক্ষিত বলে বর্ণনা করে গেছেন। মেঘদূতে আছে দেবগিরি স্কন্দ পূজার কেন্দ্রস্থান। বোধায়ন ধর্মসূত্র, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, নারায়ণ উপনিষদ ও মহাভারতে অনুসারে খৃ-৩ শতকে আগে কার্তিককে পাওয়া যায়। চোর, ডাকাত, ঠগ ইত্যাদিও সাহস সঞ্চয়ের জন্য ইত্যাদি এঁর পূজা করত। মৃচ্ছকটিকাতে স্কন্দপুত্র চোর; চৌরকর্মে সিদ্ধির জন্য কার্তিকেয় চৌরশাস্ত্র প্রণয়ন করেছিলেন। কাব্য মীমাংসা ইত্যাদিতেও কার্তিকেয় নগর বা কার্তিকেয়পুর এই দেবতার পূজার ব্যাপকত্ব সূচনা করে। অবশ্য শৈব, বৈষ্ণব ইত্যাদির মত কোন সম্প্রদায় গড়ে ওঠে নি। বর্তমানে উত্তর ভারতে কার্তিকেয়ের পূজা সে রকম হয় না কিন্তু দক্ষিণ ভারতে আজও ব্যাপক ভাবে হয়ে থাকে। গুপ্তোত্তর যুগে উ-ভারতে স্কন্দের পূজা শিবের পূজার মধ্যে এমন ভাবে হারিয়ে যায় যে কার্তিকের আর মন্দির পাওয়া যায় না। ভুবনেশ্বরে স্কন্দ শিবের পার্শ্বদেবতা। দ-ভারতেও শিবের সঙ্গে নিবিড় ভাবে জড়িত এবং এখানে বহু মন্দির আজও দাঁড়িয়ে আছে।

বৃহৎ সংহিতাতে স্কন্দের প্রথম বর্ণনা। বাহন ময়ূর, হাতে শক্তি (বর্শা জাতীয়), দু হাত ও বালক বয়স। কিন্তু বিষ্ণু ধর্মোত্তরে ৬-মুখ, রক্ত বস্ত্র, ময়ূর বাহন, হাতে কুক্কুট, ঘণ্টা, বৈজয়ন্ত পতাকা ও শক্তি। বিষ্ণু ধর্মোত্তরে এই কার্তিকেয়ের অনুরূপ আরো তিনটি মূর্তি স্কন্দ, বিশাখ ও গুহ তৈরি করতে হবে বলা হয়েছে; তবে ছয়মুখ ও ময়ূর বাহন এঁদের থাকবে না। আরো আছে চতুরাত্মা বাসুদেব কুমার হিসাবে প্রাদুর্ভূত। পুরাণেও কার্তিকেয় এবং এঁর সংস্করণ বিশাখ ইত্যাদি সম্বন্ধে এই একই নির্দেশ। মধ্যযুগে দাক্ষিণাত্যে কুমার পূজা ছড়িয়েছিল। অংশুমৎ ভেদে ২, ৪, ৬ ও ১২ হাত স্কন্দের উল্লেখ আছে। পাথর ও ব্রোঞ্জের মূর্তি দ-ভারত থেকেই পাওয়া গেছে। কার্তিকেয়ষষ্ঠী, কুমারষষ্ঠী ইত্যাদি ব্রত এই পূজার একদা জনপ্রিয়তার স্বাক্ষর। বাংলা দেশে একদিন মাত্র গণিকামহলে জাঁকজমক করে এঁর পূজা হয়ে থাকে এবং এই পূজার

পেছনে কোন ঐতিহ্য আছে কিনা স্পষ্ট নয়। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে শিল্পশাস্ত্রগুলিতে কার্তিকেয়র নানাবিধ মূর্তিনির্মাণ প্রণালীর বিস্তারিত নির্দেশ রয়েছে। দ্রঃ- রজ, বিশাখ, মুদ্রা।

কার্যকারণ—ন্যায়-বৈশেষিকে কার্য-কারণের স্বরূপ লোকপ্রচলিত ধারণারই অনুরূপ। ভারতীয় দর্শনে কার্যকারণবাদের দুটি ধারা (স্কুল) দেখা যায়। ন্যায় বৈশেষিক মতে এর নাম অসৎকার্যবাদ এবং সাংখ্যবেদান্ত মতে এর নাম সৎকার্যবাদ। সৎকার্যবাদ অর্থে বীজ অঙ্কুরের কারণ বটে কিন্তু বীজের মধ্যে অঙ্কুর সৎ। ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে কার্যের উৎপাদক কারণ তিন প্রকার সমবায়ী, অসমবায়ী, ও নিমিত্ত। সাংখ্য বেদান্ত মতে এই কারণ দু'রকমঃ—উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। মীমাংসা, সাংখ্য ও বেদান্ত এবং বৌদ্ধ দর্শন মতে কারণের মধ্যে কার্য উৎপাদন শক্তি রয়েছে, এই জন্য কারণ থেকে কার্যের উৎপত্তি ; ন্যায় বৈশেষিক মতে সব সময় এটি সত্য নয়।

কার্লা—মালাবলি রেল স্টেসনের প্রায় ৫ কি-মি উত্তরে পুনা জেলার গ্রাম। এই গ্রামের পাশে প্রাচীন বলুরক পর্বত। এই পাহাড়ে ১১০ মিটার উচ্চে বারটি শৈলখাত বৌদ্ধ বিহার, কয়েকটি শৈলখাত জলাধার ও একটি চৈত্যগৃহ বিদ্যমান। খৃস্টীয় ৭ শতক পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটি জীবিত ছিল। এখানকার বিহারগুলির মধ্যে অন্তত দুটি গুপ্ত-বাকাটক যুগের। চৈত্যগৃহটি শৈলখাত স্থাপত্য কলার অনবদ্য বৈশিষ্ট্যযুক্ত ; এবং বিশ্বের প্রত্নকীর্তিরাজির অন্যতম। খৃস্টীয় ২-শতকের দ্বিতীয় পাদের আগেই তৈরি হয়েছিল। বর্ষাকালে বলুরকের গুহাবাসী শ্রমণদের ভরণপোষণের জন্য করজিকা (—সম্ভবতঃ বর্তমান কার্লা) গ্রামটি দেওয়া হয়েছিল। ধেনুকাকটের কয়েক জন যবন ও বনবাসী, সোপারা প্রভৃতি দূরবর্তী স্থানের লোক ও অন্য বহুলোকের দানে এই চৈত্যটি তৈরি হয়েছিল।

উচ্চ শৈলখাত আবরণীযুক্ত বারান্দা ও তিনটি দ্বারপথে অধিগম্য কুলার-আকার-হলঘর নিয়ে এই চৈত্যগৃহ। মাঝখানের দ্বার পথের ওপরে ঘোড়ার খুরের আকার খিলান যুক্ত এবং খিলানের মাঝে কাঠের জালি দেওয়া গবাক্ষ। বারান্দার ভেতরের দেওয়ালে বিচিত্র কারুকার্য ও ভাস্কর্য। এই দেওয়ালে ৬-টি প্রাণবন্ত মিথুন মূর্তি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। পাশের একটি দেওয়ালে তিনটি হাতীর সামনের দিক এমন ভাবে ক্ষোদিত যে মনে হয় বহুতলা সৌধাবলী কাঁধে বহন করছে। দেওয়ালগুলিতে বুদ্ধদেবের উদগত মূর্তিগুলি খৃ ৬-শতকের সংযোজনা। হলঘরের মধ্যে থামগুলি কুলার মত সাজান ফলে ঘরটি তিন ভাগে ভাগ হয়ে পড়েছে। কুলার মধ্যভাগ ও কুলার সামনে সমাবেশ স্থান এবং পাশে ঘুরান বারান্দা। কুলার মধ্যভাগের শেষপ্রান্তে শিলা নির্মিত স্তূপ। স্তূপটির মেধিতে দুটি চত্বর। স্তূপের মাথায় কারুকার্য খচিত কাঠের ছাতা। সম্মুখ সারের এবং স্তূপের পেছন দিকের স্তম্ভগুলি অনলংকৃত ও আটকোণা। অন্য স্তম্ভগুলির মাথায় দু জোড়া জন্তুপৃষ্ঠারোহীর প্রতিমূর্তি। প্রতি জোড়ায় সাধারণত একটি পুরুষ ও একটি মেয়ে ; আবার দু একটিতে কেবল দুটি মেয়ে। নাভিস্থানের খিলান-ছাদের নীচে নির্মাণের সময়কার কাঠের কড়িবরগা এখনও বিদ্যমান। চৈত্য-

গৃহের সামনে সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণ ; এই প্রাঙ্গণের দুপাশে একটি করে স্তম্ভ ছিল। বাঁ দিকের স্তম্ভটির মাথায় চারটি সিংহের প্রতিমূর্তি রয়েছে। দক্ষিণ পাশের স্তম্ভটি ভেঙ্গে অর্বাচীন একবীরা মন্দিরটি সম্ভবত নির্মিত হয়েছিল। চৈত্যগৃহের সমসাময়িক বিহার-গুলির বেশির ভাগই নষ্ট হয়ে গেছে। যেগুলি আছে সেগুলি সে রকম কিছু নয়। সামান্য কয়েকটি প্রকোষ্ঠে শৈলখাত শয়ন স্থান আছে। কয়েকটিতে খৃ·৬ শতকের কাছাকাছি সময়ের বুদ্ধদেবের ক্ষোদিত মূর্তি রয়েছে। কয়েকটি মূর্তি'র মাথায় প্রায় ওপরে একটি করে মুকুট ধরা রয়েছে। ৬ ও ১১ নং বিহার দুটি গুপ্ত বাকাটক যুগের। ৬ নম্বরের দেওয়ালে ধর্মচক্র প্রবর্তন মুদ্রাতে বুদ্ধদেবের দুটি মূর্তি। ১১ নং বিহারের কয়েকটি প্রকোষ্ঠ অসমাপ্ত; হলঘরের দেওয়ালে বোধিসত্ত্ব সহ বুদ্ধমূর্তি রয়েছে।

কাল—ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে (২০।৪৯-৫১) বিষ্ণু মহাদেবকে দিব্য সহস্র বৎসর বহন করে ক্লান্ত হয়ে পড়েন ; বিষ্ণুর নিঃশ্বাস থেকে মহাকায় কাল উৎপন্ন হন। কাল বা সময়ের হিসাব সম্বন্ধে মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণে বহুস্থানে অতি অবাস্তব উক্তি রয়েছে ; যেমন রামচন্দ্র ১১,০০০ বছর পৃথিবী পালন করেন (রা ১।১৫।২৮)। এমন কি উত্তরকাণ্ডে ব্রাহ্মণপুত্র যে বালক মারা যায় তার বয়স হয়েছিল পঞ্চবর্ষ সহস্রকম্ (৭।৭৩।৫)। আবার বলা আছে এই বর্ষ অর্থে দিন। (২) প্রাচীন ভারতে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত চার যাম বা প্রহর এবং সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় চার যাম বা প্রহর। অর্থাৎ মোট আট প্রহরে ২৪ ঘণ্টায় এক অহোরাত্র। দণ্ড যন্ত্র (সূর্যঘড়ি) সাহায্যেও আর এক হিসাব হত; এবং এক মুহূর্ত =দিবাকালের বা রাত্রিকালের ১/১৫ অংশ ধরা হত। দিন ও রাত ছোট বড় হয় বলে মুহূর্ত কখনো সমান হয় না। কেবল বাসন্ত বিষুব সংক্রান্তি এবং জলবিষুব সংক্রান্তির দিন রাত ও দিনের মুহূর্ত সমান হয় এবং এই দুটি দিনে ১ প্রহর=১/৮×২৪=৩ ঘণ্টা ; ১ মুহূর্ত=১/১৫×১২=৪৮ মিনিট। অর্থাৎ ৩০ মুহূর্তে এক অহোরাত্র। সূর্যের অর্দ্ধোদয় থেকে তিনটি মুহূর্ত মিলে প্রাতঃকাল ; পরবর্তী তিনটি মুহূর্ত সংগব-কাল, সংগবের পর তিন মুহূর্ত মধ্যাহ্ন, পরবর্তী তিন অপরাহ্ণ। সন্ধ্যার পরিমাণও সব সময়ই তিন মুহূর্ত নির্দিষ্ট ছিল। বেদাঙ্গ জ্যোতিষে এই রকম হিসাব ছিল। পরে সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের সময় (৩০০-১২০০ খৃঃ) অহোরাত্র=৬০ দণ্ড বা ঘটিকা। প্রতি দণ্ডে ৬০ পল এবং প্রতি পলে ৬০ বিপল এবং প্রতি পলে ৬ প্রাণ। এই গণনায় এক অহোরাত্র =৩৬০০ পল বা ২১৬০০০ বিপল। এই এক দণ্ড=ঘটিকা=২৪ মিনিট এবং এক প্রাণ=৪ সেকেণ্ড। আর এক হিসাবে দুটি পাতা ওপর ওপর স্থাপন করে একটি সূচ দিয়ে বিদ্ধ করলে প্রথম পাতাটি থেকে দ্বিতীয় পাতাতে সূচ যেতে যে সময় লাগে তাকে বলা হয় অল্পকাল। অল্পকাল×৩০=ত্রুটি; ত্রুটি×৩০=কাল; কাল×৩০=কাষ্ঠা×৩০=নিমেষ (=মাত্রা)×৪=গণিত×১০ = দীর্ঘশ্বাস×৩৬= ঘটিকা × ৬০=অহোরাত্র। ১ চান্দ্রমাসে পিতৃলোকের ১ অহোরাত্র। ১২ চান্দ্র-মাসে=১ মানবীয় বৎসর=এক দৈব দিন। ৩৬০ দৈব দিনে = ১ দৈব বৎসর।

৪৮০০ দৈব বর্ষে=১ সত্যযুগ ; ৩৬০০ দৈব বর্ষে=এক ত্রেতাযুগ ; ২৪০০ দৈব বর্ষে=এক দ্বাপর ; এবং ১২০০ দৈব বর্ষে=এক কলিযুগ। অর্থাৎ এই চারটি যুগ মিলে ১২,০০০ দৈব বর্ষে=১ চতুর্যুগ বা এক দৈবযুগ। ৭১ দৈবযুগ (৭১ × ১২,০০০ দৈব বৎসর) মিলে একটি মনুর রাজত্বকাল=১ মন্বন্তর। ১৪-টি মন্বন্তর=১ কল্প=ব্রহ্মার দিবা ভাগ। ২ কল্পে ব্রহ্মার অহোরাত্র। ৩৬০ ব্রহ্ম অহোরাত্রে=১ ব্রহ্ম বৎসর ; ১২০ ব্রহ্ম বৎসরে ব্রহ্মার জীবন=এক মহাকল্প। দিবাভাগের শেষেও প্রলয় হয় ; ব্রহ্মা রুদ্ররূপে সৃষ্টি ধ্বংস করেন। এটি দৈনন্দিন প্রলয় (হরি ১৸)। ব্রহ্মার মৃত্যুতে যে প্রলয় সেটি মহাপ্রলয়। বর্তমানে শ্বেত বরাহ কল্পে ৭ম মন্বন্তর। বৈবস্বত মনুর রাজত্বকাল চলেছে। এই মন্বন্তরের ২৭-শ 'চতুর্যুগ'-টি শেষ হয়েছে ; ২৮-শ চতুর্যুগের সত্য ত্রেতা দ্বাপর শেষ হয়ে কলিকাল চলছে। ১-বৈশাখ ১৩৭৩ বঙ্গাব্দে ৫০৬৭ কল্যব্দের আরম্ভ। দ্রঃ- প্রলয়।

অমাবস্যা থেকে পরবর্তী অমাবস্যাকে চান্দ্রমাস বলা হয়। চান্দ্রমাস ২৯ দি, ১২ ঘ, ৪০ মি, ২·৮ সে ধরা হয়। পঞ্জিকার কাজ চান্দ্রবৎসর ও সৌর বৎসরের সমন্বয় করা। ৬২ চান্দ্রমাসে ৬০টি সৌর মাস। বেদাঙ্গ জ্যোতিষে ৬০ সৌর মাস অর্থাৎ পাঁচ বছরে (১৮৩০ দিন) এক যুগ ধরা হয়। এই এক যুগে অতিরিক্ত দুটি চান্দ্রমাস হচ্ছে মলমাস। উত্তরায়ণারম্ভ অমাবস্যায় ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের সংযোগে এই পঞ্চবর্ষ যুগের আরম্ভ। হিসাবের সুবিধার জন্য কালের আদি বিন্দু ৪৭১৩ খৃ-পূ ১লা জানুয়ারি ধরা হয়। এই দিন থেকে দিনের হিসাবকে জুলীয়-দিবস-হিসাব নাম দেওয়া হয়েছে। এই হিসাব অনুসারে কল্যব্দ=১৭-১৮ ফে ৩১০২ খৃ-পূ=৫৮৮৪৬৫ জুলীয়-দিবস; শকাব্দ=১৫-৩-৭৮ খৃস্টাব্দ=১৭৪৯৬২১ জু-দিবস। এই জুলীয় দিবস প্রবর্তনের প্রায় হাজার বছর আগে আর্যভট অনুরূপ দিবস ভিত্তিক গণনাই প্রবর্তন করেছিলেন এবং এর নাম অহর্গণ গণনা। সূর্যসিদ্ধান্ত মতে সত্যযুগ ১৭২৮০০০+ত্রেতা=১২৯৬০০০+দ্বাপর=৮৬৪০০০+কলি =৪৩২,০০০=৪৩২,০০০০ যুগে এক মহাযুগ। আর্যভটের মতে ১৫৭৭৯১৭৮০০ দিনে এক মহাযুগ এবং এর ফলে আর্যভট্ট ও বরাহমিহিরের বর্ষমান=১৫৭৭৯১৭৮০০/৪৩২,০০০০=৩৬৫,২৫৮৭৫ দি=৩৬৫ দি, ৬ ঘ, ১২ মি, ৩৬ সে।

ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে অনাদি অনন্ত মহাকাল নবদ্রব্যের অন্যতম। এই মহাকাল অপ্রত্যক্ষ এবং অনুমেয়। কোন কাজের দ্বারা অবচ্ছিন্ন কালকে খণ্ডকাল বলা হয়। খণ্ডকাল সাদি সান্ত ও প্রত্যক্ষ। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, পূর্বকালীন, সমকালীন, পরকালীন ইত্যাদি বিশেষণ মহাকালের সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। মহাকাল ও খণ্ডকাল দুইটি জ্ঞাতৃনিরপেক্ষ সদ্‌বস্তু। সাংখ্য মহাকাল বলে কিছু স্বীকার করে না। সাংখ্য মতে কাল হচ্ছে পদার্থের অবস্থা মাত্র। শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে কালকে ঈশ্বর সৃষ্ট বলেছেন। অর্থাৎ সৃষ্ট বস্তু হিসাবে কাল খণ্ডকাল এবং অনাদি বা মহাকাল নয়। কোন কোন মায়াবাদী মহাকালের অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং মহাকালকে অবিদ্যার নামান্তর মনে করেন। অর্থাৎ মায়াবাদীরা কালকে জগতের ন্যায় মিথ্যা অবভাস মাত্র মনে করেন। দ্রঃ- যম, বৎসর।

কালকবন—বিহারে রাজমহল পাহাড়। দ্রঃ- আর্যাবর্ত।

কালকবৃক্ষীয়—কোশলে ক্ষেমদর্শী রাজার রাজত্বকালে প্রজারা রাজপুরুষদের অত্যাচারে অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছিল। এই সময়ে রাজার মিত্র কালকবৃক্ষীয় মুনি একটি পিঞ্জরাবদ্ধ কাক নিয়ে রাজার কাছে আসেন। ক্ষেমদর্শীর পিতার রাজত্বকালে বিদ্রোহ দেখা দিলে সেই বিদ্রোহ শান্তির জন্যও তপস্যা করেছিলেন (মহা ১২।৮৩।৬৩)। মুনি এবার সারা রাজ্য ঘুরে বেড়াতে থাকেন এবং প্রচার করতে থাকেন এই কাকের ভাষা তিনি বুঝতে পারেন ইত্যাদি। কিন্তু মুনি আসলে রাজপুরুষদের কাজকর্ম দেখতে থাকেন এবং রাজপ্রাসাদে এসে কাক বর্ণনা করছে বলে অমাত্যদের অন্যায় কাজকর্ম ইত্যাদির বিবরণ দিতে থাকেন। মন্ত্রী ফলে ক্রুদ্ধ হয়ে পড়েন এবং অনুচরেরা সেই দিন রাত্রিতে কাকটিকে বাণবিদ্ধ করে হত্যা করে। পরদিন মুনি রাজাকে ব্যক্তিগত ভাবে সব ঘটনা, কিছু লোক এমন কি অন্তরৈঃ অভিসন্ধায় (মহা ১২।৮৩।৩৫) রাজাকে হত্যা করতে চাইছে ইত্যাদি জানালে রাজা প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন। কালকবৃক্ষীয়কে পুরোহিত করে দেন; দেশে সমৃদ্ধি ফিরে আসে। সমস্ত পৃথিবী জয় করেন (মহা ১২।৮৩।৬৭)। ক্ষেমদর্শীর কোষাগার একবার শূন্য হয়ে পড়লে রাজা জনক সেই সময় আক্রমণ করতে আসেন। কালকবৃক্ষীয়ের পরামর্শে রাজা মিত্রতা স্থাপন করেন এবং জনকের মেয়েকে বিয়ে করলে দেশ আবার সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

কালকা—কালিকা। কশ্যপের একটি স্ত্রী। রামায়ণ, মহাভারতের মতে দক্ষকন্যা। বিষ্ণু পুরাণে কালকা ও পুলোমা (দ্রঃ) বৈশ্বানরের মেয়ে। দু জনেই কশ্যপের স্ত্রী। এঁদের সন্তান ৬০,০০০ দানব ; এদের নাম নরকাসুর, পৌলম, কালঞ্জয় ও কালকেয় (দ্রঃ)। এঁরা দুর্জয় দানব। তপস্যায় কালকা বর পেয়েছিলেন তাঁর সন্তান হবে কিন্তু কোন গর্ভ যন্ত্রণা পেতে হবে না। কালকা ব্রহ্মার কাছে আর একবার বর পেয়েছিলেন ছেলেরা তাঁর অমর হবে। মহাভারতে (৩।১৭০।৬) কালকা ও পুলোমা দুজনেই সহস্র বর্ষ তপস্যা করে ব্রহ্মার বর পান এদের সন্তানরা যেন বেশি দুঃখে না পড়ে ; দেবতা অসুরদের হাতে অবধ্য হবে এবং ব্রহ্মার নিজের তৈরি রমণীয় খচর পুরী—নাম হিরণ্য-পুর পাবে। মৃত্যু হবে মানুষের হাতে। কালকার বিখ্যাত ছেলে আটটি (মহা ১।৬০।৪৫) ; এই আটজন পৃথিবীতে এসে জন্মান ; এঁরা মগধে জয়ৎসেন অপরাজিত, নিষাদাধিপতি, শ্রেণিমান, মহৌজা, অভীরু, সমুদ্রসেন ও বৃহৎ। হরিবংশে (১।৩।৯২) কালিকা ও পুলোমা কশ্যপের স্ত্রী ; এদের সন্তান ৬০,০০০+১৪০০০। হিরণ্যপুরে বাস ; ব্রহ্মার বরে দেবতাদের অবধ্য ইত্যাদি।

কালকামুখ—রাক্ষস প্রহস্তের ভাই। খরদূষণের সঙ্গে ছিল।

কালকূট—তীব্র বিষ। সমুদ্র মন্থনে উঠেছিল। চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে ত্রিভুবনে সকলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। ব্রহ্মার অনুরোধে মহাদেব (দ্রঃ) কণ্ঠে এই বিষ ধারণ করে সৃষ্টি রক্ষা করেন।

কালকেতু—(১) জটনক ব্যাধের ছেলে। ইন্দ্রের ছেলে নীলাম্বর, মহাদেবের শাপে ব্যাধ হয়ে জন্মান। (২) প্রসিদ্ধ অসুর রাজা। দনুর পুত্র। একাবলীকে (দ্রঃ) চুরি করে পাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন।

কালকেয়—কশ্যপের ঔরসে কালকার (দ্রঃ) / কালার গর্ভে জন্ম। দ্রঃ- পুলোমা। সংখ্যায় ৬০,০০০। অনেক সময় বৃত্রের দুর্দান্ত অনুচর হয়ে যুদ্ধ করেছেন। বৃত্রের মৃত্যুর পর অসুরেরা ভয়ে সমুদ্রের নীচে লুকিয়ে থাকতেন। সংকল্প করেছিলেন ত্রিলোক ধ্বংস করবেন এবং রাত্রিবেলা উঠে এসে ব্রাহ্মণদের ও আশ্রমবাসীদের হত্যা করবেন। বশিষ্ঠ চ্যবন ও ভরদ্বাজের আশ্রমে বহু ক্ষতি করেছিলেন। দেবতারা তখন বিষ্ণুর কাছে যান এবং বিষ্ণুর পরামর্শে অগস্ত্যের কাছে এসে সমুদ্র পান করতে অনুরোধ করেন। অগস্ত্য এক গণ্ডূষে সমুদ্র পান করলে দেবতারা এঁদের বিনাশ করেন। কিন্তু কালকেয়রা অবশ্য পাতালে পালিয়ে যান। এঁদের পরাজিত করতে না পেরে ইন্দ্র ব্রহ্মাকে জানালে ব্রহ্মা বলেছিলেন ইন্দ্র অন্য দেহে এঁদের পরাজিত করতে পারবেন (মহা ৩।১৬৯।৩১)। এই কালকেয়রা একবার নিবাতকবচদের সঙ্গে মিলিত হয়ে দেবলোক আক্রমণ করেন। দেবলোকে অস্ত্রশিক্ষার পর অর্জুন গুরুদক্ষিণা হিসাবে নিবাত কবচদের নিহত করার পর রৌদ্র নামক পাশুপত অস্ত্রে এঁদের বিনাশ করেন। ইন্দ্র অবশ্য এই দানবদের নিহত করতে অর্জুনকে বলেন নি। দ্রঃ- কালেয়।

কালচক্র—অক্ষোভ্য (দ্রঃ) কুল। কালচক্র তন্ত্রে। আদিবুদ্ধযান বা আদি যানের দেবতা। খৃ ১০-ম শতকে সনাতনপন্থী ও বৌদ্ধদের এক করবার চেষ্টায় যেন এঁর কল্পনা করা হয়েছিল। মুসলমান আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের চেষ্টা। অনঙ্গ ও রুদ্রের ওপর আলীঢ় ভঙ্গিতে নৃত্যরত। বর্ণ নীল, চার মুখ, বার চোখ, চব্বিশ হাত, হাতের রঙ বিভিন্ন। হাতে বজ্র, খড়্গ, ত্রিশূল, কর্তার, অগ্নি, বাণ, বজ্র, অঙ্কুশ, চক্র, ছুরি, দণ্ড ও কুঠার। অন্য হাতগুলিতেও নানা আয়ুধ। ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান।

কালচক্রযান—বজ্রযানের একটি শাখা হিসাবে উৎপন্ন। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের একটি অঙ্গ। এই সম্প্রদায়ে গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার বিশেষ অনুশীলন ছিল। কাল অর্থাৎ সময় এবং এর অংশ পানীপল, ঘটিকা, মুহূর্ত, শ্বাস, তিথি, পক্ষ ইত্যাদির সাহায্যে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন এই মতবাদীরা ব্যাখ্যা করতেন। দ্বাদশ রাশিচক্রে সূর্যের সঞ্চারের দ্বারা দ্বাদশ নিদান সমন্বিত প্রতীত্য সমুৎপন্নের ব্যাখ্যা এঁদের একটি অভিনব চেষ্টা। ফলিত জ্যোতিষ সাহায্যে মানুষের জীবনে গ্রহনক্ষত্রের প্রভাব নিরূপণ করতেন। এঁদের মত মানুষের ভৌতিক দেহে ত্রিজগতের সমস্ত কিছু অধিষ্ঠিত এবং ষড়ঙ্গযোগের সাহায্যে ইহা উপলব্ধি করা যায়। এই উপলব্ধি হলে কাল ও তার গতিকে ঠিক মত জানতে পেরে মানুষ জরাব্যাধি থেকে নিস্তার পাবে এবং জন্ম মৃত্যু চক্রের গতি বন্ধ হবে। তান্ত্রিক সম্প্রদায় হিসাবে কালচক্রযানীদের সাধনায় যোগশাস্ত্র ও মন্ত্র-মুদ্রা-মণ্ডল ইত্যাদির বিশেষ প্রভাব লক্ষণীয়। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বহু দেবদেবী এবং বৈষ্ণব ও শাক্ত মতবাদ কালচক্রযানে বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। কালচক্রযান ও এর টীকা বিমলপ্রভায় ইসলাম ধর্মেরও উল্লেখ আছে। গুহ্য সমাজ ইত্যাদি গ্রন্থে যে বজ্রযানীয় আদি বুদ্ধ আছেন তিনিই কালচক্রযানীদের প্রধান দেবতা কালচক্র (দ্রঃ)। ইনি ত্রিকালজ্ঞ, সর্বজ্ঞ, উৎপাদব্যয় বর্জিত এবং সকল বুদ্ধের জনক।

কথিত আছে আশি বছর বয়সে অন্য মতে বোধিত্ব পাওয়ার পরের বছরই

গৌতম বুদ্ধ ভারতে ধান্যকটকে কালচক্রযান মতবাদ ব্যাখ্যা করেন। যে পর্ষদে এই মতবাদ ব্যাখ্যা করা হয় সেখানে শম্ভলরাজ সুচন্দ্র ছিলেন এবং তিনিই শম্ভলদেশে এই মতবাদের মূলমন্ত্র রক্ষা করেন। নানা বিচারে মনে হয় এসিয়ার শম্ভল নামক কোন দেশে (সম্ভবত পূর্ব-তুর্কিস্থানে তারিম অঞ্চলে) এর উৎপত্তি। তিব্বতী ঐতিহাসিক নড়পাদের (না-রোপা) শিষ্য চিলুপা বা পি-টো-পা শম্ভল দেশের উত্তর অঞ্চল থেকে ভারতে এই মতবাদ নিয়ে আসেন। আনুমানিক খৃ ১০ শতকে এই মতবাদ ভারতে প্রবেশ করে ছড়িয়ে পড়ে। রাজা মহীপালের সময় পূর্ব ও উত্তর ভারতে এই মতবাদের রীতিমত চর্চা ছিল। নড়পাদ, অতীশ, চিলুপা, তিলোপা, সোমনাথ ইত্যাদি বৌদ্ধ পণ্ডিতরা এই মতবাদে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ১০২৬ খৃস্টাব্দে কাশ্মীর হয়ে এই মতবাদ তিব্বতে যায় এবং এই সময়টিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য তিব্বতের বর্তমান বর্ষক্রম ১০২৬ খৃস্টাব্দ থেকে প্রবর্তিত হয়েছিল। তিব্বতে লামা বৌদ্ধ-ধর্মে আজও এই মতবাদের সুস্পষ্ট প্রভাব রয়েছে। সমগ্র তিব্বতের ধর্ম ও সমাজ জীবনে এই মতবাদ রূপান্তর এনেছিল। মূল সংস্কৃত বই তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল এবং কিছু টীকাও তিব্বতীতে রচিত হয়। ১৪৪২ খৃস্টাব্দের ব্রহ্মদেশে পাগান শিলালেখ থেকে মনে হয় ১৫-শতকে এই মতবাদ ব্রহ্মদেশেও অজানা ছিল না। দ্রঃ- তান্ত্রিক বৌদ্ধ। কালচক্রযান গ্রন্থগুলিতে 'সহজে'র ব্যাখ্যা করা এবং যোগাচার ও যৌনাচার দ্বারা সহজকে পাবার পথও নির্দ্ধারিত করা হয়েছে। কালচক্রযানে যোগ একটি বিশেষ অঙ্গ।

কালঞ্জর—কালিঞ্জর, কলিঞ্জর, পূর্ণদর্ভ, মেধাবীতীর্থ। বুন্দেলখণ্ডে বান্দা জেলাতে বাদাউসা সাবডিভিসানে একটি পাহাড়। শৈবতীর্থ। যশোবর্মার জয় লাভের পর চন্দেলদের অধীনে জেজাভুক্তির রাজধানী। চন্দেলরাজ কিরাটব্রহ্ম একটি দুর্গ তৈরি করেন। এই দুর্গে নীলকণ্ঠ মহাদেবের মন্দির এবং বিখ্যাত সরোবর কোটি তীর্থ অবস্থিত ছিল। দুর্গের মধ্যে কালভৈরবের বিরাট মূর্তি রয়েছে ; ১৮ হাত, গলায় মুণ্ডমালা, সর্পভূষণ। হিরণ্যবিন্দু তীর্থও এখানে। কালঞ্জর পাহাড়ের আর এক নাম রবিচিত্র। দ্রঃ- মহোৎসব নগর, চেদি। মহাভারতে চিত্রকূট ও প্রয়াগের কাছে কালঞ্জর।

কালদ্বিজ—করবীর পুরে স্বার্থপর এক শূদ্র। যমরাজ এঁকে চারটি মন্বন্তর ধরে নরক বাসের শাস্তি দেন। শাস্তি শেষ হলে সাপ হয়ে জন্মান এবং পাথরের ফাটলে অতি কষ্টে দিন কাটাতেন। একবার আশ্বিন পূর্ণিমাতে কিছু খই কড়ি এই সাপ (কাল দ্বিজ) ছুঁড়ে দেন এবং এগুলি বিষ্ণুর পায়ে এসে পড়ে এবং পাপ মুক্ত হয়ে বিষ্ণুলোকে যান (পদ্ম-পু)।

কালনেমি—(১) রাবণের মামা। শক্তিশেলে অচৈতন্য লক্ষ্মণকে বাঁচাবার জন্যে হনুমান গন্ধমাদন থেকে ঔষধ আনতে গেলে হনুমানকে মারবার জন্য রাবণ এঁকে পাঠান। রাবণ কথা দিয়েছিলেন পুরস্কার হিসাবে অর্দ্ধেক রাজত্ব দেবেন। কালনেমি সঙ্গে সঙ্গে বিরাট পরিকল্পনা করে ফেলেন রাজ্যের কোন অর্দ্ধেক অংশ নেবেন। তারপর আগেই গন্ধমাদনে এসে উপস্থিত হয়ে হনুমানকে নিজের আশ্রমে নিমন্ত্রণ

করেন। কিন্তু হনুমান এই আতিথ্য না নিয়ে জলাশয়ে স্নান করতে গিয়ে এক কুমীরের মুখে পড়েন। দক্ষের শাপে এক অপ্সরা এই কুমীর হয়েছিল। হনুমান একে নিহত করলে অপ্সরা মুক্তি পেয়ে কৃতজ্ঞতায় হনুমানকে সাবধান করে দেন। হনুমান ফিরে এসে কালনেমিকে আকাশে এমন ছুঁড়ে দেন যে কালনেমি একেবারে রাবণের সিংহাসনের ওপর এসে পড়েন ও মারা যান।

(২) এক রাক্ষস। বিষ্ণু একে বিতাড়িত করলে রাবণের মাতামহ সুমালীর সঙ্গে পাতালে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। (৩) হিরণ্যকশিপুর ছেলে। দেবাসুরের যুদ্ধে দেবতাদের হারিয়ে দিয়ে সর্ব লোকের ত্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়ান। শেষ পর্যন্ত বৈষ্ণব পদাভিলাষী হয়ে বিষ্ণুকে আক্রমণ করলে সুদর্শন চক্রে নিহত হন এবং গরুড় পাখার ঝাপটায় এ'র মৃতদেহ পৃথিবীতে ফেলে দেন। এই কালনেমিই উগ্রসেনের ছেলে কংস হয়ে জন্মান। হরিবংশে (১।৪৮।৪৯) তারকাময় যুদ্ধে একজন কালনেমি নিহত হন। দ্রঃ- ষটগর্ভ দৈত্য।

কালপথ—বিশ্বামিত্রের ছেলে ; দার্শনিক ও ব্রহ্মবাদী।

কালপুরুষ—(১) যম। তপস্বীর বেশে রামের জীবনের শেষ অঙ্কে রামের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। গোপনে কথা বলতে চান। লক্ষ্মণ (দ্রঃ) দ্বারী নিযুক্ত হন। কালপুরুষ গোপনে নিজের মূর্তি ধারণ করে জানান ব্রহ্মার নির্দেশে তিনি এসেছেন এবং রামকে স্বর্গে ফিরে যাবার জন্য অনুরোধ করেন। (২) শীত ও বসন্ত রাতে আকাশে একটি সুপরিচিত নক্ষত্রমণ্ডল। সাতটি উজ্জ্বল এবং অনেকগুলি অনুজ্জ্বল তারা। শিশুমার প্রভৃতি মণ্ডলের মত সহজেই চোখে পড়ে। কালপুরুষে বাহুসূচক চার প্রান্তে চারটি উজ্জ্বল তারার নাম ঃ—উত্তর-পূর্বে আর্দ্রা (বেটেলজিউস), উত্তর-পশ্চিমে গণেশ (বা কার্তিক ; বেলাট্রিক্স্), দক্ষিণ-পশ্চিমে বাণরাজ (রাইজেল), কালপুরুষের মাথায় তিনটি অনুজ্জ্বল তারা ; এদের মধ্যে উজ্জ্বল তারাটি মৃগশিরা (মাইসা)। কালপুরুষকে কতকটা যোদ্ধার মত দেখতে ; হাতে ধনুক বা ঢাল ; কোমরে কোমরবন্ধ ও লম্বা তরবারি।

কালবেলা—সপ্তাহে প্রতিদিন নির্দিষ্ট এক যামার্দ্ধকে (দ্রঃ) কালবেলা বলা হয়। এই সময়ে শুভ কাজ বর্জনীয়। বৃহস্পতি ও শনিবারে বারবেলার গুরুত্ব বেশি। বিয়ের পরদিন সমস্ত রাত্রিই কালরাত্রি। হিসাব ঃ—

	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহস্পতি	শুক্র	শনি
কালবেলা	৫ যামার্দ্ধ	২	৬	৩	৭	৪	১.৮
বারবেলা	৪	৭	২	৫	৮	৩	৬
কালরাত্রি	৬	৪	২	৭	৫	৩	১.৮

কালভৈরব—শিবের এক অনুচর। মহাদেব নিজের অংশে এ'কে সৃষ্টি করে কাশীধাম রক্ষার ভার দেন। এ'র একমাত্র কাজ দুষ্টের দমন। ব্রহ্মা নিজে কন্যা গমন করার জন্য কাশীতে শিবতত্ত্ব জ্ঞান নিতে আসেন। মহাদেবের আদেশে কালভৈরব ব্রহ্মার একটি মাথা কেটে নেন। কাশীতে যেখানে এই মুণ্ড পড়ে সেই স্থানের নাম কপালমোচন (দ্রঃ)। কপালী (দ্রঃ)।

কালমুখ—রাক্ষস ও মানুষের সন্তান। দক্ষিণ দিকে সহদেব এদের পরাজিত করেন।

কালযবন—একজন যবনরাজ। মহর্ষি গার্গ্য (দ্রঃ) / শৈশিরায়নের (দ্রঃ) ঔরসে গোপালীর গর্ভে জন্ম। গোপালী একজন শাপভ্রষ্ট অপ্সরা। পুত্র কামনায় গার্গ্য ১২-বছর কেবল লোহাচুর খেয়ে মহাদেবের তপস্যা করলে কালযবনের জন্ম হয়। এক অপুত্রক যবনরাজ একে পালন করেন এবং যবনরাজের পর ইনি রাজা হন। কালযবন মাথুরদের কাছে অবধ্য (২।৫২।২৮)। শিব ও ব্রহ্মার কাছে বর পেয়েছিলেন। এর যুদ্ধকালীন বাহন অশ্বগুলির দেহের সামনের অংশ বৃষের মত (হরি ১।৩৫।১৬)। কার সঙ্গে যুদ্ধ করবেন ব্রাহ্মণদের জানতে চান। নারদ জানান বৃষ্ণি অন্ধকদের সঙ্গে। ফলে মথুরা আক্রমণ করেন। জরাসন্ধ এই কালযবনকে (দ্রঃ- রুক্মিণী) যাদবদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন। জরাসন্ধের দূত হয়ে সৌভপতি শাল্ব কালযবনকে প্ররোচিত করেন। হরিবংশে (২।৫৩।১) এই কালযবন সর্বগুণান্বিত। মথুরা আক্রমণ করেন ; উদ্দেশ্য কৃষ্ণকে নিহত করবেন। এই সময়ে কৃষ্ণ ও যাদবদের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন ঃ- জরাসন্ধের বিপুল বাহিনী ; মথুরাতে থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। ইতিমধ্যে গরুড় এসে জানায় কুশস্থলী সুন্দর সমৃদ্ধ, সুরক্ষিত নগরী। এদিকে কালযবনও এসে উপস্থিত হয়। কৃষ্ণের পরামর্শে যাদবরা মথুরা ত্যাগ করেন। দরদ, পারদ ও ম্লেচ্ছ সৈন্য নিয়ে কালযবন আক্রমণ করেন। অশ্বউষ্ট্র শকৃৎ-মূত্রে নদী তৈরি হয়, নাম অশ্বশকৃৎ। দ্বারকাতে সকলকে রেখে কৃষ্ণ একা মথুরাতে আসেন। কৃষ্ণ কালযবনকে দেওয়া বরের কথা জানতেন এবং পালাবার ছলে নিরস্ত্র (ভাগ ১০।৫৩) অবস্থায় ছুটতে থাকেন; কালযবনও নিরস্ত্র হয়ে পেছু নেন। কৃষ্ণ হিমালয়ে গুহায় ঘুমন্ত মুচুকুন্দের কাছে এসে হাজির হন। কালযবন এখানে এসে ঘুমন্ত রাজাকে কৃষ্ণ মনে করে লাথি মারেন। মুচুকুন্দের ঘুম ভেঙে যায় এবং তাঁর দৃষ্টিপাতে কালযবন ভস্মীভূত হন।

কালরাত্রি—(১) দ্রঃ- কালবেলা। (২) একজন দেবতা ; কয়লা মতো কালো ; মুখ ও চোখ ফোলা। রক্তমাল্য ও রক্তবস্ত্র পরিধান ; হাতে পাশ (মহা সৌপ্তিক-প)।

কালহস্তী—উত্তর আরকট জেলাতে রেণুগুণ্টা স্টেশন থেকে ১ মাইল। সুবর্ণমুখরী নদী তীরে পুণ্যস্থান। এখানে মন্দিরে মহাদেবের বায়ুমূর্তি ; নাম ঊর্ণনাভ। নীচে থেকে বাতাস উঠছে ফলে এই লিঙ্গমূর্তির ওপরে আলোটি সব সময় দুলছে ; অন্য আলোগুলি কিন্তু দোলে না। দ্রঃ- চিত্তমবলম্।

কালা—কালকা (দ্রঃ)। ছেলেরা কালেয়া ঃ—বিনশন, ক্রোধ, ক্রোধহন্তা, ক্রোধশত্রু ইত্যাদি (মহা ১।৫৯।৩৩)।

কালিকা—(দ্রঃ) কালকা, কালী, মাতঙ্গী।

কালাভ্র—দ্রঃ- ভদ্রাশ্ব।

কালিকাপুরাণ—একটি উপপুরাণ। গিরিজা, দেবী, কালী, ভদ্রকালী, মহামায়া প্রভৃতি বিভিন্ন মূর্তির পূজার বিবরণ আছে। এই উপপুরাণে প্রতিপাদ্য আদ্যা-শক্তির পূজা। খৃ ১১-১২ শতকে ; যেন কামাখ্যাতে রচিত।

অতি অক্ষম হাতের রচনা। সাহিত্যিক মূল্য শূন্য। অপাঠ্য। একমাত্র অরুন্ধতী ও বেতালভৈরব ছাড়া নতুন কোন কাহিনী নেই। নাম কালিকা কিন্তু প্রথম অর্দ্ধেকে বিষ্ণুই একমাত্র নায়ক; ব্রহ্মাও আছেন এবং মহাদেব এঁদের হাতে সম্পূর্ণ বুড়ো খোকাতে পরিণত। গ্রন্থে প্রথম দিকে মার্কণ্ডেয় বক্তা। কমঠাদি শ্রোতা। পরে কখনো ঔর্ব কখনো বা শিব বক্তা। শেষ অর্দ্ধেকে দেবীর পূজার বিস্তৃত বিবরণ। কিছুটা সংস্কৃত শিখে কোন এক রাজার পুরুতঠাকুর পুরাণ লেখার খোয়াব দেখেছিলেন। প্রথম অর্দ্ধেক বিষ্ণুই সব এবং শেষদিকে প্রায় প্রতি অধ্যায়ে বিষ্ণু রয়েছেন; দেবী কামাখ্যাকে কেন্দ্র করে মন্ত্র এবং পূজাবিধিও আছে। অর্থাৎ এটি সঙ্কর পুরাণ; তন্ত্রের ভাষায় খ-পুষ্প বললেও অত্যুক্তি হবে না। ইন্দ্রপূজা ও ইন্দ্রধ্বজও রয়েছে।

কালিকাসঙ্গম—কৌশিকী ও অরুণা নদী সঙ্গম।

কালিকেয়—রাজা সুবলের ছেলে। অভিমন্যুর হাতে মারা যান (মহা ৭।৪৮।৭)।

কালিদাস—সংস্কৃত সাহিত্যে মহাকবি বাল্মীকির পর এঁর স্থান। জীবন ও জন্মকাল কিছুই জানা নাই। প্রবাদ প্রথম জীবনে মন্দমতি ছিলেন পরে পণ্ডিত হন। একটি মতে খৃঃ পূঃ ১-শতকে বিক্রমাদিত্যের সময়ে তাঁর নবরত্নের মধ্যে একজন। অপর মতে গুপ্তযুগে ৩০০-৫০০ খৃস্টাব্দের মধ্যে। খৃঃ ৬৩৪, আইহোলি শিলালিপিতে এঁর উল্লেখ আছে। হর্ষচরিতে (৭ শতকে) কালিদাসের উল্লেখ রয়েছে। তাঁর রচনা থেকে মনে হয় রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, অলঙ্কার, ছন্দ, ব্যাকরণ, ষড়বেদ, ন্যায় ও প্রচলিত দার্শনিক সিদ্ধান্তগুলিতে পণ্ডিত ছিলেন। সাংখ্য ও যোগের বহু তত্ত্ব ও পরিভাষিক শব্দ তাঁর রচনায় পাওয়া যায়। প্রায় ৩০টি ছন্দ ব্যবহার করেছেন। ত্রিমূর্তিকেই শ্রদ্ধা করতেন তবে মূলত নির্গুণব্রহ্মের উপাসক ছিলেন। বর্ণাশ্রম ধর্মের পৃষ্ঠপোষক এবং সংযম ও স্বার্থত্যাগের সমর্থক। আত্মসংবৃত প্রেমের মঙ্গলময়-সৌন্দর্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করে গেছেন। প্রেমকেই প্রেমের চরম গৌরব বলে স্বীকার করেন নি। তপস্যার নির্মল বেদীতে প্রেমকে স্থাপন করেছেন। আসক্তি-বিমূঢ় হলে তার প্রায়শ্চিত্ত অনিবার্য বার বার বলেছেন। বৈদর্ভী রীতিতে রচনা; ধ্বনি ও ব্যঞ্জনা তাঁর কাব্যে প্রধান; অলঙ্কার ও গুণ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। রচনাঃ—অভিজ্ঞানশকুন্তলম, বিক্রমোর্বশীয়, মালবিকাগ্নিমিত্রম্—নাটক; রঘুবংশ, কুমারসম্ভব—মহাকাব্য; মেঘদূত ও ঋতুসংহার—খণ্ডকাব্য। এ ছাড়া শ্রুতবোধ, নলোদয়, পুষ্পবাণবিলাস, শৃঙ্গারতিলক, জ্যোতির্বিদাভরণ ইত্যাদি রচনাও তাঁর বলে প্রচলিত।

কালিন্দী—যমুনা (দ্রঃ)। কৃষ্ণের স্ত্রী; যমুনা হয়েও যমুনা নয় যেমন। বিষ্ণু যেমন কৃষ্ণ নয় যেন।

কালিবঙ্গা—সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর উপত্যকা খুঁড়ে হরপ্পা সভ্যতার ২৫টি বসতি-স্থল পাওয়া গেছে। এগুলির মধ্যে সব চেয়ে বড় কালিবঙ্গা। প্রাক্ হরপ্পীয় সভ্যতার সংস্কৃতি কেন্দ্র; এই সংস্কৃতির আর এক নাম সোথী সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতির পর হরপ্পা সংস্কৃতি এখানে এসেছিল। এখানেও নগরের একাংশে একটি দুর্গিকা ছিল।

কালিসিন্ধু—(১) দক্ষিণ সিন্ধু (মহা)। (২) সিন্ধু (মেঘদূ)। (৩) সিন্ধুপর্ণা; চম্বলের করদা; ঠিক নির্বিন্ধ্যা নদী নয়।

কালী—কালী নদী (দ্রঃ)। হিন্দনের শাখা। যুক্তপ্রদেশে সাহারানপুর ও মুজাফরপুর জেলাতে।

কালী—(১) দশ মহাবিদ্যার এক মহাবিদ্যা। শাক্তেরা আদ্যাশক্তি মনে করেন। চার হাত; ডান দিকে দু হাতে খট্টাঙ্গ ও চন্দ্রহাস এবং বাঁ দিকে দু হাতে চর্ম ও পাশ। গলায় নরমুণ্ড, দেহে ব্যাঘ্রচর্ম। বড় বড় দাঁত; রক্ত চক্ষু; বিস্তৃত মুখ; স্থূলকর্ণ; বাহন কবন্ধ। পুরাণ ও তন্ত্রে কালীর উগ্র ও শান্ত দুটি রূপেরই বর্ণনা আছে। বিষ্ণু ধর্মোত্তরে ভদ্রকালীর রূপ শান্ত ও সুন্দর। দেবী মাহাত্ম্য, কারণাগম, চণ্ডীকল্প, ভবিষ্যপুরাণ, দেবীপুরাণ ইত্যাদিতে কালী বা মহাকালী উগ্ররূপা। প্রবাদ তন্ত্রসার রচয়িতা আগমবাগীশ কৃষ্ণানন্দ 'দক্ষিণা'কালীর প্রবর্তন করেন। পূজা কিন্তু তাঁর আগেও প্রচলিত ছিল। সিদ্ধকালী, ভদ্রকালী, গুহ্যকালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, মহাকালী প্রভৃতি বিভিন্ন রূপ প্রচলিত আছে। জ্যৈষ্ঠে ফলহারিণী ও মাঘে রটন্তী কালী পূজা হয়।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে চণ্ডমুণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধের সময় দেবীর ভ্রূকুটি কুটিল মুখ থেকে বিনির্গতা দেবী কালী। এই বর্ণনাতে দেবী বিবসনা নন এবং শিব বা শাবারূঢ়াও নন। দ্রঃ- কৌষিকী। তন্ত্রসারে শবরূপী মহাদেবের বুকে দণ্ডায়মান, অন্যান্য কয়েকটি তন্ত্রেও অনুরূপ। অদ্ভুত রামায়ণে সীতা শতস্কন্ধ রাবণকে বধ করলে রাম তখন সীতাকে কালীমূর্তিতে শবরূপী মহাদেবের বুকে দণ্ডায়মান দেখেছিলেন। কালীবিলাস তন্ত্রে গৌরীর দেহ থেকে কালিকার জন্ম। বামন পুরাণে নমুচি নিহত হবার পর নমুচির দুই ভাই শুম্ভ নিশুম্ভ ত্রিলোক অধিকার করেন। এদের সেনাপতি ধূম্রলোচন নিহত হলে চণ্ড মুণ্ড যুদ্ধে আসে এবং এই সময় ক্রুদ্ধ দেবীর মুখ থেকে কালীর আবির্ভাব। কালিকাপুরাণে (৬১।৮৫) মতঙ্গাশ্রমে দেবগণ শুম্ভ নিশুম্ভ বধের জন্য দেবীর (কোন দেবীর উল্লেখ নাই) স্তব করতে থাকায় মাতঙ্গীর দেহ কোষ থেকে কালিকার জন্ম। ইনি নীলোৎপল দল শ্যামা; ব্যাঘ্রচর্মাম্বরা, কবন্ধ বাহনা। এর অষ্ট যোগিনীঃ-ত্রিপুরা, ভীষণা, চণ্ডী, কর্ত্রী, হর্ত্রী, বিধায়িনী, করালা ও শূলিনী। কালী বিলাস তন্ত্রে গৌরীর দেহ থেকে কালিকা জন্মান। রক্তবীজের রক্ত পান করেন। দ্রঃ- চামুণ্ডা, চণ্ডী, কাত্যায়নী।

মহাভারতে সৌপ্তিকপর্বে কালীর ভয়ঙ্করী মূর্তি রয়েছে। কা-প্রসন্নে (১২।২৮৪) পার্বতীর ক্রোধ থেকে জন্ম মহাকালী/ভদ্রকালী দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করতে গিয়েছিলেন।

হিমালয় দুহিতা কালী ওরফে গৌরী শ্যামল জলদাভা বা নীলোৎপলছবি। পরে তপস্যায় তপ্তকাঞ্চনাভা—(সৌর, মৎস্য পদ্ম, শিব)। সৌর পুরাণে কালী তপস্যা করছিলেন; মদন এই সময় শিবের তপঃ ভঙ্গ করেন। পদ্ম পুরাণে গৌরী গর্ভে থাকা কালীন ব্রহ্মা রাত্রি দেবীকে পাঠিয়ে দিয়ে গৌরীকে কৃষ্ণবর্ণ করে দেন। উদ্দেশ্য গায়ের রঙের জন্য কলহ বাধবেই, ফলে কৃষ্ণবর্ণা কন্যা তপস্যা করে গৌরী হবেন। এই তপস্যা একান্ত দরকার, না হলে অসুর নিধনকারী দুর্ধর্ষ সন্তান সম্ভব হবে না। ব্রহ্মার পরিকল্পনা অনুসারে শিব এক দিন উপহাস করেন। সঙ্গে সঙ্গে বচসা; শিব আরো কিছু কটূক্তি করেন। কালী তপস্যাতে বার হয়ে পড়েন। এই সময় পুত্র বীরক (কোথা থেকে জুটল?) এসে পথ আটকায়; তবু কালী তপস্যায় যান।

ব্রহ্মা এসে বর দেন ; অর্থাৎ তপস্যা করতেই হয় না। কালো খোলস ছেড়ে গৌরী হন। এই খোলস নীলমেঘবর্ণা একটি দেবীতে পরিণত হন। ব্রহ্মা তখন বলেন হে রাত্রিদেবী, তুমি পার্বতীর দেহ জাতা : একানংশা (দ্রঃ) নামে তুমি বিখ্যাত হবে। দেবীর ক্রোধ সমুদ্ভব সিংহ তোমার বাহন হবে। বিন্ধ্যাচলে গিয়ে বাস কর। আবার এই খোলস গঠিত দেবীকে কৌশিকী দেবীও বলা হয়েছে।

কালিকা পুরাণে সতী বিষ্ণু-মায়া। কালিকা সিংহস্থা, কৃষ্ণা। দেহ ত্যাগ করে মেনকার মেয়ে কালী নামে জন্মান। বিয়ের বেশ কিছু পরে হিমালয়ে এক দিন বিহার কালে উর্বশী ইত্যাদির সামনে ভিন্নাঞ্জন-শ্যামা বলে মহাদেব সম্বোধন করেন। অপমানে হিমালয়ে মহাকোষী প্রপাত নামক স্থানে শত বর্ষ (৪৫।৭৩) শিবের তপস্যা। শেষ পর্যন্ত শিব সন্তুষ্ট হয়ে কালীকে মূল শক্তিরূপিণী বলে স্মরণ করিয়ে দিয়ে আকাশ-গঙ্গার জলে স্নান করিয়ে বিদ্যুৎগৌরী রূপ দেন। কুমার-সম্ভবে এক কালীকে দেখা যায় শিবের বরযাত্রীতে যোগ দিয়েছিলেন।

দেবী ভাগবতে দেবী থেকে কৌশিকী দেবী বার হয়ে আসেন এবং অবশিষ্ঠ দেবী কালিকা নামে পরিচিত ; ইনিই কালরাত্রি। আবার এই গ্রন্থে নবমস্কন্ধে আছে কৃষ্ণভক্তির জন্য এবং কৃষ্ণতুল্যা বলে রঙ কালো। অর্থাৎ ভুনি-খিচুড়ি।

মহাভারতে সৌপ্তিক পর্বে কালীর ভয়ঙ্করী মূর্তি রয়েছে। তবু কালী বিগ্রহ অনেক পরে যেন রূপায়িত হয়। ব্রহ্ম যামলে আছে কালিকা বঙ্গ দেশে চ। কিংবদন্তী কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ (১৫০০ খৃ বা ১৭০০ খৃ) নবদ্বীপে প্রথম কালীমূর্তির পরিকল্পনা করেন। দ্রঃ- তন্ত্র। গুহ্য সমাজে এবং বৌদ্ধ বহু দেবী বিবসনা। কালী-মূর্তির রূপকার যেন এই গুহ্যসমাজ। তিব্বত ও চীনের অবদানও হয়তো এই গুহ্যসমাজে ছিল। মন্ত্র হিসাবে কুমারী তন্ত্রে আছে ওঁ বজ্রডাকে হুং ওঁ পবিত্র-বজ্রভূমে ওঁ মণিধারি বজ্রিণী মহাপ্রতিসারে। অর্থাৎ বৌদ্ধদেবী হয়তো। দ্রঃ- তারা।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রজাদের বাধ্য করেছিলেন কালীপূজা করতে। ফলে প্রতি বৎসর ১০ হাজার কালী পূজা হতে থাকে। এটি প্রবাদ হয়তো। কৃষ্ণচন্দ্রের পৌত্র ঈশান চন্দ্র অতি জাঁকজমকের সঙ্গে কালী পূজা করতেন।

কালীকে নিয়ে বহু আখড়া গড়ে ওঠে ; পুরাণ ও তন্ত্র রচিত হয়। ফলে কালী পূজার প্রাধান্য। ছোট ছোট আখড়া বা মন্দির গভীর অরণ্যে বা দুর্গম স্থানেও ডাকাত ইত্যাদি স্থাপন করে পূজা করেছে। দুর্গা এ ভাবে পূজিতা হন নি। কালী কেন্দ্রিক তন্ত্রগুলিতে মারকাট লড়াই আছে যুগপৎ পঞ্চমকার ও শব সাধনাও রয়েছে। এই ভাবে অতি নিম্নস্তরের সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল এবং অতি নিকৃষ্ট ফিল্মের মত বেশ বড় একটা ভক্তের দল গড়ে ওঠা সহজ হয়েছিল। ফলে কালীপূজার প্রাধান্য বাড়তে থাকে। গুহ্য সমাজের প্রথম দিক থেকেই অর্থাৎ আদিম সামন্ত তন্ত্রের সময় থেকেই এবং বুদ্ধের অনেক আগে থেকেই এই পূজা যেন প্রচলিত হয়েছিল। মন্দির বা আখড়ার পৃষ্ঠ পোষকতায় পাণ্ডিত্যাভিমানী অকবি, অরসিক, তথা অদার্শনিকদের হাতের স্থূলহস্তলেপন তন্ত্রের প্রতিটি পাতায় ফুটে রয়েছে দেখা যায়। এগুলি অতি নিকৃষ্ট সাহিত্য। বর্তমানে

বাঙলাতে কালী মাংসের দোকানের অধিষ্ঠাত্রী। উজ্জয়িনীতে কালীমন্দির প্রসিদ্ধ। চিদাম্বরম মন্দিরে প্রধান দেবী কালী, মহীশূরে চামুণ্ডী (কালী) প্রধান/গৃহদেবী; কাঞ্চীতে কামাক্ষী, মাদুরাতে মীনাক্ষী এবং উত্তর কর্ণাটকে মূকাম্বিকা এগুলি কালীরই শান্ত মূর্তি। দ্রঃ- শক্তি।

কালীঘাট—আদি কলিকাতার দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে বাংলার প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। দেবীর ৫১ পীঠের একটি। এখানে বিষ্ণুচক্রে দেবীর দক্ষিণ পায়ের একটি আঙুল (অন্য মতে চারটি) পড়েছিল। এখানে দেবী কালী; ভৈরব নকুলেশ্বর। নকুলীশ বা নকুলেশ্বর প্রাচীন শৈব সম্প্রদায়ের কথা মনে করিয়ে দেয়। প্রাচীন বলা হয় বটে কিন্তু অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন গ্রন্থে ও রঘুনন্দনের তীর্থতত্ত্বে এর উল্লেখ নাই। গ্রামটির আয় কালীপূজায় ব্যবহৃত হত বলে গ্রামটির নাম কর্তাকালী বা কালীকর্তা (>কলিকাতা?) ছিল। একটি মতে কিলকিলা>কলিকাতা।

কালীনদী—ইক্ষুমতী, চক্ষুষ্মতী, কালীগঙ্গা, কালিন্দী, মন্দাকিনী, কালিনী। কুমায়ুনে-উৎপন্ন; গাড়োয়াল ও রোহিলখণ্ডে। গঙ্গায় এসে পড়েছে। এর পূর্ব তীরে সাংকাশ্য ও পশ্চিমে কনৌজ। উৎপত্তি স্থান থেকে ধবলগঙ্গা, গৌরী ও চন্দ্রভাগা সঙ্গম পর্যন্ত অংশটির নাম কালীগঙ্গা; পরবর্তী অংশ কালীনদী। দ্রঃ- কলিঙ্গ দেশ।

কালীয়—বিষধর সাপ। এক হাজার মাথা। গরুড়ের সঙ্গে নাগেদের বৈরিতার একটা মীমাংসা হয়; ঠিক হয় গরুড়কে (দ্রঃ) তাঁরা হবিঃর ভাগ দেবেন। কিন্তু কালীয় সম্মত হন না; গরুড়কে ঘৃণা করতেন। ফলে যুদ্ধ হয় এবং হেরে গিয়ে সপরিবারে সমুদ্র ছেড়ে হ্রদে এসে আশ্রয় নেন। ভাগবতে (১০।১৭) নাগেরা নিয়মিত বলি এনে দিত। কিন্তু উদ্ধত কালীয় একবার ঐ সব সংগৃহীত বলি খেয়ে ফেলেন। ফলে গরুড়ের সঙ্গে ভীষণ মারামারি হয় এবং যমুনাতে এসে আশ্রয় নেন। কারণ সৌভরির বারণ সত্ত্বেও গরুড় যমুনা থেকে এক মৎস্যরাজকে খেয়ে ফেলেছিল। সাপেদের কাতরতায় সৌভরি (দ্রঃ) শাপ দিয়েছিলেন যমুনাতে এলে গরুড় মারা পড়বে। অন্য মতে গরুড়ের সঙ্গে কালীয়ের একদিন যুদ্ধ হয়; পাখার ঝাপটায় জল ছিটকে সৌভরি ঋষির তপস্যায় বিঘ্ন হতে থাকে। ফলে সৌভরি শাপ দেন গরুড় এখান থেকে চলে যাক, ভবিষ্যতে কোনদিন এখানে এলে গরুড়ের মাথা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। ফলে কালীয় নিশ্চিন্ত হয়ে বাস করতে থাকেন। এদিকে কালীয়ের ভয়েও কেউ জলে নামতে পারতেন না এবং কালীয়ের মুখ থেকে ক্রমাগত আগুন ও ধূম বার হতে থাকার ফলে তীরবর্তী স্থানগুলি জলশূন্য হয়ে পড়ে। একটিমাত্র কদম্বগাছ সুস্থ ছিল কারণ অমৃত নিয়ে ফেরার পথে গরুড় এই গাছে এসে বসেছিল। একদিন কয়েকজন রাখাল ও তাদের গরুগুলি এই জল খেয়ে মারা গেলে কৃষ্ণ ঐ কদমগাছ থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কালীয় তার হাজার ফণায় তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণকে জড়িয়ে ধরলে কৃষ্ণ নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তার ফণার ওপর উঠে নাচতে বা পা দিয়ে মাথা থেঁতলাতে থাকেন। কালীয়ের মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে থাকে এবং কালীয়ের পুত্র-পরিবার কাতর হয়ে প্রাণভিক্ষা চান। কৃষ্ণ তখন তাকে সমুদ্রে রম্যক দ্বীপে যেতে বলেন এবং আশ্বাস দেন তাঁর পায়ের

চিহ্ন কালীয়ের মাথায় থাকবে এবং এই চিহ্ন দেখলে গরুড় আর শত্রুতা করবে না। সপরিবারে কালীয় রমণক (ভাগ ১০।১৬।৩৩) দ্বীপে আসেন ; কৃষ্ণকে নিজের মাথার মণি উপহার দিয়ে যান। হরিবংশে (২।১১।৬০) কৃষ্ণ একে কেন দমন করতে যান উল্লেখ নাই। কদমগাছ থেকে লাফ দিয়ে জলে নামেন ইত্যাদি। কালীয়কে সাগরে চলে যেতে বলেছিলেন এবং পদচিহ্নের জন্য গরুড় কোন অনিষ্ট করবে না ইত্যাদি। ভাগবতে (১০।১৬) সহস্র ফণা। জড়িয়ে ধরলে কৃষ্ণ দেহ বিসারিত করেন ফলে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। কালীয় শেষপর্যন্ত অপরাধ স্বীকার করেন। কশ্যপ কদ্রুর বিখ্যাত সন্তান শেষ, ঐরাবত, তক্ষক, কর্কোটক, কালীয়, মণি-নাগ ও পুরাণ-নাগ।

কালেয়—কালকেয় (দ্রঃ)। দ্রঃ কাল। সত্যযুগে যুদ্ধদুর্মদ অসুর। ইন্দ্রাদি দেবতাদের আক্রমণ করত (মহা (৩।৯৮।৪)। বৃত্র বধের পর সমুদ্রে আশ্রয় নেয় ; রাত্রিতে উঠে এসে অত্যাচার করত। ভরদ্বাজ আশ্রমে এক রাতে ২০ জন তপস্বীকে মেরে রেখে যায়। মহাভারতে এরা ঠিক করে নেয় বিদ্যাতপসোপপন্নদের আগে শেষ করতে হবে। এদের তপস্যা দ্বারাই সর্বে লোকাঃধ্রিয়ন্তে। অশীতিশতম্ অষ্টৌ ও নয় জন তপস্বীকে বশিষ্ঠ আশ্রম থেকে (মহা ৩।১০০।৩), চ্যবন আশ্রম থেকে ১০০ জনকে খেয়ে ফেলে। দিনের বেলা সমুদ্রে লুকিয়ে থাকত। মানুষেরা এই অবস্থাতে চারদিকে পালাতে থাকে। যজ্ঞ বন্ধ হয়ে যায়। দেবতারা বিষ্ণুর সঙ্গে পরামর্শ করেন, এবং অগস্ত্যকে (দ্রঃ) সমুদ্র শোষণ করতে বলেন (মহা ৩।১০২।১৭)। সমুদ্র শোষণের পর দেবতারা দানবদের নিহত করলে (মহা ৩।১০৩।৭) অবশিষ্টগুলি পাতালে পালিয়ে যায়।

কাশ—দ্রঃ- শল। কাশের বংশ কাশীবংশ। এদের মধ্যে দীর্ঘতপা (দ্রঃ) প্রথম ছেলে। দীর্ঘতপা ও ধন্ব>ধন্বন্তরি (দ্রঃ)>কেতুমান>ভীমরথ>দিবোদাস (দ্রঃ)>প্রতর্দন> বৎস ও ভর্গ। বৎস>অলর্ক>সন্নতি ও সুনীথ>ক্ষেম্য>কেতুমান>সুকেতু>ধর্মকেতু> সত্যকেতু>বিভু>আনর্ত>সুকুমার>ধৃষ্টকেতু>বেণুহোত্র>ভর্গ (হরি ১।২৯।—)।

কাশিরাজ—চন্দ্রবংশে রাজা কাশ-এর ছেলে। কাশিরাজের ছেলে দীর্ঘতপা (দ্রঃ)। দীর্ঘতপার ছেলে ধন্বন্তরী। এক কাশিরাজের মেয়ে গান্দিনীকে যদু বংশের রাজা শ্বফল্ক বিয়ে করেন। গান্দিনীর গর্ভে অক্রুর জন্মান। বন্ধু পৌণ্ড্রক বাসুদেবকে সাহায্য করতে গিয়ে কৃষ্ণের হাতে কাশিরাজ মারা যান। আরো বহু কাশীরাজ নামের উল্লেখ আছে।

কাশী—বারাণসী (দ্রঃ)।

কাশ্মীর—দ্রঃ- কাশ্যপপুর। কশ্যপ বা কাশ্যপ উপনিবেশ। কশ্যপ>কাসগড় বা কাশ্মীর। এখানকার অধিবাসীরা মূলত কাসস্ বা কাসিয়াস্ ছিল। মৎস অবতার হয়েছিল কাশ্মীরে। এখানে পশ্চিম দিকে তুষারমণ্ডিত তিনটি শিখরের মধ্যে বড়টি নৌবন্ধন শৃঙ্গ। শিখর তিনটি বনহাল গিরিপথের পশ্চিমে, পিরপঞ্জাল পর্বত শাখাতে। অথর্ববেদে শৃঙ্গটির নাম নাবপ্রভংশন, শতপথে মনোরবসর্পণ। শিখরটির নীচে ক্রম সর (বর্তমানে কোনসরনাগ) ; এখানে বিষ্ণুর ক্রম (পাদ) চিহ্ন রয়েছে। দ্রঃ- বরাহক্ষেত্র। অশোক এখানে ভিক্ষু মঝ্ঝন্তিকাকে পাঠিয়েছিলেন। জাতকে আছে কাশ্মীর এক সময়ে গান্ধারের অংশ ছিল। দ্রঃ- শ্রীনগর, কাশ্যপপুর।

কাশ্য—(১) কাশিরাজ; অপর নাম সেনাবিন্দু। ক্রোধবশ, অম্বা, অম্বিকা ইত্যাদির পিতা।

কাশ্যপ—(১) মহারাজ দশরথের একজন ব্রাহ্মণ মন্ত্রী। (২) জনৈক মুনি। এঁ'র ছেলে বিভাণ্ডক এবং নাতি ঋষ্যশৃঙ্গ। (৩) কশ্যপের ছেলে মহর্ষি কাশ্যপ। (৪) এক জন বিষ চিকিৎসক। রাজা পরিক্ষিৎকে (দ্রঃ) রক্ষা করার জন্য আসছিলেন। পথে ব্রাহ্মণবেশী তক্ষকের সঙ্গে দেখা হয়। এঁ'র অভিপ্রায় জানতে পেরে পরীক্ষার জন্য তক্ষক এক বটগাছে কামড় দেন। বটগাছ সঙ্গে সঙ্গে পুড়ে গেলেও কাশ্যপ মন্ত্রবলে গাছটিকে আবার বাঁচিয়ে দেন। তক্ষক তখন ব্রাহ্মণকে প্রচুর ধনরত্নের প্রলোভন দেখান এবং কাশ্যপও ধ্যানে জানতে পারেন পরিক্ষিতের আয়ু শেষ হয়েছে। ফলে তিনি তক্ষকের কাছে অভীষ্ট অর্থ নিয়ে ফিরে যান।

মহাভারতে (১।৪৬।৩১) পরে আছে ন্যগ্রোধবৃক্ষটিতে ইন্ধনের প্রয়োজনে শুষ্ক শাখা কেটে নেবার জন্য এক ব্যক্তি ছিল। লোকটিও যুগপৎ ছাই হয়ে গিয়েছিল। কাশ্যপের প্রভাবে বেঁচে ওঠে এবং নগরে সমস্ত ঘটনাটা বলে (দ্রঃ- কদ্রু)। (৫) বসুদেবের এক পুরোহিত, পাণ্ডবদের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। (৬) কশ্যপ পুত্র, একটি অগ্নি।

এই নামে অপর মুনিও দেখা যায়; আবার বহুস্থানে কশ্যপকেও কাশ্যপ বলা হয়েছে। অর্থাৎ দুটি নাম মিশে খিচুড়ি হয়ে আছে। এই কশ্যপ মরীচি পুত্র অর্থাৎ ব্রহ্মার নাতিও। কাশ্যম্ (মদ) পান করতেন বলে নাম কাশ্যপ। অনেক জায়গায় শকুন্তলার পালক পিতা কণ্বকেও কাশ্যপ বলা হয়েছে। এই কণ্ব প্রতিরথের নাতি এবং মেধাতিথির (মহা ১২।২০১।২৬) ছেলে; চন্দ্রবংশীয় একজন রাজর্ষি। অর্থাৎ দুষ্মন্ত ও কাশ্যপ দুজনে যেন খুড়তুতো জাড়তুতো ভাই। অর্থাৎ কশ্যপ বংশীয় নয়। মহাভারতে কণ্ব নামের পরিবর্তে বহুস্থানে কাশ্যপ ব্যবহৃত হয়েছে। পরিক্ষিৎকে কামড়াতে আসার সময় তক্ষক যাঁকে ধনরত্ন দিয়ে ফেরান তাঁর নাম কাশ্যপ দেখা যায়। কিন্তু ইনি হয়তো প্রকৃতই কশ্যপ; কেন না সর্পমন্ত্র প্রথম লাভ করেন কশ্যপ। এই কশ্যপ বা কাশ্যপ (মহা ১।৪৬।১৪) ৭-ম দিনে জনমেজয়ের সভাতে আসছিলেন।

কাশ্যপদ্বীপ—চন্দ্রে শশকচিহ্ন।

কাশ্যপপুর—ঋষি কশ্যপ নগর। কাশ্যপ>কাশ্মীর। হেরোডোটাস বলেছেন কস্পপ্যারোস্। অন্য মতে চিরদিনই মূল নাম কাশ্মীর। টলেমির কসপাইরিয়া= মুলতান। হরিপর্বতে কশ্যপের আশ্রম রয়েছে; শ্রীনগর থেকে ১ মাইল মত (ভবিষ্য)। মুলতানকেও কশ্যপ (স্থাপিত) পুর বলা হয়েছে। দ্রঃ- মূলস্থান।

কাশ্যপী—সমস্ত পৃথিবী কশ্যপকে দান-করা হয়েছিল বলে পৃথিবীর একটি নাম।

কাশ্যা—কাশীরাজের মেয়ে। অন্য নাম বপুষ্টমা। স্বামী রাজা জন্মেজয় (দ্রঃ)। কাশ্যার দুই ছেলে চন্দ্রাপীড় ও সূর্য্যাপীড়। জন্মেজয় অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত হয়ে স্ত্রীকে সংযতা হয়ে থাকতে বলেন, কিন্তু ইন্দ্র গোপনে বপুষ্টমার সংযম নষ্ট করেন ফলে যজ্ঞে বিঘ্ন ঘটে। রাজা তখন স্ত্রীকে ত্যাগ করতে কৃতসংকল্প হন কিন্তু বিশ্বাবসুর পরামর্শে শান্ত হন। দ্রঃ- আহুক।

কাষ্ঠমণ্ডপ—প্রাচীন কাঠমণ্ডু, কান্তিপুর/পুরী, কান্তেপুর, মঞ্জুপত্তন। বাগমতী ও

বিষ্ণুমতী নদীর তীরে নেপালের রাজধানী। রাজা গণকামদেব স্থাপিত। মঞ্জুশ্রী ঐতিহাসিক ব্যক্তি ; নেপালে ইনি বৌদ্ধধর্ম আনেন। উত্তর ভারতে বৌদ্ধরা এঁকে তাঁদের বিশ্বকর্মা মনে করতেন।

কাস্পিয়ান সমুদ্র—বরুণ হ্রদ (মহা)। আবেস্তাতে বেহরকান>বরুণ। রামায়ণে ক্ষীরসমুদ্র। সিরওয়ান (অপভ্রংশ>) ক্ষীর সাগর ; সরয়িন> সুরাসাগর।

কিঙ্কর—(১) একজন রাক্ষস। কল্মাষপাদের (দ্রঃ) দেহে প্রবেশ করে এবং বশিষ্ঠের সমস্ত ছেলেদের কল্মষপাদকে দিয়ে হত্যা করে। (২) মহাকায়, মহাবল, রক্তাক্ষ, পিঙ্গলাক্ষ, শুক্তিকর্ণ, অস্ত্রধারী ইত্যাদি বিশেষণযুক্ত অষ্টসহস্র রাক্ষস। ইন্দ্রপ্রস্থ (মহা ২।৩।২৪) সভাকে এরা রক্ষন্তি চ বহন্তি চ।

কিন্দম্—একজন মহর্ষি। হরিণ রূপ ধরে স্ত্রী সঙ্গ করছিলেন। রাজা পাণ্ডু হরিণ মনে করে তীর বিদ্ধ করেন। রাজা পাণ্ডুও স্ত্রী সঙ্গ করতে গেলে মারা যাবেন (মহা ১।১০৯।২৬) এবং এই স্ত্রীও সহমৃতা হবেন শাপ দিয়ে মহর্ষি দেহত্যাগ করেন। না জেনে ব্রহ্মহত্যা করেছেন বলে কোন শাপ দেন নি।

কিন্নর—কুৎসিত নর। অন্য নাম কিম্পুরুষ। দুটি ভাগ। এক ভাগে মুখ ঘোড়ার মত দেহ মানুষের ; অপর ভাগে মুখ মানুষের, দেহ ঘোড়ার। নৃত্যগীত বিশারদ, মধুরকণ্ঠ এবং বাদ্য এঁদের অত্যন্ত প্রিয়। (১) কশ্যপ ও অরিষ্টার সন্তান। এঁদের রাজা চিত্ররথ। হিমালয়ে কৈলাসে বাস। (২) বিদ্যাধর যক্ষ গন্ধর্ব ইত্যাদি দশপ্রকার দেবযোনির অন্যতম। ব্রহ্মার ছায়া থেকে জন্ম ; রাজা কুবের। (৩) অশ্বমুখের সন্তান ; অনেকগুলি গণে বিভক্ত। প্রাচীন ভারতের ধর্ম সাহিত্য ও শিল্পকলায় এঁদের বিশেষ স্থান রয়েছে। জৈনধর্ম গ্রন্থে এঁরা ব্যন্তর দেবতা। বৌদ্ধ তন্ত্রে কিন্নররাজ লালচে গৌরবর্ণ, দু হাতে বীণা বাজাচ্ছেন। দ্রঃ- গন্ধর্ব, ইল, কশ্যপ।

কিম্মৃত্য—বিন্ধ্যপর্বতের অংশ। সোন ও তোন নদীর মধ্যে কৈমুর শাখা। জব্বলপুর জেলাতে কটাঙ্গীর কাছে আরম্ভ এবং রেওয়া রাজ্য ও বিহারের সাহাবাদের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেছে। (২) চেদির কাছে কুমার রাজ্য নামে একটি দেশ ছিল। হয়তো কুমার রাজ্য কিম্মৃত্য>কৈমুর (দ্রঃ)।

কিম্পুরুষ—(১) অন্য নাম কিন্নর (দ্রঃ)। (২) অগ্নীধ্র (দ্রঃ) পূর্বচিত্তির এক ছেলে ; কিম্পুরুষ শাসিত দেশের নাম কিম্পুরুষবর্ষ। জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত হেমকূট পাহাড় ঘেরা : অন্য মতে দক্ষিণ দিকে একটি দেশ। আর এক মতে হিমালয়ের উত্তরে। পরবর্তী জীবন হনুমান এখানে কাটান। অন্য মতে কিম্পুরুষরা পুলহের ছেলে। আর এক মতে এঁদের মা যক্ষিণী। দ্রঃ- ইল।

কিম্পুরুষদেশ—নেপাল।

কিম্পুরুষ বর্ষ—এখানে হনুমান কিম্পুরুষদের (দ্রঃ) সঙ্গে মিশে রামের উপাসনা করেন।

কিয়ুল—(১) রোহিনালা (দ্রঃ)। (২) বিহারে ঋষিকুল্যা নদী (দ্রঃ)।

কিরগ্রাম—পাঞ্জাবে বৈজনাথ। কাংড়া জেলাতে। এখানেও একটি বিখ্যাত বৈদ্য-

নাথ মন্দির রয়েছে। কোট কাঙড়া থেকে ৩০ মাইল পূর্বে, বিনুয়ন নদীর তীরে। বৈদ্যনাথ থেকে ১২ মাইল দ-পশ্চিমে সুউচ্চ পাহাড়ে আশাপুরী দেবীর মন্দির।

কিরাত—ভারতে প্রাচীনতম একটি আদিবাসী। মঙ্গোলয়েড। কিরাত=ভোটব্রহ্ম। চীনা ও ভোট জাতির আকৃতির সঙ্গে কিছু মিল। সংস্কৃতে কিরাত অর্থে সাধারণ পার্বত্য অসভ্য উপজাতি। পর্বত ও অরণ্যে এদের বাস। কোল শবর ইত্যাদি অস্ট্রিক ভাষাভাষী থেকে এরা পৃথক। ব্রহ্মপুত্র বিধৌত অঞ্চলে ভোটদেশের কতকাংশে, ; পূর্ব নেপাল ও ত্রিপুরা রাজ্যে মুখ্যত এদের বাস বলা হত। কিরাতদের প্রাচীনতম উল্লেখ যজুর্বেদে। বাজসনেয়ি-সংহিতা ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে এ'দের পার্বত্য গুহাবাসী বলা হয়েছে। রামায়ণে এদের পাহাড় ও দ্বীপে বাসকারী এবং কাঁচা মাংস খায় বলে বর্ণিত। মহাভারতে ভীম বিদেহ রাজ্য অতিক্রম করে পূর্বাঞ্চলে সাতটি কিরাত রাজাকে পরাজিত করেন। মহাভারতে সভাপর্বে আছে কিরাতরা ভীষণ নিষ্ঠুর এবং যুদ্ধে ও শিকারে বিশেষ নিপুণ। অর্জুনকে পরীক্ষা করবার জন্য মহাদেব একবার কিরাতবেশে অর্জুনের (দ্রঃ) সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন।

সুশ্রী গৌরবর্ণ কিরাতরা পশুচর্ম পরত ও মাথায় জটার ত্রিকোণ চূড়া বাঁধত। ভাষাতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব মতে মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর কিরাত জাতি প্রায় খৃ-পূ ১০ শতকে ভারতের উত্তর পূর্ব অঞ্চল দিয়ে ভেতরে এসে ঢোকে। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের ভৌমবংশীয় রাজা ভগদত্ত চীন ও কিরাত বাহিনী নিয়ে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করেছিলেন। মনু এ'দের ব্রাত্য বা বৃষল ক্ষত্রিয় হিসাবে ব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যে নিয়েছেন। মেধাতিথি এ'দের নিম্ন শ্রেণীর ক্ষত্রিয় বলেছেন। প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিকদের কাছ থেকে কিরাতদের বহু তথ্য পাওয়া গেছে। নাগার্জুনকোণ্ডা শিলালিপিতে (ঐতিহাসিক যুগে) আছে শ্রীশৈলবিহারে যে বৌদ্ধ শ্রমণরা আসতেন তাঁদের মধ্যে চিলাত (কিরাত) অন্যতম। সাঁচির বৌদ্ধস্তূপে প্রস্তর বেষ্টনীর ওপরও চিরাতীয় (কিরাতীয়) উপাসকের নাম আছে। খৃ-৯-শতকে গুর্জর-প্রতিহার রাজ ২-য় নাগভটের গোয়ালিয়র প্রশস্তিতে আছে কিরাতদেরও তিনি জয় করেছিলেন।

কিরাতদেশ—ত্রিপুরা (দ্রঃ)। টলেমির কিরহাদিয়া—সিলেট ও আসাম এর অন্তর্গত ছিল। সিকিমের পশ্চিমে কিরাতরা বাস করত। মতান্তরে নেপাল থেকে পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত এদের বাস ছিল।

কিরীটকোণা—একটি পীঠস্থান। মুর্শিদাবাদে ডাহাপাড়া থেকে ৪ মাইল। সতীর মুকুট পড়েছিল। মুর্শিদাবাদ সহর থেকে ৩ মাইল।

কিরীটী—(১) দেবাসুরের যুদ্ধে দেব সেনাপতি স্কন্দকে সাহায্য করবার জন্য যক্ষগণ যে সব লোক পাঠান তাদের এক জনের নাম। (২) অর্জুনের নাম। দানবদের সঙ্গে যুদ্ধে সূর্যপ্রভ একটি কিরীট ইন্দ্রের কাছে অর্জুন পেয়েছিলেন ; ফলে এই নাম। তপসা ভুবনস্য সূনুনা পুরন্দরার্থে নির্মিত (মহা ৮।৬৬।১৩) এই কিরীট।

কির্মীর—বক রাক্ষসের ভাই ; হিড়িম্বের বন্ধু। তিনদিন তিনরাত্রি ধরে চলতে চলতে পাণ্ডবরা কাম্যকবনে আসেন। বনের মধ্যে মাঝ রাতে দীপ্তাক্ষ ভীষণ রাক্ষস পথ

আটকায়। রাক্ষসী মায়া সৃষ্টি করে গর্জন করতে থাকে। ধৌম্য মন্ত্রপাঠ করে এই মায়া নষ্ট করে দেন। নিজের পরিচয় দেয় বকের ভাই এবং যুধিষ্ঠিরদের পরিচয় পেয়ে বক ও হিড়িম্বকে হত্যা করার এবং হিড়িম্বাকে অপহরণ করার প্রতিশোধ নিতে চায়। অর্জুন গাণ্ডীব সজ্জিত করতে যান ভীম থামিয়ে দিয়ে আক্রমণ করেন। তুমুল যুদ্ধে নিহত হয়। পাণ্ডবরা তারপর দ্বৈতবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন (মহা ৩।১২।৬৮)।

কিলকিলা—কিলগিলা ; কোঙ্কনের রাজধানী। দ্রঃ- কালীঘাট, বাকাটক।

কিষ্কিন্ধ্যা—মহীশূরের উত্তরে পম্পার কাছে। বিজনুগর উপকণ্ঠে ছোট একটি গ্রাম। নিম্বপুর থেকে ১ মাইল পূর্বদিকে। ডিমের আকার চুনাপাথরের একটা ঢিপি ; কিছু ঘাস ইত্যাদি হয়। প্রবাদ বালীর অস্থি গাদা হয়ে ঢিপি। মতান্তরে কিষ্কিন্ধ্যা =অনগণ্ডি। বা তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণ তীরে অনগণ্ডির কাছে (ধারওয়াড়ে অবস্থিত) ছোট একটি গ্রাম ; বিজয়নগর থেকে ৩ মাইল এবং বেলারির কাছে। কিষ্কিন্ধ্যার দ-পশ্চিমে ২ মাইল দূরে পম্পা সরোবর এবং পম্পার উ-পশ্চিমে অঞ্জন পর্বতে হনুমানের জন্ম। কিষ্কিন্ধ্যার ৬০ মাইল পশ্চিমে শবরী আশ্রম। হাম্পি'র (দ্রঃ) পর উপত্যকা ; তারপর পর্বতগুলি মিলে কিষ্কিন্ধ্যা। এই কিষ্কিন্ধ্যা প্রায় সম্পূর্ণ তৃণহীন ; গ্রেনিট পাথর গঠিত ; এখানে চুনাপাথরের একটি এলাকাতে বালীর শেষকৃত্য করা হয়েছিল প্রবাদ।

পণ্যাপণবতী ও চাতুর্বর্ণ্যযুতা ; ব্রহ্মার নিয়োগে বিশ্বকর্মা কৃতা। ব্রহ্মা দেবদূতকে বলেন ঋক্ষরজাকে (দ্রঃ) কিষ্কিন্ধ্যাতে রাজা করে দিয়ে আসতে (রামা ৭।৩৭.৬।-)। বালী ও সুগ্রীবকে নিয়ে ঋক্ষরজা এই বানরদের দেশে আসেন। লক্ষ্মণ (দ্রঃ) এখানে এসে নানা পণ্য উপশোভিতা নগরী দেখেছিলেন। মৈরেয় ও মধুধারা সংমোদিত মহা পথা কিষ্কিন্ধ্যা (রা ৪।৩৩।৭)। এখানে বহু প্রাসাদ ছিল। অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, গবয়, হনুমান ইত্যাদি ইত্যাদি কপিমুখ্যদের গৃহমুখ্যানি লক্ষ্মণ দেখেছিলেন। সুগ্রীবের প্রাসাদ ও রাজার উপযুক্ত প্রাসাদ এবং তন্ত্রীগীত সমাকীর্ণ এবং রূপযৌবনগর্বিতাঃ স্ত্রিয়ঃ চারদিক নানা কাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সহদেব এখানে এসে বানরদের সঙ্গে সাতদিন যুদ্ধ করেছিলেন। দ্রঃ- অরুণ, অহল্যা।

কিসা গোতমী—শ্রাবস্তীর একটি দরিদ্র পরিবারে জন্ম। কৃশতার জন্য নাম। এক মাত্র পুত্রের মৃত্যুতে বুদ্ধদেবের কাছে এলে বুদ্ধদেব তাঁকে মৃত্যু ঘটে নি এই রকম একটি গৃহ থেকে এক মুষ্টি সর্ষে আনতে বলেন। কিসা গোতমী ব্যর্থ হলে বুদ্ধদেব তাঁকে ধর্মোপদেশ দেন ; ভিক্ষুণী সংঘে প্রবেশ করে অন্তর্দৃষ্টি সহ অর্হত্ব লাভ করেন। অমসৃণ ও সাধারণ পোষাক পরিহিতা। ভিক্ষুণীদের মধ্যে তিনি প্রধান ছিলেন।

কীকট—ঋক্ বেদে মাত্র ৩-৫৩ সূক্তে এই জাতির উল্লেখ আছে। এ'রা বৈদিক ধর্মে অবিশ্বাসী। নিরুক্তে (৬-৩২) কীকট একটি অনার্য দেশ। কিন্তু বর্তমানে মনে হয় কীকট একটি অনার্য জাতি। পরবর্তী কালে কীকট ও মগধ (দ্রঃ) একার্থবাচক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সম্ভবত দক্ষিণ বিহারের অংশ। তারাতন্ত্রে দ-মগধ ; বরণ পর্বত থেকে গৃধ্রকূট পর্যন্ত। (২) প্রিয়ব্রত বংশে রাজা ভরতের (দ্রঃ) একটি ছেলে।

কীচক—কেকয় রাজার ছেলে। মহাভারতে বারবার সূতপুত্র বলা হয়েছে। স্ত্রী মালবীর

এক ছেলে কীচক এবং পরবর্তী ১০৫ ছেলে উপকীচক (দ্রঃ)। কালকেয় অসুর বংশে/অংশে জন্ম। একটি বোন সুদেষ্ণা। কীচক মৎস্যরাজ বিরাটের শালা ও সেনাপতি; ১০৬ ভাই বিরাট রাজার সঙ্গেই থাকতেন। ত্রিগর্তরাজ সুশর্মাকে বার বার যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন। অজ্ঞাত বাসের সময় দ্রৌপদীকে (দ্রঃ) দেখে কীচক মুগ্ধ হয়ে বিয়ে করতে চান প্রধানা মহিষী করবেন; কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হন। এরপর কীচকের অনুনয়ে সুদেষ্ণা ছল করে এক পূর্ণিমা রাত্রিতে দ্রৌপদীকে সুরা আনবার জন্য কীচকের কাছে পাঠান। পাঞ্চালী ভীমকে সব খবর জানালে ভীমের পরামর্শে দ্রৌপদী কীচককে সন্ধ্যার অন্ধকারে নৃত্যশালায় গোপনে দেখা করতে বলেন। কীচক আনন্দে অধীর হয়ে ওঠে; আচরণও এখানে অত্যন্ত অভদ্র এবং জানায় মৎস্য দেশে প্রকৃত রাজা কীচক। এর পর সারাদিন অসহ্য প্রতীক্ষায় কোন মতে সময় কাটিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে আসেন। ভীম আগে থেকেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কীচক নিহত হয়; হাত পা দেহের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে একটি মাংস পিণ্ডে পরিণত করে দেন ভীম। রাজপ্রাসাদের গাছগুলোও সুন্দরী দ্রৌপদীকে ঝুঁকে পড়ে দেখত; তাকে দেখে মল্ল সর্দার কীচক বিচলিত হয়ে পড়বে এটাই স্বাভাবিক।

কীর্তি—(১) ব্যাসের ছেলে শুক। শুকের স্ত্রী পিতৃদেবদের কন্যা পীবরী; চার ছেলে কৃষ্ণ, গৌরপ্রভা, ভূরি, দেবশ্রুত ও একটি মেয়ে কীর্তি। এই কীর্তির স্বামী অণুহ; বিভ্রাজ দেশের রাজা বিভ্রাজের ছেলে; কীর্তির ছেলে ব্রহ্মদত্ত (দে-ভা-১।১৯।৪০)। হরিবংশে (১।২০।২৭) শুক কন্যা কৃত্বী। (২) দক্ষ প্রজাপতির মেয়ে।

কীর্তিমান—বসুদেব দেবকীর প্রথম ছেলে। সন্তান জন্মের পর কংসের কাছে পাঠিয়ে দিলে কংস একে ফিরিয়ে দেন। কারণ দেবকীর অষ্টম পুত্র তাঁর শত্রু। এর পর নারদ এসে কংসকে তাঁর পূর্বজন্ম, কৃষ্ণের ভাবী জন্মের কারণ ইত্যাদি জানিয়ে গেলে কংস তখন কীর্তিমানকে আছাড় মেরে হত্যা করেন। (ভাগ ১০।১)

কীর্তিসেন—বাসুকির এক ভাই।

কুকুর—(১) অনুমান কাঠিওয়াড়ের উত্তর অঞ্চলে আনর্ত দেশের কাছে একটি দেশ। দশার্হ। রাজপুতানার একটি অংশ। রাজধানী বালমার=পি-লো-মি-লো (হিউ-এন-ৎসাঙ)। অন্য চীনা পরিব্রাজক মতে কিউ-চি-লো। পূর্ব রাজপুতানাতে (পদ্ম)। কুকুররা যাদব। ভাগবত ও পুরাণ অনুসারে দ্বারকা মণ্ডলের অন্তর্গত। পুরাণ কথিত যদুবংশে সাত্বতশাখার অন্ধকের (দ্রঃ) ছেলের নাম অনুসারে। বৃহৎসংহিতাতে (১৪'৫।৪) কুকুরদেশ পশ্চিম ভারতে। শাতবাহন বংশীয় গৌতমী পুত্র শাতকর্ণি অন্যান্য অঞ্চলগুলির সঙ্গে এটিও জয় করেছিলেন। (২) বৃষ্ণি বংশে এক রাজা। সাত্যকি(১)-পৃশ্নি(৫)-চিত্ররথ(৬)-কুকুর(৭)। হরিবংশে আছে (১।৩৭।২০) কুকুর>ধৃষ্ণু>কপোত-রোমা>তৈত্তির>পুনর্বসু>অভিজিৎ>আহুক (দ্রঃ) ও আহুকী। আহুকীর বিয়ে হয় অবন্তি বংশে। কুকুর ও অন্ধক বংশীয় সকলেই আত্মকলহে মুষল পর্বে নিহত হন। (৩) কশ্যপ বংশে একটি সাপ।

কুক্কুর—মহাভারতের যুগে কুকুর খুব বেশি গৃহপালিত হয়ে উঠেছিল। পথে

ঘাটেও প্রচুর ছিল। ফলে যজ্ঞ স্থানেও এসে ঢুকত। দ্রঃ-সরমা। বিশ্বামিত্র চণ্ডালের ঘরে গিয়ে কুকুর মাংস খেতে চান। মহাপ্রস্থানের সঙ্গী কুকুরটিকে বাদ দিয়ে যুধিষ্ঠির স্বর্গে যেতে রাজি হন নি। মহাভারতে (ভাণ্ডা ১২।১১৭) এক গ্রাম্য কুকুর এক তপস্বীর আশ্রমে বাস করতে থাকে। তপস্বীও ভালবাসতেন এবং কুকুরটির নিরাপত্তার জন্য ক্রমশ একে দ্বীপী, বড়বাঘ, হাতী, সিংহ ও শেষ পর্যন্ত শরভে পরিণত করে দিয়েছিলেন। শরভ তারপর শিকারের অভাবে ক্ষুধাতে কাতর হয়ে তপস্বীকেই খাবে ঠিক করলে তপস্বী আবার কুকুরে পরিণত করে দেন ; কিন্তু নিহত করেন নি। সরমা (দ্রঃ) কাহিনী অতি পরিচিত ; অর্থাৎ বেদের যুগেও গৃহপালিত যেন।

কুক্কুটপাদ—হিউ-এন-ৎসাঙ বোধিদ্রুম থেকে নৈরঞ্জন নদী পার হয়ে কিউ-কিউ-চ-পো-থো বা কক্কুটপাদ পাহাড়ে যান। কুর্কিহার। ওয়াজির গঞ্জের উ-পূর্বে ৩ মাইল। দেখতে মুরগির পা মত। গয়ার ২৫ কি-মি উত্তরপূর্বে কুর্কিহার গ্রামের কাছে যে তিনটি পাহাড় আছে সেই তিনটি মনে হয়। অন্য মতে বুদ্ধগয়ার ২৪ কি-মি পূ-উ-পূর্বে হাসরা কোলে মোহের পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়া সোভনাথ এই কুক্কুটপাদ। অন্য মতে ফা-হিয়েনের গুরুপাদগিরি বা গুরুপা (বুদ্ধগয়ার ৩৩ কি-মি পূর্ব দক্ষিণে) এই কুক্কুটপাদ। এইখানে বুদ্ধদেবের এক প্রধান শিষ্য মহাকশ্যপ তিনটি অলৌকিক কার্যকলাপ দেখিয়েছিলেন এবং এখানেই তিনি দেহ রাখেন। এখানে কয়েকটি বৌদ্ধস্তূপের ভগ্নাবশেষ রয়েছে।

কুক্কুটারাম—কৌশাম্বীতে সশিষ্য বুদ্ধদেবের থাকবার জন্য তিনজন ধনী শ্রেষ্ঠী (ঘোষিত, কুক্কুট ও পাবারিক) ঘোষিতারাম, কুক্কুটারাম ও পাবারিকাম্ববন নামে প্রসিদ্ধ তিনটি সংঘারাম করে দিয়েছিলেন।

কুক্কুর—(১) চন্দ্রবংশে এক রাজা। কুকুর বংশের প্রতিষ্ঠাতা। (২) একজন প্রসিদ্ধ মুনি।

কুক্ষি—প্রিয়ব্রতের মেয়ে ; কর্দম (দ্রঃ) প্রজাপতির স্ত্রী। ছেলে কুক্ষি (অগ্নি-পু) (২) ইক্ষ্বাকুর ছেলে।

কুচেল—সুদাম (দ্রঃ)।

কুজ—দেবগণের মধ্যে একজন। অস্ত্র শক্তি, গলায় অক্ষমালা।

কুঞ্জর—(১) অঞ্জনার পিতা ; এক জন বানর রাজা। হনুমানের মাতামহ। (২) কশ্যপের স্ত্রী কদ্রুর ছেলে একটি সাপ।

কুটিকা—(১) কুটিলা, কোসিল। অযোধ্যাতে রোহিলখণ্ডে রামগঙ্গার করদা পূর্ব শাখা। (২) গঙ্গার (দ্রঃ) বোন কুটিলা।

কুটিকোষ্ঠিকা—কোহ। অযোধ্যাতে রামগঙ্গার একটি ছোট শাখা। (রামা ২।৭১।২০)।

কুট্টাল—তামিলনাড়ুর দক্ষিণ সীমান্তে একটি মন্দির। শৈব অগস্ত্য এখানে এই বিষ্ণু মন্দিরে প্রবেশ করতে গেলে বৈষ্ণব পূজারী ইত্যাদি বাধা দেন। অগস্ত্য তখন বৈষ্ণব সেজে মন্দিরে ঢোকেন এবং মন্দিরের পূজারী ইত্যাদিকে শিক্ষা দেবার জন্য বিষ্ণুমূর্তি শিবলিঙ্গে রূপান্তরিত হয়ে যায়। সেই থেকে এটি শিব মন্দির।

কুণাল—মৌর্য সম্রাট অশোকের ছেলে। মহিষী পদ্মাবতীর গর্ভে জন্ম। প্রথম নাম ধর্ম-বিবর্ধন। আয়ত সুন্দর চোখের জন্য হিমালয়ের কুণাল পাখীর সাদৃশ্য হেতু এই নাম। ৬৪ প্রকার বিদ্যায় পারদর্শী হন এবং কাঞ্চনমালাকে বিয়ে করেন। কিন্তু বিমাতা তিষ্যরক্ষিতার কামবাসনা পূর্ণ করতে অসম্মত হলে বিমাতার চক্রান্তে রাজ আদেশে তক্ষশিলায় বিদ্রোহ দমনে যান। বিদ্রোহী প্রজারা সেখানে তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করে নিলে তিষ্যরক্ষিতা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। এই সময়ে সম্রাটকে এক কঠিন ব্যাধি থেকে নিরাময় করে তিষ্যরক্ষিতা এক সপ্তাহের জন্য সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব লাভ করেন ও এই সময়ে তক্ষশিলায় অশোকের নামে জরুরি আদেশ পাঠান কুণালের চোখদুটি যেন তুলে ফেলা হয়। অনুগত কুণাল ঘাতক ডেকে রাজার আদেশ পালন করে স্ত্রীকে নিয়ে পাটলিপুত্রের পথে বার হয়ে পড়েন। পথে গান গেয়ে ভিক্ষা করতে করতে দীন বেশে রাজধানীতে এসে প্রবেশের অনুমতি না পেয়ে রাজার রথশালায় রাত্রি যাপন করেন। পর দিন প্রত্যূষে কুণালের বাণী শুনে অশোক তাঁকে ডেকে পাঠান এবং প্রিয়পুত্রের এই অবস্থার কারণ জানতে পেরে স্ত্রীকে কঠোর শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু মৈত্রীভাবনায় কুণাল পিতাকে শান্ত করলে অলৌকিক প্রভাবে কুণাল আবার চক্ষুলাভ করেন। কারো কারো মতে মহিষী কারুবাকীর ছেলে তিবরই এই কুণাল। কুণাক জাতক গ্রন্থে হিমালয়ের কুণালপক্ষী রূপী বোধিসত্ত্বের কাহিনী আছে ; অশোকের ছেলের কোন কাহিনী নাই।

কুণিগার্গ্য—বিখ্যাত একজন মুনি। তপস্যার বলে একটি কন্যার জন্ম দেন এবং তারপর সমাধিতে দেহত্যাগ করেন। মেয়ে বৃদ্ধকন্যা। মহা ৯।৫১।৩।

কুণ্ড—স্বামী জীবিত থাকতে ব্যাভিচার জাত পুত্র। কুণ্ডের জনক কুণ্ডাশী।

কুণ্ডগ্রাম—কুণ্ডপুর, বৈশালী (দ্রঃ)। ত্রিহুতে মজফরপুর জেলাতে বর্তমানে বসুকুণ্ড ; প্রাচীন বৈশালীর একটি উপকণ্ঠ। বৈশালী অর্থে তখন ছিল মূল বৈশালী (ব্রাহ্মণদের বাস)+কুণ্ডপুর (ক্ষত্রিয়দের)+বনিয়াগ্রাম (বৈশ্যদের)। কুণ্ডগ্রামে মহাবীরের জন্ম। বৌদ্ধদের এটি কোটিগ্রাম। অন্য মতে বৈশালী উপকণ্ঠে কোল্লগ-তে নায় বা নাট ক্ষত্রিয়েরা বাস করতেন। এই বংশে মহাবীর (দ্রঃ) জন্মান। প্রথমে ব্রাহ্মণী দেবানন্দার গর্ভে মহাবীর আসেন কিন্তু ইন্দ্র এই শিশুকে ক্ষত্রিয়া ত্রিশলার গর্ভে স্থাপন করেন। কুণ্ডপুর-রাজ/প্রধান সিদ্ধার্থের ছেলে, মা বৈশালী-রাজ চেতকের বোন। চেতকের মেয়ে চেল্লানা বা বিদেহদেবী বিম্বিসারের স্ত্রী ; ছেলে অজাতশত্রু। অন্য মতে অজাতশত্রু কোসলদেবীর ছেলে ; স্ত্রী বজিরা, শ্রাবস্তীর প্রসেনজিতের মেয়ে। মহাবীরের জন্ম (৫৯৯ খৃ-পূ)। পাপাতে (পাভাপুরী) ৭২ বছর বয়সে (৫২৭ খৃ-পূ) মতান্তরে ৭০ বছর বয়সে (৫৬৯ খৃ-পূ) মৃত্যু। বুদ্ধের মৃত্যুর ২৬ বছর আগে। মহাবীরের স্ত্রী যশোদা, মেয়ে অনোজ্জা বা প্রিয়দর্শনা। নিগ্রন্থজ্ঞাতি পুত্র=জ্ঞাতপুত্র=নাতপুত্ত—রাজগৃহবাসী একজন বিখ্যাত তপস্বী ; বুদ্ধের সমসাময়িক ; ইনিই যেন মহাবীর। মহাবীর বার বছর ধরে লাড় (রাঢ়), শুভ ভূমি ইত্যাদি অঞ্চলে ঘুরে বেড়ান। তারপর এই পরিক্রমার

১৩শ বর্ষে সিদ্ধিলাভ করে নিগ্রন্থ মতবাদ প্রচার করেন। এই মতবাদ পার্শ্বনাথের মতবাদের একটি সংস্করণ। অশোকস্তম্ভে (২৯ বৎসর রাজত্বে) নিগ্রন্থদের উল্লেখ আছে। মগধে ইন্দ্রগুপ্তের সময় ১২ বৎসর ব্যাপী দুর্ভিক্ষ হয়। এই সময় জৈন নেতা ভদ্রবাহু সঙ্গীদের নিয়ে কর্ণাটে চলে যান (দ্রঃ- শ্রাবণ বেলগোলা)। মগধে যারা পড়ে থাকেন তাদের নেতা হন স্থূলভদ্র। দুর্ভিক্ষের শেষে পাটলিপুত্রে জৈন ধর্ম গ্রন্থ লেখা হয়। জৈনরা আগে কেউই কাপড় পরতেন না ; দুর্ভিক্ষের সময় পাটলিপুত্রের জৈনরা কাপড় পরতে থাকেন। ভদ্রবাহুর অনুগামীরা ফিরে এসে পাটলিপুত্রের আচার ব্যবহার ও গ্রন্থ কিছুই মানতে চান না। ফলে দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর দুটি শাখা (৭৯ বা ৮২ খৃ) সৃষ্টি হয়। পরে গুজরাটে দেবর্দ্ধির নেতৃত্বে এক সভাতে (১৫৪ খৃ) ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে একটা মীমাংসা হয়।

কুণ্ডজ—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। দ্রঃ- কুণ্ডভেদী।

কুণ্ডভেদী—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। অপর নাম কুণ্ডজ। ভীমের হাতে নিহত হন।

কুণ্ডলিনী—একটি সাপের দেহের দুটি প্রান্তে একটি করে মুখ। মূলাধার চক্রে স্বয়ম্ভু লিঙ্গকে সাড়ে তিন পাকে বেষ্টন করে ঘুমিয়ে অবস্থিত। এই কুণ্ডলিনীকে জাগান যায় ; এবং সহস্রারে তুলে আনতে পারাকে ষট চক্রভেদ বলা হয়। সাধক তখন মোক্ষ লাভ করেন। স্ত্রী দেহে নাই। দ্রঃ- শক্তি, কুলকুণ্ডলিনী।

কুণ্ডলী—(১) কুণ্ডাশী। ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। ভীমের হাতে নিহত হন। (২) গরুড়ের এক ছেলে।

কুণ্ডিক—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। এই ধৃতরাষ্ট্র জন্মেজয়ের ছেলে ; দেবব্রত ভীষ্মের কয়েক পুরুষ আগে। কুণ্ডিকের ভাই হস্তী, বিতর্ক ক্রাথ, কুণ্ডল ইত্যাদি (মহা ১।৮৯।৫১)।

কুণ্ডিনপুর—বিদর্ভ (দ্রঃ)-পুর, দেবলবারা, কুণ্ডিল্যপুর এবং ভীমপুর। প্রাচীন ভারতে একটি নগরী ; বিদর্ভের প্রাচীন রাজধানী। একটি মতে মধ্যভারতে অমরাবতীর ৪০ মাইল পূর্বে কুণ্ডপুর। মধ্য প্রদেশে চন্দ্র জেলাতে ওয়ার্দ্ধা (বিদর্ভ) নদীর তীরে ওয়ারোবা থেকে ১১ মাইল দক্ষিণে দেবলবারা কুণ্ডিনপুর বলে প্রবাদ। দময়ন্তীর জন্মস্থান। রুক্মিণী মন্দিরের কাছে এখানে প্রতি বছর মেলা হয়। প্রাচীন কুণ্ডিনপুর ছিল ওয়ার্দ্ধা থেকে অমরাবতী (আমরাওটি) পর্যন্ত। এখানে একটি অনুরূপ (ভবানী) মন্দির রয়েছে ; এই মন্দির থেকে রুক্মিণীকে কৃষ্ণ নিয়ে গিয়েছিলেন। ভীষ্মকের রাজধানী ; রুক্মিণীর জন্মস্থান। মতান্তরে বেরারে কোণ্ডাগিরি যেন কুণ্ডিনপুর। বর্তমানে বিদর যেখানে সেইখানে যেন বিদর্ভ (দ্রঃ)-পুর বা কুণ্ডিনপুর ছিল। সোমনাথ (অর্চাবতার) অর্থাৎ প্রভাস থেকে ৪০ মাইল উ-পূর্বে (বিদর্ভের) মাধবপুর এবং এই মাধবপুর থেকে যেন রুক্মিণী হরণ হয়েছিল। অনর্ঘ রাঘবে কুণ্ডিন নগর মহারাষ্ট্রে এবং বিদর্ভ ও মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত।

কুণ্ডোদর—(১) কুণ্ডাধার। ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। ভীমের হাতে মৃত্যু। (২) বিশিষ্ট একটি সাপ।

কুৎস—(১) গোত্র প্রবর্তক এক ঋষি। বহু ঋক্‌মন্ত্র রচনাকার। ইন্দ্র এঁকে বহুবার নির্যাতন করেছিলেন। একবার শুষ্ণ এই ঋষিকে কূপে ফেলে দিয়েছিলেন। এই সময়ে কুৎসের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে ইন্দ্র শুষ্ণকে হত্যা করে এঁকে উদ্ধার করেন। কুৎস ও ইন্দ্র দেখতে এমন ছিলেন যে ইন্দ্র এঁকে এক বার নিজের প্রাসাদে নিয়ে গেলে শচী চিনতেই পারেন নি কে ইন্দ্র। (২) রাজর্ষি রুরুর ছেলে (ঋক্)।

কুনর—কামহ, কুমঃ বা কাম্বর নদী। চোয়াসপেস্ (গ্রীক); চোয়েস (এরিয়ানে); কাবুল (প্রাচীন কোফেন) নদীতে এসে মিশেছে; জালালাবাদ থেকে একটু নীচে। অন্য মতে চায়োসপেস=ইউয়সপ্ল=শীষ নদী; কাবুলে এসে মিশেছে (এলফিনস্টোন ম্যাপে)।

কুন্তক—কাশ্মীর দেশীয়। সম্ভবত অভিনবগুপ্তের সমসাময়িক। এঁর বই 'বক্রোক্তি জীবিত'। কারিকা ও বৃত্তি গ্রন্থও এঁর নিজের রচনা। বৃত্তিতে পাঁচ শতের অধিক উদাহরণ বিভিন্ন কবির লেখা থেকে নেওয়া। বক্রতাকে কুন্তক বর্ণবিন্যাস বক্রতা, পদপূর্বার্ধবক্রতা, পদপরার্ধবক্রতা, বাক্যবক্রতা, প্রকরণবক্রতা, প্রবন্ধবক্রতা এই ৬-টি মূলশ্রেণীতে ভাগ করেছেন। বক্রতাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করে এই বক্রতার ব্যাপক পরিধির মধ্যে ধ্বনির সর্ববিধ প্রভেদ অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। বক্রোক্তি কেবল অলংকার নয় কবিকর্মের সব কিছুই এই বক্রোক্তির প্রকারভেদের মধ্যে নিহিত। কুন্তক প্রতিপাদন করেছেন প্রতিভার বৈচিত্র্য অনুসারে কাব্য রচনার তিনটি মার্গ:- সুকুমার, বিচিত্র ও মধ্যম।

কুন্তল—চালুক্যদের সময় এই দেশের উত্তরে নর্মদা, দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রা, পশ্চিমে আরব সাগর এবং পূর্বে গোদাবরী ও পূর্বঘাট পর্বতমালা। রাজধানী কখনো নাসিক, কখনো কল্যাণ। কুন্তলকপুর (দ্রঃ)। পরবর্তীকালে এটি দক্ষিণ মারাঠা দেশ; বর্তমানের মহীশূর সমেত। দশকুমারচরিতে কুন্তল বিদর্ভের আশ্রিত আবার কর্পূরমঞ্জরীতে (১০ শতকে) বিদর্ভ কুন্তলের অন্তর্গত। কুন্তলকে কর্ণাটও বলা হয়েছে। তারাতন্ত্রে মহারাষ্ট্র হচ্ছে কর্ণাট; রামনাদ থেকে শ্রীরঙ্গপত্তম পর্যন্ত বিস্তৃত এবং রাজধানী দ্বারসমুদ্র। মার্কণ্ডেয় পুরাণে মধ্যদেশে এবং দাক্ষিণাত্যে দুটি কুন্তল।

কুন্তলকপুর—কুন্তলপুর, কুবাত্তুর, কুবত্তুর, কৌন্তলকপুর, সুরভিপত্তন, সোমপথ (পেরিপ্লাসে)। মহীশূরে সিমোগা জেলাতে (সুরভি দ্রঃ)। দেশের রাজধানী কুন্তল; কেরলে। প্রবাদ রাজা চন্দ্রহাসের রাজধানী। কুন্তলপুর থেকে ৪২ মাইল দূরে চন্দ্রাবতী। কইরা জেলাতে সর্নল যেন কুন্তলপুর। একটি মতে কুন্তলপুর গোয়ালিয়রে। কুন্তল (দ্রঃ)।

কুন্তিভোজ—কুন্তি বা ভোজ; মালবে একটি প্রাচীন দেশ/নগর। অশ্বনদী বা অশ্ব রথ নদীর তীরে; নদীটি চম্বলে এসে মিশেছে (বৃহৎ-স)। কুন্তী এখানে পালিতা রাজকন্যা। বৈরন্ত্য নগর (দ্রঃ)।

কুন্তিভোজ—কুন্তীর পালক পিতা। সন্তানহীন এক জন যাদব রাজা কুন্তিভোজ। রাজা শূর/শূরসেনের ভাগনে; অন্য মতে পিসতুত ভাই কুন্তিভোজ (মহা ১।১০৪।২)। শূরসেন কুন্তিভোজকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাঁর প্রথম সন্তানকে কুন্তিভোজের হাতে

দিয়ে দেবেন। কুন্তিভোজই স্বয়ংবর সভা ডেকে কুন্তীর বিয়ে দেন। কুরুক্ষেত্রে ইনি পাণ্ডব দলে ছিলেন। কুন্তিভোজের দশ ছেলে অশ্বত্থামার হাতে নিহত হন।

কুন্তী—প্রকৃত নাম পৃথা। যদুবংশে রাজা শূর/শূরসেনের (দ্রঃ) প্রথম সন্তান; কৃষ্ণের পিসি; বসুদেবের বোন। অপরূপ সুন্দরী। কুন্তিভোজের (দ্রঃ) কাছে পালিত; ফলে নাম কুন্তী (হরি ১।৩৪)। কুন্তী, মাদ্রী, গান্ধারী তিন জনে যথাক্রমে সিদ্ধি, ধৃতি ও মতির অংশে জন্ম (মহা ১।৬১।৯৮)। রাজপুরীতে বালিকা বয়সে পূজা ইত্যাদির এবং মুনিঋষিরা এলে তাঁদের অতিথি সেবার ভার বিয়ের আগে এঁর উপর ছিল। একবার দুর্বাসা (মহা ১।১০৪।৫) আসেন, কুন্তী অতিথির সমস্ত ভার গ্রহণ করেন। কুন্তীকে পরীক্ষা করবার জন্য দুর্বাসা এক দিন রান্না সারতে বলেন এবং নিজে স্নান করতে যান। স্নান করতে গেলেও তৎক্ষণাৎ ফিরে আসেন; কুন্তী কোন মতে রান্না সেরেছিলেন, খেতে দেন। উত্তপ্ত অন্নের পাত্র কুন্তীর পিঠের ওপর রেখে দুর্বাসা খেতে থাকেন; তাপে পিঠ জ্বলে যেতে থাকলেও কুন্তী চুপ করে সহ্য করেন। দুর্বাসা এতে সন্তুষ্ট হয়ে একটি মন্ত্র দান করেন; একটি মতে মন্ত্রটি (ভাগবতে ৯।২৪—দেবহূতি বিদ্যা) পাঁচ বার ব্যবহার করা সম্ভব; আর এক মতে এ রকম কোন বাধা ছিল না; আর এক মতে পাঁচটি মন্ত্র দেন; শেষ দুটি মন্ত্র কুন্তী মাদ্রীকে (দ্রঃ) দিয়েছিলেন। আদি পর্বে রয়েছে কুন্তীর সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে আপৎ-ধর্ম অবেক্ষয়া মন্ত্র দিয়ে যান এবং বলে যান যে দেবতাকে এই মন্ত্রে কুন্তী ডাকবেন তার প্রসাদে কুন্তীর সন্তান হবে। কৌতূহলে কন্যা অবস্থাতে সূর্যকে ডাকেন। সূর্য এসে গর্ভ সঞ্চার করে যান। এই ছেলে কর্ণ (দ্রঃ)। বনপর্বে (৩।২৮৭) এই ঘটনার একটু হেরফের হয়েছে। এখানে আছে একজন ভীষণ তপস্বী এসে থাকতে চেয়েছিল, কিছুদিন থাকবেন, যখন খুসি আসবেন যাবেন; শোয়া বসা ইত্যাদিতে কেউ যেন বাধা না দেয়। এক বৎসর ব্রাহ্মণ নানাভাবে বেশ কিছুটা অত্যাচার মত করেন এবং সন্তুষ্ট হয়ে বর দিতে চান। প্রথমে কুন্তী কোন বর নিতে চান নি; ব্রাহ্মণ তবু জোর করে অথর্ববেদের একটি মন্ত্র দিয়ে যান। এই মন্ত্রে যে দেবতাকে ডাকবে ভৃত্যের মত সে ছুটে আসবে। অর্থাৎ বনপর্বে সন্তান হবে বা দুর্বাসা মন্ত্র দিয়েছিলেন উল্লেখ নাই। বনপর্বে (৩।২৯০।১৩) কুন্তী সূর্যের মত যদি তার একটি সন্তান হয় কামনা করে কৌতূহলে মন্ত্রবল পরীক্ষার্থে সূর্যকে ডাকেন, সূর্য তৎক্ষণাৎ আসেন। কুন্তী ভয় পেয়ে যান। সূর্য কিন্তু ফিরে যেতে চান না। কুন্তী নিরুপায় হয়ে সূর্যের মত ছেলে চান। সূর্য তখন বলেন অদিতি সূর্যকে যে কুণ্ডল দুটি দিয়েছিলেন সূর্য এই সন্তানকে সে দুটি দেবেন (মহা ৩।২৯১।২১) এবং বর দেন সর্বশস্ত্রভৃৎ শ্রেষ্ঠ পুত্র হবে; কুন্তী কন্যাই থাকবেন। মাঘ মাসে শুক্লা প্রতিপদে গর্ভ সঞ্চার হয়। একজন ধাত্রেয়িকা ছাড়া কেউ জানতে পারে না। এরপর যথা সময়ে কবচকুণ্ডল সহ সন্তান হয়। কুন্তী তৎক্ষণাৎ ধাত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে মঞ্জুষা মধ্যে রেখে স্বস্তিবাচন করে রাত্রিতে অশ্ব নদীতে ভাসিয়ে দেন। এই ছেলে কর্ণ; কুন্তী চরের সাহায্যে এর সমস্ত খবর রাখতেন। মহাভারতে (১৫।৩৮) দুর্বাসা কুন্তীকে বর নিতে বাধ্য করেছিলেন। যাকে ডাকবে সে হবে বশবর্তী। সূর্য এলে কুন্তী ফিরে

যেতে বলেছিলেন। সূর্য বলেন বর নিতে হবে ; না হলে কুন্তী ও দুর্বাসা দু-জনকে ভস্ম করবেন। কুন্তী তখন সূর্যের মত পুত্র চান। দেবী ভাগবতে (২।৬) চাতুর্মাস্য ব্রতধারী দুর্বাসা আসেন। সূর্য এলে ভয়ে কাঁপতে থাকেন এবং রজস্বলা হয়ে যান। সূর্য বলেন কামার্তঃ অস্মি।

স্বয়ংবরে কুন্তী পাণ্ডুকে গলায় মালা দেন। পরে আর একজন সপত্নী আসে মাদ্রী। কুন্তী, মাদ্রী ও পাণ্ডু তিন জনে অত্যন্ত সুখে ছিলেন। দ্রঃ- পাণ্ডু। পাণ্ডু এরপর কুন্তীকে ক্ষেত্রজ সন্তান (দ্বিজাতেঃ তপসাধিকাৎ ; মহা ১।১১৩।৩০) ধারণ করতে বলেন এবং দুর্বাসার দেওয়া মন্ত্রের কথা জানতে পেরে সন্তানবতী হবার জন্য ধর্মকে (ধর্মম্ আহ্বয় মহা ১।১১৩।৩৯) ডাকতে বলেন। শতশৃঙ্গ পাহাড়ে ধর্মের সঙ্গে মিলনে যুধিষ্ঠির (দ্রঃ) জন্মান। পরে পাণ্ডুর ইচ্ছায় বায়ুর ঔরসে ভীম এবং ইন্দ্রের ঔরসে অর্জুন হয়। প্রতি বৎসর একটি পুত্র (দে-ভাগ)। এর পর কুন্তী আর সন্তান ধারণ করতে রাজি হন নি। বলেছিলেন অতঃপরং চারিণী স্যাৎ পঞ্চমে বন্ধকী ভবেৎ (মহা ১।১১৫।৬৫)। অন্য মতে ৪-র্থ ও ৫-ম ছেলে থেকে পিতামাতা কষ্ট পাবেন বলা ছিল বলে কুন্তী আর সন্তান লাভের চেষ্টা করেন নি। রাজার ইচ্ছায় মন্ত্রটি বা বাকি মন্ত্রদুটি মাদ্রীকে (দ্রঃ) দান করেন। অন্য মতে মন্ত্রটি একবারের জন্য ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। পাণ্ডুর অনুরোধেও দ্বিতীয় বার আর দেন নি (বিভেমি অস্যাঃ পরিভবাৎ নারীনাং গতিঃ ঈদৃশী ; মহা ১।১১৬।২৩)।

পাণ্ডু মারা গেলে কুন্তী ও মাদ্রী (দ্রঃ) দুজনেই সহমৃত হতে চান ; স্বামীর মৃত্যুর কারণ জেনেও সদ্য বিধবা কুন্তী সপত্নীকে বলেছিলেন ধন্যা ত্বমসি বাহ্লীকি মত্তঃ ভাগ্যতরা তথা (মহা ১।১১৬।২১) ; কারণ মুহূর্তের জন্যও স্বামীকে সে সুখী করতে পেরেছিল। কিন্তু মুনিরা বাধা দেন ; এক জনকে সন্তানদের দায়িত্ব নিতে বলেন। ফলে কুন্তী ছেলেদের নিয়ে হস্তিনাপুরে ফিরে এসে তপস্বীদের মধ্যস্থতায় ভীষ্ম ও বিদুরকে খবর দেন (মহা ১।১২০।৭৭) ; এবং ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রয়ে বাস করতে থাকেন। হস্তিনাপুরে এলেই সকলে জানতে চেয়েছিল এবং (দে-ভাগ ২।৬) কুন্তী জানান এরা দেবতাদের ঔরসে জন্মেছে ; দৈববাণী সমর্থন করে। মহাভারতে মহর্ষিরা পাণ্ডু পুত্রদের জন্মের কাহিনী বলে অন্তর্হিত হয়ে যান। কিন্তু কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে মনোমালিন্য ক্রমশই বাড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত ছেলেদের নিয়ে বারণাবতে জতুগৃহে এসে ওঠেন। জতুগৃহে (দ্রঃ) আগুন লাগলে গুপ্ত সুড়ঙ্গ পথে কুন্তী সকলের সঙ্গে বনের মধ্যে পালিয়ে যান ; বনের মধ্যে ভীম মাকে কাঁধে নেয়। একচক্রা নগরীতে এক ব্রাহ্মণের ঘরে এসে সকলে আশ্রয় নেন। এখানে ব্যাস কুন্তীকে সান্ত্বনা দিয়ে যান। একচক্রাতে কুন্তী বক রাক্ষসের অত্যাচারের কথা জানতে পারেন এবং ভীমকে নির্দেশ দেন রাক্ষসকে হত্যা করে নগরবাসীদের রক্ষা করতে। বক রাক্ষসের মৃত্যুর পর কুন্তীর পরামর্শে সকলে পাঞ্চালে যান। এখানে ভার্গব নামে এক কুমোরের বাড়িতে সকলে আশ্রয় পান। এক দিন এখানে ভিক্ষার জন্য বার হয়ে পাঁচ ভাই সন্ধ্যা বেলাতে দ্রৌপদীকে নিয়ে ফিরে আসেন এবং কুটিরের বার থেকে আনন্দে মাকে ডাক দিয়ে

কি এনেছেন দেখে যেতে বলেন। কুন্তী কিছু না দেখেই ভেতর থেকে নির্দেশ দেন যা মিলেছে তা যেন সব ভাই সমান ভাবে ভাগ করে নেন। মায়ের এই কথা রাখবার জন্য পাঁচ ভাই দ্রৌপদীকে (দ্রঃ) বিয়ে করতে বাধ্য হন। এর পর বিদুর এসে পাঞ্চাল সভাতে কুন্তীর সঙ্গে দেখা করেন এবং ধৃতরাষ্ট্রের নির্দেশ মত সকলকে ফিরিয়ে নিয়ে যান।

অর্জুন সুভদ্রাকে বিয়ে করে আনলে কুন্তী তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন। পাণ্ডবরা বনে গেলে কুন্তী বিদুরের কাছে থাকেন। যুদ্ধের আগে সন্ধির জন্য কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের দূত হয়ে আসেন; কুন্তীর সঙ্গে দেখা করেন। কুন্তী এই সময়ে কৃষ্ণকে দিয়ে ছেলেদের যুদ্ধ করবার জন্য বলে পাঠান; তীব্র আবেদন করেন; পর অন্নে তিনি আর জীবন ধারণ করতে চান না। মুচুকুন্দ ও বিদুলা কাহিনী উল্লেখ করেন; বিদুলা বলেছিল অলাতং তিন্দুকস্য ইব মুহূর্তম্ অপি বিজ্বল—মহা ৫।১৩১।১৩। যুদ্ধের ঠিক আগে মাতৃস্নেহে ব্যাকুল হয়ে কুন্তী গোপনে কর্ণের (দ্রঃ) সঙ্গে দেখা করেন। যুদ্ধের শেষে পাণ্ডবরা যখন আত্মীয়দের সৎকার করেন তখন কুন্তী যুধিষ্ঠিরকে সব কথা জানিয়ে কর্ণের জন্য তর্পণ করতে বলেন (মহা ১১।২৭।১১)। যুধিষ্ঠির কেঁদে ফেলেন এবং শাপ দেন মেয়েছেলেরা এ ভাবে কোন কথা আর লুকিয়ে রাখতে পারবে না (মহা ১২।৬।১০)। অভিমন্যু মারা গেলে সুভদ্রা ও উত্তরাকে সান্ত্বনা দেন এবং কৃষ্ণকে অভিমন্যুর তর্পণ ইত্যাদি করতে বলেন। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের পর ধৃতরাষ্ট্র রাজর্ষি শতযূপের আশ্রমে চলে যান; সঙ্গে কুন্তী গান্ধারীকে হাতে ধরে নিয়ে যান। পাণ্ডবরা কুন্তীকে বাধা দিতে চেষ্টা করেছিলেন। দ্রৌপদী, সুভদ্রা, ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীও কুন্তীকে বারণ করেছিলেন। কুন্তী যুধিষ্ঠিরকে নির্দেশ দিয়ে যান সহদেবকে যেন বিশেষ স্নেহ করা হয়; কর্ণকে যেন কোন দিন ভুলে না যায়; (মহা ১৫।২২) কর্ণের সদগতি লাভের জন্য যুধিষ্ঠিরকে উপযুক্ত ক্রিয়া করতে বলেন; এবং ভীম বা দ্রৌপদীর ওপর যুধিষ্ঠির কোন দিন যেন বিরক্ত না হন। বনে গঙ্গাদ্বারে (১৫।৪৫।১০) কুন্তী, গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্র কঠোর তপস্যা করতে থাকেন। কুন্তী মাসান্তে একবার আহার করতে থাকেন। এখানে ৬ মাস পরে এক দিন দাবানলে তিন জনেই মারা যান। ধৃতরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কুন্তী কোন দিন কোন প্রতিবাদ করেন নি এবং নিজের ছেলেদের তিনি ক্ষত্রিয়ধর্ম পালন করতে উপদেশ দিতেন। মৃত আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে দেখা হবার পর পাণ্ডবরা ফিরে আসেন এবং এর দু বৎসর পরে এরা মারা যান (মহা ১৫।৪৫।১)।

কুন্দকুন্দাচার্য—সুপ্রসিদ্ধ দিগম্বর-জৈন দার্শনিক। খৃস্ট পূ ১-শতক থেকে ৫২৮ খৃস্টাব্দের মধ্যে মনে হয়। অন্য নাম কুন্দাচার্য, এলাচার্য, পদ্মনন্দী, কুন্দকুন্দ বা কোণ্ডকুন্দ, বক্রগ্রীব, গৃধ্রপৃচ্ছ ইত্যাদি। সম্ভবত কুণ্ডপুরের অধিবাসী। একটি কাহিনীতে ভারতে দক্ষিণ দিকে পিদথনাড়ু জেলায় কুরুমরৈ গ্রামে করমুণ্ড নামে এক ধনী বণিক ও তাঁর স্ত্রী শ্রীমতীর ছেলে। আর এক মতে মালব দেশে বারাপুর নগরে কুমুদচন্দ্র রাজার রাজ্যে কুন্দশ্রেষ্ঠী নামে এক ধনী বণিক ও তাঁর স্ত্রী কুন্দলতার সন্তান। পরিণত বয়সে বহু সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গ লাভ করেন ও দার্শনিক রূপে প্রসিদ্ধ হন। প্রবাদ মোট ৮৪-টি

গ্রন্থ লেখেন ; এগুলিকে পাহুড় (=প্রাভৃত) বলা হয়। অন্য মতে এটি একটি সংকলন মাত্র। এঁর উল্লেখ যোগ্য বই পঞ্চাস্তিকায়সার, প্রবচনসার, সময়সার, নিয়মসার, ষট্প্রাভৃত।

কুবলাই খাঁ—চীনে বিখ্যাত রাজা (১২১৬-৯৪ খৃ) ; তদানীন্তন সব চেয়ে বৃহৎরাজ্য ; ভলগা থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত। তিব্বতের লামার কাছে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন ; এবং লামাকে তিব্বতের অধীশ্বর করে দেন ; এই থেকে দালাইলামা পদের উৎপত্তি। তিব্বতী লামার সাহায্যে মোঙ্গল ভাষা লেখবার লিপি উদ্ভাবিত করেন। এই লিপি ভারতীয় লিপি থেকেই তৈরি।

কুবলাশ্ব—কুবলয়াশ্ব। ইক্ষ্বাকু বংশে রাজা বৃহদশ্বের ছেলে। ককুৎস্থ(১)-বিশ্বগাশ্ব(৪)-বৃহদশ্ব/শত্রুজিৎ(৫)-কুবলাশ্ব(৬)। বনবাস কালে যুধিষ্ঠিরকে মার্কণ্ডেয় এই কাহিনী বলেন (মহা ৩।১৯২।৬)। অন্য নাম ধুন্ধুমার। মহর্ষি উত্তঙ্কের (দ্রঃ) তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে বিষ্ণু জানিয়ে যান উত্তঙ্কের যোগ বলের জন্য ধুন্ধু দৈত্যকে কুবলাশ্ব বধ করতে পারবেন। বৃহদশ্ব বনবাসী হবার সময় উত্তঙ্ক এসে দৈত্যকে মারবার অনুরোধ করলে বৃহদশ্ব জানান তিনি অস্ত্র ত্যাগ করেছেন এবং ছেলেকে ভার দিয়ে বনে চলে যান। পিতার থেকে বহুগুণে গুণবান এই কুবলাশ্ব একুশ হাজার (মহা ৩।১৯৫) ছেলে ও সৈন্যদের নিয়ে দৈত্যকে খুঁজতে থাকেন। বিষ্ণু কুবলাশ্বের দেহে ভর করেন এবং এই সময় দৈববাণী হয় এই কুবলাশ্ব ধুন্ধুমার হবেন। এক সপ্তাহ ধরে বালুকার্ণবে খুঁজতে খুঁজতে এক জায়গায় ঘুমন্ত দানবের সন্ধান মেলে। সপ্তভিঃ দিবসৈঃ খত্বা দৃষ্টঃ ধুন্ধুঃ (দ্রঃ) মহাবলঃ (মহা ৩।১৯৫।২০)। ধুন্ধু পশ্চিম দিকে ফিরে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। এরা সকলে আক্রমণ করেন। ধুন্ধু তখন ঘুম থেকে উঠে এদের অস্ত্রশস্ত্র খেয়ে ফেলে এবং মুখের আগুনে কুবলাশ্বের ছেলেদের মেরে ফেলেন। কুবলাশ্ব তখন আক্রমণ করেন ; দেহ থেকে জল বার করে আগুন নিভিয়ে দিয়ে ব্রহ্মাস্ত্রে দৈত্যকে নিহত করেন। দেবতারা বহু আশীর্বাদ করে যান এবং নাম দেন ধুন্ধুমার। দেবতারা তারপর বর দিতে চাইলে রাজা বর চান ব্রাহ্মণদের যেন বিত্ত দিতে পারেন ; শত্রুদের যেন জয় করতে পারেন। ভূতেষু অদ্রোহ, ধর্মে মতি, অক্ষয় স্বর্গ বাস এবং বিষ্ণুর সখ্যতা। তিনটি ছেলে যুদ্ধে বেঁচে গিয়েছিল। দৃঢ়াশ্ব, কপিলাশ্ব, চন্দ্রাশ্ব/ভদ্রাশ্ব (মহা ৩।১৯৫।৩৪)। কুবলাশ্বের অপর নাম ঋতধ্বজ। মদালসার (দ্রঃ) স্বামী যেন আর এক ঋতধ্বজ।

হরিবংশে নাম কুবলয়াশ্ব ; ১০০ ছেলে ধার্মিক, বিদ্বান ও ধনুর্বিদ। উজ্জানক নামে বালুসমুদ্রে ধুন্ধু ছিল। বিষ্ণু পূর্ব যুগে বর দিয়েছিলেন (হরি ১।১১।৩৯) 'তুমি একে হত্যা করবে'। উত্তঙ্কও নানা বর দেন। দৃঢ়াশ্ব বড় ছেলে।

কুবের—যক্ষ ও কিন্নরদের রাজা। গীতাতে বিত্তেশঃ যক্ষরক্ষসাম্। অন্য নাম ত্র্যম্বকসখ, বৈশ্রবণ, পৌলস্ত্য, নরবাহন, একপিঙ্গল, ধনপতি, গুহ্যকেশ্বর। অথর্ববেদে অন্ধকারের দানবদের অধীশ্বর। পুলস্ত্যের স্ত্রী মালিনী (=হবির্ভূ) ; তৃণবিন্দুর মেয়ে ; ছেলে বিশ্রবস। ভরদ্বাজ মুনি মেয়ে দেববর্ণিনীকে বিশ্রবার আশ্রমে এনে বিয়ে দিয়ে যান (রাম ৭।৩।৩)। বিশ্রবার বহু দিন সন্তান হয়নি ; ব্রহ্মার বরে দেববর্ণিনীর

ছেলে হয় বৈশ্রবণ কুবের। ভাগবতে বিশ্রবা ও ইলবিলার ছেলে। মহাভারতে (৩।৮৭।৩) নর্মদা তীরে যেন বিশ্রবার নিকেত নামে আশ্রমে জন্ম। মহাভারতে পুলস্ত্যের গবিজাতঃ পুত্র (মহা ৩।২৫৮।১২) কুবের ; বিশ্রবা পুলস্ত্যের অপর এক ছেলে, রাবণের পিতা। কু=কুৎসিৎ ; বের=শরীর, অর্থাৎ কুৎসিৎ গঠন। তিন পা, আট দাঁত, অসুরের মত শক্তি। কুবেরের স্ত্রী আহুতি, অন্য মতে ভদ্রা ; ছেলে নলকুবর ও মণিগ্রীব, একটি মেয়ে মীনাক্ষী। মহাদেবের সখা। বাস কৈলাসে অলকাপুরী, রথ পুষ্পক, উদ্যান চিত্ররথ এবং অলকপুরীর কাছে আর একটি উদ্যান সৌগন্ধিক। কুবেরের রথ মানুষে টানে ; ফলে নাম নরবাহন। কুবেরের বিগ্রহ দেখা যায় ছাগলের পিঠে বসা : হাতে মুষল। স্কন্দপুরাণে স্ত্রী ঈশ্বরী এবং ছেলে কুণ্ড। দ্র - লক্ষ্মী, জম্ভল।

রামায়ণে আছে বিশ্রবার পুত্র হতে ব্রহ্মা আনন্দিত হয়ে বৈশ্রবণ নাম দেন। ব্রহ্মার বরে জন্ম নয়। এই কুবের বহু বৎসর তপস্যা করেন এবং শেষ কালে জলাশী মারুতাহার ও নিরাহার হয়ে (৭।৩।১২) তপস্যা করেন এবং ব্রহ্মা আসেন। বৈশ্রবণ লোকপালকত্ব ও বিত্তরক্ষণ বর চান। ব্রহ্মা বলেন ইন্দ্র, বরুণ ও যমের সমান চতুর্থ একজন লোকপাল তৈরি করবেন নিজেই ভাবছিলেন (৭।৩।১৯) ইত্যাদি এবং বর দেন ও পুষ্পক বিমান দেন। এরপর কুবের পিতার কাছে এসে কোথায় বাস করবেন জানতে চাইলে বিশ্রবা দক্ষিণ উদধেঃ তীরে ত্রিকূট পর্বতে অবস্থিত লঙ্কাতে গিয়ে বাস করতে বলেন। রাক্ষসদের জন্য বিশ্বকর্মা এই পুরী নির্মাণ করেছিলেন ; বিষ্ণুর ভয়ে বর্তমানে রাক্ষসরা এখানে আর থাকে না (৭।৩।৩০)। কুবের এখানে বাস আরম্ভ করেন এবং মাঝে মাঝে পুষ্পকে চড়ে পিতাকে দেখে যেতেন। কুবের তারপর রাবণের (দ্রঃ) দূত প্রহস্তকে বলে দিয়েছিলেন রাবণরা আসুক লঙ্কাতে সকলে এক সঙ্গে সুখে বাস করবেন ; এবং নিজে তারপর বিশ্রবার (দ্রঃ) কাছে পরামর্শ চাইতে যান এবং বিশ্রবার কথায় কৈলাসে গিয়ে বাস করতে থাকেন। কুবের কৈলাসে এরপর তপস্যা করছিলেন। একদিন হরপার্বতীকে দেখতে পান এবং সব্য চক্ষুতে (৭।১৩।২৩) দৈবাৎ উমার দিকে চাইতে দেবীর প্রভাবে চোখটি পুড়ে পিঙ্গল হয়ে যায়। এরপর পাহাড়ে অন্যত্র গিয়ে ৮০০ বছর আবার তপস্যা করেছিলেন। মহাদেব সন্তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন এই ধরণের তপস্যা তিনিই প্রবর্তন করেছিলেন ইত্যাদি। কুবেরের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করেন এবং একাক্ষিপিঙ্গল নাম হবে বর দেন। এই ঘটনার পর কুবের রাবণের (দ্রঃ) কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন।

সত্যযুগে দেবতারা এক দিন বরুণের কাছে যান এবং কুবেরের জন্য এক যজ্ঞ করেন ; এবং সাগর ইত্যাদি সমস্ত জলের অধিপতি করে দেন। সাগর ইত্যাদি কুবেরকে তাঁদের সমস্ত ধনরত্ন দিলে অগাধ বিত্তের মালিক হন। কুবের পরে জলে মাথা ডুবিয়ে ১০ হাজার বছর এবং তারপর পঞ্চাগ্নির মধ্যে এক পায়ে দাঁড়িয়ে ব্রহ্মার তপস্যা করেন। অপর মতে অল্প বয়সেই হিমালয়ে গিয়ে মাথা নীচু করে হাজার বছর এবং এক পায়ে পঞ্চাগ্নির মধ্যে হাজার বছর তপস্যা করে ব্রহ্মার কাছে অমর হবার, উত্তর দিকের দিকপাল ও ধনপতি হবার বর চেয়ে নেন। পুষ্পক, শঙ্খনিধি ও পদ্মনিধিও

পান। অন্য মতে শিবের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র এবং শিবের অনুগ্রহে সমস্ত ধনরত্ন, যক্ষ কিন্নর ও গুহ্যকদের অধিপতি হন। সকলের ধর্মদাতা, সমস্ত ধনের মালিক ও প্রদাতা। একটি মতে কুবের নিজেই ময়কে দিয়ে লঙ্কাপুরী নির্মাণ করিয়েছিলেন।

রাবণ ব্রহ্মার বরে বলীয়ান হয়ে কুবেরকে তাড়িয়ে দিয়ে লঙ্কাপুরী ও পুষ্পক রথ অধিকার করেন। বিশ্রবার উপদেশে কুবের তখন কৈলাসে অলকাপুরীতে চলে যান এবং অভিশাপ দিয়ে যান পুষ্পক রাবণের ভোগে আসবে না। রাবণকে যে হত্যা করবে এটি তার রথ হবে (মহা ৩।২৫৯।৩৪)।

কুবের তারপর যক্ষ, কিন্নর ইত্যাদিকে নিয়ে গন্ধমাদনে গিয়ে আশ্রয় নেন। কুবের সভাতে কিছু অপ্সরা রয়েছে এবং বিশ্বাবসু, হাহা, হূহূ, তুম্বুরু, পর্বত এবং শৈলূষ ইত্যাদি সভাসদ রয়েছেন। মাণিচার বা মাণিভদ্র কুবেরের এক সেনাপতি; রাবণের সঙ্গে তীব্র যুদ্ধ করেছিলেন। রাবণের অত্যাচারে বিব্রত হয়ে উঠে দেবতা ও ব্রাহ্মণরা বিষ্ণুর কাছে যখন অভিযোগ করতে যাচ্ছিলেন কুবের তখন দূত মুখে রাবণকে খবর পাঠিয়ে দেন এবং ধর্মপথে থাকতে বলেন। রাবণ ক্ষেপে গিয়ে দূতকে টুকরো টুকরো করে কেটে রাক্ষসদের খাইয়ে দেন এবং লোকপালদের জয় করতে বার হয়ে প্রথমে কুবেরকে আক্রমণ করেন। প্রথমে সংযোধকণ্টক হেরে পালায়; তারপর যক্ষপুরের দ্বারপাল সূর্যভানু মারা পড়ে। তারপর মাণিচার/মাণিভদ্র যুদ্ধে আহত হন; মাথার মুকুট পাশের দিকে সরে যায়, ফলে নতুন নাম পার্শ্বমৌলি (রা ৭।১৫।৩০) এবং পালিয়ে যান। এরপর কুবের যুদ্ধে এসে আহত ও অজ্ঞান হয়ে পড়লে নিধিরা কুবেরকে তুলে নিয়ে নন্দন বনে পালিয়ে যান। রাবণ এই সুযোগে অলকা লুঠ করেন ও পুষ্পক রথ নিয়ে চলে আসেন।

মরুত্তের (দ্রঃ) যজ্ঞে রাবণ এলে কুবের অঞ্জনী সেজে পালিয়ে যান। কুবেরের এক জন যক্ষ মন্ত্রী ছিলেন বিরূপাক্ষ। ধনরত্নের ভার ছিল এ'র ওপর। বিরূপাক্ষ আবার এক জন বিরাটকায় যক্ষকে এই পাহারা দেবার কাজে নিযুক্ত করেছিলেন (কথা-সরিৎ)। পৃথু (দ্রঃ) ধেনু রূপ পৃথিবীকে দোহন করেন; কুবের বৎস সেজেছিলেন। দেবতারা পৃথুকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেন এবং অভিষেকের সময় কুবের পৃথুকে সিংহাসন দান করেন। পৃথুকে বরুণ রাজছত্র, ইন্দ্র রাজমুকুট এবং যম রাজদণ্ড দেন।

কুশবতীতে এক মন্ত্রণা সভাতে দেবতারা কুবেরকে নিমন্ত্রণ করেন, (মহা ৩।১৫৮। ৫১।)। কুবের সখা মণিমানকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিলেন, সঙ্গে মহাপদ্ম শতৈঃ ত্রিভিঃ যক্ষ ছিল। যমুনাতীরে অগস্ত্য ঘোর তপস্যা করছিলেন। মণিমান অগস্ত্যের মাথায় থুথু দেন। ফলে অভিশপ্ত হন এক জন মানুষের হাতে রাক্ষসাধিপতি (৩।১৫৮।৫৪) মণিমান নিহত হবেন এবং কুবেরকে এ জন্য শোক করতে হবে; এবং ঐ মানুষটির সাক্ষাৎ পেলে তখন শাপ মুক্ত হবেন। বনবাসের সময়ে আর্ষ্টিসেনের আশ্রম থেকে ভীম সেন গন্ধমাদন পাহাড়ে পঞ্চবর্ণ পুষ্প সংগ্রহ করতে এলে মণিমান ভীমের হাতে মারা যান। মণিমান মারা গেছেন শুনে এবং ভীম দ্বিতীয়বার আবার অপরাধ করেছে শুনে কুবের সসৈন্যে দেখা করতে আসেন এবং ভীমের দর্শন পেয়ে কুবের শাপ মুক্ত হন। এই সময় কুবের যুধিষ্ঠিরকে অগস্ত্য শাপের কাহিনী বলেছিলেন (মহা ৩।১৫৮।-)।

স্থূণাকর্ণকে (দ্রঃ) কুবের অভিশাপ দিয়েছিলেন (মহা ৫।১৯৩।৪১)। মুচুকুন্দের সঙ্গে কুবেরের একবার যুদ্ধ হয়েছিল। শুক্রাচার্য একবার কিছু ধনরত্ন নিয়ে পালাতে চেষ্টা করেন। শিবের কাছে কুবের গিয়ে অভিযোগ করলে শিব শুক্রকে হত্যা করতে যান কিন্তু পার্বতী শেষ অবধি ঘটনাটা মেটান ; শুক্রাচার্য কিছু ধনরত্ন নিয়ে যেতে যেন সক্ষম হন (মহা ১২।২৭৮ -)। দ্রঃ- অষ্টাবক্র।

বিশ্রবাকে ত্যাগ করে চলে আসার জন্য বিশ্রবা (দ্রঃ) ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলে কুবের তিন জন রাক্ষসী নারীকে (কৈকসী দ্রঃ) বিশ্রবার সেবার জন্য পাঠিয়ে দেন।

খৃ পূ যুগে যক্ষপতি হিসাবে কুবের পূজিত হতেন। অথর্ববেদে (৮,১০।২৮) কুবের-এর উল্লেখ আছে। শিবের সঙ্গে এঁর বিশেষ সংস্রব ছিল। বেস নগরে প্রাপ্ত প্রায় খৃ পূ ২-শতকের প্রস্তর নির্মিত কল্পবৃক্ষ থেকে ঝোলান নিধিগুলিকে কুবেরের নিধি বলা হয়। ঐ সময়ের তৈরি ভারহুত স্তুপের বেদীতে ভারবহনে ক্লান্ত স্ফীতোদর যক্ষের ওপর দাঁড়ান যুক্তকর পুরুষকেও কুবের বলেই মনে হয়। মথুরা যাদুঘরে কিছুটা লম্বোদর দ্বিভুজ কুবের মূর্তি রয়েছে। গদি যুক্ত পীঠে বসা, নীচে শঙ্খ ও পদ্ম নামে নিধি ভর্তি দুটি কলস রয়েছে। মহাভাষ্যে ধনপতির মন্দিরের উল্লেখ আছে। মনুসংহিতায় (৭.৪) বলা হয়েছে ইন্দ্র, বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, কুবের, সূর্য, ও চাঁদের কলা নিয়ে রাজার সৃষ্টি। কালিদাসের রচনায় কুবের ও তাঁর অস্ত্র গদার উল্লেখ দেখা যায়। পরবর্তী যুগে পেটমোটা, হাতে ধনকোষ ও আসনের নীচে ধনপূর্ণ ঘট এবং কখনো কখনো নরবাহন রূপে তাঁকে উৎকীর্ণ করা হয়েছে।

বায়ু পুরাণে তিন পা, মস্ত মাথা, বিশাল দেহ, আট দাঁত, তামাটে দাড়ি, ছুঁচল কাণ, একটি হাত ছোট, একটি হাত বিশাল। পিঙ্গল বর্ণ। ভয়ঙ্কর দেখতে। মহানির্বাণতন্ত্রে সুবর্ণবর্ণ, সিংহাসনে বসা, দু হাত, হাতে পাশ ও অঙ্কুশ। আর একটি বর্ণনায় পীতাম্বর, অলঙ্কৃত, গদাধর, বরদ, এবং নরযুক্ত বিমানস্থ। বৌদ্ধতন্ত্রে কুবেরের স্ত্রী বসুধারা ; শস্য ও রত্নের দেবী। এক মাথা, হাত কিন্তু ২-৬, ডান হাতে বরদ মুদ্রা ; বাম হাতে ধানের শীষ।

কুবের দিকপালও বটে। সাধারণত ২, কদাচিৎ ৪-হাত। হাতে গদা। সঙ্গে শঙ্খ ও পদ্ম নামে দুটি নিধি (অনেক সময় এগুলিও বিগ্রহধারী)। কুবের অনেক সময় ভয়ঙ্কর দেখতে। বাহন নর (পৌরাণিক একটি জীব) বা মেষ। লম্বোদর ও দীর্ঘ হস্ত। বর্তমানের সর্বহারাদের দ্বারা চিত্রিত মহাজন মূর্তি। বিষ্ণু ধর্মোত্তরে কুবেরের উদীচ্য বেশ এবং কবচী। চার হাত থাকলে ডান হাতে গদা ও বর্শা, বাম হাতে রত্ন ও পাত্র। দাঁত বড় বড়, গোঁফ আছে ; এবং স্ত্রী ঋদ্ধি কুবেরের বাম কোলে অবস্থিত। গান্ধার শিল্পে বহু কুবের পাওয়া যায়। বহু বৈষ্ণব ও শৈব মন্দিরের বাইরের গায়ে দিকপাল হিসাবে কুবের উৎকীর্ণ আছেন। হাতে থলিতে রত্ন রয়েছে বা একটি নকুলের গলা টিপে ধরেছেন, নকুলের মুখ থেকে রত্ন বর্ষিত হচ্ছে। সিংহাসনে অর্দ্ধপর্যঙ্ক আসনে বসা ; ঝুলতে থাকা পা-টি দুটি কলস (শঙ্ক ও পদ্ম নামক নিধি ভর্তি) স্পর্শ করে রয়েছে বা

অনেক সময় আটটি কলস (আটটি নিধি পদ্ম, মহাপদ্ম, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, নীল, নন্দ ও শঙ্খ—মার্কণ্ডেয় পুরাণ) স্পর্শ করে রয়েছে।

লক্ষ্মীর সঙ্গে কুবের-এরও পূজা হয়। দিকপাল হিসাবেও পূজিত। বাংলা দেশে অন্নপূর্ণা পূজাতে কুবেরকেও পূজা করা হয়। বৌদ্ধ যক্ষী হারিতীর (দ্রঃ) স্বামী পাঞ্চিক ও বজ্রযানীয় জম্ভল-এর বর্ণনা প্রায় কুবেরের মতই। কুবেরের বাঁ হাতে এই বর্ণনায় রত্নপ্রবর্ষমান নকুলী। জম্ভল মণ্ডলে জম্ভলের দুই সঙ্গীর নাম ধনদ ও বৈশ্রবণ। ঊনবিংশ তীর্থঙ্কর মল্লিনাথের উপাসক শাসন যক্ষের নাম ও কুবের। শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর উভয় সম্প্রদায় মতেই ইনি চতুর্মুখ, ইন্দ্রধনুবর্ণ, গজবাহন ও আটহাত। জৈনরাও কুবেরকে দিকপতি হিসাবে পূজা করেন। দ্রঃ- মুদ্রা, অবতার, দিকপাল, হারীতী।

কুবেরতীর্থ—নল ও কূবর, কুবেরের দুটি ছেলে এখানে তপস্যা করে মহাদেবের সখ্যতা ধনাধ্যক্ষতা ও পুষ্পক ইত্যাদি লাভ করেন।

কুজ্জগৃহ—কজুগৃহ, কজুঘির, কাজুঘির, কাজিঙ্ঘর, কজিনঘর, কাজেরি। ভাগলপুর জেলাতে চম্পা থেকে ৯২ মাইল। চম্পা বা ভাগলপুরের ৬৭ মাইল পূর্বে কাঁকজোল। মুঙ্গের জেলার কাজরা (পূ-রেল পথ)। এখান থেকে তিন মাইল দক্ষিণে বহু বৌদ্ধ প্রত্নবস্তু ও অনেকগুলি উষ্ণ প্রস্রবণ রয়েছে।

কুব্জা—নর্মদার একটি করদা শাখা।

কুব্জা—(১) অতি কুৎসিত, বাল্য বিধবা। বহু বছর ধরে পুণ্যকর্ম করেছিলেন। সুন্দ উপসুন্দ যখন অত্যাচার করে বেড়াচ্ছিলেন তখন ইনি তিলোত্তমা (দ্রঃ) সেজে এঁদের মুগ্ধ করেন এবং এঁরা নিজেদের মধ্যে হাতাহাতি করে মারা যান। ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হয়ে কুব্জাকে সূর্যলোকে স্থান করে দেন (পদ্ম-পু, উত্তর কাণ্ড -১২৬)। (২) কংসের (দ্রঃ- কৃষ্ণ) অনুলেপ ব্যহিনী। দ্রঃ- পিঙ্গলা, কৃষ্ণ।

কুব্জাম্র—কুব্জাম্রক। রৈভ্যাশ্রম ; হরিদ্বার থেকে একটু উত্তরে। দ্রঃ- কুব্জাম্রক।

কুব্জাম্রক—কুব্জাম্র। হৃষিকেশ। মতান্তরে হৃষিকেশ থেকে উত্তরে। বরাহ পুরাণে দুটি আলাদা তীর্থ। কূর্মপুরাণে কুব্জাম্র=কুব্জাশ্রম কনখল। এখানে রৈভ্য আশ্রম ছিল।

কুভা—ঋক্ বেদের (৫।৫৩।৯ ; ১০।৭৫।৬) প্রাচীন নদী ; গ্রীক নাম কোফেন ; বা কোফেস ; বর্তমানে কাবুল নদী। কাবুল সহরের ৬৪ কি-মি পশ্চিমে উনাই গিরিসঙ্কটের কাছে উৎপত্তি। কোহিবাবা পর্বতের পাদদেশে শির-ই-চুষ্মা প্রস্রবণ থেকে উৎপন্ন কাবুল থেকে ৩৭ মাইল পূর্বে। প্রাচীন গৌরী ও প্রাচীন সুবাস্তু নদী মিলিত হয়ে পুষ্কলাবতী বা বর্তমান চারসাদ্দার কাছে কুভায় মিশেছে। গৌরী নদীর গ্রীক নাম গুরাইঅস ও বর্ত্তমান নাম পঞ্জকোরা। সুবাস্তু নদীর গ্রীক নাম সোয়াস্তুস ও বর্তমানে স্বোয়াৎ। কুভা নদী কাবুল পার হয়ে এটকের কিছু উত্তরে সিন্ধু নদীতে এসে মিলেছে। সমগ্র কুভা নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ৫০৬ কি-মি।

(২) কাবুল নদী বিধৌত দেশ। বৈদিক কুভা>কাবুল ; কোয় (টলেমি)। একটি মতে টলেমির কোয় এই কোফেন বা কাবুল নদী নয়। টলেমি বলেছেন ভারতের সব চেয়ে পশ্চিমী নদী কোয়। কোফেন (এরিয়ান)। কাবুল নদীর উপত্যকার সাধারণ

-নাম নিনৃগ্রহর বা, নুনৃগ্রিহর=নয়টি নদী:- সুর্খ্দ, গণ্ডমক, কুরুস, চিপরিয়ল, হিসবুক, কোটে, মোমুণ্ডরঃ কোষকোটে ও কাবুল। কুভা (বেদে)>কুহু(পুরাণে)। দ্রঃ- কুহু।

কুমার—(১) ব্রহ্মার চার মানসপুত্র:-সনৎকুমার সনন্দ, সনক ও সনাতন। এ'রা প্রজা সৃষ্টি করতে চান নি ; চিরজীবন অকৃতদার ছিলেন। পরে আর একটি ছেলে বিভুও কুমার বলে পরিচিত হন। (২) কার্তিকেয় এ'র পিঠ থেকে শাখ, বিশাখ ও নৈগমেয় জন্মান। (মহা ১।৬০।২৩)। (৩) গরুড়ের এক ছেলে।

কুমার কস্সপ—রাজগৃহের এক বণিক কন্যা গর্ভিণী অবস্থায় সংঘে যোগ দিয়ে এই সন্তানের জন্ম দেন। রাজার কাছে পালিত হয়ে সাত বছর বয়সে কস্সপ সঙ্ঘে যোগ দেন। কুড়ি বছর বয়সে উপসম্পদা হয় এবং অচিরে অর্হত্ব পান ও অপূর্ব যুক্তি শক্তি লাভ করেন। পায়াসীসুত্তটি তাঁর মনোহর কথকতার নিদর্শন।

কুমারজীব—চীনা ভাষায় ভারতীয় গ্রন্থের প্রসিদ্ধ অনুবাদক। এ'র পিতা ভারত থেকে মধ্য এসিয়ায় কুচা-তে যান এবং কুমারজীব এখানেই জন্মান। যৌবনে কুমারজীব কাশ্মীরে এসে ভারতীয় শাস্ত্রসমূহ পাঠ করেন। কথিত আছে প্রথমে সর্বাস্তিবাদী পরে মহাযানী হন। খৃঃ পূ ৪-শতকে চীনা সম্রাট কুচা নগরী দখল করেন এবং বন্দী কুমারজীবকে অন্য বন্দীদের সঙ্গে চীনে পাঠান। চীনে অল্প দিনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অনুবাদক হিসাবে গণ্য হন এবং চীনের শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তার পদ পান। তাঁর জন্য বিশেষ ভাবে তৈরি একটি বক্তৃতা গৃহে তিনি পড়াতেন এবং প্রায় তিন হাজার ছাত্র ছিল। বিনয়, ব্রহ্মজালসূত্র, বজ্রচ্ছেদিকা, প্রজ্ঞাপারমিতা, গণ্ডব্যূহ ইত্যাদি ৫০ খানি বই চীনা ভাষায় অনূদিত করেন।

কুমারদাস—কুমারভট্ট=ভট্টকুমার। প্রবাদ ইনিই সিংহলরাজ কুমার ধাতুসেন (৫১৭-৫২৬ খৃ)। এ'র গ্রন্থ জানকীহরণ। মূল বই মেলে নি। প্রথম ১৪ সর্গের সম্পূর্ণ ও ১৫ সর্গের আংশিক টীকা থেকে মূল বই তৈরি করা হয়েছে। ২৫ সর্গের পুষ্পিকা ও অন্তিম স্তবকটি অবশ্য পাওয়া গেছে। মনে হয় রামের অভিষেক পর্যন্ত কাহিনী এই বইয়ের বিষয় বস্তু।

কুমারবন—ভাগবতে কৈলাসে একটি বন। এখানে হরপার্বতী সম্ভোগ করছিলেন এমন সময় শৌনক ইত্যাদি কয়েক জন ঋষি প্রণাম করতে আসেন। মহাদেব/পার্বতী বিরক্ত হয়ে শাপ দেন ভবিষ্যতে এখানে যে আসবে সে নারীতে পরিণত হবে। দেবী ভাগবতে (১।১২।১৬)—সনকাদি ঋষি; বিবস্ত্রা লজ্জিতা পার্বতী সরে যান। বিব্রত ঋষিরা নর-নারায়ণ আশ্রমে চলে যান। স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করবার জন্য মহাদেব শাপ দেন। দ্রঃ- সুদ্যুম্ন/ইলা।

কুমারসম্ভব—(১) কালিদাস রচিত ঊনিশ (?) সর্গে মহাকাব্য। রাজা দিলীপ থেকে অগ্নিবর্ণ পর্যন্ত ২৭ জন সূর্য বংশীয় রাজার কাহিনী। (২) উদ্ভট রচিত একটি কাব্য গ্রন্থ ; কবিত্বের সুন্দর পরিচয় বহন করে ; অবশ্য কুমারসম্ভবের ছায়া অনেক শ্লোকের ওপুর এসে পড়েছে।

কুমারস্বামী—(১) সুব্রহ্মণ্য (দ্রঃ), কার্তিকস্বামী, স্বামীতীর্থ, ভর্তৃস্থান। তিরুত্তানি স্টেসন থেকে ১ মাইল দূরে, কুমারধারা নদীর তীরে। এখানে ক্রৌঞ্চপর্বতে কুমার/ কার্তিক স্বামীর মন্দির রয়েছে। শঙ্করাচার্য এখানে এসেছিলেন। (২) তুলুভাতে বিখ্যাত তীর্থ ; হসপেট স্টেসন থেকে ২৬ মাইল ; কুমারধারা নদীর তীরে। পশ্চিমঘাট পর্বত মালার সুব্রহ্মণ্যশাখা=পুষ্পগিরির নীচে বিশলি ঘাটে উৎপন্ন এই কুমারধারা।

কুমারিলভট্ট—প্রসিদ্ধ মীমাংসা দার্শনিক (খৃ ৭-শতকে)। জন্মস্থান অজ্ঞাত। এঁর শিষ্য ও ভগিনীপতি মণ্ডন মিশ্র। দ্রঃ- উভয় ভারতী। কুমারিলের দুই শিষ্য প্রভাকর মিশ্র ও ভট্টোম্বেক। দুটি সুপ্রসিদ্ধ সম্প্রদায় প্রচলিত। ভাট্টমত অর্থাৎ ভাট্টপাদ কুমারিলেরই সিদ্ধান্ত কিন্তু সমধিক সম্মানিত। কুমারিলের প্রথম ও প্রধান প্রতিপাদ্য বেদ স্বতঃপ্রমাণ ও অপৌরুষেয় তবে ঈশ্বর প্রণীত নয়। ধর্ম ও অপবর্গ একমাত্র বেদ বা বেদমূলক শাস্ত্র থেকে জানা সম্ভব, যোগবলে জানা যায় না। মুক্তির কারণ আত্মজ্ঞান ও একমাত্র বেদের জ্ঞান থেকে জ্ঞাতব্য। যোগী মুনিদের উক্তি বেদ বিরোধী হলে গ্রহণীয় নয়। জৈমিনির মীমাংসা দর্শনের ওপর শবরস্বামী যে ভাষ্য লিখেছিলেন তার সমালোচনা মূলক ব্যাখ্যার নাম বার্তিক। এই বার্তিক ভট্টপাদ কুমারিলের রচনা। মীমাংসা শাস্ত্রে ঈশ্বর স্বীকৃত হয় নি ; তবু বার্তিকের প্রথম অংশ শ্লোকবার্তিকের প্রথম শ্লোকে ভট্টপাদ কুমারিল মহাদেবকে নমস্কার করেছেন।

কথিত আছে মীমাংসাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিরুদ্ধ মতবাদ আয়ত্ত করতে গিয়ে কোন এক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধদার্শনিকের কাছে দর্শন অধ্যয়ন করেন। পরে তাঁর সঙ্গে বেদ প্রামাণ্য বিষয়ক বিচারে প্রবৃত্ত হন—বিচারে পণ ছিল হারলে স্বধর্ম ত্যাগ বা প্রাণ ত্যাগ করতে হবে। বৌদ্ধ পণ্ডিতটি হেরে গিয়ে স্বধর্ম ত্যাগ না করে ভৃগু পতনে প্রাণ-ত্যাগ করেন। বেদপ্রামাণ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেখে কুমারিল তখন গুরু হত্যার প্রায়শ্চিত্তের জন্য তুষানলে প্রবেশ করেন। এই সময়ে শঙ্করাচার্য বিচারের জন্য আসেন এবং কুমারিল তাঁকে মণ্ডনমিশ্রের সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হতে বলেন ; কারণ মণ্ডন মিশ্রের সঙ্গে বিচার কুমারিলের সঙ্গে বিচারেরই সমান হবে।

কুমারী—(১) কেপ কমোরিন। কুমারিকা, কন্যাতীর্থ। এখানে কুমারী দেবীর বিখ্যাত মন্দির রয়েছে। (২) বিহারে শুক্তিমৎ পাহাড়ে উৎপন্ন কায়োরহরি নদী। (৩) টার্ভেনিয়ারের কুয়ারী নদী ; যমুনার শাখা ; সিন্ধুতে এসে মিশেছে। ধোলপুর থেকে ১২ মাইল দূরে এই সঙ্গম। (৪) টার্ভেনিয়ারের কুমারী=সুকুমারী ; গোয়ালিয়রে সিন্ধু যমুনা সঙ্গমের কাছে সিন্ধুতে যুক্ত হয়েছে। (৫) রহু বা ভলগা নদী যেন ; শাকদ্বীপে।

কুমারী পর্বত—খণ্ডগিরি।

কুমারী পূজা—তন্ত্রশাস্ত্রে বিহিত ষোল বছরের কম বয়সের অবিবাহিত অনার্তবা কন্যার পূজা। দুর্গা পূজায় বা পীঠস্থানে দেবী বুদ্ধিতে যে কোন জাতির কুমারী কন্যা পূজনীয়া। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে দেবীকে কন্যা কুমারী বলা হয়েছে ; সেখানে মন্ত্র

কাত্যায়নৈ্য বিদ্মহে কন্যাকুমারীং ধীমহি তন্নঃ দুর্গে প্রচোদয়াৎ। কুমারী পূজা ব্যতীত দেবতার পূজা বা হোম সফল হয় না। এই পূজায় কোটিগুণ ফল লাভ হয়, বিপদ দূরীভূত হয়। কুমারী ভোজনে ত্রিলোক ভোজন ফল। তন্ত্রসার ও প্রাণতোষিণীতে বিশেষ বিবরণ আছে। বর্তমানে এই পূজা প্রচলিত না থাকলেও পুণ্য কাজ হিসাবে কুমারীকে দান-ভোজনে সম্বর্দ্ধিত করার প্রথা ক্বচিৎ-কদাচিৎ দেখা যায়। তন্ত্র-সারে ১ বৎসর বয়স কন্যাকে সন্ধ্যা, ২-বৎ সরস্বতী, ৩-বৎ ত্রিধামূর্তি, ৪-বৎ কালিকা, ৫-বৎ সুভগা, ৬-বৎ উমা, ৭-বৎ মালিনী, ৮-বৎ কুব্জিকা, ৯-বৎ কাল-সন্দর্ভা, ১০-অপরাজিতা, ১১-রুদ্রাণী, ১২-ভৈরবী, ১৩-মহালক্ষ্মী, ১৪-পীঠনায়িকা, ১৫-ক্ষেত্রজ্ঞা, ১৬ অম্বিকা বলা হয়। দ্রঃ- কন্যাকুমারী। অন্নদাতন্ত্রেও মোটামুটি এই নাম।

কুমুদ—(১) বিশিষ্ট একটি সাপ। (২) সুগ্রীবের এক অনুচর। (৩) সুপ্রতীক বংশে একটি বিশেষ হাতী। (৪) গরুড়ের এক ছেলে। (৫) একটি পাহাড়।

কুমুদাদি—ব্যাসের শিষ্য জৈমিনি। পুত্র সুমন্তু নিজের শিষ্য কবন্ধকে অথর্ব বেদ পড়ান। কবন্ধ অথর্ববেদকে দু ভাগ করে দেবাদর্শ ও পথ্যকে ভাগ করে দেন। দেবাদর্শের শিষ্য মেধা, ব্রহ্মবলি, শৌৎকায়নি, ও পিপ্পলাদ। পথ্যের শিষ্য জাবালি, কুমুদাদি, শৌনক (বিষ্ণু-পু ৩।৬)।

কুমুদ্বতী—রামচন্দ্রের পুত্রবধূ। সরযূতে জলক্রীড়া করতে গিয়ে কুশের হাত থেকে অলঙ্কার জলে হারিয়ে যায়। কুশ তখন ক্রোধে সরযূকে বাণবিদ্ধ করতে যান। কিন্তু নাগ কুমুদ এই অলঙ্কার তখন ফিরিয়ে দিয়ে যান এবং কুমুদ্বতীকে স্ত্রী হিসাবে দিয়ে যান (আনন্দ রামায়ণ)।

কুম্ভ—(৩) প্রহ্লাদের তিন ছেলেঃ—বিরোচন, কুম্ভ ও নিকুম্ভ। (২) কুম্ভকর্ণ এবং বজ্রমালার দুই ছেলে কুম্ভ ও নিকুম্ভ। দু জনেই দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। কুম্ভ সুগ্রীবের হাতে মারা যান।

কুম্ভকর্ণ—বিশ্রবা মুনির ঔরসে নিকষার/কৈকসীর গর্ভে জন্ম। রাবণের পরবর্তী ভাই। মহাভারতে মায়ের নাম পুষ্পোৎকটা। দ্রঃ- জয়। বিজয়=হিরণ্যকশিপু=কুম্ভকর্ণ=দন্তবক্র। রামায়ণে আছে শৈশবে ভাইদের সঙ্গে পিতার আশ্রমে পালিত হন। কুবের তখন সমৃদ্ধ রাজা, পুষ্পক বিমানের অধিকারী। হিংসায় কুম্ভকর্ণেরা তিন ভাই গোকর্ণ আশ্রমে ব্রহ্মার তপস্যা করেন; (দ্রঃ- রাবণ)। গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নি মধ্যে তপস্যা ইত্যাদি (রা ৭।১০।৩) করছিলেন। নন্দনে সাতজন অপ্সরা, ইন্দ্রের দশজন অনুচর, বহুঋষি ও মানুষ খেয়েছিলেন (রা ৭।১১।৩৮) ইত্যাদি নানা কারণে ব্রহ্মা বর দিতে এলে দেবতারা ব্রহ্মাকে সাবধান করে দেন; মোহং দীয়তাম্ (৭।১০।৪০) বলেন। সরস্বতী ব্রহ্মাকে জানতে চান কি করবেন; ব্রহ্মা দেবতাদের কথামত কুম্ভকর্ণকে বাণী দিতে বলেন। ফলে কুম্ভকর্ণ বর্ষম্ স্বপ্তুম্ অনেকানি বর চান (রা ৭।১১।৪৫)। ব্রহ্মা চলে গেলে কুম্ভকর্ণের খেয়াল হয়, বুঝতে পারেন দেবতারা এই করিয়েছেন। এর ঘুমের জন্য ২ যোজন×১ যোজন বিচিত্র আবাস তৈরি করে দেন রাবণ (রা ৭।১৩।৪)। রাবণ (দ্রঃ) কুম্ভকর্ণের বিয়ে দেন বৈরোচনস্য দৌহিত্রী

(রা ৭।১২।১৩) বজ্রজ্বালার/বজ্রমালার (দৈত্যরাজ বলির মেয়ে) সঙ্গে। কুম্ভ ও নিকুম্ভ দুই ছেলে হয়। সেতুবন্ধনের আগে রাবণের দ্বিতীয় মন্ত্রণা সভাতে বিভীষণ ও কুম্ভকর্ণ দু জনেই ছিলেন। সীতা হরণ কুম্ভকর্ণ সমর্থন করেন নি ; বিরুদ্ধ সমালোচনা ও কামাসক্ত রাক্ষসরাজের নিন্দা করেন। অবশ্য শেষ অবধি (রা ৬ ১২।৩৪) আশ্বাস দিয়েছিল রাবণকে জিতিয়ে দেবেন।

রামায়ণের কাহিনী অনুসারে ৬ থেকে ৯ মাস মত ঘুমাতেন (রা ৬।৬০।১৭), নয় দিন আগে রাবণের সঙ্গে মন্ত্রণা করে ঘুমতে গিয়েছিলেন। যুদ্ধে সম্পূর্ণ হীন-বল হয়ে পড়া নিরুপায় রাবণের নির্দেশে ঘুম ভাঙাবার জন্য রাক্ষসরা চিৎকার ও যুগপৎ বাজনা বাজিয়ে তুমুল শব্দ করতে থাকে। তারপর চুলটানা, কাণ কামড়ে দেওয়া, কাণে জল ঢেলে দেওয়া, নানা অস্ত্র দিয়ে খোঁচা মারা এবং গদা ইত্যাদির দ্বারা পেটাতে থাকা। শেষ পর্যন্ত দেহের ওপর দিয়ে হাজার হাতী (রা ৬।৬০।৫৫) চালিয়ে দেয়; কুম্ভকর্ণ হাই তুলে উঠে বসেন। মৃগ, মহিষ, বরাহ ইত্যাদি পশু এনে রেখেছিল ; মাংস, কলশ কলশ রক্ত ও মদ্য ইত্যাদি খেয়ে তৃপ্ত হলে রাক্ষসরা সামনে আসে। যূপাক্ষ সব কিছু জানায় এবং কুম্ভকর্ণ আশ্বাস দেন সব বানরদের নিহত করবেন এবং রাম-লক্ষ্মণের শোণিতম্ পাস্যামি (৬।৬০।৮০)। কুম্ভকর্ণ তখনি যুদ্ধে যেতে চান ; রাবণ এদিকে ডেকে পাঠান।

রাম ও বানররা লঙ্কাপুরীর মধ্যে কুম্ভকর্ণের বিরাট চেহারা দেখতে পান ; এবং বিভীষণ জানান এ কুম্ভকর্ণ ; জন্মেই হাজারটি সত্ত্বানি খেয়ে ফেলেছিলেন; সকলে তখন ইন্দ্রের শরণ নিলে ইন্দ্র একে বজ্রাঘাত করেন। কুম্ভকর্ণ একটু নড়েচড়ে ওঠেন, রাগে চিৎকার করে ওঠেন (৬।৬১।১৫) এবং ঐরাবতের দাঁত উপড়ে নিয়ে ইন্দ্রের বুকে আঘাত করেন। ইন্দ্র তখন ব্রহ্মাকে সব জানান, আশ্রম ধ্বংস করা, পরস্ত্রী হরণ (৬।৬১।২০) ইত্যাদির কথাও বলেছিলেন। ব্রহ্মা তখন কুম্ভকর্ণকে ডেকে পাঠান এবং দেখে নিজেই ভীত হযে পড়েন এবং তৎক্ষণাৎ শাপ দেন অদ্য প্রভৃতি মৃতকল্পঃ শয়িষ্যসে (৬।৬১।২৪)। রাবণ তখন গিয়ে অনেক অনুনয় বিনয় করলে ব্রহ্মা বলে ৬ মাস অন্তর একদিন জ গবে (৬।৬৩।২৮) এবং সে দিন পাবকের মত লোকান্ ভক্ষয়েৎ।

রামায়ণে রয়েছে কুম্ভকর্ণ সভায় এলে রাবণ যুদ্ধে যেতে বলেন এবং জানান রাজকোষ সর্বক্ষপিত কোষ (৬।৬২।১৯) হযে এসেছে। দুঃ- অর্থ ব্যবস্থা। কুম্ভকর্ণ আবার সমস্ত অনর্থের জন্য রাবণকে দায়ী করেন, এবং বিভীষণের উপদেশ মত কাজ করতে বলেন (৬।৬৩।২১)। রাবণ রেগে ওঠেন ফলে কুম্ভকর্ণ কথা ঘুরিয়ে নেন। একাই যুদ্ধে যাচ্ছিলেন ; রাবণ সৈন্যদের সঙ্গে নিতে বলেন। প্রথমে বানরদের সঙ্গে যুদ্ধ হয় ; বহু বানর মারা যায় ; হনুমানও যেন ভয়ে পালায় (৬।৬৬।১৬) ; আবার বানররা আক্রমণ করে এবং হনুমান (৬।৬৭।২১) পরাজিত হয়। তারপর সমস্ত বানর সেনাপতিদের পরাজিত করে অচৈতন্য সুগ্রীবকে তুলে লঙ্কাতে প্রবেশ করতে যান ; ইতিমধ্যে জ্ঞান ফিরে আসে; কুম্ভকর্ণকে হৃতকর্ণনাস (৬।৬৭।৮৮) করে সুগ্রীব লাফ

দিয়ে ফিরে আসে। লক্ষ্মণ এবার কুম্ভকর্ণকে আক্রমণ করলে লক্ষ্মণের বীরত্বের প্রশংসা করে লক্ষ্মণকে বাদ দিয়ে রামের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসেন এবং রামচন্দ্র ঐন্দ্র ও অর্দ্ধচন্দ্র অস্ত্রে হাত পা কেটে দিয়ে আবার ঐন্দ্র অস্ত্রে মাথা কেটে ফেলেন।

যুদ্ধের শেষ দিকে বিভীষণ যুদ্ধ করতে এসেছিলেন। কুম্ভকর্ণ বলেছিলেন 'ক্ষত্র বীর্যে স্থিরঃ ভব (৬।৬৭।১৪১) এবং আত্মকার্যং কৃতং বৎস (৬।৬৭।১৪৮) এবং এক মাত্র তুমিই রাক্ষসকুলে উত্তরপুরুষ হয়ে বেঁচে থাকবে; তোমাকে রক্ষা করা আমার উচিত।' বিভীষণ চোখের জলে পথ ছেড়ে দেন। কুম্ভকর্ণের স্নেহ অপূর্ব; এবং বিভীষণ চরিত্রও এখানে স্পষ্ট।

একটি কাহিনীতে কুম্ভকর্ণ ব্রহ্মার কাছে বর চেয়েছিলেন 'নির্দেবত্বম্' (দেবতা হীনতা) কিন্তু সরস্বতীর জন্য উচ্চারণ বিকৃত হয়ে উচ্চারিত হয় নিদ্রাবত্বম্। একটি মতে ব্রহ্মা বলে গিয়েছিলেন অকালে ঘুম ভাঙালে মৃত্যু হবে। মহাভারতে (৩।২৫৯।২৮) মহতী নিদ্রা বর চেয়েছিলেন। একটি মতে বর চেয়ে নেবার পর খেয়াল হলে অনুনয় করে বা রাবণ অনুনয় করে ছয় মাস অন্তর একদিন জাগবার বর আদায় করে নিয়েছিলেন।

কুম্ভকার—মধ্য এসিয়া ও উত্তর আফ্রিকাতে আনুমানিক সাত হাজার বছর আগে মৃৎপাত্রের প্রথম ব্যবহার। হরপ্পা সভ্যতার সময়ের (খৃ- পূ ২৭৫০) চাকে গড়া চিত্রযুক্ত অতি সুন্দর মাটির বাসনের বহু ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে। ছান্দোগ্য পরিশিষ্টে আছে হস্তগঠিত স্থালী ইত্যাদি দৈবিক এবং কুলালচক্র ঘটিত মৃৎপাত্র আসুরিক। সম্ভবত বৈদিক আর্যরা মৃৎশিল্প ভারতে আনেন নি; আগেই এখানে প্রচলিত ছিল।

কুম্ভকোণাম্—কুম্ভঘোন, কুম্ভকোণ, কুম্ভকর্ণ, কামকোষণী, কামকোষ্ঠী। মাদ্রাজে তাঞ্জোর জেলাতে। প্রাচীন চোল রাজধানী। এখানে শিবমন্দির বিখ্যাত। কুম্ভকর্ণ কপাল নামে একটি পবিত্র কুণ্ড রয়েছে; ১২ বৎসর অন্তর পুণ্যার্থীরা এখানে স্নান করতে আসেন।

কুম্ভনাদ—(১) বাণাসুরের মন্ত্রী। ঊষার সখী চিত্রলেখার পিতা। দ্রঃ- কুম্ভাণ্ড। (২) বাস্তব দেবতা (দ্রঃ) রূপে স্বীকৃত। এরা রুদ্রের সহচর; পিশাচ ইত্যাদি মত। মথুরা শিল্পে এদের পাওয়া যায়। এদের চেহারাতে কুম্ভ-মুষ্ক।

কুম্ভমেলা—বারো বৎসর অন্তর অনুষ্ঠিত সাধুসন্ন্যাসীর সমাগম। অন্য নাম কুম্ভযোগ বা পুষ্করযোগ। সূর্য্য ও বৃহস্পতি যথাক্রমে মেষ ও কুম্ভরাশিতে গেলে হরিদ্বারে এই মেলা হয়। সূর্য ও বৃহস্পতি মকর ও বৃষ রাশিতে গেলে প্রয়াগে; কর্কট ও সিংহ রাশিতে গেলে নাসিকে; তুলা ও বৃশ্চিক রাশিতে গেলে উজ্জয়িনীতে এই মেলা হয়। উল্লিখিত এই চার জায়গাতেই কেবল এই মেলা হয়। সমুদ্র মন্থনে দেবতারা অমৃতকুম্ভ নিয়ে দৈত্যদের মাঝখান থেকে পালাবার সময় এই চার জায়গায় কুম্ভ রক্ষিত হয়েছিল বা এই চার জায়গায় অমৃত বিন্দু উছলে পড়েছিল।

কুম্ভযোনি/কুম্ভী—অগস্ত্যের (দ্রঃ) এক নাম। মিত্রাবরুণ (দ্রঃ)। (২) এক জন অপ্সরা।

কুম্ভরেতস্—ভরদ্বাজের ঔরসে স্ত্রী বীরার গর্ভে জন্ম একটি সন্তান ; ইনি অগ্নি, অপর নাম রথপ্রভু, রথধ্বানঃ (মহা ৩।২০৯।১০)।

কুম্ভাণ্ড—দৈত্যরাজ বাণের মন্ত্রী ; এক জন অসুর। অনিরুদ্ধকে হত্যা করতে কৃতসঙ্কল্প বাণকে ইনি নিবৃত্ত করেন। পরে কৃষ্ণের হাতে বাণ মারা গেলে কুম্ভাণ্ড রাজা হন।

কুম্ভীনসী/কুম্ভনসী—(১) রামায়ণে (৭।৫।৪২) সুমালী ও কেতুমতীর চার মেয়ে রাকা, পুষ্পোৎকটা, কৈকসী ও কুম্ভীনসী। আবার (৭।২৫।২৩) শ্লোকে রয়েছে মাল্যবানের মেয়ে অনলা ও অনলার স্বামী বিশ্বাবসু (৭।৬১।১৭) এবং এই অনলার মেয়ে কুম্ভীনসী। অর্থাৎ রাবণের মাসী (সুমালীর মেয়ে হিসাবে) বা বোন, অনলার কন্যা হিসাবে। রামায়ণে ৭।২৫।২৩ ও ৭।৬১।২৭ শ্লোক অনুসারে অনলা কন্যা কুম্ভীনসী মধুরা স্ত্রী, ছেলে লবণ। কৈকসীর বোন কুম্ভীনসী যেন অন্য রাক্ষসী। ৭।২৫।৪৪ শ্লোকে রাবণের বোন বলা হয়েছে। মেঘনাদ যখন যজ্ঞ করছিলেন এবং রাবণ দিগ্‌বিজয়ে বার হয়ে বহু মেয়ে ধরে নিয়ে আসতে ব্যস্ত এবং কুম্ভকর্ণ ঘুমাচ্ছেন ও বিভীষণ জলে ডুবে তপস্যা করছেন সেই সুযোগে মধুদৈত্য এসে কুম্ভীনসীকে চুরি করে নিয়ে যান। রাবণ ফিরে এসে শুনে তখনই শাস্তি দিতে বার হয়ে যান, সঙ্গে কুম্ভকর্ণ ও মেঘনাদও যায়। মধুর দেশে এলে কুম্ভীনসী পায়ে ধরে। সন্তুষ্ট হয়ে রাবণ এখানে একরাত্রি বাস করে মধুকে নিয়ে স্বর্গ আক্রমণ করতে যান। (২) অঙ্গারপর্ণের স্ত্রী। দ্রঃ- কুম্ভীনাদী।

কুম্ভীনাদী—সুমালী কেতুমতীর মেয়ে। কুম্ভীনসী (দ্রঃ)। একটি মতে এই মেয়েকে মথুরার রাজা মধুপ অপহরণ করেন। রাবণের হাতে মধুপ মারা পড়েন।

কুম্ভীপাক—নরক। অকারণে জীবজন্তু হত্যা করলে এইখানে শাস্তি পেতে হয়।

কুয়েনলুনপর্বত—(১) নীল পর্বত (দ্রঃ)। (২) তিব্বতে কৃষ্ণ পর্বত।

কুযব—অসুর। ইন্দ্র একে বশীভূত করেন। ঋক্ ৭।১৯।২।

কুরু—ঋক্‌বেদে কুরুশ্রবণ ও পাকস্থামা কৌরায়ণ (১০।৩৩।৪ এবং ৮।৩।২১) এই দুটি নাম আছে। কুরুশ্রবণ ত্রসদস্যুর পুত্র এবং রাজা মিত্রাতিথির নপ্তা (১০।৩৩।৫)। কুরুকুলের স্পষ্ট উল্লেখ নাই। ঐতরেয় ইত্যাদি ব্রাহ্মণ গ্রন্থে পঞ্চাল-কুলের সঙ্গে কুরুকুলের বার বার উল্লেখ আছে। কিন্তু ঋক্‌বেদে পঞ্চালের উল্লেখ নাই। মনে হয় কয়েকটি প্রাচীন কুলের সংমিশ্রণে কুরু ও পঞ্চালদের উৎপত্তি। পণ্ডিতদের মতে ঋক্‌বেদের ভরত ও পুরু ইত্যাদি বিভিন্ন কুল মিশে গিয়ে পরে কুরুকুল নামে প্রসিদ্ধ হয়। এঁদের মতে ঋক্‌বেদের ক্রিবি ও তুর্বশ কুলের মিশ্রণে পঞ্চাল কুল। ঋক্‌বেদে পুরু ও ভরত কুলকে সরস্বতী নদীর উপত্যকার সঙ্গে যুক্ত দেখা যায়। সম্মিলিত তৃৎসু-ভরত কুল পুরুদের হারিয়ে দেন। ভরতদের কুলদেবী ভারতীর সঙ্গে দেবীরূপা সরস্বতী নদীর সংস্রব থেকে পরে সরস্বতী=ভারতীর উদ্ভব। কিন্তু ব্রাহ্মণ-গুলিতে এই সরস্বতী উপত্যকা অঞ্চল কুরুক্ষেত্র বা কুরুদের ভূমি। ব্রাহ্মণ সাহিত্যে পরিক্ষিতের ছেলে জন্মেজয়ের রাজধানী আসন্দীবৎ। কিন্তু মহাভারতে এই রাজধানী

হস্তিনাপুর (বর্তমানে মিরাট জেলা) ও ইন্দ্রপ্রস্থ (দিল্লির কাছে)। আসন্দীবৎ কোথায় জানা নাই। অর্থাৎ মনে হয় উত্তরবৈদিক যুগে কুরুকুল বর্তমান উত্তরপ্রদেশের পশ্চিম অংশ পর্যন্ত এগিয়ে আসে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে কুরু, পঞ্চাল, বশ ও উশীনর এই চারটি বংশকে মধ্যদেশ বাসী বলা হয়েছে। আবার কুরুদের একাংশ হিমালয় অঞ্চলে বসতি স্থাপন করলে এই অংশ উত্তরকুরু নামে পরিচিত হয়। পরবর্তী কালে উত্তর-কুরু বলতে অবশ্য পৃথিবীর উত্তর অঞ্চলবাসী একটি কাল্পনিক জাতি বুঝাত। মহা-ভারতে কুরুজনপদ তিন ভাগে বিভক্ত :—(১) কুরুদেশ, (২) কুরুক্ষেত্র, (৩) কুরুজাঙ্গল। সমগ্র কুরুদেশকেও আবার কুরুজাঙ্গল বলা হয়েছে। মহাভারত ও পুরাণ অনুসারে জন্মেজয় রাওয়ালপিণ্ডিতে তক্ষশিলায় (দ্রঃ) সর্প যজ্ঞ করেছিলেন; কিন্তু বৈদিক সাহিত্যে রাওয়ালপিণ্ডি কুরুদেশের অন্তর্ভুক্ত নয়।

কুরুদের বংশ পরিচয় :—বৈবস্বত মনুর মেয়ে ইলার গর্ভে চন্দ্রের ছেলে বুধের ঔরসে পুরূরবা জন্মান। প্রজাপতি দক্ষ >অদিতি> বিবস্বান> বৈবস্বত মনু (১)-ইলা (২)-পুরূরবা(৩)-যযাতি(৬)-পুরু(৭)-দুষ্মন্ত(২১)-ভরত(২২)-সংবরণ(৩১)-কুরু (৩২)-অর্জুন (৫৩)-অভিমন্যু(৫৪)-পরিক্ষিৎ(৫৫)-জন্মেজয়(৫৬)-নিচক্ষু(৬০)-উদয়ন(৭৯)-ক্ষেমক(৮৪)। শেষ রাজা ক্ষেমক। বংশটি কৌরব, পৌরব, ভারত বা চন্দ্রবংশ নামেও পরিচিত। পাণ্ডবরাও আসলে কৌরবই ছিলেন।

এই কুরুর মা তপতী (দ্রঃ)। কুরু অত্যন্ত ধার্মিক রাজা ছিলেন। প্রয়াগ ত্যাগ করে সমন্তপঞ্চক তীর্থের কাছে কুরুক্ষেত্রে বাস করতেন। এঁর নামে নাম হয় কুরুজাঙ্গল। তপস্যা করে কুরুক্ষেত্রকে (দ্রঃ) তীর্থে পরিণত করেন (মহা ১।৮৯।৪৩)। এই কুরুর স্ত্রী সৌদামিনীর ছেলে পরীক্ষিৎ, সুধন্বা (উপরিচর বসু বংশ) এবং আর এক স্ত্রীর ছেলে জহ্নু (ভীষ্ম এই বংশে) ও নিষধাশ্ব। আর এক মতে কুরুর (মহা ১।৮৯।৫৫) ঔরসে বাহিনীর গর্ভে অশ্ববান / অবিক্ষিৎ, অভিষ্বন্, অভিষন্ত, চৈত্ররথ / চিত্ররথ মুনি, জনমেজয়। আবার আছে স্ত্রী দাশার্হী, নাম শুভাঙ্গী, ছেলে বিডূরথ/বিদূরথ (মহা ১।৯০।৪১)। হরিবংশে (১।৩২) কুরুবংশের পরিচয় হিসাবে অজমীঢ়ের তিন স্ত্রী নীলিনী, কেশিনী ও ধূমিনী। এদের বংশ হিসাবে রয়েছে (১) স্ত্রী নীলিনী >সুশান্তি, >পুরুজাতি> বাহ্যাশ্ব>মুদ্গল, সৃঞ্জয়, বৃহদিষু, যবীনর, কৃমিলাশ্ব ; এই পাঁচ জনের ৫-টি দেশ পঞ্চাল। মুদ্গল>মৌদগল্য (এরা ক্ষত্রধর্ম বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ ; কণ্ব মৌদগল্য নামে পরিচিত) ইন্দ্রসেন >বধ্র্যশ্ব > মেনকা যমজ দিবোদাস ও অহল্যা।

(২) স্ত্রী ধূমিনী >ঋক্ষ (ধূম্রবর্ণ) > সংবরণ>কুরু (কুরুক্ষেত্র নির্মাতা)> সুধন্বা, সুবাহু, পরীক্ষিৎ, অরিমেজয়। সুধন্বা >সুহোত্র>মতিমান> চ্যবন>কৃতযজ্ঞ উপরিচরবসু (চেদিরাজ)+গিরিকা>বৃহদ্রথ (বড়, মগধরাজ), প্রত্যগ্রহ, কুশ (মণিবাহন), মাবুত, যদু, মৎস্য এবং মেয়ে কালী। বৃহদ্রথ(>কুশাগ্র>বৃষভ)>পুষ্পবান>সত্যজিৎ> ঊর্জ>সম্ভব>জরাসন্ধ (দুই মায়ের পুত্র)>সহদেব>উদায়ু>শ্রুতধর্মা। কুরুর ছেলে পরীক্ষিৎ>জনমেজয়>শ্রুতসেন, উগ্রসেন, ভীমসেন, সুরথ, মতিমান। সুরথ>বিদূরথ>

ঋক্ষ (দ্বিতীয়)>ভীমসেন>প্রতীপ>শন্তনু, দেবাপি, বাহ্লিক। শন্তনু>ভীষ্ম, বিচিত্রবীর্য (ব্যাস)>ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, বিদুর। দ্রঃ- বিতথ।

নিচক্ষু (৬০) পর্যন্ত এ'রা হস্তিনাপুরে রাজত্ব করতেন। পরে গঙ্গার বন্যায় হস্তিনাপুর বিধ্বস্ত হলে বর্তমান এলাহাবাদের কাছে কৌশাম্বীতে নিচক্ষু রাজধানী নিয়ে আসেন। বৌদ্ধ সাহিত্যে আছে উদয়ন বুদ্ধের সমসাময়িক অর্থাৎ ৫00 খৃ-পূ। উদয়নের উর্দ্ধতন ২৪-শ পুরুষ পরিক্ষিৎ খৃ-পূ ৯-১০ শতকের লোক মনে হয়। কারণ ২৪টি রাজার রাজত্বকাল মোটামুটি ৫00 বছর মত। আর এক মতে পরিক্ষিতের জন্ম থেকে কলি (দ্রঃ-) যুগের সূচনা অর্থাৎ পরীক্ষিতের জন্ম ৩১০২ খৃ-পূ। অন্য মতে পরীক্ষিতের জন্ম ২৪৪৯ খৃ-পূ। দ্রঃ- কুরুক্ষেত্র।

কুরুবংশের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ। যুধিষ্ঠির-দুর্যোধন-ভীষ্ম কেন্দ্রিক কাহিনীর ঐতিহাসিক মূল্য কতটুকু জানা নাই। বৈদিক সাহিত্যে কুরুকুল, কুরুক্ষেত্র, বিচিত্রবীর্যের ছেলে ধৃতরাষ্ট্র, পরিক্ষিতের ছেলে জন্মেজয় ইত্যাদির উল্লেখ আছে কিন্তু পাণ্ডু ও তাঁর ছেলেদের ও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কোন ইঙ্গিত নাই। দ্রঃ- শন্তনু, ভীষ্ম, বিচিত্রবীর্য, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, দুর্যোধন, যুধিষ্ঠির, অর্জুন, অভিমন্যু, জন্মেজয় ইত্যাদি।

আরো দু জন উল্লেখযোগ্য কুরু রাজঃ—(ক) স্বায়ম্ভুব মনু (১)-উত্তানপাদ (২)-ধ্রুব(২)-চাক্ষুষমনু(৬)-কুরু(৭)-বেণ(৯)। এই কুরুর আর দশ ভাই পুরু, উরু, সত্যদ্যুম্ন, তপস্বী, সত্যবাক, শুচি, অগ্নিস্টু, অধিরথ/অতিরথ, সুদ্যুম্ন, অভিমন্যু। এই কুরুর স্ত্রী আগ্নেয়ী এবং ছেলে অঙ্গ, সুমনস, খ্যাতি, ক্রতু, অঙ্গিরস, গয় ও শিবি। এ ছাড়া বিশেষ কিছু জানা নাই। এই অঙ্গ+সুনীথা=বেণ। (খ) প্রিয়ব্রত বংশে আর এক জন কুরু রয়েছেন। প্রিয়ব্রতের স্ত্রী বহিষ্মতী। ছেলে অগ্নীধ্র, ইধ্মজিৎ, যজ্ঞভানু, মহাবীর, ঘৃতপৃষ্ঠ, সব, হিরণ্যরেত, মেধাতিথি, বীতিহোত্র, কবি, ঊর্জস্পতি, উত্তম, তামস, রৈবত। এই রাজা অগ্নীধ্র+পূর্বচিত্তির ছেলে নাভি, কিম্পুরুষ, হরি, ইলাবর্ত, রম্যক, হিরণ্ময়, কুরু, ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল। এই কুরুর স্ত্রী ছিলেন নারী এবং আর কিছু জানা নাই। (৩) রন্তিদেবের এক ভাইয়ের নাম ছিল কুরু।

কুরুকুল্লা—অমিতাভ (দ্রঃ) কুল। এক মুখ; ২, ৪, ৬ বা ৮ হাত। ৬ হাত হলে মুকুটে ৫ জন ধ্যানী বুদ্ধ। দুই হাত হলে নাম শুক্ল কুরুকুল্লা। চার হাত হলে তারোদ্ভবা কুরুকুল্লা, উড্ডিয়ান কুরুকুল্লা, হেবজ্রকর্ম কুরুকুল্লা, কল্পোক্ত কুরুকুল্লা। কুরুকুল্লারা বশীকরণ দেবী ; ওঁ কুরুকুল্লে হুং হ্রীঃ স্বাহা মন্ত্র ১0 হাজার বার জপ করলে স্ত্রী বা পুরুষ বশীভূত হয় ; ৩0,000 বার জপ করলে মন্ত্রী এবং ১00,000 বার জপ করলে রাজা বশীভূত হয়। দ্রঃ- তারা বৌদ্ধ।

কুরুকুল্লা অষ্টভুজা—দ্রঃ- কুরুকুল্লা। বর্ণ রক্ত, আসন বজ্রপর্যঙ্ক, মুদ্রা ত্রৈলোক্য বিজয় ; হাত আট। প্রথম দু হাতে ত্রৈলোক্য বিজয় মুদ্রা। বাকি হাতে অঙ্কুশ, আকর্ণ-আকর্ষিত-বাণ, বরদা মুদ্রা, পাশ, ধনু ও উৎপল। সিদ্ধাচার্য ইন্দ্রভূতি (খৃ ৭00) এর প্রবর্তন করেন। নগ্ন, যুবতী, করুণাময়ী, সর্বাভরণভূষিতা। অষ্টদলপদ্মে অধিষ্ঠান। পদ্মের

পূর্ব দলে প্রসন্ন তারা, দক্ষিণে নিষ্পন্ন তারা, পশ্চিমে জয় তারা, উত্তরে কর্ণতারা, উ-পূর্বে চুন্দা, দ-পূর্বে অপরাজিতা, দ-পশ্চিমে প্রদীপ তারা, উ-পশ্চিমে গৌরী-তারা—এই আট জনই রক্তবর্ণ এবং এদের মাথাতেও ধ্যানীবুদ্ধ। এই আটজন ছাড়াও এই ব্যূহে পূর্ব দ্বারে বজ্রবেতালী, দক্ষিণ দ্বারে অপরাজিতা, পশ্চিম দ্বারে একজটা, উত্তর দ্বারে বজ্রগান্ধারী রয়েছেন।

কুরুকুল্লা উড্ডিয়ান্—রক্তবর্ণ ভীষণ আকৃতি. আসন অর্দ্ধপর্যঙ্ক। শববাহন, চার হাত। মুণ্ডমালা। মাথাতে পঞ্চ মুণ্ড. উদগত দন্ত. জিব বার হয়ে আছে। ব্যাঘ্র চর্ম। ঊর্দ্ধমুখী কপিলকেশ। ত্রিনেত্র, রক্তচক্ষু। দু হাতে পুষ্পধনুতে রক্তপদ্মবাণ সন্ধানে রত। আর দু হাতে পুষ্প. অঙ্কুশ ও লাল পদ্ম।

কুরুকুল্লা তারোদ্ভব—রক্তবর্ণ, রক্তাবরণাভরণা। রক্ত পদ্মে অবস্থান। চার হাত, অভয়মুদ্রা, বাণ, ধনু ও রক্তপদ্ম। আসন বজ্রপর্যঙ্ক। আসনের নীচে কামদেব ও তাঁর স্ত্রী—রাহুর ওপর অবস্থিত। কুরুকুল্লা পর্বতে বাস। যুবতী।

কুরুকুল্লা মণ্ডল—পদ্মের দলে ঈশান কোণে চুন্দা, পূর্ব দলে প্রসন্নতারা, দক্ষিণে নিষ্পন্নতারা, পশ্চিমে জয়তারা, উত্তরে কর্ণতারা, অগ্নিকোণে অপরাজিতা, নৈঋর্ত কোণে প্রদীপতারা, বায়ুকোণে গৌরীতারা। এরা সকলে রক্তবর্ণ। বজ্রপর্যঙ্ক ভঙ্গি, পঞ্চ-ধ্যানীবুদ্ধ মুকুটে ; হাতে বরদমুদ্রা ও তীরধনু এবং নীলপদ্ম।

কুরুকুল্লা মায়াজালকর্মা—বর্ণ রক্ত, আসন বজ্রপর্যঙ্ক, ছয় হাত। অষ্টদল রক্তপদ্মের ওপর। রক্তবাসা, প্রথম দুহাতে ত্রৈলোক্য বিজয়মুদ্রা. তারপর অভয় মুদ্রা, শ্বেতকুন্দ মঞ্জরী, অক্ষসূত্র. ও কমণ্ডলু। তক্ষকের পিঠে অবস্থিত। আরো অন্য মূর্তিও আছে।

কুরুকুল্লা শুক্লা—বর্ণ শুক্ল, প্রতীক অক্ষমালা. ও পদ্ম-পাত্র, বাহন পশু, আসন বজ্র পর্যঙ্ক। ত্রিনয়ন। পদ্মধৃক্ প্রমুখ সমস্ত তথাগত এবং বীণাদি ১৬ জন দেবী দ্বারা অভিষিক্ত। পুষ্পভূষিত জটামুকুট। দিব্যাভরণ ভূষিত। নীল অনন্ত-নাগ-বদ্ধ কেশ কলাপ, পীযূষবর্ণ বাসুকি হার, রক্ত তক্ষক কুণ্ডল. দুর্বাশ্যাম কর্কোটক যজ্ঞোপবীত, শুক্ল পদ্মনাগ হার, মৃণালবর্ণ মহাপদ্ম নূপুর, পীত শঙ্খপাল কঙ্কন, ধূমাভবৎ কুলিক কেয়ূর।

কুরুক্ষেত্র—২৯°১৫' থেকে ৩০° উ. ৭৬°২০' থেকে ৭৭° পূ। থানেশ্বর। প্রাচীন নাম সমন্তপঞ্চক। পূর্ব পাঞ্জাবে কর্ণাল জেলায়। বৈদিক যুগ থেকে পুণ্যভূমি। গীতাতে ধর্ম-ক্ষেত্র বলে অভিহিত। মহাভারতে সরস্বতী নদীর দক্ষিণে ও দৃশদ্বতী (দ্রঃ), বর্তমানে রক্ষী, নদীর উত্তরে। মহাভারত মতে এখানে কুরুপাণ্ডবদের যুদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু মৈত্রায়নী সংহিতা, শতপথব্রাহ্মণ. ঐতরেয় ব্রাহ্মণ. জৈমিনী ব্রাহ্মণ, শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্র ইত্যাদি বৈদিক গ্রন্থে পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্রের উল্লেখ আছে, কোন যুদ্ধের ইঙ্গিত, নাই। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (৫.১.১) কুরুক্ষেত্রের দক্ষিণে খাণ্ডব, উত্তরে তুর্ঘ্ন, পশ্চিমে পরীণঃ। মরুকে (রাজপুতানার মরুভূমি) বলা হয়েছে উৎকর (=যজ্ঞবেদী খোঁড়ার জন্য ওঠা মাটি)। কুরুক্ষেত্রের কাছেই মরুস্থলে সরস্বতী নদী বালিতে মিশে গেছে। কুরুক্ষেত্রের অপর নাম অদর্শন বা বিনশন। বোধায়ন ধর্মসূত্রে আর্যাবর্তের পশ্চিম সীমা অদর্শন। মনুতে আর্যাবর্তের নাম মধ্যদেশ এবং পশ্চিম সীমা এই

বিনশন। মহাভারতে কুরুক্ষেত্রকে সমন্তপঞ্চকতীর্থ এবং ব্রহ্মবেদী বা ব্রহ্মার উত্তরবেদী বলা হয়েছে। চতুঃসীমায় তরন্তুক, অরন্তুক, রামহ্রদ ও মচক্রুক (মহা ৯।৫২।২০)। সরস্বতী, দৃশদ্‌বতী, আপয়া (চিটাঙের শাখা) ইত্যাদি নদী ও শরণ্যাবৎ নামে একটি হ্রদ এখানে ছিল। এই জেলাতে আগে আমিন, শোনপথ, পাণিপথ ও কর্ণাল যুক্ত ছিল। উত্তরে সরস্বতী, দক্ষিণে দৃষদ্বতী। থানেশ্বরে ও চারপাশে মহাভারতে যুদ্ধ হয়েছিল। দ্বৈপায়ন হ্রদ=রামহ্রদ (দ্রঃ)। ব্যাসস্থলী (বর্তমানে বস্থালি), থানেশ্বর থেকে ১৭ মাইল দ-পশ্চিমে। থানেশ্বর থেকে ৫ মাইল দক্ষিণে আমিনে অভিমন্যু নিহত হন এবং অশ্বত্থামা পরাজিত হন। অভিমন্যু>আমিন (?)। আমিনে অদিতি সূর্যের জন্ম দেন। থানেশ্বর থেকে ৮ মাইল পশ্চিমে ভোর; এখানে ভূরিশ্রবা নিহত হন। চক্রতীর্থে সুদর্শন চক্রে কৃষ্ণ ভীষ্মকে হত্যা করতে যান এবং থানেশ্বর থেকে ১১ মাইল দ-পশ্চিমে নাগদুতে ভীষ্ম মারা যান। থানেশ্বরের পশ্চিমে অস্তিপুরে ঔজসঘাটে মৃত যোদ্ধাদের অগ্নিকার্য করা হয়েছিল। শোণপ্রস্থ>শোণপথ, পাণিপ্রস্থ>পাণিপথ এই দুটি গ্রাম সন্ধির সর্ত হিসাবে যুধিষ্ঠির চেয়েছিলেন। থানেশ্বর থেকে আধমাইল উত্তরে স্থাণু মহাদেবের মন্দির। আলবেরুনির (দ্রঃ) সময় মন্দিরটি তীর্থস্থান। জাবালা উপনিষদে ও শতপথ ব্রাহ্মণে দেবতারা কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ করতেন বলে উল্লিখিত। পুলস্ত্যের মতে কুরুক্ষেত্রের ধূলি যার গায়ে লাগে সেও মুক্তি পায়। পরশুরাম-একুশ বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করে এইখানে পিতৃ-তর্পণ করেছিলেন। পৃথিবীতে নৈমিষ, অন্তরীক্ষে পুষ্কর এবং তিনলোকের মধ্যে কুরুক্ষেত্র বিশিষ্যতে। একবার কুরুক্ষেত্রে যাব বললেই সব পাপ নষ্ট হয়ে যায় (মহা ১।৮১।১৭৩)। সন্ন্যাস গ্রহণ করে পুরু এখানে তপস্যা করে স্থানটিকে পুণ্য ক্ষেত্রে পরিণত করেন। কুরু যখন যজ্ঞ করছিলেন তখন সরস্বতী নদী সুবেণু/ওঘোবতী হয়ে এখানে এসে জমি ভিজিয়ে দিয়ে যান। যজ্ঞ করে এখানে হল চালনা করেন উদ্দেশ্য (মহা ৯।৫২।২১ এখানে হতাঃ বসুন্ধরাধিপাঃ) এখানে যারা প্রাণ ত্যাগ করবে তারা স্বর্গে যাবে। কুরু এখানে সব সময়ই হল চালনা করতেন। ইন্দ্র কৌতূহলী হয়ে বার বার এসে জিজ্ঞাসা করে জিনিসটা জানতে পারেন এবং ইন্দ্র কুরুকে উপহাস করে যান কিন্তু দেবতাদের সঙ্গে পরামর্শ করেন; ভয় পান কেউ আর যজ্ঞ করবে না। স্বর্গে যাবার এই সহজ পথ রোধ করার জন্য দেবতারা ইন্দ্রকে পাঠান এবং ইন্দ্র কুরুকে হল চালনা করতে বারণ করেন। ঠিক হয় এখানে উপবাস করে বা আলস্য শূন্য হয়ে যুদ্ধ করে মারা গেলে এবং যারা আগের জন্মে মানুষ ছিল এ জন্মে পশু হয়ে জন্মেছে তারাও এখানে মারা গেলে স্বর্গে যাবে। এ ছাড়াও নানা দেবতার বরে এখানের বহু মাহাত্ম্য রয়েছে। কুরুক্ষেত্রে ইক্ষুমতী নদীর তীরে তক্ষক বাস করত। এখানে গন্ধর্ব চিত্রাঙ্গদ নিহত হন। সুন্দ উপসুন্দ (দ্রঃ) এইখানে বাস করতেন। রাজা মান্ধাতা এখানে একবার যজ্ঞ করেছিলেন। মুদ্‌গল মুনি এখানে বাস করতেন। ভীষ্ম ও পরশুরামের লড়াই এইখানে হয়েছিল। বনবাসের সময় পাণ্ডবরা এখানে একবার ঘুরে গিয়েছিলেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ—দ্রঃ- সমন্তপঞ্চক। কুরুক্ষেত্রে কুরু-পাণ্ডবদের মধ্যে ১৮ দিন ব্যাপী

প্রচণ্ড সংঘর্ষ। কৌরব পক্ষে ১১ ও পাণ্ডব পক্ষে ৭ অক্ষৌহিণী (দ্রঃ) সৈন্য ছিল। অর্থাৎ মোট ৪৭২,৩৯২০ লোক অর্থাৎ আধকোটি মত লোক যুদ্ধে যোগদান করেছিল। আজকের যুগেও একটি রণক্ষেত্রে এত বড় বাহিনী চালান সম্ভবপর নয়। প্রাচীন কালের যুদ্ধে ২-৪ হাজার সেনা নিয়ে যুদ্ধ করাও খুব কঠিন কাজ ছিল। পূর্বে প্রাগ্-জ্যোতিষপুর এবং দক্ষিণে পাণ্ড্য দেশ/রাজ্য ইত্যাদি থেকে পাঞ্জাবে যুদ্ধ করতে সেই যুগে এসে উপস্থিত হয়েছিল এটা নিছক কল্পনা। এই সব রাজ্যগুলির মধ্যে কোন রাজনীতিক বা অর্থনীতিক সম্পর্ক ছিল তাও কোন প্রমাণ নাই। কোন রাজনীতিক লাভের দাবি না তুলে এই ভাবে যুদ্ধে যোগ দেওয়া একটা অসম্ভব কল্পনা। ঐতিহাসিক সত্য হয়তো সামান্য একটা সংঘর্ষ ; কিন্তু কবিরা তাকে মহাকাব্য করে তুলেছেন। যুদ্ধের তারিখ ৩১০২ খৃ পূ ; ২৪৪৯ খৃ-পূ বা ১৯০০-১৪১৫ খৃ-পূর্বের মধ্যে। দুর্যোধন এখানে দ্বৈপায়ন (বর্তমান থানেশ্বর) হ্রদের তীরে আহত হন ; এখান থেকে ২৭ কি-মি দক্ষিণে বা-স্থলী হচ্ছে প্রাচীন ব্যাসস্থলী। থানেশ্বরের ৮ কি-মি দক্ষিণে আমিন নামক যায়গায় অভিমন্যু মারা যান এবং অশ্বত্থামাও এইখানে পরাজিত হন। থানেশ্বরের ১৩ কি-মি পশ্চিমে ভোর নামক জায়গায় ভূরিশ্রবা এবং প্রায় ১৮ কি-মি দক্ষিণে নাগদু নামক স্থানে ভীষ্ম নিহত হন। এই যুদ্ধে পাণ্ডবরা পাঁচ ভাই, কৃষ্ণ ও সাত্যকি, এবং কৌরবদের কৃপাচার্য, কৃপবর্মা, ও অশ্বত্থামা এই দশ জন বেঁচেছিলেন।

যুদ্ধের প্রাক্‌কালে ভীষ্ম সন্ধি চান। কিন্তু কর্ণ বলেন পাণ্ডবরা প্রতিজ্ঞা পালন (মহা ৫।২১।১১) করেন নি, আবার বনে যাক। ধৃতরাষ্ট্র, কর্ণ ও দুর্যোধনকে সরাসরি গালি দিয়ে সঞ্জয়কে পাঠান যাতে যুদ্ধ না করে একটা মিটমাট সম্ভব হয়। এটি কিছু না দিয়ে মিটমাটের চেষ্টা। সঞ্জয় উপপ্লব্যে এসে বোঝাতে থাকেন। বলেন অন্ধকবৃষ্ণি দেশে ভিক্ষা (মহা ৫।২৭।২) করে জীবন কাটানও ভাল; আগে কেন পাণ্ডবরা যুদ্ধ করেনি ইত্যাদি। যুধিষ্ঠির ন্যূনতম দাবি হিসাবে কুশস্থল, বৃকস্থল, মাকন্দী, বারণাবত ও আর একটি গ্রাম চান। সঞ্জয় এতে সম্মত হন না। সঞ্জয় ফিরে এলে ধৃতরাষ্ট্র বার বার সন্ধির জন্য ছেলেদের বলেছিলেন ; কৃষ্ণের শরণ নিতেও বলে-ছিলেন। গান্ধারীও এদের তিরস্কার করেছিলেন। এরপর কৃষ্ণ আসেন সন্ধির জন্য। দুর্যোধন, কর্ণ ইত্যাদি বাদে সকলেই প্রায় কৃষ্ণকে সমর্থন করেন। শেষ অবধি কৃষ্ণ প্রস্তাব করেন দুর্যোধনকে বন্দী করে (মহা ৫।১২৬।৪৭) পাণ্ডবদের হাতে সমর্পণ করতে। কর্ণ শকুনি ইত্যাদি তখন কৃষ্ণকে বন্দী করার (মহা ৫।১২৮।৫) গোপন ব্যবস্থা করেন। সাত্যকি ইত্যাদি সৈন্য নিয়ে ছুটে আসেন, কৃষ্ণ বিশ্বরূপ দেখান (মহা ৫।১২৯) ইত্যাদি। এরপর কুন্তী ও কর্ণের সঙ্গে কৃষ্ণ দেখা করে যান। কর্ণের জন্ম পরিচয় জানিয়ে দল ত্যাগ করতে বলেছিলেন (মহা ৫।১৩৮।৯)। কর্ণকে (দ্রঃ) বলে যান সাত দিন পরে অমাবস্যা ; ইন্দ্র সেই দিনের অধিষ্ঠাতা দেবতা ; সেই দিন যুদ্ধ হবে (মহা ৫।১৪০।১৮)। কৃষ্ণ বিরাট নগরে ফিরে এসে পুষ্যা নক্ষত্রে যুদ্ধে যেতে বলেছিলেন। পাণ্ডবরা পুষ্যা নক্ষত্রে কুরুক্ষেত্রে এসেছিলেন। ভীষ্ম পর্বে আছে (মহা ৬।১৭।২) মঘা নক্ষত্রে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। মঘা বিষয়গঃ সোমঃ তৎ দিনং প্রত্যপদ্যত। এই মঘা বিষয়গঃ অর্থে মৃগশিরা বুঝতে

হবে। মৃগশিরা নক্ষত্রের ক্রমিক সংখ্যা ৫ ; বলরাম (দ্রঃ) যুদ্ধ দেখতে আসেন শ্রবণা নক্ষত্রে ; শ্রবণার ক্রমিকসংখ্যা ২২। বলরাম বলেছিলেন ৪২ দিন তীর্থ যাত্রায় বার হয়ে গিয়েছিলেন ; পুষ্যা নক্ষত্রে বার হয়ে শ্রবণাতে (মহা ৯।৩৩।৫) ফিরে এসেছেন। কৃষ্ণ ফিরে যাবার পর দুর্যোধনও নিজেদের সৈন্যদের অদ্য পুষ্যা নক্ষত্রে (মহা ৫।১৪৮।৩) কুরুক্ষেত্রে সমবেত হতে বলেন। উত্তরা কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল (মহা ১১।২০।২৬) ৬-৭ মাসে অভিমন্যু মারা গেছে। অর্থাৎ উদ্যোগ পর্ব ৬-৭ মাস কাল।

কুরুক্ষেত্রে পশ্চিমার্দ্ধে কৌরবরা সৈন্য সমাবেশ (মহা ৫।১৯৬।১১) করেন। পাণ্ডবরা হিরণ্বতী নদীর তীরে পরিখা খনন করেন। সমন্তক তীর্থের বহির্ভাগে পাণ্ডব শিবির (মহা ৬।১।৬) ; সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে আপণ, বেশ্যাগণ, অস্ত্র চিকিৎসক ও চিকিৎসকরা (মহা ৫।১৪৯।৩৫) এবং বেতনভুক সুনিপুণ শিল্পীরাও ছিল। ছিল কিছু অবৈতনিক সৈন্যও (মহা ৫।১৬২।৮)।

কৌরবপক্ষে (মহা ৫।১৯।২৪) ভগদত্ত ১-অক্ষৌহিণী, ভূরিশ্রবা-১, শল্য-১, জয়দ্রথ-১, কাম্বোজ সুদক্ষিণ-১, অবন্তিরাজ দু'জন-২, কেকয়-১, অন্য রাজারা-৩ ; মোট ১১ অক্ষৌহিণী সৈন্য। কৌরব পক্ষে বড় বড় রাজারা (৫।১৬২-১৬৫):- ভোজরাজ কৃতবর্মা, মদ্ররাজ শল্য, ভূরিশ্রবা, জয়দ্রথ, কাম্বোজ রাজ সুদক্ষিণ, মাহিষ্মতীর নীল, অবন্তির বিন্দ ও অনুবিন্দ, ত্রিগর্তরা ৫ ভাই (প্রধান সত্যরথ), জনৈক রাজা দণ্ডধার, অযোধ্যার বৃহদ্বল, জনৈক পৌরব, সত্যশ্রবা, কর্ণপুত্র বৃষসেন, দুর্যোধনের ছেলে লক্ষ্মণ, বাহ্লীক, সত্যবান, অলম্বুষ, ভগদত্ত, গান্ধার প্রধান অচল, বৃষক, শকুনি ইত্যাদি। পাণ্ডবদের সাত্যকি-১ অক্ষৌহিণী, ধৃষ্টকেতু-১, জয়ৎসেন-১ ইত্যাদি মোট ৭ অক্ষৌহিণী। পাণ্ডবদের ৭-জন প্রধান সেনাপতি দ্রুপদ, বিরাট, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ধৃষ্টকেতু, শিখণ্ডী ও মাগধ সহদেব। এদের মধ্যে ধৃষ্টদ্যুম্ন সকলের ওপরে। যুধিষ্ঠির এই নির্বাচন করেন।

হস্তিনাপুরে ব্যাস ভবিষ্যৎ (মহা ৬।২) বলে যান। দিব্যচক্ষু দিতে চান ; ধৃতরাষ্ট্র নিতে চান না। ব্যাস সঞ্জয়কে দিব্যচক্ষু ও শরীরে অস্ত্র স্পর্শ করবে না বর দিয়ে যান। ব্যাস (মহা ৬।২।১৪) বলে যান এ যুদ্ধ তিনিও বন্ধ করতে পারবেন না।

যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ আরম্ভ হবার মুখে যুধিষ্ঠির (দ্রঃ) ভীষ্ম ইত্যাদির কাছে গিয়ে আশীর্বাদ নিয়ে আসেন কৃষ্ণ কর্ণের কাছে গিয়ে অনুরোধ করেন যতদিন ভীষ্ম যুদ্ধ করবেন ততদিন যেহেতু কর্ণ যুদ্ধ করবেন না সেই সময়টা অন্তত পাণ্ডব পক্ষে (মহা ৬।৪১।৮৫) যেন তিনি যুদ্ধ করেন। কর্ণ সম্মত হন না। এই সময় যুধিষ্ঠিরের ডাকে যুযুৎসু (মহা ৬।৪১।৯১) এসে পাণ্ডব পক্ষে যোগ দেন। এর পর কৃষ্ণের নির্দেশে অর্জুন দুর্গার স্তব করেন (কা-প্র) এবং দুর্গা এসে বর দিয়ে যান। ভীষ্ম ১০ দিন, দ্রোণ ৫ দিন, কর্ণ ২ দিন এবং শল্য এক দিন মত যুদ্ধ করেন। জয়দ্রথ মারা গেলে একটানা রাত্রিতেও যুদ্ধ হয়েছিল। মশাল জ্বেলে যুদ্ধ (মহা ৭।১৫৩।৩৫)। উভয় পক্ষ তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়। এরপর চাঁদ উঠলে আবার যুদ্ধ হয় (মহা ৭।১৫৯।৪৯)। কি তিথি অস্পষ্ট এবং অরুণোদয় পর্যন্ত যুদ্ধ চলে। বিরাট ও দ্রুপদ দ্রোণের হাতে (মহা ৭।১৬১।১৪) মারা পড়ে ; তারপর দ্রোণ নিহত হন। কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ চলা কালে অশ্বত্থামা (মহা ৮।১১।২১) এবং

কর্ণ মারা গেলে কৃপাচার্য (মহা ৯।৩।৪৩) দুর্যোধনকে সন্ধি করতে বলেছিলেন। কর্ণ মারা গেলে সেই রাত্রে সঞ্জয় (৮।১।২৫) ঘোড়ায় করে ধৃতরাষ্ট্রকে খবর দিয়ে যান। কৌরবরা পেছু হেঁটে কুরুক্ষেত্র থেকে ঊনে দ্বিযোজনে গম্বা (মহা ৯।৪।৫৮) হিমালয় প্রস্থে গিয়ে সমবেত হয়। দুর্যোধনের ঊরু ভঙ্গের পর পাণ্ডবরা কৌরব শিবিরে এসে বহু ধনরত্ন (প্রবিশ্য প্রত্যপদ্যন্ত মহা: ৯।৬১।৩১) লাভ করেন। শিবিরে বৃদ্ধ অমাত্যগণ, স্ত্রীগণও কিছু বর্ষবর (ক্লীব) অবস্থান করছিল (মহা ৯।৬১।৫)। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ থেকে ২৪১৬৫ জন (মহা ১১।২৬।১০) যোদ্ধা পালিয়ে গিয়েছিল। যুদ্ধের পর পুরাৎ বহিঃ এক মাস বিশুদ্ধি অর্থে (মহা ১২।১।২) বাস করে পাণ্ডবরা হস্তিনাপুরে প্রবেশ করেন।

কুরুজাঙ্গল—প্রাচীন ভারতে একটি রাজ্য। হস্তিনাপুরের উত্তর পশ্চিমে শিরহিন্দে। বৌদ্ধযুগে এটি শ্রীকণ্ঠ (দ্রঃ)। সমস্ত কুরুদেশও এই নামে পরিচিত ছিল। রাজধানী হস্তিনাপুর ছিল কুরুজাঙ্গল এলাকাতে। দ্রঃ- কুরু।

কুরুপঞ্চাল—উত্তর বৈদিক সাহিত্যে কুরু ও পঞ্চাল এই দুটি কুলকে বহু জায়গায় একত্র উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ এ'রা বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন। মহাভারতে এ'দের মধ্যেই যেন যুদ্ধ হয়েছিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় কুরুদের রাজধানী ছিল হস্তিনাপুর (বর্তমানে মিরাট) এবং বেরিলি জেলাতে অহিচ্ছত্রাতে (বর্তমান রামনগর) পঞ্চালরাজ রাজত্ব করতেন।

কুলকুণ্ডলিনী—বৌদ্ধ দর্শনেও মেনে নিয়েছেন। হিন্দু ও বৌদ্ধ দুটি মতেই সহস্রার মস্তিষ্কে, মূলাধার দেহে অপর প্রান্তে। হিন্দু তান্ত্রিক মতে শিব হচ্ছেন পূর্ণ চৈতন্য স্বরূপ; সহস্রারে থাকেন। শক্তি জাগতিক শক্তির স্বরূপ; অপর প্রান্তে গুহ্যদেশে মূলাধার চক্রে অবস্থিত। বৌদ্ধতান্ত্রিক মতে সহস্রারে থাকে উপায়=করুণা=বজ্রসত্ত্ব এবং নাভিদেশে নির্মাণকায় চক্রে থাকে প্রজ্ঞা=শূন্যতা। বৌদ্ধদর্শনে ষট্‌চক্রের বদলে চক্র চারটি:— নির্মাণকায় চক্র নাভিদেশে, ধর্মকায় চক্র হৃদয়ে; সম্ভোগকায় চক্র কণ্ঠে এবং বজ্রকায়/ সহজকায়/মহাসুখ চক্র শেষ প্রান্তে মস্তিষ্কে সহস্রারে। হিন্দু ধর্মের অন্যান্য শাখাতে যোগ যেখানে স্বীকৃত সেখানেই কুলকুণ্ডলিনী গৃহীত হয়েছে। দ্রঃ- কুণ্ডলিনী।

কুলবৃক্ষ—অশোক, বকুল, কর্ণিকার, আম্র, নিম্ব, তিলক, নমেরু, পিয়াল, কুরুবক, সিন্ধুবার, কদম্ব। অন্য মতে শ্লেষ্মাত্মক, করঞ্জ, বিল্ব, অশ্বত্থ, নিম্ব, বট, উদুম্বর, ধাত্রী, আমলকী, চিঞ্চা, কদম্ব।

কুলাচল—কুল পর্বত। মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শক্তিমান, ঋক্ষ, বিন্ধ্য, পারিযাত্র (বা পারিপাত্র) এবং হিমালয় ধরলে আটটি কুলাচল। ওড়িশার সমগ্র পর্বতমালা ও পূর্বঘাট পর্বত মালার নাম মহেন্দ্র পর্বত। মহেন্দ্র পর্বত দক্ষিণে মলয় গিরির সঙ্গে যুক্ত। কাবেরী নদীর দক্ষিণে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার দক্ষিণাংশ মলয়গিরি, ও কাবেরী নদীর উত্তরে পশ্চিম-ঘাট পর্বতমালার উত্তরাংশ সহ্যাদ্রি। শক্তিমান সম্ভবত মধ্যপ্রদেশের পর্বতমালা। বিন্ধ্য পর্বতের মাঝের অংশ ঋক্ষপর্বত। চম্বল নদীর উৎস থেকে খাম্বাত উপসাগর পর্যন্ত লম্বা বিন্ধ্য পর্বতের পশ্চিমাংশ পারিযাত্র। আরাবল্লী পর্বতও পারিযাত্রের অংশ।

কুলাচার—শক্তি পূজায় যে আচার বা মার্গ অনুসরণীয়। বামাচার বা বীরাচারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কুলাচারের অনুষ্ঠানে পঞ্চমকারের (মৎস্য, মাংস, মদ্য, মুদ্রা, মৈথুন,) প্রয়োজন হয়। এগুলি অবৈদিক এবং নিন্দিত। সমর্থকরা বলেন এই মার্গ অতি কঠিন ; অত্যন্ত সাবধানতার প্রয়োজন। তবে প্রকৃত অধিকারীর কোন ভয় নাই ; এ মার্গ লম্পটের নয়। দ্রঃ- তন্ত্র।

কুলিন্দ—কলিন্দ, কুনিন্দ, কৌনিন্দ। গাড়োয়াল, সাহারানপুর জেলা ও উ-দিল্লি-মিলে একটি দেশ। গঙ্গা ও শতদ্রুর সমস্ত উত্তর অংশ। কুলিন্দ্রিনি (টলেমি)। অন্য মতে বিয়াস ও তোন নদীর মধ্যবর্তী অংশ ; কুলু (দ্রঃ) সমেত। আর এক মতে উচ্চ পর্বত এলাকা ; এখানে বিপাশা, শতদ্রু, গঙ্গা ও যমুনার উৎপত্তি। হিমালয়ে বন্দর পুচ্ছ শাখাতে একটি পাহাড়ি দেশ। কুলিন্দে উৎপন্ন বলে যমুনা=কালিন্দী। হিমালয়ের দক্ষিণগাত্রে কুলু (দ্রঃ) থেকে নেপাল পর্যন্ত এলাকাতে কয়লিণ্ডিনে-রা (টলেমি) বাস করত। কোলিন্দ (বৃহৎসং)।

কুলু—কুলিন্দ (দ্রঃ), কুনিন্দ, কলিন্দ, কুলুত, কোলুক। বিয়াসের ওপর দিকের উপত্যকা/দেশ ; রাজধানী নগরকোট (দ্রঃ)। দ্রঃ- কুলূত।

কুলূত—কাঙড়া জেলাতে কুলু (দ্রঃ) সাবডিভিসান। কাঙড়াতে উ-পশ্চিম অংশ। কুলিন্দ দেশের অংশ ; রাজধানী নগরকোট (দ্রঃ)। বর্তমান সদর সহর রঘুনাথপুর ; সেরবরি=সেরবুলি (একটি ছোট নদী) ও বিয়াস সঙ্গমে অবস্থিত। রঘুনাথপুরে রঘুনাথের মন্দির। কুলূতে বিখ্যাত তীর্থ ত্রিলোকনাথ=ত্রৈলোক্যনাথ ; একটি পাহাড়ের ওপর চন্দ্রভাগার বামতীরে তুণ্ড গ্রামে ; চন্দ্র ও ভাগা নদীর সঙ্গম থেকে ৩২ মাইল নীচে। এখানে ৬-হাত যুক্ত অবলোকিতেশ্বর বিগ্রহ মহাদেব বলে পূজিত হন।

কুল্লুকা—কোন মন্ত্র জপ করার পূর্বক্ষণে ও পরক্ষণে মাথার ওপরে মন্ত্র বিশেষ জপ করা।

কুশ—(১) রামের যমজ ছেলে কুশ ও লব। রাজা হয়ে লোক অপবাদের ভয়ে গর্ভবতী সীতাকে রাম বনে পাঠিয়ে দিলে বাল্মীকি আশ্রমে এঁদের জন্ম হয়। কুশ-গুচ্ছের অগ্রভাগ ও অধোভাগ দিয়ে তৈরি রক্ষা বন্ধনে সদ্য জাত শিশুদের পূতনাদির হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। বড় ছেলের নাম কুশ ও ছোট ছেলের নাম লব রাখেন। রামায়ণে আছে শত্রুঘ্ন লবণকে জয় করতে যাবার সময় যে দিন বাল্মীকি আশ্রমে এসে ওঠেন সেই দিন রাত্রে জন্ম। বড় কুশ ; কুশৈঃ মন্ত্রৈঃ সংস্কৃতৈঃ ফলে নাম কুশ, লবেন সমাহিত শিশুর নাম লব। বাল্মীকি নাম রাখেন এবং গ্রহ-বিনাশিনী সমস্ত ব্যবস্থা করেন। কথাসরিৎ সাগরে সীতার একমাত্র ছেলে লব। সীতা এক দিন ছেলেকে নিয়ে নদীতে স্নান করতে যান। বাল্মীকি জানতেন না ; কোন বন্য জন্তু হয়তো লবকে খেয়ে ফেলেছে ভেবে কুশ দিয়ে একটি শিশু তৈরি করে রাখেন যাতে সীতা ফিরে এসে কিছু যেন বুঝতে না পারেন। নদী থেকে সীতা ফিরে এলে বাল্মীকি নিশ্চিন্ত হন ; কুশ সীতার পালিত পুত্রে পরিণত হন। বাল্মীকি এঁদের শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং রামায়ণ গান শিখিয়েছিলেন। রামের অশ্বমেধ যজ্ঞের সভায়

বাল্মীকি এদের দু জনকে দিয়ে রামায়ণ গান করান। লক্ষ্মণের মৃত্যুর পর কুশকে রাম বিন্ধ্যপর্বত-রোধসি কুশাবতীতে এবং লবকে শ্রাবস্তীতে (রা ৭।১০৮।৪) রাজা করে দিয়েছিলেন। আবার ৭।১০৭।৭ শ্লোকে আছে কোশলে কুশ এবং উত্তরে লব রাজা হন। রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর কুশ অযোধ্যার রাজা হন। কুশের বংশে শেষ রাজা মরু। তারপর বংশ লোপ পায়। কুশ যখন রাজা (হরি ২।৩৮।৪৩) তখন সত্বত পুত্র ভীমের ছেলে অন্ধক মথুরাতে রাজত্ব করতেন। দ্রঃ- লব। (২) ব্রহ্মার ছেলে; প্রখ্যাত ঋষি। বৈদর্ভীর গর্ভে কুশের চার ছেলে হয় কুশাম্ব, কুশনাভ (দ্রঃ). অমূর্তরজা (দ্রঃ) ও বসু (রামা ১।৩২।৬)। এঁরা যথাক্রমে কৌশাম্বী, মহোদয়পুর, ধর্মারণ্য ও ও গিরিব্রজ নামে একটি করে নগরী নির্মাণ করে দেশ শাসন করতে থাকেন। এই মহোদয়পুরই কান্যকুব্জ। (৩) পুরাণ মতে বরাহরূপী বিষ্ণুর লোমই কুশ; অতি পবিত্র মনে করা হয়। কুশের আসন ও কুশ স্পৃষ্ট জল ধর্মকার্যে প্রশস্ত। এই জন্য হয়তো কুশ বা কুশাঙ্গুরীয় নিতে হয়। বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন ভাবে কুশ বেঁধে বিষ্টর, মোটক, ত্রিপত্র ও ব্রাহ্মণ ইত্যাদি তৈরি করে নেওয়া হয়; এগুলি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন কাজে প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত। কুশের অভাবে কাশ ব্যবহৃত হয়। সধবা মেয়েদের কুশ ব্যবহার নিষিদ্ধ।

কুশণ্ডিকা—হোমের সূচনায় অগ্নি সংস্কার রূপ ক্রিয়া। কুশণ্ডিকা সংস্কৃত অগ্নিতে সমস্ত কার্যের হোম করণীয়।

কুশদ্বীপ—সপ্তদ্বীপের একটি। প্রচুর মুক্তা পাওয়া যেত। জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর এই সাতটি দ্বীপ। প্রতিটি দ্বীপের পরিমাণ যথাক্রমে আগের দ্বীপটির থেকে দ্বিগুণ বড়। দ্বীপের অধিপতি জ্যোতিষ্মান। এই দ্বীপে দেবতা, দৈত্য, দানব, গন্ধর্ব, কিন্নর, মানুষ, সকলেই বাস করে। কুশদ্বীপে লোকেরা কুশস্তম্ভের উপাসনা করে। এখানে ৬-টি পর্বত গোমন্ত (নারায়ণের বাস), হেমগিরি, কুমুদ, পুষ্পবান, কুশেশয় ও হরি। এখানে ঔদ্ভিদ, বেণুমণ্ডল, সুরথাকার, কম্বল, ধৃতিমান, প্রভাকর, ও কাপিল ৭-টি বট। এখানে কোন দস্যু ও ম্লেচ্ছ নাই (ভাগ ৬।১২)।

কুশধ্বজ—(১) মিথিলার রাজা সীরধ্বজ-জনকের (দ্রঃ) ভাই, সীতার কাকা। পিতা হ্রস্বরোমা (রা ১।৭১।-)। ইক্ষুমতী নদীর তীরে সাংকাশ্যার রাজা। জনক রাজা হলে জনকের সঙ্গে থাকতেন। সুধন্বা (দ্রঃ)। দশরথ মিথিলাতে এলে পরদিন জনক ভাইকে ডেকে আনান। কুশধ্বজের মেয়ে মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তি। (২) দেবগুরু বৃহস্পতির এক ছেলে। কপর্দক হীন অবস্থায় রাজা সাম্বের সাহায্য চান। কৃপণ রাজা বিশেষ কিছু দেন না। এরপর কুশধ্বজ অর্থের জন্য ভগবতীর ধ্যান করতে থাকেন। এই সময়ে কুশধ্বজের মুখ থেকে বেদবতী/দেববতী নামে একটি বালিকা জন্মায়। অন্য মতে বেদ পাঠ করার সময় মুখ থেকে জন্ম-বালিকার বয়স হলে অসুর শম্ভু (দ্রঃ) বিয়ে করতে চান; কিন্তু কুশধ্বজ সম্মত হন না ফলে অসুরের হাতে এক দিন রাত্রিতে নিহত হন। বেদবতী অভিশাপ দিয়ে অসুরকে ভস্মে পরিণত করেন। অন্য মতে অভিশাপ দেন লক্ষ্মণের হাতে মারা যাবে। এরপর বেদবতী বিষ্ণুকে বিয়ে করার জন্য তপস্যা করতে

থাকেন। এই সময়ে রাবণ এসে একে বিয়ে করতে চান এবং চুলের মুঠি ধরে টানতে থাকেন। বেদবতী নিজের চুল কেটে পালিয়ে যান এবং আগুনে দেহ বিসর্জন করেন। পরজন্মে ইনি সীতা (উত্তর রামায়ণ)। (৩) একটি বানর ; শিবের বরে পরজন্মে কুশধ্বজ রাজা হিসাবে জন্মান। অগ্নিবেশ মুনির কন্যা যখন স্নান করছিলেন রাজা তখন মেয়েটিকে হরণ করেন। ফলে মুনি শাপ দিয়ে রাজাকে শকুনিতে পরিণত করেন। মুনি বলে দিয়েছিলেন ইন্দ্রদ্যুম্নকে সাহায্য করলে সে দিন আবার মানুষের দেহ ফিরে পাবে (স্কন্দ-পু)।

কুশনাভ—ব্রহ্মার এক ছেলে কুশ (দ্রঃ)। এই কুশ মুনির স্ত্রী বৈদর্ভী এবং চার ছেলে কুশাম্ব, কুশনাভ, অমূর্তরজা ও বসু। এই কুশনাভ মহোদয় (কন্যাকুব্জ দ্রঃ) নামে নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। এঁর স্ত্রী ঘৃতাচী এবং ঘৃতাচীর একশত সুন্দরী মেয়ে হয়। কুশনাভ পরে একটি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন এবং পিতা কুশ (রামা ১।৩৪।৩) অন্য মতে ব্রহ্মা এসে সন্তুষ্ট হয়ে বর দেন সমান ধার্মিক ছেলে হবে ; ছেলে হয় গাধি। অন্য মতে কুশনাভের নাতি গাধি। কুশ তারপর ব্রহ্মলোকে প্রয়াণ করেন।

কুশপ্লব—একটি পুণ্য স্থান। এখানে দিতি ইন্দ্রের সমান পুত্র লাভের জন্য তপস্যা করেছিলেন। এই খানেই ইন্দ্র দিতির গর্ভে প্রবেশ করে গর্ভ টুকরো টুকরো করেন। অপর নাম বিশালা (দ্রঃ)। রামলক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রের সঙ্গে গঙ্গা পার হয়ে এখানে আসেন। এখানে মারুতদের (দ্রঃ) জন্ম।

কুশবতী—দেবতারা এখানে মন্ত্রযজ্ঞ করেছিলেন ; কুবের এই যজ্ঞে মণিমানকে নিয়ে আসছিলেন। অগস্ত্য (দ্রঃ) মণিমানকে শাপ দেন। (মহা ৩।১৫৮।৫১)।

কুশভবনপুর—কুশপুর, কুশস্থলী (বায়ু-পু)। অযোধ্যাতে গোমতী তীরে সুলতান পুর। হিউ-এন-ৎস্যাঙ উল্লিখিত। কুশ অযোধ্যা থেকে রাজধানী এখানে নিয়ে আসেন।

কুশস্থল—অন্য নাম কান্যকুব্জ। হয়তো অরিস্থল। দ্রঃ- পাণিপ্রস্থ।

কুশস্থলী—দ্বারকার প্রাচীন নাম। আনর্ত দেশের রাজধানী। রাজা ইক্ষ্বাকুর ভাইপো আনর্ত এর প্রতিষ্ঠাতা। আনর্তের ছেলে রেবত এখানে প্রথম নগরী স্থাপন করেছিলেন। কিছু কাল পরে এই নগরী ডুবে যায় এবং স্থানটি পরিত্যক্ত হয়। কংসের মৃত্যুর পর অস্তি ও প্রাপ্তি প্রতিশোধ নেবার জন্য পিতা জরাসন্ধকে উত্তেজিত করতে থাকেন। বৃষ্ণিরা ফলে মহতী শ্রী ত্যাগ করে সবান্ধবে কুশস্থলীতে গিয়ে বাস করতে থাকেন। এখানে দুর্গের সংস্কার করেন। মেয়েরাও এখানে প্রতিরক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকত। রৈবত পর্বত এখানে শোভা বৃদ্ধি করছে ; এখানে মাধবী তীর্থ (মহা ২।১৩।৪৫)।

অর্থাৎ বাসুদেব/কৃষ্ণ দ্বারকা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করান। যদুবংশ ধ্বংস হবার পর দ্বারকা আবার জলে ডুবে যায়। এই দ্বারকা মনে হয় গুজরাটের পশ্চিমে একটি দ্বীপ। স্কন্দপুরাণে অবন্তির রাজধানী উজ্জয়িনীকে কুশস্থলী বলা হয়েছে। দ্রঃ- কুশাবতী। (২) উজ্জয়িনী। (৩) কুশভবনপুর।

কুশাবতী—অপর নাম কুশস্থলী (দ্রঃ)। কুশাবতী=কুশিয়া। (১) দ্বারাবতী (দ্রঃ)। (২) বিন্ধ্য পর্বতের প্রান্তে যেন প্রাচীন দর্ভবতী (দ্রঃ)। (৩) কুশভবনপুর (দ্রঃ)। (৪) পাঞ্জাবে কশুর/কসুর ; লাহোর থেকে ৩২ মাইল দ-পূর্বে ; কুশ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। (৫) কুশী নগর (দ্রঃ)। (৬) বেণা বা ওয়েন গঙ্গা তীরে একটি স্থান। উজ্জয়িনীর অত্যাচারী রাজা পালক-কে নিহত করে আভীর বংশ প্রতিষ্ঠাতা আর্যক স্থানটি চারুদত্তকে দিয়েছিলেন (মৃচ্ছকটিক)। রামচন্দ্রের ছেলে কুশ কিছু দিনের জন্য বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে কুশাবতীতে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। এই কুশাবতী বিন্ধ্যের দক্ষিণে দক্ষিণ-কোশল রাজ্যের অন্তর্গত সম্ভবত। ওড়িশা ও মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত সম্বলপুর-রায়পুর-বিলাসপুর অঞ্চলের প্রাচীন নাম দক্ষিণ কোশল। একটি মতে গুজরাটের অন্তর্গত ভরোচের প্রায় ৬১ কি-মি উ-পূর্বে দাভোই (=দর্ভবতী) হচ্ছে কুশাবতী। অন্য মতে অবধের অন্তর্গত সুলতানপুরে কুশের রাজধানী ছিল। আর এক মতে লাহোরের ৫১ কি-মি দ-পূর্বে কাসুর হচ্ছে এই কুশস্থলী। (৭) বুদ্ধের পরিনির্বাণের ক্ষেত্র কুশীনগর বা কুসিনারার প্রাচীন নাম কুশাবতী ; এই কুশাবতী প্রাচীন মল্লরাজ্যের অন্তর্গত এবং গোরক্ষপুর জেলাতে অবস্থিত।

কুশাম্ব—(১) উপরিচর বসুর ছেলে বৃহদ্রথ, কুশাম্ব, মাভেল্লা, যদু ও রাজন্য। (২) কুশের একটি ছেলে ; কৌশাম্বী নগরীর প্রতিষ্ঠাতা। মেয়ে চার্বাঙ্গী ; সূর্যবংশে রাজা ভদ্রশরেণ্যর স্ত্রী, কুশাম্বের দুই ছেলে শক্র ও গাধি। দ্রঃ- কুশনাভ, কুশিক।

কুশাবর্ত—(১) ত্র্যম্বক (দ্রঃ)। (২) হরিদ্বারে একটি পবিত্র সরোবর।

কুশিক—(ক) কুশনাভের ছেলে কুশিক। গাধির পিতা। বিশ্বামিত্রের পিতামহ। ইন্দ্রের সমান ছেলে পাবার আশায় তপস্যা করেন। ইন্দ্র এসে একবার দেখে যান ; তারপর হাজার বছর পরে আবার দেখে যান। শেষ কালে স্ত্রী পৌরকুৎসীর গর্ভে ইন্দ্র পুত্র হয়ে জন্মান। এই ছেলে গাধি ; অর্থাৎ ইন্দ্রের অবতার। গাধির ছেলে বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব পাবেন জানতে পেরে চ্যবন বিচলিত হয়ে পড়েন যে কুশিক বংশ থেকে তাঁর নিজের বংশে ক্ষত্রিয়ত্ব সঞ্চারিত হবে। এই জন্য চ্যবন কুশিক বংশ নষ্ট করতে চেষ্টা করেন ; কিন্তু সফল হন নি। দ্রঃ- জহ্নু। (খ) দুষ্যন্ত(১)>ভরত(২) >অজমীঢ়(৫)>কুশিক(৮)। জহ্নু বংশে কুশিকরা জন্মান (মহা ১।৮৯।২৯)। (৩) সর্পদষ্ট প্রমদ্বরাকে এক জন কুশিক দেখতে এসেছিলেন।

কুশী—অন্য নাম কৌশিকী। রামায়ণ ও বরাহপুরাণে একটি নদী। কথিত আছে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এখন গঙ্গার একটি উপনদী। নেপালে নাম সপ্তকুশী। বরাহ ক্ষেত্রের ৫-কি-মি উত্তর থেকে সাতটি নদী মিলে সমতলে নেমে এসেছে।

কুশীনগর—কুশীনার, কুশাবতী, কুশিয়া। ২৬°৪৫′ উ×৮৩°৫৫′ পূ। উত্তর প্রদেশ দেওড়িয়া জেলায় কাসিয়া। স্থানীয় নাম মাথা-কুঅর-কা-কোট। বর্তমানের কাসিয়া সহরের দ-পশ্চিমে প্রায় ৩ কি-মি ও সদর সহর দেওড়িয়ার উ-পূর্বে প্রায় ৩৫ কি-মি দূরে প্রাচীন কুশীনগরে বৌদ্ধধ্বংসাবশেষ রয়েছে। বেতিয়া থেকে উ-পশ্চিমে এবং গোরক্ষপুর থেকে ৩৫-৩৭ মাইল পূর্বে কসিয়া গ্রাম যেন। হিরণ্যবতী ও ছোট-গণ্ডকীর

পুরাতন খাতে। কুশীনগরের প্রাচীন নাম কুশাবতী (দ্রঃ)। এখানে মল্লবংশীয় রাজা মহাসুদর্শনের রাজধানী ছিল। এটি ছিল গণতন্ত্র। বুদ্ধদেবের সময় কুশীনগরের সমৃদ্ধি বিলুপ্ত প্রায়। পরিনির্বাণের কিছু পরে এই রাজ্য মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়ে পড়ে। এখানে ৮০ বছর বয়সে কুশীনার উপবত্তনে হিরণ্যবতী নদীর সমীপে মল্লদের শালকুঞ্জে বুদ্ধদেব (৪৭৭/৫৪৩ খৃ-পূ) দেহ রক্ষা করেন। দুটি শালগাছের মাঝখানে, রাত্রির তৃতীয় প্রহরে ডান দিকে ফিরে শুয়েছিলেন ; মাথা উত্তর দিকে। অজাতশত্রু তখন ৮ বছর রাজত্ব করেছেন। অশোক এখানে তিনটি স্তূপ নির্মাণ করান। বুদ্ধের চিতা-ভস্ম বহিতে একটি স্তূপে রাখা হয়েছিল। বহি উপস্থিত মোরিয় নগর, ন্যগ্রোধবনে অবস্থিত ; হিউ-এন-ৎসাঙ এসেছিলেন। গোরখপুর জেলাতে কসিয়ার কাছে ধ্বংসাবশিষ্ট অনিরুদ্ধতে মল্ল অভিজাতদের প্রাসাদ ছিল। দ্রোণ নামে এক ব্রাহ্মণ বুদ্ধের অস্থি আটভাগ করে লিচ্ছবি (বৈশালীতে), শাক্য (কপিলাবস্তু), বুলয় (অল্লকপ্পক), কোলিয় (রামগ্রামে), ব্রাহ্মণ (বেঠদ্বীপ=বেথিয়া ?), মল্ল (পাবাতে), মল্ল (কুশীনার) ও অজাতশত্রু (পাটলিপুত্রে) এদের দান করেন। এঁরা সকলেই এই অস্থি নিয়ে স্তূপ রচনা করেছিলেন। যে কলসী করে এই অস্থি ভাগ করেছিলেন সেই কলসীর ওপর দ্রোণ একটি স্তূপ নির্মাণ করেন। পিপ্ফল-বতীর মৌর্যরা বুদ্ধের কিছু চিতা কাষ্ঠ নিয়ে স্তূপ রচনা করেন। একটি মতে কাসিয়তে বুদ্ধদেব কাসায় বস্ত্র গ্রহণ করেছিলেন ; ফলে এই নাম। এখানে প্রধান মন্দিরে মুমূর্ষু বুদ্ধের মূর্তি রয়েছে ; পাশে স্তূপের (নির্বাণস্তূপ) মধ্যে তাম্রফলক পাওয়া গেছে। এখানকার সংঘারামগুলির মধ্যে মহাপরিনির্বাণ বিহার ও মুকুটবন্ধন বিহার উত্তর ভারতে বৌদ্ধধর্মের শেষ দিন পর্যন্ত নিজেদের প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রেখেছিল।

কুষ্মাণ্ড—শিবের অনুচর ; এক শ্রেণীর দানব। একটি সাপ।

কুসুমপুর—(১) কান্যকুব্জের আর এক নাম। (২) কুসমপুর=পাটলিপুত্র। কুসুমপুর>কুম্রার ; আসলে এটি পাটনার দক্ষিণ অংশে। মুদ্রা রাক্ষসে এটি ধনী ও অভিজাত এলাকা ; স্থানীয় নাম থেকে পরে পাটনা কুসুমপুর নাম পায়। এখানে রাজবাটি ছিল।

কুস্তন—কস্তান। স্তন। পূর্ব বা চীন তুর্কিস্তানে খোটানের রাজধানী। এখানে জেড পাথর প্রসিদ্ধ। ফা-হিয়েন ও হিউ-এন-ৎসাঙ পরিদৃষ্ট। প্রাচীন রাজধানী য়োটকান ; বর্তমানের খোটান নগর থেকে কিছু পশ্চিমে। পুরাতন পাণ্ডুলিপিতে নাম খোটান/কুস্তনক। তক্ষশিলা থেকে ভারতীয়েরা খৃ-পূ-২ শতকে স্থানটি জয় করে উপনিবেশ বসান। এখানে বহু মন্দির, স্তূপ ও বৌদ্ধ মূর্তি পাওয়া গেছে। টাকলামাকান মরুভূমির বালি চাপা পড়েছিল। ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী লিপিতে বহু দারুলেখ পাওয়া গেছে। ৩-৮ খৃ শতকের বহু পাণ্ডুলিপি মিলেছে। ফা-হিয়েন ৪র্থ শতকে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের ত্রিরত্ন রথ এখানে টানা হতে দেখেছেন। ইৎ-সিঙ বলেছেন কুস্তন।

কুহূ—(১) একানংশা (দ্রঃ)। অঙ্গিরার ৭ম কন্যা। অদ্বিতীয়া ও অনংশা বলে বিস্ময়ে লোকের মন কুহু কুহু করে ওঠে; ফলে নাম কুহু (মহা ৩।২০৮।৮)। দ্রঃ-অগ্নিবংশ, স্মৃতি। (২) কুভা (দ্রঃ)। সিন্ধু নদী কুহুদের দেশ দিয়ে প্রবাহিত। গান্ধার, ঊরসা ও কুহু অঞ্চলের অধিবাসীদের উল্লেখ রয়েছে মৎস্য পুরাণে।

কূর্চামুখ—বিশ্বমিত্রের এক ছেলে। ব্রহ্মবাদী।

কূর্ম—বৈদিক যুগ থেকে বিভিন্ন দেবতার সঙ্গে জড়িত। (১) শতপথ ব্রাহ্মণে আছে ব্রহ্মা নিজে সৃষ্টির জন্য কূর্মরূপ ধারণ করেছিলেন। (২) বিষ্ণুর দ্বিতীয়, অন্য মতে একাদশ অবতার। প্লাবনে যে সব আবশ্যক বস্তু ডুবে গিয়ে ছিল সত্য যুগে সেগুলি তোলবার জন্য বিষ্ণু কূর্মরূপে নিজেকে ক্ষীরোদ সাগরের নীচে স্থাপন করে পিঠে মন্দর পর্বত ধারণ করেন। মন্দর পর্বত মন্থন দণ্ড হয়েছিল ; অমৃত ইত্যাদি দেবতারা লাভ করেন। মন্দর খুব বেশি উঠে গেলে বিষ্ণু আবার শ্যেন হয়ে মন্দরের উপর এসে বসে পাহাড়কে নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করেন। ভাগবতে (৮।৭।৬-৮) আছে সমুদ্র মন্থনের সময় মন্দর পর্বত ডুবে যাচ্ছিল। বিষ্ণু বিশাল কচ্ছপ দেহ ধারণ করে পাহাড়টিকে তুলে ধরেন। অর্থাৎ ভাগবতে বিষ্ণুই কূর্ম। কিন্তু মৎস্য পুরাণে কূর্ম বিষ্ণুর অংশ। মৎস্য পুরাণে ব্রহ্মা দেবতাদের সমুদ্র মন্থনের জন্য বলেন এবং পাতালস্থিত বলি, কূর্মরূপী বিষ্ণু ও মন্দর পাহাড়ের সাহায্য নিতে বলেন। বিষ্ণুর চতুর্থ অংশ কূর্ম ও শেষ নাগ রূপে মন্থনে অংশ নেয়। মহাভারতে দেব ও দানবদের অনুরোধে কূর্মরাজ মন্দরপর্বত ধারণ করেছিলেন ; কিন্তু এই কূর্ম বিষ্ণু কিনা মহাভারতে নাই। শতপথে প্রজাপতি প্রজাসৃষ্টির উদ্দেশ্যে কূর্মরূপ ধারণ করেন। দ্রঃ- অকূপার।

মাদ্রাজে গঞ্জাম জেলাতে কূর্মস্থান নামে একটি তীর্থ আছে : এখানে কূর্মাবতারের মন্দিরে বিষ্ণুর কূর্মমূর্তি বর্তমান। তন্ত্র শাস্ত্রে কূর্মের রং নীল। ভাস্কর্যে দশ অবতারের মূর্তির মধ্যে কখনো প্রকৃত কচ্ছপ আকৃতি; আবার কখনো উপর ভাগে চার হাত বিষ্ণু এবং নীচের অংশ কচ্ছপ। (৩) জলদেবী যমুনার বাহন। মন্দির ইত্যাদির দরজায় মকরবাহন গঙ্গা ও কূর্মবাহন যমুনার মূর্তি দেখা যায়। (৪) জৈন তীর্থঙ্কর মুনি সুব্রতের লাঞ্ছন এই কূর্ম। দ্রঃ অবতার।

কূর্মক্ষেত্র—গঞ্জাম জেলাতে সমুদ্র তীরে চিকাকোল থেকে ৮ মাইল পূর্বে। বর্তমানে শ্রীকূর্ম।

কূর্মাচল—কুমায়ুন=কূর্মবন=কুমারবন। প্রাচীন রাজধানী কূর্মাচল চম্পাবতী (দ্রঃ), বর্তমানে আলমোড়া। পশ্চিম সীমা ত্রিশূল পাহাড় ; ত্রিশূলের মত দেখতে। কুমায়ুনে পূর্ণাগিরিতে অন্নপূর্ণার/পূর্ণাদেবীর বিখ্যাত মন্দির। এখানে লোহাঘাটে কূর্মঅবতার হন ; মন্দর (দ্রঃ) ধারণের জন্য। অন্য নাম দুর্নাগিরি পর্বত, দ্রোণাচল। লোধমুন বনে (লোধ্রকাননে) গর্গ ঋষির আশ্রম ছিল : এই বনে গগাস নদীর উৎপত্তি এবং ধৌলিতে গিয়ে পড়েছে। দ্রঃ- কর্তৃপুর, কার্তিকপুর, শোণিতপুর, পঞ্চগঙ্গা। কুমায়ুন প্রদেশ পাহাড়ি এলাকা ; গগরার পশ্চিম শাখা (এটিও কালী নদী) ও রামগঙ্গার (দ্রঃ) মধ্যবর্তী অঞ্চল।

কৃত—জনক বংশে একজন রাজা। ছেলে শুনক। কৃতের সাতটি অতি সুন্দরী মেয়ে ছিল। এরা বাল্যেই সমস্ত বাসনা ও বন্ধন জয় করে শ্মশানে গিয়ে মাটিতে শুয়ে থাকেন এবং নিজেদের দেহ পশুপাখীদের ভক্ষ্য হিসাবে দান করেন (ক-সরি)।

কৃতদ্যুতি—রাজা চিত্রকেতুর একটি স্ত্রী। সমস্ত স্ত্রীগুলিই নিঃসন্তান ছিলেন। রাজা

অঙ্গিরসের আরাধনা করে বর পান এবং কৃতদ্যুতির একটি সন্তান হয়। কিন্তু সপত্নীরা তাকে বিষ দিয়ে হত্যা করেন। রাজারাণী শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লে নারদ ও অঙ্গিরস এসে অনেক বোঝাতে চেষ্টা করেন এবং শেষ অবধি অঙ্গিরস মৃত শিশুর আত্মাকে এনে উপস্থিত করেন। এই আত্মা সকলকে সশ্রদ্ধ প্রণাম করে বলেন বহু জন্মই তাঁকে জন্মাতে হয়েছে ; সব পিতামাতা চান তাঁদের সন্তান বেঁচে উঠুক ; এদের মধ্যে তিনি কার দাবি পূর্ণ করবেন। রাজা ও কৃতদ্যুতি কোন সদুত্তর দিতে পারেন না ; আত্মা ফিরে যায়। এর পর এঁরা দুজনে পৃথিবী পর্যটনে বার হন। কৈলাসে শিবের কোলে পার্বতীকে বসে থাকতে দেখে চিত্রকেতু নিজেই লজ্জিত হয়ে পড়েন এবং পার্বতীকে অবজ্ঞা করেন। ফলে পার্বতীর শাপে চিত্রকেতু বৃত্রাসুর হয়ে জন্মান। কৃতদ্যুতি এই শাপ শুনে আত্ম বিসর্জন করেন।

কৃতবর্মা—(১) বৃষ্ণি বংশে এক রাজা। যযাতি(১)->যদু ২)->হেহয়(৫)->ধনক(৯)। ধনকের ছেলে কৃতবর্মা কৃতবীর্য, (দ্রঃ), কৃতাগ্নি. ও কৃতৌজস্। (২) ভোজ বংশে এক যোদ্ধা। হৃদিকাৎ (মহা ১।৫৭।৮৮) এবং মরুৎদের গণ থেকে (মহা ১।৬১।৭৪) ফলে নাম হার্দিক্য ও। স্যমন্তক মণি নিয়ে কলহের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অভিমন্যু বধের সপ্তরথীর এক জন। অশ্বত্থামা যখন রাত্রি বেলা পাণ্ডব শিবির আক্রমণ করেছিলেন তখন কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা শিবিরের দরজায় পাহারা ছিলেন। কৌরব পক্ষে যে তিন জন যোদ্ধা বেঁচে গিয়ে ছিলেন তাঁদের মধ্যে এক জন। যদুবংশ ধ্বংসের সময় সাত্যকির হাতে নিহত। ভাগবতে (১০।৬১) কৃতবর্মার ছেলে বলী। বলীর স্ত্রী রুক্মিণী কন্যা চারুমতি। (৩) ভোজের নাতি কৃতবর্মা। কৃতবীর্য(১)-বৃষ্ণি(৪)-সাত্যকি (৮)-ভোজ (১৭)-কৃতবর্মা (১৯)। এই ব্যক্তি কৃষ্ণের পিতামহ শূরসেনের ভাই।

কৃতবীর্য—চন্দ্রবংশে রাজা ধনকের চার ছেলে কৃতবীর্য, কৃতবর্মা (দ্রঃ), কৃতাগ্নি ও কৃতৌজস্।

কৃতবীর্য—পৃথিবীতে একজন বিখ্যাত রাজা (মহা ১।১৬৯।১১)। ভৃগু এঁদের পুরোহিত। রাজা পুরোহিতদের প্রচুর দক্ষিণা দিতেন। রাজা মারা গেলে এঁর বংশধরদের একবার অর্থের অভাব পড়ে এবং ভার্গবদের কাছে গিয়ে কিছু অর্থ চান। ভার্গবরা কেউ বা মাটির নীচে কেউ বা অপর ব্রাহ্মণকে দিয়ে নিজেদের ধনরত্ন লুকিয়ে ফেলেন। কয়েক জন ভার্গব এই বংশধরদের কিছু দিয়েও ছিলেন। একজন ক্ষত্রিয়ের সন্দেহ হয় এবং এক ভার্গবের বাড়িতে মাটি খুঁড়ে কিছু অর্থের সন্ধান পান। ক্ষত্রিয়েরা তখন শরবর্ষে ব্রাহ্মণদের শেষ করতে থাকেন ; গর্ভস্থ বালকদেরও বাদ দেন না। ভার্গবপত্নীরা তখন ভয়ে হিমালয়ে পালিয়ে যান। দ্রঃ- ঔর্ব।

কৃতমালা—(১) এই নদীতে বিষ্ণু মৎস্যরূপে প্রথম দেখা দেন। (২) ভেগা নদী, তীরে দ-মথুরা (=মাদুরা) ; মলয় পর্বতে উৎপন্ন (মার্ক, বিষ্ণু)।

কৃতাগ্নি—দ্রঃ- কৃতবীর্য।

***কৃতাশ্ব**—দক্ষ ও বীরণীর ৬০-টি মেয়ে ; এদের মধ্যে ১৩ জনকে কশ্যপ, ১০ জনকে*

ধর্ম, ২৭ জনকে চন্দ্র, ২ জনকে ভৃগু, ৪ জনকে অরিষ্টনেমি, ২ জনকে কৃশাশ্ব (দ্রঃ), এবং ২-জনকে অঙ্গিরস বিয়ে করেন।

কৃতি—(১) জৈমিনির ছেলে সুমন্তু, সুমন্তুর ছেলে সুত্বা ; সুত্বার ছেলে সুকর্মা। সুকর্মার শিষ্য হিরণ্যনাভ এবং হিরণ্যনাভের শিষ্য কৃতি। সামবেদের ২৪-টি-সংহিতা এই কৃতির রচনা। (২) নহুষের কনিষ্ঠ পুত্র। (৩) এক জন বিশ্বদেব।

কৃত্তিকা—(১) একটি নক্ষত্র পুঞ্জ (এটা টাউরি। প্লেইডস্)। স্কন্দ জন্মালে দেবতারা অন্য মতে পার্বতী ছয় জন মাতৃকাকে ধাত্রী হিসাবে স্তন্য দেবার জন্য পাঠান। মহাভারত (৯।৪৩।১১) অনুসারে এঁরা নিজেরাই ছুটে এসেছিলেন। একটি মতে শিশুর ছয়টি মুখ ছিল বলে এরা ছয় জন এসে ছিলেন। আর একটি মতে এরা ছয় জন এসে ছিলেন বলে শিশুর ছয়টি মাথা হয়েছিল। স্তন্যদান শেষ হলে এঁরা আকাশে উঠে গিয়ে কৃত্তিকা নক্ষত্রে পরিণত হন। (২) দক্ষের একটি মেয়ে কৃত্তিকা ; চন্দ্রের স্ত্রী; চন্দ্র যক্ষাগ্রস্ত ছিলেন বলে চন্দ্রের কোন স্ত্রীর সন্তান হয় নি।

কৃত্যা—একজন রাক্ষসী। অথর্ব বেদে অভিচার অংশের মন্ত্র-বলে এই রাক্ষসী জন্মায় এবং শত্রু ধ্বংস করে। পুরুষ রূপেও জন্মাতে পারে। (১) পাণ্ডবদের বনবাসের শেষদিকে পাণ্ডবরা দুর্যোধনকে (দ্রঃ) মুক্ত করে দিলে অপমানে যখন প্রায়োপবেশ করেন (মহা ৩।২৩৯। ২২) তখন অসুররা এক কৃত্যাকে সৃষ্ট করেন। কৃত্যা দুর্যোধনকে পাতালে ধরে নিয়ে যান ; এখানে অসুররা দুর্যোধনকে সমর্থন করেন ; পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করতে নিষেধ করেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন দুর্যোধনকে সব বিষয়ে সাহায্য করবেন। অসুররা তার পর দুর্যোধনকে হস্তিনাপুরে পৌঁছে দেন। (২) চ্যবন অশ্বিনীকুমারদের সোমপানের অধিকার দিতে গেলে ইন্দ্র বাধা দেন এবং বজ্রাঘাত করবেন স্থির করেন। চ্যবন তখন ইন্দ্রের হাত স্তম্ভিত করে দিয়ে যজ্ঞাগ্নি থেকে একজন কৃত্যার সৃষ্টি করেন ; নাম ছিল মদ ; অতি ভয়ঙ্কর চেহারা ; একে দেখে ভীত হয়ে ইন্দ্র সোমপানে সম্মতি দেন। (৩) অম্বরীষকে (দ্রঃ) এক কৃত্যা হত্যা করতে যায়। (৪) কৃষ্ণ যখন দ্বারকাতে রাজা তখন কারুষ দেশে পৌণ্ড্রক-বাসুদেব রাজা। ইনি এক বার কৃষ্ণকে বলে পাঠান কৃষ্ণ যেন তাঁকে প্রণাম করে যান। কৃষ্ণ রাগে সুদর্শন চক্রে রাজার শিরচ্ছেদ করেন। রাজার ছেলে সুদক্ষিণ তখন কাশীতে এসে শিবের তপস্যা করতে থাকেন এবং শিবের কাছ থেকে কি করে কৃত্যা সৃষ্টি হয় শিখে নেন। সুদক্ষিণ তারপর অগ্নি থেকে কৃত্যার জন্ম দিলে এই কৃত্যা কৃষ্ণকে নিধন করতে ছুটে যায় কিন্তু সুদর্শন চক্রে এই কৃত্যা ও সুদক্ষিণ দুজনেই নিহত হন। (৫) প্রহ্লাদের চরিত্র পরিবর্তনের জন্য তাঁর শিক্ষকরা আগুন থেকে কৃত্যার সৃষ্টি করেছিলেন। এই কৃত্যা প্রহ্লাদের গলায় শূলবিদ্ধ করতে চেষ্টা করলে শূল চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। কৃত্যা তখন ক্রোধে এই শিক্ষকদের আক্রমণ করে মৃতপ্রায় করে দেন। প্রহ্লাদ এঁদের গায়ে হাত দিয়ে সুস্থ করেন। (৬) বৃষাদর্ভি যাতুধানী (দ্রঃ) নামে এক কৃত্যার সৃষ্টি করে সপ্তর্ষিদের হত্যার জন্য পাঠিয়ে ছিলেন। (মহা ১৩।৯৪।৪০) (৭) যবক্রীতকে রৈভ্যের (দ্রঃ) কৃত্যা হত্যা (মহা ৩।১২৮।৩৯) করে।

কৃপ—বা কৃপাচার্য। নহুষ(১)-যযাতি(২)-সঞ্জাতি(১১)-দুষ্মন্ত(১৬)-ভরত(১৭)-অজমী

(২৪)-মুদ্গল(৩২)। মুদ্গলের কন্যা অহল্যা ; গৌতমের স্ত্রী, ছেলে শতানন্দ। শতানন্দের ছেলে সত্যধৃতি এবং সত্যধৃতির ছেলে (ভাগ ৯।২১) শরদ্বান (দ্রঃ)। শরদ্বান কঠোর তপস্যা করছিলেন ; বেদ পাঠে সে রকম মন ছিল না ; ধনুর্বিদ্যায় অত্যন্ত কুশলী হয়ে ওঠেন। ইন্দ্র/দেবতারা ভয় পেয়ে অপ্সরা জানপদী/রম্ভাকে (ভাগবতে উর্বশী) পাঠান। এক বস্ত্র পরিহিতা অপ্সরা সামনে এসে নাচতে থাকেন। ফলে মুনির বীর্যপাত হয়, পাশেই ধনুর্বাণ ছিল। এই বাণের ওপর বীর্য পড়ে দুভাগ হয়ে একটি ছেলে ও একটি মেয়েতে পরিণত হয়। মহাভারতে (১।১২০।২০) আছে শন্তনু মৃগয়াতে এলে এক জন অনুচর শরদ্বানের (দ্রঃ) শিশু দুটিকে দেখতে পায় এবং ধনু, শর, কৃষ্ণাজিন ইত্যাদি দেখে ব্রাহ্মণ সন্তান বলে বুঝতে পারে এবং শন্তনুর কাছে এদের নিয়ে আসে। রাজা কৃপান্বিত হয়ে পালন করতে থাকেন ; ফলে নাম কৃপ ও কৃপী। গৌতম জানতে পেরে এসে সব পরিচয় দেন ও অস্ত্রবিদ্যা ইত্যাদি সব কিছু শিক্ষা দিয়ে যান। ফলে অল্প কালেই কৃপ আচার্য পদ লাভ করেন। কৌরব, পাণ্ডব, বৃষ্ণি ও অন্যান্য বালকরাও অস্ত্রশিক্ষা করতে থাকে।*মহাভারতে (১।৬১।৭১) শ্লোকে আছে রুদ্রের গণ থেকে কৃপের জন্ম। রাজ-বাড়ির বালকরা কৃপের কাছে অস্ত্রশিক্ষা করলেও আরো একজন ভাল অস্ত্রবিদের খোঁজ চলতে থাকে এবং দ্রোণ এলে দ্রোণকে এই ভার দেওয়া হয় (মহা ১।১২১।-)। অন্য মতে শরদ্বান এসে জানিয়েছিলেন ইত্যাদি। কুরুপাণ্ডবদের অস্ত্র পরীক্ষার সময় কর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে এলে এই কৃপাচার্যই সূতপুত্র বলে কর্ণকে বাধা দিয়েছিলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে ইনি কোষাগারের দায়িত্ব ও দক্ষিণা দেবার ভার নিয়েছিলেন। অজ্ঞাতবাসের সময় দুর্যোধনের নিযুক্ত চরগুলিকে যুধিষ্ঠিরদের খুঁজে বার করবার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন এবং দুর্যোধনকে রাজকার্যে পরামর্শ দিতেন। কুরুক্ষেত্রে বহু পাণ্ডব যোদ্ধা নিহত করেন। অশ্বত্থামাকে এক বার দুর্যোধনকে আটকাতে বলেন যাতে দুর্যোধন অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে না পারেন। অভিমন্যু বধের সপ্তরথীদের মধ্যে এক জন। দ্রোণ মারা গেলে কৃপ ভয়ে পালিয়ে যান। কর্ণকে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করতে বলেছিলেন। যুদ্ধের শেষে দ্বৈপায়ন হ্রদে পালিয়ে যান এবং যুধিষ্ঠিররা এখানে এলে কৃপ এখান থেকেও পালান। দুর্যোধনের উরু ভঙ্গের পর দুর্যোধনের নির্দেশে অশ্বত্থামাকে সেনাপতি করেন এবং রাত্রি বেলা গোপনে পাণ্ডব শিবির আক্রমণ করেন। যুদ্ধে অবশিষ্ট তিন জন কৌরব বীরের মধ্যে এক জন। দ্রঃ-কৃতবর্মা। যুদ্ধের পর পাণ্ডবরা এঁকে সাদরে গ্রহণ করেন। ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে বনে যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র সঙ্গে নেন নি। মহাপ্রস্থানের সময় পাণ্ডবরা এঁকে পরিক্ষিতের গুরু নিযুক্ত করে যান। শেষ পর্যন্ত বনে গিয়ে দেহত্যাগ করেন।

কৃপী—কৃপের (দ্রঃ) বোন। দ্রোণের স্ত্রী ; অশ্বত্থামার মা।

কৃমি—অঙ্গবংশে এক রাজা। উশীনরের (দ্রঃ) স্ত্রী কৃমী ; কৃমীর ছেলে কৃমি।

কৃমিভোজন—একটি নরক।

কৃশাশ্ব—ভৃশাশ্ব। একজন প্রজাপতি। দক্ষের (দ্রঃ- অসিক্নী) কন্যা জয়া ও সুপ্রভাকে বিয়ে করেন। জয়ার মহাতেজস্বী মন্ত্ররূপ ৫০০-টি ছেলে হয়। এবং সুপ্রভারও ভয়ঙ্কর

(রামা ১।২১।১৫) শর রূপ ৫০০-টি ছেলে হয়। এরা সংহারাস্ত্র নামে পরিচিত। বিশ্বামিত্র তপস্যার বলে এই ১০০০ ছেলে/শরগুলি নিজের করে নেন ; এবং রামলক্ষ্মণকে এগুলি দান করেছিলেন। ভৃশাশ্ব তনয়ান্ রাম ভাস্বরান্ কামরূপিণঃ (রামা ১।২৮।১০)। হরিবংশে (৩।৬৫) সন্তান দেবপ্রহরণানি। দ্রঃ- অশ্ব।

কৃষ্ণ—বিষ্ণুর পূর্ণ অবতার বলে স্বীকৃত। যদুবংশে জন্ম। নহুষ(১)-যযাতি(২)-কার্তবীর্যার্জুন(১২)-শিনি(১৯)-পৃষ্ণি(২৫)-হ্নদিক(৩০)-শূরসেন(৩১)-বসুদেব(৩২)। হরিবংশে (১।১৪।১৬১) ২৮-শ দ্বাপরে জন্ম। এর কিছু আগে ব্যাস। দ্রঃ- তারকাময় যুদ্ধ। কংসের (দ্রঃ) বোন দেবকীর সঙ্গে বসুদেবের বিয়ে হয়। বরুণের শাপে কশ্যপ (দ্রঃ) অদিতি ও সুরমা যথাক্রমে বসুদেব, দেবকী ও রোহিণী হয়ে জন্মান। ব্রহ্মার হৃদয় থেকে ধর্ম জন্মান এবং দক্ষের মেয়েদের বিয়ে করেন। সন্তান হয় হরি, কৃষ্ণ, নর ও নারায়ণ। হরিও কৃষ্ণ যোগী হয়ে যান ; নর ও নারায়ণ মুনি হয়ে যান। এই নারায়ণ (দ্রঃ) মুনি অপ্সরাদের বর দিয়েছিলেন কৃষ্ণ হয়ে জন্মে এঁদের বিয়ে করবেন। কাব্যমাতাকে (দ্রঃ) হত্যা করার জন্য ও ভৃগুর শাপ ছিল বিষ্ণুকে বার বার জন্মাতে হবে। আর একটি ঘটনা পৃথিবী একবার ধেনুরূপ ধরে ব্রহ্মার কাছে গিয়ে অভিযোগ করেন দেবাসুরের যুদ্ধে যে সব অসুররা মারা গেছেন তাঁরা সকলে দুষ্ট রাজা হয়ে পৃথিবীতে জন্মাচ্ছেন পৃথিবী এদের ভার সহ্য করতে পারছেন না। ব্রহ্মা তখন শিবের কাছে এবং শিব বিষ্ণুর কাছে যান। বিষ্ণু তখন আশ্বাস দেন তিনি বসুদেবের ছেলে হয়ে জন্মাবেন। দেবতারা গোপ হয়ে এবং অপ্সারারা যেন গোপিকা হয়ে জন্মান। হরিবংশে (১।৫০।৩৭) তারকাময় যুদ্ধে কালনেমিকে নিহত করে সত্যযুগে বিষ্ণু যোগ নিদ্রায় ঘুমাতে যান। দ্বাপর শেষ হয়ে এলে সুদুঃখিতান্ লোকান্ জ্ঞাত্বা ঘুম ভাঙে। সকল মানুষ সৎপথে আছে কিন্তু এত মানুষ! পৃথিবীকে ভার পীড়িত দেখেন। নারদ এসে (১।৫৪।১৭) এই সময় অংশাবতার হয়ে জন্মাতে বলেন। অন্তর্বর্তী কালে বিষ্ণু ঘুমিয়েছিলেন। মধ্যবর্তী অবতারগুলি কি করে সম্ভব হয়েছিল বলা নাই। ব্রহ্মাও এই সময় দেবকীর গর্ভে জন্মাতে বলেন :—গোপকন্যাদের রময়ন্ চর মেদিনীম্ (১।৫৪ ৫২)। ক্ষীরোদ সাগরের উত্তরে নিজ বাসস্থান মেরু পর্বতে পার্বতী নামে গুহাতে বিষ্ণুর তিনটি পদচিহ্ন আছে। এখানে নিজের পুরাতন দেহ রেখে বসুদেবের ঘরে জন্মাতে যান। দ্রঃ- বিষ্ণু।

কংসের (দ্রঃ) হাতে দেবকীর প্রথম ছয়টি সন্তান নিহত হয়। সপ্তম সন্তান অনন্তের অংশে ; গর্ভকালে সন্তানটিকে রোহিণীর গর্ভে যোগমায়াকে দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। গর্ভ নষ্ট হয়ে গেছে খবর ছড়ায়। অষ্টম বার গর্ভ হলে কারাগারে কঠোর পাহারার ব্যবস্থা হয়। জন্ম রাত্রে কৃষ্ণাষ্টমীতে সিংহ মাসে বসুদেবের সামনে ভগবান এসে নির্দেশ দেন যে শিশু জন্মালেই তাকে নন্দের স্ত্রী যশোদাকে দিয়ে যশোদার সদ্য জাত মেয়েটিকে নিয়ে আসতে হবে (দ্রঃ- যোগমায়া, উমা)। হরিবংশে (২।৩।১৭) অর্দ্ধরাত্রে অভিজিৎ লগ্নে, জয়ন্তী নামে শর্বরীতে, বিজয় নামে মুহূর্তে জন্ম। জন্মেই বসুদেবকে বলেন নন্দরাজার ঘরে রেখে আসতে। ভাগবতে চতুর্ভুজ হয়ে জন্মান ; এরপর মানব শিশুতে পরিণত হন। দ্রঃ- একানংশা। মহামায়ার মায়াতে সকলে অচৈতন্য হয়ে

পড়লে কৃষ্ণের জন্ম হয় ; কারাগারের দরজা খুলে যায়। বসুদেব ছেলেকে নিয়ে বার হয়ে যান ; পথে বৃষ্টিতে শেষ নাগ ফণা ধরে বৃষ্টি থেকে রক্ষা করেন, এবং হেঁটে যমুনা পার হয়ে যশোদার বাড়িতে আসেন। এখানেও সকলে অচৈতন্য, ঘরের দরজা উন্মুক্ত ; বসুদেব কৃষ্ণকে রেখে যশোদার মেয়েকে নিয়ে ফিরে আসেন। প্রহরীদের তখন ঘুম ভাঙে ; কংস (দ্রঃ) সন্তান হয়েছে খবর পান। বসুদেব নিজে (হরিবংশ ১।৪।২৮) কংসকে কন্যা হয়েছে খবর দেন। দ্রঃ-উর্ণা।

বসুদেব বলরামকেও নন্দালয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং দুই ভাইয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ছেলেদের বিপদ হতে পারে এই ভয়ে বসুদেব নন্দকে মথুরা ছেড়ে গোকুলে চলে যেতে বলেছিলেন। ফলে নন্দ এঁদের নিয়ে চলে যান।

এর পর ক্রমাগত কংসের চরেরা কৃষ্ণকে হত্যা করবার জন্য আসতে থাকে। প্রথমে আসে পূতনা (দ্রঃ) এবং মারা যায়। তার পর শকটাসুর (দ্রঃ) ও তৃণাবর্ত (দ্রঃ) আসে। কৃষ্ণ স্তন্য পান করছিলেন, তৃণাবর্ত আসলে কৃষ্ণ ক্রমশ ভারী হয়ে ওঠেন ; যশোদা কোলে রাখতে পারেন না : অবাক হয়ে কৃষ্ণকে মাটিতে নামিয়ে দেন; তৃণাবর্ত কৃষ্ণকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে। এদের জাতকর্ম ইত্যাদি এবং বাল্যকালে শিক্ষার ব্যবস্থা করেন ব্রহ্ম গার্গ্য (হরি ২।১০১।৪৫)।

এর পর গার্গ্য মুনি এক দিন এসে দেবকীর ছেলের নাম কৃষ্ণ ও রোহিণীর ছেলের নাম বলরাম রেখে যান। গোপনে ভাগ ১০।৮) কাজ করা হয়। পরে কংসের মৃত্যুর পর (ভাগ ১০।৪৫) উপনয়ন দিয়েছিলেন। শিশু কৃষ্ণ এক দিন মুখে মাটি পুরলে যশোদা ছুটে আসেন এবং মুখ থেকে মাটি বার করে দিতে গিয়ে কৃষ্ণের মুখের মধ্যে বিশ্ব চরাচর ফুটে রয়েছে দেখে সম্ভ্রমে চোখ বুজিয়ে নেন। এক দিন কৃষ্ণকে স্তন্য দিতে দিতে যশোদা দেখেন উনুনে দুধ ওৎলাচ্ছে ; তাড়াতাড়ি কৃষ্ণকে মাটিতে নামিয়ে দিয়ে যশোদা দুধ দেখতে গেলে কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে ঢিল মেরে দুধের হাঁড়ি ভেঙে দেন। একটু পরে দেখেন (ভাগ ১০।৯) উদুখলের ওপর উঠে ননী পেড়ে বাঁদরকে খাওয়াচ্ছেন। যশোদা তখন রেগে গিয়ে দড়ি দিয়ে কৃষ্ণকে উদুখলের সঙ্গে বাঁধতে চেষ্টা করেন। কিন্তু যতই দড়ি আনেন সব দড়ি ছোট হয়ে যায়। যশোদা শেষ অবধি ক্লান্ত হয়ে পড়লে কৃষ্ণ তাঁকে বাঁধতে দেন। বাঁধা হলে কৃষ্ণ তখন উদুখল নিয়েই ছুটতে থাকেন। দুটি গাছের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় গাছ দুটিতে এই উদুখল আটকে যায়। গাছ দুটি (যমলার্জুন দ্রঃ) ছিল নারদের শাপগ্রস্ত নলকূবর (দ্রঃ) ও মণিগ্রীব ; দুজনেই এঁরা শাপমুক্ত হয়ে যান।

এরপর বৎসাসুর (দ্রঃ), বকাসুর (দ্রঃ) ও অঘাসুর নিহত হয়। হরিবংশে (২।৯।২) সাত বছর মত বয়সে বৃন্দাবনে গিয়ে গরু চরাবার ব্যবস্থা করেন। কৃষ্ণের দেহ থেকে অসংখ্য বৃক বার হয়ে অসংখ্য গরু ও ব্রজ বালকদের খেতে থাকে। ফলে সকলে বৃন্দাবনে যেতে সম্মত বা বাধ্য হয়েছিলেন। এখানে গোবর্ধন পর্বত ও ভাণ্ডীর বন। কৃষ্ণ একবার গোপাল বালকদের সঙ্গে খেলা করছিলেন ; ব্রহ্মা সেই সময় কৃষ্ণকে পরীক্ষা করার জন্য সমস্ত গরু চুরি করেন। কৃষ্ণ তখন গরু খুঁজতে গেলে ব্রহ্মা গোপাল বালকদেরও চুরি করেন। কৃষ্ণ তারপর এদেরও দেখতে না পেয়ে খেয়াল করেন কি

ঘটেছে এবং নিজের ক্ষমতায় নতুন করে গরু ও গোপালদের তৈরি করে নেন। এইভাবে এক বছর কেটে যায় (ভাগ ১০।১৩)। তারপর ব্রহ্মা এক দিন দেখতে এসে দেখেন এই গোপালরা সকলেই যেন এক এক জন কৃষ্ণ (ভাগ ১০।১৪।৪১) এবং দেখেন আর একদল ব্রহ্মা ও আর একটি ব্রহ্মলোক সামনে ফুটে রয়েছে। ব্রহ্মা ভয় পেয়ে স্তব করে কৃষ্ণের কাছে মার্জনা চেয়ে নেন। এরপর (ভাগ ১০।১৫) ধেনুক নিহত হয়। এর পর কৃষ্ণ কালীয় (দ্রঃ) দমন করেন। যমুনার জল বিষমুক্ত হয়। কালীয় দমন ঘটার পর সূর্য অস্ত যায় ; গোপাল বালকরা যমুনা তীরে সেই খানেই আগুন জেলে রাত কাটাবেন ঠিক করেন। কিন্তু রাত্রিতে ব্যাপক ও ভয়াবহ আগুন ছড়িয়ে পড়ে ; কৃষ্ণ এই আগুন গ্রাস করে দমন করেন (ভাগ ১০।১৭)। এর পর এক দিন প্রলম্ব (দ্রঃ) অসুর আক্রমণ করতে আসে। শ্রীদাম কৃষ্ণকে, বৃষভ ভদ্রসেনকে, বলরাম প্রলম্বকে হারিয়ে দেন। যমুনা তীরে মুঞ্জা বনে এক দিন দাবাগ্নিতে গোপাল বালকরা আটকে পড়ে ভয়ে চিৎকার করতে থাকে। কৃষ্ণ শুনতে পেয়ে ছুটে এসে এদের চোখ বুজিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বলেন এবং সেই দাবাগ্নি গ্রাস করে ফেলেন। এরা চোখ খুলে কোন আগুন দেখতে পায় না। দেখে ভাণ্ডীর বনে এসে উপস্থিত হয়েছে (ভাগ ১০।১৯)। গোপিকারা একবার যমুনাতে স্নান করতে নামলে কৃষ্ণ এদের সমস্ত বস্ত্র চুরি করে গাছে উঠে যান এবং গাছে বসে বাঁশি বাজাতে থাকেন। এরা নিরুপায় হয়ে স্তবস্তুতি করে বস্ত্র (দ্রঃ- বস্ত্রহরণ) ফিরে পান। কৃষ্ণ এক দিন তাঁর সাথীদের নিয়ে যমুনার তীর ধরে বহু দূর এগিয়ে যান। ক্ষিদে পায় ; এবং এক ব্রাহ্মণের ঘরে গিয়ে এরা তখন খেতে চান। কৃষ্ণকে দেখে ব্রাহ্মণী পরম যত্নে সকলকে পরিতুষ্ট করে খেতে দেন।

ভাগবতে (১০।২৩) আছে ব্রাহ্মণরা আঙ্গিরস যজ্ঞ করছিলেন। কৃষ্ণ রাখাল বালকদের পাঠান। এরা এসে জানায় কৃষ্ণবলরামের কাছ থেকে আসছে ; খেতে চায়। ব্রাহ্মণরা যজ্ঞ নিয়ে ব্যস্ত ; কোন কথায় কান দেয় না। এরা ফিরে এলে কৃষ্ণ এবার ব্রাহ্মণ পত্নীদের কাছে পাঠান। এ'রা আদর করে শ্রদ্ধায় পরিতৃপ্ত করে খাওয়ান ; ব্রাহ্মণরা বারণ করা সত্ত্বেও।

গোকুলে বৃষ্টির জন্য প্রতি বছর ইন্দ্রের পূজা করা হত। কৃষ্ণ বাধা দেন ; গোধনের আশ্রয়দাতা গোবর্ধন পাহাড়কে পূজা করতে পরামর্শ দেন। গোবর্ধনের পূজাতে ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে প্রবল বৃষ্টিতে পাহাড়টিকে ডুবিয়ে বা ভাসিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। কৃষ্ণ ইন্দ্রের মতলব বুঝতে পেরে গোবর্ধন পাহাড়টিকে আঙুলে করে সাত দিন ছাতার মত তুলে ধরে থাকেন ; নীচে গোকুলের সকলে আশ্রয় নেয় (ভাগ ১০।২৪)। ইন্দ্র ফলে হেরে গিয়ে কৃষ্ণের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন ; এবং স্বর্গ থেকে সুরভি এসে গোপালকদের ইন্দ্র বলে কৃষ্ণকে অভিষেক করে যান ; এবং দেবতারা নাম দেন গোবিন্দ (১০।২১)। ইন্দ্র আকাশ গঙ্গার (ভাগ ১০।২৭) জল এনে অভিষেক করেন। নন্দ একবার একাদশী করে দ্বাদশীতে আসুরীবেলাতে যমুনাতে স্নানে এলে বরুণের নির্দেশে বরুণের এক অনুচর নন্দকে চুরি করে বরুণের প্রাসাদে নিয়ে যান। কৃষ্ণ বুঝতে পেরে তৎক্ষণাৎ যমুনাতে নেমে বরুণের প্রাসাদে এসে উপস্থিত হলে বরুণ জানান কৃষ্ণকে সাক্ষাৎ দেখবার জন্য এই কাজ করেছেন

এবং ভৃত্যের বোকামির জন্য (ভাগ ১০।২৮) ক্ষমা চেয়ে নেন। নন্দকে নিয়ে ফিরে আসেন। এরপর (ভাগ ১০।৩৩) রাসলীলা (দ্রঃ) হয় ঃ—বসন্ত এলে গোকুলে কৃষ্ণ বাঁশি বাজাতেন এবং গোকুলে সমস্ত পুরনারী আকুল হয়ে কৃষ্ণের অনুসরণ করতেন। কৃষ্ণ এঁদের ঘরে ফিরে যেতে বললেও এরা যেতে পারতেন না। কৃষ্ণ এক বার অন্তর্হিত হয়ে যান ফলে সমস্ত গোপিকারা পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকেন এবং কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে কাঁদতে থাকেন। কৃষ্ণ বাধ্য হয়ে দেখা দেন এবং সকলকে নিয়ে রাসলীলা করেন। শিবরাত্রিতে গোপালরা একবার অম্বিকা বনে (ভাগ ১০।৩৪) হরপার্বতীর পূজা করে বনেতেই রাত কাটাবার ব্যবস্থা করেন। একটা অজগর সাপ এই রাত্রে নন্দকে গ্রাস করতে থাকে। জ্বলন্ত কাঠ পেটা করেও সাপের গ্রাস থেকে নন্দকে কেউ ছাড়াতে পারে না। তখন কৃষ্ণ এসে পায়ে করে স্পর্শ করতে অজগর সাপটি বিদ্যাধর সুদর্শনে পরিবর্তিত হয়ে অঙ্গিরসের দেওয়া শাপ থেকে মুক্ত হয়ে ফিরে যান। অঙ্গিরার বংশধর কদাকার ঋষিদের উপহাস করার জন্য শাপে এই অবস্থা হয়েছিল (ভাগ ১০।৩৪)। এরপর শঙ্খচূড় (দ্রঃ) নিহত হয়।

এরপর কংসের অনুচর অরিষ্ট (দ্রঃ) অসুর নিহত হয়। ভাগবতে এইখানে নারদ এসে কংসকে উস্কে দিয়ে যান। এরও পরে কংস কেশীকে (দ্র) পাঠান এবং তারপর ময়াসুরের ছেলে ব্যোমাসুর আসে। ব্যোমাসুর ছাগল সেজে আসে এবং কৃষ্ণের হাতে মারা যায়। সব দিক থেকে বিফল হয়ে কংস তখন ধনুর্যজ্ঞের ব্যবস্থা করেন; কৃষ্ণ বলরামকে নিমন্ত্রণ করে পাঠান। অক্রূর এসে জানালে (ভাগ ৯।৩৯) নন্দ বহু উপহার নিয়ে ধনুর্যজ্ঞে যাবার জন্য সকলকে আদেশ দেন। সকলকে নিয়ে ফেরার পথে যমুনা তীরে এসে অক্রূর যমুনাতে ডুব দিয়ে পাতালে অনন্তের কোলে কৃষ্ণকে দেখতে পান। মথুরাতে এসে অক্রূর এদের নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতে চান। এঁরা যান (ভাগ ১০।৪১) না। এদের আনবার জন্য অক্রূরকে পাঠিয়ে দিয়ে কংস (ভাগ ১০।৩৬) বসুদেব ও দেবকীকে বন্দী করেছিলেন এবং উগ্রসেন সমেত সকলকে হত্যা করবেন ঠিক করেছিলেন। অন্য মতে আছে মথুরাতে আসার পথে কৃষ্ণ ইত্যাদি সকলে যমুনাতে এক জায়গায় স্নান করেন। এই সময় অক্রূর কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখতে চান। স্নান সেরে ফেরবার সময় অক্রূর কৃষ্ণকে কংসের সব মতলব জানিয়ে দেন। মথুরাতে পৌঁছে দুই ভাই সন্ধ্যাবেলা নগরীর সৌন্দর্য দেখতে বার হয়েছিলেন। এক রজকের সঙ্গে দেখা হয় ; কংসের পরিধেয় ইত্যাদি কেচে নিয়ে যাচ্ছিল। এর কাছে কিছু পরিধেয় ইত্যাদি চাইলে রজক এদের গোপালক বলে উপহাস করে। কৃষ্ণ তখন রজককে ভাল ভাবে পিটিয়ে সমস্ত পরিধেয় পথে সমবেত সকলকে ভাগ করে দেন এবং নিজে পীত বস্ত্র পরিধান করেন এবং বলরামকে নীল বস্ত্র পরতে দেন। পরদিন (ভাগবতে ঐ দিন ; ১০।৪১) এক কঞ্চুককারের সঙ্গে দেখা হয় : কংসের জামা পোষাক তৈরি করত। কৃষ্ণ বলরামকে মহামূল্য পোষাক ও পাগড়ি দেয়। কৃষ্ণ সারূপ্যম্ আত্মনঃ পাবে বলে আশীর্বাদ করেন। পরদিন দুই ভাই মালাকার (ভাগ ১০।৪১) সুদামের বাড়িতে এলে সুদাম এদের গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দেন। এখান থেকে বার হয়ে পথে এগিয়ে যেতে কুব্জা/ত্রিবক্রাকে (দ্রঃ- পিঙ্গলা ;

ভাগবতে অতি সুন্দরী) দেখেন সুন্দর একটি পাত্রে অঙ্গরাগ নিয়ে আসছিলেন। কংসের এ প্রধান পরিচারিকা। কৃষ্ণকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়ে শ্রদ্ধায় পাত্র সমেত অঙ্গরাগ কৃষ্ণকে দান করেন। কৃষ্ণ বলরাম নিজেদের গায়ে এই অঙ্গরাগ মেখে নেন। কৃষ্ণ তারপর এগিয়ে এসে ত্রিবক্রার পায়ের ওপর পা দিয়ে চেপে ধরে ডান হাতে করে তার চিবুক তুলে ধরেন। সঙ্গে সঙ্গে কুব্জার দেহ স্বাভাবিক হয়ে যায়। ত্রিবক্রা অভিভূত হয়ে পড়েন এবং সেই রাত্রিতে কৃষ্ণকে তার বাড়িতে অতিথি হতে বলেন। কৃষ্ণ প্রতিশ্রুতি দেন পরে আসবেন এবং আবার এগিয়ে চলতে থাকেন। হরিবংশে রজককে হত্যা করার পর মালাকার গুণক মালা দেয় ; এঁরা বর দেন ধনবান হবে ; এরপর অম্বুজ পত্রাক্ষী কুব্জা ; কুঁজে দুটি আঙুল দিয়ে চাপ দেন ; কুব্জা সহজ হয়ে যান ; মস্তকাশিনী ও প্রণয়াৎ ও কামার্তা এদের আহ্বান করেন (২ ২৭।৩৯)। ভাগবতে (১০।৪৮) সান্দীপনির ছেলেকে ফিরিয়ে আনার পর কুব্জার গৃহে এসে সম্ভোগ করেছিলেন।

ধনুগৃহে এসে উপস্থিত হয়ে কৃষ্ণ বাম হাতে করে ধনুটিকে ভেঙে ফেলেন। প্রহরীরা তখন কৃষ্ণ বলরামকে ধরতে এলে ভাঙা ধনুকের টুকরো দিয়েই এই সব প্রহরীদের পিটিয়ে বিতাড়িত করেন এবং যজ্ঞ স্থান থেকে বার হয়ে দু ভাই চলে যান। সূর্য অস্ত গেলে দু ভাই এক জায়গায় শুয়ে রাত কাটান। কিন্তু ভাল ঘুম হয় না। কংসের দুষ্ট কাজের কথাই ভাবতে থাকেন। কৃষ্ণ বহু দুঃস্বপ্ন দেখতে থাকেন। পর দিন কংস (দ্রঃ) এক মল্লযুদ্ধের ব্যবস্থা করেন। এখানে কংস ও কংসের আট ভাই নিহত হলে অন্তঃপুরে নারীরা বিলাপ করতে থাকলে কৃষ্ণ এঁদের সান্ত্বনা দিয়ে মৃত-দেহগুলি পরদিন (হরি ২।৩২।৫৭) সংকারের ব্যবস্থা করেন এবং বসুদেব, দেবকী, উগ্রসেন ইত্যাদিকে কারামুক্ত করে দিয়ে উগ্রসেনকে রাজা করে দেন। দেবী ভাগবতে (৬।১০।৩৬) বয়স তখন ১১-১২। কৃষ্ণ বলরাম নিজেদের পোষাক অস্ত্রশস্ত্র নন্দ ও যশোদাকে দিয়ে এগুলিকে যত্ন করে রাখতে বলেন এবং এঁদের গোকুলে পাঠিয়ে দেন। দুই ভাই মথুরাতে মা বাবার সঙ্গে থেকে যান। যদু বংশকে শক্তিশালী করে তুলবেন মনস্থ করেন। এর পর গার্গ্যের পরামর্শে বসুদেব দুই ছেলেকে অবন্তিপুরবাসী সান্দীপনি কাশ্য (হরি ২।৩৩।৩) নামে এক বেদজ্ঞের আশ্রমে লেখাপড়া শিখতে পাঠান। এখানে গুরুর আশ্রমে এক সুদামের (দ্রঃ) সঙ্গে বিশেষ মিত্রতা হয়। গুরুপত্নীর নির্দেশে এক দিন বনে কাঠ আনতে গিয়ে বৃষ্টিতে পথ হারিয়ে বনেতেই কৃষ্ণ সুদাম রাত কাটান। সান্দীপনি মুনি পর দিন এঁদের বন থেকে খুঁজে নিয়ে আসেন। এখানে চৌষট্টি কলাবিদ্যা ও ধনুর্বেদ ইত্যাদি সব কিছু শিক্ষা লাভ করেন। গুরুদক্ষিণা হিসাবে সান্দীপনি মুনি প্রভাসতীর্থে ডুবে যাওয়া (হরিবংশে ২।৩৩।১২, তিমিনা হৃতঃ) ছেলেকে এঁদের কাছে ফিরে পেতে চান। কৃষ্ণ বলরাম সমুদ্র তীরে এসে বরুণের কাছে জানতে পারেন পঞ্চজন (দ্রঃ) অসুর ছেলেটিকে হত্যা করেছে। কৃষ্ণ অসুরকে নিহত করেন ; কিন্তু অসুরের আবাস শাঁখটির মধ্যে (ভাগবত ১০।৪৫, অসুরের পেটের মধ্যে) মৃত ছেলেটিকে খুঁজে পান না। শাঁখটি নিয়ে

বাজাতে বাজাতে দুই ভাই যমালয়ে গিয়ে প্রচণ্ড যুদ্ধ করে বহু ধন রত্ন ও (হরি ২।৩৩।১৫) শিশুটিকে নিয়ে ফিরে আসেন। এইটি বিখ্যাত পাঞ্চজন্য শঙ্খ বলে পরিচিত। ছেলেকে ফিরে পেয়ে গুরু এঁদের আশীর্বাদ করেন।

দুই ভাই তার পর মথুরাতে ফিরে এসে বসবাস করতে থাকেন এবং গোকুলের কথা স্মরণ করে উদ্ধবকে দিয়ে গোকুলে খবর পাঠান। উদ্ধব গোকুলে এসে কৃষ্ণ বলরামের সংবাদ দেন এবং ৪-৫ মাস এখানে কাটিয়ে নন্দ-যশোদা ও অন্যান্যদের দেওয়া নানা উপহার কৃষ্ণবলরামের জন্য নিয়ে ফিরে আসেন।

এ দিকে পিসিমা কুন্তীর ছেলেরা নানা ভাবে নির্যাতিত হচ্ছেন জানতে পেরে প্রকৃত খবর জানবার জন্য অক্রূরকে পাঠান। কুন্তীর কাছে ভীমকে হত্যা করার চেষ্টা ইত্যাদি সমস্ত খবর শুনে বিদুর ও ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে অক্রূর দেখা করেন এবং ধৃতরাষ্ট্রকে পাণ্ডবদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতে বারণ করে কৃষ্ণকে এসে সমস্ত ঘটনা জানান। কংসের শ্বশুর মগধরাজ জরাসন্ধ এ দিকে জামাতার রাজ্যে দৌহিত্রদের রাজা করার জন্য ও কৃষ্ণ বলরামকে শাস্তি দেবার জন্য শাল্ব, চেদিরাজ, দন্তবক্র ও শিশুপাল ইত্যাদিদের নিয়ে মথুরা অবরোধ করেন। কৃষ্ণের সঙ্গী বলরাম, উদ্ধব, অক্রূর ও কৃতবর্মাও যুদ্ধ করেছিলেন। বলরামের হাতে জরাসন্ধ নিহত হতেন কিন্তু কৃষ্ণ বলরামকে ছেড়ে দিতে বলেন। হরিবংশে (২।৩৪।৪) এটি যেন জরাসন্ধর ১৭-তম যুদ্ধ; কৃষ্ণ বা মথুরার বিরুদ্ধে। ভগদত্ত ও দুর্যোধনের ভাইগুলি এবং প্রাচ্য ও দক্ষিণ দিক থেকে প্রায় সমস্ত রাজারা জরাসন্ধের সঙ্গে ছিলেন। কেবল বৃষ্ণি বংশীয়েরা এবং রাম ও কৃষ্ণ এদের বাধা দেন। ২৭ দিন যুদ্ধ হয়েছিল (হরি ২।৩৬।৪)। জরাসন্ধ পালিয়ে যান। অবরোধ মুক্ত হলেও বাণাসুর ইত্যাদির সাহায্যে জরাসন্ধ বার বার মথুরা আক্রমণ করতে থাকেন। এর পর জরাসন্ধের সঙ্গে চক্রমুসল (দ্রঃ) যুদ্ধ হয়। বলরাম জরাসন্ধকে এই যুদ্ধেও হত্যা করতে যান কিন্তু দৈববাণী হয় জরাসন্ধের মৃত্যু হবে অপরের হাতে (হরি ২।৪৩।৭২)। বার বার জরাসন্ধের সঙ্গে যুদ্ধে রাজকোষ শূন্য হয়ে আসে। চক্রমুসল যুদ্ধ হয়েছিল গোমন্তক পাহাড়ে; পথে পরশুরামের সঙ্গে দেখা হয় এবং এঁর নির্দেশে গোমন্তক পাহাড়ের পাদদেশে করবীর রাজ্যে রাজা শৃগালবাসুদেবকে নিহত করে তাঁর ধনরত্ন নিয়ে ফেরার সময় প্রবর্ষণ গিরিতে এসে পৌঁছলে এখানে গরুড় কৃষ্ণকে তাঁর মাথার চূড়া এনে দেন; বাণাসুর এটি চুরি করেছিল। হরিবংশে গোমন্ত পাহাড়ে (এটি যেন প্রবর্ষণ গিরি) চক্রমুসল যুদ্ধের আগে গরুড় মুকুট এনে দিয়েছিল এবং যুদ্ধের পর শৃগাল বাসুদেব নিহত হন। প্রবর্ষণ/গোমন্ত পাহাড়ে আত্মগোপন করলে জরাসন্ধ পাহাড়টিতে চারদিক থেকে আগুন লাগিয়ে দেন; কৃষ্ণ বলরাম গোপনে স্থান ত্যাগ করেন; জরাসন্ধ মনে করেন এঁরা পুড়ে মারা গেছেন; বর্ণনাও পাওয়া যায়।

শৃগালবাসুদেব নিহত হবার পর জরাসন্ধ আবার মথুরা আক্রমণ করেন। এই ভাবে আঠার বার মথুরা (দ্রঃ) আক্রান্ত হয়েছিল। মথুরাতে কংসের ছেলেরা রাজা হবে; জরাসন্ধ কংসের শ্বশুর ইত্যাদি নানা কিছু চিন্তা করে কৃষ্ণবলরাম মথুরা ত্যাগ করে দ্বারকাতে (=কুশস্থলী, দ্রঃ) বিশ্বকর্মা নির্মিত নগরীতে নতুন রাজ্য

স্থাপন করেন। রাজা কালযবন মথুরা জয় করার চেষ্টায় তপস্যা করে শিবের বর পান যাদবদের হাতে তাঁর মৃত্যু হবে না। মথুরা ত্যাগ করার এটিও একটি কারণ। অবশ্য কালযবন (দ্রঃ) নিহত হন। কালযবনের সেনাদেরও নিহত করে (ভাগ ১০।৫২) এদের ধনরত্ন যখন দ্বারকাতে পাঠাচ্ছিলেন তখন ২৩ অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে জরাসন্ধ এদের অনুসরণ করেন। ভাগবতে কালযবন নিহত হবার পর চক্রমুসল যুদ্ধ। হরিবংশে আগে চক্রমুসল যুদ্ধ।

কুশস্থলীর (পরে নাম দ্বারকা) রাজা আনর্তের মেয়ে রেবতীকে বলরাম বিয়ে করেন। বিদর্ভ রাজ ভীষ্মকের মেয়ে রুক্মিণী কৃষ্ণের কাহিনী শুনে কৃষ্ণকে বিয়ে করবেন ঠিক করেন। হরিবংশে (২।৫০।৩১) রুক্মিণীর (দ্রঃ) স্বয়ংবরে কৃষ্ণ এসেছিলেন। এই সময় ভীষ্মকের পিতা কৈশিকের কাছে আতিথ্য গ্রহণ করেন। ক্রথ-কৈশিক দুই ভাই ; নিজেদের রাজ্য কৃষ্ণকে দেবেন ঠিক করে কৃষ্ণের অভিষেকের ব্যবস্থা করেন। স্বর্গ থেকে ইন্দ্রও নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং সিংহাসন ইত্যাদি পাঠিয়ে দিয়ে জানিয়ে ছিলেন অভিষেকে যে যোগদান না করবে সে বধ্য হবে। তবে জরাসন্ধ, সুনীথ, রুক্মী ও শাল্ব যোগদান করতে না পারেন। দেবতারাও আসেন। এই অভিষেকের উদ্দেশ্য রাজা হিসাবে কৃষ্ণ স্বয়ংবরে যেন যোগ দিতে পারেন। কৃষ্ণ রুক্মিণীকে (দ্রঃ) হরণ করে বিয়ে করেন। দ্রঃ- দুর্বাসা। সত্রাজিতের (দ্রঃ) মণির খোঁজে কৃষ্ণ বনে এসে জাম্ববানকে পরাজিত করলে জাম্ববান (দ্রঃ) কৃষ্ণকে তখন চিনতে পারেন ; স্যমন্তক মণি ও নিজের মেয়ে জাম্ববতীকে কৃষ্ণের হাতে তুলে দেন। কৃষ্ণ মণি এনে সত্রাজিৎকে দিলে প্রতিদানে সত্রাজিৎ নিজের মেয়ে সত্যভামার সঙ্গে কৃষ্ণের বিয়ে দেন। সত্রাজিৎ যৌতুক হিসাবে মণিটিও দিতে চেয়েছিলেন ; কিন্তু কৃষ্ণ নেন নি।

জতুগৃহ থেকে পাণ্ডবরা মুক্তি পেয়েছে খবর পেতে দেরি হলেও খবর পেয়েই সাত্যকি ইত্যাদি যাদব প্রধানদের নিয়ে কৃষ্ণ পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করেন। এ ঘটনাটি সব মহাভারতে নাই। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভাতে কৃষ্ণ ছিলেন এবং এই খানেই পাণ্ডবদের সঙ্গে প্রথম সরাসরি আলাপ ও বন্ধুত্ব হয়। পাণ্ডবরা ন্যায়ত দ্রৌপদীকে লাভ করেছেন বলে সমবেত রাজন্যদের বুঝিয়ে যুদ্ধ থেকে নিরস্ত করেন : এবং অন্য রাজারা যাতে জানতে না পারে গোপনে ভার্গবের কর্মশালাতেও আসেন এবং কুন্তীকে প্রণাম করে যান (মহা ১।১৭৩।-)। অর্জুন (দ্রঃ) যখন ব্রাহ্মণের গরু রক্ষা করতে গিয়ে তীর্থ যাত্রায় যেতে বাধ্য হন সেই সময় এক মাত্র কৃষ্ণের সাহায্যেই সুভদ্রাকে হরণ করে বিয়ে করেন। এই বিয়ের পর কৃষ্ণ কিছুদিন ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করেছিলেন এবং এই সময়ে খাণ্ডবদাহন ঘটে। খাণ্ডবদাহনের সময় কৃষ্ণ অর্জুনের সঙ্গে মিলে খাণ্ডব বন পোড়াতে সাহায্য করেছিলেন (মহাভারত)। দ্রঃ- খাণ্ডবদাহন। এই সময় কৃষ্ণ কৌমোদকী (দ্রঃ) গদা পান। ময়কে সভা নির্মাণের কথা বলে, মহাভারতে আছে, দ্বারকাতে ফিরে যান। ভাগবতে ১০-স্কন্ধে রয়েছে ময়ের (দ্রঃ) দ্বারা নবনির্মিত ইন্দ্রপ্রস্থে কৃষ্ণ কিছু দিন বাস করেছিলেন। এক দিন কৃষ্ণ ও অর্জুন যমুনার তীরে বেড়াচ্ছিলেন এমন সময় নারী বেশধারী যমুনার (দ্রঃ) সঙ্গে দেখা হয়। যমুনা কৃষ্ণকে বিয়ে করতে চান ; এবং বিয়ে হয়। ইন্দ্রপ্রস্থে মাস চারেক থাকার পর যমুনাকে নিয়ে কৃষ্ণ দ্বারকাতে ফিরে যান।

রাজাধিদেবী কৃষ্ণের পিসি ; এঁর মেয়ে মিত্রবিন্দাকে স্বয়ংবর থেকে হরণ করে এনে বিয়ে করেন। কোশল রাজ নগ্নজিতের সাতটি দুর্ধর্ষ বৃষভ ছিল। রাজা ঘোষণা করেছিলেন যে এই বৃষভগুলিকে রজ্জুবদ্ধ করতে পারবে তার সঙ্গে মেয়ে সত্যার বিয়ে দেবেন। বহু রাজা চেষ্টা করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত অর্জুন ও কৃষ্ণ কোশলে আসেন এবং কৃষ্ণ সাতটি মূর্তি ধরে সাতটি বৃষভকে বেঁধে ফেলেন; সত্যার সঙ্গে কৃষ্ণের বিয়ে হয়। শ্রুতকীর্তি নামে কৃষ্ণের এক পিসি ছিলেন ; এঁর মেয়ে ভদ্রা/কৈকেয়ী এঁর সঙ্গেও কৃষ্ণের বিয়ে হয়। মদ্রদেশের লক্ষ্মণা স্বয়ংবর সভাতে কৃষ্ণের গলায় মালা দেন। নরকাসুরের (দ্রঃ) ১৬,০০০ মেয়েকে ব্রহ্মা বর দিয়েছিলেন পরের জন্মে এঁরা কৃষ্ণের স্ত্রী হবেন। কৃষ্ণ ও সত্যভামা গরুড়ের পিঠে চড়ে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর গিয়ে নরকাসুরকে পরাজিত করে এই ১৬,০০০ মেয়েকে নিয়ে দ্বারকাতে ফিরে এসে এদের বিয়ে করেন। কৃষ্ণের মূল স্ত্রী রুক্মিণী, জাম্ববতী, কালিন্দী (যমুনা দ্রঃ), মিত্রবিন্দা, সত্যা, ভদ্রা, লক্ষ্মণা, সত্যভামা। হরিবংশে (২।১০৩) এঁদের নাম রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, সত্যা, সুভীমা, লক্ষ্মণা, কালিন্দী, শ্রুতসেনা, বৃহতী, শৈব্যা, সুদেবা, কৌশিকী যৌধিষ্ঠিরী, মিত্রবিন্দা, সুদত্তা, পৌরবী।

নারদের এক বার জানবার বাসনা হয় কৃষ্ণ কি করে ১৬,০০০+৮ জন স্ত্রীকে খুসি রাখেন। নারদ নিজে এই প্রতিটি নারীর ঘরে গিয়ে সেখানে কৃষ্ণকে যুগপৎ বিরাজ করতে দেখেন। কৃষ্ণের স্ত্রীরা মনে করতেন একমাত্র তাকেই কৃষ্ণ ভালবাসেন ; কৃষ্ণের 'ঐশ্বর্যের' কথা এঁরা জানতেন না (ভাগ ১০।৬৯)। ভাগবতে প্রতি মূল স্ত্রীর এবং ১৬০০০ স্ত্রীরও প্রত্যেকের ১০-টি করে ছেলে (ভাগ ৩।৩।১-১১)। দে- ভাগবতে (৫।১।৩১) মোট স্ত্রী ১৬০০+৫০+৮।

কৃষ্ণের স্ত্রী সম্বন্ধে কিছু দার্শনিক যুক্তিও খাড়া করা হয়েছে। খিল হরিবংশে কৃষ্ণের 'শক্তি' তিন জন ; শ্রী, ধী, ও সন্নতি বলা হয়েছে। বিষ্ণু পুরাণে (৫।১।৮১ এই শক্তি গুলির নাম ঃ- মহামায়া, ভূতি সন্নতি, কীর্তি, ক্ষান্তি, দ্যৌ, পৃথিবী, ধৃতি, লজ্জা, পুষ্টি ও ঊষা। অন্যত্র বলা হয়েছে শ্রী, ভূ ও লীলা তিনটি শক্তি।

হরিবংশে একস্থানে কৃষ্ণের সাতজন মহিষীর নাম রয়েছে ; কালিন্দী, মিত্রবিন্দা, নাগ্নজিতী, জাম্ববতী, রোহিণী, লক্ষ্মণা ও সত্যভামা। উপনিষদের যুগ থেকে ১৬-কলা তত্ত্বের প্রচার। এই ষোল কলাই পরে কৃষ্ণের ১৬-টি মহিষী যেন। বৃন্দাবনে প্রধান গোপী ১৬-জন এবং প্রতি গোপী থেকে এক সহস্র গোপীর উদ্ভব ; ফলে ১৬ হাজার গোপিনী—এরা দার্শনিক দৃষ্টিতে স্ত্রী নন। মহাভারতে (১।৬১।৯১) আছে কিন্তু ১৬-হাজার অপ্সরা নারায়ণ (কৃষ্ণ ?) পরিগ্রহ। সাংখ্যে প্রকৃতির ১৬-টি বিকার ; এই থেকেও যেন কৃষ্ণের ১৬ জন স্ত্রী।

এক বার নরকাসুর ইন্দ্রের ছত্র ও অদিতির কুণ্ডল কেড়ে নিয়ে যান। ইন্দ্র কৃষ্ণের সাহায্য চান। কৃষ্ণ সত্যভামাকে নিয়ে গরুড়ের পিঠে চড়ে এসে নরকাসুরকে নিহত করে ছত্র ও কুণ্ডল উদ্ধার করে স্বর্গে ফিরে যান। স্বর্গ থেকে ফেরবার সময় সত্যভামার ইচ্ছায় কৃষ্ণ স্বর্গ থেকে পারিজাত গাছ নিয়ে আসতে যান। কিন্তু ইন্দ্র বাধা

দেন ফলে যুদ্ধ হয় এবং ইন্দ্র হেরে যান। হরিবংশে কোন যুদ্ধ হয় নি ; ইন্দ্র অনুমোদন করেছিলেন। পারিজাত এনে দ্বারকাতে সত্যভামার প্রাসাদের সামনে বসিয়ে দেন। অন্য মতে স্যমন্তক মণি ফেরৎ দেবার জন্য সত্যভামার ভীষণ দুঃখ হয়েছিল এই কারণে সত্যভামাকে খুসি করার জন্য কৃষ্ণ পারিজাত নিয়ে আসেন (ভাগবত ১০ স্ক)। ঘণ্ট ও কর্ণ দুই ভাই (দ্রঃ) ; এরা অসুর। রুক্মিণীকে বিয়ে করে কৃষ্ণ বদরিকাশ্রমে সন্তান লাভের আশায় শিবের তপস্যা করতে এলে এদের সঙ্গে দেখা হয়। কৃষ্ণ এ'দের বর দেন ; এরা মুক্তি পায়। কৃষ্ণ ও অর্জুনের (পদ্মপুরাণে) মধ্যেও একবার যুদ্ধ হয়। দ্রঃ-গালব। মুরাসুরকে নিহত করে মুরারি নাম হয়। দ্রঃ-ঘণ্টাকর্ণ, চক্রমুসল যুদ্ধ।

রুক্মিণীকে পরীক্ষা করার জন্য কৃষ্ণ একবার বলেন তিনি উপস্থিত কপর্দক হীন এবং শত্রুদের কাছে পরাজিত হয়ে পালিয়ে দ্বারকাতে চলে এসেছেন। রুক্মিণী এখন বরং উপযুক্ত শক্তিশালী কোন রাজাকে বিয়ে করুক। কিন্তু কৃষ্ণ কথা শেষ করার আগেই রুক্মিণী অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। কৃষ্ণ তখন রুক্মিণীর জ্ঞান ফিরিয়ে এনে ক্ষমা চান। কৃষ্ণ বাণের (দ্র) সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন, পৌণ্ড্রককে (দ্রঃ) হত্যা করে ছিলেন। কৃষ্ণের বাকি জীবন পাণ্ডবদের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। মহাভারতে আছে ইন্দ্রপ্রস্থ সভা তৈরি হবার আগেই দ্বারকাতে ফিরে যান। ভাগবতে (১০।৭০) এই সময়েই যেন জরাসন্ধ মহাভৈরব যজ্ঞে লক্ষ রাজবলি দেবেন ঠিক করেন। দূত মাধ্যমে রাজারা কৃষ্ণকে ডেকে পাঠান। ইতিমধ্যে নারদ এসে জানান যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করছেন ; কৃষ্ণ অনুমোদন করুন। কৃষ্ণ উদ্ধবের সঙ্গে (ভাগ ১০।৭১) পরামর্শ করেন। উদ্ধব বলেন রাজসূয়ের নামে জরাসন্ধ নিধন ও রাজাদের মুক্তি এক সঙ্গে হবে। কৃষ্ণ ফলে ইন্দ্রপ্রস্থে আসেন। ভাগবতে (১০।৭১) এরপর খাণ্ডবদাহন ও ময়দানবকে দিয়ে সভা নির্মিত হয়। মহাভারতে আছে সভা তৈরির পর যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের জন্য পরামর্শ করবেন বলে সারথি ইন্দ্রসেনকে দিয়ে কৃষ্ণকে ডাকিয়ে আনান। কৃষ্ণ জরাসন্ধকে আগে নিহত করা দরকার বলেন ; এবং ভীম ও অর্জুনকে ন্যাস হিসাবে (মহা ২।১৮।৭) গ্রহণ করে ছদ্মবেশে তিনজনে মগধে প্রবেশ করেন। ভাগবতে (১০।৭২) রাজসূয় কর সংগ্রহের পর জরাসন্ধ (দ্রঃ) নিহত হন। মহাভারতে আছে হংস ও ডিম্বকের (দ্রঃ) মৃত্যুর পর কৃষ্ণের পরামর্শে ভীম মল্লযুদ্ধে জরাসন্ধকে বধ করেন। জরাসন্ধের ছেলে সহদেবকে কৃষ্ণ (মহা ২।২২।৪১) রাজা করে দেন। পৃথিবী কৃষ্ণকে নিজের কুণ্ডল দান করেন (দ- ভারতীয় সভাপর্ব)। এই রাজসূয় যজ্ঞে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হিসাবে কৃষ্ণকে ভীষ্ম অর্ঘ্য দিলে চেদিরাজ শিশুপাল ঈর্ষায় কৃষ্ণের নিন্দা করেন। কৃষ্ণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন এ'র একশ অপরাধ ক্ষমা করবেন। কিন্তু এই নিন্দা শততমের বেশি হওয়াতে কৃষ্ণ সুদর্শন চক্রে একে বধ করেন (মহা ২।৪২।২১)। পাণ্ডবদের অক্ষক্রীড়ার সময় কৃষ্ণ শাম্বরাজের সৌভনগর ধ্বংসের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময় কৃষ্ণ দ্রৌপদীকে অলক্ষ্যে শেষহীন বস্ত্র দিয়ে লজ্জা নিবারণ করেন। কোন কোন সংস্করণে রয়েছে সুভদ্রা ও অর্জুনকে একবার দ্বারকাতে নিয়ে গিয়েছিলেন।

সুভদ্রার বিয়ের পর (হরি ২।১১১।১৩) একাহ সাধ্য সোম যাগে কৃষ্ণ একবার নিযুক্ত ছিলেন। এক ব্রাহ্মণ আসেন : এর তিনটি সদ্য জাত পুত্র চুরি গেছে ; আসন্ন-জন্ম ৪-র্থ পুত্রকে রক্ষা করতে বলেন। অর্জুন (দ্রঃ) দায়িত্ব নেন, সঙ্গে যাদব বীরেরা যায়। কৃষ্ণ বলরাম প্রদ্যুম্ন বাদে। অর্দ্ধরাত্রে যথারীতি চুরি যায়। অর্জুন যমালয় পর্যন্ত ঘুরে এসে অপমানে আত্মহত্যা করতে যান। কৃষ্ণ তখন অর্জুনকে সারথি করে ব্রাহ্মণকে নিয়ে সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে উত্তরকুরুতে এসে এখান থেকে সপ্তদ্বীপ পার হয়ে লোকালোক পর্বত অতিক্রম করে এক তেজোময় পুরুষ বিগ্রহের সামনে আসেন এবং এই তেজের মধ্যে প্রবেশ করে ব্রাহ্মণের চারটি শিশুকে নিয়ে দুপুরের আগে দ্বারকাতে ফিরে আসেন। অর্জুনকে জানান সেই পরম তেজ বা পরম পুরুষ 'অহং সঃ' কৃষ্ণকে দেখবার জন্য এদের হরণ করেছিলেন (২।১১৩।৩১)। দ্রঃ- গোলক।

পাণ্ডবরা বনে এলে কৃষ্ণ অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন এবং প্রথম দিকেই কাম্যক বনে দেখা করতে আসেন ; কৌরবদের প্রতি ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন ; অর্জুন ও দ্রৌপদী স্তব করে শান্ত করেন (মহা ৩।১৩।-)। শান্ত হয়ে কৃষ্ণ পাণ্ডবদের সান্ত্বনা দেন ; শাল্বের সঙ্গে যুদ্ধে যুক্ত ছিলেন ; না হলে নিশ্চিত পাশা খেলা বন্ধ করতেন (মহা ৩।১৩।১২) ; এবং সুভদ্রা ও অভিমন্যুকে নিয়ে দ্বারকাতে ফিরে যান। পাণ্ডবরা তীর্থ যাত্রায় বার হয়ে প্রভাসে এলে (মহা ৩।১১৯।১) কৃষ্ণ ইত্যাদি যাদবদের সঙ্গে দেখা হয়। নহুষরূপী সর্পের হাত থেকে ভীম মুক্তি পাবার পর কাম্যক বনে (মহা ৩।১৮০।১) কৃষ্ণ সত্যভামা আসেন দেখা করে যান। কাম্যকে এরপর দ্রৌপদী হরণের অব্যবহিত পূর্বে (গীতা প্রেসে) সশিষ্য দুর্বাসা অতিথি হন : বিপন্ন দ্রৌপদী কৃষ্ণকে স্মরণ করেন এবং কৃষ্ণ এসে দ্রৌপদীর (দ্রঃ) অন্নের পাত্র থেকে সামান্য একটু শাক খেয়ে পরম পরিতৃপ্ত হবার ছলে পাণ্ডবদের দুর্বাসার হাত থেকে রক্ষা করেন। উপপ্লব্য গ্রামে অভিমন্যুর বিয়েতে যোগদান করেছিলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে এই সময় প্রচুর অর্থ দিয়েছিলেন।

উদ্যোগপর্বে প্রথম মন্ত্রণা সভাতে কৃষ্ণ ছিলেন। যুদ্ধের জন্য সৈন্য সংগ্রহের পরামর্শ ঠিক হয়। কৃষ্ণ দ্বারকায় চলে যান।

এরপর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্‌কালে কুরুপাণ্ডব উভয়পক্ষই কৃষ্ণকে দলে টানতে দ্বারকাতে আসেন। কৃষ্ণ নিদ্রার ভাণ করে শুয়েছিলেন। প্রথমে দুর্যোধন এসে মাথার দিকে একটি উত্তম আসনে এবং অর্জুন পরে এসে পায়ের দিকে বসে অপেক্ষা করতে থাকেন। ফলে চোখ মেলে কৃষ্ণ অর্জুনকেই প্রথম দেখেন এবং অর্জুনদের/ পাণ্ডবদের পক্ষে যোগ দেন। দুর্যোধনের দাবি ছিল তিনি প্রথমেই এসেছিলেন কিন্তু কৃষ্ণ সে যুক্তি নস্যাৎ করার জন্য বলেন তিনি কিন্তু প্রথমেই অর্জুনকে দেখেছেন। এ ছাড়া যথাসম্ভব পক্ষপাতহীন হবার চেষ্টায় দশকোটি নারায়ণী সেনা দিয়ে দুর্যোধনকে সাহায্য করেন এবং দুর্যোধনকে প্রতিশ্রুতি দেন যুদ্ধে তিনি নিজে কোন দিন অস্ত্র ধারণ করবেন না। এক দিকে অস্ত্রধারণ করবেন না প্রতিজ্ঞাবদ্ধ-কৃষ্ণ এবং আর এক দিকে দশ কোটি নারায়ণী সেনা (দ্রঃ) কে কোনটি বেছে নিতে চান বলে অর্জুনকেই প্রথম সুযোগ

দিয়েছিলেন এবং অর্জুন কৃষ্ণকেই বেছে নেন। মোটামুটি ঘটনাটা সবটাই কৃষ্ণের পরিকল্পনা অনুযায়ী ঘটে।

এরপর সঞ্জয় ও বিদুরের দৌত্য। কুরুক্ষেত্র (দ্রঃ) যুদ্ধের আগে যুধিষ্ঠির ইত্যাদি সব ভাইরা যুদ্ধ এড়াবার জন্য কৃষ্ণকে শেষ চেষ্টা করতে বলেন। দ্রৌপদী কেবল যুদ্ধ চেয়েছিলেন। রেবতী নক্ষত্রে কার্তিক মাসে মৈত্র মুহূর্তে (মহা ৫।৮৩।৭) কৃষ্ণ হস্তিনাপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সঙ্গে সাত্যকি ও আরো দশ জন মহারথ (মহা ৫।৮২।১) ও প্রচুর সৈন্য ও খাদ্য ছিল। পথে পরশুরাম ও অন্যান্য ঋষিরা দেখা করতে আসেন ; এঁরাও সন্ধির প্রস্তাব শুনতে যাবেন। বৃকস্থলে (মহা ৫।৮২।২০) এক রাত্রি বিশ্রাম করেন। এ দিকে খবর পেয়ে ধৃতরাষ্ট্রের নির্দেশে দুর্যোধন পথে অভ্যর্থনার জন্য বিশ্রামের স্থান ইত্যাদি ও বহু উপহারের ব্যবস্থা করে রাখেন। ত্রিভুবন পূজ্য হিসাবে স্বীকার করলেও দুর্যোধন কৃষ্ণকে বন্দী (মহা ৫।৮৬।১৪) করার মতলব করে-ছিলেন। হস্তিনাপুরে এসে বিদুরের গৃহে অতিথি হন, কুন্তীকে (দ্রঃ) সান্ত্বনা দেন। এর পর দুর্যোধনের আতিথ্য প্রত্যাখ্যান করেন। পর দিন ধৃতরাষ্ট্রের সভাতে আসেন। কিন্তু দুর্যোধন ইত্যাদি তাঁর উপদেশ শুনে উপহাস করতে থাকেন এবং বন্দী করবার চেষ্টাও করেন। কৃষ্ণ তখন বিশ্বরূপে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন এবং সভা ত্যাগ করে কর্ণের (দ্রঃ) সঙ্গে দেখা করে পাণ্ডবদের কাছে ফিরে যান।

যুদ্ধে কৃষ্ণ অর্জুনের সারথি ছিলেন। যুদ্ধের পূর্ব মুহূর্তে দুই দলের সৈন্যবাহিনীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে অসংখ্য জ্ঞাতিকুটম্ব ক্ষয়কৃৎ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবার আগে শোকে অর্জুন বিষণ্ণ হয়ে অস্ত্রত্যাগ করেন। কৃষ্ণ তখন অর্জুনকে বোঝান যা করবার তা তিনি নিজেই করে রেখেছেন ; অর্জুন কেবল নিমিত্ত মাত্র হয়ে যুদ্ধ করুক। অর্জুনকে আরো অনেক কিছু বোঝান এবং অর্জুনের অনুরোধে নিজের প্রকৃত পরিচয় দেন এবং অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখান। এই উপদেশ অংশ গীতা নামে প্রসিদ্ধ। অর্জুন শেষ অবধি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। যুদ্ধে কৃষ্ণ অস্ত্র ধরবেন না প্রতিশ্রুত ছিলেন কিন্তু ভীষ্ম কৃষ্ণকে বাধ্য করেন এবং কৃষ্ণ চক্রপাণি হয়ে দুবার ছুটে যান ভীষ্মকে বধ করতে। ভীষ্ম তখন অস্ত্র ত্যাগ করে এই শ্লাঘনীয় মৃত্যু বরণ করবার জন্য কৃষ্ণের স্তব করতে থাকেন। কৃষ্ণ নিবৃত্ত হয়ে আবার অর্জুনের রথে ফিরে যান। ভগদত্ত অর্জুনের প্রতি যে বৈষ্ণবাস্ত্র নিক্ষেপ করেছিলেন কৃষ্ণ সেই অস্ত্র নিজের বুকে ধারণ করে অর্জুনকে রক্ষা করেন। অভিমন্যু মারা গেলে সুভদ্রা ইত্যাদি সকলকে সান্ত্বনা দেন। জয়দ্রথ বধের সময় অকালে সন্ধ্যার ব্যবস্থা করেন এবং অর্জুন জয়দ্রথকে (দ্রঃ) বধ করলে আবার সূর্যকে প্রকাশিত করে দেন। যুধিষ্ঠির ও অর্জুনের মধ্যে বিশ্রী একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়ে যায় ; ক্রোধে অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে হত্যা করতে চান। কিন্তু কৃষ্ণ ঘটনাটার মীমাংসা করে দেন। অর্জুন তখন আত্মহত্যা করবেন স্থির করেন। কৃষ্ণ আবার বুঝিয়ে অর্জুনকে দিয়ে আত্মহত্যার বিকল্প আত্মপ্রশংসা করিয়ে অর্জুনকে রক্ষা করেন। দ্রোণ (দ্রঃ) ও কর্ণ বধও কৃষ্ণের সাহায্যেই সম্ভব হয়েছিল। অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে কর্ণ নাগাস্ত্র ত্যাগ করলে অর্জুনকে রক্ষা করার জন্য রথকে চাপ দিয়ে মাটির মধ্যে কিছুটা নামিয়ে দিলে অস্ত্রে অর্জুনের কিরীট নষ্ট হয়ে

যায়; অর্জুন রক্ষা পান। কর্ণের মৃত্যুর পর কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে শল্যকে নিহত করান। দুর্যোধনকে হত্যা করার সময়ও কৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। দুর্যোধন মারা গেলে (মহা ৯।৬১।৩৭) পাণ্ডবদের সঙ্গে কুরুক্ষেত্রে কৌরব শিবিরে আসেন। প্রচুর ধনরত্ন এখানে হস্তগত হয়। কৃষ্ণ বলেন মঙ্গলার্থে শিবিরে না গিয়ে ওঘোবতী তীরে রাত কাটাতে। এরপর হস্তিনাপুরে এসে গান্ধারীকে কিছুটা শান্ত মত করে অশ্বত্থামার দুষ্ট অভিপ্রায় রয়েছে জানিয়ে সেই রাতেই (মহা ৯।৬২।৭৩) ফিরে আসেন। উত্তরার গর্ভস্থ শিশু অশ্বত্থামার অস্ত্রে মারা গেলে একটি মতে কৃষ্ণ তাকে এই সময়ই আবার বাঁচিয়ে দেন এবং এই কাজের জন্য অশ্বত্থামাকে অভিশাপ দেন। শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মকে অনুরোধ করেন যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিতে এবং বর দেন শরশয্যায় ভীষ্মের ক্ষুধাতৃষ্ণা কিছু থাকবে না এবং জ্ঞান অক্ষুণ্ণ থাকবে। যুদ্ধের শেষে গান্ধারী যুদ্ধক্ষেত্রে কৃষ্ণকে দেখে অভিশাপ দেন যে এই ভীষণ যুদ্ধ কৃষ্ণ বন্ধ করতে পারতেন কিন্তু করেন নি; এই কারণে যুদ্ধের ৩৬ বছর পরে যদুবংশও কৌরবদের মত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এবং কৃষ্ণের অপঘাতে মৃত্যু হবে, দ্বারকার পুরনারীরা হস্তিনাপুরের পুরনারীদের মত হাহাকার করবে (মহা ১১।২৫ ৪১)। অভ্যুৎস্ময়ন্ (১১।২৫।৪৩) কৃষ্ণ বলেন ভবিষ্যৎ ও ভবিতব্যতা তিনি জানেন এবং গান্ধারীকে (১১।২৬।৫) তিরস্কার করেন। অনুশাসন পর্বে কৃষ্ণ গঙ্গাকেও পুত্রশোকে সান্ত্বনা দেন। আশ্রমিক পর্বে গীতার (যুদ্ধের প্রারম্ভে অর্জুনকে দেওয়া উপদেশ) উপদেশগুলির আবার বিশদ ব্যাখ্যা করেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠিরের অনুমতি ক্রমে সুভদ্রা ও সাত্যকিকে (মহা ১৪।৫১।৫৩) নিয়ে দ্বারকাতে ফিরে আসেন। পথে উতঙ্ক ঋষির সঙ্গে দেখা হয়; কুরুপাণ্ডবদের সমস্ত কাহিনী এঁকে জানান এবং এঁকেও বিশ্বরূপ দেখান। রৈবতক পাহাড়ে উৎসবে যোগ দিয়ে ছিলেন। এর পর দ্বারকাতে ফিরে এসে পিতা বসুদেবকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের খবর জানান এবং নিজে অভিমন্যুর শ্রাদ্ধ ইত্যাদি করেন। অশ্বমেধ যজ্ঞের আগে হস্তিনাপুরে আসেন এবং উত্তরার এই সময়ে একটি মৃত সন্তান হয়। ছেলেটি অশ্বত্থামার অস্ত্রে মারা গিয়েছিল। কুন্তীর অনুরোধে কৃষ্ণ একে জীবিত করে দেন। এই ছেলেই পরিক্ষিৎ! যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় ছিলেন এবং যজ্ঞ শেষে আবার ফিরে যান।

গান্ধারীর অভিশাপ মত ৩৬ বছর শেষ হয়ে আসছিল। কৃষ্ণের বয়স ১২৫ (ভাগ ১১।৬)। এই সময় বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও নারদ একদিন দ্বারকাতে আসেন। কয়েক জন যাদব যুবক সাম্বকে পেটে লোহার মুসল বেঁধে গর্ভবতী নারী সাজিয়ে ঋষিদের সামনে এনে বলেন ইনি বভ্রুর স্ত্রী; এবং এঁর কবে সন্তান হবে? অন্য মতে ছেলে হবে না মেয়ে হবে জানতে চান। মুনিরা বিদ্রূপ বুঝতে পেরে অভিশাপ দেন সাম্ব এই মুসলটি প্রসব করবেন এবং এই মুসলে যদুবংশ ধ্বংস হবে। এরা ভীত হয়ে ঘটনাটা কৃষ্ণকে জানান; সাম্ব পর দিন মুসল প্রসব করেন এবং কৃষ্ণের নির্দেশে সকলে মিলে মুসলটি ঘসে ঘসে খইয়ে ফেলে সামান্য মত অবশিষ্ট অংশটি সমুদ্রে ফেলে দেন। এ ছাড়া কৃষ্ণ বলরাম ও উগ্রসেন আর একটি ব্যবস্থা করেন; দ্বারকাতে মদ্যপান নিষিদ্ধ

করে দেন। কিন্তু দ্বারকাতে নানা অমঙ্গল চিহ্ন চারদিকে ফুটে উঠতে থাকে। কৃষ্ণ বলরাম ও উদ্ধব তীর্থযাত্রা করবেন ঠিক করেন। প্রভাসে যাবার মুহূর্তে উদ্ধব বুঝতে পারেন কৃষ্ণ যদু বংশ শেষ করতে চলেছেন। কৃষ্ণ স্বীকার করেন এবং উদ্ধবকে জানান (ভাগ ১১।৭) আগামী ৭-ম দিনে সমুদ্র দ্বারকা গ্রাস করবে। দেবতাদের সন্তুষ্ট করবার জন্য কৃষ্ণ সকলকে নিয়ে প্রভাস তীর্থে যান এবং এখানে দেবতাদের পূজা করতে বলেন ও এক দিনের জন্য সুরাপান নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেন। যাদব, বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশীয়েরা সকলে যথেচ্ছ সুরা তৈরি করে পান করতে থাকেন এবং উন্মত্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি সুরু করেন। সাত্যকি উত্তেজিত হয়ে কৃতবর্মার মাথা কেটে ফেলেন। অপরে এতে রেগে গিয়ে সাত্যকি ও প্রদ্যুম্নকে পানপাত্রের আঘাতে কৃষ্ণের সামনেই হত্যা করেন। মুসলের লোহা যেখানে ঘসে ঘসে নষ্ট করা হয়েছিল সেইখানে লোহার পড়ে-থাকা অণুতম কণাগুলিও তীক্ষ্ণ নল ঘাসে পরিণত হয়েছিল। কৃষ্ণ এই এক মুঠো তৃণ হাতে নিলে সেই তৃণ/নল লৌহ-মুসলে পরিবর্তিত হয়ে থাকে এবং সেই মুসল দিয়ে কৃষ্ণ বহু যাদবকে হত্যা করেন। যাদবরাও এই তৃণ তুলে নিয়ে পরস্পরকে নির্বিচারে হত্যা করতে থাকেন; শেষ পর্যন্ত যদুবংশ নিঃশেষ হয়ে যায়। ভাগবতে (১১।১৩) মৈরেয় মদ খেয়ে মারামারি; এরকা জলজ গাছ; এই তৃণ নিয়ে কৃষ্ণ ও বলরাম বহু যাদবকে নিহত করেছিলেন। কৃষ্ণ ও বলরাম বনবাসী হবেন ঠিক করেন। বলরাম এখান থেকে সরে গিয়ে একটি গাছের নীচে বসে ধ্যান করতে থাকেন। কৃষ্ণ পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। দারুক ও বভ্রু এখানে এলে কৃষ্ণ দারুককে পাঠান অর্জুনকে খবর দিতে এবং নিয়ে আসতে। কৃষ্ণ তারপর প্রাসাদে গিয়ে স্ত্রীদের সান্ত্বনা দিয়ে বসুদেবের কাছে বিদায় নিয়ে বলরামের কাছে ফিরে যান এবং দেখেন বলরামের মুখ থেকে একটি সাদা সাপ বার হয়ে সমুদ্রে নেমে গেল। কৃষ্ণ তারপর বনে বনে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে শেষ পর্যন্ত একটি গাছের ডালে পা ঝুলিয়ে বসে থাকেন। দূর থেকে কৃষ্ণের পাকে হরিণ মনে করে জরা (মহা ১৬।৫।১৯) নামে একজন ব্যাধ/অন্য মতে অসুর বাণবিদ্ধ করেন। সমুদ্রে ফেলে দেওয়া অবশেষিত মুসল অংশ দিয়ে এই বাণ তৈরি হয়েছিল। ভাগবতে (১১।৩০) সকলে মারা গেলে কৃষ্ণ এক অশ্বত্থ গাছের নীচে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। জরা তীর বিদ্ধ করে; চিনতে পেরে ক্ষমা চায় এবং তৎক্ষণাৎ স্বর্গে যায়। গরুড়-ধ্বজ রথ, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদিও স্বর্গে যায়। দারুক আসে; কৃষ্ণ বলে দেন অর্জুন যেন সকলকে নিয়ে (ভাগ ১১।৩০) যায়। বাণবিদ্ধ হয়ে কৃষ্ণ দেহত্যাগ করে বৈকুণ্ঠে চলে যান (গচ্ছন্‌ ঊর্দ্ধং রোদসী ব্যাপ্য লক্ষ্ম্যা মহা ১৬।৫।২১)। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ৩৬ বৎসর পরে এই মৃত্যু। অর্জুন এসে কৃষ্ণ প্রভৃতির সৎকারের ব্যবস্থা করেন। এক মতে এই ব্যাধ পূর্বজন্মে অঙ্গদ ছিলেন। পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ নিতে পারবেন বর ছিল। নরক দর্শনের পর যুধিষ্ঠির স্বর্গে এসে দেখেন কৃষ্ণ ব্রাহ্মেণ বপুষা (মহা ১৮।৪।২) বিরাজমান; তার অস্ত্রগুলি পুরুষ রূপে তাকে ঘিরে রয়েছে এবং অর্জুন কৃষ্ণকে পূজা করছেন। দ্রঃ- দুর্বাসা। এ ছাড়া বহু প্রক্ষিপ্ত ঘটনা কৃষ্ণ চরিত্রের মধ্যে এসে হাজির হয়েছে। কৃষ্ণের এইভাবে মৃত্যুর পর

রুক্মিণী, জাম্ববতী ইত্যাদি কিছু রাণী সহমৃতা হন। বাকি স্ত্রীরা অর্জুনের সঙ্গে হস্তিনাপুরে চলে যাচ্ছিলেন কিন্তু পথে বনদস্যুর আক্রমণে এঁরা দাঁড়িয়ে পড়েন এবং সরস্বতীতে আত্মবিসর্জন করেন ; ধরা দেন না। দ্র:- নরনারায়ণ, অষ্টাবক্র, অর্জুন, মার্কণ্ডেয়, যদুবংশ।

কৃষ্ণ হিন্দুধর্মের প্রধান উপাস্য দেবতা। এঁর দুটি রূপ একটি কূটনীতিবিদ্ পার্থ সারথি ; ধুরন্ধর রাজনীতিজ্ঞ। আর একটি যশোদা দুলাল এবং অবৈষ্ণব দৃষ্টি-ভঙ্গিতে লম্পট। এই কৃষ্ণকে তারপর নারায়ণ বিষ্ণুর সঙ্গে এবং ঋক্ বেদের বিরাট পুরুষের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া হয়েছে। ঋক্ বেদে কৃষ্ণ নামে একজন ঋষি আছেন ; ইনি অশ্বিদ্বয়কে সোমপানে আহ্বান করেছিলেন ; এই কৃষ্ণের ছেলে কার্ষ্ণি বা বিশ্বক। ঋক্‌বেদে ও কৌষীতকি ব্রাহ্মণে কৃষ্ণ আঙ্গিরস বংশীয়। ঋক্‌বেদে খিল সূক্তে কৃষ্ণ, বাসুদেব ও বিষ্ণু অভিন্ন। ছান্দোগ্যে ইনি দেবকী পুত্র কিন্তু বসুদেব পুত্র কিনা বলা নাই। এঁকে কেন্দ্র করে বৈষ্ণব সম্প্রদায়। উপরের কাহিনী অংশ বাদ দিয়ে কৃষ্ণ সম্বন্ধে আরো বহু আলোচ্য বিষয় রয়েছে। একটি মতে কৃষ্ণ ছিলেন লৌকিক সৌর দেবতা ; উত্তরকাল বৈদিক আদিত্য বিষ্ণুর সঙ্গে এক হয়ে গেছেন। অন্য মতে কৃষ্ণ ছিলেন অনার্য গোষ্ঠী বিশেষের দেবতা ; পরে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে মিশে গেছেন এবং এঁকে তখন কেন্দ্র করে পৌরাণিক বৈষ্ণব ধর্মের উৎপত্তি। আর একটি মতে কৃষ্ণ ঐতিহাসিক পুরুষ। এক জন ধর্ম প্রবক্তা, সংস্কারক এবং যোদ্ধা। পরে ভক্তরা এঁকে দেবতায় পরিণত করেছেন।

ছান্দোগ্যে (৩, ১৭, ৬) কৃষ্ণকে ঘোর আঙ্গিরস ঋষির শিষ্য এবং দেবকীর ছেলে বলা হয়েছে। উপনিষদে এঁর অভিধা অচ্যুত। পুরাণেও দেবকীপুত্র অচ্যুত। এই ঘোর-আঙ্গিরস্ সূর্যের পুরোহিত ছিলেন এবং কৃষ্ণকে সূর্যোপাসনার দীক্ষা দিয়ে-ছিলেন। ঋক্‌বেদ অনুসারে উপনিষদের কৃষ্ণের গুরুবংশের সঙ্গে ভোজগোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল : মহাভারতেও ভোজরা কৃষ্ণের নিকট আত্মীয়। ছান্দোগ্য-কৃষ্ণ গুরুর কাছে যে তত্ত্ব (৩,১৭, ১-৭) শিখেছিলেন সেগুলি মহাভারতে কৃষ্ণের মুখে গীতা রূপে ধ্বনিত হয়েছে। মহাভারতে কৃষ্ণকে মানুষ রূপে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টাই বেশি। তবু (মহা ১২।২৭১।৬১) শ্লোকে রয়েছে ভগবান বিষ্ণুর তুরীয়ার্দ্ধেন তস্য ইমং বিদ্ধি কেশবম্ অচ্যুতম্। মহাভারতে কৃষ্ণ ক্ষত্রিয় : এবং আঙ্গিরস ঋষি ঘোরের শিষ্য। মথুরার লোক। কংসের অত্যাচারে দ্বারকাতে রাজধানী স্থাপন। যদুবংশে জন্ম ফলে যাদব। ঋক্‌বেদে যদু নামে একটি আর্যগোষ্ঠী ভারতীয় রাজা দিবোদাসের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। মহাভারতে এই বসুদেব পুত্র বৃষ্ণিবংশজ। বৃষ্ণিরাও একটি প্রাচীন গোষ্ঠী ; মথুরা অঞ্চলে থাকত। এই বৃষ্ণিবংশ হয়তো যদুবংশের (দ্রঃ) একটি শাখা। মহাভারতে আছে নরনারায়ণ ঋষি পরজন্মে অর্জুন ও কৃষ্ণ হয়ে জন্মান। কালিকা পুরাণে মহাদেব শরভ রূপে নৃসিংহকে দন্তাঘাত করেন ফলে নর অংশ থেকে নর এবং সিংহ অংশ থেকে নারায়ণ জন্মান। বামন পুরাণে বহ্বৃচ ব্রাহ্মণ ছিলেন ধর্ম, তাঁর স্ত্রী অহিংসা এবং ছেলে হয়, হরি, কৃষ্ণ, নর ও নারায়ণ। কৃষ্ণের শিক্ষাগুরু সান্দীপনি এবং বেদগুরু

আঙ্গিরস বংশে ঘোর ঋষি। মহাভারতে শিশুপাল পূতনাবধের কথা বলেন নি। রামায়ণে (৬।১২০।১৬) ব্রহ্মা রামকে কৃষ্ণ বলেছেন। বৌদ্ধ ও জৈন্য সাহিত্যে কৃষ্ণ মানুষ। বৌদ্ধ দীগ্‌ঘনিকায়ে কাহ্নায়ন গোত্র ও কনৃহ ঋষির নাম আছে। জৈন গ্রন্থে বাসুদেব ও বলদেব দুটি সুপরিচিত নাম। কৃষ্ণকে নবম বাসুদেব ও দ্বারকার লোক বলা হয়েছে। পরবর্তী কল্পে কৃষ্ণ ১২-শ তীর্থঙ্কর হয়ে জন্মেছেন। বৌদ্ধ ঘটজাতক মতে তিনি বোধিসত্ত্ব ঘটের ভাই। মধুরা'র (মথুরা) রাজবংশীয় উপসাগর ও দেবগর্ভার (দেবকী) সন্তান এবং অন্ধকবেনহু (অন্ধকবৃষ্ণি বা অন্ধকবিষ্ণু) ও তাঁর স্ত্রী নন্দগোপা কর্তৃক প্রতিপালিত।

জৈন উত্তরাধ্যয়ন সূত্র অনুসারে বসুদেব ও দেবকীর সন্তান বাসুদেব বা কেশব সৌর্যপুর বা সৌরিক নগরীর রাজপুত্র এবং ২২-জৈন তীর্থংকর অরিষ্টনেমির সমসাময়িক। অর্থাৎ উপনিষদের মানব কৃষ্ণ পরে এই ভাবে দেবতায় পরিণত হতে চলেছিলেন। বিচিত্রবীর্যের ছেলে ধৃতরাষ্ট্রের উল্লেখও কৃষ্ণযজুর্বেদের অন্তর্গত কাঠক সংহিতাতে আছে। কৃষ্ণ ও ধৃতরাষ্ট্র সমসাময়িক। পণ্ডিতদের মতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ (দ্রঃ) হয়ে থাকলে খৃ-পূ নবম বা দশম শতকে হয়েছিল। কৌষীতকি ব্রাহ্মণ ও কাঠক-সংহিতাতে ঘোর-আঙ্গিরসের উল্লেখ রয়েছে। এই গ্রন্থ দুটি এবং ছান্দোগ্য খৃ-পূ ৬ শতকের কিছু আগে লেখা। মেগাস্থিনিস (৩০০-খৃ-পূ) মথুরা, শূরসেন, কৃষ্ণপূজা ইত্যাদি উল্লেখ করেছেন। খৃ-পূ ৪র্থ শতকে কৌটিল্যের সময় যদুবংশের ধ্বংসের কাহিনী সুপ্রচলিত। খৃ-পূ ২-শতকের একটি বৃষ্ণি গণরাজ্যের মুদ্রা পাওয়া গেছে। বরাহ মিহির ও কহ্লণের মতে যুধিষ্ঠির ২৩৯৪ খৃ-পূ। বিষ্ণু পুরাণ মতে পরিক্ষিতের জন্মের ১১১৫ বছর পরে মহাপদ্ম নন্দের অভিষেক হয়। বিষ্ণু পুরাণের হিসাবে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়েছিল ১৪৩০। আল্‌তেকর মতে যুদ্ধ হয়েছিল ১৪০০ খৃ-পূর্বে। বৌদ্ধ জাতকেও কৃষ্ণ বুদ্ধের আগে। জৈন ঐতিহ্য অনুসারে জৈন তীর্থংকর পার্শ্বের (প্রায় খৃ-পূ নবম শতকে) পূর্ববর্তী তীর্থংকর অরিষ্টনেমির সমকালীন। সুতরাং কৃষ্ণ দশম-নবম খৃ-পূর্বের লোকই মনে হয়।

কৃষ্ণের বংশ বৃষ্ণি বা সাত্বত কুলের উল্লেখ ঋক্ বেদে নাই কিন্তু পরে ব্রাহ্মণ সাহিত্যে প্রচুর আছে। পাণিনি (খৃ-পূ ৫ শতক) ও পতঞ্জলি (খৃ-পূ ২ শতক) এই বংশের উল্লেখ করেছেন। মহাভাষ্যে কৃষ্ণকর্তৃক কংসবধের উল্লেখ আছে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সাহিত্যের যুগ থেকে খৃ-পূ দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত ঐতিহাসিক পুরুষ হিসাবে কৃষ্ণের ধারাবাহিক উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং খৃ-পূ দশম-নবম শতকের মানুষ বলেই মনে হয়। মহাভারতে ও পুরাণে কৃষ্ণ মথুরাতে যদু কুলের বৃষ্ণি বা সাত্বত শাখার সন্তান। বৌদ্ধ ঘটজাতকেও মথুরার রাজবংশের কথাই বলা হয়েছে। এর কিছু পরে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বৃষ্ণিকুলকে সংঘ বলা হয়েছে। অর্থাৎ মথুরা যেন সাধারণ শাসিত দেশ। মহাভারতে, অর্থশাস্ত্রে ও বৌদ্ধ জাতকে ইঙ্গিত আছে এই বৃষ্ণি বংশীয় ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন।

অর্থাৎ এই বৃষ্ণি বংশে তাঁর জন্ম; ঘোর-আঙ্গিরসের কাছে তত্ত্ববিদ্যা ও

সান্দীপনি মুনির কাছে অস্ত্রবিদ্যা লাভ করেন। হরিবংশ ও কয়েকটি পুরাণে বৃন্দাবন লীলার বর্ণনা আছে ; মহাভারতে ও বৌদ্ধজাতক ইত্যাদিতে কিন্তু নাই। বৈদিক বিষ্ণুর সঙ্গে গোপালদের ও গোচারণের কিছু সম্পর্ক রয়েছে। খৃস্টীয় প্রথম শতকে পূর্ব ইরানের কাছ থেকে আগত আভীরদের কোন এক গো-পালককে কেন্দ্র করে কিছু লৌকিক উপাখ্যান ছিল। এগুলি সব মিলিয়ে কৃষ্ণ কাহিনী গড়ে উঠেছে। কৃষ্ণের গোপী লীলার ঐতিহাসিক ভিত্তি পাওয়া যায় না ; কবি ও দার্শনিকের হাতে পড়ে বর্তমান আকার ধারণ করেছে। উজ্জ্বল রস ও পুরুষ প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এই গোপীবিলাস অধ্যায় সৃষ্টি করা হয়েছে স্বীকার করলেও গীতগোবিন্দে চরম বিকৃত অন্ধ সহজিয়া দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে। ভাগবতে রাধা নাই। ব্রহ্মবৈবর্তে রাধা কৃষ্ণের স্বকীয়া নায়িকা এবং কৃষ্ণ বিষ্ণু থেকেও শ্রেষ্ঠ এবং বৈকুণ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠ গোলকে গোপ, গোপী ও শ্রীরাধা নিয়ে বাস করেন। চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব সমাজে রাধা পরকীয়া। অথর্ব বেদের গোপালতাপনী উপনিষদে কৃষ্ণ গোপ ও গোপী পরিবৃত হয়ে অবস্থান করেন এবং এখানে প্রধান গোপিনী গান্ধর্বী তত্ত্বজিজ্ঞাসু। হরিবংশে ও বিষ্ণু পুরাণে গোপও গোপী আছে রাধা নাই। অন্য পুরাণে রাধা, সরস্বতী ও গঙ্গা তিন স্ত্রী; এঁরা তিনজন ঝগড়া করে পরস্পরকে শাপ দেন ও শাপে সকলেই মর্ত্যে এসে জন্মান। গাথা সপ্তশতীতে খৃ-পূ ২-শতক প্রথম রাধাকে পাওয়া যায়। দ্রঃ-রাধা। কংসের সঙ্গে কৃষ্ণের বিরোধ সম্ভবত ঐতিহাসিক ঘটনা ; কারণ মহাভাষ্যে এর উল্লেখ রয়েছে।

পাণিনির সময় বাসুদেবভক্তদের পাণিনিতে বাসুদেবক বলা হয়েছে। অর্থাৎ সেই সময়ে তিনি দেবতা গোছের বা দেবতাতে পরিণত হয়েছেন। পতঞ্জলি পরে স্পষ্ট বলেছেন এই বাসুদেব কোন ক্ষত্রিয় বিশেষ নন ; একজন দেবতা। পতঞ্জলি এই টীকা চিন্তার প্রচুর খোরাক জোগায়। খৃ-পূ ৪ শতকের বিদেশীদের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় কৃষ্ণ তখন দেবতা। খৃ-পূ ৩ শতকের পালি সাহিত্য ও নিদ্দেশ থেকে বাসুদেব ও বলদেব ভক্ত পৃথক দুটি সম্প্রদায়ের নাম জানা যায়। অর্থাৎ ক্রমশ দেবাতাতে রূপান্তরিত হয়ে চলছেন। বৃষ্ণিবংশীয় সংকর্ষণ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, সাম্ব ও অনিরুদ্ধ এই পঞ্চবীরের এক কালে মিলিত ভাবে পূজাও প্রচলিত হয়েছিল ; অথচ বায়ু পুরাণে এঁদের 'মনুষ্য-প্রকৃতি'র বলা হয়েছে। অর্থাৎ এই ভাবে ক্রমশ দেবতাতে রূপায়ণ হয়েছিল।

এই ভাবে বর্তমান কৃষ্ণের দুটি-রূপ : একটি রণপণ্ডিত, কূটনীতিজ্ঞ, আশ্রিত বৎসল, পরমতত্ত্বজ্ঞ। আর একটি রূপ প্রেমিক, ভক্তসখা ও গোপীবল্লভ অর্থাৎ সহজিয়া এবং চরিত্রহীনও বটে। কৃষ্ণের প্রচারিত শিক্ষা অন্তর্মুখী ও নিরাসক্ত হয়ে জ্ঞানযজ্ঞের পথে এগিয়ে যাওয়া।

কৃষ্ণ সাধারণত দ্বিভুজ ; তবে পুরাণ ও তন্ত্রে চতুর্ভুজ ও অষ্টভুজ। বিষ্ণু পুরাণে চতুর্ভুজ হয়ে জন্ম ; পরে বসুদেবের প্রার্থনায় দ্বিভুজ হন। ব্রহ্মবৈবর্তে দ্বিভুজ হয়ে জন্ম। গীতাতে চতুর্ভুজ। ঔদুম্বর (খৃ-পূ ১-শতকে), কুলূতে (খৃ ১-শতক) এবং বৃষ্ণি মুদ্রাতে বিষ্ণু চক্র রয়েছে।

কিছু ইউরোপীয় পণ্ডিত মতে কৃষ্ণ কাহিনী হেরাক্লেস কাহিনীতে পরিণত

হয়েছে। পূতনা বধ, কালীয় দমন, গোধনউদ্ধার, ইত্যাদির অনুরূপ বহু কাহিনী হেরাক্লেস জীবনে রয়েছে। কিছু মতে ভারতীয় পুরাণের ছায়াতে গ্রীক পুরাণ গড়ে ওঠে। ধেনুক অরিষ্ট (বৃষ্য), কেশী (অশ্ব), ও যমলার্জুন কাহিনী খৃ ৪-র্থ শতকের সাহিত্যে ও শিল্পে পাওয়া যায়। দ্রঃ-আভীর। একটি মতে খৃস্ট জীবনের কিছু বাল্য লীলাও যেন কৃষ্ণ কাহিনী থেকে নেওয়া।

প্রধান সারথি দারুক; ঘোড়া মেঘপুষ্প, বলাহক, সৈন্য ও সুগ্রীব (দ্রঃ) (মহা ১২।৫৩।২১)। হরিবংশে বার বার বলা হয়েছে পৃথিবীর জন সংখ্যা কমাবার জন্য এবং সুরদ্বিষাম্-দের (১।৫৩।৬৭) বধের জন্য জন্ম। ধর্ম সংস্থাপনের কথা কোথাও নাই। কংস, কালযবন ইত্যাদিও ধার্মিক ছিলেন।

বৈদিক আদিত্য-বিষ্ণু, ব্রাহ্মণ সাহিত্যের ব্রহ্মাণ্ড-পতি রূপে পূজিত নারায়ণ, লৌকিক উপাখ্যান, ঐতিহাসিক কৃষ্ণ, কবির অগাধ কল্পনা ও দার্শনিকের কঠিন প্রকল্প এবং ভাগবতের তথা সহজিয়াদের রতিকান্ত এই সব মিলিয়ে বর্তমানের কৃষ্ণ। ভাগবতে (১০।২৯।৪৬, ১০।৩৩।২৬) গ্রন্থকার কৃষ্ণকে 'নিরোধ' বিলাসী রতিসর্বস্ব লম্পট করে ছেড়েছেন।

বৈষ্ণব মতে এই কৃষ্ণই ঈশ্বর। ইনি পরমাত্মা, রাধা তাঁর হ্লাদিনী শক্তি। ভক্ত হচ্ছেন জীবাত্মা। বেদে কৃষ্ণ একজন ঋষি; মহাভারতে কূটরাজনীতিক ও যোদ্ধা, গীতায় দার্শনিক, বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রেমাস্পদ পরম-পুরুষ। এই সব মিলে কৃষ্ণ। দ্রঃ- শূন্যপুরুষ, বিষ্ণু, বিরজা, শোভা, প্রভা, শান্তি, ক্ষমা।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন—ব্যাস (দ্রঃ)।

কৃষ্ণা—কৃষ্ণাবেণী, কৃষ্ণবেন্বা, বেণী, বেন্বা, বিনা, তিন্না (গ্রীক)। কৃষ্ণা নদী; প-ঘাট-পর্বতে মহাবালেশ্বরে উৎপন্ন: উৎপত্তিস্থানে (একটি তীর্থ) মহাদেবের মন্দির রয়েছে। মুসলিপত্তমের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে এসে পড়েছে। কৃষ্ণাবেণী নদীটি কৃষ্ণা ও বেণী নদীর মিলিত শাখা; এই নদীর তীরে বিল্বমঙ্গলের বাস ছিল।

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ—বাঙলার প্রসিদ্ধ সাধক ও গ্রন্থকার (১৭-শতক)। জনশ্রুতি শ্রীচৈতন্যের সমকালীন।

কেকয়—(১) বৈদিক যুগে একটি শক্তিশালী রাজ্য। বিয়াস ও শতদ্রুর মাঝখানে। শতপথ ব্রাহ্মণ, উপনিষদ, রামায়ণ, পুরাণ ইত্যাদিতে উল্লেখ আছে। রামায়ণের যুগে গান্ধার রাজ্যের পূর্ব সীমা থেকে বিপাশা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রামায়ণে এই রাজ্যের রাজধানী গিরিব্রজ (দ্রঃ- গিরিব্রজপুর) বা রাজগৃহ। অন্য মতে ঝিলম নদীর তীরে জালালপুর (প্রাচীন নাম গির্জাক) এই গিরিব্রজ। মৎস্য ও বায়ুপুরাণে কেকয় জাতি যযাতির ছেলে অনুর বংশধর। ঋক্‌বেদে বহুস্থানে অনু উপজাতির উল্লেখ আছে। অষ্টম -মণ্ডলের একটি সূত্রে আছে পাঞ্জাবে পরুষ্ণী (ইরাবতী) নদীর কাছেই অনু উপজাতিরা বাস করতেন। পরে কেকয়রা এখানে বাস করতেন। কেকয় রাজার থেকে দেশের নাম। (২) সৃঞ্জয়-উশীনর-শিবি। শিবির চার ছেলে মদ্র, সুবীর, কেকয় ও বৃষাদর্ভ। কেকয় রাজারা অনেক সময় অশ্বপতি উপাধি গ্রহণ করতেন। দশরথের স্ত্রী কৈকেয়ী

এক অশ্বপতি-কেকয় রাজের মেয়ে। কৈকেয়ীর ভাইও অশ্বপতি উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। (৩) মিথিলার এক জনকের (দ্রঃ) সমকালীন এক জন কেকয়রাজ অশ্বপতি পরম পণ্ডিত ছিলেন, শতপথে, ছান্দোগ্যে এর উল্লেখ আছে। (৪) সূর্য বংশীয় এক রাজা : মালবের দুটি রাজকুমারী এঁর দুই স্ত্রী। এক জনের ছেলে কীচক ও উপকীচক : আর এক জনের একটি মেয়ে সুদেষ্ণা, বিরাটের স্ত্রী (দ-ভারত, বিরাটপর্ব)। জৈন গ্রন্থ মতে কেকয় রাজ্যের মাত্র অর্দ্ধেক অংশে আর্য বসতি ছিল এবং এই রাজ্যেই 'সেয়বিয়া' নামে একটি নগরী ছিল।

কেকরলোহিত—একটি বিখ্যাত সাপ। নকুলেশ্বর তীর্থে শিবকে পূজা করে নর্মদাতে স্নান করতে নামলে এই সাপ চ্যবনকে পাতালে নিয়ে যায় এবং কামড়ায়। চ্যবন বিষ্ণুর ধ্যান করতে থাকেন, বিষে কোন ক্ষতি হয় না। সাপ তখন চ্যবনকে ছেড়ে দিলে নাগকন্যারা চ্যবনকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। চ্যবন তারপর পাতালে দানব পুরীর দরজায় এলে প্রহ্লাদ এসে চ্যবনকে শ্রদ্ধার সঙ্গে ভেতরে নিয়ে যান। চ্যবন এখানে আসার কাহিনী জানান এবং প্রহ্লাদের প্রশ্নে বলেন পৃথিবীতে নৈমিষ, স্বর্গে পুষ্কর এবং এবং পাতালে চক্রতীর্থ এই তিনটি শ্রেষ্ঠ তীর্থ (বাম-পু)।

কেতকী—দ্রঃ- কপালী।

কেতু—কশ্যপের ছেলে। অন্য মতে বিপ্রচিত্তির ঔরসে সিংহিকার গর্ভে জন্ম এক দানব। এঁর বড় ভাই রাহু (দ্রঃ)। কেতুর হাতে একটি তরবারি ও প্রদীপ। কেতু অমিতৌজস হয়েই জন্মান। পুরাণে ধূম্রবর্ণ (পলাশ ধূমসংকাশঃ), বিশালাক্ষ, পুচ্ছরূপ, চারহাত, শরাসন। খড়্গ চর্ম, গদা ও বাণ। ক্রূর। বৌদ্ধ তন্ত্রে বিভিন্ন জ্বরের দেবতা; কৃষ্ণবর্ণ, দ্বিভুজ, হাতে খড়্গ ও নাগপাশ। হিন্দু জ্যোতিষে কেতু (ডিসেণ্ডিং নোড) ও রাহু অশুভ গ্রহ নামে পরিচিত।

কেতুগণ—জৈমিনি পুত্র এঁরা ; বামন ; কুশদ্বীপে।

কেতুবর্মা—ত্রিগর্ত রাজকুমার। এঁর বড় ভাই সূর্যবর্মা। বড় ভাইয়ের আদেশে কেতুবর্মা যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধের ঘোড়া ধরেন। অর্জুনের হাতে দুই ভাই নিহত হন (মহা ১৪।৭৩।১৪)।

কেতুমতী—দ্রঃ- হেতি। সুমালীর (দ্রঃ) স্ত্রী।

কেতুমান—(১) সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মা পূর্ব দিকে সুধন্বা, দক্ষিণে শঙ্খপাদ, পশ্চিমে কেতুমান এবং উত্তরে হিরণ্যরোমক এই চারজন প্রহরী স্থাপন করেন (অগ্নি-পু)। (২) কলিঙ্গরাজ শ্রুতায়ুধের বন্ধু। কুরুক্ষেত্রে ভীমের হাতে মারা যান (মহা ৬।৫০।৭০)। (৩) একলব্যের পুত্র, দুর্যোধনের পক্ষে ছিলেন, ভীমের হাতে নিহত হন। (৪) দক্ষকন্যা দনুর একটি ছেলে (ভাগ)। (৫) ধন্বন্তরির ছেলে।

কেতুমাল—(১) অগ্নীধ্র পূর্বচিত্তির একটি ছেলে। (২) জম্বুদ্বীপের নবম অংশ। মেরু পর্বতের পূর্ব দিকে। ভাগবতে (৫।১৮।১৫) ভগবান বিষ্ণু এখানে কামদেব রূপে বর্তমান। সম্বৎসর নামে প্রজাপতির পুত্র ও কন্যাগণ এখানে অধিপতি।

কেতুমালবর্ষ—তুর্কিস্থান এবং অক্সাস বিধৌত দেশ (মার্ক, বিষ্ণু)।

কেদারনাথ—৩০°৪৪'১৫" উ×৭৯°৬'৩৩" পূ। উচ্চতা ৩৫২৫ মি। একটি ৩ বর্গ কি-মি চওড়া, গোল মত উষর উপত্যকা। মাঝখান দিয়ে দক্ষিণে প্রবাহিণী মন্দাকিনী। পূর্বতীরে মন্দির ও বসতি, পশ্চিম তীর বসতিহীন। উপত্যকার তিন দিকে সুমেরু পর্বতমালা—রুদ্র হিমালয়, বিষ্ণুপুরী, ব্রহ্মপুরী, উদ্‌গারীকণ্ঠ ও স্বর্গারোহিণী। এখানে পঞ্চ-গঙ্গা ঃ—অলকানন্দা (অদৃশ্য), মন্দাকিনী, দুধগঙ্গা, ক্ষীরগঙ্গা ও মৌগঙ্গা এবং পঞ্চকুণ্ড ঃ—উদককুণ্ড, রেতস্‌কুণ্ড, অমৃতকুণ্ড, ঈশানকুণ্ড, হংসকুণ্ড। শীতে ছ মাস তুষারবৃত থাকে। দীপান্বিতা থেকে অক্ষয়তৃতীয়া পর্যন্ত এখানে কেদারনাথ মন্দির বন্ধ থাকে। মন্দাকিনী ও দুধগঙ্গার সঙ্গমের দক্ষিণে কেদারনাথ মন্দির ১২-শ শিব মন্দিরের একটি। রুদ্র হিমালয়ের বরফ ঢাকা পর্বতমালা থেকে সমকোণে নির্গত একটি পর্বতবাহুর ওপর নির্মিত। মহাপন্থা শিখরের নীচে, যুক্তপ্রদেশে গাড়োয়ালে বদ্রিনাথের পশ্চিমে। ঘুর পথে যেতে হয় বলে কেদারনাথ থেকে বদ্রিনাথ ৮ দিনের পথ। হরিদ্বার থেকে কেদারনাথ ১৬ দিনের পথ। কেদারনাথ শিখর (শিব/পু) বদরিকাশ্রমে অবস্থিত। প্রবাদ অর্জুন/পাণ্ডবরা কেদারনাথের পূজা চালু করেন। মন্দিরের কাছে ভৈরবঝম্প বলে একটি খাড়াই রয়েছে, এখান থেকে বহু ভক্ত আগে লাফ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন করতেন। শঙ্করাচার্য এখানে মারা যান (দ্রঃ- কাঞ্চিপুরম)। মন্দিরের কাছে রেতঃকুণ্ড নামে একটি কুণ্ড রয়েছে; এই কুণ্ডে কার্তিকের জন্ম বলা হয়। এখান থেকে ৩২ মাইল নীচে উখী মঠ; এখানে মান্ধাতা ও পঞ্চ পাণ্ডবের বিগ্রহ রয়েছে। দ্রঃ- দক্ষিণ কেদার। বৈশাখের শেষের দিকে মন্দির খোলা হয়। উপত্যকার উত্তরে কেদারনাথ পাহাড়ের পাদদেশে পাথরের তৈরি এই মন্দির। আকারহীন এক খণ্ড পাথরকে মহিষরূপী মহেশ্বর বলে কল্পনা করা হয়। মন্দিরের উত্তরে অমৃতকুণ্ড ও নীলকণ্ঠ মহাদেব। কাছেই শঙ্করাচার্যের সমাধিক্ষেত্র। ধারণা বৃষরূপী শিবের পৃষ্ঠদেশ কেদারনাথে, বাহু তুঙ্গনাথে, মুখাবয়ব রুদ্রনাথে, জটা কল্পেশ্বরে, নাভি মদমহেশ্বরে। এই পাঁচটি মিলে পঞ্চকেদার। দেহের বাকি অংশ পশুপতি নাথে (কাঠমণ্ডু)।

কেদারনাথ হিমালয়ের শ্রেষ্ঠ তীর্থ; জ্যোতির্লিঙ্গের এবং পঞ্চ কেদারের অন্যতম। কেদারনাথের জ্যোতির্লিঙ্গের উল্লেখ মহাভারতে ও কয়েকটি পুরাণে আছে। চামোলি জেলার উখিমঠ মহকুমাতে। হৃষিকেশ থেকে ১৭৬ কি-মি দূরে কুণ্ডচটি; এখানে থেকে ৫১ কি-মি দূরে ত্রিযুগী নারায়ণ। ত্রিযুগী নারায়ণ থেকে কেদারনাথে পৌঁছতে হয়।

কেন—সামবেদের তলবকার ব্রাহ্মণের নবম অধ্যায়। অর্থাৎ তলবকার উপনিষৎ। গদ্যে ও কবিতায় লেখা। শিষ্য ও আচার্য সংবাদ; পরে একটি রূপক মাধ্যমে ব্রহ্মত্ব আলোচিত হয়েছে। ব্রহ্মের সঙ্গে জগৎ ও জীবনের সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা। শঙ্কর, রামানুজ ও মধ্ব ভাষ্য রয়েছে।

কার ইচ্ছায় প্রেরিত হয়ে মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়বর্গ নিজ নিজ কাজ করে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। মন, প্রাণ ইত্যাদির বর্তমান পরিচয় দেহ বিজ্ঞানে যতটা মিলেছে, সেখানে ব্রহ্ম অবান্তর। কিন্তু তবুও জীবনের বা প্রকৃতির কোন 'কেন' এবং প্রাণেরও ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় নি। সবই ব্রহ্ম বলে এই দুর্মর কেন প্রশ্নকে সমাধান করতে চেষ্টা করা

হয়েছিল। সেই প্রাচীন অতীতে উপনিষদ কেন বলে চিন্তা করতে পেরেছিল এটাই সব চেয়ে দুঃসাহসিকতা ও এইটুকুই অভিনন্দনীয়। হৈমবতীর আবির্ভাব সুন্দর নাটকীয়।

কেবলাভেদ—দ্রঃ- অচিন্ত্যভেদাভেদ।

কেরল—কেরলপুত্র, কেতলপুত্র, চের (দ্রঃ) দেশ, দমিল (দ্রঃ), নায়ারদের দেশ। প্রাচীন চের ভাষা থেকে এই নাম। চন্দ্রগিরি নদীর দক্ষিণ অংশে। গোকর্ণের দক্ষিণ থেকে কেপ-কমরিন পর্যন্ত এলাকা ; এবং প-ঘাট পর্বতমালার প-দিকে। পুরাণ ও মহাভারতে এর উল্লেখ আছে। শঙ্করাচার্য এখানে পূর্ণা নদীর তীরে কালদি কলতি গ্রামে জন্মান। বৃষপর্বতের পাদদেশে এই গ্রাম। পিতা শিবগুরু. পিতামহ বিদ্যাধিরাজ ; দীক্ষাগুরু বেদান্তী গোবিন্দ গণ্ড পদ্যাচার্য সন্ন্যাস নেওয়ান। গোবিন্দ ছিলেন গৌড়পাদের শিষ্য। কেরলের রাজধানী ছিল অনন্ত-শয়নম্। পরশুরাম এখানে ব্রাহ্মণ বসতি স্থাপন করেন। ভগীরথ গঙ্গা নিয়ে এলে জলে বহু জায়গা ডুবে যায়। গোকর্ণের মন্দিরের কাছে যে সব ব্রাহ্মণরা থাকতেন তাঁরা পালিয়ে গিয়ে পরশুরামের কাছে অভিযোগ করেন। পরশুরাম এসে সমুদ্রকে তখন বাণবিদ্ধ করতে চান ; কিন্তু বরুণদেব দেখা দিয়ে জল সরিয়ে নিয়ে কিছু জমি মুক্ত করে দিতে রাজি হন। যে এলাকাটি জলমুক্ত হয় সেই অংশটির নাম হয় কেরল। অন্য মতে ১৮ বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করে পরশুরাম যজ্ঞ করেন। সমস্ত জমি কশ্যপকে দান করেন। নিজের জন্য সমুদ্রকে বাণবিদ্ধ করে কিছু নতুন দেশ তৈরি করে নিয়ে সেখানে বসবাস করতে থাকেন ; এই দেশের নাম হয় কেরল (দ্রোণপর্ব)। রামায়ণে সুগ্রীব সীতাকে খোঁজবার জন্য কেরল ইত্যাদিতে যেতে বলেছিলেন। মেগাস্থিনিস্ (৪ খৃ-পূ) কেরলের শাসন ব্যবস্থার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। ইবন বতুতা (১৩৩৩ খৃ) ভারতে আসেন ; কেরল সম্বন্ধে তাঁর বর্ণনাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন পৃথিবীর এত দেশ দেখলাম ; অদ্ভুত এই কেরল ; এখানে রাস্তা সম্পূর্ণ দস্যুতস্কর মুক্ত। এখানে একটি নারিকেল চুরি করলেও প্রাণদণ্ড হয়। দ্রঃ- কশ্যপ. পরশুরাম. চিত্তমৃবলম্।

কেশব—কেশী (দ্রঃ) দানবকে হত্যা করে কৃষ্ণের নাম।

কেশবতী—নেপালে বিষ্ণুমালি বা বিষ্ণুমতী নদী, বাগমতীর করদা শাখা। কেশবতীতে চারটি নদী মিলিত হয়ে চারটি সঙ্গম তৈরি করেছে ঃ-- কাম, নির্মল, অকর ও জ্ঞান ; চারটি তীর্থস্থান ; নেপালে প্রধান ১৪টি তীর্থের অন্তর্গত। স্বয়ম্ভূ পুরাণে কেশবতীতে যুক্ত হয়েছে বিমলাবতী, ভদ্রানদী, স্বর্ণবতী, পাপনাশিনী ও কনকবতী ; এই পাঁচটি পবিত্র সঙ্গমের নাম যথাক্রমে মনোরথ, নির্মল (ত্রিবেণী), নিধন, জ্ঞান ও চিন্তামণি।

কেশবিন্যাস—মহেন্-জো-দড়োতে তামার নর্তকীমূর্তির মাথায় বেণী রচিত কবরী রয়েছে। ভারতে কবরী রচনার এটি প্রাচীনতম নিদর্শন। সাঁচি ইত্যাদিতে চুলবাঁধার বহু বিচিত্র উদাহরণ রয়েছে। অজন্টার অনেকগুলি ছবিতে কবরীর দু পাশে অবেণীবদ্ধ অলকগুচ্ছ ঝুলে রয়েছে। কবরীতে ফুলের শেখরক (নানা ধরণের টিকলি/কল্কা) ও আপীড় (পুষ্পমালা) ব্যবহার ৬৪ কলার একটি (বাৎস্যায়ন)।

কেশরী—বানররাজ। মেরুপর্বতে থাকতেন। অপ্সরা পুঞ্জিকাস্থলা এক ঋষির শাপে

অঞ্জনা বানরীতে পরিণত হন। অন্য মতে অপ্সরা মানগর্বা ব্রহ্মার শাপে অঞ্জনা হন। কেশরীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে বিয়ে করেন। অবশ্য বিয়ের পর অঞ্জনা নাম হয়েছিল। এদের কোন সন্তান হয় নি। সন্তানের আশায় অঞ্জনা বায়ুর আরাধনা করছিলেন। এই সময় দেবতারা হরপার্বতীকে জানান রাবণ বধের জন্য তাঁরা পৃথিবীতে জন্মাচ্ছেন এবং মহাদেব যেন বিষ্ণুকে যথাসাধ্য সাহায্য করেন। হরপার্বতী তৎক্ষণাৎ বানর ও বানরী বেশে বনে চলে যান ; বহু দিন কোন খোঁজ থাকে না। দেবতারা তখন এ'দের সন্ধানে বায়ুকে পাঠান। বায়ু সমস্ত গাছপালা তুমুল ঝড় তুলে নাড়া দিতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত একটি অশোক গাছকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বায়ু এই গাছে এ'রা বসে আছেন দেখেন। পার্বতী তখন গর্ভবতী হয়েছেন। এই গর্ভ পার্বতী বায়ুকে দিয়ে দেন এবং বায়ু এই গর্ভ অঞ্জনাকে দান করেন (বনপর্ব)।

কেশিনী—(১) সগর (দ্রঃ) রাজার প্রথমা স্ত্রী। বিদর্ভ কন্যা। (২) নল রাজের স্ত্রী দময়ন্তীর এক জন পরিচারিকা। বাহুক বেশে নল এলে কেশিনী বাহুকের সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিত হন বাহুকই রাজা নল। (৩) অজমীঢ়ের স্ত্রী। পুরু বংশে ; ছেলে জহ্নু, জন (মহা ১।৮৯।২৮ ; অন্য মতে ব্রজ/ব্রজন), রূপিন্। (৪) এক জন অপ্সরা। (৫) দক্ষের একটি মেয়ে ; কশ্যপের স্ত্রী। (৬) নিকষার এক নাম (ভাগবত)। (৭) সুধন্বার (দ্রঃ) স্ত্রী।

কেশী—(১) দনুর পুত্র। দেবসেনাকে (দ্রঃ) অপহরণ করতে চেষ্টা করেছিলেন। বিষ্ণুর সঙ্গেও এক কেশীর এক বার যুদ্ধ হয়েছিল। (২) কংসের অনুচর, এক জন দানব ; কংস কৃষ্ণকে হত্যা করবার জন্য কেশীকে পাঠান। হরিবংশে (১৫৪।৫০) হয়গ্রীব অসুর ; কংসের ছোট ভাই। ঘোড়া সেজে গোপদের ওপর নানা অত্যাচার আরম্ভ করতেন এবং মেরে খেয়ে ফেলতেন। কৃষ্ণকেও গিলতে যান ; কিন্তু এর মুখের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলেন। নারদ (হরি ২।২৪।৬৫) নাম দেন কেশব। অরিষ্টের পর নিহত হয়। (৩) বসুদেবের স্ত্রী কৌশল্যার ছেলে।

কৈকসী—নিকষা। দ্রঃ- সুমালী।

কৈকেয়ী—(১) কেকয় রাজার মেয়ে। যুধাজিতের বোন। দশরথের দ্বিতীয় স্ত্রী; ছেলে ভরত। অযোধ্যা থেকে কেকয় ৭-দিনের পথ। রামায়ণে আছে মন্থরার কাছে রামের (দ্রঃ) অভিষেকের কথা শুনে আনন্দে একটি আভরণ খুলে দেন এবং আরো বর দিতে চান (২।৭।৩৬) ; পরদিন অভিষেক হবে। মন্থরা আভরণ নেয় না; বোঝাতে থাকে। কৈকেয়ী তবু রামের প্রশংসা করতে থাকেন এবং বোকার মত বা সরল বিশ্বাসে বলেন রামের একশ বছর পরে ভরত রাজ্য পাবে (২।৮।১৬)। শেষপর্যন্ত কৈকেয়ীকে পরামর্শ দেয় রামকে ১৪ বছরের জন্য বনে পাঠাতে ও ভরতকে রাজ্যে অভিষিক্ত করা হক (২।৯।৩০)। শম্বরের (দ্রঃ) যুদ্ধে দেওয়া দুটি বরের কথাও মন্থরা মনে করিয়ে দেয় এবং প্রতিশ্রুত বর দুটি চেয়ে নিয়ে কর্মসিদ্ধি করতে বলে (২।১০।২০) ; বর দুটি আদায়ের জন্য ক্রোধাগারে গিয়ে অবস্থান করতে নির্দেশ দেয়। দ্রঃ- দশরথ। এইখানে কৈকেয়ী মন্থরাকে মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করতে থাকেন। মন্থরার পিঠে কুঁজের মধ্যে বুদ্ধি

জমা রয়েছে ইত্যাদি বলেন (২।৯।৪৬)। এটিও কৈকেয়ীর বুদ্ধির পরিচয়। কৈকেয়ী নিজেই বনবাসের জন্য দণ্ডকারণ্য নির্বাচন করেছিলেন (২।১১।১২)। পর দিন সকালে সুমন্ত্র দশরথকে ডাকতে এলে কৈকেয়ীই নিজে রামকে নিয়ে আসতে বলেন। রাম এলে দশরথ (দ্রঃ) চুপ করে থাকেন এবং কৈকেয়ী সব কিছু বলেন এবং রাম যতক্ষণ না বনে যাবেন ততক্ষণ স্নান খাওয়া করবেন না (২।১৯।১৭)। কৈকেয়ীর কথাতে দশরথ অজ্ঞান মত হয়ে পড়েন।

বনে যাবার সময় রামচন্দ্রেরা দশরথের কাছে বিদায় নিতে এলে সুমন্ত্র (দ্রঃ) কৈকেয়ীর মায়ের একটি কাহিনী শোনায়। এক সাধু কৈকেয়ীর পিতাকে বর দিয়েছিল সমস্ত পশুপক্ষীর ডাক বুঝতে পারবে। একদিন এক জন্তু পাখির ডাক শুনে রাজা হেসে ফেলেন ; কৈকেয়ীর মা হাসির কারণ জানতে চান। রাজা জানান জানালে মৃত্যু হবে। কিন্তু কৈকেয়ীর মা জিদ ধরে, বাঁচ বা মর বলতেই হবে (২।৩৫।১৮)। রাজা অবশ্য রাণীকে কিছুই বলেন নি। সুমন্ত্র বোঝান এই ধরণের মায়ের মেয়ে কৈকেয়ী। কৈকেয়ী সম্বন্ধে ভরতের উক্তি আত্মকামা, সদাচণ্ডী, ক্রোধনা, প্রাজ্ঞমানিনী (২।৭০।৩০)।

দশরথ রামের সঙ্গে ধনরত্ন সমেত চতুরঙ্গবাহিনী যাবার নির্দেশ দিলে কৈকেয়ী ভয় পেয়ে যান। পীতমণ্ডা-সুরাম্ ইব রাজ্য ভরত নেবে না বলে প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠেন (২।৩৬।১২) এবং যুক্তি দেখান সগর যেমন অসমঞ্জকে তাড়িয়ে ছিলেন তেমনি তাড়াতে হবে। সিদ্ধার্থ এই সময়ে প্রতিবাদ করেন ; অসমঞ্জ অত্যাচারী ছিল ইত্যাদি বোঝান এবং কৈকেয়ীকে বহু গালিও দেন। কিন্তু রাণী অটল থাকেন এবং নিজেই তারপর রামচন্দ্রদের জন্য দর্ভচীরাণি এনে দেন। দ্রঃ- সীতা। রাম চলে গেলে দশরথ (দ্রঃ) কৈকেয়ীকে পরিত্যাগ করেছিলেন।

বশিষ্ঠ, সুমন্ত্র ইত্যাদি আরো অনেকে কৈকেয়ীকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন। দশরথ সরাসরি অবশ্য রামকে বনে যেতে বলেন নি। কিন্তু রাম জানতেন কৈকেয়ীকে বিয়ে করার সময় দশরথ শ্বশুরকে কথা দিয়েছিলেন রাজ্য কৈকেয়ীর ছেলেকে দেবেন (২।১০৭।৩)। দশরথের মৃত্যুতে কৈকেয়ীকে একটুও শোকসন্তপ্ত দেখা যায়নি। মাতুলালয় থেকে ভরত (দ্রঃ) এসে কৈকেয়ীর ঘরে ঢুকে দেখেন কৈকেয়ী সোনার আসনে বসে রয়েছেন (২।৭২।২)। ভরতের কাছে কৈকেয়ী ঘৃণিত জীবে পরিণত হয়েছিলেন। রামের (দ্রঃ) অশ্বমেধ যজ্ঞের পর মারা যান। দ্রঃ- কৌশল্যা। (২) পুরুবংশে অজমীঢ়ের স্ত্রী। (৩) বিরাট রাজার স্ত্রী সুদেষ্ণার অপর নাম।

কৈটভ—প্রলয় সমুদ্রে বিষ্ণু যখন অনন্ত নাগের কোলে যোগ নিদ্রায় শুয়ে ছিলেন তখন বিষ্ণুর নাভি পদ্মে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর কর্ণমল থেকে দু জন অসুর উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মার দিন শেষ হয়ে রাত্রি আরম্ভ হয়ে দ্বিতীয় যাম কেটে গেলে এদের জন্ম। দ্রঃ- জাম্ববান। অন্য মতে সৃষ্টির পর ব্রহ্মা ঘুমিয়ে পড়েন তখন এদের জন্ম। অসুর দু জন কাঠের মত নিশ্চল হয়ে পড়েছিলেন, ব্রহ্মা এঁদের দুজনের মধ্যে বায়ু চালনা করে জীবিত করেন। এক জনের শরীর কোমল বলে নাম হয় মধু, দ্বিতীয় জন কঠিন বা কীটের

মত বলে নাম হয় কৈটভ। হরিবংশে বিষ্ণু কর্ণ মলোদ্ভবঃ; ব্রহ্মা স্পর্শ করেন ; এক জন মৃদু ফলে নাম হয় মধু আর একজন কঠিন ফলে নাম হয় কৈটভ (১।৫২।২৫)। আর এক মতে পদ্মে ব্রহ্মা জন্মাবার পর বিষ্ণু দুটি বিন্দু জল সৃষ্টি করেন। একটি বিন্দু মধু মত মিষ্ট এবং এই থেকে মধু জন্মায়, ইনি তমোগুণের (হরি ৩।১৩) আধার। অপর বিন্দু থেকে কৈটভ জন্মান, রজোগুণের আধার। এরা জলেতেই বড় হয়ে এবং ক্রমশ উদ্ধত হয়ে উঠতে থাকেন, এবং চিন্তা করতে থাকেন এই বিরাট জল রাশি কোথা থেকে এল। এই সময় মহামায়া/মহাশক্তি দেখা দেন এবং বাক্-বীজ দান করেন। এই বীজ মন্ত্রের দ্বারা এরা হাজার বছর দেবীর আরাধনা করতে থাকেন। দেবী তখন এসে বর দিতে চান এবং এরা ইচ্ছা মৃত্যু বর চান। বর পেয়ে আরো উদ্ধত হয়ে ওঠেন। ব্রহ্মার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এগিয়ে যান। অন্য মতে এদের গর্জনে ব্রহ্মার ঘুম ভেঙে যায়। আর এক মতে এক দিন ব্রহ্মার চারটি বেদ চুরি করে পাতালে গিয়ে লুকিয়ে রাখেন। ব্রহ্মা এদের অনুসরণ করতে চেষ্টা করেন এবং শেষ পর্যন্ত বিষ্ণুকে জাগিয়ে দেন। বিষ্ণুর সঙ্গে তখন এদের হাজার/পাঁচহাজার বছর যুদ্ধ হয় তবুও এঁরা ক্লান্ত হন না। এক মতে বিষ্ণু এই সময় বুঝতে পারেন এরা ইচ্ছামৃত্যু বর পেয়েছেন এবং মহামায়ার ধ্যান করে জানতে পারেন বঞ্চনা না করলে এদের নিহত করা যাবে না। অন্য মতে কোন যুদ্ধ হয় নি। বিষ্ণু এঁদের কাছে বর চান লোকের মঙ্গলের জন্য এঁরা তাঁর বধ্য হক। হরিবংশে এরা হাজার বছর যুদ্ধ করে প্রীত হয়ে আবাং জহি বলে অনুরোধ করেন এবং বিষ্ণুর পুত্রত্ব চান। বিষ্ণু এদের টিপে মারেন (১।৫১।৩১)। হরিবংশে (৩।১৩) ব্রহ্মাকে যুদ্ধে ডাকে, ব্রহ্মা নারায়ণের কাছে যেতে বলেন। নারায়ণকে এরা বিনীত ভাবে স্তব করে ও বর চায়। নারায়ণ বলেন প্রাপ্ত আয়ু থেকে আরো বেশি দিন বাঁচতে চাইছে সেইজন্য বধ্য। এরা বর চায় যেখানে কোন দিন কেউ মারা যায় নি সেইখানে তাদের নিহত করতে হবে এবং নারায়ণের পুত্র হয়ে যেন জন্মাতে পারে। একটি মতে মধুকৈটভ এই সময় আরো কিছু যুদ্ধ করতে চান কিন্তু বিষ্ণু রাজি হন না, পর জন্মে (খর ও অতিকায় হয়ে জন্মালে) যুদ্ধের বাসনা মেটাবেন বলে, আশ্বাস দিয়ে বিষ্ণু এঁদের নিহত করেন। আর এক মতে মধুকৈটভ সর্ত করেন কোন জল হীন স্থানে তাদের বধ করতে হবে এবং পর জন্মে যেন তারা বিষ্ণুর ছেলে হয়ে জন্মাতে পারেন। বিষ্ণু কোন জলহীন জায়গা না পেয়ে নিজের উরু বিশালতর করে দুজনকে সেই উরুর ওপর নিহত করেন। অন্য মতে স্থান না পেয়ে ব্রহ্মাকে বলেন শক্তিরূপিণী শিলা উঁচু করে তুলে ধরতে। ব্রহ্মা এই শিলা ধারণ করলে বিষ্ণু এর ওপর উঠে নিজের উরুর ওপর দৈত্য দুজনকে সুদর্শন চক্র দিয়ে হত্যা করেন। অসুরদের মেদ জলে ছড়িয়ে পড়ে এবং এই মেদ জমা হয়ে ক্রমশ একটি ঢেলা/মেদিনীতে পরিণত হয়। দেবী ভাগবতে (১।৯।৫২) আছে দেবী 'চোখ মারতে' থাকেন ; যুদ্ধরত এঁরা বিচলিত হয়ে পড়েন ; এই সুযোগে বিষ্ণু নিহত করেন। দ্র-ঃ মধু, ধুন্ধু। (২) উলূকের আর এক নাম ; শকুনির ছেলে।

কৈবল্য—দ্রঃ- পাতঞ্জল, মুক্তি।

কৈমুরপর্বত—কিম্মৃত্য (দ্রঃ), কুমার, কৈর, কৈরমালি (>কৈমুর), কিরমালি। শোণ ও তোন নদীর মধ্যে। প্রাচীন কইর দেশ, রেওয়ার কাছে। দ্রঃ- করূষ।

কৈলাস—মেরু পর্বতের পূর্ব দিকে জঠর ও দেবকূট, পশ্চিম দিকে পবমান ও পারিযাত্র, দক্ষিণে কৈলাস ও করবীর এবং উত্তরে ত্রিশৃঙ্গ ও মকরগিরি। কৈলাসে শিব ও কুবের বাস করেন। কুবেরের সঙ্গে যক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নর ও রাক্ষস ইত্যাদিও রয়েছেন। শিবকে সন্তুষ্ট করার জন্য কৃষ্ণ (দ্রঃ) একবার কৈলাসে তপস্যা করেছিলেন। রাজা সগর দুই স্ত্রীকে নিয়ে এখানে তপস্যা করেছিলেন। গঙ্গা আনার সময় ভগীরথ শিবকে সন্তুষ্ট করতে এখানে আরাধনা করেন। ভীম এই কৈলাসে কুবেরের পদ্মবনে এসেছিলেন।

মহাভারতে নাম হেমকূট। অষ্টপাদ। কৈলাস পর্বতমালা কাশ্মীর থেকে ভূটান পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পর্বতমালার মাঝখানে লাছু ও ঝংছু দুটি পাহাড় দিয়ে ঘেরা অংশ কৈলাস পর্বত। এই পর্বতের উত্তরাংশে কৈলাস শিখর তুষারময় ৬৭১৪ মি। এই শিখরটি দ-পশ্চিম তিব্বতে ; লাসা থেকে ১২৮৭ কি-মি দূরে। বর্তমানে তিব্বতী নাম কিং-রিম-পোচে বা কাঙ্গরিন পোচ। পাহাড়ের ২৬ কি-মি দক্ষিণে রাবণ হ্রদ (বর্তমান রাক্ষস তাল) ও মানস সরোবর। এই অঞ্চলে চারটি নদী সিন্ধু, শতদ্রু, ব্রহ্মপুত্র ও সরযূ। তাপমাত্রা ১৯·৪° সে ও ১৬·৭° সে। প্রচুর বৃষ্টি। কুমায়ুন রাজাদের অবহেলার ফলে এটি তিব্বতের অন্তর্ভুক্ত হয়। মানস সরোবর থেকে ২৫ মাইল উত্তরে, গঙ্গোত্রী থেকে আরো উপরে এবং নিতি গিরিপথের পূর্বে। গাঙ্গরি পর্বত মালত্রার একটি বাহু ; প্রশান্ত গম্ভীর দৃশ্য। মনকে ভরিয়ে দেয়। যে কোন হিমালয় শিখর থেকে সুন্দর। পাহাড়ের দুপাশে খাদ, এই পথে যাত্রীরা যায়। মহাভারতে ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে কুমায়ুন ও গাড়োয়াল কৈলাস শাখাতে অবস্থিত। বদরিকা আশ্রম কৈলাসে বলা হয়। এখানে হ্রদগুলি থেকে উত্তরে সিন্ধু সিংহমুখ থেকে, পশ্চিমে শতদ্রু বৃষভমুখ থেকে এবং পূর্বে ব্রহ্মপুত্র অশ্বমুখ থেকে বার হয়েছে। কৈলাস জৈনদের অষ্টপাদ পর্বত। শিখরটি পরিক্রমা করতে গড়ে তিন দিন মত লাগে, ২৫ মাইল মত পথ। এখানে গৌরীকুণ্ডের জল সারা বছরই জমে থাকে। কৈলাস হরপার্বতীর আবাস, গন্ধর্বদের দেশও। একটি তীর্থ স্থান। তিব্বতীদেরও পুণ্যতম শিখর। ভারত থেকে কৈলাস যাবার ৬-টি হাঁটা পথ আছে।

কোইল—(১) যুক্তপ্রদেশে আলিগড়। বলরাম এখানে কোল দৈত্যকে হত্যা করেন। (২) কোকিলা নদী ; বিহারে সাহাবাদ জেলাতে।

কোকাক্ষেত্র—কৌশিকী/কুশী নদীর পশ্চিমে দেশ। পূর্ণিয়া জেলার পশ্চিম অংশ মিলে। ত্রিবেণীর নীচে নাথপুরে অবস্থিত বরাহ ক্ষেত্র (=কোকামুখ) ও কোকাক্ষেত্রের অন্তর্গত এই পূর্ণিয়া ত্রিবেণী (দ্রঃ)। দ্রঃ- মহাকৌশিক।

কোগ্রাম—বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত একটি বৈষ্ণব তীর্থ। নিকটে উজানি মহাপীঠ ; এখানে সতীর দ-কনুই পড়েছিল। দেবী সর্বমঙ্গলা, ভৈরব কপিলাম্বর। স্থানীয় মতে এটি কালিদাসের উজ্জয়িনী।

কোঙ্কন—দ-ভারতে একটি দেশ ; মহাভারতে উল্লেখ আছে।

কোঙ্কন—(১) পরশুরাম ক্ষেত্র (দ্রঃ)। (২) অপরান্তক দেশ (দ্রঃ)। (৩) গোমন্ত দেশ (দ্রঃ)। (৪) মূষিক দেশ (দ্রঃ)। (৫) কোঙ্কম ঃ-পশ্চিমঘাট পর্বতমালা ও আরব সাগরের মধ্যবর্তী অংশ ; অর্থাৎ উত্তরে গুজরাট, পূর্বে দাক্ষিণাত্য, দক্ষিণে উত্তর কানাড়া এবং পশ্চিমে আরব সাগর। রাজধানী তান/থান (আলবেরুনি)। দ-কোঙ্কন=গোপরাষ্ট্র, কুভ। দ্রঃ- কোঙ্কনপুর।

কোটবী—(হরিবংশে) অনিরুদ্ধ বাণের হাতে বন্দী হয়ে কোটবতী দেবীর স্তব করেন। স্তব উপরিচর বসুর ইন্দ্র স্তব মত ; কোটবতী সব দেবী ইত্যাদি। কোটবতী অর্থে কোটবী। এরপর বাণের সঙ্গে যুদ্ধে দেববচনাৎ আবার স্তব। কোটবীকে বলা হয়েছে দেবীর অষ্টম ভাগ। নগ্ন দেবী, উদ্যত চক্র কৃষ্ণের সামনে থেকে গুহকে মহাদেবের কাছে সরিয়ে নিয়ে যান। এরপর শিবের নির্দেশে দেবীর দত্তক পুত্র বাণের প্রাণ ভিক্ষা চান কোটবী। কৃষ্ণ বাণের সব হাত কেটে নিয়ে দ্বিহস্ত করে ছেড়ে দেন। ভাগবতেও বাণের যুদ্ধে কোটবী আছেন। গ্রন্থাকারের চরম অক্ষমতার পরিচয়, অতি নিম্নমানের চলচ্চিত্র ছবির মত চমক দেবার চেষ্টা। কৃষ্ণ লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন ; লেখক ভেবে দেখেননি পাঠকরাও ঘৃণায় চিরদিন ঘটনাটি বাদ দিয়ে যাবে।

কোঙ্কনপুর—অনগণ্ডি : তুঙ্গভদ্রার উত্তর তীরে কোঙ্কনের প্রাচীন রাজধানী। একটি মতে এটি বাসেইন।

কোঙ্গুদেশ—কোঙ্গ। বর্তমানের কোইম্বাটুর, সালেম, তিন্নিভেলি ও ত্রিবাঙ্কুরের কিছুটা মিলে।

কোচবিহার—প্রাচীন পৌণ্ড্রদেশের অংশ। বিশেষত নিবৃত্তির পূর্ব অংশ।

কোজাগর—শরৎকালে দুর্গাপূজার পরবর্তী পূর্ণিমাতে লক্ষ্মীপূজা। পুরাণে আছে ঐ রাতে লক্ষ্মী দেবী এসে 'কো জাগর্তি'—কে জেগে আছে—আমি ধন দেব বলেন। এই জন্য নাম কোজাগর।

কোটিকাস্য—রাজা সুরথের ছেলে ; ত্রিগর্তরাজ জয়দ্রথের অনুচর ; শিবীনাং প্রবরঃ; একে দ্রৌপদী চিনতেন (মহা ৩।২৫০ -)। জয়দ্রথের নির্দেশে দ্রৌপদীকে প্ররোচনা দিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেন। দ্রৌপদী প্রত্যাখ্যান করলে জয়দ্রথ এসে দ্রৌপদীকে অপহরণ করেন।

কোলাহল—পদ্মপুরাণে বিষ্ণুর এক অবতার।

কোটিতীর্থ—(১) কোট বা করোড় তীর্থ ; কালঞ্জর দ্রঃ। (২) মথুরা। (৩) গোকর্ণে এক পবিত্র পুষ্করিণী। (৪) কুরুক্ষেত্রে। (৫) উজ্জয়িনীতে মহাকাল মন্দিরের প্রাঙ্গণে একটি পবিত্রকুণ্ড। (৬) ধনুষ্কোটিতীর্থ (স্কন্দ)। (৭) নর্মদা তীরে একটি তীর্থ।

কোটেশ্বর—কোটিশ্বর, কচ্ছেশ্বর। কচ্ছের রাজধানী। কিয়ে-ৎসি-ষি-ফা-লো (হিউ-এন-ৎসাঙ) কচ্ছের পশ্চিম উপকূলে একটি তীর্থ। সিন্ধুর শাখা কোরি নদী তীরে।

কোট্টয়ম—নেলসিণ্ডা (পেরিপ্লাসে), নিলকিণ্ডা (টলেমি), নলকানন, নলকালিক; ত্রিবাঙ্কুরে একটি প্রাচীন বন্দর।

কোণারক—অর্কক্ষেত্র (দ্রঃ)। কৃষ্ণ প্যাগোডা।

কোণ্ডবির—কুণ্ডপুর, দ্রঃ- কুণ্ডিনপুর অপর নাম কুন্দিনপুর, কুন্দপুর, কুন্তিনগর, বিদর্ভনগর, ভীমপুর। বিদর্ভের প্রাচীন রাজধানী। রুক্মিণীর পিতৃরাজ্য। দ্রঃ- কুন্তলপুর, বিদর্ভ। টাভের্নিয়ার বর্ণিত কোণ্ডবির ; বর্তমানে কোনডইডু ; মাদ্রাজ জেলাতে গুণ্টুরের কাছে।

কোরিয়—হয়তো উত্তর কুরু।

কোরুরু—(১) বা করুর। পাঞ্জাবে মুলতান জেলাতে ; মুলতান ও লোনির মধ্যে। উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্য শকদের এখানে পরাজিত (৫৩৩ খৃ) করেন। এই সময় থেকে যেন সম্বৎ সাল গণনা হয়। একটি মতে এই বিক্রমাদিত্য দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত; অন্যমতে যশোবর্মা নামে এক জন গুপ্তসেনাপতি এই নাম নিয়েছিলেন এবং শকদের পরাজিত করেন ইত্যাদি। (২) চের রাজধানী করুর। চের (দ্রঃ)।

কোলপর্বতপুর—>কোলপুর। বর্তমানে কুলিয়-পাহাড়পুর বা পাহাড়পুর। নদীয়া জেলাতে, বাঙলায়। পোলউর (টলেমি)। গঙ্গার ক্যাম্বিসন মোহনার কাছে। সমুদ্রগরি/সমুদ্রগতির (অর্থাৎ গঙ্গার প্রাচীন মোহনা) কাছেই।

কোলহাপুর—কোল্লা (=অম্বাবাই বা মহালক্ষ্মী) যে পুরে থাকেন। ১৬°৪২′ উ ×৭৪°১৬′ পূ ; মহারাষ্ট্রে একটি জেলা ও সহর। এই জেলার মধ্য দিয়ে কৃষ্ণা, পঞ্চগঙ্গা ও বেদগঙ্গা ইত্যাদি নদী প্রবাহিত। এখানে প্রসিদ্ধ মন্দির মহালক্ষ্মী মন্দির, নবম শতকের ভাস্কর্যের নিদর্শন। ব্রহ্মপুরী অঞ্চলে মেদাদিত্যের মন্দির রয়েছে। এখানে বৌদ্ধও জৈনধর্মও এক দিন প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল।

কোলাচল—গয়াতে ব্রহ্মযোনি পর্বত (বায়ু -পু)। কোলাহল পর্বত (দ্রঃ) যেন। আবার মনে হয় কোলাহল যেন অন্য। কোলাচল কলুহাপাহাড়ও হতে পারে। দ্রঃ- মুকুল পর্বত।

কোলাহল পর্বত—(১) গয়াতে ব্রহ্মযোনি পর্বত (বায়ু পু) ; মুণ্ডপৃষ্ঠ পর্বত মিলে। মুণ্ডপৃষ্ঠে গদাধরের পদচিহ্ন রয়েছে। (২) চেদি রাজ্যে একটি পর্বত মালা অর্থাৎ বুন্দেলখণ্ডের দ-পশ্চিমে বন্দিয়ার পর্বত মালা। এই পাহাড়ে (দ্রঃ- কর্ণাবতী) শুক্তিমতী নদীর উৎপত্তি।

কোলাহলপুর—কোলালপুর, কোলর, কোলার। মহীশূরের পূর্বে। এখানে কার্ত-বীর্যার্জুন নিহত হন। রুদ্রগয়া।

কোলি—কপিলাবস্তুর বিপরীত দিকে রোহিণী নদীর ওপারে দেবদত্তের রাজধানী। সুপ্রবুদ্ধ বা অঞ্জনরাজের রাজধানী। এই সুপ্রবুদ্ধের দুই মেয়ে মায়াদেবী ও প্রজাপতি গোতমী ; এরা শুদ্ধোদনের দুই স্ত্রী। মায়াদেবীর ভাই দণ্ডপাণিরও এই রাজ্য। দণ্ডপাণির মেয়ে গোপা =যশোধরা ; বুদ্ধের স্ত্রী। অযোধ্যাতে বস্তি জেলার একটি অংশ এই কোলি; বরাহছত্র (দ্রঃ) এই কোলির অন্তর্গত। নেপালি তরাইতে রুম্মিনদেই ও কোলির মধ্য অংশে রোহিণ বা রোহিণী নদিকা।

কোলিক—কোকিল। একটি ধেড়ে ইঁদুর। এক বার গঙ্গাতীরে একটি বিড়াল

তপস্যা আরম্ভ করে। কিছু দিন পরে পাখী ই'দুর সকলেই নির্ভয়ে এর কাছে আসতে থাকে। বিড়াল এদের নেতা হয়ে দাঁড়ায় এবং প্রত্যহ গোপনে একটি করে ই'দুর খেতে থাকে এবং ক্রমশ হৃষ্টপুষ্ট হতে থাকে, যুগপৎ ইদু'র সংখ্যাও কমতে থাকে। শেষ পর্যন্ত কোলিক সব কিছু ধরে ফেলে। কাহিনীটি দুর্যোধন উলূককে বর্ণনা করেন (কা-প্র)। দ্রঃ- বিড়াল তপস্বী।

কোলিত—মহা মোগ্গল্লান (দ্রঃ)।

কোল্কয়ই—কোর্কয়ই। পাণ্ড্য রাজ্যের রাজধানী। তিন্নেভেলিতে তাম্রপর্ণী নদীর মুখে। বর্তমানে দেশের ভেতর দিকে ৫-মাইল সরে গেছে। কয়েল (মার্কোপোলো); অন্য মতে টিউটিকোরিন যেন। অগস্ত্য জাতকে এটি কর ; টলেমির কোলখোই। দ্রঃ- কল্কি।

কোশল—কাশীর উত্তরে অযোধ্যা প্রদেশের সন্নিহিত রাজ্য। দেশটি মনু ইক্ষ্বাকুকে দিয়েছিলেন (রামা ২।৪১।১৩)। মোটামুটি রাজধানী অযোধ্যা (দ্রঃ)। দুটি ভাগ :- উত্তর কোশল (বরাইচ জেলা) এবং কোশল ; রাজধানী যথাক্রমে শ্রাবস্তী ও কুশাবতী (কুশস্থালিক)। বুদ্ধের সময় কোশল শক্তিশালী দেশ ; বারাণসী ও কপিলাবস্তু এর অন্তর্গত ছিল। ৩০০ খৃ-পূর্বে মগধের (রাজধানী পাটলিপুত্রের) অধীনে আসে। ইক্ষ্বাকুর পিতা মনু নির্মাণ করেছিলেন। শতপথ ব্রাহ্মণ ও প্রশ্নোপনিষদে এই দেশের উল্লেখ আছে। সরযূ নদীর উত্তরে উত্তর-কোশল, দক্ষিণে দক্ষিণ কোশল ; রাজধানী যথাক্রমে শ্রাবস্তী ও কুশাবতী। রামের রাজধানী ছিল দক্ষিণ-কোশলে। ভীম উত্তর কোশল ও সহদেব দক্ষিণ কোশল জয় করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কালে এখানে রাজা ছিলেন ক্ষেমদর্শী। মুনি কালকবৃক্ষীয়ের (দ্রঃ) সঙ্গে কোশলরাজ ক্ষেমদর্শীর রাজধর্ম নিয়ে কথোপকথন হয়েছিল। কোশলরাজকে অভিমন্যু হত্যা করেছিলেন। অম্বার স্বয়ংবর কালে ভীষ্ম, দুর্যোধনের সম্মান ও সমৃদ্ধির জন্য কর্ণ, এবং অশ্বমেধের জন্য অর্জুন এই কোশল দেশ জয় করেন। বৌদ্ধ গ্রন্থে নাম সাকেত। খৃ-পূ ৬ শতকে উত্তর ভারতে যে ১৬-টি মহাজনপদ ছিল তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ। বুদ্ধের সমকালীন রাজা প্রসেনজিৎ পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। প্রসেনজিতের আগেই কাশী কোশলের অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রসেনজিতের ছেলে শাক্য রাজ্য জয় করেন। প্রসেনজিতের সময় কোশল ও মগধের মধ্যে কলহ দেখা দেয় এবং কোশল দুর্বল হয়ে পড়ে ও শেষ পর্যন্ত মগধের অন্তর্গত হয়ে যায়। স্কন্দপুরাণ অনুসারে কোশলে দশ লক্ষ গ্রাম ছিল।

কোশল (দক্ষিণ)—গণ্ডোয়ান, মহাকোশল। মধ্য প্রদেশের পূর্বাংশ সমেত। সময়ে সময়ে পশ্চিম ও দক্ষিণ সীমানা অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। ১১-১২ খৃঃ শতকে রাজধানী রত্নপুর। প্রাচীন রাজধানী চিরায়ু। বৌদ্ধযুগে বিদর্ভ বা বেরার ছিল দ-কোশল। বৎস রাজ উদয়ন (কোশাম্বী দ্রঃ) দ-কোশল জয় করেন। অশোকের ধৌলি লেখে দ-কোশল—টোসলি। দ্রঃ- মহাকোশল, গড় মণ্ডল।

কোশাম্বী—কুশাম্ব (দ্রঃ) নির্মিত নগরী। বৎস্য রাজ্যের মধ্যস্থানে অবস্থিত। পাণ্ডব বংশে উদয়ন এখানে রাজত্ব করতেন। দ্রঃ- কৌশাম্বী।

কোষ—প্রাচীন অর্থে বাছাই করা বিষয়ের (শব্দ) সংগ্রহ। যেমন রত্নকোষ, শব্দকোষ, কথাকোষ। সর্ব প্রাচীন অর্থাৎ প্রথম কোষ গ্রন্থ বৈদিক শব্দের তালিকা; নাম নিঘণ্টু। নিঘণ্টুর ব্যাখ্যা রূপে যাস্ক নিরুক্ত গ্রন্থটি লেখেন। এরপর রচিত প্রসিদ্ধ শব্দকোষ হল অমর সিংহের, নাম লিঙ্গানুশাসন; বইটি অমরকোষ নামে প্রসিদ্ধ। বইটি অভিধান মত সাজান নয়; এটি একটি প্রতিশব্দ কোষ; লিঙ্গানুসারে সাজান। আধুনিক রীতির কোন কোষ গ্রন্থ প্রাচীন কালে ছিল না।

কোষ্ঠী—এর বিচারে মূল সূত্র ভারত ও পাশ্চাত্য দেশে প্রায় একই। ভারতীয় জ্যোতিষ নিরয়ণ রাশি চক্রের ভিত্তিতে আর পাশ্চাত্য জ্যোতিষে আয়ন রাশি চক্রের ওপর রচিত। এই জন্য ভাবাধিপতি গ্রহ নির্ণয় ইত্যাদি অনেক সময় তফাৎ হয় এবং ফলাদেশও ভিন্ন হয়। ভারতীয় জ্যোতিষে গ্রহগণের দৃষ্টি আলোচনা করা হয়। পাশ্চাত্য জ্যোতিষে দৃষ্টি নাই তার বদলে দুই গ্রহের মধ্যে আসপেক্ট বা প্রেক্ষা কল্পনা করা হয়েছে। জাতকের ভবিষ্যৎ জীবন, কোন বয়সে কি হবে নির্ণয়ের জন্য ভারতীয় জ্যোতিষে দশা গণনা প্রবর্তিত হয়েছে। পাশ্চাত্য দেশে দশা গণনার বদলে ডিরেকসান বা গ্রহচালনা পদ্ধতি রয়েছে। বৈদিক বা পরবর্তী কালে এই ধরণের কোন কোষ্ঠী গণনা ছিল না। খৃস্ট জন্মের পর এই দেশে রাশিচক্র ও গ্রহভিত্তিক ফলাদেশ পদ্ধতি চালু হয়। অনেকে মনে করেন আলেকজাণ্ডারের পর শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণ পরিবার যাঁরা পশ্চিম থেকে ভারতে এসেছিলেন তাঁরাই গ্রহভিত্তিক ফলশাস্ত্র প্রবর্তন করেছিলেন। এই ব্রাহ্মণদল গ্রহ-বিপ্র নামেও পরিচিত। বরাহ-মিহিরের (খৃ ৬ শতক) গ্রন্থে ফলিত জ্যোতিষের যে বর্তমান রূপ তার উল্লেখ রয়েছে।

কৌৎস—(১) একজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ। সর্পযজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। (২) বা কৌৎস্য। বরতনুর শিষ্য। শিক্ষার পর গুরু-দক্ষিণা দিতে চাইলে গুরু-কোটি স্বর্ণমুদ্রা চান। কৌৎস রাজা রঘুর কাছে আসেন। রঘু সে সময় বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করে নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলেন। রাজা তখন কুবেরের রাজ্য জয় করবেন মনস্থ করেন। কুবের রাতারাতি তখন রাজ-ধনাগার ভরে দেন; রাজা ও কৌৎসকে প্রার্থিত অর্থ দান করেন (রঘু-বংশ)।

কৌথুম—ব্রাহ্মণ হিরণ্যনাভের ছেলে। জনক রাজার আশ্রমে গিয়ে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তর্ক করতে করতে এক জন ব্রাহ্মণকে হত্যা করে ফেলেন। ফলে শাপে কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হন। পিতার নির্দেশে সূর্যের আরাধনা করে শাপ ও রোগমুক্ত হন।

কৌন্তেয়—কুন্তীর যে কোন ছেলে।

কৌমোদকী—অগ্নি প্রদত্ত কৃষ্ণের গদা। খাণ্ডবদাহের (দ্রঃ) সময় বরুণের কাছে থেকে অগ্নি এই গদা ও সুদর্শন চক্র এনে কৃষ্ণকে দান করেন। এই সময়ে ইন্দ্রের সঙ্গে এই গদা নিয়ে কৃষ্ণ যুদ্ধ করেন।

কৌরব—কুরু বংশে জন্ম যে কোন লোক। তবে দুর্যোধনদেরই সাধারণত কৌরব বলা হয়। দ্রঃ- কুরু।

কৌরব্য—(১) কদ্রুর গর্ভে কশ্যপের ঔরসে জন্ম একটি সাপ। (২) বশিষ্ঠ বংশে এক জন গোত্র প্রবর্তক মহর্ষি।

কৌশল্যা—(১) কোশলরাজের মেয়ে; দশরথের প্রথমা স্ত্রী; রামচন্দ্রের মা। রাজা দশরথ এ'কে এক হাজার গ্রাম দিয়েছিলেন (রা ২।৩১।২২); অর্থাৎ প্রচুর নিজস্ব আয় ছিল।

রামের সুহৃৎরা এ'কে প্রথম খবর দেন আগামী দিন রামের অভিষেক হবে। দশরথ দেন নি। কৌশল্যা মঙ্গল কামনায় নিযুক্ত হন। এদিকে অন্তঃপুরে (রা ২।২০।১১) বনবাসের খবর তখন ছড়িয়ে পড়েছে। বিষ্ণুর পূজা করে কৌশল্যা আহুতি দিচ্ছিলেন এমন সময় রাম এসে সব জানান। হতবাক কৌশল্যা অজ্ঞান মত হয়ে পড়েন; তারপর রামকে বোঝাতে চেষ্টা করেন চিরদিন কৈকেয়ী ও তাঁর লোকেদের হাতে নিগৃহীত হয়ে এসেছেন; কৈকেয়ী খরবাদী (রা ২।৪০।৪২) ইত্যাদি। লক্ষ্মণ এই সময় বলেন প্রয়োজন হলে সকলকে হত্যা করে রামকে তিনি রাজা করবেন। কৌশল্যা লক্ষ্মণকে সমর্থন করেন। শেষ পর্যন্ত স্বস্ত্যয়ন ইত্যাদি করে রামকে বিদায় দেন। অসহায় প্রধান মহিষী। বনে যাবার মুহূর্তে সীতাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন বনে স্বামীকে যেন অভক্তি না করেন। রামের অপসৃয়মান রথের পেছু পেছু পাগলের মত ছুটতে চেষ্টা করেছিলেন। বৃদ্ধ দশরথ এরপর কৌশল্যার প্রাসাদে গিয়ে ওঠেন; কৌশল্যা প্রায় সারারাত পাশে বসে কেঁদেছিলেন (রা ২।৪২।১৫)। কৌশল্যা এই সময় বলেছিলেন কৈকেয়ী এবার লব্ধকামা পন্নগী হয়ে ঘুরে বেড়াবে। দশরথের উচিত ছিল বর দেওয়া যে রাম অযোধ্যাতেই থাকবে; ভিক্ষা করে জীবন কাটাবে। এই সময় সুমিত্রা কিছুটা সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেন। রামচন্দ্রকে (দ্রঃ) বনে রেখে সুমন্ত্র ফিরে এলে কৌশল্যা মাটিতে পড়ে কাঁদতে থাকেন; সুমন্ত্র সান্ত্বনা দেন (রা ২।৬০।-)। কৌশল্যা এই সময় মিষ্টি ভাষায় দশরথকে তীব্র কটূক্তি করতে থাকেন। এই সময়ে কৌশল্যা বলেছিলেন আজকে বনবাসায় রামস্য পঞ্চরাত্রিঃ অদ্য গণ্যতে (রা ২।৬২।১৭); আবার আছে সায়াহ্নে দ্বিতীয়ে অহনি সুমন্ত্র (দ্রঃ) অযোধ্যায় ফিরে যাবেন। আবার আছে পথে নিষাদ-রাজ গুহের সঙ্গে সুমন্ত্র কয়েক দিন অপেক্ষা করেছিলেন। আবার দশরথ বলেছেন আজকে ৬ষ্ঠ রাত্রি 'রামে প্রব্রাজিতে বনম্' (রা ২।৬৫।৪)।

দশরথ অর্দ্ধরাত্রে মারা যান; কৌশল্যা ও সুমিত্রা পাশেই ঘুমাচ্ছিলেন; টের পান নি। সকালে এ'দের ডেকে তোলা হয়। কৌশল্যা দশরথের মাথা কোলে তুলে নিয়ে বিলাপ করেন এবং সামনে কৈকেয়ীকে পেয়ে তিরস্কার করতে থাকেন। এর পর ব্যবহারিকরা কৌশল্যাকে সরিয়ে নিয়ে যায়। অযোধ্যায় ফিরে রাম অশ্বমেধ যজ্ঞ করার পর কৌশল্যার মৃত্যু হয়। (২) অম্বা, অম্বিকা, অম্বালিকার মা। (৩) যাদব কেশীর (দ্রঃ) মা। (৪) যযাতির ছেলে পুরুর স্ত্রী; ছেলে জনমেজয় (মহা ১।৯০।১১)।

কৌশাম্বী—বর্তমান নাম কোসাম। কৌসাম্বি, কৌসাম্বিনগর, কোসম, কোসাম, বৎসদেশ। দ্রঃ-বৎস। প্রাচীন নগর। রত্নাবলীতে কৌশাম্বীর বর্ণনা আছে। এলাহাবাদ থেকে দ-পশ্চিমে ৫১ কি-মি দূরে যমুনা নদীর বাঁ দিকে অবস্থিত ছিল। দুর্গপ্রাকার ও পরিখা সুরক্ষিত প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষের ওপর বর্তমানের কোসাম ও পাশের গ্রামখানি দাঁড়িয়ে রয়েছে। পাশেই যমুনা। প্রাচীন প্রাকারের মোট দৈর্ঘ্য ছিল ৬'৪ কি. মি;

উচ্চতা গড়ে প্রায় ১১ মি ; কতকগুলি বুরুজের উচ্চতা ২১ মিটারেরও বেশি। পুরা-কালের প্রাকারের বাইরেও বসবাস ছিল এবং এই বাসস্থান এলাকা ২১ বর্গ কি-মি। প্রাকারের উ-পূর্ব ও পশ্চিমে গাত্রে নিয়মিত ব্যবধানে বুরুজ ও একাদশটি প্রবেশদ্বার ছিল ; এদের মধ্যে পাঁচটি মূল দরজা। এই জায়গাটির প্রাচীনতা খৃ-পূ এক হাজার বছরের কাছে হবে এবং বিভিন্ন যুগের বহু প্রত্ন বস্তু এখান থেকে পাওয়া গেছে। আদি প্রতিরক্ষা গড়টির নির্মাণকাল প্রাক্‌বুদ্ধ যুগের। গড়ের মধ্যে পূর্বদিকের দরজার কাছে ইঁটের তৈরি ঘোষিতারাম নামে সংঘারামটি ছিল। অর্থাৎ এই সংঘারামের স্থান ও ধ্বংসাবশেষ নিশ্চিতভাবে পাওয়া গেছে।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর একের পর এক রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন-ঘটলেও খৃ ৫-শতক পর্যন্ত কৌশাম্বীর গৌরব অক্ষুন্ন ছিল। দুর্গ প্রাকারের তৃতীয় পর্যায়ের নির্মাণ হয়েছিল (খৃ-পূ ২ শতক) মিত্র নৃপতিদের সময়। কনিষ্কের সময়ে (খৃ ১ শতক) বুদ্ধমিত্রা নামে একজন ভিক্ষুণী একটি বোধিসত্বের মূর্তি এইখানে প্রতিষ্ঠা করেন। পঞ্চমবারে প্রাকার নির্মিত হয় সম্ভবত মঘদের রাজত্ব কালে। খৃস্টীয় ২-শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে কৌশাম্বীতেই মঘদের রাজধানী ছিল। গুপ্তযুগে কৌশাম্বী গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। গুপ্তযুগের শেষ পর্যায়ে বৌদ্ধবিরোধী হূণদের হাতে কৌশাম্বীর পতন আরম্ভ হয়। হিউ-এন-ৎসাঙ-এর পরিদর্শন কালে কৌশাম্বী ছিল ১৯৩২ কি-মি-এর অধিক আয়তন বিশিষ্ট একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র, রাজধানীর পরিসীমা ছিল ৯·৭ কি-মি।

জৈনদের প্রভাব এখানে বিশেষ ছিল না। জৈনদের মতে মহাবীর বর্দ্ধমান এখানে চন্দ্রসূর্যের দ্বারা পূজিত হয়েছিলেন এবং চন্দনা এখানে কৈবল্য লাভ করেন। এখানে জীনপ্রভসূরির জন্ম ও সারা জীবন কেটেছিল। এ জন্য জৈনদের কাছেও জায়গাটি পবিত্র। কোসাম থেকে ৪ কি-মি দূরে পাভোসা পাহাড়টি খুব সম্ভবত হিউ--এন-ৎসাঙ বর্ণিত ড্রাগন গুহার পাহাড়। পাহাড়ে অহিচ্ছত্রের রাজা আষাঢ় সেন একটি গুহা কস্‌সপীয় অর্হৎ-দের জন্য খুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন।

খৃ-পূ ৬-শতকে সুপ্রতিষ্ঠিত ষোড়শ জনপদের অন্যতম বৎস রাজ্যের রাজধানী। শতপথ ব্রাহ্মণেও এর উল্লেখ আছে। রামায়ণ ও মহাভারতে আছে কুশাম্ব এই রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। পুরাণে আছে গঙ্গার জলে হস্তিনাপুর ডুবে গেলে নিচক্ষু (অর্জুনের পর ৭ম পুরুষ) এখানে রাজধানী নিয়ে আসেন এবং নিচক্ষু থেকে ক্ষেমক পর্যন্ত ২৫ জন-রাজা এখানে রাজত্ব করেন। এই বংশের প্রসিদ্ধ রাজা উদয়ন, বুদ্ধের সমকালীন। এখানে ঘোষিতারামে বুদ্ধদেব বাস করতেন। বৌদ্ধরা উদয়নকে রাজা পরন্তপের ছেলে বলেছেন। স্ত্রী বাসবদত্তা বা বাসুলদত্তা ছিলেন চণ্ড প্রদ্যোত (মহাসেনের) মেয়ে। উদয়নকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দেন পিণ্ডোলা। উদয়নই প্রথমে বৌদ্ধপ্রতিমা তৈরি করান, চন্দন কাঠে ৫ ফু খাড়া মূর্তি। কোশলরাজ প্রসেনজিৎও বুদ্ধের সমসাময়িক; ইনি বুদ্ধের দ্বিতীয় প্রতিমা নির্মাণ করান, এটি সোনার। ফা-হিয়েন বলেছেন এটিও চন্দন কাঠের। বররুচি (কাত্যায়ন) এখানে জন্মেছিলেন এবং পাটলি-

পুত্রের রাজা নন্দের মন্ত্রী হন। ঘোষিত, কুক্কুট, ও পাবারিক তিন জন বিত্তশালী শ্রেষ্ঠী এই নগরীতে বৌদ্ধধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং তিন জনে তিনটি বিহার ঘোষিতারাম, কুক্কুটারাম ও পাবারিকারাম বা পাবারিকাম্রবন তৈরি করে দিয়েছিলেন। কৌশাম্বীতে বা এর উপপ্রান্তে চতুর্থ বুদ্ধাবাস বদরিকারাম। উদয়নের দারু-শিল্পী উত্তরও একটি বিহার করে দিয়েছিলেন। ঘোষিতারামে বুদ্ধদেব একাধিক বার অবস্থান করেছিলেন। সারিপুত্ত, আনন্দ ইত্যাদি শিষ্যও এখানে এই মঠে বাস করেছিলেন। এই সংঘারামেই সব প্রথম সংঘভেদের সূত্রপাত হয়। বুদ্ধদেবের সময় কৌশাম্বী সমৃদ্ধ সম্ভ্রান্ত নগরী ছিল। অশোকের সময় বৎস রাজ্য মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত নগরী হয়েছিল এবং কৌশাম্বী সমৃদ্ধ ছিল ও অশোকের মহামাত্যের কর্মকেন্দ্র ছিল। এলাহাবাদের অশোক স্তম্ভটি প্রথমে কৌশাম্বীতেই ছিল। হিউ-এনৎ-সাঙ এখানে দশের বেশি সংঘারাম দেখেছিলেন এবং সবগুলিই বিনষ্ট প্রায় তখন; এবং পঞ্চাশের বেশি ব্রাহ্মণ্য মন্দির ও অগণ্য অবৌদ্ধ জনতাকে দেখেছিলেন।

কৌশিক—(১) মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরকে বনবাস কালে (৩।১৯৭।-) এই কাহিনী শোনান। এক জন ব্রাহ্মণ তপস্বী। এক দিন গাছ তলায় বসে বেদ পাঠ করছিলেন। এই সময় একটি বলাকা এ'র ওপর পুরীষ ত্যাগ করলে ইনি ক্রুদ্ধ হয়ে ওপর দিকে চাইতেই বকটি ছাই হয়ে যায়। তখন অনুতপ্ত কৌশিক ভিক্ষা করতে করতে ঘুরে বেড়াতে থাকেন। পূর্বপরিচিত এক গৃহস্থের বাড়িতে এলে গৃহিণী তাঁকে একটু অপেক্ষা করতে বলেন কারণ বাসন মাজছিলেন। ইতিমধ্যে ক্ষুৎপীড়িত স্বামী ফিরে আসে; গৃহিণী স্বামী সেবায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। পরে ভিক্ষুকের কথা মনে পড়তে লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি ভিক্ষা দিতে আসেন। এই দেরি হওয়াতে কৌশিক রেগে যান; বলেন স্বামীকে শ্রেষ্ঠ মনে করলে ব্রাহ্মণ অতিথিকে অপমান করা হয় ইত্যাদি। কিন্তু মহিলাটি হাসি মুখে বলেন স্বামী সেবা আগে; বকের মত তাকে ছাই করে ফেলা সম্ভব হবে না; ধর্মের যথার্থ রূপ কৌশিক জানেন না; অক্রোধ ও মোহহীনকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলেন। এছাড়া মিথিলাবাসী ধর্ম-ব্যাধের (দ্র:) কাছে গিয়ে কৌশিককে তিনি ধর্ম শিক্ষা করতে বলেন। গৃহিণী আবার ক্ষমা চান; কৌশিক সন্তুষ্ট হয়ে চলে যান। কৌশিক বাড়ি ফেরেন এবং সেই দিনই বার হয়ে পড়েন। মিথিলাতে গিয়ে ধর্মব্যাধের কাছে কৌশিক পিতামাতাকে সেবা করার ফল জানতে পারেন এবং বাড়ি ফিরে গিয়ে পিতামাতার ও বৃদ্ধদের সেবায় নিযুক্ত হন। (২) নদীর ধারে বাস কারী জনৈক সত্যবাদী ব্রাহ্মণ তপস্বী। পূর্বোক্ত কৌশিক হতে পারেন। দস্যুর ভয়ে এক বার কয়েক জন লোক তাঁর আশ্রমে আশ্রয় নেয়। দস্যুরা এদের সন্ধানে এলে কৌশিক সত্য কথা বলেন ফলে লোকগুলি মারা পড়ে। এ জন্য কৌশিককে (মহা ৮।১৯।১৭) নরকে যেতে হয়। (৩) এক জন মুনি; কুরুক্ষেত্রে থাকতেন। হরিবংশে ওঁকারনাথ-টীকাতে এই কৌশিক বিশ্বামিত্র (১।২১।৬)। এর ছেলে খসৃম, ক্রোধন হিংস্র, পিশুন, কবি, বাগদুষ্ট, পিতৃবর্তী। চরিত্র অনুসারে এই নাম রাখা হয়েছিল। ছেলেগুলি গার্গ্যের আশ্রমে শিক্ষা লাভ করেন। কৌশিক মারা গেলে এ'রা ভীষণ দরিদ্র হয়ে পড়েন এবং দেশেও সেই সময় ভীষণ

দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। গার্গ্য তাঁর কপিলা দুগ্ধবতী গরুটিকে বনে চরিয়ে আনতে বলেন। এরা ক্ষুধিত ছিল ; ঠিক করে গরুটিকে মেরে পিতৃদেবদের পূজা দিয়ে সেই মাংস খাবে। কোন পাপ হবে না। কবি ও খসৃম বারণ করতে চেষ্টা করেছিল। পিতৃবর্তী (হরি ১।২১।১৫) ধেনুকে প্রোক্ষয়িত্বা পিতৃগণের উদ্দেশ্যে নিবেদন করে মাংস খান এবং গার্গ্যকে জানান গরুটিকে নেকড়ে বাঘে খেয়েছে। বাছুরটি ফিরিয়ে দেন।

কালক্রমে এই সাতটি ছেলে মারা গিয়ে দাসপুরে নিম্ন শ্রেণীতে বনবাসী হয়ে জন্ম নেন। পিতৃদেবদের যজ্ঞ করেছিলেন বলে পূর্বজন্মের কথা এদের মনে ছিল। ফলে এরা ধর্মাচরণ করতেন ও দেবতাদের ভক্তি করতেন। হরিবংশে (১।২১।২১) দশার্ণে ব্যাধের ঘরে জন্ম। জাতিস্মর। নাম নির্বৈর, নিবৃতি, শান্ত, নির্মন্যু, কৃতি, বৈধস ও মাতৃবর্তী। এদের পিতা মাতা মারা গেলে এরাও বনে গিয়ে দেহ ত্যাগ করে শুভ কর্মের জন্য কালঞ্জর পাহাড়ে জন্তু/হরিণ হয়ে জন্মান। হরিবংশে নাম উন্মুখ, নিত্য-বিত্রস্ত, স্তব্ধকর্ণ, বিলোচন, পণ্ডিত, ঘস্মর ও নাদী। এই জন্মেও এদের পূর্ব জ্ঞান ছিল এবং পাহাড় থেকে লাফ দিয়ে পড়ে দেহত্যাগ করে। হরিবংশে যোগধর্ম পালন করে প্রায়োপবেশনে (১।২১।২৮) দেহত্যাগ ; কালঞ্জরে এখনও এদের পদচিহ্ন আছে। এরপর শরদ্বীপে চক্রবাক হয়ে জন্ম ; নাম নিঃস্পৃহ, নির্মম, ক্ষান্ত, নির্দ্বন্দ্ব নিষ্পরিগ্রহ, নিবৃত্তি, নিভৃত (হরি ২১।৩১)। এবারও ধার্মিক ইত্যাদি, প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগ ও মানসে সাতটি হংস হয়ে জন্ম। হরিবংশে নাম সুমনা, শুচিবাক্, শুদ্ধ, পঞ্চম্, ছিদ্রদর্শন, সুনেত্র, স্বতন্ত্র। পদ্মপুরাণে এদের চরিত্র অনুসারে এবার নাম হয় সুমনস্, কুসুম, বসু, চিত্রদর্শী, সুদর্শী, জ্ঞাতা ও জ্ঞানপারগ। হরিবংশে (১।২১) আছে নীপদের রাজা বিভ্রাজ (পৌরব) অন্তঃপুরবাসীদের নিয়ে এই বনে আসেন। রাজাকে দেখে স্বতন্ত্র এই রকম রাজা হতে চান ; নিষ্ফল তপস্যাতে ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন (১।২১।৪৪)। অন্য দুই ভাই স্বতন্ত্রের সচিব হতে চান। এদের কথা শুনে যোগভ্রষ্ট হবার জন্য শুচিবাক্ ইত্যাদি চার ভাই তিরস্কার করেন। বাসনা পূর্ণ হবে তবে যোগ ভ্রষ্ট হতে হবেই। এরা তিন জনে কাতর হয়ে পড়লে সুমনা আশ্বাস দেয় মানুষ হয়ে জন্মালেও যোগধর্ম লাভ করবে ; স্বতন্ত্র সর্বপ্রাণীরুতজ্ঞ হবে এবং এই মনুষ্য জন্মে সপ্তব্যাধাঃ দশার্ণেষু ইত্যাদি শ্লোক শুনে মুক্তি পাবে (হরি ১।২২।১২)।

বিভ্রাজ (দ্রঃ) পুত্র অণুহ রাজা হলে এরা মারা যায়। অণুহের ছেলে হয়ে স্বতন্ত্র জন্মায়, নাম হয় ব্রহ্মদত্ত, ছিদ্রদর্শন ও সুনেত্র বাভ্রব্য ও বৎস দুই ঋষি পুত্র। তিন জনেই অতি মোহিত কিন্তু বেদ বেদাঙ্গ পারগ (হরি ১।২৩।১৯)। বাকি চার ভাই জাতিস্মর ; কবির নাম হয় পাঞ্চক এবং খসৃম হন কণ্ডরীক। এরা দুজন ব্রহ্মদত্তের বন্ধু। ব্রহ্মদত্ত সব জীবের ভাষা বুঝতেন ; স্ত্রী অসিতদেবলের মেয়ে সন্নতি (হরি ১।২৩।২৫)। এই রাণী পদ্মপুরাণে গার্গ্যের গরু ছিল ; রাণীও অত্যন্ত ধার্মিক। ব্রহ্মদত্ত কাম্পিল্যে রাজা। অন্য চার ভাই শ্রোত্রিয় কুলে দরিদ্র ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মান ; ধার্মিক ও জাতিস্মর (হরি ১।২৩।২৮) ; বনে গিয়ে তপস্যা করবেন স্থির করেন। কিন্তু দরিদ্র পিতা নিষেধ করলে এরা পিতাকে জানায় ব্রহ্মদত্ত ও তার দুজন মন্ত্রীকে সপ্তব্যাধাঃ দশার্ণেষু

মৃগাঃ কালাঞ্জরে গিরৌ। চক্রবাকাঃ শরদ্বীপে হংসাঃ সরসি মানসে—শ্লোকটি শোনালে সমস্ত দারিদ্র্য দূর হবে। পদ্ম পুরাণে শ্লোকটি একটু তফাৎ।

ব্রহ্মদত্ত একদিন বনে গিয়ে শুনতে পান পু-পিপীলিকা কামার্ত হয়ে ডাকছে; স্ত্রী পিপীলিকা ক্রুদ্ধ হয়ে পড়ছে। রাজা হেসে ফেলেন। রাণী মনে করে রাজা উপহাস করলেন; উপবাস করতে থাকেন। রাজা সব বলেন; রাণীর বিশ্বাস হয় না। ব্রহ্মদত্ত তখন বিষ্ণুর শরণ নেন। ৬-ষ্ঠ রাত্রে বিষ্ণু জানিয়ে যান আগামী সকালে ব্রহ্মদত্ত কল্যাণ লাভ করবেন। পদ্মপুরাণে দুই পিপীলিকা কলহরত; কলহ মিটিয়ে আবার ভালোবাসায় বিভোর হয়ে ওঠে ইত্যাদি, ব্রহ্মদত্ত কি করে সব জীবজন্তুর ভাষা শিখল রাণী জানতে চান; রাজা কোন জবাব দিতে পারেন না; রাজা তখন সাত দিন উপবাস করেন; ৭ম দিনে ব্রহ্মা বলে যান এক জন ব্রাহ্মণের কাছে জানতে পারবেন ইত্যাদি।

পর দিন রাজা স্নান করে রাজপুরীতে ফিরছিলেন, কণ্ডরীক রশ্মি ধরে ছিল, বাভ্রব্য চামর ব্যজন করছিল, এমন সময় সেই দরিদ্র পিতা এসে শ্লোকটি শোনান। রাজা ও দুই সচিব তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হয়ে যান (১।২৪।২২)। এরপর ব্রহ্মদত্ত বিষ্বকসেনকে রাজা করে দিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে বনে চলে যান। সন্নতি জানায় রাজার মোহমুক্তির জন্য সব জেনেও সে ক্রুদ্ধ হবার ভাণ করেছিল। ব্রহ্মদত্ত, কণ্ডরীক ও বাভ্রব্য/পাঞ্চাল্য তিন জনেই মুক্তি পান (হরি ১।২৪।৩৩)।

পদ্মপুরাণে কৌশিকের চারটি ছেলের নাম হয়েছিল ধৃতিমান, সর্বদর্শী, বিদ্যাচন্দ্র ও তপোধিক; চরিত্র অনুসারে এই নাম। নির্দিষ্ট দিনে ব্রহ্মদত্ত, রাণী ও মন্ত্রীরা পথে বেড়াতে বার হয়েছিলেন। জ্ঞান ফিরে পেলে ব্রাহ্মণকে প্রচুর দান করেন এবং মানস সরোবরে গিয়ে তপস্যা করে তিন জনেই মুক্তি পান।

(৪) এক জন রাজা; রাত্রিতে মোরগ হয়ে যেতেন। রাণী এই দুঃখের কথা গালবকে জানালে গালব বলেন আগের জন্মে রাজা শক্তিমান হবার জন্য মোরগের মাংস খেতেন। মোরগরাজ তাম্রচূড় এই কথা জানতে পেরে শাপ দেন প্রতি রাত্রে রাজা মোরগ হয়ে যাবেন। গালবের উপদেশে রাজা শিবের তপস্যা করে শাপমুক্ত হন (স্কন্দ-পু)। (৫) পুরু বংশে কপিলের ছেলে। গৃৎসপতি (দ্রঃ) এই কৌশিকের ভাই (অগ্নি-পু)।

কৌশিকী—বর্তমানের কোশী। অন্য মতে কুশী। এই নদীর তীরে বিশ্বামিত্র ব্রহ্মণত্ব পান (মহা ১।৮৫।৯)। শৌচার্থে বিশ্বামিত্র এই নদী সৃষ্টি করেছিলেন (মহা ১।৬৫।৩০)। রামায়ণে বিশ্বামিত্রের (দ্রঃ) বোন। দ্রঃ- সত্যবতী, কুশী।

কৌশিকী—কুশী নদী। বর্তমানে যেখানে তাজপুর সেইখানে প্রবাহিত ছিল; পরে পূর্ব দিকে সরে গিয়ে ব্রহ্মপুত্রে যুক্ত হয়; গঙ্গার সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না। পরে গঙ্গাতে যোগ দেয়; এই মিলিত ধারা পদ্মা। ফলে ভাগীরথীর পুরাতন খাত সোতলি (সুতি) থেকে নদীয়া পর্যন্ত প্রায় শুষ্ক মত হয়ে পড়ে। খৃ: ৩-শতকে যেন এই যোগ ঘটেছিল এবং এই সময় সুলতানগঞ্জ নামক বন্দর (দ্রঃ) গড়ে ওঠে। ছোট-নরহরিতে

কৌশিকী গঙ্গা সঙ্গম ; এটি একটি তীর্থস্থান। (২) দৃষদ্বতীর একটি শাখা ; কুরুক্ষেত্রে (বামন)। দ্রঃ- কৌশিকী সঙ্গম, মহাকৌশিক, কৌশিকী।

কৌশিকী—(১) উমার দেহজাত এক দেবী। দ্রঃ-একানংশা। কৃষ্ণের নির্দেশে যশোদার গর্ভে জন্মান। বসুদেব কৃষ্ণকে বদলে এ'কে আনেন। কংস এ'কে আছড়ে মারতে গেলে তাঁর হাত থেকে বার হয়ে আকাশে উঠে গিয়ে ভবিষ্যৎ বাণী করেন যে কংসের ঘাতক জন্ম গ্রহণ করেছে। ইন্দ্র এ'কে বিন্ধ্যবাসিনী রূপে বিন্ধ্যাচলে স্থাপন করেন। (২) মার্কণ্ডেয় পুরাণ মতে কাত্যায়নীর (দ্রঃ- কালী) দেহকোষ জাত দেবী ; ফলে নাম কৌশিকী। শুম্ভ নিশুম্ভের দুই সেনাপতি চণ্ড ও মুণ্ড একটি সুন্দরী নারীর কথা শুম্ভকে জানালে সুগ্রীব নামক এক দূতকে শুম্ভ এই দেবীর (কৌশিকী) কাছে পাঠান। শুম্ভ বা নিশুম্ভ যে কোন এক জনের স্ত্রী হবার জন্য সুগ্রীব প্রস্তাব করেন। দেবী জানান তিনি বীর্যশুল্কা। দূতের কাছে এই কথা শুনে দেবীর চুলের মুঠি ধরে নিয়ে যাবার জন্য ধূম্রলোচন নামে এক সেনাপতিকে শুম্ভ পাঠান। ধূম্রলোচন এসে দেবীর ক্রোধে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। শুম্ভ তখন চণ্ডমুণ্ডকে পাঠান। এ'রা এলে হিমালয়ে সিংহবাহিনী এই দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ হয়। দেবীর ললাট থেকে দেবী চামুণ্ডা (দ্রঃ) বের হয়ে এ'দের নিহত করেন এবং এ'দের দু জনের মাথা কৌশিকী দেবীকে উপহার দেন। এর পর শুম্ভ নিশুম্ভ যুদ্ধে আসেন এবং মারা যান। (৩) দ্রঃ- পার্বতী/ব্রহ্মা। কালীর গা থেকে যে কালো চামড়া খুলে পড়ে যায় সেই চামড়া। কৌশিকী দেবীতে পরিণত হয়। ইন্দ্র এ'কে পার্বতীর কাছ থেকে বোন হিসাবে চেয়ে নিয়ে যান। বিন্ধ্যবাসিনী রূপে বিন্ধ্যাচলে স্থাপন করেন এবং অসুর ধ্বংসের কাজ দেন। কৌশিকী সম্বন্ধে বহু মত দেখা যায়। (৪) অপর নাম শ্রুত সোমা। হরিবংশে (২।১০৩।) কৃষ্ণের এক স্ত্রী। ছেলে বনস্তম্ব, নিবাসন, অবনস্তম্ব, স্তম্ববল, উপসন্ন, শঙ্কু, বজ্রাংশু ও ক্ষিপ্র। মেয়ে স্তম্ববতী।

কৌশিকীকচ্ছ—পূর্ণিমা জেলা।

কৌশিকীসঙ্গম—(১) ভাগলপুরে পাথরঘাটার উত্তরে কহলগাঁও-এর বিপরীত দিকে গঙ্গা ও কৌশিকী (দ্রঃ) যুক্ত হয়েছে। (২) দৃষদ্বতী ও কৌশিকী (দ্রঃ) যেখানে যুক্ত হয়েছে ; রক্ষী নদীর তীরে বলুগ্রামের কাছে ; থানেশ্বর থেকে ১৭ মাইল দক্ষিণে।

কৌষীতকি—অপর নাম শাঙ্খায়ন (সাঙ্খায়ন্) ব্রাহ্মণ। ঋষি কৌষীতকের রচনা। দশপূর্ণ মাসের বিবরণ ইত্যাদি রয়েছে। ঋক্‌বেদে শাঙ্খায়ন শাখার অন্তর্গত। কৌষীতকি ব্রাহ্মণের অংশ ফলে ব্রহ্মোপনিষদও বটে। ঐতরেয় মত এটিও প্রাচীন উপনিষদ। আধ্যাত্মিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা। প্রাচীন ভাষ্য শঙ্করানন্দের।

কৌস্তভ—সমুদ্র মন্থনে উত্থিত মণি। বিষ্ণু এই মণি বুকে ধারণ করেন।

ক্রতু—এক জন প্রজাপতি। ব্রহ্মার মানসপুত্র (মহা ১।৫৯।১০)। এক জন মহর্ষি বা সপ্তর্ষি। অন্য পুরাণ মতে ব্রহ্মার দেহ থেকে উৎপন্ন। স্ত্রী দক্ষ কন্যা সন্নতি/শান্তি। মহাভারত মতে সন্নতির (ভাগবতে ৪।১।৩৮, ক্রিয়ার) বালখিল্য নামে ৬০,০০০ ছেলে। যজ্ঞাদি কাজে বিষম বিপদ দেখা দিলে অন্যান্য ঋষিদের সঙ্গে ইনিও এসে হাজির হতেন। পরাশরের রাক্ষস নিধন যজ্ঞ বন্ধ করে দেন। আর এক মতে শিবের বরে

ক্রতুর এক হাজার ছেলে হয়। ভীষ্ম যখন শরশয্যায় তখন এসে দেখা করেছিলেন। মহাভারতে (১।৬০।৮) ক্রতুর ছেলেরা পতঙ্গ সহচারিণঃ।

ক্রথ/ক্রাথ—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে।

ক্রব্যাদ—(১) পূর্ব পুরুষদের মধ্যে দেবত্বপ্রাপ্ত একটি দল। মৃতদের আত্মাকে গ্রহণ করেন। (২) শব ভক্ষক অগ্নি বিশেষ।

ক্রমদীশ্বর—বাঙালি, সংস্কৃত বৈয়াকরণ। পিতা চক্রপাণি ; পিতামহ শ্রীপতি। ১০ বা ১২ শতক। আর কিছু জানা নাই। প্রচলিত কাহিনী শৈশবে পিতৃমাতৃহীন বালককে এক পণ্ডিত শিক্ষাদান করেন। ক্রমদীশ্বর তারপর সমস্ত ব্যাকরণের সার সংগ্রহ করে সংক্ষিপ্ত সার লেখেন। এ'র পাণ্ডিত্য দেখে এক সহপাঠী তাঁকে হত্যা করেছিলেন। আর এক মতে গ্রন্থটি জটিল হওয়াতে জনপ্রিয় হতে পারে নি, এ জন্য ক্ষুব্ধ হয়ে গ্রন্থটি মহারাজ জুমরনন্দীর পুকুরে ফেলে দিয়ে আত্মহত্যা করেন। জুমরনন্দী পুঁথিটি তুলে এনে সংশোধন করে কৃদন্ত, উণাদি, ও তদ্ধিত অংশ সংযোজন করে বইটির একটি বৃত্তি রচনা করেন।

ক্রথকৈশিক—(১) পয়োষ্ণী; বেরারে পূর্ণা নদী। (২) রাজা বিদর্ভের দুই ছেলে ক্রথ ও কৈশিক ফলে বিদর্ভের অপর নাম।

ক্রাথ—(১) দ্রঃ- ক্রথ। (২) মহাভারতে বিখ্যাত এক রাজা, রাহুর অংশে জন্ম, কুরুক্ষেত্রে কৌরব পক্ষে। (৩) বিখ্যাত সর্প। বলরাম মারা গেলে বলরামের (দ্রঃ) আত্মাকে পাতালে নিয়ে যায়।

ক্রিয়া—দক্ষের মেয়ে ; ধর্মের স্ত্রী। সন্তান দণ্ড, ন্যায় ও বিনয়।

ক্রুমু(ঋক্)—চোসপেস/চোয়াসপেস্ (গ্রীক) ; দ্রঃ- কুনর। অপর নাম কমহ নদী। এটিই কোরম নদী। কুরামু, কুরমু, কুরুমু, নদী (বেদ) ; এটি ইসখেল-এর কাছে সিন্ধুতে পড়েছে।

ক্রূরা—ক্রোধবশার (দ্রঃ) একটি নাম। অপর নাম ক্রোধা।

ক্রোড়দেশ—কুর্গ, ক্রোড়গু, কোলগিরি, কোলাগিরি, কোল্বগিরি, কোরগিরি। মালাবার উপকূলে একটি দেশ।

ক্রোধ—(১) কশ্যপ ও কালার সন্তান ; বিখ্যাত অসুর। (২) ব্রহ্মার ভ্রূ থেকে জন্ম। জমদগ্নি একবার যজ্ঞ করছিলেন। এই সময় ক্রোধ এসে যজ্ঞীয় ধেনুর দুধে তৈরি পায়স নষ্ট করে দেন। উদ্দেশ্য ছিল জমদগ্নিকে ক্রোধান্বিত করা। জমদগ্নি (দ্রঃ) জানতে পারেন কিন্তু একটুও রাগ করেন না। ক্রোধ তখন মুনির কাছে এসে ক্ষমা চান। কিন্তু পিতৃদেবদের শাপে ক্রোধ বেঁজিতে পরিণত হন ; শাপ ছিল যজ্ঞ ও ধর্মকে নিন্দা করলে মুক্তি পাবে। এই জন্য বহু যজ্ঞে গিয়ে নিন্দা করেছিল। যুধিষ্ঠির ধর্ম। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের নিন্দা করলে মুক্তি পায় (মহা ১৪।৯৬।-)। দ্রঃ- উঞ্ছবৃত্তি। (৩) লোভের ছেলে : নিজের বোন হিংসাকে বিয়ে করেন। ছেলে কলি, মেয়ে দুরুক্তি।

ক্রোধবশা—দক্ষের মেয়ে। প্রজাপতি কশ্যপের স্ত্রী (রামা ৩।১৪।১২)। সন্তান জলচর ও মাংসাশী পক্ষী ইত্যাদি :—দশটি মেয়ে :—মৃগী, (সন্তান জন্তু), মৃগমন্দা

(ভল্লুক সৃমর, চমর ইত্যাদি), মাতঙ্গী (হাতী), হরী (সিংহ ও বানর), ভদ্রমদা (>ইরাবতী>ঐরাবত), শার্দূলী (বাঘ, গোলাঙ্গুল ইত্যাদি), শ্বেতা (দিক্‌নাগ), সুরভী (>রোহিণী>গবাদি এবং গন্ধর্বী>অশ্বাদি), সুরসা (নাগ), কদ্রু (উরগ, সরীসৃপ)। মহাভারতে (১।১০।৫৮) ভদ্রমদা=ভদ্রমনা। কদ্রুর সন্তানকে পন্নগও বলা হয়েছে। ক্রোধবশার কিছু ছেলে অসুর; নাম ক্রোধবশ অসুর, কুবের-এর পদ্মবনে 'পাহারা দিতেন; রাবণের সৈন্যদলেও কিছু ছিলেন। বহু ক্রোধবশ দৈত্য ভূভার হরণার্থে পৃথিবীতে নন্দিক, সিদ্ধার্থ, দন্তবক্র, একলব্য, রুক্মী, শ্রুতায়ু, উদ্ধব, বৃহৎসেন ইত্যাদি রাজা রূপে জন্ম নিয়েছিলেন (মহা ১।৬১।৫৪)। দান যজ্ঞ ইত্যাদি ইষ্টপূর্ত কাজ কুকুরে দেখলে এই সব কাজের ফল ক্রোধবশ-রা হরন্তি (মহা ১৭ ৩।১০)। দ্রঃ- ক্ষত্রিয়।

ক্রোধহন্তা—কশ্যপ-কালার ছেলে; বৃত্রের ভাই।

ক্রোষ্টা—স্ত্রী গান্ধারী (>অনমিত্র>নিম্ন,>প্রসেনজিৎ>সত্রাজিৎ. দ্রঃ) : এবং মাদ্রী (>যুধাজিৎ ও দেবমীঢ়ুষ)। হরিবংশ ১।৩৮।১০।

মহাভারতে (গী· প্রেস ১৩।১৪৭।১৮)যযাতি>যদু>ক্রোষ্টা>বৃজিনীবান>ঋষদৃগু উষঙ্গু>চিত্ররথ। হরিবংশে(১।৩৬।১)যদু>ক্রোষ্টা>বৃজিনীবান>স্বাহি>রুশদগু> চিত্ররথ>শশবিন্দু>পৃথুশ্রবা>উত্তর>সুযজ্ঞ(সুখজ্ঞ)>উশত>শিনেয়ু>মরুত্ত>কম্বল-বর্হিষ (বড়)>১০০ ছেলে; এদের মধ্যে জীবিত ছিল কেবল রুক্মকবচ>পরাজিৎ >রুক্মেষু, পৃথুরুক্ম, জ্যামঘ, পালিত, হরি। পালিত বিদর্ভ রাজের দত্তক। হরি বিদেহে রাজা। রুক্মেষু রাজা হয়। রুক্মেষু ও পৃথুরুক্ম মিলে জ্যামঘকে (দ্রঃ) তাড়িয়ে দেয়।

ক্রৌঞ্চ—(১) একটি পাহাড়; এখানে ক্রৌঞ্চ অসুর বাস করত। অগস্ত্য শিবের আরাধনা করে কাবেরী নদীকে লাভ করে কমণ্ডলু করে নিয়ে আসছিলেন; বিন্ধ্যকে দমন করে দক্ষিণে একটি তীর্থ স্থাপন করবেন। পথে এই অসুর পাহাড় হয়ে দাঁড়ায় এবং প্রবল বৃষ্টিপাত করাতে থাকে। অগস্ত্য বিব্রত হয়ে বনে বনে ঘুরতে থাকেন এবং তার পর প্রকৃত ঘটনাটা বুঝতে পেরে শাপ দিয়ে অসুরকে ঐ পাহাড় হয়েই থাকতে বলেন; কার্তিকেয়ের বাণে বিদ্ধ হলে তখন মুক্তি পাবে। কার্তিকেয়র সঙ্গে যুদ্ধে বলিরাজের ছেলে বাণাসুর এই ক্রৌঞ্চ পাহাড়ে আশ্রয় নেন। কার্তিকেয় তখন এই ক্রৌঞ্চ পাহাড় বিদীর্ণ করেন; অসুর বার হয়ে আসে। (২) কৈলাস পর্বতে মানস সরোবর অংশ; এখানে ক্রৌঞ্চরন্ধ্র। আর একটি দ-ভারতে। দ্রঃ- কুমারস্বামী। (৩) সপ্তদ্বীপের অন্তর্গত একটি দ্বীপ। (৪) একটি মতে ক্রৌঞ্চ পর্বত মৈনাকের ছেলে।

ক্রৌঞ্চদ্বীপ—এখানে লোকেরা মহাক্রৌঞ্চ গিরির উপাসনা করে। এখানে পাহাড় ক্রৌঞ্চ, বামন অনুকারক, মৈনাক, গোবিন্দ ও নিবিড় (৬।১২)।

ক্রৌঞ্চব্যূহ—মোটামুটি ক্রৌঞ্চের আকার ব্যূহ। এই ব্যূহে আটটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান :— মুখমণ্ডল, চোখ, মাথা, গলা, উদর, দুটি পার্শ্বদেশ এবং উরু। ভীষ্ম এই ব্যূহ রচনা করে দ্রোণকে মুখমণ্ডলে, অশ্বত্থামা ও কৃপকে চোখে, হার্দিক্যকে মাথায়, শূরসেনকে গলাতে, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজাকে উদরে, যবন, শক ইত্যাদিকে বাম পার্শ্বে, শতায়ু, ভূরিশ্রবা ইত্যাদিকে উরুদেশে স্থাপন করেছিলেন (মহা ৬।৭১।১৪)।

ক্রৌঞ্চরন্ধ্র>কুমায়ুনে নিতি গিরিপথ ; ভারত থেকে তিব্বতে যাবার রাস্তা। পরশু-রাম বাণবিদ্ধ করে এই পথ তৈরি করেন। হংসদ্বার।

ক্রৌঞ্চী—কশ্যপ তাম্রার সন্তান।

ক্লিসোবোরস—গ্রীক নাম। মহাবন ; মথুরা থেকে ৬০-মাইল দক্ষিণে ; যমুনার বিপরীত দিকে। মতান্তরে বৃন্দাবন। এটি যেন কলিসপুর ; বর্তমানে মুগু নগর। মেগাস্থেনিসের করেসোবরা।

ক্লীব—হনুমান (দ্রঃ) ভীমকে নিজের রূপ দেখাবার সময় বলেছিল স্ত্রীষু ক্লীবান্ নিষ্প্রীত (মহা ৩।১৪৯।৪৬)। কৌরব শিবিরে যুদ্ধের পর পাণ্ডবরা এসে দেখেন এখানে অনেক ক্লীব রয়েছে। দুর্যোধন চিত্রাঙ্গদ কন্যাকে (মহা ১২।৪।১০) হরণ করেন (দ্রঃ কর্ণ); এই স্বয়ংবরে কন্যার প্রহরী হিসাবে নপুংষকরা নিযুক্ত ছিল। অর্জুন উর্বশীর শাপে ক্লীবে পরিণত হয়ে বিরাট অন্তঃপুরে বাস করতেন। রাম যখন দেহত্যাগ করতে যান তখন অনুগামী জনতাতেও বর্ষবর/ক্লীব ছিল। সে যুগে ক্লীবদের যেন ব্যাপক ব্যবহার হয়েছে।

ক্ষণভঙ্গবাদ দ্রঃ- ক্ষণিকবাদ।

ক্ষণিকবাদ—অন্য নাম ক্ষণভঙ্গুরবাদ। সংসারের ক্ষণস্থায়িত্ব ও সদা গতিশীলতাকে ভিত্তি করে গঠিত মতবাদ। সংসার বিমুক্তি হচ্ছে নির্বাণ এবং নির্বাণই নিত্য, নির্গুণ ও অনির্বচনীয় ; এবং নির্বাণের পথ নির্বিকল্প জ্ঞান। অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মা এই তিনটি ক্ষণস্থায়িত্বের লক্ষণ। ক্ষণস্থায়িত্বের জন্যই জীব দুঃখাপন্ন হয়। জীব অর্থে চিত্ত ও ভৌতিক উপাদানের পরিবর্তনশীল সমষ্টি। আত্মা নামে কোন নিত্য বস্তু নাই। অথর্ববেদে, মহাভারতে ও মৈত্রী উপনিষদের কালবাদ যেন এই বৌদ্ধ ক্ষণিকবাদের পূর্বাভাস। তবে ক্ষণিকবাদ কালবাদ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বৌদ্ধদর্শনে কোন নিয়তি নাই ; পাপপুণ্য আছে। মহাভারতে কালবাদে জরা ও মৃত্যুর কথা আছে। ক্ষণিকবাদের এই ক্ষণ সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম ক্ষণ। এবং এই সূক্ষ্মতম ক্ষণেই জীবের বা বস্তুর উৎপত্তি স্থিতি ও বিনাশ সংগঠিত হচ্ছে। একটি ক্ষণ ত্রিধা হয়ে এই যে কাজ করে এ কথা বিরুদ্ধবাদীরা স্বীকার করেন না। বৌদ্ধ দার্শনিকরা কারণের ও কার্যের সম্বন্ধ স্বীকার করেন, কিন্তু এদের পৌর্বাপর্ব মানেন না। বৌদ্ধরা বলেন কার্য থেকেই কারণ নির্ণীত হয়। কার্য অবশ্য কারণকে অনুধাবন করে এবং কার্য তাৎক্ষণিক। বৌদ্ধ মতে কারণ সর্বদাই কার্যপ্রসূ নয়। বৌদ্ধ দর্শন সাংখ্যের সৎকার্য-বাদ স্বীকার করে না। বৌদ্ধরা বলেন কারণের বিনাশে কার্যের আবির্ভাব। পশ্চিমী দর্শনে এটি negation। বৌদ্ধরা বলেন দুটি ক্ষণে একই বস্তুর সমাবস্থান হতে পারে না। থাকলে কাল সংকর দেখা দেবে অর্থাৎ অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ থাকবে না ; সব এক হয়ে যাবে। ক্ষণের মাধ্যমে বস্তুর এই রূপান্তর নির্দিষ্ট নিয়মাধীন এবং এই নিয়মের বৌদ্ধ নাম প্রতীত্যসমুৎপাদ। ক্ষণিকবাদ বর্তমানের ডায়ালেকটিক মেটিরিয়ালিজম্।

ক্ষত্তা—বিদুর।

ক্ষত্রদেব—শিখণ্ডীর ছেলে। কুরুক্ষেত্রে লক্ষ্মণ ও দ্রোণের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। লক্ষ্মণের হাতে নিহত হন।

ক্ষত্রপ—প্রাচীন পারসিক ক্ষথ্রপাবন শব্দই সংস্কৃতে ক্ষত্রপ ও প্রাকৃতে খতপ বা ছত্রপ। ভারতে ক্ষত্রপরা প্রধানত শক। বৈদেশিক রাজার প্রাদেশিক শাসনকর্তা রূপে এঁরা রাজ্য শাসন করতেন ; পরে কোন দিন স্বাধীন হয়ে পড়লে রাজা হয়ে বসতেন। সাধারণত একজন মহাক্ষত্রপ ও তাঁর উত্তরাধিকারী এক জন ক্ষত্রপ শাসন ব্যবস্থায় যুক্ত থাকতেন। এ রকমের বহু ক্ষত্রপ ও মহাক্ষত্রপের নাম ভারতের ইতিহাসে ছড়িয়ে রয়েছে।

ক্ষত্রবর্মা, ক্ষত্রঞ্জয়, ক্ষত্রধর্মা—ধৃষ্টদ্যুম্নের ছেলে। তিন জনেই কুরুক্ষেত্রে দ্রোণের হাতে মারা যান।

ক্ষত্রবৃদ্ধ—(১) ভাগবতে (৯।৭।১৮) আয়ু>ক্ষত্রবৃদ্ধ>পৌত্র=কুশ>প্রতি>সঞ্জয়>জয় >হর্যবল/ন>সহদেব>হীন>জয়সেন>সংকৃতি>জয়। (২) হরিবংশে (১।২৯।৬) অনেনা>ক্ষত্রবৃদ্ধ>সুনহোত্র>কাশ, শল, ও গৃৎসমদ (দ্রঃ)।

ক্ষত্রি—কথইডি-দের দেশ। হাইড্রায়টেস (রাবি) ও হাইপাসিস (বিয়াস)-এর মধ্যে ; রাজধানী মঙ্গল (টলেমি)।

ক্ষত্রিয়—কশ্যপ ও ক্রোধবশার (দ্রঃ) সন্তান। ক্রোধবশার কিছু সন্তানদের নাম ক্রোধবশ। বহু ক্ষত্রিয় রাজা এই ক্রোধবশদের সন্তান বলে নিজেদের দাবি করেন। পরশুরামের হাতে ক্ষত্রিয় হীন হয়ে পৃথিবী রসাতলে নেমে যাচ্ছিল, বশিষ্ঠ আটকান। পৃথিবী জানান (১) পৌরবদায়াদ বিদূরথ/বিড়্রথ পুত্র জীবিত আছে, ঋক্ষবান পর্বতে ভল্লুকরা একে রক্ষা করছে। (২) সৌদাসপুত্র সর্বকর্মা, একে পরাশর রক্ষা করছেন। (৩) শিবি পুত্র গোপতি; গোষ্ঠে বৎসকুল দ্বারা রক্ষিত। (৪) প্রত্যর্দন পুত্র বৎস, বৎসদের দ্বারা অভিরক্ষিত। (৫) দধিবহন পৌত্র, অর্থাৎ দিবিরাথের ছেলে অঙ্গ, গৌতম একে গঙ্গাতীরে রক্ষা করছেন। (৬) বৃহদ্রথ গৃধ্রকূটে গোলাঙ্গুল কর্তৃক রক্ষিত। (৭) মহাসাগরও মরুত্ত বংশীয় কিছু বালককে মহাসাগরে রক্ষা করছে। এরা স্থপতি ও স্বর্ণকার হিসাবে দিন যাপন করছে (মহা ১২।৪৯।-)। কশ্যপ এদের এনে আবার রাজ্যে স্থাপন করেন। চন্দ্র ও সূর্যবংশীয় রাজারা মূলত ব্রাহ্মণ ; পরে ক্ষত্রিয়। দ্রঃ- চতুর্বর্ণ।

ক্ষমা—প্রজাপতি দক্ষের একটি মেয়ে, পুলহের স্ত্রী। ছেলে কর্দম, উর্বরীয়ান ও সহিষ্ণু (বি-পু ১।১০)। (২) এক গোপী ; এর সঙ্গে কৃষ্ণ ঘুমাচ্ছিলেন। রাধা কৌস্তুভ, পীত বসন ইত্যাদি নিয়ে চলে যান। কৃষ্ণ লজ্জায় ও পাপে কালো হয়ে যান। ক্ষমা দেহত্যাগ করে পৃথিবীতে নেমে আসেন। কৃষ্ণ একে ভাগ করে বহু কিছুর মধ্যে ছড়িয়ে দেন (দেবীভাগ ৯।১৩।৭১)।

ক্ষয়মাস—দ্রঃ- মলমাস।

ক্ষীরগ্রাম—বর্দ্ধমানে কাটোয়া মহকুমা থেকে ২১ কি-মি-দূরে। এখানে সতীর ডান পায়ের আঙুল/পাতা পড়েছিল। দেবী যোগাদ্যা, ভৈরব ক্ষীরকণ্ঠ। কিংবদন্তী দেবী কুমারী বেশে এক শাঁখারির কাছে শাঁখা পরে জল থেকে শাঁখা পরা হাত তুলে

ও শাঁখারিকে দেখান। এই জন্য প্রতিমা সারা বছর জলে ডোবান থাকে। বৈশাখী সংক্রান্তিতে প্রতিমা তুলে পূজা করা হয়। মেলা বসে। কৃত্তিবাসে এই ঘটনার উল্লেখ আছে।

ক্ষীরভবানী—শ্রীনগর থেকে ১২ মাইল। কুণ্ডের মধ্যে অবস্থিত দেবী। এই জলের রঙ দিনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন।

ক্ষীরোদসমুদ্র—পূর্বদিকে ; অপ্সরাদের বিহার স্থান। মন্থন করে চন্দ্র ইত্যাদি (দ্রঃ- বারুণী) উঠেছিল। দ্রঃ- কামধেনু।

ক্ষুপ—(১) একজন প্রজাপতি। ব্রহ্ম একবার যজ্ঞ করবেন স্থির করেন। সুতরাং একজন উপযুক্ত ঋত্বিক পাবার চেষ্টায় নিজের মাথাতে এক হাজার বছর গর্ভ ধারণ করেন। তারপর একদিন হাঁচেন, মাথা থেকে এই গর্ভ হাতে এসে পড়ে (মহা ১২।১২২।১৭)। ক্ষুপ এই ঋত্বিক। (২) ইক্ষ্বাকুর পিতা (মহা ১৪।৪।৩)। নিরামিষাশী। বৈবস্বত মনুর কাছে একটি তরবারি লাভ করেছিলেন। (৩) কৃত যুগে কোন রাজা ছিল না। মানুষরা ব্রহ্মার কাছে আসেন। ব্রহ্মা ইন্দ্র ও লোকপালদের ডেকে তাদের তেজের অংশ দিতে বলেন, তারপর অক্ষুপৎ এবং ক্ষুপ জন্মান। লোকপালদের অংশ এই ক্ষুপকে ব্রহ্মা রাজা করে পাঠিয়ে দেন। ইন্দ্রের অংশ পেয়ে মহী শাসন করতে থাকেন।

ক্ষুরপ্র—অর্জুন ভীষ্মের প্রতি এই বাণ নিক্ষেপ করেছিলেন।

ক্ষেত্রপাল—ক্ষেত্রের অধিপতি দেবতা। লিঙ্গপুরাণ মতে শিবের অবতার। শাক্তানন্দ তরঙ্গিণী ও ডাকিনীতন্ত্রে এঁর উল্লেখ আছে। অন্যান্য দেবতার পূজার সঙ্গে এঁর পূজার ব্যবস্থা কর্তব্য। এঁর বিভিন্ন রূপ ও বিভিন্ন পূজা-উপকরণের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতে বিভিন্ন প্রান্তে নানা ভাবে সাধারণ লোকের দ্বারা পূজিত হন। একটি ধ্যানে ইনি শিবের ছেলে, বিকৃত আনন, ত্রিলোচন, জটাকপালধারী, দিগম্বর, ভুজঙ্গভূষণ, উগ্রদর্শন, কেশ পিঙ্গলবর্ণ ; ত্রিশূল, ডমরু ও খট্বাঙ্গধারী। মৎস্য পুরাণে কুক্কুর ও শৃগাল বেষ্টিত। ধ্যানে আছে গন্ধ ও বস্ত্রে উজ্জ্বল, কটিতে-বদ্ধ ঘণ্টাতে শব্দ হচ্ছে। অর্থাৎ শিব যেন। চাট, মাংস ইত্যাদি নানা কিছু এঁর নৈবেদ্য। এঁর বরে অল্প পরিশ্রমে প্রচুর শস্য হয়, রোগভয় দূর হয়, বাঘের ভয় থাকে না। চট্টগ্রামে হিন্দু-মুসলমান সকলেই এঁর পূজোয় যোগ দিত। তন্ত্রে শিবের একটি নাম। যজুর্বেদে শতরুদ্রীয় স্তোত্রে রুদ্রকে ক্ষেত্রপতি বলা হয়েছে। বাস্তু পূজার সময় শঙ্খপাল, নাগপাল ও বাস্তুপালের সঙ্গে পূজিত। পুরোহিত দর্পণে ইনি শম্ভু তনয় এবং এঁরা গ্রাম্য দেবতা। ক্ষেত্র অর্থাৎ শস্য ক্ষেত্রের দেবতা। দ-ভারতে নগর রক্ষক দেবতাও। হাত ২, ৪ বা ৮ এবং সত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণানুসারে তিন মূর্তি। মৎস্য ও অগ্নিপুরাণ দ্বিনেত্র ; তন্ত্রসারে ত্রিনেত্র। বৌদ্ধ মহাযানীরাও ক্ষেত্রপালের পূজা করেন। কোন অনার্য দেবতা হতে পারেন।

ক্ষেমঙ্কর—ত্রিগর্তরাজ। দ্রৌপদী হরণের সময় ছিলেন (মহা ৩।২৪৯।-)।

ক্ষেমক—কুরুবংশের (দ্রঃ) শেষ রাজা। (২) কশ্যপ কদ্রু পুত্র।

ক্ষেমদর্শী—দ্রঃ- কালকবৃক্ষীয়।

ক্ষেমবতী—ক্ষেম, ক্রকুচন্দ্র। তিলৌরা থেকে ৪ মাইল দক্ষিণে ; বর্তমান গুটিভ। পূর্বতন বুদ্ধ ক্রকুচন্দ্রের জন্মস্থান।

ক্ষেমমূর্তি—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে।

ক্ষেমা—একজন অপ্সরা।

ক্ষেমেন্দ্র—আলংকারিক ও সাহিত্যিক ; খৃ ১১ শতক। পিতা প্রকাশচন্দ্র। অভিনবগুপ্তের কাছে সাহিত্য পাঠ করেন ; ক্ষেমেন্দ্রের উপনাম ব্যাসদাস। অন্য মতে শৈবদার্শনিক ক্ষেমেন্দ্র এবং দার্শনিক ক্ষেমেন্দ্র একই ব্যক্তি। ক্ষেমেন্দ্রের প্রতিভা বহুমুখী। অলংকার, ছন্দ, নাটক, প্রহসন, কামশাস্ত্র ইত্যাদি নানা বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। এগুলির বেশির ভাগই অবশ্য সারসংগ্রহ। তাঁর অলংকার বই :—ঔচিত্যবিচার, কবিকণ্ঠাভরণ। ছন্দ :—সুবৃত্ততিলক। কাব্য :—সময়মাতৃকা, দর্পদলন, কলাবিলাস, দেশোপদেশ, নর্মমালা, সেব্যসেবকোপদেশ, চারুচর্যা, চতুবর্গসংগ্রহ, দশাবতারচরিত। ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎকথামঞ্জরী, রামায়ণমঞ্জরী ও মহাভারতমঞ্জরী যথাক্রমে গুণাঢ্যের বৃহৎকথা, রামায়ণ ও মহাভারত অবলম্বনে রচিত।

অমৃততরঙ্গ, অবসরসার, কনকজানকী, কবিকর্ণিকা, ক্ষেমেন্দ্রপ্রকাশ, দানপারিজাত, রাজাবলী, ললিতরত্নমালা, লোকপ্রকাশ, ব্যাসাষ্টক—এগুলিও ক্ষেমেন্দ্রের রচনা বলে পরিচিত কিন্তু সবগুলির সন্ধান পাওয়া যায় নি।

খ

খগম—সত্যবাদী অত্যন্ত ক্ষমতাবান ব্রাহ্মণ তপস্বী। ঋষিপুত্র সহস্রপাদের (দ্রঃ) বন্ধু। এক দিন খড়কুটো দিয়ে একটা সাপ তৈরি করে অগ্নিহোত্র কাজে ব্যস্ত খগমকে সহস্রপাদ ভয় দেখান। খগম ভয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়েন ; জ্ঞান ফিরে পেয়ে, বিষহীন সাপ তৈরি করে ভয় দেখাবার জন্য বিষহীন ডণ্ডুভ (ঢোঁড়া) সাপে পরিণত হবার জন্য শাপ দেন। পরে সহস্রপাদের কাতর অনুনয়ে বলেন সুমতির ছেলে রুরু (দ্রঃ) মুনির সঙ্গে দেখা হলে মুক্তি হবে। শাপমুক্ত হয়ে ইনি আবার নিজের দেহ ফিরে (মহা ১।১০।৭) পান।

খজুরাহ—২৪°৫১′উ×৮০° পূ। বিন্ধ্য পর্বতের পশ্চিম দিকে প্রাচীন কালঞ্জর নামে রাজ্যের মধ্যে একটি প্রাচীন নগর। এটি মধ্যপ্রদেশের ছতরপুর জেলার একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। সদর সহর থেকে ৪৩-কি-মি পূর্বে। চন্দেল্ল রাজবংশের অন্যতম রাজধানী খর্জুর বাহকই বর্তমানে খজুরাহো। খৃ ১০-১২ শতকে এই রাজাদের সময় এখানে বহু মন্দির তৈরি হয়, এগুলির মধ্যে ২৫টি এখনও বর্তমান। সব চেয়ে প্রাচীন মন্দিরটি চতুঃষষ্টি যোগিনী মন্দির ; প্রায় নবম শতকের। এটি অনেকগুলি মন্দিরের সমাবেশ। পিছনের সারিতে মধ্যস্থিত মন্দিরটি অপেক্ষাকৃত বড় ; মূল দেবতা মনে হয় এই মন্দিরেই ছিলেন। বাকিগুলিতে একটি করে যোগিনীমূর্তি ছিল। অনেকগুলি মন্দিরই নষ্ট হয়ে গেছে ; মূর্তিগুলির মধ্যে মাত্র তিনটি অবশিষ্ট। চন্দেলরাজ ধঙ্গ

(৯৫০-১০০২ খৃ) শিব মরকতেশ্বর মন্দিরটি রচনা করেন। পরবর্তী কালের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ কন্দারিয়া মহাদেব মন্দির। চিত্রগুপ্ত, লক্ষ্মণ, জগদম্বী, বামন, বিশ্বনাথ, চতুর্ভুজ দুলাদেও এবং জৈনদের আদিনাথ ও পার্শ্বনাথ মন্দির সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য। মন্দিরের গা দেবদেবীর মূর্তি, লীলারত সুরসুন্দরী ও নায়িকার মূর্তি, জীবজন্তুর ছবি, মানুষের দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ, নৃত্যগীত ইত্যাদির অজস্র ছবিতে শোভিত এবং কখনো কখনো পীড়িত। মন্দিরের ভেতরের মূর্তিগুলিও অতুলনীয়। মূর্তি বাহুল্যের বিচারে প্রমাণিত হয় শৈব ও বৈষ্ণব গোষ্ঠীর প্রাধান্যই এখানে বেশি ছিল। মন্দির গায়ে নৃত্যরতা মাতৃকামূর্তির সংখ্যাও প্রচুর। এ ছাড়াও নবগ্রহ, অষ্টদিকপাল, গঙ্গাযমুনা, নাগ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর ইত্যাদি ব্রাহ্মণ্য দেবতাদি মন্দিরের গায়ে দেখা যায়। জৈন মন্দিরে চক্রেশ্বরী দেবী, শাসন দেবতা, বিদ্যাদেবী, রাম, বলরাম, পরশুরাম মূর্তি রয়েছে। মন্দির এখানে দু ধরণের; সাধারণ ধরণের এবং মণ্ডপ ধরণের। মণ্ডপ ধরণের মন্দিরেও আরাধ্য বিগ্রহ রয়েছে।

খট্টাঙ্গপ্রপাত—মাঙ্গালোরের কাছে কানাড়াতে সরস্বতী প্রপাত। এখানে জলের ভীষণ গর্জন হয়।

খটবাকু—বৈবস্বত মনুর এক ছেলে। ইক্ষ্বাকুর পূর্বপুরুষ। এই খটবাকুই প্রথম রাজা; অযোধ্যা নগরীর প্রতিষ্ঠাতা।

খটবাঙ্গ—সূর্যবংশে এক রাজা। একটি মতে কল্মাষপাদ > অশ্মক > মূলক > খটবাঙ্গ। আর এক মতে বিশ্বসহ ও ইলবিলার ছেলে; নাম দিলীপ। দেবাসুরের যুদ্ধে এক বার দেবতাদের সাহায্য করেন। দেবতারা সন্তুষ্ট হয়ে বর দিতে চাইলে ইনি নিজের পরমায়ু জানতে চান। দেবতারা জানান তিনি আর মুহূর্ত মাত্র বাঁচবেন। এই শুনে আনন্দিত হয়ে সমস্ত কাজ ত্যাগ করে সমাহিত মনে বিষ্ণুকে ধ্যান করতে করতে দেহ ত্যাগ করেন (ভাগ ৯।৯)। দ্রঃ- রাজা।

খড়্গ—দেবাসুরের এক যুদ্ধ আরম্ভ হতে যায়। ব্রহ্মা যজ্ঞ করেন; যজ্ঞ থেকে খড়্গ জন্মায়। দানবদের বিনাশার্থে ও লোকরক্ষার্থে সৃষ্টি। মহাদেবকে দেন। মহাদেব বহু অসুর বধ করেন। মহাদেব > বিষ্ণু > মরীচি > ইন্দ্র, ...ক্ষুপ > ইক্ষ্বাকু > মুচুকুন্দ > ......দ্রোণ > কৃপ। এই খড়্গের নক্ষত্র কৃত্তিকা, দেবতা অগ্নি, রোহিণী উৎপত্তিস্থান; রুদ্র গুরু। (মহা ১২।১৬০।৮০)।

খণ্ডগিরি—অন্য নাম কুমারী পর্বত। ভুবনেশ্বরের ৬ কি-মি পশ্চিমে ২০°১৬′ উ × ৮৫°৪৭′ পূ। বালি-পাথর পাহাড়। এর উচ্চতা ৩৮ মি। জৈন সাধুদের তীর্থ-স্থান; বহু শৈলখাত, গুহা ও পুষ্করিণী আছে। খৃ-পূ ১-ম শতকে মহামেঘবাহন বংশের তৃতীয় রাজা খারবেলের নেতৃত্বে স্থানটি জৈন-ধর্মের কেন্দ্ররূপে বিশেষ সমৃদ্ধিলাভ করে। খৃ ১১ শতকে সোমবংশীয় রাজা উদ্যোতকেসরীর সময়ে এখানকার কয়েকটি গুহায় জৈন ও শাসনদেবীদের মূর্তিগুলি এঁকে গুহাগুলিকে পূজাস্থানে পরিণত করা হয়েছিল। গঙ্গ ও গজপতি রাজবংশের সময়ও খণ্ডগিরি জৈনধর্মের কেন্দ্র ছিল। ১৫-টি দর্শনীয় খাত গুহা আছে। অনন্তগুম্ফা ইত্যাদি গুম্ফার উদগত চিত্রগুলিতে সমসাময়িক

মধ্যদেশীয় শৈলীই প্রতিফলিত। শিল্পমান খৃ-পূ ২-শতকের ভারহুতের শিল্পকৃতি থেকে উচ্চস্তরের এবং খৃ-পূ ১ম শতকের সাঁচির সঙ্গে তুলনীয়। খণ্ডগিরির পাদদেশে প্রস্তরাশ্ম যুগের একটি কুঠার পাওয়া গেছে।

খণ্ডপরশু—দক্ষ তাঁর জামাতা শিবকে যজ্ঞে ডাকেন নি। শিব ত্রিশূল ছুঁড়লে দক্ষের যজ্ঞ নষ্ট হয় এবং ত্রিশূল তারপর গিয়ে বদরিকাশ্রমে তপস্যারত নরনারায়ণের মধ্যে নারায়ণের বুকে বিদ্ধ হয়। ফলে নারায়ণের মাথায় সমস্ত চুল মুঞ্জা ঘাসের মত রঙ হয়ে যায়, নাম হয় মুঞ্জকেশ। নারায়ণ তখন হুঙ্কার দিলে এই ত্রিশূল শিবের হাতে ফিরে আসে। ত্রিশূল এই ভাবে অপমানিত হয়েছে দেখে শিব নারায়ণকে বধ করতে আসেন। পাশেই নর ছিলেন, মন্ত্রপাঠ করে বাণ সন্ধান করেন। অন্য মতে নারায়ণ মুনি নিজেই এক মুঠো ঘাস নিয়ে মন্ত্র পড়ে শিবের দিকে ছুঁড়ে দেন। বাণ/ঘাস কুঠারে পরিণত হয়ে এগিয়ে আসে এবং দু টুকরো হয়ে ভেঙে যায়। ফলে বিষ্ণুর/নারায়ণের নাম হয় খণ্ডপরশু ততঃ অহং খণ্ডপরশুঃ স্মৃতঃ (মহা ১২।৩৩০।৪৯)। আবার মহাভারতে (৭।১৭৩।৩৩) শিবকেও খণ্ড-পরশু বলা হয়েছে। একটি টুকরো শিবের পরশুতে পরিণত হয়। এরপর নারায়ণ শিবকে প্রণাম করলে যুদ্ধ বন্ধ হয়। দ্বিতীয় পরশুটি (=বাকি টুকরা) শিব পরশুরামকে দান করেন।

খনক—বিদুর একে দিয়ে জতুগৃহে খবর পাঠান কৃষ্ণাচতুর্দশী রাত্রিতে দুর্যোধন জতুগৃহে আগুন দেবেন ঠিক করেছেন। এই খনকই জতুগৃহ থেকে পালাবার জন্য গুপ্ত-সুড়ঙ্গ কেটে নিয়ে যান।

খনা—কিংবদন্তী সিংহলে রাজার মেয়ে, শুভক্ষণে জন্ম বলে নাম ক্ষণা। এ দিকে বরাহের ছেলে হলে বরাহ গণনা করে দেখেন শিশু মিহিরের আয়ু এক বছর। এই জন্য শিশুকে একটি পাত্রে করে জলে ভাসিয়ে দেন। পাত্রটি সিংহলে এসে পৌঁছয় এবং রাজা ছেলেকে পালন করে ক্ষণার সঙ্গে বিয়ে দেন। এরা দুজনেই পরে জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। পরে মিহির খনাকে নিয়ে জন্মভূমিতে বাবার কাছে ফিরে আসেন। মিহির ও বিক্রমাদিত্যের সভায় প্রতিপত্তি লাভ করেন। আকাশে কত নক্ষত্র আছে রাজা জানতে চাইলে বরাহ বা মিহির গণনা করতে পারেন না; খনা গুণে দেন। রাজা মুগ্ধ হয়ে খনাকে সভায় আনাবার জন্য আদেশ দেন। প্রতিপত্তি হানির ভয়ে বরাহের আদেশে মিহির তখন খনার জিব কেটে দেন। এর পর খনার মৃত্যু হয়। জিব কাটার অন্য কাহিনীও প্রচলিত আছে।

বরাহ ও মিহির কিন্তু একই ব্যক্তি; নাম বরাহমিহির। খনার বচনগুলির ভাষা থেকে জানা যায় এগুলির বয়স মাত্র চারশ বছর। কিন্তু বরাহমিহির দেড়হাজার বছর আগেকার ঐতিহাসিক ব্যক্তি। বরাহমিহিরের জাতকাদি জ্যোতিষগ্রন্থের ভাষার সঙ্গে খনার কতকগুলি বচনের অদ্ভুত সাদৃশ্য বর্তমান।

খনীনেত্র—বিংশের নাতি; বিবিংশের ১৫ জন ছেলের মধ্যে বড় ছেলে। রাজা হয়ে প্রজাদের উৎপীড়ন করতেন। ফলে খনীনেত্রের ছেলে সুবর্চা রাজা হন (মহা ১৪।৪।৬)। দ্রঃ- বৈবস্বত মনু।

খর—একটি মতে শূর্পণখা (দ্রঃ) ও খর যমজ ভাইবোন এবং অপর দুই ভাই দূষণ ও ত্রিশিরা। মধু ও কৈটভ খর ও অতিকায় হয়ে জন্মায়। রাবণের (দ্রঃ) এ'রা সৎ ভাই। সুমালীর মেয়ে রাকার ছেলে খর। খরের ছেলে মকরাক্ষ। রাবণরা তিন ভাই যখন তপস্যা করছিলেন তখন খর ও শূর্পণখা রাবণদের দেখাশোনা করত। রাবণের অসাবধানতায় শূর্পণখার স্বামী মারা গেলে বিধবা বোনকে খর ও দূষণের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। রাবণের আদেশে চোদ্দ হাজার রাক্ষস অনুচর নিয়ে এ'রা শূর্পণখার রক্ষক ও আজ্ঞাবহ হয়ে দণ্ডক বনে বাস করত। লক্ষ্মণের হাতে শূর্পণখার নাক কান কাটা গেলে শূর্পণখা খরকে এসে জানায় এবং খর ১৪ জন মহাবল রাক্ষসকে পাঠায় রামচন্দ্রদের নিহত করতে ; শূর্পণখা যাতে এদের রক্ত খেতে পারে। এরা মারা গেলে শূর্পণখা (দ্রঃ) কাঁদতে কাঁদতে খবর দেয় ; খর নিজে এবার ১৪ হাজার রাক্ষস নিয়ে যুদ্ধে আসে। দূষণ ছিল সেনাপতি। খরের সঙ্গে ১২ জন বিশেষ যোদ্ধা গিয়েছিল শ্যেনগামী, পৃথুগ্রীব, যজ্ঞশত্রু, বিহঙ্গম, দুর্জয়, করবীরাক্ষ, পরুষ, কালকার্মুক, মেঘমালী, মহামালী, সর্পাস্য ও রুধিরাশন (রা ৩।২৩।৩২) ; এবং দূষণের সঙ্গে বিশেষ চারজন যোদ্ধা ছিল মহাকপাল, স্থূলাক্ষ, প্রমাথী, ত্রিশিরা (রা ৩।২৩'৩৪)। খর জন স্থান থেকে বার হয়ে আসে (রা ৩।২২।২২), পথে নানা অশুভ লক্ষণ দেখতে থাকে (রা ৩।২৩।২), ত্রিশিরা মারা গেলে খর যুদ্ধে আসে ও রামের হাতে মারা যায়।

খরোষ্ঠী—অশোকের সময় পশ্চিম পাকিস্তানের দিকে প্রচলিত লিপি। ডান থেকে বাঁয়ে লেখা হত। ঐ সময় এই লিপির কি নাম ছিল জানা নেই। পরে খরোষ্ঠী নামে পরিচিত হয়। এই লিপির অ-অক্ষরটি খরের ওষ্ঠের মত বলে এই নাম হয়েছিল। অন্য মতে খরোষ্ঠী কথাটি ভুল, আসল নাম খরোস্ত্রী। পশ্চিম পাকিস্তানের কাছে খরোস্ত্র নামে একটি দেশ অনুসারে এই নাম। আর এক মতে খর পোস্ত অর্থাৎ খরের চামড়ার ওপর লিখিত হত বলে এই নাম। খৃ-পূ ৬-শতকের শেষ ভাগ থেকে দু'শ বছর মত পশ্চিম পাকিস্তানের অনেকাংশে পারস্যের হখামনিষ-রা রাজত্ব করতেন। এ'দের ভাষা অরামিক, পশ্চিম পাকিস্তানেও চালু হয়েছিল। খরোষ্ঠী এই অরামিক লিপির ভারতীয় রূপ। অরামিক লিপিতে ভারতীয় ভাষা দ্রুত লিখতে গিয়ে এই খরোষ্ঠীর জন্ম। অরামিক ভাষায় হারুখা বা হিব্রু ভাষায় বার্সেথ (=উৎকীর্ণ করা) শব্দের বিকার থেকে খরোষ্ঠী উৎপন্ন হয়েছে মনে হয়। পেশোয়ার ও হাজরা জেলায় এই লিপিতে অশোকের লেখা পাওয়া গেছে। খৃ-পূ ২-১ শতকে পশ্চিম পাকিস্তানে ও আফগানিস্থানে গ্রীক, শক, ও পহ্লব-রাজাদের কালে মুদ্রায়ও এই খরোষ্ঠী ব্যবহৃত হত। পরবর্তী কুষাণ আমলেও ঐ অঞ্চলের লেখাবলীতে খরোষ্ঠী ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এই বর্ণমালায় আ, ঈ, ঊ প্রভৃতি দীর্ঘমাত্রা চিহ্নের অভাব থাকায় ভারতীয় ভাষা শেখার অসুবিধা দেখা দিয়েছিল ; সেই জন্যই পরে ক্রমশ ব্রাহ্মী লিপি খরোষ্ঠীর স্থান অধিকার করেছিল। মৌর্য যুগের পর আফগানিস্থান ও মধ্য এসিয়ার কয়েকটি জনপদে খরোষ্ঠী চালু হয়েছিল, কিন্তু পরে ব্রাহ্মী লিপিও

এই সব স্থানে ঐ একই কারণে চালু হয়। খরোষ্ঠী লিপিতে কতকগুলি অক্ষর প্রায় এক রকম। দ্রঃ- খরোসথ্র।

খরোসথ্র—খাস গড়। এই খান থেকে খরোষ্ঠী লিপি ভারতে চালু হয়। তাকিস্থানে লেসার বুখারিয়া অংশ।

খলতিক পর্বত—<স্খলতিক। গয়াতে জাহানাবাদ সাব ডিভিসানে বরাবর পর্বত। এখানে সাত-ঘরা ও নাগার্জুন গুহা অশোক ও তাঁর নাতি দশরথের সময়ের। স্টেসন থেকে ৭ মাইল পূর্বে। গুহাতে শিলালেখে আছে আজীবকদের দশরথ কিছু গুহাবাস করে দিয়েছিলেন। পর্বতের পাদদেশে ও দক্ষিণ দিকে পাথর কেটে সাতটি গুহা তৈরি হয়েছিল, নাম সাতঘরা, এই সাতটির মধ্যে তিনটি নাগার্জুন পর্বতে, দশরথ দান করেন; এবং চারটি বরাবর পাহাড়ে, অশোক দান করেন। এখানে একটি পবিত্র ঝর্ণা রয়েছে পাতাল গঙ্গা। কাছেই খলতিক পর্বতের শাখা কাওয়া-দোল পর্বত।

খশ—বা খষ, খস বা খশীর। দ্রঃ- খসা। কাশ্মীরের দক্ষিণে খশদের দেশ। দ-পূর্বে খশহর থেকে পশ্চিমে বিতস্তা পর্যন্ত। এখানে রাজপুরী ও লোহারদের পার্বত্য রাজ্য ছিল। খশ—বর্তমানে খক। উত্তর ভারতে হিমালয়ের সানুদেশের অধিবাসী; প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষী উপজাতি। মহাভারত, হরিবংশ, মনু ও অথর্ব বেদ পরিশিষ্ট, বৃহৎসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে খশ জাতির উল্লেখ আছে। মধ্য এসিয়া ও উত্তর পূর্ব পারস্যের আর্য জাতির কতকগুলি শাখার সঙ্গে এদের যোগ ছিল। খশ জাতি মোটামুটি ভারতে সংস্কৃত ভাষী গোষ্ঠীর অন্তর্গত ছিল। পরবর্তী কালে মুখ্যত কাশ্মীরের পূর্বাঞ্চল থেকে আরম্ভ করে পূর্ব নেপালের পূর্বাঞ্চল পর্যন্ত পার্বত্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এদের ব্রাত্য বা পতিত আর্য বলা হত এবং এদের মৌলিক ক্ষত্রিয়ত্বও স্বীকৃত। নানা কারণে উত্তর ভারতের নানা জায়গা থেকে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এদের এখানে এসে বসবাস করতে থাকেন ফলে সভ্যতার ও কৃষ্টির বহু সংমিশ্রণ ঘটে। উত্তর ভারতের সমতল থেকে আনীত প্রাকৃত ও আধুনিক আর্যভাষা, খশেদের নিজেদের আর্যভাষা এবং প্রাক্-আর্য অধিবাসী ভোটব্রহ্ম (=কিরাত) ও মুণ্ডাকোল (=নিষাদ) ভাষা এই সব মিলিয়ে পাহাড়ি হিমালী ভাষাগুলি তৈরি হয়েছে।

খসা—দক্ষের মেয়ে, কশ্যপের স্ত্রী, খসার গর্ভে যক্ষ, রাক্ষস (হরিবংশ ৩।১১৮।-) ও খশ এই তিন জাতির জন্ম। মধ্য এসিয়ার কাসগর নামের সঙ্গে এই আদি খশ জাতির সংস্রব ছিল। এখনও গাড়ওয়াল ও কুমায়ুনের জনসাধারণ খাসিয়া নামে পরিচিত। নেপালে খস শব্দ ছেত্রী বা ক্ষত্রিয় শব্দের সমার্থক। খস জাতির সংস্কৃত নাম খশীর। দ্রঃ- খশ।

খাজনা—প্রাচীন ভারতে রাজারা ভূমিদান করতেন। ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, যোদ্ধা ও রাজকর্মচারীরা এই ভূমি পেতেন নানা কারণে। বেতনের বদলেও অনেক সময় জমি দেওয়া হত। এঁরা প্রকৃত পক্ষে ভূস্বামিত্ব লাভ করতেন না, পুরুষানুক্রমে রাজার প্রাপ্য দিতেন এবং নিজেদের জীবিকা চালাতেন। ভারতে প্রাচীন ও মধ্য যুগে রাষ্ট্রই ভূস্বামী ছিল বা রায়তই ছিল ভূস্বামী, জমিদার নয়। ভারতে খাজনার রূপ ছিল

ফসল খাজনা। বৈদিক যুগ থেকে মোগল আমলের আগে পর্যন্ত এই প্রথা প্রচলিত ছিল। বর্গাদার বা ভাগচাষ প্রথার অঙ্কুর প্রাচীন ভারতে গড়ে উঠেছিল এবং বর্তমানে চলে আসছে।

খাণ্ডব—কুরুক্ষেত্রের কাছে যমুনা তীরে প্রাচীন নগর। খাণ্ডব বনের অংশ বিশেষের উপর অবস্থিত এই নগর বর্তমান দিল্লি সহরের অন্তর্গত ফিরোজশাহের কোটলাভূমি ও হুমায়ুনের সমাধি স্তম্ভের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল। দ্রৌপদীর বিয়ের পর ভীষ্মের উপদেশে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের অর্দ্ধেক রাজত্ব দেন এবং খাণ্ডব প্রস্থে (= খাণ্ডব) বসবাস করতে দেন। এখানে পাণ্ডবরা ইন্দ্রপ্রস্থ নগরী স্থাপিত করেন। দ্রঃ- খাণ্ডব দহন, বিজয়।

কালিকা পুরাণে আছে সোমবংশে রাজা সুদর্শন হিমালয় থেকে নাতি দূরে বন কেটে (৮৯।৪৬) খাণ্ডীব নগরী বসান। এই নগরীর মধ্য দিয়ে কনখলা নামে গঙ্গা শাখাকে প্রবাহিত করান। কনখলা গিয়ে সীতাতে যুক্ত হয়। সুদর্শন দেবতাদেরও জয় করেন। বারাণসীর রাজা বিজয়, ভৈরব (দ্রঃ) বংশে জন্ম; এই দেবতা-বিরোধী সুদর্শনকে প্রথমে নিজের সচিব করে দেন এবং তারপর সুযোগ মত আক্রমণ করেন। সুদর্শন মারা যায়। বিজয় খাণ্ডবীতে প্রবেশ করলে ইন্দ্র এসে এটিকে বনে পরিণত করে দিতে বলেন; সুদর্শন জোর করে এটি প্রতিষ্ঠা করেছিল। তক্ষকের সঙ্গে ইন্দ্র এখানে বিহার করবেন। বিজয় এখানে প্রজাদের অন্য স্থানে যেতে বলেন, ধনসম্পত্তি আত্মসাৎ করেন এবং নগরী ভেঙে বনে পরিণত করে দেন। শ্বেতকির যজ্ঞে রোগগ্রস্ত অগ্নি শেষ পর্যন্ত অর্জুন সাহায্যে খাণ্ডবদহন (দ্রঃ) করেন। দ্রঃ খাণ্ডব বন।

খাণ্ডবদহন—ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি নিয়ে পাণ্ডবরা ইন্দ্রপ্রস্থ নামে নগরী স্থাপন করেন। এক দিন গ্রীষ্মে অর্জুন কৃষ্ণকে নিয়ে যমুনাতে যেতে চান। সন্ধ্যায় আবার ফিরে আসবেন। যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে অনুচরদের, মেয়েদের এবং দ্রৌপদী ও সুভদ্রাকে নিয়ে এঁরা যান। কাছেই খাণ্ডব বন। মেয়েরাও এখানে বরাসব পান করে উন্মত্ত হয়ে পড়েন। কৃষ্ণ ও অর্জুন একটু দূরে নির্জনে বসে অতীত যুদ্ধকাহিনী ইত্যাদি বলছিলেন। এমন সময়ে ব্রাহ্মণ বেশে অগ্নি (দ্রঃ) এসে নিজের সমস্ত পরিচয় দিয়ে খাণ্ডব বন দহন করবার জন্য এঁদের সাহায্য চান। ব্রহ্মার কথা মত (দ্রঃ- শ্বেতকি) অগ্নিমান্দ্য থেকে সেরে ওঠার জন্য অগ্নি এর আগে সাতবার বহু জীবজন্তু পূর্ণ এই বন দহন করবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এই বনে ইন্দ্রের বন্ধু তক্ষক সপরিবারে বাস করতেন। ফলে ইন্দ্রের নির্দেশে হাজার হাজার হাতী ও নাগেরা জল সেচ করে বা মেঘের জল দিয়ে সাত বারই বাধা দিয়েছিলেন। ব্রহ্মার কাছে অগ্নি আবার অভিযোগ করলে ব্রহ্মা কৃষ্ণ-অর্জুনের জন্য অপেক্ষা করতে বলেছিলেন। অগ্নি এই বন ও এখানকার সমস্ত জীবজন্তুকে খেতে চান। কৃষ্ণ ও অর্জুন সাহায্য করতে রাজি হন। অগ্নি সতর্ক করে দেন খাণ্ডব বনে ইন্দ্রের বন্ধু তক্ষক রয়েছেন, ইন্দ্র বৃষ্টি দিয়ে আগুন নিভিয়ে দেবেন। এঁরা উপযুক্ত অস্ত্র ও রথ চান। অগ্নি বরুণকে স্মরণ করেন। বরুণ এলে রাজা সোমের দেওয়া ধনুক ও তূণ এবং কপিলক্ষণ রথ এবং তপস্যায় বিশ্বকর্মা যে চক্র নির্মাণ করেছিলেন সেই চক্রও চান। এই রথে সোম দানবদের জয় করেছিলেন (মহা ১।২১৬।১১); ধ্বজে কপিঃ দিব্যঃ

স্থিতঃ ; গাণ্ডীব ব্রহ্মণা নির্মিতং ; দ্রঃ - ভীম। বরুণ কৌমোদকী গদাও দিতে চান। এর পর অগ্নি বরুণ দেবের কাছ থেকে গাণ্ডীব, অক্ষয় তূণ ইত্যাদি এনে নিরস্ত্র অর্জ্জুনকে এবং কৌমোদকী গদা ও চক্র এনে নিরস্ত্র কৃষ্ণকে দান করেন। এ'রা, তখন বনের সীমানা পাহারা দিতে থাকেন যাতে কোন জীবজন্তু পালাতে না পারে এবং অগ্নি খাণ্ডব বন পোড়াতে থাকেন। বনে যে সব মুনিরা ছিলেন তাঁরা তৎক্ষণাৎ, মহাভারতে (১।২১৭।১৫) স্বর্গের দেবতারা, ইন্দ্রের কাছে গিয়ে সাহায্য চান এবং ইন্দ্রও অবিলম্বে বৃষ্টি দিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু অর্জুন বাণ দিযে মেঘ ঢেকে ফেলেন যাতে একটুও জল না পড়ে। এই সময়ে তক্ষক কুরুক্ষেত্রে গিয়েছিলেন ; তক্ষকের ছেলে অশ্বসেন পালাতে চেষ্টা করে আগুনের তাপে ছটফট করতে থাকলে তার মা ছেলেদের মুখে পুরে পালাতে চেষ্টা করেন। অর্জুন দেখে বাণবিদ্ধ করে অশ্বসেনের মার শিরচ্ছেদ করে আগুনে ফেলে দেন। কিন্তু ইন্দ্র দেখতে পেয়ে সেই মুহূর্তে অর্জুনকে মোহমুগ্ধ করে দেন ; ফলে অশ্বসেন কোন মতে বেঁচে যান। অর্জুন তখন ক্রুদ্ধ হয়ে সমস্ত জীব জন্তুকে বাণবিদ্ধ করে অগ্নিতে সমর্পণ করতে থাকেন। কৃষ্ণ ও অর্জুন এবং অগ্নি এই বঞ্চনার জন্য (মহা ১।২১৮।১১) অশ্বসেনকে শাপ দেন কোথাও আশ্রয় পাবে না। সর্প, গৃধ্র ইত্যাদি অর্জুন নিহত করতে থাকেন; অসুরদের কৃষ্ণ নিহত করতে থাকেন। মোহমুগ্ধ করার জন্য অর্জুন সরাসরি এবার ইন্দ্রকে আক্রমণ করেন। ইন্দ্র ঐরাবতে চড়ে যুদ্ধ করেন। সঙ্গে সুপর্ণাদ্যাঃ পক্ষিণঃ ও উরগরাও যুদ্ধ করেছিল। ইন্দ্র শেষ পর্যন্ত বজ্রাঘাত করতে যান। এই সময় যম, কুবের, বরুণ, শিব, অশ্বিনীকুমারেরা, ধাতা, জয়, ত্বষ্টা, অংশ, মৃত্যু, অর্যমা, মিত্র, পূষা, স্কন্দ, ভগ, সবিতা, রুদ্রেরা, বসুরা, মরুৎ-রা, বিশ্বদেবরা সকলে মিলে অর্জুনের কাছে হেরে যান। অর্জুনের শৌর্যে ইন্দ্র প্রীত হন। এই সময় দৈববাণী ইন্দ্রকে জানিয়ে দেয় তক্ষক নিরাপদে কুরুক্ষেত্রে আছে এবং কৃষ্ণার্জুনকে ইন্দ্র পরাজিত করতে পারবেন না (মহা ১।২২৯।১৪)। ইন্দ্র ফিরে যান এবং কৃষ্ণ ও অর্জুন আগুন থেকে পলায়মান জীবদের নিহত করে আগুনে ফেলতে থাকেন। খাণ্ডবদাহ শেষ হলে ইন্দ্র এসে বর দিতে চান। অর্জুন অস্ত্র চান; ইন্দ্র বলেন মহাদেবকে প্রসন্ন করতে, তারপর দেবেন। কৃষ্ণ বর চান অর্জুনের সঙ্গে যেন শাশ্বত প্রীতি থাকে (মহা ১।২২৫।১৩)। ৬ দিন অন্য মতে ১৫ দিন খাণ্ডব দহন করে তৃপ্ত হয়ে এ'দের ধন্যবাদ দিয়ে অগ্নি ফিরে যান। ময়দানব (দ্রঃ) এই বনে ছিলেন ; কৃষ্ণ অর্জুনের কাছে ইনি প্রাণ ভিক্ষা করেন এবং বেঁচে যান। আর বেঁচে যায় মন্দপালের (দ্রঃ) ছেলে চারটি শার্ঙ্গক পাখী। ময় অর্জুন ও কৃষ্ণ নদীকূলে এসে বসেন।

খাণ্ডববন—খাণ্ডব প্রস্থ, প্রাচীন দিল্লি। মিরাটের উত্তরে মুজাফর নগর। একটি স্টেসন। প্রাচীন কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত। বুলন্দসর থেকে সাহারানপুরও খাণ্ডব নামে পরিচিত ছিল। পদ্মপুরাণে যমুনার তীরে; এবং ইন্দ্রপ্রস্থ ও খাণ্ডবপ্রস্থ ছিল খাণ্ডব বনের অংশ। অর্জুন এই বন পোড়ান। দ্রঃ-খাণ্ডব।

খান্দেস—(১) হৈহয়দের দেশ ; দক্ষিণ মালব ও ঔরঙ্গাবাদের অংশ মিলে। (২) অনূপদেশ ; কার্তবীর্যার্জুনের রাজ্য ; রাজধানী মাহিষ্মতী। প্রাচীন বিদর্ভের অংশও।

খারবেল—কলিঙ্গে (দ্রঃ) মহামেঘবাহন বংশে তৃতীয় রাজা। খৃ-পূ ১ শতক। জৈনধর্মী সাধুদের জন্য খণ্ডগিরি পাহাড়ে হাতী গুম্ফা নামে একটি গুহাবাস তৈরি করে দেন। অন্য ধর্মের প্রতিও কোন বিদ্বেষ ছিল না। খারবেলের অপর নাম রাজর্ষি বসু; উপাধি মহাবিজয়। উপরিচর বসুর বংশধর বলে দাবি করতেন।

খাশীর—ভারতে উত্তর পূর্ব কোণে একটি দেশ। দ্রঃ- খশ।

খিব—(১) উর্জগুণ্ডাতে খানৎ হচ্ছে খিব (মৎস্য); অপর নাম উর্জেগুজ। (২) সুরভিদের দেশ।

খিল—গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশ। যেমন মহাভারতের হরিবংশ। ঋক্‌বেদে কয়েকটি সূক্তকেও খিল বলা হয়। ঋক্ বেদের পরিশিষ্ট রূপে মূল সংহিতার শেষে ছাপা হয়। বিভিন্ন লুপ্ত শাখার অন্তর্গত বিচ্ছিন্ন মন্ত্রগুলির সংকলন এই অংশে ছিল। খিল অংশের সব মন্ত্রই খুব অর্বাচীন নয়। ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থে খিলের অনেক মন্ত্রের উল্লেখ আছে। ঋক্ বেদের বিভিন্ন সংস্করণে খিল সূক্তের সংখ্যা বিভিন্ন। কাশ্মীরে প্রাপ্ত একটি পুঁথিতে সব চেয়ে বেশি খিল সূক্ত পাওয়া গেছে। শ্রীসূক্ত, রাত্রিসূক্ত, নিবিদধ্যায়, প্রৈষাধ্যায় ইত্যাদি মন্ত্রগুলি খিল অংশের অন্তর্গত।

খেচরী মুদ্রা—জিবকে উল্টে তালুর দিকে করা, শঙ্খিনীর মুখের দিকে গিয়ে পৌঁছাবে। এইপথে অমৃত ক্ষরণ হয়। ফলে জিহ্বা সাহায্যে যোগী অমৃত গ্রহণ করবে। অমর হবে। যোগ গ্রন্থগুলিতে খুব বেশি প্রশংসিত মুদ্রা।

খেতক—খেত, খেড়, খেতক (পদ্ম-পু), কইর (বর্তমানে)। আমেদাবাদ থেকে ২০ মাইল দক্ষিণে, গুজরাটে বেত্রবতী (বত্রক) নদিকার তীরে (পদ্ম-পু)। বেত্রবতী সাবরমতী সঙ্গমের কাছে। কিয়েচ—(হিউ-এন-ৎসাঙ)।

খেমা—মদ্রদেশের সাগল নগরের রাজার মেয়ে বিম্বিসারের স্ত্রী। অসামান্যা রূপসী। বুদ্ধের সঙ্গে দেখা করতেন না পাছে ভগবান বুদ্ধ তাঁর রূপযৌবনের নিন্দা করেন। এই জন্য বিম্বিসার এক বার সভাকবিকে বেণুবন আশ্রমের সৌন্দর্য শোনাতে বললে খেমা মুগ্ধ হয়ে আশ্রম দেখতে যান। ভগবান বুদ্ধ ঐ সময়ে বেণুবনে ছিলেন এবং খেমার চেয়ে সুন্দরী এক জন অপ্সরা সৃষ্টি করেন। অপ্সরা বুদ্ধদেবকে বাতাস করতে থাকেন। বুদ্ধদেব তার পর এই অপ্সরার দেহে ক্রমশ জরা এনে দেহের চরম পরিণতি ক্ষেমাকে দেখালে খেমার চৈতন্য হয় এবং রাজার অনুমতি নিয়ে ভিক্ষুণী সংঘে যোগ দেন এবং বুদ্ধের উপদেশ পেয়ে অর্হত্ব লাভ করেন। জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির জন্য খেমা বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। মার খেমার মনে কামভাব জাগাবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছিলেন।

খোটান—৩৭°৪′ উ×৮০°২′ পূ। মধ্য এসিয়াতে পূর্ব তুর্কিস্থানে কুয়েনলুন পাহাড়ের উত্তর পাদদেশে ও তাকলামাকান মরুভূমির দক্ষিণ প্রান্তের মধ্যে অবস্থিত প্রসিদ্ধ সহর। স্থানীয় প্রবাদ অশোকের ছেলে কুস্তন। (=কুণাল) এখানে রাজ্য স্থাপন করেন। কুস্তন থেকে বর্তমান নাম খোটান। চীনা ও তিব্বতী গ্রন্থে এই রাজাদের নামের তালিকা আছে। খৃস্টীয় প্রথম চার শতকে এটি সমৃদ্ধ হিন্দু উপনিবেশ ও বৌদ্ধ ধর্মের কেন্দ্র ছিল। একটি খরোষ্ঠী লিপিতে মহারাজ রাজাতিরাজ দেব বিজিত

সিংহের নাম পাওয়া যায়। এ'দের সকলের নামে এই 'বিজিত' শব্দটি ব্যবহার হত। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি এখানে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। গোমতী বিহার ইত্যাদি অনেক বড় বড় বৌদ্ধ মন্দির ও বিহার এখানে ছিল। ফাহিয়েন ও হিউ-এন-ৎসাঙ দু জনেই গোমতী বিহারের ও খোটানের সমৃদ্ধির বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন ; এ সময়ে এখানে প্রায় ১০০ বিহার ও পাঁচ হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিল। বহু ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত ও ভিক্ষু এখানে ছিলেন। চীন থেকে ভারতে না গিয়ে এখানে এসে বৌদ্ধ শাস্ত্র পাঠ নেওয়া হত। গোমতী বিহারে রচিত অনেক গ্রন্থ বৌদ্ধ ত্রিপিটকের মর্যাদা লাভ করেছিল। এখানকার মুদ্রায় চীনা ও খরোষ্ঠী লিপিতে প্রাকৃত ভাষায় লেখা থাকত।

খোরসান—খুরসান। অশ্বের জন্য বিখ্যাত।

খ্যাতি—(১) দক্ষের মেয়ে। ভৃগুর স্ত্রী। ছেলে ধাতা, বিধাতা ও মেয়ে লক্ষ্মী। (২) ধ্রুব বংশে কবু রাজার একটি মেয়ে।

খ্যাতিবাদ—ভারতীয় দর্শনে ভ্রমের বিভিন্ন আলোচনার নাম। খ্যাতি অর্থে জ্ঞান। কোন বস্তুর তদ্ভিন্ন রূপ খ্যাতিকে ভ্রম বলা হয়। মোট ছয় প্রকার খ্যাতি স্বীকার করা হয় ঃ—অখ্যাতিবাদ, অন্যথাখ্যাতিবাদ, আত্ম-খ্যাতি-বাদ অসৎখ্যাতিবাদ,অনির্বচনীয় খ্যাতি-বাদ, সৎখ্যাতিবাদ।

গ

গঙ্গা—মধ্য হিমালয়ের গাঢ়ওয়াল পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত গঙ্গোত্রী (দ্রঃ) নামে পরিচিত একটি হিমবাহ থেকে উৎপন্ন একটি ধারা ভাগীরথী , গঙ্গোত্রী হিমবাহের গোমুখ (৩৮৩১ মি) নামে গুহা বা তুষারগুহা থেকে বার হয়েছে। এরপর গোমুখ থেকে ২৮ কি-মি দ-পশ্চিম দিকে তিব্বত থেকে আগত জাহ্নবী বা জাড়গঙ্গা ভাগীরথীতে এসে মিশেছে। এই মিলিত ধারা বন্দরপুঁছ ও শ্রীকণ্ঠ এই দুই গিরি শ্রেণীর মধ্যবর্তী গভীর খাদের ভেতর দিয়ে এগিয়ে আসছে। সুক্কী গ্রামের পর থেকে এর বেগ প্রবল। টিহ্রি সহরের দক্ষিণে দেবপ্রয়াগে অলকানন্দা এসে এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। দেবপ্রয়াগের পরবর্তী অংশের নাম গঙ্গা। গঙ্গার দৈর্ঘ্য ২৪৬৪ কি-মি।

ভাগীরথী, জাহ্নবী, ত্রিস্রোতা। ঋক্‌বেদে ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে। বৃহৎ-ধর্মপুরাণে গঙ্গার পথের কিছু বিশদ বিবরণ রয়েছে। সুলতান-গঞ্জে জহ্নু আশ্রমের (দ্রঃ) পর নদী দক্ষিণ মুখী এবং ভাগীরথী নাম নিয়ে জলাঙ্গীর সঙ্গে মিশেছে ; সাহেব গঞ্জ থেকে নাম হুগলি নদী। এই নদীপথে ছয়টি জহ্নু/বাঁক রয়েছে। (১) ভৈরবঘাটি ; গঙ্গোত্রীর নীচে ; এখানে ভাগীরথী ও জাহ্নবী মিলিত হয়েছে ; গাড়োয়ালে। (২) কান্যকুব্জ। (৩) ভাগলপুরের পশ্চিমে সুলতান গঞ্জে। (৪) সাহেব গঞ্জে রামপুর-বোয়ালিয়া-র ওপরে। (৫) মালদাতে গৌড়ে। (৬) জাননগর/ব্রাহ্মণীতলা ; নদীয়ার

৪ মাইল পশ্চিমে। এর পর ত্রিবেণী, চাগদা বাবুই-পুর, রাজগঞ্জ, আদিগঙ্গা এবং ডায়মণ্ডহারবার হয়ে সাগর দ্বীপের কাছে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। দ্রঃ- কৌশিকী।

ঋক্-বেদে (১০।৭৬।৫) গঙ্গা ও অন্য কয়েকটি নদীর স্তব আছে। গঙ্গার স্তব ঋক্ বেদে একবার মাত্র। গঙ্গা মকরবাহিনী, শুক্রবর্ণা, চতুর্ভুজা। এক হাতে একটি পাত্র ও এক হাতে পদ্মফুল। জ্যৈষ্ঠ শুক্লাদশমীতে এর পূজা হয়। এই দিনে গঙ্গা স্নানে দশ রকম পাপ নষ্ট হয় ; তাই এই তিথির নাম দশহরা। গঙ্গার জল স্নানে, পানে ও স্পর্শে পুণ্য এনে দেয়। গঙ্গাতীরে বাস ও মৃত্যু গৌরব জনক। মৃতের দগ্ধাবশিষ্ট অস্থি গঙ্গা জলে দেওয়ার নিয়ম আছে। গঙ্গার মাহাত্ম্য হিসাবে কাহিনীর সীমা নাই।

রাগরাগিণীতে নারদ সুদক্ষ বলে অভিমানী ছিলেন; নিজের ত্রুটি জানতেন না। নারদের গর্ব খর্ব করবার জন্য রাগরাগিণীরা বিকলাঙ্গ নরনারী আকারে পথে পড়ে থাকেন। এঁদের এ ভাবে পড়ে থাকতে দেখে নারদ এঁদের জিজ্ঞাসা করে নিজের ত্রুটি জানতে পারেন এবং এঁদের সুস্থ হবার উপায় কি জানতে চান। এঁরা জানান মহাদেব নিজে গান শোনালে এঁরা সুস্থ হয়ে উঠতে পারবেন। নারদ তখন মহাদেবকে গাইতে রাজি করান এবং উপযুক্ত শ্রোতার দরকার বলে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে উপযুক্ত শ্রোতা হিসাবে নিয়ে আসেন। মহাদেবের গান শুনতে শুনতে রাগরাগিণীরা সুস্থ হয়ে ওঠেন। কিন্তু এই সঙ্গীতের ব্রহ্মা কিছুই বুঝতে পারেন না। বিষ্ণু কিছুটা পেরেছিলেন এবং গান শুনতে শুনতে মোহিত হয়ে দ্রবীভূত হয়ে যান। ব্রহ্মা তখন এঁকে কমণ্ডলুতে ধরে ফেলেন। গঙ্গার উৎপত্তির এই এক কাহিনী। দ্রঃ-দেব কুল্যা ; মেনা।

দেবী ভাগবৎ ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ মতে রাসের সময় মহাদেব কৃষ্ণের গান করতে থাকেন। গান শুনে রাধাকৃষ্ণ মুগ্ধ হয়ে গলে যান। ফলে গঙ্গার উৎপত্তি। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে এক সময় গঙ্গা কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লে রাধা রাগে ও ঈর্ষায় গঙ্গাকে খেয়ে ফেলতে যান। গঙ্গা তখন কৃষ্ণের চরণে আশ্রয় নেন। এর ফলে পৃথিবী জলশূন্য হয়ে পড়লে দেবতাদের অনুরোধে নিজের পায়ের আঙ্গুলের নখ থেকে গঙ্গাকে মুক্ত করে দেন। সেই থেকে গঙ্গার নাম হয় বিষ্ণুপদী। পরে ব্রহ্মার অনুরোধে গন্ধর্ব মতে কৃষ্ণ গঙ্গাকে বিয়ে করেন। ভাগবত পুরাণ মতে ত্রিবিক্রম রূপী বিষ্ণুর বাঁ পায়ের আঙ্গুলের নখের আঘাতে ব্রহ্মাণ্ড কটাহ ছিন্ন বাইরের জলধার এখানে এসে জমা হয়েছিল। এই জল বহু দিন আকাশে (=বিষ্ণু পদে) আটকে ছিলেন। ফলে নাম হয় বিষ্ণুপদী। যেখানে আটকে ছিলেন সেই বিশেষ স্থানটির নাম ধ্রুব মণ্ডল। ধ্রুব মণ্ডলে ধ্রুব তপস্যা করেন। বিষ্ণুপদ থেকে গঙ্গা আসেন চন্দ্রলোকে। চন্দ্রলোক থেকে গঙ্গা সুমেরু পর্বতে ব্রহ্মলোকে নেমে আসেন এবং সীতা, চক্ষুষ, অলকানন্দা ও ভদ্রা চার ভাগ হয়ে যান। সীতা ব্রহ্মলোকে মেরু পাহাড়ে নেমে ভদ্রাশ্ববর্ষ পার হয়ে পূর্ব সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। চক্ষুষ/বংক্ষু মাল্যবান পাহাড়ে এসে কেতুমালবর্ষ পার হয়ে পশ্চিম সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। অলকানন্দা হেমকূট পাহাড় হয়ে ভারতবর্ষ অতিক্রম করে দক্ষিণ সমুদ্রে এবং ভদ্রা শৃঙ্গবান/শৃঙ্গধাম পাহাড় হয়ে উত্তরকুরু অতিক্রম করে উত্তর লবণ সমুদ্রে গিয়ে যোগ দেয় (ভাগ ৫।১৭)।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে বিষ্ণুপদ থেকে চন্দ্রে এবং চন্দ্র কিরণের সঙ্গে মিশে মেরুপৃষ্ঠে,

মেরুপৃষ্ঠ থেকে হিমালয়ে ; এবং শিব এখানে গঙ্গাকে ধারণ করেন। ভগীরথের তপস্যায় শিবের কাছ থেকে সপ্তধা হয়ে দক্ষিণে প্রবাহিতা হন। মেরুপৃষ্ঠ থেকে একটি ধারা সীতা=অক্সাস্। বৃহৎধর্ম পুরাণে সতী পর জন্মে গঙ্গা ও উমারূপে মেনকার গর্ভে জন্মান। দেবতারা গঙ্গাকে নিয়ে যান ; ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে স্থান পান। এর পর এক সময় শিব ও নারদের গান শুনে বিষ্ণু দ্রবীভূত হলেন ; এই জলও ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে স্থান পেল ; ফলে গঙ্গা পুণ্য-তোয়া। বিষ্ণুপুরাণে বিষ্ণু পাদাঙ্গুষ্ঠ-জলই গঙ্গা। আর এক মতে বিষ্ণুর দেহ জাতা।

রামায়ণে মেরু দুহিতা মেনার বড় মেয়ে গঙ্গা, ছোট উমা। দেবতারা দেবকার্যের জন্য গঙ্গাকে নিয়ে যান ; হিমালয় ত্রৈলোক্যহিতকাম্যয়া (রা ১।৩৫।১৭) দিয়ে দেন। গঙ্গা স্বর্গে গিয়ে সুরনদীতে পরিণত হন। অগ্নি শিবের বীর্য ধারণ করার পর (দ্রঃ- কার্তিকেয়) এবং দেবতারা পার্বতীর (দ্রঃ) কাছে অভিশপ্ত হবার পর দেবতা ও ঋষিরা ব্রহ্মাকে জানান প্রতিশ্রুত সেনাপতি (রা ১।৩৭।২) এখনও জন্মায় নি। ব্রহ্মা তখন গঙ্গাকে দেখিয়ে বলেন এই আকাশগা গঙ্গা যস্যাং পুত্রং হুতাশনঃ জনয়িষ্যতি (রা ১।৩৭।৮) এবং গঙ্গা তং সুতং মানয়িষ্যতি (রা ১।৩৭।৯)। অর্থাৎ শিব পার্বতীরই ছেলে ; গঙ্গার জলে শিবের উগ্রবীর্য যেন কিছুটা শান্ত হবে। সকলে কৈলাসে এসে অগ্নিকে পুত্রার্থম্ নিযোজয়ামাসুঃ। দ্রঃ- কার্তিকেয়। অগ্নি তখন গঙ্গাকে গর্ভ ধারণ করতে বলেন ; এবং শিবের বীর্য দান করেন। গঙ্গাও শেষ পর্যন্ত অশক্তা হয়ে পড়েন ; দেহ জ্বলে যেতে থাকে (রা ১।৩৭।১৬) ; অগ্নি তখন পরামর্শ দেন হিমবতঃ পার্শ্বে গর্ভ ত্যাগ করুন। গঙ্গা স্রোত থেকে গর্ভং উৎসসর্জ। দ্রঃ- কার্তিকেয়, বিন্দুসর।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গা তিন জনেই বিষ্ণুর স্ত্রী। বিষ্ণু ও গঙ্গার পরস্পরের প্রতি বেশি আসক্তি ফুটে ওঠে। লক্ষ্মী ক্ষমা করেন কিন্তু সরস্বতী সহ্য করতে পারেন না ; গঙ্গাকে প্রহার করতে থাকেন। লক্ষ্মী তারপর সরস্বতীকে থামাতে চেষ্টা করেন ; সরস্বতী গঙ্গাকে প্রহার করা বন্ধ করলেও লক্ষ্মীকে পৃথিবীতে জন্মাবার জন্য শাপ দেন। লক্ষ্মীকে শাপ দেবার জন্য রেগে গিয়ে গঙ্গা সরস্বতীকে নদী হবার শাপ দেন এবং সরস্বতীও গঙ্গাকে নদী হয়ে জীব লোকের সমস্ত পাপ গ্রহণ করতে হবে বলে শাপ দেন। দেবী ভাগবতে (৯।৭) এই শাপ দেবার কাহিনী আছে ; বিষ্ণু বলেন লক্ষ্মী ধর্মধ্বজের গৃহে তাঁর কন্যা হয়ে জন্মাবেন ; পর জন্মে তুলসী হয়ে জন্মাবেন এবং বিষ্ণুর অংশে জন্ম শঙ্খচূড়ের সঙ্গে বিয়ে হবে ; এবং তারপর লক্ষ্মী পদ্মাবতী নদীতে পরিণত হবে। গঙ্গাকে বলেন রাজা ভগীরথ তাঁকে পৃথিবীতে নিয়ে যাবেন ; নাম হবে ভাগীরথী। পৃথিবীতে রাজা শন্তনুর সঙ্গে বিয়ে হবে ; গঙ্গা তারপর কৈলাসে ফিরে গিয়ে শিবের স্ত্রী হবেন। সরস্বতীও নদী হয়ে জন্মাবেন এবং পরে ব্রহ্মলোকে ফিরে গিয়ে ব্রহ্মার স্ত্রী হবেন। দ্রঃ- বলি।

রামায়ণে দিলীপের ছেলে ভগীরথ (দ্রঃ) গঙ্গা আনবার বর পান। গঙ্গা ইচ্ছা করে সুবৃহৎ রূপং কৃত্বা (রা ১।৪৩।৫) দুঃসহ বেগে শিবের/ভগিনীপতির মাথায় নেমে আসেন এবং ভগিনীপতিকে ভাসিয়ে পাতালে নিয়ে যাবেন ঠিক করেন।

অবিবাহিতা বড় শালীর অভিসন্ধি বুঝতে পেরে জটার মধ্যে সংবৎসরান্ গণান্ বহূন্ (রা ১।৪৩।১০) আটকে রাখেন। ভগীরথ এবার মহাদেবের তপস্যা ; শিব বিন্দু সরোবরে গঙ্গাকে মুক্ত করে দেন। প্রাচী দিকে হ্লাদিনী, পাবনী, নলিনী এবং প্রতীচী দিকে সুচক্ষু, সীতা ও সিন্ধু হিসাবে ভাগ হয়ে যান। এখানে আর একটি ধারা অলকানন্দার উল্লেখ আছে মাত্র। গঙ্গার সপ্তম ধারা ভগীরথের পেছু পেছু এগিয়ে যায়। পৃথিবীতে নেমে আসার সময় মৎস্য, কচ্ছপ, শিংশুমার ও অন্যান্য বহু জলচর জীব এই স্রোতে নেমে আসে। দেবতারা দেখতে আসেন ; ভগীরথের সঙ্গে এগিয়ে যান। রামায়ণে দেবতা ও ঋষিরা ইত্যাদি জহ্নুকে (দ্রঃ) স্তব করেন এবং জহ্নু কাণ থেকে বার করে দেন ; ফলে জাহ্নবী। এরপর ভগীরথের সঙ্গে গিয়ে ইত্যাদি।

শিবের জটাতে অবস্থান হেতু শিবের পত্নী হয়েছিলেন। এই কারণে গঙ্গা শিব বীর্য ধারণ করতে চেষ্টা করেছিলেন। সৌরপুরাণে মেনকার ছেলে মৈনাক ও ক্রৌঞ্চ এবং মেয়ে গঙ্গা ও গৌরী। বামন পুরাণে মেয়ে রাগিণী, কুটিলা, ও কালী। শিব বীর্য ধারণের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করাতে ব্রহ্মার শাপে কুটিলা নদীতে পরিণত হন। একটি মতে কুটিলাই কিন্তু গর্ভধারণ করে শর বনে নিক্ষেপ করেছিলেন। কালিকা পুরাণেও গঙ্গা উমার থেকে বড়।

ইক্ষ্বাকু বংশে রাজা মহাভিষ সত্যলোকে এসে ব্রহ্মার আরাধনা করতে থাকেন। গঙ্গাও এখানে ছিলেন। এক দিন বাতাসে গঙ্গার বস্ত্র সামান্য অসংবৃত হয়ে যায়। মহাভিষের চোখে পড়ে। গঙ্গা ও রাজা দু জনেই কামার্ত হয়ে পড়েন। ব্রহ্মা এই দেখে দু জনকে অভিশাপ দেন ; মহাভিষ পৃথিবীতে রাজা হয়ে জন্মাবেন এবং গঙ্গা তাঁর স্ত্রী হবেন। গঙ্গা তখন কাতর হয়ে প্রার্থনা করলে ব্রহ্মা বলেন অষ্ট বসু জন্মালে গঙ্গা মুক্তি পাবেন। মহাভিষ রাজা শন্তনু হয়ে জন্মান।

বশিষ্ঠ এক বার বসুগণকে (দ্রঃ) শাপ দেন। মহাভিষ শন্তনু হয়ে জন্মালে গঙ্গা নারী মূর্তিতে দেখা দিয়ে রাজাকে মুগ্ধ করে বিয়ে করেন। বসুদের (দ্রঃ) সঙ্গে গঙ্গার যে কথাবার্তা হয়েছিল সেই কথা মত প্রথম সাতটি সন্তানকে গঙ্গা জলে ডুবিয়ে হত্যা করেন। বিয়ের সর্ত অনুসারে রাজা কোন বাধা দেন নি। কিন্তু অষ্টম বারে বাধা দিলে এই সন্তানটিকে (দ্রঃ) রাজার অনুমতিতে নিজের সঙ্গে নিয়ে অন্তর্হিত হয়ে যান এবং রাজোচিত শিক্ষা দানের পর আবার ফিরিয়ে দিয়ে যান। এই শিশু ভীষ্ম (দ্রঃ)। ভীষ্ম মারা গেলে গঙ্গা জল থেকে উঠে এসে কাঁদতে থাকেন (মহা ১৩।১৫৪ ১৮)। কৃষ্ণ ও ব্যাস সান্ত্বনা দেন। দ্রঃ-প্রতীপ, সগর, ভগীরথ ও উমা।

ভগীরথের মেয়ে বলে গঙ্গার অপর নাম ভাগীরথী ; স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালে প্রবাহিত বলে নাম ত্রিপথগা, এবং আর এক নাম উর্বশী। দ্রঃ- প্রতীপ, ঐরাবত।

পদ্মপুরাণে গঙ্গা দ্বিভুজা, শুভ্রবর্ণা, ও মকর-বাহনা। স্কন্দ পুরাণে চতুর্ভুজা, রত্ন চন্দ্রসৌম্যা। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে শ্বেত-চম্পকবর্ণা। বৃহৎ ধর্মপুরাণে চতুর্ভুজা, মকর-বাহনা ; অগ্নিপুরাণে মকর-বাহনা ও শ্বেতবর্ণা। হিউ-এন-ৎসাঙ খৃ ৪-র্থ শতকে গঙ্গার পবিত্রতার

কথা উল্লেখ করেছেন। গুপ্ত রাজাদের সময় (খৃ ৪/৫ শতক) এবং মধ্য যুগের প্রথম দিকে গঙ্গা ও যমুনা মূর্তি পূজিত হত; বহু মন্দিরের দরজাতে দেখা যায়। অপ্সরী মত সুন্দর মূর্তি, নাচছে না। বেস নগর গঙ্গা সুন্দর ভঙ্গিতে মকরের ওপর দাঁড়িয়ে, ডান হাতের কনুই একজন সহচরীর কাঁধের ওপর। ভগীরথ যেন মকরকে চালিয়ে নিয়ে চলেছেন।

গাঙ্গ—রাঢ়-দেশ। রাজধানী সপ্তগ্রাম=গাঙ্গে (টলেমি) বন্দর। বাংলাদেশ। টলেমি বলেছেন গাঙ্গে-রাইডস্-দের দেশ; গঙ্গার পশ্চিম তীরে এঁদের বাস। রাজা তৃতীয় কৃষ্ণের করহদ শিলালেখে এবং হরিহর ও বেলুড় শিলালেখে এটি একটি দেশ; কলিঙ্গ ও মগধের মধ্যবর্তী। পেরিপ্লাসে মোটামুটি বাংলাদেশ। ১-২ খৃ শতকে সপ্তগ্রাম রাঢ়ের প্রধান সহর, বঙ্গের নয়। বৈদিক যুগের শেষ দিকে গাঙ্গকে গাঙ্গায়নী বলা হয়েছে; কৌষীতকি উপনিষদে এখানকার রাজাকেও গাঙ্গায়নী অর্থাৎ গঙ্গার ছেলে বলা হয়েছে। এ ছাড়া গাঙ্গ নামে একটি রাজবংশ দ-মহীশূর, কুর্গ, সালেম, কোইম্বাটুর, নীলগিরি এবং মালাবারের কিছু অংশে ২-৯ শতকে রাজত্ব করত। এদেরই একটি শাখা উড়িষ্যাতে রাজ্য করেছে; এঁরা যেন রাঢ় (বর্তমানের হুগলি), মেদিনীপুর ইত্যাদি জয় করেন। চোরগঙ্গা উৎকল জয় করে গঙ্গাতীরে মন্দার (=সুহ্ম বা রাঢ় যেন) রাজাকে নিহত করেন। অর্থাৎ ১২ শতকে উড়িষ্যার গঙ্গাবংশ রাঢ়ে রাজত্ব করত।

গঙ্গাধর—মাথা পেতে গঙ্গাকে (দ্রঃ) ধারণ করার জন্য শিবের একটি নাম।

গঙ্গাধরমূর্তি—গঙ্গাইকোণ্ডাচোলপুরম মন্দিরে উৎকীর্ণ ছবি। শিব জটা থেকে পেছন দিকের ডান হাত দিয়ে গঙ্গাকে মুক্ত করে দিচ্ছেন এবং সামনের ডান হাত দিয়ে উমা-পার্বতীকে আদর করছেন। পার্বতীর মুখে ও ভঙ্গিতে সপত্নীর প্রতি ঈর্ষা,—অপূর্ব রূপায়ণ।

গঙ্গাবল—কাশ্মীরীদের উত্তর-গঙ্গা হ্রদ। কাশ্মীরে হরমুখ পর্বতের পাদদেশে। এখানে সিন্ধুর উৎপত্তি মনে করা হয়।

গঙ্গাসাগর—২১°৩৬-২১°৫৬′ উ, ৮৮°২-৮৮°১১′ পূ। সাগর দ্বীপের দক্ষিণে একটি গ্রাম। আয়তন ৫৯৪ বর্গ কি-মি। সমস্ত দ্বীপটি গঙ্গাসাগর নামে পরিচিত। উত্তর-পশ্চিমে গঙ্গা এগিয়ে এসে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। কপিল মুনি এই খানে তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করেন; ভগীরথ (দ্রঃ) এইখানে সগর রাজার ছেলেদের উদ্ধার করেন। প্রতি বছর পৌষ সংক্রান্তিতে এখানে মেলা হয়। দ্বীপটির একটি প্রান্তে একটি মন্দিরে কপিল মুনি ও ভগীরথের একটি মূর্তি আছে। প্রাচীন মন্দির ডুবে গেছে; সম্প্রতি আর একটি মন্দির করা হয়েছে।

গঙ্গেশ উপাধ্যায়—তত্ত্বচিন্তামণি প্রণেতা প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক কাশ্যপ গোত্রীয় ছাদন বংশে মিথিলায় জন্ম। তাঁর গ্রন্থ রচনাকাল ১৩০০-১৩৫০ খৃ। ন্যায়-বৈশেষিক-প্রস্থান অবলম্বী বটে তবু নতুন এক চিন্তাধারার প্রবর্তন করেন। এই চিন্তাধারাই পরে নব্যন্যায় বলে পরিণত হয়। এর প্রভাব পরবর্তী সমস্ত দর্শন গ্রন্থে, ভাষা, চিন্তা ও অলংকার শাস্ত্রের ওপর ছড়িয়ে পড়েছিল।

গঙ্গোত্রী—গঙ্গোদ্ভেদ। ৩০°৫৯″ উ × ৭৮°৫৯′ পূ; উচ্চতা ৩৩৯৬। এটি মধ্য

হিমালয়ের গাড়ওয়াল অঞ্চলের চারটি তীর্থস্থানের মধ্যে একটি। উত্তর প্রদেশে উত্তরকাশী জেলার অন্তর্গত। হিমবাহ গলে পরিণত গঙ্গার (ভাগীরথী) প্রাচীন উৎপত্তি-স্থান। গাড়োয়ালে রুদ্র হিমালয়ে ; গঙ্গার উৎস বলে কথিত। এখানে গঙ্গাদেবীর মন্দির রয়েছে। প্রকৃত উৎস আরো অনেকটা উত্তরে। গঙ্গোত্রী থেকে ১ ক্রোশ এবং মিয়ানি-কি-গড় থেকে ২ ক্রোশ দূরে পতন গিরি। বলা হয় পঞ্চ পাণ্ডবরা এখানে ১২ বৎসর মহাদেবের তপস্যা করেছিলেন ও এখানেই দ্রৌপদী ও চারজন পাণ্ডব দেহ রাখেন। এখান থেকে যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহিণী শিখরে ওঠেন ; এই শিখর থেকে গঙ্গা বার হয়েছে। রুদ্র হিমালয়ে ৫টি শৃঙ্গঃ- রুদ্র হিমালয় (পূর্বদিকে), বুরামপুরি/ব্রহ্মপুরী, বিসেনপুরী/বিষ্ণুপুরী, উদগুরিকণ্টা/উদগারিকানাথ ; ও স্বর্গারোহিণী (পশ্চিমে)। শৃঙ্গগুলি মিলে অর্দ্ধচন্দ্র আকার একটি হ্রদ মত সৃষ্টি করেছে ; চির তুষারধৃত হ্রদ ; এই বরফ গলেই গঙ্গার উৎপত্তি। দ্রঃ- সুমেরু, গৌরীকুণ্ড। গঙ্গোত্রীর দক্ষিণ পূর্বে এই গঙ্গোত্রী-হিমবাহ বর্তমানে যেখানে গলে নদীরূপে পরিণত হয়েছে সেই জায়গাটির নাম গোমুখ। গঙ্গোত্রী হিমবাহ ভারতের বৃহত্তম হিমবাহ ; ও পাশ থেকে মন্থনী, স্বচ্ছন্দ, গহন ও কীর্তি হিমবাহ এসে মিশেছে। কীর্তি হিমবাহের কাছে কেদারনাথ শৃঙ্গ ৬৮৩১ মি। এর বাঁ দিকে শিবলিঙ্গ পর্বতমালার তিনটি এবং ডান দিকে ভগীরথ পর্বতমালার তিনটি শিখর। ভগীরথ শিখরগুলি গঙ্গোত্রী শিখর নামেও পরিচিত। গ্রীষ্ম কালে এখানে তাপ ২১°-২৪° সে, শীতে ৩°-৭° সে। কিছু বসতিও আছে। গঙ্গোত্রীর পথ বৈশাখ থেকে আশ্বিন পর্যন্ত খোলা থাকে। উত্তর কাশী থেকে হাঁটা পথে ৯২ কি-মি।

গজ—(১) রামের এক জন বানর যোদ্ধা। (২) শকুনির ছোট ভাই। সুবলের ছেলে ; কুরুক্ষেত্রে ইরাবানের হাতে নিহত হন।

গজকচ্ছপ—বিভাবসু এক জন রাগী মুনি। ছোট ভাই সুপ্রতীক বার বার পিতৃধন বিভাগের জন্য অনুরোধ করেন। বিভাবসু ভিন্ন হবার কুফল বোঝাতে চেষ্টা করেন এবং শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে ভাইকে হাতী হবার শাপ দেন। সুপ্রতীকও তখন কচ্ছপ হবার জন্য পাল্টা শাপ দেন। এর পর গজ ও কচ্ছপ দু জনে বহু কাল ধরে কশ্যপের আশ্রমের কাছে (মহা ১।২৫।২০) এক সরোবরের ধারে মারামারি করে কাটাচ্ছিলেন। গরুড় (দ্রঃ) অমৃত আনতে বার হয়ে এদের দু জনকে খেয়ে ফেলেন। দ্রঃ- সুভদ্র।

গজকুম্ভীর—ইন্দ্রদ্যুম্নের (দ্রঃ) স্মৃতি অক্ষুণ্ণ ছিল। হূ হূ দেবলের পা টেনে ধরেছিল ফলে শাপে কুমীর হন। হস্তী ইন্দ্রদ্যুম্ন তত্ত্বের স্তব করে ; ব্রহ্মা ইত্যাদি কেউ আসেন না। বিষ্ণু কুমীরের মুখ বিদীর্ণ করে দেন ইত্যাদি (ভাগ ৮।৪)। দ্রঃ গজেন্দ্র ঘোষ।

গজলক্ষ্মী—অন্য নাম অভিষেক লক্ষ্মী। লক্ষ্মীর একটি বিশিষ্ট রূপ ; দু পাশে দুটি হাতী দেবীর মাথায় অভিষেক বারি ঢালছে। গুপ্ত বা গুপ্ত পরবর্তী যুগে রচিত বিষ্ণুধর্মোত্তর-এ এই রূপ কল্পনার প্রথম সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। খৃ-পূ যুগের ভারহুত, সাঁচি, বুদ্ধগয়া, অমরাবতী প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধ শিল্প কলায় দেখা যায়। দেবী পদ্ম-হস্তা. প্রশস্তজঘনা, ক্ষীণকটি ও পীনপয়োধরা। দেবী মূলত উৎপাদিক শক্তির এবং পৃথিবীর প্রতীক। পরবর্তী কালে শ্রীসম্পদের দেবী লক্ষ্মীর সঙ্গে অভিন্ন হয়ে পড়েন। অর্থাৎ

বৌদ্ধদের এই দেবী হিন্দুদের লক্ষ্মীর সঙ্গে কল্পনার দিক থেকে অভিন্ন ছিলেন। খৃ-পূ ৩-২ শতকের বহু মুদ্রায় এই মূর্তি পাওয়া যায়। অয়িলিস্, রজুবুল, শোডাস ইত্যাদি বিদেশী শাসকদের মুদ্রায়ও এই মূর্তি আছে। আরো বহু জায়গা থেকে এই মূর্তি পাওয়া গেছে। ময়ূরভঞ্জের অন্তর্গত খিচিঙে একটি মধ্যযুগীয় সুন্দর মূর্তি পাওয়া গেছে; দেবী বিশ্বপদ্মের ওপর ললিতাক্ষেপে সমাসীন; ডান হাত ডান হাঁটুর ওপর বরদামুদ্রা যুক্ত; বাঁ হাতে পদ্ম; দুটি হাতী দুপাশে দুটি পদ্মের উপর দাঁড়িয়ে মাথায় অভিষেক বারি ঢালছে। প্রাচীন কালে হাতী শ্রীসম্পদের প্রতীক ছিল। বৈদিক সাহিত্যে ও হাতীকে একটি বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হয়েছিল; এই জন্যই বোধ হয় লক্ষ্মীর সঙ্গে দুটি হাতী থাকে। দ্রঃ- মুদ্রা।

গজাসুর—দুর্দ্ধর্ষ এক অসুর। মহেশ নামে এক রাজা নারদকে এক বার যথাযোগ্য সম্মান না দেখালে পর জন্মে নারদের শাপে গজাকার দানবে পরিণত হন। ইনি দেবদ্বেষী। এঁর অত্যাচারে সকলে পীড়িত হয়ে পড়লে মহাদেব এঁকে বধ করে এর চামড়া নিজে পরিধান করেন (স্কন্দ)।

গজেন্দ্র মোক্ষ—(১) শোণপুর, দ্রঃ- বিশালছত্র; অপর নাম হরিহরক্ষেত্র। (২) তাম্রপর্ণী তীরে একটি তীর্থ, তিন্নেভেলি থেকে ২০ মাইল পশ্চিমে; (৩) বামন পুরাণে ত্রিকূট পাহাড়ে একটি স্থান। দ্রঃ- গজকুম্ভীর।

গড়মণ্ডল—এখানকার হৈহয় রাজাদের রাজধানী ছিল লন্‌ঝি (প্রাচীন নাম চম্পনত্তু), রতনপুর (মণিপুর) ও মণ্ডল (মহিষ্মতি)। দক্ষিণ কোসলের অন্তর্গত এলাকা।

গড়মুক্তেশ্বর—গণমুক্তেশ্বর। মিরাট জেলাতে গঙ্গাতীরে। প্রাচীন হস্তিনাপুরের অংশ। এখানে গণেশ মহাদেবকে পূজা করেছিলেন।

গণ—শিব ও পার্বতীর অনুচর ও ভৃত্যগণ। নন্দীকে বহু সময় গণদের অধিপতি বলা হয়। শিব ও গণেশের কঠোর শাসনে এঁরা থাকতেন। অন্যায় আচরণের জন্য কৈলাস থেকে এঁদের পৃথিবীতে নির্বাসিত করা হত। কালিকাপুরাণে যজ্ঞ বরাহের সঙ্গে যুদ্ধকালে শরভ এদের সৃষ্টি করে। এরা ভীষণ, অতি ক্রূর (৩০।১১৭); যতী ও যোগী, ষড় ঐশ্বর্য সম্পন্ন (৩০।১৫২), বলশালী ও অস্ত্র সজ্জিত। মহাদেবের গণ। এরা 'ভূত কর্ম' গান করেছিল বলে ব্রহ্মা নাম দেন ভূতগ্রাম (৩০।১৭৯)। দ্রঃ- গণাধিপতি।

গণতন্ত্র—দুই জাতের; প্রত্যক্ষ ও প্রাতিনিধিক। প্রাচীন ভারতে খৃ পূ ৭-৪ শতকে বহু গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। এদের গণ বা সংঘ বলা হত। সাধারণত এক একটি সংঘ ছিল ক্ষত্রিয়কুলের অভিজাতক গণতন্ত্র। প্রভুস্থানীয় ক্ষত্রিয় বংশের সভ্যেরা রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত আলোচনা করে গ্রহণ করতেন। দ-পশ্চিম ভারতের কয়েকটি সংঘের সভায় কৃষক, গোপালক ও বণিকরাও স্থান পেত। সেনাপতি ও প্রধান কার্যনির্বাহক সভার দ্বারা নির্বাচিত হতেন। সংঘের মাথায় নামে এক জন রাজা (নির্বাচিত বা পুরুষানুক্রমিক) থাকত। ভারতের প্রাচীন গণতন্ত্রগুলি প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র ছিল। এদের কয়েকটি আবার একক সংঘ ছিল এবং কয়েকটি ছিল মিলিত সংঘ যেমন বজ্জি (বৃজি), ত্রিগর্ত, যাদব ইত্যাদি। সংঘ শাসিত উপজাতিদের অরাষ্ট্রক বা আরট্ট বলা

হত। বুদ্ধের সময় (খৃ-পূ ৭-৬ শতক) বৈশালীর বজ্জি বা লিচ্ছবিরা এবং কুশীনগরের মল্লেরা ছিল শ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক। কপিলাবস্তুর শাক্যেরা ও পিপ্পলি বনের মৌর্যেরা ছিল তুলনায় একটু নীচে। লিচ্ছবি ও মল্ল গণরাজ্যের আদর্শ বৌদ্ধ সংঘের সংগঠনকে প্রভাবিত করেছিল। খৃ-পূ ৫-৩ শতকে পঞ্চ নদের দেশে প্রতিষ্ঠিত গণরাজ্য ছিল যৌধেয়, ক্ষুদ্রক, মালব, বসাতি, শিবি, অম্বষ্ঠ, উডুম্বর, ত্রিগর্ত, মদ্র, কেকয়, অগ্রেয় ও প্রস্থল। এ ছাড়াও পাণিনি ও কৌটিল্যের গ্রন্থে অন্ধক-বৃষ্ণি (সৌরাষ্ট্রে যাদবদের সাত্বত শাখা) কুকুর (উ-গুজরাত), কুরু (রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ), পাঞ্চাল (রাজধানী কাম্পিল বা কাম্পিল্য, উত্তর প্রদেশ), বৃক (শকগণ?), সাল্ব (অলোয়ার অঞ্চলে), কাম্বোজ (গান্ধারের কাছে), মধুমন্ত ও অপ্রীত (সম্ভবত উ-পশ্চিম সীমান্তের মোহমান্দ ও আফ্রিদিদের পূর্বপুরুষ)। ইন্দোগ্রীক, শক ও কুষাণদের পর যৌধেয়, মালব, শিবি, অর্জুনায়ন প্রভৃতি গণতন্ত্রগুলি আবার পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল।

গণদেবতা—মিলিত দেবতা; এঁদের নয়টি ভাগ ঃ—(১) আদিত্য বার জন। (২) বিশ্ব বা বিশ্বদেব দশ জন। (৩) বসু আট জন। (৪) তুষিত ছত্রিশ জন। (৫) আভাস্বর ৬৪ জন। (৬) বায়ু ঊনপঞ্চাশজন। (৭) মহারাজিক দুশ-কুড়ি জন। (৮) সাধ্য বার জন। (৯) রুদ্র এগার জন। এঁরা সকলেই দেবতাদের নীচে এবং শিবের অনুচর। এঁদের নেতা গণেশ।

গণাধিপতি—দক্ষ যজ্ঞের পর শিব সন্তুষ্ট হয়ে দক্ষকে গণাধিপতি অর্থাৎ অনুচরদের অধিপতি করে দেন। অসুর অন্ধক মৃত্যুর আগে প্রার্থনা করলে শিব একেও গণাধিপতি করে দেন। মৎস্যপুরাণে (১৫৪ ২৩) বীরক একজন গণাধিপতি। গণাধিপতি অর্থে গণেশ্বর ও গণেশ বহুস্থানে ব্যাখ্যা আছে। এছাড়া গণেশ পার্বতীর ছেলে; একজন দেবতাও বটে এবং গণাধিপতিও বটে। মহাভারতে গণাধিপতি ৩৩ জন ঃ- নন্দীশ্বর, মহাকায়, গ্রামণী, বৃষভধ্বজ, গণেশ্বর বিনায়ক, সৌম্য, রৌদ্র, যোগভৃত, যোগীসমূহ, সরিৎ-সমূহ, আকাশ ও সুপর্ণ ইত্যাদি। কৃষ্ণ যজুর্বেদে অসংখ্যক গণাধিপতি। লিঙ্গপুরাণে (১০৫।৪৯) দেবতারা শিবের কাছে আসেন এবং ব্রহ্মা অসুরদের হাত থেকে নিরাপত্তা চান। তখন শিব গণাধিপতি/গণেশ্বর বপু ধারণ করেন। অর্থাৎ শিব নিজেও গণাধিপতি। সৌরপুরাণ গৌরীভর্তা শিবকেই গণাধিপতি গণেশ্বর বলা হয়েছে। দ্রঃ-গণেশ। রামায়ণ (৭।২৭ ৩৪-৪২) এবং মহাভারতে বন (৩৯।৭৯) শিবকে গণাধিপতি অর্থে গণেশ বলা হয়েছে। বামন পুরাণে (৫২।১৯) পার্বতীর বিয়ের সময় শিবকে গণাধিপতি না বলে গণেশ বলা হয়েছে। পুরাণকারদের এটি বৃথা প্রহেলিকা প্রিয়তা। হুবিষ্কের একটি মুদ্রাতে ধনুর্বাণ ধারী একটি মূর্তির নীচে গণেশ নাম ক্ষোদিত আছে। অর্থাৎ তখনও যেন শিবের পুত্র গণেশের সৃষ্টি হয় নি।

গণিকা—উত্তর (দ্রঃ) কৌরববাহিনী জয় করে ফিরছেন শুনে রাজা বিরাট রাজপথ সাজাতে নির্দেশ দেন এবং গণিকাদেরও পাঠান রাজপথ অলঙ্কৃত করতে। দ্রঃ-বেশ্যা।

গণিত্ত—এক জন বিশ্বদেব। সময় ইত্যাদির হিসাব করতেন।

গণেশ—হরপার্বতীর ছেলে। অপর নাম বা সংস্করণ গণপতি, বিনায়ক, মহাগণপতি,

বিরিগণপতি, শক্তিগণপতি, বিদ্যাগণপতি, হরিদ্রাগণপতি, উচ্ছিষ্টগণপতি. লক্ষ্মীবিনায়ক, হেরম্ব, বক্রতুণ্ড, একদন্ত, মহোদর, গজানন, লম্বোদর, বিকট, ও বিঘ্নরাজ; এবং দ্বৈমাতুর অর্থে দুটি জন্ম। মূর্তি অনুসারে ধ্যান ও পূজার প্রকার ভেদ আছে। গণেশের বাহন ইঁদুর ; এই ইঁদুর ধর্মের অবতার ; মহাবল ও পূজাসিদ্ধির অনুকূল। কিন্তু হেরম্বের বাহন সিংহ। নেপালে হেরম্ব মূর্তির বাহন অবশ্য ইঁদুর। হেরম্ব মূর্তিতে পাঁচটি মাথা মাঝখানের মাথাটি আকাশের দিকে ঊর্দ্ধমুখ। হেরম্ব অর্থে দীন পালক (ব্রহ্ম বৈ-পু)। গণেশের কোন কোন রূপভেদকে কেন্দ্র করে মারণাদি ষট্‌কর্ম অনুষ্ঠিত হয়। মহাগণপতি, শক্তিগণপতি, বিরিগণপতি এঁরা শক্তি যুক্ত ও আদিরসাশ্রিত। তন্ত্রসারে ৫-জন ঃ- গণপতি, মহাগণপতি, হেরম্ব, হরিদ্রা, গণেশ ও উচ্ছিষ্টগণেশ। মহাগণপতি ও তাঁর স্ত্রী উপস্থ নিয়ে খেলা করছেন। তন্ত্রসারে, কাশ্মীরে, নেপালে ও আফগানে গণেশ সিংহবাহন।

মহাগণপতি—গণপতিরই একটি বিশেষ রূপ। ইনি তান্ত্রিক গণেশ, সঙ্গে শক্তি রয়েছে ; পরস্পরে পরস্পরের উপস্থ হাতে করে স্পর্শ করে রয়েছেন। নৃত্যগণেশ সাধারণত আট হাত; নাচছেন; এক হাতে অস্ত্র নাই ; নাচের বিভিন্ন মুদ্রা দেখাচ্ছেন। প্রসন্ন গণেশ সাধারণ গণেশ জাতীয়। বিনায়ক গণেশ অগ্নিপুরাণে উল্লিখিত। বিনায়ক গণেশের আবার ৫-টি ভাগ ঃ- চিন্তামণি বিনায়ক, কপর্দী বিনায়ক. আশা বিনায়ক, গজবিনায়ক ও সিদ্ধি বিনায়ক। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে বিনায়ক একজন মাত্র ; এবং ইনি অম্বিকা পুত্র। বিরিগণেশ সারদা-তিলকে মহাগণপতি ধরণের অনুরূপ ভাবে শক্তির সঙ্গে মিলিত ; নরকপাল থেকে মদ্যপাম করছেন। শক্তিগণেশ আর এক মূর্তি। বৌদ্ধ গণেশ—বৌদ্ধ সাধন মালাতে, ১২-হাতে ; এক হাতে রক্তপূর্ণ কপাল ; অন্য হাতে শুষ্ক মাংস পূর্ণ কপাল। লক্ষ্মী গণেশ লক্ষ্মীকে (শ্রী নন) আলিঙ্গন করে আছেন। শ্রীগণেশ সারদা তিলকে; মহাগণপতি থেকে কিছুটা শোভন সংস্করণ। হরিদ্রা গণেশ তন্ত্রসারে। নারদ পঞ্চরাত্রে আছে ; পার্বতী হলুদ বেটে তৈরি করেছিলেন। হেরম্ব গণেশ-এঁর ধ্যানে ৫-মাথা ; হাতে বর, অভয়, মোদক, নিজদন্ত, টাঙ্গি, মুণ্ডমালা, মুদ্গর, অঙ্কুশ, ত্রিশূল। চৌরগণেশ প্রাণতোষিণী তন্ত্রে, ইনি সাধকের সাধনার ফল অপহরণ করেন। বিঘ্ন গণেশ বিঘ্ন ঘটান। গণাধিপতি ও গণেশ্বর কিন্তু গণেশ নন। গণপতির একটি মূর্তিতে শুঁড় বামদিকে, অন্য মূর্তিতে ডান দিকে। এঁর বিশাল ভুঁড়ির মধ্যে বিশ্ব অবস্থান করছে।

পুরাণে গণেশ বিঘ্ন নাশক অর্থাৎ সিদ্ধিদাতা; কিন্তু পূজা না করলে বিঘ্ন দাতা। মানব-গৃহ্য সূত্রে বিঘ্নের দেবতা। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতাতে প্রায় সব রকম বিঘ্নের তালিকা রয়েছে ; গণেশের রোষে ঘটতে পারে। বৌদ্ধগ্রন্থেও বিঘ্নরাজ ; সাধনমালাতে পর্ণশবরীর পদতলে বিঘ্নরূপী গণেশ রয়েছেন। পদ্মপুরাণে গণেশের স্তবে গণেশকে গণনায়কম্, যোদ্ধুকামং মহাবাহুম্ বলা হয়েছে। বৃহৎ-সংহিতাতে প্রতিমালক্ষণে প্রমথাধিপ বলা হয়েছে। পদ্ম ও বামন পুরাণে কার্তিকেয়ের আগে জন্ম। বৃহৎ-ধর্ম পুরাণে সরস্বতী গণেশকে লেখনী ও ব্রহ্মা জপমালা দিয়েছিলেন। প্রাচীন গণপতি মূর্তিতে লেখনী ও পুস্তক পাওয়া যায় না ; অর্থাৎ প্রথম দিকে, গণেশের কেবল যেন গণাধিপতই

ছিল। বাহন হিসাবে পৃথিবী মূষিক দিয়েছিলেন (বৃহৎধর্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত)। স্কন্দ-পুরাণে আছে পার্বতী মোদক পাত্র দিলে তস্য গন্ধেন মূষিকঃ নিষ্ক্রান্তঃ বিলাৎ এবং বাহন হল। তন্ত্রসারে এই মূষিককে বৃষরূপর্বঃ বৃষঃ ত্বং বলা হয়েছে। যজুর্বেদে এই আখু ছিল রুদ্রের প্রিয় পাত্র। মহানির্বাণ তন্ত্রে গণপতির হাতে মদ্য পূর্ণ কুম্ভ রয়েছে।

যাজ্ঞবল্ক্য (১।২৭১) বলেছেন রুদ্র ও ব্রহ্মা বিঘ্ন সৃষ্টির নিমিত্ত ও গণদের ওপর আধিপত্য করার জন্য বিনায়ককে সৃষ্টি করেছেন। গণেশ গীতাতে অহম্ এব জগৎ সর্বং মহাবিষ্ণুঃ সদাশিবঃ যে উক্তি আছে সেটি অন্ধভক্তদের কাছে ভোট সংগ্রহের বক্তৃতা। রাজা বরেণ্যকে বিশ্বরূপও দেখিয়েছিলেন।

যে কোন পূজার আগে গণেশ পূজনীয়; শুভকার্যে, ব্যবসায়ে নববর্ষে সিদ্ধি-দাতা হিসাবে এঁর পূজা করা হয়। গণেশ ভক্ত সম্প্রদায়ের নাম গাণপত্য। দুর্গা পূজার সময় এবং ভাদ্র ও মাঘ মাসে শুক্লা চতুর্থীতে গণেশের পূজার বিশেষ ব্যবস্থা হয়। ভাদ্র শুক্লা চতুর্থীকে গণেশচতুর্থী বলা হয়। এই দিন মহারাষ্ট্রে সাড়ম্বরে এই পূজা হয়। আনুমানিক খৃ ৫-শতকে গণেশের একক পূজার প্রচলন হয়; কিন্তু গাণপত্য সম্প্রদায় আরো দু-এক শতক পরে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। অর্থাৎ নবীন সম্প্রদায়। গাণপত্যদের ক্রমশ ছটি শাখা গড়ে ওঠে: মহা, হরিদ্রা, উচ্ছিষ্ট, নবনীত, স্বর্ণ, ও সন্তান-গাণপত্য। বর্তমানে গাণপত্য সম্প্রদায় লুপ্তপ্রায়। শঙ্করের জীবনীকার অনন্তগিরির কিছু আগে এই ছয়টি সম্প্রদায় চালু হয়েছিল। গণেশ গায়ত্রী-মহৎকায়ায় বিদ্মহে, বক্রতুণ্ডায় ধীমহি তন্নো দন্তী প্রচোদয়াৎ।

আদিম জাতির পূজিত হস্তিদেবতা ও লম্বোদর যক্ষ এই দুটি মিলে গণেশের জন্ম মনে হয়। বা হয়তো সম্পূর্ণ আদিবাসী দেবতা। ইঁদুরও আদিম জাতীয় কোন এক সংস্কারপ্রতীক। হস্তিমুণ্ড ও মূষিক বাহন ভিত্তিতে এই ধারণার জন্ম। বৌধায়ন ধর্মসূত্রে (খৃ-পূ ৮-৬ শতক) হস্তিমুণ্ড, বক্রতুণ্ড, একদন্ত, লম্বোদর ইত্যাদি রুদ্রের বিশেষণ। কালিদাস (খৃ ৪-শতক), ভারবি (খৃ ৬-শতক) এবং ভরতের নাট্যশাস্ত্রে গণেশ নাই। পঞ্চতন্ত্রে (খৃ ৫-শতক) নাই। ভাণ্ডারকরের মতে গুপ্ত শিলা-লেখে গণপতির উল্লেখ নাই। বৃহৎ-সংহিতাতে যেটুকু আছে সেটুকু মনে হয় পরবর্তী কালের যোজনা। গুপ্ত যুগের শেষ দিক থেকে যেন এঁর পূজা চালু হয়। মানবগৃহ্যসূত্র ও যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে শাল, কটঙ্কট, উষ্মিত, কুষ্মাণ্ড রাজপুত্র ও দেবযজন ইত্যাদিকেও বিনায়ক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মহাভারতে এরা বিনায়ক। বিনায়কদের কাজ নানা ভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি করা। এই সব বিনায়কগুলি মিলে যেন পরে গণপতি (দ্রঃ- গণাধিপতি) রূপগ্রহণ করেছে। এদের সন্তুষ্ট করলে তবে বিঘ্ন নাশ হয়। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে একজন বিনায়ককে অম্বিকাপুত্র বলা হয়েছে। অম্বিকাপুত্র হিসাবে এই প্রথম উল্লেখ। বহু পুরাণে গণেশ পার্বতীপুত্র, অপুংজনি জন্ম; আবার বহু স্থানে শিব-পার্বতীর পুত্র; আবার কিছু স্থানে স্বয়ম্ভূ। অর্থাৎ প্রাচীন আদিবাসী প্রকৃত-ভারতীয় গণেশকে দেবতার পদে তুলে আনার চেষ্টা। আবার ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে কৃষ্ণের অংশ। শিবকে মহাভারতে গণেশ্বর বলা হয়েছে। গণেশ অর্থাৎ গণপতি যেন এই গণদের মাধ্যমেই গণেশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। স্কন্দের গণ/পার্ষদগুলির নানা জীবজন্তু

ও পাখীর মুখ। ভূমারাতে (খৃ-৬ শতক) এই ধরণের বহু গণ রয়েছে দেখা যায়। ফলে গণ-ঈশকে হস্তিমুখ হতে হয়েছে। আবার কিছু মতে যক্ষ দেবতা ও নাগ দেবতা মিলে গণেশ। অমরাবতীতে হাতীর মাথা যুক্ত যক্ষ হয়েছে। যক্ষেরাও লম্বোদর। এ ছাড়া সর্প=নাগ হস্তী=নাগে পরিণত হয়ে গণেশ রূপ নিতে পারে। বেদে বৃহস্পতি= ব্রহ্মণস্পতিকে গণপতি বলা রয়েছে; ফলে গণেশ(=গণপতি) বৃহস্পতি হয়ে পড়েছেন যেন ; জ্ঞানের দেবতা হিসাবে সম্মান পেয়েছেন এবং ব্যাসের লিপিকার হয়ে মহাভারত লিখেছেন। এই লিপিকারিতা অংশটি নিশ্চয়ই মনে হয় প্রক্ষিপ্ত। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতাতে বিনায়ক ও গণপতি পূজার বিবরণ আছে। মালতী মাধবে (খৃ-৭ শতক) গণেশ আছেন।

রাজস্থানে ঘটিয়ল স্তম্ভে চারটি গণেশ চারদিকে মুখ করে অবস্থিত ; এখানে শিলা লেখে রয়েছে ব্যবসায়ে সফল হয়ে করুক এই স্তম্ভ স্থাপিত করেছেন।

পুণাতে ছিঞ্চবাড়ের গণেশ মন্দির প্রসিদ্ধ। কপিলাশ রোড স্টেসনের অদূরে গণেশক্ষেত্র নামে মহাবিনায়ক পর্বত একটি তীর্থক্ষেত্র। সিংহলে (খৃ-পূ ১ —খৃ-১ শতক) মিহিনটালে প্রাপ্ত শিলাফলকে গুড়ি মারা অবস্থায় গজমুণ্ড ও রদ-বিশিষ্ট মূর্তিকে গণপতির প্রাচীন-তম শিল্পরূপ ধরা হয়। উত্তর প্রদেশে ফররুখবাদ জেলায় প্রাপ্ত আনুমানিক ৪ শতকের একটি দ্বিভুজ গণেশ শিলামূর্তি পাওয়া গেছে ; দেবতার বাঁ হাতে সম্ভবত মোদক ভাণ্ড ; শুঁড় দিয়ে মোদক খাচ্ছেন। খৃ- ৫-শতকে উদয়গিরির (মধ্য-প্রদেশে) গুহাগারে; ভূমারা (ম-প্রদেশ) ও ভিতরগাঁও (উ-প্রদেশে; খৃ ৫-শতক মত) মন্দিরে প্রাপ্ত পোড়া মাটির ফলকেও গণেশ শুঁড় দিয়ে মোদক খাচ্ছেন। উদয়গিরির মূর্তি ঊর্দ্ধলিঙ্গ বলে মনে হয়। এই সব মূর্তির সাধারণত তিনটি ভাগঃ-বসা (সব চেয়ে বেশি), দাঁড়ান ও নৃত্যরত। নৃত্যরত মূর্তি গুলিতে বাহনের ওপর দেবতা নাচছেন। গজমুণ্ড, তিন চোখ, বেঁটে দেহ, মস্ত ভুঁড়ি, হাত চার, ছয়, আট বা দশ। দ্বিভুজ মূর্তি কম। বৌদ্ধ ও জৈনরাও এঁকে পূজা করেছেন। ভারতের বাইরেও গণেশকে পাওয়া যায়। মিসনে (আন্নাম) প্রাপ্ত মূর্তি দ্বিভুজ, দাঁড়িয়ে মোদক খাচ্ছেন। যেন একজন সুখী স্বচ্ছল ভদ্রলোক। হাতে মোদক ভাণ্ড ছাড়াও পরশু, অক্ষমালা, মূলকদন্ত, অঙ্কুশ, পাশ, দণ্ড, শূল, সর্প, ধনু ও শর ইত্যাদি দেখা যায়। বর্তমানে হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম থাকে। জাভাতে বাড়া নামক স্থানে আবিষ্কৃত মূর্তিটি নরকপাল যুক্ত আসনে বসা ; মাথায় জটাতেও নরকপাল। এটি ১১-শতকের মূর্তি এবং তান্ত্রিকতার প্রভাব সুস্পষ্ট।

প্রথম দিকের গণেশ মূর্তিগুলি দাঁড়ান বা বসা এবং দ্বিভুজ। হাতে পরশু ও মূলক। হাতীর মাথা, একদন্ত ও লম্বোদর। আবার কিছু মূর্তিতে চার হাত। বৃহৎসংহিতাতে দু হাত ; এই মূলক হাতীর ভোজ্য এখানে বলা আছে। অমরকোষে একদন্ত। অংশুমৎভেদাগম, কালিকাগম এবং বিষ্ণুধর্মোত্তর ইত্যাদিতে চার হাত ; নিজের দাঁত, কপিত্থ মোদক, অঙ্কুশ, পাশ, নাগ, অক্ষসূত্র ও পদ্ম ইত্যাদি হাতে দেখা যায়। পরবর্তী কালের এই সব গ্রন্থের সংস্করণে গণেশের বাহক মূষিক এবং স্ত্রী ভারতী (সরস্বতীর অপর নাম), শ্রী, বিঘ্নেশ্বরী, বুদ্ধি ও কুবুদ্ধি। এই সব শাস্ত্রে আরো আছে গণেশ ত্রিনেত্র, মূর্তি আভঙ্গ বা সমভঙ্গ, পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম এবং সর্পের যজ্ঞোপবীত।

বিগ্রহ হিসাবে নানা ধরণের মূর্তি দেখা যায়। এই সব মূর্তি কিন্তু গুপ্তোত্তর মধ্যযুগেও চালু হয় নি। মথুরাতে প্রাপ্ত বেলেমাটির গণপতি এবং ভিতরগাঁওতে ইটের তৈরি মন্দিরে প্রাপ্ত পোড়া মাটির ফলকটিতে (দুটিই গুপ্ত যুগের প্রথম দিকের) দেখা যায় গণপতির মূর্তি ক্রমশ বিবর্তনে গড়ে উঠতে চলেছে। ভূমারা শিবমন্দিরে (খৃ-৬শতক মত) বিবর্তন শেষ হয়ে গেছে। প্রথম দিকে নগ্ন দণ্ডায়মান বিগ্রহগুলিতে দেবতা বলে মনেই হয় না; ভিতরগাঁও ফলকে ঠিক দেবতা নয় যেন; উড়ে যাচ্ছেন দেখান হয়েছে। উদয়গিরিতে (ভিলসা) চন্দ্রগুপ্ত গুহাতে আর একটি প্রথম গুপ্ত যুগের উৎকীর্ণ চিত্র রয়েছে; অর্দ্ধ পর্যঙ্ক আসনে বসা, বাম হাতে মোদক ভাণ্ড; কিন্তু সঙ্গে ইঁদুর নাই। মথুরাতেও ইঁদুর নাই।

বসামূর্তি প্রথম ও শেষ মধ্যযুগে সারা ভারতে ছড়িয়ে ছিল। ইন্দোনেসিয়াতেও বসামূর্তি। জাভাতে চার হাত। খিচিঙে দাঁড়ান মূর্তিটি অত্যন্ত সুন্দর, মধ্যযুগের প্রথম দিকের এই মূর্তি, চার হাত, আভঙ্গ দেহ; হাতে অক্ষসূত্র, নিজের বিষাণ, মোদক ভাণ্ড, বাকি হাতটিতে কি ছিল অস্পষ্ট; তির্যক চোখে চতুর ইসারা এবং সর্প যজ্ঞোপবীত। বাহন ইঁদুর রয়েছে। উড়িষ্যাতে এই অঞ্চলে আর একটি নৃত্যগণেশ পাওয়া গেছে; আট হাত; সামনের দক্ষিণ হস্ত গজহস্ত, নৃত্যের আবর্ত স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। বিভিন্ন যুগের মধ্য দিয়ে গণপতির বিবর্তন স্পষ্ট এবং কৌতূহল দীপক।

শক্তিপূজা ও তান্ত্রিকতার প্রভাব এক সময় গণেশ পূজার মধ্যে বিশেষ ভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। তান্ত্রিক গণেশ মূর্তিতে সঙ্গে শক্তি আছেন; যেমন শক্তিগণেশ, লক্ষ্মীগণেশ, উচ্ছিষ্টগণেশ ইত্যাদি। লক্ষ্মীগণেশের লক্ষ্মী অর্থের দেবী নন। দক্ষিণ ভারতে উচ্ছিষ্ট গণেশের কিছু মূর্তি পাওয়া গেছে। এদের পূজা বামাচারে। জব্বলপুরের কাছে গজমুণ্ড বিশিষ্ট একটি নারীমূর্তি পাওয়া গেছে; মনে হয় এটি গণেশের স্ত্রী গণেশানী।

পৌরাণিক কাহিনীঃ- হিমালয়ের কন্যা পার্বতীর সঙ্গে শিবের বিয়ে হয়। কিন্তু বহু বৎসর সন্তান না হওয়ায় বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করবার জন্য পুত্রক ব্রত করেন। এক বছর ব্রত করলে বিষ্ণু বর দেন এবং যথা সময়ে একটি শিশু হয়। শিশুকে সব দেবতারা ও শনিও দেখতে আসেন। শনির স্ত্রীর অভিশাপ ছিল শনি যে দিকে চাইবেন সব পুড়ে যাবে; এই জন্য শনি এসেও শিশুকে দেখছিলেন না। পার্বতী অনুযোগ করলে শনি (দ্রঃ) কি কারণ জানান। কিন্তু পার্বতী তবু পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। ফলে চেয়ে দেখার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মাথা খসে যায়। খবর পেয়ে বিষ্ণু ছুটে আসেন এবং পথে একটি ঘুমন্ত হাতীর মাথা সুদর্শনে কেটে এনে শিশুর দেহে জুড়ে দেন এবং নিয়ম করে দেন এই মাথার জন্য গণেশ কোন দিন অনাদৃত হবেন না এবং সব কাজে আগে এঁর পূজা হবে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত মতে মালী ও সুমালী নামে দুই শিবভক্ত সূর্যকে ত্রিশূল দিয়ে আঘাত করেন। সূর্য এতে অচৈতন্য হয়ে যান এবং সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার হয়ে পড়ে। সূর্যের পিতা কশ্যপ ছেলের অবস্থা দেখে মহাদেবকে শাপ দেন তাঁর ছেলের মাথাও খসে যাবে। এই জন্য গণেশের মাথা যায়

এবং ইন্দ্রের ঐরাবতের মাথা এনে লাগিয়ে দেওয়া হয়। অন্য মতে হরপার্বতী বানর রূপে বনে বিহার করার সময় হনুমান (দ্রঃ-কেশরী) জন্মান। এর পর ঐরাবত বেশে বনে বিহার করার সময় (পদ্মপুরাণ) গণেশ জন্মান। আর এক মতে পার্বতী এক বার এক বস্ত্রে স্নান করতে যান। স্নান ঘরে সেই সময় শিব প্রবেশ করতে যাচ্ছিলেন গণেশ বাধা দেন ; শিব রেগে গিয়ে গণেশের মাথা কেটে ফেলেন ; পরে শান্ত হয়ে হাতীর মাথা জুড়ে দেন। স্কন্দপুরাণে গণেশ খণ্ডে সিন্দূর নামে এক দৈত্য পার্বতীর গর্ভে আটমাসে প্রবেশ করে গণেশের মাথা কেটে দেন। শিশু মারা যায় না; এবং জন্মাবার পর নারদ এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে গণেশ ঘটনাটি জানান। নারদ তখন বালককে একটা কিছু ব্যবস্থা করতে বলেন। বালক নিজের তেজে গজাসুরের মাথা কেটে এনে নিজের দেহে লাগিয়ে নেন। ব্রহ্মবৈবর্তে আছে পরশুরাম একুশবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করে মহাদেবের সঙ্গে দেখা করতে এলে দ্বাররক্ষক গণেশ বাধা দেন। ফলে ভীষণ যুদ্ধ হয় এবং পরশুরাম কুঠারের আঘাতে গণেশের একটি দাঁত সমূলে উৎপাটিত করেন। শিব পুরাণে রুদ্র সংহিতাতে আছে পার্বতীর গাত্র মল থেকে গণেশের জন্ম। আর এক মতে পার্বতীর গাত্রমল থেকে তৈরি একটি পুতুলে, পার্বতীকে খুসি করার জন্য, মহাদেব একটি গজমুণ্ড জুড়ে দেন ; এবং মহাদেবের করুণায় এই পুতুল জীবন্ত হয়ে পার্বতীকে প্রদক্ষিণ ও পাদবন্দনা করে নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধির পরিচয় দেন। লিঙ্গপুরাণে (১০৫।৪৯) দেবতারা শিবের কাছে আসেন এবং অসুরদের হাত থেকে ব্রহ্মা নিরাপত্তা চান। শিব তখন নিজের দেহ থেকে গণেশের জন্ম দেন। এই শিশু গজানন, বা গণেশ অর্থাৎ সাধারণে পূজিত শিবপুত্র গণেশ এবং একজন গণাধিপতিও (দ্রঃ)। বরাহপুরাণে (২।১৬।১৮) দেবতারা ও ঋষিরা বিঘ্ন প্রশমনের জন্য রুদ্রের কাছে একজন নতুন দেবতা চান। তখন হাস্যময়ী শিবের সামনে আকাশে শিবের গণযুক্ত একটি কুমার ফুটে উঠল বা জন্ম নিল। এই শিশুর রূপে দেবতারা ও উমাও মুগ্ধ হয়ে গেলেন। কিন্তু শিব রেগে উঠলেন এবং শাপ দিলেন এর গজমুখ ও লম্বোদর ও সর্প উপবীত হবে। এই রেগে উঠার সময় শিবের পা থেকে ঘাম দিতে থাকে এবং এই ঘাম থেকে অসংখ্য গজমুখ বিনায়ক গণ(=অনুচর) জন্ম লাভ করে ; এবং এই কুমার এদের গণাধিপত্য পান। এখানে কুমার গণেশ এবং বিনায়করা বিঘ্নকর ও গজাস্য বলে উল্লিখিত (২১।২৮)। মহাদেব এদের বর দেন দেবতাদের যজ্ঞে ও অন্যান্য কাজে আগে পূজা পাবেন। শিবপুরাণে (৩২।১৬।১৮) আছে পার্বতী তার সখী জয়া ও বিজয়ার সঙ্গে একদিন পরামর্শ করেন তাঁর এক জন আজ্ঞাপালক অনুচর থাকা দরকার। এরপর পার্বতী একদিন নন্দীকে দ্বারী রেখে স্নান করছিলেন শিব নন্দীকে ভর্ৎসনা করে সরিয়ে দিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হন। পার্বতী বিরত হয়ে পড়েন এবং ঠিক করেন তাঁর আজ্ঞা পালনকারী একজন অনুচর একান্ত দরকার এবং জল থেকে পাঁক তুলে একটি সুন্দর পুত্র তৈরি করেন। এরপর একদিন এই কুমার দরজায় পাহারা ছিল পার্বতী স্নান করছিলেন ; শিব সেখানে আসেন। কুমার বাধা দেন। প্রথমে প্রমথদের সঙ্গে বিবাদ হয় এবং পার্বতীর ইঙ্গিতে যুদ্ধ হয়।

প্রমথগণ, শিব ও দেবতারা সকলে হেরে যান। তখন নারদের পরামর্শে বিষ্ণু কুমারকে মোহাচ্ছন্ন করলেন এবং শিব শূলের আঘাতে কুমারের মাথা ছিন্ন করলেন। পার্বতী তখন রাগে সৃষ্টি নষ্ট করতে যান। নারদ ও দেবতারা থামান। পার্বতী চান কুমার জীবিত হক ও সকলের পূজ্য হক। গণেশের মুণ্ড তখন আর পাওয়া গেল না। শিব প্রমথদের উত্তরদিকে পাঠান এবং বলেন প্রথমে যাকে পাবে তারই মাথা যেন নিয়ে আসে। ফলে একদন্ত হস্তিমুণ্ড আসে এবং দেবতারা এই গজমুণ্ড দিয়ে কুমারকে বাঁচিয়ে তোলেন। শিব একে নিজের পুত্র বলে স্বীকার করে নেন (শিব পু ৩৪।৫০)।

স্কন্দপুরাণে অর্বুদখণ্ডে আগে পার্বতী খেলার ছলে গাত্র মল দিয়ে একটি পুতুল তৈরি করেন। কেবল দেহটি তৈরি হয়। পার্বতী তারপর স্কন্দকে বললেন এই পুতুলের মাথা তৈরির জন্য কাদা আনতে ; এই পুতুল তার ভাই হবে। স্কন্দ কাদা না পেয়ে একটি হাতীর মাথা কেটে নিয়ে আসেন। পার্বতী বার বার আপত্তি করলেও দৈব যোগে এই মাথাই দেহে যুক্ত হয় ; পুতুলের দেহে বিশেষ নায়ক ভাব ফুটে ওঠে এবং পার্বতী শক্তিস্বরূপিণী ; স্বশক্ত্যা একে জীবন দান করেন। পার্বতীর অনুরোধে মহাদেব বর দেন দেহে এই নায়কত্ব ফুঠে ওঠার জন্য মহাবিনায়ক নামে পরিচিত হবে, গণাধিপতি হবে এবং সব কাজে আগে এর পূজা না করলে সিদ্ধি লাভ হবে না। তখন স্কন্দ একে কুঠার দিলেন, পার্বতী মোদকপূর্ণ সুন্দরগন্ধ ভোজন পাত্র দিলেন। মোদকের গন্ধে মূষিক এসে বাহন হল। স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে পার্বতী নিজের গাত্রমল থেকে একটি সুন্দর ও সম্পূর্ণ পুতুল তৈরি করে তাকে জীবিত করে নেন। এখানেও স্নানাগারে পাহারা এবং শিব একা আসেন, যুদ্ধ হয় এবং ত্রিশূলে করে শিব এর মাথা ছিন্ন করেন (১২।১৮)। শিব তারপর গজাসুরকে সামনে পেয়ে এর মাথা কেটে জুড়ে দেন। বৃহৎ-ধর্ম পুরাণে পার্বতী পুত্র কামনায় শিবের সঙ্গে বিবাদ করেন। পুত্রলাভে শিবের অনিচ্ছা। শেষ পর্যন্ত পার্বতীর বস্ত্র টেনে ধরে শিব বলেন এই তাঁর পুত্র এবং একে চুম্বন করতে বলেন (৩০।২৪)। পার্বতী বস্ত্রটিকে পুত্রের আকার দিয়ে কোলে নিলেন, এটি জীবিত হয়ে উঠল। শিব তারপর এই ছেলেকে হাতে নিয়ে বললেন এর স্বল্পায়ু। উত্তর দিকে মাথা করে শায়িত এই শিশুর মস্তকও এই সময়ে ছিন্ন হয়ে যায়। পার্বতী শোকাকুল হয়ে পড়েন। আকাশবাণী হয় এই মাথায় শিশু বাঁচবে না ; এবং উত্তর-শীর্ষে শুয়ে আছে এই রকম কারো মাথা এনে জুড়ে দেওয়া হক। দেবী নন্দীকে পাঠান এবং নন্দী ঐরাবতের মাথা কেটে নিয়ে আসেন। দেবতারা বাধা দিয়েও আটকাতে পারেন নি। শিব মাথা দিয়ে পুত্রকে জীবিত করে দেন। শিবের বরে ইন্দ্র ঐরাবতকে সমুদ্র জলে ফেলে দিলে ঐরাবতের আবার মাথা হয়। দেবীপুরাণে আছে মহাদেবের রাজস-ভাব দেখা দেয় এবং দু হাত ঘামলে গজানন জন্মগ্রহণ করেন। মৎস্যপুরাণে আছে পার্বতী চূর্ণক (বেসম) মত দিয়ে নিজের গা পরিষ্কার করছিলেন এবং এই চূর্ণক দিয়ে একটি গজানন পুতুল তৈরি করে গঙ্গাজলে ফেলে দেন। পুতুলটি বিরাট আকার ধারণ করে পৃথিবী পূর্ণ করতে উদ্যত হয়। পার্বতী ও গঙ্গা একে পুত্র বলে সম্বোধন করেন এবং ব্রহ্মা একে গণাধিপতি করে দেন। বামন

পুরাণেও গৌরী স্নানের সময় নিজের গায়ের ময়লা নিয়ে চতুর্ভুজ গজানন মূর্তি তৈরি করেন। মহাদেব একে পুত্র রূপে গ্রহণ করলেন এবং বলেন যেহেতু ময়া নায়কেন (=পিতা) বিনা জাতঃ পুত্রকঃ সেই হেতু বিনায়ক বলে প্রসিদ্ধ হবে এবং বিঘ্ন নাশ করবে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আছে পার্বতী কৃষ্ণের শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারী মূর্তি দেখে অনুরূপ পুত্র কামনা করেন। কৃষ্ণ বর দেন। এরপর পার্বতী স্বগৃহে ক্রীড়া রত ছিলেন, কৃষ্ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশে ভিক্ষা চাইতে আসেন। শিব বীর্য পতিত হয়। কৃষ্ণ শিশু রূপে পালঙ্কে আবির্ভূত হন এবং বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অন্তর্হিত হয়ে যান। পার্বতী শতচন্দ্রসমপ্রভম্ শিশুকে বিছানায় দেখতে পেলেন। এরপর দেবতা ও ঋষিরা এবং শনিও শিশুকে দেখতে আসেন। শনি নিজের কুদৃষ্টির কথা বলেন কিন্তু পার্বতী তবু পীড়াপীড়ি করেন। শনি অনিচ্ছায় ভয়ে ভয়ে বাম চোখের কোণ দিয়ে পার্বতীর কোলে শিশুর দিকে দেখতেই শিশুর মাথা ছিন্ন হয়ে গোলকে কৃষ্ণের দেহে গিয়ে মিশে গেল। পার্বতী মূর্চ্ছিত হয়ে যান ইত্যাদি। বিষ্ণু এদিকে গরুড়ে চড়ে পুষ্পভদ্রা নদীর তীরে এসে উত্তর দিকে মাথা করে শুয়ে থাকা এক হাতীকে দেখেন ; সঙ্গে হস্তিনী ও বাচ্ছারাও ছিল। বিষ্ণু এর মাথা কেটে নিলে হস্তিনী ও বাচ্ছারা কাঁদতে থাকে ও স্তব করে। বিষ্ণু তখন এই মুণ্ড থেকে আর একটি মুণ্ড তৈরি করে হাতীর দেহে লাগিয়ে দেন এবং মূল মাথাটি এনে গণেশের দেহে জুড়ে দেন (ব্রহ্ম-বৈ ১২।২০)। শিবের অনুগ্রহে গণেশ সমস্ত দেবতাদের আগে পূজা পাবার অধিকারী। পার্বতী ও মহাদেবের বরে ইনি গণদের অধিপতি; বিঘ্ননাশক ও সর্বসিদ্ধি দাতা। কার্তিকেয়কে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করতে গিয়ে ইন্দ্রের হাত স্তম্ভিত হয়ে যায়। ইন্দ্র শিবকে কি ব্যাপার জানতে চান। শিব বলেন আগে গণেশকে পূজা না করার জন্য হয়েছে। গণেশের স্ত্রী সিদ্ধি ও বুদ্ধি। (দে-ভাগ ৯।১) স্ত্রী পুষ্টি। অন্য মতে তুলসী গণেশকে বিয়ে করতে চান। গণেশ সর্বদা তপস্যায় মগ্ন থাকতেন ; তুলসীর এই বিকল্প চিন্ততায় শাপ দেন দানব পত্নী হতে হবে। তুলসীও শাপ দেন। ফলে পুষ্টি নামে একটি মেয়েকে গণেশ বিয়ে করতে বাধ্য হন। একটি কাহিনীতে আছে কার্তিক ও গণেশের বিয়ের বয়স হলে শিবপার্বতী এদের দু জনকে পরীক্ষা করতে চান। শিব পুরাণে আছে দুই ভাই বিয়ের জন্য পীড়াপীড়ি করেছিলেন। ঠিক হয় পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে কে আগে ফিরতে পারে। কার্তিক তখনই ময়ূর চড়ে বার হয়ে পড়েন ; এবং গণেশ ধীরে সুস্থে শিবপার্বতীকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে নিয়ে বলেন শাস্ত্রমতে তাঁর শতবার পৃথিবী পরিক্রমা হয়ে গেল। কার্তিক তখনও ফিরে আসেন নি। গণেশ জয়ী হবার জন্য আগে গণেশের বিয়ে হয়। শিব পুরাণে আছে প্রদক্ষিণ করার পর বিশ্বরূপের দুই মেয়ে সিদ্ধি ও বুদ্ধির সঙ্গে বিয়ে হয়। সিদ্ধির ছেলে হয় লক্ষ্য এবং বুদ্ধির ছেলে লাভ। কার্তিক নারদের মুখে বিয়ের খবর শুনে ফিরে আসেন এবং মনের দুঃখে ক্রৌঞ্চ পর্বতে গিয়ে বাস করতে থাকেন।

তন্ত্রে গণেশের দুই স্ত্রী লক্ষ্মী ও সরস্বতী। আবার তীব্রা, জ্বালিনী, নন্দা, সুভোগদা, কামরূপিণী, উগ্রা, তেজোবতী, সত্যা ও বিঘ্ননাশিনী নামে ৯-জন শক্তিরও নাম আছে।

গণেশ মহাপণ্ডিতও। কৌরব ও পাণ্ডবদের মৃত্যুর পর ব্যাস ধ্যান করতে থাকেন। মহাভারতের সমস্ত কাহিনী তাঁর মনের মধ্যে ফুটে ওঠে। মহাভারত লেখার জন্য ব্যাস লিপিকার খুঁজতে খুঁজতে ব্রহ্মার কাছে যান এবং ব্রহ্মা গণেশের কাছে যেতে বলেন। গণেশ সর্ত করেন লিখতে লিখতে তিনি থামবেন না ; এবং থামলে আর লিখবেন না। ব্যাসদেবও সর্ত করেন কোন শ্লোক লেখার আগে অর্থ বুঝে তবে লিখতে হবে (মহা ১।১।৭৫)। এতে ব্যাসদেবের সুবিধা হয়। প্রয়োজন মত কঠিন শ্লোক তৈরি করে গণেশকে দেরি করিয়ে দিয়ে নিজে ইতি মধ্যে প্রস্তুত হয়ে নিতেন। তিন বছরে এই বই লেখা হয়। দ্রঃ- কাবেরী, গণেশচতুর্থী।

গণেশ—কালপুরুষ (দ্রঃ) নক্ষত্রের অন্তর্গত নক্ষত্র।

গণেশচতুর্থী—শুক্লা চতুর্থী ; সিংহ মাসে। গণেশের জন্ম দিন। গণেশ অত্যন্ত মোদক প্রিয়। একবার তাঁর জন্ম তিথিতে প্রতি বাড়িতে মোদক খেয়ে ভরা পেটে মূষিক বাহনে ফিরছিলেন। পথে একটি সাপের সামনে এসে পড়লে মূষিক ভয়ে কাঁপতে থাকে। গণেশ মাটিতে পড়ে যান এবং পেট ফেটে সব মোদক বার হয়ে পড়ে। গণেশ তখন সেই সব মোদক কুড়িয়ে নিয়ে পেটের মধ্যে ভরে পেটের চামড়া ঠিক মত চাপা দিয়ে সাপটি পেটে জড়িয়ে বেঁধে নেন। চন্দ্র এই দেখে আকাশে হেসে ফেলেন এবং গণপতি শাপ দেন এই চতুর্থীর দিনে কেউ যেন চাঁদ না দেখেন। গণেশ পুরাণে আছে মহাদেব এই দিন গণেশকে লুকিয়ে কার্তিককে একটি ফল দেন। ফলে চন্দ্র হেসেছিলেন ও অভিশপ্ত হয়েছিলেন ইত্যাদি। দ্রঃ- মুদ্রা।

গণ্ডক—পুরাণে নাম সদানীরা। নারায়ণী, শালী, ত্রিশূলগঙ্গা, গল্লিকা। নেপালে নাম শালগ্রামী। নেপালে পার্বত্য উপত্যকাতে জন্ম। ধোলগিরি ও গোঁসাইথান পর্বতশ্রেণীর মধ্যবর্তী নেপাল রাজ্যের পার্বত্য উপত্যকা দিয়ে প্রবাহিত কয়েকটি ছোট ছোট ধারার মিলিত প্রবাহ। হিমালয়ে সপ্তগণ্ডকী বা ধবল গিরি পর্বত থেকে উৎপন্ন। মধ্য তিব্বতের দ-সীমা। দ্রঃ- মুক্তিনাথ। সমতলে ত্রিবেণী ঘাটে এসে পৌঁচেছে। দ্রঃ- সপ্তগণ্ডকী। এই উৎসে বিষ্ণু তপস্যা করেছিলেন ; গণ্ড থেকে ঘাম ঝরে পড়ে এই নদী (বরাহ)। বিহারে মজফরপুর জেলাতে শোণপুরে গঙ্গাতে এসে মিশেছে। এখানে গজেন্দ্রমোক্ষ মেলা হয়। ছোট গণ্ডক = হিরণ্যবতী (দ্রঃ)। সমস্ত তীর্থ সলিল মিলে এই গণ্ডক/গণ্ডকীর জল। সমুদ্র মন্থনের পর মোহিনী মূর্তিকে দেখে মুগ্ধ হয়ে মহাদেব আলিঙ্গন করেন। এই আলিঙ্গনে উৎপন্ন ঘর্ম এই নদীতে পরিণত।

গণ্ডূষ—দ্রঃ- শূরসেন। বিশ্বকসেন নিজের চার ছেলে চারুদেষ্ণ, সুচারু, পঞ্চাল ও কৃতলক্ষণকে দত্তক হিসাবে গণ্ডূষের হাতে দেন (হরি ১।৩৪।৩৫)।

গদ—যদু বংশীয় বীর। কৃষ্ণের ছোট ভাই। রোহিণীর ছেলে। সুভদ্রার বিয়েতে যৌতুক নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে এসেছিলেন। শাল্বের আক্রমণ থেকে দ্বারকা রক্ষার সময় যুদ্ধ করেছিলেন। যদুবংশ ধ্বংসের সময় সকলে যখন নিজেদের মধ্যে মারামারি করছিলেন তখন গদ প্রহৃত হতে থাকলে কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। (২) কশ্যপের ছেলে ; একটি অসুর। দ্রঃ- গদাধর।

গদাধর—গদ (দ্রঃ) অসুর বিষ্ণুর হাতে নিহত হলে বিশ্বকর্মা অসুরের অস্থিতে একটি আদি গদা তৈরি করে দেন। এই গদাতে বিষ্ণু হেতি ইত্যাদি রাক্ষসকে বিনাশ করেন। তাই নাম গদাধর। বামন পুরাণে হিমালয়ে কালঞ্জর পাহাড়ের উত্তরে গয়া নামক স্থানে জনৈক রাজা গয় অশ্বমেধ, নরমেধ ও মহামেধ যজ্ঞ করেন। বিষ্ণু এই সময় দরজাতে গদা হাতে পাহারা দিয়েছিলেন ফলে নাম গদাধর।

গন্ধবতী—(১) সত্যবতী (দ্রঃ)। (২) বায়ুর বাসস্থান। দ্রঃ- মেরু।

গন্ধবতী—শিপ্রা নদীর একটি ছোট শাখা ; এর তীরে উজ্জয়িনীতে মহাকাল মন্দির ছিল।

গন্ধমাদন—(১) রুদ্র হিমালয়ের উত্তরে, পুরাণে কৈলাসের। অবশ্য সবটাই বল্গাহীন কল্পনা মাত্র। গন্ধমাদনে বদরিকাশ্রম। গাড়োয়াল পাহাড়ের যে অংশে অলকানন্দা প্রবাহিত এই অংশটিও গন্ধমাদন। বিক্রোমোর্বশীতে মন্দাকিনী গন্ধমাদনে প্রবাহিত। হিমালয়ে স্বর্ণময় ঋষভ পর্বত ও কৈলাস পর্বতের মাঝখানে দীপ্তিমান ভেষজ পর্বত। হিমালয়ের উত্তরে (মহা ৩।৩৮।১৯)। ইলাবৃতবর্ষ ও ভদ্রাশ্ববর্ষের সীমানাতে ; নীল ও নিষধ পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানে বিশল্যকরণী, সুবর্ণকরণী, অস্থি-সঞ্চারিণী ও মৃতসঞ্জীবনী এই চার প্রকার ভেষজ গাছ পাওয়া যেত। লঙ্কার যুদ্ধের সময় হনুমানকে দু বার এখান থেকে ভেষজ গাছ আনতে হয়। প্রথম বার এই গাছের গন্ধে রামলক্ষ্মণ শল্যমুক্ত হন। দ্বিতীয়বার শক্তিশেলে লক্ষ্মণ মৃতপ্রায় হলে হনুমান গাছ চিনতে না পেরে পাহাড়ের চূড়াটি তুলে নিয়ে আসেন। ভেষজ গাছের গন্ধে সকলে মত্ত হয়ে পড়ত বলে নাম গন্ধমাদন। মহাভারতে আছে এই পাহাড়ে কদলীবনে হনুমান (মহা ৩।১৪৭।৬০) বাস করতেন। (২) দ-ভারতে রামেশ্বরের কাছে একটি পাহাড় ; মূল গন্ধমাদনের অংশ ; হনুমান এনেছিলেন প্রবাদ। (৩) ভগবতীর একটি পীঠস্থান। এখানে ভগবতীর নাম কামুকী (দেবী ভাগবত)। লঙ্কা থেকে বিতাড়িত হয়ে কুবের এখানে আশ্রয় নেন। কশ্যপ এখানে তপস্যা করেছিলেন। (৪) কুবেরের এক ছেলে। (৫) কুবের সভায় এক রাক্ষস। (৬) রামের এক সেনাপতি।

গন্ধর্ব—আদি গন্ধর্ব। প্রথম নর নারী যম ও যমীর (দ্রঃ) পিতা (ঋক্ ১০।১০।৪)। শতপথে আছে গন্ধর্বরা বাচের কাছে বেদ ব্যক্ত করেন। পরবর্তী সাহিত্যে গন্ধর্বরা দেবযোনি ও স্বর্গীয় গায়ক। সঙ্গীত শাস্ত্রের অপর নাম গন্ধর্ববেদ; সামবেদের উপবেদ। গন্ধর্বদের অমঙ্গল সাধনের ক্ষমতাও আছে গন্ধর্ববেদে বলা হয়েছে। এদের বাসস্থান গুহ্যলোকের ওপরে ও বিদ্যাধর লোকের নীচে (স্কন্দ)। এঁরা অত্যন্ত রূপবান। বৈদিক যুগে এঁরা স্বর্গের উপদেবতা। পরে সংখ্যায় বাড়লে নিম্ন শ্রেণীতে নেমে যান। এঁরা গাছ গাছড়া সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ও দেবতাদের বিশ্বস্ত অনুচর। গন্ধর্বরা সোমরস তৈরি করে রক্ষা করতেন। সোমরস সর্বরোগ হর বলে এঁদের স্বর্গবৈদ্যও বলা হয়েছে। এঁরা সূর্যের (দ্রঃ) রথ চালাতেন এবং অগ্নি ও বরুণের দাস ছিলেন। সুগায়ক ও বাদক হিসাবে দেবতাদের উৎসবে এঁরা যোগ দিতেন। পৌরাণিক আধা দেবতা। বহু ধর্মগ্রন্থে ও শিল্পে

উল্লেখ আছে। অথর্ব বেদে (৮।১০) তিনজন নাম করা গন্ধর্ব চিত্ররথ, বসুরুচি ও সূর্যবর্চস্। পৌরাণিক যুগে চিত্ররথ গন্ধর্বরাজ (রামায়ণ ও মহাভারতে)। গন্ধর্বরা যেন অন্তরীক্ষে থাকেন।

এ'দের মধ্যে নরনারীর অবাধ মেলামেশা ও নারীদের প্রতি বিশেষ আসক্তি ছিল। পুরাণে এ'দের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা কাহিনী আছে। অরিষ্টা ও কশ্যপের সন্তান বলা হয়েছে। বেদের পরবর্তী যুগে অপ্সরারা এ'দের স্ত্রী বা সঙ্গিনী রূপে উল্লিখিত। ইন্দ্র সভায় এ'রা অপ্সরাদের সঙ্গে গায়ক হিসাবে যোগ দিতেন। অন্তরীক্ষে স্বচ্ছন্দচারী। সুন্দরী মেয়েছেলে দেখলে কখনো কখনো পৃথিবীতে নেমে আসতেন। এ'দের বিবাহ প্রথা গন্ধর্ব বিবাহ (দ্রঃ)। বিষ্ণু পুরাণ মতে ব্রহ্মার কান্তি থেকে জন্ম। অন্য মতে কশ্যপের দুই স্ত্রী মুনি ও প্রধার গর্ভে ১৬-টি ও ১০-টি গন্ধর্বের জন্ম হয়েছিল। মুনির ছেলে চিত্ররথ (দ্রঃ)। হরিবংশে স্বারোচিষ মন্বন্তরে অরিষ্টার গর্ভে এ'দের জন্ম। মহাভারতে যক্ষ, গন্ধর্ব ও রাক্ষসরা সমপর্যায়ে। সন্ধ্যা থেকে সারারাত এ'রা বিচরণ করে বেড়ায়। এ'দের একটি গণ সূর্যবর্চাঃ। এ'রা প্রায় সকলেই ধনী, এ'দের নগরী সমৃদ্ধ। হাহা, হূহূ, হংস, চিত্ররথ, চিত্রসেন, বিশ্ববসু, গোমায়ু, তুম্বুরু, নন্দি ইত্যাদি কয়েকটি বিখ্যাত গন্ধর্ব। বৌদ্ধতন্ত্রে এক গন্ধর্ব রাজের নাম পঞ্চশিখ ; পীত বর্ণ ; দু হাত বীণা বাজাচ্ছেন। জৈন গ্রন্থে এ'রা জৈনধর্মাবলম্বী। সিন্ধুর উভয় পার্শ্বে গান্ধার দেশবাসীরা রামায়ণে গন্ধর্ব বলে উল্লিখিত। রামায়ণে যুধাজিৎ রামের কাছে পুরোহিত গার্গ্যকে পাঠান এই গন্ধর্বদের দমন করার জন্য সাহায্যের প্রার্থনা করে (৭।১০০।২)। ভরত এ'দের দমন করে তক্ষশিলা ও পুষ্কলাবতী নিজের ছেলেদের হাতে তুলে দেন (রা ৭।১০১।১১)।

মহাভাষ্যে এ'দের নগরের উল্লেখ (আফগানে ?) আছে। মানসারে গন্ধর্ব ও কিন্নরদের এক সঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে। এদের দেহের নীচের অংশ পশু দেহ ; ওপর অংশ মানুষের এবং মুখ গরুড়ের। হাতের সঙ্গে ডানা রয়েছে। মাথাতে মুকুট 'কমলযুক্ত' এবং দেহের রঙ পুষ্পচ্ছায় ; হাতে 'করুণ বীণা' এবং গান করছে। মানসারে ৭-ম অধ্যায়ে আবার বলা হয়েছে কিন্নররা অশ্বমুখী যক্ষিণী। মন্ত্র-সংগ্রহে আছে গন্ধর্বেরা সুন্দর দেখতে, অনুগতদের বর দান করেন ; মাথাতে মুকুট, কাণে কুণ্ডল, হাতে মুষল এবং বীণা বাজাচ্ছে।

অতি প্রাচীন কাল থেকে গন্ধর্বদের বহু মূর্তি পাওয়া গেছে। ভারহুত ও সাঁচিতে দেখা যায় গন্ধর্বরা মালা হাতে উড়ে আসছে ; দেহে নীচের অংশ পাখীর মত এবং হাতে ডানা যুক্ত রয়েছে। দেহ ও মাথা মানুষের। অজন্তাতে গন্ধর্ব স্ত্রী পুরুষরা মিশ্র চেহারা, বীণা বাজাচ্ছে। বিষ্ণু ও শিবের সঙ্গে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বহু উৎকীর্ণ চিত্রে গন্ধর্বেরা অনুরূপ ভাবে উপস্থিত রয়েছে। অনেক সময় প্রভাবলীতে দেখা যায় গন্ধর্ব মিথুন, পুরুষ বাজাচ্ছে স্ত্রী নাচছে। দেওগড়ে (ঝাঁসি জেলা) প্রাপ্ত গন্ধর্ব/কিন্নর মিথুন (গুপ্ত যুগে) একটি প্রাংশু গাছের দু'পাশ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ; ওপর অংশ মানুষের, হাত অস্পষ্ট ; ডানা রয়েছে ; হাঁটুর নীচে পা অংশও মানুষের ; পায়ের পাতা কিন্তু

পাখীর মত এবং চোখ ড্যাবড্যাবে। কিছু মতে এই গন্ধর্ব ও কিন্নররা ভারতের আদিবাসী নিজস্ব সম্পদ। দ্রঃ- ইল, কিম্পুরুষ।

গন্ধর্ববিদ্যা—সঙ্গীত বিদ্যা।

গন্ধর্ববিবাহ—নিজেরা প্রণয়াসক্ত হয়ে সরাসরি বিবাহ করা। এই বিবাহে দেবতা বায়ুই এক মাত্র সাক্ষী ও উপকরণ।

গন্ধর্ববেদ—সঙ্গীত শাস্ত্র।

গন্ধর্বলোক—গুহ্যলোকের ওপরে এবং বিদ্যাধর লোকের নীচে। এখানে গন্ধর্বদের বাস।

গন্ধর্বী—সুরভি কামধেনুর সন্তান। গন্ধর্বীর সন্তান সমস্ত অশ্বজাতি (রা ৩।১৪।২৭)।

গন্ধহস্তিস্তূপ—বুদ্ধগয়ার বিপরীত দিকে ফল্গুতীরে বকরউর। এখানে হিউ এন-ৎসাঙ এসেছিলেন ; মলতাঙ্গ (<মতঙ্গ লিঙ্গ) আগে এই গন্ধহস্তিস্তূপের অংশ ছিল। বৌদ্ধ তীর্থ ; বর্তমানে মতঙ্গ আশ্রমে রূপান্তরিত ; শিবলিঙ্গ এখানে মতঙ্গেশ। এখানে একটি পুষ্করিণী মতঙ্গবাপী।

গন্ধেশ্বরী—বণিকদের শত্রু গন্ধাসুরকে বৈশাখী পূর্ণিমাতে বধ করে এই নাম। ঐ দিন পূজা হয়। মূর্তি সিংহবাহিনী, চতুর্ভুজা ; পূজা হয় দুর্গার ধ্যানে। পূজার সংকল্পে বাণিজ্য বৃদ্ধির কামনা থাকে।

গবল্গণ—সঞ্জয়ের পিতা।

গবাক্ষ—(১) রামের এক জন দুর্দ্ধর্ষ সেনামুখ্য। (২) শকুনির ছোট ভাই। ইরাবানের হাতে নিহত হন।

গবিজাত—শমীক (=নাগভূষণ) মুনির ছেলে শৃঙ্গী। দ্রঃ- কুবের।

গবীধুমৎ—কুন্দরকোট। এটোয়ার উ-পূর্বে ২৪ মাইল দূরে, সাংকাশ্য থেকে ৩৬ মাইল।

গবিষ্ঠ—বিখ্যাত অসুর। দ্রুমসেন রূপে জন্মান।

গভস্তিমান—একটি দ্বীপ।

গম্ভীরা—মালবে শিপ্রার একটি শাখা।

গয়—(১) সুগ্রীবের অনুচর। সীতার সন্ধানে যাবার জন্য সুগ্রীব ডেকে পাঠালে বহু বানর সৈন্য নিয়ে ইনি কিষ্কিন্ধ্যায় আসেন। (২) এক জন রাজর্ষি (মহা ৩।৯৩।১৭) অমূর্তরজসের/অমূর্তরয়সের (কালী ৭।৬৬) ছেলে। আমিষ স্পর্শ করতেন না। একশ বছর ধরে আহুতির অবশিষ্ট খেয়ে অগ্নির পূজা করেছিলেন। অগ্নি তার পর বর দিতে চাইলে ইনি বেদ পাঠের অধিকার চান। অগ্নির বর পেয়ে পৃথিবীর ওপর নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে থাকেন। ক্রমশ আরো ধর্ম-নিষ্ঠ হয়ে ওঠেন এবং বৃহৎ যজ্ঞের ব্যবস্থা করেন। এই যজ্ঞের ফলে একটি বট চিরজীবী হয়ে রয়েছে ; এটি অক্ষয় বট। একটি যজ্ঞে নদী সরস্বতী বিশালা নামে যোগদান করেন। রাজা মান্ধাতার কাছে এক বার পরাজিত হন। মহাভারতে (৩।৯৩।-) বিরাট যজ্ঞ করেছিলেন বলা হয়েছে। এতলোক খেয়েছিল যে অবশিষ্ট অন্নে ২৫টি পর্বত (৩।৯৩।২৪) হয়েছিল। এমন কি দেবতারাও হবিষা

এত বেশি পরিতর্পিত হয়েছিলেন যে পরবর্তী অন্য কোন যজ্ঞে হবি গ্রহণ করতে পারবেন কি না প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। মহাভারতে (৩।১২১।৩) আবার আছে সাতটি হয় মেধ করেছিলেন ; এই সাতটি যজ্ঞে এখানে গাছপালা মাটি, যজ্ঞের জিনিসপত্র সব কিছু হিরণ্ময় হয়ে যায়। এই সাতটি যজ্ঞের সাতটি প্রয়োগও বিখ্যাত। সপ্ত এক একস্য যূপস্য চষালাশ্চ উপরি স্থিতাঃ। যূপগুলি হিরণ্ময় রূপে শোভা পাচ্ছিল। এগুলিকে স্বয়ং ইন্দ্রও দেবতারা উত্থাপয়ামাসুঃ। এই সব যজ্ঞে সোম পান করে এবং ব্রাহ্মণরা দক্ষিণা পেয়ে মেতে উঠেছিলেন। মাটিতে যেমন বালি আকাশে যেমন তারা তেমনি অসংখ্য দান করেছিলেন যজ্ঞে সদস্যদের। নানা দিক থেকে আগত ব্রাহ্মণদের বিশ্বকর্মা-কৃত হিরণ্ময় গরু দিয়েছিলেন এবং পৃথিবী চৈত্যে ছেয়ে দিয়েছিলেন। এর পর ইন্দ্রলোকে যান। বিরাটের গোধন চুরির সময় অর্জুন ও কৃপাচার্যের যুদ্ধ দেখতে বিমানে করে উপস্থিত হয়েছিলেন। দ্রঃ- গয়শির।

(৩) অগ্নি-পুরাণে বিষ্ণু ভক্ত অসুর। এ'র নাম থেকে গয়া। কঠোর তপস্যা করতেন। দেবতারা ভয়ে ব্রহ্মার কাছে যান এবং ঠিক হয় কোন একটা বর দিয়ে এ'কে নিবৃত্ত করতে হবে। গয় বর চান ব্রাহ্মণ, তীর্থশালা, দেবতা, যোগী, মন্ত্র ইত্যাদি সব কিছু থেকে তাঁর দেহ যেন পবিত্র হয়। ফলে এই পবিত্র দেহ স্পর্শ করে সকলেই বৈকুণ্ঠে যেতে থাকেন এবং দেশ জনশূন্য হয়ে পড়ে। যম পুরীতে কোন পাপী নাই। যম এ কথা বিষ্ণুকে জানালে দেবতারা তখন এক দিন এই গয়াসুরের কাছে এসে তাঁর দেহ ভিক্ষা চান ; দেহের ওপর যজ্ঞ করবেন। গয় সম্মত হলে ব্রহ্মা গয়ের দেহের ওপর যজ্ঞ করতে থাকেন। উত্তাপে গয় নড়ছিলেন ; দেবতারা তখন মস্ত বড় একটা পাথর গয়ের ওপর চাপিয়ে তার ওপর চেপে বসেন। এতেও গয়াসুর বেঁচে ছিলেন। বিষ্ণু তখন নিজে পাথরের ওপর বসেন। গয়াসুর ব্যাপারটা বুঝতে পেরে অভিযোগ করেন তাঁর সঙ্গে এ ভাবে চালাকি করা উচিত নয়। গয়াসুরের বিনয়ে দেবতারা সন্তুষ্ট হয়ে আবার বর দিতে চান। গয়াসুর বর চান যাবৎ চন্দ্রসূর্য পৃথিবীতে থাকবে দেবতারা যেন তাবৎ তাঁর বুকের ওপর বসে থাকেন। যজ্ঞ শেষ হলে ব্রহ্মা যজ্ঞের পুরোহিতদের নানা কিছু দান করেন। এখানে সোনার পাহাড় তৈরি করে দেন, নদীতে দুধ ও মধু বয়ে যায়। কিন্তু ব্রাহ্মণরা ক্রমশ লোভী হয়ে পড়তে থাকলে ব্রহ্মার শাপে এ'রা নিরক্ষর ও দুষ্টবুদ্ধি হয়ে যান। বায়ু পুরাণে আছে দেবতারা বিষ্ণুর কাছে জানালে বিষ্ণু এসে পবিত্রতম হবার বর দিয়েছিলেন। পাথর চাপান হয় ; দেবতারা পাথরের ওপর উঠে গিয়ে বসেন ইত্যাদি এবং শেষ কালে বিষ্ণুর দেহ নির্গত শিলাও চাপান হয় এবং শেষ পর্যন্ত ত্রিমূর্তিও উঠে এসে বসেন। চাপে গয়ের দেহ কাঁপতে থাকা এরপর বন্ধ হয় ; এবং এবার গয় বর চান যত দিন চন্দ্রসূর্য থাকবে তত দিন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যেন তাঁর ওপর বসে থাকেন। অগ্নি পুরাণে গয় প্রথমে সকল তীর্থ থেকে 'পবিত্রতা' বর চেয়েছিলেন এবং বিষ্ণু পরামর্শ দিয়েছিলেন গয়ের মাথার ওপর যজ্ঞ করতে। যজ্ঞে ব্রহ্মা পূর্ণাহুতি দিয়েছিলেন ; এবং দেবতাদের পর বিষ্ণু গদাধর মূর্তিতে উঠে গিয়ে বসেছিলেন। গরুড় পুরাণেও দেবতারা ও বিষ্ণু এ'র মাথায় উঠে বসেছিলেন এবং বিষ্ণু

এ'কে মায়াতে মোহিত করে কীকট দেশে এনে গদাঘাতে নিহত করেন। গয়াসুরকে কেউ কেউ অস্তাচল বলে ব্যাখ্যা করেন। দ্রঃ- গয়া। গয়ের পুণ্যে গয়া বিখ্যাত তীর্থ। (৪) পুরূরবার ছেলে আয়ুস। আয়ুসের ছেলে গয় ও নহুষ। (৫) পৃথুর পৌত্র হবির্ধানের একটি ছেলে। (৬) ধ্রুবের বংশে এক অসুর।

গয়শির—মহাভারতে (৩।৯৩।১০) গয় যে পর্বতে যজ্ঞ করেছিলেন। যজ্ঞে অন্নের শত শত পর্বত এবং ঘি ও দুধের বহু নদী হয়ে গিয়েছিল। বহু দিন ব্রাহ্মণ ভোজন করান। যজ্ঞে দক্ষিণা দেবার সময় ব্রহ্মঘোষে পৃথিবী চারদিক, খ ও নভ ভরে যায়; অন্য কিছু শুনতে পাওয়া যায় না। এখানে গয়শির নামে একটি সরোবর এবং পুণ্যা মহানদী রয়েছে। এই তীর্থে অগস্ত্য বৈবস্বতং প্রতি গতঃ। ধর্ম নিজে এখানে বাস করেছিলেন এবং সমস্ত নদীদের সমুদ্ভেদ এই পাহাড়ে। মহাদেব এখানে নিত্যবাসী। এখানে গয়ের অক্ষয় বট (দ্রঃ) রয়েছে। পাণ্ডবরা এখানে চাতুর্মাস্য ঋষিযজ্ঞ করেন। দ্রঃ- গয়া, গয়াশীর্ষ।

গয়া=গয়াশীর্ষ ২৪°৪৮'৪৪"উ×৮৫°৩'১৬" পূ। ফল্গু নদীর দক্ষিণ তীরে। অন্য নাম গয়াধাম; গয়াক্ষেত্র, গয়াপুরী। গয় (দ্রঃ) অসুরের নামে নাম। উত্তরে রামশিলা পর্বত এবং দক্ষিণে ব্রহ্মযোনি পর্বত। বর্তমান সহর অর্থে উত্তরে সাহেবগঞ্জ এবং দক্ষিণে প্রাচীন গয়া নগর। সহরের দক্ষিণ ভাগে চক্রবেড় নামক স্থানে (চৈতন্য ভাগবৎ) বিষ্ণুপাদ মন্দির; ইন্দোরের মূলহর রাও হোলকারের পুত্রবধূ অহল্যা বাঈ নির্মিত (১৭৬৬-১৭৯৫ খৃ)। ফা হিয়েনের আগেও এখানে পূর্বতন মন্দির ছিল; পুরাতন একটি মন্দিরের স্থানে নির্মিত। পূজিত বিষ্ণুপাদ চিহ্ন আসলে বুদ্ধের পদচিহ্ন। ব্রহ্মযোনি পর্বত (দ্রঃ) সহরের দক্ষিণে। গয়াতে বিষ্ণুপাদ যুক্ত সমস্ত মন্দিরগুলিই এক দিন বৌদ্ধমন্দির ছিল। বিষ্ণুপাদ মন্দিরের কাছে সূর্যকুণ্ড ও প্রাচীন বৌদ্ধকুণ্ড। দ্রঃ- খলতিক পর্বত। বুদ্ধের জীবিত দশাতে গয়াতে সব প্রথম বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়; বৌদ্ধ ধর্মের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। ২-৪ শতকে গয়া সনাতন পন্থীদের হাতে আসে। ফা-হিয়েন (৪০৪ খৃ) স্থানটিকে নির্জন ও পরিত্যক্ত দেখেছিলেন। হিউ-এন-ৎসাঙ (৬৩৭ খৃ) সমৃদ্ধ, সুরক্ষিত, এবং দুষ্প্রবেশ্য ব্রাহ্মণ্য নগর দেখেছিলেন; হাজার ব্রাহ্মণ পরিবার অধ্যুষিত; এরা সকলেই ঋষি গয়াদির বংশধর। একটি মতে গয়াসুর কাহিনী হচ্ছে গয়া থেকে বৌদ্ধ বিতাড়ন কাহিনী; দ্রঃ- গয়া, গয়ানাভি। বুদ্ধ গয়া (দ্রঃ- উরুবিল্ব) গয়া থেকে ৬ মাইল দক্ষিণে। এখানে মঙ্গলগৌরী ৫২ পীঠের একটি; সতীর স্তন পড়েছিল; ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের একটি শাখাতে অবস্থিত; শাখাটির নাম হচ্ছে ভাসনাথ (দেবীভাগ)। বিষ্ণুপাদ থেকে ব্রহ্মসর ১ মাইল দ-পশ্চিমে; মতঙ্গবাপী (বর্তমানে মলতাঙ্গ) ৬ মাইল দূরে। দ্রঃ- ধর্মারণ্য। গোদালোল বিষ্ণু-পাদ থেকে ১ মাইল দক্ষিণে, মারণপুরের কাছে এবং উত্তর মানস ১ মাইল উত্তরে। উমঙ্গ নগরে (উমগা) জগন্নাথ মন্দির; দেয়তে সূর্যমন্দির এবং গয়া জেলাতে টিকরির কাছে কূচ; এগুলি প্রাচীন; এই স্থানগুলিতে শিলালেখ পাওয়া গেছে। মহাভারতে বিষ্ণুপাদ মন্দির থেকে ১ মাইল দ-পশ্চিমে ব্রহ্মসর।

কোলাহলপুরে রুদ্রগয়া। বেরারে লেনার/লোনার হচ্ছে বিষ্ণু গয়া। গয়াতে অক্ষয় বটের কাছে শিলালেখে রয়েছে খৃ ১০-ম শতকেও এটি তীর্থ ছিল। গয়াতে তপোবন থেকে ৬ মাইল উত্তরে বুদ্ধবন। গয়া থেকে ৮-৯ কি-মি দূরে বুদ্ধ গয়াতে প্রসিদ্ধ বোধিদ্রুমের নীচে গৌতম বুদ্ধ বোধি লাভ করেন। বোধিদ্রুমের পাশেই যে বিশাল মন্দিরটি রয়েছে তার নির্মাণ কাল জানা নাই। তবে খৃ ১১ শতকে ব্রহ্ম দেশের বৌদ্ধ রাজা এর সংস্কার করে দেন। সিংহলের রাজা মেঘবর্ণ গুপ্তবংশের দ্বিতীয় রাজা সমুদ্র গুপ্তের অনুমতি নিয়ে সিংহলীয় বৌদ্ধ যাত্রীদের বাসের জন্য একটি বাড়ি ও বোধিদ্রুমের উত্তর দিকে একটি বিহার তৈরি করে দিয়েছিলেন। হিউ-এন-ৎসাঙ এই বিহার ও অন্যান্য মন্দির চৈত্য, স্তূপ ও বিহার ইত্যাদির অতুল সমৃদ্ধি ও মনোহারিত্বের বর্ণনা করেছেন। সিংহলীয় বৌদ্ধ বিহারে তখন হাজারের বেশি ভিক্ষু ছিলেন। খৃ ১৩ শতকেও এখানে সিংহলীয় ভিক্ষুদের বিশেষ প্রভাব ছিল।

গয়ার বিষ্ণুপাদ মন্দির একটি তীর্থস্থান। আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষে এখানে মেলা বসে। বৈশাখী পূর্ণিমাতে বুদ্ধগয়ার বৌদ্ধ মন্দিরের কাছেও একটি মেলা হয়।

গয়ানাভি—বিষ্ণুর কাছে গয়াসুর পরাজিত হলে মাটিতে অসুরের দেহ পড়ে থাকে। গয়াতে মাথা ছিল ফলে গয়া=গয়াশীর্ষ (দ্রঃ) ; যাজপুরে নাভি ; ফলে যাজপুর গয়-নাভি এবং পিঠাপুরে (পিষ্ঠপুর; রাজমাহেন্দ্রি থেকে ৪০ মাইল দূরে) পা এসে পৌঁছেছিল ; ফলে স্থানটি গয়াপাদ নামে পরিচিত। রাজপুরে একটি কূপ/ঝর্ণাকে এই নাভির কেন্দ্রস্থান বলা হয়েছে। দ্রঃ- যজ্ঞপুর।

গয়াশীর্ষ—(১) অপর নাম গয়াশিস। দ্রঃ- গয়ানাভি। দ্রঃ- ব্রহ্মযোনি পাহাড়। দ্রঃ- গয়শির।

গরুড়—ঋক্‌বেদে সূর্যকে গরুড় বলা হয়েছেঃ- দিব্যঃ সঃ সুপর্ণঃ গরুত্মান্। অপর নাম তার্ক্ষ্য—ঋক্ বেদে। তার্ক্ষ্য=অশ্ব। গায়ত্রী যখন গন্ধর্বদের কাছ থেকে সোম চুরি করেছিলেন তখন গরুড় পথ প্রদর্শন করেন (ঐতরেয়)। মহাভারতে আছে কশ্যপ পুত্র কামনায় যজ্ঞ করলে ইন্দ্র, বালখিল্য মুনিরা ও দেবতারা যজ্ঞের কাঠ নিয়ে আসতে থাকেন। ইন্দ্র বড় বড় কাঠ আনতে থাকেন ; অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ বালখিল্যরা সকলে মিলে একটি পলাশ পাতা বয়ে নিয়ে আসতে গিয়ে জলপূর্ণ একটি গোষ্পদে ক্লিশ্যমান হয়ে পড়েন। ইন্দ্র দেখে হেসে ফেলেন এবং এদের ডিঙিয়ে/লঙ্ঘয়িত্বা চলে যান। এর ফলে বালখিল্যরা অন্য কোন দেবতাকে ইন্দ্রের জায়গায় ইন্দ্র করবেন ঠিক করে যজ্ঞ করতে থাকেন। শৌর্য ও বীর্যে ইন্দ্রের শতগুণ হবে ; নিজেদের তপস্যা দিয়ে একে ইন্দ্র করে দেবেন। ইন্দ্র ভয়ে কশ্যপের শরণ নেন। কশ্যপ এদের বোঝান যে ব্রহ্মার নির্দেশে ইন্দ্র ইন্দ্রত্ব করছেন; সুতরাং ব্রহ্মার এ নির্দেশ ঠিক থাকুক। কশ্যপ নিজেও ঠিক ইন্দ্রকে চাইছিলেন না ; বলেন সব দিক রক্ষা হবে ; বালখিল্যদের ইন্দ্র পক্ষীদের ইন্দ্র হয়ে জন্মাক। বালখিল্যরা ইন্দ্রকে ক্ষমা করেন এবং যেহেতু পুত্রার্থে কশ্যপও যজ্ঞ করছিলেন বাল্যখিল্যরা চান, বালখিল্যদের সংকল্পিত ইন্দ্র কশ্যপের সন্তান হয়ে জন্মাক। তাহলে বালখিল্যদের ও কশ্যপের সকলের কামনা পূর্ণ হবে। ইন্দ্র এই পক্ষী-ইন্দ্রের

কাছে পরাজিত হবেন। এই সময়ে বিনতা ঋতু স্নান করে পুত্র লাভের জন্য স্বামীর কাছে এলে কশ্যপ বর দেন তাঁর বাসনা পূর্ণ হবে এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দুটি বীর সন্তান হবে। কশ্যপের যজ্ঞের ফলে বালখিল্যদের যজ্ঞের ফল যুক্ত হয়ে লোকপূজিত দুটি শিশু জন্মাবে। ভগবান মারীচ আরো বলেন অপ্রমাদেন গর্ভধারণ করতে এবং একটি পুত্র সর্বপতত্রিনাম্ ইন্দ্রত্ব করবে (মহা ১।২৭।২৯)। এছাড়া ইন্দ্রকে আশ্বাস দেন এই খগ-সন্তান দুটি ইন্দ্রের সহায়ক হবেন ; কোন ভয় নাই ; এবং ভবিষ্যতে ব্রাহ্মণকে আর যেন অপমান না করেন। যথা কালে বিনতার দুটি ডিম হয় এবং ডিম থেকে অরুণ (দ্রঃ) ও গরুড় সন্তান হয়। অন্য মতে কশ্যপের স্ত্রী তাম্রার মেয়ে নলা এবং নলার মেয়ে বিনতা; অর্থাৎ বিনতা কশ্যপের নাতনি। কদ্রু ও বিনতা দু জনে কশ্যপের সেবা করেন ; কদ্রু এক হাজার ছেলে হবে বর পান ; বিনতা এই এক হাজার ছেলে থেকে সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ দুটি ছেলে চান।

গরুড় বিষ্ণুর বাহন। একটি ডিম থেকে অকালে অরুণ (দ্রঃ) হয় এবং অপর ডিমটি থেকে আরো পাঁচ শত বছরের পর গরুড়ের জন্ম হয়; বিনতা তখন কদ্রুর (মহা ১।২০।২) দাসী। গরুড় আধখানা পাখী, আধখানা মানুষ। জন্মের পর দেহ থেকে সূর্যের মত দীপ্তি ছড়িয়ে পড়তে থাকে ; দেবতারা এসে সকলে আশীর্বাদ করেন। গরুড়ের মুখ সাদা, ডানা রক্তবর্ণ, দেহ স্বর্ণাভ। পাখীর মত ঠোঁট ও নখ। খাদ্য জীব-জন্তু ও ফলমূল। এঁর ছেলে সম্পাতি ও ময়ূর। মহাভারতে (৫।৯৯) ছয় ছেলে সুমুখ, সুনামা, সুনেত্র, সুবর্চা, সুরূপ, সুবলা ; এরা ব্রাহ্মণ হয়েও কর্ম দোষে পন্নগভোজী নির্দয় ক্ষত্রিয়ে পরিণত হয়েছিলেন। ডিম থেকে বার হয়ে মাকে দেখতে পান না ; বিনতা (দ্রঃ) তখন কদ্রুর (দ্রঃ) দাসী। ভয়ঙ্কর অগ্নির মত জ্বল জ্বল করতে আকাশে উঠে যান। গরুড়কে অগ্নি মনে করে সমস্ত প্রজা অগ্নিদেবের শরণ নেন। অগ্নি আশ্বাস দেন বলেন, ঐ গরুড়। দেবতা ও ঋষিরা এর স্তব করেন ; গরুড় তখন নিজের তেজ প্রতিসংহার করেন ; এরপর সমুদ্র পার হয়ে মার কাছে যান (মহা ১।২১।১)। আরোপরে একদিন কদ্রুর নির্দেশে সমুদ্র কুক্ষিতে রমণীয়ক দ্বীপে নাগেদের আলয়ে বিনতা কদ্রুকে ও গরুড় ও সাপেদের বহন করে নিয়ে যেতে বাধ্য হন। আকাশে সূর্যের কাছ দিয়ে যেতে থাকেন ; সাপেরা তাপে মূর্চ্ছিত হয়ে যায়। কদ্রু ইন্দ্রের স্তব করেন ইন্দ্র নীল মেঘ দিয়ে (মহা ১।২২।১) আকাশ ঢেকে দেন ; জল ঝরতে থাকে ; নাগেরা রক্ষা পায়। এই দ্বীপে আসার পর সাপেরা অন্য দেশে বেড়াতে যাবে ; গরুড়কে নিয়ে যেতে বলে। গরুড় তখন বিনতাকে জিজ্ঞাসা করে ও সব শুনে সাপেদের সঙ্গে কথা বলেন এবং মায়ের মুক্তির জন্য সাপেদের দাবি অনুসারে অমৃত আনতে যাবেন স্থির করেন এবং মার কাছে কিছু খেতে চান। বিনতা বলে দেন সমুদ্রকুক্ষিতে নিষাদরা বাস করে তাদের খেয়ে নিক। কিন্তু কোন ব্রাহ্মণকে যেন না খায় ; মুখের মধ্যে কোন ব্রাহ্মণ গেলে অঙ্গার স্পর্শে জ্বলে যাবার মত অবস্থা হবে। এরপর বিনতা আশীর্বাদ করেন গরুড়ের ডানা মারুত, পৃষ্ঠ চন্দ্র, মাথা বহ্নি এবং সর্ব দেহ ভাস্কর (মহা ১।২৪।৮) রক্ষা করবেন। গরুড় তার পর বার হন ; পথে ক্ষিধে মেটাবার জন্য নিষাদদের খেয়ে ফেলেন। নিষাদদের সঙ্গে এক

ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকেও মুখের মধ্যে পুরে ফেলেছিলেন। দু জনকে তাড়াতাড়ি মুখ থেকে বার করে দেন। তারপর গন্ধমাদন পাহাড়ে কশ্যপের সঙ্গে দেখা করতে আসেন এবং সব কথা জানান ও আরো কিছু খেতে চান। এমন কিছু খেতে চেয়েছিলেন যাতে অমৃত আনতে সমর্থঃ স্যাম্ (মহা ১।২৫।৯)। অদূরে হ্রদে গজকচ্ছপ (দ্রঃ) দুটিকে কশ্যপ খেতে বলেন। গরুড় এদের দু জনকে দু হাতে করে নিয়ে উড়তে থাকেন এবং অলম্বতীর্থে (মহা ১।২৫।২৭) একটি দেববৃক্ষে গিয়ে বসতে যান। দেববৃক্ষগুলি সেখানে ভয়ে কাঁপতে থাকে। গরুড় তখন একটি রোহিণ বৃক্ষে গিয়ে বসতে যান.; গাছটিও গরুড়কে অভ্যর্থনা করে। কিন্তু বসতে গেলে পায়ের স্পর্শে শাখাটি ভেঙে পড়ে। ঐ ডালে বালখিল্য মুনিরা নীচের দিকে মাথা করে ঝুলছিলেন। মুনিদের পাছে কোন ক্ষতি হয় ডালটিকে তৎক্ষণাৎ ঠোঁটে করে ধরে নিয়ে আবার উড়তে থাকেন এবং উপযুক্ত কোন স্থান না পেয়ে কশ্যপের কাছে গন্ধমাদন পর্বতে (মহা ১।২৬।৫) আবার ফিরে আসেন। কশ্যপের স্তবে বালখিল্যরা ডাল থেকে নেমে হিমালয়ে তপস্যা করতে যান এবং কশ্যপের উপদেশে এক নির্জন তুষারাচ্ছন্ন পাহাড়ে শাখাটি ফেলে দিয়ে ঐ পাহাড়ের চূড়ায় বসে এ পর্যন্ত হাতে ধরে রাখা গজকচ্ছপ দুটিকে খেয়ে নেন।

গরুড় আসার আগেই দেবলোকে নানা অশুভ লক্ষণ দেখা দিতে থাকে। ইন্দ্র বৃহস্পতিকে প্রশ্ন করেন। বৃহস্পতি জানান ইন্দ্রের অপরাধ ও প্রমাদের ফলে গরুড়ের জন্ম; অমৃত নিতে আসছে। ইন্দ্র সোমপ্রহরীদের সাবধান করে দেন। তুমুল যুদ্ধ হয়; গরুড় নিরস্ত্র কিন্তু। সাধ্যাঃ সগন্ধর্বাঃ প্রাচীদিকে, বসু ও রুদ্রেরা দক্ষিণ দিকে, আদিত্যেরা প্রতীচী ও নাসত্যরা উত্তরে পালিয়ে যান। যুদ্ধের প্রথমেই ভৌবন/বিশ্বকর্মা মারা পড়েন। অংশুক্রন্দ, রেণুক, ক্রথন ইত্যাদি ইত্যাদি যক্ষেরাও যুদ্ধ করেছিলেন (মহা ১।২৮। ১৭)। সমস্ত রক্ষীদের নিহত করে সামনে গিয়ে দেখেন আগুন জ্বলছে। গরুড় তখন মুখে করে নদীর জল এনে আগুন নিবিয়ে নিজের দেহ ছোট করে নিয়ে ভেতরে এসে দেখেন ক্ষুরধার অয়স্ময় চক্র অনিশং ঘুরছে ; এটি দেব-নির্মিত যন্ত্র ; অমৃত রক্ষা করছে। গরুড় তখন অত্যন্ত ছোট হয়ে অরের ফাঁক দিয়ে চকিতে ভেতরে এসে দেখেন দুটি ভীষণ সাপ অমৃত পাহারা দিচ্ছে। এদের যে কোন একটি তাকিয়ে দেখলেই ভস্ম-সাৎ হয়ে যেতে হবে। গরুড় এদের চোখে ধুলা ছুঁড়ে দিয়ে তারপর আক্রমণ করে দু টুকরো (মহা ২।২৯।৯) করে দিয়ে সোম নিয়ে ফিরতে থাকেন। অমৃত পেয়েও নিজে পান করবার চেষ্টা করেন না। আকাশে তখন বিষ্ণু দেখা দেন (অন্য মতে বিষ্ণুর কাছে গরুড় গিয়েছিলেন) এবং অমৃতে লোভ না করার জন্য বর দিতে চান। গরুড় বর চান বিষ্ণুর ওপর তিনি অবস্থান করবেন এবং অজর ও অমর হবেন। এই বর লাভ করে গরুড় বিষ্ণুকে বর দিতে চান এবং বিষ্ণু চান গরুড় তাঁর বাহন হবেন ; বাকি সময় বিষ্ণুর ধ্বজের ওপরে অবস্থান করবেন। এরপর ইন্দ্র এসে বজ্রাঘাত করেন ; বজ্রাঘাতে গরুড় হেসে ফেলেন এবং ইন্দ্র ও যে ঋষির অস্থিতে বজ্র তৈরি হয়েছে তাঁদের সম্মানে একটি পালক গা থেকে তুলে ফেলে দেন। সুরূপ এই পত্র দেখে সর্বভূতানি নাম রাখে সুপর্ণ (দ্রঃ)। ইন্দ্র মুগ্ধ হয়ে অনন্ত সখ্য চান এবং গরুড়ের বল কতখানি জিজ্ঞাসা করেন। গরুড়

জানান সমস্ত পৃথিবী, সমুদ্র ও ইন্দ্রকে এক পক্ষে নিয়ে উড়তে পারেন। একটুও ক্লান্ত হবেন না। ইন্দ্র তখন বোঝাতে থাকেন ; এবং গরুড় প্রস্তাব করেন মায়ের মুক্তির জন্য তিনি অমৃত সাপেদের দেবেন ; ইন্দ্র তারপর চুরি করতে পারেন। ইন্দ্র সন্তুষ্ট হয়ে বর দিতে চান ; গরুড় সর্পভুক্ হবার বর চেয়ে নেন।

নাগলোকে ফিরে এসে কুশাসনের ওপর অমৃতকুম্ভ স্থাপন করে নাগেদের স্নান করে আসতে বলেন এবং নিজের মায়ের মুক্তি চেয়ে নেন। সাপেরা বিনতাকে মুক্তি দিয়ে অমৃত খাবার লোভে দেহ পবিত্র করে নেবার জন্য স্নান করতে যান। মহাভারতে ইন্দ্র অন্য মতে বিষ্ণু এই সুযোগে অমৃত চুরি করে পালিয়ে যান। সাপেরা ফিরে এসে অমৃত না পেয়ে কুশাসন চাটতে থাকে ফলে এদের জিব দ্বিধা হয়ে যায়। অমৃত স্পর্শে কুশ পবিত্র হয়ে ওঠে।

স্কন্দ পুরাণে মোটামুটি এই কাহিনী ; কদ্রুর ৫০০ ডিম ইত্যাদি। নিজের মাকে অভিশাপ দেবার জন্য অনুতপ্ত অরুণ নারদের পরামর্শে যাত্রেশ্বর শিবের পূজা করে সূর্যের সারথি হবেন বর পান। স্কন্দ পুরাণে আর এক জায়গায় আছে গরুড় মহাদেবকে তপস্যায় তুষ্ট করে বিষ্ণুর বাহন ও পক্ষীরাজ হবার বর পেয়েছিলেন। অথর্ব বেদে গরুড় বিষ ধ্বংসকারী।

শতপথ ব্রাহ্মণে কদ্রু বিনতার উপাখ্যান মত একটি কাহিনী আছে। স্বর্গে সোম ছিল। দেবতারা এই সোম চান যজ্ঞ করবেন। তাঁরা সুপর্ণী ও কদ্রুকে সৃষ্টি করলেন। এরপর এদের ঝগড়া ; শেষ অবধি ঠিক হল যার যত বেশি দূর-দৃষ্টি সে জয়ী হবে। সুপর্ণী বলল সাগরের পারে শ্বেত পাথরে একটি অশ্ব শুয়ে আছে ; এবং কদ্রু বলল অশ্বের লেজটি বাতাসে কাঁপছে। সুপর্ণী দেখে আসে এবং কদ্রু জয় লাভ করে। কাহিনী এইখানেই শেষ। দাসীত্ব ও গরুড়ের জন্ম ইত্যাদি নাই। এই সুপর্ণী তারপর গায়ত্রী ছন্দ সৃষ্টি করেন ; এবং এই ছন্দ সোম আহরণ করে। কৃষ্ণযজুর্বেদের (১।১।৫।৮।১) কাহিনী জরা মুক্তির জন্য সাপেরা চিন্তা করছিল। কদ্রুপুত্র-কসর্নীর একটি মন্ত্র তৈরি করেন, এই মন্ত্রে এরা নতুন শরীর লাভ করে। কৃষ্ণযুজুর্বেদে আর এক জায়গায় এদের বিবাদ এবং সৌপর্ণেয়া ছন্দ দ্বারা স্বর্গ থেকে সোম আহরণের কাহিনী রয়েছে। এখানে এদের বিবাদের কারণ দেওয়া নাই। স্কন্দপুরাণে উচ্চৈঃশ্রবাকে দেখে ঝগড়া ; এটি কিন্তু সূর্যের অশ্ব। কদ্রু বলেছিল কালো রঙ। কদ্রুর কথা শুনে সাপেরা কাঁদতে থাকে ; কদ্রু হেরে যাবেন। কদ্রুর নির্দেশে তখন সাপেরা অশ্বকে কাল করল।

রামায়ণে (৩।৩৫।৩৬) অমৃত আনবার সময় যে গাছে বসলে ডালটি ভেঙেছিল সেই গাছটি নগ্রোধ সুভদ্র (দ্রঃ) ; ডালটিকে গরুড় সমুদ্রে ফেলে দিয়েছিলেন ; এবং সমুদ্রে সেইখানে মাটি পাহাড় হয়ে উঁচু হয়ে উঠে ত্রিকূট/লঙ্কা গঠিত হয়।

ইন্দ্রের বরে গরুড় যথেচ্ছ নাগকুল ধ্বংস করতে থাকলে নাগেরা শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে গরুড়ের সঙ্গে একটা আপোষ করে প্রতি দিন একটি করে সাপ গরুড়কে খেতে দেওয়া হবে। গরুড়ের যথেচ্ছ অত্যাচার বন্ধ হয় বটে কিন্তু কালীয় (দ্রঃ) নাগ এই প্রস্তাবে রাজি হন না।

গরুড়ের বড় বোন সুমতি। বিনতা যখন কদ্রুর দাসী ছিলেন তখন এক দিন বনে কদ্রুর জন্য কাঠ আনতে যান। বনে ঝড় বৃষ্টিতে পথ হারিয়ে গিয়ে এক সন্ন্যাসীর আশ্রমে গিয়ে আশ্রয় নেন। সন্ন্যাসী বিনতার কষ্ট দেখে আশীর্বাদ করে ছিলেন একটি শক্তিশালী ছেলে হবে এবং দাসীত্ব থেকে মুক্ত করে দেবে। গরুড়ের জন্মের অনেক পরে বিনতা তথা গরুড় সুমতির (দ্রঃ) বিয়ের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়লে বিনতা তখন গরুড়কে এই সন্ন্যাসীর কাছে পাঠান এবং সন্ন্যাসী গরুড়কে ঔর্বের কাছে পাঠান। ঔর্বের পরামর্শে গরুড় সুমতির সঙ্গে সগরের বিয়ের ব্যবস্থা করেন (ব্রহ্মাণ্ড-পু)।

মাতলির মেয়ে গুণকেশী ; বিয়ে হয় সুমুখ নাগের সঙ্গে। ঠিক ছিল গরুড় এই নাগকে এক মাসের মধ্যে ভক্ষণ করবেন। মাতলির পরামর্শে সুমুখ ইন্দ্রের কাছে গিয়ে আশ্রয় নেন। গরুড় এসে ইন্দ্রকে অনুরোধ করেন তাঁর ভক্ষ্যকে ছেড়ে দিতে। ইন্দ্র জানান বিষ্ণু সুমুখ-কে দীর্ঘ জীবন বর দিয়েছেন। রাগে গরুড় বিষ্ণুর কাছে গিয়ে আস্ফালন করেন তিনি বিষ্ণুকে তাঁর ডানার প্রান্তে বসিয়ে বহন করেন ইত্যাদি। বিষ্ণু তখন গরুড়কে তাঁর বাঁ হাতের ভার সইতে বলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে হাতটি গরুড়ের ওপর রাখলে ভারে গরুড় অজ্ঞান হয়ে যান এবং জ্ঞান ফিরলে ক্ষমা চেয়ে নেন। (মহা ৫।১০৩।-) বিষ্ণু তখন পায়ের আঙ্গুলে করে সুমুখকে গরুড়ের বুকে ছুঁড়ে দেন ; সেই থেকে গরুড় আর সুমুখকে হিংসা করেন না।

গালব যখন গুরু দক্ষিণা দেবার চিন্তায় বিপন্ন তখন গরুড় এসে প্রথমে গালবকে পিঠে নিয়ে ঋষভ পর্বতে যান। এখানে ব্রহ্মবাদিনী শাণ্ডিলী এদের অতিথি সৎকার করেন এবং সেই রাত্রিতে এখানে এঁরা কাটান। পরদিন সকালে উঠে গরুড় দেখেন তাঁর সমস্ত পালক ঝরে গেছে। মুখপাদান্বিত একটি মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়েছেন (মহা ৫।১১১।৫)। সিদ্ধা শাণ্ডিলীকে এই পাহাড় থেকে প্রজাপতি, মহাদেব, বিষ্ণু, ধর্ম ও যজ্ঞের কাছে অর্থাৎ উপযুক্তধামে নিয়ে যাবার কথা গরুড় চিন্তা করেছিলেন। ফলে শাণ্ডিলী মনে করেন গরুড় তাঁকে তুচ্ছ করেছেন। ফলে এই অবস্থা। গরুড় ক্ষমা চাইলে (মহা ৫।১১১।১০) শাণ্ডিলীর আশীর্বাদে গরুড়ের আবার পালক গজায়। এখান থেকে গালবকে নিয়ে গরুড় যযাতির কাছে পৌঁছে দেন। পারিজাত নিয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে ইন্দ্রের যখন যুদ্ধ হয় সেই সময়ে গরুড়ের প্রহারে ঐরাবত অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল। সমুদ্র মন্থনের সময় মন্থনদণ্ড হিসাবে মন্দর পর্বতকে তুলে আনতে কেউ যখন পারলেন না তখন বিষ্ণুর নির্দেশে গরুড় গিয়ে ঠোঁটে করে পাহাড়টিকে তুলে আনেন। এর পর কিন্তু বাসুকি নাগকে গরুড় আনতে গিয়ে বিফল হন। দ্রঃ- সমুদ্র মন্থন।

বনবাসের সময় মহর্ষি আর্ষ্টিষেনের (মহা ৩।১৫৭।১৯) আশ্রমে পাণ্ডবরা যখন আসেন সেই সময় গরুড় সমুদ্রের তলদেশ থেকে ঋদ্ধিমান নাগকে তুলে আনেন ; পাখার ঝাপটায় কুবেরের উদ্যান থেকে পঞ্চবর্ণ কহ্লারপুষ্প দ্রৌপদীর পায়ের কাছে এসে পড়ে। দ্রঃ- উপরিচর বসু। একবার এক দানব কৃষ্ণের মুকুট চুরি করলে গরুড় এই

মুকুট উদ্ধার করে এনে দেন। লঙ্কাতে লক্ষ্মণ যখন নাগপাশে বদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন গরুড় এসে মুক্ত করেন। কার্তিকেয়ের জন্ম হলে গরুড় নিজের ছেলে ময়ূরকে কার্তিকেয়ের বাহন হবার জন্য দান করেন। গরুড়ের আর একটি কাহিনী জীমূত-বাহনকে (দ্রঃ) মুক্তি দেওয়া।

প্রথম দিকে গরুড়কে টিয়াপাখী মত বলা বা দেখান হয়েছে। সাঁচিতে দরজায় রূপকথার পাখী যেন ; কাণে কুণ্ডল রয়েছে। গান্ধার শিল্পে বিরাটকায় ঈগল পাখী মত ; ডানা স্বাভাবিক ; কিন্তু কাণে কুণ্ডল আছে। এর পর গুপ্ত রাজাদের মুদ্রাতে গরুড় একটা মোটাসোটা পাখী, সুন্দর ডানা। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রৌপ্য মুদ্রাতে গরুড় ডানা মেলে দাঁড়ান ; সম্পূর্ণ পাখী। কিছু মুদ্রাতে সঙ্গে মানুষের মত হাত, এবং হাতে বালা ; কিছু মুদ্রাতে হাত নাই ; ঠোঁটে সাপ রয়েছে। প্রথম কুমার গুপ্তের সময়কার পোড়া মাটির একটি সিল মোহরে (নালন্দাতে প্রাপ্ত) গরুড় বেশ মোটাসোটা একটা পাখী কিন্তু মুখ মানুষের। শিল্প-রত্ন ইত্যাদিতে দু হাত; আবার আট হাত বর্ণনাও আছে, হাতে কমণ্ডলু, গদা, শঙ্খ, চক্র, খড়্গ, সর্প ও একটি হাতে বিষ্ণুর পা ধরা আছে ; বিষ্ণু গরুড়ের সামনের দুটি হাতের ওপর বসা। শিল্পরত্নে দু হাত গরুড়কে বলা হয়েছে তার্ক্ষ্য। বিষ্ণু-ধর্মোত্তরে বলা হয়েছে তার্ক্ষ্যের নাক হবে পাখীর ঠোঁটের মত ; চার হাত ; গোল গোল চোখ ; বুক, হাঁটু ও পা শকুনির মত ; পেছনের হাতে ছাতা ও অমৃত কলস, সামনের হাতে অঞ্জলি মুদ্রা; পিঠে বিষ্ণু মূর্তি থাকলে বিষ্ণুর পা পেছনের হাতে ধরা থাকবে ; এবং কিঞ্চিৎ লম্বোদর। আবার শ্রী-তত্ত্ব নিধিতে মাথাতে ফণী-মুকুট।

মধ্য যুগীয় গরুড় মূর্তি যা পাওয়া গেছে তার দুটি ভাগ ; একটি ভাগ বিষ্ণুর বাহন ; আর একটি ভাগ পাখী ও মানুষ মিলে চেহারা ; স্তম্ভের ওপর বা বিষ্ণু মন্দিরে। এই মূর্তিগুলিতে সব সময়ই গোল-গোল চোখ ; মানুষ মত চেহারা, নাক পাখীর ঠোঁটের মত। পাখীর মত ডানা এবং কখনো কখনো পায়ে পাখীর মত নখ। সাধারণত দুটি হাতে অঞ্জলি মুদ্রা। মধ্যযুগের শেষ দিকে পূর্ব ভারতে চার হাত পাওয়া যায়। পেছনের হাতে নারায়ণের বা লক্ষ্মী নারায়ণের পা ধরা রয়েছে। স্তম্ভের ওপর যে সব মূর্তিগুলি দেখা যায় সেগুলি অনেক সময় দুটি মূর্তি এক সঙ্গে জুড়ে দেওয়া ; অর্থাৎ সামনে ও পেছন থেকে দু দিক থেকেই গরুড় দেখা যাবে। আবার মথুরা সংগ্রহ শালাতে বিষ্ণুর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ; সম্পূর্ণ মানুষ মূর্তি; ছোট মত ডানা রয়েছে ; হাতে ছোট একটা সাপ। এটি মধ্য যুগের প্রথম দিকের। খৃ-১৭ শতকের কাঠ খোদাই একটি মূর্তি পালুরে (ত্রিবাঙ্কুরে) রয়েছে ; এর হাতে গজ কচ্ছপ। বাদামি ৬ নং গুহাতে গরুড় অমৃত হরণ করছে উৎকীর্ণ রয়েছে। দ্রঃ- সমুদ্রগুপ্ত।

গরুড়-অস্ত্র—এই অস্ত্র ছুঁড়লে নাগপাশের নাগেরা ভয়ে পালিয়ে যায়।

গরুড়ধ্বজ—(১) বেস নগরে হেলিয়োদোরাস (দ্রঃ) এই স্তম্ভ স্থাপন করেন। (২) বিষ্ণুর রথ।

গর্গ—গর্গ্য। বৃহস্পতি বংশে জন্ম ; ভরদ্বাজের (দ্রঃ) ছেলে মন্যু; মনুজ একটি ছেলে (ভাগ ৯।২১।১) গর্গ এবং গর্গের ছেলে শিনি। বিষ্ণু পুরাণে এই শিনির ছেলে গার্গ্য ও

শৈন্য এঁরা ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ। গর্গের ভাই নর এবং নরের নাতি রন্তিদেব। শিবের আরাধনায় চৌষট্টি অঙ্গ জ্যোতিষ ইত্যাদি জ্ঞান লাভ করেন। যাদবদের কুলপুরোহিত হয়েছিলেন। এই গর্গের পরামর্শেই কৃষ্ণ বলরাম সান্দীপনি আশ্রমে যান। রাম রাজা হলে এক গর্গ দেখা করতে এসেছিলেন। পৃথুর সভাতে প্রধান এবং জ্যোতির্বেত্তা। অন্য মতে ব্রহ্মার ছেলে গর্গ। দ্রঃ- গার্গ্য।

গর্গআশ্রম—(১) গগাসন ; রায়বেরিলি জেলাতে গঙ্গার তীরে অম্ন-র বিপরীত দিকে। (২) দ্রঃ- কূর্মাচল। এই লোধমুনাতে গুগাস/গগাস নদীর উৎপত্তি এবং ধৌলিতে গিয়ে মিশেছে।

গর্জপুর—গাজিপুর। এখানে ৫-শতকে ফা-হিয়েন এসেছিলেন। গর্জপুর বলে পুরাণে কোন স্থান ছিল কিনা জানা নাই। এলাকাটি ধর্মারণ্যের (দ্রঃ) অংশ।

গর্দভি—গার্দভি (মহা ১৩।৪।৫৮)। বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মবাদী এক ছেলে।

গর্ত্ত—ভরতের এক ছেলে।

গাঙ্গ—দ্রঃ- পৃ ৪৪০।

গাঙ্গেয়—ভীষ্ম।

গাণ্ডীব—অর্জুনের ধনুক। ব্রহ্মা এই ধনুক প্রথমে তৈরি করে প্রজাপতিকে দেন ; প্রজাপতি ইন্দ্রকে ; ইন্দ্র সোমকে ; সোম বরুণকে দেন (দ্রঃ- খাণ্ডবদহন)। অন্য মতে ব্রহ্মার থেকে চন্দ্র এবং চন্দ্র থেকে বরুণ। এক সময়ে বরুণালয়ে বরুণের ছেলের ধনু হিসাবে অবস্থিত ছিল। নারদ মাতলিকে দেখিয়ে ছিলেন (মহা ৫।৯৬। ১৯)। দেবতা ও মানুষ সকলের সঙ্গে এই ধনুকে যুদ্ধ করা যেত এবং ১ নিমিষে ১ লক্ষ শত্রু নিধন করা যেত। খাণ্ডব দাহের (দ্রঃ) সময় অগ্নি এই ধনুক বরুণের কাছ থেকে চেয়ে এনে অর্জুনকে দেন। মহাভারতে (৪।৩৮।৪১) আছে ব্রহ্মা এই ধনু হাজার বছর ধারণ করেছিলেন ; এরপর প্রজাপতি ১৫০০ বছর, তারপর ইন্দ্র ৮৫ বছর, সোম ৫০০ বছর এবং বরুণ ধারণ করেছিলেন ১০০ বছর ; এবং পার্থ ৬৫ বছর। দ্রঃ- মাতলি। গণ্ডারের মেরুদণ্ড দিয়ে তৈরি বলে এই নাম। এই ধনুকে অর্জুন কুরুক্ষেত্রে জয় লাভ করেন। অর্জুনের প্রতিজ্ঞা ছিল কেউ যদি তাঁকে গাণ্ডীব অপরকে দিয়ে দিতে বলেন তাহলে তাঁর শিরচ্ছেদ করবেন। কুরুক্ষেত্রে ১৭ দিনের দিন কর্ণের হাতে অর্জুন নিপীড়িত হলে যুধিষ্ঠির অর্জুনকে তিরস্কার করে উপযুক্ত লোকের হাতে গাণ্ডীব তুলে দিতে বলেন। অর্জুন তখন যুধিষ্ঠিরের শিরচ্ছেদ করতে যান কিন্তু কৃষ্ণ থামান এবং অর্জুনকে উপদেশ দেন যুধিষ্ঠিরকে তুমি বলে সম্বোধন করতে। তুমি সম্বোধন হত্যার সমান প্রতিশোধ হবে এবং অর্জুনের প্রতিজ্ঞা এই ভাবে রক্ষা হবে। অর্জুন এভাবে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করলে বড় ভাইকে অপমান করার জন্য অনুতাপে আত্মহত্যা করতে যান। কৃষ্ণ বাধা দেন এবং অর্জুনকে নিজের গুণকীর্তন করতে বলেন এবং বোঝান সেইটাই আত্মহত্যার সমান হবে। অর্জুন পরে যুধিষ্ঠিরের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন। যদুবংশ ধ্বংসের পর অর্জুন যখন যাদব নারীদের নিয়ে ফিরছিলেন তখন পথে আভীর দস্যুদের বাধা দেবার জন্য গাণ্ডীব তুলতে পারেন নি। মহাপ্রস্থানে যাবার সময় পর্যন্ত গাণ্ডীব ও

অক্ষয় তূণ-দুটি ব্যবহার করতে না পারলেও অর্জুনের কাছেই ছিল। মহাপ্রস্থানের পথে অগ্নি এসে এগুলি বরুণকে ফিরিয়ে দিতে বলেন। অর্জুন তখন এগুলি সমুদ্রে ফেলে দেন।

গাথা—বৈদিক শব্দ; অর্থ গীতি বা গেয় পদ। গাথ-গাথা শব্দের অর্থ সায়ণাচার্য মতে গাতব্য স্তোত্র; স্তুতিরূপা বাক্; সকলের দ্বারা গীত যোগ্য গীতি। প্রাচীন ইরানীয় ভাষাতেও গাথার অর্থ গীত। আবেস্তার একটি অংশের নাম গাথা, জরথুশ্ত্র রচিত বৈদিক ছন্দের অনুরূপ প্রাচীন ছন্দে লেখা কতকগুলি স্তোত্র সংগ্রহ। এই গাথা অংশের ভাষা আবেস্তার অন্য অংশের ভাষার চেয়ে প্রাচীনতর।

পরে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ইত্যাদির মধ্যে গাথার অর্থ অনেকটা বদল হয়েছে। এই গাথাগুলিতে কেবল গীত নয়; উক্তি ও প্রত্যুক্তির মাধ্যমে পুরাতন উপাখ্যানের সারাংশ উপস্থিত করা হয়েছে। পালিতে ও মিশ্র-সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্যেও গাথা এই ভাবে গীত ও কাহিনী মিলিয়ে রচিত।

গাথাসপ্তশতী—প্রাকৃত ভাষায় গাহা (গাথা) ছন্দে লেখা শ্লোকের সংকলন। প্রকৃত নাম গাহাসত্তসই। মোটামুটি ৮০০ খৃস্টাব্দের পরবর্তী সংকলন নয়। কোন কোন পুঁথিতে কোন কোন শ্লোকের রচয়িতার নামও দেওয়া আছে। মেয়েদেরও নাম রয়েছে। গ্রাম্য কবি, মেয়েলি রচনা, পণ্ডিত কবি সকলের রচনাই এতে আছে। বেশির ভাগ শ্লোক আদি রসের। মধ্য ভারতীয় আর্যভাষায় লেখা; সাধারণ লোকের উপভোগ্য কবিতা।

গাথি—কোসলে গাথি নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। এক পুষ্করিণীর জলে গলা ডুবিয়ে বসে তপস্যা করছিলেন। আট মাস এই ভাবে থাকার পর বিষ্ণু দেখা দেন; গাথি মায়াকে প্রত্যক্ষ করবেন বর চান। এর পর বহু বছর কেটে যায়। গাথি এক দিন স্নান করতে জলে ডুব দেন এবং উঠে এসে মন্ত্র ইত্যাদি সব কিছু ভুলে যান এবং মন সম্পূর্ণ বদলে যায়। তিনি প্রত্যক্ষ দেখতে পান বাড়িতে তিনি মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে আছেন। তার পর দেখেন সকলে কাঁদছে. তাঁর দেহ শ্মশানে নিয়ে গিয়ে অগ্নি সংকার করা হল। গাথি তারপর অনুভব করতে থাকেন তিনি বিদেহী আত্মা। ঘুরতে ঘুরতে এই আত্মা/গাথি এক চণ্ডাল রমণীর গর্ভে আশ্রয় পান। প্রত্যক্ষ দেখতে থাকেন কৃষ্ণকায় এক শিশু হয়ে জন্মালেন, ক্রমশ তার পর বড় হয়ে বলিষ্ঠ এক পুরুষে পরিণত হলেন এবং এর পর সুন্দরী একটি চণ্ডাল কন্যার সঙ্গে জীবন কাটাচ্ছেন। মাটিতে পর্ণশয্যায় কুঁড়ে ঘরে, ঝোপে, গুহাতে এই ভাবে জীবন কাটছে দেখতে পান এবং বহু দুষ্ট সন্তান হচ্ছে প্রত্যক্ষ করতে থাকেন। এর পর অনুভব করতে থাকেন ক্রমশ তাঁর স্বাস্থ্য ভাঙছে এবং একটি কুটির বেঁধে গাথি বৃদ্ধ চণ্ডাল, তপস্বীর মত কাটাতে থাকেন। তার পর এক দিন দেখেন হঠাৎ তাঁর সামনে স্ত্রী, সন্তানগুলি ও পরিবারে যে যেখানে ছিল মারা গেল। গাথি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন এবং কুটির থেকে বার হয়ে নিরুদ্দেশে ঘুরতে ঘুরতে কীরমণ্ডল নগরীতে এসে উপস্থিত হন। সুন্দর সাজান নগরী; এখানে রাজা মারা গেছেন। এই রাজ্যের নিয়ম অনুসারে রাজপ্রাসাদের হাতী নতুন রাজা খুঁজতে বার হয়েছিল। গাথিকে দেখে পিঠে তুলে নিয়ে প্রাসাদে

ফিরে এল। গাধির এখানে অভিষেক হল ; নতুন নাম হল গালব এবং মৃত রাজার স্ত্রীদের বিয়ে করে আর এক জীবন কাটাতে থাকেন। গাথি এ সব স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছিলেন। আট বছর এই ভাবে রাজত্ব করার পর এক দিন সাধারণ বেশে প্রাসাদ থেকে বার হলে প্রাসাদের দরজায় বসে থাকা এক দল চণ্ডাল গাথিকে চণ্ডাল বলে চিনতে পারে এবং ধরে ফেলে এবং এত দিন চণ্ডাল গাথি কোথায় ছিল জানতে চায়। রাজা গাথি কিন্তু এই চণ্ডালদের চিনতে পারেন না। এ দিকে প্রাসাদে সকলে ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে ; সারা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে গালব এক জন চণ্ডাল। ফলে সব ছেড়ে দিয়ে গাথি রাজ্য থেকে পালিয়ে যান। পথে দেখেন এক জন চণ্ডালকে এনে রাজা করার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে বহু প্রজা স্থানে স্থানে অগ্নিকুণ্ডে আত্মবিসর্জন করছে। তাঁর জন্য এত প্রজা মৃত্যু বরণ করছে দেখে গালব/গাথি ও অনুশোচনায় একটি অগ্নিকুণ্ডে আত্মত্যাগ করেন।

এই ভাবে প্রাণ ত্যাগের পর গাথির আবার সব মনে পড়ে : তিনি এখানে স্নান করতে এসেছিলেন মাত্র। সমস্ত ঘটনা কিন্তু গাথির মনে থাকে ; কোন নাটকের নায়কের মত যেন পর পর অভিনয় করেছিলেন। অথচ অভিনয় নয় ; জীবনে এগুলি সত্যই তাঁর ঘটে গিয়েছিল। গাথি তারপর কৌতূহলে কীরমণ্ডল নগরীতে গিয়ে যাচাই করে আসেন প্রতিটি ঘটনা বাস্তব ; একটুও স্বপ্ন নয়। গাথি তখন বুঝতে পারেন বিষ্ণুর বরে মায়াকে তিনি প্রত্যক্ষ করলেন। এর পর গাথি সব কিছু ত্যাগ করে এক গুহাতে গিয়ে তপস্যা করতে থাকেন (যোগবাশিষ্ঠ)।

গাদি—কামসূত্রে লবনবীথিকা নামে খেলাটির অনুরূপ খেলা।

গাধি—অন্য নাম গাধিরাজ। দুষ্মন্ত(১)—ভরত(২)—অজমীঢ়(৫)—জহ্নু(৬)—সিন্ধু-দ্বীপ(৭)—বলাকাশ্ব(৮)—বল্লভ(৯)—কুশিক(১০)—গাধি (১১) (মহা ১৩।৪।২-৫)। আবার (মহা ১২।৪৯।৩) জহ্নু>বল্লব>কুশিক>গাধি। কালীপ্রসন্নে (১২। ৪৯) জহ্নু>অজ>বলাকাশ্ব>কুশিক>গাধি। কুশ (দ্রঃ)। কুশনাভের (দ্রঃ) ঔরসে ঘৃতাচীর গর্ভে এক শত মেয়ে হয়। পরে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করে, অন্য মতে ইন্দ্রের কাছে পুত্র প্রার্থনা করলে ইন্দ্র নিজে গাধি রূপে জন্মান। মহোদয়ের রাজা গাধি যখন বনে তপস্যা করছিলেন তখন গাধির সত্যবতী নামে অপূর্ব সুন্দরী একটি মেয়ে হয় (রা ১।৩৪।৭)। ঋচীকের (দ্রঃ) সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবার পর গাধির ছেলে বিশ্বামিত্র (দ্রঃ) জন্মান। কান্যকুব্জেই সত্যবতীকে দান করেছিলেন, বিয়েতে দেবতারা জন্যাঃ (বরযাত্রী) এসেছিলেন (মহা ৩।১১৫।৯)। বিশ্বামিত্রকে রাজা করে দিয়ে গাধি বনে তপস্যা করতে যান। বনে ঋচীকের আশ্রমে বহু দিন ছিলেন। শেষ পর্যন্ত সমাধি লাভ করে স্বর্গে যান। দ্রঃ- পুরূরবা।

গাধিনগর—কান্যকুব্জের আর এক নাম।

গান্দিনী—কাশীরাজের মেয়ে। শ্বফল্কের স্ত্রী ও অক্রূরের মা। হরিবংশে এঁর নাম নিবৃত্তি। ব্রাহ্মণদের রোজ ইনি গোদান করতেন বলে নাম গান্দিনী। বহু বছর ইনি মায়ের পেটে ছিলেন ; শেষ কালে এঁর বাবা এঁকে শীঘ্র ভূমিষ্ঠ হতে বলেন।

মেয়ে তখন জানান প্রতিদিন গোদান করতে পেলে আজই তিনি জন্মাবেন। পিতা এই কথা স্বীকার করলে গান্দিনী জন্মান (হরি ১৩৪।৯)।

গান্ধার—প্রাচীন ভারতে ভরত মুনির কাল পর্যন্ত যে শ্রেষ্ঠ সংগীত প্রচলিত ছিল। পরবর্তী কালে রাগ সংগীতের জন্ম হয় এবং রাগ সংগীতের শ্রেষ্ঠ পদগুলি গান্ধারের সঙ্গে মিশে মার্গ সংগীত নামে পরিচিত। ভরত মুনি কৃত সংজ্ঞা :- তন্ত্রী বাদ্যের অন্তর্গত অপরাপর বাদ্য সমাশ্রিত স্বর, তাল ও পদযুক্ত রচনা। এই রচনা দেবতাদের বিশেষ প্রার্থিত এবং গন্ধর্বদের প্রীতিকর। এই গান্ধারে বীণার প্রাধান্য থাকলেও কণ্ঠ সংগীতও যোজিত হত।

গান্ধার/গন্ধার—সিন্ধু নদের পশ্চিম তীর থেকে আফগানিস্তানের অধিকাংশ। বর্তমানের কান্দাহার প্রাচীন গান্ধার নগরী। অতি প্রাচীন কাল থেকে ভারতের সঙ্গে নানা ভাবে যুক্ত। ঋক্ বেদে (১।১২৬।৭) অথর্ব বেদে (৫।২২।১৪) গান্ধারের উল্লেখ আছে। ঐতরেয় ও শতপথ ব্রাহ্মণে গান্ধার-রাজ নগ্নজিৎ ও ঐ বংশের স্বর্জিতের কাহিনী আছে। ছান্দোগ্যে এই দেশ ও এখানকার অধিবাসীদের আলোচনা রয়েছে। যযাতি ও শর্মিষ্ঠার ছেলে দ্রুহ্যু ; দ্রুহ্যুর প্রপৌত্র গন্ধার এবং এর থেকে এই দেশের নাম গান্ধার। বায়ু পুরাণে গন্ধারের পিতা অরুদ্ধ ; মৎস্য পুরাণে শরদ্বাজ। বিষ্ণু পুরাণে সেতুর পৌত্র গন্ধার। ভাগবত ছাড়া অন্য পুরাণে দ্রুহ্যুর ছেলে সেতু। অগ্নি পুরাণে যযাতি(১)—তুর্বসু(২)—দুষ্যন্ত(১০)—বরূথ(১১)—গাণ্ডীর(১২)—গান্ধার(১৩)। গান্ধার, কেরল, চোল, কোল ও পাণ্ড্য এঁরা ভাই। গান্ধারের এক রাজা সুবলের ছেলে শকুনি, মেয়ে ধৃতরাষ্ট্রের স্ত্রী গান্ধারী। অভিমন্যুর নাতি জনমেজয় গান্ধারে তক্ষশিলা জয় করেন। গান্ধারের কাছে কেকয় দেশের রাজকন্যা কৈকেয়ী ভরতের মা। রাম রাজা হলে কেকয়রাজ যুধাজিৎ রামকে গান্ধার জয় করতে বলেন ফলে রাম ভরতকে দিয়ে জয় করান। ভরতের ছেলে পুষ্কর ও তক্ষ, এদের নাম অনুসারে গান্ধারে তাঁদের রাজধানী হয় পুষ্করাবতী ও তক্ষশিলা।

গন্ধর্ব দেশ। কাবুল নদীর তীরবর্তী দেশ ; খোয়াসপেস ও সিন্ধুর মধ্যবর্তী অংশ। পেশোয়ার ও উত্তর পাঞ্জাবের রাওলপিণ্ডি জেলা মিলে। রাজধানী পুরুষপুর ও তক্ষশিলা (আলেকজেন্দ্রীয়)। টলেমি বলেছেন গান্ধারের পশ্চিম সীমা সিন্ধু। পারস্য রাজ দারিয়ুস তাঁর রাজত্বের ৫-ম বর্ষে বেহিস্তুন শিলালিপিতে (৫১৬ খৃ-পূ) গান্ধার ও অন্যান্য রাজ্য জয় করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। জারেক্সস্-এর এক সেনাপতির অধীনে গান্ধার সৈন্য ও ডাডিক সৈন্য এক সঙ্গে ছিল। হিউ-এন-ৎসাঙ গান্ধারকে বলেছেন কিয়ানতোলো ; স্ট্রাবো বলেছেন কুন্দর গান্ধ্রিডো; আইন-ই আকবরিতে এটি পুকেলি জেলা ; কাশ্মীর ও এটোকের মধ্যবর্তী অংশে। গান্ধার বলতে পেশোয়ার, রাওলপিণ্ডি, সোয়াৎ, ও হোটিমর্দান (=ইউসুফজোই) দেশ। পেশোয়ার জেলাতে ইউসুফজোই পরগণাতে জামালগিরি পেশোয়ার থেকে ৩০ মাইল দূরে ; জামালগিরিতেও বহু ভাস্কর্য পাওয়া গেছে। পুষ্করাবতী=পুষ্কলাবতী =পুকেলি ; গান্ধারের প্রাচীন রাজধানী ; বর্তমানে নাম হস্তনগর ; দ্বিতীয়

রাজধানী ছিল পুরুষপুর। রামায়ণে এটি গন্ধর্বদেশ ; মহাভারত ও বৌদ্ধযুগে গান্ধার, কথাসরিৎসাগরে এটি পুষ্করাবৎ ; বিদ্যাধরদের রাজধানী। কোরিন্থিয়ান স্থাপত্য ছিল সারা ইউসুফজোই দেশে ; ডোরিক স্থাপত্য ছিল কাশ্মীরে এবং আয়োনিক স্থাপত্য ছিল তক্ষশিলা বা সহ্যাদ্রিতে (এটোক ও রাওলপিণ্ডির মধ্যে)। ভিক্ষু মঝ্ঝন্তিকাকে (২৪৫ খৃ-পূ) অশোক গান্ধারে পাঠান। চন্দ্রগুপ্ত ও অশোক এটি জয় করেছিলেন এবং এগাথোক্লেস মৌর্যদের তাড়িয়ে আবার এটি দখল করেন। সিন্ধু নদীর এই গান্ধাররা মনে হয় খৃ ৫-ম শতকে কান্দাহারে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন।

গান্ধারে সালাতুরে (৬০০ খৃ-পূ মত) পাণিনি জন্মান। খৃ-পূ ৬ শতকের প্রথমার্ধে গান্ধার ষোড়শ মহাজনপদের অন্যতম ছিল। ৬ শতকের শেষার্ধে গান্ধার পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। আলেকজান্দারের আক্রমণ কালে পুষ্পলাবতী, তক্ষশিলা, গান্ধার ইত্যাদি ছোট ছোট রাজ্যে উত্তর পশ্চিম ভারত বিভক্ত ছিল। এর পরে এগুলি মৌর্য সাম্রাজ্যের অধীন হয়। অশোকের রাজত্ব কালে (২৭৩-২৩২ খৃ-পূ) গান্ধারের সীমা ছিল সিন্ধু নদের পশ্চিম পর্যন্ত ; তক্ষশিলা তখন গান্ধারের অন্তর্গত ছিল না। সে যুগে গান্ধারের সীমানা ছিল উত্তরে সোয়াৎ ও বুনের-এর পাহাড়। দক্ষিণে কালবাগের পাহাড়, পূর্বে সিন্ধু এবং পশ্চিমে লমঘান ও জালালাবাদ। পূর্ব সীমা অনেক সময় আরো এগিয়ে আসত এবং পাঞ্জাবের রাওলপিণ্ডি জেলাও এক সময় গান্ধারের অন্তর্গত ছিল। গান্ধারের রাজধানী হিসাবে তিনটি নগরী প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল ঃ- পুষ্পলাবতী (পেশোয়ারের ২৭ কি-মি উত্তর পূর্বে চারসাদা ও প্রাঙ্গ), পুরুষপুর (পেশোয়ার) ও তক্ষশিলা। প্রথম দুটি সিন্ধু নদের পশ্চিমে ; তক্ষশিলা পূর্বে। সম্ভবত অশোকের সময় এখানে বৌদ্ধধর্ম প্রসারিত হয়। ভারতের প্রবেশ পথে গান্ধার ; ফলে বহু বিদেশী আক্রমণ এখানে হয়েছিল। মৌর্য সাম্রাজ্যের পর ইন্দোগ্রীক, শক, পহ্লব ও কুষাণেরা এসেছিল। এই বিদেশীরা কিন্তু বৌদ্ধধর্মের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতি দেখিয়ে ছিলেন এবং এই সময়ে এখানে বহু বৌদ্ধ সৌধ তৈরি হয়েছিল। ইন্দো-গ্রীক রাজা মেনান্দের বৌদ্ধ ধর্ম নিয়েছিলেন। থেওদোরুস নামে একজন গ্রীক সোয়াৎ উপত্যকায় বুদ্ধদেবের দেহাবশেষের ওপর স্তূপ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ক্ষত্রপ পুত্র শক-পতিক (খৃ-পূ ১-শতক) তক্ষশিলাতে শাক্য মুনির দেহাবশেষ প্রতিষ্ঠা ও সংঘারাম তৈরি করে দিয়েছিলেন। ফা-হিয়েন ও সুং য়ুন (৬ শতকের প্রথমপাদে) ও হিউ-এন-ৎসাঙ (৭ শতকের মধ্য ভাগে) এই তিন জনেই বলেছেন মহারাজ কনিষ্ক তাঁর রাজধানী পুরুষপুরে ভারতের উচ্চতম স্তূপ তৈরি করেছিলেন। ফা-হিয়েন এসেছিলেন একটি সমৃদ্ধ দেশে এবং বহু বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান দেখেছিলেন। হিউ-এন-ৎসাঙও বহু বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান দেখেছিলেন কিন্তু গান্ধারের রাজপরিবার তখন লুপ্ত ; দেশ কপিশির (কাফিরিস্তান) অধীন, নগর ও গ্রাম জনহীন, বৌদ্ধদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। অধিবাসীরা বেশির ভাগ ভিন্ন ধর্মী। জনগণ সাহিত্য অনুরাগী। প্রায় সহস্র সংঘারাম তখন ধ্বংসপ্রাপ্ত ও লোকশূন্য ; অবৌদ্ধ মন্দির সংখ্যা ১০০ মত। এদের মধ্যে পো-লু-ষে'র উত্তর পূর্বে একটি উঁচু পাহাড়ের পাদদেশে

মহাদেবের মন্দির ও মহাদেবের স্ত্রী ভীমা দেবীর অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন মূর্তিরও উল্লেখ করেছেন। এই ভীমা দেবী পর্বতই সম্ভবত মহাভারতের ভীমাস্থান। হিউ-এন-ৎসাঙ এ দেশের পূর্বতন শাস্ত্রকারদের নাম বিশেষ করে উল্লেখ করেছেন যেমন: নারায়ণদেব, অসঙ্গ, বসুবন্ধু, ধর্মত্রাতা, মনোরথ ও পার্শ্ব।

আফগানিস্তান ও মধ্য এসিয়াতে বৌদ্ধধর্ম প্রসারের মূলে বিদেশী রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় গান্ধারের অবদান অপরিসীম। এখানে প্রচুর বৌদ্ধ প্রত্নকীর্তি রয়েছে এবং এগুলি মোটামুটি খৃ ১-৫ শতকে নির্মিত। জালালাবাদ, হাড্ডা, বামিয়ান, পেশোয়ার, তখৎ-হি-বাহি, সাহরিবাহ্‌লোল, জামালগড়ি, তক্ষশিলা, মানিকিয়ালা প্রত্নকীর্তিতে সমৃদ্ধ; বামিয়ান-এ গুহাচিত্র ও অতিকায় বুদ্ধমূর্তি রয়েছে। একটি মূর্তির উচ্চতা ৫১ মিটার।

নানা রীতি এসে মিশে গান্ধারের এক অভূতপূর্ব শিল্পকলা গড়ে তুলেছিল। এখানকার বুদ্ধ প্রতিমা বাহ্যত যবন রীতি অনুগ; কিন্তু তবুও এতে ভারতীয় ভাবাদর্শ অনুযায়ী মহাপুরুষের সমস্ত লক্ষণ বিদ্যমান। কোন কোন পণ্ডিতের মতে গান্ধারেই প্রথম বুদ্ধমূর্তি তৈরি হয়েছিল। সুদীর্ঘ ৪-শত বছর ধরে গান্ধার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুদ্ধের জন্ম থেকে মহানির্বাণ পর্যন্ত ঘটনাগুলিকে অজস্র ভাস্কর্যে রূপ দিয়েছে। উপজীব্য ঘটনা কখনও সত্য কখনও কিংবদন্তি। জাতক কাহিনীর চেয়ে বুদ্ধদেবের জীবন কাহিনী গান্ধারকে বেশি আকৃষ্ট করেছিল। অবশ্য মৈত্রেয় প্রমুখ কয়েক জন বোধিসত্ত্ব, হারিতী ও তাঁর স্বামী পাঞ্চিকও কোথাও কোথাও শিল্পের কিছু উপজীব্য হয়েছেন।

এখানে স্তূপ ছিল মুখ্য উপাস্য। বর্তমানে সামান্য কিছু স্তূপ বাদে অধিকাংশ স্তূপগুলিরই কেবল নিম্নাংশ পড়ে আছে। স্তূপ অর্ধগোলক বা স্তম্ভের আকার দু রকম হত। স্তূপের গা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে উপস্তম্ভ, বুদ্ধপ্রতিমা ও অন্যান্য মূর্তি দিয়ে অলংকৃত। বেশির ভাগ মুখ্য স্তূপের পাশে ছোট ছোট গৌণ দেবায়তন রয়েছে। প্রতি বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানে এক বা একাধিক স্তূপ এবং সংঘারাম ছিল। একাধিক তল বিশিষ্ট সংঘারামও ছিল। এখানকার সংঘারামগুলির বিন্যাস রীতি মোটামুটি ভারতীয় সংঘারামগুলির মত। দ্রঃ- শিব।

গান্ধারী—গান্ধার (দ্রঃ) দেশের রাজা সুবলের মেয়ে; ধৃতরাষ্ট্রের স্ত্রী। দেশের নাম অনুসারে নাম। গান্ধারীর ভাই শকুনি, বৃষক, অচল। মতি গান্ধারী হয়ে জন্মান (মহা ১।৬১।৯৮)। গান্ধারী শৈশব থেকে শিব ভক্ত এবং বর পান এক শত ছেলে হবে। ভীষ্ম এই বরের কথা জানতে পেরে রাজা সুবলের কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। অন্ধ হলেও বংশ মর্যাদা হিসাব করে সুবল রাজি হন। গান্ধারী শুনে নিজের চোখে কাপড় বেঁধে ফেলেন এবং ন অতি অশ্নীয়াম্‌ সঙ্কল্প করেন। অত্যন্ত পতিব্রতা ও ধর্মশীলা (মহা ১।১০৩।১৩)। ভাই শকুনি বোনকে হস্তিনাপুরে নিয়ে আসেন এবং এই খানেই বিয়ে হয়। ক্ষুধায় কাতর ব্যাসকে খাইয়ে তৃপ্ত করে ব্যাসের কাছেও ১০০ ছেলে হবে বর পান (মহা ১।১০৭।৮)। গর্ভবতী হয়ে দু বছরেও কোন সন্তান না হওয়াতে এবং কুন্তীর

ছেলে হবার সংবাদে ঈর্ষায় (গর্ভকে ভর্ৎসনা করেন বা) স্বামীকে না জানিয়ে গর্ভপাত করেন। একটি মাংস পিণ্ড প্রসব হওয়াতে গান্ধারী ফেলে দিচ্ছিলেন। কিন্তু ব্যাসদেব বাধা দেন; এটিকে ঠাণ্ডা জলে ভিজিয়ে একশ এক ভ্রূণে ভাগ করে একশ এক ঘিয়ের কুণ্ডে ভিজিয়ে মাঝে মাঝে এগুলিকে নেড়ে দিতে হবে (মহা ১।১০৭।২২) বলে ব্যাস হিমালয়ে তপস্যাতে চলে যান। এর এক বছর পরে দুর্যোধন এবং আর এক মাসের মধ্যে অন্য ৯৯-টি ছেলে ও দুঃশলা নামে একটি মেয়ে হয়। ভীম ও দুর্যোধন এক দিনে জন্মান (গীতা-প্রেস)। এদের নাম বয়স অনুসারে (মহা ১।১০৮ ভাণ্ডারকর) ঃ- দুর্যোধন, যুযুৎসু, দুঃশাসন, দুঃসহ, দুঃশল, জলসংধ, সম, সহ, বিন্দ, অনুবিন্দ, দুর্ধর্ষ, সুবাহু, দুষ্প্রধর্ষ, দুর্মর্ষণ, দুর্মুখ, দুষ্কর্ণ, কর্ণ, বিংশতি, বিকর্ণ, শলসত্ব সুলোচন, চিত্র, উপচিত্র, চিত্রাক্ষ, চারুচিত্র, শরাসন, দুর্মদ, দুষ্প্রগাহ, বিবিৎসু, বিকট, সম, ঊর্ণনাভ, সুনাভ, নন্দ, উপনন্দক, সেনাপতি, সুষেণ, কুণ্ডোদর, মহোদর, চিত্রবাণ, চিত্রবর্মা, সুবর্মা, দুর্বিমোচন, অয়োবাহু, মহাবাহু, চিত্রাঙ্গ, চিত্রকুণ্ডল, ভীমবেগ, ভীমবল, বলাকী, বলবর্দ্ধন, উগ্রায়ুধ, ভীমকর্মা, কনকায়ুধ, দৃঢ়ায়ুধ, দৃঢ়বর্মা, দৃঢ়ক্ষত্র, সোমকীর্তি, অনূদর, দৃঢ়সন্ধ, জরাসন্ধ, সত্যসন্ধ, সদঃসুবাক, উপশ্রবা, অশ্বসেন, সেনানী, দুষ্পরাজয়, অপরাজিত, পণ্ডিতক, বিশালাক্ষ, দুরাধর, দৃঢ়হস্ত, স্বহস্ত, বাতবেগ, সুবর্চস্, আদিত্যকেতু, বহ্বাশী, নাগদন্ত, উগ্রযায়ী, কবচী, নিষঙ্গী, পাশী, দণ্ডধার, ধনুর্গ্রহ, উগ্র, ভীমরথ, বীরবাহু, অলোলুপ, অভয়, রৌদ্রকর্মা, দৃঢ়রথ, অনাধৃষ্য, কুণ্ডভেদী, বিরাবী, দীর্ঘলোচন, দীর্ঘবাহু, মহাবাহু, ব্যূঢ়োরু, কনকধ্বজ, কুণ্ডাশী, বিরজা—ধৃতরাষ্ট্রের মোট ১০১ ছেলে। মহাভারতের বিভিন্ন সংস্করণে এই নামের তালিকা এক নয়। এ ছাড়া ছাপার ভুল আছেই।

পাশা খেলায় জয়লাভ করে দ্রৌপদীকে সভামধ্যে অপমান করলে গান্ধারী একাধিক বার স্বামীর কাছে দুর্যোধনকে ত্যাগ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। অজ্ঞাত বাসের পর সন্ধি স্থাপনের জন্য পাণ্ডবরা দূত পাঠালে তখনও গান্ধারী রাজ-সভায় এসে দুর্যোধনকে তিরস্কার করে বলেছিলেন ধর্মহীন ঐশ্বর্যের পরিণাম মৃত্যু। ফলে দুর্যোধন অবজ্ঞায় সভা ত্যাগ করেন। দুর্যোধনকে প্রশ্রয় দেবার জন্য স্বামীকে তিনি সকলের সামনে দায়ী করেছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আরম্ভের আগে দুর্যোধন মার কাছে আশীর্বাদ চাইতে এলে গান্ধারী বলেছিলেন ধর্ম যেখানে সেখানে জয়। দুর্যোধনের ঊরু ভঙ্গের পর কৃষ্ণ হস্তিনাপুরে ছুটে আসেন সান্ত্বনা দিতে এবং তৎক্ষণাৎ ফিরে যেতে চান; বলেন অশ্বত্থামার হাত থেকে পাণ্ডবদের রক্ষা করতে হবে। গান্ধারী সর্বান্তকরণে কৃষ্ণকে অনুমোদন করেন (মহা ৯।৬২।৭০)। গান্ধারী তার পর স্বামী ও পুত্রবধূদের নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে আসেন এবং পাণ্ডবদের শাপ দিতে উদ্যত হন। ব্যাসদেব গান্ধারীকে তখন শান্ত করেন এবং ভীম ক্ষমা চান। গান্ধারী তখন রাগে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দেখা করতে চান। যুধিষ্ঠির এগিয়ে এসে সমস্ত অপরাধের দায়িত্ব নিজের মাথায় তুলে নিয়ে অভিশপ্ত হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে গান্ধারীর পায়ে হাত দিলে চোখে বাঁধা কাপড়ের ফাঁক দিয়ে গান্ধারী যুধিষ্ঠিরের পায়ের আঙুলের মাথার দিক দেখতে পান। ফলে যুধিষ্ঠিরের আঙুলগুলির এই অংশ কালো কুৎসিত হয়ে ওঠে। ক্ষোভে ভীমের সঙ্গে কথা বলেন। ভীম সান্ত্বনা

দেন ; ভয়ে ভয়ে বলেন দুঃশাসনের রক্ত মুখে তুলে নিলেও রক্তপান করেন নি (মহা ১১।১৪।১৫)। গান্ধারী শেষ অবধি বলেন দুজন অন্ধের জন্য যষ্টিঃ একা ন বর্জিতা কথম্ (মহা ১১।১৪।২১)। যুদ্ধ বন্ধ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কৃষ্ণ তা করেন নি এই জন্য গান্ধারী কৃষ্ণকে শাপ দেন ছত্রিশ বছর পরে জ্ঞাতিদের বিনাশ করবেন। আত্মীয় স্বজন হারিয়ে বনের মধ্যে কৃষ্ণকে নিকৃষ্ট ভাবে নিহত হতে হবে এবং যাদব নারীরাও কুরু-নারীদের মত হাহাকার করবে। দ্রৌপদীকেও গান্ধারী সান্ত্বনা দেন (মহা ১১।১৪।২০)। নিজেদের দোষে (মহা ১১।২৫।৪১) কৌরবরা নিহত হয়েছিল জেনেও বিচলিত ও ধৈর্যচ্যুত হয়ে এই শাপ দেওয়া। শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণ (মহা ১১।২৬।৫) তিরস্কার করে গান্ধারীকে চুপ করান।

পাণ্ডবরা রাজা হবার পর গান্ধারীরা ১৫ বছর পাণ্ডবদের কাছেই ছিলেন। সকলেই গান্ধারীকে শ্রদ্ধা করত। এর পর পাণ্ডবদের মত নিয়ে গঙ্গাতীরে রাজর্ষি শতযূপের আশ্রমে ধৃতরাষ্ট্র (দ্রঃ) বাণপ্রস্থে চলে যান। সঙ্গে গান্ধারী কুন্তী, বিদুর (ও বহু কৌরব রমণীও) গিয়েছিলেন। পাণ্ডবরা এক দিন কুন্তীর সঙ্গে দেখা করতে আসেন পথে ব্যাসদেবও এঁদের সঙ্গী হন। ধৃতরাষ্ট্রের শোক লাঘব করার জন্য গান্ধারীর অনুরোধে ব্যাসদেব তপোবলে কুরুক্ষেত্রে নিহত সমস্ত যোদ্ধাদের এক দিনের জন্য পুনর্জীবিত করে সকলকে দেখান। ধৃতরাষ্ট্র সাময়িক ভাবে দৃষ্টি ফিরে পেয়ে এঁদের দেখেন। বনবাসে গান্ধারী কেবল মাত্র জল খেয়ে তপস্যা করতেন। বাণ-প্রস্থের তৃতীয় বৎসরে এঁরা বনের মধ্যে গিয়ে বাস করতে থাকেন। বনে এক দিন অন্য মতে আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে দেখা হবার দুদিন পরে, হঠাৎ দাবানল জ্বলে উঠলে ধৃতরাষ্ট্র, কুন্তী ইত্যাদি পূর্বাস্য হয়ে বসে প্রাণ বিসর্জন করেন। গান্ধারী কুবের লোক প্রাপ্ত হন। (২) অজমীঢ়ের স্ত্রীর নামও গান্ধারী। (৩) হরিবংশে (২।৬০) রাজা শৈব্যের মেয়ে ; কৃষ্ণের প্রধান একটি স্ত্রী।

গান্ধারী—ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশের প্রাকৃত ভাষার নাম। এই ভাষার যাবতীয় নিদর্শন খরোষ্ঠী লিপিতে। অশোকের শাহ্-বাজগাঢ়ি ও মনসেরা শিলালিপি, ইন্দো গ্রীক রাজাদের ও শক-ক্ষত্রপদের কিছু অনুশাসন, মধ্য এসিয়া থেকে প্রাপ্ত ধর্মপাদ ও অন্যান্য গ্রন্থ এবং কাঠ, চামড়া বা রেশমের ওপর কিছু দলিল এই গান্ধারী প্রাকৃতে লেখা।

গায়ত্রী—(১) বৈদিক ছন্দ (দ্রঃ-গরুড়)। (২) সূর্যের ঘোড়া। (৩) বেদের কয়েকটি শ্লোক। ঋক্‌বেদে (৩।৬২।১০) শ্লোকটিকে গায়ত্রী বলা হয়। শ্লোকটি :—ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যাং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধীয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ। এটির অন্য নাম সবিতা মন্ত্র। এর অর্থ সর্বলোক প্রকাশক সর্বব্যাপী সেই সবিতা মণ্ডল জগৎ প্রসবিতা পরম দেবতার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করি ; যিনি আমাদের সকল বুদ্ধিবৃত্তি দিয়েছেন।

দেবী রূপী এই গায়ত্রী ব্রহ্মার স্ত্রী ও চতুর্বেদের জননী। গায়ত্রীর ধ্যানে আছে ইনি সূর্যমণ্ডল মধ্যস্থা, ব্রহ্মরূপা, বিষ্ণুরূপা বা শিবরূপা, হংসাস্থিতা, বা গরুড়াসনা,

বা বৃষবাহনা। গায়ত্রী একাধারে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব এবং তিন বেদ। দ্বিজগণের উপাস্য মন্ত্র এই গায়ত্রী। সকালে, দুপুরে ও সন্ধ্যায় এই মন্ত্রে সবিতাকে ধ্যান করতে হয়। যাঁরা এই মন্ত্র গান বা পাঠ করেন তাঁরা মুক্তি পান এই জন্য এই মন্ত্রের নাম গায়ত্রী ঃ-গায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাৎ গায়ত্রী ত্বং ততঃ স্মৃতা। গায়ত্রীর তিনটি রূপ ঃ- প্রাতঃ কালে ব্রাহ্মী, রক্তবর্ণা, হাতে কমণ্ডলু, অক্ষমালা। মধ্যাহ্নে বৈষ্ণবী শঙ্খচক্রগদাপাণি। সন্ধ্যাতে শিবানী বৃষবাহিনী, হাতে শূল, পাশ, ও নরকপাল ; গলিতযৌবনা। বেদজ্ঞ আচার্যের কাছে এই মন্ত্রে দীক্ষিত হলে তখন পুনর্জন্ম হয় বা দ্বিজপদবাচ্যতা আসে। বৈদিক গায়ত্রী মন্ত্রের অনুকরণে বিভিন্ন দেবতার গায়ত্রী মন্ত্র রয়েছে। যেমন নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ বা শ্রীমদ্দক্ষিণাকালিকায়ৈ বিদ্মহে শ্মশানবাসিন্যৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ বা পশুপাশায় বিদ্মহে (পশু গায়ত্রী) ইত্যাদি ইত্যাদি তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে তান্ত্রিক গায়ত্রী জপের ব্যবস্থা আছে।

সব থেকে কৌতূহলদীপক কাম গায়ত্রী ঃ কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তৎ নঃ অনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ। যৌন আবেদনের (লিবিডো) ওপর ভিত্তি করে এই গায়ত্রীর তথা সহজিয়া সম্প্রদায়গুলির জন্ম। লিবিডোকে এ ভাবে কাজে লাগাতে গিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই লাম্পট্য এসে পড়েছিল। রাধা (দ্রঃ) ও রাসের (দ্রঃ) সৃষ্টি হয়েছিল। অবশ্য আচার্যদের চেষ্টায় কোন ত্রুটি ছিল না। না জেনেও এঁরা বিজ্ঞান ভিত্তিক অধিবারণের (ইনহিবিসান) দিকে এগিয়ে যেতে চেয়েছিলেন ; বলেছিলেন ভুক্তি থেকে মুক্তি আসবে। বৈষ্ণবদের উজ্জ্বল রস অতুলনীয়।

ব্রহ্মার যজ্ঞে সমস্ত যখন প্রস্তুত তখন ব্রহ্মার স্ত্রী সাবিত্রী একা যজ্ঞ স্থলে আসতে রাজি হন না। লক্ষ্মী, সতী ইত্যাদি সকলে এলে তিনি এক সঙ্গে আসবেন ; যজ্ঞ কিছু ক্ষণের জন্য বন্ধ থাকুক বলে পাঠান। ব্রহ্মা তখন কুপিত হয়ে অন্য কোন নারীকে তাঁর পত্নী হিসাবে নিয়ে আসতে বলেন যাতে যজ্ঞের শুভ মুহূর্ত যেন চলে না যায়। ইন্দ্র তখন বার হয়ে পড়েন এবং সুরূপা, সুভাষা, চারুলোচনা এক আভীর কন্যাকে পথে বসে দুধ ইত্যাদি গোরস বিক্রি করছে দেখতে পান। ইন্দ্র এঁকে জোর করে ধরে নিয়ে আসেন এবং বিষ্ণুর অনুরোধে ব্রহ্মা (দ্রঃ) এঁকে গন্ধর্ব মতে বিয়ে করে যজ্ঞ নিষ্পন্ন করেন (শব্দ-কল্পদ্রুম)। ইনিই গায়ত্রী।

গার্গী—বা গার্গীবাচক্নবী। বৈদিক যুগে এক জন বিদুষী ঋষি কন্যা। গর্গ মুনির মেয়ে। বেদের বহু মন্ত্রের রচয়িতা। আজীবন ব্রহ্মচারিণী ছিলেন এবং শাস্ত্রচর্চা করতেন। ঋক্ বেদের গৃহ্যসূত্রে আছে ব্রহ্মযজ্ঞ করার সময় এঁকেও শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। জনক রাজা মিথিলায় এক যজ্ঞ করে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের নিয়ে আসেন। যজ্ঞ শেষে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ ও বেদজ্ঞকে জানবার ইচ্ছায় এবং দক্ষিণা দেবার জন্য ঘোষণা করেন যিনি শ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মিষ্ঠ তিনি দানের এক হাজার গরু নিতে পারেন ; এগুলির শিঙ সোনা দিয়ে বাঁধান। যাজ্ঞবল্ক্য তখন এই দান নিতে যান। রাজ-পুরোহিত অশ্বল ইত্যাদি তখন যাজ্ঞবল্ক্যকে পরীক্ষা করতে চান; অবশ্য যাজ্ঞবল্ক্য অনায়াসে জয়ী হন। এরপর গার্গী এগিয়ে এসে প্রশ্নে যাজ্ঞবল্ক্যকে জর্জরিত করে

তোলেন। বৈদিক অনুশাসন লঙ্ঘন করে উত্তেজনায় গার্গী সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রশ্ন করতে থাকেন। যাজ্ঞবল্ক্য তখন গার্গীকে থামতে বলেন নতুবা বেদ বিধি অনুসারে গার্গীর মাথা খসে পড়বে। এর পরেও গার্গী দুটি প্রশ্ন করেন। তাঁর একটি প্রশ্ন আকাশ কি কারণে ওতপ্রোত হয়ে আছে। এর উত্তর যাজ্ঞবল্ক্য সঠিক দিতে পারেন। দু জনের পাণ্ডিত্য দেখে সকেলই মুগ্ধ হয়ে যান এবং গার্গী নিজেও যাজ্ঞবল্ক্যের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন (বৃহদারণ্যক)।

গার্গ্য—মহর্ষি। দ্রঃ- শৈশিরায়ণ। অন্ধকবৃষ্ণিদের গুরু। বৃষ্ণি বংশেই বিয়ে। দ্রঃ- কৃষ্ণ। ব্রহ্মচারী ; স্ত্রী সহবাস করতেন না। ফলে গার্গ্য ঊর্দ্ধরেতা ছিলেন। এক বার এঁর এক শালা গার্গ্যের পুরুষত্ব পরীক্ষার জন্য বীর্যপাত হয় কিনা প্রমাণ চান। কিন্তু ঊর্দ্ধরেতা বলে বীর্যপাত হয় না এবং নপুংসক বলে অপবাদ রটে যায়। গার্গ্য তখন রেগে গিয়ে লোহা চুর খেয়ে বারো বছর মহাদেবের তপস্যা করে বর পান যে অন্ধক ও বৃষ্ণি ধ্বংসকারী তাঁর এক অজেয় ছেলে হবে। এক জন যবন রাজা এই বর লাভের কথা জানতে পেরে গোপালী নামে এক অপ্সরাকে তাঁর সঙ্গে মিলিত করে দেন (হরি ২।৫৭। ১৫)। গোপালীর গর্ভে কালযবন (দ্রঃ) জন্মান এবং যবন রাজের মৃত্যু হলে রাজা হন। (২) বিশ্বামিত্রের এক ছেলে। (৩) ত্রিজট নামে মুনি। এঁর বহু সন্তান হয়েছিল। ইনি যখন পুত্র পরিবার নিয়ে বনে বাস করছিলেন তখন রামচন্দ্র বনে যাবার প্রাক্‌কালে বহু ব্রাহ্মণকে সাধ্য মত দান করছিলেন। গার্গ্যের স্ত্রী খবর পেয়ে স্বামীকে তৎক্ষণাৎ রামের কাছে পাঠিয়ে দেন। যমুনার তীরে কিছু গরু চরছিল, রামচন্দ্র এই গরুগুলি এঁকে দান করেন। (৪) বেদের এক শাখার প্রবর্তক এক জন ঋষি। বহু সময় গর্গ (দ্রঃ) ও গার্গ্য যেন একই ব্যক্তি। দ্রঃ- ব্যাস।

গালব—বিশ্বামিত্রের প্রিয় শিষ্য। একটি ছেলের নামও। ত্রিশঙ্কুর (দ্রঃ) কারণে যখন ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয় তখন বিশ্বামিত্র কৌশিকী নদীর তীরে তপস্যা করছিলেন। বিশ্বা-মিত্রের পরিবারের সকলে বিশেষ বিপন্ন হয়ে পড়লে বিশ্বামিত্রের স্ত্রী ছেলেদের নিয়ে ভীষণ চিন্তায় পড়েন এবং মেজ ছেলেটিকে গলায় কুশের/দর্ভ ঘাসের দাড় বেঁধে বিক্রি করবার জন্য বাজারে নিয়ে যান ; এই জন্য নাম হয় গালব। একে বিক্রি করে কিছু অর্থ সংগ্রহ করতে চেয়েছিলেন। মা ও ছেলে দু জনেই কাঁদছিলেন। শেষস্য ভরণার্থায় (হরিবংশে ১।১২।২১) ১০০ গরুর বদলে বিক্রি করতে চেয়েছিলেন। ত্রিশঙ্কু দেখতে পান ; সব শুনে বিক্রি করতে নিষেধ করেন এবং বিশ্বামিত্র না ফেরা পর্যন্ত প্রতি দিন এঁদের সকলের আহারের ব্যবস্থা করবেন প্রতিশ্রুতি দেন। প্রতি দিন মৃগয়া করে আশ্রমে একটি গাছে এই মাংস ঝুলিয়ে রেখে আসবেন কথা দেন।

শিক্ষা শেষে বিশ্বামিত্রকে শিষ্য-গালব গুরুদক্ষিণা নেবার জন্য বার বার অনুরোধ করলে বিশ্বামিত্র রেগে গিয়ে চাঁদের মত সাদা এবং একটি কাণ শ্যামবর্ণ এই রকম আটশত ঘোড়া চান (মহা ৫।১০৪।২৬)। গালব চিন্তিত হয়ে বিষ্ণুর আরাধনা করতে থাকেন এবং সারা দেশ ঘুরে বেড়ান। এই সময় গালবের বাল্য বন্ধু গরুড় (দ্রঃ) এসে ঋষভ পর্বতে নিয়ে যান এখান থেকে বার হলে পথে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে দেখা হয়। বিশ্বামিত্র আবার

দক্ষিণা চান। গরুড় তখন পরামর্শ দিয়ে যযাতির কাছে পৌঁছে দেন। কিন্তু রাজা যযাতির সামর্থ্য ছিল না। যযাতি ঘোড়ার বদলে নিজের মেয়ে মাধবীকে দান করেন এবং বলে দেন যে কোন রাজার হাতে এই মাধবীকে শুল্ক হিসাবে দিলে সেই রাজা গালবকে আট-শত ঘোড়া দিয়ে দেবেন। গালব তখন সন্তানার্থী অযোধ্যারাজ হর্যশ্বের কাছে যান। রাজা শুল্ক হিসাবে মাত্র দুশো ঘোড়া আছে দেবেন বলেন। মাধবী তখন গালবকে জানান এক মুনির বর আছে প্রতি বার সন্তান হবার পর আবার তিনি কুমারী হয়ে যাবেন। সুতরাং গালব ক্রমান্বয়ে চার জন রাজার হাতে মাধবীকে দিয়ে আটশো ঘোড়া সংগ্রহ করতে পারেন। এর ফলে মাধবীরও চারটি ছেলে হবে। গালব তখন হর্যশ্বের কাছ থেকে দুশো ঘোড়া নেন। হর্যশ্বের ছেলে হয় বসুমনা। এর পর ক্রমান্বয়ে গালব মাধবীকে কাশীরাজ দিবোদাস (ছেলে হয় প্রতর্দন) এবং ভোজ রাজ উশীনরের (ছেলে হয় শিবি) হাতে দেন। এরপর গরুড় এসে জানান আর ঘোড়া পাওয়া যাবে না। কারণ এই রকম এক হাজার ঘোড়া ঋচীক বরুণের কাছে পেয়েছিলেন এবং কান্যকুব্জরাজ গাধিকে দিয়ে গাধির মেয়ে সত্যবতীকে বিয়ে করেন। গাধি পুণ্ডরীক যজ্ঞ করে (মহা ৫।১১৭।৭) এই সব ঘোড়া ব্রাহ্মণদের দান করেন এবং ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে, হর্যশ্ব, দিবোদাস ও উশীনর দুশো করে ঘোড়া কিনে নিয়েছিলেন। বাকি ৪০০ ঘোড়া চুরি গেছে। এর ফলে উপায়ান্তর কোন কিছু না পেয়ে গালব তখন বিশ্বামিত্রকে ৬০০ ঘোড়া ও বাকি ২০০ ঘোড়ার বদলে মাধবীকে গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন ; বিশ্বামিত্র মাধবীর চতুর্থ পুত্রের জনক হতে পারেন। বিশ্বামিত্র স্বীকৃত হন ; ছেলে হয় অষ্টক। পরে বিশ্বামিত্র এই ছেলেকে ধর্ম অর্থ ও ঘোড়াগুলি দিয়ে এবং মাধবীকে গালবের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বনে চলে যান তপস্যা করতে।

গালব যেখানে আশ্রমে তপস্যা করতেন সেখানে অসুর পাতালকেতু তাঁকে নিয়মিত উৎপীড়ন করছিলেন। মুনি এক দিন হতাশ হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলেন ; সঙ্গে সঙ্গে আকাশ থেকে একটি ঘোড়া নেমে আসে, (দ্রঃ- বিভাবসু) এবং দৈববাণী হয় ঘোড়াটি দিনে হাজার যোজন যেতে পারবে। মুনি ঘোড়াটিকে কুবলাশ্বের (দ্রঃ) হাতে তুলে দেন। বামন-পু।৫৯।

গালব এক দিন নদীতে স্নান করছিলেন এই সময় আকাশ পথে চিত্রসেন যাবার সময় থুথু ফেলেন। গালবের পূজার দ্রব্যে এই থুথু এসে পড়লে গালব কৃষ্ণের কাছে অভিযোগ করেন এবং কৃষ্ণ প্রতিশ্রুতি দেন সূর্যাস্তের আগেই চিত্রসেনের মাথা এনে দেবেন। নারদ এই কথা তৎক্ষণাৎ চিত্রসেনকে জানিয়ে আসেন এবং বলে আসেন চিত্রসেনের স্ত্রী সন্ধ্যা ও বলী সুভদ্রার কাছে শরণ নিক। চিত্রসেন, স্ত্রী দু জনকে নিয়ে সুভদ্রার প্রাসাদের সামনে এসে, একটি অগ্নিকুণ্ড করে নিজে আত্মবিসর্জন করতে যান এবং সন্ধ্যা ও বলী কাঁদতে থাকেন। অর্জুন তখন প্রাসাদে ছিলেন না। সুভদ্রা প্রাসাদ থেকে বার হয়ে আসেন এবং সন্ধ্যা ও বলী সুভদ্রার কাছে মঙ্গল ভিক্ষা বর চান। এই বরে সুখী দম্পতী হয়ে জীবন কাটান যাবে। সুভদ্রা বর দেবার পর ওদের সব কাহিনী শুনতে পান। ইতি মধ্যে কৃষ্ণ ও অর্জুনও এসে

পড়েন। কৃষ্ণ চিত্রসেনকে আক্রমণ করতে গেলে অর্জুন বাধা দেন। ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়; পৃথিবী ধ্বংস হতে যায়। সুভদ্রা তখন নিজে এসে যুদ্ধ থামান। কৃষ্ণ চিত্রসেনকে গালবের পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে বলেন এবং গালবও ক্ষমা করেন (পদ্ম-পু)। গালব নিজের পুণ্যের অষ্টমাংশ যযাতিকে দান করেছিলেন। রাজা প্রতীপের গাঢ় বন্ধু ছিলেন এই গালব। যুধিষ্ঠিরের এক জন সভাসদ। অগস্ত্যের পদ্মচুরি করার দলে ইনি ছিলেন না। গালবের স্ত্রী সুভ্রূ; ছেলে প্রাক্‌শৃঙ্গবান (মহা ৯।৫১।১৪) অন্য মতে শৃঙ্গব বা শৃঙ্গবান শৃঙ্গবের স্ত্রী বৃদ্ধকন্যা।

গালবআশ্রম—(১) রাজপুতনাতে জয়পুর থেকে ৩-মাইল। (২) চিত্রকূট পাহাড়।

গিরনার—রৈবত, রৈবতক, উজ্জয়ন্ত, উদয়ন্ত, গিরিনগর। ২১°৩১ উ×৭০°৪২′ পূ। গুজরাটে জুনাগড় সহরের ১৬ কি-মি পূর্বে একটি গিরিতীর্থ। বৃহৎ সংহিতায় এর নাম গিরিনগর। মহাভারতে পুণ্যগিরি বা উজ্জয়ন্তী। অনেকের মতে প্রাচীন রৈবতক। অন্যান্য নাম পুষ্পগিরি, বৈজয়ন্ত, গিরিবর। গুজরাটে জুনাগড় পাহাড়। এখানে ঋষি দত্তাত্রেয়র আশ্রম ছিল। সূতকে এখানে বলরাম হত্যা করেন। বৃহৎ-সংহিতা ও রুদ্রদামন শিলালেখে গিরনারের উল্লেখ আছে। পাহাড়ে অশোকের এক শিলালিপিতে গ্রীক (যবন) রাজ এণ্টিয়োকাস্ (থিয়োস অব সিরিয়া), (২) টুরমায়=টলেমি (মিসরের ফিলাডেলফাস), (৩) এণ্টিকিনি=এণ্টিগোনাস (ম্যাসিডোন্-এর গোনাটাস), (৪) মক বা মগ, এবং (৫) অলীক শূদ্র—দ্বিতীয় আলেকজান্দার (এপিরাস-এর) উল্লেখ রয়েছে। বস্ত্রা-পথ ক্ষেত্রে অবস্থিত এই গিরনার। স্কন্দপুরাণে প্রভাসখণ্ডে এর উল্লেখ আছে। এই পাহাড়ের পাদদেশ ধরে পলাসিনী (দ্রঃ)=স্বর্ণরেখা নদী প্রবাহিত। স্কন্দপুরাণে এই অঞ্চল শিবের পর্যটন ক্ষেত্রের অন্তর্গত। কিংবদন্তি কৃষ্ণের সময়ে যাদবদের ক্রীড়াভূমি ছিল এবং বলরাম এখানে দ্বিবিদকে (দ্রঃ) বধ করেন। ঐতিহাসিক কালে ক্রমিক নতুন নাম মণিপুর, চন্দ্রকেতুপুর, রৈবতনগর, পুরাতনপুর।

৫ শতকে স্থানীয় শাসক চক্রপালিত গিরিনগরে চক্রভৃতের (বিষ্ণু) একটি মন্দির তৈরি করে দিয়েছিলেন। মন্দিরটি অধুনা লুপ্ত। গিরনার পাহাড় জৈনদের তীর্থস্থান। পাহাড়ের মাথায় অনেকগুলি মন্দির আছে। এগুলির মধ্যে নেমিনাথ (১০৯৪-১১৪৪ খৃ) ও বস্তু পালের (১২৩১ খৃ) মন্দির উল্লেখ যোগ্য। নেমিনাথ/অরিষ্টনেমি (২২-শ তীর্থংকর); জন্ম মথুরাতে। উগ্রসেনের মেয়ে রাজিমতীর ছেলে অর্থাৎ কৃষ্ণের পিসির ছেলে এই নেমিনাথ। অত্যন্ত বৃদ্ধ বয়সে নেমিনাথ গিরনারে দেহ রাখেন। পুরাণে এই পাহাড় ২১টি শিখরের উল্লেখ আছে। বর্তমানের উল্লেখ যোগ্য প্রথম শিখর অম্বাদেবী। ইনি গিরনারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ১২-শ শতকে তৈরি অম্বাদেবীর মন্দির এখানে উপস্থিত সব চেয়ে প্রাচীন হিন্দু মন্দির; একান্ন পীঠের একটি। এখানে সতীর উদরদেশ পড়েছিল। গোরখনাথ সব চেয়ে উঁচু চূড়া (১১১৭ মি); শিখর মন্দিরটি কানফাটা যোগী সম্প্রদায়ের আদি গুরু শিবভক্ত গোরক্ষনাথের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। গুরু-দত্তাত্রেয় শিখর মন্দিরে দত্তাত্রেয়-র পায়ের

ছাপ ও একটি বড় ঘণ্টা আছে। নেমি-নাথ শিখরে সিঁড়ি বা মন্দির নাই; কেবল কালো পাথরে নেমিনাথের মূর্তি আছে। মহাকালী শিখর স্থানীয় পাহাড়ী জাতি অঘোরীদের প্রিয় জায়গা। এ ছাড়া এখানে গোমুখী, হনুমানধারা ও কমণ্ডলু নামে তিনটি কুণ্ড আছে। পাহাড়ের উত্তরতম প্রান্তে আছে ভৈরব ঝম্প ; এখান থেকে লোকে আত্মহত্যা করত। জুনাগড়ের নাম ছিল গিরিনগর ; পরে পর্বতটিরও এই নাম হয়। এখানে শক ক্ষত্রপের (রাজা পালের) রাজধানী ছিল ; ইনি খৃ-পূ ২-শতকের প্রথম দিকে সিস্তান বা শকস্তানের রাজার থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। গিরনার পাহাড়ে গুরুদত্ত চরণ বলে একটি পদচিহ্ন রয়েছে ; বলা হয় এটি কৃষ্ণের পদচিহ্ন।

গিরনারের কাছেই প্রত্নকীর্তির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হচ্ছে জুনাগড়ে উপরকোট ও বাবা পিয়ারা নামে জৈন শৈলখাত গুহারাজি (খৃ ১-৭ শতক) এবং ইণ্টোয়া (গিরনার পাহাড় থেকে প্রায় ৩ কিমি- উত্তরে) ও বোরিয়ার (গিরনার পাহাড় থেকে প্রায় ৩ কি-মি দক্ষিণে) অঞ্চলের ব্যাপক বৌদ্ধ ধ্বংসাবশেষ। ইণ্টোয়াতে শক ক্ষত্রপ রুদ্রসেনের (১৯৯-২২২ খৃ) নামানুসারে রুদ্রসেন বিহার নামে একটি বিহারের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে।

গিরিকা—দ্রঃ- উপরিচর বসু।

গিরিজা—দক্ষকন্যা সতী. পর জন্মে হিমালয় গিরির কন্যা পার্বতী।

গিরিব্রজ/গিরিব্রজপুর—রাজগির, রাজগির, কুশাগার পুর, রাজগৃহ। বিহারে, ধার্মিক কুশের (দ্রঃ) ছেলে বসু এই নগরী স্থাপন করেন। গঙ্গা ও শোণ নদীর সঙ্গমে। বসুর ছেলে বৃহদ্রথের ছেলে জরাসন্ধ। জরাসন্ধের সময় মগধের রাজধানী, অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এখানে একটি পাহাড়কে জরাসন্ধ ও নগরবাসীরা পূজা করতেন। ঋষভ রাক্ষসকে এখানে রাজা বৃহদ্রথ নিহত করেন (মহা ২।১৯।১৪)। বহু রাজাকে এখানে জরাসন্ধ বন্দী করে রেখেছিলেন। ধুন্দুমার এইখানে এসে এক বার ঘুমিয়ে ছিলেন (মহা ১৩।৬।৩৯)। মহাভারতে মগধের রাজধানী ; জরাসন্ধ বংশের রাজত্ব। বৌদ্ধগ্রন্থে রাজগৃহ (দ্রঃ)। পাটনা থেকে ৬২ মাইল ও বিহার-সহর থেকে ১৪ মাইল দক্ষিণে পাটনা জেলাতে। রাজা বসু স্থাপিত ফলে আর এক নাম বসুমতী। পাঁচটি পর্বত বৈহার, বরাহ, বৃষভ, ঋষিগিরি ও চৈত্যক নগরীটিকে ঘিরে রেখেছে। এগুলির বর্তমান নাম বৈভার, বিপুল, রত্নকূট, গিরিব্রজ ও রত্নাচল ; বৌদ্ধ নাম গিজ্জকূট, ইসিগিলি, বেভার, বেপুল, পাণ্ডব। অর্থাৎ বৈহার=বৈভার= বেভার ; ঋষিগিরি=ইসিগিলি=রত্নগিরি=রত্নকূট=পাণ্ডব ; চৈত্যক = বিপুল = বেপুল ; বরাহ=গিরিব্রজ ; এর একটি অংশ গিজ্জকূট; এবং বৃষভ=রত্নাচল। গিরিব্রজ-গিরি অর্থে দুটি ছোট পাহাড় উদয়গিরি ও সোনগিরি। উদয়গিরি রত্নগিরির সঙ্গে দ-পূর্ব অংশে যুক্ত রয়েছে। সোনগিরি অবস্থিত উদয়গিরি ও গিরিব্রজ-গিরির মধ্যে। গিরিব্রজপুর বৌদ্ধসাহিত্যে কুসুমপুর বা রাজগৃহ। রাজগৃহের উত্তরে বৈভার ও বিপুল গিরি (পশ্চিম অংশে বৈভার : পূর্ব অংশে বিপুল) ; পূব দিকে বিপুল গিরি ও রত্নগিরি (=রত্নকূট) ; পশ্চিমে বৈভারগিরি (=চক্র) ও রত্নাচল এবং দক্ষিণে

উদয়গিরি, সোনগিরি ও গিরিব্রজগিরি। গিরিব্রজপুর=রাজগৃহে চারিটি প্রবেশ দ্বার:- উত্তরে বৈভার ও বিপুলগিরির মধ্যে সূর্যদ্বার ; দ্বাররক্ষক জরা রাক্ষসী, দ্বিতীয় গিরিব্রজ-গিরি ও রত্নাচলের মধ্যে নাম গজদ্বার ; তৃতীয় রত্নগিরি ও উদয়গিরির মধ্যে এবং চতুর্থ দ্বার রত্নাচল ও চক্রের মধ্যবর্তী অংশে। এই পর্বত ঘেরা সহরের মধ্য দিয়ে সরস্বতী নদী বয়ে গেছে এবং উত্তর দ্বারের কাছ দিয়ে বার হয়ে গেছে। রাজগিরের দক্ষিণে বনগঙ্গা নদী। রামায়ণের সময় শোণ নদী এই সহরের মধ্য দিয়ে বয়ে যেত। এই উপত্যকাতে পশ্চিম দিকে বৈভার ও রত্নাচলের মধ্যবর্তী অংশে জরাসন্ধের প্রাসাদ ছিল। হংসস্তুপ (দ্রঃ) বৈভার গিরির পাদদেশে জরাসন্ধের মল্লযুদ্ধভূমি ছিল ; সোনভাণ্ডার গুহা থেকে এটি ১ মাইল পশ্চিমে। সোনগিরির পাদ দেশে একটি স্থানে জরাসন্ধ মারা যান, প্রবাদ আছে। এখানে প্রাকৃতিক যে সব খোঁদল গর্ত রয়েছে সেগুলিকে ভীম ও জরাসন্ধের মল্লযুদ্ধের চিহ্ন বলা হয়। দক্ষিণ দিকে উদয়গিরির কাছে নগ্ন পর্বতগাত্রে অনেকগুলি ছোট ছোট শিলালিপি রয়েছে। সোনগিরির পাদদেশে জরাসন্ধ রাজাদের বন্দী করে রাখতেন। রাজগির থেকে ৬-মাইল দূরে গিরিয়েক পর্বত। পঞ্চান নদী পার হয়ে এই গিরিয়েক পাহাড়ে উঠে কৃষ্ণ, ভীম, অর্জুন জরাসন্ধ পুরীতে প্রবেশ করেছিলেন। বৈভার গিরির উত্তর দিকের একটি ঢালে একটি ছোট মন্দিরে দুটি পায়ের ছাপ রয়েছে ; রাজগিরে প্রবেশের সময় কৃষ্ণের পায়ের ছাপ। দ্রঃ- গোরখ পর্বত। উত্তরে বৈভার গিরির পাদদেশে এবং উত্তর দ্বারের থেকে কিছু দূরে সাতটি কুণ্ড বা উষ্ণ প্রস্রবণ রয়েছে ; এগুলি ব্যাস, মার্কণ্ড, সপ্তর্ষি (=সপ্তধারা), ব্রহ্ম, কশ্যপ, গঙ্গা-যমুনা ও অনন্তকুণ্ড। এই কুণ্ডগুলি থেকে পূব দিকে কিছু দূরে সূর্য, চন্দ্রমা, গণেশ, রাম ও সীতা ৫-টি উষ্ণ প্রস্রবণ রয়েছে। এই ৫-টি কুণ্ড থেকে পূব দিকে আর একটি উষ্ণ প্রস্রবণ রয়েছে ; নাম-শৃঙ্গি-ঋষি কুণ্ড ; বর্তমান নাম মুখদুম কুণ্ড ; এই কুণ্ডটি বিপুলগিরির পাদদেশে উত্তর দিক ঘেঁসে। এই মুখদুম কুণ্ডের কাছে একটি গুহা রয়েছে এটি মুখদুম ফকিরের গুহা ; এবং গুহাটির পাশে বিরাট একটি পাথরের চাঙড় তির্যক ভাবে অবস্থিত। বলা হয় রায়োল ও লাট্রা এই পাথরটি গড়িয়ে ফকিরকে হত্যা করতে চেষ্টা করেছিল ; কিন্তু মুখদুম ফকির চেয়ে দেখেন ফলে পাথরটি এই ভাবে আটকে যায়। কতকটা দেবদত্ত বুদ্ধ কাহিনীর মত। উত্তর দ্বারের কাছে জরা রাক্ষসীর মন্দির রয়েছে। বৈভার, বিপুল, উদয় ও সোনগিরি পর্বতে মহাবীর, পার্শ্বনাথ ও বহু জৈন তীর্থংকরের মন্দির রয়েছে। বুদ্ধদেব প্রথমে রাজগৃহে এসে পাণ্ডব গিরিতে (সহরের পূব দিকে রত্ন গিরি) একটি গুহাতে অবস্থান করেন। এখানে প্রথমে আড়ার ও পরে বুদ্রকের শিষ্য হয়েছিলেন। পরে পাণ্ডব গিরির পূব দিকে কৃষ্ণশিলা গুহাতে যখন বাস করছিলেন তখন বিম্বিসার দেখা করতে আসেন। বৈভার গিরির দক্ষিণ গাত্রে সোন ভাণ্ডার গুহা হচ্ছে একটি মতে সপ্তপর্ণী গুহা ; এখানে প্রথম বৌদ্ধ মহাসংগীতি বসে ছিল ; এই গুহাটি ফা-হিয়েন উল্লিখিত প্রস্তরগুহা ; এখানে বুদ্ধদেব ধ্যান করতেন। একটু দূরে পূব দিকে আর একটি গুহাতে আনন্দ ধ্যান করতেন। মারের ভয়ে আনন্দ ভীত হয়ে পড়লে ভগবান বুদ্ধ গুহার দেওয়ালের একটি

ফাটলের মধ্য দিয়ে হাত বাড়িয়ে আনন্দের কাঁধে চাপড় মেরে শান্ত করেন। সোন-ভাণ্ডার গুহার সামনে যেন একটি লম্বা ঘর ছিল ; এখানে বুদ্ধদেব উপদেশ দিতেন (ফা-হিয়েন)। বিপুল ও রত্নগিরি পর্বতের একটি বাঁকে এবং উত্তর দ্বারের কাছে আম্রপালির আম্রকানন। উদ্যানটি আম্রপালি জীবককে দান করেন ; জীবক এখানে একটি বিহার তৈরি করে বুদ্ধদেবকে দান কারন। একটি মতে দেবদত্তের বাড়ি ও এই পাহাড়ের বাঁকে অবস্থিত ছিল। দেবদত্তের গুহাটি পুরাতন সহরের বার দিকে অবস্থিত ছিল ; মনে হয় শৃঙ্গঋষি কুণ্ডের কাছে। বুদ্ধের মৃত্যুর ৯-১০ বছর আগে দেবদত্ত একটা মত বিরোধ সৃষ্টি করেন। দেবদত্তের শিষ্যদের গোতমক বলা হয়। দেবদত্তের প্ররোচনায় অজাতশত্রু নিজের পিতাকে হত্যা করেন। বেণুবন বিহার(দ্রঃ)= করণ্ডবেণুবন বিহার ; বিম্বিসার এটি তৈরি করে বুদ্ধকে দিয়েছিলেন ; রাজগৃহে এলেই বুদ্ধদেব এখানে থাকতেন। বৈভার পর্বতে একেবারে শেষ পূর্বপ্রান্ত থেকে ৩০০ পদ দূরে এই বেণুবন বিহার অর্থাৎ উপত্যকার বাইরে এবং বৈভার পর্বতের উত্তরে। এই বেণুবনে সারিপুত্ত (উপতিষ্য) এবং মৌদ্গল্যায়ন (কোলিত) বুদ্ধশিষ্য হন। এই বেণুবনের একটি পিপ্পল গাছের নীচে বুদ্ধ প্রতিদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের পর ধ্যানে বসতেন। সপ্ত-পর্ণ বা সপ্তপর্ণী গুহা অর্থে কয়েকটি গুহা ; পিপ্পল গুহা থেকে প্রায় এক মাইল পশ্চিমে, অর্থাৎ বৈভার পর্বতের উত্তর দিকে ; এখানে বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর সপ্তপর্ণী গুহার সামনে অজাতশত্রু নির্মিত হলঘরে প্রথম বৌদ্ধ সম্মেলন বসে: মহাকশ্যপ প্রধান আহ্বায়ক ছিলেন। বেণুবন বিহারের উত্তরে সিতবন পর্বত ; এটির অপর নাম বসু-রাজ কি গড় ; জরাসন্ধের পিতামহ এই বসুরাজ এই সিত-বনে একটি শ্মশান রয়েছে। বিম্বিসার একবার ঘোষণা করেন অবহেলার জন্য যার বাড়িতে আগুন লাগবে তাকে ঐ শ্মশানে গিয়ে বাস করতে হবে। পরে রাজ প্রাসাদেই আগুন লাগে এবং বিম্বিসার শ্মশানে এসে বাস করতে থাকেন। কিন্তু বৈশালীরাজ অন্য মতে উজ্জয়িনী রাজ চণ্ডপ্রদ্যোতের আক্রমণের ভয় ছিল ; ফলে বিম্বিসার এখানে একটি নতুন সহর তৈরি করতে থাকেন। পুরাতন রাজগৃহ থেকে ১ মাইল দূরে এই নতুন রাজগৃহ ; এবং ছেলে অজাতশত্রু এর নির্মাণ কাজ শেষ করেন। এই নতুন রাজগিরের পশ্চিম দ্বারের কাছে অজাতশত্রু তাঁর ভাগে প্রাপ্ত বুদ্ধের চিতাভস্ম নিয়ে স্তূপ রচনা করিয়েছিলেন। এই ভাবে পুরাতন রাজগির পরিত্যক্ত হয়। অজাতশত্রুর রাজত্বের ৮ম বর্ষে বুদ্ধদেব দেহ রক্ষা করেন। অজাতশত্রুর নাতি উদয়াশ্ব (৫১৯-৫০৩ খৃ-পূ) পাটলিপুত্রে রাজধানী নিয়ে যান। দ্রঃ- বিক্রমশিলা বিহার। শিশুনাগ বংশীয় এবং ন-জন নন্দবংশীয় রাজা এখানে ৬৮৫-৩২১ খৃ-পূ রাজত্ব করেছিলেন। শিশুনাগ একবার বৈশালীতে রাজধানী নিয়ে যান। কালাশোকের সময় দ্বিতীয় বৌদ্ধ সম্মিলন ৪৪৩ খৃ পূর্বে বালুকারাম বিহারে রেবতের নেতৃত্বে ডাকা হয়েছিল।

বুদ্ধের সময় নিগ্রন্থজাতি পুত্র (=মহাবীর) রাজগৃহে গুণশিলা চৈত্যে বাস করতেন ; সঙ্গে পূর্ণকশ্যপ, মঙ্খলিপুত্র গোসাল, অজিতকেশ কম্বল, সঞ্জয়-বেলট্‌ঠপুত্র ও পকুধ কচ্চায়ন পাঁচজন তীর্থংকর থাকতেন। মহাবীরের প্ররোচনায় রাজগৃহে শ্রীগুপ্ত

নামে এক গৃহস্থ ভগবান বুদ্ধকে বিষ-অন্ন ভোজন করিয়ে আগুনের গর্তে ফেলে হত্যা করতে (অবদান কল্পলতা) চেষ্টা করেছিলেন। গোসাল মঙ্খলিপুত্ত আজীবক সম্প্রদায় স্থাপিত করেন। রাজগিরের দ-পশ্চিমে ১০ মাইল দূরে পাবাপুরীতে (দ্রঃ- পাপা) মহাবীর দেহ রাখেন। রাজগৃহে এলে বুদ্ধদেব গৃধ্রকূট, গৌতম-ন্যগ্রোধ আরাম, চৌরপ্রপাত, সপ্ত-পর্ণী গুহা, ঋষিগিরির কাছে কৃষ্ণশিলা, সপ্তশৌণ্ডিক গুহা, সিতবনকুঞ্জ, জীবকের আম্রবন, তপোদ আরাম বা মদ্রকুক্ষির মৃগবনে বাস করতেন।

(২) কেকয় রাজধানী ; পাঞ্জাবে বিয়াস নদীর উত্তরে। একটি মতে বর্তমানের জালালপুর ; প্রাচীন নাম ছিল গির্জাক।

গিরিয়েক—দ্রঃ- গিরিব্রজপুর। পঞ্চান (=পঞ্চানন, দ্রঃ) নদীর তীরে একটি প্রাচীন বৌদ্ধ বসতি। পাটনা জেলার দক্ষিণ সীমানায় ; বিহার সহরের দশ মাইল দক্ষিণে। দুটি বৌদ্ধগ্রাম গিরিয়েক ও অম্বষণ্ড মিলে এই বসতি। নদীর অপর পারে গিরিয়েক (<গৈরিক) পর্বত=গৃধ্রকূট পর্বত=গৃধ্রপর্বত (ফা-হিয়েন)=ইন্দ্রশিলা গুহা (হিউ-এন -ৎসাঙ)। গিরিয়েক পাহাড় হচ্ছে বিপুল বা চৈত্যক শাখার একটি বাহু। এর একটি শিখরে বিখ্যাত বুরুজ জরাসন্ধ কা বৈঠক অবস্থিত ; হিউ-এন-ৎসাঙ মতে এটি হংসস্তূপ (দ্রঃ)। গিরিয়েক হচ্ছে ফা-হিয়েনের বিচ্ছিন্ন খণ্ডগিরি।

গিরি—(১) হিমালয় চূড় পর্বতে উৎপন্ন একটি নদী (পুরাণ, বিক্রম); রাজঘাটে যমুনাতে এসে মিশেছে। (২) লণ্ডাই নদী ; এর তীরে পুষ্কলাবতী।

গিলগিট—৩৫°৫৫'উ, ৭৪°২২' পূ। কাশ্মীরে; বহু হিমবাহ যুক্ত ও তুষারপূর্ণ স্থান। হুনজা ও গিলগিট নদীর সঙ্গমে অবস্থিত। অনেকগুলি গিরিপথ দিয়ে এখান থেকে মধ্য এসিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য চলে। গিলগিটের ৩৮ কি-মি দক্ষিণে সিন্ধু নদ। অধিবাসী বর্তমানে অধিকাংশই মুসলমান। প্রাচীন কালে এখানে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এখানকার অধিবাসীরা ব্যাক্‌ট্রিয়ান, গ্রীক, কুষাণ, পার্থিয়ান ও সিদিয়ানদের বংশধর। গৌরবর্ণ ; সুসমানুপাত চেহারা। এরা দরদ এবং এটি প্রাচীন দেশ দরদিস্তান।

মাটির নীচের একটি স্তূপের থেকে ভূর্জবল্কলে এবং কয়েকটি-মাত্র কাগজে লেখা পুঁথি পাওয়া গেছে। এগুলি খৃ ৬-শতকের এবং এগুলির নাম দেওয়া হয়েছে গিলগিট পাণ্ডুলিপি। এই পুঁথিগুলির মধ্যে বহু সূত্র, প্রজ্ঞাপারমিতা, সদ্ধর্মপুণ্ডরীক ও মূল সর্বাস্তিবাদের বিনয়পিটক বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। বুদ্ধদেবের প্রস্তরমূর্তি, স্তূপ ও অন্যান্য বৌদ্ধ ধ্বংসাবশেষ গিলগিটের কাছে নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে।

গীতগোবিন্দ—লেখক জয়দেব (দ্রঃ)। ডি এইচ লরেন্সের লেডি চ্যাটার্লিস্ লাভার শ্রেণীর বই। কিছু মতে এটি গীত গোবিন্দের অনুবাদ। রামায়ণ ও মহাভারতের কট্টর পটভূমিতে ব্লু-বুক হিসাবে বর্ষবরদের চরম ও পরম পরিতৃপ্তি দিয়েছিল; আজও দেয়। তন্ত্রাভিলাষী সমাজে তন্ত্রগুলি চেতন ও অবচেতন মনকে যেমন তৃপ্তি দেয়।

গীতবিদ্যাধর—এক গন্ধর্ব। গীতশাস্ত্রে পণ্ডিত। পুলস্ত্য মুনি গান ভালবাসতেন না;

সেই জন্য মুনিকে বিরক্ত করার জন্য শূকরের মত মুখে শব্দ করতেন। ফলে মুনির শাপে শূকরে পরিণত হন। রাজা ইক্ষ্বাকুর হাতে মৃত্যু হলে শাপ মুক্ত হন (পদ্ম-পু)।

গীতা—মহাভারতে ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত একটি অধ্যায়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে প্রথম অস্ত্র ধরবার আগের মুহূর্তে অর্জুন এই বিরাট আত্মীয় হত্যা যুদ্ধের জন্য বিমর্ষ হয়ে ভেঙে পড়লে অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ যে সব উপদেশ দিয়েছিলেন সেই অংশ। সব সমেত ৭-শত শ্লোক, ফলে অপর নাম সপ্তশতী। গীতা পাঠে পুণ্য হয়। সম্প্রদায় ভেদে গীতার ব্যাখ্যা বিভিন্ন হয়েছে। এই গীতার আদর্শে শিবগীতা, রামগীতা, অনুগীতা ইত্যাদি নানা গীতা বিভিন্ন পুরাণের মধ্যে পাওয়া যায়। গীতার ভাষ্যগুলির মধ্যে শংকর ভাষ্য অনেকের মতে শ্রেষ্ঠ। শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যা বৈষ্ণব সমাজে আদৃত। শংকরাচার্য সম্প্রদায়ের মধুসূদন সরস্বতীর অদ্বৈতবাদ ও ভক্তিবাদ মিশিয়ে একটি প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা আছে। আকবরের অনেক আগে আরবিতে অনূদিত হয়েছিল। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ভাষাতেই এর অনুবাদ পাওয়া যায়। কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখে অর্জুনের স্তব বিশ্বসাহিত্যে অতুলনীয়।

গীতাতে প্রধান শিক্ষার বিষয় ভক্তি, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা। গীতার মধ্যে বেদ উপনিষদের আদর্শ এবং সাংখ্য, যোগ, বেদান্ত ও ভাগবত দর্শনের চিন্তাধারা এসে মিশেছে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য সমাজের চিন্তার প্রায় সবটা এর মধ্যে রয়েছে। গীতাকে এই জন্য সমন্বয় গ্রন্থ বলা হয়। বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাবও (?) কিছু আছে। কিন্তু মূলত উপনিষদ্ ভিত্তিক ; বেদান্ত, তত্ত্ব ও ভক্তি এর বিষয় বস্তু।

গীতার প্রধান প্রতিপাদ্য আত্মতত্ত্ব : এবং মায়া মোহাচ্ছন্ন সংসার পার হয়ে অভয় লোক পাবার পথ। অর্থাৎ সাধন ও সাধ্য দুটি জিনিসই গীতায় রয়েছে। এখানে বক্তব্য জীব স্বভাবতই পূর্ণ কিন্তু মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন বা পরিচ্ছিন্ন : ফলে কর্মফলাসক্তি। জীব পূর্ণতার স্বরূপ জানে না। ফলে কর্ম ও ভোগ চক্রের বন্ধনে সে নিপীড়িত। কর্মই সব দুঃখের মূল। কর্মের মূল অজ্ঞান। এক মাত্র জ্ঞানই অজ্ঞানকে ধ্বংস করতে পারে সুতরাং, জ্ঞানই শরণ্য। কর্ম বন্ধন কি ভাবে দৃঢ়তর হয়ে ওঠে এবং কি ভাবে এই বন্ধন ছিন্ন করা যায় গীতায় দেখান হয়েছে। আসক্তি থেকে কাম, কাম থেকে ক্রোধ, ক্রোধ থেকে মোহ, মোহ থেকে স্মৃতি-ও-বুদ্ধি নাশ এবং ফলে জীব ধ্বংস হয়। সুতরাং কর্মবন্ধন মুক্ত হতে হলে বুদ্ধিযুক্ত নিষ্কাম কর্ম করতে হবে। নিষ্কাম কর্ম ও জ্ঞানানুশীলন হচ্ছে কর্ম যজ্ঞ। কর্ম থেকে জ্ঞান ও জ্ঞান থেকে ভক্তি। এই তত্ত্ব-বুদ্ধির ফলে জীব আত্মস্বরূপে স্থিত হয়ে পরমানন্দের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে। পুরুষোত্তম ঈশ্বর এই জগৎ প্রপঞ্চের আদি সনাতন বীজ। কর্মের ভূমিতে ইনি বিধি রূপে, শক্তির ভূমিতে প্রকৃতি রূপে এবং জ্ঞানের ভূমিতে পুরুষোত্তম রূপে বিদ্যমান।

এই গীতাই ভারতের সমস্ত দুঃখের মূল কারণ। মানুষকে কর্ম বন্ধন ত্যাগ করিয়ে মুমুক্ষা এনে দিয়ে চরম ক্ষতি করে দিয়েছে। সারা দেশটা—'নিমিত্ত মাত্র ভব সব্যসাচি' হয়ে বসে পড়েছিল। একটি মতে গীতা খৃ-পূ ৪-৩ শতকে লেখা হয়েছিল ;

পরে মহাভারতে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। মহাভারতে মঙ্কি গীতা ইত্যাদি আরো বহু গীতা আছে। রামগীতা, দ্রঃ- রামায়ণ। হংস গীতা, দ্রঃ- হংস।

গুজরাট—ভারতের পশ্চিম উপকূল প্রান্তে ২০°১'-২৪°৭' উ×৬৪°৪'-৭৪°৪' পূ। পশ্চিমে আরব সাগর, উত্তরপূর্বে রাজস্থান, উত্তরপশ্চিমে পাকিস্থান, দক্ষিণে মহারাষ্ট্র। গুজরাট উপদ্বীপের নাম সৌরাষ্ট্র। প্রাচীন অধিবাসী গুর্জর উপজাতির নাম থেকে নাম। খাদ্য সংগ্রহকারী মানুষের পর প্রস্তর যুগ তারপর সিন্ধু সভ্যতা এখানে গড়ে উঠেছিল। গুর্জর, সুরাষ্ট্র (দ্রঃ), সৌরাষ্ট্র, আনর্ত, লাট, লাড়, লাল, নাটক, লরিকে (টলেমি)। পেরিপ্লাস অনুসারে গুজরাটের দ-পূর্ব অংশে নর্মদার মোহনায় একটি গ্রাম : নাম আভীরা ; গ্রীক নাম আবেরিয়া। হিউ-এন-ৎসাঙ-এর সময় গুজরাট উপদ্বীপের নাম গুর্জর ছিল না ; গুজরাটের নাম ছিল তখন সৌরাস্ত্র। হিউ-এন-ৎসাঙের সময় রাজপুতনার দ-অংশ ও মালবের নাম ছিল গুর্জর। বর্তমানের মারওয়ার জেলা ও তখন গুর্জর নামে অভিহিত। খান্দেস ও মালবের বেশির ভাগ অংশ। সৌরাষ্ট্রে সাহ রাজ নহপানের অভিষেক থেকে শক শতাব্দী প্রচলিত যেন। মতান্তরে শাতকর্ণি রাজকে নহপান পরাজিত করেন এবং এই জয়লাভের স্মৃতি হিসাবে নহপান (আসলে রাজ্যপাল) তাঁর প্রভু শকরাজার সম্মানে ৭৮ খৃস্টাব্দ থেকে শকাব্দ গণনা সুরু করেন। মৌর্যবংশই এখানে প্রথম ঐতিহাসিক রাজবংশ। সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের প্রদেশপাল পুষ্যগুপ্ত জুনাগড়ের কাছে সুদর্শন হ্রদ নামে একটি জলাধার তৈরি করে দিয়েছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের পর গ্রীক, ক্ষত্রপ, সাতবাহন ক্ষত্রপ, গুপ্ত, বাকাটক ইত্যাদি ক্রমান্বয়ে এখানে সমগ্র গুজারটে বা আংশিক ভাবে রাজত্ব করেছেন। ১২৯৯ খৃস্টাব্দে এখানে প্রথম তুর্কি অনুপ্রবেশ ঘটে। এখানে নর্মদা নদীর মোহনায় ব্রোচ প্রাচীন সহর : পেরিপ্লাসে এর নাম বারুগজ ; এখান থেকে রোম ইত্যাদির সঙ্গে বাণিজ্য হত। এখানে ভৃগু মুনির একটি মন্দির আছে। আরব সাগর তীরে দ্বারকা একটি তীর্থস্থান। জুনাগড় জেলায় গিরনার (দ্রঃ) একটি তীর্থস্থান। দ্বারকা থেকে ৬৪ কি-মি দক্ষিণে প্রভাসপত্তনে বিখ্যাত সোমনাথ মন্দির রয়েছে। (২) পাঞ্চালে একটি জেলা ; প্রাচীন গৌরব রাজ্যের অংশ।

গুডিমল্লম—উত্তর আরকটে রেনিগুণ্টার কাছে। শিবলিঙ্গের (দ্রঃ) জন্য বিখ্যাত। দ্রঃ- মহাদেব।

গুড়াকেশ—নিদ্রা ও আলস্য বিজয়ী বলে অর্জুনের এক নাম।

গুণ—ন্যায় বৈশেষিক মতে লাল রং গুণ ; এবং এই গুণ কোন দ্রব্যকে আশ্রয় করে অবস্থিত। কিন্তু তবুও দ্রব্য ও গুণ বিভিন্ন পদার্থ ; একত্রে থাকলেও ভিন্ন পদার্থ রূপেই তাদের প্রতীতি। এই ভাবে গুণ ২৪ প্রকার :-রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিয়োগ, পরত্ব, অপরত্ব, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, শব্দ, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম, অধর্ম, সংস্কার। বৈদান্তিকরাও দ্রব্য ও গুণ পৃথক পদার্থ বলে স্বীকার করেন অবশ্য এই স্বীকৃতি সবটাই ন্যায় বৈশেষিকদের অনুরূপ নয়। অভিজ্ঞতাবাদী বৌদ্ধরা দ্রব্য ও গুণ পৃথক পদার্থ স্বীকার করেন না। সাংখ্য দর্শনে গুণ পদার্থ দ্রব্য নির্ভর কোন ধর্ম নহে; নিজেরাই দ্রব্য। সাংখ্যে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এ তিনটিই

গুণ। সাধারণ হিসাবে মানুষের ১৪ প্রকার গুণ—দেশকালজ্ঞান, দৃঢ়তা, ক্লেশসহ্যক্ষমতা, সব বিষয়ের জ্ঞান, চতুরতা, উৎসাহ বা বল, মন্ত্রগুপ্তি, উল্টপাল্টা কথা না বলা, শূরতা, নিজের শত্রুর শক্তির জ্ঞান, শরণাগত বাৎসল্য, কৃতজ্ঞতা, অমর্ষশীলতা, অচঞ্চলতা।

গুণকেশী—মাতলির রূপসী ও গুণবতী মেয়ে; মা সুধর্মা। ভোগবতী নগরীতে ঐরাবত নাগের বংশে রাজা আর্যক নাগের ছেলে চিকুর; এবং চিকুরের ছেলে সুমুখ। মেয়ের জন্য পাত্রের সন্ধানে নারদের সঙ্গে ত্রিভুবন ঘুরতে ঘুরতে মাতলি (দ্রঃ) পাতালে এসে বাসুকির পুরীতে এই সুমুখকে পছন্দ করেন এবং বিয়ে হয়। রাজা আর্যক কিন্তু জানিয়ে দেন গরুড় কিছু দিন আগে চিকুরকে খেয়েছেন এবং এক মাস পরে সুমুখকেও খাবেন ঠিক করেছেন। নারদ সামনেই ছিলেন; সুমুখকে তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রের কাছে নিয়ে যান এবং ইন্দ্র সুমুখকে আশীর্বাদ করে দীর্ঘ জীবন দান করেন। গরুড় (দ্রঃ) এ কথা জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রের সঙ্গে গিয়ে দেখা করেন। সুমুখ রক্ষা পায়।

গুণনিধি—কোশল রাজ্যে এক জন বিত্তবান পণ্ডিত ছিলেন; নাম গিরিনাথ। লোকে এঁকে শ্রদ্ধায় গিরিনাথ দীক্ষিত বলতেন। এঁর ছেলে গুণনিধি অত্যন্ত সুন্দর। গুণনিধি গুরু সুধীষণের কাছে বিদ্যা শিখতে যান এবং ক্রমশ গুরুপত্নী মুক্তাবলীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত বিষ খাইয়ে গুরুকে হত্যা করেন। গুণনিধির পিতামাতা ঘটনাটি জানতে পেরে ছেলেকে ভৎর্সনা করেন। মুক্তাবলী ও গুণনিধি দু জনে তখন পরামর্শ করে বিষ দিয়ে গুণনিধির পিতামাতাকেও হত্যা করেন। এর পর বিলাসিতায় গুণনিধি ও মুক্তাবলীর অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে; গুণনিধি সুরাসক্ত হয়ে পড়ে চুরি করতে থাকেন। গ্রাম থেকে সকলে এঁদের তাড়িয়ে দেয়। বনে গিয়ে এঁরা দস্যুতে পরিণত হন এবং পথিকদের লুণ্ঠন ও হত্যা করে জীবন কাটাতে থাকেন। এর পর এক রুদ্রাক্ষ গাছের নীচে এই পাপিষ্ঠ গুণনিধি এক দিন মারা যান এবং এত পাপ করা সত্ত্বেও রুদ্রাক্ষের মাহাত্ম্যে শিবলোক প্রাপ্ত হন। দেবী ভাগবতে (১১।৬) যেখানে মারা যান সেখানে মাটিতে দশ হাত নিচে রুদ্রাক্ষ ছিল; ফলে যমদূতরা ফিরে যান; শিব দূতরা শিবলোকে নিয়ে যান।

গুণবতী—দ্রঃ- চন্দ্রাবতী।

গুণবরা—একজন অপ্সরা।

গুণমতিবিহার—গয়া জেলাতে জাহানাবাদ সাবডিভিসানে ধারওয়াত-এ কুণ্ব পর্বত। এখানে ১২ হাত যুক্ত ভৈরব মূর্তি আসলে অবলোকিতেশ্বর মূর্তি। হিউ-এন-ৎসাঙ এখানে এসেছিলেন।

গুণমুখ্যা—একজন অপ্সরা।

গুণাঢ্য—পার্বতী এক বার শিবের কাছে একটি মৌলিক গল্প শুনতে চান: এমন গল্প যা কেউ কোন দিন শোনে নি। নন্দীকে দরজাতে পাহারা বসিয়ে বলে দেন কেউ যেন ভেতরে না আসে। মহাদেব বিদ্যাধরদের সম্বন্ধে গল্প বলছিলেন এমন সময় পুষ্পদন্ত নন্দীর কথা না শুনে সেখানে গিয়ে হাজির হন। গল্পটি এত কৌতূহলদীপক যে পার্বতী কিছুই টের পান না; পুষ্পদন্ত আড়ালে দাঁড়িয়ে গল্প শুনে অলক্ষ্যে স্থান

ত্যাগ করেন। পুষ্পদন্ত পরে নিজের স্ত্রী জয়াকে গল্পটি বলেন; জয়া আবার পার্বতীকে এই গল্প শোনান। পার্বতী শুনে শিবের কাছে অভিযোগ করেন পুরাণ গল্প শুনিয়েছেন। অভিমানে পার্বতী কাঁদতে থাকেন। শিব বুঝতে পারেন কি হয়েছে এবং পার্বতীকে সব খুলে বলেন। পার্বতী তৎক্ষণাৎ পুষ্পদন্তকে ডেকে পাঠান এবং পুষ্পদন্ত সব কথা স্বীকার করেন। পুষ্পদন্তের স্বপক্ষে মাল্যবানও অনুরোধ করতে এসেছিলেন। পার্বতী এদের দু জনকে অভিশাপ দেন মানুষ হয়ে জন্মাতে হবে। এদের প্রার্থনায় পার্বতী তার পর বলেন সুপ্রতীক নামে এক যক্ষকে বৈশ্রবণ অভিশাপ দিয়েছিলেন; এই যক্ষ কাণভূতি পিশাচ হয়ে বিন্ধ্যপর্বতে গভীর অরণ্যে বাস করছে। তাঁর সঙ্গে দেখা করে পুষ্পদন্ত কাণভূতিকে আগে নিজের কাহিনী ও এই গল্প বলবে এবং তার পর মুক্তি পাবে। কাণভূতি তার পর মাল্যবানকে বহু কাহিনী শোনাবেন এবং তখন মুক্তি পাবেন। মাল্যবান এই সব গল্প জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করলে মাল্যবান তবে মুক্তি পাবেন। এর পর পুষ্পদন্ত বররুচি নামে কৌশাম্বীতে এবং মাল্যবান গুণাঢ্য নামে সুপ্রতিষ্ঠিত নগরে জন্মান।

যক্ষ সুপ্রতীক শূলশিরস্‌ নামে এক রাক্ষসের সঙ্গে মিত্রতা করলে বৈশ্রবণ এতে ক্রুদ্ধ হয়ে সুপ্রতীককে শাপ দিয়েছিলেন। সুপ্রতীকের বড় ভাই দীর্ঘজঙ্ঘ এসে বৈশ্রবণের কাছে ক্ষমা চাইলে বৈশ্রবণ বলেন পুষ্পদন্ত মানুষ হয়ে জন্মালে পুষ্পদন্তের কাছে অদ্ভুত অদ্ভুত কাহিনী শুনবেন ও শোনাবেন; তার পর মুক্তি পাবেন।

প্রতিষ্ঠান দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত নগরীতে সোমশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। এঁর দুই ছেলে বৎস ও গুল্মক এবং একটি মেয়ে শ্রুতারথা। মা বাবা মারা গেলে মেয়েটি ভাইদের কাছে মানুষ হয় এবং বাসুকির ভাই কীর্তিসেন একে গন্ধর্ব মতে বিয়ে করেন। সন্তান হয় গুণাঢ্য। গুণাঢ্য বড় হয়ে দক্ষিণ দেশে গিয়ে এক ব্রাহ্মণের কাছে সমস্ত কিছু বিদ্যা শিক্ষা করেন এবং সাতবাহন রাজার মন্ত্রী হন। এক দিন গুণাঢ্যের স্ত্রী রাজা সাতবাহনকে ব্যাকরণ গত কিছু ভুলের জন্য ভর্ৎসনা করেন। রাজা অত্যন্ত ম্লান ও দুঃখিত হয়ে পড়েন। ইতি মধ্যে সর্ববর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ এসে রাজাকে প্রতিশ্রুতি দেন ছ মাসের মধ্যে রাজাকে সমস্ত ভাষাতে সুপণ্ডিত করে দেবেন। গুণাঢ্য বলেন এ সম্ভব নয়। দু জনে তার পর বাজি রাখেন; গুণাঢ্য বলেন তিনি যদি হেরে যান তাহলে তাঁর সংস্কৃত, প্রাকৃত ও স্থানীয় ভাষার জ্ঞান তিনি পরিত্যাগ করবেন। সর্ববর্মা বলেন তিনি হেরে গেলে গুণাঢ্যের পাদুকা বার বছর মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়াবেন। সর্ববর্মা তারপর কার্তিকের আরাধনা করে রাজাকে সংস্কৃতে পণ্ডিত করে দেন। গুণাঢ্য হেরে গিয়ে সব কিছু ত্যাগ করে বিন্ধ্য পর্বতে চলে যান। বনে পিশাচদের ভাষা শুনতে থাকেন এবং কিছু দিনের মধ্যে এই ভাষা সুন্দর শিখে নেন। এর পর পিশাচরাজ কাণভূতি এলে কথা বলতে কোন অসুবিধা হয় না। কাণভূতি সাতটি বিদ্যাধরদের কাহিনী শোনান এবং সাত বছর ধরে গুণাঢ্য এটি লিখতে থাকেন; লিখেছিলেন পাতার ওপর রক্ত দিয়ে।

গুণাঢ্য তারপর এই গ্রন্থ পাঠ করতে থাকেন, সমস্ত দেবতারা এসে কাহিনী

শুনতে থাকেন। এই গ্রন্থ বৃহৎ-কথা ; কাণভূতি এই কাহিনী শুনে মুক্তি পান। এই গ্রন্থকে কি ভাবে রক্ষা করা যায় গুণাঢ্য যখন ভাবছিলেন তখন তাঁর দু জন সঙ্গী গুণদেব ও নন্দী দেব এই গ্রন্থটিকে রাজা সাতবাহনের নামে উৎসর্গ করতে বলেন। রাজা সবটা পড়েন কিন্তু বইটা তাঁর পছন্দ হয় না। সঙ্গী দু জন গ্রন্থটি গুণাঢ্যের কাছে ফিরিয়ে আনেন। গুণাঢ্য হতাশ হয়ে পড়ে নরবাহনের কাহিনীটি বাদ দিয়ে বাকি অংশ আগুনে পোড়াতে থাকেন। একটি করে পাতা পড়তে থাকেন এবং আগুনে দিতে থাকেন। শিষ্যরা পাশে দাঁড়িয়ে থাকে এবং বনের পশুরাও এসে কাহিনী শুনতে থাকে। এই সময়ে রাজা সাতবাহনের অসুখ করে। বৈদ্য রাজাকে পরীক্ষা করে বলেন শুষ্ক মাংস খেয়ে এই অসুখ হয়েছে। শিকারী যারা মাংস আনে তারা জানায় এ ছাড়া ভাল মাংস মিলছে না। কারণ বনে সব পশুপাখী একটি লোকের গল্প শুনছে ; নিজেদের খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। লোকটি একটি করে পাতা পড়ে শোনাচ্ছে তার পর পাতাটি আগুনে পুড়িয়ে ফেলছে। শুনে সাতবাহন তৎক্ষণাৎ শিকারীদের সঙ্গে গুণাঢ্যের কাছে এসে উপস্থিত হন এবং গুণাঢ্যের পায়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে নমস্কার করেন। পুষ্পদন্ত থেকে আরম্ভ করে তাঁর নিজের গ্রন্থ পোড়ান পর্যন্ত সমস্ত কাহিনী গুণাঢ্য বর্ণনা করেন। গুণাঢ্যের সঙ্গীরা এই সব কথা অনুবাদ করে রাজাকে শোনান। এই সময়ে ছ-টি গ্রন্থ পোড়ান হয়ে গিয়েছিল ; রাজা বাকিটুকু নিয়ে যান ; গুণাঢ্য আগুনে আত্মবিসর্জন করেন।

নরবাহন দত্তের কাহিনীটুকু নিয়ে সাতবাহন ফিরে আসেন। এইটি বৃহৎ কথা। গুণদেব ও নন্দী দেব গ্রন্থটি সংস্কৃতে অনুবাদ করে রাজাকে শোনান।

গুণ্টুর—অন্ধ্রপ্রদেশের জেলা ও সহর। ১৫°১৮′-১৬°৫০′ উ×৭০°১০′-৮০°৫৫′ পূ। এখানে ভাট্টিপ্রোল ও অমরাবতীতে বিখ্যাত বৌদ্ধস্তূপ আছে। পালনাদ তালুকে নাগার্জুন কোণ্ডার প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্য অনেক ; এখানে সম্প্রতি একটি জলাধার তৈরি হওয়াতে কিছু কিছু প্রত্নসম্পদ পাহাড়ের মাথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

গুপ্তচর—প্রাচীন ভারতে গুপ্তচর নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল। কৌটিল্য, কামন্দক, যাজ্ঞবল্ক্য তিন জনেই এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। গুপ্তচর বৃত্তির ওপর কৌটিল্য বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন এবং এই বৃত্তির বিভিন্ন দিক সম্বন্ধেও আলোচনা করেছেন। কামন্দকে ও মহাভারতে আছে গুপ্তচররাই রাজার চক্ষু। শুক্র নীতিসারে আছে রাজা প্রতি দিন রাত্রিতে প্রজাদের, অমাত্যদের, আত্মীয় এবং অন্তঃপুরিকাদের মনোভাব চরের কাছ থেকে জেনে নিতেন।

এই কাজের জন্য তীক্ষ্ণধী, মধুরালাপী, বিচক্ষণ লোককেই কাজে নিয়োগ করা হত। চরেরা ছাত্র, উদাসী পুরুষ, গৃহস্থ, বণিক, তপস্বী ইত্যাদি ছদ্মবেশ নিত। সন্ন্যাসিনী, পরিব্রাজিকা, গণিকা, জ্যোতিষী ইত্যাদিকেও চর নিযুক্ত করা হত। কৌটিল্য এদের দু ভাগে ভাগ করতেন ; (১) যারা এক স্থানে বসে কাজ করবে এবং (২) যারা বিভিন্ন স্থানে গিয়ে খবর আনবে। এ ছাড়াও ব্যবস্থা ছিল ; পাষণ্ড, তাপস

ইত্যাদিদের পররাষ্ট্রে নিয়োগ করা হবে। একই খবরের জন্য একাধিক চরও নিয়োগ করা হত এবং চরেরা বহু ক্ষেত্রেই পরস্পরকে চিনত না।

সমাজ বিরোধী অর্থাৎ ভেজাল দেওয়া, জালমুদ্রা তৈরি, চুরি ইত্যাদি থেকে রাজদ্রোহী কাজকর্ম ইত্যাদি সব খবরই রাজা এদের কাছ থেকে পেতেন। রাজ্য চালাবার এরা একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় অঙ্গ ছিল। খবর মিথ্যা প্রমাণ হলে গুপ্তচরদের শাস্তি দেওয়া হত; খবর তথ্যের দ্বারা সমর্থিত হলে পুরস্কার দেওয়া হত। কৌটিল্য এমন কি এদের সাহায্যে কোথায় কি মতবাদ মাথা তুলছে তাও জানবার কথা বলেছেন; এবং বলেছেন রাজা এই ভাবে খবর সংগ্রহ করে প্রয়োজন মত বিপথগামী প্রজাদের শাস্তি দেবেন; প্রয়োজন মত বিবাদ ও বিভেদের বীজ বপন করে বিপক্ষকে দুর্বল করে দেবেন। বিচারের কাজেও কৌটিল্য চর নিয়োগের কথা বলেছেন। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের খবর আনার জন্য পাষণ্ড, প্রচ্ছন্ন তাপস, বণিক এমন কি বিদেশে অবস্থানকারী রাজদূতও গুপ্তচরের কাজ করত এবং এটি একটি সুপ্রচলিত ব্যবস্থা ছিল। বিদেশের অন্তর্বিভেদের সুযোগ নিয়ে সেই দেশের রাজার বিরোধীদের কাছে লাগান হত। কুরুক্ষেত্রে উভয় পক্ষেরই চর বিরোধী সৈন্যদের মধ্যে কাজ করেছিল। বিদেশ থেকে চরেরা গুপ্তলিপিতে খবর পাঠাত। এ ছাড়া অন্তর্ঘাতী কাজ ও উস্কানির কাজেও চর পাঠান হত। অজাতশত্রুর মন্ত্রী বস্‌সকার সফলতার সঙ্গে উস্কানি দেওয়ার কাজ করেছিলেন।

গুপ্তরাজা—এ'রা ছিলেন বৈষ্ণব। রাজকীয় সিল মোহরে ছিল গরুড়। এ'দের বহু মুদ্রাতেও গরুড় রয়েছে।

গুরলামান্ধাতা—৩০°২৬'১৮" উ, ৮১°১৭'৫৭" পূ; উচ্চতা ৭৭২৮ মি। এটি লদাখ পাহাড়ের সব চেয়ে উঁচু শিখর। গাঁবিয়ঙ ও লিপুলেখ গিরিপথ দিয়ে যেতে যেতে দেখা যায়। মানস সরোবরের দক্ষিণে অবস্থিত। রাজা মান্ধাতা এই শিখরমূলে আজও তপস্যা করছেন এই রকম কিংবদন্তি।

গুরু—ভারতীয় জীবনে প্রাচীন কালে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছিলেন। এমন কি সহজিয়া বৈষ্ণব, আউল, বাউল, কর্তাভজারাও গুরুকে পরম দেবতা মনে করেন। অর্থনৈতিক বিচারে আশ্রম ব্যবসা চালাতে হলে পরম দেবতা বলে স্বীকার করা একান্ত প্রয়োজন। এদের কাজ ছিল পঠন, পাঠন এবং যজ্ঞ, পূজা ইত্যাদি। শিক্ষার জন্য সে সময়ে শিষ্যকে গুরুগৃহে গিয়ে বাস করতে হত। বহু সময়ে শিষ্যদের গুরুর কাছে কঠিন পরিশ্রম করতে হত। সাধারণতঃ গুরুর কাছ থেকে ফেরার সময় গুরুকে তাঁর বাসনা অনুযায়ী দক্ষিণা দিতে হত। গুরুর দক্ষিণার বহু অতিরঞ্জিত কাহিনী প্রচলিত আছে। বলা হয় গুরুর ঋণ শোধ করা যায় না। তন্ত্রে আছে গুরু হবেন শান্ত, দান্ত, সদ্‌বংশীয়, বিনীত, শুদ্ধাচার, শুদ্ধবেশ, সুবুদ্ধি এবং তন্ত্রমন্ত্র বিশারদ। রোগী, অধিকাঙ্গ, হীনাঙ্গ, বহুভোক্তা, বহুভাষী, পুত্রহীন ও শঠ ব্যক্তিকে গুরু রূপে বরণ করা উচিত নয়। প্রচলিত মতে গুরু দেবতা স্বরূপ, বা ইষ্টদেব। গুরু সামনে থাকলে নিত্য পূজা বা অন্য দেবতার পূজা না করে গুরুর পূজা করাই কর্তব্য। যেখানে কুল-

গুরু প্রথা চালিত আছে সেখানে গুরু নির্বাচনের কোন প্রশ্ন নাই। বর্তমান সমাজে কেবল মন্ত্রগুরু অর্থাৎ তান্ত্রিক দীক্ষাগুরুই আছেন এবং গুরুর সম্মান পেয়ে থাকেন। শিক্ষাগুরু ইত্যাদির কোন সম্মান নেই।

গুরুদার—গরুড়ের এক ছেলে।

গুরুপাদগিরি—গুরুপ পর্বত, কুক্কুটপাদ গিরি, কুঁকিহর, গুরুপাদক (দিব্য অবদানে)। বৌদ্ধগয়া থেকে প্রায় ১০০ মাইল ; গয়া জেলাতেই। মাহের পর্বতের একটি অংশ গুরুপাদগিরি ; এখানে সর্বোচ্চ শিখর শোভনাথ। গুরুপদ গিরিতে কশ্যপবুদ্ধ/মহাকশ্যপ নির্বাণ লাভ করেন ; ইনি শাক্যসিংহেরও আগে। এই পর্বতে ভবিষ্যৎ বুদ্ধ মৈত্রেয় আবার ধর্মপ্রচার করবেন।

গুরেজ—গরেস, দরৎপুরী ; দরদ রাজধানী। কাশ্মীরের উত্তরে। যেন উর্জগুণ্ডা।

গুর্জর—একটি মতে বৈদেশিক জাতি ; হূণদের পর ভারতে আসে এবং পাঞ্জাব ও রাজপুতানায় বসবাস করে। অন্য মতে এরা গুর্জর দেশেরই আদিবাসী ; বিদেশী কেউ নয়। গুর্জর রাজ্য প্রতিষ্ঠা হয় ৬ শতকের মাঝে ; রাজা হরিশ্চন্দ্র প্রথম রাজ্য স্থাপন করেন মন্দরে (=যোধপুর)। এই হরিশ্চন্দ্রের ছোট ছেলে প্রথম দদ্দ সম্ভবত গুজরাতে রাজ্য স্থাপন করেন। হিউ-এন-ৎসাঙ বর্ণিত কিউ-চো-লো সম্ভবত গুর্জর দেশেরই নাম এবং রাজধানী পি-লো-মো-লো (বর্তমানে ভিনমাল বা বাড়মের)।

গুলিক—এক ব্যাধ। বিষ্ণু মন্দিরের ছাদ থেকে সোনার পাত চুরি করতে চেষ্টা করেন। উত্তঙ্গ মুনি সে সময়ে মন্দিরে ছিলেন, ব্যাধ এঁকে হত্যা করতে চেষ্টা করলে মুনি একে অভিশাপ দিয়ে হত্যা করেন। পরে করুণা হয় এবং এঁর দেহে গঙ্গা জল ছিটিয়ে দিলে ব্যাধ বৈকুণ্ঠে চলে যান (নারদীয় পু)।

গুহ—(১) বা গুহক। গঙ্গাতীরে শৃঙ্গবের পুরে এক নিষাদরাজ। অযোধ্যা ত্যাগ করে রাম, লক্ষ্মণ, সীতা প্রথমে এঁর রাজ্যে এলে গুহক এগিয়ে এসে ভক্তি ভরে অতিথি সেবা করেন ; জটার জন্য বটের আটা জোগাড় করে দেন এবং নৌকা করে গঙ্গা পার করে দেন। পরে ভরত সসৈন্যে এসে এঁরই অতিথি হয়েছিলেন এবং এঁর সাহায্যে পর দিন নদী পার হয়েছিলেন। ভরতকে ভীষণ সন্দেহ করেছিলেন এবং সরাসরি জানতে চেয়েছিলেন কোন দুষ্ট অভিসন্ধি আছে কিনা (রা ২।৮৫।৭)। লঙ্কা থেকে ফেরার পথে হনুমানকে দিয়ে রামচন্দ্র আগে এঁকে খবর পাঠান। (২) দক্ষিণ ভারতে একটি নদী।

গুহাচিত্র—প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ভারতে গুহার গায়ে ছবি আঁকা হয়েছে। এই ছবি আঁকার প্রেরণা এসেছিল ধর্ম বা সৌন্দর্য সাধনা থেকে। মধ্য ভারত থেকে দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্র পাওয়া যায়। মধ্যপ্রদেশে বেত্রবতী ও চম্বল উপত্যকায়, ছত্রিশগড়ের সিংহালপুর ও রায়গড় ইত্যাদিতে, উত্তর মির্জাপুরের লিখুনিয়া, কহবর ও ভালদারিয়ায়, ওড়িশার চক্রধরপুরে প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্র পাওয়া গেছে। ঐতিহাসিক যুগে গুহাচিত্র ভারতে শিল্পের একটি বিশেষ মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। ভারতে অজন্তা, বাঘ, বাদামি, সিত্তনবসাল,

পিঠালখোড়া, এলোরা ; সিংহলে সিগিরিয়া, পোলোন্নারুয়া ; মধ্য এসিয়াতে খোটান, এবং আফগানিস্তানে বামিয়েন এগুলি ঐতিহাসিক যুগের গুহাচিত্র যুক্ত গুহা। আর খোদিত চিত্র রয়েছে বিহারে লোমশঋষি ; ওড়িশায় খণ্ডগিরি, ললিতগিরি ; গুজরাতে জুনাগড়, কাঠিয়াওয়াড়, তলাজ, ডঙ্ক, ও সান; মহারাষ্ট্রে কার্লে, ভাজা, বেদসা, নাসিক, জুনার, পুনাতে পাতালেশ্বর গুহা, কানহেরি, মহাকাল, যোগেশ্বর, এলিফ্যান্টা, ঔরঙ্গাবাদ, আইহোলি ইত্যাদি ; অন্ধ্রে শংকরম, কোট্টপল্লী, উণ্ডবল্লী, পেনমগ, সীতারামপুরম প্রভৃতি; মাদ্রাজে মহাবলীপুরম, তিরুক্কলু-কুনরম, সিংহপেরুমলকোবিল, সিংহবরম এবং মাদুরাই প্রভৃতি স্থানের গুহাতে। এই সমস্ত চিত্রে ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের নানা কিছু বিষয় চিত্রিত হয়েছে।

গুহামন্দির—অতি প্রাচীন কাল থেকে দেবমন্দির, চৈত্যগৃহ ইত্যাদি রূপে পাহাড়ের গুহার ব্যবহার ভারতে প্রচলিত ছিল। পাহাড়ের স্বাভাবিক ফাটল ইত্যাদি সন্ন্যাসীরা ব্যবহার করতেন। খৃ-পূ ৩-শতকে অশোক ও তাঁর পৌত্র দশরথ গয়ার কাছে বরাবর পাহাড়ে ভারতের প্রাচীনতম গুহামন্দির তৈরি করেন। অনুমান হয় পারস্য রাজ্যের আদর্শে অশোক এইগুলি নির্মাণ করান ও আজীবিক সন্ন্যাসীদের দান করেন। এই ভাবে মন্দির বা চৈত্য নির্মাণ খৃ-৯ শতকের শেষ ভাগ পর্যন্ত চলেছিল। ভারতে এই জাতীয় মন্দির প্রায় ১২০০ মত।

হিন্দু, জৈন, হীনযান ও মহাযান বৌদ্ধ এই চার সম্প্রদায়ের গুহামন্দির পাওয়া যায়। হীনযান চৈত্যে বুদ্ধ প্রতিমা থাকে না। মহাযান মন্দিরে বুদ্ধের মূর্তি ও ছবি দুই আছে। অনেক সময় হীনযান চৈত্য গৃহকে পরে মহাযান চৈত্য গৃহে পরিণত করা হয়েছে। বৌদ্ধ মন্দিরে থাকে একটি প্রার্থনা ঘর বা চৈত্যগৃহ এবং ভিক্ষুদের বাসস্থান বা বিহার। চৈত্যগৃহে একটি স্তূপ থাকত। বিহারগুলিতে প্রথমে একটি চারকোণা হলঘর এবং চারপাশে ভিক্ষুদের থাকবার অসংখ্য ছোট ছোট চার-কোণা কক্ষ। সেই সময়ে বিহার ও চৈত্য প্রচলিত কাঠের ঘরের অনুকরণে তৈরি হত। গয়ার কাছে বরাবর পাহাড়ে গুহার পাঁচিল যেন কাঠের তক্তা জুড়ে জুড়ে তৈরি। হীনযান বৌদ্ধ মন্দিরগুলি খৃ-পূ ২-শতকের থেকে খৃ ২-শতকের মধ্যে তৈরি হয়েছিল। পশ্চিম ভারতের এই হীনযান মন্দিরগুলি নির্মাণকাল অনুসারে সাজালে ভাজা, কোণ্ডণ, পিঠালখোড়া, অজন্তা (১০ নং গুহা), বেদসা, অজন্তা (৯ নং), নাসিক ও কার্লা। মহাযান সম্প্রদায়ের চৈত্য ও বিহার প্রধানত অজন্তা ও ইলোরাতে। এদের নির্মাণ কাল ৪৫০-৬৪২ খৃ। অজন্তা (দ্রঃ) ও এলোরা (দ্রঃ) ভাস্কর্যের জন্য প্রসিদ্ধ ; দারুশিল্পের অনুকরণ নেই।

মাদ্রাজে পল্লব যুগের মন্দিরগুলি উচ্চশ্রেণীর ভাস্কর্যের ও কৌশলের জন্য প্রসিদ্ধ। এক একটি বড় পাথর কেটে এক তলা বা দু-তলা মন্দির করা হয়েছে। এলোরাতে কৈলাস মন্দির একটি পাহাড়ের গা কেটে তৈরি। জৈনদের, এলোরাতে ৫-টি গুহামন্দির, এগুলিতে অলংকরণের উৎকর্ষতা আছে কিন্তু গঠন স্বচ্ছন্দ নয়। এগুলির মধ্যে ইন্দ্রসভা নামে দু তলা গুহামন্দিরটি উল্লেখ যোগ্য।

গুহ্যক—দেবযোনি বিশেষ। কুবেরের অনুচর। বাসস্থান পিশাচ লোকের ওপরে এবং গন্ধর্বলোকের নীচে। জৈন গ্রন্থে আছে এরা কৈলাসে থাকে। কুকুর মূর্তিতে পৃথিবীতে বাস করে। ভূমি স্পর্শ করে না; চোখে পাতা পড়ে না। দ্রঃ- রেবন্ত।

গুহ্য সমাজ—বুদ্ধের জন্মের বহু আগে থেকে একটি সম্প্রদায়। এদের ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ড গুহ্য। এই সমাজে বহু নগ্নমূর্তি পূজিত হত। গুহ্য সমাজের মূর্তিগুলির কিছুটা হদিস পাওয়া যায় বৌদ্ধ দেবদেবী মূর্তি থেকে। তিব্বত ও চীনের অবদান হয়তো গুহ্য সমাজে ছিল। এই গুহ্য সমাজই যেন তান্ত্রিক মতবাদের জন্মদাতা বা ধাত্রী। গুহ্য সমাজ গণমানসের একটা অংশের পরিচয় বহন করে। সমাজের নিম্নতম স্তরের চিন্তা ও জীবনযাত্রা এই গুহ্য সমাজ।

গুহ্য সাধনা—গুহ্য তন্ত্র সাধনা। ১৬ খৃ-শতক পর্যন্ত বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমিত ছিল। গুহ্য সাধনার (দ্রঃ-তন্ত্র) একটি ধারা বৌদ্ধতন্ত্র, আর একটি ধারা শাক্ততন্ত্র।

গুহ্যেশ্বরী—ব্রাহ্মণ্য ও উত্তর ভারতীয় বৌদ্ধদের দেবী। বাগমতীর বামতীরে। পশুপতি নাথ মন্দির থেকে সিকি মাইল ওপরে এবং কাঠমণ্ডুর উ-পূর্বে ৩ মাইল দূরে।

গৃষ্টিমা—দ্রঃ-শূরসেন। ছেলে হয় বীর ও অশ্বপাল (হরি ১।৩৪।২১)।

গৃৎসপতি—পুরুবংশে রাজা কপিলের ছেলে। এঁর চার ছেলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এই চার ছেলে থেকে চতুর্বর্ণের জন্ম।

গৃৎসমদ—(১) বিখ্যাত মুনি। বীতহব্যের ছেলে। বৃহস্পতির সমান পণ্ডিত, ইন্দ্রের বন্ধু এবং যুধিষ্ঠিরকে একবার উপদেশ দিয়েছিলেন। অসুররা এঁকে একবার ইন্দ্র মনে করে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলেছিলেন। এঁর ছেলে কুচেতা। (২) ভৃগুবংশে রাজা সুহোত্রের ছেলে; এক রাজা। (৩) ইন্দ্রের ঔরসে মুকুন্দার পুত্র। রাজা রুক্মাঙ্গদ এক বার প্রাসাদে ছিলেন না; ইন্দ্র এই সময় রুক্মাঙ্গদের বেশে এসে রুক্মাঙ্গদের স্ত্রী মুকুন্দার সঙ্গে রাত্রি যাপন করেন। সন্তান হয় গৃৎসমদ। বিখ্যাত পণ্ডিত হয়ে ওঠেন; তর্কে অপরাজেয় হন। এক বার মগধরাজের প্রাসাদে এক শ্রাদ্ধে এসে যোগদান করেন সঙ্গে বশিষ্ঠ ইত্যাদি ছিলেন। অত্রি মহর্ষি এখানে গৃৎসমদের পিতার অত্যন্ত প্রশংসা করেন। গৃৎসমদ বাড়িতে এসে মাকে ব্যাপারটা জানতে চাইলে মা সব কথা বলেন। ফলে গৃৎসমদ কুপিত হয়ে মাকে শাপ দেন কণ্টক গাছে পরিণত হবেন। মুকুন্দাও শাপ দেন গৃৎসমদের ছেলে রাক্ষস হবে (গণেশ-পু)। (৪) দ্রঃ- ক্ষত্রবৃদ্ধ। গৃৎসমদ > শুনক। চতুর্বর্ণের মধ্যে শৌনক গোত্র রয়েছে। (হরি ১।২৯।৭)

গৃধ্রউলূক—রামায়ণে (৭।৫৯, প্র-১৩) এক বনে এক গৃধ্র ও এক উলূক বহুদিন মারামারি করে বাস করছিল। শেষ পর্যন্ত গৃধ্র উলূকের বাসা দখল করে; এবং রামের কাছে দুজনেই বিচারের জন্য আসে। ধৃষ্টি, জয়ন্ত ইত্যাদি সচিবদের নিয়ে রাম বিচারে বসেন। গৃধ্র জানায় পৃথিবী যখন মানুষের দ্বারা আবৃত হয়েছিল তখন থেকে এই বাসাতে সে বাস করছে। উলূক বলে পৃথিবী যখন গাছ-পালাতে ভরে উঠেছিল তখন থেকে বাস করছে। রামচন্দ্র বিচার করে বলেন ব্রহ্মা আগে গাছপালা সৃষ্টি করেছিলেন অর্থাৎ বাসা উলূকের, গৃধ্র দণ্ডনীয়। তখন দৈববাণী হয় ব্রহ্মদত্ত নামে এক সত্যব্রত

ব্যক্তি গৌতম মুনিকে না জেনে মাংস খেতে দিয়েছিল ফলে পাপে এই অবস্থা হয়েছে পরে অনুনয় করলে গৌতম বর দিয়েছিলেন রাম স্পর্শ করলে গৃধ্র মুক্তি পাবে। রাম স্পর্শ করেন।

গৃধ্রকূট—গিরিয়েক (দ্রঃ)। একটি মতে শৈলগিরির একটি অংশ। রাজগিরের (গিরিব্রজপুর দ্রঃ) দ-পূর্বে ২·৫ মাইল দূরে। রত্নকূট বা রত্নগিরির একটি শাখা। পাণ্ডব-গিরি গুহা ত্যাগ করে বুদ্ধদেব এখানে কিছু দিন তপস্যা করেছিলেন ; পরে এখানে বহু উপদেশ দিয়েছিলেন। এই পাহাড়ের চূড়া থেকে একটি পাথর গড়িয়ে দিয়ে দেবদত্ত নীচে চলমান বুদ্ধদেবকে হত্যা করতে চেষ্টিত হন। এই পাহাড়ের পাদদেশে জীবকের উদ্যানে বুদ্ধদেব বহুদিন বাস করেছিলেন। এইখানে অজাতশত্রু ও তাঁর মন্ত্রী বর্ষাকার বুদ্ধের সঙ্গে দেখা করতে আসেন এবং এর ফলে পাটলিপুত্র প্রতিষ্ঠা হয়। দ্রঃ- পঞ্চানন।

গৃধ্রিকা—কশ্যপের ঔরসে তাম্রার একটি মেয়ে।

গৃহনির্মাণ—গৃহ্যসূত্রে গৃহ তৈরি ও গৃহ প্রবেশকে শালাকর্ম বলা হয়েছে। প্রথমে স্থান নির্বাচন প্রয়োজন। গৃহ্যসূত্রগুলিতে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে। গৃহ্যসূত্রের এই অংশের নাম বাস্তু পরীক্ষা। জমিতে মালিকের পূর্ণ সত্ব থাকা চাই। মাটি যেন উষর না হয় ; প্রচুর লতাগুল্ম এবং কুশ ও বেণা ঘাস হয় এবং জল বার হয়ে যেতে পারে এই রকম জমি বাসগৃহের উপযুক্ত। পাশে অপরের বাড়ির আলো বাতাস যেন বন্ধ না হয় ; জমির পূর্ব বা উত্তরে নদী বা জলাশয় থাকা দরকার। জলাশয়ের কারণে মাটি ধসে যাবে কিনা তাও সাবধান হতে বলা হয়েছে। কাছে ক্ষীরী, কণ্টকী ও কটুবৃক্ষ শ্রেণী যেন না থাকে। জমি যেন সমতল হয়। গৌরবর্ণ, বালুকা যুক্ত মাটিতে ব্রাহ্মণরা, রক্তবর্ণ, বালুকা যুক্ত মাটিতে ক্ষত্রিয়েরা এবং কালো মাটিতে বৈশ্যরা গৃহ তৈরি করবেন। প্রথমে হাল দিয়ে সমস্ত আগাছা তুলে ফেলে দিতে হবে। বাসগৃহ পূর্ব, উত্তর বা দক্ষিণদ্বারী করণীয় ; পশ্চিমদ্বারী নয়। ভাদ্র আশ্বিন ও কার্তিক মাসে গৃহ নির্মাণ করলে উত্তর মুখে, অগ্রহায়ণাদি তিন মাসে পূর্ব মুখে, ফাল্গুনাদি তিন মাসে করলে দক্ষিণ মুখে এবং জ্যৈষ্ঠাদি তিন মাসে করলে পশ্চিম মুখে করতে হবে।

বাস্তুবিদ্যাতে প্রাসাদের মূল ভাগ ৫-টি। প্রতি ভাগে আবার নয়টি করে উপবিভাগ বা নয় প্রকার প্রাসাদ হিসাব করা হয়। ভূমির পরিমাণ, ভিত্তি গোল, না বর্গ, না আয়ত ক্ষেত্র ইত্যাদি, প্রাসাদের উচ্চতা ইত্যাদি নানা কিছু হিসাব এই ভাগে করা হত।

মূল ভাগ বৈরাজ (চতুরস্র), পুষ্পক (চতুরায়ত), কৈলাস (বৃত্ত), মালক (বৃত্তায়ত), ও ত্রিবিষ্টপ (অষ্টাস্র)। বৈরাজ গত নয়-টি প্রকার :—মেরু, মন্দর, বিমান, ভদ্রক, সর্বতোভদ্র, রুচক, নন্দন, নন্দিবর্দ্ধন, শ্রীবৎস। পুষ্পক :- বলভী, গৃহরাজ, শালাগৃহ, মন্দির, বিমান, ব্রহ্মমন্দির, ভবন, উত্তম্ভ, শিবিকাবেশ্ম। কৈলাস :- বলয়, দুন্দুভি, পদ্ম, মহাপদ্ম, ভদ্রক, সর্বতোভদ্র, রুচক, নন্দন, গবাক্ষ, গবাবৃত্ত। মালক :- গজ, বৃষভ, হংস, গরুড়, সিংহ, ভূমুখ, ভূধর, শ্রীজয়, পৃথ্বীধর। ত্রিবিষ্টপ :- বজ্র, চক্র, মুষ্টিক/বভ্রু, বক্র, স্বস্তিক, খড়্গ, গদা,

শ্রীবৃক্ষ, বিজয়। আবার এই বিভিন্ন ৪৫ প্রকার প্রাসাদেরও নানা প্রকার ভেদ রয়েছে। যেমন সর্বতোভদ্র প্রাসাদগুলি চতুর্শাল ও চতুর্দ্বার, নন্দ্যাবর্তা প্রাসাদে পশ্চিমদ্বার থাকে না; বর্ধমান প্রাসাদে দক্ষিণদ্বার থাকে না; বর্দ্ধমান প্রাসাদ ধনপ্রদ; স্বস্তিকাখ্য প্রাসাদ প্রাগ্-দ্বার রহিত; স্বস্তিকাখ্য পুত্র ও ধনপ্রদ।

গৃহ নির্মাণের প্রশস্ত মাস বৈশাখ, আষাঢ়, শ্রাবণ, কার্তিক, ও ফাল্গুন। শুক্লপক্ষে গৃহ আরম্ভ করলে সুখ, কৃষ্ণপক্ষে ভয়। রিক্তা ইত্যাদি ছাড়া অন্য তিথিতে গৃহারম্ভ মঙ্গল জনক। রবি ও মঙ্গলবারে কাজ আরম্ভ করা উচিত নয়। শুভ দিনে বাস্তু ও অন্যান্য দেবতার পূজা করে গৃহারম্ভ কাজ বিধেয়। নতুন ঘরে স্ত্রী পরিবার সকলকে নিয়ে শুভ দিনে গৃহকর্তাকে প্রবেশ করতে হয়। কন্যা, কুম্ভ, বৃষ, বৃশ্চিক, সিংহ, মিথুন লগ্নে সোম, বুধ, বৃহ, শুক্রবারে গৃহপ্রবেশ শুভ। সকাল বেলা সঙ্গে ধান নিয়ে স্ত্রীর পিছু পিছু গৃহ প্রবেশ করতে হয়। স্ত্রীর কাঁখে জলপূর্ণ কলসী থাকবে। যজুর্বেদীয় মতে স্ত্রী আগে যাবে; সামবেদীয় মতে স্ত্রী পাশে পাশে যাবে। ঋক্ বেদের মতে স্ত্রী ও বড় ছেলেকে নিয়ে গৃহ প্রবেশ করতে হয়। বাড়িতে প্রবেশ করে বাস্তুপূজা ও আনুষঙ্গিক পূজা, নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ ও হোম ইত্যাদি করণীয়।

গৃহপতি—এক জন মুনি। পিতা বিশ্বানর, মা শুচিষ্মতী; নর্মদা তীরে আশ্রমে বাস করতেন। সন্তান ছিল না। স্ত্রী স্বামীকে সন্তানের জন্য কিছু একটা করতে বলেন; বিশ্বানর কাশী গিয়ে তপস্যা করতে থাকেন। মহাদেব সন্তুষ্ট হয়ে বর দেন সন্তান হবে। এর পর শুচিষ্মতীর সন্তান হয় নাম হয় গৃহপতি। বালকের নয় বছর বয়স হলে নারদ এসে সাবধান করে দেন অগ্নি ভয় আছে। বিশ্বানর তৎক্ষণাৎ আবার শিবের আরাধনা করেন এবং ছেলের আগুনের মত ক্ষমতা হয় অর্থাৎ আগুন আর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এর ফলে গৃহপতি কাশীতে এক শিব মূর্তি স্থাপন করে নাম দেন অগ্নীশ্বর (শিব-পু)।

গৃহ্যসূত্র—জাতকর্ম, উপনয়ন, বিবাহ ইত্যাদি সংস্কার ও গৃহস্থের কর্তব্য পঞ্চ মহাযজ্ঞের ব্যবস্থা এই গ্রন্থে আছে। বেদাঙ্গ কল্পসূত্রের অঙ্গ। বিভিন্ন বেদ বা তার শাখার জন্য বিভিন্ন গৃহ্যসূত্র। আবার কোন কোন বেদের একাধিক শাখার জন্য একটি গৃহ্য সূত্র রয়েছে। ঋক্‌বেদের গৃহ্যসূত্র দুটি:- শাঙ্খায়ন ও আশ্বলায়ন। শাঙ্খায়ন বাষ্কল শাখার গৃহ্যসূত্র। কৌষীতকি মনে হয় শাঙ্খায়নেরই একটি সংস্করণ। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র ঋক্‌বেদের আশ্বলায়ন শাখার গ্রন্থ। সামবেদের গৃহ্যসূত্র তিনটি:- গোভিল, খাদির, জৈমিনীয়। খাদির গৃহ্যসূত্র আসলে গোভিলের সার সঙ্কলন। জৈমিনীয় গৃহ্য সূত্র সামবেদের জৈমিনীয় শাখার গ্রন্থ।

শুক্লযজুর্বেদের মাধ্যন্দিন শাখার গৃহ্যসূত্রের নাম পারস্কর বা কাতীয়। রচয়িতা পারস্কর অর্থাৎ কাত্যায়ন। কৃষ্ণযজুর্বেদের গৃহ্যসূত্র নয়টি:- বৌধায়ন, ভারদ্বাজ, আপস্তম্ব, হিরণ্যকেশি, বৈখানস, আগ্নিবেশ্য, মানব, কাঠক ও বারাহ। বৌধায়ন শ্রৌতসূত্র প্রাচীন গ্রন্থ; বৌধায়ন গৃহ্যসূত্র এর অংশ বিশেষ। আপস্তম্বীয় শ্রৌত-সূত্রের সপ্তবিংশতি প্রশ্ন (= অধ্যায়) হচ্ছে আপস্তম্বীয় গৃহ্যসূত্র। হিরণ্যকেশির অপর

নাম সত্যাষাঢ় এবং হিরণ্যকেশি শৌত্রসূত্রের অন্তর্গত। বৈখানসের মন্ত্রগুলি তৈত্তিরীয় সংহিতা আগত নয়; বৈখানসীয় মন্ত্রসংহিতা থেকে গৃহীত। রচয়িতা অগ্নিবেশের নাম অনুসারে আগ্নিবেশ্য ; এই গৃহ্যসূত্রটিতে 'নারায়ণ বলি', 'যতিসংস্কার', 'বানপ্রস্থ-বিধি' ইত্যাদি কতকগুলি বিধি আছে ; অন্য কোন গৃহ্যসূত্রে এগুলি নাই। মানব গৃহ্যসূত্রের অপর নাম মৈত্রায়ণী মানব গৃহ্যসূত্র ; মৈত্রায়ণী সংহিতার মন্ত্র থেকে রচিত। কাঠক গৃহ্যসূত্রের অপর নাম লৌগাক্ষী গৃহ্যসূত্র ; এটিও স্বতন্ত্র একটি মন্ত্রসংহিতার অনুসারী। বারাহ গৃহ্যসূত্র মৈত্রায়ণী শাখার অবান্তর ভেদ।

অথর্ব বেদের একটি মাত্র গৃহ্যসূত্র ; নাম কৌশিক গৃহ্যসূত্র ; এই গৃহ্যসূত্রে সাধারণ কাজ ছাড়াও শান্তিক, পৌষ্টিক ও আভিচারিক কাজেরও বিবরণ আছে।

গেহমুর—গমর (পূ-রেল)। গাজিপুর জেলাতে। মুর দৈত্যের দেশ। কৃষ্ণের হাতে নিহত। বামন পুরাণ অনুসারে শ্বেতদ্বীপে যুদ্ধ হয়েছিল।

গো—পুলস্ত্যের স্ত্রী। ছেলে বিশ্রবণ (দ্রঃ)।

গোকর্ণ—(১) বর্তমানে গোওয়া। উত্তর কানাড়াতে কারওয়ার জেলাতে। গোয়া থেকে ৩০ মাইল ; বিখ্যাত তীর্থ। এখানে রাবণ প্রতিষ্ঠিত মহাবালেশ্বর শিব মন্দির রয়েছে। এখান থেকে ৩০ মাইল দক্ষিণে এবং গোয়া থেকে ৩ মাইল দক্ষিণে সদাশিবগড় ; শৈব নীলকণ্ঠকে এখানে শঙ্কর পরাজিত করেন। (২) শ্লেষ্মাত্মক বা উত্তর গোকর্ণ ; নেপালে পশুপতিনাথ থেকে উ-পূর্বে ২-মাইল। (৩) গোমুখী (দ্রঃ)। (৪) বরাহ পুরাণে সরস্বতী সঙ্গমে একটি তীর্থ।

রাজা কল্মাষপাদ এই গোকর্ণে তপস্যা করে মুক্তি পান। কেরল রাজ্যের জন্ম এই গোকর্ণকে কেন্দ্র করে। দ্রঃ- গঙ্গা, পরশুরাম। ভগীরথ গঙ্গা আনবার জন্য এই গোকর্ণে তপস্যা করেছিলেন। তীর্থ যাত্রা কালে অর্জুন গোকর্ণে এসেছিলেন। ভানুমতীকে অপহরণকারী নিকুম্ভকে কৃষ্ণ, অর্জুন ও প্রদ্যুম্ন এই গোকর্ণে নিহত করেন।

গোকর্ণ—(১) শিবের এক অবতার। বরাহ কল্পে শিব গোকর্ণ রূপে জন্মান ; সন্তান কশ্যপ, উশনস্, চ্যবন, ও বৃহস্পতি।

(২) তুঙ্গভদ্রা তীরে একটি গ্রাম। এখানে যে সব ব্রাহ্মণরা বাস করতেন তাঁরা এটিকে সমৃদ্ধ করে তোলেন। এখানে আত্মদেব নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, এঁর স্ত্রী অত্যন্ত কলহপ্রিয়া ; নাম ধুন্দুলী। বহু দিন এদের সন্তান হয়নি। দুঃখে আত্মদেব বনে চলে যান ; বনে একটি জলাশয়ের ধারে যখন বসেছিলেন তখন এক সন্ন্যাসীর দেখা হয়। সন্ন্যাসীর সঙ্গে কথাবার্তা হয়। সন্ন্যাসী ধ্যানে সব জানতে পারেন এবং বলেন পর পর সাত জন্ম তার কোন সন্তান হবে না। আত্মদেবকে সে জন্য সন্ন্যাস নিতে বলেন। কিন্তু আত্মদেব সম্মত হন না ; সন্ন্যাসীকে কোন একটা উপায় করার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। সন্ন্যাসী তখন একটি ফল দেন এবং বলে দেন ধুন্দুলী যেন ফলটি খায় এবং এক বছর যেন উপবাস করেন। আত্মদেব ফিরে এসে স্ত্রীকে সব কথা বলেন এবং ফলটি দেন। ধুন্দুলী ফলটি খেতে চায় বটে কিন্তু উপবাস করতে চায় না। এই সময়ে ধুন্দুলীর বোন এসে গোপনে জানায় তার

সন্তান হবে ; সন্তানটিকে সে দিয়ে দেবে। আত্মদেবও প্রকৃত ঘটনা জানতে পারবে না ; এবং ফলটি একটি গরুকে খেতে দিয়ে পরীক্ষা করে দেখা যাবে। এদের পরিকল্পনা অনুযায়ী ধুন্দুলী গর্ভবর্তী হয়েছে বলে প্রচার করা হয় এবং যথা সময়ে বোনের ছেলে হলে ধুন্দুলীর ছেলে বলেই লোকে বিশ্বাস করে। ধুন্দুলীর সে রকম দুধ হচ্ছে না বলে ধুন্দুলীর বোন এসে স্তন্য দিতে থাকেন। ছেলের নাম হয় ধুন্দুকারী।

ফলটি যে গরু খেয়েছিল তিন মাস পরে তারও একটি শিশু হয় ; মানুষের মত দেখতে শিশু ; কান দুটি কেবল গরুর মত। ফলে নাম হয় গোকর্ণ। ধুন্দুকারীও গোকর্ণ এক সঙ্গে পালিত হতে থাকেন। ধুন্দুকারী ক্রমশ দুর্বৃত্ত হয়ে উঠতে থাকেন এবং গোকর্ণ ক্রমশ পণ্ডিত হয়ে ওঠেন। ধুন্দুকারী পিতামাতার জীবন পর্যন্ত দুর্বিষহ করে দেন। আত্মদেব বনে গিয়ে তপস্যা করে মুক্তি লাভ করেন। পুত্রের অত্যাচারে ধুন্দুলী কূপে আত্মবিসর্জন করেন। গোকর্ণ তীর্থযাত্রায় বার হয়ে যান।

ধুন্দুকারী বেশ্যাদের নিয়ে দিন কাটাতে থাকেন। বৃত্তি হয়ে দাঁড়ায় চুরি করা। রাজপুরুষরা জানতে পেরে ধুন্দুকারীকে পুড়িয়ে হত্যা করে। ধুন্দুকারীর আত্মা প্রেতে পরিণত হয়। গোকর্ণ খবর পেয়ে ফিরে আসেন এবং গয়াতে শ্রাদ্ধ করেন। কিন্তু প্রেত শান্তি পায় না : গোকর্ণকে অনুরোধ করে তার শান্তির ব্যবস্থা করতে। গোকর্ণ তখন পণ্ডিতদের পরামর্শে সূর্যের আরাধনা করেন। সূর্য এসে উপদেশ দেন সাত দিন ভাগবত পাঠ করতে। অপরের সঙ্গে ধুন্দুকারীর আত্মাও ভাগবত শুনতে আসে এবং এক সপ্তাহ শেষে মোক্ষ লাভ করে। ধুন্দুকারী যখন স্বর্গে যাচ্ছেন তখন গোকর্ণ জানতে চান সে একা কেন স্বর্গে যাচ্ছে। অপরে কেন যেতে পাচ্ছে না। ধুন্দুকারী জানান অপরে পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে শোনেনি। গোকর্ণ তখন আবার আর এক সপ্তাহ ভাগবত পাঠ করেন এবং সকলে পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং সকলেই স্বর্গে যান (ভাগবত মাহাত্ম্য)।

গোকুল—ব্রজ, মহাবন। মথুরার পূর্ব ও দক্ষিণ কোণে অবস্থিত। যমুনার বাঁ দিকে পুণ্যস্থান। মথুরা থেকে ৬ মাইল দ-পশ্চিমে। এখানে নন্দ বাস করতেন। কৃষ্ণের বাল্য জীবনের বহু ঘটনা এখানে ঘটেছিল। কৃষ্ণ বলরাম এখানে বাল্যে পালিত হয়েছিলেন। পূতনা ইত্যাদিকে কৃষ্ণ (দ্রঃ) এখানেই নিহত করেন। কংসের অত্যাচারে নন্দ পরে কৃষ্ণকে নিয়ে বৃন্দাবনে চলে যান। অম্বালীগ্রাম নিবাসী বল্লভ ভট্ট (চৈতন্যের সমকালীন) বল্লভাচারী সম্প্রদায় স্থাপন করেন এবং মহাবনের অনুকরণে নতুন একটি গোকুল, নাম নবগোকুল, প্রতিষ্ঠা করেন। এটি যমুনার পূর্ব তীরে এবং পুরাতন গোকুলের দক্ষিণে ১ মাইল মত। এখানে নন্দ বাস করতেন। বৈষ্ণবদের পরম তীর্থ। দ্রঃ- ব্রজ, ব্রজ মণ্ডল।

গোখলি—ব্যাসের শিষ্য পরম্পরার মধ্যে এক জন। শাকল্যের সরাসরি শিষ্য। শাকল্য বেদের যে অংশ পেয়েছিলেন সেই অংশ ভাগ করে বালগায়ন, মৌদ্গল্য, শালি, আদিশিশির, গোখলি ও জাতুকর্ণকে ভাগ করে দেন।

গোভিল—(১) ইনি উতথ্যকে শাপ দিয়ে সর্পে পরিণত করেন। পরে উতথ্য সত্যতপসে পরিণত হন। (২) বৈশ্রবণের এক জন যক্ষ ভৃত্য। এক বার আকাশ পথে যাবার সময় বিদর্ভরাজ উগ্রসেনের স্ত্রী পদ্মাবতীকে সখীদের সঙ্গে স্নান করতে দেখেন। পদ্মাবতীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে পাশে একটি ছোট পাহাড়ে উগ্রসেনের বেশ ধরে গান করতে থাকেন। পদ্মাবতী স্বামী মনে করে এগিয়ে এলে যক্ষ পদ্মাবতীকে সম্ভোগ করেন। কিন্তু যক্ষের আচরণে পদ্মাবতীর সন্দেহ হয়; পদ্মাবতী প্রশ্ন করলে যক্ষ নিজের পরিচয় দিয়ে পালিয়ে যান (পদ্ম-প়)। দ্রঃ- কংস।

গোণ্ডা—(১) গৌতম আশ্রম (দ্রঃ)। (২) গোনর্দ (দ্রঃ)।

গোণ্ডয়ান—দক্ষিণ কোসল। মহাকোসল। চণ্ড জেলার ওয়াইরাগড়ও এই মহা কোসলের অন্তর্গত।

গোতম—ঋক্ বেদে বহু মন্ত্রের রচয়িতা। ঋক্ বেদে বহু জায়গায় এঁর নাম আছে। প্রথম মণ্ডলে রহুগণের ছেলে: ৭৪-৯৩ সূক্ত এঁর রচনা। আরো অনেকগুলি সূক্তে এঁর নাম আছে। মরুভূমির মধ্যে তৃষ্ণায় একবার মরুৎদের/অশ্বিনীকুমারদের কাছে জল চান। এঁরা একটি কূপ তুলে এনে কাৎ করে কূপ থেকে এঁকে জল ঢেলে দেন। এঁর প্রণীত আইনের বইয়ের নাম ধর্মশাস্ত্র। অপর নাম শতানন্দ। অহল্যার স্বামী অন্য ব্যক্তি। দ্রঃ- গৌতম।

গৌতমী—(১) জনৈকা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণী। এঁর ছেলে সাপের কামড়ে মারা গেলে অর্জুনক নামে একটি ব্যাধ সাপটিকে গৌতমীর সামনে এনে হত্যা করবার অনুমতি চান। গৌতমী রাজি হন না; কারণ এতে তাঁর ছেলে বেঁচে উঠবে না; ধর্মনিষ্ঠ হতে হলে শোক জয় করতে হবে: ব্রাহ্মণের রাগ করা অন্যায়। অর্জুনক পীড়াপীড়ি করলেও ইনি মত দেন না। এই সময় সাপটি জানায় বালককে কামড়াবার জন্যই মৃত্যু তাকে পাঠিয়েছে; পাপেতে এর মৃত্যু হয়েছে। এই বলার পর মৃত্যু এসে জানান তিনি কালের অধীন; সাপকে পাঠাতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন; তিনি নিজে নির্দোষ। এর পর স্বয়ং কাল আসেন এবং জানান বালকের মৃত্যুর জন্য তার কর্মই দায়ী। গৌতমী তখন স্বীকার করেন কর্মবশেই বালক মারা গেছে; কর্মবশেই তিনি পুত্রহীনা হয়েছেন; অর্জুনকের উচিত সাপকে ছেড়ে দেওয়া। অর্জুনক ছেড়ে দেন; কাল ও মৃত্যু চলে যান; এবং গৌতমী শোকশূন্য হন (মহা ১৩।১)। (২) দ্রোণাচার্যের স্ত্রী কৃপী।

গোত্র—বোধায়ন শ্রৌতসূত্রে আটজন গোত্র-প্রবর্তক ঋষির নাম আছেঃ ভরদ্বাজ, জমদগ্নি, গৌতম, অত্রি, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, অগস্ত্য। গোত্র এই ঋষিদের বংশ সূচিত করে; যেমন কাশ্যপ গোত্র কশ্যপ ঋষির বংশ। আবার মূল গোত্র বলা হয়েছে আঙ্গিরস, কাশ্যপ, ভৃগু, ও বশিষ্ঠ। এ ছাড়াও আরো অনেকগুলি ঋষির নামে পরে আরো অনেকগুলি গোত্র চালু করা হয়েছিল। দ্রঃ- প্রবর। সমান গোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের গোত্র কুলপুরোহিতের গোত্র অনুসারে ঠিক হয়। বৌদ্ধ ও জৈনদের মধ্যেও গোত্র বিচার রয়েছে। অন্তত হরিবংশ যে যুগে লেখা হয়েছিল

সে সময় গোত্র ব্যবস্থার একটি বিশেষ পরিচয় ফুটে রয়েছে গৃৎসমদে (দ্রঃ)। প্রাচীন রোমানদেরও কিছুটা গোত্র বিচার ছিল। (২) ঊর্জার (দ্রঃ) ছেলে।

গোত্রভিৎ—ইন্দ্রের একটি নাম (শুক্লযজু ১৭।৩৮)। গোত্র অর্থে অসুরকুল, মেঘ বা পর্বত (মহীধর মতে)। কৃষ্ণযজুর্বেদের ব্যাখ্যায় সায়ন (৪।৪।৬।৪) বলেছেন পর্বতের পক্ষচ্ছেদক। ঋক্‌বেদে (১।৫৭।৬, ২।১৭।৫) পর্বতের পক্ষ ছেদ, এবং পর্বত আবৃত জল ইন্দ্র মুক্ত করে দিয়ে ছিলেন। এটি যেন রূপক। মেঘ যেন আকাশে সঞ্চরণশীল পর্বত। ঋক বেদে পক্ষচ্ছেদ প্রসঙ্গ বিভিন্ন স্থানে আছে। (৮।৬।১৩) ঋকে বলা হয়েছে পর্ব সমন্বিত মেঘ বৃত্রাসুরকে পর্বে পর্বে আঘাত করে জলবর্ষণের পথ মুক্ত করে দিয়েছিলেন। পর্বত অর্থে যাস্ক বলেছেন মেঘ। রামায়ণে সুন্দরকাণ্ডে (১।১১৭-১২১) মৈনাক হনুমানকে বলে সত্যযুগে পর্বতরা গরুড়ের মত উড়ে বেড়াত ইত্যাদি। মৈনাক বায়ুর সাহায্যে কোন মতে রক্ষা পেয়েছে।

গোদাবরী—দাক্ষিণাত্যের নদী। গোদা, গৌতমী (দ্রঃ), গোমতী গঙ্গা, দক্ষিণ গঙ্গা, নন্দা। ব্রহ্মগিরি পর্বতে উৎপত্তি ; পাশেই ত্র্যম্বক গ্রাম ; নাসিক থেকে ২০ মাইল। মতান্তরে নিকটে জটাফাটকা পর্বতে উৎপন্ন। ত্র্যম্বকে কুশাবর্ত নামে একটি হ্রদ আছে ; প্রবাদ এর নীচে দিয়ে গোদাবরী এগিয়ে গেছে। ত্র্যম্বক গ্রামকে গৌতমীও বলা হয়। প্রতি বৎসর সারা ভারতবর্ষ থেকে পুণ্যার্থীরা গৌতমীতে স্নান ও ত্র্যম্বকেশ্বর শিবের (১২ লিঙ্গের একটি) পূজা দিতে আসেন। গোদাবরী জেলাতে ভদ্রাচলমে একটি মন্দির রয়েছে ; এখানে রামচন্দ্র লঙ্কা যাবার পথে গোদাবরী পার হন। প্রণহিতা ও গোদাবরী সঙ্গম থেকে গোদাবরী মোহনা পর্যন্ত গোদাবরীর নাম মহাশালা (পদ্ম-পু)=মেইসোলোস্ (গ্রীক)। বৈনতেয় গোদাবরী=সুপর্ণা ; বশিষ্ঠ গোদাবরীর একটি শাখা। গোদাবরীর সব চেয়ে দক্ষিণ প্রান্তীয় শাখা। পশ্চিমঘাট পর্বত থেকে বার হয়ে বঙ্গোপসাগরে এসে পড়েছে। এর তীরে প্রতিষ্ঠান (বর্তমানে পাইথান) প্রাচীন নগরী। রাজমন্দ্রীর কিছু পরে নদী দুটি শাখায় ভাগ হয়েছে : পূর্ব শাখা গৌতমী গোদাবরী, পশ্চিম শাখা বশিষ্ঠ গোদাবরী ; দুটি শাখার মাঝে বদ্বীপ। সিদ্ধপুরুষ সেবিত এই নদীতে স্নান করলে গোমেধ যজ্ঞের ফল এবং বাসুকি লোক লাভ হয়। রাজা যুধিষ্ঠির এই নদী তীরে তীর্থ যাত্রায় এসেছিলেন। রামচন্দ্র গোদাবরী তীরে পঞ্চবটীতে দীর্ঘকাল বাস করেন। ধর্মকার্যে অন্যান্য নদীর সঙ্গে গোদাবরীকেও আহ্বান করা হয়।

গোধা—দ্রঃ-মুদ্রা, দেবী। ভরনুস্ বেঙ্গালেন্সিস্।

গোনর্দ—(১) পাঞ্জাব ; কাশ্মীররাজ গোনর্দ জয় করেছিলেন ; ফলে এই নাম। (২) গোনন্দ, গোণ্ডা, গৌড়। উত্তর কোসলের সাবডিভিসান, রাজধানী শ্রাবস্তী। সমস্ত উত্তরকোসলও গোণ্ডা (<গোনর্দ) নামে অভিহিত। পতঞ্জলির (খৃ-পূ ২ শতক) জন্ম স্থান ; ফলে পতঞ্জলির অপর নাম গোনর্দীয়। পতঞ্জলি পুষ্যমিত্রের সমসাময়িক ; মহাভাষ্য (খৃ-পূ ১৪০-১২০) ; এই সময় মিনান্দর অযোধ্যা আক্রমণ করেছিলেন। (৩) বিদিসা ও উজ্জয়িনীর মধ্যবর্তী একটি নগর।

গোপকবন—গোপকপত্তন, গোপকপুর, গোয়া। বোম্বে প্রেসিডেন্সিতে। কদম্ব বংশের রাজ্য।

গোপতি—(১) কালকেতু অসুরের সহকর্মী এক জন অসুর। ইরাবতীর তীরে মহেন্দ্র পর্বতে কৃষ্ণের হাতে নিহত হন। (২) মুনির গর্ভে কশ্যপের ঔরসে জন্ম এক জন গন্ধর্ব। (১) শিবির ছেলে। পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করলে এক পাল গরু এই শিশুকে পালন করে। দ্রঃ- ক্ষত্রিয়।

গোপথ ব্রাহ্মণ—অথর্ব বেদের এক মাত্র ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে যজ্ঞীয় বিধির আলোচনা এবং যজ্ঞের স্তুতি থাকে। কিন্তু গোপথ এর কিছুটা ব্যতিক্রম। অথর্ববেদে আভিচারিক মন্ত্রের প্রাচুর্য রয়েছে কিন্তু গোপথে অভিচার কর্মের কোন প্রসঙ্গ নেই। এটি বৈদিক যুগের একেবারে শেষে রচিত মনে হয়। অনেকের মতে কল্পসূত্রগুলিরও পরে এর রচনা। গোপথ শৌনক শাখার ব্রাহ্মণ বটে তবু পৈপ্পলাদ শাখার মন্ত্রও এতে আছে। দুটি ভাগ। পূর্ব ভাগে সৃষ্টিতত্ত্ব, অথর্ববেদীয় ঋত্বিক ব্রহ্মার মহিমা, ওঁকার ও গায়ত্রী মন্ত্রের মহিমা, ব্রহ্মচারীর কর্তব্য এবং ভৃগু, অঙ্গিরা, অথর্ব ইত্যাদি ঋষি সম্বন্ধে আলোচনা। কয়েকটি যজ্ঞের তাৎপর্যেরও ব্যাখ্যা আছে। এই গোপথের প্রথম ভাগে বলা হয়েছে ঘোর ও শান্ত দুটি উপাদানে অথর্ব বেদ গঠিত। উপনিষদের ভাব ধারারও বেশ কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়।

উত্তর ভাগের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নাই; অন্যান্য বৈদিক গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত বিষয় নিয়ে রচিত। নানা কাজ ও আথর্বন মন্ত্রের প্রয়োগ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আছে।

গোপরাষ্ট্র—গোবরাষ্ট্র। নাসিক জেলাতে ইগাৎপুর সাবডিভিসনে। একটি মতে কুভ, দক্ষিণ কোঙ্কন। টলেমির কৌব (গোভ)। দীপবর্তী (দ্রঃ)।

গোপা—বুদ্ধের স্ত্রী। সুপ্পবদ্ধ নামে এক শাক্যের কন্যা। গায়ের রঙ সোনার মত ছিল বলে অপর নাম ভদ্দা কচ্চানা। ছেলে রাহুল যে দিন জন্মায় সেই দিনই বুদ্ধদেব সংসার ত্যাগ করেন। গোপা সন্ন্যাসিনী বেশে রাজ পরিবারে অবস্থান করতেন। শুদ্ধোদনের মৃত্যুর পর গোপা ভিক্ষুণী সঙ্গে যোগদান করেন। দ্রঃ- কোলি।

গোপাচল—(২) রোটাস পর্বত। (২) শঙ্করাচার্য পর্বত। (৩) গোয়ালিয়র।

গোপালী—একজন অপ্সরা। দ্রঃ-শৈশিরায়ন। কালযবনের জন্মের পর গোপালী স্বামীকে ত্যাগ করে ফিরে যান।

গোপী—বৈষ্ণব সাহিত্য ও দর্শনের সৃষ্টি। রাধাই অসংখ্য গোপী রূপে প্রকাশিত। কৃষ্ণ ও গোপীদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক ছিল। দ্রঃ-রাধা ও রাস। কিন্তু বৈষ্ণব দৃষ্টিতে এই যৌন সম্পর্কের অসংখ্য কূট আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা তুলে ধরা হয়েছে। গোপীদের দুটি শ্রেণী; একটি ভাগ নিত্যসিদ্ধা এদের বলা হয় সখী; আর একটি ভাগ সাধন সিদ্ধা, এদের বলা হয় মঞ্জরী। মঞ্জরীরা দেহদান করতেন না; রাধা কৃষ্ণের মিলনে ও সেবায় সহায়তা করতেন। ললিতা বিশাখা ইত্যাদিরা রাধার সমজাতীয়। পদ্ম পুরাণে আছে সমস্ত মুনিরা তাঁকে রাম হিসাবে দেখতে চান এবং ভোগ করতে চান। ফলে এরা গোপী হয়ে জন্মান। দ্রঃ-ক্ষমা, বিরজা, প্রভা, শান্তি, শোভা।

পুরুষ দেহে পুরুষ রস ক্ষরণ কম হলে এবং অগ্নিদা রসের আধিক্যে যে বিকার দেখা দেয় সেই বিকার থেকেই বৈষ্ণব সাহিত্যের গোপী শাখা ও রাধাকৃষ্ণের মিলন শাখার সৃষ্টি ; সঙ্গে অবশ্য কিছুটা নন্দনতত্ত্ব রয়েছে। দ্রঃ- ধর্ম, বৈষ্ণব; নারী।

গোপুর—বা গোপুরম। মন্দির বা প্রাসাদের দরজায় অট্টালিকা বিশেষ। দ্বারশালা। নানা পরিকল্পনা অনুসারে তৈরি হত ; এবং প্রচুর কারুকার্য থাকত। পনের রকমের গোপুরমের বিশদ বিবরণ প্রাচীন স্থাপত্য শাস্ত্র মানসারে রয়েছে। এক থেকে ১৭ তলা পর্যন্ত হতে পারে। অনেক সময় সমকেন্দ্রিক পাঁচমহলা প্রাসাদ রূপেও দেখা যায়। প্রতি তলের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা অলংকরণ ইত্যাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পাওয়া যায়। ভেতরের কক্ষ, জানালা, দরজা ইত্যাদিরও বিশদ বিবরণ আছে। গোপুরম দক্ষিণী স্থাপত্য রীতির বৈশিষ্ট্য ; সম্ভবত পল্লব শৈলী থেকে জন্ম। দক্ষিণ ভারত ছাড়া অন্য কোথাও নাই। মাদুরায় মীনাক্ষী ও তাঞ্জোরে নটরাজের মন্দিরে গোপুরম অতুলনীয়। এলোরায় কৈলাস মন্দিরেও গোপুরম আছে।

অগ্নিপুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, কামিকাগম, অর্থশাস্ত্র, মানসার লিপি ইত্যাদি বহু জায়গায় এই গোপুরমের উল্লেখ ও বিবরণ রয়েছে।

গোপ্রতার—গুপ্তার, গুপ্তহরি। অযোধ্যাতে। ফয়জাবাদে সরযূ তীরে একটি তীর্থ। রামচন্দ্র এখানে দেহত্যাগ করেন (মহা ৩।৮২।৬৩)। কাছেই গুপ্তার মহাদেবের মন্দির।

গোবর্দ্ধন—মথুরা জেলার বৃন্দাবন থেকে ২৯ কি-মি দূরে একটি পাহাড়। অপর নাম গিরিরাজ। ভাগবতে আছে ব্রজে এক বার অনাবৃষ্টি হলে দেশের লোকেরা ইন্দ্রযজ্ঞের ব্যবস্থা করেন। হরিবংশে (২।১৭।১১) বৃন্দাবনে চিরাচরিত প্রথা ছিল ইন্দ্রকে পূজা করা। কিন্তু কৃষ্ণের কথায় ইন্দ্রের বদলে গোবর্দ্ধন পাহাড়কে সকলে পূজা করেন। পূজাতে পশু ও মহিষ মাংস সকলে খায়। কৃষ্ণ বিরাট গিরি দেবতা রূপ ধরে (২।১৭।২১) মাংস খান। ইন্দ্র এতে অপমানিত হয়ে সপ্তাহ ধরে শিলাবৃষ্টি ও বজ্রপাতে বৃন্দাবন ধ্বংস করে ফেলতে চেষ্টা করেন ; কৃষ্ণ তখন গোকুল ও গোপদের রক্ষা করার জন্য বাঁ হাতের এক আঙুলে পৈথো গ্রামে গোবর্দ্ধন পাহাড় মাটি থেকে তুলে ছাতার মত ধরে বৃন্দাবনবাসীদের রক্ষা করেন। ইন্দ্র হেরে গিয়ে ক্ষমা চান। স্বর্গের গরুরা কৃষ্ণকে গরুদের ইন্দ্র/গোবিন্দ নাম দিয়েছে জানিয়ে যান এবং সব সময় অর্জুনের সহায় থাকতে বলেন। কার্তিক মাসের শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে বৈষ্ণবরা পূর্বাহ্নে গোবর্দ্ধন পূজা করেন। মথুরাতে গোবর্দ্ধন পাহাড়কে অর্চনা ও প্রদক্ষিণ করা হয়। অন্যত্র অন্ন বা গোময় দিয়ে পাহাড় তৈরি করে অর্চনা করা হয়। দ্রঃ-ব্রজমণ্ডল। গোবর্দ্ধনমঠ= ভোগবর্দ্ধনমঠ, দ্রঃ।

গোবর্দ্ধনপুর—বোম্বে প্রেসিডেন্সিতে নাসিকের কাছে একটি গ্রাম (মার্কণ্ড)।

গোবাসন—শিবি দেশের রাজা ; মেয়ে দেবিকা ; যুধিষ্ঠিরকে (দ্রঃ) স্বয়ংবরে বিয়ে করেন।

গোবাসন—কিউ-পি-সোঙ-না (হিউ-এন-ৎসাঙ) বা গোবিসন। পশ্চিম রোহিলখণ্ডে

মত্তিপুরের (বর্তমানে মুণ্ডোর) দ-পূর্বে। রাজধানী বিরাটপত্তন ; কুমায়ুন জেলাতে বর্তমানে ধিকুলি।

গোবিতত—বিশেষ এক ধরণের অশ্বমেধ। ভরতের জন্য কণ্ব (দ্রঃ) এই যজ্ঞ করেন।

গোভিল—সামবেদীয় কৌথুমী শাখার গৃহ্যসূত্রকার। এঁর অন্য গ্রন্থ সামবেদের নৈগেয় সূত্র ও পুষ্পসূত্র।

গোভিলগৃহ্যসূত্র—এই গ্রন্থে চার প্রপাঠক ও ঊনচল্লিশ কাণ্ডিকা, মোট সূত্র সংখ্যা ১০৬৯। প্রথম প্রপাঠকে সামান্য বিধি, গৃহস্থের অবশ্য কর্তব্য, ব্রহ্মযজ্ঞ ও অন্যান্য যজ্ঞের বিধি আছে। দ্বিতীয় প্রপাঠকে বিবাহ, গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তকরণ, জাত-কর্ম, নামকরণ, চূড়াকরণ, উপনয়ন ইত্যাদি। তৃতীয় প্রপাঠকে গোদান, আদিত্য ব্রত, বেদাধ্যয়ন ব্রত, সমাবর্তন, গোযজ্ঞ, অশ্বযজ্ঞ, শ্রাবণী আশ্বযুজী, আগ্রহায়ণী অষ্টকা প্রভৃতির বিবরণ, চতুর্থ প্রপাঠকে রয়েছে বিবিধ অন্বষ্টকা, নানা কার্য সিদ্ধির উপায় ও গৃহারম্ভ ইত্যাদি।

এই গ্রন্থের মন্ত্রগুলি আংশিক ভাবে সামবেদ থেকে নেওয়া ; অবশিষ্ট অংশ মন্ত্রব্রাহ্মণ থেকে। সামবেদীয় কৌথুমী শাখার ব্রাহ্মণদের বিবাহ উপনয়ন ইত্যাদি সংস্কারের মন্ত্রগুলির চয়নিকা এই মন্ত্রব্রাহ্মণ। সায়ণাচার্যের মতে গোভিল গৃহ্যসূত্র সামবেদীয় আটখানি ব্রাহ্মণের অন্যতম। সামবেদীয় গৃহসূত্রগুলির মধ্যে এটি প্রাচীনতম এবং সেই সময়ের আচার অনুষ্ঠানের বর্ণনা এতে পাওয়া যায়।

গোমতী—একটি নদী। অপর নাম কৌশিকী। ঋচীকের স্ত্রী ছিলেন কৌশিকী (দ্রঃ)। ঋচীক এক বার ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার সঙ্গে দেখা করতে যান। কৌশিকী বিরহে কাতর হয়ে স্বামীকে অনুসরণ করেন। পথে ঋচীক জানতে পারেন এবং শাপ দিয়ে নদীতে পরিণত করেন। একটি মতে এই কৌশিকী বিশ্বামিত্রের বোন। গোমতী নদীর অধিপতি গোমতী দেবী বরুণের সভাতে থাকেন। (২) বিশ্বভুক নামে অগ্নিদেবের স্ত্রী গোমতী নদী (=গোপতি ; মহা ৩।২০৯।১৯)।

গোমতী—(১) গুমটি, বাশিষ্ঠী। অযোধ্যাতে একটি নদী ; তীরে লক্ষ্ণৌ। (২) ত্র্যম্বক মন্দিরের কাছে গোদাবরীর নাম গোমতী, গৌতমী (দ্রঃ) ; গৌতমের আশ্রম ছিল। (৩) স্কন্দ পুরাণে গুজরাটে একটি নদী ; তীরে দ্বারকা। (৪) মালবে চম্বলের একটি শাখা ; তীরে রন্তিপুর। (৫) ঋকবেদে (১০।৭৫।৬) গোমল নদী ; আফগানে আরাকোসিয়াতে উৎপন্ন ; ডেরাইসমাইল খাঁ ও পাহাড়পুরের মাঝ দিয়ে সিন্ধুতে এসে মিশেছে। (৬) পাঞ্জাবে কাঙড়া জেলাতে একটি নদী।

গোমন্ত=একটি পর্বত। অপর নাম গোম বা রৈবতক।

গোমন্তগিরি—পশ্চিমঘাট পর্বত মালার একটি বিচ্ছিন্ন অংশ। হরিবংশে জরাসন্ধ এইখানে পরাজিত হন। পাহাড় শিখরে গোরক্ষ তীর্থ। কোঙ্কনে গোয়ার কাছে এলাকাটি গোমন্ত দেশ (পদ্ম-পু)। হরিবংশে উত্তর কানাড়াতে একটি পর্বত।

গোমাংস—ঋকবেদে প্রচুর ব্যবহৃত। ঋক্ (১।১৬৪।৪৩) উক্ষাণং পৃশ্নিম্ অপচনন্তম্। ঋকে (১০।৮৬।১৪) বৃষ খাদ্য বস্তু বলা হয়েছে। উক্ষণঃ হি মে পঞ্চদশ সাকং পচন্তি বিংশতিম্;

১৪-২০ খৃষ একটি ব্যক্তি (ইন্দ্র) খেয়ে খুশি হন। মহাভারতে উশীনর (দ্রঃ) বৃষ [illegible] খেয়েন যজ্ঞে লোক দেখান। সত্যব্রত/ত্রিশঙ্কু নিজে গোমাংস খেয়েছিলেন এবং বিশ্বামিত্র পরিবারকেও খাইয়েছিলেন। বশিষ্ঠ 'অপ্রোক্ষিত' মাংস ভোজনের জন্য শাপ দেন; গো মাংসের জন্য নয়। দ্রঃ-কৌশিক, রন্তিদেব। মহাভারতে (১২।২৫৪।৪৬) ত্বষ্টাকে মধুপর্ক দেবার জন্য নহুষ গোহত্যা করতে যাচ্ছিলেন। এই প্রসঙ্গে স্যমরশ্মি (দ্রঃ- বলি) ধেনু হত্যার (১২।২৬০।১৯) কথা সমর্থন করেন। মহাভারতে (১২।২৫৫।৩১) আছে যজ্ঞে গো হত্যা করলেও করতে পারে সঃ গাম্ আলব্ধুম্ অর্হতি। মহাভারতে (১২।২৫৭।২) যজ্ঞে গো হত্যা দেখে বিচক্ষু কাতর হয়ে পড়েন। গোমাংসের গুণ হিসাবে ভাবপ্রকাশে রয়েছে—সুস্নিগ্ধম্. পিত্তশ্লেষ্মবিবর্দ্ধনম্, বৃংহণম, বলকারিত্বম্, পীনসপ্রদরনাশিত্বম্।

গোমুখ—গঙ্গোত্রী-(দ্রঃ)-হিমবাহ গঙ্গোত্রীর দ-পূর্বে বর্তমানে যেখানে গলে নদী রূপে পরিণত। আগে হিমবাহ গঙ্গোত্রীতে গলে নদীতে পরিণত হত। গোমুখের (৩৮৩১ মি) কাছে রক্তবর্ণ নামে একটি ছোট হিমবাহ এসে মিশেছে। গঙ্গোত্রী থেকে ২ মাইল উত্তরে। বড় একটা প্রস্তরখণ্ড কতকটা গরুর মুখ ও দেহ মত দেখায়। রামায়ণে নাম গোকর্ণ; এই গোমুখের কাছে একটি পাথরের ওপর বসে রাজা ভগীরথ গঙ্গার তপস্যা করেছিলেন; এই পাথরটির নাম ভগীরথ শিলা। এখানে নদীগর্ভ থেকে একটু উঁচুতে গঙ্গাব মন্দির আছে এবং গঙ্গার পায়ের কাছে ভগীরথের মূর্তি আছে। মন্দির দ্বারে বিভিন্ন রঙের কাপড়ের ফালি ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। শীত কালে এখানে জল জমে যায়। এখানকার বাড়ির ছাদ আলগা ভাবে বসান স্লেট পাথর দিয়ে তৈরি। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা এখানে থাকেন। শীতকালে জায়গাটি জনশূন্য হয়ে যায়। চৈত্র-বৈশাখ মাসে পশু-চারণের জন্য বহু পশু আনা হয়। এখানকার সামরিক গুরুত্ব আছে। স্থানীয় লোকেরা মঙ্গোলীয়, তিব্বতী ও ভারতীয় জাতিগুলির মিশ্রণে উদ্ভূত। (২) এক জন অসুর। (৩) ইন্দ্রের সারথি মাতলির ছেলে (রা ৭।২৮।১০)।

গোম্মটসার—নেমি চন্দ্র সিদ্ধান্ত চক্রবর্তী কৃত জৈনতত্ত্বের বই। অপর নাম 'পঞ্চসংগ্রহ'। চামুণ্ড রায়কে এই বই উৎসর্গ করার জন্য এর নাম গোম্মটসার।

গোম্মটেশ্বর—শ্রবণবেলগোলায় প্রথম তীর্থংকর ঋষভদেবের ছেলে বাহুবলির বিশাল মূর্তি স্থাপিত করেন (৯৮০-৯৮৩ খৃ) চামুণ্ড রায়। চামুণ্ড রায়ের আর এক নাম ছিল গোম্মট। ফলে এই মূর্তির নাম গোম্মটেশ্বর। চামুণ্ড রায় ছিলেন গঙ্গাবংশীয় রাজা দ্বিতীয় মারসিং ও দ্বিতীয় রাজমল্লের মন্ত্রী ও সেনাপতি। গোম্মট শব্দের অর্থে উৎকৃষ্ট, চিত্তাকর্ষক।

গোয়া—১৪°৫৩'-১৫°৪৮' উ × ৭৩°৪৫'-৭৪°২৪' পূ। ভারতের পশ্চিম উপকূলে বোম্বাই থেকে ৪০০ কি-মি দ-পূ। রামায়ণ মহাভারতে ও পুরাণে নাম গোমনচালা, গোয়াপুরী, গোপকাপুর, গোপকা-পাটনা ইত্যাদি। পরবর্তী যুগে বাণাভাসির কদম্ব রাজ্যের অন্তর্গত হয়। পরে বিজয়নগর ও বাহমনী রাজ্যের অধীনে আসে।

গোয়ালিয়র—গোপাচল। মধ্যপ্রদেশের একটি জেলা ও সহর। ২৫°৩৪'—২৬°২১' উ, এবং ৭৭°৪০'—৭৮°৫৪' পূ। পৌরাণিক নাম গোপ পর্বত, গোপগিরি বা গোপাদ্রি।

এক পাহাড়ি সাধুর কৃপায় সূরয মেন নামে জনৈক ব্যক্তি কুষ্ঠরোগ মুক্ত হয়ে প্রতিদানে পাহাড়ের ওপর গোয়ালিয়ার নামে একটি দুর্গ তৈরি করে দেন। গোয়ালিয়ার ক্রমে গোয়ালিয়রে পরিণত হয়েছে। এই দুর্গ অতি প্রাচীন; ৫২৫ খৃস্টাব্দের একটি শিলালিপিতে এর উল্লেখ আছে। গোয়ালিয়রের শাসক মণ্ডলী নাগেরা খৃ ১-শতকে রাজত্ব করতেন। রাজধানী ছিল পদ্মাবতী (বর্তমানে পদম পওয়ায়া)। এর পর কুষাণ, গুপ্ত, হূণ, প্রতীহার বংশ যথাক্রমে এখানে রাজত্ব করেন।

গোরক্ষনাথ—নাথ বা যোগী সম্প্রদায়ের সুপ্রতিষ্ঠাতাদের এক জন। কিংবদন্তি ৮ শতক থেকে ১৬ শতক পর্যন্ত বার বার তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। নাথপন্থীদের বিশ্বাস সত্যযুগে পাঞ্জাবে, ত্রেতায় গোরক্ষপুরে, দ্বাপরে হরমুজ-এ এবং কলিতে কাঠিওয়াড়ের গোরক্ষমঢীতে বাস করতেন। নেপালেও কিছু দিন বাস করেছিলেন। ঐতিহাসিক সাক্ষ্যে ১১ শতকের লোক মনে হয়। কিংবদন্তি প্রথমে বৌদ্ধ ছিলেন পরে আদিগুরু মৎস্যেন্দ্র-নাথের শিষ্য হন। গোরক্ষনাথ সম্ভবত কবীরের মত কোন অখ্যাত বংশের সন্তান। কাহিনী আছে ঈশ্বরের সন্তান। অন্য মতে মহাদেবের জটা থেকে জন্ম। পাঞ্জাবী ও নেপালী কাহিনীতে কোন এক বন্ধ্যা নারী শিবের বরপূত ভস্ম গোবর গাদায় ফেলে দিলে বার বছর পরে সেই স্তূপ থেকে জন্ম; কিছু মতে ভস্ম খেয়েছিলেন; সন্তান হলে গোবরের গাদাতে ফেলে দিয়েছিলেন। এই জন্য শিশুর নাম হয় গোরক্ষনাথ। অপর কাহিনীতে শিব ও গাভীর সন্তান। নেপালী কিংবদন্তি অনুসারে পশ্চিম নেপালে গুহাতে বাস করতেন। পাঞ্জাবে ঝিলমে টিলাগ্রামে যেন বহু দিন কাটিয়েছিলেন। সারা ভারতে ঘুরে বেড়াতেন। শিয়ালকোটে শালবাহন রাজার ছেলের, ভর্তৃহরির (উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্যের ভাই), ইত্যাদি থেকে কপিল ও মহম্মদেরও গুরু ছিলেন কাহিনী রয়েছে। এঁকে পরমব্রহ্ম মনে করা হয়। আজও অমর। নির্গুণ আবার সগুণ। ত্রিমূর্তিরও গুরু। হিমালয়ে আজও বাস করছেন। নেপালী বৌদ্ধরা ধর্মত্যাগী বলে এঁকে ঘৃণা করেন। দ্রঃ- নাথবাদ, নাথসিদ্ধ।

বিশ্বাস উত্তর পশ্চিম ভারতের কোথাও জন্ম। উত্তর প্রদেশে গোরক্ষপুরে তাঁর মন্দির আছে। তাঁর লিখিত যা কিছু পাওয়া গেছে সেগুলির ভাষা মিশ্রিত হিন্দি। তাঁর নামের সঙ্গে জড়িত স্থানগুলির বেশির ভাগই উত্তর ভারতে। মৎস্যেন্দ্র-নাথের শিষ্য। তাঁর শিষ্যা ময়নামতী (বাংলার কোন রাজমহিষী হলেও) উজ্জয়িনীর রাজকন্যা এবং ভর্তৃহরি, জালন্ধর ইত্যাদি শিষ্যরাও বাঙালী নন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত কানফাটা যোগী সম্প্রদায় এখনও হিমালয়েই বেশি দেখা যায়। নাথপন্থীদের বিশ্বাস তিনিই পরম-পুরুষ। শিবের অবতার রূপে পূজিত হতেন। নেপালের দেবতা পশুপতি নাথ হলেও মুদ্রায় গোরক্ষনাথের নাম থাকে। গোর্খা জাতির ইনি ইষ্টদেবতা এবং এঁর নাম থেকেই গোর্খা নাম। মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রভাব শেষ হলে সমগ্র নেপালে তিনি পূজিত হতেন।

হঠযোগ বা কায়সাধনার দ্বারা দেহকে পরম সত্য উপলব্ধির উপযোগী করে তোলা হচ্ছে নাথপন্থীদের তপস্যা। হঠযোগ গ্রন্থে ও গোরক্ষবোধ গ্রন্থে নাথ পন্থীদের

হঠযোগসাধনের ইঙ্গিত আছে। তাঁর নাদানুসন্ধানও সাধনার অঙ্গ। নাথ মার্গে তন্ত্র ও রহস্যবাদ এসে মিশেছে এবং গোরক্ষনাথের অবদানও এখানে প্রচুর। তাঁর মতবাদ সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ 'গোরক্ষনাথ কী গোষ্ঠী'। হিন্দি ভাষারও তিনি অন্যতম স্রষ্টা বলে ধরা হয়। গোরক্ষবোধ গ্রন্থ নাথ সম্প্রদায়ের গীতা ; এতে তাঁর ধর্মমত আলোচিত হয়েছে ; বইটি ১১ শতকের।

গোরক্ষপুর—২৫°৩৮'-২৭°৩০' উ×৮২°১৩'-৮৬°২৬' পূ। উত্তর প্রদেশের একটি জেলা। গোরক্ষপুর বিভাগের অন্তর্গত। গোরক্ষপুর সহর ২৬°৪৫'উ,×৮৩°২২'পূ; রাপ্তী নদীর তীরে। ১৪০০ খৃ এই সহরে গোরক্ষনাথের মন্দির স্থাপিত হয়। এই জেলায় বহু বৌদ্ধ স্তূপ ও বিহার আছে। সবগুলি খনন করা হয় নি। কাসিয়ার স্তূপটি বিখ্যাত. এখানে মন্দিরের ভেতর বুদ্ধের শায়িত মূর্তি আছে। জেলার দক্ষিণে স্কন্দগুপ্তের একটি স্তম্ভ (খৃ-পূ ৬৬০) আছে। কনৌজ হিন্দু রাজাদের বহু তাম্রলিপি এখানে পাওয়া গেছে।

গোরক্ষ পর্বত—বাথানি কা পাহাড়। ছোট বিচ্ছিন্ন একটি পাহাড়। পুরাতন রাজ গৃহ উপত্যকা থেকে ৫-৬ মাইল পশ্চিমে : দূর থেকে তিনটি শিখর যুক্ত। এখান থেকে কৃষ্ণ ভীম ও অর্জুন মগধ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। সন্দোল পাহাড়ের উত্তরে এবং তুলনায় একটু বড়। গোধন গিরি।

গোরু—মিশরে, সুমেরীয় সভ্যতায়, ক্রিটে, হিত্তি রাজ্যে গাভী ও ষাঁড় বিশেষ ভাবে পূজিত হয়েছে। হরপ্পা সংস্কৃতিতে ভারতীয় গরুর প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায়। সেখানে ককুদ সহ ও ককুদ হীন দু রকম ষাঁড়েরই সিল পাওয়া গেছে। বৈদিক যুগে জীবন যাত্রা গোপালকের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল ছিল। সে যুগে গরুর মাধ্যমে সম্পদের পরিমাণ হত। গোত্র-শব্দটির মূল অর্থ গোশালা। পূষা ছিলেন হারান গোরুর উদ্ধারকারী দেবতা। কার গোরু চিনবার জন্য গোরুর কাণে চিহ্ন করে দেওয়া হত। ঋক্ বেদের পরের সংহিতাগুলিতে কৃষিতে ও শকটে গরুর ব্যবহার ক্রমবর্দ্ধমান হিসাবে দেখা যায়। ছয়, আট, বার বা চব্বিশটি গরু জুড়েও হাল চালনা করা হত। বলদেরও ব্যবহার ছিল। বশিষ্ঠ ইত্যাদি মুনির হাজার হাজার গরু রীতিমত বড় দুগ্ধ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। শিষ্যেরা এই গরুগুলি দেখা শোনা করত। সার হিসাবে গোবরও ব্যবহৃত হত। গোচর্ম থেকে ধনুকের ছিলা হত। রাজারা বহু গরু এক সঙ্গে দান করতেন। বিরাট রাজার গরু চুরি করতে ভীষ্ম নিজেও গিয়েছিলেন। গরু অভুক্ত থাকলে অনধ্যায় বিহিত ছিল। মধ্যযুগীয় ভাস্কর্য ও স্থাপত্যে গরুর উপস্থিতি কম নয়। বৃহৎ-সংহিতায় (খৃ ৬-শতক) গরুর অবয়ব সংস্থান কিছু আলোচনা আছে। গরুর মল মূত্রও পবিত্র বলে পরিগণিত হয় ও নানা দেবকার্যে ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত। পঞ্চগব্য পানও পুণ্যজনক। গোবর জল দিয়ে মুছে জায়গা পবিত্র করা হয়।

গী-প্রেস (১৩।৭৭) সংস্করণে মহাভারতে আছে সৃষ্টির পর ক্ষুধিত প্রজারা দক্ষের কাছে আসেন। দক্ষ তখন অমৃত পান করেন। সুগন্ধে উদ্গার ওঠে এবং এই উদ্গার থেকে সুরভির জন্ম। এই সুরভি তারপর কপিলা-দের সৃষ্টি করেন। একবার কপি-

লাদের বাচ্ছারা দুধ খাচ্ছিল ; এদের মুখের ফেনা (১৩।৭৭।২০) মহাদেবের মাথায় এসে পড়ে। মহাদেব রাগে কপিলাদের দিকে তাকান, ফলে এদের রঙ নানা রকমের হয়ে যায়। যারা কেবল চন্দ্রের শরণ নিয়েছিল তাদের রঙ আগের মতই অমৃত বর্ণ থেকে যায়। দক্ষ তখন মহাদেবকে শান্ত করেন ও কতকগুলি গাভী ও বৃষ দেন। মহাদেব এই বৃষকে তখন বাহন ও নিজের ধ্বজাতে স্থাপন করেন। দেবতারা এই সময়ে মহাদেবকে পশুপতি বলে অভিহিত করেন।

গোরুরা (১৩।৭৯) কঠোর তপস্যা করে বরলাভ করে শ্রেষ্ঠ দান হিসাবে গণ্য হবে। পুরীষ পবিত্রতা সাধনে ব্যবহৃত হবে। আগে (১৩।৮১।১২) এদের শিঙ ছিল না। ব্রহ্মার কাছে স্তব করে শিঙ হয়। লক্ষ্মী (১৩।৮২।৩) একবার এসে এদের দেহে অবস্থান করতে চান। কারণ গোরুদের মাহাত্ম্য অতুলনীয়। লক্ষ্মী চঞ্চলা ও বহু জনভোগ্যা বলে প্রথমে প্রত্যাখ্যাত হন। পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত সম্মত হয়ে এরা পুরীষে বাস করতে অনুমতি দেয়।

গোরুরা (১৩।৮৩) গোলোকে থাকে ; লোকপালদের বাস স্থানেরও অনেক ওপরে। দ্রঃ- সুরভি।

গোরুর দাঁতে মরুৎ, জিবে সরস্বতী, চোখে চন্দ্রসূর্য, মূত্রে জাহ্নবী নদী বর্তমান। যেখানে গোরু সেখানেই লক্ষ্মী বিরাজিত। গাভীকে স্বয়ং ভগবতী স্বরূপা মনে করা হয়। গাভী সপ্ত মাতার এক জন। কার্তিকী শুক্লা প্রতিপদ ও অষ্টমীতে গোপূজার বিশেষ বিধান আছে। এই পূজার বিশিষ্ট অঙ্গ গোগ্রাস দান। চান্দ্রায়ণ ও প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠানে ও গোগ্রাস দানের নিয়ম আছে। এই উপলক্ষ্যে কচিঘাস, বাঁশ পাতা ইত্যাদি মাথায় নিয়ে গোরুকে দিলে গোরু যদি স্বচ্ছন্দে খায় তাহলে শুভ। শাস্ত্রে গোদানের মাহাত্ম্য ও প্রকার ভেদ বর্ণিত রয়েছে। সমস্ত পাপ মুক্ত হয়ে যম দ্বারে তপ্ত বৈতরণী অনায়াসে পার হবার উদ্দেশ্যে মৃত্যুর পূর্বে সবৎসা ধেনু দানের বিধান আছে। মৃতের স্বর্গ কামনায় ষোড়শ দানের মধ্যে গোদান অন্যতম। বৃষোৎসর্গ ও চন্দনধেনু দান শ্রাদ্ধের অঙ্গ।

বৈদিক যুগে শূলগব, গবাময়ন প্রভৃতি নানা যজ্ঞে গরু মারা হত ও মাংস (দ্রঃ- গোমাংস) খাওয়া হত। বাড়িতে বিশেষ অতিথি এলে মধুপর্কের মাংসের জন্য গরু বধ করা হত। এ জন্য অতিথির আর এক নাম গোঘ্ন। শিশুপাল (দ্রঃ) কৃষ্ণকে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে সকলের সামনে গোঘ্ন বলেছিলেন। দ্রঃ- চর্মন্বতী। কালক্রমে এই গোহত্যা ও গোমাংস ভক্ষণ পাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দৈবাৎ কোন কারণে গরু মারা গেলে নানা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা রয়েছে।

গোলোক—বিষ্ণুর আবাসস্থল। ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত সমস্ত লোকের ওপর একটি লোক। ব্রহ্মবৈবর্ত মতে বৈকুণ্ঠের ওপর গোলোক। আয়তনে পঞ্চাশ কোটি যোজন। এই গোলোক বায়ুর ওপর অবস্থিত। এখানে বৃন্দাবন নামে একটি বন আছে এবং এখানে কৃষ্ণ রাধিকা বিহার করেন। হরিবংশে কৃষ্ণ (দ্রঃ) জন্মাবার আগে মেরু পর্বতে নিজের বাসস্থানে গিয়েছিলেন। আবার ব্রাহ্মণের ছেলেদের ফিরিয়ে আনবার জন্য কৃষ্ণ (দ্রঃ)

লোকালোক পর্বত অতিক্রম করে (২।১১৩।৩১) এক জায়গায় গিয়েছিলেন। অর্থাৎ এগুলিও বিষ্ণুর আবাস স্থল। দ্রঃ-বিষ্ণু।

গোশৃঙ্গ পর্বত—(১) কোহমারি ; পূর্ব তুর্কিস্থানে উজৎ এর কাছে খোমারি পর্বত শাখা ; হিউ-এন-ৎসাঙ এখানে এসেছিলেন। খোটান থেকে ১৩ মাইল ; বিখ্যাত তীর্থ। এখানে একটি বিহার ছিল ; একটি গুহাতে একজন অর্হৎ থাকতেন। (২) মধ্যভারতে নিষাদভূমির (নরওয়ার) কাছে একটি পাহাড় ; অপর নাম গোপাদ্রি। (৩) নেপালে গোপুচ্ছ ; কাঠমণ্ডুর কাছে, এখানে স্বয়ম্ভূনাথের মন্দির।

গোসাল মোঙ্খলিপুত্র—পিতা মঙ্খলি, মা ভদ্দা (=ভদ্রা)। এক দিন ভিক্ষার জন্য ঘুরতে ঘুরতে বর্ষাতে শ্রাবস্তী নগরের কাছে সরবণ নামে একটি জায়গায় গোবহুল নামে এক ধনী ব্রাহ্মণের গোশালায় এঁরা আশ্রয় নেন এবং এখানে জন্ম বলে নাম গোসাল মঙ্খলিপুত্র। মহাবীরের সন্ন্যাস গ্রহণের তৃতীয় বছরে নালন্দায় গোসালের সঙ্গে মহাবীরের দেখা হয় এবং পণিয়ভূমি নামে গ্রামে গোসাল এঁর শিষ্য হয়ে সন্ন্যাসী হন এবং দু জনে এক সঙ্গে এখানে ছয় বছর কাটিয়ে দেন। এর পর এঁদের মত ভেদ হলে গোসাল শ্রাবস্তীতে চলে যান। এখানে হলাহল নামে এক কুম্ভকারের বাড়িতে ছয় মাস কঠোর তপস্যা করে জিনত্ব পান। জিনত্ব পেয়ে আজীবিক নামে নতুন এক সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন ও মহাবীরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠেন। এর পর এক দিন শ্রাবস্তীতে আবার মহাবীরের সঙ্গে দেখা হয় এবং তার সাত দিন পরে গোসাল মারা যান। চব্বিশ বছর গোসাল সন্ন্যাসী হয়ে জীবন যাপন করেছিলেন।

গৌড়—প্রাচীন লক্ষ্মণাবতী, নিবৃত্তি, লক্ষ্ণৌটি, বিজয়পুর, বরেন্দ্র, পৌণ্ড্র-বর্দ্ধন। পশ্চিম বাংলা, মালদহ, মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের প্রাচীন নাম। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এর উল্লেখ আছে। গুড় উৎপাদনের প্রাচুর্যের জন্য নাম। খৃস্টীয় ৭-শতকে শশাঙ্ক এখানে রাজা ছিলেন। নাম পূর্বগৌড়, রাজধানী গৌড়। মালদা থেকে ১০ মাইল দূরে ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে। গঙ্গার বাম তীরে ; উপস্থিত গঙ্গা ৪-৫ মাইল কোথাও ১২ মাইল মত সরে গেছে। গৌড়ের কাছে রামকেলি গ্রামে রামকেলি মেলা হত ; চৈতন্য-দেবের সময় থেকে মেলাটি গৌড়ে হয়। দ্রঃ- লক্ষ্মণাবতী। দেবপাল, মহেন্দ্রপাল, আদিশূর, বল্লালসেন ও মুসলমান রাজারাও এখানে বাস করতেন। ৬৪৮ খৃস্টাব্দে মগধের হাত থেকে স্বাধীনতা লাভ করে স্থাপিত রাজধানী ; আগে রাজধানী ছিল পৌণ্ড্রবর্দ্ধন। হর্ষ চরিতে গৌড় আছে। অঙ্গ দেশের দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত সমস্ত এলাকাটি গৌড়। (২) শ্রাবস্তীর অপর নাম গৌড় বা উত্তর গৌড় (কূর্ম, লিঙ্গ)। শ্রাবস্তী থেকে ৪২ মাইল দক্ষিণে উত্তর কোসলের সাবডিভিসান গোণ্ডা<গৌড়। গোনর্দ (দ্রঃ)>গৌড় হতে পারে। (৩) পশ্চিম গৌড় ছিল গণ্ডোয়ানা। কাবেরী নদীর তীরে দ-গৌড়। (৪) গঙ্গা ও মহানদী সঙ্গমে আর একটি গৌড়। দ্রঃ- বিন্দুসর।

গৌড়পাদ—প্রাচীন অদ্বৈত সম্প্রদায়ের সুপ্রসিদ্ধ আচার্য। শঙ্করাচার্যের পরম গুরু। অথর্ব বেদের মাণ্ডুক্যোপনিষদের ওপর একটি বিবরণাত্মক কারিকা রচনা করেন। তবে এই গৌড়পাদ এক ব্যক্তি নাও হতে পারেন। সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ব্যক্তির

মিলিত প্রচেষ্টায় এই কারিকা হতে পারে। সাংখ্যকারিকা ভাষ্য, উত্তরগীতাবৃত্তি ইত্যাদি আরো বহু গ্রন্থ আছে।

গৌড়ী—সংস্কৃতে একটি বিশেষ রচনা রীতির নাম। পূর্ব ভারতের কবিরা (বাংলা বিহার, আসাম, ওড়িশা) এই রীতি অনুসরণ করতেন। দণ্ডী এই রীতির ব্যাখ্যা করে চারটি বিশেষত্ব দেখিয়েছেন: অনুপ্রাস প্রিয়তা, অতিশয়োক্তি, দুরূহ শব্দের আধিক্য ও শ্লেষ। দণ্ডীর কাব্যাদর্শে এই অঞ্চলের প্রাকৃতকে গৌড়ী প্রাকৃত বলা হয়েছে এবং একটি প্রধান আঞ্চলিক প্রাকৃত বলে গণ্য করা হয়েছে।

গৌতম—ন্যায় সূত্রকার অক্ষপাদ (দ্রঃ) গৌতম। মন্ত্রদ্রষ্টা, গোত্রপ্রবর্তক, সংহিতাকার গৌতমের অপর নাম গোতম (দ্রঃ)। রামায়ণে অহল্যার (দ্রঃ) স্বামীও গৌতম। শরদ্বানের এবং তার ছেলে কৃপ ও কৃপীও গৌতম এবং গৌতমী বলে অভিহিত। জনক বংশের পুরোহিত শতানন্দ অহল্যাপুত্র এবং মৎস্য পুরাণে ঋষি দীর্ঘ-তমা গৌতম। অক্ষপাদকে বহু জায়গায় গোতম বলা হয়েছে। অন্য মতে দীর্ঘতমা সুরভির প্রসাদে অন্ধত্ব মুক্ত হয়ে গৌতম নাম পান এবং তপস্যায় ব্রহ্মত্ব লাভ করেন। ইনিই অক্ষপাদ নাম পেয়েছিলেন। গোত্র-প্রবর্তক সংহিতাকার গৌতমের, একটি মতে, প্রকৃত নাম ভরদ্বাজ সম্ভবত ইনি হিন্দু যুগের মধ্য বা শেষ ভাগের লোক। গৌতম জন্মালে গো (--আলো ছড়িয়ে পড়ে ; চার দিকে তম (অন্ধকার) সরে যায়; ফলে নাম। কোন গৌতমেরই বংশ পরিচয় জানা নাই। ফলে কোন্ গৌতম কে অস্পষ্ট।

অহল্যার স্বামী গৌতম, ছেলে শতানন্দ, শরদ্বান ও চিরকারী। হাতে শর নিয়ে জন্ম বলে, নাম শরদ্বান, প্রতি কাজ করার আগে দীর্ঘ সময় চিন্তা করতেন বলে নাম চিরকারী। (মহাভারতে ১২।২৫৮।-) এই গৌতমের অনুপস্থিতিতে ইন্দ্র এক বার আশ্রমে আসেন এবং অহল্যা (দ্রঃ) অতিথি সৎকার করেন। ইন্দ্র তারপর ফিরে গেলে গৌতম আসেন এবং অহল্যাকে সন্দেহ করে ছেলে চিরকারীকে গোপনে ডেকে অহল্যার শিরশ্ছেদের আজ্ঞা দিয়ে বনে চলে যান। চিরকারী কিন্তু ভাবতেই থাকেন কি করা উচিত। গৌতম এদিকে বনে গিয়ে চিন্তা করে দেখেন নিরপরাধ অহল্যাকে তিনি ঈর্ষায় এ ভাবে সন্দেহ করেছিলেন। ফলে তাড়াতাড়ি আশ্রমে ফিরে আসেন এবং চিরকারী পিতাকে ফিরতে দেখে গৌতমের আদেশের কুফল বোঝাতে চেষ্টা করেন। গৌতম খুসি হয়ে ছেলেকে আশীর্বাদ করেন। কাহিনীর আর একটি রূপ কিনা অস্পষ্ট ; তবে যেন ইন্দ্র পরে অহল্যার (দ্রঃ) সতীত্ব নষ্ট করলে ইন্দ্র ও অহল্যা দুজনকেই গৌতম শাপ দেন। এক গৌতমের একটি মেয়ের নাম পাওয়া যায় না; উতঙ্ক মাথায় করে সমিধের বোঝা নিয়ে এলে এই মেয়েটি উতঙ্কের কষ্টে কেঁদে ফেলেছিল। অপর তিনটি মেয়ে জয়া, জয়ন্তী ও অপরাজিতা। প্রিয় শিষ্য উতঙ্ককে (দ্রঃ) শিক্ষা শেষেও বাড়ি ফিরে যেতে দেন নি। উতঙ্ক বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। রাজা কল্মাষপাদ শাপগ্রস্ত অবস্থায় শেষ দিকে গৌতমের কাছে এসে আশ্রয় নেন এবং এঁরই পরামর্শে গোকর্ণে গিয়ে শিবের তপস্যা করেন।

নোধা ঋষি ওরফে গৌতম/কাক্ষীবান ঋক্‌বেদে প্রথম-মণ্ডলে ৫৮-শ সূক্ত রচন

করেন। একজন গৌতম মগধে থাকতেন (মহা ২।১৯১৫); শূদ্রাস্ত্রী ঔশীনর; সন্তান কাক্ষীবান ইত্যাদি মগধে জন্মান। জরাসন্ধের সঙ্গে এ'র প্রীতির সম্পর্ক; অঙ্গবঙ্গের রাজারাও গৌতম-গৃহে এসে আনন্দ পেতেন। ইনি যুধিষ্ঠিরের এক জন সভাসদ। সপ্তর্ষিদের একজন। সত্যবানের পিতা দ্যুমৎসেনকে মতান্তরে দৃষ্টি ফিরে পাবার বর দিয়েছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মাঝে দ্রোণকে উপদেশ দিয়েছিলেন যুদ্ধ বন্ধ করতে। শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মের সঙ্গেও দেখা করে গিয়েছিলেন। পারিযাত্র পর্বতের শিখরে আশ্রম নির্মাণ করে বহু বছর এখানে তপস্যা করেছিলেন এবং এখানে কাল এ'র অতিথি হন। বৃষাদর্ভিকে উপদেশ দিয়েছিলেন সৎকাজের জন্য কোন পুরস্কার আশা করা উচিত নয়। বৃষাদর্ভি (দ্রঃ) কাহিনীতে গৌতম নিজের নামের অর্থ বলেন গোদমঃ দমগঃ অধূমঃ দমঃ দুর্দশনশ্চতে। বিদ্ধি মাং গৌতমং কৃত্যে যাতুধানি নিবোধ মে (মহা ১৩।৯৫।৩৩)। এক জন পণ্ডিত মুনি। ছেলে একত, দ্বিত ও ত্রিত। আর এক জন মুনি; ইনি একবার বনের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় একটি ক্লান্ত হস্তী শিশু দেখতে পান। আশ্রমে এনে একে পালন করেন। এটি বড় হয়ে উঠলে ইন্দ্র ধৃতরাষ্ট্রের বেশে এসে গোপনে হাতীটিকে নিয়ে পালাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ধরা পড়ে যান এবং এক হাজার গরু ও প্রচুর ধনরত্ন দিয়ে হাতীটিকে নিতে চান। তবু গৌতম দিতে চান না। পালিত জীবটির প্রতি এই প্রগাঢ় ভালবাসা দেখে ইন্দ্র সন্তুষ্ট হয়ে দু জনকেই স্বর্গে নিয়ে যান। আর এক জন অকৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ পিতামাতাকে ত্যাগ করে নানা দেশ ঘুরতে ঘুরতে এক বনে আসেন। এখানে বনবাসীদের সঙ্গে/দস্যুদের সঙ্গে কুটির বেঁধে বাস করতে থাকেন এবং একটি বনবাসী বিধবা নারীকেও বিয়ে করেন। এই ভাবে বাস করার সময় এক দিন এক ব্রাহ্মণ বালক/এক বেদজ্ঞ বন্ধু এসে উপস্থিত হয়। রাত্রিতে কোন ব্রাহ্মণ গৃহস্বামী না পেয়ে এ'র কাছে অতিথি হন এবং এই ভাবে জীবন যাপন করতে দেখে নিজের গৃহে ফিরে যাবার জন্য উপদেশ দেন। পর দিন সকালবেলা অতিথি কোন অন্নগ্রহণ না করে চলে গেলে গৌতম অতিথির উপদেশের কথা ভাবতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত এখানকার জীবন যাত্রা ফেলে রেখে আবার বার হয়ে পড়েন।

মহাভারতে (১২।১৬২।২৯) মধ্যদেশ নিবাসী ব্রাহ্মণ। ভিক্ষার্থে ব্রাহ্মণ বর্জিত এক গ্রামে আসেন। এক দস্যুর কাছে এক বৎসরের মত খাদ্য ও আশ্রয় চান। একটি যুবতী দাসীও পান। সংসর্গ দোষে ব্যাধে পরিণত। বন্ধু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ।

পথে একটি সার্থবাহ দলে যোগ দেন; কিন্তু পথে বুনো হাতীর আক্রমণে বহু বণিক নিহত হয়: গৌতম দল থেকে পালিয়ে যান। একা যেতে যেতে এক বট গাছের নীচে আশ্রয় নেন। সন্ধ্যার সময় ব্রহ্মার সখা কশ্যপ পুত্র বকরাজ নাড়িজঙ্ঘ ব্রহ্মলোক থেকে নেমে আসেন; পৃথিবীতে ইনি রাজধর্মা নামে প্রসিদ্ধ। দাক্ষায়ণীর গর্ভে নাড়িজঙ্ঘের জন্ম। ইনি গৌতমের অতিথি হন। অন্য মতে গৌতম এ'র অতিথি হয়েছিলেন; বিশেষ বন্ধুতা হয়ে গিয়েছিল; নদী থেকে মাছ এনে খাওয়াতেন এবং নিজের পাখা দিয়ে ব্রাহ্মণকে বাতাস দিতেন। আর এক মতে ঐ বট গাছে শকুনি নাড়িজঙ্ঘ বাস করত; গৌতম একে ধরে খেতে চেষ্টা করেন। কিন্তু নাড়িজঙ্ঘ

ব্রাহ্মণকে খেতে দিয়ে পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। গৌতম অত্যন্ত গরিব, কিছু অর্থ চান। নাড়িজঙ্ঘ তখন মেরুব্রজ নগরে তাঁর বন্ধু রাক্ষস বিরূপাক্ষের কাছে যেতে বলেন। কার্তিক পূর্ণিমার দিন ঐখান থেকে তিন যোজন দূরে এসে বিরূপাক্ষের সঙ্গে গৌতম দেখা করলে প্রথমে বিরূপাক্ষ পরিচয় চান। গৌতম আচার ভ্রষ্ট জেনে রাক্ষসরাজ অত্যন্ত দুঃখিত হন কিন্তু তবুও হাজার ব্রাহ্মণের সঙ্গে বসিয়ে তাঁকেও ভোজন করান এবং প্রচুর ধনরত্ন দেন। গৌতম বহু কষ্টে এই সব দান মাথায় নিয়ে আবার বটগাছের নীচে ফিরে আসেন। বকরাজ রাজধর্মা গৌতমের পরিচর্যা করেন। রাত্রে দু-জনে এক জায়গায় শুয়ে পড়েন। কিন্তু মাংস খাবার লোভে/বা পথের খাবার হিসাবে বন্ধুকে হত্যা করে তার মাংস নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। বিরূপাক্ষ এর পর দু দিন নাড়িজঙ্ঘকে দেখতে না পেয়ে অন্য মতে পরদিনই ছেলেকে বন্ধুর খোঁজে পাঠান। কারণ নাড়িজঙ্ঘ প্রতিদিন বিরূপাক্ষের সঙ্গে দেখা করে যেত। ছেলে এসে বকরাজের হাড় পালক ইত্যাদি পড়ে আছে দেখে কি হয়েছে বুঝতে পারেন এবং অনুসরণ করে গৌতমকে পিতার কাছে ধরে নিয়ে যান। বকরাজের জন্য বিরূপাক্ষ অভিভূত হয়ে পড়েন এবং রাক্ষসদের বলেন গৌতমকে খেয়ে ফেলতে। কিন্তু গৌতমের পাপ-দেহ কেউ খেতে চায় না। গৌতমকে তখন টুকরো টুকরো করে দস্যুদের খেতে দেওয়া হয় কিন্তু এরাও খায় না। শেষ কালে কাকদের খেতে দেওয়া হয়।

বিরূপাক্ষ এর পর নাড়িজঙ্ঘের সংকারের আয়োজন করলে দক্ষ কন্যা সুরভি আসেন এবং তাঁর মুখের ফেনা চিতার ওপর পড়লে বকরাজ আবার বেঁচে ওঠেন। অন্য মতে ব্রহ্মার নির্দেশে স্বর্গ থেকে সুরভি দুধ বৃষ্টি করেছিলেন। এই সময় ইন্দ্র এসে জানান ব্রহ্মার সভায় এক বার না যাবার জন্য ব্রহ্মার শাপে বকরাজের এই মৃত্যু হয়েছিল। তার পর বকরাজের অনুরোধে ইন্দ্র গৌতমকেও বাঁচিয়ে দেন।

গৌতম এরপর শবরালয়ে গিয়ে আবার এক জন শূদ্রা মহিলাকে বিয়ে করেন এবং বহু দুষ্ট সন্তানদের জন্ম দিতে থাকেন। ফলে দেবতাদের অভিশাপে নরকে গতি হয়।

গৌতম আশ্রম—(১) অহল্যা আশ্রম (দ্রঃ)। (২) গোদনা (গোদান), গোওা। ছাপরা থেকে ৬/৭ মাইল পশ্চিমে। রেভেলগঞ্জের কাছে সরযূ তীরে। আগে কাছেই গঙ্গা প্রবাহিত ছিল। ন্যায়দর্শনের ঋষি গৌতমের আশ্রম। মতান্তরে গৌতমবুদ্ধ পাটলিপুত্র ত্যাগ করে এইখানে নদী পার হয়েছিলেন বলে গৌতম আশ্রম নাম। অবশ্য পাটনা থেকে গোদনাতে এসে নদী পার হওয়া কল্পনা। (৪) বক্সারের কাছে অহিরোলি। (৫) গোদাবরী নদীর (দ্রঃ) উৎসের কাছে। (৬) রামায়ণে ত্রিহুতে জনকপুরে।

গৌতমী—(১) গোতমী। দ্রঃ- পৃ ৪৯২। (২) গোদাবরী নদী ; দ্রঃ- গোমতী। (৩) গোদাবরীর উত্তর শাখা ; অপর নাম গৌতমী গঙ্গা বা নন্দা (ব্রহ্ম)।

গৌরপ্রভা—ব্যাসের ছেলে শুক ; শুকের স্ত্রী পীবরী (দ্রঃ) ; এঁদের চার ছেলে কৃষ্ণ, গৌর-প্রভা, ভূরি ও দেবশ্রুত এবং একটি মেয়ে কীর্তি।

গৌরমুখ—শমীক মুনির ছেলে রাজা পরীক্ষিৎ-কে শাপ দিলে শিষ্য গৌরমুখকে দিয়ে শমীক রাজার কাছে শাপের কথা জানিয়ে দেন। রাজাকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে বলে যান। ছেলেকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে শমীক এই গৌরমুখকে পাঠিয়েছিলেন। (মহা ১।৩৮।১৬)।

গৌরী—(১) ব্রহ্মা নিজের দেহ থেকে গৌরীকে সৃষ্টি করে রুদ্রকে দান করেন। তপস্যার জন্য রুদ্র জলে ডুব দিলে গৌরীকে ব্রহ্মা নিজের দেহে বিলীন করে নেন এবং পরে দক্ষের হাতে তুলে দেন। এ দিকে দীর্ঘকাল তপস্যা করে জল থেকে উঠে রুদ্র পৃথিবীর সৌন্দর্য ও মানুষের পরিপূর্ণতা দেখে রাগে চিৎকার করতে থাকেন। ফলে রুদ্র কাণ থেকে ভূত, প্রেত, বেতাল ইত্যাদি ইত্যাদি সৃষ্টি হয়ে দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করে এবং দেবতাদের ওপর অত্যাচার করতে থাকে। বিষ্ণু তখন রুদ্রের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। ব্রহ্মা এই যুদ্ধ মিটিয়ে দিয়ে গৌরীকে ফিরিয়ে দিতে বলেন এবং কৈলাসে রুদ্রের বাসস্থান ঠিক করে দেন। দক্ষযজ্ঞ ও অমৃত নষ্ট করে দিয়েছিলেন রুদ্র। গৌরী এ জন্য দুঃখে হিমালয়ে কঠোর তপস্যায় রত হলে তাঁর দেহ ছাই হয়ে যায় এবং উমা হয়ে হিমালয়ের ঘরে জন্মান এবং মহাদেবকে পাবার জন্য কঠোর তপস্যা করতে থাকেন। তুষ্ট হয়ে মহাদেব বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশে ভিক্ষা করতে আসেন। উমা বৃদ্ধকে স্নান করে আহার করতে বলেন। গঙ্গায় স্নান করতে নামলে এক মকর আক্রমণ করলে সাহায্যের জন্য বৃদ্ধ উমাকে ডাকতে থাকেন। উমা এগিয়ে এসে বৃদ্ধের হাত ধরলে দেখেন স্বয়ং মহাদেবের হাত ধরেছেন। এর পর হিমালয় এঁদের বিয়ে দেন (বরাহ)। বিভিন্ন পুরাণে গৌরীকে নিয়ে নতুন কাহিনী দিতে চেষ্টা করা হয়েছে। কূর্ম-পুরাণে মেনার কন্যা কালী জন্মেই বিশ্বরূপ দেখান এবং হিমবান ভীত হয়ে পড়লে তখন দ্বিভুজা, নীলোৎপল দল বর্ণা হন। এখানে নামই কেবল কালী ; তন্ত্রের কালী ইনি নন। বরাহপুরাণে রয়েছে দক্ষকন্যা অগ্নিতে দেহত্যাগ করে হিমালয়ে এসে জন্মান এবং নাম হয় কৃষ্ণা। বসন্তে মৃগশিরা নক্ষত্রে নবমীতে অর্দ্ধরাত্রে (কালিকা ৪১।৪১) জন্ম। সৌরপুরাণে নাম হয়েছিল কালী। বামনপুরাণে মেনার তিন কন্যার মধ্যে কনিষ্ঠা কালিকা। গৌরীর জন্মের আর এক কাহিনীতে ব্রহ্মা রাত্রি দেবীকে পাঠিয়ে জন্মের সময় গৌরীর রঙ কাল করে দিয়েছিলেন ; ফলে পূর্বতন নাম কালী। এর উদ্দেশ্য শিবের পরিহাসে তপস্যা করতে যেতে বাধ্য হবেন এবং তপস্যায় শক্তিলাভ করে শিববীর্য ধারণে সক্ষম হবেন। পদ্মপুরাণে যথাকালে তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা বর দিলেন ; খোলস ত্যাগ করে কালী গৌরী হলেন ; ঐ খোলস একানংশা (দ্রঃ) বা কৌশিকী ; তিনি সিংহকে নিয়ে বিন্ধ্য পর্বতে চলে গেলেন। স্কন্দপুরাণে রেবাখণ্ডে কৈলাসে উর্বশীদের সামনে মহাদেব স্ত্রীকে ভিন্নাঞ্জনশ্যামা বলে সম্বোধন করে অপ্সরাদের সঙ্গে আলাপ করতে বলেন। এর ফলে রাগে পার্বতী কালী তপস্যা করতে যান। স্কন্দ-পুরাণে মহাকোশী প্রপাত নামক হিমালয়ের সানুদেশে পার্বতী তপস্যা করেছিলেন এবং মহাদেবই কালীকে এসে বর দিয়েছিলেন এবং আকাশগঙ্গাতে স্নান করিয়ে গৌরাঙ্গী করে তুলে দিলেন। পদ্ম, বামন ও মৎস্যপুরাণে পার্বতীকে বর দিয়েছিলেন ব্রহ্মা।

বামন-পুরাণে রমণ কালে মহাদেব উপহাস করেছিলেন। বামন-পুরাণে পার্বতী কালীর পরিত্যক্ত খোলস থেকে কৌশিকী=কাত্যায়নী জন্মান। ইন্দ্র এ'কে বিন্ধ্যপর্বতে বাস করার ব্যবস্থা করে দেন এবং সিংহ দেন এবং ইনিই মহিষাসুর বধ করেন। শিবপুরাণে শুম্ভ নিশুম্ভ বর পেয়েছিলেন ব্রহ্মার অংশ থেকে জন্ম অযোনিজা অম্বিকার অংশ স্বরূপা পুরুষ স্পর্শবর্জিতা কন্যার প্রতি অনুরক্ত হলে তবেই তাদের মৃত্যু হবে। দৈত্যদের হাতে দেবতারা নির্জিত হলে ব্রহ্মা মহাদেবকে অনুরোধ করেন এবং মহাদেব স্ত্রীকে কালী বলে উপহাস করেন। পার্বতী তখন তপস্যা করতে যান। ব্রহ্মা এসে পার্বতীকে তখন সব জানান এই পার্বতী নিজের খোলস ছেড়ে গৌরী হন। এই খোলস থেকে জন্মালেন কৌশিকী কালী ; ব্রহ্মা এই কৌশিকীকে বিন্ধ্য পর্বতে বাস ও সিংহ দান করেন। ইনি শুম্ভ নিশুম্ভকে বধ করেন। হিরণ্যাক্ষের ছেলে অন্ধক (দ্রঃ) মন্দর পাহাড়ে গৌরীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে হস্তগত করবার চেষ্টা করেন। প্রহ্লাদের নিষেধেও অন্ধক কাণ দেন না। ফলে গৌরী শতরূপা হয়ে অন্ধককে নির্যাতন করেন। (২) বরুণের স্ত্রী।

গৌরী—পঞ্জকোরা, গ্রীক গৌরাইয়োস্ বা গুরায়েয়াস্। নদীটি সোয়াৎ নদীর সঙ্গে মিলে লণ্ডাই নদীতে পরিণত। লণ্ডাই নদী কাবুল নদীর একটি শাখা। গিলগিটে পঞ্জকোরাতে উৎপত্তি। খোনর (=খমে) ও সোয়াতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। পঞ্চগৌড়>পঞ্জকোরা ; এই নদীর তীরে এই নামে একটি নগরও রয়েছে। দ্রঃ-পঞ্চকর্পট, কুভা।

গৌরীকুণ্ড—(১) গঙ্গোত্রী থেকে একটু নীচে তীর্থস্থান। এখানে কেদার গঙ্গা ভাগীরথীতে এসে মিশেছে। গৌরীকুণ্ড থেকে কিছু নীচেঁ গঙ্গাদেবীর ছোট একটি মন্দির আছে। যে পাথরে বসে ভগীরথ তপস্যা করেছিলেন সেই পাথরের ওপর এই মন্দির। (২) কৈলাসে একটি পবিত্র হ্রদ ; এখান থেকে সিন্ধু ও সরস্বতীর উৎপত্তি। (৩) কেদারনাথ থেকে ১ দিনের পথ ; ৮ মাইল দক্ষিণে, এখানে একটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। এটি একটি পুণ্য সরোবর। (৪) একটি উষ্ণ প্রস্রবণ ; কালিগঙ্গার তীরে। নেপাল ও আলমোড়া সীমান্তে।

গৌরীশিখর—গৌরীশঙ্কর (বরাহ)।

গৌহাটি—আদি নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর। মহাভারতের রাজা ভগদত্তের রাজধানী। পরে কোচ প্রভৃতি জাতির অধিকারে আসে। এখানে শাক্ত, বৈষ্ণব ও শৈব মন্দির আছে। এর মধ্যে নীলাচলে কামাখ্যা দেবীর মন্দির একটি পীঠস্থান। উত্তর গৌহাটিতে অশ্বক্রান্ত কুণ্ড আছে। সহরের দক্ষিণে বশিষ্ঠ আশ্রম।

গ্রন্থাগার—প্রাচীন ভারতের নালন্দা, তক্ষশিলা ও বিক্রমশিলার গ্রন্থাগার বিখ্যাত ছিল।

গ্রন্থিক—পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের সময় নকুল এই নামে বিরাট ভবনে ছদ্মবেশে বাস করতেন।

গ্রহ—পুরাণ ও জ্যোতিষশাস্ত্রে রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতুকে গ্রহ বলা হয়েছে। এই নয়টি নবগ্রহ। বিজ্ঞানে সূর্য ও চন্দ্র গ্রহ নয় ; সূর্য

একটি নক্ষত্র ; চন্দ্র উপগ্রহ এবং রাহু ও কেতু (দ্রঃ) দুটি নভো-বিন্দু। রাহু ও কেতু বিষুব বৃত্ত ও ভূবৃত্তের ছেদ বিন্দু ; এবং যে হেতু বিন্দু সেই হেতু এদের কোন ভরও নাই।

গ্রহণ—পুরাণ অনুসারে রাহু (দ্রঃ) আক্রোশ বশে সূর্য বা চন্দ্রকে গ্রাস করতে যান। বিষ্ণু অমৃত পরিবেশন করছিলেন। সূর্য ও চন্দ্র রাহুকে ধরিয়ে দিলে বিষ্ণু চক্রের আঘাতে রাহুর মাথা কেটে ফেলেন। কিন্তু যে হেতু অমৃত রাহুর গলা পর্যন্ত গিয়েছিল সেই হেতু রাহুর মাথা অমর হয়ে থাকে এবং চির দিন চন্দ্র সূর্যকে গ্রাস করতে এসে থাকে। গ্রহণের সময় অতি পুণ্যকাল ; স্নানদান, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি প্রশস্ত। এই সময় যে কোন জল গঙ্গাজল তুল্য ; সমস্ত ব্রাহ্মণ ব্যাসের সমান। এই সময়ে ভোজনের ও বিদেশ যাত্রা ইত্যাদির নানা বিধি নিষেধ আছে।

গ্রহমাতৃকা—এক জন বৌদ্ধ দেবী। বৈরোচন (দ্রঃ) কূল। তিন মুখ—শ্বেত, পীত, রক্তবর্ণ ; ছয় হাত। হাতে ধর্মচক্র-মুদ্রা, বজ্র, শর, পদ্ম, ধনু। সহস্রদল পদ্মের ওপর বজ্রাসনে আসীন।

গ্রীবা—তাম্রার একটি মেয়ে (অগ্নি-পু)।

ঘগ্‌গর—গগ্‌গর, কগ্‌গর। পাবনী (দ্রঃ)

ঘট কর্পর—ঘট ও কর্পর দুই বন্ধু : চোর। কর্পর এক বার এক রাজকুমারীর ঘরে চুরি করতে ঢোকে ; ঘট দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে। কর্পর ঘরে ঢুকে রাজকুমারীকে সম্ভোগ করে ; রাজকুমারী খুসি হয়ে কিছু অর্থ দান করে এবং আবার আসতে বলে। কর্পর বার হয়ে এসে ঘটকে সব কথা জানায় এবং প্রাপ্ত অর্থ সবটাই দিয়ে দেয়। এর পর কর্পর আবার রাজকুমারীর ঘরে এসে সারা রাত সম্ভোগ করে ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে এবং সকাল বেলা প্রহরীর হাতে রাজকুমারী ও কর্পর দুজনেই ধরা পড়ে যায়। কর্পরের মৃত্যু দণ্ড হয়। বধ্যভূমিতে যাবার সময় ঘটের সঙ্গে দেখা হয় এবং কর্পর অনুরোধ করে যায় রাজকুমারীকে রক্ষা করতে। ফলে ঘট রাজকুমারীকে চুরি করে নিয়ে যায়। রাজা চার দিকে খোঁজ করতে থাকেন এবং প্রহরীদের নির্দেশ দেন কর্পরের শব যদি কেউ দেখতে আসে তাকেও যেন বন্দী করা হয়। কারণ নিশ্চয়ই কর্পরের সে ঘনিষ্ঠ কেউ ; এবং রাজকুমারীর খবর তার কাছে পাওয়া যেতে পারে। ঘট রাজার নির্দেশ জানতে পারে এবং পর দিন মাতাল সেজে সঙ্গে দুটি ভৃত্যকে নিয়ে এসে ধুতরা বীজ মেশান অন্ন কর্পরের শব প্রহরারত প্রহরীকে খেতে দেয়। প্রহরী অজ্ঞান হয়ে পড়লে ঘট মৃত দেহের অগ্নি সংকার করে ফিরে যায়। খবর পেয়ে রাজা আবার পাহারা বসান কর্পরের অস্থি যে নিতে আসবে তাকে যেন ধরা হয়। কিন্তু ঘট এক সন্ন্যাসীর কাছে শেখা মন্ত্রের ফলে প্রহরীদের ঘুম পাড়িয়ে অস্থি নিয়ে চলে যায়। এর পর ঘট স্থির করে সেখানে থাকা নিরাপদ নয়। ঘুম-পাড়ান মন্ত্র

য দিয়েছিল সেই সন্ন্যাসী এ দিকে রাজকুমারীকে নিয়ে অন্যত্র চলে যায়। রাজকুমারী ক্রমে সন্ন্যাসীর প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়ে ঘটকে বিষ দিয়ে হত্যা করে। (২) কিংবদন্তি বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের এক জন। ঘটকর্পর কাব্যের রচয়িতা। ২৩-টি শ্লোকে শৃঙ্গার রসাত্মক এই কাব্য। প্রথম ছয় শ্লোকে বর্ষার বর্ণনা ; পরের শ্লোকগুলিতে বিরহিণী স্ত্রী মেঘকে দূত করে স্বামীর কাছে খবর পাঠাচ্ছেন। যমক ও অলঙ্কার সমৃদ্ধ ; এই জন্য নাম যমক-কাব্য। অভিনবগুপ্ত এর একটি টীকা লেখেন। অন্য মতে ভাসই ঘট-কর্পর। এ'র বিখ্যাত শ্লেষঃ—একঃ হি দোষঃ গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতি ইন্দোঃ ইতি যঃ বভাষে ॥ নূনং ন দৃষ্টঃ কবিনাপিতেন দারিদ্রদোষঃ গুণরাশিনাশী। এখানে কবি নাপিতেন অর্থে কবিনা-অপি তেন এবং কবি রূপ নাপিতেন।

ঘটিকা—২৪ মিনিট। ছিদ্র যুক্ত ঘটে জল ভরে সময় হিসাব হত ফলে এই নাম। দ্রঃ- ঘড়ি।

ঘটোৎকচ—ভীমের ঔরসে সদ্যগর্ভা হিড়িম্বার (দ্রঃ) গর্ভে জন্ম এক জন রাক্ষস। পাণ্ডব। ঘট অর্থে হাতীর মাথা ; উৎকচ অর্থে কেশহীন অর্থাৎ কেশহীন বিরাট মাথা। মহাভারতে (মহা ১।১৪৩।১৪) আছে ঘটের মত উচ্ছ্রিত কেশ বলে ভীম ও হিড়িম্বা দুজনে মিলে নাম রাখেন। বিশাল দেহ, বিকৃত চোখ, শঙ্কুর মত কাণ, তীক্ষ্ণ দাঁত, ও বিকট কণ্ঠস্বর। রাক্ষসীদের নিয়ম গর্ভবতী হয়েই প্রসব করা। ঘটোৎকচ এই ভাবে জন্মেই যৌবন লাভ করে সব রকম অস্ত্র প্রয়োগে দক্ষ হয়ে ওঠেন। ব্রাহ্মণ ও যজ্ঞ বিদ্বেষী এবং ইন্দ্রের বরে ইন্দ্রের সমান শক্তিমান। হিড়িম্বা প্রতিশ্রুতি মত নিজের পথে ফিরে যান। ঘটোৎকচ উত্তর দিকে চলে যান ; ভীমকে কথা দিয়ে যান। স্মরণ করলেই ফিরে আসবেন। এই ঘটোৎকচকে কর্ণের বিনাশের জন্য ইন্দ্র সৃষ্টি করেছিলেন (মহা ১।১৪৩।৩৮)। বদরিকাশ্রমের পথে ভীম স্মরণ করতেই এসে পরিশ্রান্ত দ্রৌপদীকে কাঁধে করে নরনারায়ণের আশ্রমে পৌঁছে দেন। কুরুক্ষেত্রে অলম্বুষ, অলায়ুধ, ও অকাসুর ইত্যাদি ও বহু বিপক্ষ সৈন্যকে নিহত করেছিলেন। দুর্যোধন ও ভগদত্তের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন এবং কৌরবদের বহু ক্ষতি করেন। ছেলে অঞ্জনপর্বাকে অশ্বত্থামা নিহত করেন। যুদ্ধের (মহা ৭।১৩১।৫১) ১৪-শ দিনে কৌরবদের একান্ত চাপে অন্য মতে কর্ণ নিজে বিপর্যস্ত হয়ে বৈজয়ন্তী/একাঘ্নী (ইন্দ্র প্রদত্ত শক্তি) অস্ত্রে একে নিহত করেন। এই অস্ত্র কর্ণ অর্জুনের জন্য রেখে দিয়েছিলেন। মরবার মুহূর্তে ঘটোৎকচ নিজের শরীরকে বহু গুণ বড় করে কৌরব সেনাদের ওপর গিয়ে পড়েন ; ফলে বহু সৈন্য পিষে যায়। ঘটোৎকচের আর এক ছেলে বর্বরিক (দ্রঃ) ; কুরুক্ষেত্রেই মারা যায়। মৃত্যুর পর যক্ষলোকে যান। ব্যাস যখন মৃত আত্মীয় স্বজনদের এক দিনের জন্য দেখা করাতে এনেছিলেন তখন ঘটোৎকচও এসেছিলেন। মহাভারতে (৭।১০৬।২৬) ঘটোৎকচ মারা গেলে কৃষ্ণ বলেন তিনিই ব্যবস্থা করে কর্ণকে দিয়ে একে নিহত করেছেন। ঘটোৎকচ যজ্ঞবিরোধী, ব্রাহ্মণদ্বেষী ইত্যাদি ; পাণ্ডবদের সন্তান বলে এ পর্যন্ত চুপচাপ ছিলেন। কর্ণের হাতে মৃত্যু না হলে তিনি নিজে বধ করতেন।

ঘটোদ্ভব—অগস্ত্য।

ঘড়ি—বৈদিক যুগে সময় নির্দ্ধারণের ব্যবস্থা ছিল। সূর্য সিদ্ধান্ত ও নিদান সূত্রে কাল পরিমাণের উল্লেখ আছে; এগুলি ত্রুটি, লব, নিমেষ, কাষ্ঠা, কলা, নালিকা, মুহূর্ত, প্রহর ইত্যাদি। সূর্যের আলোতে ১২ অঙ্গুলি দীর্ঘ একটি শঙ্কুর ছায়া যখন বারো অঙ্গুলি দীর্ঘ হয় তখন তাকে এক ছায়া পুরুষ বলা হত। ছায়ার দৈর্ঘ্য ৭২ অঙ্গুলি হলে দিনের ১/১৪ এবং ৯৬ হলে দিনের ১/১৮ ধরা হত। ছায়া না পড়লে মধ্যাহ্ন ধরা হত। এর নাম ছিল শঙ্কুপট বা রবিচক্র। অন্য এক রকম ঘড়ি ছিল জলঘড়ি। কপালের মত দেখতে জলপূর্ণ একটি পাত্রের নাম ছিল কপালক। ৪-মাষা সোনা দিয়ে তৈরি জলপূর্ণ পাত্রের নির্দিষ্ট একটি ফুটো দিয়ে জল বার হয়ে যেতে যে সময় লাগত তাকে বলা হত ৪০ কাল বা ১ নালিকা (=২৪ মিনিট) =এক ঘটিকা (দ্রঃ)।

ঘনট—বশিষ্ঠ বংশে এক ব্রাহ্মণ। শিবের তপস্যা করতেন। দেবলের মেয়েকে বিয়ে করতে চান। কিন্তু কুৎসিত পাত্রকে দেবল প্রত্যাখ্যান করলে মেয়েটিকে চুরি করে ঘনট বিয়ে করেন। ফলে দেবল শাপ দিয়ে পেচকে পরিণত করে দেন এবং বলেন ইন্দ্রদ্যুম্নকে যে দিন সাহায্য করবে সে দিন মুক্তি পাবে (স্কন্দ-পু)।

ঘনপাঠ—বেদপাঠের বিশেষ একটি পদ্ধতি। জটাপাঠের মধ্যে যাতে কোন ভুল না হয় তার জন্য ঘনপাঠ। পাদপাঠ ও ক্রমপাঠ মিলে এই ঘনপাঠ।

ঘণ্টাকর্ণ—ঘণ্ট ও কর্ণ দুই ভাই ; এ'রা অসুর। অনেক সময় বড় ভাই ঘণ্টকে ঘণ্টাকর্ণ নামেই অভিহিত করা হয়েছে। বিষ্ণুদ্বেষী কিন্তু শিবভক্ত। দারুক অসুর ব্রহ্মার বলে বলীয়ান হয়ে সারা পৃথিবীতে অত্যাচার করতে থাকেন। শিব তখন তাঁর তৃতীয় নেত্র থেকে ভদ্রকালীকে সৃষ্টি করেন এবং ভদ্রকালী অসুরকে নিহত করেন। ময়ের মেয়ে মন্দোদরী দারুকের স্ত্রী ; শোকে বিহ্বল হয়ে তপস্যা করতে থাকে এবং শিব দেখা দিয়ে নিজের গায়ের কয়েক ফোঁটা ঘাম মন্দোদরীকে দেন। এই ঘাম যার গায়ে ছিটিয়ে দেওয়া হবে তার ছোট-বসন্ত হবে ; এবং রোগীরা তখন মন্দোদরীকে আরাধনা করবে। অর্থাৎ মন্দোদরীকে ছোট বসন্তের দেবীতে পরিণত করে দেন। পৃথিবীতে আসবার পথে মন্দোদরী ভদ্রকালীকে দেখতে পান এবং প্রতিহিংসায় ভদ্রকালীর গায়েই সেই ঘাম ছিটিয়ে দেন। ভদ্রকালী ভীষণ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। মহাদেব জানতে পেরে তখন ঘণ্টাকর্ণকে সৃষ্টি করেন ; এই রাক্ষস ভদ্রকালীর গা থেকে বসন্তের সমস্ত গুটি চেটে পরিষ্কার করে নেন। এ'রা দুজনেই যেহেতু শিবের সন্তান সেই হেতু ভদ্রকালী তাঁর ভাই ঘণ্টাকর্ণকে মুখ চাটতে দেন না। সেই থেকে ভদ্রকালীর মুখে বসন্তের গুটি রয়েছে।

এই ঘণ্টাকর্ণ প্রথম দিকে কাণে ঘণ্টা বেঁধে রাখতেন এবং সব সময় মাথা নেড়ে ঘণ্টা বাজাতেন পাছে হরিনাম কোন মতে তাঁর কাণে ঢুকে যায়। এই জন্য নাম ঘণ্টাকর্ণ। অর্থাৎ বিষ্ণুদ্বেষী। ঘণ্টাকর্ণ পরে কুবের-এর অনুচর হন এবং মুক্তির জন্য তপস্যা করতে থাকেন। শিব দেখা দিলে মুক্তি চান এবং মহাদেব তখন বদরিকাতে নারায়ণের আশ্রমে গিয়ে বিষ্ণুর আরাধনা করতে বলেন। ফলে ঘণ্টাকর্ণ বিষ্ণু ভক্ত হন। হরিবংশে (৩।৮০।-) সাত্যকিকে/যাদবদের দ্বারাবতীর ভার দিয়ে কৃষ্ণ

পুত্র লাভের আশায় হরপার্বতীর তপস্যা করবার জন্য কৈলাসে যাবার পথে বদরিকাতেও কিছু দিন তপস্যা করেছিলেন। এক দিন এখানে কৃষ্ণ যখন ধ্যান করছিলেন তখন ঘণ্টাকর্ণ পিশাচদের সঙ্গে নিয়ে শিকারে বার হয়েছিলেন এবং কৃষ্ণের নাম করতে করতে এগিয়ে আসছিলেন। দেখে কৃষ্ণের করুণা হয় এবং জানতে চান সে কি চায়। ঘণ্টাকর্ণ জানান মহাদেব বর দিয়েছেনঃ বদরিকাতে এক দিন দেখা হবেই ; বিষ্ণুকে সে দেখতে চায়। কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হয়ে বিষ্ণুমূর্তিতে অন্তরে দেখা দিলে ঘণ্টাকর্ণ আনন্দে বিহ্বল হয়ে মৃত এক ব্রাহ্মণের দেহার্দ্ধেক কৃষ্ণকে উপহার দেন। রাক্ষস নীতিতে এই উপহার শ্রেষ্ঠ উপহার। কৃষ্ণকে বিষ্ণু, বলে চিনতে পারেন। কৃষ্ণের স্পর্শে কন্দর্প সমান সুন্দর হয়ে যান। কৃষ্ণ বর দেন অক্ষয় স্বর্গ লাভ হবে ; ইন্দ্রলোকে থাকবে এবং বর্তমান ইন্দ্রের কল্প শেষ হলে বিষ্ণু সাযুজ্য লাভ করবে (৩।৮৫।২৫)। ঘণ্টাকর্ণের ভাইও স্বর্গ লাভ করবে। মৃত ব্রাহ্মণকে কৃষ্ণ জীবিত করে দেন। স্কন্দপুরাণে শিবের এক অনুচর। কাশীতে ইনি ঘণ্টাকর্ণেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

ঘণ্টাকর্ণের বিগ্রহ মূর্তিতে আঠার হাত দেখা যায়। ডান দিকের হাতে বজ্র, তরবারি, চক্র ও বাণ রয়েছে ; বাম দিকের হাতে কাঁটা, তরবারি, দড়ি, ঘণ্টা ও গাঁইতি রয়েছে। ছোট বসন্ত, বিস্ফোটক ইত্যাদি চর্মরোগ থেকে মুক্তি লাভের জন্য এ'র পূজা করা হয়। সর্বব্যাধি বিনাশকও। বর্তমানে বাঙলাতে ঘেঁটু নামে পরিচিত। কালিপড়া মাটির হাঁড়িকে ঘেঁটু বলে পূজা করা হয় ; পরে হাঁড়িটি ভেঙ্গে ফেলা হয়। চৈত্র সংক্রান্তি বা অন্য সময়ে এই পূজা। রঘুনন্দনে চৈত্রমাসে স্নুহীমূলে জলপূর্ণ ঘটে এ'র পূজা করণীয়।

ঘরা—বিয়াস ও সাটলেজের মিলিত ধারা। স্থানীয় নাম 'নই'।

ঘর্ঘর—ঘগরা বা গোগরা। কুমায়ুনে উৎপত্তি। সরযূতে এসে মিশেছে।

ঘাঘরা—(১) সরযূ। (২) ঘর্ঘরা। (৩) দেওয়া নদী; অযোধ্যা সহর এর তীরে।

ঘারাপুরী—পুরী ; এলিফ্যাণ্টা দ্বীপ। বোম্বে থেকে ৬-মাইল। ৩-১০ খৃ শতকে বিখ্যাত তীর্থ।

ঘুস—অর্থশাস্ত্রে চাণক্য বলেছেন মাছেরা জল খাচ্ছে না বিশ্রাম নিচ্ছে বলা যেমন কঠিন রাজপুরুষরা ঘুস নিচ্ছে কিনা বলাও তেমনি কঠিন। দ্রঃ- উৎকোচ।

ঘূর্ণিকা—দেবযানীর পালিতা মাতা (মহা ১।৭৩।২৪)।

ঘৃত ধারা—দ্রঃ-বসুধারা।

ঘৃতপৃষ্ঠ—প্রিয়ব্রতের স্ত্রী, বিশ্বকর্মার মেয়ে সুরূপা। সুরূপার দশ ছেলে অগ্নীধ্র, ইধ্মজিহ্ব, যজ্ঞবাহু, মহাবীর, রুক্মশুক্র, ঘৃতপৃষ্ঠ, সবন, মেধাতিথি ও বীতিহোত্র এবং একটি মেয়ে ঊর্জস্বতী।

ঘৃতাচী—এক জন অপ্সরা। মহাভারত মতে ছ জন শ্রেষ্ঠ অপ্সরার মধ্যে এক জন। বহু ঋষির তপস্যা নষ্ট করেছেন এবং বহু সন্তানের কারণ হয়েছেন। বিশ্বকর্মার ঔরসে ঘৃতাচীর মেয়ে চিত্রা/চিত্রাঙ্গদা (দ্রঃ)। দ্রঃ- শুকদেব, ইন্দ্রপ্রমিতি, রুরু, কুশনাভ, রৌদ্রাশ্ব, দ্রোণ, ভরদ্বাজ, নল, কান্যকুব্জ।

ঘোষযাত্রা—প্রাচীন কালে নিজেদের রাজ্যে ঘোষপল্লীগুলি রাজারা দেখতে যেতেন। রাজা সেখানে গরু বাছুর ও ষাঁড় সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য নিতেন এবং যা কিছু করণীয় উপদেশ দিতেন এবং গোয়ালাদের প্রয়োজনীয় অর্থ ও দ্রব্যাদি সাহায্য করতেন। গোয়ালারা ও তাঁদের স্ত্রীরা নাচে গানে এবং আতিথ্যে রাজাকে প্রীত করতেন। এর নাম ছিল ঘোষযাত্রা। কৃষ্ণ সত্যভামা পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করে যাবার পর এক দুষ্ট ব্রাহ্মণ ধৃতরাষ্ট্রকে বনে পাণ্ডবদের দুরবস্থার কথা জানালে কর্ণ শকুনি ইত্যাদির পরামর্শে এই রকম ঘোষ-যাত্রার ছলে পাণ্ডবদের দুর্দশা দেখবার জন্য বা বিদ্রূপ করার জন্য, ও নিজেদের ঐশ্বর্য দেখাবার ছলে দুর্যোধন সপরিবারে ও সসৈন্যে দ্বৈতবনে পাণ্ডবদের দেখতে এসেছিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র আসতে দিতে চাইবেন না এ'রা জানতেন। এই কারণে সমঙ্গ নামে একজন বল্লবকে (গোপ; মহা ৩।২২৮।২) দিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের সামনে গোরু সম্বন্ধে কথা তোলান। এই প্রসঙ্গে কর্ণ, শকুনি গোরুর হিসাব ইত্যাদি করতে যেতে চান। ধৃতরাষ্ট্র লোক পাঠিয়ে হিসাব নেবার কথা বলেন এবং শেষ অবধি মত দেন। বিরাট সৈন্য বাহিনী, সঙ্গে শকটাপণ, বেশ্যা ও বণিকরাও ছিল। বনে এসে গোরুর হিসাব ইত্যাদি নেন। গোপেরা নাচগানে পরিতুষ্ট করে। এ'রা তারপর মৃগয়াতে যান। যুধিষ্ঠির এই দিন সদ্যস্ক (মহা ৩।২২৯।১৪) যজ্ঞ করছিলেন। দুর্যোধন কাছেই কোথাও তাঁবু ফেলতে বলেন। অনুচররা দ্বৈতবনে সরোবর এলাকাতে প্রবেশ করতে এলে গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন বাধা দেন; অপ্সরা ইত্যাদিকে নিয়ে সেখানে বিহার করছিলেন। ফলে যুদ্ধ হয়। চিত্রসেন নিজে যুদ্ধ করেন: কর্ণ হেরে গিয়ে পালান এবং দুর্যোধনরা সপরিবারে বন্দী হন। দুর্যোধনের অনুচররা যুধিষ্ঠিরের কাছে আশ্রয় নেন; ভীম খুসি হয়েছিলেন কিন্তু যুধিষ্ঠির কৌরবদের মুক্ত করে দেবার নির্দেশ দেন। চিত্রসেন অর্জুনের কাছে প্রায় হেরে গিয়ে জানান কৌরবদের অভিপ্রায় জানতে পেরে ইন্দ্র তাঁকে পাঠিয়েছেন এদের ধরে নিয়ে যেতে ও পাণ্ডবদের রক্ষা করতে এবং যুধিষ্ঠিরকে সব জানান ও ফিরে যান। মৃত গন্ধর্বদের ইন্দ্র জীবিত করে দেন। যুধিষ্ঠির কৌরবদের স-সম্মানে বিদায় দেন। দ্রঃ- অর্জুন।

ঘোষা—ঋক্‌বেদে বিখ্যাত এক তপস্বিনী। দীর্ঘতমা মহর্ষির নাতনি এবং কক্ষীবানের মেয়ে। শৈশবে কুষ্ঠ হয়েছিল। অশ্বিনী দেবতাদের একটি স্তব রচনা করে রোগমুক্ত হন; তখন বিয়ে হয়।

ঘোষিতারাম—দ্রঃ- কৌশাম্বী

চক্র—(১) গোল মত; প্রান্ত ধারাল, কোণযুক্ত। নীল জলের মত রঙ। কাজ ছেদন, ভেদন ও নিপাতন। দ্রঃ- বিভূতি। (২) বাসুকির এক ছেলে। সর্পযজ্ঞে নিহত হন। (৩) সুদর্শন চক্র। (৪) তান্ত্রিক ক্রিয়া ইত্যাদি। (৫) গাড়ির চাকা।

ক—বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মবাদী এক ছেলে। মহা ১৩।৪।৫৩।

চক্রতীর্থ—(১) কুরুক্ষেত্রে (দ্রঃ) রামহ্রদ। (২) প্রভাসে গোমতী তীরে। (৩) গোদাবরীর উৎসে ত্র্যম্বক গ্রাম থেকে ৬-মাইল। (৪) বারাণসীতে একটি কুণ্ড ; মণিকর্ণিকা ঘাটে; লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা স্থানটি। (৫) রামেশ্বর।

চক্রনগর—(১) মহাভারতে একচক্রা। ইটোয়া থেকে ১৭ মাইল দ-পশ্চিমে। ঠিক জানা নয়। (২) কেলস্বর। মধ্যপ্রদেশে, ওয়ার্ধা থেকে ১৭ মাইল উ-পূর্বে। পদ্ম পুরাণের চক্রাঙ্কনগর যেন।

চক্রবাক—পাখী ; anas casarca। দ্রঃ- বৃহদশ্ব।

চক্রব্যূহ—সেনা সন্নিবেশের বিশেষ একটি ব্যবস্থা। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দ্রোণাচার্য এই ব্যূহ রচনা করেন। অভিমন্যু (দ্রঃ) এটি ভেদ করে ভিতরে গিয়েছিলেন; কিন্তু বার হয়ে আসার উপায় জানতেন না। দুর্যোধনের ছেলে লক্ষ্মণ আক্রমণের নেতা হয়েছিলেন। ব্যূহের মাঝখানে কর্ণ, দুঃশাসন ও কৃপ ছিলেন। দ্রোণ ছিলেন ব্যূহের নেতা। ব্যূহের পাশে ছিলেন শল্য ও ভূরিশ্রবা। সিন্ধুরাজ ও অশ্বত্থামাও ছিলেন।

চক্রমন্দ—একটি সাপ। অনন্তের নির্দেশে বলরামের আত্মাকে নিয়ে যেতে এসেছিলেন।

চক্রমুসল যুদ্ধ—হরিবংশে একটি বড় কাহিনী। জরাসন্ধের সঙ্গে যাদবদের এটি ১৮-তম যুদ্ধ যেন। দ্রঃ-কৃষ্ণ। কংস মারা যান, মথুরা সুরক্ষিত করে যান নি (২।৩৮।৫৯). জরাসন্ধ মথুরা আক্রমণ করেন। পুরীতে খাদ্য, ইন্ধন সবই অল্প। যাদবদের মধ্যেও মত বিরোধ। কৃষ্ণ দক্ষিণ ভারতে পালাতে চান : উদ্দেশ্য জরাসন্ধ পেছু নেবে, মথুরা রক্ষা পাবে। এই উদ্দেশ্যে কৃষ্ণ বলরাম করবীরপুরে আসেন। বেণাতীরে এক ন্যগ্রোধ ছায়াতে বসেছিলেন ; পরশুরাম (২।৩৯।২০) অপরান্ত থেকে উপদেশ দিতে আসেন। এরপর এঁরা বেণা পার হয়ে সহ্য পর্বতের শাখা যজ্ঞগিরিতে এসে এখানে এক রাত্রি বাস করে খট্বাঙ্গ নদী (১৩৯।৫৯) পার হয়ে ক্রৌঞ্চপুরে আসেন। এখানে ধার্মিক, যদুবংশীয় মহাকপিঃ ইতি খ্যাতঃ এক রাজা, এঁর সঙ্গে দেখা না করেই এঁরা অনড়ুহ তীর্থে যান এবং তারপর গোমন্তে আসেন। গোমন্ত থেকে পরশুরাম শূর্পারকে ফিরে যান; এখানে শৃঙ্গদুর্গে অপেক্ষা করতে বলে যান; চক্র, মুসল ইত্যাদি দিব্য অস্ত্র এখানে আসবে; যে যুদ্ধ হবে সেটি চক্রমুসল যুদ্ধ নামে পরিচিত হবে। এরপর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হবে (২।৩৯।৮১)। পর দিন জরাসন্ধবাহিনী এসে পর্বত ঘিরে ফেলে এবং শেষ পর্যন্ত পাহাড়ে আগুন লাগিয়ে দেয়। শকুনি, বিরাট এবং দ্রুপদও জরাসন্ধের সঙ্গে ছিলেন। কৃষ্ণ ও বলরাম পাহাড় থেকে লাফ দিয়ে আগুন পার হয়ে রাজাদের মধ্যে বার হয়ে আসেন। কৃষ্ণ পায়ের চাপে পাহাড় থেকে জল বার করে আগুন নিভিয়ে দেন। জল দেখে রাজারা ভয় পান। আকাশ থেকে চক্র, মুসল ইত্যাদি দিব্য অস্ত্র আসে। বলরাম রাজা দরদকে নিহত করেন এবং জরাসন্ধকেও নিহত করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু আকাশবাণী (২।৪৩।৭৭) নিষেধ করে। জরাসন্ধ তারপর পালান। এরপর রুক্মিণীর (দ্রঃ) সঙ্গে বিয়ে হয়।

চক্রস্বামী—থানেশ্বরে কৃষ্ণ বিগ্রহ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের স্মারক হিসাবে নির্মিত। ব্রোঞ্জ মূর্তি। প্রায় মানুষ সমান। আলবেরুনি বলেছে 'বর্তমানে' গজনিতে অশ্বশালাতে পড়ে আছে। সোমনাথ বিগ্রহও গজনিতে এইখানে রয়েছে।

চক্ষুষ—গঙ্গার (দ্রঃ) একটি শাখা। (২) অক্সাস্ (দ্রঃ)। কেতুমাল দেশের দিকে এগিয়ে গেছে। মহাভারতে শক দ্বীপে। পামির হ্রদ, সারিকুল বা পীত হ্রদে উৎপন্ন; জাক্সারটেস (দ্রঃ) থেকে ৩০০ মাইল দক্ষিণে।

চট্টগ্রাম—২০°৩৫′-২২°৫৯′ উ×৯১°৩০′-৯২°২৩′ পূ। একটি জেলা। এই জেলার পূর্বে অনুচ্চ তিনটি সমান্তরাল পর্বতশ্রেণী। মধ্যের শ্রেণীটির উত্তরাংশের নাম সীতাকুণ্ড। জেলার মধ্যে সব চেয়ে উঁচু পাহাড় চন্দ্রনাথ। পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্রে চট্টগ্রামের নাম চট্টল। বৌদ্ধ শ্রমণরা একে রম্যবতী বলেছেন। চট্টগ্রাম থেকে ৩০·৪ কি-মি দূরে ধর্মঘাট; চণ্ডীতে বর্ণিত মেধস্ মুনির সমাধির জন্য বিখ্যাত। দ্রঃ- চট্টল।

চট্টল—দ্রঃ- চট্টগ্রাম। ফুল্লগ্রাম। এখানে চন্দ্রশেখর পর্বতে সীতাকুণ্ডের কাছে ভবানী মন্দির একটি পীঠস্থান। চন্দ্রশেখর পর্বতও একটি তীর্থ। সতীর ডান হাত পড়েছিল।

চণ্ড—দৈত্য শুম্ভের প্রধান অনুচর ও সেনাপতি। ছোট ভাই মুণ্ড। শুম্ভের আদেশে কৌশিকী (দ্রঃ) দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে চামুণ্ডার হাতে নিহত হন। দ্রঃ- চণ্ডপুর।

চণ্ডকৌশিক—(১) কক্ষীবানের ছেলে; গৌতমের নাতি; উদার প্রকৃতির এক জন মহাতপস্বী। সন্তানহীন মগধরাজ বৃহদ্রথকে (দ্রঃ) আশীর্বাদ করলে ছেলে হয় জরাসন্ধ। (২) বিশ্বামিত্রের (কোপন স্বভাবের জন্য) আর এক নাম।

চণ্ডনায়িকা—অষ্ট নায়িকার এক জন। ভগবতীর এক সখী। অপর নাম চণ্ডা ও চণ্ডী। একই ধ্যান। উগ্রচণ্ডী ইত্যাদি শব্দে উগ্র বিশেষণ মাত্র।

চণ্ডপুর—সাহাবাদ জেলাতে ভাবুয়া থেকে ৫ মাইল পশ্চিমে। এখানে শুম্ভ নিশুম্ভ মারা যান; মার্কণ্ডেয় পুরাণে হিমাচলে এবং বামন পুরাণে বিন্ধ্যাচলে। এখানে চণ্ডমুণ্ডের আবাস ছিল ফলে নাম। মুণ্ডেশ্বরীতে চৌমুখী মহাদেব ও দুর্গার মন্দির ও স্থাপন করেছিলেন। ভাবুয়া থেকে ৭ মাইল দ-পশ্চিমে মুণ্ডেশ্বরী অতি প্রাচীন মন্দির; গুপ্তশৈলীর অলঙ্করণ যুক্ত। মন্দিরে এক স্থানে ৬৩৫ খৃ মত তারিখ রয়েছে। বামন পুরাণে বিন্ধ্যপর্বতে বিন্দুবাসিনীর হাতে চণ্ডমুণ্ড মারা যান। চয়েনপুর বা চন্দ্রপুর।

চণ্ডপ্রদ্যোত—বুদ্ধদেবের জীবিত কালে ষোড়শ মহা জনপদের অন্যতম অবন্তির রাজা। রাজধানী উজ্জয়িনী। বিম্বিসার ও তাঁর ছেলে অজাতশত্রুর সঙ্গে চণ্ডপ্রদ্যোত মহাসেনের যথেষ্ট সদ্ভাব ছিল। বিম্বিসার এক বার নিজের চিকিৎসক জীবককে চণ্ডপ্রদ্যোতের চিকিৎসার জন্য পাঠান। কৌশাম্বীর রাজা উদয়ন প্রদ্যোতের শত্রু ছিলেন এবং প্রদ্যোতের মেয়েকে হরণ করে বিয়ে করেন। প্রদ্যোতের অনুরোধে বুদ্ধদেব মহাকচ্চায়ন নামে এক শিষ্যকে অবন্তিরাজ্যে ধর্মপ্রচারে নিযুক্ত করেছিলেন। পাশের রাজ্যগুলির ওপর নিজ আধিপত্য স্থাপন করে চণ্ডপ্রদ্যোত শক্তিশালী হয়ে ওঠেন।

চণ্ডরোষণ—অক্ষোভ্য (দ্রঃ) বংশ। বর্ণ পীত। দু হাত; প্রতীক তরবারি ও তর্জনী

পাশ। অপর নাম মহাচণ্ডরোষণ, চণ্ডমহারোষণ বা অচল। যবযুম মূর্তি, একমুখ, কেকরাক্ষ; দংষ্ট্রাকরাল, ভয়ঙ্কর মুখ। রত্নমৌলি, মাথাতেও মুণ্ডমালা। চোখ আরক্ত। আয়ুধ তরবারি, শ্বেতনাগ যজ্ঞোপবীত, ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান, ও রত্ন বিভূষিত। ধ্যানে শক্তির উল্লেখ নাই, কিন্তু প্রচলিত রীতি যবযুম মূর্তি। পূজা গোপনে।

চণ্ডাল—স্মৃতিতে হিন্দু সমাজের নিম্নতম অস্পৃশ্য জাতি। মনু অনুসারে শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণ কন্যার গর্ভে জন্ম। কিন্তু সম্ভবত কোন অনার্য জাতি থেকে এদের উৎপত্তি। বৌদ্ধ জাতকে বহু স্থানে এদের ছায়া পর্যন্ত অশুদ্ধ। স্মৃতিতে আছে এদের স্পর্শে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। ফা-হিয়েন লিখে গেছেন এরা সহরের বাইরে বাস করত; সহরে আসতে হলে দুটি কাঠি বাজিয়ে অপরকে সাবধান করে দিয়ে এগিয়ে আসত। তন্ত্রে চণ্ডালের শব ও মুণ্ডের বিশেষ সমাদর রয়েছে। তন্ত্রে চণ্ডাল বলিদানে মহাসিদ্ধিঃ প্রজায়তে। যোগিনী হৃদয় তন্ত্রে শবসাধনায় চণ্ডালের শব অতিমূল্যবান। অবশ্য এ মূল্য সম্পূর্ণ স্যাডিস্টিক।

চণ্ডিকা—পার্বতীর উগ্রমূর্তি। অনেক সময় ২০ হাত। ১০ বা ১২ হাতও দেখা যায়।

চণ্ডী—(১) শিবের শক্তি। অন্য নাম চণ্ডিকা (দ্রঃ) অর্থাৎ প্রচণ্ডা। (২) মার্কণ্ডেয় পুরাণের একটি অধ্যায়; মন্ত্র সংখ্যা ৭০০; অন্য নাম সপ্তশতী। সুরথরাজ এবং সমাধি নামে এক বৈশ্যের কাছে মেধস্ মুনি দেবীর স্বরূপ বর্ণনা করে এই কাহিনী বলেন। যুগে যুগে দেবী আবির্ভূত হয়ে কি ভাবে অসুরদের মেরে দেবতাদের উদ্ধার করেন তার তিনটি ঘটনা এই অংশে রয়েছে। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে প্রথমা দেবী মধুকৈটভকে, দ্বিতীয়া দেবী মহিষাসুরকে এবং তৃতীয় বারে তৃতীয়া দেবী মহিষাসুরের অনুচর ধূম্রলোচন-চণ্ডমুণ্ড-রক্তবীজ ও শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ করেন।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে মহিষাসুরের অত্যাচারে দেবতারা ক্রুদ্ধ হলে এঁদের মুখ থেকে তেজ বার হতে থাকে এবং এই সব তেজ মিলিত হয়ে শিবের তেজে মুখ, বিশুর তেজে বাহু, ব্রহ্মার তেজে পায়ের পাতা, চন্দ্রর তেজে স্তন ইত্যাদি পূর্ণাবয়ব মূর্তি দেখা দেয়। দেবতারা নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র থেকে অস্ত্র এবং হিমালয় সিংহ দেন। শুম্ভ, নিশুম্ভ বধের পূর্বে দেবতাদের স্তবে প্রীত হলে দেবীর দেহ থেকে যিনি বার হয়ে আসেন তিনি কৌশিকী এবং অবশিষ্ট অংশ যা পড়ে রইল তিনি কালিকা, হিমালয়ে আশ্রয় নেন।

দেবী ভাগবতে মহিষাসুর বধের জন্য ব্রহ্মা এসেছিলেন মহাদেবের কাছে। ব্রহ্মার বর ছিল নারীর হাতে মৃত্যু। শিব চিন্তায় পড়েন। বিষ্ণু প্রস্তাব দেন সকলের তেজ থেকে এক জন দেবী তৈরি হক। দেবী ভাগবতে এই আবির্ভূতা দেবীর নাম মহালক্ষ্মী; বামন পুরাণে ইনি কাত্যায়নী। দেবতাদের তেজ কাত্যায়ন ঋষির আশ্রমে এসে রূপ নিয়েছিল বলে এই নাম। এই কাত্যায়নী শিবের কেউ নন। তবে মহিষাসুর বধের পর দেবতারা ও সিদ্ধরা স্তব করেন এবং দেবী তখন হরপাদমূলে প্রবেশ করেন। বামন পুরাণেও কাত্যায়নী এই ভাবে রূপ পান। কালিকাপুরাণে এই কাহিনী একটু বদলান; দেবতাদের তেজে ধৃত বপুঃ এবং কাত্যায়নেন সঙ্কুক্ষিতা (কালি ৬০।৭৭)। অর্থাৎ কাত্যায়ন যেন তিলোত্তমা মত কাউকে সৃষ্টি করলেন। অর্থাৎ চণ্ডী কাত্যায়নী।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে চণ্ডীর দেহ থেকে ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী ইত্যাদি শক্তি বার হয়ে শুম্ভ-দৈত্য বধে সাহায্য করেন। এই সব দেবীর সাহায্য নেবার জন্য শুম্ভ বিদ্রূপ করলে দেবীরা সকলে আবার চণ্ডীর স্তনে লীন হয়ে যান। মার্কণ্ডেয় পুরাণে ও বামন পুরাণে রক্তবীজ বধের সময় দেবীর মুখ থেকে ব্রহ্মাণী, কৌমারী ইত্যাদি দেখা দেন। দেবীর বর্ণনায় চার হাত ; অক্ষমালা, কমণ্ডলু, রত্নকলস, ও পুস্তক হাতেও মূর্তি দেখা যায়। মহিষাসুর বধের সময় চণ্ডী পপৌ পুনঃ পুনশ্চৈব।

শুম্ভ নিশুম্ভকে যিনি বধ করেন তাকে কেবল হিমালয় বাসিনী বলা হয়েছে। তিন জনেরই শিবের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। প্রথম দেবী বিষ্ণুর যোগ নিদ্রা, মহামায়া ; দ্বিতীয় দেবী দেবগণের তথা শিবের তেজ থেকে উৎপন্ন। তৃতীয় দেবীর সম্বন্ধে বলা আছে দেবতারা হিমালয়ে এসে বিষ্ণুমায়াং প্রতুষ্টুবুঃ। সকলেই এঁরা শিবের সঙ্গে সম্পর্কহীন। এ ছাড়াও আছে শিব এই দেবীর দূত হয়ে শুম্ভ নিশুম্ভের কাছে গিয়েছিলেন ফলে দেবীর নাম শিবদূতী (চণ্ডী ৮।২৭)। চণ্ডীতে দেবী স্বতন্ত্রা-মূলদেবী তবে কিছুটা বিষ্ণু আশ্রিতা। দেবী ভাগবতে ইনি পরমেশ্বরী, জননী সর্বদেবানাং ব্রহ্মাদীনাং তথেশ্বরী (১।১৫।৩৪)। চণ্ডীতে ইনি কোথাও শিব মায়া বা শিবশক্তি নন। সব সময় সিংহবাহিনী, আট বা দশভুজা। দ্রঃ- দুর্গা, কৌশিকী, শিবদূতী।

ঋক্ বেদে রুদ্রের মূর্ত ক্রোধকে 'মনা' বলা হয়েছে : এই মনাই যেন চণ্ডী। উমা-হৈমবতী নাম পাওয়া যায় প্রথমে কেন উপনিষদে। দুর্গা নাম প্রথম মেলে তৈত্তিরীয় উপনিষদে। ঋক্ বেদের একটি সূক্তে এই দেবীকে অরণ্যানী বলা হয়েছে। উমা-হৈমবতী সুবেশী সুন্দরী ; ব্রহ্মের মর্মজ্ঞা, শিবের স্ত্রী।

মহাভারতে চণ্ডীর ব্যাপক উল্লেখ আছে। অর্থাৎ যেন খৃস্ট-পূর্ব সময়ের দেবী। উমা হৈমবতী আর্য কল্পনা, দুর্গা চণ্ডী হয়তো অনার্য কল্পনা ; দুই মিলে এক হয়ে গেছে। চণ্ডী শব্দটি বহু ধ্যানে কোথাও বিশেষ্য আবার কোথাও বিশেষণ হিসাবে ব্যবহৃত ; অত্যন্ত বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে।

শিখগুরু গোবিন্দ সিং-এর চণ্ডীগীতি বলে একটি রচনা আছে। ইনি উজ্জয়িনীর রাজকন্যা। পরে রাজ্যের শাসক। ইন্দ্র এসে এঁর কাছে সাহায্য চান। এই কন্যা বাঘের পিঠে চড়ে অসুর নাশ করেন।

চতুরাশ্রম—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস ; জীবনের এই চারটি আশ্রম।

চতুরাস্য—এক জন অসুর। রম্ভার প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়েন। স্বয়ংপ্রভা রম্ভার সখী ; রম্ভাকে প্ররোচিত করে অসুরের সঙ্গে মিলন ঘটায়। এর পর রম্ভা ও চতুরাস্য দাক্ষিণাত্যে ময়ের তৈরি প্রাসাদে বাস করতে থাকে। কিন্তু রম্ভার জন্য ইন্দ্র ব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং চতুরাস্যকে হত্যা করে রম্ভাকে ফিরিয়ে নিয়ে যান এবং স্বয়ংপ্রভাকে শাপ দেন পৃথিবীতেই বাস করতে হবে ; সীতার খোঁজে বানররা এলে তাদের ঠিক মত আতিথি সংকার করলে তখন মুক্তি পাবে।

চতুরিকা—এক ব্রাহ্মণ দক্ষিণা হিসাবে এক বার এক খণ্ড সুবর্ণ পান। কিন্তু দরিদ্র ব্রাহ্মণ এই সোনা দিয়ে কি করবেন ভেবে পান না। এই সময় এক বন্ধু উপদেশ

দেন বিদেশে পর্যটন করে আসতে। কিন্তু ব্রাহ্মণ কোথায় যাবেন, কি ভাবে যাবেন কিছুই ঠিক করে উঠতে পারেন না। বন্ধুটি তখন কাছাকাছি বাস করে চতুরিকা নামে দেহোপজীবিনীর কাছে যেতে বলেন ; চতুরিকাকে সুবর্ণ খণ্ডটি দিয়ে সাম-ভাবে কথা বললেই সে সব কিছু বুঝিয়ে দেবে। সরল ব্রাহ্মণ উপহাসটি বুঝতে পারেন না ; চতুরিকার কাছে যান এবং সুবর্ণ খণ্ডটি দিয়ে পর্যটনে যাবার উপদেশ চান। চতুরিকা ও সেখানে আর যারা উপস্থিত ছিল সকলে শুনে হাসতে থাকে। ব্রাহ্মণ তখন হাতে গোকর্ণ মুদ্রা তৈরি করে সাম গান করে শোনাতে থাকেন। চার পাশে সকলে আরো হাসতে থাকে। ব্রাহ্মণ কোন মতে পালিয়ে এসে বন্ধুকে আবার সব কথা জানালে বন্ধু ব্রাহ্মণটিকে নিয়ে চতুরিকার কাছে যান এবং ব্রাহ্মণটিকে দেখিয়ে চতুরিকাকে বলেন এই আস্ত-গরুর সামান্য ঘাসটুকু সে যা নিয়েছে ফিরিয়ে দিক। চতুরিকা হাসতে হাসতে ব্রাহ্মণকে তখন তাঁর সুবর্ণ খণ্ডটি ফিরিয়ে দেয়।

চতুর্থ সাবর্ণি মন্বন্তর—দ্রঃ-সাবর্ণি মনু।

চতুর্বর্গ—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ নামে চারটি পুরুষার্থ। পুরুষের প্রয়োজন বা এই চারটির জন্যই জীব ক্রিয়াশীল। সুখই জীবনের অভীষ্ট এবং সুখের মূল এই চারটি।

চতুর্বর্ণ—মনু প্রবর্তিত চারটি জাতি ঃ- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। অন্য মতে ব্রহ্মা এ'দের সৃষ্টি করেন এবং এদের কাজ ভাগ করে দেন। ব্রাহ্মণরা জন্মান ব্রহ্মার মুখ থেকে ; এ'রা সব প্রথম। দ্বিতীয় দফায় বুক থেকে জন্মান সাহসী যোদ্ধা/ক্ষত্রিয়েরা। এদের মধ্যে রজ গুণের আধিক্য। এর পর উরু থেকে জন্মান বৈশ্যেরা ; এ'দের মধ্যে রজ ও তম গুণ মিশিয়ে অবস্থিত। শেষ কালে পাদদেশ থেকে জন্মান শূদ্রেরা ; এ'দের তমঃ গুণই বেশি।

অহিংসা, সত্যকথা, দয়া, দান, তীর্থযাত্রা, ব্রহ্মচর্য, মাৎসর্যহীনতা, দেবতো-ব্রাহ্মণ ও গুরু সেবা, ধর্মপালন, পিতৃপূজা, রাজভক্তি, শাস্ত্রপথে চলা, নিষ্ঠুর না হওয়া, তিতিক্ষা, ঈশ্বরে বিশ্বাস এগুলি প্রতিবর্ণের সকলেরই সব সময়েরই কর্তব্য।

ব্রাহ্মণদের কাজ যজ্ঞ, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান করা ও দান গ্রহণ করা। উপনয়নের সময় ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় জন্ম হয়। ব্রাহ্মণীর গর্ভে শূদ্রের সন্তান চণ্ডাল, ক্ষত্রিয়ের সন্তান সূত এবং বৈশ্যের সন্তান বৈদেহিক। ব্রাহ্মণরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে চাষ, গোরক্ষা বাণিজ্য ও সুদের ব্যবসায় করতে পারেন। তবে দুধ, লবণ, ও মাংস বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অবশ্য ব্রাহ্মণরা যে কাজই করুন যজ্ঞ ইত্যাদি জাতিগত কাজগুলি অবশ্য পালনীয়। ঋত (দ্রঃ) এবং অমৃত (দান প্রাপ্ত) অন্নে জীবন রক্ষা করবেন। উপনয়ন হবে আট বছর বয়সে। পশুচর্ম পরিধান করবেন এবং ভিক্ষা চাইবেন যখন তখন ভগবন্/ভগবতি ভিক্ষাং দেহি বলবেন। পদবী শর্মা। ব্রাহ্মণ যে কোন বর্ণে বিয়ে করতে পারলেও কেবল মাত্র ব্রাহ্মণী স্ত্রীর সহযোগে যাগযজ্ঞ ইত্যাদি করবেন।

ক্ষত্রিয়ের কাজ দান, বেদ অধ্যয়ন ও যজ্ঞ করা। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনও ক্ষত্রিয়ের একটি বিশেষ কাজ। এদের উপাধি হবে বর্মা। উপনয়ন হবে। ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান করবেন; ভিক্ষা করলে ভগবন্/ভগবতি শব্দটি দ্বিতীয় স্থানে ব্যবহার

করবেন। ব্রাহ্মণ ছাড়া যে কোন বর্ণে বিয়ে করতে পারবেন। বিয়ের সময় স্ত্রীর হাতে একটি বাণ থাকবে। দ্রঃ- ক্ষত্রিয়।

বৈশ্যদের কাজ চাষ, গোসেবা ও বাণিজ্য; পদবী গুপ্ত; উপনয়নের পর মেষ চর্ম পরিধান করবেন। বৈশ্য বা শূদ্র বর্ণে বিয়ে করতে পারে। বিয়ের সময় স্ত্রীর হাতে বেত থাকবে। শূদ্রের কাজ অপর বর্ণের সেবা করা ও শিল্প কর্ম; ক্ষত্রিয় স্ত্রী হলে সন্তান হবে পুল্কস বা ক্ষত্তা এবং বৈশ্য স্ত্রী হলে সন্তান আয়োগব।

চণ্ডালের কাজ মৃত্যুদণ্ডে অপরাধীকে হত্যা করা এবং মেয়েদের উপার্জনে জীবিকা নির্বাহ করা। পুল্কস-রা শিকার করবেন; আয়োগবরা নাটক এবং শিল্পকর্ম করবেন। দ্রঃ- বর্ণসঙ্কর।

চতুর্ব্যূহ—পঞ্চরাত্র শাস্ত্রে বিষ্ণুকে চতুর্ব্যূহ বা চার জন রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ মিলে চতুর্ব্যূহ। বিশিষ্টাদ্বৈত বেদান্ত মতে পরম-ব্রহ্ম বাসুদেব জ্ঞান, বল, ঐশ্বর্য, বীর্য, শক্তি ও তেজ ষড়গুণে পরিপূর্ণ। সংকর্ষণ অনন্ত জ্ঞান ও বল যুক্ত, প্রকৃতিলীন, জীবতত্ত্বের অন্তর্যামী ও জগৎস্রষ্টা। অনিরুদ্ধ অনন্ত শক্তি ও তেজ যুক্ত বিশ্বসৃষ্টিকর্তা এবং রক্ষাকর্তা। প্রদ্যুম্ন অনন্ত ঐশ্বর্য ও বীর্য যুক্ত, মনস্তত্ত্বের অন্তর্যামী ও শুদ্ধবর্ণের স্রষ্টা। মাধ্ব বেদান্ত মতে এঁরা সকলেই তুল্য গুণ সম্পন্ন। গৌড়ীয় মতে ভগবানের নিরুপাধি অবস্থা হচ্ছে বাসুদেব; অন্যেরা তাঁর প্রকাশ। সঙ্কর্ষণ প্রকৃতি ও জীবতত্ত্বের অন্তর্যামী, প্রদ্যুম্ন সূক্ষ্ম পঞ্চ মহাভূতের অন্তর্যামী। এঁরা তুল্য রূপ হলেও বাসুদেব শ্রেষ্ঠ। এঁরা অজ, অমর, অবুদ্ধ, অমুক্ত, পূর্ণ, পরম ও নিত্যানন্দ।

পঞ্চরাত্রে (দ্রঃ) বর্ণিত শুদ্ধ সৃষ্টি তত্ত্ব। এক একটি ব্যূহ এক একটি প্রকাশ স্তর। অর্থাৎ প্রথমটি থেকে দ্বিতীয়টি, দ্বিতীয়টি থেকে তৃতীয় ইত্যাদি প্রকাশিত/উৎপন্ন। এই চতুর্ব্যূহের যথাক্রমিক নাম বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। বাসুদেব-ব্যূহ প্রথম গুণ উন্মেষ অবস্থা; শক্তি ও শক্তিমানের প্রথম ভেদ অবস্থা; এটি বাসুদেব তত্ত্ব; এরপর বাসুদেব নিজের মধ্যে নিজেকে ভাগ করে সংকর্ষণ হলেন। ভগবান সৃষ্টিরূপে প্রকাশ পান নি কিন্তু দিগন্তনিম্নে অবস্থিত উদীয়মান সূর্যের মত নিজেকে ছড়িয়ে দেওয়া যেন সংকর্ষণ। উদয়স্থে তথা দেবে প্রভা সংকর্ষণাত্মিকা—অহির্বুধ্ন্যসংহিতা (৫।৩০-৩১)। সঙ্কর্ষণ ব্যূহে শুদ্ধ সৃষ্টি থেকে শুদ্ধেতর সৃষ্টির প্রথম প্রকাশ। সঙ্কর্ষণ ব্যূহে চিতে চিতে, অচিতে অচিতে বা চিৎ-অচিতে কোন ভেদ নাই। সঙ্কর্ষণ ব্যূহ থেকে প্রদ্যুম্ন ব্যূহের উৎপত্তি—এই স্তরে পুরুষ ও প্রকৃতি ভাগ হল; সত্ব, রজঃ ও তমঃ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির জন্ম হল। প্রদ্যুম্ন থেকে অনিরুদ্ধের জন্ম। অনিরুদ্ধ যেন প্রদ্যুম্নের আরব্ধ কাজ সুসম্পন্ন করেন। বাসুদেব ষড়-গুণান্বিত ভগবান। সংকর্ষণ এই ষড়গুণের জ্ঞান ও বলের প্রকাশ, প্রদ্যুম্ন ঐশ্বর্য ও বীর্যের প্রকাশ, অনিরুদ্ধ শক্তি ও তেজের প্রকাশ।

বিষ্বক্সেন সংহিতাতে প্রদ্যুম্ন সৃষ্টি, অনিরুদ্ধ স্থিতি, সংকর্ষণ লয়। চণ্ডীতন্ত্রে অনিরুদ্ধ সৃষ্টি, প্রদ্যুম্ন স্থিতি, সঙ্কর্ষণ লয়।

মহাসনৎকুমার সংহিতাতে বাসুদেবের দেহ থেকে শ্বেতবর্ণ শান্তিদেবী ও সঙ্কর্ষণ রূপ শিব উৎপন্ন হন। শিবের বাম অঙ্গ থেকে শ্রীদেব; তাঁর পুত্র প্রদ্যুম্ন—তিনিই ব্রহ্মা। এই ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন পীত সরস্বতীকে ও পুরুষোত্তম রূপ অনিরুদ্ধকে।

অহির্বুধ্ন্য সংহিতাতে (৫।২২-২৪) সঙ্কর্ষণ ভগবৎ-প্রাপ্তি সাধক ঐকান্তিক মার্গ প্রকাশ করেন; প্রদ্যুম্ন ভগবৎ প্রাপ্তির মার্গরূপ শাস্ত্রার্থ ভাবে অবস্থান করেন। অনিরুদ্ধ সাধকদের শাস্ত্রার্থের ফল প্রাপ্ত করান।

দর্শনে সঙ্কর্ষণ জীব তত্ত্বের, প্রদ্যুম্ন মন ও বুদ্ধিতত্ত্বের এবং অনিরুদ্ধ অহঙ্কার তত্ত্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। পঞ্চরাত্রের লক্ষ্মীরূপ শক্তিকে জগতের যোনি বলা হয়েছে।

বহু পুরাণ ও তন্ত্রে এ'রা চার জনেই বাসুদেব বা বিষ্ণুর চারমূর্তি বলে স্বীকৃত। বিষ্ণু ধর্মোত্তর পুরাণে অনিরুদ্ধ বায়ুমূর্তি, প্রদ্যুম্ন হুতাশন এবং সঙ্কর্ষণ রুদ্রমূর্তি। দ্রঃ-ব্যূহ।

চতুর্বেদ—বৈরাজ, অগ্নিষ্বাত্ত, গার্হপত্য, সোমপা, একশৃঙ্গ, চতুর্বেদ ও কাল এ'রা পিতৃদেব।

চতুর্মুখ—তিলোত্তমা (দ্রঃ) অপরূপ সুন্দরী; দেবতাদের যখন প্রদক্ষিণ করছিলেন তখন তিলোত্তমা যে দিকে যাচ্ছিলেন সেই দিকেই তাঁকে দেখবার জন্য ব্রহ্মার চারদিকে চারটি মাথা বার হয়; অর্থাৎ চতুর্মুখ হন।

চতুর্যুগ—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি চার যুগ। এদের পরিমাণ যথাক্রমে ৪৮০০, ৩৬০০, ২৪০০, এবং ১২০০ দৈব বৎসর। অর্থাৎ ১২০০০ দৈব বৎসরে চার যুগ=এক দৈব যুগ। চতুর্যুগের শেষে বেদ নষ্ট হয়ে যায়; সপ্তর্ষিরা এসে আবার বেদ সৃষ্টি করেন।

চতুষ্পীঠ পর্বত—অসিন্ন পর্বত শাখা। কটক জেলাতে জয়পুরের দক্ষিণে। অপর নাম খণ্ডগিরি ও অলটি গিরি। ভুবনেশ্বর থেকে ৪ মাইল উ-পশ্চিমে।

চন্দনা—(১) গুজরাটে সাবরমতী নদী। (২) সাঁওতাল পরগণাতে একটি নদী; গঙ্গাতে মিলিত হয়েছে (রামা)।

চন্দ্র—চন্দ্র মণ্ডলের দেবতা। বহু স্থানে চন্দ্র/সোমকে প্রশস্তিতে সূর্য, অগ্নি, ইন্দ্র, বিশ্বভুবনের রাজা, প্রজাপতি, ধনদাতা, অন্নদাতা ইত্যাদি নানা কিছু বলা হয়েছে। সীমাহীন স্তাবকতা।

(ঋক্ ১।১১৬।১৭) সবিতা নিজের মেয়ে সূর্যাকে সোমরাজকে দিতে ইচ্ছা করেছিলেন। সোমও পাণিপ্রার্থী (ঋক্ ১০।৮।৫৯) ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অশ্বিদ্বয় (দ্রঃ) এ'কে লাভ করল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৪।১৭।১) প্রজাপতি সূর্য্যা নামে দুহিতাকে সোমকে দিতে চেয়েছিলেন। যাস্ক (১৮।৮।৫) বলেছেন সবিতা সূর্য্যাকে সোম বা প্রজাপতির হাতে দিতে চেয়েছিলেন। বৈদিক গ্রন্থে সূর্যা কখনো সূর্যের পত্নী; কখনো বা প্রজাপতির পত্নী। এখানে সূর্যের স্ত্রী ও কন্যা দুজনেরই নাম সূর্যা। সোমকে বহু স্থানে প্রজাপতিও বলা হয়েছে।

কল্পে কল্পে বহু চন্দ্রের উৎপত্তি ও লয় হয়েছিল। প্রথম স্বায়ম্ভুব মনুর সময়ে সমুদ্র মন্থন কালে চন্দ্র, অমৃত, পারিজাত, লক্ষ্মী, ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবা ইত্যাদি উঠেছিলেন। মহাদেব হলাহল পান করেছিলেন বলে তাঁর বিষের জ্বালা কমাবার জন্য চাঁদ রূপ এই স্নিগ্ধ রত্নটিকে তাঁকে মাথায় ধারণ করতে দেওয়া হয়।

স্কন্দ পুরাণে সমুদ্র থেকে চন্দ্র উঠেই কালভৈরব শিবের আরাধনা করেন এবং শিব সন্তুষ্ট হয়ে চন্দ্রকে মাথায় গ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে দক্ষ-শাপগ্রস্ত চন্দ্র শিবের শরণ নিলে শিব এঁকে মাথায় গ্রহণ করেন।

আর এক মতে ব্রহ্মার মানসপুত্র অত্রি ; অত্রির ছেলে চন্দ্র। অন্যমতে ব্রহ্মা ত্রি অনসূয়ার (দ্রঃ) সন্তান সোম হয়ে জন্মান। হরিবংশে (১।২৫) অত্রি তিন হাজার দব্য বৎসর তপস্যা করেন। দেহ সোমে পরিণত হয় (১।২৫।৫), চোখের জল চন্দ্রে রিণত হয়। চারদিক আলোকিত হয়ে ওঠে, দশ দিকের দেবীরা এসে গর্ভে ধারণ করেন কন্তু ধারণ করে রাখতে পারেন না। চন্দ্র ও দেবীরা বসুন্ধরাতে পড়ে যান। ব্রহ্মা াড়াতাড়ি এই পতমান চন্দ্রকে রথে বসিয়ে ইত্যাদি। স্কন্দ প্রভাসখণ্ডে—তিন চাকার থে চাড়িয়ে একুশ বার পৃথিবী পরিক্রমা করান। এতে চন্দ্রের তেজ পৃথিবীতে নেকটা ছড়িয়ে পড়ে এবং এই তেজে ওষধিবর্গের জন্ম হয়। চন্দ্র নিজে অনেকটা ন্তমিত হয়ে পড়েন। ব্রহ্মা তারপর চন্দ্রকে ওষধিবর্গ, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণদের াজা রূপে অভিষিক্ত করেন। ফলে নাম অত্রিজ। চন্দ্র তার পর রাজসূয় যজ্ঞ রে অপ্রতিহত তেজে রাজত্ব করতে থাকেন। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে সৃষ্টির মানসে ব্রহ্মা যখন রম ব্রহ্মের ধ্যান করছিলেন সেই সময়ে ব্রহ্মার মনে কাম ভাব জেগে ওঠে এবং তৎক্ষণাৎ ই মন থেকে সরস্বতীর জন্ম হয়। সরস্বতী ব্রহ্মাকে প্রণাম করেন। কিন্তু ব্রহ্মা রস্বতীকে দেখে আরো কামোন্মত্ত হয়ে পড়েন। সরস্বতীর জন্য স্থান করে দেন কলের জিবে, বিশেষত পণ্ডিতদের জিহ্বাগ্রে। এর পর সরস্বতীকে ভোগ করেন। রে শান্ত হয়ে এই কাম ভাব জাগাবার জন্য মদনকে অভিশাপ দেন শিবের তৃতীয় ত্রের আগুনে ভস্মীভূত হতে হবে। এর পর ব্রহ্মা নিজের মনের কামভাব অত্রিকে ান করেন ; অত্রি এই কামভাব স্ত্রী অনসূয়াকে দান করেন। অনসূয়ার মধ্যে এই ামভাব ক্রমশ ঘনীভূত হয়ে চন্দ্র রূপে জন্মলাভ করেন। অন্য মতে অনসূয়া কামভাব হ্য করতে না পেরে অত্রিকে এই কাম ফিরিয়ে দেন এবং অত্রির চোখ থেকে চন্দ্র রূপে াই কাম জন্ম লাভ করেন।

আর এক মতে মহর্ষি অত্রিকে সৃষ্টি করতে বললে অত্রি তপস্যা করতে াকেন। কয়েক বছর তপস্যার পর অত্রির হৃদয়ে দীপ্ততেজ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ফুটে ঠেন। আনন্দে অত্রির চোখ দিয়ে জল গড়াতে থাকে। এই অশ্রু বিন্দু দিকেরা ারী বেশে পান করেন যাতে তাঁদের সন্তান হয়। কিন্তু গর্ভ হলে এই গর্ভ তাঁরা ারণ করতে পারেন না ; পরিত্যাগ করেন। ব্রহ্মা তখন এগুলিকে নিয়ে একত্র করে কটি যুবা পুরুষে পরিণত করেন এবং বিমানে ব্রহ্মলোকে নিয়ে আসেন। ঋষি,

দেবতা, গন্ধর্ব সকলে সামগান করে এই উজ্জ্বল যুবার স্তব করতে থাকেন। ব্রহ্মর্ষিরা এ'কে নিজেদের অধিপতি করে নিতে চান। এ'র থেকেই সমস্ত ওষধির সৃষ্টি হয়।

চন্দ্র বিষ্ণুর তপস্যা করেন প্রায় দশ বছর ধরে। বিষ্ণু দেখা দিয়ে বর দিতে চান। চন্দ্র বলেন স্বর্গে তিনি যজ্ঞ করবেন ; যজ্ঞে ব্রহ্মা যেন নিজে যজ্ঞভাগ নিতে আসেন এবং মহাদেব যেন যজ্ঞশালার দ্বারী হন। বিষ্ণু বর দেন ; যজ্ঞ হয়। যজ্ঞে অত্রি, ভৃগু, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, দেবতারা, বসুরা, মরুৎরা ও বিশ্বদেবরা আসেন। দক্ষিণা হিসাবে ঋত্বিকদের চন্দ্র ত্রিভুবন দান করেন। যজ্ঞ শেষ হলে চন্দ্র স্নান করে উঠলে লক্ষ্মী, সিনীবালী (কর্দম), দ্যুতি (বিবস্বান), পুষ্টি (ধাতা), প্রভা (সূর্য), কুহূ (হবিষ্মান), কীর্তি (জয়ন্ত), অংশুমালা (কশ্যপ), ধৃতি (নন্দ) চন্দ্রের প্রণয়াসক্ত হয়ে চন্দ্রের অভিসারে আসেন এবং চন্দ্র এ'দের সকলকে পরিতৃপ্ত করেন। চন্দ্রের এই অধর্ম আচরণে সকলে স্তম্ভিত হয়ে যান। বৃহস্পতির (দ্রঃ) স্ত্রী তারাও (দ্রঃ) চন্দ্রের কাছে চলে আসেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত ও অন্যান্য পুরাণে দক্ষ তার ২৭-টি মেয়েকে চন্দ্রের সঙ্গে বিয়ে দেন। এদের মধ্যে রোহিণী রূপে তাষাং অতিরিচ্যতে (মহা শল্য ৩৪।৪২) ; চন্দ্র এ'র কাছেই বেশিক্ষণ থাকতেন ফলে অন্য মেয়েরা অভিযোগে করে ; দক্ষ কুপিত হয়ে শাপ দেন যক্ষা হবে (ব্রহ্ম বৈ ৯।৫২)। চন্দ্র তখন শিবের শরণ নেন এবং শিব এ'কে রোগমুক্ত করে নিজের ললাটে স্থাপন করেন। চন্দ্রের স্ত্রীরা এসে দক্ষকে আবার জানান ; দক্ষ শিবের কাছে যান কিন্তু শিব শরণাগত চন্দ্রকে ফিরিয়ে দিতে চান না। দক্ষ তখন অভিশাপ দিতে যান। শিব তখন কৃষ্ণকে স্মরণ করেন কৃষ্ণ বৃদ্ধব্রাহ্মণ বেশে এসে শিবের কপাল স্থিত চন্দ্র থেকে চন্দ্রকে নিষ্কাশিত করে দক্ষকে দান করেন। শিবের মাথায় অর্দ্ধচন্দ্র থেকে যায় এবং কৃষ্ণের বরে মতান্তরে চন্দ্র পূর্ণতা লাভ করেন।

মহাভারতে মেয়েদের প্রথম অভিযোগে দক্ষ জামাতাকে বোঝান কিন্তু কোন লাভ হয় না ; দ্বিতীয় বার অভিযোগে শাপ দেবেন ভয় দেখান এবং তৃতীয় বার অভিযোগে যক্ষাকে সৃষ্টি করেন এবং এই যক্ষা চন্দ্রম্ আবিশৎ (শল্য ৩৪।৫৫)। চন্দ্র শাপমুক্তির জন্য যজ্ঞ করেন কিন্তু কোন লাভ হয় না। ওষধিপতি রোগাক্রান্ত হওয়াতে ওষধি সমূহ নষ্ট হতে থাকে ; জীবগণও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। দেবতারা প্রজাপতিকে অনুরোধ করেন। প্রজাপতি সোমকে সকল স্ত্রীর প্রতি সমান ব্যবহার করতে অনুরোধ করেন এবং বলে দেন সরস্বতী নদীর প্রধান তীর্থে (মহা ৯।৩৪।৭০-৭৬) প্রথমে স্নান করতে। ফলে ১৫ দিন ক্ষয় এবং ১৫ দিন বৃদ্ধি পাবে। এই ভাবে চন্দ্রও শাপমুক্ত হন। অমাবস্যাতে স্নান করে লোকান্ প্রভাসয়ামাস ; শীতাংশুত্বম্ অবাপ (৯।৩৪।৭০)। মহাভারতে শান্তিপর্বে (১২।৩২৯।৪৬) আছে দক্ষ প্রথমেই শাপ দেন, তারপর সকল স্ত্রীর প্রতি সমান ব্যবহার করতে বলেন এবং ঋষিরা চন্দ্রকে পশ্চিম সমুদ্রে হিরণসরঃ তীর্থে স্নান করতে বলেন। স্নান করে পাপ ক্ষয় হয় এবং অবভাষিত হন ; স্নানটি প্রভাস তীর্থ নামে পরিচিত হয়। একটি মতে দক্ষ শাপ দিয়েছিলেন যক্ষা হবে এবং কোন সন্তান হবে না। শিবপুরাণে দক্ষ দ্বিতীয়বার এসে

রোগগ্রস্ত হবেন শাপ দেন। ব্রহ্মার নির্দেশে দেবতা ও ঋষিরা চন্দ্রকে নিয়ে শিবের আরাধনা করলে শিব বর দেন একপক্ষ ক্ষয় হবে ইত্যাদি। স্কন্দপুরাণে দক্ষ দ্বিতীয় বারে শাপ দিয়েছিলেন। ফলে রোগগ্রস্ত চন্দ্র রোহিণীর সঙ্গে মাটিতে এসে পড়েন। চন্দ্র তখন দক্ষকে স্তব করলে দক্ষ শিবের আরাধনা করতে বলেন এবং শিব একপক্ষ ইত্যাদি বর দেন। দ্রঃ- সরস্বতী, অরুণাতীর্থ।

হরিবংশে দক্ষের মেয়েদের বিয়ে করার পর চন্দ্র রাজসূয় যজ্ঞ করেন। অত্রি, ভৃগু, ব্রহ্মা, নারায়ণ ইত্যাদি যজ্ঞে হোতা, অধ্বর্যু ইত্যাদি হন। এই সময় সিনী, কুহু, পুষ্টি, প্রভা, বসু, কীর্তি, ধৃতি, লক্ষ্মী প্রভৃতি ৯ জন দেবী চন্দ্রের সেবা করতেন। ঐশ্বর্যে চন্দ্রের মতিভ্রম হয়। তারাকে হরণ করেন। শুক্র চন্দ্রের সঙ্গে রুদ্র বৃহস্পতির সঙ্গে যোগ দেন। দেবাসুরে ভীষণ যুদ্ধ হয় ; এটি তারকাময় যুদ্ধ (১।২৫।৩৫)। শেষ পর্যন্ত দেবতারা ও তুষিতেরা (দ্রঃ) ব্রহ্মার কাছে যান। ব্রহ্মা তারাকে ফেরৎ দেওয়ান। হরিবংশে পুরূরবা ও উর্বশীর সাত ছেলে হবার পর চন্দ্রের হঠাৎ যক্ষা হয়। অত্রির শরণ নেন ; অত্রি রোগমুক্ত করে দেন।

কালিকা পুরাণে অন্য স্ত্রীরা রোহিণীতে আসক্ত চন্দ্রকে বোঝাতে চেষ্টা করেন। উত্তরফল্গুনী (ভরণী), কৃত্তিকা, আর্দ্রা, মঘা, বিশাখা, উত্তরভাদ্রপদ, জ্যেষ্ঠা ও উত্তরাষাঢ়া ভীষণ রেগে যায়। কয়েক জনে মিলে রোহিণীকে চন্দ্রের কোল থেকে টেনে নামিয়ে হত্যা করতে চায় ; কটু কথা বলতে থাকে। চন্দ্র কোন মতে বাঁচান, ও শাপ দেন কৃত্তিকাদি চারজন উগ্রা তীক্ষ্ণ-নক্ষত্র বলে পরিগণিত হবে (২০।৬৭) এবং কৃত্তিকাদি নয়টি নক্ষত্র অযাত্রা। এরা তখন দক্ষকে জানায়। দক্ষ দুবার এসে সাবধান করে দেন। তৃতীয় বার মেয়েরা অভিযোগ করলে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন ; নাক থেকে যক্ষা বার হয় (২০।১০৫) ইত্যাদি। চন্দ্র তথা সমস্ত পৃথিবী ক্ষয় প্রাপ্ত হতে থাকে। যজ্ঞ বন্ধ ; মানুষ পাপে রত ইত্যাদি। দেবতারা ব্রহ্মার কাছে এবং ব্রহ্মা পাঠান দক্ষের কাছে। দক্ষ তখন জগতের হিতার্থে বর দেন ১৫ দিন ক্ষয় এবং ১৫ দিন বৃদ্ধি এবং নির্দেশ দেন সকল স্ত্রীর প্রতি সমান ব্যবহার করতে হবে। দেবতারা সস্ত্রীক চন্দ্রকে নিয়ে আসেন। ব্রহ্মা বৃহৎ লোহিত পুষ্করে চন্দ্রকে স্নান করান। নীরোগ ও চিরায়ু হন। সঙ্গে সঙ্গে রাজযক্ষা চন্দ্রের দেহ থেকে বের হয়ে এসে ব্রহ্মাকে জানতে চান কোথায় থাকবেন এবং কে স্ত্রী হবে। ব্রহ্মা তখন অমৃতপুষ্ট রাজযক্ষাকে পাহাড়ে চেপে পিষে ফেলে সমস্ত অমৃত বার করে নিয়ে ক্ষীরোদ সাগরের জলে রহসি (২১।৭৮) ফেলে দেন। সুধার সঙ্গে চন্দ্রের তেজ ও জ্যোৎস্নাও বার হয়ে এসেছিল ; সব কিছু সমুদ্রে ফেলে দেন। এর পর ব্রহ্মা সমুদ্র থেকে এই তেজ, জ্যোৎস্না ও সুধা এনে দেবতাদের মাঝখানে রাখেন এবং যক্ষাকে বলেন যারা খুব বেশি রতিপরায়ণ তাদের দেহে যক্ষা বাস করবে (২১।৫০) এবং মৃত্যু কন্যা তৃষ্ণা যক্ষার স্ত্রী হবে। চন্দ্রকে তারপর সুধা, জ্যোৎস্না ও তেজ দিয়ে আবার পূর্ববৎ ১৬-কলা যুক্ত করে দেন। চন্দ্র পরিপূর্ণ হয়ে বল পাচ্ছিলেন না। ব্রহ্মা বলেন সমুদ্রের জলে ধুতে গিয়ে জ্যোৎস্না ইত্যাদি কিছু অংশ নষ্ট হয়ে গেছে। ব্রহ্মা তখন ব্যবস্থা করেন যজ্ঞে প্রজাপতি, ইন্দ্র ও অগ্নিকে পুরোডাশ আহুতি দিয়ে চন্দ্রের জন্যও পুরোডাশ

আহুতি দিতে হবে। এই যজ্ঞ ভাগ পেলে চন্দ্র সুস্থ হয়ে উঠবেন (২১।৬৫)। এ ছাড়া স্বারোচিষ মন্বন্তরে দ্বিতীয় সত্যযুগে শিবের পুত্র দুর্বাসা জন্মাবেন। তৃতীয় সত্যযুগে দুর্বাসা ইন্দ্রকে শাপ দেবেন এবং চতুর্থ সত্যযুগে সমুদ্রমন্থন হবে। সাগরে যে অমৃত কণা থেকে গিয়েছিলে সেই কণা চন্দ্রের কিরণে বৃদ্ধি পেয়ে বিপুল হয়ে উঠবে এবং মন্থনে দেবতারা সেই অমৃত আহরণ করবেন (২১।৭৭) এবং এই সময় সর্বৌষধি যোগে চন্দ্রকে সমুদ্রে ব্রহ্মা স্নান করিয়ে আনবেন ফলে চন্দ্রের সমস্ত দুর্বলতা কেটে যাবে।

ব্রহ্মা তারপর চন্দ্রকে ১৬ ভাগ করেন ; এক কলা শিবের মাথায় থাকে বাকি ১৫ কলা নিয়ে চন্দ্রের ক্ষয় বৃদ্ধি হবে। যখন ক্ষয় হবে তখন এই কলার জ্যোৎস্না শিবের মাথার কলাতে যাবে এবং সুধা অংশ দেবতারা পান করবেন এবং তেজ সূর্যতে যাবে। বৃদ্ধির সময় এগুলি আবার ক্রমশ ফিরে আসবে (২১।৭০)। আরো ব্যবস্থা করেন প্রতি অমাবস্যাতে অপরাহ্নে পিতৃগণ রোহিণী গৃহে কলা বিশিষ্ট চন্দ্রকে ভোজন করবেন (২১।১০১)। এরপর সমস্ত দেবতাদের অনুরোধে শিব চন্দ্রের ১-টি কলা মাথাতে ধারণ করেন। যোগীরা যখন আনন্দের সন্ধান পান তখন তাদের মন এই কলাতে লীন হয়ে যায়।

দেবতাদের যেখানে সভা হয়েছিল সেই খানে সীতা নামে একটি নদী উৎপন্ন হয়। এর জলে ব্রহ্মার নির্দেশে দেবতারা চন্দ্রকে স্নান করান (২২।২)। চন্দ্র স্নান করার জন্য সীতা পুণ্যজল হন এবং বৃহৎ-লোহিত সরোবরে এসে পড়ে। এখানে জল বাড়তে থাকে। ব্রহ্মা এই অমৃত জলের দিকে চেয়ে দেখেন ফলে জল থেকে একটি কন্যা বার হয়ে আসে। ব্রহ্মা নাম দেন চন্দ্রভাগা। চন্দ্র গন্ধ-ঘাতে পাহাড়ের পশ্চিম দিকে পথ করে দেন। এই পথে চন্দ্রভাগা সাগরে চলে যায় ; সাগর একে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করেন।

হিমালয়ের সঙ্গে যুক্ত কুন্দ-ইন্দু-ধবল-গিরি নামে একটি পর্বত রয়েছে। এই পাহাড়ে ব্রহ্মা চন্দ্রকে টুকরো টুকরো করে দেবভোজ্য, পিতৃভোজ্য করে দেন। এই কারণে চন্দ্রের ক্ষয়বৃদ্ধি হয়। এই জন্য পাহাড়টির নাম হয় চন্দ্রভাগ।

কৃষ্ণযজুর্বেদে প্রজাপতির ৩৩ কন্যা চন্দ্রের স্ত্রী ; ইত্যাদি। অন্যান্য স্ত্রীরা প্রজাপতির কাছে ফিরে যান। সোমও যান এবং সকলের সঙ্গে সমান ব্যবহার করবেন বলে ফিরিয়ে আনেন। কিন্তু আবার রোহিণীর সঙ্গে বাড়াবাড়ি করতে থাকেন এবং রোগগ্রস্ত হন। এই ভাবে যক্ষার উৎপত্তি। এরপর সোম সকলের সঙ্গে সমান ব্যবহার করতে বাধ্য হন এবং স্ত্রীরা চরু রন্ধন করে খাইয়ে সোমকে পাপ ও রোগ মুক্ত করেন।

রোহিণী সব চেয়ে উজ্জ্বল তারা ; অন্যান্য তারা ১৮½ বছরে একবার মাত্র আচ্ছাদিত হয়।

সমুদ্র মন্থনে অমৃত উঠলে সিংহিকার ছেলে রাহু অমৃত নিয়ে সকলের অজ্ঞাতে পাতালে পালিয়ে যান। কিন্তু বিষ্ণু মোহিনী (দ্রঃ) মূর্তি ধরে উদ্ধার করে আনেন। এর পর অমৃত পানের সময় রাহু দেবতার বেশে অমৃত পান করতে যাচ্ছিলেন ; চন্দ্র, অন্য মতে চন্দ্র ও সূর্য্য ঘটনাটা বিষ্ণুকে জানিয়ে দেন এবং

বিষ্ণু সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণপাত্র/চক্র দিয়ে রাহুর মাথা কেটে ফেলেন। কিন্তু ইতি মধ্যে অমৃত রাহুর গলা পর্যন্ত নেমে গিয়েছিল। ফলে রাহুর মাথা অমর হয়ে যায়। সেই থেকে মস্তক রূপী রাহু সুযোগ পেলেই চন্দ্রকে গ্রাস করে ফেলেন ; কিন্তু কাটা গলা দিয়ে চন্দ্র বার হয়ে যান। একে চন্দ্রগ্রহণ বলা হয় (পদ্ম, ভাগবত)। দেহ অংশ কেতু। গলা যখন কাটা হয় তখন কয়েক ফোঁটা রক্ত ও গিলে ফেলা কয়েক ফোঁটা অমৃত মাটিতে পড়ে। এই রক্ত থেকে পিঁয়াজ এবং অমৃত থেকে রশুন জন্মায়।

রাজসূয় যজ্ঞ করে চন্দ্র অত্যন্ত অহঙ্কারী ও কামাসক্ত হয়ে পড়েন। এবং ভাদ্র মাসের চতুর্থী তিথিতে বৃহস্পতির স্ত্রী তারাকে চুরি করেন। তারা অপমানিত হয়ে শাপ দেন চন্দ্র কলঙ্কী, মেঘাচ্ছন্ন. রাহুগ্রস্ত ও ক্ষয়রোগাক্রান্ত হবেন। এর পর বৃহস্পতির অনুরোধে ব্রহ্মা তারাকে ফিরিয়ে দিতে বলেন কিন্তু চন্দ্র শোনেন না। বহু দৈত্য দানব চন্দ্রের দলে যোগ দেন। ইন্দ্র. ইত্যাদি দেবতারা বৃহস্পতির দলে আসেন। ইন্দ্র কথা দেন তারাকে ফিরিয়ে আনবেন কিন্তু চন্দ্র দূতকে ফিরিয়ে দেন। ফলে ক্ষীরোদ সাগরের তীরে ভীষণ যুদ্ধ হতে যায়। ব্রহ্মা/মহাদেব এসে সকলকে শান্ত করে তারাকে ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন। মহাদেব তখন চন্দ্রকে ক্ষীরোদ সাগরে স্নান করে পাপমুক্ত হতে বলেন এবং নির্মল অর্দ্ধচন্দ্রকে নিজের মাথাতে ধারণ করেন। কিন্তু কলঙ্কিত অর্দ্ধচন্দ্র লজ্জায় ক্ষীরোদ সমুদ্রে প্রাণ ত্যাগ করেন। মহর্ষি অত্রি করুণায় সেই জলে অশ্রুত্যাগ করলে চাঁদের নতুন দেহ হয়। শিব ও ব্রহ্মা আবার তাঁকে রাজা করে দেন। কিন্তু তারার শাপে চন্দ্রে কলঙ্ক থেকে যায়। ভাদ্র মাসের চতুর্থী এই জন্য নষ্ট চন্দ্র নামে বিখ্যাত। দ্রঃ- গণেশচতুর্থী।

দে-ভাগবতে (১।-) তারা এক দিন বেড়াতে বেড়াতে চন্দ্রের গৃহে যান। দু জনে দু জনকে দেখে মুগ্ধ হন এবং বিয়ে হয়। খুঁজতে খুঁজতে সন্ধান পেয়ে বৃহস্পতি বার বার শিষ্যদের পাঠান এবং শেষ কালে নিজে যান। কিন্তু তারা আসেন না। এমন কি চন্দ্র জানিয়ে দেন তারা নিজের ইচ্ছায় এসেছেন এবং তৃপ্ত হয়ে নিজের ইচ্ছায় ফিরে যাবেন। কিছু দিন পরে বৃহস্পতি আবার আনতে যান কিন্তু চন্দ্রের দ্বাররক্ষীরা তাঁকে বাড়ির ভেতরে ঢুকতেই দেন না। বৃহস্পতি তখন ইন্দ্রকে জানান এবং ইন্দ্র তারাকে ফিরিয়ে দিতে বলেন নতুবা যুদ্ধ করবেন স্থির করেন। দেবতাদের মধ্যে তখন মত বিরোধ দেখা দেয়। অসুররা খবর পায় ; শুক্র চন্দ্রকে আশ্বাস দেন এবং তারাকে দিয়ে দিতে নিষেধ করেন। শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মা এসে চন্দ্র ও শুক্রকে ভৎ'সনা করে তারাকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করেন। দ্রঃ- তারা।

তারা এই সময় গর্ভবতী ছিলেন। বৃহস্পতির আদেশে তারা তৎক্ষণাৎ এই গর্ভ শরস্তম্ভে ত্যাগ করেন এবং এই গর্ভ থেকে একটি ছেলের জন্ম হয়। তারা স্বীকার করেন এটি চন্দ্রের ছেলে। চন্দ্র তখন একে গ্রহণ করেন ও নাম রাখেন বুধ। দেবী ভাগবতে ছেলে হলে বৃহস্পতি নিজের ছেলে হিসাবে জাতকর্ম ইত্যাদি করেন। চন্দ্র খবর পেয়ে নিজের ছেলে হিসাবে দাবি করেন। ফলে আবার দেবাসুরের যুদ্ধ বাঁধবার উপক্রম হয় এবং ব্রহ্মা এসে মধ্যস্থতা করে তারার স্বীকারোক্তি অনুসারে

ছেলেটিকে চন্দ্রের হাতে সমর্পণ করেন। বায়ু পুরাণে আছে তারার জন্য দেব দানবের যুদ্ধ দেখা দেয়; এবং দেবতাদের অনুরোধে ব্রহ্মা তারাকে ফিরিয়ে আনেন। বুধের জন্ম হয়; তারা স্বীকার করেন চন্দ্রই বুধের পিতা। সোম বুধকে পান; কিন্তু গুরুপত্নী গ্রহণের পাপে যক্ষারোগাক্রান্ত হন (বায়ু উত্তর খণ্ড ২৮।৪৫।৪৭)। সোম পিতা অত্রির শরণ নেন এবং অত্রি পাপ মুক্ত করেন। শিব পুরাণেও এই কাহিনী; তারা দুষ্টেন হৃতা; দেবাসুরের যুদ্ধ বাধে প্রায়; ব্রহ্মা ও অত্রি তারাকে ফিরিয়ে আনেন। তারা গর্ভত্যাগ করলে বৃহস্পতি তারাকে গ্রহণ করেন। বিষ্ণু পুরাণেও এই কাহিনী; মদাবলেপাৎ সোম চুরি করেছিলেন। ঋক্‌বেদে (১০।১০৯।২ ও ১০।১০৯।৫-৭) সোম ব্রহ্মজায়াকে ফেরৎ দেন উল্লেখ আছে; কিন্তু আর কোন কিছু নাই।

অর্থাৎ চন্দ্রের যক্ষা হবার দুটি কারণ: একটি রোহিণী ও একটি তারা। চন্দ্রের কলঙ্কের একটি কারণ তারা হরণ। আর একটি কারণ শুক্ল যজুর্বেদে (১।২৮) আছে: দেবাসুরের যুদ্ধের সময় দেবতারা চন্দ্রে যজ্ঞ করেছিলেন। ফলে স্থানটি কৃষ্ণবর্ণ হয়ে গেছে।

দক্ষের সাতাশটি কন্যা চন্দ্রের স্ত্রী:—অশ্বিনী, ভরণী, রোহিণী, কৃত্তিকা, মৃগশিরা, আর্দ্রা, অশ্লেষা, অনুরাধা, পুনর্বসু, পুষ্যা, পূর্বাষাঢ়া, শতভিষা, পূর্বপ্রোষ্ঠপদা, পূর্বফল্গুনী, উত্তর ফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, হস্তা, চিত্রা, উত্তরপ্রোষ্ঠপদা, বিশাখা, স্বাতী, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, মঘা, রেবতী। মহাভারতে (১।১০।২১) চন্দ্রের স্ত্রী মনোহরা; ছেলে বর্চস্ (দ্রঃ শিশির, প্রাণ, রমণ। চন্দ্রের মেয়ে ভদ্রা, মারিষা, জ্যোৎস্নাকালী। তন্ত্রে চন্দ্রের নয়টি শক্তি; রাকা, কুমুদ্বতী, নন্দা, সুধা, সঞ্জীবনী, ক্ষমা, আপ্যায়নী, চন্দ্রিকা ও হ্লাদিনী। এখানে শক্তি অর্থে ক্ষমতা ধরাই শ্রেয়। কাব্যে কুমুদিনী চন্দ্রের আর এক স্ত্রী।

গো-রূপা ভূমি দেবীকে পৃথু যখন দোহন করেন তখন ব্রহ্মা নিজে বৎস সেজেছিলেন। পৃথুর পর ঋষিরা যখন দোহন করেন চন্দ্র তখন বৎস সেজেছিলেন। ব্রহ্মা এই সময়ে সন্তুষ্ট হয়ে চন্দ্রকে তারাদের ও ওষধির অধিপতি করে দেন।

নবগ্রহের সঙ্গে চন্দ্রের পূজা হয়; আলাদা পূজা হয় না। চন্দ্রের ধ্যানে আছে দু হাতে গদা ও বর; শুভ্রবর্ণ ও শ্বেতবস্ত্র। রথে দশ অশ্ব, শ্বেত পদ্মে অবস্থিত। তন্ত্রে চন্দ্র পূজার নিয়ম ও ফল বর্ণিত আছে। পূর্ণিমাতে চন্দ্র উদিত হলে তাম্র পাত্রে রুটি ও মধু মিশিয়ে চন্দ্রকে উৎসর্গ করলে সুখ ও সমৃদ্ধি লাভ হয়। দ্রঃ- চন্দ্রভাগা।

চন্দ্রের একটি করে কলা দেবতারা দিনে পান করেন এবং সূর্য তারপর সুষুম্না রশ্মিতে চন্দ্রকে প্রবৃদ্ধ করে দেন। যখন দুটি কলা মাত্র অবশিষ্ট থাকে চন্দ্র তখন সূর্য পথে এসে উপস্থিত হন; এবং সূর্যের অমা (দ্রঃ- তুষ্টি) রশ্মিতে অবস্থান করেন। এই দিন অমাবস্যা। অমাবস্যায় চন্দ্র জলে প্রবেশ করেন এবং তারপর গাছে ও লতায় অবস্থান করেন। এই সময়ে গাছ কাটলে ব্রহ্ম হত্যার পাপ হয়। অমাবস্যার দিন ১৫-শ কলার যেটুকু অবশিষ্ট থাকে পিতৃগণ সেইটুকু পান করেন। একটি কলা তখনও অবশিষ্ট থাকে।

চন্দ্রকীর্তি—প্রাচীন ভারতে এক জন বৌদ্ধ দার্শনিক। আচার্য দিঙ্‌নাগের পর খৃ ৬-শতকে দক্ষিণ ভারতে সমন্ত দেশে জন্ম। নালন্দার এক জন আচার্য ; চন্দ্রগোমী ও ধর্মকীর্তির সমসাময়িক। নাগার্জুনের মাধ্যমিক শূন্যবাদের টীকা প্রসন্নপদা এঁর রচনা। অন্যান্য গ্রন্থ শূন্যতাসপ্ততি টীকা, যুক্তিষষ্টিকারিকা টীকা, মধ্যমাবতার, প্রদীপদ্যোতনা।

চন্দ্রকেতু—ছত্রকেতু। লক্ষ্মণের (দ্রঃ) ছোট ছেলে। ভরতের কথায় রাম এঁকে উত্তর দিকে চন্দ্রকান্ত দেশ দান করেন। দ্রঃ- চন্দ্রমতী।

চন্দ্রকেতুগড়—২৪ পরগণায়। কলকাতা থেকে ৪০ কি-মি দূরে। বর্তমান নাম বেড়াচাঁপা। খৃ ১-শতকে রচিত পেরিপ্লাস গ্রন্থে 'গাঙ্গে' এবং টলেমির উল্লিখিত 'গাঙ্গেরিদাই' সহর এই চন্দ্রকেতুগড় বলেই মনে হয়। ৩ কি-মি থেকে বেশি একটি জায়গা। প্রাচীন নগর বেষ্টন কারী প্রাচীর ও বসতির চিহ্ন পাওয়া গেছে। আনুমানিক গুপ্ত যুগের একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ও খৃ ৩-৪ শতকের এবং পরবর্তী যুগের বহু মৃন্ময়মূর্তি ও মুদ্রা পাওয়া গেছে। ২০ সে-মি ব্যাস পোড়া মাটির নল যুক্ত পয়ঃপ্রণালী মাটির নীচে দেখা যায়। মৌর্যযুগের ব্রাহ্মী লিপিরও নিদর্শন পাওয়া গেছে। এই সভ্যতা মনে হয় খৃ পূ ৭-৬ শতকের আর্য সভ্যতার সঙ্গে যুক্ত ছিল। অনেকের মতে দে-গঙ্গা এই চন্দ্রকেতুগড়।

চন্দ্রগিরি—বেলগোলার কাছে ; শ্রীরঙ্গপত্তমেরও কাছে। জৈন তীর্থ। প্রাচীন নাম দেয়দুর্গ। পয়স্বিনী (দ্রঃ) নদী।

চন্দ্রগুপ্ত—কার্তবীর্যার্জুনের (দ্রঃ) মন্ত্রী।

চন্দ্রনাথ—চট্টগ্রামে একটি পাহাড়। ৭০০ ধাপ সিঁড়ি দিয়ে উঠে ১১৫৫-ফু ওপরে চন্দ্রনাথ শিবের মন্দির। পাহাড়টি বৌদ্ধদেরও তীর্থক্ষেত্র। বলা হয় এখানে বুদ্ধদেবের আঙুলের হাড় সমাহিত আছে। চৈত্রসংক্রান্তিতে এখানে বৌদ্ধ মেলা হয়। বড়বা কুণ্ডের জলে সব সময়ই যে আগুনের শিখা দেখা যায় তাকে মহাদেবের তৃতীয় চক্ষু বলা হয়।

চন্দ্রদ্বীপ—বাখরগঞ্জ জেলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল ব্যাপিয়া সুবিস্তীর্ণ অঞ্চল। অন্য নাম ছিল বঙ্গাল। গুপ্তযুগেই এখানকার বৌদ্ধদেবী তারা প্রসিদ্ধি লাভ করেন। খৃ ৫-৬ শতকে ব্যাকরণাচার্য চন্দ্রগোমী এখানে বাস করার সময় তারা স্তোত্র রচনা করে ছিলেন। চন্দ্রদ্বীপের তারা মূর্তিই সম্ভবত পাল রাজাদের পতাকাতে শোভা পেত।

চন্দ্রপর্বত— চন্দ্রদ্বীপ।

চন্দ্রপুর—মধ্যপ্রদেশে চান্দা। হংসধ্বজের রাজধানী ; জৈমিনি ভারতে এটি চম্পক নগরী। চন্দ্রপুর, চন্দ্রাবতী বা চন্দনাবতী ছিল কুন্তলকপুর থেকে ২ দিনের পথ।

চন্দ্রবংশ—চন্দ্র (দ্রঃ) থেকে উদ্ভুত বংশ। চন্দ্র > বুধ > পুরূরবা > আয়ুস্ > নহুষ > আযাতি, যযাতি। যযাতি + শর্মিষ্ঠা = দ্রুহ্যু অনুদ্রুহ্যু ও পুরু। যযাতি + দেবযানী = যদু, তুর্বসু। দ্রুহ্যু > বভ্রু > সেতু > আরণ > গন্ধর্ব > ধর্ম > ঘৃত > দুর্দম > ম্লেচ্ছ। অনুদ্রুহ্যু > সভানর, চক্ষুষ, পরোক্ষ। সভানর > কালানর > সৃঞ্জয় > জন্মেঞ্জয়, মহামনস্, উশীনর,

তিতিক্ষ। উশীনর>শিবি, বেণ, কৃমি, উশী, দর্প। শিবি>ভদ্র, সুবীর, কেকয়, বৃষদর্প, কপটরোম। কেকয়>কীচক। তিতিক্ষ>কৃষৎরথ, হোম, সুতপস্, বলি। বলি>অনঘাভূ, অঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র, বঙ্গ, অদ্রুপ। অঙ্গ>দধিবাহন>রবিরথ ধর্মরথ> চিত্ররথ> সত্যরথ > লোমপাদ > চতুরঙ্গ> পৃথুলাক্ষ> চম্প>হর্যঙ্গ>ভদ্ররথ। ভদ্ররথ>বৃহৎরথ, বৃহৎকর্মা, বৃহৎভানু। (অগ্নি, বিষ্ণু, ভাগবত, ব্রজান্ত)।

এই বংশের যদু থেকে যাদব বংশ (কৃষ্ণ এই বংশে), পুরু থেকে পৌরব, কুরু থেকে কৌরব ইত্যাদি বংশের উৎপত্তি।

চন্দ্রবতী—দ্রঃ- চন্দ্রাবতী।

চন্দ্রবর্মা—কাম্বোজ নরপতি। চন্দ্র নামে অসুর অংশে জন্ম। কুরুক্ষেত্রে ধৃষ্টদ্যুম্নের হাতে মারা যান।

চন্দ্রভাগা—পঞ্চনদের একটি ; বর্তমান নাম চেনাব। (১) এখানে স্নান করে চন্দ্র দক্ষের শাপ থেকে মুক্ত হন ; তাই নাম চন্দ্রভাগা। গ্রীক নাম আকেসিনেস, বৈদিক, নাম অসিক্নী, মরুদ্বৃধা (দ্রঃ), এবং সীতা। বাড়লাচ গিরিবর্ত্মের দক্ষিণ পূর্বে ৪৮৬৬ মি উচ্চে তুষার স্তূপ থেকে উৎপন্ন চন্দ্রনদী এবং ঐ গিরিবর্ত্মের উত্তরপশ্চিম থেকে আগত ভাগা নদীর সঙ্গে তাণ্ডিতে মিলিত হয়েছে। ঝঙ জেলার ত্রিমু'র কাছে বিতস্তার সঙ্গে মিশে এই মিলিত ধারাও চন্দ্রভাগা নামেই পরিচিত। ঝিলম ও চেনাবের মিলিত ধারা ঋক্‌বেদে। লৌহিত্য সরোবরে (বর্তমানে নাম চন্দ্রভাগা হ্রদ) উৎস (কালিকা-পু.)। মধ্য তিব্বতে (=লহুলে) ; লাডাকের দক্ষিণে। দ্রঃ- চন্দ্র।

তপসারণ্যে চন্দ্রভাগা নদীতে অরুন্ধতী তীর্থে স্নান করলে মানুষ বৈকুণ্ঠে যায়। এর বংশে কোন দিন আর রাজ-যক্ষ্মা হয় না ইত্যাদি। মূলতানে চন্দ্রভাগার তীরে মহাভারতের রাজা-সাম্বের স্মৃতি জড়িত সূর্য মন্দির রয়েছে। (২) ভীমা নদী (দ্রঃ)। (৩) অর্কক্ষেত্র (দ্রঃ)।

চন্দ্রভানু—(১) কৃষ্ণের সখী চন্দ্রাবলীর পিতা। মহীভানুর ঔরসে মাতা সুখদার গর্ভে রঘুভানু, চন্দ্রভানু, বৃষভানু, সুভানু ও ভানু ৫-টি ছেলে ও একটি মেয়ে ভানুমুদ্রা জন্মায়। চন্দ্রভানুর স্ত্রী বিন্দুমতী। (২) কৃষ্ণের এক ছেলে : সত্যভামার গর্ভে জন্ম।

চন্দ্রমতী—চন্দ্রকেতুর রাজ্য। দ্রঃ- লক্ষ্মণ।

চন্দ্রলেখা—বাণরাজের মন্ত্রী কুম্মাণ্ডের মেয়ে। ঊষার সখী। এ'র চেষ্টায় ঊষা অনিরুদ্ধকে বিয়ে করতে সক্ষম হন।

চন্দ্রশেখর—রাজা পৌষ্যের বহু দিন ছেলে হয় নি। শিবের আরাধনা করেন। মহাদেব সন্তুষ্ট হয়ে একটি ফল দেন। পৌষ্যের তিন জন স্ত্রী ফলটি ভাগ করে খান এবং যথাকালে গর্ভবতী হয়ে, তিনটি মাংস-পিণ্ডের জন্ম দেন। এই তিনটি অংশ জুড়ে গিয়ে একটি বালক হয়, নাম চন্দ্রশেখর। তিন মায়ের ছেলে বলে নাম ত্র্যম্বক (কালিকা ৪৭।১৪)। পৌষ্য বনে চলে গেলে ১৬ বছর বয়সে রাজা। ব্রহ্মাবর্তে দৃষদ্বতী তীরে করবীরপুরে রাজত্ব। ককুৎস্থ রাজার মেয়ে তারাবতী স্ত্রী ; স্বয়ংবর সভাতে বিবাহ ; সঙ্গে প্রধান পরিচারিকা হিসাবে ছোট বোন চিত্রাঙ্গদা আসেন।

চন্দ্রশেখরের ঔরসে তিন ছেলে যথাক্রমে উপরিচর, দমন ও অলর্ক এবং শিবের ঔরসে বেতাল (বড়) ও ভৈরব (দ্রঃ)। তারাবতীর এই মোট ৫-টি পুত্রের মধ্যে প্রথম তিন জনই বড়। ৫-ভাই জ্ঞানে, অস্ত্রে শস্ত্রে সুশিক্ষিত হয়ে ওঠে ; নিজেদের মধ্যেও অতুলনীয় প্রীতি। কিন্তু চন্দ্রশেখর বেতাল ও ভৈরবকে অবিশ্বাস করতে থাকেন ; এদের কিছুই দেন না। উপরিচরকে রাজা করে দেন ; দমন ও অলর্ককে প্রচুর ধনরত্ন দেন। চিত্রাঙ্গদার (দ্রঃ—তারাবতী) দুই ছেলে তুম্বুরু ও সুবর্চা। কপোত মুনি চিত্রাঙ্গদার দুই ছেলেকে এবং প্রচুর ধনরত্ন চন্দ্রশেখরের হাতে তুলে দিয়ে তপস্যায় চলে যান। উপরিচর অর্দ্ধেক রাজত্ব সুবর্চাকে দান করেন।

চন্দ্রসূর্য—তন্ত্রে ও যোগ শাস্ত্রে বহু সময় চন্দ্র ও সূর্য উল্লিখিত হয়েছে। এরা ইড়া ও পিঙ্গলা। এদের মিলন অর্থে প্রাণ ও অপানের মিলন বা নিশ্বাস গ্রহণ ও নিশ্বাস ত্যাগের মিলন। সিদ্ধ সিদ্ধান্ত পদ্ধতিতে দেহ গঠিত হয়েছে কর্ম, কাম, চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নি মিলে। এগুলির মধ্যে কর্ম ও কাম দেহের অভিব্যক্তি। অর্থাৎ মূলত দেহ গঠিত হয়েছে চন্দ্র ও সূর্য দিয়ে। অগ্নিকে সূর্যের অংশ ধরা হয়। চন্দ্র=রস=সোম=উপভোগ্য ; সূর্য=অগ্নি=ভোক্তা। আবার বলা হয়েছে অগ্নি শুক্র ও সোম ডিম্ব। চন্দ্র হচ্ছে শিব=পুরুষ এবং সূর্য=শক্তি=স্ত্রী। চন্দ্র রয়েছে সহস্রারের অব্যবহিত নীচে : সূর্য রয়েছে মূলাধারে। এদের নীচের মেরু নাভিদেশ। দ্রঃ-প্রাণায়াম।

চন্দ্রসেন—(১) বঙ্গদেশের রাজা সমুদ্রসেনের ছেলে। দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে উপস্থিত ছিলেন। ভীমের হাতে এ'রা পিতাপুত্রে এক বার পরাজিত হন। তারপর পাণ্ডবদের দলে ছিলেন। অশ্বত্থামার হাতে চন্দ্রসেন কুরুক্ষেত্রে মারা যান। (২) কৌরব পক্ষে এক রাজা। শল্যের রথের বাহক। যুধিষ্ঠিরের হাতে নিহত হন।

চন্দ্রহাস—রাবণের (দ্রঃ) খড়্গ। দিগ্বিজয়ে রাবণ কৈলাসে এসে সমূল পাহাড় তুলে নিতে চেষ্টা করেন। পাহাড় কাঁপতে থাকে। পার্বতী শিবের কাছে ছুটে যান। শিব পার্বতীকে আশ্বাস দিয়ে কৈলাসকে মাটিতে চেপে ধরেন। রাবণের হাত পাহাড়ের ভারে থেৎলে পাহাড়ের তলায় আটকে যায়। এই অবস্থায় রাবণ হাজার বছর মত আটকে থাকেন ও শিবের স্তব করতে থাকেন। শিব তখন সন্তুষ্ট হয়ে রাবণকে চন্দ্রহাস খড়্গ দান করেন। এই খড়্গকে অবজ্ঞা করলে মহাদেবের কাছে খড়্গ ফিরে যাবে সর্ত ছিল (রাম ৭।১৬।৪৫) (২) এক জন রাজা। বাল্য কালে বাপ মা মারা গেলে ধাত্রী এ'কে নিয়ে বনে পালিয়ে যান। পরে ধাত্রীও মারা যান। মন্ত্রী রাজ্য শাসন করতে থাকেন। রাজপুত্রকে কেউই চিনতেন না। এক দিন এই ছেলে মন্ত্রীর বাড়ির সামনে দিয়ে যখন যাচ্ছিলেন তখন এক জন দৈবজ্ঞ জানান যে এই ছেলে সসাগরা পৃথিবীর রাজা হবেন এক দিন। ফলে মন্ত্রীর ভয় হয় এবং গুপ্তঘাতক দিয়ে ছেলেটিকে হত্যা করাবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ঘাতকরা একে বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়েও সদয় হয়ে ছেড়ে দেয়। এর পর চন্দ্রহাস এক সম্ভ্রান্ত লোকের আশ্রয়ে বাস করতে থাকেন। মন্ত্রী আবার এক দিন এ'কে চিনতে পারেন এবং একটি বন্ধ চিঠি দিয়ে একে নিজের ছেলের কাছে পাঠিয়ে দেন। নির্দেশ ছিল একে যেন হত্যা করা হয়। চিঠি নিয়ে

মন্ত্রীর বাগানে এসে ক্লান্ত চন্দ্রহাস ঘুমিয়ে পড়েন। মন্ত্রিকন্যা বিষয়া ঘুমন্ত যুবককে দেখে মুগ্ধ হয়ে যায় এবং মন্ত্রীর চিঠি দেখতে পেয়ে কৌতূহলে চিঠি খুলে পড়ে চিঠিটি সরিয়ে নিয়ে আর একটি চিঠি লিখে দেন বিষয়ার সঙ্গে যেন চন্দ্রহাসের বিয়ে দেওয়া হয়। মন্ত্রীর ছেলে চিঠি পেয়ে বিয়ে দেন। এর পর মন্ত্রী এসে এই সব দেখে দেবালয়ে ঘাতক নিযুক্ত করে পূজার অছিলায় চন্দ্রহাসকে পাঠান। কিন্তু দৈবের বশে চন্দ্রহাসকে আটকে দিয়ে মন্ত্রিপুত্র নিজেই দেবালয়ে গিয়ে ঘাতকের হাতে মারা যান। চন্দ্রহাস শেষপর্যন্ত সসাগরা পৃথিবীর রাজা হয়েছিলেন।

চন্দ্রাঙ্গদ—নলের নাতি। আর্যাবর্তের রাজা চিত্রবর্মার মেয়ে সীমন্তিনীকে বিয়ে করেন। যাজ্ঞবল্ক্যের স্ত্রী মৈত্রেয়ীর সহায়তায় এই বিয়ে সম্ভব হয়। যমুনাতে চন্দ্রাঙ্গদ একবার নৌকার রেস খেলছিলেন। এমন সময় ঝড়ে নৌকা ডুবে যায়। চন্দ্রাঙ্গদের বহু অনুচর ডুবে মারা যায়। চন্দ্রাঙ্গদও ডুবে যান; তক্ষক এঁকে পাতালে নিয়ে যান এবং নাগকন্যাদের সঙ্গে কিছুদিন কাটাতে থাকেন। এদিকে রাজ্যে শ্রাদ্ধ ইত্যাদি করে সীমন্তিনী বিধবার বেশ ধারণ করেন। শত্রুরা ইতিমধ্যে এসে রাজ্য দখল করে এবং চন্দ্রাঙ্গদের পিতা ইন্দ্রসেনকে বন্দী করেন। ওদিকে নাগরাজ চন্দ্রাঙ্গদকে নাগকন্যা বিয়ে করে পাতালে বসবাস করার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু চন্দ্রাঙ্গদ সীমন্তিনীর কথা ইত্যাদি জানালে নাগরাজ এঁকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন। শত্রু রাজা তখন পালায়; চন্দ্রাঙ্গদ রাজ্য ও সীমন্তিনীকে ফিরে পান (শিব পু)।

চন্দ্রাদিত্যপুর—নাসিক জেলাতে চন্দোর, চমদোর। দৃঢ়-প্রহার নামে এক যাদব রাজার রাজধানী।

চন্দ্রাপীড়—কাশীরাজ কন্যা বপুষ্টমা জনমেজয়ের (দ্রঃ) স্ত্রী। বপুষ্টমার ছেলে চন্দ্রাপীড় সূর্যাপীড়। চন্দ্রাপীড়ের বড় ছেলে সত্যকর্ণ এবং সত্যকর্ণের ছেলে শ্বেতকর্ণ।

চন্দ্রাবতী—(১) মধ্য ভারতে ললিতপুর জেলাতে চন্দেরি। অন্দ্রবতীস (গ্রীক); চন্দ্রবরি (পৃথ্বিরাজ রাসো); চেদিরাজ শিশুপালের রাজধানী। (২) চন্দনা, অন্ধ বা অন্ধেলা নদী; ভাগলপুরের কাছে চম্পানগরে গঙ্গাতে মিলিত হয়েছে। এরিয়ানে এর নাম অন্দ্রমাতিস। (৩) রাজপুতানাতে ঝলরপত্তন সহর; চন্দ্রভাগা নদীর তীরে।

চন্দ্রাবতী—সুনাভের দুই মেয়ে চন্দ্রাবতী ও গুণবতী। এঁরা দু জনে এক দিন প্রদ্যুম্ন ও প্রভাবতীকে (দ্রঃ) প্রেমালাপ করতে দেখে প্রভাবতীকে অনুরোধ করে তাদের জন্যও উপযুক্ত যাদব স্বামী নির্বাচিত করে দিতে। প্রভাবতী তখন এই দুই বোনকে দুর্বাসা দত্ত মন্ত্র শিখিয়ে দেন। এই মন্ত্র পাঠ করে কোন পুরুষকে স্মরণ করলে তাকে বিয়ে করা যায়। এঁরা গদ ও শাম্বকে স্মরণ করে এবং চন্দ্রাবতী গদকে ও গুণবতী সাম্বকে বিয়ে করেন। সুনাভের বড় ভাই বজ্রনাভের মেয়ে প্রভাবতী।

চন্দ্রাবলী—কৃষ্ণের এক সখী। চন্দ্রভানুর (দ্রঃ) মেয়ে; মা বিন্দুমতী। রাধিকা চন্দ্রাবলীর নিজের খুড়তুতো বোন। ভ্রুগুার ছেলে গোবর্দ্ধন মল্লের স্ত্রী। ইনিও কৃষ্ণের এক প্রেমিকা। এঁর কুঞ্জে কৃষ্ণ এক বার রাত কাটান ফলে রাধিকা চন্দ্রাবলীর ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন।

চন্দ্রাশ্ব—কুবলাশ্বের তিন ছেলে ঃ চন্দ্রাশ্ব, দৃঢ়াশ্ব, ও কপিলাশ্ব।

চমৎকার পুর—গুজরাটে আমেদাবাদ জেলাতে : আনর্তপুর, আনন্দপুর (হিউ-এন-ৎসাঙ), বড় নগর, বড়পুর, বরনগর, চম্পকপুর, নগর, নাগর। গুজরাটে বরনগর বলভি থেকে ১১৭ মাইল। এই নাগরবাসী ব্রাহ্মণরা যেন নাগর লিপির প্রবর্তক। এখানে প্রথমে শিব পূজার প্রচলন হয়; দেবতা এখানে অচলেশ্বর লিঙ্গ। অন্য পুরাণে গাড়োয়ালে দারু, দারুক বা দেবদারু বনে প্রথম প্রচলন। দ্রঃ- দারুবন।

চমর—কশ্যপের ঔরসে ক্রোধবশার সন্তান মৃগমদা। মৃগমদার সন্তান সৃমর ও চমর।

চমস—প্রিয়ব্রত বংশে রাজা ভরতের ছোট ভাই। এই ভরত থেকে নাম ভারতবর্ষ। ভরতের ভাই কুশাবর্ত ইলাবর্ত, ব্রহ্মাবর্ত, আর্যাবর্ত, মলয়, ভদ্রকেতু, সেন, চন্দ্রস্পৃক্ ও কীকট। ভরতের অপর নয়টি ভাই নবযোগী ঃ কবি, হরি, অম্বরীষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবিহোত্র, দ্রমিড়, চমস ও করভঞ্জ।

চম্পকারণ্য—(দ্রঃ) বর্ত্তমানে চম্পারণ। পাটনা বিভাগে তীর্থ স্থান। এখানে এক রাত বাস করলে হাজার গোদানের ফল হয়। (২) মধ্যভারতে রাজিম থেকে ৫ মাইল উত্তরে। রাজা হংসধ্বজের রাজধানী ছিল। বৌদ্ধ ও জৈন তীর্থ। জৈমিনি ভারতে এটি চম্পক।

চম্পা—(১) চম্পা নামে রাজার স্থাপিত প্রসিদ্ধ প্রাচীন একটি নগরী। দ্রঃ গঙ্গাতীরে। পুরাণে বহু উল্লেখ আছে। ত্রেতা যুগে এখানে লোমপাদ বাস করতেন। দ্বাপরে সূত অধিরথ/অতিরথ এখানে রাজত্ব করতেন। বর্তমানের ভাগলপুরের কাছে। অঙ্গরাজ কর্ণের রাজধানী। দ্রঃ- চম্পাপুরী।

(২) ভিয়েৎনামের মাঝখানে অনাম প্রদেশে প্রাচীন চম্পা একটি হিন্দু রাজ্য। খৃ ২-৩ শতকে ভারতীয় লিপিতে সংস্কৃত ভাষা এখানে চালু ছিল। ১৫ শতক পর্যন্ত এই দেশ স্বাধীন হিন্দু রাজ্য ছিল। এর পর অনাম জাতি এই দেশ জয় করেন এবং চম্পা ধ্বংস হয়। ভারতের ভাষা, শৈব, বৈষ্ণব ও বৌদ্ধ ধর্ম, ভারতীয় দর্শন ও সাহিত্য, সামাজিক রীতিনীতি শিল্পকলা ও শাসনপ্রণালী এখানে প্রচলিত ছিল। এখানে বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির ও দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া যায়। এই রাজ্যের চারটি প্রদেশ উত্তর থেকে দক্ষিণে নাম ছিল অমরাবতী, বিজয়, কৌঠার ও পাণ্ডুরঙ্গ। (৩) শ্যাম (হিউ-এন-ৎসাঙ গিয়েছিলেন)। যবন দেশ। (৪) টঙ্কিন ও কাম্বোডিয়া (মার্কোপোলো)। (৫) চম্পানদী, অঙ্গ ও মগধের মধ্যে; পদ্মপুরাণে একটি তীর্থ। (৬) বর্ত্তমানের ছম্বা উপত্যকা; এখানে রাভি নদীর উৎস। কাঙড়া (ত্রিগর্ত) ও কাষ্ঠাবাটের মধ্যে।

চম্পানগর—চান্দনিয়া বা চান্দময়, চন্দমায়া। চাঁদ সওদাগরের নামে। বোগুড়া থেকে ১২ মাইল উত্তরে এবং মহাস্থান নগর থেকে ৫ মাইল উত্তরে। বাংলাতে। এখানে গৌরি ও সৌরি দুটি বড় বড় জলা রয়েছে; নদীর অবশেষিত অংশ এ-দুটি। বর্ত্তমানে করতোয়া তীরে। মহাস্থান গড় দুর্গের প্রাচীরের বার দিকে কালিদহ সাগর।

ভাগলপুরের চম্পানগরকেও চাঁদ সওদাগরের দেশ বলা হয়। এখানে প্রতি বছর বেহুলার মেলা হয়। দ্রঃ- উজ্জয়িনী, চম্পাপুরী।

চম্পানালা—চম্পা নদী। এর তীরে চম্পা অবস্থিত ছিল।

চম্পাপুরী—চম্পা, চম্পানগর, মালিনী, চম্পামালিনী (মৎস্য), কালচম্পা। বিহারে ভাগলপুর থেকে পশ্চিমে চার মাইল। প্রাচীন অঙ্গের রাজধানী। রামায়ণে লোমপাদের রাজধানী ; লোমপাদের প্রপৌত্র মালিনী-নগরকে নতুন করে গড়েন, নাম হয় চম্পানগর। মহাভারতে লোমপাদ ও পরে কর্ণের রাজধানী। এখানে কর্ণগড়, প্রবাদ কর্ণের দুর্গ, নামে একটি ধ্বংসাবশেষ দুর্গ রয়েছে। অন্য মতে এটি কর্ণসুবর্ণের রাজা কর্ণসেনের দুর্গ ; মুঙ্গেরে কর্ণচওাও এই রাজারই দুর্গ বলা হয়। বেহুলা কাহিনীর সঙ্গে এই চম্পা জড়িত। এখানে মনস্কামনা নাথ মহাদেবের মন্দির রয়েছে ; এটিকেও রাজা কর্ণের মন্দির বলা হয়। এটি একটি প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দির। মন্দিরের বাইরে দক্ষিণ দিকে বহু বুদ্ধমূর্তি রয়েছে। হিউ-এন-ৎসাঙ এটিকে বৌদ্ধতীর্থ হিসাবে দেখেন। লঙ্কাবতার সূত্রের লেখক বিরজ-জিন ও হস্তী আয়ুর্বেদের লেখক পালকাপ্য মুনির জন্মস্থান। থেরগাথার লেখকও এখানে বাস করতেন। সহরে বহুস্থানে বুদ্ধমূর্তি ও ভাঙা প্রাচীন স্তম্ভ ছড়ান রয়েছে। সহর ঘিরে প্রাচীর (হিউ-এন-ৎসাঙ) ছিল ; এই প্রাচীর উঁচু মাদার ওপর গড়া হয়েছিল। নাথ-নগর স্টেসনের কাছে এই মাদা আজও চেনা যায়।

একটি মতে অঙ্গরাজ ব্রহ্মদত্তের রাজধানী ছিল চম্পা ; বুদ্ধের জন্মের আগে ইনি মগধ জয় করেছিলেন। এই মগধ জয়ের সময় বিম্বিসার বালক ছিলেন। পরে বড় হয়ে অঙ্গ আক্রমণ করে ব্রহ্মদত্তকে নিহত করেন এবং চম্পাতেই বাস করতে থাকেন ; পিতা ক্ষত্রঞ্জয়ের মৃত্যুর পর রাজ গৃহে ফিরে আসেন। এই সময় থেকে অঙ্গ মগধের অধীন হয়। বুদ্ধের সময়ে ভারতের ছটি বড় নগরীর মধ্যে একটি। আনন্দ বুদ্ধকে অনুরোধ করেছিলেন চম্পা, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, সাকেত, কৌশাম্বী বা বারাণসীতে দেহ রাখতে ; আখ্যাত কুশীনারাতে নয়। অশোকের মা সুভদ্রাঙ্গী চম্পাতে জন্মান। দরিদ্র ব্রাহ্মণ পিতা সুভদ্রাঙ্গীকে এনে বিম্বিসার অমৃতঘাতকে দান করেন এবং ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা হিসাবে বলে যান এই মেয়ে এক দিন মহিমময়ী রাজমাতা হবে। অন্য রাণীরা ঈর্ষায় এঁকে দাসী করে রেখেছিলেন। সুভদ্রাঙ্গীর ছেলে অশোক ও বীতশোক। এখানে সরোবর নামে বুজে আসা একটি পুষ্করিণী রয়েছে। রাণী গগ্গরা এই হ্রদ খনন করিয়ে এর তীরে চাঁপাগাছ সাজিয়ে দেন। বুদ্ধের জীবিত কালে ভিক্ষুরা এখানে পায়চারী করে বেড়াতেন। এই মজে যাওয়া পুষ্করিণী থেকে বৌদ্ধযুগীয় বহু মূর্তি পাওয়া গেছে।

জৈনদের এটি পবিত্র তীর্থ। মহাবীর এখানে তিনটি বর্ষা কাটান। দিগম্বর সম্প্রদায়ের বাসুপূজ্য এখানে জন্মান ও মারা যান। এখানে বাসুপূজ্য মন্দির ২৫৫৯ (৫৪১ খৃ-পূ) যুধিষ্ঠির অব্দে জয়পুরের রাজা নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। নাথ নগর চম্পাপুরীরই একটি মহল্লা। প্রবাদ যেখানে বাসুপূজ্য মারা গিয়েছিলেন সেইখানেই

এই মন্দিরটি। মহাবীরের ১১ জন শিষ্যের মধ্যে সুধর্ম একজন ; এই সুধর্মের জীবিতকালে চৈত্য পুন্নভদ্দ নামে একটি মন্দির চম্পাতে ছিল। অজাতশত্রুর রাজত্বকালে সুধর্ম এখানে এলে অজাতশত্রু খালি পায়ে এঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। সুধর্মের শিষ্য জম্বু এবং জম্বুর শিষ্য প্রভবও চম্পাতে এসেছিলেন। প্রভবের শিষ্য স্বয়ম্ভব এখানে বাস করতেন এবং দশবৈকালিক সূত্র এখানেই রচনা করেন। বিম্বিসারের পর অজাতশত্রু চম্পাতেই রাজধানী করেন। উদায়ী পাটলীপুত্রে রাজধানী নিয়ে যান। এখানে শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়েরও একটি মন্দির আছে ; এই মন্দিরে বহু তীর্থংকরের মূর্তি রয়েছে। দশকুমার চরিতে চম্পা মস্তান ও গুণ্ডার আস্তানা। এক সময়ে অত্যন্ত সমৃদ্ধ নগর ছিল।

মহাভারতে অনুশাসন পর্বে আছে চম্পা চাঁপা গাছে ভর্তি ছিল। দুটি সুন্দর রাজ প্রাসাদ ছিল। একটি গণ্ডলতা ; কুরুছত্তর (বর্তমানে কর্পট) নামক স্থানে ; ভাগলপুর থেকে ৭ মাইল পূর্বে গঙ্গাযমুনা সঙ্গমে। আর একটি প্রাসাদ ক্রীড়াস্থলী ; পাথরঘাটার কাছে : গঙ্গা ও কোশির সঙ্গমে। যেখানে লক্ষীন্দরকে সাপে কামড়ায় এবং যে ঘাটে (পূর্ব রেল স্টেসনের কাছে) এঁর দেহ ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল আজও দেখান হয়। এটি বেহুলা ঘাট ; গঙ্গা ও চন্দনা নদীর সঙ্গমে ভাদ্রমাসে এখানে বেহুলার মেলা হয়। সহরের পাশেই গঙ্গা ছিল, বর্তমানে ১ মাইল উত্তরে সরে গেছে। বর্দ্ধমানের চম্পাই ও বোগুড়ার চম্পানগরের তুলনায় এই চম্পাপুরীই চাঁদ সওদাগরের সম্ভাব্য আবাসস্থল যেন।

চম্পাবতী—চম্পাউটি। কুয়ায়ুনে প্রাচীন রাজধানী। এটি চম্পাতীর্থ (মহা, বন)। (২) পেরিপ্লাসে উল্লিখিত সেমিল্ল এবং আরবদের উল্লিখিত সৈমুর, বর্তমানে চউল ; বোম্বে থেকে ২৫ মাইল দক্ষিণে। বর্তমানে রেবদণ্ড (প্রাচীন রেবাবন্তী) বা রেবতী-ক্ষেত্র। উত্তর কোঙ্কনে কোলাবা জেলাতে। প্রবাদ পরশুরাম ক্ষেত্রে একটি স্বাধীন রাজ্যের এটি রাজধানী ছিল। হয়তো এটি স্কন্দপুরাণের চম্পাবতী। চউল বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল।

চম্পূ—গদ্য ও পদ্যময় সংস্কৃত কাব্য। ৮ শতকে দণ্ডীর কাব্যাদর্শে এর প্রথম উল্লেখ আছে। বর্তমানে দশম শতকের আগে লেখা কোন চম্পূকাব্য পাওয়া যায় না। ত্রিবিক্রম ভট্টের রচনা নলচম্পূ বা দময়ন্তীকথা, সোমপ্রভসূরির যশস্তিলকচম্পূ, জীব গোস্বামীর গোপাল চম্পূ, কবিকর্ণপূরের আনন্দবৃন্দাবন চম্পূ ইত্যাদি কয়েকটি প্রসিদ্ধ চম্পূকাব্য।

চরক—আয়ুর্বেদ শাস্ত্র চরক সংহিতার লেখক। মৎস্য অবতার হয়ে নারায়ণ বেদ উদ্ধার করলে অনন্তদেব অথর্ববেদের অন্তর্গত আয়ুর্বেদ অংশ পান। অনন্তদেব তার পর চর বেশে অর্থাৎ গুপ্তবেশে পৃথিবীতে এসে মানুষের ব্যাধি ও যন্ত্রণা দেখে করুণার্দ্র হয়ে এক মুনির ঘরে জন্মে মানুষের রোগ সারাতে থাকেন। চর রূপে এসেছিলেন বলে নাম হয়েছিল চরক। ব্রহ্মা, প্রজাপতি, অশ্বিনীকুমার, ধন্বন্তরি, ইন্দ্র ভরদ্বাজ, আত্রেয়, ও অগ্নিবেশর কাছে যথাক্রমে সূত্র, শারীরস্থান, ঐন্দ্রিয়, চিকিৎসা,

নিদান, বিমান, বিকল্প ও সিদ্ধি এই অষ্টস্থান শিক্ষা করে চরক সংহিতা প্রণয়ন করেন।
প্রাচীন কাল থেকে কায় চিকিৎসা ও শল্য চিকিৎসা নামে দুটি ধারা চলে আসছিল। কায় চিকিৎসার অন্যতম প্রবর্তক আত্রেয় মুনি। আত্রেয়-মুনির ছ-জন ছাত্র অগ্নিবেশ, ভেড়, জাতুকর্ণ, পরাশর, ক্ষারপাণি, হারীত। এই ছ-জন ঋষিই নিজের নিজের নামে একটি করে চিকিৎসা গ্রন্থ লেখেন। কিন্তু এই বইগুলি এখন ঠিক পাওয়া যায় না। অগ্নিবেশ রচিত বইটিকে স্পষ্ট করে এবং সম্পূর্ণ করে চরক তাঁর গ্রন্থটি লেখেন। এই চরক যে কে জানা যায় না। রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থের কপিলবলকে অনেকে চরক বলে মনে করেন। ইনি কনিষ্কের সমসাময়িক। বর্তমানের গ্রন্থটি আচার্য দৃঢ়বল সম্পাদিত। দৃঢ়বল মনে হয় কপিলবলের ছেলে। এই বইয়ের সিদ্ধিস্থানের সপ্তদশ অধ্যায়ের পরবর্তী অংশ দৃঢ়বলের লেখা। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে একজন চরকের উল্লেখ আছে। ফলে অনেকে মনে করেন ইনি খৃ-পূ ৪ শতকের আগের লোক। আবার অনেকের মতে চরক ছিলেন গোত্রপ্রবর্তক। এঁদের বংশধরদের সকলেরই উপাধি চরক। এঁদের বংশের বহু লোকের সাধনায় এই চরক সংহিতা রচিত।

চরকের নাম দেশ বিদেশের প্রাচীন গ্রন্থে শ্রদ্ধার সঙ্গে বার বার উল্লিখিত রয়েছে। আরবিতে চরকের নাম সরক। চরকের উপদেশ রোগীকে চিকিৎসক সমস্ত অন্তর দিয়ে যত্ন করবেন এবং নিজের জীবন সংশয় হলেও রোগীর যেন কোন অপকার না করেন। রোগীর পারিবারিক খবরও যেন বাইরে প্রকাশ না করেন।

চরকসংহিতা—চরক (দ্রঃ) লিখিত চিকিৎসা শাস্ত্র। বইটির আটটি ভাগ : সূত্রস্থান, নিদানস্থান, বিমানস্থান; শারীরস্থান, ইন্দ্রিয়স্থান, চিকিৎসাস্থান, কল্পস্থান এবং সিদ্ধিস্থান। গ্রন্থের অংশ বিশেষে আত্রেয় ও অগ্নিবেশকে বক্তা ও শ্রোতারূপে উল্লেখ করা হয়েছে। বইটিতে পড়বার পদ্ধতির নির্দেশ আছে। গুরু সূত্র অংশটিকে গুরু আদিষ্ট বলে গ্রহণ করতে হবে; শিষ্যসূত্র অংশ গুরু শিষ্যের প্রশ্ন উত্তর হিসাবে সাজান। এবং একীয় সূত্র বা প্রতিসংস্কারক সূত্র হচ্ছে গুরুসূত্র ও শিষ্যসূত্রের মিলিত অংশ।

সূত্রস্থানে খনিজ, উদ্ভিজ ও প্রাণিজ দ্রব্যগুলিকে যথা সম্ভব শ্রেণী বিভাগ করে সাজান হয়েছে যাতে এগুলি স্পষ্ট চেনা যায়। এর পর এগুলির রোগ সারানর ক্ষমতা ও ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বিশদ ভাবে বর্ণিত হয়েছে। নিদান স্থানে ব্যাধির মুখ্য ও গৌণ কারণ এবং কি ভাবে রোগ ছড়ায় এবং রোগ কি ভাবে অন্য রোগে পরিণত হয় ইত্যাদি আলোচনা রয়েছে। বিমান স্থানে মানুষের দেহ ও মনের উপাদান, ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া ও বাইরের প্রকৃতির প্রভাব উল্লিখিত হয়েছে। এই অংশে সে সময়ের রাজতন্ত্র ও জনপদেরও কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। তৎকালে মনঃসমীক্ষার পদ্ধতিও এতে জানা যায়। নানা দিক দিয়ে অধ্যায়টি গুরুত্বপূর্ণ। শারীর স্থানও একটি বিস্ময়কর অধ্যায়। ইন্দ্রিয়স্থান অধ্যায়ে শরীর ও মনের বর্তমান লক্ষণ দেখে ভবিষ্যতে কি রোগ হতে পারে বা মৃত্যু হবে কিনা আলোচিত হয়েছে। চিকিৎসা স্থানে রোগ

কত প্রকার ও রোগের প্রকৃতি আলোচিত হয়েছে। ভেষজ সম্বন্ধেও বিশেষ আলোচনা আছে। কল্পস্থানে ও সিদ্ধিস্থানে কায় চিকিৎসকদের জন্য নানা উপদেশ আছে এবং দুর্ঘটনার রোগীদের জন্য কি করণীয় সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে।

এ ছাড়াও বইটিতে আয়ুপুরুষবাদ নামে একটি দার্শনিক মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। মতবাদটি আস্তিক, যোগিক, সাংখ্যিক, চিন্তাধারার সমন্বয় সাধন করে বস্তুবাদের অস্তিত্ব স্থাপন করেছে। চরক সংহিতার ওপর বহু টীকা আছে। এদের মধ্যে চরক টীকা, পরিহার বর্তিকা, নিরন্তরপদ ব্যাখ্যা, তত্ত্বপ্রদীপিকা, জল্পকল্পতরু ও চরকোপস্কার উল্লেখযোগ্য।

চরণাদ্রি—মির্জাপুর জেলাতে চুনার : চণ্ডেলগড়। বাঙলার পাল রাজাদের (খৃ ৮-১২ শতক) নির্মিত ভারতের দুর্জয়তম গিরিদুর্গ। কয়েকজন পাল রাজা এখানে বাস করেছিলেন। দুর্গের একটি অংশ ভর্তৃহরি প্রাসাদ বলে কথিত; এখানে ভর্তৃহরি (৬৫১/৬৫২ খৃ মৃত্যু) বাস করতেন। সকালে প্রথম প্রহর বাদ দিয়ে বাকি সব সময় দুর্গটিকে দেবী গঙ্গা রক্ষা করতেন।

চরু—যজ্ঞীয় পায়সান্ন। হোমের জন্য এই অন্ন পাক করা হত। দেবতারা এই চরু খান। এর উপকরণ চাল যব ও গবেধুকা নামে এক জাতীয় নিকৃষ্ট চাল। যজ্ঞীয় প্রয়োজন হিসাবে ও দেবতা হিসাবে উপকরণ ও প্রস্তুত বিধি বিভিন্ন হয়। যেমন গবেধুক চরু পশুপতি রুদ্রদেবকে দেওয়া হয়। মাটির বা তামার পাত্র যাতে চরু তৈরি হয় তার নাম চরুস্থালী। অধ্বর্যু-রা চরু পাক করতেন। ধান থেকে চাল-ও বিভিন্ন বৈদিক শাখার বিধি অনুসারে তৈরি করতে হয়। এর পর চাল, দুধ ও জল ভাপে সিদ্ধ করতে হয় এবং সাবধান থাকতে হয় গলে না যায় বা পুড়ে না ওঠে; ভাতগুলি যেন আস্তই থাকে; নামাবার সময় গলা ঘি দিয়ে নামাতে হয়। এই চরু দিয়ে হোম করতে হয়। বহু গৃহ্যকর্মে চরু হোম করণীয়। বিয়েতে করতে হয় না কিন্তু বিয়ের পর চতুর্থীতে চরুপাক করা যায়। সীমন্তোন্নয়ন, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, গৃহপ্রবেশ, বৃষোৎসর্গ, এবং শুভকামনায় ও আয়ুষ্কামনায় চরুহোমের বিধি আছে।

চর্মণ্বতী—চম্বল, রাজপুতানাতে। বিন্ধ্য পর্বতের সুউচ্চ জনপব শিখরে উৎপন্ন। বর্তমানে বুন্দেলখণ্ড অন্তর্গত চম্বল নদী। মহারাজ রন্তিদেব প্রতি দিন কয়েক হাজার ষাঁড় কেটে ব্রাহ্মণ ও অতিথিদের খাওয়াতেন। এদের রক্ত ও ক্লেদে এই নদীর উৎপত্তি। দেবী ভাগবতে (১।১৮।৫৪) রাজা শশবিন্দু যজ্ঞ করেন; এত পশু হত্যা করেন যে পশুচর্ম জমা হয়ে গাদা হয়ে ওঠে। এর পর বৃষ্টিতে চামড়া ধোওয়া জলে নদী তৈরি হয়। এই নদীতে স্নান করলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়।

চর্মবান—শকুনির ভাই। অর্জুনের ছেলে ইরাবানের হাতে নিহত হন।

চর্যাপদ—বৌদ্ধ সহজিয়া মতবাদের পরিপূর্ণ প্রকাশ। দ্রঃ-শান্তরক্ষিত।

চাক্ষুষ—উত্তানপাদের ছেলে ধ্রুব ও স্ত্রী শম্ভুর ছেলে শিষ্টি ও ভব্য। শিষ্টি ও স্ত্রী সুচ্ছায়ার ছেলে রিপু, রিপুঞ্জয়, বিপ্র, বৃকল ও বৃকতেজস্। এই রিপু ও স্ত্রী বৃহতীর

ছেলে চাক্ষুষ। চাক্ষুষ ও স্ত্রী পুষ্করিণীর (মেরুবংশে জন্ম। বীরণ প্রজাপতির মেয়ে) ছেলে চাক্ষুষ মনু (দ্রঃ)।

চাক্ষুষমনু—চাক্ষুষের (দ্রঃ) ছেলে। স্ত্রী নড্বলা ; বৈরাজ প্রজাপতির মেয়ে। ছেলে কুরু/উরু, পুরু, সত্যদ্যুম্ন/শতদ্যুম্ন, তপস্বী, সত্যবান/সত্যবাক, সুদ্যুম্ন, শুচি/সূচী, অগ্নিষ্টোম/অগ্নিষ্টু, অতিরাত্র/অধিরাজ, অভিমন্যু/অতিমন্যু। একটি কাহিনীতে অনমিত্রের ছেলে আনন্দ (দ্রঃ) চাক্ষুস মনু হয়ে জন্মান। দে-ভাগবতে (১০) অঙ্গের ছেলে। পুলহের কাছে বর চান এবং পুলহের উপদেশে তপস্যা করে দেবীর বরে মনু হন। চাক্ষুস মনুর রাজত্ব কালে ইন্দ্র মনোজব। দেবতাদের ভাগঃ-অক্ষয়, প্রসূত, ভব্য, পৃথুক ও লেখ। প্রতি ভাগে ৮ জন দেবতা। সপ্তর্ষিঃ- সুমেধস্, বিরজস্, হবিষ্মান, উত্তম, মধু, অতিনামন্, ও সহিষ্ণু। চাক্ষুষ মনুর রাজত্ব কালে ধর্মের পুত্র নারায়ণ জন্মান। ব্রহ্মা ইন্দ্র হয়ে, বিষ্ণু দত্তাত্রেয় হয়ে, শিব দুর্বাসা হয়ে অত্রি ও অনসূয়ার সন্তান হিসাবে জন্মান। হরিবংশে(১৭।৩১) ঋষিঃ- ভৃগু, নভঃ, সুধামা, বিরজা, অতিনামা ও সহিষ্ণু। দেবতাদের ৫-টি গণঃ আদ্য, প্রভূত, ঋভু, পৃথগ্ভাব ও লেখ। এই দেবতারা অঙ্গিরা ও নড্বলার পুত্র। পুত্র উরু ইত্যাদি। ভাগবতে (৮।৫) ইন্দ্র মন্ত্রদ্যুম্ন। মনু পুত্র ঃ- পুরু, পুরুষ ও সুদ্যুম্ন। অর্থাৎ বই অনুসারে তফাৎ হবেই। এর পর বৈবস্বত মনু।

চাক্ষুষী বিদ্যা—এই বিদ্যাতে ত্রিলোকে যা কিছু দেখতে ইচ্ছা হবে দেখা যায়। মনু সোমকে, সোম বিশ্বাবসুকে, বিশ্বাবসু অঙ্গারপর্ণকে এবং অঙ্গারপর্ণ এটি অর্জুনকে দেন (মহা ১।১৫৮।৪০)।

চাণক্য—চণকের ছেলে বা বংশধর। অপর নাম বিষ্ণুগুপ্ত বা কৌটিল্য। তক্ষশিলাতে জন্ম। উপার্জনের আশায় কাঞ্চীপুর থেকে পাটলীপুত্রে এসে নন্দবংশের রাজসভাতে অপমানিত হন। চাণক্য তখন নন্দবংশ ধ্বংস করার প্রতিজ্ঞা করেন এবং ধ্বংস করে চন্দ্রগুপ্তকে রাজা করে নিজে মন্ত্রী হন (খৃ-পূ ৪০০ ?)। চাণক্য কাহিনী নিয়ে রচিত মুদ্রারাক্ষস। রাজনীতিতে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁর গ্রন্থ অর্থশাস্ত্র ও চাণক্য রাজনীতি শাস্ত্র। বাংলাদেশে চাণক্য শ্লোক নামে বিভিন্ন বই পাওয়া যায় ; এগুলি কার লেখা নিশ্চয়তা নাই।

চানূর— দ্রঃ- কংস। করূষ দেশে জন্ম। (হরি ২।৩০।২৪-)।

চান্দ্রমসী—বৃহস্পতির স্ত্রী তারার অপর নাম।

চান্দ্রায়ণ—চাঁদের কলার বাড়া কমা অনুসারে এক গ্রাস করে খাদ্য বাড়ান কমান রূপ ব্রত। কৃষ্ণপ্রতিপদে ১৪ গ্রাস থেকে আরম্ভ, কৃষ্ণচতুর্দশীতে মাত্র এক গ্রাস ও অমাবস্যায় উপবাস। শুক্লপ্রতিপদে আবার এক গ্রাস এবং বাড়তে বাড়তে পূর্ণিমাতে ১৫-গ্রাস। এই ভাবে যখন খাদ্য গ্রহণ করা হয় তখন বলা হয় পিপীলিকা-মধ্য চান্দ্রায়ণ। কারণ মাঝখানে খাদ্যের পরিমাণ পিপীলিকার কটিদেশের মত ক্ষীণ। শুক্লপক্ষে আরম্ভ করলে শুক্ল প্রতিপদে একগ্রাস, পূর্ণিমায় ১৫ গ্রাস এবং তারপর কমতে কমতে অমাবস্যায় উপবাস-এর নাম যবমধ্য-চান্দ্রায়ণ। কারণ মাঝে পূর্ণিমাতে খাদ্যের পরিমাণ সব চেয়ে বেশি। যতি চান্দ্রায়ণে প্রতিদিন মধ্যাহ্নে আটগ্রাস করে

হবিষ্যান্ন ; শিশু চান্দ্রায়ণে প্রতিদিন প্রাতে ৪ গ্রাস এবং সন্ধ্যায় ৪ গ্রাস ; ঋষি চান্দ্রায়ণে প্রতিদিন তিন গ্রাস। আর এক চান্দ্রায়ণে মাসে মোট ২৪০ গ্রাস অন্ন গ্রহণীয়। এক গ্রাস অন্ন একটি ময়ূরের ডিমের মত। এ ছাড়া শুদ্ধাচারে থাকা, প্রতিদিন তিন বার স্নান ও মন্ত্র জপাদি কর্তব্য। যে পাপের কোন প্রায়শ্চিত্ত নেই তাও চান্দ্রায়ণে দূর হয়। দেবতারাও এই ব্রত করতেন।

চামুণ্ডা—মার্কণ্ডেয় পুরাণে চণ্ডমুণ্ডকে নিহত করে এদের মুণ্ড নিয়ে কালী অট্টহাস করলে চণ্ডী কালীকে এই নাম দিয়েছিলেন। চণ্ডমুণ্ড তাদের সৈন্যদল নিয়ে দেবীকে আক্রমণ করলে দেবী বার হয়ে আসেন দুর্গার কপাল থেকে। রক্তবীজ অসুরের প্রতি রক্ত বিন্দু মাটিতে পড়লে সেই বিন্দু সমান শক্তিমান আর একটি অসুরে পরিণত হত। যুদ্ধে আহত রক্তবীজের রক্ত যাতে মাটিতে পড়তে না পারে সেই জন্য এই দেবী রক্তবীজের দেহ নির্গত রক্ত পান করতে থাকেন। রক্তবীজ এই ভাবে অন্য অসুরের জন্ম দিতে না পেরে মারা যান।

চামুণ্ডা কালো, করালবদনা, গায়ের চামড়া দড়িপাকান, ভীষণ দেখতে, বিরাট মুখ, লকলকে জিব, এবং লাল, কোটর গত চোখ, পরণে বাঘছাল, গলায় মুণ্ডমালা। অস্ত্র হচ্ছে অসি, পাশ ও খট্বাঙ্গ। তন্ত্রসারে বাঁ হাতে পাশ ও নরমুণ্ড, ডান হাতে বজ্র ও খট্বাঙ্গ। মুখ মণ্ডল সুন্দর ও কোটি দাঁত। মাথায় চুল পিঙ্গল, বাহন শব। শুষ্কমাংসাতি ভৈরবা বা নির্মাংসা এবং দ্বীপিচর্মধরা। কালী কিন্তু সাধারণ সুস্থ চেহারা। চামুণ্ডার বিভিন্ন মূর্তি রুদ্রচর্চিকা=রুদ্রচামুণ্ডা, সিদ্ধচামুণ্ডা=সিদ্ধ যোগেশ্বরী, রূপবিদ্যা-ভৈরবী, ক্ষমা ইত্যাদি। বামন পুরাণে রুরু দানবের চর্ম (বর্ম) ও মুণ্ড কালী ছেদন করে চামুণ্ডা নাম পান। বিভিন্ন পুরাণ মতে মাতৃকারা সাত, আট বা নয়। মাতৃকাদের নাম ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বরাহী, ইন্দ্রাণী, চামুণ্ডা, শিবদূতী ও নারসিংহী। অর্থাৎ চামুণ্ডা একজন মাতৃকা। অগ্নি পুরাণে মাতৃকাদের নাম চামুণ্ডা ব্রহ্মাণী, চামুণ্ডা মাহেশ্বরী ইত্যাদি : এখানে চামুণ্ডা একক নাম নেই : চামুণ্ডাকে অনেক জায়গায় যমের শক্তি যামী বলা হয়। আবার শিবের ঘোর রূপ ভৈরবের শক্তিকেও চামুণ্ডা বলা হয়। ব্রহ্মাণী ইত্যাদি যেমন ব্রহ্মা ইত্যাদির শক্তি। বাজসনেয় সংহিতায় মনোজবস্ মনে হয় মুণ্ডকোপনিষদের যমের পত্নী যামী ; এবং ইনিই চামুণ্ডা। মনোজবাকে চামুণ্ডা ধরলে খৃ-পূর্বের সময়ের দেবী। মনে হয় চামুণ্ডা ও দেবীর বিভিন্ন রূপের অনেকগুলি রূপ অনার্যদের কাছ থেকে এসে আর্য ধর্মের সঙ্গে মিশেছে। চামুণ্ডা, ব্রহ্মাণী, কালিকা ইত্যাদি দেবীকে ফল শস্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীও মনে করা হয় এবং চামুণ্ডা মানকচুর দেবী। এই দৃষ্টিভঙ্গিও অনার্য জাতির কাছ থেকে পাওয়া। চামুণ্ডার পূজা একদিন সারা ভারতে ছড়িয়েছিল।

উড়িষ্যার যাজপুরে প্রাচীন বিরজা ক্ষেত্রে আবিষ্কৃত মূর্তি ও ভুবনেশ্বরের বৈতাল দেউলে চামুণ্ডার ভীষণ রূপের পরিচয় আছে। যাজপুরে আর একটি মূর্তি পাওয়া গেছে ; এটি চামুণ্ডার দন্তুরা মূর্তি। উড়িষ্যার (১) ভয়ঙ্কর মূর্তিটির চার হাত, অস্থিসার, মুণ্ডমালা, শবাসন। শবের হাত অঞ্জলিবদ্ধ। বড় বড় দাঁত। গভীর কোটর

থেকে চোখ ঠেলে বার হয়ে আসছে। টাক মাথা থেকে অগ্নিশিখা বার হচ্ছে। হাতে কর্ত্রি, শূল, কপাল ও নরমুণ্ড। পুরা মূর্তিটি শিল্প হিসাবে প্রাণবন্ত। (২) দন্তুরা মূর্তিটি দ্বিভুজা, কঙ্কালসার, বসে আছেন; লম্বকর্ণ; সরু, গলিত স্তন। মুখে একটি ভয়াল ভাব। বৌদ্ধ নিষ্পন্নযোগাবলীতে চামুণ্ডার উল্লেখ আছে; বজ্রযানীদের চর্চিকা-চামুণ্ডা রূপী চামুণ্ডাকে স্পষ্ট চেনা যায়। পিকিঙেও একটি মূর্তি পাওয়া গেছে। এই মূর্তি সম্ভবত তান্ত্রিক-সাধকদের মধ্যেই অধিক প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। বশীকরণ ইত্যাদি আভিচারিক কাজেও চামুণ্ডার পূজা হয়।

চারণ—পশ্চিম ভারতের একটি জাতি। স্কন্দপুরাণে আছে বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে জন্ম। রাজা ও ব্রাহ্মণদের গুণকীর্তন, সংগীত ও কামশাস্ত্র এদের উপজীবিকা। প্রাচীন ভারতে রাজসভায় নানা কাজে এ'রা বীরদের কাহিনী গান করতেন। এই কাহিনীর নাম ছিল 'নারাশংসি'। রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনীও এদের মুখেই প্রচারিত হত। মনে হয় এ'রা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন এবং পরে চারণ, ভাট, নট, কুশীলব নামে পরিচিত হন। চারণরা শিবের বংশে নিজেদের জন্ম বলে দাবি করতেন। বহু সময় এ'রা পথিকদের সঙ্গে থাকতেন এবং পথে দস্যু আক্রমণ করলে এ'রা এগিয়ে গিয়ে নিজেকে শিবের সন্তান বলে পরিচয় দিয়ে পথিককে বাঁচাতে চেষ্টা করতেন। বাঁচাতে না পারলে দস্যুকে শাপ দিয়ে আত্মহত্যা করতেন। এই আত্মহত্যাকে বলা হত ত্রাগা। লুঠেরদের হাত থেকে গৃহস্থের সম্পত্তিও এই ভাবে বাঁচাতে চেষ্টা করতেন। আত্মবিসর্জনকারী চারণদের উদ্দেশ্যে স্থাপিত প্রস্তর ফলক পশ্চিম ভারতে বিশেষত কাঠিওয়াড় অঞ্চলে প্রচুর রয়েছে। চারণদের দুটি শাখা:— কাচিলি শাখা ব্যবসা করেন; মরুশাখা চারণ-গান করে বেড়ান।

চারু—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। কুরুক্ষেত্রে ভীমের হাতে নিহত হন।

চারুগুপ্ত—রুক্মিণীর (দ্রঃ) এক ছেলে।

চারুদেষ্ণ—রুক্মিণীর (দ্রঃ) একটি ছেলে।

চারুনেত্রা/চারুনেত্রী—অপ্সরা। কুবের সভাতে।

চারুমৎস্য—বিশ্বামিত্রের এক ছেলে। ব্রহ্মবাদী।

চার্বাক—অন্য নাম বার্হস্পত্য বা লোকায়ত। মৈত্রায়ণী উপনিষদ ও বিষ্ণুপুরাণ মতে অসুরদের অধঃ পতিত করার জন্য দেবগুরু প্রচারিত মোহজালই বার্হস্পত্য। ত্রিপিটক, রামায়ণ ও মহাভারতে লোকায়ত ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে। সদ্ধর্মপুণ্ডরীক, দিব্যাবদান ইত্যাদিতে লোকয়তদের যজ্ঞ ও মন্ত্রের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। গীতায় নামেই-যজ্ঞকারী অসুররাও লোকায়ত সম্প্রদায়। গুণরত্নের বর্ণনায় লোকায়তিকরা কাপালিক ও ভস্মমণ্ডিত যোগী।

লোকায়ত দর্শনের আদিরূপ হচ্ছে (১) ভারতীয় চিন্তাধারার স্বাধীনতার মুখপাত্র; (২) প্রাচীন সুমেরীয় অন্ত্যেষ্টি পদ্ধতির অন্তর্নিহিত বিশ্বাসের ভারতীয় সংস্করণ; (৩) ভারতীয় রাষ্ট্র বিদ্যার আদিরূপ; (৪) সাধারণ গ্রাম্য মানুষের কাহিনী; (৫) দেহতত্ত্ব ও কায়সাধনায় আস্থাবান সহজিয়া সম্প্রদায়ের আদি সংস্করণ। মধ্যযুগে

চার্বাক সম্প্রদায়ের নামে বিশেষ একটি মতবাদ গড়ে উঠেছিল। এই মতবাদ ঃ—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এই চারটি ভূত নশ্বর দেহ তৈরি করেছে। আত্মা বলে কিছু নাই। কর্মফল, জন্মান্তর ও পরলোক সম্পূর্ণ ধাপ্পা। স্বভাবই জগৎ কারণ এবং প্রত্যক্ষই প্রমাণ। চার্বাকরা লৌকিক অনুমানকে স্বীকার করেন ; অলৌকিক ও প্রত্যক্ষাতীত অনুমান (অর্থাৎ আত্মা, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি) স্বীকার করেন না। চার্বাকদের নিজস্ব কোন বই অবশ্য পাওয়া যায় না। দ্রঃ- জড়বাদ।

এ'দের মোটামুটি চারটি সম্প্রদায়। এ'দের এক মাত্র লক্ষ্য ছিল পর মত খণ্ডন। কোন তত্ত্বকেই এ'রা তত্ত্ব মনে করতেন না। সর্বত্র সন্দেহ জাগিয়ে তোলাই এ'দের কাজ ছিল। ঈশ্বর বেদ ইত্যাদি মানতেন না। এ'রা নাস্তিক, বৈতণ্ডিক, হৈতুক, লোকায়ত, তত্ত্বোপপ্লববাদী ইত্যাদি নামে পরিচিত ছিলেন। এ'দের একটি সম্প্রদায়ের নাম ধূর্তচার্বাক বা উচ্ছেদবাদী বা দেহাত্মবাদী। এ'দের মতে পরিদৃশ্যমান জগৎ আকস্মিক ও চাতুর্ভৌতিক। অনুমানকে এ'রা মানতেন না। ইন্দ্রিয় সুখই পুরুষার্থ এবং ঐহিক দৈহিক ক্ষণিক সুখই স্বর্গ। সুশিক্ষিত চার্বাক নামে আর একটি দল গড়ে উঠেছিল। লোকযাত্রার জন্য এ'রা অনুমান ইত্যাদি কিছু কিছু মানতেন। অবশ্য ঈশ্বর জন্মান্তর ইত্যাদি প্রমাণের জন্য যে সব অনুমান দরকার হয় তা স্বীকার করতেন না। পশু সুলভ ঐহিক ও ক্ষণিক সুখের পরিবর্তে পবিত্রতর ও সূক্ষতর মানসিক সুখকে এ'রা পুরুষার্থ বলতেন। এ'দের আবার তিনটি উপসম্প্রদায় ছিল ঃ ইন্দ্রিয়াত্মবাদী অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কে যাঁরা আত্মা বলতেন ; মন-আত্মাবাদী অর্থাৎ যাঁরা মনকে আত্মা বলতেন এবং দেহাত্মবাদী অর্থাৎ দেহকে যাঁরা আত্মা বলতেন। আর এক শ্রেণীর চার্বাক দল আকাশকে পঞ্চম ভূত হিসাবে স্বীকার করেছিলেন। এ'রা কতকটা অধ্যাত্মবাদী হয়ে উঠেছিলেন।

বৃহস্পতিকে চার্বাক মতের প্রবর্তক বলা হয় বটে কিন্তু ইনি যে কে এ নিয়ে মত ভেদ আছে। ঋক্ বেদে (১০।৭২।৩) লৌক্যবৃহস্পতির মতে অসৎ থেকে সৎ উৎপন্ন হয়েছে ; এবং এই লৌক্য বৃহস্পতিই মনে হয় লোকায়ত মত-বাদের আদি জনক। (২) বৃহস্পতির শিষ্য এক জন দার্শনিক মুনি। এ'র মত সচেতন দেহের অতীত আত্মা বলে কিছু নেই। সুখই চরম পুরুষার্থ। প্রমাণ প্রত্যক্ষভিত্তিক। (৩) মহাভারতে (১২।৩৮) দুর্যোধনের এক রাক্ষস বন্ধু। সত্যযুগে বদরিকাতে তপস্যা করে ব্রহ্মার বরে দর্পিত হয়ে দেবতাদের উৎপীড়ন করতেন। দেবতারা শেষ অবধি ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলে ব্রহ্মা বলেন চার্বাক দুর্যোধনের বন্ধু হবে এবং ব্রাহ্মণদের অপমান করলে ব্রহ্মশাপে দগ্ধ হবে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর আত্মীয় বধের গ্লানিতে ম্রিয়মান যুধিষ্ঠির যখন সিংহাসনে উঠতে যাচ্ছিলেন তখন সমবেত ব্রাহ্মণদের মধ্য থেকে ছদ্মবেশী এই রাক্ষস যুধিষ্ঠিরকে বলেন আত্মীয় ও গুরু-জনদের হত্যার জন্য ব্রাহ্মণরা তাঁকে ধিক্কার দিচ্ছেন ও মৃত্যুবরণ করতে বলছেন। এই কথায় যুধিষ্ঠির আরো মর্মাহত হয়ে পড়েন। কিন্তু ব্রাহ্মণরা চার্বাক রাক্ষসকে চিনতে পেরে সক্রোধে হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন এবং এই হুঙ্কারে দগ্ধ হয়ে চার্বাক মারা যায়।

চিকিৎসা—ঋক্‌ ও অথর্ব বেদে বিভিন্ন রোগ ও তার ভেষজের উল্লেখ আছে। এরপর কায় চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমারভৃত্য, শল্য, শালাক্য, অগদ, রসায়ন ও বাজীকরণ ঃ- অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদের এই প্রতিটি শাখায় প্রচুর চর্চা হয়েছিল। সেই যুগের তুলনায় অতি উন্নত ধরণের জ্ঞান অধিগত হয়েছিল। শালিহোত্রসংহিতা, পালকাপ্যসংহিতা বৃক্ষায়ুর্বেদ ইত্যাদি বই থেকে নিশ্চিত রূপে জানা যায় যে পশুপাখী ও গাছপালার চিকিৎসাও সে যুগে প্রচলিত হয়েছিল। পরে বহু বই লুপ্ত হয় এবং সংকলন গ্রন্থ হিসাবে চরক ও সুশ্রুত সংহিতা তৈরি হয়।

চিতল—উই। বিষ্ণু একবার লক্ষ্মীকে দেখে হেসে ফেলেন। লক্ষ্মী উপহাস মনে করেন এবং সন্দেহ হয় হয়তো কোন অধিকতর সুন্দরীর প্রতি আসক্ত হয়ে এই হাসি। ফলে অভিশাপ দেন বিষ্ণুর মাথা ছিন্ন হবে। শাপ দেবার সঙ্গে সঙ্গে অসুররা আক্রমণ করে এবং বহু দিন ধরে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে ধনুকের এক প্রান্ত মাটিতে রেখে অপর প্রান্তের ওপর চিবুক স্থাপন করে বিশ্রাম করতে করতে বিষ্ণু ঘুমিয়ে পড়েন। দেবতারা এ দিকে এই সময় যজ্ঞ আরম্ভ করেন। যজ্ঞে বিষ্ণুকে না পেয়ে ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবতারা বৈকুণ্ঠে যান এবং সেখানেও না পেয়ে সব বুঝতে পারেন এবং বিষ্ণু যেখানে ঘুমাচ্ছিলেন সেইখানে অপেক্ষা করতে থাকেন। বিষ্ণুকে জাগাবার কি ব্যবস্থা করা যায় ভাবতে ভাবতে ব্রহ্মা উই পোকা সৃষ্টি করেন। এরা ধনুকের নীচের অংশ খেয়ে ফেললে ধনুকের গুণ কেটে যাবে ; ধনুক ছিটকে উঠে বিষ্ণুর ঘুম ভাঙিয়ে দেবে। কিন্তু উই পোকারা রাজি হয় না ; দেবতাদের লাভ হলেও তাদের পাপ হবে যুক্তি দেখায়। ব্রহ্মা তখন উই পোকাদের যজ্ঞের হবির একটা ভাগ দেবেন বলেন ; অগ্নিকুণ্ডের পাশে মাটিতে যে হবি পড়বে চিতলরা সেই হবি খাবে। উই পোকারা তখন সম্মত হয় ; কিন্তু গুণ মুক্ত ধনুকের তীব্র আঘাতে বিষ্ণুর মাথাও ছিন্ন হয়ে যায়। দেবতারা তখন নিরুপায় হয়ে একটি ঘোড়ার মাথা এনে বিষ্ণুর দেহে লাগিয়ে দিয়ে বিষ্ণুকে জীবিত করে তোলেন। বিষ্ণুর নির্দেশে উই পোকারা হয়গ্রীব অসুরের ধনুও এইভাবে কেটে দেয় ; অসুর মারা পড়ে। দেবী মাহাত্ম্য ১ম সুন্দ।

চিত্তম্বলম্—চিতাম্বরম্, চিদম্বরম্, চিদাম্বরম্, শ্বেতাম্বরম্, সিতাম্বরম্। দক্ষিণ আরকট জেলাতে ; মাদ্রাজ থেকে প্রায় ১০৫ মাইল দক্ষিণে এবং উপকূল থেকে ৭ মাইল। মহাদেব কনক-সভাপতির মন্দির রয়েছে। প্রবাদ শঙ্করাচার্য কানাড়াতে (কেরল দ্রঃ) জন্মান এবং ৩২ বছর বয়সে কাঞ্চিপুরে মতান্তরে কেদারনাথে দেহ রাখেন। দ-ভারতে মহাদেবের ক্ষিতিমূর্তি কাঞ্চিপুরে, তেজোমূর্তি অরুণাচলে, মরুৎমূর্তি কালহস্তীতে এবং ব্যোমমূর্তি চিত্তম্বলমে।

চিত্তর—ত্রিম্নেভেলিতে তাম্রপর্ণী নদী। তামবরবরী ও চিত্তর নদীর মিলিত ধারা।

চিৎপাবন—শাকান্নভোজী দ্রাবিড় ব্রাহ্মণদের ৫-টি শাখার অন্যতম। কোঙ্কন অঞ্চলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে নাম কোঙ্কনস্থ। অধিকাংশ মতে এ'রা বিদেশী ; এখানকার সঙ্গে একীভূত হয়ে গেছেন। স্কন্দ পুরাণে আছে কোঙ্কন উপকূলে ১৪-টি বিদেশীর মৃতদেহ ভেসে আসে। পরশুরাম এ'দের চিতার আগুনে পূত করে নিয়ে জীবন দান

করেন। এই জন্য নাম চিৎপাবন। এ'রা গৌরবর্ণ, শ্রীমণ্ডিত ও বৈদিক ঐতিহ্য পুষ্ট। পশ্চিম উপকূলে বিভিন্ন জেলাতে বাস। আগে এ'রা মুখ্যত শৈব ছিলেন পরে অন্য দেবদেবীরও পূজা করেন। দ্রাবিড় ব্রাহ্মণদের অন্যান্য শ্রেণীর সঙ্গে এ'দের অনেক মিল ও অমিল রয়েছে। বালাজি বিশ্বনাথ, পরে প্রথম বাজিরাও, প্রথম মাধবরাও, নানা ফড়নবিশ ইত্যাদি বহু ভারত বিখ্যাত লোক এই সম্প্রদায়ের সন্তান।

চিত্র—চিত্রবাণ/চিত্রক। ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। ভীমের হাতে নিহত।

চিত্রক—বৃষ্ণির (দ্রঃ) ছেলে। স্ত্রী শ্রবিষ্ঠা ও শ্রবণা। সন্তান পৃথু, বিপৃথু, অশ্বগ্রীব, অশ্ববাহু, সুপার্শ্বক, গবেষণ, অরিষ্টনেমি, অশ্ব, সুধর্মা, ধর্মভূৎ, সুবাহু, বহুবাহু (হরি ১।৩৪।১৬ ও ১।৩৮।৫৭)।

চিত্রকলা—ভারতে চিত্রকলার প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। মধ্যপ্রদেশের রামগড়ের নিকট যোগীমারা গুহাগাত্রের ও অজন্তার প্রথম পর্যায়ের ছবিগুলি খৃ-পূ ২-১ শতকের। এই শিল্পীরা টেম্পেরা পদ্ধতি অনুসরণ করতেন মনে হয়। ভারতীয় শিল্পীর প্রভাব তার পর ছড়িয়ে পড়ে এবং সিংহলের সিগিরিয়া, মধ্য এসিয়ার দণ্ডন-উলিখ, চীনের তুন হুয়াঙ, জাপানের হোরিউজি মন্দিরের দেওয়ালে এই শৈলী স্পষ্ট। অজন্তা, বাঘ, বাদামি, সিত্তনবাসল, এলোরা, তাঞ্জোর মন্দির, তিরুপতি কুন্দরম্ মন্দির, পদ্মনাভপুর প্রাসাদ, জয়পুর, নেপাল ইত্যাদি স্থানের ভিত্তি চিত্রের মধ্য দিয়ে বিংশ শতকেও এই ভারতীয় ধারা এগিয়ে চলেছে। চিত্রিত পুঁথিও ভারতে বেশ কিছু পাওয়া গেছে জৈন, বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থতে গীতগোবিন্দ ইত্যাদি ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থে এই ছবি পাওয়া যায়।

প্রাচীন ভারতীয় চিত্রশিল্প শাস্ত্রের অনেকাংশই আজ লুপ্ত। বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ চালুক্যবংশীয় রাজা সোমেশ্বর বা সোমদেবের অভিলষিতার্থ-চিন্তামণি (আলেখ্য কর্ম প্রসঙ্গ), শ্রীকুমার-কৃত শিল্পরত্ন (চিত্রলক্ষণ প্রসঙ্গ), যশোধর রচিত কামসূত্রের জয়মঙ্গল টীকা ইত্যাদি কয়েকটি বই থেকে অনেক তথ্য জানা যায়। চিত্রশিল্প সম্বন্ধে গভীর অনুশীলন হত। ভারতীয় শিল্পবিদদের মতে ছবির ছয়টি অঙ্গ ঃ—রূপভেদ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্যযোজন, সাদৃশ্য, বার্ণিক ভঙ্গ। চীন দেশে শিল্প শাস্ত্রেও অনুরূপ ছয়টি অঙ্গের উল্লেখ আছে; অবশ্য চীনা শিল্প অন্য জিনিস। প্রাচীনকালে চিত্রশিল্পীরা অনেক সময় পেশাদার ছিলেন। বংশানুক্রমিক ভাবেও এই পেশা প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মধ্যেও বহু সুদক্ষ চিত্রকর ছিলেন।

মধ্য ভারতে বিন্ধ্য ও কৈমুর অঞ্চলে, রায়গড়ের সিংহনপুর গ্রামের কাছে, উত্তরপ্রদেশে মির্জাপুর জেলায়, মধ্য প্রদেশের পশ্চিম অঞ্চলে বিশেষত বেতোয়া ও চম্বল নদীর উপত্যকায় চিত্রযুক্ত গুহাবাস রয়েছে; এগুলি মধ্য ও নব্য প্রস্তরযুগীয় মনে করা হয়। এগুলির সময় খৃ-পূ ৬০০০-৪০০। এই ছবিগুলি মানুষ ও পশুর চিত্র; কিছু কিছু হাতী বাঘ ও গণ্ডার আছে এবং তীর ধনুক ও বর্শা দিয়ে হরিণ, মহিষ ইত্যাদির শিকার চিত্রও আছে। লাল পাথরের গুঁড়ার রঙ তৈরি করে, গাছের সরু ডাল দিয়ে আঁকা। ছবিগুলি দ্বিমাত্রিক, বাস্তবানুগ ও প্রাণবন্ত। এর পর ভারতের তাম্রপ্রস্তর যুগের ছবি মহেন্‌জোদড়ো, হরপ্পা, লোথাল ও কালিবঙ্গানের মৃৎ-পাত্রে দেখা যায়। এগুলি

খৃ-পূ ৩০০০-২০০০ সময়ের ছবি। এখানে পশুপাখী গাছপালা ও কিছু বোনার নক্সাও পাওয়া যায়। মধ্য ভারতের সরগুজা'র রামগড় পাহাড়ে যোগীমারা গুহার ছবিকে ঐতিহাসিক চিত্র বলা হয়। এর মধ্যে কিছু ছবি খৃ-পূ ১ শতকের ছবি। পশু, মানুষ, নানা সামুদ্রিক প্রাণী ইত্যাদি এই সব ছবিতে দেখা যায়। অজন্তার ৯ এবং ১০ নং গুহার ছবিও ঐ সময়ের। বিষয়বস্তু বৌদ্ধ, ছবিগুলি ভারতীয় চিত্রকলার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি। ছবিতে নানা কাহিনী ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। গুপ্তযুগের এই ছবিগুলি ছাড়া আর বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না এবং এগুলি নিঃসন্দেহে উজ্জ্বল শিল্পকর্ম। ১নং গুহাতে অবলোকিতেশ্বরের ছবি, ১৭ নং গুহাতে বুদ্ধের সামনে রাহুল যশোধরার ছবি, সুন্দরী নারী বা সামান্য দরিদ্র ব্রাহ্মণ অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে আঁকা হয়েছে। এই ছবিগুলির মধ্যে বহু ছবিতে শাস্ত্রোক্ত মুদ্রা ও ভঙ্গির মাধ্যমে ভাব প্রকাশ করা হয়েছে। বাঘ গুহার (গুহা ৩নং ও ৪নং) ছবি শৈলীর বিচারে অজন্তার দ্বিতীয় পর্যায়ের চিত্রাবলীর সমগোত্রীয়। বাঘের চিত্রগুলির বিষয়বস্তু বৌদ্ধ ও বাস্তবানুগ। কিছু ছবি যেন সম্পূর্ণ ধর্ম নিরপেক্ষ। অবশ্য অজন্তার ছবির রসমাধুর্য এখানে নেই। বাদামির গুহামন্দিরের ছবির রীতি ও আঙ্গিক অজন্তা ও বাঘগুহা চিত্রের সমগোত্রীয় ; কিন্তু তবুও শৈলী স্বতন্ত্র। অজন্তা, বাঘ ও বাদামির রীতি হল ভারতীয় ক্লাসিক রীতি। এই রীতির চারিত্রিকতা হল রেখা ও বর্ণের বর্তুলতা সৃষ্টিকারী প্রয়োগ এবং বহিঃ রেখার প্রবহমান ও ছন্দোময় সতেজতা ও নমনীয়তা। মাদ্রাজে সিত্তনবসাল-এ জৈন মন্দিরের ছবিগুলিও এই রীতিতে রচিত। গুপ্ত পরবর্তী যুগে এলোরার কৈলাস মন্দিরে (খৃ ৮ শতক), তিরুমলয় পুরমের বিষ্ণু মন্দিরে (খৃ ৭ শতক), কাঞ্চিপুরমে কৈলাসনাথ মন্দিরে (খৃ ৮ শতক) এবং তাঞ্জোরের বৃহদীশ্বর মন্দিরে (খৃ ১১ শতক) এই ক্লাসিক রীতিই অনুসৃত হয়েছে। ১০-১৩ শতকের বাংলা, বিহার ও নেপালের বৌদ্ধ পুঁথি চিত্রণেও এই ক্লাসিক রীতি দেখা যায়।

এর পর মধ্য যুগে ভারতে চৈত্রশৈলীতে নতুন একটা ধারা ফুটে ওঠে। অনেকের মতে মধ্য এসিয়ার যাযাবর জাতিগুলি বিভিন্ন পর্যায়ে এই শৈলী ভারতে আনেন। এই জন্য মধ্যযুগের এই ধারার নাম উত্তর আগত বা উদীচী ধারা। এলোরায় ও চোল ভাস্কর্যের আদর্শে রচিত ছবিগুলিতে এই উদীচী প্রভাব আছে। গুজরাতের জৈন পুঁথিচিত্রেও এই মধ্য যুগীয় রীতির বিকাশ দেখা যায়। খৃ ১২-১৫ শতক পর্যন্ত এই রীতি চালু ছিল এবং তালপাতার ওপরে, কাগজের পুঁথির পাতায় এই ছবি দেখা যায়। মুসলমান আক্রমণের সময় বহু শিল্পী মালব, রাজপুতানা, গুজরাতের পূর্ব অঞ্চল থেকে চলে এসে হিন্দু ও জৈন শাসকদের আশ্রয়ে ছড়িয়ে পড়েন এবং জৈন ধর্মাধিষ্ঠানগুলিতে পুঁথিচিত্র আঁকতে থাকেন। এগুলি সবই ক্ষুদ্রাকার ছবি। এই ছবিগুলির চারিত্রিকতা রেখার সূচাগ্রতা, ও তীক্ষ্ণতা, অবয়বের দ্বিমাত্রিকতা এবং দেহের বহু অংশে কনুই, হাঁটু, নাক, চোখ ইত্যাদির ক্ষেত্রে কৌণিকতার প্রয়োগ। গুজরাতি পুঁথিচিত্রের আর একটি বিশেষত্ব সাচীকৃত ছবিতেও দুটি চোখের উপস্থিতি। ছবিতে নানা জ্যামিতিক অলংকরণও দেখা যায়। গুজরাতি এই ছবি-

গুলি প্রায় সর্বত্রই প্রাণহীন ও অবাস্তব, এবং সোনালি রঙের প্রাচুর্যযুক্ত। বাঙলা বিহার ও নেপালের বৌদ্ধ পুঁথিচিত্রগুলিতে (খৃ ১০-১৩ শতক) কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় ক্লাসিক রীতিই দেখা যায়। এই পর্যন্তকে ভারতীয় প্রাচীন যুগের শেষ বলা চলে।

কপিশ (কাফিরিস্তান) থেকে বাহ্লীক যাবার পথে বামিয়েন একটি সমৃদ্ধ দেশ। এই উপত্যকার পূর্ব ও পশ্চিমে হিন্দুকুশ পাহাড়ের গায়ে বহু গুহা মন্দির রয়েছে। এই গুহাগুলির ছবিতে বিষয়বস্তু, পরিকল্পনা ও রচনাশৈলী সম্পূর্ণ ভারতীয়; রচনাকাল খৃ ৫-৬ শতক; সামান্য কিছুটা অবশ্য গ্রীক, ইরান বা কুশান প্রভাব আছে। খোটানের চিত্রকলাও ভারতীয় প্রভাবান্বিত। খোটান থেকে নিয়া'র পথে ডণ্ডন-উলিক-এর ছবিগুলি সম্পূর্ণ ভারতীয় শৈলীতে আঁকা। নিয়া থেকে দক্ষিণ বাহী পথে মিরানের ছবিতে প্রথমে গ্রীক ও ভারতীয় প্রভাব ও পরে (৮-৯ শতকে) চীনা ও তিব্বতীর প্রভাব দেখা যায়। কিজিলের গুহামন্দিরগুলির নাম হাজার মন্দির এবং এখানে অন্য প্রভাব থাকলেও আদর্শ এখানে সুস্পষ্ট। তুর্ফান, তোয়ুক, বেকগান-কোয়ল, বাজাকলিক ইত্যাদি স্থানে বৌদ্ধ শিল্পের যে নিদর্শন পাওয়া যায় তাতেও ভারতীয় ধর্ম ও শিল্পের অনুপ্রেরণা বেশ খানিকটা রয়েছে। মধ্য এসিয়ার দক্ষিণবাহী উত্তরবাহী দুই পথের সংযোগ স্থলে চীনের পশ্চিম সীমান্তে তুন হুয়াং। তুন-হুয়াং-র অপর নাম হাজার বুদ্ধের গুহা। এখানে বৌদ্ধ সংস্থার গুহামন্দিরে ছবিগুলি ল্পেরা। শিল্পীরা স্টেনসিল বা পাউনস্ দিয়ে ছবি এঁকে পরে রঙ করে দিতেন। খানে ৫০০ গুহামন্দিরের মধ্যে ৩০০টি ভাস্কর্য ও চিত্রশোভিত; গুহাতে সারি সারি শত শত বুদ্ধের ছবি, রচনাকাল ৩-১০ শতক। শিল্পের ইতিহাসে এই গুহাগুলি বিস্মরণীয়। ছবিগুলির পরিকল্পনা ও মূর্তিতত্ত্ব ভারতীয়; শৈলী চৈনিক। তবে রতীয় শৈলীও চোখে পড়ে; সাধারণত এগুলি মিশ্রিত শৈলী। কয়েকটি ছবিতে খানে ত্রিমাত্রিক রীতি-গঠন; ভারত ও পশ্চিম থেকে এখানে এসেছিল।

চিত্রকূট—২৫°১৫′ উ, ৮০°৪৬′ পূ; উত্তর প্রদেশে বান্দা জেলার একটি পাহাড়। ম্পতানাথ গিরি। বুন্দেলখণ্ডে। পয়স্বিনী (মন্দাকিনী) নদীর পারে একটি চ্ছন্ন পর্বত। করবী স্টেসন থেকে ৮ কি-মি দূরে সীতাপুর গ্রামই প্রাচীন চিত্রকূট। াগ থেকে দশ ক্রোশ দূরে। বনে এসে রাম, লক্ষ্মণ, সীতা এখানে কুটির তৈরি করে ছু দিন বাস করেছিলেন। এইখানে ভরত এসে দেখা করেছিলেন।

চিত্রকেতু—সুরসেন/শূরসেন; মথুরা দেশের সন্তানহীন রাজা। ভাগবতে (৬।১৪।১১) কোটি স্ত্রী; পৃথিবী শস্য ও সম্পদ শালিনী। অঙ্গিরা ঋষির বরে বা যজ্ঞের চরু খেয়ে প্রথমা স্ত্রী কৃতদ্যুতি/কেতুদ্যুতির একটি রূপবান ছেলে হয়। কিন্তু শিশুটি পরে । যায়। ভাগবতে সপত্নীরা বিষ দিয়ে হত্যা করেন। শোক সন্তপ্ত রাজা অঙ্গিরার ছ মৃত শিশুকে নিয়ে যান। অঙ্গিরা শিশুটিকে জীবিত করে দেন; বা শিশুর াকে ডেকে চিত্রকেতুর সন্তান হয়ে বাস করতে/জন্মাতে বলেন। দ্রঃ- কৃতদ্যুতি। বতে শিশু (৬।১৫) জীবিত হয়নি। অঙ্গিরা ও নারদ চিত্রকেতুকে বহু তত্ত্বকথা য়ে সান্ত্বনা দেন। ভগবান বিষ্ণু এসেও সান্ত্বনা দিয়ে যান। চিত্রকেতু বিষ্ণু ভক্ত

হয়ে ওঠেন এবং রাজা ও স্ত্রী কৃতদ্যুতি দুজনেই গন্ধর্ব দশা প্রাপ্ত হন। এঁরা তার পর স্বর্গে যাচ্ছিলেন ; ভাগবতে (৬।১৭) চিত্রকেতু নিজেকে জিতেন্দ্রিয় মনে করে একটু অহঙ্কারী হয়ে পড়েছিলেন এবং আকাশে লক্ষ বছর ভগবানকে খুঁজছিলেন। এক দিন কৈলাসে শিবের কোলে পার্বতীকে বসে থাকতে দেখে শিবকে উপহাস করেন। পার্বতী ফলে শাপ দেন এবং চিত্রকেতু বৃত্রাসুর হয়ে জন্মান। (২) গরুড়ের এক ছেলে। (৩) পাঞ্চাল রাজপুত্র ; পাণ্ডব পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন। (৪) শিশুপালের ছেলে।

চিত্রকেশী—এক জন অপ্সরা।

চিত্রগুপ্ত—যমের মন্ত্রী। মানুষের কৃতকর্মের হিসাব রাখেন।

চিত্রচাপ—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে ; ভীমের হাতে নিহত হন।

চিত্রবর্মা—(১) ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। ভীমের হাতে মারা যান। (২) পাঞ্চাল দেশে রাজা সুচিত্রের চার ছেলে চিত্রকেতু, সুধন্বা, চিত্ররথ ও বীরকেতু। চার জনেই কুরুক্ষেত্রে মারা যান। (৩) চন্দ্রাঙ্গদের (দ্রঃ) স্ত্রী সীমন্তিনীর পিতা।

চিত্রবর্হ—গরুড়ের এক ছেলে।

চিত্রবাহু—চিত্রায়ুধ। ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে ; ভীমের হাতে নিহত হন।

চিত্রবেগিক—ধৃতরাষ্ট্র বংশের একটি সর্প। সর্পযজ্ঞে নিহত হন।

চিত্রভানু—মণিপুরের রাজা। অর্জুনের স্ত্রী চিত্রাঙ্গদার পিতা।

চিত্ররথ—দ্রঃ- অঙ্গারপর্ণ গন্ধর্ব। (২) রাজা পুরু ও স্ত্রী বাহিনীর ছেলে। (৩) জনৈক সাল্ব রাজা ; এর জন্য রেণুকার (দ্রঃ) আশ্রমে ফিরতে দেরি হয়। (৪) একজন পাঞ্চাল রাজপুত্র। (৫) দশরথের এক মন্ত্রী (দ্রঃ-রাম)। (৬) যাদব বংশে উশঙ্গুর ছেলে। শূরের পিতা (মহা ১৩।১৪৭।২৯)। (৭) একটি বন ; এই বনে রাজা যযাতি বিশ্বাচীর সঙ্গে বাস করেছিলেন। রাজা পাণ্ডু স্ত্রীদের নিয়ে এখানে কিছু দিন কাটিয়েছিলেন। দ্রঃ- জমদগ্নি।

চিত্ররথা—চিত্ররথী নদী। পিনাকিনীর (উত্তর পেন্নর) একটি করদা শাখা।

চিত্রল—বোলোর।

চিত্রলেখা—(১) দ্রঃ- চন্দ্রলেখা। বাণরাজার মন্ত্রী কুষ্মাণ্ডের মেয়ে ; উষার সখী। স্বপ্নে দৃষ্ট নায়কের প্রণয়াসক্ত হয়ে উষা ম্লান হয়ে পড়েন। পর দিন চিত্রলেখা স্বপ্নের কথা শুনে নানা দেশের রাজপুত্রের ছবি দেখিয়ে উষার প্রণয়ী কে জেনে নিয়ে দ্বারকায় চলে যান। হরিবংশে আছে নারদের তামসী বিদ্যার প্রভাবে নিজেকে অদৃশ্য করে অনিরুদ্ধকে সমস্ত কথা জানিয়ে এবং ঐ বিদ্যার বলে অনিরুদ্ধকে বাণরাজার অন্তঃপুরে গোপনে এনে দেন। (২) এক জন অপ্সরা।

চিত্রশরাসন—চিত্রচাপ। ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে ; ভীমের হাতে নিহত হন।

চিত্রশিখণ্ডী—মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ। এঁরা শিখা ধারণ করতেন বলে নাম চিত্রশিখণ্ড/ণ্ডী।

চিত্রসেন—গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসুর ছেলে (মহা ১।১৬৪।৫৪)। ইন্দ্রের সভাসদ : নাচ

গান ও বাজনায় বিশেষ দক্ষ। অর্জুন ইন্দ্রলোকে এসে এঁর কাছে নাচগান ও বাজনা ইত্যাদি শেখেন। এই চিত্রসেনই উর্বশীকে বলেছিলেন অর্জুন উর্বশীর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছেন। ফলে উর্বশী অর্জুনের কাছে অভিসারে গিয়েছিলেন।

পরবর্তী কাহিনীতে আছে পাণ্ডবরা দ্বৈত বনে থাকার সময় দুর্যোধনরা ঘোষ যাত্রায় (দ্রঃ) আসেন। সেই সময়ে দ্বৈতবনে সরোবরের তীরে জল ক্রীড়ার জন্য চিত্রসেন সদল বলে অবস্থান করছিলেন। দুর্যোধনদের এঁরা দ্বৈতবনে প্রবেশ করতে বাধা দেন ; ফলে যুদ্ধ হয় এবং হেরে গিয়ে দুর্যোধনরা সস্ত্রীক বন্দী হন। দুর্যোধনের মন্ত্রীরা তখন পাণ্ডবদের শরণাপন্ন হলে যুধিষ্ঠির চার ভাইকে পাঠান। ভীম অবশ্য প্রথমে যুধিষ্ঠিরকে বাধা দিতে চেষ্টা করেছিলেন। অর্জুনের কাছে চিত্রসেন হেরে যান এবং অর্জুনের সখা বলে নিজের পরিচয় দিয়ে জানান দুর্যোধনরা পাণ্ডবদের বিদ্রূপ করতে এসেছিল ; ইন্দ্রের আদেশে তিনি এদের বন্দী করেছেন। ইন্দ্রের নির্দেশ সখা ও শিষ্য অর্জুনকে (মহা ৩।২৩৫।৬) চিত্রসেন রক্ষা করুক। অর্জুনের অনুরোধে চিত্রসেন সকলকে ছেড়ে দেন। কৌরব রমণীদের মর্য্যাদা হানি না করার জন্য যুধিষ্ঠির এঁকে ধন্যবাদ দেন। অমৃত বর্ষণ করে মৃত গন্ধর্বদের ইন্দ্র বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। দ্রঃ- গালব। (২) যুধিষ্ঠিরের এক জন সভাসদ। যম ও ইন্দ্রের সভাসদও। (৩) অপর নাম উগ্রসেন। ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। ভীমের হাতে নিহত হন। (৪) অপর নাম শ্রুতসেন। ত্রিগর্তরাজ সুশর্মার ভাই। (৫) কর্ণের ছেলে নকুলের হাতে নিহত। (৬) কর্ণের ভাই ; যুধামন্যুর হাতে নিহত।

চিত্রসেনা—একটি অপ্সরা।

চিত্রা—(১) একটি নক্ষত্র (আলফা ভার্জিনিস্)। (২) কুবের সভাতে এক জন অপ্সরা। অষ্টাবক্রকে নাচ দেখিয়ে সম্মানিত করেছিলেন।

চিত্রাক্ষ—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। ভীমের হাতে নিহত হন।

চিত্রাঙ্গদ—(১) সত্যবতীর গর্ভে শান্তনুর ছেলে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য। ভীষ্ম এঁদের বৈমাত্রেয় ভাই। শান্তনু মারা গেলে সত্যবতীর মত নিয়ে ভীষ্ম অপ্রাপ্তবয়স্ক চিত্রাঙ্গদকে রাজা করেন। চিত্রাঙ্গদ অমিত বলশালী হয়ে ওঠেন এবং দেবাসুর, গন্ধর্ব, সকলকেই হেয় জ্ঞান করতেন। নানা দেশ জয় করে রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। এক বার মৃগয়াতে যান এবং চিত্রাঙ্গদ নামে এক গন্ধর্বরাজ এঁকে নাম পাল্টাতে বলেন। ফলে কুরুক্ষেত্রে হিরণ্বতী নদী তীরে (মহা ১।৯৫।৮) তিন বছর যুদ্ধ হয় এবং কৌরব চিত্রাঙ্গদ মারা যান। ভীষ্ম প্রেতকার্য্যাণি করেন এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক বিচিত্রবীর্যকে রাজা করে দেন (মহা ১।৯৫।১২)। (২) চিত্রাঙ্গদ=চিত্রাঙ্গ=শ্রুতান্তক। ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। ভীমসেনের হাতে মারা যান।

চিত্রাঙ্গদা—(১) চিত্রভানু/চিত্রবাহন/চিত্রাঙ্গদের মেয়ে। এই বংশে এক পূর্ব পুরুষের নাম প্রভঞ্জন/প্রভংকর (মহা ১।২০৭।-) ; ইনি মহাদেবের তপস্যা করে বর পান যে তাঁর বংশে

প্রতি পুরুষে একটি করে সন্তান হবে। অর্থাৎ চিত্রভানুর একটি মাত্র সন্তান চিত্রাঙ্গদা মেয়েকে ছেলের মত মানুষ করেন। অর্জুন একা যখন বনে যেতে বাধ্য হন সেই সময়ে প্রথমে উলূপীকে বিয়ে করেন তার পরে মণিপুরে (মণলূর মানালূর) এলে রাজা এঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। অর্জুন চিত্রাঙ্গদাকে দেখে বিচলিত হয়ে পড়েন এবং মৃদু হয়ে রাজার কাছে প্রার্থনা করেন। রাজা তাঁদের বংশের কাহিনী জানান এবং বিয়ে দেন। বিয়ের সর্ত হয় চিত্রাঙ্গদা ও চিত্রাঙ্গদার সন্তান মণিপুরেই থাকবে ও রাজত্ব করবে। বিয়ের পর অর্জুন আবার দক্ষিণে তীর্থ যাত্রায় বার হয়ে যান। মণিপুরে অর্জুন তিন বছর (মহা ১।২০৭।২৩) ছিলেন। এখান থেকে পঞ্চতীর্থে (দ্রঃ) আসেন ইত্যাদি। ফের যখন মণলূরে আসেন তখন চিত্রাঙ্গদার ছেলে হয়েছে বভ্রুবাহন (মহা ১।২০৯।২৩)। এর পরবর্তী কাহিনী যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধের ঘোড়া মণিপুরে এলে উলূপীর (দ্রঃ) প্ররোচনায় বভ্রুবাহন (দ্রঃ) এই ঘোড়া ধরেন। ফলে তুমুল যুদ্ধে অর্জুন মারা যান। বভ্রু অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। চিত্রাঙ্গদা আসেন, সপত্নী উলূপীকে এজন্য দায়ী করেন। নাহং শোচামি তনয়ং (মহা ১৪।৭৯।৭) বলেন এবং অর্জুনকে বাঁচিয়ে দিতে বলেন এবং নিজে প্রায়োপবেশনে বসেন। উলূপী তারপর বাঁচিয়ে দিলে চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে অর্জুনের মিলন হয়। অশ্বমেধ যজ্ঞে উলূপী, চিত্রাঙ্গদা ও বভ্রুবাহন হস্তিনাপুরে আসেন। এখানে কুন্তী, পাঞ্চালী ইত্যাদির পায়ের ধুলা নিয়ে সুভদ্রা ইত্যাদির সঙ্গে চিত্রাঙ্গদা বাস করতে থাকেন। কুন্তী, পাঞ্চালী ও সুভদ্রা চিত্রাঙ্গদাকে বহু উপহার দিয়েছিলেন। গান্ধারীকে চিত্রাঙ্গদা পরিচারিকার মত সেবা করতেন। ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তী যখন বনে যান তখন চিত্রাঙ্গদাও এঁদের জন্য অশ্রুপাত করেছিলেন। মহাপ্রস্থানের পর চিত্রাঙ্গদা মণিপুরে ফিরে যান।

(২) ঘৃতাচী ও বিশ্বকর্মার মেয়ে। নৈমিষারণ্যে এক দিন চিত্রাঙ্গদা সখীদের নিয়ে স্নান করতে গেলে রাজা সুদেবের ছেলে সুরথের সঙ্গে দেখা হয়। চিত্রাঙ্গদা সখীদের কথা না শুনে সুরথের সঙ্গে কথা বলেন এবং দু জনেই প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়েন। বিশ্বকর্মা ঘটনাটা জানতে পেরে চিত্রাঙ্গদাকে শাপ দেন বিয়ে হবে না ; কোন দিন স্বামী পুত্র পাবে না। অভিশাপের সঙ্গে সঙ্গে সরস্বতী নদী সুরথকে ভাসিয়ে নিয়ে যান এবং চিত্রাঙ্গদা অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। সখীরা মুখে চোখে জল দিয়ে জ্ঞান ফেরাতে চেষ্টা করেন এবং শেষ পর্যন্ত মারা গেছে মনে করে অগ্নি সৎকারের চেষ্টা করেন। ইতি মধ্যে চিত্রাঙ্গদার জ্ঞান ফিরে আসে এবং কাউকে কাছে দেখতে না পেয়ে সরস্বতীতে ঝাঁপ দেন। স্রোতে ভাসতে ভাসতে গোমতী নদীতে এবং গোমতী থেকে ভাসতে ভাসতে একটি শ্বাপদ সঙ্কুল বনে এসে ওঠেন (বামন-পু)।

এক জন যক্ষ গুহ্যক আকাশ পথে যেতে যেতে চিত্রাঙ্গদাকে দেখতে পান। গুহ্যক প্রশ্ন করে সব কিছু শুনে উপদেশ দিয়ে যান কাছেই শ্রীকান্তের মন্দির আছে, সেখানে গিয়ে দেবতা আরাধনা করলে সব বিপদ থেকে মুক্তি পাবেন। গুহ্যক আশীর্বাদ করে চলে যান। উপদেশ অনুসারে যমুনার দক্ষিণে এই মন্দিরে এসে নদীতে স্নান করে মন্দিরে মহেশ্বরের আরাধনা করতে থাকেন। এই সময় সামবেদী ঋতধ্বজ মুনি

স্নান করতে এসে চিত্রাঙ্গদাকে দেখে প্রশ্ন করে সব কিছু জানতে পেরে বিশ্বকর্মাকে অভিশাপ দেন নিজের মেয়ের প্রতি এই রকম দুর্ব্যবহারের জন্য বানর হয়ে জন্মাতে হবে; এবং চিত্রাঙ্গদাকে সপ্তগোদাবরে গিয়ে হাটকেশ্বর মহাদেবের আরাধনা করতে বলেন; এবং বলেন কন্দারমালী অসুরের মেয়ে দেববতী, গুহ্যক অঞ্জন/আঞ্জন কন্যা তপস্বিনী দময়ন্তী এবং পর্জন্য কন্যা বেদবতী এই তিনটি মেয়ের সঙ্গে হাটকেশ্বরের মন্দিরে চিত্রাঙ্গদার দেখা হলে চিত্রাঙ্গদারও স্বামী মিলন হবে। চিত্রাঙ্গদা মুনির উপদেশ পালন করতে থাকেন।

বিশ্বকর্মা অভিশপ্ত হয়ে বানর রূপে বনে ভীষণ উৎপাত করতে থাকেন। এক দিন ঋতধ্বজের ৫-বছরের ছেলে জাবালি নদীতে স্নান করতে এলে এই বালককে তুলে নিয়ে গিয়ে এক বট গাছের মাথায় বসিয়ে লতাপাতা দিয়ে বেঁধে ফেলেন। এর পর বিশ্বকর্মা অঞ্জনের কাছ থেকে দময়ন্তীকে বিচ্ছিন্ন করেন। অঞ্জন-গুহ্যক ও প্রম্লোচার মেয়ে এই দময়ন্তী। মুদ্গল মুনি ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন প্রসিদ্ধ এক রাজার সঙ্গে এই মেয়ের বিয়ে হবে। দময়ন্তী এই কথা শুনে পুণ্যতোয়া হিরণবতী নদীতে স্নান করতে গেলে বিশ্বকর্মা দময়ন্তীকে তেড়ে যান। দময়ন্তী ভয়ে জলে নেমে গিয়ে স্রোতে ভাসতে ভাসতে জাবালি যে বনে বাঁধা ছিল সেই বনেই এসে উপস্থিত হন। জাবালির সঙ্গে দময়ন্তীর দেখা হয় এবং দু জনে পরস্পরের দুর্ভাগ্যের কাহিনী বর্ণনা করেন। জাবালি তখন উপদেশ দেন যমুনা তীরে শ্রীকান্তেশ্বর মন্দিরে গিয়ে আরাধনা করতে। দময়ন্তী মন্দিরে এসে মন্দিরের দেওয়ালে নিজের ও জাবালির দুর্ভাগ্যের কথা একটি শ্লোকে লিখে রাখেন এবং এই মন্দিরেই দেবতার আরাধনা করে দিন কাটাতে থাকেন। ঘৃতাচী ও পর্জন্যের মেয়ে বেদবতী। বেদবতী বনে খেলা কর-ছিলেন—বিশ্বকর্মা এক দিন দেখতে পান; এবং ইচ্ছা করে বেদবতীকে দেববতী বলে ডাকেন এবং ধরতে যান। সন্ত্রস্ত বেদবতী একটি গাছে উঠে পড়েন। বানর বিশ্বকর্মা লাথি মেরে গাছটি ভেঙ্গে ফেলেন। বেদবতী গাছের একটি শাখা প্রাণপণে ধরে রাখেন। বিশ্বকর্মা শাখাটিকে সমুদ্রে ফেলে দেন। বেদবতীকে এই অবস্থায় দেখে এক জন গন্ধর্ব বলেন ব্রহ্মার কথা মত এই বেদবতী মনুর ছেলে ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রধানা মহিষী হবেন। গন্ধর্বের কথা শুনে ইন্দ্রদ্যুম্ন শর সংযোগে গাছের ডালগুলি টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলেন কিন্তু বেদবতীকে দেখতে পান না। বেদবতী জলে ভাসতে ভাসতে এক বনে এসে ওঠেন এবং হাঁটতে হাঁটতে শ্রীকান্তেশ্বরের মন্দিরে এসে উপস্থিত হন এবং দময়ন্তীর সঙ্গে এখানে দেখা হয়। এই সময় গালবও এই মন্দিরে আসেন এবং এঁদের কাহিনী শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে পড়েন। পর দিন গালব সপ্তগোদাবরে স্নান করতে যান এবং দময়ন্তী ও বেদবতীও সঙ্গে যান। স্নান করবার জন্য জলে ডুব দিয়ে গালব দেখতে পান কতকগুলি কুমারী মৎস্য একটি হাঙ্গরকে ঘিরে ধরে প্রণয় ভিক্ষা করছে। হাঙ্গর রূঢ় ভাষায় এদের প্রত্যাখ্যান করলে এরা তখন বোঝাতে থাকেন গালবের মত ধার্মিক মুনি যদি দুটি সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে সর্বসাধারণের সমক্ষে ঘুরে বেড়াতে পারেন তা'হলে জলের নীচে সকলের অগোচরে

হাঙ্গরের কোন কলঙ্কের ভয় থাকতে পারে না। হাঙ্গর পাল্টা জবাব দেন গালবের দুঃসাহস আছে এবং প্রেমে গালব অন্ধ হয়ে পড়েছেন। এই সব শুনে গালব বিমূঢ় হয়ে জলের নীচেই অবস্থান করতে থাকেন। দময়ন্তী ও বেদবতী স্নান করে তীরে উঠে গালবকে দেখতে পান না এবং গালবের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। এ দিকে চিত্রাঙ্গদা আগেই এখানে এসেছিলেন; এ'দের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। চিত্রাঙ্গদা মনে মনে ভাবতে থাকেন ঋতধ্বজের ভবিষ্যৎবাণী অনুসারে কন্দারমালীর মেয়ে দেববতী কখন আসবেন। ইতিমধ্যে বিশ্বকর্মা বানরের তাড়া খেয়ে দেববতীও ঐ স্থানে এসে উপস্থিত হন।

এ দিকে দুপুরে ঋতধ্বজ শ্রীকান্তের মন্দিরে এসে দেওয়ালে লেখা শ্লোকটি দেখেন। ইতিমধ্যে ৫০০ বছর কেটে গেছে। ঋতধ্বজ বুঝে দেখেন রাজা ইক্ষ্বাকুর ছেলে শকুনি জাবালিকে মুক্ত করে নামিয়ে আনতে পারবেন। ঋতধ্বজ তৎক্ষণাৎ অযোধ্যায় এসে সব কথা জানিয়ে শকুনিকে নিয়ে আসেন। শকুনি শর সন্ধানে জাবালির বন্ধন কেটে ফেলতে থাকেন; এ দিকে ঋতধ্বজ গাছে উঠে যান ছেলেকে নামিয়ে আনবেন বলে। শেষ পর্যন্ত শকুনিও গাছে উঠে যান এবং সযত্নে ডালটি কেটে দুজনে মিলে জাবালিকে নামিয়ে আনেন। ডালটি জাবালির পিঠে আটকে লেগে গিয়েছিল। এরা তার পর তিন জনে প্রায় ১০০ বছর দময়ন্তীকে খুঁজতে খুঁজতে হতাশ হয়ে জাবালি ও ঋতধ্বজ কোশলে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের কাছে আসেন। জাবালির পিঠে ডালটি তখনও আটকে ছিল। ইন্দ্রদ্যুম্ন জানান তিনি একটি মেয়েকে ভেসে যাওয়া এক গাছের ডাল থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্নও এই অনুসন্ধানে যোগ দেন। এরা তারপর বদরী আশ্রমে এলে এখানে তপস্যারত সুরথের সঙ্গে দেখা হয়। সমস্ত শুনে সুরথও এদের দলে জুটে যান এবং খুঁজতে খুঁজতে সপ্তগোদাবরে এলে চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। এদিকে ঘৃতাচী মেয়ের জন্য দুঃখে অরুণাচলে চিত্রাঙ্গদাকে খুঁজতে খুঁজতে বানর বিশ্বকর্মাকে দেখতে পান। ঘৃতাচী প্রশ্ন করেন কোন মেয়েকে সে দেখেছে কিনা। বানর সব কিছু বলেন। ঘৃতাচী তখন সপ্তগোদাবরে আসেন; বিশ্বকর্মাও পেছু পেছু আসেন। জাবালি বানরকে দেখেই ক্রুদ্ধ হয়ে ছুটে যান শাস্তি দেবার জন্য; ঋতধ্বজ বাধা দিয়ে বিশ্বকর্মার কাহিনী বর্ণনা করেন। বিশ্বকর্মা তখন জাবালির পিঠ থেকে হাজার বছর আটকে থাকা ডালটি খুলে দেন। ঋতধ্বজ সন্তুষ্ট হয়ে বানরকে বর দিতে চাইলে বানর শাপমুক্তি চান। ঋতধ্বজ বলেন ঘৃতাচীর গর্ভে একটি শক্তিমান শিশু জন্মালে তবেই বিশ্বকর্মা মুক্তি পাবেন। এই কথা শুনেই ঘৃতাচী পালিয়ে যান; বানর বিশ্বকর্মাও পেছু পেছু ছুটে যান। কোলাহল পর্বতে এসে দু জনে দীর্ঘকাল বাস করেন; তার পর বিন্ধ্য পর্বতে চলে যান। এখানে গোদাবরী তীরে এ'দের ছেলে হয় নল। বিশ্বকর্মা এবার নিজের চেহারা ফিরে পান এবং ঘৃতাচীকে নিয়ে সপ্তগোদাবরে ফিরে আসেন। গালবও আসেন। দেববতী ও জাবালি, ইন্দ্রদ্যুম্ন ও বেদবতী, দময়ন্তী ও শকুনি এবং চিত্রাঙ্গদা ও সুরথের বিয়ে হয়।

(৩) তারাবতীর (দ্রঃ) পিতা ককুৎস্থ একদিন হিমালয়ে মৃগয়াতে গিয়ে উর্বশীকে দেখে সঙ্গম প্রার্থনা করেছিলেন ; সঙ্গে সঙ্গে একটি মেয়ে হয় ; নাম চিত্রাঙ্গদা। এই চিত্রাঙ্গদা একবার অষ্টাবক্রকে উপহাস করলে মুনি শাপ দেন নিজের বংশে দাসী হয়ে থাকতে হবে। দুটি কানীন ছেলে হলে তখন ভদ্রম্ অবাপ্স্যাসি (কালিকা ৪৯।৭৫)। কপোত মুনির ঔরসে ছেলে হয় তুম্বুরু ও সুবর্চা। (৪) রাবণের এক স্ত্রী ; বীরবাহুর মা।

চিত্রায়ুধ—চিত্রবাহু। ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। ভীমসেনের হাতে মারা যান।

চিত্রায়ুধ—দৃঢ়ায়ুধ। ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। ভীমসেনের হাতে মারা যান।

চিত্রাশ্ব—সত্যবান (দ্রঃ)—মহা ৩।২৭৮।১৩।

চিত্রোপচিত্র—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। ভীমসেনের হাতে নিহত হন।

চিত্রোৎপলা—চিত্রোপলা, চিত্তুতোলা। উড়িষ্যাতে মহানদী ও পিরি সঙ্গমের নীচে মহানদীর অংশ। অন্য মতে মহানদীর একটি শাখা।

চিৎশক্তি—পরম ব্রহ্ম চিৎ-স্বরূপ ; তাঁর শক্তি।

চিদম্বরম্—ভারতে স্থাপত্যকলার একটি বিশেষ স্মরণীয় ও অতুলনীয় কেন্দ্র। এখানে নটরাজের মন্দির (খৃ ৯ শতকে) এবং তাঞ্জোরে বৃহদীশ্বরের মন্দির (খৃ ১০ শতকে) বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং শিল্পে ও ভাস্কর্যে অতুলনীয়। হোয়াসাল রাজ বংশের কীর্তি।

চিনি—সংস্কৃত নাম শর্করা। জন্মভূমি ভারত। সুদূর অতীতে ভারতে চিনি প্রস্তুত হয়েছে। বিখ্যাত প্লিনি ও সেনেকা দুজনে ভারতীয় চিনির প্রশংসা করে গেছেন। খৃ ৭ শতকে চীন সম্রাট তাই হাং ভারতীয় আখ চাষ ও চিনি তৈরির পদ্ধতি শেখবার জন্য এক দল চীনা ছাত্রকে বিহারে পাঠান।

চিন্তা—দ্রঃ- শ্রীবৎস।

চিন্তাপূর্ণা—পাঞ্জাবে হোসিয়ারপুর জেলাতে চিন্তাপূর্ণী পাহাড়ে একটি তীর্থ। একটি শঙ্কু মত প্রতিমার পেছনে ছিন্নমস্তার ছবি বসান রয়েছে।

চিবুক—নন্দিনীর দেহ জাত সৈন্য ; বিশ্বামিত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। দ্রঃ- চীনার।

চিরকারী—গৌতম (দ্রঃ) ও অহল্যার পুত্র।

চিরাণ্ড—ছাপরা থেকে ৬/৭ মাইল পূর্বে। সারন জেলাতে সরযূর তীরে। একটি মতে প্রাচীন বৈশালী। সরযূ তীরে একটি ভগ্নাবশেষ দুর্গ রয়েছে। রাজা ময়ূরধ্বজের দুর্গ। এই রাজা নিজের ছেলেকে করাতে কেটে ব্রাহ্মণ বেশী কৃষ্ণকে মাংস খেতে দিয়েছিলেন। এখানে চ্যবন আশ্রম ও জিয়াচকুণ্ড নামে একটি পুষ্করিণী আছে। জিয়াচ কুণ্ড যেন ব্রহ্মকুণ্ড। চির+আনন্দ=চিরানন্দ=চিরান্দ= চিরাণ্ড যেন। অর্থাৎ বুদ্ধের জ্ঞাতিভাই ও শিষ্য আনন্দের দেহের ওপর বৈশালীর লিচ্ছবিরা কুটাগার টাওয়ার তৈরি করান। বৌদ্ধ যুগের বহু নিদর্শন এখানে পাওয়া গেছে। ছাপরা আজও চিরান(ড) ছাপরা বলে পরিচিত। আনন্দের দেহের বাকি অর্দ্ধেকটা অজাতশত্রু একটি স্তূপের মধ্যে রক্ষা করেন। এই স্তূপটি যেন বাঁকিপুরে ভিক্ষনা-পাহাড়ি-র কাছে।

চিরজীবী—বিষ্ণু, মার্কণ্ডেয়, ব্যাস, বলি, কৃপ, অশ্বত্থামা, পরশুরাম, বিভীষণ, হনুমান ও কাক।

চিরান্তক—গরুড়ের এক ছেলে।

চীন—মহাভারতে ও মনুতে আছে। মহাচীনও বলা হত। কশ্যপ মাতঙ্গ ও ধর্মরক্ষ এ'রা দু জন প্রথম বৌদ্ধ ভিক্ষু ; খৃ ৬৭ সালে চীন যান। খৃ ৪-র্থ শতকে বৌদ্ধধর্ম চীনে ছড়ায়। ৩৮১ খৃস্টাব্দে নানকিং-এ প্রথম প্যাগোডা তৈরি হয়। অনমও একটি নাম। (২) তন্ত্রে বহু স্থানে চীন ও মহাচীন অর্থে কাশ্মীর, ভুটান, নেপাল, তিব্বত ও বাংলা মিলে বিস্তীর্ণ এলাকা বুঝায়।

চীনার—নন্দিনীর দেহ জাত সৈন্য ; বিশ্বামিত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। যুধিষ্ঠিরকে এ'রা কর দিয়েছিলেন। একটি মতে এই করদাতারা প্রকৃতই চীন দেশ বাসী।

চুক্কি—শতদ্রুউর (ঋকবেদে) নদী। ছুতুদ্রি। সাটলেজ নয়। বিয়াসে যুক্ত হয়েছে। এরপর সমতলে নেমে এসেছে।

চুঞ্চু—(১) হেহয় বংশে এক রাজা। রোহিতাশ্বের নাতি; হারীতের ছেলে। (২) ব্রাহ্মণ পিতা ও বৈদেহ মায়ের সন্তান।

চুনার—উত্তর প্রদেশের মির্জাপুর জেলার একটি সহর। কিংবদন্তি উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্যের ভাই ভর্তিনাথ চুনার দুর্গটি স্থাপন করেন। দুর্গ সমেত সহরটি গঙ্গার ধারে বিন্ধ্য পর্বতের একটি অংশে অবস্থিত। এই অংশের চেহারা মানুষের পায়ের মত বলে প্রাচীন নাম চরণাদ্রি। চুনার দুর্গ ৩৬০ মি × ১২০-২৭০ মি। এই দুর্গের বেশির ভাগই হিন্দু গৃহ ও মন্দিরাদির উপকরণ দিয়ে প্রস্তুত। রেল স্টেসনের ধারে দুর্গাকুণ্ড ও জীর্ণা নালার ধারে কামাক্ষীর মন্দির অবস্থিত। নিকটে পাহাড়ের গায়ে বহু মূর্তি খোদিত আছে ; পেছনের দেওয়ালের শিলালিপি গুপ্ত যুগের মনে হয়। আরো উত্তরে দুর্গাখো গুহাতে গুপ্ত যুগের শিলালিপি আছে।

চুন্দা—বৈরোচন (দ্রঃ) কুল। বৌদ্ধ দেবী ; শ্বেতবর্ণ ; প্রতীক পদ্মের ওপর ও পুস্তক ; হাত ২, ৪, ১৬, ১৮ বা ২৬। বৈরোচন কন্যা। অপর নাম চন্দা, চুন্দ্রা, চণ্ডা, চুণ্ড্রা বা চুন্দবজ্রী।

একজন ধারিণী (দ্রঃ) দেবী। ধারিণী মন্ত্র বিশেষ। মঞ্জুশ্রীমূলকল্প গ্রন্থে (২০০ খৃ) চন্দ্রা নাম আছে। গুহ্য সমাজ গ্রন্থে (অসঙ্গ ৩০০ খৃ) চুন্দবজ্রী আছে। শিক্ষা সমুচ্চয়ে (৭ম শতক) চুন্দা নাম আছে। এক মুখ চার হাত, শ্বেতবর্ণ। হাতে বরদা মুদ্রা, পুস্তক, পাত্র। সর্বালঙ্কারভূষিতা অষ্টভুজ কুরুকুল্লার সহচরী। কুরুকুল্লা মণ্ডলে (দ্রঃ) পদ্মদলে, ঈশান কোণে অবস্থিত। কালচক্র মণ্ডলে চক্রিরাজের স্ত্রী এবং এখানে হাতে মুদ্গর, ছুরিকা, পদ্ম ও দণ্ড। ধর্মধাতুবাগীশ্বর মণ্ডলে হাতে অক্ষমালা ও কমণ্ডলু। মঞ্জুবজ্রমণ্ডলে ছাব্বিশ হাত। মূল দুটি হাতে চুন্দমুদ্রা, বাকি হাতে অভয়মুদ্রা, খড়্গ, রত্নমালা, বীজপুরক, শর, পরশু, গদা, মুদ্গর, অঙ্কুশ, বজ্র, ত্রিপতাকা, অক্ষসূত্র, চিন্তামণি লাঞ্ছিত পতাকা, পদ্ম, কমণ্ডলু, পাশ, ধনু, শক্তি, চক্র, খড়্গ, তর্জনীমুদ্রা, ঘণ্টা, ভিন্দিপাল ও প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থ। ২৬ হাত যুক্ত মূর্তি পাওয়া যায় না ; কিন্তু ১৬-হাত যুক্ত মূর্তি

প্রচুর। বরদা যাদুঘরের মূর্তিতে ১৬ হাত ; একটি শায়িত মানুষের ওপর বসা (সত্ত্বপর্যঙ্ক)।

চুমুরি—ধুনি ও চুমুরিকে নিদ্রা কালে প্রাপ্ত হয়ে ইন্দ্র বধ করেছিলেন। এদের সঙ্গে যুধ্যমান রাজর্ষি দভীতিকে রক্ষা করেছিলেন (ঋক্‌ ২।১৫।৯)। বৃহৎদেবতাতে (৪।৬২-৬৬) আছে গৃৎ-সমদ ঋষি বিরাট আকার ধারণ করলে ধুনি ও চুমুরি আক্রমণ করতে আসে। গৃৎ-সমদ এদের মনোভাব বুঝতে পেয়ে ইন্দ্রের গুণকীর্তন করতে থাকেন। ইন্দ্রের নাম শুনে এরা পালাতে চেষ্টা করে ; সুযোগ বুঝে ইন্দ্র এদের নিহত করেন।

চুল্লবগ্‌গ—বিনয় পিটকের দ্বিতীয় বিভাগের নাম। চুল্ল অর্থে তার পর। বিনয় পিটকে ভিক্ষু জীবনের সমগ্র নিয়মাবলী দেওয়া আছে। চুল্লবগ্‌গে প্রথম অধ্যায়ে আছে বিনয়ের সামান্য নিয়মাদির ব্যতিক্রমের জন্য ভিক্ষুকে কি ভাবে বিচার করতে হবে এবং কি শাস্তি হবে। প্রাতিমোক্ষ সূত্রের (=পাতিমোক্‌খ) ১৩-টি বিশেষ নিয়মের ব্যতিক্রমকে সংঘাদিশেষ বলা হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে এই বিষয় আলোচিত হয়েছে ; অর্থাৎ ভিক্ষু দোষী কি না বিচার ও কি পরিবাস হওয়া উচিত তার ব্যবস্থা। পরিবাস অর্থে কত দিন দোষী ভিক্ষুকে সংঘের অধিকারাদি থেকে বঞ্চিত থাকতে হবে এবং সঙ্গে ভিক্ষু জীবনের আরো কি কি প্রতিবন্ধক পালন করতে হবে। শাস্তির আদেশ মত ঠিক ভাবে চললে ভিক্ষুকে আবার সব অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হয়। চতুর্থ অধ্যায়ে সংঘের ভিক্ষুদের মধ্যে বিবাদ হলে তা আপোষে মেটাবার ৭টি পন্থা দেওয়া আছে। পঞ্চম অধ্যায়ে ভিক্ষুদের জীবন যাত্রার সুষ্ঠু আচার বিচারের নিয়মাবলী দেওয়া আছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিহার নির্মাণের ও বিহারের শয্যা ও আসবাব পত্রের নিয়মাবলী। সপ্তম অধ্যায়ে অজাতশত্রুর সহায়তায় ভগবান বুদ্ধকে হত্যার প্রচেষ্টা কাহিনী। অষ্টম অধ্যায়ে আগন্তুক ভিক্ষুদের প্রতি বিহারবাসীরা কি রকম ব্যবহার করবেন ও অরণ্যবাসী ভিক্ষুরা গ্রামে বা সহরে এসে কি করবেন বর্ণিত হয়েছে। সর্বশেষে উপাধ্যায় ও শিষ্যদের পারস্পরিক কর্তব্য দেওয়া আছে। নবম অধ্যায়ে রয়েছে পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় উপসোথ ক্রিয়া কালে প্রাতিমোক্ষসূত্র আবৃত্তি করতে কোন কোন ভিক্ষুকে দেওয়া হবে না। এই ক্রিয়ার সময় প্রত্যেক ভিক্ষুকে জানাতে হবে যে তিনি গত চোদ্দ দিনের মধ্যে প্রাতিমোক্ষসূত্রের ২২৭-টি নিয়ম পালন করেছেন। লঘু নিয়মের ব্যতিক্রম হলে অন্য ভিক্ষুদের কাছে দোষ স্বীকার করে দোষ স্খালন করে নিতে পারেন ; গুরু নিয়মের ব্যতিক্রম হলে ভিক্ষুকে উপাসোথাগার থেকে বার করে দেওয়া হবে। দশম অধ্যায়ে আছে ভিক্ষুণীসংঘ কি ভাবে এবং কবে তৈরি হয়েছিল এবং কি কি কাজ ভিক্ষুণীদের করণীয়। একাদশ অধ্যায়ে প্রথম ধর্ম সংগীতির বিবরণ আছে। অজাতশত্রুর সময় স্থবির মহাকাশ্যপের সভাপতিত্বে রাজগৃহের সপ্তপর্ণি গুহায় ৫০০ অর্হৎ ভিক্ষু মিলে এই ধর্ম সংগীতি অনুষ্ঠিত হয় এবং এইখানে বিনয়পিটক সংকলিত হয়। দ্বাদশ অধ্যায়ে বৈশালীতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সংগীতির বিবরণ রয়েছে। প্রথম সংগীতির একশ বছরেরও বেশি পরে হয়েছিল। বৌদ্ধধর্মে সাম্প্রদায়িক ভেদের সূত্রপাত এই বৈশালীতেই সুরু হয়।

চূড়াকরণ—দশটি সংস্কারের মধ্যে একটি। মোটামুটি শিশুর চুল কাটা।

চূড়ামণি—জনক এটি সীতাকে দিয়েছিলেন। জল সম্ভূত মণি। যজ্ঞে তুষ্ট হয়ে ইন্দ্র এটি জনককে দিয়েছিলেন (রা ৫।৬৬।৫)। বধূকালে সীতার মাথাতে অধিক শোভাপেত। হনুমানকে অভিজ্ঞান হিসাবে সীতা এটি দেন।

চূড়ামণি যোগ—রবিবারে সূর্য গ্রহণ বা সোমবারে চন্দ্র গ্রহণ।

চূলী—গন্ধর্বী ঊর্মিলার মেয়ে সোমদা। সোমদা এই চূলী নামে মুনির পরিচর্যা করতেন। সেবায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে মুনি বর দিতে চাইলে সোমদা মুনির ব্রহ্মতেজের দ্বারা (ব্রাহ্মেণ উপগতায়াঃ দাতুম্ অর্হসি মে সুতম্—রা ১।৩৩।১৭) একটি পুত্র সন্তান চান। চূলীর বরে সোমদার ছেলে হয় ব্রহ্মদত্ত। অর্থাৎ মানস পুত্র। কুশনাভের (দ্রঃ) এক শত মেয়েকে ব্রহ্মদত্ত বিয়ে করেন।

চেকিতান—সাত্বত, বার্ষ্ণেয়। পাণ্ডব পক্ষে এক জন বীর যোদ্ধা। রাজসূয় যজ্ঞে যুধিষ্ঠিরকে তূণ উপহার দিয়েছিলেন। কুরুক্ষেত্রে প্রচণ্ড যুদ্ধ করেছিলেন। দুর্যোধনের হাতে মারা যান। ব্যাসের বরে মৃত যোদ্ধাদের সঙ্গে চেকিতানও এসেছিলেন।

চেতনা—কোন কোন দার্শনিকের মতে সম্পূর্ণ অনন্য এবং এর সংজ্ঞা নিরূপণ অসম্ভব। জড়বাদী মতে চৈতন্য জড়েরই উচ্চস্তর। চৈতন্যকে অনেকে দ্রব্য রূপে গ্রহণ করেন, কেউ আবার নিছক গুণ রূপে গণ্য করেন। আত্মা বা মনের স্বরূপ চৈতন্য। সাংখ্য অনুসারে একমাত্র পুরুষই চেতনা। মন, অহং ও ইন্দ্রিয়াদি প্রকৃতির পরিণাম মাত্র। বৈদান্তিক মতে ব্রহ্মই এক মাত্র চৈতন্য স্বরূপ পরম তত্ত্ব।

চেতিয়গিরি—চৈত্যগিরি, চেত, চেতিয় নগর, দক্ষিণ গিরি, বেস নগর। ভূপাল রাজ্যে ভিলসা থেকে ৩-মাইল উত্তরে। এখানে অশোক দেবীকে বিয়ে করেন। দক্ষিণ-গিরি (দ্রঃ) (<দশার্ণ) দেশের রাজধানী। একটি মতে চেতিয় গিরি সাঁচি; ভিলসা থেকে ৫/৬ মাইল দ-পশ্চিমে। বেত্রবতী, বিদিসা (বেস) নদী ও গঙ্গার সঙ্গমে অবস্থিত। গঙ্গা এখানে কল্পিত।

চেদি—প্রাচীন ভারতে একটি জনপদ ও জাতি। ঋকবেদে একটি স্তোত্রে চেদি ও তাদের রাজার দানশীলতার বিশেষ প্রশংসা আছে। খৃ-পূ ৬ শতকে উ-ভারতের ১৬ টি মহা জনপদের একটি। বর্তমানে বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলে যমুনা নদীর শাখা শুক্তিমতী (বর্তমানে কেন; পালিতে সোৎথিবতী) নদীর তীরে চেদির রাজধানী ছিল। চেতি (বৌদ্ধ); সোত্থিবতী (জাতক)=শুক্তিমতী; চন্দেরি (টড), সদ্রাবতিস (গ্রীক), চন্দ্রাবতী। ললিতপুর থেকে ১৮ মাইল পশ্চিমে। চেদি দেশ বুন্দেলখণ্ড ও মধ্য প্রদেশের কিছু অংশ মিলে। পশ্চিমে কালিসিন্ধু ও উত্তরে তমসা। বর্তমান সহরের ৮-মাইল উ-পশ্চিমে প্রাচীন চন্দেরির ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। অপর মতে দাহল মণ্ডল হচ্ছে প্রাচীন চেদি; নর্মদার তীরে অবস্থিত। স্কন্দপুরাণে মণ্ডল = চেদি। মণ্ডলকে টলেমি বলেছেন মণ্ডলাই; শোণ ও নর্মদার উৎসের কাছে। গুপ্তরাজাদের সময় চেদির রাজধানী ছিল কালঞ্জর, মহাভারতে রাজধানী শুক্তিমতী। চেদির অপর নাম ত্রিপুরী, বর্তমানে তেওয়ার; জব্বলপুর থেকে ৬-মাইল। দহলের রাজধানী

তেওয়ার (আলবিরুনি)। কলচুরিদের সময় মাহিষ্মতী ছিল চেদি মণ্ডলের রাজধানী (অনর্ঘ রাঘব)।

মহাভারতে চেদিরাজ শিশুপালের কাহিনী আছে। শিশুপালের (দ্রঃ) মৃত্যুর পর ধৃষ্টকেতু রাজা হন। ধৃষ্টকেতু পাণ্ডব পক্ষে ছিলেন। নকুলের স্ত্রী করেণুমতী চেদি রাজকন্যা। নল রাজার সময় চেদি রাজ্যে রাজা ছিলেন সুবাহু। পুরাণে এঁরা যদুবংশীয় ঃ—যযাতি(১)—যদু(২)—উশিক(১৭)—চেদি ১৮)। কৌরব বংশে রাজা উপরিচর বসু চেদি রাজ্য জয় করে এই দেশের রাজা হন। কলিঙ্গের রাজা খরবেল চেদি বংশীয় বলে পরিচিত। ২৪৮-২৪৯ খৃস্টাব্দে পশ্চিম ভারতে চেদি অব্দ বা কলচুরি অব্দ নামে নতুন একটি অব্দ চালু হয়েছিল। পরে কলচুরি (দ্রঃ) রাজারা চেদি রাজ্যকে কেন্দ্র করে পরাক্রান্ত সাম্রাজ্য গড়েছিলেন ; রাজধানী ছিল তখন ত্রিপুরী।

চের—কেরল (দ্রঃ)। অশোকের অনুশাসনে কেরলপুত্র। মালাবার উপকূলে। বর্তমান মহীশূর, কোইম্বাটুর, সালেম, দ-মালাবার, ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন মিলে। দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা ও উত্তরে গোয়া। খৃ-৭ শতকে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। মিসর থেকে মালাবারে ও সিংহলে অতি প্রাচীন কালেই বাণিজ্য চলেছে। প্রাচীন রাজধানী স্কন্দপুর ; কোইম্বাটুর জেলাতে ; গুজেলহাটি গিরিপথের পশ্চিমে। টলেমি বলেছেন কেরোবোথ্রসের (কেরলপুত্রের) রাজধানী করউর। করউর-এর অপর নাম করুর, বঞ্জি, তাম্রচূড়-ক্রোড় ; অমরাবতীর (কাবেরীর করদা শাখা) বাম তীরে কুনগানোরের কাছে অবস্থিত ছিল। বড় রাজধানী ছিল তালকাড়, (দ্রঃ) দলবনপুর ; কাবেরীর উত্তর তীরে ; মহীশূর থেকে ২৮ মাইল দ-পশ্চিমে এবং শ্রীরঙ্গপত্তম থেকে ৩০/৪০ মাইল পূর্বে। বর্তমানে এর ধ্বংসাবশেষ তাকাড় নামে পরিচিত। গঙ্গাবংশীয়দের এটি রাজধানী ছিল। পরে দ্বারাবতী=দ্বারসমুদ্র—হলেবিড-এ (বর্তমান নাম) খৃ ১০ শতকে রাজধানী আনা হয়। হলেবিড (দ্রঃ) মহীশূরে হাসান জেলাতে।

চৈত্রবংশ—ব্রহ্মা>অত্রি>চন্দ্র। রাজসূয় যজ্ঞ করে চন্দ্র সম্রাট হন : চন্দ্র>বুধ>চৈত্র (চৈত্র বংশের প্রতিষ্ঠাতা)>বিরথ>সুরথ (দ্রঃ)।

চৈত্ররথ—মহাভারতে একটি নামকরা বন। বার বার উল্লিখিত হয়েছে। পাণ্ডু প্রব্রজ্যা নিয়ে চৈত্ররথ ইত্যাদি অতিক্রম করে গন্ধমাদনে যান (মহা ১।১১০।৪৪)।

কার্তিকের জন্মের পর নানা উৎপাত দেখা দিতে থাকে। এই সময় চৈত্ররথ বনের অধিবাসীরা বলা-বলি করতে থাকেন (মহা ৩।২১৫।২) ঋষি পত্নীদের ও অগ্নির পাপে এই সব বিপর্যয় ঘটছে।

চোল—চোর। দক্ষিণ ভারতে প্রাচীন রাজ্য। রুক্মিণী স্বয়ংবরে চোল রাজা উপস্থিত ছিলেন। যুধিষ্ঠিরকে চোল রাজা উপহার দিয়েছিলেন। তুর্বসুর বংশ ঃ—মরুত্ত>সুষান্ত>বরূথ>গাণ্ডীর। গাণ্ডীরের সন্তানেরা চোল, কেরল, পাণ্ড্য রাজ্য গঠন করেন। কাত্যায়নের বার্তিক (খৃ পূ ৪-শতক) ও অশোকের শিলালিপিতে (খৃ পূ ৩-শতক) চোল বংশের উল্লেখ আছে।

গিরনরে অশোকের অনুশাসনে চোড় ; করমণ্ডল উপকূলে। উত্তরে পেন্নর

নদী ; পশ্চিমে কুর্গ। নেলোর থেকে পুড়ুকোট্টাই ; তাঞ্জোর সমেত। রাজধানী ছিল উরইয়ূপুর (টলেমি অর্থোউরা), কাবেরী তীরে ত্রিচিনোপল্লীর কাছে খৃ ২-শতকে ; ১১-শতকে রাজধানী কাঞ্চিপুর, কুম্ভকোনাম, ও তাঞ্জোর। চোল=দ্রাবিড়। চোল পরে পাণ্ড্য রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়।

প্রাচীন তামিল কিংবদন্তিতে চোল রাজ করিকালের নামে সুপ্রসিদ্ধ। দীর্ঘকাল চোল রাজ্যের আয়তন অতি ছোট ছিল। কাঞ্চির পল্লব বংশের সময় চোলরা পল্লব সম্রাটদের সামন্ত বা লঘুমিত্র ছিলেন। উত্তরকালে ৯ শতক থেকে এ'দের ক্রমশ বিস্তৃতির ইতিহাস পাওয়া যায়।

চৌরঙ্গী—দ্রঃ- আজীবিক।

চৌরপঞ্চাশিকা—বসন্ততিলক ছন্দে ৫০ শ্লোকে রচিত একটি সংস্কৃত খণ্ড কাব্য। অন্য নাম চৌরীসুরত পঞ্চাশিকা বা চোরপঞ্চাশৎ বা বিহ্লন কাব্য। অধিকাংশ পুঁথিতে আরো কয়েকটি শ্লোক বেশি আছে। বিষয় বস্তু হচ্ছে বিরহী নায়ক বর্ণনা করছেন নায়িকার মিলন বিলাসের স্মৃতি। বিহ্লন (খৃ ১১ শতক) রচিত বলে প্রসিদ্ধ। অন্য মতে চোরকবি, সুন্দরকবি অথবা বররুচি এর রচয়িতা।

কাব্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে কাহিনী আছে এক রাজকুমারীর সঙ্গে গুপ্ত প্রণয়ে জড়িত এক যুবক রাজদ্বারে অভিযুক্ত এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে বধ্য ভূমিতে নীত হলে যুবকটি তাঁর প্রণয়লীলার বিবরণপূর্ণ কাব্যটি আবৃত্তি করেন। রাজা শুনে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে কন্যা দান করেন।

চৌর্য্যশাস্ত্র—৬৪-কলার অন্যতম একটি। প্রবর্তক স্কন্দ বা কার্তিকেয়। অন্য মতে মূলদেব। মূলদেবকে ধূর্তপতিও বলা হয়েছে এবং ইনি বাকপটু ও সংগীত বিশারদ। চোরদের উপাস্য দেবতা কালী। যুবরাজদেরও এই বিদ্যা শিক্ষণীয় বলা হয়েছে। বর্ত্তমানে ষন্মুখকল্প ও চৌরচর্যা নামে দুটি পুঁথি পাওয়া যায়। যন্মুখকল্পে প্রধান আলোচ্য বিষয় অন্তর্ধান, মার্গসংহরণ, ভেল্‌কি, দরজাখোলা, দৃষ্টি স্তম্ভন, দেব-নরাদি বশীকরণ, বন্ধনমোক্ষ, ইত্যাদি। অন্য বহু জায়গায় বিক্ষিপ্ত ভাবে নানা তথ্য রয়েছে। চোরদের সাতটি শ্রেণী বলা হয়েছে ; প্রকৃত চোর, চোরের বিশ্বাস-ঘাতক, মন্ত্রী, ভেদজ্ঞ, চোরাই মালের ক্রেতা, চোরের অন্নদাতা ও আশ্রয়দাতা। চৌর্যপ্রসঙ্গে নানা রকমের সুড়ঙ্গের উল্লেখ আছে, যেমন পদ্মব্যাকোশ, ভাস্কর, বালচন্দ্র, বাপী, বিস্তীর্ণ, স্বস্তিক, ও পূর্ণকুম্ভ। চোরের যন্ত্রপাতি হিসাবে সন্দংশনিকা ও কর্কটরজ্জু ইত্যাদি নাম পাওয়া যায়। উল্লিখিত আছে যোগচূর্ণ সাহায্যে চোর নিজেকে অদৃশ্য করতে পারে ; যোগবর্তিকা সাহায্যে সব কিছু দেখতে পায়। এক রকম কজ্জলের সাহায্যে অন্ধকার রাত কোটি সূর্যের আলোতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অবস্বাপ্নিকা মন্ত্রে অপরকে এরা ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারে এবং তালোদঘাটিনী বিদ্যায় অনায়াসে তালা খুলতে পারে। এ ছাড়া ঘরে কেউ আছে কিনা জানবার জন্য ব্যবস্থা ছিল। সিঁধের গর্তের মধ্য দিয়ে প্রথমে একটি প্রমাণকার পুতুল ঢুকিয়ে দিতে হবে। সঙ্গে ভ্রমর বা প্রজাপতি ভর্তি বাক্স থাকবে ; বাক্স খুলে দিলে এরা উড়ে গিয়ে গৃহস্থের দীপ নিবিয়ে দেবে।

চ্যবন—মহর্ষি ভৃগু ও পুলোমার ছেলে। গর্ভকালে পুলোমার প্রাক্তন বহু দিনের পাণি-প্রার্থী এক রাক্ষস (এর নামও পুলোমা) পুলোমোকে চুরি করে পালাতে চেষ্টা করেন। মায়ের বিপদ দেখে সূর্যের মত উজ্জ্বলকান্তি শিশু গর্ভচ্যুত হয় এবং শিশুর তেজে রাক্ষস পুড়ে ছাই হয়ে যান। অন্য মতে রাক্ষস পালিয়ে যান (দ্রঃ- বধূসরা)। গর্ভচ্যুত বলে নাম হয় চ্যবন। নর্মদার কাছে বৈদূর্য পাহাডে (মহা ৩।১২১।১৮) বাল্যকাল থেকেই তপস্যা করতে করতে জরা গ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং দেহ বল্মীক ও লতাপাতায় চাপা পড়ে যায়। এক দিন শর্যাতি তাঁর চার হাজার স্ত্রী ও মেয়ে সুকন্যাকে নিয়ে সেখানে বিহার করতে আসেন (মহা ৩।১২২)। সুকন্যাকে দেখে মুগ্ধ চ্যবন ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকেন। কিন্তু সুকন্যা শুনতে পান না বরং উই-ঢিপির মধ্যে টিপ-টিপ করছে চোখ দুটি দেখে কৌতূহলী হয়ে উই-ঢিপি ভাঙতে যান কিন্তু ভেতর থেকে মানুষের গলায় (দে ভাগ ৭।২।৫৩) কে যেন বারণ করেন। সুকন্যা নিরস্ত হলেও, কাঁটা ফুটিয়ে দুটি চোখ নষ্ট করে দেন। চ্যবন এতে রাগে রাজার সৈন্যদের মলমূত্র নিঃসরণ বুদ্ধ করে দেন। অন্য মতে চ্যবন রাগ করেন নি; কিন্তু সুকন্যার পাপে দেশে নানা দুর্ঘটনা দেখা দিতে থাকে। স্ত্রী পুরুষ সকলের এবং ক্রমশ জীবজন্তুর মলমূত্র রোধ হয়ে যায়। এই অবস্থার কারণ কি রাজা সহজে বুঝে উঠতে পারেন না। পরে খেয়াল হয়; চ্যবনের প্রতি কেউ কোন দুর্ব্যবহার করেছে কিনা সকলকে জানতে চান (মহা ৩।১২২।-)। শেষ পর্যন্ত রাজার কাছে সুকন্যা নিজের অপরাধ স্বীকার করেন। রাজা তখন ক্ষমা চাইতে এলে সুকন্যাকে বিয়ে করার সর্তে চ্যবন ক্ষমা করতে রাজি হন। রাজা তৎক্ষণাৎ বিয়ে দেন; অন্য মতে রাজা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। কিন্তু সুকন্যা নিজেই প্রজাদের স্বার্থে চ্যবনকে বিয়ে করতে রাজি হন। সৈন্যরা সুস্থ হয়ে ওঠে। চ্যবনের আর এক স্ত্রী

বিয়ের পর সুকন্যা স্বামীকে কায়মনোবাক্যে তাপসী হিসাবে সেবা করতে থাকেন। এক দিন সদ্য স্নাতা সুকন্যার নিরাভরণ দেহের রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে অশ্বিনীকুমার দুজন এসে সুকন্যাকে পরিচয় চান এবং বৃদ্ধ অন্ধ চ্যবনকে ত্যাগ করে তাঁদের যে কোন এক জনকে বিয়ে করতে বলেন। কিন্তু সুকন্যা রাজি হন না। এঁরা সুকন্যাকে বোঝাতে চেষ্টা করেন তাঁরা যুবা ইত্যাদি এবং নিজেদের পরিচয় দিয়ে সর্ত করেন চ্যবনকে তাঁরা চোখ ও যৌবন ফিরিয়ে দেবেন; তিন জনেই একই রূপ ধরবেন এবং সুকন্যাকে তখন এই তিন জনের মধ্য থেকে যে কোন এক জনকে বেছে নিতে হবে। সুকন্যা কি করবেন বুঝতে পারেন না। চ্যবন আবার চোখ ফিরে পাবেন এই আশাতেই অধীর হয়ে ওঠেন। সব কথা জানালে চ্যবন সম্মতি দেন। অশ্বিনী-কুমার দু জন চ্যবনকে নিয়ে নদীতে ডুব দিয়ে একই রূপ ধরে তিনটি যুবা পুরুষ হিসাবে উঠে আসেন। (নিজের ইষ্ট দেবীকে স্মরণ করে) স্বামীকে চিনতে সুকন্যার কোন কষ্ট হয় না। অশ্বিনীকুমার দু জন সন্তুষ্ট হয়ে সুকন্যাকে আশীর্বাদ করেন এবং চ্যবনকে জানান তাঁরা কি ভাবে সোমপানের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। চ্যবন প্রত্যুপকার হিসাবে এঁদের সোমপায়ী করে দেবেন ঠিক করে শর্যাতিকে দিয়ে (সোম)

যজ্ঞের ব্যবস্থা করেন। চ্যবন পুরোহিত হন, সমস্ত দেবতারা আসেন এবং তার পর এ'দের দু জনকে সোমপাত্র দিতে গেলে ইন্দ্র বাধা দেন এবং বোঝাতে চান এ'রা দেবতাদের চিকিৎসক ; এ'দের কাজের জন্য এ'রা সোমপানের অধিকারী নন। চ্যবন এ কথায় কাণ না দিলে ইন্দ্র বজ্রাঘাত করতে যান। চ্যবন তখন মন্ত্র বলে ইন্দ্রের হাত স্তম্ভিত করে দিয়ে মন্ত্র পড়ে আহুতি দিয়ে আগুন থেকে মদ নামে এক কৃত্যার সৃষ্টি করেন। মদ আক্রমণ করলে দেবতারা সব পালিয়ে যান কিন্তু ইন্দ্র পালাতে পারেন না। মদ ইন্দ্রের নিক্ষিপ্ত বজ্র গিলে ফেলে ইন্দ্রকে গিলতে যান। দেবতারা তখন ফিরে এসে চ্যবনকে শান্ত করেন। ইন্দ্র নিজেই ক্ষমা চান ; এবং অশ্বিনীকুমার দু-জনকে সোমপানের অধিকারী বলে স্বীকৃতি দেন।

কৃত্যা যখন দেবতাদের গ্রাস করতে যাচ্ছিল তখন কপ নামে অসুরগুলি স্বর্গ অধিকার করে (মহা ১৩।১৪২) বসে। দেবতারা ব্রহ্মার শরণ নেন। ব্রহ্মা ব্রাহ্মণদের কাছে যেতে বলেন। কপদের সংহার করবার জন্য ব্রাহ্মণরা যজ্ঞ আরম্ভ করলে কপদের ধনী নামে এক দূত এসে জানায় কপরাও বেদবেত্তা, যাজ্ঞিক, সত্যপরায়ণ ইত্যাদি ; যজ্ঞ বন্ধ করতে বলে। ব্রাহ্মণরা জানান দেবতা ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই ইত্যাদি। কপরা তখন আক্রমণ করতে চেষ্টা করলে ব্রাহ্মণদের প্রজ্বলিত আগুনে নিহত হয়। বাকি অংশ দেবতাদের হাতে মারা পড়ে।

আর এক মতে কৃত্যার আক্রমণে ইন্দ্র বৃহস্পতির উপদেশ চান এবং এই উপদেশ অনুসারে দেবতারা সকলে ক্ষমা চান। মোটামুটি চ্যবনের কাছে পরাজিত হয়ে ইন্দ্র এদের সোম পানের অধিকার দেন।

দেবী ভাগবতে নতুনত্ব হিসাবে সুকন্যা প্রথমে অশ্বিনীকুমারদের প্রস্তাবে অভিশাপ দিতে যান। জল থেকে উঠলে জগন্মাতার স্তব করে সুকন্যা চ্যবনকে চিনতে পারেন। কনকাচলে ব্রহ্মার যজ্ঞে ইন্দ্র অশ্বিনীকুমারদের সোমপান করতে দেন নি। পরাজিত হয়ে ইন্দ্র এদের আবার সোম পানের অধিকার দেন। যুবক চ্যবনকে দেখে শর্যাতি চিনতে না পেরে সন্দেহে সুকন্যাকে শাপ দিতে যান।

ভাগবতে (৯।৩) অশ্বিনীকুমারেরা এলে চ্যবন যৌবন চান। পরিবর্তে সোমপায়ী করে দেবেন। সুকন্যা চিনতে না পেরে অশ্বিনীকুমারদেরই স্তব করেছিলেন এবং শর্যাতি ইন্দ্রের হাত স্তম্ভিত করে দিয়েছিলেন। দ্রঃ- মদ।

পরশুরাম একবার চ্যবনের আশ্রমে কিছু দিন ছিলেন। ভৃগু সেই সময়ে এখানে ছিলেন এবং এ'রা দুজনে পরশুরামকে উপদেশ দেন কৈলাসে গিয়ে শিবকে তপস্যায় সন্তুষ্ট করতে। চ্যবন (গী·প্রে ১৩।৫০।৩) এক বার ব্রত নিয়ে বারো বছর গঙ্গা যমুনার সঙ্গমে জলের মধ্যে বাস করতে থাকেন। এই সময়ে এক দিন জেলেদের জালে ধরা পড়েন। মুমূর্ষু মাছেদের দেখে দুঃখে তিনি জানান মাছেদের সঙ্গে তিনিও মরতে চান। জেলেদের কাছে খবর পেয়ে নহুষ ছুটে আসেন। চ্যবন নহুষের পুরোহিত। নহুষ অর্থমূল্য দিয়ে পুরোহিতকে কিনে নিতে চান। নহুষ হাজার মুদ্রা দাম দিতে চান ; কিন্তু চ্যবন বলেন তাঁর দাম আরো বেশি এবং শেষ পর্যন্ত সমস্ত রাজ্যই দাম হিসাবে

দিতে চান কিন্তু চ্যবন তাতেও রাজি হন না। তখন গো-গর্ভজাত এক ব্রাহ্মণের পরামর্শে নহুষ একটি গাভী দিয়ে চ্যবনকে কিনে নেন। কারণ গাভী অমূল্য জীব। সম্ভ্রমে ও আনন্দে জেলেরা চ্যবনকে এই গাভীটি নিতে বলে এবং চ্যবন গাভী নিয়ে জেলেদের আশীর্বাদ করেন স্বর্গে যাবে। মাছেদের সঙ্গে জেলেরাও স্বর্গে যায়। চ্যবন এবং ঐ তপস্বী এরপর নহুষকে বর দেন ধর্মে অচলা স্থিতি হবে।

চ্যবন জানতে (গী-প্রে ১৩।৫২) পেরেছিলেন ক্ষত্রিয় কুশিক বংশ থেকে তাঁর ব্রাহ্মণ বংশে ক্ষত্রাচার সংক্রামিত হবে। এই ভয়ে তিনি কুশিক বংশ ধ্বংস করবার জন্য কুশিকের কাছে গিয়ে বাস করবেন অভিলাষ প্রকাশ করেন। কুশিক তাঁকে সসম্মানে গ্রহণ করেন। চ্যবন এক ব্রত করবেন বলেন এবং তাঁর নিজের সেবার জন্য সস্ত্রীক কুশিককে নির্দেশ দেন। এর পর চ্যবন এঁদের নানা ভাবে নির্যাতন করতে থাকেন। ঘুমালে সাবধানে পা টিপে দিতে বলেন এবং একটানা একুশ দিন ঘুমিয়ে থাকেন। এরাও পা টিপে দিতে থাকে। চ্যবন তারপর উঠে কোন কথা না বলে ঘর থেকে বার হয়ে অন্তর্হিত হয়ে যান। একুশ দিন অনাহার ও অনিদ্রায় ক্লান্ত রাজা রাণী খুঁজতে খুঁজতে আরো ক্লান্ত হয়ে ঘরে এসে দেখেন চ্যবন ঘুমচ্ছেন। আবার একুশ দিন এরা পা টিপে দিতে থাকেন। এরপর ঘুম ভেঙে উঠে প্রাসাদের বিভিন্ন জিনিস আনিয়ে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে অন্তর্হিত হয়ে যান। পর দিন আবার বহু কিছু পোড়ান। এই ভাবে ৪৯ দিন কাটে। ঘোড়ার বদলে রাজা ও রাণীকে দিয়ে রথ টানান এবং নিজে রথে বসে বিনা কারণে কশাঘাতে এদের জর্জরিত করে তোলেন। ৫০টা দিন উপোস থেকে এরা নির্বিকারে সব সহ্য করেন। চ্যবন শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়ে স্পর্শ করে রাজা ও রাণীকে সুস্থ করে দিয়ে আশ্রমে ফিরে যান। গঙ্গাতীরে চ্যবন একটি ব্রত করবেন এবং আশ্রমে এসে এঁরা যেন দেখা করেন বলে যান। পর দিন গঙ্গাতীরে চ্যবনের আশ্রমে গিয়ে এরা গন্ধর্বপুরীর মত সুন্দর প্রাসাদ ইত্যাদি দেখতে পান। একটু পরে সব অদৃশ্য হয়ে যায়। ব্রাহ্মণের ক্ষমতা দেখে রাজা ও রাণী মুগ্ধ হয়ে যান। চ্যবন এঁদের সংযমে সন্তুষ্ট হয়ে এঁদের বর দিতে চান। রাজা জানান দীপ্ততেজা ব্রাহ্মণের সংস্পর্শে এসেও তাঁরা দগ্ধ হন নি এইটাই যথেষ্ট। চ্যবন তখন বলেন ব্রহ্মার কাছে জানতে পেরেছিলেন যে কুশিকের বংশ থেকে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বংশের মধ্যে কুল সংকর দেখা দেবে। এই জন্য কুশিক বংশ ধ্বংস করবার চেষ্টায় চ্যবন এঁদের ওপর এই রকম অত্যাচার করেছিলেন। কিন্তু অভিশাপ দেবার মত কোন ছিদ্র খুঁজে পান নি। অনুতাপে রাজারাণীকে কিছু ক্ষণের জন্য স্বর্গ সুখ দেবার ইচ্ছায় গঙ্গা তীরে এই স্বর্গোদ্যান রচনা করেছিলেন। কুশিক ব্রাহ্মণত্ব বাসনা করেন চ্যবন জানেন ; এবং বলেন কুশিকের তৃতীয় পুরুষে অর্থাৎ কুশিকের পৌত্র বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করবেন। ভৃগু বংশে ঔর্ব নামে এক ঋষি জন্মাবেন। ঔর্বের ছেলে ঋচীক সমগ্র ধনুর্বেদ আয়ত্ত করে নিজের ছেলে জমদগ্নিকে তা শিখিয়ে দেবেন। এই ঋচীকের সঙ্গে কুশিকের পৌত্রী অর্থাৎ গাধির মেয়ের বিয়ে হবে। ঋচীকের ছেলে জমদগ্নি এবং জমদগ্নির ছেলে পরশুরাম।

চ্যবন সুকন্যার ছেলে প্রমতি; প্রমতির ছেলে রুরু (মহা ১।৮।১)। চ্যবনের এক স্ত্রী আরুষী; মনুর মেয়ে; ছেলে হয় ঔর্ব (মহা ১।৬০।৪৫)। ঔর্বের ছেলে ঋচীক। চ্যবনের একটি মেয়ে সুমনস্; সোমশর্মার স্ত্রী। ভাগবতে (৯।৩) চ্যবনের ছেলে উত্তানবর্হি, আনর্ত ও ভূরিষেণ। আনর্তের ছেলে রেবত। আস্তীক চ্যবনের কাছে বেদ অধ্যয়ন করেন। চ্যবন ভীষ্মের গুরু ছিলেন এবং ব্রহ্মার সভায় এক জন সভাসদ ছিলেন। সন্তানহীন বেদশর্মা কৌশিক (গোত্র) এ'র আশ্রমে এলে চ্যবনের আশীর্বাদে এ'র সন্তান হয়। দেবী ভাগবতে (৪।৮।১২) রেবা নদীতে ব্যাহৃতীশ্বর তীর্থে স্নান করতে যান। একটি সাপ চ্যবনকে পাতালে টেনে নিয়ে যায়। কেকরলোহিত (দ্রঃ) অনুরূপ ঘটনা। চ্যবনের কাছে তীর্থের কথা শুনে প্রহ্লাদ (দ্রঃ) তীর্থ যাত্রায় বার হয়ে যান।

চ্যবনআশ্রম—(১) চৌসা; সাহাবাদ জেলাতে। (২) পয়োষ্ণী (বর্তমানে পূর্ণা) নদীর কাছে সাতপুরা পাহাড়েও একটি আশ্রম ছিল। (৩) জয়পুর রাজ্যে নার্নোল/নরলোল এর ৬-৮ মাইল দক্ষিণে ধোসিতে অনূপদেশের রাজকন্যা চ্যবনের চোখ অন্ধ করে দিয়েছিলেন। (৪) চিলনালা; গঙ্গাতীরে রায়-বেরিলি জেলাতে; অশ্বিনীকুমারেরা এখানে চ্যবনকে যৌবন দান করেন। দ্রঃ- চিরাণ্ড।

ছ

ছত্তিশগড়—দশার্ণা দেসরেন রেজিয়ো (পেরিপ্লাসে); মহাকোসল, দ-কোসল।

ছন্দ—ছন্দের মূল উপাদান চারটি দল বা সিলেবল, কলা বা কালমাত্রা, প্রস্বর বা এক-সেণ্ট ও মিল। এর যে কোন একটি উপাদান ছন্দ সৃষ্টি করে। প্রাচীন আর্য ভাষায় দল সংখ্যার নানা বিভাগের ওপর ভিত্তি করে দলবৃত্ত ছন্দ গড়ে উঠেছিল। প্রস্বর দু জাতের; বল প্রস্বর অর্থাৎ উচ্চারণের ঝোঁক জাত এবং গীতি প্রস্বর অর্থাৎ কণ্ঠস্বরের তীব্রতা প্রসৃত। প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে গীতি প্রস্বর ছন্দও পাওয়া যায়। অর্বাচীন সংস্কৃতে কিছু কালমাত্রা-গত ছন্দও পাওয়া যায় এবং এই ছন্দের নাম কলা-বৃত্ত, বা মাত্রাবৃত্ত বা জাতি ছন্দ। আর্যা, পজ্‌ঝটিকা, ও পাদাকুলকও এই মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। প্রাচীন সংস্কৃত ছন্দ দল সংখ্যাত হলেও কালমাত্রা নিরপেক্ষ নয়। এগুলি মুখ্যত দলসংখ্যাত এবং গৌণত কলাসংখ্যাত; এই গুলিকে সেই জন্য নিয়ন্ত্রিত দলবৃত্ত বা অক্ষরবৃত্ত বা বর্ণবৃত্ত বলা হয়। ইন্দ্রবজ্রা, মালিনী, মন্দাক্রান্তা, স্রগ্ধরা এই জাতীয় ছন্দ। ভারতীয় মাত্রাবৃত্ত বা জাতিবর্গের ছন্দে ও মিলের গুরুত্ব কম নয়।

বৈদিক ছন্দ মূলত দল সংখ্যাত। লঘুগুরু দল বিন্যাস ঋক্‌বেদের ছন্দেও দেখা যায়। ছন্দ পংক্তির শেষাংশে এই রকম দল বিন্যাস রয়েছে। পরবর্তী কালে এই ভাবে দল বিন্যাস সমস্ত পংক্তিতেই ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু বৈদিক প্রধান ছন্দ অনুষ্টুভ প্রায় অবিকৃতই থেকে গিয়েছিল। এই ভাবে অনুষ্টুভ ছন্দ অপেক্ষাকৃত মুক্ত থাকার ফলে অনুষ্টুভ ছন্দ সংস্কৃতে সর্বপ্রধান স্থান অধিকার করে আছে। ঋক্‌বেদের যুগেই অনুষ্টুভ ছন্দের উৎপত্তি। ঋক্‌বেদের পনেরটি ছন্দের মধ্যে গায়ত্রী, অনুষ্টুভ,

ত্রিষ্টুভ ও জগতী এই চারটিই প্রধান। এর মধ্যে ত্রিষ্টুভ ছন্দই বেশি ব্যবহৃত হয়েছে ; তারপর গায়ত্রী এবং তারপর অনুষ্টুভ। উত্তর কালে গায়ত্রী আর ব্যবহৃত হত না ; অনুষ্টুভ ছন্দই সামান্য একটু রূপান্তরিত হয়ে ব্যাপক ছন্দ হয়ে ওঠে এবং এরই নাম হয় শ্লোকছন্দ। বাল্মীকিকে এই শ্লোকছন্দের প্রবর্তক বলা হয়। দ্রঃ- অনুষ্টুপ।

গায়ত্রী ছন্দ (দ্রঃ- গরুড়) ত্রিপঙ্‌ক্তিক ; প্রতি পংক্তিতে দল সংখ্যা আট। অনুষ্টুভ, ত্রিষ্টুভ, জগতী ইত্যাদি ছন্দ চতুষ্পংক্তিক। অনুষ্টুভ, ত্রিষ্টুভ ও জগতী ছন্দে দলসংখ্যা যথাক্রমে আট, এগারো, বারো। জগতী ছন্দ ত্রিষ্টুভের একটি সংস্করণ। অনুষ্টুভ ইত্যাদি বৈদিক ছন্দ থেকে পরে ইন্দ্রবজ্রা, মালিনী, প্রভৃতি অক্ষরবৃত্ত-বর্গীয় সমস্ত ছন্দ উৎপন্ন হয়েছে। লঘুগুরু দল বিন্যাসের বৈচিত্র্য ও পংক্তি দৈর্ঘ্যের সাহায্যে এই সব অক্ষর বৃত্ত ছন্দের জন্ম। আর্যা, পজ্‌ঝটিকা ইত্যাদি মাত্রা বর্গীয় ছন্দগুলি প্রাকৃত ভাষার প্রভাবে এবং গানের তাল বিভাগের প্রভাবে উৎপন্ন।

সংস্কৃত সাহিত্যে ছন্দ ও ছন্দশাস্ত্র অনেক। ছন্দকে বেদাঙ্গ বলে স্বীকার করা হয়েছে এবং বেদাঙ্গ হিসাবে পঠিত হয়। ঋক্‌বেদের প্রাতিশাখ্য সূত্রে, সামবেদের নিদান সূত্রে, শাঙ্খায়নের শ্রৌতসূত্রে ইত্যাদিতে এই ছন্দ চর্চার পরিচয় রয়েছে। ভারতীয় ছন্দ শাস্ত্রগুলি অনেকাংশ সাংকেতিক পদ্ধতিতে রচিত এবং ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটানই এদের উদ্দেশ্য ছিল। পিঙ্গলের ছন্দঃসূত্র, গঙ্গাদাসের ছন্দোমঞ্জরী, কেদারভট্টের বৃত্ত-রত্নাকর এবং মধ্য যুগের প্রাকৃত-পৈঙ্গলম উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ছন্দ গ্রন্থ।

ছাগ—সনাতন ধর্মে ছাগের ওপর বিশেষ একটা মোহ রয়েছে। দক্ষের ছাগ মুখ; কার্তিকেয়র ষষ্ঠমুখ ছাগ মুখ। বিশাখের ছাগ মুখ; স্কন্দ মাতৃগণের পুত্র বীরাষ্টকও ছাগ-মুখ। দেবীর কাছেও একে বলি দেওয়া হয়। অশ্বমেধের অশ্বকে (ঋক্ ১।১৬২।৩) অজ (দ্রঃ) পথ দেখিয়ে নিয়ে যেত ; বলি দেওয়া হত। ছাগ বলি দিয়ে দেবী এথেনাকেও এই চর্ম উপহার দেওয়া হত।

ছান্দোগ্য—সামবেদীয় ব্রাহ্মণের অংশ। ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের দশটি অধ্যায়ের শেষ ৮-ই অধ্যায়। বৈশম্পায়নের ৯-জন শিষ্যের মধ্যে একজন তাণ্ড্য। তাণ্ড্য প্রবর্তিত শাখার নাম তাণ্ড্য শাখা এবং তাণ্ড্যশাখার অন্তর্গত ব্রাহ্মণ ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ। শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব ও রাধাকৃষ্ণন কৃত টীকা আছে। প্রথম দুটি অধ্যায় গৃহ্যকর্ম উপযোগী মন্ত্রের সংকলন; নাম মন্ত্র ব্রাহ্মণ। শেষ আটটি ছান্দোগ্য উপনিষদ; প্রতি অধ্যায় বহু খণ্ডে বিভক্ত। প্রধানতম উপনিষদগুলির মধ্যে ছান্দোগ্য একটি ; এবং বহু জায়গায় এটি আরণ্যক ধর্মী। বেদান্ত দর্শনের মূল তত্ত্বগুলি ছান্দোগ্যে স্পষ্ট। প্রথম অংশে আরণ্যকধর্মিতা বিশেষ ভাবে স্পষ্ট।

প্রথম অধ্যায়ে উদগীত উপাসনার কথা বলা হয়েছে। যজ্ঞে গেয় সামের প্রধান অংশ উদগীত এবং এই উদগীতকে এখানে ওঁ-কার বলে প্রতিপাদিত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের শেষে সামগানের অন্তর্গত স্তোভ-অক্ষরের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা রয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাম উপাসনা এবং নানা ধরণের রূপক বহুল ব্যাখ্যা। তৃতীয় অধ্যায়ে প্রথমে আদিত্য উপাসনা ; শেষ অংশে রূপক ও রহস্য মাধ্যমে ব্রহ্ম-

বিদ্যার আলোচনা। এই অধ্যায়েই সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম মন্ত্রটি রয়েছে। ৪-র্থ অধ্যায়ে রৈক্ব-জানশ্রুতি সংবাদ, জাবাল সত্যকাম ও গৌতম কাহিনী এবং সত্যকাম ও উপকোসল কামায়নের কাহিনী রয়েছে। এই অধ্যায়ে আছে ব্রহ্মপ্রাপ্তির পর মানবলোকে আর ফিরতে হয় না। ৫-ম অধ্যায়ের প্রথমে কর্ম ফল ও পুনর্জন্ম তত্ত্ব এবং শ্বেতকেতু প্রবাহণ সংবাদ, অশ্বপতি কৈকেয় ও আরুণি প্রভৃতির কথোপকথন রয়েছে। এরপর ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে আরণ্যক ধর্মিতা নেই ; কেবল দার্শনিক তত্ত্ব আলোচিত। ষষ্ঠ অধ্যায়ে উদ্দালক শ্বেতকেতু সংবাদের মাধ্যমে এক অদ্বিতীয় চিন্ময় সৎ থেকে দৃশ্যমান জগতের উৎপত্তির কথা বলা হয়েছে। দেহ ত্যাগে আত্মার বিনাশ হয় না এ তত্ত্বও এখানেই রয়েছে। তৎ-ত্বমসি মন্ত্রও এই অধ্যায়ে। সপ্তম অধ্যায়ে নারদ ও সনৎ কুমারের কথোপকথনের মধ্যে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় বলা হয়েছে। অষ্টম অধ্যায়ে অসুরদের প্রচারিত মতবাদ দেহ ও আত্মা অভিন্ন এই-দেহ-সর্বস্ববাদের খণ্ডন। আত্মা অবিনশ্বর এখানে প্রমাণ করা হয়েছে।

বামদেব্য সাম (১৭৪ শ্লোক) অংশে ন কাঞ্চন পরিহরেৎ তৎব্রতম্ অর্থে বুঝতে হবে শ্বেতকেতুর (দ্রঃ) অভিশাপ দেবার আগের যুগের ঘটনা। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাতেও বামদেব্য সাম অস্বীকৃত।

ছায়া—বা ছয়। গুজরাটে পোর বন্দর। খৃ-শতকের প্রভাতে বিখ্যাত বন্দর। সুদামাপুরী।

ছায়া—সূর্যের স্ত্রী সংজ্ঞা (দ্রঃ) স্বামীর তেজ সহ্য করতে না পেরে মায়াতে নিজের অনুরূপ একটি মেয়েকে তৈরি করে সূর্যের কাছে রেখে দিয়ে পালিয়ে যান। এই মেয়ের নাম ছায়া। নিজের ছেলে মেয়েদের ভার ও সংজ্ঞা এই ছায়ার হাতে দিয়ে যান। ছায়াকেই সূর্য সংজ্ঞা বলে জানতেন। ছায়ার সন্তান সাবর্ণিমনু. শনি, তপতী, বিষ্টি ইত্যাদি। সংজ্ঞার ছেলেদের চেয়ে নিজের সন্তানদের বেশি ভালবাসতেন। ফলে যম এক বার রেগে গিয়ে সংমাকে লাথি মারতে যান। ছায়া তখন শাপ দেন যে তার পা খসে যাবে। যম তখন সূর্যের কাছে সব জানালে সূর্য ছেলেকে ঠিক শাপ মুক্ত করে দেন না ; বলেন যমের পায়ের মাংস কিছু খসে যাবে ; কৃমিকীটরা এই মাংস খাবে। সূর্য তার পর ছায়াকে তিরস্কার করলে ছায়া আরো রেগে গিয়ে সংজ্ঞার সমস্ত কথা এবং নিজের পরিচয় সূর্যকে জানিয়ে দেন। হরিবংশে (১।৯।১৪) তেজে সংজ্ঞা বিবর্ণ হয়ে গিয়ে সবর্ণ ছায়াকে রেখে পালান। ছায়া কথা দিয়েছিলেন কেশাকর্ষণ ও শাপ না দিলে কিছু বলবেন না। বৈবস্বত মনু সহ্য করলেও যম পায়ে করে সন্তর্জয়ামাস (১।৯।১৭)।

ছায়াগ্রাহী—সিংহিকা (দ্রঃ)।

ছিন্নমস্তা—দশ মহাবিদ্যার ৫-ম দেবী। সব চেয়ে ভয়ঙ্করী মূর্তি। অন্য নাম চণ্ডিকা। ইনি বাঁ হাতে নিজের কাটা মাথা ধরে আছেন এবং নিজের কাটা গলা থেকে রক্তধারা পান করছেন। এঁর বা দিকে সহচরী ডাকিনী ও দক্ষিণে সহচরী বর্ণিনীকেও দেবী রক্ত পান করাচ্ছেন। এঁরা সকলেই দিগম্বরী, মুণ্ডমালিনী ও মুক্তকেশী। দেবীর

মাথার চুল নানা ফুল দিয়ে সাজান; গলায় মুণ্ডমালা ও নাগ উপবীত। রতি ও কামের ওপর ইনি দাঁড়িয়ে আছেন। অন্য হাতে নর-কপাল ও খড়্গ। ইনি প্রসন্ন হলে উপাসকদের শিবত্ব দেন; অপুত্রক পুত্র পায়; নির্ধন ধন পায়, মূর্খ বিদ্বান হয়। নারদ পঞ্চরাত্রে ছিন্নমস্তার উৎপত্তি কাহিনী হচ্ছে এক দিন পার্বতী দুই সহচরী নিয়ে মন্দাকিনীতে স্নান করতে যান। সহচরী দু জনের ক্ষিধে পেলে তাঁরা বার বার দেবীর কাছে খাবার কথা বললে দেবী বাঁ হাতে নখ দিয়ে নিজের মাথা ছিঁড়ে ফেলে তিন জনেই রক্ত ধারা পান করে ক্ষিধে মেটান। মহাভাগবত পুরাণ মতে দক্ষ যজ্ঞে মহাদেব যেতে বারণ করলে নিজের বিভূতি দেখাবার জন্য মহাদেবকে সতী দশটি মহাবিদ্যা (দ্রঃ) রূপ মূর্তি দেখিয়ে অভিভূত করে দক্ষ যজ্ঞে যাবার অনুমতি আদায় করে নেন। বৌদ্ধ বজ্রযোগিনী=সনাতনী ছিন্নমস্তা। অভিচার কর্মের দেবী। দ্রঃ- বজ্রযোগিনী।

ছোটতিব্বত—বোলর। বালটিস্তান ও চিত্রল। রাজধানী শকর্দু।

ছোটনাগপুর—মুণ্ড (বায়ু পু) ঃ ঝাড় খণ্ড ; মুণ্ডাদের দেশ।

জ

জগতী—(১) একটি ছন্দ (দ্রঃ)। (২) সূর্যের একটি অশ্ব

জগৎ—পৃথিবী, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সব কিছু মিলে জগৎ। চার্বাক প্রভৃতির মতে ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ এই চারটি ভূত থেকে অর্থাৎ জড় থেকে জগতের উৎপত্তি এবং জড়েতে এর বিলুপ্তি।

বেদবাদী দার্শনিকরা তিনটি ভাগে বিভক্ত—সাংখ্য যোগ, বৈশেষিক ন্যায় ও মীমাংসা-বেদান্ত। এই তিনটি ভাগের প্রতিটির পূর্বভাগে অর্থাৎ সাংখ্য, বৈশেষিক ও মীমাংসাতে জগতের মূল স্বরূপ এবং উত্তর ভাগে জগতের সূক্ষ্ম স্বরূপ আলোচনা করে জগতের সংজ্ঞা ঠিক করতে ঋষিরা চেষ্টা করেছেন।

সাংখ্য মতে দৃশ্যমান বিশ্ব হচ্ছে চেতন (=পুরুষ) ও জড়ের (=প্রকৃতি) বিলাস। পঞ্চ ভূত ও পঞ্চ তন্মাত্র, পাঁচটি জ্ঞান ইন্দ্রিয় ও পাঁচটি কর্ম ইন্দ্রিয় এবং এই দশটি ইন্দ্রিয়ের অধিপতি একাদশ ইন্দ্রিয় মনকে স্বীকার করা হয়েছে। এবং এই সব কিছুর মূলে এদের কারণ রূপ একটি অহংকার তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই অহংকার চেতন ও জড়ের গ্রন্থি ও জগতের মূল কারণ। সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ গুণ যুক্ত প্রকৃতি (=জড়) ক্রিয়াশীল নয়। পুরুষও অমূর্ত, ফলে ক্রিয়া সমর্থ হলেও সৃষ্টি কর্মে অসমর্থ। ফলে 'পঙ্গু অন্ধ' রীতিতে জড় ও চেতন জগৎ সৃষ্টি করছে। প্রকৃতি ও পুরুষ বিরুদ্ধ স্বভাব যুক্ত বলে এদের মধ্যে অহংকার তত্ত্ব হচ্ছে বন্ধন রজ্জু। সাংখ্যে এই ভাবে জগতের জড় অংশ এবং যোগে জগতের চেতনাংশের বিচার করা হয়েছে।

বৈশেষিকরা ছয়টি পদার্থ স্বীকার করেন এবং ষষ্ঠ পদার্থটির নাম বিশেষ। এই জন্য এই সম্প্রদায়ের নাম বৈশেষিক। এই মতে বিশেষ পদার্থই অন্য পদার্থগুলির সঙ্গে মিলে জগৎ সৃষ্টি করছে। ভারতীয় সংস্কৃতিতে বৈশেষিকের প্রভাব

প্রচুর। বৈশেষিক অংশে স্থূল জগতের এবং ন্যায় অংশে সূক্ষ্ম অর্থাৎ জ্ঞান রহস্যের বিচার করা হয়েছে। মীমাংসা মতে জীবের জন্ম মৃত্যু আছে কিন্তু বিশ্বের নেই। অতএব মহাপ্রলয় বা বিশ্ব ধ্বংস স্বীকৃত নয়। এই ভাবে মীমাংসা অংশে জগতের ব্যাখ্যা রয়েছে ; বেদান্ত অংশে আছে জ্ঞানের বিচার।

জৈন মতে জগতের উপাদান কারণ হিসাবে ঈশ্বর স্বীকৃত নন। জড় জগৎ অজীব ; ধর্ম, অধর্ম, আকাশ ও পুদ্গল সবই অজীব অর্থাৎ দ্রব্য। অবিভাজ্য ক্ষুদ্রতম দ্রব্য অণু ; অণু মিলে স্কন্দের সৃষ্টি। জীব ভিন্ন সব কিছুই অজীব। জগৎ সৃষ্টি ব্যাপারে জৈনেরা জড়বাদী। বিভিন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কাছে জগতের ধারণা বিভিন্ন। বৈভাষিক সম্প্রদায় সর্বাস্তিবাদী ; এঁদের মতে বাহ্য জগৎ প্রত্যক্ষগম্য। সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়ের মতে বাহ্য জগৎ আমাদের অনুমানের ওপর নির্ভর করে ; অর্থাৎ এরা অনুমেয় বাদী। বৌদ্ধ যোগাচার সম্প্রদায় মতে বাহ্য জগৎ অলীক ; স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নাই ; 'বিজ্ঞান' প্রসূত সৃষ্টি মাত্র। বৌদ্ধ মাধ্যমিক সম্প্রদায় মতে জগৎ নাই, আত্মা নাই, সবই শূন্য, সবই অলীক ; কাল্পনিক প্রবাহ মাত্র। এই চারটি বৌদ্ধ মতেই প্রমেয় জগৎ বলে কিছু স্বীকৃত হয় না।

বৈশেষিক মতে নিত্য পদার্থ পরমাণু এবং নিমিত্ত ঈশ্বর থেকে পরিদৃশ্যমান জগতের জন্ম। ঈশ্বরের ইচ্ছায় দুটি পরমাণু যোগে একটি দ্ব্যণুক, এবং তিনটি দ্ব্যণুক যোগে একটি ত্রসরেণু। ত্রসরেণুই সব চেয়ে ছোট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্রব্য। এক একটি খণ্ড-প্রলয়ের পর ঈশ্বরের ইচ্ছা ও জীবগণের অদৃষ্টবশত পরমাণু—যাতে সংযুক্ত হতে পারে সেইরূপ অনুকূল ক্রিয়া পরমাণুতেই দেখা দেয় এবং ক্রমশঃ স্থূল জগৎ সৃষ্টি হয়। ন্যায়েরও এই মত। সাংখ্যযোগ মতে জগতের মূল উপাদান হচ্ছে অব্যক্ত প্রকৃতি ; অবস্থা বিশেষ প্রকৃতি পুরুষের কাছে এসে সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং জগতের সৃষ্টি হয়। অব্যক্ত প্রকৃতি থেকে ২৪-টি তত্ত্ব সাংখ্যে স্বীকৃত হয়েছে।

বৈষ্ণব সম্প্রদায় অর্থাৎ শুদ্ধাদ্বৈত মতে জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ সবই ঈশ্বর। জগৎ ব্রহ্মের স্বরূপ ও পরিণাম এবং ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন। নিম্বার্ক অর্থাৎ দ্বৈতাদ্বৈত মতে অচিৎ থেকে জগতের উৎপত্তি। মধ্ব অর্থাৎ দ্বৈত মতে বিষ্ণুর সৃজনী শক্তির প্রকাশ ও তাঁর সর্বকর্তৃত্বের বিকাশ এই জগৎ। বিভিন্ন বস্তু ও চেতন আত্মা নিয়ে জগৎ গঠিত। ঈশ্বর নিজে ক্রিয়া করেন ও অপরকে করান ; এই থেকে জগতের জন্ম। রামানুজ অর্থাৎ বিশিষ্টাদ্বৈত মতে ঈশ্বর নাম-রূপহীন এক ও অভেদ ; তিনি বহু হবার বাসনায় এবং অন্তরস্থ সৃষ্টি প্রেরণায় নানা রূপে জগতে পরিণত হন। রামানুজ মতে এই বিশ্ব জগৎ জড় ও নৈতিক নিয়মের অধীন এবং ঈশ্বরের ইচ্ছায় চালিত। শঙ্কর বেদান্ত (অদ্বৈত) মতে ব্রহ্মাশ্রিত মায়া বা প্রকৃতি থেকে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। এই মতবাদে কখনো কখনো জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণও ঈশ্বর। অদ্বৈত বেদান্ত মতে জগৎ পূর্ণ সৎ নয় ; আবার অসৎও নয় ; একটি ব্যবহারিক সত্তাযুক্ত। এই জগৎ অনির্বচনীয়, মায়িক ও মিথ্যাভূত। এই মতবাদে ব্রহ্মকে বাদ দিলে জগতের কোন অস্তিত্ব থাকে না। শঙ্কর মতে জগৎ স্বপ্ন নয় ; নিয়মের অধীন ও

চকগুলি ঘটনা সমারোহের সুসংহত রূপ। এই সব ঘটনার পেছনে দেশ কাল ও রণের সংযুক্ত প্রভাব রয়েছে। শৈব দার্শনিক মতে স্থূলকে জগতের মূল কারণ ও ার বলে স্বীকার করা হয় ; প্রাত্যহিক জগৎ স্বয়ংসম্পূর্ণ, শাশ্বত সংবিদ্ বা স্থূলের র্ণ কালিক প্রকাশ। কাশ্মীরের শৈববাদ অনুসারে বিশ্বাত্মার ইচ্ছারূপ বৈশিষ্ট্যের স্থূল ভব্যক্তি থেকে বিশ্বের প্রকাশ। শৈব সিদ্ধান্তীদের মতে জগতের উপাদান কারণ য়া, জগৎ জড় বা অচিৎ।

ভারতীয় চিন্তায় দৃশ্যমান ভোগ্য জগতের ধারণার সঙ্গে কর্মবাদ অঙ্গাঙ্গিভাবে ড়ত। বিশ্ব জগৎকে নৈতিক বলা হয়েছে। জীব তার কর্মানুসারে দেহ, ইন্দ্রিয়াদি, রবেশ ও ভোগ্য দ্রব্য লাভ করে ও সংসার আবর্তে ঘুরে বেড়ায়। কর্মফল ভোগের ন্যই ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেন। দেশ ও কালের দিক থেকে জগৎ অনাদি। বিষ্ণু াণে ব্রহ্মাণ্ড হচ্ছে চতুর্দশ লোক ; ভূতল এদের মধ্যে একটি : এই লোকগুলির ধ্য কোটি কোটি যোজন দূরত্ব। লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মাণ্ড মিলে এই বিশ্বজগৎ।

জগৎগ্রাম—উত্তর প্রদেশে দেরাদুন জেলায়। খৃ ৩-শতকের কয়েকটি ইষ্টক নির্মিত শ্বমেধ চৈত্য পাওয়া গেছে। বহু ইঁটে লেখা আছে রাজা শীলবর্মা চারটি অশ্বমেধ জ্ঞ করেছিলেন।

জগৎ-সৃষ্টি—দ্রঃ- ব্রহ্মাণ্ড।

জগদ্দল—গঙ্গা ও করতোয়া সংগম স্থলে রামপালের (১০৭৭-১১২০) গড়ামহাচম্পা জধানী রামাবতীর একাংশে দ্বাদশ শতকের একটি বৌদ্ধ বিহার এই জগদ্দল। বৌদ্ধ স্কৃতির একটি অন্যতম পীঠস্থান হয়ে উঠেছিল। ভারত তিব্বত ইত্যাদির বহু ণ্ডিত এখানে মিলিত হতেন। মুসলমান আক্রমণে এটি ধ্বংস হলেও এর যশ বহু দিন

জগদ্ধাত্রী—দুর্গার এক মূর্তি। সিংহবাহিনী, চার হাত, রক্ত বস্ত্র, দেহে নানা অলংকার, হের রঙ অরুণ সূর্যের মত, সর্প এঁর যজ্ঞোপবীত, বাঁ হাতে শঙ্খ ও ধনুক, ডান হাতে চক্র পঞ্চবাণ। দেবীর পায়ের কাছে একটি হাতীর মাথা ; এটি করীন্দ্রাসুরের মাথা। ক বার অগ্নি, বায়ু, বরুণ, ও চন্দ্র এই চারজন ঠিক করেন তাঁরাই শ্রেষ্ঠ এবং তাঁরাই রমেশ্বর। এই অহঙ্কারের কথা শুনে দুর্গা কোটি সূর্যের মত জ্যোতির্ময়ী হয়ে এঁদের মনে এসে উপস্থিত হন। এঁরা ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে পবন দেবকে সামনে াঠিয়ে দেন। একটি তৃণ রেখে পবনকে জ্যোতির্ময়ী তুলতে বলেন কিন্তু বহু চেষ্টাতেও পবন পারেন না। এর পর অগ্নি এলে এটিকে পুড়িয়ে ফেলতে বলেন; াগ্নিও চেষ্টা করে অকৃতকার্য হন। চার জনই এইভাবে হেরে গিয়ে জ্যোতির্ময়ীর ারাধনা করতে থাকেন এবং ইনিই জগদ্ধাত্রী। কার্তিক শুক্লা নবমীতে এঁর পূজা য়। একই দিনে তিন পূজা বা কোথাও কোথাও দুর্গার মত তিন দিন পূজা হয়। ায়াতন্ত্রে ও তন্ত্রসারে দুর্গা প্রসঙ্গে এঁর কথা বলা হয়েছে। দুর্গার এক মূর্তি। কিংবদন্তী াজা কৃষ্ণচন্দ্র আলিবর্দির কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে মুর্শিদাবাদ থেকে নদীয়াতে আসেন। সেই বছর দুর্গাপূজা করতে না পারার জন্য রাজা অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে পড়েন। কিন্তু

দেবী জগদ্ধাত্রী মূর্তিতে দেখা দিয়ে কার্তিক শুক্লা নবমীতে পূজার নির্দেশ দেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র অন্তত এই পূজাকে জনপ্রিয় করেন। অবশ্য রঘুনন্দনের ২০০ বছর আগে শূলপাণি কালবিবেক গ্রন্থে (খৃ ১৫ শতক) কার্তিক মাসে জগদ্ধাত্রী পূজার উল্লেখ আছে।

জগন্নাথ—বিষ্ণু বা কৃষ্ণের অবতার। সারা ভারতবর্ষে পূজিত। উড়িষ্যায় পুরীতে এ'র মন্দির। জ্যৈষ্ঠে স্নানযাত্রায় ও আষাঢ়ে রথের সময় বিশেষ ভাবে পূজিত হন। স্নান যাত্রায় জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা তিন মূর্তিকেই স্নান করান হয়; রথ যাত্রায় এ'দের রথে তুলে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়।

যদুবংশ ধ্বংসের পর কৃষ্ণের মৃত্যু হলে তাঁর মৃতদেহ একটা গাছের নীচে পড়ে ছিল। এই সময়ে কয়েক জন ভক্ত কৃষ্ণের কয়েকটি অস্থি সংগ্রহ করে বাক্সে তুলে রাখেন। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন বিষ্ণু পূজা করবেন ঠিক করেন কিন্তু কি মূর্তির পূজা করবেন ভেবে পান না। বিষ্ণু এই সময়ে এসে ইন্দ্রদ্যুম্নকে (দ্রঃ) তাঁর সনাতন মূর্তি নির্মাণ করে মূতির মধ্যে কৃষ্ণের অস্থি রক্ষা করতে বলেন। বিশ্বকর্মা এই মূতি নির্মাণের ভার নিয়েছিলেন। সর্ত ছিল যত দিন না মূতি তৈরি শেষ হবে তত দিন যেন কেউ তাঁকে বিরক্ত না করেন। কিন্তু পনের দিন পরে রাজা অস্থির হয়ে পড়েন এবং কি রকম মূতি হল দেখবার জন্য এসে উপস্থিত হন। ফলে বিশ্বকর্মা রাগ করে অসম্পূর্ণ হাত-পা মূতি ফেলে রেখে চলে যান। ইন্দ্রদ্যুম্ন তখন ব্রহ্মার কাছে এর একটা বিহিত করার জন্য প্রার্থনা করলে ব্রহ্মা প্রীত হয়ে মূতির চক্ষু ও প্রাণ দান করে নিজে পুরোহিত হয়ে পূজা করেন।

পুরীর এই বর্তমান মন্দির অনুমান খৃ-১২ শতকের মাঝামাঝি তৈরি হয়েছিল। এ'দের মূতি নিম কাঠের। মাঝে মাঝে এই মূতি তিনটিকে সমাধিস্থ করে নতুন প্রতিমা স্থাপন করা হয় এবং পুরাতন বিগ্রহ থেকে কোন একটি পদার্থ নিয়ে নতুন মূতির মধ্যে রেখে দেওয়া হয়। পদার্থটি কি পুরোহিতও জানেন না; চোখে ও হাতে কাপড় ঢাকা দিয়ে পদার্থটিকে স্থানান্তরিত করা হয়।

প্রবাদ শবর বিশ্বাবসু নামে একজন অনার্য নীলাচলে নীলমাধবের পূজা করতেন। পরে এই নীলমাধব জগন্নাথে পরিণত হন। বিশ্বাবসু শবরের মেয়ের বংশের লোকেরা দইতাপতি নামে পরিচিত এবং এখনও জগন্নাথের বিশেষ বিশেষ সেবায় নিযুক্ত আছেন। পরে এই বিগ্রহ মাটিতে চাপা পড়ে যায় এবং রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন জগন্নাথ মূতির প্রতিষ্ঠা করেন। বহু মতে এই ত্রিমূতি বৌদ্ধ ত্রিরত্নের প্রতীক; ধর্মমঙ্গল ইত্যাদি সাহিত্যে জগন্নাথ ত্রিরত্নের প্রথম রত্ন। পরে ব্রাহ্মণ্য দেবতায় পরিণত। ওড়িশার লোক গীতিতে জগন্নাথ ও বুদ্ধ অভিন্ন। জয়দেব বুদ্ধদেবকে বিষ্ণুর নবম অবতার বলেছেন। ওড়িশা ও বাঙলার কোন কোন মন্দিরে বিষ্ণুর নবম অবতার হিসাবে জগন্নাথকে দেখা যায়। জগন্নাথকে নানা বেশ ভূষায় সাজিয়ে নানা উৎসব পালন করা হয়েছে এবং এখনও হয়। তাঁকে নাকি বুদ্ধ বেশেও সাজান হত জনশ্রুতি আছে। ধর্মমঙ্গল ইত্যাদি সাহিত্যে ধর্মঠাকুর উড়িষ্যাতে জগন্নাথ রূপে এবং গৌড়ে ধর্মঠাকুর রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

পুরীর মন্দিরে পীঠস্থান হিসাবে বিমলা দেবীর মন্দির আছে। শক্তি মূর্তি বিমলার ভৈরব জগন্নাথকে এখানে পঞ্চ মকারের বিকল্প নিত্য সেবায় নিবেদন করা হয়। শৈব ও শাক্ত মতে জগন্নাথ ভৈরব। ব্রহ্মপুরাণ ইত্যাদিতে জগন্নাথ ওঁ-কার মন্ত্র।

জটাধর—দেবাসুরের যুদ্ধে সাধ্য, রুদ্র, বসু ও পিতৃগণ কার্তিকেয়ের কাছে যে সব সেনাধ্যক্ষ পাঠান তাঁদের মধ্যে এক জন।

জটাপর্বত—জটাফাটকা ; দণ্ডকারণ্যে। এখানে গোদাবরীর উৎপত্তি।

জটায়ু—অরুণের স্ত্রী শ্যেনী ; দুই ছেলে বড় সম্পাতি ও ছোট জটায়ু। অন্য মতে মায়ের নাম মহাশ্বেতা। শ্যেনীও মহাশ্বেতা নামে পরিচিত। জটায়ু সমস্ত পাখীদের অধিপতি এই জন্য নাম পক্ষিরাজ। দশরথের বন্ধু। দুই ভাই ইন্দ্রকে জয় করবার জন্য আকাশ পথে এগিয়ে যেতে গিয়ে অন্য মতে সূর্যের দিকে যেতে গিয়ে দুপুরে সূর্যের তাপে জটায়ু অবসন্ন বা ঝলসে যাবার অবস্থা হলে সম্পাতি (দ্রঃ) নিজের ডানা দিয়ে এঁকে রক্ষা করেন। পঞ্চবটীতে রাম-লক্ষ্মণ-সীতা এলে জটায়ুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। জটায়ু এখানে সৃষ্টি তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন ও নিজের বংশ পরিচয় দেন এবং জটায়ু এই গহন বনে এঁদের সহায় হবেন ও সীতাকে রক্ষা করবেন কথা দেন। সীতাকে নিয়ে পালাবার সময় বনস্পতিগণ জটায়ুকে অনুরোধ করলে অবসুপ্ত জটায়ু (রা ৩।৫০।১) উঠে এসে রাবণকে বাধা দেন ; রাবণ বোঝাতে চেষ্টা করে। জটায়ুর বয়স তখন ষষ্ঠি বর্ষ সহস্রাণি ; এর পর যুদ্ধ হয়। রাবণের হাতে জটায়ুর ডানা কাটা যায় এবং মৃতপ্রায় হয়ে মাটিতে পড়ে যান।

সীতাকে খুঁজতে খুঁজতে রাম এঁকে দেখতে পেয়ে প্রথমে ভেবেছিলেন এই পাখীই সীতাকে খেয়ে ফেলেছে। রাম জটায়ুকে বধ করতে যান কিন্তু প্রকৃত ঘটনা জানতে পেরে নিরস্ত হন। রামকে খবর জানিয়ে জটায়ু মারা যান। রাম-লক্ষ্মণ তখন পিতৃসখা জটায়ুর সংকার করেন।

জটাসুর—একজন রাক্ষস, দুর্যোধনের বন্ধু, অলম্বুষের পিতা। পাণ্ডবদের বনবাসের সময়ে অর্জুন যখন স্বর্গে ছিলেন সেই সময়ে দ্রৌপদীর রূপে মুগ্ধ হয়ে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ বলে নিজের পরিচয় দিয়ে পাণ্ডবদের সঙ্গ নেয় এবং সুযোগ খুঁজতে থাকে। যুধিষ্ঠির সরল মনে আশ্রয় দেন। সৌগন্ধিক পদ্ম সংগ্রহের পরবর্তীকালে (মহা ৩।১৫৪।-) একদিন ভীম মৃগয়াতে গেলে এবং ঘটোৎকচ প্রভৃতি আশ্রমে না থাকাতে জটাসুর ভীষণ রূপ ধরে যুধিষ্ঠিরদের তিন ভাই ও দ্রৌপদীকে এবং পাণ্ডবদের অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে পালাতে চেষ্টা করে। সহদেব কোন মতে নিজেকে মুক্ত করে ভীমকে ডাকতে থাকেন। যুধিষ্ঠির বোঝাতে চেষ্টা করেন এবং শেষ অবধি ভারী হয়ে ওঠেন যাতে রাক্ষস দ্রুত পালাতে না পারে। ইতি মধ্যে ভীম এসে পড়েন এবং ভীমের সঙ্গে বাহু যুদ্ধে জটাসুর নিহত হয়। অরত্নিনা অভিহত্য ভীম মাথা ছিঁড়ে নেন (মহা ৩।১৫৪।৫৯)।

জটিলা—(১) জাবট গ্রামে গোল নামে এক গোপের স্ত্রী ; রাধিকার স্বামী অভিমন্যু বা আয়ানের মা। জটিলার আর এক ছেলের নাম দুর্মদ এবং একটি মেয়ে কুটিলা।

জটিলা কাকের মত কালো এবং বিরাট ভুঁড়ি ছিল। ইনি সাধ্য মত চেষ্টা করেছিলেন যাতে অভিমন্যুর প্রতি রাধিকার ভালবাসা জন্মায়। রাধিকার সখী ললিতা ও কুন্দলতাকেও কাতর অনুরোধ করেছিলেন রাধিকাকে বোঝাবার ও বাধা দেবার জন্য। (২) গৌতম বংশে একটি ধার্মিক মহিলা ; স্বামী সাত জন ঋষি (মহা ১।১৮৮।১৪)।

জটোদ্ভব—জটোদা। ব্রহ্মপুত্র শাখা। জলপাই ও কুচবিহার বিধৌত।

জঠর—দর্শন হিসাবে কপিল বোঝাতে থাকেন জঠরে শিশুদের টনটনে জ্ঞান থাকে। এই মতবাদ কি ভাবে গড়ে উঠল অস্পষ্ট, পরাশর ইত্যাদি বহু শিশুর এই ভাবে বর্ণনা রয়েছে।

জড়বাদ– চার্বাক দর্শনকে dogmatic জড়বাদ বলা চলে। চার্বাকদের মধ্যে দুটি সম্প্রদায় ঃ—প্রত্যক্ষ বাদী ও অনুমান বাদী। সম্প্রদায় হিসাবে এঁরা জড় থেকে চৈতন্যের উৎপত্তি বলেছেন। কোন অপ্রাকৃত সত্ত্বাকে বিশ্বাস করতেন না।

জড়ভরত—ঋষভ দেবের ছেলে ভরত (দ্রঃ, হরিণ হয়ে জন্মে মারা যান এবং তারপর এক ব্রাহ্মণের দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে জাতিস্মর হয়ে জন্মান এবং যাতে আর অধোগতি না হয় সেই জন্য সম্পূর্ণ অনাসক্ত ভাবে জীবন কাটাতে থাকেন। জড়-বুদ্ধি উন্মত্তের মত থাকতেন, জড়িত স্বরে কথা বলতেন এবং কাজ কর্মে বিমুখ ছিলেন বলে জড়ভরত নামে পরিচিত হন। এই অবস্থা হলেও শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান ছিল। ব্রাহ্মণের প্রথমা স্ত্রীর নয়টি ছেলে। ব্রাহ্মণ মারা গেলে দ্বিতীয়া স্ত্রী সহমৃতা হন ; এবং ভরত সৎ-ভাইদের হাতে দাসে পরিণত হন। এক দিন মধ্য রাত্রে ভাইদের ক্ষেত পাহারা দিচ্ছেন এমন সময় দেখেন কাছেই চণ্ডালরা উৎসব করছে নরবলি দেবে। নরবলির মানুষটি কিন্তু সুযোগ মত পালিয়ে যায়। চণ্ডালরা ব্যস্ত হয়ে খুঁজতে খুঁজতে ভরতকে পেয়ে ধরে নিয়ে যায়। কিন্তু কালী বিগ্রহের সামনে এই দৃপ্ততেজ ভরতকে নিয়ে এলে দেবী ক্রুদ্ধ হয়ে চণ্ডালদের খেয়ে ফেলেন। ভরত মুক্তি পেয়ে ঘুরতে ঘুরতে এক রাজ্যে আসেন। জড়বুদ্ধি দেখে এখানেও লোকে তাঁকে অপমান করত এবং খেতে দিয়ে নানা কাজ করিয়ে নিত। এখানে এক দিন সিন্ধু সৌবীরপতি রহূগণ এঁকে বলিষ্ঠ দেখে শিবিকা বহন করতে বাধ্য করেন। ইক্ষুমতী নদীর ধার দিয়ে রাজা কপিল মুনির সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন। জীব হিংসার ভয়ে ভরত সাবধানে পা ফেলে এগিয়ে চলতে থাকেন ফলে গতি ব্যাহত হতে থাকে এবং ঝাঁকানি লাগতে থাকে। রাজা প্রথমে উপহাস (ভাগ ৫।১০), তারপর তীব্র ভৎ'সনা করলে অন্য মতে শাস্তি দেবার ভয় দেখালে ভরত হেসে রহূগণের প্রতিটি কথা অবলম্বনে দর্শন ও পরমার্থ তত্ত্ব নিয়ে নানা উপদেশ দিতে থাকেন। রাজা বিস্মিত হয়ে ভরতকে ব্রহ্মজ্ঞ বলে বুঝতে পেরে পায়ে পড়ে ক্ষমা চেয়ে নেন। ভরত বিষ্ণুর স্তব করতে করতে বনে চলে যান। জড় ভরত শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে সেই জন্মেই মোক্ষ লাভ করেন (ভাগ ৫।-।)।

ভাগবতে (৫।৯) আঙ্গিরস নামে ব্রাহ্মণের ছেলে। সন্তান কামনায় এক শূদ্র দলপতি পূজা করছিল ; দলপতি জড়ভরতকে ধরে। ভদ্রকালী এদের নিহত করে সানুচরী রক্ত পান করেন। জড়ভরত সব সময়ই অবিচলিত ও নিস্পৃহ ছিলেন।

জতুগৃহ—লাক্ষা, ধুনা ইত্যাদি দাহ্য পদার্থ দিয়ে বারণাবতে এক বাড়ি তৈরি করিয়ে দুর্যোধন পিতার অনুমতি নিয়ে মন্ত্রী পুরোচনকে সঙ্গে দিয়ে এখানে পাণ্ডবদের পাঠান। বিদুর ও অন্য কিছু লোক কিছুটা অনুগমন করেন। পাণ্ডবদের ধৃতরাষ্ট্র তাড়াচ্ছেন বলে (মহা ১।১৩৩।-) বহু লোকে নিন্দা করেন। সাধারণ লোকের ভিড় কমলেই ভীষ্ম ও কিছু পৌরজনের সামনেই বিদুর প্রহেলিকা ভাষায় জানিয়ে দেন বারণাবতে আগুনের ভয় আছে (মহা ১।১৩৪।২৫)। এ'রা অষ্টমে অহনি রোহিণ্যাং প্রয়াতাঃ ফল্গুনস্য তে (মহা ১।১৩৩।৩০)। ঠিক ছিল সুযোগ মত পুরোচন এখানে আগুন দিয়ে এদের হত্যা করবেন। বারণাবতে এসে পেঁছিলে স্থানীয় প্রজারা বিপুল সম্বর্দ্ধনা জানান। পুরোচনও বিপুল ভাবে অভ্যর্থনা করেন। দশরাত পুরোচনের আবাসে কাটিয়ে শিব নামে (মহা ১।১৩৪।১১) নব নির্মিত জতুগৃহে আসেন। এখানে এসেই যুধিষ্ঠির বুঝতে পারেন এবং ভীমকে জানান। ভীম তখনই পালাতে চান। যুধিষ্ঠির ধৈর্য ধরতে বলেন ; পুরোচন সরাসরি কিছু করে বসতে পারেন ; এবং ঠিক করেন সেই দিন থেকেই সুড়ঙ্গ কাটবেন। এরপর বিদুরের পাঠান খনক আসে গোপনে ; কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশী রাত্রিতে আগুন দেবে (মহা ১।১৩৫।৪) জানায়। সুড়ঙ্গ কাটা হয়।

এক বৎসর এই ভাবে কেটে যায়। পাণ্ডবরা দিনের বেলায় মৃগয়া ছলে পথ ঘাটের সঙ্গে পরিচিত হতে থাকেন ; রাত্রিতে জেগে সশস্ত্র অবস্থান করেন। পুরোচন ভাবেন পাণ্ডবরা তাকে বিশ্বাস করে ইত্যাদি। যুধিষ্ঠির এদিকে ভাইদের জানান পালাবার সময় এসেছে ; এখানে কয়েকটা মৃতদেহ ফেলে রেখে যেতে চান। কুন্তী একদিন গরিবদের দান করেন ও রাত্রিতে ব্রাহ্মণ ভোজন করান। পঞ্চপুত্রসহ এক নিষাদীও খেতে আসে ; এরা মদ খেয়ে বিহ্বল অবস্থায় ছিল। এখানেই ঘুমিয়ে পড়ে। রাত্রিতে পুরোচন যেখানে ঘুমচ্ছিলেন ভীম প্রথমে সেইখানে পরে বাড়িতে সর্বত্র আগুন দিয়ে সুড়ঙ্গ পথে সকলে বার হয়ে যান। দেবী ভাগবতে (২।৭।২৯) ভীম যুধিষ্ঠিরকে না জানিয়ে আগুন দিয়েছিলেন।

আগুন জ্বলে উঠলে পৌরজনরা ছুটে আসে ; ধৃতরাষ্ট্রকে দোষ দিতে থাকে ; পুরোচন পুড়ে মরেছে ধরে নিয়ে সন্তুষ্ট হয় : চারদিকে সকলে ঘিরে অবস্থান করে। রাত্রিশেষে নগরবাসীরা সকলে (মহা ১।১৩৭।-) আসে ; জল দিয়ে আগুন নেবায় ; সাতটি মৃতদেহ দেখতে পায় ; বিদুর ইত্যাদি সকলকে দায়ী করতে থাকে এবং হস্তিনাপুরে খবর পাঠায়। সুড়ঙ্গ থেকে বার হয়ে পাণ্ডবরা গঙ্গাতে বিদুরের পাঠান নৌকা করে ওপারে পালিয়ে যান। যত দিন পাণ্ডবেরা এ বাড়িতে ছিলেন তত দিন রাত্রি বেলা পুরোচনের অজ্ঞাতে এই সুড়ঙ্গের মধ্যে কাটাতেন। পাণ্ডবরাই মারা গেছেন এই সংবাদ অনুসারে ধৃতরাষ্ট্র এ'দের শ্রাদ্ধশান্তিও করেছিলেন।

জনক—ইক্ষ্বাকু(১)—নিমি(২)—মিথি(৩) মিথিলার প্রতিষ্ঠাতা—উদাবসু(৪)—নন্দিবর্দ্ধন(৫)—সুকেতু(৬)—দেবরাত(৭)—বৃহদ্রথ(৮)—মহাবীর(৯)—সুধৃতি(১০)—ধৃষ্টকেতু (১১)—হর্যশ্ব(১২)—মরু(১৩)—প্রতীন্ধক(১৪)—কীর্তিরথ(১৫)—দেবমীঢ়(১৬)—বিবুধ (১৭)—মহীধ্রক(১৮)—কীর্তিরাত(১৯)—মহারোমা(২০)—স্বর্ণরোমা(২১)—হ্রস্বরোমা

(২২)—সীরধ্বজ=জনক(২৩) ও কুশধ্বজ (রা ১।৭১।-)। ভাগবতে (৯।১৩) মহাবীর্য (৯), প্রতীক(১৪), কৃতরথ(১৫), বিশ্রুত(১৭), মহাধৃতি(১৮), কৃতিরাত(১৯)।

ভাগবতে সীরধ্বজ>কুশধ্বজ>ধর্মধ্বজ>কৃতধ্বজ ও মিতধ্বজ। কৃতধ্বজ> কেশিধ্বজ এবং মিতধ্বজ>খাণ্ডিক্য। কেশিধ্বজ আত্মতত্ত্বে এবং খাণ্ডিক্য কর্মতত্ত্বে পারদর্শী। কেশিধ্বজের ভয়ে খাণ্ডিক্য পালিয়ে যান। কেশিধ্বজ>ভানুমান> শতদ্যুম্ন>শুচি>সনদ্বাজ>ঊর্দ্ধকেতু>অজ ইত্যাদি (ভাগ ৯।১২।-)। দ্রঃ- জনকবংশ।

জনক এই বংশে সব রাজার উপাধি/নাম। নিমির দেহ মন্থন করে মিথি নামে এক ছেলে হয়। বিচেতন দেহ থেকে জন্ম বলে বিদেহ। মিথির রাজ্যের নাম মিথিলা। রামায়ণে মিথির ছেলে প্রথম জনক, এই জনকের ছেলে উদাবসু। জনক হ্রস্বরোমার ছেলে জনক সীরধ্বজ। ক্রমশঃ দেশের নাম হয় বিদেহ এবং রাজধানী মিথিলা বলে পরিচিত হয়। জনক সীরধ্বজের ভাই কুশধ্বজ। জনক সীরধ্বজ যজ্ঞ করবার জন্য এক দিন লাঙ্গল দিচ্ছিলেন এই সময় লাঙ্গলের ফলাতে একটি মেয়ে উঠে আসে। সীরধ্বজ (দ্রঃ) নাম রাখেন সীতা এবং পালন করে বড় হলে এঁকে বীর্যশুল্কা বলে ঘোষণা করেন। হরধনুতে যে গুণ লাগাতে পারবে তার সঙ্গে বিয়ে দেবেন। বহু রাজা আসেন এবং ফিরে যান। প্রত্যাখ্যাত রাজারা মিলিত হয়ে মিথিলা আক্রমণ করেন। জনক এক বৎসর মত ঠেকিয়ে রাখেন এবং দুর্বল হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত তপস্যা করে দেবতাদের কাছে চতুরঙ্গ (রা ১।১৮) বল লাভ করে পরাজিত করেন। সুধন্বার (দ্রঃ) সঙ্গেও এই কারণে যুদ্ধ হয়েছিল। সীতা (২।১১৮।৪২) বলেছেন জনক সমবায়ে সীতাকে বীর্যশুল্কা ঘোষণা করেন এবং রাজারা ধনুক দেখে পালায়। রাম (দ্রঃ) ধনুক ভাঙলে জনক বিয়ের জন্য দশরথকে আনান। দশরথ এলে পরদিন কুশধ্বজকে (১।৭০।৩) সাংকাশ্যা থেকে আনান এবং তারপর সভাতে জনক বংশের পরিচয় দিয়ে বিয়ের জন্য মঙ্গল কার্যগুলি করতে দশরথকে অনুরোধ করেন এবং বলেন, আজ মঘা; তৃতীয় দিনে উত্তর ফল্গুনী, সেই দিনে বিয়ের ব্যবস্থা হক (১।৭১।২৪)।

সীতার অনুজা ঊর্মিলার সঙ্গে লক্ষ্মণের বিয়ে হয়। এই সীরধ্বজ জনক শেষ বয়সে সন্ন্যাসী হয়ে যান। কালিকা পুরাণে দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞের খবর শুনে নিজের চার স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে যজ্ঞ করে (৩৭।১২) দুটি ছেলে হয়। তারপর নারদ ইত্যাদির পরামর্শে যজ্ঞভূমি কর্ষণ করে সীতাকে লাভ করেন। পৃথিবী এই সময় জানিয়ে যান সীতার কারণে রাবণ ইত্যাদি মারা যাবে এবং রাবণ মারা গেলে পৃথিবী আর একটি ছেলে দিয়ে যাবেন। জনককে দিয়ে শপথ করিয়ে নেন জনক যেন এই শিশুকে পালন করেন। এই শিশু নরক (দ্রঃ)।

এক জন জনক এক বার যোগবলে নিজের দেহ ত্যাগ করেন এবং বিমানে করে দেবলোকে যাবার পথে যমালয়ে নীত হন। জনকের দেহের বায়ু নিঃশ্বাস নিয়ে এখানে নরকে পাপীরা যন্ত্রণা থেকে একটু আরাম পায়। জনক তার পর এখান থেকে চলে যেতে গেলে পাপীরা জনকের কাছে প্রার্থনা করে, এখানে থাকতে বলে, তাহলে তাদের নরক ভোগ কিছুটা লাঘব হবে। জনক পাপীদের কথা চিন্তা করে যমপুরীতেই

থাকবেন স্থির করেন। সেই সময়ে যম এসে জনককে সেখানে দেখে বিস্মিত হয়ে যান এবং এখান থেকে জনককে ফিরে যেতে বলেন। জনক পাপীদের মুক্তি চান, তবে তিনি যাবেন। যম তখন সেখানে প্রতিটি পাপীর পাপ জীবনের পরিচয় দিতে থাকেন। শেষ অবধি ঠিক হয় জনক যদি তাঁর পুণ্য দান করেন তবেই এরা মুক্তি পাবে। জনক এক দিন সকালে উঠে রাম নাম জপ করেছিলেন, সেই পুণ্য দান করেন, পাপীরা মুক্তি পায়। জনক তখন তাঁর নিজের কথা জিজ্ঞাসা করেন; যম বলেন জনক এক বার একটি গাভীকে ঘাস খেতে বাধা দিয়েছিলেন সেই কারণে এখানে সাময়িক এক বার এসেছেন। এক জন জনকের শাস্ত্রগুরু ছিলেন সাংখ্যাচার্য পঞ্চশিখ; মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হবার পন্থা এঁ'র সঙ্গে এই জনক আলোচনা করেন এবং এঁ'র উপদেশে বহু সংশয় জয় করেন। শুকদেব এক বার ভাগবত পাঠ করে স্থানে স্থানে বুঝতে না পেরে জনকের কাছে এসে এই সব ব্যাখ্যা জেনে নেন এবং মোক্ষশাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করেন। ব্যাসদেব নিজেও এই সব ব্যাখ্যা জানতেন না; তাই ছেলেকে এঁ'র কাছে পাঠিয়েছিলেন। জনক ধর্মধ্বজকে সুলভা (দ্রঃ) নামে এক বিদুষী মহিলা পরীক্ষার জন্য সুন্দরী নারী সেজে আসেন; ব্রহ্মচারিণী সুলভার সঙ্গে মোক্ষ তত্ত্ব ও নানা শাস্ত্র আলোচনা হয়েছিল। সুলভা সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যান। যাজ্ঞবল্ক্য ইত্যাদি ঋষিরা প্রায়ই এক জনকের সভায় আসতেন। দেবরাত জনকের ছেলে বসুমান জনক (মহা ১২।২৯৮।-) যাজ্ঞবল্ক্যকে বহু প্রশ্ন করেছিলেন। দেবরাত জনক হরধনু (দ্রঃ) লাভ করেছিলেন। এক জনক ও রাজা প্রতর্দনের সঙ্গে যুদ্ধে জনকের সৈন্যরা ভয়ে দাঁড়িয়ে পড়লে জনক নিজের সৈন্যদের স্বর্গ ও নরকের দৃশ্য দেখিয়ে যুদ্ধে প্ররোচিত করেন (মহা ১২।১০০।-)। এক জন জনকের কাছে ক্ষেমদর্শী যখন হেরে যাচ্ছিলেন তখন কালকবৃক্ষীয়ের (দ্রঃ) পরামর্শে জনকের মেয়েকে বিয়ে করে ক্ষেমদর্শী সন্ধি করেন (মহা ১২।১০৭।২৭)। এক জনক ও মাণ্ডব্য তৃষ্ণা সম্বন্ধে বহু আলোচনা করেছিলেন (মহা ১২।২৬৮।১)। এক জন জনক পরাশরের সঙ্গে সমৃদ্ধি লাভের বিষয় আলোচনা করেন (মহা ১২।২৮৭।১)। অশ্মা নামে এক ব্রাহ্মণ এক জনককে কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন (মহা ১২।২৮।-)। ভীমসেন এক জনককে (মহা ২।২৭।১২) পরাজিত করেছিলেন। করাল জনক, জনদেব জনক ইত্যাদি নামও পাওয়া যায়। দ্রঃ- কহোড়, অষ্টাবক্র। জনকেরা সকলেই বিদ্বান, বিদ্যোৎসাহী, ব্রহ্মবিদ ও জীবন্মুক্ত রাজর্ষি। এই জনকগুলি সকলেই যে বিভিন্ন ব্যক্তি সে রকম বিশেষ কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় না।

জনকবংশ—ইক্ষ্বাকু বংশের একটি শাখা। বিষ্ণু পুরাণ মতে এই বংশে ৫৬ জন এবং ভাগবত মতে ৫৩ জন রাজা জন্মেছিলেন। দ্রঃ-জনক।

জন-লোক—ধ্রুবপদ লোক থেকে তিন কোটি যোজন দূরে অবস্থিত।

জন-স্থান—রামায়ণে দণ্ডকারণ্যের একটি অংশ। ঔরঙ্গাবাদ এবং গোদাবরী ও কৃষ্ণার মধ্যগত অংশ। পঞ্চবটী বা নাসিক এই জনস্থানে। মতান্তরে গোদাবরীর দুই তীর মিলে জনস্থান। বা গোদাবরী ও প্রণহিতা বা ওয়েন গঙ্গার সঙ্গম স্থানের চার পাশে দেশ। রাম, লক্ষ্মণ, সীতা এখানে বাস করেছিলেন। এখানে শূর্পণখার নাক কাণ

কাটা যায়। খরদূষণ ত্রিশিরা এখানে নিহত হন এবং এখান থেকেই সীতা চুরি যান। দ্রঃ- দণ্ডকারণ্য।

জনা—মাহিষ্মতী-রাজ নীল/নীলধ্বজের স্ত্রী। অত্যন্ত গঙ্গা ভক্ত এবং গঙ্গার বরে শিবের এক অনুচর জনার গর্ভে প্রবীর নামে জন্মান। জনার মেয়ে স্বাহা/সুদর্শনা (দ্রঃ- নীল)। পাণ্ডবদের অশ্বমেধের ঘোড়া এলে প্রবীর এই ঘোড়া আটকান। নীল-ধ্বজ ঘোড়া ছেড়ে দিতে বলেন ; কিন্তু জনা প্রবীরকে যুদ্ধে পাঠান। কৃষ্ণের সাহায্যে অতিকষ্টে পাণ্ডবরা জয়লাভ করেন ; প্রবীর মারা যান। যুদ্ধের শেষে অগ্নির পরামর্শে নীলধ্বজ অর্জুনের সঙ্গে সন্ধি করলে জনা স্বামীকে তীব্র ভৎ'সনা করে ভাইয়ের কাছে সাহায্য চান। ভাই সাহায্য করতে রাজি না হলে জনা নিজেই যুদ্ধে আসেন এবং জনার তেজে সকলে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে থাকে। কৃষ্ণের চেষ্টায় বহু কষ্টে পাণ্ডবরা রক্ষা পান। পুত্রশোকে জনা গঙ্গায় আত্মহত্যা করেন। জৈমিনী ভারতে জনার নাম জ্বালা এবং আগুনে আত্মহত্যা করেন এবং অর্জুনের ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্য ভয়ঙ্কর বাণরূপে বভ্রুবাহনের তূণে আশ্রয় নেন (দ্রঃ- নীল)।

জন্মান্তরবাদ—মৃত্যুর পর জীবের আবার জন্ম। ভারতীয় চিন্তাধারার বিশেষ একটি সর্বগ্রাসী মতবাদ। এক মাত্র চার্বাক জড়বাদীরা স্বীকার করেন না ; আত্মা ও পরলোক এ'রা কিছুই মানেন না। জন্মান্তর বাদের উর্বর মাটিতে জাতিস্মর শব্দটির জন্ম।

ন্যায় বৈশেষিক মতে আত্মার একটি গুণ অদৃষ্ট এবং এই অদৃষ্ট দ্বারাই নতুন দেহ ধারণ করা (উপসর্পণ) নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রারব্ধ শেষ হলে আত্মার মুক্তি আসে। সাংখ্য যোগ-সম্প্রদায় মতে বিবেক জ্ঞান উদয় হবার পূর্বে জীব বার বার জন্ম নেয়। কৃত-কর্মের জন্য বার বার বিভিন্ন জীব রূপে এই জন্ম হতে পারে। মীমাংসক মতে জীব যথাসময় উপযুক্ত শরীর পায়। এই জীবকে স্বর্গ লাভের আগে পর্যন্ত কর্ম অনুসারে বিভিন্ন জন্মের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। ভৃগু গণনাতেও জন্মান্তর বাদ স্বীকৃত।

শৈব ও শাক্তরাও সকলেই, জন্মান্তরবাদী। জন্মের ক্রম অনুসারে জীব বিভিন্ন অবস্থার ও দেহান্তরের মধ্য দিয়ে মুক্তির দিকে এগিয়ে চলে। স্থূলদেহ বিশিষ্ট সংসার বদ্ধ জীবকে স-কল জীব বলা হয়। দেহ বিহীন দ্বিতীয় দশা প্রলয়কল ; এটি কর্ম, সংস্কার ও মূল অবিদ্যাযুক্ত অশরীরী অণু। তৃতীয় অবস্থা বিজ্ঞান-কল ; এটি কৈবল্যদশা।

জৈনরাও জন্মান্তর বাদী। জৈন মতে দেহ পুদ্গল সৃষ্ট। অতীত জীবনের কর্ম, ভাবনা, ও বাক্য আত্মাতে এক অন্ধ আবেগের সৃষ্টি করে এবং এই আত্মা তখন বিশেষ বিশেষ দেহ ধারণের উপযোগী বিশেষ বিশেষ পুদ্গল আকর্ষণ করে। জন্ম, জাতি, কুল ও স্বভাব জৈন মতে সবই কর্ম নির্দ্ধারিত। জৈন তীর্থংকররা জাতিস্মর ছিলেন। বৌদ্ধরা আত্মার স্থায়ী সত্তা স্বীকার না করলেও জন্মান্তরবাদী। বৌদ্ধ মতে কর্মভোগের জন্য জীব বার বার জন্মায়। ভগবান বুদ্ধ নিজের কর্ম ও পুনর্জন্ম স্বীকার করেছেন ; জাতকে তাঁর পূর্ব জন্মগুলির বৃত্তান্ত রয়েছে।

পৃথিবীর সমস্ত জীবকে এক সূত্রে বাঁধবার জন্য আর্য ঋষিদের কল্পিত এই

জন্মান্তর বাদ। পলায়নী বৃত্তির এটি রঙীন ফানুস। কর্মফল ও জন্মান্তর বাদ মিলিয়ে জীবনের বালক সুলভ ব্যাখ্যা চিত্তচমৎকারী। এই মতবাদ সমাজের নৈতিক উন্নতির জন্য কিছুটা হয়তো সাহায্য করেছিল ; ক্ষতি করেছিল অপরিসীম। ভগবানকে/ ঈশ্বরকে সব সময়ে এবং সব দিক থেকে মঙ্গলময় করে রাখার চেষ্টাতেও কর্মবাদের জন্ম।

জন্মাষ্টমী—কৃষ্ণের (দ্রঃ) জন্মতিথি। এ দিন কৃষ্ণের পূজা ও উৎসব হয়। বৈষ্ণবদের ও গোয়ালাদের এটি আনন্দের দিন।

জন্মেঞ্জয়—বা জনমেজয়। অভিমন্যু >পরিক্ষিত> জন্মেঞ্জয়। জন্মেঞ্জয়ের আরো ভাই উগ্রসেন, ভীমসেন ও শ্রুতসেন (মহা ১।৩।১) ; মা মাদ্রবতী/মাদ্রী। পরিক্ষিতের মৃত্যুর পর মন্ত্রীরাই রাজার শেষকৃত্য করেন এবং রাজপুরোহিত ও মন্ত্রীরা এঁকে ১১ বছর বয়সে সিংহাসনে বসান। মন্ত্রী ও পুরোহিতরা রাজকার্য চালাতে থাকেন। দেবী ভাগবতেও (২।১১।-) শিশুকে রাজা করা হয়। ১১ বৎসর বয়সে কুল পুরোহিতরা উপনয়ন দেন। কাশীরাজ সুবর্ণবর্মার (দেবী ভাগবত সুবর্ণবর্মাক্ষ) মেয়ে বপুষ্টমার সঙ্গে বিয়ে হয় : ছেলে শতানীক (দ্রঃ) ও শঙ্কু (মহা ১।৭০।৯৪)। শঙ্কুর ছেলে শঙ্কুকর্ণ। দ্বিতীয় স্ত্রী কাশ্যার দুই ছেলে চন্দ্রাপীড় ও সূর্যাপীড়। সূর্যাপীড়ের (হরিবংশ ৩।১; চন্দ্রাপীড়ের) এক শত ধনুর্দ্ধর ছেলে ; বড় ছেলে সত্যকর্ণ জন্মেঞ্জয়ের পর রাজা হন। সত্যকর্ণের ছেলে শ্বেতকর্ণ (দ্রঃ)। জন্মেঞ্জয় কৃপাচার্যের (দ্রঃ) কাছে ধনুর্বিদ্যা লাভ করেন।

জন্মেঞ্জয় এক বার ভাইদের সঙ্গে মিলে কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ করছিলেন : এই সময় অদৃষ্ট ভয় (দ্রঃ) শাপ গ্রস্ত হন। এরপর এই শাপ মুক্তির জন্য শ্রুতশ্রবা (দ্রঃ) পুত্র সোমশ্রবাকে হস্তিনাপুরে আনেন যজ্ঞ করবেন বলে এবং ভাইদের ওপর দায়িত্ব দিয়ে তক্ষশিলা আক্রমণ করতে যান (মহা ১।৩।৮১)। তক্ষশিলার রাজাকে ও তাঁর রাজ্য জয় করে নেন। জন্মেঞ্জয়ের উপাধ্যায় ছিলেন বেদ (মহা ১।৩ ৮৫)। এই বেদের শিষ্য উতঙ্ক তক্ষকের ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্য তক্ষশিলা থেকে ফিরলে জন্মেঞ্জয়কে প্ররোচিত করেছিলেন। ফলে সর্পযজ্ঞ। সর্পযজ্ঞে রাজা ও উতঙ্ক দুজনের প্রতিহিংসা চরিতার্থ হতে যাচ্ছিল। দেবী ভাগবতে (২।১১।২২ ৪৫) জন্মেঞ্জয়ের বিয়ের পর উতঙ্ক এসেছিলেন ; অশ্বযজ্ঞ নামে যজ্ঞ হয় ; উতঙ্ক হোতা, তক্ষক পশু। মহাভারতে পুরোহিত, ঋত্বিক, উতঙ্ক ইত্যাদি সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে সর্পনাশের জন্য তক্ষশিলাতে সর্পসত্র যজ্ঞ করেন। যজ্ঞে যখন দীক্ষা নিচ্ছেলেন তখন নানা অশুভ লক্ষণ দেখা দিতে থাকে : মুনিরা জানান এক ব্রাহ্মণ এসে এই যজ্ঞ পূর্ণ হতে দেবেন না। অন্য মতে যজ্ঞ ভূমি যখন মাপা হচ্ছিল তখন সূত নামে এক পুরাণ কথক ভবিষ্যৎবাণী করেন। ফলে রাজা কঠোর ব্যবস্থা করেন যজ্ঞস্থলে যেন কোন অপরিচিত ব্রাহ্মণ আসতে না পায়। যজ্ঞে ঋত্বিক ছিলেন অসিত, আত্রেয়, উতঙ্ক, উদ্দালক, কুণ্ডিবট, কহোড়, কুণ্ডজঠর, কৌৎস, চণ্ডভার্গব, জৈমিনি, দেবল, দেবশর্মা, নারদ, পর্বত, পিঙ্গল, প্রমত্তক, ব্যাস, বাৎস্য, মৌদ্গল্য, শার্ঙ্গরব, শ্বেতকেতু, শ্রুতশ্রবা, সমসৌরভ (মহা ১।৪৮।৮)। আহুতি দিলে বহু সাপ এসে আগুনে মারা পড়তে থাকে। তক্ষক ফলে ইন্দ্রের কাছে শরণ নেন। এ দিকে বাসুকিও ক্রমশ মন্ত্রের বশীভূত হয়ে পড়তে থাকেন এবং বোন

জরৎকারুকে বলেন আস্তীককে পাঠাতে। আস্তীক এসে নানা স্তবস্তুতি করে জন্মেজয়ের কাছে বর চান। কিন্তু পারিষদ ও হোতারা রাজাকে নিবারিত করেন। তক্ষক আসছেন না দেখে উত্তঙ্ক দিব্যচক্ষে দেখেন তক্ষক ইন্দ্রের কাছে আশ্রয় নিয়েছেন। ঋত্বিকরা তখন ইন্দ্র, ইন্দ্রের সিংহাসন ও তক্ষক তিন জনকেই আহুতি দেবার জন্য মন্ত্র পাঠ করেন। মন্ত্রের বলে সিংহাসন সমেত ইন্দ্র ও তক্ষক এগিয়ে আসতে থাকেন। আর এক মতে তক্ষক আসছেন না দেখে ঋত্বিকরা ইন্দ্রকে আহ্বান করেন ; ইন্দ্র আসতে বাধ্য হন ; তক্ষক ইন্দ্রের উত্তরীয়ের মধ্যে লুকিয়ে থাকেন। জন্মেজয় তখন ইন্দ্রকেও আহুতি দিতে বলেন ফলে ইন্দ্র তক্ষককে ফেলে রেখে পালিয়ে যান এবং তক্ষক আগুনের দিকে এগিয়ে আসতে বাধ্য হন। ঋত্বিকরা তখন যজ্ঞ সফল হয়েছে মনে করে রাজাকে অনুমতি দেন আস্তীককে বর দিতে। আস্তীক তখন সুযোগ পেয়ে তিষ্ঠ বলে তক্ষককে দাঁড় করিয়ে দিয়ে রাজাকে যজ্ঞ থেকে নিবৃত্ত হবার বর চান। রাজা প্রথমে অসম্মত হলেও সকলের অনুরোধে আস্তিককে বর দিয়ে যজ্ঞে নিবৃত্ত হন। এই ভাবে তক্ষক ও অবশিষ্ট সাপেরা বেঁচে যায় (মহা ১।৫১।১৫)। দ্রঃ- জরৎকারু। এর পর জন্মেজয় কলিযুগে নিষিদ্ধ অশ্বমেধ যজ্ঞের ব্যবস্থা করেন। দ্রঃ বপুষ্টমা। যজ্ঞস্থানে কোন কারণে এক ব্রাহ্মণ কুমারকে জন্মেজয় সর্পে পরিণত করে দেন এবং সাপটি তার পর নিহত হয়। এই ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্তের জন্য ব্যাসের শিষ্য বৈশম্পায়ন মহাভারত পাঠ করে শুনিয়ে রাজাকে পাপ মুক্ত করেন। মহাভারতে (১।৫৪।২২) সর্প যজ্ঞের সময় ব্যাস জন্মেজয়ের অনুরোধে মহাভারত কাহিনী শোনান। মহানির্বাণ তন্ত্রে পৃ ৮৭০ মহাভারত কাহিনী শুনতে শুনতে জন্মেজয়ের কৃষ্ণবর্ণ চন্দ্রাতপ শ্বেতবর্ণ হয়ে যায়। দেবী ভাগবতে মহাভারত শুনেও শান্তি পান না। ব্যাস তখন দেবী ভাগবত শোনান। হরিবংশে সর্পযজ্ঞের পর মহাভারত শোনেন। অশ্বমেধের সময় জন্মেজয়ের অনুরোধে ব্যাস পরিক্ষিৎকে স্বর্গ থেকে নিয়ে এসে দেখান। শমীক ও শৃঙ্গীকেও এই সময় স্বর্গ থেকে আনিয়েছিলেন (মহা ১৫।৪৩।৭)।

একটি মতে ৩১৩৮ খৃ-পৃ কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ হয়েছিল। পাণ্ডবরা তার পর ৩৬ বছর রাজত্ব করে মহাপ্রস্থানে যান। পরিক্ষিৎ ৬০ বছর রাজত্ব করেছিলেন। অর্থাৎ ৩০৪২ খৃ-পৃ জন্মেজয় যেন রাজা হন। (২) মান্ধাতার হাতে পরাজিত এক রাজা (কা-প্র ৭ ৬২।-); ইনি যমের এক জন সভাসদ। (৩) ক্রোধবশ অসুর জন্মেজয় নামে এক ক্ষত্রিয় রাজা হয়ে জন্মান ; পার্বতীয় মহাযোধী (মহা ৮।৪।৭০); ধৃতরাষ্ট্রের ছেলে দুর্মুখের হাতে নিহত হন। (৪) তপতীপুত্র (১।৮৯।৪৪) কুরুর স্ত্রী বাহিনীর এক ছেলে রাজা জন্মেজয়। এই জন্মেজয়ের এক ভাই অভিষন্। অভিষনের ছেলের নাম পরিক্ষিত>জনমেজয় ইত্যাদি সাত ছেলে (মহা ১।৮৯।৪৭)। জন্মেজয়ের ছেলে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, বাহ্লীক, নিষধ, জাম্বুনদ, কুণ্ডোদর, পদাতি ও বর্ষাতি। ধৃতরাষ্ট্র বড় (মহা ১।৮৯।৪৯)। (৫) পরিক্ষিত বংশে এক রাজা ; এঁর ছেলে ধৃতরাষ্ট্র ; ইনি এক বার ব্রহ্মহত্যা করে বসেন এবং পাপ মোচনের জন্য শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রোত মুনিকে দিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ করান (মহা ১২।১৪৬।২)। (৬) শর্মিষ্ঠা পুত্র পুরু ও কৌশল্যার ছেলে ; স্ত্রী অনন্তা ; জনৈকা

মাধবী : ছেলে প্রাচিম্বান্ (মহা ১৷৯০৷১২)। (৮) রাজা (একজন পাঞ্চালরাজ ; মহা ৭৷২২৷৪৪ ও ৮৷৩২৷৪২) যুধিষ্ঠিরের মিত্র ; কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। (৯) বরুণের সভাতে একটি সাপ।

জপ—কোন একটি দেবতার নাম বা মন্ত্র বার বার উচ্চারণ করা। উপাসনার একটি বিশেষ অঙ্গ। বৈদিক যুগে স্বস্ত্যয়নেরও একটি অঙ্গ। তান্ত্রিক উপাসনায় জপ মস্ত বড় স্থান অধিকার করে আছে। মন্ত্রের অর্থ বুঝে পবিত্র ভাবে জপ করা বিধেয়। অবশ্য মন্ত্রের অর্থ না বুঝলেও জপে ফল লাভ হয়। যেমন রত্নাকর দস্যুর লাভ হয়েছিল।

মন্ত্র সিদ্ধির জন্য হাজার, লক্ষ, কোটি ইত্যাদি সংখ্যক জপ করণীয়। একাসনে বসে জপ করা কর্তব্য। তবে যেখানে দশ কোটি বা আরো বেশি জপ করা হয় সেখানে আসন ভঙ্গ করতেই হয় এবং পর পর কয়েক দিন ধরেই জপ হয়। আবার দিনের পর দিন সংখ্যা হীন জপও আছে। জপ চার রকম বাচিক, উপাংশু, জিহ্বা ও মানস। বাচিক অর্থে উচ্চৈঃস্বরে জপ করা ; এটি নিম্নস্তরের জপ। জিব ও ঠোঁটের সাহায্যে জপ অর্থাৎ অপরে শুনলেও শুনতে পেতে পারে এবং নিজে শুনতে পাচ্ছেই এ রকম জপকে উপাংশু বা দ্বিতীয় শ্রেণীর জপ বলা হয়। বাচিক জপ থেকে এটি দশ গুণ শ্রেষ্ঠ। কেবল জিবের দ্বারা জপকে জিহ্বা জপ বলা হয় ঃ বাচিক জপ থেকে এক শত গুণ শ্রেষ্ঠ। মনে মনে জপ অর্থাৎ কোন শব্দ যখন উচ্চারিত হয় না তাকে মানস জপ বলা হয় এবং এ জপ বাচিক জপের দেড় হাজার গুণ শ্রেষ্ঠ।

জপের সময় বুকের ওপর ডান হাত রেখে অঙ্গ-বস্ত্র চাপা দিয়ে জপ করতে হয়। আঙুল-গুলি এক সঙ্গে থাকে ; বুড়ো আঙুলটি কেবল অনামিকায় মধ্য পর্ব স্পর্শ করে তারপর অনামিকার নিম্ন পর্ব এবং ক্রমে কনিষ্ঠার নিম্ন, মধ্য, অগ্রপর্ব, তার পর অনামিকা, মধ্যমা ও তর্জ্জনীর অগ্রপর্ব এবং তার তর্জনীর মধ্য ও নিম্ন পর্বে এসে শেষ হয়। এতে দশটি পর্ব স্পর্শ করা হয় এবং দশবার জপ বলা হয়। শক্তি মন্ত্রের জপ আরম্ভ হয় ঐ একই ভাবে কিন্তু বুড়ো আঙুল মধ্যমার অগ্রভাগ স্পর্শ করে নীচের দিকে নেমে গিয়ে শেষকালে তর্জনীর নিম্নপর্ব স্পর্শ করে শেষ হয়। আঙুলে জপের চেয়ে মালা জপ আরো প্রশস্ত। এক এক দেবতার জন্য এবং এক এক কাজে এক এক রকমের মালা প্রশস্ত। রুদ্রাক্ষ, জীবপুত্রিকা, তুলসীকাঠ, পদ্মবীজ, স্ফটিক ইত্যাদি মালা প্রসিদ্ধ। মানুষের কপালের হাড় বা কাণ ও চক্ষুর মধ্যস্থিত হাড়কে মহাশঙ্খ বলা হয়। মহাশঙ্খের মালা তান্ত্রিক কাজে ব্যবহৃত। মানুষের আঙুলের মালা নাড়ি দিয়ে গেঁথে ব্যবহার করাও হয়।

অন্যান্য ধর্মেও মালা জপের ব্যবস্থা রয়েছে। দীর্ঘ জপের একটা মনস্তাত্ত্বিক দিক আছে। বাস্তব নিরপেক্ষ একটি ওরিয়েন্টেসান গড়ে ওঠে। মন সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে ; মনের এই বিরাম একটা অনাস্বাদিত বিরতির স্বাদ এনে দেয়। বাচিক জপে যান্ত্রিক ভাবে জপ করে গেলেও মন সেই সময় অন্য চিন্তায় ব্যাপৃত থাকতে পারে। এই জন্য বাচিক জপ নিকৃষ্ট। (৩) তৃতীয় মন্বন্তরে (দ্রঃ) এক দল দেবতা। এই

মন্বন্তরে মনু=উত্তম, ইন্দ্র=সুশান্তি, এবং দেবগণের ৫-টি ভাগ=সুধর্মা, সত্য, জপ, প্রতর্দন ও বশবর্তিন। এই প্রতি ভাগে ১২ জন করে দেবতা।

জপেশ্বর—শিব ও লিঙ্গপুরাণে উল্লিখিত। জলপীস (কালিকা)। তিস্তা নদীর পশ্চিমে জলপাইগুড়িতে। এখানে নন্দী তপস্যা করতেন ; (দ্রঃ- নন্দিগিরি)। কালিকা পুরাণে কামরূপের উ-পশ্চিমে। লিঙ্গ পুরাণে মহীশূরে। কূর্মপুরাণে সাগরের কাছে। বরাহ পুরাণে এটি শ্লেষ্মাত্মকে বা গোকর্ণের (দ্রঃ) কাছে।

জবলপুর—বা জব্বলপুর। মধ্যপ্রদেশের একটি বিভাগ; ২২°৪৯-২৪°৮′ উ× ৭৯°২১-৮০°৫৮′ পূ। মহাভারতের চেদি রাজাদের রাজধানী ত্রিপুরীতে (=তেওয়ার) প্রাপ্ত শিলালিপিতে জবালি পট্টানা বা জাউলি-পট্টানা নাম। একটি মতে দার্শনিক ব্রাহ্মণ জাবালির নাম অনুসারে নাম। আর এক মতে আরবি শব্দ জবল (=পাথর) থেকে জবলপুর। এখানে সিহরা তহসিলের রূপনাথে প্রাপ্ত শিলালিপিতি অশোকের নাম আছে। গুপ্ত যুগে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীন হলেও স্থানীয় রাজার শাসনে ছিল। একাদশ শতকে আলবিরুনির সময় হৈহয়-কলচুরি বংশীয় চেদি রাজের শাসনে ছিল। এরপর এখানে গণ্ড রাজবংশ স্থাপিত হয়।

জবালা—মহর্ষি সত্যকামের মা। যৌবনে বহু-চারিণী ছিলেন এবং সেই সময়ে সত্যকামের জন্ম হয়। বিদ্যার্থী সত্যকাম মায়ের কাছে নিজের গোত্র জানতে চাইলে জবালা ছেলেকে অকপটে নিজের জীবনের কথা জানান ; বলেন সত্যকামের গোত্র তিনি জানেন না (ছান্দোগ্য)। এই সত্যবাদিতার জন্য স্মরণীয়া। অন্য মতে অল্প বয়সে বিয়ে করেছিলেন এবং সন্তান হবার পর বিধবা হন গোত্র জানতেন না। দ্রঃ- জাবাল।

জমদগ্নি—এক জন বৈদিক ঋষি। ভৃগু(১)→চ্যবন(২)→ঔর্ব(৩)→ঋচীক(৪)→জমদগ্নি(৫)—(মহা ৩।১১৫।৩০)। ঋচীকের ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে জন্ম। এই সত্যবতী (দ্রঃ) কুশাস্তের রাজা গাধির মেয়ে। সস্ত্রীক ভৃগু এক বার প্রপৌত্র (অন্য মতে) ঋচীক (দ্রঃ) ও সত্যবতীকে দেখতে এলে সত্যবতী নিজের জন্য ও নিজের মায়ের জন্য পুত্রার্থে বর চান। ভৃগু বলে যান ঋতু স্নানের পর সত্যবতীর মা যেন অশ্বত্থ গাছ এবং সত্যবতী যেন উড়ুম্বর গাছ (ficus glomerata) আলিঙ্গন করেন ; তারপর যেন চরু খান। ভৃগু খাবার জন্য ব্রহ্মতেজ যুক্ত চরু সত্যবতীকে এবং ক্ষাত্র তেজ যুক্ত চরু সত্যবতীর মায়ের জন্য দিয়ে যান। অন্য মতে সত্যবতী ঋচীককে অনুরোধ করেছিলেন এবং ঋচীকই এই চরুর ব্যবস্থা করেন। কিন্তু মহিলা দুজন চরু বদল করে খেয়ে ফেলেন বা পাত্র অজ্ঞাতে বদল হয়ে গিয়েছিল। ভৃগু যোগবলে ঘটনাটা জানতে পেরে, অন্য মতে ঋচীক স্ত্রীর মুখে ক্ষত্র তেজ ফুটে উঠতে দেখে এবং শ্বাশুড়ির মুখে ব্রহ্মতেজ দেখে ঘটনাটা জানতে পেরে সত্যবতীকে জানান তাঁরা উল্টপাল্টা কাজ করেছেন ; সত্যবতীর মা সত্যবতীকে বঞ্চিত করেছেন। মহাভারতে কোন চরুর উল্লেখ নাই (মহা৩।১১৫।২৪)। এই বদলাবদলির জন্য সত্যবতীর ছেলে ব্রাহ্মণ হয়েও ক্ষত্রিয় ধর্মাবলম্বী এবং সত্যবতীর মায়ের ছেলে ক্ষত্রিয় হয়েও ব্রাহ্মণ হবে। সত্যবতী ক্ষত্রিয়াচারী ছেলে চান না ; ভৃগুকে (মহাভারতে)/ঋচীককে অনুরোধ করলে বর পান পৌত্র তাহলে ক্ষত্রিয়ধর্মী হবে।

এর পর সত্যবতীর ছেলে হয় জমদগ্নি। একটি মতে আবার জমদগ্নি ও বিশ্বামিত্র দুই ভাই।

বৃষাদর্ভির কৃত্যাকে নিজের নামের অর্থ বলেছিলেন জাজমদ্যজজা-নাম মৃজা মাহ জিজায়িষে জমদগ্নিঃ ইতি খ্যাতম্ অতঃ মাং বিদ্ধি শোভনে (মহা ১৩।৯৫।৩৭)। সমস্ত ধনুর্বেদ জমদগ্নির কাছে প্রত্যভাৎ এবং বেদ অধ্যয়ন করে তপস্যা করতেন। জমদগ্নি বয়স হলে তীর্থ যাত্রায় যান। পথে ইক্ষ্বাকু রাজা প্রসেনজিতের প্রাসাদে এসে সুন্দরী রেণুকাকে (দ্রঃ) দেখে মুগ্ধ হয়ে বিয়ে করেন। বিয়ের পর এঁরা নর্মদা তীরে কুটির বেঁধে বাস করতে থাকেন। রেণুকার পাঁচ ছেলে বসু, বিশ্বাবসু, বৃহৎ-ভানু, বৃহৎ-কণ্ব ও ছোট পরশুরাম। অন্যমতে বসু, সুহোত্র, রুমণ্বান্, পরশুরাম। মহাভারতে (৩।১১৬।-) নাম বসু, বিশ্বাবসু, সুষেণ, রুমণ্বান্ ও পরশুরাম। কালিকা পুরাণে (৮৩।৩) রুমণ্বান্, সুষেণ, বসু, বিশ্বাবসু ও পরশুরাম। ভাগবতে (৯।১৫।১২) বসুমান ইত্যাদি ছেলে।

রেণুকা এক দিন স্নান করতে গিয়ে মার্তিকাবত দেশের রাজা চিত্ররথকে (মহা ৩। ১১৬।৬) স্ত্রীদের সঙ্গে জলক্রীড়া করতে দেখে কামার্তা হয়ে পড়েন এবং তাড়াতাড়ি অসম্বৃত ভাবে (কালিকা পুরাণে (৮৩।-) গঙ্গাতে; চিত্ররথকে অভিলাষও করেছিলেন) আশ্রমে ফিরে আসেন। অন্য মতে কামার্তা হন নি; বেশ দেরি করে ফিরে এসেছিলেন। স্ত্রীকে এই ভাবে ফিরতে দেখে জমদগ্নির সন্দেহ হয় এবং স্ত্রীর কামার্তি সহ্য করতে না পেরে রেণুকাকে হত্যা করবার জন্য ছেলেদের আদেশ দেন। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে রেবা নদীতে কার্তবীর্যার্জুন স্ত্রীদের সঙ্গে জলকেলি করেছিলেন। আড়াল থেকে দেখতে দেখতে সময় কেটে যায়। এরা তার পর জল থেকে উঠে গেলে নদীতে সেইখানের কাদাজল এড়িয়ে গিয়ে আর এক জায়গায় নামতে গিয়ে সাল্ব দেশের রাজা চিত্ররথকে স্ত্রীদের সঙ্গে জলকেলি করতে দেখেন। এই সব কারণে রেণুকার দেরি হয়েছিল; কামার্তা হন নি; এবং দেরি হবার জন্যই জমদগ্নি ফল-আহরণ-করে-ফিরে-আসতে-থাকা রুমণ্বান, সুষেণ, বসু ও বিশ্বাবসুকে নির্দেশ দেন রেণুকাকে হত্যা করতে। এরা পিতৃ আজ্ঞা পালন করতে পারেন না ফলে অভিশপ্ত হন, মৃগপক্ষি ধর্ম জড়বুদ্ধিতে পরিণত হন। পরশুরামের বয়স তখন ১৪ বছর; আশ্রমে এলে জমদগ্নি এঁকে আদেশ দেন এবং তৎক্ষণাৎ পরশুরাম কুঠারাঘাতে মাকে কেটে ফেলেন। জমদগ্নি শান্ত হন এবং ছেলের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে বর দিতে চান। পরশুরাম তখন মায়ের পুনর্জন্ম, নিজের পাপমুক্তি, মাতৃ-হত্যার স্মৃতি ভোলবার, ভাইদের মুক্তি এবং যুদ্ধে নিজের অজেয়ত্ব এবং নিজের দীর্ঘায়ু বর চেয়ে নেন (মহা ৩।১১৬।১৮)। কালিকা পুরাণে (৮৩।২১) কল্পান্ত পর্যন্ত আয়ু। সূর্য জমদগ্নিকে ছাতা ও পাদুকা দান করেন। দ্রঃ- ধর্ম, রেণুকা।

মাহিষ্মতীর রাজা (মহাভারতে অনূপপতি) কার্তবীর্যার্জুন ছেলেদের, মন্ত্রী চন্দ্রগুপ্তকে ও অনুচরদের নিয়ে মৃগয়াতে বার হয়েছিলেন। দুপুর বেলা ক্লান্ত হয়ে এঁর আশ্রমে আসেন। জমদগ্নি ছিলেন না; রেণুকা এদের যথোচিত সৎকার করেন কিন্তু তবু এরা আশ্রমের গাছপালা নষ্ট করেন এবং কামধেনু সুরভিকে (মহাভারতে; ৩।১১৬।২১; আছে মদমত্ত রাজা হোমধেনুর বৎসটিকে) নিয়ে পালিয়ে যান। অন্য মতে জমদগ্নি আশ্রমে

ছিলেন। কার্তবীর্য একা এসেছিলেন ; অনুচররা দূরে অপেক্ষা করছিল ; ঋষি সকলকে নিয়ে আসতে বলেন এবং কপিলা/সুশীলা নামে কামধেনুর কাছে প্রার্থনা করে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সকলকে ভূরিভোজনে পরিতৃপ্ত করেন। রাত্রিতে আশ্রমে কাটিয়ে রাজা প্রাসাদে ফিরে আসার পর মন্ত্রী চন্দ্রগুপ্তের কাছে সব জানতে পারেন এবং মন্ত্রীকে পাঠিয়ে লক্ষ গরু এমন কি অর্দ্ধেক রাজত্ব দিয়েও সুশীলাকে নিয়ে আসতে বলে দেন। কিন্তু জমদগ্নি রাজি হন না। এরা তখন জোর করে সুশীলাকে নিয়ে যায় এবং মুনি বাধা দিতে চেষ্টা করলে মুনিকে হত্যা করে যায়। সুশীলা আকাশে অন্তর্হিত হয়ে যায়। অন্য মতে রাজা প্রথম দিনই জোর করে গরুটি নিতে চেষ্টা করলে কপিলার দেহ থেকে বহু সশস্ত্র যোদ্ধা বার হয়ে রাজাকে পরাজিত করে। কার্তবীর্য সে দিন ফিরে যান কিন্তু পরে আবার আক্রমণ করেছিলেন। মহাভারতে আছে পরশুরাম আশ্রমে ছিলেন না ; ফিরে এলে জমদগ্নি ছেলেকে সমস্ত ঘটনা বলেন এবং পরশুরাম কার্তবীর্যকে আক্রমণ করেন এবং হাজার হাত ছিন্ন করে নিহত করেন। এরপর কার্তবীর্যার্জুনের ছেলেরা পরশুরামের অনুপস্থিতিতে আক্রমণ করে জমদগ্নিকে হত্যা করে যায়। সমিধ সংগ্রহ করে ফিরে পরশুরাম জানতে পারেন (মহা ৩।১১৬।-)। ভাগ (৮।১৬) পরশুরাম ও ভাইদের অনুপস্থিতিতে জমদগ্নি নিহত হন।

রেণুকা স্বামী শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। এমন সময় পরশুরাম ও তাঁর শিষ্য অকৃতব্রণ ইত্যাদি আশ্রমে আসেন। রেণুকা এই সময়ে একুশ বার বুক চাপড়ালে পরশুরাম মায়ের হাত ধরে ফেলেন এবং সান্ত্বনা দিয়ে প্রতিজ্ঞা করেন একুশ বার তিনি ক্ষত্রিয় রাজাদের নিধন করবেন। এর পর জমদগ্নির সংকারের ব্যবস্থা করা হলে শুক্র এসে জমদগ্নিকে পুনর্জীবিত করে দেন। সুশীলাও ফিরে আসে ; কিন্তু বাছুরটি আসে না। পরশুরাম ও অকৃতব্রণ এ দিকে কার্তবীর্যার্জুনকে আক্রমণ করেন ; রাজা ও রাজার ছেলেরা মারা যান এবং সুশীলার বাছুরটিকে ফিরিয়ে আনেন। অন্য মতে জমদগ্নি এ ভাবে নিহত ও পুনর্জীবিত হন নি। সুশীলাকে নিয়ে রাজা চলে যাবার পর পরশুরাম আশ্রমে ফিরে আসেন এবং গরু নিয়ে যাবার খবর পেয়ে মাহিষ্মতীতে গিয়ে যুদ্ধ করেন ; ভল্লের আঘাতে কার্তবীর্যার্জুনের হাজার হাত কেটে দিয়ে হত্যা করেন এবং রাজার ছেলেদেরও নিহত করেন এবং গরু নিয়ে আসেন। দুটি কাহিনীতেই কার্তাবীর্যার্জুনের মৃত্যুর পরও জমদগ্নি জীবিত ছিলেন এবং এতগুলি নর হত্যা করার জন্য পরশুরামকে মহেন্দ্র পর্বতে গিয়ে তপস্যা করতে বলেন। পরশুরাম তপস্যার জন্য চলে গেলে শূরসেন নামে কার্তবীর্যের এক ছেলে এসে জমদগ্নির মাথা কেটে নিয়ে ফিরে যান। এঁরা এ বার জমদগ্নির অগ্নিসংকার করেন এবং রেণুকা আগুনে আত্মাহুতি দেন এবং পরশুরাম একুশ বার ক্ষত্রিয় নিধনে বার হয়ে যান। জমদগ্নি পরে সপ্তর্ষিমণ্ডল সপ্তম ঋষি (ভাগ ৯।২৬) হয়েছেন।

ঋচীকের এক শত ছেলের মধ্যে একটি ছেলে জমদগ্নি। রাম বনবাস থেকে ফিরে এলে জমদগ্নি দেখা করতে এসেছিলেন। কুরুক্ষেত্রে দ্রোণকে জমদগ্নি যুদ্ধ থামাতে বলেছিলেন। দ্রঃ- স্বর্ণ নকুল।

জমদগ্নি আশ্রম—(জামদগ্নীয়>)জামানিয়া। (১) ভাগলপুরের বিপরীত দিকে গাজিপুর জেলাতে ; খয়রাডিহতে ; বালিয়া থেকে ৩৬ মাইল উ-পশ্চিমে ; এলাহাবাদ ও অযোধ্যার মধ্যে যুক্তপ্রদেশে। (২) বাঙলাতে মহাস্থান গড়ে। (৩) নর্মদা তীরে মাহিষ্মতীতে।

জম্বু—মেরু পর্বতের দক্ষিণ দিকে একটি গাছ। জম্বুদ্বীপে। সিদ্ধচারণেরা এই গাছে জল দেন। বছরে সব সময়ই এই গাছে ফুল ও ফল হয়। গাছের শাখা স্বর্গ পর্যন্ত বিস্তৃত। গাছে ফলগুলি হাতীর মত বড় ; ফলগুলি খসে মাটিতে পড়ে যায়; রস গড়িয়ে জম্বু নদী সৃষ্টি করেছে। ইলাবৃত দেশ দিয়ে এই নদী প্রবাহিত ; এই ফলের রস মাটির সঙ্গে মিশে আলো ও বাতাসে (দেবী ভাগ ৮।৬) জাম্বুনদ নামে সোনাতে পরিণত। এই নদীর তীরে দেবী জম্বাদিনী থাকেন ; একে দেবতা, রাক্ষস, মুনি, ঋষি সকলেই পূজা করেন। জম্বু-engenea jambolana (মনিয়ার উই)। ইনি সব রোগ নিরাময় করেন এবং মানুষকে সব কিছু দান করেন। মহাভারতে (৬।৮।১৮) নীল পর্বতের দক্ষিণে ও নিষধের উত্তরে জম্বুবৃক্ষ। সকলকে অভিলষিত ফল দেয়। শত সহস্র যোজন উন্নত এবং ২৫০০ অরত্নি বিস্তৃত। ফলের রজত সন্নিভ রসে জম্বুনদী ; সুমেরু প্রদক্ষিণ করে উ-কুরুতে প্রবাহিত। এই রস পান করলে তৃষ্ণা ও জরা থাকে না। জাম্বুনদ সোনা দেবতাদের ভূষণ।

জম্বুক—শম্বুক (দ্রঃ)।

জম্বুকেশ্বর—ত্রিচিনোপল্লী ও শ্রীরঙ্গমের (দ্রঃ) মাঝে। তিরুবানিকাবল।

জম্বুদ্বীপ—সুদর্শন দ্বীপ। খৃ-পূ ৩ শতকে আশোকের অনুশাসনে তাঁর সাম্রাজ্যকে কখনো পৃথিবী, কখনো জম্বুদ্বীপ বলা হয়েছে। অশোকের এই সাম্রাজ্য ভারতবর্ষ ও আফগানিস্তান মিলিয়ে। সিংহলের পালি গ্রন্থেও এই ভূখণ্ডের নাম জম্বুদ্বীপ। পালি বৌদ্ধ সাহিত্যে পৃথিবীকে অনেক সময় চক্রবাল রাজ্য বলা হয়েছে; এই পৃথিবীর কেন্দ্রে সুমেরু পাহাড় ; এবং চার দিকে সমুদ্রের মধ্যে উত্তরে কুরু বা উত্তর কুরু, দক্ষিণে জম্বুদ্বীপ, পূর্বে পূর্ববিদেহ, এবং পশ্চিমে অপর-গোথান। পুরাণেও সুমেরু পাহাড়ের উত্তরে উত্তর কুরু দক্ষিণে জম্বুদ্বীপ বা ভারতবর্ষ, পূর্বে ভদ্রাশ্ব-কেতুমাল। এ ছাড়াও সমস্ত পৃথিবীকেও অনেক সময় পুরাণে জম্বুদ্বীপ বলা হয়েছে।

পরে পুরাণে সপ্তদ্বীপ পৃথিবীর কল্পনা প্রাধান্য লাভ করেছিল। কল্পিত হয় সাতটি সমকেন্দ্রিক বৃত্তাকার দ্বীপ দিয়ে পৃথিবী গঠিত। কেন্দ্রে জম্বুদ্বীপ লবণ সমুদ্র বেষ্টিত ; তারপর প্লক্ষ দ্বীপ ইক্ষু সমুদ্র বেষ্টিত ; তারপর শাল্মলি দ্বীপ সুরা সমুদ্র বেষ্টিত ; এর পর কুশদ্বীপ ঘৃত সমুদ্র বেষ্টিত ইত্যাদি। এই জম্বু দ্বীপের কেন্দ্রে সুমেরু পর্বত ও চারদিকে ইলাবৃত বর্ষ। এর উত্তর ও দক্ষিণে বর্ষ পর্বত দিয়ে বিচ্ছিন্ন তিনটি করে ছয়টি বর্ষ। দক্ষিণে ভারত, কিম্পুরুষ, ও হরিবর্ষ ; উত্তরে রম্যক, হিরণ্ময় ও উত্তর কুরু। সুমেরুর পূর্বে ভদ্রাশ্ব, পশ্চিমে কেতুমাল। অর্থাৎ জম্বু দ্বীপে নয়টি বর্ষ :-ইলাবৃত, ভারত, কিম্পুরুষ, হরি, রম্যক, হিরন্ময়, উত্তর-কুরু, ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল। এবং সাতটি বর্ষ পর্বত :-হিমবান, হেমকূট, নিষধ, মেরু, নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গবান। দ্রঃ- জম্বু।

বিভিন্ন পুরাণ ইত্যাদিতে এই কাল্পনিক বর্ণনা বিভিন্ন হবেই। দেবী ভাগবতে উ-কুরুকে কুরুবর্ষ বলা হয়েছে। এখানে মানুষ (মহা ৬।৭।১৮) দিবাকর তুল্য দীপ্তিমান। ভাগবতে (৫।১৬) এবং মহাভারত (৬।১৭) ইত্যাদিতে বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

জম্বুমার্গ—কালিঞ্জর যেন। অগ্নিপুরাণে পুষ্কর ও অর্বুদ পাহাড়ের মাঝে; কালঞ্জর আর একটি তীর্থ। মতান্তরে অর্বুদ পাহাড়ে।

জম্বুমালী—প্রহস্তের ছেলে। সীতার অভিজ্ঞান নিয়ে ফেরবার পথে হনুমান অশোক বন ধ্বংস করতে থাকলে রাবণ অন্যান্য বীরদের সঙ্গে এঁকেও পাঠান। যুদ্ধে হনুমানের হাতে নিহত হন।

জম্বুমালিকা—বিয়ের সময়ে অধুনাতন নাপিতের খেউড়ের প্রাচীন রূপ। কন্যাপক্ষ ও বরপক্ষ নারীদের মধ্যে প্রেমপূর্ণ কলহ ও পরিহাস। ঊষা ও অনিরুদ্ধের বিয়েতে হরিবংশে এর উল্লেখ আছে।

জম্ভ—অনেকগুলি জম্ভ অসুরের নাম দেখা যায়। ধন্বন্তরীর হাত থেকে যারা অমৃত কেড়ে নিয়েছিলেন তাদের নেতা ছিলেন। কৃষ্ণ এক জম্ভকে নিধন করেন। রাবণের অনুচর এক জন জম্ভাসুর হনুমানকে এক বার আক্রমণ করেছিলেন। অর্জুন এক জন জম্ভাসুরকে নিহত করেন। মহিষাসুরের বাবার নামও অনেক সময় জম্ভ বলা হয়েছে। একটি মতে এক জম্ভ ইন্দ্রের কাছে একবার হেরে গিয়ে তপস্যায় মহাদেবকে সন্তুষ্ট করে পৃথিবী বিজয়ী ছেলে হবে বর পান। বর পেয়ে ফেরবার পথে ইন্দ্রের সঙ্গে আবার দেখা হলে যুদ্ধে ডাক দেন। তারপর স্নান করবার অছিলাতে সরোবরে গিয়ে সেখানে স্ত্রীকে পেয়ে স্ত্রীকে গর্ভবতী করে ফিরে এসে ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে মারা যান। এই ছেলে মহিষাসুর।

জম্ভল—(১) ব্রাহ্মণ্য কুবের পুত্র। এমন কি জম্ভল মূর্তিতে আটটি রত্ন কলস (অষ্ট নিধি)ও থাকে। জম্ভলের নতুনত্ব হাতে রত্নবর্ষী নকুল।

(২ ক) বৌদ্ধ দেবতা। অক্ষোভ্য (দ্রঃ) কুল। ৩-মুখ, ৬ হাত; যবযুম মূর্তি। ধ্যানী বুদ্ধ থেকেও প্রাচীন কল্পনা। ইনি এক জন যক্ষ। মঞ্জুশ্রী মত কুল নির্দিষ্ট নয় কিন্তু। সম্পদের দেবতা। মাথাতে জটা, হাতে মাতুলুঙ্গ, অঙ্কুশ, বাণ, এক হাতে আলিঙ্গিত প্রজ্ঞা, পাশবদ্ধ নকুল ও বাণ।

(২ খ) রত্নসম্ভব (দ্রঃ) কুল। অনেকগুলি বর্ণন আছে। রত্নসম্ভব কুল হলে ডান হাতে নকুল এবং বাম হাতে বীজপুরক। নকুলকে মনে করা হয় সমস্ত রত্নের ভাণ্ডার; এর পেট টিপলে রত্ন বর্ষণ করে। একক বা শক্তি সহ যবযুম মূর্তি। যবযুম মূর্তি হলে চাঁদের ওপর বসা, স্বর্ণবর্ণ, লম্বোদর, সর্বাভরণ ভূষিত। পীত পদ্মের মালা, কোলে বসুধারা। চন্দ্রের নীচে পদ্মের আটটি দলে আটজন যক্ষ মণিভদ্র, ধনদ, বৈশ্রবণ, কেলিমালী চিবিকুণ্ডলী, সুখেন্দ্র ও চরেন্দ্র; এরা সকলেই এক রকম দেখতে। প্রতিটি যক্ষের সঙ্গে তার শক্তি যবযুম আলিঙ্গনে বদ্ধ। এই যক্ষিণীদের নাম: চিত্রকালী, দত্তা সুদত্তা, আর্যা সুভদ্রা, গুপ্তা, দেবী ও সরস্বতী। যক্ষিণীরা বসুধারার মতই দেখতে—বর্ণ পীত,

হাতে শস্যমঞ্জরী ও বরদ মুদ্রা। একক জম্ভল মূর্তি স্বর্ণবর্ণ ; বাম হাতে নকুল। দুহাত বিশিষ্ট জম্ভল মূর্তিও আছে ; শঙ্খমুণ্ডকে ও পদ্মমুণ্ডকে পায়ে করে দলিত করছে।

তিনমুখ যবযুম জম্ভল মূর্তিও রয়েছে। ছয় হাত ; শ্বেত বর্ণ। দক্ষিণ মুখ লাল ; বাম নীল। বজ্রপর্যঙ্কাসন এবং স্বাভা বসুধারাকে দুহাতে আলিঙ্গনে বদ্ধ ; বাকি হাতে বজ্র, অসি, মরকত ও পদ্ম।

জম্ভল, উচ্ছুষ্ম—(১) অক্ষোভ্য (দ্রঃ) কুল, অপর নাম ডিম্ভ। সঙ্গে শক্তি বসুধারা। ৫ বছর বয়স ; বেঁটে মত ; সর্পভূষণ, রত্ন কিরীট। প্রত্যালীঢ় ভঙ্গি। ঘুমন্ত ধনদের কপালে একটি পা ; ধনদের মুখ থেকে রত্ন বার হয়ে আসছে। নগ্ন, ঊর্দ্ধলিঙ্গ, হাতে রক্তপূর্ণ কপাল। বাম হাতে রত্নবর্ষী নকুল। মাথাতে অর্দ্ধচন্দ্র। পিঙ্গল ঊর্দ্ধকেশ।

(২) রত্নসম্ভব (দ্রঃ) কুল। অক্ষোভ্য কুলের মতই বর্ণনা ; প্রত্যালীঢ় ভঙ্গি। বাম পা কুবেরের কপালের ওপর এবং ডান পা কুবেরের পায়ের ওপর। ভয়ঙ্কর চেহারা। লম্বোদর, করাল দংষ্ট্র ও সর্পভূষণ। হাতে রক্তপূর্ণ কপাল এবং সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে এই দিকে চেয়ে আছে ; বাম হাতে নকুল।

জয়—(১) বিরাট গৃহে অজ্ঞাত বাসের সময় যুধিষ্ঠিরের নাম। (২) ধৃতরাষ্ট্রের একটি ছেলে। বিরাট গৃহে গরু চুরির পর অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। ভীমের হাতে কুরুক্ষেত্রে নিহত হন। (৩) বৈকুণ্ঠের দ্বারী ; দ্রঃ- জয় ও বিজয়। (৪) বিরাধ রাক্ষসের পিতা জয় ; জয়ের স্ত্রী শতহ্রদা। এই বিরাধ দণ্ডক বনে রামের হাতে নিহত হন। (৪) মূল বা প্রথম মহাভারত।

জয় ও বিজয়—দুই ভাই। স্বর্গে বিষ্ণুর দ্বার রক্ষক। এক দিন সনকাদি ঋষিরা বিষ্ণু দর্শনে এলে এ'রা ঋষিদের (উচিত মত সমাদর করে) ভেতরে ঢুকতে দেন না। ফলে শাপগ্রস্ত হন পৃথিবীতে জন্মাতে হবে। তখন অনুনয় বিনয় করলে এ'রা বলেন বিষ্ণুকে মিত্রভাবে ভজনা করলে সাত জন্মে এবং শত্রুভাবে ভজনা করলে তিন জন্মে শাপ মুক্তি হবে ; এবং স্বর্গে ফিরে আসতে পারবে। আশু মুক্তির আশায় এ'রা শত্রু ভাবেই জন্মাতে চান। সত্য যুগে জয় হিরণ্যাক্ষ, বিজয় হিরণ্যকশিপু ; ত্রেতায় জয় রাবণ, বিজয় কুম্ভকর্ণ এবং দ্বাপরে জয় শিশুপাল এবং বিজয় দন্তবক্র রূপে জন্মান। বিষ্ণুর হাতে নিহত হয়ে এ'রা স্বর্গে ফিরে যান।

জয়ৎসেন—(১) মগধের রাজা ; জরাসন্ধের ছেলে। (২) অজ্ঞাতবাস কালে নকুলের নাম। দ্রঃ- জয়সেন। (৩) ধৃতরাষ্ট্রের ছেলে ; ভীমের হাতে নিহত। (৪) সার্বভৌমের (দ্রঃ) ছেলে। স্ত্রী বৈদর্ভী ; সুষুবা/সুশ্রবা : ছেলে অরাচীন/অবাচীন (মহা ১।৯০।১৭)।

জয়দুর্গা—দুর্গার একটি বঙ্গীয় লৌকিক রূপ। মাথায় চন্দ্রকলা, চতুর্ভুজা, ত্রিনেত্রা, প্রলয়ের মেঘের মত রঙ, সিংহস্কন্ধে আসীনা ; হাতে শঙ্খ, চক্র, কৃপাণ ও ত্রিশূল।

জয়দেব—গীতগোবিন্দ (দ্রঃ) রচয়িতা। পিতা ভোজদেব, মাতা বামাদেবী, স্ত্রী পদ্মাবতী। বীরভূমে অজয় নদীর তীরে কেন্দুবিল্ব গ্রামে জন্ম। অন্য মতে মিথিলা বা ওড়িশা বাসী। খৃ ১২-শতকের শেষে লক্ষ্মণ সেনের সভায় গোবর্দ্ধন, শরণ, ধোয়ী, উমাপতি, ও জয়দেব পঞ্চরত্ন বর্তমান ছিলেন। গীতগোবিন্দে এই নামগুলি আছে কিন্তু লক্ষ্মণ

সেনের নাম নাই। ঐ যুগের কোশকাব্য 'সদুক্তি কর্ণামৃতে' গীতগোবিন্দের ৫-টি শ্লোক ও জয়দেবের নামে আরো ২৬-টি শ্লোক আছে। প্রসন্নরাঘব, চন্দ্রালোক, ও রতিমঞ্জরীর রচয়িতা জয়দেব অপর ব্যক্তি।

গীতগোবিন্দে সুড়সুড়ি আছে আর আছে দুষ্পাচ্য যৌনতা। ছন্দবদ্ধ পদ লিখলেই যদি কবি হওয়া যায় তাহলে শুভঙ্কর দাসও কবি। ঋক্‌বেদে শশ্বতীর উক্তি (দ্রঃ- অসঙ্গ) বা বৃহদারণ্যকে বাজপেয় যজ্ঞের রূপক শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করা যায়। সত্যদৃষ্টি সেখানে অপাপবিদ্ধ। সহজিয়া জয়দেব আবিল. অপাঠ্য। তীব্র কটু আদি রসের কীট এই সহজিয়া কবি জানতেন না ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় স্বামী ক্লীব হলেও স্ত্রীর গোপন অভিসার কোন দিন স্বীকৃত নয়। অর্জুনের তথা বিশ্বজীবের জীবনের সারথি ও গীতগোবিন্দের (দ্রঃ) লম্পট নায়ক কখনই এক ব্যক্তি নন। দ্রঃ- ধর্ম, বৈষ্ণব।

জয়দ্বল—বিরাট রাজগৃহে সহদেবের ছদ্মনাম।

জয়দ্রথ—সৌবীর ও সিন্ধুরাজ (মহা ৩।২৫১।৭)। হস্তী(১)→অজমীঢ়(২)→ বৃহৎকায়/বৃদ্ধক্ষত্র(৫)→জয়দ্রথ(৬)। বহু ব্রত-উপবাস করে এই ছেলে হয়। ছেলের জন্মের সময় দৈববাণী হয় যুদ্ধে জয়দ্রথের মাথা কাটা যাবে। শুনে বৃদ্ধক্ষত্র (মহা ৭।১৪৬) অভিশাপ দেন তাঁর ছেলের মাথা যে মাটিতে ফেলবে তার মাথাও শতধা বিদীর্ণ হয়ে যাবে। অন্য মতে দৈববাণী হয় এর মাথা যে মাটিতে ফেলবে তার মাথাও শতধা হবে। অল্প বয়সে রাজা হন এবং দুঃশলার (দ্রঃ) স্বামী। জয়দ্রথের ছেলে সুরথ। প্রথম থেকেই পাণ্ডবদের সঙ্গে তীব্র শত্রুতা সুরু হয়। হয়তো স্বয়ংবরে পাঞ্চালীকে বিয়ে করতে না পারার জন্য এই শত্রুতা।

আর এক বার বিয়ে করবার জন্য জয়দ্রথ যখন শাল্ব রাজ্যে যাচ্ছিলেন বনবাসের শেষ বছরে শেষের দিকে পাণ্ডবরা তখন কাম্যক বনে ছিলেন। আশ্রমে একজন সুন্দরী রমণী একা আছেন জানতে পেরে প্রথমে ত্রিগর্তরাজ কোটিকাশ্যকে দূত হিসাবে পাঠান; জয়দ্রথ বিয়ে করবেন একে (মহা ৩।২৪৮।১২)। জয়দ্রথের সঙ্গে ছিল ক্ষেমঙ্কর (দ্রঃ), কুণিন্দাধিপতি, ইক্ষ্বাকুরাজ সুবলের ছেলে ও সৌবীরক দ্বাদশ রাজপুত্র অঙ্গারক. কুঞ্জর, গুপ্তক, শত্রুঞ্জয়, সঞ্জয়, কুহর, প্রতাপ, প্রভংকর, ভ্রমর, রবি. শূর ও সুপ্রবৃদ্ধ এবং জয়দ্রথের ভাই বলাহক, অনীক, বিদারণ ইত্যাদি (মহা ৩।২৪৯।১২)। দ্রৌপদীর পরিচয় পেয়ে কোটিকাশ্য দ্রৌপদীকে বিশেষ কিছু আর না বলে ফিরে যান এবং এরপর জয়দ্রথ আরো ছ-জনকে সঙ্গে নিয়ে (দ্রঃ-মাংস) এসে বোঝাতে চেষ্টা করেন। দ্রৌপদী ভর্ৎসনা করেন ইত্যাদি যা মুখে আসে গালি দিতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত জয়দ্রথ জোর করে রথে তুলে নিয়ে পালিয়ে যেতে চান। দ্রৌপদী ধৌম্যের পায়ে প্রণাম (মহা ৩।২৫২।২৪) করে চলে যেতে বাধ্য হন। দেবী ভাগবতে মুনিদের আশ্রমে ছিলেন। জয়দ্রথ এলে মুনিপত্নীরা ও দ্রৌপদীও দেখতে আসেন; মুনিদের অনাদৃত্য (৩।১৬।৩৯) হরণ করেন।

ইতি মধ্যে পাণ্ডবরা মৃগয়া থেকে ফিরে এসে দ্রৌপদীর ধাত্রীকন্যা (ধাত্রেয়িকা; মহা ৩।২৫৩।১০) কাছে সব শুনে জয়দ্রথের অনুসরণ করেন। জয়দ্রথের সৈন্যেরা হেরে গেলে দ্রৌপদীকে রথ থেকে নামিয়ে দিয়ে জয়দ্রথ পালাতে চেষ্টা করেন।

যুধিষ্ঠির ও নকুল সহদেব দ্রৌপদীকে নিয়ে আশ্রমে ফিরতে থাকেন ; ভীম অর্জুন জয়দ্রথকে ধরতে এগিয়ে যান। যুধিষ্ঠির নিষেধ করে দেন দুঃশলার স্বামীকে যেন হত্যা না করে। দ্রৌপদী বলে দেন যেন হত্যা করা হয়। ভীম জয়দ্রথকে ধরে তুলধোনা করেন ; সিন্ধুরাজ অজ্ঞান হয়ে যান। মাথায় জায়গায় জায়গায় কামিয়ে পাঁচ-চূড়া করে দিয়ে এবং নিজেকে সর্বত্র পাণ্ডবদের দাস বলে পরিচয় দেবার নির্দেশ দিয়ে এবং নানা ভাবে লাঞ্ছিত করে আশ্রমে এনে যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদী ইত্যাদিকে দেখিয়ে ছেড়ে দেন। দুঃশলার স্বামী বলে হত্যা করেন নি। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে করদ রাজা হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন এবং পাশা খেলায় উপস্থিত ছিলেন।

দ্রৌপদীকে চুরি করতে গিয়ে অপমানিত হয়ে প্রতিশোধের জন্য শিবের তপস্যা করে অর্জুন ভিন্ন সমস্ত পাণ্ডবদের হারাবেন (মহা ৭।৪২।১৭) বর পান। কুরুক্ষেত্রে অভিমন্যু বধের চক্রব্যূহের দরজায় পাহারা ছিলেন ; অর্জুন তখন সংশপ্তকদের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। এই কারণে জয়দ্রথ চারজন পাণ্ডবকেই পরাজিত করেন। এই দিন সন্ধ্যা-বেলা অন্যায় যুদ্ধে অভিমন্যুকে হত্যা করা হয়েছে শুনে অর্জুন প্রতিজ্ঞা করেন পর দিন সূর্যাস্তের আগেই জয়দ্রথকে তিনি বধ করবেন ; নয়তো আগুনে আত্মহত্যা করবেন। চরমুখে (৭ ৫২।১) প্রতিজ্ঞা শুনে জয়দ্রথ বাড়ি পালিয়ে যাচ্ছিলেন; কিন্তু দ্রোণ, দুর্যোধন ইত্যাদি তাঁকে আশ্বস্ত করেন। অর্জুন প্রতিজ্ঞা করলে কৃষ্ণ ঠিক করেন তিনি দারুককে নিয়ে নিজেই কৌরব সৈন্য ছিন্নভিন্ন করবেন। এই সুযোগে অর্জুন জয়দ্রথকে বধ করবেন। পর দিনে ব্রাহ্ম মুহূর্তে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নিয়ে কৈলাসে এসে দিব্যাস্ত্র চান। নিকটেই দিব্য সরোবর। মহাদেব সরোবর থেকে ধনুর্বাণ (ভাণ্ড ৭।৫৭।৬৪) আনতে বলেন; এগুলি মহাদেবের অস্ত্র। সরোবরে দুটি সহস্র শীর্ষ নাগ ছিল। দুজনে এদের আরাধনা করেন। এরা শর ও শরাসনে পরিণত হয়। অর্জুন (মহা ৭।৫৭।৭৩) এগুলি মহাদেবের কাছে আনেন। মহাদেবের দেহের পার্শ্ব থেকে একজন ব্রহ্মচারী বার হয়ে এসে শরাসন ব্যবহার ইত্যাদি শিখিয়ে দিয়ে এগুলি জলে ফেলে দেন। মহাদেব তখন পাশুপত অস্ত্র ও বর দেন প্রতিজ্ঞা সফল হবে। এদিকে দ্রোণ শকট ব্যূহ তৈরি করেন। শকট ব্যূহের পেছনে গর্ভব্যূহ ; গর্ভব্যূহের মধ্যে সূচীব্যূহ এবং সূচীব্যূহের মধ্যে বহু সৈন্য পরিবেষ্টিত হয়ে জয়দ্রথ অবস্থান করেন। যুদ্ধ করতে করতে বিকেল হয়ে আসে। কৃষ্ণ যোগবলে সূর্য ঢেকে ফেলে অকাল সন্ধ্যা সৃষ্টি করেন। অর্জুন আত্মহত্যা করবেন এই আনন্দে কৌরবরা ব্যূহ ছেড়ে অর্জুনকে দেখতে আসেন। সুযোগ পেয়ে অর্জুনও জয়দ্রথের মাথা কেটে ফেলেন। কৃষ্ণ ঠিক এর আগের মুহূর্তে আকাশে সূর্যকে প্রকাশিত করে দেন।

কৃষ্ণ স্মরণ করিয়ে দেন জয়দ্রথের কাটা মাথা যেন মাটিতে না পড়ে। এই জন্য অর্জুন আরো কয়েকটি বাণে কাটা মাথা উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে সমন্তপঞ্চক দেশের বাইরে (সমন্ত পঞ্চকাৎ অস্মাৎ বহিঃ মহা ৭।১২১।২৪) আর এক মতে সমন্তপঞ্চক বনে, বৃদ্ধক্ষত্রের কোলে নিয়ে গিয়ে ফেলেন। বৃদ্ধক্ষত্র সন্ধ্যা বন্দনা করছিলেন ; চমকে

উঠে দাঁড়াতে কাটা মাথা মাটিতে পড়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধক্ষত্রের মাথাও শতধা হয়ে যায়।

জয়ধ্বজ—কার্তবীর্যার্জুনের এক শত ছেলের মধ্যে একটি; তালজঙ্ঘের পিতা অবন্তির রাজা। তালজঙ্ঘের ১০০ ছেলে; এদেরও নাম তালজঙ্ঘ। এই বংশে বীতিহোত্র, সুজাত, ভোজ, তৌণ্ডিকের, ভরত ইত্যাদি বিখ্যাত রাজা জন্মান। এই বংশে বৃষ>মধু>১০০ ছেলে। এদের মধ্যে বৃষণ বংশভাক্। এই বৃষণ থেকে বৃষ্ণি বংশ এবং মধু থেকে মাধব বংশ (হরি ১।৩৩।৫৫)।

জয়ন্ত—পুরাণে ইন্দ্র (দ্রঃ) ও শচীর ছেলে। রাবণ স্বর্গ আক্রমণ করলে জয়ন্ত রাক্ষস সেনাদের পরাজিত করেন। সারথি ছিল মাতলি পুত্র গোমুখ। কিন্তু মেঘনাদের মায়া যুদ্ধে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। জয়ন্তের মাতামহ পুলোমা এই সময় সকলের অজ্ঞাতে জয়ন্তকে পাতালে নিয়ে গিয়ে রক্ষা করেন (রা ৭।২৮।১৯)। পারিজাত হরণের সময় জয়ন্ত প্রদ্যুম্নের হাতে পরাজিত হন। বেদে (১০।২৮।১) ইন্দ্রের ছেলে বসুক্র। এই বসুক্র ঋক্ বেদে দশম মণ্ডলের অনেকগুলি সূক্তের ঋষি। সীতা হনুমানকে অভিজ্ঞান হিসাবে তাঁদের জীবনের একটি ঘটনা জানান, রামকে গিয়ে বলতে বলেন (৫।৩৮।-)। যখন চিত্রকূটে ছিলেন তখন একদিন মন্দাকিনীর জল থেকে উঠে সলিল ক্লিন্না সীতা রামের কোলে গিয়ে বসেন এই সময়ে এক কাক মাংসের লোভে সীতাকে ঠোকরাতে থাকে এবং সীতা তাড়াতে থাকেন। কাক সীতাকে দারয়ন্ চিৎকার করতে করতে খানিকটা সরে যায়; সীতার গায়ে কাপড় কিছুটা সরে যায় এবং রাম সীতাকে তখন বিদ্রূপ (অপহসিতা) করেন এবং লজ্জিতা ও বায়সেন প্রকোপিতা সীতাকে সান্ত্বনা দেন। পরিশ্রমের ফলে রামের কোলে সীতা তারপর ঘুমিয়ে পড়েন। তারপর রাম সুপ্তপ্রবুদ্ধা সীতার কোলে মাথা রেখে ঘুমতে থাকেন। কাক আবার এসে ঠোকরায়; রামের গায়ে বিন্দু বিন্দু রক্ত পড়ে এবং সীতা রামকে জাগান। সীতাকে রাম এই ভাবে আক্রান্ত দেখেন এবং তীক্ষ্ণ স-রুধির নখ কাকটিকেও দেখতে পান। এই কাক ইন্দ্র পুত্র জয়ন্ত (৫।৩৮।২৮)। রাম ক্রুদ্ধ হয়ে মাটি থেকে এক মুঠি দর্ভ নিয়ে ব্রহ্ম অস্ত্রে যুক্ত করে কাকের প্রতি নিক্ষেপ করেন। কাক পালায় তার পিতা এবং কোন মহর্ষি তাকে আশ্রয় দিতে পারে না। ত্রিভুবনে এই ভাবে কোথাও আশ্রয় না পেয়ে আবার রামের কাছে এসে আশ্রয় ভিক্ষা করে। করুণায় রাম কাককে নিহত করেন না; অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্রে কাকের ডান চোখ নষ্ট হয়। কাক রামকে প্রণাম করে ফিরে যায়।

চিত্রকূটে ভরত আসার আগের ঘটনা যেন। ২।৯৫।১- প্রক্ষিপ্ত সর্গে ঘটনাটি একটু তফাৎ। সকলের খাবার পর অবশিষ্ট মাংস শুকিয়ে রাখবার জন্য সীতা ব্যবস্থা করছিলেন এই সময় কাকের/জয়ন্তের আক্রমণ ঘটে ইত্যাদি। দ্রঃ- একাক্ষ, অগস্ত্য। (২) অযোধ্যার রাজা দশরথের মন্ত্রী। (৩) বিরাট ভবনে ভীমের ছদ্ম নাম। (৪) এক জন আদিত্য। (৫) এক জন রুদ্র।

জয়ন্তী—ইন্দ্রের মেয়ে; জয়ন্তের বোন। দৈত্যরা একবার দেবতাদের কাছে হেরে গেলেও গুরু শুক্রাচার্য দৈত্যদের জন্য নতুন শক্তি সংগ্রহের চেষ্টায় কৈলাসে শিবের

আরাধনা করতে থাকেন। এই সময় ইন্দ্র নিজের মেয়েকে পাঠান শুক্রের সেবা করার ছলে তপস্যা নষ্ট করতে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও জয়ন্তী রাজি হন এবং নিষ্ঠার সঙ্গে অনুগত শিষ্যা হিসাবে সেবা করতে থাকেন। কোন বাধা সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেন নি। আরাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে শিব এসে বর দিলে তারপর জয়ন্তীর অনুরোধে দশ বছর জয়ন্তীকে শুক্র স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করেন। জয়ন্তীর মেয়ে হয় দেবযানী। দ্রঃ- ঋষভদেব।

জয়সেন—(১) বিরাট ভবনে অজ্ঞাতবাস কালে নকুলের গুপ্ত নাম; দ্রঃ- জয়ৎসেন। (২) অবন্তিরাজ; স্ত্রী রাজাধি দেবী; ছেলে বিন্দানুবিন্দ; মেয়ে মিত্রবিন্দা, কৃষ্ণের স্ত্রী।

জয়া—(১) অন্ধক অসুরের রক্ত পান করার জন্য মহাদেব যে মাতৃকাদের সৃষ্টি করেন তাঁদের এক জন। (২) চতুঃষষ্টি যোগিনীর এক জন। (৩) লক্ষ্মীর এক জন সহচরী। (৪) গৌতমের স্ত্রী অহল্যার চার মেয়ে জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও অপরাজিতা। এঁরা সকলেই মহাদেবের স্ত্রী: সতীর সহচরী। এই জয়ার কাছে পার্বতী দক্ষযজ্ঞের খবর পান। (৫) পার্বতীর আর এক সহচরী; প্রজাপতি কৃশাশ্বের মেয়ে (স্কন্দ-পু)। (৬) দক্ষের দুই মেয়ে জয়া ও সুপ্রভা; দ্রঃ- কৃশাশ্ব।

জয়াশ্ব—(১) দ্রুপদের ছেলে: অশ্বত্থামার হাতে নিহত। (২) বিরাটের এক ভাই।

জরৎকারু—ভৃগু বংশে এক মুনি। জরা যার কারু (=দারুণ); কঠোর তপস্যায় (মহা ১।৩৬।৩) জরাগ্রস্ত হয়েছিলেন বলে নাম। মতান্তরে ব্রহ্মার বংশে যাযাবর নামে ঋষির একটি মাত্র ছেলে। মহাভারতে (১।১৩।১০) আছে যাযাবরাণাং ধর্মজ্ঞঃ। ইনি ব্রহ্মচারী, মহাতপা ও পরিব্রাজক। বায়ু মাত্র ভক্ষণ করে তপস্যা করতেন। ঘুরতে ঘুরতে এক দিন কতকগুলি লোককে গাছের ডাল থেকে/ঘাসের পাতা থেকে মাথা নীচের দিকে করে ঝুলতে দেখেন; বীরণ-স্তম্ভকে লগ্নাঃ এবং ইঁদুর কাটছে। মহা ১।৪১।৪ শ্লোকে আছে একটি মাত্র তন্তু (অর্থাৎ জরৎকারু) অবশিষ্ট আছে এবং এটিও আখু (কাল) কাটছে। এঁরা নরকে গিয়ে পড়বেন। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন এঁরা যাযাবর ঋষি: বংশ লোপের সূচনায় এই অবস্থায় ঝুলছেন; বংশধর বিয়ে করেনি ইত্যাদি। ক্রমশ পরিচয় পেয়ে জরৎকারুকে বিয়ে করতে বলেন। ১।৪১।—অধ্যায়ে আছে এঁরা জানিয়েছিলেন পুণ্যলোকে থেকে ভ্রষ্ট হয়ে ঝুলছেন: জরৎকারু নিজের পুণ্য দিয়ে এঁদের রক্ষা করতে যান। এঁরা জানান পুণ্য তাঁদেরও আছে; বরং জরৎকারু নামে তাঁদের বংশের যে একটি মাত্র সন্তান আছে তাঁর সঙ্গে দেখা হলে তাকে যেন বিয়ে করতে বলেন ইত্যাদি। জরৎকারু তখন নিজের পরিচয় দেন; বিয়ে করবেন প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু তবু সর্ত করেন সম-নামা কন্যা চাই; স্বেচ্ছায় কন্যাপক্ষ বিয়ে দেবেন এবং স্ত্রীকে তিনি ভিক্ষা নেবেন এবং ভরণ পোষণের দায়িত্ব নেবেন না (মহা ১।৪২।৭)। এর পর বহুদিন কেটে যায়; একদিন পিতৃপুরুষদের কথা স্মরণ করে গহন বনে এক জায়গায় উচ্চৈঃস্বরে তিনবার কন্যা ভিক্ষা চান। বাসুকি শুনতে পান (মহা ১।১৩।৩১) এবং ১।৪২।- অধ্যায়ে আছে সাপেরা শুনতে পেয়ে গিয়ে জানিয়েছিল। মোটামুটি বাসুকি আসেন, নিজের বোনের নাম জানান (দ্রঃ- জরৎকারু, স্ত্রী); এবং মুনির সমস্ত

সর্ত মেনে নেন। বিয়ের পর মুনি স্ত্রীকে জানান কোন অন্যায় করলে তখনই স্ত্রীকে তিনি ত্যাগ করবেন (মহা ১।৪৩।৮)। স্ত্রী সব মেনে নেন এবং শ্বেতকাকীয়ৈঃ উপায়ৈঃ স্বামীর সেবা করতে থাকেন। মহাভারতে (১।৪৩।৩) দুজনে বাসুকির আবাসেই থাকতেন ; অন্য মতে পুষ্করে বাস করছিলেন।

মুনি এক দিন স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছেন। এমন সময় সন্ধ্যা হয়ে যায় দেখে সান্ধ্যকৃত্যের জন্য মুনি কি করবেন বুঝে উঠতে না পেরে স্বামীকে ডেকে তোলেন। মুনি রেগে যান ; তিনি ঘুমিয়ে থাকলে সূর্যের অস্ত যাবার কোন ক্ষমতাই নেই। এই অপরাধের জন্য স্ত্রীকে ত্যাগ করে চলে যান ; কোন অনুনয়ে কাণ দেন না। স্ত্রীকে দুঃখ করতে বারণ (মহা ১।৪৩।২৯) করেন এবং কঠোর তপস্যার জন্য বনে চলে যান। স্ত্রী এই সময় গর্ভবতী ছিলেন ; জরৎকারু তাঁর পেটে তিন বার হাত রেখে বলেন অস্তি ; ফলে নাম হয় আস্তীক। অন্য মতে স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন না ; এই বিপদে ব্রহ্মাকে অন্য মতে পিতা কশ্যপ ও ইষ্ট গুরু মহাদেবকে স্মরণ করলে তাঁরা এসে মুনিকে বোঝান পুত্রোৎপাদন না করে স্ত্রীকে ত্যাগ করতে নাই। স্বামী তখন স্ত্রীর নাভিদেশ স্পর্শ করেন ; গর্ভে এক তেজস্বী ও তপস্বী পুত্রের সঞ্চার হয়।

জরৎকারু(স্ত্রী)—কশ্যপের মেয়ে, বাসুকির বোন, জরৎকারু মুনির স্ত্রী, আস্তীকের মা ; সাপের কামড়ে বহু মৃত্যু হচ্ছিল। সকলে তখন কশ্যপের কাছে প্রতিকার চাইলে কশ্যপ ব্রহ্মার কাছে যান এবং ব্রহ্মার উপদেশে কশ্যপ সর্প বিষের মন্ত্র সৃষ্টি করেন এবং কশ্যপের মন থেকে এই সব মন্ত্রের দেবীর জন্ম হয়। কশ্যপের মন থেকে জন্ম ফলে নাম মনসা। অন্য মতে কৃষ্ণকে ইনি মনে করে রেখেছিলেন বলে নাম মনসা। আর এক মতে শিব বীর্যে পদ্ম বনে জন্ম ; ফলে নাম পদ্মা। অত্যন্ত শান্ত ও সুন্দর দেখতে এবং সকলের পূজিত বলে নাম জগৎগৌরী। কুমারী অবস্থায় কৈলাসে মহাদেবের তপস্যা করে দিব্যজ্ঞান লাভ করেন। মহাদেব এঁকে সামবেদ শিক্ষা দেন, অষ্টাক্ষরী কৃষ্ণমন্ত্র এবং ত্রৈলোক্যমঙ্গল নামে কৃষ্ণ কবচ দান করেন। এই কবচ ধারণ করে পুষ্করে ইনি তিন যুগ ধরে তপস্যা করেন ; কৃষ্ণ তারপর দেখা দিয়ে এঁকে প্রার্থিত বর দেন এবং এঁর দেহ ও পরিধেয় জীর্ণ হয়ে গিয়েছিল বলে কৃষ্ণ নাম দেন জরৎকারু। কদ্রুর বড় ছেলে বাসুকি মায়ের শাপ থেকে বাঁচবার কথা যখন ভাবছিলেন তখন এলাপত্র নামে এক নাগ জানান কদ্রু যখন শাপ দিয়েছিলেন তখন ব্রহ্মা দেবতাদের বলেছিলেন জরৎকারুর গর্ভে মুনি জরৎকারুর ঔরসে আস্তীক জন্মে সাপেদের সর্পযজ্ঞে রক্ষা করবেন। এলাপত্রের কথা শুনে বাসুকি বোনের বিয়ের ব্যবস্থা করেন। দেবী ভাগবতে (২।১২।৩২) অভিশপ্ত হয়ে বাসুকি ইত্যাদি ব্রহ্মার কাছে যান এবং ব্রহ্মা বিয়ে দিতে বলেন। আস্তীকের জন্ম হলে মনসাদেবী কৈলাসে হরপার্বতীর কাছে চলে যান। অপর নাম বিষহরি। মনসা দেবীর মন্ত্রে সিদ্ধ হলে সাধক ধন্বন্তরীর সমান হয়ে দাঁড়ান ; বিষ তাঁর কাছে অমৃত হয়ে দাঁড়ায়। দ্রঃ- মনসা⇌বৌদ্ধ জাঙ্গুলী।

জরথুশ্ত্র—বা-যত্র। ইরানে এক তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষ ; খৃ-পূ ১০০০ মত। ইরানে

আর্যধর্ম সংস্কারকদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। নিজের রচিত গাথা সমূহ মাধ্যমে একেশ্বর বাদ প্রচার করেন। গাথার ভাষা উপনিষদের ভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কিত। পশ্চিম ইরানের মিডিয়া বা 'মদ' নামক প্রদেশে জন্ম। শৈশবে গোত্রনাম ছিল স্পিতম (=সং—শ্বিতম বা শ্বেত)। পিতা রাজবংশ জাত ছিলেন এবং পুরোহিত গোষ্ঠীতে যোগদান করেন। পিতার নাম পৌরুষস্‌প (=সং—পুরু+অশ্ব), মায়ের নাম 'দুঘ্‌দ্‌হেবো' (=দুগ্ধবতী গাভী); স্ত্রী 'হ্বোম্বো' = গবী। জরথুশ্‌ত্র (সং—জরৎ উষ্ট্র) বুড়ো উট। জরথুশ্‌ত্র নামের অন্য ব্যাখ্যা স্বর্ণময় ঊষার কিরণ অর্থাৎ যিনি প্রদীপ্ত জ্ঞান লাভ করেছেন। মনে হয় এই পরিবার কৃষিকর্মে নিযুক্ত ছিল এবং প্রচুর গবাদি পশু ছিল।

পনের বছর বয়সে উশিদারায়ণ পাহাড়ে তপস্যা করতে যান। এখানে ত্রিশ বছর মত বয়সে পরমেশ্বর অহুর মজদা (=অসুর মেধস্‌) তাঁকে দেখা দেন। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান প্রচার করতে গিয়ে দীর্ঘ দিন তাঁকে নির্যাতন ভোগ করতে হয়। বিয়াল্লিশ বছর বয়সে পূর্ব ইরানের বাক্‌ট্রিয়া বা বাহ্লীক প্রদেশে পালিয়ে কবি বিষ্‌তাস্‌প (বিষ্টাশ্ব) নামে রাজা ও তাঁর রাণী হুতোষার কাছে আসেন। এখান থেকে পঁয়ত্রিশ বছর ধর্ম প্রচার করেন এবং সাতাত্তর বছর বয়সে তুরব্রাতুর নামে এক জন তুরানি ধর্মান্ধ ব্যক্তির হাতে বাল্‌খ্‌ বা বাহ্লীকের অগ্নি মন্দিরে নিহত হন। জরথুশ্‌ত্র-এর তিন ছেলে ও তিন মেয়ে। তাঁর বড় ছেলে মগ; জরথুশ্‌ত্রীয় পুরোহিত সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। এই মগ শব্দই লাতিনে মাগুস, বহুবচনে মাগি—প্রাচ্যের জ্ঞানী ব্যক্তি অর্থে প্রযুক্ত। খৃস্ট জন্মের ২-১ শতকের মধ্যে এই মগরা ভারতে আসেন এবং মগব্রাহ্মণ বা শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণ নামে জ্যোতির্বিদ হিসাবে হিন্দু সমাজে গৃহীত হন। এই মগরা ইরানের সমাজে ভারতীয় ব্রাহ্মণদের অনুরূপ কাজ করতেন।

জরথুশ্‌ত্র ধর্ম—জরথুশ্‌ত্রের প্রবর্তিত ধর্ম। অহুর মজদা (=অসুর মেধস্‌=শক্তিময় বা জ্ঞানময় ঈশ্বর) নামে এক পরমেশ্বরে বিশ্বাস রূপ একেশ্বর বাদ। ইন্দো-ইরানীয় আর্যেরা সূর্য, চন্দ্র, জল, অগ্নি, বায়ু ইত্যাদি বহু কিছুকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করতেন। ক্রমশ এই ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে বলিদান এবং নানা কুসংস্কার ও অত্যাচার জমতে থাকে এবং এই সবের মাধ্যমে পুরোহিতরা এবং কবি নামে শাসকবর্গ লাভবান হতে থাকেন। এই সময়ে গোধনের রক্ষক রূপে, সমাজের সংস্কারক রূপে এবং কবিদের নেতা ও শিক্ষা গুরু রূপে জরথুশ্‌ত্র জন্মান। জরথুশ্‌ত্র বললেন বিশ্ব জগতের সব কিছু ঈশ্বরের নিয়ম 'অর্ত' (প্রাচীন পারসিক) অনুযায়ী। এই অর্ত আর সংস্কৃত ঋত এক জিনিস। অবেস্তার ভাষায় অর্ত=অষ। ঈশ্বর মানুষকে চিন্তা শক্তি দিয়েছেন। এই শক্তিতে মানুষকে স্পেন্ত মইন্যু (শুদ্ধ শক্তি) ও অঙ্গ্রমইন্যু (অসৎ শক্তি) এই দুটির যে কোন একটিকে বেছে নিয়ে চলতে হয়। সৎ মানুষের ছটি আদর্শ অবলম্বন করা উচিত :—(১) বোহুমনো=সংস্কৃতে বসুমনস্‌ বা শ্রেষ্ঠ মনন ; (২) অষ=ঋত ; (৩) খষত্র =ক্ষত্র=দৈবশক্তি ; (৪) আর্‌মইতি=ভক্তি ; (৫) হউর্বতাৎ=সর্বতাৎ অর্থাৎ পরিপূর্ণতা ; (৬) অমেরেতাৎ=অমৃতাৎ বা অমৃতত্ব। মানুষের তিনটি নীতি হুমত (=সুমত) ;

হুখ্‌ত (সুউক্ত) ; ও হ্বর্স্ত (=সুবৃত্ত) অর্থাৎ শুভমনস্‌, শুভ বচন, ও শুভ কর্ম করা উচিত।

জীবন শেষে মানুষ উর্বন (=নির্বাণ) বা আত্মা সুবিচার লাভ করে পইরিদ এজ (=প্যারাডাইজ) স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। প্রতি যুগের শেষে ফ্রষোকেরেতি বা আত্মার পুনর্জীবন লাভ ঘটে। পরবর্তী যুগে আবার এক জন সওষ্যন্ত (সৎসন্ত ?)= ত্রাণ কর্তার আবির্ভাব হবে। এই নতুন মতবাদ যাঁরা গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের নাম হয় 'মজদা-য়সনান্‌' ; আর যাঁরা পুরাতন পথে রয়ে গেলেন তাঁদের নাম হল দএব য়সনান্‌ (=দেব যজমান)। নতুন মতবাদে মূর্তিপূজা, বলি বা কর্মবাদ কিছুই থাকল না। জরথুশ্‌ত্রের এই স্বর্গ ও নরক কল্পনা পরে ক্রমে ইহুদি, খৃস্টান ও মুসলমান ধর্মে গিয়ে পৌঁছয়। গাথায় আছে মৃত্যুর পর মানব আত্মাকে 'চিন্‌বৎ পেরেতু' নামে সেতুর ওপর দিয়ে ঈশ্বরের কাছে বিচারের জন্য এগিয়ে যেতে হয়। ইসলামের পুল্‌ সিরাত এই জরথুশ্‌ত্রীয় সেতু।

জরথুশ্‌ত্রের পর তাঁর ছেলে প্রধান আথ্‌বান (আথর্বান) ধর্মনেতা ও পুরোহিত হন। প্রাচীন আর্য দেবদেবীর কোন উল্লেখ গাথাতে ছিল না। কিন্তু পুরোহিতেরা পরে নানা কারণে প্রাচীন দেবদেবীদের য়জত (সংস্কৃত যজত) বা দেবদূত নামে আবার প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু মূর্তিপূজা ও বলিদান বাদই থেকে যায়। এই দেবদূতদের নাম মিথ্র (=মিত্র), বেরেথ্রঘেন (=বৃত্রঘ্ন), অর্তবহিষ্‌ত (=ঋত বশিষ্ঠ) অদ্বি-সূর, অনাহিত ইত্যাদি। জরথুশ্‌ত্র আতর (সং অথর্‌=অথর্বান=অগ্নি) মন্দির স্থাপন করেন। গ্রীকরাজ আলেকজান্দার পারস্য জয়ের সময় ইরানের সুবিখ্যাত গ্রন্থাগারগুলি ধ্বংস করেন। খৃ ৭ শতকে আরবীয় মুসলমান আক্রমণে এই ধর্ম, সংস্কৃতি, মন্দির ইত্যাদি সব কিছু নষ্ট হয়ে যায়। মগ পুরোহিতদের গ্রন্থাবলী ২১ নস্ক (=খণ্ড) নষ্ট হয়ে মাত্র দেড় খণ্ডে পরিণত হয়। এই সময় জরথুশ্‌ত্র বাদীরা ভারতে পালিয়ে এসে সন্‌-জান্‌-এর হিন্দু রাজার আশ্রয় গ্রহণ করেন। এঁরাই পার্সি।

জরফসান—হাটক নদী (ভাগবতে), হিরণ্যবতী (মহাভারতে) ; ইয়রকন্দ=ভদ্রা ; ট্রান্সঅক্সিয়ান। বোখারা ও সমরখন্দের উত্তরে।

জরা—একজন ব্যাধ ; কৃষ্ণকে (দ্রঃ) হত্যা করেছিল।

জরা—মহাভারতে (২।১৬।১৮) মাংসশোণিত ভোজনা রাক্ষসী। বৃহদ্রথের রাণীদের পরিত্যক্ত জীবিত দুটি অর্দ্ধাঙ্গ শিশুকে কৌতূহলে পাশাপাশি রেখেছিল ; এবং এ দুটি নিজে থেকে জুড়ে গিয়ে পূর্ণাঙ্গ শিশু হয়েছিল। বজ্রসার শিশুকে রাক্ষসী নিয়ে পালাতে পারে নি এবং শিশুর কান্নায় প্রাসাদ থেকে সকলে ছুটে আসে। রাক্ষসী ভাবে এই রাজার রাজ্যে বাস করে রাজপুত্রকে নিয়ে পালান উচিত হবে না এবং মানুষের রূপ ধরে শিশুকে দিয়ে দেয় এবং রাজা পরিচয় চাইলে জরা নিজের পরিচয় দেন ও বলেন এই রাজ্যে তিনি পূজিতা (মহা ২।১৭।৩) এবং সুখে বাস করছেন ইত্যাদি। গীতাপ্রেস ইত্যাদি সংস্করণে আছে মানুষকে ভালবাসতেন। প্রতি বাড়িতে ঘুরে বেড়াতেন বলে ব্রহ্মা এঁকে গৃহদেবী নাম দিয়েছিলেন। বিশ্বাস ও ভক্তিভরে এঁকে ঘরের দেওয়ালে

অঙ্কিত রাখলে শ্রীবৃদ্ধি হয়। দানবদের ইনি বিনাশ করেন। এক মতে ইনি ষষ্ঠী। দ্রঃ- হারীতী, জরাসন্ধ।

জরাসন্ধ—চন্দ্রবংশীয় মগধরাজ বৃহদ্রথের ছেলে। রাজার প্রাসাদে জরা (দ্রঃ) রাক্ষসীর মূর্তি আঁকা ছিল ; বৃহদ্রথ এ'কে পূজা করতেন। কাশীরাজের দুটি যমজ কন্যা বৃহদ্রথের স্ত্রী। নিঃসন্তান রাজা শেষ অবধি বনে যান এবং বনে গৌতম পুত্র কক্ষীবান বা চণ্ড-কৌশিকের সঙ্গে দেখা হয়। রাজা পুত্রার্থে বর চান। মুনি একটি আম গাছের নীচে বসে ধ্যান করছিলেন ; একটি আম তাঁর কোলে এসে পড়ে। মুনি আমটিকে মন্ত্র পূত করে রাজাকে দেন ; রাজা আমটি দুভাগ করে দুই রাণীকে দান করেন। রাণীরা আম খেয়ে গর্ভবতী হন। উপযুক্ত সময়ে দুই রাণীরই অর্দ্ধদেহ যুক্ত একটি করে সন্তান হয়। রাণীরা নিরুপায় হয়ে সন্তান দুটিকে পথে ফেলে দেন। জরা এই অংশ দুটিকে দেখতে পেয়ে তুলে নিয়ে এক সঙ্গে করলে দুটি অংশ জুড়ে গিয়ে একটি শিশুতে পরিণত হয়। শিশু কেঁদে ওঠে ; জরা শিশুটিকে রাণীদের কাছে ফিরিয়ে দেন। এই ছেলে জরাসন্ধ নামে পরিচিত। জরাসন্ধ ক্রমে অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। জরাসন্ধের দুই বোন/মেয়ে অস্তি ও প্রাপ্তি ; এ'রা কংসের স্ত্রী। কংসের মৃত্যুর পর এ'রা দু জনে পিতার কাছে ফিরে যান। জরাসন্ধ প্রতিশোধ নেবার জন্য আঠার বার (হরি ২।৩৬।১৭) মথুরা (দ্রঃ) আক্রমণ করেছিলেন। তীব্র যুদ্ধ হয়েছিল। ভাগবতে (১০।৫০।-) ২৩ অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে মথুরা অবরোধ করেন। স্বর্গ থেকে দিব্য অস্ত্র আসে। বলরামের হাতে পাশবদ্ধ হন ; কৃষ্ণ ছেড়ে দিতে বলেন। এইভাবে ক্রমান্বয়ে ১৭ বার আক্রমণ। ভাগবতে চক্রমুসল যুদ্ধ নাই। ১৮শ যুদ্ধের সূচনা দেখা দেয়। এই সময় নারদ প্রেরিত কালযবন (দ্রঃ) তিন কোটি ম্লেচ্ছ সৈন্য নিয়ে মথুরা অবরোধ করে। কৃষ্ণবলরাম সমুদ্র কূলে শক্তিশালী বিরাট এক দুর্গ করে সেখানে গিয়ে বাস করতে থাকেন। দেবী ভাগবতে ১৭ বার মথুরা আক্রমণ করে পরাজিত হন। তারপর চক্রমুসল যুদ্ধ এবং তারপর কালযবন। ১৭তম আক্রমণের সময় (দ্রঃ-কৃষ্ণ) এবং চক্রমুসল (দ্রঃ) যুদ্ধে বলরাম (দ্রঃ) জরাসন্ধকে হত্যা করতে যাচ্ছিলেন কিন্তু দৈববাণী হয় বলরামের হাতে জরাসন্ধের মৃত্যু হবে না। ফলে বলরাম মুক্তি দেন। কৃষ্ণকে (দ্রঃ) বধ করার জন্য একটি গদাকে নিরানব্বই বার প্রদক্ষিণ করে গিরিব্রজ থেকে মথুরার দিকে ছুঁড়ে দেন ; কিন্তু গদা নিরানব্বই যোজন দূরে গিয়ে পড়ে।

মহাভারতে (৭।১৫৬।৮) কৃষ্ণ বলরামের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে ছিলেন ; বলরামও স্থূণাকর্ণ অস্ত্রে প্রতিহত করেন। পাঞ্চালীর স্বয়ংবরে ছিলেন। রাজসূয় যজ্ঞের জন্য পরামর্শ সভায় কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলেন এই জরাসন্ধকে আগে নিহত করতে হবে। কৃষ্ণ বলেন, শিশুপাল, ভগদত্ত, পৌণ্ড্রকবাসুদেব, ভীষ্মক, বক্র, দন্তবক্র, করূষ, করভ ও মেঘবাহন জরাসন্ধের দলে। উত্তর দেশীয় ভোজেরা এবং আঠারটি রাজ বংশ :- শূরসেন, ভদ্রকার, বোধ, শাল্ব, পটচ্চর, সুস্থরা, সুকুট্টা, কুণিন্দা, কুন্তিরাজারা, শাল্বেয় রাজারা, কিছু পাঞ্চাল রাজ, কিছু কোশলরাজ. মৎস্যরা, সংন্যস্তপাদরা নিজেদের দেশ ছেড়ে দক্ষিণে ও পশ্চিমে পালিয়ে গেছে (মহা ২।১৩।২৮)। জরাসন্ধ মহাদেবের পূজা করে অপর রাজাদের

হারিয়ে দিয়ে ধরে এনেছে এবং এ পর্যন্ত এই ভাবে ৮৬ জন রাজাকে মহাদেবের কাছে বলি দিয়েছে। আর ১৪ জনকে (ভাগবতে, ১।১৫, মহাভৈরব যজ্ঞে) বলি দিলে ১০০ হবে।

জরাসন্ধের সহায় হংস ও ডিম্ভক (দ্রঃ) মারা গেছে। কৃষ্ণ ভীম ও অর্জুনকে ন্যাস হিসাবে নিয়ে যেতে চান ; ভীম জরাসন্ধকে বধ করবেন। তিন জনে স্নাতক ব্রাহ্মণ বেশে কুরু দেশ থেকে কুরুজাঙ্গল পার হয়ে পদ্মসরঃ-এ আসেন। তারপর কালকূট পার হয়ে গণ্ডকী, সদানীরা, শর্করাবর্ত, 'একপর্বত' গত নদীগুলি, সরযূ, পূর্বকোশল, মিথিলা, মালা, চর্মন্বতী, গঙ্গা, এবং শোণ পার হয়ে মগধে আসেন। এরপর গোরথগিরিতে উঠে জরাসন্ধের প্রাসাদ দেখতে পান। ক্রমশ বৈহার, বরাহ, বৃষভ, ঋষিগিরি ও চৈত্যক ৫-টি শৃঙ্গ বেষ্টিত গিরিব্রজে আসেন। এরপর ঋষভ রাক্ষসের চর্মে নির্মিত ভেরী তিনটিকে ও চৈত্য শৃঙ্গকে ভেঙে ফেলে দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকেন। এই সময়ে হাতীর পিঠে অবস্থিত জরাসন্ধকে পুরোহিতরা অমঙ্গল চিহ্ন দেখে আগুন জ্বেলে আরতি করছিল (মহা ২।১৯।২০)। পথে মালাকারের কাছ থেকে গায়ের জোরে মালা কেড়ে নিয়ে পরে রাজপ্রাসাদে তিনটি কক্ষ পার হয়ে রাজার সামনে এসে উপস্থিত হন। ধার্মিক জরাসন্ধ তৎক্ষণাৎ এদের পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে অভ্যর্থনা করেন। অর্দ্ধ-রাত্রেও স্নাতক ব্রাহ্মণ এলে এই ভাবে অভ্যর্থনা করতেন। সত্যসন্ধ (মহা ২।১৯.৩৭) রাজা এদের বসতে দিয়ে প্রকৃত পরিচয় জানতে চান। হাতে জ্যাঘাত চিহ্ন রয়েছে ইত্যাদি, চৈত্যশৃঙ্গ ভেঙেছেন, অদ্বারে প্রবেশ করেছেন কেন এবং পাদ্য অর্ঘ্য কেন গ্রহণ করলেন না জিজ্ঞাসা করেন। কৃষ্ণ তখন নিজের পরিচয় দিয়ে প্রস্তাব করেন বন্দী রাজাদের মুক্তি দিতে হবে নয়তো আমাদের মধ্যে যে কোন একজনের হাতে মৃত্যু বরণ করতে হবে। জরাসন্ধ জানান ক্ষত্রধর্ম অনুসারে রাজাদের পরাজিত করে এনেছেন ইত্যাদি। ছেলে সহদেবের অভিষেকের আজ্ঞা দিয়েও হংস ও ডিম্ভককে একবার স্মরণ করেন। ব্রহ্মার আজ্ঞা স্মরণ করে কৃষ্ণ জরাসন্ধকে বধ করতে চাইলেন না। জরাসন্ধ ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চান (মহা ২।২১।৩)। ব্রাহ্মণরা রাজার এবং কৃষ্ণ ভীমের স্বস্ত্যয়ন করেন। কার্তিক মাসে প্রথম দিনে যুদ্ধ আরম্ভ হয় ; দিবারাত্র অবিশ্রান্ত যুদ্ধ। ত্রয়োদশীতে যুদ্ধ আরম্ভ হয়, চতুর্দশীতে জরাসন্ধ ক্লান্ত হয়ে পড়েন। কৃষ্ণ উৎসাহ দিতে থাকেন ; ভীম তুলে আছাড় মেরে শিরদাঁড়া চুরমার করে দেন। রাজদ্বারে মৃতদেহ ফেলে দিয়ে রাত্রিতেই এ'রা বার হয়ে আসেন। তারপর জরাসন্ধের রথে উঠে বন্দী রাজাদের মুক্ত করেন। ইন্দ্রর কাছ থেকে বসু. বসুর কাছ থেকে বৃহদ্রথ এবং তারপর জরাসন্ধ এই রথ পেয়েছিলেন। মুক্ত রাজারা কৃষ্ণকে অনেক ধনরত্ন দেন ; কৃষ্ণ অনুকম্পায় এগুলি গ্রহণ করেন এবং রাজাদের বলে দেন যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে যেন তাঁরা কর দেন। দ্রঃ- মহাদেব। অন্য মতে ভীম এ'কে মাটিতে ফেলে পায়ে করে এক পা চেপে ধরে আর এক হাতে অপর পা ধরে জরাসন্ধকে চিরে দু টুকরো করে ফেলেন।

ভাগবতে (১০।৭৩) ২০২৮ জন রাজা মুক্তি পান। ভাগবতে যুধিষ্ঠিরদের রাজসূয় কর সংগ্রহের পর জরাসন্ধ নিহত হন। ভাগবতে (৯।২২।৬) জরাসন্ধ>সহদেব>

সোমাপি>শ্রুতশ্রবা। দ্রঃ- কালযবন, কৃষ্ণ, মথুরা, (২) ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে ; ভীমের হাতে নিহত হন।

জরিতা—(১) মন্দপাল নামে অপুত্রক এক তপস্বী মারা গেলে পিতৃলোকে স্থান পান না। দেবতারা এ'কে পুত্রলাভের জন্য উপদেশ দিলে মন্দপাল জরিতা নামে একটি শার্ঙ্গিকা পাখীর সঙ্গে শার্ঙ্গ পাখীরূপে সহবাস করেন। ফলে জরিতার চারটি ছেলে হয় জরিতারি, সারিসৃক, স্তম্বমিত্র ও দ্রোণ। ছেলেগুলি ডিমের মধ্যে থাকাকালে মন্দপাল এদের ত্যাগ করে লপিতার কাছে চলে যান। খাণ্ডব বনে জরিতা ছেলেদের পালন করতে থাকেন। খাণ্ডব দহন কালে জরিতা ও ছেলেদের ফেলে পালায়। কিন্তু অগ্নির দয়ায় ছেলেরা রক্ষা পেলে মন্দপাল ও জরিতা ফিরে এসে এদের সঙ্গে মিলিত হন। (২) একটি পাখী ; অগ্নি সম্বন্ধে এ'র তৈরি কয়েকটি ঋক্ মন্ত্র আছে।

জলধার পর্বত—কালিকা পুরাণে (১৮।২৭) সতীর মৃত্যুতে মহাদেবের চোখের জল পৃথিবীতে পড়লে পৃথিবী ভস্ম হয়ে যাবে দেখে দেবতারা শনিকে বলেন। শনি মহাদেবের চোখের জল নিয়ে এই পাহাড়ে এনে স্থাপন করেন। পর্বতটি লোকালোক পর্বতের কাছে, পুষ্কর দ্বীপের পেছনে এবং জলসাগরের পশ্চিমে। এখানে পুষ্কর, আবর্ত ইত্যাদি মেঘ এসে জল পান করে যায়। অগস্ত্য এখানে তপস্যা করেন। এই জল পাহাড় থেকে নদী হয়ে নেমেছে ; সাগরের সংস্পর্শে কিছুটা 'সৌম্যতা' পায়। পাহাড় থেকে নামা নদীটি বৈতরণী : বৈবস্বত পুরদ্বারে নদীটি আজও অবস্থিত।

জলন্ধর—বা জালন্ধর। ত্রিগর্ত (দ্রঃ)। ৩০ ৫৬' ৩১ ৩৭' উ; ৭৫°৫'-৭৬°১৬' পূ। পূর্ব পাঞ্জাবের একটি বিভাগ, জেলা ও সহর। সম্রাট কনিষ্কের পৌরোহিত্যে খৃস্ট যুগের সূচনায় কুভায় যে বৌদ্ধ সম্মেলন হয়েছিল তাতে জালন্ধর নাম আছে। জলন্ধর অসুর স্থাপিত। কুলিন্দ্রিন (টলেমি)।

কৈলাসে শিবের সঙ্গে দেখা করতে এসে ইন্দ্র এক ভীষণ আকার পুরুষকে দেখতে পান। শিব কোথায় এ'কে জানতে চাইলে কোন জবাব পান না। ইন্দ্র তখন রাগে এ'র মাথায় বাজ মারেন। আহত এই পুরুষের মাথা থেকে ভীষণ আগুন বার হয়ে ইন্দ্রকে পুড়িয়ে ফেলতে যায়। ইন্দ্র বুঝতে পারেন স্বয়ং মহাদেবের মাথাতেই বাজ মেরেছেন। ফলে নানা স্তব করে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করলে মহাদেব সেই আগুন সমুদ্রে ফেলে দেন। ফলে সমুদ্রে এক শিশুর জন্ম হয় এবং কাঁদতে থাকে। এ দিকে ব্রহ্মা খবর পেয়ে এসে হাজির হলে সমুদ্র জানান এই শিশু সমুদ্রের সন্তান ; ব্রহ্মা যেন একে পালন করেন। ব্রহ্মা শিশুটিকে কোলে তুলে নিলে শিশু ব্রহ্মার দাড়ি এমন জোরে টেনে ধরে যে ব্রহ্মার চোখ দিয়ে জল বার হয়ে আসে। ব্রহ্মা এই জন্য এ'র নাম দেন জলন্ধর। এই দৈত্য জলন্ধরকে ব্রহ্মা বর দেন এক মাত্র মহাদেবের হাতেই এ'র মৃত্যু হবে। জলন্ধরকে ব্রহ্মা অসুর রাজ্যে রাজা করে দেন। সারথি হয় খড়্গরোমা।

আর এক মতে জল থেকে ব্রহ্মা এ'কে তুলে নিয়েছিলেন বলে সমুদ্রকে জলন্ধর পিতামহ মনে করত। এক বার মস্তক হীন রাহুর কাছে সমুদ্র মন্থনের

কাহিনী শুনে পিতামহকে মন্থন করা হয়েছে রূপ অন্যায়ের জন্য জলন্ধর ক্ষিপ্ত হয়ে দেবতাদের আক্রমণ করেছিল। বহু অসুর মারা যায়; ইন্দ্র এবং বিষ্ণু পরাজিত হন; বিষ্ণুকে বন্দী করে সমুদ্রের নীচে লুকিয়ে রাখে। মহাদেব শেষ অবধি জলন্ধরকে হত্যা করে বিষ্ণুকে মুক্ত করেন।

একটি মতে দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের যখন যুদ্ধ হচ্ছিল তখন দেবতারা হারছেন দেখে মহাদেব নিজে যুদ্ধে আসেন। জলন্ধর পরাজিত হন এবং পরাজিত হয়ে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টায় শুম্ভ নামে এক সেনাপতিকে জলন্ধর সেজে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে বলে এবং নিজে শিবের বেশে কৈলাসে এসে হাজির হয়। জলন্ধরের সঙ্গে এক জন অনুচর ছিল নাম দুর্বারণ; অনুচর নন্দীর বেশ ধরেছিল। সারা দেহ অস্ত্রে ক্ষত বিক্ষত এবং রক্তাক্ত অবস্থাতে নন্দীর কাঁধে ভর দিয়ে আসে। পার্বতী বিচলিত হয়ে পড়েন। মায়া-শিব যুদ্ধের সমস্ত ঘটনা বলতে থাকেন, তাঁর পার্ষদরা সকলে নিহত হয়েছে; গণেশ ও কার্তিকের মুণ্ড মাটিতে পড়েছিল তুলে এনেছেন। মুণ্ড দুটি পার্বতীকে দেন; এবং সান্ত্বনার জন্য পার্বতীকে সম্ভোগে ডাকেন। পার্বতী সম্মত হয় না; এই দুঃখের মুহূর্তে সম্ভোভ অনুচিত। মায়াশিব তখন বৈরাগ্য দেখিয়ে চলে যাবার ভাণ করেন। পার্বতীও অস্থির, কিংকর্তব্যবিমূঢ় চিত্তে সরে গিয়ে আকাশ গঙ্গার তীরে বসে তপস্যা করতে থাকেন। এর পর এক দিন পার্বতী জয়াকে পাঠান খবর নিতে সত্যই এ শিব কিনা। পার্বতীর বেশে জয়া এলে জলন্ধর যেহেতু সর্বজ্ঞ নন, জয়াকে পার্বতী মনে করে জড়িয়ে ধরলে সঙ্গে সঙ্গে বীর্যপাত হয়। জয়া ফিরে এসে পার্বতীকে সব জানান। পার্বতী তখন ভয়ে একটি পদ্ম ফুলের মধ্যে লুকিয়ে থাকেন এবং পার্বতীর সখীরা ফুলটিতে পোকা হয়ে অবস্থান করতে থাকেন।

কালনেমির মেয়ে বৃন্দার (দ্রঃ) সঙ্গে জলন্ধরের বিয়ে হয়েছিল। জলন্ধর যখন পার্বতীকে সম্ভোগের চেষ্টায় ব্যস্ত বিষ্ণু তখন প্রতিশোধ নেবার জন্য বৃন্দার কাছে আসেন। বৃন্দা স্বামীর প্রাণ রক্ষার জন্য এ দিকে বিষ্ণুর পূজা করছিলেন। বিষ্ণু জলন্ধরের রূপ ধরে এলে অক্ষত দেহ স্বামীকে দেখে বৃন্দা আনন্দে উঠে পড়েন। একটি মতে জলন্ধর বেশী বিষ্ণু বৃন্দার সতীত্ব নাশ করেন। বর দেওয়া ছিল বৃন্দার সতীত্ব অক্ষুণ্ণ থাকলে জলন্ধরের মৃত্যু হবে না। বৃন্দার (দ্রঃ) সতীত্বনাশ ও মৃত্যু ইত্যাদি গভীর অরণ্যে ঘটে। ইতিমধ্যে একজন অনুচর বৃন্দাকে প্রাসাদে না পেয়ে খবরটা যুদ্ধ ক্ষেত্রে শুম্ভকে জানালে জলন্ধরও সংবাদ পান এবং আবার যুদ্ধে এসে যোগ দিয়ে মারা যান।

জলন্ধর দোয়াব—প্রাচীন কেকয় ও বাহ্লীক মিলে। বিয়াস ও সাটলেজের মধ্যবর্তী।

জলসন্ধি—(১) ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে; ভীমের হাতে নিহত। (২) কৌরব পক্ষে যোদ্ধা; সাত্যকির হাতে নিহত।

জলেপু—পুরুর ছেলে রুদ্রাশ্ব। রুদ্রাশ্বের ঔরসে মিশ্রকেশীর গর্ভে জলেপু জন্মান।

জল্পীশ শিব—কামরূপে বায়ুকোণে (কা-পু ৭৭।১১)

জল্লালপুর—পাঞ্জাবে বুকেফল (গ্রীক)।

জহ্নু—একজন রাজর্ষি। উর্বশীর গর্ভে পুরূরবার সাত ছেলের মধ্যে একজন অমাবসু। অমাবসু>ভীম>কাঞ্চনপ্রভ>সুহোত্র। সুহোত্র+কেশিনী>জহ্নু। আর এক মতে দুষ্মন্ত (১)>ভরত (২)>বৃহৎপুত্র (৪)>অজমীঢ় (৫)। অজমীঢ়ের স্ত্রী ধূমিনী, নীলী ও কেশিনী। কেশিনীর ছেলে জহ্নু (মহা ১।৮৯।২৮)। যুবনাশ্বের মেয়ে কাবেরীর সঙ্গে জহ্নুর বিয়ে হয় (হরি ১।২৭।৯); ছেলে সুনহ>অজক>বলাকাশ্ব>কুশ> কুশিক, কুশনাভ, কুশাম্ব ও মূর্তিমান। আর এক মতে জহ্নু ছেলে বলাকাশ্বকে রাজ্য দান করেন। সর্বমেধ যজ্ঞ করে জহ্নু বিখ্যাত হয়েছিলেন। গঙ্গা এ'কে পতিরূপে পাবার জন্য এলে প্রত্যাখ্যাত হন এবং তখন এ'র যজ্ঞস্থল ভাসিয়ে দেন। রাজা রেগে গিয়ে গণ্ডূষে গঙ্গাকে খেয়ে ফেলেন (হরি ১।২৭।৫)। সেই থেকে মহর্ষিরা গঙ্গাকে জহ্নুর মেয়ে বলে স্বীকার করেন; নাম হয় জাহ্নবী। অন্য মতে ভগীরথ (দ্রঃ) গঙ্গাকে নিয়ে যখন এগিয়ে চলেছিলেন তখন গঙ্গা জহ্নুর যজ্ঞস্থল ভাসিয়ে দেন ইত্যাদি। তারপর ভগীরথ ইত্যাদির স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে কাণ দিয়ে অন্য মতে জানু থেকে বার করে দেন; ফলে নাম হয় জাহ্নবী।

জহ্নু আশ্রম—সুলতানগঞ্জে (পূ-রে) এই আশ্রম। গঙ্গা (দ্রঃ)। ভাগলপুরের পশ্চিমে আশ্রমের স্থানটিতে গৈবিনাথ মহাদেবের মন্দির রয়েছে। সুলতানগঞ্জের সামনে গঙ্গা থেকে উদ্‌গত একটি পাহাড়ের ওপর এই মন্দির। পাণ্ডারা কাছেই জঙ্গিরা (জহ্নু গিরি/গৃহ) আশ্রমে থাকেন। সুলতান গঞ্জে একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল এবং খৃ ৫-শতকে এই বিহারে তামার এক বিরাট বৌদ্ধ মূর্তি ছিল।

জাঙ্গুলী—অক্ষোভ্য (দ্রঃ) কুল। বৌদ্ধ মহাযানে ও তন্ত্রে। একজন ব্যাপক পূজিতা দেবী। সর্পবিষহারিণী। সাপ কামড়ানও বন্ধ রাখেন। বুদ্ধদেব নিজে আনন্দকে জাঙ্গুলী সম্বন্ধে বলেছিলেন ও পূজার মন্ত্র দিয়েছিলেন। তিনটি ধ্যান প্রচলিত ঃ-(১) বর্ণশ্বেত, চার হাত, এক মুখ; মুদ্রা অভয়, প্রতীক সাপ বা বীণা। মাথায় জটামুকুট। সর্প ও রত্ন আভরণ, পশুবাহন। (২) শ্যাম বর্ণ, মুদ্রা অভয়, প্রতীক ত্রিশূল, ময়ূর পালক ও সর্প। (৩) পীত বর্ণ, তিন মুখ, ছয় হাত, বাহন সাপ। হাতে খড়্গ, বজ্র বাণ, তর্জনী পাশ, পদ্ম ও ধনু; সাপের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ব্রাহ্মণ্য তান্ত্রিক মনসার সঙ্গে অনেক মিল। জৈনদেবী পদ্মাবতী ও জাঙ্গুলীতারা যেন অভিন্ন।

জাজলি—একজন ঋষি। অথর্ববেদ বেত্তা পথ্যের শিষ্য। সমুদ্রের জলে তপস্যা করছিলেন। ধ্যানে সমুদয় লোক বিচরণ ও নিরীক্ষণ করে গর্বিত হয়ে ভাবেন তিনি অদ্বিতীয়। সঙ্গে সঙ্গে আকাশ থেকে রাক্ষসরা জানায় বারাণসীতে তুলাধার এ রকম গর্বিত নয়। জাজলি তখন অনুরোধ করলে রাক্ষসরা একে জল থেকে তুলে বারাণসীর পথ দেখিয়ে দেয়।

জাজলি নিশ্চল হয়ে বহুদিন তপস্যা করছিলেন। দুটি চড়াইপাখী (কুলিঙ্গ-শকুনৌ) এসে মাথাতে বাসা বাঁধে। এরা তারপর ডিম পাড়ে, বাচ্চা হয় এবং বাচ্চাগুলি বড় হয়ে আসা যাওয়া করতে থাকে। এরপর এক দিন এরা সব পাখী

উড়ে যায় ; ৬ দিন পরে আবার ফিরে আসে ; জাজলি কিন্তু চুপ করে এই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন। এরপর পাখীগুলি আবার চলে যায় এবং এক মাস পরেও আর ফেরে না।

জাজলি তখন নদীর জলে স্নান ও অগ্নিতে আহুতি ইত্যাদি দিয়ে মনে মনে গর্ব অনুভব করেন যথার্থই ধর্ম লাভ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে আকাশবাণী হয় বারাণসীতে তুলাধার (দ্রঃ) এ রকম গর্বিত নয়। জাজলি তারপর বহু জায়গা ঘুরতে ঘুরতে বারাণসীতে আসেন।

এই দুটি ঘটনা মহাভারতে (১২।২৫৩) পর পর রয়েছে। কোনটি আগে বা দুটি একই ঘটনা কিনা স্পষ্ট নয়। জাজলি দেখা করলে সমুদ্রের জলে তপস্যা, চড়াইপাখীর বাসা ইত্যাদি তুলাধার সব বলে যায়। জাজলি বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়ে পড়েন। তুলাধার (দ্রঃ) জানায় সে তপস্যা করে না। কিন্তু অহিংসা, লোভহীনতা, অপরকে অভয় দেওয়া, সর্বজীবে দয়া ইত্যাদি তার কাজ। আরো বহু উপদেশ দিয়েছিল।

জাঠ—ধৈর্য, শ্রম ও অসীম বীরত্ব ইত্যাদির জন্য বিখ্যাত জাতি। নিজেদের এরা যাদব বলে দাবি করেন। আফগানিস্তান থেকে মালব পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকাতে ছড়িয়ে আছেন। সাধারণ কৃষিজীবী।

জাতক—পালি ভাষাতে সুত্তপিটকের অন্তর্গত খুদ্দক নিকায়ের দশম গ্রন্থ এবং প্রাচীন নবাঙ্গ বিভাগের একটি অঙ্গ। জাতক অর্থে বৌদ্ধ সাহিত্যে গৌতম বুদ্ধের অতীত জন্ম বৃত্তান্ত। জাতকের কাহিনীগুলিতে বুদ্ধ অবশ্য সব সময় নায়ক নন ; অনেক কাহিনীতে গৌণ চরিত্র হিসাবেও দেখান হয়েছে। বৌদ্ধদের বিশ্বাস কোটিকল্প কাল বোধিসত্ত্ব রূপে বার বার জন্মের মধ্য দিয়ে দানশীলাদি দশপারমিতার পরাকাষ্ঠা লাভ করে এবং শেষে পূর্ণ প্রজ্ঞা লাভ করে বুদ্ধত্ব পাওয়া যায়।

জাতকত্থবণ্ণনা অনেকের মতে বুদ্ধ ঘোষের রচনা। কাহিনীগুলি দীঘ-মজ্‌ঝিম সংযুত্তাদি নিকায় গ্রন্থে ও বিনয়পিটকে মহাবগ্‌গ ও চুল্লবগ্‌গ ইত্যাদি অংশে ছড়ান রয়েছে। কাহিনীগুলির কিছু কাহিনী বোধিসত্ত্বহীন ; আবার কিছু কাহিনীতে নায়ককে বোধিসত্ত্ব বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এই কাহিনীগুলি থেকে নির্বাচিত সংকলন হচ্ছে জাতকত্থবণ্ণনা। অনেকের মতে পিটকভুক্ত খুদ্দ-নিকায়ের যে অংশ জাতক নামে অভিহিত তাতে কেবল গাথাই সংকলিত রয়েছে। পরে এই গাথাগুলিকে স্পষ্ট করবার জন্য গাথার বিষয় বস্তুকে সম্প্রসারিত করে গল্প-গুলি রচিত হয়েছে এবং এই গল্প সংগ্রহ হচ্ছে জাতকত্থবণ্ণনা। ভগবান বুদ্ধ নিজে কিছু কাহিনী রচনা করেছিলেন; তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যরা কিছু রচনা করেছিলেন। ধর্ম প্রচারের জন্য এই ভাবে জাতক সমৃদ্ধ ও পরিমার্জিত হতে থাকে। চুল্লনিদ্দেশ নামক গ্রন্থে জাতকের সংখ্যা বলা হয়েছে ৫০০; ফা-হিয়েনের মতে ৫০০ ; ফৌসবোলের জাতক গ্রন্থে ৫৪৭ কাহিনী আছে ; বুদ্ধ ঘোষ এদের সংখ্যা বলেছিলেন ৫৫০। খৃস্ট জন্মের ২ বা ৩ শতক পূর্বে অনেকগুলি জাতক কাহিনী প্রচলিত ছিল। ভারহুত ও সাঁচী স্তূপ প্রাচীরের গায়ে কিছু কাহিনীর শিলা চিত্র দেখা যায়।

প্রতিটি জাতকে কয়েকটি ভাগ দেখা যায়। প্রথম ভাগের নাম প্রত্যুৎপন্ন বস্তু বা বর্তমান কাহিনী অর্থাৎ কোথায় কোন প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব কাহিনীটি বর্ণনা করে ছিলেন। দ্বিতীয় ভাগের নাম অতীত বস্তু এই অংশ বুদ্ধের অতীত জন্মের কাহিনী। কোন কোন প্রত্যুৎপন্ন বস্তু ও অতীত বস্তুর সঙ্গে কিছু পদ্যাংশ আছে ; এগুলির নাম গাথা। প্রত্যুৎপন্ন বস্তুর টীকা সমন্বিত গাথা অংশের নাম বেয্যাকরণ বা ব্যাকরণ। প্রতিটি জাতকের শেষে উপসংহার অংশটির নাম সমোধান অর্থাৎ সমবধান। এই সমবধান অংশে প্রত্যুৎপন্ন বস্তুর পাত্রদের সঙ্গে অতীত বস্তুর পাত্রদের অনন্যতা দেখান হয়েছে। অতীত বস্তুর বহু কাহিনীর আরম্ভ হয়েছে 'অতীতকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্তের রাজত্ব কালে' এই উক্তিটি দিয়ে। এই উক্তির বিশেষ কোন অর্থ আছে মনে হয় না। ব্রহ্মদত্ত শব্দটি কাশী রাজদের গোত্র নাম বলে মনে হয়।

জাতকত্থবন্ননা গ্রন্থের মুখবন্ধ অংশের নাম 'নিদান কথা'। এটির তিনটি অংশ ; দূরে নিদান, অবিদূরে নিদান. এবং সন্তিকে নিদান। দূরে নিদান অংশে বোধিসত্ত্ব অবস্থায় বুদ্ধদেবের সুমেধ ব্রাহ্মণ রূপে জন্ম থেকে তুষিত স্বর্গে উৎপত্তি পর্যন্ত বিস্তৃত বিবরণ। অবিদূরে নিদান অংশে তুষিত স্বর্গ থেকে পতিত হয়ে সিদ্ধার্থ রূপে জন্ম ও বোধিত্ব পাওয়া পর্যন্ত ঘটনা। সন্তিকে নিদান অংশে বুদ্ধদেবের জীবনের পরবর্তী ঘটনাগুলি সঞ্চিত রয়েছে।

বৌদ্ধ ধর্ম জনপ্রিয় করে তোলার জন্য এই জাতক। সাহিত্য শিল্প ও ঐতিহাসিক উপাদানে জাতক কাহিনীগুলি সমৃদ্ধ।

জাতি—(১) বিভিন্ন ব্যক্তিতে বা দ্রব্যে বিদ্যমান অনুগত ধর্মকে জাতি বলা হয়। বৈশেষিক দর্শনে সাতটি পদার্থের একটি। জাতি একটি নিত্য পদার্থ : বহুর মধ্যে অবিচ্ছেদ্য ভাবে বর্তমান একটি ধর্ম। ভাট্ট ও প্রাভাকর মীমাংসকরা জাতি স্বীকার করেন কিন্তু জাতি ও ব্যক্তিকে ভিন্ন পদার্থ বলে মানেন না। মীমাংসকদের মতে জাতি ব্যক্তি থেকে ভিন্নও বটে আবার অভিন্নও বটে। প্রাভাকরদের মতে ব্যক্তির উৎপত্তির সঙ্গে জাতি ও ব্যক্তি সম্বন্ধ উৎপন্ন হয়। বৌদ্ধ দার্শনিকরা জাতি মানেন না। সামাজিক ব্যবস্থায় জাতি বর্ণের অন্তর্গত বিভাগ।

(২) রাগসঙ্গীতে যখন স্বরগ্রামে সাতটি স্বরের প্রয়োগ হয় তখন তাকে 'সম্পূর্ণ' বলা হয় ; ছয়টি স্বরের প্রয়োগ হলে ষাড়ব এবং পাঁচটি স্বরের প্রয়োগ হলে তাকে ঔড়ব বলা হয়। রাগসঙ্গীতে ঔড়ব থেকে কম স্বর ব্যবহার হয় না। স্বরের আরোহন ও অবরোহন ক্রম অনুসারে রাগ সঙ্গীতের জাতি সংখ্যা নয়টি ঃ—সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ-ষাড়ব, সম্পূর্ণ-ঔড়ব, ষাড়ব-সম্পূর্ণ ষাড়ব-ষাড়ব, ষাড়ব-ঔড়ব. ঔড়ব-সম্পূর্ণ, ঔড়ব-ষাড়ব, ঔড়ব-ঔড়ব। রাগ সঙ্গীতের আগে প্রাচীন ভারতে জাতি গানই প্রচলিত ছিল। পরে জাতির লক্ষণগুলি রাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মতঙ্গের মতে শ্রুতি, স্বর ও গ্রাম সমূহ থেকে যে গীতরূপ তার নাম জাতি। শুদ্ধ জাতি সাত ঃ—ষাড়বী, আর্ষভী, গান্ধারী, মধ্যমা, পঞ্চমী, ধৈবতী, নৈষাদী। এছাড়াও ১১টি বিকৃত জাতি ছিল ষড়্জ-কৈশিকী, ষড়্জোদীচ্যবা, ষড়্জমধ্যমা, গান্ধারোদীচ্যবা,

রক্তগান্ধারী, কৈশিকী, মধ্যমোদীচ্যবা, কার্মারবী, গান্ধারপঞ্চমী, আন্ধ্রী, ও নন্দয়ন্তী। জাতির প্রধান লক্ষণ দশটি ঃ—গ্রহ, অংশ, তার, মন্দ, ন্যাস, অপন্যাস, সংন্যাস, বিন্যাস, বহুত্ব, অল্পত্ব।

জাতিব্যবস্থা—হিন্দু সমাজে বর্ণ সংখ্যা চার : জাতি প্রায় তিন হাজারেরও বেশি ; ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এগুলি জাতি নয় ; বর্ণ। সত্ত্ব, রজো, তমো গুণের কম বেশি হিসাবে চারটি বর্ণের জন্ম। বেদের ব্রাহ্মণাংশের রচনা খৃ-পূ ৫-শতকে শেষ হয়। ব্রাহ্মণাংশে জাতি চারটি ; যজন-যাজন-বৃত্তিধারী-ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও দাস বা দস্যু জাতি। এই দস্যুরা পরে শূদ্রে পরিণত হন। সে যুগে একই বর্ণের মধ্যে বিভিন্ন বৃত্তি প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ভারতে নতুন কোন জাতির সঙ্গে পরিচিত হলেই এই জাতির গুণ ও কর্ম অনুসারে কোন না কোন বর্ণের মধ্যে একে স্থান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই জাতির গুণ ও কর্ম যদি কোন বর্ণের সঙ্গে না মিলত তখন মিশ্র গুণ যুক্ত এই জাতিকে নিয়ে স্মৃতিকাররা বিব্রত হয়ে পড়তেন ; এই জাতিকে সমাজের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়ার প্রশ্ন জটিল হয়ে উঠত।

বৈদিক যুগে বৃত্তি সম্বন্ধে স্বাধীনতা ছিল ; যে কোন বর্ণের যে কোন বৃত্তি হতে পারত। স্মৃতির যুগে বৃত্তি থেকে জাতি হত। কোন জাতি কোন বর্ণের অন্তর্গত হবে স্মৃতিকাররা ঠিক করে দিতেন। পৌণ্ড্রক, ঔড্রদ, দ্রাবিড়, কম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্নব/পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ ও খশ এই সকল দেশে জন্ম ক্ষত্রিয়েরা কর্ম দোষে শূদ্রে পরিণত হয়েছেন এ কথাও তাঁরা বলে গেছেন। ব্রাহ্মণাদি চার বর্ণের ক্রিয়ালোপ হেতু এদের বাহ্য জাতি বলা হয়েছে ; এবং সাধুভাষী বা ম্লেচ্ছভাষী এরা যাই হোক এদের দস্যু জাতি বলা হত। অর্থাৎ বিভিন্ন দেশ থেকে আগত বিভিন্ন জাতি (বর্তমান অর্থে) এসে হিন্দু সমাজের চতুর্বর্ণকে শক্তিশালী ও বিরাট করে তুলেছিল। ভারতীয় অর্থে জাতি ছিল বৃত্তিগত ; নতুন কোন জীবিকার পথ পেলে চার বর্ণের লোকই এই জীবিকাতে যোগ দিয়ে নতুন বৃত্তিগত নতুন জাতি গড়ে তুলত। এবং এই নতুন জাতিকে চারিটি বর্ণের মধ্যে যে কোন একটি বর্ণের মধ্যে ধরে নেওয়া হত।

ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি কয়েকটি বৃত্তিকে উত্তম ও কয়েকটিকে হেয় মনে করেছিল এবং সেই অনুসারে ঐ বৃত্তিগত জাতিকে উত্তম বা হেয় বলে স্বীকার করা হয়েছে। তন্ত্রে জাতি বিচার স্বীকৃত। আলবিরুনি হাড়ি, ডোম চণ্ডাল, 'বধতো'—এগুলিকে অন্ত্যজ জাতি হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

জাতিস্মর—যে ব্যক্তি পূর্ববর্তী এক বা একাধিক জন্ম স্মরণ করতে পারে। জন্মান্তর বাদের (দ্রঃ) ওপর এই জাতিস্মরতার ভিত্তি। ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ এসিয়ায় এই মতবাদ চালু আছে। মহাভারতে জাতিস্মর নামে এক হ্রদের কথা আছে ; এখানে স্নান করলে জীব জাতিস্মর হত। সূর্যোদয়ের সময় সমাহিত চিত্তে অষ্টোত্তর শতবার সূর্য নাম পাঠ করলেও জাতিস্মর হওয়া যেত। গীতাতেও জাতিস্মরবাদ স্বীকৃত। হরিবংশে আছে কুরুক্ষেত্রের সাতজন ব্রাহ্মণ গোহত্যা করে পাপ স্খালনের জন্য সেই মাংস পিতৃদেবদের

উৎসর্গ করে থান। এর ফলে পর জন্মে এ'রা সাত জন জাতিস্মর ব্যাধ হয়ে জন্মান এবং পরের জন্মে এ'রা সাতটি জাতিস্মর হরিণ হয়ে জন্মান। দ্রঃ- কৌশিক-৩।

মনুতে আছে বেদপাঠ, তপস্যা ইত্যাদির দ্বারাও জাতিস্মর হওয়া যায়। যোগসূত্রে আছে অপরোক্ষ অনুভূতির দ্বারা পূর্বজন্মের জ্ঞান জন্মাতে পারে। পশু পক্ষীও জাতিস্মর হত। দ্রঃ- জড় ভরত। অভিনবত্ব আনবার মোহেই লেখককুল বহু জায়গায় এই জাতিস্মরতাকে কাজে লাগিয়েছিলেন। বর্তমানেও এক দল লোক জাতিস্মরতাকে বিশ্বাস করেন এবং নানা পরীক্ষা করতে চেষ্টা করেন।

জানপদী—এক জন অপ্সরা। কৃপ (দ্রঃ) ও কৃপীর মা।

জাবাল—(১) জবালার (দ্রঃ) ছেলে। অন্য নাম সত্যকাম। গৌতমের কাছে বিদ্যার্থী হয়ে এসে সরল মনে সত্য কথা বলেছিলেন বলে নাম সত্যকাম। হারিদ্রুমত গৌতম সন্তুষ্ট চিত্তে বালককে ছাত্ররূপে স্বীকার করে নেন। কারণ ব্রাহ্মণ না হলে এ ভাবে সত্য কথা বলার সাহস নিশ্চয় থাকত না। ছান্দোগ্য উপনিষদের ঘটনা। গৌতম ৪০০ শীর্ণকায় গাভীর (ছান্দো ৩০৬) ভার দেন। সত্যকাম প্রতিশ্রুতি দেন ১০০০ হৃষ্টপুষ্ট গাভী করে এদের নিয়ে আসবেন। বনে গরু চরাতেন। বায়ু, সূর্য, অগ্নি, প্রাণ এ'কে জ্ঞান দান করেন। এর পর হাজার গাভী করে নিয়ে এলে সত্যকামের কাছে সব ঘটনা শুনে গৌতম এ'কে পরমাত্মা সম্বন্ধে জ্ঞান দান করেন। সত্যকামের প্রসিদ্ধ শিষ্য উপকোশল কামলায়ন (ছান্দো ৩২৫); ১২ বছর গুরুর পরিচর্যা করেন ও গুরুর অগ্নি রক্ষা করতেন। তবু সত্যকাম উপকোশলকে জ্ঞান দান করেন না; সত্যকামের স্ত্রী অনুরোধ করলেও চুপচাপ থাকেন। এর পর অগ্নি এসে উপকোশলকে আশ্বাস দেন, শেষ পর্যন্ত সত্যকাম এ'কে জ্ঞান দান করেন।

জাবালি—বিশ্বামিত্রের ছেলে। অথর্ব বেদের ব্যাখ্যাতা। সারা জীবন বশিষ্ঠের সঙ্গে জড়িত। শাস্ত্রজ্ঞ, এবং ব্যবহার বুদ্ধি সম্পন্ন ব্রহ্মর্ষি। (৩) দশরথে এক উপদেষ্টা। বন থেকে রামকে ফিরিয়ে আনতে ভরতের সঙ্গে গিয়েছিলেন। রামকে বোঝাতে চেষ্টা করেন পিতামাতার প্রতি অন্ধ ভক্তি বা বৃথা ধর্ম পরায়ণ হয়ে কষ্ট পাওয়া নিরর্থক। পরলোক ইত্যাদি নাই; রামচন্দ্রের উচিত ফিরে আসা। জাবালির যুক্তি ছিল বৌদ্ধযুক্তি ও ক্ষণিকবাদ (রা ২।১০৮।-); এতে রাম জাবালিকে নাস্তিক ও বৌদ্ধরা চোর (২।১০৯।৩৪) বলে ভং'সনা করলে জাবালি বোঝান যে প্রয়োজন বোধে তিনি নাস্তিক বা আস্তিক হয়ে থাকেন। কথা তারপর ঘুরিয়ে নিয়ে নিজেকে আস্তিক বলে ঘোষণা করলেও আবার ক্ষণিকবাদের যুক্তিঃ- সঃ চাপি কালঃ অয়ম্ উপস্থিতঃ—দেখাতে থাকেন। (৩) ব্যাস সুমন্তুকে অথর্ববেদ শেখান। সুমন্তু থেকে কবন্ধ এবং কবন্ধ অধীত অংশ দুভাগ করে দেবাদর্শ ও পথ্যকে দেন। দেবাদর্শের শিষ্য মগধ. ব্রহ্মবলি, সৌৎকয়ানি ও পিপ্পলাদ। পথ্যের শিষ্য জাবালি, কুমুদ ও সৌনক (বিষ্ণু পু৩)। (৪) এক জন মুনি। এ'র সন্তানরাও জাবালি নামে পরিচিত। ইনি এক বার বনের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে এক সুন্দর যুবককে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন দেখেন। বেশ কয়েক বছর পরে যুবকের ধ্যান ভাঙলে জাবালি এর কাছে জানতে পারেন কৃষ্ণের ধ্যানে এ

বিভোর ছিল। জাবালির বাকি জীবন কৃষ্ণের আরাধনাতে কাটে। পর জীবনে চিত্রগন্ধা নামে গোপিকা হয়ে জন্মান (পদ্ম-পু)। (৯) এক জন মুনি। কঠোর তপস্যাতে ভয় পেয়ে ইন্দ্র রম্ভাকে পাঠান। একটি মেয়ে হয়। রাজা চিত্রাঙ্গদ এই মেয়েকে নিয়ে পালান। ফলে জাবালির শাপে চিত্রাঙ্গদ কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হন (স্কন্দ পু ৩।১৪৩)।

জাবালিপুর—জব্বলপুর।

জামদগ্ন্য—পরশুরামের অন্য নাম।

জাম্ববতী—জাম্ববানের মেয়ে। দ্রঃ- স্যমন্তক/জাম্ববান। কৃষ্ণের স্ত্রী। কৃষ্ণের অন্যান্য স্ত্রীর সন্তান হয় কিন্তু জাম্ববতী নিঃসন্তান থাকেন ; এবং শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণকে অনুরোধ করেন। কৃষ্ণ তখন পর্বতে শৈব উপমন্যুর আশ্রমে গিয়ে (দে-ভাগ ৪।২৫) উপমন্যুর কথা মত শিবের তপস্যা করতে থাকেন। ছ মাস তপস্যা করার পর মহাদেব এসে বর দেন কৃষ্ণের ১৬০০+১০০ স্ত্রী হবে এবং প্রত্যেকের দশটি ছেলে হবে। দেবী বর দেন ১০০ বছর পরে যদুবংশ ধ্বংস হবে। মহাভারতে (১৩।১৪।১২) আছে প্রদ্যুম্নের হাতে শম্বর নিহত হবার বার বছর পরে জাম্ববতী কৃষ্ণের অনুরূপ একটি ছেলে চান ইত্যাদি। উপমন্যু আশ্রমে এলে উপমন্যু আশ্বাস দিয়েছিলেন ৬ মাসের মধ্যে মহাদেব ৮ ও পার্বতী ১৬টি বর দিয়ে যাবেন। এই জন্য জাম্ববতীর প্রথম ছেলের নাম সাম্ব। অন্য ছেলেগুলি ঃ—সুমিত্র, পুরুজিৎ, শতজিৎ, সহস্রজিৎ, বিজয়, চিত্রকেতু, বসুমান, দ্রাবিড় ও ক্রতু (ভাগ ১০।৬১)। হরিবংশে (২।১০৩) সাম্ব, মিত্রবীন, মিত্রবাহু, মিত্রবিন্দ, সুনীথ। কৃষ্ণের মৃত্যুর পর অর্জুনের সঙ্গে হস্তিনাপুরে এসে কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে আগুনে দেহ ত্যাগ করেন।

জাম্ববান—ব্রহ্মার ছেলে। বানর বা ঋক্ষ। দুর্দ্ধর্ষ বীর। রাবণের অত্যাচারে বিব্রত হয়ে দেবতারা ব্রহ্মার কাছে এলে ব্রহ্মা বিষ্ণুর কাছে আসেন। বিষ্ণু আশ্বাস দেন তিনি রাম হয়ে জন্মাবেন এবং ব্রহ্মাকে বানর সৈন্য সৃষ্টি করতে বলেন। ব্রহ্মা তখন অনেক ক্ষণ বসে বসে চিন্তা করতে থাকেন এবং তারপরই হাই তোলেন এবং মুখের মধ্যে থেকে ঋক্ষ-জাম্ববান বার হয়ে আসেন (রা ১।১৭।৭)। অন্য মতে মধু-কৈটভ যখন ব্রহ্মাকে আক্রমণ করতে যান তখন ব্রহ্মার মাঝখানের মুখ দিয়ে ঘাম ঝরতে থাকে এবং এই ঘাম গড়িয়ে কোমর পর্যন্ত নেমে এলে জাম্ববানের জন্ম হয়। ত্রেতাতে সুগ্রীবের মন্ত্রী ও সেনাপতি। সীতা অন্বেষণে লঙ্কাতে যাবার জন্য কথা হচ্ছিল তখন সমবেত বানররা প্রত্যেকে নিজেদের অক্ষমতা জানায় ; হনুমান চুপ করে বসে ছিল। জাম্ববান তখন হনুমানকে অনুরোধ করে এবং হনুমানের জীবন বৃত্তান্ত ও তার ক্ষমতা স্মরণ করিয়ে দিয়ে হনুমানকে লঙ্কায় যেতে রাজি করে (৪।৩৯।২৫)। রামায়ণে আছে ঋক্ষরাজ এই সময় নিজের ক্ষমতার হিসাব জানায় বর্তমানে সে অতিবৃদ্ধ, তবু ৯০ যোজন মত ডিঙতে পারবে। অতীতে বামন অবতারে তিনপায়ে সব-কিছু-ক্রমমাণঃ- বামনকে (৪।৬৬।৩৪) একুশবার প্রদক্ষিণ করেছিল। দেবতাদের নির্দেশে সমুদ্র মন্থনের সময় নানা ঔষধয়ঃ সঞ্চয় করেছিল। বয়সের সঙ্গে ক্ষমতা অবশ্য কমে এসেছে। লঙ্কা থেকে ফেরার সময় হনুমান গর্জন করতে থাকে ; জাম্ববান

তখন বানরদের আশ্বাস দেয় নিশ্চয়ই হনুমান কৃত-কার্য হয়ে ফিরছে। লঙ্কার যুদ্ধে উপস্থিত ছিল। দ্রঃ- তৃণবিন্দু। বামন অবতারে বামনকে প্রদক্ষিণ করলেও বয়সের জন্য তখন যে ক্ষমতা ছিল রাম অবতারের সময় অবশ্য ক্ষমতা অনেক কমে গিয়েছিল। এই জাম্ববানই স্যমন্তক (দ্রঃ) মণি সিংহের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিল। প্রসেনজিৎকে হত্যার অপবাদ দূর করার জন্য কৃষ্ণ মণির সন্ধান করেন এবং জাম্ববানের সঙ্গে সাতাশ (ভাগ ১০।৮৩।১০) দিন যুদ্ধ করেন। রামই কৃষ্ণ (দ্রঃ) হয়ে জন্মেছেন জানতে পেরে হার স্বীকার করে মণি দিয়ে দেন এবং নিজের মেয়ে জাম্ববতীর সঙ্গে কৃষ্ণের বিয়ে দেন। জাম্ববান বিষ্ণুর নটি অবতার দেখেছিলেন এবং বিষ্ণুর আরাধনা রত হয়ে দেহত্যাগ করেন।

জাম্বুনদ—(১) একটি পর্বত ; মেরু পর্বতের অংশ। (২) উশীর বীজ পর্বতে স্বর্ণময় একটি শৃঙ্গ। (৩) সোনা : অপত্যং জাতবেদসঃ (মহা ১৩।৮৪)। দ্রঃ- কার্তিকেয় পৃ-৩২৫, বিতল, জহ্নু।

জালালপুর—(১) রাজগৃহ। (১) কেকয় রাজধানী গির্জক (রামা); ঝিলমের তীরে।

জাহাজ—প্রাচীন ভারতে জাহাজের প্রচুর ব্যবহার ছিল। অশোকের সময় সিরিয়া, মিসর, গ্রীস ও ইহুদি দেশগুলিতে নিয়মিত ভারতীয় জাহাজ যাতায়াত করত। যবদ্বীপে হিন্দু উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল উন্নততর জাহাজ শিল্পের ও সুদক্ষ নাবিকদের কারণে। বরোবুদুরের গায়ে আঁকা ছবি থেকে ভারতীয় জাহাজ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়। আল-বিরুনি ও মার্কোপোলো ভারতীয় নৌ শিল্প সম্বন্ধে বহু বিবরণ লিপি বদ্ধ করে গেছেন। দ্রঃ- দত্তাত্রেয়।

জাহ্নবী—দ্রঃ- জহ্নু।

জিনবতী—উশীনরের (দ্রঃ) মেয়ে। পৃথিবীতে সব চেয়ে সুন্দরী। দ্যু (দ্রঃ) নামে বসুর স্ত্রী। এই জিনবতীর জন্যই বসুরা বশিষ্ঠের গরু চুরি করতে গিয়েছিলেন।

জিনেন্দ্রবুদ্ধি—দ্রঃ- পাণিনি।

জিপসি—যাযাবর। ইউরোপ ও এসিয়ার ইতস্তত প্রান্তে যে সব যাযাবর আছে তাদের ভাষায় ও আচার ব্যবহারে এসিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন ভাষা ও স্থানের ছাপ পড়লেও এরা মূলত অবিসংবাদিত ভাবে ভারতীয় আর্য। ভারত থেকে বার হয়ে প্রথমে ইরানে এবং সেখান থেকে এসিয়া মাইনর হয়ে ইউরোপে যায়। অনুমান খৃ ৫-শতকের কাছাকাছি এরা একাধিক দলে ভারতবর্ষ থেকে বার হয়ে গিয়েছিল। ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চল, গান্ধার ইত্যাদির অধিবাসী। আবার অন্য মতে এরা ভারতীয় প্রাচীন ডোম জাতি।

জিম্ভকাস্ত্র—ঘুম পাড়ানি অস্ত্র। দ্রঃ- জৃম্ভিকা।

জিষ্ণু—অর্জুনের আর একটি নাম। যুদ্ধকালে কেউ অর্জুনের কাছে যেতে পারতেন না ; কারণ যে কোন দুর্দ্ধর্ষ শত্রুকেও অর্জুন জয় করতেন।

জীব—বা জীবাত্মা। দেহ বিশিষ্ট আত্মার নাম। দ্রঃ- জগৎ, জন্মান্তর। কর্ম

অনুসারে জীব সুখ দুঃখ ভোগ করে এবং গতি পায়। অদ্বৈত বেদান্ত মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন।

জীবক—বুদ্ধের সমসাময়িক বিখ্যাত চিকিৎসক। জনশ্রুতি বিম্বিসারের রাজত্ব কালে রাজগৃহের বারবনিতা শালবতীর গর্ভে জন্মান ও আবর্জনা স্তূপে পরিত্যক্ত হন। রাজকুমার অভয় অন্য মতে বিম্বিসার একে নিয়ে এসে পালন করেন। নাম হয়েছিল কুমার ভৃত্য। অন্য মতে কুমার-তন্ত্র অর্থাৎ শিশু চিকিৎসায় পারদর্শী ছিলেন বলে ঐ নাম। বয়স কালে জীবক তক্ষশিলায় (দ্রঃ) গিয়ে আচার্য আত্রেয়ের কাছে ৭ বছর চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করেন। শিক্ষার পর তাঁর বিশ্বাস হয় পৃথিবীর সমস্ত উদ্ভিদকেই কোন না কোন রোগে ভেষজ হিসাবে ব্যবহার করা যায় বা যাবে। ফিরে এসে জীবক এক জন চিকিৎসক, অস্ত্রোপচারক ও ভেষজবিশারদ রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তথাগত বুদ্ধের পিত্তাধিক্য ও পায়ের ক্ষত সহজেই আরোগ্য করে দেন। বুদ্ধের শিষ্য হয়ে ভিক্ষুদের সেবায় আত্মোৎসর্গ করেন। এমন কি নিজের আম বাগানে প্রচুর খরচায় বুদ্ধকে একটি মন্দির তৈরি করে দেন। বুগ্‌ণ ভিক্ষুদের জন্য জীবকের দেওয়া বিনয়-নিয়ম বহির্ভূত বহু বিধান বুদ্ধদেব সাদরে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। পরবর্তী কালে রাজা অজাতশত্রুর মন্ত্রী ও প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। চিন্তা জর্জরিত অজাতশত্রুকে বুদ্ধের সমীপে এনে তাঁর চিত্তকে শান্ত করে তোলেন।

জীবন—ব্রাহ্মণ্য ধর্মে জীবন যাত্রাকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল ঃ- (১) ব্রহ্মচর্য; এই সময়ে গুরু গৃহে বাস করে গুরু সেবা করে শিক্ষা লাভ করতে হত। (২) গার্হস্থ্য জীবন ; গুরুগৃহ থেকে ফিরে বিয়ে করে সংসার পালন, পূজা ও বেদ পাঠ ইত্যাদি। (৩) বানপ্রস্থ; ৫০ বছরের পর বনে গিয়ে দুঃখকষ্ট সহ্য করে ভগবৎ চিন্তায় দিন কাটান। (৪) সন্ন্যাস ; শেষ বয়সে সন্ন্যাসী হয়ে দেশ ভ্রমণ. ভিক্ষান্নে দিনপাত এবং সমস্ত আসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের হাতে নিজেকে তুলে দেওয়া।

জীবনমুক্তি—বেঁচে থেকে যুগপৎ মুক্তি। জীবনমুক্ত অর্থে শুদ্ধমায়া গঠিত নিষ্পাপদেহ =প্রণবতনু =মন্ত্রতনু=জরামৃত্যুহীন দেহ। এই দেহই পরে পরামুক্ত=দিব্যদেহ=জ্ঞান দেহতে (—চিন্ময়) পরিণত হয়। সরাসরি দেহকে জরাহীন করা জীবন্মুক্তি।

জীবল—ঋতুপর্ণ রাজার নিজের সারথি। নলরাজা বাহুক নামে সারথি হলে জীবল বাহুকের অধীনে কাজ করতেন (মহা ৩।৬৪।৭)।

জীবাত্মা—পর-ব্রহ্ম হচ্ছেন ঈশ্বর। পরব্রহ্মের তুলনায় অপরব্রহ্ম সব দিকে সীমিত। এই অপরব্রহ্ম হচ্ছেন জীবাত্মা। দেহে অন্নময় কোষের মধ্যে প্রাণময় কোষ অবস্থিত প্রাণময় কোষের মধ্যে মনোময় কোষ এবং মনোময় কোষের মধ্যে বিজ্ঞানময় কোষ বিজ্ঞানময় কোষের মধ্যে আনন্দময় কোষ এবং এই আনন্দময় কোষের মধ্যে অবস্থান করেন জীবাত্মা। আনন্দময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ ও প্রাণময় কোষ তিনটি মিলে সূক্ষ্ম শরীর।

জীমূত—বিরাট রাজের এক মল্ল। বিরাট রাজ্যে ব্রহ্মোৎসবের সময় কয়েক জন

মল্লকে পরাজিত করলে বিরাট রাজ বল্লবকে (ছদ্মবেশী ভীম) জীমূতের সঙ্গে লড়তে বলেন। জীমূত ভীমের হাতে নিহত হন।

জীমূতকেতু—এক বার বর্ষায় পার্বতী ক্ষোভে মহাদেবের কাছে অনুযোগ করতে থাকেন জলবৃষ্টি থেকে কোথায় নিরাপদে থাকা সম্ভব। মহাদেব হাসেন এবং তারপর পার্বতীকে নিয়ে আকাশে মেঘের ওপরে/মধ্যে বাস করতে থাকেন। বৃষ্টি হলেও শিব পার্বতীর কোন অসুবিধা হয় না। সেই থেকে নাম জীমূতকেতু।

জীমূতবাহন—বাঙালী স্মৃতিকার ; ১১-১৬ শতক। সম্ভবত রাঢ় দেশে পারিভদ্র কুলে জন্ম। মীমাংসা ও জ্যোতিষশাস্ত্রে পণ্ডিত। তিনটি গ্রন্থ প্রণেতা ঃ—কালবিবেক, ব্যবহারমাতৃকা ও দায়ভাগ।

জীর্ণনগর—জুনার। পুণা জেলাতে। ক্ষত্রপরাজ নহপানের রাজধানী। এখানে চৈত্যগুহা ১-২ শতকের।

জুতা—দ্রঃ- রেণুকা। যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপে ভারতীয় দেবতাদের পায়ে জুতা থাকে। শ্যামদেশে বৃষভারূঢ়া দুর্গার পায়ে শুঁড় ওলা নাগরা জুতা।

জুনাগড়—যবন নগর। অসিল দুর্গ। গুজরাটে কর্ণকুজ। গুজরাটে রাজকোট বিভাগের অন্তর্গত জেলা ও সহর। ২০°৪৪′-২১°৫৩′ উ×৭১°৫-৬৯°৪৯′ পূ। এখানে এক মাত্র উচ্চভূমি গিরনার (দ্রঃ) অঞ্চল। চৌদাসামা উপজাতির অধীনে জুনাগড়ে একটি রাজপুত রাজ্য ছিল। ৮৭৫ খৃ গিরনার সহরের কাছে এর রাজধানী স্থাপিত হয়। জেলার মধ্যে সরস্বতী নদীকে অতি পবিত্র মনে করা হয়। এখানে উপরকোট বা প্রাচীন দুর্গের পরিখার কাছের অঞ্চলটি বৌদ্ধযুগের বহু গুহায় পরিপূর্ণ। সহরের উত্তরে খাপ্রাখোদিয়া গুহামণ্ডলী উল্লেখ যোগ্য। ২ বা ৩ তলা বিহারও ছিল। চৌদাসামাদের শাসন কালে উপরকোটে অপরূপ কারুকার্যযুক্ত ছয়টি থামের ওপর তৈরি অলিন্দ বেষ্টিত পুকুর ও প্রকোষ্ঠ সহ একটি দুতলা বাড়ি প্রসিদ্ধ।

জুয়া—সংস্কৃত দ্যূত খেলা, অক্ষবতী, কৈতব, পণ, দেবল। পণ রেখে অক্ষ, চর্ম পট্টিকা, হাতীর দাঁতের গুটি ইত্যাদি দিয়ে প্রতিযোগিতা মূলক খেলা। মুরগি, পায়রা, ভেড়া মোষ, ষাঁড়, ঘোড়া, মল্ল ইত্যাদি দিয়েও প্রতিযোগিতা হত নাম ছিল সমাহ্বয়। দ্যূত ক্রীড়ার অধ্যক্ষের নাম সভিক ; ইনি খেলার জিনিসপত্র যোগান দেওয়া, কোন গোলমাল হলে মেটান এবং পণের টাকা ভাগ করে দেওয়া ইত্যাদি সমস্ত দায়িত্ব পালন করতেন। ঋক্ বেদে অক্ষ সূক্তে (১০।৩৪) আছে এক জুয়াড়ি পাশায় সর্বস্বান্ত হয় ; বাপ মা ও স্ত্রী তাকে ত্যাগ করে এবং চরম দুর্দশায় পড়ে। ঋক্ বেদের আরো অনেকগুলি মন্ত্রে পাশাখেলার উল্লেখ আছে। অথর্ব বেদে ৪।১৬।৫ এবং ৪।৩৮ মন্ত্রে পাশা খেলায় সৌভাগ্য লাভের কথা আছে। শুক্লযজুর্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতায় পুরুষমেধ যজ্ঞে অক্ষ রাজের বলি হিসাবে জুয়াড়িকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। রাজসূয় যজ্ঞে সভ্যাগ্নি স্থাপনের অন্যতম অঙ্গীয় কার্য যজমানের দেওয়া গাভী পণ রেখে ঋত্বিকদের পাশা খেলা। উত্তর কালে বিশেষ বিশেষ দিনে পাশাখেলা বিশেষ ভাবে অনুমোদিত হয়। কার্তিক মাসে শুক্লা প্রতিপদের নাম দ্যূত প্রতিপদ। এই দিনে পাশাখেলে পার্বতী

মহাদেবকে সর্বহারা করে দিয়েছিলেন। নল (দ্রঃ) ও যুধিষ্ঠির (দ্রঃ) পাশা খেলেছেন। মহাভারত যেন পাশা খেলারই বীভৎস পরিণাম। স্মৃতিকাররা পাশা খেলাকে ঠিক একেবারে বর্জন করতে বলেন নি। মনু অবশ্য বলেছেন দ্যূত ও সমাহ্বয়কে রাজা যেন একেবারে বন্ধ করে দেন ; কারণ জুয়া খেলা প্রত্যক্ষ চুরি ও রাষ্ট্র নাশের কারণ। রাজা যেন জুয়াড়িদের এবং যারা এই খেলাকে প্রশ্রয় দেয় তাদের শাস্তি দেন এবং নির্বাসিত করেন। যেখানে কোন প্রতারণার প্রশ্ন নেই এ রকম আনন্দোৎসবেও জ্ঞানী ব্যক্তিদের যোগ দেওয়া নিষিদ্ধ ছিল। নারদ স্মৃতি মতে রাজার নিয়ন্ত্রণে প্রকাশ্য স্থানে জুয়া খেলা চলতে পারে। যাজ্ঞবল্ক্য রাজার নিয়ন্ত্রণে নগরের মাঝখানে জুয়া খেলা অনুমোদন করেছিলেন কারণ এই জুয়া খেলার মাধ্যমে রাজকোষে টাকা আসে এবং চোর ধরবার সুবিধা হয়।

জুষ্কপুর – কাশ্মীরে জুকুর।

জূর্ণি—ঋক্ (১।১২৯।৮) ক্ষিপ্তা জূর্ণিঃ ন বক্ষতি—রাক্ষসরা জূর্ণি (জ্বলন্ত চেলাকাঠ) ছুঁড়ে দিয়ে গরিলা যুদ্ধ করত।

জৃম্ভকাস্ত্র—দ্রঃ- জৃম্ভিকা।

জৃম্ভন---ইন্দ্রকে বৃত্রাসুর এক বার গিলে ফেলেন। দেবতারা বৃহস্পতিকে জানালে বৃহস্পতির বরে বৃত্র হাই তুলতে থাকেন এবং সেই সুযোগে ইন্দ্র বার হয়ে আসেন। সেই সময় থেকে জৃম্ভন (হাই তোলা) সম্ভব হয়।

জৃম্ভিকা—একটি অস্ত্র। তাড়কা ও অন্য রাক্ষসদের মারার পর বিশ্বামিত্র সন্তুষ্ট হয়ে রামকে এই অস্ত্র দান করেন। কঠোর তপস্যা করে বিশ্বামিত্র এটি অত্রির কাছে পেয়েছিলেন। এই অস্ত্রে লোক ঘুমিয়ে পড়ত। বিশ্বামিত্রের বরে লবকুশ আপনা থেকেই এই অস্ত্র আয়ত্ত করেছিল। দ্রঃ- কৃশাশ্ব।

জেজাভুক্তি—জজাহুতি, জঝোতি। বুন্দেলখণ্ডের প্রাচীন নাম। চণ্ডেলদের রাজ্য : রাজধানী ছিল মহোৎসব নগর (দ্রঃ) ও খজুরাহো। চন্দেলদের সময় জেজাভুক্তির রাজধানী হয় কালঞ্জর।

জেতবনবিহার—বর্তমানে সাহেট ; অচিরবর্তী নদীর তীরে ; গোরক্ষপুর গোণ্ডা লাইনে বলরাম পুর স্টেশন থেকে ১৬ কি-মি দূরে। যোগিনী ভরীয় ঢিপি। শ্রাবস্তীর ১ মাইল দক্ষিণে। অযোধ্যাতে রাপ্তি তীরে ; সাহেট মাহেট থেকে ১-মাইল দক্ষিণে। শ্রাবস্তীর শ্রেষ্ঠী সুদত্ত—অনাথপিণ্ডদ ; প্রসেনজিতের ছেলে জেত-র কাছে থেকে উদ্যানটি কিনে এর মধ্যে একটি বিহার তৈরি করে বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যদের দান করেন। বুদ্ধের প্রিয় বিহার। বুদ্ধের অনুরোধে আনন্দ এখানে একটি আমগাছ বসান। এখানে এখনও বিহারের ধ্বংসাবশেষ আছে। কোশল রাজ্যের রাজধানী শ্রাবস্তীর (বর্তমানে মাহেট) দক্ষিণ উপকণ্ঠে এই জেতবন। সারিপুত্ত নিজে এর নির্মাণের তত্ত্বাবধান করেছিলেন। এখানে ভিক্ষুদের বাসগৃহ, উপস্থান শালা, অগ্নিশালা ইত্যাদি সব ব্যবস্থা ছিল। গন্ধকুটি, করেরি-মণ্ডলমাল, কোসম্বকুটি, চন্দনমাল ইত্যাদি কুটিগুলি অনাথপিণ্ডিক নিজে তৈরি করিয়েছিলেন। রাজকুমার জেত উদ্যান বিক্রির সমস্ত মূল্য ফেরত দিয়ে এই অর্থে

এখানে দোতলা প্রবেশ তোরণ করে দিয়েছিলেন। এখানে গন্ধকুটিতে বুদ্ধদেব পঁচিশ বছর মত কাটান। বহু সূত্র, জাতক-দেশনা ও বিনয়নীতি এইখানে বুদ্ধদেব রচনা করেন। রাজা প্রসেনজিৎ জেতবনে 'সললঘর' নামে একটি বড় কুটি তৈরি করে দিয়েছিলেন। বিহারের বাইরে একটি আম বাগান ছিল। প্রবেশ পথের কাছে অনাথ-পিণ্ডিক একটি বোধিবৃক্ষের চারা বসিয়েছিলেন; এই গাছটি পরে আনন্দ-বোধি নামে পরিচিত। অশোকের সময় জেতবন অতি পবিত্র স্থান ছিল। ফা-হিয়েন দেখেছিলেন জেতবন বিহার সাত তলা এবং পূজার জিনিস ও ধ্বজ পতাকা শোভিত। এখনও এই জেতবনে বিহারের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

জেতুত্তর—নাগরি, নাগরী, মেদপাত, মেওয়ার। চিতোরের ১১-মাইল উত্তরে। শিবি (দ্রঃ) বা মেবারের রাজধানী। জত্তরউর (আলবিরুনি)।

জেন—সংস্কৃত ধ্যান থেকে অপভ্রংশ। খৃ ৫ শতকের শেষার্ধে বোধিধর্ম নামে এক জন ভিক্ষু চীনে গিয়ে জেন পন্থা প্রচার করেন। চীনে প্রাচীনতর তাও মতের দ্বারা প্রভাবিত মহাযানের একটি শাখা। এই মতে বাহ্য ক্রিয়া কলাপে বুদ্ধত্ব লাভ হয় না। চিত্তকে শূন্যতার চরম গভীরে স্থাপিত করলে তবে বোধি লাভ হতে পারে। খৃ ১২ শতকে এই মতবাদ জাপানে যায়। ক্রিয়াকাণ্ড বিবর্জিত এই আত্মবিদ্যা জাপানে যোদ্ধা সম্প্রদায়কে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করে এবং তাদের সাহায্যে জাপানে ছড়িয়ে পড়ে। বুদ্ধি বা যুক্তি দিয়ে যে সমস্যা পূরণ করা যায় না সেই সব জিনিস একাগ্র ভাবে ভাবতে ভাবতে শূন্যতার গভীরে ডুবে গেলে অনেক সময় নিস্তরঙ্গ মনে ক্ষণিকের জন্য অকস্মাৎ সত্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এই ভাবে ধ্যানকে জেন বলা হয়। এটি intuition বাদ।

জেন্দ্ আবেস্তা—ঋক্ বেদের অনেক পরে। অহুর মজদা, অসুর মহান এখানে প্রধান দেবতা। দ্রঃ- আবেস্তা।

জেলা—গুপ্তযুগে প্রথম জেলার (=বিষয়) হিসাব পাওয়া যায়। সমগ্র দেশ কতকগুলি প্রদেশে এবং প্রদেশ কতকগুলি বিষয়ে (=জেলা) ভাগ ছিল। অনেক সময় বিষয় ও মণ্ডল একই অর্থে ব্যবহৃত। আবার বহুস্থানে বিষয় মণ্ডলের অন্তর্গত বা মণ্ডল বিষয়ের অন্তর্গত ছিল। গুপ্ত যুগে বিষয় পতি ছিলেন জেলা শাসক। সাধারণত কুমারামাত্য, আযুক্তক, সামন্ত মহারাজগণ বিষয়পতি হতেন। কোন কোন বিষয়পতি সরাসরি রাজার অধীন হতেন। তবে সাধারণত তাঁরা প্রাদেশিক শাসনের অধীন থাকতেন। বিষয়পতিকে সাহায্যের জন্য বিষয়াধিকরণও ছিল। 'কোটিবর্ষ' নামক জেলার 'বিষয়ের' অধিকরণে এই বিষয়পতিকে সাহায্য করার জন্য শ্রেষ্ঠী, প্রথম কুলিক, প্রথম কায়স্থ, প্রথম সার্থবাহের উল্লেখ আছে।

জৈগীষব্য—হিমালয়ের ঔরসে মেনার অপর্ণা, একপর্ণা ও একপাটলা তিন মেয়ে হয়। দেবল মুনি একপর্ণাকে, জৈগীষব্য একপাটলাকে বিয়ে করেন। দেবলকে জৈগীষব্য বহু উপদেশ দিয়েছিলেন (মহা ১২।২২২।৪)। দ্রঃ- দেবল। এঁর মতে গার্হস্থ্য ধর্ম ও মোক্ষ ধর্মের মধ্যে মোক্ষধর্মই বড়।

জৈত্রম—রাজা হরিশ্চন্দ্রের রথ। ধৃষ্টদ্যুম্নের শঙ্খ।

জৈন—(১) ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। ভীমের হাতে নিহত। (২) নাস্তিক দর্শন। এই দর্শনে বেদ অস্বীকৃত। জিনের প্রবর্তিত। দ্রঃ- বৃহস্পতি। অন্য নাম অর্হৎ ধর্ম বা নিগ্রন্থ ধর্ম। বিশ্বে যে অংশে জীব ও জড় বস্তু থাকে তাকে লোক বলা হয়; এবং লোকের চার দিকে বিস্তৃত শূন্য অংশ অলোক। জৈন মতে বিশ্ব অনাদি অনন্ত; কোন ঈশ্বর বা অবতার নাই। ফলে কর্মফলকে কেউই বদলাতে পারে না; জীবকে নিজেরই মুক্তির চেষ্টা করতে হবে। জৈনরা জীবন্মুক্তিতে বিশ্বাসী। জৈন মতে তীর্থংকররা জীবন্মুক্ত। তীর্থ অর্থে সংঘও বোঝায় এবং এই অর্থে তীর্থংকর হচ্ছে সংঘ প্রতিষ্ঠাতা। জৈন দর্শনে অর্হৎ-রা তীর্থংকর পরমেষ্ঠী; বিদেহী মুক্তাত্মারা সিদ্ধপরমেষ্ঠী। আর তিনটি পরমেষ্ঠী হচ্ছেন আচার্য পরমেষ্ঠী, উপাধ্যায় পরমেষ্ঠী ও সাধু পরমেষ্ঠী; এই তিন পরমেষ্ঠী মুক্তাত্মা নন। সব সমেত পাঁচ শ্রেণীর পরমেষ্ঠী। জৈনরা বিশ্বাস করেন কর্মই কর্মের ফলদাতা; সাধনার ফলে কর্মক্ষয় হয় এবং মোক্ষ আসে। এ জন্য এঁদের উপাসনায় কোন করুণা চাওয়া নেই। তীর্থংকরদের কোন ক্ষমতা নেই কারও কর্মক্ষয়ে সাহায্য করা। জৈনদের উপাসনার উদ্দেশ্য নিজের কর্মক্ষয় করতে চেষ্টা করা।

জৈন ও বৌদ্ধ মতে বহু মিল থাকলেও জৈন মত বৌদ্ধ মতের শাখা নয়। বৌদ্ধরা ক্ষণ ভঙ্গুরবাদী; জৈনরা তা নন এবং আত্মার স্থায়িত্বে বিশ্বাস করেন। জৈন দর্শনে পুদ্গল নামে একটি নতুন জড় স্বীকৃত। জৈনদের প্রথম তীর্থংকর ঋষভদেব (দ্রঃ) এবং শেষ তীর্থংকর মহাবীর (দ্রঃ)। পার্শ্বনাথ (দ্রঃ) আর একজন তীর্থংকর। পরে জৈনদের আচারগত দুটি সম্প্রদায় দেখা দেয় একটি দিগম্বর আর একটি শ্বেতাম্বর।

জৈন মতে জ্ঞান আত্মার ধর্ম। আত্মা স্বরূপত অনন্ত জ্ঞান যুক্ত; কিন্তু কর্মফলের জন্য দেহ ইন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা এই আত্মা সংকুচিত বা আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। কর্মফল বা আবরণ শেষ হলে আত্মা নিজের অনন্তজ্ঞান স্বরূপকে অনুভব করতে পারে। জ্ঞানকে জৈন দার্শনিকরা দু ভাগে ভাগ করেছেন পরোক্ষ জ্ঞান ও অপরোক্ষ জ্ঞান। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগে ব্যবহারিক বা অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মে। আর আত্মা যখন ইন্দ্রিয় বা মন ব্যতীত কোন বস্তুর পরিচয় পায় তখন সেটিকে প্রকৃত বা পরমাত্মিক অপরোক্ষ জ্ঞান বলা হয়। কিছুটা কর্ম প্রভাব মুক্ত হয়ে আত্মা আর এক রকম জ্ঞান লাভ করতে পারে। রাগদ্বেষ ইত্যাদি জয় করে আত্মা যে জ্ঞান লাভ করে, অপরের মনের যে প্রত্যক্ষ পরিচয় পায় তার নাম মনঃপর্যায় জ্ঞান। ইন্দ্রিয় ও মনের সাহায্যে জ্ঞানের আর এক নাম মতি। জৈন মতে লৌকিক, প্রত্যক্ষ, স্মৃতি, প্রত্যভিজ্ঞা ও অনুমান সমস্তই মতির অন্তর্গত। জৈনরা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শাস্ত্র বাক্যের প্রামাণিকতা স্বীকার করেন। তীর্থংকরদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানই এঁদের শাস্ত্র।

জৈন মতে প্রতি বস্তুই অনন্ত ধর্ম ও বহু বিভাব যুক্ত। মানুষের চোখে বস্তুটির একটি দিক প্রকাশ পায়। অর্থাৎ মানুষের জ্ঞান অপূর্ণ ও আপেক্ষিক। এই অপূর্ণ জ্ঞানের নাম 'নয়'। এক মাত্র জিনদের পূর্ণ জ্ঞান। এই জন্য জৈনরা প্রতিটি নয়ের আগে স্যাৎ এই শব্দটি ব্যবহার করেন; অর্থাৎ এটি একটি আপেক্ষিক

অপূর্ণ জ্ঞান। জৈনরা জ্ঞাতার দৃষ্টি বৈচিত্র্য ও বস্তুর বিভাব ও বহুত্বে বিশ্বাসী। অর্থাৎ এ'দের সমস্ত কিছুই আপেক্ষিক সত্য। এই আপেক্ষিকতা থেকে 'সপ্তভঙ্গি' নয় এর জন্ম ঃ-স্যাৎ অস্তি, স্যাৎ নাস্তি, স্যাৎ অস্তি নাস্তি চ। স্যাৎ অবক্তব্যম্, স্যাৎ অস্তি চ অবক্তব্যম্ চ, স্যাৎ নাস্তি চ অবক্তব্যম্, স্যাৎ অস্তি চ নাস্তি চ অবক্তব্যম্। অর্থাৎ জৈন মতে কোন প্রশ্ন করলে যেমন ঘট আছে কিনা উত্তরে এ'রা হ্যাঁ বা না বলেন না; বলেন স্যাৎ অস্তি বা স্যাৎ নাস্তি। অর্থাৎ উত্তর দাতার দৃষ্টি ভঙ্গিতে আছে বা নাই। স্যাৎ অবক্তব্যম্ অর্থে বক্তার দৃষ্টি ভঙ্গিতে অবক্তব্য। যেমন ঘট কাঁচা থাকলে এক রঙ থাকে পোড়ালে বিভিন্ন রঙ হয়। সুতরাং ঘটের সকল অবস্থার রঙ এক সঙ্গে বলতে গেলে অবক্তব্য। এই ভাবে এই নয় গুলির উৎপত্তি।

জৈনরা বস্তু স্বাতন্ত্র্যবাদী। এ'দের মতে বস্তু বহু এবং দু রকম ঃ- জীব ও অজীব। জীব আত্মায় যুক্ত। প্রতি বস্তুই অনেকান্ত; মানুষ তার দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে বস্তুটির একটি বা কয়েকটি বিভাব দেখতে পায়। বস্তুর পূর্ণস্বরূপের জ্ঞান কেবল সিদ্ধ-পুরুষদেরই আছে। জৈন মতে প্রতি দ্রব্যে দু রকমের ধর্ম আছে। একটি ধর্ম দ্রব্যটি যত দিন থাকে ধর্মগুলিও তত দিন বর্তমান থাকে; এই শ্রেণীর ধর্মের নাম গুণ। এই অর্থে চৈতন্য আত্মার ধর্ম বা গুণ। আর এক শ্রেণীর ধর্ম দ্রব্যে কখনো থাকে না; এরা আগন্তুক এবং এদের নাম 'পর্যায়'। জৈনরা তাই বলেন দ্রব্য হচ্ছে গুণ ও পর্যায় যুক্ত এবং সৎ-বস্তু। সৎ-বস্তুর জন্ম, মৃত্যু ও স্থায়িত্ব আছে অর্থাৎ বস্তু সৎ হলেও তার কতকগুলি ধর্মের উৎপত্তি ও বিনাশ দেখা যায়। জীবাত্মা নিত্য; এক এক জন্মের মধ্য দিয়ে উৎপত্তি ও বিনাশের মাধ্যমে তার কতকগুলি ধর্মের উৎপত্তি ও বিনাশ ঘটতে থাকে। দ্রব্যের আবার দুটি শ্রেণী ভাগ রয়েছে; একটি শ্রেণী অস্তিকায়; অর্থাৎ এদের কায়া আছে। আকাশের কায়া অনুমান সিদ্ধ ফলে আকাশও অস্তিকায়। আর একটি অনস্তিকায় অর্থাৎ কায়া হীন। যেমন কাল। কাল অবশ্য দ্রব্য; কারণ কালের গুণ ও পর্যায় আছে। অস্তিকায় দ্রব্যকে ভাগ করা যায়; অনস্তিকায়কে করা যায় না। কাল জৈন মতে দু রকম ঃ মানুষের গড়া কাল ও প্রকৃত কাল বা পারমার্থিক কাল। পারমার্থিক কাল নিত্য, অরূপ ও অনুমানগম্য। অস্তিকায় দ্রব্যের দুটি ভাগ জীব ও অজীব এবং জীবের দুটি ভাগ বদ্ধজীব ও মুক্তজীব। বদ্ধজীবের আবার দুটি ভাগ 'এস' ও 'স্থাবর'। 'এস' জীব জঙ্গম এবং নানা ইন্দ্রিয় যুক্ত। উচ্চতর 'এস' জীবের পঞ্চ ইন্দ্রিয়। অনস্তিকায় দ্রব্য অজীব; অজীবেরও নানা শ্রেণী ভাগ আছে। আবার অনস্তিকায় অজীব দ্রব্যের অতিরিক্ত এবং অস্তিকায় শ্রেণীর অন্তর্গত চারটি অজীব দ্রব্য স্বীকার করেন; এগুলি ধর্ম, অধর্ম, আকাশ ও পুদ্গল।

জৈন দর্শনে আত্মাকে জীব বলা হয়। সকল জীবের চেতনা সমান নয়। কর্ম বন্ধন অনুসারে জীব এক বা একাধিক ইন্দ্রিয় যুক্ত। উচ্চ শ্রেণীর জীব পঞ্চেন্দ্রিয় যুক্ত; কর্মমুক্ত জীব মুক্তাত্মা। জীব জ্ঞাতা; তার কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব আছে। জীব প্রদীপের মত অপ্রকাশ ও অপরের প্রকাশক। জীব নিত্য; জরা মৃত্যু ইত্যাদির

মধ্য দিয়ে তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। জীবের নিজের কোন মূর্তি নাই: কর্ম অনুসারে মূর্তি পায়। জীব বিভু বা অণু নয়; দেহপরিমাণ। পুদ্‌গল ও আত্মা সংযোগে দেহ তৈরি হয়। পুদ্‌গল আত্মায় সংলগ্ন হতে পারে আবার খসে যেতেও পারে। পুদ্‌গলের তিনটি গুণ স্পর্শ, রস ও বর্ণ। পুদ্‌গল দু রকম। সূক্ষ্ম, অবিভাজ্য এবং ভোগ্য নয় এমন পুদ্‌গলকে অণু বলা হয়: একাধিক অণু মিলে সংযত বা স্কন্দ। বহির্জগতের দ্রব্যাদি এমন কি মানুষের দেহ মন বাক্য শ্বাসবায়ু প্রভৃতিও পুদ্‌গল গঠিত। জীব স্বরূপত অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি ও আনন্দের অধিকারী। কিন্তু দেহ অর্থাৎ কর্ম বন্ধন তাকে সীমিত করে রাখে। পূর্ব জন্মের বাসনা কামনা অনুসারে পুদ্‌গল গঠিত দেহ আত্মায় যুক্ত থাকে। দুধ ও জলের মত কর্ম ও জীব এমন ভাবে থাকে যে কোন স্বাতন্ত্র্যবোধ থাকে না। বাসনার আবির্ভাবের সঙ্গে আসে বন্ধন। জীবের ক্রোধ, মান, মায়া, লোভ ইত্যাদিকে কষায় ও আঠা বলা হয়। বার থেকে কর্মগুলি এসে কষায়ের সাহায্যে জীবে সংলগ্ন থাকে। কর্ম থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হওয়ার নাম মুক্তি। মুক্ত হতে হলে আত্মায় সঞ্চিত পুদ্‌গল পরমাণুদের বিতাড়িত করতে হবে এবং নতুন কর্ম-পুদ্‌গল আসা বন্ধ করতে হবে। আত্মার সঞ্চিত কর্ম-রাশির ক্ষয়কে নির্জরা বলা হয়; এবং কর্ম পুদ্‌গলের নতুন আগমন রোধ করাকে সম্বর বলা হয়। বাসনার কারণ অবিদ্যা; এই অবিদ্যাকে দূর করতে হলে জিনদের উপদেশ পালনীয়।

কর্মের বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে হলে জীব, অজীব, আস্রব, বন্ধ, পুণ্য, পাপ, নির্জরা, সংবর ও মোক্ষ এই নয়টি তত্ত্বের জ্ঞান অর্জন করতে হবে। প্রথম তত্ত্ব জীব; জীবের লক্ষণ চেতনা, জ্ঞান, দর্শন, বীর্য, আনন্দ ইত্যাদি। একেন্দ্রিয় প্রাণী থেকে মুক্ত আত্মা সব কিছুই জীব। দ্বিতীয় তত্ত্ব অজীব বা জড়। ধর্ম (জৈন অর্থে), অধর্ম (জৈন অর্থে) আকাশ, পুদ্‌গল ও জ্ঞান এই পাঁচটি অজীব। তৃতীয় তত্ত্ব আস্রব; জীবে বা আত্মায় কর্ম-পুদ্‌গলের আসার নাম আস্রব। অবিদ্যা, অবিরতি, কষায়, প্রমাদ ও যোগ এইগুলির কারণে আত্মায় কর্ম পুদগল আসে। চতুর্থ তত্ত্ব বন্ধ; আত্মার সঙ্গে কর্মপরমাণুর যুক্ত হওয়ার নাম বন্ধ। বন্ধ আবার চার রকম; প্রকৃতি বন্ধ, স্থিতিবন্ধ, অনুভব বন্ধ, প্রদেশ বন্ধ। প্রকৃতি বন্ধে আত্মায় বিশেষ বিশেষ গুণ আবৃত হয়। এই প্রকৃতি বন্ধ আট রকমঃ-জ্ঞানাবরণীয়, দর্শনাবরণীয়, বেদনীয়, মোহনীয়, আয়ু, নাম, গোত্র, অন্তরায়। স্থিতি বন্ধ অর্থে বন্ধনের কাল নিরূপিত হওয়া। অনুভব বন্ধে কর্ম কি ফল দেবে নিরূপিত হয়। প্রদেশ বন্ধে কি পরিমাণ কর্মপরমাণু আসবে নির্ধারিত হয়। পঞ্চম ও ষষ্ঠ তত্ত্ব পাপ ও পুণ্য। সপ্তম তত্ত্ব সংবর, অষ্টম তত্ত্ব নির্জরা। নতুন কর্মের আগমন বন্ধ করা সংবর। আর পূর্বকর্ম বন্ধ স্বভাবত শেষ হবার আগেই ধ্যান উপবাস আদির দ্বারা পূর্বকর্ম বন্ধকে শেষ করা (=নির্জরা) যাতে আর নতুন কর্ম বন্ধ না ঘটে। নবম তত্ত্ব মোক্ষ অর্থে পুরাতন কর্ম বন্ধের শেষ হওয়া; ও নতুন কর্ম বন্ধ না ঘটে আত্মার স্বরূপত্ব লাভ। এই অবস্থায় জীব সিদ্ধশালায় গমন করে এখানে অনন্তকাল বাস করে। এই বাস করা নির্বাণ।

মোক্ষ লাভের জন্য এই নয়টি তত্ত্বের জ্ঞানের সঙ্গে সম্যক দর্শন, সম্যক জ্ঞান, ও সম্যক চরিত্রও প্রয়োজন। এই তিনটির নাম ত্রিরত্ন। আত্মা ও অনাত্মা সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানের নাম সম্যক জ্ঞান। কর্ম ও সংস্কার মুক্ত হলে সম্যক দর্শন ও জ্ঞান অভ্যাসে পরিণত হয়ে সম্যক চারিত্রের পথ তৈরি হয়।

ধর্ম ও অধর্ম এ দুটি শব্দ জৈন শাস্ত্রে পারিভাষিক। ধর্ম সচল দ্রব্যকে গতি দেয়। অধর্ম স্থিতির সহায়ক। অধর্ম স্থির বস্তুগুলিকে ধারণ করে থাকে এবং চলমান বস্তুর গতিরোধ করে না। ধর্ম ও অধর্ম উভয়েই নিত্য, নিরবয়ব, স্থির ও লোকাকাশ পরিব্যাপ্ত করে বিদ্যমান। ধর্ম ও অধর্ম যথাক্রমে গতি ও স্থিতির কারণ কিন্তু কোন কিছুতেই লিপ্ত নয়। ধর্ম ও অধর্মকে সেইজন্য উদাসীন কারণ বলা হয়।

আত্মার ক্রমিক বিকাশের মধ্য দিয়ে জীব মুক্তি লাভ করে। জৈন দর্শনে এই বিকাশের স্তর ১৪-টি। একে গুণস্থানে সমারোহ বলা হয়। শেষ গুণস্থান নির্বাণ। এই পথে এগোতে হলে প্রয়োজন পঞ্চ মহাব্রত, সমিতি, গুপ্তি, দশবিধ ধর্ম, আত্মতত্ত্বানুসন্ধান, শম, দম, তিতিক্ষা ও সমতা। গৃহী জৈনদের শ্রাবক বলা হয়। জৈন শাস্ত্রে কালকে দু ভাগে ভাগ করা হয়েছে উৎসর্পিনী (অর্থাৎ ক্রমিক অভ্যুদয়ের) ও অবসর্পিনী (ক্রমিক অবনতির) কাল। প্রতি উৎসর্পিনী বা অবসর্পিনী ছয়টি অরে (ভাগে) বিভক্ত ; এবং প্রতি উৎসর্পিনী বা অবসর্পিনীর ৩-য় ও ৪র্থ অরে ২৪ জন করে তীর্থংকর জন্মান। বর্তমান অবসর্পিনীর প্রথম তীর্থংকর ঋষভ দেব।

জৈন ধর্মের এই দর্শন থেকে দেখা যায় এর প্রতিটি তত্ত্বই হচ্ছে প্রকল্প এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মত সবটাই পলায়নী বৃত্তি।

জৈনপর্বত—৫-টি তীর্থ ঃ- শত্রুঞ্জয়, অর্বুদ, গিরনর, চন্দ্রগিরি ও সমেত শিখর।

জৈমিনী—পূর্ব মীমাংসা দর্শনের প্রণেতা ঋষি। বাদরায়নের সমকালীন খৃ ৩ শতকে মনে হয়। বেদের কর্মকাণ্ডের সূত্রগুলিকে সুসংবদ্ধ ও সংশোধিত করেন। এ জন্য প্রাথমিক সূত্রকার বলে পরিগণিত। ভাগবতে (১২।৬) জৈমিনি ব্যাসের শিষ্য ; অশ্বত্থামার কাছে মার্কণ্ডেয় পুরাণ শুনেছিলেন। সুমন্তুর গুরু ও সাম বেদের সংকলয়িতা। অন্য মতে জৈমিনির ছেলে সুমন্তু ও সুমন্তুর ছেলে সুত্বান। আর এক মতে ব্যাসের ৫টি বিখ্যাত শিষ্য সুমন্তু, জৈমিনি, পৈল, বৈশম্পায়ন, এবং শুক। এই ৫ জনেই ব্যাস প্রণীত জয় (মূল মহাভারত)* প্রচার করেন। নৈমিষারণ্যে হিরণ্যনাভকে জৈমিনি ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ শোনান। শর শয্যায় ভীষ্মের সঙ্গে দেখা করেন। সর্প যজ্ঞেও উপস্থিত ছিলেন। এঁর মীমাংসা সূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় বেদের কর্ম-কাণ্ডের ব্যাখার নিয়ম ও ধর্ম। জৈমিনি মতে বেদ অপৌরুষেয়, নিত্য ও স্বতঃ প্রমাণ, ঈশ্বরকৃত নয়। যজ্ঞ কর্তা স্বর্গ পান এই সূত্রে আত্মার অমরতা স্বীকার করেছেন। মোক্ষ ও ঈশ্বরের কথা কোথাও বলেন নি। এঁর ভারত সংহিতা জৈমিনি ভারত নামেও পরিচিত। ছান্দোগ্যানুবাদও এঁর প্রণীত বলা হয়। পূর্ব মীমাংসা ষড় দর্শনের অন্যতম। জৈমিনি বৈশম্পায়ন ইত্যাদি ৫ জন বজ্রবারক নামে প্রসিদ্ধ।

জোগড়—উড়িষ্যাতে গঞ্জাম জেলায়। গঞ্জামের উ-পশ্চিমে ৮-মাইল দূরে একটি দুর্গ।

এখানে অশোকের শিলা-লেখ (২৫০ খৃ-পূ) রয়েছে। পুরুষোত্তমপুরের ৪-মাইল পশ্চিমে একটি পাহাড়ে, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে ঋষিকুল্যার উত্তর তীরে এই শিলালেখ। এরও ইতিহাস শিশুপাল গড়ের মত। এখানকার প্রতিরক্ষা প্রাচীর কাঁচা। এখানে নগর পত্তনের আগে নবাশ্মীয় সংস্কৃতির একটি বসতি ছিল।

জ্ঞান—চার্বাক মতে ইন্দ্রিয়ই প্রত্যক্ষ প্রমাণ ; এবং ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষই প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান। প্রতক্ষ্যের মাধ্যমে কেবল বর্তমানকেই জানা যায়। ফলে অতীত ও ভবিষ্যৎ বাহ্য-ইন্দ্রিয়ের অগোচর বলে সর্ব দেশ কালিক জ্ঞান সম্ভব নয়। জৈন মতে জ্ঞান দু-রকম অপরোক্ষ অর্থাৎ আপেক্ষিক জ্ঞান ও পরোক্ষ জ্ঞান। সংস্কার দূর হলে আত্মা যে জ্ঞান লাভ করে সেটি জৈনদের পারমার্থিক জ্ঞান ; কোন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে এই পাওয়া নয়। এ ছাড়াও মতি ও শ্রুতি বলে দুটি ব্যবহারিক জ্ঞান এঁরা স্বীকার করেন। বৌদ্ধ মতে জ্ঞান চার রকম : ইন্দ্রিয় জ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, আত্মসংবেদন ও যোগী জ্ঞান—জ্ঞানান্তরের অপেক্ষা না রেখেই এ জ্ঞানগুলি লাভ করা যায়। প্রমাণ না থাকলেও প্রমেয় থাকতে পারে। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ক্ষেত্রে স্বলক্ষণ যুক্ত নির্বিকল্প প্রত্যক্ষকে এঁরা স্বীকার করেন। অবশ্য বিভিন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায় জ্ঞানের আলোচনায় ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণের কথা বলেছেন।

ন্যায় মতে জ্ঞান চারটি প্রমাণের ওপর নির্ভর করে। প্রথমত জ্ঞানের স্বরূপ ; জ্ঞান সামনের বিষয়াদিকে প্রকাশ করে দেয়। দ্বিতীয় হচ্ছে জ্ঞানের দুটি প্রকার ; প্রমা ও অপ্রমা। প্রমা বা প্রমিতি চার ভাগে বিভক্ত ; প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শব্দ। অর্থাৎ প্রমা হচ্ছে যথার্থ বিষয়ানুভব। স্মৃতি, সংশয়, ভ্রম, তর্ক ইত্যাদি অপ্রমা।

অপ্রমা সত্য বা মিথ্যা হতে পারে। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সম্পর্ক হলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। জ্ঞানের বাস্তব কার্যকারিতা অংশে ন্যায়, বৈশেষিক, বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মত বহুলাংশেই এক। ন্যায় মতে জ্ঞান বিষয়ানুগ, এবং জ্ঞান আলোচনা ও যুক্তি অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত। সাংখ্য মতে জ্ঞান বা প্রমার পক্ষে তিনটি স্বতন্ত্র প্রমাণ হচ্ছে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ। স্বতন্ত্র প্রমাণ হিসাবে উপমান, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি সাংখ্যে স্বীকৃত নয়। সাংখ্য মতে প্রত্যেক প্রমায় তিনটি অংশ প্রমাতা, প্রমেয় ও প্রমাণ। প্রমাতা হচ্ছে চিন্ময় আত্মা; ইন্দ্রিয়াদি মাধ্যমে প্রাপ্ত বিষয় প্রমেয় এবং বুদ্ধিবৃত্তি হল প্রমাণ। আত্মার নিকটতম অচিৎ অথচ স্বচ্ছ সাত্ত্বিক বুদ্ধির ওপর আত্মার চেতন রশ্মি প্রতিবিম্বিত হয়ে জ্ঞেয় বিষয়কে প্রকাশ করে। সাংখ্য মতে জ্ঞান প্রকাশাত্মক ও আত্মগত ব্যাপার। আত্মা জ্ঞান স্বরূপ সাক্ষী চৈতন্য। আত্মা ও অনাত্মার অবিবেক জনিত অজ্ঞান জীবের ত্রিবিধ দুঃখের কারণ। বিবেক-জ্ঞান হলেই জীব কৈবল্য পায়।

বেদের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করবার জন্য মীমাংসকরা জ্ঞানের আলোচনা করেছিলেন। এঁরা পরোক্ষ ও অপরোক্ষ দুটি জ্ঞান স্বীকার করেন। এঁদের প্রাত্যক্ষিক জ্ঞানের বিষয় সৎ-বস্তু। জ্ঞানের স্বতঃ প্রামাণ্যবাদ এঁদের যুক্তির ভিত্তি। শ্রুতিও

এঁদের কাছে স্বতঃপ্রমাণ। প্রভাকর সম্প্রদায় জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানের ত্রিপুরী স্বীকার করেন। এক মাত্র প্রভাকর সম্প্রদায় ভিন্ন অন্য মীমাংসা সম্প্রদায় প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, উপমান, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি এই ছটি স্বতন্ত্র প্রমাণ স্বীকার করেন। প্রভাকর মতে অনুপলব্ধি প্রমাণ নয়।

মধ্বাচার্যের মতে জ্ঞেয় স্বরূপে যদি জ্ঞানের গোচর হয় তবেই সেই জ্ঞান প্রমা। এঁদের মতে সব রকম প্রত্যক্ষই আপেক্ষিক বা সবিকল্পবোধ। নির্বিকল্প বোধ অসম্ভব। মধ্ব মতে যথার্থ জ্ঞান অর্থে বুদ্ধি ও প্রকৃতির সামঞ্জস্য। সামঞ্জস্যের অভাব হলে মিথ্যাত্ব আসে। প্রত্যক্ষের আলোচনায় মধ্বগণ ন্যায় মত অনুসরণ করেন এবং ন্যায়ের ছয়টি প্রত্যক্ষ ছাড়াও সাক্ষী প্রত্যক্ষ বলে আর একটি প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন। স্মৃতি জ্ঞান একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ। নিম্বার্ক সম্প্রদায় প্রত্যক্ষ অনুমান ও শব্দ এই তিনটিকে স্বীকার করেন। এঁদের প্রত্যক্ষ দু রকম লৌকিক ও অলৌকিক। প্রত্যক্ষ আলোচনায় নিম্বার্ক সম্প্রদায় ন্যায়ের ধারাই মানেন।

অদ্বৈত বেদান্তে ছয় প্রকার বৃত্তি-জ্ঞান। এঁদের মতে জ্ঞানের বৃত্ত্যংশ পরিবর্তনশীল; জ্ঞানাংশ অপরিবর্তনীয়। অপরিবর্তনীয় জ্ঞানই সৎ এবং এই সৎ-ই চিৎ। এঁদের মতে জ্ঞান স্বয়ং প্রকাশ। দ্রঃ- জৈন, বৌদ্ধ।

জ্ঞানশ্রীমিত্র—গৌড়ীয় বৌদ্ধাচার্য (খৃ ১১ শতকে), বিক্রমশীলা মহাবিহারের অন্যতর মহাস্তম্ভ। হিন্দু ও বৌদ্ধ ন্যায়ের বিবাদে ইনি এক দিকে শঙ্কর, ভাসর্বজ্ঞ, ত্রিলোচন, বাচস্পতি, বিত্তোক ইত্যাদি হিন্দু নৈয়ায়িকদের মত এবং অপর দিকে বৌদ্ধ দার্শনিক ধর্মোত্তরের মত খণ্ডন করে নিজের মত স্থাপন করেন। বৌদ্ধ ন্যায় প্রস্থানে জ্ঞানশ্রী মিত্র শেষ মৌলিক গ্রন্থকার। ধর্মকীর্তি রচিত 'প্রমাণ বার্তিকের' অন্যতম ভাষ্যকার প্রজ্ঞাকর গুপ্তের প্রস্থান অনুসরণকারী। জ্ঞানশ্রীমিত্রের রচনা ক্ষণভঙ্গাধ্যায়, আপোহ-প্রকরণ, ঈশ্বরবাদ এবং সাকার-সিদ্ধি-শাস্ত্র প্রধান। জৈন বাদিদেবসূরি ও মৈথিল নৈয়ায়িক শংকর মিশ্র এঁর গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।

জ্বর—মেরু পর্বতে জ্যোতিষ্ক তীর্থে সাবিত্র পর্বতে (মহা ১২।২৭৪।৪) শিব পার্বতী বসে ছিলেন। সেই দিন কনখলে (গঙ্গাদ্বারে) দক্ষ যজ্ঞ করছিলেন। দেবতারা যজ্ঞে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন দেখে পার্বতী জানতে চান ওঁরা কোথায় যাচ্ছেন। শিব সব কিছু বলেন এবং পার্বতী পিতার আচরণে অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে পড়েন। পার্বতীর দুঃখে শিব অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন। অনুচরদের নিয়ে দক্ষ যজ্ঞ আক্রমণ করেন। যজ্ঞ মৃগরূপ ধরে পালাচ্ছিল; মহাদেব ছুটে যান। কপাল থেকে ঘাম পড়ে আগুনে পরিণত হয়। এই আগুন থেকে জ্বর জন্মায়। হ্রস্ব, অতিমাত্ররক্তাক্ষ, হরিশ্মশ্রু, বিভীষণ, ঊর্দ্ধকেশ, অতিলোমাঙ্গ, করাল, কৃষ্ণবর্ণ ও রক্তবাস। শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মা এসে শিবকে বুঝিয়ে যজ্ঞভাগের ব্যবস্থা করেন; হ্রস্ব পুরুষটিকে নাম দেন জ্বর (মহা ১২।২৭৪।৪৫)। শিব তারপর এই জ্বরকে টুকরো টুকরো করে বিভিন্ন জীবের মধ্যে ছড়িয়ে দেন। হাতীর মাথার তাপ, শিলাজতু, জলীয় শৈবাল, সাপের খোলস, গোজাতির ক্ষুর-রোগ, ভূমির উর্বরতা, পশুর দৃষ্টি রোধ, অশ্বের গলরোগ, ময়ূরের শিখা উদ্ভেদ, কোকিলের চক্ষুরোগ,

মেষের পিত্তভেদ, শুকের হিক্কা, এবং শার্দূলের ক্লান্তিকে জ্বর বলা হয়। বৃত্র বধের সময় ইন্দ্রের দেহে তেজ ও বৃত্রের দেহে জ্বর এনে দিয়ে মহাদেব ইন্দ্রকে বৃত্র বধ করার জন্য আদেশ দেন।

অন্য মতে তৃতীয় নেত্র থেকে এক ফোঁটা জল পড়ে, আর এক মতে দীর্ঘ নিশ্বাস থেকে জ্বরের উৎপত্তি। কোন কোন পুরাণে দেবতারা বিপর্যস্ত হয়ে শিবের শরণ নেন; ভীষণ জ্বর হয়েছিল। দেবতাদের দেহ থেকে এই জ্বরকে বার করে টুকরো করে ইত্যাদি......। সুরাসুর সকলে এই জ্বরকে ভয় করে। হরিবংশে বাণাসুরের যুদ্ধে ত্রিশিরা জ্বরের (২।১২২।৭১) কালো কুচকুচে রঙ, প্রলয়ের মেঘ মত গর্জন, তিন মাথা, তিন পা, এবং এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকা নয়-চোখ। ভীষণ জ্বর হলে যে রুক্ষ চেহারা হয় সেই রকম দেখতে। অস্ত্র ভস্ম, সর্বদা ছাই ছড়ায়। বলরামকে সম্পূর্ণ এবং কৃষ্ণকে প্রায় পর্যুদস্ত করেছিল। কৃষ্ণ তখন পাল্টা আর এক জ্বরের সৃষ্টি করেন। ত্রিশিরা জ্বরকে কৃষ্ণ নিহত করতে যাচ্ছিলেন কিন্তু ত্রিশিরা কৃষ্ণের শরণ নেয় এবং পরে দক্ষ যজ্ঞের জ্বরের মতই একেও ভাগ করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

জ্বালামুখী—৩১°৫২' উ×৭৬°২০' পূ; কাংড়া জেলার একটি গ্রাম। কাংড়া থেকে নাদাউন যাবার পথে। কাঙড়া সহর থেকে ২২।২৫ মাইল দক্ষিণে এবং নাদাউন থেকে ১০ মাইল উ-পশ্চিমে। একটি পীঠস্থান; সতীর জিব পড়েছিল। জ্বালামুখী পাহাড়ের পশ্চিম ঢালু গায়ে। আগ্নেয়গিরি প্রস্তর থেকে কুঁদে এই বিখ্যাত মন্দিরটি গঠিত। কোন স্থাপত্য বা অলঙ্করণ নাই; এখানে পাহাড়ের গা থেকে স্বাভাবিক গ্যাস বার হয়। দশটি গ্যাস-জেট রয়েছে; ৫-টি মন্দিরের মধ্যে এবং ৫-টি মন্দিরের দেওয়ালে। একটি মতে অম্বিকা বা মঠেশ্বরী প্রতিমা। কোন বিগ্রহ নাই; দেওয়ালের গায়ে জ্বলন্ত শিখাময় ফাটল দেবীর অগ্নিকম্প মুখ বলে কল্পিত। দেবীর শিরহীন দেহ রয়েছে ভবন মন্দিরে।

বিতস্তা নদীর উত্তর সীমান্তে হিমালয়ে উত্তুঙ্গ পর্বত শ্রেণীর পাদদেশে। গুপ্ত যুগেই তীর্থস্থান বলে প্রসিদ্ধ। যেখানে গ্যাস বার হয় সেখানে একটি স্বর্ণ মন্দির আছে। মন্দিরটি অবশ্য প্রাচীন নয়। মন্দিরের মাঝে কুণ্ডের চার পাশে জ্বলিত স্বাভাবিক গ্যাসকে দেবীর তেজ বলা হয়। প্রতি বছর এপ্রিল মাসে এখানে নওরাত্রির বড় মেলা হয়। এক সময়ে সমৃদ্ধ সহর ছিল; ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে রয়েছে।

মতান্তরে অসুর জলন্ধরের মুখ থেকে এই আগুন বার হচ্ছে। মহাভারতের বড়বা। জ্বালামুখী পাহাড় ৩২৮৪ ফু; মন্দিরটি ১৮৮২ ফু ওপরে।

জ্যাক্সারটেস্—সীতা, শীলা বা রসা নদী। আবেস্তাতে রংহা, রণহ। হেরোডোটাসে এরাক্সেস্। জ্যাক্সারটেস্ 'জ' নামেও উল্লিখিত। বর্তমানে সির (<সীতা) দরিয়া। ইসিককুল হ্রদের দক্ষিণ দিকের উপত্যকা থেকে উৎপন্ন। ইয়রকন্দ নদী =জরফসান (দ্রঃ) নদী; এর তীরে ইয়রকন্দ সহর অবস্থিত। মহাভারতে শকদ্বীপ গত নদী। আর্মেনিয়ার এরাক্সেস্ ও পারস্যের এরাক্সেস্ থেকে এটি আলাদা। মতান্তরে

জ্যাক্সরটেস্ হচ্ছে শৈলোদা ; সোগডোনিয়ার উ-পশ্চিমে। মহাভারতে শৈলোদা। মেরু ও মন্দার পর্বতের মধ্যস্থলে প্রবাহিত।

জ্যামঘ—পুরু বংশীয় রাজা। স্ত্রী শৈব্যা। অপুত্রক। স্ত্রীর ভয়ে দ্বিতীয় বার বিয়ে করতে পারেন নি। হরিবংশে (৩৬।১৬) বনে বাস করতেন। দ্রঃ- ক্রষ্টু। ব্রাহ্মণরা একে বলবান করে দেন। মৃত্তিকাবতী ও ঋক্ষবান পর্বত জয় করে শুক্তিমতী নগরীতে রাজ্য করতে থাকেন। এক দিন এক শত্রুকে হারিয়ে শত্রুর মেয়ে ভোজ্যাকে (হরিবংশে উপদানবী) কেড়ে এনে সন্ত্রস্ত হয়ে স্ত্রীকে জানান এই মেয়েটি তাঁদের পুত্রবধূ হবে। ভাগবতে ভোজ্যাকে যখন রথে করে আনছিলেন, শৈব্যা দেখতে পান ; জ্যামঘ ভয়ে বলেন এটি তাঁদের পুত্রবধূ হবে। শৈব্যার ছেলে হলে তার সঙ্গে বিয়ে হবে। পিতৃগণ ও দেবগণের আশীর্বাদে শৈব্যা পরে গর্ভধারণ করেন। হরিবংশে উপদানবীর উগ্রতপস্যাতে শৈব্যা গর্ভধারণ করেন ; এবং বিদর্ভ নামে একটি ছেলে হয়। বিদর্ভের সঙ্গে পরে ভোজ্যার বিয়ে হয়।

জ্যামিতি—পৃথিবীকে মিতি করার শাস্ত্র। প্রধানত জমি ও যজ্ঞ বেদি মাপবার জন্য কতকগুলি বিচ্ছিন্ন সূত্র সমষ্টি হিসাবে ভারতে এর সৃষ্টি। এই প্রাচীন জ্যামিতি অংশ বর্তমানে মেনসুরেসান নামে পরিচিত। খৃ-পূ ৮ শতকে রচিত কৃষ্ণ যজুর্বেদ ও শুক্ল যজুর্বেদ সংহিতার অন্তর্গত শুল্ব সূত্রে ভারতে জ্যামিতি চর্চার নিদর্শন রয়েছে। অবশ্য আরো আগে থেকেই এই চর্চা আরম্ভ হয়েছিল। মোট সাতটি শুল্ব সূত্র বর্তমানে পাওয়া যায়। এগুলিতে ক্ষেত্রফল সংক্রান্ত সূত্রাবলী, বর্গকে আয়ত ক্ষেত্রে বা ত্রিভুজকে বর্গক্ষেত্রে রূপান্তরের নিয়ম, সদৃশ চিত্র (সিমিলার ফিগার) সম্বন্ধে বিবিধ সূত্র, সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ সম্পর্কিত উপপাদ্য ; এবং এই অতিভুজের ওপর বর্গ অপর দুই বাহুর ওপর অঙ্কিত দুটি বর্গের যোগফলের সমান উপপাদ্যটিও রয়েছে। বৌধায়নের শুল্ব সূত্রেও অনুরূপ প্রতিজ্ঞা আছে।

আর্যভট (৬ শতক), বরাহমিহির (৬ শতক), ব্রহ্মগুপ্ত (৭ শতক) মহাবীরাচার্য (৯ শতক) এবং ভাস্করাচার্য (১২-শতক) ভারতে সেই যুগের জ্যামিতি গবেষক। ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হিসাবের একটি নিয়ম বার করেন আর্যভট। ব্রহ্মগুপ্ত ও মহাবীর আচার্য আর্যভটের সূত্র থেকে বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের এবং তা থেকে চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র বার করেন। আর্যভট ও ভাস্করাচার্যের হিসাবে $\pi = ৩{\cdot}১৪১৬$। মহাবীরের রচনায় কনিক সেকসান সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

জ্যেষ্ঠা—(১) অলক্ষ্মী (দ্রঃ)। (২) নক্ষত্র : আলফা স্কর্পি।

জ্যোতিরথা—জোহিলা, শোণের শাখা জ্যোতিষা।

জ্যোতির্বিদাভরণ—রচনাকার কালিদাস।

জ্যোতির্বিদ্যা—জ্যোতিষ্কদের অবস্থান ইত্যাদি গণনা। বৈদিক কাল থেকে ভারতে চর্চা হয়েছে। তখন কেবল সূর্য ও চন্দ্রের গতিই পর্যবেক্ষণ করা হত। সূর্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন দিয়ে ঋতুকাল ও বছর ঠিক হত। পূর্ণিমা ও অমাবস্যা দিয়ে বছরকে মাসে ভাগ করা হত। বেদে ঋষিরা সূর্যগ্রহণের উল্লেখ করেছেন এবং চন্দ্র

পথকে ২৭ বা ২৮ নক্ষত্র-বিভাগে ভাগ করেছিলেন। প্রায় ১৩০০ খৃ পূর্বে চন্দ্র সূর্য গতিকে ভিত্তি করে বেদাঙ্গ জ্যোতিষের বর্ষপঞ্জী রাখার পদ্ধতি চালু হয়। গ্রহ গতির হিসাবের কোন উল্লেখ এই সময়ে নাই। গ্রহ গতি সম্বন্ধে জ্ঞান মনে হয় মধ্য প্রাচ্য অর্থাৎ পশ্চিম এসিয়া আগত। ভারতীয় জ্যোতির্ষিক জ্ঞান কিছু পৃথক, কিছু উন্নতও ছিল বটে। আর্য ভট (৪৭৬ খৃ?) কৃত আর্যভটীয়, বরাহ মিহির (৫২৭ খৃ?) কৃত পঞ্চ সিদ্ধান্তিকা, ব্রহ্ম গুপ্ত (৫৯৮ খৃ?) কৃত ব্রাহ্ম-স্ফুট সিদ্ধান্ত, ভাস্করাচার্য (১১৫০ খৃ?) কৃত গণিতাধ্যায় ও গোলাধ্যায় এবং ময়দানব (প্রকৃত নাম অজ্ঞাত) কৃত সূর্য-সিদ্ধান্ত নাম করা পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। এই বইগুলিতে রবি, চন্দ্র ইত্যাদির আবর্তন কাল, গ্রহগণের পাত, ও মন্দোচ্চের অবস্থান ও গতি মধ্য গ্রহ থেকে স্পষ্ট গ্রহ আনয়ন, সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণ গণনা, উদয়াস্ত গণনা প্রভৃতি আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার সমস্ত বিষয়গুলিই আছে। এই সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রন্থে ভূকেন্দ্রিক মতবাদই ভিত্তি করা হয়েছে। আর্যভট পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতির কথা বলেছিলেন বটে কিন্তু তাহলেও তাঁর হিসাব ভূকেন্দ্রিকই ছিল। বর্তমানের সপ্তাহ ও বার (দ্রঃ) গণনা, রবিমার্গকে বারটি রাশিতে ভাগ করা ইত্যাদি অভারতীয় উদ্ভাবনা। সিদ্ধান্ত গ্রন্থ হিসাবে ৫টি (১) সূর্যসিদ্ধান্ত; (২) বশিষ্ঠ সিদ্ধান্ত, বিষ্ণুচন্দ্রকৃত; (৩) রোমকসিদ্ধান্ত শ্রী সেন লিখিত; (৪) পৌলিস সিদ্ধান্ত; ইনি গ্রীক, প্রকৃত নাম পল; আলেকজান্দ্রিয়াতে। এ'র টীকাকার পুলিস (৫) ব্রহ্মসিদ্ধান্ত লেখক ব্রহ্মগুপ্ত(দ্রঃ), পিতা জিষ্ণু। মূলতান ও অনহিলওয়ারার মধ্যে ভিল্লামল নগরে। দ্রঃ- বরাহমিহির।

জ্যোতির্মঠ—জোসিমঠ বর্তমানে। বদ্রিনাথে শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত। কুমায়ুনে অলকানন্দা তীরে।

জ্যোতির্লিঙ্গ—ওঙ্কারনাথ অমরেশ্বর, ভীমশঙ্কর (দ্রঃ- ডাকিনী), দারুবন, সোমনাথ সৌরাষ্ট্রে, মল্লিকার্জুন শ্রীশৈলে, মহাকাল উজ্জয়িনীতে, কেদারনাথ হিমালয়ে, বিশ্বেশ্বর বারাণসীতে, ত্র্যম্বক গোমতীতে, বৈদ্যনাথ বৈদ্যনাথে, রামেশ্বর সেতুবন্ধে, ঘুশ্রীণেশ শিবালয়ে।

জ্যোতিষ—প্রাচীন ভারতে জ্যোতিষের তিনটি ভাগ ছিল; গণিত, সংহিতা, ও হোরা জ্যোতিষ। সংহিতা ও হোরা একত্রে ফলিত জ্যোতিষ নামে পরিচিত। ফলিত জ্যোতিষের কাজ ভাগ্য গণনা। বরাহ মিহিরের বৃহৎ-সংহিতায় ১০৮ অধ্যায়কে (১) জ্যোতির্বিদ্যা, (২) আবহবিদ্যা, (৩) উদ্ভিদবিদ্যা, (৪) প্রাণীবিদ্যা ইত্যাদি ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা যায়। আর এক বিচারে এই সংহিতার দুটি ভাগ (১) প্রাকৃতিক বিবরণ অংশ এবং (২) গ্রহ নক্ষত্রের ফলাফল অংশ। যে অংশে লগ্ন ও গ্রহ আদির শুভাশুভ ফল বিবেচিত হয় তার নাম হোরা শাস্ত্র বা অঙ্গ বিনিশ্চয়। হোরা শব্দের এক অর্থ অর্দ্ধ রাশি ও অর্দ্ধলগ্ন। অহোরাত্র শব্দটি থেকে অ ও ত্র এই অক্ষর দুটি বাদ দিয়ে হোরা শব্দের উৎপত্তি। হোরা শাখার উপশাখা জাতক, চেষ্টা ও প্রশ্ন ইত্যাদি। জাতক শাখা আবার তিন ভাগে বিভক্ত:—গ্রহগোচর বা গোচর ফল, অষ্ট বর্গ গণনা,

ও দশা গণনা। বেদের ছয়টি অঙ্গের (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, ছন্দ ও নিরুক্ত) মধ্যে জ্যোতিষ একটি।

জ্যোৎস্নাকালী—চন্দ্রের দ্বিতীয় কন্যা ; অত্যন্ত সুন্দরী, বরুণের ছেলে পুষ্করের স্ত্রী। (মহা ৫।৯৬।১৩)।

ঝ

ঝর্ঝ—অপর নাম জম্ভ (রামা ১।২৫।৮)। সুন্দ (দ্রঃ) অসুরের পিতা। সুন্দের স্ত্রী তাড়কার ছেলে মারীচ ইত্যাদি।

ঝাড়খণ্ড—ছোটনাগপুর। এক সময় বাঙলাতে বীরভূম (বীরদেশ, রাজধানী ও নগর) থেকে বারাণসী পর্যন্ত সমস্ত পার্বত্য এলাকা বোঝাত। মহালিঙ্গেশ্বর তন্ত্রে সাঁওতাল পরগণাও এর অন্তর্গত। রাঁচির ২ মাইল পূর্বে বর্তমানে অখ্যাত একটি গ্রাম চুটিয়া ; প্রবাদ অনুসারে নাগ (ছোটনাগ) বংশীয় রাজার রাজধানী ছিল : পুণ্ডরীক নাগের ইনি বংশধর।

ঝিলম—বিতস্তা। বিতংসা (বৌদ্ধ), বেহত। হাইডাস্পেস্ বিদাস পেস (গ্রীক)। পাঞ্জাবে কাশ্মীর উপত্যকাতে বরাহমূল নামক স্থান থেকে নেমে এসে ঝুং-এর কাছে চেনাবে এসে পড়েছে। রামায়ণে হ্লাদিনী।

ঝিল্লী—বৃষ্ণি বংশে এক জন যোদ্ধা। দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে ছিলেন (মহা ১।১৭৭।১৮)। সুভদ্রার বিয়ের যৌতুক নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে এসেছিলেন (মহা ১।২১৩।২৮)। কুরুক্ষেত্রে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। (২) ত্রয়োদশ মন্বন্তরে ইন্দ্রশত্রু এক জন দানব।

ট

টক্কদেশ—পাঞ্জাবে বিপাশা ও সিন্ধু নদীর মাঝখানে। এখানে বাহ্লিকদের বাস ছিল দ্রঃ- মদ্র।

টগর—গ্রীক নাম। ধরগড় : নিজাম রাজ্যে দৌলতাবাদে। মতান্তরে ধরগড়= জুন্নির বা কুলবর্গা। একটি মতে টের : পৈথান থেকে ৯৫ মাইল দ-পূর্বে ; হায়দ্রাবাদে থান ও সাতারা শিলালেখে উল্লেখ আছে। অপর মতে পুণা জেলাতে জুন্নরি। আর এক মতে নিজাম রাজ্যে দরুর। মতান্তরে দেবগিরি বা দেবগিরির কাছে রোজা বা কুল-বর্গা বা ত্রিকূট।

টিগ্রিস—বিতৃষ্ণা নদী : তৃষ্ণা নদী। শাল্মলী দ্বীপে।

টিট্টিভ—এক জন অসুর।

টিট্টিভসর—বাল্মীকি আশ্রমের কাছে একটি পবিত্র জলাশয় ; আগে ছিল না। এখানে দুটি জলচর পাখী থাকত। পু-পাখীটি এক দিন খাদ্য অন্বেষণে গিয়েছিল ; ফেরবার সময় দেখে আরো কতকগুলি পাখী তার মত ঐ একই দিকে এগিয়ে চলেছে। ফলে পু-পাখীটি তার স্ত্রী সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে পড়ে এবং তাকে ত্যাগ করে। স্ত্রী পাখীটি

তখন অষ্টদিকপালের স্তব করতে থাকলে এরা এসে দেখা দেন এবং একটি জলাশয় তৈরি করে স্ত্রী পাখীটিকে এই জলাশয়ের এক পার থেকে আর এক পারে সাঁতরে যেতে বলেন। মাঝখানে জলে ডুবে না গেলে নিষ্কলঙ্ক চরিত্র বলে প্রমাণিত হবে। স্ত্রী পাখীটি অনায়াসে সরোবর পার হয়ে যায় ; ফলে নাম টিট্টিভ সর।

সীতার বনবাসের সময় সীতাকে পরীক্ষা করবার জন্য বাল্মীকিও সীতাকে এই সরোবর পার হয়ে যেতে বলেন। সীতা পৃথিবীর কাছে প্রার্থনা করলে পৃথিবী দেবী নিজে এসে সিংহাসনে বসিয়ে সীতাকে পার করে দিয়েছিলেন ; সীতার গায়ে একটু জলও লাগেনি (ক-সরিৎ)।

টলেমি—ক্লাউদিউস প্তোলেমায়স্ টলেমি ; খৃ ২ শতক ; আলেকজান্দ্রিয়াতে বাস। পৃথিবীর যে ভৌগলিক বিবরণ লিখে গেছেন তাতে ভারতের বহু জনপদ, নদ, নদী, পর্বত ও বন্দরের উল্লেখ আছে। প্রতিটির অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা দেওয়া আছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এই হিসাব ভুল ; যার জন্য তদানীন্তন বহু জনপদকে আজ চিনতে পারা সম্ভব নয়।

টাঁকশাল—একটি মতে গ্রীক প্রভাবের ফলে ভারতে মুদ্রা ও মুদ্রাঙ্কন চালু হয়। বৈদিক সাহিত্যে অবশ্য স্বর্ণমুদ্রা নিষ্কের উল্লেখ আছে। মনুতে স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রার বিশদ বিবরণ রয়েছে। খৃ-পূ ৬ শতকে ভারতে মুদ্রা প্রচলিত ছিল এবং ভারতে নিজস্ব (গ্রীক প্রভাব নয়) মুদ্রা প্রস্তুত বিদ্যা গড়ে উঠেছিল মনে হয়। প্রাচীন রোহিতক অঞ্চলে যৌধেয় মুদ্রাগুলি তৈরি হত। অর্থশাস্ত্রে লক্ষণাধ্যক্ষ নামে টাঁকশাল কর্মীর উল্লেখ আছে।

টেনাসেরিম—তনুশ্রী। তনসুরি, তেনাসেরি। বর্মার নীচের অংশ।

ড

ডবাক—সমুদ্রগুপ্তের একটি করদ রাজ্য। সম্ভবত ঢাকা, ময়মন সিং জেলা নিয়ে গঠিত। আসামে কপিলি নদীর উপত্যকায় ডবোক নামে একটি জায়গা রয়েছে। বহু মতে এই ডবাকের অপভ্রংশ ডবোক।

ডমরু—দু মুখ চামড়া দিয়ে ঢাকা ; যুক্ত শঙ্কু আকার ; পেট অংশ হাতে ধরে নাড়িয়ে বাজান হয়। দুটি দড়ির প্রান্তে দুটি ভারী গুটি বাঁধা থাকে ; এই গুটি সাহায্যে আহত হয়ে শব্দ হয়। মহাদেবের প্রিয় যন্ত্র। এসিয়া ও আফ্রিকার বহু প্রাচীন দেশে এটির ব্যবহার ছিল। দ্রঃ-পাণিনি।

ডাকিনী—পিশাচী। হরপার্বতীর অনুচর। ডাক অর্থে মন্ত্রসিদ্ধ গুণী। ডাক এখন অপ্রচলিত। ডাইনী শব্দ ডাকিনীর অপভ্রংশ। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রশাস্ত্রে শক্তির সহচরী ডাকিনী, হাকিনী, শাকিনী, রাকিনী, ও লাকিনী পাওয়া যায়। হাকিনী মনে হয় ডাকিনীর অনুপ্রাস শব্দ ; শাকিনী মনে হয় শঙ্খিনীর অপভ্রংশ ; রাকিনী মনে

হয় রাকিনীর (চামুণ্ডা বা দরিদ্র-ক্ষুধিতা) অপভ্রংশ। লাকিনী মনে হয় অনুপ্রাস শব্দ। বৌদ্ধ তন্ত্রে ডাকিনী অপদেবতা। ডাকিনী তন্ত্রে কয়েক জন ডাকিনীর নাম ও বর্ণনা :

ডাকিনী	সর্পবদনা	জ্বলনপ্রভা	কমণ্ডলু ও কর্তৃকা	বরপ্রদা	
রাকিনী	উলূকবদনা	নীলসন্নিভা	খড়্গ ও খেটক		
লাকিনী	ত্রিকপাল	পাটলীপুষ্পাভা	পাশ ও অঙ্কুশ		
কাকিনী	হয়বক্ত্র	মাণিক্যপ্রভা		সিদ্ধিদাত্রী	
শাকিনী	মার্জারাস্যা	অঞ্জনবর্ণা	কুলিশ ও দণ্ড		
হাকিনী	ঋক্ষবদনা	নীলমেঘবর্ণা	শূল ও খেটক	অভয়া	মুখ ১-৬

পর্যন্ত। দ্রঃ--যোগিনী।

ডাকিনী—ভীমশঙ্কর, ভীমপুর। পুণা থেকে উ-পশ্চিমে। ভীমার উৎস। এখানে ভীমশঙ্কর মহাদেবের (১২-শ জ্যোতির্লিঙ্গের একটি) মন্দির রয়েছে। শিবপুরাণে ডাকিনী সহ্যাদ্রি (প-ঘাট) পর্বতে অবস্থিত।

ডিণ্ডিক—একটি ইঁদুর। দ্রঃ- কৌলিক, বিড়াল তপস্বী।

ডিভক– ডিম্বক (দ্রঃ)।

ডিম্বক---শাল্ব নগরে রাজা ব্রহ্মদত্ত; ব্রাহ্মণ মন্ত্রী মিত্রসহ। রাজার দুই স্ত্রী। রাজা ও মন্ত্রী দু জনেই নিঃসন্তান ছিলেন। মহাদেবের ১০ বৎসর তপস্যা করে রাজা বর পান; দুই রাণীর মহাদেবের অংশে ছেলে হয়; বড় হংস এবং ছোট ডিম্বক। মন্ত্রী ৫ বৎসর বিষ্ণুর উপাসনা করেন, ছেলে হয় জনার্দন। তিনটি ছেলেই বেদবেদান্তে সুপণ্ডিত হয়ে ওঠে। এর পর হিমবৎপার্শ্বে হংস ও ডিম্বক মহাদেবের ৫ বৎসর তপস্যা করে প্রায় অবধ্য হবার বর এবং বহু অস্ত্র শস্ত্র ও যুদ্ধে সহায়তা করবে এ রকম দুজন গণেশ্বর অনুচর হংসরা পায়। ফলে অত্যন্ত গর্বিত হয়ে ওঠে। এরপর স্থির করে পিতাকে দিয়ে রাজসূয় যজ্ঞ করাবে এবং মৃগয়াতে বার হয়ে পুষ্কর তীরে এক আশ্রমে এসে এখানে মুনিদের আগামী যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করে। তারপর এখানেই দুর্বাসার আশ্রমে এসে দুর্বাসাকে অপমানিত করে; আশ্রম তছনছ করে দেয়। দুর্বাসা ফলে শাপ দেন বিষ্ণুর হাতে মৃত্যু হবে এবং কৃষ্ণের কাছে এসে প্রতিবিধান চান। এরপর রাজসূয় যজ্ঞের কর সংগ্রহের জন্য জনার্দনকে হংসরা কৃষ্ণের কাছে পাঠায়। জনার্দন এলে কৃষ্ণ তখন সাত্যকিকে হংসের কাছে পাঠান। এরপর পুষ্কর তীরে যুদ্ধ হয়। বিচক্র, হিড়িম্ব ইত্যাদি দানব এবং বহু রাজা এসে হংসের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। জরাসন্ধ যুদ্ধের খবর পেয়েও আসেনি। পুষ্করে কৃষ্ণ বিচক্রকে এবং বলরাম হিড়িম্বকে নিহত করেন। এরপর যুদ্ধ হয় গোবর্দ্ধনে এবং এখানে হংস কৃষ্ণের হাতে নিহত হয়। খবর পেয়ে ডিম্বক যুদ্ধ ত্যাগ করে যমুনাতে আত্মহত্যা করে (হরিবংশ ৩।১০৩-১২৯।-)। যুদ্ধের পর কৃষ্ণ গোকুলে সকলের সঙ্গে দেখা করে ফিরে যান।

মতান্তরে হংস ও ডিম্বক পরশুরামের কাছে অস্ত্রশিক্ষা করেন। হংস ও ডিম্বক নিজেরাই অশ্বমেধ যজ্ঞ করবে ঠিক করেছিল। কৃষ্ণের দূত হিসাবে সাত্যকি ও বলরাম

গিয়েছিলেন। কৃষ্ণের হাতে ডিম্বক নিহত হয় এবং পদাঘাতে হংসকে পাতালে পাঠিয়ে দেন। পাতালে সর্পাঘাতে হংস মারা যায়।

ডুণ্ডুভ—খগমের শাপে সর্পে পরিণত সহস্রপাৎ। রুরুকে (দ্রঃ) নিজের কাহিনী বলার পর শাপমুক্ত হন এবং রুরুকে অহিংসা ধর্মে উপদেশ দিয়ে অন্তর্হিত হয়ে যান (মহা ১।১০।৭)।

ড্রাগনগুহা—কৌশাম্বী (বর্তমানে কোসাম) থেকে ৪ কি-মি দূরে পাভোসা পাহাড়টি সম্ভবত ড্রাগনগুহার পাহাড়। এই গুহার কাছে অশোক একটি স্তূপ তৈরি করে দিয়েছিলেন। গুহাটি বুদ্ধদেবের স্পর্শে ধন্য। গুহাতে একটি শিলালিপি আছে। এতে জানা যায়-অহিচ্ছত্রের রাজা আসয় সেন এটি কস্যপীয় অর্হৎ-দের জন্য খনন করে দিয়েছিলেন। পাভোসা জৈনদেরও একটি তীর্থ।

ত

তংসু—পুরু বংশে এক রাজা; মতিনার>তংসু>ইলিন/ঈলিন; স্ত্রী কালিন্দী (মহা ১।৭০।২৮)।

তক্ষ—ভরতের ছেলে; ভাই পুষ্কল, দশরথের পৌত্র। গান্ধার জয় করে ভরত তক্ষশিলা ও পুষ্কলাবত নগর স্থাপন করেন। রামায়ণে আছে (৭।১০১।১০) এ দুটি আগে থেকেই সমৃদ্ধ নগর ছিল।

তক্ষক—পুরাণ অনুসারে অষ্টনাগের মধ্যে শেষ, বাসুকি ও তক্ষক তিন জন প্রধান। অন্য নাম অনন্ত; বাসুকির ভাই। কশ্যপের ঔরসে কদ্রুর গর্ভে জন্ম। কদ্রু তাঁর যে সব ছেলেদের অভিশাপ দিয়েছিলেন তাদের সঙ্গে নিয়ে মার কাছ থেকে চলে যান। মহাভারতে (১।৩।১৪৫) আছে কুরুক্ষেত্রে ইক্ষুমতীম্ নদীম্ অনু বাস করেন। শ্রুতসেন তক্ষকের ছোট ভাই। তক্ষক ইন্দ্রের বন্ধু; খাণ্ডব বনে বাস করতেন; খাণ্ডব দাহের সময় কুরুক্ষেত্রে ছিলেন; এঁর স্ত্রী ও পুত্র পালাতে গিয়ে অর্জুনের বাণে মারা যান; কেবল একটি ছেলে অশ্বসেন পালাতে পারেন। এই থেকে অর্জুনের সঙ্গে তক্ষকের শত্রুতা দেখা দেয়। পরিক্ষিৎকে (দ্রঃ) কামড়াবার জন্য সাত দিনের দিন তক্ষক অতি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশে আসছিলেন। পথে এক বিষ-বৈদ্য কাশ্যপের (দ্রঃ) সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। কাশ্যপ কোথায় কি উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন জানতে পেরে তক্ষক নিজের পরিচয় দেন এবং কাশ্যপের ক্ষমতা পরীক্ষা করার জন্য সেইখানে পথের ধারে বিরাট একটা বট গাছকে কামড়ালে গাছটি মুহূর্তের মধ্যে ছাই হয়ে যায়। কাশ্যপ মন্ত্র পড়ে জল দিয়ে ছাই থেকে প্রথমে দ্বিপত্রযুক্ত অঙ্কুরে এবং ক্রমশ যথাবৎ গাছে পরিণত করে দেন। তক্ষক বিষ-বৈদ্যকে বোঝান ক্ষীণায়ু রাজাকে বাঁচান নাও যেতে পারে এবং অভীষ্ট ধন দিয়ে ফিরিয়ে দেন। দ্রঃ- কাশ্যপ। দেবীভাগবতেও (২।১০) এই ঘটনা। তক্ষক এবার আরো কয়েকটি নাগের সাহায্য নেন; এরা ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ করে ফল নিয়ে রাজাকে উপহার দিতে আসেন; তক্ষক এদের একটি ফলের মধ্যে কীট রূপে অবস্থান করেন। প্রহরীরা ব্রাহ্মণদের ভেতরে যেতে দেন না; উপহার রাজার কাছে পাঠিয়ে দেন

এবং পরিক্ষিৎ এই ব্রাহ্মণদের অপেক্ষা করতে বলেন, পর দিন দেখা করবেন। রাজা সুন্দর দেখে উপহার দেওয়া একটি ফল বেছে নেন এবং ফলটি কাটলে ভেতর থেকে একটি লাল রঙের কীট বার হয়ে আসে। এ দিকে সন্ধ্যা হয়ে আসছে। মন্ত্রীদের চেষ্টাতে এই ভাবে প্রাণ রক্ষা হতে রাজা মন্ত্রীদের ধন্যবাদ দেন। বিষের আর ভয় নাই মনে করেন ; এবং ব্রাহ্মণের অভিশাপ সবটাই যাতে বিফল না হয় সেই উদ্দেশ্যে এই কীটও অন্তত তাঁকে কামড়াক এই রূপ ইচ্ছায় কীটটিকে নিজের গলায় স্থাপন করেন (মহা ১।৩৯।-)। কীটটি সঙ্গে সঙ্গে নিজ মূর্তি ধারণ করে কামড়ালে রাজা মারা যান। উতঙ্ক (দ্রঃ) যখন কুণ্ডল নিয়ে আসছিলেন তখন এই তক্ষক সেই কুণ্ডল চুরি করেন। এই সময় থেকে উতঙ্ক তক্ষকের উপর প্রতিশোধ নেবার সুযোগ খুঁজতে থাকেন। উতঙ্কই জন্মেজয়কে (দ্রঃ) প্ররোচনা দিয়ে অন্যান্য ঋষিদের সাহায্যে সর্পযজ্ঞ আরম্ভ করেছিলেন।

গোরূপা পৃথিবীকে সকলে যখন পর্যায় ক্রমে দোহন করছিলেন এক তক্ষক বৎস হন এবং নাগেরা তখন পৃথিবী দোহন করে বিষ লাভ করেন। বলরামের আত্মা পাতালে এসে পৌঁছলে তক্ষক শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁকে গ্রহণ করেন। বরুণের সভায় তক্ষক বাস করেন। দ্রঃ- নাগ।

তক্ষশিলা—প্রাচীন ভারতে প্রসিদ্ধ নগরী। প-পাকিস্তানে প্রায় ৩২ কি-মি উত্তর-পশ্চিমে শাহ-ঢেরির (৩৩°৪৫´উ×৭২°৪৯´ পূ) কাছে। রাওলপিণ্ডি জেলায়। দ্রঃ- তক্ষ। জন্মেজয় (দ্রঃ) এখানে বিতস্তা নদীর তীরে সর্পযজ্ঞ করেছিলেন। অতি প্রাচীন কাল থেকে শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র। এইখানে প্রথমে মহাভারতের কাহিনী বলা হয়েছিল। টক্সিলা (গ্রীক) : গান্ধার রাজধানী ; এবং কালকা সরাই থেকে ১-মাইল উ-পূর্বে এটোক ও রাওলপিণ্ডির মধ্যে। রাওলপিণ্ডি থেকে ২৬ মাইল উ-পশ্চিমে এবং কালকা সরাই থেকে ২ মাইল দূরে একটি সুরক্ষিত ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে। অপর মতে সাহডেরি থেকে ৮ মাইল উ-পশ্চিমে হাসান আব্দুলে তক্ষশিলা (গ্রীক) অবস্থিত ছিল। ভরতের ছেলে তক্ষের নাম অনুসারে। তক্ষ এখানে রাজা হন। এটি প্রাচীন হর্ম্য নগর বলে প্রমাণিত হয়েছে। বৌদ্ধ কাহিনীতে আছে আগের জন্মে বুদ্ধদেব ভদ্রশীলাতে রাজা ছিলেন। নাম ছিল চন্দ্রপ্রভ। এক ব্রাহ্মণ ভিখারীকে অনুমতি দেন ; ভিখারীটি রাজার শিরচ্ছেদ করে : সেই থেকে নাম তক্ষশিলা। কথাসরিৎ সাগরে এটি বিতস্তা/ ঝিলম তীরে। ওম্ফি/আম্ভি তক্ষশিলার রাজা ; আলেকজান্দারের কাছে পরাজয় স্বীকার করেছিলেন। পিতার রাজত্বকালে পাঞ্জাবের রাজ্যপাল অশোক এখানে বাস করতেন। অশোকের বড় ভাই সুমন এখানে রাজ্যপাল নিযুক্ত হন ; কিন্তু বিন্দুসার মারা গেলে অশোকের হাতে নিহত হন। এক সময় তক্ষশিলা গান্ধার দেশের রাজধানী ছিল। একটি বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র এখানে গড়ে উঠেছিল। পাণিনি ও জীবক এখানে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। শালাবতী একজন বারবণিতা ও রাজকুমার অভয়ের ছেলে এই জীবক ; বিম্বিসারের নাতি। বাল্যকালেই রাজগৃহ থেকে তক্ষশিলাতে এসে আত্রেয়'র কাছে জীবক চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। চাণক্যও (দ্রঃ) যেন এইখানের অধিবাসী ও ছাত্র

ছিলেন। এখানে গুরুদক্ষিণা শিক্ষান্তে এক হাজার মুদ্রা ছিল। বেদ থেকে আরম্ভ করে ধনুর্বিদ্যা সব কিছু এখানে শিক্ষা দেওয়া হত। এটি ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাকেন্দ্র। দ্রঃ- নালন্দা।

সহর যেখানে ছিল সেখানে বর্তমানে সাইডেরি, সিরকপ, সিরসুখ ও কচ্ছকোট গ্রাম অবস্থিত। সিরকপে পূর্বজন্মে বুদ্ধের মাথা কাটা যায়। এখন থেকে ১ মাইল পূর্বদিকে কর্মাল (<কুণাল) গ্রামে একটি ধ্বংসাবশেষ স্তূপ আছে; বিমাতা তিষ্য-রক্ষিতার ষড়যন্ত্রে এখানে কুণালের চোখ (অশোক ও পদ্মাবতীর ছেলে) নষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। কালকা সরাই থেকে ৮-মাইল পশ্চিমে আবদুল হাসানে পাহাড়ের পাদদেশে এলাপত্র নাগের পুষ্করিণী রয়েছে; বর্তমানে নাম বাবা ওয়ালি বা পঞ্জ সাহেবের পুষ্করিণী। এই পুষ্করিণীর চারপাশে বহু মন্দির রয়েছে। সিরকপ থেকে ৪ মাইল দূরে চতুষ্কোণ একটি ধ্বংসাবশেষ রয়েছে; এটি তক্ষশিলা বিদ্যাভবন যেন। রাওলপিণ্ডি থেকে ১৪ মাইল দক্ষিণে মাণিক্যালয় স্তূপ। কুষাণরা ব্যাকৃট্রিয়া (দ্রঃ- শাকদ্বীপ) থেকে বিতাড়িত হয়ে এখানে খৃ-পূ ১-ম শতকে রাজধানী স্থাপন করেন। এখানে পাওয়া একটি এরামিক শিলালিপি থেকে মনে হয় পারস্য রাজ দারিয়ুস যেন ভারত সীমান্তেও কিছু দেশ হস্তগত করেছিলেন। দারিয়ুসের সেনাপতি স্কাইলাক্স ৫১০-৫১৫ খৃ-পূর্বে অর্থাৎ বুদ্ধের মৃত্যুর ৩০ বছর পরে এখানে কিছু কিছু এলাকা অধিকার করেন। ৩২৬ খৃ পূর্বে আলেকজান্দার তক্ষশিলা জয় করেন; এর চার বছর পরে তক্ষশিলা মগধের চন্দ্রগুপ্তের হাতে আসে। অশোকের মৃত্যুর পরে ডেমেট্রিয়াস তক্ষশিলা জয় করে (১৯০ খৃ-পূ) আবার ব্যাকৃট্রিয়ান্ (গ্রীক) রাজার অধীনে আনেন। এর পর শকেরা প্রায় ৬০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। শকদের পর কুষাণরা রাজা হন। এখানে বির-ঢিপি এলাকা সব চেয়ে প্রাচীন বসতি এলাকা। সিরকপে গ্রীক, শক, ও পহ্লবদের রাজধানী ছিল। কুষাণরা সিরসুখে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যান।

বৌদ্ধ জাতকের বহু কাহিনীতে বিশ্ববিদ্যালয় নগর রূপে প্রসিদ্ধ। খৃ-পূ ৬ শতকের প্রথমার্দ্ধে গান্ধার পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়। খৃ-পূ ৪-শতকে গান্ধারে কতকগুলি ছোট ছোট রাজ্যের উৎপত্তি হয়: তক্ষশিলা এদের মধ্যে একটি। তক্ষশিলার রাজা আম্ভি আলেকজান্দারের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন খৃ-পূ ৩২৬ সালে। মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের সময় তক্ষশিলা রাজপ্রতিভূর প্রধান কর্মস্থান ছিল।

তক্ষশিলা তিনটি বাণিজ্য পথের সংগমে অবস্থিত নগরী। মধ্য ও পশ্চিম এসিয়ার পথের মিলন কেন্দ্র। বহুবার বিদেশী আক্রমণ সহ্য করতে হয়েছিল। মৌর্যদের পর বাহ্লীক, ইন্দ্রোগ্রীক, ও শক-পহ্লব রাজারা এখানে নিজেদের অধিকার স্থাপন করেছিলেন। কনিষ্কের সময় রাজধানী পুরুষপুরে সরিয়ে নেওয়া হয়। কিন্তু তবুও খৃ ৪-শতক পর্যন্ত তক্ষশিলার সমৃদ্ধি ও গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল। এই সময়ে তক্ষশিলা ভারতে একটি বিশিষ্ট বৌদ্ধ-কেন্দ্র রূপে পরিচিত হয়। খৃ ৫-শতকে হূণদের আক্রমণে নগরটি নষ্ট হয়। খৃ ৭-শতকে হিউ-এন-ৎসাঙের সময় তক্ষশিলা কাশ্মীরের অন্তর্গত ছিল।

এখানে খনন কার্যের ফলে তিনটি প্রাচীন সহরের চিহ্ন পাওয়া গেছে।

প্রাচীন সহরটির বর্তমান নাম ভিড়-ঢিপি ; রেল স্টেসন ট্যাকসিলার পূর্বে এবং তাম্র-নালা নদীর পশ্চিমে। সম্ভবত খৃপূ ৬-শতকে এর পত্তন হয়েছিল ; আয়ু খৃ-পূ ২-শতক পর্যন্ত। নগর বিন্যাস ও গৃহ নির্মাণে সুচিন্তিত পরিকল্পনা ছিল না। বেশির ভাগ গৃহই পাথরে তৈরি। খৃপূ ২-শতকে নতুন রাজধানী হয় সিরকপে ; এই নগরীর আয়ু মনে হয় চারশো বছর। ভিড়-ঢিপির কিছু দূরে এবং তাম্রনালার পূর্বতীরে ইন্দো-গ্রীকরা এটি তৈরি করেন। পহ্লবদের সময় নতুন ভাবে গ্রীক নগর পরিকল্পনার আদর্শে এটি পরিমণ্ডিত হয়। নতুন প্রতিরক্ষা প্রাচীর তৈরির সময় গ্রীক আদর্শ মত একটি গিরিদুর্গও তৈার করা হয়েছিল। প্রাচীর ঘেরা সহরের মধ্যে একটি দেওয়াল তুলে সহরটি দুভাগ করে সহরের উচ্চপার্বত্য অংশে এই দুর্গ ও রাজপ্রাসাদ তৈরি হয়েছিল ; নিম্নাংশে জনগণের বাসস্থানের ব্যবস্থা ছিল। নিম্নভূমির এই বসতি অঞ্চল সুপরিকল্পিত ও গ্রীক আদর্শে গঠিত। সহরের মধ্যের প্রশস্ত রাজপথটি উত্তর-দক্ষিণ মুখী। দু দিক থেকে বহু সমান্তরাল রাস্তা রাজপথটির সঙ্গে সমকোণে এসে মিশে-ছিল। এই সমান্তরাল শাখা পথগুলির মাঝে বাড়িগুলি সুষ্টুভাবে সাজান। এ ছাড়া এই অংশে ছোট মত একটি প্রাসাদ ও একটি বৌদ্ধমন্দির ও কয়েকটি স্তূপ পাওয়া গেছে। শেষ সহরটির নাম সিরসুখ, সম্ভবত কুষাণ আমলে তৈরি। সিরকপের উত্তর পূর্বে ও প্রায় ২ কি-মি দূরে সমভূমিতে অবস্থিত ; লুণ্ডিনালার পাশে। সহরটি আয়তক্ষেত্র মত।

সহর তিনটির পার্শ্ববর্তী অঞ্চল বিশেষ করে পাহাড়গুলি বৌদ্ধকীর্তিরাজিতে পূর্ণ। এখানের স্থাপত্যে ও ভাস্কর্যে বিদেশীয়, ভারতীয় ও স্থানীয় প্রভাব মিশে রয়েছে। তাই বহু স্থানে গ্রীক প্রভাব স্পষ্ট। তক্ষশিলার মুখ্য স্তূপ ধর্মরাজিকা (স্থানীয় নাম চির) হথিয়াল পাহাড়ের দক্ষিণ দিকে তাম্রনালার তীরে সমুচ্চ ভূমিতে অবস্থিত। নাম অনুসারে হয়তো অশোকের প্রতিষ্ঠিত ; তবে দেখে মনে হয় কুষাণ যুগের। স্তূপটির ভিত্তি দেশ গোল ; অর্দ্ধেক ডিমের মত আকার ; ভেতরে ব্যাসার্দ্ধের মত ষোলটি পাথরের মোটা দেওয়াল দিয়ে শক্ত করে তোলা। এর গাত্র স্তম্ভগুলির মধ্যস্থ কুলুঙ্গিগুলি ফাঁকা ; সম্ভবত এগুলিতেও বুদ্ধমূর্তি ছিল। ধর্মরাজিকাকে কেন্দ্র করে বহু স্তূপ, মন্দির, সংঘারাম এবং একটি সূর্পাকার চৈত্য গড়ে উঠেছিল। কোন কোনটি স্তূপে অস্থিভস্ম পাওয়া গেছে। দু একটিতে কুষাণ মুদ্রাও পাওয়া গেছে। একটি স্তূপের গায়ে সারিবদ্ধ বুদ্ধমূর্তি এবং আর একটি স্তূপে গান্ধার শৈলীতে ক্ষোদিত বুদ্ধদেবের জীবনের কয়েকটি প্রধান ঘটনা রয়েছে। একটি মন্দিরে একটি পাথরের পাত্রের মধ্যে একটি রূপার বাটিতে সোনার ছোট একটি কৌটায় কয়েকটি হাড় পাওয়া গেছে। সঙ্গের একটি খরোষ্ঠী লিপি থেকে জানা যায় এগুলি বুদ্ধদেবের অস্থি ; তারিখ ১৩৬ অয়র (?)। আর একটি মন্দিরে গান্ধার শৈলীর, পাথরে ক্ষোদিত প্রচুর মূর্তি পাওয়া গেছে। হথিয়ালের উত্তরে শেষ পাহাড়টির ওপর কুণাল স্তূপ ; খৃ ৩ বা ৪ শতকের। কুণাল স্তূপের পশ্চিমে ১৩।১৪ ফুট উচ্চ একটি প্রশস্ত সংঘারাম ; এর পূর্ব দিকের দেওয়াল ১৯২ ফুট। সংঘারামটি আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়েছিল।

শিব স্বতন্ত্র ; কিন্তু স্বরূপত উভয়ে এক। মোক্ষের মার্গ ঃ—চর্যা, ক্রিয়া, যোগ ও জ্ঞান। সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য, সাযুজ্য এগুলি স্তর। আনব মল বা মূল অবিদ্যা দূর হলে প্রকৃত জ্ঞান আসে এবং বন্ধন মুক্ত হয়ে জীব মুক্তি লাভ করে।

বীর শৈব আর একটি পূর্ণাঙ্গ চিন্তাধারা। যে উৎস থেকে জগতের উৎপত্তি ও যেখানে এর লয় তাকে এই মতবাদে লিঙ্গ বলা হয়। সক্রিয়তত্ব হিসাবে লিঙ্গের ধারণা এই মতবাদের ভিত্তি এবং এই মতবাদীদের নাম লিঙ্গায়েৎ। লিঙ্গ একটি প্রতীক চিহ্ন।

শাক্তাদ্বৈতবাদেও ৩৬টি তত্ত্ব স্বীকৃত। এই মতে জগতের উপাদান মায়া। তত্ত্বজ্ঞান মোক্ষের উপায়। শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের মধ্য দিয়ে আত্মা ও দেহ এক এই ধারণা দূর হয় এবং আত্মা সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান আসে। সব শেষে আসে প্রত্যভিজ্ঞা অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক। সংসার দশার মূল অজ্ঞানকে প্রত্যভিজ্ঞা নাশ করে এবং জীব মোক্ষ পায়। শাক্তেরা জীবন্মুক্তি ও বিদেহ মুক্তি দু রকম মুক্তিই বিশ্বাস করেন।

নারী-শক্তির উপাসনা হিন্দুধর্মে প্রথম থেকেই ছিল। শাক্ত তন্ত্রে এই পূজাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এই শাক্ততন্ত্রের বক্তব্য প্রতি দেবতার মধ্যে একটি জাগ্রত বামাশক্তি আছে। এই শক্তি বা প্রকৃতি দেবতার স্ত্রী রূপে প্রতিভাত। প্রতি তন্ত্রে শিব-শক্তির বিভিন্ন একটি রূপকে বড় করে দেখান হয়েছে। দেবতাদের কথোপকথন ভঙ্গিতে এই তন্ত্র রচিত ; অন্য নাম গুহ্যশাস্ত্র (মিস্টিক/কুহেলি শাস্ত্র)। দীক্ষিত বা অভিষিক্ত ছাড়া কারো কাছে এ শাস্ত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ। কুলার্ণব তন্ত্রে আছে ধন, স্ত্রী, নিজের প্রাণ সব কিছু দিতে পারা যায় কিন্তু গুহ্য শাস্ত্র কারো কাছে যেন প্রকাশ করা না হয়।

তন্ত্রের দৃষ্টি ভঙ্গি ঃ-শিবের স্ত্রী একটি বিশেষ শক্তি রূপে প্রতিভাত হয়ে যৌন সম্পর্কের ভেতর দিয়ে ও অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের সাহায্যে তন্ত্রশক্তিকে কার্যকরী করেছেন। প্রতিটি শক্তির দুটি প্রকৃতি বা স্বভাব আছে ঃ-শ্বেত বা কৃষ্ণ অর্থাৎ নম্র বা উগ্র। উমা ও গৌরী শিবের নম্র শক্তির প্রতীক এবং দুর্গা ও কালী রুদ্র শক্তির প্রতীক। তান্ত্রিক পূজায় মদ্য, মৎস্য, মাংস, মুদ্রা, মৈথুন এই ৫-টি জিনিসের বিশেষ প্রয়োজন। শক্তি উপাসক দু রকম দক্ষিণাচারী ও বামাচারী। দক্ষিণাচারীরা বেদোক্ত বিধি অনুসারে পূজা করেন ; মদ্য মাংস ইত্যাদি ব্যবহার করেন না ; ঘোরতন্ত্র-পূজার বিরোধী। বামাচারীরা উগ্র-তন্ত্র পূজারী ; নানা বিধ যৌন ও নানা উদ্ভট পদ্ধতির সমর্থক। বামা শক্তিকে এ'রা বাস্তব রূপে পূজা করেন। এই জন্য অনেক ক্ষেত্রেই নারীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে শক্তিপূজা আরম্ভ হয়। বাংলাতে বামাচারীদের প্রাধান্য। কিছু কিছু জায়গায় বামাচার ও দক্ষিণাচার মিশে গেছে দেখা যায়। বৌদ্ধ তন্ত্রও এই সমস্ত শক্তি তন্ত্র অনুকরণে তৈরি হয়েছিল। দ্রঃ- শৈব ও শাক্তধর্ম।

তন্ত্রের স্বরূপ হচ্ছে ব্রাহ্মণ্য মত-বাদ বিরোধী পন্থা ; যেমন বিরোধী রাজনৈতিক

দল গড়ে ওঠে। এই তন্ত্র কলি যুগে ধর্মীয় সর্বহারাদের মুক্তির সহজ ও নিশ্চিত পথ ; অন্য যুগে নয়। সহজ বা সহজিয়া নতুন পথ ; সবটাই লিবিডো ভিত্তিক। অথচ প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য রীতি শিরাতে বয়ে যাচ্ছে। মহা-নির্বাণ তন্ত্রে ১৪-উল্লাসে ব্রহ্মের জয় জয়কার। আদ্যা শক্তিই সব চেয়ে বড় অথচ পরম ব্রহ্মই সব। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ইত্যাদি সকলেই শিব (দ্রঃ-মহাদেব ও শিবলিঙ্গ)। বৈদিক কর্মকাণ্ড ও দেবতাদের স্বীকার করে নিয়ে তার ওপর পঞ্চ-মকারের মোটা প্রলেপ লাগিয়ে নিয়েছেন। অর্থাৎ শক্তি একমাত্র ঈশ্বরী, শিব-পরমজ্ঞানী, আদ্যাশক্তির সন্তানও বটে, ভর্তা ও ভক্তপূজারী এবং দর্শন বক্তা ঈশ্বরও। বৌদ্ধ হেরুক, এবং রাক্ষস, পিশাচ, ভূত কাউকে স্বীকৃতি দিতে এঁরা কার্পণ্য করেন নি। নতুন কোন দর্শন এঁদের নাই। এদের পথটা কেবল পঞ্চ-মকার দিয়ে গড়ে তোলা।

শক্তি সাধকদের দাবি প্রবৃত্তি মার্গে একদিন নিবৃত্তি আসবেই। ইউরোপে নুডিস্ট ক্লাবগুলিও এই মতবাদ গ্রহণ করেছে ; নিবৃত্তি আসবেই। তন্ত্র মৈথুনকে ধর্মীয় ও পারমার্থিক বলেছেন। কিন্তু ধনতান্ত্রিক সমাজ হুঁসিয়ার করে দেয় যৌনতা একটা পুঁজি ; পরমার্থিক কিছু নয়। ফলে তান্ত্রিক সাধকরা ঘরে দরজা দিয়ে চক্রানুষ্ঠান করবার নির্দেশ দিয়েছেন। ব্রাহ্মণ্য মতবাদে রিরংসা হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'ব বাড়বে, এরাও এ কথা মানেন। এরা বলেন রিরংসা বাড়ুক ; ইন্ধন ফুরিয়ে গেলে অধিবারণ/ইনহিবিসান আসবেই ; মুক্তি মিলবেই। পাভলভ ও ফ্রয়েডও এই কথা বলেছেন। সম্ভোগকে এই জন্য তান্ত্রিকরা অবাধ ও সম্পূর্ণ ধর্মীয় করতে চেয়েছেন। এঁদের মতে পুলিস মর্গের অধ্যক্ষ স্যাডিস্ট নন ; সীমাহীন বীভৎসতার মধ্য দিয়ে তাঁর মনে সুদৃঢ় অধিবারণ আসে ; মোহমুক্তি ও ব্রহ্মলাভ ঘটে। কথাটা অকাট্য সত্য। নেক্রো-ম্যানিয়াকে ও স্যাডিজমকে এঁরা নিপুণ ভাবে কাজে লাগিয়েছেন। বিশ শতকের শেষপ্রান্তের চিকিৎসকদের মধ্যে এদের যুক্তিকে সুন্দরভাবে ফুটে উঠতে দেখা যায়। যে সব ডাক্তার সকাল বেলা বাড়িতে, দুপুরে হাসপাতালে এবং সন্ধ্যাতে আবার বাড়িতে স্পেকুল্যাম ইত্যাদি নিয়ে কাজ করেন তাঁদের হাত অবস্টেটরিকদের হাতে পরিণত হয় ; মনে ঘৃণা ও রিরংসা কিছুই থাকে না ; অধিবারণের নির্মল আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে এঁরা নিজেদের অজান্তে কৈবল্য লাভ করেন।

এই জন্য তান্ত্রিকদের সাধনসঙ্গিনী নগ্নিকা ; উপাস্য দেবী ও বহুস্থানে তথৈবচ এবং বহুস্থানে ধ্যেয় দেবীও সঙ্গমসুখে বিভোর। এই জন্য এঁদের ভাষা (দ্রঃ) কপ্রোলালিয়া হয়ে উঠেছে এবং বলেন আলিঙ্গনং ভবেৎ ন্যাসঃ চুম্বনম্ ধ্যানম্ ঈরিতম্, আবাহনম্ শীৎকারঃ স্যাৎ, নৈবেদ্যম্ অনুলেপনম্, জপনং রমণং প্রোক্তং, রেতঃপাতশ্চ দক্ষিণা। অর্থাৎ ভাষা ও দৃষ্টিভঙ্গি এঁদের সম্পূর্ণ আলাদা ; লক্ষ্য একমাত্র কৈবল্য। এঁদের সম্বন্ধেই মার্কণ্ডেয় বলেছেন কলিযুগে এঁরা জন্মাবেন ; এঁরা মুখে-ভগাঃ (মহা. ৩।১৮৬।-)।

রামায়ণে ভরদ্বাজ মুনি ভরতের প্রতিটি অনুচরের জন্য জন পনের উলঙ্গ টগবগে দিব্যাঙ্গনার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তন্ত্রকারদের মতে ভরদ্বাজ মুনি ছিলেন

মহাশাক্ত ; এক রাত্রিতে ভরতের প্রতিটি অনুচরের মোহমুক্তি ঘটিয়েছিলেন। তন্ত্রের এইটাই বক্তব্য ; সাধক যত বড় লম্পট হোক না কেন আনুষ্ঠানিক ধর্মীয় অবাধ যৌন মিলনের ফলে নিশ্চয়ই সে চিৎকার করে উঠবে ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। এই ভাবে দ্রুত induced জিতেন্দ্রিয়তা আসবেই এবং ক্রমশ কৈবল্য অধিগত হবে।

যৌন মিলনকে তন্ত্র সাবলাইম বললেও, জীবনের চরম সত্যকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকৃতি দিলেও পুঁজিবাদী সমাজের সঙ্গে আপোষ করতে বাধ্য হয়েছে। মহাভারতে পুঁজিবাদী সমাজে দীর্ঘতমা স্ত্রী ও ছেলেদের কাছে মার খেয়েছিলেন। কলিতে ঐ পুঁজিবাদের বুনিয়াদ অতি দৃঢ় ; সতীত্ব এখানে মস্ত পুঁজি। তন্ত্রের মূল দৃষ্টিভঙ্গি পুঁজিবাদকে ভাঙ, ভাবালু নীতিবাদের মুখে আগুন দিয়ে লুটে নাও, কর্মফল দেবীর হাতে তুলে দিও। ফলে আপোষ রূপে ভৈরবীদের আনা হয়েছে। এরা ধর্মীয় দেহোপজীবিনী। ধনতান্ত্রিক সমাজ এতে সন্তুষ্ট ; কারণ ধনতন্ত্রের প্রাণ কেনা আর বেচা। শ্বেতকেতুর অভিশাপের ভিত্তিও ছিল এই ধনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। ফলে ভৈরবী কেনা বেচার মাধ্যমে তন্ত্রকাররা ধনতন্ত্রের কাছে পরাজয় স্বীকার করলেন।

তন্ত্রের দুঃসাহসিক ও প্রশংসনীয় অভিনবত্ব সম্ভোগকে সর্বসিদ্ধিপ্রদ ও সাবলাইম তত্ত্ব বলে স্বীকার করা। ফলে একাধিক সাধক, চক্রেশ্বরের অনুমতি নিয়ে, একজন শক্তিকে ক্রমিক ভোগ করতে পারেন ; এটি কিন্তু দলবদ্ধ ধর্ষণ নয় ; আনুষ্ঠানিক শেষতত্ত্বের স্বাদ নেওয়া। এমন কি সমাজকে এই সাবলাইম পথে আনার জন্য পায়ুকামের শাস্তি (১১।১৪-ম-নি-তন্ত্র) মৃত্যুদণ্ড নির্দেশ করা হয়েছে। ধনতান্ত্রিক সমাজের পতিব্রতা অর্থাৎ পতি-পরজীবিনীদের (পৃ ১০-১০৭ ; মহা-নি-তন্ত্র) এঁরা সযত্নে ও ঘৃণায় পরিত্যাগ করেন ; কারণ এই সব প্রতিব্রতারা বিনা কারণে দশমহাবিদ্যার রূপ ধবে। অবলম্বনহীন নারীদের সাময়িক বিবাহ মাধ্যমে (চক্রানুষ্ঠান যাবৎ) ভৈরবী নামে সম্মান দিয়ে সম্মানিত জীবিকার ব্যবস্থা করে দিতেন। ধনতান্ত্রিক সমাজ ফলে খুসি হয়ে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই কারণেই মহা-নির্বাণ তন্ত্রে ১৩ উল্লাসে ধর্মীয় অনুষ্ঠান ব্যতীত অন্য নারী সম্ভোগে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শাস্তির আগেই লিঙ্গচ্ছেদ ইত্যাদি শাস্তির ব্যবস্থা করেছে। এই নারীরও শাস্তি হবে বলেছে। ৯।২।৮০ শ্লোকে বলা হয়েছে চক্রাতীতে তু তাং ত্যজেৎ—অর্থাৎ ভৈরবী সম্পূর্ণ দেহোপজীবিনী। তন্ত্রের মহতী চেষ্টা লাল আলোর এলাকার অধিবাসিনীদের সমাজে সম্মানের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করা এবং পুরুষের গোপন যাতায়াতকে প্রকাশ করে দিয়ে সীমিত করে আনা। ধনতান্ত্রিক সমাজের শাসনকে মেনে নিয়ে তন্ত্র বলছে ব্রাহ্মণ্য বিবাহের স্ত্রী ও সন্তান থাকাকালীন শৈব বিবাহের (দ্রঃ) সন্তান কেবল গ্রাসাচ্ছাদন পাবে। অর্থাৎ বহু বিবাহে দুয়োরাণীরা ও তাদের সন্তানেরা যে ভাগ পায় ভৈরবী ও ভৈরবীর সন্তানেরা সে ভাগও পাবে না। তবে ধর্মীয় চক্রসঙ্গিনীদের অক্ষয় স্বর্গের ভাগ অক্ষুন্ন থাকবেই।

তান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নারী কেবল সাধনার উপচার ; যে ভাবেই একে পূজা করা হক সে ভোগ্যা ও বলি। নারীপুরুষের সম্পর্ক যে সবটাই মার্কসীয় অর্থনৈতিক সম্পর্ক সর্বজ্ঞ তন্ত্রকাররা এই কথা হাড়ে হাড়ে জানতেন। ফলে নারীকে দাসীতে পরিণত করে

দেবী আখ্যা দিয়ে পুরুষের মুক্তির পথ সরলতম করে দিয়েছেন। তন্ত্র ভুল করতে পারে না ; উর্বশী, পঞ্চচূড় ও কবীরের বাঘিনীদের প্রতি উপযুক্ত বিচারই হয়েছে যেন।

তান্ত্রিক সাধনায় সাধক সব সময়ে পুরুষ এবং স্বকীয়া পতিব্রতাকে সযত্নে বাদ দিয়ে প্রায় সব ক্ষেত্রেই ধার্মিক পরকীয়াকে নিয়ে এই সাধনা। সাধক নারী হতে পারে---কোন তন্ত্রে আভাস পর্যন্ত নাই। নারীর সাধনার সঙ্গী বা উপচার হিসাবে স্বকীয় বা পরকীয় পুরুষ ভৈরবের উল্লেখ কোথাও নাই। কবচে বলা হয়েছে মেঢ্রং পাতু সুরেশ্বরী ; যোনিং পাতু নয় এবং প্রার্থনা প্রাণান্ রক্ষ যশঃ রক্ষ পুত্রান্ দারান্ (স্বামিনম্ নয়) ধনানি চ। অর্থাৎ তন্ত্র নারীকে কোন স্বীকৃতি দেয় নি। বার বার বলা হয়েছে স্বকীয়ার সঙ্গে মৈথুন প্রশস্ত হলেও গুরুর আজ্ঞা নিয়ে পরকীয়াই প্রশস্ততম।

দ্রঃ-পঞ্চ-মকার। পঞ্চ'শ'কার অর্থাৎ ৫-টি শীল এই সাধনার আর একটি দিক। এই শীলগুলি ঃ-(১) কপ্রোলালিয়া (ভাষা, দ্রঃ), (২) স্যাডিজম, (৩) শবকাম (নেক্রোমেনিয়া), (৪) সিদ্ধি/বিজয়া ও বারুণী যোগে নির্দিষ্ট উদধ্যাস এবং (৫) সম্ভোগকে সাবলাইম বলে স্বীকৃতি দেওয়া। তান্ত্রিক গুরুদের মূল প্রচেষ্টা ছিল আপামর জনসাধারণকে আখড়ায় টেনে এনে কৈবল্যলাভ করিয়ে দেওয়া। বিজয়া, বারুণী ও নারীসঙ্গ এই কৈবল্যের পথে বিশেষ আকর্ষণ। তন্ত্রে এই জন্য বিজ্ঞান-ভিত্তিক কথাটি বার বার বলা হয়েছে—বিষ যোগে বিষের চিকিৎসা করাই সম্ভব। গুরুর একমাত্র কর্তব্য ছিল উপযুক্ত উদধ্যাস / হ্যালুসিনেসান ঘটিয়ে দেবীকে দর্শন করিয়ে দেওয়া। এই জন্য গুরুর নির্দেশ মত বিজয়া ও বারুণী ব্যবহার করতে হয়। অবশাসন/ওবসেসান গড়ে তোলার একটি নির্ভুল ও drastic পথ ধরে গুরুরা যেতেন—অবশাসন এখানে আমি কৈবল্য লাভ করেছি ; আরাধ্য দেবীকে পেয়েছি এবং শিবত্ব ওরফে ব্রহ্মত্ব লাভ হয়েছে।

তন্ত্রকাররা মনস্তত্বে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁরা জানতেন বলা-অতিবলা, বিশ্বামিত্রের দেওয়া মন্ত্র এবং কৃশাশ্বের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তবেই রামলক্ষ্মণ ভূতপ্রেত রাক্ষস ইত্যাদিকে ঠেকাতে পেরেছিলেন। কলিযুগে সাধকের বন্ধুবর্গ অর্থাৎ উত্তর-সাধকেরা (দ্রঃ) লাঠি কাটারি নিয়ে শব সাধনার সময় উপদ্রবকারীদের বাধা দিয়ে কিছুতেই রক্ষা করতে পারবে না। তাঁরা জানতেন এবং জানেন মনস্তাত্বিক দিক থেকে উত্তরসাধকদের উপস্থিতি সাধককে সম্পূর্ণ নিঃসহায় করে দেবে। এরপর শব যদি উপদ্রাবয়েৎ তদা দদ্যাৎ নিষ্ঠীবনং শবে—ভাবচূড়ামণি। শব তাহলে শান্ত হবে। ভাবের চূড়ামণি নিশ্চিত জানতেন শব উপদ্রব করবে এই সম্ভাবনা আছে জানিয়ে দিলে পরিবেশ ঘোরতর হয়ে পড়বে : সাধক চরম ভাবে নিঃসহায় হয়ে পড়বে। ফ্রয়েড ও পাভলভের বহু আগেই এঁরা বাস্তব অভিজ্ঞতার ফলে জানতে পেরেছিলেন এই চরম অসহায় অবস্থায় সাধকের কর্টিক্যাল নিউরোনগুলি অর্থাৎ জৈবিক কম্পিউটার পূর্বতন কোন ডেটা খুঁজে না পেয়ে প্রতিফলনে একটা আশ্রয়কে জড়িয়ে ধরবেই। অস্তিত্ববাদের Border line পরিস্থিতিও তাঁরা জানতেন এই অবস্থায়

সঙ্গে বিজয়া ও বারুণী যথাযথ সরবরাহ করতে পারলে চাক্ষুষ, শ্রাবণিক, নসীয়, জিহ্বীয় ও ত্বকীয় উদধ্যাস একটার পর একটা আসতে থাকবেই। ইষ্ট দেবতা আসতে বাধ্য হবেন। সাধক তাঁকে জড়িয়ে ধরে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠবেন। তন্ত্রের সাধনা এই হিসাবে নিখুঁত।

তন্ত্র অনেক বিচার বিবেচনা করে বহু যুগের চেষ্টায় তার সাধন পদ্ধতিকে ত্রুটিহীন করে তুলেছিল। পঞ্চমুণ্ডের আসন, অল্পবয়সী মৃতশিশুর দেহ পিটিয়ে শুকিয়ে আসন (দ্রঃ), স্বয়ম্ভূপুষ্প, কুণ্ডপুষ্প, গোলকপুষ্প, খ-পুষ্প বীভৎস রুচির পরিচয় হতে পারে। কিন্তু তবু এগুলি ম্যাজিক মত কাজ করে। বীভৎসতা থেকে সাধক ছিটকে বার হয়ে ইষ্টদেবীর সরাসরি কোলে এসে আশ্রয় নেয়। নান্দিক চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি এই জন্যে তন্ত্রে নিষিদ্ধ; সাধক তাহলে বৃন্দাবনীয় লম্পটে পরিণত হবে। আরাধ্য দেবী ধ্যানে সামনে এসে মহাশিবের সঙ্গে মিলিত হবেন এ প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য একমাত্র তান্ত্রিকদেরই আছে। শোষণ ভিত্তিক উন্নাসিক ধনতান্ত্রিক সমাজ নাক সিঁটকাবে এটিও তাঁরা জানতেন। এই জন্য তন্ত্র সাধকদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে এই সব আচার পদ্ধতি মাতৃজারবৎ গোপনীয়। এখানে মাতৃজার শব্দটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মায়েদেরও জার থাকবে স্বীকার করা উদার মনেরই একটা বিশেষ পরিচয়। ব্রাহ্মণ্যপুঁজিবাদী সমাজের সমস্ত কুসংস্কার চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়ে কৈবল্য লাভের নির্ভুল ও অকৃত্রিম পথ এই তন্ত্র-সাধনা।

অবধূতরা তন্ত্রের সৃষ্ট কোন ভিন্নমনসিয়া / স্কিজোফ্রেনিক দশা নয়। তন্ত্র বলতে চায় জীবনে পাগল কে নয়? মুমুক্ষু পাগলরা এমন কি দোষ করল। দৈনন্দিন অন্ন সংস্থান থাকলে ফালতু দেশ বা সমাজের কথা চিন্তা না করে দেবীর পায়ে মাথা রাখতে চেষ্টা করা অনেক বড় জিনিস; এবং পাগল হলেই সেই পাগলীর দেখা পাওয়া যায়; দিল্লির মসনদ যে পারে লুটে খাক। সুষুম্না, ষটচক্র, কুলকুণ্ডলিনী ইত্যাদি সম্পূর্ণ রাবিস তাঁরা জানতেন। তন্ত্র এই জন্য সগর্বে বলেছে বিশ্বাসে মিলায় বস্তু। যুক্তির বেড়াজালে মুক্তি মিলবে না। রাবিসকে গ্রহণ করার মত শিশুসুলভ সরলতা যাদের আছে তারাই প্রকৃত সাধক হবার উপযোগী। বিজয়া ও বারুণীর ওপর কোন কর সে যুগে ছিল না; কুটিরশিল্প হিসাবে এগুলি তৈরি হত; ফলে কৈবল্য সে যুগে কত সহজ ছিল।

অর্থ-নৈতিক ব্যাখ্যাতা রূপ মর্কটদের মন্তব্য স্বভাবতই উল্টপাল্টা। তাঁরা বলেন একোলজিক্যাল পরিবেশ সুযোগ দিয়েছিল। ধনতান্ত্রিক সমাজের নিরঙ্কুশ শোষণের একটা রূপ এই তন্ত্রসাধনা। গুরুদেবরা ছোট ছোট আখড়া করে কলিযুগে অর্থমূল্যে কৈবল্য বিক্রয় করতেন। বিজয়া বারুণী ও মৈথুনের লোভে ক্রেতারা ভন ভন করে উঠত। এই জন্যই তন্ত্রকাররা মুক্তকণ্ঠে বার বার বলেছেন ভোগী ও দুর্বলচিত্ত মানুষকে বৈদিক কৃচ্ছ্রসাধনার মধ্যে ঠেলে না দিয়ে গায়ে পঞ্চ-শ-কারের নামাবলী জড়িয়ে দিয়ে পঞ্চ-ম-কারের ৫-ঘোড়ার যুড়ি গাড়িতে করে কৈবল্যধামে নিয়ে যাওয়া অতি সহজ। মার্কসীয় মতে ব্যবসা হিসাবে গুরুর পরিশ্রম হয় অল্প, কিন্তু

মুনাফা সব চেয়ে বেশি। তন্ত্র এই জন্য ধর্মীয় সর্বহারাদের কৈবল্যের ঠিকাদার। অন্নচিন্তাহীন অলস ও অশিক্ষিত মানুষকে সহজে ইষ্টদেবতার সাক্ষাৎ করিয়ে দিয়ে গুরুগিরির ব্যবসা পালতোলা ময়ূরপঙ্খীতে পরিণত হয়েছিল। পঞ্চ-ম-কারের আবর্তে সাধক যত গভীরে অবগাহন করবে গুরুর লাভ তত বেশি। আর কোন বিপর্যয় ঘটলে বুঝতে হবে দেবী পরীক্ষা করছেন। শাক্তগুরুর ব্যবসা ছোট কুটিরশিল্প; একজন বা দুজন ভৈরবী এবং জনা বিশেক ভৈরব শিষ্য; বৌদ্ধ ইত্যাদির মত নালন্দা গোছের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় নি কোনদিন। গান্ধীর কুটির শিল্প মত; একটা আখড়ার আয়ে গুরুদেবের একটা সংসার ভাল ভাবে চলে যায়। আবার অনেক সময় জাঁদরেল ভৈরবী কয়েকটি কৈবল্যপ্রার্থী ঋষভপুঙ্গব সংগ্রহ করে মক্ষিরাণী হয়ে ধর্মীয় আশ্রমটি ওরফে অর্থনৈতিক ব্যবসাটি সুনিপুণ ভাবে চালিয়ে যেতেন। প্রয়োজন মত থাবড়া মেরে, বিষপ্রয়োগে ইত্যাদি ভেরব বিশেষকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। দ্রঃ- বেশ্যা।

গুহ্য সমাজ আগে না তন্ত্র আগে এ নিয়ে বিতর্ক আছে। তবু অন্নচিন্তা হীন অলস জীবনে তন্ত্র একটা বিরাট অভিনবত্ব এনেছিল।

তন্ত্রে কিছু ব্রাহ্মণ্য খাদ মিশালে শাক্ততন্ত্র এবং কিছু বৌদ্ধ খাদ মিশালে বৌদ্ধ-তন্ত্র; এবং বৈষ্ণব খাদ মিশালে সহজিয়া বৈষ্ণব। মহাচীন অর্থে বিহার, বঙ্গ, আসামের কিছু অংশ এবং নেপাল, তিব্বত ও ভুটান মিলে বিস্তীর্ণ এলাকাতে তন্ত্র একদিন বিরাট পরিবর্তন এনেছিল। তন্ত্রে দার্শনিকতা অর্থে দেহকে সাধন যন্ত্র করে গুহ্য সাধনা বা লিবিডোর সাধনা। এই জন্য শিবই পরম সঙ্কুচিত বিন্দু, শক্তি পরম প্রসারিণী নাদরূপা। সমস্ত শাক্ত আগম শাস্ত্রে ভাতার গোপনে মাগের কাছে জ্ঞান বিতরণ করেন। তন্ত্রে দেহের বাম দিক নারী তত্ত্ব এবং ডান দিক পুরুষ তত্ত্ব। তন্ত্রে শিবের মৈথুন অবশ্য বর্ণনীয়।

তদানীন্তন বিটল ও সমাজের-গোপনচারী জনতার গড়ে তোলা মতবাদ। অদ্বৈতব্রহ্ম ও ওঁ মিলে বামাচারী খিচুড়ি। বৃহদারণ্যকের ৪০৬ বা ৪১২ মন্ত্রের বিকৃততম বিকাশ এই তন্ত্র। ভুক্তিমুক্তি প্রদায়িনী তত্ত্ব সম্পূর্ণ ফ্রয়েডীয়। অবসেসান থেকে অধিবারণ (ইনহিবিসান) এবং শেষ পর্যন্ত সাবলিমেসান।

শালাবৃকানাং হৃদয়ানি এতাঃ ঋক্‌বেদে উর্বশীর স্বীকারোক্তি। অথচ তান্ত্রিক দর্শনে ন-যোষিৎ সমধাতা, ন বিষ্ণুঃ নাপি শঙ্করঃ স্ত্রিয়দেবাঃ স্ত্রিয়ঃ প্রাণাঃ স্ত্রিয়ঃ এব বিভূষণম্ (অন্নদা ১৬।৪৫)। অর্থাৎ বেদকে অস্বীকার করার পাপে ভারতের মাটিতে তান্ত্রিকতা আজ সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে গেছে। বৌদ্ধ-ধর্ম থেকে কর্তাভজা সম্প্রদায়ও এই পাপে আজ জীবাশ্মে পরিণত। দ্রঃ- আগম, নাদ, বৌদ্ধ-ধর্ম, বৌদ্ধতন্ত্র, কামযান।

মাধবাচার্য বলেছেন তান্ত্রিকতা যৌন তাণ্ডব। কিন্তু তবু চিন্তা করার প্রয়োজন আছে। পশ্চিমী সভ্যতাতে যৌনতা আজকে একটি অতি বড় পণ্য; রাতারাতি অর্থে সম্পদে রাজাধিরাজ হয়ে যাওয়া যায়। ফলে প্রশ্ন, উঠেছে ধর্মশাসিত যৌনাচার (এটিও ব্যবসা) শ্রেয় না পশ্চিমী সভ্যতার ভোগ শাসিত যৌনতা শ্রেয়। হিরোইন ও এল-এস-ডি'র বদলে দেবীর প্রসাদ বিজয়া ও বারুণী নিশ্চয় অনেক নিরাপদ।

তান্ত্রিকতাকে ইউরোপে বহু স্থানে কাল্ট অব একস্ট্যাসিও বলা হয়েছে। অবশ্য নিয়মিত ও দলগত ভাবে সম্ভোগের মধ্যে একস্ট্যাসি নিশ্চয়ই থাকে না। এ তুলনায় সহজিয়া কণ্ঠী বদল বোধ হয় অনেক ভাল। দ্রঃ- ধর্ম বৈষ্ণব।

তন্ত্র, বৌদ্ধ—দ্রঃ-তন্ত্র। বৌদ্ধধর্মেও একজন আদিবুদ্ধ ও তাঁর নিত্যা শক্তি রয়েছেন। স্বভাবকায় বা বজ্রকায় বুদ্ধ হচ্ছেন আদিবুদ্ধ; তন্ত্রের পরমেশ্বরের যমজ ভাই (একই ডিম্বাণু জাত)। আদি বুদ্ধের নিত্যা শক্তি আদি দেবী বা আদি প্রজ্ঞা শাক্ত দৃষ্টিতে পরমেশ্বরী। এই দ্বয় তত্ত্ব মূলত বৌদ্ধ না মূলত শাক্ত এবং কে কার কাছ থেকে আত্মসাৎ করেছে কোন প্রমাণ নাই। প্রকৃত ঘটনা ভারতের মাটিতে একই মানসিকতা এই দ্বৈতবাদকে এক জায়গায় বৌদ্ধরঙ আর এক জায়গায় শাক্তরঙ দিয়েছে। শক্তি ও শক্তিমান মিলে অদ্বয় তত্ত্ব; দার্শনিকরা দাবি করেন। কিন্তু এই দ্বয় বা অদ্বয় তত্ত্ব কতটা অলস তর্কজাল নিরপেক্ষ ভাবে চিন্তনীয়।

আদি বুদ্ধ থেকে ৫-জন ধ্যানী বুদ্ধের উৎপত্তিঃ—বৈরোচন, রত্নসম্ভব, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধি ও অক্ষোভ্য; এ'রা যথাক্রমে রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই পঞ্চ স্কন্ধের দেবতা। সৃষ্টি এই পঞ্চ স্কন্ধাত্মক। বেচারি ব্রহ্মা ও প্রথমে দক্ষ ইত্যাদি মানস পুত্রদের সৃষ্টি করেছিলেন এবং এই মানস পুত্রেরা সব কিছু জীব ইত্যাদি সৃষ্টি করেন। দুটি চিন্তাধারাই সমান্তরাল; এবং দুটিই সমান কল্পনাবিলাস। এর পর পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের পঞ্চ শক্তি চাই এবং এ'রা যথাক্রমে তারা (বজ্রধাতু ঈশ্বরী), মামকী, পাণ্ডরা, আর্যতারা ও লোচনা। অর্থাৎ সনাতনীদের মতই দেবতার সঙ্গে শক্তি থাকা চাই। অর্থাৎ সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষ মতবাদের ছায়াতে শাক্ত ও বৌদ্ধ দুটি ধারাই লালিত। সশক্তি ধ্যানীবুদ্ধ মনুষ্যদেহে যথাক্রমে-মাথা, মুখ, হৃদয়, নাভি ও পাদদেশে অবস্থিত। এও এক সমান্তরাল কল্পনা বিলাস। হীনযান অবশ্য শূন্যতাবাদের সাধনা; মহত্ব লাভের পথ। এদের মধ্যে এই শক্তি বাদ নাই। মহাযানে শূন্যতা ও করুণা মিলে অভিন্ন বোধিচিত্ত। তান্ত্রিক বৌদ্ধদের কাছে এই শূন্যতা প্রজ্ঞারূপিণী।

বৌদ্ধধর্মে শাক্ত পরমেশ্বরের স্থানে রয়েছেন হেবজ্র, হেরুক, বজ্রধর, বজ্রেশ্বর, বজ্রসত্ত্ব, মহাসত্ত্ব, চণ্ডরোষণ ইত্যাদি। এদের সঙ্গে অঙ্ক বিহারিণী শক্তি বজ্রধাতুঈশ্বরী, বজ্রবারাহী (সনাতনী বরাহ অবতারের কোন সন্তান), প্রজ্ঞাপারমিতা ইত্যাদি।

বহু বৌদ্ধতন্ত্রে (হেবজ্র ইত্যাদি) শাক্ত তন্ত্রের ধারাতে পুরুষ গোপনে তার গিন্নি প্রজ্ঞাকে জ্ঞান বিতরণ করেন। সরাসরি ভৈরবী নিয়ে সাধনা বৌদ্ধতন্ত্রে না থাকলেও তন্ত্রে ভৈরবী সাধনার মূলে যে দৃষ্টি ভঙ্গি বৌদ্ধ তন্ত্রেও সেই দৃষ্টিভঙ্গি। বৌদ্ধ সহজিয়া মতে সহজিয়া চিত্তই স্বয়ং ভগবান। নৈরাত্মাই গৃহিণী। বৌদ্ধতন্ত্রেও কুলকুণ্ডলিনী/চক্র সাধনার অনুরূপ আনন্দ অনুভূতি ও সাধনা আছে। মস্তকস্থিত উষ্ণীষ কমলে এই শক্তির স্থিতিতে মহাসুখ। বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের এটি পরম কাম্য। এই মহাসুখ সহজানন্দ (একটা হেবেফ্রেনিক দশা)। বৌদ্ধদের চারটি চক্র বা সঙ্ঘঃ-প্রথমে নির্মাণ চক্র নাভিদেশে, এরপর হৃদয়ে ধর্মচক্র, কণ্ঠে সম্ভোগচক্র এবং মস্তকে উষ্ণীষ কমলে মহাসুখ

এই নির্মাণ চক্র ৬৪-দলপদ্ম। সহজানন্দদায়িনী শক্তিই বৌদ্ধ সহজিয়া তথা বৌদ্ধ-তান্ত্রিকদের দেবী। এই সহজানন্দের মধ্যে চিত্তের সম্পূর্ণ বিলোপই যথার্থ নৈরাত্ম্য প্রতিষ্ঠা। কুলকুণ্ডলিনীর এই জাগ্রত শক্তিকে চণ্ডালী, ডোম্বী ইত্যাদি বলা হয়েছে।

বাঙলা ও তৎসংক্রান্ত অঞ্চলে খৃ ৮-১২ শতক সময়টিতে মহাযানী বৌদ্ধদের ওপর তন্ত্র ব্যাপক ও গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

তপ—অপর নাম পাঞ্চজন্য; এক জন প্রসিদ্ধ তপস্বী/দেবতা। অগ্নির মত এ°র তেজ। কশ্যপ, বশিষ্ঠ, প্রাণক, চ্যবন ও ত্রিবর্চস্ এ°দের তপস্যায় তপের জন্ম। এই পাঞ্চজন্য (দ্রঃ) অগ্নির ১৫টি ছেলে:-অভীম, অতিভীম, ভীম, ভীমবল, বল, সুমিত্র, মিত্রবান, মিত্রজ্ঞ, মিত্রবর্দ্ধন, মিত্রধর্মা, সুপ্রবীর, বীর, সুবর্চস্, সুবেশ, সুরহন্তা। এ°রা যজ্ঞে বিঘ্ন ঘটান (মহা ৩।২১০।১২)। দ্রঃ- শিশুমাতরঃ।

তপতী—সূর্যের ঔরসে ছায়ার গর্ভে জন্ম। সাবিত্রীর ছোট বোন (মহা ১।১৬০।৭)। বহু চেষ্টাতেও উপযুক্ত পাত্র না পেয়ে রাজা সংবরণের (দ্রঃ) সঙ্গে সূর্য এ°র বিয়ে দেবেন ঠিক করেন। তপতীর ছেলে কুরু থেকে কৌরব বংশ। সূর্যের বরে তপতী নর্মদা নদীতে পরিণত হন।

তপনীয়া—অপর নাম পূজনী (দ্রঃ)।

তপলোক—এখানে বৈরাজরা (পিতৃগণ) বাস করেন। আগুনে এরা দগ্ধ হন না। ধ্রুবলোক থেকে ১১-যোজন ঊর্দ্ধে।

তপস্যা—শরীর ও মনের মালিন্য দূর করার জন্য যোগের অঙ্গ স্বরূপ অনুষ্ঠান। দেহকে নানা ভাবে কষ্ট সহিষ্ণু করে তোলা হয়। শারীরিক, বাচিক, মানসিক, সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে তপস্যা নানা শ্রেণীর। জৈন মতে ছয় রকম বাহ্য ও ছয় রকম আভ্যন্তর তপস্যা। জৈনদের নিত্য অনুষ্ঠেয় ষট্‌কর্মের অন্যতম হচ্ছে তপশ্চর্যা। বুদ্ধদেব নিজে কঠোর তপস্যা করলেও পরে এই আচরণের নিন্দা করেছেন। গ্রীষ্মে চারপাশে আগুন জ্বেলে সূর্যের দিকে চেয়ে থাকা; বর্ষায় আকাশের নীচে বসে থাকা, শীতে ভিজা কাপড়ে বা জলে অবস্থান করা, গাছ থেকে খসে পড়া ফল বা পাতা খেয়ে জীবন ধারণ বা মেঘের জলের ওপর জীবন ধারণ ইত্যাদি কৃচ্ছ্রসাধনা রয়েছে।

তমঃ—আত্মার একটি গুণ। অপর দুটি সত্ত্ব ও রজঃ। তম থেকে লোভ, ঘুম, সাহস, নিষ্ঠুরতা, ঈশ্বরে অবিশ্বাস, দুষ্ট স্বভাব, ভিক্ষা করা ইত্যাদি আসে। তমো গুণের প্রভাবে মানুষ কামুক হয়। তামসিক জীবনের ফলে ক্রমশঃ নীচ যোনিতে জন্ম হয়।

তমসা—কয়েকটি নদী। একটি মধ্যপ্রদেশ মাইহারের পার্বত্য অঞ্চলে উৎপন্ন; রেওয়া'র মধ্য দিয়ে এলাহাবাদের ২৮ কি-মি দক্ষিণে গঙ্গায় এসে পড়েছে। দ্বিতীয়টি উত্তর প্রদেশে ফৈজাবাদ জেলার পশ্চিম দিক থেকে বার হয়ে ঘর্ঘরা ও গোমতীর মাঝ দিয়ে এগিয়ে এসে বালিয়া জেলাতে গঙ্গায় এসে মিশেছে।

উত্তর প্রদেশে যমুনার পশ্চিমে বন্দরপুচ্ছ শৃঙ্গের কাছ থেকে একটি তমসা বার হয়ে যমুনাতে এসে মিশেছে।

অযোধ্যাতে সরযূ ও গোমতীর মাঝখানে ; সরযূর একটি শাখা। আজমগড় হয়ে ভুলিয়ার কাছে গঙ্গাতে এসে মিশেছে ; সরযূ থেকে ১২ মাইল পশ্চিমে। প্রকৃত পক্ষে ধোতিতে বিশ্বি ও মধু নদী মিলিত হয়েছে এবং এর পরবর্তী অংশ তমসা।

গাড়োয়ালে ও দেরাদুনে একটি নদী। তমসা ও যমুনা সিরমুর সীমান্তে যুক্ত হয়েছে ; স্থানটি পবিত্র মনে করা হয়। এখানে প্রবাদ একবীর=হৈহয় জন্মেছিলেন।

বুন্দেলখণ্ডে পর্ণাশা বা তমসা।

বাল্মীকির তমসা কোনটি মতভেদ আছে। বাল্মীকি তাঁর তমসার তীরে ক্রৌঞ্চ বধ দেখেছিলেন। বনে যাবার সময় রাম এখানে এক রাত বাস করেছিলেন। সুমন্ত্র রামকে এই নদী পর্যন্ত অনুগমন করেছিলেন।

তরণীসেন—বিভীষণের স্ত্রী সরমার ছেলে। বাল্মীকি রামায়ণে নাই। তরণীসেন ও রাম/বিষ্ণু ভক্ত ছিলেন তবে রাবণকে ত্যাগ করেন নি। রাবণের আদেশে যুদ্ধে আসেন। রথে পতাকাতে ও নিজের দেহে সর্বত্র রাম নাম লিখে যুদ্ধে এসেছিলেন এবং লক্ষ্মণকে পরাজিত করেন। বিভীষণ ছেলের পরিচয় গোপন রেখে রামকে ব্রহ্মাস্ত্র ব্যবহার করতে পরামর্শ দেন। এই অস্ত্রে তরণীসেন মারা যান।

তরুণক—ধৃতরাষ্ট্র বংশে একটি সাপ। সর্পযজ্ঞে নিহত হয়।

তর্পণ—জল বা তিল মিশ্রিত জল পিতৃপুরুষ ইত্যাদিকে দেওয়া।

তলাতল—এখানে মায়াবী অসুর ময় বাস করেন। পাতালের (দ্রঃ) একটি এলাকা।

তাজিক—পার্সিয়া।

তাণ্ডয়া—শ্রাবস্তী থেকে ৯ মাইল পশ্চিমে। কাশ্যপ বুদ্ধের জন্মস্থান।

তাড়কা—যক্ষ সুরক্ষের নিঃসন্তান ছেলে সুকেতু তপস্যা করে ব্রহ্মার বরে হাজার হাতীর সমান শক্তি এক মেয়ে পায়। প্রসিদ্ধ জম্ভ দৈত্যের/ঝর্ঝের ছেলে সুন্দের সঙ্গে বিয়ে হয়। তাড়কা/তাটকা স্বভাবতই নিষ্ঠুর, ভয়ঙ্কর ও মায়াবী। সন্তান হয় মারীচ। রামায়ণে (১।২০।২৫) আছে সুন্দ উপসুন্দের স্ত্রী ; ছেলে মারীচ ও সুবাহু। হরিবংশে (১।৩।১০২) আছে মারীচ, শিবমাণ ও সুরকম্প মোট তিন ছেলে। সুন্দ এক বার অগস্ত্য আশ্রম আক্রমণ করলে অগস্ত্যের ক্রোধে শাপে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তাড়কা তখন দুই ছেলেকে নিয়ে অগস্ত্যকে খেয়ে ফেলতে গেলে শাপে বিরূপা পুরুষাদী রাক্ষসীতে পরিণত হয় (রা ১।২৫।১১)। এই জন্য রাগে মলদা ও করূশা (দ্রঃ- কারুষ) দুটি স্ফীত জনপদকে উৎসাদিত করে বনে পরিণত করেছিল। এ দুটি অগস্ত্যাচরিত দেশ। এরা তিন জনে প্রথমে সুমালীর সঙ্গে পাতালে যায় পরে রাবণের কাছে আসে এবং রাবণের সাহায্যেই পরে মলদ ও কারুষ (দ্রঃ) দুটি সমৃদ্ধ জনপদ দখল করে নষ্ট করে এবং গো-ব্রাহ্মণ ও আশ্রমবাসীদের ওপর অত্যাচার করতে থাকে। মলদ ও কারুষ যমুনা তীরে দুটি পাশাপাশি রাজ্য। বৃত্র হত্যার শাপ থেকে মুক্ত করার জন্য ঋষিরা এখানে ইন্দ্রকে স্নান করিয়েছিলেন। ইন্দ্রের মল ও করীষ (থুথু) এখানে পড়েছিল ফলে রাজ্য দুটির নাম। অগস্ত্যের তপোবন তাড়কার বনে পরিণত হয়। যজ্ঞ কর্ম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, বিশ্বামিত্র (দ্রঃ) তার পর রাম লক্ষ্মণকে (দ্রঃ)

নিয়ে আসেন। তাড়কা এদের আক্রমণ করে। বিশ্বামিত্র একে হত্যা করতে বলেন; তবু রাম চিন্তা করেছিলেন (রা ১।২৬।১১) হত্যা না করে একে পঙ্গু ও বিনিবৃত্তা করবেন। তাড়কা প্রথমে পাথরের চাঙড় ছুঁড়তে থাকে, তারপর সরাসরি তেড়ে আসে। রাম প্রথমে এর হাত দুটি এবং লক্ষ্মণ কর্ণাগ্র ও নাসিকা ছিন্ন করেন। তাড়কা মায়াতে শিলাবৃষ্টি করতে থাকে। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসে। রাম তখন তাড়কাকে বাণবিদ্ধ করে নিহত করলে রাক্ষসী এক গন্ধর্ব নারীতে পরিণত হয়ে স্বর্গে চলে যায়। মারীচ বাণাহত হয়ে ছিটকে দূরে গিয়ে পড়ে।

তাতার—রসাতল, পাতাল, হূণদেশ, শাকদ্বীপ, তৈত্তির, তৈত্তিরী।

তান—সাতটি সুরের ক্রমিক আরোহণ ও অবরোহণকে মূর্চ্ছনা বলা হয়। এই আরোহণ থেকে একটি বা দুটি স্বর লোপ বা অপকর্ষ করে তান নির্ণয় করা হয়। এক স্বর থেকে ষট্ স্বর পর্যন্ত তান যথাক্রমে আর্চিক, গাথিক, সামিক, স্বরান্তর, ঔড়ব ও ষাড়ব। মূর্চ্ছনাকৃত তানাগুলিকে বিপরীত ভাবে উচ্চারিত হলে তাকে কূটতান বলে।

তান্ত্রিকউপাসনা—উপাসনায় পশুভাব, বীর ভাব, দিব্যভাব নামে তিনটি ভাব এবং বেদ, বৈষ্ণব, শৈব, দক্ষিণ, বাম, সিদ্ধান্ত ও কৌল সাত প্রকার আচার আছে। দ্রঃ- বামাচার।

তান্ত্রিকতা—অতি প্রাচীন একটি ধারা। গুহ্য সমাজের জনক না সন্তান বিতর্ক আছে। ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্ম থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। প্রাচীন ধারাতে কোন আধ্যাত্মিক রঙ ছিল না; এবং এটি অতি আদিম। এর সঙ্গে ক্রমশ যোগাচার ও অসংখ্য আচার যুক্ত হতে থাকে। দ্রঃ- তন্ত্র

তান্ত্রিকতা, বৌদ্ধ—বৌদ্ধ মতবাদ ও তান্ত্রিকতা মিলে যুগনদ্ধ রূপ। তান্ত্রিক বৌদ্ধ মতবাদ থেকে তিনটি শাখা বার হয়ঃ- (১) বজ্রযান, (২) কালচক্রযান ও (৩) সহজযান। দ্রঃ-মহাযান। এদের মধ্যে কালচক্র যানের কোন দার্শনিক মূল্য নাই। দ্রঃ-তান্ত্রিকতা, মহাসুখ। বৌদ্ধতন্ত্রে শিবকে পরম দেবতা বলে স্বীকার করার প্রবণতা দেখা যায়। তান্ত্রিক বৌদ্ধরা বজ্রসত্ত্বকে বিশ্বাস করেন।

কিছু মতে বুদ্ধ নিজেই সাধারণ শিষ্যদের জন্য তান্ত্রিক ক্রিয়া, মুদ্রা ও মণ্ডলকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন বা স্বীকার করে গেছেন। বুদ্ধের সময়ই কিছু তান্ত্রিক ক্রিয়া ও যৌনাচার বৌদ্ধ ধর্মে এসেছিল সত্য। কিন্তু বুদ্ধ নিজে কতটা দায়ী ছিলেন স্পষ্ট নয়। শিষ্য সংগ্রহের চেষ্টায় এ রকম কিছু করেছিলেন সন্দেহ মাত্র।

তাপসাশ্রম—বোম্বে প্রেসিডেন্সিতে পন্ধরপুর, পাণ্ডুপুর। তবসোই (টলেমি)।

তাপ্তি—তাপনী, তাপী। বিন্ধ্যপাদ (সাতপুরা শাখা) পর্বতে গোনন গিরি নামক অংশে উৎপত্তি। আরব সাগরে গিয়ে পড়েছে। এর তীরে সুরাট। দ্রঃ- মূলতাপী।

তামস—চতুর্থ মনু। প্রথম মনু স্বায়ম্ভুবের ছেলে প্রিয়ব্রত। বিশ্বকর্মার মেয়ে সুরূপা ও বর্হিষ্মতীকে ইনি বিয়ে করেন। প্রথমা স্ত্রী সুরূপার অগ্নীধ্র ইত্যাদি দশ ছেলে এবং সব শেষে মেয়ে ঊর্জস্বতী। বর্হিষ্মতীর তিন ছেলে উত্তর, তামস ও রৈবত; এবং

এঁরা তিন জনে তিনটি মন্বন্তরের অধিপতি। নর্মদা তীরে তপস্যা করেছিলেন। এঁর শাসন কালে চার ভাগ দেবতা ঃ-সুপার, হরি, সত্য ও সুধী ; প্রতি ভাগে ২৭ দেবতা। ইন্দ্র ঃ-শিবি। সপ্তর্ষি ঃ-জ্যোতিষ্মান, পৃথু, কাব্য, চৈত্র, অগ্নিবনক, পীবর, নর। ছেলে খ্যাতি, কেতুরূপ, জানুজঙ্ঘ ইত্যাদি। দ্রঃ- মনু, মনু তামস, তামস মন্বন্তর।

তামসবন—পাঞ্জাবে সুলতানপুর। কুলুর রাজধানী। বিয়াস ও সেরবরি বা সাটলেজ সঙ্গমে অবস্থিত। অপর নাম রঘুনাথপুর। এখানে রঘুনাথ মন্দির রয়েছে। একটি মতে দোয়াব-ই-জলন্ধর-পীঠের সমস্ত পশ্চিম অংশ এক সময় খুব জঙ্গলে ঢাকা ছিল বলে তামসবন নাম। এখানে বিহারে কণিষ্ক ৪-র্থ বৌদ্ধ মহাসম্মেলন ডেকে ছিলেন ৭৮ খৃস্টাব্দে ; ভিক্ষু বসুমিত্রের নেতৃত্বে। হিউ-এন-ৎসাঙ্ ইত্যাদির মতে কাশ্মীরে কুন্তলবন-বিহারে (কাশ্মীরের রাজধানীর কাছে) ৭৮ খৃস্টাব্দে এই সম্মেলন বসেছিল। এই সময় থেকে শকাব্দ সুরু। অপর মতে শকাব্দ সুরু করেন ভনোন।

তামস মন্বন্তর—৪র্থ মন্বন্তর হরিবংশে (১।৭।২৩)। ঋষি ঃ- কাব্য, পৃথু, অগ্নি, জন্যু, ধাতা, কপীবান ও অকপীবান। দেবতা সত্য। মনু পুত্রঃ- দ্যুতি, তপস্য, সুতপা, তপোমূল, তপোধন, তপরতি, অকল্মাষ, তন্বী, ধন্বী, ও পরন্তপ। ভাগবতে (৮।১) উত্তম মনুর ভাই ৪র্থ মনু। এর ১০-টী ছেলেঃ- পৃথু, খ্যাতি, নর ইত্যাদি। দেবতা সত্যক, হরি ও বীরগণ। ইন্দ্র ত্রিশিখ। সপ্তর্ষি জ্যোতির্ধাম ইত্যাদি। দ্রঃ- তামস।

তামসী—এক রকম মায়াবিদ্যা। নিকুম্ভিলা যজ্ঞে তুষ্ট হয়ে মহাদেব ইন্দ্রজিৎকে এই বিদ্যা দান করেছিলেন। এই মায়ায় মেঘনাদ নিজেকে অদৃশ্য করে যুদ্ধ করতে পারতেন। দ্রঃ- অনিরুদ্ধ।

তাম্বুরা—তানপুরা। তুম্বুরু (দ্রঃ) গন্ধর্ব নির্মিত বাদ্য যন্ত্র। বড় লাউয়ের খোলা দিয়ে তৈরি ওপরে ফাঁপা একটি বাঁশের গায়ে ২-টি পেতল ও ২-টি লোহার তার। এটি টংকার যন্ত্র।

তাম্র—সুর নামে অসুরের ছেলে তাম্র, অন্তরীক্ষ, শরবণ, বসু, বিভাবসু, নভস্বান ও অরুণ। তাম্র মহিষাসুরের মন্ত্রী ছিলেন। কৃষ্ণের হাতে মুরাসুরের সঙ্গেই নিহত হন।

তাম্রপর্ণী—(১) সিংহল (বৌদ্ধ) ; অশোকের গিরিনর শিলালেখে রয়েছে। (২) তামবরবরী নদী ; তিন্নেভেলিতে। এর সঙ্গে চিত্তর (দ্রঃ) নদীও যুক্ত রয়েছে। অগস্ত্যকূটে এর উৎপত্তি। অপর নাম তাম্রবপর্ণী, অগস্ত্যমলয় (৮°৩৭′ উ×৭৭°১৫′ পূ) পর্বতে উৎপন্ন। আমালিতলা ও গজেন্দ্রমোক্ষ তীর্থ এই নদীর তীরে। এই নদীর মোহনাতে এক সময় মুক্তা চাষ হত, এজন্য বিখ্যাত ছিল। মোহনার নাম কোলকাই (টলেমি) ; বর্তমানে মোহনাটি দেশের মধ্যে ৫ মাইল সরে গেছে। ফলে কোলখিক বা মানার উপসাগর নাম। দ্রঃ- পাণ্ড্য, কারা।

তাম্রলিপ্তি—মেদিনীপুরে তমলুক। এখানে গঙ্গার মোহনা ছিল। সিলাই (শিলাবতী) ও দলকিসোর (দ্বারিকেশ্বরী) নদী দুটি মেদিনীপুরে মিলিত হয়ে রূপনারায়ণ। খৃ- ৬ শতকে সুহ্মের রাজধানী ছিল। এক সময় মগধের অংশও। প্রাচীন নগরীর বড় একটা অংশ নদী গ্রাস করেছে। মহাভারতে ইত্যাদি, ও নানা

বৌদ্ধগ্রন্থে আছে। কথাসরিৎ-সাগরে এটি খ্যাতনামা সমুদ্র বন্দর। খৃ ৪-১২ শতক পর্যন্ত এই খ্যাতি ছিল। এই বন্দর থেকেই প্রবাদ বিজয় সিংহলে যান। এখানে সহরে প্রাচীন মন্দির হিসাবে বর্গাভীমার মন্দির; এটি একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল বলে মনে হয়। হিউ-এন-ৎসাঙ যেন এটিকে উল্লেখ করে গেছেন। যেন খৃ ১৪ শতকে এটিকে উড়িষ্যা মন্দিরের অনুকরণে ব্রাহ্মণ্য মন্দিরে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। দেবীর মূর্তি এখানে প্রাচীন; একটি পাথর কেটে তৈরি; দেবীর হাত পাও খোদিত। দণ্ডী (খৃঃ ৬ শতকে) তাম্রলিপ্তে বিন্দুবাসিনীর মন্দিরের কথা বলেছেন। খৃ ৭ শতকে ই-ৎসিঙ এখানে বিখ্যাত বরাহ বিহারে বাস করতেন। বর্তমানের জিষ্ণু-নারায়ণ মন্দিরটি, বলা হয় নদীতে প্রাচীন মন্দিরটি নষ্ট হলে তার ৫০০ বছর পরে, তৈরি করা হয়েছিল। প্রাচীন মন্দিরটি বর্গাভীমার পূব দিকে ছিল। নতুন মন্দিরে অর্জুন ও কৃষ্ণের বিগ্রহ রয়েছে। প্রবাদ এটি ময়ূরধ্বজ ও ছেলে তাম্রধ্বজের রাজ্য; এরা কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন অর্থাৎ জৈমিনি ভারতের রত্নপুর যেন এই তাম্রলিপ্ত (মতান্তরে রত্নপুর ছিল নর্মদা তীরে)। রূপনারায়ণ নদের পশ্চিম তীরে। প্রাচীন দেশ ও বন্দর নগরী। কথাসরিৎসাগরে নাম তাম্রলিপ্তিকা; অভিধান চিন্তামণিতে তাম্রলিপ্ত, দামলিপ্ত, তামলিপ্তি, তমালিনী, বিষ্ণুগৃহ, স্তম্বপূ; ত্রিকাণ্ড শেষে নাম বেলাকূল। সিংহলে ধর্মগ্রন্থ মহাবংশে আছে অশোকের নির্দেশে বোধিদ্রুম চারা নিয়ে এখান থেকে মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রা সিংহলের জন্য যাত্রা করেন।

খৃ ১ শতকে প্লিনি ও ২-শতকে টলেমি এই নগরীর উল্লেখ করেছেন। এক শতকের গ্রীক সমুদ্র-বিবরণীতে গাঙ্গে মোহনায় অবস্থিত গাঙ্গে বন্দরের উল্লেখ আছে। চীন গ্রন্থ শুই-চিং-চু-তে আছে তাম্রলিপ্তের এক জন রাজা খৃ ৩-শতকে নানকিং-এর রাজদরবারে দূত পাঠিয়েছিলেন। খৃ ৫-শতকে জাহাজে করে ফা-হিয়েন এখান থেকে সিংহলে যান। খৃ ৭-শতকে ই-ৎসিঙ এখান থেকে সমুদ্র পথে সম্ভবত সুমাত্রা দ্বীপের পূর্বাঞ্চল (শ্রীবিজয়) অভিমুখে যান। এই শতকে হিউ-এন-ৎসাঙ এখানে আসেন; তাঁর লেখায় আছে একটি সংকীর্ণ খাড়ির ধারে এই বন্দর নগরী। পিছনের পশ্চাৎ-ভূমি সমস্ত উত্তর ভারতের সঙ্গে এই তাম্রলিপ্ত যুক্ত ছিল।

এখানে হিন্দুধর্মই প্রধান ছিল; বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ও ছিল। হিউ-এন-ৎসাঙের সময় বহু মন্দির ও বৌদ্ধ মঠ ছিল। দশকুমার চরিতে (খৃ ৬-শতক) এখানে যবন নাবিকদের আসার কথা আছে। ৯-শতকে এর খ্যাতি অক্ষুণ্ণ ছিল।

এখানে মৌর্য, শুঙ্গ ও কুষাণ যুগের বহু পুরা বস্তু পাওয়া গেছে। প্রাক্-খৃস্ট যুগেরও বহু জিনিস রয়েছে। কিছু মৃৎ-ফলকে জাতক ইত্যাদির বৌদ্ধ কাহিনীর ছায়া ফুটে রয়েছে। মৌর্যশৈলীর বস্তুগুলি উত্তর ভারতের নানা স্থানে প্রাপ্ত জিনিস-গুলির সঙ্গে তুলনীয়। এ ছাড়াও গ্রীস ও রোমের সঙ্গে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের পরিচায়ক বহু জিনিস পাওয়া গেছে। একটি পোড়া মাটির ফলক পাওয়া গেছে; এর খোদিত লিপি মনে হয় গ্রীক লিপি। লিপির অর্থ মনে হয় এক জন গ্রীক নাবিক নিরাপদ সমুদ্র যাত্রার জন্য পূবের বাতাসকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন।

খননের ফলে এখানে কয়েকটি যুগের পরিচয় পাওয়া গেছে। প্রথম যুগে নবাশ্ম কুঠার ও সামান্য দগ্ধ কৌলাল। দ্বিতীয় যুগ (খৃ পূ ৩-২); ছাঁচে তৈরি তাম্র মুদ্রা, উত্তর দেশীয় কৌলালের অনুরূপ মৃৎপাত্র ; মনোরম শৈলীতে নির্মিত পুতুল ইত্যাদি। তৃতীয় যুগে, খৃস্ট ১-২ শতক মত, রোমক জগতের সঙ্গে বাণিজ্যের পরিচায়ক এক শ্রেণীর অসংখ্য মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে। এই যুগে ইঁটের ধাপ যুক্ত পুষ্করিণী ও বাঁধান কূপ ছিল। চতুর্থ যুগে (খৃ ৩-৪ শতক) কুষাণ ও গুপ্ত যুগের অন্তত সুন্দর পোড়া মাটির মূর্তি পাওয়া গেছে। বিস্তৃত ইতিহাস এখনও অজ্ঞাত।

তাম্রা—তমর। সপ্তকোশির একটি। দ্রঃ- মহাকৌশিক, ত্রিবেণী।

তাম্রা—দক্ষকন্যা। কশ্যপের স্ত্রী। সন্তান ক্রৌঞ্চী (পেচক ইত্যাদি), ভাসী (ভাস ইত্যাদি), শ্যেনী (চিল, শকুন ইত্যাদি), ধৃতরাষ্ট্রী (হংস, কোকিল ইত্যাদি), শুকী (নটা ইত্যাদি)। একটি মতে এই নটা বিনতার মা। বিনতার ছেলে গরুড় ইত্যাদি। মহাভারতে (১।৬০।৫৪) সন্তান কাকী (>উলূক), শ্যেনী (>শ্যেন), ভাসী (>ভাস ও গৃধ্র), ধৃতরাষ্ট্রী (>হংস, কলহংস ও চক্রবাক), শুকী (>শুক)। দ্রঃ- শুচি।

হরি বংশে (১।৩।১০৮) মেয়ে কাকী (>কাক), শ্যেনী (>শ্যেন), ভাসী (>ভাস), সুগ্রীবী (>অশ্ব, উঠ ও গর্দভ), শুচি (>জলার পক্ষী), গৃধ্রিকা (>গৃধ্র), উলূকী (>উলূক)।

তারক—(১) তার অসুরের ছেলে। দ্রঃ- বজ্রাঙ্গ। পদ্মপুরাণে কশ্যপ ও দিতির পুত্র বজ্রাঙ্গ এবং বজ্রাঙ্গের ছেলে তারক। দেবতাদের জয় করার জন্য শৈশব থেকেই হাজার বছর তপস্যা করেও ঠিক কোন ফল হয় না। এর-পর মাথা থেকে একটা তেজ বার হয়ে দেবতাদের পুড়িয়ে ফেলতে থাকে। দেবতারা তখন ব্রহ্মার শরণ নেন। ব্রহ্মা এর কাছে এলে তারক তার চেয়ে শক্তিশালী কেউ যেন না জন্মায় এবং এক মাত্র মহাদেবের ছেলের হাতে যেন মৃত্যু হয় দুটি বর চেয়ে নেন। অন্য মতে বর চেয়েছিলেন যদি মরতে হয় তাহলে সাত-দিন বয়স এই রকম শিশুর হাতে যেন মৃত্যু হয়। অন্য মতে শিবের কাছে বর পেয়েছিলেন। এর পর প্রসেন, জম্ভ, কালনেমি ইত্যাদির সঙ্গে যোগ দিয়ে তারক নির্ভয়ে দেবতাদের ওপর অত্যাচার করতে থাকেন। শিব এই সময় সতীর বিরহে পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন/তপস্যা করছিলেন। দেবতারা আবার ব্রহ্মার কাছে এলে ব্রহ্মা শিবের যাতে সন্তান হয় সেই চেষ্টা করতে বলেন। বলেন সতী পার্বতী হয়ে জন্মাবেন এবং শিবকে স্বামী হিসাবে পাবার জন্য তপস্যা করবেন ; এঁদের সন্তান হলে তবেই তারক নিহত হবে। দেবতারা তখন চেষ্টা করে পার্বতীর (দ্রঃ) সঙ্গে বিয়ে দেন এবং কার্তিকেয়'র (দ্রঃ) জন্ম হয়। তারক কার্তিকেয়র হাতে মারা পড়েন। তারকের ছেলে তারাক্ষ, কমলাক্ষ, ও বিদ্যুন্মালী। দ্রঃ- ত্রিপুর। কালিকা পুরাণে (৪২।৭৫) তারকের সেনাপতি ক্রৌঞ্চ। স্বর্গ থেকে বিতাড়িত দেবতারা ব্রহ্মার কাছে এলে ব্রহ্মা স্বর্গ রাজ্য ফিরিয়ে দিতে বলেন। তারক তখন পৃথিবীতে এসে বাস করতে থাকেন কিন্তু দেবতাদের ওপর অত্যাচার চলতেই থাকে। ইন্দ্র তখন মদনকে শিবের বিয়ের জন্য পাঠান। দ্রঃ- বজ্রাঙ্গ, কার্তিকেয়।

(২) নন্দগ্রামে এক গণিকা বাস করত ; নাম ছিল মহানন্দা। অত্যন্ত শিব ভক্ত। এর একটি পোষা বানর ও একটি পোষা মোরগ ছিল। এদের দুটিকে রুদ্রাক্ষের মালা পরিয়ে দিয়ে মহানন্দা যখন শিবের স্তব করতেন তখন এরা নাচত। এক বার এক বৈশ্য আসে ; এর কাছে একটি স্ফটিক শিবলিঙ্গ ছিল। মহানন্দা এটি নেবার জন্য লালায়িত হয়ে পড়েন এবং বৈশ্যকে প্রতিশ্রুতি দেন এটি পেলে তিন রাত্রি তাঁর বিশ্বস্ত স্ত্রী হয়ে কাটাবেন। বৈশ্য সম্মত হন। সেই রাতে তার পর উন্মত্ত সম্ভোগের পর ক্লান্ত হয়ে যখন ঘুমচ্ছিলেন তখন গৃহে আগুন লাগে। শিবলিঙ্গ আগুনে ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। বৈশ্যও এই দেখে আত্মবিসর্জন করেন। মহানন্দা বিশ্বস্তা স্ত্রী হিসাবে আগুনে দেহ ত্যাগ করতে যান। কিন্তু মহাদেব দেখা দিয়ে নিবৃত্ত করেন এবং জানান তিনি বৈশ্য সেজে পরীক্ষা করতে এসেছিলেন। মহানন্দা তখন শিবলোকে যেতে চান ; এবং মহাদেব নিয়ে যান। বানর ও মোরগ-টিকে বর দিয়ে যান পর জন্মে এরা শিব ভক্ত হয়ে জন্মাবে এবং মোক্ষ পাবে। পর-জন্মে বানরটি কাশ্মীর রাজ ভদ্রসেনের ছেলে সুধর্মা হয়ে জন্মায় ; এবং মোরগটি মন্ত্রীর ছেলে হয়ে জন্মায়, নাম হয় তারক (শিবপুরাণ)।

তারকাময় সংগ্রাম—মহাভারতে (৯।৫০।১) উল্লেখ আছে ; চন্দ্র যেখানে রাজসূয় যজ্ঞ করেছিলেন সেইখানে এই যুদ্ধ হইয়াছিল।

মহাভারতে (৬।৭৯।২৫) ভগদত্ত ও ঘটোৎকচের যুদ্ধের উপমা হিসাবে উল্লিখিত। হরিবংশে (১।৪২।১০) বৃত্র বধের পর একটি বড় যুদ্ধ। ময়, তার ইত্যাদি যুদ্ধে আসে। যুদ্ধে অসুররা ঔর্ব অগ্নি যোগে দেবতাদের পোড়াতে থাকে। হিরণ্যকশিপুর ছেলে কালনেমিকে চক্রে নিহত করে বিষ্ণু ঘুমতে যান এবং দ্বাপরে ঘুম ভাঙলে কৃষ্ণ (দ্রঃ) হয়ে জন্মান। এই তার ও ময় পর জন্মে নরকের রাজ্যে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে বাস করত। তারাকে কেন্দ্র করে চন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধও তারকাময় যুদ্ধ (হরি ১।২৫।১৫) বলে উল্লিখিত। দ্রঃ- পৃ ৫২১।

দেবীভাগবতে (১।১১) বৃহস্পতি যজমানের কাজে গিয়েছিলেন। চন্দ্র তারাকে দেখতে পান। দুজনেই কামাতুর হয়ে কেটে পড়েন। বৃহস্পতি ফিরে এসে চাঁদকে বার বার ডেকে পাঠান ; শেষে নিজে যান। চন্দ্র বোঝান কয়েক দিন পরে ফিরে যাবে। কয়েক দিন পরে বৃহস্পতি আবার এলে চাঁদ দেবগুরুকে তাড়িয়ে দেন। বৃহস্পতি ইন্দ্রের কাছে আসেন। ইন্দ্রের দূতকে চাঁদ বলে দেন মমতাকে যে দিন বৃহস্পতি গ্রহণ করেছিলেন সেই দিন থেকে তারা চাঁদের প্রতি অনুরক্ত। ফলে বহু বৎসর যুদ্ধ। শেষ অবধি ব্রহ্মা এসে শাসান বিষ্ণুকে ডাকবেন, ফলে চাঁদ তারাকে ফিরিয়ে দেন।

তারা—দেবগুরু বৃহস্পতির স্ত্রী , চন্দ্র (দ্রঃ) এঁকে চুরি করেন ; ছেলে হয় বুধ। দ্রঃ- তারকাময় যুদ্ধ। (২) বানর রাজ বালীর স্ত্রী , সুষেণ বানরের মেয়ে ও অঙ্গদের মা। একটি মতে তারা ও রুমা (দ্রঃ) সমুদ্র মন্থনে উঠেছিলেন। অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ; কখন কি করতে হবে ঠিক মত বলতে পারতেন। সুগ্রীবের সঙ্গে দ্বিতীয়বার যুদ্ধ করতে যাবার সময় তারা স্বামীকে বাধা দেন। রামায়ণ মতে তারা (৪।১৫।১৮) অঙ্গদের কাছে খবর পেয়ে-ছিলেন ; চরেরা খবর দিয়েছিল ; রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীবের সঙ্গে বন্ধুতা স্থাপন করেছেন

ইত্যাদি ; এবং তারা সুগ্রীবকে যৌব রাজ্যে অভিষিক্ত করতে বলেন। মহাভারতে এই তারা সর্বভূতরুতজ্ঞা (৩।২৬৪।১৯), সুগ্রীবের গর্জন শুনেই 'হৃতদার' রামচন্দ্রের কথা বুঝতে পেরেছিলেন এবং বালীকে জানান। বালী অবশ্য তারার বাধা মানেন নি। মৃত্যু সময়ে বালী সুগ্রীবকে সব সময় তারার পরামর্শ নিয়ে রাজকার্য চালাতে বলে গিয়েছিলেন। রাম তারাকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। ৪।২৯।৪ শ্লোকে আছে সুগ্রীব তারাকে পেয়েছিল ; বিয়ে করেছিল কিনা উল্লেখ নাই। বালীর (দ্রঃ) জন্য পরে একবারও শোকার্তা হতে দেখা যায় নি।

(৩) দশমহাবিদ্যার দ্বিতীয় মহাবিদ্যা। দক্ষ যজ্ঞে যাবার অনুমতি চেয়ে বিফল হলে সতী নিজের যে দশ রূপ মহাদেবকে দেখিয়েছিলেন তারই দ্বিতীয় রূপ ঃ—

নীল রঙ, নবযৌবনা, ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান, চার হাত, প্রজ্বলিত চিতা মধ্যে অবস্থান ; প্রত্যালীঢ়-পদা ; বাম পা শবের বুকে। দুঃখ থেকে তারণ করেন বলে তারা। তন্ত্রশাস্ত্রে ইনিই মহানীল সরস্বতী। নেপাল থেকে তিব্বত (এখানে নাম দোল্‌মা বা সগ্রোল্‌মা হয়ে মঙ্গোলিয়া (এখানে নাম দর-একে) ও জাপানে ছড়িয়েছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে দেবীর জন্ম তিব্বতে ও চীনে এবং নেপাল হয়ে ভারতে এসেছিলেন। অন্য মতে সম্পূর্ণ ভারতীয় দেবী। তারা'র দুই সখী জয়া (দু হাত, তপ্তকাঞ্চন বর্ণা) ও বিজয়া (দু হাত, দলিতাঞ্জনবর্ণা)। তিব্বতে খৃ ৭-ম শতকে তারার উপাসনা চালু ছিল। খৃ ৭-শতকে ভারতে এর ব্যাপক উপাসনা হিউ-এন-ৎসাঙ দেখেছিলেন। নাগার্জুন কোণ্ডাতে খৃ ৩ শতকের একটি তারা মূর্তি পাওয়া গেছে। বাঙলাতে রাজা ধর্মপাল (খৃ ৭৬৯—৮০১) তাঁর পতাকাতে তারা মূর্তি অঙ্কিত করতেন। এই তারার অপর নাম হিসাবে উগ্রতারা, তারিণী, একজটা, নীল সরস্বতী, কুরুকুল্লা, ইত্যাদি অনেক নাম রয়েছে। তন্ত্রসারে মহাবিদ্যা তারা হলেন বৌদ্ধতারা/একজটা। তারার অষ্টযোগিনীঃ- মহাকালী, রুদ্রাণী, উগ্রা, ভীমা, ঘোরা, ভ্রামরী, সদারাত্রি, ভৈরবী। মায়াতন্ত্রে তারা ৮ জন ঃ—তারা, উগ্রা, মহাঘোরা, বজ্রা, কালী, সরস্বতী, কামেশ্বরী ও ভদ্রকালী। কুব্জিকা মাতা তন্ত্রে যথা কালী তথা তারা মহামন্ত্র প্রকীর্তিতা (২।৫৯)। দ্রঃ- তারা, উগ্র, একজটা।

তারা—বৌদ্ধদেবী। যে দেবীর মন্ত্রে 'তারে তুতারে তুরে' স্বাহা রয়েছে তিনিই তারা দেবী। অনেক সময়েই মূর্তি দেখে দেবী চেনা যায় না। অনেক সময় বাম হাতে নিশিপদ্ম এবং ডান হাতে বরদ মুদ্রা। মাথাতে অমোঘসিদ্ধির মূর্তি থাকতে পারে। রং অনুসারে ঃ—

শ্যামবর্ণা ঃ—

(১) খদিরবণী (দ্রঃ)	নিশিপদ্ম	বরদমুদ্রা		অশোককান্তামারীচী, একজটা
(২) বশ্যা			ভদ্রাসন	একা
(৩) আর্য্যা			অর্ধপর্যঙ্ক	একা
(৪) মহত্তারী			বজ্রপর্যঙ্ক	একা
(৫) বরদা			অর্ধপর্যঙ্ক	অশোককান্তামারীচী, মহামায়ূরী, একজটা, জাঙ্গুলী

(৬) দুর্গোত্তারিণী চারহাত	পাশ, অঙ্কুশ, পদ্ম	বরদমুদ্রা	পদ্মাসনা		
(৭) ধনদা (দ্রঃ)	অক্ষসূত্র পাশ, অঙ্কুশ, পদ্ম	বরদমুদ্রা	পশুবাহনা	আটজনদেবী	অমোঘ-সিদ্ধিকুল
(৮) জাঙ্গুলী চারহাত	ত্রিশূল, ময়ূর-পুচ্ছ, সর্প	অভয়মুদ্রা			অমোঘ-সিদ্ধিকুল
(৯) পর্ণশবরী ৪।৬ হাত, তিনমুখ		সব মুখ সক্রোধহসি-তাননা			
(১০) মহাশ্রী -দ্রঃ- তারা মহাশ্রী					
শ্বেতবর্ণা ঃ-					
(১১-১) অষ্টমহামায়া			অর্ধপর্যঙ্ক	দশজনদেবী পরিবৃতা সবগুলি মূল দেবীর সমান।	
(১২-২) মৃত্যুবঞ্চন	আয়ুধ চক্র		বজ্রপর্যঙ্ক		
(১৩-৩) সিত চতুর্ভুজা	উৎপলমুদ্রা ও পদ্ম	বরদমুদ্রা		মারীচী, মহামায়ুরী	অমোঘ-সিদ্ধিকুল
(১৪-৪) সিত ষড়্ভুজা, তিনমুখ	শ্বেতপদ্ম	অভয়মুদ্রা	সর্পবাহন		অমোঘ-সিদ্ধিকুল
(১৫-৫ বিশ্বমাতা একমুখ	অক্ষসূত্র	পশুবাহন			
(১৬-৬) কুরুকুল্লা দুহাত	পদ্মপাত্র বীণাবাদনরতা	অভয়মুদ্রা			
(১৭-৭ জাংগুলী	শ্বেতসর্প				
পীতবর্ণা ঃ—				দশজন দেবী	রত্নসম্ভবকুল
(১৮-১) বজ্রতারা (দ্রঃ) ৪ মুখ ৮ হাত					অক্ষোভ্যকুল
(১৯-২) জাঙ্গুলী ৩ মুখ ৬ হাত	স্মিতহাস্য				অক্ষোভ্যকুল
(২০-৩) পর্ণশবরী ৩মুখ ৪ হাত	অক্ষসূত্র,ত্রিদণ্ডী, কমণ্ডলু	বরদমুদ্রা			অমিতাভকুল
(২১-৪) ভৃকুটি ১মুখ ৪ হাত					
(২২-৫) প্রশান্ত তারা (দ্রঃ)					
নীলবর্ণা ঃ—					
(২৩-১) একজটা (দ্রঃ-বিদ্যুৎজ্বালাকরালী, ১২ মুখ, ২৪ হাত)					অক্ষোভ্য
(২৪-২) মহাচীন তারা (দ্রঃ)					

রক্তবর্ণা ঃ—

(২৫-১) রক্তবর্ণ তারা কম। কুরুকুল্লা অবশ্য রক্তবর্ণা, অমিতাভ কুল, মাথাতে ৫-টি ধ্যানী বুদ্ধ। রক্তবর্ণ হলে ৪, ৬ বা ৮ হাত দ্রঃ- তারা (১৬-৬)।

তারা, উগ্র—ব্রাহ্মণ্য দেবী। ব্রাহ্মণ্য তারারই একটি সংস্করণ। শবরূপী শিবের বুকে দক্ষিণ পদ। খর্বাকৃতি। হুঙ্কারবীজের ওপর অবস্থিত। কটিতে ব্যাঘ্রচর্ম। তন্ত্রে তারা, উগ্রতারা ও নীল সরস্বতী অভিন্ন।

তারা, খদিরবণী—বৌদ্ধ দেবী, অমোঘসিদ্ধি (দ্রঃ) কুল। দ্রঃ-তারা। দু হাত, বরদ মুদ্রা ও উৎপল। সঙ্গে অশোককান্তা, মারীচী ও একজটা। হরিৎবর্ণ। অপর নাম শ্যাম তারা।

তারা, ধনদা—বৌদ্ধ দেবী ; অমোঘসিদ্ধি (দ্রঃ) কুল। দ্রঃ-তারা। চার হাত। হরিত শ্যাম, এক মুখ। দু চোখ। হাতে অক্ষসূত্র, বরদমুদ্রা, উৎপল ও পুস্তক। বিচিত্র বস্ত্রালঙ্কার, বাহন একটি পশু।

তারা, বজ্র—রত্ন সম্ভব (দ্রঃ) কুল। চারমুখ, আট হাত, সুবর্ণবর্ণ (দ্রঃ- তারা), মূল মুখ হেমাভ, দক্ষিণ মুখ শ্বেত, পেছনে নীল, এবং বামে লাল। হাতে বজ্র, পাশ, শর, শঙ্খ, পীত নিশিপদ্ম, ধনু, অস্কুশ এবং তর্জনীমুদ্রা ; জনপ্রিয় দেবী। ইনি কুমারীলক্ষণোজ্জ্বলা। রত্নসম্ভবের স্ত্রী। বজ্রতারা যে পদ্মের ওপর বসে আছেন সেই পদ্মের দলের ওপর পূর্বে পুষ্পতারা, দক্ষিণে ধূপতারা, পশ্চিমে দীপতারা এবং উত্তরে গন্ধ-তারা অবস্থিত। অর্থাৎ বজ্রতারাকে ঘিরে একটি মণ্ডল। পুষ্পতারা শ্বেতবর্ণা, মনোরমা, ওঁ বীজ থেকে জন্ম, এক মুখ ও দুহাত। ধূপতারা কৃষ্ণবর্ণা, সুরূপিণী, হাতে ধূপ। দীপতারা পীতবর্ণা, চলৎকুণ্ডলা, হাতে দীপযষ্টি ; এবং গন্ধতারা, রক্তবর্ণ, হাতে গন্ধশঙ্খ। এই চারজনকে ঘিরে আর একটি মণ্ডলে চারজন দ্বাররক্ষী দেবী রয়েছেন। পূর্ব দ্বারে বজ্রাঙ্কুশী; এক মুখ, দুহাত ; হাতে অস্কুশ ও নিশিপদ্ম, নীলবর্ণ ; বিকৃতবদনা। দক্ষিণ দ্বারে বজ্রপাশী, পীতবর্ণা, বিকৃতবদনা, হাতে পাশ। পশ্চিম দ্বারে বজ্রস্ফোটী, রক্তবর্ণা, বিকৃত বদনা, বজ্রস্ফোটহস্তা। উত্তর দ্বারে বজ্রঘণ্টা, শ্বেতবর্ণা, বিকৃতবদনা, হাতে ঘণ্টা। ঊর্ধ্বে উষ্ণীষবিজয়া; নিম্নে শুম্ভা।

বজ্রতারার ক্ষমতা সম্বন্ধে বলা হয়েছে কাপড়ের খুটে গেরো বেঁধে সাতবার বজ্রতারার মন্ত্র এই গেরোর ওপর পাঠ করে বিন্ধ্য পর্বতে যে কোন দুর্গম স্থানে গেলেও কোন বিপদ হবে না। চোর ইত্যাদি এবং বাঘ ইত্যাদি পশু এই তারা নাম উচ্চারণ করলে পালাবে ইত্যাদি। এই মন্ত্র সহকারে ১০৮ পদ্ম অগ্নিতে আহুতি দিলে যে কোন স্ত্রীলোককে বশে আনা যায়। কাকের একটি পালকের ওপর এই মন্ত্র ৩২ বার পাঠ করে শত্রুর গৃহে রেখে এলে এক সপ্তাহের মধ্যে এই গৃহ নষ্ট হবে।

তারা, প্রশান্ত—পীত বর্ণ, আট মুখ, ১৬ হাতে। অষ্ট ভুজ কুরুকুল্লার (রক্তবর্ণ) সহচরী। একক দেবী হিসাবেও পাওয়া যায়। রঙ অনুসারে রত্ন-সম্ভব বংশ। অপর নাম অমৃতমুখী, অমৃতলোচনা। সাতটি মুখে সুন্দর মিষ্ট ভাব, ঊর্দ্ধ মুখটি বাদে। বিদ্যুৎজ্বালা করালী মত ভয়ঙ্করী দেবী। সম্পদ দান করেন। ত্রিনেত্র ; গলায় ৫০ নরমুণ্ডের মালা। প্রত্যালীঢ় ভঙ্গি। এক এক মুখে এক এক রঙ। হাতে খট্বাঙ্গ, উৎপল, শর, বজ্র, অস্কুশ, চন্দ্র, কর্তারি, অভয় মুদ্রা, পাশতর্জনী, কপাল, ধনু, খট্বাঙ্গ, বজ্র, পাশ, ব্রহ্মার মুণ্ড ও রত্নকুম্ভ। বাম পায়ে ইন্দ্রকে ও দ-পায়ে উপেন্দ্রকে দলিত করছেন এবং পদদ্বয় মধ্যে রুদ্র ও ব্রহ্মাকে পিষ্ট করছেন। সমস্ত অজ্ঞানের আবরণ নষ্ট করেন।

তারা, বশ্যা—অমোঘসিদ্ধি (দ্রঃ) কুল। অপর নাম আর্য তারা। বর্ণ শ্যাম, মুদ্রা বরদ, প্রতীক পদ্ম, আসন ভদ্রাসন, সঙ্গে কোন দেবী নাই।

তারা, মহাচীন—উগ্রতারা ; অক্ষোভ্য বংশ (দ্রঃ)। বর্ণ নীল। দ্রঃ- তারা। আসন প্রত্যালীঢ়, বাহন শব। ভয়ঙ্কর দেখতে, চার হাত। এই মহাচীন তারাই ব্রাহ্মণ্য তারাতে পরিণত ; ব্রাহ্মণ্য দেবীর পায়ে মহাদেব এবং মহাচীন তারার মাথাতে অক্ষোভ্য প্রতীক ; পার্থক্য এইটুকু। গলাতে মুণ্ডমালা, লম্বোদরী, সর্পভূষণ, ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান, লোলজিহ্বা, করাল দংষ্ট্রা। হাত খড়্গ, কর্তরি, উৎপল ও কপাল।

তারা, মহাশ্রী—অমোঘসিদ্ধি (দ্রঃ) কুল। শ্যামবর্ণ, দু হাত, ব্যাখ্যান মুদ্রা; সঙ্গে একজটা, অশোককান্তামারীচী, আর্যাজাঙ্গুলী, ও মহামায়ূরী। চন্দ্রের ওপর সিংহাসনে আসীন। চম্পক, অশোক, নাগেশ্বর, ও পারিজাত কুসুম বিভূষিত। ধনদাতা। অন্য মতে রাজলীলা আসন।

তারা, সিত, চতুর্ভুজ—মাথাতে ৫টি ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তি। সিত বর্ণ তারা (দ্রঃ-)। এক মুখ চার হাত। তিন চোখ। সর্বালঙ্কার ভূষিতা। হাতে উৎপল মুদ্রা, চিন্তামণি রত্ন সংযুক্ত বরদমুদ্রা ও উৎপলমঞ্জরী। সঙ্গে দক্ষিণে মারীচী (দ্রঃ-) পীতবর্ণ, দু হাত, নীল বস্ত্র, হাতে অশোক শাখা ও চামর। দ্বিতীয় সহচরী মহামায়ূরী (দ্রঃ)—প্রিয়ঙ্গুশ্যামবর্ণা, দু হাত. হাতে ময়ূরপুচ্ছ ও চামর।

তারা, সিত, ষড়্ভুজা—অমোঘসিদ্ধি (দ্রঃ) কুল। তিন মুখ, ছয় হাত। দক্ষিণ মুখ পীত, বাম নীল। ত্রিনেত্র। হাতে বরদ মুদ্রা, অক্ষসূত্র, বাণ, উৎপল, পদ্ম ও ধনু। অর্দ্ধপর্যঙ্ক-নিষণ্ণা। মাথাতে ৫-টি নরমুণ্ড। বহু রত্নভূষিতা ; দ্বি-অষ্টবর্ষ আকৃতি এবং অষ্ট শ্মশান মধ্যস্থিতা।

তারাবতী—চন্দ্রশেখর জন্মাবার তিন বছর পরে আর্যাবর্তে ভোগবতী নগরীতে ককুৎস্থ রাজার স্ত্রী ভর্গদেবের তনয়া (৪৮।৫ কালিকা) মনোন্মাথিনীর গর্ভে তারাবতী জন্মান। প্রথমে ১০০ ছেলে, তার পর তিন বছর চণ্ডিকার আরাধনা করে চণ্ডিকার বরে হারসংযুক্তা জন্ম এই কন্যা। ইনি পার্বতী। স্বয়ংবর ব্যবস্থা হয়। উপযুক্ত পাত্র নির্বাচন করার জন্য মা ও মেয়ে দুজনেই চণ্ডিকা ও কালিকার পূজা করতে থাকেন ; দেবী চন্দ্রশেখরকে বরণ করতে বলে যান। বিয়ে হয়।

দৃষদ্বতী নদীতে একদিন ঋতুস্নান করতে এলে কপোত নামে এক মুনি তারাবতীকে দেখে বিচলিত হয়ে পড়েন ও সঙ্গমপ্রার্থনা করেন। পাছে হিংসা করে বসেন এই ভয়ে মুনি কপোতবেশে ঘুরে বেড়াতেন ; ফলে এই নাম। দুটি ছেলে হবে লোভ দেখান (৪৯।১৭)। তারাবতী শাপের ভয়ে ছোট বোন চিত্রাঙ্গদাকে তারাবতীর বেশে মুনির কাছে পাঠিয়ে দেন ; সঙ্গে সঙ্গে দুটি সন্তান হয়। কপোত চিত্রাঙ্গদাকে নিজের কাছে রেখে দেন। তারাবতী স্বামীকে সব জানান। এর কিছু দিন পরে তারাবতী আবার স্নান করতে আসেন ; কপোত দেখতে পায় ; চিত্রাঙ্গদাকে বলেন এ হয়তো পার্বতী নিজে এসেছেন এবং স্তব করতে বলেন। চিত্রাঙ্গদা এই সময়ে ভয়ে প্রকৃত ঘটনা জানিয়ে দিলে মুনি তারাবতীকে শাপ দেন এক বৎসরের মধ্যে বীভৎস-বেশ একজন এসে সঙ্গম করবে এবং তৎক্ষণাৎ বানর মুখ দুটি ছেলে হবে। তারাবতী তখন দৃঢ় ভাবে মুনিকে জানিয়ে দেন চন্দ্রশেখর ছাড়া কেউ তাঁকে স্পর্শ করতে পারবেন না। তারাবতীর

এই দৃঢ়তায় মুনি বিস্মিত হন এবং ধ্যানে তারাবতীর জন্ম ইত্যাদি সব জানতে পারেন। তারাবতী এসে স্বামীকে সব জানান। চন্দ্রশেখর সুউচ্চ অট্টালিকা ইত্যাদি করে সাবধান হবার ব্যবস্থা করেন।

এরপর এক দিন আকাশ পথে শিব পার্বতী যাচ্ছিলেন। তারাবতীকে দেখেন ; পার্বতীকে তারাবতীর দেহে প্রবেশ করতে বলেন এবং শিব বীভৎস কাপালিক বেশে মিলিত হন। সঙ্গে সঙ্গে দুটি সন্তান হয় ; শিব নিজের প্রকৃত পরিচয় দিয়ে ফিরে যান। এর পর রাজা আসেন। সরস্বতী দৈববাণী করে এদের পালন করতে বলেন। দ্রঃ-শিব। নারদ এই ছেলেদের জাত কর্ম করেন এবং বড়কে ভৈরব ও ছোটকে বেতাল নাম দেন।

তার্ক্ষ্য—একজন মুনি (মহা ৩।১৮৪।-) সরস্বতীকে ধর্ম সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলেন; সরস্বতী উত্তর দিয়েছিলেন।

তালকাড়—তলবনপুর, শিরোবন। চের (দ্রঃ) রাজধানী। বর্তমানে কাবেরীর বালিতে চাপা পড়ে গেছে।

তালকেতু—দ্রঃ- মদালসা।

তালজঙ্ঘ—দ্রঃ- জয়ধ্বজ। ভাগবতে (৯।২৩) তালজঙ্ঘের ছেলেদের সগর নিহত করেন। তালজঙ্ঘের ১০০ ছেলের মধ্যে বড় বীতিহোত্র>মধু>১০০ ছেলে ; মধুর ১০০ ছেলের মধ্যে বড় বৃষ্ণি। মূলত যদুবংশ। যদু এবং এই মধু ও বৃষ্ণি থেকে যাদব, মাধব ও বৃষ্ণি বংশ। কার্তবীর্যের ৫-ম ছেলে জয়ধ্বজের পুত্র তালজঙ্ঘ।

তালধ্বজ—নারদ এক বার বিষ্ণুর কাছে জীবনের রহস্য জানতে চান। বিষ্ণু বলেন জীবন বলে কিছুই নাই; যা আছে সবই মায়া। নারদ তখন মায়াকে দেখতে চান। বিষ্ণু নারদকে নিয়ে গরুড়ের পিঠে বার হয়ে পড়েন। নদনদী পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে এঁরা কান্যকুব্জে এক হ্রদের ধারে এসে নামেন। এখানে কিছুক্ষণ পায়চারি করে একটা গাছের নীচে সকলে বসলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর নারদকে জলাশয়ে স্নান করতে বলেন। বীণা ইত্যাদি বিষ্ণুর জিম্মায় রেখে নারদ জলে নেমে ডুব দিলে সঙ্গে সঙ্গে একটি সুন্দরী নারীতে পরিণত হন ; আগের সব স্মৃতি ভুলে যান। ইতিমধ্যে রাজা তালধ্বজ ঘোড়ায় চড়ে সেখানে এসে পৌঁছলে নারদকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়ে বিয়ে করে নিয়ে যান। নারদের নাম হয় সৌভাগ্যসুন্দরী। বার বছর এক সঙ্গে থাকার পর একটি ছেলে হয় বীরধর্মা এবং তার পর প্রতি দু বছর অন্তর অন্তর একটি করে সন্তান হতে থাকে ; মোট বারটি ছেলে হয়। এরপর আরো আটটি ছেলে অর্থাৎ মোট বিশটি ছেলে হয়। এই বিশটি ছেলে বড় হলে তাদের বিয়ে হয় এবং তাদেরও ছেলে হয়। মস্ত বড় একটা পরিবার গড়ে ওঠে।

এরপর হঠাৎ এক দিন অন্য এক রাজা এসে কান্যকুব্জ আক্রমণ করলে তালধ্বজের ছেলে ও নাতিরা যুদ্ধে সকলে মারা পড়ে ; তালধ্বজ কোন মতে বেঁচে যান। সৌভাগ্যসুন্দরী শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। পরিত্যক্ত যুদ্ধ ক্ষেত্রে এসে ছিন্নভিন্ন দেহ ছেলে, নাতি ইত্যাদিকে দেখে রাণী মাটিতে পড়ে আর্তনাদ করতে থাকেন। বিষ্ণু তখন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে এসে জীবনের রূঢ় বাস্তব সম্বন্ধে কিছু

উপদেশ দেন। তারপর তালধ্বজ ও সৌভাগ্যসুন্দরীকে নিয়ে গিয়ে সেই জলাশয়ে আবার ডুব দিয়ে স্নান করতে বলেন। সৌভাগ্যসুন্দরী ডুব দিয়ে নারদের বেশে উঠে আসেন ; দেখেন বিষ্ণু তাঁর বীণা ইত্যাদি নিয়ে তখনও অপেক্ষা করছেন। বিষ্ণুকে দেখে সমস্ত ঘটনা নারদের মনে পড়ল ; নারদ দেখতে পেলেন সবই মায়া। তালধ্বজ এ পর্যন্ত জলে নামেন নি। জল থেকে সৌভাগ্যসুন্দরীকে না উঠে আসতে দেখে ব্যাকুল হয়ে পড়েন। বিষ্ণু তখন এঁকেও স্নান করতে বলেন। তালধ্বজ স্নান করলে তাঁর মনে বৈরাগ্য আসে এবং তপস্যা করে মোক্ষ লাভ করেন। দেবী ভাগবতে (৬।২৮) নারদ শ্বেতদ্বীপে বিষ্ণুর কাছে এলে লক্ষ্মী লজ্জায় সামনে থেকে সরে যান। নারদ বিস্মিত হয়ে জানতে চান তাঁকে দেখে এ লজ্জা কেন। বিষ্ণু তখন বলেন এ সবই মায়া। নারদ তখন মায়া কি জিনিস জানতে চাইলে এই ঘটনাটি ঘটেছিল।

তালবন—গোবর্দ্ধনের উত্তরে। যমুনার তীরে। এখানে ধেনুক অসুর থাকত। দ্রঃ-কৃষ্ণ।

তাহরপুর—বুলন্দসর জেলাতে। অনুপসহর থেকে ১২ মাইল উত্তরে। গঙ্গা তীরে এখানে জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ হয়েছিল।

তিতিক্ষা—দক্ষ কন্যা। তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা মৈত্রী ইত্যাদি তের জন ধর্মের।

তিতিক্ষু—নহুষের বংশে রৌদ্রাশ্ব ও ঘৃতাচীর ছেলে কক্ষেয়ু (হরি ১।৩১।৩১)। এই কক্ষেয়ু বংশে তিতিক্ষু। তিতিক্ষু>উষৎরথ (পূব দিকে রাজা)>ফেন>সুতপা>বলি।

তিত্তিরি—(১) এক রকম পাখী ; তিত্তির (partridge)। দ্রঃ-ত্রিশিরস্। (২) একটি সাপ ; কদ্রুর ছেলে। (৩) বিশেষ জাতের ঘোড়া। (৪) যাস্কের এক শিষ্য।

তিব্বত—২৭°—৩৭°উ×৭৮°২৫′—১০০° পূ। ভোট, ভোটাঙ্গ, ভোটান, হিমবন্ত, উত্তরকুরু (হরিবংশে)। দ্রঃ- বোলোর। এসিয়াতে একটি সুউচ্চ মালভূমি ; উচ্চতা সমুদ্র থেকে ৩৬০০-৪৮০০ মি। সংস্কৃত সাহিত্য নাম কিন্নরখণ্ড বা ভোট দেশ।

সিন্ধু, শতদ্রু, ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গার বহু উপনদীর এবং আরো বহু নদীর উৎস এখানে। মানস ও রাক্ষসতাল হ্রদও এইখানে।

জনশ্রুতি এখানে আদিমতম ও প্রাচীনতম রাজা এক জন ভারতীয়। খৃ-৬ শতকের শেষ ভাগে এখানকার রাজা শ্রেঙ-বৎসন-স্গম-পো একটি চীনা ও একটি নেপালী রাজকুমারীকে বিয়ে করেন। এঁরা দু জনেই বৌদ্ধ ছিলেন। ফলে রাজা বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়ে দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ব্যবস্থা করেন এবং পাণ্ডতদের পাঠিয়ে ভারতীয় লিপির অনুকরণে এক লিপি তৈরি করিয়ে দেশে প্রচলিত করেন। খৃ ৮-শতকে নালন্দ মহাবিহারের অধ্যক্ষ শান্তি রক্ষিত তিব্বতের রাজার নিমন্ত্রণে এখানে গিয়ে এখানকার বৌদ্ধ ধর্মের সংস্কার করেন। তাঁর ভগ্নীপতি পদ্মসম্ভবও ঐ কাজে সাহায্যের জন্য তিব্বতে গিয়েছিলেন। মগধের ওদন্তপুরী বিহারের অনুকরণে রাজধানী লাসায় তিব্বতের রাজা একটি বিহার তৈরি করিয়েছিলেন ; শান্তি রক্ষিত এখানে অধ্যক্ষ হন। শান্তি রক্ষিত এবং পদ্মসম্ভব এখানে লামা সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন ; পূজনীয়ার্থে সংস্কৃত 'উত্তর' শব্দের তিব্বতী প্রতিশব্দ 'লামা'। ১০৩৮ খৃ

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান এখানে আসেন এবং এখানে ধর্মের বিশেষ সংস্কার করেন। এর পর ১৩ শতকে কুবলাই খাঁ চীন ও তিব্বত জয় করলে লামাদের প্রতিপত্তি বিশেষ বৃদ্ধি পায়। কুবলাই খাঁ পরে বৌদ্ধ ধর্মকে তাঁর রাজ্যে প্রধান স্থান দেন।

তিমিঙ্গিল—ডিণ্ডিগল উপত্যকা যেন। টঙ্গল=টগ (টলেমি)। মাদুরা জেলাতে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি।

তিমিধ্বজ—বৈজয়ন্ত পুরের রাজা ; এক জন অসুর। অপর নাম শম্বর। এই শম্বরের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য দশরথ দেব লোকে যান (রা ২।৯।১২)। দ্রঃ- সুমিত্রা।

তিলক—চন্দন, মাটি, গিরিমাটি, তুলসী মাটি, নদী তীরের মাটি, মন্দির সংলগ্ন মাটি ইত্যাদি নানা মাটি দিয়ে দেহে যে টিপ/রেখা অঙ্কন করা হয়। তিলকের রঙ, আকার, আকৃতি, তিলক ধারণের সময়, কোন আঙুল দিয়ে দেহে কোথায় আঁকা হয়েছে এই সব কিছু মিলে তিলকের বিশেষ বিশেষ ফল। আঁকার সময় নির্দিষ্ট। সংশ্লিষ্ট দেবতাকে স্মরণ করতে হয়। উধ্বর্পুণ্ড্র একটি তিলক বিশেষ।

তিলপ্রস্থ—তিলপথ। তোঘলকবাদ থেকে ৬ মাইল দ-পূর্বে এবং কুতুব থেকে ১০ মাইল দ-পূর্বে। প্রাচীন তিলপথ পরগণার বেশির ভাগ অংশ বর্তমানে ফরিদাবাদ নামে পরিচিত। যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থের অংশ ছিল : এবং সন্ধির সর্ত হিসাবে এই গ্রামটিও চেয়েছিলেন।

তিলোগ্রাম্মোন—(টলেমি) তীরগ্রাম। যশোহর।

তিলোত্তমা—(১) কপিলা অন্য মতে প্রধার মেয়ে ; রম্ভা ইত্যাদির বোন। (২) সুন্দ উপসুন্দ (দ্রঃ) দৈত্য দু জনকে দমন করার জন্য দেবতারা ব্রহ্মার স্মরণ নিলে বিশ্বকর্মাকে দিয়ে ব্রহ্মা এঁকে সৃষ্টি করান। ত্রিভুবনের সমস্ত উত্তম জিনিস তিল তিল সংগ্রহ করে এনে এঁকে তৈরি করা হয় বলে এই নাম। বিগ্রহবতীব শ্রীঃ। অনুশাসনপর্বে ব্রহ্মা রত্নানাম্ কুঁচি দিয়ে গড়েন। সৃষ্টির পর বিদায় নেবার সময় তিলোত্তমা প্রদক্ষিণ করেন। এই সময়ে এঁকে দেখবার জন্য ব্রহ্মার চার দিকে চারটি মুখ হয় ; ইন্দ্র সর্বতঃ চক্ষু হন ; শিব নিশ্চল হয়ে স্থাণু হয়ে যান এবং মোট ৪টি মাথা হয় (মহা ১।২০৩।২৬)। দ্রঃ- মহাদেব। ব্রহ্মা তার পর এঁকে সুন্দ উপসুন্দের কাছে পাঠিয়ে দিলে এঁকে বিয়ে করার জন্য দুই ভাই মারামারি করে দু জনেই মারা পড়েন। দেবতারা সকলে তিলোত্তমাকে অভিনন্দিত করেন এবং ব্রহ্মা এঁকে আদিত্যলোকে বাস করবার নির্দেশ দেন, ফলে কেউ আর একে দেখতে পাবে না (মহা ১।২০৪।৩৩)। কুব্জা (দ্রঃ)।

তিলোত্তমা এক বার বলির ছেলে সাহসিকের সঙ্গে খেলায় মত্ত হয়ে দুর্বাসার ধ্যান ভঙ্গ করলে ঋষির শাপে বাণের কন্যা ঊষা (দ্রঃ) হয়ে জন্মাতে হয়।

তিলোদক—তিলারা। ফল্গুর পূর্ব তীরে ; পাটনা থেকে ৩৩ মাইল দক্ষিণে। হিউ এন-ৎসাঙ এসেছিলেন। এখানে একটি বিখ্যাত বিহার ছিল।

তিলৌরা—কপিলাবস্তু (দ্রঃ)। বুদ্ধের জন্মস্থান। নেপাল তরাইতে ভৌলিভা থেকে ২ মাইল উত্তরে। একটি মতে কণক মুনি—কণগর্মনবুদ্ধের জন্মস্থান শোভাবতী নগর হচ্ছে অরৌরা ; তিলৌরা থেকে ১ যোজন পূর্বে। ন্যগ্রোধবিহার (এখানে একটি

বিরাট স্তূপ রয়েছে) একটি মতে লোরিকুদানের দক্ষিণে এবং তৌলিভার ১·৫ মাইল পশ্চিমে। তিলোরাকোটের ২ মাইল উত্তরে সগরওয়াতে বিরূঢক শাক্যদের হত্যা করেছিলেন। শুদ্ধোধন উদায়ীকে (কলুদা) পাঠিয়ে বুদ্ধদেবকে নিমন্ত্রণ করে আনলে এই ন্যগ্রোধ কাননে এসে অবস্থান করেন এবং এখানে নন্দ ও রাহুলকে দীক্ষা দেন। এই ন্যগ্রোধ আরামে বিমাতা প্রজাপতি ও অন্যান্য শাক্য নারীদের বুদ্ধদেব দীক্ষা দিতে অস্বীকার করেছিলেন কিন্তু পরে আনন্দের অনুরোধে বৈশালীতে এদের দীক্ষা দেন। শাক্যদের গণতন্ত্র রাষ্ট্র ; নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে এরা রাজা বলতেন। সাধারণ সভাগৃহে (সন্থাগারে) এ'রা মন্ত্রণা করতেন। শুদ্ধোধন এই রকম এক জন নির্বাচিত রাজা।

তীরভুক্তি—প্রাচীন বিদেহের পরবর্তী নাম। বৈয়াকরণ বামন একে একটি দেশ বলেছেন। বৃহৎ-পুরাণে এর সীমানা উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে গঙ্গা, পূর্বে কোশী, পশ্চিমে গণ্ডক। শক্তিসংগম তন্ত্রে গণ্ডকী ও চম্পারণ্যের মধ্যে অবস্থিত। প্রাচীন তীরভুক্তি থেকে বর্তমানে অপভ্রংশ শব্দ ত্রিহুৎ।

তীর্থ—পুণ্য স্থান। এক অনার্য দৃষ্টিভঙ্গি মনে হয় ; পরে আর্যরা একে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। যাস্ক এক জন প্রাচীন ঋষি ঔর্ণবাভ-এর মত উল্লেখ করেছেন। এতে বোঝা যায় গয়শিরঃ (বর্তমানে গয়া) উত্তর বৈদিক যুগে তীর্থ ছিল। উত্তর বৈদিক যুগে কুরুক্ষেত্রও তীর্থ বলে স্বীকৃত হয়েছিল। প্রাচীন কালে দুটি নদীর সংগম স্থানকে তীর্থ বলা হয়েছে। পৌরাণিক যুগে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ সৌরাষ্ট্র ও মগধে তীর্থ যাত্রার কথা আছে। খৃ-পূ ৩ শতকে অশোকের শিলালিপিতে পুণ্যার্জনের জন্য তীর্থ যাত্রার কথা আছে। লুম্বিনি ও বোধগয়াতে অশোক তীর্থ করতে গিয়েছিলেন। খৃ ২ শতকে পশ্চিম ভারতে এক জন হিন্দুধর্মাবলম্বী শক নায়ক প্রভাস, পুষ্কর ইত্যাদি তীর্থে গিয়েছিলেন। ৫ শতকে উত্তর বাংলা থেকে এক জন নেপালে বরাহক্ষেত্রে তীর্থে গিয়েছিলেন। ৬ শতকে পূর্ব মালবের এক রাজা প্রয়াগে আত্মহত্যা করেন। দুটি নদীর সংগম স্থল, দেবদেবীর মন্দির স্থান, সাধকের সিদ্ধিলাভ ক্ষেত্র ইত্যাদি তীর্থ বলে স্বীকৃত হয়। পুরাণে সাধারণত তীর্থগুলির বিস্তৃত বিবরণ আছে। স্নানের সময় মন পবিত্র ও নির্মল না থাকলে অবশ্য কোন পুণ্য হয় না। মহাভারত ও পুরাণ ইত্যাদি মিলে তীর্থ সংখ্যা বহু। এগুলির বেশির ভাগই আজ আর চিনে ওঠা সম্ভব নয়। কেবল মাত্র নামেই পর্যবসিত। সামান্য কয়েকটি তীর্থ যেমন কনখল গয়া, প্রয়াগ, বারাণসী ইত্যাদি আজও পুণ্যার্থীদের আকর্ষণ করে। কিছু তীর্থের অবশ্য নাম বর্তমানে অন্য।

মহাভারতে বহু তীর্থের নাম আছে। এই স্থানে কোন দেব বিগ্রহ ছিল কিনা তাও জানা যায় না। ঐতিহাসিক বিচারে নামগুলি সম্পূর্ণ অলস উক্তি। পুলস্ত্য (মহা ৩।৮০।-) একই তীর্থের নাম একাধিকবার উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ একই নামে একাধিক তীর্থ ছিল কিনা অস্পষ্ট। সন্ন্যাসী নামে পরজীবী সম্প্রদায় ও রাজার প্রেরিত চর ছাড়া যে যুগে এক পাও কোথাও কেউ যেত না। একটা হিউ-এন-ৎসাঙ বা একটা মার্কো-পোলো না জন্মাবার কারণ :- যশ্চেদং শৃণুয়াৎ নিত্যং তীর্থপুণ্যং সদা শুচিঃ—নাক পৃষ্ঠে

স মোদতে (মহা ৩।৮৩।৮৭) ইত্যাদি শ্লোক। পুলস্ত্যের পর (মহা ৩।৮৫।-) তীর্থগুলিকে দিক হিসাবে ধৌম্য সাজিয়েছেন। ধৌম্যের তালিকাও কল্পনা বিলাস এবং ধৌম্যও বলেছেন নাম শুনলেই পুণ্য।

পুলস্ত্য (৩।৮০-) ভীষ্মকে যে সব তীর্থের নাম বলেছিলেন সেগুলির মধ্যে অনেকগুলি আবার ঋষীণাং পরমং গুহ্যং; (৩।৮০।৮)। তীর্থগুলি ঃ পুষ্কর, জম্বুমার্গ, তণ্ডুলিকাশ্রম, অগস্ত্যসর, কণ্বাশ্রম, যযাতি-পতন, মহাকালতীর্থ, ভদ্রবট, নর্মদা, দক্ষিণসিন্ধু, চর্মণ্বতী, অর্বুদ, পিঙ্গাতীর্থ, প্রভাস, সরস্বতীসাগরসঙ্গম, বরদান, দ্বারাবতী, পিণ্ডারক, সিন্ধুসাগরসঙ্গম, দৃমী, বসুধারা, সিন্ধুউত্তম, ব্রহ্মতুঙ্গ, ইন্দ্রকুমারিকা, রেণুকাতীর্থ, পঞ্চনদ, ভীমাস্থান, মুঞ্জাগিরি, বিমলতীর্থ, মলদা, বস্ত্রাপদ, মণিমৎ, দেবিকাতীর্থ, কামাখ্যা, দীর্ঘসত্র, বিনশন, চমসোদ্ভেদ, শিবোদ্ভেদ, নাগোদ্ভেদ, শশযান, কুমারকোটি, রুদ্রকোটি, সরস্বতীসঙ্গম, সত্রাবসান, কুরুক্ষেত্র, বিষ্ণুস্থান, পারিপ্লব, শালূকিনী, সর্পদর্বী/সর্পদেবী, তরন্তুক, পঞ্চনদ, অশ্বিনোতীর্থ, বারাহতীর্থ, সোমতীর্থ, একহংস, কৃতশৌচ, মুঞ্জবট, রামহ্রদ, বংশমূলক, কায়শোধন, লোকদ্বার, শ্রীতীর্থ, কপিলাতীর্থ, সূর্যতীর্থ, গোভবন, শঙ্খিনী, অরন্তুক, ব্রহ্মাবর্ত, সুতীর্থ, অম্বুবশ্য, মাতৃতীর্থ, শীতবন, শ্বানলোমাপহ/শ্বাবিল্লোমাপহ, দশাশ্বমেধিক তীর্থ, মানুষতীর্থ, আপগা, ব্রহ্মোদুম্বর, কেদার, সরক, ইলাস্পদ, কিংদান, কিংজপ্য, কলসীতীর্থ, অনাজন্ম, পুণ্ডরীকতীর্থ, ত্রিবিষ্টপ, ফল্গকীবন, দৃষদ্বতী, সর্বদেবতীর্থ, পাণিখাত, মিশ্রকতীর্থ, ব্যাসবন, মনোজব, মধুবটী, কৌশিকীদৃষদ্বতীসংগম, ব্যাসস্থলী, কিংদত্ত, অহঃ, সুদিন, মৃগধূম, গঙ্গাহ্রদ, দেবতীর্থ, বামনক, কুলংপুন, পবনহ্রদ, অমরহ্রদ, শালিশূর্প, সরস্বতীতে শ্রীকুঞ্জ, নৈমিষকুঞ্জ, কন্যাতীর্থ, ব্রহ্মস্থান, সোমতীর্থ, সপ্তসারস্বত, ঔশনস, কপালমোচন, অগ্নিতীর্থ, বিশ্বামিত্রতীর্থ, ব্রহ্মযোনি, পৃথূদক, মধুস্রব, সরস্বতীঅরুণাসঙ্গম, শতসহস্রক, সাহস্রক, রেণুকা তীর্থ, বিমোচন, পঞ্চবট, ঔজস/ বরুণতীর্থ, কুরুতীর্থ, স্বর্গদ্বার, অনরক, সর্বদেবতীর্থ, স্বস্তিপুর, পাবন, গঙ্গাহ্রদ, আপগা, স্থাণুবট, বদরীপাচন, ইন্দ্র/রুদ্র-মার্গ, আদিত্যাশ্রম, সোমতীর্থ, দধীচতীর্থ, কন্যাশ্রম, সংনিহিতী/সন্নিহতী, কোটিতীর্থ, গঙ্গাহ্রদ, কুরুক্ষেত্র, ধর্মতীর্থ, জ্ঞানপাবন/কারাপতন, সৌগন্ধিকবন, সরস্বতী, ঈশানঅধ্যুষিত তীর্থ, সুগন্ধা, শতকুম্ভা, পঞ্চযজ্ঞা, ত্রিশূলখাত, শাকম্ভরী, সুবর্ণাখ্য/সুবর্ণাক্ষ, ধূমাবতী, রথাবর্ত, ধারাতীর্থ, গঙ্গাদ্বার, সপ্তগঙ্গা, ত্রিগঙ্গা, শক্রাবর্ত, কনখল, কপিলাবট, নাগতীর্থ, ললিতিক, গঙ্গাযমুনা সঙ্গম, সুগন্ধাতীর্থ, রুদ্রাবর্ত, জাহ্নবী-সরস্বতী সঙ্গম, ভদ্রকর্ণেশ্বর, কুব্জাম্রক, অরুন্ধতীবট, ব্রহ্মাবর্ত, যমুনাপ্রভব, দর্বীসংক্রমণ, সিন্ধুপ্রভব, বেদীতীর্থ, ঋষিকুল্যা, বাশিষ্ঠতীর্থ, ভৃগুতুঙ্গ, বীরপ্রমোক্ষ, কৃত্তিকাতীর্থ, মঘাতীর্থ, বিদ্যাতীর্থ, মহাশ্রমতীর্থ, বেতসিকা, সুন্দরিকা, ব্রাহ্মণী, নৈমিষ, গঙ্গোদ্ভেদ, সরস্বতী, বাহুদা, চীরবতী, বিমলাশোক, সরযূতে গোপ্রতার, গোমতীতে রামতীর্থ, শতসাহস্রিক, ভর্তৃস্থান, কোটিতীর্থ, বারাণসীতে কপিলাহ্রদ, মার্কণ্ডেয় তীর্থ, গোমতী গঙ্গা সঙ্গম, গয়াতে অক্ষয়বট ও মহানদী, ব্রহ্মসর, ধেনুকা, গৃধ্রবট, উদ্যন্তপর্বত, যোনিদ্বার, ফল্গু, ধর্মপৃষ্ঠ, ব্রহ্মতীর্থ, রাজগৃহ, মণিনাগ, গৌতমবনে অহল্যাহ্রদ, জনককূপ, বিনশন, গণ্ডকী, অধিবংশ্য, কম্পনা নদী, বিশালা নদী, মাহেশ্বরী ধারা, দেবতাদের পুষ্করিণী, মহেশ্বরপদ, তীর্থকোটি, নারায়ণস্থান, জাতিস্মর, বটেশ্বরপুর, বামনতীর্থ, ভরতাশ্রম, চম্পকারণ্য, জ্যোষ্ঠিল,

কন্যাসংবেদ্য, নিশ্চীরা, দেবকূট, কৌশিকহ্রদ, বীরাশ্রম, অগ্নিধারা, পিতামহসর, কুমারধারা, গৌরীশিখরে স্তনকুণ্ড, তাম্রারুণ, নন্দিনীতে কূপ, কৌশিকী, অরুণা ও কালিকা সঙ্গমে কালিকা অংশ, উর্বশীতীর্থ, সোমাশ্রম, কুম্ভকর্ণাশ্রম, কোকামুখ, সকৃৎনন্দা, সরস্বতীতে ঋষভদ্বীপ, উদ্দালক, ধর্মতীর্থ, ভাগীরথীতে চম্পা নামক স্থানে দণ্ডার্ক, দণ্ডাপর্ণ, লবেডিকা/ললিতিকা, সংবেদ্য, লৌহিত্য, করতোয়া, গঙ্গাসাগরসঙ্গম, বৈতরণীতে বিরজ, শোণ ও জ্যোতিরথীসংগম, নর্মদা ও শোণের উৎপত্তিস্থল-বংশগুল্ম, কোশলেতে ঋষভ, কোশলেতে কালতীর্থ, পুষ্পবতী, বদরিকা, মহেন্দ্রপর্বতে রামতীর্থ, মতঙ্গের কেদারতীর্থ, শ্রীপর্বতে নদী, শ্রীপর্বতে দেবহ্রদ, পাণ্ড্যতে ঋষভ পর্বত, কাবেরী, সমুদ্রতীরে কন্যাতীর্থ, গোকর্ণ, গায়ত্রী, সংবর্তবাপী বেন্না, গোদাবরী, বেন্নাসঙ্গম, বরদাসঙ্গম, ব্রহ্মস্থান/ব্রহ্মস্থূণা, কুশপ্লবন, কৃষ্ণবেন্না জলোদ্ভব দেবহ্রদ, জ্যোতির্মাত্রহ্রদ/জাতিমাত্রহ্রদ, কন্যাশ্রম, এরপর সর্বদেব হ্রদ, জাতিমাত্র হ্রদ, পয়োষ্ণী, দণ্ডকারণ্য, শরভঙ্গাশ্রম, শুকাশ্রম, শূর্পারকে রামতীর্থ, সপ্তগোদাবর, দেবপথ, তুঙ্গকারণ্য, মেধাবিক, কালঞ্জরে দেবহ্রদ, চিত্রকূটে মন্দাকিনী, ভর্তৃস্থান, কোটিতীর্থ, জ্যেষ্ঠস্থান, শৃঙ্গবেরপুর, প্রয়াগ, প্রতিষ্ঠান, কম্বল, অশ্বতর ও ভোগবতী (এই পাঁচটি ব্রহ্মার বেদি নামেও পরিচিত), হংসপ্রপতন।

মহাভারতে এই নামগুলি এই ভাবে ক্রমিক সাজান আছে ; পুনরুক্তিও রয়েছে। অর্থাৎ ক্রমিক এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হত হয়তো এবং একই নামে একাধিক তীর্থ ছিল যেন।

তীর্থ—মন্ত্রী, পুরোহিত, যুবরাজ, সেনাপতি, দ্বারপাল, অন্তঃবেশিক, কারাধ্যক্ষ, কোষাধ্যক্ষ, ব্যয়সচিব, প্রদেষ্টা, নগরাধ্যক্ষ, কার্যনির্মাণকর্তা, ধর্মাধ্যক্ষ, সভাধ্যক্ষ, দণ্ডপাল, দুর্গপাল, রাষ্ট্রসীমাপাল, বনরক্ষক—এগুলিকে তীর্থ বলা হয়েছে। অপর দেশের এই আঠারটি তীর্থ সম্বন্ধে চর মাধ্যমে রাজারা ওয়াকিবহাল থাকতেন এবং কলকাঠি নাড়তে চেষ্টা করতেন। এটা চর ব্যবস্থার একটা দিক। নিজের দেশের প্রথম তিন জনকে বাদ দিয়ে বাকি ১৫-টি তীর্থেও চর ব্যবস্থা ছিল। এই ১৮-টি বিভাগ রাজা নিজে চালাতেন ; এর জন্য অর্থ ব্যবস্থাও করতেন। বহু স্থানে দেখা যায় সেনা বিভাগের কোষাধ্যক্ষ ও অন্যান্য বিভাগের কোষাধ্যক্ষ বিভিন্ন ব্যক্তি ; অর্থাৎ দুটি আলাদা দপ্তর।

তীর্থংকর—যিনি তীর্থ করেন। জৈন (দ্রঃ) শাস্ত্রে এর অর্থ একটু আলাদা। সাধু, সাধ্বী এবং শ্রাবিকা সংঘও তীর্থ। যাঁরা কেবল-জ্ঞান লাভ করে এই রকম সংঘ স্থাপন করেন তাঁদের তীর্থংকর বলা হয়। তীর্থংকরদের উপদেশমালা হচ্ছে শ্রুতি-সাহিত্য। বন্ধন মুক্ত কেবলীরা সামান্য কেবলী। কেবল-জ্ঞানলাভ করে যাঁরা তীর্থ প্রতিষ্ঠা করেন তাঁরাই তীর্থংকর। জৈনধর্মে অবতার নেই। তীর্থংকররা ফলে বহু জ্ঞানের অধিকারী পরিপূর্ণ মুক্ত আত্মা। জৈন সাহিত্যে ২৪ জন তীর্থংকর ছাড়াও কিছু অতীত ও ভবিষ্যৎ তীর্থংকরদের উল্লেখ আছে। ঋষভদেব=আদিনাথ (লাঞ্ছন বৃষ), অজিতনাথ (হস্তী), সম্ভবনাথ (অশ্ব), অভিনন্দন (বানর), সুমতিনাথ (ক্রৌঞ্চ), পদ্মপ্রভু (পদ্ম), সুপার্শ্বনাথ (স্বস্তিক), চন্দ্রপ্রভনাথ (চন্দ্র), সুবিধিনাথ (লাঞ্ছন, পুষ্পদন্ত বা কুমীর), শীতলনাথ (শ্রীবৎস), শ্রেয়াংসনাথ (গণ্ডার);

বাসুপূজ্য (মহিষ), বিমলনাথ (বরাহ), অনন্তনাথ (চিল), ধর্মনাথ (বজ্র), শান্তিনাথ (হরিণ), কুন্থুনাথ (অজ), অরনাথ (নন্দ্যাবর্ত), মল্লিনাথ (কলস), মুনিসুব্রত (কচ্ছপ), নমিনাথ (নীলপদ্ম), নেমিনাথ (শঙ্খ), পার্শ্বনাথ (ক্ষুরযুক্ত সর্প), মহাবীর (সিংহ)।

তীর্থপুরী—পশ্চিম তিব্বতে কৈলাস পর্বতের পশ্চিমে। দাঁচন বা গঙ্গরি থেকে ২১ মাইল। সাটলেজ নদীর তীরে। দুলজু থেকে উ-পশ্চিমে হাঁটাপথে আধবেলা। এখানে একটি উষ্ণ প্রস্রবণ রয়েছে। এখানে এক গাদা ছাই দেখান হয়; ভস্মাসুর বা বৃকাসুরের ভস্মাবশেষ বলে। মহাদেবের মন্দির-গুহাতে গুপ্তেশ্বর নিহত হয়। মহাদেবের বর ছিল যার মাথা স্পর্শ করবে সেই ভস্ম হয়ে যাবে এবং মহাদেবেরই মাথা স্পর্শ করতে যায়। শিব পালিয়ে বিষ্ণুর কাছে আশ্রয় নেন। বিষ্ণু বুঝিয়ে অসুরকে নিজের মাথা স্পর্শ করতে বলেন ইত্যাদি। অন্য কাহিনীও আছে।

তুখার—তুষার। বালখ্, ব্যাকট্রিয় (গ্রীক), তোখরিস্তান (আরব) মিলে ইউচি দেশ। ইন্দো-সিদিয়ান দেশ। কনিষ্ক ছিলেন ইউচি। একটি মতে অক্সাস উপত্যকার ওপর অংশ এবং বালখ্ ও বদক্সান মিলে তুখার। তোখরি-দের দেশ। নকুল দেশটি জয় করেন। অশ্বের জন্য বিখ্যাত।

তুগ্র—ঋক্‌বেদে এক বিখ্যাত রাজা। রাজপুত্রকে বহু সৈন্য দিয়ে সমুদ্রপথে দ্বীপান্তরে শত্রু জয় করতে পাঠান। সমুদ্রে বেশ অনেকটা এগিয়ে গেলে ঝড়ে এদের নৌকা উল্টে যায় এবং রাজপুত্র ও সৈন্যেরা জলে পড়ে যান। রাজপুত্র তখন অশ্বিনীদেবদের প্রার্থনা করলে অশ্বিনীদেবরা এদের সকলকে জল থেকে তুলে প্রাসাদে পাঠিয়ে দেন।

তুঙ্গকারণ্য—মহাভারতে (১।৮৩।৪৩) এইখানে সারস্বত ঋষি (অঙ্গিরসের ছেলে) ব্রাহ্মণদের আবার বেদ পাঠ করান। দেবতারা এখানে ভৃগুকে দিয়ে যজ্ঞ করিয়েছিলেন।

তুঙ্গভদ্রা—তুঙ্গবেণী। কৃষ্ণার একটি করদা শাখা। তুঙ্গ ও ভদ্রা নদী মিলে গঠিত। দুটি নদীই মহীশূরের দ-পশ্চিম প্রান্তে গঙ্গা-মূল থেকে উৎপন্ন। তুঙ্গভদ্রা তীরে কিষ্কিন্ধ্যা।

তুণ্ড—দ্রঃ- অশোক সুন্দরী, নহুষ। অনেক সময় হুণ্ড নামে পরিচিত।

তুণ্ডিকের—অবন্তি (?)। একটি দেশ; এখানকার অধিবাসীরা কুরুক্ষেত্রে যোগ দিয়েছিল।

তুম্বুর—বিন্ধ্য পাহাড়ে একটি দেশ।

তুম্বুরু—এক জন গন্ধর্ব। বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী। ব্রহ্মার কাছে সঙ্গীত শিখেছিলেন। চৈত্র মাসে সূর্যের রথে অবস্থান করেন। প্রধা ও কশ্যপ সন্তান। তুম্বুরু, বাহু, হাহা, হূহু চার জন বিখ্যাত গন্ধর্ব। রম্ভার প্রতি আসক্ত হয়ে অনুপস্থিত থাকার জন্য প্রভু কুবেরের শাপে বিরাধ রাক্ষসে পরিণত হন। ব্রহ্মার কাছে বিরাধ অবধ্য হবার বর পান। এ'র বিকট দেহ, রক্তাক্ত কলেবর, পরণে বাঘছাল। দণ্ডকারণ্যে রাম-লক্ষ্মণ একে পরাজিত করে জীবন্ত পুঁতে ফেলেন। সুন্দর দেহ ধরে তুম্বুরু শাপ মুক্ত হয়ে বার হয়ে আসেন। তুম্বুরুর শাপে উর্বশী ও পুরূরবার (দ্রঃ) বিচ্ছেদ

ঘটেছিল। গন্ধর্বরা উর্বশীকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। তুম্বুরু পাণ্ডবদের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। যুধিষ্ঠিরকে এক শত ঘোড়া উপহার দিয়েছিলেন। পূর্ণিমার দিন গন্ধমাদন পর্বতে তুম্বুরুর গান শোনা যায়। দ্রঃ- তাম্বুরো।

তুরুষ্ক—পূর্ব তুর্কিস্তান (গরুড়-পু)।

তুর্কিস্তান—শাকদ্বীপ, রসাতল, পাতাল। কেতুমালবর্ষ দেশ।

তুর্বশ—ঋকবেদে (১৷৫৪৷৬) এক রাজা।

তুর্বসু—যযাতি দেবযানীর এক ছেলে। তুর্বসুর ভাই যদু। তুর্বসু জরা নিতে রাজি না হলে যযাতি (দ্রঃ) শাপ দেন। তুর্বসু > বহ্নি > গোভানু > ত্রৈসানু > করন্ধম > মরুত্ত > সম্মতা (হরি ১৷৩২৷৭৯)। ভাগবতে (৯৷২৩৷১৭) তুর্বসু > বহ্নি > ভর্গ > ভানুমান > ত্রিভানু > করন্ধম। দ্রঃ- হেহয়।

তুলজাভবানী—ভবানীনগর তুলজাভবানী নগর, তুলজাপুর। খাণ্ডয়া স্টেসন থেকে ৪ মাইল ; নিমর জেলাতে ; বর্তমানে নলদুর্গ জেলাতে। সোলাপুর স্টেসন থেকে ২৮ মাইল। একটি পীঠস্থান। এখানে মহিষাসুর নিহত হয়। দেবী এখানে মহাসরস্বতী, তুকাই।

তুলসী—রাধার সহচরী গোপী। স্বর্গে এক দিন কৃষ্ণের সঙ্গে তুলসীকে বিহার করতে দেখে রাধিকা একে মানবী হয়ে জন্মাবার শাপ দেন। অন্য মতে লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গা তিন জনে বিষ্ণুর স্ত্রী। বিষ্ণু ও গঙ্গাকে পরস্পরের প্রতি এক দিন বিশেষ ভাবে অনুরক্ত হয়ে উঠতে দেখে লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গা তিনজনের মধ্যে হাতাহাতি আরম্ভ হয়ে যায় এবং সরস্বতী শাপ দেন লক্ষ্মী পৃথিবীতে গাছ হয়ে জন্মাবেন। গঙ্গা এই শাপ দেওয়া সহ্য করতে না পেরে সরস্বতীকে নদী হয়ে জন্মাবার শাপ দেন এবং সরস্বতীও পাল্টা শাপ দেন গঙ্গা নদী হয়ে জন্মাবেন। এই সব ঝগড়া মিটলে বিষ্ণু লক্ষ্মীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন পৃথিবীতে রাজা ধর্মধ্বজের মেয়ে হয়ে জন্মাবেন। তারপর গাছে পরিণত হবেন এবং এই গাছ ত্রিভুবনকে পবিত্র করে দেবে। গাছের নাম হবে তুলসী। শঙ্খচূড় দৈত্যের সঙ্গে বিয়ে হবে ; এবং শেষ অবধি লক্ষ্মী গোলকে ফিরে আসবেন। পবিত্র নদী পদ্মাবতীও লক্ষ্মীর অংশে উৎপন্ন হবে।

লক্ষ্মী তার পর ধর্মধ্বজের (দ্রঃ- বৃষধ্বজের) স্ত্রী মাধবীর গর্ভে জন্মান। দেবী-ভাগবতে (৯৷১৭) মাধবী গন্ধমাদনে বিহার করে কাটাচ্ছিলেন। শতবর্ষ গর্ভ-বাসের পর কার্তিকী পূর্ণিমাতে সোমবারে তুলসী জন্মান। দেবী-ভাগবতে জন্মেই বদরিকাতে লক্ষ বছর তপস্যা ; এবং ব্রহ্মা বর ইত্যাদি ছাড়াও ১৬-অক্ষর মন্ত্র দেন; রাধিকার ভয় আর থাকবে না। অন্য মতে একটু বয়স হলে বনে গিয়ে ব্রহ্মার তপস্যা করে নারায়ণকে স্বামী রূপে চান। ব্রহ্মা বর দেন কৃষ্ণের অঙ্গজাত সুদামের স্ত্রী হতে হবে পরে বিষ্ণুকে পাবেন; এবং নারায়ণের নির্দেশ মত তুলসী গাছ হয়েও জন্মাতে হবে ; তুলসী না হলে নারায়ণের পূজা হবে না। রাধিকার শাপে সুদামা শঙ্খচূড় (দ্রঃ) দানব হয়ে জন্মান এবং যথা সময়ে তুলসীর সঙ্গে বিয়ে হয়। শঙ্খচূড়ের বর ছিল তাঁর স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট হলে তবেই তাঁর মৃত্যু হবে। শঙ্খচূড়ের অত্যাচারে দেবতারা ব্রহ্মাকে

নিয়ে শিবের শরণ নিলে শিব সকলকে নিয়ে নারায়ণের কাছে আসেন। ঠিক হয় শিব দৈত্যের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন এবং নারায়ণ এদিকে তুলসীর সতীত্ব নষ্ট করবেন। শঙ্খচূড়ের বেশে নারায়ণ এসে তুলসীকে সম্ভোগ করতে থাকেন। কিন্তু তুলসীর সন্দেহ হয় এবং শঙ্খচূড়বেশী এই বঞ্চককে পাষাণে পরিণত হবার শাপ দেন। বিষ্ণু তখন নিজের মূর্তি ধরে জানান সুদাম শঙ্খচূড় হয়ে জন্মেছিলেন ; তার শাপমুক্তির সময় এসেছিল। এই জন্য তিনি বাধ্য হয়ে এই কাজ করেছেন ; এবং তুলসীকে দেহত্যাগ করতে বলেন ; তাঁকে সঙ্গে করে গোলকে নিয়ে যাবেন। বিষ্ণু আরো বলেন তুলসীর দেহ গণ্ডক নদীতে পরিণত হবে। লক্ষ্মীর মত তুলসীও নারায়ণের প্রিয় হবেন। তুলসী তখন লক্ষ্মীর রূপ ধরে গোলকে ফিরে যান। শঙ্খচূড়ের হাড় লবণ সমুদ্রে ফেলে দিলে এই হাড় থেকে দেব পূজার জন্য নানা রকম শঙ্খের জন্ম হয়।

তুলাধার—বারাণসীতে একজন ধার্মিক ব্রহ্মজ্ঞানী বণিক। মহর্ষি জাজলি (দ্রঃ) এ'র কাছে জ্ঞান লাভ করেন (মহা ১২।২৫৩।৮)।

তুলুভ—তুলুঙ্গ। দক্ষিণ কানাড়া। পশ্চিমঘাট ও সমুদ্রের মধ্যে। কল্যাণপুর ও চন্দ্রগিরি নদীর মাঝখানে। এখানে মাধবাচার্যের জন্ম। মতান্তরে এটি বর্তমানের মালয়ালম। দ্রঃ- মালাবার।

তুষার—প্রাচীন ভারতে একটি দেশ। বর্তমানের (?) তুখারিস্তান। এদের তুষার বলা হত; রাজাও এখানে তুষার নামে পরিচিত। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে এই তুষার-রাজ ভাণ্ডার রক্ষক ছিলেন। বনবাসের সময় এই রাজ্য অতিক্রম করে পাণ্ডবরা দ্বৈত বনে গিয়েছিলেন। শান্তি পর্বে আছে মান্ধাতার দেশে তুষার নামে একটি বর্বর জাতি বাস করত। ক্রৌঞ্চব্যূহেও (মহা ৬।৭১।২০) তুষাররা উপস্থিত ছিল।

তুষিত—চাক্ষুষ মন্বন্তরে বার জন দেবতা বৈবস্বত মন্বন্তরে আদিতির পুত্র হয়ে জন্মান। বৈবস্বতে এ'রা বার জন আদিত্য।

তুষ্টি—(১) দক্ষের মেয়ে ; ধর্মের স্ত্রী। (২) চন্দ্রের কলা:- পূষা, যশা, সুমনা, রতি, প্রাপ্তি, ধৃতি, ঋষি, সৌম্যা, মরীচি, অংশুমালিনী, অঙ্গিরা, শশিনী, ছায়া, সম্পূর্ণমণ্ডলা, তুষ্টি, অমৃতা। তন্ত্র মতে নাম অমৃতা, মানদা, পূষা, পুষ্টি, তুষ্টি, রতি, ধৃতি, শশিনী, চন্দ্রিকা, কান্তি, জ্যোৎস্না, শ্রী, প্রীতি, রঙ্গদা, পূর্ণা, অপূর্ণা। রঙ্গদা ও অপূর্ণার বদলে অঙ্গদা ও পূর্ণামৃতা নামও দেখা যায়। বহু মতে (রঘুনন্দন) অমা আর একটি কলা।

তৃণবিন্দু—(১) অলম্বুষার স্বামী। ভাগবতে (৯।২) দিষ্ট (দ্রঃ) বংশে জন্ম। কয়েকটি ছেলে ও মেয়ে ইলবিলা। উল্লেখযোগ্য তিন ছেলে বিশাল (দ্রঃ), শূন্যবন্ধু ও ধূম্রকেতু। দ্রঃ- ইন্দুমতী। (২) একজন মুনি। ঋষিতীর্থে তপস্যা করতেন। মেয়ে মালিনী, রাবণের মাতামহী। পুলস্ত্য যখন হিমালয়ে তপস্যা করছিলেন তখন কয়েক জন গন্ধর্ব কন্যা সেখানে এসে নেচে গান করে বাজনা বাজিয়ে হল্লা করতে থাকেন ; তপস্যাতে বিঘ্ন সৃষ্টি করছিলেন। স্থানটি সব ঋতু উপভোগ্য ছিল। পুলস্ত্য তখন স্থানটিকে শাপ দেন ; সেখানে কোন মেয়ে ছেলে এলেই অন্য মতে 'যা মে দর্শনমাগচ্ছেৎ' (রামা ৭।২।১৩) সে গর্ভবতী হয়ে পড়বে। তৃণবিন্দুর মেয়ে মালিনী না জেনে এখানে এসে,

একটি মতে বেদ পাঠ শোনেন এবং গর্ভবতী হন ; মালিনী তখন পিতাকে গিয়ে সব কথা জানান এবং তৃণবিন্দু এসে পুলস্ত্যকে অনুরোধ করে এঁদের দুজনের বিয়ে দেন এবং ছেলে হয় বিশ্রবা।

হনুমান একবার বিবদমান একটি সিংহ ও হাতীকে তৃণবিন্দুর আশ্রমের দু দিকে বেঁধে রাখেন। তৃণবিন্দু আশ্রম থেকে বার হতে গিয়ে প্রথমে ভয় পেয়ে যান। ধ্যানে জানতে পারেন হনুমান এই কাজ করেছেন। মুনি তখন শাপ দেন হনুমানের সমস্ত দৈবী ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাবে। হনুমান তখন স্তবস্তুতি করলে তৃণবিন্দু বলেন সীতা অন্বেষণে বার হলে অন্য কোন বানরে যদি হনুমানকে তার ক্ষমতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় তাহলে তখনই হনুমান আবার নিজের বল ফিরে পাবেন। জাম্ববান (দ্রঃ) হনুমানকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। (৩) কাম্যক বনে একটি হ্রদ।

তৃণাবর্ত—কংসের অনুচর এক জন অসুর। তারকাসুরের ছেলে। কৃষ্ণকে বধ করার জন্য কংস একে গোকুলে পাঠিয়েছিলেন। অসুর ঘূর্ণিবায়ু হয়ে কৃষ্ণকে (দ্রঃ) আকাশে তুলে নিয়ে পালাতে চেষ্টা করলে কৃষ্ণ ভীষণ ভারী হয়ে ওঠেন। কৃষ্ণকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে না। আকাশে কিছুটা তুলে নিয়েছিল এবং কৃষ্ণ এর গলা টিপে ধরেন। ফলে অসুরটি আকাশ থেকে নীচে পড়ে মারা যায়।

তৃতীয়া—গয়াতে তিলিয়া নদী (অগ্নি)।

তৃষ্ণাপল্লী—ত্রিশিরপল্লী। ত্রিচিনোপল্লী। মাদ্রাজ প্রদেশে। রাবণের সেনাপতি ত্রিশিরার দেশ।

তেজবতী—অগ্নির পুরী। মেরু (দ্রঃ) পর্বতে দ-পূর্ব কোণে। পশ্চিমে বরুণালয় ; নাম শ্রদ্ধাবতী।

তেলকুপি—২৩°৩৮′ উ×৮৬°৩৫′পূ ; প্রাচীন নাম তৈলকম্পী। দামোদর বাঁধ দেবার জন্য জলমগ্ন হয়ে গেছে। পঞ্চকোটের শিখর রাজবংশের রাজা রুদ্রশিখরের রাজধানী। এঁরা আসলে জমিদার ; এবং ১৯৫৭ সালে বাঁধ তৈরির আগে পর্যন্ত এঁরা এখানকার মন্দিরগুলির সত্ত্বাধিকারী ছিলেন এবং সমস্ত ব্যয়ভার চালাতেন। এখানে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর ও জৈন বহু মন্দির ছিল। ৯ম-১৬ শতক পর্যন্ত এখানে মন্দির তৈরি হয়েছে। ১৬-টি শিব মন্দির, ৩-টি সূর্য মন্দির, দুটি বিষ্ণু মন্দির ছিল। ১৫-১৬ শতকে নির্মিত ভৈরবনাথের মন্দিরটিকে পবিত্রতম মনে করা হয় ; এই মন্দিরে জৈন শাসন দেবী অম্বিকার একটি প্রাচীন মূর্তি ছিল। মন্দির শিল্পে উত্তর ভারত, উড়িষ্যা ও বাঙ্গলার শৈলী মেশান। মন্দিরের গায়ে সে রকম ভাস্কর কৃতি ছিল না।

তৈজসতীর্থ—সত্যযুগের প্রারম্ভে দেবতারা বরুণকে নদীপতি হতে বলেন। সমুদ্রে বাস করবেন ইত্যাদি। বরুণ সম্মত হন। তৈজসতীর্থে বরুণের অভিষেক হয়। (কা-প্র ১।৪৮)।

তৈত্তিরীয়—কৃষ্ণযজুর্বেদে। অতি প্রাচীন। কৃষ্ণ যজুর্বেদের ব্রাহ্মণ। যাজ্ঞিকদের সর্ব প্রধান উপজীব্য গ্রন্থ। তৈত্তিরীয় উপনিষদে ওঁ-উপাসনা রয়েছে ; শঙ্কর, মধ্ব ও রামানুজ ভাষ্য বর্তমান। তৈত্তিরীয় নাম সম্বন্ধে কাহিনী আছে ঃ—

বৈশম্পায়ন (দ্রঃ) ব্রহ্ম নামে এক ব্যক্তিকে হত্যা করে প্রায়শ্চিত্তের জন্য শিষ্যদের যজ্ঞ করতে বলেন। কিন্তু শিষ্যদের মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্য (দ্রঃ) অসম্মত হলে বৈশম্পায়ন তাঁকে শিষ্যত্ব ত্যাগ করতে বলেন। যাজ্ঞবল্ক্য তখন শিষ্যত্ব ত্যাগ করে গুরুর দেওয়া উপদেশ উগরে ফেলে দেন। অন্য শিষ্যরা তখন তিতির পাখী হয়ে সেগুলি গ্রহণ করে তৈত্তিরীয়/তৈত্তিরেয় ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হন। বুদ্ধির মালিন্য হেতু এই যজুঃগুলি কালো হয়ে গিয়েছিল বলে অন্য নাম কৃষ্ণ যজুর্বেদ। বা সংহিতা ও ব্রাহ্মণ মিশে থাকার জন্য নাম কৃষ্ণ যজুর্বেদ। সায়ণ আচার্য এই শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

তৈল—সিন্ধু সভ্যতার যুগে হরপ্পায় তিলের চাষ ও তৈল ব্যবহারের প্রমাণ আছে। বৈদিক যুগে তিল ও সর্ষপ ব্যবহার হত।

তোণ্ডমণ্ডল—দ্রাবিড়ের অংশ। রাজধানী ছিল কাঞ্চিপুর। প্রবাদ কুরুম্বর ভূমি নামক বনে কুলোতুঙ্গ চোল এই কাঞ্চিপুর নির্মাণ করান। পরে অংশটি তোণ্ডমণ্ডল নামে পরিচিত হয়।

তোমর—আসামের দ-পশ্চিম প্রান্তে গারো পর্বতের অধিবাসী; এলাকাটিরও নাম তোমর (=গারোপর্বত)।

তোমর—লোহার শাবল মত অস্ত্র। তিনটি শ্রেণী। উত্তম তোমর পাঁচ হাত মত; মধ্যম সাড়ে চার হাত এবং অধম চার হাত মত। আর এক শ্রেণীর হিসাবে উত্তম ১৬-আঙুল, মধ্য সাড়ে পাঁচ এবং অধম পাঁচ আঙুল।

তোসলি—তোসলে (টলেমি)। অশোকের ধৌলি লেখে উল্লিখিত। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে এটি কোসলক, বৃহৎসংহিতাতে কোসল। অশোকের সময়ে দ-কোসল বা গণ্ডোয়ানার অংশ।

ত্বষ্টা—পুরাণে বিশ্বকর্মা। বেদে শিল্পী; বজ্র নির্মাণ করেন (ঋক্ ১।৩২।২)। মহাভারতে (৩।১০০) বজ্র নির্মাতা। ব্রহ্মণস্পতির লোহার কুঠারে ধার দিয়ে দিয়েছিলেন; দেবতাদের পানপাত্র তৈরি করে দিতেন (ঋক্ ১০।৫৩।৯)। কাঠের পানপাত্র চমস তৈরি করেছিলেন। ত্বষ্টার হাতে লৌহময় বাঁশী; ছুতারের কুঠার। ভাগবতে ও অন্য পুরাণে ত্বষ্টার ছেলে ত্রিশিরা। ত্রিশিরা (দ্রঃ) মারা গেলে প্রতিশোধ নেবার জন্য যজ্ঞ থেকে বৃত্রকে (দ্রঃ) সৃষ্টি করেন। নিঘণ্টুতে ত্বষ্টা মধ্যস্থানের অর্থাৎ অন্তরীক্ষের দেবতা। ভাগবত পুরাণে একজন আদিত্য। বনপর্বে সূর্যের এক নাম ত্বষ্টা। পুরাণে ত্বষ্টা ফাল্গুনের আদিত্য (স্কন্দ ১০।১।৬৬); বৃহৎ-দেবতায় আদিত্য; আবার বহু স্থানে আদিত্যদের নামের তালিকাতে ত্বষ্টার বদলে দক্ষ নাম রয়েছে। ঋক্‌বেদে ত্বষ্টাকে সবিতা ও অসুরত্বের অধিকারী বলা হয়েছে (ঋক্ ৩।৫৫।১০)। ২।১।৫ ঋকে ত্বষ্টাকে অগ্নি বলা হয়েছে; পৃথিবী ও বিশ্বভুবনকে রূপময় করেছেন। বিশ্বভুবন সৃষ্টি করেছেন (শুক্ল যজু ২।৯)। শকপূণি বলেছেন ত্বষ্টা অগ্নি। যাস্ক ত্বষ্টা শব্দের নানা অর্থ করেছেন। বৃহৎ-দেবতাতে (১৫।১৬) ত্বষ্টা পার্থিব অগ্নি। ভাগবতে বিশ্বকর্মা বজ্র তৈরি করেছিলেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে বিশ্বকর্মা ও ত্বষ্টা অভিন্ন। মহাভারতে বিশ্বকর্মা তিলোত্তমাকে সৃষ্টি করেন। ঋক্ দশম মণ্ডলে বিশ্বকর্মা বিশ্বভুবনে যজ্ঞ করেন;

তিনি আমাদের পিতা (ঋক্ ১০।৮১।২) ; ঋষিঃ হোতা ন্যসীদৎ পিতা নঃ। এই বিশ্বকর্মা বিশ্বতঃ বাহু, বিশ্বতস্পাৎ দ্যুলোক ও ভূলোক রচনা করেছেন (ঋক্ ১০।৮৩।৩)। এই সব বর্ণনার মধ্য দিয়ে বিশ্বকর্মাকে সব কিছুর সৃষ্টি কর্তা বলা হয়েছে। কৃষ্ণ-যজু'বেদেও ভূমি নির্মাণ করেছেন ইত্যাদি। অথর্ববেদে (২০।৫।৬২) বিশ্বকর্মা ইন্দ্র ও সূর্যের ওপরে। যাস্ক বলেছেন বিশ্বকর্মা সর্বস্য কর্তা এবং বৃহৎ-সংহিতাতে (২।৫১) বর্ষাকালীন সূর্য্য। বৈদিক বিশ্বকর্মা সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। বৈদিক ত্বষ্টা (ঋক্ ৫।৩১।৪) বজ্র, চমস ইত্যাদি নির্মাতা।

বহু সময় বিশেষণ হিসাবে ব্যবহৃত 'বিশ্বকর্মা' বহু বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। মোটামুটি বৈদিক যুগে বিশ্বকর্মা ত্বষ্টা থেকে লক্ষগুণ যেন বড়। একজন বিশ্ব কর্মা আর ত্বষ্টা চমস্ তৈরি করেন, কুঠারে ধার দেন ইত্যাদি। পুরাণে বিশ্বকর্মা দেবতাদের অস্ত্র ও পুরী ইত্যাদি তৈরি করেন, ত্বষ্টাকে প্রায় পাওয়াই যায় না। পুরাণে সূর্যের তেজ কমান, বিষ্ণুর চক্র, শিবের ত্রিশূল, যমের দণ্ড ইত্যাদি বিশ্বকর্মা তৈরি করেন। কৃষ্ণযজুর্বেদে (১।১।৫) এই বিশ্বকর্মা বিশ্বের আয়ু ইত্যাদি ইত্যাদি। লঙ্কাপুরী বিশ্বকর্মার তৈরি। দ্রঃ-নল। ভরতকে আপ্যায়ন করার জন্য ভরদ্বাজ মুনি বিশ্বকর্মাকে দিয়ে অতিথি শালা ইত্যাদি এবং হরিবংশে শ্রীকৃষ্ণ একে দিয়ে দ্বারকাপুরী নির্মাণ করিয়েছিলেন। বিষ্ণুপুরাণে বিশ্বকর্মা দেবতাদের বিমান ও অলঙ্কার ইত্যাদি তৈরি করে দেন। মৎস্যপুরাণে (৪।২৭) বিশ্বকর্মা বসু প্রভাসের ছেলে। বিষ্ণুপুরাণে (১৫।১১৯) প্রভাস ও বৃহস্পতির-বড়-বোন বরস্ত্রীর সন্তান। বিষ্ণু পুরাণে বিশ্বকর্মার চার ছেলে অজৈকপাদ, অহিবুর্ধ্ন্য, ত্বষ্টা ও রুদ্র হরিবংশে প্রজাপতির পুত্র বিশ্বকর্মা ; বহু স্থানে বিশ্বকর্মার মেয়ে সংজ্ঞা। মহাভারতে (উদ্যোগ ৯।৩) ও দেবী ভাগবতে (২।৬।২৯) ত্বষ্টা প্রজাপতিঃ আসীৎ। প্রজাপতিকে যাস্ক বলেছেন প্রজাদের পালক। ব্রাহ্মণগ্রন্থে প্রজাপতি দেবতাদের পিতা। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে প্রজাপতির অপর নাম ব্রহ্মা। শতপথে (২।২।১) সৃষ্টির আগে প্রজাপতি ছিলেন। কৃষ্ণ যজুর্বেদে প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করেছিলেন। কৃষ্ণ যজুর্বেদে (৫।৫।৭।৫) প্রজাপতি ও বিশ্বকর্মা দুজন দেবতা। শতপথে প্রজাপতি ও ইন্দ্র একই দেবতা। প্রজাপতি দক্ষ নামেও পরিচিত এবং প্রজাপতির একটি যজ্ঞের নাম দাক্ষায়ণ যজ্ঞ। অর্থাৎ পুরাণে ত্বষ্টা নাই ; বিশ্বকর্মা শিল্পী ও স্থপতি এবং প্রজাপতি শিল্পী ও স্থপতি থেকে অনেক বড় ; তিনি জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ার ; দেবতা, প্রাণী, উদ্ভিদ ইত্যাদির সৃষ্টিকর্তা ; সব মিলে চরম বিভ্রান্তি। শুক্রের এক ছেলে ত্বষ্টাবর (অবর ত্বষ্টা ?)/ত্বষ্টাধর (মহা ১।৫৯।৩৬) : ইনি অসুর যাজক।

অন্য মতে কশ্যপ সুরভির সন্তান এগার জন রুদ্র। শিবের বরে সুরভির আর পাঁচটি ছেলে হয় অজ, একপাৎ, অহিবুর্ধ্ন্য, ত্বষ্টা ও রুদ্র। ত্বষ্টার স্ত্রী রচনার (ভাগ ৬।৬।৪৪) বা বিরোচনার (দ্রঃ) বড় ছেলে সন্নিবেশ এবং ছোট ছেলে ত্রিশিরা (দ্রঃ) = বিশ্বরূপ। ত্রিশিরার সৃষ্টি হয়েছিল ইন্দ্রকে নিধন করার জন্য। ত্রিশিরা মারা গেলে ইন্দ্রকে বধ করার জন্য ত্বষ্টা (ভাগবতে ৬।৯।৩) দক্ষিণ অগ্নিকুণ্ডে 'ইন্দ্রশত্রু' বলে আহুতি,

দিয়ে বৃত্রকে সৃষ্টি করেন। শেষ পর্যন্ত ত্বষ্টা ইন্দ্রকে শাপ দেন পুত্র শোক পেতে হবে এবং মেরু পর্বতে তপস্যা করতে চলে যান। ত্বষ্টাকে অনেক সময় রুদ্রও বলা হয়েছে। খাণ্ডব দাহনের সময় ত্বষ্টা ইন্দ্রের সঙ্গী হিসাবে কৃষ্ণার্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। ইন্দ্রের সভায় ত্বষ্টা শোভা বর্দ্ধন করেন। ত্বষ্টার মেয়ে কশেরু। নরকাসুর একে অপহরণ করেন। নল (দ্রঃ-চিত্রাঙ্গদা) বানর এই ত্বষ্টার ছেলে। দ্রঃ-সরণ্যু, আদিত্য।

ত্বষ্টাধর—শুক্রাচার্যের ছেলে। আর এক ছেলে অত্রি। মহাভারতে (১।৫৯।৩৬)-নাম ত্বষ্টাবর (দ্রঃ); অসুর যাজক।

ত্বাষ্ট্রী—সবিতার স্ত্রী। বড়বা রূপধারিণী; অন্তরীক্ষে অশ্বিনী দু জনকে জন্ম দেন (মহা ১।৬০।৩৪)।

ত্যাজ্য—স্নাত অশ্ব, মদমত্তহস্তী, রিরংসু বৃষ, দুষ্ট পণ্ডিত, দুষ্ট কাজ, অস্বাস্থ্য-কর স্থান, দুষ্টখাদ্য ও দুষ্টাস্ত্রী।

ত্রয্যারুণ—ত্রিশঙ্কুর পিতা।

ত্রসদস্যু—ইক্ষ্বাকু বংশে একজন পুণ্যশ্লোক রাজা। যুবনাশ্ব>মান্ধাতা>পুরুকুৎস> ত্রসদস্যু। দস্যুদের ত্রাস সৃষ্টি করেছিলেন বলে এই নাম। এক জন রাজর্ষিতে পরিণত হন। অশ্বিনীদেবরা এক বার এঁকে পরাজয় থেকে রক্ষা করেন। এক বার অগস্ত্য, শ্রুতর্বা, এবং বধ্র্যশ্ব তিনজন মুনি এঁর দেশে আসছেন খবর পেয়ে রাজা তাঁর রাজ্যের সীমানাতে গিয়ে এঁদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসেন। এরা কিছু অর্থ চেয়েছিলেন; কিন্তু রাজার দেবার কোন সঙ্গতি ছিল না (মহা ৩।৯৬।১৪)। (২) মান্ধাতা (দ্রঃ)।

ত্রসরেণু—ওজনের (দ্রঃ) পরিমাণ।

ত্রি-ঋষি—যুক্ত প্রদেশে নৈনিতাল হ্রদ। হ্রদের তীরে নয়নাদেবীর মন্দির রয়েছে।

ত্রিকলিঙ্গ—তৈলিঙ্গন (<ত্রিকলিঙ্গ), তিলিঙ্গ। প্লিনি অনুসারে স্থানটিতে কলিঙ্গ, মকো (মধ্য) কলিঙ্গ ও গাঙ্গেরিড-কলিঙ্গরা বাস করতেন। এখানে কলিঙ্গ অর্থে প্রকৃত কলিঙ্গ, মধ্যকলিঙ্গ=উড়িষ্যা এবং গাঙ্গেরিড কলিঙ্গ–রাঢ়। রাঢ়ের রাজধানী ছিল সপ্তগ্রাম। দ-কোসলের বা মধ্যপ্রদেশের রাজাদের ত্রিকলিঙ্গ-রাজ বলা হত। মতান্তরে ত্রিকলিঙ্গ=কৃষ্ণা তীরে ধনকটক বা অমরাবতী,+অন্ধ্র বা ওয়ারঙ্গল+ কলিঙ্গ বা রাজমহেন্দ্র (টলেমি)। গোদাবরী ও কৃষ্ণার মধ্যবর্তী এলাকাকে তৈলিঙ্গন বলা হয়েছে। অশোকের শিলালেখে তৈলিঙ্গন–সাতিয়পুত্র; তিলিঙ্গ দেশের রাজধানীকে বলা হয়েছে কোলো/গোলো কণ্ডাই। দ্রঃ-অন্ধ্র।

ত্রিকায়তত্ত্ব—ধর্মকায়বুদ্ধ পরমদেবতা; সম্ভোগকায় বুদ্ধ ধ্যানীবুদ্ধ; নির্মাণকায় বুদ্ধ মানুষীবুদ্ধ।

ত্রিকূট—(১) সুমেরু পাহাড়ের ছেলে; ক্ষীরোদ সাগর থেকে উদ্গত। এর তিনটি শৃঙ্গ; প্রথমটি সোনার, দ্বিতীয়টি রূপার এবং তৃতীয়টি বৈদূর্য, ইন্দ্রনীল ইত্যাদি মণির তৈরি। তৃতীয় শৃঙ্গটি সর্বশ্রেষ্ঠ। এই ত্রিকূটে দেবর্ষিরা থাকতেন। অপ্সরা, বিদ্যা-ধর, গন্ধর্ব ও কিন্নর ইত্যাদির লীলাভূমি। (২) তিনটি শৃঙ্গযুক্ত, লবন সমুদ্রের একটি

পাহাড়। এই পাহাড়ে লঙ্কা অবস্থিত। বাসুকি ও বায়ুর মধ্যে একবার তর্ক হয় কে বড়। বাসুকি মেরু পর্বতকে জড়িয়ে ধরেন এবং বায়ু পর্বতকে উড়িয়ে নিতে চেষ্টা করেন। ঝড়ে এত ধুলা ওড়ে যে সমস্ত পৃথিবী চাপা পড়ে যায়। দেবতারা ভয়ে বিষ্ণুর শরণ নেন। বিষ্ণু বাসুকিকে বোঝালে বাসুকি মেরু পর্বতকে ছেড়ে দেন। পর্বত উড়ে এসে পড়ে। এই ত্রিকুট পাহাড়ের ওপর লঙ্কা।

(৩) সিংহলে, দ-পূর্ব কোণে। (৪) কাশ্মীরের দক্ষিণে এবং পাঞ্জাবের উত্তরে একটি সুউচ্চ পাহাড় ; অথর্ববেদে এর উল্লেখ আছে। (৫) যমুনোত্রী পর্বত ; হিমালয়ে। (৬) রঘু একটি ত্রিকূট/ত্রিগিরি জয় করেন ; এই ত্রিকূট=জুন্নর বা টগর (টলেমি)।

ত্রিকোণমিতি=রেখা গণিতের এই অংশ প্রাচীন ভারতে বেশ কিছু আলোচিত হয়েছিল। ভারতে ৩°৪৫′ অন্তর অন্তর সাইন সারণী তৈরি হয়েছিল। সাইন$^2\theta$+কস$^2\theta$=১ ; কসθ=সাইন (৯০—θ) এবং ১-কস২θ=২সাইন$^2\theta$ সূত্রগুলি ভারতীয়েরা ব্যবহার করেছিলেন। খৃ ৮-শতকে আরবরা এই বিষয়গুলি অনুবাদ করে নেন। সূর্য সিদ্ধান্তে এই রকম বহু গাণিতিক তথ্য রয়েছে এবং এগুলি ১৬-শতকের আগে ; ইউরোপে এগুলি জানা ছিল না। ভারতীয় নাম সাইন=জ্যা, কোসাইন=কোটিজ্যা ; ভারসাইন=উৎক্রমজ্যা।

ত্রি-গর্ত—বর্তমানে কাংড়া। লাহোর জেলার একটি অংশ জলন্ধর/জালন্ধর রাজ্য। মতান্তরে তাহোর/তিহোর ; সাটলেজের পশ্চিম তীরে ; লুধিয়ানা থেকে কয়েক মাইল দূরে। কাঙড়া ও জলন্ধরে অবস্থিত ; চম্পা পাহাড় ও বিয়াস নদীর ওপর অংশের মাঝখানে ; অর্থাৎ এই কাঙড়া যেন প্রাচীন ত্রিগর্ত ; মতান্তরে জলন্ধর। তিনটি নদী রাভি, বিয়াস ও সাটলেজ এখানে গর্ত করেছে। শিলালেখেও ত্রিগর্ত বর্তমান জালন্ধর। (২) উ-কানাড়া। দ্রঃ-গোকর্ণ, নগরকোট।

ত্রিচিনোপল্লি—উরগপুর (দ্রঃ), অর্গরোড (গ্রীক), নিচলপুর, তৃষ্ণপল্লী (দ্রঃ), ত্রিশিরপল্লী।

ত্রিজট—অপর নাম গার্গ্য (দ্রঃ)। পিঙ্গলবর্ণ একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। উঞ্ছবৃত্তিঃ ফালকুদ্দাললাঙ্গলী (রা ২।৩২।২২) বনে মাটিতে গর্ত করে বাস করতেন।

রাম বনে যাবার সময় দান করছেন শুনে এঁর তরুণী স্ত্রী সন্তানদের জন্য ইত্যাদি রামের কাছে যেতে বলেন। ত্রিজট শাটীম্ আচ্ছাদ্য দুশ্ছদাম্ (রা ২।৩২।৩২) সোজা রামের কাছে এসে হাজির হন। দীপ্ত তেজ ব্রাহ্মণকে কেউ বাধা দেয় না। রাম পরিহাস (রা ২।৩২।৩৬) করে এঁকে এঁর দণ্ড ছুঁড়ে দিতে বলেন। যেখানে গিয়ে পড়বে সেখান পর্যন্ত যত গরু আছে দিয়ে দেবেন। দণ্ড সরযূর অপর পারে গিয়ে পড়ে (রা ২।৩২।৩৮) ; এবং এই পর্যন্ত এলাকার সমস্ত গরুগুলি পান। পরিহাস করার জন্য ক্ষমা চেয়ে নেন এবং আরো ধন দান করেন। সভার্য ত্রিজট (রা ২।৩২।৪৩) আশীর্বাদ করে ফিরে যান।

ত্রিজটা—রাবণের অন্তঃপুরিকা এক জন রাক্ষসী। রাবণের আদেশে সীতাকে পাহারা দিত। ত্রিজটা ধার্মিক ও সরমার মত সীতার প্রতি সদয় ছিল। রাবণের আদেশে

রাক্ষসীরা সীতাকে ভয় দেখিয়ে রাবণকে বিয়ে করার জন্য চাপ দিতে থাকে ও শাসাতে থাকে। ত্রিজটা এদের থামায় এবং নিজের দুঃস্বপ্নের কথা এদের বলে (৬।২৭) ঃ—

রাম লক্ষ্মণকে অন্তরিক্ষগত দিব্য শিবিকাতে অবস্থান করতে দেখেছে এবং সীতা রামের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। তারপর রাম লক্ষ্মণকে চতুর্দন্ত মহাগজে অধিষ্ঠিত দেখে ও সীতা রামের কোলে উঠে যান। তারপর রামের কোল থেকে আকাশে উঠে চন্দ্রসূর্যকে সীতা দু-হাতে করে মুছে দিতে থাকেন দেখেছে। তিনজনে তারপর হাতীর পিঠে চড়ে লঙ্কার ওপর আসেন। তারপর আটটি ঋষভ বাহিত রথে লঙ্কাতে এসেছেন এবং তারপর পুষ্পক বিমানে চড়ে উপর দিকে চলে গেলেন। রাবণকে দেখেছিল মাথা মুড়ান, পৃথিবীতে অবস্থান করছে, লাল কাপড় পরা এবং গলায় করবীর মালা এবং পিবন্ মত্তঃ। তারপর দেখে পুষ্পক থেকে পড়ে গেছে, কালো কাপড়-পরা-রাবণের মুণ্ড একটি স্ত্রীলোক টানছে। তারপর দেখে খরযুক্ত রথে রক্তমাল্যধারণ করে চলেছে। আবার দেখে তৈল পান করছে, হাসছে, নাচছে এবং ভ্রান্তচিত্ত। গর্দভে চড়ে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আবার দেখে গাধার পিঠ থেকে মাথা নীচের দিকে করে পড়ে গেল তারপর হঠাৎ উঠে ভয়ার্ত চিত্তে প্রলাপ বকতে বকতে দুর্গন্ধ অন্ধকার মল পঙ্কে দিগ্বাসা রাবণ প্রবেশ করল। রক্তবাসিনী কর্দমলিপ্তাঙ্গী কালী প্রমদা রাবণকে গলায় দড়ি বেঁধে দক্ষিণ দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে দেখে। কুম্ভকর্ণ ও রাবণের সব ছেলেদের এই অবস্থা দেখে। আবার দেখে রাবণ বরাহের পিঠে, ইন্দ্রজিৎ শিংশুমারের পিঠে এবং কুম্ভকর্ণ উটের পিঠে চড়ে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে। আবার দেখে বিভীষণ চতুর্দন্ত হাতীর পিঠে চড়ে আকাশে অবস্থান করছে সঙ্গে চার জন সচিব রয়েছে। লঙ্কাপুরী সবাজিরথকুঞ্জরা সাগরে পড়ে যাচ্ছে দেখেছে। আরো দেখেছে রামের দূত লঙ্কা পুড়িয়ে দিয়েছে। রাক্ষসীরা তেল পান করে ভস্মরুক্ষ লঙ্কাতে হাসতে হাসতে, নাচতে নাচতে প্রবেশ করছে। কুম্ভকর্ণ ইত্যাদি রাক্ষসরা রক্তবাস পরিধান করে গোময়হ্রদে প্রবেশ করছে।

ত্রিজটা চেটীদের বারণ করে দেয় সীতার ওপর যেন অত্যাচার না করা হয়। রাবণের আদেশে এই ত্রিজটা সীতাকে পুষ্পকে করে যুদ্ধক্ষেত্রে নাগপাশে বদ্ধ রামলক্ষ্মণকে দেখিয়ে নিয়ে যায় এবং এরা জীবিত আছে বলে সান্ত্বনা দেয় (রা ৬।৪৮।২১)। লঙ্কা জয়ের পর রামচন্দ্র একে পুরস্কার দিয়েছিলেন।

ত্রিত—ইন্দ্রের সখা, ঋক্ বেদে। ত্রিতের বন্ধুত্বের জন্য ইন্দ্র ত্রিশিরাকে বধ করেন। অপ্তের ছেলে ত্রিত। ঋক্‌বেদ কয়েক স্থানে অহি বা বৃত্রের বিরুদ্ধে ত্রিত যুদ্ধ করেছিলেন। তৈত্তিরীয় সংহিতাতে অগ্নি জল থেকে একত, দ্বিত ও ত্রিত তিনটি পুরুষকে সৃষ্টি করেন। এই ত্রিত জল পান করতে গিয়ে কূপে পড়ে যান। অসুররা কূপের মুখে চাপা দিয়ে দিলে ত্রিত এই আবরণ ভেদ করে উঠে আসেন। ঋক্ বেদে আপ্তের পুত্র ত্রিত ত্রিশিরকে নিহত করেন এবং ত্রিশিরার সমস্ত গাভী অপহরণ করেন (ঋক্ ১০।৮।৮)। দ্রঃ- ত্রিশিরা, বরাহ।

আবার আছে এক গৌতম-মুনির ছেলে একত, দ্বিত ও ত্রিত। দ্রঃ- উদ্পান। (মহা ৯।৩৫।-) পিতার মৃত্যুর পর এঁরা ঠিক করেন বহু পশু সংগ্রহ করে মহাফলপ্রদ যজ্ঞ করে সোম রস পান করবেন। বহু গরু সংগ্রহ করে এঁরা বনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন ; ত্রিত সামনে ছিলেন। পথে রাত্রি হয়। পেছনে দুই ভাই পরামর্শ করে ত্রিত বেদজ্ঞ ; যজ্ঞ করে অনেক বেশি গরু সংগ্রহ করতে পারবে। তিনজনে এগোতে থাকে। পথে সামনে এক নেকড়ে বাঘ দেখে পালাতে গিয়ে সরস্বতী নদীর কাছে এক শুষ্ক কূপে ত্রিত পড়ে যান। দুই ভাই কূপ থেকে ত্রিতের চিৎকার শুনে গরুগুলি নিয়ে পালান। ত্রিত তারপর কূপের মধ্যেই যজ্ঞ করতে থাকেন। তাঁর গলা ও বেদপাঠ শুনে বৃহস্পতি ও দেবতারা ভয়ে এসে যজ্ঞ ভাগ গ্রহণ করেন ; নাহলে ত্রিত অন্য দেবতা সৃষ্টি করবেন হয়তো। দেবতারা তারপর বর দিতে চাইলে ত্রিত কূপ থেকে বার হয়ে আসতে চান এবং এই কূপের জল যে স্পর্শ করবে সে যেন সোমপায়ী গতি লাভ করে বর চান। সরস্বতীর জলে সঙ্গে সঙ্গে কূপ ভরে ওঠে। ত্রিত ভেসে বার হয়ে বাড়িতে ফিরে দুই ভাইকে শাপ দেন তারা (পশুরূপ ধরে দংষ্ট্রিণাম্ অভিতঃ চরৌ—মহা ৯।৩৫।৪৯) ভীষণ পশুতে পরিণত হবে এবং তাদের সন্তানরা গোলাঙ্গুল ভল্লুক ও বানর হয়ে জন্মাবে। ১২।৩২৬।৭৯ শ্লোকে আছে ত্রিত-উপঘাতাৎ একত ও দ্বিত প্রাপ্সতঃ বানরত্বং এবং এদের বংশজদের সাহায্যে রামচন্দ্র সীতা উদ্ধার করেন। অন্যান্য গ্রন্থে দুই ভাই গরু নিয়ে পালালে ত্রিত মনোকষ্টে ঘুরতে ঘুরতে সরস্বতী নদীর কাছে এসেছিলেন (কা-প্র ৯।৩)।

অপর এক কাহিনীতে মরুভূমির মধ্যে এরা একবার পথ হারিয়ে ফেলেন ; ভীষণ তৃষ্ণা পায়। এর পর একটি কূপ খুঁজে পেয়ে ত্রিত কূপের মধ্যে নেমে গিয়ে নিজের তৃষ্ণা নিবারণ করেন এবং ভাইদের জন্য জল নিয়ে উঠে আসেন। এরা দুই ভাই জল খেয়ে ত্রিতকে কূপের মধ্যে ফেলে দিয়ে কূপের ওপর গরুর গাড়ির এক চাকা চাপা দিয়ে চলে যান। অশ্বিনীদেবের স্তব করলে এঁরা ত্রিতকে উদ্ধার করেন। আর এক মতে অগ্নির সৃষ্ট ত্রিত জল আনতে গিয়ে কূপে পড়ে যান ; দানববা কূপ চাপা দিয়ে বন্ধ করে দেয়। কিন্তু ত্রিত কূপের ওপর দিক ভেঙে বার হয়ে আসেন। আর একটি মতে দেবতারা যজ্ঞ করতে করতে হবিতে হাত মাখামাখি হয়ে যায়। তখন সেই হাত পরিষ্কার করবার জন্য এঁদের জন্ম।

ত্রিদস্যু—অগস্ত্য ও লোপামুদ্রার সন্তান ইধ্মবাহ (দ্রঃ)।

ত্রিনেত্র—মহিষাসুরের তিন জন মন্ত্রী ঃ- বাষ্কল, ত্রিনেত্র ও কালান্ধক (মার্ক ৮৩।১৭)।

ত্রিনেত্রেশ্বর—কাথিওয়াড়ে ঝালোয়ার সাবডিভিসানে থান। একটি তীর্থ। উবেন নদীর তীরে মহাদেব ত্রিনেত্রেশ্বরের মন্দির (স্কন্দ), কাছেই ভদ্রকর্ণ নামে একটি কুণ্ড বা হ্রদ।

ত্রিপদী—ত্রিমল, ভেঙ্কটগিরি, তিরুপতি : মাদ্রাজে উত্তর আরকটে। মাদ্রাজ সহর থেকে ৭২ মাইল উ-পশ্চিমে। রেনিগুণ্টা থেকে কাছেই। এই ভেঙ্কটগিরির শেষাচলের মাথায় ভেঙ্কটেশ্বর নারায়ণ/বালাজি বিশ্বনাথের বিগ্রহ রয়েছে। রামানুজ প্রতিষ্ঠিত।

পাহাড়ের পাদদেশে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার মূর্তি রয়েছে। লঙ্কা থেকে ফেরার পথে এক রাত্রি এঁরা এখানে বিশ্রাম করেছিলেন প্রবাদ। শেষাচলে পাপনাশিনী গঙ্গার উৎপত্তি।

ত্রিপিটক—বুদ্ধ বচন সংগ্রহ। সাধারণত তিনটি বিভাগ ঃ বিনয় পিটক, সূত্র পিটক ও অভিধর্ম পিটক। বিনয় পিটকে কায় ও বাক্যকে বিনীত করে তোলার উপদেশ। সূত্র পিটকে আত্মহিত ও পরহিত ইত্যাদি সূচনা করে এই রকম উপদেশগুলি এখানে সূতা দিয়ে মালার মত গাঁথা রয়েছে বলে এই নাম। এর শিক্ষা সাধারণ ব্যবহার ও লৌকিক শিক্ষা ; সংযম ও আত্ম সংযমের উপদেশ এখানে রয়েছে। অভিধর্ম পিটক হচ্ছে অতিরিক্ত বা বিশিষ্ট অংশ। এর শিক্ষা পরমার্থ শিক্ষা। পিটক অর্থে পেটিকা বা ভাজন বা মঞ্জুষা। বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণের পর তাঁর ৫০০ অর্হৎ শিষ্য রাজগৃহে জমা হয়ে বুদ্ধের বচনগুলি সংগ্রহ করে সম্পাদন ও সংকলিত করেন। যত দিন না এগুলি লেখা হয়েছিল ততদিন মুখে মুখে চালু ছিল। বিনয় পিটক আয়ত্ত হলে চারিত্রিক গুণ সম্পন্ন হয়ে ত্রিবিদ্যা আয়ত্ত হয় ; জন্ম মৃত্যুর জ্ঞান, আস্রবক্ষয় সম্বন্ধে জ্ঞান, জাতিস্মরতা ও দিব্য দৃষ্টি লাভ হয়। সূত্র পিটক আয়ত্ত হলে ছয়টি অভিজ্ঞান লাভ করা যায়। অভিধর্ম্ম পিটক আয়ত্ত হলে প্রজ্ঞাবান হয়ে চার প্রকার প্রতি-সংবেদ লাভ হয়। পালি ত্রিপিটক প্রাচীনতম ও ব্যাপকতম। এতে বিনয় অংশে ৬ ভাগ, সূত্র অংশে ৫ ভাগ, অভিধর্ম্ম অংশে ৭-টি ভাগ রয়েছে।

ত্রিপুর—তিন ভাই বা এদের তিনটি পুরী। কালীপ্রসন্নে (৮।৩৪) দৈত্যরা হেরে গেলে তারকাসুরের তিন ছেলে তারকাক্ষ, কমলাক্ষ ও বিদ্যুন্মালী তপস্যায় ব্রহ্মার কাছে বর পান তারা তিনটি আলাদা আলাদা পুর অর্থাৎ নগরে বাস করবেন। পুরগুলি ইচ্ছা মত সঞ্চরণ করতে পারত। এই পুরে তাঁদের অভীষ্ট সব কিছু থাকবে এবং কেউ এই নগর তিনটি ধ্বংস করতে পারবে না ; ব্রহ্ম শাপেও নয়। হাজার বছর পরে তিন ভাই মিলিত হবেন এবং তাঁদের তিনটি পুরও মিলিত হবে এবং তখন যে দেবতা একটি বাণে এই তিনটি পুরীকে ভেদ করতে পারবেন তিনিই তাঁদের নিহত করতে পারবেন। ময় দানবকে দিয়ে স্বর্গে তারকাক্ষের জন্য স্বর্ণময় পুর, অন্তরীক্ষ কমলাক্ষের জন্য রৌপ্যময় পুর এবং পৃথিবীতে বিদ্যুন্মালীর জন্য লৌহময় পুর এঁরা তৈরি করিয়ে নেন। অসুর বিরোচনের ছেলে বলি এবং বলির ছেলে বাণ ; বাণ এই পুর তিনটিকে রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। তিনটি পুর এক সঙ্গে ত্রিপুর নামে অভিহিত। সমস্ত দৈত্যরা এসে (কা-প্র) এখানে আশ্রয় নেয়। তারকাক্ষের ছেলে হরি তপস্যায় ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করে প্রতিটি পুরে একটি করে মৃত সঞ্জীবনী সরোবর তৈরি করে নেন। এখানে মৃত দৈত্যদের ফেলে দিলে তাঁরা বেঁচে উঠত। এর ফলে দেবতাদের ওপর অত্যাচার বেড়ে চলতে থাকে। ইন্দ্র ত্রিপুরের কাছে পরাজিত হন। মহাভারতে (কা-প্র ৭।২০৩) কমলাক্ষের সুবর্ণময়, তারকাক্ষের রজতময় পুর। মহাদেব ত্রিপুর ভেদ করে বালকরূপে পার্বতীর কোলে আবির্ভূত হন। দেবতারা বুঝতে পারেন না। ইন্দ্র অসূয়া পরবশ হয়ে বজ্র নিক্ষেপ করতে যান কিন্তু হাত স্তম্ভিত হয়ে যায়। এর পর ব্রহ্মার নির্দেশে স্তবস্তুতি করে মুক্তি পান। কা- প্রসন্নে (৮.৩৪) আছে পৃথিবীতে যা

কিছু মহাসত্ব তাই মিলিয়ে দেবতারা রথ তৈরি করে দিয়েছিলেন। ভাগবতে (৭।১০) বিষ্ণুর কাছে পরাজিত হয়ে দানবরা ময়কে দিয়ে তিনটি পুর নির্মাণ করান। তিনটি পুর অদৃশ্য থেকে লোকপাল সহ ত্রিলোককে ধ্বংস করতে থাকে। দেবতাদের প্রার্থনায় শিব দানবদের বাণবিদ্ধ করতে থাকেন। ময় ত্রিপুর গত অমৃত কূপ থেকে এদের জীবিত করতে থাকে। বিষ্ণু তখন গরুরূপে ও ব্রহ্মা বৎস রূপে এই কূপ পান করেন। শিব এরপর ত্রিপুর ধ্বংস করেন।

ভাণ্ডারকরে (৮।২৪) আছে ইন্দ্র পরাজিত হলে দেবতারা ব্রহ্মার কাছে যান এবং ব্রহ্মা তাদের শিবের কাছে পাঠান। শিব রাজি হন। নারদকে ত্রিপুরে পাঠান। নারদের চেষ্টায় অসুর স্ত্রীরা ক্রমশ দেব ভক্ত হয়ে উঠতে থাকেন। শিব এই সময় নর্মদার তীরে এসে বাস করতে থাকেন এবং দেবতাদের কাছ থেকে অর্ধ পরিমাণ হিসাবে তেজ নিয়ে সব দেবতার বড় মহাদেবতাতে পরিণত হন। মহাদেব তারপর দেবতাদের কাছে রথ ও ধনুক চাইলে বিশ্বকর্মা তখন পৃথিবী, নদী, মন্দর পর্বত, বিন্ধ্য, দিকবিদিক, নক্ষত্র মণ্ডল, সপ্তর্ষি মণ্ডল, দিনরাত্রি শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষ, সিন্ধু, গঙ্গা, সরস্বতী প্রভৃতির অংশ নিয়ে রথ তৈরি করে দেন। চন্দ্র ও সূর্য রথের চাকা হন। ইন্দ্র, বরুণ, যম ও কুবের এই চার জন লোকপাল ঘোড়া হন, সুমেরু হয় রথের ধ্বজদণ্ড; বিদ্যুন্ময় মেঘ হয় পতাকা। মহাদেব সংবৎসরকে/মন্দরপর্বতকে ধনু ও কালরাত্রিকে/বাসুকিকে জ্যা করেন। বিষ্ণু, অগ্নি ও চন্দ্র মহাদেবের বাণ হন; ব্রহ্মা হন রথের সারথি (কা-প্র ৮।৩৪)। রথের ধ্বজে অবস্থিত বৃষের গর্জনে ত্রিভুবন কাঁপতে থাকে। আর এক মতে শিবের এক পাশে যম ও এক পাশে কালরাত্রি অবস্থান করেন। বিষ্ণু বাণ হন; বাণের মুখে অগ্নি এবং পুচ্ছে বায়ু অবস্থান করেন। এতগুলি দেবতা এক সঙ্গে থাকাতে ভারে রথ মাটিতে বসে যায় বিষ্ণু তখন বাণ থেকে বার হয়ে বৃষ হয়ে মাটি থেকে রথ তুলে দেন। মহাদেব তখন ঘোড়ার পিঠে এক পা ও বৃষরূপী নারায়ণের পিঠে আর এক পা রেখে দানবপুর তিনটি দেখতে থাকেন; মহাদেব এই সময়ে অশ্বের স্তন ছেদ করেন এবং বৃষের খুর দু ভাগ করে দেন। (কা-প্র ৮।৩৪) সেই থেকে অশ্বজাতির স্তন নাই এবং গো-জাতির ক্ষুর খণ্ডিত। মহাদেব তারপর পাশুপত অস্ত্র জুড়ে অপেক্ষা করতে থাকেন এবং ত্রিপুর মিলিত হলে পাশুপত অস্ত্রে দানব সমেত তিনটি পুরকে পশ্চিম সাগরে ফেলে দেন। মৎস পুরাণে ময়, বিদ্যুন্মালী ও তারক তপস্যা করেন; অজেয় ও দুর্ভেদ্য ত্রিপুর তৈরি করবেন; ব্রহ্মা রাজি হন না; রফা হয় একমাত্র শিব একটি বাণে এই তিনটি পুরকে ধ্বংস করতে পারবেন। পৃথিবীতে লৌহময়, আকাশে রজতময় এবং তার ওপর সুবর্ণময় তিনটি পুর। ক্রমশ এরা অত্যাচারী হয়ে ওঠে। দেবতারা ব্রহ্মাকে নিয়ে শিবের মতান্তরে রুদ্রের কাছে আসেন। বিরাট রথ তৈরি হয়; ব্রহ্মা রথের সারথি। দীর্ঘ দিন যুদ্ধ; তীব্র সংগ্রামে তারক নিহত; বিদ্যুন্মালী নন্দীর হাতে নিহত। পুষ্যাযোগে তারপর ত্রিপুর একত্র হয়। মহাদেবের ইচ্ছানুসারে নন্দী ময়কে সমুদ্রে গিয়ে আশ্রয় নিতে বলে; এবং মহাদেব ত্রিপুর ভস্মীভূত করেন। বহু পাঠান্তর যুক্ত এই কাহিনী। তারকের পুত্র তারকাক্ষ (স্বর্ণপুরীর অধীশ্বর), কমলাক্ষ (রজতপুরী) এবং বিদ্যুন্মালী (লৌহপুর);

মহাদেব দেবতাদের অর্দ্ধতেজ ইত্যাদি এবং পুড়িয়ে পশ্চিম সাগরে নিক্ষেপ করেন। কৃষ্ণযজুর্বেদে ত্রিপুর ধ্বংস করেন রুদ্র ; শুক্লযজুর্বেদে অগ্নি। দ্রঃ- ষট্পুর, উজ্জয়িনী।

ত্রিপুর—(মৎস্য-পু), ত্রিপুরী, টিয়োর। নর্মদা তীরে। জব্বলপুর থেকে ৭ মাইল পশ্চিমে। তারকাসুরের ছেলেদের এই পুর ; এখানে ধ্বংস হয়। কাহিনীটি শৈবদের হাতে বৌদ্ধ বিতাড়ন কাহিনী। (২) কলচুরি রাজ কোকল্লদেবের রাজধানী (খৃ ৯ শতক)। চেদি রাজধানী ; অপর নাম চেদি নগর। চেদি সম্বৎ (২৪৮ খৃ) কলচুরিরা চালু করেন। (৩) উষার পিতৃ রাজধানী বাণপুর, শোণিতপুর।

ত্রিপুরা—ত্রিপুরী, কর্তৃপুর, কিরাতদেশ, সুহ্মদেশ। কামরূপের অন্তর্গত ছিল। পার্বত্য ত্রিপুরাতে উদয়পুর পাহাড়ে ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির একটি পীঠস্থান। ত্রিপুরা ও আরাকান মিলে সুহ্মদেশ।

ত্রিপুরা—কালিকা পুরাণে দেবী। রক্তবর্ণ, চার হাত, বিবসনা, হাতে আয়ুধ ও পুস্তক ইত্যাদি। কুণপের ওপর দণ্ডায়মান। রক্ত-বসন-পরিহিতা ধ্যানও আছে। হাতে কোনো আয়ুধ নাই এবং গলায় আপাদ মুণ্ডমালা ; এবং আরো অন্য মূর্তি ও দেখা যায়। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় কুরুতে ত্রিমূর্ত্যা। ফলে নাম ত্রিপুরা। কাম্যাখ্যা দেবীও ত্রিপুরা। দ্রঃ- ষোড়শী।

ত্রিপুরারি—ত্রিপুর (দ্রঃ) ধ্বংসকারী ; মহাদেব।

ত্রিবক্রা—দ্রঃ- কুব্জা।

ত্রিবর্চস্—এক জন মুনি। কশ্যপ, প্রাণ, চ্যবন, অগ্নি এবং ত্রিবর্চস্ মিলে ৫ জনে তপস্যা করে অগ্নির সমান উজ্জ্বল একটি পুত্রের জন্ম দেন। সন্তানের নাম হয় তপ (দ্রঃ) বা পাঞ্চজন্য (মহা ৩।২১০।১)।

ত্রিবার—গরুড়ের একটি বংশজ। অন্যান্য নামী বংশধর অনঘ, অনল, অনিল, কপোত, কাশ্যপি, কুণ্ডলী, কুমুদ, কুমার, গুরুভার, চণ্ডতুণ্ডক, চিত্রবর্হ, চিরান্তক, দারুণ, দিশাচক্ষু, দক্ষ, দ্বীপক, দৈত্যদ্বীপ, দিবাকর, ধ্বজবিষ্কম্ভ, নাগাশী, নিমেষ, নির্মিষ, নিশাকর, পদ্মকেসর, পরিবর্হ, বৈনতেয়, বামন, বাতবেগ, বাল্মীকি, বিষ্ণুধন্বা, বিশালাক্ষ, মধুপর্ক, মলয়, মাতরিশ্বা, মেঘকৃৎ, সারস, সর্পান্ত, সপ্তবার, সরিৎ-দ্বীপ, সুবর্ণচূড়, সুমুখ, সুখকেতু, সোমভোজন, সূর্যনেত্র, সুস্বর, হরি, হেমবর্ণ, (মহা ৫।৯৯।৯)। গরুড়ের (দ্রঃ) ছয় ছেলের বংশ এরা।

ত্রিবেণী—(১) দক্ষিণ প্রয়াগ ; বাঙলাতে হুগলির উত্তরে ; মুক্তবেণী ; গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী তিনটি নদী এখানে ভাগ হয়ে গেছে। (২) যুক্তবেণী ; এই তিনটি নদী এলাহাবাদে যুক্ত হয়েছে ; এটি প্রয়াগ (দ্রঃ)। (৩) এটোয়া ও কম্পির মধ্যে যমুনা, চম্বল ও সিন্ধু সঙ্গম। (৪) পূর্ণিয়াতে নাথপুরের কাছে তিনটি কোশি নদী :—তোমর/তোম্বর, অরুণা ও সুন/সূর্য কোশি সঙ্গম ; অপর নাম কোকামুখ সঙ্গম। কোকাক্ষেত্র (দ্রঃ)। বরাহক্ষেত্রের অব্যবহিত ওপরে। এর পর নদী সমতলে নেমে এসেছে। (৫) গণ্ডক, দেবিকা (দ্রঃ) ও ব্রহ্মপুরী সঙ্গম=গজেন্দ্রমোক্ষ (দ্রঃ)। (৬) গুজরাটে সোমনাথ পত্তনের কাছে সরস্বতী, হিরণ্য ও কপিলা সঙ্গম।

ত্রিলোকনাথ—কুলু-তে লাহুল নামক স্থানে একটি তীর্থ। এখানে মহাদেবের বিগ্রহ পাণ্ডবদের স্থাপিত ; প্রবাদ। দ্রঃ- কুলূত।

ত্রিমূর্তি—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসের দেবতা। ব্রহ্মাই (ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে ৬।২-৩) সৃষ্টির আদিতে নারায়ণরূপে মহাসলিলে যোগ নিদ্রায় নিমগ্ন ছিলেন। কূর্ম পুরাণেও এই কাহিনী। কৃষ্ণযজুর্বেদীয় স্কন্দোপনিষদে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর একই দেবতা। মৎস্য পুরাণে (৩।১৬) আছে একা মূর্তিঃ অথচ তিন ভাগ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর।

ত্রিরত্ন—দ্রঃ- ত্রিশরণ।

ত্রিলোচন—শিবের একটি নাম। হিমালয়ে মহাদেব যখন তপস্যা করছিলেন তখন পার্বতী খেলার ছলে মহাদেবে দুই চোখ চেপে ধরলে মহাদেবের কপালে তৃতীয় চোখ ফুটে ওঠে। এই চোখের দৃষ্টি ধ্বংসকারী, কামদেব এই চোখের আগুনে মারা যান।

ত্রিশঙ্কু—হরিবংশ অনুসারে মান্ধাতার বংশে ত্রসদস্যু > অনরণ্য > ত্রয্যারুণ, অরুণ > সত্যব্রত, ত্রিশঙ্কু + সত্যরথা (কেকয় বংশ) > হরিশ্চন্দ্র > রোহিত (রোহিতপুরস্থাপয়িতা) > হরিত > চঞ্চু (হরি ১।১৩।২৮) > বিজয় > সুদেব। বিজয় > রুরুক > বৃক > বাহু > সগর > অসমঞ্জ + ৬০,০০০ (এদের মধ্যে চারজন বেঁচে গিয়েছিল)। অসমঞ্জ (= পঞ্চজন) > অংশুমান > দিলীপ (= খট্বাঙ্গ) > ভগীরথ (গঙ্গা আনেন) > শ্রুত > নাভাগ > অম্বরীষ > সিন্ধুদ্বীপ > অযুতাজিৎ > ঋতুপর্ণ (অক্ষবিৎ, ইনি নলের বন্ধু) > আর্তপর্ণি > সুদাস (ইন্দ্রের সখা) > সৌদাস (= কল্মাষপাদ = মিত্রসহ) > সর্বকর্মা > অনরণ্য > নিঘ্ন > অনমিত্র ও রঘু (হরি ১।১৫।২৩)। অনমিত্র > দুলিদুহ > দিলীপ > রঘু > অজ > দশরথ > রামচন্দ্র > কুশ > অতিথি > নিষধ > নল > নভ > পুণ্ডরীক > ক্ষেমধান্বা > দেবানীক > অহীনগু > সুধন্বা > অনল > উকৃথ > বজ্রনাভ > শঙ্খ (= ব্যুষিতাশ্ব) > পুষ্প > অর্থসিদ্ধি > দর্শন > অগ্নিবর্ণ > শীঘ্র > মরু > বৃহৎবল (১।১৫।৩৪)।

ত্রিশঙ্কু অর্থাৎ সত্যব্রত বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দুষ্ট ও কামুক হয়ে ওঠেন। অপরের ভার্যা চুরি করতেন। একদিন এক ব্রাহ্মণের গৃহ থেকে কন্যা সম্প্রদানের মুহূর্তে মেয়েটিকে পিঁড়ি থেকে গায়ের জোরে অপহরণ করেন। ফলে রাজা ত্রয্যারুণ ছেলেকে বারো বছরের জন্য তাড়িয়ে দেন। কোথায় থাকবেন জানতে চাইলে রাজা তাঁকে চণ্ডালদের সঙ্গে থাকতে বলে দেন। এদের সঙ্গে বাস করলেও সত্যব্রত এদের জীবন গ্রহণ করেন নি। প্রতি দিন নিজে শিকার করে নিজের খাদ্য সংগ্রহ করতেন। পিতার বিরুদ্ধে কোন বিরূপ মনোভাব ছিল না। কিন্তু কুলগুরু কিছু একটা প্রতিকার করতে পারতেন অথচ করলেন না এবং এই গুরুর পরামর্শেই তিনি বিতাড়িত হয়েছেন। এই জন্য বশিষ্ঠের বিরুদ্ধে তীব্র মনোভাব গড়ে ওঠে।

রাজারও ভীষণ মনোকষ্ট হয়। বনে গিয়ে তপস্যা করতে থাকেন। পুত্রত্যাগ করার জন্য শাস্তি হিসাবে ইন্দ্র বার বছর দেশে বৃষ্টি বন্ধ করে দেন (হরি ১।১৩।১০)। দুর্ভিক্ষে সকলে ভীষণ কষ্টে পড়ে। এই সময়ে বিশ্বামিত্র স্ত্রীপুত্রকে এখানে রেখে দিয়ে সাগরানূপে (হরি ১।১২।২০) তপস্যা করছিলেন। গালবকে (দ্রঃ) সত্যব্রত এই সময়েই রক্ষা করেন এবং বিশ্বামিত্রের পরিবারের সকলের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেন।

সত্যব্রত আশা করেছিলেন বশিষ্ঠের করুণা হবে কিন্তু বশিষ্ঠ চেয়েছিলেন এইভাবে প্রায়শ্চিত্ত করুক। রাজকার্য বশিষ্ঠই দেখা শোনা করছিলেন (হরি ১।১৩।৪)। আসলে পিতুঃ নিয়োগাৎ ১২-বৎসর উপাংশুব্রত নিয়েছিলেন। ক্রমশ সত্যব্রতের ক্রোধ বেড়ে চলছিল। রাজ্যে বারো বছর দুর্ভিক্ষের শেষ দিকে অত্যন্ত ক্ষুধিত অবস্থায় এবং কোন পশু শিকার করতে না পেরে সত্যব্রত বশিষ্ঠের আশ্রমে এসে কামধেনু নন্দিনীকে মেরে নিজের ক্ষুধা নিবৃত্ত করেন এবং বাকি মাংস বিশ্বামিত্রের আশ্রমে দিয়ে আসেন (১।১৩।১৫)। বশিষ্ঠ ধ্যানে সব জানতে পারেন এবং ক্রুদ্ধ হয়ে সত্যব্রতকে ডেকে পাঠিয়ে শাপ দেন সেই দিন থেকে সত্যব্রত চণ্ডাল হবেন। (১) পিতার ক্রোধ অর্জন করা, (২) গোহত্যা এবং (৩) অপ্রোক্ষিত গোমাংস ভক্ষণ করা এই তিনটি পাপের জন্য ত্রিশঙ্কু হয়ে/নামে সারা জীবন দুঃখ ভোগ করতে হবে। বিশ্বামিত্র ফিরে এসে সন্তুষ্ট হয়ে রাজ্যে অভিষিক্ত করে দেন এবং পরে স্বশরীরে দিবং অরোপয়ৎ (হরি ১।১৩।২৩)। মতান্তরে মৃত নন্দিনী কামধেনুকে বশিষ্ঠ জীবিত করে নেন। অভিশপ্ত রাজপুত্র শাপমুক্তির চেষ্টায় বহু ঋষিকে যজ্ঞ করতে বলেন ; কিন্তু কেউ সম্মত হন না। ত্রিশঙ্কু তখন দেবতাদের স্তব করে আগুনে প্রবেশ করতে যান। দেবতারা রাজপুত্রকে আত্মহত্যা করতে বারণ করেন এবং শীঘ্রই রাজা হবেন ভবিষ্যৎ-বাণী করে যান।

রামায়ণে বহু দিন ধর্মপথে রাজত্ব করে শেষে বাসনা হয় স্বশরীরে স্বর্গে যাবেন। সম্ভব নয় বলে বশিষ্ঠ বাসনা ত্যাগ করতে বলেন (রা ১।৫৭।১৬); বশিষ্ঠের ছেলেদের অনুরোধ করলে তাঁরাও রাজাকে উপহাস করেন। ত্রিশঙ্কু তখন স্পষ্ট মুখের ওপর বলেন অন্য কেউ হয়তো তাকে স্বর্গে পাঠাতে পারবেন। এই উদ্ধত জবাবে বশিষ্ঠ ও ছেলেরা আবার চণ্ডাল হবার শাপ দেন (রা ১।৫৮।৮)।

রামায়ণে আছে বশিষ্ঠের ছেলেরা চণ্ডাল হবার শাপ দিলে পরদিন সকালে রাজা ভীষণ চণ্ডাল হয়ে যান। সঙ্গের মন্ত্রী ও অনুচররা সকলে অযোধ্যায় পালিয়ে যান। বিশ্বামিত্র (দ্রঃ) এই সময় ব্রাহ্মণ হবার জন্য তপস্যা করছিলেন. বিশ্বামিত্রের শরণ নেন। বিশ্বামিত্র এঁকে চিনতে পারেন; ত্রিশঙ্কু জীবনে যত যজ্ঞ ইত্যাদি করেছেন (রা ১।৫৮।১৯) জানান এবং বশিষ্ঠ ইত্যাদির সমস্ত ঘটনা বলেন ও অনুরোধ করেন পুরুষাকারের দ্বারা দৈবম্ নিবর্তয়িতুম্ অর্হসি (রা ১।৫৮।২৪) ইত্যাদি। বিশ্বামিত্র তখন চণ্ডালরূপেই রাজাকে স্বশরীরে স্বর্গে পাঠাবেন কথা দেন (রা ১।৫৯।৪)। ছেলেদের ও শিষ্যদের বলেন যজ্ঞে মুনিঋষিদের নিয়ে আসতে। 'চণ্ডালের যাজক ক্ষত্রিয়' ইত্যাদি বলে মহোদয় নামে একজন এবং বশিষ্ঠ পুত্রেরা ডাকতে-গিয়েছিল-যারা-তাদের ফিরিয়ে দেন। বিশ্বামিত্র শুনে বশিষ্ঠ পুত্রদের শাপ দেন এরা ভস্মীভূত হবে এবং ৭০০ জন্ম মৃতদেহ ও কুকুরের মাংস খেয়ে মুষ্টিকা জাতি হয়ে (রা ১।৫৯।১৯) দিন কাটাবে এবং মহোদয় বহুদিন নিষাদ হয়ে থাকবে।

বিশ্বামিত্র তারপর যারা এসেছিলেন তাদের যজ্ঞ করতে বলেন ; নিজে যাজক হন। ভয়ে সকলে যজ্ঞ আরম্ভ করেন (রা ১।৬০।৬) ; কিন্তু দেবতারা কেউই যজ্ঞ ভাগ নিতে

আসেন না (রা ১।৬০।১১)। বিশ্বামিত্র তখন রাগে নিজের তপস্যার ফল দিয়ে সশরীরে একে স্বর্গে পাঠান। ত্রিশঙ্কু স্বর্গে এলে ইন্দ্র ও দেবতারা বলেন ত্রিশঙ্কু গুরুর শাপগ্রস্ত ; এবং অবাক্‌শির মাটিতে গিয়ে পড়তে বলেন। ত্রিশঙ্কু পড়তে পড়তে ত্রাহি ত্রাহি চিৎকার করতে থাকেন। বিশ্বামিত্র তিষ্ঠ বলে ত্রিশঙ্কুকে আটকে দিয়ে আকাশে দক্ষিণ দিকে অপর সপ্তর্ষি ও নক্ষত্রমালা সৃষ্টি করেন (রা ১।৬০।২১) এবং অন্য ইন্দ্র ও দেবতাদের সৃষ্টি করতে যান (রা ১।৬০।২৩)। দেবতারা তখন বোঝান ত্রিশঙ্কু গুরুর শাপে পরিক্ষত (১।৬০।২৫) ; স্বর্গের উপযুক্ত নন। বিশ্বামিত্র জানান তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন স্বশরীরে স্বর্গে পাঠাবেন। শেষ অবধি মীমাংসা হয় বিশ্বামিত্র যে নক্ষত্রলোক সৃষ্টি করেছেন যাবৎ লোকাঃ ধরিষ্যন্তি তিষ্ঠন্তু। বৈশ্বানরপথাৎ বহিঃ এই সব নক্ষত্র থাকবে ত্রিশঙ্কুও এইখানে থাকবেন। রাজাকে জ্যোতীংষি অনুযাস্যন্তি। দেবতারা স্বীকার করে নেন।

অন্য মতে ত্রিশঙ্কু স্বর্গে প্রবেশ করতে গেলে দেবতারা ইন্দ্রকে খবর দেন ইন্দ্র (ভাগবতে ৯।৭-দেবতারা) তখন রাজাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিলেন। বিশ্বামিত্র নতুন ইন্দ্র ইত্যাদি সৃষ্টি করতে গেলে ইন্দ্র ত্রিশঙ্কুকে বিমানে করে স্বর্গে নিয়ে যান।

অন্য কাহিনীতে আছে বশিষ্ঠ পুত্রেরা চণ্ডাল হবার শাপ দিলে ত্রিশঙ্কু আবার বনে চলে যান। ছেলে হরিশ্চন্দ্র পিতাকে ফিরিয়ে আনতে লোক পাঠান। কিন্তু আসেন না ; হরিশ্চন্দ্র রাজা হন। এই সময় বিশ্বামিত্র তপস্যা শেষে ফিরে এসেছিলেন ; এবং স্ত্রী পুত্রদের কাছে সত্যব্রতের ত্রিশঙ্কুর সমস্ত ঘটনা জানতে পারেন। ভীষণ চণ্ডাল বেশে ত্রিশঙ্কু এই সময় বিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হন। একটি মতে প্রথম দফায় চণ্ডাল হবার পর এই দেখা ; ত্রিশঙ্কুকে বর দিয়ে পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত করে দেন। পরে ত্রিশঙ্কুর স্বর্গারোহণের জন্য যজ্ঞ করেন। দেবতারা ত্রিশঙ্কুর সশরীরে স্বর্গারোহন স্বীকার করে নেন। আর এক মতে দ্বিতীয় দফায় চণ্ডাল হয়ে ত্রিশঙ্কু বনে ছিলেন। বিশ্বামিত্র অশ্বাবনে এসে নিজেই দেখা করেন ; সব শুনে যজ্ঞ করবার ব্যবস্থা করেন।

দেবী ভাগবতেও (৭।১০।৭) এই কাহিনী। রাজা, কামী, মহাত্মা, অতি-লোলুপ। বিশ্বামিত্র পরিবারকে মহিষ মাংসও দিতেন। আবার ৭।১০।৪৯ শ্লোকে ধার্মিষ্ঠ। বশিষ্ঠ শাপ দেন (৭।১০।৫৫), গোবধ, পরস্ত্রী হরণ ও পিতার ক্রোধ---তিনটি শঙ্কুচিহ্ন মাথাতে এবং পিশাচ হবে। ত্রিশঙ্কু এরপর দেবীমন্ত্র জপ করতে থাকেন ; পাপ কেটে যেতে থাকে। পুরশ্চরণ করতে চান। পুরোহিতেরা সম্মত হন না। অগ্নিতে আত্ম বিসর্জন (৭।১১।১১) দিতে যান, দেবী এসে বারণ করেন ; পরশু সচিবরা এসে নিয়ে যাবে। এদিকে নারদ ত্রয্যারুণকে এসে সব জানান ; রাজা ছেলেকে ফিরিয়ে আনেন। দেবীর উপাসনা করে নিষ্পাপ হন। স্বর্গে যাবার জন্য যজ্ঞ ; বশিষ্ঠ সম্মত না হলে অন্য পুরোহিত নিয়োগ করতে চান। বশিষ্ঠ চণ্ডাল হবার শাপ দেন। ত্রিশঙ্কু প্রথমে আত্মহত্যা করবেন ঠিক করেন। শেষ অবধি বনে

৪২

চলে যান। হরিশচন্দ্র ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হন। এর পর বিশ্বামিত্রের চেষ্টায় স্বর্গপ্রাপ্তি ইত্যাদি। নতুন নক্ষত্রলোক সৃষ্টি নাই।

ত্রিশঙ্কু ও বিশ্বামিত্রের কাহিনী অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত। ব্রাহ্মণ হবার পথে বাধা দেবার জন্য ও বিশ্বামিত্রের (দ্রঃ) তপস্যার ফল নষ্ট করার জন্য রচিত কাহিনী।

ত্রিশরণ—বৌদ্ধ সাহিত্যে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘকে ত্রিশরণ বা ত্রিরত্ন বলা হয়। এই তিনটির শরণ নিলে শরণাগতি বলা হয়। শরণাগতি একটি বৌদ্ধ প্রক্রিয়া। এই শরণের ফলে চিত্তের মলিনতা ক্রমশ দূর হতে থাকে। বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি এবং সংঘং শরণং গচ্ছামি তিন বার বলে এই শরণ নিতে হয়। শরণাগতি দু রকম:— সত্যদ্রষ্টাদের শরণাগম লোকোত্তর এবং সাধারণ লোকের শরণাগম লৌকিক। লৌকিক শরণাগতির অপর নাম ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন।

ত্রিশিরা—(১) দূষণের অনুচর দূষণ (দ্রঃ) ইত্যাদি সকলে মারা গেলে পর রামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আসছিল। ত্রিশিরা খরকে আটকে দিয়ে নিজে যুদ্ধে আসে ও তীরধনুক নিয়ে যুদ্ধ করে। রামের বাণে নিহত হয় রা ৩.২ ।-)। (২) রাবণের এক ছেলে তিন মাথা। কুম্ভকর্ণের পর এরা চার ভাই দেবান্তক, নরান্তক, মহোদর, ও ত্রিশিরা রামের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসে। হনুমান এক চড়ে ত্রিশিরাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে তার হাতের খড়্গ কেড়ে নিয়ে এই খড়্গে তিনটি মাথাই কেটে ফেলে। (৩) কুবেরের আর এক নাম। (৪) অন্য নাম বিশ্বরূপ। ব্রহ্মার ছেলে মরীচি; মরীচির ছেলে কশ্যপ এবং কশ্যপের ছেলে বিশ্বরূপ ত্রিশিরা। দ্রঃ-ত্বষ্টা। আর এক মতে বিশ্বকর্মার ছেলে বা নাতি। ত্বষ্টা ধার্মিক ও ব্রাহ্মণদের হিতকামী ছিলেন। ইন্দ্র ও ত্বষ্টার মধ্যে বহু দিনের বিবাদ চলছিল। শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে রচনার (ভাগ ৬।৬।৪৪) গর্ভে ত্রিশিরার (তিন মাথাযুক্ত) জন্ম দেন। ত্রিশিরা, পরে মায়ের আদেশে অসুরদের দলে যোগ দেন। হিরণ্যকশিপু বশিষ্ঠকে ত্যাগ করে এঁকে পৌরোহিত্যে নিযুক্ত করেন। এই জন্য বশিষ্ঠের শাপে নরসিংহের হাতে হিরণ্যকশিপু মারা যান। বাল্যকাল থেকেই জাগতিক সুখে ত্রিশিরার বৈরাগ্য এসেছিল ফলে তপস্যা করে দিন কাটাতেন (দ্রঃ- ত্বষ্টা)। অসুরদের মঙ্গলের জন্য বা ইন্দ্রত্ব লাভের (কা-প্র ৫।৮) জন্য একবার কঠোর তপস্যা করেন। ইন্দ্র ভয়ে ঘৃতাচী উর্বশী, রম্ভা ইত্যাদিকে এঁর তপস্যা নষ্ট করতে পাঠান। কিন্তু এঁরা বিফল হয়। ইন্দ্র তখন এঁকে বধ করার জন্য দধীচির কাছে যান এবং দধীচি নিজের অস্থি দান করলে এই অস্থিতে বজ্র তৈরি করে ঐরাবতে চড়ে এসে বজ্রাঘাত করেন। একটি মতে ইন্দ্র এঁকে পুরোহিত নির্বাচন করলে ইনি যজ্ঞ করেন এবং মায়ের নির্দেশে দেবতা ও অসুর সকলেরই সমৃদ্ধি কামনা করেন। ফলে অসুরদেরও শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকলে ইন্দ্র বজ্রাঘাত করেছিলেন। আহত ত্রিশিরা মাটিতে পড়ে যান।

কৃষ্ণ যজুর্বেদে বিশ্বরূপ/ত্রিশিরা দেবতাদের পুরোহিত এবং অসুরদের ভাগিনেয়। তিন মুখে যথাক্রমে সোম, সুরা, ও অন্নগ্রহণ করতেন। দেবতাদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ এবং অসুরদের থেকে পরোক্ষ যজ্ঞ ভাগ নিতেন/অবদৎ (২।৫)। এই জন্য রাষ্ট্রে বিপর্যয়

এসেছিল ফলে ইন্দ্র বজ্র দিয়ে একে হত্যা করেন। অর্থাৎ বজ্র আগেই তৈরি হয়েছিল। এর পর বৃত্র জন্মায়। ঋক্‌ বেদে কিন্তু ত্বষ্টার সঙ্গে বৃত্রের কোন সম্পর্ক নাই ; ত্বষ্টা ইন্দ্রের বজ্র তৈরি করে দেন।

মহাভারতে ইন্দ্রের অনিষ্ট কামনায় ত্বষ্টা ত্রিশিরাকে সৃষ্টি করেছিলেন। ত্রিশিরা ইন্দ্রত্ব লাভের জন্য তপস্যা করেছিলেন (মহা ৫।৯।৩)। সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নির মত এঁর তিন মাথা। এক মুখে বেদপাঠ করতেন, এক মুখে সুরা পান করতেন ; এবং আর এক মুখে পিবন্‌ ইব জগৎ অবলোকন করতেন। এঁর তপস্যা নষ্ট করার জন্য ইন্দ্র অপ্সরাদের পাঠান ; এরা ব্যর্থ হলে বজ্রাঘাত করেন। ত্রিশিরা মারা যান কিন্তু জীবন্‌ ইব চেয়ে থাকেন। ইন্দ্র ভয়ে এক সূত্রধরকে (তক্ষা) দিয়ে তেজঃ বিকিরণকারী ত্রিশিরার মাথা কেটে ফেলেন। সূত্রধর প্রথমে রাজি হয় নি ; ইন্দ্রকে ভৎ'সনা করে ; ইন্দ্র তখন বর দেন যজ্ঞে পশুমুণ্ড পাবে। বেদ পাঠকারী মাথা কাটলে এই গলা থেকে এক ঝাঁক কপিঞ্জল (চাতক) পাখী ; সুরাপায়ী দ্বিতীয় মাথা কাটলে এই গলা থেকে এক ঝাঁক কলবিঙ্ক এবং তৃতীয় গলা থেকে এক ঝাঁক তিতির পাখী বার হয়ে যায় (মহা ৫।৯।৩৮)। ত্রিশিরার মৃত্যুতে ত্বষ্টা ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্রের শাস্তির জন্য অগ্নিতে আহুতি দিয়ে বৃত্রাসুরের সৃষ্টি করেছিলেন। মহাভারতে শান্তিপর্বে ত্রিশিরা দেবতাদের পুরোহিত এবং অসুরদের ভাগিনেয়। দেবতাদের প্রত্যক্ষ এবং অসুরদের পরোক্ষ যজ্ঞ ভাগ দিতেন। অসুররা তখন হিরণ্যকশিপুকে (মহা ১২।৩২৯।১৮) পুরো ভাগে নিয়ে বিশ্বরূপের মায়ের কাছে গিয়ে অভিযোগ করেন পরোক্ষ যজ্ঞভাগ দেবার জন্য অসুররা দুর্বল হয়ে পড়ছে। ত্রিশিরা তখন মায়ের আদেশে অসুরদের বর্দ্ধনের জন্য তপস্যা আরম্ভ করেন। ইন্দ্র প্রথমে অপ্সরাদের পাঠান। এরা ব্যর্থ হয়। বিশ্বরূপ তখন দেবতাদের প্রভাব নষ্ট করার জন্য মন্ত্র জপ করে নিজেকে অত্যন্ত বর্দ্ধিত করে ফেলেন এবং এক মুখে সোম-পান, এক মুখে অন্ন গ্রহণ ও তৃতীয় মুখে দেবতাদের ভক্ষণ করতে যান। তখন ব্রহ্মার পরামর্শে দেবতারা দধীচিকে দেহত্যাগ করতে বলেন। ধাতা বজ্র তৈরি করে দেন ইত্যাদি এবং ত্রিশিরার দেহ থেকে বৃত্র জন্মায়।

ভাগবতে (৬।৭) বৃহস্পতি একবার ইন্দ্রের সভায় এলে ঐশ্বর্য গর্বিত ইন্দ্র আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ান না। ফলে বৃহস্পতি অপমানে নিরুদ্দেশ হন। ইন্দ্র অনুশোচনায় ভরে ওঠেন। এই সুযোগে অসুররা আক্রমণ করলে দেবতারা হেরে যান : ব্রহ্মা তখন ত্বষ্টার ছেলে বিশ্বরূপের আরাধনা করতে বলেন। যদিও অসুরদের প্রতি বিশ্বরূপের পক্ষ-পাতিত্ব রয়েছে তবুও দেবতারা এসে বিশ্বরূপকে অভিনন্দিত করেন এবং উপাধ্যায় হতে বলেন। বিশ্বরূপ তখন নারায়ণ কবচ দেন ; এই কবচে সুরক্ষিত হয়ে দেবতারা জয় লাভ করেন। ভাগবতে (৬।৯) এরপর গোপনে অসুরদের যজ্ঞভাগ দেবার জন্য ইন্দ্র তিনটি মাথা কেটে ফেলেন এবং মাথা তিনটিই চাতক, চড়াই ও তিতির পাখীতে পরিণত হয়। ব্রহ্মহত্যার পাপ ইন্দ্র এক বছর মত ভোগ করে ভূমি, বৃক্ষ, স্ত্রীজাতি ও জলে ভাগ করে দেন ; এই পাপ যথাক্রমে ঊষরতা, নির্যাসরূপেণ, রজোরূপেণ এবং ফেনা ও বুদবুদ রূপে যথাক্রমে ফুটে ওঠে।

দেবী ভাগবতে (৬।১) ত্বষ্টা প্রজাপতি, ইন্দ্রের প্রতি বিদ্বেষে ত্রিশিরাকে সৃষ্টি করেন। ত্রিশিরা ইন্দ্রত্বের জন্য তপস্যা করছিলেন। উর্বশী ইত্যাদি পাঠালেও ব্যর্থ হয়। বজ্রাঘাত এবং তারপর তক্ষাণং অবদৎ ; ( ) ইত্যাদি।

ত্রিশিরা বধের উল্লেখ বেদে আছে। ত্রিতের বন্ধুত্ব লাভের চেষ্টায় ত্বষ্টাপুত্র ত্রিশিরাকে ইন্দ্র হত্যা করেছিলেন (ঋক্ ২।১১।১৯)। আবার আছে (ঋক্ ১০।৮।৮-৯) আপ্তের পুত্র ত্রিতকে ইন্দ্র পাঠান। ত্রিত পিতার অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করেন ও সপ্তরশ্মি ত্রিশিরাকে নিহত করেন এবং ত্বষ্টার ছেলের গাভীগুলিকে অপহরণ করেন। ত্বষ্টার সঙ্গে ত্রিত ও ইন্দ্রের বিরোধ ছিল। শত পথ ব্রাহ্মণে একটি মুখেতে সোমপান, একটিতে সুরাপান ও একটিতে ভোজন করতেন। বিদ্বেষে ইন্দ্র ছিন্নমুণ্ড করেন। ত্বষ্টা তখন বিশ্বকে ইন্দ্রহীন করার জন্য আহুতি দেবেন বলে সোম গ্রহণ করেন। এই যজ্ঞ থেকে সকল দেশ ব্যাপ্ত করে বৃত্র জন্মায় ; পা ছিল না বলে অপর নাম অহি ; দনু পালন করে ফলে দানব। যজ্ঞে ইন্দ্রশত্রু (ইন্দ্র-রূপী শত্রু) বর্দ্ধস্ব বলতে ইন্দ্র জিতেছিলেন। ত্রিশিরাকে হত্যা করার পাপ ব্রহ্মহত্যা রূপ ধরে ইন্দ্রকে (দ্রঃ) অনুসরণ করতে থাকে।

সূর্য, বিশ্বকর্মা ইত্যাদি বহু দেবতাকে ত্বষ্টা বিশেষণে বহু স্থানে বিশেষিত করা হয়েছে। দ্রঃ- বিশ্বরূপ, বাজী, তৃষ্ণাপল্লী।

ত্রিশূল—বিষ্ণুর চক্র, শিবের ত্রিশূল, কুবেরের পুষ্পক এবং কার্তিকেয়ের শক্তি এগুলি সূর্যের খণ্ডিত খণ্ডিত টুকরো অংশ থেকে সংজ্ঞার (দ্রঃ) পিতা বিশ্বকর্মা তৈরি করে দেন।

ত্রিশূল গঙ্গা—ত্রিশূলগণ্ডকী। গণ্ডকী ও ত্রিশূল নদী সঙ্গমের পরবর্তী গণ্ডকী অংশ নেপালে নোয়াকোট উপত্যকাতে।

ত্রিষ্টুপ— সূর্যের রথের একটি ঘোড়া। দ্রঃ- ছন্দ।

ত্রিস্রোতা—(১) তিস্তা, তৃষ্ণা। রংপুরে। কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্বতে উৎপত্তি। (২) গঙ্গা।

ত্রিহুত—তীরভুক্তি, বিদেহ (দ্রঃ), মিথিলা, লিচ্ছবি। জনকের ও পরে লিচ্ছবিদের রাজ্য।

ত্রেতাযুগ—পরিমাণ ১২,৯৬০০০ বছর (দ্রঃ- কাল)। এই যুগে (দ্রঃ) মানুষ লম্বায় চোদ্দ হাত : প্রাণ অস্থিগত ; পরমায়ু দশ হাজার বছর। পুণ্য ত্রিপাদ, পাপ একপাদ। এই যুগে অবতার বামন, পরশুরাম, রাম। এই যুগে সূর্যবংশে উল্লেখযোগ্য রাজা। পৃথু, ককুৎস্থ, ত্রিশঙ্কু, হরিশ্চন্দ্র, মরুত্ত, অনরণ্য, সগর, অংশুমান, রঘু, অজ, দশরথ, রাম ইত্যাদি। দ্রঃ- উর্বশী।

ত্রৈলোক্য বিজয়—অক্ষোভ্য (দ্রঃ) বুদ্ধ। নীলবর্ণ, চারমুখ আট হাত। ভয়ঙ্কর দেখতে। প্রত্যালীঢ় ভঙ্গি; বাহন শিবদুর্গা। হাতে বজ্রহুঙ্কার মুদ্রাতে ঘণ্টা ও বজ্র, বাকি হাতে খট্টাঙ্গ, অঙ্কুশ, বাণ, ধনু, পাশ ও বজ্র। এক পা মহেশ্বরের মাথার উপর এক পা গৌরীর বুকে। অলঙ্কার ও বহু বর্ণের পরিচ্ছদ।

ত্রোপিন (গ্রীক)—ত্রিপুনিয় ; কোচিনের প্রাচীন রাজধানী। ত্রোপিন (প্লিনি)= তিরুপত্তর ; কোচিনের বিপরীত দিকে।

ত্র্যম্বক—(১) শিব। ত্রি+অম্ব (চোখ)—হলায়ুধ ; ত্রি+অম্ব (মা)—অমরকোষ। (২) অষ্ট বসুর এক জন।

থ

থাটুন—পেগুতে সুধর্ম নগর। সিতঙ ; নদীর তীরে ; মর্তবানের উপরে। একটি মতে এটি মহাবংশের সুবর্ণ ভূমি ; গোল্ডেন চেরসোনেজ। অন্য মতে বর্মা—সুবর্ণভূমি।

থানেশ্বর—২৯°৫৮'৩০" উ, ৭৬°৫২' পূ। পূর্ব পাঞ্জাবে করনাল জেলায়, আম্বালার ৪০ কি-মি দক্ষিণে, কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত অধুনা লুপ্ত সরস্বতীর তীরে একটি তীর্থ। প্রাচীন নাম স্থান্বীশ্বর। মহাভারত ও বামন পুরাণে উল্লেখ আছে। ৭-শতকে পুষ্যভূতি রাজবংশের সময় রাজধানী ছিল। হিউ-এন-ৎসাঙ বৃহৎ নগরী বলে উল্লেখ করেছেন। ১১-শতকে গজনির সুলতান মামুদ আক্রমণ করে লুঠ করেন। বর্ত্তমানে পরিত্যক্ত একটি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ। দ্রঃ- চক্রস্বামী।

থেরবাদ—বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দ। সংস্কৃতে স্থবিরবাদ। বৌদ্ধ সাহিত্যে থের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশেষণ ; এক মাত্র গৌতম বুদ্ধের ভিক্ষুশিষ্যদের ছাড়া সাধারণত কাউকে থের বলা হয় নি। ধম্মপদে আছে পক্ককেশ হলে থের হয় না ; প্রকৃত জ্ঞানীই থের। অঙ্গুত্তর নিকায়ে আছে তরুণ হলেও পণ্ডিত ভিক্ষু থের হতে পারেন। স্থিতপ্রজ্ঞকে বৌদ্ধরা সাধারণত থের বা স্থবির বলেন।

গৌতমবুদ্ধের দেহত্যাগের পর ত্রিপিটক (দ্রঃ) সংকলিত হয় এবং বলা হয় থের-রা এই সংকলন করেছিলেন। ফলে ত্রিপিটকের আর এক নাম থেরবাদ বা স্থবির-বাদ বা আচার্যবাদ। রাজগৃহের প্রথম সম্মিলনের একশ বছর পরে বৈশালীতে দ্বিতীয় বৌদ্ধ সংগীতি বসে। এখানে এক দল ভিক্ষু পুরাতন কয়েকটি ক্ষুদ্র-নগণ্য আচার বিধি মানতে অস্বীকৃত হয়ে সংগীতি ত্যাগ করে আর একটি সংগীতি বসান। এই নতুন সংগীতির নাম হয় মহাসংগীতি এবং এঁতে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের নাম হয় মহাসাংঘিক। এই সর্বপ্রথম প্রচলিত থেরবাদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এসে ত্রিপিটকের এঁরা সংস্কার করেন। এই মহাসাংঘিকদের মধ্যে পরে বহু সম্প্রদায় দেখা দিয়েছিল। প্রাচীন থেরবাদের অনুসরণকারীদের মধ্যে পরে মহিংসাসক (মহীশাসক) ও বজ্জিপুত্তক [বৃজি-পুত্রক] দুটি সম্প্রদায় গড়ে ওঠে ; বজ্জিপুত্তক পরে আবার ভাগ হতে থাকে। এই ভাবে বুদ্ধের দেহ ত্যাগের ২-শত বছরের মধ্যে মহাসাংঘিক গত ছয়টি সম্প্রদায় এবং থেরবাদ গত এগারটি সম্প্রদায় মোট ১৭টি সম্প্রদায় দেখা দেয়। পরবর্তী কালে আরো বহু সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। থের বাদ সিংহল ও দক্ষিণপূর্ব এসিয়াতে আজও সুপ্রতিষ্ঠিত।

দংশ—সত্যযুগে এক জন প্রবল অসুর। নাম ছিল প্রাকৃগৃৎস। ভৃগুর সমান বয়স

(মহা ১২।৩।১৯)। ভৃগুর স্ত্রীকে চুরি করার অপরাধে মূত্রপায়ী অলর্ক (দ্রঃ) কীট হয়ে ছিল। ভৃগুর বলা ছিল পরশুরামের হাতে শাপমুক্তি হবে।

দক্ষ—এক জন প্রজাপতি। বহু মতে এক, এবং বহু মতে দুই ব্যক্তি। আবার বহু মতে দক্ষযজ্ঞে নিহত হওয়া পর্যন্ত এক ব্যক্তি, পরে জীবিত হবার পর যে নতুন দক্ষের কাহিনী পাওয়া যায় তিনি যেন আর এক জন। ব্রহ্মার মন থেকে মরীচি, অঙ্গিরস, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, বশিষ্ঠ ও ক্রতু জন্মান। এর পর ক্রোধ থেকে রুদ্র. কোল থেকে নারদ, দ-বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ থেকে দক্ষ, মন থেকে সনক ও বাম বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ থেকে বীরিণী জন্মান। দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ থেকে জন্ম বলে নাম দক্ষ। দ্রঃ- প্রচেতা।

ভাগবতে দক্ষ ব্রহ্মার মানস পুত্র। সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার এই চারজন সৃষ্টি কর্মে অনিচ্ছুক হলে ব্রহ্মা মরীচি ইত্যাদি উপরে উল্লিখিত পুত্রগুলিকে সৃষ্টি করেন। এই দশটি ছেলেও প্রজাপতি নামে প্রসিদ্ধ। এদের মধ্যে ব্রহ্মার অঙ্গুষ্ঠ থেকে দক্ষ জন্মান। ব্রহ্মার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মনু ও শতরূপা জন্মান। শতরূপার গর্ভে মনুর দুই ছেলে ও তিন মেয়ে আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতি। মনু এই প্রসূতির (দ্রঃ) সঙ্গে দক্ষের বিয়ে দেন (ভাগ ৪।১।১১)। অর্থাৎ দক্ষ নিজের ছোট ভাইয়ের মেয়ে প্রসূতিকে বিয়ে করেন। প্রসূতিকে মানবী বলা হয়েছে। প্রসূতির ১৬টি মেয়ে হয় ; এর মধ্যে ধর্ম ১৩টিকে (শ্রদ্ধা মৈত্রী, দয়া, শান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্রিয়া, উন্নতি, বুদ্ধি. মেধা. তিতিক্ষা, হ্রী ও মূর্তি) অগ্নি স্বাহাকে, পিতৃগণ স্বধাকে এবং শিব সতীকে বিয়ে করেন। গীতা প্রেসে (১।১৪৭।২৪) স্বায়ম্ভুব মনু > অঙ্গ > অন্তর্দ্ধামা > হবির্দ্ধামা > প্রাচীনবর্হিঃ > ১০ প্রচেতা > দক্ষ প্রজাপতি।

নাসৌ মুনিঃ যস্য মতং ন ভিন্নম্ উক্তি অনুসারে দক্ষের জন্ম ও কন্যা সংখ্যার কোন নিশ্চয়তা নেই। এমন কি ধ্রুবের ছেলে শ্লিষ্টির (দ্রঃ) বংশে জন্মও বলা হয়েছে। দক্ষের জন্ম সম্বন্ধে (দ্রঃ- মারিষা) দক্ষ চন্দ্রের নাতি বা শ্বশুর ইত্যাদি সম্পর্কের প্রশ্নে হরিবংশে গ্রন্থকার জবাব দিয়েছেন কল্প অনুসারে ঘটনা বা সম্পর্কের তফাৎ হবেই। স্ত্রী পাবার জন্যও দক্ষ বহু স্থানে দ্বিধা হয়েছেন। দক্ষ কন্যা সতীর স্বামী ভব নামে এক জন ঋষির উল্লেখও দেখা যায়। অর্থাৎ সব গ্রন্থকারেরই মৌলিক হবার আপ্রাণ প্রচেষ্টা।

আর এক মতে দক্ষের স্ত্রী অসিক্নী ; অনেকগুলি মেয়ে হয় ও শেষকালে এক মেয়ে সতী ; শিবের স্ত্রী। মহাভারতে (১।৬০।৯-১৩) ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ থেকে দক্ষ এবং বাম অঙ্গুষ্ঠ থেকে দক্ষের স্ত্রী জন্মান। এই দক্ষের ৫০-টি মেয়ে। কন্যাদের দক্ষ 'পুত্রিকা' হিসাবে পালন করেন ; ছেলের মত বংশ রক্ষা করবে। এ'দের দশটিকে ধর্ম. তেরটিকে কশ্যপ, এবং সাতাশটিকে চন্দ্র বিয়ে করেন। আর এক মতে দক্ষের স্ত্রী প্রসূতি, প্রিয়ব্রতের মেয়ে, মনুর পৌত্রী। প্রসূতির (দ্রঃ) মেয়ে চব্বিশ বা পঞ্চাশ বা ষাট। চব্বিশটি মেয়ে : শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, ধৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপু, শান্তি, সিদ্ধি, কীর্তি, খ্যাতি, সতী, সন্ততি, স্মৃতি, প্রীতি. ক্ষমা, সম্ভূতি, অনসূয়া, উর্জা, স্বাহা ও ও স্বধা। এ'দের প্রথম তেরজন ধর্মের স্ত্রী। মহাভারতে (১।৭০।৫) স্ত্রী বীরিণী ; আত্মতুল্য সহস্র পুত্র ; নারদ এ'দের সাংখ্য জ্ঞান দেন। মহাভারতে (১।৭০।৪) দক্ষ প্রচেতস্ পুত্র।

আর এক কাহিনীতে আছে একটি মন্বন্তরে প্রচেতস্-রা (প্রাচীনবর্হির দশটি ছেলে) তপস্যা করছিলেন। পৃথিবীতে ঠিক মত চাষ হচ্ছিল না; পৃথিবী ঘন বন জঙ্গলে ভরে যায়। এমন কি বায়ু চলাচল পর্যন্ত বিঘ্নিত হয়ে পড়ে। তপস্যা শেষে প্রচেতসরা সমুদ্র থেকে উঠে এই সব বন জঙ্গল দেখে মুখ থেকে অগ্নি ও বায়ু বার করে দেন। প্রায় সমস্ত বন পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তখন চন্দ্র এসে প্রচেতসদের ক্রোধ সংবরণ করতে বলেন; তাহলে বৃক্ষেরা প্রচেতসদের সঙ্গে সন্ধি করবেন; মারিষা চন্দ্রের পালিতা কন্যা গাছে এর জন্ম; এই মারিষার সঙ্গে চন্দ্র প্রচেতসদের বিয়ে দেবেন, এবং প্রচেতসদের মনের অর্দ্ধাংশ নিয়ে এবং চন্দ্রের মনের অর্দ্ধাংশ নিয়ে মারিষার গর্ভে দক্ষ প্রজাপতি জন্মাবেন। প্রচেতসরা তখন তাঁদের ক্রোধ সংবরণ করে মারিষাকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করেন। দশ জন প্রচেতসের সন্তান হিসাবে এর পর দক্ষের জন্ম হয়। এই দক্ষ ও প্রথম দক্ষ দু জনে এক কিনা কোন হদিস মেলে না। কিছু মতে শিবের অভিশাপে এই দ্বিতীয় জন্ম। এই জন্মে দক্ষের সাত ছেলে ঃ- ক্রোধ, তামস, দম, বিকৃত, অঙ্গিরা, কর্দম ও অশ্ব। হরিবংশ মতে বিষ্ণু নিজেই দক্ষ হয়ে জন্মে সমস্ত জীবজন্তু সৃষ্টি করেন। যোগবলে এই প্রথম মানব দক্ষ নিজেকে আবার নারীরূপে সৃষ্টি করে এই নারীর গর্ভে অনেকগুলি মেয়ের জন্ম দেন এবং এঁদের বিয়ে দেন। পদ্মপুরাণে বীরিণীর গর্ভে দক্ষের ৬০ কন্যা; ধর্ম ১০, কশ্যপ ১৩, সোম ২৭, অরিষ্টনেমি ৪, ভৃগুপুত্র ২, কৃশাশ্ব ২, অঙ্গিরস ২। মার্কণ্ডেয় পুরাণে (১০৪।৩) ব্রহ্মা > মরীচি > কশ্যপ > কাশ্যপ। এই কাশ্যপ দক্ষের ১৩-টি কন্যাকে বিয়ে করেন। বৃহৎ দেবতাতে কশ্যপের স্ত্রী অদিতি, দিতি, দনু, কালা, দনায়ু, সিংহিকা, মুনি, ক্রোধবশা, বরিষ্ঠা, সুরভি, বিনতা ও কদ্রু। হরিবংশে (২।৪৩) দশ জন প্রচেতার অর্দ্ধতেজ ও সোমের অর্দ্ধতেজ মিলে দক্ষ জন্মান। দক্ষের ৫০ মানস কন্যা (২।৪৭): ১০ ধর্ম, ১৩ কশ্যপ ও ২৭ সোম। অর্থাৎ এই সব কাহিনীতে সতী নাই। ভাগবত (৬।৬) ৬০ মেয়ে। ধর্ম ১০, কশ্যপ ১৩, চন্দ্র ২৭, ভূত ২, অঙ্গিরা ২, কৃশাশ্ব ২ ও তার্ক্ষ্য ৪ জনকে বিয়ে করেন। কয়েকটি মেয়ের নাম ঃ-দিতি, অদিতি, দনু, কালিকা, তাম্রা, ক্রোধবশা, মনু, অনলা ইত্যাদি। দ্রঃ- কৃশাশ্ব।

আগের সৃষ্টিগুলি হরিবংশে (২।৫০) সঙ্কল্পাৎ, দর্শনাৎ ও স্পর্শনাৎ বলা হয়েছে। ঋষি, দেব, গন্ধর্ব, অসুর, রাক্ষস, যক্ষ, ভূত, পিশাচ, বয়ঃ, পশু, সরীসৃপ, এরা মানস সৃষ্টি (৩।১)। হরি-বংশে আবার বলা হয়েছে মহাদেবের (অন্য গ্রন্থে পার্বতীর) বৈরীভাবের জন্য দেবীদের সন্তান হচ্ছিল না। দক্ষ ফলে অসিক্লীকে বিয়ে করেন। হর্যশ্বেরা (নীচে দ্রষ্টব্য) নিখোঁজ হয়ে গেলে দক্ষ নারদকে বিনাশ করতে চান। ব্রহ্মা মহর্ষিদের সঙ্গে এসে বাধা দেন। তখন প্রস্তাব করেন দক্ষের কনিষ্ঠা শ্যালিকার গর্ভে নারদ জন্ম নিক (১।৩।১১ হরি)। কশ্যপের ঔরসে এই জন্ম। পরে ১০০০ শবলাশ্ব (নীচে দ্রঃ) নিখোঁজ হয়ে গেলে দক্ষ নারদকে শাপ দেন নাশম্ এহি এবং গর্ভে বাস করতে হবে। এই সময় থেকে ভাইদের অনুসরণে (হরি ১।৩।২৬) ভাই গেলে আর ফেরে না। দেবী ভাগবতে দ্বিতীয়বারে শবলাশ্বেরা চলে গেলে দক্ষ শাপ দেন দক্ষের

ছেলে হয়ে জন্মাতে হবে, গর্ভে বাস করতে হবে। ফলে বীরিণীর ছেলে। এর পর ৬০ মেয়ে ইত্যাদি।

বিষ্ণু পুরাণে প্রথম কাহিনী ব্রহ্মার ৯ জন মানস পুত্র ঃ- ভৃগু, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরস, মরীচি, দক্ষ, মিত্র, বশিষ্ঠ। ব্রহ্মার আত্মা জাত মনু তপস্যায় শতরূপাকে সৃষ্টি করে বিয়ে করেন। শতরূপার ২৪টি মেয়ে হয় ; এদের মধ্যে ১৩ জন ধর্মের এবং সতী রুদ্রের স্ত্রী। দক্ষ যজ্ঞে এই সতী দেহ ত্যাগ করেন (বিষ্ণু পু ৮।১১)। বিষ্ণু পুরাণে দ্বিতীয় কাহিনী ব্রহ্মা প্রচেতসদের সৃষ্টি করেন প্রজাবর্দ্ধনের জন্য। এঁরা ১০ হাজার বছর তপস্যা করেন, এরপর সোমের আদেশে বৃক্ষকন্যা মারিষার গর্ভে সোমের তেজ ও প্রচেতসদের তেজ মিলিত হয়ে দক্ষের জন্ম হয়।

এরপর ব্রহ্মা এক বার এই দক্ষকে ডেকে প্রজা সৃষ্টি করতে বলেন। দক্ষ তখন দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব, অসুর, সর্প ইত্যাদি সৃষ্টি করেন। কিন্তু এই সব সৃষ্ট প্রজারা নিজেদের বংশ বৃদ্ধি করতে পারছে না দেখে নিজের স্ত্রী বীরণ কন্যা অসিক্নীর গর্ভে পাঁচ হাজার সন্তানের জন্ম দেন। এঁরা হর্যশ্ব নামে পরিচিত। কিন্তু নারদ এঁদের সঙ্গে দেখা করে পৃথিবীর সীমানা খুঁজে দেখতে প্ররোচনা দেন এবং এঁরা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েন। দক্ষ তখন আবার আর এক হাজার সন্তানের জন্ম দেন, এঁরা শবলাশ্ব নামে পরিচিত। নারদ এঁদেরও আবার পৃথিবীর সীমানা খুঁজে দেখতে পাঠান ; এবং এঁরাও আর ফেরেন না। দক্ষ তখন নারদকে অভিশাপ দেন নারদও জীবন ভর এই রকম সর্বত্র ঘুরে বেড়াবেন। এরপর অসিক্নীর গর্ভে দক্ষের ৬০-টি মেয়ে হয়। এঁদের মধ্যে দশ জনকে কশ্যপ, সাতাশ জনকে চন্দ্র, চার জনকে অরিষ্টনেমি এবং দুজনকে কৃশাশ্ব বিয়ে করেন। বিষ্ণু পুরাণে এক স্থানে আছে ব্রহ্মার দ-অঙ্গুষ্ঠ থেকে দক্ষ এবং এই দক্ষের কন্যা অদিতি ইত্যাদি।

প্রসূতি নামে স্ত্রীর গর্ভে চব্বিশটি মেয়ে হয়েছিল এবং এঁদের মধ্যে তেরজনকে ধর্ম (দ্রঃ) বিয়ে করেন। শতরূপার ১৩টি মেয়েকেও বিয়ে করেছিলেন। অথচ ধর্মের স্ত্রী ছাব্বিশ জন নয়। অর্থাৎ বিবরণের মধ্যে কিছু অসামঞ্জস্য রয়েছে বা প্রসূতিই শতরূপা। বাকি এগার জনের মধ্যে খ্যাতির বিয়ে হয় ভৃগুর সঙ্গে, সতীর শিবের সঙ্গে, ইত্যাদি। বিভিন্ন গ্রন্থে কাহিনী বিভিন্ন।

ঋক্‌বেদে (২।২৭।১) মিত্র অর্যমা, ভগ, তুবিজাত, বরুণ, দক্ষ, অংশ এই কয় জনকে আদিত্য বলা হয়েছে। ১০।৭২।৪-৫ ঋকেও অদিতির পুত্র। যাস্ক বলেছেন দক্ষ একজন আদিত্য। আবার বহু স্থানে আদিত্যদের নামের তালিকাতে দক্ষের বদল ত্বষ্টা নামও পাওয়া যায়। শতপথ ব্রাহ্মণে দক্ষই প্রজাপতি। তাঁর যজ্ঞের নাম দাক্ষায়ণ যজ্ঞ। ঋক্‌বেদে (৩।১৪।৭) অগ্নিকেও দক্ষ বলা হয়েছে ; এটি সরল বিশেষণ মাত্র এবং সায়ণও এই দক্ষ শব্দটিকে বলত্ব বা সুপটুত্ব অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন। ৯।৬১।১৮ ঋকে সোমকে দক্ষ বলা হয়েছে। আবার আছে দক্ষং দধাসি জীবসে (ঋক্ ১।৯১।৭)— সোম দক্ষকে ধারণ করেন। আবার এক স্থানে অগ্নি দক্ষের পিতা। এই সব ঋকে উল্লিখিত দক্ষকে সতীর পিতা মনে করা সম্পূর্ণ যুক্তি হীন। আবার আছে দক্ষ ও অদিতি

জগতের পিতা মাতা। ঋক্ ১০।৭২।৪-৫ সম্পূর্ণ প্রহেলিকা, এখানে অদিতি দক্ষের কন্যা এবং দক্ষ অদিতির পুত্র। এই প্রহেলিকার অর্থ ভাষ্যকার হিসাবে ভিন্ন হবেই। অর্থাৎ এই প্রহেলিকার দক্ষ সতীর পিতা নন। আবার আছে অগ্নিঃ অপি অদিতিঃ উচ্যতে (নিরুক্ত ১।১২৩।৭)- এবং এই অদিতি সরল বিশেষণ ; কশ্যপ পত্নী নিশ্চয় নন।

দক্ষের যজ্ঞ সৃষ্টি যজ্ঞ, সে যজ্ঞে ধ্বংসের দেবতা রুদ্রের স্থান হতে পারে না বলে অনেকে ব্যাখ্যা করেন। এই জন্যই শিবহীন যজ্ঞ; এ সব অবশ্য ব্যক্তিগত ভাষ্য। রুদ্রকে যজুর্বেদে যজ্ঞ ভাগ দেওয়া হয়েছে। শতপথ ব্রাহ্মণে ও সাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণে আছে পর্বত-পুত্র-দক্ষ যজ্ঞ করে কাম্য ফল (শত ২।৪।১) পেয়েছিলেন। এই দক্ষ ও সতীর পিতা দক্ষকে এক করারও কোন কারণ নাই। দক্ষ কন্যা উমা বা সতী বৈদিক সংহিতাতে নাই। ঋক বেদে দক্ষ কন্যা ইলার উল্লেখ আছে। পুরাণে বহুস্থানে দক্ষ কন্যার তালিকাতে সতী নাই। দ্রঃ- পার্বতী।

বিশ্ব স্রষ্টারা একবার যজ্ঞ করলে দক্ষ ইত্যাদি সকলেই আসেন। দক্ষ এলে সকলেই উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখান কিন্তু ব্রহ্মা ও মহাদেব ওঠেন না। এতে দক্ষ মহাদেবকে নিন্দা করেন এবং শাপ দেন মহাদেব কোন যজ্ঞের আর ভাগ পাবেন না। দ্রঃ- প্রম্লোচা। দেবী ভাগবতে (৭।৩০।২৭) আছে অত্রির ছেলে দুর্বাসা জম্বুনদে গিয়ে জগদম্বিকার আরাধনা করতে থাকেন। দেবী সন্তুষ্ট হয়ে নিজের গলা থেকে মালা নিয়ে দুর্বাসাকে দেন। এই মালার ফুল থেকে মধু পড়ছিল। দুর্বাসা এই মালা মাথায় জড়িয়ে দক্ষের কাছে যান সতীকে নমস্কার করতে। মালা সম্বন্ধে সব শুনে দক্ষ দুর্বাসার কাছে এটি চেয়ে নেন এবং শয়ন কক্ষে রেখে দেন। এই ফুলের গন্ধে আকুল হয়ে দক্ষ স্ত্রীকে সম্ভোগ করেন। এই পাপে (তেন) দ পাপেন (-ভাগ ৭।৩০।৩৬) দক্ষের মনে সতী ও শঙ্করের প্রতি বিদ্বেষ গড়ে ওঠে। অন্য মতে শিব ও পার্বতী ঘটনাটি জানতে পেরে দক্ষকে ভৎর্সনা করেন। দক্ষ এই ভাবে ভর্ৎসিত হয়েছিলেন বলেই নিজের যজ্ঞে শিব ও পার্বতীকে আমন্ত্রণ করেন নি। অন্য মতে মালাটি ঘরে ছিল ; দক্ষ সম্ভোগ করাতে মালাটি অপবিত্র হয় এবং মালাগত প্রচ্ছন্ন শাপে দক্ষ মহাদেবকে ঘৃণা করতে থাকেন। শিবকে যজ্ঞে না ডাকার আর একটি কারণ বিষ্ণু যখন ঘুম থেকে উঠে সৃষ্টি করবেন স্থির করলেন তখন প্রথমে তাঁর মুখ থেকে ব্রহ্মা জন্মান ; ব্রহ্মার পাঁচটি মাথা ছিল। এরপর বিষ্ণুর মুখ থেকে মহাদেবের জন্ম হয়। এই ব্রহ্মা ও শিব দুজনেই অহঙ্কারে মত্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে কে বড় এই নিয়ে বিবাদ আরম্ভ করেন এবং শেষ অবধি ব্রহ্মার একটি মাথা মহাদেব ছিঁড়ে নেন। এই মাথা শিবের হাতে আটকে লেগে থাকে ; এবং ব্রহ্মা শাপ দেন মহাদেব চিরদিন অপবিত্র হয়ে থাকবেন। এই সব কারণে দক্ষ নিজের যজ্ঞে শিবকে নিমন্ত্রণ করেন নি।

ভাগবতে (৪।২) আছে প্রজাপতিগণের যজ্ঞ। দক্ষ ইত্যাদি সকলে আসেন। ব্রহ্মা ও শিব উঠে দাড়ান না। দক্ষ গালি দেন 'মর্কট লোচন' (৪।২।১২) জামাতা। ব্রহ্মার কথায় অপাত্রে কন্যা দিতে হয়েছে ইত্যাদি। দক্ষ শাপ দেন দেবতাদের যজ্ঞে শিব যজ্ঞ ভাগ পাবে না। নন্দী তখন পাল্টা শাপ দেন অবিদ্যাতে আচ্ছন্ন দক্ষের ছাগমুণ্ড হবে (৪।২।২৮)। ব্রাহ্মণরা যারা দক্ষের কথা অনুমোদন করেছে তাদের শাপ

দেন বার বার জন্মে সংসার যন্ত্রণা ভোগ করতে ; যাচক হয়ে পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াবে। ভৃগু তখন শাপ দেন শিবের ভক্তরা শাস্ত্রবিরোধী পাষণ্ড হবে। এই ভাবে উভয় পক্ষ শাপ দিতে থাকলে শিব স্থান ত্যাগ করেন। হরির উপলক্ষ্যে ১000 বছর ধরে এই যজ্ঞ (বিশ্বসৃজঃ সত্রঃ ৪।২।৩৪) হয়। যজ্ঞ শেষে প্রয়াগে অবভৃত স্নান করে যে যার বাড়ি ফিরে যান।

ভাগবতে (৪।৩) ব্রহ্মা দক্ষকে সকলের অধিপতি ঘোষণা করলে দক্ষ গর্বিত হয়ে শিবপক্ষীয় ব্রহ্মজ্ঞ দেবতাদের অগ্রাহ্য করে বাজপেয় যজ্ঞ শেষে বৃহস্পতি যজ্ঞ আরম্ভ করেন। সমস্ত ঋষি, বাকি দেবতা ও পিতৃগণকে নিমন্ত্রণ করেন। এরা আকাশ পথে নানা আলোচনা করতে করতে যেতে থাকেন। সতী এদের দেখে ও কথা শুনে সকলের মত সেজে যেতে চান। শিব বারণ করেন ; গেলে অমঙ্গল হবে। সতী তবু আসেন ; সঙ্গে শিবের বহু অনুচরও থাকে কিন্তু দক্ষ সমাদর করেন না। রাগে সতীর তেজেও বহু ভূত প্রেত জন্মায়। সতী তারপর পিতাকে তিরস্কার করে, যোগবলে (প্রজজ্বাল সমাধিজাগ্নিনা ৪।৪।২৭) দেহত্যাগ করেন। তখন শিবের ও সতীর অনুচররা দক্ষকে হত্যা করতে ছুটে এলে ভৃগু অগ্নিতে আহুতি দিয়ে ঋভু নামে দেবতাদের (ভাগ ৪।৪।৩৩) দৃষ্টি করেন। শিব ও সতীর অনুচরদের এরা বিতাড়িত করেন। সব খবর পেয়ে মহাদেব একটি জটা ছিঁড়ে মাটিতে ফেলেন ; বীরভদ্র জন্মায়। দক্ষবধের নির্দেশ দেন। শিবের অনুচররা এসে যজ্ঞ স্থল চুরমার করে। ভৃগু দাড়ি দেখিয়ে শিবকে উপহাস করেছিলেন ফলে বীরভদ্র দাড়ি ছিঁড়ে নেন। ভগ দক্ষকে ইসারা করে উৎসাহিত করেছিলেন ফলে বীরভদ্র চোখ উপড়ে নেন। পূষা দাঁত বার করে হেসেছিলেন ফলে দাঁতগুলি ভেঙে দেন। দক্ষের মাথা ছিন্ন করতে না পেয়ে বীরভদ্র দক্ষকে যূপে ফেলে নিহত করে ছিন্নশির দক্ষিণাগ্নিতে আহুতি দিয়ে ফিরে যান। দেবতা (ভাগ ৪।৬) ইত্যাদি তখন ব্রহ্মার কাছে আসেন। এই সব হবে জেনে ব্রহ্মা ও নারায়ণ যজ্ঞে আসেন নি। ব্রহ্মা শিবকে সন্তুষ্ট করে যজ্ঞ ভাগ দিতে বলেন। বিরাট বট (৪।৬।৩১) গাছের নীচে মহাদেব বসেছিলেন। ব্রহ্মা ইত্যাদি সকলে আসেন। সব কিছু সুস্থ ও জীবিত করে দেবার বর চান। যজ্ঞে যা অবশিষ্ট থাকবে (যৎ উচ্ছিষ্টঃ অধ্বরস্য বৈ) সবই মহাদেব পাবেন স্থির হয়। মহাদেব সন্তুষ্ট হয়ে (ভাগবতে ৪।৭) দক্ষের ছাগমুণ্ড হবে, ভৃগুর ছাগ দাড়ি (বস্তশ্মশ্রু) হবে, আহত ও বিকলাঙ্গদের অশ্বিনীকুমাররা সুস্থ করে দেবেন বর দেন। সকলে শিবকে অনুরোধ করেন যজ্ঞ সম্পাদন করতে। দক্ষ ক্ষমা চান। বিষ্ণুও আসেন। যজ্ঞ সম্পন্ন হয়। অন্য মতে শিবের অনুচরেরা ক্রমশ পৃথিবী নষ্ট করে ফেলতে যাচ্ছিল দেখে সকলে মহাদেবকে শান্ত করেন। মহাদেব অনুচরদের ফিরিয়ে নেন। দেবতারা দক্ষের জীবন ভিক্ষা চাইলে মহাদেব ছাগমুণ্ড জুড়ে দিতে বলেন। ছাগমুণ্ড পেয়ে জীবিত হয়ে দক্ষ যজ্ঞ পূর্ণ করেন এবং মহাদেবের স্তব করেন।

মহাভারতে দক্ষযজ্ঞের কাহিনীর কয়েকবার উল্লেখ রয়েছে। মহাভারতে দ্রোণ পর্বে (৭।১৭৩) দক্ষ যজ্ঞের উল্লেখ আছে। যজ্ঞে শিবের ভাগ না থাকাতে শিব যজ্ঞ

নষ্ট করেন ; পুরোডাশ চর্বণ রত পূষণের দাঁত ভাঙেন। দেবতাদের বাণ বিদ্ধ করেন। দেবতারা তখন যজ্ঞ ভাগ দেন। শিবও আবার যজ্ঞ চালু হতে দেন।

মহাভারতে (১০।১৮।১) দেবযুগ অতীত হলে দেবতারা এক যজ্ঞ করেন। রুদ্রের বিশেষ পরিচয় এরা জানতেন না : ফলে যজ্ঞভাগ ছিল না। যজ্ঞ নাশক ধনু তৈরি করে আক্রমণ করেন। যজ্ঞকে বাণবিদ্ধ করলে মৃগরূপ ধরে স্বর্গে পালায়। পূষার দাঁত, ভগের নয়ন ও সবিতার হাত যায়। দেবতারা পালাতে গেলে মহাদেব এঁদের প্রতিরোধ করেন। দেবতাদের বাক্যে (বাক্ অমরৈঃ উক্তা) মহাদেবের শরাসন ছিন্ন হয়। যজ্ঞকে সঙ্গে নিয়ে দেবতারা মহাদেবের শরণ নেন। নিজের রাগকে মহাদেব জলাশয়ে স্থাপন করেন। এই রাগরূপ অগ্নি জল পান করে (দ্রঃ বড়বা)। সূর্য্য ইত্যাদি সুস্থ হয়ে যান।

মহাভারতে (১২।২৮৩) আছে সুমেরু পর্বতে দুর্গমে সাবিত্র শৃঙ্গে হরপার্বতীর বাস। পার্বতী জিজ্ঞাসা করলে মহাদেব জানান যজ্ঞভাগ নির্দিষ্ট করার সময় দেবতারা তাঁর ভাগের ব্যবস্থা করেন নি ইত্যাদি। মহাদেব তারপর পার্বতীর অভিপ্রায় বুঝে নিজে গিয়ে যজ্ঞ নষ্ট করেন। মৃগরূপী যজ্ঞ পালাতে থাকে। মহাদেব পেছু পেছু ছুটে যান। কপাল থেকে ঘাম পড়ে ; ঘাম থেকে আগুন জন্মে যজ্ঞ ইত্যাদি সব কিছু পোড়াতে থাকে। এই আগুন থেকে একজন অনুচর জন্মায় ; ইনি জ্বর (দ্রঃ)। জ্বর ছুটে এলে দেবতারা পালায়। পার্বতী এখানে দক্ষ কন্যা নন। দক্ষের এটি অশ্বমেধ যজ্ঞ ছিল। কালীপ্রসন্নে এই ঘটনাটি আছে এবং পরবর্তী অধ্যায়ে আবার রয়েছে ঃ--

মহাভারতে (কালী প্রসন্ন ১২।২৮৪) বৈবস্বত মনুর রাজত্বকালে হরিদ্বারে প্রচেতস্ পুত্র দক্ষের অশ্বমেধ যজ্ঞ। সমস্ত দেবতারা আসেন। রুদ্র আসেননি বলে দধীচি তীব্র প্রতিবাদ করেন। দক্ষ বলেন একাদশ রুদ্রকে তিনি জানেন কিন্তু তাদের মধ্যে কে মহাদেব তিনি জানেন না। আবার অন্য সংস্করণে দক্ষ বলেন শিব মহাদেব, যজ্ঞের অতীত মনে করে শ্রদ্ধায় নিমন্ত্রণ করেন নি। দধীচি বলেন দক্ষের এসব মতলব বাজি : এবং যজ্ঞ নষ্ট হবে ভবিষ্যৎ বাণী করেন। এদিকে পার্বতী দুঃখ করতে থাকেন। তখন মহাদেব মুখ থেকে বীরভদ্র এবং পার্বতীর ক্রোধ থেকে কালী, ভদ্রকালী যজ্ঞ নষ্ট করতে যান। বীরভদ্রের রোম কূপ থেকে গণেশ্বররা জন্মান। সকলে এসে যজ্ঞ নষ্ট করেন। বীরভদ্র মৃগরূপী যজ্ঞের (দক্ষের নয়) শিরচ্ছেদ করেন। শেষ পর্যন্ত দক্ষ শিবের উদ্দেশ্য স্তব করেন। শিব সন্তুষ্ট হয়ে অগ্নিকুণ্ড থেকে বার হন সহস্র অশ্বমেধ ও শত বাজপেয় যজ্ঞের ফল ও পাশুপত ব্রতের ফল বর দেন। লণ্ডভণ্ড যজ্ঞ স্থল আবার ঠিক হয়ে যায় ; যজ্ঞ নিষ্পন্ন হয়। ভগ ইত্যাদি দেবতার কোন উল্লেখ নাই। পার্বতীকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে যান।

শিব এখানে বলেন পূর্ব পূর্ব কল্পেও দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করেছিলেন (কা-প্র ১২।২৮৫)। এখানে শৈবধর্ম সম্বন্ধে বিশেষ ব্যাখ্যা ও প্রশংসা রয়েছে। মহাদেব দক্ষকে বলেন বেদ ইত্যাদি মিলিয়ে এই পাশুপত ধর্ম নামে নতুন ধর্ম সৃষ্টি করেছেন। সহজেই প্রভূত ফল পাওয়া যায়।

মহাভারতে (১২।৩০০) আছে দক্ষ যজ্ঞে রুদ্রের ভাগ ছিল না। দধীচি দ্রুব

মহাদেবকে ক্ষিপ্ত করে যান। মহাদেব শূল নিক্ষেপ করেন। অর্থাৎ পার্বতীর দেহত্যাগ ইত্যাদি এখানে নাই। পরবর্তী ঘটনাগুলি ঃ- খণ্ডপরশু দ্রষ্টব্য।

মহাভারতে (১৩।১৬০।১১) দক্ষ যজ্ঞের উল্লেখ আছে এবং রুদ্রের যজ্ঞভাগ দেবতারা নির্দিষ্ট করে দেন।

হরিবংশে অশ্বমেধ যজ্ঞ হচ্ছিল, বৃহস্পতি পুরোহিত। ভাগার্থে রুদ্র ও নন্দী দক্ষকে নিহত করেন। এই নন্দী মহাদেবের দেহ দ্বিধা হয়ে উৎপন্ন। যজ্ঞকে বাণবিদ্ধ করলে মৃগরূপে ব্রহ্মার শরণ নেয়; ব্রহ্মা যজ্ঞকে মৃগশিরা নক্ষত্র হিসাবে স্থাপন করেন। বিষ্ণু (৩।৩২।৩৭) যুদ্ধে আসেন। মরুৎগণ ও বিশ্বদেবগণ একশেষ পর্যন্ত বিষ্ণু ভাগের ব্যবস্থা করে দেন। পুনরায় যজ্ঞ হয়।

বরাহ পুরাণে গৌরী ব্রহ্মার কন্যা। দক্ষ যজ্ঞ নষ্ট করতে এলে ব্রহ্মার আদেশে দক্ষ গৌরীর সঙ্গে শিবের বিয়ে দেন।

বরাহ পুরাণে গৌরী দক্ষের পালিতা কন্যা; রুদ্রপত্নী; দক্ষযজ্ঞে তাঁর কোন অংশ ছিল না। এই কাহিনীতে ব্রহ্মা রুদ্রকে সৃষ্টি করেন। তপবল ছিল না; রুদ্র প্রজাসৃষ্টি করতে না পেরে জলে ডুবে তপস্যা করতে থাকেন। ব্রহ্মা গৌরীকে নিজের দেহে লীন করে নেন। পরে দক্ষ ইত্যাদি ৭-জন মানস পুত্র সৃষ্টি করে দক্ষের হাতে গৌরীকে পালন করতে দেন। দক্ষ আনন্দে ব্রহ্মার তৃপ্তির জন্য যজ্ঞ করেন। দেবতারা যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন। তপস্যা শেষ করে রুদ্র জল থেকে উঠে যজ্ঞ দেখে যুদ্ধ আরম্ভ করেন। ভগের নেত্র, পূষার দন্ত যায়। বিষ্ণুর সঙ্গে তারপর তীব্র যুদ্ধ হতে থাকে। ব্রহ্মার আদেশে তখন দেবগণ যজ্ঞভাগ দিলে রুদ্র সন্তুষ্ট হয়ে যজ্ঞ পূর্ণ হবার বর দেন। বরাহ পুরাণে (৩৩ অধ্যায়) আছে ক্রতুর বৃষণ ও যায়; যজ্ঞ স্থল থেকে বায়ু পালান। দেবতারা পশুতে পরিণত হয়। শেষ অবধি ব্রহ্মা রুদ্রের যজ্ঞ ভাগের ব্যবস্থা করেন।

দেবী ভাগবতে মহাদেবের ক্রোধে 'ভদ্রকালীগণ' দ্বারা অন্বিত বীরভদ্র জন্মান।

বৃহৎ-ধর্ম পুরাণে শিব বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে নিজের অনুরক্তা দক্ষকন্যা সতীকে অপহরণ করেন। এই কারণে ক্রুদ্ধ হয়ে দক্ষ শিবহীন যজ্ঞ করেন। সতী যজ্ঞে যেতে চান; দশমহাবিদ্যা রূপ দেখান এবং অনুমতি আদায় করে চতুর্ভুজা কালী রূপে যজ্ঞে আসেন এবং পিতার কাছে তিরস্কৃতা হলে সতীই পিতাকে অভিশাপ দেন। শিব বীরভদ্রকে নিয়ে আসেন এবং বীরভদ্র দক্ষের মুণ্ড ছেদন করেন। পূষার দন্ত ও ভগের চক্ষুও যায়। এরপর প্রসূতির স্তবে ও অন্যান্য দেবতাদের অনুরোধে নন্দী ছাগমুণ্ড জুড়ে দেন; দক্ষ জীবিত হয়ে শিবের স্তব করেন।

শিবপুরাণে দক্ষ দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে হিমালয়ে একদিন জামাতাকে দেখতে আসেন। কিন্তু শিব দাঁড়িয়ে উঠে দক্ষকে সম্মান দেন না। এই রাগে দক্ষ যজ্ঞ করেন; অন্যান্য জামাতাদের নিয়ে আসেন এবং শিবকে হবির্ভাগ দেন না। নারদের কাছে খবর পেয়ে সতী ছুটে আসেন। দক্ষ আরো রেগে গিয়ে সতীকে বাদ দিয়ে অন্যান্য মেয়েদের অর্চনা করলেন। সতী প্রতিবাদ করলে দক্ষ শিব ও সতীর নিন্দা করতে থাকেন। সতী তখন শাপ দেন দক্ষের কুল নষ্ট হবে এবং শিবের হাতে শাস্তি

পাবে এবং নিজে দেহত্যাগ করে হিমালয়ে চলে যান। সতী দক্ষকে ত্যাগ করলে যজ্ঞের মন্ত্রাদিও তিরোহিত হয় এবং মহাদেব শাপ দেন বৈবস্বত মন্বন্তরে প্রাচীনবর্হির পৌত্র এবং প্রচেতাদের পুত্র হয়ে জন্মাতে হবে এবং মহাদেব তখন দক্ষের ধর্মকর্মে বার বার বিঘ্ন সৃষ্টি করবেন।

এই শাপ অনুসারে বৈবস্বত মন্বন্তরে দক্ষের যজ্ঞ কালে হিমালয় কন্যা পার্বতী যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হন নি। দেবীর প্ররোচনায় শিব বীরভদ্রকে সৃষ্টি করেন এবং বীরভদ্র নিজের রোম কূপ থেকে অসংখ্য গণেশ্বর সৃষ্টি করে যজ্ঞ পণ্ড করেন; দক্ষের মাথা কেটে নেন এবং যজ্ঞে উপস্থিত দেবতাদের শাস্তি দেন। ব্রহ্মা সমেত দেবতারা শিবকে সন্তুষ্ট করলে দক্ষের যজ্ঞ সম্পন্ন হয় এবং ব্রহ্মা নিজে দক্ষের জরৎছাগ মুণ্ড করে দেন। দক্ষ শিবের গাণপত্য পান (শিব পু ১৭।২৫-২৯)

বামন পুরাণে ঋষি গৌতমের কন্যা জয়ার কাছে সতী শিবহীন যজ্ঞের কথা শুনেই দেহ ত্যাগ করেছিলেন। স্কন্দ পুরাণে পতিনিন্দা শুনে দেহত্যাগ করে হিমালয়ের কন্যা হয়ে জন্মান এবং শিবের ঘরে আসেন। দক্ষ প্রচেতস্ পুত্র হয়ে জন্মে গঙ্গাদ্বারে শিবহীন যজ্ঞ করেন এবং বীরভদ্র এসে যজ্ঞ নষ্ট করে।

একটি মতে মহাদেবকে যজ্ঞে না ডাকার মূল কারণ মহাদেব অনার্য দেবতা। দক্ষ চন্দ্রকে (দ্রঃ) শাপ দিয়েছিলেন ক্ষয় রোগ গ্রস্ত হতে হবে। পৃথু (দ্রঃ) যখন গোরূপা পৃথিবীকে দোহন করেন তখন দক্ষকে সকলের রাজা (দ্রঃ) করা হয়েছিল। শরশয্যায় ভীষ্মকে দক্ষ দেখতে এসেছিলেন। দক্ষের আর এক নাম ক (মহা ১২।২০১।৭)। দক্ষকে চন্দ্রের বাবা, অন্য মতে ছেলে বলা হয়।

দক্ষসাবর্ণি—নবম মনু। বরুণের ছেলে। এই মন্বন্তরে তিন শ্রেণীর দেবতা থাকবেন; প্রাণ, মরীচি-গর্ভ ও সুধর্মা। এই তিনটি ভাগের প্রতি ভাগে বারটি করে দেবতা থাকবেন। ইন্দ্র অদ্ভুত নামে অভিহিত হবেন। সপ্তর্ষি হবেন সবন, দ্যুতিমান, ভব্য, বসু, মেধাতিথি, জ্যোতিষ্মান ও সত্য। দক্ষসাবর্ণির ছেলে হবে ধৃতকেতু, দীপ্তিকেতু, পঞ্চহস্ত, নিরাময়, পৃথু-শ্রবা ইত্যাদি ইত্যাদি। আয়ুষ্মানের ঔরসে অম্বুধারার গর্ভে ভগবান বিষ্ণু (ভাগ ৮।১৩।২০) ঋষভ (দ্রঃ) হয়ে জন্মাবেন। হরিবংশে (৭।৬৫) ইনি দশম মনু। সপ্তর্ষিঃ- পুলহ গোত্র হবিষ্মান, ভার্গব সুকৃতি, আত্রেয় আপোমূর্তি, বশিষ্ঠ অষ্টম, পুলস্ত্যগোত্র প্রমিতি, কাশ্যপবংশে নাভাগ এবং নভসের পুত্র সত্য। দেবতাদের দুটি গণ। ১০ মনুপুত্রঃ- মনুসুত, উত্তমৌজা, নিকুষঞ্জ, বীর্যবান, শতানীক, নিরামিত্র, বৃষসেন, জয়দ্রথ, ভূরিদ্যুম্ন ও সুবর্চা।

দক্ষিণ কেদার—মহীশূরে বলিগামা, বল্লীপুর। এখানেও কেদারনাথের মন্দির রয়েছে। বিখ্যাত তীর্থ।

দক্ষিণ গঙ্গা—গোদাবরী। কাবেরী (নৃসি-পু)। নর্মদা (স্কন্দ-পু)। তুঙ্গভদ্রা (বিলহন)।

দক্ষিণ গিরি—(১) চেতিয় (দ্রঃ); ভূপালের রাজধানী। (২) মগধে একনালাতে একটি গ্রাম যেন। বুদ্ধদেব এখানে কাশিভরদ্বাজসুত্ত উপদেশ দেন।

দক্ষিণদিক—সূর্য যজ্ঞ করে এই দিকটি কশ্যপকে দক্ষিণা হিসাবে দান করেছিলেন। গরুড় এই দক্ষিণ দিকে গজকচ্ছপ পেয়েছিল। এই দিকে সাবর্ণি ও যবক্রীত সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন ; সূর্য এই সীমা অতিক্রম করতে পারেন না। এই দিকে শিবা নামে ব্রাহ্মণীরা সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করে আলভন্তে যমক্ষয়ম্ (মহা ৫।১০৭।১৮)।

দক্ষিণ মথুরা—মাদ্রাজ প্রদেশে কৃতমালা নদীর তীরে মদুরা, মথুরা, বা মীনাক্ষী (দ্রঃ)। পাণ্ড্যদের প্রাচীন রাজধানী। যুক্তপ্রদেশের অনুরূপ যেন।

দক্ষিণ সিন্ধু—কালিসিন্ধু ; চম্বলের একটি করদা। মেঘদূতে এটি সিন্ধু।

দক্ষিণা—প্রজাপতি রুচি ও স্ত্রী আকূতির কন্যা। শতরূপার মেয়ে প্রসূতি ও আকূতি। আকূতির ছেলে যজ্ঞ এবং মেয়ে দক্ষিণা। যজ্ঞের ঔরসে দক্ষিণার গর্ভে বারটি ছেলে হয়। স্বায়ম্ভুব মনুর রাজত্বকালে এই বার জন যম অন্য মতে তুষিত দেব বলে পরিচিত। এঁদের নাম তোষ, সন্তোষ, প্রতোষ, ভদ্র, শান্তি, ইড়াস্পতি, ইধ্ম, কবি, বিভু, বহ্নি, সুদেব ও রোচন।

এই দক্ষিণাই গোলকে রাধার সখী হয়ে সুশীলা নামে জন্মান। গোপী সুশীলাকে এক দিন কৃষ্ণ সম্ভোগ করছিলেন। রাধিকা এসে পড়েন এবং কৃষ্ণ অন্তর্হিত হয়ে যান। রাধিকা তখন সুশীলাকে অভিশাপ দেন ভবিষ্যতে গোলোকে এলে ছাই হয়ে যাবে। এর পর রাধিকা কৃষ্ণকে খুঁজতে থাকেন কিন্তু খুঁজে পান না।

এর পর সুশীলা লক্ষ্মীর আরাধনা করতে থাকেন এবং লক্ষ্মী দেখা দিলে সুশীলা লক্ষ্মীর দেহে লীন হয়ে যান। অর্থাৎ আগের জন্মের দক্ষিণা এইভাবে লীন হয়ে গেলে দেবতাদের যজ্ঞ দক্ষিণার অভাবে পূর্ণ হতে পায় না। দেবতারা তখন ব্রহ্মার কাছে যান ; ব্রহ্মা বিষ্ণুর ধ্যান করতে থাকেন। বিষ্ণু সন্তুষ্ট হয়ে দক্ষিণাকে লক্ষ্মীর দেহ থেকে বার করে ব্রহ্মাকে দান করেন। ব্রহ্মা তখন দক্ষিণাকে যজ্ঞপুরুষের হাতে দান করেন। যজ্ঞপুরুষ দক্ষিণাকে পেয়ে আত্মহারা হয়ে যান এবং বহু দিন এক সঙ্গে নির্জনে বিহার করতে থাকেন। ফলে দক্ষিণা গর্ভবতী হন এবং একটি ছেলে হয় নাম ফলদ। এই ফলদ যজ্ঞের ফল দান করেন।

দক্ষিণাপথ—দাক্ষিণাত্য। নর্মদার দক্ষিণ অংশ। বিন্ধ্যের দ-অংশ। দক্ষিণাবদেশ (গ্রীক)। প্রথম দিকে গোদাবরীর ওপর অংশের আর্য বসতিও বোঝাত। মহারাষ্ট্র (দ্রঃ)।

দগ্ধরথ—দ্রঃ- অঙ্গারপর্ণ।

দণ্ড—(১) ভীমসেনের অস্ত্র। (২) সুমালী ও কেতুমতীর ছেলে প্রহস্ত, অপম্পন, বিকট, ধূম্রাক্ষ, সুপার্শ্ব, সংহ্রাদ, প্রাকবাত, ভাসকর্ণ ও দণ্ড ; এঁরা রাবণের নয় জন মন্ত্রী। কালকার্মুক ও প্রঘস আরো দুটি (রামা ৭।৫।৩০) ভাই রয়েছে দণ্ডের। (৩) রাজা ইক্ষ্বাকুর একশ ছেলের মধ্যে বিকুক্ষি, নিমি, ও দণ্ড তিন জন প্রধান। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে দণ্ড দেবাসুরের যুদ্ধে বহু অসুর বধ করেছিলেন। হিমালয় থেকে বিন্ধ্য পর্যন্ত অঞ্চলে রাজ্য ; মধুমতী নগরী স্থাপন করে রাজ্য পালন করতেন। মুনি সাগন এঁর পুরোহিত। (৪) ক্রোধহন্তা (মহা ১।৬১।৪৩) অসুর দণ্ড হয় জন্মান। দ্রঃ- দণ্ডক, সুদণ্ড।

দণ্ড—রাজনীতির চারটি ভাগ সাম দান, ভেদ ও দণ্ড। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, শুক্র, কামন্দক ইত্যাদি মতে মানুষকে ধর্ম পথে অবিচলিত রাখে। না হলে মানুষ বিপথগামী হয়। দণ্ডের অভাবে সমাজে মাৎস্য ন্যায় প্রচলিত হয়। আর এক অর্থে দণ্ড রাজার বা বা শাসকের শক্তি। শাসকের কর্তব্য মৃদুতা ও নির্দয়তা ত্যাগ করে উচিত দণ্ড প্রয়োগ করা।

দণ্ড—দেশে ও অনাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতায় ভরে যায়। ব্রহ্মা মহাদেবকে একটা উপায় করতে বলেন : মহাদেব তখন দণ্ডের সৃষ্টি করেন। এ ছাড়া দণ্ডপ্রয়োগের জন্য দেবতাদের রাজা (দ্রঃ) ইন্দ্র, পিতৃগণের রাজা যম ইত্যাদি ইত্যাদি এবং মানুষের রাজা ক্ষুপ ইত্যাদিকেও (মহা ১২।১২২।২৭) ক্ষমতায় স্থাপন করেন। সমাজে দণ্ডের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধের বলা হয়েছে ঈশ্বরশ্চ মহাদণ্ডঃ দণ্ডে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ (মহা ১২।১২১।১)।

শর শয্যায় ৩-য় দিনে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলেন পৃথিবীতে কোন রাজা ছিল না। দুর্নীতিতে ভরে ওঠে। দেবতারা ব্রহ্মার কাছে যান। ব্রহ্মা নীতিশাস্ত্র রচনা করে দেবতাদের দেন। এটি দণ্ডনীতি ; সহস্রাণাং শতং অধ্যায় যুক্ত (মহা ১২।৫৯।১৯)। মহাদেব একে সংক্ষিপ্ত করেন নাম হয় বৈশালাক্ষ। ইন্দ্র আরো ছোট করেন, নাম হয় বাহুদণ্ডক। বৃহস্পতি আরো ছোট করেন নাম হয় বার্হস্পত্য (১২।৫৯।৯০)। শুক্র আরো ছোট করেন ; নাম নাই। দেবতারা তারপর বিষ্ণুর কাছে রাজার জন্য যান। বিরজা মানস সৃষ্টি ; ইনি রাজা না হয়ে সন্ন্যাস ধর্ম নেন। বিরজা >প্রজাপতি কর্দম ইত্যাদি ক্রমশ রাজা হতে থাকেন।

দণ্ডক—শম্বূককে হত্যা করে রাম অগস্ত্যের আশ্রমে এলে মুনি বলেন তিনি একবার দণ্ডক বলে তপস্যা করতে গিয়েছিলেন। দ্রঃ-শ্বেত। কৃত যুগে মনু রাজা হন। মনুর ছেলে ইক্ষ্বাকু। ইক্ষ্বাকুর দেবোপম একশত পুত্র (রা ৭।৭৯।১৩)। এদের মধ্যে সব চেয়ে যে ছোট সে মূঢ়, অকৃতবিদ্য এবং বয়স্কদের সেবা করতেন না। ফলে পিতা নাম দেন দণ্ড। বিন্ধ্য ও শৈবল পর্বতের মধ্যে এক স্থানে রম্যে পর্বতরোধসি মধুমন্ত নামে দণ্ড একটি সুন্দর পুর নির্মাণ করেন এবং উশনস্‌কে পুরোহিত করে রাজ্য পালন করতে থাকেন। বহু বৎসর রাজত্ব করেন। এক দিন মনোহর চৈত্র মাসে রাজা পুরোহিতের আশ্রমে আসেন। এখানে অনিন্দ্য সুন্দরী ভার্গব কন্যা অরজাকে দেখতে পান এবং অরজার অনুনয় অগ্রাহ্য করে যা হবার হবে বলে বলাৎকার করে ফিরে যান। ভার্গব (৭।৮১) জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ শিষ্যদের নিয়ে ক্ষুধিত অবস্থায় সেখানে আসেন এবং শাপ দেন সাত রাত্রির মধ্যে রাজা সমস্ত অনুচর সমেত ধূলিবৃষ্টিতে মারা যাবেন। রাজ্য ধ্বংস হবে, সর্বসত্ত্বানি পাংশু বর্ষেণ মারা যাবে। আশ্রমবাসী সকলকে জনপদান্তেষু গিয়ে থাকতে বলেন এবং মেয়েকে শাপ দেন এই যোজন বিস্তারী সরোবরের তীরে সে একা বাস করবে : এবং সেই রাত্রিতে যারা অরজার কাছে এসে হাজির হবে তারা রক্ষা পাবে। অর্থাৎ বিন্ধ্যও শৈবল পর্বতের অন্তর্গত দণ্ডের এই রাজত্ব দণ্ডকারণ্য (রা ৭।৮১।১৮)। তপসিদ্ধরা যেখানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন সেটি জনস্থান।

বিন্ধ্যের দক্ষিণে যোজনার্দ্ধসহস্র (৩।১১।১৭-২৩) এলাকা। এখানে বৃষ্টি হয় না।

বহু অব্দ সহস্র এই ভাবে ছিল। অগস্ত্য তারপর হিমালয়ের শ্বেত শিখর থেকে এখানে আসেন ও পর্জন্য দেবকে বৃষ্টি দিতে বলেন এবং হিমালয় থেকে 'মনসা' গাছপালা এনে এখানে রোপন করেন। আবার নদী ও পুষ্করিণী তৈরি হয়। তবে রাক্ষসদের উপদ্রব দেখা দেয়। অত্রির আশ্রম থেকে বার হয়ে এগিয়ে গিয়ে রাম (দ্রঃ) দণ্ডক বনে প্রথম প্রবেশ করেন এবং মুনিদের একটি উপনিবেশ/আশ্রমে (রা ৩।১।৪) আসেন। আশ্রমের বর্ণনাও আছে অপ্সরারা এই আশ্রমে নিত্য নেচে যায় (রা ৩।১।৪)। আশ্রমে এই বাইজি নাচের তাৎপর্য্য দুর্বোধ্য। এখানে রাত কাটিয়ে পরদিন ভোরবেলা রামচন্দ্রেরা আবার বার হয়ে পড়েন (রা ৩।২।১) ; এবং একটু এগিয়ে যেতেই দ্বিতীয় দিন সকালে বিরাধের হাতে পড়েন। পাশেই জনস্থান থেকে সীতা চুরি হয়েছিল। দ্রঃ- দণ্ডকারণ্য।

দণ্ডক—মহারাষ্ট্র ; নাগপুর সমেত। দণ্ডকের একটি অংশ জনস্থানগড়। মতান্তরে বুন্দেলখণ্ড থেকে কৃষ্ণা পর্যন্ত বন এলাকা। ভবভূতির মতে জনস্থানের পশ্চিমে দণ্ডক মধুমন্ত।

দণ্ডকারণ্য—দাক্ষিণাত্যে গোদাবরী ও নর্মদার মধ্যবর্তী বন। মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা অন্ধ্র ও মহারাষ্ট্র এই চারটি রাজ্যের অংশ মিলে। মৎস্যকুণ্ড, শবরী, ইন্দ্রাবতী, বংশধারা, নাগবল্লী ইত্যাদি নদী এবং পূর্বঘাট পর্বতমালা এখানে অবস্থিত। ইক্ষ্বাকুর ছেলে রাজা দণ্ড (দ্রঃ) মৃগয়াতে একদিন এখানে এসে শুক্রাচার্যের মেয়ে অরাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে বলাৎকার করেন। অরা পিতাকে জানালে ইত্যাদি।

দণ্ডগৌরী—এক জন অপ্সরা।

দণ্ডধর—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে ; ভীমের হাতে নিহত।

দণ্ডপাণি—(১) যম। (২) কাশীতে এক জন ভৈরব। যক্ষ পূর্ণভদ্র মহাদেবের আরাধনা করলে হরিকেশ নামে একটি ছেলে হয়। এই ছেলেও মহাদেবের কঠোর তপস্যা করলে মহাদেব সন্তুষ্ট হয়ে একে স্পর্শ করেন এবং কাশীতে দুষ্টের দমনকারী ও শিষ্টের পালক হিসাবে স্থাপিত করে দণ্ডপাণি নাম দেন। সম্ভ্রম এবং উদ্ভ্রম দু জন যক্ষ সব সময় এঁর অনুচর হয়ে থাকবেন ঠিক করে দেন। মহাদেবের নির্দেশ মত আগে এঁর পূজা। তারপর মহাদেবের পূজা ; মহাদেব তাঁর নিজের সামনে দণ্ডপাণির আসন করে দিয়েছিলেন। সেই থেকে দণ্ডপাণি কাশীর শাসক।

দণ্ডী—(১) ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। (২) সূর্যের পরিচারক। সূর্যের ডান দিকে প্রহরী হিসাবে ; মসী ও লেখনীধারী। বামপার্শ্বে পিঙ্গল হাতে লাঠি। এঁরা দুজন সূর্যের গণ। (৩) এক জন রাজা। উর্বশী অভিশাপে এক বার ঘোটকী হলে দণ্ডী এই ঘোটকীকে গ্রহণ করেন। কিন্তু কৃষ্ণ এসে দাবি করলে দণ্ডী একে দিতে চান না ; ভয়ে পালিয়ে যান। ত্রিভুবনে কেউ আশ্রয় দিতে রাজি হয় না। দণ্ডী তখন ভীমের কাছে আসেন এবং ভাইদের কথা না শুনে ভীম আশ্রয় দেন। এর ফলে কুরুপাণ্ডবদের মিলিত বাহিনীর সঙ্গে কৃষ্ণ ও দেবতাদের যুদ্ধ হয়। উর্বশী শাপমুক্ত হয়ে স্বর্গে চলে গেলে যুদ্ধের শেষ হয়। দণ্ডী নিজের রাজ্যে ফিরে যান।

দণ্ডী—আনুমানিক ৮-শতক। ব্যাস ও বাল্মীকীর পরবর্তী তৃতীয় প্রসিদ্ধ কবি।

অলংকার গ্রন্থ কাব্যাদর্শের রচয়িতা। এ'র তিনটি বই বিখ্যাত বলা হয়; কিন্তু কোন তিনটি স্পষ্ট নয়। দশকুমার চরিত (দ্রঃ) কার লেখা মতভেদ আছে। পূর্ব ও উত্তর পীঠিকা সম্বন্ধে আরো বেশি মতভেদ। অবন্তিসুন্দরী কার লেখা নিশ্চিত বলা যায় না। অবশ্য এগুলি দণ্ডীর নামেই চালান হয়।

দত্তাত্রেয়—পুত্রকামনায় অত্রি উপাসনা করলে বিষ্ণু বলেছিলেন 'পুত্র রূপে আমি তোমাকে দত্ত হলাম।' এর পর অত্রির স্ত্রী অনসূয়ার সন্তান হয়; নাম হয় দত্তাত্রেয়। অর্থাৎ বিষ্ণুর অবতার (ভাগ ২।২৭); ভাগবতে (৪।১১) বৈবস্বত মন্বন্তরে। আর এক মতে অনসূয়ার (দ্রঃ) দত্তাত্রেয় ইত্যাদি তিন ছেলে হয়। আর এক মতে তিন মাথা বিশিষ্ট একটি সন্তান হয়। দ্রঃ- বলি। অগ্রহায়ণ পূর্ণিমাতে জন্ম। দত্তাত্রেয় শৈশব থেকেই তপস্যা করতেন। জম্ভাসুরের (মার্ক-পুরা) সঙ্গে যুদ্ধের সময় দেবতাদের সাহায্য করে জয়যুক্ত করেন। হৈহয় রাজা কার্তবীর্যার্জুনের গুরু। স্ত্রীকে নিয়ে কার্তবীর্যার্জুন নর্মদা তীরে দত্তাত্রেয়ের আশ্রমের কাছে এসে এ'র আরাধনা করতে থাকেন। দত্তাত্রেয় তপস্যা করছিলেন; সন্তুষ্ট হয়ে রাজাকে হাজার হাত ও চির-যৌবন ইত্যাদি বহু বর দেন। কার্তবীর্যার্জুন পরে প্রয়োজন হলেই এ'র কাছে ছুটে আসতেন। রাবণ একবার এ'র আশ্রমে এসে মন্ত্রপূত একটি জলপাত্র চুরি করেন। ফলে দত্তাত্রেয় শাপ দেন রাবণের মাথায় বানরে নাচবে। এই দত্তাত্রেয়ের বরে নহুষের জন্ম। দত্তগীতা, অবধূতগীতা ইত্যাদির রচনাকার বলে প্রসিদ্ধ।

দত্তোলি—পুলস্ত্য ও প্রীতির ছেলে। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অগস্ত্য দত্তোলি হয়ে জন্মান।

দধিক্রা—ঋক্‌বেদে (৪।৪০।৪, ৪।৩৮।৬-৭) একজন গৌণ দেবতা। এই দধিক্রা যেন অশ্ব বা অগ্নি। ঊষা প্রকাশিত হবার পর এর স্তব করা হয়। ইনি অভীষ্ট বর্ষী।

দধিমুখ—(১) সুগ্রীবের মামা; মধুবন (দ্রঃ) রক্ষক (রামা ৭।৬১।৯)। (২) একটি সাপ।

দধীচি, দধীচ, দধ্যঙ্—অথর্বা (দ্রঃ) মুনির (ঋক্) ঔরসে কর্দম কন্যা শান্তির গর্ভে জন্ম। এই অথর্বা বশিষ্ঠের ছেলে। বৃহৎ-দেবতাতে অথর্বা পুত্র। দধ্যঙ=অথর্ববেদ-বিৎ বা অথর্বা পুত্র।

মহাভারতে ইনি ভৃগুর পুত্র; ভাগবতে এ'র নাম দধ্যঙ্ (দধ্যঞ্চ) ও অশ্বশির; মায়ের নাম চিত্তি। সরস্বতী নদীর তীরে আশ্রমে বাস করতেন। কঠোর তপস্বী। ইন্দ্র বিচলিত হয়ে অলম্বুষাকে (দ্রঃ) পাঠান। মুনির তপস্যা নষ্ট করার জন্য অলম্বুষা এসে নাচতে ও গান করতে থাকেন (মহা ৯।৫০।—।)। ফলে দধীচি উন্মনা হয়ে পড়েন এবং বীর্যপাত হয়। এই বীর্য সরস্বতী নদীতে পড়লে নদী গর্ভবতী হয় এবং একটি সন্তান হয়। নদী যথাসময়ে মুনিকে এই সন্তান এনে দেখালে মুনি সন্তুষ্ট হয়ে আশীর্বাদ করেন এই নদীর জলে পূজা করলে সব দেবতাই সন্তুষ্ট হবেন; বিশ্বদেব, পিতৃগণ ইত্যাদির জন্য এই জলে তর্পণ করলে তাঁরা প্রীতি লাভ করবেন। অন্য সমস্ত নদীর থেকে সরস্বতী পবিত্র হবে; এবং ছেলের নাম দেন সারস্বত (দ্রঃ)। সরস্বতী এঁকে পালন করবার জন্য নিয়ে যান। দ্রঃ—সারস্বত তীর্থ। এরপর ইন্দ্র অস্থি সংগ্রহ করতে এসেছিলেন। এই অস্থিতে

বজ্র, চক্র, গদা ও দণ্ড তৈরি হয়। ইন্দ্র এই বজ্রে ৯৯ জন দৈত্য নিহত করে (মহা ৯।৫০।৩৩)।

ঋক্ ১।১১৬।১২ টীকায় সায়ণ বলেছেন ইন্দ্র দধীচিকে মধুবিদ্যা শেখান এবং কাউকে এই বিদ্যা শিক্ষা দিলে দধীচির মাথা কেটে ফেলবেন সাবধান করে দেন এই জন্য অশ্বিনী কুমার দ্বয় অশ্বমুণ্ড দান করে মধুবিদ্যা শিখে নেন এবং ইন্দ্র এই অশ্বমুণ্ড কেটে ফেললে এরা দধীচির নিজের মাথা লাগিয়ে দেন। অশ্বমুণ্ডে বজ্র হয় বৃহৎ দেবতাতে (৩।১৮-২৩) এই কাহিনী; ইন্দ্র বজ্র দিয়ে দধীচির অশ্বমুণ্ড ছিন্ন করেন; এই অশ্বমুণ্ড শর্যনাবৎ সরোবরে গিয়ে পড়ে। অশ্বিনীদ্বয় দধীচির নিজের মাথা আবার জুড়ে দেন। অর্থাৎ দধীচির মৃত্যুর আগেই বজ্র নির্মিত হয়েছিল। পদ্ম পুরাণে ত্বষ্টা দধীচির অস্থিতে বজ্র তৈরি করেন। একটি মতে মধুবিদ্যা শেখালে মাথা খসে গিয়েছিল। দ্রঃ-ত্রিশিরা।

ভাগবতে দধীচি অশ্বমুণ্ড নিয়ে জন্মান। মহাভারতে, ভাগবতে ও দেবী ভাগবতে দধীচি স্বেচ্ছায় নিজের অস্থি দান করেছিলেন।

মহাভারত মতে ইনি শিব ভক্ত কঠোর তপস্বী। দক্ষকে শিবহীন যজ্ঞ করতে নিষেধ করেছিলেন এবং যজ্ঞে যানও নি। ব্রহ্মার কাছে ইন্দ্র জানতে পারেন দধীচির অস্থিতে নির্মিত অস্ত্রে বৃত্র বধ হবে। তখন ইন্দ্র এসে অন্য মতে নরনারায়ণকে সঙ্গে নিয়ে এসে আর এক মতে দেবতাদের পাঠিয়ে দধীচির-অস্থি প্রার্থনা করেন। অলম্বুষাকে পাঠান ইত্যাদি নানা কারণে দধীচি ইন্দ্রের প্রতি বিরূপ ছিলেন তবু দেবতাদের উপকারের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেন। অস্থিতে বজ্র (দ্রঃ) তৈরি হলে ইন্দ্র সেই বজ্রে বৃত্রকে ও অসুরদের নিধন করেন। একটি ঋক্ কাহিনীতে আছে ইন্দ্র একবার স্বর্গে গেলে পৃথিবী অসুরে ভরে যায়। ইন্দ্র এঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসেন এবং দধীচির আশ্রমে কিছু অস্ত্র পাওয়া যায় কিনা খুঁজতে গিয়ে শর্যণাবৎ (১।৮৪।১৩) নামে একটি স্থানে একটি ঘোড়ার মাথা খুঁজে বার করেন এবং এই হাড় দিয়ে অসুর নিধন করেন।

দধ্যঙ্—দধীচি।

দনায়ুস্—দক্ষের এক মেয়ে; কশ্যপের স্ত্রী। সন্তান বিক্ষর, বল, বীর, ব্রত (১।৫৯।৩২)।

দনু—দক্ষের মেয়ে; কশ্যপের স্ত্রী। এক শত ছেলে। প্রসিদ্ধ ছেলেগুলি অজক, অসিলোমা, অয়শিরস্, অশ্বশিরস্, অশ্বগ্রীব, অয়ঃশঙ্কু, অশ্ব, অশ্বপতি, অজমুখ, অমূর্দ্ধা, ইস্‌পা, একপাদ, একচক্র, কেশী, কেতুমান, কপট, কপিল, গগনমূর্দ্ধা, গর্গ, চন্দ্র, তারক, তুহুণ্ড, দুর্জয়, দ্বিমূর্দ্ধা, নমুচি, নিচন্দ্র, নিকুম্ভ, পুলোমা, বনায়ু, বিশ্রুত, বিপ্রচিত্তি, বেগবান, বৃষপর্বা, বিরূপাক্ষ, শরভ, শলভ, শঙ্কুশীর্ষ, শঙ্কর, স্বর্ভানু, সূক্ষ্ম, সূর্য, শম্বর, হর, অহর, প্রলম্ব, মহাবাহু, কুপথ, কাপথ, মহাবল। এরা দানব (মহা ১।৫৯।২৫)। মহাভারতে (১।৫৯।২৮) শ্লোকে আরো নাম আছে একাক্ষ, মৃতপা, নরক, শত্রুতপন, বাতাপি, শঠ, গবিষ্ঠ, দনায়ু, দীর্ঘজিহ্ব।

এই নামে কিছু দৈত্যও (দ্রঃ) আছে। এই চন্দ্র সূর্য দেবতা চন্দ্র সূর্য নন।

(২) এক জন দানব; দুই ছেলে রম্ভ ও করম্ভ।

দন্তকূর—বা দণ্ডপুর। এখানে কলিঙ্গদের কৃষ্ণ পরাজিত করেন এরপর বহু বৎসর বারাণসী দগ্ধ করেন (মহা ৫।৪৭।৭০)।

দন্তধ্বজ—মনু তামসের ছেলে। দন্তধ্বজের কোন সন্তান ছিল না। যজ্ঞ করেন এবং দেহ থেকে মাংস, রক্ত, রোম ইত্যাদি নানা অংশ আহুতি দিতে থাকেন এমন কি নিজের বীর্যও আহুতি দেন। সঙ্গে সঙ্গে দৈববাণী তাঁকে 'না' বলে নিষেধ করেন এবং দন্তধ্বজ তৎক্ষণাৎ মারা যান এবং আগুন থেকে তেজোদীপ্ত সাতটি সন্তান জন্ম লাভ করে কাঁদতে থাকে। ব্রহ্মা এসে এদের মরুৎ বলে অভিষেক করেন ; তামস মন্বন্তরে এঁরা মরুৎ (বাম-পু)।

দন্তপুরী—প্রাচীন কলিঙ্গের রাজধানী। পুরুষোত্তম ক্ষেত্র (দ্রঃ)। বুদ্ধদেবের বাম শ্বদন্ত এখানে প্রথমে ছিল। কলিঙ্গরাজ ব্রহ্মদত্ত বুদ্ধের মৃত্যুর কিছু পরে এনে স্থাপন করেছিলেন ; এবং একটি মন্দির নির্মাণ করান। ফলে এই নাম। চিতা থেকে নিয়ে ক্ষেম এটি ব্রহ্মদত্তকে দিয়েছিলেন। খৃ-৪ শতকে কলিঙ্গরাজ গুহশিব দাঁতটিকে পাটলিপুত্রে নিয়ে গিয়ে জৈনদের নানাভাবে বারবার বেকুব করেছিলেন ; এবং তারপর ফিরিয়ে আনেন। এরপর দাঁতটি কেড়ে নেবার জন্য দন্তপুর আক্রান্ত হয় ; গুহশিব মারা পড়েন। কিন্তু গুহশিবের মেয়ে হেমমালা ও জামাতা দন্ত কুমার (গুহশিবের ভাগনে এবং উজ্জয়িনীর রাজপুত্র) দাঁতটি নিয়ে সিংহলে পালিয়ে যান। কীর্তিশ্রী মেঘবাহন (২৯৮-৩২৬) অনুরাধপুরে এটি রক্ষা করেন। বর্তমানে কাণ্ডিতে শ্রীবর্দ্ধন পুরে মালিগয় মন্দিরে রক্ষিত। কিছু মতে উড়িষ্যাতে পুরীই এই দন্তপুর। আর এক মতে গোদাবরী তীরে রাজমাহেন্দ্রি বা মেদিনীপুরের দাঁতন সেই দন্তপুর। বৌদ্ধ সাহিত্যে দন্তপুরের উল্লেখ আছে ; ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে নাই। বর্তমানে নিশ্চিত মনে হয় পুরীই দন্তপুর। দ্রঃ- জগন্নাথ।

দন্তবক্র—দমঘোষের ছেলে ; শিশুপালের ভাই ; করূষ দেশের রাজা। দ্রঃ- জয় বিজয়। হরিবংশে (১।৩৪।-) রাজা শূরের মেয়ে পৃথুকীর্তির গর্ভে এবং করূষ-রাজ বৃদ্ধশর্মার ঔরসে জন্ম। শিশুপালের মৃত্যুর পর কৃষ্ণের সঙ্গে গদা যুদ্ধে মারা যান। দন্তবক্র, করূষ, কলভ, মেঘবাহন ও ভূতমণি জরাসন্ধের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন (মহা ২।১৩।২২)। ভাগবতে (৯।১৪) শ্রুতদেবার ছেলে ; পূর্ব জন্মে এক জন দৈত্য ; ঋষির শাপে এই জন্ম ; দমঘোষের (দ্রঃ) ছেলে।

দন্তুর—বৈতরণী নদী ; বাসেইনের উত্তরে ; পরশুরাম এটিকে পৃথিবীতে আনেন। (২) পুরী।

দম—সূর্যবংশে এক রাজা। মায়ের পেটে নয় বছর ছিলেন। প্রসূতিকে এ জন্য দম অবলম্বন করতে হয়। সন্তান দমশীল হবেন জেনে পুরোহিতরা নাম রাখেন দম। রাজা দম অশেষগুণান্বিত ছিলেন; বৃষপর্বার কাছে ধনুর্বেদ ও দুন্দুভির কাছে নানা অস্ত্র-বিদ্যা শিখেছিলেন। (মার্ক- পুরা ১৩৪।-) বেদবেদাঙ্গে বিশেষ জ্ঞান ছিল। দ্রঃ- দমন।

দমঘোষ—চেদি রাজ্যের রাজা। কৃষ্ণের পিতা বসুদেবের দ্বিতীয় বোন শ্রুতশ্রবার স্বামী। ছেলে শিশুপাল ও দন্তবক্র (দ্রঃ)। দমঘোষ মগধরাজ জরাসন্ধের অনুগত ছিলেন।

এ জন্য যাদবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। হরিবংশ (২।৫৯।২২) এর ছেলে শিশুপাল, দশগ্রীব, রৈভ্য, উপদিশ ও বলী। পূর্বজন্মে হিরণ্যকশিপু।

চক্রমুসল যুদ্ধের (হরিবংশ) অব্যবহিত পরবর্তী ঘটনা। কারূষ ও চেদি সৈন নিয়ে দমঘোষ পদাতি কৃষ্ণ বলরামের সঙ্গে যোগ দিতে আসেন। এঁদের রথে তুলে নিয়ে পথে তিন রাত কাটিয়ে করবীর পুরে রাজা শৃগালবাসুদেবের সঙ্গে দেখা করে (২।৪৩।৯৮)। শৃগালবাসুদেব আক্রান্ত হয়েছেন মনে করে যুদ্ধ করেন এবং কৃষ্ণের হাতে মারা যান। শৃগালের ছেলে শক্রদেবকে কৃষ্ণ অভিষিক্ত করে দিয়ে সেই দিনই যাত্রা করেন ও মথুরাতে ফিরে আসেন।

দমন—বিদর্ভ রাজ ভীমের বহু দিন সন্তান হয় নি। এই সময় এক দিন দম/দমন নামে এক মহর্ষি ভীমের অতিথি হন এবং এই মহর্ষির বরে দম (দ্রঃ), দান্ত ও দমন এবং এক মেয়ে দময়ন্তী জন্মায়। এই দময়ন্তী নলের স্ত্রী।

দময়ন্তী—দ্রঃ- দমন। অর্জুন যখন অস্ত্র শিক্ষার জন্য স্বর্গে যান তখন যুধিষ্ঠির অর্জুনের অভাবে অত্যন্ত মনোকষ্টে ছিলেন। মুনি বৃহদশ্ব এই সময়ে দেখা করতে আসেন এবং দময়ন্তীর কাহিনী শোনান। দময়ন্তী পরমা সুন্দরী। লোক মুখে পরস্পরের পরিচয় পেয়ে নিষধরাজ নল (দ্রঃ) ও দময়ন্তী পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন। সখীরা ভীমের কাছে দময়ন্তীর ব্যাকুলতার কথা জানায়। রাজা স্বয়ংবরের ব্যবস্থা করেন। নারদ ও পর্বত এ দিকে ইন্দ্রলোকে যান ; পৃথিবীর সব রাজারা দময়ন্তীর স্বয়ংবরে গেছে জানান। ফলে লোকপালরাও স্বয়ংবরে এসে যোগদান করেন। নলের মাধ্যমে লোকপালরা দময়ন্তীর মনের কথা জানতে পেরে চার জন দেবতাই নলের রূপ ধরে স্বয়ংবর সভাতে যোগদান করেন। দময়ন্তী পাঁচজন নলকে দেখে করুণভাবে প্রার্থনা করেন তিনি যেন মানুষ নলকে পতিত্বে বরণ করতে পারেন। এঁরা ফলে দেবচিহ্ন ধারণ করেন। দময়ন্তী জানতেন দেবতাদের ঘাম হয় না, চোখে নিমেষ পড়ে না। ফলে প্রকৃত নলকে বেছে নিতে অসুবিধা হয় না।

দময়ন্তী নলকে পাশা খেলা থেকে নিবৃত্ত করাতে অকৃতকার্য হয়ে বৃহৎসেনকে দিয়ে অমাত্যদের ডাকিয়ে আনান এবং প্রজাদের নাম করে নলকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু নল সে কথায় কাণ দেন না। তখন ধাত্রীকে দিয়ে সারথি বার্ষ্ণেয়কে ডাকিয়ে ছেলে ইন্দ্রসেন ও মেয়ে ইন্দ্রসেনাকে নলের প্রিয় অশ্বযুক্ত রথে করে কুণ্ডিন দেশে রেখে আসতে বলেন। বার্ষ্ণেয় তারপর যেখানে খুসি যেতে পারে। সারথি অমাত্যদের জানায় ও নলের অনুমতি নিয়ে ইন্দ্রসেন, ইন্দ্রসেনা, রথ, অশ্ব কুণ্ডিনপুরে পৌঁছে দিয়ে মনের দুঃখে নানা জায়গা ঘুরতে ঘুরতে ঋতুপর্ণের কাছে এসে তাঁর সারথি হয়ে কাজ করতে থাকেন। পাশাতে শেষ পর্যন্ত দময়ন্তীকে পণ রাখার প্রস্তাব ওঠে। নল রাজি হন না এবং নিজে গায়ের আভরণ ইত্যাদি খুলে দিয়ে এক বস্ত্রে রাজ্য ত্যাগ করেন। দময়ন্তীও এক বস্ত্রে স্বামীর সঙ্গে বনে চলে যান।

এক দিন নল (দ্রঃ) পালিয়ে যান ; দময়ন্তী তখন ঘুমাচ্ছিলেন। ঘুম ভাঙলে কাঁদতে থাকেন, রাগ হয় (৩।৬০।১২) এবং নলকে খুঁজতে গিয়ে দময়ন্তী এক অজগরের

কবলে পড়েন। তাঁর আর্তনাদে এক ব্যাধ এসে অজগরকে হত্যা করে ; এবং সমস্ত পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়ে দময়ন্তীকে গ্রহণ করতে যায়। কিন্তু দময়ন্তীর অভিশাপে ব্যাধ মারা পড়ে। এর পরে খুঁজতে খুঁজতে উত্তর দিকে যেতে যেতে তিন দিন তিন রাত পরে (মহা ৩।৬১।৫৬) গভীর বনের মধ্যে এক তাপসারণ্যে এসে উপস্থিত হন। এখানে বশিষ্ঠ ইত্যাদি বহু মুনিঋষি সব শুনে সান্ত্বনা দেন ও সব ফিরে পাবেন আশ্বাস দেন। এর পর মুহূর্তে তাপসারণ্য অদৃশ্য হয়ে যায়। এরপর নলের খোঁজ করতে করতে এক বণিক দলের সঙ্গে চেদি রাজ্যে যাবার চেষ্টা করেন। দময়ন্তী নিজের অকপট পরিচয় দেন ; এই দলের নেতা শুচি (মহা ৩।৬১।১২৩) জানায় নলকে সে জানে না। যাই হক এদের সঙ্গে যেতে থাকেন। বহু দিন পরে দারুণ বনের মধ্যে এক তড়াগের পশ্চিম তীরে বণিকরা শ্রান্ত হয়ে রাত্রিতে আশ্রয় নেয়। গভীর রাত্রিতে পাহাড় থেকে জল খেতে নামা হাতীর পায়ে বহু বণিক মারা যায়। পরদিন সার্থবাহ আবার এগিয়ে যায় এবং বেশ কয়েক দিন পরে একদিন সন্ধ্যায় চেদি রাজ্যে এসে উপস্থিত হয়। মতান্তরে দময়ন্তীই দুর্ঘটনার কারণ মনে করে এঁরা তাঁকে হত্যা করবেন ঠিক করেন। কিন্তু দময়ন্তী বুঝতে পেরে বনের মধ্যে পালিয়ে যান এবং বণিক দলের কয়েক জন ব্রাহ্মণের সঙ্গে চেদি রাজ সুবাহুর রাজধানীতে আসেন। প্রাসাদের সামনে এলে পেছনে ছেলের দল কৌতূহলে জমা হয়। দময়ন্তীর রূপে মুগ্ধ হয়ে রাজমাতা তাঁকে প্রাসাদে ডেকে আনলে দময়ন্তী নিজের সমস্ত বিপদের কথা জানান। পরিচয় দেন তিনি সৈরন্ধ্রী ভুজিষ্যা; প্রকৃত পরিচয় দেন না এবং আশ্রয় চান। রাজামাতা তাঁকে সৈরন্ধ্রী হিসাবে রেখে দেন এবং নিজের মেয়ে সুনন্দাকে এর প্রতি সখীর মত আচরণ করতে বলে দেন এবং আশ্বাস দেন রাজপুরুষদের দিয়ে দময়ন্তীর স্বামীর খোঁজ করাবেন। সখী হয়ে থাকেন এবং সর্ত থাকে কোন উচ্ছিষ্ট তিনি খাবেন না ; কারো পায়ে হাত দেবেন না ; অপরিচিত কোন পুরুষের সঙ্গে কোন কথা বলবেন না এবং কোন পুরুষ অনুরাগ দেখালে দণ্ডনীয় হবে (মহা ৩।৬২। ৩৯)। বিদর্ভ রাজ এ দিকে খোঁজ করছিলেন। দময়ন্তীর ভাইয়ের সখা সুদেব এদের খোঁজে চেদি রাজ্যে আসেন এবং এক দিন যজ্ঞ কালে দময়ন্তীকে চিনতে পেরে সখানে নিজের পরিচয় দিলে দময়ন্তী কেঁদে ফেলেন। সুনন্দা দেখতে পেয়ে মাকে গিয়ে জানায়। রাজ পরিবারে কথাটা ছাড়িয়ে পড়ে।

সুদেব চিনতে পারেন দময়ন্তীর দুটি ভুরুর মাঝে পিপ্লুরুক্ম রয়েছে দেখে। চেদি রাজের স্ত্রী ছিলেন দময়ন্তীর মাসিমা। দশার্ণ অধিপতি সুদামের এক মেয়ে এই রাজমাতা আর এক মেয়ে দময়ন্তীর মা। দময়ন্তী মাসিমাকে চিনতেন না; প্রণাম করেন এবং বিদর্ভে পাঠিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ করেন। এর পর বিদর্ভে এসে সে দিন রাত্রিতে বিশ্রাম করে পরদিন (মহা ৩।৬৬।২২) দময়ন্তী মাকে বলেন নলকে খুঁজে বার করতে।

বিদর্ভ রাজ চার দিকে লোক পাঠান নলকে খুঁজতে ; এবং পর্ণাদ নামে এক ব্রাহ্মণ এসে খবর দেন রাজা ঋতুপর্ণের সারথি বাহুকই যেন নল। খবর পেয়ে মায়ের সামনে দময়ন্তী সুদেবকে দিয়ে ঋতুপর্ণের কাছে খবর পাঠান নল নিরুদ্দিষ্ট বলে দময়ন্তী পর দিন (৩।৬৮) আবার স্বয়ংবরা হবেন। এই কথা মত ঋতুপর্ণ পরদিনই

বাহুককে নিয়ে কুণ্ডিন নগরীতে এসে উপস্থিত হন। দময়ন্তী বাহুককে চিনতে পারেন না।

কেশিনী নামে এক দূতীকে পাঠান বাহুককে পর্যবেক্ষণ করার জন্য। কেশিনী এসে জানায় কোন ছোট দরজা বাহুক অতিক্রম করতে গেলে দরজা আপনি বড় হয়ে যায়, পথে বের হলে জনতা সম্ভ্রমে বাহুকের পথ ছেড়ে দেয়; বাহুকের দৃষ্টিপাতে শূন্য কলস জলে ভরে যায় এবং একমুঠো তৃণ প্রয়োজন হলে আপনি জ্বলে ওঠে, আগুনে বাহুকের হাত পোড়ে না এবং কোন ফুল বাহুক থেঁতলে দিলেও আরো সুগন্ধ হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত কেশিনীকে দিয়ে বাহুকের রান্না মাংস আনিয়ে খেয়ে দময়ন্তী নিশ্চিত হন এবং কেশিনীকে দিয়ে ছেলে মেয়েকে পাঠিয়ে দিলে বাহুক এদের জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকেন। কিন্তু পর মুহূর্তে সংযত হয়ে যান। দময়ন্তী তখন মা বাবাকে সব কথা জানান। বলেন স্বয়ংবরের ইচ্ছা ছল মাত্র; সে নিজে নিষ্পাপ এবং বায়ু, সূর্য ও চন্দ্রমাকে সাক্ষী রূপে ডাকেন। বায়ু সাক্ষ্য দেন এই তিন বছর (মহা ৩।৭৫।১২) দময়ন্তীকে সকলে তাঁরা রক্ষা করেছেন। দুজনের মিলন হয়। (২) প্রম্লোচার এক মেয়ে।

দমিল—কেরল (দ্রঃ)। দ-মালাবার। মালাবার উপকূলে। লিমুরিক (টলেমি), অন্য মতে সিংহলে/নাগদ্বীপে—এখানে দমিল বংশ রাজত্ব করত।

দম্ভ—বিপ্রচিত্তির ছেলে। শুক্রের কাছে বিষ্ণু মন্ত্র লাভ করে পুষ্করতীর্থে তপস্যা করে ছেলে হয় শঙ্খচূড়।

দম্ভু—দ্রঃ- বেদবতী।

দম্ভোদ্ভব—মহাভারতে এক রাজা। কৃষ্ণ সন্ধির জন্য কৌরব সভাতে এলে পরশুরাম এই কাহিনী শোনান। বোঝান নর নারায়ণ-ই অর্জুন ও কৃষ্ণ। সন্ধি করার জন্য বলেন দম্ভোদ্ভব অত্যন্ত শক্তিমান বলে ভীষণ দম্ভ। নিজের সমান কাউকে না পেয়ে ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করেন অন্য মতে ব্রাহ্মণরা এঁকে বলেছিলেন গন্ধমাদন পাহাড়ে নর-নারায়ণ নামে দুজন সন্ন্যাসী আছেন, তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী পেয়ে আনন্দে রাজা ষড়ঙ্গিনী সেনা নিয়ে আক্রমণ করতে এলে নরনারায়ণ (দ্রঃ) রাজাকে বুঝিয়ে প্রথমে নিরস্ত করতে চান। নর তারপর এক মুষ্টি ইষীকা (শর তৃণ; মহা ৫।৯৪।২৩) নিয়ে তীরের মত এঁর সৈন্যদের দিকে ছুঁড়ে দেন। ফলে সমস্ত আকাশ সাদা হয়ে যায় এবং সেনাদের চোখে কাণে ও নাকে ঢুকে যায়। রাজা হেরে গিয়ে ক্ষমা চান এবং দম্ভ ত্যাগ করেন। এঁরা সৎ হবার পরামর্শ দেন।

দরদ—(১) বাহ্লিক দেশের রাজা। অসুর সূর্য্যের অংশে জন্ম। (২) উ-পূ অংশে ভারতে একটি দেশ। কৌরব পক্ষে এখানকার রাজা যুদ্ধ করেছিলেন। কুরুক্ষেত্রে সাত্যকির হাতে নিহত হন। (৩) কিছু ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণদের হিংসা করতে থাকেন ফলে দরদ জাতিতে পরিণত হন (মহা ১৩।৩৫)। (৪) দরদ-ই-স্তান। কাশ্মীরের উত্তর অংশে। রাজধানী দরৎপুরী, গুরেজ। উদ্যান (দ্রঃ) দেশের অংশ। হেরোডোটাসের সময় থেকে আজও একই জায়গায় এরা বাস করছে। চিত্রল ও য়াসিন থেকে সিন্ধুনদীর অপর পারে ইত্যাদি স্থানে, কিষেণ গঙ্গা উপত্যকাতে। কাশ্মীরের অব্যবহিত উ-পর্যন্ত। দ্রঃ- গিলগিট।

দর্ব—দর্ভ ; উপজাতি। অভিসারদের সঙ্গে বাস করত। বিতস্তা ও চন্দ্রভাগার মধ্য অংশে।

দর্ভাবতী—দর্ববতী। গুজরাটে দাভোই। বরোচ থেকে ৩৮ মাইল উ-পূর্বে এবং বরদা থেকে ২০ মাইল দ-পূর্বে। অন্য মতে এটি দিভাই—রাডোফ (গ্রীক) ; বুলন্দসর থেকে ২৬ মাইল দ-পশ্চিমে।

দর্শন—ছয়টি ভাগ :- সংখ্য, যোগ, বৈশেষিক, ন্যায়, মীমাংসা/পূর্বমীমাংসা, বেদান্ত/উত্তর মীমাংসা।

দর্শনপুর— গুজরাটে বনস তীরে দিসা।

দল—ইক্ষ্বাকু বংশে রাজা পরিক্ষিতের স্ত্রী সুশোভনা ; ইনি মণ্ডুক রাজ আয়ুর মেয়ে। পিতার শাপে সুশোভনার ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী শল, দল, বল, তিনটি ছেলে হয়। মহর্ষি বামদেবের দুটি ঘোড়া শল নিয়ে আর ফিরিয়ে দেন না ; ফলে শল বামদেবের শাপে রাক্ষসের হাতে মারা পড়েন। এর পর দল রাজা হন, বামদেব এ'র কাছে ঘোড়া চান। ইনি উত্তরে বামদেবকে মারবার জন্য সারথিকে বাণ আনতে বলেন। কিন্তু বামদেবের সামনে এই বাণ দলের দশ বছর বয়স ছেলে শ্যেনজিৎকে মেরে ফেলে। দল আবার তীর ছুঁড়তে গেলে তাঁর হাত অবশ হয়ে যায়। দল তখন বামদেবের শরণ নেন এবং বামদেবের আদেশে নিজের স্ত্রীকে এই বাণ দিয়ে স্পর্শ করে পাপ মুক্ত হন এবং ঘোড়া দুটি ফিরিয়ে দেন। রাণী স্বামীর পাপ মুক্তির বর চান এবং অনুরোধ করেন সপুত্রবান্ধব রাজার জন্য বামদেব যেন কল্যাণ চিন্তা করেন (মহা ৩।১৯০)।

দলকিশোর— দ্বারিকেশ্বরী নদী। দ্বারকেশী। রূপনারায়ণের শাখা। বাঙলাতে বিষ্ণুপুরে।

দশঅবতার—পৃথিবীর সঙ্কট মুহূর্তে দুষ্টের দমন ও ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য বিষ্ণুর দশ বার যে জন্ম/আবির্ভাব হয়েছিল। দ্রঃ- মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি। কল্কি অবশ্য ভবিষ্যতে জন্মাবেন। দ্রঃ- বিষ্ণু, অবতার। তন্ত্র-সারে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বুদ্ধ (অসুরদের ভ্রান্ত করবার জন্য) ও হয়গ্রীব।

দশকর্ম—বেদোক্ত মুখ্য দশটি সংস্কারঃ- গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, সমাবর্তন, ও বিবাহ।

দশকুমার চরিত- দণ্ডীর (দ্রঃ) লেখা বলে প্রচলিত। পদলালিত্যে অতুলনীয়। কবি প্রতিভার চমক লাগান অভূতপূর্ব গদ্য কাব্য। সুবন্ধু ও বাণের তুলনায় রচনা সরল। পূর্ব ও উত্তর পীঠিকা দশকুমার গ্রন্থের পূর্ব ও শেষ অংশ।

দশপুর—মালবে দশর। মান্দাসোর।

দশ মহাবিদ্যা—কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী, কমলা/মহাবিদ্যা দশ মূর্তি (মুণ্ডমালা তন্ত্র)। দক্ষ (দ্রঃ) যজ্ঞে যেতে মহাদেব নিষেধ করলে সতী এই দশ মূর্তি/বিভূতি দেখিয়ে অনুমতি আদায় করেন। বিভিন্ন মতে মহা-বিদ্যার সংখ্যা বিভিন্ন ; একটি মতে ২৭। দুর্গা, কামাখ্যা ও অন্নপূর্ণাও মহাবিদ্যা। বৃহৎ

ধর্মপুরাণের কাহিনীতে দেবী অনুমতি আদায় করতে আসেন দেবীর তৃতীয় নয়ন থে
আগুন বার হতে থাকে। দেবী পরিবর্তিত হয়ে কালী বা শ্যামা হয়ে যান। এই মৃ
দেখে শিব ভয়ে পালাতে যান কিন্তু দশ দিকে দশ মহাবিদ্যাকে দেখতে পান। বি
দশ অবতারের অনুকরণ যেন। বা পুরাণকার বলতে চেয়েছেন সতীর মত শ
গৃহিণীরাও যে কত তুচ্ছ কারণে কত কুৎসিৎ হতে পারে। ক্রোধে বিবসনা হয়ে কা
হতে পারে। পুরাণকারের নিজের জীবনের ব্যক্তিগত তিক্ত অভিজ্ঞতা যেন। দশমহাবি
অর্বাচীন কালের কল্পনা। মালিনী বিজয়ে দশমহাবিদ্যা কালী, নীলা, মহাদুর্গা, ত্বরি
ছিন্নমস্তকা, বাগ্‌বাদিনী, অন্নপূর্ণা, প্রত্যাঙ্গিরা, কামাখ্যাবাসিনী, বালা, মাত
শৈলবাসিনী। দ্রঃ-পীঠস্থান।

দশরথ—ইক্ষ্বাকু বংশে দিলীপের ছেলে রঘু, রঘুর ছেলে অজ এবং অজের ছে
নেমি বা দশরথ। দশরথের প্রধান তিন স্ত্রী কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা।

পরিবৃত্তি (শূদ্রা) ও বাবতা (বৈশ্যা) স্ত্রী ছিল (রা ১।১৪।৩৫); এদে
সংখ্যা ৩৫০ (২।৩৯।৩৭), এরা এবং তিন জন প্রধান মহিষী; মোট ৩৫৩। কৈকেয়ীকে
বিয়ে করার সময় দশরথ শ্বশুরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কৈকেয়ীর ছেলেকে রাজ
দেবেন (রা ২।১০৭।৩)।

দশরথের মন্ত্রী ধৃষ্টি, বিজয়, সিদ্ধার্থ, অশোক, মন্ত্রপাল, সুমন্ত্র ও জয়ন্ত। আবা
নাম পাওয়া যায় ধৃষ্টি, বিজয়, জয়ন্ত, সুরাষ্ট্র, রাষ্ট্রবর্দ্ধন, অকোপ, ধর্মপাল, সুম
(রা ১।৬।৩-গী-প্রেস)। বশিষ্ঠ ও বামদেব (১।৭।৪) দুজন প্রধান ঋত্বিক এবং আরো
ছজন নাম করা পুরোহিত ছিলেন সুযজ্ঞ, জাবালি, কাশ্যপ, গৌতম, মার্কণ্ডেয় ও কাত্যায়ন
(১।৭।৫)। সরযূ নদীর তীরে কোশল দেশে অযোধ্যা (দ্রঃ) নগরী রাজধানী
দেবতাদের সঙ্গে মিশে একবার শম্বর অসুরের বিরুদ্ধে স্বর্গে যুদ্ধ করতে যান। সঙ্গে
কৈকেয়ীও গিয়েছিলেন। আধ ঘণ্টার মধ্যে অসুর সৈন্য ধ্বংস করলে শম্বর দশটি
শম্বরে পরিণত হয়ে দশদিক থেকে রাজাকে আক্রমণ করেন। রাজাও চকিতে দশদিকে
রথ ঘুরিয়ে নিতে থাকেন এবং যুগপৎ দশদিকে যুদ্ধ করে অসুরকে নিহত করেন।
ফলে রাজা নেমি দশরথ নামে অভিহিত হন। রথ এই ভাবে পরিচালিত করতে
গিয়ে চাকার খিল খুলে গিয়েছিল এবং কৈকেয়ী নিজের আঙুল দিয়ে এই চাকা
রক্ষা করেন। কৈকেয়ীর এই কাজের জন্য রাজা সন্তুষ্ট হয়ে বর দিতে চান। অন্য মতে
এই যুদ্ধে দশরথ আহত হয়ে ফিরে এলে কৈকেয়ী অক্লান্ত সেবায় ও যত্নে রাজাকে
সুস্থ করেন; সন্তুষ্ট হয়ে রাজা বর দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কৈকেয়ী প্রয়োজন হলে
নেবেন বলেছিলেন। রামায়ণে আহত রাজাকে যুদ্ধ থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে রক্ষা
করেছিলেন।

একটি মতে কৌশল্যার শান্তা (দ্রঃ) নামে একটি মেয়ে ছিল। অঙ্গরাজ পালন
করেন। রামায়ণে আছে অবিবাহিত জীবনে রাজা অন্ধক (দ্রঃ) মুনির কাছে অভিশপ্ত
হন। রামায়ণে আছে রাজা ঠিক করেন সুতার্থে বাজিমেধ (১।৮।২) করবেন। বশিষ্ঠ
ইত্যাদি পুরোহিতরা সরযূর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমির ব্যবস্থা করেন। সুমন্ত্র এই সময়

জানান ঋত্বিকদের কাছে শুনেছেন সনৎকুমার দেবযুগে (১।১১।১১) ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন বিভণ্ডকপুত্র (১।৯।৩) ঋষ্যশৃঙ্গ দশরথের পুত্রযজ্ঞ (১।৯।১৯) করবেন ও চারপুত্র হবে। এই কথা অনুসারে রাজা সান্তঃপুর অঙ্গদেশে গিয়ে সেখানে ৭।৮ দিন থাকার পর সপুত্র শান্তাভর্তা (১।১১।৬) ঋষ্যশৃঙ্গকে নিয়ে আসেন। অযোধ্যাতে বেশ কিছুদিন থাকার পর বসন্ত এলে (১।১২।১) ঋষ্যশৃঙ্গকে রাজা পুত্রার্থে বরণ করেন। অশ্বমেধ যজ্ঞের ব্যবস্থা হয়; বশিষ্ঠ ইত্যাদি পুরোহিতরাও ৪-টি পুত্র হবে আশীর্বাদ করেন। পরবর্তী বসন্তে ঋষ্যশৃঙ্গং পুরস্কৃত্য (১।১৩।২) যজ্ঞ আরম্ভ হয়। জনক, কাশীপতি, কেকয়রাজ, রোমপাদ, প্রাচীনান্, সিন্ধুসৌবীরান্, সৌরাষ্ট্রান্, দাক্ষিণাত্যান্ (১।১৩।২১) রাজারা যজ্ঞে ছিলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞ শেষ হলে এরপর পুত্রেষ্টি যজ্ঞ হয়; অথর্ব বেদ মন্ত্রে। যজ্ঞে সমস্ত দেবতারা আসেন। ব্রহ্মাকে রাবণের অত্যাচারের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে ব্রহ্মা বলেন রাবণ বর নেবার সময় অবজ্ঞেয় মানুষের নাম করে নি ইত্যাদি এবং বিষ্ণুকে দেবতারা চার ছেলে হয়ে জন্মে রাবণকে নিহত করতে অনুরোধ করেন (১।১৫।১১)। বিষ্ণু বলেন রাবণকে হত্যা করে ১১,০০০ বর্ষ পৃথিবী পালন করবেন। যজ্ঞ শেষ হলে যজ্ঞের আগুন থেকে প্রাজাপত্য নর দেবনির্মিত পায়স দিয়ে যান (১।১৬।১৬)। রাজা নিজে পায়স ভাগ করেন এবং কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা ১ : ১ : ২ ভাগ পান। যজ্ঞ সমাপ্তির বার মাস পরে (১।১৮।৮) কৌশল্যার রাম, কৈকেয়ীর ভরত এবং ২ ভাগ চরু খাবার জন্য সুমিত্রার লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন দুটি ছেলে হয়। অযোধ্যা উৎসব মুখর হয়ে ওঠে; রাজপথ স্থানে স্থানে নট-নর্তকী সংকুলা (১।১৮।১৮) দেখা যায়।

রাম ক্রমশ বড় হয়ে ওঠেন, লক্ষ্মণকে নিয়ে মৃগয়ায় যান। রামের ১৫ বছর মত বয়স (১।২০।২) যখন দশরথ তখন এদের বিয়ের কথা ভাবতে থাকেন। এমন সময় বিশ্বামিত্র আসেন রামকে নিয়ে যাবেন; রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। দশরথ নিজে একা যুদ্ধে যেতে চান; তারপর চতুরঙ্গবাহিনী ও রামকে নিয়ে যুদ্ধে যেতে চান। শেষপর্যন্ত বোঝাতে চান ষষ্টি বর্ষ সহস্রাণি বয়সে (১।২০।১০) রামকে তিনি একা ছাড়তে পারবেন না। রাবণের নাম শুনে দশরথ স্পষ্ট স্বীকার করেন (১।২০।২০) রাবণকে তিনি হারাতে পারবেন না এবং মারীচ বা সুবাহু যে কোন একজনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যেতে তিনি প্রস্তুত (১।২০।২৫)। বশিষ্ঠ এই সময় বোঝান রামের হিতার্থে বিশ্বামিত্র এসেছেন। দশরথ তখন স্বস্ত্যয়ন ইত্যাদি করে রামলক্ষ্মণকে যেতে দেন।

রাম (দ্রঃ) দশম দিনে রাক্ষসদের দমন করে তারপর মিথিলাতে যান এবং মিথিলা থেকে ক্লান্তবাহনাঃ দূতাঃ তিন দিনে রামলক্ষ্মণের বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আসে। বশিষ্ঠ ও মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে দশরথ জানান পরদিন প্রভাতে যাত্রা করবেন। পরদিন সকালে যাত্রা করে চতুর্থ দিনে মিথিলাতে আসেন। জনক অভ্যর্থনা করে বিশ্রাম নিতে বলেন এবং আগামী কাল সভাতে আসতে বলেন এবং 'নিজের মেয়েদের জন্য' মঙ্গলকর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। পরদিন জনক (দ্রঃ) রাজের সভাতে এসে দশরথ বশিষ্ঠকে ইক্ষ্বাকু বংশের পরিচয় দিয়ে রামলক্ষ্মণের

জন্য জনকের কন্যা দুটিকে বরণ করতে চান। এই সময় বিশ্বামিত্র কুশধ্বজ কন্যাদের সঙ্গে ভরত ও শত্রুঘ্নের বিয়ের প্রস্তাব করেন। উত্তরে দিবসে ফল্গুনীভ্যাং ভগঃ যত্র প্রজাপতিঃ সে সময়ে (১।৭২।১৩) বিয়ের লগ্ন জনক ঠিক করেন। দশরথ নিজের নিলয়ে ফিরে এসে নান্দীমুখ ইত্যাদি করেন। এই দিনে যুধাজিৎ (দ্রঃ) ও এসে উপস্থিত হন ; অযোধ্যায় ভাগনেদের দেখতে এসেছিলেন ; সেখান থেকে আসেন। পরদিন বিয়ে হয় এবং তারপর দিন সকালে দশরথ (১।৭৪।১) সকলকে নিয়ে অযোধ্যার অভিমুখে যাত্রা করেন।

পথে অমঙ্গল চিহ্ন দেখে রাজা ভয় পেলে বশিষ্ঠ আশ্বাস দেন। পরশুরাম (দ্রঃ) দর্পহীন হন। অযোধ্যায় এসে কয়েক দিন পরে ভরতকে যুধাজিতের সঙ্গে কেকয়ে যাবার অনুমতি দেন। শত্রুঘ্নও যায় ; সস্ত্রীক কি না উল্লেখ নাই।

ভরত ও শত্রুঘ্ন মাতুলালয়ে থাকা কালীন রামের অভিষেকের ব্যবস্থা করেন। জনক ও কেকয় রাজকে বাদ দিয়ে বাকি রাজাদের ডাকিয়ে আনেন। চৈত্রঃ শ্রীমান অয়ং মাসঃ (২।৩।৪) ; অভিষেকের ব্যবস্থা হয়। রামকে ডাকিয়ে এনে (২।৩।২২) পুষ্য-যোগেন যৌবরাজ্য গ্রহণ করতে বলেন ও নানা উপদেশ দেন। আগামী কাল পুষ্য যোগ। রাম চলে যান ; আবার ডাকিয়ে এনে নিজের দুঃস্বপ্নের (২।৪।১৭) কথা শোনান: এই দুঃস্বপ্নের অর্থ রাজার মৃত্যু নয়তো ঘোর বিপদ। আবার বলেন আজকে চন্দ্র পুনর্বসু নক্ষত্রে, আগামী কাল পুষ্য নক্ষত্রে যাবে এবং কাল অভিষেক হবে ; এবং আজ রাতে সীতার সঙ্গে উপবাস করে দর্ভপ্রস্তরে শুয়ে থাকতে হবে (২।৪।২৩)। দশরথ আরো বলেন ভরত এখানে না থাকা কালে অভিষেক করতে চান (২।৪।২৫)। রাম চলে গেলে দশরথ বশিষ্ঠকে পাঠান রামসীতাকে ব্রত নিয়ম ধারণ করিয়ে আসতে।

বশিষ্ঠ ব্রত ধারণ করিয়ে ফিরে এলে দশরথ সভা ত্যাগ করে অন্তঃপুরে কৈকেয়ীকে প্রিয়ম্ আখ্যাতুম্ (২।৫।২৬) আসেন। কিন্তু পান না ; এ রকম শূন্যগৃহে দশরথ কোন দিন প্রবেশ করেন নি। তরুণী ভার্যাকে (২।১০।১৩) তারপর ক্রোধাগারে দেখতে পান এবং জিজ্ঞাসা করেন অবধ্যঃ বধ্যতাম্ কঃ বা বধ্যঃ কঃ বা বিমুচ্যতাম্ (২।১০।৩৩) এবং প্রাচীনাঃ (দ্রাবিড়), সিন্ধু-সৌবীরাঃ, সৌরাষ্ট্রাঃ, দক্ষিণাপথাঃ, বঙ্গাশ্চ, মাগধাঃ, মৎস্যাঃ, সমৃদ্ধ-কাশিকোশলাঃ এতগুলি রাজ্যের ওপর তাঁর প্রভুত্ব রয়েছে ; কৈকেয়ী কি চায়। রামের নামেও শপথ করেন। কৈকেয়ী তখন শম্বরের যুদ্ধে প্রতিশ্রুত বর দুটি চান ; একটি বরে রামের ১৪ বৎসরের জন্য দণ্ডকারণ্যে নির্বাসন (২।১১।২৬) আর একটি বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক।

এই প্রস্তাবে দশরথ প্রথমে অজ্ঞান হয়ে যান ; তারপর অনুনয় করতে থাকেন। কৈকেয়ী কোন কথা বুঝতে চান না ; এইভাবে সারা রাত কাটে। পরদিন ভোরে কৈকেয়ী আবার বিষোদ্‌গার (২।১৪-) করতে থাকেন। ইতিমধ্যে সুমন্ত্র ডাকতে আসেন এবং কৈকেয়ী রামকে নিয়ে আসতে বলেন। সুমন্ত্র বার হয়ে গেলেও পুরোহিত ও সমবেত রাজাদের অনুরোধে আবার দশরথকে ডাকতে আসেন এবং রাজা এবার নিজে রামকে আনার জন্য বলেন (২।১৫।২৬)। রাম এলে দশরথ কোন কথা বলতে পারেন না ; কৈকেয়ী (দ্রঃ) সব বলেন ; রাজা বর দিতে সম্মত হয়েছেন জানান।

বনবাসে যাবার জন্য রামলক্ষ্মণ ও সীতা বিদায় নিতে এলে রাজা সুমন্ত্রকে বলেন সমস্ত রাণীদের নিয়ে আসতে ; দারৈঃ পরিবৃতঃ সর্বৈঃ (২৩৪।১০) রামকে তিনি দেখবেন। ৩৫০-টি রাণী প্রমদাঃ তাম্রলোচনাঃ কৌশল্যাং পরিবার্য রাজার কাছে আসেন ; দশরথ তারপর রামকে আসতে বলেন ; জড়িয়ে ধরতে যান কিন্তু পড়ে যান। দশরথ বর দিয়েছেন স্বীকার করেন তবু রাম মাম্ নিগৃহ্য অযোধ্যাতে রাজা হক (২।৩৪।২৬) অনুরোধ করেন। রামকে মিথঃ আশীর্বাদ করেন এবং সেই দিন রাত্রিতে অন্তত অযোধ্যায় থেকে যেতে বলেন ; পরদিন যাত্রা করবেন। রাম রাজি হন না ; পিতাকে বোঝান ; গলায় বেশ একটা অভিমানের সুর। দশরথ তখন সমস্ত চতুরঙ্গ বাহিনী, ব্যবসায়ী, বাদক, রূপ-জীবী, এবং রাজার সমস্ত ধনকোশ ও ধান্য রামের সঙ্গে দিয়ে দিতে বলেন। কৈকেয়ী তীব্র প্রতিবাদ করে ওঠেন। সীতার (দ্রঃ) চীরবাস গ্রহণে সকলে প্রতিবাদ করে উঠলে দশরথও তখন সীতাকে নিষেধ করেন। কৈকেয়ীকে তারপর গালি দিয়ে সুমন্ত্রকে নির্দেশ দেন রথে করে এদের জন পদের বাইরে পৌঁছে দিতে এবং সচিবকে বলেন ১৪ বছরের মত উপযুক্ত বাসাংসি ও দামী আভরণানি সঙ্গে দিতে।

রামকে শেষ দেখা দেখতে পথে বার হয়ে এসেছিলেন এবং মাটিতে পড়ে যান। রথের ধুলা মিলিয়ে গেলে রাজা আবার পড়ে যান ; কৌশল্যা ডান পাশে ও কৈকেয়ী বাম পাশে এসে রাজাকে ধরলে রাজা কৈকেয়ীকে সরে যেতে বলেন (২।৪২।৬) এবং তাঁকে ত্যাগ করেছেন জানান। ভরতের দেওয়া শ্রাদ্ধ ও গ্রহণ করবেন না বলেন। প্রাসাদে কৌশল্যার গৃহে এসে ওঠেন।

সুমন্ত্র ফিরে এসে রাজাকে সব খবর দিলে রাজা আবার অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান (২।৫৭।২)। এই সময় কৌশল্যার ও সুমিত্রার কথায় তীব্র শ্লেষ ফুটে উঠতে থাকে। রাজা তারপর ঘুমিয়ে পড়েন। এরপর কৌশল্যা বলেছেন পঞ্চরাত্রঃ অদ্য গণ্যতে (২।৬২।১৭)। দশরথের তারপর ঘুম ভেঙে গেলে অন্ধক (দ্রঃ) কাহিনী শোনান। অথচ ২।৬৩।৪ শ্লোকে আছে রজনীং ষষ্ঠীং রামে প্রব্রাজিতে বনে। এরপর রাজা চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছিলেন না ; কৌশল্যা কে স্পর্শ করতে বলেন। রাণী দুজন তারপর ঘুমিয়ে পড়েন। অর্দ্ধরাত্রে দশরথ (২।৬৪।৭৮) প্রাণত্যাগ করেন।

পরদিন বন্দীরা গান গেয়ে যায় ইত্যাদি ; সকলে সূর্যোদয়ের অপেক্ষা করেন; অন্তঃপুরের অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা তখন রাজাকে ঘুম ভাঙাতে এসে অবস্থাটা বুঝতে পারে। কৌশল্যা ও সুমিত্রা তখনও ঘুমচ্ছিলেন। অমাত্যরা তৈলদ্রোণে রাজার দেহ ডুবিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেন। দ্রঃ-ভরত।

মতান্তরে আছে পুত্রেষ্টি যজ্ঞে অগ্নিদেব/দৈত্যপুরুষ বার হয়ে প্রজাপতি পাঠান চরু দিয়েছিলেন এবং ঋষিদের কথা মত রাজা এই চরু কেবল কৌশল্যা ও কৈকেয়ীকে দিয়েছিলেন। এঁরা দুজনে নিজেদের ভাগ থেকে সুমিত্রাকে দেন।

ভরত, শত্রুঘ্ন ফিরে এসে রাজার শেষ কৃত্য করেন। লঙ্কায় সীতার অগ্নি পরীক্ষার পর দশরথ ইন্দ্রলোক থেকে এসে সীতাকে ও দুই ভাইকে আশীর্বাদ করে যান। দ্রঃ-কলহা, ধর্মধ্বজ।

দশহরা—জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্লাদশমীতে মঙ্গল বারে হস্তা নক্ষত্রে স্বর্গ থেকে গ পৃথিবীতে আসেন। ফলে এটি অতি পবিত্র দিন। এই দিনে স্নান ও দান কর বাজিমেধ যজ্ঞের ফল হয়। এই তিথিতে গঙ্গা দশবিধ ও দশ জন্ম অর্জিত পাপ হ করেন বলে এই নাম।

দশার্ণ—দশ+ঋণ (দুর্গ)। মহাভারতে পশ্চিম দিকে একটি দশার্ণ (নকুল জ করেন); এবং পূর্বে আর একটি দশার্ণ। পূর্ব মালব+ভূপাল রাজ্য মিলে পশ্চিম-দশার্ণ রাজধানী বিদিসা। অশোকের সময় এই রাজধানী। মধ্যপ্রদেশে ছত্রিশ গঢ় ও চার পাশে অংশ মিলে পূর্ব দশার্ণ।

পূর্ব দশার্ণ পেরিপ্লাসে দোসরেন; মধ্যপ্রদেশের ছত্রিশগড়ের অংশ। (২) দশন দশান নদী; মতান্তরে এটি হচ্ছে বুন্দেলখণ্ডের ধোস-অউন=টলেমির দোসরন। দ্রঃ ছত্রিশগড়।

একটি মতে অবশ্য বিন্ধ্যের দ-পূর্ব অংশ। মেঘদূতে বিদিসা দশার্ণের রাজধানী পাণ্ডু, ভীম ও নকুল এই দশার্ণকে যথাক্রমে পরাজিত করেছিলেন। দশার্ণের এক রাজা সুদামা; সুদামার দুই মেয়ে; বড় মেয়ে বিদর্ভরাজ ভীমের স্ত্রী, ছোট মেয়ে চেদি রাজ বীরবাহুর রাণী। এই ভীমের মেয়ে (মহা ৩।৬৬।১৩) দময়ন্তী, এবং চেদিরাজের মেয়ে সুনন্দা। দশার্ণের এক রাজা হিরণ্যবর্মার মেয়েকে দ্রুপদের মেয়ে শিখণ্ডিনী (দ্রঃ শিখণ্ডী) পুরুষের ছদ্মবেশে বিয়ে করেন। দশার্ণ রাজ কৌরবপক্ষে যুদ্ধ করে ছিলেন। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় দশার্ণে রাজা ছিলেন চিত্রাঙ্গদ।

দশার্হ—যদু বংশে এক বিখ্যাত রাজা। বিদর্ভ (দ্রঃ) বংশ। দশার্হ>(ব্যোম)> >জীমূত>বৃহতি>ভীমরথ>নবরথ>দশরথ>শকুনি>করম্ভ>দেবরাত>দেবক্ষত্র> দেবক্ষত্র (=মধু)+বৈদর্ভী>মরুবসু>পুরুদ্বান+বৈদর্ভী/ভদ্রাবতী>মধু এই মধুর ইক্ষ্বাকু বংশীয় ভার্যা>সত্ত্বান্ (হরি ১।৩৬।২৪)।

কৃষ্ণ এই বংশে জন্মান ফলে কৃষ্ণ বহু জায়গায় দাশার্হ বলে উল্লিখিত। (২) একটি দেশ। গুজরাটে দ্বারকা। দ্রঃ-কুকুর।

দশাশ্বমেধ—কাশীর একটি তীর্থস্থান। রাজর্ষি দিবোদাসের সাহায্যে ব্রহ্মা এখানে দশটি অশ্বমেধ করেছিলেন।

দশেরা—সর্বভারতীয় উৎসব। গোপথ ব্রাহ্মণে এর উল্লেখ আছে। দুর্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী প্রধানত পূজিতা হন। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে এটি রামচন্দ্রের উৎসব বলে পালিত হয়। দশেরা অর্থে দশরাত্র, সংস্কৃতে অর্থ নবরাত্র; আশ্বিন ও চৈত্র মাস কাল-দংষ্ট্রা মাস অর্থাৎ এই সময়ে মহামারী ইত্যাদি হয়। এই সব বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য ও সুখ ও সমৃদ্ধির আশায় এই পূজা করা হয়।

দেবী ভাগবতে রাবণ বধের উপায় হিসাবে নারদ রামকে নবরাত্র ব্রত পালন করতে বলেন। নারদ বলেছেন বহু দেবতা ইত্যাদি এই ব্রত করেছিলেন:- শিব ত্রিপুর বধের জন্য; ইন্দ্র বৃত্র বধের জন্য; বিষ্ণু মধুকৈটভ বধের জন্য। অষ্টমীতে দেবী দেখা দিয়ে রামকে বর দিয়েছিলেন। এই কাহিনীতে ব্রহ্মা দেবীকে অকালে বোধন করেছিলেন ঘটনা নাই।

দস্যু—প্রাচীনকালে উ-ভারতে আদিবাসী জাতি। কুভ (কাবুল) উপত্যকা থেকে যমুনা পর্যন্ত এগিয়ে আসার ইতিহাস ঋক্ বেদ। সিন্ধু পার হয়ে এই দস্যুদের সঙ্গে অনার্যদের প্রথম যুদ্ধ হয়। দস্যু রাজা শম্বরের সঙ্গে আর্যদের যুদ্ধ করতে হয়েছিল। সহস্র নগরীর রাজা ছিলেন এই শম্বর; নগরগুলি শক্তিশালী প্রাচীর দিয়ে ঘেরা; দুর্গগুলির নাম ছিল অশ্মময়ী, আয়সী ও শতভুজী ইত্যাদি। দস্যুদের একটি শাখার নাম ছিল পণি; আর্যদের এঁরা ভীষণ ভাবে বাধা দিয়েছিলেন। যাস্কের মতে পণিরা ব্যবসায়ী ছিলেন। ঋগ্‌বেদে দস্যু রাজা হিসাবে ধুনি, চুমুরি, পিপ্রু, বর্চস্, শম্বর ইত্যাদি দুর্দান্ত রাজার নাম আছে। দস্যুদের উল্লেখযোগ্য শাখা শিম্যু, কীকট, শিগ্রু, যক্ষু ইত্যাদি; ঋক্‌বেদে এদের অনাস (নাসিকাহীন) বলা হয়েছে অর্থাৎ এদের নাক চেপ্টা ছিল। রঙও এদের কালো। এরা হোম, যজ্ঞ ইত্যাদি বিরোধী; সম্ভবত এরা দ্রাবিড় এবং এদের দেবতা ছিল সম্ভবত লিঙ্গ, শিব ও শক্তি। দ্রঃ- দাস।

দস্র—দস্র ও নাসত্য (দ্রঃ) অশ্বিনীকুমার দুজনের নাম।

দহ—এক জন রুদ্র। ব্রহ্মার ছেলে স্থাণুর পুত্র।

দাক্ষায়ণী—দক্ষের যে কোন মেয়ে। তবে অদিতিই এই নামে বিশেষ পরিচিত।

দান—প্রাচীন ভারতে সমাজ ব্যবস্থায় অর্থ বণ্টনের একটি প্রচলিত ধর্মীয় নীতি।

দানব—দনুর (দ্রঃ) সন্তান। দেবতাদের চিরশত্রু। দ্রঃ- দৈত্য।

দাবা—উৎপত্তি ভারতবর্ষে। যুদ্ধের সময় যুদ্ধমূলক চতুরঙ্গ ক্রীড়ার প্রচুর প্রচলন ছিল; এর দুটি ধারা: শতরঞ্জ এবং নববল। এই দুটি ধারার মিশ্রণে বর্তমানে দাবার আন্তর্জাতিক রূপ।

দামোদর—যশোদা কৃষ্ণকে উদূখলে বাঁধলে কৃষ্ণ ছুটোছুটি করতে থাকেন। দড়ি ছিঁড়ে যায়; পেটে দড়ির একটা অংশ বাঁধা থাকে; ফলে নাম হয় দামোদর।

দামোদর—ধর্মোদয়, দামুদা নদী।

দারিয়ুস—বুদ্ধের মৃত্যুর ৩০ বছর পরে ভারত আক্রমণ করেন। দ্রঃ- তক্ষশিলা।

দারা সেকো—শাহাজানের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৭ শতকে। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সম্বন্ধে অদম্য কৌতূহল ছিল। তাঁর বই মজমা-উল-বহরেইন (দুই সাগরের মিলন); কিন্তু বইতে দেখা যায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সম্বন্ধে কিছুই সংগ্রহ করতে পারেন নি। প্রকৃত কোন ভারতীয় পণ্ডিতের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পান নি কেন অস্পষ্ট। পার্সিয়ান ভাষাতে নিজে গীতা অনুবাদ করেছিলেন; ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে পাণ্ডুলিপি রয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা অস্পষ্ট; দারা নিজে সংস্কৃত জানতেন না। যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থ তাঁকে এত মুগ্ধ করেছিল যে স্বপ্নে একদিন বশিষ্ঠ ও রাম দেখা দেন; রামচন্দ্র দারাকে আলিঙ্গন করেন ইত্যাদি। অর্থাৎ দিল্লির মসনদে বসবার মত শয়তানি দারার ছিল না। দারা যে মতবাদ (ধর্ম ?) প্রচার করতে চেয়েছিলেন তার নাম দীন ইলাহি।

দায়ভাগ—বাঙলায় প্রচলিত উত্তরাধিকার আইন। রচয়িতা জীমূতবাহন (দ্রঃ)। দায় বা উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সমস্যাগুলির মীমাংসা এই বইতে করা হয়েছে। পিণ্ড দানের সঙ্গে উত্তরাধিকার যুক্ত করেন। বাঙলাতে উত্তরাধিকারের যাবতীয় সমস্যা

দায়ভাগ অনুসারে সমাধান হয়। ভারতে অন্যান্য প্রদেশে প্রচলিত মিতাক্ষরার সঙ্গে তীব্র মত পার্থক্য রয়েছে। গ্রন্থটিতে মৌলিক চিন্তা ও তীক্ষ্ণ বিচারশক্তি সর্বত্র স্পষ্ট।

দারুক—(১) মহিষাসুরের সারথি। (২) গরুড়ের (দ্রঃ) ছেলে। (৩) কৃষ্ণের সারথি। সুভদ্রা হরণের সময় কৃষ্ণার্জুনের রথ চালাতে রাজি হননি। কৃষ্ণকে অনুরোধ করেছিলেন তাঁকে বেঁধে রেখে কৃষ্ণ যেন নিজে রথ চালান। কুরুক্ষেত্রে ১৪ দিনের দিন কৃষ্ণের আদেশে সাত্যকির সারথি হয়েছিলেন। যদুবংশ ধ্বংস হলে কৃষ্ণের আদেশে হস্তিনাপুরে গিয়ে অর্জুনকে দ্বারকায় নিয়ে আসেন।

দারুবন—দেবদারু বন (দ্রঃ), দারুকা বন, চমৎকার পুর (দ্রঃ)। এটি নিজাম রাজ্যে অউন্ধা : পর্ভানি থেকে ২৫ মাইল দ-পূর্বে। এখানে মহাদেব নাগেশের মন্দির রয়েছে। ১২টি জ্যোতির্লিঙ্গের একটি। শিব-পুরাণে প-সমুদ্রতীরে।

দার্বাভিসার—বিতস্তা থেকে চন্দ্রভাগা পর্যন্ত সমতল এলাকা। পার্বত্য রাজ্য রাজপুরী এর অন্তর্গত। কাশ্মীরের অধীনে ছিল। দ্রঃ- দর্ব।

দালভ্য—দলভ পুত্র বক। অপর নাম বকদালভ্য (বামন পুরাণ)। নৈমিষারণ্যে মুনিরা একবার দ্বাদশ বর্ষ ব্যাপী বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করেন। যজ্ঞশেষে এঁরা পাঞ্চাল রাজের কাছে ২১টি গরু চান। বকদালভ্য তখন ঋষিদের কিছু গরু দেন এবং নিজে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে কিছু পশু সাহায্য চান। মুনিদের নেতা হয়ে গিয়েছিলেন দালভ্য। রাজা তিরস্কার করেন ও কিছু মৃতগরু দিতে চান অর্থাৎ রিক্ত হস্তে ফিরিয়ে দেন। দালভ্য তখন সরস্বতী তীরে পৃথূদকে অবকীর্ণ তীর্থে যজ্ঞ করে ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যের বিকল্প রূপে সেই মৃতগরুর মাংস আহুতি দেন। ধৃতরাষ্ট্রের রাজত্ব ক্রমশ নষ্ট হতে থাকে। রাজা ভয়ে মুনিদের শরণ দেন এবং কারণ জানতে পেরে অবকীর্ণে এসে দালভ্যকে বহু পশু উপহার দিয়ে আবার সন্তুষ্ট করেন। দালভ্য তখন (মহা ৯।৪০।·) যজ্ঞ করে শান্তির ব্যবস্থা করেন এবং বহু পশু নিয়ে নৈমিষারণ্যে ফিরে যান। যুধিষ্ঠিরের সভাতে দালভ্য ছিলেন। সত্যবানের পিতা দ্যুমৎসেনকে ভবিষ্যৎবাণী করে ছিলেন সত্যবান দীর্ঘায়ু হবেন।

দালভ্য আশ্রম—দালমৌ। রায়বেরিলিতে গঙ্গার তীরে।

দাশরাজ্ঞ—ভারতে বিখ্যাত একটি যুদ্ধ। পঞ্চ নদের আর্য এবং ভারতের আদি-বাসীদের মধ্যে এই যুদ্ধ হয়। ঋক্‌বেদেরও আগে। সুদাস দশ রাজার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সুদাসের সঙ্গে আর্য ও অনার্য সকলেই ছিলেন এবং সুদাস যুদ্ধে জয়লাভ করেন। এই জয়লাভের পর উত্তর ভারতে সঙ্কর জাতি সভ্যতা গড়ে উঠল। এরাই বর্তমানের হিন্দু। সুদাসের পুরোহিত ছিলেন বশিষ্ঠ (ঋক্ ৭।৮৩।৭)।

দাস—অনার্য জাতি। দাস ও দস্যু (দ্রঃ) শব্দ প্রায় সমর্থক ; বৈদিক সাহিত্যে এরা আর্যদের শত্রু। এরা সুরক্ষিত আয়সীপুর অর্থাৎ দুর্গে বাস করত। দাসরা বিশে (গোষ্ঠীতে) বিভক্ত ছিল ; এরা কৃষ্ণত্বক, অনাস, মৃধ্রবাচ (দুষ্টভাষী)। বেদে ইলিবিশ, শম্বর, বর্চিন ইত্যাদি দাস রাজের নাম রয়েছে। কিরাত, কীকট, চণ্ডাল প্রভৃতি দাসেরা

গাঙ্গেয় উপত্যকায় বাস করত। দাস শব্দ অসুর অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। তবে বেদে এরা মানুষ। পরবর্তী কালে দাস অর্থে ক্রীত দাস হয়েছে।

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল থেকে দাসপ্রথা চলিত ছিল। সিন্ধু সভ্যতায় দাসত্ব প্রথা বিদ্যমান ছিল প্রমাণ হয়। প্রাচীন আর্য সমাজেও যেন ছিল। ঋক্ বেদে কোথাও কোথাও এর উল্লেখ রয়েছে। উপনিষদ ইত্যাদিতে দাস উপহার দেবার উল্লেখ আছে। ঋক্ বেদে দ্যূত ক্রীড়ার ফলে দাসত্ববরণের উল্লেখ পাওয়া যায়। দাস ও দাসপুত্রের সোম যজ্ঞে অধিকার ছিল না। মহাভারতে দাসত্ব প্রথার বহু উল্লেখ আছে ; কদ্রু বিনতার উপাখ্যান ইত্যাদি ইত্যাদি। জাতকের গল্পে ও বৌদ্ধ সাহিত্যে ও দাসত্বপ্রথার উল্লেখ রয়েছে।

গ্রীস ও রোমের মত নিষ্ঠুর প্রথা ভারতে ছিল না মনে হয়। দাসের শ্রেণী ছিল : যুদ্ধে প্রাপ্ত, ক্রীত, পণে জিত, গৃহজ, ভক্তদাস (অন্নদাস), ঋণ দাস ও দণ্ড দাস। এই দাসদের অধিকার সম্বন্ধে বহু আলোচনা সংস্কৃত ও বৌদ্ধ শাস্ত্রে পাওয়া যায়। মুক্তি প্রাপ্ত দাসের নাগরিক অধিকার মনু স্বীকার করেন নি কিন্তু নারদ স্বীকার করেছেন।

দাসরাজ—সত্যবতীর পিতা, শন্তনুর শ্বশুর। প্রকৃত নাম উচ্চৈঃশ্রবস্।

দিকপাল—পৃথিবীতে বিভিন্ন দিকের পালক দেবগণ। প্রধান দিক পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম এবং উত্তর এবং দিকপালরা যথাক্রমে ইন্দ্র, যম, বরুণ ও কুবের। দক্ষিণ পূর্ব, দক্ষিণ পশ্চিম, উত্তর পশ্চিম ও উত্তর পূর্ব দিকগুলি অপ্রধান দিক এবং এদের পালক যথাক্রমে অগ্নি, নৈঋর্ত, বায়ু ও ঈশান। অবশ্য অন্যান্য নাম ও অনেক জায়গায় দেখা যায়। ঊর্দ্ধে ব্রহ্মা এবং অধঃ দিকে অনন্ত। দ্রঃ- লোকপাল।

কিছু কিছু গ্রন্থে কে কোন দিকের অধিপতি এ নিয়ে কিছুটা মত বিরোধ রয়ে গেছে। বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থেও দিকপাল আছেন ; নামের নানা বৈচিত্র্য দেখা যায়। মনু বলেছেন রাজা হবেন অষ্টদিকপালের (সোম, অগ্নি, অর্ক, অনিল, ইন্দ্র, কুবের, বরুণ ও সোম) মিলিত প্রতিমূর্তি। অনেক সময় নিঋর্তি ও ঈশানকেও সূর্য ও চন্দ্রের বদলে পাওয়া যায়। প্রথম দিকে অগ্নি, যম, পিতৃগণ একত্রে ও বরুণ এই চারজন দিকপাল ছিলেন। পরে সংখ্যা বাড়তে থাকে। অগ্নির স্থানে অনেক জায়গায় কুবের এসেছেন। রামায়ণে ইন্দ্র, যম, বরুণ ও কুবের। গোভিল গৃহ্যসূত্রে দশজন :-ইন্দ্র (পূ) বায়ু (দ-পূ), যম (দ), পিতৃগণ (দ-পশ্চি), বরুণ (পশ্চি), মহারাজ (উ-পশ্চিম), সোম (উ), মহেন্দ্র (উ-পূ), বাসুকি (নিম্নে), ব্রহ্মা (ঊর্দ্ধে)। অথর্ব বেদে ছয় জন দিকপাল হিসাবে আবার ছয়টি নাম ও পাওয়া যায় :—অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, সোম, বিষ্ণু ও বৃহস্পতি। এ ছাড়া আরো ছ'জন দিকরক্ষক রয়েছেন :—অসিত, তিরশ্চিরাজি, পৃদাকু, স্বজ, কল্মাষগ্রীব ও শ্বিত্র। কৃষ্ণ যজুর্বেদেও অথর্ব বেদ মত দিকপাল ও দিকরক্ষক আছেন তবে বিষ্ণুর বদলে যমকে দেখা যায়। বেদে শিব ও বৈশ্রবণ দিকপাল নন।

বৌদ্ধ সাহিত্যে চারজন দিকপাল :-ধৃতরাষ্ট্র, গন্ধর্বরাজ (পূ); বিরূঢ়ক, কুম্ভনাদের

রাজা (দক্ষিণ); বিরূপাক্ষ, নাগরাজ (পশ্চিম); বৈশ্রবণ, যক্ষরাজ (উত্তর); এদের চারজনকে মহারাজ বলা হয়েছে। জৈনরাও ব্রাহ্মণ্য দিকপালদের পুরাপুরি গ্রহণ করেছিলেন।

(১) ইন্দ্র:-দিকপাল ইন্দ্রের বাৎসরিক উৎসব মধ্যযুগের প্রথম দিকে দ-ভারতে চালু ছিল। খৃ ৮-ম শতকের বিবরণ আছে বৈশাখী পূর্ণিমাতে এই উৎসব আরম্ভ হবে, চোল রাজধানী কাবিরিপ্পুম্পাট্টিনমে ; ২৮ দিন এই উৎসব চলবে। এটি দিকপাল হিসাবে পূজা। মূল দেবতার মন্দিরে বিশেষ একটি স্থানে ইন্দ্রের মূর্তি বসান হত। বৃহৎ সংহিতাতে শুক্লঃ চতুর্বিষাণদ্বিপঃ, বজ্রপাণিত্বম্ (তির্যক্-ললাট-সংস্থম্) তৃতীয়ম্ অপি নেত্রম্।

বিষ্ণুধর্মোত্তরে আরো বিশদ বর্ণনা রয়েছে এবং আছে চতুর্ভুজ শচী ইন্দ্রের কোলে বসে। অংশুমৎভেদ ইত্যাদিতে ইন্দ্রের দুহাত, হাতে শক্তি অঙ্কুশ নীলোৎপল ও বজ্র ; আবার চার হাতেরও উল্লেখ আছে। গান্ধার শিল্পে ও মথুরাতে বুদ্ধকে প্রণাম করতে এসেছেন হিসাবে দিকপাল ইন্দ্রকে দেখান হয়েছে। চিদম্বরম্ মন্দিরে চার হাত ইন্দ্র ; হাতীর পিঠে দুদিকে পা ঝুলিয়ে বসা ; সামনের হাতে বরদ ও অভয় মুদ্রা, পেছনের হাতে অঙ্কুশ ও বজ্র।

(২) অগ্নি দিকপাল হিসাবে বিষ্ণুধর্মোত্তরে বর্ণিত হয়েছেন। চার হাত, চারটি দংষ্ট্রা, তিন চোখ, দাড়ি আছে, রথে বসা ; রথের পতাকা ধূম, এবং চারটি শুকপাখী বাহিত রথ। স্ত্রী স্বাহা কোলে বসে। অগ্নির হাতে শিখা, ত্রিশূল, ও জপমালা। মহাভারতে বর্ণনা সপ্তজিহ্ব, ধূমকেতু, হাতে অগ্নিময় শূল, রক্তবর্ণ-সপ্তাশ্ব বাহিত রথ। রথের চাকা বায়ু। সাত মুখ, পিঙ্গল চোখ, উজ্জ্বল দ্যুতিময় কেশ, এবং স্বর্ণবর্ণ অশ্বও মহাভারতে অন্য স্থানে উল্লিখিত হয়েছে। আগমে চতুর্ভুজ, ত্রিনেত্র, সামনের হাতে বরদ ও অভয় মুদ্রা, পেছনের হাতে স্রুক্ ও শক্তি। বিহারে প্রাপ্ত দিকপাল মূর্তিটি লম্বোদর, দু হাত, অজ বা মেষের পিঠে পর্যঙ্কাসনে বসা, হাতে কমণ্ডলু, জপমালা : যজ্ঞোপবীতধারী, দাড়ি আছে, ক্রুদ্ধদৃষ্টি। পাহাড়পুরের অগ্নির দু হাত, বাহন নাই, হাতে জপমালা ও কমণ্ডলু। ত্রিবাঙ্কুরে কণ্ডিয়ূর-এ শিবমন্দিরে অগ্নির দুটি ছাগমুণ্ড ; সাত হাত এবং তিন পা।

(৩) বৃহৎসংহিতাতে যম দণ্ডধারী ও মহিষ বাহন। বিষ্ণুধর্মোত্তরে বিশদবর্ণনা। চার হাতে দণ্ড, খড়্গ, ত্রিশূল ও জপমালা ; কোলে স্ত্রী ধূমোর্ণা। যমের দক্ষিণে চিত্রগুপ্ত উদীচ্য বেশ, হাতে লেখনী ও পত্র এবং বাম দিকে ভয়ঙ্কর মূর্তি পাশ হস্ত কাল। পাহাড়পুর মন্দিরে দেওয়ালে যেন যম রয়েছেন ; দু হাত, হাতে পাশ। এক পাশে যেন চিত্র গুপ্ত আর এক পাশে ধূম্রোর্ণা ; বাহন নাই। চিদাম্বরমে যম বাহনের সামনে দাঁড়ান, হাতে পাশ ও মুসল।

(৪) নির্ঋতি দ-পশ্চিম কোণের দেবতা। এঁকে অমঙ্গলের দেবতা বলা হয়েছে। বিষ্ণুধর্মোত্তরে নির্ঋতিকে বিরূপাক্ষের স্ত্রী বলা হয়েছে। বিরূপাক্ষ হচ্ছেন কাল এবং মৃত্যু নির্ঋতি। নির্ঋতির মূর্তি বিরল। Ahobilam মূর্তিতে নির্ঋতি

একটি মানুষের কাঁধের ওপর বসে। রাজসাহি সংগ্রহ শালাতেও নরবাহন, উ-বঙ্গ থেকে প্রাপ্ত।

(৫) বরুণ, বৃহৎ সংহিতাতে, হাতে পাশ হংসারূঢ়, বিষ্ণু ধর্মোত্তরে যাদোসাম্ পতি কিঞ্চিৎ প্রলম্ব জঠর, সপ্তহংস বাহিত রথ। চতুর্বাহু, হাতে পদ্ম, পাশ, শঙ্খ ও রত্নমঞ্জুষা; স্ত্রী গৌরী কোলে বসা, এবং দু পাশে গঙ্গা ও যমুনা বাহনারূঢ়া থাকবে। রথের সপ্ত হংসকে সপ্ত সিন্ধু বলা হয়েছে। বরুণের মূর্তিতে সাধারণত দু-হাত দেখা যায়; মকরের ওপর বসা। ভুবনেশ্বরে একটি মন্দিরে সুন্দর মূর্তি, গলাতে যজ্ঞোপবীত, হাতে পাশ ও বরদমুদ্রা, কানে কুন্তল ইত্যাদি।

(৬) বায়ু, বিষ্ণুধর্মোত্তরে দু বাহু, বাতাসে ফুলে ওঠা বস্ত্র, মুখ হাঁ করা, এবং চুল এলোমেলো বিস্রস্ত; অর্থাৎ একটা গতি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কনিষ্ক ও হুবিষ্ক মুদ্রাতে জরোস্ট্রিয়ান দেবতা 'বাত' ও অনুরূপ দেখতে। অংশুমৎভেদ ইত্যাদিতে দু হাত, হাতে পতাকা ও দণ্ড; এবং সিংহাসনে বসা। হাতে অঙ্কুশ ও হরিণ বাহন বহু গ্রন্থে। রূপমণ্ডনে চার হাত, বরদ মুদ্রা, ধ্বজ, পতাকা, কমণ্ডলু, হরিণ বাহন ও সবুজ রঙ। মধ্য যুগের প্রথম দিকের মন্দিরে হরিণ বাহন ও পতাকাধারী বায়ু পাওয়া [illegible] হিসাবে বায়ু ততটা প্রসিদ্ধ নন।

(৭) কুবের, অংশুমৎভেদে, দু হাত, হাতে বরদ ও অভয়মুদ্রা এবং মেষ বাহন; সঙ্গে স্ত্রী ও দুজন নিধি শঙ্খ ও পদ্ম (ভূতাকারম্ মহাবলম্) সুপ্রভেদাগমে হাতে মুসল। শিল্পরত্নে রথারূঢ়, নরবাহিত রথ লম্বোদর, হাতে গদা, সঙ্গে অষ্টনিধি ও গুহ্যক পরিবাহিত। পূর্বকারণাগমে কুবের মানুষের ওপর বসা; হাতে মুসল, এবং সঙ্গে শঙ্খ ও পদ্ম। রূপমণ্ডনে চার হাত, হাতে মুসল, মাতুলুঙ্গ, নিধি ও কমণ্ডলু। কিছু কিছু গ্রন্থে দুটি দংষ্ট্রা ও লম্বোদর। মুখে দাড়ি এবং বামকোলে ঋদ্ধি বসে আছে।

(৮) ঈশান—উ-পূর্ব কোণের অধিপতি। শিবের বিশেষ একটি রূপ। নানা গ্রন্থের বর্ণনায় জটামুকুট, শ্বেত যজ্ঞোপবীত। তিন চোখ, হাতে শূল ও কপাল, ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান, বৃষবাহন। বিষ্ণুধর্মোত্তরে ঈশানকে গৌরীশর্ব বলা হয়েছে। অর্থাৎ অর্দ্ধ নারীশ্বর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

দিকপাল—বজ্রযানে দশটি দিকের দেবতাদেরও সৃষ্টি করা হয়েছে। অনেক সময় এই সব দেবতাদের সঙ্গে এদের শক্তি যবযুম আলিঙ্গনে আবদ্ধ থাকে। এই দেবতারা অনেক সময় ভয়ঙ্কর। এঁদের কাজ ধর্ম-রক্ষা; ধর্মের পথ থেকে সমস্ত বিপদ দূর করা। এই দেবতাগুলি যমান্তক (পূর্বে), প্রজ্ঞান্তক (দক্ষিণ), পদ্মান্তক (পশ্চিম), বিঘ্নান্তক (উত্তর তক্কিরাজ (অগ্নি, দ-পূ), নীলদণ্ড (নৈঋর্ত, দ-পশ্চি), মহাবল (বায়ু-উ পশ্চি), অচল (উ-পূ), উষ্ণীষ (ঊর্দ্ধ), সুম্ভরাজ (নিম্ন)। এ ছাড়া ছয় জন দেবী ও কল্পিত হয়েছিল; এঁরা দিক পালিকা; যমান্তক ইত্যাদি দেবতাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। এই ছয় জন দেবী এবং পুষ্প, ধূপ, দীপ ও গন্ধ মিলে দশ সংখ্যা পূর্ণ হয়ে ওঠে। এই দেবীঃ- বজ্রাঙ্কুশী (পূর্ব), বজ্রস্ফোটা (পশ্চিম) বজ্রপাশী (দক্ষিণ), বজ্রঘণ্টা (উত্তর), উষ্ণীষ বিজয়া (ঊর্দ্ধ), সুম্ভা (অধঃ)। দ্রঃ- দেবতা, উষ্ণীষ।

	অপর নাম	রঙ	মুখ	হাত	অস্ত্র	শক্তি
যমান্তক	বজ্রদণ্ড	নীল	তিন	ছয়	মুদ্গর খড়্গ রত্ন পদ্ম	আলিঙ্গিত
প্রজ্ঞান্তক	বজ্রকুণ্ডলী	শ্বেত	তিন	ছয়	দণ্ড খড়্গ রত্ন পদ্ম	,,
পদ্মান্তক	বজ্রোষ্ণীষ	রক্ত	তিন	ছয়	চক্র খড়্গ রত্ন রক্তপদ্ম	,,
বিঘ্নান্তক	অনলার্ক	হরিত	তিন	ছয়	বজ্র খড়্গ রত্ন পদ্ম	,,
তক্কিরাজ	বজ্রজ্বালানলার্ক	নীল	তিন	ছয়	দণ্ড খড়্গ রত্ন পদ্ম	,,
নীলদণ্ড	হেরুকবজ্র	নীল	তিন	ছয়	দণ্ড খড়্গ রত্ন পদ্ম	,,
মহাবল	পরমাশ্ব	নীল	তিন	ছয়	ত্রিশূল খড়্গ রত্ন পদ্ম	,,
অচল	ত্রৈলোক্যবিজয়	নীল	তিন	ছয়	বজ্র খড়্গ রত্ন পদ্ম	,,
উষ্ণীষ	উষ্ণীষ চক্রবর্তী	পীত	তিন	ছয়	চক্র খড়্গ রত্ন পদ্ম	,,
সুম্ভরাজ	বজ্রপাতাল	নীল	তিন	ছয়	বজ্র খড়্গ রত্ন পদ্ম	,,
বজ্রাঙ্কুশী		শ্বেত	এক	দুই	অঙ্কুশ, তর্জনী	
বজ্রপাশী		পীত	এক	দুই	পাশ তর্জনী	
বজ্রস্ফোটা		রক্ত	এক	দুই	শৃঙ্খল তর্জনী	
বজ্রঘন্টা		শ্যাম	এক	দুই	ঘন্টা তর্জনী	
উষ্ণীষবিজয়া		শ্বেত	এক	দুই	চক্র তর্জনী	
সুম্ভা		নীল	এক	দুই	সর্পপাশ তর্জনী	

দিগম্বর সম্প্রদায়—জৈনদের (দ্রঃ) প্রধানত দুটি সম্প্রদায়ঃ- শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর। প্রথম দিকে এ রকম কোন সম্প্রদায় ছিল না। খৃ-পূ ৪ শতকে এঁদের মধ্যে সঙ্ঘ বিচ্ছেদ আরম্ভ হয়। ভদ্রবাহুর নেতৃত্বে যাঁরা দাক্ষিণাত্যে ধর্ম প্রচার করতে যান তাঁরা পরে ফিরে এসে দিগম্বর সম্প্রদায় স্থাপন করেন। মূল সম্প্রদায়টি শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় রূপে পরিচিত।

দিগ্‌গজ—দিক রক্ষক হস্তী। পৌরাণিক মতে আকাশে আট দিকে দাঁড়িয়ে এরা পৃথিবীকে ধরে রেখেছে। ঐরাবত (স্ত্রী অভ্রমু) পূর্ব দিকে, পুণ্ডরীক (স্ত্রী কপিলা) অগ্নি কোণে, বামন (স্ত্রী পিঙ্গলা) দক্ষিণ দিকে, কুমুদ (স্ত্রী অনুপমা) নৈঋর্তে, অঞ্জন (স্ত্রী তাম্রকর্ণী) পশ্চিমে, পুষ্পদন্ত (স্ত্রী শুভ্রদন্তা) বায়ুকোণে, সার্বভৌম (স্ত্রী অঙ্গনা) উত্তর দিকে, সুপ্রতীক (স্ত্রী অঞ্জনাবতী) ঈশান কোণে। এ ছাড়াও নীচে পাতালে চারটি হস্তী পৃথিবীকে মাথাতে ধারণ করে রেখেছেঃ- পূব দিকে বিরূপাক্ষ —এ মাথা নাড়লে ভূমিকম্প হয়, দক্ষিণে মহাপদ্মাশ্ম, পশ্চিমে সৌমনস এবং উত্তরে ভদ্রা ; সগর সন্তানেরা পাতালে এগুলিকে দেখেছিলেন।

দিতি—প্রজাপতি দক্ষের ৬০টি মেয়ের মধ্যে দিতি, দনু, ইত্যাদি ১৭ জন কশ্যপের স্ত্রী। দিতির পুত্রেরা দৈত্য এবং দনুর পুত্রেরা দানব নামে পরিচিত। দিতির বহু দিন সন্তান হয় নি। সপত্নীদের সন্তান দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েন। সন্ধ্যার সময় কশ্যপ গভীর ধ্যানে মগ্ন ছিলেন ; এই সময়ে দিতি সন্তান প্রার্থনা করেন। কশ্যপ দিতিকে কিছুক্ষণ অন্তত অপেক্ষা করতে বলেন ; সন্ধ্যাতে রুদ্রের অনুচরেরা ঘুরে বেড়ায়। কামার্তা দিতি নিজেকে সংযত রাখতে পারেন না। মিলিত হবার পর দিতি ভাবী সন্তানের জন্য রুদ্রের ভয়ে প্রার্থনা করতে থাকেন। কশ্যপ বলেন সন্ধ্যাকালে মিলিত হওয়া ইত্যাদি ৪-টি পাপের ফলে এই গর্ভে দুষ্ট ও অত্যাচারী দুটি যমজ সন্তান হবে এবং বিষ্ণুর হাতে

এরা নিহত হবে (ভাগ ৩।১৪।৪১)। দিতির মনে কিছুটা অনুশোচনা আসে ; কশ্যপ তখন বর দেন নাতি প্রহ্লাদ বিষ্ণু ভক্ত হবে। শতবর্ষ গর্ভ ধারণ করে দুটি ছেলে হয় হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু। সনক-সনন্দ ইত্যাদির অভিশাপে জয় ও বিজয় এই দুই ছেলে রূপে জন্মান। অন্য গ্রন্থে আছে জয় ও বিজয় লক্ষ্মীদেবীকে অনুরূপ বাধা দিয়েছিলেন। বিষ্ণু তখন যোগনিদ্রায় সুপ্ত ছিলেন। ফলে লক্ষ্মীই অভিশাপ দিয়েছিলেন। এই ভাবে জন্মে ব্রাহ্মণদের অবহেলা করার পাপ বিষ্ণুর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করার মাধ্যমে ক্ষয় হবে।

প্রথম ছেলে যেন হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু এবং মেয়ে সিংহিকা, বিপ্রচিত্তির স্ত্রী। হরিবংশ (১।৩।৭০)।

অমৃত নিয়ে যুদ্ধে দিতির সমস্ত ছেলেরা নিহত হন। দিতি তখন স্বামীর কাছে ইন্দ্র বিজয়ী একটি পুত্র চান। কশ্যপ বলেন তাহলে হাজার বছর দেহ ও মনে শুচি হয়ে গর্ভ ধারণ করতে হবে। ভাগবতে এক বছর ব্রত পালন, ব্রতে ৩১-টি বিধি-নিষেধ ছিল। কশ্যপ বলেন এই ছেলে ইন্দ্রঘাতী নয়তো দেববান্ধব (ভাগ ৬।১৮।৪৫) হবে। এরপর কশ্যপ দিতির সর্বাঙ্গে কেবল হাত বুলিয়ে দেন। ফলে দিতি গর্ভবতী হন। এই সন্তান ৪৯ মরুৎ (দ্রঃ) হয়ে জন্মান। মরুৎরা ইন্দ্রের সহায়ক হন। শূরপদ্ম, বজ্রাঙ্গ, সিংহবক্ত্র, তারকাসুর, গোমুখ, অজমুখ এরাও দিতির ছেলে। দ্রঃ- দনু।

দিন—ব্রহ্মা যখন সৃষ্টি করছিলেন তখন ব্রহ্মার মধ্যে তমোগুণ প্রধান হয়ে ওঠে এবং ব্রহ্মার কটি দেশ থেকে অসুররা জন্মান। এর পর ব্রহ্মা এই তমোগুণ ত্যাগ করেন ; পরিত্যক্ত তমোগুণ রাত্রিতে পরিণত হয়। আবার ব্রহ্মা ধ্যান করতে থাকেন ; মুখ থেকে দেবতাদের জন্ম হয় ; দেবতারা সত্ত্বগুণের প্রতিমূর্তি। ব্রহ্মা তার পর এই সত্ত্বগুণ পরিত্যাগ করেন ; পরিত্যক্ত সত্ত্বগুণ দিনে পরিণত হয়। এর পর পিতৃগণ সৃষ্টি হয় ; এঁদের মধ্যে আংশিক সত্ত্বগুণ। ব্রহ্মা এই আংশিক সত্ত্বগুণ ও পরিত্যাগ করেন ; এবং এটি সন্ধ্যাতে পরিণত হয়। এর পর ব্রহ্মা রজোগুণে মানুষ সৃষ্টি করেন এবং পরিত্যক্ত রজোগুণ ঊষাতে পরিণত হয়। অর্থাৎ দিন, রাত্রি, ঊষা ও সন্ধ্যা ব্রহ্মার অংশ (মার্ক ৪৮।-)।

দিবাকর—গরুড়ের এক বংশধর। দ্রঃ- ত্রিবার।

দিবোদাস—(১) ঋকবেদে এক জন বৈদিক রাজা। জীবনে শেষ দিকে রাজর্ষি হয়ে যান। ঋক্‌বেদে এই দিবোদাসের বহু উল্লেখ আছে। অত্যন্ত অতিথি পরায়ণ ছিলেন। ঋক্‌বেদে আছে ইনি শম্বর অসুরের ভয়ে জলের নীচে লুকিয়ে ছিলেন। (২) চন্দ্রবংশে ধন্বন্তরী > কেতুমান > ভীমরথ (=ভীমসেন, সুদেব) > দিবোদাস। আর এক মতে কেতুমানের ছেলে দিবোদাস। অন্য মতে কাশীরাজ হর্যশ্বের ছেলে সুদেব এবং সুদেবের ছেলে দিবোদাস। আকাশ থেকে দেবতারা এঁকে রত্ন ও ফুল দিতেন বলে এই নাম। রাক্ষস ক্ষেমককে নিহত করে দিবোদাস নিজের রাজ্য বাড়িয়ে নেন। হর্যশ্ব ও সুদেব দুজনেই হৈহয় বা বীতহব্যের ছেলেদের সঙ্গে যুদ্ধে মারা যান। দিবোদাস তখন রাজা হন। হেহয় রাজা ভদ্রশ্রেণ্য কাশী আক্রমণ করলে এঁর একশ ছেলেকে

দিবোদাস নিহত করেন। বীতহব্যের ছেলেরা আবার কাশী আক্রমণ করে দিবোদাসকে পরাজিত করে তাঁর ছেলেদের নিহত করেন। হাজার দিন যুদ্ধ হয়েছিল ; দিবোদাস তখন পালিয়ে গিয়ে মহর্ষি ভরদ্বাজের শরণ নিলে মহর্ষি এক যজ্ঞ করেন। ফলে ছেলে হয় প্রতর্দন (দ্রঃ)। ভরদ্বাজের যোগবলে এই ছেলে পরাক্রান্ত হয়ে ওঠেন এবং দিবোদাস এ'কে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। দিবোদাস যযাতির মেয়ে মাধবীকে ২০০ শ্যামকর্ণাশ্ব শুল্ক দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন। দ্রঃ- বারাণসী, নিকুম্ভ। (৩) পুরুবংশে হর্যশ্বের ছেলে মুদ্গল। মুদ্গল বংশের ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণত্ব পেয়ে মৌদ্গল্য নামে পরিচিত হন। রাজা মুদ্গলের ছেলে বৃদ্ধশ্ব, এবং বৃদ্ধশ্বর ছেলে দিবোদাস ও মেয়ে অহল্যা। দিবোদাসের ছেলে মিত্রয়ু এবং মিত্রয়ুর ছেলে রাজা চ্যবন (বি-পু ৪।১৯।১৮)।

দিব্যগঙ্গা—সিন্ধু।

দিব্যাশ্রম—এখানে বিষ্ণু তপস্যা করতেন (মহা ৯।৫৩।১) এবং সমস্ত সনাতন যজ্ঞ করেছিলেন। শাণ্ডিল্য দুহিতা এখানে তপস্যা করে সিদ্ধি লাভ করে স্বর্গে যান। বলরাম এখানে আসেন এবং এখান থেকে প্লক্ষপ্রস্রবণ (৯।৫৩।১১) ইত্যাদি কয়েকটি তীর্থ হয়ে কুরুক্ষেত্রে যান।

দিলীপ—পুণ্যশ্লোক সগর বংশে অংশুমানের ছেলে এবং ভগীরথের (রাম ১।৪২।৫) বাবা। রামায়ণে বুঝে উঠতে পারেন না কি ভাবে গঙ্গা আনবেন। ত্রিংশৎবর্ষ সহস্রাণি রাজ্য করে (১।৪২।৮) রোগে মারা যান ও ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন। ছেলেকে রাজ্য দিয়ে যান। কালিদাসে মগধ কন্যা সুদক্ষিণা স্ত্রী। মহা ১২।২৯।৬৪—ইলবিল পুত্র। এক বার স্বর্গ থেকে ফেরার পথে ঋতুস্নাতা স্ত্রীর কথা চিন্তা করতে করতে অন্যমনস্ক পথে সুরভি গাভীকে প্রণাম না করে চলে যান। অপমানিতা সুরভি শাপ দেন সুরভির মেয়ে নন্দিনীকে সেবায় সুখী ও সন্তুষ্ট করতে পারলে তবে দিলীপের সন্তান হবে। বহু দিন সন্তানহীন থাকার পর বশিষ্ঠের কাছে এই কথা জানতে পেরে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে নন্দিনীর সেবা করতে থাকেন। এক দিন গরু চরাতে গেলে বনে এক সিংহ নন্দিনীকে আক্রমণ করে। দিলীপ শর সন্ধান করতে যান কিন্তু হাত অবশ হয়ে যায়। সিংহ নিজের পরিচয় দেয় সে হচ্ছে পার্বতীর বাহন ; এখানে পাহারা দিতে নিযুক্ত ইত্যাদি এবং তার শিকার সে খাবে, রাজা যেন বাধা না দেন। নিরুপায় হয়ে রাজা আশ্রিতকে রক্ষা করার জন্য সিংহকে অনুরোধ করেন নন্দিনীর বদলে সিংহ রাজাকে খেয়ে ফেলুক। সিংহ তখন অন্তর্হিত হয়ে যায় এবং নন্দিনী জানান রাজাকে তিনি পরীক্ষা করছিলেন এবং সন্তুষ্ট হয়ে বর দিলে রঘুর জন্ম হয়। মহাভারতে (৩।১০৬।৩৬) এবং রঘুবংশে আছে রাজা হবার পর গঙ্গা আনবার চেষ্টা করেছিলেন ; কিন্তু সফল হন নি ; ছেলেকে রাজত্ব দিয়ে বনে যান ও তপস্যায় দেহ ত্যাগ করেন। (২) কশ্যপ পুত্র একটি সাপ।

দিশাচক্ষু—গরুড়ের এক বংশধর। দ্রঃ- ত্রিবার।

দিষ্ট—ভাগবতে (৯।২)—দিষ্ট>নাভাগ>ভলন্দন>বৎসপ্রীতি>প্রাংশু>প্রমিতি>খনিত্র>চাক্ষুষ>বিবিংশতি>রম্ভ>খনীনেত্র>করন্ধম>অবীক্ষিৎ>মরুত্ত>দম>রাজ্যবর্দ্ধন>সুধৃতি>নর>কেবল>বন্ধুমান>বেগবান>বুধ>তৃণবিন্দু।

দিল্লি—ইন্দ্রপ্রস্থ (দ্রঃ), দেহলি; বর্তমানে ইন্দ্রপৎ। দ্রঃ- তিলপ্রস্থ। বর্তমান দিল্লি অর্থে সাহাজাহানবাদ (সাহাজাহান নির্মিত)+তোঘলক বাদ (গিয়াসুদ্দিন তোঘলক নির্মিত)+প্রাচীন হিন্দু দিল্লি (তোমর, চৌহানদের এলাকা)। এই হিন্দু এলাকার নাম ছিল যোগিনীপুর। ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে পুরাতন হিন্দু নগর ৫ মাইল মত। এখানে রাজা ধব একটি লৌহ স্তম্ভ স্থাপন করেছিলেন (খৃ ৪-শতক); পাঞ্জাবের বাহ্লিকদের পরাজিত করার স্মৃতি হিসাবে। অবশ্য প্রকৃত ঘটনা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের ছেলে প্রথম কুমারগুপ্ত স্থাপিত। পৃথ্বীরাজের যজ্ঞশালা নামক এলাকাটিতে স্তম্ভটি বর্তমান। পুরাতন দিল্লিতে দ্বিতীয় অনঙ্গপালের দুর্গ (১০৬০ খৃ) এবং যোগমায়ার মন্দির রয়েছে। দিল্লিতে অশোকের অনুশাসন যুক্ত স্তম্ভ ঃ- একটি ফিরোজশাহ কোটিলাতে (শ্রুঘ্ন (দ্রঃ) অর্থাৎ খিজেরাবাদ থেকে সরিয়ে আনা হয়েছিল)। আর একটি রয়েছে মেমোরিয়াল টাওয়ারের কাছে (মিরাট থেকে আনা)।

পূর্বে যমুনা, উত্তর পশ্চিমে আরাবল্লি পাহাড়, দক্ষিণে ওখলা ও মেহেরৌলি পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা। বহু মতে এইখানে খাণ্ডব বন ছিল; ইন্দ্রপ্রস্থ এইখানে গড়া হয়েছিল। বহু মতে পুরাণা কিল্লা হচ্ছে এই ইন্দ্রপ্রস্থ। কৌরবদের রাজধানী হস্তিনা-পুর দিল্লির ৯৭ কি-মি দূরে উ-পূর্বে অবস্থিত ছিল।

দীননাথ—দ্বাপরে এক শক্তিশালী সন্তানহীন রাজা। গালবের কাছে উপদেশ চান; গালব নরমেধ যজ্ঞ করতে বলেন। সুদর্শন, বিদ্বান এবং উচ্চবংশীয় একটি বলির প্রয়োজন। রাজার অনুচরেরা সন্ধানে বার হন এবং এরা দশপুরে আসেন। এখানে কৃষ্ণদেব নামে এক ব্রাহ্মণের তিনটি ছেলের মধ্যে একটিকে চার লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রা দিয়ে কিনে নিতে চান। কৃষ্ণদেব নিজে যজ্ঞের বলি হতে চান কিন্তু অনুচরেরা সে কথা না শুনে সুবর্ণ মুদ্রা দিয়ে একটি ছেলেকে ধরে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে। এই সময়ে কৃষ্ণদেবের মধ্যমপুত্র স্বেচ্ছায় নিজের ভাইকে মুক্ত করে দিয়ে রাজার অনুচরদের সঙ্গে চলে যান। পথে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে দেখা হয়; বিশ্বামিত্র ছেলেটিকে ছেড়ে দিতে বলেন; কিন্তু রাজার অনুচরেরা অসম্মত হন। বিশ্বামিত্র তখন নিজে এসে যজ্ঞ করেন; নরবলির প্রয়োজন হয় না; রাজা সন্তান লাভ করেন (পদ্ম-পু ১২)।

দীপবতী—দিবর দ্বীপ। গোয়া দ্বীপের উত্তরে। এখানে পঞ্চগঙ্গা তীরে প্রাচীন নার্ভেম-এ মহাদেব সপ্ত কোটীশ্বরের মন্দির রয়েছে; সপ্তঋষি স্থাপিত।

দীর্ঘজিহ্ব—কশ্যপ দনুর ছেলে।

দীর্ঘতমা—মা সত্যবতীকে ভীষ্ম বলেছিলেন (মহা ১।৯৮।৬) ঃ—মমতার গর্ভকালে উতথ্যের ছোট ভাই দেবগুরু বৃহস্পতি, উতথ্যের অনুপস্থিতে, মমতার সঙ্গে সহবাস করতে চান। মমতা বারণ করেন; তিনি গর্ভবতী; গর্ভে উতথ্যের শিশু বেদবেদাঙ্গে পারদর্শী হয়ে উঠেছে। বৃহস্পতির বীর্যও সমান শক্তিশালী; দুটি শক্তিশালী গর্ভ তিনি ধারণ করতে পারবেন না। গর্ভস্থ শিশুও নিষেধ করেন। কারণ একটি গর্ভে দুটি শিশুর স্থান হবে না। কিন্তু বৃহস্পতি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না; গর্ভস্থ শিশু তখন পা দিয়ে বাধা দেন; বীর্য গর্ভে প্রবেশ করতে পারে না; মাটিতে পড়ে

যায় ও একটি শিশুতে পরিণত হয় (দ্রঃ- ভরদ্বাজ)। বৃহস্পতি এতে ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দেন দীর্ঘকাল একে তামসে প্রবিষ্ট হতে হবে (১।৯৮।১৫) অর্থাৎ অন্ধ হবে। ফলে গর্ভস্থ শিশু অন্ধ হয়ে জন্মায়, নাম হয় দীর্ঘতমস্ (মহাভারত)। মহাভারতে (১২।৩২৮।৪৬-৬০) গর্ভস্থ শিশু বলে নার্হ-সি অম্বাং প্রবাধিতুম্। অন্ধ বালক পরে কেশবের নাম কীর্তন করে চক্ষুষ্মান হয় এবং নাম হয় গোতম।

ধার্মিক ও বেদজ্ঞ দীর্ঘতমা বৃহস্পতির মত তেজস্বী ; স্ত্রী ব্রাহ্মণ কন্যা প্রদ্বেষী (বর্দ্ধমান-সং) ; অনেকগুলি সন্তান ; এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গোতম। এই সব ছেলেরা লোভ ও মোহে অভিভূত ছিল। সুরভির মেয়ে কামধেনুর কাছে গোধর্ম শিক্ষা করে যত্রতত্র সঙ্গম করে বেড়াতেন ফলে মুনিরা দীর্ঘতমাকে আশ্রম থেকে বার করে দেন ; স্ত্রীও স্বামীর ভরণপোষণ করতে করতে ক্লান্ত ও বিদ্রোহী হয়ে পড়েন। দীর্ঘতমা স্ত্রীকে শান্ত করতে চেষ্টা করেন এবং অর্থ সংগ্রহের জন্য ক্ষত্রিয়দের কাছে তাঁকে নিয়ে যেতে বলেন। প্রদ্বেষী এ সব কথা শুনতে চান না। দীর্ঘতমা তখন নিয়ম করেন স্ত্রী একটি মাত্র স্বামীকে আশ্রয় করে জীবন কাটাবে ; এমন কি স্বামীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার স্বামী গ্রহণে পতিতা হবে। স্বামী না থাকলে অর্থ সম্পত্তি থাকলেও বৃথা হবে ইত্যাদি। প্রদ্বেষী তখন রাগে নির্দেশ দেন এবং মায়ের কথামত ছেলেরা মিলে একটি ভেলায় করে এঁকে গঙ্গাতে ভাসিয়ে দেন। চন্দ্র বংশে সুতপস্ পুত্র বলিরাজ স্নান করছিলেন এঁকে দেখতে পান এবং সন্তান উৎপাদনের জন্য বাড়িতে নিয়ে আসেন। স্ত্রী সুদেষ্ণার গর্ভে উজ্জ্বল সন্তান উৎপাদন করতে অনুরোধ করেন। সুদেষ্ণা অন্ধ ও বৃদ্ধমুনিকে অবজ্ঞা করে তাঁর শূদ্রা দাসী ধাত্রেয়িকাকে ঋষির কাছে পাঠিয়ে দেন। এই দাসীর কাক্ষীবান (মহা ১।৯৮।২৭) ইত্যাদি এগারটি ছেলে হয়। রাজা কিছু জানতেন না ; কিন্তু দীর্ঘতমা একদিন জানান এগুলি রাজার ছেলে নয় ; বলতে গেলে এগুলি দীর্ঘতমার। রাজা কোন দাবি করতে পারেন না। ঘটনাটা রাজা এবার জানতে পেরে সুদেষ্ণাকে আবার অনুরোধ করেন। মুনি সুদেষ্ণাকে স্পর্শ করে বর দেন অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম নামে পাঁচটি ছেলে হবে এবং প্রত্যেকের নামে একটি করে দেশের নাম হবে। দীর্ঘতমার এক স্ত্রী উশিক। দীর্ঘতপা=দীর্ঘতমা (মনিয়ার)। দ্রঃ- কাশিরাজ।

দীর্ঘপুর—দীগ। ভরতপুর রাজ্যে।

দীর্ঘবাহু—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে : ভীমের হাতে নিহত।

দীর্ঘরোমা—দীর্ঘলোচন। ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে ; ভীমের হাতে নিহত। (২) শিবের এক অনুচর।

দীর্ঘিকা—বিশ্বামিত্রের একটি মেয়ে। অত্যন্ত লম্বা। শাস্ত্রের বিধান অনুসারে এত লম্বা মেয়েকে বিয়ে করলে ছয় মাসের মধ্যে মৃত্যু হয়। এই ভয়ে কেউ এঁকে বিয়ে করতে চান না। স্বামী লাভের জন্য বহুদিন তপস্যা করতে করতে বৃদ্ধ বয়সে এক গৃহস্থের সঙ্গে বিয়ে হয়। স্বামীকে কাঁধে নিয়ে পথে যাবার সময় অণিমাণ্ডব্যের (দ্রঃ) কাছে এই স্বামী অভিশপ্ত হন সূর্য ওঠার আগেই মারা যাবেন ইত্যাদি। স্ত্রীর পুণ্যে শাপ সফল হয়েও হয় না ইত্যাদি। মনে হয় এই দীর্ঘিকা হচ্ছেন শীলাবতী (দ্রঃ)।

দুঃখ—দ্রঃ- বৌদ্ধধর্ম ।

দুঃশল—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে ; ভীমের হাতে নিহত।

দুঃশলা—গান্ধারীর (দ্রঃ) একমাত্র মেয়ে ; দুর্যোধনের ছোট। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের স্ত্রী। এই জন্য দ্রৌপদীকে (দ্রঃ) হরণ করার পর ধরা পড়লেও যুধিষ্ঠির জয়দ্রথের প্রাণ রক্ষা করেন। জয়দ্রথের মৃত্যুর পর শিশু পুত্র সুরথকে ইনি রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া নিয়ে অর্জুন সিন্ধুদেশে এলে ঘোড়া ধরার জন্য ভীষণ যুদ্ধ হয় ; এরা হেরে যান। দুঃশলা তখন পৌত্রকে নিয়ে অর্জুনের সঙ্গে দেখা করেন; জানান অর্জুন ঘোড়া নিয়ে এসেছে শুনেই সুরথ মারা গেছে ; সুরথের ছেলে পরাজয় স্বীকার করছে। যুদ্ধ বন্ধ হয় (মহা ১৪।৭৭।-)।

অর্জুন তখন সুরথের নাবালক ছেলেকে সিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে দুঃশলাকে সান্ত্বনা দিয়ে ফিরে যান।

দুঃশাসন—ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর দ্বিতীয় পুত্র, দুর্যোধনের ছোট ও দুর্যোধনের অতি প্রিয় পাত্র। পাঞ্চালীর স্বয়ংবরে ছিলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে নিমন্ত্রিতদের খাওয়াবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। প্রথম পাশা খেলাতে দ্রৌপদীকে পণ রেখে হেরে গেলে দুর্যোধনের আদেশে দুঃশাসন একবস্ত্রা, রজস্বলা দ্রৌপদীকে চুলের মুঠি ধরে সভায় টেনে আনেন এবং অশ্লীল ভাষায় বিদ্রূপ করতে থাকেন। অঙ্গরাজ কর্ণের প্ররোচনায় দ্রৌপদীকে বিবস্ত্র করতেও চেষ্টা করেন। কিন্তু বস্ত্র সীমাহীন হয়ে পড়ে : দুঃশাসন ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েন। এই অপমানের জন্য ভীম প্রতিজ্ঞা করেছিলেন দুঃশাসনের বুক চিরে রক্ত খাবেন এবং সেই রক্তে দ্রৌপদীর কেশ রঞ্জিত করে দেবেন। ঘোষ যাত্রায় গন্ধর্বদের হাতে বন্দী হন। অপমানিত দুর্যোধন এই সময় দুঃশাসনকে রাজত্ব দিয়ে দিতে চান কিন্তু দুঃশাসন রাজি হন না। কুরুক্ষেত্রে তীব্র যুদ্ধ করেছিলেন : এবং অভিমন্যু ও সহদেবের কাছে হেরে যান। যুদ্ধের ১৬/১৭ দিনের দিন ভীম গদাঘাতে মাটিতে ফেলে দেন এবং বুকে চেপে বসে জানতে চান কোন হাতে দ্রৌপদীর চুলের মুঠি ধরেছিলেন। দুঃশাসন ডান হাত তুলে দেখালে ভীম এই হাত মুচড়ে ছিঁড়ে নেন এবং ছিন্ন বাহুর আঘাতে দুঃশাসনকে জর্জরিত করে তোলেন এবং শেষ পর্যন্ত বুক চিরে রক্ত খান। মহাভারত ১১। ১৪।১৫ শ্লোকে ভীম অবশ্য বলেছেন রুধিরং ন ব্যতিক্রামৎ দন্তোষ্ঠং মে অম্ব মা শুচঃ। পরে তীক্ষ্ণ অসির আঘাতে এঁকে বধ করেন। দুঃশাসনের প্রাসাদে পরে অর্জুন বাস করতেন। ব্যাসের আহ্বানে মৃত যোদ্ধাদের সঙ্গে ইনিও দেখা করতে এসেছিলেন।

দুঃসহ—(১) ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে : ভীমের হাতে নিহত। (২) অলক্ষ্মীর (দ্রঃ) স্বামী।

দুধগঙ্গা—গাড়োয়ালে। মন্দাকিনীর একটি করদা। অলকানন্দার একটি শাখা।

দুন্দুভি—(১) কশ্যপ দনুর ছেলে। আর এক মতে হেমা ও ময়ের ছেলে দুন্দুভি ও মায়াবী (রা ৭।১১।১৩)। রাবণের শালা। অন্য মতে মায়াবীর ছেলে। রামায়ণে আছে মহিষঃ দুন্দুভিঃ নাম (৪।১১।৭), বিরাট চেহারা, সহস্র হস্তীর বল। বর লাভে গর্বিত এবং সমুদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যায়। হিমালয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করবার পরামর্শ দিয়ে সমুদ্র ফিরিয়ে দেয়। তীরের মত বেগে হিমালয়ে এসে বড় বড় পাথর তুলে মাটিতে আছড়ে

ফেলতে থাকে। হিমবান জানান তিনি যুদ্ধে অকুশল (৪।১১।১৭) ইত্যাদি। দুন্দুভি জানতে চায় কার সঙ্গে তাহলে সে যুদ্ধ করবে। হিমবান বালীর সঙ্গে যুদ্ধ করবার পরামর্শ দেন। মহিষরূপ ধারণ করে (৪।১১।২৫) কিষ্কিন্ধ্যাতে এসে গর্জন করতে থাকে এবং কিষ্কিন্ধ্যার দরজার মাটি খুঁড়তে থাকে। বালী অন্তঃপুর থেকে বার হয়ে এলে দুন্দুভি যুদ্ধ করতে চায় তবে এক রাত্রি মত সময় দেবে বলে; কামভোগেষু তৃপ্ত হয়ে এবং সকলের কাছে বিদায় নিয়ে কাল সকালেও যুদ্ধ করতে পারে। বালী রাগে একটু হেসে ফেলে।

বালীও সুগ্রীব পেছু পেছু তেড়ে আসেন। দুন্দুভি শেষ পর্যন্ত একটি গুহার মধ্যে ঢুকে পড়ে ; বালীও পেছনে আসেন ; সুগ্রীব গুহার মুখে পাহারা থাকেন। এক বছরে ধরে গুহার মধ্যে যুদ্ধ হয় এবং দুন্দুভি মারা যায়। দুন্দুভির দেহ বালী ঋষ্যমূক পাহাড়ের দিকে ছুঁড়ে দিলে মতঙ্গ মুনির আশ্রমে ছিটকে রক্ত এসে পড়ে ; ফলে মুনিশাপ দেন, যে এই রক্ত ফেলেছে কোন দিন সে যদি ঋষ্যমূক পাহাড়ে আসে তাহলে তখনই তার মাথা ফেটে মারা যাবে। দ্রঃ- মায়াবী। (২) প্রাচীন বৃহৎ চর্ম বাদ্য। ভরত নাট্য শাস্ত্রে আছে স্বাতি মুনি দেবতাদের দুন্দুভি দেখে মুরজ বাদ্য নির্মাণ করেন। মঙ্গল/বিজয় উৎসব ইত্যাদিতে বাজান হত।

দুর্গ—স্কন্দপুরাণে দেবী বিন্ধ্যবাসিনী রুরু দৈত্যের পুত্র দুর্গ অসুরকে বধ করেছিলেন। দুর্গ অসুরের বর ছিল পুরুষদের হাতে সে অজেয়। স্বর্গ অধিকার করে ত্রিলোকে অত্যাচার করতে থাকলে মহাদেব ভগবতীকে আদেশ করেন একে বধ করতে। দেবী প্রথমে কালরাত্রিকে দূত হিসাবে পাঠান ইত্যাদি। এরপর যুদ্ধ। দুর্গ প্রথমে হাতী তারপর মহিষ হয়ে যুদ্ধ করতে থাকে এবং বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর হাতে নিহত হয়। দ্রঃ-দুর্গম।

দুর্গম—হিরণ্যাক্ষ বংশে রুরুর পুত্র। জন্ম থেকেই দেবতাদের শত্রু। ভেবে ঠিক করেন বেদ নষ্ট করতে পারলে কোন যজ্ঞ হবে না ; দেবতারা তখন দুর্বল হয়ে পড়বেন। দুর্গম ফলে তপস্যা করে ব্রহ্মার কাছে বর চান এবং বেদ হস্তগত করেন। ফলে ব্রাহ্মণরা মন্ত্র ভুলে যান, যজ্ঞ বন্ধ হয়ে যায় ; দেবতারা শীর্ণকায় হয়ে পর্বত গুহাতে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

অসুর আমরাবতী অধিকার করেন ; যজ্ঞের অভাবে অনাবৃষ্টিতে পৃথিবী ধ্বংস হতে যায়। দেবতাদের স্তুতিতে তখন দেবীর শত নয়নে অশ্রুপাত হতে থাকে ; (দে- ভাগ ৭।২৮।৩৮) নব রাত্র ব্যাপী একটানা বৃষ্টিতে পৃথিবী জলপূর্ণ হয়ে ওঠে। দেবতারা তখন দেবীকে শতাক্ষী নাম (দে-ভাগ ৭।২৮) দেন। অন্য মতে ব্রাহ্মণরা তখন হিমালয়ে গিয়ে দুর্গার শরণ নেন। এঁদের দুঃখের কথা শুনে দুর্গার চোখে জল আসে ফলে পৃথিবী আবার সজল হয়ে ওঠে। দুর্গা তখন ক্ষুধার্ত দেবতাদের/সকলকে শাক ভোজন করতে দিয়ে রক্ষা করেন ফলে দুর্গা শাকম্ভরী নামে পরিচিত হন। দুর্গম এদিকে খবর পেয়ে এসে আক্রমণ করেন ; দুর্গার দেহ থেকে তখন বগলা, মাতঙ্গী, গুহ্যকালী ইত্যাদি অসংখ্য দেবী বার হন। ১১ দিনের যুদ্ধে অসুর নিহত হয়। দুর্গমের তেজ দেবীর দেহে মিলিয়ে যায়। দেবী বেদ ফিরিয়ে দেন। নাম হয় দুর্গা।

দুর্গ-শৈল—এল বুর্জ পর্বত। শাকদ্বীপে। দুর্গ=বুর্জ।

দুর্গা—গুজরাটে সবরমতীর একটি করদা শাখা।

দুর্গা—পরমা প্রকৃতি ঃ- দ্রঃ- দেবী। সৃষ্টির আদি কারণ ; মহাদেবের স্ত্রী। অপর নাম নারায়ণী। ব্রহ্মাদি সকলের দ্বারা পূজিত। দুর্গার বহু মূর্তি/রূপ পুরাণে বর্ণিত হয়েছে। মহিষাসুরের অত্যাচারে স্বর্গচ্যুত দেবতারা ব্রহ্মার শরণ নিলে ব্রহ্মা, শিব ও অন্য সকলকে নিয়ে বিষ্ণুর কাছে আসেন। ব্রহ্মার বরে মহিষাসুর পুরুষের অবধ্য। বিষ্ণু নির্দেশ দেন নিজ স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়ে নিজ নিজ তেজের কাছে প্রার্থনা করতে হবে যে সমবেত তেজ থেকে যেন এক নারীমূর্তির আবির্ভাব হয়। এই শুনে দেবতাদের দেহ থেকে তেজ বার হয়ে সেই তেজ সমবেত হয়ে এক দেবীর সৃষ্টি হয়। দেবতারা নিজেদের অস্ত্র দিয়ে এঁকে সজ্জিত করেন। দ্রঃ- কাত্যায়নী, চণ্ডী। এই দেবী মহিষাসুরকে তিন বার বধ করে ছিলেন ; প্রথম বার অষ্টাদশভুজা উগ্রচণ্ডা (দ্রঃ-) রূপে ; দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার দশভুজা দুর্গা রূপে। স্বপ্নে ভদ্রকালীর মূর্তি দেখে মহিষাসুর এই মূর্তির আরাধনা করেছিলেন। দেবী দেখা দিলে মহিষাসুর জানান মৃত্যুতে তিনি ভীত নন, তিনি চান দেবীর সঙ্গে তিনিও যেন পূজিত হন। দেবী বর দিয়েছিলেন উগ্রচণ্ডা, ভদ্রকালী বা দুর্গা তিন মূর্তিতেই অসুর তাঁর পদলগ্ন থাকবেন এবং দেবতা রাক্ষস ও মানুষের পূজ্য হবেন।

স্কন্দপুরাণে দুর্গ দৈত্যকে নিহত করে দেবী দুর্গা নামে খ্যাত হন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবী বলেছেন দুর্গ অসুরকে বধ করে তিনি দুর্গা নামে পরিচিত হবেন। দেবী ভাগবতে হিরণ্যাক্ষ বংশে জন্ম দুর্গ অসুর বধ কাহিনী বিস্তারিত ভাবে আছে। স্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে রুরু দৈত্যের পুত্র দুর্গ (দ্রঃ) অসুরের কাহিনী রয়েছে। দ্রঃ- দুর্গম।

স্কন্দপুরাণে ইনি দেবী বৈষ্ণবী। পৌরাণিক বহু কাহিনীতে বিষ্ণু ও কৃষ্ণের সঙ্গেও দুর্গা যুক্ত রয়েছেন। মহাভারতে কিছু সংস্করণে যুধিষ্ঠিরের দুর্গা স্তবে নারায়ণ প্রিয়া ও যশোদা-গর্ভ-সম্ভূতা। অর্জুন ও এই স্তব করেছেন। ভাণ্ডারকর সংস্করণে যুধিষ্ঠিরের বা অর্জুনের দ্বারা এই স্তব নাই। মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবী=চণ্ডী=অম্বিকা, দুর্গা ইত্যাদি নাম আছে। কিন্তু তিনি পর্বতবাসিনী, পর্বত কন্যা নন। হরিবংশে অনিরুদ্ধ বন্দী হলে দুর্গা শব্দ (২।১২০।৩৫) ব্যবহৃত হয়েছে। হরিবংশে আর্যা স্তোত্রেও বলা হয়েছে যশোদাগর্ভ-সম্ভূতাম্ নন্দগোপকুলে জাতাম্। মার্কণ্ডেয় পুরাণে ইনি বৈষ্ণবী শক্তি। বৃহৎ সংহিতাতে ইনি একানংশা ; কৃষ্ণ বলরামের মাঝখানে অবস্থিতা।

দেবী পুরাণে মত্তদিক্‌গজের পিঠে বসে মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন। দেবী পুরাণে দুর্গে বিরাজমানা এবং দেবী ভাগবতে নগরপালিকা বলা হয়েছে। স্কন্দপুরাণে কাশী রক্ষার নিমিত্ত মহাদেব নন্দীকে প্রতিদুর্গে দুর্গাপ্রতিমা স্থাপন করতে বলেন। চাণক্য বলেছেন প্রতি দুর্গে দেবতাদের সঙ্গে অপরাজিতাকেও স্থাপন করতে হবে এবং এই অপরাজিতা পণ্ডিতদের মতে দেবী দুর্গা।

স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে (কালিকা ৬০।৩৯) রাত্রিতেই ব্রহ্মণা বোধিতা দেবী ; দেবতারা

তারপর পূজা করেন। আশ্বিনে শুক্লা অষ্টমী দুর্গা অষ্টমী ; নবমীতে রাবণ নিহত (৬০।৩০)। দেবী অদৃশ্য ভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। দ্রঃ- দশেরা।

স্বারোচিষ মন্বন্তরে রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য মূর্তি গড়ে তিন বছর 'দেবীর' পূজা করেছিলেন। ত্রেতা যুগে রাবণ চৈত্রমাসে এঁর পূজা (বাসন্তী পূজা) করতেন। রাবণ বধের জন্য রামচন্দ্র অকালে এঁর শারদীয়া পূজা করেন ; বাল্মীকি রামায়ণে কিন্তু এ ঘটনাটি নাই। দ্রঃ- মহিষাসুর- নিশুম্ভ। অবশ্য রামায়ণের সময় যেন বাসন্তীপূজা সমধিক প্রচলিত ছিল। শারদীয়া পূজা তখনও চালু হয়নি যেন। বাল্মীকি রামায়ণে রাবণ বধ ঠিক শরৎকালে হয় নি। দেবী ভাগবতে ও বৃহৎ-ধর্ম পুরাণে রাম শরৎকালে পূজা করে রাবণ বধ করেন। ফলে কৃত্তিবাস ও শরৎকালে রামকে দিয়ে পূজা করান। বিষ্ণু যামলে আছে শরতে ঘরে ঘরে দুর্গা পূজা। মার্কণ্ডেয় পুরাণে (৯২।১১) দেবী বলেছেন শরৎকালে পূজা করতে হবে।

দুর্গা বা চণ্ডীকে বহু স্থানে গোধাসনা দেখা যায়। প্রাচীন বিদিসার অদূরে উদয় গিরি গুহাতে ১৮ হাত দুর্গার মূর্তি আছে ; এটি খৃ ৫-শতকে খোদিত ; দেবী ওপরের দুহাত দিয়ে একটি গোধা ধারণ করে আছেন। দুর্গার এটি প্রাচীনতম মূর্তি। কলিকাতা যাদুঘরে খৃ ১২-শতকে নির্মিত গোধাসনা চণ্ডীমূর্তি আছে। গোধাবাহনা চণ্ডীর বহুমূর্তি পাওয়া গেছে। জৈন মূর্তি শিল্পে গোধাবাহনা গৌরীর উল্লেখ আছে। কালিকা পুরাণে চণ্ডিকার কাছে গোধিকা বলি দেওয়া হবে বলা হয়েছে। বৌদ্ধশাস্ত্রে মহাবস্তুতে গোধাজাতক রয়েছে। দ্রঃ- দেবী।

তন্ত্রসারে বর্ণিত দুর্গা ও মহিষ মর্দিনী—আধুনিক দুর্গা প্রতিমা] থেকে আলাদা। মহিষমর্দিনী প্রতিমা তামিলনাড়ুতে বর্তমানে প্রচলিত। বাঙলাতে বর্তমানে পূজিত প্রতিমা কাত্যায়নী মূর্তি। গায়ত্রী হিসাবে তন্ত্রসারে রয়েছেঃ—

দুর্গা—	মহাদেব্যৈ বিদ্মহে	দুর্গায়ৈ	ধীমহি	তন্নোঃ	দেবি প্রচোদয়াৎ।	
জয়দুর্গা—	নারায়ণ্যৈ ,,	,,	,,	,,	গৌরি	,, ।
মহিষমর্দিনী—	মহিষমর্দিন্যৈ ,,	,,	,,	,,	ঘোরে	, ।
কাত্যায়নী—	কাত্যায়ন্যৈ ,,	কন্যাকুমারীম্ ,,		,,	দুর্গে	,, ।

বাঙলাতে কালীপূজা থেকে ব্যাপকতর ও প্রাচীনতর। অথচ ব্রহ্মযামলে আছে কালিকা বঙ্গদেশে চ। খৃ ১৪ শতক থেকে দুর্গা পূজার বিধান বাঙলাতে কিছু কিছু গ্রন্থে পাওয়া যায়; তবে যেন খৃ ১২-১৩ শতক থেকে বাঙলাতে পূজা চালু হয়েছিল। বিহারের কিছু কিছু অংশে এবং বাঙলা ও আসামে দুর্গা পূজা হয়। ভারতে অন্যত্র নবরাত্র ইত্যাদি ব্রত। এই পূজা মূলত উৎসব ভিত্তিক। রাজারা ও জমিদাররা নিজেদের আভিজাত্যের ও ঐশ্বর্যের প্রমাণ হিসাবে দুর্গা পূজা করতেন।

এটি শক্তি পূজা। তবে বামাচারী পূজা নয়। কিন্তু তবু তন্ত্রের ছাপ বহুস্থানে রয়ে গেছে। যেমন প্রতিমা বিসর্জনের সময় বলা হয়েছে ভগলিঙ্গাভিধানৈশ্চ ভগলিঙ্গ-প্রগীতকৈঃ ভগলিঙ্গাদিশব্দৈশ্চ ক্রীড়য়েয়ুঃ অলং জনাঃ (কালিকা ৬১।২১)।

বৈদিক সাহিত্যে দুর্গার উল্লেখ আছে। তন্ত্র ও পুরাণে বিশেষ আলোচনা ও পূজা

বিধি রয়েছে। দুর্গা, মহিষমর্দিনী, শূলিনী, জয়দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, গন্ধেশ্বরী, বনদুর্গা ইত্যাদি বহু নামে এঁর পূজা হয়। তন্ত্রে ইনি চতুর্ভুজা, সিংহস্থা, মরকতবর্ণা। পুরাণ অনুসারে বাঙলায় অতসী পুষ্প বর্ণা ইত্যাদি। আশ্বিনে শুক্লপক্ষে শারদীয়া এবং চৈত্রে শুক্লপক্ষে বাসন্তী পূজা এই দুর্গার পূজা। বর্তমানে সমবেত প্রচেষ্টায় বাঙ্গলায় পথে ঘাটে শরতে পূজনীয়া। দ্রঃ- কাত্যায়নী. মুদ্রা ও মূর্তি।

দুর্জয়—(১) দুষ্পরাজয়। ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। ঘোষ যাত্রার সময় বন্দী হন। কুরুক্ষেত্রে ভীমের হাতে মৃত্যু। (২) এক জন দানব ; দনুর ছেলে। (৩) সুপ্রতীকের ছেলে। গৌরমুখ মুনির কাছে চিন্তামণি মণি আছে জানতে পেরে এই মণিটি সংগ্রহ করার জন্য যুদ্ধ করেন এবং মারা যান। যেখানে মারা যান সেই স্থানটি নৈমিষারণ্য নামে পরিচিত হয়।

দুর্জয়লিঙ্গ—>দার্জিলিঙ>দোরেজ। এখানে দুর্জয় লিঙ্গ মহাদেবের মন্দির রয়েছে। মতান্তরে অবজারভেটরি পাহাড়ে দোরেজ গুহা থেকে এই নাম।

দুর্দম—গন্ধর্ব বিশ্বাবসুর ছেলে। উলঙ্গ স্ত্রীদের নিয়ে জলক্রীড়া করছিলেন। বশিষ্ঠ ফলে শাপ দেন রাক্ষসে পরিণত হতে হবে। কিন্তু পরে বলেন ১৭ বছর এই শাপ ভোগ করতে হবে। রাক্ষস হয়ে ইনি গালবকে এক দিন খেয়ে ফেলতে যান ; বিষ্ণু তখন এঁকে সুদর্শন চক্রে নিহত করে শাপ মুক্ত করেন।

দুর্ধর—দুরাধার। ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। ভীমের হাতে নিহত।

দুর্ধর্ষণ—দুর্মদ। ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে ; ভীমের হাতে মৃত্যু।

দুর্বাসা—অত্রির (দ্রঃ) ঔরসে স্ত্রী অনসূয়ার গর্ভে জন্ম। দে-ভাগবতে (৯।৪১।২৯) শিবের অংশে জন্ম কিন্তু পরম বৈষ্ণব। অত্যন্ত তেজস্বী ও অতি কোপনশীল পৌরাণিক ঋষি। জন্ম সম্বন্ধে নানা কাহিনী ঃ- একবার ব্রহ্মা ও শিবের মধ্যে যুদ্ধ হয়। শিবকে রাগে ফেটে পড়তে দেখে দেবতারা ভয়ে পালান। শিব ব্রহ্মার একটি মাথা ছিঁড়ে নেন; কিন্তু তবু রাগ মেটে না। পার্বতী ভয় পেয়ে যান এবং বলেন 'দুর্বাসস্ ভবতি মে'। কোন মতে স্বামীকে শান্ত করেন। শিব তখন বাকি ক্রোধ অনসূয়াকে আরোপ করেন। মহাদেবের এই ক্রোধ অনসূয়ার গর্ভে দুর্বাসা হয়ে জন্মায়। আর এক কাহিনী দ্রষ্টব্যঃ- অনসূয়া। বামন পুরাণে আছে ব্রহ্মার কাছে হেরে গিয়ে মহাদেব নরনারায়ণের আশ্রমে আশ্রয় নেন এবং সমস্ত কাহিনী জানান। এঁরা শিবকে বলেন এঁদের হাতে শূল বিদ্ধ করতে। শূল বিদ্ধ হাত থেকে তিনটি ধারায় রক্ত পড়তে থাকে ; একটি ধারা দুর্বাসাতে পরিণত হয়। ত্রিপুরকে ধ্বংস করার জন্য মহাদেব যে বাণ সন্ধান করেছিলেন সেই বাণ ত্রিপুর ধ্বংস করে শিবের কোলে একটি শিশুর রূপ ধরে ফিরে আসে ; এই শিশু দুর্বাসা। ঔর্ব মুনির মেয়ে কন্দলীর স্বামী। কথা ছিল দুর্বাসা এঁর একশ অপরাধ ক্ষমা করবেন একশ এক অপরাধ করার পর স্ত্রীকে শাপ দিয়ে ছাই করে ফেলেন। মেয়ের শোকে ঔর্ব শাপ দেন দুর্বাসার দর্প চূর্ণ হবে। এই জন্য মহারাজ অম্বরীষের (দ্রঃ) কাছে হতদর্প হন। দ্রঃ- ইল্বল। কুন্তী ভোজের প্রাসাদে (মহা ১।১১৪।৩৪) কুন্তীর সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে কুন্তীকে (দ্রঃ) আহ্বান মন্ত্র দিয়েছিলেন। এই মন্ত্রে দেবতাদের ডাকা যায়। দুর্বাসার দেওয়া মালা মাটিতে ফেলে দেবার

জন্য ইন্দ্রকে (দ্রঃ) ইনি শাপ দেন; এবং শেষ পর্যন্ত সমুদ্র মন্থন করতে হয়। দ্রঃ- দক্ষ শকুন্তলাকে (দ্রঃ) শাপ দিয়েছিলেন দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে চিনতে পারবেন না। পাণ্ডবদে বনবাস কালে দুর্যোধনের (দ্রঃ) অনুরোধে দশ হাজার শিষ্য নিয়ে অসময়ে পাণ্ডবদে অতিথি হন। কৃষ্ণের (দ্রঃ) মায়াতে পাণ্ডবরা/দ্রৌপদী (দ্রঃ) নিষ্কৃতি পান। লক্ষ্মণের (দ্রঃ মৃত্যুর কারণ হন। হংস ও ডিম্বকের (দ্রঃ) কাছে এক বার অপদস্থ হয়েছিলেন।

দুর্বাসা একবার সর্বত্র ঘুরে বেরিয়ে বলতে থাকেন (মহা ১৩।১৪৪।-) তিনি অত্যং রাগী ; তাঁকে কে বাসস্থান দিতে পারবে, অতি সাবধান হতে হবে ইত্যাদি। কেউ সাহস করে না। কৃষ্ণ কিন্তু আশ্রয় দেন। অতিথি হয়ে দুর্বাসা যা খুসি করতে থাকেন এমন কি জিনিসপত্র পোড়াতে ও নষ্ট করতে থাকেন। বিপর্যস্ত করে তোলেন। হঠা একদিন পায়স খেতে চান। বলা মাত্র কৃষ্ণ উত্তপ্ত পায়স এনে দেন। দুর্বাসা নিজে পায়স খান এবং বাকি অংশ কৃষ্ণকে নিজের গায়ে মাখতে বলেন। কৃষ্ণ নির্বিকাে গায়ে ও মাথায় সেই উচ্ছিষ্ট পায়স মাখেন। পায়ের তলায় মাখেন নি। দুর্বাসা তখ রুক্মিণীর গায়ে পায়স মাখিয়ে দিয়ে তাঁকে রথে জুড়ে নিয়ে সেই রথে চড়ে রুক্মিণীবে চাবুক মারতে থাকেন। রুক্মিণী সাধ্য মত রথ টেনে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। পথে রুক্মিণ বার বার পড়ে যেতে থাকেন, দুর্বাসা তবু কশাঘাত করতে থাকেন। শেষ অবধি দুর্বাসা রাগে রথ থেকে নেমে দক্ষিণ দিকে চলে যাচ্ছিলেন। কৃষ্ণ দুর্বাসাকে খোসাম করে সন্তুষ্ট করেন। এই ঘটনাতে কৃষ্ণ ক্রোধ জয় করতে পেরেছিলেন বলে কৃষ্ণবে ক্রোধজিৎ বলে প্রশংসা করেন এবং বর দেনঃ—অন্ন যেমন সকলের প্রিয় কৃষ্ণ ও তেমনি সকলের প্রিয় হবেনঃ যতদিন খুসি বেঁচে থাকতে পারবেন। পায়ের পাতাতে পায়স না মেখে দুর্বাসার অপ্রিয় কাজ করা হয়েছে। সারা গায়ে পায়স মাখার জন গায়ে কোনদিন জরা আসবে না এবং সারা দেহ দুর্ভেদ্য হয়ে যাবে। রুক্মিণীকে বর দেন জরা ব্যাধি ও বিবর্ণতা স্পর্শ করবে না। প্রধান মহিষী হবে। দুর্বাসা যে সব জিনিস ভেঙে বা পুড়িয়ে নষ্ট করেছিলেন সব নতুন হয়ে যায়। কৃষ্ণ তাঁর অ-দুর্ভেদ্য পায়ের তলাতেই বাণ-বিদ্ধ হয়ে মারা যান (মহা ১৬।৫।১৭)। দুর্বাসার শাপে সাম্ব মুসল প্রসব করেন। শ্বেতকির (দ্রঃ) যজ্ঞ করে দেন ; ফলে অগ্নির অজীর্ণ দেখা দেয়। দ্রঃ- মুদ্গল, ভদ্রগণ।

দুর্বাসাআশ্রম—(১) কহল গাঁও (দ্রঃ)। (২) রাজাউলি থেকে ৭-মাইল উ-পূর্বে পাহাড়ের মাথায়; চলতি নাম দুবাউর (দুর্বাসাপুর) ; গয়া জেলার নওদা সাবডিভিসানে।

দুর্বিগাহ—দুর্বিষহ। ধৃতরাষ্ট্রের একটি ছেলে ; ভীমের হাতে নিহত।

দুর্বিমোচন—ধৃতরাষ্ট্রের একটি ছেলে ; ভীমের হাতে নিহত।

দুর্বিরোচন—ধৃতরাষ্ট্রের একটি ছেলে ; ভীমের হাতে নিহত।

দুর্মদ—গন্ধর্বরাজ হংসের ছেলে। দুর্মদ ও উন্মদা দুজনে মিলে পুরূরবা ও উর্বশীকে প্রতারিত করেন। উর্বশী ফলে শাপ দেন দুর্মদ রাক্ষস হয়ে জন্মাবেন। এর ফলে উন্মদা (দ্রঃ) বিদেহ রাজার মেয়ে হরিণী হয়ে জন্মান এবং দুর্মদ দীর্ঘজঙ্ঘ রাক্ষসের ছেলে

পিঙ্গলাক্ষ হয়ে জন্মান। হরিণীকে এক দিন পিঙ্গলাক্ষ অপহরণ করেন। রাজপুত্র বসুমনস্ এই হরিণীর কান্না শুনে রাক্ষসকে হত্যা করে হরিণীকে বিদেহ রাজার কাছে পাঠিয়ে দেন। সকলে স্থির করেন বসুমনসের সঙ্গে হরিণীর বিয়ে হবে। কিন্তু বিয়ের দিন হেহয় রাজ ভদ্রশ্রেণ্য হরিণীকে জোর করে নিয়ে পালিয়ে যান এবং বিয়ে করেন; ছেলে হয় দুর্মদ। দুর্মদ বড় হতে থাকে এবং গর্গের উপদেশে পিতৃব্য কন্যা চিত্রাঙ্গীকে বিয়ে করেন। এর কিছু পরে কাশীরাজ দিবোদাস ও ভদ্রশ্রেণ্যের যুদ্ধ হয় এবং উর্বশীর শাপ মত এরা নিহত হয়। হরিণী আগুনে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে শাপ মুক্ত হন (ব্রহ্মাণ্ড-পু)।

দুর্মর্ষণ—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। ভীমের হাতে নিহত। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর এর প্রাসাদে নকুল বাস করতেন।

দুর্মুখ—(১) ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। ঘোষ যাত্রায় দ্বৈতবনে এসে গন্ধর্বদের হাতে বন্দী হন। কুরুক্ষেত্রে ভীমের হাতে মারা যান। এর প্রাসাদে পরে সহদেব বাস করতেন। (২) রামের গুপ্তচর। এ'র সাহায্যে রাম প্রজাদের মতামত সংগ্রহ করতেন। সীতার বিরুদ্ধে সমালোচনা এ'র কাছেই অবগত হন। (৩) মহিষাসুরের এক অনুচর। (৪) রাবণের এক অনুচর; সুন্দরী ও মাল্যবানের ছেলে। (৫) একটি সাপ; বলরামের আত্মাকে গ্রহণ করতে এসেছিল।

দুর্যোধন—(১) ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর (দ্রঃ) প্রথম ছেলে। কলির অংশে জন্ম। ভাইগুলি পৌলস্ত্যাঃ (মহা ১।৬১।২৮)।

স্বামীর অজ্ঞাতে গান্ধারী (দ্রঃ) গর্ভপাত করেন। দুর্যোধন জন্মালে ভীষ্ম, বিদুর ইত্যাদি সকলকে ডেকে ধৃতরাষ্ট্র জানতে চান এই ছেলে রাজা হবে কি না। ধৃতরাষ্ট্রের মনের পরিচয় এই জিজ্ঞাসা। সঙ্গে সঙ্গে ক্রব্যাদাঃ শিবাঃ ইত্যাদি চিৎকার করে ওঠে। জন্মের সময় ও গৃধ্র, গোমায়ু, বায়স চিৎকার করে উঠেছিল।

বিদুর ও ব্রাহ্মণরা গণনা করে ধৃতরাষ্ট্রকে জানান এই ছেলে দেশের ও প্রজাদের সমূহ ক্ষতি করবে; এর জন্য কুরুকুল ধ্বংস হবে; এবং ছেলেকে পরিত্যাগ করারও উপদেশ দিয়েছিলেন। দুর্যোধনের স্ত্রী ভানুমতী এবং একটি ছেলে লক্ষ্মণ ও একটি মেয়ে লক্ষ্মণা। দ্রঃ- বলরাম। মহাভারতে (১২।৪) চিত্রাঙ্গদ কন্যাকে হরণ করে নিয়ে আসার কথা আছে।

পাণ্ডুর মৃত্যুর পর পাণ্ডবরাও ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেদের সঙ্গে একত্র প্রতিপালিত হতে থাকেন। ফলে বালকদের মধ্যে অনেক সময় অকারণেও ঝগড়া হত। ভীম ও দুর্যোধন একই দিনে জন্মেছিলেন। ভীম অমিত বলশালী ছিলেন ফলে অনেক সময় কৌরব বালকরা ভীমের গুণ্ডামিতে উৎপীড়িতও হত। দুর্যোধনের ঈর্ষাও ছিল। ফলে শৈশব থেকেই ভীমের সঙ্গে দুর্যোধনের একটা শত্রুতা দেখা দেয়। বলরামের কাছে দুর্যোধন গদাযুদ্ধ শেখেন। ভীমকে অতি বলশালী হয়ে উঠতে দেখে হত্যা করবার চিন্তা করতে থাকেন। পরে যুধিষ্ঠির ও অর্জুনকে বেঁধে ফেলে বসুন্ধরার রাজা হতে পারবেন। ভ্রাতৃহত্যার পরিকল্পনা স্থির করেন। প্রমাণকোটীতে (মহা ১।১১৯।২০)

গঙ্গাতে জলক্রীড়ার জন্য পাণ্ডবদের এক দিন সঙ্গে করে নিয়ে যান। খাবার স
কালকূট বিষ মিশিয়ে ভীমকে নিজে খাওয়াতে থাকেন ; এরপর জলক্রীড়া। সকলে
থেকে অধিক হুল্লোড় করার ফলে ভীম অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েন এবং দিবাবসা
জল থেকে উঠে মৃতকল্পবৎ ঘুমিয়ে পড়েন। দুর্যোধন বিষ দিয়েছিলেন বটে ; ত
কখন দিয়েছিলেন মত দ্বৈধ আছে। এই সুযোগে রাত্রি বেলা ভীমকে দড়ি দিয়ে বেঁ
জলে ফেলে দেন। পর দিন সকালে ভীমকে পাওয়া যায় না ; অনেকে বলে
ভীম (দ্রঃ) তাহলে আগেই হস্তিনাপুরে ফিরে গেছেন। আট দিন পরে ভীম পাতা
থেকে ফিরে আসেন। দ্রোণের কাছে অস্ত্র শিক্ষার পর অস্ত্র বিদ্যা প্রদর্শনের ব্যব
হয়। এই প্রদর্শনীতে দুর্যোধন ও ভীম নৃশংস ভাবে পরস্পরকে গদা যুদ্ধে আক্রম
করলে দ্রোণের আদেশে অশ্বত্থামা দুজনকে থামিয়ে দেন। এর পর কর্ণ অর্জুনে
প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে যোগ দিতে আসেন অন্য মতে অস্ত্রশিক্ষা প্রদর্শন করতে এসেছিলে
মাত্র। কর্ণের বংশ পরিচয় নিয়ে কৃপাচার্য ও পাণ্ডবপক্ষীয়েরা বিরোধিতা করলে সে
মুহূর্তে কর্ণকে দুর্যোধন অঙ্গরাজ্যের রাজা বলে ঘোষণা করেন। এর পর দ্রোণকে দে
গুরু দক্ষিণা হিসাবে দ্রুপদ রাজাকে ধরে আনতে গিয়ে দুর্যোধনরা অত্যন্ত বিপদে
পড়েছিলেন ; পাণ্ডবদের চেষ্টায় মুক্তি পান ; এবং অর্জুন দ্রুপদকে ধরে আনেন।
ফলে দুর্যোধন নিজেকে আরো বেশি অপমানিত মনে করতে থাকেন।

রাজ্য কারা পাবে এই প্রশ্ন বড় হয়ে উঠতে থাকে। পৌরজনেরাও যুধিষ্ঠিরকে চায়
দুর্যোধন পিতার সঙ্গে পরামর্শ করেন। ধৃতরাষ্ট্র প্রথমে মত দিতে চান না। দুর্যোধন
অর্থ দিয়ে প্রজাদের বশ করে যুধিষ্ঠিরদের বারণাবতে পাঠাবেন ঠিক করেন। ধৃতরাষ্ট্র
সম্মত হন ; দুর্যোধন বলেন দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা তাঁকে সমর্থন করবেন। এরপর বহু অর্থ
ছড়াতে থাকেন এবং লোকমুখে বারণাবতের প্রশংসা ধ্বনিত হতে থাকে। পাণ্ডবদেরও
ইচ্ছা হয় বারণাবত দেখে আসবেন। সুযোগ পেয়ে (মহা ১।১৩১।—) বারণাবতে
যাবার জন্য ধৃতরাষ্ট্র প্রায় নির্দেশ দিয়ে বসেন ; যুধিষ্ঠিরের তখন খেয়াল হয় ; অসহায়
ভাবে নিজেরা প্রস্তুত হতে থাকেন। দুর্যোধনের সঙ্গে শকুনি ও কর্ণ সব সময় পরামর্শ
দাতা হিসাবে ছিলেন।

দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রকে সামনে রেখে মন্ত্রী পুরোচনকে দিয়ে পাণ্ডবদের বারণাবতে
জতুগৃহে পাঠিয়ে দেন। এই জতুগৃহ পুরোচনকে দিয়ে দুর্যোধন আগে থেকেই তৈরি
করিয়ে রেখেছিল।

এক বছর পাণ্ডবরা এখানে বাস করার পর এই প্রাসাদে আগুন দেওয়া হয়।
পাণ্ডবরা গোপনে পালিয়ে গেলেও খবর ছড়ায় এঁরা পুড়ে মারা গেছেন ; দুর্যোধন
অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে পড়েন। স্বয়ংবর সভাতে অর্জুন দ্রৌপদীকে লাভ করলে
দুর্যোধনরা লজ্জায় সেখান থেকে ফিরে আসেন। পাণ্ডবদের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে,
দুর্যোধন ঈর্ষায় ফেটে পড়তে থাকেন। দুর্যোধন এই সময় মেয়েছেলে পাঠিয়ে ভাইদের
মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে সর্বনাশ করবারও মতলব করেছিলেন। ভীষ্ম দ্রোণ ইত্যাদির
পরামর্শে ধৃতরাষ্ট্র কিছুটা রাজ্য দিয়ে পাণ্ডবদের ফিরিয়ে আনেন। পাণ্ডবরা ইন্দ্রপ্রস্থে
বাস করতে থাকেন এবং এখানে রাজসূয় যজ্ঞ করেন। ময় দানব নির্মিত ইন্দ্রপ্রস্থে

এই যজ্ঞে দুর্যোধনও যোগ দেন। এই সময় দুর্যোধন বলি-উপহার গ্রহণের ভার নিয়েছিলেন। যজ্ঞের শেষে সকলে চলে গেলেও দুর্যোধন শকুনি ইত্যাদি থেকে যান এবং ইন্দ্রপ্রস্থ সভা ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকেন। এই সময়ে প্রতি পদে স্তম্ভিত এবং নিজেদের আচরণে সকলের উপহাসাস্পদ হয়ে উঠেছিলেন। জলাশয় বুঝতে না পেরে পড়ে গেলে দুর্যোধনকে জলে নিপতিতং দৃষ্ট্বা কিংকরাঃ জহসু ভৃশম্ (২।৪৩।৬) ; ভীমেরা চার ভাই ও হেসেছিলেন (২।৪৩।৭)।

পাণ্ডবদের সমৃদ্ধিতে দুর্যোধন পীড়িত হয়ে পড়েন, বাঁচতে চান না (মহা ২।৪৩।২৮) বলেন ইত্যাদি। শকুনি তখন পাশা খেলবার প্রস্তাব করেন ও আশ্বাস দেন। ডাকলে যুধিষ্ঠির পাশা খেলতে আসতে বাধ্য হবেন এবং শকুনি নিশ্চিত হারাতে পারবেন (মহা ২।৪৪।২৯)। শকুনি ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি নিতে বলেন, দুর্যোধন শকুনিকে অনুমতি সংগ্রহের জন্য যেতে বলেন এবং শেষ পর্যন্ত দুজনে গিয়ে খেলার প্রস্তাব করেন। ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের মতামত জানতে চান ; দুর্যোধন বাধা দেন এবং পিতাকে বাধ্য করবার জন্য আত্মহত্যা করবেন বলে জানান। অপত্যস্নেহে ধৃতরাষ্ট্র অনুমতি দিয়ে তারপরে বিদুরকে জানান। বিদুর মত দেন না। ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের কথা শুনতে চান না ; বলেন পাণ্ডবদের ডেকে আনতে ; কিন্তু বিদুরের কথায় তবু চিন্তিত হয়ে পড়েন : এবং দুর্যোধনকে আবার বোঝাতে চেষ্টা করেন। এরপরে বিদুর (৫।৫১।২০) পাণ্ডবদের ডাকতে যান।

খেলা আরম্ভ হলে কপটতার আশ্রয়ে দুর্যোধন প্রতিবার খেলাতে জিততে থাকেন ; শেষ পর্যন্ত বিদুর যুধিষ্ঠিরকে খেলা বন্ধ করতে বলেন। যুধিষ্ঠির এ উপদেশ শোনেন না : সমস্ত রাজ্য এমন কি শেষ পর্যন্ত দ্রৌপদীকেও দুর্যোধন জিতে নেন। দুর্যোধন তখন দূত পাঠান দ্রৌপদীকে নিয়ে আসবার জন্য ; দ্রৌপদী দূতকে ফেরত দেন। দুর্যোধন তখন দুঃশাসনকে পাঠান। দুঃশাসন চুলের মুটি ধরে টানতে টানতে এঁকে সভাতে নিয়ে আসেন। দুর্যোধন দ্রৌপদীকে নিজের নগ্ন উরুতে এসে বসবার জন্যও ডাকেন। এই অপমানের জন্য ভীম প্রতিজ্ঞা করেছিলেন দুর্যোধনের উরু ভেঙ্গে প্রতিশোধ নেবেন। শেষ পর্যন্ত ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের সব কিছু ফিরিয়ে দিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের এই উদারতা দুর্যোধন কিছুতেই সহ্য করতে পারেন না। শকুনির পরামর্শে আবার পাশা খেলায় ডেকে পাঠান। ঠিক হয় হারলে বার বছর বনবাস এবং পরে এক বছর অজ্ঞাত বাসে থাকতে হবে ; এবং ধরা পড়লে আবার বনবাস এবং আবার অজ্ঞাত বাসে যেতে হবে। দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রকে বোঝান প্রথম বার খেলার পর দ্রৌপদীকে যে ভাবে অপমানিত হতে হয়েছে তার একটা প্রতিশোধ নিতে পাণ্ডবরা চেষ্টা করবেই। এই জন্যেই পাণ্ডবদের দূরে সরিয়ে দেওয়াই ভাল। পাণ্ডবরা খেলায় হেরে যান এবং দ্রৌপদীকে সঙ্গে নিয়ে বনে চলে যান।

মহাদেব একবার দুর্যোধনকে নগ্ন হয়ে তাঁর সামনে আসতে বলেছিলেন। কিন্তু ইনি কৌপীন মত পরে এসেছিলেন এবং মহাদেবের দৃষ্টিপাতে কৌপীন ঢাকা অংশ বাদে তাঁর সমস্ত দেহ কঠিন ও শক্তিশালী হয়ে গিয়েছিল ; এই কারণে ভীম উরু-ভাঙ্গতে সমর্থ হয়েছিলেন।

পাণ্ডবরা বনে গেলে দুর্যোধনেরা দ্রোণকে দ্বীপ হিসাবে আশ্রয় করেন। কিন্তু দ্রোণ স্পষ্ট বলে দিয়েছিলেন তিনি সব কিছু করবেন বটে ; তবুও পরাজয় নিশ্চিত (মহা ২।৭১।৪১)। পাণ্ডবরা বনে পৌঁছলে বিদুর (দ্রঃ) ও পাণ্ডবদের কাছে আসেন। বিদুর তারপর ফিরে এলে দুর্যোধনেরা চিন্তিত হয়ে পড়েন ; ধৃতরাষ্ট্র হয়তো পাণ্ডবদের ডেকে পাঠাবেন ইত্যাদি। কর্ণ মতলব দেন পাণ্ডবদের শেষ করে ফেলা দরকার এবং এই মতলব অনুসারে রথে করে এরা বার হয়ে পড়েন ; কিন্তু ব্যাস এসে নিবারিত করেন ; এরপর মৈত্রেয় ঃ—

পাণ্ডবরা কাম্যক বনে এলে মৈত্রেয় এ'দের বিপদে মর্মাহত হয়ে ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। বিদুর মৈত্রেয়ের উপদেশ পালন করতে ধৃতরাষ্ট্রকে পরামর্শ দেন ; দুর্যোধন কিছুতেই সম্মত হন না ; সামনে দাঁড়িয়ে থেকে উরু চাপড়াতে থাকেন। মৈত্রেয় তখন অভিশাপ দেন এই দুর্বুদ্ধিতার জন্য যুদ্ধ বাঁধবেই এবং ভীম ঐ উরু চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেবেন। পাণ্ডবরা যখন দ্বৈত বনে বাস করছিলেন দুর্যোধন তখন নিজের পারিষদ নিয়ে ঘোষ যাত্রায় (দ্রঃ) ও মৃগয়ার অছিলায় আসেন। উদ্দেশ্য ছিল পাণ্ডবদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখা এবং উপহাস করা। কিন্তু বনের মধ্যে গন্ধর্ব রাজ চিত্রসেনের হাতে নিগৃহীত হন ও সপরিবারে বন্দী হন। পাণ্ডবরা গন্ধর্বদের হাত থেকে মুক্ত করে দিয়ে হস্তিনাপুরে ফিরে যেতে দেন। মুক্তি পেয়ে আত্মগ্লানিতে দুর্যোধন প্রায়োপবেশনে আত্মহত্যা করবেন ঠিক করেন এবং দুঃশাসনকে রাজা করে দিতে চান। কর্ণ বোঝাতে চেষ্টা করেন প্রজা হিসাবে পাণ্ডবরা রাজার বিপদে রাজাকে রক্ষা করেছে ইত্যাদি। এ দিকে পাতালে দানবরা চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং ব্রাহ্মণদের দিয়ে (মহা ৩।২৩৯।২২) যজ্ঞ করে কৃত্যার জন্ম দিয়ে কৃত্যাকে দিয়ে রাত্রিতে দুর্যোধনকে পাতালে নিয়ে আসেন। দানবরা বোঝায়। তপস্যা করে মহাদেবের কাছে থেকে দুর্যোধনকে তারা লাভ করেছেন, মহাদেব দুর্যোধনের দেহের ওপর অংশ বজ্রসংচয়ৈঃ তৈরি করে দিয়েছেন ; ওপর অংশ অভেদ্য। নীচের অংশ দেবীর দ্বারা নির্মিত পুষ্পময় (মহা ৩।২৪০।৮)। ভগদত্ত ইত্যাদি দুর্যোধনকে সাহায্য করবার জন্যই জন্মেছেন, কর্ণের মধ্যে তারকাসুরের একটা অংশ রয়েছে ইত্যাদি। অর্থাৎ দানবরা তাঁকে সাহায্য করবেনই। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ইত্যাদিকে দৈত্যেরা মোহান্ধ করে রাখবে ফলে এ'রা পাণ্ডবদের প্রকৃতই আক্রমণ করবেন। সংশপ্তকরা রাক্ষসাবিষ্ট-চেতসঃ (মহা ৩।২৪০।৩০): পাণ্ডবরা নিশ্চয়ই হারবে। দুর্যোধন আশান্বিত হয়ে ওঠেন এবং কৃত্যা আবার দুর্যোধনকে ওপরে পৌঁছে দিয়ে যায়। দুর্যোধনের মনে হয় যেন তিনি স্বপ্ন দেখলেন। এই ভাবে সাহস আসে ; পরদিন কর্ণ ইত্যাদি আবার বোঝান এবং দুর্যোধন তখন প্রায়োপবেশন ভঙ্গ করেন।

এরপর দুর্যোধন রাজসূয় যজ্ঞ করবার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু ব্রাহ্মণরা বিধান দেন তাঁর রাজসূয় যজ্ঞের অধিকার নাই, বিষ্ণু যজ্ঞ করতে পারেন (মহা ৩।২৪১।১২)। এই যজ্ঞে দুর্যোধন পাণ্ডবদের যোগ দিতে ডাকেন, কিন্তু পাণ্ডবরা আসেন না। এর পর শিষ্যদের নিয়ে দুর্বাসা এক দিন আসেন, দুর্যোধন সেবাতে এ'দের পরিতুষ্ট করে বর

চান দুর্বাসা (দ্রঃ) যেন পাণ্ডবদের খাওয়া হয়ে গেলে সশিষ্য পাণ্ডবদের কুটিরে গিয়ে অতিথি হন। এরপর দ্রৌপদী (দ্রঃ) হরণ হয়েছিল।

পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের সময় দুর্যোধন চার দিকে চর পাঠান কিন্তু কোন লাভ হয় না। কীচক মারা গেলে ত্রিগর্ত-রাজ সুশর্মা দুর্যোধনকে পরামর্শ দেন বিরাট-রাজকে আক্রমণ করতে, প্রথমে ত্রিগর্ত রাজ বিরাটের গরুগুলি চুরি করেন।

কৌরববাহিনীর নেতা হিসাবে পরদিন দুর্যোধন (দ্রঃ-উত্তর) মৎস্যরাজ্য আক্রমণ করেন। পাণ্ডবদের এই দিন অজ্ঞাতবাসও শেষ হয়। অর্জুনের হাতে দুর্যোধনরা সম্পূর্ণ পরাজিত হন। ব্যক্তিগত যুদ্ধেও দুর্যোধন এই সময় সম্পূর্ণ হেরে ছিলেন। পাণ্ডবরা এর পর দুর্যোধনের কাছে নিজেদের রাজত্ব এবং কম পক্ষে পাঁচটি মাত্র গ্রাম ফিরে চান। কিন্তু দুর্যোধন জানিয়ে দেন বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র ভূমিও তিনি দেবেন না। যুদ্ধের প্রস্তুতি চলতে থাকে। দুর্যোধন কৃষ্ণকে দলে নেবার জন্য দ্বারকাতে আসেন। দুর্যোধন আসছেন শুনে কৃষ্ণ ঘুমের ভাণ করে শুয়ে থাকেন, দুর্যোধন কৃষ্ণের মাথার দিকে সিংহাসনে বসে অপেক্ষা করতে থাকেন। এর পর অর্জুন আসেন ও কৃষ্ণের পায়ের দিকে বসে থাকেন। কৃষ্ণ কপট নিদ্রা থেকে উঠে আগে পায়ের দিকে অর্জুনকে দেখেন এবং দুর্যোধনকে বোঝান অর্জুন পরে এলেও তাঁর সঙ্গে অর্জুনেরই আগে দেখা ও আগে কথাবার্তা হয়েছে। তার পর দশ লক্ষ নারায়ণী সেনা (এক অর্বুদ গোপ) ও কৃষ্ণের মধ্যে যে কোন একটিকে অর্জুন কনিষ্ঠ বলে অর্জুনকে কৃষ্ণ আগে বেছে নিতে বলেন। দুর্যোধনকে বেছে নেবার সুযোগই দেন না। দুর্যোধনকে ঐ সেনাবাহিনী নিতে হয় এবং কৃষ্ণ দুর্যোধনকে আরো প্রতিশ্রুতি দেন যুদ্ধে কোন দিন তিনি অস্ত্রধারণ করবেন না। দুর্যোধন তারপর বলরামের সাহায্য চান, কিন্তু বলরাম নিরপেক্ষ থাকতে চান। এ ছাড়া দ্বারকা থেকে কৃতবর্মাকে ও ১-অক্ষৌহিণী সেনা পান দুর্যোধন।

দুর্যোধন শেষ পর্যন্ত মোট এগার অক্ষৌহিণী সৈন্য সংগ্রহ করেছিলেন এবং যুদ্ধকে একটি যজ্ঞ বলে ঘোষণা করেন। যুদ্ধের আগের মুহূর্তে কৃষ্ণ কৌরবদের কাছে সন্ধির জন্য আসেন ; দুর্যোধন তাঁকে তখন বন্দী করবার মতলব করেন। কিন্তু হস্তিনাপুরে কেউ তাঁর এ মতলবের সমর্থক ছিলেন না। কৃষ্ণ এলে দুর্যোধন অবশ্য যথোচিত সম্মান ও বহু উপহার দিয়েছিলেন এবং খেতে নিমন্ত্রণও করেছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ এ আতিথ্য বা উপহার কিছুই গ্রহণ করেন নি। কণ্ব মুনি এসে এই সময় দুর্যোধনকে যুদ্ধ করতে বারণ করেন কিন্তু দুর্যোধন অটল থাকেন। শেষ পর্যন্ত দুর্যোধন কৃষ্ণকে বন্দী করতে চেষ্টা করেন ; কিন্তু জানাজানি হয়ে যায় ; কৃষ্ণ ফিরে যান। কৃষ্ণ ফিরে গেলে শকুনির ছেলে উলূককে দুর্যোধন দূত হিসাবে পাণ্ডবদের কাছে পাঠান ; উলূক বহু কটু কথা শুনিয়ে আসেন।

যুদ্ধে দুর্যোধন ভীষ্মকে প্রথম সেনাপতি করেন এবং দুঃশাসনকে ভীষ্মের দেহরক্ষী নিযুক্ত করেন। দুর্যোধনের পতাকা সর্পলাঞ্ছিত ছিল। কুরুক্ষেত্রে দুর্যোধন বার বার ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। অন্যান্য বহু যোদ্ধার সঙ্গেও যুদ্ধ করেছিলেন এবং কোথাও জয়লাভ ও কোথাও পরাজিত হয়েছিলেন। বহু বীর দুর্যোধনের হাতে

নিহত হন। ভীষ্মের পর দ্রোণ এবং তার পর কর্ণকে সেনাপতি করেন। অভি
বধের সপ্তরথীর মধ্যে দুর্যোধনও এক জন। অভিমন্যু বধের প্রতিশোধ নেবার জন্য অ
জয়দ্রথকে বধ করার জন্য এগিয়ে এলে তুমুল যুদ্ধ হয়। দ্রোণকে এই সময় দুর্যে
পাণ্ডবদের প্রতি সহানুভূতি শীল, বিশ্বাসঘাতক ইত্যাদি বলে গালি দেন। তিরস্কৃত
মহাদেবের দেওয়া কবচ দুর্যোধনকে দান করেন (৭।৬৯।৬২)। দুর্যোধন যুধিষ্ঠির
অন্তত বন্দী করতে বলেন (ভাণ্ডা ৭।১১।১৭) ; আবার তাহলে পাশা খেলিয়ে বনব
করতে পারবেন। দুর্যোধনকে অভেদ্য কবচ পরিয়ে দিয়ে দ্রোণ অর্জুনকে আট
রাখতে বলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে ধরবার জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। পাণ্ড
খবর পান (ভাণ্ডা ৭।১২)।

দ্রোণ যে দিন নিহত হন সে দিন সকালে সাত্যকিকে দেখে তাঁর কাছে
আত্মীয় নিধন যুদ্ধের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করেন। কর্ণ ছাড়া প্রত্যেক কৌ
সেনাপতিকেই তিনি পাণ্ডবদের পক্ষপাতী বলে অভিযোগ এনেছিলেন। জয়দ্রথ
বাঁচাবার অনেক চেষ্টা করেছিলেন এবং জয়দ্রথ মারা যেতে অত্যন্ত ভগ্নোৎসাহ হ
পড়েন। অশ্বত্থামা এক বার কর্ণকে হত্যা করতে গেলে দুর্যোধন অশ্বত্থামাকে শ
করেন। শল্যকে কর্ণের সারথি হতে বললে শল্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে পড়েন কি
দুর্যোধন বুঝিয়ে শল্যকে রাজি করেছিলেন। অশ্বত্থামা এক বার সন্ধির একটা প্রস্তাব আনে
কিন্তু দুর্যোধন কর্ণপাত করেন না। কর্ণের মৃত্যুর পর কৃপাচার্য আবার সন্ধির (৯।৩।৪৩
কথা বলেন ; কিন্তু দুর্যোধন রাজি হন না। আঠার দিনের দিন শল্যকে সেনাপ
করেন। শল্য ঐ দিনই নিহত হন ; কৌরব বাহিনী শেষ হয়ে যায়। দুর্যোধন পদা
প্রস্থিতঃ (মহা ৯।২৮।২৫); এই সময় দুর্যোধন স্বীকার করেছিলেন (৯।৪।১৬
দ্রৌপদী অত্যন্ত লাঞ্ছিতা হয়েছিলেন ; পরিক্লিষ্টা সভামধ্যে সর্বলোকস্য পশ্যতঃ এ
ঊনে দ্বিযোজনে গত্বা হিমালয় পৃষ্ঠে (৯।৫।৪) দুর্যোধন সৈন্য সমাবেশ করেন। নি
দ্বৈপায়ন হ্রদে গিয়ে আশ্রয় নেন। চরম নিঃস্ব অবস্থা। মায়ায় হ্রদের জল স্তম্ভিত ক
জলের মধ্যে লুকিয়ে থাকেন। কৌরব পক্ষে কৃপাচার্য, কৃতবর্মা ও অশ্বত্থামা এখা
পরামর্শ করতে এলে পর দিন কথা বলবেন বলে এঁদের বিদায় দেন। দুর্যোধন একদি
বিশ্রাম চান ; আর যুদ্ধে ঠিক রাজি হন না। অশ্বত্থামা কিন্তু সেই রাত্রে পাণ্ডবদের শে
করতে চান। কয়েক জন ব্যাধ এখান দিয়ে যেতে যেতে এদের দেখতে পায়। ভীমকে এ
মাংস সরবরাহ করত। অলক্ষ্যে এদের কথা শোনে ও ভীমকে জানায়। প্রচুর অর্থ পায়
পাণ্ডবরা আসে। অশ্বত্থামারা বুঝতে পেরে সরে গিয়ে অবস্থান করেন। যুধিষ্ঠিরে
কটুবাক্যে উত্তেজিত হয়ে হ্রদ থেকে বার হয়ে এসে গদা যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হন
ঠিক হয় দুর্যোধন যে কোন এক জনের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। যুধিষ্ঠির বলেন যে কো
এক জনকে নিহত করতে পারলেই রাজ্য পাবেন (ভাণ্ডা ৯।৩১।৫৩)। এই প্রতিশ্রু
দেবার জন্য কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে তিরস্কার করেন। ভীমকে বধ করার জন্য তের বছর ধ
লৌহমূর্তির ওপর গদাঘাত অভ্যাস করেছিলেন। খবর পেয়ে বলরাম ও এসেছিলেন এব

কুরুক্ষেত্রের মাঝখানে সমন্তপঞ্চকে সরস্বতীর দক্ষিণ তীরে এই গদাযুদ্ধের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। ভীম বলশালী হলেও সমান কৌশলী ছিলেন না।

ন্যায় যুদ্ধে ভীম পারবেন না চিন্তা করে উরুভঙ্গের কথা স্মরণ করিয়ে দেন কৃষ্ণ। কৃষ্ণ আরো বলেন দুর্যোধন অরণ্য বাসে কৃত নিশ্চয় হয়ে অবস্থান করছিলেন ; যুদ্ধের জন্য পাণ্ডবদের আসা অনুচিত হয়েছে।

যুদ্ধের সময় কৃষ্ণের ইঙ্গিতে অর্জুন নিজের বাম উরুতে চড় মেরে প্রতিজ্ঞার কথা মনে করিয়ে দিলে ভীম সুযোগ মত দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করেন এবং বাঁ পায়ে করে মাথা থেঁতলে দিতে চেষ্টা করেন। দুর্যোধন এ সময়ে কৃষ্ণকে তিরস্কার করেন।

শল্য যে দিন মারা যান সেই দিন অপরাহ্নে দুর্যোধন (৯।৩১।২) ভগ্নোরু হন। মৃতপ্রায় দুর্যোধনকে পাণ্ডবরা ত্যাগ করে চলে গেলে দুর্যোধন সঞ্জয়কে বিদায় দেন ; ধৃতরাষ্ট্রকে শোক করতে বারণ করে দেন ; এবং নিজে বিলাপ করতে থাকেন। ইতিমধ্যে অশ্বত্থামারা আসেন। পাণ্ডবদের নিধন করতে চান। দুর্যোধনের নির্দেশে (৯।৬৬) কৃপ অশ্বত্থামাকে অভিষিক্ত করেন। দুর্যোধন ভীমের ছিন্নমুণ্ড নিয়ে আসবার নির্দেশ দেন। এঁরা দ্রৌপদীর পাঁচ ছেলে ও ধৃষ্টদ্যুম্ন ইত্যাদিকে হত্যা করে এঁদের মাথা এনে দিলে অন্ধকারে ভীমের মাথা নয় দুর্যোধন ঠিক বুঝতে পারেন ও মারা যান।

ব্যাস মৃত যোদ্ধাদের গঙ্গাতীরে আহ্বান করলে দুর্যোধনও এসেছিলেন। যুধিষ্ঠির স্বর্গে পৌঁছে দেখেন দুর্যোধন সিংহাসনে সূর্যের মত ভাস্বর হয়ে অবস্থান করছেন। এই দুর্যোধন সম্বন্ধে সাম্ব নামে এক বহ্বৃচ ব্রাহ্মণ ধৃতরাষ্ট্রের বনে যাবার সময় সমবেত জনতার পক্ষ থেকে (মহা ১৫।১৫।১১) বলেছিলেন প্রজারা দুর্যোধনকে পিতার মত শ্রদ্ধা করত।

দুর্যোধন অত্যন্ত ভাগ্যহীন। যুদ্ধ করলেও ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও শল্য সকলেই বিশ্বাস ঘাতকতা করেছিলেন। ভীষ্ম নিজের মৃত্যুর উপায়ও বলে দিয়েছিলেন। কর্ণ (দ্রঃ) ও বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন। শল্য কর্ণের তেজ সংহার করেছিলেন। দ্রোণ এই পরিমাণ বিশ্বাসঘাতকতা না করলেও পাণ্ডবদের প্রতি তাঁর উচ্ছল স্নেহ ছিলই। এমন কি কৃপও যুদ্ধের প্রারম্ভে পাণ্ডবদের আশীর্বাদ করেছিলেন জয় হবে।

বর্তমানে নৈটিয়ার থেকে ওপরের দিকে তমসার দুই তীরে যতগুলি গ্রাম আছে সেখানকার একমাত্র উপাস্য দেবতা দুর্যোধন। প্রতিটি গ্রামেই দুর্যোধনের মন্দির আছে। এই অঞ্চলটির ভৌগলিক নাম ফতে পর্বত। অধিবাসীরা রাওয়াই নামে পরিচিত। অথচ নিম্ন তমসা অর্থাৎ দেরাদুন জেলার চাক্রাতা অঞ্চলের জৌনসারী অধিবাসীরা পাণ্ডব পূজারী।

(২) এক ইক্ষ্বাকুর ১০০ ছেলে। এদের মধ্যে মাহিষ্মতীর গর্ভে জন্ম দশাশ্ব, ইক্ষ্বাকুর দশম পুত্র। (মহা ১৩।২) দশাশ্ব> মদিরাশ্ব >দ্যুতিমান> সুবীর> সুদুর্জয়> দুর্যোধন। এই দুর্যোধনের স্ত্রী নর্মদা, মেয়ে সুদর্শনা ; অগ্নির স্ত্রী (মহা ১৩।২।১২)। দ্রঃ-ওঘোবতী।

দুষ্প্রধর্ষণ—দুষ্প্রধর্ষ। ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে ; ভীমের হাতে নিহত।

দুষ্যন্ত—দুষ্মন্ত/দুঃষন্ত। চন্দ্র বংশে যযাতি (১) দুষ্যন্ত (১৪)। সত্তুরোধের তিন ছেলে দুষ্যন্ত, প্রবীর ও সুমন্ত। সত্তুরোধের ভাই প্রতিরথের ছেলে এক কণ্ব। মহাভারতে (১।৮৯। ১৩) তংসুর ছেলে ইলিন/ঈলিন। দুষ্যন্তের পিতা এই ঈলিন ও মাতা রথন্তরী এবং দুষ্যন্তের আরো চার সহোদর ভাই শূর, ভীম, বসু, প্রবসু (১।৮৯।১৫)। হরিবংশে সম্মতার (দ্রঃ) ছেলে। হরিবংশে (১।৩২।৮৩) দুষ্যন্তের আর এক স্ত্রী ছিল ; এর ছেলে করুথাম > আক্রীড় > পাণ্ড, কেরল, কোল, চোল। দ্রঃ- ঋচেপু।

রাজা হয়ে অল্প দিনেই সারা ভারতের সম্রাট হয়ে বসেন। এক বার মৃগয়াতে বার হয়ে হরিণের পেছু পেছু প্রথমে যতি বাল-খিল্যদের আশ্রমে এবং তারপর (মহা ১।৬৪।১৮) মালিনী নদীর তীরে কণ্ব মুনির আশ্রমে এসে উপস্থিত হন। আশ্রমের দরজায় সেনাবাহিনীকে অপেক্ষা করতে বলে কাশ্যপ কণ্বকে দর্শন করবার বাসনায় রাজচিহ্ন সমস্ত ত্যাগ করে (মহা ১।৬৪।২৯) সামাত্য পুরোহিত এগিয়ে আসেন এবং এরপর এদেরও বাদ দিয়ে এগিয়ে যান। মালিনী নদীর তীরে কণ্ব মুনির আশ্রমে এসে উপস্থিত হন। মুনি ছিলেন না ; তাঁর পালিতা কন্যা শকুন্তলা (দ্রঃ) অতিথি সৎকার করেন। রাজা পরিচয় চাইলে শকুন্তলা যথাযথ সমস্ত পরিচয় দেন। রাজা মুগ্ধ হয়ে গন্ধর্ব মতে বিয়ে করেন। শকুন্তলা সর্ত করে নেন (মহা ১।৪৭।১৭) যে তাঁর ছেলেকে কিন্তু রাজা করতে হবে। বিয়ের পর রাজা কিছু দিন আশ্রমে থাকেন এবং ফিরে আসার সময় কথা দিয়ে আসেন চতুরঙ্গ পাঠিয়ে শকুন্তলাকে রাজধানীতে আনবেন এবং এই বিয়ের জন্য কাশ্যপ কণ্ব কুপিত হবেন কিনা ভাবতে ভাবতে রাজধানীতে ফিরে আসেন।

এর পর আশ্রমে দুর্বাসা আসেন ; শকুন্তলা বসে বসে রাজার কথা ভাবছিলেন, দুর্বাসা এসেছেন খেয়াল হয় নি ; ফলে মুনি শাপ দেন রাজা সব কিছু ভুলে যাবে। এর পর কণ্ব মুনি ফিরে আসেন ; সব কিছু জানতে পেরে এবং শকুন্তলা গর্ভবতী শুনে আশীর্বাদ করেন এই ছেলে সসাগরা ধরণীর অধিপতি হবে। যথা সময়ে ছেলে হয় ; কণ্ব সমস্ত জাতকর্ম করেন এবং ছেলের নাম রাখেন সর্বদমন। ছেলে ছয় বৎসর মত হলে কণ্ব শিষ্যদের দিয়ে এঁদের রাজধানীতে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু শাপগ্রস্থ রাজা এঁদের চিনতে পারেন না। মহাভারতে (১।৬৯।-) দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার মধ্যে এই সময় বহু বিতর্ক হয় এবং রাগে ও দুঃখে শকুন্তলা ফিরে আসছিলেন এমন সময় দৈববাণী হয়। দৈববাণীতে সর্বদমনের নাম ভরত রাখতে বলা হয়। ভরস্ব পুত্রং (মহা ১।৬৯।২৯) ফলে নাম হয় ভরত।

রাজা এবার এদের গ্রহণ করেন এবং বলেন চিনতে পেরেও লোক অপবাদের ভয়ে অস্বীকার করছিলেন। অন্য মতে আশ্রম থেকে চলে আসার সময় রাজা নিজের আংটিটি দিয়ে এসেছিলেন। রাজধানীতে আসার সময় শকুন্তলার আঁচল থেকে এই অভিজ্ঞান জলে পড়ে যায়। দুর্বাসার শাপ ছিল রাজা চিনতে পারবেন না বটে তবে এই অভিজ্ঞান দেখলেই আবার চিনতে পারবেন। একটি মাছের পেটে এই আংটি পেয়ে এক জেলে রাজাকে এটি এনে দিলে রাজার সব ঘটনা মনে পড়ে এবং

শকুন্তলাকে গ্রহণ করেন। কালিদাসের শকুন্তলা গ্রন্থে কণ্ব মুনি আশ্রমে ফিরে এসে শকুন্তলার বিয়ে ও গর্ভসঞ্চারের কথা জানতে পেরে রাজার কাছে পাঠিয়ে দেন। আংটি জলে পড়ে যায়। শকুন্তলা প্রত্যাখ্যাত হন। পরে আংটি একটি জেলে এনে দিলে রাজার সব কিছু মনে পড়ে এবং দৈবক্রমে বহু দিন পরে শকুন্তলার ও ভরতের (সর্বদমনের) সন্ধান পান। দুষ্যন্তের আর এক স্ত্রী লক্ষ্মণার ছেলে জনমেজয়। এই ভরত থেকে ভারত (হরিবংশ ১।৩২।১০)। ২, পুরু বংশে অজমীঢ়ের ছেলে, মা নীলী। এই দুষ্যন্ত ও পরমেষ্ঠী দুই ভাই. এদের বংশধরেরা পাঞ্চাল নামেও পরিচিত (মহা ১।৮৯।২৮)।

দূত—পুরাণ, মনুস্মৃতি ও মহাভারতে দূত সম্বন্ধে বহু তথ্য আলোচিত হয়েছে।

দূষণ—রাবণের এক সেনাপতি। এঁর ভাই খর। রাবণের রাজ্য দণ্ডকারণ্যে গোদাবরী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। খর ও দূষণ দুই ভাই ১৪ হাজার সৈন্য নিয়ে জনস্থান থেকে রাজ্যের এই প্রান্তদেশ রক্ষা করতেন। শূর্পণখার নাক কাণ কাটা গেলে এরা সসৈন্যে রাম লক্ষ্মণকে আক্রমণ করেন এবং প্রথমে খর ও পরে দূষণ মারা পড়েন।

দৃঢ়ক্ষত্র—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে ; ভীমের হাতে নিহত।

দৃঢ়দস্যু—অপর নাম ইধ্মবাহ। অগস্ত্য লোপামুদ্রার ছেলে। সাত বছর গর্ভে ছিলেন। এক জন বিখ্যাত পণ্ডিত ও তপস্বী।

দৃঢ়বর্মন—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে ; ভীমের হাতে নিহত।

দৃঢ়রথ—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে ; ভীমের হাতে নিহত।

দৃঢ়সন্ধ—শত্রুঞ্জয়। ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে ; ভীমের হাতে নিহত।

দৃঢ়হস্ত—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে ; ভীমের হাতে নিহত।

দৃঢ়ায়ুধ—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে ; ভীমের হাতে নিহত।

দৃঢ়াশ্ব—ইক্ষ্বাকু বংশে এক বিখ্যাত বীর। কুবলাশ্বের ২১০০০ ছেলের মধ্যে এক জন। ধুন্ধুর হাতে ছেলেগুলি মারা যায় ; কেবল দৃঢ়াশ্ব, কপিলাশ্ব, ও চন্দ্রাশ্ব বেঁচে যান।

দৃশদ্বতী দৃষদ্বতী—(১) চিতং, চৌতঙ, চিতঙ্গ, চিত্রঙ্গ। সরস্বতীর দক্ষিণে সমান্তরাল নদী। ফলকীবন মধ্যগত। ঋগ্বেদে একটি নদী। পূর্ব পাঞ্জাবে। বর্তমানে নাম চিতাং, চিত্রাংগ, চৌতাংগ। এরই একটি উপনদী সরস্বতী। এই দৃষদ্বতী, সরস্বতী ও আপগা নদীর তীরে ভারতীয় আর্যেরা বাস করতেন (ঋক্) এবং দৃষদ্বতী ও সরস্বতীর তীরভূমি যজ্ঞভূমিতে পরিণত হয়। সরস্বতীর দক্ষিণে ও দৃষদ্বতীর উত্তরে অবস্থিত কুরুক্ষেত্র। মনুতে দৃষদ্বতী ও সরস্বতীর মধ্যে ব্রহ্মাবর্ত দেশ অবস্থিত। অন্য মতে কুরুক্ষেত্রের অংশ বিশেষ হচ্ছে ব্রহ্মাবর্ত।

(২) কগ্‌গর বা ঘগ্‌গর। আম্বালা ও সিরহিন্দের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ছিল। বর্তমানে রাজপুতানার বালিতে মিশে গেছে। কুরুক্ষেত্রের দ-সীমানা ছিল। দ্রঃ- রক্ষী।

দেওঘর—পুরাণে বৈদ্যনাথ ধামের বিভিন্ন নামের উল্লেখ রয়েছে ; যথা :—বৈদ্যনাথ, হরিদ্রাপীঠ, রাবণ কানন, কেতকীবন। শিব পুরাণে আছে রাবণ কৈলাস থেকে

শিবের প্রতীক একটি জ্যোতির্লিঙ্গ লঙ্কায় নিয়ে যাচ্ছিলেন। বিষ্ণু কৌশলে এটিকে এখানে নামিয়ে নিয়েছিলেন। দেওঘর ৫২ পীঠের একটি ; এখানে সতীর হৃৎপিণ্ড পড়েছিল। বৈদ্যনাথের মন্দিরটি মনে হয় চোলবংশীয় রাজা আদিত্য সেন (৮৭১-৯০৭ খৃ) তৈরি করান।

দেওনীমোর—পশ্চিম ভারতে সাবরকণ্ঠা জেলাতে অবস্থিত। খৃ-৩য় শতক হতে ক্ষত্রপদের রাজত্ব কালে এখানে একটি বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। প্রধান স্তূপের আসনের বহির্ভাগে পঙ্‌ক্তিবদ্ধ কুলুঙ্গিতে পোড়া মাটির তৈরি বুদ্ধমূর্তিগুলি প্রতিষ্ঠিত ছিল। মূর্তিগুলিতে গান্ধার শৈলীর প্রভাব। আরো দু-টি বিহার এখানে পাওয়া গেছে। মনে হয় ৬ শতক পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানটি বর্তমান ছিল।

দেওয়ালী—দীপাবলী। মুখ্য উৎসব কার্তিক মাসে অমাবস্যায় সন্ধ্যায়। সর্ব ভারতীয় (হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন) উৎসব। সীতাকে নিয়ে রাম অযোধ্যায় ফিরে এলে প্রজারা প্রথমে এই উৎসব করেন। বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগ ও তাঁর শিষ্য মহামোগ্‌গলায়নের পরিনির্বাণ উপলক্ষ্যেও দীপাবলী পালন করা হয়। জৈন তীর্থংকর মহাবীর আশ্বিনী কৃষ্ণাচতুর্দশী রাত্রিতে নির্বাণ লাভ করেন ; জৈনরা এই জন্য দীপ দেন। কৃষ্ণা চতুর্দশীতে নরকাসুর বধের স্মারক হিসাবে হিন্দুরা দীপাবলী দেন ফলে আর এক নাম নরক/ভূত চতুর্দশী।

দেব—দেব শব্দের অর্থ আলো ও লীলা। মুণ্ডকোপনিষদে (২।১।৭) আছে ঈশ্বর থেকে দেবতা, মানুষ, পশু-পাখী সব জন্মায়। তস্মাৎ চ দেবাঃ বহুধা সম্প্রসূতাঃ সাধ্যাঃ মনুষ্যাঃ পশবঃ বয়াংসি। দেব অর্থে সাধারণত কশ্যপ-অদিতি পুত্র। আদিত্য বার, রুদ্র এগার বসু আট এবং অশ্বিনী কুমার দুই ; মোট তেত্রিশ। দ্রঃ- দেবতা।

দেবক—যযাতি বংশে এক রাজা ; উগ্রসেনের ভাই। মেয়ে দেবকী ; কৃষ্ণের মা। হরিবংশে (১।৩৭।২৭) আহুকের ছেলে দেবক>দেববান, উপদেব, সুদেব ও দেবরক্ষিত। এ ছাড়া সাত মেয়ে দেবকী, শান্তিদেবা, সুদেবা, দেবরক্ষিতা, বৃকদেবী, উপদেবী, সুনাসী ; এরা সকলে বসুদেবের স্ত্রী। ভাগবতে (৯।২৪) দেবরক্ষিত- দেববর্দ্ধন এবং সুদেবা, বৃকদেবী, উপদেবী ও সুনাসীর বদলে সহদেবা, ধৃতদেবা, উপদেবা ও শ্রীদেবা নাম পাওয়া যায়। (২) বিদুরের শ্বশুর। (৩) মুখ্য গন্ধর্বরাজ (মহা ১।৬১।৬২)।

দেবকী—নহুষ(১) —কার্তবীর্যার্জুন(১২)—দেবক(৩৫)—দেবাপ(৩৬)—দেবকী(৩৭)। বিদর্ভ রাজ আহুকের দুই ছেলে দেবক ও উগ্রসেন (হরি ১।৩৭।২৭)। দেবকের অন্য মতে দেবাপের সাতটি মেয়ে শ্রুতদেবা, শান্তিদেবা, উপদেবা, শ্রীদেবা, দেবরক্ষিতা সহদেবা, দেবকী। হরিবংশে (২।১০১।৮) শ্রুতদেবার নাম বৃকদেবী। দেবা স্থলে বহু ক্ষেত্রে দেবী ও দেখা যায়।

এদের মধ্যে দেবকী সব চেয়ে পরিচিতা ; কৃষ্ণের মা। অগ্নি পুরাণে দেবকী কংসের ভ্রাতুষ্পুত্রী। কশ্যপ ও অদিতি বসুদেব ও দেবকী হয়ে জন্মান (দ্রঃ- ইন্দ্র)। এই সাত বোনেরই বসুদেবের সঙ্গে বিয়ে হয়। দেবকীর বিয়েতে বার ভার সোনা ও একটি রথ উপহার দেওয়া হয়েছিল। কংস (দ্রঃ) নিজে এই রথে করে দেবকী ও বসুদেবকে

বাড়ি পৌঁছে দিতে গিয়েছিলেন। দেবকীর প্রথম ছয়টি ছেলে কংসের (দ্রঃ) হাতে নিহত হয়। দেবী ভাগবতে কাহিনী আছে বসুদেব ও দেবকী প্রথম থেকেই করারুদ্ধ ছিলেন। ছয়টি ছেলে নিহত হলে আকুল হয়ে কুলপুরোহিত গর্গকে আনান। গর্গ উপদেশ দেন দেবীর উপাসনা করতে ; দীর্ঘায়ু পুত্র হবে। এছাড়াও বসুদেবের প্রার্থনায় গর্গ বিন্ধ্যপর্বতে গিয়ে দেবীর আরাধনা করেন। দেবী জানিয়ে যান তিনি কৃষ্ণকে পাঠিয়েছেন এবং যশোদা কন্যাকে নিয়ে আসা ইত্যাদি সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন। সপ্তম সন্তান বলরাম গর্ভ থেকে সঙ্কর্ষিত হয়ে রোহিণীর গর্ভে স্থাপিত হবে। দেবকীর অষ্টম ছেলের হাতে কংসের মৃত্যু হবে। দ্রঃ- একানংশা। এই অষ্টম পুত্র কৃষ্ণ (দ্রঃ)। দেবকীর স্বয়ংবরে বহু ক্ষত্রিয় রাজা যোগ দিয়েছিলেন। কংস নিহত হলে দেবকী ও বসুদেব মুক্তি পান। কৃষ্ণের মৃত্যু সময়ে দেবকী ও বসুদেব দুজনেই জীবিত ছিলেন। অর্জুনের হাতে যাদব নারীদের তুলে দিয়ে বসুদেব যোগস্থ হয়ে দেহত্যাগ করেন ; দেবকী, রোহিণী ইত্যাদি অন্যান্য স্ত্রীরাও স্বামীর চিতায় সহমৃতা হন। দ্রঃ- ইন্দ্র, কশ্যপ, ঊর্ণা, একানংশা।

দেবকুল্যা— মরীচির নাতনি. স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে। দ্রঃ-কলা। বিষ্ণুর পা ধুয়ে দিয়েছিলেন বলে পর জন্মে গঙ্গা হয়ে জন্মান।

দেবগিরি —দেবগড়, ধরগড়, টগর (দ্রঃ-), দৌলতাবাদ। শিবপুরাণে উল্লেখ আছে। বোপদেব ও হিমাদ্রি এখানে রাজসভাতে ছিলেন। দ্রঃ- শিবালয়। (২) আরাবল্লী পর্বত শাখার একটি অংশ। (৩) চম্বলের কাছে একটি পাহাড়, উজ্জয়িনী ও মন্দাসোরের মধ্য অংশে। (৪) একটি মতে মালবের মধ্যস্থানে চম্বলের দক্ষিণে দেবগড় দেবগিরি।

দেবতা—দ্যুতি বিশিষ্ট সত্তা। দ্রঃ- দেব। দেবতার কল্পনা চার প্রকার ঃ-(১) যাজ্ঞিক সম্প্রদায়ের কাছে দেবতা মন্ত্র স্বরূপ। যজ্ঞাদিতে যাকে হবিঃ দেওয়া হয় তিনিই দেবতা। (২) একত্ববাদী মতে অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্ম সাধকের কাছে যে বিভিন্ন মূর্তিতে আবির্ভূত পূজিত হন। সব দেবতাই মূলত পরমব্রহ্মের প্রতীক। (৩) অচেতন বস্তুর অধিষ্ঠাতা হিসাবেও দেবতা কল্পিত হয়েছেন, যেমন পৃথিবীর অধিষ্ঠাতা অগ্নি, অন্তরীক্ষে ইন্দ্র বা বায়ু, দ্যুলোকে সূর্য। আবার ঋকে আছে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোকে প্রতিটি স্থানে ১১টি করে মোট ৩৩-টি দেবতা। এই ভাবে বিভিন্ন জড় বস্তুর অধিপতি হিসাবে ৩৩ কোটি বা সংখ্যাতীত দেবতা কল্পিত হয়েছে। দ্রঃ- ঋগ্বেদ। জড় বস্তুর মাধ্যমেও যে মহাশক্তির লীলা সেই শক্তি লীলাকে এই দেবতা বলে কল্পনা করা হয়েছে। (৪) দেবতাগণ এক শ্রেণীর উন্নত ধরণের দেহী, জন্ম-মৃত্যু আছে তবে দীর্ঘায়ু বলে সাধারণত অমর বলা হয়। আদি দেবতারা হচ্ছেন মরীচি পুত্র কশ্যপের জ্যেষ্ঠা পত্নী অদিতির সন্তান। দেবতারা স্বর্গে থাকেন। এঁদের রাজা ইন্দ্র ; এঁদের প্রত্যেকের নিজস্ব বিশেষ বাহন এবং বিশেষ বিশেষ অস্ত্রশস্ত্রও আছে। এঁদের খাদ্য হবির্ভাগ ও প্রধান পানীয় সোমরস। দেবতারা স্বেচ্ছায় রূপ পরিবর্তন করতে পারেন ইত্যাদি ; অর্থাৎ অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি রয়েছে। দেবতারা মানুষের কল্যাণ করেন ; মানুষেও তাঁদের জন্য যজ্ঞ ও পূজা করে। অগ্নি দেবতাদের মুখ। উত্তরায়ণের ৬ মাস দেবতাদের দিন ; দক্ষিণায়নের ৬ মাস রাত্রি। দ্রঃ- ইন্দ্র। দৈত্যদের এঁরা দমন করেন। দেবতাদেরও পাপপুণ্য আছে,

উপাস্য ও উপাসক ভাব আছে এবং পারিবারিকতা আছে। তাঁরাও তপস্যা করেন এবং ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করে মুক্তি পান। দেবতাদের ঘাম হয় না, চোখে পাতা পড়ে না; মাটিতে পা স্পর্শ করে না এবং গলায় পুষ্পমাল্য কোন দিন ম্লান হয় না।

দেবতা হিসাবে (মহা ১।১।৪০) নাম আছে দিবস্পুত্র, বৃহৎভানু, চক্ষু, আত্মা, বিভাবসু, সবিতা, ঋচীক, অর্ক, ভানু, আশাবহ, রবি এবং কনিষ্ঠ মহ্য; এ'রা বিবস্বতঃ পুত্রাঃ সর্বে। বর্দ্ধমান সংস্করণে দিবস্পুত্র নাম নাই, বদলে বিবস্বান এবং এ'রা অদিতির পুত্র। কালী প্রসন্নে ও ভাণ্ডারকরের মতই নাম এবং দিবস্পুত্র অংশকে ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে এ'রা 'দিব'-এর পুত্র।

ঋক্ বেদে দেবতা সংখ্যা ৩৩ ঃ- ১১ জন স্বর্গে, ১১ জন অন্তরীক্ষে, ও ১১ জন পৃথিবীতে ঃ- ঋক্ (১।১৩৯।১১) =

যে দেবাসঃ দিবি একাদশ স্থ পৃথিব্যা মধ্যে একাদশ স্থ
অপ্সুক্ষিতঃ মহিনৈকাদশ স্থ তে দেবাসঃ যজ্ঞং ইমং জুষধ্বম্।

মূল দেবতা হিসাবে ঋক বেদে দেখা যায় পৃথিবীতে অগ্নি, পৃথিবী, অপ ও সোম। অন্তরীক্ষে ইন্দ্র, রুদ্র, পর্জন্য। দ্যুলোকে সূর্য, সবিতা, বিষ্ণু, মিত্র বরুণ, দ্যু, পূষা, অশ্বিনী কুমার দুজন, ঊষা, রাত্রি, যম ও বৃহস্পতি। কিন্তু মূল সুর বিরাটপুরুষ।

অথর্ব বেদেও এই ভাবে (১১।৪।১০) ৩৩ দেবতা। তৈত্তিরীয়তেও ৩৩। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ৮বসু+১১রুদ্র+১২ আদিত্য+প্রজাপতি ও বষটকার। বৃহদারণ্যকে বষটকারের স্থলে ইন্দ্র কিন্তু মোট সংখ্যা ৩৩। বৃহদারণ্যকে ২১২ শ্লোকে বলা হয়েছে ৮ বসু+১১ রুদ্র+১২ আদিত্য+প্রজাপতি+ইন্দ্র=৩৩। অন্য দেবতারা মহিমানঃ এব এষাম্। অষ্ট বসু হিসাবে ২১৩ শ্লোকে আছে অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরিক্ষ, আদিত্য, দ্যুলোক, চন্দ্র ও নক্ষত্র সমূহ: এবং রুদ্র হিসাবে ২১৪ শ্লোকে আছে ৫ জ্ঞান ইন্দ্রিয় ও ৫ কর্ম ইন্দ্রিয়ের দেবতা ও আত্মা, এ'রা মর্ত্য শরীর থেকে বার হয়ে গিয়ে সকলকে রোদন করান ফলে নাম রুদ্র। কেন'তে (১৮/২৮) অগ্নি, বায়ু ও ইন্দ্র ব্রহ্মকে প্রথমে জেনেছিলেন বলে অন্যান্য দেবতাদের থেকে এ'রা শ্রেষ্ঠ। শতপথ ব্রাহ্মণে প্রজাপতি ও ইন্দ্র নাই, সেখানে দ্যৌ ও পৃথিবী এসেছে (৪।৫।৭।২) মোট সংখ্যা ৩৩-ই রয়ে গেছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এই ৩৩ জন দেবতাকে ১১ জন প্রযাজ, ১১ জন অনুযাজ ও ১১ জন উপযাজ হিসাবে ভাগ করা হয়েছে।

ঋক্ বেদ ইত্যাদি যেহেতু বিভিন্ন ঋষির লেখা তার ফলে ৩৩ জন ছাড়াও অশ্বিদ্বয়কে (১।৩৪।১১) পাওয়া যায় এবং (১।৪৫।২) ঋকে ৩৩+অগ্নি রয়েছেন। আবার (৮।৩৫।৩) ঋকে ৮ বসু+১১ রুদ্র+১১ আদিত্য+অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, বিষ্ণু, ঊষা ও সূর্য রয়েছেন অর্থাৎ ৩৩ থেকে বেশি। পুরুষ সূক্তে একেশ্বর বাদ প্রকট কিন্তু দেবী সূক্তে একেশ্বর বাদ স্বীকৃত নয়। রুদ্র বা বসুদের সঙ্গে চরামি বা বিভর্মি ইত্যাদির মধ্য দিয়ে অন্য সত্ত্বাদেরও স্বীকার করা হচ্ছে; অদ্বৈতবাদের মত নিশ্চিত অর্থ/উক্তি নয়।

আবার ঋক্‌বেদে (৩।৯।৯) বলা হয়েছে ৩৩৩৯ দেবতা অগ্নিকে পূজা করবেন। অর্থাৎ সংখ্যা ৩৩৪০। শুক্লযজুর্বেদে বাজসনেয়ী সংহিতাতেও (৩৩।৭) ৩৩৩৯ বলা

হয়েছে। সায়ণের মতে এই সংখ্যা দেবতাদের মহিমা জ্ঞাপক সংখ্যা ; দেবতা সংখ্যা নয়। আবার কিছু মতে ৩৩ কোটি দেবতা অলস উক্তি হলেও বিভিন্ন জড় বস্তুর মাধ্যমে মহাশক্তির যে লীলা সেই লীলাগুলিকেই দেবতা বলা হয়েছে। অর্থাৎ সঙ্গে যুগপৎ অদ্বৈতবাদ আছেই।

ভারতবর্ষে নানা দেবদেবীর পূজা হয়। কিন্তু এ পূজা কোন সময়েই মূর্তি পূজা নয় ; প্রতিমা না হলে ঘটেও পূজা হয়। মন্ত্র একই। আহূত দেবতাকে সব সময়ই বিরাট শক্তি/ঈশ্বরের অংশ হিসাবেই পূজা করা হয়। এমন কি সামান্য ইতুপূজাও সূর্যের পূজা। অর্থাৎ সব দেবতাই ঈশ্বর, পুরুষের বা প্রকৃতি/শক্তির অংশ মাত্র। ভারতীয় রক্তে জড় ও চেতনকে মিলিয়ে ব্রহ্ম ; এই উপলব্ধি ভারতীয় ধর্মের প্রাণবস্তু ; পূজার দেবতা সব সময়ই প্রতীক ; একটুকরো নুড়িকে বিনা দ্বিধায় পূজা করা যায়। ফলে দেবতার সংখ্যা অবান্তর।

ইউরোপীয় থিয়োলজিতে ভারতীয় ঈশ্বর নাই ; ভারতীয় ভগবান আছেন। কিন্তু এই ইউরোপীয় ভগবান সর্বশক্তিমান নন : অত্যন্ত দুর্বল প্রকল্প ; ভক্তের কল্পনা অনুযায়ী বিগ্রহ নেবার ক্ষমতা এঁর নাই।

যাস্ক বা তাঁর আগেকার নিরুক্তকারদের মতে বেদে মোট ও মূল দেবতা তিন জন অগ্নিঃ পৃথিবীস্থানঃ, বায়ুঃ বা ইন্দ্রঃ অন্তরীক্ষস্থানঃ এবং সূর্যঃ দ্যুস্থানঃ। ঋক্ ১০·১৫৮। ১ এই কথাই বলা হয়েছে যেন :-সূর্যঃ নঃ দিবঃ পাতু, বাতঃ অন্তরীক্ষাৎ, অগ্নিঃ নঃ পার্থিবেভ্যঃ। অবশ্য এই ঋক্ থেকে অন্য কোন আর দেবতা নাই এ কথা স্পষ্ট নয়। এর পর অগ্নি গোষ্ঠীতে বৈশ্বানর, জাতবেদা নরাশংস, সুসমিদ্ধ, তনূনপাৎ ইত্যাদি দেবতা ; বায়ু গোষ্ঠীতে মাতরিশ্বা, রুদ্র, ইন্দ্র, অপাং নপাৎ, মরুৎ ইত্যাদি এবং সূর্য শ্রেণীতে আদিত্য, বিষ্ণু, মিত্র, বরুণ, পূষা, ভগ, অশ্বিনীকুমার, সবিতা ইত্যাদি। গুণকর্ম বিভাগ অনুসারে যেন তিন মূল দেবতা থেকে এই সমারোহ। ঋক্‌বেদে (১।১৬৪।৪৬) আরো স্পষ্ট আছে একস্য আত্মনঃ অন্যে দেবাঃ প্রত্যঙ্গানি ভবন্তি। এই আত্মনঃ অর্থে অগ্নি (যাস্কের মতে , বা সূর্য (কাত্যায়ন ও ঋক্ বেদ মতে)। অর্থাৎ সব দেবতাই প্রত্যক্ষ-দেবতা সূর্যের অংশ মাত্র। ঋক্ (২।১, সূক্তে প্রত্যক্ষ দেবতা অগ্নিকে বলা হয়েছে ইন্দ্র, বিষ্ণু, বরুণ, মিত্র, অর্যমা, ভগ, বসু, অদিতি, ভারতী, ইলা, বৃত্রহন্তা, সরস্বতী। ঐতরেয় ও তৈত্তিরীয় অগ্নিঃ সর্বাঃ দেবতাঃ। যাস্কও এই কথাই বলেছেন। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা সূর্য ও অগ্নি। এই অগ্নি আকাশে বিদ্যুৎ, পৃথিবীতে জাতবেদা ও সমুদ্রে বড়বাগ্নি। আবার আছে অগ্নেঃ বা আদিত্যঃ জায়তে ; আদিত্যাৎ বৈ চন্দ্রমা জায়তে, চন্দ্রমসঃ বৈ বৃষ্টিঃ জায়তে এবং বৃষ্টেঃ বৈ বিদ্যুৎ জায়তে (ঐতরেয় ৪।৮।৮)। কৃষ্ণ যজুর্বেদে (৭।৩।১০ আছে আদিত্যে অগ্নি রূপে মর্তে ছিলেন : দেবতারা তাঁকে পিঠে করে নিয়ে গিয়ে স্বর্গে স্থাপন করেছিলেন। অর্থাৎ সূর্য, বিদ্যুৎ ও অগ্নি তিন প্রত্যক্ষ দেবতা ; একই দেবতার তিনটি বিভিন্ন মূর্তি ; এবং এই দেবতাই ঈশ্বর, ব্রহ্ম বা বিরাট পুরুষ। যাস্কের মতে দীপ্ ধাতু থেকে দেব বা দ্যু স্থানের অধিবাসী দেব। অর্থাৎ ভারতীয় চিন্তা ধারায় মূল দেবতা তেজ, বা ব্রহ্ম বা চৈতন্য।

যুক্তি তর্কের বিচারের আগে লৌকিক কাহিনী ও কিংবদন্তী চালু হয় : পরে

তত্ত্ব ও দর্শনের সাজ পোষাক পরান হয়। এই কারণেই লোকাচারে লক্ষ্মী বিষ্ণুর স্ত্রী; তত্ত্ব দৃষ্টিতে দ্বজনে অভিন্ন ইত্যাদি। রাধা চ্যাটচেটে আদিরস সাহিত্যের গ্রাম্য নায়িকা হয়ে দেখা দিয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত এই আভীরবধূর (উমাপতি ধর) আদ্যাশক্তিতে পদোন্নতি হয়।

দেবতা অপ্রধান—ঋকবেদে ১০ম মণ্ডলে অক্ষ, অরণ্যানী, যক্ষ্মঘ্ন, দুঃস্বপ্নঘ্ন, কেশী যমী ইত্যাদি। এছাড়া মন্যু, দয়া, জ্ঞান, শ্রদ্ধা, মায়া, সৃষ্টি ইত্যাদি ভাবাত্মক দেবতা। মন্যুর কাছে শত্রুধ্বংসের প্রার্থনা করা হয়েছে। এদের বিশেষ কোন রূপ বেদে নাই। পুরাণে মদন বসন্ত ইত্যাদি রয়েছেন। পদ্মপুরাণে শ্রদ্ধা, শান্তি, অহিংসা, মেধা, প্রজ্ঞা, দয়া ইত্যাদির বর্ণনা আছে। ব্রহ্মচর্য, সত্য, তপঃ, দম, শৌচ ইত্যাদিরও বর্ণনা পাওয়া যায়। শ্রদ্ধাঃ- তপ্তকাঞ্চন-বর্ণা রক্তাম্বরা, মুক্তাভরণা শোভাঢ্যা, চারুহাসিনী। অহিংসাঃ- শ্যামবর্ণা। ক্ষমা ঃ- গৌরবর্ণা, হাস্যমুখী, পদ্মনেত্রা। প্রজ্ঞা ঃ হংস ও চন্দ্র তুল্য শুভ্রা, মুক্তাহারে ভূষিতা, শ্বেতবস্ত্র, পুস্তক ও অক্ষমালাধারিণী। দয়া ঃ- লাক্ষাবর্ণা, পীতাম্বরা, পীতপুষ্পমাল্যা, অলঙ্কারভূষিতা, সুপ্রসন্না। দ্রঃ- দেবতা ব্যন্তর।

দেবতা উষ্ণীষ—বজ্রযানে উল্লিখিত আটজন দেবতা। যেন ধ্যানী বুদ্ধেরই সংস্করণ। এরা সকলেই এক মুখ, দু হাত, এক এক দিকে অবস্থান। ভূষণাবরণাঢ্য, রত্নমুকুট

বজ্র উষ্ণীষ	পূব	শ্বেত	ভূস্পর্শমুদ্রা।
রত্ন উষ্ণীষ	দক্ষিণ	নীল	বরদমুদ্রা।
পদ্ম উষ্ণীষ	পশ্চিম	রক্ত	ধ্যানমুদ্রা।
বিশ্ব উষ্ণীষ	উত্তর	শ্যাম	অভয়মুদ্রা।
তেজ উষ্ণীষ	অগ্নি	সিতরক্ত	সূর্যভৃৎ।
ধ্বজ উষ্ণীষ	নৈঋত	রক্তনীল	চিন্তামণিপতাকা
তীক্ষ্ণ উষ্ণীষ	বায়ু	নভোশ্যাম	কৃপাণপুস্তক।
ছত্র উষ্ণীষ	ঈশান	শ্বেত	ছত্র।

দ্রঃ- উষ্ণীষ বিজয়া।

দেবতা জৈন—জৈন দেবদেবীদের চারটি ভাগ ঃ—জ্যোতিষী, বিমানবাসী, ভবনপতি ও ব্যন্তর দেবতা। তীর্থঙ্করদের বাদ দিয়ে এই হিসাব। সাধারণত নবগ্রহ, দিকপাল, যক্ষ, ও যক্ষিণী মূর্তিদের দেখা যায় তীর্থঙ্করদের উপাসক হিসাবে। এ ছাড়া আরো ষোল জন বিদ্যাদেবী রয়েছেন ; এদের মধ্যে সরস্বতী প্রধান। অষ্ট মাতৃকা, ভৈরব, ৬৪ যোগিনী, লক্ষ্মী, গণেশ ও ক্ষেত্রপাল ইত্যাদিও আছেন। সাধারণত এগুলি ব্রাহ্মণ্য দেবতাদের মতই দেখতে। জৈন নৈগমেষ দেবরাজ ইন্দ্রের সেনাপতি; ইনি ব্রাহ্মণ্য দেবতা ছাগমুখ দক্ষ প্রজাপতি বা কার্তিকের অনুচর ছাগবক্ত্র যেন। ঋষভদেবের উপাসক —শাসন দেবতা গোমুখ যক্ষ নিশ্চিত মহাদেব নন্দিকেশ্বর। ব্রাহ্মণ্য ব্রহ্মা যক্ষ ব্রহ্মা হয়ে শীতলনাথের উপাসক হয়েছেন। ঈশ্বর যক্ষ ও ষণ্মুখ যক্ষ ব্রাহ্মণ্য শিব ও কার্তিক। এ ছাড়া যক্ষ, কুমার, গরুড়, কুবের, ও বরুণ নামে দেবতারা অন্যান্য তীর্থঙ্করদের সঙ্গে রয়েছেন, এই নামগুলি ব্রাহ্মণ্য নাম কিন্তু কোন ব্রাহ্মণ্য দেবতা স্পষ্ট নয়। অম্বিকা ও

কুষ্মাণ্ডিনী নেমি নাথের শাসন দেবতা। অম্বিকা চেহারাতে ব্রাহ্মণ্য, সিংহ বাহিনী ; কিন্তু চার হাত, হাতে আম্রশাখা, পাশ, শিশু ও অঙ্কুশ ; জৈন পুরাণ কাহিনীও ভিন্ন। কুষ্মাণ্ডিনী ব্রাহ্মণ্য কুষ্মাণ্ডী (=দুর্গা) শব্দ থেকে জন্ম, সঙ্গে সাতজন অনুচরী নাচছে ; এঁরা যেন সপ্তমাতৃকা। পার্শ্বনাথের শাসন দেবতা পদ্মাবতী সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণ্য মনসা (= পদ্মা)। জৈন ধর্মের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্যই স্বাভাবিক ভাবেই ব্রাহ্মণ্য দেবতারা তীর্থঙ্করদের উপাসকে পরিণত হয়েছেন।

দেবতা বৈদিক—এঁরা শরীরী না অশরীরী তর্ক উঠেছিল একদিন। যাস্ক মন্তব্য করেছেন অপি বা উভয়বিধাঃ স্যুঃ। জটিল যুক্তির অবতারণা করেছিলেন যাস্ক। কিন্তু পতঞ্জলি এবং মীমাংসা দর্শনে জৈমিনি দেবতাকে মন্ত্রময়ী বলেছেন, ; অর্থাৎ শরীরী বলতে সেই যুগেতেও এঁরা কুণ্ঠিত হয়েছেন। বজ্রযানে মন্ত্র থেকে দেবতার জন্ম/আবির্ভাব এই একই জিনিস।

দেবতা বৌদ্ধ—বৌদ্ধরা যা কিছু পেয়েছেন সব কিছুকেই দেবতাতে পরিণত করে তাঁর মূর্তি রঙ, হাতে আয়ুধ ইত্যাদি দিয়ে সাজিয়ে তুলেছিলেন। বর্ণমালার অক্ষর থেকে আরম্ভ করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কারণ সব কিছুকেই দেবতা করে নিয়েছিলেন। চৈত্যদ্বারের অংশ, বিশেষ বিশেষ জন্তু কেউই দেবত্বলাভে বঞ্চিত হন নি। দ্রঃ- তারা, উষ্ণীষ দেবতা, দেবী বৌদ্ধ।

অসংখ্য দেবদেবী। বর্তমানের মনস্তাত্ত্বিকরা জানেন চাক্ষুষ উদধ্যাস সৃষ্টি করা কিছুই নয়। বৌদ্ধ আচার্য্য সিদ্ধরা এই চাক্ষুষ উদধ্যাস/হ্যালুসিনেসানের নাগপাশে বন্দী হয়ে পড়েন। উদধ্যাসে যা দেখতে পেতেন তাকেই সত্য বলে মর্যাদা দিয়েছিলেন। এছাড়াও এঁরা বিশেষ বিশেষ পদ্ধতি ধারা (মন্ত্র, যন্ত্র, মণ্ডল ইত্যাদি ইত্যাদি) নির্দিষ্ট করে লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। যার ফলে বিশেষ একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট একটি দেবতাকে চাক্ষুষ উদধ্যাস হিসাবে পাওয়া যেত। ফলিত/applied মনস্তত্ত্বের এটি একটি বড় দিক। অবশ্য যুগপৎ তাঁরা জানতেন এ সব দেবতাই শূন্যের প্রকাশ মাত্র ; মূল সত্য শূন্য। সনাতনীরাও যেমন বলে থাকেন দেবতারা ব্রহ্মের প্রকাশ মাত্র ; মূল সত্য ব্রহ্ম।

গৌতম বুদ্ধ অবশ্য নিজে মূর্তি পূজার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তবু প্রথম যুগেই তত্ত্বের দিক থেকে ৩৩টি সনাতন দেবদেবীকে বৌদ্ধরা স্বীকার করে নেন ; এরা ত্রয়স্ত্রিংশৎ স্বর্গে বাস করেন। এর পর মহাযানে বুদ্ধকে দেবতা ও লোকোত্তর বলে স্বীকার করা হয়েছিল। এর প্রমাণ সাঁচি, ভারহুত ইত্যাদিতে কোন বুদ্ধমূর্তি নাই : অর্থাৎ তখনও ইনি দেবতা নন। বুদ্ধের সময় স্তূপকে পূজা করা হত। স্তূপ হচ্ছে বৌদ্ধ ব্রহ্মাণ্ড ও সমস্ত বৌদ্ধ-স্বর্গের প্রতীক। ত্রিরত্নকেও পূজা করা হয়েছে এবং ত্রিরত্নের মধ্যে ধর্ম হচ্ছে দেবী।

প্রথম থেকেই বহু সঙ্ঘ বিদ্রোহ ঘটে আসছিল। দ্বিতীয় মহাসংগীতিতে দলগত কলহ প্রকাশ পায় ; কিছু মহাসাঙ্ঘিকরা বিতাড়িত হন ইত্যাদি। যেন এই সময় বা আরো আগে থেকেই হয়তো সঙ্গীতি বা সঙ্গীতি আকারে তন্ত্র এবং গুহ্যসমাজ

(গোপন ক্রিয়া কলাপ) চালু হয়েছিল। নতুন শিষ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে নতুন এবং জমকালো কিছু শিষ্যদের দিতে হবেই। এ ছাড়া সঙ্ঘের আচার্যরা থেকে সামান্য স্রোতাপন্নরাও আত্মতৃপ্তি পেতে চাইছিলেন; জটিল দর্শন কেউই ঠিক গিলতে চাইছিলেন না। ফলে গোপন ক্রিয়া কলাপ (গুহ্য সমাজ) জোরদার হয়ে উঠতে থাকে। এছাড়া বলা হয়ে থাকে গৌতমবুদ্ধ নিজেই এই সঙ্গীতি চালু করেছিলেন ও শিষ্যদের দিয়ে গিয়েছিলেন। বীজ মন্ত্রের মাধ্যমে দেবতাকে প্রত্যক্ষ করা রূপ ম্যাজিক ফলে দাবানলের মত ছড়াতে থাকে। গৌতম বুদ্ধের যুগে ম্যাজিক না হলে কোন ধর্মেরই টিকে থাকা সম্ভব ছিল না। ফলে গৌতমবুদ্ধকেও কিছু ম্যাজিক স্বীকার করতে হয়েছিলই। সনাতন ধর্মেও প্রচুর ভোজবাজির খেলা ছিলই।

ভগবান বুদ্ধ নিজে শ্রাবকযান ও প্রত্যেক বুদ্ধযান দুটি ভাগ সৃষ্টি করেন। এরপর মহাযান=বোধিসত্ত্বযান দেখা দেয়। অর্থাৎ ৩০০ খৃস্টাব্দ মত সময়ে তিনটি যান চালু হয় এবং এদের পেছনে চারটি দর্শন ছিল: (১) সর্বাস্তিবাদ/সৌত্রান্তিক, (২) বাহ্যার্থভঙ্গ/বৈশেষিক, (৩) বিজ্ঞানবাদ/যোগাচার, (৪) শূন্যবাদ/মধ্যমক। শ্রাবক যান ও প্রত্যেক যান বৈভাষিক দর্শনের ওপর গড়ে ওঠে। মহাযান দুধরণের—(১) পারমিতা নির্ভর ও (২) মন্ত্রন্যায় নির্ভর। এই পারমিতা ন্যায়, সৌত্রান্তিক, যোগাচার ও মধ্যমক নির্ভর। মন্ত্রন্যায় গড়ে উঠেছে যোগাচার ও মধ্যমকের ওপর। শূন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদ দিয়ে মন্ত্রন্যায়ের আরম্ভ এবং মহাসুখতত্ব এখানে গৃহীত হয়েছে।

বুদ্ধের প্রথম প্রতিমা তৈরি হয় গান্ধার বা মথুরা শৈলীতে। তন্ত্রে বুদ্ধের পূজার বিশেষ ও বিশদ ব্যবস্থা রয়েছে। বজ্রযানে ৫-টি ধ্যানী বুদ্ধের প্রচলন হয়; এরা ৫-টি স্কন্ধের (রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান) প্রতিমূর্তি। এই ভাবে ৫-টি কুল প্রতিষ্ঠিত হয়; এই ৫-টি কুল হচ্ছে দ্বেষ, মোহ, রাগ, চিন্তামণি ও সাম্য। বজ্রযানে শক্তি বা প্রজ্ঞার (সনাতনী প্রকৃতি) প্রচলন করে প্রতি কুলে বহু দেবদেবীর স্থান করে দেওয়া হয়। প্রতি দেবতার মাথায় কুলের পরিচয় হিসাবে সংশ্লিষ্ট ধ্যানীবুদ্ধের মূর্তি থাকবে ব্যবস্থা হয়। প্রতি দেবতার রঙ, ভাবভঙ্গি, আয়ুধ, বাহন, কাজকর্ম ইত্যাদিও নির্দিষ্ট করা হয়। দেবতাদের মাথা এক থেকে আট এবং হাতও অনুপাতে বাড়তে থাকে। অনেক সময় মাথা ও হাতের সংখ্যার অনুপাত থাকে না। পায়ের সংখ্যা বাড়তে সাধারণত দেখা যায় না। বাহন হিসাবে শূকরও পাওয়া যায় এবং বিগ্রহের একাধিক মাথা হলে একটি শূকর (ব্রাহ্মণ্য বরাহ) মাথাও দেখা যায়। এই সব দেবদেবীকে প্রত্যক্ষ পাবার জন্য মন্ত্র, যন্ত্র, মণ্ডল, মুদ্রা ইত্যাদি সব কিছু নির্দিষ্ট ও প্রবর্তিত হয়।

সুখাবতী ব্যূহে (১০০ খৃ) অবশ্য সব প্রথম অমিতাভ ও অবলোকিতেশ্বর প্রকল্প চালু হয়েছিল। প্রজ্ঞাপারমিতাতে বুদ্ধের ব্যাপক পূজার ব্যবস্থা রয়েছে কিন্তু কোন দেবতার ব্যবস্থা নাই। গুহ্যসমাজ গ্রন্থ লিখিত হয় ৩০০ খৃস্টাব্দে মত। এর আগে বৌদ্ধ দেবদেবীর সমারোহ প্রায় ছিল না। গুহ্যসমাজে প্রথম ৫-ধ্যানী বুদ্ধ, এদের পূজা ও যন্ত্রমন্ত্র ইত্যাদি পাওয়া যায়। অর্থাৎ গুহ্যসমাজের যুগে বৌদ্ধ দেবসমাজও গড়ে উঠল।

নিষ্পন্নযোগাবলীর লেখক অভয়াকরগুপ্ত; মোটামুটি ১০৮৪-১১৩০ খৃ। এই

গ্রন্থে অসংখ্য দেবদেবীর উল্লেখ রয়েছে। ১৬ জন বোধিসত্ব, ১২-জন প্রজ্ঞা পারমিতা, ১২ জন বাসিত, ১২-টি ভূমি ও ৪-টি প্রতিসম্বিতের উল্লেখ রয়েছে।

দেবতার হাতে বজ্র অর্থাৎ এটি শূন্যের প্রতীক ; ঘণ্টা অর্থে প্রজ্ঞা, কর্তরী অর্থে অজ্ঞানতা নাশক ও কপাল অর্থে one-ness ; এবং যুগবদ্ধ অর্থে দ্বৈত ও অদ্বৈতের মধ্যে কোন তফাৎ নাই।

অমিতাভকে প্রথম পাওয়া যায় সুখাবতী ব্যূহে ; চীনা অনুবাদ ১৪৮—১৭০ খৃ ইনি সুখাবতী বা অকনিষ্ঠ স্বর্গের অধিপতি ; এবং অবলোকিতেশ্বরের জন্মদাতা। সুখাবতীর আর এক সংস্করণের চীনা অনুবাদে (৩৮৪—৪৭১ খৃ) আরো দুজনকে অর্থাৎ অক্ষোভ্য—তথাগত. এবং মঞ্জুশ্রী (দ্রঃ) বোধিসত্ত্বকে পাওয়া যায়। ফা-হিয়েন (৩৯৪—৪১৪)- মঞ্জুশ্রী, অবলোকিতেশ্বর ও মৈত্রেয়-র উল্লেখ করেছেন। য়ুয়ান-চুয়াঙ (৬২৯-৬৪৫) অবলোকিতেশ্বর, হারিতি, ক্ষিতিগর্ভ, মৈত্রেয়, মঞ্জুশ্রী, পদ্মপাণি, বৈশ্রবণ, শাক্যবুদ্ধ, শাক্য-বোধিসত্ত্ব ও যমের উল্লেখ করেছেন। ইৎ-সিঙ (৬৭১—৬৯৫) অবলোকিতেশ্বর, অমিতায়ুস্, হারিতি. চতুর্মহারাজিক, মৈত্রেয়, মঞ্জুশ্রী, যক্ষ ও অন্যান্য আরো দেবতার কথা বলেছেন।

ধ্যানী বুদ্ধ এবং এদের কুল কল্পনার পর থেকে বৌদ্ধদের দেবীর সংখ্যা বাড়তে বাড়তে বিপুল হয়ে উঠল। ভারতে এই ভাবে নতুন নতুন বৌদ্ধ দেবদেবীর উদ্ভাবনা দেখে চীন, জাপান ও তিব্বতেও তাদের স্থানীয় ঐতিহ্যকে ভিত্তি করে নতুন নতুন দেবদেবীর সৃষ্টি হতে লাগল। অর্থাৎ মোট সংখ্যা প্রায় ৩৩ কোটি মত যেন। বৌদ্ধ সমাজ, মঠ, আচার্যদের চাহিদা অনুসারে দেশ ও কাল অনুযায়ী নতুন নতুন দেবতার আবির্ভাব হয়েছিল।

পর্ণশবরী, অপরাজিতা ইত্যাদি কিছু দেবীকে দেখা যায় গণেশকে পদদলিত করছেন। অন্যান্য বহু দেবতার আসনের নীচে বহু ব্রাহ্মণ্য দেবতার স্থানে হয়েছে। ব্রহ্মা. বিষ্ণু, শিব ও ইন্দ্রকে মার বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এরাও পদদলিত হয়েছেন। শিবপার্বতীকে ত্রৈলোক্য বিজয় পদদলিত করেছেন। নারায়ণকেও বাহন করা হয়েছে। ব্রহ্মার ওপর বৌদ্ধদের ক্রোধ যেন সর্বাধিক। ব্রহ্মবাদকে উচ্ছেদ করার জন্য বহু বৌদ্ধ দেবতার হাতে ব্রহ্মার ছিন্নমুণ্ড ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখানে অবান্তরে হলেও আধুনিক মনস্তত্ত্বের বিচারে মনে হয় বৌদ্ধ আচার্যদের মনে মৈত্রী বা করুণার কোন ছায়া থাকলে এ ভাবে বৌদ্ধ দেবদেবীর কল্পনা সম্ভব হত না। ভাগ্যের পরিহাসে নিরুপাধিক ব্রহ্মই বৌদ্ধ দর্শনের শূন্য।

আবার খৃ ১০ম শতকে সনাতনীদের সঙ্গে মিলিত হবার চেষ্টায় বহু বহু ব্রাহ্মণ্য দেবতাকে কালচক্রে বৌদ্ধ দেবতা হিসাবে স্বীকার করে পূজা করা হতে থাকে। এঁরা তখন আর বৌদ্ধ দেবতাদের পদদলিত নন। ফলে খৃ ১০ শতকের পর একই গণেশ কোথাও কোন বৌদ্ধ দেবতার পদদলিত, আবার আর এক স্থানে বৌদ্ধ দেবতা হিসাবে সযত্নে পূজিত হতে থাকেন।

কিছু মতে বৌদ্ধদের মহাচীন-তারা তারা-হিসাবে, জাঙ্গুলী মনসা-হিসাবে, বজ্র-

যোগিনী ছিন্নমস্তা হিসাবে ব্রাহ্মণ্য দেবীতে পরিণত হয়েছেন। আবার বহু মতে সনাতনীরা সব সময়ই দিয়ে এসেছে ; কোন বৌদ্ধ দেবতাকে গ্রহণ করে নি।

বৌদ্ধ দেবতাদের রঙ আছে বটে কিন্তু নির্দিষ্ট নয়। শান্তিকবিধি অনুসারে পূজার সময় দেবতার রঙ পীত বা শ্বেত ; এই দেবতাই তারপর আকর্ষণ বিধিতে সবুজ বা লাল এবং মারণ বিধিতে পূজার সময় নীল। নীল রঙ দেবতাগুলি সাধারণত ভয়ঙ্কর মূর্তি দেবতা। বৌদ্ধচিন্তাতে মোটামুটি ৫টি রঙ গ্রহণ করা হয়েছিল, শ্বেত (জল সম্পর্কিত), পীত (স্থিতি সম্পর্ক), লাল (অগ্নি সম্পর্ক), সবুজ (আকাশ সম্পর্ক), এবং নীল (বায়ু সম্পর্ক)। এই রঙগুলির মধ্যে শ্বেত ও পীত শান্ত রঙ ; বাকি তিনটি রঙ ঘোর রূপের দ্যোতক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। দেবতাদের আসন ও আয়ুধেরও বিশেষ বিশেষ ব্যাখ্যা আছে। যবযুম অর্থে পিতা ও মাতা, আলিঙ্গিত মূর্তি অর্থে নির্বাণ দশা।

বৌদ্ধ দর্শনের শূন্য থেকে এই সব দেবতাদের উৎপত্তি, শূন্যই দেবতা হিসাবে রূপ নেন (দ্রঃ ধ্যানী বুদ্ধ) এবং ভক্তের বাসনা পূর্ণ করে দিয়ে আবার শূন্যে মিলিয়ে যান। নির্বাণ লাভ এই শূন্যে লীন হয়ে যাওয়া। তত্ত্ব হিসাবে এই শূন্য এত কঠিন যে এর অপর নাম বজ্র। বৌদ্ধ দর্শনে ধ্যানীবুদ্ধেরাও শূন্যের বিগ্রহ মাত্র। অর্থাৎ বৌদ্ধ দর্শনের সব দেবতা ইত্যাদি নিরুপাধি শূন্যের প্রকাশ মাত্র। বোধি চিত্ত অর্থে বোধি লাভের জন্য চিত্ত। এই বোধি চিত্তই বিভিন্ন আয়ুধ। বিখ্যাত শ্লোকটি ঃ-বোধিচিত্তম্ ভবেৎ বজ্রম্, প্রজ্ঞা ঘণ্টা বিধীয়তে, চক্রম অজ্ঞান ছেদাৎ চ রত্নম্ তু দুর্লভাৎ অপি। ভবদোষৈঃ অলিপ্তত্বাৎ জ্ঞানম্ তৎ পদ্মম্ উচ্যতে, খড়্গঃ ক্লেশারি সংচ্ছেদাৎ উৎপলম্ প্লবনাৎ তথা। অর্থাৎ বৌদ্ধ দেবতাদের হাতে খড়্গ বা সূচসুতা সবই বোধিচিত্ত। এ ছাড়া পূজা শেষে দেবতাকে বলা হয় গচ্ছধ্বম্ বুদ্ধবিষয়ম্ পুনরাগমনায় মুঃ। এই সব আয়ুধ, রক্তপূর্ণ কপাল, ব্রহ্মার ছিন্নশির ইত্যাদি বৌদ্ধ অচেতন মনের একটা ভয়ঙ্কর দিক উদ্ভাসিত করে তোলে। প্রকাশ্যে অবশ্য এঁরা অহিংস ছিলেন, এটা অবিসংবাদিত সত্য। দ্রঃ -দেবী বৌদ্ধ।

দেবতা, বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ্যকুল -বহু ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীকে বৌদ্ধধর্মে গ্রহণ করা হয়েছে। বহু দেবদেবীকে বৌদ্ধ দেবদেবীর দ্বারা পদদলিতও করা হয়েছে। বৌদ্ধধর্মে ব্রাহ্মণ্য দেবতারা এসে বৌদ্ধ রঙ, প্রতীক ও ধ্যানীবুদ্ধ কুল পেতে বাধ্য হয়েছেন। মাথায় শিখা রেখে দিয়ে আধুনিক ব্রাহ্মণ যেন। অর্থাৎ স্বাধীন বলিষ্ঠ চিন্তাধারার অভাব অনস্বীকার্য। কিছু দেবতাকে নেওয়া হয়েছিল হয়তো সনাতনীদের প্ররোচিত করে বৌদ্ধ করার জন্য। বৌদ্ধধর্মের প্রেম, মৈত্রী, ও ভালবাসার মুখোসের নীচে কি ভয়ঙ্কর হিংসা লুকিয়েছিল! যার ফলে বিষ্ণু ইত্যাদিকে বৌদ্ধ দেবতার পাদপীঠে পরিণত হতে হয়েছিল। ফ্রয়েডীয় বিশ্লেষণে যা পাওয়া যায় তার উল্লেখ না করাই ভাল। এই তুলনায় ব্রাহ্মণ্য চিন্তাধারায় ভগবানবুদ্ধ কিন্তু বিষ্ণুর অবতার।

(১) মহাকালকে সাধনমালা ও নিষ্পন্নযোগাবলীতে পাওয়া যায়। এঁকে নানা রূপ দেওয়া হয়েছে। একজন বৌদ্ধ ঘোর-দেবতাতে পরিণত হয়েছেন। ছয় হাত, দেবতার হাতে বজ্রপাশ রয়েছে। ১৬ হাত দেবতার মাথায় ৫-জন ধ্যানী বুদ্ধ স্থান

পেয়েছেন। এই মহাকালকে ঘিরে আটজন দেবী অবস্থিত। এদের নাম ঃ-মহামায়া, যক্ষদূতী, কালদূতী, কালিকা, চাঁচিকা, চণ্ডেশ্বরী, কুলিশেশ্বরী এবং মহাকালের নিজের শক্তি। মহাকালকে মারণ কর্মে পূজা করা হয়। যে সব বৌদ্ধরা তাঁদের আচার্য ও ত্রিরত্নকে ঠিক মত ভক্তি করে না তাদের এই মহাকাল খেয়ে ফেলেন।

(২) গণপতি—সাধনমালাতে একে একবার মাত্র পাওয়া যায়। মাথা, বার হাত, মূষিক বাহন, একদন্ত। হাতে বৌদ্ধ বজ্র ও আয়ুধ। নিম্নে দ্রষ্টব্য।

(৩) গণপতিহৃদয়া। গণপতির শক্তি সম্ভবত। কোন ধ্যানীবুদ্ধ কুল অ

(৪) সরস্বতী। এক মুখ, দু হাত বা তিন মুখ, ছয় হাত। বৌদ্ধদেরও ...ার দেবী। এর বিভিন্ন রূপ ঃ—(৪-১) মহাসরস্বতী, শ্বেতবর্ণ, হাতে কোন আয়ুধ শান্তমূর্তি। বীণা ও নাই। একে ঘিরে প্রজ্ঞা, মেধা, স্মৃতি ও মতি চারজন দেবী অব... করছেন। (৪-২) বজ্রবীণা সরস্বতী, শ্বেতবর্ণা, হাতে বীণা আছে। একে ঘিরেও অনুরূপ চারজন দেবী অবস্থিত। (৪-৩) বজ্র শারদা, দু হাত, হাতে পুস্তক, বীণা নাই। একে ঘিরেও প্রজ্ঞা ইত্যাদি চারজন দেবী। (৪-৪) আর্য সরস্বতী শ্বেতবর্ণা। (৪-৫) বজ্র সরস্বতী তিনমুখ, ছয়হাত, রক্তবর্ণ; কর্তরি ইত্যাদি আয়ুধ ও ব্রহ্মার কপাল হাতে।

নিষ্পন্নযোগাবলীতে ব্রাহ্মণ্য দিকপালদেরও নেওয়া হয়েছে। বৌদ্ধ দৃষ্টিতে এঁরা মূর্তিমান দিক। (১) ইন্দ্রকে পূর্ব দিকের অধিপতি বলা হয়েছে। বর্ণ পীত ; ঐরাবতের পিঠে। এক হাতে একটি স্ত্রীর স্তনম্ চ দধানঃ। (২) যম ঃ—কৃষ্ণবর্ণ, দু হাত, মহিষ পৃষ্ঠে, দক্ষিণ দিকে, মৃত্যুর দেবতা। (৩) বরুণ, দুহাত, পশ্চিমে, শ্বেতবর্ণ, মকর বাহন, হাতে সর্পপাশ ও শঙ্খ। (৪) কুবের ঃ পীতবর্ণ, নরবাহন, উত্তরে, হাতে অঙ্কুশ ও গদা। (৫) ঈশান ঃ- বর্ণশ্বেত, নীলকণ্ঠ, দুহাত, ঈশান কোণে, বৃষবাহন, মাথাতে চন্দ্রকলা। (৬) অগ্নি ঃ—রক্তবর্ণ, দুহাত, ছাগবাহন, হাতে শ্রুব ও কমণ্ডলু, অগ্নি কোণে। (৭) নৈঋর্তি ঃ—নীলবর্ণ ; দু হাত, শরবাহন, নৈঋর্ত কোণে, রাক্ষসাধিপতি। (৮) বায়ু ঃ- নীলবর্ণ : দু হাত, মৃগবাহন ও বায়ু কোণে অবস্থিত। এরপর দশজন ব্রাহ্মণ্য প্রধান দেবতাকে নেওয়া হয়েছে। (১) ব্রহ্মা, বর্ণপীত, বাহন হংস, হাতে ব্রাহ্মণ্য অক্ষসূত্র ইত্যাদি। (২) বিষ্ণু ঃ—চারহাত, শঙ্খ, চক্র ইত্যাদি, বাহন গরুড়। (৩) কার্তিকেয় ঃ—রক্তবর্ণ, ছয় হাত, প্রতীক কুক্কুট এবং বাহন ময়ূর। একটি হাতে বজ্র। (৫) বারাহী—কৃষ্ণবর্ণ, চারহাত, প্রতীক রোহিত মৎস্য, বাহন পেচক। (৬) চামুণ্ডা ঃ—রক্তবর্ণ, চারহাত, শববাহনা। (৭) ভৃঙ্গি ঃ—কৃষ্ণবর্ণ চার হাত, হাতে অক্ষসূত্র, কমণ্ডলু ইত্যাদি। (৮) গণপতি ঃ—নিষ্পন্নযোগাবলীতে কয়েকবার এর উল্লেখ রয়েছে ; জনপ্রিয় দেবতা, সিতবর্ণ, চারহাত, করিবক্ত্র, মূষিকবাহন, হাতে ত্রিশূল, মূলা, লাড্ডু ইত্যাদি। (৯) মহাকাল ঃ—কৃষ্ণবর্ণ, দুহাত, প্রতীক ত্রিশূল। (১০) নন্দিকেশ্বর ঃ- বর্ণ কৃষ্ণ, দুহাত, প্রতীক মুরজ, বাহন মুরজ।

নিষ্পন্নযোগাবলীতে ব্রাহ্মণ্য নবগ্রহকে গ্রহণ করা হয়েছে। (১) আদিত্য ঃ—রক্তবর্ণ, দু হাত, সপ্তাশ্বরথ। (২) চন্দ্র ঃ—শুভ্রবর্ণ, দুহাত, হংস বাহন। (৩) মঙ্গল ঃ- রক্তবর্ণ, দুহাত, হাতে ছিন্ন নরমুণ্ড, ছাগবাহন। (৪) বুধ ঃ—পীত বর্ণ, দুহাত, ধনুর্বাণ।

(৫) বৃহস্পতি ঃ—গৌরবর্ণ, দুহাত, প্রতীক অক্ষসূত্র ও কমণ্ডলু, বাহন ভেক বা কপাল (৬) শুক্র ঃ—বর্ণ শুক্ল, দুহাত, প্রতীক অক্ষকমণ্ডলু। (৭) শনি ঃ—কৃষ্ণবর্ণ, দুহাত, প্রতীক দণ্ড, বাহন কচ্ছপ, আকাশে শনির গতিও মন্থর। (৮) রাহু ঃ—বর্ণ রক্তকৃষ্ণ, দুহাত ; হাতে চন্দ্র ও সূর্য। (৯) কেতু—বর্ণ কৃষ্ণ, দুহাত, প্রতীক খড়্গ ও নাগপাশ।

এরপর বলভদ্র মণ্ডল একটি ভাগ। চারজন দেবতা ; নিষ্পন্নযোগাবলীতে এঁদের উল্লেখ রয়েছে। ব্রাহ্মণ্যধর্মে এই চারজন নাকি কামদেবের সহায়। (১) বলভদ্র ঃ-বর্ণশ্বেত, চার হাত, প্রতীক লাঙ্গল, বাহন কুঞ্জর। (২) জয়কর ঃ—শ্বেতবর্ণ, চার হাত, প্রতীক মালা, কোকিল রথ। (৩) মধুকর ঃ- গৌরবর্ণ, প্রতীক মকরধ্বজ, শুকরথ। (৪) বসন্ত ঃ-সিতবর্ণ, চার হাত, বাহন প্লবঙ্গ।

এরপর যক্ষ, কিন্নর, গন্ধর্ব ও বিদ্যাধরদের রাজাদের দেবতাতে পরিণত করা হয়েছে। যক্ষেরা ধনপতি। আটজন যক্ষরাজের নাম দেওয়া হয়েছে পূর্ণভদ্র, ধনদ, চিবিকুণ্ডলী, সুখেন্দ্র, মণিভদ্র, বৈশ্রবণ, কেলিমালী ও চলেন্দ্র। এদের ডান হাতে বীজপুরক এবং বাম হাতে নকুল। লেবু ও নকুল জম্ভলের প্রতীক। এদের বর্ণ বিভিন্ন। কিন্নর রাজের নাম নাই ; তবে তাকে রক্ত গৌর ও বীণাবাদনপর বলে বর্ণনা করা হয়েছে। গন্ধর্ব রাজকে পঞ্চশিখ বলা হয়েছে : রঙ পীত এবং বীণা বাজাচ্ছেন। বিদ্যাধর রাজাকে সর্বার্থসিদ্ধ নাম দেওয়া হয়েছে ; শ্বেতবর্ণ, এবং কুসুমমালা হস্ত। এরপর অশ্বিনী, ভরণী আদি আটাশটি নক্ষত্রকে দেবতাতে পরিণত করা হয়েছে, এদের সকলেরই দু হাত ; অঞ্জলিবদ্ধ। রঙ এদের বিভিন্ন এবং আটাশটি রঙ না পাওয়ার ফলে একই রঙ একাধিক নক্ষত্রকে দিতে হয়েছে। যেমন অশ্বিনী, অশ্লেষা, হস্তা ইত্যাদিকে শ্বেত রঙ কল্পনা করা হয়েছে। বার মাসের দেবতা হিসাবে কালচক্র মণ্ডলে রয়েছে চৈত্রে নৈঋতি, ফাল্গুনে যক্ষ, আষাঢ়ে যক্ষমুখ, আশ্বিনে শক্র, মার্গশীর্ষে রুদ্র, ভাদ্রপাদে গণেশ, বৈশাখে বায়ু, জ্যৈষ্ঠে অগ্নি, পৌষে কুবের, কার্তিকে ব্রহ্মা, শ্রাবণে সমুদ্র এবং মাঘে বিষ্ণু। সাধারণ দেবতা হিসাবে এদের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা থেকে কালচক্রমণ্ডলের দেবতারা কিছুটা তফাৎ। কালচক্র মণ্ডলে এদের চার হাত এবং সঙ্গে শক্তি রয়েছে ; এবং বাহন ও বিভিন্ন। দ্বাদশ রাশিকেও দেবতা করা হয়েছে। এই ভাবে বৌদ্ধ দেবতা সংখ্যা অসংখ্য।

দেবতা ব্যন্তর—মূল দেবতা বাদ দিয়ে বাকি গুলি। জৈন মতে পিশাচ, ভূত, যক্ষ রাক্ষস, কিন্নর, কিম্পুরুষ, মহোরগ ও গন্ধর্ব। বৌদ্ধ মতে যক্ষ, নাগ, দেব, রাক্ষস, গন্ধর্ব অসুর, গরুড়, কিন্নর ও মহোরগ। সনাতন মতে আরো কয়েক জন দলে যুক্ত হয়েছেন ঃ কুম্ভনাদ, কবন্ধ, দৈত্য, দানব, অপ্সরা, সিদ্ধ, সাধ্য, বিদ্যাধর, প্রমথ ও গণ।

দেবদত্ত—বুদ্ধের খুল্লতাত পুত্র। ঐতিহাসিক মতে খৃ-পূ ৬ শতকে জন্ম। নিজের ভাই আনন্দের মত স্বেচ্ছায় যৌবনে সংসার ত্যাগ করে বুদ্ধের কাছে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। বিম্বিসারের ছেলে অজাতশত্রুকে প্রভাবিত করেছিলেন। সংস্কারবাদী বুদ্ধের সঙ্গে রক্ষণশীল দেবদত্তের মত বিরোধ ঘটে। বুদ্ধের পর দেবদত্ত সঙ্ঘের নেতা হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বুদ্ধের আদেশে মহাপরিনির্বাণের পর বিনয় ও ধর্ম অনুসারে সংঘ

কার্য পরিচালিত হতে থাকে। বাসস্থান, ভোজন ও পরিধেয় সম্বন্ধে ৫-টি কঠোর নিয়ম দেবদত্ত বাধ্যতামূলক করতে চান ; এবং এই সব বিষয়ে চলতি বিকল্প নিয়ম-গুলিকে বাতিল করতে চান। এ বিষয়ে সঙ্ঘ তাঁকে তিন বার নিরস্ত হতে বলেন কিন্তু দেবদত্ত নিজের দাবি ত্যাগ না করায় সংঘাবশেষ অপরাধে অপরাধী হন এবং সংঘ-ভেদ করেন। বৌদ্ধ সাহিত্যে দেবদত্ত সম্বন্ধে প্রচলিত নানা কাহিনী এবং বুদ্ধ-দেবকে হত্যা করার চেষ্টাও উল্লিখিত আছে। (২) অর্জুনের শঙ্খ। দ্রঃ-বিন্দুসর। বরুণের কাছ থেকে ময় এই শঙ্খ লাভ করেছিলেন। ইন্দ্রপ্রস্থ নগরী তৈরি করে দিয়ে এই শঙ্খ অর্জুনকে ময় (মহা ২।৩।৭) উপহার দেন। মহা ৩।১৬৫।২২ শ্লোকে আছে কালকেয় ইত্যাদি নিধনের জন্য যাত্রা করলে দেবতারা এই শঙ্খ দিয়েছিলেন। মহা ৩।১৭১।৫ শ্লোকে আছে কালকেয়দের সঙ্গে যুদ্ধে যাবার সময় ইন্দ্র অর্জুনকে দিয়েছিলেন। (৩) উতথ্য মুনির পিতা।

দেবদারুবন—গাড়োয়ালে কেদারের কাছে গঙ্গাতীরে। এখানে লিঙ্গ পূজার প্রথম প্রবর্তন হয়। এই বনে বদরিকাশ্রম অবস্থিত। দ্রঃ- দারুবন, কামাশ্রম।

দেবদাসী—বড় বড় মন্দিরে দেবতার সামনে নৃত্যগীত পরিবেশনের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত কন্যা। নাচ গানে এদের অতি উত্তম শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা চালু ছিল। এঁরা যেন স্বর্গে ইন্দ্র সভার অপ্সরী। সমাজে এঁদের মর্যাদাও অপরিসীম ছিল। কবে এ প্রথা চালু হয়েছিল অস্পষ্ট। দেবদাসী সৃষ্টির মাধ্যমে নৃত্য ও সঙ্গীত শিল্পের একটা মহতী আদর্শ রূপ নিয়েছিল সত্য। কিন্তু বাস্তবের মানবীয় দুর্বলতা সমস্ত নান্দিক মূল্যকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছিল।

দেবপুর—মধ্যভারতে রায়পুর জেলাতে মহানদী ও পইরি প্রেতোদ্ধারিণী সঙ্গমে রাজিম বা রাজীবলোচন। রায়পুর সহর থেকে ২৪ মাইল দ-পূর্বে। শত্রুঘ্নকে রক্ষা করতে রাম এখানে এসেছিলেন। এখানে রামচন্দ্রের মন্দিরে অষ্টম শতকের একটি লিপিলেখ রয়েছে।

দেববতী—মণিময় গন্ধর্বের মেয়ে ; রাক্ষস সুকেশের স্ত্রী ; ছেলে মাল্যবান, সুমালি, মালি। অন্য মতে গ্রামণী নামে গন্ধর্বের মেয়ে (রমা ৭।৫।১)।

দেববন্দর—দিউ ; গুজরাটে। খৃ ৭-ম শতকে পার্সিরা প্রথমে এখানে আসেন। তারপর ভারতে পশ্চিম উপকূলে সঞ্জন দ্বীপে বসবাস আরম্ভ করেন।

দেববর্ণিনী—ভরদ্বাজ মুনির মেয়ে : বিশ্রবার স্ত্রী (রামা ৭।৩।৩)। ছেলে বৈশ্রবণ (=কুবের)। বা বৃহস্পতির মেয়ে।

দেবব্রত—ভীষ্মের এক নাম।

দেবমিত্র শাকল্য—মাণ্ডূকেয় মুনির ছেলে। বেদজ্ঞ পণ্ডিত। মুদ্গল গোকল, মৎস্য খালিল্য, ও শৈশিরেয় এঁর শিষ্য।

দেবমীঢুষ—ক্রোষ্টুর (দ্রঃ) ছেলে। স্ত্রী অশ্মকী, ছেলে শূর (হরি ১।৩৪।২)।

দেবযান—যজ্ঞ ইত্যাদি কর্মকাণ্ড ত্যাগ করে যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্ম উপাসনা নিয়ে জীবন কাটান তাঁরা মৃত্যুর পর যে পথে ব্রহ্মলোকে যান।

দেবযানী—শুক্রাচার্যের প্রথম মেয়ে। স্ত্রী প্রিয়ব্রতের মেয়ে ঊর্জস্বতীর (দ্রঃ) সন্তান এই দেবযানী। দ্রঃ- জয়ন্তী, কচ। শুক্রাচার্য দৈত্য বৃষপর্বার পুরোহিত; ফলে রাজ-কন্যা শর্মিষ্ঠা ও দেবযানী সখী ছিলেন। এক দিন এ'রা দুজনে পরিচারিকাদের নিয়ে জলক্রীড়া করছিলেন। ইন্দ্র এই সময়ে এখানে আসেন এবং বায়ুরূপে এদের পরিধেয়-গুলি উড়িয়ে একত্রে মিশিয়ে দেন। এরা জল থেকে তাড়াতাড়ি উঠে অন্য মতে স্নান সেরে যথা সময়ে উঠে কাপড় পরেন এবং শর্মিষ্ঠা ভুলে দেবযানীর কাপড় পরেন এবং দেবযানীর কাছে রূঢ় ভাবে তিরস্কৃত হন। শর্মিষ্ঠাও তখন শুক্রাচার্যকে বৃষপর্বার স্তাবক, দেবযানীকে ভিক্ষুকী ইত্যাদি বলে গালি দেন। এর পর দুজনে হাতাহাতি হয় এবং দেবযানীকে পাশে একটি কূপে ঠেলে ফেলে দিয়ে দেবযানী মরে গিয়েছে মনে করে স-ক্রোধে প্রাসাদে ফিরে যান। এইসময়ে যযাতি বনে মৃগয়াতে এসেছিলেন; ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত হয়ে এখানে এসে অন্য মতে দেবযানীর আর্তস্বরে এখানে এসে; পরিচয় চান এবং নিজের পরিচয় দেন। দেবযানী নিজের ডান হাত বাড়িয়ে দিয়ে রাজাকে বলেন উদ্ধার করে দিতে। যযাতি শুষ্ক কূপ থেকে তুলে দিয়ে ফিরে যান। মেয়ে ফিরছে না দেখে শুক্রাচার্য ও ঊর্জস্বতী ব্যস্ত হয়ে পরিচারিকা ঘূর্ণিকাকে (দ্রঃ) পাঠান; মহাভারতে ঘূর্ণিকা দেবযানীর সঙ্গেই ছিলেন যেন। একে দিয়ে দেবযানী বলে পাঠান বৃষপর্বার রাজ্যে তিনি প্রবেশ করবেন না।

ঘূর্ণিকার (মহা ১।৭৩।২৪) কাছে খবর পেয়ে শুক্রাচার্য এসে উপস্থিত হন। দেব-যানীরও নিশ্চয় কোন দোষ আছে (মহা ১।৭৩।২৪) শুক্রাচার্য বলেন এবং বোঝাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু দেবযানী অটল থাকেন। শুক্রাচার্য তখন বৃষপর্বাকে সব কথা জানিয়ে অন্যত্র চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। রাজা এসে অনুনয় বিনয় করে এ'দের শান্ত করেন এবং ঠিক হয় হাজার দাসী সমেত শর্মিষ্ঠা দেবযানীর সেবা করবেন এবং দেবযানীর বিয়ে হলে দাসীরূপে এ'র অনুগমন করবেন।

এর বহুদিন পরে যযাতি আবার এক দিন বনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন বা মৃগয়াতে এসেছিলেন; দেবযানীর সঙ্গে তমেব দেশে দেখা হয়ে যায়। শর্মিষ্ঠা ও সহস্রদাসী নিয়ে দেবযানী খেলা করছিলেন এবং মধুমাধবী ও বিভিন্ন ফল ও ভক্ষ্য খাচ্ছিলেন। শর্মিষ্ঠা পা টিপে দিয়ে ইত্যাদি সেবা করছিলেন। যযাতি দুজনের পরিচয় চান। দেবযানী পরিচয় দেন; এবং যযাতি পরিচয় দিলে অনুরোধ করেন সখা ভর্তা চ মে ভব।

শুক্রাচার্যের বিনা অনুমতিতে ক্ষত্রিয় রাজা যযাতি অসবর্ণ বিয়েতে রাজি না হলে দেবযানী পিতাকে আনিয়ে রাজার পরিচয় দিয়ে বলেন দুর্গে যঃ পাণিম্ অগ্রহীৎ; রাজাকে সে বিয়ে করবে। কচের অভিশাপ স্মরণ করে শুক্র রাজি হন। যযাতি তবু বর্ণ সংকরতার ভয় পান, শুক্র আশ্বাস দেন সে পাপ তিনি খণ্ডন করে দেবেন। শর্মিষ্ঠাকেও শুক্র দান করেন ও সাবধান করে দেন মা চ এনাং শয়নে হ্বয়ে (মহা ১।৭৬। ৩৪)। অন্য মতে প্রচুর যৌতুক ও এক হাজার পরিচারিকাকে দাসী হিসাবে পান। শুক্রাচার্য রাজাকে শর্মিষ্ঠার সম্পূর্ণ পরিচয় জানিয়ে দিয়ে তাকে উপযুক্ত সম্মান দিতে বলেন। সকলে প্রাসাদে ফিরে আসেন।

কালক্রমে দেবযানীর ছেলে হয় যদু এরপর সহস্র বৎসর পরে শর্মিষ্ঠা ঋতুপ্রাপ্তা হন ; এবং দেবযানীর ছেলেকে দেখে মন স্থির করেন এবং রাজা এলে চারুহাসিনী ঋতুং দেহি বলে প্রার্থনা করেন। যযাতি অধর্ম বলে বোঝাতে চান। শর্মিষ্ঠা যুক্তি দেখান সখীর স্বামীও তাঁর স্বামী ; দানশীল যযাতি কারো প্রার্থনা কোন দিন অপুরণ রাখেন না ইত্যাদি। শর্মিষ্ঠার যথা সময়ে ছেলে হয় দ্রুহ্যু ; এই সন্তান হতে দেবযানীর সন্দেহ হয়। কিন্তু শর্মিষ্ঠা মিথ্যা কথা বলেন ; এক ধর্মাত্মা ঋষি এসেছিলেন ; স ময়া যাচিতঃ ; এ তাঁরই অপত্য। দেবযানী ঋষির পরিচয় চান ; শর্মিষ্ঠা বলেন তিনি জানেন না। দেবযানী তখন আশ্বাস দেন ; শ্রেষ্ঠ দ্বিজের সন্তান যে হেতু সেই হেতু তিনি আর রাগ করছেন না (মহা ১।৭৮।৭)। দেবযানীর দ্বিতীয় ছেলে হয় তুর্বসু ; শর্মিষ্ঠার আরো দুটি ছেলে হয় অনু ও পুরু। এর পর যযাতি ও দেবযানী এক দিন উদ্যানে যখন বেড়াচ্ছিলেন তখন শর্মিষ্ঠার ছেলে তিন জন এগিয়ে আসে। কৌতূহলে বা সন্দেহে বালকদের কাছে কে তাদের পিতা ইত্যাদি দেবযানী জিজ্ঞাসা করে সব জানতে পারেন এবং শর্মিষ্ঠাকে প্রশ্ন করলে শর্মিষ্ঠা নির্ভয়ে বলেন সখীর স্বামীও তাঁর স্বামী। দেবযানী রাগে স্বামীকে ত্যাগ করে পিতার কাছে ফিরে যান। মহাভারতে যযাতি পেছু পেছু সান্ত্বনা দিতে দিতে আসেন। দেবযানী অভিযোগ করেন রাজা শর্মিষ্ঠাকে তিনটি পুত্র দিয়েছেন ; দেবযানীকে কেবল দুটি পুত্র দিয়েছেন ; শর্মিষ্ঠার দ্বারা তিনি 'অতিবৃত্তাস্মি' হয়েছেন। শুক্র শাপ দেন অধর্মকে প্রিয় করার জন্য দুর্জয়া জরা আক্রমণ করবে (মহা ১।৭৮।৩০)। দ্রঃ- যযাতি।

ভাগবতে (৯।১৪৮) দেবযানীরা জলে বিবস্ত্রা হয়ে খেলা করছিলেন। আকাশ পথে হর পার্বতীকে দেখে উঠে এসে কাপড় পড়েন। বিবস্ত্রা দেবযানীকে কূপে ফেলে দেন। যযাতি নিজের গায়ের চাদর পরতে দেন তারপর তুলে আনেন। শুক্র রাগে দেবতাদের দলে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন। দৈত্যদের স্বার্থে বৃষপর্বা শর্মিষ্ঠাকে দাসী হিসাবে দান করেন।

দেবযোনি—দেবতা থেকে জন্ম। দেবতা ও মানুষের মধ্যবর্তী। অপ্সরা, বিদ্যাধর, কিন্নর, যক্ষ, রক্ষ, পিশাচ, গুহ্যক, সিদ্ধ ও ভূত এই দশটি ভাগ।

দেবরক্ষিতা—দেবকীর বোন। কৃষ্ণের মাসি।

দেবরাত—(১) অভিমন্যুর ছেলে পরিক্ষিতের অন্য নাম। (২) ইক্ষ্বাকু বংশে নিমির বড় ছেলে। দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করার সময় মহাদেব একটি ধনুক দিয়ে দেবতাদের শিরশ্ছেদ করতে যান। দেবতারা তখন মহাদেবকে শান্ত করলে এই ধনুক তিনি দেবতাদের কাছে গচ্ছিত রাখেন। দেবতারা ধনুকটিকে দেবরাতের কাছে গচ্ছিত রাখেন। এই ধনুক ভেঙে সীতার বিয়ে হয়।

দেবরাষ্ট্র—মারাঠা দেশ। সমুদ্রগুপ্ত ৩৪০ খৃস্টাব্দে জয় করেছিলেন।

দেবর্ষি—ঋষি। এঁদের স্থান স্বর্গে ; নারদ ইত্যাদি।

দেবল—তত্ত ; সিন্ধুতে। এই সহরের ধ্বংসাবশেষ দিয়ে সিন্ধে লাহরি/লারি বন্দর নির্মিত।

দেবল—সরস্বতী তীরে আদিত্য তীর্থবাসী গৃহস্থ তপস্বী। ধৌম্যের বড় ভাই। বহু স্থানে ইনি অসিতদেবল নামে পরিচিত। মহাভারতে (৯।৪৯।১) আছে বসতি অসিতঃ দেবলঃ পুরা ; (৯।৪৮।৮) দদর্শ অথ দেবলঃ, এবং (৯।৪৯।৩৯) সমাপশ্যৎ ততঃ অসিতঃ ; অর্থাৎ একই ব্যক্তি বিভিন্ন নামে উল্লিখিত। আবার অসিত ও দেবল দু জন ঋষি অন্যত্র বলা হয়েছে। অসিত, দেবল ও অসিতদেবল তিনটি নাম মোটামুটি একটা মত বিরোধের সৃষ্টি করে।

(১) আদিত্য তীর্থে গার্হস্থ্যধর্ম অবলম্বন করে বিখ্যাত বেদজ্ঞ মুনি অসিতদেবল বাস করছিলেন। জৈগীষব্য (দ্রঃ) মুনি এক বার এঁর আশ্রমে এসে যোগ নিরত হয়ে বাস করতে থাকেন ; কোন কথা বলতেন না। কিছু দিন পরে এখান থেকে চলে যান কেবল খাবার সময় আসতেন। আশ্রমে জৈগীষব্য থাকা কালীন এক দিন দেবল আকাশ পথে সমুদ্রে এসে দেখেন জৈগীষব্য তাঁর আগেই সমুদ্রে এসেছেন, বাড়ি ফিরে এসে দেখেন বাড়িতেও জৈগীষব্য বসে রয়েছেন। জৈগীষব্যকে পরীক্ষা করার জন্য দেবল ব্যোমমার্গে উঠে গিয়ে দেখলেন অন্তরীক্ষচারী সিদ্ধগণ জৈগীষব্যের পূজা করছেন। তিনি আরো দেখলেন জৈগীষব্য স্বর্গলোক, পিতৃলোক, যমলোক, চন্দ্রলোক প্রভৃতি ঊর্দ্ধলোকে ভ্রমণ করে অন্তর্হিত হলেন। সিদ্ধেরা দেবলকে জানালেন জৈগীষব্য ব্রহ্মলোকে গিয়েছেন। দেবলের অবশ্য সেখানে যাবার মত পুণ্যবল নাই। দেবল এর পর আশ্রমে ফিরে এসে দেখেন জৈগীষব্য আশ্রমেই রয়েছেন। দেবল তার পর এঁর কাছে মোক্ষ ধর্ম গ্রহণ করে সিদ্ধি লাভ করেন। মোক্ষধর্ম গ্রহণ করার জন্য পিতৃগণ ও অন্যান্য প্রাণীগণ হাহাকার করতে থাকে (মহা ৯।৪৯।৫৫) ; অসিতদেবল তখন মোক্ষধর্ম ত্যাগ করবেন স্থির করেন। কিন্তু ফলমূল ওষধি ইত্যাদির কান্না শুনে মোক্ষধর্মে অবস্থান করে সিদ্ধিলাভ করেন। জন্মেজয়ের সর্প যজ্ঞেও উপস্থিত ছিলেন। এঁর মেয়ে সুবর্চলা ; সুবর্চলার স্বয়ংবর হয় ; মুনিপুত্রেরা সকলে আসেন এবং শ্বেতকেতুর গলায় ইনি মালা দেন। দ্রঃ- ঘনট।

অপর কাহিনীতে মহর্ষি অসিতের ছেলে। ব্যাসের শিষ্য ; ধৌম্যের বড় ভাই। শিবের বরে অসিত মুনির এক ছেলে হয় ; নাম হয় দেবল। রম্ভা এই দেবলের প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়েন কিন্তু দেবল প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে রম্ভার শাপে ইনি কৃষ্ণাঙ্গ ও অষ্ট অঙ্গ বেঁকে গিয়ে অষ্টাবক্র (দ্রঃ) নামে পরিচিত। বহু দিন ইনি রাধাকৃষ্ণের তপস্যা করেন ; রাধাকৃষ্ণ তার পর দেখা দেন এবং কৃষ্ণ এঁকে আলিঙ্গন করেন। দেবলের দেহ সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে যায় এবং বিমানে চড়ে রাধাকৃষ্ণের সঙ্গে স্বর্গে চলে যান। ব্যাস মহাভারত রচনা করেন ; দেবল এই কাহিনী পিতৃ-দেবদের মধ্যে প্রচার করেন (ব্রহ্মবৈবর্ত)। যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেকেও উপস্থিত ছিলেন। স্ত্রী হিমালয়ের কন্যা একপর্ণা (হরিবংশ১।১৮।২৩)। দ্রঃ- গজকুম্ভীর।

(২) প্রত্যূষের (—এক জন বসু) ছেলে। দেবলের দুই ছেলে (মহা ১।৬০।২৫)।

দেবশ্রুত—ব্যাসের ছেলে শুক। শুকের স্ত্রী পিতৃদেবের কন্যা পীবরী। চার ছেলে হয় কৃষ্ণ, গৌরপ্রভ, ভূরি ও দেবশ্রুত।

দেবসাবর্ণি—১৩শ মনু।

দেবসেনা—সাবিত্রী গর্ভজাত প্রজাপতির মেয়ে অন্য নাম ষষ্ঠী, আশা, সুখপ্রদা লক্ষ্মী, সিনীবালী, কুহূ, সদ্‌বৃত্তি ও অপরাজিতা (মহা ৩।২১৮।৪৭) ইনি মাতৃকা শ্রেষ্ঠা ও শিশুপালিকা। অন্য মতে দক্ষের মেয়ে। মহাভারতে প্রজাপতির মেয়ে; এঁরা দুই বোন দৈত্যসেনা (দ্রঃ) ও দেবসেনা। অত্যন্ত সুন্দরী ও চরিত্রশীলা। দুজনে মানসসরোবরে জলক্রীড়াতে আসতেন। লোমশ এই কাহিনী যুধিষ্ঠিরকে বলেন। কেশী এক দিন এঁদের দেখতে পেয়ে বিয়ে করতে চান। দৈত্যসেনা রাজি হন; দেবসেনা প্রত্যাখ্যান করেন। কেশী দেবসেনাকেও চুরি করতে যান। এ দিকে দেবতারা অসুরদের হাতে বার বার পরাজিত হলে ইন্দ্র (দ্রঃ) এক জন উপযুক্ত সেনাপতি খুঁজতে খুঁজতে মানস সরোবরে একটি মেয়ের আর্তনাদ শুনে এগিয়ে আসেন। দেবসেনা ইন্দ্রের সাহায্য চান; ফলে যুদ্ধ হয় এবং শেষ পর্যন্ত কেশী দৈত্যসেনাকে নিয়ে সরে পড়েন। দেবসেনা ইন্দ্রকে নিজের পরিচয় দেন, সমস্ত ঘটনা জানান:—কেশী রোজই তাঁকে হরণ করবে বলতেন; দৈত্যসেনা কেশীকেই পছন্দ করতেন ফলে কেশী তাঁকে হরণ করেছেন। ইন্দ্র তখন চিনতে পারেন; ইন্দ্রের মা দাক্ষায়ণী; দেবসেনা ইন্দ্রের মাতৃস্বসেয়া (মহা ৩।২১৩। ২০)। দেবসেনা ইন্দ্রকে অনুরোধ করেন তাঁর স্বামী খুঁজে স্থির করে দিতে এবং বলেন ব্রহ্মার বরে তাঁর বলবান পতি হবে এবং বলেন দেবদানবযক্ষাণাং কিন্নরোরগরাক্ষসাম্ জেতা পতি চাই। ইন্দ্রের সঙ্গে মিলে সেই স্বামী সকলকে জয় করবেন। ইন্দ্র ভাবতে থাকেন (দ্রঃ-কার্তিকেয়) এবং দেবসেনাকে নিয়ে ব্রহ্মার কাছে আসেন। কার্তিকেয়র সঙ্গে ইন্দ্র এর পর এঁর বিয়ে দেন (মহা ৩।২১৮।৪৬)। দেবাসুরের যুদ্ধে এই দেবসেনা কার্তিকেয়কে সাহায্য করেছিলেন।

পুরাণে ষষ্ঠী তিথিকে দেবসেনা বলা হয়েছে। ইনি প্রকৃতির ষষ্ঠ অংশ, বিষ্ণু মায়া শিশুদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী; সন্তান দান করেন। দেবী ভাগবতে ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণেও ষষ্ঠী দেবীর উল্লেখ আছে। তন্ত্রসারেও এঁকে প্রকৃতির ৬ষ্ঠ অংশ, শুভদা, সুপুত্রদা ও দেবসেনা বলা হয়েছে।

দেবহূতি—স্বায়ম্ভুব মনুর মেয়ে; প্রজাপতি কর্দমের স্ত্রী। বিয়ের আগে একদিন হাতে কন্দুক নিয়ে খেলা করছিলেন। বিশ্বাবসু বিমানে করে যাচ্ছিলেন; দেখে মুগ্ধ হয়ে পড়ে যান (ভাগ ৩।২২।১৬), অর্থাৎ নিরুপমা। বিয়ের পর এক দিন সন্তান চান। কর্দম একটি কামগ বিমান আনান। বিন্দুসরোবরে স্নান করতে বলেন। জলে নামলে এখানে অসংখ্য পরিচারিকা দেবহূতিকে স্নান করিয়ে প্রসাধনে ও অলঙ্কারে অপরূপ সুন্দরী করে কর্দমের কাছে পৌঁছে দেন। বিমানে করে দুজনে বিশ্বভুবন ঘুরে বেড়ান ও রমণ করেন। শত বৎসর পরে আশ্রমে ফিরে এসে ৯-টি মেয়ে হয় (৩।২৩ ৪৮)। কর্দম এরপর তপস্যা করতে চলে যাচ্ছিলেন। দেবহূতি জানতে চান তাঁর সংসারমুক্তির উপায় কি। কর্দম আশ্বাস দেন বিষ্ণুর অংশে তাঁর একটি ছেলে হবে (৩।২৪।৪)। এই ছেলে কপিল জন্মালে ব্রহ্মা এসে কর্দমকে মেয়েদের বিয়ে দিতে বলেন। মরীচির সঙ্গে কলার, অত্রির অনসূয়া, অঙ্গিরসের শ্রদ্ধা, পুলস্ত্যের সঙ্গে হবির্ভূ,

পুলহের গতি, ক্রতুর ক্রিয়া, ভৃগুর সঙ্গে খ্যাতি, বশিষ্ঠের সঙ্গে অরুন্ধতী, অথর্বের সঙ্গে শান্তির বিয়ে দিয়ে কর্দম ঋষি বনে চলে যান (৩।২৪।৭৬)। কর্দম চলে যাবার পর কপিলের কাছে প্রকৃতি পুরুষ ভেদ জানতে চান। কপিল মাকে সাংখ্য উপদেশ দিয়ে বনে চলে যান। সরস্বতী নদীর তীরে ঐ আশ্রমেই দেবহূতি তপস্যা করে মুক্তি লাভ করেন। স্থানটি সিদ্ধিপদ (৩।৩৩।৩০) নামে পরিচিত হয়।

দেবাতিথি—পুরু বংশে এক রাজা; অক্রোধ/অক্রোধন ও করণ্ডুর ছেলে। দেবাতিথির স্ত্রী বিদেহ রাজকন্যা মর্যাদা। ছেলে ঋচ/অরিহা (মহা ১।৯০।২২)।

দেবাদর্শ—কবন্ধের শিষ্য। দেবাদর্শের শিষ্য মেধা, ব্রহ্মবলি, সৌতায়ন, পিপ্পলাদ, ইত্যাদি।

দেবান্তক—রাক্ষস রুদ্রকেতুর ছেলে। এর অত্যাচারে ত্রিভুবন জর্জরিত হয়ে উঠলে গণপতি একে নিহত করেন।

দেবাপি—চন্দ্র বংশে প্রতীপের তিন ছেলে দেবাপি, শন্তনু ও বাহ্লীক (মহা ১।৯০। ৪৬); দেবাপি বড়; পিতা এবং প্রজাদের অত্যন্ত প্রিয়। কিন্তু চক্রাকার কুষ্ঠ থাকার জন্য প্রজারা আপত্তি করাতে প্রতীপ শন্তনুকে রাজত্ব দেন। দেবাপি বনে গিয়ে তপস্যা করে জীবন কাটান। কুরুক্ষেত্রে পৃথূদক তীর্থে তপস্যা করে মোক্ষ লাভ করেন। হরিবংশে (১।৩২।৭১) দেবতাদের উপাধ্যায় হন। চ্যবন এঁকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। ভাগবতে (৯।২২) ইনি এখনও কলাপ গ্রামে বাস করছেন। সত্যযুগ এলে আবার চন্দ্রবংশ প্রতিষ্ঠা করবেন (ভাগ ১২।২)। দ্রঃ- মরু।

দেবাবৃধ—সত্বানের ছেলে। পর্ণাশা নদীর জল স্পর্শ করে সর্বগুণোপেত পুত্রের জন্য তপস্যা করছিলেন। তপস্বীর উপকার করার জন্য নদী নিজেই সুন্দরী কুমারী বেশে এসে বিয়ে করেন। ছেলে হয় বভ্রু। বভ্রু বংশের সন্তানরাই মাতৃকাবতে ভোজ রাজবংশ (হরি ১।৩৭।৩৬)।

দেবাসুরের যুদ্ধ—অসুর (দ্রঃ) যে কারা নানা মত ভেদ রয়েছে। বহু মতে এরা ভারতের আদিবাসী; আর্যদের বাধা দিতেন। আবার বহু মতে এরা যজ্ঞবিরোধী বৌদ্ধ। মহাভারতে অসুররাও কশ্যপ সন্তান; ব্রাহ্মণ। সাহিত্য সৃষ্টিতে দাঙ্গা মারামারি ইত্যাদি না হলে কাহিনী জমবে না; এই ধারণার বশেই কাহিনীর নায়কের প্রতিস্পর্দ্ধী হিসাবে অসুরদের সৃষ্টি। মানুষের চারিত্রিক দুর্বলতাকে কেন্দ্র করে দেবাসুরের যুদ্ধ অথাৎ বোম্বে ফিল্ম সৃষ্টি হয়েছিল। তারকাময় যুদ্ধকে একটি বড় যুদ্ধ বলা হয়।

দেবিকা—অপর নাম বেদিকা। রাজা শৈব্য গোবাসনের মেয়ে; যুধিষ্ঠিরের স্ত্রী; ছেলে যৌধেয় (মহা ১।৯০।৮৩)।

দেবিকা—অযোধ্যাতে দেবা নদী। সরযূ = গোগরা। সরযূর দক্ষিণ অংশ দেবিকা দেবা; উত্তর অংশ কুমায়ুনে কালীনদী সঙ্গমের পর থেকে কালীনদী নামে পরিচিত দ্রঃ- কালী নদী। কালিকা পুরাণে গোমতী ও সরযূর মধ্যবর্তী স্থানে একটি আলাদা নদী। গণ্ডক, সরযূ (দেবিকা) ও গঙ্গা সঙ্গমও ত্রিবেণী (দ্রঃ); ছাপরার কাছে সিঙ্গিতে। (২) পাঞ্জাবে রাভি নদীর একটি করদা শাখা; সৌবীর (দ্রঃ) দেশ বিধৌত করেছে।

নদীটি মৈনাক (শিবালিক) শাখাতে উৎপন্ন। মদ্র দেশের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেছে। মূলতান ছিল এই দেবিকা নদীর তীরে। রাভির দক্ষিণে একটি করদা শাখা দীগ নদী মনে হয় এই দেবিকা ; বামন পুরাণেও এই কথাই যেন বলা হয়েছে।

দেবী—প্রথম দিকে দেবতার সৃষ্টি হয়েছিল। দেবীরও সৃষ্টি হয়েছিল তবে সংখ্যায় খুব কম। ঋক্‌বেদে এই দেবীর সংখ্যা সামান্যতম। এঁদের মধ্যে অদিতি, উষা ও সরস্বতী প্রধান। সরস্বতীর ও সঙ্গে ইড়া, ইলা, ভারতী আরো দুটি দেবীর নাম পাওয়া যায়। এই তিন জনের কাছে সম্পত্তি চাওয়া হয়েছে। আবার কিছু স্থানে ইলা, সরস্বতী ও মহী তিনটি দেবী একত্রে উল্লিখিত হয়েছেন। যজুর্বেদে ইড়া, সরস্বতী ও ভারতীর একসঙ্গে উল্লেখ দেখা যায়। আচার্য মহীধরের মতে সরস্বতী মধ্যস্থানে, ভারতী দ্যুস্থানা ও ইড়া পৃথিবীস্থানা—এঁরা (সায়ণ মতে) অগ্নি মূর্তয়ঃ বা জ্যোতি বা বাক্।

আরো কতকগুলি দেবী সৃষ্টি হয়েছিলেন ইন্দ্রাণী, বাক্, রাত্রি, অরণ্যানী, বৃহস্পতি (ঋক্ ১০।১০৯) পত্নী জুহূ। শ্রদ্ধা, সরমা, সরণ্যু, সূর্যা, যমী ও উর্বশী এবং যজুর্বেদে অম্বিকা, অপ্, ও পৃথিবী স্ত্রী দেবতা হিসাবে গণ্য হয়েছেন।

এর পর ক্রমশ একটি ধারাতে পুরুষ দেবতাকে উৎখাত করে 'দেবীকে' খাড়া করা হয় ; এঁকে আদি দেবী আদ্যা (দ্রঃ) বলা হয়েছে। তন্ত্রে এই আদ্যাদেবী শক্তির জয় জয়কার। পুরাণ-কাররাও কিছু দেবীকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন : তবে তন্ত্রকারদের মত এঁদের গোঁড়ামি ছিল না।

বিষ্ণু যখন বটের পাতায় শিশু রূপ ধরে ভাসছিলেন তখন ভাবছিলেন তিনি কে, কে তাঁকে সৃষ্টি করল, তিনি কি কাজ করবেন ইত্যাদি। এমন সময় এক দৈববাণী হয় এবং দেবী মহাদেবী দেখা দেন। দেবীর চার হাত ; হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ; দিব্য আবরণ ও আভরণে ভূষিত এবং পরিচারিকা/মাতৃকা গণ দ্বারা পরিবেষ্টিত ; এই পরিচারিকারা ঃ রতি, ভূতি, বুদ্ধি, মতি, কীর্তি, ধৃতি, স্মৃতি, শ্রদ্ধা, মেধা, স্বাহা, স্বধা, ক্ষুধা, নিদ্রা, দয়া, গতি, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্ষমা, লজ্জা, জৃম্ভা ও তন্দ্রা। মহাদেবী বিষ্ণুকে জানান তিনি নির্গুণ পরাশক্তি নন। বিষ্ণুও পরা শক্তি নন : বিষ্ণু সত্ত্বগুণের আধার এবং বিষ্ণুর নাভি পদ্মে ব্রহ্মা জন্মাবেন ; ব্রহ্মাতে রজো-গুণের প্রাধান্য থাকবে এবং ব্রহ্মার কপাল থেকে তমোগুণের আধার রুদ্র জন্মাবেন। ব্রহ্মা তপস্যা করে সমস্ত সৃষ্টি করবেন, বিষ্ণু সকলকে রক্ষা করবেন এবং কল্পান্তে রুদ্র সব কিছু ধ্বংস করবেন (দেবী-ভাগবতে)।

ব্যাস এক বার জন্মেজয়ের প্রশ্নে দেবীর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন তিনি নির্গুণ, অনাদি এবং প্রয়োজন মত নানা রূপ ধারণ করেন।

মূল প্রকৃতি যখন বিষ্ণুর রূপ ধারণ করেন তখন বিষ্ণুর (দ্রঃ), মধ্য থেকে দুর্গা, লক্ষ্মী (দ্রঃ), সরস্বতী (দ্রঃ), সাবিত্রী (দ্রঃ), ও রাধা (দ্রঃ) পঞ্চ দেবী রূপ নিল। এই পাঁচটি দেবী পরা দেবীর পূর্ণ অবতার। পরা দেবীর অংশাবতার রয়েছেন ছ জন ঃ- গঙ্গা, তুলসী, মনসা, দেবসেনা, মঙ্গল চণ্ডিকা ও ভূমি দেবী। এই দেবসেনা হচ্ছেন ষষ্ঠীদেবী : সন্তান দেন এবং সন্তানদের রক্ষা করেন। মঙ্গলচণ্ডিকার জন্ম মূল প্রকৃতির মুখ থেকে ;

মানুষের সমস্ত কামনা, বাসনা পূর্ণ করেন। ভূমি দেবী অর্থে মোটামুটি পৃথিবী ; মানুষকে সম্পদ দান করেন। এঁদের চেয়ে আর এক ধাপ নিম্ন পর্যায়ের দেবী রয়েছেন এঁরা মহাদেবীর অংশ অর্থাৎ পরা দেবীর অংশের অংশ ; এঁরা ঃ- কীর্তি, ক্রিয়া, ক্ষুধা, জরা, তুষ্টি, দক্ষিণা, দয়া, দাহিকা, দিবা, দীক্ষা, ধৃতি, নিদ্রা, পুষ্টি, প্রতিষ্ঠা, প্রভা, প্রীতি, বুদ্ধি, ভক্তি, মিথ্যা, মূর্তি, মৃত্যু, মেধা, রাত্রি, লজ্জা, শান্তি, শ্রদ্ধা, শ্রী, সতী, সন্ধ্যা, সম্পত্তি, সিদ্ধা, সুধা, স্বস্তি ও স্বাহা। এই গুলিকে অংশাংশ দেবী বলে কল্পনা করা হয়েছে ; এঁদের জন্মদাতা ও স্বামীও কল্পনা করা হয়েছে। এই সব অংশাংশ দেবীগুলি মানুষের জীবনে বিশেষ বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছেন। এঁদের না হলে বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। দিতি, অদিতি ইত্যাদিকেও অংশাংশ দেবী বলা হয়েছে। এই সমস্ত দেবীরই বিশেষ বিশেষ মূর্তি রয়েছে ; বিশেষ বিশেষ অস্ত্রশস্ত্র ও বিশেষ কাজ কল্পনা করা হয়েছে। পূজার মূল মন্ত্র ও দেবী অনুসারে আলাদা।

ধর্মীয় ব্যাপারে আচার্যরা যা বলবেন তাই যুক্তি। দেবী-ভাগবতে (৯।৩১) রয়েছে প্রাকৃতিক সৃষ্টির প্রথমে রাসমণ্ডলে (দঃ) কৃষ্ণের বাম অঙ্গ থেকে এক দেবী উৎপন্ন হন। তারপর কৃষ্ণের ইচ্ছা অনুসারে এই দেবী দু ভাগ হয়ে গিয়ে দক্ষিণাংশ রাধা ও বাম অংশ মহা-লক্ষ্মীতে পরিণত হন। (২) দেবী অর্থে সাধারণত মহাদেবের স্ত্রী বুঝায়। শিবের শক্তি রূপে দেবীর চরিত্র দু রকম নম্র ও উগ্র। নম্র মূর্তিতে দেবীর নাম উমা, গৌরী, পার্বতী, হৈমবতী ইত্যাদি। উগ্র মূর্তি হচ্ছেন কালী, চণ্ডী, ভৈরবী, মাতঙ্গী ইত্যাদি। অর্থাৎ সবই কপোল কল্পিত। দ্রঃ- পীঠস্থান।

দেবীর (দুর্গা) বাহন গোধা হল কেন অস্পষ্ট। প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় গোধাদের সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গও তন্ত্রকার বা পুরাণকার ইত্যাদির জানা সম্ভব ছিল না। তবু তাঁরা দেবীর বাহনকে বহু স্থানে গোধা করেছেন। দেবীর ধ্যান হিসাবে ঃ-

জৈন মূর্তি শিল্পে ঃ	গৌরীং দেবীং গোধাবাহনাং চতুর্ভুজাং।
রূপমণ্ডনে	গোধাসনা ভবেৎ গৌরী লীলয়া হংসবাহনা।
প্রতিমালক্ষণে	গোধাসমাশ্রিতা মূর্তি গৃহে পূজ্যা শ্রিয়ে সদা।
বৃহৎ-ধর্ম-পুরাণে	ত্বং কালকেতু-বরদাছলে গোধিকা।

দেবী আদ্যা'--দেবী ভাগবতে (৩।২।১৯) রয়েছে আদি মূলে দেবীর সাত্ত্বিকী রূপ মহালক্ষ্মী, রাজস রূপ সরস্বতী এবং তামসী রূপ মহাকালী।

আবার আছে মধুকৈটভকে নিহত করার সময় এই আদি দেবী যোগমায়াই দেখা দেন। মধুকৈটভ (দ্রঃ) নিহত হলে বিষ্ণু ও ব্রহ্মা ছিলেন রুদ্র সেখানে এসে দেখা দেন। তিন জনে দেবীকে দেখতে পান ও স্তব করেন। দেবী নির্দেশ দেন নিজেদের স্থান ঠিক করে চতুর্বিধ প্রজা সৃষ্টি করতে। দেবী তারপর একটি বিমানে করে ত্রিমূর্তিকে নিয়ে ব্রহ্মলোক, কৈলাস ও বৈকুণ্ঠে যান এবং এখানে যথাক্রমে অন্য ব্রহ্মা, শিব ও বিষ্ণুকে দেখতে পান। অর্থাৎ কত যে ত্রি-মূর্তি কল্পে কল্পে (?) সৃষ্টি হন। শেষকালে এঁদের নিয়ে মণি দ্বীপে আসেন। এখানে রত্ন পর্যঙ্কে মূলপ্রকৃতি রয়েছেন। ইনি সদা পুরুষসঙ্গত (৩।৩।৬০)। এঁরা এই দেবীর দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে নারীতে

পরিণত হয়ে যান। এই মূলপ্রকৃতির পায়ের নখে বিশ্বচরাচর দেখতে পান। আদ্যা আবার এঁদের সৃষ্টি করতে বলেন। ব্রহ্মাকে শক্তি, বিষ্ণুকে মহালক্ষ্মী ও শিবকে মহাকালী দান করেন এবং যেখানে মধুকৈটভ নিহত হয়েছিল সেখানে আবার পৌঁছে দেন।

দেবীতীর্থ—কুরুক্ষেত্রে তিনটি স্থান ঃ শঙ্খিনী, মধুবতী ও মৃগধূমা।

দেবীপত্তন -দেবীপাটন। অযোধ্যাতে গোণ্ডা থেকে ৪৬ মাইল উ-পূর্বে। পীঠস্থান ; দেবীর ডান হাত পড়েছিল।

দেবী বৌদ্ধ —বৌদ্ধ দেবী অনেকগুলি। বহু সময় গোষ্ঠী হিসাবে এদের কল্পনা করা হয়েছে। যেমন আলোক দেবী ৪ জন, গৌরী দেবী ৮-জন ইত্যাদি।

(ক) দেবী আলোক বজ্রযানে ও নিষ্পন্নযোগাবলীতে ও। নগ্নিকা, ভয়ঙ্করী মুণ্ডমালাধারিণী ও শবের ওপর প্রত্যালীঢ় মুদ্রা ঃ—

(১)	সূর্যহস্তা/সূর্যধরা	শ্বেত	দু-হাত	প্রতীক সূর্য
(২)	দীপা	নীল	দু- ,,	,, দীপযষ্টি
(৩)	বজ্রোল্কা উল্কাধরা	পীত	দু- ,,	,, রত্ন
(৪)	তড়িৎকরা বিদ্যুৎধরা	শ্যাম	দু- ,,	,, বিদ্যুৎ

(খ) দেবী গৌরী --বজ্রযানে, ব্যাপক পূজিতা. সকলেই ভয়ঙ্করী ; মুণ্ডমালা ; প্রত্যেকেই প্রত্যালীঢ় ভঙ্গিতে নাচছেন। উদ্ধত তর্জনী। মোট আটজন। বজ্র-ডাক দেবতাকে ঘিরে মণ্ডলে অবস্থিত ঃ

(১)	গৌরী	শ্বেত	দু-হাত	হাতে অঙ্কুশ	উদ্ধত তর্জনী।
(২)	চৌরী			হাতে পাশ	
(৩)	বেতালী	রক্ত		স্ফোটভৃৎ	
(৪)	ঘস্মরী	শ্যাম		হাতে ঘণ্টা	উদ্ধত তর্জনী
(৫)	পুক্কসী	নীল		.. বোধিচিত্ত ঘটা	,,
(৬)	শবরী	শ্বেত		মেরুধরা	,,
(৭)	চণ্ডালী	নীল	,,	বহ্নিকুণ্ড	,,
(৮)	ডোম্বী	বিশ্ববরণা	..	মহাধ্বজপতাকা	,,

(গ) দেবী ডাকিনী তন্ত্রে বার বার উল্লিখিত ; নিষ্পন্নযোগাবলীতে সৎ-চক্রবর্তী মণ্ডলে। সকলেই এক রকম দেখতে একই প্রতীক। বজ্রবারাহী সাধনাতে এক মুখ চার হাত ; খট্বাঙ্গ, কপাল, ডমরু, কর্তারি। তিন চোখ, মুক্তকেশ, আলীঢ়াসন এবং পঞ্চ মুদ্রা বিভূষিতা। এদের মধ্যে ডাকিনী নীল, লামা শ্যাম, খণ্ডরোহা রক্ত ও রূপিণী শ্বেত বর্ণা।

(ঘ) দেবী দার্শনিক -নিষ্পন্নযোগাবলীতে ; মূলগুণের মূর্তিমতী দেবী . এই গুণ থাকলে বুদ্ধত্ব পাওয়া যায়। এঁরা পারমিতা (ঘ-১) দেবী—বা পূর্ণতা ; জীবনের মূলগুণ। ভগবান বুদ্ধ পূর্বে বিভিন্ন জন্মে এই একটি গুণে পূর্ণতা পেয়েছিলেন। দশটি পারমিতা ; বজ্রযানে বার জন। সকলেরই এঁদের দু-হাত, একমাত্র প্রজ্ঞা পারমিতার

চার হাত। হাতে চিন্তামণি লাঞ্ছিত পতাকা, বাম হাতে প্রতীক। সকলেরই মানুষী মূর্তি এ'দের মধ্যে প্রজ্ঞাপারমিতা সব চেয় প্রসিদ্ধ। প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থে প্রজ্ঞাপারমিতা শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। গ্রন্থটি পাতাল থেকে নাগার্জুন উদ্ধার করেন। নিষ্পন্নযোগাবলীতেও বার জন। রত্নসম্ভব কুল ঃ—

(ঘ-১।১)	রত্নপারমিতা	রক্তবর্ণ	প্রতীক	পদ্মোপরি চন্দ্র।
(ঘ-১।২)	দানপারমিতা	সিতরক্ত	,,	নানা ধান্য মঞ্জরী।
(ঘ-১।৩)	শীলপারমিতা	শ্বেত	,,	সপল্লব গৌরকুসুমচক্র।
(ঘ-১।৪)	ক্ষান্তিপারমিতা	পীত	,,	শ্বেতপদ্ম।
(ঘ-১।৫)	বীর্যপারমিতা	শ্যাম	,,	নীলোৎপল।
(ঘ-১।৬)	ধ্যানপারমিতা	গগনশ্যাম	,,	শ্বেতপদ্ম।
(ঘ-১।৭)	প্রজ্ঞাপারমিতা	পীত	,,	প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থ। মোট চার হাত বাম হাতে পদ্মের ওপর প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থ। মূল দুটি হাতে ধর্মচক্রমুদ্রা, ও ডান হাতে চিন্তামণি পতাকা
(ঘ-১।৮)	উপায়পারমিতা	প্রিয়ঙ্গুশ্যাম	প্রতীক	পদ্মোপরি বজ্র।
(ঘ-১।৯)	প্রণিধানপারমিতা	নীলোৎপল	,,	পদ্মোপরি খড়্গ।
(ঘ-১।১০)	বলপারমিতা	রক্ত	,,	প্রজ্ঞাপারমিতা পুস্তক।
(ঘ-১।১১)	জ্ঞানপারমিতা	শ্বেত	,,	বোধিবৃক্ষ।
(ঘ-১।১২)	বজ্রকর্মপারমিতা	বিশ্ববর্ণা	,,	বিশ্ববজ্র।

(ঘ-২) বাসিতা দেবী—নিষ্পন্নযোগাবলীতে সকলেই দু-হাত; ডান হাতে পদ্ম, বাম হাতে প্রতীক; অমিতাভ বংশ। এ'রা আত্মনিয়ন্ত্রণের দেবী ঃ-

(ঘ-২।১)	আয়ুর্বাসিতা	সিতরক্তা	প্রতীক	বুদ্ধ বিম্ব।
(ঘ-২।২)	চিত্তবাসিতা	সিতা		রক্তপঞ্চসূচিকাবজ্র।
(ঘ-২।৩)	পরিষ্কারবাসিতা	পীতা		চিন্তামণিধ্বজ।
(ঘ-২।৪)	কর্মবাসিতা	হরিতা		বিশ্ববজ্র।
(ঘ-২।৫)	উপপত্তিবাসিতা	বিশ্ববর্ণা		বিবিধবর্ণ জাতি লতা।
(ঘ-২।৬)	ঋদ্ধি বাসিতা	নভঃশ্যামা		পদ্মোপরি সূর্য ও চন্দ্র।
(ঘ-২।৭)	অধিমুক্তিবাসিতা	মৃণালগৌরা		
(ঘ-২।৮)	প্রণিধানবাসিতা	পীতা		নীলোৎপল।
(ঘ-২।৯)	জ্ঞানবাসিতা	সিতনীলোৎপলা		নীলোৎপলস্থ খড়্গ।
(ঘ-২।১০)	ধর্মবাসিতা	সিতা		রক্তপদ্মোপরি ভদ্রঘট।
(ঘ-২।১১)	তথতাবাসিতা	শ্বেতা		রত্নমঞ্জরী।
(ঘ-২।১২)	বুদ্ধবোধিপ্রভাবাসিতা	কনকাভা		চিন্তামণিধ্বজোপরি চক্র এবং ডান হাতে পীত পদ্মস্থ পঞ্চসূচিক বজ্র

(ঘ-৩) ভূমি দেবী—বিভিন্ন আধ্যাত্মিক স্বর্গের দেবী। এই স্বর্গগুলি অধিকার করে ক্রমশ বৌদ্ধত্ব লাভ হয়। দশ জন; বজ্রযানে ১২-জন। স্বর্গগুলি ক্রম অনুসারে সাজান। শেষ স্বর্গে পৌছলে বোধিসত্ত্ব তখন বুদ্ধত্ব লাভ করেন। নিষ্পন্নযোগাবলীতে এ'দের দু হাত, ডান হাতে সকলের বজ্র ; বাঁ হাতে প্রতীক। ক্রম অনুসারে ভূমিগুলি ঃ-

		বর্ণ			
(১)	অধিমুক্তিচর্যা	বর্ণ	রক্ত	প্রতীক	রক্ত পদ্ম
(২)	প্রমুদিতা			,,	চিন্তামণি রত্ন
(৩)	বিমলা		শ্বেত	,,	শ্বেতপদ্ম
(৪)	প্রভাকরী		রক্ত	,,	পদ্মোপরি সূর্য
(৫)	অর্চিষ্মতী		মরকত	,,	নীলপদ্ম
(৬)	সুদুর্জয়া		পীত	,,	মরকত
(৭)	অভিমুখী		হেমপ্রভা	,,	প্রজ্ঞাপারমিতা পুস্তক।
(৮)	দুরঙ্গমা		গগনশ্যাম	,,	বিশ্বপদ্মোপরি বিশ্ববজ্র।
(৯)	অচলা		শরৎ-চন্দ্রাভা		চন্দ্রোপরি পঞ্চসূচিকা বজ্র।
(১০)	সাধুমতি		সিত		পদ্মোপরি খড়্গ।
(১১)	ধর্মমেঘা		নীল		প্রজ্ঞাপারমিতা পুস্তক।
(১২)	সমন্তপ্রভা	,,	মধ্যাহ্নাদিত্য	,,	অমিতাভবিম্ব।

(ঘ-৪) ধারিণী দেবী -এই দেবীগুলি অর্থহীন মন্ত্র ; মনে রাখতে হয় এবং বার বার পঠনীয়। মানসিক ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে। সাধনমালা, নিষ্পন্নযোগাবলী ইত্যাদিতে। অনেক সময় এই মন্ত্রগত বানান ও বিভিন্ন হয়ে থাকে। নিষ্পন্নযোগাবলীতে বার জন। অমোঘসিদ্ধি বংশ ; শ্যামবর্ণ। অর্থাৎ মন্ত্র বা বিদ্যা দেবীতে পরিণত। এক মুখ, দু হাত, ডান হাতে সকলেরই বিশ্ববজ্র ; বাম হাতে প্রতীক। ধারিণী মন্ত্র বার বার আবৃত্তি করলে অদ্ভুত শক্তি ও সিদ্ধি লাভ হয়। এ'দের মধ্যে উষ্ণীষ বিজয়া, জাঙ্গুলী, চুন্দা ও পর্ণশবরী বিশেষ জনপ্রিয় দেবী ঃ--

(১)	সুমতি	পীতা	প্রতীক	ধান্যমঞ্জরী।
(২)	রত্নোল্কা	রক্তা	,,	চিন্তামণিধ্বজ।
(৩)	উষ্ণীষবিজয়া	সিতা	,,	চন্দ্রকান্তমণি কলস।
(৪)	মারী	রক্তগৌরা	,,	সূত্রসূচী।
(৫)	পর্ণশবরী (দ্রঃ)	শ্যামা	,,	ময়ূরপিচ্ছ।
(৬)	জাঙ্গুলী	শুক্লা	,,	বিষপুষ্পমঞ্জরী।
(৭)	অনন্তমুখী	প্রিয়ঙ্গুশ্যামা	,,	মহানিধি কলস।
(৮)	চুন্দা	শুক্লা	,,	অক্ষসূত্রাবলম্বিত কমণ্ডলু।
(৯)	প্রজ্ঞাবর্দ্ধনী	সিতা	,,	খড়্গ।
(১০)	সর্বকর্মাবরণবিশোধনী	হরিতা	,,	ত্রিসূচিক বজ্র।
(১১)	অক্ষয়জ্ঞানকরণ্ডা	রক্তা	,,	রত্নকরণ্ড।
(১২)	সর্ববুদ্ধধর্মকোশবতী	পীতা	,,	রত্নপেটক।

(ঘ-১) প্রতিসম্বিত দেবী—এ'রা ন্যায় বিশ্লেষণকারী দেবী। বজ্রযানে ও নিষ্পন্নযোগাবলীতে। সকলে দু হাত।

(১)	ধর্ম প্রতিসম্বিৎ	সিতরক্ত	প্রতীক	পাশ ও নকুল	পূর্বদ্বারে।
(২)	অর্থ প্রতিসম্বিৎ	মরকত	,,	পাশ	দক্ষিণদ্বারে।
(৩)	নিরুক্তি প্রতিসম্বিৎ	রক্ত	,,	শৃঙ্খল	পশ্চিমদ্বারে।
(৪)	প্রতিভান প্রতিসম্বিৎ	মরকতশ্যাম	,,	ঘণ্টা	উত্তরদ্বারে।

(ঙ) দেবী দ্বারপালিকা বজ্রযানে দরজার তালা, চাবি, কপাট ও পর্দার দেবী। এদের মানুষের দেহ দু হাত, নগ্নিকা, প্রত্যালীঢ় ভঙ্গি। নিষ্পন্নযোগাবলীতে—

(১)	তালিকা,	দ্বারতালকাধরা	শ্বেত	প্রতীক	তালা।
(২)	কুঞ্চী,	কুঞ্চিকাধরা	পীত	,,	চাবি।
(৩)	কপাট,	দ্বারধরা	রক্ত	,,	কাষ্ঠফলক।
(৪)	পটধারিণী,	বিতানধরা	নীল	,,	কাণ্ডপট।

(চ) দেবী নৃত্য - বজ্রযানে জনপ্রিয় দেবী, ভয়ঙ্করী, মুণ্ডমালাধারিণী, প্রত্যালীঢ় মুদ্রা, উদ্ধত তর্জনী। সাধনমালা ও নিষ্পন্নযোগাবলীতে বার বার উল্লিখিত। সকলেরই দু হাত। মোটামুটি একই ধরণের।

(১)	লাস্যা	রক্ত	প্রতীক	লাস্য।
(২)	মাল্যা মালা	রক্ত	,,	মালা।
(৩)	গীতা	রক্তসিত	,,	কাঁসি।
(৪)	নৃত্যা	বিশ্ববর্ণা	,,	বজ্র।

(ছ) দেবী পঞ্চরক্ষা:- মহাযানে জনপ্রিয় রক্ষা দেবী। অনেক সময় প্রতি ঘরে পূজিতা হতেন। দীর্ঘায়ু দান করেন। রাজ্য, গ্রাম, শস্যক্ষেত্র রক্ষা করেন। রোগ, দুর্ভিক্ষ এবং সংসারের সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করেন। একক দেবী বা ৫-টি দেবীর মণ্ডল হিসাবেও পূজিতা। এদের মুখগুলি বিভিন্ন বর্ণের:

(১) কেন্দ্রে মহাপ্রতিসরা-পীত, মুখ চার, হাত ১২ ৮, প্রতীক রত্ন, হাতে:- রত্ন, চক্র, বজ্র, বাণ, খড়্গ, বরদমুদ্রা বজ্র, পাশ, ত্রিশূল, ধনু, পরশু, শঙ্খ।

(২) পূর্বে মহাসাহস্রপ্রমর্দনী-শ্বেত, মুখ চার, হাত ১০/৮, প্রতীক চক্র, হাতে:- পদ্মাঙ্গুষ্টার-চক্র বজ্র, তর্জনীপাশ, অঙ্কুশ, বাণ, অসি, বরদমুদ্রা, পাশ, ধনু, পাশ, ধনু।

(৩) দক্ষিণে মহামন্ত্রানুসারিণী মন্ত্রানুধারিণী, নীল, মুখ তিন, হাত ১২, প্রতীক বজ্র, হাতে:- ধর্মচক্রমুদ্রা, সমাধিমুদ্রা, বজ্র বাণ, বরদমুদ্রা, অভয়মুদ্রা, তর্জনীপাশ, ধনু, রত্ন, কুম্ভ।

(৪) পশ্চিমে মহাশীতবতী-রক্ত, মুখ তিন, হাত ৮, প্রতীক পদ্ম, হাতেঃ- অভয়মুদ্রা, বাণ, বজ্র, অসি, পাশ-তর্জনী, ধনু, রত্নধ্বজ, পাণ্ডুলিপি।

(৫) উত্তরে মহামায়ূরী-শ্যাম, মুখ তিন হাত ৮ এবং প্রতীক পাত্রোপরিভিক্ষু ; হাতে ঃ- ময়ূরপিচ্ছ, বাণ, বরদমুদ্রা, খড়্গ, পাত্রোপরিভিক্ষু, ধনু, রত্নকুম্ভ, বজ্ররত্নধ্বজ।

(জ) দেবী পশুমুখী—নিষ্পন্নযোগাবলীতে ; ভয়ঙ্কর দেখতে ; নগ্নিকা ; শবের ওপর নৃত্যরতা ; মুণ্ডমালা, হাতে কর্তরি, কপাল কাঁধে খট্বাঙ্গ। ২।৪ হাত। মূল মুখ মানুষের বা পশুর। মানুষের মুখ হলে মাথার ওপর নির্দিষ্ট পশুমুণ্ড। নৈরাত্মা মণ্ডলে।

(১) হয়াস্যা পূর্বদ্বারে	হয় মুখ	সিতনীল	২-হাত	চারমুখ চার হাত
(২) শূকরাস্যা দক্ষিণে	শূকর মুখ	পীতনীল	,,	,,
(৩) শ্বানাস্যা পশ্চিমে	কুকুর মুখ	রক্তনীল	,,	,,
(৪) সিংহাস্যা উত্তরে	সিংহ মুখ	রক্তনীল	,,	,,

কাকচক্রমণ্ডলে আরো ৪-জন দেবী আছেন কাকাস্যা, গৃধ্রাস্যা, গরুড়াস্যা ও ও উলূকাস্যা, এঁরা অগ্নিকোণ ইত্যাদিতে থাকেন।

(ঝ) দেবী বাদ্য - বাদ্য যন্ত্রের দেবী। বহু প্রধান দেবতাদের সঙ্গে। বজ্রডাক মণ্ডলে ; নগ্নমনুষ্য মূর্তি, ভয়ঙ্কর দেখতে। নরমুণ্ডমালা। প্রত্যালীঢ় মুদ্রা ঃ—

(১)	বংশ্যা,বাঁশী	রক্ত	২-হাত	প্রতীক	বাঁশী।
(২)	বীণা	পীত	,,	,,	বীণা।
(৩)	মুকুন্দা	শ্বেত	,,	,,	মুকুন্দ।
(৪)	মুরজা	ধূম্র	,,	,,	মুরজ।

দেবীভাগবত—একটি উপপুরাণ। দ্বাদশ স্কন্ধে অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকে বিচিত্র উপাখ্যানে দেবীমাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। একটি মতে বইটি ব্যাসকৃত মহাপুরাণ। একটি মতে রচনাকাল খৃ ১১ শতক। বইতে নতুন কিছু নাই। ৯৯% চর্বিত চর্বণ এবং আদ্যা দেবীই একমাত্র দেবী এই মতবাদ প্রচারের অতি দুর্বল চেষ্টা। আদ্যা দেবী একমাত্র দেবী বলে স্বীকৃত হলেও বিষ্ণু বিষ্ণুই গ্রন্থের নায়ক ; প্রতি অধ্যায়েই আছেন। রাধা মূল প্রকৃতি এবং কৃষ্ণ সম্বন্ধে অনেক কিছু রয়েছে। অতি মূর্খ কবিনাপিতের লেখা : আদ্যাদেবী 'চোখ মারছেন' (দ্রঃ কৈটভ) আছে। মহাভারতে সাবিত্রী ও যমের আলাপ অংশ রূপ অনবদ্য কাহিনীতে দিঙ্নাগের স্থূলহস্তাবলেপন রয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। সাহিত্য মূল্য তথা ধর্মীয় মূল্য শূন্য। ভাষা অতি দুর্বল। অপর মতে খৃ ১২ শতকের পর।

দেবীসূক্ত—ঋক্‌বেদে ১০।১২৫।১-৮ ঋক্। বহু মতে এটি শক্তিবাদের উৎস। অথচ এই সূক্তগুলি কবিতা ছাড়া বিশেষ কিছু নয়। দিলখুস অবস্থায় কিছু অত্যুক্তি।

মনস্তত্ত্বে এটিকে প্যারানয়েড গ্র্যাঞ্জার বলা হয়। বিশেষ কোন রোগের চতুর্থ দশাতেও বা নেশা করলেও দেখা যায়। আপ্রী সূক্তও এই জাতীয় অতিশয় উক্তি। শাক্তরা বামাচারী হয়েও দেবীসূক্তের/বেদের মোহ কেন কাটাতে পারল না ? দ্রঃ- একেশ্বরবাদ।

দেরাদুন—প্রাচীন নাম কেদার খণ্ড বা শিবভূমি। কিংবদন্তি এইখানে দ্রোণাচার্যের বাস ছিল।

দৈত্য—দ্রঃ- দিতি। দেবতাদের চিরশত্রু; যজ্ঞ ইত্যাদি নষ্ট করে দিতেন। দ্রঃ- অসুর। সুর বিদ্বেষী বলে নাম অসুর। দিতির দুই ছেলে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ; এ'রা দু জন আদি দৈত্য। আদি দানব ৬১; এদের মধ্যে ১৮ জন প্রধান; দৈত্যরাজ অর্থে হিরণ্যকশিপু। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য। দৈত্য বংশে বলি, প্রহ্লাদ ইত্যাদি দাতা ও ভক্ত জন্মেছিলেন। দৈত্যরা দেবতাদের থেকে কোন বিষয়ে বিশেষ কম ছিলেন না। শৌর্যবীর্যে বরং বেশিই ছিলেন। দেবতাদের সঙ্গে এ'দের বৈবাহিক সম্বন্ধও দেখা যায়। স্থাপত্য বিদ্যায় এ'রা অসাধারণ ছিলেন। এ'দের সাহায্যে সমুদ্র মন্থন করা হয় কিন্তু বিষ্ণুর শঠতায় এ'রা সুধার ভাগ পান নি। দৈত্য দানব অসুর সাধারণত সমার্থক। ময় দানবের লেখা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ময়মত। দ্রঃ- দনু।

দৈত্যদ্বীপ—গরুড়ের এক বংশজ। দ্রঃ- ত্রিবার।

দৈত্যসেনা—দেবসেনার (দ্রঃ) বোন। দুই বোন একবার প্রমদার্থে মানস সরোবরে গেলে সেখানে দৈত্যসেনা কেশী দানবকে দেখে তাঁর প্রতি অনুরাগী হন। কেশী একে হরণ করে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করেন।

দৈর্ঘ্য পরিমাণ—শতপথ, কঠোপনিষদ, আশ্বলায়নশ্রৌতসূত্র, সাংখ্যায়নশ্রৌতসূত্র, ঐতরেয় ইত্যাদিতে দেখা যায় অঙ্গুলি, অঙ্গুষ্ঠ, পাদ, প্রাদেশ (=বিঘত), বাহু, শল ইত্যাদি মাপের একক হিসাবে ব্যবহার হত। বৃদ্ধ মনুতে একটি সূক্ষ্ম হিসাবের প্রথম প্রচলন হয়: ৮ ত্রসরেণুতে=১ রেণু, ৮ রেণুতে=১ কেশাগ্র, ৮ কেশাগ্রে=১ লিক্ষা (পোস্তদানা), ৮ লিক্ষাতে=১ যুক, ৮ যুকে=১ যব, ৮ যবে=১ অঙ্গুলি। এর পর মনু যোগ করেন ১২ অঙ্গুলিতে=১ বিতস্তি, ২ বিতস্তিতে=১ হাত। আরো হিসাব পাওয়া যায়:- ৪ হাতে= ১ দণ্ড/যষ্টি, ১০ হাতে=১ বংশ, ২ দণ্ডে=১ নাড়িকা, ২০০০ দণ্ডে =১ ক্রোশ, ২ ক্রোশে=১ গব্যূতি, ৪ ক্রোশে=১ যোজন।

দোল—ভারতে একটি বিখ্যাত উৎসব। ফাল্গুন মাসে শুক্লাচতুর্দশী তিথিতে। দক্ষিণ ভারতে চৈত্র মাসে উৎসব হয়। কবে থেকে কি ভাবে প্রচলন হয় স্পষ্ট নয়। প্রধান ধর্মীয় অংশ রাধাকৃষ্ণকে দোলায় বসিয়ে যথারীতি পূজা করে আবীর কুঙ্কুমে রঞ্জিত করা। দ্রঃ- আমোদ প্রমোদ।

দোহন—পৃথুর দোহন কাহিনীর উৎস অথর্ববেদ (৮।৫।৬)। বৎস, পাত্র ইত্যাদির ও উল্লেখ আছে।

দ্বাপর—তৃতীয় যুগ। ৮,৬৪,০০০ বছর। দ্রঃ- কাল, কলিকাল। দ্বাপরে অর্দ্ধেক পাপ ও অর্দ্ধেক পুণ্য। মানুষ মাথায় সাত হাত। পরমায়ু হাজার বছর; অন্নপাত্র তামার। ভাদ্রে কৃষ্ণা একাদশীতে আরম্ভ। এই যুগে অবতার কৃষ্ণ ও বলরাম। এই যুগে

নাম করা রাজা শাল্ব, বিরাট, কংস, হংসধ্বজ, ময়ূরধ্বজ, বভ্রুবাহন, রুক্মাঙ্গদ, দুর্যোধন, যুধিষ্ঠির, পরিক্ষিৎ, জন্মেজয়, বিষ্বকসেন, শিশুপাল, জরাসন্ধ, উগ্রসেন ইত্যাদি।

দ্বারকা—বর্তমানে গুজরাটের পশ্চিম সীমায়। ২২°১৪′ উ×৬৯°১′ পূ। দ্বারিকা, কুশস্থলী বা দশার্ণ। ওখা বন্দর থেকে ২৮ কি-মি। আজও এখানে কিছু লোক কৃষ্ণের বংশে জন্ম বলে দাবি করেন এবং গোপালন করেন। প্রাচীন কালে নাম দ্বারাবতী। খৃ পূ ১৫-শতক থেকে হিসাবে ৩-৪ বার ধ্বংস হয়েছিল। খৃ-পূ ১৫-১০ শতকে দুবার সমুদ্রে নষ্ট হয়েছিল। মহাভারতে উল্লিখিত দ্বারকা খৃ-পূ ১৫-১৪ শতকের; কোন কাহিনী নয়; সামুদ্রিক প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের হিসাব (অমৃ-পত্রি ৮।১।৮৪)। দ্বারকা (দ্রঃ- ভেট দ্বারকা) সমুদ্র উপকূলে বিস্তৃত শক্তিশালী দুর্গ। দুর্গের মধ্যে ১২ যোজন বিস্তীর্ণ নগর। দেবতারাও এই নগরী নির্মাণে সাহায্য করেছিলেন। ইন্দ্র পারিজাত বৃক্ষ পাঠিয়ে দেন (ভাগ ১০।৫৩)। হরিবংশে আছে (২।৯৮) প্রদ্যুম্ন বজ্রনাভ (দ্রঃ) কন্যাকে বিয়ে করে দ্বারকাতে ফিরে এলে ইন্দ্র বিশ্বকর্মাকে দিয়ে দ্বারকার নানা পরিমণ্ডন করে দেন। যাদবী স্ত্রীরাও যেন যুদ্ধ করতে পারে (২।৯৮।৩০)। অর্থাৎ সামাজিক ও সামরিক পরিস্থিতি লক্ষ্যণীয়। দ্রঃ-ব্যাস, যুগ, কলি।

বৈদিক যুগে তীর্থ রূপে পাওয়া যায় না। পাণ্ডবদের তীর্থ যাত্রার সূচীতেও দ্বারকা ছিল না। সম্ভবত খৃ-পূ ২ শতকে তীর্থরূপে পরিগণিত হয়। বৈষ্ণব তীর্থ রূপে প্রসিদ্ধ। প্রসিদ্ধ শৈব তীর্থও: এখানে জ্যোতির্লিঙ্গ নাগেশ শিব। দ্বারকার প্রাচীন আর এক নাম কুশস্থলী; মহাভারত ও কয়েকটি পুরাণ অনুসারে আনর্ত দেশের রাজধানী কুশস্থলীতেই দ্বারকা স্থাপিত হয়। পুণ্যজন রাক্ষস কুশস্থলী অধিকার করলে শর্যাতির বংশধররা ঐ নগর পরিত্যাগ করেন। কংস বধের পর কৃষ্ণের আদেশে বিশ্বকর্মা কুশস্থলীতে এই নগরী নির্মাণ করেন। কালযবন ও জরাসন্ধের বার বার আক্রমণে জর্জরিত যাদবদের নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ এখানে চলে আসেন। এই সময় নাম হয় দ্বারকা। মথুরা থেকে রণ ছেড়ে কৃষ্ণ এখানে এসেছিলেন বলে রণ-ছোড় নাথ নামে কৃষ্ণ আজও এখানে পূজিত হন। গর্গ সংহিতা অনুসারে ইক্ষ্বাকুর ভ্রাতুষ্পুত্র আনর্তের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে সমুদ্রের ওপর শ্রীকৃষ্ণ এই দ্বারকা নির্মাণ করেন। এখানে রাজর্ষি রেবত বাস করতেন। হরিবংশে আছে রুক্মিণী হরণের সময় গরুড় এসে জানান দ্বারকা সুরক্ষিত ইত্যাদি। এরপর কালযবন (দ্রঃ) আক্রমণ। যাদবরা মথুরা ছেড়ে দ্বারকাতে পালিয়ে আসেন। কালযবনের মৃত্যুর পর কৃষ্ণ দ্বারকার সংস্কার করেন। বিশ্বকর্মা (পুন ?) নির্মাণ করে দেন; সমুদ্র অনেকটা জমি দেন। নিধিরাজ প্রজাদের ধন দেন; বায়ু স্বর্গ থেকে সুধর্মা-সভাকে এনে এখানে স্থাপন করেন (হ-বংশ ২।৫৮।-)। অবশ্য প্রাচীন দ্বারকা কোথায় ছিল এ নিয়ে বেশ কিছু মতভেদ রয়ে গেছে। একটি মতে জুনাগড়ে বা গিরিনগরে আর একটি মতে বেট দ্বারকাই প্রধান দ্বারকা নগরী। দ্বারকা থেকে ৩২ কি-মি দূরে এই বেটদ্বারকা দ্বীপ তীর্থ হিসাবে স্বীকৃত। বেট দ্বীপে শঙ্খচূড় দৈত্যকে কৃষ্ণ নিহত করে দৈত্যের স্ত্রীকে তুলসী গাছে পরিণত করে দেন। পাশেই রৈবতক পাহাড় দুর্গের মত নগরীকে রক্ষা করত। নন্দন, চৈত্ররথ, বৈভ্রাজ ও

মিশ্রক চারটি উদ্যান ছিল (গী-প্রে ২।৩৮।-)। অবশ্য উদ্যান কিনা অস্পষ্ট। রৈবতক ছিল পূব দিকে, উত্তরে বেণুমন্ত, পশ্চিমে সুকক্ষ এবং দক্ষিণে লতাবেষ্ট-পঞ্চবর্ণ (গী-প্রে ২।৩৮) চারটি পাহাড়। নগরীতে ৫০-টি প্রধান সিংহদ্বার ছিল। অর্জুন যখন তীর্থ যাত্রায় বার হয়েছিলেন তখন এখানে এসে সুভদ্রা হরণ করেন। শাল্ব (দ্রঃ) রাজ এক বার দ্বারকা আক্রমণ করে পরাজিত হয়ে ফিরে যান। এই খানে সাম্ব মুসল প্রসব করেন। কৃষ্ণ, বলরামও এখানে দেহত্যাগ করেন। যদুবংশ ধ্বংসের পর অর্জুন এখান থেকে যাদব নারীদের নিয়ে হস্তিনাপুরে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দ্বারকা সমুদ্র কবলিত হয়।

(২) সায়ামের প্রাচীন রাজধানী দ্বারাবতী - অযুথ্য = অযুধ্য। (৩) দ্বারসমুদ্র হলেবিড ; হাসান জেলাতে ; মহীশূরে। দ্রঃ- চের।

দ্বারকাধীশ মন্দির—উৎখননের ফলে তিনটি মন্দিরের ক্রমিক চিহ্ন পাওয়া গেছে। প্রথম মন্দির খৃ-পূ ১-ম শতকে ; ৩-য় মন্দির ৯ম খৃ-শতকে (অমৃ-পত্রি ৮।১।৮৪)।

দ্বিত—গৌতমের এক ছেলে। ত্রিতের (দ্রঃ) শাপে বৃকে পরিণত হয় এবং বানর ইত্যাদির জন্ম দিতে থাকে।

দ্বিবিদ—(১) সুগ্রীবের মন্ত্রী ও মৈন্দের ভাই। (২) নরকাসুরের সখা। কংসের অনুচর। নরকাসুর নিহত হলে দ্বারকাতে সারা দেশে গোপনে নানা ভাবে অন্তর্ঘাতী কাজ করে ভীষণ ক্ষতি করছিল। রৈবতক পাহাড়ে একদিন গান হচ্ছিল ; বারুণী পান করে নারী-পরিবৃত হয়ে বলরাম গান করছিলেন। দ্বিবিদ সেখানে এসে মুখভঙ্গি করে বাঁদরামি করতে থাকে ; বলরামের মদিরার কলস নিয়ে পালায় ও এটি ভেঙে ফেলে এবং তারপর এসে মেয়েদের কাপড় ছিঁড়তে থাকে। দ্বিবিদের অন্তর্ঘাতী কাজের কাহিনী বলরাম জানতেন ; বলরাম আক্রমণ করে নিহত করেন (ভাগ ১০।৬৭)।

দ্বৈতবন—পঞ্চনদের অন্তর্গত সরস্বতী নদীর তীরে বিখ্যাত পবিত্র বন। দেওবাঁদ, দেওবন্দ।

যুক্তপ্রদেশে সাহারানপুর জেলাতে। মিরাট থেকে ৫৩ মাইল উত্তরে। পূর্ব কালিন্দী থেকে ২·৫ মাইল। পাণ্ডবরা এখানে বনবাসের সময় ছিলেন। এখানে সহর থেকে আধ মাইল দূরে দেবীকুণ্ড নামে একটি ছোট হ্রদ আছে। এই হ্রদের তীরে বহু মন্দির ও ঘাট রয়েছে। এই দ্বৈত বনে মীমাংসা দার্শনিক জৈমিনির জন্ম। এখানে দেবতা, গন্ধর্ব, ঋষি ও তপস্বীরা বাস করেন। এই বনে বাস করলে শোক ও মোহ থাকে না ; ফলে নাম দ্বৈতবন।

দ্বৈতবাদ—জীব ও ঈশ্বর অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা দুটি পৃথক সত্তা বলে স্বীকার করা। পরমাত্মা সর্বজ্ঞ এবং এক। জীবাত্মা অল্পজ্ঞ ও বহু। সাংখ্য মতে ঈশ্বর নাই অর্থাৎ পরমাত্মা নাই। কিন্তু জীব অর্থাৎ পুরুষ রয়েছেন; এবং জড় জগতের মূল অর্থাৎ প্রকৃতি রয়েছে। এই পুরুষ ও প্রকৃতি মিলে দ্বৈতবাদ। আর এক মতে বিষ্ণু সত্য এবং জগত সত্য—এ দুটি পৃথক সত্তা ; অর্থাৎ দ্বৈতবাদ। আর এক মতে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ সত্য অর্থাৎ দ্বৈতবাদ। বিশ্বপ্রপঞ্চ ও মিথ্যা নহে। প্রপঞ্চ শব্দের

অর্থ প্রকৃষ্ট পঞ্চভেদ—অর্থাৎ জীবের সঙ্গে পরমেশ্বরের, জড়ের সঙ্গে পরমেশ্বরের, জড়ের সঙ্গে জীবের, জীবের সঙ্গে জীবের এবং জড়ের সঙ্গে জড়ের ভেদ সত্য এবং নিত্য সত্য।

বৃহদারণ্যক উপনিষদেও সৃষ্টির আদি-এক-কে রমণেচ্ছায় স্ত্রীপুরষ হিসাবে দ্বিধা হতে দেখা যায়। উপনিষদে আর এক ধরণের মিথুন তত্ত্ব পাওয়া যায়। সৃষ্টিকাম প্রজাপতি প্রথমে মিথুন সৃষ্টি করেন। এই মিথুন কোথাও প্রাণ ও রয়ি, কোথাও প্রাণ ও অন্ন, কোথাও অন্নাদ ও অন্ন বা বাক্ ও প্রাণ বা অগ্নি ও সোম। অর্থাৎ প্রজাপতি গৌণ ; দ্বৈত মিথুনই মুখ্য। উপনিষদের এই মিথুন তত্ত্বই পরে শিব ও শক্তিতে পরিণত। প্রাণ বা অগ্নিই শিব। দ্রঃ-সৃষ্টি।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবরাও শক্তি তত্ত্বের দ্বারা শ্রীরাধার ব্যাখ্যা করেন রাধার সমর্থনে বলা হয়েছে ঃ- লীলার্থং কল্পিতং দ্বৈতং অদ্বৈতাৎ অপি সুন্দরম্।
অবশ্য সাংখ্যের প্রেত এই দ্বৈতবাদের জনক।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদ—এঁদের মতে দ্বৈতবাদে ভেদ যেমন সত্য তেমনি ভেদ নাই এ যুক্তিও সত্য। এই ভেদ ও অভেদ মিলে দ্বৈত-অদ্বৈতবাদ। আর এক মতে ভেদ ও অভেদ দুটিই সত্য, দুটিই স্বাভাবিক। এই মতে ব্রহ্ম সগুণ। দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের মধ্যে আপোষ মতবাদ হচ্ছে এই দ্বৈতাদ্বৈতবাদ।

দ্বৈপায়ন—(১) বেদব্যাসের অপর নাম। (২) কুরুক্ষেত্রের নিকটে একটি হ্রদ। দ্রঃ- দুর্যোধন।

দ্যু—দ্যৌ। অষ্টবসুর (দ্রঃ) একজন ; অপর নাম আপ। একটি মতে এঁর স্ত্রী বনে বেড়াতে বেড়াতে নন্দিনীকে বশিষ্ঠের আশ্রমের কাছে দেখতে পান। এর দুধ খেলে অযুত বর্ষ আয়ু হবে। উশীনর রাজার মেয়ে জিনবতীকে গরুটি উপহার দেবার জন্য স্বামীকে এটি চুরি করতে বলেন। বসুরা নন্দিনী ও বাছুর দুটিই চুরি করেন (মহা ১।৯৩।২১)। দ্রঃ- ভীষ্ম।

দ্যুতিমান—(১) মদ্রদেশের রাজা। মেয়ে বিজয়া ; সহদেবের স্ত্রী। (২) শাল্ব দেশের রাজা ; ঋচীককে রাজ্য দান করেন (মহা ১২।২২৬।৩৩)। (৩) ইক্ষ্বাকু বংশে রাজা মদিরাশ্বের ছেলে (মহা ১৩।২।৯)। (৪) ভৃগু বংশে এক মুনি ; মৃকণ্ডুর ভাই প্রাণের ছেলে।

দ্যুমৎসেন—শাল্ব দেশের রাজা : স্ত্রী শৈব্যা : ছেলে সত্যবান। সত্যবান যখন শিশু ছিলেন তখন রাজা অন্ধ হয়ে যান এবং শত্রুরা এঁর রাজ্য কেড়ে নেন। রাজা সপরিবারে বনে বাস করতেন এবং তপস্যা করতেন। পরে পুত্রবধূ সাবিত্রী (দ্রঃ) বনে যমের কাছ থেকে দ্যুমৎসেনের রাজ্য, চোখের দৃষ্টি ফিরে পাওয়া ইত্যাদি বর পান। যথাকালে দ্যুমৎসেন ছেলেকে রাজ্য দিয়ে সস্ত্রীক বানপ্রস্থ গ্রহণ করেন।

দ্যৌ—বা দ্যু (দ্রঃ)।

দ্যৌঃ—ঋকবেদীয় সূক্তে দ্যোঃ (= দ্যৌষ্পিতা) একটি দেবতা। ইনি গ্রীসে জেউস বা জেউস-পাতের ; পরবর্তী কালে যুপিটার। ঋক্‌বেদের বর্তমান সংহিতায় উষস্,

অগ্নি, পর্জন্য, সূর্য, আদিত্য, মরুৎ প্রভৃতির পিতৃরূপে বর্ণিত ; স্বতন্ত্র ভাবে উল্লিখিত নয়। নতুবা পৃথিবী, ভূমি ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত ভাবে উল্লিখিত—যেমন দ্যাবাপৃথিব্যো। বৈদিক আর্যগণ পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দ্যোঃ এই তিনটি লোকে বিশ্বভুবনকে ভাগ করে ছিলেন। এ'দের কল্পনায় দ্যোঃ পিতা, পৃথিবী মাতা এই দুই দেবতার মিলনে এই বিশাল সৃষ্টির উদ্ভব। ঋক্ সূক্তে ঋষি অগস্ত্য বলেছেন দ্যু এবং পৃথিবীর মধ্যে কে আগে এবং কেনই বা এ'রা উৎপন্ন হয়েছিলেন কেউ জানে না ইত্যাদি। এ'রা ভেষজ প্রদান করেন। অগ্নির মত এ'রা দুজনে যজ্ঞের হবি স্বর্গে নিয়ে যান এবং সোম পানের জন্য যজ্ঞস্থানে দেবতাদের নিয়ে আসেন (ঋক্ ২।৪১।২১)। দ্যো শব্দে আকাশ বোঝালেও যাস্ক বলেছেন দ্যোঃ অর্থে প্রকাশমান/দ্যোতমান = স্বয়ং প্রকাশমান। অথর্ব বেদেও আকাশ দেবতা।

দ্রবিড়—(১) মনুপুত্র প্রিয়ব্রত বংশে এক রাজা। (২) বা দ্রমিল ; কংসের প্রকৃত পিতা ; এক জন গন্ধর্ব। মেয়ে অংশুমতী। দ্রঃ- দ্রাবিড়।

দ্রব্য—আত্মা, মন, কাল, দিক (চরক ১।৪৫ সূত্র স্থান)।

দ্রমিল—সম্ভবত দমিল (দ্রঃ)। অন্য মতে দ্রাবিড় (দ্রঃ) ; পল্লবদের বাসস্থান। ভারতে পূর্ব-উপকূলে। দ্রঃ- দ্রবিড়।

দ্রাবিড়—দ্রবিড়। দাক্ষিণাত্যের অংশ। দ্রমিল (দ্রঃ)। মাদ্রাজ থেকে শ্রীরঙ্গপত্তম ও কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত। পেন্নর (দ্রঃ) বা তৃপ্তি নদীর দক্ষিণে দেশ। রাজধানী কাঞ্চিপুর। মহাভারতে এর উত্তর সীমা গোদাবরী। দ্রঃ- চোল।

মহাভারতে দ্রাবিড়. কেরল, প্রাচ্য, বনবাসিক, কর্ণাটক, মহিষক, মূষিক/মূষক ইত্যাদি নামের উল্লেখ আছে। এরা ক্ষত্রিয় ; দ্রমিল ; ব্রাহ্মণদের শাপে শূদ্রে পরিণত হয়েছেন্। মহাভারতে আছে ব্রাহ্মণানাম্ অদর্শনাৎ এই বৃষলত্ব (মহা ১৩।৩৩।২১)। প্রাচীন সংস্কৃতে, দ্রমিড়, দ্রবিড়, দ্রাবিড় ইত্যাদি। একটি মতে এরা আগে প-এসিয়াতে ছিল। পরে বেলুচিস্তান হয়ে ভারতে আসে এবং আর্যদের আক্রমণে ক্রমশ দক্ষিণ দিকে সরে যায়। আর এক মতে এরা ভূমধ্যসাগরীয় জাতি। এদের একটি ভাগকে আদি ভূমধ্যসাগরীয় জাতি বলা হয় (বর্তমানে তামিল, মালয়াম্ ইত্যাদি অঞ্চলে)। দ্বিতীয় পরবর্তী ভাগটি দীর্ঘ কায়, সুদর্শন। এরা সুসভ্য জাতি, ভারতে আর্যপূর্ব সভ্যতা এদের তৈরি। পাঞ্জাব ইত্যাদি স্থানে বসবাস আরম্ভ করেছিল। বহু মতে সিন্ধু সভ্যতার স্রষ্টা এই দ্রাবিড় জাতি। ওড়িশা, বিহার, এমন কি বেলুচিস্থানেও এই দ্রাবিড় জাতি রয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যে দাস, দস্যু, শূদ্র, অন্ধ্র, দ্রমিড় ইত্যাদিকেও বহু জায়গায় দ্রাবিড় বলা হয়েছে।

দ্রুপদ—পাঞ্চালের রাজা। প্রকৃত নাম যজ্ঞসেন। পিতা সোমক ; অন্য মতে পৃষত/পৃষ্ঠ। মরুৎগণের অংশে জন্ম (মহা ১।৬১।৭৪)। চন্দ্র বংশে হস্তী (১)—অজমীঢ় (২)—পাঞ্চাল (৯)—সোমক(১৬)—যজ্ঞসেন(১৭)। ভরদ্বাজ আশ্রমে শিক্ষা লাভ করেন। দ্রোণের বাল্যসখা ও সতীর্থ ; অন্য মতে কেবল সতীর্থ। ভরদ্বাজ ও সোমক/পৃষত বন্ধু ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর দেশে ফিরে দ্রুপদ উত্তর পাঞ্চালের রাজা হন। সতীর্থ দ্রোণকে দ্রুপদ একবার গুরুগৃহে থাকার সময় বলেছিলেন রাজ্য পেলে বন্ধুকে অর্দ্ধেক রাজ্য/অর্থ

দান করবেন। দ্রুপদ রাজা হলে এই বন্ধুত্বের দাবিতে দ্রোণ দেখা করতে এসেছিলেন ; নিজের ছেলে অশ্বত্থামাকে দুধ খেতে দিতে পারতেন না ; চরম কষ্টে পড়েছিলেন। কিন্তু দ্রুপদ রূঢ় উপদেশ দিয়ে বন্ধুকে বিমুখ করেন ;বলেছিলেন অর্থ নিবন্ধনে সখ্যতা ছিল হয়তো ; বন্ধুতা হয় সমানে সমানে ইত্যাদি (মহা ১।১২২।৯)। এক দিনের মত ভিক্ষা দিতে সম্মত হয়েছিলেন।

অস্ত্রশিক্ষার পর গুরুদক্ষিণা হিসাবে দ্রুপদ-রাজ্য জয় করবার জন্য প্রথমে কর্ণ ইত্যাদি কৌরব সৈন্য নিয়ে দুর্যোধন পাঞ্চাল আক্রমণ করেন। দ্রুপদ এদের পরাজিত করেন। এর পর অর্জুন আসেন এবং দ্রুপদ বন্দী হন। অর্জুনের সঙ্গে অবশ্য ভীম নকুল ও সহদেবও ছিলেন। দ্রোণের কাছে দ্রুপদ নীত হন এবং উ-পাঞ্চালে অহিচ্ছত্র দ্রোণকে দিয়ে দ্রুপদ মুক্তি পান। দ্রোণ বলেছিলেন রাজাসি দক্ষিণে কূলে ভাগীরথ্যাহম্ উত্তরে (মহা ১।১২৮।১২)। দ্রুপদ কাম্পিল্যে/মাকন্দীতে (১।১২৮।১৫) বাস করতে থাকেন ; দ-পাঞ্চালে যাবৎ চর্মণ্বতী নদী তাঁর রাজ্য হয়। মুখে বন্ধুতা স্থাপিত হয়। কিন্তু প্রতিশোধ নেবার চেষ্টায় একটি যজ্ঞ করবার চেষ্টা করেন। পুরোহিতের খোঁজ করতে থাকেন ; জাতান্ পুত্রান্ ধিক্কার দিতে থাকেন ; দ্রোণ হন্তা পুত্র চান। কল্মাষপাদ রাজার পুরী সমীপে ঘুরতে ঘুরতে ব্রহ্মাণদের আবাসে এসে কাশ্যপ গোত্রীয় যাজ ও উপযাজকে পান (মহা ১।১৫৫।৮)। নানা ভাবে সেবা করে উপযাজকে সম্মত করেন ; এক অর্বুদ গুরু দক্ষিণা দেবেন। দ্রোণ হন্তা পুত্র চান শুনে উপযাজ যেন রাজি হন না। আরো এক বৎসর (মহা ১।১৫৫।১৮) সেবা ও অনুনয় করতে থাকেন। উপযাজ তখন বড় ভাই যাজের কাছে যেতে বলেন ; যাজ যা পান তাই গ্রহণ করেন ইত্যাদি। অর্বুদ গুরু দক্ষিণাতে যাজ সম্মত হন। শেষ অবধি যাজ ও উপযাজ দুজনে মিলে যজ্ঞ করেন। যজ্ঞে আহুতি দেবার পর যাজ পৃষতের স্ত্রীকে আসতে বলেন ; দুটি শিশু এসেছে। রাণী জানান অবলিপ্ত রয়েছেন ; শুচি হয়ে আসবেন একটু দেরি হবে। উপযাজ মন্ত্রপাঠ করেছিলেন এবং যাজ যজ্ঞে আহুতি দিয়েছিলেন (মহা ১।১৫৫।৩৬)। আগুন থেকে দেবতার তুল্য সশস্ত্র এক রাজকুমার রথে চড়ে বার হয়ে আসে এবং বেদী মধ্য থেকে শ্যামা, পদ্মপলাশাক্ষী, নীলকুঞ্চিতমূর্দ্ধজা একটি কন্যা বার হয়ে আসে ; নীলোৎপলসমগন্ধঃ যস্যাঃ ক্রোশাৎ প্রবায়তি। দৈববাণী হয় এই কন্যা ক্ষত্রিয়দের ক্ষয়ং নিনীষতি এবং কুমার দ্রোণকে নিহত করবে। ধৃষ্টত্বাৎ ও অতিধৃষ্ণুত্বাৎ ইত্যাদি কারণে বালকের নাম হয় ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং বর্ণ হেতু মেয়েটির নাম হয় কৃষ্ণা।

দ্রুপদের আর একটি মেয়ে অন্য মতে নপুংসক সন্তান ছিল শিখণ্ডী। দ্রৌপদী বড় হলে ইচ্ছা ছিল অর্জুনের সঙ্গে বিয়ে দেবেন ; এবং পাণ্ডবরা জীবিত নাই জেনেও দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে কঠিন লক্ষ্যভেদের ব্যবস্থা করেছিলেন (মহা ১।১৭৬।৮) : মনে ইচ্ছা ছিল অর্জুন ছাড়া কেউ যেন সফল না হন। দ্রৌপদীর বিয়ের সময় ৫-ভাইয়ের সঙ্গে বিয়েতেও দ্রুপদ আপত্তি করেছিলেন কিন্তু ব্যাসের কাছে পাঞ্চালীর পূর্ব জন্ম কাহিনী শুনে সম্মত হন। কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবদের সাত জন সেনাধ্যক্ষের মধ্যে এক জন ছিলেন। বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন এবং ১৫-শ দিনে সকালে নাতির সঙ্গে দ্রুপদ দ্রোণের

হাতে নিহত হন। স্বর্গে দ্রুপদ বিশ্বদেবগণে পরিগণিত হন। গঙ্গাতীরে ব্যাসের আহ্বানে মৃত যোদ্ধাদের সঙ্গে দ্রুপদও এসেছিলেন।

দ্রুমকুল্য—রাম (দ্রঃ) সমুদ্র শাসন করতে গিয়ে শর নিক্ষেপ করতে যান। কিন্তু সমুদ্র (দ্রঃ) তখন অনুরোধ করেন উত্তরে দ্রুমকুল্য নামক স্থানে এই শর নিক্ষেপ করতে। দ্রুমকুল্য নামে মরুকান্তারে এই শর নিক্ষেপ করলে মাটিতে গর্ত হয়ে এখানে জল বার হতে থাকে। গর্তের নাম হয় ব্রণকূপ (বা ৬।২২।৩৮)। রাম বর দেন পশুরা এখানে অল্পরোগ হবে এবং স্থানটি রসাল বহু ফল যুক্ত শিবঃ পন্থাতে পরিণত হবে। আভীর প্রমুখাঃ পাপাঃ এইখানে সমুদ্র জল খায়; এদের স্পর্শ থেকে মুক্তি পাবার জন্য সমুদ্র এই অনুরোধ করেছিলেন।

দ্রুহ্যু—যযাতির ছেলে; শর্মিষ্ঠার গর্ভে জন্ম। সকল দিক জয় করে যযাতি ছেলেদের রাজ্য ভাগ করে দিয়েছিলেন। দ্রুহ্যু পেয়েছিলেন প্রতীচী। ইনিও যযাতির জরা নেন নি এবং অভিশপ্ত হয়েছিলেন এঁর কোন অভিলাষ পূর্ণ হবে না; রাজ্য নষ্ট হয়ে যাবে এবং দ্রুহ্যু ভোজ নামে পরিচিত হবেন। দ্রুহ্যুর বংশে কোন রাজা নাই। হরিবংশে (১৩২।৮৬) দ্রুহ্যু-বভ্রু ও সেতু। সেতু অঙ্গারসেতু (=মরুৎপতি)। অঙ্গার (সেতু?)-গন্ধার। গন্ধারের দেশ গান্ধার নামে পরিচিত। অঙ্গারসেতু ১৪ মাস যুদ্ধ করে যুবনাশ্বের ছেলে মান্ধাতার হাতে নিহত হন। ভাগবতে (৯।২৩) দ্রুহ্যু বংশের উল্লেখ আছে। (২) মতিনার-এর এক ছেলে।

দ্রোণ—মহর্ষি ভরদ্বাজের ছেলে। অঙ্গিরসাং বরঃ (মহা ১।১২৩।৬৮)। বৃহস্পতির অংশে জন্ম (মহা ১।৬১।৬৩)। পাঞ্চাল রাজ পৃষত একটি মতে ভরদ্বাজের বন্ধু ছিলেন ফলে পৃষতের ছেলে দ্রুপদ (দ্রঃ) দ্রোণের বাল্য বন্ধু। দুজনে এক সঙ্গে খেলা করত ও অধ্যয়ন করত।

গঙ্গাদ্বারে ভরদ্বাজের আশ্রম। এক দিন স্নান করতে নদীতে এসে ঘৃতাচীকে দেখতে পান। ঋষিকে দেখে ঘৃতাচী সরে যেতে যান কিন্তু গাছপালায় বস্ত্র আটকে গিয়ে অসম্বৃত হয়ে পড়েন। মহাভারতে (১।১৫৪।-) আছে ভরদ্বাজ স্নান করতে আসেন; ঘৃতাচী স্নান করে ওঠে; বায়ু ঘৃতাচীর বস্ত্র হরণ করেন। মহাভারতে (১।১২১।৩) আছে ভরদ্বাজ একদিন হবির্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন ইত্যাদি। স্নাতা ঘৃতাচীর বস্ত্র বায় হরণ করেন ইত্যাদি। ভরদ্বাজের বীর্যপাত হয়। এই বীর্য একটি পাত্রে (= দ্রোণ) রক্ষিত হয় এবং বীর্য থেকে যে ছেলে হয় তার নাম হয় দ্রোণ। পিতার কাছে বেদ বেদাঙ্গ এবং ভরদ্বাজ শিষ্য অগ্নিবেশ্য (দ্রঃ) মুনির কাছে অস্ত্র শিক্ষা করেন এবং আগ্নেয়াস্ত্র লাভ করেন। ভরদ্বাজ মারা যান, কিন্তু ভরদ্বাজের নির্দেশ ছিল; সেই অনুসারে (মহা ১।১২১।১১) শরদ্বান কন্যা কৃপীকে বিয়ে করেন এবং এক মাত্র সন্তান হয় অশ্বত্থামা। একটি মতে রাজা দ্রুপদ এঁর কেবল সতীর্থ ছিলেন, বাল্যবন্ধু নন; মহাভারতে আছে দ্রুপদ বলেছিলেন (১।১২২।৩০) অর্দ্ধেক রাজত্ব দেবেন। পরশুরাম ব্রাহ্মণদের নানা কিছু দান করছেন শুনে দ্রোণ বিত্তকাম হয়ে (মহা ১।১২২।১৭) মহেন্দ্র পর্বতে ছুটে আসেন। পরশুরাম তখন সব কিছু দিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর দেহ ও অস্ত্রশস্ত্রগুলি বাকি ছিল।

পরশুরাম বলেন তাঁর দেহটি বা অস্ত্রশস্ত্রগুলি দ্রোণ নিতে পারেন এবং দ্রোণ তখন অস্ত্রগুলি ও ব্রহ্মাস্ত্র (মহা ১'১৫৪।১৩) গ্রহণ করেন। একবার (কা-প্র ৭।১৯৬) নারায়ণ ব্রাহ্মণ বেশে দ্রোণের কাছে এলে দ্রোণ নারায়ণ অস্ত্র চেয়ে নেন। পরশুরামের কাছে অস্ত্র লাভ করে উত্তর পাঞ্চালের রাজা দ্রুপদের কাছে আসেন। দরিদ্র দ্রোণ ছেলেকে দুধ পর্যন্ত দিতে পারতেন না। দ্রুপদ (দ্রঃ) কিছু রূঢ় উপদেশ দেন ; রাজার সঙ্গে গরিব ব্রাহ্মণের বন্ধুতা হতে পারে না ইত্যাদি এবং ফিরিয়ে দেন। দ্রোণ তখন প্রতিজ্ঞা করেন এর প্রতিশোধ নেবেন। মুহূর্তের জন্য চিন্তা করে হস্তিনাপুরে চলে আসেন (মহা ১।১২২।১১)। এই উদ্দেশ্যে কিছু শিক্ষিত যোদ্ধা তৈরি করার মানসে ছদ্মবেশে হস্তিনাপুরে এসে কৃপের গৃহে বাস করতে থাকেন। হস্তিনাপুরে নগরের বাইরে একদিন কুরুপাণ্ডব বালকদের খেলার বীটা কুয়ার মধ্যে পড়ে যায়। এরা বীটা টি কি করে তুলবে ভাবছিল এমন সময় দ্রোণ আসেন এবং সব শুনে হেসে বলেন ভরত বংশে জন্মেও বীটা তুলতে পারছে না! তারপর নিজের আঙটিও কূপে ফেলে দিয়ে একমুষ্ঠি ঈষিকা নিয়ে মন্ত্রপূত করে একটি ঈষিকা দিয়ে বীটাটি বিদ্ধ করেন। তারপর প্রথমটির পেছনে দ্বিতীয় আর একটি এবং দ্বিতীয় তীরের পেছনে ইত্যাদি অনেকগুলি ঈষিকা বাণ ক্রমশ সন্ধান করে লম্বা বাণের সারি গঠিত হয় ; বীটাটিকে তুলে আনেন। অনুরূপ ভাবে নিজের আংটিও তুলে আনেন। কুরুপাণ্ডব বালকরা বিস্ময়ে অভিবাদন করে এবং দ্রোণ তখন সমস্ত ঘটনাটি ভীষ্মকে জানাতে বলেন। ভীষ্ম শুনে সব বুঝতে পারেন এবং ডেকে আনান। ভীষ্ম এঁকে রাজপুত্রদের অস্ত্র শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করেন। দ্রুপদের কাহিনীও দ্রোণ ভীষ্মকে জানান।

অস্ত্রশিক্ষা দেবার আগে দ্রোণ ভবিষ্যতে গুরুদক্ষিণার কথা বলে ছিলেন ; সকলে চুপ করে থাকে। অর্জুন কেবল কথা দেন দ্রোণ যে কাজ বলবেন সে কাজ অর্জুন করে দেবেন। অর্জুনকে জড়িয়ে ধরে দ্রোণ কেঁদে ফেলেন। অর্জুন সব সময়ই গুরুর ইচ্ছা পূর্ণ করবেন প্রতিশ্রুতি দিতেন এবং ক্রমশ প্রিয় শিষ্য হয়ে ওঠেন। বহু দেশ থেকে অন্যান্য রাজপুত্রেরাও দ্রোণের কাছে অস্ত্র শিক্ষা করতে এসেছিল।

কর্ণও অস্ত্র শিক্ষা করতেন এবং দুর্যোধনকে নির্ভর করে পাণ্ডবদের অবজ্ঞা করতেন (মহা ১।১২২।৪৭)। দ্রোণ এই সব বালকদের অনেক সময় জল আনতে পাঠিয়ে দিয়ে অশ্বত্থামাকে গোপনে বিশেষ অস্ত্র শিক্ষা দিতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু অর্জুন বুঝতে পারেন এবং তাড়াতাড়ি জল এনে দিয়ে অশ্বত্থামার সঙ্গে সমান শিক্ষা লাভ করতেন। অর্জুনের কৃতিত্ব দেখে দ্রোণ বারণ (১।১২৩।-) করে দিয়েছিলেন অর্জুনকে যেন অন্ধকারে খেতে দেওয়া না হয়। কিন্তু একদিন খেতে বসলে দীপ নিভে যায়, অর্জুন অন্ধকারেই খেতে থাকেন এবং অর্জুন হৃদয়ঙ্গম করেন না দেখেও লক্ষ্যভেদ করা যায়। অর্জুন এর পর অন্ধকারেও অস্ত্র অভ্যাস করতে থাকেন ; দ্রোণ টের পান, খুসি হন এবং প্রতিশ্রুতি দেন অর্জুনের সমান অস্ত্র শিক্ষা আর কাউকে দেবেন না।

একবার দ্রোণের ছাত্রেরা বনে মৃগয়াতে যান এবং একলব্যের (দ্রঃ) সঙ্গে দেখা হয়। দ্রোণ নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য অর্থাৎ অর্জুনকে শ্রেষ্ঠ ধনুর্বিদ করার জন্য

একলব্যের ডান হাতের বুড়ো আঙুল গুরুর 'বেতন' হিসাবে আদায় করতে দ্বিধা করেন না। দ্রোণের কাছে শিক্ষা লাভ করে অর্জুন শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ, ভীম ও দুর্যোধন গদাযুদ্ধে অদ্বিতীয়, নকুল ও সহদেব তরবারি যুদ্ধে এবং রথ যুদ্ধে বিশেষ দক্ষ হয়ে ওঠেন। দ্রোণ একবার মাটির একটি ভাস গাছের ডালে বসিয়ে শিষ্যদের লক্ষ্যভেদ করার জন্য একে একে সকলকে ডাকতে থাকেন। লক্ষ্যবদ্ধ করার পর কি দেখছে জিজ্ঞাসা করতে থাকেন; প্রত্যেক বালকেরা কি কি দেখছে উত্তর দেয়; দ্রোণ হেসে বালকদের নিরস্ত করে সরিয়ে দেন। শেষকালে অর্জুন এসে লক্ষ্যবদ্ধ করলে দ্রোণ জিজ্ঞাসা করেন এবং অর্জুন জানান পাখীটির কেবলমাত্র গলাটি তিনি দেখতে পাচ্ছেন। দ্রোণ তখন বাণবিদ্ধ করতে বলেন। পাখীটির মুণ্ড ছিন্ন হয়ে মাটিতে পড়ে। আনন্দে দ্রোণ শিষ্যকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। দ্রোণ একবার শিষ্যদের নিয়ে গঙ্গাতে স্নান করতে নামলে একটি কুমীর আক্রমণ করে। দ্রোণ ডাক দিয়ে সকলকে সাহায্য করতে বলেন। ছাত্রেরা বিমূঢ় হয়ে পড়ে। কিন্তু অর্জুন বাণবিদ্ধ করে তৎক্ষণাৎ কুমীরকে (১।১২৩।৭৩) নিহত করেন। মুক্ত হয়ে উঠে এসে অর্জুনকে ব্রহ্মশির অস্ত্র দান করেন; তবে নিষেধ করে দেন এই বাণ যেন কোন মানুষের প্রতি প্রয়োগ করা না হয়। গুরু দক্ষিণা হিসাবে দ্রুপদকে (মহা ১।১২৮।২) বেঁধে আনার জন্য এবং ১।১৫৪।২১- শ্লোকে আছে ছত্রবতীর রাজা দ্রুপদের রাজ্য দাবি করেন। গীতা-প্রেসে (১।১৬৫।২২) আছে দুর্যোধন ও কর্ণ প্রথমে গিয়ে আক্রমণ করে সম্পূর্ণ পরাজিত হয়ে পালিয়ে আসেন। এরপর অর্জুন গিয়ে বেঁধে ফেলেন এবং ভীমকে এই সময় নিষেধ করে দেন দ্রুপদের সৈন্যদের যেন বিশেষ ক্ষতি না করে; কারণ দ্রুপদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক রয়েছে। দ্রোণ বন্ধু দ্রুপদকে অভয় দেন; বাল্যের স্নেহ এখনও তাঁর আছে এবং অর্দ্ধেক রাজত্ব ফিরিয়ে দেন:- বলেন দক্ষিণ কূলে তুমি রাজা হও; ভাগীরথ্যা অহম্ উত্তরে (মহা ১।১৫৪।২৪) এবং মুক্তি দেন; এর ফলে এবার রাজায় রাজায় দ্রুপদের (দ্রঃ) সঙ্গে বন্ধুত্ব হবে। দ্রোণ কিন্তু কোনদিনই এ রাজ্য গ্রহণ করেন নি যেন; মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ধৃতরাষ্ট্রের কাছেই ছিলেন। এর এক বছর পরে যুধিষ্ঠির যুবরাজ হন। এই রাজসভাতে দ্রোণ অর্জুনকে প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য করেছিলেন যে প্রয়োজন হলে অর্জুন দ্রোণকেও যেন অস্ত্রাঘাত করতে দ্বিধা না করেন। পাণ্ডবরা দ্রৌপদীকে বিয়ে করেছেন খবর পেয়ে দুর্যোধন হস্তিনাপুরে নানা ষড়যন্ত্র করার কথা ভাবছিলেন। কিন্তু দ্রোণ তখন পাণ্ডবদের সাদরে ফিরিয়ে আনতে এবং অর্দ্ধেক রাজত্ব দিতে উপদেশ দেন। রাজসূয় যজ্ঞে দ্রোণ ছিলেন। পাশা খেলার সময় দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে পাশাখেলা দেখতে এসেছিলেন। শকুনি ও যুধিষ্ঠিরের পাশা খেলার মধ্যে কপটতা রয়েছে ঘোষণা করেন।

পাণ্ডবরা বনে চলে গেলে দুর্যোধনরা দ্রোণকে দ্বীপ হিসাবে গ্রহণ করেন। দ্রোণ তখন স্পষ্ট বলেন কৌরবদের জন্য তিনি সব কিছু করবেন কিন্তু তাঁর মৃত্যুর জন্য ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদী এসেছে। হৈমন্তী-তাল-ছায়া মত এই শ্রী; ১৩ বছর পরে নিশ্চয়ই বিপদ আসবে। দুর্যোধন যা উচিত বিবেচনা করবে তাই করুক (মহা ২।৭১।৪৪)।

বিরাটের গরু চুরি করলে বৃহন্নলা (অর্জুন) যুদ্ধ করতে আসেন এবং অর্জুনের শাঁখের শব্দে দ্রোণ অর্জুনকে চিনতে পারেন এবং অর্জুনের অস্ত্রে আহত হয়ে দ্রোণ পালিয়ে যান। অজ্ঞাত বাসের পর কৃষ্ণ সন্ধির জন্য এলে দ্রোণ পাণ্ডবদের সমর্থন করেছিলেন। যুদ্ধ যখন নিশ্চিত হয়ে পড়ে তখন দ্রোণ নিজের ক্ষমতার হিসাব দিতে গিয়ে বলেছিলেন পাণ্ডব সৈন্য তিনি এক মাসের মধ্যে ধ্বংস করতে পারবেন। যুদ্ধের প্রাক্‌কালে যুধিষ্ঠির দ্রোণের কাছে দেখা করতে এলে দ্রোণ বলেন অর্থের দাস হিসাবে কৌরব পক্ষে তাঁকে যুদ্ধ করতে হচ্ছে। যত দিন তিনি জীবিত থাকবেন তত দিন পাণ্ডবদের জয়লাভ সহজ হবে না; পাণ্ডবরা সেই জন্য যত তাড়াতাড়ি পারে দ্রোণকে যেন নিহত করে। অর্থাৎ দুর্যোধনকে কোন দিন সমর্থন করেন নি। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে ৭ম দিনে বিরাটের ছেলে শঙ্খকে নিহত করেন। ভীষ্মের পর দ্রোণ কর্ণের প্রস্তাবে (৭।৫) সেনাপতি হন। ১১শ-১৫-শ দিন সেনাপতি ছিলেন। ১৩ দিনের দিন অভিমন্যু বধে সাহায্য করেন। ১৪-শ দিনের দিন বৃহৎক্ষত্র, ধৃষ্টকেতু এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের ছেলে ক্ষত্রধর্মাকে নিহত করেন। এ ছাড়া বহু বীর যোদ্ধা দ্রোণের হাতে নিহত হয়। অস্ত্র ত্যাগ না করলে দ্রোণ দেবতাদের কাছেও অজেয়। এই জন্য কৃষ্ণ মন্ত্রণা দেন 'অশ্বত্থামা হত' বলতে হবে। অর্জুন রাজি হন না; যুধিষ্ঠির বাধ্য হন। স্বপক্ষীয় মালবরাজ ইন্দ্রবর্মার (৭।১৬৪।১০১) হাতী অশ্বত্থামাকে ভীম নিহত করে চিৎকার করতে থাকেন। দ্রোণ আকুল হয়ে পড়েন; বিশ্বাস করতে চান না। বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, বালখিল্য ইত্যাদি ইত্যাদি দ্রোণকে অস্ত্র ত্যাগ করে মৃত্যু বরণ করতে বলেন; এঁরা বলেন দ্রোণের আয়ু শেষ হয়ে এসেছে এবং দ্রোণ অন্যায় ভাবে যুদ্ধ করছেন। সামনে ধৃষ্টদ্যুম্নকে দেখেও মন ভেঙে যায়। কৃষ্ণ ও ভীম এদিকে যুধিষ্ঠিরকে বাধ্য করেন 'অশ্বত্থামা হত' বলতে। যুধিষ্ঠিরের রথ মাটি থেকে ৪ আঙুল ওপরে থাকত; অনুচ্চ কণ্ঠে 'ইতি গজঃ' বলা সত্ত্বেও রথ মাটি স্পর্শ করল। মরণে কৃতনিশ্চয় হয়ে তবু ধৃষ্টদ্যুম্নের সঙ্গে কিছুটা যুদ্ধ করে যুধিষ্ঠিরের কথায় বিশ্বাস করে ৮৫ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ শোকে কাতর হয়ে রথে যোগাসনে বসে বিষ্ণুর ধ্যান করতে করতে প্রাণত্যাগ করেন। এই সুযোগে ধৃষ্টদ্যুম্ন মৃত দেহ থেকে দ্রোণের মাথা কেটে আনেন। ব্যাসের আহ্বানে মৃত কুরুপাণ্ডব বীরদের সঙ্গে ইনিও এসেছিলেন। দ্রোণ ৫-দিন যুদ্ধ করেছিলেন। রৈবতকে দ্রোণ ও একলব্য (মহা ১।৫৬।২৮) বহুদিন বাস করেছিলেন। বৃত্র (দ্রঃ) বধের জন্য মহাদেব নিজের গাত্রজ কবচ ইন্দ্রকে দিয়েছিলেন। ইন্দ্র থেকে অঙ্গিরা, তারপর ক্রমশ, বৃহস্পতি (মহা ৭।৬৯।৬৬), অগ্নিবেশ্য ও দ্রোণ পান। এ কবচটিও দুর্যোধনকে (দ্রঃ) দিয়ে দিয়েছিলেন; অর্থাৎ কর্ণের মত কবচহীন হয়ে পড়েছিলেন। (২) মন্দপালের ঔরসে জরিতার গর্ভে একটি পাখী। এই দ্রোণের স্ত্রী বপু (দ্রঃ)। (৩) এক জন বসু; অষ্ট বসুর মধ্যে জ্যেষ্ঠ। দ্রঃ- ধরা, কুশীনগর, দেরাদুন।

দ্রৌপদী—দ্রুপদের (দ্রঃ) যজ্ঞ বেদীতে শ্রীর অংশে (মহা ১।৬১।৯৫) জন্ম। আজন্ম যুবতী, শ্যামবর্ণা, নীলকুঞ্চিত কেশ কলাপ, রন্ধন-নিপুণা, সেবাপরায়ণা ও কলাবতী। গায়ে নীলোৎপল গন্ধ ক্রোশ-মাত্রাৎ প্রবাতি (মহা ১।১৮৯।৩৪)। ১।১৮৯।৪৯ শ্লোকে

আছে সৃষ্টা স্বয়ং দেবপত্নী স্বয়ংভুবা ; এবং স্বর্গশ্রী পাণ্ডবার্থায় (১।১৮৯।৪৮) সমুৎপন্না মহামখে। পূর্ব জন্মের কাহিনী হিসাবে দ্রঃ- মায়াসীতা, বেদবতী, নলায়নী। মহাভারতে (১৮।৪।১০) ইন্দ্র বলেছেন দ্রৌপদী অযোনিজা লক্ষ্মী ; মহাদেব পাণ্ডবদের জন্য সৃষ্টি করেছিলেন। এঁর জন্মের সময় দৈববাণী হয় ক্ষত্রিয় ও কৌরবদের কুলক্ষয় করে দেবতাদের মহৎ কাজ সম্পন্ন করবেন। এঁর অপর নাম কৃষ্ণা, পাঞ্চালী, যাজ্ঞসেনী। দ্রুপদ এক আকাশ যন্ত্র ও এক দুর্জয় ধনু তৈরি করে ঘোষণা করেন। এই ধনুতে জ্যা লাগিয়ে যন্ত্রের মধ্য দিয়ে পঞ্চবাণে (মহা ১।১৭৯।১৬) যে লক্ষ্যভেদ করবে সেই দ্রৌপদীকে বিয়ে করবে। অর্জুনের সঙ্গে বিয়ে দেবার ইচ্ছায় এই ভাবে ব্যবস্থা করেছিলেন। জতুগৃহ থেকে মুক্তি পেয়ে পাণ্ডবরা ভিক্ষা করে জীবন ধারণ করতেন। এক দিন এক অতিথি ব্রাহ্মণের মুখে খবর পেয়ে ব্রহ্মচারী বেশে পাণ্ডবরা দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় আসবেন ঠিক করেন।

একচক্রা থেকে পাণ্ডবরা পাঞ্চালে যাবার জন্য মনস্থ করেন। এর মধ্যে ব্যাস আসেন, দ্রৌপদীর পূর্ব জন্মের কাহিনী বলেন ঃ- অতি সুন্দরী ; স্বামী মিলছিল না। মহাদেবকে পূজা করেন এবং মহাদেব বর দিতে এলে ৫-বার পতিং দেহি বলার জন্য বর দেন পর জন্মে পাঁচজন স্বামী হবে। এই কন্যাই দ্রৌপদী ; এবং নির্দিষ্টা ভবতাং পত্নী (মহা ১১৫৭।১৪) স্পষ্ট বলেছিলেন। পাঞ্চালে যেতে বলে যান। পাঞ্চালে পাণ্ডবরা ও কুন্তী কুম্ভকারের গৃহে আশ্রয় নিয়েছিলেন। দ্রৌপদীর বয়স ঃ- দ্রঃ ধৃষ্টদ্যুম্ন।

স্বয়ংবরে সমবেত রাজারা পাঞ্চালে শিশুমারপুর/শিশুমারশির নামক স্থানে অবস্থান করেন। নগরের প্রাক্ দক্ষিণ ঈশান কোণে স্বয়ম্বর সমাজ (দ্রঃ) স্থাপিত হয়েছিল। পৌরজনরা দেখতে এসেছিল। পাণ্ডবরা ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বসে থাকেন। নটনর্তক সমাজ (মহা ১।১৭৬।২৮) চলতে থাকে। ১৬-শ দিনে রঙ্গভূমিতে দ্রৌপদী আসেন। সোমকদের পুরোহিতরা আহুতি দেন। তারপর বাজনা বন্ধ হয়ে যায়। চারদিক নিশ্চুপ হয়ে পড়ে। ধৃষ্টদ্যুম্ন ঘোষণা করেন ৫-টি বাণ আছে। ছিদ্র পথে লক্ষ্য বিদ্ধ করতে হবে এবং তারপর দ্রৌপদীর কাছে সমবেত রাজাদের পরিচয় দেন। ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, বসুদেব ও সুবল ছাড়া সমকালীন প্রায় সব রাজারাই এসেছিলেন। ধনুকে কেউই জ্যা লাগাতে পারেন না। কর্ণ অবশ্য লাগিয়েছিলেন এবং যেন লক্ষ্যভেদ করতে পারবেন মনে হচ্ছিল কিন্তু দ্রৌপদী সূতপুত্রকে বিয়ে করবেন না জানালে (গী-প্রে ১।১৮৬।২২) কর্ণ ফিরে যান। ভাণ্ডারকরে কর্ণ অকৃতকার্য হয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ বেশী পাণ্ডবদের কৃষ্ণ চিনতে পারেন এবং বলরামকেও দেখিয়ে দেন। দ্রৌপদীকে দেখে ৫-ভাই মদন বাণে পীড়িত হয়ে পড়েন। ব্রাহ্মণবেশী অর্জুন এবার উঠে এসে (একটি মতে কৃষ্ণের ইঙ্গিতে) লক্ষ্যভেদ করেন। আনন্দিত দ্রুপদ সসৈন্যে তৎক্ষণাৎ সাহায্যের জন্য অর্জুনের পাশে এসে দাঁড়ান। যুধিষ্ঠির যমজ ভাইদের নিয়ে বাড়ি ফিরে আসেন। দ্রৌপদী মালা দিতে যান কিন্তু অর্জুন দ্রৌপদীকে নিয়ে রঙ্গভূমি থেকে বার হয়ে আসেন।

ব্রাহ্মণকে কন্যাদান করার জন্য সমবেত রাজারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। দ্রুপদকে

সবংশে শেষ করবেন এবং দ্রৌপদী যদি কোন রাজাকে বরণ না করেন তাহলে দ্রৌপদীকে পুড়িয়ে মেরে ফেলবেন। বিজয়ী ব্রাহ্মণকে ক্ষমা করবেন। রাজারা আক্রমণ করেন। ভীম একটি গাছ উপড়ে নেন। কৃষ্ণ বলরামকে ৫-পাণ্ডবদের দেখিয়ে দেন। ১।১৭৯।২১ শ্লোকে কিন্তু যুধিষ্ঠির ও নকুল-সহদেব ফিরে গিয়েছিলেন। কর্ণ অর্জুনের কাছে প্রায় হেরে যান এবং ব্রাহ্মণ মনে করে নিরস্ত হন। ভীম শল্যকে আছড়ে ফেলে দেন। সমবেত রাজারা হেরে যায়: তারা এদের পরিচয় জানতে চায়। উদ্দেশ্য ব্রাহ্মণ না হলে আবার যুদ্ধ করবে। কৃষ্ণ সকলকে বোঝান এরা পণে জিতেছে। এদের সঙ্গে যুদ্ধ করা অন্যায়।

কুন্তী এদিকে চিন্তিত এবং মহর্ষি অপরাহ্নে (১।১৮১।৪০ এরা ফিরে আসেন। ভীম অর্জুন এসে বার থেকে ভিক্ষা এনেছি বলে মাকে ডাক দেন। কুন্তী ভেতর থেকে বলেন সকলে মিলে ভাগ করে নিও (১।১৮২।৪)। এরপর দ্রৌপদীকে দেখে কুন্তী বিমূঢ় হয়ে পড়েন, এবং দ্রৌপদীকে দু হাত ধরে যুধিষ্ঠিরের সামনে এনে বলেন না জেনেই তিনি ভাগ করে নিতে বলেছেন; তবু এ কথা যেন অনৃত না হয় এবং দ্রুপদ-কন্যারও যেন কোন অপমান না হয় সেই ব্যবস্থা করতে। যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বিয়ে করতে বলেন (১।১৮২।৭)। অর্জুন রাজি হন না। এদিকে ৫-ভাই দ্রৌপদীকে দেখতে থাকেন। সকলের মনের চাঞ্চল্য দেখে প্রত্যেকের মনোভাব বিচার করে এবং ব্যাসের কথা স্মরণ করে যুধিষ্ঠির বলেন সকলেই একে বিয়ে করবেন।

কৃষ্ণ-বলরাম এই সময় দেখা করতে আসেন। কৃষ্ণ নিজের পরিচয় দিয়ে কুন্তীকে প্রণাম করেন ইত্যাদি এবং নিজেদের শিবিরে ফিরে যান; অন্য রাজারা কিছু যেন জানতে না পারেন (১।১৮৩।৯)।

পাণ্ডবদের পরিচয় পেয়ে দ্রুপদ অর্জুনের সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা করতে বলেন। যুধিষ্ঠির কুন্তীর নির্দেশের কথা জানান। দ্রুপদ বিব্রত ও বিমূঢ় হয়ে পড়েন। ইতিমধ্যে ব্যাস আসেন। দ্রুপদ ও ধৃষ্টদ্যুম্ন ব্যাসকে জানান এ রকম বিয়ে চান না। যুধিষ্ঠির কুন্তীর নির্দেশ জানান এবং জটিলা (দ্রঃ) নামে এক গৌতমী সাতজন ঋষির সংসার করেছেন (১।১৮৮।১৪) উদাহরণ দেন। ব্যাস দ্রুপদকে অন্য ঘরে নিয়ে গিয়ে নৈমিষারণ্যে ইন্দ্র এসেছিলেন এবং মহাদেবের (দ্রঃ-নলায়নী) কাছে অভিশপ্ত হয়েছিলেন কাহিনী শোনান।

ব্যাস তারপর যুধিষ্ঠিরকে বলেন আজকে পৌষ্যম্ যোগম্ উপৈতি চন্দ্রমা। আজকে বিয়ে হক (মহা ১।১৯০।৫)। ধৌম্য যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে চলে যান। এরপর ক্রমশ চার ভাইয়ের সঙ্গেও বিয়ে হয়। ব্যাস বলেছিলেন প্রতি পর দিন দ্রৌপদী আবার কন্যা হয়ে যেতেন (১।১৯০।১৪)। বিয়ের পর কুন্তী নববধূকে আশীর্বাদ করেন, "যথেন্দ্রাণী মহেন্দ্রস্য স্বাহা চৈব বিভাবসৌ........."। আজও নববধূকে এই মন্ত্রেই আশীর্বাদ করা হয়। দ্বারকা থেকে কৃষ্ণ বহু উপহার পাঠান।

নারদ তার পর ব্যবস্থা করে যান দ্রৌপদী ক্রমান্বয়ে এক বছর করে এক এক ভাইয়ের সঙ্গে থাকবেন। সেই সময় অন্য কোন ভাই সেখানে এলে তাঁকে ১২ বছর বনে

বাস করতে হবে। ব্যাস আরো বলেন পাণ্ডবরা পাঁচ ভাই ইন্দ্র অংশে জন্মেছেন এবং শচী জন্মেছেন দ্রৌপদী হয়ে। মহাদেবের কাছে পাঁচ বার স্বামী চাওয়ার কাহিনীও বলেন।

বিয়ের পর এক বছর (মহা ১।৫৫।২২) প্রবাসে থাকার পর জানাজানি হয়ে যায় এবং ধৃতরাষ্ট্র (দ্রঃ) সকলকে হস্তিনাপুরে ফিরিয়ে আনেন।

দৌপদী এক বার যখন যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে ছিলেন তখন অর্জুন (দ্রঃ) সেখানে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। ফলে অর্জুন তীর্থযাত্রায় বার হয়ে যান। এই সময়ে অর্জুন সুভদ্রাকে বিয়ে করেন এবং এই বিয়ের জন্য দৌপদীর বেশ ঈর্ষা বা অভিমান হয়েছিল। অর্জুন দেখা করতে এলে বলেছিলেন 'তত্রৈব গচ্ছ কৌন্তেয় যত্র সা সাত্বতাত্মজা। সুবদ্ধস্যাপি ভারস্য পূর্ববন্ধঃ শ্লথায়তে (মহা ১।২১৩।১৫)। কিন্তু পর মুহূর্তে সুভদ্রাকে আশীর্বাদ করেন নিঃসপত্নঃ অস্তু তে পতিঃ (মহা ১।২১৩।২০)। ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করার সময় খাণ্ডবদাহের আগে অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর গর্ভে ৫-ভাইয়ের যথাক্রমে প্রতিবিন্ধ্য, সুতসোম, শ্রুতকর্মা বা শ্রুতকীর্তি (মহা ১।৫৭।১০২ ও ১।২১৩।৭২), শতানীক ও শ্রুতসেন পাঁচটি ছেলে হয়। এরা এক এক বৎসরের ছোট। ধৌম্য জাতকর্ম, উপনয়ন ইত্যাদি করেন। দ্রৌপদেয়রা বিশ্বদেবের অংশ (মহা ১।৬১।৮৭) ; ১৮।৪।১১ শ্লোকে এরা গন্ধর্ব। প্রথম পাশা খেলাতে (দ্রঃ) পাণ্ডবরা দৌপদীকেও পণ রেখে হেরে গেলে দুর্যোধন (দ্রঃ) প্রথমে বিদুরকে বলেছিলেন ; বিদুর যান নি ; তার পর প্রাতিকামীকে পাঠান কিন্তু দ্রৌপদী একে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর দুঃশাসন (দ্রঃ) দ্রৌপদীকে সভাতে চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসেন। সভাতে দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণেরও চেষ্টা করেন। অসহায় দ্রৌপদী কৃষ্ণকে স্মরণ করতে থাকেন। শত শত বস্ত্র অলক্ষ্যে কৃষ্ণ দিয়ে যেতে থাকেন ; দুঃশাসন দ্রৌপদীর দেহ থেকে বস্ত্র খুলে শেষ করতে পারেন না ; ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েন। দুর্যোধনও এ সময়ে অপমানিত করেন। কর্ণ তখন দ্রৌপদীকে প্রাসাদে দাসী হিসাবে পাঠিয়ে দিতে বলেন। দুঃশাসন আবার দ্রৌপদীকে টেনে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেন। একটি মতে দ্রৌপদী এই সময় প্রতিজ্ঞা করেছিলেন দুঃশাসনের রক্ত মাখা হাতে ভীম যে দিন তাঁর চুল বেঁধে দেবেন সেই দিন থেকে আবার তিনি চুল বাঁধবেন। অবস্থা খুব বাড়াবাড়ি হয়ে পড়ছিল। এই সময়ে ভীষ্ম ও দ্রোণ এদের শান্ত করতে চেষ্টা করেন ; দুর্যোধন নিজের নগ্ন উরু দ্রৌপদীকে দেখান। ধৃতরাষ্ট্র দ্রৌপদীকে মুক্তি দেন এবং দ্রৌপদী প্রথম বরে যুধিষ্ঠিরের, দ্বিতীয় বরে অন্যান্য পাণ্ডবদের মুক্তি ধৃতরাষ্ট্রের কাছে চেয়ে নেন। ধৃতরাষ্ট্র আরো বর দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু দ্রৌপদী আর বর নিতে সম্মত হন নি।

এর পর আবার পাশা খেলায় হেরে গিয়ে পাণ্ডবরা দ্রৌপদীকে নিয়ে বনে যান। প্রথমে কাম্যক বনে এসে ওঠেন ; কৃষ্ণ খবর পেয়ে দেখা করতে আসেন। দ্রৌপদী এই সময় ন ভ্রাতরঃ ন চ পিতা, নৈব চ বান্ধবাঃ বলে চিরন্তনী নারী সেজে কাঁদতে থাকেন। যে কোন পুরুষকে এ কান্না যেন পাগল করে দিতে পারে। কৃষ্ণ ও স্বাভাবিক ভাবে বিচলিত হয়ে পড়ে কথা দেন পতেৎ দ্যৌঃ হিমবান শীর্যেৎ......কৃষ্ণার অভিলাষ তিনি পূর্ণ করবেন। দ্রৌপদীর ছেলেরা এবার মামার বাড়ি চলে যায় (৩।২৪।৪৬)।

বনবাসের সময় দ্রৌপদী কটুবাক্যে বার বার কৌরবদের বিরুদ্ধে যুধিষ্ঠিরকে উত্তেজিত করতেন। বনে যাবার সময় সূর্য দ্রৌপদীকে একটি তামার পাত্র দেন ; এই পাত্রে কিছু রাঁধলে দ্রৌপদী যতক্ষণ না খাবেন ততক্ষণ পাত্রটি পূর্ণ থাকবে। এই কারণে বনে যত অতিথিই আসুক দ্রৌপদীর কোন অসুবিধা হত না।

অস্ত্র সংগ্রহের জন্য অর্জুন যখন তপস্যা করতে যান দ্রৌপদী তখন স্বস্তি বলে বিদায় দেন এবং বলেন আমাদের মত ক্ষত্রিয় কুলে কাউকে যেন জন্মাতে না হয় (৩।৩৮।২১)। নলদময়ন্তী কাহিনী শোনার পর দ্রৌপদী একদিন বলেন অর্জুনের অভাবে এই কাম্যক বনে মোটেই ওঁর মন বসছে না। ভীম এবং নকুল সহদেব সমর্থন করেন। এরপর পাণ্ডবরা তীর্থযাত্রায় (দ্রঃ) যান। ঘটোৎকচ নরনারায়ণের আশ্রমে পৌঁছে দেয় ; এখানে একদিন বাতাসে উড়ে এসে পড়া সৌগন্ধিক পুষ্প পান এবং ভীমকে বলেন যদি তে অহং প্রিয়া পার্থ (৩।১৪৬।১১), তাহলে এই ফুল আরো সংগ্রহ কর ; —চিরন্তন নারী চরিত্র ফুটে উঠেছে। দ্বিতীয়বার ভীমকে পঞ্চবর্ণ পুষ্প আনতে দ্রৌপদীই পাঠান। ভীম ফুল আনতে গিয়ে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন ; যুধিষ্ঠিরেরা ভীত হয়ে দ্রৌপদীকে আর্ষ্টিষেণের আশ্রমে রেখে ভীমের (দ্রঃ) কাছে গিয়ে উপস্থিত হন। ঘোষযাত্রার ও দুর্যোধনের যজ্ঞের পর পাণ্ডবদের কাম্যক বনে থাকার সময় দুর্যোধন (দ্রঃ) একবার দশ হাজার শিষ্য সমেত দুর্বাসাকে দ্রৌপদীর খাওয়ার পর পাঠিয়ে দেন। দ্রৌপদী প্রকৃত বিপদে পড়ে কৃষ্ণকে স্মরণ করেন ; কৃষ্ণ তৎক্ষাণৎ এসে সেই তামার খালি পাত্রের কাণায় লেগে থাকা শাক-অন্ন কণা খেয়ে উদ্‌গার তুলতে থাকেন ; সঙ্গে সঙ্গে সশিষ্য দুর্বাসা আকণ্ঠ ভোজনের ক্লান্তিতে যেখানে ছিলেন সেখানেই শুয়ে পড়েন। কাম্যক বনে দ্রৌপদী এক দিন বিশ্রাম নিচ্ছিলেন এমন সময় বকের ভাই কির্মীর আক্রমণ করেছিল। বদরিকাশ্রমে অর্জুনের অপেক্ষায় থাকা কালীন জটাসুর (দ্রঃ) পাঞ্চালী ইত্যাদিকে অপহরণ করেছিল ; অর্জুন সে সময়ে অস্ত্র শিক্ষার জন্য স্বর্গে ছিলেন। জটাসুরের হাত থেকে মুক্তি পাবার পর আর্ষ্টিষেণের আশ্রমে এ'রা কিছু দিন কাটান। কৃষ্ণের সঙ্গে সত্যভামা এক দিন বেড়াতে এলে দ্রৌপদী সত্যভামাকে স্ত্রীর কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দেন। দ্রৌপদীর এই উপদেশ তুলনাহীন। এই কাম্যক বন থেকে সকলের অনুপস্থিতিতে জয়দ্রথ (দ্রঃ) একদিন দ্রৌপদীকে চুরি করেন ; পাণ্ডবরা পরমুহূর্তে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। অজ্ঞাতবাসের সময় বিরাট-রাণী সুদেষ্ণার পরিচারিকা ও কেশবন্ধনে কুশলী ভুজিষ্যা সৈরন্ধ্রী রূপে বাস করতে থাকেন। প্রাসাদ থেকে রাস্তায় দ্রৌপদীকে দেখেই সুদেষ্ণা (৪।৮।৯) ডাকিয়ে আনিয়েছিলেন। দ্রৌপদী বলেছিলেন বিলেপন প্রস্তুত করতে ও মালা গাঁথতে বিশেষ দক্ষতা আছে ; দ্রৌপদীর পরিচারিকা ছিলেন ; মালিনী (৪।৮।১৯) নাম দিয়েছিলেন দ্রৌপদী। সুদেষ্ণা বলেন সৈরন্ধ্রীর রূপ দেখার জন্য প্রাসাদের গাছগুলোও ঝুঁকে পড়ছে ; মৎস্যরাজ নিজেই হয়তো সৈরন্ধ্রীর ভজনা করবেন ; আশ্রয় দিয়ে সুদেষ্ণা নিজের বিপদ ডেকে আনছেন। দ্রৌপদী সাবধান করে দেন ; বলেন এক গন্ধর্ব রাজের ৫-ছেলে তার স্বামী (মহা ৪।৮।২৭)। অলক্ষ্যে তাঁরা সব সময় সযত্নে দ্রৌপদীকে পাহারা দিচ্ছেন ; এবং দ্রৌপদী কারো

পা ধুয়ে দেবেন না বা কারো উচ্ছিষ্ট খাবেন না। এখানে দশমাস থাকার পর সুদেষ্ণার ভাই কীচক দ্রৌপদীকে দেখে লুব্ধ হয়ে পড়েন। নিজে দ্রৌপদীকে বোঝান এবং তারপর সুদেষ্ণাকে গিয়ে বলেন দ্রৌপদীকে দিয়ে দিতে। সুদেষ্ণা প্রথমে রাজি হননি ; কীচক বিলাপ করতে থাকে। শেষ অবধি সুদেষ্ণা পরামর্শ দেয় পর্ব দিনে সুরা অন্ন তৈরি করে রাখতে। সুরা আনতে হবে অছিলায় সুদেষ্ণা দ্রৌপদীকে কীচকের কাছে পাঠান। দ্রৌপদী যেতে চান না ; কিন্তু সুদেষ্ণা সাহস দিতে থাকেন। নিরুপায় দ্রৌপদী তখন সূর্যের কাছে প্রার্থনা করেন ; সূর্য একজন অদৃশ্য রাক্ষসকে রক্ষক হিসাবে (৪।১৪।২০) সঙ্গে দিয়ে দেন। কীচকের কাছে এলে......কীচক এঁকে ধরতে চেষ্টা করলে দ্রৌপদী ধাক্কা দিয়ে কীচককে ফেলে দিয়ে রাজসভাতে পালিয়ে আসেন। কীচক পেছু পেছু ছুটে এসে সভাতে চুলের মুঠি ধরে (৪।১৫।৭) দ্রৌপদীকে পদাঘাত করেন। সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য রাক্ষস কীচককে তুলে ছুঁড়ে মাটিতে ফেলে দেয়।

কীচকের (দ্রঃ) ভয়ে বিরাট এবং আত্মপ্রকাশের ভয়ে পাণ্ডবেরা নীরব থাকেন। সভাতে দ্রৌপদী করুণ আবেদন করেন ; সভাসদরা কীচককে নিন্দা করেন ; দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকেও কটূক্তি করেন। কঙ্ক (দ্রঃ) সৈরন্ধ্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে প্রাসাদে ফিরে যেতে বলেন। সুদেষ্ণার কাছে এলে সুদেষ্ণা একেবারে সাধু সেজে যান, সান্ত্বনা দিতে থাকেন এবং বলেন দ্রৌপদী যদি চান তাহলে কীচককে তিনি হত্যা করবেন (৪।১৫।৪০)। দ্রৌপদী জানিয়ে দেন কীচক সেই রাতেই বোধহয় নিহত হবে। দ্রৌপদীর বর্ণনায় আছে ত্রিহায়ণী বাশিতা (৪।১৬।৬) মত গোপনে ভীমের কাছে এসে কীচককে নিহত করতে বলেন। চিরন্তন নারীর স্ফুরিত ওষ্ঠের আবেদন : কোন সম্রাজ্ঞীর রাজনৈতিক চতুর মন্ত্রণা নয়। ভীম আশ্বাস দেন এবং কীচককে রাজার নর্তনাগারে সন্ধ্যার পর আনবার ব্যবস্থা করতে বলেন। পরদিন কীচকের সঙ্গে দেখা করে দ্রৌপদী নিমন্ত্রণ করেন। রাতে নাট্যশালায় দ্রৌপদীর আহ্বানে কীচক অভিসারে আসেন এবং ভীম নিমেষে কীচককে পিষে মাংস পিণ্ডে পরিণত করে ফেলেন।

কীচক মারা যাবার পরও দ্রৌপদী যেন রাগ সামলাতে পারছিলেন না। সভাপালদের ডেকে দেখান গন্ধর্বরা কি ভাবে প্রতিশোধ নিয়েছে। পরদিন উপকীচকরা যখন কীচকের দেহ সংকারের জন্য নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছিল তখনও দ্রৌপদী সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন---অর্থাৎ অহমিকা তখনও যেন শান্ত হয় নি। উপকীচকরা এই সময় দ্রৌপদীকেও বেঁধে ফেলে এবং বিরাটের অনুমতি নিয়ে দ্রৌপদীকেও কীচকের সঙ্গে দগ্ধ করবে বলে নিয়ে যায়। দ্রৌপদী জয় (দ্রঃ), জয়ন্ত (দ্রঃ) ইত্যাদিকে চিৎকার করে ডাকতে থাকেন। ভীম (দ্রঃ) ছুটে এসে মুক্ত করে দিয়ে ফিরে যান। দ্রৌপদী মুক্তি পেয়ে ফিরে এসে দেখেন ভীম আগেই ফিরে এসেছেন ও বসে আছেন।

দ্রৌপদীকে দেখে গন্ধর্বদের ভয়ে সকলেই ভীত হয়ে পড়েন। ভীত রাজা সুদেষ্ণাকে দিয়ে বলান দ্রৌপদী যেখানে পারে চলে যাক। দ্রৌপদী আরো মাত্র ১৩-দিন আশ্রয় চান ; অজ্ঞাতবাসের আরা তের দিন তখনও বাকি।

এর পরবর্তী ঘটনা হিসাবে দেখা যায় উত্তর (দ্রঃ) যখন সারথির অভাবে কুরু-সৈন্যদের দমন করতে যেতে পারছেন না। অর্জুন হলেও তাকে 'দেখে নিতাম' (৪।৩৩।৯) বলে অন্তপুরে আস্ফালন করছিলেন ; দ্রৌপদীর অসহ্য হয়ে ওঠে। দ্রৌপদী বলেন বৃহৎ-নলা খাণ্ডবদাহনের সময় অর্জুনের সারথি ছিল ; উত্তরাকে দিয়ে ডেকে পাঠালে বৃহৎ-নলা নিশ্চয়ই সারথি হবে। দ্রৌপদীকে এরপর দেখা যায় যুধিষ্ঠিরের ইঙ্গিতে নিঃশব্দে পাত্র এনেছেন ; যুধিষ্ঠিরের নাক থেকে রক্ত যেন মাটিতে না পড়ে।

যুদ্ধের পূর্বে শেষ চেষ্টা হিসাবে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে কৃষ্ণ যখন হস্তিনাপুরে যাবেন ঠিক হয় তখন সকলে যে যার বক্তব্য কৃষ্ণকে জানিয়ে দেন। দ্রৌপদী তখন নিজের খোলা চুল দেখিয়ে 'অয়ং তে পুণ্ডরীকাক্ষ দুঃশাসন-করোদ্ধৃতঃ', অপমানের কথা স্মরণ করিয়ে দেন (মহা ৫।৮০।৩৬) ; এবং দুঃশাসনের ভুজং সংছিন্নং পাংসু-গুণ্ঠিতম্ (মহা ৫।৮০।৩৯) দেখতে চান এবং বলেন পাণ্ডু পুত্রেরা সন্ধি করলেও তাঁর বৃদ্ধ পিতা এবং প্রতিবিন্ধ্য ইত্যাদি পাঁচ ছেলে অপমানের প্রতিশোধ নেবেই। যুদ্ধে কৌরবদের সমুচিত শাস্তির ব্যবস্থা করার জন্য কৃষ্ণকে দ্রৌপদী অনুরোধ করেন।

অভিমন্যু মারা গেলে সুভদ্রাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে দ্রৌপদী নিজেই অজ্ঞান হয়ে পড়েন। দুর্যোধনের উরুভঙ্গের পর অশ্বত্থামা রাত্রিতে পাণ্ডব শিবির আক্রমণ করে দ্রৌপদীর পাঁচটি ছেলেকেই হত্যা করেন। নকুলের কাছে এই খবর পেয়ে দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের সামনে প্রায়োপবশনে প্রাণত্যাগের সংকল্প করেন। শেষ অবধি অশ্বত্থামার মাথার মণি পেলে সংকল্প ত্যাগ করবেন বলেন এবং ভীমকে এই মণি আনার জন্য পাঠান। অবশ্য অর্জুনই মণি সংগ্রহ করেন এবং ভীম সেই মণি এনে দিলে দ্রৌপদী শান্ত হন এবং যুধিষ্ঠিরকে এই মণি ধারণ করতে দেন। দ্রঃ- অশ্বত্থামা। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠিরের মনে বৈরাগ্য এলে দ্রৌপদী সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞে চিত্রাঙ্গদা, উলূপী ইত্যাদি এলে এ'দের বহু উপহার দেন। কুন্তী ও গান্ধারী যতদিন হস্তিনাপুরে ছিলেন ততদিন এ'দের সযত্নে সেবা করেছিলেন। কুন্তীর সঙ্গে দ্রৌপদী বনে যেতেও চেয়েছিলেন। অর্জুনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব থাকলেও প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য ভীমকেই বার বার অনুরোধ করতেন। পাণ্ডবদের সঙ্গে দ্রৌপদীও মহাপ্রস্থানে যান এবং পথে মেরুপর্বতে প্রথমেই দেহত্যাগ করেন। যুধিষ্ঠির বলেন অর্জুনের প্রতি পক্ষপাতিত্বের বা বিশেষ প্রীতির জন্যই দ্রৌপদীর এই মৃত্যু। অর্বাচীন ভাগবতে (১।১৫।৪৯) মহাপ্রস্থানে যান নি ; স্বামীদের নিস্পৃহতা দেখে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হন : মহাভারতের অনবদ্য কবিতা এখানে কপিতাতে পর্যবসিত হয়েছে। দ্রৌপদীর মত প্রকৃত জীবনসঙ্গিনী পৃথিবীর সাহিত্যে দ্বিতীয় কেউ নেই। পাণ্ডবদের নয়ন পুত্তলি এই দ্রৌপদী। ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী সকলেই এঁকে সমাদর করতেন। জৈন শাস্ত্রাদিতে পাণ্ডবরা শত্রুঞ্জয় পাহাড়ে দেহ রাখেন।

ধ

ধনকটক—সুধন্যাকটক, ধরণীকোট, ধান্যকটক, ধান্যবতীপুর, ধর্মকোট, ধমনকটক

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে কৃষ্ণা বা গুণ্টুর জেলাতে। অমরাবতী (অমরাওটি) থেকে ১-মাইল পশ্চিমে এবং বেজোয়াদা থেকে ১৮ মাইল পশ্চিমে। কৃষ্ণার দ-তীরে; অন্ধ্রের রাজধানী। একটি মতে এটি যেন বেজোয়াদা। ২০০ খৃ-পূ থেকে প্রসিদ্ধ। পুরাণে অন্ধ্রভৃত্যকদের এবং লিপিলেখে সাতকর্ণিদের (=শালিবাহন) রাজধানী। ধনকটক=ধনকটকছেক রাজধানী হলেও যুবরাজেরা অনেক সময় গোদাবরী তীরে পৈঠানে বাস করতেন। এখানে নাগার্জুন স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। ভিক্ষু ভাব-বিবেক এখানে মৈত্রেয় বুদ্ধের জন্মের অপেক্ষায় ছিলেন।

ধনঞ্জয়—(১) অর্জুনের এক নাম। সমস্ত ধন জয় ও সংগ্রহ করে তার মধ্যে বাস করতেন বলে এই নাম। (২) কশ্যপ কদ্রুর একটি ছেলে; ত্রিপুর নিধনের সময় মহাদেবের রথে অশ্ববন্ধন রজ্জু হিসাবে কাজ করে।

ধনুগ্রহ—ধৃতরাষ্ট্রের একটি ছেলে। কুরুক্ষেত্রে ভীমের হাতে নিহত।

ধনুষ্কোটি—৯°১২'উ×৭৯°২৫' পূ। ধনু তীর্থ। বর্তমানে মাদ্রাজে একটি বন্দর। ভারত ও বঙ্গোপসাগরের সঙ্গম স্থলে। প্রসিদ্ধ তীর্থ। ধনুকের কোটি/কোণ দিয়ে এই স্থানে রামচন্দ্র সেতু ভেঙ্গে দেন। কাছেই রামেশ্বর তীর্থ। পক-প্রণালীতে রামেশ্বরম দ্বীপের পূর্বপ্রান্তে। রামেশ্বরম থেকে ১০-১২ মাইল মত। অপর মতে লক্ষ্মণ বাণ-বিদ্ধ করে এটি গঠন করেছিলেন (স্কন্দ-পু)। কেপ-কোরি (টলেমি)।

ধন্বন্তরি—ধন্বন্তরি গোত্র প্রবর্তক। ঋকবেদে ধন্বন্তরি ও দিবোদাস দুই নামই পাওয়া যায়। দিবোদাস গোত্রেরও উল্লেখ আছে। সুশ্রুত সংহিতায় জানা যায় কাশীরাজ দিবোদাস-ধন্বন্তরি বানপ্রস্থ নিয়ে বনে বাস করছিলেন। এই সময় সুশ্রুত ও সুশ্রুতদের সহপাঠীদের অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ শিক্ষা দেন। গরুড় পুরাণে গৃৎসমদ ঋষির ছেলে শৌনক, শৌনক পুত্র দীর্ঘতমা এবং দীর্ঘতমার ছেলে ধন্বন্তরি। মোটামুটি বংশ পরিচয় অনিশ্চিত এবং বহু মতে ধন্বন্তরি ও দিবোদাস বিভিন্ন। তবে কাশীরাজ বংশে জন্ম এবং দীর্ঘতমার পুত্র এ বিষয়ে অনেকেই এক মত।

পুরূরবা (দ্রঃ) বংশ। ভাগবতে (৯।১৮) ধন্বন্তরি>কেতুমান>ভীমরথ>দিবোদাস, দ্যুমান (=প্রতর্দন), শত্রুজিৎ, বৎস, ঋতুধ্বজ, কুবলয়াশ্ব। দ্যুমান>অলর্ক>সন্ততি>সুনীথ>নিকেতন>ধর্মকেতু>সত্যকেতু>ধৃষ্টকেতু>সুকুমার>বীতিহোত্র>ভর্গ>ভার্গভূমি।

বিক্রমাদিত্যের সভার ধন্বন্তরি ৪র্থ শতকের লোক; ইনি মূল ধন্বন্তরি কি না প্রমাণ নাই। আর এক মতে সমুদ্রমন্থনের দ্বিতীয় পর্বে এঁর আবির্ভাব।

শ্বেতাম্বরধর, হাতে শ্বেত কমণ্ডলুতে অমৃত। ভাগবতে বিরাট ষণ্ডাগুণ্ডা চেহারা, চক্ষু অরুণ, রঙ শ্যামল, বয়সে তরুণ, সিংহবিক্রম ও অমৃত কলস হাতে। ব্রহ্মবৈবর্তে এর প্রথম গ্রন্থ চিকিৎসাতত্ত্ব বিজ্ঞান। ধন্বন্তরি দেববৈদ্য, সর্ববেদবিদ্, এবং মন্ত্রতন্ত্র বিশারদ। ইনি দেবতা, দেবতার মতই পূজিত হতেন ও যজ্ঞের ভাগ পেতেন। হরিবংশে (১।২৯।-) সমুদ্র মন্থনে উঠে আসেন। আগে থেকেই সিদ্ধিলাভের জন্য তপস্যা করছিলেন। ইনি যখন উঠে আসেন বিষ্ণু তখন ধ্যান করছিলেন। জল

থেকে উঠে আসার জন্য বিষ্ণু নাম দেন অব্জদেব। বিষ্ণু বর দিতে চান। ধন্বন্তরি নিজেকে বিষ্ণুর ছেলে বলে দাবি করেন এবং বাসস্থান ও যজ্ঞভাগ চান। তিনি দেবতা নন বলে বিষ্ণু দিতে পারেন না; তবে বর দেন পরজন্মে দ্বিতীয় দ্বাপরে গর্ভ অবস্থাতেই অণিমা প্রভৃতি সিদ্ধিলাভ করবেন; আয়ুর্বেদ আটভাগে বিভক্ত করবেন এবং সেই শরীরে দেবত্ব পাবেন, স্বশরীরে স্বর্গে যাবেন এবং ব্রাহ্মণরা 'যক্ষ্যান্তি ত্বাং'-। ভাগবতে (৮।৮) বিষ্ণুর অবতার ও যজ্ঞভাগের অধিকারী। এরপর দ্বিতীয় দ্বাপরে হরিবংশে (১।২৯।-)সুনহোত্রের এক ছেলে শল; শলের ছেলে আর্ষ্টিষেণ; আর্ষ্টিষেণের ছেলে কাশ এবং কাশের ছেলে ধন্বা। সুনহোত্রের দ্বিতীয় পুত্র গৃৎসমদ; একটি মতে ধন্বন্তরি এই গৃৎসমদ্ বংশে জন্মান। কাশের ছেলে রাজা ধন্বা পুত্র কামনায় দীর্ঘ দিন অব্জ দেবের আরাধনা করেন। ধন্বা চান অব্জদেবই তাঁর ছেলে হয়ে জন্মাক। অব্জদেব প্রীত হয়ে ধন্বের ছেলে রূপে ধন্বন্তরি নামে জন্ম গ্রহণ করেন। ভরদ্বাজের কাছে এই কাশীরাজ আয়ুর্বেদ শেখেন এবং আয়ুর্বেদকে আট ভাগে ভাগ করেন। ধন্বন্তরির ছেলে কেতুমান, কেতুমানের ছেলে ভীমরথ এবং ভীমরথের ছেলে দিবোদাস। চরকে কিন্তু ধন্বন্তরি নাম নাই।

পরিক্ষিৎ রাজাকে বাঁচাবার জন্য একটি মতে ইনিই আসছিলেন; পথে তক্ষক এঁকে ধনরত্ন দিয়ে ফিরিয়ে দেন। ধন্বন্তরি এক বার শিষ্যদের নিয়ে কৈলাস যাচ্ছিলেন পথে তক্ষক এক জায়গায় ফোঁস করে ওঠে। ধন্বন্তরির একটি শিষ্য সঙ্গে সঙ্গে তক্ষকের মাথা থেকে মণিটি তুলে নিয়ে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দেন। বাসুকি খবর পেয়ে দ্রোণ, পুণ্ডরীক, ধনঞ্জয় ইত্যাদি সাপের নেতৃত্বে হাজার হাজার সাপকে পাঠান; এদের বিষাক্ত নিশ্বাসে ধন্বন্তরির শিষ্যরা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। ধন্বন্তরি তৎক্ষণাৎ একটি গাছ থেকে ঔষধ তৈরি করে এদের জ্ঞান ফিরিয়ে আনেন এবং সাপেদের সংজ্ঞাহীন করে দেন। বাসুকি তখন মনসাদেবীকে পাঠান। মনসাদেবীও এই শিষ্যদের আবার হতজ্ঞান করে দিলে ধনন্তরি এদের আবার সুস্থ করে তোলেন। মনসাদেবী হেরে গিয়ে শিবের কাছে প্রাপ্ত ত্রিশূল দিয়ে আক্রমণ করেন। শিব ও ব্রহ্মা তখন আবির্ভূত হয়ে দুজনকে শান্ত করেন (ব্রহ্ম বৈ-পুরাণে কৃষ্ণ জন্ম খণ্ড)।

পুরাণে একটি কাহিনীতে আছে গালব বনের মধ্যে কুশ ও সমিধ আনতে যান। হাঁটতে হাঁটতে ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়েন। এমন সময় বীরভদ্রা নামে একটি বৈশ্য কন্যা সেই পথে জল নিয়ে আসছিলেন। এর কাছ থেকে গালব জল চেয়ে খান এবং সন্তুষ্ট হয়ে সুপুত্র হক বর দেন। মেয়েটি জানায় তার বিয়েই হয় নি। গালব তখন কুশ দিয়ে একটি পুরুষ তৈরি করে এই কুশপুত্তলিকার কাছ থেকে সন্তানবতী হতে বলেন। কুশপুত্তলিকা ব্রাহ্মণ, বীরভদ্রা বৈশ্য অর্থাৎ সন্তান হয় অম্বষ্ঠ; সুন্দর একটি বালক জন্মায়; নাম রাখা হয় ধন্বন্তরি। এই ধন্বন্তরি ও সমুদ্র মন্থনের ধন্বন্তরি এক ব্যক্তি কিনা কোথাও উল্লেখ নাই (অম্বষ্ঠাচার চন্দ্রিকা)।

ধবলগিরি—ধবলি পর্বত, ধৌলি। উড়িষ্যাতে খুর্দা সার্বাডিভিসানে। খণ্ডগিরি থেকে ৫ মাইল। ভুবনেশ্বরের থেকে ৪-৫ মাইল খণ্ডগিরি। এখানে অশোকের শিলালেখ ও

বহু বৌদ্ধগুহা রয়েছে। ধৌলি শিলালেখে আছে 'দুবলহি তুফ' = দুর্বলদের স্তূপ। অর্থাৎ ধৌলি হচ্ছে > দুবল বিহার। শিলালেখে আছে পাহাড়টি তোসল-এ অবস্থিত। এই তোসল = 'তোসলাঃ কোসলাঃ' (ব্রহ্মাণ্ড)। গিরনর ও ধৌলি শিলালেখ অক্ষর ও ভাষার দিক থেকে পুনরাবৃত্তি।

ধম্ম—ধম্ম ও সংস্কৃতে ধর্ম দুটি একার্থক শব্দ নয়। ধম্ম অর্থে নিয়ম, শীল, গুণ, দেশনা ইত্যাদি। জাগতিক ভোগসুখের ঊর্দ্ধে দুঃখ বিহীন পরমশান্তি নিবাণ প্রাপ্তির জন্য যে সাধনা তাই ধম্ম। বুদ্ধের ধম্মঃ—পরিয়ত্তি, পটিপত্তি, ও পটিবেধ ধম্মরূপে ত্রিবিধ।

ধম্মকায়—বুদ্ধের আধ্যাত্মিক শরীর। এই শরীরে বুদ্ধোপযোগী সমস্তগুণের সমাবেশ হয়েছে। এই শরীর অনন্ত ও বিশ্বব্যাপী। ধম্মকায় অচিন্তনীয়, অবর্ণনীয়, অপরিবর্তনীয়, অজ্ঞেয় এবং জরা মৃত্যু ও নির্বাণের ঊর্দ্ধে। মহাযান মতে ধম্মকায়ই নির্বাণ।

ধর—প্রথম বসু। ধর্মের ঔরসে স্ত্রী ধূম্রার গর্ভে জন্ম। ধরের দুই ছেলে দ্রবিণ ও হুতহব্যবাহ (মহা ১।১০।১৮,২০)।

ধরা—দ্রোণ নামে বসুর স্ত্রী। (২) হরিবংশে (১।৩।১১৭) কশ্যপের স্ত্রী ; সন্তান জলচর ও স্থলচর প্রাণী।

ধরাবৎ—গয়া জেলাতে জাহানাবাদ সাবডিভিসানে। এখানে কুণ্ব পর্বতে গুণমতী বিহারে হিউ-এন-ৎসাঙ এসেছিলেন।

ধর্ম—(১) যাহা ধারণ ও পোষণ করে। ব্যক্তিগত জীবন, সামাজিক জীবন এবং পর-লৌকিক জীবনকে যা সুখান্বিত ও শান্তিময় করে। ধর্মের আচরণে নিজের ও বিশ্ব-মানবের কল্যাণ হয় ; পাপক্ষয় হয় ; পুনরায় আর জন্মাতে নাও হতে পারে। ভয়, ভক্তি, প্রেম ইত্যাদি ধর্ম থেকে গড়ে ওঠে , কিন্তু পরে ব্যবসায় ও প্রাণহীন অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। ধর্মীয় গুরু হয়ে সেবা পাবার জন্য রক্তারক্তি হয়। নতুন ধর্মমত আবার গড়ে উঠতে থাকে। (২) বরাহ পুরাণে আছে সৃষ্টি করার জন্য ব্রহ্মা যখন গভীর ধ্যানে মগ্ন ছিলেন তখন তাঁর দক্ষিণ অঙ্গ থেকে ধর্মের জন্ম হয়। ধর্ম চতুষ্পাদ এবং বৃষভ আকৃতি। গুণ, ধর্ম, ক্রিয়া ও জাতি ধর্মের এই চারটি পদ। সত্যযুগে ধর্ম চতুষ্পাদ, ত্রেতায় ত্রিপাদ, দ্বাপরে দ্বিপাদ ও কলিতে একপাদ। এঁর দুই মাথা ও সাত হাত। বেদে এঁর নাম ত্রিশৃঙ্গ। মহাভারতে (১।৬০।৩০) ব্রহ্মার দ-স্তন থেকে জন্ম ; এই ধর্ম সর্ব লোকের সুখাবহ। এঁর তিন ছেলে শম (স্ত্রী প্রাপ্তি ও অঙ্গনা), কাম (স্ত্রী রতি) ও হর্ষ (স্ত্রী নন্দা)।

বামন পুরাণে এঁর স্ত্রী অহিংসা (দ্রঃ- অসিক্লী)। অহিংসার চারটি ছেলে সনৎকুমার, সনাতন, সনক ও সনন্দ। অন্য পুরাণে এঁরা চারজন ব্রহ্মার মানসপুত্র। পুরাণে ধর্মের স্ত্রী তেরটি ঃ- শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, ধৃতি, পুষ্টি, তুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপুস্‌, শান্তি, সিদ্ধি ও কীর্তি। বিভিন্ন পুরাণ ইত্যাদিতে দক্ষের তেরটি মেয়ের, ধর্মের স্ত্রী হিসাবে, নামও পাওয়া যায় ঃ—শ্রদ্ধা, শান্তি, পুষ্টি, তুষ্টি, ক্রিয়া, বুদ্ধি, মেধা,

মৈত্রী, দয়া, উন্নতি, তিতিক্ষা, হ্রী ও মূর্তি। মহাভারতে (১৬০।১৩) ১০ জন স্ত্রী দক্ষকন্যা ঃ—কীর্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, মেধা, পুষ্টি, শ্রদ্ধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, মতি।

বিষ্ণু পুরাণে (১।১৫) বৈরিণীর দশ মেয়েকে বিয়ে করেন ঃ—অরুন্ধতী (সন্তান পৃথিবী বিষয় ঔষধাদি), বসু (সন্তান বসুগণ), যমী (নাগবীথি), লম্বা (ঘোষ, এ'রা দেবতা), ভানু (ভানুগণ), মরুৎবতী (মরুত্বান ও জয়ন্ত), সংকল্পা (সংকল্প), মুহূর্তা (মুহূর্তাভিমানী), সাধ্যা (সাধ্যগণ), বিশ্বা (বিশ্বদেবগণ)। আরো কয়েকটি নাম পাওয়া যায় ঃ-ককুভ, সুনৃতা। এই সব স্ত্রীদের থেকে এক একটি বংশ গড়ে ওঠে। শ্রদ্ধা থেকে শুভ ; মৈত্রী-প্রসাদ, দয়া-অভয়, শান্তি-সুখ, তুষ্টি-মোদ, উন্নতি-দর্প, বুদ্ধি-অর্থ, মেধা-সুকৃতি, তিতিক্ষা-শম, হ্রী-প্রশ্রয়, মূর্তি-নর, নারায়ণ ; সূনৃতা>সত্যব্রত ও সত্যসেন দুটি দেবতা। এই সত্যসেন বহু দুষ্ট যক্ষ, দানব ইত্যাদি নিহত করেন।

ভাগবতে (৬।৬) প্রাচেতস দক্ষ ও অসিক্নীর দশটি মেয়েকে ধর্ম বিয়ে করেন। অরুন্ধতীর বদলে এখানে ককুভ নাম রয়েছে। ভানুর ছেলে দেবর্ষভ, লম্বার বিদ্যোত। ঋষভের ছেলে ইন্দ্রসেন এবং বিদ্যোতের ছেলের নাম স্তনয়িত্নু। ককুভের ছেলে সঙ্কট ; এবং সঙ্কটের ছেলে কীকট ও দুর্গদেব। যামীর ছেলে স্বর্গ ও স্বর্গের ছেলে নন্দী। সাধ্যার ছেলে সাধ্যগণেরা এবং সাধ্যগণদের ছেলে অর্থসিদ্ধি। এই সাধ্যরা ব্রহ্মার ছেলে নন।

ধর্মের আর তিনটি ছেলে শম, কাম, ও হর্ষ; এ'দের স্ত্রী যথাক্রমে রতি, প্রাপ্তি ও নন্দা। ধর্মের (ছেলে দে- ভাগ ৪ ৫।১১) হরি, কৃষ্ণ, নর ও নারায়ণ। ভবিষ্যপর্বে হরি বংশে (৩।১৪ ৩৫) ৫টি স্ত্রী ঃ—লক্ষ্মী, কীর্তি সাধ্যা, বিশ্বা ও মরুত্বতী ; এরা দক্ষকন্যা।

ধর্মের স্ত্রী ধর্মবতীর মেয়ে ধর্মব্রতা (দ্রঃ) : ব্রহ্মার ছেলে মরীচির সঙ্গে বিয়ে হয়। এক দিন মরীচি বন থেকে ফুল ও কুশ ইত্যাদি সংগ্রহ করে ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসে আহার করে ঘুমিয়ে পড়েন। স্ত্রী পা টিপে দিতে থাকেন। ইতি মধ্যে ব্রহ্মা আসেন এবং ধর্মব্রতা ব্রহ্মার অতিথি সৎকার করতে থাকেন। মরীচির ঘুম ভাঙলে দেখেন স্ত্রী অপর এক জনের সেবা করছেন ফলে শাপ দিয়ে স্ত্রীকে পাথরে পরিণত করেন। ধর্মব্রতা তখন অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে তপস্যা করতে থাকেন। ব্রহ্মা ইত্যাদি অপর দেবতা এসে সান্ত্বনা দেন এবং কথা দেন তাঁরাও এই পাথরের মধ্যে অবস্থান করবেন। এই পাথরটি এর পর ধর্মশিলা (দ্রঃ) নামে পরিচিত হয় (অগ্নি-পু ১১৪।-)।

অণিমাণ্ডব্যের (দ্রঃ) শাপে ধর্ম বিদুর হয়ে জন্মান। ধর্মের অংশেই কুন্তী পুত্র যুধিষ্ঠিরের জন্ম। পাণ্ডবদের বনবাসের সময় হরিণ রূপে এসে ধর্ম এক ব্রাহ্মণের 'অরণী' চুরি করেন এবং তারপর যক্ষ/বক যুধিষ্ঠিরকে বাদ দিয়ে চার ভাইকে ক্রমশ নিহত করেন এবং পরে যুধিষ্ঠিরের বাক্যে ও ধর্মজ্ঞানে সন্তুষ্ট হয়ে সকলকে জীবিত করে দেন। যক্ষ (মহা ৩।২৯৭।১১) নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন অহং বকঃ শৈবলমৎস্য-ভক্ষঃ। এই ধর্মই একবার ক্রোধরূপে এসে যজ্ঞীয়ধেনুর দুধের সঙ্গে মিশে অবস্থান করেন। জমদগ্নি এই দুধ খেয়ে ফেলেন কিন্তু তাঁর একটুও ক্রোধের উদ্রেক হয় না। ধর্ম তখন

পরাজিত হয়ে জমদগ্নিকে আশীর্বাদ করে যান (দ্রঃ-ক্রোধ)। পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থানের পথে ধর্ম কুকুর বেশে সঙ্গ নিয়েছিলেন।

ধর্ম ও কাল দুজনে ঠিক এক দেবতা নন। কাল হচ্ছেন যম। কালের পিতা সূর্য, মা বিশ্বকর্মার মেয়ে সংজ্ঞা। এই কাল বিষ্ণুর ৬-ষ্ঠ বংশধর। কালের কাজ মানুষের পাপপুণ্যের বিচার। আর ধর্মদেব ধর্মের মূর্ত বিগ্রহ। কালের কোন ছেলে নাই ; ধর্মদেবকে অবশ্য আত্ম নিয়ন্ত্রণকারী দেবতা যমন/যম ও বলা হয়। দ্রঃ- ধর্মারণ্য।

ধর্ম খুচরা—কামযান (দ্রঃ) পন্থীদের ধর্ম। আনন্দ অর্থে এ'রা যৌন পরিতৃপ্তি বুঝতেন বা বোঝেন। ফ্রয়েডীয় সত্য অবাধ যৌনতার শেষে সার্বলিমেসান আসবেই। এই মতবাদের ভিত্তিতে এ'রা বলেছেন ভুক্তিমুক্তি। ফলে দেখা দেয় রাসলীলা, মন্দিরের গায়ে যৌনমিলন অর্থাৎ অদ্বয় তত্ত্ব, বহুস্থানে নগ্নদেবদেবী (তন্ত্রে)। লিবিডো ভিত্তিক এই মতবাদের সঙ্গে সৌন্দর্যজ্ঞান মিশিয়ে রাধা=উজ্জ্বল রসের (দ্রঃ) জন্ম। সহজিয়া বৈষ্ণবরা ফলে কিছুটা সফল হন। তন্ত্র সাধনার সবটাই কিন্তু বীভৎস করাল আবেদনে ভরা ; ফলে তান্ত্রিকদল বৈষ্ণবদের কাছে হেরে যান। দ্রঃ-তন্ত্র, ধর্ম বৈষ্ণব।

বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, বা তান্ত্রিক তথা সহজিয়া ইত্যাদিদের মতবাদ আলোচনা করলে দেখা যাবে এদের ধর্ম খেটে খাওয়া মানুষের জন্য নয়। অন্নের চিন্তা থেকে যারা মুক্ত তারাই জীবন ভর পাগলামি/সাধনা করতে পেরেছেন। ২০-২৫ বছরের কোন যুবককে মাথায় চুল রেখে, কাঁচুলি ও সাড়ি পরে গোপী সেজে নাচতে দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায় দেহে এদের স্বাভাবিক যৌনগ্রন্থি রসের অভাব ঘটেছে। দ্রঃ- উজ্জ্বল রস।

অথচ এ তুলনায় বেদের ধর্ম সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক। বিশেষ বিশেষ ঋতুতে ঋত্বিকরা এসে ধনী যজমানের ঘরে যজ্ঞ করে যেতেন। সমাজে উৎসবে গ্রাম মুখরিত হয়ে উঠত। দুহাতে দান করতেন। গোরু বা ঘোড়ার মাংস রান্না হত। যাজকদের জীবিকা নির্বাহ হত তথা ধনবণ্টনের সুব্যবস্থা হত। মুক্তি পাওয়ার 'পাগলামি' মাস হিস্টিরিয়া হয়ে দেখা দিত না।

খুচরা ধর্মগুলিতে হটযোগ মাধ্যমে কায়সাধনা প্রায় সবগুলিতেই বর্তমান। বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সহজিয়াদের কায়সাধনা অতি প্রয়োজনীয়,—সহজকে বা মহাপ্রেমকে উপলব্ধি করার জন্য এই প্রয়োজন।

ধর্মচক্র—(দ্রঃ) বৌদ্ধ চক্র।

ধর্মজৈন—দ্রঃ- জৈন।

ধর্মঠাকুর—এ'কে বহু জায়গায় নিরঞ্জন (দ্রঃ) বলা হয়েছে। পূর্ণ চৈতন্যের সমুদ্র থেকে এ'র আবির্ভাব। বাহন উলূক। ঋকবেদে ধর্মরাজ যমের বাহনও উলূক। একাধারে ইনি ত্রিমূর্তি। ইনিই ওঁ। অন্য সমস্ত উপাধি মিলিয়ে ইনি ব্রাহ্মণ্য ব্রহ্ম। বহু স্থানে ইনি উপনিষদের নিরুপাধিক ব্রহ্ম=শিব (শৈব বা তান্ত্রিক মতে) = বিষ্ণু (বৈষ্ণব মতে)। বালুকা (বর্দ্ধমান জেলাতে) নদীর তীরে এ'র আবির্ভাব। এক মাত্র পশ্চিম বঙ্গে পূজিত।

শূণ্যপুরাণে এ'কে শূন্যরূপ বলে নমস্কার করা হয়েছে। ধর্মমঙ্গল কাব্যে কৃষ্ণ

বা রামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। কিন্তু পূজাপার্বণে ইত্যাদি লৌকিক আচারে ইনি যেন শিব; শৈবধর্মের সঙ্গে খুব বেশি মিশে গিয়েছেন। ধর্মমঙ্গল কাব্যে সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণ্য দেবতা, কোন বৌদ্ধ রঙ নাই। কিন্তু এঁর পূজার গ্রন্থ ইত্যাদিতে ইনি মিশ্র চরিত্রের। এই সব গ্রন্থে শূন্য ও শূন্যতা সম্বন্ধে নানা কথা আছে। কিন্তু ধর্মমঙ্গলে শূন্য ও শূন্যতা অতি কদাচিৎ উল্লিখিত হয়েছে। ধর্মপূজা বিধান ইত্যাদিতে বহু স্থানে ইনি ধৌত কুন্দেন্দু ধবল। শূন্যপুরাণে দেবস্থানে আছে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও ইন্দ্র এঁর তপস্যা করছেন। হনুমান (দ্রঃ) এঁর স্নানের জন্য বজ্র নখে করে পুকুর কেটে দিচ্ছেন। ধর্মঠাকুর স্নান করতে গেলে সমস্ত দেবতা এবং নারদ, বশিষ্ঠ ইত্যাদি ঋষিরাও সঙ্গে যান। বহু স্থানে ইনি শিব বা বিষ্ণু; কৈলাসে বা বৈকুণ্ঠে থাকেন। নিরাকার বলা হলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ইনি দেহধারী সাধারণ দেবতা হিসাবেই পূজিত। বাঁকুড়াতে চম্পা নদীতে ইনি ব্রাহ্মণদের মত সন্ধ্যাহ্নিক করেন

এঁকে সূর্যও বলা হয়েছে। আকাশে উদিত হন। সঙ্গে বার জন আদিত্য ও ইন্দ্র ইত্যাদি থাকেন। সপ্তাশ্ব বাহিত সোনার রথে সূর্য হিসাবে বর্ণনা ঋক্‌বেদের ১।২২।৮, ১।২৫।৪, ১।৩৫।২, ৪, ৫) মত। ধর্মমঙ্গলে বিষ্ণু বা কৃষ্ণের মত যেন। পায়ে তুলসী পাতা দেওয়া হয়। আবার চণ্ডীর স্বামী হিসাবে বিল্বপত্র দিয়েও পূজার ব্যবস্থা রয়েছে। ধর্মমঙ্গলে শিব অনেক সময় ধর্মঠাকুরের আজ্ঞা পালন করেন এবং এঁকে সাহায্য করছেন ও দেখা যায়। বহু জায়গাতে আছে ধর্মঠাকুর সভাতে বসে অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে মন্ত্রণা করছেন: কারণ শাক্তরা ভীষণ উৎপাত করছে। ধর্মঠাকুরের পূজা চালু করার জন্য পরম ভক্ত লাউসেন বিপদে পড়লেই ধর্মঠাকুরের সিংহাসন নড়ে ওঠে। উলূক ও হনুমানের কাছে ধর্ম ঠাকুর জানতে চান কি ব্যাপার। হনুমান ধর্মঠাকুরের অমাত্য ও প্রধান অনুচর। অনেক সময় হনুমান বাহনও।

মঙ্গলকাব্যে গাঢ় নীল রঙ; হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম। বুকে কৌস্তুভ। ধর্মপূজা বিধানে বিষ্ণুর দশ অবতার রূপে ইনিই দশবার এসেছিলেন। ধর্মঠাকুর রামলীলা করেন। ধ্রুব, প্রহ্লাদ ইত্যাদি সকলকে রক্ষা করেন। ইনি অর্জুনের সারথি এবং রাবণের হত্যাকারী।

সত্য, ত্রেতা ইত্যাদি চারটি যুগে এবং আগামী শূন্য যুগে ধর্মঠাকুরের একজন করে মোট ৫-জন পণ্ডিত ছিল বা আছে। এঁরা যথাক্রমে সেতাই (সাদা), নীলাই (নীল), কংসাই (হলুদ), রামাই (লাল) ও গোঁসাই (সবুজ)। ধর্মঠাকুরের পূজার সময় এই পাঁচ জনকেও পূজা করতে হয়। এই ৫-পণ্ডিত / পুরোহিত মন্দিরের ৫-টি দরজায় অবস্থিত। এঁদের প্রত্যেকের এক জন করে মোট ৫-জন কোটাল আছে; এরা চন্দ্র, হনুমান, সূর্য, গরুড় ও উলূক। শূন্য পুরাণে এই কোটালেরা দ্বারপাল ও পুরোহিতদের অনুচরও। ধর্মপূজা বিধানে কিন্তু কোটলরা ঠিক দ্বারপাল নন; দ্বারপাল হিসাবে চার জন পাত্র রয়েছেঃ—ঝঝঁরিসুন্দর / মহাকাল, জম্ভব / তীক্ষ্ণদংষ্ট্রা, মহাকায় ও নন্দীদেব। ৫-ম শূন্যদ্বারে কোন পাত্র নাই। পণ্ডিতদের আবার অনেকগুলি করে

অনুচর, এবং আমিনী / ঘটদাসী রয়েছে। বৌদ্ধদের পঞ্চতথাগত মতবাদ এই ভাবে যেন পরিমণ্ডিত হয়েছে। দ্রঃ-ধর্মারণ্য।

সাধারণত সঙ্গে কোন শক্তিদেবীর উল্লেখ কোথাও নাই। তবে কামিন্যা বলে একটি দেবী যেন ধর্মঠাকুরের শক্তি। যে সব স্থানে শিব বলে উল্লিখিত সেই সব স্থানে শক্তি হিসাবে সঙ্গে ভগবতী, আদিদেবী, আদিশক্তি, বাশুলি, চণ্ডী, দুর্গা, পার্বতী ইত্যাদির উল্লেখ রয়েছে। পূজাপদ্ধতি ইত্যাদি গ্রন্থে বারবার এঁকে মহাদেব বলা হয়েছে। কিছু কিছু মন্দিরে ইনি সম্পূর্ণ শিবে পরিণত। ধর্মের গাজন আসলে শিবের গাজন। এই পূজা মূলত শিবের পূজা। এই ঠাকুর দুর্গা, বাশুলি, কালী ইত্যাদির পূজা উৎখাত করে দিয়ে নিজের পূজা প্রচলন করেছিলেন। ভক্ত লাউসেন এইসব দেবীদের ষড়যন্ত্র নষ্ট করে দিয়ে ধর্মঠাকুরের পূজা প্রবর্তন করেন। দ্রঃ-ধর্মারণ্য।

ধর্মঠাকুর সম্প্রদায়—পূজাপদ্ধতি ইত্যাদি গ্রন্থগুলিতে ধর্মঠাকুরকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শিব বা বিষ্ণুর সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। যমের সঙ্গে তত বেশি নয়। ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে যেন বিষ্ণু, কৃষ্ণ বা রামের ঘনিষ্ঠ প্রতিচ্ছবি। আবার এই সম্প্রদায় বৈশাখী পূর্ণিমা (বুদ্ধের জন্মতিথি) ও আষাঢ়ী পূর্ণিমা (বুদ্ধ এই দিন ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন)—এই দুটি দিনকেও শ্রদ্ধায় পালন করেন। কেবল মাত্র পশ্চিম বঙ্গে জনপ্রিয় ধর্মমত হয়ে দেখা গিয়েছিল। উপাস্য ধর্মঠাকুর। উড়িষ্যার কিছু কিছু অংশে ও ময়ূরভঞ্জেও। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন বিশ্বাস মিলে খিচুড়ি। বৌদ্ধদের শেষ দিকের আচার আচরণ + জনপ্রিয় ব্রাহ্মণ্য সংস্কার + অনার্য আদিবাসীদের আচার আচরণ ও বিশ্বাস মিলিয়ে শ্রীক্ষেত্র। মন্ত্রযান ও বজ্রযান থেকেও অনেক কিছু এসেছে। বলিদান ও হোমও আছে। ১০% পরবর্তী কালের বৌদ্ধমতবাদ + ৯০% অন্যান্য ধর্ম থেকে। সহজিয়া বৌদ্ধদের মধ্যে যে যোগাচার ছিল ধর্মঠাকুর সম্প্রদায়ে সেটি নেই। নিরাকার এক ভগবানে বিশ্বাসী ; এদের গ্রন্থ শূন্যপুরাণ। শূন্যপুরাণ ও ধর্মপূজা বিধান গ্রন্থে দেখা যায় মুসলমান আক্রমণকে ও অভিজাত হিন্দুদের ওপর অত্যাচারকে ধর্মঠাকুর সম্প্রদায়ীরা আনন্দে অভিনন্দিত করেছেন। এই কারণে জবাই, পশ্চিমমুখ হয়ে পূজা, শুক্রবারকে কিছুটা অধিক গুরুত্ব দেওয়া ইত্যাদি এঁদের মধ্যে দেখা যায়। হিন্দু, বৌদ্ধ এবং স্থানীয় দেবতা, অপদেবতা এবং কিছু নাথ ও সিদ্ধকেও এঁরা পূজা করেন। দ্রঃ- ধর্মপূজা, ধর্মারণ্য।

ধর্মদত্ত—করবীর নগরীতে এক ব্রাহ্মণ। এক দিন পূজার উপচার নিয়ে মন্দিরে যাচ্ছিলেন এমন সময় পথে রাক্ষসী কলহার (দ্রঃ) সঙ্গে দেখা এবং পূজার উপচারগুলি এঁর মুখে ছুঁড়ে মারেন। এই উপচারের সঙ্গে তুলসীপাতা ছিল। এর স্পর্শে কলহার পূর্বজন্মের কাহিনী মনে পড়ে এবং ধর্মদত্তের কাছে এই রাক্ষসী জীবন থেকে মুক্তির উপায় জানতে চান। ধর্মদত্ত করুণাসিক্ত হয়ে কার্তিকের ব্রত জনিত সমস্ত পুণ্য এঁকে দান করেন। পরজন্মে এঁরা দুজনে দশরথ ও কৈকেয়ী হয়ে জন্মান (পদ্ম ও স্কন্দ-পু)।

ধর্মধ্বজ—দক্ষসাবর্ণির ছেলে ব্রহ্মসাবর্ণি ; ব্রহ্মসাবর্ণি ছেলে ধর্মসাবর্ণি; ধর্মসাবর্ণির ছেলে রুদ্রসাবর্ণি। রুদ্রসাবর্ণির ছেলে দেবসাবর্ণি এবং দেবসাবর্ণির ছেলে ইন্দ্রসাবর্ণি। ইন্দ্রসাবর্ণির ছেলে বৃষধ্বজ, বৃষধ্বজের ছেলে রথধ্বজ ; রথধ্বজের ছেলে ধর্মধ্বজ ও কুশধ্বজ। বৃষধ্বজ ছিলেন শিবভক্ত এবং আরাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে বৃষধ্বজের কুটিরে শিব তিন দেবযুগ অবস্থান করেন। বৃষধ্বজ তার পর ঘোষণা করেন অন্য দেবতাকে কেউ পূজা করতে পারবে না। এই জন্য সূর্য অভিশাপ দেন সমস্ত ধনসম্পত্তি নষ্ট হয়ে যাবে। শিব এতে ক্রুদ্ধ হয়ে সূর্যকে আক্রমণ করতে যান। সূর্য তখন কশ্যপের কাছে যান ; এঁরা দুজনে তারপর ব্রহ্মার কাছে এবং ব্রহ্মা এদের নিয়ে বিষ্ণুর কাছে আসেন। বিষ্ণু সকলকে শান্ত করে বলেন ইতিমধ্যে বহু দিন পৃথিবীতে কেটে গেছে ; বৃষধ্বজ ও রথধ্বজ মারা গেছে। বৃথা কলহ। এখন বেঁচে আছে ধর্মধ্বজ ও কুশধ্বজ। এ দিকে পৃথিবীতে ধর্মধ্বজ ও কুশধ্বজ লক্ষ্মীর তপস্যা করতে থাকেন। লক্ষ্মী এদের দেখা দিয়ে বর দেন তিনি এদের দুজনের সন্তান হয়ে জন্মাবেন এবং আবার ধনসম্পত্তি ফিরে আসবে। এর পর ধর্মধ্বজের স্ত্রী মাধবীর (দে-ভাগবত ৯।১৫।-) মেয়ে হয়ে লক্ষ্মী জন্মান নাম হয় (দ্রঃ-) তুলসী। দ্রঃ- সীতা।

ধর্মধ্বজ—জনক বংশে মিথিলার এক রাজা। দণ্ডনীতি, সন্ন্যাসধর্ম, ও মোক্ষশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। সুলভা নামে এক ব্রাহ্মণী সন্ন্যাসিনী যোগবলে মনোহর এক সুন্দরী সেজে এঁকে পরীক্ষা করতে আসেন। রাজা মুগ্ধ হয়ে এঁকে সংবর্দ্ধনা করেন। সুলভা তার পর যোগবলে নিজের স্বত্ত্ব, বুদ্ধি ও চক্ষু রাজার স্বত্ত্ব, বুদ্ধি ও চক্ষুতে সন্নিবিষ্ট করলে রাজা সুলভার অভিপ্রায় জানতে পারেন এবং সুলভাকে জানান আসক্তি, মোহ, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হয়ে তিনি পরাজ্ঞান লাভ করে মোক্ষ লাভ করেছেন। ফলে তাঁদের মিলন হতে পারে না। এক জন সন্ন্যাসিনী অপর জন গৃহস্থ, এক জন ব্রাহ্মণী অন্য জন ক্ষত্রিয়। দু জনের মধ্যে কোন অনুরাগও জন্মাতে পারে না। ব্রাহ্মণী যেহেতু রাজাকে পরাজিত করে নিজের উন্নতি চাইছেন সেই হেতু এই মিলন বিষময় হয়ে উঠবে। এর উত্তরে সুলভা জানান রাজা এখনও আমার বা আমার নয় এই দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত নন ; সকলকে এখনও সমান জ্ঞানে দেখতে পারছেন না। নিজেকে মিথ্যা মুক্ত মনে করছেন। রাজা এখনও জীবন্মুক্ত নন বলেই ব্রাহ্মণীর সংস্পর্শে তার অপকার হবে মনে করছেন। সুলভার জ্ঞান দেখে রাজা স্তম্ভিত হয়ে যান (মহা ১২।৩০৮।-)। (২) দ্রঃ-বৃষধ্বজ।

ধর্মনেত্র—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে।

ধর্মপত্তন—(১) শ্রাবস্তী। (২) কালিকট।

ধর্মপাল—আনু খৃ ৬-৭ শতক। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ দার্শনিক। দাক্ষিণাত্যে কাঞ্চির অধিবাসী। কিছু সময় গয়াতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করতেন ; কৌশাম্বীর তর্কসভাতে বহু হীনযানী পণ্ডিতদের পরাস্ত করেন। নালন্দার অধ্যক্ষ হয়েছিলেন ৬৩৫ খৃ। এর পর এঁরই শিষ্য প্রখ্যাত শীলভদ্র এখানে মঠাধ্যক্ষ হন।

ধর্মপুত্র—যুধিষ্ঠির।

ধর্মপূজা—ধর্মঠাকুরের (দ্রঃ) পূজা। ধর্মমঙ্গল কাব্যের দেবতা। আদিম সমাজের সৃ দেবতা ; সাদা রঙের পশুবলি দিয়ে পূজা করা হয়। ছাগল ও কবুতর বলি সাধারণ দেওয়া হয়। সাদা ঘোড়া এঁর বাহন ; সাদা ফুলে এঁর প্রসন্নতা।

ধর্ম, বৈষ্ণব—বৈষ্ণব ধর্ম বলতে বাঙলাতে কৃষ্ণ কেন্দ্রিক ভাগবত ভিত্তিক যে ধর্ম সে মূলত শাক্ত ধর্মের দ্বিতীয় একটি রূপ। এই ধর্মের মূল কাম বীজ, ও কামগায়ত্রী (দ্রঃ) ভৈরবীকে এখানে নিত্যসঙ্গী পরকীয়া হিসাবে পাবার চেষ্টা করা হয়েছে। ধনতান্ত্রি সমাজের রক্তচক্ষুকে শান্ত করার জন্য পরকীয়া তত্ত্বের (দ্রঃ) বহু বিকৃত ব্যাখ্যাও কর হয়েছে। মনের মানুষ বা সাধনসঙ্গিনী পেলেই কণ্ঠীবদল মন্দ নয় ; অন্তত বীভৎ ভৈরবীসেবন থেকে অনেক উন্নত প্রক্রিয়া। সহজিয়া মতবাদ অর্থে প্রাক্‌গুহ্য সমাজে অবদান যেন অপরিসীম। এই সহজিয়া দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গীতগোবিন্দের (দ্রঃ) উৎপত্তি এই সহজিয়া দর্শন থেকেই ভাগবতে বস্ত্রহরণ ও রাসলীলা ; শ্রীকৃষ্ণ ভাগবতে সম্ভোগ চূড়ামণি অথচ দেহের 'শ্রেষ্ঠ ধাতু' ত্যাগ করতেন না। অবশ্য বৈষ্ণব আচার্যদের একটি বিরাট গুণ সব সময় সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে এবং ভোগের মধ্য দিয়ে সাবলিমেসানে পথে এগিয়ে যাওয়া। তবে লিবিডোটা সব সময়ই ভিত্তিপ্রস্তর। বামাচারীরাও বীভৎ ধর্মীয় যৌনপরিতৃপ্তির মধ্যে দিয়েই সাবলিমেসানের দিয়ে এগিয়ে যান। অর্থাৎ দু সম্প্রদায়ই সাবলিমেসান চান ; একটি সম্প্রদায় সৌন্দর্যযান ও যৌনযান আর একটি সম্প্রদায় বীভৎসযান ও যৌনযান মাধ্যমে। বৈষ্ণব আচার্যরা লিবিডো সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না। কিন্তু তবু এটিকে সুনিপুণ ভাবে ধর্মে রূপ দিয়েছেন ; সৌন্দ প্রতিপদে উপচে উঠেছে। বৈষ্ণবধর্মের সবটাই উজ্জ্বল রস (দ্রঃ)। সখ্য, দাস্য, বাৎসল ইত্যাদি সমস্তই অতুলনীয়। আচার্যরা কেবল কোথায় থামতে হবে বুঝতে পারেন নি বিসর্জনীতে রবীন্দ্রনাথ থামতে জানেন। কিন্তু জয়দেব তথা ভাগবতের লেখক কবি না হবার ফলে থামতে পারে নি। উপগুপ্ত বলতে পারেন 'এসেছি বাসবদত্তা' আর বৃন্দাবনী লম্পট (তখন বয়স কত ?) কুব্জাকেও (দ্রঃ) বাদ দেন নি।

অতীতের মস্তান সমস্যা অর্থাৎ জগাই-মাধাই সমস্যা মেটাবার অতি সুন্দর ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল এই শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্পদায়ের মাধ্যমে। পোষমানা মহাপুরুষে পরিণত হচ্ছিল এঁরা। ভারতবর্ষের দুর্দশা, দারিদ্র্য ও বিজাতীয় শাসনের মূল বোধ হয় এইখানে মস্তানরা এ ভাবে নিয়ন্ত্রিত না হলে স্বাভাবিক ভাবেই তারা রাজনীতিতে নেমে যেত আউল, বাউল, নাথ, কর্তাভজা, সহজিয়া ইত্যাদি বহু সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল বৌদ্ধরাও ছিলেন। বৈষ্ণব কবিতার মধ্য দিয়ে এঁদের mass-Contact অতি নিপুণ কবিতাগুলি রহস্যের ও যৌনতার রসে কস্তুরী গন্ধে পরিণত হয়েছেঃ আজও মুগ্ধ করে দুঃখ কেবল এই বিরাট ভক্ত জনতার মধ্য থেকে একজন ফ্রয়েড দেখা দেয় নি অথচ উপাদান তাঁরা ভূরি ভূরি সংগ্রহ করেছিলেন ; মহালক্ষ্মীর মাথাতে যোনি-চিহ্ন স্থাপন করেছিলেন।

সর্বনাশ করেছিল সাংখ্য। পুরুষের সঙ্গে প্রকৃতি চাই এই অতি অসত্য দর্শনই রাধার জন্ম দিয়েছে। সৃষ্টিতে বহু অপুংজনি জন্ম আছে তাঁরা জানতেন না। আবার

অজামিল, ধ্রুব ও প্রহ্লাদ শাশ্বত স্বর্গে গিয়েছেন ; কোন রাধার প্রয়োজন এদের হয় নি। অর্থাৎ পুরাণের পরবর্তী যুগে আচার্যরা মনোমৈথুনের মধ্যে নিজেদের হারিয়ে ফেলেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ এদের জানা সম্ভব ছিল না পুরুষদেরও অগ্নিদা রস ক্ষরিত হয়। ব্যক্তিগত চিন্তাধারার ওপর নির্ভর করে পুরুষত্ব ও নারীত্ব : যে কোন পুরুষ নিজেকে কেবল তীব্র চিন্তার মাধ্যমে স্ত্রীতে বা ক্লীবে পরিণত করতে পারে। ঈশ্বরকে উপাধিযুক্ত করতে গিয়ে পুরুষে পরিণত করে বাকি সকলে শাঁখা, সিঁদুর ও কাঁচুলি পরে গোপী সেজেছিল। ফলে পার্থসারথিকে হারিয়ে লম্পট সারথিকে পেয়েছি যাঁর একমাত্র উপাধি পীনপয়োধর-পরিসরমর্দন-চঞ্চল-কর-যুগশালী।

মহাভারতে গর হজম হয়ে ওঠা সাংখ্যের বা গুহ্য সমাজের তথা সহজিয়াদের কোন ছায়া নাই। মহাভারতের বয়স হিসাবে করতে হলে এগুলি ও বিবেচ্য। মহাভারত অতুলনীয়।

মনের মানুষ / মানুষী সব যুগে সব সময়েই দুর্লভ। মনের মত শবরী, ডোম্বী ইত্যাদি পেলে আজও যে কোন দুর্দান্ত একনায়ক বা মন্ত্রী বা মন্ত্রিকৃৎরাও সব কিছু হাসিমুখে বিসর্জন দেন। ক্লিয়োপেট্রা তত্ত্বই একমাত্র সত্য এবং বৈষ্ণবধর্মের এটি প্রাণবস্তু। অবশ্য রাস ও রাসভলীলা বাদ দিয়ে সুস্থ অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও আছে।

প্রাকচৈতন্য যুগে কৃষ্ণ এবং গোপীরা বিশেষত রাধা রাসের মাধ্যমে মিলিত হয়ে অদ্বয় তত্ত্ব রূপায়িত করতেন। উত্তর চৈতন্য চিন্তাধারাতে চৈতন্যদেব নিজেই হচ্ছেন কৃষ্ণ ও রাধার যুগলমূর্তি—অদ্বয়তত্ত্ব।

ধর্ম, বৌদ্ধ, বাঙলাতে—পাল রাজারা বহু স্থানে বৌদ্ধ বিহার স্থাপনে পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। নালন্দার বহু সংস্কার করেছিলেন। বিভিন্ন মতবাদের বৌদ্ধ পণ্ডিতদের ও বিদেশী বৌদ্ধ পণ্ডিতদের মিলনের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল নালন্দা। তারানাথ অনুসারে ওদন্তপুরী / উদন্তপুরী মহাবিহার স্থাপন করেন প্রথম গোপাল। পাগ্-সোম্-জোন্-জঙ অনুসারে গোপালই নালন্দা স্থাপন করেছিলেন। এই গোপালের ছেলে ধর্মপাল = বিক্রমশিলাদেব ; ইনি বিক্রমশিলাবিহার স্থাপন করেছিলেন। উত্তরবঙ্গে সোমপুর মহাবিহারও ধর্মপাল কর্তৃক স্থাপিত। সোমপুর মহাবিহারের কাছে খসর্পণ অবলোকিতেশ্বরের মন্দির। এই মন্দিরের চারপাশে মুক্ত ধর্মশালা ছিল। এখানে তারাদেবীর বিগ্রহও ছিল।

বিক্রমপুরী বিহার সম্ভবত যেন পূর্ববঙ্গে। কুমার চন্দ্র অপর নাম হচ্ছে অবধূত এই বিহারে বসে একটি তান্ত্রিক টীকা লিখেছিলেন। ত্রৈকূটক বিহার ধর্মপালের সময় বর্তমান ছিল। এখানে আচার্য হরিভদ্র অষ্ট-সাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা লেখেন।

দেবী-কোট উ-বঙ্গে একটি বিহার। এখানে অদ্বয়বজ্র নামে একজন তান্ত্রিক বৌদ্ধ থাকতেন। বিখ্যাত শ্রমণী মেখলাও এই বিহারে ছিলেন। পণ্ডিত বিহার ছিল চট্টগ্রামে ; তান্ত্রিক মতবাদের মস্তবড় কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এই বিহারের সঙ্গে যেন তিলো-পা = তৈলপাদ যুক্ত ছিলেন। তিলোপা শিষ্য ছিলেন নড়-পা = নাড়পাদ। কনকস্তূপ বিহার ছিল পট্টিকেরক সহরে। সহরটি যেন ত্রিপুরা জেলাতে মেহেরকুল।

জগদ্দল বিহার প্রতিষ্ঠা করেন শেষ পালরাজা রামপাল। এখানে অবলোকিতেশ্বর ও মহাতারা বিগ্রহ ছিল। গঙ্গা ও করতোয়া সঙ্গমে নতুন রাজধানীতে এই বিহার। এখানে বিভূতিচন্দ্র ও দানশীল দুজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। দ্রঃ- হিউ-এন-ৎসাং ও ই-ৎসিঙ, বৌদ্ধধর্ম, বৌদ্ধদর্শন।

ধর্মব্যাধ—মিথিলাবাসী, জাতিস্মর, জিতেন্দ্রিয়, পিতামাতার সেবাপরায়ণ এক জন ব্যাধ। মিথিলাতে (মহা ৩।১৯৮।১০) মৃগ, বরাহ ও মহিষ মাংস বিক্রয় করতেন।

পূর্বজন্মে ইনি এক জন বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ ও এক রাজার বন্ধু ছিলেন। সংসর্গ দোষে অর্থাৎ রাজার সঙ্গে মৃগয়াতে গিয়ে হরিণ মনে করে এক মুনিকে বাণ বিদ্ধ করেন। মুনি এঁকে শাপ দেন এ জন্য শূদ্র ব্যাধ রূপে জন্মাতে হবে। অবশ্য কাতর অনুনয়ে জাতিস্মর হবার এবং শাপ শেষে আবার ব্রাহ্মণ হবেন বর দিয়ে ঋষি মারা যান। অন্য মতে পরজন্মে বৃত্তি, চরিত্র ইত্যাদি কি হবে তাও বর দিয়েছিলেন এবং মারা যান নি; ধর্মব্যাধের (মহা ৩।২০৬।৭) সেবাতে সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন।

এই জাতিস্মর ব্যাধের কাছে কৌশিক (দ্রঃ) ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা করতে এলে ধর্মব্যাধ দিব্যজ্ঞানে সমস্ত ঘটনা জানতে পারেন। কৌশিক কেন এসেছেন সব বলে যান; এবং সসম্মানে এঁকে গ্রহণ করেন এবং নিজের পূর্ব জন্মের কাহিনীও জানান। কুলধর্ম পালন করছেন বলেন। হরিণ ও মহিষ মাংস বিক্রয় করলেও তিনি নিজে এ সব পশু-হত্যা করেন না, এবং মাংস তিনি একদমই খান না। এই মাংসে লোকে দেবতাদের, পিতৃগণের, অতিথিগণের, ও আত্মীয়দের সেবা করে। নিহত পশুরও এতে পুণ্য হয়। তিনি সাধ্যমত দান করেন এবং দেবতা অতিথি, ভৃত্য ইত্যাদি সকলের খাবার পর যা থাকে তাই খান। ব্রহ্মবিদ্যা, দর্শন, মোক্ষ ও ধর্ম সম্বন্ধে ব্যাধ বহু উপদেশ দেন এবং প্রত্যক্ষ দেখাবার জন্য নিজের বৃদ্ধ পিতামাতার সামনে নিয়ে যান এবং বলেন পিতামাতাই সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ। এছাড়া জানান পিতামাতার অনুমতি না নিয়ে কৌশিক বেদ পাঠের জন্য গৃহ ত্যাগ করেছেন বলে তাঁর পিতামাতা অন্ধ হয়ে গেছেন। কৌশিকের উচিত সেই দিনই ফিরে গিয়ে তাঁদের সেবা করা।

ধর্মব্রতা—ধর্ম (দ্রঃ) নামে এক রাজা ও রাণী বিশ্বরূপার মেয়ে। ধর্মব্রতা কঠোর তপস্যা করেছিলেন পতিব্রতা হবার জন্য। ঋষি মরীচি এক দিন এঁকে জিজ্ঞাসা করে এই তপস্যা ও পতিব্রতা হবার ঘটনা জানতে পারেন। মরীচি তখন এঁকে জানান তাঁর মত পতিব্রতা স্ত্রীর সন্ধানে তিনি ঘুরছেন। নিজেও তিনি স্বামী হিসাবে শ্রেষ্ঠ হবেন। সুতরাং তাঁরা বিয়ে করতে পারেন। ধর্মব্রতা তখন এঁকে ধর্মের কাছে গিয়ে প্রস্তাব জানাতে বলেন। রাজা ধর্ম এঁদের তারপর বিয়ে দেন।

এক দিন মরীচির নির্দেশে ধর্মব্রতা স্বামীর পা ধুয়ে দিচ্ছিলেন এমন সময় মরীচির বাবা ব্রহ্মা এলে শ্বশুরকে অভ্যর্থনা করবার জন্য ধর্মব্রতা উঠে যান। মরীচি এতে রেগে গিয়ে পাথরে পরিণত হবার শাপ দেন। এই অকারণে শাপ দেবার জন্য ধর্মব্রতাও রেগে গিয়ে শাপ দেন যে শঙ্করও এক দিন মরীচিকে শাপ দেবেন (অগ্নি-পু ১১৪।-)।

ধর্মব্রাহ্মণ্য—বেদ, উপনিষদ অনুযায়ী ধর্ম। এটিকে হিন্দু ধর্ম (দ্রঃ) বলা অনুচিত।

ধর্মভৃৎ—জনৈক মুনি। পম্পাসর তটাকের কাছে বাস করতেন। রামকে (দ্রঃ) এই জলাশয়ের কাহিনী শোনান। দ্রঃ-মাণ্ডকর্ণি।

ধর্মমঙ্গল—দ্রঃ- মঙ্গলকাব্য, ধর্মঠাকুর।

ধর্মরথ—সগর (দ্রঃ) রাজার ছেলে। কপিল মুনির শাপে অন্যান্য ছেলেরা মারা যান ; কেবল বর্হকেতু, সুকেতু, ধর্মরথ, ও মহাবীর এই চারজনে অবশিষ্ট থাকেন।

ধর্মরাজ—যম। বৌদ্ধ সাহিত্যেও যম। দ্রঃ- ধর্ম।

ধর্মশাস্ত্র—যে সব গ্রন্থে ধর্মীয় জীবনের অনুশাসন ও নির্দেশ ইত্যাদি রয়েছে এবং আলোচিত হয়েছে। রাজধর্ম ইত্যাদিও এই সব গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। এই সব গ্রন্থগুলির তিনটি ভাগ ঃ-ধর্মসূত্র, ধর্মসংহিতা (-শাস্ত্র), এবং ব্যাখ্যা। বর্তমানে গৌতম, বৌধায়ন, আপস্তম্ব, বশিষ্ঠ, বিষ্ণু, ও বৈখানস এই কয় জনের ছাড়া সূত্রগ্রন্থ বিশেষ পাওয়া যায় না। এগুলির মধ্যে গৌতমধর্মসূত্র খৃ-পূ ৫-৪ শতকে এবং সব চেয় অর্বাচীন বৈখানস ধর্মসূত্র খৃ ৩-৪ শতক।

প্রধানত মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি ইত্যাদিকে আগে ধর্মশাস্ত্র বলা হত পরে সমস্ত স্মৃতিকেই ধর্মশাস্ত্র বলা হয়েছে বা হয়। এগুলিতে সাধারণত আচার ব্যবহার ও প্রায়শ্চিত্ত থাকে। শাস্ত্রকার (সংখ্যা ১৮ বা ২০ ; অন্য মতে ৪২) মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, অত্রি, অঙ্গিরা, আপস্তম্ব, উশনা, কাত্যায়ন, গৌতম, দক্ষ, বশিষ্ঠ, ব্যাস, বিষ্ণু, বৃহস্পতি, যম, লিখিত, হারীত, শংখ, সংবর্ত, শাতাতপ। নারদ, ভৃগু, মরীচি, কশ্যপ, বিশ্বামিত্র, এবং বৌধায়নও শাস্ত্রকার হিসাবে পরিচিত।

শাক্ত মতে সত্য যুগে শ্রুতি, ত্রেতাতে স্মৃতি, দ্বাপরে পুরাণ ও কলিতে আগমশাস্ত্র প্রচলিত (কুব্জিকা তন্ত্র)। অর্থাৎ কলিতে আগম ছাড়া বাকিগুলি পরিত্যাজ্য।

ধর্মশিলা—কচ্ছপ আকার। নেপালী বৌদ্ধদের স্তূপের প্রতিকৃতি। দ্রঃ- ধর্ম।

ধর্মসাবর্ণি—চতুর্দশ মনুর মধ্যে ১১-শ। এই মন্বন্তরে অবতার ধর্মসেতু ; ইনি বিষ্ণুর অবতার। ইন্দ্রের নাম বৈধৃতি। এই মনন্তরে বিহঙ্গমগণ, কামগমগণ ও নির্বাণরতিগণ দেবতা ; প্রতিটি গণে ৩০ জন করে দেবতা। এই মনন্তরে নিশ্চর, অগ্নিতেজা, বপুষ্মান, বিষ্ণু, আরুণি, হবিষ্মান ও অনঘ এই সাত জন হচ্ছেন সপ্তর্ষি। অন্য মতে বৃষ, অগ্নিতেজস্, বপুষ্মান, ঘৃণী, আরুণি, হবিষ্মান ও অনঘ। ধর্মসাবর্ণির ছেলে সর্বত্রগ, সুধর্মা, দেবানীক ইত্যাদি।

ধর্মহিন্দু—ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি সমস্ত ধর্ম মিলে। ঈশ্বরে বিশ্বাস করব না বলে বৌদ্ধেরা যাত্রা সুরু করেছিলেন ; কিন্তু তাঁরা হিন্দু। হিন্দুর সমস্ত সংস্কার তাঁদের মধ্যে ছিল এবং শেষপর্যন্ত উপনিষদের ব্রহ্মকে (অন্য নামে) স্বীকার করে তুবড়ির মত ফেটে পড়ে ব্রাহ্মণ্যধর্মে মিশে গেছেন। তুবড়ির ফাটা খোলের টুকরো হিসাবে যে কয়টি গোষ্ঠী ছড়িয়ে আছে সেগুলি মুখে যাই দাবি করুক তাদের সকলকে তথা জৈন, সহজিয়া ইত্যাদি ইত্যাদিকে মিলিয়ে যে গোষ্ঠী সেটি হিন্দু গোষ্ঠী · ধর্ম।

ধর্মাধিকরণ—রাজা এবং বিচারক (ধর্মাধিকারী) নিয়ে বিচারালয় গঠিত হত। বিচারককে ধর্মস্থ বা ধর্ম প্রবক্তাও বলা হত। রাজা সব সময় আসতে পারতেন না।

ফলে এক জন বিদ্বান ব্রাহ্মণ (=প্রাড়্‌বিবাক) নিযুক্ত করতেন। এই প্রাড়্‌বিবাকই বিচার সভায় সভাপতি-স্থানীয় হতেন ; ইনিই বাদী, সাক্ষী ইত্যাদিকে প্রশ্ন করতেন : প্রাড়্‌বিবাক ছাড়া তিন জন মত বিচারক/ধর্মাধিকারী নিয়ে এই বিচার সভা। যে সব বিবাদ সম্বন্ধে (মূল ১৮টি) স্পষ্ট শাস্ত্র নির্দেশ থাকত সেগুলি ছাড়াও অন্যান্য বিবাদ বিচারের জন্য উপস্থিত হলে অনুশাসন ছিল শাশ্বত ধর্ম অনুসরণে বিচার করতে হবে। বিচারালয়ে বাদী বিবাদীর কোন প্রতিনিধি গ্রাহ্য হত কিনা স্পষ্ট ঠিক বোঝা যায় না। মনুস্মৃতি ইত্যাদি মতে বিচারপ্রার্থীদের পক্ষে ব্যবহার শাস্ত্রজ্ঞ উকিল বিচার সভাতে যোগ দিতে পারতেন : কিন্তু মেধাতিথি মতে এই উকিলের কোন পক্ষ অবলম্বন করার কোন অধিকার ছিল না। বিচারালয় সত্যাসত্য নির্ণয় করতেন কিন্তু সাধারণত রাজা দণ্ড দিতেন। প্রাচীন যুগে ছোট এবং প্রধান বিচারালয় ইত্যাদি কিছু ভাগ ছিল না মনে হয়। তবে কুল, শ্রেণী, গণ প্রভৃতির নিজ নিজ বিষয়ে বিচার করার অধিকার ছিল ; এগুলি যেন মোড়ল বা পঞ্চায়েত বিচার। এই বিচার ব্যবস্থার ক্রমানুয় ছিল অর্থাৎ এক জনের কাছ থেকে আর এক জনের কাছে বা এক জনের পরিবর্তে পক্ষপাতিত্বের কারণে আর এক জনের কাছে বিচার প্রার্থনা করা যেতে পারত। সব কিছুর ওপরে ছিলেন রাজা। এই সব কুল প্রভৃতির বিচারে পরাজিত হলে রাজা পুনর্বিচার করতে পারতেন। ধর্মাধিকরণে অন্যায় বিচার হলেও রাজার পুনর্বিচারের অধিকার ছিল। অন্যায় বিচার করলে প্রাড়্‌বিবাক বা ধর্মাধিকারীর দণ্ড হত।

ধর্মারণ্য—স্কন্দপুরাণে সূর্যপুত্র যম একজন ঋষি ; নাম ধর্ম বা ধর্মরাজ। মহাদেবের তপস্যা করতে থাকেন। ইন্দ্র ইত্যাদি ভয় পেয়ে অপ্সরা বর্দ্ধিনীকে পাঠান। কিন্তু কোন লাভ হয় না। তপস্যাতে সন্তুষ্ট হয়ে যমের প্রার্থনা মত মহাদেব বর দেন. স্থানটি তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়। নাম হয় ধর্মারণ্য। ধর্ম নিজে বৃষভ রূপ ধারণ করে শিবের বাহন হন। মহিষের ওপর অবস্থিত যমরাজকে ধর্মঠাকুর সম্প্রদায় প-বঙ্গে বহু স্থানে ধর্মঠাকুর বলে মনে করেন। ধর্মরাজের গাজনও হয়। ধর্মপূজা গ্রন্থে এই ধর্মরাজকে মহিষবাহন, সঙ্গে চিত্রগুপ্ত ও দুজন অনুচর কাল ও বিকাল।

ধর্মারণ্য (১) ধর্মপৃষ্ঠ, ধর্মপ্রতিষ্ঠান। বুদ্ধগয়া থেকে ৪ মাইল। যুক্তপ্রদেশে গাজিপুর, বালিয়া (ভৃগু আশ্রম দ্রঃ) ও জৌনপুরের কিছু অংশ মিলে প্রাচীন ধর্মারণ্য। এখানে ধর্মেশ্বরের একটি মন্দির রয়েছে। ব্রহ্মসর নামে ও একটি তীর্থ ছিল। (২ কিছু মতে বালিয়া ও গাজিপুরের অংশ (দ্রঃ- ভৃগু আশ্রম)। (৩) মির্জাপুর জেলাতে বিন্ধ্যাচল সহর থেকে ১৪ মাইল উত্তরে মোহরপুর বা প্রাচীন মোহেরকপুর। এই মোহরপুর থেকে ৩ মাইল উত্তরে গৌতমের কাছে অভিশপ্ত হয়ে ইন্দ্র তপস্যা করেছিলেন। (৪) হিমালয়ে মন্দাকিনী নদীর দ-তীরে। (৫) রাজপুতনাতে কোটার কাছে কণ্ব আশ্রম।

ধাতৃ—সৃষ্টিকর্তা। ঋক্‌বেদের পরবর্তী স্তোত্রে এঁর বিশেষ কোন গুণাবলীর উল্লেখ নাই। সৃষ্টি ও স্বাস্থ্য রক্ষার কাজে সব সময় নিযুক্ত। বিবাহে ঘটক, জন্মদাতা,

গৃহকর্তা এবং ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধার কর্তা হিসাবে দেখা যায়। ইনি এক জন আদিত্য; খাণ্ডবদাহনে কৃষ্ণার্জুনকে বাধা দিয়েছিলেন। পুরাণে ইনি প্রজাপতি বা ব্রহ্মাতে পরিণত। বিষ্ণু পুরাণে ভৃগুর ছেলে ধাতা (স্ত্রী আয়তি), বিধাতা (স্ত্রী নিয়তি) এবং মেয়ে লক্ষ্মী (স্বামী বিষ্ণু)। ধাতার ছেলে প্রাণ, প্রাণের ছেলে দ্যুতিমান, দ্যুতিমানের ছেলে রাজবান ইত্যাদি। ভাগবতে (৭।১৮) স্ত্রী কুহূ, সিনীবালী, রাকা ও অনুমতি। ছেলে যথাক্রমে সায়ং, দর্শ, প্রাতঃ, পূর্ণমাস।

ধান্যমালিনী—রাবণের স্ত্রী হিসাবে অশোকবনে এঁকে পাওয়া যায়। সীতাকে বধ করতে উদ্যত রাবণকে নিরস্ত করেন। টীকাতে আছে কনিষ্ঠ স্ত্রী।

ধামতত্ত্ব—তন্ত্রের একটি মূল দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে সমস্ত ভগবৎ তত্ত্ব মানুষের দেহের মধ্যে অবস্থিত। অর্থাৎ শরীরস্থ বিভিন্ন চক্রে বা পদ্মে শিবধাম ও শক্তিধাম রয়েছে। বিষ্ণু পুরাণ ও সংহিতাতেও ঐ একই কথা রয়েছে। মাথুর-মণ্ডল অর্থাৎ গোকুলকে সহস্র-পত্রকমলাকারধাম বলা হয়েছে; এর মধ্যে স্থিত কর্ণিকার হচ্ছে বৃন্দাবন। এই সহস্রপর্ণ কমল হচ্ছে মস্তকস্থিত সহস্রার; চরম তত্ত্বের আবাসভূমি। ব্রহ্মসংহিতাতে এই ধাম তত্ত্বের ব্যাখ্যা রয়েছে এবং এই ব্যাখ্যা তন্ত্রের সঙ্গে মিলে যায়। পার্থক্য শিবের স্থানে বিষ্ণু ইত্যাদি। শৈবশাস্ত্র গত শক্তিবাদ ও বৈষ্ণব শাস্ত্রের শক্তিবাদ মূলত একই জিনিস।

ধাত্রীবিদ্যা—চরক ও সুশ্রুতের চিকিৎসা শাস্ত্রে স্ত্রীরোগ ও প্রসূতি পরিচর্যার বিবরণ রয়েছে। প্রসব কার্যে বিশেষ যন্ত্রপাতিও ব্যবহার হত। এদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হচ্ছে 'যুগ্মপঙ্খ' অস্ত্র।

ধারণ—দ্রঃ- রাজযোগ।

ধারানগর—মালবে ধার।ধর। রাজা ভোজের (খৃ ৯ শতক) রাজধানী। প্রবাদ কালিদাস ও প্রসন্ন রাঘব রচয়িতা এঁর সভাতে ছিলেন।

ধারিণী—পিতৃদেবগণ ও স্বধার বড় মেয়ে মেনা. ছোট ধারিণী. দুজনেই বেদজ্ঞ।

ধুনি—দ্রঃ- চুমুরি।

ধুন্ধু—কশ্যপ দনুর ছেলে। ব্রহ্মার তপস্যা করে দেবতাদের অবধ্য হবার বর পান। চতুর্থ কলিযুগের আরম্ভে হিরণ্যকশিপুর রাজত্বকালে স্বর্গে দেবতাদের তাড়িয়ে দিয়ে বাস করতে থাকেন। এবং হিরণ্যকশিপু ও এই সময়ে মন্দর পর্বতে ধুন্ধুর অনুচর হয়ে বাস করেছিলেন। দেবতারা ব্রহ্মলোকে গিয়ে বাস করতে থাকেন। শুক্রের কাছে ধুন্ধু শোনেন ইন্দ্র ১০০ অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছেন। ধুন্ধুও অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে থাকেন; দেবতারা ভীত হয়ে পড়ে বিষ্ণুর কাছে এসে কিছু একটা করবার জন্য প্রার্থনা করেন। বিষ্ণু তখন বামন রূপ ধরে দেবিকা জলাতে এসে এক টুকরো শুষ্ক কাঠের মত ভাসতে থাকেন। ধুন্ধু ও মুনিরা দেখেন বামন ডুবছেন আবার ভেসে উঠছেন। জল থেকে এঁরা বামনকে তোলেন এবং জানতে চান এখানে তিনি কি করে এলেন। বামন জানান বরুণের বংশে প্রভাস নামে এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণের তিনি ছোট ছেলে; নাম গতিভাস। পিতার মৃত্যুর পর ভাইদের সঙ্গে সম্পত্তি ভাগ করতে চাইলে বড় ভাই এই

জলে ফেলে দিয়েছেন। পুরোহিতরা তখন ধুন্ধুকে বলেন বামনকে অর্থ সম্পত্তি ও দাস-দাসী দিতে। বামন নিতে চান না; অর্থ সম্পত্তি তাঁকে আবার কোন জলায় নিয়ে গিয়ে ফেলবে। বামন বরং ত্রিপাদ ভূমি চান। ধুন্ধু ত্রিপাদ ভূমি দিতে সম্মত হলে বামন স্বর্গ ও মর্ত্য অধিকার করে তৃতীয় পদ রাখার স্থান না পেয়ে এই পায়ের আঘাতে গভীর গর্তে ধুন্ধুকে ফেলে মাটি চাপা দিয়ে কালিন্দীর জলে অন্তর্হিত হয়ে যান (পদ্ম-পু ৭৮।-)। (২) মধুকৈটভের ছেলে। মধুকৈটভ বিষ্ণুর কাছে মৃত্যুর আগে বর চেয়েছিল তোমার পুত্রত্বম অভিগচ্ছাব (মহা ৩।১৯৪।৬)। এই ধুন্ধু তপস্যায় ব্রহ্মার বরে সকলের ত্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। উত্তঙ্ক ঋষির আশ্রমের কাছ মরু / মরুধন্ব প্রদেশে উজ্জানক নামে বহু যোজন বিস্তৃত বালুময় এক মরুভূমিতে বালির নীচে দারুণ তপস্যা করত (মহা ৩।১৯২।-): ত্রিভুবন বিনাশ করতে চায়। বৎসরান্তে একবার জেগে উঠে নিশ্বাস ফেলত তাতে চন্দ্র সূর্য পর্যন্ত ধূলি, ধোঁয়া ও অগ্নি শিখাতে ঢেকে যেত এবং এক সপ্তাহ ধরে ভূমিকম্প হত। চার দিকে বহু ক্ষতি হত। উত্তঙ্ক/উত্তানক (দ্রঃ) মুনিই সব চেয় বিপন্ন হয়ে পড়তেন। বিষ্ণু বলে যান কুবলাশ্বের হাতে নিহত হবে। উত্তঙ্ক (দ্রঃ) তখন কুবলাশ্বের (দ্রঃ) শরণ নেন। হরিবংশে (১।১১।৩৩) মধু রাক্ষসের ছেলে।

ধুন্ধুমার—কুবলাশ্ব। রামায়ণে (১।৬৯।২৫) ত্রিশঙ্কুর ছেলে। ধুন্ধুমারের ছেলে যুবনাশ্ব।

ধুন্ধ্র—অম্বর (দ্রঃ)। ধুন্ধু > ধুন্ধ্র = সারা জয়পুর : বিশেষত অম্বর। মরুধন্বনের অন্তর্গত ছিল।

ধূতপাপ—(১) ধোপাপ। গোমতী তীরে। অযোধ্যাতে সুলতান পুর থেকে ১৮ মাইল দ-পূর্বে। এখানে রাবণ বধের পাপ থেকে স্নান করে রাম মুক্তি পান। দ্রঃ-হত্যাহরণ। মুঙ্গেরে কষ্টহারিণী ঘাটেও ঐ জন্য স্নান করেছিলেন বলা হয়। (২) বারাণসীতে গঙ্গার একটি করদা নদী।

ধূমকেতু—জীবকুল নাশের জন্য ব্রহ্মা এক সুন্দরী নারী মৃত্যুকে সৃষ্টি করে জীবদের নিহত করতে বলেন। কিন্তু এই নারী অসম্মত হয়ে কাঁদতে থাকেন; চোখের জলের ফোঁটাগুলি এক একটি রোগে পরিণত হতে থাকে। এই দেখে মৃত্যু তখন তপস্যা করতে থাকেন। ব্রহ্মা তখন আশীর্বাদ করে বলেন জীবদের আর নিধন করতে হবে না। মৃত্যু তখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন এবং এই নিশ্বাস ধূমকেতুতে পরিণত হয়।

ধূমাবতী—দশ মহাবিদ্যার মধ্যে ৭ম। স্বতন্ত্র তন্ত্রে আছে ক্ষুধিত হয়ে পার্বতী একবার মহাদেবের কাছে খাদ্য চেয়ে না পেলে ক্ষুধায় মহাদেবকেই গ্রাস করে ফেলেন। নারদ পঞ্চরাত্রে আছে মহাদেবের দিতে দেরি হয়েছিল। এই সময় পার্বতীর দেহ থেকে ধোঁয়া বার হয়ে পার্বতীকে বিবর্ণ করে দেয়। মায়াতে মহাদেব শরীর কাঁপিয়ে বলেন স্বামীকে খেয়ে বিধবা হয়ে বিধবা বেশেই থাকতে হবে। এই বেশে ধূমাবতী বগলামুখী নামে সকলের পূজা পাবেন। এই চেহারা :- রুক্ষ, মলিন-বসনা, বিবর্ণ-কুন্তলা, বিরল-দন্তা, বিলম্বিত-পয়োধরা, দীর্ঘনাসা, চঞ্চলা, রুষ্টা, দীর্ঘা, নিত্যবুভুক্ষিতা, অতিকৃশা, বৃদ্ধা। দুটি হাত, এক হাতে কুলা ও এক হাতে বর। রথরূঢ়া, রথের ধ্বজাতে কাক। স্বতন্ত্র তন্ত্রে

সতীর দেহ ত্যাগের পর চারদিকে ধূম ছড়িয়ে পড়ে। এই ধূম থেকে ধূমাবতীর জন্ম। (২) একটি তীর্থ (মহা ৩।৮২।২০)।

ধূম্র—বানর দলপতি জাম্ববানের ভাই। লঙ্কাতে যুদ্ধে বহু রাক্ষস বিনাশ করে।

ধূম্রকেশ—রাবণের মন্ত্রী। অপর নাম ধূম্রাক্ষ (দ্রঃ) বা ধূম্রলোচন। সুমালি ও কেতুমতী সন্তান। লঙ্কার যুদ্ধে হনুমানের হাতে মৃত্যু।

ধূম্রবর্ণ—এক নাগরাজ। যাদব বংশের আদি পুরুষ যদু এক বার সমুদ্র ভ্রমণে গেলে এই নাগ এঁকে নাগেদের রাজধানীতে নিয়ে যান। যদু এখানে ধূম্রবর্ণের পাঁচ মেয়েকে বিয়ে করেন। এই থেকে নাগেদের পাঁচটি বংশের উৎপত্তি।

ধূম্রলোচন—শুম্ভ দৈত্যের সেনাপতি। ভগবতী রূপসী মূর্তি ধরে বলেছিলেন যে তাঁকে জয় করতে পারবে তার গলায় তিনি মালা দেবেন। এই কথা শুনতে পেয়ে দেবীকে বেঁধে আনবার জন্য শুম্ভ ধূম্রলোচনকে ষাট হাজার সৈন্য সমেত পাঠান। কিন্তু দেবীর হুঙ্কারে এঁরা সকলেই মারা পড়েন। দ্রঃ- ধূম্রকেশ।

ধূম্রা—দক্ষের এক মেয়ে। ধর্মের স্ত্রী; ছেলে ধ্রুব ও ধর। মহাভারতে (১।৬০।১৮) পিতামহের পুত্র প্রজাপতির স্ত্রী; ছেলে ধর ও ধ্রুব।

ধূম্রাক্ষ—রাবণের এক সেনাপতি। নাগপাশ থেকে রাম-লক্ষ্মণ মুক্তি পেলে রাবণ এঁকে যুদ্ধে পাঠান। পাহাড়ের আঘাতে হনুমান এঁর মাথা চূর্ণ করে দেয়।

ধৃতদেবা—দেবকের মেয়ে। বসুদেবের স্ত্রী। ছেলে হয় বিপৃষ্ঠ।

ধৃতবর্মা—ত্রিগর্ত রাজ কেতুবর্মার ছেলে। সূর্যবর্মা, কেতুবর্মা, ও ধৃতবর্মা এরা তিন ভাই। বড় ভাই সূর্যবর্মা যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধের ঘোড়া ধরলে যুদ্ধ হয়। কেতুবর্মা ও সূর্যবর্মা মারা গেলে ইনি অর্জুনের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ করে পরে বশ্যতা স্বীকার করেন।

ধৃতরাষ্ট্র—(১) চন্দ্রবংশে শান্তনুর দ্বিতীয় স্ত্রী সত্যবতীর বড় ছেলে চিত্রাঙ্গদ, ছোট বিচিত্রবীর্য। বিচিত্রবীর্যের দুই স্ত্রী অম্বিকা ও অম্বালিকা। বিয়ের অল্পকাল পরে বিচিত্রবীর্য ক্ষয় রোগে মারা যান। সত্যবতী তখন ব্যাসের ঔরসে অম্বিকা ও অম্বালিকার (দ্রঃ) ক্ষেত্রজ সন্তানের ব্যবস্থা করেন। ব্যাসের মূর্তি দেখে অম্বিকা ভয় পান এবং চোখ বুজিয়ে থাকেন। ফলে তাঁর ছেলে অন্ধ হয়ে জন্মায়; নাম ধৃতরাষ্ট্র।

মহাভারতে (১৮।৪।৩২) ইনি আগের জন্মে গন্ধর্ব রাজ ধৃতরাষ্ট্র (?) ছিলেন। ১।৬৯।৫৭ শ্লোকে আছে অরিষ্টার ছেলে হংস; ইনি গন্ধর্বপতি, ধৃতরাষ্ট্র হয়ে জন্মান। ভীষ্মের কাছে পালিত হন। অন্ধ বলে রাজা হন নি; ছোট ভাই পাণ্ডু রাজা হন। ধৃতরাষ্ট্র দুর্বল মতি কিন্তু প্রজ্ঞাচক্ষু এবং ব্যাসের বরে শতহস্তীর সমান বলশালী। পাণ্ডু রাজা হলেও বনে চলে গিয়েছিলেন এবং অল্প বয়সে মারা যান। ফলে ধৃতরাষ্ট্র রাজা না হলেও সারা জীবন রাজকার্য পরিচালনা করেছিলেন। দ্রঃ- হংস।

ধৃতরাষ্ট্রের বয়স হলে ভীষ্ম গান্ধারীর সন্ধান পান এবং জানতে পারেন শিবের বরে তার এক শত ছেলে হবে। গান্ধারীর (দ্রঃ) পিতা রাজা সুবলের কাছে ভীষ্ম দূত পাঠান; সুবল অন্ধ জামাতাকে ঠিক পছন্দ না করলেও বংশ পরিচয়ে বিয়েতে সম্মত হন। দুর্যোধন ইত্যাদি একশ ছেলে; এদের মধ্যে দুর্যোধন, দুঃশাসন, বিকর্ণ ও চিত্রসেন

(মহা ১।৯০।৭১) প্রধান। এছাড়া দুঃশলা নামে একটি মেয়ে হয়। গান্ধারীর গর্ভকালে এক বৈশ্যা নারী রাজার সেবা করতেন। ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে এই বৈশ্যার গর্ভে আর একটি ছেলে হয় যুযুৎসু। দুর্যোধন এদের মধ্যে বড়। দুর্যোধনের জন্মের সময় বহু কুলক্ষণ দেখা দিতে থাকে ; সকলে এই ছেলেকে ত্যাগ করতে বলেন কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র তা পারেন নি।

পাণ্ডুর মৃত্যুর পর ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদেরও অভিভাবক হন এবং ভীষ্মের সঙ্গে একত্রে সব কিছু দেখশোনা করতেন। দুর্যোধন কিন্তু পাণ্ডবদের সব সময়ই উচ্ছেদ করতে চাইতেন এবং ধৃতরাষ্ট্র এ সব বিষয়ে নিজের ছেলেদের বহু দিক থেকে সমর্থনই করতেন। দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রকে দিয়েই পাণ্ডবদের বারণাবতে পাঠান। পাণ্ডবদের শ্রীবৃদ্ধিতে মনে মনে তিনি ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। জতুগৃহে পাণ্ডবদের মৃত্যু সংবাদে ধৃতরাষ্ট্র নিজেকে বাইরে শোকার্ত দেখান এবং এ'দের শ্রাদ্ধেরও ব্যবস্থা করেন। দ্রৌপদীর বিয়ের খবর পেয়ে অন্তরে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। প্রথম খবর পেয়ে মনে করেছিলেন দুর্যোধন বিয়ে করেছেন এবং আনন্দে মুখর হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু বিদুরের কাছে প্রকৃত খবর জানতে পেরে সন্তুষ্ট হবার ভাণ করেন।

দুর্যোধন পাণ্ডবদের এই অভ্যুত্থানকে বাধা দিতে হবে ধৃতরাষ্ট্রকে বোঝাতে চান। ধৃতরাষ্ট্র বলেন বিদুরের সামনে পাণ্ডবদের প্রশংসা করতে তিনি বাধ্য হন। দুর্যোধন মতলব দেন পাণ্ডবদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা, অর্থ দিয়ে দ্রুপদ ও তার ছেলেদের প্রলোভিত করা, ভীমকে গোপনে হত্যা করা বা পাঞ্চাল থেকে হস্তিনাপুরে এলে বা হস্তিনাপুরে আসবার পথে ডাকাত দিয়ে হত্যা করা যেতে পারে। কর্ণ জানান বিভেদ সৃষ্টি করা ইত্যাদি সম্ভব নয়। একমাত্র পথ সত্বর ও সরাসরি যুদ্ধ করা। ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম দ্রোণ ইত্যাদিকে ডেকে যুদ্ধের জন্য মন্ত্রণা করেন। ভীষ্ম অর্দ্ধরাজ্য দিতে বলেন ; দ্রোণ সমর্থন করেন। কর্ণ বিরোধিতা করেন ; অম্বুবীচ (১।১৯৬।১৭) কাহিনী বলেন এবং ভীষ্ম ও দ্রোণ সম্বন্ধে সকলকে কর্ণ সাবধান হতে বলেন। বিদুরও রাজ্য দিতে বলেন। ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে পাঠান পাণ্ডবদের আনতে ; পাঞ্চালে তখন কৃষ্ণ ছিলেন ; কৃষ্ণও মত দেন। ধৃতরাষ্ট্র শেষপর্যন্ত অর্দ্ধরাজ্য দিয়ে খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করার ব্যবস্থা করে দেন।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে এসেছিলেন। দুর্যোধন কপট পাশা খেলার ব্যবস্থা করলে প্রথমে সৎ পরামর্শ দিয়ে বাধা দিয়েছিলেন এবং বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে সাবধান করে দেবার পর বিদুরের মত নেই দুর্যোধনকে বোঝাতে থাকেন; নিজে ঠিক যেন কিছু বলেন না। এই সময়ে গান্ধারী ও বিদুরের পরামর্শ উপেক্ষা করেছিলেন ; বিদুরকে দিয়ে শেষে পাণ্ডবদের ডাকিয়ে পাঠান। প্রথম খেলায় পাণ্ডবরা যখন ক্রমশ সর্বস্বান্ত হচ্ছিলেন ধৃতরাষ্ট্র তখন কিংজিতম্, কিংজিতম্ বলে (২।৫৮।৪১) ক্রমশঃ উল্লসিত হয়েছিলেন এবং দ্রৌপদীকে পণ রেখে খেলা আরম্ভ হলে স্পষ্ট উল্লাসে বিচলিত হয়ে পড়েন। এরপর পাশাতে কৌরবরা দ্রৌপদীকে জিতেছে জেনে আনন্দিতই হয়েছিলেন। তাঁর উপস্থিতিতেই দ্রৌপদী লাঞ্ছিত হন ; অথচ তিনি কোন বাধা দেন নি। অবস্থা আয়ত্তের

বাইরে চলে গেলে বিদুর, বিকর্ণ ইত্যাদির প্রতিবাদে এদের সকলকে মুক্তি দেওয়া ও রাজ্য ফিরিয়ে দেওয়া ছাড়া দ্বিতীয় আর কোন পথ ছিল না। এর পরই কিন্তু দ্বিতীয় বার পাশা খেলার প্রস্তাবে ধৃতরাষ্ট্র আবার সম্মতি দিয়েছিলেন। গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রকে বাধা দিতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র ছেলেদের কোন বাধা দেন নি। পাণ্ডবরা হেরে গিয়ে বনে চলে যান। ধৃতরাষ্ট্র এই সময় অস্থির-চিত্তে বিদুরের কাছে সকলের মঙ্গলার্থে পরামর্শ চান। যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য ফিরিয়ে দেওয়া এবং দুর্যোধনকে নিগৃহীত করার পরামর্শ দিলে বিদুরকে তিনি তিরস্কার করেন এবং যেখানে খুসি চলে যেতে বলেন। নিজে অন্তঃপুরে চলে যেতে যান। দরজার কাছে এসে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান (মহা ৩।৭)। জ্ঞান হতে কেঁদে ফেলেন এবং সঞ্জয়কে পাঠান বিদুরকে ফিরিয়ে আনতে। বিদুর ফিরে আসেন। এরপর দুর্যোধনরা পাণ্ডবদের হত্যা করবার জন্য বার হয়ে যান; ব্যাস এসে থামান এবং ধৃতরাষ্ট্রকে জানান। ধৃতরাষ্ট্র স্বীকার করেন স্নেহে তিনি বিকল হয়ে পড়েছেন। আবার বলেন নিয়তি; অর্থাৎ পাশ কাটাতে চান। ব্যাস নানা উপদেশ দেন এবং ধৃতরাষ্ট্র অনুনয় করেন দুর্যোধনকে বোঝাতে (৩।১১।৩)। ইতিমধ্যে মৈত্রেয় আসেন; ব্যাস কেটে পড়েন। মৈত্রেয় (দ্র০) দুর্যোধনকে শাপ দিলে ধৃতরাষ্ট্র অনুনয় করেন শাপ ফিরিয়ে নিতে এবং কির্মীর কাহিনী শুনতে চান। মৈত্রেয় বিরক্তিতে উঠে পড়েন; বিদুরের কাছে কির্মীর হত্যার ঘটনা শুনতে বলে যান। অর্জুন ইন্দ্রলোকে গেছেন শুনেও স্বাভাবিক ভাবেই বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন (৩।৪৬)। মহাভারতে ২।৭০ অধ্যায়ে আছে ধৃতরাষ্ট্র অস্থির হয়ে দুশ্চিন্তাতে দিন কাটাতেন। ২।৭১- অধ্যায়ে আছে দ্রোণের কথা শুনে বলেছিলেন পাণ্ডবদের ফিরিয়ে আনা হক; আর যদি না আসে তাহলে রথ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সব কিছু পাঠিয়ে দেওয়া হক। ২।৭২ - অধ্যায়ে বলেছেন পাঞ্চালীকে সভাতে অপমান করা হলে গান্ধারী ও কৌরবস্ত্রীরা প্রাক্রোশৎ ভৈরবম্ (২।৭২।১৯) ইত্যাদি এবং নানা দুর্লক্ষণ দেখা দিয়েছিল: তবু কিন্তু তিনি কিছু করতে পারেন নি; 'সবই দৈব'। বনবাসকালে তীর্থ যাত্রায় বার হয়ে যাবার সময় কিছু ব্রাহ্মণকে যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের কাছে বৃত্তির জন্য পাঠিয়েছিলেন: ধৃতরাষ্ট্র বৃত্তি দিয়েছেলেন। ৩।২২৫- অধ্যায়ে এক ব্রাহ্মণের কাছে পাণ্ডবদের বনে স্বাভাবিক দুরবস্থার কথা শুনে স্বীকার করেছিলেন সব কিছুর জন্য তিনি দায়ী; এবং পাণ্ডবদের হাতে সকলে এরা মারা পড়বে। দুর্যোধনেরা এই দুরবস্থা দেখতে যাবার জন্য অছিলায় বার হয়ে পড়তে চান। ধৃতরাষ্ট্র প্রথমে অনুমতি না দিলেও ঘোষ যাত্রাতে শেষ পর্যন্ত মত দিয়ে ছিলেন। অজ্ঞাতবাসের পর পাণ্ডবরা রাজ্য ফিরে চাইলে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে দিয়ে পাণ্ডবদের কাছে শান্তি ভিক্ষা করেন কিন্তু রাজ্য ফিরিয়ে দেবার কথা বাদ দিয়ে যান। বিদুরকে আবার পরামর্শে ডাকেন এবং স্বীকার করেন দুর্যোধন কাছে এলেই তাঁর বুদ্ধি নষ্ট হয়, অন্যায় করে বসেন। সন্ধির প্রস্তাব আসে পাণ্ডব পক্ষ থেকে। দুর্যোধনকে তিরস্কার করে ধৃতরাষ্ট্র সন্ধি করতেই বলেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত কর্ণ ইত্যাদির কথায় আবার চুপ হয়ে যান। মধ্যস্থতার জন্য কৃষ্ণ এলে ধৃতরাষ্ট্র নিজের অক্ষমতার

কথা জানিয়ে স্ত্রীকে দিয়ে দুর্যোধনকে বোঝাতে চেষ্টা করেন কিন্তু বোঝান সম্ভব হয় নি। সঞ্জয় যখন শান্তি স্থাপনের জন্য দৌত্য করেছিলেন সে সময় (৫।৫৭।১৯) ধৃতরাষ্ট্র বলেছিলেন দুর্যোধনঃ ময়া ত্যক্তঃ। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের সময় সঞ্জয় রাজাকে সমস্ত ঘটনা শোনাতেন। এ সময়ে আত্মপক্ষের পরাজয় শুনলেই বিচলিত হয়ে পড়তেন। এই সময় সঞ্জয় স্পষ্ট মন্তব্য করেছিলেন যে তাঁর পুত্র স্নেহ, পক্ষপাত, পাণ্ডবদের প্রতি বিদ্বেষ, কুটিল মনোভাব এবং ন্যায় পরায়ণতার অভাবই কুরুক্ষেত্রে বংশনাশের কারণ।

অর্জুন জয়দ্রথ বধের প্রতিজ্ঞা করেছেন শুনে ধৃতরাষ্ট্র ভয়ে চীৎকার করে ওঠেন। সাত্যকি যখন কুরু সৈন্য ধ্বংস করেন ধৃতরাষ্ট্র তখন দুঃখে বাক্যহীন হয়ে পড়েন। কর্ণের পতন শুনে ধৃতরাষ্ট্র অজ্ঞান হয়ে যান। শল্য ও দুর্যোধন মারা গেছে শুনেও আবার ধৃতরাষ্ট্র পড়ে যান এবং কাঁদতে থাকেন। যুদ্ধের শেষে শোকাকুল রাজাকে সঞ্জয় সান্ত্বনা দেন। এর পর গান্ধারী ইত্যাদি মহিলাদের নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র দেখতে আসেন। পথে সূর্যোদয়ের আগে (১১।১০।২৩) অশ্বত্থামা, কৃপ ও কৃতবর্মার সঙ্গে দেখা হয়। এরা পাণ্ডবদের ভয়ে বিদায় নিয়ে তৎক্ষণাৎ পালান। এর কিছু পরে পাণ্ডবদের হাতে অশ্বত্থামা আক্রান্ত হন।

ধৃতরাষ্ট্র এসে অসন্তুষ্ট মনেই যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন করেন এবং ভীমকে খুঁজতে থাকেন। কৃষ্ণ তাঁর মনোভাব বুঝতে পেরে এক আয়সী মূর্তি (যুগটি একটি নতে তাম্র যুগ ছিল) এগিয়ে দেন। আলিঙ্গনে মূর্তিটি চূর্ণ করে ফেলে বুকে চাপ পড়ায় রক্ত বমি করতে (১১।১১।১৯) করতে বসে পড়ে ভীমের জন্য শোক করতে থাকেন। এটি তাঁর কপটতার চরম পরকাষ্ঠা। কৃষ্ণ তখন ধৃতরাষ্ট্রকে তিরস্কার করে পঞ্চপাণ্ডবকে তাঁর সামনে এনে হাজির করেন। ধৃতরাষ্ট্র তারপর শ্রাদ্ধশান্তি করার জন্য পাণ্ডবদের নির্দেশ দেন।

রাজ্য লাভ করে পাণ্ডবরা ১৫ বছর (১৫।১।১) ধৃতরাষ্ট্রের প্রায় তত্ত্বাবধানেই রাজত্ব করেন। বাকি ২১ বছর নিজেরা মোট ৩৬ বৎসর রাজত্ব করেন। সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা ও সম্মান পেলেও পুত্রশোক ভুলতে পারছিলেন না। ভীম অবশ্য সুযোগ মত দুর্ব্যবহার করতেন। একদিন শুনিয়ে শুনিয়ে বলেন বাহুবলে কাণার ছেলেদের যমের বাড়ি পাঠিয়েছেন ইত্যাদি (১৫।৪।৭)। গান্ধারী শুনেও চেপে যান; ধৃতরাষ্ট্র কাতর হয়ে পড়েন। কোন দিন দিনের চতুর্থ ভাগে, কোন দিন বা অষ্টম ভাগে (১৫।৫।১০) সামান্য মত খেতেন; গান্ধারী ছাড়া কেউ জানত না। দুর্বল শরীর, ভীমের বাক্যে ব্যথিত হয়ে বনে যাবার জন্য যুধিষ্ঠিরের কাছে অনুমতি চান; কথা বলতে বলতে ধৃতরাষ্ট্র অজ্ঞান হয়ে যান (১৫।৬।২১)। যুধিষ্ঠির রাজি হচ্ছিলেন না। ব্যাস এসে (১৫।৮।৬) বাধা না দিতে যুধিষ্ঠিরকে বলে যান। ধৃতরাষ্ট্র এরপর পুরবাসী প্রজাদের কাছে বিদায় নেন, নিজের ছেলেদের জন্য ক্ষমা চান। সমবেত জনতার মধ্য থেকে সাম্ব নামে এক বহ্বৃচ্ ব্রাহ্মণ (১৫।১৫।১১) ধৃতরাষ্ট্রকে তখন সম্বোধিত করেন এবং দুর্যোধন প্রজাদের পিতার মত পালন করতেন (১৫।১৫।২১) ঘোষণা করেন।

পরদিন বিদুরকে দিয়ে কিছু অর্থ চেয়ে পাঠান। মৃত যোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে

শ্রাদ্ধ ও দান করবেন। বিদুর এলে ভীম বিরোধিতা করেন। যুধিষ্ঠির ভীমের জন্য ক্ষমা চান এবং প্রচুর অর্থ দেন। ধৃতরাষ্ট্র একটানা ১০ দিন (১৫।২০।১৭) দান করতে থাকেন। ১১ দিনের দিন কার্তিকপূর্ণিমা/কার্তিক মাস; হস্তিনাপুর ত্যাগ করেন। কুন্তী, গান্ধারী, বিদুর ও সঞ্জয় সঙ্গে যান। পাণ্ডবরা এবং দ্রৌপদী, সুভদ্রা, চিত্রাঙ্গদা, উত্তরা ইত্যাদি সকলে প্রত্যুদ্গমন করেন। ধৃতরাষ্ট্র কৃপ ও যুযুৎসুকে যুধিষ্ঠিরের হাতে তুলে দিয়ে যান। গান্ধারী ও বিদুরকে বলেন কুন্তীকে নিরস্ত (১৫।২৪।৪) করতে; যুধিষ্ঠিরও চেষ্টা করেন। কিন্তু কুন্তী সম্মত হন না।

প্রথম দিন রাত্রিতে সকলে গঙ্গা তীরে কাটান। সকালে উঠে ক্রমাগত উত্তর দিকে যান। ঐদিন সন্ধ্যায় সকলে গঙ্গায় স্নান অবগাহন করে কুরুক্ষেত্রে এসে এখানে পূর্বতন কেকয়রাজ শতযূপের আশ্রমে (১৫।২৫।৯) আসেন। তারপর শতযূপকে নিয়ে ব্যাসের আশ্রমে এসে ব্যাসের কাছে বনবাসের দীক্ষা নিয়ে আবার শতযূপের আশ্রমে সকলে ফিরে যান (১৫।২৫।১২)। শতযূপ বনবাসের বিধি নিয়ম বুঝিয়ে দিতে থাকেন। বিদুর ও সঞ্জয়ও এখানে বল্কল ধারণ করে (১৫।২৫।১৮) সকলেই তপস্যা করতে থাকেন।

একদিন ঋষিরা দেখা করতে আসেন। নারদ কথায় কথায় বলেন ইন্দ্রের কাছে শুনেছেন (১৫।২৭।১০) ধৃতরাষ্ট্র আর তিন বছর বাঁচবেন এবং কুবেরলোক প্রাপ্ত হবেন।

এক বছর মত পরে (১৫।৩৭।৪) ধৃতরাষ্ট্র ইত্যাদিকে দেখবার জন্য পাণ্ডবরা সকলে ব্যাকুল হয় পড়েন। দেখতে যাবেন ঠিক করেন। ৫-দিন মত সকলের (১৫।২৯।২৬) তৈরি হতে লাগে। যুযুৎসু ও ধৌম্যের হাতে পুররক্ষার ভার দিয়ে ৬-ষ্ঠ দিনে যাত্রা করেন। বহু লোক সঙ্গে যান। যমুনা পার হয়ে ধৃতরাষ্ট্রদের আশ্রমে আসেন। চিত্রাঙ্গদা, সুভদ্রা, কালী (ভীমের স্ত্রী), করেণুমতী (নকুল), উত্তরা ইত্যাদি সকলেই এসেছিলেন।

এই দিনই বিদুর (দ্রঃ) মারা যান। পর দিন পাণ্ডবরা অন্যান্য আশ্রমে ঘুরে দেখতে থাকেন; বহু উপহার পান। এক মাস মত এঁরা (১৫।৩৬।৭) এখানে থাকেন। এক দিন ব্যাস ও নারদ আসেন। ব্যাস প্রথমে আভাস দেন। ধৃতরাষ্ট্র মৃতপুত্র ইত্যাদি সকলকে দেখতে চান। গান্ধারী ইত্যাদি সকলেই চান। গান্ধারী এই সময় বলেন ১৬ বছর আগে (১৫।৩৭।৬) এরা মারা গেছে।

ব্যাস সকলকে গঙ্গা তীরে যেতে বলেন, মৃতদের এনে দেখাবেন তাঁরও ইচ্ছা ছিল। গঙ্গা তীরে এসে সকলে অপেক্ষা করতে থাকেন। রাত্রি হয়। মৃত আত্মীয় স্বজন জল থেকে উঠে আসেন। ধৃতরাষ্ট্রকে ব্যাস দিব্য চক্ষু দেন। আনন্দে সকলে উদ্বেল হয়ে পড়েন। সারারাত কথাবার্তায় কাটিয়ে রাত্রি শেষে সকলে জলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যান। ব্যাস তারপর পতিলোক লভেচ্ছু কৌরব রমণীদের জলে অবগাহন করতে বলেন। অবগাহন করে দিব্য দেহ ধারণ করে এরাও স্বর্গে চলে যান (১৫।৪১।১৮)। ব্যাস এরপর

ধৃতরাষ্ট্রকে বলেন পাণ্ডবদের ফিরে যাবার জন্য বলতে। যুধিষ্ঠির প্রথমে ফিরতে চান নি।

পাণ্ডবরা ফিরে আসার ২-বছর পরে (১৫।৪৫।১) নারদ আসেন। জানান পাণ্ডবরা ফিরে আসার পর ধৃতরাষ্ট্ররা গঙ্গাদ্বারে গিয়ে তপস্যা করছিলেন। গঙ্গাস্নান সেরে আশ্রমে ফেরার পথে তিন জনে এঁরা দাবানলে সমধিস্থ হয়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। সঞ্জয় কোন মতে আত্মরক্ষা করতে পেরেছেন। অবশ্য ঠিক দাবানল নয়। ধৃতরাষ্ট্র স্নান সেরে যে আগুন জ্বেলেছিলেন সেই আগুনই দাবানল পরিণত হয়েছিল (১৫।৪৭।৪)। সঞ্জয়কে আত্মরক্ষার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। দেবী ভাগবতে ধৃতরাষ্ট্রের স্ত্রী গান্ধারী ও শৈব্যা (২।৬।৭)। যুদ্ধের পর ১৮ বছর (২।৭।১৫) হস্তিনাপুরে ছিলেন। ভীম কৌরবদের ঊর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া করেন নি। সেই ক্ষোভে বনে যান। শতযূপ আশ্রমে এসে কুটির। ৬-বছর পরে যুধিষ্ঠিররা দেখা করতে আসেন। পরদিন বিদুর মারা যান। গান্ধারী, কুন্তী, উত্তরা মৃতদের দেখতে চেয়েছিলেন। দেবী মহামায়াকে (২।৭।৬৭) সন্তুষ্ট করে ব্যাস মৃতদের আনান। যুধিষ্ঠিররা ফিরে আসার পর ৩-য় দিনে এরা মারা যান।

(২) মুনি ও কশ্যপ পুত্র। এক জন গন্ধর্ব। এই গন্ধর্বই দুর্যোধনের পিতা হয়ে জন্মান। (৩) কদ্রু কশ্যপ সন্তান। বরুণের সভায় বাস করেন। পৃথু রাজার সময়ে নাগেরা যখন পৃথিবীকে দোহন করেন তখন এই ধৃতরাষ্ট্রই দোহন করেছিলেন। এই ধৃতরাষ্ট্রই একবার শিবের রথে স্থান পান। দেহ ত্যাগের পর বলরামের আত্মা পাতালে এলে ধৃতরাষ্ট্র ইত্যাদি নাগেরা (দ্রঃ) তাঁকে অভ্যর্থনা করেন। (৪) বাসুকির ছেলে। পাণ্ডবদের অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় অর্জুন যখন মণিপুরে যুদ্ধে মারা যান তখন বভ্রু নাগলোকে মৃত সঞ্জীবনী মণি নিতে আসেন। বাসুকির ভাণ্ডারে মণি রক্ষক হিসাবে এই ধৃতরাষ্ট্র অবস্থান করেছিলেন। বভ্রুর সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রের তীব্র যুদ্ধ হয় তবে মণি সংগ্রহ করতে পারেন। এই ধৃতরাষ্ট্র অর্জুন জীবিত হক চাইছিলেন না; ফলে নিজের ছেলেদের দিয়ে অর্জুনের মাথা দালভোর আশ্রমে লুকিয়ে রেখেছিলেন। (৫) জন্মেজয়ের (দ্রঃ) বড় ছেলে ধৃতরাষ্ট্র। ধৃতরাষ্ট্রের ছেলে কুণ্ডিক, হস্তী, বিতর্ক, ক্রাথ, কুণ্ডল, হবিঃশ্রবা, ইন্দ্রাভ, সুমন্যু/ভূমন্যু ও অপরাজিত (মহা ১।৮৯।৫১)। গীতা প্রেসে আরো ছেলে প্রতীপ, ধর্মনেত্র ও সুনেত্র; বর্দ্ধমান সংস্করণে এরা ধৃতরাষ্ট্রের নাতি।

ধৃতরাষ্ট্রী—তাম্রা ও কশ্যপ কন্যা। ধৃতরাষ্ট্রীর সন্তান রাজহংস ও লাল হাঁস।

ধৃতি—(১) দক্ষের মেয়ে; ধর্মের স্ত্রী। ধৃতি ও ধর্মের সন্তান নিয়ম। ধৃতি পর জন্মে মাদ্রী হয়ে জন্মান; নকুল ও সহদেবের মা। (২) বিদেহ রাজ বীতহব্যের ছেলে। বিচিত্র-বীর্যের সমকালীন; ধৃতির ছেলে বহুলাশ্ব।

ধৃষ্টকেতু—(১) চেদিরাজ শিশুপালের ছেলে। আগের জন্মে হিরণ্যকশিপুর ছেলে অনুহ্লাদ ছিলেন। শিশুপালের পর রাজা হন। ধৃষ্টকেতুর বোন করেণুমতি, নকুলের স্ত্রী। পাণ্ডবরা বনে এলে দেখা করতে এসেছিলেন এবং বোনকে নিয়ে শুক্তিমতী পুরীতে ফিরে যান (মহা ৩।২৩।৪৭)। পাণ্ডব পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন। জয়দ্রথ যে

দিন মারা যান সে দিন অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়ে ছিলেন। দ্রোণাচার্যের গতি রোধ করতে গেলে ত্রিগর্ত রাজ সুশর্মার ছেলে বীরধন্বা ধৃষ্টকেতুকে বাধা দেন এবং নিহত হন। বহুক্ষণ তারপর যুদ্ধ করে দ্রোণের হাতে ধৃষ্টকেতু মারা যান। মৃত্যুর পর বিশ্বদেবে পরিণত হন। ব্যাসের আহ্বানে মৃত যোদ্ধাদের সঙ্গে ইনিও দেখা দিতে এসেছিলেন (২) দ্রুপদের নাতি, ধৃষ্টদ্যুম্নের ছেলে।

ধৃষ্টদ্যুম্ন—দ্রোণ (দ্রঃ) অর্দ্ধেক পাঞ্চাল অর্জুনের (দ্রঃ) সাহায্যে আদায় করে নিলে অপমানিত দ্রুপদ (দ্রঃ) দ্রোণকে বধ করার জন্য যজ্ঞ করেন। যজ্ঞাগ্নি থেকে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদীর জন্ম। কবচ ও অস্ত্র ধারণ করেই এ'র জন্ম এবং অগ্নি থেকে বার হয়েই রথে উঠে বসেন যেন তখনই দিগ্বিজয়ে যাবেন ; এবং দৈববাণী হয় এই ছেলে দ্রোণকে নিধন করবেন। দ্রুপদ এ'কে পালন করেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্মের কারণ সকলেই এবং দ্রোণও জানতেন। তবু দ্রোণই এ'কে অস্ত্র শিক্ষা দেন। অস্ত্র শিক্ষার পর দ্রুপদ লাঞ্ছিত হন এবং যজ্ঞ করার জন্য পুরোহিত খুঁজতে এক বছর মত লাগে। এ দিকে অস্ত্রশিক্ষার এক বছর মত পরে (গী-প্রেস ১।১৩৮।১) যুধিষ্ঠির যুবরাজ হন। অর্থাৎ এই সময় দ্রৌপদী জন্মেছেন মাত্র। জতুগৃহ দাহের পর বিয়ে হয় যখন তখন দ্রৌপদীর বয়স কত হতে পারে? দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে দ্রৌপদীকে সভাতে নিয়ে আসেন এবং স্বয়ংবর পরিচালনা করেন। পাণ্ডবরা ব্রাহ্মণবেশী হলেও ধৃষ্টদ্যুম্নের সন্দেহ ছিল; পাণ্ডবদের পেছু পেছু সঙ্গোপনে কুম্ভকারগৃহে এসে লুকিয়ে সারা রাত কাটান (মহা ১।১৮৪।-) ; এবং নিশ্চিন্ত হয়ে দ্রুপদকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন দ্রৌপদী বোধহয় অপাত্রে পড়েনি : ছন্নাঃ ধ্রুবং তে প্রচরন্তি পার্থাঃ (মহা ১।১৮৫।১৩)। পাণ্ডবরা বনে গেলে ধৃষ্টদ্যুম্ন বোনকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন এবং দ্রৌপদীর ছেলেদের নিয়ে নিজের দেশে ফিরে যান ; এবং কথা দিয়ে যান দ্রোণকে নিহত করবেন (৩।১৩।১৮৮)। কাম্যক বনেও পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করতে এসে ছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ নিশ্চিত হয়ে উঠলে ইনি পাণ্ডব সেনা বাহিনীকে শিক্ষিত করে তুলতে থাকেন। পাণ্ডবদের সাত জন কুশলী রণনায়কের এক জন তীব্র যুদ্ধ করেছিলেন এবং ইনিই দ্রোণের (দ্রঃ) মাথা কেটে নিয়ে আসেন এতে পাণ্ডব পক্ষে সকলেই তাঁকে তিরস্কার করেন। এমন কি সাত্যকির সঙ্গে হাতাহাতি হবার উপক্রম হয়। কৃষ্ণ ইত্যাদির চেষ্টায় মিটমাট হয়। দুর্যোধনের উরুভঙ্গের পর রাত্রিবেলা অশ্বত্থামা পাণ্ডব শিবির আক্রমণ করে লাথি মেরে নৃশংসভাবে এ'কে হত্যা করেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের আত্মা অগ্নিতে প্রবেশ করে। তিন ছেলে ঃ-ক্ষত্রবর্মা (দ্রঃ), ক্ষত্রঞ্জয় ও ক্ষত্রধর্মা। দ্রঃ ধৃষ্টকেতু।

ধেনুক—খর নামে রাক্ষস। কংসের অনুচর। গোবর্দ্ধনের কাছে তালবনে থাকত। এখানে ভয়ে কেউ যেতেন না। এক বার গরু নিয়ে এই জন শূন্য স্থানে তাল বনে কৃষ্ণ বলরাম আসেন এবং তাল পাড়তে থাকেন। ধেনুক তখন গর্দভ বেশে তীব্র আক্রমণ করে বলরামকে কামড়াতে থাকে। বলরাম এর পা ধরে ঘোরাতে ঘোরাতে তাল গাছে আছাড় মেরে হত্যা করেন। অন্য মতে ধেনুক ধেনু রূপে এ'দের গরুর পালে এসে ঢুকেছিল এবং মারা পড়ে। কৃষ্ণের বয়স তখন ৬ (ভাগ ১০।১৫)। হরিবংশে (১।৫৪।-) কালীয় দমন ও প্রলম্ব বধের মধ্যবর্তী ঘটনা।

ধেনুকা—একটি (দ্রঃ) তীর্থ (মহা ৩।৮২।৭৫)।

ধোতী—শর্বণ। অযোধ্যাতে ফয়জাবাদ জেলাতে মই ও বিশ্বা নদীর সঙ্গমে। এখানে দশরথ সিন্ধুকে বধ করেছিলেন। কাছেই অন্ধমুনির আশ্রম ছিল। উনাও থেকে ২০ মাইল দ-পশ্চিম।

ধৌম্য—(১) মহর্ষি অসিতের ছেলে ও দেবলের ছোট ভাই। জতুগৃহ থেকে মুক্তি পাবার পর অর্জুনের হাতে চিত্ররথ পরাজিত হয়ে বন্ধুতা করেন। চিত্ররথের পরামর্শে উৎকোচক তীর্থে তপস্যারত ধৌম্যকে পাণ্ডবরা নিজেদের পুরোহিত করেন (মহা ১।১৭৪।২)। এর পর পাণ্ডবদের জীবনের সঙ্গে ইনি যেন মিশে যান। পাঁচ ভাইয়ের সঙ্গে (দ্রঃ) দ্রৌপদীর পৃথক পৃথক ভাবে বিয়ে দেন। পাণ্ডবদের সন্তান হলে এদের উপনয়ন ইত্যাদি করেন। রাজসূয় যজ্ঞে প্রধান পুরোহিত ছিলেন এই ধৌম্য। পাণ্ডবরা বনবাস যাবার সময় ইনি হাতে কুশ নিয়ে মন্ত্রপাঠ করতে করতে পথ দেখিয়ে এগিয়ে যান এবং বহু মূল্যবান উপদেশ দেন। পাণ্ডবদের সঙ্গে বহু ব্রাহ্মণ ভিক্ষু ও বনে এসে জমা হয়। নিঃস্ব যুধিষ্ঠির এদের ভরণ পোষণ চিন্তায় বিব্রত হয়ে পড়লে কার্তবীর্যার্জুন, বৈন্য ও নহুষের দৃষ্টান্ত জানিয়ে ধৌম্য যুধিষ্ঠিরকে সাহস দেন এবং নারদের কাছে পাওয়া সূর্যের স্তবটি প্রমাণাখ্য বটের নীচে মহা (৩।৩।৩০) যুধিষ্ঠিরকে শিখিয়ে দেন। স্তবটি নারদ ইন্দ্রের কাছে পেয়েছিলেন। এই স্তবের দ্বারা যুধিষ্ঠির অক্ষয়স্থালী (দ্রঃ- দ্রৌপদী) লাভ করেন। কাম্যক বনে পাণ্ডবরা প্রথমে প্রবেশ করতেই কির্মীর আক্রমণ করে। বনের দ্বার আবৃত করে মৈনাক মত অবস্থান করছিল। রক্ষঘ্ন মন্ত্রে ধৌম্য এই রাক্ষস মায়াজাল নষ্ট করে দিলে কালকম্প কির্মীর প্রত্যক্ষ হয়; এবং যুদ্ধে মারা পড়ে (মহা ৩।১২।১৯)। বনবাসের সময়টাও ধৌম্য পাণ্ডবদের সঙ্গে ছিলেন, তীর্থ যাত্রায়ও সঙ্গে গিয়েছিলেন। মণিমানের সঙ্গে ভীমের যখন যুদ্ধ হয় তখনও ধৌম্য যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে ছিলেন এবং যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে এগিয়ে যান। নহুষের দ্বারা আক্রান্ত ভীমের খোঁজেও যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে ছিলেন (মহা ৩।১৭৮।-)। জয়দ্রথ যখন দ্রৌপদীকে হরণ করতে আসেন দ্রৌপদী তখন ধৌম্যকে প্রণাম করেন। ধৌম্য জয়দ্রথকে বোঝাতে চেষ্টা করেন এবং শেষ পর্যন্ত জয়দ্রথের পেছু পেছু এগিয়ে যেতে থাকেন। পাণ্ডবরা তারপর জয়দ্রথকে অনুসরণ করে বিক্রোশন্তং ধৌম্যকে শান্ত হতে বলেন এবং জয়দ্রথকে আক্রমণ করেন (মহা ৩।২৫২।-)।

বিরাট নগরে কি ভাবে অজ্ঞাত বাসে থাকতে হবে ইত্যাদি বহু উপদেশ দিয়েছিলেন এবং অজ্ঞাতবাসে যাবার মুহূর্তে এঁদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্য যজ্ঞ করে আশীর্বাদ করেন। পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের সময় বাধ্য হয়ে দ্রুপদের আশ্রয়ে বাস করতেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর ইনি শ্রাদ্ধ শান্তি করেন। (২) আয়োদ্-ধৌম্য (দ্রঃ) নামে একজন ঋষি। আরুণি, উপমন্যু ও বেদ এঁর তিনটি শিষ্য। অন্য মতে উপমন্যুর ভাই। (৩) সত্যবানের পিতা দ্যুমৎসেনের পরিচিত এক ঋষি। (৪) সত্যযুগে ব্যাঘ্রপাদ ঋষির ছেলে। বড় ভাই উপমন্যু। এই উপমন্যু একদিন দুধ দোওয়া দেখে মার কাছে গিয়ে দুধ খেতে চান। মা দুধ দিতে পারেন না; উপদেশ দেন অভীষ্ট বস্তু পেতে হলে মহাদেবের

উপাসনা করতে হবে। ফলে উপমন্যু কঠোর তপস্যা করেন এবং মহাদেবের বরে অজর, অমর ও দিব্যজ্ঞান সম্পন্ন হন। সামান্য দুধের জন্য তপস্যা করেছিলেন বলে উপমন্যু চাইলেই তাঁর সামনে ক্ষীর সমুদ্র আবির্ভূত হত। মহাদেব স্থায়ী ভাবে তাঁর আশ্রমে বাস করতেন। এক কল্প পরে উপমন্যু মহাদেবে গিয়ে লীন (উপযাস্যাসি, মহা ১৩।১৪।১৯৪) হয়ে যান।

ধ্বজাগ্রকেয়ূরা—অক্ষোভ্য কুলে (দ্রঃ) দুটি মূর্তির ধ্যান প্রচলিত :—(১) বর্ণ কৃষ্ণ, তিন মুখ, চার হাত ; দক্ষিণ মুখ লাল ; বাম মুখ শ্যাম। খড়্গ, পাশ, বজ্রাঙ্কিত খট্টাঙ্গ ও চক্র ; ঊর্দ্ধ পিঙ্গল কেশ ; মাথাতে পাঁচটি শুষ্ক মুণ্ড ; ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান, করাল দংষ্ট্রা, লম্বোদরী, পীত বস্ত্র কঞ্চুক। হুং বীজ। (২) চার মুখ ও চার হাত মূর্তিও প্রচলিত। হাতে, খড়্গ, চক্র, তর্জনীপাশ ও মুসল। কাঁধে ত্রিশূল। প্রথম মুখ পীত ; বাম মুখ লাল, দক্ষিণ মুখ সাদা এবং ওপর দিকের মুখটি ধূম্রবর্ণ।

ধ্রুব—রাজা উত্তানপাদের (দ্রঃ) ছেলে ; মা উপেক্ষিতা সুনীতি। এক দিন বৈমাত্রেয় ভাই উত্তম রাজার কোলে বসে ছিল ধ্রুবও সেই সময় কোলে উঠতে চান। কিন্তু বিমাতা সুরুচি উপহাস করেন ও তপস্যা করতে বলেন ভাগ ৪।৮। ধ্রুব নিজের মাকে জানালে সুনীতি সান্ত্বনা দিয়ে উপদেশ দেন এক মাত্র হরিই দুঃখ মোচন করতে পারেন। পাঁচ বছরের বালক ব্যাকুল হয়ে ওঠেন ; এমন একটি স্থান চান যেখানে তাঁর পিতাও যেতে পারবেন না ; এবং রাত্রিতে গভীর বনে গিয়ে হরিকে খুঁজতে থাকেন। ক্রমাগত পূব দিকে এগোতে এগোতে সপ্তর্ষিদের দেখতে পান এবং এ পর্যন্ত যে স্থান কেউ কোন দিন পাননি সেই রকম স্থান পাবার বাসনা ব্যক্ত করেন। এঁরা বিষ্ণুর আরাধনা করতে বলেন। নারদ এসে নিবৃত্ত করতে চান। ধ্রুব জানান তিনি ক্ষত্রিয়। নারদ তখন বলে যান যমুনা তীরে মধু বনে তপস্যা করতে এবং মন্ত্র (ভাগ ৪।৮) দিয়ে যান ওঁ নমঃ ভাগবতে বাসুদেবায়। যমুনা তীরের মধুবনে কঠোর তপস্যা করেন। সুনীতি বালককে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেও বিফল হন। ৬ মাস মাত্র তপস্যা (ভাগ ৮। ১০)।

দেবতারা প্রথমে ভীত হয়ে তপস্যা ভাঙতে চেষ্টা করেন এবং বিফল হয়ে বিষ্ণুর শরণ নেন। বিষ্ণু এসে দেখা দিলে ধ্রুব বর চান চির দিন তিনি যেন হরির স্তব করতে পারেন। বিষ্ণু বর দেন (ভাগ ৪।৯।১৯) পিতৃরাজ্য পাবে, ৩৬ বৎসর রাজ্য পালন করে ধ্রুব লোক প্রাপ্তি হবে ; উত্তম মৃগয়াতে গিয়ে নিরুদ্দেশ হবে, সুরুচি ছেলেকে খুঁজতে গিয়ে দাবাগ্নিতে মারা যাবে।

বিষ্ণু আবার ধ্রুবের পরম স্থান পাবার বাসনার কথা মনে করিয়ে দেন এবং বলেন আগের জন্মে ধ্রুব এক ব্রাহ্মণ সন্তান ছিলেন। বন্ধু এক রাজপুত্রকে দেখে রাজপুত্র হতে চেয়েছিলেন। এ জন্য রাজপুত্র হয়ে জন্ম (বিষ্ণু ১।১২)। উপস্থিত তপস্যা করে মুক্তি মিলেছে। ধ্রুবের কামনা মতই চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা সব কিছুর ঊর্দ্ধে ধ্রুবলোকে তাঁর স্থান নির্দিষ্ট করে দেন। এর পর পিতার রাজ্যে রাজা হন। ফিরে এসে কিন্তু ধ্রুবের দুঃখ হয় বিষয় পেয়ে ভুলে গেল। মুক্তি চেয়ে নিল না কেন। ধ্রুবের স্ত্রী প্রজাপতি শিশুমার কন্যা ব্রাহ্মী (ভাগবতে ভ্রমি) ; এঁর দুটি ছেলে কল্প ও বৎসর। দ্বিতীয় স্ত্রী বায়ুর কন্যা

ইলা; ছেলে হয় উৎকল এবং (ভাগবতে) রূপবতী একটি মেয়ে। আর এক স্ত্রী শম্ভু, এ'র ছেলে শিষ্টি (দ্রঃ শ্লিষ্টি) ও ভব্য। ধ্রুবের ভাই উত্তম এক যক্ষের হাতে নিহত হয়েছিলেন। ধ্রুব এজন্য কুবের লোক আক্রমণ করে পরাজিত করেছিলেন। কুবের তখন দেখা দিয়ে ধ্রুবকে আশীর্বাদ করে বিমানে করে ধ্রুব লোকে স্থাপন করে আসেন। অন্য মতে মৃত্যুর পর বিষ্ণু দত্ত ধ্রুব লোকে নক্ষত্র রূপে অবস্থান করেন। জননী সুনীতিও নক্ষত্র হয়ে কাছেই অবস্থান করছেন। স্বর্গে বিষ্ণুপাদ নামে পরিচিত অংশে এই ধ্রুবলোক। ভাগবতে (৪।১১) উত্তমের জন্য হিমালয়ে গিয়ে যক্ষদের সঙ্গে যুদ্ধ; মনু এসে পৌত্র ধ্রুবকে বুঝিয়ে শান্ত করেন; এরপর কুবের এসে স্তব করেন (৪।১২) এবং বর দেন বিষ্ণুর প্রতি অচলা ভক্তি। ফিরে এসে বহু দিন রাজত্ব ও বহু যজ্ঞ। বিষ্ণুর প্রিয় পাত্র নন্দ ও সুনন্দ এসে রথে করে স্বশরীরে (ভাগ ৪।১২।৩১) স্বর্গে; সুনীতিও তৎক্ষণাৎ স্বর্গে যান নষ্ঠ ছেল ৎসর রাজা হয়। ধ্রুব (ভাগ ২।৭) অবতার।

(২) নহুষের একটি ছেলে; যযাতির ভাই। (৩) ধর্ম ও স্ত্রী ধূম্রার ছেলে। ধ্রুবের ছেলে কাল; লোকপ্রকালন (মহা১।৬০।২০)।

ধ্রুবতারা—লঘু সপ্তর্ষি শিশুমার গত একটি উজ্জ্বল তারা। পোল স্টার।

নকুল—পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পুত্র; ৪-র্থ পাণ্ডব। মাদ্রীর (দ্রঃ) গর্ভে অশ্বিনীকুমার দুজনের ঔরসে এ'র ও সহদেবের জন্ম; যমজ। অতি সুপুরুষ। কুলে এত সুন্দর কেউ নন বলে নাম ন-কুল। মাদ্রী সহমৃতা হন; সকলে হস্তিনাপুরে ফিরে আসেন এবং কুন্তীর কাছে পালিত হন। শতশৃঙ্গ পর্বতে মুনিরা নকুলের জাতকর্ম করেছিলেন। বসুদেবের পুরোহিত কশ্যপ উপনয়ন করান; রাজর্ষি শুক বাল্যকালে ধনুর্বেদ ও অসিবিদ্যা শেখান পরে দ্রোণের কাছে অস্ত্রশিক্ষা; এবং অসি যুদ্ধে পারদর্শী হন। বিচিত্র যুদ্ধ করতে পারতেন ফলে নাম হয়েছিল অতিরথ ও চিত্রযোধী। জতুগৃহ থেকে বার হয়ে গঙ্গাতীরে পৌঁছলে নকুল ও সহদেব ক্লান্ত হয়ে মাটিতে বসে পড়লে ভীম এ'দের বগলে করে নিয়ে যান। দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীর এক জন; ছেলে হয় শতানীক। এ'র অপর স্ত্রী চেদিরাজ ধৃষ্টকেতুর বোন করেণুমতী, ছেলে নিরমিত্র (মহা ১।৯০।৮৬)। রাজসূয় যজ্ঞের প্রাক্‌কালে নকুল পশ্চিম দিকে কর সংগ্রহে যান। রোহিতক পর্বতে মত্তময়ূরকদের, মরুভূমি এলাকা, শৈরীষক, মহেচ্ছ/মহোত্থ, দশার্ণ, শিবি, ত্রিগর্ত, অম্বষ্ঠ, মালব, পঞ্চকর্পট, মাধ্যমিক দেশে বাটধান দ্বিজদের, এরপর পুষ্করারণ্য বাসী উৎসবসঙ্কেতগণদের, সিন্ধুকূলে গ্রামেয়ানদের, সরস্বতী তীরে শূদ্র ও আভীরগণদের, মৎস্যজীবীদের, পর্বতবাসীদের, পঞ্চনদ, অপরপর্যট/অমরপর্বত, উত্তর জ্যোতিষ, বৃন্দাটক, দিব্যকট এবং দ্বারপাল দেশ জয় করেন। এরপর রমঠদের, হারহূণদের, প্রতীচ্য রাজাদের বশীভূত করে বাসুদেবের কাছে দূত পাঠান; কৃষ্ণেরা ও যাদবরা ও দশটি রাজ্য সমেত বশ্যতা স্বীকার করেন। তারপর শাকলে এলে নিজের মামা মদ্ররাজ শল্য প্রচুর ধনরত্ন কর দেন। এরপর

সাগর কুক্ষির কাছে ম্লেচ্ছ রাজাদের, পহ্লবদের ও বর্বরদের পরাজিত করে কর নিয়ে হাজার করভের পিঠে বোঝাই ধনরত্ন সমেত ফিরে আসেন। যজ্ঞের পর নকুল রাজা সুবল ও তাঁর ছেলেদের গান্ধারে পৌঁছে দিয়ে এসে ছিলেন। যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে ইনিও বনে যান। বনে নকুল দুঃখে গায়ে মাটি মেখে বসে থাকতেন। ঘোষযাত্রায় দুর্যোধনদের উদ্ধার করার জন্য ইনিও ভাইদের সঙ্গে গিয়েছিলেন। বনে জটাসুর একবার নকুলকে ধরে নিয়ে পালায়। জয়দ্রথের হাত থেকে দ্রৌপদীকে উদ্ধার করবার সময় (মহা ৩।২৫৫।১৭) বনে ক্ষেমংকর, মহামুখ, ও সুরথকে নিহত করেন। ব্রাহ্মণের অরণি-মন্থ উদ্ধারের জন্য পাঁচ ভাই বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে তৃষ্ণার্ত্ত হয়ে পড়লে নকুল ভাইদের জন্য তূণে করে জল আনতে গেলে জলাশয়ের তীরে বকরূপী যক্ষ/ধর্ম তাঁকে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে জল পান করতে নিষেধ করেন। নকুল এই নিষেধ অগ্রাহ্য করলে তখনই মারা যান। পরে মৃত ভাইদের মধ্যে যে কোন এক জনকে ধর্ম জীবন দিতে চাইলে যুধিষ্ঠির প্রথমেই নকুলের জীবন ভিক্ষা চান। অজ্ঞাত বাসের সময় নকুল শমী গাছে সকলের অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রেখে এরপর নিজেকে রাজা যুধিষ্ঠিরের অশ্ব-রক্ষক ও অশ্ব-চিকিৎসক বলে পরিচয় দিয়ে বিরাটের অশ্বশালার ভার নেন। এই সময়ে নকুলের ছদ্মনাম ছিল জয়ৎসেন, ও গ্রন্থিক। অজ্ঞাতবাসের পরে পশু চুরির যুদ্ধে ত্রিগর্তরাজের সঙ্গে নকুলের যুদ্ধ হয়। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের আগে মন্ত্রণাকালে কৃষ্ণ যখন দূত হয়ে কৌরবদের কাছে আসছিলেন নকুল তখন তাঁকে কালোচিত কার্য করতে পরামর্শ দিয়ে বলেছিলেন প্রথমে মিষ্ট ভাষায় যদি কাজ না হয় তাহলে যেন ভয় দেখাতে কৃষ্ণ কুণ্ঠিত না হন। নকুলের প্রস্তাব ছিল কুরুক্ষেত্রে দ্রুপদরাজ পাণ্ডবদের সেনাপতি হবেন। কুরুক্ষেত্রে নকুল বহু কৌরব সৈন্য নিহত করেন। ষোল দিনের পর কর্ণের হাতে লাঞ্ছিত ও পরাজিত হন। কুন্তীর কাছে প্রতিজ্ঞা অনুসারে কর্ণ নকুলকে নিহত করেন না। দ্রৌপদীর পাঁচ ছেলে মারা গেলে উপপ্লব্য নগর থেকে নকুল দ্রৌপদীকে নিয়ে আসেন। অশ্বত্থামার মণি আনার সময় নকুল ভীমের রথে সারথি হয়ে প্রথম বার হয়ে যান। যুদ্ধের পর নকুল যুধিষ্ঠিরকে গার্হস্থ্য ধর্মে উপদেশ দেন। যুধিষ্ঠির যুদ্ধের পর নকুলকে সৈন্যাধ্যক্ষ করে দিয়েছিলেন। যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে ধৃতরাষ্ট্রের ছেলে দুর্মদের প্রাসাদে বাস করতেন। অশ্বমেধের সময় ভীম ও নকুলের হাতে নগরী রক্ষার ভার ছিল। ভাইদের সঙ্গে ইনিও মহাপ্রস্থানে যান। সব চেয়ে রূপবান বলে গর্ব ছিল বলে স্বর্গে যেতে পারেন নি। নরক ভোগ করার পর ভাইদের সঙ্গে নকুলও স্বর্গবাস করেন। অশ্বিনীকুমারদের সঙ্গে মিশে যান।

নকুল, স্বর্ণ—দ্রঃ- ক্রোধ, উঞ্ছবৃত্তি।

নকুলীশ—লকুলীশ। মহাদেবের ২৮তম ও শেষ অবতার। একটি মতে ইনি ঐতিহাসিক ব্যক্তি ; খৃ-পূ ২-শতকে পশ্চিম ভারতে জন্ম। পাশুপত ধর্ম সম্প্রদায় সুগঠিত করেন। পুরাণ বর্ণিত কাহিনী অনুসারে কায়াবতারে বা কায়ারোহনে (আধুনিক কাথিয়াওয়ার অঞ্চলে) কার্বান গ্রামে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেন।

নকুলীশের মূর্তি পূজা কবে প্রচলিত হয় ঠিক হিসাব নাই। ভারতে নানা স্থানে নকুলীশের বহু মূর্তি পাওয়া যায়। উড়িষ্যা, গুজরাট, কাথিয়াওয়াড় পেনিনসুলা এলাকাতে এঁর মধ্যযুগীয় মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। পূর্বভারতে বিশেষত উড়িষ্যাতে এঁর মূর্তি বুদ্ধের মত। দ্বিগুণ দল পদ্মের ওপর বসা ; দুটি নাগরাজ এই পদ্মফুল তুলে ধরেছে ; এক হাতে ধর্মচক্র মুদ্রা। এমন কি কোথাও কোথাও পাদপীঠে হরিণ ও ধর্মচক্র রয়েছে।

ভুবনেশ্বরের রাজরাণী, মুক্তেশ্বর, শিশিরেশ্বর ইত্যাদি শিব-মন্দিরের গায়ে নকুলীশের মূর্তির সঙ্গে আরো ৪-টি মূর্তি খোদিত দেখা যায়। সম্ভবত এঁরা নকুলীশের ৪-জন শিষ্য কুশিক, মিত্র, গর্গ, এবং পৌরুষ্য/কৌরুষ্য। মথুরাতে একটি pilaster-এ উৎকীর্ণ মূর্তি পাওয়া গেছে। দণ্ডায়মান, দ্বিভুজ ও ত্রিনেত্র ; এক হাতে গদা আর এক হাতে কপাল। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের (খৃঃ ২-শতক) সময়কার। উড়িষ্যাতে দুটি মধ্যযুগীয় মূর্তি (খৃ ৯-১০ শতক) পাওয়া গেছে। একটি দ্বিভুজ, উর্দ্ধলিঙ্গ মূর্তি (আশুতোষ সংগ্রহ শালাতে) ; বদ্ধ পদ্মাসন মুদ্রাতে বসা ; বাম হাতে গদা কাঁধের ওপর স্থাপিত ; ডান হাত ভাঙা; দুপাশে দুটি কিছুটা লম্বোদর ছোট আকারের মূর্তি—হয়তো এরা দুজন শিষ্য। দ্বিতীয়টি মুখলিঙ্গমে সোমেশ্বর মন্দিরে চতুর্ভুজ উর্দ্ধলিঙ্গ মূর্তি, বদ্ধপদ্মাসন মুদ্রাতে বসা এবং দুদিকে মোট চারজন দাড়িওলা মুনি ; যেন মূল চারজন শিষ্য কুশিক, মিত্র, গর্গ ও কৌরুষ্য ; কি যেন তর্কে জড়িয়ে পড়েছেন। চতুর্ভুজ মূর্তির (গদাটি সামনের বাম হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরা) সামনের দুটি হাতে ধর্মচক্র মুদ্রা, পেছনের হাতে অক্ষমালা ও ত্রিশূল—এগুলি বিশেষ চিহ্ন। এ দুটি পূর্ব দেশীয় নকুলীশ ; এবং বুদ্ধমূর্তির সঙ্গে খুব বেশি একটা মিল রয়েছে।

কালীঘাটে নকুলেশ্বর শিবও এই নকুলীশ। দ্রঃ- শৈবা, শাক্ত, দর্শন।

নক্ষত্র—দ্রঃ- তারা। চন্দ্র-কক্ষ পথকে আকাশের গায়ে চিহ্নিত করার জন্য এবং চন্দ্র কি বেগে ঘুরছে হিসাবের জন্য ২৭-টি নক্ষত্র ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলি এক একটি নক্ষত্র পুঞ্জ ; প্রতিটি পুঞ্জে একটি প্রতিনিধি স্থানীয় তারা আছে—এটি যোগ তারা। এই যোগ তারার নাম অনুসারে নক্ষত্রপুঞ্জটিরও নাম। যেমন অশ্বিনী নক্ষত্রের পুঞ্জটিকে অশ্বিনী বলা হয়। ২৭ দিনের জন্য ২৭-টি নক্ষত্র রয়েছেঃ-অশ্বিনী-বিটা বা গামা আরিয়েটিস্ ; ভরণী-৩৫ আরিয়েটিস্, মুস্কা ; রোহিণী-আলফা টাউরি, ৫-টি তারা, অলডিবারন্ ; আর্দ্রা-আলফা ওরিয়োলিস্ ; পুষ্যা-ডেল্টা কাউক্রি ; মঘা-আলফা লিয়োনিস ; উত্তর ফাল্গুনী-বিটা লিয়োনিস ; চিত্রা-আলফা ভার্জিনিস, স্পিকা ; বিশাখা-আয়োটা লিব্রা ; জ্যেষ্ঠা-আলফা স্কর্পি ; পূর্বাষাঢ়া-ডেল্টা সাজিটারি ; শ্রবণা আলফা একুইলা ; শতভিষা-ল্যাম্বডা একোয়ারি ; উত্তরভাদ্রপাদ-গামা পেগাসি ; কৃত্তিকা-এটা টাউরি, প্লেইডস্ ; মৃগশিরা-ল্যাম্বডা ওরিয়োলিস ; পুনর্বসু বিটা জেমিনো-রাম ; অশ্লেষা-ডেল্টা হাইড্রা ; পূর্ব ফাল্গুনী-ডেল্টা লিয়োনিস্ ; হস্তা-ডেল্টা করভি ; স্বাতী-আলফা বুটিশ ; আরেটুরাস্ ; অনুরাধা-ডেল্টা স্কর্পি ; মূলা-ল্যাম্বডা স্কোর্পিয়ো-

রিস; উত্তরাষাঢ়া-টাউ সাজিটারি; ধনিষ্ঠা-বিটা ডেলফিনি; পূর্বভাদ্রপাদ-আলফা পেগাসি; রেবতী-জিটা পিসসিয়াম। আর একটি বহু উল্লিখিত নক্ষত্র অগস্ত্য-ক্যানোপাস্ এবং বৈদিক যুগে বার বার উল্লিখিত নক্ষত্র অভিজিৎ—আলফা লিরা, ভেগা। নাগবীথী ঃ-অশ্বিনী, কৃত্তিকা, ভরণী। গজবীথী ঃ-রোহিণী, আর্দ্রা ও মৃগশিরা। ঐরাবতী বীথী—পুষ্যা, অশ্লেষা ও পুনর্বসু (দে-ভাগ ৫।১৫)।

নক্ষত্রকল্প—অথর্ববেদের একটি ভাগ। মুঞ্জকেশ মুনি ভাগ করেন ঃ-নক্ষত্রকল্প (নক্ষত্র পূজা সম্বন্ধীয়), বেদকল্প (ঋত্বিক হিসাবে ব্রহ্মের কাজ), সংহিতা কল্প (মন্ত্রঅংশ), অঙ্গিরসকল্প (অভিচার ও ইন্দ্রজাল) এবং শান্তিকল্প (হস্তী, অশ্ব ইত্যাদির রোগ চিকিৎসা)।

নক্ষত্রযোগ--অশ্বিনী ভরণী ইত্যাদি ২৭-টি নক্ষত্রে বিশেষ বিশেষ দান করলে বিশেষ পুণ্য হয়। যেমন অশ্বিনী নক্ষত্রে রথ ও অশ্ব দান করলে পরজন্মে মহৎ পরিবারে জন্ম হয় ইত্যাদি।

নগর—যেখানে নগ অর্থাৎ অচল আয়তন সৌধগুলি থাকে। প্রাচীন ভারতে নগরের অধীনে অনেক গুলি গ্রাম থাকত। তখন নগর ছিল তিন রকম ঃ-নগর, পত্তন ও খর্বট। নগরের অধীনে থাকত ৮০০ গ্রাম; যেখানে রাজধানী থাকত তাকে পত্তন বলা হত; এবং ২০০ গ্রাম বিশিষ্ট নগরকে খর্বট বলা হত। নগর এক যোজন বা আরো বড় হতে পারত। নগরের আকৃতি চারকোণা, তিনকোণা বা কদাচিৎ গোলাকার হত। নগরের মাঝখান দিয়ে পূর্বপশ্চিমে ও উত্তরদক্ষিণে দুটি রাস্তা থাকত বলে নগরটি চারটি খণ্ডে ভাগ হয়ে যেত। এই রাজপথগুলির সমান্তরাল সংকীর্ণ আরো অনেক রাস্তা থাকত, ফলে নগরটি ছোট ছোট চারকোণা বহু এলাকাতে বিভক্ত হয়ে পড়ত। সাধারণত নগরগুলি পাথরের প্রাচীর এবং নদী বা সমুদ্রতীরবর্তী হলে কাঠের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা থাকত। প্রধান দুটি রাজপথের প্রান্তে অর্থাৎ মূল চারটি প্রবেশ দ্বার থাকত। দ্বারগুলি কতটা চওড়া হবে ইত্যাদি নির্দিষ্ট ছিল এবং নাম ছিল দক্ষিণে গন্ধর্বদ্বার, পশ্চিমে বরুণ দ্বার, উত্তরে সোমদ্বার এবং পূর্বে সূর্যদ্বার। অন্যান্য পথের প্রান্তেও অনেক ক্ষেত্রে প্রবেশ দ্বার থাকত। পাটলিপুত্র নগরে এই রকম ৬৪-টি প্রবেশ দ্বার ছিল। নগরে চতুবর্ণের লোক, অনেক জাতি, অনেক শিল্পী, নৃত্যকার, অভিনয়কারী, নট, গণিকা, মৎস্যজীবী, সূত্রধর, রাজমিস্ত্রি, মদ্য ব্যবসায়ী ইত্যাদি এবং সর্ব ধর্মের লোক থাকত। বিভিন্ন বৃত্তির লোক নগরে বিভিন্ন স্থানে বাস করত। দেবায়তনগুলি সাধারণত নগরের মধ্যস্থলে হত; এবং আশে পাশে পণ্যবীথি সুবিন্যস্ত ভাবে সাজান থাকত। নগরের এক প্রান্তে শ্মশান ও সমাধিস্থান থাকত। নগর সৈন্যদ্বারা সুরক্ষিত হত; অর্থাৎ অধীনে সমস্ত গ্রামগুলিকেও রক্ষা করত। নগরগুলির শাসনের জন্য উপযুক্ত কর্মচারী ব্যবস্থাও ছিল। পাটলিপুত্রের পৌরসংঘের শাসন ভার ৬-টি উপসমিতিতে ৩০ জনের এক পরিষদের উপর ন্যস্ত ছিল। প্রাচীন নগরগুলিতে পথে অনেক সময় দীপ স্তম্ভ এবং পথ প্রান্তে ঢাকা দেওয়া নর্দমা ছিল। নগরে নানা উৎসব, নাটক অভিনয় ও

জন্য যম বর দিতে চান। নচিকেতা তখন পুণ্যবান লোকদের দেখতে চান এবং যমের আদেশে দিব্যরথে করে পুণ্যবান লোকদের দেখতে গিয়ে দুগ্ধহ্রদ ইত্যাদি দেখেন এবং দেখেন ধেনুদানকারীরাই সব চেয়ে উচ্চ-স্থান লাভ করেছেন। যম নচিকেতাকে বহু উপদেশ দেন ; এই উপদেশগুলি মিলে কঠোপনিষদ।

নচিকেতার প্রথম উল্লেখ ঋক্‌বেদে (১০।১৩৫) পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে নচিকেতা ফিরে এসে ঋষিগণের কাছে সুকর্মের ফল ও পাপের ফল ইত্যাদি বর্ণনা করেন। কাহিনী সর্বত্র সমান নয়। নচিকেতার তৃতীয় প্রশ্নের সমাধান আজও মেলেনি। আজকেও প্রশ্ন আমি কে এবং কেন।

নটরাজ—মহাদেবের নৃত্যরত লীলামূর্তি। সভাপতি নামেও পরিচিত। দ-ভারতে কোন স্থানে এই রূপ কল্পনা সুরু হয়েছিল মনে হয়। ব্রোঞ্জ নির্মিত মূর্তিগুলি মধ্যযুগীয় ভারতীয় শিল্পীদের অসাধারণ সৃষ্টি রূপে নন্দিত হয়েছে।

অপস্মার-পুরুষ নামক এক কুশ্রী বামনের ওপর নর্তনশীল মূর্তি : দক্ষিণ পা অপস্মারের পিঠে প্রোথিত ; বাম পা একটু দক্ষিণ ঘেঁষে তোলা। সামনের বাম হাত গজহস্তভঙ্গিতে উত্থিত, বাম পাকে নির্দেশ করে প্রলম্বিত ; সামনের ডান হাতে অভয়মুদ্রা, পেছনের বাম হাতে অগ্নিগোলক ; পেছনের ডান হাতে ডমরু। সম্পূর্ণ মূর্তিটি অগ্নিশিখার মালা বা প্রভাবলী দ্বারা বেষ্টিত ; প্রভাবলীর প্রান্ত দুটি নীচে পীঠিকায় এসে মিলিত হয়েছে। ব্যাখ্যা হিসাবে বলা হয় ডমরু থেকে সৃষ্টির সুরু ; অভয় মুদ্রাতে স্থিতির ইঙ্গিত, অগ্নিগোলক প্রলয়ের প্রতীক ; উত্থিত বাম পদে মুক্তির (অনুগ্রহ, প্রসাদের) আভাস ; প্রভাবলী তাঁর তিরোভাবের দ্যোতক। অর্থাৎ এই মূর্তিতে দেবতার পঞ্চকৃত্য সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, অনুগ্রহ ও তিরোভাব পরিস্ফুট।

এ ছাড়া বহু বিভিন্ন রীতিতে বহু বিচিত্র মূর্তি পাওয়া যায় : হাতের সংখ্যা বেশি হয় এবং সঙ্গে নন্দী, পার্বতী, গঙ্গা ইত্যাদিকেও দেখা যায়। ব্যাখ্যাও নানা রকম হয়। দ্রঃ- মহাদেব।

নড্বলা—চাক্ষুষ মনুর (দ্রঃ) স্ত্রী।

নতা—কশ্যপ ও তাম্রার মেয়ে শুকী ; শুকীর মেয়ে নতা ; নতার মেয়ে বিনতা (রা ৩।১৪)।

নদী—ঋক্‌বেদে কুভা, সিন্ধু, পরুষ্ণী, শতদ্রু, সরস্বতী, যমুনা, অসিক্নী, মরুদ্বৃধা, বিতস্তা সুসোমা, আর্জীকীয়া, তৃষ্টামা, সুসৃর্ত্তু, রসা, শ্বেতী, ক্রুমু, গোমতী ও মেহত্নু নদীর নাম পাওয়া যায়। গঙ্গার থেকে এগুলির গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য অনেক বেশি ছিল। গঙ্গার নাম ঋক্‌বেদে মাত্র এক বার আছে। কুভা থেকে যমুনা এলাকা আর্যাবর্ত। পুরাণে সুবাস্তু, বিপাশা ইত্যাদি বহু নাম।

ননা—হুবিষ্কের একটি মুদ্রাতে এক পিঠে ননা (—উমা?) অপর পিঠে যেন শিবের মূর্তি রয়েছে। দ্রঃ- হিংলাজ, মুদ্রা।

নন্দ—(১) নন্দ গোপ (দ্রঃ)। (২) ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে ; ভীমের হাতে নিহত। (৩) একটি সাপ।

নন্দক—বিষ্ণুর খড়্গ। মেরুপর্বতে অলকানন্দা তীরে ব্রহ্মা এক বার যজ্ঞ করেন। ব্রহ্মা যখন গভীর ধ্যানে মগ্ন ছিলেন তখন লোহাসুর আসে যজ্ঞে বিঘ্ন করতে। ব্রহ্মার ধ্যান থেকে তৎক্ষণাৎ এক জন পুরুষ জন্মান এবং ব্রহ্মাকে নমস্কার করেন। দেবতারা পুরুষটিকে অভিনন্দন করেন ফলে নাম হয় নন্দক এবং খড়্গে পরিণত হন। দেবতাদের অনুরোধে বিষ্ণু এই খড়্গ গ্রহণ করেন এবং সহস্র হস্ত বজ্রমুষ্টি লোহাসুর গদা হাতে এগিয়ে এলে বিষ্ণু এই খড়্গে একে নিহত করেন। ব্রহ্মাও যজ্ঞ শেষ করতে সক্ষম হন (অগ্নিপুরাণ ২৪৫।-)।

নন্দগোপ—নন্দ। প্রথম বসু দ্রোণ এবং স্ত্রী ধারা একবার দেবতাদের অনুচিত একটি কাজ করে বসেন। ব্রহ্মা জানতে পেরে অভিশাপ দেন গোপালক বংশে গিয়ে জন্মাতে হবে। এরা তারপর অনুনয় বিনয় করলে বলেন বিষ্ণু কৃষ্ণ হয়ে জন্মালে তারপর মুক্তি পাবেন। এঁরা নন্দ ও যশোদা হয়ে জন্মান (ভাগ ১০।-)। আর এক কাহিনীতে উজ্জয়িনীতে মহাকালের মন্দিরে চন্দ্রসেন তপস্যা করেছিলেন। শিব সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে একটি রত্ন দেন। অন্যান্য রাজারা খবর পেয়ে রত্নটি কেড়ে নিতে আসেন। রাজা পালিয়ে এসে মন্দিরে আশ্রয় নেন। এই সময় উজ্জয়িনীতে এক গোয়ালিনীর শ্রীকর নামে একটি ছেলে ছিল। এই শ্রীকরও ছেলেবেলা থেকে শিবভক্ত, মহাকালের মন্দিরে শিবের আরাধনা করে শিবের অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন। যে সব রাজারা চন্দ্রসেনকে ধরতে এসেছিলেন তাঁরা এই শ্রীকরের দেহ থেকে বিচ্ছুরিত জ্যোতি দেখে ভয়ে পালিয়ে যান। এই শ্রীকর অষ্টম জন্মে নন্দগোপ হয়ে জন্মান (শিব-পু)।

নন্দগোপ মথুরার অপর দিকে গোকুল গ্রামে বাস করতেন। জাতিতে গোপ; স্ত্রী যশোদা। কৃষ্ণকে (দ্রঃ) পালন করেন। কৃষ্ণকে বধ করার জন্য কংস ক্রমাগত ছদ্মবেশী চর পাঠাতে থাকলে শেষ পর্যন্ত ভীত হয়ে নন্দ বৃন্দাবনে চলে যান। হরিবংশে (২।৫।৬০) বসুদেবের পরামর্শে ব্রজে চলে যান। বরুণ এক বার নন্দকে ধরে পাতালে নিয়ে যান (দ্রঃ- কৃষ্ণ)। নন্দকে এক বার একটি অজগর সাপ গিলতে চেষ্টা করে; কৃষ্ণ (দ্রঃ) বাঁচান। কংসের যজ্ঞে নন্দ নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন; সঙ্গে কৃষ্ণ ছিলেন এবং এই সময় কংস কৃষ্ণের হাতে মারা যান। দ্রঃ- ধর্ম।

নন্দন—হিরণ্যকশিপুর ছেলে। শ্বেতদ্বীপে রাজত্ব করতেন। শিবের বরে অজেয় হন। জীবনের শেষে মহাদেবের গণদের সঙ্গে যোগ দেন।

নন্দনকানন—স্বর্গের উদ্যান। চৈত্ররথ, বৈভ্রাজ ও সর্বভদ্র আরো তিনটি উদ্যান।

নন্দনসর—কাশ্মীরে পিরপঞ্জাল পর্বতের উত্তর দিকে একটি পবিত্র হ্রদ।

নন্দা—(১) সরস্বতীর একটি অংশ (পদ্ম)। (২) কুসি নদীর পূব দিকে মহানন্দা নদী (মহা) বাঙলাতে। (৩) গাড়োয়ালে মন্দাকিনী নদিকা; অলকানন্দাতে এসে মিশেছে; এই সঙ্গম নন্দপ্রয়াগ (ব্রহ্মাণ্ড; দ্রঃ- পঞ্চ প্রয়াগ)। ভাগবতে আছে কৈলাসে অলকার এক পাশে নন্দা অপর পাশে অলকানন্দা; দুটি নদী। (৪) গোদাবরী নদী। (৫) নন্দা বা নন্দাদেবী; কুমায়ুনে বরফ ঢাকা শঙ্কু মত একটি শিখর; এখানে নন্দা দেবীর বিখ্যাত মন্দির রয়েছে। মহাভারতে (৩।৮২) আছে কোকামুখ থেকে নন্দা তীর্থে আসতে

নৃত্য গীত ইত্যাদিও হত। বাণিজ্যের জন্য বিদেশীদের যাতায়াত সব সময়ই ছিল ফলে ভোজনাগারে ভাত ও রান্না মাংস সব সময়ই কিনতে পাওয়া যেত। নগরে রাজপথে প্রতিদিন সকালে ঝাঁট দিয়ে জলও দেওয়া হত (রামা ১।৫।৮)। পথে কেউ আবর্জনা ফেললে দণ্ড পেত।

এই নগর গড়ার নির্দিষ্ট ব্যবস্থা মহেন্-জোদড়ো, হরপ্পা ইত্যাদিতে স্পষ্ট। এই সময়ে নগরে স্নানাগারও থাকত। তক্ষশিলা, পাটলিপুত্র, উজ্জয়িনী, বুদ্ধগয়া, সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল। হিন্দু ও বৌদ্ধ যুগে বহু উপাসনা স্থানকে বা মন্দিরকে কেন্দ্র করে নগর গড়ে উঠেছিল। রাজধানী ও বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করেও নগর গড়ে উঠত। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্র নগর। খাজুরাহো, কাঞ্চিপুরম মন্দির নগর। সেকালে বেশির ভাগ নগরই এক একটি দুর্গ বিশেষ ছিল। বাঙলার প্রাচীন নগরী তাম্রলিপ্ত, পুণ্ড্রবর্দ্ধন, কর্ণসুবর্ণ, ত্রিবেণী, লক্ষণাবতী ও পরে গৌড়।

নগরকোট—কাঙড়া বা কোট কাঙড়া। কোহিস্তানে মান্ঝি ও বনগঙ্গা নদীর সঙ্গমে। এখানে মাতাদেবী বা বজ্রেশ্বরীর মন্দির রয়েছে। মামুদ গজনি এটি নষ্ট করেছিল। পীঠস্থান। সতীর স্তন পড়েছিল। ত্রিগর্ত বা কুলূতদের প্রাচীন রাজধানী। এখানে ধ্বংসাবশেষ দুর্গটিকে একদিন অপরাজেয় মনে করা হত। দুর্গের মধ্যে হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। কাঙড়া থেকে ১ মাইল দূরে জন বহুল ভবন সহর 'মূলকের'-পাহাড়ের দ-ঢালু গায়ে। এই সহরেও একটি হিন্দু মন্দির রয়েছে; মন্দিরের চূড়া গিলটি করা। প্রাচীন নাম সুশর্মা পুর/নগর। কাঙড়া উপত্যকাতে একটি বিচ্ছিন্ন পাহাড় আশাপুরী ; এটি তীর্থস্থান।

নগরহার—নিগরহার, নিগ্রহার, নিরাহার। সুরখর বা সুরখ্-রুদ এবং কাবুল নদীর সঙ্গমে। জালালাবাদের কাছে। কাছেই অবস্থিত একটি গ্রামের নাম আজও নগরক, নে-কিয়ে (ফা হিয়েন) বা না-কিয়া-লো-হো (হিউ-এন-ৎসাঙ)। একটি মতে জালালাবাদ থেকে ৪-৫ মাইল পশ্চিমে নন্ঘেনহর বা নন্গ্রিহর। টলেমি একে নগর বা ডিয়োনিসোপোলিস্ বলেছেন ; ন্যস (দ্রঃ) (আলেকজেন্দ্রীয়) ও নেকেরহর নামও পাওয়া যায়। কাবুল উপত্যকার নাম নুনগ্নিহর এবং এই উপত্যকাতে ৯-টি পাহাড়ি নদী রয়েছে। ১৫৭০ সালে আকবর জালালাবাদ সহর স্থাপন করলেও এখানে যেন গ্রীক রাজধানী কাবুল নদীর দক্ষিণ তীরে জালালাবাদের কাছেই অবস্থিত ছিল। গ্রীক রাজা এগাথোক্লেস ও প্যান্টালিয়োনের রাজধানী। মামুদগজনির সময়েও ডিয়োনিসোপোলিস নাম চালু ছিল। আলবেরুনি বলেছেন ডিনুস সহর কাবুল ও পেশোয়ারের মধ্যে অবস্থিত। অপর নাম উদ্যানপুর। নগরহার ধ্বংসাবশেষের কিছু দূরে এবং নদীর অপর পারে মর-খো অর্থাৎ মেরু পর্বত (আলেকজেন্দ্রীয়) অবস্থিত। জালালাবাদে ৪০-টি মত বৌদ্ধ স্তূপ (খৃ ১-৭ শতক) রয়েছে। কাবুল নদীর দ-তীরে এই নগরহার ছিল ভারতের শেষ সীমানা। গুসেরোয়া (বিহার থেকে ১০ মাইল দ-পূ) শিলালেখে নগরহারকে উত্তরাপথে অবস্থিত বলা হয়েছে।

নগ্নজিৎ—কোশলের রাজা ; এঁর মেয়ে সত্যা বা নাগ্নজিতী। অগ্নির স্ত্রী স্বাহা

কৃষ্ণকে স্বামী রূপে পাবার জন্য তপস্যা করেন। পর জন্মে সত্যা নামে জন্মান। রাজার পণ ছিল তাঁর রক্ষিত সাতটি মহাবৃষকে যিনি বধ করতে পারবেন তাঁর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন। কৃষ্ণ এগুলিকে পরাস্ত করে সত্যাকে বিয়ে করেন। ভাগবতে (১০।৫৮) ফিরে যাবার পথে বহু রাজা আক্রমণ করে; অর্জুনের গাণ্ডীবের টঙ্কারে সকলে পালায়। (২) গান্ধারের এক জন ক্ষত্রিয় রাজা। অসুর ইষুপাদ (দ্রঃ) অংশে জন্ম। কর্ণ একে নিহত করেন এবং এর ছেলে কৃষ্ণের হাতে পরাজিত হন। মহাভারতে (৫।৪৭।৬৯) কৃষ্ণ গান্ধারবাসীদের তথা নগ্নজিতের ছেলেদের পরাস্ত করে সুদর্শনীয়-কে মুক্ত করেন। (৩) প্রহ্লাদের এক জন অনুচর; পর জন্মে সুবল (দ্রঃ)। (৪) গ্রন্থ চিত্রলক্ষণ প্রণেতা। অবশ্য প্রতিমালক্ষণ হয়তো চিত্রলক্ষণের একটা অংশ/অধ্যায়।

নচিক—বিশ্বামিত্রের এক ব্রহ্মবাদী ছেলে।

নচিকেতা—রাজা বাজশ্রবার (=অন্য নাম গৌতম) ছেলে। নচিকেতা=যে জানেনি, অথচ জানতে চায়। স্বর্গে যাবার জন্য রাজা এক যজ্ঞ করে সমস্ত ধন রত্ন দান করেন। নচিকেতা তখন বালক। কিছু বুড়ো গরুও রাজা দান করেছিলেন। নচিকেতা তখন বাবাকে জিজ্ঞাসা করেন কোন ঋত্বিকের হাতে তাকে দান করবেন। রাজা প্রথম কান দেননি; কিন্তু নচিকেতা তিন বার জিজ্ঞাসা করেন কার হাতে তাকে দান করবেন। রাজা তখন রেগে গিয়ে বলেন যমের হাতে। ফলে কথা রাখার জন্য ছেলেকে যমের কাছে পাঠিয়ে দেন।

যম ছিলেন না; এখানে নচিকেতা তিন রাত উপোস করে কাটান। যম ব্রহ্মলোক থেকে ফিরে এসে সব শুনে তিন রাত উপোস করার জন্য তিনটি বর দিতে চান। প্রথম বরে নচিকেতা চান তাঁর বাবা যেন ছেলের জন্য চিন্তা না করেন এবং আগের মতই যেন নচিকেতার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। দ্বিতীয় বরে স্বর্গে যাবার পথ জানতে চান এবং যাঁরা স্বর্গে আসবেন তাঁরা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জরা, মৃত্যু, শোক ইত্যাদির অধীন যেন না হন। তৃতীয় বরে জানতে চান মৃত্যুর পর অন্তরে কি হয়; জীবাত্মা বলে কিছু আছে কি না। যম প্রথম দুটি বর দিয়ে নানা প্রলোভন দেখিয়ে নচিকেতাকে নিবৃত্ত করতে চান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে তৃতীয় প্রশ্নের জবাবে ব্রহ্ম বিদ্যা দান করেন। এই তৃতীয় প্রশ্নের জবাবই কঠোপনিষদ।

মহাভারত (১৩।৭০) মতে উদ্দালক ঋষির ছেলে। একদিন ঋষি নদীতীরে ফল ইত্যাদি ফেলে এসে ছেলেকে সেগুলি আনতে বলেন। নচিকেতা এসে দেখেন সেগুলি সব জলে ভেসে গেছে। খালি হাতে ফিরলে ঋষি ছেলেকে যমের বাড়ি যাবার শাপ দেন; সঙ্গে সঙ্গে নচিকেতা মারা যায়। উদ্দালক তখন বিলাপ করতে থাকেন এবং এক দিন এক রাত মৃতদেহ পড়ে থাকে। পর দিন ছেলেকে জীবিত দেখে ঋষি বুঝতে পারেন ছেলে দেবলোক থেকে ফিরে এল এবং এখন তার দেহ আর মানবীয় দেহ নয়। নচিকেতা জানান তিনি যমরাজের কাছে গিয়ে ছিলেন এবং কোথায় তারপর যেতে হবে জানতে চাইলে যম বলেন উদ্দালকের শাপ অনুসারে নচিকেতার যম দর্শন হয়েছে এবার সে বাবার কাছে ফিরে যেতে পারে। যমের অতিথি হবার

জন্য যম বর দিতে চান। নচিকেতা তখন পুণ্যবান লোকদের দেখতে চান এবং যমের আদেশে দিব্যরথে করে পুণ্যবান লোকদের দেখতে গিয়ে দুগ্ধহ্রদ ইত্যাদি দেখেন এবং দেখেন ধেনুদানকারীরাই সব চেয়ে উচ্চ-স্থান লাভ করেছেন। যম নচিকেতাকে বহু উপদেশ দেন ; এই উপদেশগুলি মিলে কঠোপনিষদ।

নচিকেতার প্রথম উল্লেখ ঋক্‌বেদে (১০।১৩৫) পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে নচিকেতা ফিরে এসে ঋষিগণের কাছে সুকর্মের ফল ও পাপের ফল ইত্যাদি বর্ণনা করেন। কাহিনী সর্বত্র সমান নয়। নচিকেতার তৃতীয় প্রশ্নের সমাধান আজও মেলেনি। আজকেও প্রশ্ন আমি কে এবং কেন।

নটরাজ—মহাদেবের নৃত্যরত লীলামূর্তি। সভাপতি নামেও পরিচিত। দ-ভারতে কোন স্থানে এই রূপ কল্পনা সুরু হয়েছিল মনে হয়। ব্রোঞ্জ নির্মিত মূর্তিগুলি মধ্যযুগীয় ভারতীয় শিল্পীদের অসাধারণ সৃষ্টি রূপে নন্দিত হয়েছে।

অপস্মার-পুরুষ নামক এক কুশ্রী বামনের ওপর নর্তনশীল মূর্ত্তি ; দক্ষিণ পা অপস্মারের পিঠে প্রোথিত ; বাম পা একটু দক্ষিণ ঘেঁষে তোলা। সামনের বাম হাত গজহস্তভঙ্গিতে উত্থিত, বাম পাকে নির্দেশ করে প্রলম্বিত ; সামনের ডান হাতে অভয়মুদ্রা, পেছনের বাম হাতে অগ্নিগোলক ; পেছনের ডান হাতে ডমরু। সম্পূর্ণ মূর্তিটি অগ্নিশিখার মালা বা প্রভাবলী দ্বারা বেষ্টিত ; প্রভাবলীর প্রান্ত দুটি নীচে পীঠিকায় এসে মিলিত হয়েছে। ব্যাখ্যা হিসাবে বলা হয় ডমরু থেকে সৃষ্টির সুরু ; অভয় মুদ্রাতে স্থিতির ইঙ্গিত, অগ্নিগোলক প্রলয়ের প্রতীক ; উত্থিত বাম পদে মুক্তির (অনুগ্রহ, প্রসাদের) আভাস ; প্রভাবলী তাঁর তিরোভাবের দ্যোতক। অর্থাৎ এই মূর্তিতে দেবতার পঞ্চকৃত্য সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, অনুগ্রহ ও তিরোভাব পরিস্ফুট।

এ ছাড়া বহু বিভিন্ন রীতিতে বহু বিভিন্ন মূর্তি পাওয়া যায় ; হাতের সংখ্যা বেশি হয় এবং সঙ্গে নন্দী, পার্বতী, গঙ্গা ইত্যাদিকেও দেখা যায়। ব্যাখ্যাও নানা রকম হয়। দ্রঃ- মহাদেব।

নড্বলা—চাক্ষুষ মনুর (দ্রঃ) স্ত্রী।

নতা—কশ্যপ ও তাম্রার মেয়ে শুকী ; শুকীর মেয়ে নতা ; নতার মেয়ে বিনতা (রা ৩।১৪)।

নদী—ঋক্‌বেদে কুভা, সিন্ধু, পরুষ্ণী, শতদ্রু, সরস্বতী, যমুনা, অসিক্নী, মরুদ্বৃধা, বিতস্তা সুসোমা, আর্জীকীয়া, তৃষ্টামা, সুসর্তু, রসা, শ্বেতী, ক্রুমু, গোমতী ও মেহত্নু নদীর নাম পাওয়া যায়। গঙ্গার থেকে এগুলির গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য অনেক বেশি ছিল। গঙ্গার নাম ঋক্‌বেদে মাত্র এক বার আছে। কুভা থেকে যমুনা এলাকা আর্যাবর্ত। পুরাণে সুবাস্তু, বিপাশা ইত্যাদি বহু নাম।

ননা—হুবিষ্কের একটি মুদ্রাতে এক পিঠে ননা (উমা ?) অপর পিঠে যেন শিবের মূর্তি রয়েছে। দ্রঃ- হিংলাজ, মুদ্রা।

নন্দ—(১) নন্দ গোপ (দ্রঃ)। (২) ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে ; ভীমের হাতে নিহত। (৩) একটি সাপ।

নন্দক—বিষ্ণুর খড়্গ। মেরুপর্বতে অলকানন্দা তীরে ব্রহ্মা এক বার যজ্ঞ করেন। ব্রহ্মা যখন গভীর ধ্যানে মগ্ন ছিলেন তখন লোহাসুর আসে যজ্ঞে বিঘ্ন করতে। ব্রহ্মার ধ্যান থেকে তৎক্ষণাৎ এক জন পুরুষ জন্মান এবং ব্রহ্মাকে নমস্কার করেন। দেবতারা পুরুষটিকে অভিনন্দন করেন ফলে নাম হয় নন্দক এবং খড়্গে পরিণত হন। দেবতাদের অনুরোধে বিষ্ণু এই খড়্গ গ্রহণ করেন এবং সহস্র হস্ত বজ্রমুষ্টি লোহাসুর গদা হাতে এগিয়ে এলে বিষ্ণু এই খড়্গে একে নিহত করেন। ব্রহ্মাও যজ্ঞ শেষ করতে সক্ষম হন (অগ্নিপুরাণ ২৪৫।-)।

নন্দগোপ—নন্দ। প্রথম বসু দ্রোণ এবং স্ত্রী ধারা একবার দেবতাদের অনুচিত একটি কাজ করে বসেন। ব্রহ্মা জানতে পেরে অভিশাপ দেন গোপালক বংশে গিয়ে জন্মাতে হবে। এরা তারপর অনুনয় বিনয় করলে বলেন বিষ্ণু কৃষ্ণ হয়ে জন্মালে তারপর মুক্তি পাবেন। এঁরা নন্দ ও যশোদা হয়ে জন্মান (ভাগ ১০।-)। আর এক কাহিনীতে উজ্জয়িনীতে মহাকালের মন্দিরে চন্দ্রসেন তপস্যা করেছিলেন। শিব সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে একটি রত্ন দেন। অন্যান্য রাজারা খবর পেয়ে রত্নটি কেড়ে নিতে আসেন। রাজা পালিয়ে এসে মন্দিরে আশ্রয় নেন। এই সময় উজ্জয়িনীতে এক গোয়ালিনীর শ্রীকর নামে একটি ছেলে ছিল। এই শ্রীকরও ছেলেবেলা থেকে শিবভক্ত, মহাকালের মন্দিরে শিবের আধারনা করে শিবের অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন। যে সব রাজারা চন্দ্রসেনকে ধরতে এসেছিলেন তাঁরা এই শ্রীকরের দেহ থেকে বিচ্ছুরিত জ্যোতি দেখে ভয়ে পালিয়ে যান। এই শ্রীকর অষ্টম জন্মে নন্দগোপ হয়ে জন্মান (শিব-পু)।

নন্দগোপ মথুরার অপর দিকে গোকুল গ্রামে বাস করতেন। জাতিতে গোপ ; স্ত্রী যশোদা। কৃষ্ণকে (দ্রঃ) পালন করেন। কৃষ্ণকে বধ করার জন্য কংস ক্রমাগত ছদ্মবেশী চর পাঠাতে থাকলে শেষ পর্যন্ত ভীত হয়ে নন্দ বৃন্দাবনে চলে যান। হরিবংশে (২।৫।৬০) বসুদেবের পরামর্শে ব্রজে চলে যান। বরুণ এক বার নন্দকে ধরে পাতালে নিয়ে যান (দ্রঃ- কৃষ্ণ)। নন্দকে এক বার একটি অজগর সাপ গিলতে চেষ্টা করে ; কৃষ্ণ (দ্রঃ) বাঁচান। কংসের যজ্ঞে নন্দ নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন ; সঙ্গে কৃষ্ণ ছিলেন এবং এই সময় কংস কৃষ্ণের হাতে মারা যান। দ্রঃ- ধর্ম।

নন্দন—হিরণ্যকশিপুর ছেলে। শ্বেতদ্বীপে রাজত্ব করতেন। শিবের বরে অজেয় হন। জীবনের শেষে মহাদেবের গণদের সঙ্গে যোগ দেন।

নন্দনকানন—স্বর্গের উদ্যান। চৈত্ররথ, বৈভ্রাজ ও সর্বভদ্র আরো তিনটি উদ্যান।

নন্দনসর—কাশ্মীরে পিরপঞ্জাল পর্বতের উত্তর দিকে একটি পবিত্র হ্রদ।

নন্দা—(১) সরস্বতীর একটি অংশ (পদ্ম)। (২) কুসি নদীর পূব দিকে মহানন্দা নদী (মহা) বাঙলাতে। (৩) গাড়োয়ালে মন্দাকিনী নদিকা, অলকানন্দাতে এসে মিশেছে ; এই সঙ্গম নন্দপ্রয়াগ (ব্রহ্মাণ্ড ; দ্রঃ- পঞ্চ প্রয়াগ)। ভাগবতে আছে কৈলাসে অলকার এক পাশে নন্দা অপর পাশে অলকানন্দা ; দুটি নদী। (৪) গোদাবরী নদী। (৫) নন্দা বা নন্দাদেবী ; কুমায়ুনে বরফ ঢাকা শঙ্কু মত একটি শিখর ; এখানে নন্দা দেবীর বিখ্যাত মন্দির রয়েছে। মহাভারতে (৩।৮২) আছে কোকামুখ থেকে নন্দা তীর্থে আসতে

হয় ; এখানে একবার এলেই সব পাপ মুক্ত হয়ে ইন্দ্রলোকে গতি হয়। নন্দা থেকে ঋষভ আশ্রমে যেতে হয়। ব্রাহ্মণের গোধন উদ্ধারের পর তীর্থ যাত্রার সময় অর্জুন এই নন্দা ও অপরানন্দা তীরে এসেছিলেন। নৈমিষারণ্যের পূর্ব দিকে এই নদী। বনবাসের সময়ও পাণ্ডবরা অগস্ত্য আশ্রমে গিয়ে দুর্জয়াতে (মহা ৩।৮৪) অবস্থান করেন। এরপর পাপভয়াপহা নন্দা ও অপরানন্দা নদী অতিক্রম করে লোমশ মুনির সঙ্গে এগিয়ে যান। নন্দা থেকে কৌশিকী নদীতে (৩।১০৯) যাওয়া যায়।

নন্দা—পুষ্কর থেকে সরস্বতী (দ্রঃ) পশ্চিম দিকে এগিয়ে যান নাম হয় নন্দা। রাজা প্রভঞ্জন স্তন্য দান রত এক হরিণীকে বাণ বিদ্ধ করলে হরিণী শাপ দেয় রাজাকে বাঘ হয়ে এইখানে বাস করতে হবে ; এবং ক্ষমা চাইলে বলে এক শত বছর পরে এই খানে নন্দা নামে এক গাভীর সঙ্গে কথা বললে মুক্তি পাবে। এক শত বছর পরে এখানে এক দল গরু চরতে আসে , দলের নেত্রী ছিল নন্দা নামে একটি গাভী। বাঘ প্রভঞ্জন এই নন্দাকে আক্রমণ করলে গাভীটি বাঘের কাছে প্রার্থনা করে উপস্থিত তাকে ছেড়ে দিতে, তার দুগ্ধপোষ্য বাচ্ছার কাছে সে বিদায় নিয়ে আসতে চায়। বাঘ ছেড়ে দেয় এবং গাভী পরে আবার ফিরে আসে। বাঘ প্রভঞ্জন এই রকম সত্যরক্ষা দেখে অবাক হয়ে যান. গাভীকে তার নাম জিজ্ঞসা করেন এবং নাম শুনে রাজার শাপ মুক্তি ঘটে। ধর্ম তখন এসে এই ভাবে সত্যরক্ষার জন্য নন্দাকে বর দিতে চাইলে নন্দা চায় স্থানটি পবিত্র তপোবন হক এবং এইখানে প্রবাহিত সরস্বতী নদীর নাম হক নন্দা।

নন্দাকিনী—পুরাণে নন্দা (দ্রঃ)। গাড়োয়ালে অলকানন্দাতে এসে মিশেছে। দ্রঃ- পঞ্চ প্রয়াগ।

নন্দিকেশ—নন্দী (দ্রঃ)

নন্দিক্ষেত্র—কাশ্মীরে শ্রীনগর থেকে ২৩ মাইল ; হরমুখ পাহাড়ের কাছে। এই এলাকাতেই গঙ্গাবল হ্রদ ও নন্দিসর হ্রদ (নন্দকোল/কালোদক) রয়েছে। নন্দিসর শিবপার্বতীর আবাস স্থল। হরমুখ পর্বতের পূব দিকের তুষার নদীর পাদদেশের উপত্যকা। এখানে জ্যেষ্ঠরুদ্র/জ্যেষ্ঠেশ্বর মন্দির রয়েছে।

নন্দি গ র—মহীশূরে নন্দিদুর্গ। এখানে শিব মন্দির রয়েছে ৫টি নদীর উৎপত্তি এখানে। উ-পিনাকিনী (=পেন্নর), দ-পিনাকিনী (পাপঘ্নী), চিত্রবতী, ক্ষীরনদী (পালর) ও অর্কবতী। পাহাড় কেটে নন্দীর মুখ তৈরি করা হয়েছে ; এই মুখ থেকে ক্ষীরনদী যেন বার হয়েছে। লিঙ্গপুরাণে নদীগুলির নাম অন্য। দ্রঃ- পঞ্চ নদ।

নন্দিগ্রাম—নন্দ গাঁও। অযোধ্যাতে। ফয়জাবাদ থেকে ৮—৯ মাইল দক্ষিণে। ভরত কুণ্ডের কাছে। অযোধ্যা থেকে ১-ক্রোশ/১৪ মাইল দূরে। রামকে ফিরিয়ে আনতে না পেরে ভরত (দ্রঃ) এখানে এসে রামের হয়ে রাজ্য পালন করতেন। রাম ফিরে এলে এইখানে ভাইদের মিলন হয়, পরে সকলে অযোধ্যাতে আসেন। নন্দন গাঁও ; ভদ্রাশা।

নন্দিনী—সুরভির মেয়ে। ইনিও কামধেনু। বশিষ্ঠের আশ্রমে। এঁর সেবা

করে দিলীপ (দ্রঃ) পুত্র লাভ করেন। বসুরা (দ্রঃ- দ্যু) এ'কে হরণ করে অভিশপ্ত হন। এই গরুটির জন্যই বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের বিবাদ আরম্ভ হয়।

নন্দিপুর—দেবী নন্দিনী থেকে নাম। পীঠস্থান। বীরভূমে।

নন্দীমুখ—নান্দীমুখ। পিতৃদেবদেব একটি শ্রেণী।

নন্দী—নন্দিকেশ, নন্দীশ্বর। মহাদেবের প্রধান অনুচর ও গণনায়ক। মহর্ষি শিলাদ মহাদেবের বরে অযোনি সম্ভব ছেলে পান। এই ছেলে নন্দী বহু দিন মহাদেবের পূজা করে তাঁর গণ-মধ্যে পরিগণিত হন। মরুৎদের মেয়ে সুযশার সঙ্গে মহাদেব নন্দীর বিয়ে দেন। নন্দীর সঙ্গী ভৃঙ্গী (দ্রঃ)। কুবেরকে জয় করে পুষ্পক রথে করে রাবণ কৈলাসে যাচ্ছিলেন। পথে রথ থেমে যায়; নন্দী রাবণকে নিষেধ করেন; কারণ হরগৌরী তখন বিহার করছিলেন। এ'র মুখে দেখে রাবণ হেসে ফেললে নন্দী শাপ দেন তাঁর মুখের আকৃতি বিশিষ্ট বানররা রাবণকে সবংশে নিধন করবে।

শিবের বাহনের নামও। বহু সময় পুরা মানুষ চেহারা। অতি প্রাচীন যুগে বৃষই শিবের প্রতীক রূপে বহু স্থানে এমন কি মুদ্রাতেও চালু ছিল। বেদে রুদ্র ইত্যাদি বহু দেবতাকে বৃষভ বলা হয়েছে। বেদের পরবর্তী যুগে বৃষভ অর্থে একমাত্র শিব বুঝিয়েছে। বৃষভ শিবের বাহনে পরিণত হয় খৃ-পূ ১ শতকের কিছু আগে থেকে খৃ- ১ শতকের মধ্যে। খৃ যুগের প্রথম দিকে বাহন তারপর ক্রমশ মানুষের মূর্তি পেতে থাকে। কুমার সম্ভবে সম্পূর্ণ মানুষ; নাম নন্দী। আবার রামায়ণে আছে করাল-কৃষ্ণ-পিঙ্গলঃ বামনঃ বিকটঃ মুণ্ডী নন্দী হ্রস্বভুজঃ বলী এবং বানর রূপ। মধ্য যুগের প্রথম দিকের বৃষমুণ্ড নন্দী মূর্তি জানা নাই। লিঙ্গপুরাণ ইত্যাদিতে সবটাই মানুষ মূর্তি; কোন বিকট কিছু নয়। বরং শিবের কিছু সাদৃশ্যও এর মধ্যে ফুটে রয়েছে। বিষ্ণু ধর্মোত্তরে নন্দী ত্রিনেত্র, চতুর্ভুজ, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম, হাতে ত্রিশূল ও ভিন্দিপাল এবং এক হাত মাথায় ও এক হাতে তর্জনী মুদ্রা। একটি দ-ভারতীয় গ্রন্থে হাতে পরশু ও হরিণ এবং সামনের হাত দুটিতে অঞ্জলিমুদ্রা। ভস্মধূলিপাণ্ডুরম্ শশিকলাগঙ্গাকপর্দ-উজ্জ্বলম্, অর্থাৎ নন্দী যেন শিবের চন্দ্রশেখর মূর্তি মত; এই মূর্তি দ-ভারতে বহু শিব মন্দিরের দরজায় দেখা যায়, এটি যে নন্দী মূর্তি তার পরিচয় হাতের নমস্কার মুদ্রা। বৃষরূপী নন্দীও প্রত্যেক শিব মন্দিরে থাকে। বহু স্থানে আবার নন্দী যেন শিবের নামান্তর।

নন্দীশ্বর—নন্দী (দ্রঃ)।

নপ্তা—এক ধরণের দেবতা (মহা ১৩।৯১।৩৫)।

নবগান্ধার—কান্দাহার (দ্রঃ)। চার জন রক্ষণদেবতা বোধিলাভের পর বুদ্ধদেবকে চারটি ভিক্ষা পাত্র দিলে বুদ্ধদেব এই চারটি পাত্রকে একটিতে পরিণত করে লিচ্ছবিদের দান করেন; বৈশালীতেই এটি ছিল। খৃ ২-শতকে কণিষ্ক এটি নিয়ে যান। কিতোলো গান্ধার জয় করলে গান্ধার বাসীরা এটিকে নবগান্ধারে কান্দাহারে (খৃ ৫-শতকে) নিয়ে চলে যায়।

নবগ্রহ—রবি, সোম মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু, কেতু। রবি ও সোম যে ভাবে পৃথিবীতে প্রভাব বিস্তার করে সেই ভাবে নভোচারী মঙ্গল, বুধ, বৃহ, শুক্র, শনিও

পৃথিবীতে মানুষের জীবনে মঙ্গল অমঙ্গল ঘটিয়ে থাকে ধরে নেওয়া হয়েছে। রাহু (দ্রঃ) ও কেতু (দ্রঃ) কেবল দুষ্ট বলে মনে করা হয়। অর্থাৎ এদের সকলকেই বিপদ-জনক বা 'গ্রহ' মনে করে গৃহযাগে ও স্বস্ত্যয়নে এদের পূজা দেবার ব্যবস্থা রয়েছে।

যাজ্ঞবল্ক্য সূত্রে আছে নবগ্রহ মূর্তি তামা, স্ফটিক, রক্তচন্দন, সোনা, রূপা, লোহা, সীসা বা কাঁসা দিয়ে তৈরি হবে বা পটের ওপর রং দিয়ে আঁকা হবে। বিষ্ণুধর্মোত্তর, অগ্নিপুরাণ, অংশুমৎভেদাগম ও শিল্পরত্ন ইত্যাদিতেও এদের মূর্তির বিবরণ রয়েছে। শিলা ফলকের ওপর আলাদা ভাবে বা এক সঙ্গে এই গ্রহদের পাওয়া যায়। সাধারণত সব সময়েই দাঁড়ান মূর্তি। মধ্য যুগে বহু মন্দিরের অলংকরণ হিসাবে এই সব ফলক ব্যবহৃত হত। শেষ গুপ্ত যুগের লাল বেলে পাথরের একটি উৎকীর্ণ চিত্রে (কলিকাতা যাদুঘরে) বৃহস্পতি, শুক্র, শনি সুঠাম ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন এবং রাহু বুক পর্যন্ত ভয়ংকর মূর্তি। বাকি গ্রহগুলি (কেতু বাদ দিয়ে) ছিল ; ফলকটি ভেঙে যাবার ফলে বাদ গেছে। ভৌম-কর যুগের গ্রহমূর্তি হিসাবে অষ্টগ্রহকে দেখা যায় ; কেতু যেন গঙ্গ-যুগ থেকে এসে যোগ দিয়ে নবগ্রহ তৈরি করেছেন। কঙ্কনদিঘি (২৪ পরগণা) থেকে প্রাপ্ত শিলাতে গণপতিও সঙ্গে রয়েছেন। এই শিলাটির আকার ও গঠন ভঙ্গি থেকে মনে হয় এটি নিয়মিত পূজিত হত ; কোন মন্দির সাজাবার জন্য তৈরি হয়নি। খিচিঙে প্রাপ্ত নবগ্রহ চক্র আর একটি উল্লেখযোগ্য নবগ্রহ মূর্তি। বারটি অরযুক্ত চাকা। চাকার কেন্দ্রস্থানে একটি মূর্তি এবং পরিধিতে নয়টি গ্রহ অবস্থিত। এটিও মনে হয় কঙ্কনদিঘির মূর্তির মত নিয়মিত পূজিত হত।

নবদুর্গা—কালী, কাত্যায়নী, ঈশানী, মুণ্ডমালিনী, চামুণ্ডা, ভদ্রকালী, ভদ্রা, ত্বরিতা ও বৈষ্ণবী। দক্ষ যজ্ঞ নষ্টের সময় বীরভদ্রের (দ্রঃ) সঙ্গে এঁরা গিয়েছিলেন।

নবদেবকূল—নবল। অযোধ্যাতে বান-গরমউ-এর কাছে। উনাও থেকে ৩৩ মাইল দ-পশ্চিমে এবং কনৌজ থেকে ১৯ মাইল দ-পূর্বে। হিউ-এন-ৎসাঙ এখানে এসেছিলেন। আলবি দ্রঃ।

নবদ্বীপ—নদীয়া। প্রাচীন নবদ্বীপ মায়াপুর ; গঙ্গার অপর পারে। বর্তমান নবদ্বীপ প্রাচীন কুলিয়া গ্রাম। নবদ্বীপ হিন্দু রাজাদের রাজধানী। বল্লালসেনের প্রপৌত্র অশোকসেনের (লক্ষ্মণসেনের পৌত্র=লক্ষ্মণীয়া) এখানে সভাগৃহ ছিল। দ্রঃ-মিথিলা।

নবপত্রিকা—রম্ভা-ব্রহ্মাণী, কচু-কালিকা, হরিদ্রা-দুর্গা, জয়ন্তী-কার্তিকী, বিল্ব-শিবা, দাড়িম্ব-রক্তদন্তিকা, অশোক-শোকরহিতা, মানকচু-চামুণ্ডা, ধান্য-লক্ষ্মী।

নবরাত্র—দ্রঃ- দশেরা। দেবী ভাগবতে (৩।২৬) শরৎকালে পূজিতা দেবী। চতুর্হস্ত; শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম। যারা আমিষভোজী তারা অজ, বরাহ বা মহিষ বলি দেবে (৩।২৬।৩২)। শিব, বিষ্ণু থেকে বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র সকলেই নবরাত্র ব্রত করেছিলেন (৩।৩০।২৬)। দ্রঃ-রাম।

নবরাষ্ট্র<নৌসরি। নোয়াগ্রাম (টলেমি)। বোম্বেতে ব্রোচ জেলা।

নবলা—নড্বলা (দ্রঃ)।

নবাশ্মীয় যুগ—অশ্ম যুগের পর। মধ্যভারত ও দাক্ষিণাত্যে কুঠারাদি বেশির ভাগ তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতির অন্তর্গত। উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জে কুচাই নামে জায়গায় ক্ষুদ্রাশ্মীয় আয়ুধ বিশিষ্ট স্তরের ওপর নবাশ্মীয় স্তর দেখা যায়। আসামে, পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গে ও বিহারে বহু নবাশ্মীয় অস্ত্র পাওয়া গেছে। দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতের নবাশ্ম কুঠারের মধ্যে আকৃতিগত পার্থক্য আছে। পূর্ব ভারতীয় নবাশ্মীয় ধারা পূর্ব এসিয়া থেকে আগত মনে হয়। কাশ্মীরে শ্রীনগর জেলায় বুর্জাহোম নামক স্থানে নবাশ্ম সংস্কৃতির পরিচয় রয়েছে। এখানে অধিত্যকায় শক্ত মাটিতে অর্দ্ধবৃত্তাকার গর্ত খুঁড়ে মানুষ বাস করত; দৈনিক ব্যবহারের জন্য ছিল পাথরের কুঠার, হাড়ের অস্ত্র হিসাবে হারপুন, তুরপুন ও ছুঁচ; হাতে তৈরি কালো-মৃৎ পাত্রও প্রচলিত ছিল। এই ধরণের সংস্কৃতি ভারতে আর কোথাও দেখা যায় না। বহির্ভারতের সঙ্গে বোধ হয় এদের যোগ ছিল।

নব্যন্যায়—দ্রঃ- ন্যায়।

নভগ—দ্রঃ- নাভাগ।

নভস্বান্—দ্রঃ- নরকাসুর।

নমুচি একজন দৈত্য। কশ্যপ দনুর পুত্র। শুম্ভের তৃতীয় ভাই (বাম-পু)। ঋক্‌বেদে নমী ঋষির সাহায্যে ইন্দ্র একে হত্যা করেছিলেন। নমুচিকে হত্যার উল্লেখ ঋক্‌বেদে বহু স্থানে। ঋক্‌বেদে জলের ফেনা দিয়ে হত্যা করা হয়। কৃষ্ণযজুর্বেদে বৃত্র বধের পরবর্তী কালে ইন্দ্র ও নমুচির মল্লযুদ্ধ হয়। ইন্দ্র হেরে যাচ্ছিলেন। নমুচি তখন সন্ধির প্রস্তাব করেন শুষ্ক বা আর্দ্র অস্ত্র দিয়ে দিনে বা রাত্রিতে তাকে মারতে পারবেন না। এই কারণে অনুদিত সূর্য মুহূর্তে (কৃ-যজু) দেবরাজ ইন্দ্র জলের ফেনা দিয়ে একে হত্যা করেন। শতপথে আছে ইন্দ্রের ইন্দ্রিয়, অন্নরস ও সুরাসহ সোমপাত্র নমুচি গ্রহণ করেন। ইন্দ্র তখন সরস্বতী ও অশ্বিনীদ্বয়কে গিয়ে জানান এবং শুষ্ক ও আর্দ্র, যষ্টি বা ধনু ব্যবহার না করা ও দিবা বা রাত্রিতে হত্যা না করার শপথ জানান। অশ্বিদ্বয় ও সরস্বতী জলের ফেনা দিয়ে বজ্র সিঞ্চন করে দেন ইত্যাদি। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে নমুচির হাতে ইন্দ্র নির্জিত হয়েছিলেন। অন্য মতে বিপ্রচিত্তি দানবের ছেলে। ইন্দ্র অসুরদের পরাজিত করেন কিন্তু একমাত্র এঁর কাছে হেরে যান। প্রথমে ইন্দ্রের বন্ধু ছিলেন। পরে সোমরস ও ইন্দ্রের বল হরণ করেন। নমুচি বহু সৈন্য নিয়ে দেবলোক আক্রমণ করেন; দৈত্যরা হেরে যায় এবং নমুচি পালিয়ে গিয়ে সূর্যের কিরণে লুকিয়ে থাকেন। ইন্দ্র এঁকে খুঁজে বার করেন ও সন্ধি হয়। সর্ত হয় দিনে কিংবা রাত্রে শুষ্ক বা আর্দ্র কোন অস্ত্র দিয়ে ইন্দ্র এঁকে বধ করতে পারবেন না। এই সন্ধির পর নমুচির সাহস ফিরে আসে এবং বার হয়ে আসেন। আবার যুদ্ধ হয়। শুম্ভ নিশুম্ভকে ইন্দ্র বিতাড়িত করলে দৈত্যরা পাতালে গিয়ে আশ্রয় নেয় এবং সন্ধ্যাবেলা সমুদ্রের ফেনার আঘাতে ইন্দ্র নমুচিকে হত্যা করেন। অন্য মতে ইন্দ্র বন্দী হয়ে গিয়েছিলেন। নমুচির সঙ্গে সন্ধির পর মুক্তি পান। এর পর সরস্বতী ও অশ্বিনীকুমার-দুজনের কাছ থেকে সমুদ্রের-ফেনা রূপ দিব্যাস্ত্র লাভ করেন। জলের এই ফেনা শুষ্কও নয় আর্দ্রও

নয়। এই অস্ত্রে দিবা ও রাত্রির সন্ধিতে অর্থাৎ গোধূলিতে ইন্দ্র নমুচির মাথা কেটে ফেলেন। অন্য মতে ইন্দ্র সমুদ্রের ফেনার মধ্যে আত্মগোপন করে ছিলেন। নমুচি যখন সমুদ্রের জলে খেলা করছিলেন সেই সময় এই ফেনা নমুচির নাকে ও মুখে ঢুকে যায়। ফেনার মধ্যে থেকে ইন্দ্র বজ্রযোগে নমুচিকে হত্যা করেন। নমুচির মাথা কাটা গেলে এই কাটা মাথা, 'পাপাত্মা, বন্ধুর মাথা কেটে ফেললি' বলে ইন্দ্রকে ধরতে গেলে ইন্দ্র ব্রহ্মার শরণ নেন। ব্রহ্মার উপদেশে অরুণা/সরস্বতী নদীতে স্নান করে পাপ মুক্ত হয়ে ইন্দ্র স্বর্গে ফিরে যান। নমুচির মাথাও এখানে স্নান করে অক্ষয় স্বর্গ লাভ করে। নমুচির মৃত্যুতে রাগে শুম্ভ নিশুম্ভ আবার দেবতাদের আক্রমণ করেন। মহাভারত ও কোন কোন পুরাণে বৃত্র ও নমুচি একই অসুর। দ্রঃ- কালী।

(২) হিরণ্যাক্ষের এক সেনাপতি। যুদ্ধে ইন্দ্র অজ্ঞান হয়ে যান। বিষ্ণু সাহায্যে আসেন এবং ইন্দ্রের হাতে নমুচি মারা যান। (৩) হিরণ্যাক্ষের আর এক জন সেনাপতি। যুদ্ধে প্রথমে চারদিক ইন্দ্রজালে অন্ধকার করে দেন। ইন্দ্র এই অন্ধকার দূর করলে নমুচি ঐরাবতের দাঁত ধরে এমন নাড়া দেন যে ইন্দ্র পড়ে যান; মাটিতে পড়ে গিয়ে ইন্দ্র তরবারি দিয়ে নমুচির মুণ্ডচ্ছেদ করেন (পদ্ম-পু সৃষ্টি কাণ্ড)।

নর—ব্রহ্মার বুক থেকে ধর্মের জন্ম। ধর্মের (দ্রঃ) অনেকগুলি ছেলে হয়; এদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হরি, কৃষ্ণ, নর ও নারায়ণ। নর ও নারায়ণ বদরিকাশ্রমে তপস্যা করে কাটাতেন। এঁরা উর্বশীর (দ্রঃ) জন্ম দেন। সমুদ্র থেকে অমৃত ওঠার পর অমৃত ভক্ষণ করে দেবাসুরের যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছিল সেই যুদ্ধে নর ও নারায়ণ দেবতাদের পক্ষ নিলে তবে অসুররা পরাজিত হন। এর পর থেকে ইন্দ্র এই নর মুনিকে অমৃত রক্ষার ভার দেন। দ্রঃ- দম্ভোদ্ভব, খণ্ডপরশু, নরনারায়ণ।

নরক—এখানে পাপের শাস্তি ভোগ করতে হয়। শাস্ত্র মতে অধর্মই নরকের হেতু। মৃত্যুর পর সূক্ষ্ম শরীর নরকে গিয়ে কৃতকর্মের ফল ভোগ করে। সমস্ত ধর্মশাস্ত্রেই অল্প বিস্তর নরকের কথা আছে। বিষ্ণু পুরাণে নরকের বিবরণ সর্ব প্রথম দেখা যায় পরবর্তী কালে শ্রীমদ্‌ভাগবতে তামিস্র, রৌরবাদি ২১-টি এবং ক্ষার-কর্দম ইত্যাদি আরো সাতটি নরকের বর্ণনা পাওয়া যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে পাপ অনুসারে নির্দিষ্ট বহ্নিকুণ্ড, তপ্তকুণ্ড ইত্যাদি ৮৬-টি ভয়াবহ কুণ্ডের বর্ণনা রয়েছে। স্মৃতি শাস্ত্রে পাপ ও পাতকের কথা আছে, প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা আছে কিন্তু নরকের কথা বিশেষ নাই। বৈদিক সাহিত্যে যম, যমলোক ইত্যাদি অনেক কিছু আছে নরক নাই। ঈশোপনিষদের অসূর্যলোক হয়তো নরক। বৌদ্ধ শাস্ত্রে নরকের বহু উল্লেখ রয়েছে। জৈনেরা ৭-টি নরক স্বীকার করেন। ভাগবতে আছে ভূমণ্ডলের দক্ষিণে মাটির নীচে ও জলের ওপর পিতৃগণের সঙ্গে যম বাস করেন। ইনি দণ্ডদাতা। যম মৃতদের এখানে এনে কর্ম অনুসারে শাস্তি দেন। নরকে নদীর নাম বৈতরণী; অধিবাসীরা প্রেত। মহাভারতে যুধিষ্ঠির নরক দেখেন; স্থানটি বালুকা, অস্থি, কণ্টকসংকুল; দুর্গন্ধ, যন্ত্রণাদায়ক; এখানে প্রদীপ্ত অগ্নি, জ্বলন্ত তৈলকটাহ, অসিপত্র, শাল্মলীবন ইত্যাদি রয়েছে। কয়েকটি নাম ঃ—অন্ধতামিস্র, অন্ধকূপ, অবীচি; অসিপত্রবন,

অধঃ-শিরস্, অপ্রতিষ্ঠ, অপ্রাচী, অয়ঃপান, কুম্ভীপাক, কালসূত্র, কৃমিভোজন, কৃমীশ, কৃষ্ণ, ক্ষারকর্দম, তামিস্র, তপ্তকৃমি, তাল, তপ্তমূর্তি, তপ্তকুম্ভ, তমস্, দারুণ, দণ্ডশূক, পাপ, পর্যাবর্তনক, পূয়োদ, প্রাণরোধ, বৈতরণী, বজ্রকণ্টক, বিষাশন, বিলোপিত, বহ্নিজ্বালা বটরোধ, মহারৌরব, মহদ্‌জ্বালা, রৌরব, রোধ, রুধিরান্ধস, রক্ষঃভক্ষ, লালাভক্ষ, লবন, শূকরমুখ, শ্বভোজন, (সারমেয়াদন), শূলপোত, শাল্মলী, সন্দংশ, সূকর, সূচীমুখ।

নরকাসুর--বিখ্যাত অসুর। হিরণ্যাক্ষ বরাহের রূপ ধরে পৃথিবীকে দাঁতে করে তুলে পাতালে নিয়ে যান। বরাহের দাঁতের স্পর্শে পৃথিবী গর্ভবতী হন, ছেলে হয় দুর্দ্ধর্ষ নরকাসুর। অন্য মতে দনু-কশ্যপ পুত্র। পৃথিবী বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা করেন শিশুকে যেন তিনি রক্ষা করেন। বিষ্ণু শিশুকে নারায়ণাস্ত্র প্রদান করেন। এই অস্ত্র হাতে থাকলে বিষ্ণু বাদে সকলের কাছে নরক অজেয় হবে (ভাগ ১০।-)। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে রাজধানী স্থাপন করেন ও বহু দিন রাজত্ব করেন। ছেলে ভগদত্ত। দেবতারা ভয়ে কাঁপতে থাকেন। একবার এই নরক হাতী সেজে বিশ্বামিত্রের/ত্বষ্টার মেয়ে কশেরুকে চুরি করে বলাৎকার করেন। পরে দেবতা গন্ধর্ব অপ্সরা ও মানুষদের ১৬০০০ মেয়েকে নানা স্থান থেকে ধরে এনে মণিপর্বত শিখরে বন্দী করে রাখেন। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে দ্বাররক্ষী হিসাবে চার জন দুর্দ্ধর্ষ অনুচর হয়গ্রীব, নিসুন্দ, পঞ্চাও ও মুরকে নিযুক্ত করেছিলেন। নরকাসুরের দশটি ছেলে অন্তপুর রক্ষার কাজে ব্যস্ত থাকত। সীতার খোঁজে বানরদের পাঠানর সময় সুগ্রীব প্রতীচীতে নরকের প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরেও (৪।৪২।৩১) অনুসন্ধান করবার জন্য বলে দিয়েছিলেন।

এক রাজার ১৬০০০ মেয়ে ছিল; বিষ্ণু এক দিন সন্ন্যাসী বেশে এখানে এলে এই মেয়েরা এসে সন্ন্যাসীকে ঘিরে ধরে। রাজা এতে ক্রুদ্ধ হয়ে মেয়েদের শাপ দেন এবং এরা অনুনয় বিনয় করলে রাজা বলেন পরজন্মে এরা বিষ্ণুর স্ত্রী হবে। আর এক মতে মেয়েরা নারদকে অনুরোধ করেছিলেন এবং নারদের নির্দেশে ব্রহ্মার স্তব করলে ব্রহ্মা শাপ মুক্তির ব্যবস্থা করেন। অন্য মতে নারদই শাপ মুক্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। এই রাজাই পরে নরকাসুর হয়ে জন্মান এবং মেয়েগুলি নানা দেশে রাজকুমারী হয়ে জন্মান ; নরকাসুর এঁদের বন্দী করে আনেন। নরকাসুর এক বার দেবলোক আক্রমণ করে অদিতির কুণ্ডল ও ইন্দ্রের ছত্র কেড়ে নিয়ে যান। ইন্দ্র বিষ্ণুর কাছে অভিযোগ করেন। কৃষ্ণ হয়ে জন্মে সত্যভামাকে (দ্রঃ-) সঙ্গে নিয়ে গরুড়ের পিঠে চড়ে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে এসে যুদ্ধ করেন। বহু দুর্দ্ধর্ষ অসুর মারা যায়। শেষকালে নরকাসুর নিহত হন। কুণ্ডল ও ছত্র কৃষ্ণ যথাস্থানে ফিরিয়ে দিয়ে আসেন। ইন্দ্রের থেকেও বড় হবার জন্য নরকাসুর তপস্যা করেছিলেন ; কৃষ্ণের হাতে নিহত হবার এটিও একটি কারণ। হরিবংশে বিষ্ণুপুত্র কশেরুর বয়স ১৪ (২।৬৩।৭) ; ১৬১০০ মেয়ে চুরি ; ভোগ করতে পারেনি। মুর বা মুরু সহস্র পুত্র সমেত যোগ দিয়েছিল। কেবল অদিতির কুণ্ডল চুরি ও দেবতা...র ওপর অত্যাচার (২।৬৩।১৬)। হয়গ্রীব ইত্যাদি দ্বারপাল ; পঞ্চাও=পঞ্চনদ। পঞ্চনদরা ও নরক যুদ্ধে কৃষ্ণের হাতে ক্রমশ নিহত। পৃথিবী এসে কুণ্ডল ও নরকের ছেলের দায়িত্ব (২।৬৭।১২৭) দেন।

অনুচরেরা হস্তী, অশ্ব, ও ধনরত্ন ইত্যাদি উপহার। এগুলি দ্বারকাতে পাঠিয়ে দিয়ে বরুণের ছত্রটি পেয়ে হস্তগত করেন। মেয়েদের মুক্তি ; এরা বিয়ে করতে চায় কৃষ্ণকে ; এদেরও দ্বারকাতে পাঠিয়ে দেন। এরপর মণি পর্বতের শিখর উপড়ে নিয়ে গরুড়ে চড়ে মেরুপর্বতে ইন্দ্রলোকে (২।৬৪।৪৮)। ইন্দ্রকে কুণ্ডল ফেরত দিয়ে অদিতিকে নমস্কার। অদিতি বর দেন অজেয় হবে এবং সত্যভামা কৃষ্ণের জীবিত কালে চির যুবতী (২।৬৪।৩২)। কৃষ্ণ পারিজাত গাছ নির্বিবাদে নিয়ে আসেন।

ভাগবতে (১০।৫৯) কুণ্ডল ও ইন্দ্রের ছাতা, এবং ইন্দ্রকে তাড়িয়ে দেওয়া। মুরকে পঞ্চমুণ্ড বলা হয়েছে এবং এর সাত ছেলে তাম্র, অন্তরীক্ষ, শ্রবণ, বিভাবসু, বসু, নভস্বান্‌, ও অরুণ। এরা সকলে ও নরক নিহত হন। ১৬000 বন্দী কন্যা। স্বর্গে কুণ্ডল ও ছত্র ফিরিয়ে দিয়ে আসেন এবং ভীষণ যুদ্ধ করে পারিজাত এনে দ্বারকাতে সত্যভামার গৃহ উদ্যানে বসিয়ে দেন। দ্রঃ- নরনারায়ণ।

কালিকা পুরাণে রজস্বলা পৃথিবীর গর্ভে জন্ম বলে অসুর (৩৭।৭)। বরাহরূপী বিষ্ণুপুত্র (৩৬।২৯)। দুর্দ্ধর্ষ হবে বলে দেবতারা গর্ভরোধ করে দেন। বহু দিন অপেক্ষার পর ক্লান্ত পৃথিবী বিষ্ণুকে জানান। বিষ্ণু বলেন : ত্রেতাযুগের মাঝখানে রাবণ মারা গেলে জন্মাবে, শঙ্খের অগ্রভাগ দিয়ে স্পর্শ, পৃথিবীর ক্লান্তি কেটে যায়।

রাবণ নিহত হলে সীতা যেখানে উঠেছিলেন সেইখানে জনকের যজ্ঞভূমিতে মধ্য রাত্রে জন্ম (৩৭।৩৪)। বিষ্ণু বলে যান যত দিন মনুষ্যভাবে চলবে কল্যাণ হবে। ১৬ বছর বয়সে প্রাগ্‌জ্যোতিষে রাজা হবে। পৃথিবী তারপর জনককে খবর দেন। জনক এসে দেখেন অপরূপ শিশু। যজ্ঞবাটের বাইরে গড়াতে গড়াতে এসে নরকপালে মাথা রেখে শুয়ে আছে। এই জন্য রাজ পুরোহিত নাম দেন নর-ক (৩৮।২)।

জনকের স্ত্রী সুমতিকে মা বলেই জানত। পৃথিবী অবশ্য কাত্যায়নী নামে ধাত্রী সেজে পালন করতেন। সমস্ত ক্ষত্রিয় সংস্কার হয়। ১৬ বছর বয়সে সব দিকে অতুলনীয়। জনক ভয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন; পৃথিবী জানিয়ে যান এবার নিয়ে যাবেন। কাত্যায়নী নরককে নিয়ে গঙ্গাতে স্নান করতে এসে সমস্ত বলেন এবং বিষ্ণুকে স্মরণ করে দুজনে জলে ডুব দিয়ে একেবারে প্রাগ্‌-জ্যোতিষে (৩৮।৯৫) গিয়ে ওঠেন। বিষ্ণু অভিষিক্ত করে যান। শিবের অনুমতি ক্রমে ললিতা-কান্তা'র পূব দিকে থেকে সাগর পর্যন্ত কিরাতদের রাজ্য। ললিতাকান্তা'র পশ্চিম থেকে করতোয়া পর্যন্ত নরকের রাজ্য (৩৮।১২৩) হয়। বিদর্ভ রাজ কন্যা মায়ার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে, দুর্গ ইত্যাদির সংস্কার সাধন করে এবং শক্তি অস্ত্র দিয়ে বিষ্ণু বলে যান দ্বাপরের শেষে ছেলে হবে। ব্রাহ্মণ ইত্যাদির সঙ্গে বিরোধ না করলে চিরজীবী, এবং কামাখ্যা ছাড়া কাউকে যেন পূজা না করে (৩৮।১৪১)।

জনক সপরিবারে এসে দেখা করে যান। এরপর বাণের সঙ্গে মিশতে থাকেন ; ব্রাহ্মণ, দেবতাদের ও কামাখ্যার পূজা বন্ধ (৩৯।৯)। বশিষ্ঠ একবার দেবী দর্শনে এলে আটকে দেন ; ফলে অভিশাপ পিতার হাতে মৃত্যু হবে তারপর বশিষ্ঠ এসে কামাখ্যা দেবীর পূজা করে যাবেন। শাপের ফলে কামাখ্যা দেবীও সপরিবারে চলে যান।

ভীত নরক পৃথিবী ও বিষ্ণুকে স্মরণ করেন। এরা আসেন না। নগর শ্রীহীন হতে থাকে। বাণ উপদেশ দেন বিষ্ণু অতি দুষ্ট ; ব্রহ্মা বা শিবের তপস্যা করতে। ব্রহ্মাচলে ব্রহ্মপুত্র তীরে ১০০ মনুষ্য বৎসর ব্রহ্মার তপস্যা। অনেকগুলি বর, একটি বর দ্বাপরের সন্ধ্যায় তিলোত্তমা ইত্যাদি ১৬,০০০ স্ত্রী পাবে। ব্রহ্মা সাবধান করে দিয়ে যান যত দিন না কিন্তু নারদ দেখা করতে আসবেন ততদিন যেন এই স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকে (৩৯।৮৫)। তবু বাণ কিন্তু সাবধান করে দেন ; সন্তানের জন্ম দিতে বলেন। চার ছেলে হয় ভগদত্ত, মহাশীর্ষ, মদবন্ত ও সুমালী (৪০।১)।

হয়গ্রীব, মুর, সুন্দ, নিসুন্দ, বিরূপাক্ষ এসে যোগ দেয়। এরপর দেবতা ও মুনিদের ওপর অত্যাচার ; ইন্দ্রকে জয় করেন ও অদিতির কুণ্ডল নিয়ে আসেন। বাণের পরামর্শে ৫ হাজার বছর এই রকম চলতে থাকে। পীড়িতা পৃথিবী দেবতাদের জানান। দেবতারা বিষ্ণুকে অবতীর্ণ হতে বলেন এবং বিষ্ণুও দেবতাদের জন্ম নিতে বলেন। দেবতারা তিলোত্তমা ইত্যাদির মত ১৬,০০০ স্ত্রী উৎপাদয়ামাসুঃ (৪০।৩১)। মেয়েরা হিমালয়ে খেলা করছিল ; নরক দেখতে পেয়ে ধরে আনেন। এরা নারদ আসা পর্যন্ত সময় চায়। এদিকে কৃষ্ণ অবতার হয়ে জন্মেছেন ; ইন্দ্র সরাসরি দ্বারকাতে এসে অনুরোধ করেন। প্রাগ্‌জ্যোতিষে চৈত্রশুক্লা পঞ্চমীতে নারদ আসেন। বলে যান নবমীতে বি[illegible] আছে : কেটে গেলে চতুর্দশীতে স্ত্রীদের সঙ্গে মিলিত হতে পারবে। নারদ চলে যাচ্ছিলেন ; কৃষ্ণ আসেন দেখা হয়। যুদ্ধের সময় নরক কৃষ্ণের পাশে কালিকাং কামাখ্যাং অপি দেখতে পান। কৃষ্ণ ও নারদ ভগদত্তকে অভিষিক্ত করেন। শক্তি অস্ত্রটিও ভগদত্তকে দেন।

(২) নরকের ছেলে ভগদত্ত পাতালে নরক অংশে ও রাজত্ব করতেন ফলে ইনিও নরক নামে পরিচিত।

নরনারায়ণ—দু জন প্রাচীন ঋষি। ধর্ম ও অহিংসার (দ্রঃ- মূর্তি) অন্য মতে ধর্ম ও দক্ষের কন্যাদের যে সব ছেলে হয় তাদের মধ্যে হরি, কৃষ্ণ, নর ও নারায়ণ প্রধান। এই নারায়ণ কৃষ্ণের অংশাবতার। দ্রঃ- রক্তজ। ভাগবতে (২।৭) বিষ্ণুর অবতার : যম ও দক্ষকন্যা মূর্তির সন্তান। ভাগবতে (৪।১) ধর্ম ও মূর্তির সন্তান। কালিকা পুরাণে (৩০।১২৫) নরসিংহের দেহ (দ্রঃ-যজ্ঞবরাহ) শরভরূপী মহাদেবের আক্রমণে দু-টুকরা হয়ে নর অংশ থেকে নরঋষি এবং সিংহ অংশ থেকে নারায়ণ ঋষি জন্মান। বিষ্ণু এদের দু জনকে মৎস্য অবতার কর্তৃক রচিত নৌকাতে স্থাপন করে যজ্ঞ বরাহের (দ্রঃ) যুদ্ধে ফিরে যান। মহাভারতে (১২।৩৩৫ কা-প্র) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ধর্মের চার ছেলে নর, নারায়ণ, হরি ও কৃষ্ণ। অতি দুর্গম পাহাড়ে অন্য মতে বদরিকাশ্রমে তপস্যা করতেন। দেবী ভাগবতে (৪।৫) বদরিকাতে প্রালেয়াদ্রিতে তপস্যা। হাজার বছর তপস্যা করে ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করেছিলেন। এঁদের কঠোর তপস্যায় পৃথিবী উত্তপ্ত হয়ে উঠলে ইন্দ্র ঐরাবতে চড়ে এসে এঁদের বর দিতে চান। ইন্দ্রের কথায় এঁরা কর্ণপাতও করেন না। ইন্দ্র তখন মায়ার আশ্রয় নিয়ে নানা বন্য জন্তু ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ সৃষ্টি করে এঁদের ভয় দেখাতে

থাকেন ; কিন্তু কোন ফল হয় না। এর পর মদন, রতি ও বহু অপ্সরাকে পাঠান তপস্যা ভাঙবার জন্য। অন্য মতে দুজন মাত্র অপ্সরা এসেছিলেন। নারায়ণ চোখ চেয়ে দেখেন ; কিছুটা বিচলিত হন ; সামনে মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা, সুকেশিনী, মনোরমা, মহেশ্বরী, পুষ্পগন্ধা, প্রমদ্বরা, ঘৃতাচী, চন্দ্রপ্রভা, সোমা, বিদ্যুৎমালা, অম্বুজাক্ষী, কাঞ্চনমালা, ইত্যাদি অপ্সরাকে দেখতে পান। দেবী ভাগবতে (৮।৫) এ'রা দেবীভক্ত ফলে অপ্সরারা ব্যর্থ হন। সব বুঝতে পারেন এবং নিজেদের ক্ষমতা ও আসক্তি হীনতা দেখাবার জন্য নারায়ণ নিজের উরুতে আঘাত করে সামনের অপ্সরাদের থেকেও সুন্দরী এক জন অপ্সরার জন্ম দেন। উরু থেকে জন্ম বলে নাম উর্বশী। এবং আরো কয়েক জন/হাজার অপ্সরাকে জন্ম দেন। দেবী ভাগবতে উরু চাপড়ে উর্বশী এবং যতগুলি অপ্সরা এসেছিল ততগুলি সুন্দরী পরিচারিকা তৈরি করেন এবং ইন্দ্রের জন্য এই উর্বশীকে দান করেন। অর্থাৎ প্রমাণ করে দেন প্রয়োজন হলে নিজেই তিনি অপ্সরাদের গড়ে নিতে পারেন। স্বর্গ থেকে আগত অপ্সরারা ভয়ে ক্ষমা চান। নারায়ণ ক্ষমা করেন এবং এ'দের দিয়ে উর্বশীকে উপহার হিসাবে ইন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে দেন। অন্য মতে এদের মধ্য থেকে যে কোন এক জনকে বেছে নিতে বলেন এবং ইন্দ্র যাঁকে বেছে নেন তিনি উর্বশী। ইন্দ্র লজ্জিত হয়ে ফিরে যান। নারায়ণ অপ্সরাদের ক্ষমা করলে এ'রা বার বার তাঁকে বিয়ে করতে অনুরোধ করেন। নারায়ণ এ'দের তখন বুঝিয়ে বলেন উপস্থিত তিনি তপস্যা করছেন। ২৮-শ দ্বাপরে তিনি কৃষ্ণ হয়ে জন্মাবেন তখন এদের সকলকে বিয়ে করবেন।

দেবী ভাগবতে ৫০।১৮০০০ অপ্সরা বিয়ে করতে চাইলে নারায়ণ ভয় পান ; তাড়ালে হয়তো শাপ দেবে (৪।৭।১৬)। ৪।১৭।১ শ্লোকে আছে নারায়ণ এদের শাপ দিতে যান ; নর-থামান ; এবং নারায়ণ আশ্বাস দেন ২৮-শ দ্বাপরে কৃষ্ণ হয়ে জন্মে সকলকে বিয়ে করবেন। দেবী ভাগবতে নর-নারায়ণের ঘটনা ঘটে চাক্ষুষ মন্বন্তরে (৪।১৬।৫)।

নর মুনির রঙ উজ্জ্বল ; নারায়ণ কালো। বদরিকাশ্রমে এ'রা মহাসমাধি পান। পর জন্মে দ্বাপরে এ'রা অর্জুন ও কৃষ্ণ হয়ে জন্মান। মহাভারতে আছে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে বিষ্ণুর অবতার এই নর। দ্রঃ- খণ্ডপরশু, প্রহ্লাদ, শরভ, নর।

নরবলি—দ্রঃ- বলি। পুরাণে ও তন্ত্রে বহু স্থানে নর-বলির উল্লেখ আছে। সাধারণতঃ এটি অতিশয়োক্তি। তবে রাজারা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীদের অনেক সময় বলি দিয়ে নিজের অক্ষয় পুণ্য তথা বলি প্রদত্ত ব্যক্তিরও অক্ষয় স্বর্গ বাসের ব্যবস্থা করতেন। মহাভারতে জরাসন্ধ বন্দী রাজাদের এই ভাবে বলি দিতেন। মহাভারতেই আবার অহিংসার প্রশংসা ও যে কোন পশুবলির বিরোধিতাও আছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে হবে একমাত্র প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিকেই বলি দেওয়া হত।

নরমেধ—এই যজ্ঞে নর (পুং) বধের বিধান। শুক্ল যজুর্বেদে ৩০ ও ৩১ অধ্যায়ে আছে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় প্রতিষ্ঠা কামনা করে এই যজ্ঞ করেন ; ৪০ দিনে সমাপ্য। অম্বরীষ, হরিশ্চন্দ্র, ও যযাতি এই যজ্ঞ করেছিলেন।

নরসিংহ—সত্য যুগে বিষ্ণুর চতুর্থ অবতার। অর্ধ নর ও অর্ধ সিংহ রূপ। লাথি মেরে হিরণ্যকশিপু (দ্রঃ) রাজ সভাতে একটি স্ফটিক স্তম্ভ ভেঙ্গে ফেললে এর মধ্য থেকে বার হয়ে পেট চিরে দৈত্যকে হত্যা করেন। দৈত্যের অন্ত্র নিজের গলায় মালার মত পরে গর্জন করে ওঠেন। মুখ এবং হাত ও পায়ের থাবা সিংহের মত, দেহ মানুষের মত। প্রহ্লাদের বাক্য সত্য প্রতিপন্ন করতে স্তম্ভ থেকে বার হন। ব্রহ্মার বরে হিরণ্যকশিপু মানুষ ও পশুর অবধ্য ছিলেন ফলে বিষ্ণু এই রূপ ধরেন (দ্রঃ- ত্রিশিরস্)। প্রহ্লাদ স্তব করে এঁকে শান্ত করলে প্রহ্লাদকে আশীর্বাদ করে বিষ্ণু অন্তর্হিত হন। ভিজাগাপট্টম্ জেলাতে নরসিংহ দেবের মূর্তি আছে ; প্রসিদ্ধি প্রহ্লাদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মৎস্য-পুরাণে আট-হাত, অগ্নি পুরাণে ৪-হাত। শারদা তিলকে এক স্থানে চার আর এক স্থানে আট হাত মূর্তিতে সিংহের মুখ। দ্রঃ- নরনারায়ণ, মুদ্রা।

নরা—উশীনরের স্ত্রী নৃগা, নরা, কৃমী, দশা ও দৃশদ্বতী ইত্যাদি। নৃগার ছেলে নৃগ, নরার ছেলে নর, কৃমীর ছেলে কৃমি, দশার ছেলে সুব্রত এবং দৃশদ্বতীর ছেলে শিবি।

নরান্তক—(১) রাবণের এক দুর্দ্ধর্ষ ছেলে ; লঙ্কাতে অঙ্গদের হাতে মৃত্যু। (২) রুদ্রকেতুর ছেলে, এক জন অসুর। অত্যাচারে ত্রিভুবন অস্থির হয়ে ওঠে। গণপতি কশ্যপের ঘরে আর্বিভূত হন। গণেশকে হত্যা করার বহু চেষ্টা নরান্তক করেছিল। শেষ পর্যন্ত গণেশের হাতে নিহত হয়।

নরিষ্যন্ত—মরুত্তের ছেলে, এক জন রাজা। স্ত্রী ইন্দ্রসেনা - বাভ্রব্য। ছেলে দম (দ্রঃ)। গৃহস্থরূপে বনবাস কালে বপুষ্মানের হাতে নিহত হন। ইন্দ্রসেনা সহমৃতা হন। মার্ক-পু।

ভাগবতে (৯।২) মনু নরিষ্যন্ত চিত্রসেন ঋক্ষ>মীঢ্বান পূর্ণ ইন্দ্রসেন> বীতিহোত্র>সত্যশ্রবা উরুশ্রবা দেবদত্ত>অগ্নিবেশ্য। অগ্নি নিজে অগ্নিবেশ্য রূপে জন্মান। ইনি কানীন এবং জাতুকর্ণ নামে প্রসিদ্ধ। এঁর বংশ অগ্নিবেশ্যায়ন বংশ ; এঁরা ব্রাহ্মণ।

নর্মদা—(১) এক গন্ধর্বী। এঁর তিন মেয়ে সুন্দরী, কেতুমতী ও বসুধা : এঁরা যথাক্রমে মাল্যবান সমালি ও মালির স্ত্রী (রামা ৭।৫।৩০)। (২) একটি নদী। প্রাচীন নাম রেবা সোমদ্ভবা, মেখলা-সুতা, মুরলা, মুরণ্ডলা, পূর্বগঙ্গা। মেখল দেশের মহাকাল (মৈকাল) পাহাড়ে অমরকণ্টক শৃঙ্গস্থিত এক কুণ্ড (২২ ৪১´ উ × ৮১ ৪৮´ প) থেকে উৎপন্ন। কয়েকটি ছোট নদী মান্দালা পর্বতে এই নর্মদাতে এসে মিশেছে। মধ্যপ্রদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গুজরাটে ভৃগু কচ্ছের (বর্তমানে ব্রোচ সহর) নিকট খম্বাত উপসাগরে এসে পড়েছে। প্রথম প্রপাত কপিল ধারা। মোহনার নাম নর্মদা-উদধি সঙ্গম। এটি জমদগ্নি তীর্থ।

আগে খান্দেশের দ-পশ্চিম দিক দিয়ে তাপ্তীতে গিয়ে পড়ত। নর্মদা উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সীমা। নারদের মতে কনখলে গঙ্গা অধিক পুণ্যতোয়া, সরস্বতী কুরুক্ষেত্রে ; কিন্তু নর্মদা সর্বত্রই সমান পুণ্যতোয়া। সরস্বতীর জলে তিন দিনে মানুষ পবিত্র হয়, গঙ্গার জলে এক দিনে কিন্তু নর্মদার জলে স্পর্শমাত্রেই পাপমুক্ত। শিবের দেহ থেকে জন্ম। মতান্তরে তপতী পরজন্মে নর্মদাতে পরিণত হন। (৩) মাহিষ্মতীর

রাজা দুর্যোধনের সঙ্গে দেবনদী নর্মদার বিয়ে হয়েছিল ; মেয়ে হয়েছিল সুদর্শনা। (৪) মান্ধাতার ছেলে পুরুকুৎসকেও নর্মদা (দ্রঃ- পিতৃগণ) এক বার বিয়ে করেছিলেন ; ছেলে ত্রসদস্যু।

নল—(১) বিশ্বকর্মার এক ছেলে। রামের সেনাবাহিনীতে বিখ্যাত একজন স্থপতি। সমুদ্র শাসনের সময় সমুদ্র দেখা দিয়ে নলের পরিচয় দিয়ে বলে যান এর পিতা একে বর দিয়েছেন পিতার মতই স্থপতি হবে ; এই নলই সেতু বাঁধতে পারবে। নল রামকে জানায় তাকে এ পর্যন্ত কেউ অনুরোধ করেনি বলে সে চুপ করে বসে ছিল। তার পিতা বিশ্বকর্মা মন্দর পর্বতে একবার তপস্যা করছিলেন ; বালক নল তখন উপাস্য দৈবতম্-কে খেলার ছলে সমুদ্রে বার বার ফেলে দিচ্ছিল এবং নলের মা আবার তুলে আনছিলেন। বিশ্বকর্মার ধ্যান শেষ হলে জানতে পারেন এবং বর দেন নল যা কিছু জলে ফেলুক ডুববে না (রা ৬।২২।-)।

(২) দ্রঃ- চিত্রাঙ্গদা। (৩) নল নিষধরাজ। রাজা বীরসেনের ছেলে। একটি মতে গৌড়দেশে পিপ্পল নগরীতে এক বৈশ্য ছিলেন। এই বৈশ্য সব কিছু ত্যাগ করে বনে চলে যান এবং বনে এক জন মুনির উপদেশে গণেশের আরাধনা করেন। পর জন্মে নল হয়ে জন্মান। আর এক কাহিনীতে নল ও দময়ন্তী আগের জন্মে আহুক ও আহুকা নামে দুজন বনবাসী ছিলেন। শিব সন্তুষ্ট হয়ে বর দেন পর জন্মে রাজ পরিবারে জন্ম হবে এবং শিব নিজে হংসের বেশে এসে সাহায্য করবেন।

অত্যন্ত ধার্মিক রাজা। মহাভারতে (৩।৫০।৩) বেদজ্ঞ, শূর, অক্ষপ্রিয়, সত্যবাদী ও অপরূপ সুন্দর। দময়ন্তীর প্রশংসা শুনে আকৃষ্ট হন। এক দিন অন্তঃপুর সমীপে বনে কতকগুলি জাতরূপ হংস দেখেন এবং একটিকে ধরে ফেলেন। হংস রাজাকে বলে তাকে ছেড়ে দিলে সে দময়ন্তীকে পাইয়ে দেবে। নল ছেড়ে দেন। হাঁসগুলি তখন দময়ন্তী অন্তিকে যায় : দময়ন্তী ও সখীরা ধরতে যান। দময়ন্তী যাকে ধরতে যান সেই হাঁসটি নলের প্রশংসা করে, দময়ন্তী সুখী হবে ইত্যাদি বলে। দময়ন্তী তখন একে এবার নলের কাছে পাঠান নিজের মনোভাব জানাতে (মহা ৩।৫০।৩১)। এর পর বিদর্ভ রাজধানী কুণ্ডিনপুরে স্বয়ংবর সভাতে নল যোগ দিতে আসেন। ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ও যম এঁরাও দময়ন্তীকে (দ্রঃ) বিয়ে করার আশায় স্বয়ংবরে যোগ দিতে আসছিলেন পথে নলের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়।

এঁরা নিজেদের পরিচয় দেন এবং একটি কাজ করতে বলেন। নল সম্মত হন। এঁরা তখন নলকে দূত হিসাবে পাঠাতে চান। দময়ন্তী যেন লোকপালদের একজনকে বরণ করেন। নল জানান তিনি নিজেই পাণিপার্থী ; তিনি এ কাজ কি করে করবেন। দেবতারা শুনতে চান না ; সকলের কাছে অদৃশ্য হয়ে নল দময়ন্তীর সঙ্গে দেখা করতে পারবেন (৩।৫২।১০) বর দেন। নল এসে দময়ন্তীকে জানালে দময়ন্তী সব শুনে বলে দেন নলকেই তিনি বরমাল্য দেবেন। ফিরে এসে নল দেবতাদের সব জানান। দময়ন্তী (দ্রঃ) সভাতে নলকেই বরণ করেন। লোকপালরা এতে সন্তুষ্ট হন। ইন্দ্র বর দেন যজ্ঞে ইন্দ্রকে স্পষ্ট দেখতে পাবেন এবং শুভগতি হবে। অগ্নি বর দেন যেখানে

আগুন নেই সেখানে চাইলেই আগুন পাবেন এবং অগ্নিপ্রভ লোক প্রাপ্তি হবেন। যম বর দেন নলের রান্না সুস্বাদু হবে ও ধর্মে স্থিতি হবে এবং বরুণ বর দেন যেখানে চাইবেন সেখানে জল পাবেন এবং উত্তমগন্ধ মালা দেন (মহা ৩।৫৪।২৮)। মোট আটটি বর পান। বিয়ের পর নল সুখে ও ধর্মে রাজ্য পালন করতে থাকেন ও অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন (মহা ৩।৫৪।৩৬)। ছেলে ইন্দ্রসেন এবং মেয়ে ইন্দ্রসেনা।

এই স্বয়ংবর সভার খবর পেয়ে কলি ও দ্বাপর আসছিলেন। পথে ইন্দ্র ইত্যাদি ফিরে আসছেন দেখা হয়েছিল। এদের কাছে দময়ন্তী নলকে বিয়ে করেছেন শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে দুজনে ফিরে যাচ্ছিলেন। দেবতাদের অবজ্ঞা করে বিয়ে করার জন্য কলি নলকে শাস্তি দিতে চেয়েছিলেন। দেবতারা কলিকে বুঝিয়েছিলেন এটা অন্যায় হবে ।

এরপর কলি নলের দেহে প্রবেশ করার জন্য চেষ্টা করতে থাকেন। এবং বার বছর অপেক্ষা করার পর নল এক দিন প্রস্রাব করে পা না ধুয়ে সন্ধ্যা করতে বসেন। এই ত্রুটি পেয়ে (মহা ৩।৫৬।৩) কলি নলের দেহে প্রবেশ করেন এবং কলির বন্ধু দ্বাপর অক্ষের ছকের মধ্যে প্রবেশ করেন। ফলে নলের মতিচ্ছন্ন হয়। পাশা খেলতে আরম্ভ করেন এবং ক্রমশ হারতে থাকেন। ভাই পুষ্করের সঙ্গে খেলতে খেলতে সর্বস্বান্ত হতে থাকেন। পৌরজন ও মন্ত্রীরা এবং দময়ন্তী রাজাকে নিবারণ করতে চেষ্টা করেন কিন্তু কোন ফল হয় না। বহুমাস ধরে খেলা চলতে থাকে। দময়ন্তী বার্ষ্ণেয়কে দিয়ে ছেলেমেয়েদের বিদর্ভে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন। এর পর হৃতসর্বস্ব হন। পুষ্কর তখন দময়ন্তীকে পণ রাখতে বলেন ; নল রেগে যান ; নিজের গা থেকে ভূষণাদি খুলে এক বস্ত্রে প্রাসাদ থেকে বার হয়ে যান। দময়ন্তীও এক বস্ত্রে সঙ্গে যান।

তিন দিন এঁরা নগরীর বাইরে অবস্থান করেছিলেন। এই সময় ভাই পুষ্কর (দ্রঃ) ঘোষণা করেছিলেন কেউ এদের কোন সাহায্য করলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। এই ঘোষণার পর আরও তিন দিন কেবল জল খেয়ে নল ও দময়ন্তী ঐখানেই ছিলেন। তার পর বনে গিয়ে ঢোকেন।

বনেও কলি নলকে নানা ভাবে উৎপীড়ন করতে থাকেন। বনে ঘুরতে ঘুরতে ক্ষুধার্ত নল এক দিন সোনারঙ কতকগুলি পাখী দেখে নিজের পরিহিত কাপড় দিয়ে ধরতে গেলে পাখীগুলি কাপড়টি নিয়ে উড়ে চলে যায় এবং বলে যায় কাপড়টি নিয়ে যাবার জন্যই এরা এখানে এসেছিল। যে অক্ষ-কাটি দিয়ে নল পাশা খেলেছিলেন এরা সেই অক্ষ-কাটি। দময়ন্তীর বস্ত্রের অর্দ্ধেক তখন নল নিজের দেহে জড়িয়ে নিয়ে দুজনে বনে ঘুরে বেড়াতে থাকেন। নল এর পর দময়ন্তীকে বিদর্ভ ও কোশলের পথ দেখিয়ে নানা ভাবে বোঝান ; কিন্তু স্পষ্ট ফিরে যেতে বলতে পারেন না। দময়ন্তীও রাজি হন না। এরপর একদিন ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় দুজনে বনের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েন। একটু পরে নলের ঘুম ভেঙে যায়। চিন্তা করতে থাকেন দময়ন্তীকে ত্যাগ করতে পারলে দময়ন্তী নিশ্চয়ই বিদর্ভে ফিরে যাবে ; দুঃখের হাত থেকে মুক্তি পাবে। পরিহিত বস্ত্র দু ভাগ করবার উপায় খুঁজতে থাকেন

এবং এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে একটা খড়্গ পড়ে আছে দেখতে পান। এই খড়্গে বস্ত্র ছিন্ন করে নল পালিয়ে যান।

নল তারপর বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে একটি দাবাগ্নি দেখেন এবং আগুনের মধ্যে থেকে আর্তনাদ করে তাঁর নাম ধরে কে ডাকছে শুনতে পান (মহা ৩।৬৩।২)। এগিয়ে এসে আগুনের মধ্যে প্রবেশ করে নাগরাজ কর্কোটক নাগকে দেখতে পান ; নারদের শাপে কর্কোটক স্থবির হয়ে অবস্থান করছিল। নলের স্পর্শে মুক্তি পাবেন কথা ছিল। নল একে তুলে এনে আগুন থেকে রক্ষা করেন ; নলের স্পর্শে কর্কোটক শাপ মুক্ত হয়ে নলকে পদক্ষেপ গুণতে গুণতে এগিয়ে যেতে বলেন ; এবং দশম পদক্ষেপে কর্কোটক (দ্রঃ) কোলে থেকেই দংশন করেন। বিষে নলের রূপ বিকৃত বিবর্ণ হয়ে যায়। কর্কোটক আশ্বাস দিয়ে নলকে বলেন তিনি প্রত্যুপকার করলেন ; এই বিপদের দিনে কেউ আর চিনতে পারবে না ; নলের এতে ভীষণ সুবিধা হবে এবং এই বিষের জ্বালায় দেহস্থ কলি সর্বদা ছটফট করতে থাকবেন। কোন শত্রু বা দংষ্ট্রী ভয় থাকবে না ; ব্রহ্মবিদ্ হবে এবং সংগ্রামে অজেয় হবে ; এবং দুটি পরিধেয় দিয়ে বলেন এই দুটি বস্ত্র পরিধান করে কর্কোটককে স্মরণ করলে আবার পূর্বের চেহারা ফিরে পাবেন ; এবং পরামর্শ দেন অযোধ্যার ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা ঋতুপর্ণের কাছে গিয়ে বাহুক নামে সারথি হয়ে (মহা ৩।৬৩।১৯) বাস করতে এবং রাজাকে অশ্বহৃদয় মন্ত্র শিখিয়ে দিতে এবং রাজার কাছ থেকে অক্ষহৃদয় মন্ত্র শিখে নিতে।

নল এর পর হাঁটতে হাঁটতে দশ দিনে অযোধ্যাতে এসে বাহুক নামে অশ্বরক্ষক নিযুক্ত হন। এ ছাড়া রাঁধতে জানেন এবং যে কোন শিল্প কর্মে নিপুণ বলে পরিচয় দেন। বার্ষ্ণেয় (দ্রঃ-দময়ন্তী) ও জীবল যে দুজন অশ্ব রক্ষক ছিল তাঁরা বাহুকের সহকারী হয়ে কাজ করতে থাকে। বেতন ছিল শতং শতাঃ। প্রতিদিন সন্ধ্যায় এখানে নল কাজের শেষে একটি শ্লোক আবৃত্তি করতেন ঃ ক্ব নু সা ক্ষুৎপিপাসার্তা শ্রান্তা শেতে তপস্বিনী, স্মরন্তী তস্য মন্দস্য কং বা সাদ্য উপতিষ্ঠতি। (মহা ৩।৬৪।১০) শুনতে শুনতে জীবল এক দিন প্রশ্ন করে কি ব্যাপারটা। বাহুক সমস্ত কাহিনী শোনান কিন্তু স্পষ্ট কিছুই ব্যক্ত করেন না।

এ দিকে দময়ন্তী (দ্রঃ) বাপের বাড়িতে চলে আসেন এবং মাকে দিয়ে পিতাকে অনুরোধ করেন নলকে খুঁজে বার করতে। চার দিকে লোক যায়। বহু দিন পরে পর্ণাদ নামে এক ব্রাহ্মণ দময়ন্তীর (দ্রঃ) কাছে খবর আনেন বাহুক স্বীকার করেনি ; কিন্তু সেই যেন রাজা নল। তখন দময়ন্তীই (দ্রঃ) মাকে জানিয়ে সুদেবকে দিয়ে তখনই অযোধ্যাতে ঋতুপর্ণ রাজাকে নিজের স্বয়ংবরের মিথ্যা খবর পাঠান ; রাজা যেন নিশ্চিত যোগদান করেন ; অযোধ্যা থেকে বিদর্ভের রাজধানী কুণ্ডিন নগরীতে এক রাত্রিতে আসতে হবে। স্বয়ংবরের কথা শুনে বিচলিত হলেও নল বিশ্বাস করেন না। বাহুক রাজাকে আশ্বাস দেন ; এবং বেছে ঘোড়া এনে রথে জোড়েন। 'অল্পপ্রাণ' ঘোড়া দেখে ঋতুপর্ণ ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হয়ে উঠলেও বাহুক হয়তত্ত্বজ্ঞ বলে চুপ করে থাকেন। রথে সারথি বার্ষ্ণেয়ও ওঠে এবং রথ চালনা দেখে ভাবতে থাকে এ কি রাজা নল !

আকাশ পথে তীব্র গতিতে রথ এগিয়ে চলেছিল ; পথে এক জায়গায় রাজার উত্তরীয় উড়ে যায়। রাজা বাহুককে রথ থামাতে বলেন, বাহুক জানান সে উত্তরীয় এক যোজন দূরে পড়ে আছে। রথ চালাবার অদ্ভুত ক্ষমতা/অশ্বহৃদয় মন্ত্রের কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে। পথে একটি বিভীতক গাছ পড়ে ; ঋতুপর্ণ নিজের এক অদ্ভুত গণনা ক্ষমতা আছে দেখাবার জন্য এই গাছে কতগুলি পাতা ও ফল আছে গুণে বলে দেন। বাহুকের বিশ্বাস হয় না ; রথ থামিয়ে নিজে গিয়ে গুণে দেখতে যান। ঋতুপর্ণ ব্যস্ত হয়ে বাধা দিতে চান। বাহুক আশ্বাস দেন এক মুহূর্তে সে ফিরবে এবং রাজা ইচ্ছা করলে বার্ষ্ণেয়কে সারথি করেও যেতে পারেন। ঋতুপর্ণ রাজি হন না : বলেন বিদর্ভে পৌঁছে গিয়ে সূর্য দেখতে পেলে বাহুকের মনস্কামনা পূর্ণ করে দেবেন। বাহুক গুণে ফিরে আসেন পাতার সংখ্যা মিলে যায়। ঋতুপর্ণ তখন অক্ষহৃদয় বিদ্যার কথা জানান ; ফলে গুণতে তিনি বিশারদ। বাহুক অক্ষহৃদয় বিদ্যা চান এবং নিজের অশ্বহৃদয় বিদ্যা রাজাকে দেবেন বলেন।

একটি মতে এই সময় বাহুকও অশ্ব সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য অর্থাৎ অশ্বহৃদয় মন্ত্র রাজাকে শিখিয়ে দেন। ঋতুপর্ণের কাছে অক্ষহৃদয় মন্ত্র পাবার সঙ্গে সঙ্গে কলি কর্কোটক বিষ বমন করতে করতে নলের দেহ থেকে বার হয়ে আসেন। নল কলিকে অভিশাপ দিতে যান কিন্তু কলি জানান নল যখন দময়ন্তীকে বনে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন সেই সময় দময়ন্তী কলিকে শাপ দিয়েছিলেন। সেই শাপে সে ভীষণ পীড়িত এবং কর্কোটক বিষে দিবা রাত্র দহ্যমান। নলের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন এবং বর দেন যারা নলের নাম কীর্তন করবে কলি তাদের কোন ক্ষতি করবেন না। সামনে একটি বিভীতক গাছে গিয়ে কলি আশ্রয় নেন। সেই থেকে বিভীতক অভিশপ্ত : ঋতুপর্ণ এ সব কিছুই জানতে পারেন না।

কুণ্ডিনপুরে সন্ধ্যার সময় এঁরা এসে উপস্থিত হন। রাজা ভীম সাদরে অভ্যর্থনা করেন ; কিন্তু স্বয়ংবরের কোন ব্যবস্থা রাজা ঋতুপর্ণ দেখতে পান না। ঋতুপর্ণ বিস্মিত হলেও চুপ করে যান। এ দিকে ঋতুপর্ণের রথের চাকার শব্দে দময়ন্তী এবং বার্ষ্ণেয়-এখানে- নলের-যে-অশ্বগুলি এনেছিল সেগুলি নিঃসন্দেহে বুঝতে পারে নল নিজে রথ চালাচ্ছেন (মহা ৩।৭১।৩)। দময়ন্তী প্রাসাদ থেকে এসে দেখেন ; কিন্তু বিরূপ চেহারা নলকে চিনতে পারেন না। দময়ন্তী দ্রঃ) নিশ্চিত হবার জন্য আরো কয়েকটি প্রমাণ সংগ্রহ করেন এবং ছেলে ও মেয়েকে বাহুকের সামনে পাঠিয়ে দিলে বাহুক এদের বুকে জড়িয়ে ধরেন। নল ও দময়ন্তীর এর পর মিলন হয় ; কর্কোটকের দেওয়া বস্ত্র পরিধান করে নল নিজের রূপ ফিরে পান এবং বায়ু এই সময় নলকে ডেকে বলেন 'নৈষা কৃতবতী পাপং নল সত্যং ব্রবীমি তে'। চতুর্থ বর্ষে (মহা ৩।৭৫।২৫) এদের মিলন হয়। নল পরদিন শ্বশুরের সঙ্গে দেখা করেন এবং মহাভারতে এই সময়ে ঋতুপর্ণকে অশ্বহৃদয় (৩।৭৬।১৮) বিদ্যা দান করেন।

রাজা ঋতুপর্ণ নলের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে সুখী মনে ফিরে যান। এই সময় নল ঋতুপর্ণকে বলেছিলেন পূর্বং হ্যাসি সখা এবং সংবন্ধী (মহা ৩।৭৬।১৪)। এক মাস

মত বিশ্রাম করে কিছু সৈন্য নিয়ে নল নিজের দেশে ফিরে আসেন। পুষ্কর প্রথমে পাশা খেলায় রাজি হন নি ; নল ইতিমধ্যে অর্জিত সমস্ত অর্থ ও দময়ন্তীকে পণ রাখেন ; দময়ন্তীকে পাবার সম্ভাবনায় পুষ্কর আনন্দে প্রলাপ বকতে থাকে ; নল রেগে উঠে পুষ্করের শিরশ্ছেদ করতে গিয়েও সংযত হয়ে যান। পুষ্কর সমস্ত ধনরত্ন ও নিজের জীবন পণ রেখে হেরে যান (মহা ৩।৭৭।৮)। নল ভাইকে ক্ষমা করেন এবং স্বপুরে অধিষ্ঠানে ফিরে যেতে দেন। এক মাস মত পুষ্কর এখানে থেকে নিজের লোক জনদের নিয়ে ফিরে যান। এরপর দময়ন্তী ও ছেলে মেয়েকে নল বিদর্ভ থেকে আনান।

নলরাজ পাককর্মে নিপুণ ছিলেন, তাঁর রচনা বলে কথিত পাকশাস্ত্র পাওয়া যায়। (দ্রঃ- যুধিষ্ঠির)

নলকূবর—বা নলকুবের। কুবেরের ছেলে। এ'র ভাই মণিগ্রীব। রামায়ণে আছে রাবণ মধুকে নিয়ে স্বর্গ আক্রমণ করতে এসে কৈলাসে সেনা নিবেশ করে (৭।২৫।৫২) ; রাত্রিতে সৈন্যরা ঘুমিয়ে পড়ে। আকাশে জ্যোৎস্না, প্রাকৃতিক দৃশ্য, কিন্নর ও বিদ্যাধরদের গান এবং কুবের ভবন থেকে অপ্সরাদের গান সব মিলে রাবণকে কামাতুর করে তোল। এই সময় রম্ভা সেজেগুজে যাচ্ছিল ; রাবণ একে আটকায়। রম্ভা জানায় নলকূবরের সে ভার্যা (৭।২৬।৩২), কৃতসঙ্কেতা। অর্থাৎ সম্পর্কে রাবণের পুত্রবধূ। রাবণ কোন কথা শোনে না। ধর্ষিতা রম্ভা নলকূবরকে এসে সব জানালে নলকূবর শাপ দেন :- কোনদিন অকামা কোন নারীকে ধর্ষণ করলে রাবণের মাথা সপ্তধা হয়ে যাবে।

এই ভয়ে রাবণ সীতার ওপর জোর করেন নি। নলকূবরের আর এক স্ত্রী ময়ের মেয়ে সোমপ্রভা। নলকূবর ও মণিগ্রীব দুই ভাই একবার সুরা পানে মত্ত ও বিবস্ত্র হয়ে কতকগুলি মেয়েদের নিয়ে গঙ্গাতে জলক্রীড়া করছিলেন। নারদ এই সময় বিষ্ণুর কাছে থেকে ফিরছিলেন। নারদকে দেখে মেয়েরা সন্ত্রমে বস্ত্র পরিধান করে পথ ছেড়ে দেন। এ'রা দু জন নারদকে গ্রাহ্য করেন নি ; এদের দু জনকে এই অবস্থায় দেখে (ভাগ ১০।১০) স্থাবর-যোনি পাবার অভিশাপ দেন। পূর্বস্মৃতি থাকবে ; একশত দিব্য বৎসর পরে মুক্তি পাবে। ভাগ ১০।১০ শ্লোকে এরা গুহ্যক। ফলে এ'রা যমলার্জুন নামে দুটি গাছ হয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। নারদকে অবশ্য স্তব স্তুতি করেছিলেন এবং নারদ বলেছিলেন কৃষ্ণের স্পর্শে মুক্তি পাবেন। গোকুলে নন্দের বাড়ির কাছে দুটি গাছ হয়ে জন্মেছিলেন। দ্রঃ- কৃষ্ণ।

নলতন্তু—নবতন্তু। বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মবাদী এক ছেলে।

নলায়নী—মৌদ্‌গল্য নামে এক বৃদ্ধ মুনির স্ত্রী ইন্দ্রসেনা বা নলায়নী। নলায়নীর বয়স কম ছিল এবং অত্যন্ত পতিব্রতা ছিলেন। কিন্তু মুনি বদ মেজাজী হয়ে উঠতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত মুনির কুষ্ঠ হয়। এক দিন খাবার সময় মুনির একটি আঙুল খসে অন্নের মধ্যে পড়ে যায়। নলায়নী এই আঙুল সরিয়ে রেখে নিজে অম্লান মুখে খেয়ে নেন। মুনি সন্তুষ্ট হয়ে বর দিতে চান। নলায়নী বর চান মুনি পঞ্চশরীর হন ; তিনি যৌবন ভোগ করতে পারবেন। মৌদ্‌গল্য বর দেন। হাজার বছর ধরে তারপর এ'রা যৌবন ভোগ করতে থাকেন ; মুনি পর্বত আকার ধারণ করলে নলায়নী পর্বতে নদী

হয়ে ভেসে যান ; মুনি পুষ্পিত তরু হলে নলায়নী লতা হয়ে জড়িয়ে থাকেন। শেষ পর্যন্ত মুনি আবার তপস্বী জীবনে ফিরে আসেন কিন্তু নলায়নী মুনিকে যৌবনোচ্ছল জীবনে ফিরে যাবার জন্য খোসামোদ করতে থাকেন। মুনি তখন স্ত্রীকে পাঞ্চাল রাজের মেয়ে হয়ে জন্মাতে; পাঁচজন স্বামী হবে, যৌবন ভোগ করতে পারবে শাপ দেন। অভিশপ্ত হয়ে নলায়নী শিবের তপস্যা করতে থাকেন। মহাদেব দেখা দিয়ে বর দেন পাঁচজন স্বামী হলেও দ্রৌপদী কুমারীই থাকবেন। মহাদেব নলায়নীকে গঙ্গার তীরে পাঠান ; সেখানে একটি সুন্দর যুবককে দেখতে পাবেন তাকে মহাদেবের কাছে নিয়ে আসতে বলে দেন। নৈমিষারণ্যে এই সময় দেবতারা যজ্ঞ করছিলেন, মহাভারতে (১।১৮৯।-) আছে, কাল/যম শামিত্রকর্মী/ঘাতক ছিলেন। ফলে কোন প্রজা/মানুষ মারা যাচ্ছিল না। তখন ইন্দ্র, বরুণ, কুবের ইত্যাদি দেবতারা ব্রহ্মাকে গিয়ে জানান প্রজা-বৃদ্ধির জন্য তাঁরা ভীত হয়ে পড়েছেন। ব্রহ্মা আশ্বাস দেন যজ্ঞ শেষ হলেই যম নিজের কাজে ফিরে যাবেন। দেবতারা তখন যজ্ঞ স্থানে আসেন এবং ভাগীরথীর জলে সোনার পদ্মফুল (মহা ১।১৮৯।১১) ভেসে আসতে দেখেন। কৌতূহলী ইন্দ্র এগিয়ে যান এবং গঙ্গার উৎপত্তি যেখানে সেখানে এসে দেখেন একটি পাবকপ্রভা যোষা জলে অবগাহ্য রয়েছে ও কাঁদছে। এর চোখের জল সোনার পদ্মে পরিণত হচ্ছে। ইন্দ্র পরিচয় ইত্যাদি জানতে চান। ইনি নলায়নী। মেয়েটি তখন ইন্দ্রকে সঙ্গে যেতে বলেন, কেন কাঁদছে দেখাবে। সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে ইন্দ্র দেখেন গিরিরাজের চূড়াতে সিংহাসনে বসে একজন পুরুষ একটি যুবতীর সঙ্গে অক্ষক্রীড়া করছেন। ইন্দ্র কিছুটা বিরক্তির সঙ্গে বলেন তিনি সমস্ত বিশ্বের ঈশ। পুরুষটি হেসে ইন্দ্রের দিকে চাইতে ইন্দ্র সংস্তম্ভিত হয়ে যান। তারপর খেলা শেষ হলে সেই 'রুদতী' নারীকে বলেন ইন্দ্রকে সামনে আনতে ; দর্প করার জন্য তাকে শাসন করবেন। মেয়েটি স্পর্শ করা মাত্র ইন্দ্র মাটিতে পড়ে যান। মহাদেব বারণ করে দেন এ রকম গর্ব যেন আর কোন দিন না করেন এবং পাহাড় সরিয়ে এর মধ্যে প্রবেশ করতে বলেন। গিরিশিখর সরিয়ে ভেতরে ইন্দ্র তুল্যদ্যুতি আরো চার জনকে দেখতে পান ; এবং দুঃখিত হয়ে পড়েন তাঁর যেন এ রকম অবস্থা না হয়। কিন্তু মহাদেব বলেন তাঁকে অবমাননা করার জন্য ইন্দ্রকেও এখানে প্রবেশ করতেই হবে। ইন্দ্র অনুনয় করলে মহাদেব বলেন গুহার মধ্যে এরাও এই রকম আচরণ করেছিল ; এ রকম কাউকে তিনি ক্ষমা করবেন না। ইন্দ্র এদের সঙ্গে পাহাড়ের মধ্যে গিয়ে শুয়ে থাকুক। শেষ পর্যন্ত এই ৫ জনে মানুষ হয়ে জন্মাবে ; বহু দুঃসাধ্য কাজ করবে এবং বহু লোককে নিহত করে আবার ইন্দ্রলোকে ফিরে আসবে। ভেতরে যে চারজন ইন্দ্র ছিল তাঁরা তখন বলেন ধর্ম, বায়ু, ইন্দ্র ও অশ্বিনীদ্বয় কোন নারীর গর্ভাধান করে দিক ; তাঁরা সেই সন্তান হিসাবে জন্মাবেন (মহা ১।১৮৯।২৭)। ইন্দ্র বলেন তিনি নিজে জন্মাবেন না ; কিন্তু নিজের বীর্যে পঞ্চম পুরুষের জন্মের ব্যবস্থা করে দেবেন। মহাদেব এঁদের প্রার্থনা মেনে নেন এবং মেয়েটিকে মানুষের মধ্যে জন্মাতে বলেন। এই পাঁচজন ইন্দ্র হচ্ছেন বিশ্বভুক্, ভূতধামা, শিবি, শান্তি, তেজস্বী (বঙ্গ' ও গীতা-প্রেস)। এরপর মহাদেব সকলকে নিয়ে নারায়ণের কাছে আসেন।

নারায়ণ এই ব্যবস্থাতে সম্মত হন এবং নিজের মাথা থেকে একটি কৃষ্ণ ও একটি শুক্ল কেশ তুলে নেন। এই কেশ দুটি যদু বংশে দেবকী ও রোহিণীর গর্ভে প্রবেশ করে কৃষ্ণ ও বলরাম হয়ে জন্মান। ব্যাস বলেন গুহা গত সেই চারজন পুরুষ এই চার পাণ্ডব ; এবং ইন্দ্রের অংশে অর্জুন। সেই কন্যা দ্রৌপদী হয়ে জন্মেছেন। দ্রৌপদী এই ৫ জনের স্ত্রী হবে নির্দিষ্ট আছে এবং দ্রুপদকে ব্যাস দিব্য চক্ষু দেন ; পাণ্ডবরা পূর্বে কে ছিলেন দেখতে পান (১।১৮৯।৩৫)।

একচক্রা গ্রাম থেকে বার হয়ে আসার সময় ব্যাস যুধিষ্ঠিরকে যে কাহিনী বলেছিলেন এবং দ্রুপদকে যে কাহিনী বললেন দুটি কাহিনী বেশ কিছুটা তফাৎ। তবে মৌদ্গল্যের স্ত্রীর মাধ্যমে দুটি কাহিনী জুড়ে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। মায়াসীতা (দ্রঃ)। বেদবতী (দ্রঃ) কাহিনীও রয়েছে।

নলিনী—পদ্মানদী (রামা)। পদ্মপুরাণে নলিনী ও পদ্মা দুটি নদী। বর্ণনা থেকে নলিনী যেন ব্রহ্মপুত্র। অপর নাম বটোদক।

নলোদয়—একটি মতে কালিদাস রচিত।

নষ্টচন্দ্র—ভাদ্রমাসে শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্থীর চন্দ্র। এই চাঁদ দেখা নিষিদ্ধ ; দেখলে মিথ্যা অপবাদ পেতে হয়। এই জন্যই কৃষ্ণকে স্যমন্তক মণি চুরির অপবাদ পেতে হয়েছিল। পুরাণের কাহিনী এই দিন চন্দ্র তাঁর গুরুপত্নীকে বলাৎকার করেছিলেন তাই তাঁকে দর্শনে পাপ হয়। পশ্চিম ভারতে এই দিন গণেশ চতুর্থী ; কাহিনী আছে এই দিন ঘরে ঘরে গণেশের পূজা হতে থাকে ; ফলে ভূরিভোজনে ক্লান্ত হয়ে সন্ধ্যাবেলা গণেশ (দ্রঃ) অস্বাভাবিক ভাবে পথ চলতে থাকলে চন্দ্র হেসে ফেলেন। এই কারণে গণেশ শাপ দেন এই দিন কেউ যেন চাঁদ না দেখে।

নহুষ—পুরূরবা উর্বশীর ছেলে আয়ু। আয়ু ও স্ত্রী ইন্দুমতীর ছেলে নহুষ। ইন্দুমতী স্বর্ভানুর মেয়ে। নহুষের এক স্ত্রী অশোকসুন্দরী (দ্রঃ)। দ্রঃ- পিতৃগণ। আয়ু (দ্রঃ) দত্তাত্রেয়ের কাছে একটি ফল পান ফলটি ইন্দুমতীকে খেতে দেন। যথা সময়ে একটি ছেলে ছেলে হয়। এক দিন আঁতুড় ঘর থেকে দাসী যখন বার হয়ে আসে সেই সময়ে হুণ্ড/হুণ্ড অসুর দাসীর দেহে প্রবেশ করে ঘরের মধ্যে আসেন এবং সকলে ঘুমিয়ে পড়লে শিশুটিকে নিয়ে কাঞ্চনপুরে নিজের রাজধানীতে ফিরে আসেন। নিজের স্ত্রী বিপুলাকে শিশুটি দিয়ে রান্না করে দিতে বলেন। বিপুলা দাসীকে নির্দেশ দেন। দাসী কিন্তু শিশুটিকে বশিষ্ঠের আশ্রমের দরজায় ফেলে দিয়ে এসে অন্য মাংস রান্না করে দেন। পর দিন বশিষ্ঠ একে পান এবং পালন করেন। এ দিকে আয়ু ও ইন্দুমতী কান্নাকাটি করতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত নারদ এসে সান্ত্বনা দিয়ে যান ; যথা সময়ে তাঁরা ছেলে ফিরে পাবেন।

হরিবংশে নহুষের স্ত্রী বিরজা, ছেলে যতি, যযাতি, সংযাতি, আয়াতি, ভব ও সুযাতি। যযাতি>যদু, তুর্ব, সু। দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু। পুরু>জনমেজয়>প্রচিম্বান্ (প্রাচী জয় করেছিলেন)>প্রবীর>মনস্যু>অভয়দ>সুধন্বা>বহুগব>শম্যাতি>রহস্যাতি>রৌদ্রাশ্ব+ঘৃতাচী>ঋচেয়ু (বড়), বৃকণেয়ু, কক্ষেয়ু, স্থণ্ডিলেয়ু, সন্নতেয়ু, দশার্ণেয়ু,

জলেয়ু স্থলেয়ু, ধনেয়ু, বনেয়ু এবং দশ মেয়ে রুদ্রা (দ্রঃ), শূদ্রা, ভদ্রা, মলদা, মলহা খলদা, নলদা, সুরুসা, গোচপলা. স্ত্রীরত্নকূটা ; এরা দশজনে অগ্নিহোত্র বংশের প্রভাকরের স্ত্রী হন। কক্ষেয়ু->সভানর, চাক্ষুষ, পরমন্যু। সভানর ->কালানল->সৃঞ্জয়->পুরঞ্জয়-> জনমেজয়->মহাশাল মহামনা->উশীনর (দ্রঃ), ও তিতিক্ষু (দ্রঃ)।

নহুষ এক দিন সমিধ আনছিলেন এমন সময় দেবচারণদের মুখে নিজের কাহিনী শুনতে পান এবং বশিষ্ঠের কাছে ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করে ঘটনাটা সব কিছু জানতে পারেন। এর পর বশিষ্ঠকে প্রণাম করে তাঁর ধনুক নিয়ে বার হয়ে পড়েন। তুণ্ড এ দিকে নহুষকে খেয়ে ফেলেছেন ধারণা নিয়ে অশোক সুন্দরীকে গিয়ে ঘটনাটা জানিয়ে আবার বিয়ে করতে চান। অশোকসুন্দরী মর্মাহত হয়ে পড়েন কিন্তু কিন্নর বিদ্যুৎ ধর ও তাঁর স্ত্রী সান্ত্বনা দেন নহুষ বেঁচে আছেন এবং আরো ঘটনা যা ঘটবে বর্ণনা করেন। ইতি মধ্যে এইখানে নহুষ এসে উপস্থিত হন এবং তীব্র যুদ্ধে অসুরকে নিহত করে অশোকসুন্দরীকে বিয়ে করে পিতার কাছে ফিরে আসেন (পদ্মপুরা)।

পুণ্যবান ও আত্মসংযমী রাজা ; তুণ্ডকে বধ করে ত্রিলোকের প্রশংসা ভাজন হন। পুণ্যকর্মে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন বলে হঠাৎ গোবধ করে ফেলেও ঋষিদের কৃপায় পাপ থেকে মুক্তি পান। অন্যের প্রশ্রয় নিয়ে বৃত্রকে বধ করে শ্রান্ত ও বিচেতন ও স্বকল্মষে অভিভূত হয়ে মানস সরোবরে ইন্দ্র যখন আত্মগোপন করে বাস করছিলেন তখন দেবতা ও মহর্ষিরা সকলে মিলে নহুষকে দেবরাজ করে দেন। শত অশ্বমেধ যজ্ঞ পূর্ণ করার জন্যও নহুষ ইন্দ্রত্বের অধিকারী হয়ে ছিলেন। নহুষ এই সময় বর লাভ করেন দৃষ্টিমাত্র সকলের তেজ হরণ করতে পারবেন।

শত সহস্র বৎসর ইন্দ্রত্ব করার পর নহুষ অহঙ্কারী, উদ্ধত ও বিলাসী হয়ে পড়েন এবং একদিন শচীকে দেখে তাঁকে স্ত্রীরূপে পাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন (মহা ৫।১১।১৫)। শচী বৃহস্পতির আশ্রয় নেন। বৃহস্পতি ইন্দ্রাণীকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেন। বাধা পেয়ে নহুষ ক্রমশ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছিলেন। দেবতারা ও ঋষিরা বোঝান ; নহুষ বুঝতে চান না। বীভৎস পরিস্থিতি দেখা দেয়। সকলে বৃহস্পতির কাছে আসেন। ঠিক হয় শচী সময় চাইবেন এবং সময় নেন। বিষ্ণু মতলব দেন অশ্বমেধ করতে (মহা ৫।১২।১৩)। অশ্বমেধ করে ব্রহ্মহত্যা পাপকে ইন্দ্র বৃক্ষ, নদী, পর্বত, পৃথিবী ও স্ত্রী জাতির (মহা ৫।১২।১৭ মধ্যে ভাগ করে দেন ; তবু তেজ নিহন্তা নহুষের ভয়ে লুকিয়ে থাকেন। উপশ্রুতি সংবাদ দায়িকা দেবী ; শচী এঁর কাছে প্রার্থনা করেন এবং এঁর অনুসরণ করে এগিয়ে যান। হিমালয়ের উত্তরে এক সরোবরে মৃণালদণ্ডের মধ্যে শচী ইন্দ্রের সাক্ষাৎ পান, সব জানান। ইন্দ্র ঋষিযানের পরামর্শ দেন (৫।১৫।৪)। ইন্দ্রাণী নহুষকে গিয়ে বলেন। নহুষ সপ্তঋষিকে বিমানে যোজয়িত্বা (৫।১৫।২০) শচীর গৃহের দিকে যাত্রা করেন। শচী এরপর বৃহস্পতিকে জানান। বৃহস্পতি তৎক্ষণাৎ নহুষ বধের জন্য যজ্ঞ (৫।১৫।২৬) করেন এবং অগ্নি নিজে আবার ইন্দ্রকে খুঁজে আনতে বার হয়ে যান। প্রথমে খুঁজে পান না ; জলের মধ্যে ঢুকতে রাজি হন না। বৃহস্পতি আশ্বাস দেন। দ্বিতীয়বারে খবর এনে দিলে দেবতা

ও ঋষিরা গিয়ে ইন্দ্রের স্তব করেন। ফলে ইন্দ্রের বৃদ্ধি হতে থাকে। লোকপালরাও আসেন। ইন্দ্র সকলের সাহায্য চান। লোকপালদের নিজেদের পদে অভিষিক্ত করে দেন এবং অগ্নির জন্য ঐন্দ্রাগ্ন্য ভাগ ব্যবস্থা করেন। এদিকে নহুষের সঙ্গে ঋষিরা তর্ক আরম্ভ করেন। গোপ্রোক্ষণের মন্ত্রে নহুষ বিশ্বাস করেন না বলেন এবং তর্ক করতে করতে অগস্ত্যের মাথায় পদাঘাত করেন। পূর্বতন ঋষিদের মন্ত্রে অবিশ্বাস করা, অগস্ত্যের মাথায় পদাঘাত এবং ঋষিদের বাহক করা এই তিনটি দোষের জন্য অভিশাপ দেন অগস্ত্য—১০,০০০ বছর সাপ হয়ে থাকতে হবে (মহা ৫।১৭।১৫)। তারপর স্বর্গে ফিরে যাবে। মহাভারতে ৩।১৭৬।২১ আছে নহুষ প্রশ্ন করলে যে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে সেই নহুষকে মুক্ত করে দিতে পারবে।

মহাভারতে ১৩।১০২।- অধ্যায়ে আছে পৃথিবীতে সুকৃত কর্মের জন্য এবং পিতামহের বরে (১৩।১০৩।৩১) ইন্দ্রত্ব লাভ। স্বর্গেও জপযজ্ঞ মনোযজ্ঞ ইত্যাদি ইত্যাদি ধর্মকর্মে নিযুক্ত থাকতে থাকতে ইন্দ্রস্য ভবিষ্যত্বাৎ অহঙ্কারী হয়ে ওঠেন। 'বরদেন' বরঃ দত্তঃ ফলে নহুষ মদান্বিত হয়ে ওঠেন। ঋষিগণকে পর্যায়ক্রমে রথের বাহক করে বেড়াতে থাকেন। ক্রমশঃ অগস্ত্যের পর্যায় আসে। এ দিকে পিতামহ ভৃগুকে পাঠান; ভৃগু অগস্ত্যকে জানান নহুষের এই সব কাজ ক্ষমা করা উচিত নয়। দেব-উপহিতচিত্তঃ (১৩।১০২।২৫) নহুষ অগস্ত্যকে পদাঘাত করবে এবং ভৃগু সেই সময় শাপ দেবেন। ভৃগু তারপর অগস্ত্যের জটার মাধ্য লুকিয়ে অবস্থান করেন, কারণ নহুষ বর পেয়েছিলেন যাকে দেখবেম তার তেজ নষ্ট হয়ে যাবে। নহুষ তারপর অগস্ত্যকে যানে নিযুক্ত করে বার বার কষাঘাত করেন এবং শেষ কালে ক্রোধে অগস্ত্যের মাথায় বাঁ পা দিয়ে লাথি মারেন (মহা ১৩।১০৩।২০)। ভৃগু তখন শাপ দেন স্মৃতি অক্ষুন্ন থাকবে; সাপে পরিণত হতে হবে। নহুষ কাতর হয়ে প্রার্থনা করেন, ভৃগু বর দেন যুধিষ্ঠির নহুষকে শাপমুক্ত করবেন। রাজা অজগর শাপ হয়ে বিশাখযূপ বনে এাস পড়েন। পাঠান্তরে আছে পাল্কি যেতে দেরি হচ্ছে দেখে অধৈর্য হয়ে নহুষ 'সর্প, সর্প' (সৃপধাতু) বলেছিলেন ও পদাঘাত করেছিলেন।

পাণ্ডবরা যখন দ্বৈতবনে তখন নহুষ সাপ এক দিন ভীমকে জড়িয়ে ধরেন। ভীম নিজের পরিচয় দেন, নহুষও অগস্ত্যের শাপ ইত্যাদি কাহিনী জানান। যুধিষ্ঠির খুঁজতে এসে সাপকে অনুরোধ করেন ভীমকে ছেড়ে দিতে। সাপ তখন প্রশ্ন করেন কে প্রকৃত ব্রাহ্মণ। যুধিষ্ঠির বলেন সত্য, দান, ক্ষমা, অহিংসা, দয়া ও তপস্যা যাঁর আছে তিনি শূদ্র হলেও ব্রাহ্মণ। উত্তর শুনে অন্য মতে যুধিষ্ঠিরের স্পর্শে ভীমকে (দ্রঃ) ছেড়ে দিয়ে শাপ মুক্ত হয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে দিব্যরূপ ধারণ করে স্বর্গে ফিরে যান। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণেও ঐশ্বর্য গর্বিত নহুষের স্বর্গপ্রাপ্তির কাহিনী আছে। ইন্দ্র হবার ঘটনা ঋক্‌বেদেও আছে। পিতার কাছ থেকে বিখ্যাত তরবারি লাভ করে ছিলেন। চ্যবনের কাছেও একটি বর পেয়েছিলেন। নহুষের ছেলে যতি, যযাতি, সংযাতি, অযাতি, বিযাতি ও কৃতি। গীতা প্রেসে (১৭৫।৩০) যতিং যযাতিং সংযাতিং আয়াতিং আয়তিং ধ্রুবম্। নহুষঃ জনায়ামাস ষট্ পুত্রান্ প্রিয়বাসসি। আয়তি, ধ্রুব

ইত্যাদি নাম ও পাওয়া যায় (ভাগ ৯।১৮।১)। কিন্তু মোট ছয় ছেলে। যতি রাজ্য গ্রহণ করেন নি (ভাগ, । (২) কদ্রুর একটি ছেলের নাম।

নাগ—মানুষের আকার দেবযোনি। নাগলোকে থাকে। কশ্যপের স্ত্রী কদ্রুর অনন্ত, বাসুকি, কম্বল, কর্কোটক. পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খ, কুলিক, ও অপরাজিত নামে কয়েকটি পরাক্রান্ত ছেলে হয়েছিল। এদের বংশ। এরা কুটিল ও বিষধর। এদের বংশ পৃথিবী ছেয়ে গিয়েছিল। বহু প্রজা ক্ষয় হচ্ছিল। প্রজারা তখন ব্রহ্মার শরণ নিলে ব্রহ্মা শাপ দেন কল্পান্তরে নাগ বংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হবে। নাগেরা তখন অনুনয় করে ; ব্রহ্মা নিজেই তাঁদের কুটিল ও বিষধর করেছেন ; শাপ না দিয়ে নাগদের থাকার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। এই সময় থেকে নাগেরা ব্রহ্মার নির্দেশে পাতাল বিতল ও সুতল এই তিন লোকে বাস করতে থাকে ; এবং ব্রহ্মার নির্দেশ মত এক মাত্র আয়ুশেষ জীবকেই এরা কামড়াবে এবং মন্ত্রৌষধি যারা ধারণ করবে তাদের স্পর্শ করবে না। একটি মতে সুরসার সন্তানরা নাগ। কদ্রুর সন্তানরা উরগ।

নাগ ও নাগিনীর বহু মূর্তি প্রাচীন কাল থেকে পূজিত হয়েছে , এদের ব্যন্তর দেবতা মনে করা হয়। বৈদিক যুগের থেকেও এই পূজা প্রাচীন। বেদেও এর প্রভাব অনেকটা এসে পড়েছিল। ঋক্ বেদে অহি বুধ্ন্য (দ্রঃ) যেন অহি বৃত্তের একটি রূপ।

অথর্ব বেদে বহু সর্প দেবতার নাম আছে ; এবং বহু স্থানে এরা গন্ধর্ব, অপ্সরা. পুণ্যজন যক্ষ (দ্রঃ) ও পিতৃদেবদের সঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে (অথর্ব ৮।৮।১৫)। এখানে বিশেষ ৫-টি (অথর্ব ৩।২৭) সাপের নাম তিরশ্চিরাজি (দক্ষিণ দিকের), পৃদাকু (পশ্চিমে), স্বজ (উত্তরের), কল্মাষ গ্রীব (পূর্বে ও শ্বিত্র (উর্দ্ধাদিকের রক্ষক)। অথর্ব বেদে (৮।১০।২৯) প্রথম তক্ষককে পাওয়া যায় ; বিশালের পুত্র বলা হয়েছে। ধৃতরাষ্ট্রকে ইরাবন্তের পুত্র বলা হয়েছে। এই ধৃতরাষ্ট্র বিরাটের (বিশ্ব) কাছ থেকে বিষ দোহন করেছিল ; বিষ সাপেদের পুষ্টির যোগান দেয়। মহাভারতে ধৃতরাষ্ট্র একজন মহৎ-নাগ। মহাভারতে আর একটি সাপ মণিমান, এই নাম থেকেই যেন জনশ্রুতি সাপদের মাথায় মণি আছে। বরাহমিহির বলেছেন তক্ষক ও বাসুকি বংশের সাপেদের এবং কামগ সাপেদের মাথাতে উজ্জ্বল নীলাভ মণি রয়েছে (বৃহ সং, LXXXI-২৫)। গৃহ্য সূত্রে বর্ষার চার মাস সর্প বলি দেবার বিধান রয়েছে। এই সর্পবলিই যেন বর্তমানে নাগপঞ্চমীতে পালিত হয়।

বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থে সর্প দেবতা সম্বন্ধে বহু তথ্য রয়েছে। ব্রাহ্মণ্য অনুকরণ। চুল্লবগ্গে চারজন সর্পরাজের নাম আছে :- বিরূপাক্ষ, এরাপত্র, ছব্যাপুত্ত, এবং, কণ্ব-গোতমক। আরো বহু সাপের নাম বৌদ্ধগল্পে রয়েছে। অনেকে মনে করেন কালীয় দমন কাহিনীতে সর্প-পূজা বন্ধের ইঙ্গিত রয়েছে। বৌদ্ধ সঙ্ঘের সদস্য করার সময় অনেক ক্ষেত্রে প্রশ্ন করা হত আগত ব্যক্তি কোন নাগ সম্প্রদায়ের লোক কি না।

তক্ষক. কর্কোটক, পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খপাল ও কুলিক নাগের বর্ণনা দিয়েছেন হেমাদ্রি :- এরা দ্বিজিহ্ব, দ্বিভুজ, সপ্তফণ এবং মণিযুক্ত ; হাতে অক্ষসূত্র ; এবং এদের স্ত্রী ও সন্তানদের এক থেকে তিন ফণা। বিষ্ণু ধর্মোত্তরে অনন্ত নাগের চার হাত, অনেকগুলি

ফণা ; মধ্যকার ফণার ওপর ভূমি দেবী অবস্থিত। ডান দিকের হাতে পদ্ম ও মুসল বাম হাতে লাঙলের ফলা ও শঙ্খ। অনন্তকে বিষ্ণুর অবতার বলা হয়েছে এবং এই অনন্তই বলরাম। শিল্পরত্নে (১৭ খৃ শতক) সাপেরা নাভির ওপর দিকে মানুষের আকৃতি ; মাথা ঘিরে ১, ৩, ৫, ৭ বা ৯ ফণা এবং হাতে অসি ও চর্ম।

শিল্পে ভারহুত প্রাচীরে প্রসেনজিৎ স্তম্ভে নাগরাজ এলাপত্র বুদ্ধের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন উৎকীর্ণ রয়েছে। ৫-টি ফণা ; এবং মধ্য ফণার ওপর একটি দেবী অধিষ্ঠিত। সঙ্গে পেছনে হাত জোড় করে এলাপত্রের স্ত্রী ও কন্যা এগিয়ে এসেছে। তিনটি মূর্তিই মানুষের ; মাথার পেছনে কেবল ফণা। এলাপত্র যেখানে নতজানু হয়ে বোধিবৃক্ষকে প্রণাম করছে সেখানে সম্পূর্ণ মনুষ্য দেহ ; মাথাতে পাশের দিয়ে কেবল ৫-টি ফণা। আর একটি ভারহুত প্রাচীরে চক্রবাক নাগরাজ রয়েছে ; সম্পূর্ণ মানুষের চেহারা; হাতে নমস্কার মুদ্রা। মাথাতে মোটা পাগড়ি এবং ৫-টি ফণা।

মথুরা এলাকাতে যে সব নাগমূর্তি পাওয়া গেছে সেগুলি খৃ ১-ম শতকের যেন ; এবং এগুলি পূজিত হত। একটি শিলা-লেখ (মথুরা-যাদুঘরে) থেকে জানা যায় হুবিষ্ক (৪৭ কনিষ্ক বর্ষে) যে বৌদ্ধ বিহার স্থাপন করেছিলেন তার কাছেই যেন দধিকর্ণ সাপের মন্দির ছিল। চারগাঁওতে (মথুরা থেকে ৫-মাইল দক্ষিণে) যে নাগমূর্তি পাওয়া গেছে সেটি সম্পূর্ণ সাপ ; ৭টি ফণা যুক্ত।

গুপ্ত যুগে ও পরবর্তী কালে নাগ-নাগিনীদের বিষ্ণু ইত্যাদি দেবতার সঙ্গে দেখা যায়। বহু স্থলে এদের দেহ অর্দ্ধ নর। তবে আদি, শেষ ও অনন্ত নাগের মূর্তি সাধারণত বহু ফণা-মূর্তি। উৎকীর্ণ বরাহ চিত্রে শেষ নাগ ও তাঁর স্ত্রীকে ওপর অংশ মনুষ্য মূর্তি হিসাবে দেখান হয়েছে। খিচিঙে প্রাপ্ত একটি মূর্তিতে সাপটি সম্পূর্ণ মানুষ ; মাথার পেছনে কেবল ফণা রয়েছে। আবার এই খিচিঙে একটি নাগিনী মূর্তির কেবল ওপর অংশ মানুষের এবং মাথাতে তিনটি ফণা মাত্র। সুতনাতে (মধ্য প্রদেশে) প্রাপ্ত একটি নাগিনীর আটহাত, পদ্মের ওপর ললিতাক্ষেপ আসনে অবস্থিত ; চারপাশে বহু সহচরী, সবগুলিরই মানুষ-চেহারা ; মাথার পেছন দিকে কেবল ৭টি ফণা। ব্রাহ্মী অক্ষরে পরিচয় রয়েছে শ্রীনাইনি=নাগিনী। এই মূর্তিটি জৈন সর্পদেবী ; ব্রাহ্মণ্য মনসার সমপর্যায়ে।

বীরভূমে মনসার মূর্তি পাওয়া গেছে. পদ্মের ওপর ঐ ভাবে বসা. মাথাতে সাতটি ফণা। পদ্মটি একটি কলসীর ওপর অবস্থিত ; এবং কলসী থেকে আরো দুটি সাপ বার হয়ে আসছে। মূর্তিটিতে বহু অলঙ্কার এবং সর্প কুচবন্ধন এবং হাতে একটি ফণাধরা সাপ। দেবীর এক পাশে জরৎকারু আর এক পাশে আস্তীক।

নাগদত্ত—ধৃতরাষ্ট্রের একটি ছেলে। ভীমের হাতে নিহত।

নাগপঞ্চমী—শ্রাবণে কৃষ্ণা, কোথাও কোথাও শুক্লা পঞ্চমীতে মনসাদেবী ও নাগসমূহের পূজা হয়। এই সময়ে দেবী মনসা (দ্রঃ) গাছে আশ্রয় করেন ফলে এই গাছ দিয়ে পূজা হয়।

নাগপাশ—মন্ত্রপূত অস্ত্র। এই অস্ত্র প্রয়োগে লক্ষ লক্ষ সাপ বার হয়ে শত্রুকে জড়িয়ে ধরে। বরুণের অস্ত্র। ইন্দ্রজিৎ এই অস্ত্র ইন্দ্রের কাছে পেয়েছিলেন। দ্রঃ- গরুড় অস্ত্র।

নাগপুর—নৈমিষারণ্যে গোমতী নদীর বেসিন-এ একটি এলাক। মহাভারতে এর উল্লেখ আছে। এখানে পদ্মনাভ বলে একটি নাগ বাস করত।

নাগবর্ষ্ম—সরস্বতীর দ-তীরে। এখানে বাসুকির বাসস্থান। দেবতারা এখানে বাসুকির অভিষেক করেছিলেন। এখানে অসংখ্য সর্প কিন্তু কোন সর্পভয় নাই। চতুর্দশ সহস্র মহর্ষি এখানে নিরন্তর বাস করেন। ভাণ্ডারকরে নাগধন্বান (৯।৩৬।২৯)।

নাগরী—মধ্যমিকা (জেতুত্তর দ্রঃ)।

নাগরী—ব্রাহ্মী লিপি থেকে গঠিত উত্তর ও মধ্য ভারতে প্রচলিত লিপি। নগর জনের জন্য ব্যবহৃত। এই লিপিতে বর্তমানে সমস্ত সংস্কৃত গ্রন্থ ছাপা হয়। দেবভাষার লিপি বলে অপর নাম দেবনাগরী।

নাগলোক—দ্রঃ- নাগ। এখানে বাসুকি রাজা। এখানে একটি বিশেষ জলাশয়ে জল পান করলে হাজার হাতীর বল পাওয়া যায়।

নাগারি—গরুড়ের একটি বংশধর।

নাগার্জুন—মহাযানের একটি প্রধান শাখা মাধ্যমিক ; এই শাখার প্রথম ও প্রধান প্রতিষ্ঠাতা। অশ্বঘোষ, নাগার্জুন, আর্যদেব, ও কুমারলাত সমসাময়িক ছিলেন খৃ ২ শতক। বিদর্ভের অধিবাসী। অন্ধ্রদেশে রাজা সাতবাহনের সঙ্গে বিশেষ বন্ধুতা ছিল। ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম। দার্শনিক, জ্যোতির্বিদ ও চিকিৎসা শাস্ত্রজ্ঞ। যাদু বিদ্যাতেও সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। এই নামের সঙ্গে বহু প্রবাদ রয়েছে ; হয়তো একাধিক নাগার্জুন ছিলেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি মাধ্যমিক কারিকা ; এই গ্রন্থে শূন্যবাদ আলোচিত হয়েছে। সুহৃৎ-লেখ, প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্রশাস্ত্র, দশভূমিবিভাষা শাস্ত্র, বিগ্রহব্যবর্তনী, যুক্তি যষ্টিকা, শূন্যতাসপ্ততি, মহাযান বিংশক ইত্যাদি তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ। মনে হয় তন্ত্রশাস্ত্রকার, রসায়নশাস্ত্রকার ও চিকিৎসাশাস্ত্রকার আরো তিন জন নাগার্জুন ছিলেন।

নাগার্জুনকোণ্ডা—গুন্টুর জেলাতে কৃষ্ণা নদীর তীরে বৌদ্ধ ধ্বংসাবশেষ। ১৬°৩১´ উ : ৭৯°১৪´ পূ। প্রাচীন নাম বিজয়পুরী। এই প্রতিষ্ঠান খৃ ৩ শতকে ইক্ষ্বাকু রাজাদের সময়কার। বহু স্তূপ, চৈত্যগৃহ ও বিহার ছিল। কয়েকটি স্তূপ হরিতাভ চূণা-পাথরে খোদিত ফলক দিয়ে আবৃত ছিল। ফলকগুলিতে বুদ্ধের জীবনী অমরাবতী শৈলীতে অঙ্কিত।

পাহাড়ের পাদ দেশে একটি প্রশস্ত উপত্যকা। এখানে একটি বাঁধ দেবার ফলে এলাকাটি বর্তমানে জলমগ্ন ; উপত্যকার মধ্যগত পাহাড়টি একটি দ্বীপে পরিণত। উপত্যকাটি ২৩ বর্গ কি-মি ; প্রত্নকীর্তি সমৃদ্ধ এবং এখানে বিজাপুরের রাজধানী ছিল। উপত্যকার তিন দিকে দুর্ভেদ্য পাহাড় এবং চতুর্থ দিক কৃষ্ণা নদী দিয়ে রক্ষিত। নাগার্জুনের সময়ের সঙ্গে জড়িত হলেও প্রত্নতাত্ত্বিক কোন প্রমাণ মেলে না। প্রাগৈতিহাসিক যুগেও এখানে বসবাস ছিল। প্রত্নাশ্মীয়, ক্ষুদ্রাশ্মীয় ও নবাশ্মীয় বহু অস্ত্র-শস্ত্র ও মৃৎপাত্র এখানে পাওয়া গেছে। ইক্ষ্বাকু রাজাদের সময় এখানে বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলির চরম সমৃদ্ধি দেখা যায়। নিরবচ্ছিন্ন শান্তি এখানে ছিল না। কিন্তু তবু সমৃদ্ধি ব্যাহত হয় নি। খৃ ৪-র্থ শতকের পর বৌদ্ধ ভাস্কর্যের আর কোন নিদর্শন

পাওয়া যায় না। ইক্ষ্বাকুদের পরই এখানকার গৌরবের দিন অস্তমিত হয়। ইক্ষ্বাকু রাজারা ব্রাহ্মণ্য ধর্মী ছিলেন ; ফলে হিন্দু মন্দিরও প্রচুর গড়ে উঠেছিল। বিষ্ণু, শিব, কার্তিকেয় ইত্যাদির ২০টি মন্দির পাওয়া গেছে। মন্দিরগুলি হয় দুর্গের কাছে নয়তো কৃষ্ণা নদীর কাছে। সর্বদেবতাদের উদ্দেশ্যে নির্মিত প্রাসাদ মত মন্দিরটি ইহুভুল চান্তমূল রাজার রাজত্বকালে নির্মিত হয়েছিল। আর একটি উল্লেখযোগ্য মন্দির অষ্ট-ভুজস্বামীর (= বিষ্ণু) : ২৭৮ খৃঃ মত। ৩০-এর বেশি বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানের ধ্বংসাবশেষ এখানে পাওয়া গেছে। বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলি ৯০% স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। সংঘারাম থেকে বিচ্ছিন্ন স্তূপের সংখ্যা মাত্র ৫-টি। প্রাচীনতম স্তূপটি মহাচৈত্য ; এখানে বুদ্ধদেবের ধাতু পাওয়া গেছে। এই ধাতু একটি স্বর্ণ মঞ্জুষার মধ্যে রাখা ছিল ; মঞ্জুষাটি একটি রূপার পাত্রের মধ্যে অবস্থিত এবং এই রূপার পাত্রটি অপর একটি পাত্রের মধ্যে ছিল। বৌদ্ধ স্তূপ ইত্যাদিতে শৈলী অমরাবতীর শেষ পর্যায়ের (খৃ ২-৪ শতক)। অলংকরণ ছিল অপর্যাপ্ত ; স্তূপ, চৈত্যগৃহ, সংঘারাম ইত্যাদিতে ইঁট ও পাথর প্রয়োজন মত ব্যবহৃত হয়েছে : স্তূপগুলির মধ্যগত কক্ষের গঠন ও কারুকার্য বিচিত্র। কাঠের স্তম্ভও প্রচুর ব্যবহৃত হয়েছে। সিংহল ও অন্যান্য জায়গা থেকে তীর্থ যাত্রীরাও এখানে আসতেন। বিদেশী তীর্থযাত্রীদের জন্য স্বতন্ত্র চৈত্যগৃহও গড়ে উঠেছিল।

নাগার্জুনকোণ্ডার এই সহরে একটি উন্মুক্ত প্রেক্ষাগৃহ পাওয়া গেছে ; আয়ত চত্বর ১৬·৪৬×১৩·৭২ মি ; একে ঘিরে চারদিকে প্রায় এক হাজার দর্শকের বসবার সোপানাসন (গ্যালারি) ছিল। আমোদপ্রমোদ ও পাশাখেলার জন্য নির্মিত কিছু মঞ্চের ধ্বংসাবশেষও পাওয়া গেছে। সহরের বিভিন্ন অংশে বেশ কয়েকটি পান্থশালা, স্নানের চৌবাচ্চা, বাঁধান ঘাট ইত্যাদি পাওয়া গেছে। কৃষ্ণা নদীর তীরে শ্মশান ছিল। সতীদাহের একটি উদ্‌গত চিত্রও এখানে পাওয়া গেছে।

দুটি বিষ্ণু মন্দির পাওয়া গেছে ; এ দুটি মনে হয় প্রথমে জৈন মন্দির ছিল ; কারণ আরাধ্য তীর্থঙ্কর মূর্তি দুটি বাইরে পড়ে রয়েছে।

নাটক—ভরতের নাট্য শাস্ত্রে আছে ব্রহ্মা চতুর্বেদ থেকে উপকরণ নিয়ে নাটক তৈরি করেন এবং এতে শিবের তাণ্ডব ও পার্বতীর লাস্য যোগ করেন। অর্থাৎ কবে থেকে অভিনয় আরম্ভ হয়েছিল অস্পষ্ট। পুরূরবা-উর্বশী, যম-যমী ইত্যাদি দৃশ্যকাব্যের বিষয়বস্তু হতে পারে কিন্তু অভিনয় হত কিনা স্পষ্ট নয়। বহু মতে সংবাদ সূক্তগুলি ভারতীয় নাটকের আদি উৎস। ছান্দোগ্যে সপ্তম অধ্যায়ের সুরুতে নারদ সনৎকুমারের কাছে নিজের পরিচয় হিসাবে দেবজনবিদ্যাম্ অধ্যেমি বলেছিলেন। শঙ্কর বলেছেন দেবজন বিদ্যা=গন্ধযুক্তি নৃত্যগীতবাদ্য শিল্পাদি। গন্ধযুক্তি (আনন্দগিরি)=কুঙ্কুমাদি সম্পাদন। হয়তো পুতুল নাচ ও চালু ছিল। বৈদিক যুগে মহাব্রত অনুষ্ঠান হয়তো নাটক অভিনয়ের প্রথম পদক্ষেপ। এই অনুষ্ঠানে বৈশ্য-শূদ্রের যুদ্ধ, ব্রাহ্মণছাত্রের ও গণিকার অশ্রাব্য খিস্তি ইত্যাদি বিষয়গুলি যেন নাটকের আদিরূপ। একটি মতে অলেক্‌জান্দারের ভারত অভিযানের পর গ্রীক দরবারে নাটক অভিনয় দেখে ভারতে প্রেরণা এসেছিল। কিন্তু এ মতের কোন প্রমাণ নাই। নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত

অমৃতমন্থন ও ত্রিপুরদাহ কবে কে লিখেছিলেন কিছুই জানা যায় না ; বইও পাওয়া যায় না।

ভরত নাট্য শাস্ত্র থেকে আর একটা জিনিস স্পষ্ট ; এটি হচ্ছে ভরত মুনির আগে অভিনয় ও নাটক নিশ্চয় প্রচলিত ছিল।

পতঞ্জলি মহাভাষ্যে (খৃ-পূ ২ শতকে) কংসবধ ও বলি-বন্ধ দুটি দৃশ্যকাব্যের উল্লেখ আছে। অষ্টাধ্যায়ীতে নটসূত্র শব্দটি এবং মহাভাষ্যে কুশীলব শব্দটি পাওয়া যায়। অর্থ শাস্ত্রেও দুটি নাটকের উল্লেখ আছে। রামায়ণে নাটক শব্দের উল্লেখ রয়েছে। দ্রঃ- অযোধ্যা। মহাভারতে জীবনের সর্বস্তরে নৃত্যগীতবাদ্য ছড়িয়ে গিয়েছিল। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে (২।৩০।৪৮) কথয়ন্তঃ কথাবহ্বীঃ পশ্যন্তঃ নটনর্তকান্ ; দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে (১।১৭৬।২৮) এবং ধৃতরাষ্ট্রের বনগমনের প্রস্তুতি পর্বেও (১৫।২০।১৬) নট-নর্তকলাস্যাঢ্য পরিবেশের উল্লেখ রয়েছে। হরিবংশেও অভিনয়ের উল্লেখ রয়েছে।

মহাভারতে আছে কৃষ্ণের বংশধরেরা নাটক অভিনয় করেছেন। অর্থাৎ অভিনয় কবে আরম্ভ হয়েছিল এবং সাজ সজ্জা ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না।

কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে উল্লিখিত নাট্যকার সৌমিল্ল ও কবিপুত্র সম্বন্ধে কিছুই জানা নাই।

নাট্যকার অশ্বঘোষ ও ভাস দু-জনেই কালিদাসের আগে। অশ্বঘোষ কনিষ্কের সম-সাময়িক। কালিদাসের পরে শূদ্রক। উভয়াভিসারিকা, পদ্মপ্রাভৃতক, ধূর্তবিট-সংবাদ, ও পাদতাড়িতক এই চারটি নাটক কালি-দাসের পর। এই নাটকগুলিতে সাময়িক সমাজের একটি ছবি ফুটে উঠেছে। হর্ষ (খৃ ৭-শতক) ; এঁর নাটক প্রিয়দর্শিকা, রত্নাবলী ও নাগানন্দ। বিশাখ দত্তের (খৃ ৯-শতক) মুদ্রারাক্ষস। রচনা সরল স্বচ্ছন্দগতি, সাময়িক রাজনীতির একটা রূপ এখানে পাওয়া যায়। খৃ ৯-শতকে ভট্টনারায়ণের বেণীসংহার ; বিষয় বস্তু মহাভারতীয় অর্থাৎ সাময়িক সমাজের কোন-সন্ধান এতে পাওয়া যায় না। ভবভূতি খৃ ৭-৮-শতকে। এঁর মহাবীর চরিত, উত্তররামচরিত সামাজিক কোন পরিচয়ের স্বাক্ষর বহন করে না ; তাঁর মালতীমাধব কতটা বাস্তব সে কথা বলা আজ প্রায় অসম্ভব। শূদ্রক ও বিশাখ দত্তের নাটক বাদে জীবনের তদানীন্তন পদধ্বনি শোনা যায় এমন লেখা আর নাই।

নাটিক—নাড়িক, কুণ্ডগ্রাম (দ্রঃ), কোল্লাগ। বৈশালীর (দ্রঃ) উপকণ্ঠে। এখানে নাট ক্ষত্রিয়েরা বাস করত এবং এখানে জ্ঞাত্রিক ক্ষত্রিয়দেরও বাস ছিল। এই বংশে মহাবীর জন্মান।

নাট্যশাস্ত্র—ভরত মুনি লিখিত। নাটকের বিষয় বস্তু, রচনা, অভিনয় ব্যবস্থা, অভিনয় ইত্যাদি ইত্যাদি যাবতীয় দিক বিশদ ভাবে আলোচিত হয়েছে। অর্থাৎ ভরত মুনির সমকালীন যা অভিনীত হত সেগুলি সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া যায়। পরবর্তী যুগে এই নাট্য শাস্ত্রীয় অনুশাসন ভারতীয় নাটকের ধারাকে রোধ করে দিয়েছিল না নাটকের নিজের প্রাণশক্তির অভাবে নাটক রচনা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলা কঠিন। নাটকের ফল স্বরূপ ধর্ম, অর্থ, কাম ভরত মুনির মতে বিভূতি ;

এই বিভূতির চিন্তাই নাটককে এগিয়ে যাবার মত কোন প্রেরণা দিতে পারেনি ; এটাই যেন চরম সত্য। মৃচ্ছকটিক, মুদ্রারাক্ষস ইত্যাদি অবিশ্বাস্য ব্যতিক্রম। বর্তমান নাট্যশাস্ত্র গ্রন্থটি খৃ ৪-শতকের সংস্করণ। এতে শক, যবন, পহ্লব ইত্যাদির উল্লেখ আছে। অর্থাৎ অংশগুলি প্রক্ষিপ্ত না হলে মূল গ্রন্থটি খৃস্ট যুগের পূর্বে লেখা। অভিনব গুপ্তের সাক্ষ্য অনুসারে এতে ৩৬ অধ্যায় ও ৬০০০ শ্লোক।

নাড়ি—সুষুম্না, গান্ধারী, হস্তিজিহ্বা অলম্বুষা, কুহূ, যশস্বিনী ও শঙ্খিনী (শারদা-তিলক ১।৪০)। এবং ইড়া, পিঙ্গলা, পৃথা, যশ।

নাড়িজঙ্ঘ—(১) ইন্দ্রদ্যুম্ন হ্রদে অমর বক। (২) এক বক, কশ্যপের ছেলে : ব্রহ্মার বন্ধু ; অপর নাম রাজধর্মা। এক গৌতম (দ্রঃ) একে এক বার মাংসের লোভে হত্যা করেছিল।

নাথদ্বার—সিয়র। বনস নদীর তীরে। উদয় পুর থেকে ২২ মাইল উ-পূর্বে। বিখ্যাত প্রাচীন কেশবদেব মূর্তিটিকে রাণা রাজসিংহ মথুরা থেকে এখানে সরিয়ে আনেন ; ঔরঙজেবের ভয়ে।

নাথধর্ম—কবে চালু হয়েছিল নির্ভরযোগ্য কোন হিসাব নাই। হয়তো খৃ ১০-শতকের কাছাকাছি। সারা ভারতে। দাক্ষিণাত্যের ওপর অংশে, যুক্ত ও মধ্য প্রদেশ, গুজরাটে মহারাষ্ট্রে, পাঞ্জাবে, বিহারে, বাঙলায় ও নেপালে।

সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলির ওপর নাথ হওয়াই এই ধর্মের মূল কথা। প্রথমে এই নাথ হতে হয় ; এর ফলে মৃত্যুঞ্জয় হয়ে প্রথমে সিদ্ধতনু, পরে দিব্যতনু বা প্রণবতনু লাভ করতে হয়। প্রণবতনু লাভ করলে প্রকৃত নাথ হওয়া যায়। এ'রা শৈব, এ'দের স্বীকৃত আদি গুরু স্বয়ং মহাদেব। এ'দের কয়েকটি প্রখ্যাত সিদ্ধপুরুষ হচ্ছেন মীননাথ, বা মৎস্যেন্দ্রনাথ (বহু মতে এ'রা দু জন ব্যক্তি), গোরক্ষনাথ (দ্রঃ) বা গোখনাথ; জলন্ধরী-পা বা হাড়িসিদ্ধা এবং কানু-পা।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন তান্ত্রিক বৌদ্ধ মতবাদের একটি শাখা। বৌদ্ধসহজিয়াদের সমসাময়িক যেন। নাথ বাদে সূর্য ও চন্দ্র মিলে অদ্বয়। দ্রঃ-হটযোগ। পতঞ্জলির সময়েও নাথবাদ ছিল। অর্থাৎ বৌদ্ধ, esoteric মতবাদ থেকে উৎপত্তি ঠিক যুক্তিযুক্ত নয়। মূলত যোগধর্ম। কিছু মতে এ'রা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। আবার কিছু মতে esoteric বৌদ্ধ। পরে শৈব মতবাদ গ্রহণ করেছিলেন। আবার কিছু মতে এরা মূলত শৈব। আর এক মতে এরা সিদ্ধ সম্প্রদায়ের বিশেষ একটি পর্যায়। প্রথম গুরু আদিনাথ।

প্রধানত শৈব মতবাদের প্রাধান্য। ফলে শিবত্ব প্রাপ্তির চেষ্টা। সাধারণ মানুষ থেকে নাথ সিদ্ধদের পার্থক্য এ'রা মৃত্যুকে জয় করেছেন। এ'দের মধ্যে ও শেষের দিকের বৌদ্ধদের মধ্যে এত বেশি মিল রয়েছে যে বহু ক্ষেত্রে গোরক্ষনাথ আগে যেন বৌদ্ধ ছিলেন মনে হয়। নাম ছিল অনঙ্গবজ্র ; অন্য মতে রমণবজ্র। নাথযোগীদের মতে নাথ সাহিত্যও শৈব মতবাদ থেকে গড়ে উঠেছে। মহাদেব নিজে এ'দের মূল উপদেষ্টা। ফলে গোরক্ষনাথকে বহু সময় এ'রা মহাদেব বলে মেনে নেন। এ'দের ধর্মীয় দেবতা মহাদেব। এ'দের সাহিত্যে দেখা যায় নাথ সিদ্ধরা সিদ্ধি ও গাঁজাতে মেতে রয়েছেন।

মুখে সব সময় ব্যোম ব্যোম শব্দ করেন। যম, ব্রহ্মা, দুর্গা ইত্যাদি নানা দেব দেবীকেও এরা স্বীকার করেন। কুলকুণ্ডলিনীতে বিশ্বাস করেন। মূলাধারে শক্তি এবং সহস্রারে শিব রয়েছেন। বহু তন্ত্রে কিন্তু শিব থাকেন আজ্ঞা চক্রে (দ্রঃ- ষট্ চক্র)। সহস্রারে অদ্বয় তত্ত্বের উপলব্ধি হয়।

তবুও এদের ধর্মীয় মতবাদ মোটামুটি অজানা। যা পাওয়া গেছে সেগুলি কাহিনী ও রূপকথা। যোগ অভ্যাসের ফলে এরা ঐশ্বরিক ক্ষমতা পেতেন। ব্রাহ্মণ্যধর্মেও এই ঐশ্বরিক ক্ষমতা ঋদ্ধি রয়েছে। নাথ সিদ্ধদের ও ময়নামতীর ঋদ্ধি (দ্রঃ) ছিল বলা হয়। নাথ সাহিত্যে যোগীরা যেন কায়সিদ্ধির জন্য ব্যস্ত। কায় সাধনার মাধ্যমে এরা কেবল অমরতা ও মহেশ্বরতা চান। এদের সাধনপদ্ধতির নাম কায়-সাধনা বা উল্টসাধনা (দ্রঃ)। এই কায়সাধনার অর্থ ধীরে ধীরে দেহ ক্রমশ পবিত্র ও তরুণ হয়ে উঠবে এবং শেষ পর্যন্ত নতুন এক বস্তুতে পরিণত হবে। দ্রঃ-রস, রসায়ন, আজীবিক। এদের যোগের চরমদশা = সহজদশা - শূন্যসমাধি। নাথ বাদের মধ্যে একটা বিদ্রোহের ঘোষণাও রয়েছে। বহুস্থানে নাথবাদ ও সহজিয়া মতবাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

বৌদ্ধ সহজিয়াদের সাধনায় মনস্তাত্ত্বিক দিকটা (অর্থাৎ যৌন আবেদন ও যৌন পরিতৃপ্তি) এবং দৈহিক দিক দুটিই ছিল। কিন্তু নাথবাদে মনস্তাত্ত্বিক দিকটা নাই। বৈষ্ণব সহজিয়ারাও যৌন আবেদনকে দেহের ও মনের দিক থেকে সব সময় স্বর্গীয় করে তোলার চেষ্টা করেছেন। পছন্দ মত নারী না পেলে মহাসুখ (বৌদ্ধ-সাধনায়) ও মহাপ্রেম (বৈষ্ণব মতে) কোন দিনই পাওয়া সম্ভব নয়। ফলে বৌদ্ধরা নারীকে প্রজ্ঞা ও বৈষ্ণবরা মহাভাব বলেছেন। দ্রঃ-নারী। নাথপন্থীরা নারীকে বাদ দিয়েই সাধনা করেন। তবু বজ্রাউলি,, তাম্রাউলি ও সহজাউলি ইত্যাদি কিছু যোগাচার রয়ে গেছে ; নারীকে সঙ্গে নিয়েই এই সাধনা করা হয়। এইসব সাধনাতে মেয়েদের অংশ দেওয়া হয় বটে তবুও এদের নিয়ে দর্শন বা আদর্শ গড়ে তোলার বিন্দুমাত্র চেষ্টাও কোথাও দেখা যায় না। নাথ সিদ্ধরা সব সময় অবিবাহিত। নারীদের প্রতি চরম ঘৃণা। নাথ দৃষ্টিভঙ্গিতে বীর্য মহারস। সাধনা অর্থে বীর্যপাত না করা। নাথ সাহিত্যে স্ত্রীরা সব সময়ই বাঘিনী ; পুরুষকে বাঘিনীর কবল থেকে রক্ষা করতে হবে। দ্রঃ- কামযান, যৌনযান।

নাথসিদ্ধ ও বৌদ্ধসহজিয়াদের মধ্যে মিল অর্থে দুই সম্প্রদায়ই হটযোগী। কিন্তু যোগ সাধনার লক্ষ্য প্রায় সম্পূর্ণ আলাদা। নাথরা চান মৃত্যুকে জয় করবেন। বৌদ্ধ-সহজিয়ারা চান মহাসুখ। নাথসিদ্ধরা পরিবর্তনশীল বাস্তব দেহকে সূক্ষ্ম অবিনশ্বর দেহে পরিণত করতে চান। বৌদ্ধরা মহাসুখ উপলব্ধি করে পুনর্জন্মের চক্র জয় করতে চান। নাথ পন্থীরা যোগ সাধনার দ্বারা স্থূল দেহকে অবস্তুতে পরিণত করতে চান। বৌদ্ধরা যৌনযোগাচার মাধ্যমে যৌনপরিতৃপ্তিকে গভীর bliss-এ পরিণত করতে চান। দ্রঃ- মহাসুখ। নাথপন্থীদের মৃত্যুকে জয় করার পথে নারী চরম বাধা। বৌদ্ধরা নারী জাতিকে প্রজ্ঞা বা শূন্যতার প্রতিমূর্তি হিসাবে শ্রদ্ধায় উত্তাল। অবশ্য বৌদ্ধ সহজিয়াদের প্রজ্ঞা, যোগিনী ইত্যাদি বহুক্ষেত্রে রক্তমাংসের কোন নারী নয়।

তন্ত্র, হটযোগ, সহজিয়া, শৈবাচার, ধর্মপূজা মিলে এক নতুন ধর্মবাদ। ঐতিহাসিক আদিপুরুষ মীননাথ। ইনি শিব দুর্গার কথোপকথন থেকে সমস্ত গুহ্যতত্ত্ব জানতে পারেন এবং শিষ্য গোরক্ষনাথকে সব কিছু শিক্ষা দেন। এ'রা ছাই মাথা, মাথায় জটা, কড়ি ও কুণ্ডলধারী সন্ন্যাসী। রুদ্রাক্ষ ও ত্রিশূল ইত্যাদিও থাকে।

নাথসিদ্ধ—আটজন প্রসিদ্ধ নাম ঃ-গোরক্ষনাথ (দ্রঃ-নাথবাদ), জালন্ধরি, নাগার্জুন, দত্তাত্রেয়, দেবদত্ত, জড়ভরত, আদিনাথ ও মৎস্যেন্দ্রনাথ। আদিনাথ ইত্যাদি কিছু নাথযোগীকে মনে করা হয় অমর; হিমালয়ে কোথাও এখনও জীবিত আছেন। মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ, জালন্ধরি, চৌরঙ্গীনাথ—এ'রা বিখ্যাত নাথ আচার্য। আবার বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য বলেও স্বীকৃত। বিখ্যাত বৌদ্ধ সহজিয়া যোগীরাও সিদ্ধাচার্য বলে পরিচিত ছিলেন। বিখ্যাত নাথযোগীরাও সিদ্ধাচার্য। অর্থাৎ নাথযোগীদের মধ্যে কে যে বৌদ্ধসিদ্ধাচার্য ছিলেন কিছুই বলা সম্ভব নয়। নাথসিদ্ধদের চরম লক্ষ্য রসসিদ্ধদের মত। দ্রঃ-মুক্তি। এদের কায়সাধনা হচ্ছে দেহের পরিবর্তন এবং নতুন বস্তুতে পরিণত হওয়া।

নাদবাদ—বিষ্ণুর ক্রিয়া শক্তি যখন জাগ্রত হয় তখন ঐ শক্তি নাদরূপতা গ্রহণ করে। এই শব্দ একটানা ঘণ্টা শব্দ মত। পরম নাদস্বরূপা শক্তিকে পরম যোগীরা কেবল জানতে পারেন। এই নাদ যখন উন্মেষহীন যোগীরা তখন একে বিন্দু বলেন। এই বিন্দু নাম ও নামী রূপে দ্বিধা বিভক্ত হয়। এই নামের উদয়কে অবলম্বন করে শব্দব্রহ্ম প্রবর্তিত হয়, এবং নামীর উদয়কে অবলম্বন করে ভূতি প্রবর্তন হয়। নাম অর্থে বিন্দুময়ী শক্তির নাম-তা গ্রহণ। এই নাম অবর্ণ হয়েও স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ ভেদে দ্বিধা অবস্থান করে। শব্দ সৃষ্টি-ময়ী, একানেক বিচিত্রার্থা, নানাবর্ণ বিকারিণী, সাক্ষাৎ সোমরূপা এই যে শক্তি ইহাই লক্ষ্মীর শব্দময়ী তনু, এটি তাঁর পরা রূপ। লক্ষ্মীর এই নাদরূপিণী পরা শক্তি কুণ্ডলিনী রূপে শান্ত এবং নিরঞ্জন রূপে মূলাধার পদ্মে বাস করে (দ্রঃ- ধাম তত্ত্ব)। এই নাদরূপা শক্তি যখন দৃষ্টিদৃশ্যাত্মতা প্রাপ্ত হয়ে শব্দার্থতত্ত্বের বিবর্তনী রূপে নাভি পদ্মে অবস্থান করে তখন নাম হয় পশ্যন্ত। এই পশ্যন্ত শক্তি হৃৎপদ্মে উঠে এলে বাচ্যবাচক হয়ে ক্রিয়াময়ী হয়ে ওঠে, একে তখন বলা হয় মধ্যমা। এরপর কণ্ঠে এসে ব্যঞ্জনাদি রূপে প্রকাশিত হয়ে এটি তখন, তন্ত্র ও স্ফোটবাদ উক্ত, বৈখরী রূপ পায়। এই জন্য বর্ণ সকলকে বিষ্ণুশক্তিময়াঃ বর্ণাঃ বিষ্ণুসংকল্পজৃম্ভিতাঃ বলা হয় (অহির্বুধ্ন্য সংহিতা ১৭।৩)।

সরল ইন্দ্রিয় বিষয় থেকে প্রত্যাহৃত হয়ে চিত্তে সমাহিত হলে এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে চিত্তপ্রবাহ ও নিরুদ্ধ হলে ভিতরে একটা স্ফুরণ দেখা দেয়। এই স্ফুরণ হচ্ছে অনাহত নাদ। এই নাদকে অবলম্বন করে ধ্রুব বিন্দুতে পৌঁছতে হয়। তন্ত্রে এই নাদই শক্তি; বিন্দুই শব।

নাভাগ—রাজা ইক্ষ্বাকুর একটি ভাই এ'র ছেলে রাজা অম্বরীষ। সমস্ত পৃথিবী জয় করে ধর্মপথে রাজ্য পালন করতেন। দ্রঃ-দিষ্ট।

বৈবস্বত মনুর দশটি ছেলের এক জন। ইনি যখন ব্রহ্মচারী ছিলেন তখন

এ'র বাবা ও ভাইগুলি মিলে এ'কে পিতৃধনে বঞ্চিত করেন। নাভাগ পরে বাবার কাছে অনুযোগ করলে মনু তাঁকে ভাইদের অবিশ্বাস করতে বলেন এবং আঙ্গিরস মুনিদের কাছে বিশ্বদেবগণ সম্বন্ধে দুটি সূক্ত পাঠ করে শোনাতে বলেন। এই সূক্ত পাঠ করলে যজ্ঞের শেষে স্বর্গে যাবার সময় এ'রা যজ্ঞের অবশিষ্ট সমস্ত ধন নাভাগকে দিয়ে যাবেন। যজ্ঞ শেষে এই ভাবে দান গ্রহণ করতে গেলে এক জন কৃষ্ণকায় পুরুষ এসে বাধা দিয়ে এই ধন দাবি করেন। নাভাগ আবার বাবাকে জানালে মনু বলেন ইনি রুদ্র, ইনিই দানের প্রকৃত অধিকারী। নাভাগ তখন রুদ্রকে সমস্ত ধন নিতে দেন। নাভাগের আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে রুদ্র এ'কে ধন এবং ব্রহ্মবিদ্যা দিয়ে অন্তর্হিত হন। ভাগবতে (৯।৪) মনুবংশে নভগের ছেলে নাভাগ। ভাইরা নাভাগকে বঞ্চিত করেছিলেন এবং পিতার দায়িত্বও এর ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন। কাহিনী বাকি অংশ অনুরূপ।

নাভি—আগ্নীধ্রের (দ্রঃ) ছেলে। স্ত্রী মেরুদেবী (দ্রঃ); ১০০ ছেলে। এদের মধ্যে পরিচিত ভরত থেকে দেশের নাম ভারতবর্ষ। নাভির কয়েকটি ছেলে কুশাবর্ত, ব্রহ্মাবর্ত, মলয়, কেতু, ভদ্রসেন, ইন্দ্রস্পৃক্, বিদর্ভ, কীকট, কবি, হরি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রমিড়, চমস, করভাজন। ভাগবতে (৫।৩।২০) নাভি যজ্ঞ করেন; নারায়ণ দেখা দেন এবং ঋষিদের প্রার্থনা মত ঋষভ (দ্রঃ) দেব নামে জন্মগ্রহণ করেন।

নামসঙ্গীতি—ইনি মঞ্জুশ্রী নামসঙ্গীতি নন। প্রজ্ঞাপারমিতার মত নামসঙ্গীতি হচ্ছেন শাস্ত্রের প্রতিমূর্তি। বর্ণনা থেকে বোঝা যায় ইনি একজন বোধিসত্ত্ব; বৈরোচন বংশ; কারণ শ্বেতবর্ণ। একমুখ, জটামুকুট, স্মেরানন, ছয়মুদ্রা অলঙ্কৃত, বার হাত। হাতে অভয়মুদ্রা, অঞ্জলিমুদ্রা, খড়্গ, তর্পণ মুদ্রা, অমৃতক্ষেপণ মুদ্রা, সমাধি মুদ্রা, খট্বাঙ্গ। পদ্মের ওপর বসে ধ্যান করছেন।

নায়নার—সংস্কৃত ন্যায় শব্দ থেকে গঠিত তামিল শব্দ। ন্যায় বা ধর্মের প্রতীক। শিবভক্ত একটি সম্প্রদায়। দ-ভারত।

নারদ—ব্রহ্মার মানস পুত্র; কোল থেকে জন্ম। প্রজা সৃষ্টি করতে অভিলাষী ব্রহ্মা তাঁর মন থেকে মরীচি, অত্রি, স্কন্দ প্রভৃতি ও পরে সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার, নারদ ও রুদ্রদেবকে সৃষ্টি করেন। নারদ সপ্তর্ষি নন, বেদে নাই। ইনি ত্রিকালদর্শী, বেদজ্ঞ এবং হরিভক্ত তপস্বী। তর্পণের জন্য ইনি সর্বদা জল (=নার) দান করতেন বলে বা অনাবৃষ্টির পর জন্ম বলে নাম নারদ। সঙ্গীতজ্ঞ।

ভাগবতে (১।৫) আছে পূর্ব কল্পে ব্রাহ্মণদের এক দাসীর গর্ভে জন্ম। ব্রাহ্মণদের সেবা করতেন ও এদের কাছে কৃষ্ণ নাম শুনতেন। ফলে কৃষ্ণকে হৃদয়ঙ্গম করেন; যেন ৫-বৎসর মত বয়সে। একদিন রাত থাকতে দুধ দুইতে বার হয়ে নারদের মা সর্প দংশনে মারা যান। মায়ের মৃত্যুতে সব কিছু ত্যাগ করে উত্তর দিকে বার হয়ে পড়লেন। যেতে যেতে এক ভয়ঙ্কর নির্জন বনে এক অশ্বত্থ গাছের নীচে ভগবানের ধ্যান। ধ্যানে হরির দেখা পান (১।৬।২০)। আরো অধীর হয়ে পড়েন। দৈববাণী হয় এ জন্মে আর দেখতে পাবেন না। হঠাৎ এরপর এইখানে মৃত্যু। হরির পার্ষদে পরিণত হন।

কল্পাবসানে নারায়ণ যখন সমুদ্র জলে শুয়ে ছিলেন তখন তাঁর নিশ্বাসের সঙ্গে নারদ তাঁর অন্তরে প্রবেশ করেন। সহস্র যুগ পরে প্রলয়ের শেষে যোগনিদ্রা থেকে উঠে নারায়ণ আবার সৃষ্টি করতে থাকলে তাঁর ইন্দ্রিয়/প্রাণ থেকে মরীচি, অত্রি ও ঋষিরা এবং নারদ জন্মান। সেই থেকে নারদ দেবদত্ত বীণায় হরিনাম করে সর্বত্র ঘুরে বেড়ান।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে নারদ ব্রহ্মার কণ্ঠ থেকে জন্মান। অন্য মানস পুত্রদের মত নারদকে ও ব্রহ্মা সৃষ্টির ভার দিয়েছিলেন ; মরীচি, সনক ইত্যাদির মত অবিবাহিত থাকতে পারবেন না। কিন্তু ঈশ্বর চিন্তায় বাধা পড়বে দেখে নারদ ব্রহ্মার আদেশ পালনে রাজি হলেন না ; বিয়ে করতে চাইলেন না। ব্রহ্মা তখন শাপ দেন নারদের জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পাবে ; ৫০টি মেয়েকে বিয়ে করতে হবে, গন্ধর্ব উপবর্হন নামে জন্মাতে হবে ; বিখ্যাত সঙ্গীত সাধক ও অদ্বিতীয় বীণা বাদক হবেন। মৃত্যুর পর দাসীপুত্র ও বিষ্ণু ভক্ত হয়ে জন্মাতে হবে। তার পর আবার ব্রহ্মার ছেলে হয়ে জন্মালে ব্রহ্মা তখন জ্ঞান দান করবেন। পুষ্কর হ্রদের তীরে গন্ধর্ব চিত্রকেতু সন্তানের আশায় শিবের তপস্যা করছিলেন। শিব এসে বর দেন নারদ তাঁর ছেলে হয়ে জন্মাবেন। উপবর্হন জন্মান, বিষ্ণু ভক্ত হন এবং হিমালয়ে তপস্যা করতে থাকেন। এক দিন যখন সমাধি মগ্ন ছিলেন সেই সময় চিত্ররথ গন্ধর্বের ৫০টি মেয়ে সেখানে আসেন এবং উপবর্হনের প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়েন। এদের গানে উপবর্হনের সমাধি ভেঙ্গে যায় ; ইনিও মুগ্ধ হয়ে এঁদের বিয়ে করে প্রাসাদে ফিরে আসেন। এক বার অপ্সরা ও গন্ধর্বেরা ব্রহ্মলোকে বিষ্ণুর নাম গান করার জন্য নিমন্ত্রিত হন। উপবর্হন ও যান এবং রম্ভাকে দেখে এত কামার্ত হয়ে পড়েন যে বীর্য স্খলিত হয়। প্রজাপতিরা এতে ক্রুদ্ধ হয়ে পড়েন ও মানুষ হয়ে জন্মাবার শাপ দেন। অন্য মতে মানুষ/দাসীপুত্র হয়ে জন্মাবার শাপ আগেই ছিল। উপবর্হন প্রাসাদে ফিরে এসে স্ত্রীদের সব কথা বলেন এবং মাটিতে কুশ বিছিয়ে শুয়ে পড়েন ও মারা যান। উপবর্হনের জ্যেষ্ঠা স্ত্রী মালতী ক্রুদ্ধ হয়ে ব্রহ্মা, যম ও মৃত্যুকে অভিশাপ দিতে যান ; এঁরা বিষ্ণুর কাছে ছুটে যান ; বিষ্ণু এদের তিন জনকে মালতীর কাছে পাঠান। এই সময় এক ব্রাহ্মণ এখানে আসেন এবং ব্রহ্মাকে উপবর্হনের মৃত্যুর কারণ জানতে চান। ব্রহ্মা বলেন আগের ব্যবস্থা অনুসারে এখনও হাজার বছর আয়ু রয়েছে : প্রজাপতিদের ক্রোধে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। ব্রাহ্মণ তখন বিষ্ণু রূপে প্রকাশ পান এবং উপবর্হনকে আশীর্বাদ করে বাঁচিয়ে দেন। ছেলে ও নাতিনাতনিদের নিয়ে উপবর্হন সুখে জীবন কাটাতে থাকেন। আয়ু শেষ হয়ে এলে উপবর্হন ও মালতী গঙ্গাতীরে কৃচ্ছ্র সাধন করতে থাকেন এবং উপবর্হন মারা গেলে মালতীও চিতায় প্রাণত্যাগ করেন।

কান্যকুব্জে দ্রুমিল নামে এক গোপরাজের স্ত্রী কলাবতী। সস্ত্রীক রাজা গঙ্গাতীরে সন্তানের জন্য তপস্যা করতেন। কশ্যপকে কলাবতী সন্তুষ্ট করেন এবং তাঁর আশীর্বাদে গর্ভ হয়। অন্য মতে কশ্যপ নামে এক ঋষি এক দিন মেনকাকে দেখে কামার্ত হয়ে বীর্যপাত করলে এই বীর্য পান করে কলাবতীর গর্ভ হয়। দ্রুমিল

এ দিকে ব্রাহ্মণদের সব কিছু দান করে বনে গিয়ে বাস করতে থাকেন এবং বনেতেই মারা যান। কলাবতী সহমরণে যাচ্ছিলেন কিন্তু দৈববাণী তাঁকে নিষেধ করে। কলাবতী তখন এক ব্রাহ্মণের গৃহে দাসী হয়ে বাস করতে থাকেন। যথা সময়ে একটি ছেলে হয়। দেশে অনাবৃষ্টি চলছিল ; ছেলেটি হতে প্রচুর বৃষ্টি হয় ; গৃহস্বামী এই জন্য নার-দ নাম রাখেন। এই ছেলে বড় হলে কলাবতীকে তাঁর পূর্ব জীবনের কথা জানান এবং বিষ্ণু ভক্ত হয়ে পড়েন। মায়ের আদেশে যোগীদের সেবায় নিযুক্ত হয়েছিলেন। যোগীদের আজ্ঞায় তাঁদের উচ্ছিষ্ট অন্ন এক বার আহার করায় নারদের শাপ মোচন হয়. চিত্তশুদ্ধি ও ধর্মে মতি আসে। এক দিন কলাবতী দুধ দুইতে গিয়ে অন্য মতে পথে সাপের কামড়ে মারা পড়েন। শিব ও শিবের তিন জন অনুচর এই সময় ছদ্মবেশে এসে নারদের বিষ্ণু ভক্তি ও দাস্যভাব দেখে অত্যন্ত খুসি হন। নারদ সঙ্গীতেও নিপূণ হয়ে ওঠেন এবং মহাদেব নারদকে ভাগবত শিক্ষা দিয়ে যান। ভগবান বিষ্ণু এক বার এসে ক্ষণিক দেখা দিয়ে গিয়েছিলেন এবং জানিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন নারদের অনুরাগ বাড়িয়ে দেবার জন্য এসেছিলেন; এবং সাধুদের সেবায় নিযুক্ত থাকলে ক্রমে নারদ ভগবানের পার্শ্বচর হতে পারবেন। নারদ তখন ভগবৎ চিন্তায় নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াতে থাকেন। গঙ্গা তীরে বহু দিন তপস্যা করে বিষ্ণুর ধ্যান করতে করতে নারদ মারা যান এবং ব্রহ্মে লীন হয়ে যান। কয়েক কল্প পরে ব্রহ্মা যখন আবার সৃষ্টি করতে থাকেন তখন তাঁর কণ্ঠ থেকে নারদ আবার জন্মান।

ব্রহ্মা এ বারও চেয়েছিলেন নারদ বিয়ে করুক। চতুরাশ্রমের মধ্যে দিয়েও মুক্তি পাওয়া যায় ইত্যাদি বোঝাতে থাকেন। মহর্ষি সৃঞ্জয়ের মালতী অপর নাম দময়ন্তী নামে একটি মেয়ে আছে। শিবের বর আছে এই জন্মে এদের বিয়ে হবে। নারদকে ব্রহ্মা নরনারায়ণের আশ্রমে যেতে বলেন ; নরনারায়ণ বিয়ের ব্যবস্থা করবেন। নারদ বাধ্য হন এবং পরে পর্বত মুনির সঙ্গে তীর্থযাত্রায়,পৃথিবী পরিক্রমায় বার হয়ে ঘুরতে ঘুরতে সৃঞ্জয় রাজার কাছে আসেন।

মহাভারতে (১২।৩০) মানুষান্ ভোগান্ ভুঞ্জানৌ লোভে পৃথিবীতে এসে ছিলেন। দেবী ভাগবতে (৬।২৬) পৃথিবীতে এসে বহু তীর্থ ঘুরে সৃঞ্জয়ের কাছে বর্ষার চারমাস কাটাবেন বলে দুজনে আসেন। সৃঞ্জয়ের স্ত্রী কৈকেয়ী, (৬।২৭) মেয়ে দময়ন্তী। রাজা এঁদের থাকবার ব্যবস্থা করে দেন. রাজার মেয়ে মদয়ন্তী/দময়ন্তী এদের পরিচর্যা করতে থাকেন এবং নারদের প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়েন। পর্বতমুনির সন্দেহ হয় ; নারদের কাছে কথাটি তুললে নারদ অকপটে স্বীকার করেন তিনি দময়ন্তীর প্রতি অত্যন্ত প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়েছেন। পর্বতমুনি তখন ক্রুদ্ধ হয়ে পড়েন। তীর্থযাত্রায় বার হবার সময় তাঁদের মধ্যে অঙ্গীকার ছিল কেউ কোন কথা গোপন রাখবেন না ; অথচ নারদ এ কথা এত দিন গোপন রেখে ছিলেন। নারদকে পর্বত মুনি শাপ দেন বানরে পরিণত হতে হবে। নারদ ও শাপ দেন পর্বতকে ; একশ বছর স্বর্গে যেতে পাবেন না, নরকে থাকতে হবে। এ দিকে সৃঞ্জয়ের মন্ত্রীরা অন্য বিয়ের ব্যবস্থা করতে বলেন; কিন্তু দময়ন্তীর পীড়াপীড়িতে

(দে-ভাগ) শেষ পর্যন্ত রাজা বানরের সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেন। একশ বছর/বহুদিন পরে পর্বত মুনি শাপমুক্ত হয়ে ফিরে এলে বানর রূপী নারদ পর্বতকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন এবং দময়ন্তীর জন্য (দে-ভাগ) করুণার্দ্র হয়ে নারদকে বানরত্ব থেকে মুক্তি দেন। রাজপ্রাসাদে নারদ বহু দিন সুখে কাটান এবং দময়ন্তী মারা গেলে নারদ ব্রহ্মলোকে ফিরে যান। মহাভারতে আছে পর্বত শাপ দিয়েছিলেন বিয়ে করলেই বানর মুখ হতে হবে এবং নারদ শাপ দিয়েছিলেন ন স্বর্গবাসমাপ্স্যসি (১২।৩০।২৬)। মহাভারতে আছে বহু দিন পরে দুজনের আবার দেখা হয় এবং দুজন দু জনকে শাপ মুক্ত করেন (মহা ১২।৩০।৩৭)। দ্রঃ-সৃঞ্জয়।

সৃষ্টির কাজ শেষ হয়ে গেলে ব্রহ্মার নির্দেশে দক্ষ (দ্রঃ) বীরণীকে বিয়ে করেন। বীরণীর ৫ হাজার ছেলে হয়; এঁদের নাম হর্যশ্ব। এরা বিয়ে করে সন্তানের জন্ম দিতে যাবেন এমন সময় নারদ এসে এদের পরামর্শ দেন পৃথিবীর সীমা আগে খুঁজে দেখতে। ফলে হর্যশ্বেরা চার দিকে বার হয়ে পড়েন এবং আর ফেরেন না। এর পর দক্ষ শবলাশ্ব নামে সন্তানদের জন্ম দেন। এঁদেরও নারদ আবার ঐ ভাবে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেন। দক্ষ আবার ৫-হাজার সন্তানের জন্ম দেন এবং এঁদেরও নারদ বিরাট বিশ্বে ছড়িয়ে দিলে দক্ষ/ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হয়ে নারদকে শাপ দেন দক্ষের ছেলেদের মত নারদও সারা জীবন পথে পথে ঘুরে বেড়াবে। কোন স্থায়ী আবাস থাকবে না এবং এক বার দক্ষের ছেলে হয়েও জন্মাতে হবে।

নারদ একবার কীট হয়ে জন্মান। এক বার নারদ যখন দ্বারকাতে ছিলেন তখন কৃষ্ণের সঙ্গে এক দিন বিমানে করে বার হন। পথে একটি নদী পড়ে; নারদ তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েন। কৃষ্ণ বলেন আগে স্নান করে তারপর যেন জল পান করেন। কিন্তু নারদ সে কথা না শুনে আগেই জল খান এবং সুন্দরী একটি রমণীতে পরিণত হন। কৃষ্ণকে আর দেখতে পান না। বনে বনে ঘুরতে ঘুরতে এক ঋষির আশ্রমে আসেন; বিয়ে হয় এবং ষাটটি ছেলে হয়। এর পর এক দিন এই ঋষি ও ছেলেগুলি সব মারা যান। নারদ শোকে কাতর হয়ে পড়েন; এদের শেষকৃত্য করতে হবে তাও সংযত হতে পারছিলেন না। এই সময় ভীষণ ক্ষিদে লাগে। কাছে একটা আম গাছ ছিল। ক্ষিধেতে এত অস্থির হয়ে পড়েন যে মৃত দেহগুলি পর পর গাদা করে তার ওপর উঠে আম পাড়েন। ইতিমধ্যে এক জন ব্রাহ্মণ এসে বলেন এই অবস্থায় স্নান না করে খাওয়া অনুচিত। রমণীটি তখন আমটি হাতে নিয়ে নদীতে গিয়ে ডুব দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের পূর্ব দেহ ফিরে পান। যে হাতটিতে আমটি ছিল সেই হাতটি উঁচু করে রেখেছিলেন. জল লাগেনি; হাতটি চুড়ি সমেত মেয়েছেলের হাত রূপেই থাকে। নদীর তীরে ব্রাহ্মণ কৃষ্ণে রূপান্তরিত হয়ে যান। কৃষ্ণ তখন আবার ডুব দিতে বলেন এবং নারদ সম্পূর্ণ ডুব দিয়ে উঠে আসেন; হাতটি এবার নিজের হাতে পরিণত হয় এবং হাতের আমটি বীণাতে পরিণত হয়। কৃষ্ণ বলেন ঐ ঋষি ছিলেন কাল পুরুষ। মায়া কি জিনিস নারদ এই ভাবে প্রত্যক্ষ করেন। আবার একবার মায়া কি জিনিস দেখতে চেয়েছিলেন। কৃষ্ণ জানান পরে দেখাবেন। এর

পর এক দিন পথে বেড়াতে বেড়াতে বৃষ্টি এলে নারদ কাছেই একটি কুঁড়ে ঘরে গিয়ে ওঠেন। এখানে একটি সুন্দরী যুবতী ছিল। একে দেখে নারদ মুগ্ধ হয়ে বহু বছর এর সঙ্গে বাস করতে থাকেন এবং অনেকগুলি সন্তান হয়। এর পর এক বন্যায় স্ত্রী ও সন্তানগুলি সব ভেসে যায়। নারদ শোকে কাতর হয়ে পড়েন। কৃষ্ণ এই সময় দেখা দিয়ে শোক করতে বারণ করেন; কারণ এ সব বৃথা। দ্রঃ- তালজঙ্ঘ, সুতপা।

কলি যখন পৃথিবীতে জাঁকিয়ে বসেছেন তখন কলির কীর্তি দেখবার জন্য নারদ সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াতে থাকেন। যমুনা তীরে কৃষ্ণের লীলাক্ষেত্রে একটি মেয়েকে দেখতে পান: মেয়েটির দুপাশে দুটি বৃদ্ধ অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে এবং মেয়েটি এদের জ্ঞান ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন নারদ দেখতে পান। আরো বহু মেয়ে পাশে ছিল তারাও এদের জ্ঞান ফিরিয়ে আনবার জন্য বাতাস করছিল ও মেয়েটিকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করছিল। নারদ এগিয়ে এসে মেয়েটির পরিচয় পান, তাঁর নাম ভক্তি এই দুটি বৃদ্ধ তাঁর ছেলে, একজনের নাম জ্ঞান ও আর এক জনের নাম বৈরাগ্য। বাকি যারা রয়েছেন এঁরা পুণ্যতোয়া নদী; ভক্তিকে সেবা করতে এসেছেন; মেয়েটি (ভাগ-মাহাত্ম্য ১।৪৮) বলেন দ্রাবিড়ে কর্ণাটকে তাঁর জন্ম। গুজরাটে গিয়েছিলেন; নাস্তিকরা কলির প্রভাবে তাঁর দেহ ক্ষত বিক্ষত করে দিয়েছিল; উপস্থিত অত্যন্ত দুর্বল। মেয়েটি আরো বলেন বৃন্দাবনে এসে নিজের যুবতী দেহ আবার ফিরে পেয়েছেন; কিন্তু এদের এখনও জ্ঞান হয় নি; এদের জন্য মেয়েটির দুঃখের সীমা নাই। মেয়েটি জানতে চান তাঁরা তিন জনে এক সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন; মা আবার যুবতী হল অথচ ছেলে দু'জন বৃদ্ধই রয়ে গেল এ রকম অসঙ্গতির কারণ কি। নারদ বেদাঙ্গ পড়ে শোনান কিন্তু কোন ফল হয় না। এই সময় ব্রহ্মের মানস পুত্রেরা সনক, সনন্দন, সনৎকুমার, সনৎসুজাত ইত্যাদি নারদকে ভাগবত পাঠ করতে বলেন। ভক্তির ছেলে দুটি আবার যুবাতে পরিণত হন (পদ্ম-পুরাণ)।

নারদের কাহিনীর যেন শেষ নাই। নারদ একবার কৌতূহলে কৃষ্ণকে পরীক্ষা করতে যান এবং কৃষ্ণকে (দ্রঃ) তাঁর প্রতিটি স্ত্রীর ঘরে যুগপৎ দেখতে পান। শ্রেষ্ঠ গায়ক হিসাবে নারদ একবার অত্যন্ত গর্বিত হয়ে ওঠেন। বিষ্ণু তখন এঁকে বনে এক জায়গায় নিয়ে যান, বহু সুন্দরী সুন্দরী মেয়ে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে; ছটপট করছে নারদকে দেখান। এরা নিজেদের পরিচয় দেয় এরা বিভিন্ন রাগিণী; নারদের হাতে তাদের এই দশা হয়েছে। নারদের তখন গর্ব নষ্ট হয়। দ্রঃ- গঙ্গা। নারদের সঙ্গে এক বার হনুমানের দেখা হয় এবং হনুমান, একটি গান শোনান। গান শুনতে শুনতে নারদ তাঁর বীণাটিকে একটি পাথরের ওপর রাখেন। গানে পাথরটি গলে গিয়েছিলে: বীণা এই গলা পাথরের মধ্যে ডুবে যায় এবং গান থামলে পাথরটি আবার জমে ওঠে এবং বীণাও এই পাথরের মধ্যে আটকে যায়। হনুমান তখন নারদকে বলেন গান গেয়ে পাথরকে গলিয়ে নিজের বীণা খুলে নিতে। নারদ চেষ্টা করে বিফল হন। হনুমান তখন আবার গান করেন; নারদ বীণা ফিরে পান এবং লজ্জায় ফিরে যান। ব্রহ্মার কাছে নারদ গান শিখেছিলেন। পরে বিষ্ণুর কাছে গন্ধর্ব তুম্বুরুর গান শুনে

নিজের সঙ্গীতজ্ঞান অপূর্ণ বুঝে বিষ্ণুর পরামর্শে উলূকেশ্বর গন্ধর্বের কাছে গান শেখেন। শেষকালে কৃষ্ণের দয়ায় জ্ঞান যোগ, গীতযোগ ও উপদেশামৃত শুনে ব্রহ্মানন্দ লাভ করেন। নারদ একবার বীণা বাজাতে বাজাতে বৈকুণ্ঠে এলে লক্ষ্মী দেবী সলজ্জ ভঙ্গিতে সেখান থেকে চলে যান। বিষ্ণুকে নারদ এর কারণ জানতে চান। বিষ্ণু বলেন মারকে সকলে সম্পূর্ণ জয় করতে পারে না ; লক্ষ্মীও পারেন নি ; নারদকে ভাল লেগে গেছে ফলে লজ্জায় উঠে গেছেন। নারদ এক বার সনৎকুমারের কাছে গিয়ে ব্রহ্ম বিদ্যা শিক্ষা করেন। ব্রহ্মা নারদকে হরে রাম, হরে রাম ষোলটি শব্দযুক্ত মন্ত্র শিক্ষা দেন, এই মন্ত্রে কলির প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া যায়। রামায়ণ রচনা করার জন্য রামের কাহিনী বাল্মীকিকে শুনিয়ে গিয়েছিলেন ; অর্থাৎ কাহিনী নারদের কাছে পাওয়া। সন্তানহীন ব্যাস একবার এঁর কাছে জানতে চান কি করলে সন্তান লাভ হবে। নারদ পরাশক্তির আরাধনা করতে বলেন। ব্যাস কৈলাসে গিয়ে আরাধনা করলে শুক জন্মলাভ করেন। কাহিনীর স্রোতের মধ্যে নারদ চমক এনে দিতেন। বৃকাসুর এক বার জানতে চান ত্রিমূর্তির মধ্যে কে আশু-তোষ ; নারদ জানান মহাদেব। অসুর তখন মহাদেবের তপস্যা করতে থাকেন। অগস্ত্যের (দ্রঃ) শাপে নারদের 'মহতী' মানুষের হাতের বীণায় পরিণত হয়। নারদ এক কল্পে কশ্যপ ও মুনির সন্তান গন্ধর্ব হয়ে জন্মান। দময়ন্তীর স্বয়ংবর হচ্ছে ইন্দ্রলোকে গিয়ে খবর দিয়েছিলেন (মহা ৩।৫১।১৮) ; সগরকে খবর দিয়েছিলেন ছেলেরা মারা গেছে (মহা ৩।১০৬।৪)।

দ্রৌপদীর বিয়ের পর নারদ এসে পাণ্ডবরা বিবাহিত জীবন কি ভাবে কাটাবেন ব্যবস্থা করে যান এবং সুন্দ-উপসুন্দের কাহিনী শুনিয়ে যান (মহা ১।২০০।৯)। প্রশ্নোত্তর ছলে যুধিষ্ঠিরকে বহু উপদেশ দিয়েছিলেন। ইন্দ্রপ্রস্থ নির্মাণের পর নারদ এসে ইন্দ্রের অমরাবতী, এবং ব্রহ্মা, যম ও বরুণের সভার বর্ণনা শুনিয়ে যান। সঙ্গে সুমুখ ও সৌম্য শিষ্য ছিল, (মহা ২।৫।২)। যুধিষ্ঠিরকে নানা কুশল প্রশ্ন করেছিলেন। নারদের এই প্রশ্নগুলি পুরাতত্ত্বের দিক থেকে অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং বলেন পাণ্ডু যমসভা থেকে বলে পাঠিয়েছেন যুধিষ্ঠির যেন রাজসূয় যজ্ঞ করেন। তারপর দাশার্হ নগরীতে যাবেন বলে বিদায় নেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে ছিলেন। পাণ্ডবরা বনে গেলে ধৃতরাষ্ট্রকে দেখা দিয়ে বলে যান দুর্যোধনের পাপে ১৩ বছর পরে সব শেষ হবে। মহাভারতে (৩।৮০) নারদ যুধিষ্ঠিরদের বনবাসের সময় দেখা দিয়ে তীর্থযাত্রার কথা তোলেন এবং ভীষ্মকে পুলস্ত্য যে সব তীর্থের কথা পিতৃব্রততে বলেছিলেন সেই সব তীর্থের কথা শুনিয়ে যান। স্বর্গ থেকে অর্জুন ফিরে এসে দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ দেখাতে গেলে নারদ এসে নিবারণ করেছিলেন।

কৌরব পক্ষ নিহত হলে নারদই বলরামকে গিয়ে খবর দিয়ে আসেন। কুন্তী ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর মৃত্যুর খবরও নারদ যুধিষ্ঠিরকে এনে দিয়ে ছিলেন। সাবিত্রীর পিতা অশ্বপতির কাছে সত্যবানের অল্পায়ুর কথা জানান এবং সাবিত্রীকেই সমর্থন করেছিলেন ফলে সাবিত্রীর সঙ্গে সত্যবানের বিয়ে হয়।

বীণা বাজিয়ে ত্রিভুবন ঘুরে সকলকে মোহিত করে বেড়াতেন। পরামর্শ দেওয়া, গোপন খবর জানিয়ে দেওয়া, ঘটকালি ইত্যাদিতে বিশেষ দক্ষ ছিলেন যেন।

প্রকর্তা কলহানাং চ নিত্যং চ কলহপ্রিয়ঃ (মহা ৯।৫৩।১৮)। শিবের বিয়ে দেওয়া, ধ্রুবকে তপস্যার মন্ত্র দেওয়া, দক্ষের দর্প চূর্ণ করার ব্যবস্থাও এঁর কাজ। দেব সভায় কংস বধের পরিকল্পনা হয়েছিল কংসকে সেটি জানিয়ে দেন; অনিরুদ্ধ বন্দী হয়েছেন কৃষ্ণকে খবর দেন। যে কোন গোপন খবর প্রকাশ করে দেবার যেন একটা দুর্বার চেষ্টা ছিল; ফলে গোলযোগ/কলহ বেড়ে যেত। নারদ মাতুল এবং পর্বত ঋষি ভাগনে (মহা- ১২।৩০।৬)। নারদের বাহন ঢেঁকি; কিন্তু শাস্ত্রে উল্লেখ নাই। নারদ স্মৃতি, নারদ রচনা বলে পরিচিত। বিশ্বসাহিত্যে এ রকম ভবঘুরে চরিত্র আর নাই। কেবল ভব ঘুরে নয়; ভূমার স্বাদ পেয়েছেন এবং অপরকে (হর্যশ্ব ইত্যাদিকে) ভূমার সন্ধান ও দিয়েছেন। ব্রহ্মার ও সংসারের মুখে তুড়ি মেরে বেড়িয়েছেন এই মহাবাউল। দ্রঃ- নলকূবর; কংস : বৃদ্ধকন্যা; কর্কোটক।

নারদ—বিশ্বামিত্রের এক ব্রহ্মবাদী ছেলে।

নারদী—বিশ্বামিত্রের এক ব্রহ্মবাদী ছেলে।

নারাচ—লৌহময় বাণ। বজ্র সমান এবং গিরীণাং দারণাঃ (৪।৫৪।১৫)

নারায়ণ—প্রলয়ের পর নারায়ণ অনন্ত শয্যায় যোগ নিদ্রায় শুয়ে ছিলেন। সেই সময়ে তাঁর হাজার মাথা, হাজার চোখ, হাজার হাত ও হাজার পা ছিল। এর পর এঁর নাভি থেকে সাত যোজন বিস্তীর্ণ এক পদ্ম ফুটে ওঠে। এই পদ্মে ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। জল=নার; জলে যে শুয়ে থাকেন। শতপথে পুরুষই নারায়ণ। ভাগবতে (২।১০।১০) অণ্ড ভেদ করে বার হয়ে এসে নার (জল) সৃষ্টি করে অবস্থান করেন; ফলে নাম নারায়ণ। দ্রঃ- বিষ্ণু, নরনারায়ণ। নারায়ণ গায়ত্রীঃ- ওঁ নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ।

নারায়ণপর্বত—বদরিকাশ্রমে একটি পাহাড়। অলকানন্দার বাম তীরে।

নারায়ণসর—সিন্ধু নদীর মোহনাতে একটি হ্রদ। কচ্ছের রানের প-প্রান্তে। লখপত থেকে ১৮ মাইল দ-পশ্চিম। দ্বারকার সমান পবিত্র। এখানে ৫-টি পবিত্র সরোবরঃ উত্তরে মানস, পূর্বে বিন্দু (ভুবনেশ্বর), দক্ষিণে পম্পা, পশ্চিমে নারায়ণ সর ও মধ্য অংশে পুষ্কর রয়েছে।

নারায়ণী সেনা—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যে দশ কোটি দুর্দ্ধর্ষ সেনা কৃষ্ণ (দ্রঃ) দুর্যোধনকে দিয়েছিলেন। কুরুক্ষেত্রে অর্জুন এদের নিহত করেন। নারায়ণী সেনা অর্থে কোন দিব্য ক্ষমতা যুক্ত নয়। এরা গোয়ালা (মহা ৫।৭।১৬)।

নারী—এরা পরজীবী। সব সময়ই যা পাবে আত্মসাৎ করবার জন্যই জন্ম। ফলে নিজেকে সাজিয়ে ও মিষ্টকথা বলে পুরুষের মনোরঞ্জন এদের একমাত্র ধর্ম। শাস্ত্রকারদের এটি জানা ছিল। ফলে ব্রহ্মণ্যধর্মে এদের সব সময়ই দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা।

ঋকৃবেদে উর্বশীর উক্তি এসেছে ঋষিদের গভীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। রামায়ণে নারী চরিত্রের পরিচয় আছে কৈকেয়ীর মধ্যে। অগস্ত্যের মুখেও বিদ্যুৎ চমকের মত দশ দিক উদ্ভাসিত করে ফুটে উঠেছিল এষা হি প্রকৃতিঃ স্ত্রীণাম্ আসৃষ্টেঃ রঘুনন্দন।

সমস্থম্ অনুরজ্যন্তি বিষমস্থম্ ত্যজন্তি চ ॥ শতহ্রদানাং লোলত্বং শস্ত্রাণাং তীক্ষ্ণতাং তথা। গরুড়ানিলয়োঃ শৈঘ্র্যম্ অনুগচ্ছন্তি যোষিতাঃ (রামাঃ ৩।১৩।৫)। মহাভারতে অষ্টাবক্রকে উত্তর দিক্ রূপী দেবী বলেন (১৩।২০।৬৬) নৈতা জানন্তি পিতরং ন কুলং ন চ মাতরম্ ন ভ্রাতৄন্ ন চ ভর্তারং ন পুত্রান্ ন চ দেবরান্। মহাভারতে (১৩।৩৮।২৫ ও ২৯) পঞ্চচূড় বলেছে নাগ্নিঃ তৃপ্যতি কাষ্ঠানাম্ নাপগানাং মহোদধিঃ। নান্তকঃ সর্বভূতানাম্ ন পুংসাং বামলোচনাঃ॥ অন্তকঃ শমনঃ মৃত্যুঃ পাতালঃ বড়বামুখম্। ক্ষুরধারা বিষং সর্পঃ বহ্নিঃ ইতি একতঃ স্ত্রিয়ঃ॥ নারী চরিত্রের স্বরূপ হিসাবে পুরাণকাররা দশমহাবিদ্যার (দ্রঃ) ও বর্ণনা দিয়ে গেছেন। এই পটভূমিতে চিন্তা করলে সীতা, দময়ন্তী বা দ্রৌপদী অবিশ্বাস্য মহাকাব্য। রামায়ণ ও মহাভারতের আকর্ষণ ও অনবদ্যতা এইখানে।

মা ও সন্তানের সম্পর্কও নিছক প্রয়োজনের সম্পর্ক। অনেক সময় অবিবেচনার পরিণামও। মহাভারতকার একথা হাড়ে হাড়ে জানতেন। ফলে ব্যাস ও কর্ণ। এই সেদিনও কবীর (?) বলেছেন দিন কা মোহিনী রাত কা বাঘিনী পলকে পলকে লহু চোষে। হর দুনিয়া বাউরা হোকর ঘর ঘর বাঘিনী পোষে। অর্থাৎ বেদ থেকে কবীর পর্যন্ত সকলেই সাবধান করে দিয়েছিলেন। তবু বৌদ্ধ সহজিয়ারা, তান্ত্রিকরা এবং সহজিয়া তথা গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা মেয়েদের সর্বোচ্চ স্থান দিতে গিয়ে বেদকে (উর্বশীর উক্তিকে) অস্বীকার করার পাপে আজ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেন।

মদ ও মেয়েদের নেশা ঝাঁঝাল নেশা। এর ওপর আধ্যাত্মিকতার রঙ দিতে দিতে এমন একটা অবস্থা আসে একদিন যে নারীকে আদর্শ করে তোলা হয়। নারীর প্রতি প্রেম ভগবানের প্রতি প্রেমের সমান বলে ঘোষণা করা হয়। নারীর সঙ্গে মিলনে অদ্বয় তত্ত্বের সন্ধানও পেতে থাকেন আচার্যরা। যৌন পরিতৃপ্তি দাঁতের যন্ত্রণার বা গোদের যন্ত্রণা নিবৃত্তি একই জিনিস। এই পরিতৃপ্তি আনন্দ নয়। একথা কেউ বুঝল না। এমন কি orgasin-কে আনন্দ বলে ঘোষণা করা হল। এই মতবাদের কবলে তান্ত্রিক বৌদ্ধরা ভেসে গেলেন। আউল, বাউল, সহজিয়া, তথা গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা এবং তান্ত্রিকরাও এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির মূর্তিমান বিগ্রহ। এই কারণেই ভাগবতে বস্ত্রহরণ, ও রাসলীলা। অবশ্য ভাগবতে গ্রন্থকার ঠিক কি বলতে চেয়েছেন স্পষ্ট নয়। নারী চরিত্র সম্বন্ধে আছে পতিং পুত্রং ভ্রাতরং বা ঘন্তি অর্থে ঘাতয়ন্তি চ (৬।১৮।১২); ১০ম অধ্যায়ে এই শাশ্বত নারী চরিত্রই গোপীদের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন: দেহই এদের সর্বস্ব, এরা একমাত্র জানে উত্তম্ভয়ন্ রতিপতিং নাগর এদের পরিতৃপ্ত করুক। আবার স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক মাৎস্য ন্যায়ের ভিত্তিতে একথা মানতে চাইলেন না; কিন্তু কার্যত নারীকে বেশ্যা করে তুলেছিলেন আচার্যরা। স্ত্রীসংসর্গ মলমূত্র ত্যাগের মত জীবনের একটা সত্য মাত্র। কিন্তু আচার্যেরা বুঝলেন না। জনমেজয়ের প্রতিবাদে শুকদেব সত্য কথাটাও বলতে পারলেন না ভাগবতে। জয়দেবের (দ্রঃ) মকমকানি এই মতবাদেরই সোচ্চার প্রকাশ। এই প্রশ্রয়েই আয়ান ঘোষের বিবাহিত স্ত্রী শ্বেতকেতু (দ্রঃ- উদ্দালক) ও মনুর শাসন ছুঁড়ে ফেলে দিতে সাহস করে।

পঞ্চচূড় এই ভাবে শবরী, ডোম্বী, চণ্ডালী বা রজকিনী রামীতে পরিণত হয়েছিল। পঞ্চচূড়ের বিবর্তনের দুটি ধারা। একটি ধারা ভৈরবী; আজও তান্ত্রিক সাধক হলে সংগ্রহ করতে হয়। এই ভৈরবীরা সাধনার সাময়িক উপকরণ এবং অর্থমূল্যে কেনা। আর এক ধারা বৈষ্ণবদের ইত্যাদির কণ্ঠীবদল করা হরিণী। এরা সাধারণতঃ জীবন সঙ্গিনী হয়ে সারা জীবন উজ্জ্বল রসের সন্ধান দেন; অবশ্য যদি ইতিমধ্যে উজ্জ্বলতর রসের প্রয়োজনে আবার কণ্ঠীবদল করতে না হয়। দ্রঃ- ধর্ম বৈষ্ণব, তন্ত্র। আবার ব্রাহ্মণ্য দৃষ্টিভঙ্গিতে উর্বশী বা পঞ্চচূড়কে হতে হবে বলা হয়েছে কার্যেষু দাসী করণেষু মন্ত্রী রূপে চ রম্ভা সহনে ধরিত্রী। ভোজে চ মাতা শয়নে তু বেশ্যা ষট্‌কর্ম যুক্তা খলু ধর্মপত্নী।

নারীতীর্থ—দ্রঃ-পঞ্চতীর্থ।

নালিক—এক জাতীয় বাণ।

নালন্দা—২৫°৫′ উ এবং ৮৫°২′ পূ। বরগাঁও। বক্তিয়ারপুর রাজগিরি রেল লাইনে একটি স্টেসন। রাজগিরের প্রায় ১০ কি-মি উত্তর পশ্চিমে। বিহার প্রদেশে; পাটনা জেলাতে। খৃ ১৩ শতকে বিখ্যাত বৌদ্ধ শিক্ষা কেন্দ্র ছিল। বিহারগ্রাম> বরগাঁও। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাটিতে বর্তমানে চাষ হচ্ছে। হিউ-এন-ৎসাঙ বলেছেন ইঁটের প্রাচীর ঘেরা সীমানার মধ্যে আটটি এলাকা ছিল; ভেতরে আসার একটি মাত্র দরজা ছিল। নালন্দা থেকে ৪ মাইল দ-পূ কালপিনাক গ্রামে (হিউ-এ-ৎসাঙ মতে) মতান্তরে রাজগৃহের কাছে নারদগ্রামে; আর এক মতে রাজগৃহ থেকে ৪ মাইল দূরে অলন্দতে সারিপুত্ত জন্মান। অর্থাৎ নারদগ্রাম—অলন্দ>নালন্দ যেন। পিতা ধর্মপতি, মা সারি. সাতটি ছেলের মধ্যে কনিষ্ঠ সারিপুত্ত; নালন্দাতেই দেহ রাখেন। শঙ্কর ও মুদ্‌গরগামী দুই ভাই মিলে সারিপুত্রের জন্মস্থানে বিখ্যাত বিহারটি নির্মাণ করিয়েছিলেন। হিউ-এন-ৎসাঙ বলেছেন রাজা শক্রাদিত্য নির্মাণ করিয়েছিলেন। নালন্দা বিহারে নাগার্জুন (১-২ খৃ শতকে বাস করতেন। বহু চীনা পরিব্রাজক ও হিউ-এন-ৎসাঙ ও ই-ৎসিঙ এখানে অধ্যয়ন করেছিলেন। নালন্দার বিখ্যাত মন্দিরটি বৌদ্ধগয়ার মন্দিরটির অনুরূপ; খৃ ১-শতকে বালাদিত্য নির্মিত। এখানে রাস্তার ধারে উত্তর দিক থেকে তৃতীয় স্তূপটি মনে হয় এই মন্দির। অপর মতে সারিপুত্তের যেখানে শেষকৃত্য করা হয়েছিল সেইখানে নালন্দা বিহারের উ-পশ্চিমে এই মন্দির নির্মিত হয়েছিল; ভেতরে বুদ্ধের একটি প্রতিমা ছিল। হিউ-এন-ৎসাঙ মতে ১০ হাজার, ই-ৎসিঙ মতে ৩ হাজারের কিছু বেশি ভিক্ষু এই বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি এলাকাতে ৬টি অট্টালিকাতে বাস করতেন। এই অট্টালিকাগুলিও ভারতে তুলনাহীন ছিল। বরগাঁও বলতে বড় গাঁও গ্রাম, বেগমপুর, মুস্তাফাপুর. কপতিহ ও আনন্দপুর। এগুলির মধ্য দিয়ে একটি বড় রাস্তা উত্তর থেকে দক্ষিণে গেছে। এই রাস্তার দু পাশে বহু ঢিপি ও বহু ইষ্টক ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে। বড় বড় ঢিপিগুলি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। উত্তর দিকের সব চেয় বড় ঢিপিটির কাছে একটি ঘেরা জায়গার মধ্যে একটি মস্তবড় এবং অত্যন্ত সুন্দর বুদ্ধমূর্তি রয়েছে, বুদ্ধগয়ার মূর্তিটির মত মূর্তি। এটি বালাদিত্য বিহারের দক্ষিণে তৃতীয় ঢিপিটি/মন্দিরের

মধ্যে ছিল। নালন্দাতে বহু অমূল্য ভাস্কর শিল্পের নিদর্শন ছড়ান রয়েছে। বিহারের দক্ষিণ-দিকে একটি পুষ্করিণীতে নালন্দা (নাগ/ড্রাগন) বাস করত। বর্তমানে এটি কাঁগিদ্য পুষ্করিণী। কুশীনগরে যাবার পথে নালন্দাতে পাবারিক আম্রবনে বুদ্ধদেব বাস করেছিলেন; এবং এই আম্রবনেই নালন্দা বিহার গড়ে ওঠে। বরগাঁওতে একটি সূর্য মন্দির এবং মহাবীরের একটি শ্রাবক মন্দির রয়েছে। মহাবীর এখানে ১৪-টি বর্ষা কাটান। একটি মতে বড়গাঁও হচ্ছে কুন্দনপুর; মহাবীরের জন্ম স্থান। মহাবীরের জন্ম স্থান কুন্দনপুর/কুন্দন গ্রাম বটে কিন্তু এটি বৈশালীর উপকণ্ঠে; অর্থাৎ নালন্দা/বড়গাঁওতে শ্রাবক-মন্দির এলাকাতে বহুদিন কাটিয়ে ছিলেন মাত্র। মহাবীর-শিষ্য উপালি এক জন গৃহপতি; বুদ্ধদেব এঁকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন। বিনয় পাঠকের লেখক অন্য ব্যক্তি। এই ঘটনার পর প্রবাদ মহাবীর এখান থেকে পাপাতে চলে যান এবং পাপাতে ভগ্নমনোরথে দেহ রক্ষা করেছিলেন। ই-ৎসিঙ (৭-ম শতকের শেষ দিকে) দেখেছেন এখানে দশটিরও বেশি পুষ্করিণী ছিল; একটি ঘণ্টা বাজালে হাজার হাজার ভিক্ষু এই সব পুষ্করিণীতে স্নান করতে আসতেন। নালন্দাতে ইতস্তত বহু বড় বড় পুষ্করিণী রয়েছে; এদের কিছু শুকিয়ে গেছে; বর্তমানে চাষ হচ্ছে। বৌদ্ধ যুগে ভারতে মোট ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয় ছিলঃ- নালন্দা, বিক্রমশিলা (দুটিই পূ-ভারতে), তক্ষশিলা, বল্লভি, ধনকটক ও কাঞ্চি/কঞ্জি ভরম। ৭-ম শতকে বিদর্ভে পদ্মপুরেও যেন একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। উজ্জয়িনী, তক্ষশিলা ও বারাণসী ব্রাহ্মণ্য বিশ্ববিদ্যালয়। তক্ষশিলার উত্তর সাধক হিসাবে নালন্দা গড়ে উঠেছিল এবং ১২ শতক পর্যন্ত বর্তমান ছিল। বুদ্ধ শিষ্য মৌদ্গল্যের জন্মস্থান কুলিক; বরগাঁও থেকে দ-পশ্চিমে ১-মাইল মত। নালন্দা ও রাজগিরের মধ্যে অম্বলখিকা নামে একটি পান্থশালা ছিল।

বুদ্ধদেব কয়েক বার নিজে এখানে এসেছিলেন। এখানে পাবরিকের আম্রকুঞ্জ তাঁর প্রিয় আবাস ছিল। সারিপুত্রের জন্মস্থান। মহারাজ অশোক এখানে সারিপুত্রের চৈত্যে উপাসনা করেছিলেন। নাগার্জুন (খৃ ২-শতক) এখানে প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। হিউ-এন-ৎসাঙ এখানে কয়েক বছর অধ্যয়ন করেন। খৃ ৫-শতকে গুপ্তরাজাদের সাহায্যে নালন্দাতে সমৃদ্ধির একটি পরম যুগ এসেছিল। প্রথম বিহারটি মনে হয় গুপ্ত যুগে প্রথম তৈরি হয় এবং পরে আটবার পুনর্নির্মিত হয়েছিল। গুপ্ত ও অন্যান্য রাজাদের এখানে সিলমোহর ইত্যাদি পাওয়া গেছে। একটি তাম্রপটে আছে সুবর্ণ দ্বীপের শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজা বান/বালপুত্রদেব একটি বিহার নির্মাণ করান এবং তাঁর অনুরোধে পালরাজ দেবপাল বিহারটির ব্যয় নির্বাহের জন্য পাঁচটি গ্রাম দান করেন। এখানে বুদ্ধদেবের ৮০ ফু উচ্চ একটি তাম্রমূর্তি নির্মাণেরও চেষ্টা হয়েছিল। সমগ্র বৌদ্ধ জগতে শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র হিসাবে এই সময়ে এর খ্যাতি ছড়িয়ে যায়। খৃ ১২-শ শতক পর্যন্ত এই খ্যাতি অক্ষুণ্ণ ছিল। জ্ঞানের সমস্ত শাখা, এমন কি হেতুবিদ্যা, শব্দবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা ও বেদও পড়ান হত। ৮ম থেকে ১২শ খৃ শতকে পাল রাজাদের বদান্যতায় আরো সমৃদ্ধ ও প্রখ্যাত হয়ে ওঠে। মহাযান ও

বজ্রযানের কেন্দ্রে পরিণত হয়। এখান থেকে শ্রমণরা দেশ বিদেশে বুদ্ধের বাণী নিয়ে যেতেন। ১২ শতকের শেষাংশে মুসলমান আক্রমণে নালন্দা ক্রমশ বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যেতে থাকে। এখানে বহু বিহার ও বহু মন্দির ছিল। প্রধান মন্দিরটি প্রথমে ছোট ছিল। পরে পর পর ছ বার পরিবর্তনের ফলে বিরাট আকার হয়। ৪-র্থ বারের পরিবর্ধিত মন্দির গাত্রে চূণা নির্মিত সারি সারি বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব মূর্তি সাজান। এখানে সংঘ মন্দিরগুলিতে যে সব মূর্তি পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য অবলোকিতেশ্বর, বজ্রপাণি, মঞ্জুশ্রী, জম্ভল, ত্রৈলোক্যবিজয়, যমান্তক, তারা, প্রজ্ঞাপারমিতা, মারীচী, হারিতী, অপরাজিতা ও মহামায়ূরী। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মূর্তি হিসাবে বিষ্ণু, বলরাম, সূর্য, রেবন্ত, ও গণেশ পাওয়া যায়। দ্রঃ-বৌদ্ধধর্ম।

নাসত্য—অশ্বরূপধারী সূর্য (দ্রঃ) উত্তর কুরুতে এসে বড়বা রূপধারিণী স্ত্রী সংজ্ঞার (দ্রঃ) সঙ্গে মিলিত হতে যান। পর পুরুষ আশঙ্কায় সংজ্ঞা ঘুরে দাঁড়ান। দু জনে পরস্পরের নাসিকা স্পর্শ করেন এবং মুখ ও নাসিকা থেকে নাসত্য ও দস্রের জন্ম হয়। রেতঃ থেকে রেবন্ত (গুহ্যকাধিপতি) জন্মান। অশ্বিনী কুমার (দ্রঃ)।

নাসিক—মহারাষ্ট্রে একটি জেলা ; ১৯°৩৫′-২০°৫৩′ উত্তর এবং ৭৩°১৫′-৭৪°৫৬′ পূর্ব। নাসিক্য, সুগন্ধা, পঞ্চবটী (দ্রঃ)। টলেমি নাসিক উল্লেখ করেছেন। নাসিক জেলা প্রাচীন গোবর্ধন।

কয়েকটি গ্রাম ছাড়া সমস্ত জেলাটি একটি মালভূমি। সমুদ্র থেকে ৪০-৬০ মি ওপরে। প্রধান নদী গোদাবরী ; অন্যগুলি গোদাবরীর উপনদী এবং গিরনা ইত্যাদি নদী রয়েছে। জেলাতে তিনটি প্রধান বিভাগ ; প্রাচীনতম পঞ্চবটী ; গোদাবরীর পূর্ব তটে। বহু মতে এটি রামায়ণের পঞ্চবটী। পতঞ্জলে, বৃহৎসংহিতায়, বায়ুপুরাণে, বরাহপুরাণে, নন্দিসূত্র ইত্যাদিতে এর উল্লেখ রয়েছে।

নাসিক থেকে ৮ কি-মি দূরে অতীত নাম ত্রিরশ্মি পাহাড়ের ২৪-টি গুহা পাণ্ডবদের গুহা বা পাণ্ডুলেন নামে ও পরিচিত। এই গুহাগুলির অধিকাংশ গুহা খৃ ২ শতকের সৃষ্টি। এগুলি বৌদ্ধ বিহার/চৈত্যগৃহ। অলংকরণ স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য ইত্যাদিতে তুলনাহীন।

নিকই—গ্রীক নাম। বা নিকোইয়া। বর্তমানে মঙ্গ বা মুঙ্গ। পাঞ্জাবে ঝিলম নদীর তীরে একটি সহর। এইখানে পুরু আলেকজান্দারের যুদ্ধ হয়েছিল এবং যুদ্ধের স্থানে আলেকজান্দার এই নগরী নির্মাণ করে ছিলেন। অন্য মতে যুদ্ধ হয়েছিল ডিতি সহরে এবং এখানে বিজয় স্তম্ভ হিসাবে পেতলের একটি থামও ছিল।

নিকষা—অন্য নাম কৈকসী। সুমালি (দ্রঃ) রাক্ষসের মেয়ে ; মায়ের নাম কেতুমতী। লঙ্কা রাক্ষসদের আবাস স্থল ছিল। কিন্তু বিষ্ণুর কাছে হেরে গিয়ে রাক্ষসরা পাতালে পালিয়ে যায়। সুমালি তাঁর মেয়ের বিয়ের জন্য পাতাল থেকে বার হয়ে আসেন এবং বিষ্ণুকে দমন করতে পারে এমন এক নাতির আশায় অন্য মতে কুবেরের ঐশ্বর্য দেখে কুবেরের পিতা বিশ্রবাকে বিয়ে করতে বলেন। রামায়ণে নিকষা পূর্ণচন্দ্রনিভাননা। তপস্যারত বিশ্রবার কাছে গিয়ে নিকষা অধোমুখে মাটিতে আঙুল দিয়ে দাগ দিতে

থাকেন। বিশ্রবা তখন নিকষার পরিচয় ও আসার কারণ জানতে চাইলে নিজের পরিচয় দেন এবং এখানে আসার কারণ ধ্যানে জেনে নিতে বলেন। বিশ্রবা নিকষার আসার কারণ জানতে পারেন। মহর্ষি বলেন প্রদোষ কালে নিকষা এসেছেন বলে তাঁর ছেলেরা রাক্ষস হবে। নিকষার অনুনয়ে শেষ পর্যন্ত বলেন ছোট ছেলে রাক্ষস হলেও ধার্মিক হবে। নিকষার সন্তান যথাক্রমে রাবণ, কুম্ভকর্ণ, শূর্পণখা ও বিভীষণ (রাম ৭।৯।৩৮)। এরা সকলেই ঐ আশ্রমে বড় হতে থাকে। এরপর একদিন কুবের পিতার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। সপত্নী পুত্র কুবেরের ঐশ্বর্য্য দেখে ঈর্ষায় নিকষা ছেলেদের তপস্যা করে কুবেরের মত তেজ ও ঐশ্বর্য্য পেতে বলেছিলেন। রাবণ মাকে সান্ত্বনা দিয়ে প্রতিজ্ঞা করেন কুবেরের মত বা আরো বড় হবেন। এরপর রাবণেরা তিন ভাই গোকর্ণ আশ্রমে তপস্যা করতে যান। মহাভারতে কুবের বিশ্রবার সেবা পরিচর্যা করবার জন্য পুষ্পোৎকটা, রাকা ও মালিনী তিন জন রাক্ষসীকে পাঠান। পুষ্পোৎকটার ছেলে হয় রাবণ ও কুম্ভকর্ণ ; মালিনীর ছেলে বিভীষণ, এবং রাকার যমজ সন্তান খর ও শূর্পণখা (মহা ৩।২৫৯।৩-৮)।

নিকায়—পালি ত্রিপিটকের অন্তর্গত সূত্রপিটকের সমগ্র সূত্রসংগ্রহ অংশ। এই নিকায় ৫-ভাগে বিভক্ত। সংস্কৃত বৌদ্ধশাস্ত্রে নিকায়গুলিকে আগম বলা হয়। (১) দীর্ঘ নিকায় =দীর্ঘাগম—বুদ্ধের উপদিষ্ট দীর্ঘাকার সূত্রগুলি সন্নিবেশিত গ্রন্থ। (২) মজ্‌ঝিম্ নিকায়=মধ্যাগম—এই ভাগে নিকায়গুলি নাতি দীর্ঘ ও নাতি হ্রস্ব। (৩) সংযুক্তি নিকায়—বিষয়বস্তুর দিকে সঙ্গতি রেখে অধ্যায় সমূহ ভাগ করা হয়েছে ফলে এই নাম ; (৪) অঙ্গুত্তর নিকায়—অঙ্গ-উত্তর নিকায়—বুদ্ধোপদিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ক কথোপ কথন ও উপদেশাবলী উত্তর ও প্রত্যুত্তর হিসাবে সাজান ; ফলে এই নাম। গ্রন্থটি ত্রিপিটকের সার সংগ্রহ। (৫) খুদ্দক নিকায়—ছোট ছোট সূত্র ও শ্লোক সংগ্রহ।

নিকুম্ভ (১) কুম্ভকর্ণের ঔরসে স্ত্রী বজ্রমালার একটি ছেলে ; অপর ছেলে কুম্ভ। নিকুম্ভ রামের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন এবং হনুমানের হাতে মারা যান। (২) এক জন অসুর। হরিবংশ মতে শিবের বর ছিল বিষ্ণুর হাতে মারা যাবেন। বরে তিনটি দেহ পেয়েছিলেন। কৃষ্ণের বন্ধু ব্রহ্মদত্তের মেয়ে ভানুমতীকে হরণ করলে একটি দেহ কৃষ্ণের হাতে মারা পড়ে (হরি ২।৮৫।৬১)। নিকুম্ভের দ্বিতীয় শরীর ষট্‌পুরে : তৃতীয় শরীর দিতির সেবায় নিযুক্ত। এই নিকুম্ভের ভাই বজ্রনাভের (দ্রঃ) মেয়ে পদ্মাবতী (২।৯০। ৪)। দ্রঃ- ভানুমতী। (৩) জনৈক গণেশ্বর (হরি ১।২৯।৪৭)। মহাদেব কিছু দিন শ্বশুর বাড়িতে ছিলেন। মেনকা বিরক্ত হতে থাকেন, মেয়ে জামাইকে নিন্দা করতে থাকেন। উমা ফলে নিজেদের বাড়িতে চলে যেতে চান। মহাদেব সারা পৃথিবী পর্যবেক্ষণ করে বারাণসীকে পছন্দ করেন ও গণেশ্বরকে বলেন বারাণসীর রাজা দিবোদাস অত্যন্ত শক্তি-শালী, কোন একটা মৃদু উপায়ে বারাণসীকে জনশূন্য করে দিতে। নিকুম্ভ বারাণসীতে এসে কণ্ডুক নাপিতকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে নগরীর প্রান্তে তাঁর মূর্তি স্থাপন করতে বলেন। কণ্ডুক তাই করে ; রাজাকে জানায় ; আড়ম্বরে পূজা হতে থাকে এবং গণেশ্বর সকলের বাসনা পূর্ণ করে দিতে থাকেন।

রাজা দিবোদাসের স্ত্রী সুযশা এ'কে বহু দিন পূজা করলেও কোন সন্তান হয় নি। রাজা তখন রাগে নিকুম্ভ বিগ্রহ ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেন। নিকুম্ভ তখন শাপ দেন বারাণসীও ধ্বংস হবে। এই শাপের জন্যই তালজঙ্ঘ ইত্যাদির আক্রমণে কাশী (দ্রঃ) ধ্বংস হয় এবং দিবোদাস পালিয়ে যান। পরে আবার নিকুম্ভ মন্দির তৈরি করা হয় ; কাশীও আবার সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। (৪) প্রহ্লাদের তৃতীয় সন্তান। (৫) হিরণ্যকশিপু বংশে এক জন দৈত্য ; ছেলে সুন্দ, উপসুন্দ।

নিকুম্ভিলা—লঙ্কাতে একটি উপবন : ইন্দ্রজিৎ এখানে যজ্ঞ করে যুদ্ধে যেতেন। বিভীষণের সাহায্যে লক্ষ্মণ এখানে এসে যজ্ঞ কালে ইন্দ্রজিৎকে বধ করেন।

নিকেত—একটি পুণ্যস্থান। এখানে বিশ্রবা মুনির ছেলে কুবের জন্মান (মহা ৩।৮৭।৩)।

নিকৃন্তন—মার্কণ্ডেয় পুরাণে (১২।১৫) একটি নরক। এখানে কুলাল চক্রে বসিয়ে পাপীকে একটানা ঘোরাতে থাকে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কালসূত্রেণ ছিন্নভিন্ন হতে থাকে। খণ্ড অংশগুলি আবার এক সঙ্গে জুড়ে যায়।

নিক্ষুভা—একজন অপ্সরা। মিহির গোত্রে এক ব্রাহ্মণ, নাম সুজিহ্ব ; সূর্যের শাপে নিক্ষুভা এ'র মেয়ে হয়ে জন্মান। পিতার নির্দেশে নিক্ষুভা সব সময় অগ্নি প্রজ্বলিত রাখতেন। এক দিন এই আগুন হঠাৎ জ্বল জ্বল করে জ্বলে ওঠে ; নিক্ষুভার সৌন্দর্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এবং সূর্য মুগ্ধ হয়ে যান। পর দিন সূর্য এসে সুজিহ্বকে জানান এই মেয়েকে তিনি বিয়ে করেছেন ; নিক্ষুভা গর্ভবতী হয়েছেন। সুজিহ্ব এতে রেগে গিয়ে মেয়েকে শাপ দেন তার সন্তানদের সকলে ঘৃণা করবে। সূর্য নিক্ষুভাকে সান্ত্বনা দেন ঘৃণা করলেও এরা সুশিক্ষিত ও পণ্ডিত হবে এবং অগ্নির আরাধনা করতে পারবে। সূর্যের ঔরসে নিক্ষুভার অনেকগুলি ছেলে হয়েছিল। ভোজ পরিবারে এই ছেলেদের বিয়ে হয়েছিল। নিক্ষুভা যখন শক দ্বীপে বাস করতেন সেই সময়ে কৃষ্ণের ছেলে সাম্ব নিক্ষুভার ছেলেদের সাম্বপুরে সূর্য মন্দিরে পূজা করাবার জন্য পাঠান (ভবিষ্য-পু)।

নিগলিভ—কপিলাবস্তু (দ্রঃ)। পাদেরিয়া (= লুম্বিনি উদ্যান) থেকে ৮-মাইল উ-পশ্চিমে। একটি মতে নিগলিভ-তে কপিলাবস্তুর ধ্বংসাবশেষ পড়ে রয়েছে।

নিঘণ্টু—অর্থ শব্দ সংগ্রহ। সাধারণত বোঝায় বৈদিক শব্দ সংগ্রহ। এর ব্যাখ্যা/টীকার নাম নিরুক্তি। বহু নিঘণ্টু রচিত হয়েছিল মনে হয়। একটি মাত্র নিঘণ্টু এবং যাস্ক কৃত এর নিরুক্তই বর্তমানে পাওয়া যায়। কিছু মতে এই নিঘণ্টুটি যাস্ক দ্বারা সংকলিত।

নিঘ্ন—দ্রঃ- সত্রাজিৎ।

নিচাক্ষ—নিচৈরাখ্য (কালিদাস), নিছয় গিরি। দেবী পুরাণে একটি পর্বত। দ্রঃ- ভোজপুর পর্বত। ভূপাল রাজ্যে।

নিত্যা—একজন শক্তি দেবী। এ'কে আবার হরিতার (দ্রঃ) অনুচরী বা যোগিনী বলা হয়েছে। শশীভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন নিত্যা সহজিয়াদের মূল দেবী। এ'র নির্দেশে বাশুলী মানুষের কাছে প্রেমের নিজস্ব রূপটি চণ্ডীদাস মাধ্যমে প্রচার করেছিলেন।

সহজিয়া মতে এই প্রেম সত্য। স্থরিতার অষ্টশক্তি নিরঞ্জনী, ক্লিন্না, ক্লেদিনী, মানাতুরা, মদগর্বা, দ্রবিণী, দ্রাবিণী ও নিত্যা।

নিধি—কুবেরের নয়টি রত্ন। এদের নাম, পদ্ম, শঙ্খ, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, শঙ্খ, কুন্দ, খর্ব ও নীল। দ্র:- পদ্মিনী বিদ্যা।

নিধ্রুব—কশ্যপ বংশে ঋষি 'বৎসার' ছেলে। স্ত্রী, চ্যবন সুকন্যার মেয়ে, সুমেধস্। অনেকগুলি ছেলে নাম কুণ্ডপায়িন্ (বায়ু-পু)।

নিবাতকবচ—হিরণ্যকশিপুর ছেলে সংহ্লাদের বংশ (ভাগ ৩।১০৪)। সংখ্যায় এঁরা তিন কোটি। এঁদের কবচ, বাতহীন; অর্থাৎ অভেদ্য। তপস্যা ও কৃচ্ছ্র সাধন করে নিজেদের জীবন এঁরা পবিত্র করে ছিলেন। ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করে সমুদ্রের নীচে মণিমতী নগরীতে বাস করার ও দেবতাদের অবধ্য হবার বর পান। এই পুরী আগে ইন্দ্রের ছিল (মহা ৩।১৬৯।২৮), নাম মণিমতী। ব্রহ্মা বলে দিয়েছিলেন বিধাতার বিধান অনুসারে ইন্দ্র অন্য দেহ অবলম্বন করে এই নিবাতকবচদের নিহত করবেন। নিবাতকবচ ও কালকেয়রা মিলে বিরাট একটা দল গড়ে তুলেছিলেন। রাবণ (দ্রঃ) এক বার এঁদের নগরী আক্রমণ করেন; ভীষণ যুদ্ধ হয়: এবং শেষ অবধি দু দলে মিত্রতা স্থাপন করেন। পরে সারা পৃথিবী নাশের কারণ হয়ে পড়েন ও দেবতাদের ওপর অত্যাচার করতে থাকেন। স্বর্গে অস্ত্র-শিক্ষা করে অর্জুন গুরু দক্ষিণা দিতে চাইলে ইন্দ্র এঁদের নিধন করতে বলেন। মাতলি চালিত রথে ভীষণ যুদ্ধে অর্জুন এঁদের প্রায় সকলকে নিহত করেন। রামায়ণ অনুসারে বিষ্ণুর হাতে নিহত।

নিবৃত্তি—পুণ্ড্র (দ্রঃ) দেশের পূর্ব অর্দ্ধেক। দিনাজপুর, রঙপুর ও কুচবিহার মিলে। প্রধান সহর বর্দ্ধনকুটি—পুণ্ড্রবর্দ্ধন। গৌড়কেও নিবৃত্তি বলা হয়েছে।

নির্বিন্ধ্যা—নিউজ (জম-নির্রি)। চম্বলের একটি করদা নদী; মালবে বেত্রবতী ও সিন্ধুর মধ্য অংশে। মালবে কালিসিন্ধু নদী।

নিমি—সূর্য বংশে ইক্ষ্বাকুর দ্বাদশ-তম পুত্র; মোট ১০০ ছেলে। দে-ভাগবতে নিমির (৬।১৩) ১২ ছেলে। নিমির পুরের নাম বৈজয়ন্ত। কাছেই গৌতম থাকতেন। দে-ভাগবতে (৬।১৪) জয়ন্তপুর ব্রাহ্মণায় নির্মাণ করেদেন; এবং ৫০০০ বছর ব্যাপী জগদম্বিকা যজ্ঞ করবেন স্থির করেন। বশিষ্ঠ পুরোহিত। অত্রি, অঙ্গিরস, ভৃগু ইত্যাদিকেও ডাকেন। কিন্তু বশিষ্ঠ কিছু দিন অপেক্ষা করতে বলেন; ইন্দ্রের যজ্ঞ শেষে (দেবী ভাগবতে ৫০০ বর্ষ ব্যাপী পরাশক্তি মখ) নিমির যজ্ঞ করবেন। নিমি অপেক্ষা করেন না; গৌতম পুরোহিত হন (ভাগবতে অপর এক জন পুরোহিত)। হিমালয়ের পাশে নিজের পুরের সমীপত যজ্ঞ করেন। দে-ভাগবতে হিমালয়ের পাশে সাগরের সমীপে যজ্ঞ হয়েছিল। ইন্দ্রের যজ্ঞের শেষে বশিষ্ঠ আসেন এবং গৌতম যজ্ঞ করছেন দেখে রেগে যান। রাজার সঙ্গে দেখা করবার জন্য মুহূর্তকাল বসেন (৭।৫৫।১৫)। রাজা কিন্তু এ সময় গাঢ় ঘুমে অভিভূত ছিলেন। বশিষ্ঠ আরো রেগে যান এবং শাপ দেন চিরদিন চেতনেন বিনাভূত হয়ে থাকবে। রাজার ঘুম

ভাঙলে শাপ শুনে বলেন ঘুমিয়ে ছিলেন বলেই বশিষ্ঠ এসেছিলেন জানতে পারেন নি, বশিষ্ঠও অনুরূপ ভাবে অচেতন হয়ে পড়ে থাকবেন। দ্রঃ-মিত্রাবরুণ, বশিষ্ঠ।

এদিকে নিমির দেহ চেতনহীন হয়ে পড়ে থাকতে দেখে ঋষিরা যোগদীক্ষা আরম্ভ করেন এবং রাজার দেহ রক্ষা করেন। দেবী ভাগবতে (৬-১৫) মন্ত্রাদি সাহায্যে কোন মতে শ্বাসপ্রশ্বাস সম্বল করে বাঁচিয়ে রাখেন। যজ্ঞ শেষে ভৃগু জানান রাজার চেতনা ফিরে আসবে। প্রীত দেবতারাও নিমির চেতঃকে জিজ্ঞাসা করেন কোথায় সে অবস্থান করতে চায়। নিমির চেতঃ জানায় সর্বভূতানাম্ নেত্রেষু। এই জন্যই সকলের চোখে নিমেষ পড়ে। দেবী ভাগবতে দেবতারা নিমিকে বলেছিলেন দেবীকে ডাকতে; দেবী এসে তথাস্তু বলে বর দিয়েছিলেন। এর পর ঋষিরা নিমির দেহ অরণি যোগে মন্ত্রহোমৈঃ মন্থন করতে থাকেন ফলে এক সন্তান হয়। এর নাম মিথি (মন্থন জাত) বা জনক (মৃত দেহ জাত) বা বিদেহ। ইনিই মিথিলা নগরী স্থাপন করেন; এই বংশই জনক বংশ বলে পরিচিত। সীতার জন্ম এই বংশে।

বিভিন্ন পাঠে দেখা যায় নিমির নগর বৈজয়ন্ত নগর; ব্রাহ্মণদের জন্য গৌতম আশ্রমের কাছে জয়ন্তপুর নগরী তৈরি করে দিয়েছিলেন। যজ্ঞে বামদেব, পুলস্ত্য, পুলহ, ঋচীক ও এসেছিলেন। গৌতম পুত্র শতানন্দ পুরোহিত হয়েছিলেন। বশিষ্ঠ এলে অনুচরেরা রাজার ঘুম ভাঙায়; তিনি বশিষ্ঠের পায়ে ধরেন। নিমি যজ্ঞ স্থানে এসে সব জানিয়ে দেহত্যাগ করেন। রাজার দেহ তেল, ঔষধ ও মন্ত্র দিয়ে রক্ষা করে যজ্ঞ শেষ করা হয়। দেবতারা নর বা দেব দেহ দিতে চান। নিমি (ভাগ ৯।১৩) কোন বন্ধন নিতে চান নি। তখন বর পান প্রাণীদের চোখে নিমেষ হিসাবে বাস। (২) দত্তাত্রেয়ের এক ছেলে। (৩) বিদর্ভ রাজের এক ছেলে: মেয়েকে অগস্ত্যের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে স্বর্গে যান।

নিমেষ—গরুড়ের এক ছেলে। দ্রঃ-নিমি।

নিম্বার্ক—এ'র প্রচারিত মতবাদঃ স্বাভাবিক দ্বৈতাদ্বৈত বাদ।

নিয়তি—বিধাতার স্ত্রী; ছেলে প্রাণ। প্রাণ মৃকণ্ডু মার্কণ্ডেয়।

নিয়াপ্রাকৃত—এসিয়াতে খোতন দেশের সীমান্তে প্রাপ্ত প্রত্নলিপির ভাষা। বেশির ভাগ পাওয়া যায় নিয়া নামক স্থানে; ফলে নাম নিয়াপ্রাকৃত। অশোকের পর কাবুল, কান্দাহার ও পেশোয়ারে খরোষ্ঠী অক্ষরে যে ভাষা প্রচলিত ছিল তারই জ্ঞাতি ভাই। নিয়া প্রত্নলিপিগুলি সবই খরোষ্ঠীতে লেখা; দুটিতে কেবল ব্রাহ্মীলিপি। এটি কথ্য ভাষা মিশ্রিত সাধুভাষা।

নিরঞ্জন—ধর্ম ঠাকুরকে বহু জায়গায় নিরঞ্জন বলা হয়েছে। বৌদ্ধ সাহিত্যে বিশেষণটি বহু ব্যবহৃত। নাথ, বাউল ও সুফিরাও শব্দটি বহু বার কাজে লাগিয়েছেন।

নিরমিত্র—নকুলের ও করেণুমতির ছেলে। (২) এক জন ত্রিগর্ত রাজ; সহদেবের হাতে মারা যান।

নিরুক্ত—দ্রঃ- নিঘণ্টু। যাস্ক লিখিত বৈদিক অভিধান। বেদের কঠিন শব্দের বিশ্লেষণ, প্রয়োগ ও অর্থ এই গ্রন্থে দেওয়া আছে। মোটামুটি ২৫০০ বৈদিক শব্দের আলোচনা।

গ্রন্থটিতে ১২টি অধ্যায় ; প্রতি অধ্যায় ৪টি পাদ ; প্রতিপাদে একাধিক খণ্ড। প্রথম অধ্যায়ে শব্দশাস্ত্রের সাধারণ বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। ২য় ও ৩য় অধ্যায়ে একার্থ-বোধক শব্দগুলির নিঘণ্ট। ৪র্থ-৬ষ্ঠ অধ্যায়ে কঠিন শব্দগুলির অর্থ। ৭ম-১২শ অধ্যায়গুলি শেষ ছয় কাণ্ড নামে পরিচিত এবং এগুলি এক সঙ্গে দৈবত কাণ্ড নামে অভিহিত। ১৩শ-১৪শ অধ্যায় গ্রন্থটির পরিশিষ্ট।

নিঋ´তি—(১) বৈদিক দেবী ; মৃত্যুর। শতপথে কৃষ্ণবর্ণা ও ঘোরা। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৪।১৭) পাশহস্তা। মহাভারতে (১।৬০ ৫২) এর সন্তান নৈঋ'ত।

(২) একজন দিকপাল ; দ-পশ্চিম কোণে। এক জন রুদ্রও বটে। ব্রহ্মার ছেলে স্থাণুর পুত্র। রাক্ষসেশ্বর। রক্ষকূট পাহাড়ে বাস। জটাজুটধারী ; হাতে তরবারি। কালিকা পুরাণে (৭৯।৬০) রাক্ষসেশ্বর। খড়্গহস্ত, বামে চর্মধরঃ তথা জটাজুটধর, প্রাংশু, কৃষ্ণাচলোপম, দুহাত, কৃষ্ণবাস, গর্দভ বাহন।

(৩) অধর্মের স্ত্রী। তিন ছেলে ভয়, মহাভয় ও অন্তক। মার্কণ্ডেয় পুরাণে হিংসা+অধর্ম>অনৃত+নিঋ'তি>ভয়, নরক (৫০।২৯) এবং মেয়ে মায়া ও বেদনা। মায়া>মৃত্যু। বেদনা+নরক>দুঃখ। মৃত্যু+নিঋ'তি (অলক্ষ্মী) >১৪টি ছেলে। ব্যাধি, জরা, শোক, তৃষ্ণা এবং ক্রোধ ও মৃত্যুর সন্তান।

(৪) অলক্ষ্মী ; লক্ষ্মীর আগে সমুদ্র মন্থনে ওঠেন। লক্ষ্মী বিষ্ণুকে লাভ করেন ; এবং তারপর বিষ্ণুকে অনুরোধ করেন তাঁর বড় বোনের বিয়ের ব্যবস্থা করতে। বিষ্ণু উদ্দালক মুনির সঙ্গে বিয়ে দেন। স্রবদারক্তনয়না, রুক্ষপিঙ্গশিরোরুহা স্ত্রীকে নিয়ে হোম-ধূপ-সুগন্ধাঢ্যং বেদঘোষ-মুখরিতম্ আশ্রমে মুনি ফিরে আসেন। কিন্তু অলক্ষ্মী এ আশ্রমে প্রবেশ করতে চান না। যেখানে নিত্য কলহ, অশান্তি, কটূক্তি, অপমান ও অন্যায় কাজ রয়েছে সেই রকম স্থানে/আশ্রমে থাকতে চান। উদ্দালক বিপন্ন হয়ে পড়েন ; নিঋ'তিকে অশ্বত্থ গাছের নীচে একটু অপেক্ষা করতে বলেন এবং আশ্রম খুঁজতে যাবার নাম করে পালিয়ে যান। বহুক্ষণ অপেক্ষা করার পর অলক্ষ্মী কাঁদতে থাকলে লক্ষ্মী এই কান্না শুনে নারায়ণকে পাঠান। নারায়ণ এই অশ্বত্থ গাছে অলক্ষ্মীর বাস নির্দ্ধারিত করে যান।

নির্বাণ—বাসনা, সংস্কার ইত্যাদি থেকে মুক্তি। নির্বাণকে অনির্বচণীয় বলা হয়েছে। আবার এর বর্ণনা রয়েছে পরম, শান্ত, বিশুদ্ধ, পণিত, অক্ষর, ধ্রুব, সত্য, আনন্দ, অজাত, কেবল ও শিব (=মঙ্গল)। মহাসুখ। বৌদ্ধ দর্শনে মুক্তি। শূন্য ও বিজ্ঞান মিলে। বজ্রযানে এর সঙ্গে মহাসুখ মিলিত রয়েছে। বুদ্ধের বহু পূর্ব থেকেই প্রচলিত। বৌদ্ধ দর্শনে শব্দটির একটি বিশেষ অর্থ ; বিশেষ মুক্তি সূচিত হয়। মোটামুটি অর্থ :-(১) পুনর্জন্ম নিরোধ, (২) সব রকম বন্ধন থেকে মুক্তি, (৩) তৃষ্ণার বিনাশ, (৪) বাসনা ও আসক্তির বিনাশ, (৫) পঞ্চস্কন্ধের নিরোধ, (৬) রাগ, দ্বেষ, ও মোহ ক্ষয়। নির্বাণ মানে মৃত্যু নয়। নির্বাণ লাভের পর বুদ্ধ ৪৬ বৎসর জীবিত ছিলেন। এই হিসাবে নির্বাণ একটি আনন্দঘন জীবন। দ্রঃ-নৈরাত্মা।

নিশা—ভানুর তৃতীয় স্ত্রী। এঁদের সাত ছেলে অগ্নি, সোম, বৈশ্বানর, বিশ্বপতি, সংনিহিত, কপিল ও অগ্রণী এবং এক মেয়ে রোহিণী (মহা ৩।২১১।-)।

নিশাকর—(১) বিন্ধ্য পর্বতে সম্পাতি উল্লিখিত একজন মুনি। অঙ্গদরা সীতা অন্বেষণে এলে সম্পাতি জানায় আট হাজার বছর আগে এই মুনি স্বর্গে চলে গেছেন (রা ৪।৬০।৯)। মুনি একদিন স্নান সেরে আশ্রমে ফিরছিলেন ; ঋক্ষ, সিংহ, ব্যাঘ্র, সৃমর, সরীসৃপ, নাগ, সঙ্গে আসছিল আশ্রমে পেঁাছে দেবে। পৌঁছে দিয়ে এরা ফিরে যায়। নিশাকর সম্পাতিকে (দ্রঃ) দেখে খুসি হয়ে আশ্রমে ঢুকে যান এবং পর মুহূর্তে বার হয়ে এসে এভাবে পুড়ে গিয়েছিল কেন জানতে চান। সব শুনে বলেন পক্ষৌ ও প্রপক্ষৌ আবার হবে এবং শক্তি ইত্যাদিও ফিরে পাবে (৪।৬২।২)। নিশাকর জানান পুরাণে শুনেছেন এবং তপসা দৃষ্টং (৪।৬২।৩) রাজা দশরথের ছেলে বনে আসবেন ইত্যাদি। সীতা লঙ্কাতে কিছু খাবেন না ; ইন্দ্র পরমান্ন এনে দিলে সীতা এর অগ্রভাগ রামলক্ষ্মণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত করবেন। এই সীতার অন্বেষণে বানরদের আসা পর্যন্ত সম্পাতিকে অপেক্ষা করতে হবে। তাদের সীতার খবর জানালে আবার পাখা গজাবে। নিশাকর আরো বলেছিলেন সম্পাতিকে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ করে দিতে পারেন কিন্তু লোক হিতার্থে করবেন না। রামলক্ষ্মণকে দেখবার ইচ্ছাও নিশাকরের ছিল কিন্তু তত দিন জীবিত থাকার আর বাসনা ছিল না।

(২) মুদ্‌গল মুনির ছেলে কোশকার সুপণ্ডিত ও তপস্বী। স্ত্রী ধর্মিষ্ঠা ; বাৎস্যায়নের মেয়ে। এদের একটি মূক, বধির ও হতধী ছেলে হয়। ছেলেকে এরা বাড়ির বাইরে পরিত্যাগ করেন। সুরূপাক্ষী নামে এক রাক্ষসী শিশুদের ধরে নিয়ে যেত। এর কাছে একটি রোগা চিমসে ছেলে ছিল ; এটিকে রেখে দিয়ে বদলে ধর্মিষ্ঠার ছেলেকে নিয়ে স্বামীর কাছে খাবার জন্য ফিরে যায় এবং সব ঘটনা বলে। সুরূপাক্ষীর অন্ধ স্বামীও রাক্ষস ; তৎক্ষণাৎ শিশুকে ফিরিয়ে দিয়ে আসতে বলেছিল ; কারণ কোশকার জানতে পারলে অভিশাপ দেবেন। এদিকে কোশকার মূক ছেলের কান্না শুনে কৌতূহলে বাইরে বার হয়ে এসে দেখেন ছেলেটিকে কে যেন বদলে নিয়ে গেছে। কোশকার মন্ত্রযোগে শিশুটিকে মাটির সঙ্গে বেঁধে রাখেন। এদিকে রাক্ষসী অলক্ষ্যে ফিরে এসে ধর্মিষ্ঠার ছেলেকে ফিরিয়ে দেয় বটে কিন্তু একে মাটি থেকে খুলে নিয়ে যেতে পারে না। কোশকার তার পর রাক্ষসীর দেওয়া শিশুটিকে স্ত্রীকে দিয়ে দেন এবং জড়বুদ্ধি শিশুটিকে নিজে পালন করতে থাকেন। ক্রমশ এদের সাত বছর বয়স হয় ; রাক্ষসীর দেওয়া বালকটির নাম রাখা হয় দিবাকর এবং কোশকারের ছেলের নাম হয় নিশাকর। দু জনেরই উপনয়ন হয় ; দিবাকর বেদ ইত্যাদি পাঠ করেন, নিশাকর কিছুই অধ্যয়ন করেন না ; সকলে এঁকে ঘৃণা করতেন। শেষ পর্যন্ত কোশকার একে এক কূপে ফেলে দিয়ে একটি পাথর চাপা দিয়ে দেন। নিশাকর বহু দিন কূপের মধ্যে বাস করেন ; কূপের মধ্যে যে সব গাছ হয়েছিল তার ফল খেয়ে জীবন ধারণ করতেন। বছর দশেক পরে ধর্মিষ্ঠা এক দিন বন্ধ কূপ লক্ষ্য করে আপন মনে জিজ্ঞাসা করেন কে কূপ বন্ধ করল। কূপের মধ্য থেকে নিশাকর

তখন উত্তর দেন পিতা কূপ বন্ধ করেছেন ; এবং পূর্বাপর সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করেন। ধর্মিষ্ঠা তখন পাথর সরিয়ে ফেললে নিশাকর মায়ের সঙ্গে ঘরে ফিরে যান। বাড়িতে ফিরে পিতা কোশকারকে নিজের পূর্ব জন্মের কথা ও এ জন্মে মূকবধির হয়ে জন্মাবার কারণ জানান।

পূর্ব জন্মে বৃষাকপি ও মালার ছেলে হয়ে জন্মেছিলেন। বেদ ও সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করে গর্বিত ও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়েন। অপরের স্ত্রী ও অর্থ অপহরণ করতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করে রৌরব নরকে যেতে হয়েছিল। নরকে হাজার বছর থাকার পরে একটি বাঘ হয়ে জন্মান ; তখনও কিছু পাপ অবশিষ্ট ছিল। এক রাজা এই বাঘকে বন্দী করে প্রাসাদে নিয়ে আসেন। এই রাজা এক দিন যখন অনুপস্থিত ছিলেন তখন রাজার সুন্দরী রাণী অজিতাকে দেখে বাঘ কামুক হয়ে ওঠে। অজিতাও কামার্ত হয়ে পড়েন এবং বাঘের বন্ধন খুলে দেন। বাঘ রাণীর দিকে এগিয়ে আসতে থাকলে রাজার অনুচরেরা দেখে ফেলে এবং বাঘকে পিটিয়ে মেরে ফেলে। এর পর আবার নরকে হাজার বছর থাকার পর অগ্নিবেশ্য নামে এক ব্রাহ্মণের ঘরে একটি সাদা গাধা হয়ে জন্ম হয়। ব্রাহ্মণের অনেকগুলি স্ত্রী ছিল। গাধার কাজ ছিল এদের বহন করা। এক দিন বিমতি নামে এক স্ত্রী গাধার পিঠে চড়ে বাপের বাড়ি যাত্রা করেন। পথে এই বিমতি একটি নদীতে স্নান করেন : এবং স্নানরতা বিমতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে গাধাও জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু সেই সময়ে একটি লোক এসে গাধাকে ধরে ফেলে। গাধা লোকটির হাত থেকে কোন মতে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দক্ষিণ দিকে পালিয়ে যায় এবং বিমতির কথা ভাবতে ভাবতে ছয় দিন পরে মারা যায় এবং আবার নরকে যেতে হয়। পর জন্মে শুক পাখী হয়ে জন্ম হয় এবং এক ব্যাধ এই পাখীটিকে ধরে এক বৈশ্য বণিকের কাছে বিক্রয় করে। বণিক বাড়িতে মেয়েদের পাখীটি দিয়ে দেন। এক দিন এই বণিকের স্ত্রী পাখীটিকে বুকে নিয়ে আদর করছিল। এই স্ত্রীলোকটির স্পর্শে শুকপাখী কামুক হয়ে পাখা দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরতে যায়, কিন্তু হটকারিতার ফলে মাটিতে পড়ে গিয়ে কপাটের চাপে পিষ্ট হয়ে মারা যায়। এর পর জন্মে এক চণ্ডাল গৃহে বৃষ হয়ে জন্ম হয়। চণ্ডাল এক দিন এই বৃষকে গাড়িতে জুড়ে স্ত্রীকে নিয়ে বনের দিকে যাচ্ছিল। পথে চণ্ডালের স্ত্রী গান করতে থাকে ; গান শুনে মুগ্ধ হয়ে ফিরে দেখতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে বৃষ মারা যায় এবং আবার একশ বছর নরক বাস করার পর এইখানে এসে সে জন্মেছে। কূপে বাস করার পর তার সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়ে গেছে (বামন-পুরাণ ৯১-)।

নিশাকর এই কাহিনী বলে বনে গিয়ে তপস্যা করতে থাকেন। বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হন।

নিশুম্ভ—কশ্যপের ঔরসে দনু/দিতির গর্ভে জন্ম। বড় ভাই শুম্ভ, ছোট নমুচি। পাতালে জন্ম এবং সেইখানেই বড় হয়ে ওঠেন। যৌবনে পৃথিবীতে এসে কঠিন তপস্যা করেন। ব্রহ্মার কাছে অমর হবার বর চান। ব্রহ্মা দিতে রাজি হন না ; তখন বর চান কোন দেব, মানুষ, পাখী বা জন্তুর হাতে যেন মৃত্যু না হয়। এই বর পেয়ে এরা পাতালে ফিরে যান। শুক্রকে শুম্ভ নিশুম্ভ গুরু করেন। সোনার সিংহাসনে বসিয়ে

শুম্ভকে গুরু অভিষেক করেছিলেন। ধূম্রলোচন, রক্তবীজ ইত্যাদি বহু দৈত্য এসে দলে যোগ দান করেন।

নমুচি ইন্দ্রের হাতে মারা যাবার পরবর্তী ঘটনা শুম্ভ রাজা। নিশুম্ভ সমস্ত পৃথিবী জয় করে দেবলোক আক্রমণ করেন। তীব্র যুদ্ধে নিশুম্ভ অজ্ঞান হয়ে যান; সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। খবর পেয়ে শুম্ভ এসে আক্রমণ করেন; দেবতারা হেরে যান; শুম্ভ স্বর্গেও রাজা হন, ঐরাবত ইত্যাদি শুম্ভের হস্তগত হয়। কুবের ও যমকেও তাঁদের রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেন। হাজার বছর এই ভাবে কেটে যায়। দেবতারা দেবীর আরাধনা করলে দেবী দেখা দেন। দেবীর দেহ থেকে তার পর আর এক দেবী বার হয়ে আসেন; ইনি কৌষিকী। কৌষিকীর রঙ কালো ফলে অপর নাম কালিকা। দেবী ও কালিকা তখন দেবলোকের দিকে এগিয়ে গিয়ে একটি পাহাড়ের ওপর এসে অবস্থান করেন। মহিষাসুরের মন্ত্রী রক্তবীজের কাছে এর পর শুম্ভ জানতে পারেন দেবী দুর্গার হাতে মহিষাসুর মারা গেছেন এবং সেনাপতি চণ্ড ও মুণ্ড প্রাণভয়ে জলের নীচে লুকিয়ে আছেন। এই শুনে কৌষিকী দেবীকে বিনাশ করবার জন্য এরা চণ্ডমুণ্ডের সঙ্গে মিলিত হন।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে চণ্ড মুণ্ড এক দিন পথে যেতে যেতে এই অপরূপ সুন্দরী দেবীকে দেখতে পেয়ে শুম্ভ নিশুম্ভকে জানান। শুম্ভ তখন তাঁর অনুচর সুগ্রীবের মুখ দিয়ে বলে পাঠান শুম্ভ নিশুম্ভ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বীর, এবং দেবীও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরী; সেই হেতু দেবী এদের এক জনকে বিয়ে করুক। দেবী জানিয়ে দেন যুদ্ধে তাঁকে যে হারাতে পারবে তাকেই তিনি বিয়ে করবেন। ফলে প্রথমে ধূম্রলোচন তার পর চণ্ডমুণ্ড বিশ কোটি সৈন্য সমেত এবং তার পর রক্তবীজ দেবীকে ধরতে চেষ্টা করেন এবং তীব্র যুদ্ধে দেবীর হাতে নিহত হন। শেষকালে শুম্ভ নিশুম্ভও যুদ্ধে এসে মারা পড়েন। এই যুদ্ধে ব্রহ্মাণী মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ইন্দ্রাণী, নারসিংহী এঁরা সপ্ত মাতৃকা; এঁরাও যোগ দান করেছিলেন। চামুণ্ডা রক্তবীজকে গিলে ফেলেন। দেবীর বর্শার আঘাতে নিশুম্ভ মারা যান এবং শুম্ভও মারা পড়েন। দেবতারা স্বর্গে ফিরে যান। দ্রঃ- লঙ্কালক্ষ্মী বিহুণ্ড, ও জলন্ধর।

নিশঠ—নিষঠ, নিসঠ, নিসথ। রেবতী ও বলরামের ছেলে। সুভদ্রার বিয়ের যৌতুক নিয়ে খাণ্ডবপ্রস্থে আসেন (মহা ১।২১৩।২৭)। রৈবতক পর্বতে মহোৎসবে যোগ দিয়েছিলেন। মৃত্যুর পর বিশ্বদেবে পরিণত হন।

নিশ্চ্যবন—বৃহস্পতির দ্বিতীয় পুত্র। যশ, শ্রী ও বর্চস্ থেকে ইনি চ্যুত (চ্যবন) হন না (মহা ৩।২০৯।১২)। পৃথিবীকে স্তব করেন। ছেলে সত্য। দ্রঃ- অগ্নিবংশ।

নিশ্চারা—নীলাজন, নিরঞ্জনা, নিরঞ্জর, লীলাছন, নীলাজন, নৈরঞ্জনা। ফল্গু নদীর ওপর অংশ। সুন্দর গভীর অপ্রশস্ত গিরিখাতের (=খই বানের) মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেছে। দু পারে তৃণপাদপ হীন নগ্ন পাথর জড়িয়ে পাকিয়ে খেয়ালখুসি মত খাড়া হয়ে উঠেছে। নদী এগিয়ে এসে অনেক ওপর থেকে নীচে মালুদা নামে সুন্দর একটি শ্যামল উন্মুক্ত প্রান্তরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। শব্দ বহু দূর থেকে শোনা যায়।

প্রাচীন বুদ্ধগয়ার বিপরীত দিকে এই জলধারা দু ভাগ হয়ে গেছে। বড় এবং পূব দিকের শাখাটি নিশ্চীরা/নীলাজন ; গয়ার কাছে মোহনাতে যুক্ত হয়েছে। দ্রঃ- ফল্গু। নৈরঞ্জনাকে অশ্বঘোষ ফল্গু বলেছেন। হাজারিবাগ জেলাতে সিমেরিয়ার কাছে নৈরঞ্জনার উৎপত্তি।

নিষঙ্গী—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। ভীমের হাতে নিহত।

নিষধ—নরওয়ার<নলপুর, নলরাজার রাজধানী। পুরাণে এটি নাগের দেশ। সিন্ধু (কালিসিন্ধুর) নদীর দ-তীরে ; গোয়ালিয়র থেকে ৪০ মাইল দ-পশ্চিমে। মতান্তরে বেরার থেকে উ-পশ্চিমে সাতপুরা পর্বতে অবস্থিত। অপর আর এক মতে মালবের দক্ষিণে। দ্রঃ- নিষাদভূমি, পদ্মাবতী। (২) গন্ধমাদনের পশ্চিম দিকে এবং কাবুল নদীর উত্তরে। বর্তমান নাম হিন্দুকুশ। গ্রীক নাম পরোপমিসোস্>পর্বত-উপ-নিষধ। বা নিষধ পর্বত মালার সব চেয়ে পশ্চিম শাখা পারিপাত্র (দ্রঃ)>পরোপমিসোস্। হিমালয়েরই পশ্চিম অংশের বিভিন্ন স্থানের নাম পরোপমিসোস্, হিন্দুকুশ, কোল ই-বব।

নিষাদ—প্রাচীন ভারতে একটি অনার্য জাতি। নিষাদ অর্থে নিষাদ, পুলিন্দ, কোল, ভিল্ল, মুণ্ডা খেরওয়াল, খাসিয়া, নিকোবরী, ইত্যাদি বর্তমানের অস্ট্রিক (দক্ষিণ-দেশীয়) গোষ্ঠী। দ্রঃ- কিরাত, দ্রাবিড়। অবশ্য প্রাচীন যুগে নিষাদ, কিরাত ইত্যাদি নাম ব্যবহার হলেও এরা যে কারা কোথাও সে কথা আলোচিত হয় নি। কেবল বোঝা যায় রাজস্থান থেকে বাঙলা দেশ পর্যন্ত অরণ্যময় পার্বত্য অঞ্চলে নিষাদরা বাস করত। এদের জীবিকা ছিল শিকার করা ও মাছ ধরা। এরা কালো, মাথাতে পাখীর পালক এবং তীরন্দাজ। বর্ত্তমানের হিসাবে এরা অস্ট্রিক জাতি। ভূমধ্যসাগরের পূর্বপ্রান্ত-বাসী জাতির একটি অতি প্রাচীন শাখা থেকে জন্ম। ভারতে দ্রাবিড়দের আগমনের আগে এরা এসেছিল। এদের চেহারা অতি দীর্ঘকায়, দীর্ঘ কর্ন্নোটি, ঋজু ও তনু দেহ; মাথায় চুল লম্বা, ও কোমল, রঙ কালো, নাক চেপ্টা। ভারতে কৃষিমূলক গ্রামীণ সংস্কৃতি প্রধানত এদেরই দান। বলদ সাহায্যে চাষ ও পশুপালন এরাই সুরু করে-ছিল। সম্ভবত হাতীকেও এরা পোষ মানায়। বর্তমানে নিষাদ গোষ্ঠীর ভাষা অর্থে সাঁওতাল, মুণ্ডারি, হো, ভূমিজ, কোরুক, গদব, এবং সোরা বা শবর, আসামে খাসিয়াদের ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ভাষা।

অগ্নিপুরাণে আছে রাজা বেণের (দ্রঃ) ঊরু মথিত হলে বেঁটে কালো পুরুষ নিষাদ জন্মান। মনুর মতে ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে জাত সন্তান। রামায়ণে কোশল রাজ্যের বাইরে একটি নিষাদ রাজ্যের উল্লেখ আছে ; রাজধানী শৃঙ্গবের পুর ; রাজা গুহক। রামকে ইনি সাহায্য করেছিলেন এবং ভরতকে মাছ, মাংস, ও মধু উপহার দিয়েছিলেন। দ্রঃ- পৃথু।

নিষাদভূমি—নিষাদ বা ভিলদের দেশ। মূলত মারওয়ার বা যোধপুর। পরে মালব ও খান্দেশের প-সীমান্তে সুউচ্চ বিন্ধ্য ও সাতপুরা পাহাড়ে এসে এরা আশ্রয় নেয় ; মাহী, নর্মদা ও তাপ্তী নদীর অরণ্যসঙ্কুল তীরভূমিতে এসে বাস করতে থাকে।

নিসুন্দ—সংহ্রাদের ছেলে (ভাগ)।

নিষ্কৃতি—বৃহস্পতির ছেলে ; একটি অগ্নি। মহাভারতে অপর নাম সত্য ; নিশ্চ্যবনের ছেলে। মানুষকে দুঃখ থেকে মুক্তি দেন বলে এই নাম। দ্রঃ- অগ্নিবংশ।

নীতিসার—কামন্দক রচিত। বইটিতে প্রথমে কৌটিল্যকে প্রণাম করে বলা হয়েছে অর্থশাস্ত্রের অনুকরণে এই বই রচিত। ২০টি সর্গ ও ৩৬টি প্রকরণ। রাজার ও দেশের মঙ্গলের জন্য গুপ্ত হত্যা, বিশ্বাসঘাতকতা ও বিষপ্রয়োগের কথা রয়েছে এবং পার্শ্ববর্তী রাজাকে ছলে বলে ধ্বংস করতে বলা হয়েছে। অধিকাংশই অনুষ্টুপ ছন্দে। টীকা জয়মঙ্গল ; জনৈক শঙ্করাচার্য রচিত। রাজ্যের কেন্দ্রীয়, প্রান্তীয় ও গ্রামীণ শাসন ব্যবস্থার বিশদ বিবরণ নাই। স্মৃতির আইন কানুনের কথাও বাদ দেওয়া হয়েছে।

নীপবংশ—দ্রঃ- বৃহৎক্ষত্র।

নীরা—ত্রিবারা। ভীমার একটি করদা শাখা। প-ঘাট পর্বতে উৎপত্তি।

নীল—(১) এক জন বানর। অগ্নির অংশে জন্ম। সুগ্রীবের বন্ধু। সীতার খোঁজে বহু বানর নিয়ে দক্ষিণ দিকে গিয়েছিলেন। সেতু বন্ধনের সময় রামকে সাহায্য করে-ছিলেন। (২) মাহিষ্মতী নগরীর রাজা। হেহয় বংশ ; অসুর ক্রোধবশার অংশে জন্ম। অপর নাম দুর্যোধন ; স্ত্রী নর্মদা। এঁর মেয়ে স্বাহা/সুদর্শনাকে এক দিন যজ্ঞাগারে দেখে অগ্নি মুগ্ধ হয়ে পড়েন ; অগ্নিহোত্রে সুদর্শনা চারু ওষ্ঠপুটেন ফুঁ না দিলে অগ্নি প্রজ্বলিত হত না ; এবং ব্রাহ্মণবেশে যা খুসি করে ঘুরে বেড়াতেন (মহা ২।২৪।১৭)। রাজা যথা শাস্ত্র অগ্নিকে শাসন করলে অগ্নি ক্রুদ্ধ হয়ে জ্বলে ওঠেন এবং প্রমাদ সৃষ্টি করেন। রাজা স্তব করে শান্ত করেন। সুদর্শনার সঙ্গে বিয়ে হয়। কথা দেন জামাতা হিসাবে মাহিষ্মতীতে থাকবেন, রাজার সৈন্যবাহিনী রক্ষা করবেন। সেই থেকে মাহিষ্মতী অজেয় হয়ে পড়ে এবং এখানে মেয়েদেরও তিনি বর দেন কেউ তাদের স্বেচ্ছায় গ্রহণ করতে পারবে না ; মেয়েরা অপ্রতিবারণা হয়ে ওঠে ফলে স্বৈরিণী হয়ে পড়ে (মহা ২।২৮।২৪)।

রাজসূয় যজ্ঞের সময় সহদেব এই নগরী অবরোধ করলে অগ্নি সহদেবদের সৈন্যদের ঘিরে ফেলেন। পরে সহদেবের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে রাজা নীলকে পাণ্ডবদের কর দিতে অগ্নি রাজি করান। কুরুক্ষেত্রে ইনি পাণ্ডবদের দলে ছিলেন এবং অশ্বত্থামার শরে নিহত হন। দ্রঃ- জনা।

নীলকণ্ঠ—সমুদ্র মন্থনে বিষ উঠে আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়লে বহু সুরাসুর মারা পড়েন। দেবতারা তখন মহাদেবের সাহায্য চাইলে সৃষ্টি রক্ষার্থে মহাদেব এই বিষ পান করে গলায় রেখে দেন। ফলে গলা নীল হয়ে যায়। এই জন্য নাম।

মহাভারতে (১২।৩২৯।১৫) আছে ত্রিপুর নাশের সময় উশনা নিজের একটি জটা ছিঁড়ে মহাদেবের প্রতি নিক্ষেপ করেন। এই জটা হতে অসংখ্য ভুজঙ্গ বার হয়ে মহাদেবকে কামড়াতে থাকে ; ফলে নীলকণ্ঠ। দক্ষযজ্ঞে বিষ্ণু গলা টিপে ধরেছিলেন (হরিবংশ) ফলে নীলকণ্ঠ। মহাভারতে (১৩।১২৮।৮) মহাদেবের শ্রীকে হস্তগত করবার (শ্রীকাঙ্ক্ষিণা মম) চেষ্টায় ইন্দ্র বজ্রাঘাত করেন ফলে কণ্ঠ নীল হয়ে যায়। মহাভারতে (১২।৩৩০।৪৭) আছে দক্ষযজ্ঞে রুদ্রের ভাগ ছিল না ; ফলে মহাদেব যজ্ঞ আক্রমণ করেন। নারায়ণ (ঋষি) গলা টিপে ধরেন ফলে কণ্ঠ নীল।

নারায়ণের বুকে শূল চিহ্ন শ্রীবৎস চিহ্ন (১২।৩৩০।৬৫) নামে পরিচিত হয়। রুদ্রের নীলকণ্ঠ নামের বিকল্প শ্রীকণ্ঠ নামও চালু হয়।

নীলকণ্ঠ—নেপালে কাঠমণ্ডু থেকে ৫-মাইল উত্তরে। শিয়োপুরী শিখরের (প্রাচীন শতরুদ্র পর্বত) পাদদেশে নীলকণ্ঠ মহাদেবের মন্দির। নেপালের একটি বিখ্যাত তীর্থ।

নীলকানন—ভরদ্বাজ আশ্রম থেকে চিত্রকূটের পথে অবস্থিত বন (রা ২।৫৫।৮)। শ্যাম ন্যগ্রোধ যেখানে ছিল তার পর। দ্রঃ-রাম।

নীলপর্বত—(১) নীলাচল (দ্রঃ)। (২) বা নীলগিরি; মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে দর্দর, দর্দুর বা দুর্দুর পর্বত। (৩) হরিদ্বার/চণ্ডী পর্বত; গঙ্গার উত্তর দিকে। (৪) মেরুর উত্তরে; তিব্বতে কুয়েন-লুন শাখা। দ্রঃ- উত্তরকুরু, হরিবর্ষ।

নীললোহিত—যাঁর কণ্ঠ নীল এবং জটা লোহিত। বা এক কল্পে যিনি নীল, অপর কল্পে লোহিত। ভাগবতে (৩।১২) আছে সনক, সনন্দ, সনাতন ইত্যাদিকে সৃষ্টি করে ব্রহ্মা এঁদের প্রজা সৃষ্টি করতে বলেন। এঁরা সম্মত হন না। ব্রহ্মা রেগে যান কিন্তু ক্রোধ দমন করেন। তখন তাঁর দুই ভুরুর মধ্য থেকে নীললোহিত জন্মান। জন্মে ভীষণ কাঁদছিলেন ফলে নাম রুদ্র। ব্রহ্মা এই রুদ্রের জন্য ১১টি স্থান ঃ-হৃদয়, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র ও তপস্যা— নির্দিষ্ট করে দেন। এই নীললোহিতের ১১টি নাম দেন ঃ-মন্যু, মনু, মহিনস্, মহান, শিব, ঋতধ্বজ, উগ্ররেতা, ভব, কাল, বামদেব ও ধৃতব্রত এবং ১১ জন রুদ্রাণী/স্ত্রী ঃ-ধী, বৃত্তি, উশনা, উমা, নিযুৎ, সর্পি, ইলা, অম্বিকা, ইরাবতী, সুধা ও দীক্ষা। ব্রহ্মা তারপর প্রজা সৃষ্টি করতে আদেশ দেন; নীললোহিত তখন নিজের মত প্রচণ্ড প্রজা সৃষ্টি করতে থাকেন; ফলে অসংখ্য রুদ্র জন্মালেন। এদের দেখে ভয় পেয়ে ব্রহ্মা রুদ্রকে তপস্যা করতে বললেন (৩।১২।১৬)।

নীলাচল—নীলগিরি; নীলপর্বত। উড়িষ্যাতে পুরী জেলাতে একটি অনুচ্চ বালি পাহাড়। এই পাহাড়ে জগন্নাথ মন্দির অবস্থিত (পদ্ম-পু); চার পাশের এলাকা থেকে স্থানটি অন্তত ২০ ফুট উচ্চ। (২) আসামে ছোট একটি পাহাড়; এখানে কামাখ্যা দেবীর মন্দির অবস্থিত। (৩) হরিদ্বারে নীলপর্বত (দ্রঃ)।

নীলাম্বর—দ্রঃ-কালকেতু।

নৃগ—রামায়ণে (৭।৫৩) এক রাজা। এক কোটি সবৎসা গরু পুষ্করে গিয়ে দান করেন। এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের গরুও এই দলে মিশে গিয়েছিল; সেটিও দান হয়ে যায়। যার গরু সে কয়েক বছর ধরে গরু খুঁজতে খুঁজতে একদিন কনখলে গিয়ে জীর্ণবৎসা গরুটিকে এক ব্রাহ্মণের ঘরে দেখতে পান। দরিদ্র ব্রাহ্মণটি শবলা বলে নাম ধরে ডাকলে গরুটি পেছু পেছু এগিয়ে আসতে থাকে। ফলে দুই ব্রাহ্মণে ভীষণ বিবাদ এবং দু জনেই রাজার কাছে আসেন। কিন্তু রাজদ্বারে অনেক দিন অপেক্ষা করেও রাজার দেখা না পেয়ে রাগে দুজনেই রাজাকে কৃকলাস হবে শাপ দেন এবং 'অস্মিন্ শ্বভ্রে' বাস করবে এবং যদু বংশে বাসুদেবের হাতে রাজা মুক্তি পাবেন।

ব্রাহ্মণরা চলে গেলে নারদ ও পর্বত এসে রাজাকে সব জানান। রাজা মন্ত্রী, পুরোহিত, ও প্রজাদের ডেকে সব কথা জানান ; ছেলে বসুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করতে বলেন এবং শিল্পীদের দিয়ে সুখস্পর্শ তিনটি শ্বভ্র (গর্ত) নির্মাণ করতে বলেন। বর্ষঘ্ন, হিমঘ্ন ও গ্রীষ্মঘ্ন তিনটি শ্বভ্রে গাছ ইত্যাদি লাগিয়ে নন্দন কানন করে তোলেন এবং ছেলে বসুকে রাজ্য ও উপদেশ দিয়ে শ্বভ্রে গিয়ে প্রবেশ করেন (রা ৭।৫৪।১০)।

অন্য কাহিনীতে নৃগ ইক্ষ্বাকুর ভাই। নৃগের ছেলে সুমতি। অত্যন্ত ধার্মিক, সদাশয় ও ব্রাহ্মণ ভক্ত রাজা। পুষ্করে গরু দান করার সময় এখানে পর্বত নামে এক ব্রাহ্মণকে একটি সবৎসা গাভী দেন। পর্বত এটিকে এখানে রেখে বনে গিয়েছিল। নৃগ না জেনে এটিকে অনার্ত নামে আর এক ব্রাহ্মণকে দান করে দেন। পর্বত ফিরে এসে গরু না পেয়ে খুঁজতে খুঁজতে অনার্ত পণ্ডিতের ঘরে এটিকে দেখতে পান। ব্রাহ্মণ দুজন শাপ দেন হাজার বছর গর্তে কাটাতে হব। রাজা এঁদের স্তবস্তুতি করলে এঁরা বলেছিলেন কৃষ্ণের স্পর্শে মুক্তি পাবেন। ভাগবতে (৯।২) বৈবস্বত মনুর (দ্রঃ) ছেলে নৃগ > সুমতি > ভূতজ্যোতি > বসু > প্রতীক > ওঘবান ও ওঘবতী (সুদর্শনের স্ত্রী)।

রাজা দ্বারকাতে একটি পরিত্যক্ত কূপে কৃকলাস হয়ে জন্মান। মহাভারতে (১৩।৬৯।-) আছে নৃগ যজ্ঞসহস্রযাযী। এক ব্রাহ্মণের গাভী রাজার গরুর পালে মিশে গিয়েছিল ; ইত্যাদি। দুই ব্রাহ্মণ রাজার কাছে এলে বহু কিছু দিয়ে রাজা গরুটিকে ফিরে চান। কিন্তু ব্রাহ্মণটি সম্মত হন না। গাভীর প্রকৃত মালিকও পরিবর্তে অন্য কিছু নিতে রাজি হন না। ব্রাহ্মণদের ঐ সমস্যা মেটাবার আগেই রাজা মারা যান। এই অজ্ঞানকৃত পাপের (ব্রাহ্মণস্ব অভিমর্শন মহা ১৩।৬৯।১) জন্য যম শাস্তি হবে বলেন। নৃগ নিজের পাপের ফল আগে ভোগ করতে চান। যম বলে দেন হাজার বছর পরে যম মুক্তি দিলে তখন স্বর্গে যাবে। পূর্ব স্মৃতি সমস্ত অক্ষুন্ন থাকে। ভাগবতে (১০। ৬৪) প্রকৃত মালিককে গরুটি দিয়ে দিলে অপর ব্রাহ্মণ রাগে স্থান ত্যাগ করেন। এই ব্রহ্মস্ব হরণের জন্য শাস্তি দেন কৃকলাস হয়ে থাকতে হবে এবং কৃষ্ণের স্পর্শে পাপ মুক্ত হয়ে স্বর্গে ফিরে যাবেন। রামায়ণ মতে 'কার্য্যার্থীদের' সঙ্গে দেখা করতে দেরি বা অবহেলা করার জন্য এই শাস্তি (রামা ৭।৫৩।২৫)। এক দিন সাম্ব ও অন্যান্য যাদবরা, মহাভারত মতে কয়েক জন জলার্থী এটিকে দেখে তুলতে চেষ্টা করেন। শেষ অবধি কৃষ্ণ এটিকে তোলেন এবং কৃষ্ণের স্পর্শে শাপ মুক্তি হয়। একটি মতে ইন্দ্রলোক প্রাপ্তি ঘটে।

নৃগ একবার বরাহ তীর্থে পয়োষ্ণী নদীর তীরে যজ্ঞ করেছিলেন। এই যজ্ঞে ইন্দ্র সোম রস পান করে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন (মহা ৩।১২১।১)। মহাভারতে (৩।১৯১। ২৮) আছে কৃষ্ণ নৃগকে মজ্জমান অবস্থা থেকে তুলে স্বর্গে স্থাপন করেন। (২) দ্রঃ- নরা, উশীনর।

নৃগসরিৎ—দক্ষিণ দিকে একটি পুণ্যতীর্থ। এটি রম্য ও বহুজলা এবং সুতেন

সোমেন বিমিশ্রিতোদাং(৩।১২০।৩০) এবং পয়োষ্ণী। এর নাম ও পয়োষ্ণী। এখানে রাজা নৃগের অনুবংশ্যাং মার্কণ্ডেয় গান করেছিলেন। নৃগের যজ্ঞে সাক্ষাৎ ইন্দ্র এখানে সোমেন অমাদ্যং

নৃত্য—ঋক্ বেদে বিবাহ, ফসল কাটা ও অন্যান্য উৎসব উপলক্ষ্যে নৃত্যের উল্লেখ আছে। নর্তকী উষসের উল্লেখও রয়েছে। ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় নৃত্যে অভিজ্ঞ ছিলেন। কৃষ্ণযযুর্বেদে ইয়াতি শব্দের অর্থ আবৃত্তি সহ নাচ। রামায়ণ, মহাভারতের যুগে নৃত্য ছিল সমাজ জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। অর্জুন দক্ষ শিল্পী ছিলেন। রাস নৃত্য ও পরিচারিকাদের নাচের ব্যাপকতার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। এ ছাড়া শিবের তাণ্ডব ও উমার লাস্যের কাহিনী ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি পদে ছড়ান রয়েছে। সাঁচি, অমরাবতী, কণারক, খজুরাহো, অজন্তা, ইলোরা গুহাতে নাচের বিভিন্ন ভঙ্গি ফুটিয়ে রাখা হয়েছে। চিদাম্বরম মন্দিরে গোপুরমের গায়ে পাথরে খোদাই ১০৮টি নৃত্যরত মূর্তি ভরত মুনির নাট্যশাস্ত্রের বিভিন্ন সূত্রের উদাহরণ স্বরূপ গঠিত। দ্রঃ- নাটক।

নৃষদ্—কণ্বের পিতা (ঋক্)।

নৃসিংহ—নরসিংহ। দ্রঃ- নরনারায়ণ।

নেপাল—কিম্পুরুষ বর্ষ। স্বয়ম্ভু পুরাণে এটি একটি হ্রদ/নাগবাস/কালীহ্রদ ; কর্কোটক নাগের আবাস স্থল। ১৪ মাইল×৪ মাইল। মহাচীনের পঞ্চশীর্ষ পর্বত থেকে মঞ্জুশ্রী এসে এই হ্রদের দ-দিকে পাহাড় কেটে জল বার করে দেন। উদ্ধার পাওয়া জমিতে স্বয়ম্ভুনাথ বা স্বয়ম্ভুজ্যোতিরূপ বা আদিবুদ্ধের মন্দির তৈরি করেন। উত্তর দেশীয় বৌদ্ধদের ইনি ঈশ্বর। কাঠমণ্ডু থেকে ১·৫ মাইল মত পশ্চিমে। গুহ্যেশ্বরী মন্দিরও মঞ্জুশ্রী নির্মাণ করেন। গুহ্যেশ্বরী হচ্ছেন ব্রাহ্মণ্য দর্শনের প্রকৃতি যেন। শুষ্ক হ্রদ এলাকার নাম দেন নেপাল। প্রথমে এখানে মহাচীন থেকে লোক এসে বসবাস করে। পরে রাজা প্রচণ্ড দেবের সময় গৌড় থেকে এখানে লোক আসে।

নেপাল—দিগ্বিজয়ের সময় কর্ণ নেপাল আক্রমণ করেছিলেন। দ্রঃ- কাঠমণ্ডু।

নেমি—দশরথ (দ্রঃ)।

নেমিচক্র—হস্তিনাপুরে এক রাজা। যমুনার বন্যায় হস্তিনাপুর এক বার নষ্ট হয়ে যায়; রাজা কৌশাম্বীতে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন।

নেমিনাথ—অরিষ্টনেমি। ২৪ জন তীর্থঙ্করের মধ্যে ২২-শ তীর্থঙ্কর। জন্ম মথুরার কাছে সৌরিপুরে। পিতা সমুদ্র বিজয়, মাতা শিবা। গৌতম গোত্র, ক্ষত্রিয়। ছোট বেলা থেকেই উদাসীন। ভোজরাজ উগ্রসেনের কন্যা রাজীমতীকে বিয়ে করবেন ঠিক হয়। কিন্তু উগ্রসেনের প্রাসাদের কাছে এসে পশুদের আর্তনাদ শুনে বিগলিত হয়ে পড়েন। বিবাহের ভোজের আয়োজনে এগুলিকে বধ করা হবে। নেমিনাথ সঙ্গে সঙ্গে সংসার ত্যাগ করে গিরনারে গিয়ে তপস্যা করেন ও কেবল জ্ঞান লাভ করেন। ভাবী বধূ রাজীমতীও নেমিনাথের পালিয়ে যাবার খবর পেয়ে তাঁর অনুগামিনী হয়েছিলেন। মথুরা শিলালেখে উল্লেখ আছে।

কৃষ্ণের সমকালীন। ইনিও যাদব। জৈন গ্রন্থে কোন সাল-তারিখ দেওয়া নাই।

১০ ধনু দৈর্ঘ্য ; প্রিয় গাছ বেতস। জৈন ধর্ম গ্রন্থে ইনি ও কৃষ্ণ দু জনেরই ১০০০ বছর আয়ু। প্রধান শিষ্য বরদত্ত ও রক্ষিণী। গিরনর পাহাড়ে দেহত্যাগ। বৌদ্ধ পুঁথি ইত্যাদিতে আর একজন অরিষ্টনেমি আছেন ; দুজনে এক কিনা কোন প্রমাণ নাই। অরিষ্টনেমি আদৌ ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা কোন হদিস মেলে না।

নেলক্যণ্ড—ত্রিবাঙ্কুরে কোট্টায়াম। টলেমির নেলকিণ্ড। মালাবার উপকূলে নীলেশ্বরম্ যেন। অন্য মতে নলকালিকা (ব্র-পু) বা নলকানন (মহাভা)।

নৈগমেয়—নৈগমেষ। দ্রঃ- কার্তিকেয়। অথর্ব বেদে নৈগমেষ এক জন ক্রূরকর্মা রাক্ষস মত।

নৈনিতাল -যুক্তপ্রদেশে। তিন ঋষির হ্রদ।

নৈমিষারণ্য—গোমতী নদীর কাছে পুরাণ প্রসিদ্ধ তপোবন। নিমখারবন বা নিমসর। নিমসর স্টেসনের কাছেই ; সীতাপুর থেকে ২০ মাইল, লক্ষ্ণৌ থেকে ৫ মাইল উ-পশ্চিমে। গোমতীর বাম তীরে। এই বনে গোমতীর তীরে নাগপুর বলে একটি সহর ছিল। ৬০,০০০ মুনি এখানে থাকতেন। বহু পুরাণ এখানেই লিখিত।

উত্তর ভারতে সীতাপুর জেলায় ; বর্তমান নাম নিমসর। গৌরমুখ মুনি বা বিষ্ণু এখানে নিমেষে অসুর সৈন্য পুড়িয়ে ছাই করে ফেলেছিলেন ফলে এই নাম। এই বনে সমবেত ঋষিদের সামনে সৌতি মহাভারত পাঠ করেন। শৌনক মুনি এখানে বার বছর যজ্ঞ করেছিলেন। যজ্ঞে যে সব মুনিরা এসেছিলেন তাঁরা সরস্বতী নদীর তীরে নানা স্থানে কুটিরে বাস করছিলেন। যাঁরা স্থান পান নি তাঁরা পূব দিকে স্থানে স্থানে ছড়িয়ে অবস্থান করতে থাকেন। নদী সরস্বতী এতে দুঃখিত হয়ে ঘুরে আবার পূর্ব গামিনী হন যাতে সমস্ত ঋষিরা তাঁর তীরে বসবাস করতে পারেন। পৃথিবীর সমস্ত তীর্থ এখানে অবস্থিত (মহা ১।৮২।৫৫)। দে-ভাগবতে (১।২।৩২) কাহিনীতে আছে কলিযুগ এগিয়ে আসছে দেখে মুনিরা দল বেঁধে ব্রহ্মার কাছে যান এবং কি করণীয় জানতে চান। ব্রহ্মা তখন মুনিদের সামনে একটি চক্র এনে এটিকে অনুসরণ করতে বলেন। যেখানে গিয়ে চক্র নেমি সংশীর্ণতে সেখানে বাস করলে কলিযুগ স্পর্শ করতে পারবে না। সত্য যুগ আসা পর্যন্ত অনায়াসে এইখানে মুনিরা থাকতে পারবেন। চক্রটি তার পর নৈমিষারণ্যে এসে পড়ে এবং এখানে নেমি গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায়। দ্রঃ- দুর্জয়, কেকরলোহিত।

নৈরঞ্জন—নিশ্চীরা (দ্রঃ)। নদীর পশ্চিমে এবং কাছেই বুদ্ধগয়া। হাজারিবাগ জেলাতে সিমেরিয়ার কাছে নৈরঞ্জনার উৎপত্তি।

নৈরাত্মা—অক্ষোভ্য (দ্রঃ) কুল। বজ্রবারাহী মত বর্ণনা ; বাহন শব ; শব উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। নৈরাত্মার বাহন পাশে ফিরে। বজ্রবারাহীর ডান কানের কাছে একটা উঁচু আব মত ; নৈরাত্মার নাই। বাকি সব দিকে মিল। অর্দ্ধ পর্যঙ্ক নাট্যস্থিতা। বর্ণ নীল, একমুখ, ঊর্দ্ধ পিঙ্গলকেশ, করালদংষ্ট্রা, লোলজিহ্বা, আয়ুধ কর্ত্তরি, কপাল, খট্বাঙ্গ। রক্তবর্তুল ত্রিনেত্র এবং পঞ্চমুদ্রা বিভূষিত।

নৈরাত্মা অর্থে আত্মা নয় ঃ নির্বাণ লাভ করে বোধিসত্ত্ব এই নৈরাত্মা বা শূন্যে লীন হয়ে যান। শূন্যের প্রতিমূর্তি এই নৈরাত্মা।

নৌকা—নৌকার ব্যবহারে ভারত বিশেষ দক্ষতা লাভ করেছিল। মহেন-জো-দড়োর ধ্বংসাবশেষে, অজণ্টার গুহামন্দিরে ও সাঁচির স্তূপগাত্রে নৌকা আঁকা আছে। জাভাতে বোরোবুদুর মন্দিরে ভারতীয় নৌকার রূপায়ণ রয়েছে। যুক্তি কল্পতরু ও বৃক্ষ আয়ুর্বেদে নৌকার শ্রেণীবিভাগ, নৌকার অলংকরণ, এবং যাত্রীদের সুখ সুবিধা বিধানের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।

ন্যগ্রোধ—উগ্রসেনের এক ছেলে। কংস মারা গেলে ইনি যুদ্ধ করেন এবং বলরামের হাতে মৃত্যু হয়।

ন্যগ্রোধ পরিমণ্ডলা—স্তনৌ সুকঠিনৌ যস্যাঃ নিতম্বে চ বিশালতা, মধ্যে ক্ষীণা ভবেৎ যা সা ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলা।

ন্যস—ন্যসত্ত। নগর=ডিয়োনিসোপোলিস=নগরহার (দ্রঃ) ; কাবুল নদীর উত্তর এবং হস্ত নগর থেকে ২-লিগ নীচে।

ন্যায়—যা দিয়ে বাদীর বিবক্ষিত অর্থের সিদ্ধি বা নিশ্চয়কে লাভ করা যায়। ন্যায় প্রতিপাদক শাস্ত্র ও ন্যায় বা প্রমাণ-শাস্ত্র নামে অভিহিত। পরার্থ অনুমান ও তজ্জন্য প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়ব বাক্যগুলিই ন্যায়। এই পঞ্চাবয়ব বাক্যগুলি=প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয়ন ও নিগমন। ন্যায়ে প্রতিপাদ্যাদি ১৬টি পদার্থ ঃ—প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান। প্রত্যক্ষ লব্ধ জ্ঞান ও শাস্ত্রোক্ত জ্ঞান সংগ্রহের পর অনুমান, প্রমাণ, ও যুক্তি সাপেক্ষ মননই এই অন্বীক্ষা। অন্বীক্ষা শাস্ত্রের নাম আন্বীক্ষিকী। ন্যায় মতে প্রমেয় ১২-টি ঃ—আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ ও অপবর্গ।

গৌতম কৃত ন্যায়শাস্ত্র ও বাৎস্যায়নাদি ভাষ্য ও টীকাদি প্রাচীন ন্যায় গ্রন্থ। গঙ্গেশ উপাধ্যায় ও পক্ষধর মিশ্র ইত্যাদির যুক্তি ধারাকে নব্য ন্যায় বলা হয়। ন্যায় মতে জ্ঞান দু রকম অনুভূতি ও স্মৃতি। অনুভূতি প্রকৃষ্ট জ্ঞান বা প্রমা ; স্মৃতি প্রকৃষ্ট জ্ঞান নয়। যে জিনিস প্রকৃষ্ট অনুভূতি ঘটায় সেই জিনিসই প্রমাণ। গৌতম মতে প্রমাণ চতুর্বিধ ঃ—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দপ্রমাণ। প্রত্যক্ষ অর্থে প্রতি অক্ষ (=যে কোন ইন্দ্রিয় বা মন)। প্রত্যক্ষ দু রকম ঃ—লৌকিক ও অলৌকিক প্রত্যক্ষ। আর এক হিসাবে প্রত্যক্ষ জ্ঞান দু রকম ঃ—নির্বিকল্প ও সবিকল্প। অনুমান প্রমাণ তিন রকম ঃ—পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট।

গৌতম ও কণাদের ন্যায় এবং বৈশেষিক দর্শনকে অবলম্বন করে মোটামুটি ১৪-শ খৃ-শতকে প্রথমে মহামতি গঙ্গেশ (মিথিলাতে জন্ম) নব্যন্যায়ের প্রবর্তন করেন। গঙ্গেশ প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের মধ্যে কেবল প্রমাণকে মেনে নিয়েছেন। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চারটি প্রমাণ নিয়ে চার খণ্ডে রচিত গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থ। তত্ত্বচিন্তামণিতে অধ্যাত্ম তত্ত্ব অংশ অতি অল্প। দ্রঃ- ন্যায়দর্শন।

ন্যায় অজাকৃপাণীয়—স্তম্ভে ছাগল নিজের পা ঘসতে গিয়ে স্তম্ভে আলগা ভাবে বাঁধা কৃপাণ পড়ে গিয়ে ছাগলের মৃত্যু। নিজের হাতে নিজের বিনাশ।

ন্যায় অন্ধগোলাঙ্গুল—এক অন্ধকে এক জন শঠ একটি গরুর লেজ ধরিয়ে দিয়ে বলে গরুটি তাকে গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দেবে; সে যেন লেজ না ছাড়ে। ফলে অন্ধকে গোরুর পেছু পেছু যেতে যে বিপদে পড়তে হয়। শঠের হাতে সরল মানুষের প্রতারণা।

ন্যায় অন্ধদর্পণ—অন্ধের কাছে দর্পণ নিষ্ফল। তেমনি অজ্ঞের কাছে শাস্ত্রও নিষ্ফল।

ন্যায় অন্ধপঙ্গু—অন্ধের কাঁধে পঙ্গু উঠে বসে পারস্পরিক সহযোগিতা।

ন্যায় অন্ধপরম্পরা—এক অন্ধ দুধকে কালো বলতে দ্বিতীয় অন্ধ কথাটা মেনে নিল। দ্বিতীয় অন্ধ থেকে তৃতীয় অন্ধে এই ভাবে ভ্রান্ত ধারণা ছড়িয়ে পড়া।

ন্যায় অন্ধহস্তী—কতকগুলি অন্ধ, হস্তীর স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে কেউ বলে হস্তী শুণ্ডের মত দেখতে ইত্যাদি। অংশত দৃষ্ট খণ্ড ধারণা।

ন্যায় অরণ্যরোদন—জনশূন্য অরণ্যে রোদন নিষ্ফল।

ন্যায় অরুন্ধতীদর্শন—যে কোন একটি নক্ষত্র দেখিয়ে ক্রমশ দৃষ্টিকে অরুন্ধতীতে নিয়ে আসা। ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়া।

ন্যায় অর্দ্ধজরতী—চুল পাকেনি অথচ স্তন গলিত এ রকম স্ত্রী। প্রয়োজন কিছু সিদ্ধ কিছু অসিদ্ধ থাকা অবস্থা। এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ তার গরুটিকে বিক্রয়ার্থে হাটে নিয়ে যান। বয়স হলে অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতা আসে চিন্তা করে ব্রাহ্মণ তার গরুটিকে প্রাচীনা বলে বিক্রি করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু এর ফলে বিক্রি হয় না। তখন এক ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে বোঝান নবীনা ও এক বিয়ানী বলতে। ব্রাহ্মণ দু রকম কথা বলতে সম্মত হন না। স্থির করেন অর্দ্ধজরতী অর্দ্ধনবীনা বলবেন।

ন্যায় অশোকবনিকা—অশোক বনে ছায়া, সৌরভ ফল, ফুল সব পাওয়া যায়। তবু অন্যত্র যাবার ইচ্ছা।

ন্যায় অশ্বতরীগর্ভ—অশ্বতরীর গর্ভ তার মৃত্যুর কারণ হয়।

ন্যায় অশ্মলোষ্ট—লোহা তুলার চেয়ে কঠিন কিন্তু পাথরের চেয়ে নরম। অর্থাৎ নীচের সহিত তুলনায় যে উচ্চ সে আবার অপরের তুলনায় নীচ।

ন্যায় অহিনকুল—নিত্য শত্রুতার উদাহরণ।

ন্যায় উষ্ট্রকণ্টক ভক্ষণ—উটেরা কণ্টক যুক্ত পত্র খায়। অভীষ্টলাভে প্রচুর কষ্ট পাওয়া।

ন্যায় কদম্বগোলক—কদম্বের মত সমস্ত অংশের এক সঙ্গে উদ্‌গম হওয়া। সবগুলি ঘটনার যুগপৎ সমাবেশ।

ন্যায় করকঙ্কন—করে অবস্থিত কঙ্কন মত। অন্যত্র রক্ষিত নয়।

ন্যায় কাকতালীয়—গাছ থেকে খসে পড়া তালের আঘাতে বৃক্ষমূলে অবস্থিত কাকের মৃত্যুরূপ অভাবনীয় যোগাযোগ।

ন্যায় কাকদন্তপরীক্ষা—কাকের দাঁত নাই জেনেও পরীক্ষা করতে যাওয়ার অনুরূপ চেষ্টা

ন্যায় কাকাক্ষিগোলক—প্রবাদ কাকের একটি অক্ষিগোলক। প্রয়োজন মত দুটি চোখেই এই গোলক স্থানান্তরিত করে কাজ চালায়।

ন্যায় কূপমণ্ডূক—কূপের ব্যাঙ। বাইরে সংসারের অভিজ্ঞতাহীন।

ন্যায় কূপযন্ত্রঘটিকা—কূপযন্ত্রে ঘটিকাগুলি এক বার খালি হয় আবার ভর্তি হয়। জীবনে এই রকম পূর্ণতা ও শূন্যতার মালা।

ন্যায় কূর্মাঙ্গ—কচ্ছপের প্রত্যঙ্গ দেহের মধ্যে ঢুকিয়ে নিলেও সেগুলি রয়েছে; কেবল বাহ্যত অদৃশ্য।

ন্যায় কৈমুতিক—পূর্ববর্তী বাক্য বা শব্দের দ্বারা পরবর্তী অংশের অর্থ সমর্থিত হওয়া।

ন্যায় খলকপোত—বৃদ্ধ, শিশু, যুবা সকলের এক সঙ্গে খলে (অর্থাৎ শস্য মাড়ার স্থানে) যুগপৎ এসে পড়া।

ন্যায় গড্ডালিকাপ্রবাহ—মেষ যূথের এগিয়ে যাওয়া। সামনের পশুগুলি বিপদে পড়লেও পেছনের পশুগুলি নির্বিচারে সেই পথেই এগিয়ে যায়।

ন্যায় গোবলীবর্দ—বলীবর্দও গরু। কিন্তু তবু পূর্ববর্তী গো শব্দ অর্থ প্রকাশে যেন কিছুটা সাহায্য করছে।

ন্যায় ঘট্টকুটীপ্রভাত—খেয়াঘাটে পয়সা দেবার ভয়ে অন্য পথে সারারাত ঘোরাফেরা করে প্রভাতে আবার সেই ঘাটে এসে হাজির হওয়া।

ন্যায় ঘুণাক্ষরে—ঘুণ কাঠে ছিদ্র করে; সেই ছিদ্র রেখা অক্ষর মত হলেও হতে পারে।

ন্যায় তক্রকৌণ্ডিন্য—সকল ব্রাহ্মণকে দই দাও এবং কৌণ্ডিন্য ব্রাহ্মণকে ঘোল দাও এই রকম ব্যবহার।

ন্যায় তৃণজলৌকা—তৃণজলৌকা (জোঁক) তৃণান্তর গ্রহণ করে পূর্বাশ্রিত তৃণ ত্যাগ করে। তেমনি মানুষ কর্মানুসারে পর জন্ম সৃষ্টি করে ইহ জন্ম ত্যাগ করে।

ন্যায় দগ্ধপট/পত্র—পুড়ে যাওয়া পট বা পত্রের আকার বোঝা গেলেও কোন কার্য সাধিত হয় না।

ন্যায় দণ্ডাপূপ—ইঁদুর দণ্ড খেয়ে ফেলেছে অর্থে দণ্ড সংলগ্ন পিষ্টকও খেয়েছে বুঝতে হবে।

ন্যায় দর্শন—অক্ষপাদ গৌতম রচিত। অন্য মতে দীর্ঘতমা ঋষি রচিত। ৫-টি অধ্যায়ে ১০ আহ্নিকে বিভক্ত। ৫৩৮ টি সূত্র। কি ভাবে অনুকূল ও প্রতিকূল তর্কের দ্বারা জ্ঞান বিশুদ্ধ ও ভ্রমশূন্য হয় তাই এর প্রতিপাদ্য।

ন্যায় দেহলীদীপ—চৌকাঠের দীপ; ঘরের ভেতর ও বাইরে আলোকিত করে।

ন্যায় নষ্টাশ্বদগ্ধরথ—একের ঘোড়া গেল অন্যের রথ গেল। দুজনে তখন একের রথ ও অন্যের ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে যায়।

ন্যায় পঙ্কপ্রক্ষালন—পাঁক ঘেঁটে হাত পা ধোয়ার চেয়ে পাঁক না ঘাঁটাই ভাল।

ন্যায় পিষ্টপেষণ—পিষ্ট দ্রব্যের আবার পেষণ। নিরর্থক অনুষ্ঠান বা অত্যাচার।

ন্যায় বধ্যঘাতক—বধ্য ও ঘাতক একত্রে অবস্থান করে না। এদের সম্পর্ক।

ন্যায় বহ্নিধূম—যেখানে ধোঁয়া সেখানে আগুন আছে। সম্বন্ধ সূচকতা।

ন্যায় বিষকৃমি—বিষে জাত কৃমি বিষকে সহ্য করতে পারে।

ন্যায় বিষবৃক্ষ—নিজে পুঁতলেও বিষবৃক্ষ কেটে ফেলা উচিত নয়। নিজের অর্জিত বিষয় নষ্ট করা অনুচিত।

ন্যায় বীজাঙ্কুর—বীজ থেকে অঙ্কুর এবং অঙ্কুর থেকে আবার বীজ। অর্থাৎ বীজ ও অঙ্কুর উভয়ই কার্য ও কারণ।

ন্যায়বৃদ্ধকুমারীবাক্য—বৃদ্ধ কুমারী বর চায় তার ছেলেরা যেন সোনার থালায় দুধভাত খেতে পায়। অর্থাৎ একই বরে স্বামী, পুত্র, সম্পত্তি লাভ।

ন্যায় মণ্ডূকপ্লুতি—বেঙের মত লাফিয়ে যাওয়া। কোন কিছুকে বাদ দিয়ে ডিঙিয়ে যাওয়া।

ন্যায় লাজবন্ধন—কোন স্তম্ভের কাছে বসে থাকা কোন ক্ষুধিত ব্যক্তি স্তম্ভের দু পাশ দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়ে অঞ্জলি ভরে তাড়াতাড়ি খই ভিক্ষা নেয়, কিন্তু খেতে পারা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

ন্যায় লৌহচুম্বক—নিশ্চল চুম্বক যেমন লোহাকে টেনে নেয় তেমনি কাজ করা।

ন্যায় শতপত্রভেদ—পদ্মের শত সংখ্যক দল পরপর রেখে সূচ দিয়ে বিদ্ধ করলে যুগপৎ দল গুলি বিদ্ধ হয়েছে মনে হলেও সবগুলি কিন্তু বিদ্ধ হয় না।

ন্যায় শ্যেনকপোত—শ্যেনের আকস্মিক আক্রমণ রূপ আকস্মিক দুর্ঘটনা।

ন্যায় সিংহাবলোকন—প্রসিদ্ধি সিংহ যে কোন পশু শিকার করে মাথা ঘুরিয়ে সামনে পেছনে দেখে নেয়।

ন্যায় সূচীকটাহ—প্রথমে অল্পব্যায় সাধ্য সূচী নির্মাণ করে বহুব্যায় সাধ্য কটাহ নির্মাণ বিধেয়।

ন্যায় স্থালীপুলাক—স্থালীতে একটি তণ্ডুল সিদ্ধ হয়েছে দেখার ন্যায় একটি বস্তু থেকে সবগুলির অবস্থা জানতে পারা।

ন্যায় স্থূণানিখনন—গৃহের স্থূণাকে (খুঁটি) নিখনন দ্বারা শক্ত করার মত।

ন্যায় স্ফটিকলৌহিত্য—জবা ফুলের সান্নিধ্যে স্ফটিক লাল দেখায়। এই রূপে অপরের গুণে গুণান্বিত হওয়া বা দেখান।